রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

প্রবাসী

সূচীপত্র

বৈশাখ—আশ্বিন

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

বিষয়-সূচী

বিবিধ প্রসঙ্গ

চিত্র-সূচী

রঙীন চিত্র

একবর্ণ চিত্র

সংকীর্তন

শ্রীসতীন্দ্রনাথ লাহা

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জন্ম : ২৫শে বৈশাখ, ১২৬৮ (৭ই মে, ১৮৬১)

মৃত্যু : ২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮ (৭ই আগস্ট ১৯৪১)

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৩শ ভাগ
১ম খণ্ড } বৈশাখ, ১৩৬০ { ১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

নববর্ষ

আজ পুরাতন বর্ষের শেষ দিন। অনেক ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়া এই বৎসর গিয়াছে, সে সকলের পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। শুধু যা বিধাতার কৃপায় গত বৎসর সুবৃষ্টি হওয়ায় মোটের উপর দেশের লোক অন্নকষ্টে আরও ক্লিষ্ট হয় নাই। তাহা সত্ত্বেও দেশের লোকের কষ্ট লাঘব হওয়ার কোনও চিহ্ন এতদিন প্রকাশ পায় নাই। বরঞ্চ দেশের আবহাওয়া আরও অভাব-অভিযোগে বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

পশ্চিম বাংলার অবস্থার বিচার নানাদিক দিয়া করা হয়, কিন্তু পশ্চিম বাংলার প্রকৃত অধিবাসীদিগের বিষয় সাধারণ খবরে বিশেষ কিছুই থাকে না। অল্প যাহা পাওয়া যায় তাহাতে বুঝা যায় যে, দেশের লোক ধ্বংসের পথেই চলিয়াছে।

পশ্চিম বাংলার বাঙালীর জমিজমা ও পৈতৃক বাস্তু বিক্রয় ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯৫০ সনে ঐরূপ সম্পত্তি বিক্রয়ের সংখ্যা ছিল ৩৪৯৮০৪ এবং তাহার মূল্য ছিল ২৬,১৮,৫৩,২৭১ টাকা। ১৯৫১ সনে তাহা দাঁড়ায় সংখ্যায় ৪৬৬,৬৬৪ এবং তাহার মূল্য হয় ৩৩,৯১,৭৭,৪২৬ টাকা। ১৯৫২ সনের পুরা হিসাব এখনও হয় নাই, কিন্তু যাহা বুঝা যায় তাহাতে বিক্রীত সম্পত্তির পরিমাণ আরও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং দেশের সন্তান প্রকৃতপক্ষে যাহারা তাহাদের দুর্দ্দশা কোন্ সীমায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। জেলা হিসাবে ১৯৫১ সনে দেখা যায়, ২৪ পরগণায় ১০১৩৭৯টি সম্পত্তি ঐরূপে বিক্রীত হয় যাহার মূল্য ছিল ৯,৬৪,৭৩,৫৩৫ টাকা। ইহার প্রায় সবই ঋণের দায়ে বা গ্রাসাচ্ছাদনের চেষ্টায় বিক্রয় হয়, সুতরাং ঐ জেলার অর্থনৈতিক অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

তাহার পরই মেদিনীপুর। ওখানে ১৯৫১ সনে ৮৩৯২৫টি সম্পত্তি বিক্রয় হয় যাহার মূল্য ছিল ৪,০৪,৯১,৬৪৬ টাকা। তাহার পর মুর্শিদাবাদ, মালদহ, নদীয়া ইত্যাদি জেলা আসে।

পৈতৃক সম্পত্তি ও বাস্তু এইরূপে বিক্রয়ের একমাত্র কারণ অবস্থার নিদারুণ বিপর্যয়। ২৪ পরগণার মত একটি জেলায় লক্ষাধিক পরিবার যদি ঐরূপে প্রতি বৎসর সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পথে দাঁড়ায় তবে দেশ কিরূপ দ্রুত গতিতে ধ্বংসের পথে চলিতেছে তাহা সবিশেষ বুঝাইবার প্রয়োজন আছে কি?

আমাদের কলিকাতাস্থ বিতর্কাগারদ্বয়ে যাহা চলিতেছে তাহার সহিত দেশের বাস্তব অবস্থার বিশেষ যোগ আছে মনে হয় না। জেলা-মফস্বল অঞ্চলের প্রতিনিধিবর্গ সকলেই প্রায় এক একটি দলের খোঁয়াড়ে প্রবেশ করিয়া বসিয়া আছেন। তাহার পর ঘণ্টা বাজিলে খেলার মাঠের প্রতিযোগিতার মত দুই পক্ষ তাল ঠুকিয়া আসরে নামেন এবং দলপতির নির্দ্দেশ অনুসারে বিপক্ষের বাজীমাতের চেষ্টা দেখেন। অথচ নামে ইঁহারা সকলেই পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি এবং নির্ব্বাচনকালে সকলেই স্ব স্ব অঞ্চলকে ভূস্বর্গে পরিণত করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। কার্য্যোদ্ধার হইবার পর দেশের কথা ভুলিয়া ইঁহারা সকলেই নিজস্ব বা দলগত স্বার্থের চিন্তাতেই রহিয়াছেন।

দেশের শাসনতন্ত্র তো এখন প্রায় একনায়কত্বে পরিণত। যে স্থবির-চূড়ামণি এখন নায়ক তিনি পশ্চিমবঙ্গ বলিতে বুঝেন কলিকাতা ও শহরতলী এবং দেশবাসী বলিতে বুঝেন ভিন্নপ্রদেশীয় নাগরিক ও উদ্বাস্তু। সুতরাং পশ্চিম বাংলার সন্তানের আশা-ভরসা কিছুই সেখানে নাই।

তবে নববর্ষে দেশের ভবিষ্যতে আলোকরশ্মি দেখা দিবার অবকাশ কোথায়? অবকাশ দেশের লোকের মনে, যেখানে সকল উদ্যম, সকল আশার আকর।

যদি ১৩৬০ সালে দেশের লোকের মধ্যে চেতনার সঞ্চার হয়; যদি ব্যর্থতার অবসাদ দূর করিয়া নূতন বৎসরে নব উদ্যমে তাহারা স্বকীয় শক্তিতে নিজের ও দেশের পরিত্রাণের পথ সুগম করিতে বদ্ধপরিকর হয়, তবেই ভরসা আছে, নচেৎ নহে। পশ্চিম বাংলার সন্তান যেদিন বুঝিবে যে সে উদ্দাম ভাবের উচ্ছ্বাসে তাহার ভূত ও ভবিষ্যৎ সবই খোয়াইতে বসিয়াছে এবং বর্ত্তমানের কঠোর সমস্যাপূর্ণ বাস্তবকে ফাঁকি দিয়া এড়াইবার উপায় নাই, সেদিন হয়ত তাহার চেতনার সঞ্চার হইবে।

বাংলার বাহিরে যেদিকে দেখি সকলেই নূতন উদ্যমে নিজের ভবিষ্যৎ নিজ হস্তে গড়িতে চেষ্টিত। বাঙালী ভিন্ন অন্য সকল সম্প্রদায়ের উদ্বাস্তুর ক্ষেত্রেও তাহাই ঠিক। আমাদের পাঁচ বৎসরের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় আমরা দেখিয়াছি পঞ্জাবী, সিন্ধী, সীমান্তপ্রদেশীয় ও বাহাওয়ালপুরী উদ্বাস্তুর দল সক্রিয়ভাবে নিজেদের উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছে এবং তাহাদের অধিকাংশ বেশ কিছু সাফল্যলাভও করিয়াছে। তাহারা কোন দলের ক্রীড়াকন্দুক হইতে রাজী হয় নাই বা অলীক প্রলোভনে প্রতারিত হইয়া বাস্তুঘুঘুর শিকারও হয় নাই। একথা বলা ভুল হইবে যে, তাহাদের সকল সমস্যার সমাধান হইয়াছে বা তাহারা পূর্ব্বেকার সম্বিতের দশমাংশও ফিরিয়া পাইয়াছে। কিন্তু একথা নিশ্চয় বলা চলে যে তাহাদের দৈহিক, নৈতিক ও মানসিক অধোগতি রুদ্ধ হইয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে অনেকেই নূতন জীবনের পথে অগ্রগামী হইয়াছে। বাঙালী উদ্বাস্তু সে হিসাবে বহু বহু পিছনে, এবং তাহার কারণ সে মরীচিকার পিছনে ছুটিয়া সর্ব্বস্ব খোয়াইতেছে।

নববর্ষে বহির্জগতে নূতন আলোর রেখা দেখা দিয়াছে। জানি না তাহা আলোক কি আলেয়া, কিন্তু যাহাই হউক ভবিষ্যতের অন্ধকার যেন কিছু স্বচ্ছ মনে হইতেছে। বিশেষতঃ দেখিতেছি যাহারা যুদ্ধের আশায়, অন্যের সর্ব্বনাশে নিজেদের স্বার্থপূর্ত্তির চিন্তায় উৎসুক ও উদগ্রীব হইয়া এতদিন ছিলেন, তাঁহারাও যেন ব্যর্থকাম ও বিমনা হইয়াছেন। ষ্টক্ এক্সচেঞ্জে, চোরাবাজারে, এদেশে ও বিদেশে, মন্দার ভাটা পড়িতেছে তাহাও দেখিতেছি, সুতরাং ভয়ে ভয়ে বলি, হয়ত সুদিন আসিতেও পারে। আমাদের দেশ প্রত্যেক যুদ্ধেই নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, লক্ষ লক্ষ পরিবার কোটি কোটি দরিদ্র মানব সর্ব্বস্ব হারাইয়াছে, পেট মোটা হইয়াছে সেই শিবাদলের, যাহাদের মরণেই ছিল দেশের মঙ্গল। দুই মহাযুদ্ধে সারা জগতের যে নৈতিক অবনতি হইয়াছে তাহা পূর্ণ এক শতাব্দীর শান্তিতেও উদ্ধার হইবে কি না সন্দেহ। ভারতে ও বাংলায় তো ইহাতে ঐরূপ যা ক্ষতি হইয়াছে তাহার পূর্ণ অনুমানও অসম্ভব। সুতরাং আমাদের কাছে যুদ্ধ মানেই অমঙ্গল।

কিন্তু যদিও ঘরে ও বাহিরে শান্তি আমাদের একান্তই কাম্য তাহা সত্ত্বেও ক্লৈব্যপ্রাপ্তি বাঞ্ছনীয় নহে। যদি দেখা যায় যে দেশের ও দশের ভবিষ্যৎ ক্রমেই ম্লান হইতে ম্লানতর হইয়া চলিতেছে তবে বর্ত্তমানে অবিমিশ্র অমঙ্গলকেও বরণ করিয়া আমাদের প্রতিকারের চেষ্টা দেখিতেই হইবে। যদি কেহ আমাদের শত্রুতা করিতে বদ্ধপরিকর হয় তবে তাহাকে বুঝিতে দিতে হইবে যে শস্ত্রবলে শস্ত্ররোধ করিতে আমরাও সমর্থ।

যেরূপ দিনকাল আসিয়াছে তাহাতে ঘরের শত্রু ও বাহিরের শত্রু সকলেই আমাদের ক্ষীণ জ্ঞানে পীড়ন করিতে উদ্যত এবং মৌন কণ্ঠে অপমান ও আঘাত গ্রহণে পশ্চিম বাংলার বাঙালী আজ জগতের সেরা, প্রায় জড়ভরত তুল্য। ইহা অহিংসব্রতীর ধৈর্য্য নহে, ইহা মৃত্যুঞ্জয়ী ক্ষত্রিয়ের শৌর্য্য নহে, ইহা ক্লীবত্ব।

এই ক্লীবত্বের অপবাদ গত যুদ্ধে আংশিক ভাবে দূর করিয়াছিল কয়েক সহস্র শিক্ষিত বাঙালী যুবক, যাহারা বিমানবাহিনী, গোলন্দাজ ও অন্যান্য সামরিক বিভাগে কৃতিত্বের সহিত অফিসারের কার্য্য চালায়। বর্ত্তমানে সে গৌরবও ম্লান হইতে চলিয়াছে। শুধু 'যুদ্ধ চাই' চিৎকারে বীরত্ব প্রকাশ পায় না।

পরমৈপদী সর্ব্বোদ্ধার করিতে গিয়া আমাদের যথাসর্ব্বস্ব তো পরহস্তগত হইতে চলিয়াছে। কেবলমাত্র শ্লোগানের চীৎকার বা দলবদ্ধভাবে অভিযোগ-অনুযোগে কি ফল প্রাপ্তি হয় তাহাও তো আমরা বিগত পাঁচ বৎসরে দেখিলাম। এখন আমাদের প্রয়োজন এক ঘরোয়া পাঁচসালা পরিকল্পনার, যাহাতে শ্রমের বদলে পারিশ্রমিক আসিবে ও প্রয়াসের পরিবর্ত্তে সম্বিৎ ফিরিবে।

পাবলিক সার্ভিস কমিশন

"পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সোমবার বিরোধী পক্ষ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ এবং উহার কর্ম্মনীতি সম্পর্কে সরকারকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেন।

এগার দিন বিরতির পর বিধানসভা সোমবার পুনরায় সম্মিলিত হইলে সভার সম্মুখে পশ্চিমবঙ্গের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ১৯৫০-'৫১ সনের কার্য্যবিবরণী পেশ করা হয়। এই কার্য্যবিবরণী আলোচনা করিবার জন্য শ্রীবঙ্কিম মুখোপাধ্যায় একটি বেসরকারী প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া সভাকে কার্য্যবিবরণীটি অস্বীকার করিতে বলেন। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় এবং প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় কমিশনের সমালোচনায় নেতৃত্ব করেন। তাঁহারা বলেন যে, প্রথম হইতেই মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিয়া উহাকে সরকারের পক্ষপুটে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং ইহাতে গণতন্ত্রের কাঠামোকেই বিপন্ন করা হইয়াছে। তাঁহারা অভিযোগ করেন যে, কমিশনের রিপোর্ট হইতে "উহার যে চরিত্র প্রকাশ পাইয়াছে তাহা মর্য্যাদাহীন এবং সরকারের তাঁবেদার।"

বিরোধী পক্ষ মনে করেন, "বর্ত্তমান কমিশনের সদস্যদের যদি কোন যোগ্যতা থাকে, তবে তাহা সরকারের মন জোগাইয়া চলার যোগ্যতা মাত্র।"

শ্রীযুক্ত মুখার্জি বলেন, "এই সম্ভ্রমহীন কমিশনকে অবিলম্বে অপসারিত করা প্রয়োজন।"

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় বিরোধী পক্ষের সমালোচনার উত্তরে এই মর্ম্মে বলেন যে, তাঁহারা কমিশনের সহিত সম্পূর্ণ সংবিধানসঙ্গত সম্পর্ক রক্ষা করিতেছেন এবং কোথাও কমিশনের ক্ষমতা খর্ব্ব করার চেষ্টা হয় নাই। কমিশনের বর্ত্তমান সদস্যদের যোগ্যতা সম্পর্কে অভিযোগ তিনি দৃঢ়তার সহিত অস্বীকার করেন। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অধিকার কতখানি ও উহার নির্দ্দেশ কতখানি বাধ্যতামূলক হইবে, তাহা লইয়া বিরোধীপক্ষ যে প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁহার উত্তরদান প্রসঙ্গে বলেন যে, সংবিধানে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

কমিশনের যেসব পরামর্শ সরকার গ্রহণ করিবেন না সেইসব বিষয়ে বিধানসভাকে জানাইতে হইবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কমিশনের পরামর্শ ছাড়াই রাজ্যপাল সরকারী পদে লোক নিয়োগ করিতে পারিবেন, সংবিধানে এইরূপ ব্যবস্থা রহিয়াছে। ডাঃ রায় বলেন যে, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরামর্শ অনুযায়ী কর্ম্মচারী নিয়োগ করা সরকারের পক্ষে বাধ্যতামূলক নয়। ইহা বাধ্যতামূলক হইলে বিসদৃশ অবস্থার সৃষ্টি হইবে, কারণ অন্যদিকে রাজ্যপালকে আবার কমিশনের পরামর্শ ছাড়াই কর্ম্মচারী নিয়োগের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া, তিনি আরও বলেন, "যদি কমিশনের নির্দ্দেশই বাধ্যতামূলক হয় তবে সরকারী কর্ম্মচারীদের উপর একটা দ্বৈত কর্তৃত্বের সৃষ্টি হইবে; একদিকে থাকিবে মন্ত্রিসভা পরিচালিত সরকার, অন্যদিকে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কর্তৃত্বাধীন সরকার। যেহেতু সরকারী কর্ম্মচারীদের কাজের এবং যোগ্যতার জন্য সরকারকেই বিধানসভা ও জনসাধারণের সম্মুখে দায়ী হইতে হইবে, সেইজন্য সরকারী কর্ম্মচারীদের সম্পর্কে সরকারের অধিকার থাকা প্রয়োজন।"

ডাঃ রায়ের যুক্তি খণ্ডনের ভার আমাদের নয়। দেশের লোক যাঁহাদের বিধান সভায় নানা দলের পক্ষে পাঠাইয়াছেন এই কাজ তাঁহাদের। শ্রীযুক্ত হরিপদ চট্টোপাধ্যায় পত্রান্তরে তাঁহার মতামত প্রকাশ করিতেছেন, সুতরাং ব্যাপারটা চাপা পড়ার সম্ভাবনা কম।

আমরা ডাঃ রায়কে শুধু বলিব, তিনি কি পশ্চিম বাংলায় সেই অখ্যাতি রাখিয়া যাইতে চাহেন, যাহা তিনি কু পোষ্যপালন চাটুকারের দোষক্ষালন দ্বারা কলিকাতা 'চোরপোরেশন' ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাখিয়া আসিয়াছেন। স্থবিরের পক্ষে নূতন কিছু দেখা বা শেখা অসম্ভব, কিন্তু ভোটের জোর যাহাই হউক, কর্ত্তব্যজ্ঞান বলিয়া একটা নীতিগত পদার্থ তো আছে? তিনি কুপোষ্য পালন ও দুর্নীতির সাফাই কীর্ত্তন দ্বারা দেশকে কোন্ বিপদের মধ্যে লইয়া যাইতেছেন, সে বিষয়ে চেতনা হওয়া কি অসম্ভব? চিকিৎসকরূপে খ্যাতি তাঁহার ভারতময়, কর্ম্মঠ ও শক্তিশালী ব্যক্তি হিসাবে যে খ্যাতি তাঁহার হইয়াছিল, আজ তাহা দিনে দিনে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। তাহার কারণ ঐ চাটুকারবৃন্দ। অথচ তিনি নিজে শিক্ষালাভ করিয়াছেন—কর্পোরেশনের অল্ডারম্যানরূপে শেষবার প্রার্থী হওয়ার সময়—যে, অসময়ে ঐ চাটুকারের দলই কিরূপে শত্রুপক্ষের সহায় হয়। শেষজীবনে কি দেশব্যাপী কুখ্যাতি রাখাটাই শ্রেয়ঃ?

পাবলিক সার্ভিস কমিশন সারা ভারতে অকর্ম্মণ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে ডাঃ রায়ের ন্যায় অধিকারীবর্গের যথেচ্ছাচারে। ইহার প্রমাণ আজ প্রতি পদে পাওয়া যাইতেছে, সুতরাং সাফাই গাহিয়া তাহার শোধন সম্ভব নহে।

পশ্চিমবঙ্গের আয়-ব্যয়

২১শে চৈত্রের 'যুগান্তর' লিখিতেছেন :

"পশ্চিমবঙ্গের একাউণ্টেণ্ট জেনারেল রাজ্য সরকারের আয়-ব্যয়-সমূহ পরীক্ষা করিয়া ১৯৫০-৫১ সালের যে এপ্রোপ্রিয়েশন (অর্থ প্রয়োগ) একাউণ্টস এবং ১৯৫২ সালের যে অডিট রিপোর্ট প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতে সরকারী হিসাবে বহু বেআইনী ব্যয় ও ক্ষতির নিদর্শন উল্লিখিত হইয়াছে।

দুই জন মন্ত্রীর বাড়ীভাড়া বাবদ যে মাসোহারা সরকারী হিসাবে দেখান হইয়াছে তাহাতে একাউণ্টেণ্ট জেনারেল আপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। বেআইনী ব্যয়ের তালিকায়, বিশেষ একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে হিন্দী ও বাংলায় প্রচারপত্র প্রকাশ করিবার জন্য অপর একটি রাজনৈতিক দলকে টাকা দেওয়ার ঘটনা উল্লেখ করা হইয়াছে। যে রাজনৈতিক দলটিকে এই প্রচারপত্রগুলি প্রকাশ করিবার ভার দেওয়া হয় তাহারা প্রচারপত্র নিজেদের নামেই প্রকাশ করেন। অথচ সরকারী অর্থ হইতে উহার ব্যয়ভার বহন করা হয়। একাউণ্টেণ্ট জেনারেলের রিপোর্টে বলা হইয়াছে, কোন রাজনৈতিক দলের নামে যে প্রচারকার্য করা হয় তাহার ব্যয় সরকারী রাজস্ব হইতে বহন করা নীতির দিক হইতে অন্যায় এবং পদ্ধতিটি অভিনব ও অস্বাভাবিক।

'সরকারী পরিবহন' এই শিরোনামায় রিপোর্টে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কয়েকটি বিমান রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত হিসাবের ত্রুটিবিচ্যুতি উল্লিখিত হইয়াছে। দুই জন পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারীর রাহা খরচ (ট্রাভেলিং এলাউয়েন্সেস) এবং তাঁহাদের সরকারী গাড়ী ব্যবহারের হিসাব তুলনামূলকভাবে বিচার করিয়া দেখা গিয়াছে যে, অন্ততঃ সাতটি ক্ষেত্রে যখন রাহা খরচের হিসাব অনুযায়ী তাঁহাদের কলিকাতার বাহিরে থাকার কথা সেই সময় তাঁহারা কলিকাতায় খাদ্য-দপ্তরের সরকারী গাড়ী ব্যবহার করিয়াছেন।

আলোচ্য বৎসরে সরকারী পরিবহন দপ্তরের শতকরা উনচল্লিশটি বাস অকেজো অবস্থায় পড়িয়া থাকিয়াছে এবং রাস্তার মাঝখানে ঘন ঘন খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। ইহার ফলে সরকারী বাসে কুড়ি লক্ষ টাকা আয় হানি ঘটিয়াছে বলিয়া রিপোর্টে উল্লেখ করা হইয়াছে।

রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে যে, কতকগুলি অসুবিধা পূর্ব্বাহ্নে উপলব্ধি না করায় পূর্ত্ত বিভাগ একটি রাস্তা নির্ম্মাণের ব্যাপারে এক

লক্ষ ছিয়াশি হাজার নয় শত চুয়ান্ন টাকা বৃথা ব্যয় করিয়াছেন।"

একাউন্টাণ্ট জেনারেল তো শুধু সেই ভুলত্রুটি ধরিয়াছেন যাহা "লেফাফাদুরস্ত" নহে। যথাযথ ভাবে বাজেটে ধরিয়া পরে ঘুরাইয়া অন্যপথে খরচের তালিকা ইহাতে আসিতে পারে না, চাটুকার পোষণ ও কুপোষ্য পালনের জন্য পদ ও কণ্ট্রাক্ট সৃষ্টি করিয়া গৌরী-সেনের টাকা জলে ঢালাকেও তিনি অপব্যয় বলিতে পারেন না। নেহাৎ পুকুর চুরি বা খাতা লেখায় ভুল বা গাফিলতিই তিনি ধরিয়াছেন। সেটুকুর জন্যও তিনি সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র।

"লেফাফাদুরস্ত" শব্দ ব্যবহারের জন্য কিছু কৈফিয়ৎ দেওয়া হয়ত প্রয়োজন। এই একাউণ্টাণ্ট জেনারেল মহাশয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী গুরুজন-দিগের আমলে—অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসনকালে—"কোন রাজনৈতিক দলের নামে যে প্রচারকার্য্য করা হয় তাহার ব্যয় সরকারী রাজস্ব হইতে বহন করা" নীতির দিক হইতে অন্যায় বা অভিনব ও অস্বাভাবিক পদ্ধতি বলিয়া গণ্য হইত না। কুখ্যাত পর্কল সার-কুলারের পর একটি রাজনৈতিক দল মাসে ১৩৫০০।-১০০০০৲ কয়েক বৎসর পাইয়াছে তাহা সকলেই জানে এবং আর একটি দল লক্ষ লক্ষ টাকা পাইয়াছে, তাহাও সাংবাদিকদিগের মধ্যে প্রাচীন দলস্থ সকলেই জানেন। তবে একটি দেওয়া হইত শ্রমবিভাগের দপ্তর হইতে, অন্যটি কৃষি দপ্তর মারফত। ইহা ছাড়াও প্রত্যেক প্রদেশের ও কেন্দ্রের "হোম" দপ্তর 'খুফিয়া' খরচ বাবদ লক্ষ লক্ষ টাকা ছড়াইয়াছে, কখনও হোম-ডেপুটি সেক্রেটারী মারফত, কখনও পাবলিসিটি ডিপার্টমেণ্ট মারফত।

উদ্বাস্তুবিক্ষোভ ও বিধানসভা

২৭শে চৈত্রের 'যুগান্তর' লিখিতেছেন :

"পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় মঙ্গলবার পাবলিক একাউণ্টস কমিটির রিপোর্ট সম্পর্কিত আলোচনায় বিরোধী দলের তিন জন সদস্য সরকারী হিসাবপত্র এবং কর্মনীতির বিভিন্ন গলদ উল্লেখ করিয়া দীর্ঘ বিতর্কের অবতারণা করিলেও, তাহাতে কোনও উত্তেজনা বা উত্তাপের চিহ্ন সভায় পরিলক্ষিত হয় নাই। বিরোধী দলের বিতর্কের শেষে মুখ্য-মন্ত্রী ডাঃ রায়ের উত্তরদানের প্রাক্কালে কিন্তু সভার একঘেয়ে নিরুত্তাপ আবহাওয়া কাটিয়া গিয়া এক চাঞ্চল্যকর নাটকীয় পরিবেশের সৃষ্টি হয় এবং তাহার পরিণতিতে বিরোধী দলের সদস্যদের সকলেই সভা-কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

সভাকক্ষের বাহিরে উদ্বাস্তুদের বিক্ষোভ প্রদর্শনকে কেন্দ্র করিয়াই এই নাটকীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এই দিন সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদের উদ্যোগে এক বিরাট উদ্বাস্তু মিছিল বিধানসভার দ্বারপ্রান্তে গিয়াছিল মুখ্যমন্ত্রী ও উদ্বাস্তু পুনর্বাসন মন্ত্রীর নিকট নিজেদের অপরিসীম দুঃখদুর্গতির কথা বলিতে এবং অবিলম্বে সুষ্ঠু পুনর্বাসনব্যবস্থা করিবার অনুরোধ জানাইতে। বিরোধী দলের সদস্যরা মুখ্যমন্ত্রী ও উদ্বাস্তু পুনর্বাসন মন্ত্রীকে উদ্বাস্তুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিলে, তাঁহারা তাহাতে সম্মত হন নাই। ইহা লইয়া উভয় দলের মধ্যে তুমুল বাগ্‌বিতণ্ডা ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। বিরোধী দলের সকল সদস্যই সভাকক্ষ ছাড়িয়া চলিয়া যান। ইহার পর মুখ্যমন্ত্রী বিরোধীদলবিহীন, শান্ত শব্দহীন সভায় পাবলিক একাউণ্টস কমিটির রিপোর্ট সম্পর্কে বিরোধী দলের সমালোচনার উত্তর দেন।"

এই 'নাটকীয় পরিস্থিতি'র ফলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তো সহজেই রেহাই পাইয়া গেলেন। অন্য কাহারও কিছু উপকার হইল কি? বিরোধী দলগুলির আত্মপ্রসাদের জন্য বাস্তব কিছু জুটিল কি?

পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যা দিনে দিনে যেরূপ জটিল হইয়া দাঁড়াইতেছে তাহাতে উহার যে কোনও দিন সমাধান হইবে মনে হয় না। ইহার প্রধান কারণ যদিও সরকারী নির্ব্বুদ্ধিতা, ত্রুটি, গাফিলতি ও দৌর্ব্বল্য, তবুও অন্য কারণগুলি কিছু কম নহে।

আজ যে সকল রাজনৈতিক দল বাস্তুঘুঘুদের সহিত একজোট হইয়া এই অভাগা ছিন্নমূল নরনারীদিগকে লইয়া ছিনিমিনি খেলিতেছে, তাহাদের মধ্যে প্রধান দল ভারত-বিভাগ, সেই সঙ্গে বঙ্গ ও পঞ্জাব বিভাগে, সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করিয়াছে। যদিও ভারত-বিভাগের প্রধান দায়িত্ব মুসলীম লীগের, কিন্তু ২৬শে জুলাই ১৯৪২ সনের পর ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির সজোর সমর্থন তাহাতে কিছু কম খেলা খেলে নাই। লোকস্মৃতি অতি ক্ষণস্থায়ী, নহিলে সেইদিন হইতে ভারত-বিভাগ পর্য্যন্ত ঐ দলের মুখপত্রগুলিতে এবং ঐ দলের প্রধানদিগের বক্তৃতায় 'মুসলমান জাতির' স্বাতন্ত্র্যে অধিকার (সেল্‌ফ-ডিটারমিনেশন) সম্পর্কে যে দিনের পর দিন কয়েক বৎসর ধরিয়া সজোর আন্দোলন চলিয়াছিল সেকথা সকলের মনে থাকিত। আজ সেই দলই উদ্বাস্তু উদ্ধারে নাটকীয় পরিস্থিতির রচনা করিয়া ত্রাণকর্ত্তা সাজিতেছেন!

বাংলার উদ্বাস্তু যতদিন তাহার শত্রু ও মিত্রের মধ্যে প্রভেদ না বুঝিবে ততদিন তাহার পরিত্রাণ নাই।

দেশী আদিবাসী ও বিদেশী মিশনরী

কিছুদিন পূর্ব্বে সংবাদপত্রে নিম্নোদ্ধৃত দুইটি সংবাদ কয়েকদিন পরে পরে বাহির হয় :

"কোহিমা, ৩০শে মার্চ্চ—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু অদ্য কোহিমায় এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে নাগাদিগকে যে সকল বহিরাগত দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করিতেছে, তাহাদিগকে দৃঢ়তার সহিত সাবধান করেন। তিনি বলেন, যাহাতে ইহার অবসান ঘটাইবার জন্য সকলেই যত্নবান হন, আমি তাহাই চাই।

"প্রধানমন্ত্রী জনসভায় পৌঁছিবার অল্পকাল পূর্ব্বেই নাগা জাতীয় পরিষদের সমর্থক অধিকাংশ নাগা শ্রোতা সভাস্থল ত্যাগ করে। তাহাদের অভিযোগ এই যে, স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ নাগা জাতীয় পরিষদকে প্রধানমন্ত্রীর নিকটে তাঁহাদের স্মারকলিপি দাখিল করার অনুমতি দেন নাই। ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবেই তাহারা সভাস্থল ত্যাগ করে।

নাগাদের একাংশ যে স্বাধীনতার দাবী করিতেছে, শ্রীনেহরু তাহার নিন্দা করেন এবং বলেন, তাহারা স্বাধীনতা অর্থ যে কি বুঝিতেছে তাহা তিনি জানেন না। তিনি বলেন যে, বর্ত্তমানে সমগ্র দেশই স্বাধীন, কাজেই নাগারাও স্বাধীন।"

"আইজল, ৩রা এপ্রিল—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ এখানে বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে নাগাদের একটি শ্রেণী যে স্বাতন্ত্র্য দাবী করিতেছে, উহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত নয়। এই দাবী কে আরোপিত এবং ভারত স্বাধীনতা লাভ করার দুই-এক বৎসর পূর্ব্বে অপরে তাহাদের দ্বারা এই দাবীটি উত্থাপন করাইয়াছে, সে সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোনই সন্দেহ নাই। এখানে সাংবাদিক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী এই বিবৃতি দেন।

"শ্রীনেহরু কোহিমায় বলিয়াছিলেন যে, নাগারা বাহিরের লোকের প্ররোচনায় স্বাতন্ত্র্য দাবী করিতেছে। বাহিরের লোক বলিতে তিনি কাহাদিগকে বুঝাইতে চাহেন এবং এই দাবীর জন্য ভারত-সরকার মিশনরীদিগকে দোষী করিতেছেন কিনা, জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীনেহরু এই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, মিশনরীরা কয়েকটি পাহাড়িয়া এলাকায় চমৎকার কাজ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক বলিয়া তাঁহারা ভারতীয় সংস্কৃতিকে যথোপযুক্ত মর্য্যাদাসহকারে গ্রহণ করিবেন, ইহা কদাচিৎ আশা করা যায়। ব্রিটিশ শাসনের যুগে এই সকল এলাকা ভারতের অপরাপর অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল। পাহাড়িয়া অঞ্চলে তখন বিদেশী মিশনরী ও সরকারী ব্রিটিশ কর্ম্মচারীরাই উপস্থিত ছিলেন। মিশনরীরা সকলে কেবল চিন্তায়ই অভিন্নহৃদয় ছিলেন না, তাঁহারা সকলে এক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া কাজ করিতেন। তাঁহারা সেবার মনোবৃত্তি লইয়া কাজ করিতেন না, কাজ করিতেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য লইয়া।"

ভারতে দুই-তিন প্রকার মিশনরী আসিয়া থাকেন। অতি অল্প কয়েকজন সেবাধর্ম্ম ও আর্ত্তের পরিত্রাণ মূল লক্ষ্য করিয়া এদেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গী সহচরগণ বিদেশী শাসকদিগের সঙ্গ না লইয়া কুষ্ঠাশ্রম, আতুরাশ্রম, যক্ষ্মারোগীর সেবাশ্রম ইত্যাদি গঠন করিয়া তাঁহাদের প্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণে সেবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইহারা রাষ্ট্রনীতি বা কূটনীতির ধার ধারিতেন না ও সেইজন্য ব্রিটিশ আমলে শাসক ইংরেজগোষ্ঠী ইহাদের বিশেষ নেকনজরে দেখিতেন না। এই সঙ্গে শিক্ষাব্রতী কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত ইংরেজ মিশনরীরও উল্লেখ করা উচিত যাঁহারা তাঁহাদের প্রভুর বার্ত্তা প্রচার ও সাম্রাজ্যবাদ বিস্তার এক বলিয়া মানেন নাই এবং সেইজন্য ব্রিটিশ দমন-নীতির বিরোধিতা করিয়া অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া গিয়াছেন।

পুণ্যশ্লোক দীনবন্ধু এণ্ডরুজ ঐ শ্রেণীর ছিলেন এবং সেইজন্য তাঁহার মৃত্যুর পরও ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর বিরোধিতায় সেন্টপলস গীর্জ্জার কবরস্থানে তাঁহার শেষ শয্যার স্থান হয় নাই। অবশ্য তাহাতে ক্ষতি হইয়াছে সেন্টপলস গীর্জ্জারই।

ঐরূপ অল্পসংখ্যক মিশনরী ভিন্ন যাঁহারা এদেশে আসিয়াছেন তাঁহাদের দৃষ্টিকোণ অপরূপ। তাঁহারা ধর্ম্মপ্রতারকই ছিলেন, ধর্ম্মের নামে সরল অশিক্ষিত জনগণকে দাসত্বের চরম শৃঙ্খলে বাঁধিবার চেষ্টাই ছিল তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। বিদেশে ভারতবাসীদিগের কুৎসাপ্রচারে ইহারা ছিলেন—ও এখনও আছেন—শতমুখ। ব্রিটিশ আমলে ইহারা ছিলেন একাধারে পুলিস, কুলীর আড়কাঠি ও ধর্ম্মযাজক।

আজ দেশ স্বাধীন হওয়ায় এই ঘৃণ্য, নীচ-মনোবৃত্তিযুক্ত প্রতারকদলের ক্ষোভ ও রোষ চরমে উঠিয়াছে। ভারতের শাসনতন্ত্র নেহরুর তত্ত্বাবধানে, সর্দ্দার পাটেলের পরলোকগমনের পরে, যেরূপ নিস্তেজ ও ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইতেছে তাহাতে ইহাদের চক্রান্ত বাড়িবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

পাকিস্থানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি

যুগান্তর লিখিতেছেন, "পাক-প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন আজ উপদলীয় চক্রান্তে পরিবেষ্টিত। রাইফেলের বুলেট আর সঙ্গীনের খোঁচায় আপাততঃ লাহোরকে ঠাণ্ডা করা গিয়াছে মনে হইলেও আসলে লাহোরের 'খুন' আদৌ ঠাণ্ডা হয় নাই। লাহোরবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা ক্ষতস্থলে দাওয়াই প্রয়োগে রত থাকিলেও অন্তরের বিক্ষোভ মোটেই প্রশমিত হয় নাই। এখানে ফিরোজ খাঁ নুন নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন বটে, কিন্তু আইন-পরিষদ আহূত হইলে ইহার পতন অনিবার্য্য বলিয়া পর্য্যবেক্ষক মহলের ধারণা। কারণ পরিষদের সরকার পক্ষের সদস্যদের মন হইতে সেই দিনের সামরিক শাসনের দুষ্ট ক্ষত এখনও শুকাইয়া যায় নাই।"

"খাজা সাহেব স্বয়ং এখানে আসিয়া পরিষদের বিরোধী দলের নেতা মামদোতের খান এবং আরও কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগকে 'জাতির এই দুর্দিনে' সম্মিলিত মন্ত্রিসভা গঠনে সহযোগিতা করিতে অনুরোধ করিলে তাঁহারা 'গণতন্ত্র'-বিরোধী নাজিম-সরকারের সহিত হাত মিলাইতে অসম্মতি জানাইয়াছেন।"

"পঞ্জাব মুস্লিম লীগ শুধু যে খাজা নাজিমুদ্দিনের প্রতি বিরূপ তাহা নহে, বাংলা ও বাঙালীদের প্রতি পঞ্জাব লীগ প্রধানদের বিরূপ মনোভাব আজ আর ঢাকিয়া রাখা যায় না। পাকিস্থান গণপরিষদের মূল নীতি নির্দ্ধারক কমিটির রিপোর্টে পাক পার্লামেন্টে পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিম পাকিস্থানের মধ্যে সমান আসন বণ্টনের সুপারিশ থাকায় তাঁহাদের মনে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়। আহমদিয়া-বিরোধী আন্দোলনের প্রতি ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী মমতাজ দৌলতানার সহানুভূতি এবং বাঙালী নাজিমুদ্দিনের প্রতি বিরূপ মনোভাবই পাক-পঞ্জাবের সকল চক্রান্ত ও রক্ত সঙ্ঘর্ষের মূল কারণ বলিয়া সাধারণ পর্য্যবেক্ষক মহল মনে করিতেছেন।

"ইহার পর গোদের উপর বিষফোঁড়ার ন্যায় খাজা সাহেব সিন্ধুর সেই 'লৌহ মানব' খুরোকে লইয়া বড়ই বেসামাল হইয়া পড়িয়াছেন। পাকিস্থানের 'আব্বা' স্বয়ং জিন্নাজীকে যিনি সব সময়

টেক্কা মারিয়া চলিতেছেন, তিনি যে খাজা সাহেবকে কেয়ার করিবেন, এমন ধারণা করা ভুল হইবে। ইতিমধ্যে সিন্ধুর এককালীন জাতীয়তাবাদী প্রধানমন্ত্রী জনাব জি. এম. সৈয়দ দীর্ঘকালের রাজনৈতিক অজ্ঞাতবাসের পর খুরোর সঙ্গে হাত মিলাইয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

"জনাব সৈয়দ যে সে পাত্র নহেন। তিনিও এককালে জিন্নাহ্জী.ক কম হয়রানি করেন নাই। সিন্ধুর রাজনৈতিক কোন্দলে মতাজ দৌলতানা যে খুরোর প্রতি পঞ্জাব হইতে বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করিয়াছেন, এমন অনুমান ভিত্তিহীন নয়। পঞ্জাবী-সিন্ধী কাস্তের বিরুদ্ধে বাঙালী নাজিমুদ্দিন সাহেব সংগ্রাম পরিচালনা করিয়া কতদিন গদীতে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন বলা কঠিন।

"পাকিস্থানে সাধারণ নির্বাচনের রব উঠিয়াছে। পূর্ববঙ্গে বৎসরের পর বৎসর নির্বাচনের তারিখ পশ্চাদপসরণ করিতেছে। তন নির্বাচনে নূতনত্ব কোথায়? ছয় বৎসর উত্তীর্ণ হইতে চলিয়াছে, তবু স্বাধীন দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নই শেষ হইল না। পূর্ববঙ্গে ক্রমেই সরকারবিরোধী রাজনৈতিক দলের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাইতেছে। মুখ্যমন্ত্রী জনাব নুরুল আমিন কুমিল্লা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চল সফরে গেলে কালোপতাকা সম্বর্দ্ধনা পান। স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, পূর্ববঙ্গের পদ্মার জলেও উদ্বেল তরঙ্গ সৃষ্টি আসন্ন।"

'যুগান্তরে'র লাহোরস্থ খাস সংবাদদাতা যদি সত্যসত্যই দিকের হাওয়া এবং রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের প্রত্যক্ষ নিরিখে পরোক্ত সিদ্ধান্তে আসিয়া থাকেন, তবে পাকিস্থানে দুর্যোগের সম্ভাবনা আছে। পাক ঘাটতি রপ্তানির মাল অচল এইসব কারণে পাকিস্থানের ভিতরের অবস্থা কঠিন সমস্যাপূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু পাকিস্থান এখনও ব্রিটেনের "ডোমিনিয়ন" সুতরাং বিপদে তাহাকে সাহায্য করার লোক জুটিবে। উপরন্তু আমাদের হবুচন্দ্র ও গবুচন্দ্র আছেনই। পাকিস্থানের ইসারা মাত্র পাইলেই তাঁহাদের বংস ধর্ম্মভাব চাগিয়া উঠে। সুতরাং ভবিষ্যতের কথা জোর করিয়া না বলাই ভাল।

ভারত-পাকিস্থান বাণিজ্য-চুক্তি

সম্প্রতি ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে নূতন বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। এই চুক্তি তিন বছরের জন্য কার্য্যকরী থাকিবে ভারতবর্ষ বৎসরে ১৮ লক্ষ গাঁইট করিয়া পাকিস্থানী পাট ক্রয় করিবে। তিনটি বিষয় লইয়া নূতন চুক্তি হইয়াছে—পাট, কয়লা ও ফিল্ম্। ভারতবর্ষ পাকিস্থানী পাট ক্রয় করিবে এবং পাকিস্থান ভারতবর্ষ হইতে কয়লা ও ফিল্ম্ আমদানী করিবে। তবে ইহা পরস্পর-বাণিজ্য নয়, কারণ আমদানী ও রপ্তানী পরস্পর নির্ভরশীল নয়, অর্থাৎ, ভারতবর্ষ পাট ক্রয় করিলেই যে পাকিস্থান কয়লা ক্রয় করিবে তাহা নয় এবং পাকিস্থান ইচ্ছা করিলে কয়লা নাও কিনিতে পারে। এই চুক্তির সর্ত্তানুসারে ২৫শে মার্চ্চ হইতে পাকিস্থান পাকা ও কাঁচা পাট রপ্তানী বাবদ যে আড়াই টাকা হিসাবে লাইসেন্স ফি লইত তাহা বন্ধ করিয়া দিবে, অর্থাৎ ভারতবর্ষকে পাট আমদানী বাবদ মণ প্রতি অতিরিক্ত আড়াই টাকা আর দিতে হইবে না। পাকা এবং কাঁচা গাঁইটের উপর রপ্তানী-কর পাকিস্থান সমান করিয়া দিয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট পাকিস্থানে কয়লা রপ্তানীর উপর অতিরিক্ত মূল্য হ্রাস করিয়া দিয়াছেন, কয়লার আভ্যন্তরিক ও রপ্তানী মূল্য সমান করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পাকিস্থানের পাট উৎপাদন যাহাতে পরিকল্পিতভাবে হয়, তাহার জন্য ভারতবর্ষ তিন বৎসর ধরিয়া বছরে ১৮ লক্ষ গাঁইট করিয়া পাট আমদানী করিবে এবং অতিরিক্ত পরিমাণ প্রয়োজন হইলে পাকিস্থান ২৫ লক্ষ গাঁইট পর্য্যন্ত সরবরাহ করিবে। ভারত গবর্ণমেণ্ট কয়লা রপ্তানীর জন্য সর্ব্ববিধ সুবিধা দিবেন এবং তাহার জন্য প্রয়োজনীয় ওয়াগনের বন্দোবস্ত করিবেন।

কয়েকটি পত্রিকা এই চুক্তিতে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছে, কারণ ইহা নাকি উভয় দেশের পক্ষে মঙ্গলকর হইবে। বলা হয় যে, ভারত ও পাকিস্থানের অর্থনীতি পরিপূরক, তাই এইরূপ বাণিজ্যচুক্তি নাকি যথার্থ হইয়াছে। কিন্তু পরিপূরক কথাটি আপেক্ষিক, স্থান ও কালসাপেক্ষ। ভারত-বিভাগের অব্যবহিত পরেই এই কথাটির সার্থকতা হয়ত ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে তাহা আর নাই। ভারত-বিভাগের ফলে সমস্ত পাটকল (মোট তখন ছিল ১০৪) ভারতবর্ষে পড়ে। এই মিলগুলির কাঁচাপাটের চাহিদা ছিল বৎসরে প্রায় ষাট লক্ষ গাঁইট, কিন্তু বিভক্ত ভারতে মোটে প্রায় ছয় লক্ষ গাঁইটের মত পাট উৎপন্ন হইত। ইহা সহজেই অনুমেয় যে, মিলগুলির অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য ভারতবর্ষ তখন সম্পূর্ণরূপে পাকিস্থানের উপর নির্ভরশীল ছিল। ভারতের জুট মিল তথা ভারতবর্ষকে জব্দ করিবার এইরূপ সুযোগ পাকিস্থান ভালভাবেই সদ্ব্যবহার করিয়াছিল অর্থাৎ, নানা অছিলায় পাট সরবরাহ করে নাই। বাণিজ্য-চুক্তি ইচ্ছা করিয়াই পাকিস্থান কার্য্যকরী করে নাই। আজ ভারতবর্ষ পাট উৎপাদনে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ, ১৯৫২ সনে ভারতে প্রায় ৪৬ লক্ষ গাঁইট পাট উৎপন্ন হইয়াছে এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই ভারতীয় পাট উৎপাদন যে ৬০ লক্ষ গাঁইটে পৌঁছাইবে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে এ চুক্তি একেবারেই যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। এ চুক্তির ফলে ভারতে পাট উৎপাদন ও মূল্য হ্রাস পাইবে। ভারতের পাট উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা ব্যাহত হইবে।

পাকিস্থান এতদিন পর্য্যন্ত নানা কৌশলে ভারতকে জব্দ করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছিল। ভারতে রপ্তানী পাটের মণ প্রতি আড়াই টাকা হিসাবে লাইসেন্স ফি লইতেছিল এবং সস্তায় ইউরোপীয় জুটমিলগুলিকে কাঁচাপাট সরবরাহ করিতেছিল যাহাতে এই মিল সুবিধা দরে আমেরিকায় পাট রপ্তানী করিতে পারে। এই লাইসেন্স ফির ফলে ভারতে প্রস্তুত পাটজাত দ্রব্যের আন্তর্জাতিক মূল্য অপেক্ষাকৃত বেশী ছিল, তাই এ দেশ প্রতিযোগিতায় হটিয়া আসিতেছিল। পাকিস্থানের বাণিজ্য ষড়যন্ত্র শেষ পর্য্যন্ত তাহার পক্ষে সুবিধাজনক হইল না—তাহার কাঁচাপাট রপ্তানী হ্রাস পাইতে লাগিল এবং পাটের মূল্য তথা উৎপাদনও দ্রুত হ্রাস পাইল। এ

অবস্থায় এই নূতন বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদিত হইল। এই চুক্তির ফলাফল হইবে—পাকিস্থান তার পাট উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে পারিবে এবং পাটের বাজার সম্বন্ধে আগামী তিন বৎসর ধরিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবে। ভারতের পাটের উৎপাদন হ্রাস পাইবে, মূল্য হ্রাস হইবে—ক্ষতি হইবে কাহার? ভারতের চাষীর। গত তিন-চার বৎসর ধরিয়া যখন ভারতের আভ্যন্তরিক পাট উৎপাদন অল্প ছিল, তখন যদি পাকিস্থানের পাট ব্যতীত ভারতের জুটমিলগুলি চলিতে পারে, তবে এখন কেন চলিবে না? ইহা কি ভারত-পাকিস্থান বাণিজ্য-চুক্তি, না এই দুই দেশের পুঁজিবাদীদের আঁতাত? গবর্মেণ্ট হইয়াছেন এই আঁতাতের শিখণ্ডী।

গত বৎসর যে পাক-ভারত বাণিজ্য-চুক্তি হইয়াছিল তাহাতে পাটের কথা ছিল না। ভারতবর্ষ তার মূল্যবান সম্পদ যাহার অধিকাংশই সামরিক ব্যবহারে লাগিবে, পাকিস্থানকে দিতে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছিল এবং সেই অনুসারে এই সকল সরবরাহ করিয়া আসিতেছে। যথা—লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, সিলিকন, রেল এবং অন্যান্য ষ্টীল-জাত দ্রব্য, বস্ত্র, এলুমিনিয়াম প্রভৃতি। ঐ চুক্তি অনুসারে পাকিস্থান ভারতকে মশলা, বাঁশ, ডিম, মাছ প্রভৃতি সরবরাহ করিত। ১৯৫২ সনের চুক্তি দেখিয়া মনে হয় যে, ইহা যেন পাকিস্থানকে সাহায্য করিবার জন্যই করা হইয়াছিল। নূতন চুক্তি অনুসারে ভারতবর্ষ পাকিস্থানকে কয়লা সরবরাহ করিবে নিজেদের ওয়াগন দিয়া। ভারতীয় কোলফিল্ড কমিটির হিসাব অনুসারে ভারতবর্ষে মোট ১৬,৪৭৪ মিলিয়ন টন কয়লা মজুত আছে। সেই তুলনায় রাশিয়ার মজুত কয়লা আছে ২৯৫, ৯০০ মিলিয়ন মেট্রিক টন এবং ইংলণ্ডে আছে ১২৯,৯০০ মিলিয়ন মেট্রিক টন। এ কথা সর্ব্বজন-বিদিত যে, ভারতের মজুত কয়লা অত্যন্ত অল্প এবং আশঙ্কা করা হয় বর্তমান হারে কয়লা খরচ হইতে থাকিলে আগামী ৫০ বৎসরের মধ্যে ভারতের কয়লা নিঃশেষ হইবে। ভারতের উচ্চশ্রেণীর মেটালারজিক্যাল কয়লার মোট মজুত পরিমাণ আছে ৭৫০।৮০০ মিলিয়ন টন, যাহা আমেরিকার এক বৎসরের উৎপাদন। এ অবস্থায় ভারত গবর্মেণ্ট হঠাৎ পাকিস্থানকে কয়লা সরবরাহ করার চুক্তি করিলেন কেন? ইহা শুধু নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক নহে—ইহা জাতীয় সম্পদের বেআইনী অপচয়।

আরও বলা প্রয়োজন যে, ভারতবর্ষ পাকিস্থান হইতে আর কাঁচা তুলা আমদানী করিতেছে না। পাট উৎপাদনে ভারতবর্ষ আজ প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাই আজ যাহারা চীৎকার করে যে, এ দুই দেশের অর্থনীতি পরস্পরের পরিপূরক তাহারা ক্লাইভ ষ্ট্রীটের দালাল ব্যতীত আর কিছুই নহে। এক অর্থে শুধু পাকিস্থান কেন, সমস্ত মানবজাতির সমবেত প্রচেষ্টাই হইতেছে পরিপূরক। আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা রাষ্ট্রের কিছু উপকারে আসে।

পাকিস্থানের মুদ্রার বিনিময়-মূল্য অত্যধিক থাকিবার দরুনও ভারতের পক্ষে এই চুক্তি ক্ষতিকারক হইবে। পাকিস্থানী মুদ্রার মূল্য অধিক থাকার জন্যই পাকিস্থানের বহির্বাণিজ্যে ঘাটতি দেখা দিয়াছে এবং তাহার পাট রপ্তানী হ্রাস পাইতেছে। ভারতের মাধ্যমে কিনিলে ষ্টার্লিং ও ডলার দেশগুলি পাট সরবরাহ অপেক্ষাকৃত সস্তায় পাইবে। এ চুক্তির পিছনে বহু রকম স্বার্থ এবং অন্তর্নিহিত অর্থ আছে বলিয়া মনে হয়। ভারতবর্ষ কয়লার রপ্তানীমূল্য হ্রাস করিল কেন? আজকালকার বহির্বাণিজ্যের রেওয়াজ হইয়াছে যে, রপ্তানীমূল্য আভ্যন্তরিক মূল্য হইতে অধিক থাকে। ইংলণ্ডের রপ্তানী মূল্য আভ্যন্তরিক মূল্য হইতে অধিক—তবে এই রপ্তানীমূল্য সকল দেশের পক্ষেই সমানভাবে প্রযোজ্য, কোন পক্ষপাতিত্ব করা হয় না, যেমন পাকিস্থান ভারতে পাট রপ্তানীর বেলায় করিত। ভারতের পক্ষে কয়লার রপ্তানীমূল্য হ্রাস করা যুক্তিসঙ্গত হয় নাই।

পূর্ব পাকিস্থান ও তাহার কৃষি-ব্যবস্থা

১৮ই মার্চের 'বরিশাল হিতৈষী' এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে পূর্ব-বাংলার বর্ত্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া লিখিতেছেন যে, "পূর্ব-বাংলা নদীমাতৃক এবং কৃষিপ্রধান দেশ। ভূ-প্রকৃতির অকস্মাৎ কোন গভীরতম পরিবর্তন না হইলে ইহা অনাগত সুদূর ভবিষ্যৎ পর্যন্ত নদীমাতৃকই থাকিবে এবং পাশ্চাত্য প্রভাবে কয়েকটি স্থানে কলকারখানা স্থাপিত হইলেও শস্যোৎপাদন বা কৃষিই হয়ত হইবে ইহার রুজিরোজগারের প্রধান উপায় এবং কৃষক হইবে তাহার জনতার পরিচয়। কৃষকদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে সরকারী মাসিক পত্রিকা 'কৃষি কথা'য় প্রকাশিত মোহাম্মদ মোস্তাফা আলী সাহেবের এক প্রবন্ধের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া উক্ত সম্পাদকীয়তে বলা হইয়াছে যে, পূর্ব-বাংলার শতকরা ৬৬'৬টি পরিবারের জমির পরিমাণ ৪ একরের কম। যদিও কৃষকরাই জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ, কৃষকদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়: দারিদ্র্য, রোগ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি কৃষকের নিত্যসহচর। সামাজিক জীবনে 'চাষা' কথা গালি হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। মোস্তাফা আলী সাহেবের প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিয়া পত্রিকাটি বলিতেছেন, "এক মুখে চাষা বলে গালি দিয়ে অন্য মুখে দেশকে কৃষিপ্রধান বলার সহজ অর্থও দাঁড়ায় যে, এদেশ 'গালিপ্রধান'।" প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাও কৃষক সন্তানকে কৃষি হইতে দূরে টানিয়া লইতেছে। কৃষক এবং কৃষকের জীবন লইয়া রচিত সাহিত্য নাই বলিলেও চলে। ছায়াছবির মাধ্যমেও কৃষকজীবনকে রূপায়িত করিবার বা কৃষি সমস্যাকে জনসাধারণের সম্মুখে তুলিয়া ধরিবার কোন চেষ্টা হয় নাই।

ইন্দো-কাশ্মীর চুক্তি

কাশ্মীর একটি 'খ' শ্রেণীর রাজ্য। ১৯৪৭ সনে ভারত-বিভাগের পর যখন পাকিস্থান কাশ্মীর আক্রমণ করে তখন কাশ্মীরের তদানীন্তন মহারাজা হরি সিং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দেন এবং তাহা তদানীন্তন বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। আইনতঃ সেদিন হইতে কাশ্মীর ভারতীয় রাষ্ট্রের অংশ। পাকিস্থান বেআইনীভাবে কাশ্মীর আক্রমণ করায় ভারত তাহা প্রতিরোধ করে এবং পরে রাষ্ট্রসঙ্ঘে এ সম্বন্ধে নালিশ করে। কাশ্মীর ভারতের

সাধারণতঃ তাহা করিবে। এইরূপ কমিশন ডাকিয়া নীতি সমর্থন করাইবার অর্থ হইতেছে গবর্মেণ্টের নিজেদের উপর আস্থার অভাব এবং তাহার জন্য দেশের অর্থ অযথা খরচ করা।

সোজা কথা এই যে, ঘাটতি খরচ যেন উৎপাদনকারী পরিকল্পনার উপর নিয়োজিত হয় এবং আভ্যন্তরিক ঋণের যেন অযথা অপ-ব্যবহার না হয়। ঋণ-নীতির মাপকাঠি এই হইবে যে তাহার দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি কি ভাবে বৃদ্ধি পায়—কোন আন্তর্জাতিক কমিশনের মতামতের উপর নহে।

ষ্টার্লিঙের পূর্ণ বিনিময়

যুদ্ধের পূর্ব্বে ষ্টার্লিং ছিল আন্তর্জাতিক মুদ্রা যাহার দ্বারা পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে লেনদেন নিষ্পত্তি করা হইত। ডলারের তখন এত প্রাধান্য ছিল না এবং ডলার ষ্টার্লিঙের মত আন্তর্জাতিক মুদ্রা ছিল না। ষ্টার্লিং ছিল অবিভাজ্য, অর্থাৎ সকল দেশের পক্ষেই ষ্টার্লিঙের পূর্ণ বিনিময় সম্ভবপর ছিল। হিটলারের অর্থমন্ত্রী ডাঃ শাখ্ট যখন রাইখস ব্যাঙ্কের ভার লইলেন তখন তিনি জার্ম্মান মুদ্রা "মার্ক"কে বিভাজ্য করিয়া দিলেন, অর্থাৎ বিভিন্ন দেশের পক্ষে মার্কের বিনিময় বিভিন্ন রকম হইবে। মার্কের স্বাধীন এবং পূর্ণ বিনিময় ডাঃ শাখ্ট বন্ধ করিয়া দিলেন। সেদিন ব্রিটিশেরা জার্ম্মান ও শাখ্টকে বিদ্রূপ করিয়াছিল এবং গর্ব্ব করিয়া ঘোষণা করিয়াছিল যে, আমাদের ষ্টার্লিং অবিভাজ্য এবং পূর্ণ বিনিময়শীল। ১৯৩৯ সনের যুদ্ধ আসিয়া গেল—ষ্টার্লিঙের রূপ গেল বদলাইয়া। ষ্টার্লিং হইল বিভাজ্য এবং ইহার বিনিময় হইল সীমাবদ্ধ—ডাঃ শাখ্ট হইলেন ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের আদর্শ।

যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, কিন্তু ষ্টার্লিং আজও বিভাজ্য এবং পূর্ণ বিনিময় পুনরায় প্রয়োগ করা সম্ভবপর হয় নাই। ব্রিটেন ষ্টার্লিং দেশগুলিকে নিজের করায়ত্তে রাখিতে চায়—নিজের উৎপাদিত মাল ইহাদের বাজারে চালু রাখার জন্য। ব্রিটেনের রাজনৈতিক উপনিবেশ আজ প্রায় যাওয়ার পথে—কিন্তু অর্থনৈতিক উপনিবেশ অর্থাৎ ষ্টার্লিং দেশগুলি ঠিক বজায় আছে। সেইজন্য যুদ্ধোত্তর যুগে বিধ্বস্ত ব্রিটেন আমেরিকার সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় বাঁচিয়া গেল একমাত্র ষ্টার্লিং অঞ্চলের জন্য। মুক্ত প্রতিযোগিতায় আমেরিকার মালের চাহিদা বেশী, ব্রিটেন সেখানে হটিয়া আসে। কিন্তু ষ্টার্লিং দেশগুলিতে ব্রিটেন তাহার মাল চালু রাখিয়াছে—সভ্য দেশগুলির জমা ষ্টার্লিঙের বদলে। মজুত ষ্টার্লিং ব্রিটেন ফেরত দিতে চাহে না—নানা অছিলায় আটকাইয়া রাখে; বলে আমাদের মাল দিয়া ঐগুলি কাটান দিয়া দিব। ভারতের মজুত ষ্টার্লিং ব্রিটেন এইভাবে শোধ দিতেছে। আজ ভারতের ডলার অত্যন্ত প্রয়োজন—খাদ্য এবং যন্ত্রপাতি আমেরিকা হইতে আমদানী করার জন্য। চলতি আয় হইতে ভারতবর্ষ এ সকল জিনিষ আমদানী করিতেছে এবং আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ঋণ লইতেছে। মজুত ষ্টার্লিং যদি ডলারে বিনিময় করা যাইত তাহা হইলে ভারতের ব্যয়ভার তথা ঋণভার অনেক কম হইত—পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খরচের খানিকটা সুরাহা হইত।

সভ্যদেশগুলি যখন ষ্টার্লিঙের বিনিময়ে ডলার দাবী করে তখন ব্রিটেন ধুয়া তোলে যে, আমার সোনা নাই, সঞ্চিত ডলারও নাই, আমি দেউলিয়ার পথে। ষ্টার্লিং দেশগুলি চুপ করিয়া যায়—আশ্বস্ত হয় কিনা বলা কঠিন। ব্রিটেন ষ্টার্লিং দেশগুলিকে উপদেশ দেয়—তোমরা বেশী করিয়া রপ্তানি কর, আয়ের টাকা আমার কাছে জমা রাখ, তাহা হইতে আমি কিছু কিছু দিব। ব্রিটেন মাঝে মাঝে ষ্টার্লিং দেশগুলিকে আশ্বস্ত করিবার জন্য ঘোষণা করে যে এইবারে ষ্টার্লিংকে ডলারে বিনিময় করিবার পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হইবে। এই পর্য্যন্ত! তাহার পর আর কিছু শুনা যায় না। তবে এইটুকু অনুমান করা যায় যে, ষ্টার্লিং দেশগুলির মজুত ষ্টার্লিং নিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ষ্টার্লিং ডলার মুক্ত বিনিময় ব্রিটেন করিবে না।

সম্প্রতি একটি ব্রিটিশ ডেলিগেশন আমেরিকা যায়—ব্রিটেনের অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে। আমেরিকা দাবী করিয়াছে যে, আন্তর্জাতিক ব্যবসা হইতে সকল নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লইতে হইবে এবং ষ্টার্লিংকে বিনিময়শীল করিতে হইবে। ব্রিটেনের অর্থমন্ত্রী মিঃ বাটলার সেই পুরাতন কথা তুলিয়াছেন যে, ব্রিটেনের সোনা যথেষ্ট নাই যাহাতে ষ্টার্লিংকে স্বাধীন বিনিময়-সুযোগ দেওয়া যায়। তিনি দাবী করিয়াছেন যে, বরং কমনওয়েলথের মধ্যে যাহাতে অধিকতর স্বাধীন ব্যবসা চলিতে পারে তাহার জন্য আমেরিকার সহযোগিতা প্রয়োজন—অর্থাৎ আমেরিকা যেন তাহার মাল কমনওয়েলথের বাজারে সহজে বিক্রয় করিতে না যায়, ইহা ব্রিটেনের একচেটিয়া বাজার। এই প্রস্তাবে আমেরিকা রাজী হইতে পারে নাই। ভবিষ্যতে আবার দেখা হইবে এবং এ সম্বন্ধে আলোচনা হইবে বলিয়া ব্রিটিশ ডেলিগেশন দেশে ফিরিয়া গিয়াছে।

ভারত খুব ভাল ছেলে। ব্রিটেন যাহা বুঝায় তাহাই বুঝে, এমন কি বলিবার আগেই ব্রিটেনের মনের কথা বুঝিয়া ফেলে। ১৯৪৯ সনে ডি-ভ্যালুয়েশনের ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র টাকার ডি-ভ্যালুয়েশন করিয়া ফেলিল। নিজের মজুত টাকা, অর্থাৎ মজুত ষ্টার্লিং জমা রাখিয়া, অপরের কাছ হইতে বেশী সুদে টাকা ঋণ লইতেছে, যথা—আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক, আমেরিকার আমদানী-রপ্তানী ব্যাঙ্ক, ইত্যাদি। যত বিদেশী টাকা ভারতে খাটিতেছে তাহার জন্য এবং বিদেশী ঋণের জন্য ভারতবর্ষ বৎসরে প্রায় ৩৯ কোটি টাকার মত সুদ দেয়। তবু মজুত ষ্টার্লিঙের দ্বারা বিদেশী প্রতিষ্ঠান হইতে ভারত কিনিবে না—কারণ আমরা লোক ভাল, আমাদের সুনাম আছে; কারণ আমাদের অর্থনৈতিক শোষণ করিবার জন্য আমরা অপরকে ডাকিয়া লইয়া আসি এবং সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করি।

সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়

সাপ্তাহিক 'নিশান' পত্রিকা এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে বাংলাদেশে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবকে অভিনন্দন জানাইয়া লিখিতেছেন:

"ইহা অপেক্ষা সুসঙ্গত ও ন্যায় কার্য্য আর কিছু হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। সহস্র বৎসর পরে দেশের স্বাধীনতা আসিল অথচ ভারতীয় মূল ভাষার উদ্ধার হইবে না এমন একটা অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক কথা ভাবিতেও ক্লেশ হয়। সত্য বটে দীর্ঘ সহস্র বৎসরে ভারতের বিচ্ছিন্ন অবস্থা হেতু নূতন নূতন প্রাদেশিক ভাষা সৃষ্ট হইয়াছে এবং তাহা বেশ সমৃদ্ধিশালীও হইয়াছে। আজ তাহারই শাখাকে সমগ্র দেশীয় রাজনৈতিক ভাষারূপে ব্যবহারের ব্যবস্থা হইতেছে। কিন্তু সে সব প্রাদেশিক ভাষার মূল উৎস সংস্কৃত। সেই মূল উৎস সচল ও সজীব না থাকিলে শাখা-ভাষা যে ধ্বংস হইতে পারে "একথা কি বলিয়া দিবার আবশ্যকতা আছে?"

শাখা ভাষা ধ্বংস না হওয়াই সম্ভব, কিন্তু তাহার সমৃদ্ধি ব্যাহত হওয়া নিশ্চিত।

মেদনীপুরে প্রাথমিক শিক্ষা ও জেলা স্কুল বোর্ড

"মেদিনীপুর পত্রিকা" লিখিতেছে, যে ১৮০২ সালেও মেদিনী-পুরের প্রতি গ্রামে একটি করিয়া কোন-না-কোনরূপ স্কুল বা পাঠশালা ছিল—"আর বর্ত্তমানে স্বাধীন দেশে প্রায় সাড়ে দশ হাজার গ্রামে স্কুল বোর্ডের অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩০০০ এরও নিম্নে।" পত্রিকাটির অভিমতে "আজ পর্যন্ত এমন কি স্বাধীন হওয়ার পরও দেশে যেটুকু শিক্ষার প্রসার হইয়াছে তাহা সরকারী সাহায্যে নহে, সরকারী বাধা বা অন্তরায় সৃষ্ট সত্ত্বেও স্থানীয় জন-গণের বদান্যতায়, প্রচেষ্টায় ও শিক্ষকগণের সর্ব্বত্যাগী মনোভাব ও জীবনাদর্শের জন্য।"

বর্ত্তমানে মেদিনীপুরে জেলা স্কুল বোর্ড একটি রাজনৈতিক দলা-দলির কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। "দরিদ্র প্রাথমিক শিক্ষকেরা যদি রাজনৈতিক কার্য্যে সরকারী দলকে সহায়তা না করিয়া থাকেন—তাঁহাদের চাকুরী বা ভবিষ্যৎ ভয়াবহ হইয়াছে এরূপ অভিযোগের অন্ত নাই। সেক্রেটারী বা পরিচালক কমিটি যদি সরকারী দলের তাঁবেদারী করিতে প্রস্তুত না থাকেন তাহা হইলে তাঁহাদের বিদ্যালয়টির অনুমোদন সম্বন্ধে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইবে ইহাই যেন অলিখিত আইনে পরিণত হইয়াছে।"

বহুক্ষেত্রেই দরিদ্র শিক্ষকগণ বৎসরাধিক কাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রাপ্য সামান্য বেতন ও ভাতা পান না। আইনানুগভাবে আবেদন নিবেদন করিয়াও কোন ফল হয় না। স্কুল বোর্ডের আসন্ন নির্ব্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলি ক্ষমতা করায়ত্ত করিবার চিন্তায় বিভোর। "কি ভাবে স্কুলবোর্ডের মাধ্যমে প্রদত্ত লক্ষ লক্ষ টাকার বণ্টনেও প্রায় দশ সহস্র গ্রামীণ দরিদ্র শিক্ষকগোষ্ঠীকে দলীয় রাজনীতির উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার করিতে পারা যাইবে সেই চিন্তায়ই সকলে মশগুল।"

পাঠ্যতালিকা ও শিক্ষার মান অতি নিম্নস্তরের ও হতাশাব্যঞ্জক। "পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা ৩১৪টি এবং সেগুলিও সরকারী ব্যবসায়ের অঙ্গ করিয়াও চাহিদা অনুপাতে অপ্রচুর বিধায় কালোবাজারের ব্যবস্থাকে সুযোগ দিবার যথেষ্ট সুব্যবস্থা আছে।

"প্রশ্নোত্তরিকার মাধ্যমে বুঝিয়া বা না বুঝিয়া 'হাঁ' বা 'না'র মধ্যেই প্রাথমিক ছাত্রের জ্ঞান বিকাশের পরিধি।

"অথচ সেই ছাত্রই ৫ম শ্রেণীতে যখন ভর্ত্তি হইবে তাহাকে ন্যূনপক্ষে ১০।১২ খানি পাঠ্যপুস্তক, বিভিন্ন বিষয় এবং লিখিতভাবে সর্ব্বপ্রকার পরীক্ষাদি দিতে হইবে।"

দেশের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অবিলম্বে এই করুণ অবস্থার পরিবর্ত্তন দাবী করিয়া পত্রিকাটি মন্তব্য করিতেছেন যে শিক্ষাক্ষেত্র হইতে সকল রাজনৈতিক প্রভাব দূর করিয়া প্রকৃত শিক্ষাব্রতী ও সমাজসেবীদিগের হস্তে পরিচালনার সর্ব্বপ্রকার দায়িত্ব অর্পণ করিতে হইবে।

কলম্বো পরিকল্পনা

ইংরেজী "সাপ্তাহিক পশ্চিমবঙ্গ" পত্রিকা কলম্বো পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিতেছেন:

"১৯৫০ সনের জানুয়ারী মাসে কলম্বোতে কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির বৈদেশিক মন্ত্রীদের এক সম্মেলন হয়। সেই সম্মেলন দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার দেশগুলির যৌথ উন্নতির জন্য এক পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

"সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশগুলি বিশ্ব-বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। পৃথিবীর প্রায় সকল পাট এবং রবার, শতকরা ৭৫ ভাগেরও বেশী চা, দুই-তৃতীয়াংশ টিন, এবং এক-তৃতীয়াংশ তৈল ও চর্ব্বি এই সকল দেশ হইতে পাওয়া যায়।

"কলম্বো পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য হইল এই সকল দেশের উন্নতি ত্বরান্বিত করা। পরিকল্পনা অনুযায়ী এই সকল দেশ পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিবে; সঙ্গে সঙ্গে তাহারা কমন্‌-ওয়েলথ, আমেরিকা এবং বিশ্ব-ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হইতেও সাহায্য পাইবে।

"১৯৫০ সনের নবেম্বর মাসে যুক্তরাজ্য, ভারত, পাকিস্থান, সিংহল, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড এবং কানাডা এই কয়টি দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ মিলিত হইয়া পরিকল্পনাটির একটি নক্সা রচনা করেন। তাঁহাদিগকে 'দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়া সম্পর্কে কমনওয়েলথ পরামর্শকারী কমিটি' নামে অভিহিত করা হয়। এই কমিটির শেষ সভায় থাইল্যাণ্ড, কাম্বোডিয়া, লাওস্ এবং ভিয়েৎনাম হইতে প্রতিনিধি দল এবং ব্রহ্মদেশ ও ইন্দোনেশিয়া হইতে পর্য্যবেক্ষকগণ যোগদান করেন। কমিটির রিপোর্টে ছয় বৎসরব্যাপী এক পরি-কল্পনার কথা বলা হয়।

"১৯৫০-এর রিপোর্টে বলা হইয়াছিল যে সমগ্র কর্ম্মসূচীকে কার্য্যকরী করিতে প্রায় ২৪৯৮ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে; ইহার মধ্যে ৩৩৪ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ষ্টার্লিং ব্যালান্স হইতে পাওয়া যাইতে পারে। কলম্বো পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহ

হইতে যে পরিমাণ অর্থ পাওয়া যাইবে তাহা বাদেও ১১১৫ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা বাহির হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে।

"পরিকল্পনা উদ্ভাবিত হইবার পর কলম্বো পরিকল্পনার দেশগুলিকে বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইয়াছে। প্রথম দিকে উন্নয়নের পথে প্রধান অন্তরায় ছিল অর্থ। কিন্তু ১৯৫০ সালে এবং ১৯৫১ সালের গোড়ার দিকে বিশ্ববাজারে কাঁচামালের মূল্য চড়িয়া যাওয়ায় কলম্বো পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির আয় বৃদ্ধি পায়। ফলে প্রথমে যেরূপ আশা করা গিয়াছিল পরিকল্পনাভুক্ত দেশগুলি তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে অর্থ নিজেদের উন্নয়নকল্পে ব্যয় করিতে সমর্থ হয়। ১৯৫১ সালের পর বিশ্ববাজারের মূল্য হ্রাস পাওয়ার ফলে বর্তমানে অর্থাভাব পুনরায় এক সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়াছে।

"১৯৫২ সালের জানুয়ারী মাসে কমনওয়েলথ অর্থমন্ত্রীদের যে সম্মেলন হয় তাহাতে স্থির হয় যে ষ্টার্লিং এলাকায় অবস্থিত সকল দেশই সঞ্চয়ের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন—কার্যক্ষেত্রে তাহার অর্থ হইল যে ঐ দেশগুলির ষ্টার্লিং এলাকার বহির্ভূত অঞ্চলে রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি করা। ষ্টার্লিং এলাকার অন্যান্য দেশগুলি হইতে প্রতিশ্রুত সাহায্যের পরিমাণ হ্রাস না করিয়া এতদিন পর্যন্ত এই সমবেত চেষ্টা করা হইয়াছে।

"কিন্তু অন্যান্য দেশ হইতে কি পরিমাণ সাহায্য পাওয়া যাইবে তাহার উপরই অনেক কিছু নির্ভর করিতেছে। আশার কথা যে যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা হইতে ইতিমধ্যেই এরূপ সাহায্য পাওয়া যাইতেছে; এবং বিশ্বব্যাঙ্ক ইতিমধ্যেই কয়েকটি ঋণদান করিয়াছে এবং অন্যান্য ঋণের কথা বিবেচনাধীন আছে।

"উন্নয়ন অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গে নূতন কলকারখানা পরিচালনা করিবার জন্য অধিক সংখ্যায় যন্ত্রবিদের (technicians) প্রয়োজন হইবে। যন্ত্রবিদরূপে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য পরিকল্পনাভুক্ত প্রত্যেক দেশেই বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু সেজন্য সময়ের প্রয়োজন। ইতিমধ্যে বিভিন্ন দেশ হইতে যন্ত্রবিদগণকে ঐ সকল দেশে পাঠান হইতেছে। বিদেশে পরিকল্পনাভুক্ত দেশসমূহের যুবকদিগকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে দুই শত আশীটি শিক্ষাকেন্দ্রও খোলা হইয়াছে।

"ষাট কোটি লোক অধ্যুষিত অঞ্চলে ষষ্ঠ বর্ষব্যাপী এই পরিকল্পনার কার্য্য সমাপ্ত হইলে ঐ অঞ্চলের সম্পদ বৃদ্ধি করিবার এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার ও জীবনধারণের মানের উন্নতিবিধানের ভিত্তি রচিত হইবে।"

দামোদর পরিকল্পনার নুতন বাঁধে ফাটল

১৬ই চৈত্রের 'মেদিনীপুর পত্রিকা'য় প্রকাশিত নিম্নলিখিত সংবাদটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে:

"দামোদর পরিকল্পনার তিলাইয়া বাঁধের নির্ম্মাণকার্য্য নাকি শেষ হয়ে এসেছে। প্রায় ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৯৮ ফুট উঁচু ১১৪৭ ফুট লম্বা এবং তলদেশে ৯৬ ফুট চওড়া, সম্পূর্ণ কংক্রীটের এই বাঁধ তৈরী হয়েছে মার্কিন তত্ত্বাবধানে।

"কিন্তু পুকুর চুরির হিড়িকে বাঁধের ভবিষ্যতের কথা মনে ছিল না। শোনা যাচ্ছে, পরীক্ষায় নাকি ধরা পড়েছে যে বাঁধের কংক্রীটে প্রয়োজনের তুলনায় সিমেণ্ট কম দেওয়া হয়েছে এবং ভিতে যে রকম সাইজের পাথরের চাপ দেওয়া প্রয়োজন তা দেওয়া হয় নি। একটি কংক্রীটের ব্লকে গুরুতর ফাটল দেখা দিয়েছে। ফলে বাঁধটি চিরকালের জন্য দুর্বল এবং আশঙ্কার কারণ হইল। জনসাধারণকে অবহিত করার দায়িত্ব সরকারের।"

সহযোগী এই সংবাদ কোথা হইতে পাইয়াছেন জানি না। যদি সত্য হয়, তবে ইহার পূর্ণ তদারক ও বিচার প্রয়োজন; যদি গুজবমাত্র হয় তবে ইহার প্রত্যাহৃত হওয়া উচিত।

গো-উন্নয়ন

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার-অধিকর্ত্তা কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'কৃষি-পত্র' ফাল্গুন, ১৩৫৯ (প্রচার পত্র নং ৭) সংখ্যায় 'গো-উন্নয়ন' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে:

"পূর্ব্ব পঞ্জাবের হারিয়ানা জাতের গরু আমাদের দেশী গরুর চেয়ে অনেক বেশী দুধ দেয় এবং এ জাতের বলদ আমাদের দেশী বলদ অপেক্ষা অনেক বলিষ্ঠ। তাই এরা যেমন অনেক ভাল গাড়ি টানতে পারে তেমনি এদের দিয়ে চাষবাসের কাজও ভাল চলে। হারিয়ানা ষাঁড় দিয়ে দেশী গরুর প্রজনন করলে প্রথম বারের বাছুরের মধ্যে (১ম সঙ্কর) শতকরা ৫০ ভাগ উন্নত জাতের রক্ত থেকে যায়। সেজন্য সেসব এঁড়ে অনেক বেশী তাগড়া হয় এবং বকনাগুলি পরে অনেক বেশী দুধ দেয়। তখন এরা ২॥-৩ সের পর্য্যন্ত দুধ দিয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার গো-উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য প্রায় সমস্ত জেলাতেই অনেকগুলো হারিয়ানা জাতের ষাঁড় দিয়েছেন। প্রত্যেক জেলার কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট এলাকায় এই সকল ষাঁড় রাখা হয়েছে। চাষীরা দরকারমত নিজের গরুর জন্য এ সব ব্যবহার করেন এবং সেজন্য কোন খরচই এঁদের দিতে হয় না। দেখা গেছে, প্রথম বারের বকনাকেও যদি ঐ উন্নত জাতের ষাঁড় দিয়ে প্রজনন করান হয় তবে তার যে বাচ্চা হয় (২য় সঙ্কর) তারা প্রায় ৫ সের পর্য্যন্ত দুধও দিতে থাকে। সুতরাং ঐ নির্দ্দিষ্ট এলাকার চাষীরা এই সব সরকারের দেওয়া ষাঁড় ছাড়া যেন অন্য কোন খারাপ ষাঁড় ব্যবহার করে নিজেদের ক্ষতি না করেন। আরও একটি দরকারী কথা সর্বদা মনে রাখতে হবে। আপনাদের এলাকার নিকৃষ্ট জাতের এঁড়েগুলি যত শীঘ্র সম্ভব নিজেরা সযত্নে বলদ করে ফেলুন। সেজন্য দরকার হলে স্থানীয় কৃষি-বিভাগের কর্ম্মচারীর সাহায্য অনায়াসেই পেতে পারেন। তাঁরা বিনা রক্তপাতে একটি সামান্য যন্ত্র সাহায্যে আপনাদের জন্য এ কাজ সহজেই করে দেবেন। দেখবেন যেন একটু যত্ন বা লক্ষ্যের অভাবে আপনার উন্নত গরুর একটিও যাতে

নিকৃষ্ট ষাঁড়ের কাছে না যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত চাহিদা মেটাতে হলে যে সংখ্যক উন্নত জাতের ষাঁড়ের দরকার, তা জোগাড় ও প্রতিপালন করা খুবই ব্যয়সাপেক্ষ। যাতে কমসংখ্যক ষাঁড় দিয়ে অনেক বেশী গরুর প্রজনন করা যায়, সেজন্য সরকার কয়েকটি কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র খুলেছেন। সাধারণতঃ একটি ষাঁড় দিয়ে বছরে ৭০-৮০টি গরু প্রজনন করা হয়; কিন্তু এই উপায়ে একটি ষাঁড় দিয়ে ৭০০-৮০০টিরও বেশী গরু প্রজনন করা যায়। এ সব কেন্দ্রে বৈজ্ঞানিক উপায়ে গাভীর গর্ভসঞ্চার করা হচ্ছে। এতেও চাষীদের কোন খরচই দিতে হবে না। চাষীদের এ সব সুযোগের সদ্ব্যবহার করে নিজেদের গরুর উন্নতি করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।"

এ বিষয়ে আমাদের এক বিশেষজ্ঞ বন্ধুর মতামত নিম্নরূপ:

"হারিয়ানা ষাঁড়ের খ্যাতি অনেকদিন হইতেই প্রচারিত হইতেছে, অবশ্য এ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের মধ্যেও মতভেদ আছে; যতদূর স্মরণ হয় ১৯৩৬।৩৭ সন হইতে বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলায় হারিয়ানা ষাঁড় প্রচলনের চেষ্টা হইতেছে এবং ১৯৩৬।৩৭ সনেই এক হাজার হারিয়ানা ষাঁড় ঢাকা, ফরিদপুর, নোয়াখালি, ত্রিপুরা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, রাজসাহী, মালদহ, হুগলী এবং বাঁকুড়া জেলায় সরবরাহ করা হইয়াছিল, পরবর্ত্তী বৎসরে অর্থাৎ ১৯৩৭।৩৮ সালে আরও ৩৮৪টি হারিয়ানা ষাঁড় হাওড়া, খুলনা, ময়মনসিংহ, পাবনা, মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগণা, জলপাইগুড়ি, বর্দ্ধমান, বীরভূম এবং বগুড়া জেলায় সরবরাহ করা হইয়াছিল, ইহার পর প্রতি বৎসরে কোন্ কোন্ জেলায় কত ষাঁড় সরবরাহ করা হইয়াছে তাহার সঠিক হিসাব জানি না। মোট কথা, গত ১৬।১৭ বৎসর হইতে হারিয়ানা ষাঁড়ের প্রচলনের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় হইয়াছে, ইহার ফলে স্থায়ী কি ফল পাওয়া গিয়াছে জানিবার স্বাভাবিক কৌতূহল হয়, স্থানে স্থানে হয় ত কেহ কেহ হারিয়ানা ষাঁড় ব্যবহারের ফলে কিছু ফল পাইয়াছেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহারা ব্যক্তিগত ভাবে লাভবান হইতে পারেন, তদ্দ্বারা সমগ্র দেশের উপকার কিছুই হয় নাই। গত ১৬।১৭ বৎসরের চেষ্টায় পঃ বাংলার মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, মালদহ, হুগলী, হাওড়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, বীরভূম, চব্বিশ পরগণা প্রভৃতি জেলার গোজাতির কি পরিমাণ উন্নতি হইয়াছে, দুগ্ধবতী গাভীদের দুগ্ধের পরিমাণ কত বৃদ্ধি পাইয়াছে—কোন এক উন্নত শ্রেণীর গোজাতির উদ্ভব হইয়াছে কিনা এই সব তথ্য জানিতে পারিলে এই পরিকল্পনার ফল বুঝা যাইবে।

উপদেশের মধ্যে বলা হইয়াছে যে, "চাষীরা এই সব সরকারের দেওয়া ষাঁড় ছাড়া যেন অন্য কোন খারাপ ষাঁড় ব্যবহার করে নিজেদের ক্ষতি না করেন।" অথচ বলা হইয়াছে যে, একটি হারিয়ানা ষাঁড়ের দ্বারা বৎসরে ৭০৮০ টি গাভীর প্রজনন করা যায়, প্রতি "নির্দ্দিষ্ট এলাকায়" কতগুলি হারিয়ানা ষাঁড় রাখা হইয়াছে জানি না; তাহাদের দ্বারা কি স্থানীয় সকল গাভীর উপযুক্ত সময়ে প্রজনন সম্ভব; একটি ষাঁড়কে দিনে কয়টি গাভীর প্রজনন কার্য্যের জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে? গাভী 'ডাকিলেই' তাহার প্রজননের দরকার; সুতরাং হারিয়ানা ষাঁড়ের সুযোগ না পাইলে স্থানীয় ষাঁড়ের দ্বারাই উহার প্রজনন করাইতে হয়। পল্লীগ্রামের অবস্থা আমরা জানি বলিয়াই এই কথা বলিতেছি; যে সকল এলাকায় হারিয়ানা বা অন্য কোন উন্নত শ্রেণীর ষাঁড় আছে সেই সকল এলাকার খুব অল্পসংখ্যক লোকেরাই গাভীর প্রজননের জন্য উন্নত শ্রেণীর ষাঁড়ের সুবিধা পায়; অধিকাংশ লোকদের স্থানীয় ষাঁড়ের উপর নির্ভর করিতে হয়। কলিকাতার উপকণ্ঠে বেলগাছিয়াতে যে "পশু কলেজ" আছে সেখানেও প্রজননের জন্য ষাঁড় রাখা হইয়াছে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি যে, উক্ত কলেজেও সকল সময়ে গাভীর প্রজননের জন্য ষাঁড়ের সুবিধা পাওয়া যায় না; অনেক ক্ষেত্রেই গাভী ফিরাইয়া আনিতে হয়। সুতরাং বর্ত্তমানে উপরোক্ত উপদেশের বিশেষ সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না।

আরও একটি বিশেষ কথা এই যে, কেবল মাত্র উন্নত শ্রেণীর ষাঁড়ের দ্বারা গাভীদের প্রজনন কার্য্য করাইলেই কি স্থানীয় গোজাতির উন্নতি সাধন হইবে? আমাদের দেশে একটা চলতি কথা আছে, "গরুর মুখেই দুধ" অর্থাৎ গরুকে উপযুক্ত খাদ্য দিলেই উহার দুগ্ধের পরিমাণ বাড়িবে। সুতরাং গরুর উপযুক্ত খাদ্যের সংস্থান না করিয়া কেবলমাত্র উন্নত শ্রেণীর ষাঁড়ের প্রচলনের দ্বারা গোজাতিকে উন্নত করার আশা দুরাশা মাত্র। ইহা ব্যতীত আরও কয়েকটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যেমন, বর্ত্তমান গোয়াল ঘরের উন্নতি, রোগনিবারণের ব্যবস্থা, যত্ন প্রভৃতি। সকল বিষয়ই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

প্রথমেই বলিয়াছি যে, বিশেষজ্ঞদের মধ্যেও পশ্চিম বাংলার গোজাতি সম্পর্কীয় বর্ত্তমান সরকারী পরিকল্পনা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। সুতরাং একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করিয়া একটি কার্য্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।"

কাছাড়ে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন

কাছাড়ে সরকারী উদ্বাস্তু পুনর্বাসন নীতি যে ভাবে কার্য্যকরী করা হইতেছে তাহাতে উদ্বাস্তুদিগের বিশেষ উপকার হইতেছে না। বহু ক্ষেত্রেই ঋণের টাকা খণ্ড খণ্ড ভাবে দেওয়ার ব্যবস্থা হওয়ায় ঋণের উদ্দেশ্য সফল হইতেছে না। অথচ ঋণপ্রার্থী উদ্বাস্তুগণ আংশিক ঋণও প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন না। যাঁহারা আজ পর্য্যন্ত কোন সাহায্য বা ঋণ পান নাই তাঁহাদের দুঃখ-দুর্গতির ত সীমাই নাই।

সরকারী পুনর্বাসন নীতির সমালোচনা করিয়া সাপ্তাহিক 'যুগশক্তি' লিখিতেছেন:

"বহুনিন্দিত আই, টি,-এ স্কিমে কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক ২০,৯১,০০০ টাকা যে ভাবে অপব্যয়িত হইয়াছে তাহার কৈফিয়ৎ আজ কে দিবে? এত টাকা খরচ হওয়া সত্ত্বেও চা-বাগানস্থিত উদ্বাস্তুরা এক কেদার জমিরও স্বত্বস্বামিত্ব লাভ করিতে পারে নাই এবং তাহাদের অধিকাংশই চরম দুর্দ্দশার সম্মুখীন। এ

পর্যন্ত যে ভাবে সাহায্য ও ঋণ বণ্টন হইয়াছে তাহাতে চাষবাসের সময় অতিবাহিত হইয়া গেলে পর কৃষিঋণের অংশ পাওয়া গিয়াছে, বর্ষার সময় হয়ত রাস্তা তৈরি বা পুকুর কাটার অনুমতি মিলিয়াছে, যেখানে ব্যবসায়ের কোন সুযোগই নাই তথায় ব্যবসা-ঋণ মঞ্জুর হইয়াছে।"

সম্প্রতি ঝড়ে বহু উদ্বাস্তু গৃহহীন হইয়াছে। স্বল্পপরিমাণ সাহায্য দেওয়া হইলেও গৃহসমস্যার সমাধানের জন্য কোন সরকারী প্রচেষ্টা হয় নাই।

'যুগশক্তি' আরও লিখিতেছেন, "কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন বিভাগের কলিকাতা আপিসের অমনোযোগিতা, দীর্ঘসূত্রিতা ও অকর্মণ্যতা সম্পর্কে সরকারী বেসরকারী উভয় সূত্রেই নানা অভিযোগ শুনা যাইতেছে। রাজ্য সরকারের উপর কাছাড় জেলার উদ্বাস্তু পুনবসতি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব অর্পণ করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে সাহায্য সহযোগিতার পরিবর্তে বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছেন—এরূপ ধারণা বা আশঙ্কার কারণ ঘটা কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নহে। শেষ পর্যন্ত তাহা হইলে রাজায় রাজায় যুদ্ধে উলুখাগড়া উদ্বাস্তুরাই প্রাণে মরিবে।"

এই প্রসঙ্গে ২৭শে মার্চের 'যুগশক্তি'তে প্রকাশিত নিম্নলিখিত সংবাদটি বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। যুগশক্তি লিখিতেছেন: "প্রকাশ, ভারত-সরকারের পুনর্বাসন দপ্তর হইতে শিলচর শহরে এক পত্র আসিয়াছে। তাহার খামের উপরে ও শিরোনামায় লেখা রহিয়াছে —To the Chief Secretary, *Govt. of Cachar*; নীচে দস্তখত রহিয়াছে K. D. Gupta, Under-Secretary, Relief and Rehabilitation Dept, Govt. of India, New Delhi."

সরকারী অব্যবস্থার নমুনা

৩১শে মার্চের "মুর্শিদাবাদ সমাচার" পত্রিকায় প্রসাদ লিখিতেছেন:

"বহরমপুর সরকারী হাসপাতালে গত বৎসর ৬ই ডিসেম্বর বাংলার রাজ্যপাল একটি নূতন ১৫ কে-ভি এক্সরে প্ল্যান্টের উদ্বোধন করেন। উক্ত প্ল্যান্টটির দাম সরকারী ও বেসরকারী কয়েকটি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান দিয়াছেন। কিন্তু কল কেনা হইয়াছে, তাহার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনও হইয়াছে বটে, তবে এখন পর্যন্ত কল চালু হয় নাই। কাজেই হাসপাতালে এক্সরে লওয়ার সব ব্যবস্থা বর্তমানে বানচাল হইয়া গিয়াছে। পুরাতন কলটি যক্ষা ওয়ার্ডে পাঠানো হইয়াছে। সংবাদ লইয়া জানা গেল, নূতন এক্সরে কলটি চালু করার সমস্ত ব্যবস্থাই ঠিক, মাত্র তার লাগানোর (wiring) ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত হয় নাই। রাজ্যের ইলেকট্রিক ইঞ্জিনীয়ারীং বিভাগ এখনও বিজলী শক্তি গ্রহণের জন্য উপযুক্ত তারের ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই বলিয়া এক্সরে মেসিন চালু হয় নাই। রাজ্যের ইলেকট্রিক বিভাগ তিন মাসাধিক কালেও ওয়ারিং-এর কাজ শেষ করিতে পারেন নাই, ইহা বড়ই আশ্চর্যের কথা। চাবুক অভাবে ঘোড়া রেকাবের কাহিনী আর কাহাকে বলে। ঘটনার বিবরণ কি কেহ রাজ্যপাল মহোদয়কে জানান নাই?"

যদি এই সংবাদ ঠিক হয় তবে বলিতে হইবে 'সাবাস ডাঃ রায়'!

রেশম-শিল্প ও সরকারী প্রচেষ্টা

বাংলাদেশের রেশম-শিল্প নষ্ট হইয়াছে দীর্ঘদিনের সরকারী নিশ্চেষ্টতার ফলে। রেশমের উন্নত মান বজায় রাখিতে না পারার ফলে অন্যান্য প্রদেশে এবং বিদেশে বাংলার রেশমের চাহিদা কমিতে থাকে। বাংলা-সরকার তখন রোগমুক্ত রেশম কীট পোষণ ব্যাপারে সচেষ্ট হন এবং ১৯০৮ সনে সরকারী সেরিকালচার বিভাগ খোলা হয়। ১৯২৫ সনে এই বিভাগের উপর গ্রামে গ্রামে গুটিপোকা পালনের নূতন প্রণালী শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব অর্পিত হইলেও রেশম-শিল্পের উন্নতি ঘটে নাই। কেন্দ্রীয় রেশম কমিটি থাকা সত্ত্বেও বাংলার রেশম শিল্পের কোন উন্নতি হয় নাই, তাহার কারণ, 'মুর্শিদাবাদ সমাচারের' ভাষায়, "বাংলায় সবকিছু কাগজে-কলমে হইয়া থাকে, রেশম শিল্পের পুনরুজ্জীবনকল্পে যেটি প্রয়োজন সেই কার্যকরী বিদ্যা বা পরিকল্পনা গ্রামে গ্রামে অভাবী তুঁতচাষী বা রেশম-শিল্পীকে আজ পর্যন্ত ঠিকভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় নাই।"

দৃষ্টান্তস্বরূপ 'মুর্শিদাবাদ সমাচার' লিখিতেছেন: "এ সম্বন্ধে অধুনাতন একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। তাহা হইতে পশ্চিম বাংলায় রেশম-শিল্প উন্নয়ন প্রচেষ্টার রকমফের ভালই বুঝিতে পারা যায়। কিছুদিন পূর্ব্বে ভারত-সরকার জাপান হইতে তিনটি উন্নততর সিল্ক রিলিং মেসিন আনয়ন করেন এবং সেই তিনটি কল মহীশূর, কাশ্মীর ও বহরমপুরে স্থাপনের জন্য প্রেরণ করেন। উক্ত মেসিন স্থাপনা ও চালু করিবার জন্য মিঃ টারো টানাকা নামে এক জাপানী বিশেষজ্ঞও ভারতে আসেন। তিনি মহীশূর ও কাশ্মীরে উক্ত রিলিং মেসিন চালু করিয়া বাংলার মেসিন চালু করিতে বহরমপুরে আসেন। সেখানে তিনি ৪৫ মাসের মধ্যে কল চালু করিয়া দিলেও বহরমপুরে উক্ত কল বসাইতে মিঃ টানাকার এক বৎসরের বেশী লাগিয়া যায়।

"মহীশূর বা কাশ্মীরে উক্ত রিলিং মেসিন যে পরিমাণ সুতা দেয়, বহরমপুরে সে পরিমাণ সুতা এখনও হয় না। অথচ কল তিনটি এক এবং একই লোক কলগুলি বসাইয়া গিয়াছেন। কেন হয় না তাহার কৈফিয়ৎ রেশম কীটপোষ বিভাগ বলিতে পারেন। শুনিয়াছি, উক্ত মেসিনের জন্য যে উন্নততর রেশমের কোঁয়ার প্রয়োজন, তাহা বহরমপুর রেশম কীটপোষ ফার্মে হয় না, মালদহ হইতে সেই জাতীয় কোঁয়া আনাইতে হয়।

"অথচ আমরা জানি বহরমপুরে একটি কেন্দ্রীয় রেশম কীটপোষ রিসার্চ ষ্টেশন আছে, সেখানে রেশমের কোঁয়া বড় করিবার জন্য গবেষণা চলে। কিন্তু গবেষণার ফলে রেশমের উন্নততর কোঁয়া ব্যবসা করার মত বৃহত্তর মানে উৎপাদনের ব্যবস্থাসংশ্লিষ্ট বাস্তবে কতখানি

কার্য্যকরী করা হইতেছে, তাহা বিভাগই বলিতে পারেন। শুনিয়াছিলাম, পরলোকগত চারুচন্দ্র ঘোষ ব্রহ্মদেশ হইতে নূতন জাতের রেশমকীট আনাইয়া বহরমপুরে সেরিকালচার ফার্মে তাহার চাষে সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই জাতীয় রেশমের কোঁয়ার উৎপাদন এখনও বহরমপুর ফার্মে চলিতেছে কিনা বলা কঠিন। চলিলে মালদহ হইতে কোঁয়া আনয়নের প্রয়োজন থাকিতে পারে না। সেরিকালচার বিভাগ ঠিকই চলিতেছে, তবু মুর্শিদাবাদী রেশম-শিল্পের কিছু উন্নয়ন কাগজে-কলমে চলিতেছে, বাস্তব হয় নাই।"

সমস্যার সমাধানের পথ হিসাবে পত্রিকাটি অভিমত দিতেছে যে, অবিলম্বে উন্নততর প্রণালীতে তুঁতচাষ সম্পর্কিত যাবতীয় গবেষণার ফল চাষীদিগের গোচরীভূত করিতে হইবে। বর্ত্তমানে প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত দুই তিন জাতীয় পলু পোষার পরিবর্ত্তে সঙ্কর জাতীয় পলু পোষার প্রচলনের ফলে যে পলু-পালনকারীরা লাভবান হইবে তাহাদিগকে সে কথা বুঝাইতে হইবে এবং এই প্রকার রেশম পলু পুষিতে তাহাদের আগ্রহান্বিত করিতে হইবে। তুঁতচাষীরা যাহাতে অর্থলোভে পড়িয়া পাট চাষ না করে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং সর্ব্বোপরি "রেশম-শিল্পীদের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক চরম দুর্দ্দশা অপনোদনেও" অবহিত হইতে হইবে। তবেই রেশম-শিল্পের পুনরুজ্জীবন সম্ভব।

বোম্বাই রাজ্যপালের রাজভবনে ব্যয়

বোম্বাই রাজ্যের রাজভবনগুলির টেবিল, চেয়ার প্রভৃতির ঢাকা এবং দরজা ও জানালাগুলির পর্দ্দা পরিবর্ত্তন এবং রূপার থালা ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য সরকার পক্ষ বোম্বাই রাজ্য আইন-সভায় একটি অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব আনয়ন করেন। প্রস্তাবের সমর্থনে অর্থমন্ত্রী বলেন যে, রাজ্যপালের মানমর্য্যাদা বজায় রাখার জন্য এরূপ অর্থব্যয় করা যুক্তিযুক্ত।

এই বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করিয়া শ্রীমগনভাই দেশাই 'হরিজন' পত্রিকায় লিখিতেছেন: "মানমর্য্যাদা কিসে বজায় হয় তাহা নির্ভর করে কোন্ জিনিষে আমরা কি মর্য্যাদা আরোপ করি তাহার উপর। আমাদের মধ্যে কিছুটা সেই পুরাতন ধারণার অবশেষ রহিয়া গিয়াছে বটে যে রাজকীয় জাঁকজমক ও বহুমূল্য চাকচিক্যই বুঝি আভিজাত্য ও মর্য্যাদার প্রতীক। এই সকল জাঁকজমক ও আসবাবপত্রকে বর্ত্তমান যুগের ও গণতান্ত্রিক ভারতের অনুপযোগী বুঝিয়া বর্জ্জন করা উচিত নহে কি?…রাজভবনে গৃহস্থালীতে সাদাসিধা সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা প্রচলন করিয়া রাজ্যপালদের রাজকর্ম্মচারী ও জনসাধারণের সমক্ষে আদর্শ স্থাপন করা উচিত। ব্যয়সংক্ষেপের কথা ভাবিয়া ইহা নহে। অনাড়ম্বর সরল জীবনযাত্রার সৌন্দর্য্য ও মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং গণতন্ত্রের উপযোগী আভিজাত্যের মান প্রতিষ্ঠার জন্যই এইরূপ পন্থা গ্রহণীয় মনে হয়।"

সোভিয়েট রাশিয়ার বন্দীমুক্তি

ষ্টালিনের মৃত্যুর পর ম্যালেনকভের গবর্মেণ্ট কিছু কিছু বন্দীমুক্তির আদেশ দিয়াছেন। জারের আমলে পুত্রের জন্ম উপলক্ষ্যে রাজকীয় উৎসবে কিংবা সিংহাসন আরোহণ উপলক্ষ্যে বন্দীমুক্তি দেওয়ার প্রথা ছিল। বলশেভিক শাসনের প্রথম দিকে প্রায় প্রত্যেক বৎসরই কিছু কিছু বন্দী মুক্তি দেওয়া হইত। কিন্তু ষ্টালিনের শাসনকালে এই প্রথা লোপ পায়। ১৯২৭ সনে বৃহদাকারে শেষ বন্দী মুক্তি দেওয়া হয়—তখনও পর্য্যন্ত বন্দী-শিবির প্রথা সোভিয়েট রাষ্ট্র শাসনের একটি অঙ্গ হইয়া উঠে নাই। তার পর মাঝে মাঝে হয়ত কিছু কিছু বন্দী মুক্তি দেওয়া হইয়াছে কিন্তু এইরূপ অধিকসংখ্যক নহে।

আদেশ দেখিয়া মনে হয় যে, নিন্দিত বন্দীশিবিরের প্রায় অর্দ্ধেক বন্দী মুক্তিলাভ করিবে। যাহাদের সাজা পাঁচ বছরের কম তাহারা অবিলম্বে মুক্তি পাইবে; যাহাদের সাজা পাঁচ বছরের বেশী তাহাদের সাজা অর্দ্ধেক করিয়া দেওয়া হইবে। কেবলমাত্র যাহারা ভীষণ প্রকৃতির ডাকাত কিংবা বিদ্রোহী-বিপ্লবী তাহাদের সাজা মকুব করা হইবে না। যদিও গত ১৯৩০-৩৫ সনের পার্টি হইতে বহিষ্কার করিবার জন্য বন্দীশিবিরে যে সংখ্যক লোক ছিল, বর্ত্তমানে তাহার তুলনায় অনেক কম কয়েদী বন্দীশিবিরে আছে, তথাপি অনুমান করা হয় যে, এখন প্রায় কুড়ি হইতে ত্রিশ লক্ষ লোক রাশিয়ার বন্দীশিবিরে আছে।

বন্দীমুক্তির আদেশ যেন রাশিয়ার রাজনৈতিক জীবনকে সহজ এবং স্বাভাবিক করিবার প্রচেষ্টা। শেষ-জীবন পর্য্যন্ত ষ্টালিনের রাজত্বে রাজনৈতিক ধরপাকড় বাড়িয়াই চলিতেছিল। সেদিন পর্য্যন্ত ষ্টালিনের বিশ্বস্ত অনুচর ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, "রাশিয়ায় এখনও অনেক লোক বুর্জোয়া মনস্তত্ত্বে বিশ্বাসী।" বন্দীশিবির ছিল ষ্টালিনের রাজত্বের বিশেষত্ব। রাষ্ট্রের নূতন অধিনায়কগণ এরূপ নিন্দিত ব্যবস্থা যদি রহিত করিয়া দেন তাহা হইলে তাঁহারা বিশ্বের অভিনন্দন পাইবেন।

নূতন নীতির আরও পরিচয় আমরা পাইতেছি নিম্নলিখিত সংবাদে:

"মস্কো, ৪ঠা এপ্রিল—সোভিয়েট স্বরাষ্ট্র দপ্তর আজ ঘোষণা করিয়াছেন যে, কয়েকজন সোভিয়েট নেতার মৃত্যু ঘটাইবার অভিযোগে গত জানুয়ারী মাসে যে নয়জন বিশিষ্ট চিকিৎসককে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল তাহাদের মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

এই ঘোষণায় আরও বলা হইয়াছে যে, উক্ত চিকিৎসকগণ সোভিয়েট রাশিয়ার প্রাক্তন রাষ্ট্রনিরাপত্তা দপ্তর কর্ত্তৃক অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন—উঁহাদের গ্রেপ্তার করার কোনো আইনসঙ্গত যুক্তিই ছিল না এবং উঁহাদের নিকট হইতে আইনবিরোধী পন্থায় অপরাধের স্বীকৃতি আদায় করা হইয়াছিল। এই নয় জন চিকিৎসকের সহিত আরও ছয় জন চিকিৎসককে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের যে কেন গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল সরকারী ঘোষণায় সে সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই। এই প্রসঙ্গে আরও ঘোষণা করা হইয়াছে যে, মহিলা চিকিৎসক ডাঃ এল এফ টিমাসুককে গত

২০শে জানুয়ারী তারিখ যে 'অর্ডার অব লেনিন' উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছিল সুপ্রীম সোভিয়েটের সভাপতিমণ্ডলী তাহা নাকচ করিয়া দিয়াছেন। পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠী সোভিয়েটের এই সিদ্ধান্তকে সোভিয়েট শাসনব্যবস্থার ইতিহাসে অভূতপূর্ব বলিয়া অভিহিত করিতেছেন।"

নূতন নীতির এ পর্য্যন্ত যে দৃষ্টান্ত আমরা পাইয়াছি তাহা আশাপ্রদ। ইহাতে বুঝা যায় যে এতদিনে বহির্বিশ্বের মতামতের কিছু ছায়া সোভিয়েটে পড়িয়াছে। ভারতের শান্তি-প্রস্তাব অতি রূঢ় অশিষ্ট ভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়া সোভিয়েটের দল প্রাচ্য-জগতের দৃষ্টিতে অনেক নামিয়াছিলেন। এখন ঐ প্রস্তাবই সামান্য অদল-বদল করিয়া চীন সরকারের নামে উপস্থিত করা হইয়াছে এবং ভারতীয়দের মনের খেদ মিটাইবার জন্য একজন তৃতীয় শ্রেণীর রাজনৈতিক ভাগ্যান্বেষীকে "ষ্টালিন শান্তি পুরস্কার" দেওয়া হইয়াছে। ঐরূপে ইহুদিমেধ যজ্ঞারম্ভের ফলে সারা ইউরোপের কম্যুনিষ্ট গোষ্ঠীতে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হয়—বিশেষতঃ যেখানে সোভিয়েটের আধিপত্য নাই। তাহার ফলে মিথ্যা অভিযোগের প্রত্যাহার ও প্রকৃত দোষীর সাজার ব্যবস্থা হইল।

মনে হয় ষ্টালিন ছিলেন হিটলারী মতবাদের ভক্ত, সেইরূপ একনায়কত্ব, অন্যের মতামতকে ঘৃণার সহিত উপেক্ষা, ইত্যাদি সবকিছুই তাঁহার রাষ্ট্র-চালনায় দেখা যাইত। হয়ত বা নূতন দল অন্য মতাবলম্বী।

জাতি-বিদ্বেষের দেশ দক্ষিণ-আফ্রিকা

ভি. লংগিলোফ লিখিতেছেন: "দক্ষিণ আফ্রিকার অশ্বেতকায় অধিবাসীরা বহুকাল যাবৎ অতীব নিষ্ঠুর জাতিবৈষম্য ও জাতি-নির্যাতন সহ্য করিয়া আসিতেছে। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই জাতি-বৈষম্য প্রবেশ করিয়াছে—জনশিক্ষায়, টেকনিক্যাল ট্রেনিং ও মেডিক্যাল সার্ভিসে, বাসগৃহ নীতিতে, সংস্কৃতির ব্যাপারে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে। স্থানীয় কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীদের থিয়েটারে যাইবার, পার্কের বেঞ্চে বসিবার ও একই রেলগাড়ীতে ইউরোপীয়দের সঙ্গে ভ্রমণ করিবার অধিকার নাই।

"ফ্যাসিষ্ট মালান গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবার পর জাতিবৈষম্য আরও প্রবল আকার ও অসম্ভব ব্যাপকতা লাভ করে। ১৯৫০ সনে মালান সরকার জাতিগত পৃথক বসবাস আইন পাস করে। এই জঘন্য আইনের মর্ম্ম এই যে, কৃষ্ণাঙ্গ পীতাঙ্গদের শ্বেতাঙ্গদের নিকট হইতে আলাদা করিয়া রাখা হইবে। এই আইনে আফ্রিকাবাসীদের নেটিভ অঞ্চলে ও অন্যান্য এশিয়াবাসীদের পৃথক অঞ্চলে বসবাসের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দক্ষিণ-আফ্রিকার ইউনিয়নে 'পাস' সম্পর্কিত আইন এক কলঙ্কময় কুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। এই আইন অনুসারে আফ্রিকাবাসীদের সব সময়ে তাঁহাদের সঙ্গে রাখিতে হইবে তাঁহাদের পোল ট্যাক্স পরিশোধের রসিদ, কাজের সার্টিফিকেট ও রাত্রির পাস।

"পূর্ব্বে অপরাপর অশ্বেতকায়দের তুলনায় ভারতীয়দের অদৃষ্ট কিছুটা ভাল ছিল। কিন্তু ১৯৪৮ সনে ভারতীয়দেরও সর্ব্ব অধিকার-বঞ্চিত আফ্রিকাবাসীদের সমপর্য্যায়ে নামাইয়া আনা হয়। আফ্রিকাবাসীদের ন্যায় ভারতীয়রাও ভোটের অধিকার হইতে বঞ্চিত।

"অশ্বেতকায়দের অধিকাংশই নিরক্ষর। বর্ণবিদ্বেষী শাসকরা তাঁহাদের সম্মুখে শিক্ষার পথ অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

"দক্ষিণ-আফ্রিকার ইউনিয়নে জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রভুত্ব করিতেছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের কুক্ষিগত খনিশিল্প। পঁচিশ লক্ষ অশ্বেতকায় মজুরের মধ্যে প্রায় পাঁচ লক্ষ কাজ করে খনিশিল্পে। আকরিক ধাতু খনিগুলির কাজের অবস্থা ও ব্যবস্থা ভয়াবহ এবং মজুরীর হার শোচনীয়। নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও শ্রমিক আইন-কানুনের কোনও বালাই নাই। ছাদ ধ্বসিয়া পড়া ও অন্যবিধ খনি-দুর্ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। খনিগুলির জন্য মজুর সংগ্রহের কাজকে দক্ষিণ-আফ্রিকায় বলা হয় নেটিভ যোগাড়ের 'শিকার'। এই সংগ্রহ অভিযানের সঙ্গে থাকে পুলিসবাহিনী। পুলিস লইয়া রাত্রিকালে আফ্রিকাবাসীদের আস্তানায় হানা দেওয়া হয়।

"আফ্রিকাবাসীদের ধর্ম্মঘটে অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার নাই। এই নিষেধ অমান্য করিলে তিন বৎসরের কঠোর কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়।"

"জাতিবৈষম্য ও পুলিসী চণ্ডলীলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া গত জুন মাসে নিগ্রো, মুলাত্তো ও ভারতীয়রা কুখ্যাত ফ্যাসিষ্ট শাসকদের বিরুদ্ধে আইন অমান্যের আন্দোলন সুরু করে। ব্যাপক গণআন্দোলনে ভীতিগ্রস্ত হইয়া দক্ষিণ-আফ্রিকা ইউনিয়নের গবর্ণমেণ্ট ঐ আন্দোলনে যোগদানকারীদের উপর নৃশংস পুলিসী ব্যবস্থা চালাইতে থাকেন। ১৯৫২ সনের ২৬শে জুন হইতে ১৯৫৩ সনের ১লা জানুয়ারী পর্যন্ত সময়ের মধ্যে মালান গবর্ণমেণ্ট আট হাজারেরও বেশী দক্ষিণ-আফ্রিকান দেশভক্তকে কারারুদ্ধ করিয়াছেন।

"কিন্তু কোন কিছুই নিপীড়িত জনতার মনোবল ভাঙিয়া দিতে পারিবে না। দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্ত অধিবাসীর গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতা আদায়ের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রাম জয়যুক্ত করিবার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার প্রগতিশীল শক্তিগুলি দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছে।

বিশ্ব ভাস্কর-শিল্প প্রতিযোগিতা

'মার্কিন-বার্ত্তা'র সংবাদে প্রকাশ, লণ্ডন ইন্‌ষ্টিটিউট অব কন্‌টেমপোরারী আর্টসের উদ্যোগে এপ্রিল মাসে লণ্ডনে বিশ্ব ভাস্কর-শিল্প প্রতিযোগিতার আয়োজন হইতেছে। 'অজ্ঞাত রাজনৈতিক বন্দী' হইল প্রতিযোগিতার বিষয়। ভারতবর্ষসহ পৃথিবীর ৫৭টি রাষ্ট্র এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবে। এই প্রতিযোগিতায় যে শিল্পের নিদর্শন শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহা কোন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শহরে প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। আন্তর্জাতিক বিচারকগণের নির্ব্বাচিত ৮০টি নিদর্শন লণ্ডনস্থ টাটে শিল্পশালায় প্রদর্শিত হইবে এবং মোট ৩২ হাজার ২শত ডলার শিল্পীদিগকে পুরস্কারস্বরূপ দেওয়া হইবে।

প্রাচীন ভারতে নারীশিক্ষা

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

বর্তমান ভারতে শিক্ষা, বিশেষ করে নারীশিক্ষা, একটি প্রধানতম সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কথা বলাই বাহুল্য যে, দেশের উন্নতির সঙ্গে শিক্ষাবিস্তার অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত। আমাদের দেশে আজ পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষার হারই অতি অল্প, নারীশিক্ষার কথা ত বাদ দেওয়াই চলে। সেজন্য দেশের চিন্তাশীল বিজ্ঞ ব্যক্তিরা আজ সকলেই একত্র হয়ে এই গুরুতর সমস্যা সমাধানের জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারতে নারীশিক্ষার কি সুযোগ-সুবিধা ও বিধিব্যবস্থা ছিল তা বিশেষ ভাবে চিন্তনীয়। কারণ অতি প্রাচীন এবং বারংবার বৈদেশিকগণের আক্রমণে বিধ্বস্ত এই জাতির বহু ভাল জিনিষই আজ অবলুপ্ত হয়ে গেছে। সেজন্য বর্তমান যুগের প্রগতিশীল পাশ্চাত্ত্য জাতিসমূহের নিকট ভিক্ষাপাত্র নিয়ে দাঁড়াবার পূর্বে আমাদেরই অতি নিজস্ব সংস্কৃতির যুগ যুগব্যাপী সঞ্চিত রত্নাগারে কি অমূল্য নিধি অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে, তা জানতে চেষ্টা করার দিন আজ এসেছে। সেজন্য প্রাচীন ভারতে মেয়েদের শিক্ষার প্রণালী কি ছিল এবং নবীন ভারতে তা কত দূর গ্রহণযোগ্য সে সম্বন্ধে সামান্য কিছু আলোচনা আজ করছি।

প্রাচীন ভারতে চতুরাশ্রমের মধ্যে সর্বপ্রথম আশ্রম ছিল "ব্রহ্মচর্য" বা বিদ্যান্বেষী ছাত্রজীবন। "ব্রহ্মচর্য" নামটি অতি সুন্দর এবং এই সুমিষ্ট নামের মধ্যেই নিহিত হয়ে আছে আমাদের বেদোপনিষৎসম্মত সুপ্রাচীন শিক্ষার অপূর্ব আদর্শটি। "ব্রহ্মচর্য" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হ'ল : "ব্রহ্মণি চরতি যঃ সঃ ব্রহ্মচারী ; তস্য ভাবম্ ইতি ব্রহ্মচর্যম্"। অর্থাৎ, ছাত্রজীবনের অর্থ ই হ'ল বেদ ও ব্রহ্মে বিচরণ করা বা বেদ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়া। ভারতীয় মতে বিদ্যাশিক্ষার অর্থ কেবল ব্যবহারিক এবং জাগতিক দিক্ থেকে প্রয়োজনীয় শিল্পকলা প্রভৃতি আয়ত্ত করে, সাংসারিক দিক্ থেকে ধন, মান প্রভৃতি অর্জন করা নয়, প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য আরও অনেক ব্যাপক ও গভীর। কারণ শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য আত্মোপলব্ধি ও আত্মোন্নতি বা মানবের ভগবৎস্বরূপত্বের পূর্ণ পরিস্ফুটন। ভারতবর্ষের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, সৃষ্টির আদিকাল থেকে এই পুণ্যভূমি ভূমার পূজারী। মানবসভ্যতার প্রথম উষাগমে জগতে সর্বপ্রথম এই দেশেরই ঋষিকণ্ঠে সগৌরবে ধ্বনিত হয়েছিল ভূমা মহানের সেই অপূর্ব জয়গান :

"যো বৈ ভূমা তৎ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি।"

সেজন্য ভারতীয় মতে সেই শিক্ষাই একমাত্র শিক্ষা যা মানবকে ভূমা মহানের পথে উদ্বুদ্ধ করে এবং সত্তার পূর্ণতম বিকাশের সহায়ক হয়। সেজন্য পরমতত্ত্বলাভে চরম আত্ম-বিকাশই শিক্ষার মূল কথা। এরূপে আত্মসংযম ও তপস্যার দ্বারাই ছাত্র বিদ্যার্জনে ব্রতী হতেন। সেজন্য প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাবিধির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিল, যা অন্যত্র দৃষ্ট হয় না।

১। প্রথমতঃ ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রবেশের পূর্বে জ্ঞানার্থী ছাত্রকে গুরু কর্তৃক উপনীত হতে হ'ত। জ্ঞানার্থীকে জ্ঞানলাভের উপযুক্ত বলে বিবেচনা করলে গুরু তাঁকে ছাত্ররূপে গ্রহণ করে নিতেন এই পবিত্র উপনয়ন সংস্কার বা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। উপনয়ন সংস্কার ব্যতীত ছাত্র বেদপাঠ ও বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণে অধিকারী হতেন না।

২। ব্রহ্মচর্যকালে ছাত্রকে গুরুগৃহে পরিবারভুক্ত হয়ে পুত্রবৎ বাস করতে হ'ত।

৩। এই সময়ে তপস্যা ও আত্মসংযমের প্রতীকস্বরূপ ছাত্রকে কয়েকটি বাহ্যিক চিহ্ন ধারণ করতে হ'ত। যথা, তাঁকে অজিন বা মৃগচর্ম ও বল্কল পরিধান করতে হ'ত, হাতে দণ্ড নিতে হ'ত এবং জটা, উপবীত ও মেখলা ধারণ করতে হ'ত। পাঠ, ধ্যান প্রভৃতি ছাত্রজনোচিত কর্তব্যকর্ম ব্যতীত তাঁকে দীনতা ও আত্মাভিমানশূন্যতার প্রমাণস্বরূপ প্রত্যহ সমিধ আহরণ, গোপালন, ভিক্ষাবৃত্তি প্রভৃতি কর্মেও প্রবৃত্ত হতে হ'ত।

নারীদের ক্ষেত্রেও এই একই শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত ছিল কি না, তা প্রথম বিবেচ্য। এই প্রসঙ্গে যে প্রশ্নটি সর্ব-প্রথম মনে জাগে তা হ'ল এই যে, প্রাচীন ভারতে নারী-দেরও উপনয়নে এবং বেদপাঠ ও বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণে অধিকার ছিল কি না। পরবর্তী যুগে অবশ্য—রাজনৈতিক নানা কারণে দুর্ভাগ্যক্রমে নারীরা উপনয়নে অধিকার হারিয়ে বৈদিক শিক্ষা ও অন্যান্য সকল প্রকার শিক্ষা-দীক্ষা থেকেই ক্রমশঃ হয়েছিলেন বঞ্চিত। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রের প্রকৃত বিধান যে এ কোনক্রমেই নয়, তারও প্রমাণ বেদোপনিষদ্ প্রভৃতিতে বহু পাওয়া যায়।

প্রাচীন ভারতে নারীদেরও যে ব্রহ্মচর্য বা শিক্ষাদীক্ষায় পূর্ণ অধিকার ছিল তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় অথর্ব-

বেদের একটি মন্ত্রে: "ব্রহ্মচর্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিম্"। (১১-৫-১৮।)—ব্রহ্মচর্য বা বেদচর্চার দ্বারা কন্যা তরুণ বয়স্ক পতিলাভ করেন।

"সংস্কার প্রকাশ" নামক স্মৃতিগ্রন্থেও বলা হয়েছে: "প্রাগ্ রজসঃ সমাবর্তনম্ ইতি হারীতোক্ত্যা", অর্থাৎ, সুবিখ্যাত স্মৃতিকার হারীতের মতে, যৌবনপ্রাপ্ত হবার পূর্বেই নারীদের সমাবর্তন বা গুরুগৃহ থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করে প্রত্যাবর্তন করা কর্তব্য।

পূর্বমীমাংসা সূত্রের প্রখ্যাত ভাষ্যকার জৈমিনিও "স্বর্গ-কামো যজেত" এই সুপ্রসিদ্ধ বিধির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে স্পষ্ট বলেছেন যে, নরনারী নির্বিশেষে সকল স্বর্গলাভেচ্ছু ব্যক্তিই বৈদিক যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপে পূর্ণ অধিকারী: "স্ত্রী চাবিশেষাৎ"।

মাধবাচার্যও তাঁর "ন্যায়মালা বিস্তারে" পরিষ্কারভাবে বলেছেন: "ইত্যত্রাপি স্ত্রিয়োপি অধিকারঃ"। অর্থাৎ, আট বৎসর বয়সে ব্রাহ্মণ-সন্তানদের উপনয়ন ও অধ্যয়নের ব্যবস্থা করা কর্তব্য—নারীদেরও এসবে সমান অধিকার আছে।

এরূপে প্রাচীন ভারতে যে নারীরা পুরুষদের মতই যথাকালে উপনীতা হয়ে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রবেশ করে বেদপাঠ করতেন তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বা direct evidence আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়।

এ ছাড়া নারীদের উপনয়নে অধিকারের অন্যান্য বহু পরোক্ষ প্রমাণ বা indirect evidence-ও সর্বত্র জাজ্বল্যমান। তন্মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রমাণ, নারীদের বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণে পূর্ণ অধিকার। কন্যা, পত্নী ও মাতারূপে নারীরা যে বিভিন্ন গৃহ্য ও শ্রৌত ক্রিয়াকলাপে মন্ত্রোচ্চারণ করতেন তার অসংখ্য প্রমাণ আমাদের গৃহ্য ও শ্রৌতাদি সূত্রে ও সংহিতা প্রমুখ গ্রন্থে আমরা পাই। যথা, বাজসনেয়ক সংহিতায় উল্লিখিত আছে যে, শাকমেধ যজ্ঞকালে পতি-লাভেচ্ছু কুমারী সুবিখ্যাত ত্র্যম্বক মন্ত্র উচ্চারণ করেন। পত্নীর বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ ও পতির সঙ্গে বৈদিক যাগ-যজ্ঞাদিতে অংশ গ্রহণের কথা ত সুবিদিত। কারণ সুবিখ্যাত বৈয়াকরণ পাণিনির মতে, "পত্নী" শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থই হ'ল "পত্যুর্নো যজ্ঞসংযোগে"। অর্থাৎ, পত্নী পতির যজ্ঞসহকারিণী ও ধর্মসঙ্গিনী। আশ্বলায়ন-গৃহ্য-সূত্রে বলা হয়েছে যে, গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করবার পর থেকেই গৃহকর্তা, তাঁর স্ত্রী, পুত্র, কুমারী কন্যা বা শিষ্য নিয়মিত গৃহাগ্নিতে হোম ও আহুতি প্রদান করবেন। এরূপে হোমের প্রারম্ভে ও শেষে নারীরাও প্রণব মন্ত্রোচ্চারণ এবং আহুতি প্রদানে পূর্ণ অধিকারিণী ছিলেন। পারস্কর গৃহ্য-সূত্রের মতে নারীরা পুরুষের সহায়তা ব্যতীতই সীতাযজ্ঞ সম্পাদনে অধিকারিণী ছিলেন। হরিহর তাঁর ভাষ্যে স্পষ্ট বলেছেন যে, "পুরুষাণাং স্ত্রীণাং সর্বাসাং মন্ত্র পাঠঃ"—স্ত্রী-পুরুষ সকলেই মন্ত্রপাঠে সমান অধিকারী।

এই দু-একটি দৃষ্টান্ত থেকেই স্পষ্ট প্রমাণিত হবে যে, বৈদিক যুগে নারীরা 'ওম্', 'স্বাহা' প্রভৃতি বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ করতেন। কিন্তু উপনয়ন ব্যতীত মন্ত্রোচ্চারণে অধিকার জন্মে না—সেজন্য নারীরাও যে সে সময়ে উপনয়নে ও পুরুষদের মতই ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও শিক্ষাদীক্ষায় সমান অধিকারিণী ছিলেন, তা নিঃসন্দেহ।

বৈদিক ও তৎপরবর্তী যুগের নারীশিক্ষার অত্যুচ্চ মান এবং নারীদের উপনয়ন ও ব্রহ্মচর্যে অধিকারের আর একটা শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। জগতের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদে ঘোষা, গোধা, বিশ্ববারা, অপালা প্রমুখ সাতাশ জন নারীঋষি-রচিত সূক্ত ভারতীয় রমণীদের অপূর্ব মনীষার উজ্জ্বলতম নিদর্শনরূপে আমাদের অশেষ গৌরবের কারণ-স্বরূপ বিরাজ করছে। এই নারীঋষিদের মধ্যে অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্ নিগূঢ়তম 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' তত্ত্ব পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি পূর্বক ব্রহ্মের সঙ্গে নিজের অভিন্নত্ব প্রকাশ করে যে অপূর্ব সূক্তটি রচনা করেন, তা সত্যই অতুলনীয়।

উপনিষদের যুগেও পূর্ববর্তী বৈদিক যুগের উচ্চ মান ও আদর্শ অক্ষুণ্ণ ছিল। এই যুগের বিদুষী নারীদের মধ্যে উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক ছিলেন দার্শনিকশ্রেষ্ঠা গার্গী, বাচক্নবী। যে বৃহদারণ্যক উপনিষদে 'পণ্ডিতা দুহিতা' লাভেচ্ছুক দম্পতির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা দেওয়া আছে, সেই বৃহদারণ্যক উপনিষদেই 'পণ্ডিতা দুহিতার' শ্রেষ্ঠ প্রতীকরূপে আমরা সাক্ষাৎলাভ করি এই মহীয়সী নারী গার্গীর। মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্য যখন নিজেকে ব্রহ্মনিষ্ঠ বা সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞরূপে দাবি করেন, তখন অন্যান্য আট জন প্রখ্যাত জ্ঞানী ঋষি তাঁর পাণ্ডিত্য পরীক্ষা করবার জন্য তাঁকে নানাবিধ দর্শন সম্বন্ধীয় প্রশ্ন করেন। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য তাঁদের প্রশ্নের উত্তর অবলীলাক্রমে প্রদান করে তাঁদের সকলকেই পরাস্ত করেন। কেবল মাত্র মহামনস্বিনী গার্গীর প্রশ্নের উত্তর দিতে না পেরে তিনি বলতে বাধ্য হন, 'স হোবাচ—গার্গী! মাতি প্রাক্ষীঃ মা তে মূর্ধা ব্যপপ্তৎ॥'—গার্গী! অতি প্রশ্ন করো না, তোমার মস্তক যাতে নিপতিত না হয়।' (বৃহদা ৩.৬।) প্রকাণ্ড রাজসভায় সহস্র সহস্র মহাপণ্ডিতগণের সম্মুখে গার্গীর এই জয় সেই সময়ে ভারতীয় নারীদের অপূর্ব ধীশক্তি ও বিদ্যাবত্তার পরিচায়ক। পরে অবশ্য যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর নিকট নিগূঢ় অক্ষর বিদ্যাপ্রপঞ্চিত করলে, তিনি তাঁকে বিনা দ্বিধায় ব্রহ্মিষ্ঠ বলে স্বীকার করলেন।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের আর এক জন মহীয়সী মহিলা

মৈত্রেয়ীর শাশ্বত জিজ্ঞাসা: 'যে নাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্'—যাতে আমি অমৃতত্ব লাভ না করতে পারি, তাতে আমার কি লাভ? মানব হৃদয়ের চিরন্তনী আকৃতি রূপে কালের অসীম প্রান্তরে নিরন্তর ধ্বনিত হচ্ছে।

পরবর্তী পাণিনির যুগেও আমরা বহু পণ্ডিতা ও শিক্ষাব্রতী রমণীর সাক্ষাৎ লাভ করি। সেই সময়ে শিক্ষাদাত্রী রমণীর সংখ্যা এত অধিক ছিল যে, তাঁদের জন্য একটি বিশেষ নাম বা সংজ্ঞার প্রয়োজন হয়। শিক্ষক বা অধ্যাপকের স্ত্রীকে 'আচার্যাণী' ও 'উপাধ্যায়ানী' বলা হ'ত। কিন্তু 'যা তু স্বয়মেবাধ্যাপিকা' যাঁরা নিজেরাই অধ্যাপিকা তাঁদের নাম ছিল—'আচার্যা' ও 'উপাধ্যায়া' বা 'উপাধ্যায়ী'। পাণিনি বেদের বিভিন্ন শাখা পাঠকারিণী নারীদের জন্য বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছিলেন। যথা, কঠ শাখা ও ঋগ্বেদে পারঙ্গতা নারীদের যথাক্রমে 'কঠি' ও 'বহ্বৃচী' বলা হ'ত। পতঞ্জলির মতে, আপিশলী ব্যাকরণ এবং কাশকৃৎস্ন মীমাংসাদর্শনে ব্যুৎপত্তিশালিনীদের যথাক্রমে 'আপিশলা' ও 'কাশকৃৎস্না' নাম ছিল। তিনি এও বলেছেন যে, ঔড়মেধ্যা নাম্নী উপাধ্যায়ার শিষ্যদের 'ঔড়মেধ্য' বলা হ'ত।

উপরের কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকেই নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হবে যে, মানবসভ্যতার প্রথম ঊষাগম ঋগ্বেদের কাল থেকেই ভারতের মেয়েরা সকল ক্ষেত্রেই পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার ও সম্মান দাবি করতেন এবং তাঁদের সে ন্যায্য দাবিও সমাজ ও পরিবার সানন্দে স্বীকার করত। সেজন্য শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রেও যে নারীরা পুরুষদের মতই সমান সুযোগ-সুবিধা পেতেন, তা বলাই বাহুল্য। অতএব এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, মেয়েরাও প্রাচীন যুগে উপনয়ন সংস্কার, ব্রহ্মচর্যাশ্রম এবং বেদপাঠ প্রভৃতিতে পূর্ণ অধিকারিণী ছিলেন।

এ স্থলে প্রশ্ন হতে পারে যে, পুরুষদের শিক্ষাব্যবস্থা প্রাচীন যুগে নারীদের ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য ছিল কি না। আমরা জানি যে, সেই যুগে ছাত্ররা ব্রহ্মচর্যাশ্রম কালে বা ছাত্রাবস্থায় গুরুগৃহে বসবাস করতেন; মৃগচর্ম, মেখলা, জটা, দণ্ড প্রভৃতি কয়েকটি চিহ্ন ধারণ করতেন, এবং ভিক্ষা প্রভৃতি কয়েকটি দৈনন্দিন বৃত্তি অবলম্বন করতেন। মেয়েদের ক্ষেত্রেও এগুলি বাধ্যতামূলক ছিল কি না, সে বিষয়ে কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ অবশ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু কয়েকটি পরোক্ষ প্রমাণ আমাদের এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে যথেষ্ট সাহায্য করে। যেমন, এই সম্বন্ধে সুবিখ্যাত স্মার্ত যম ও হারীতের দুটি বিধান আমরা পাই। যম বলেছেন:

"পুরাকল্পে কুমারীণাং মৌঞ্জী বন্ধনমিষ্যতে" ইত্যাদি।

অর্থাৎ,

"পুরাকল্পে কুমারীগণ মৌঞ্জী বা মেখলা ধারণ করতেন, বেদপাঠ করতেন, এবং সাবিত্রী মন্ত্র বা প্রণব উচ্চারণ করতেন। কিন্তু বর্তমানে পিতা, ভ্রাতা বা পিতৃব্য ব্যতীত অন্য কেহ তাঁদের শিক্ষা দেবেন না; তাঁরা স্বগৃহেই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করবেন, এবং তাঁরা মৃগচর্ম, বল্কল ও জটাধারণ পরিত্যাগ করবেন।"

হারীত বলছেন:

"দ্বিবিধাঃ স্ত্রিয়ঃ, ব্রহ্মবাদিন্যঃ সদ্যোবধ্বশ্চঃ" ইত্যাদি।

অর্থাৎ,

"স্ত্রীগণ দ্বিবিধ—ব্রহ্মবাদিনী ও সদ্যোবধূ। এঁদের মধ্যে ব্রহ্মবাদিনীগণ উপবীত ধারণ, যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি প্রদান, বেদাধ্যয়ন, এবং স্বগৃহে ভিক্ষাবৃত্তিতে অধিকারিণী। কিন্তু সদ্যোবধূগণ বিবাহের পূর্বেই কেবল উপনীত হন।"

এরূপে যমের মতে, পুরাকালে বা প্রাচীন বৈদিক যুগে স্ত্রী পুরুষের একই শিক্ষাব্যবস্থা ছিল, এবং নারীরা পুরুষদের মতই গুরুগৃহে অধ্যয়ন করতেন, মৃগচর্মাদি ধারণ করতেন এবং ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতেন। কিন্তু যমের যুগে বা পরবর্তী স্মৃতির যুগে নারীদের অধিকার ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হয়ে আসাতে স্ত্রী পুরুষের শিক্ষাব্যবস্থা ভিন্ন করা হয়, এবং নারীদের গুরুগৃহে গমন, মৃগচর্মাদি ধারণ, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন প্রভৃতি নিষিদ্ধ হয়।

হারীতের মতেও ব্রহ্মবাদিনী বা উচ্চতম জ্ঞানলাভেচ্ছু নারীরা পুরুষদের মতই শিক্ষাদীক্ষায় পূর্ণ অধিকারিণী—কেবল তাঁরা স্বগৃহেই অধ্যয়নাদি করবেন, গুরুগৃহে নয়।

এরূপে সিদ্ধান্ত করা চলে যে, প্রাচীন বৈদিক যুগে নরনারীর শিক্ষাবিধিতে কোনরূপ প্রভেদ বা তারতম্য ছিল না। পরবর্তী যুগের মত সে যুগে মেয়েদের পক্ষে বিবাহও বাধ্যতামূলক ছিল না এবং বৈদিক যুগে অবিবাহিতা মেয়েদের 'অমাজুঃ' বলা হ'ত। ব্রহ্মবাদিনী ঋষিরা সে যুগে অনায়াসে নিগূঢ়তম জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চায় জীবন অতিবাহিত করতে পারতেন; গুরুগৃহে পঠন-পাঠন করতে পারতেন এবং নিজেরাও ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দিতে পারতেন।

বৈদিক এবং পরবর্তী যুগে পাঠ্যতালিকায় কি কি বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল, সে সম্বন্ধে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। সে যুগে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার সমান সুযোগ-সুবিধা ছিল বলে পাঠ্যতালিকার দিক্ থেকেও যে তাঁদের মধ্যে কোনরূপ প্রভেদ করা হ'ত না, তা নিশ্চিত। বিশেষ করে, উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে পুরুষদের মত নারীরাও বেদ, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ এবং বেদাঙ্গ পাঠ করতেন। মুণ্ডক উপনিষদে ছয়টি বেদাঙ্গের উল্লেখ আছে, যথা—শিক্ষা বা বেদোচ্চারণ প্রভৃতি বিষয়ক বিদ্যা, কল্প বা বৈদিক যাগযজ্ঞাদি বিষয়ক বিদ্যা, ব্যাকরণ, নিরুক্ত বা শব্দতত্ত্ব, ছন্দঃ এবং জ্যোতিষ। কিন্তু বেদ ও বেদাঙ্গসমূহকে মুণ্ডক উপনিষদে 'অপরা বিদ্যা', এবং

অক্ষর বিদ্যাকে 'পরা বিদ্যা' বলে অভিহিত করা হয়েছে। ছান্দোগ্যোপনিষদে নারদ—চতুর্বেদ, ইতিহাস, পুরাণ, ব্যাকরণ, শ্রাদ্ধতত্ত্ব, গণিতশাস্ত্র প্রভৃতি কুড়িটি বিদ্যা লাভ করে কেবল 'মন্ত্রবিৎ' হয়েছেন, 'আত্মবিৎ' হতে পারেন নি বলে দুঃখ করেছেন' (৭-১)। সুতরাং এই কুড়িটি শাস্ত্রও 'অপরা বিদ্যা' বলে পরিগণিত হ'ত।

নারীরাও 'পরা বিদ্যা' ও 'অপরা বিদ্যা' উভয় শাস্ত্রই শিক্ষালাভ করে পারদর্শিনী হতেন, নিঃসন্দেহ।

নারীরাও জাগতিক বিদ্যার্জনেও সমান সুবিধা পেতেন। যথা, তাঁরা রচনাকৌশল শিক্ষা করে রচনা বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। ঋগ্বেদের সাতাশ জন নারীঋষি বিরচিত সূক্তসমূহ কেবল দার্শনিক বা আধ্যাত্মিক দিক্‌ থেকেই উল্লেখযোগ্য নয়, শ্রেষ্ঠ কাব্যরচনারও নিদর্শনস্বরূপ। নারীদের কাব্য রচনার এই অপূর্ব ধারাটি পরবর্তী যুগেও বহুদিন অব্যাহত ছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, মধ্যযুগের সংস্কৃত নারী কবি বিজ্জা, বিকটনিতম্বা, শীলা ভট্টারিকা, মারুলা, মোরিকা প্রভৃতি এবং প্রাকৃত নারী কবি অনুলক্ষ্মী, অমুলদ্ধি, মাধবী প্রভৃতি নামোল্লেখ করা যায়।

নারীরা নানারূপ ললিত কলাতেও শিক্ষালাভ করে পারদর্শিনী হতেন। বিশেষ করে নৃত্য, গীত ও বাদ্য তাঁদের অতি প্রিয় বিষয় ছিল। ঋগ্বেদে নারীরা উৎসবাদি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে গান করতেন বলে উল্লেখ আছে। সত্যাষাঢ় শ্রৌতসূত্র, সাংখ্যায়ন শ্রৌতসূত্র, লাট্যায়ন শ্রৌতসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থে অপঘাটলিকা, শালুক বীণা, কাণ্ডবীণা, পিচ্ছোরা প্রভৃতি যে সুকঠিন বাজনা মেয়েরা সে যুগে বাজাতেন, তার সুদীর্ঘ তালিকা পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে নারীদের নৃত্য-কুশলতারও প্রমাণ আছে।

বৈদিক যুগে নারীরা বাগ্মিতা শক্তির জন্যও প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁরা সমন বা প্রকাশ্য সভায় পুরুষদের সঙ্গে বিতর্ক, আলোচনা প্রভৃতিতে পরাঙ্মুখ ছিলেন না।

আজ পর্যন্ত আমাদের দেশেই কেবল নয়, প্রগতিশীল পাশ্চাত্য দেশেও নারীদের যুদ্ধবিদ্যাদি শিক্ষার কোনওরূপ বিধিব্যবস্থা নেই। কিন্তু প্রাচীনতম ঋগ্বেদে আমরা বধ্রিমতী ও বিশ্‌পলা নাম্নী দু'জন নারীযোদ্ধার সাক্ষাৎ পাই। তাঁরা দু'জনেই রণাঙ্গনে স্বয়ং অবতীর্ণ হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। ঋগ্বেদে আর এক জন নারী যোদ্ধার উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন মুদ্‌গল-পত্নী মুদ্‌গলানী। যুদ্ধকালে তিনি স্বয়ং স্বামীর রথ চালনা করে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যান এবং শত্রুদের জয় করে বিতাড়িত করেন।

প্রাচীন যুগে নারীদের শিক্ষাব্যবস্থা যে কিরূপ উন্নত ছিল, তার অন্যতম প্রধান প্রমাণ খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে বিরচিত বাৎস্যায়নের সুবিখ্যাত কামসূত্রে। কামসূত্রে নারীদের অবশ্যশিক্ষণীয় চৌষট্টি কলা বা বিদ্যার উল্লেখ আছে—যেমন, নৃত্য, গীত, বাদ্য, চিত্রাঙ্কন, বেণীবন্ধন, তিলকরচনা, মাল্যগ্রথন, পুষ্পশয্যা-রচনা, কাব্যরচনা প্রভৃতি কলাবিদ্যা; সুগন্ধ দ্রব্যাদি নির্মাণ, পাককর্ম, সূচীকর্ম, বেত্রশিল্প, তক্ষণ (ছুতোরের কাজ), সুযন্ত্রাদি পরিচালন, স্থাপত্যবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা, বৃক্ষ-চিকিৎসা প্রভৃতি কার্য্যকরী বিদ্যা, ইন্দ্রজাল, হস্তলাঘব, দ্যূতক্রীড়া, বাল-ক্রীড়নক (পুত্তলিকা ক্রীড়া ইত্যাদি) প্রভৃতি বহুবিধ ক্রীড়া, নানারূপ ব্যায়াম, যুদ্ধবিদ্যা প্রভৃতি। সে যুগে নারীদের শিক্ষার যে অতুলনীয় বহুমুখী ও সর্বব্যাপী ব্যবস্থা ছিল, তা সত্যই অতীব বিস্ময়কর।

সুপ্রাচীন বৈদিক যুগে আমাদের দেশে নারীশিক্ষার যে উচ্চতম আদর্শ স্থাপিত হয়েছিল, সৌভাগ্যক্রমে তা পরবর্তী রামায়ণ মহাভারতের যুগেও অব্যাহত ছিল। রামায়ণের আদিকাণ্ডে অযোধ্যারমণীদের বহুল গুণগ্রামের উল্লেখ আছে। রাজার সুশাসনে সেই সময়ে নারীদের জন্যও শিক্ষাদীক্ষার পূর্ণ ব্যবস্থা ছিল। পুরুষদের মত নারীরাও যে উপনয়ন, ব্রহ্মচর্যাশ্রমে পূর্ণ অধিকারিণী ছিলেন, তার প্রমাণ আমরা পাই যখন আমরা দেখি যে, তাঁরাও পুরুষদের মতই নানাবিধ বৈদিক ক্রিয়াকলাপে অংশ গ্রহণ করছেন, এবং বৈদিক মন্ত্রাদি উচ্চারণ করছেন। যেমন, নিত্যব্রতপরায়ণা মহারাণী কৌশল্যা বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক অগ্নিতে আহুতি দিতেন, সীতা প্রত্যহ বৈদিক প্রথানুসারে সন্ধ্যাবন্দনা করতেন। বালিপত্নী বিদুষী তারাও বেদজ্ঞারূপে সম্মানিতা ছিলেন। বালি-সুগ্রীবের যুদ্ধকালে তিনি বালির বিজয়ার্থে স্বস্তিযজ্ঞানুষ্ঠান করেন।

রামায়ণে নিগূঢ়তম ব্রহ্মবিদ্যালাভে ধন্যা ব্রহ্মবাদিনী নারীর উদাহরণও আমরা পাই। যেমন, মহামুনি মতঙ্গের শিষ্যা শ্রমণী শবরীর আশ্রম ছিল পম্পানদীতীরে। তিনি বল্কল ও জটাধারণ করে কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হন এবং সিদ্ধি লাভ করে সর্বজন-সম্মানিত হন।

পারিবারিক, সামাজিক দিক থেকেও রামায়ণের যুগে মেয়েদের অবস্থা যথেষ্ট উন্নত ছিল। সে যুগেও স্ত্রীকে স্বামীর আত্মা এবং মাতাকে পিতার অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক সম্মানীয়া বলে গ্রহণ করা হ'ত।

রাষ্ট্রীয় দিক থেকেও সেযুগে নারীদের যোগ্য মর্যাদা প্রদান করা হ'ত। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, সীতার কথা উল্লেখ করা চলে। রামের বনগমনকালে সীতাও স্বামীর অনুবর্তিনী হতে দৃঢ়-সংকল্প হলে কুলগুরু মহামুনি বশিষ্ঠ তাঁকে অনুরোধ করেন যে, স্ত্রী স্বামীর আত্মস্বরূপ বলে সীতাই যেন স্বামীর অনুপস্থিতিতে

তাঁর রাজ্যশাসন করেন। এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে, শিক্ষাদীক্ষায় সে যুগের নারীরা চরমোন্নতিলাভে ধন্য হয়েছিলেন। নতুবা বশিষ্ঠের মত এরূপ এক জন জ্ঞানী ঋষি এক জন নারীকে পৃথিবী পালনের গুরুভার দিতে স্বীকৃত হতেন না।

বৈদিক যুগের মত মহাভারতের যুগেও নারীরা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যে পূর্ণ অধিকারিণী ছিলেন। অর্থাৎ, ইচ্ছানুসারে তাঁরা আজীবন ব্রহ্মচর্যব্রত অবলম্বন করে জ্ঞানানুশীলনে ও তপশ্চর্যায় কালাতিপাত করতে পারতেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ সুলভার উল্লেখ করা যায়। তিনি ব্রহ্মচারিণীর জীবন অবলম্বন করে পরমতত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু হয়ে দেশে দেশে পরিভ্রমণ করেন এবং মোক্ষজ্ঞানলাভে ধন্য মহাপণ্ডিত জনকরাজার সভায় এসে তাঁকে শিক্ষা দেন। মহাভারতে সকল বেদ-পারঙ্গতা সিদ্ধা-তপস্বিনী শিবা, ব্রহ্মচারিণী তপঃসিদ্ধা শাণ্ডিল্যদুহিতা প্রভৃতি অন্যান্য সংসারত্যাগিনী, মহাবিদুষী তপস্বিনীর সাক্ষাৎ আমরা পাই।

মহাভারতে বিবাহিতা, গার্হস্থ্য-জীবনে প্রবিষ্টা বিদুষীদেরও উল্লেখ আছে। যথা, হরিবংশে প্রভাস-পত্নী ব্রহ্মবাদিনী যোগসিদ্ধার কাহিনী আমরা পাই। ব্রহ্মজ্ঞা গৌতমী একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর পরও পরলোকবিষয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করছেন, সে চিত্রও আমরা পাই। বশিষ্ঠ-পত্নী অরুন্ধতীও মহাবিদুষী এবং পাণ্ডিত্যে স্বামীরই সমস্থানীয়া বলে খ্যাতা ছিলেন। তিনি আচার্য-পত্নীরূপে "আচার্যানী"ই কেবল ছিলেন না, স্বয়ং শিক্ষয়িত্রীরূপে "আচার্যাও" ছিলেন এবং কেবল প্রকৃত জ্ঞানলাভেচ্ছুদেরই শিক্ষা দিতেন।

মহাভারতের নারীরা কেবল যে এরূপে নিগূঢ়তম দার্শনিক বিদ্যাতেই ব্যুৎপন্না ছিলেন তাই নয়; অন্যান্য জাগতিক শাস্ত্রেও তাঁদের কৃতিত্ব কম ছিল না। যথা, রাজপরিবারের রমণীরা সকলেই রাজনীতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা ছিলেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, মহাভারতের প্রখ্যাততম নারী গান্ধারীর উল্লেখ করা যায়। প্রকাণ্ড রাজসভায় তিনি পুত্রের সঙ্গে রাজনীতিমূলক আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কুন্তী ও দ্রৌপদীও পাণ্ডিত্যে এবং তেজস্বিতায় অতুলনীয় ছিলেন। পরম তেজস্বিনী বিদুলার অপূর্ব চিত্রটিও আমাদের মুগ্ধ করে। কিন্তু গান্ধারীর রাজনীতি ছিল ধর্মের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর সুপ্রসিদ্ধ বাণী: "যতো ধর্ম স্ততো জয়ঃ"— যখন তিনি নিজের পুত্রেরও জয়কামনা করতে অসম্মত হয়ে কেবল ধর্মেরই জয় প্রার্থনা করেন—ভারতীয় নারীদের ন্যায়পরায়ণতার মূর্ত প্রতীকরূপে পৃথিবীতে অমর হয়ে আছে।

মহাভারতের নারীরা যে নৃত্য-গীতাদি ললিতকলাতেও যথেষ্ট ব্যুৎপন্না ছিলেন, তার প্রমাণও আমরা পাই।

উপরের সংক্ষিপ্ত বিবরণী থেকে প্রমাণিত হবে যে, মহাভারতের যুগেও নারীশিক্ষার অতি উন্নত ব্যবস্থা ছিল এবং তারই ফলে বহু মনস্বিনী নারীরই সাক্ষাৎ আমরা পাই সেই মহাযুগে। পারিবারিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁরা পুরুষদের সঙ্গে সমান সুযোগ ও অধিকার পেতেন। স্ত্রীকে "ভার্যা শ্রেষ্ঠতম সখা" বলে স্বামীর শ্রেষ্ঠ বন্ধুর আসন দেওয়া হয়েছে। নারীদের সম্বন্ধে মহাভারতে বলা হয়েছে:

"পূজনীয়া মহাভাগাঃ পুণ্যাশ্চ গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয় গৃহস্যোক্তাস্তস্মাৎ রক্ষ্যাঃ বিশেষতঃ।"

"নারীরা পূজনীয়, মহামঙ্গলময়ী, পুণ্যশীলা, তাঁরা বিশেষ যত্নের সঙ্গে রক্ষণীয়া।"

আর একটি সুন্দর শ্লোকে বলা হয়েছে:

"যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥"

"যে স্থলে নারীরা পূজিতা হন, সে স্থলে দেবগণও বিরাজ করেন; কিন্তু যে স্থলে নারীরা পূজিতা হন না, সে স্থলে সমস্ত ক্রিয়াকলাপই নিষ্ফল হয়।"

এই শ্লোকটি সুবিখ্যাত মনুস্মৃতিতেও পাওয়া যায়।

এই দু'একটি শ্লোক থেকেই গৌরবোজ্জ্বল মহাভারতের যুগে নারীদের গৌরবময় স্থানের কথা পরিস্ফুট হবে।

অতি সংক্ষেপে প্রাচীন যুগে বেদোপনিষদের যুগ থেকে রামায়ণ মহাভারতের যুগ পর্যন্ত ভারতীয় নারীদের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিবরণী দেওয়া হ'ল। এই শিক্ষার প্রণালী অল্পমাত্রও আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, এটি অতি বিজ্ঞানসম্মত। এই শিক্ষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এ কেবল সঙ্কীর্ণ বস্তুবাদের গণ্ডীতেই আবদ্ধ নয়, কিন্তু একটি মহান্ আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষার মধ্যে একটি আদর্শবাদ বা Idealism নিহিত থাকা অত্যাবশ্যক। কেবলই Realistic ও Materialistic বা বস্তুবাদী শিক্ষার কুফল ত আমরা বর্তমানে চারিদিকেই দেখছি। এই শিক্ষায় আজকাল কেবল সুবিধাবাদী, চাকুরীজীবীই তৈরি হচ্ছে, 'মানুষ' তৈরি হচ্ছে না। কিন্তু শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য চরিত্রের পূর্ণতম বিকাশ, কেবল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চাকুরী-লাভ নয়। আমরা দেখেছি যে, প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাগুণে নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকলেই আধ্যাত্মিক সমুন্নতির শীর্ষদেশে উপনীত হতে পারতেন, জনসেবায় জীবনোৎসর্গ করতেন। সে শিক্ষা আজ আর কোথায়?

দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীন যুগে শিক্ষার্থীকে গুরুগৃহে থেকেই বিদ্যাশিক্ষা করতে হ'ত। আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতিতেও আবাসিক শিক্ষা বা Residential Institution-এর উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে, যদিও আমাদের দেশে

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা এখনও সম্ভবপর হয় নি।

তৃতীয়তঃ, উচ্চশিক্ষার্থীকেও প্রত্যহ কিছু দৈহিক শ্রম করতে হ'ত, যেমন কাঠ আনা, ভিক্ষা করা ইত্যাদি। কেবল মাত্র মস্তিষ্কের বিকাশে চরিত্রের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হয় না। সেই সঙ্গে সঙ্গে যাকে বলে dignity of manual labour বা কায়িক শ্রমের মর্যাদা অবশ্য স্বীকার্য। আধুনিক শিক্ষা-বিধিতে এই কথাও আজ বিশেষ জোর দিয়ে বলা হচ্ছে, যদিও আজও উচ্চশিক্ষা এবং কায়িক শ্রমের মধ্যে এরূপ শুভ-সংযোগ স্থাপন সুদূরপরাহতই বলে মনে হয়।

চতুর্থতঃ, প্রাচীন যুগে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে গুরুর চরণপ্রান্তে স্বতন্ত্রভাবে বসে শিক্ষালাভ করতে হ'ত। বর্তমান যুগের lecture-type education বা বহু ছাত্রের সামনে শিক্ষকের বক্তৃতাপ্রদানবিধি প্রাচীনযুগে প্রচলিত ছিল না। আমরা এখন এই বিধির ব্যর্থতা উপলব্ধি করে seminar-type of education বা স্বতন্ত্র ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনাদির সাহায্যে শিক্ষাদান-পদ্ধতির প্রবর্তনের প্রচেষ্টা করছি এবং এখনও এই প্রচেষ্টা ফলবতী হয় নি। কিন্তু কত সহস্র বৎসর পূর্বে আমাদেরই দেশে তার চেয়ে কত উন্নততর ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

পঞ্চমতঃ, প্রাচীনযুগে অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। শিক্ষক ও ছাত্রীদের মধ্যে যে কোনরূপ 'কেনা-বেচার' সম্পর্ক থাকতে পারে না—বিদ্যা বিক্রয়ের বস্তু নয়, স্বেচ্ছাকৃত, সস্নেহ দানের বস্তু—এই ছিল প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাতত্ত্ববিদ্‌গণের সুদৃঢ় অভিমত। সেজন্য গুরু শিষ্যকে পুত্রবৎ স্নেহে গৃহে লালন-পালন করে শিক্ষা দেবেন—এই ছিল ভারতের সুপ্রাচীন রীতি। গুরুর ভার অবশ্য নেবেন দেশের রাজা সাগ্রহে, সসম্মানে। আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতিতেও Free Education বা জাতীয় সরকার পরিচালিত অবৈতনিক শিক্ষার স্থান অতি উচ্চে। রাশিয়া প্রভৃতি জনশাসিত স্থানে কেবল প্রাথমিক শিক্ষাই নয়, উচ্চশিক্ষাও অবৈতনিক। এদিক থেকেও প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতি বর্তমানেও অনুকরণীয়।

এরূপে আমরা দেখি যে, প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা আদর্শ ও পদ্ধতি উভয় দিক থেকেই বর্তমান শিক্ষা থেকে বহুগুণে উন্নততর ছিল। বস্তুতঃ আধুনিক যুগে শিক্ষার ব্যর্থতা দেখে আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ববিদ্‌গণ প্রতীকারের যে যে উপায় চিন্তা করছেন, তা সবই উন্নততর ও ব্যাপকতররূপে সুদূর অতীতে আমাদেরই দেশে অনুসৃত হ'ত—এ কি কম গৌরবের কথা ?

বিশেষ করে নারীদের শিক্ষার এরূপ ব্যাপক ব্যবস্থা আজও পৃথিবীর কোন দেশে সম্ভবপর হয় নি। প্রাচীনযুগে ভারতে আধ্যাত্মিক শিক্ষা থেকে আরম্ভ করে ললিতকলা, ব্যবহারিক বিদ্যা ও যুদ্ধবিদ্যা পর্যন্ত নারীদের পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল; এবং এরূপ ব্যাপক ও গভীর শিক্ষার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ সে যুগের নারীরা ব্রহ্মবাদিনী ঋষি, আচার্যা নানাবিধকলা-পটিয়সী, যোদ্ধা, সুগৃহিণী—সবই হতেন। আমাদের স্থির বিশ্বাস যে, নবীন-ভারতে প্রাচীন-ভারতের এই অপূর্ব শিক্ষাপ্রণালী পুনঃপ্রচলিত হলে শিক্ষা-প্রসারের ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল।

বেহাই, বেহান ও তাম্রকূট

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

একটি সরস বিদ্রূপ মুখে করে পর্দা ঠেলে ভেতরে যাচ্ছিলাম, হাতটা টেনে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়তে হ'ল। এতটা ভুল হওয়া কি সম্ভব! তবুও নিজেকে বিশ্বাস না করে আস্তে আস্তে রাস্তায় বেরিয়ে আসছিলাম, একবার ভাল করে দেখে নোব, এমন সময় ভেতর থেকে বন্ধুরই গলার আওয়াজে শুনলাম—

"ঠিক আছে হে, বাড়ীও ভুল হয় নি, ঘরও ভুল হয় নি, যাকে খুঁজছ সেও হাজির—পার্থিব দেহেই; নির্ভয়ে চলে এস ভেতরে।"

চৌকাঠ ডিঙিয়েও আবার আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হ'ল, নাকটা আপনি কয়েকবার উঠল কুঁচকে কুঁচকে, বেশ বিস্মিত হয়েই ঘরের চারিদিকটা দেখে নিয়ে বললাম, "তা না হয় এলাম, কিন্তু এখনও যে সেই-ঘর, সেই-তুমি এটা বিশ্বাস করা শক্ত হয়ে পড়ছে। তোমার ঘরে একটা বিড়ি ঢোকবার উপায় ছিল না, দম ফুললে বারান্দায় গিয়ে খেয়ে আসতে হ'ত, আর এ যে দেখছি একেবারে ব্যোমযান হয়ে রয়েছে ঘর; আর ওসব খানদানী আসবাবপত্রই বা ঢুকল কি করে?—হুঁকো, ছিলিম, গড়গড়া, তাদের বৈঠক, টিকে, সরা-ভরা ছাই, তামাকের টিন—চাঁদের হাট বসে গেছে যে!"

গড়গড়া টানছিলেন, বললেন, "বোস, কাহিনী আছে একটু। দেবে নাকি দুটো টান?"

নলটা বাড়িয়ে ধরলেন। সভয়ে হাত নেড়ে বললাম, "না ভাই, এমনি ঘরে ঢুকেই যা ফলপ্রাপ্তি হয়েছে তাতেই ক'দিন বিড়িতে আগুন দেওয়া বন্ধ রাখতে হয় দেখ।...কিন্তু সে-কথা থাক্—নতুন বেহাই বাড়ী থেকে এলে, কোথায় ভাবতে ভাবতে আসছি যে আদরযত্নে—তোয়াজে..."

"আদরযত্নেই তো এই অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে..."

"অমন সাত্ত্বিক পুরুষ থেকে এই...কি যে বলে..."

"নেশাখোরই বল না, কোঁৎ পড়বার দরকার নেই।"

"তাই বলতে হয় বৈকি; যদিও সামনে মাত্র তামাকটুকু দেখছি..."

"না, অন্তরালে আর কিছু নেই, এটুকু শপথ করিয়ে নিতে পার।...আচ্ছা, তামাক ছাড়া অন্য কোন গন্ধ নাকে আসছে না?"

ঘরবোঝাই ধোঁয়ার কুণ্ডলীগুলোর দিকে তাকিয়ে বললাম, "এ আসরে সম্ভব বলে মনে হয়? তবে একটা মিঠে মিঠে গন্ধ মাঝে মাঝে যেন অতি সূক্ষ্ম আকারে এসে নাকে পৌঁছচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। তা সে তো তামাকেরও গন্ধও হতে পারে—যখন বেহাই-বাড়ীরই আমদানী শুনছি।"

"ওডিকলোন তামাকে দেয় না, তুমিও দেখছি আমারই মতন বিশারদ; বিড়ি-সিগারেটেই হাত-পাকালে, এ ইলিম আর জানবে কোথা থেকে! ওডিকলোন ছাড়া আরও দু'একটা খোশবাই আছে, একটু কাছে ঘেঁষে বসলে টের পেতে; তা দু'একবার যমের বাড়ীর দিকে যাত্রা করবার সময় ঐটেই গায়ে মেখে বেরিয়েছিলাম বলে ঐটেই চিনি, অন্যগুলোর সঙ্গে ত আর পরিচয় হ'ল না এ অভাগার, নাম বলতে পারব না।...মোট কথা, বেশ গোটাকতক নাম-করা খোশবাইয়ের মিশ্ররাগিণী এখনও ঘিরে রয়েছে আমাকে—মাঝখানে তাম্রকূট মহারাজ না থাকলে সেটুকুকে বেহাই-বাড়ীর সওগাত বলে বেশ চিনে নিতে পারতে তোমরা; কিন্তু আমার অদৃষ্ট খারাপ..."

"তাঁদেরও তো..."

"ততটা নয়, কেননা তাঁরা তো আদরযত্ন করতে গিয়েই এ অবস্থাটা দাঁড় করিয়ে ফেলেছেন..."

"আবার গুলিয়ে দিচ্ছ মাথাটা..."

"কাহিনীটাই আরম্ভ করি এবার; এটুকু গৌরচন্দ্রিকার দরকার ছিল। তার আগে আর একটা কথা—আমায় দেখে কি রকম মনে হচ্ছে বল ত।"

"মনে হচ্ছে এই ক'রাত একবারও চোখ বোজ নি, স্রেফ বসে বসে বেহাইয়ের কাছে গড়গড়ার তালিম নিয়েছ।"

বন্ধু একটু হাসলেন, তারপর কয়েকটা দ্রুত টান দিয়ে ধোঁয়াটা ছেড়ে বললেন, "বেহাই বেচারিকে এর মধ্যে টানা অধর্ম; যা করেছেন বেহান, তিনিই তো প্রকৃতিস্বরূপা। তবে তাঁরও ঠিক দোষ বলতে কিছু নেই; বেহান দু'হাতে দুটি জিনিস আমার জন্যে তুলে ধরেছিলেন; এক হাতে (সেটা দক্ষিণ হস্তই বলি) ঐ ওডিকলোন ল্যাভেণ্ডার, আর অন্য হাতে এই খাম্বিরা..."

"তুমি খাম্বিরাই বেছে নিলে?"

"এমনি তার জন্যে বেশী দোষ দেওয়া যায় না, কেননা বেহানের হাতের সুগন্ধি মিষ্টি কি নেশা মিষ্টি ঠাহর করে ওঠা কোন মিঞার পক্ষেই সহজ নয়। তবে আমি যে খাম্বিরা বেছে নিতে বাধ্য হলাম তার কারণ এক্ষেত্রে সুগন্ধি মানে দাঁড়াল একটি মেয়ে, অর্থাৎ বিবাহ। তা সুগন্ধিটা বেহানের দক্ষিণ-হস্তের পরিবেশন হলেও, এ বয়সে আমায় কন্যা দেবে

এত দাক্ষিণ্য তো কোন মেয়ের বাপের কাছে আশা করা যায় না। কাজেই নান্য পন্থা অয়নায়। এবার তা হলে ভেঙে বলি তোমায়—

সকালে পৌঁছুলাম গিয়ে আর সঙ্গে সঙ্গেই ঐ যে তুমি বললে আদরযত্ন-তোয়াজ তার হিড়িকে গেলাম পড়ে। আর সবার জীবনে দুটোই হয়ে থাকে—বয়েসকালে শ্বশুরালয়, তারপর বয়েস হয়ে গেলে বেহাই-বাড়ী—সুতরাং তুলনায় বলতে পার কোন্‌টে বেশী সরেস, কিন্তু আমার ভাগ্যে তো এই একমেবাদ্বিতীয়ম্‌—সুতরাং একটিমাত্র শব্দও আছে তার জন্যে—অর্থাৎ 'অতুলনীয়'। বেহাই-বেহান যেন—যাকে বলে কোথায় রাখবেন কি করবেন ঠিক করে উঠতে পারছেন না; ছেলে মেয়ে-বৌয়েরা তটস্থ; তার ওপর আমাদের মেয়েটিও এখন ওঁদের বাড়ীতেই, শুধু ত তাই নয়, ওঁদের আপনজন হয়ে আমাদের পর হয়ে গেছে, কাকার জীবনের যত কিছু খুঁটিনাটি, ছোট-বড় বদ অব্যেস, কুটুম বাড়ীতে যা সব নিয়ে লজ্জা পাবারই কথা—সবগুলি ওঁদের কানে তুলে দিয়েছে।—না চাইতেই পাওয়া এবং অভাবের অতিরিক্ত পাওয়া—এই দুইয়ে আমার সমস্ত দিনটি যেন আদরের অত্যাচারে উপচে উপচে উঠতে লাগল। তারপর বেহাই-বেহানই তো; সমস্তটুকুর ওপর একটি মিষ্টি সরসতা মাখানো—পৃথিবীর এক কোণে এ অধমের জন্যে যে এই রকম একটি জায়গা তোয়ের থাকতে পারে, না গিয়ে পড়বার আগে কি কল্পনা করতে পেরেছিলাম?…তোমার কি মনে হচ্ছে?—এর এক বর্ণও কিন্তু মিথ্যে বা অতিরঞ্জিত নয়।"

বললাম, "মনে হচ্ছে আমার মেয়েটিকে কবে পার করতে পারব। ভাবনাটা তার জন্যেই নয়, ভাবছিলাম যা বলছ তার এক বর্ণও যদি সত্যি হয় তো স্বর্গ তো 'হমিনস্ত—হমিনস্ত—হমিনস্ত'।"

"কিন্তু হঠাৎ এক সময় আমার সন্দেহ হ'ল—স্বর্গে কোথাও যেন অশান্তি ঢুকে বসেছে, খুবই সূক্ষ্ম আকারে, তারপর যতই দিনটা এগোতে লাগল বুঝতে পারলাম—সূক্ষ্ম মূর্তিটা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে।"

বিস্মিত এবং বেশ একটু বিব্রত হয়েই প্রশ্ন করলাম, "সে কি!—কি করে টের পেলে?"

"প্রথমটা হঠাৎই একবার বেহানের মুখের ওপর নজর পড়তে; তারপর কয়েক বার আড়চোখে চেয়ে চেয়ে। বেশ একটা দুশ্চিন্তার ভাব, একটা যেন মস্ত বড় অশান্তির মধ্যে পড়ে গেছেন, ভেবে কিছু ঠিক করে উঠতে পারছেন না, আর যতই সময় যাচ্ছে অশান্তির কারণটা ততই যেন এগিয়ে আসছে। এটা গেল প্রথম ষ্টেজ, দ্বিতীয় ষ্টেজে ঐ রকম একটা হঠাৎ অভিজ্ঞতাতেই টের পাওয়া গেল, বেহাইও যেন রয়েছেন এ রহস্যের মধ্যে; শুধু তাই নয়, বেহান আমার দৃষ্টিকে সন্দেহ না করে এমন একটা কটাক্ষ করে গেলেন বেহাইয়ের দিকে—খানিকটা দূরে, দাওয়ার ওদিকটায়—যাতে আমার এ সন্দেহও উঠল মনে যে অশান্তিটুকুর মূলে হয়তো রয়েছেন আমাদের বেহাই-ই, অর্থাৎ তিনিই হয়তো স্রষ্টা।

এদিকে সব ঠিক আছে—খাওয়া-দাওয়া, চা, পান, হাসি-গল্প; আর তাও যে একটা কুটুম্বিতা রক্ষার মতন করে করা এমনও নয়, আন্তরিকতায় ভরা, বেশ বোঝা যায় নতুন বেহাই পেয়ে দু'জনেই যেন বর্তে গেছেন। কাজেই আমিও প্রাণ খুলেই এ-সবের যা আনন্দ সেটুকু উপভোগ করে যাচ্ছি, শুধু মাঝে মাঝে একটি ইঙ্গিতে, কি একটি কটাক্ষে জানিয়ে দিয়ে যাচ্ছে কোথায় যেন একটা গলদ আছে আর সেটা ক্রমেই উঠছে ঘনিয়ে। তার সঙ্গে এটাও কি করে যেন পরিষ্কার হয়ে উঠছে যে ব্যাপারটার সূত্রপাত হয়েছে আমি আসার পর থেকে, অর্থাৎ আমাকে নিয়েই। বড় অশান্তিতে পড়েছি এইটুকু নিয়ে, মনের অন্তস্তলে ছন্দপতন ঘটে যাচ্ছে মাঝে মাঝে—সব আনন্দের মধ্যে। সমস্ত ব্যাপারটুকুর ওপর একটু বোধ হয় আলোকসম্পাত করতে পারে আমার ভাইঝিটি, তবে তার কাকা বলেই সে নিজের শ্বশুর-বাড়ীতে বেশী আত্মীয়তা দেখাতে পারছে না; মাঝে মাঝে যা আসছে প্রথমত তো একলা পাওয়া যাচ্ছে না, যদি পাওয়া গেল তো সে ব্যাপারটা ওদের পারিবারিক, একটু নীচু গলাতেই যার প্রসঙ্গটা তুলতে হবে তার জন্যে যথেষ্ট সময় বা সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে না।

সন্ধ্যের পর ব্যাপারটা আর একটু পরিষ্কার হ'ল, অর্থাৎ আরও খানিকটা জটিল হয়ে উঠল। বিকেলে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম একটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে, বেহাইয়ের বাতটা চাগিয়েছে; বাড়ীতেই রইলেন। যখন ফিরলাম—সন্ধ্যের খানিকটা পরে—টের পাওয়া গেল যেন স্বামী-স্ত্রীতে কথা-কাটাকাটি চলছে। দোহাই, যেন মনে করে বোস না যে বেহাই-বেহানের দাম্পত্য-কলহে আড়ি পাতছিলাম আমি। আসল কথা—ওঁদের বাড়ীটা একটা গলির মধ্যে, সদরদরজাটা সর্বদা বন্ধ রাখতে হয়, বেড়িয়ে এসে দরজা খোলাতে যে সময়টুকু গেল তাইতেই গোটাকতক ছাড়া ছাড়া কথা কানে গেল। তাও পুরো নয়; ওঁরা, আমাদের ফেরবার সময় হয়েছে বুঝে যেন সতর্কই ছিলেন, দরজায় ধাক্কা পড়তেই বচসাটুকু গেল থেমে। ওরই মধ্যে কিন্তু একটা জিনিস টের পেলাম, বেশ স্পষ্ট করেই, সেটা এই যে, আমায় কোন্‌ ঘরে শুতে দেওয়া হবে তাই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে মতভেদ চলছে।

অথচ সে-ব্যবস্থা তো আগেই হয়ে গেছে। দুপুরে আহারাদির পর বেহাই-বেহান দু'জনেই সঙ্গে করে বাড়ীটা

ঘুরিয়ে আনলেন। টানা একতলা বেশ বড় বাড়ী, অনেকগুলি ঘর, প্রশস্ত উঠোন, তাইতেই আবার খানিকটা বাগান, একধারে ইঁদারা ; বেশ বাড়ী। সবটুকু দেখিয়ে শেষকালে বাড়ীর একপ্রান্তে একটি বড় ঘরের মধ্যে নিয়ে এলেন। ঘরটির আসবাবপত্র, ছবি, আলনা আরও সব অন্য নিদর্শনে বুঝতে পারা গেল এটা ওঁদের ঘর। বেহাই বললেন, 'একটু একটেরেয় পড়ে যাচ্ছে, নইলে এই ঘরটাই বোধ হয় বেহাইয়ের সুবিধে হ'ত।'

উত্তরটা আগে বেহানই দিলেন, বললেন, 'একটেরে হওয়ার জন্যে ভাবি না, বেহাইকে তো ভূতে ধরবে না, নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ, একটু আলাদা থাকেন সেই ভালো ; তবে অপছন্দ হবার অন্য কারণও তো থাকতে পারে।'

কথাটা বলে বেহাইয়ের মুখের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে আমার দিকেও মতামতের জন্যে ঘুরে চাইলেন।

আমার সব দিক দিয়েই ভাল লাগছিল ঘরটি, প্রথমত একেটেরে বলেই ; তার ওপর বেশ বড় বড় জানলা, বাড়ীর শেষদিকে বলে বাইরের দিকটা ফাঁকা ; তবুও বেহানের কথাটা এমন ঘরের পক্ষে একটু হেঁয়ালির মতন ঠেকায় একবার ভেতরের দিকটা চোখ বুলিয়ে নিলাম, তারপর বললাম, "অপছন্দর তো কিছু দেখছি না, তবে একটু কিন্তু হতে হচ্ছে বৈকি।"

সম্বন্ধটা ঠাট্টার হলেও বয়সে দু'জনেই বেশ বড়, তাই কথাটা কি করে শেষ করব ভাবছি, বেহানই নিলেন তাড়াতাড়ি সামলে, একটু লজ্জিতভাবেই হেসে বললেন, 'হয়েছে, আর 'কিন্তু' হতে হবে না ; অপছন্দ যখন নয়, এই ঘরেই ব্যবস্থা করে দিক।'

তখনকার মতন ব্যবস্থাটা ঐখানেই শেষ হয়ে গেল, ও নিয়ে চিন্তা বা আলোচনার আর দরকারই হয় নি। বেড়িয়ে এসে যখন টের পাওয়া গেল যে ঘর নিয়েই আসলে গণ্ডগোল, তখন সত্যিই বড় লজ্জায় পড়ে গেলাম। তখন দুপুরের কথাগুলোও নতুন অর্থ নিয়ে দেখা দিলে, আর এও বেশ বোঝা গেল বেহাইয়ের ভাবটা কতকটা 'পছন্দ কর তওভি আচ্ছা, অপছন্দ কর তওভি আচ্ছা'-গোছের হলেও বেহানের যেন ছিল আপত্তি ; তাঁর সেই ইঙ্গিতটুকু বুঝে নিয়ে আমিও যে কেন আপত্তি করে সব অশান্তির গোড়া মেরে দিই নি এই ভেবে লজ্জায় আপসোসে যেন সারা হয়ে যেতে লাগলাম।

অথচ আর নতুন করে কথাটা তুলতেও পারছি না। ওঁরা টের পেয়ে গেছেন যে দরজার বাইরে থেকে কিছু শুনেই ফেলেছি, অন্তত ঐ ধরণের একটা সন্দেহ ঢুকেছে তাঁদের মনে, কেননা কয়েক বার টের পেলাম একটু আড়চোখে দেখে নিয়ে যেন আমার মুখের ভাবটা ঠাহর করতে চান, দু'জনেই খুব সাবধানে থাকতে হচ্ছে—অর্থাৎ ভাবে দেখাতে হচ্ছে—এসেই জোরে ধাক্কা দেওয়া হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গেই খুলে দিলে, কৈ, কিছুই তো কানে যায় নি!...এ অভিনয়ের জন্যে একটা মেডেল ডিজার্ভ করি না ?"

বললাম, "দাঁড়াও তিন-জনের মধ্যে ষ্টার অভিনেতা কে শেষ পর্যন্ত না শুনে তো বলা যাচ্ছে না।"

বন্ধু একটু ওপরের দিকে চাইলেন, কি যেন ভেবে নিয়ে বললেন, "বেহানকে সোজা বাদ দিতে পার, কেননা তিনি হচ্ছেন খোদ ডিরেক্টার..."

বললাম, "সেটা আন্দাজ করে নিতে বেগ পেতে হয় না, আর পরিচয়ও তো দিয়ে রেখেছ যে তিনি প্রকৃতিস্বরূপা।... গল্পটাই বল, আমি বরং খানিকটা সাহায্য করছি, অর্থাৎ আহার-পর্বটা সাহিত্য-সভার প্রবন্ধের মতন 'পঠিত বলে গৃহীত' ধরে নিচ্ছি, কেননা ওটার বর্ণনা তোমার যে পরিমাণে মিষ্টি লাগবে, আমার ঠিক সেই পরিমাণে লাগবে তেতো—তুমি যত বেশী ফলাও করে বলবে, পাত-সাজানো এটা-ওটা-সেটা, নাতি কোলে বসে ফরমাস করছে, বেহান বসে হাওয়া করছেন, বেহাই..."

বন্ধু হেসে বললেন, "তোমার লুব্ধ কল্পনা যখন আগেই গেছে পৌঁছে, তখন বর্ণনা-বাহুল্যও তো, একে তো যতই ফলাও করে বলতে যাই, যথাযথ পারবই না ধরে দিতে। বেশ, তা হলে একেবারে শয়নপর্ব থেকেই আরম্ভ করি। বরং আরও খানিকটা 'টেকেন এজ রেড' বলে ধরে নাও, ছুটো দিন বাদ দিয়ে একেবারে তৃতীয় দিনের শয়ন-পর্বে এসে পড়া যাক। আমি তার পরদিন আসব চলে। মাঝে আর কোন বৈচিত্র্য নেই—এক যদি বলো বেহাই-বেহানের সদ্গুণে সবকিছুই হয়ে পড়ে বিচিত্র। তবে সেই অশান্তিটা কিন্তু রইলই লেগে ; বেহানের মাথায় কি করে সেঁদিয়ে বসে রইল যে আমার কোনমতেই ভাল ঘুম হচ্ছে না, কোনমতেই না ; জোর করে যতই বলছি খুব হচ্ছে ততই জিদ ধরে বসছেন—হতে পারেই না—অসম্ভব কথা বললে তিনি শুনবেন কেন ?...মানে, খাঁটি মেয়েলী ন্যায়শাস্ত্র, না মানে যুক্তি, না মানে প্রমাণ।

তৃতীয় রাত্রে ক্লাইম্যাক্সে দাঁড়াল।

সন্ধ্যার পর বেড়িয়ে এসে বাইরের খোলা রকে আমাদের মজলিস বসে, বেহানও থাকেন, তবে খাবার দেবার আগে একবার তদারকে উঠে যান। উনি উঠে গেলে বেহাইও কি একটা কাজে উঠে গেলেন। আমি খানিকটা পায়চারি করলাম রকটায়, তারপর গা'টা একটু সিরসির করায় গেঞ্জির ওপর পাঞ্জাবীটা চাপিয়ে নোব বলে ঘরের দিকে গেছি'

চৌকাঠের বাইরে থেকেই দেখি তুমুল কাণ্ড। বেহান কোমরে হাত দিয়ে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন, বেহাই একদিকে তটস্থ, আমার ভাইঝি—সে মশারির ফিতেগুলো খুলছে, তার একটি দেওর তোশক-চাদর-বালিশ সব নিচে নামিয়ে পুরু গদিটা ধরে টানাটানি করছে। অতর্কিতে গিয়ে পড়ায় খানিকটা শুনেও ফেললাম, বেহান বলছেন, 'আমি কালই বলেছিলাম, ও গদি পর্যন্ত বদলাতে হবে, তা শুনলে না, আজ আমি কোনমতেই...'

পেছন ফিরে ছিলেন, আমার ভাইঝির দৃষ্টি অনুসরণ করে আমায় দেখে থেমে গেলেন। তখন আমারও ফেরবার উপায় নেই; জবুথবু হয়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালাম; একটা কথা না বললেও চলে না, হাওয়াটা একটু হালকা করে দেবার জন্য গম্ভীরভাবে বললাম, 'আমি তো কালই যাচ্ছি বেহান... তবে আর...'

সবাই আশ্চর্য হয়ে মুখের পানে চাইতে বেহানের দিকে চেয়েই বললাম, 'এই জন্যে বলছিল শুনেছি জামাই তাড়াতে কে নাকি আসন বন্ধ করে দিয়েছিল, সেই হিসেবেই আরও বড় কুটুম বলে বেহাই তাড়াতে কি বিছানা কেড়ে নেবার...'

সবাই হেসে ওঠায় ঘরের গুমোটটা একটু কাটল বটে, কিন্তু বেহান আবার অনুযোগের কণ্ঠেই বললেন, 'না বেহাই, আপনার ঘুম হচ্ছে না এ দু'দিন থেকে, লুকোচ্ছেন আপনি, কিন্তু বুঝতে তো পারছি।'

'আমার চমৎকার ঘুম হচ্ছে বেহান, এত ভাল অনেক দিন হয়নি। আপনার বোঝবার পদ্ধতিটা ধরতে পারছি না বলে কোনমতেই বোঝাতে পারছি না আপনাকে।'

'পারবেন না বোঝাতে। আর সব বদলেছি, মশারি আর গদি আজ আমি বদলাবই; আপনার কোনও নেশা নেই পত্তর নেই, এ গদির ওপর আপনার ঘুম আসতেই পারে না...'

কি রকম ঠেকল কথাটা একটু, তবে অত না ভেবে উত্তর যা হয় একথার ওপর সেইটেই দিলাম, বললাম, 'মাপ করবেন, কিন্তু তা হলে তো ধরে নিতে হয় বেহান যে...'

শেষ করতেও হ'ল না। বেহাই হেসে উঠলেন; ওরা দেওর-ভাজে মুখ ঘুরিয়ে তাড়াতাড়ি সরে পড়ল; বেহানও পৃষ্ঠভঙ্গই দিয়েছিলেন, দোর পর্যন্ত গিয়ে বোধ হয় বোঁকটা সামলে নিয়ে আবার ফিরে এলেন, বললেন, 'বেশ, ঘুম হচ্ছে তো ঘুমোন তা হলে, ঘরে ব্রাহ্মণকে জায়গা দিয়ে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়েছি বলে আমায় আর পাপের ভাগী হতে হবে না।'

বেহাইয়ের দিকে একটু কটাক্ষ করে বললেন, 'যার কীর্তি সে-ই বুঝবে।'

ফিরে যেতে যেতে আবার ঘুরে এলেন, বললেন, 'ঘুম যে হচ্ছে তা কিসে বুঝব বলুন, কত করে বলছি অন্তত আর একটা দিনও থেকে যান...হয় না সন্দেহ যে...?'

বেহাই কথাটা লুফে নিলেন, বললেন, 'হ্যাঁ, এ একটা কাজের কথা বলেছ, তা হলে আমারও অপবাদটা যায়।... কি বেহাই?'

বেহানও আগ্রহভরে চেয়ে আছেন। ওঁদের এই দু'দিন ব্যাপী মন-কষাকষির পর শান্তিস্থাপনের এই সুযোগটুকু ছেড়ে দিতে মন সরে না, হেসে বললাম, 'বিশেষ দরকার ছিল, সত্যিই; তা একটা দিন থেকে গেলে যদি আপনার হয় বিশ্বাস, কি আর করব?' "

বন্ধু নলচের ওপর থেকে কলকেটা তুলে নিয়ে আগুনে কয়েকটা ফুঁ দিয়ে ঠিক করে নিলেন, তারপর কলকেটা আবার বসিয়ে গোটাকতক টান দিয়ে বললেন, "বিশ্বাস কিন্তু একেবারেই হয় নি, সেই কথাই বলছি এবার।

নিশুতি-রাত, অকাতরে ঘুমোচ্ছিলাম, হঠাৎ একটা কড়া গন্ধে ঘুমটা ছাঁৎ করে ভেঙে গেল। ওডিকলোনের ঝাঁঝ, তার সঙ্গে আরও কিছু যেন মেশানো রয়েছে। ওডিকলোন-জাতীয় খোশবাইয়ের সঙ্গে এ অভাগার পরিচয়ের ইতিহাস তোমায় আগেই জানিয়েছি, হঠাৎ মাঝ-রাত্রে ঘুম ভেঙে যাওয়ায় যে আচ্ছন্ন ভাবটা লেগে রয়েছে তাতে প্রথমে সন্দেহ হ'ল কোনও কঠিন রোগে বিছানা নিয়েছি নাকি? নাড়ীটা টিপে দেখলাম, কিছু ঠাহর হচ্ছে না; কপালে হাত দিলাম, হঠাৎ আতঙ্কে একটু একটু ঘাম জমে গেছে বটে তবে তাপের তেমন কিছু দেখলাম না। ততক্ষণে আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গিয়ে মাথাটা একটু পরিষ্কার হয়েছে, বুকটা যে ঢিপ-ঢিপ করছে, বুঝতে পারা গেল সেটাও ঐ আচমকা ঘুমটা ভেঙে যাওয়ার জন্যেই। তা নয় হ'ল, কিন্তু গন্ধ আসে কোথা থেকে? স্বপ্ন তো নিশ্চয় নয়, স্বপ্নের গন্ধ জেগে ওঠার পরও এত সত্যি হয়ে থাকবে এরকম কাণ্ড তো ঘটে নি কখনও!

একটু পড়ে থেকে ব্যাপারটা ভাল করে বোঝবার জন্যে গা ঝাড়া দিয়ে উঠতে যাব, হঠাৎ একটা চাপা ফিসফিসানি কানে গেল—দু'জনের কথা হচ্ছে—

'এইটেও নাও,...খুব আস্তে আস্তে মশারি তুলে...'

'উঠে পড়বেন'

'পড়বেন না—প্রথম ঘুম—একটু থাকবে এখন...'

'তুমি দিয়ে এস এবার...'

'বুদ্ধি!...আর আমিই ঘরদোর বিছানার এই অবস্থা করতে গেছলাম!...'

'পড়বেনই উঠে এবার কিন্তু...'

আর বাড়ানো ঠিক হয় না, আমিই পূর্ণচ্ছেদ টেনে

দিলাম ; গভীর নিদ্রাটা যেন ভেঙে আসছে এইভাবে একটা টানা নিঃশ্বাস নিয়ে পাশ ফিরে শুলাম। টের পেলাম দু'জোড়া চরণ সন্তর্পণে আমার শিয়রের দিকের দরজাটা দিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল।

ব্যাপারটা বুঝে নিতে দেরি হ'ল না। বেহানের সেই বাতিক—অর্থাৎ আমার কোনমতেই ঘুম হতে পারে না এই বিছানায়—যদিই বা একটু হয় প্রথম দিকে, দুটো-রাত জাগার জন্যে তো তা টিকতে পারে না কোনমতেই। সেই জন্যেই বেহাই বেচারীকে পরিচালিত করে (সিনেমার ডিরেক্‌শনের অর্থেই বলছি) এসেন্স-ল্যাভেণ্ডারে ঘুমের যাদু ছড়াতে এসেছিলেন।

কৃতজ্ঞতায় মনটা অবশ্য ভরে উঠল, কিন্তু যা করতে এসেছিলেন ফলে দাঁড়াল ঠিক তার উল্টোটি—ঘুমের দফা একেবারে নিকেশ।'

আমি বললাম, 'সেকি ! অমন গন্ধের আমেজ—বসন্তকে খাটের সঙ্গে একরকম বেঁধে দিয়ে গেলেন দু'জনে মিলে !'

বন্ধু বাধা দিয়ে বললেন, "কতবার আর তোমায় বলতে হবে ভাই ?—এ বসন্তের সঙ্গে আমার পরিচয় তো যমের বাড়ী যাবার পথে। একটু করে তন্দ্রার মতন আসে আর কড়া ওডিকলোন-ল্যাভেণ্ডারের গন্ধে ছাঁৎ করে ঘুমটা ভেঙে যায়, নাড়ী টিপে দেখি, কপালে হাত দিই, বুকের ধড়ফড়ানির হিসেব নি, দুশ্চিন্তায় পড়ে যাই গদির মধ্যে কি এমন বাসা বেঁধেছে যে তার এই মারাত্মক প্রতিষেধকের ব্যবস্থা। ক্লান্তিতে অবসাদে তন্দ্রা টেনে আনে ; আবার সেই নাড়ী টেপা, তাপ দেখা, বুকের ধুকপুকুনি গোনা, এ করে কেউ কখনও ঘুমোতে পেরেছে ! তোমাদের অগুরু-ওডিকলোন-ল্যাভেণ্ডারের যুগ আরম্ভ হয়েছে জীবনের একটি বসন্ত-রাতেই —পুষ্পশয্যা, নববধূ, এ অকিঞ্চনের কথা—সে আর কতবার বলাবে ? অভাগাকে একবার অপারেশন টেবিলেও উঠতে হয়েছিল—এক ধরণের ফুলশয্যাও বলতে পার, সেই থেকে আমার কাছে দুটি গন্ধ সমান হয়ে দাঁড়িয়েছে একরকম—ক্লোরোফরম আর ওডিকলোন—অন্ততঃ নিদ্রিত অবস্থায় নাকে গেলে ধড়মড়িয়ে উঠতে হয়…"

অসাবধানে আমার একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ে যেতে বন্ধু একটু হাসলেন, বললেন, "না, হয়তো একেবারে পুরোপুরি ঐ রকম বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাসের মতন নয়—দু'একটা সুখ-স্বপ্নও লুকিয়ে-চুরিয়ে এসে পড়ে থাকবে গন্ধের ছিদ্রপথে, কিন্তু তুমি তো এ অধমের জীবনকাহিনী সবটুকুই জান, খানিকটা এগোতে না এগোতে সেও যে আতঙ্কেই দাঁড়াচ্ছিল। হয় ত এ ক্ষেত্রে আর নাড়ী টিপতে হয় নি, কিন্তু একটা দুর্ভোগ কাটিয়ে উঠেছি এ ভাবটুকু ত ঘুম ভাঙার বেশ খানিকক্ষণ পর্য্যন্ত লেগেই থাকছিল মনে…জিজ্ঞেস করছ, কেন ?"

একটু চোখ তুলে ভেবে নিয়ে বললেন—'বন্ধু বলে তোমার একটু অপ্রিয় লাগতে পারে, কিন্তু একটা মেয়েলী প্রবাদে সবটুকু পরিষ্কার হয়ে যেতে পারে, এক কথায় ; ওরা বলে, কুকুরের মুগের পত্তি কুকুর বলে একি বিপত্তি !… আরও বুঝিয়ে বলতে হবে ?'

হেসে বললাম—'ওটুকু বলবারও দরকার ছিল না। তার পর, ঘুম গেল কোন্ পথে তা ত টের পেলাম, তামাক এল কোন্ পথে এবার সেইটে বল।'

বললেন—"পথ দুয়ের একই, খোশবাই যার ঘুমের শত্রু, তামাক ত তার মিত্রই হবে।…পরের দিন অনিদ্রায় চোখে মুখে নিশ্চয় কালি ছেয়ে গেছে, কিন্তু দেখলাম বেহান বেশ প্রসন্ন। তোমার একটু নিশ্চয় আশ্চর্য লাগছে ; কিন্তু আসল কথা—মেয়েদের চোখ আছে নিশ্চয়—কত কাব্য হয়ে গেল—কিন্তু দৃষ্টিশক্তি নেই। ওদের মন যা বলে চোখ তাতে শুধু সায় দিয়ে যায় মাত্র। একটা উপমা দিয়ে বলা চলে ওদের চোখ ওদের আপিসের বড়বাবু—ঘর আলো করে বসে আছে, যা কিছু প্রশংসা ওই লুটছে, কাজের বেলা কিন্তু ভেতর থেকে যা আসছে তার ওপর শুধু সই মেরে যাওয়া।… বেয়ান বেশ প্রসন্ন, ওঁর মন বলে দিয়েছে চমৎকার ব্যবস্থা হয়েছে, ঘুম আর না এসেই পারে না, চোখও দেখছে ঠিক তাই। হেসে প্রশ্ন করলেন, ঘুম কালকে নিশ্চয় ভাল হয়েছিল, বেহাইয়ের ?'

বললাম—'চমৎকার বেহান। আমার ভয় হয়েছিল অবাধ্য হয়ে গদি না ছাড়বার জন্যে বুঝি শাপ দিয়ে যাবেন, কিন্তু কি মায়ামন্ত্র ঝেড়ে দিয়ে গেলেন বলুন ত ?'

একটু হাসলেন, বললেন —'মন্ত্র-তন্ত্র আমাদের অনেক রকম জানতে হয় বৈকি, কিন্তু—'

বাধা দিয়ে বললাম—'সেটা জানি, নৈলে কি দারোগা বশে রাখা যায় ? তবু একটু যদি বলে দিতেন…

বেহাই আমাদের দারোগা, জানই। লজ্জিত হলেন বেহান, তবে ভাঙলেন না, বললেন—'সব কথা কি বলেই দিতে হয় বেহাই ?'

—অর্থাৎ যে এমন গাড়ল, এতবড় পরিবর্তনটা ধরতে পারলে না তাকে বলে ফলই বা কি ? আমিও চেপে গেলাম গন্ধের কথাটা—তুমি বোধ হয় জিজ্ঞেস করবে—কেন, বেহাইয়েরও নজরে পড়ল না—রাত জেগে তোমার চোখ-মুখের অবস্থাটা ? আমার উত্তর—যাঁরা বেহানদের সঙ্গে সমস্ত জীবন একত্রে থেকে বেহাই হয়েছেন, তাঁদের কি আর

আলাদা চোখ থাকতে পারে ?—তুমিই বুকে হাত দিয়ে বল না, চললেই ত এবার বেহাই হতে।”

হেসে বললাম—‘মেনে নিচ্ছি, কিন্তু মেয়ে ?’

বললেন—“মেয়ে ধরেছিল বৈকি, মুখের পানে ঘুরে ফিরে বারকয়েক চেয়ে দেখে একবার বললে—‘কাল তোমার ঘুম কেমন হয়েছিল মেজকাকা ?’

একটু ব্যথিত দৃষ্টি, বললাম—বাঃ, ঘুম !···কেন তোর শাশুড়ীর কথা বিশ্বাস হচ্ছে না ?’—মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল।

দুপুরবেলা গা ঢেলে নিদ্রা দেবার উপায় নেই, বেহান নিরাশ হবেন। রাত্রে অবস্থা আরও সঙ্গীন হয়ে উঠল। ওষুধের কার্যকারিতায় উৎসাহিত হয়ে বেহান বিছানা এক-রকম ভিজিয়ে রেখেছেন বললেই চলে। গত চব্বিশ ঘণ্টার অনিদ্রা, তায় বুকের ওপর এই গন্ধমাদনের চাপ, মাথা ধরে গেছে বিশ্রী রকম, দুটো চোখের পাতা এক করতে পারলাম না। রাত্রে বৈদ্যদম্পতি আবার এসেছিলেন—দু'বার দীর্ঘ-নিঃশ্বাস আর পাশমোড়া দিয়ে তাড়ালাম ; এইটি যে শেষ রাত্রি এইটুকু সান্ত্বনা বুকে নিয়ে এপাশ ওপাশ করে কোন রকমে কাটিয়ে দিলাম।”

বন্ধু চুপ করলেন। কল্‌কেটা আবার তুলে নিলেন, এখনও ‘শিশু’ই ত, আগুনের হিসাব রাখতে পারছেন না।

প্রশ্ন করলাম—‘তামাক ?’

কল্‌কেটা বসিয়ে দিয়ে বললেন—“এই এসে পড়্‌ল।···পর দিন বারটার সময় গাড়ী। স্নানাদি সেরে ওরই মধ্যে যতটা সম্ভব একটু চাঙ্গা হয়ে বসেছি, বেহান এলেন, তার পরেই বেহাইও এসে বসলেন। আজ দেখলাম গল্প করতে করতে এই প্রথম তাঁর হাতে হুঁকো। খান জানি, তবে এর আগে শুধু আওয়াজ শুনেছি, গন্ধ পেয়েছি, দু'একবার দেখেছিও, তবে দূরে থেকেই ; কাছে হুঁকো নিয়ে বসলেন এই প্রথম।

বেহান একটু মুখটা কোঁচকালেন ; ইঙ্গিতটা বেশই স্পষ্ট, বেহাই যেন সাফাই গাইবার জন্যেই একটু লজ্জিত ভাবেই হেসে বললেন—তা একটু হুঁকো হাতে করেই বসলাম আজ, অভ্যেস, এটুকু হাতে না থাকলে জমেই না গল্প যেন। আর আজ ত শেষ দিন, বেহাইয়ের না হয় একটু কষ্ট হ'ল ; গরীবের বাড়ীতে আসা মানেই ত কষ্ট।’

বড় লজ্জায় পড়ে গেলাম, বিশেষ করে আমার জন্যেই যে তাঁকে এই দারোগা হয়েও চোরের মত পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে এই ভেবে। বললাম—‘কি যে বলছেন বেহাই ! আর তামাকের ধোঁয়ায় আমার অরুচি এমন অদ্ভুত কথা আপনাকে বললেই বা কে ? পৃথিবীর তিন ভাগ জল এক ভাগ স্থল, কিন্তু সে তার নিচেটায়, ওপরে ত প্রায় সমস্তটাই তামাকের ধোঁয়া—কোথায় পালাবে লোকে ?’

বেহান যেন কান পেতে শুনছিলেন, প্রসঙ্গটা বেশ রুচিকর নয় বলেই যেন অন্য কথা পাড়লেন—‘এটুকুর জন্যে কষ্ট না দিলে যেন চলত না !···তা যাক্, কপালে যেটুকু দুর্ভোগ, ফলবেই ত।···আপনার কালকে ঘুম কেমন হ'ল বলুন বেহাই।’

বললাম—‘চমৎকার বেহান !···এ দুটো রাত যা কাটিয়েছি !’

‘তার মানে ত এই দাঁড়ায় আগের দুটো রাত একেবারে ঘুম হয় নি—লুকুচ্ছিলেন···’

বললাম—‘লুকোচুরি খেলায় ত একটা আনন্দ আছেই, এমন সঙ্গী পেয়েও যদি···কিন্তু, একটা আপসোস নিয়েই যেতে হচ্ছে বেহান, এমন রোগের এমন চমৎকার ঝাড়ফুঁক —ঝাড়ফুঁকই বলুন বা ওষুধই বলুন—কিন্তু কৈ, সঙ্গে ত নিয়ে যেতে পারলাম না···’

বেশ জমে উঠছে দেখেই বোধ হয় বেহাই অন্যমনস্ক হয়ে হুঁকোয় একটা লম্বা টান দিয়ে একেবারে অনেকখানি ধোঁয়া আসরে দিলেন ছেড়ে। বেহানের মুখখানি বিরক্তিতে বেশ ভাল করেই গেল কুঁচকে, বললেন—‘তা হলে খুলেই বলি বেহাই, ভেবেছিলাম ঘরের কেচ্ছাটা আর বের করব না। ঐ তামাকের গন্ধ, ছাতে, দেয়ালে, খাটে, গদিতে, ঘরের তাবৎ আসবাবপত্রে—কোন্‌খানটা একেবারে ছেয়ে নেই বলুন। পারে কোন মানুষে ঐ ঘরে শুতে ?—ঐ খাটে, ঐ বিছানায়, ঐ গদিতে, ঐ চাদরে, ঐ বালিসে···’

আমার ঠোঁটের হাসিটুকুর ওপর দৃষ্টি পড়ে যাওয়ায় একটু থমকে গিয়ে বললেন—‘আমার কথা ?—আমার কথা বাদ দিন, মেয়েছেলেদের সবই সয়—আজ চল্লিশ বছর ধরে এই যন্ত্রণা ভুগছি, ঘাঁটা পড়ে গেছে।···’

বেহাই বেশ খোলাখুলি ভাবেই হেসে ফেললেন, তাঁরও ত চল্লিশ বছর ধরে এই গঞ্জনা, ঘাঁটা পড়ে যাবারই কথা। বেহান বেশ একটু উষ্ণ হয়েই উঠলেন, বললেন—‘হাসছ আবার ? যা অবস্থা করে রেখেছ, পারতেন ঘুমোতে যদি ঐ বুদ্ধিটুকু না বের করতাম ?···খোলাখুলিই বলি তা হলে বেহাই—বুঝুন কি কাণ্ডটা করতে হয়েছে তবে ঐ ঘুমটুকু হয়েছে দুটা রাত ডাহা জেগে—টের নিশ্চয় পেয়েছেনও, যদিও জেগে উঠতে উঠতে ততক্ষণ অনেকখানি উবে গেছে গন্ধটা,—কথা হচ্ছে বৌমাদের কাছে যত রকম ভাল ভাল গন্ধ আছে—গোলাপ জল, ওডিকলন, অগুরু—আরও বিলিতী কি সব গন্ধ, সব একত্র করে ছড়াতে হয়েছে

বিছানাময়, তবে গিয়ে ঐ ভূত ছেড়েছে—মানে চল্লিশ বছরের বিদকুটে তামাকের গন্ধটা চাপা পড়েছে· এই তবে গিয়ে ব্রাহ্মণের চক্ষে একটু ঘুম এয়েছে।'

শেষের কথাটুকু বেহাইয়ের দিকে একটু আক্রোশভরা দৃষ্টিতেই চেয়ে বললেন, তার পর আমার দিকে আবার ঘুরে বললেন—'এই আমার মন্ত্র ওষুধ যা বলুন বেহাই; একেবারে খুলে বললাম আপনাকে।'

বেহাই মিটি মিটি হেসে যাচ্ছেন।

বললাম—'তা হলে অনুমতি দেন ত আমিও এবার মন খুলেই বলি বেহান···'

'কি!'—একটু আশ্চর্য হয়েই চাইলেন; বেহাইও আমার ঠোঁটে হাসি দেখে হুঁকো টানা থামিয়েছেন, বললাম—'এ দুটো রাত একেবারে ঘুম হয় নি বেহান—ডাহা জেগে কাটিয়েছি—ছাতে ক'টা কড়ি ক'টা বরগা আছে নির্ভুল বলে দিতে পারি···'

বেহাই মুখ থেকে হুঁকো সরিয়ে হো-হো করে হেসে উঠলেন। বেহানের মুখেও একটা কৌতুকের হাসি ফুটে উঠতে উঠতে থেমে গেছে, কতকটা অপ্রতিভ ভাবে জিজ্ঞেস করলেন—'সে কি!···আর ওদিকে দুটো রাত?'

'কোন্ দিক দিয়ে যে ওদুটো রাত কেটে গেছে টেরই পাই নি···'

'সে কি! সেই বিটকেল তামাকের গন্ধের মধ্যে ঘুমুলেন—অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসে···আর এমন চমৎকার সব গন্ধ···অত মেহনৎ করে···'

—হঠাৎ মেয়েলী জিদে শরীরটা গুটিয়ে নিয়ে পাশ কাটিয়ে বসলেন, বললেন—'না, কোনমতেই হতে পারে না; আপনারা দু' বেহাইয়ে একজোট হয়েছেন, আমায় অপ্রস্তুতে ফেলবার জন্যে···অমন ভুরভুরে গন্ধের মধ্যে আপনার ঘুম হ'ল না, আর···'

বেহানকে আমার সঙ্গে ওডিকলোনের সম্বন্ধটা আর ও-ভাবে বললাম না।

বললাম—'বেহান, একটু হিসেবে ভুল হয় নি আপনার? ভেবে দেখুন না, তা হলেই বুঝতে পারবেন মিছে বলছি না—আপনাদের বেহাই হচ্ছে বুড়ো বয়েস পর্যন্ত আইবুড়ো, তার যদি এ রকম ফুলশয্যের ব্যবস্থা করে দেন—অনব্যেসের ফোঁটা কপাল চড়চড় করবে না?—ঘুম হয় কখনও?—সেই মেছুনীর গল্পটা ত জানেন বেহান—'

বেহাই হাসছেন যেন হাসির চোটে ছাদ নামিয়ে ফেলবেন, বুঝতে পারছি পাশের ঘরেও সবাই গেছে জুটে, বেহান অনেকক্ষণ চেষ্টা করলেন হাসি চাপবার, তার পর মেছুনীর প্রসঙ্গটা এনে ফেলতে তিনিও আর সামলাতে পারলেন না। অনেকক্ষণ ধরে চলল হাসির জের। সেটা কতকটা থামলে বললাম—'আর একটা কথা, দীক্ষা নিচ্ছি, আশীর্বাদ করুন।'

হাল ছেড়েই দিয়েছেন, হাসিতে মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে, জিজ্ঞেস করলেন—'আবার দীক্ষা কিসের গো? অবাক!'

বললাম—'তামাকে বেহাইয়ের কাছে; আপনিই হলেন গুরুপত্নী, পায়ের ধুলো দিন।'

পা দুটি তাড়াতাড়ি গুটিয়ে নিয়ে শিউরে উঠেই বললেন—'ওমা কেন?···এত জিনিষ থাকতে তামাক! ঐ অখদ্যে···'

বললাম—'বুঝিয়ে বলছি বেহান। প্রথমত তামাকে আমাদের বিতৃষ্ণা হয় না; যেমন দোক্তায় হয় না আপনাদের। একটু অন্য ভাবে বললে দাঁড়ায়—যেমন চল্লিশ বছর আপনি বেহাইয়ের তামাকে ভুগেছেন তেমনি চল্লিশ বছর বেহাইও আপনার দোক্তায় ভুগেছেন। এই গেল প্রথম, দ্বিতীয় কথা—যার জন্যে শেষবয়সে আমার তামাকে হাতে-খড়ি—সেটা হচ্ছে এই যে আপনাদের স্নেহ-আদরের মায়ায় পড়ে গেছি বেহান—মেয়েটি দিয়েছি, নাতিটি রয়েছে, নাতনীরও ত আশা করা যায়, সুতরাং মাঝে মাঝে জ্বালাতন করতে আসতেই হবে—সেই জ্বালাতনের ওপর যদি আবার তামাক-সমস্যা এসে পড়ে—আর অব্যেস নেই, গন্ধে সারা হচ্ছি মনে করে আপনাদেরও ঘুম যায় ছুটে, রাত দুপুরে দু'জনে গন্ধের শিশি নিয়ে—'তুমি যাও ত, তুমি যাও'—করে ঠেলাঠেলি···'

—বেহানের চোখদুটো ক্রমেই বড় হয়ে উঠছিল, আর থাকতে পারলেন না; 'অ্যা! বেহাই!···আপনি মটকা মেরে পড়েছিলেন সে দিন!'—

—চাপা খোলা সবরকম হাসির একটা হট্টগোল পড়ে-গেছে, তারই মধ্যে পালানোর পথ খুঁজতে দাঁড়িয়ে উঠেছেন, এমন সময় বেহাই কখন উঠে গিয়েছিলেন, এই গড়গড়া হাতে নিয়ে উপস্থিত, কল্কেটা বসিয়ে দিয়ে নলটা বাড়িয়ে ধরে বললেন—'এই ধরুন; আর দীক্ষার সঙ্গে আমার এই গড়গড়াটাও দিচ্ছি বেহাই, অজয়-অমর-অক্ষয় হয়ে থাকুক আপনার ঘরে।—অনেক দিনের পুরনো, পয়মন্ত গড়গড়া।' ”

আমি প্রশ্ন করলাম—'আর বেহান—গুরুপত্নী—তিনি কি আশীর্বাদ দিলেন?'

বন্ধু উত্তর করলেন—“গুরুপত্নী বললেন—'যাক্, একটা পাপ অন্তত বিদেয় হ'ল বাড়ি থেকে—সবচেয়ে পুরোনোটাই। সবচেয়ে যেটা জ্বালিয়েছে।'···তার পর?—তাম্রকূট-রহস্য ত শুনলে, এবার এদিককার খবর কি বল।”

অতি-সাম্প্রতিক কাব্য সাহিত্য

শ্রীরাধারাণী দেবী

শান্তিনিকেতনে সাহিত্য-মেলায় যোগ দিতে এসে গভীর ভাবে মনে পড়ছে গুরুদেবকে। তাঁর তপস্যাভূমি শান্তিনিকেতনে এই রকম একটি অনুষ্ঠানের যে প্রয়োজন ছিল, এটি অনেকেরই হয় ত আগে মনে পড়ে নি।

গুরুদেব আমাদের জীবনের, বিশেষ করে সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রেই দৃষ্টিপাত করে তাঁর কল্যাণ-স্পর্শ দিয়ে চলতেন। বোলপুরের এই বিস্তীর্ণ প্রান্তরে কেবলমাত্র বিদ্যায়তন রচনাতেই ত তিনি নিমগ্ন থাকেন নি, মানব জীবনে কল্যাণ সৃষ্টি এবং কলাসৃষ্টির সমস্ত দিকই তাঁর কাছ থেকে প্রাণরস আহরণ করে এখানে বিকশিত ও পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু তাঁর হৃদয়রসেই শুধুমাত্র নয়, হৃদয়রক্তে পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে বাংলা-সাহিত্য।

ক্রমবর্দ্ধমান বাংলা-সাহিত্যের প্রতি কবির উৎসুক দৃষ্টি সদা-জাগ্রত ছিল। চলন্ত সাহিত্যের আলোচনার জন্য এই সাহিত্য-মেলার অনুষ্ঠানে তাঁর চিন্তাধারার প্রতি শ্রদ্ধাকৃতজ্ঞতা সম্পন্ন করা হয়েছে। এটি শুধু শান্তিনিকেতনবাসীদেরই কর্তব্য নয়, প্রধানতঃ এটি সাহিত্যিকদেরই কর্তব্য। শান্তিনিকেতন এই পুণ্য-যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযুক্ত ক্ষেত্র মাত্র। কারণ, ভাষা-দেশ-দল-মত-নির্ব্বিশেষে সকল সাহিত্যিক অনায়াসে যদি কোনওখানে সমবেত হতে পারেন ত সে এই শান্তিনিকেতনে।

নিখিল বিশ্ব-সাহিত্যসেবীদের পরমতীর্থ শান্তিনিকেতনে উদার আদর্শনিষ্ঠ সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় এই যে সাহিত্য মেলার উদ্বোধন করলেন, আমরা যেন একে মহৎ তাৎপর্যে গ্রহণ করি। গুরুদেবের জীবনের মূল আদর্শ মিলনের আদর্শ। এই সাহিত্য মেলায় সেই আদর্শ সুন্দর সার্থক হয়ে উঠুক। সামান্য-অসামান্য ছোট-বড় নির্ব্বিশেষে সকল সাহিত্যিকই যেন এই মেলায় স্বচ্ছন্দে মিলিত হতে পারেন। এই মেলা কুম্ভমেলার মতই ভারতীয় ঐতিহ্যময় মিলন-মেলায় পরিণত হয়ে উঠুক, যেখানে আপনা হতেই সমস্ত মানুষ নিরভিমান প্রসন্নচিত্তে এগিয়ে এসে যোগ দিতে পারেন। এর জন্য বাংলাদেশের সাহিত্যিকগণকেই অবশ্য প্রথমে এগিয়ে এসে আয়োজন করতে হবে।

ভারতবর্ষে অধ্যাত্মপথযাত্রী নানা ধর্ম্মের, নানা দলের, মতের ও পথের তপস্বী এবং সিদ্ধপুরুষগণ প্রতি বারো বৎসর অন্তে পুণ্য প্রয়াগ তীর্থে বা হরিদ্বার তীর্থে কুম্ভমেলায় সমবেত হয়ে থাকেন। সেখানে তাঁরা সাক্ষাৎ-আলোচনায়, আপন আপন সাধনার ও সিদ্ধির জ্ঞানের আদান-প্রদানে পরস্পরে উপকৃত হন এবং পরস্পরকে উপকৃত করেন। তেমনই আমাদের দেশের সাহিত্য-তপস্বীরাও রুচি দল মত নির্ব্বিশেষে তাঁদের সাধনার ফল এবং অভিজ্ঞতা ও বক্তব্য নিয়ে পুণ্যতীর্থ শান্তিনিকেতনে সাহিত্য-মেলায় সম্মিলিত হতে পারেন।

এই মেলা ভবিষ্যতে পঞ্চবার্ষিকী অথবা ত্রৈবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়ে নবাগত সাহিত্যের বিচারে ও আলোচনায় সাহিত্যসেবীদের কল্যাণকর প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হতে পারে। গুরুদেবের বিশ্বভারতীর বিরাট আদর্শ এর মধ্যে সর্ব্বতোভাবে সার্থক পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠুক। এই সাহিত্য মেলা সর্ব্বভারতীয় রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে ক্রমে নিখিল-বিশ্ব সাহিত্য মেলায় পূর্ণতা লাভ করুক এই কামনা করি। পাক্-ভারত উপমহাদেশই মাত্র নয় সমস্ত পৃথিবী যেন এই মিলন-তীর্থে অকুণ্ঠ হৃদয়ে আনন্দিতচিত্তে মিলিত হতে পারে।

এর জন্য যে উদার আতিথ্যের প্রয়োজন তা এখানকার জীবনা-দর্শের মধ্যে, শিক্ষার মধ্যে, ঐতিহ্যের মধ্যে গুরুদেব আপন হাতে আয়োজন করে রেখে গেছেন। এখানকার আকাশে বাতাসে প্রান্তরে শাল বীথিকায় গুরুদেবের প্রসন্ন হৃদয়ের উদার অভ্যর্থনা সতত বিরাজমান রয়েছে।

সাম্প্রতিক পাঁচ বৎসরের কাব্য-সাহিত্য নিয়ে আজ আমাদের আলোচনা। এই পাঁচ বৎসরে নূতন কবিতা রচিত হয়েছে যথেষ্ট, কাব্যগ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে অনেক। লক্ষ্য করা যায়, এই পঞ্চ-বার্ষিকী কবিতার মধ্যে সৃজনী প্রতিভাজাত কবিতার চেয়ে নির্ম্মাণ-নৈপুণ্যজাত কবিতাই বেশি।

পাঁচ বৎসরের অন্তর্গত বাংলার কাব্যলোকে সংঘটিত একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য—যা অভিনব সন্দেশ রূপে সাগর পরপারে বিদেশী বেতারেও প্রচারিত হয়েছিল।

এক দল নবীন কবি নগরের রাজপথে প্রাচীরপত্রের ধ্বজা বহন করে 'বেশি করে কবিতা পড়ুন' ধ্বনি তুলে দেশবাসীকে কাব্য রসাস্বাদনে মনোযোগী করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কবিতা-নিস্পৃহ জনগণকে কবিতাপ্রিয় করে তোলার জন্য উচু আওয়াজ তুলে কাব্যের প্রচার এবং ফুটপাথে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে স্বরচিত কবিতা পাঠ—অভিনব সন্দেহ নেই। এইটুকু বোঝা গেছে, সমাজ-সচেতন কাব্য নামে যে কথাটি কিছুকাল থেকে শোনা গিয়েছে, যার অর্থ ব্যাখ্যা ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বক্তৃতা এবং বিতণ্ডা শোনা যায়, ধ্বনি ও পোষ্টারের মাধ্যমে এই কাব্য-আন্দোলন সমাজ-সচেতন কাব্যেরই প্রত্যক্ষ একটি রূপ সম্ভবতঃ। জনগণ সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ সচেতন থেকে যে কাব্য নির্ম্মিত হচ্ছে, জনগণই যদি সে কাব্য সম্বন্ধে নিস্পৃহ থেকে যায়, সে কাব্যে তারাই যদি রুচিশীল না হয়, তা হলে যে কোনও উপায়ে হোক তাদের কাব্যস্পৃহ করে তোলার জন্য প্রত্যক্ষ আন্দোলন করা ছাড়া উপায় কি?

কিন্তু জিজ্ঞাসা, কাব্য কি আন্দোলন করে আস্বাদন করাবার সামগ্রী? কাব্য কি সমালোচনা দ্বারা নির্ণীত ও প্রমাণিত হওয়ার বস্তু? তা যদি না হয়, তা হলে আজকের বৈঠকে আমরা কি

করতে জড়ো হয়েছে ? উত্তর দিতে পারা যায়, সমালোচনা দ্বারা কবিতা আস্বাদন করতে। এই আস্বাদনের ব্যাপারে আমার যা বক্তব্য এবং জিজ্ঞাস্য, বিনম্রভাবে নতুন কবিদের কাছে নিবেদন করছি।

বহু পুরুষানুক্রমে মানুষ পৃথিবীতে যা-কিছু সৃষ্টি এবং নির্ম্মাণ করেছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় সৃষ্টি কাব্য। কবিতা মানুষকে তার আপন সীমানা উত্তীর্ণ করিয়ে বহু দূরে অনেক উর্দ্ধে নিয়ে চলে যায়। মানুষের সীমিত শক্তি এখানে আপনাকে অনেকখানি অসীমের মধ্যে উন্নীত করতে এবং প্রসারিত করতে সমর্থ হয়েছে। পরম দুর্লভকে সহজে লাভ করতে পেরেছে—কামনাকে যথা অভিরুচি সফল সার্থক করে তুলেছে—যা মানুষ জীবনে আর কোনও ক্ষেত্রে এমন করে পারে নি বা পায় নি। মানুষ কল্পনায় স্বর্গ রচনা করেছে। যুগে যুগে দেশে দেশে পুরাণে গল্পে কিংবদন্তীতে ধর্ম্মের পুঁথিতে পুঁথিতে স্বর্গ তার আশ্চর্য্য উজ্জ্বল রূপ নিয়ে মানুষের সামনে উঁকি দিয়েছে মাত্র, কিন্তু স্বর্গকে করতলগত করে সম্পূর্ণ উপভোগ করেছে পৃথিবীতে একমাত্র কবিচিত্ত। কবিতার মধ্যে স্বর্গ সম্পূর্ণভাবে মানুষের হৃদয়ে ধরা দিয়েছে।

কালিদাস যেদিন রচনা করছিলেন—

> তত্রাগারং ধনপতিগৃহানুত্তরেণাস্মদীয়ং
> দূরাল্লক্ষ্যং সুরপতিধনুশ্চারুণা তোরণেন

সেদিন তাঁর কুটীরের পাশেই দুর্গন্ধ নর্দ্দমা ছিল কি না, তাঁর ভাঙা দরজার সামনেই আবর্জ্জনার স্তূপ পড়ে ছিল কি না, গৃহিণীর হাঁড়িতে চাল বা শিশুর গায়ে জামার অভাব ছিল কি না আমাদের কারুরই জানা নেই। কিন্তু মহারাজা বিক্রমাদিত্যের রত্নসিংহাসনের বর্ণনা, রাজসভার আড়ম্বর, স্বর্ণপাত্রে রাজভোগ গ্রহণ আর রূপসী চামরধারিণীদের কাহিনী আমাদের যথেষ্ট জানা আছে। কিন্তু আমরা কেউই বোধ হয় অস্বীকার করব না, মেঘদূত কাব্য রচনা কালে কবি কালিদাস তাঁর কল্পলোকের যে সিংহাসনে বসে অমরার সুখ উপলব্ধি করেছিলেন, সে সুখভোগ সম্রাট বিক্রমাদিত্যের ভাগ্যে ঘটে নি। বিক্রমাদিত্যের তুলনায় কালিদাসের ঐশ্বর্য্য উপভোগ ও সুখানুভূতি তুচ্ছ নয়, বরং অনেক উচ্চই।

মানুষ জীবনের বাস্তবলোকে যেমন আপনার কর্ম্মজগৎকে সৃষ্টি করেছে তেমনি মানসলোকে সৃষ্টি করে নিয়েছে কল্পনাজগৎকে। কর্ম্মজগৎ থেকে গড়ে উঠেছে তার বিরাট ও বিচিত্র সভ্যতা—কল্পজগৎ থেকে গড়ে তুলেছে মানুষ সাহিত্য, কাব্য। মনোময় জগতের এই কল্পলোক বস্তুময় জগতের কর্ম্মলোক হতে তুচ্ছ নয় অথবা দূরে নয়। বরং অদৃশ্য অস্পর্শ হয়েও বস্তুজগতের অতি-নিকটবর্ত্তী বলা যেতে পারে। কর্ম্মময় জগতের মূলে আছে মানুষের মন। মনেরই নিজস্ব লীলার রাজ্য কল্পনার অনির্ব্বচনীয় লোক। বাস্তব থেকে রস আহরণ করে তার প্রাণ, কিন্তু তার আত্মা সকল বন্ধন, সকল দায়িত্বের উর্দ্ধে। মাটি আর সারের কাছে ঋণী বলে গোলাপ ফুলকে যদি মাটিরই পাপড়িতে গড়ে তুলতে চেষ্টা করা হয়, তার পেলবতা ও বর্ণ গন্ধের সমারোহকে বাস্তবজীবনের প্রয়োজন-শূন্য বিলাসিতামাত্র বলে উপহাস করা হয়, যুক্তিতর্কের দিক থেকে বিচার করলে সেটা ন্যায্য প্রমাণিত হতে পারে, কিন্তু ঠিক ঐ যুক্তিতর্কের মাধ্যমে গোলাপ ফুলের বিচার করা হাস্যকর রসিকজনেরা অবশ্যই বলবেন। সংসারে সকল বস্তুই ন্যায়ের দণ্ডে বা প্রয়োজনের দণ্ডে মাপা যেতে পারে না,—রসের দণ্ডে, আনন্দের দণ্ডে, শিল্পের দণ্ডেও মাপ আছে। অনেক কিছুই সাধারণ বস্তু এবং বিষয় আছে, যুক্তির সাহায্যেই যাদের প্রমাণিত করা হয়। কিন্তু সংসারে এমনও অল্প কিছু অসাধারণ বস্তু এবং বিষয় আছে, যাদের প্রমাণ—উপলব্ধি আস্বাদন আর আনন্দের মধ্যেই নিহিত।

অবশ্য বলা যেতে পারে, উপলব্ধি, আস্বাদন এবং আনন্দেরও তো মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া যায়। অর্থাৎ, মানুষের রুচি ও প্রবৃত্তির গতি বদল করার শক্তিও যখন মানুষের নিজেরই হাতে কতকটা,—তখন আজকের যুগের অর্থনৈতিক, সমাজনৈতিক ও রাজনৈতিক গুরুতর প্রয়োজনের জন্য আমরা শিল্পের রূপ ও শিল্প-আস্বাদনের রুচি বদল করে নেব না কেন ?

এই রুচি ও আস্বাদনের রং-বদল পৃথিবীতে চিরকাল নিজের স্বাভাবিক নিয়মেই হয়ে আসছে। প্রয়োজনের চাপে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে হয় নি। ফুলেরই প্রয়োজনে ফুল ফুটে উঠেছে, ঝরে পড়েছে,—গরজের তাগিদে নয়। সাহিত্যেরই সজীবতার প্রয়োজনে সাহিত্য যুগে যুগে বদল হয়েছে, বদল হবেও।

আজ আমাদের শান্তচিত্তে চিন্তা করে দেখা দরকার, যুগানুগত আপাতকালের কাছে আমরা সর্ব্বকাল বা চিরকালকে বন্ধক দিয়ে রাখব কিনা। শিল্পী এবং তার সৃষ্টি আপাতকালে আশ্রয় গ্রহণ করে মাত্র, তার লক্ষ্য বা ইষ্ট সর্ব্বকাল। এই সর্ব্বকালিক আদর্শকে সর্ব্বকালিক সত্যকে কোনও কিছুরই জন্য ক্ষুণ্ণ করলে মহৎ শিল্পের অভ্যুত্থানে বাধা ঘটে।

আপন জীবনকালে যে-সকল জীবনসমস্যার মধ্যে, আশা-নিরাশা সুখ-দুঃখের মধ্যে কবিচিত্ত আন্দোলিত হয়ে থাকে, যেখান থেকে তাপ সঞ্চয় করে তাঁর চিত্তের প্রদীপ জ্বলে ওঠে, তার প্রভাব এবং প্রতিচ্ছবি আপনিই তো সাহিত্যে কাব্যে ফুটে উঠবে। শিল্পী ও কবি তাঁদের জীবনের বর্ত্তমান যুগের বাইরের মানুষ নন। স্বীয় কালের দুঃখ-সুখ, প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের সঙ্গে স্বাভাবিক নিয়মেই তাঁরা জড়িত। প্রতি যুগের মানসিক ছবি তো আপনা হতেই কবির কাব্যে চিত্রীর চিত্রে সঞ্চারিত হয়। যেমন বহু পূর্ব্বকালের ছবি আমরা প্রাচীন সাহিত্যে কাব্যে চিত্রে দেখতে পাই।

আজ পৃথিবীর কাব্য সাহিত্য চিত্রের জন্য অলিখিত অথচ দৃঢ় নির্দিষ্ট ক্যারিকুলাম তৈরি হয়েছে। আজ নবীন কবি লেখনী নিয়ে ভাবছেন তাঁর কবিতার ভাব এবং বিষয়বস্তু কি হওয়া উচিত। চিত্রকর তুলি নামিয়ে চিন্তা করছেন,—কোন্ বিষয়কে অবলম্বন করে তাঁর হৃদয়ের আনন্দকে মুক্তি দিলে সার্থকচিত্র হবে। অর্থাৎ—আজ কবি ও শিল্পীর হৃদয়ের পূর্ণ স্বাধীনতা নেই যা খুশী তাই

নিয়ে কাব্য রচনা করবার বা তুলি টানবার। মস্তিষ্ক সম্রাট হয়ে বসে বুদ্ধির শাণিত প্রভাবে হৃদয়ের গতি নিয়ন্ত্রিত করছে। এখন—

'হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচেরে—'

লিখবার উপায় নেই। হৃদয় এখন বুদ্ধির শিকলে বাঁধা। নাচ সে হয়ত ভালরকম শিখেছে, তার শিক্ষার আশ্চর্য্য নৈপুণ্য যে বাহবা পাওয়ার যোগ্য এতে সন্দেহ নেই। তবে কল্পনাকাশের মেঘোদয়ে হৃদয়-ময়ূরের পেখমমেলা স্বাধীন নৃত্য, আর, বিশেষ উদ্দেশ্য-সচেতন বুদ্ধির শিকলে বাঁধা হৃদয়ের সুশিক্ষিত সুনিপুণনৃত্য—এ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ সকলেই মানবেন।

যুগের প্রয়োজন, যুগের চিন্তা, যুগের রুচি কেউই অস্বীকার করে না। কিন্তু কাব্যের উদার বিস্তৃতিকে গণ্ডীর মধ্যে খর্ব্ব করার ব্যবস্থায় আপাত-কল্যাণ থাকেও যদি, চিরন্তন কল্যাণ থাকতে পারে না। কল্পলোক মানুষের জীবনে যতই প্রধান হয়ে উঠুক না কেন, বস্তুলোককে অস্বীকার বা অতিক্রম করতে পারে না। কারণ, কবির চিত্ত কল্পলোকে সঞ্চরণশীল হলেও কবি স্বয়ং বস্তুলোকেরই অধিবাসী, রক্তে-মাংসে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় গঠিত। তাই এতকাল কল্প-লোক ও বস্তুলোকের সম্মিলিত স্পর্শে অনেক মহৎশিল্পের উদ্ভব হয়েছে পৃথিবীতে। আজ বস্তুলোক তার সর্ব্বগ্রাসী আত্মপ্রসারণে কল্পলোককে নির্ম্মূল করতে চায়। কল্পলোককে অবজ্ঞায় উপহাস এবং অস্বীকার করে বস্তুলোককেই এখন একমাত্র চরম ও পরম সত্য বলে মেনে নেওয়ার মতবাদ এসেছে। আমাদের মনে হয়, এতে হবে মানুষের সামনের দিকের যাত্রাকে পিছনের দিকে টেনে পিছিয়ে আনা।

ছোটকে বড় করে তোলায় মধ্যে গৌরব আছে কিন্তু বড়কে ছোট করে আনায় কৃতিত্ব থাকলেও গৌরব নেই।

লাভ-ক্ষতির হিসাব আর দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যের গুরুভার—এর থেকে বিশ্বদুনিয়ায় কারুরই রেহাই নেই। কবিচিত্ত নামে যে বস্তুটা এতকাল ধরে কাজের দুনিয়ার দরকারী-জোয়াল টানা থেকে ফাঁকি দিয়ে আকাশে বাতাসে মাটিতে যদৃচ্ছা-বিচরণ করে ফিরছিল,—আজ তাকেও ধরে এনে প্রত্যক্ষ সংসারের সদুদ্দেশ্যের জোয়ালে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে দেখা যাচ্ছে। আজ পরাধীন মানবের আর অন্নহীন মানবের দুঃখে সকলেই আমরা ব্যথিত, আত্মগ্লানি-পরায়ণ, কিন্তু দুর্ভাগা কবিদের এই শৃঙ্খলিত বন্দীদশা কারুর অন্তর স্পর্শ করে না কেন? আমি তো দেখি, আজ পৃথিবীর মধ্যে সকলের চেয়ে দুঃখী এবং বঞ্চিত বর্ত্তমানযুগের নবীন কবিরা। এদের উপরে আজ যে শাসন ও বন্ধন অদৃশ্য লিখনে দেশে দেশে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে, তাদের চিন্তাশক্তি, দৃষ্টিভঙ্গী ও রুচিকে সুনির্দ্দিষ্ট এবং নির্ণীত-লক্ষ্য করে দেওয়া হচ্ছে, তার করুণতা কেন সকলের দৃষ্টি-গোচর হচ্ছে না।

কবিতা যদি পরিপূর্ণ মুক্তির মধ্যে, দায়িত্বের ভারমুক্ত পাখায় অবাধ সঞ্চরণের উপযুক্ত উন্মুক্ত আকাশের দূরবিস্তৃতি না পায়, তবে তার প্রাণের লীলা, গানের লীলা, গতির লীলা খর্ব্ব হবেই, হয়ে উঠবে আড়ষ্ট। আধুনিক নবতম কবিতার আস্বাদ গ্রহণ করতে গিয়ে আমরা বাধা ও বেদনা পাই তার সর্ব্বাঙ্গের কঠোর নিষেধ-শৃঙ্খলগুলিতে।

পঁচিশে বৈশাখ

সুফী মোতাহার হোসেন

কালের নেপথ্য হতে পঁচিশে বৈশাখ বারে বারে
ডাক দেয় ধরণীরে তব পুণ্য স্মৃতি-উদ্‌যাপনে।
তারি উদ্‌বোধন-গীতি দিকে দিকে বাজে ক্ষণে ক্ষণে
ধীর আয়োজন যেন পত্রে পুষ্পে পূর্ণ করে তারে।
নিগূঢ়ের মন্ত্রখানি বৈশাখীর বীণার ঝঙ্কারে
মেঘ-মন্দ্র রবে কভু, কভু খর রবির কিরণে
আপনি বাজিতে থাকে, ধ্বনি তার ঘনায় যে মনে
কুসুম-বাণীটি কার ফুটে বলে ফুল-উপহারে।

বঙ্গের অঙ্গন ঘিরি' মাসে বর্ষে ফোটে যেই ফুল
বর্ষা বসন্তের ছন্দে যে-কবিতা নিত্য-উচ্ছ্বসিত-
বেদনা আনন্দঘন, রসগূঢ়, আসে ঘনাইয়া
অরূপের রূপ-স্বপ্ন, অমৃতের বাণী সাথে নিয়া;
সেথা তব নিত্য স্মৃতি, হে কবীন্দ্র, সেথায় ছন্দিত
তোমার অমর কাব্য, পুণ্য শ্লোক গভীর, বিপুল।

বাংলার মন্দির (৪)

শ্রীপঞ্চানন রায়, কাব্যতীর্থ

নিম্বার্ক মঠের মন্দির

নিম্বার্কাচার্য্য সম্প্রদায় ভারতের অন্যতম প্রাচীন বৈষ্ণব-গোষ্ঠী। ইঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রমতে সৃষ্টির আদি-ভাগে সনৎকুমার ব্রহ্মাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ভগবান পুরুষোত্তমের স্তুতিগান করেন। পুরুষোত্তম হংসরূপে অবতীর্ণ হইয়া সনক প্রভৃতিকে ত্রয়ী বিদ্যা উপদেশ দেন। হংস বিষ্ণুর প্রধান অষ্টনামের অন্যতম। ইনি এই সম্প্রদায়ের বর্ত্তমানে ৫০৪৭-৪৮ নিম্বার্ক সংবৎ চলিতেছে। এই সম্প্রদায়ের প্রাচীনতম মূল আখড়া মথুরা জেলার গিরি-গোবর্দ্ধনের সন্নিহিত শ্রীনিম্ব গ্রামে অবস্থিত। রাজস্থানের সালেমাবাদে শ্রীজী মহারাজের নিকট নিম্বার্কাচার্য্যের শাল-গ্রাম শিলাটি রহিয়াছে। এই সম্প্রদায়ের ত্রয়স্ত্রিংশত্তম আচার্য্য কেশব ভারতী চৈতন্যদেবের গুরু ছিলেন।

উক্ত সম্প্রদায়ের একচত্বারিংশত্তম আচার্য্য শ্রীনহরিশরণ

নিত্যদেবমণ্ডলে শ্রীবেহারীলালজীউর প্রাসাদরীতির প্রধান মন্দির। প্রতিষ্ঠা ১২৭৯ সাল

মঠের অধীন পরগণার উৎকলীয় মিশ্ররীতির শিবালয়। দ্বারশীর্ষে গণেশ ও চূড়ায় আমলার উপর বিষ্ণুচক্র, তদুপরি ত্রিশূল

আদি প্রবর্ত্তক হইলেও চতুর্থ গুরু নিম্বার্কাচার্য্য হইতেই সম্প্রদায়ের নামকরণ হইয়াছে। গোদাবরী-তীরে বৈদূর্য্য-পত্তন বা মুংগাপট্টনে অরুণ ঋষির ঔরসে ও জয়ন্তী দেবীর গর্ভে ইঁহার জন্ম। ব্রহ্মাকে নিম্ববৃক্ষে অর্ক দেখাইয়া ইনি নিয়মানন্দ নামের পরিবর্ত্তে নিম্বার্ক নাম প্রাপ্ত হন। বেদান্ত-ভাষ্যে ইঁহার কোন মতের খণ্ডন বা পাণিনি সূত্রের উল্লেখ না থাকায় ইঁহাকে প্রাচীনতম বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। ইনি রমাকান্ত পুরুষোত্তমবাদী। ইঁহার মতে ব্রহ্ম একাধারে সগুণ ও নির্গুণ। বিশ্বের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ভিন্ন ও অভিন্ন। ব্যাসদেব এই মত সমর্থন করেন।

দেবাচার্য্য ইং ১৭০০, বাং সন ১১০০ সালের কাছাকাছি সময়ে বাংলাদেশে প্রথম আসন স্থাপন করেন। ইহা বর্দ্ধমানের সান্নিধ্যে বাঁকা নদীর তটে রাজগঞ্জ গ্রামে অবস্থিত। একটি বিল্ববৃক্ষ এখনও মূল আসনটি নির্দ্দেশ করিতেছে। বাংলাদেশে এখানকার মঠ বা অস্থলের নিম্নলিখিত চারিটি শাখা বিদ্যমান: চেতুয়া বৈকুণ্ঠপুর (মেদিনীপুর), আড়ং-ঘাটা (নদীয়া), উখড়া (বর্দ্ধমান), সোহাগগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)। এই মঠগুলি অস্থল নামে পরিচিত। অবিষ্ণুবাচক স্থল তাঁহার আশ্রয়। মূল এবং শাখা অস্থলগুলিরও শাখা-প্রশাখা বিভিন্ন জেলায় আছে। ধর্ম্মপ্রচার, ইষ্টদেবতার

আরাধনা, অতিথি ও গো-সেবা এই সকল অস্থলের নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম। ধর্ম্মপ্রচারের একান্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ দেবতা-প্রতিষ্ঠা। মন্দির এই দেবতার আশ্রয়, সুতরাং এই সকল অস্থলের অধীনে নানাস্থানে বহুসংখ্যক দেবালয় বা মন্দির আছে। উহাদের গঠনরীতি, পুত্তলিকা ও অলঙ্কার-বিন্যাস, লিপি প্রভৃতির মাধ্যমে বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্যের

শ্রীবালাজীউর পরিত্যক্ত প্রাসাদরীতির মন্দির

সহিত এই সম্প্রদায়ের মধুর মিলনের বাণীই ধ্বনিত হয়। এই অস্থলগুলির নিত্যনৈমিত্তিক পূজা এবং উৎসবাদি সামাজিক ব্যাপারে প্রাদেশিকতার লেশমাত্র নাই। ভিন্ন দেশীয়, ভিন্ন ভাষাভাষী সম্প্রদায়াচার্য্য বা মহান্তগণ প্রাচীন কাল হইতেই বাঙালীর সংস্কৃতির সহিত আপনাদের রীতি নীতির বিস্ময়কর সামঞ্জস্যবিধান করিয়া লইয়া প্রাত্যহিক কর্ম্মধারা বজায় রাখিয়া চলিতেছেন। ইঁহাদের প্রাচীন মন্দিরসমূহে বাংলাদেশের মন্দিরের গঠন-রীতিই সংরক্ষিত হইয়াছে।

বর্দ্ধমানের জমিদার কীর্ত্তিচন্দ্র শ্রীমৎ শুকদেবাচার্য্যকে বাং সন ১১২৭।২৫শে আশ্বিন, সন ১১২৮।২২শে অগ্রহায়ণ ও সন ১১২৯।২৫শে মাঘ মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার চেতুয়া পরগণার নানা স্থানে প্রায় ৯২৩/০ বিঘা জমি দান করেন। ঐ সময়ের কাছাকাছি কোন সালে চেতুয়া অস্থল প্রথম স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠাকাল হইতে অদ্যাবধি যে সকল মঠাধীশ বা মহান্ত এই অস্থলে কর্তৃত্ব করিয়াছেন তাঁহাদের নাম :—(৪২।১) শ্রীমৎ শুকদেবাচার্য্য। (৪৩।২) শ্রীমৎ গোপাল দেবাচার্য্য ও শ্রীমৎ মোহনশরণ দেবাচার্য্য। (৪৪।৩) শ্রীমৎ চতুরদাসশরণ দেবাচার্য্য। (৪৫।৪) শ্রীমৎ চৈতন্যদাসশরণ দেবাচার্য্য ও শ্রীমৎ জানকীরামশরণ দেবাচার্য্য। (৪৬।৫) শ্রীমৎ মাধবদাস ও শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস। (৪৭।৬) শ্রীমৎ শুকদেব দাস। (৪৮।৭) শ্রীমৎ বলদেব

নৈমিত্তিক দেবমহলে হিন্দোল মণ্ডপ ও নাটমন্দির, উপরে বৃত্তাকার লিপির ফলক। প্রতিষ্ঠা ১২৪০ সাল

দাস। (৪৯।৮) শ্রীমৎ হলধর দাস। প্রথম সংখ্যাটি সাম্প্রদায়িক পর্য্যায়, দ্বিতীয়টি ক্রমিক সংখ্যা। সকল মহান্তই ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত ও সকলের নামের শেষেই শরণ দেবাচার্য্য গোস্বামী বর্ত্তমান।

অস্থলের প্রধান দেবতা শ্রীরাধাবিহারী লাল, শ্রীরাজ-রাজেশ্বর শিলা ও শ্রীসুদর্শন চক্র। শালগ্রামের সংখ্যা চারি-শতাধিক, বিগ্রহ-মূর্ত্তির সংখ্যাও অনেকগুলি। শ্রীজগন্নাথ-মূর্ত্তিও আছেন। শ্রীগরুড় শ্রীমহাবীর, গুরু পাদুকাবলী, ধর্ম্মগ্রন্থ, মহান্তের গদী বর্ত্তমানে প্রাসাদরীতির প্রধান মন্দিরে রক্ষিত। ত্রিপুণ্ড্র, শঙ্খ ও চক্র সম্প্রদায়ের চিহ্ন। রাণীচকের অস্থলটি ইহার শাখা। সেখানে শ্রীশেষনারায়ণ-জীউ শালগ্রামের একটি প্রাসাদরীতির মন্দির আছে। গোলাড়ের শাখা অস্থল পরিত্যক্ত।

প্রায় পঞ্চাশ বিঘা সমতল ভূমির উপর জলাশয় ও বিল-গুলির বেষ্টনীর মধ্যে উপবন-মণ্ডিত রমণীয় চেতুয়া অস্থল

বর্ত্তমান। ইহা নিত্যদেব মহল, নৈমিত্তিক দেবমহল ও প্রসাদমহলে বিভক্ত। চত্বরে বিভিন্ন প্রাসাদ ও নাটমন্দির। নিত্য দেবমহলে শ্রীবিহারীলাল প্রভৃতির প্রাচীন মন্দির রহিয়াছে। ইহা অলঙ্কারশূন্য প্রাসাদরীতির দেবালয়।

১৮৬৮ শকাব্দের বৈশাখ মাসের ২১শে শনিবার অক্ষয় তৃতীয়ায় শ্রীবেহারীলালের এই নশ্বর পরমাশ্রয় আমি হলধর-শরণ ভক্তিপূর্ব্বক সংস্কার করাইলাম। রাজোচিত এই সংস্কার অনুষ্ঠানে দশ হাজার টাকা খরচ হইয়াছে।

শ্রীরামচন্দ্রজীউর পরিত্যক্ত প্রাসাদরীতি ও মন্দির। ছাদের বৃহৎ খিলান ও দেয়ালে মসৃণ প্রলেপ

মঠসান্নিধ্যে অপর মঠের পরিত্যক্ত প্রাসাদরীতির ভগ্ন মন্দির

মধ্যে দুইটি কক্ষের একটি দেবতাগণের শয়নাগার—সম্মুখের অলিন্দও দুইটি। পঞ্চম মহান্ত শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস শকাব্দা ১৭৯৪ বা ১২৭৯ সনে এই মন্দিরটি নির্ম্মাণ করান। বর্দ্ধমানের মহান্ত শ্রীমৎ মধুসূদনদাস বাং ১৩১৫ সালে ইহার পুনঃসংস্কার করেন। বর্ত্তমান মহান্ত শ্রীমৎ হলধরশরণ ১৩৫২ সালে সুষ্ঠুভাবে ইহার সংস্কার করাইয়াছেন। মর্ম্মর ও মোজাইকের মেঝে—পিত্তলনির্ম্মিত কবাট প্রভৃতির দ্বারা মন্দিরটির নব কলেবর অতি সুন্দর হইয়াছে। ইহাতে বর্ত্তমান লেখক রচিত নিম্নোক্ত লিপিটি যোজিত হইয়াছে :

নগরসবসুভুমে শাক বর্ষেহথ রাধে কৃতযুগজনু-
ঘস্রেবিশ্বমেসৌরিবারে।
নরপরমভুবং বেহারিলালস্য বিষ্ণোর্হলধর শরণোহং
ভক্তিতঃ সংস্করোমি॥

কবাটে আদি মহান্ত, মন্দির-প্রতিষ্ঠাতা ও সংস্কারকের নাম ক্ষোদিত এবং অন্য দুই স্থানেও বর্ত্তমান সংস্কারকের নাম উৎকীর্ণ করা হইয়াছে। লিপির মর্ম্ম :

নৈমিত্তিক দেবমহলে হিন্দোল বা ঝুলন উৎসব মহা সমারোহে সম্পন্ন হয়। প্রতি বৎসর শ্রাবণের শুক্লা তৃতীয়া হইতে পূর্ণিমা অবধি দেববিগ্রহগণ ঐ মহলের হিন্দোল-মণ্ডপে অধিষ্ঠান করেন এবং প্রতি তিথিতে বিভিন্ন সাজে সজ্জিত হইয়া হিন্দু ও অহিন্দু সকলকে দর্শনদান করেন। নিত্য দেবমহলে অহিন্দুগণের প্রবেশ নিষেধ—প্রধান দ্বারের পার্শ্বে সংস্থাপিত ফলকে এই বাণী উৎকীর্ণ। হিন্দোল-মণ্ডপ একটি সাধারণ প্রাসাদশ্রেণীর দেবালয়। ইহার দ্বারের সম্মুখভাগস্থ কারুশিল্পের বৈশিষ্ট্য আছে। ঊর্দ্ধভাগে একটি প্রস্তরগঠিত বিষ্ণুমূর্ত্তি। সম্মুখে নাটমন্দির, উহার অভ্যন্তরভাগের পশ্চিমাংশের লিপি হইতে জানা যায় চতুর্থ মহান্ত শ্রীমৎ চৈতন্যদাস শকাব্দ ১৭৫৫, বাং সন ১২৪০ সালে এই নাটমন্দিরটি নির্ম্মাণ করান। বর্ত্তমান মোহান্ত ইহার ভিতরের পূর্ব্বাংশে একটি গরুড়মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। নৈমিত্তিক উৎসবে এখানে যাত্রাগান ও সভা প্রভৃতি হইয়া থাকে।

এই অঞ্চলের বহিঃপ্রাঙ্গণে আরও চারিটি দেবালয় আছে। সেগুলি এখন পরিত্যক্ত। নৈমিত্তিক মহলের

পূর্ব্বভাগে ৺মদনমোহনজীউর দেউলচূড় আলগোছটুঙ্গী মন্দির। ইহাতে কোন লিপি নাই। খোপে দশাবতার প্রভৃতির পুত্তলিকা। বুদ্ধের স্থলে সংস্কারকালে জগন্নাথ এই দেশের বৈশিষ্ট্য। সুঠাম অশ্বারোহী যোদ্ধার মূর্ত্তি লক্ষণীয়।

শ্রীমদনমোহনজীউর পরিত্যক্ত আলগোছটুঙ্গী মন্দির। খোপে খোপে পুত্তলিকা ও সম্মুখভাগে অলঙ্কার

কতকগুলি সুন্দর পুত্তলিকা শ্রীবেহারীলালের মন্দিরে সন্নিবেশিত হইয়াছে। মন্দিরটির সম্মুখভাগ সূক্ষ্ম আলঙ্কারিক কারুকার্য্যে মণ্ডিত।

নিত্যানন্দ মহলের অগ্নিকোণে রামচন্দ্রজীউর প্রাসাদরীতির বিশাল মন্দিরটির ছাদ খিলানে গঠিত। ইহার গাত্রের চুণ-বালির প্রলেপ মসৃণ ও দৃঢ়। দ্বারের ঊর্দ্ধে ছাদের উপর যুগ্ম সিংহ ও বিষ্ণুচক্র।

এই মন্দিরের কিছু দক্ষিণে এই রীতির বালাজীর পরিত্যক্ত মন্দিরটির ছাদও বিশাল খিলান। যুগ্ম সিংহ, বিষ্ণুচক্র ও বাতায়নের উপরিভাগে কিছু রঙের প্রলেপ ইহাতে এখনও আছে।

এই অস্থলের বায়ুকোণে আর একটি পৃথক অস্থল ছিল। উহার দ্বিতল অট্টালিকা ও প্রাসাদরীতির মন্দিরটি এখন ধ্বংসপ্রায়। এই পরিত্যক্ত মন্দিরগুলির দেবতাগণের পৃথক ভূসম্পত্তি ও সেবাদির স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছিল। ঐ সকল দেবতা এখন প্রধান মন্দিরে স্থানান্তরিত হইয়া একত্রে পূজিত হইতেছেন। সুঠাম দেবায়তনসমূহ দ্রুত ধ্বংসমুখী।

ঘাটাল বিষ্ণুপুর রোডের ছয় মাইলের নিকট পরগণা

প্রধান মন্দিরের পিছনে মঠাধীশ হলধরশরণ

উৎকলরীতির শিবমন্দিরটি এই অস্থলের কর্ত্তৃত্বে পরিচালিত। ইহার শীর্ষে ক্ষুদ্র আমলা ও দ্বারের ঊর্দ্ধে গণপতিমূর্ত্তি উপরে ত্রিশূলের স্থলে চক্র।

নিম্বার্ক ব্রতোৎসব নির্ণয় পঞ্জিকার মতে অস্থলের বার্ষিক উৎসবসমূহ উদ্‌যাপিত হয়। মথুনা নামক কঠিন নোনতা গোলাকার পিষ্টক রাত্রিকালীন ভোগে ব্যবহৃত হয়। তোকমাই নামক পায়স, পণঝুরি নামক এক প্রকার মিষ্টচূর্ণ উৎসবের ভোগের উপকরণ।

বর্ত্তমান মহান্ত অস্থলের উন্নতি-বিষয়ে যত্নশীল। যুগপ্রভাবে আজ সর্ব্বত্র আদি পুরোহিত-প্রাধান্যের দ্রুত অবসান ঘনাইয়া আসার দরুন মঠসমূহ ক্রমশঃ বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু সুখের বিষয়, এই উদ্যমশীল মঠাধীশ মহাশয়ের ব্যবস্থাধীনে মঠের কার্য্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে। ইঁহার মধ্যে বিষয়বুদ্ধি এবং বৈরাগ্যের এক অপূর্ব্ব সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়।

সূর্য্যকেন্দ্রীয় পরিকল্পনার গোড়াপত্তন

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন, এম্-এস্‌সি

১

কোপার্নিকাসের পূর্ব্বে প্রচলিত জ্যোতির্ষীয় মতবাদ

সূর্য্যকেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ও আধুনিক জ্যোতিষের গোড়াপত্তন হয় ষোড়শ শতাব্দীতে। এই জ্যোতিষের পশ্চাতে ছিল কোপার্নিকাস, টাইকো ব্রাহে, কেপ্‌লার ও গ্যালিলিওর যুগান্তকারী গবেষণা। প্রাচীন ভূকেন্দ্রীয় জ্যোতিষ ও আধুনিক সূর্য্যকেন্দ্রীয় জ্যোতিষের মধ্যে সীমারেখা যদি কোথাও টানিতে হয় তবে তাহা টানা উচিত ১৫৪৩ সনে। ঐ বৎসর কোপার্নিকাসের বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থ *De revolutionibus orbium coelestium* প্রকাশিত হয় নুর্নবার্গ হইতে। এই গ্রন্থের প্রস্তাবিত জ্যোতির্ষীয় পরিকল্পনায় সূর্য্য হইল ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থল ; পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগুলি সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া পরিক্রমণশীল। '*De revolutionibus*' প্রকাশের পূর্ব্বে দুই হাজার বৎসরেরও অধিককাল জ্যোতিবিদদের বিশ্বাস ছিল পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে অবস্থিত এবং এইরূপ ভূকেন্দ্রীয় পরিকল্পনার ভিত্তিতে এরিষ্টটল, হিপার্কাস্, টলেমী প্রমুখ প্রাচীন গ্রীক বিজ্ঞানীরা যে জ্যোতিষশাস্ত্রের কাঠামো রচনা করিয়া গিয়াছিলেন এই বিদ্যার তাহাই হইল শেষ কথা।

সূর্য্যকেন্দ্রীয় পরিকল্পনার উদ্ভাবক হিসাবে কোপার্নিকাসের নাম জ্যোতিষের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইলেও একথা ভুলিলে চলিবে না যে, তাঁহার পূর্ব্বে একাধিক জ্যোতিবিদ বিভিন্ন সময়ে সূর্য্যকেন্দ্রীয় ব্রহ্মাণ্ড পরিকল্পনার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতাব্দীতে পিথাগোরীয় দার্শনিকদের বিশ্বাস ছিল, অগ্নি ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে অবস্থিত এবং এই অগ্নির চতুর্দ্দিকে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগুলি আবর্ত্তিত হইয়া থাকে। খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে বিখ্যাত আলেকজান্দ্রীয় জ্যোতিবিদ আরিস্টার্কাস (খ্রীঃ পূঃ ৩১০-২৩০) সূর্য্যই যে ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে অবস্থিত এবং তাহাকে কেন্দ্র করিয়া পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ পরিক্রমণরত—এই মত দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করেন। বেবিলনের সেলুকাস (খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী) আরিস্টার্কাসের সূর্য্যকেন্দ্রীয় মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং এই জ্যোতিষ প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে সাধ্যমত চেষ্টা করেন। প্লুটার্ক, কিকেরো প্রমুখ পরবর্ত্তীকালের লেখক ও ঐতিহাসিকগণ প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের মধ্যে কে কে সূর্য্যকেন্দ্রীয় মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং কোপার্নিকাস নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, "আমি প্রথম কিকেরোর লেখায় দেখি যে, সাইরাকিউজবাসী হিসেটাস পৃথিবীর গতিতে বিশ্বাস করিতেন। তার পর আমি প্লুটার্কের রচনায় আবিষ্কার করি, প্রাচীনকালের অনেকেরই এইরূপ অভিমত ছিল।"

তথাপি কোপার্নিকাসের নামের সহিত সূর্য্যকেন্দ্রীয় পরিকল্পনাকে ওতঃপ্রোতভাবে জড়াইবার কারণ এই যে, এই পরিকল্পনা অনুযায়ী গাণিতিক পদ্ধতিতে নানা জ্যোতির্ষীয় তথ্যের প্রথম সন্তোষজনক ব্যাখ্যা তিনিই প্রদান করেন। কোপার্নিকাসের পূর্ব্বে ভূকেন্দ্রীয় জ্যোতিষে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন সত্য এবং পৃথিবীর পরিবর্ত্তে সূর্য্যই যে ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থল এরূপ অভিমতও অনেকে দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভূকেন্দ্রীয় মতবাদের ভিত্তিতে টলেমী সমগ্র জ্যোতির্ষীয় তথ্যের মধ্যে যেরূপ শৃঙ্খলাবিধান ও তাহাদের ব্যাখ্যায় যেরূপ সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন, সূর্য্যকেন্দ্রীয় মতবাদের ভিত্তিতে জ্যোতির্ষীয় তথ্যরাজির সেরূপ কোন শৃঙ্খলাবিধানের চেষ্টা এই মতবাদের প্রাচীন সমর্থকদের মধ্যে দেখা যায় না। এই চেষ্টায় নিকোলাস কোপার্নিকাস অগ্রগণ্য। টাইকো ব্রাহের জ্যোতির্ষীয় পর্য্যবেক্ষণ, কেপলারের তত্ত্বীয় গবেষণা ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে গ্যালিলিওর নানা আবিষ্কার চিরকালের জন্য ভূকেন্দ্রীয় মতবাদের সমাধি রচনা করিয়া অটল ও দৃঢ় ভিত্তির উপর সূর্য্যকেন্দ্রীয় জ্যোতির্ষীয় পরিকল্পনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।

পর পর কয়েকটি প্রবন্ধে সূর্য্যকেন্দ্রীয় পরিকল্পনার গোড়াপত্তনের ইতিহাস আলোচিত হইবে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ভূকেন্দ্রীয় জ্যোতিষ সম্বন্ধে এরিষ্টটল ও টলেমীর মতবাদ ও মধ্যযুগে কোপার্নিকাসের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ইউরোপে প্রচলিত জ্যোতির্ষীয় ধারণা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব। কোপার্নিকাস ও পরবর্ত্তী জ্যোতিবিদগণের অবদান বুঝিবার পক্ষে এই আলোচনা অপরিহার্য্য।

এরিষ্টটলের জ্যোতির্ষীয় মতবাদ

এরিষ্টটলের বিশ্বপরিকল্পনায় ব্রহ্মাণ্ড একক, সম্পূর্ণ ও সসীম। যাবতীয় বস্তু এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অসীম বস্তু কল্পনাতীত। কারণ অসীম বস্তু হয় অতি সহজ ও সাধারণ হইবে, নয় বহু জিনিষের সংমিশ্রণে উহা হইবে অতি জটিল। যদি সহজ ও সাধারণ হয় তবে সেই বস্তু

মৌলিক উপাদান ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না, এবং যেহেতু মৌলিক উপাদান অসীম নয় সেই হেতু অসীম বস্তু সহজ ও সাধারণ হইতে পারে না। পক্ষান্তরে অসীম বস্তু জটিল হইলে তাহা মূলতঃ মৌলিক উপাদানের সংমিশ্রণ হইতে বাধ্য। পদার্থের মৌলিক উপাদানগুলি সংখ্যায় পরিমিত—মাত্র চারিটি ; সুতরাং জটিল বস্তুকে অসীম হইতে হইলে অন্ততঃ কোনও একটি মৌলিক উপাদানকে অসীম হইতে হইবে। কিন্তু অসীম মৌলিক উপাদানের অস্তিত্ব অসম্ভব, কারণ যে কোন একটি মৌলিক পদার্থকে অসীম মনে করিলে উহাই সমস্ত শূন্য স্থান জুড়িয়া থাকিবে, অন্যান্য মৌলিক পদার্থের অস্তিত্বের আর অবকাশ থাকিবে না। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ড অসীম হইতে পারে না। ইহা এরিষ্টটলীয় সিলসিজম্ বা যুক্তির একটি দৃষ্টান্ত। '*Physics*' গ্রন্থে এই যুক্তিটি প্রদর্শিত হইয়াছে।

এরিষ্টটলীয় জ্যোতিষে একক, সম্পূর্ণ ও সসীম ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে পৃথিবী অধিষ্ঠিত। পিথাগোরীয়রা কেন্দ্রে অগ্নিকে বসাইয়াছিলেন, কারণ কেন্দ্রের মত বিশিষ্টস্থানে মৃত্তিকা অপেক্ষা অগ্নিকে সংস্থাপন করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। এরিষ্টটল এই মতের বিরুদ্ধতা করিয়া বলেন যে, ভারী বস্তু মাত্রই পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখে ধাবিত হয় ; পক্ষান্তরে অগ্নির গতি ঊর্দ্ধমুখী। সুতরাং মৃত্তিকাধর্ম্মী কেন্দ্রাতিগ পৃথিবীরই স্থান হওয়া উচিত ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে। ইহার পর তিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে কয়েকটি স্ফটিক স্বচ্ছ এক-কেন্দ্রীয় (concentric) গোলকে (crystal spheres) ভাগ করেন। কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত প্রথম গোলকটি হইল মৃন্ময় পৃথিবীর গোলক ; পরবর্ত্তী গোলকে সমুদ্র ও মহাসমুদ্র বিরাজমান, তার পরের দুইটি গোলকে যথাক্রমে বাতাস ও অগ্নির অবস্থিতি। ইহার পরের এক একটি গোলক যথাক্রমে চন্দ্র, সূর্য্য, বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিগ্রহকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তিত হইয়া থাকে। শনিগ্রহের পরবর্ত্তী গোলকে স্থির নক্ষত্রেরা সাবিবদ্ধভাবে বিরাজ করে। এই স্থির নক্ষত্রের গোলকের দ্বারাই ব্রহ্মাণ্ডের সীমা নির্দ্দিষ্ট।

এখন পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহদের এই যে বিরামহীন আবর্ত্তন ইহার কারণ কি? কাহার নির্দ্দেশে এই অবিশ্রান্ত গতি? কোথায় ইহার উৎস? এরিষ্টটল হইতে নিউটন পর্য্যন্ত প্রত্যেক বিজ্ঞানীকে এই প্রশ্ন বিব্রত করিয়াছে। *Metaphysics* গ্রন্থে এরিষ্টটল গ্রহদের অবিশ্রান্ত গতির স্বরূপ ও কারণ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার পর বলেন যে, আকার (Form) ও পদার্থের (Mtetr) মত গতি চিরন্তন ও অবিনশ্বর। ইহার আদিও নাই অন্তও নাই। এই গতির পশ্চাতে রহিয়াছে "অচল চালক" (*Primen movens* বা Unmoved Mover)। এই চালক অচল, কারণ নিজে অচল না হইলে তাহার পক্ষে অন্যকে সমান ও অবিশ্রান্তভাবে চালনা করা অসম্ভব। এই অচল, অচঞ্চল, অশরীরী, অদৃশ্য *Primen movens* একমাত্র সত্য, ইহাই প্রকৃত শক্তি, ইহাই ভগবান! এই অদৃশ্য সর্ব্বশক্তিমান অচল চালক ব্রহ্মাণ্ডের প্রান্তদেশে অবস্থান করিয়া বিশ্বচক্রকে নিরন্তর ঘুরাইতেছেন।

হিপার্কাস টলেমীর ব্রহ্মাণ্ড পরিকল্পনা

এরিষ্টটলের উপরি-উক্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিকল্পনা গ্রীক জ্যোতিষীয় ভাবধারার প্রাথমিক ও শৈশব পর্য্যায় বলিলেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। জীববিদ্যা, ন্যায়শাস্ত্র, দর্শন প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এরিষ্টটল জ্যোতিষ, বলবিদ্যা ও পদার্থবিদ্যায় বিশেষ দুর্ব্বলতার ও অপরিপক্বতার পরিচয় দিয়াছেন। বিজ্ঞানের এই বিভাগগুলিতে নূতন অবদানের পরিবর্ত্তে ভ্রান্ত মতবাদ দৃঢ়তার সহিত সমর্থনের জন্য বরং তিনি ক্ষতিই করিয়াছিলেন বেশী। ব্রহ্মাণ্ডকে স্ফটিক গোলকে বিভক্ত করিবার যে পরিকল্পনা তিনি প্রদান করেন তাহার প্রকৃত উদ্ভাবক ইউডক্সাস (৪০৯-৩৫৬ খ্রীঃ পূঃ)। এরিষ্টটলের সমসাময়িক হেরাক্লিডেস অব পন্টুস (৩৮৮-৩১৫ খ্রীঃ পূঃ) পৃথিবীর আহ্নিক গতি আবিষ্কার করেন এবং বুধ ও শুক্রের আপাতঃ অদ্ভুত ব্যবহার ব্যাখ্যাকল্পে পৃথিবীর পরিবর্ত্তে সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া এই গ্রহদ্বয়কে পরিক্রমণরত কল্পনা করেন (১নং চিত্র)। পৃথিবী অবশ্য ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রেই অবস্থিত এবং সূর্য্য পৃথিবীকে কেন্দ্র
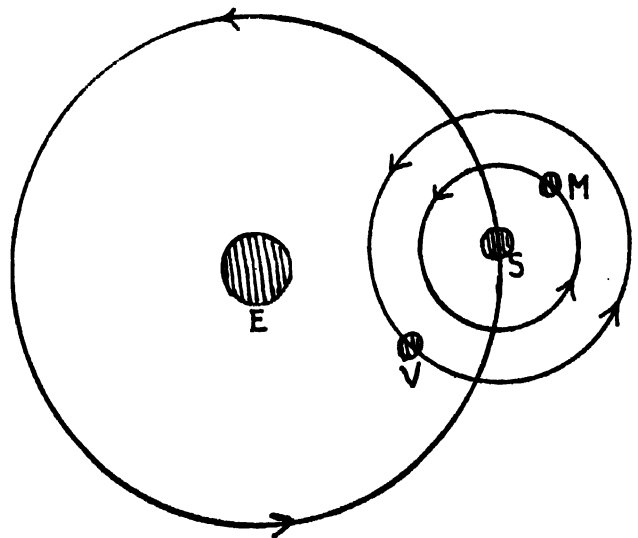
১নং চিত্র

করিয়া পরিক্রমণশীল। এরিষ্টটলের রচনায় হেরাক্লিডেসের মতবাদের কোন উল্লেখ নাই; হয় তিনি এ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না, অথবা অবহিত থাকিলেও তাহা গ্রহণ করেন নাই।

গ্রীক জ্যোতিষের পূর্ণ পরিণতি ঘটে হিপার্কাসের সময়ে (১৯০-১২০ খ্রীঃ পূঃ)। আলেকজান্দ্রিয়ার প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ ক্লডিয়াস টলেমী (খ্রীঃ অব্দ দ্বিতীয় শতক) পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রীক জ্যোতির্বিদদিগের অবদান একত্র গ্রথিত করিয়া জ্যোতিষের যে বিরাট গ্রন্থ 'অ্যাল্‌মাজেষ্ট' রচনা করেন, দুই হাজার বৎসর পর্য্যন্ত ইহাই ছিল ইউরোপ ও এশিয়াখণ্ডের সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য গ্রন্থ।

হিপার্কাস পিথাগোরীয়দের অগ্নিকেন্দ্রিক ব্রহ্মাণ্ড পরিকল্পনা ও আরিস্টার্কাসের সূর্য্যকেন্দ্রিক পরিকল্পনার সহিত পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তিনি পৃথিবীর পরিক্রমণগতি সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া এরিষ্টটল, ইউডক্সাস প্রমুখ প্রাচীন বিজ্ঞানীদের প্রদর্শিত পথে ভূকেন্দ্রীয় পরিকল্পনার ভিত্তিতে সূর্য্য ও গ্রহদের পরিক্রমণ বুঝাইবার চেষ্টা করেন। তিনি অবশ্য ইউডক্সাস্-এরিষ্টটলের স্ফটিকস্বচ্ছ গোলকের ধারণা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেন এবং বলেন যে, গ্রহরা বৃত্তপথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। কিন্তু তাঁহার পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, সূর্য্য ও গ্রহগুলি যে সব এক কেন্দ্রীয় বৃত্তপথে পরিভ্রমণ করে পৃথিবী সেই সব বৃত্তের ঠিক কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করে না, কেন্দ্র হইতে কতকটা দূরে সরিয়া অবস্থান করে। অর্থাৎ গ্রহগুলি উৎকেন্দ্রীয় বৃত্তপথে (eccentric circle) পৃথিবীকে পরিক্রমণ করিয়া থাকে।

সূর্য্য পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া সমবেগে ধাবিত হইলে মহাবিষুব (vernal equinox) হইতে জলবিষুবে (autumnal equinox) পৌঁছিতে এবং জলবিষুব হইতে আবার মহাবিষুবে তাহার ফিরিয়া আসিতে ঠিক অর্দ্ধেক বৎসর বা ১৮২।১৮৩ দিন লাগিবার কথা। কিন্তু পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা বহু পূর্ব্বেই জানা গিয়াছিল যে, ক্রান্তিবৃত্তপথে মহাবিষুব হইতে জলবিষুবে পৌঁছিতে সূর্য্যের ১৮৬ দিন লাগে এবং বাকি অর্ধেক পথ ঘুরিয়া মহাবিষুবে পুনরায় পৌঁছিতে তাহার লাগে ১৭৯ দিন। হিপার্কাস আরও লক্ষ্য করেন যে, বসন্তকালের (মহাবিষুব হইতে কর্কট ক্রান্তি) স্থায়িত্ব ৯৪ দিন এবং গ্রীষ্মকালের (কর্কটক্রান্তি হইতে জলবিষুব) স্থায়িত্ব ৯২ দিন। এই তথ্য হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ক্রান্তিবৃত্তের উভয় অর্দ্ধে সূর্য্যের পরিক্রমণ বেগ অসমান; পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া সূর্য্য সমবেগে সঞ্চারিত হইলে বসন্ত ও গ্রীষ্মকালের দৈর্ঘ্যের এইরূপ তারতম্য ব্যাখ্যার অতীত হইয়া পড়ে। এই অসঙ্গতি দূর করিবার জন্য হিপার্কাস প্রস্তাব করেন, পৃথিবী ক্রান্তিবৃত্তের ঠিক কেন্দ্রে অবস্থান না করিয়া ইহার অনতিদূরে অবস্থান করে। দ্রষ্টার স্থান কেন্দ্র হইতে কিছু দূরে কল্পনা করিলে সূর্য্যের গতির যে আপাত
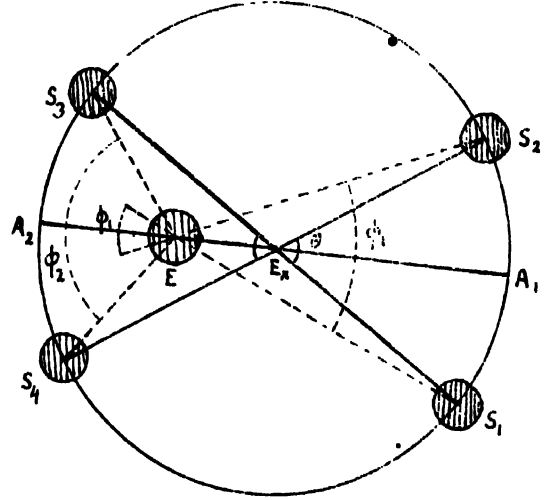
২নং চিত্র

অসমবেগ পরিলক্ষিত হয় তাহা উপরের ২নং চিত্রটি একটু তলাইয়া দেখিলে সহজেই বুঝা যাইবে।

E^x = ক্রান্তিবৃত্তের কেন্দ্র ; E = পৃথিবী ;

A = অপভূ ; A_2 = অনুভূ ;

S_1, S_2, S_3 ও S_4 = সূর্য্যের বিভিন্ন অবস্থান ;

সহজেই দেখা যায় যে,

$$Q_1 < V$$

সুতরাং সূর্য্য S_1 হইতে S_2-এ যে গতিতে অগ্রসর হয়, পৃথিবী (E) হইতে দেখিলে সেই গতি অপেক্ষাকৃত মন্থর মনে হইবে।

$$\text{আবার,}\quad Q_2 > V > Q_1$$

সুতরাং S_3 হইতে S_4-এ সূর্য্য পূর্ব্বের মত একই কৌণিক বেগে অগ্রসর হইলেও পৃথিবী হইতে মনে হইবে যেন সে অনেক দ্রুতবেগে ধাবিত হইতেছে। আর একটি লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে অপভূর নিকট সূর্য্যের গতি সর্বাপেক্ষা মন্থর, অপ তে ক্রমশঃ অনুভূর দিকে অগ্রসর হইবার সময় ইহার আপাতঃ গতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে; এবং পরে এই গতি আবার হ্রাস পাইতে থাকে। পর্য্যবেক্ষণলব্ধ তথ্য এবং বসন্ত, গ্রীষ্ম, শরৎ, শীত প্রভৃতি বিভিন্ন ঋতুর দীর্ঘতার তারতম্য হিপার্কাস উৎকেন্দ্রীয় বৃত্তের পরিকল্পনার সাহায্যে অতি চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেন।

ঋতু পরিবর্ত্তনের কারণ উদ্ঘাটন করিতে গিয়া হিপার্কাস যেমন উৎকেন্দ্রীয় বৃত্তের পরিকল্পনা উদ্ভাবন করিয়াছিলেন গ্রহদের খামখেয়ালী ও আপাত বিশৃঙ্খল গতি-রহস্যের

কিনারা করিতে গিয়া টলেমী সেইরূপ পরিবৃত্ত (epicycle) ও ডেফারেন্টের (deferent) ধারণা তাঁহার জ্যোতির্বীয় আলোচনায় প্রয়োগ করেন। টলেমীর ব্রহ্মাণ্ড পরিকল্পনায় এই পরিবৃত্ত ও ডেফারেন্ট নামক জ্যামিতিক কৌশলদ্বয় অতীব গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। প্রথমে এই কৌশল দুইটি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা দরকার। চন্দ্রের অসমান গতির একটি সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদানের উদ্দেশ্যে টলেমী প্রথম পরিবৃত্ত ও ডেফারেন্টের অবতারণা করেন। টলেমীর অনেক পূর্ব্বে হিপার্কাস চন্দ্রের অসমান গতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং ইহা বুঝাইবার জন্য সূর্য্যের ন্যায় চন্দ্রের ক্ষেত্রেও তিনি উৎকেন্দ্রীয় বৃত্তের সাহায্য গ্রহণ করেন, অর্থাৎ চন্দ্র যেই বৃত্তে পৃথিবীকে পরিক্রমণ করে সেই বৃত্তের কেন্দ্র হইতে সামান্য কিছু দূরে পৃথিবীর অবস্থিতি। টলেমী দেখাইলেন, হিপার্কাসের এই পরিকল্পনা অনুযায়ী চন্দ্রের অসমান গতির পুরাপুরি ব্যাখ্যা সম্ভবপর নহে। মনে করা যাক 'E' পৃথিবী এবং 'E'-র অনতিদূরে 'Ex'কে কেন্দ্র করিয়া M¹ P Q
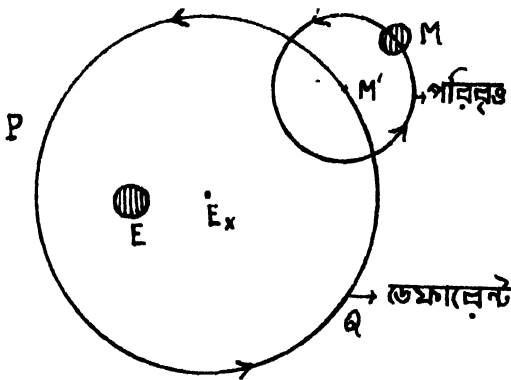
৩নং চিত্র

একটি উৎকেন্দ্রীয় বৃত্ত (৩নং চিত্র)। হিপার্কাস এই উৎকেন্দ্রীয় বৃত্তে চন্দ্রকে পরিক্রমণ করাইয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু টলেমী বলিলেন, এই M¹ P Q বৃত্তের উপর অবস্থিত M¹কে কেন্দ্র করিয়া আসল চন্দ্র M আর একটি পরিবৃত্তের উপর ঘুরিতেছে। এই পরিকল্পনায় চন্দ্রের গতি এইরূপ যে M যখন পরিবৃত্ত পথে সঞ্চরণ করিতেছে সেই পরিবৃত্তের কেন্দ্র M¹ বিন্দুটি সেই সঙ্গেই আবার উৎকেন্দ্রীয় বৃত্ত M¹ P Q-এর পথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। M¹ P Q বৃত্তের নামই ডেফারেন্ট। এখন অবশ্য আমরা জানি, চন্দ্র উপবৃত্ত পথে (ellipse) পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে; এই উপবৃত্তের কথা টলেমীর জানা না থাকায় পরিবৃত্ত, ডেফারেন্ট প্রভৃতির সমন্বয়ে নানা অবাস্তব জ্যামিতিক কৌশল তাঁহাকে প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল।

এইবার টলেমীর প্রস্তাবিত ব্রহ্মাণ্ড পরিকল্পনার কথা বলা যাক। অ্যালমাজেষ্টের নবম হইতে ত্রয়োদশ খণ্ডে গ্রহদের গতি ও সাধারণভাবে ভূকেন্দ্রিক পরিকল্পনার কথা বর্ণিত হইয়াছে। এই পরিকল্পনার জন্যই বিজ্ঞানের ইতিহাসে টলেমীর প্রসিদ্ধি এবং প্রাচীনকালে নিউটনের পূর্ব্বে সমগ্র জ্যোতির্বীয় তথ্য একটি সুপরিকল্পিত তত্ত্বের দ্বারা প্রকাশ করিবার ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রয়াস। পরবর্ত্তীকালে টলেমীর পরিকল্পনা ভুল প্রতিপন্ন হইয়াছে বলিয়া বিজ্ঞানের ইতিহাসে ইহার গুরুত্ব কোনও অংশে কম নহে। বিজ্ঞান প্রগতিশীল। তাহার ইতিহাসে বহু পর্য্যবেক্ষণ ও তথ্যের ভুল বাহির হইয়াছে, বহু মতবাদের উত্থান-পতন ঘটিয়াছে। তাহার অগ্রগতি এই সমস্ত ভুল ও নির্ভুল চেষ্টার সম্মিলিত ফল। এই চেষ্টার পশ্চাতে যে অসাধারণ প্রতিভা, চিন্তাশক্তি ও অধ্যবসায়ের প্রকাশ দেখা যায় তাহার মূল্যই শাশ্বত ও চিরন্তন।

যাহা হউক, হিপার্কাসের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া টলেমী সূর্য্যের পরিক্রমণ নির্দেশ করিতে উৎকেন্দ্রীয় বৃত্তের আশ্রয় গ্রহণ করেন। চন্দ্রের গতি সম্বন্ধে তাঁহার ব্যাখ্যা আগেই আলোচিত হইয়াছে। এইবার বাকি রহিল গ্রহদের গতির কথা। গ্রহদের এই গতির ব্যাখ্যা ব্যাপারেই তিনি সবচেয়ে বেশী অসুবিধায় পড়িয়াছিলেন। আপাত দৃষ্টিতে এই গতি নিতান্তই খাপছাড়া ও বিশৃঙ্খল বলিয়া বোধ হইবে। এই গতি যে শুধু অসমান তাহা নহে, কখনও কখনও এইরূপ মনে হয় যে, গ্রহরা পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে না গিয়া যেন ইহার ঠিক বিপরীত দিকে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। আবার কখনও মনে হইবে গ্রহরা যেন কিছুক্ষণের জন্য একেবারে নিশ্চল অবস্থায় রহিয়াছে। গ্রহদের এই ছন্নছাড়া গতি হেরাক্লিডেসের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল এবং বুধ ও শুক্রের বেলায় পরিবৃত্তের কল্পনা করিয়া তিনি ইহার কিরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। টলেমী পরিবৃত্তের সাহায্য গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু কোন গ্রহকে সূর্য্যের চারিদিকে ঘূর্ণ্যমান কল্পনা করেন নাই। তাঁহার পূর্ণ পরিকল্পনা চিত্রে দেখানো হইল (৪নং চিত্র)।

সূর্য্য (S) উৎকেন্দ্রীয় বৃত্তপথে পৃথিবীকে (E) সমবেগে পরিক্রমণ করে। ক্রান্তিবৃত্ত অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর দুইটি উৎকেন্দ্রীয় বৃত্তে (ডেফারেন্ট) যথাক্রমে কল্পিত শুক্র ও বুধ [চিত্রে শুধু শুক্রের (V) গতি দেখানো হইয়াছে] পরিক্রমণ করে; আসল শুক্র ও বুধ আবর্ত্তিত হয় এক একটি পরিবৃত্তের উপর—কল্পিত শুক্র বা বুধ এই বৃত্তের কেন্দ্র মাত্র। তারপর বুধ ও শুক্রের গতি এইরূপভাবে বিধিবদ্ধ যে, পরিবৃত্তে ইহাদের অবস্থান যাহাই হউক E বিন্দু, কল্পিত গ্রহ ও সূর্য্য সব সময়ে একই সরল রেখার (Ex C S) উপর থাকিবে। সূর্য্য অপেক্ষা অধিক দূরবর্ত্তী

৫নং চিত্র
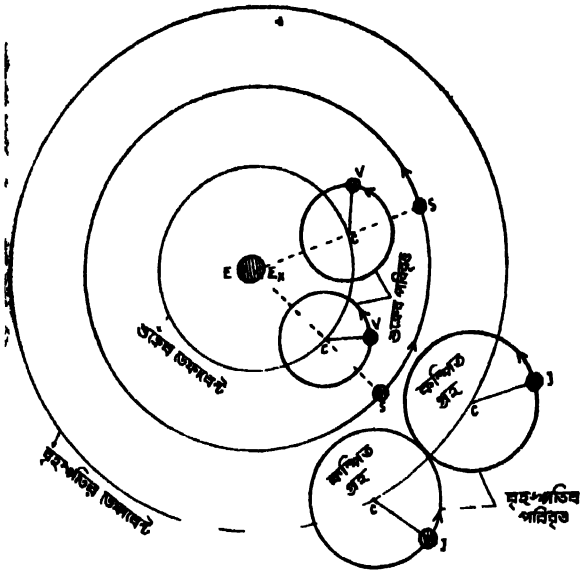
গ্রহদের গতি বৃহস্পতির দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝানো হইয়াছে বৃহস্পতিও একটি পরিবৃত্তের উপর আবর্ত্তিত হয় এবং এই পরিবৃত্তের কেন্দ্র অর্থাৎ কল্পিত বৃহস্পতি Eₓকে কেন্দ্র করিয়া একটি বৃহৎ বৃত্তের (ডেফারেণ্ট) পরিধি পথে পরিক্রমণ করে। এই কল্পিত বৃত্তপথে একবার ঘুরিয়া আসিতে বৃহস্পতির বার বৎসর সময় লাগে, কিন্তু পরিবৃত্ত পথে সম্পূর্ণরূপে একবার ঘুরিয়া আসিতে লাগে এক বৎসর। টলেমী বুধ ও শুক্র ছাড়া অন্যান্য গ্রহের ক্ষেত্রে পরিবৃত্তের মাপ এইরূপ কল্পনা করিয়াছিলেন যে, তাহাদের প্রত্যেকেরই ঠিক এক বৎসর লাগে স্ব স্ব পরিবৃত্ত একবার ঘুরিয়া আসিতে। ইহা বুঝাইতে গিয়া তিনি বলেন যে, গ্রহের আসল অবস্থান হইতে পরিবৃত্তের কেন্দ্র পর্য্যন্ত সরল রেখা টানিলে সেই সরল রেখা সব সময়েই পৃথিবী হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত অঙ্কিত সরল রেখার সহিত সমান্তরাল থাকিবে। সমগ্র পরিকল্পনাটি অতীব জটিল ও নানা দিক দিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে অসঙ্গত তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই পরিকল্পনার সাহায্যে টলেমী গ্রহদের আপাত গতির সন্তোষজনক মিল ঘটাইয়াছিলেন। তাঁহার এই সাফল্যের জন্য অন্যান্য নানা অসঙ্গতি সত্ত্বেও সমগ্র বিদ্বৎসমাজ ইহাকে অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কোপার্নিকাসের পূর্ব্বে ইহা অপেক্ষা উন্নততর মতবাদ আর কেহই প্রস্তাব করিতে সমর্থ হন নাই।

মধ্যযুগে ব্রহ্মাণ্ড পরিকল্পনা—দান্তের জ্যোতিষ

গ্রীক ও গ্রেকো-রোমক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পতন ঘটিলে সমগ্র ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনার উপরও সেই সঙ্গে যবনিকা নামিয়া আসে। আট শত কি নয় শত বৎসরের মধ্যে এই যবনিকার পর্দা আর অপসারিত হয় নাই। বিজ্ঞান-লক্ষ্মী তখন ধীরে ধীরে ইউরোপ-খণ্ড পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিম এশিয়ার শরণাপন্ন। প্রথমে নেষ্টোরীয় খ্রীষ্টান ও ইহুদীদের তৎপরতায় এবং পরে অষ্টম, নবম ও দশম শতাব্দীতে মুসলমান পণ্ডিতদের উৎসাহে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চ্চায় প্রাণবন্ত হইয়া উঠে। এই নেষ্টোরীয়, ইহুদী ও মুসলমান বিজ্ঞানীদের কল্যাণেই গ্রীক বিজ্ঞান ও অমূল্য গ্রীক গ্রন্থরাজি নিশ্চিত ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। অন্ধকার যুগের শেষভাগে ইউরোপে বিদ্যোৎসাহিতার পুনর্জন্ম ঘটিলে, উন্নততর জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চ্চার স্পৃহা জাগ্রত হইলে অগ্রসর মুসলমান দেশগুলির কাছেই ইউরোপ শিক্ষানবিশি করিয়াছিল। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলমান জ্যোতির্বিদ্‌দের কল্যাণে তাহারা নূতন করিয়া এরিষ্টটল, টলেমী প্রমুখ প্রাচীন গ্রীক জ্যোতির্বিদ্‌দের এবং আল্ জার্‌কালি, আল্ বিত্রুজি, আল্ বাত্তানি, নাসির-আল্ দিন তুসি প্রমুখ খ্যাতনামা মুসলমান জ্যোতির্বিদ্‌দের গবেষণা ও জ্যোতিষীয় মতবাদের কথা অবগত হয়। বলিতে গেলে জ্যোতিষ-শাস্ত্রে লাটিন ইউরোপের ইহাই প্রথম হাতে খড়ি।

যাহা হউক, একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে ব্রহ্মাণ্ড পরিকল্পনা সম্বন্ধে মুসলমান জ্যোতির্বিদেরা দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। একদল এরিষ্টটলীয় ব্রহ্মাণ্ড পরিকল্পনার সমর্থক, অপর দল টলেমীর সমর্থক। অবশ্য উভয় দলই যে ভূকেন্দ্রীয় ব্রহ্মাণ্ড পরিকল্পনায় আস্থাবান ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লাটিন ইউরোপেও জ্যোতিষ সম্বন্ধে এইরূপ বাদানুবাদের ঢেউ অনুভূত হয়। আল্ বিত্রুজি কর্ত্তৃক সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত এরিষ্টটলীয় জ্যোতিষ একদল পণ্ডিত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সন্তোষজনক বলিয়া প্রচার করিতে চেষ্টা করেন। এল্‌বার্টাস্ ম্যাগ্‌নাস্, সেণ্ট বোনাভেঞ্চুর, ইংরেজ রবার্ট প্রমুখ পণ্ডিতরা ছিলেন আল্ বিত্রুজিপন্থী, ভিন্‌সেণ্ট অব্ বোভে, বার্ণার্ড অব্ ভেরডুন, জন অব্ সিসিলি প্রমুখ আর এক দল পণ্ডিত ও জ্যোতির্বিদ 'অ্যাল্‌ম্যাজেষ্টে' প্রস্তাবিত জ্যোতিষীয় মতবাদের শ্রেষ্ঠত্ব সমর্থন করেন। গ্রোসেটেস্ট ও রজার বেকন আবার কোন দিকেই পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন না করিয়া দ্বিবিধ মতই সমর্থনযোগ্য বলিয়া রায় দিয়াছিলেন। আল্ বিত্রুজির জ্যোতিষের সমাদর লাভের প্রধান কারণ প্রাচীন কালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী হিসাবে এরিষ্টটলের জনপ্রিয়তা। কিন্তু বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও সঙ্গতির দিক হইতে বিচার করিলে নানা দোষত্রুটি সত্ত্বেও টলেমীর ব্রহ্মাণ্ড পরিকল্পনা যে অনেক বেশী উন্নত ধরণের তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এজন্য ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং নিঃসংশয়ে চতুর্দ্দশ

শতাব্দী হইতে টলেমীর জ্যোতিষীয় মতবাদের সমর্থকেরাই উত্তরোত্তর সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।

এইরূপ মতভেদ ও মতবাদ বিশেষের বিরুদ্ধ বা অনুকূল সমালোচনা ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীর জ্যোতিষীয় তৎপরতার এক সুলক্ষণ হিসাবে বিবেচিত হইলেও ইহার দ্বারা কোন নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর অবতারণা সম্ভবপর হয় নাই। ইহা অনেকটা নিষ্ফল পণ্ডিতীয় তর্কেরই শামিল ছিল। টলেমী সমগ্র জ্যোতিষকে যে পর্য্যায়ে উন্নীত করিয়াছিলেন, মুসলমান জ্যোতির্বিদেরা নূতন পর্য্যবেক্ষণবলে মধ্যে মধ্যে যেরূপ নূতন তথ্য আবিষ্কার ও সন্নিবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, লাটিন ইউরোপে তাহার কিছুই দৃষ্ট হয় না। কোপার্নিকাসের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমগ্র মধ্যযুগে জ্যোতিষে ইউরোপীয়দের অবদান একরূপ নাই বলিলেই চলে। বরং খ্রীষ্টধর্ম্মের সহিত সংহতি রক্ষার প্রয়াসে জ্যোতিষীয় মতবাদে ও ব্রহ্মাণ্ড পরিকল্পনায় নানা উদ্ভট ধারণা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। মধ্যযুগে পৃথিবী, গ্রহ, নক্ষত্র, বিশ্বলোক তাহাদের আবর্ত্তন, গুণাগুণ ও ব্যবহার সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা সর্বসাধারণ্যে বলবৎ ছিল তাহার নিখুঁত বর্ণনা আমরা পাই ইটালীর অমর কবি দান্তের *Divina Commedia*-য়। দান্তের কবি প্রতিভা বিশ্ববিশ্রুত, এই প্রতিভার সহিত মিলিত হইয়াছিল তাঁহার ব্যাপক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। তাঁহার জ্যোতিষীয় মতবাদ এরিষ্টটলপন্থী এবং ইহা প্রধানতঃ মুসলমান জ্যোতির্বিদ আল্-ফারঘানি হইতে গৃহীত। মধ্যযুগে ইউরোপে সাধারণভাবে প্রচলিত জ্যোতিষীয় ধারণার এইরূপ সুস্পষ্ট চিত্র আর কেহ অঙ্কিত করিয়া যায় নাই।

দান্তের পরিকল্পনায় পৃথিবী একটি গোলক; ইহা ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে অবস্থিত। উত্তর গোলার্দ্ধের কতকটা স্থান জুড়িয়া ভূখণ্ড, অবশিষ্ট সমস্ত অংশই সমুদ্রাবৃত। এই ভূখণ্ড পশ্চিমে হারকিউলিসের স্তম্ভ হইতে পূর্ব্বে গঙ্গানদী পর্য্যন্ত এবং উত্তরে মেরুবৃত্ত হইতে দক্ষিণে বিষুবরেখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পবিত্র নগর জেরুজালেম এই ভূখণ্ডের কেন্দ্রদেশে অবস্থিত। বিষুবরেখার আরও দক্ষিণে ভূখণ্ডের বিস্তৃতি ও লোক-বসতির নানা গল্প পর্য্যটকদের মুখে দান্তে অবশ্য অনেক শুনিয়াছিলেন, কিন্তু এইসব গল্প (?) তিনি বিশ্বাস করিতেন না। জেরুজালেমের ঠিক বিপরীত দিকে প্রতিপাদ স্থানে (antipode) ভূপৃষ্ঠের বিশাল সমুদ্রবক্ষ ভেদ করিয়া একটি শঙ্কু আকৃতির পাহাড় বর্ত্তমান। এই পাহাড় প্রেতলোকের নিবাস (purgatory)। জেরুজালেমের তলদেশে মৃত্তিকা-গহ্বরে ভূকেন্দ্র বরাবর নরকে নামিয়া গিয়াছে; লুসিফার এই নরক-রাজ্যের অধীশ্বর।

পৃথিবীর সহিত এককেন্দ্রীয় দশটি গোলকে ব্রহ্মাণ্ড বিভক্ত। পৃথিবী হইতে দূরত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই গোলকগুলির স্বর্গীয় গুণাগুণও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া দশম গোলকে গিয়া চরমে পৌঁছে। ইহাই এম্পিরিয়ান বা গোলকধাম; স্বয়ং ঈশ্বরের আবাস। পৃথিবীর অব্যবহিত পরের গোলকে চন্দ্রের স্থিতি, তারপরে বুধগ্রহের, তারপরে শুক্র, সূর্য্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিগ্রহের। অষ্টম গোলকে ধ্রুব তারকারা বিরাজমান। নবম বা স্ফটিক গোলকটি (crystalline sphere) অতি দ্রুতবেগে আবর্তিত হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা কোন গ্রহের ধারক বা বাহক নহে। এই নবম গোলক হইতেই সমগ্র বিশ্বের গতি উৎসারিত হইয়া থাকে বলিয়া ইহার নাম প্রাথমিক চালক বা 'primum mobile'। এই গতি স্তরে স্তরে সঞ্চারিত হইয়া অন্যান্য গোলকদের ঘুরাইয়া থাকে এবং সেই সঙ্গে গ্রহদেরও ঘুরায়। কিভাবে এই গতি সঞ্চারিত হইয়া থাকে তাহা ব্যাখ্যাকল্পে দান্তে নানা উদ্ভট ও অলৌকিক দৈবশক্তির অধিকারী পরী, দেবদূত প্রভৃতিদের অবতারণা করিয়াছেন।

দান্তের পরিকল্পনায় নানা গোলকে বিভক্ত গোটা ব্রহ্মাণ্ডটাই পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া চব্বিশ ঘণ্টায় একবার পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে আবর্ত্তিত হইতেছে। গোলকের সহিত সূর্য্য সংলগ্ন তাহার গতি ছাড়া সূর্য্যের নিজস্ব আর একটি গতি আছে। এই গতির জন্যই ইহা পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে রাশিচক্র বরাবর বৎসরে একবার ঘুরিয়া আসে। সূর্য্যের এই আহ্নিক গতি ও বাৎসরিক গতি বুঝাইবার জন্য দান্তে এক উপমা দিয়া বলেন যে, এক ব্যক্তি সিঁড়ি বাহিয়া নীচ হইতে উপরে উঠিবার সময় সিঁড়িটিও যদি সেই সঙ্গে উপর হইতে নীচে ক্রমাগত নামিতে থাকে তাহা হইলে ব্যক্তিটির যেরূপ দ্বিবিধ গতি হইবে সূর্য্যেরও সেইরূপ দ্বিবিধ গতি হইয়া থাকে।

এরিষ্টটল-নির্ভর দান্তের জ্যোতিষ হিপার্কাস্-টলেমী যুগের জ্যোতিষ অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। দান্তে অবশ্য জ্যোতির্বিদ নহেন এই অর্থে যে, জ্যোতিষ সম্বন্ধে অনেক খবর রাখিলেও জ্যোতিষচর্চ্চা তাঁহার জ্ঞানচর্চ্চার একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। জ্যোতিষ যাঁহাদের জ্ঞানচর্চ্চার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল তাঁহারা টলেমীর মতবাদে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং 'অ্যালমাজেষ্ট'ই ছিল তাঁহাদের কাছে জ্যোতির্বিদ্যার বাইবেল-স্বরূপ। তথাপি *Divina Commedia*-য় বর্ণিত জ্যোতিষের আলোচনা আমরা এইজন্য করিলাম যে, জ্যোতিষ সম্বন্ধে খাঁটি মধ্যযুগীয় মনোভাব দান্তে যেরূপ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, আর কেহ এরূপ সমর্থ হয় নাই। ধর্ম্মতত্ত্ব, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, মানুষের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ, তাহার নানা কুসংস্কার ইত্যাদি সবকিছুর সংমিশ্রণে মধ্যযুগীয় জ্যোতিষ কিরূপ আকৃতি প্রাপ্ত হইয়া-

ছিল অতীব দক্ষতার সহিত কবির অতুলনীয় লেখনীতে তাহা চিত্রিত হইয়াছে।

প্রাচীন জ্যোতিষে সন্দেহ—নূতন জ্যোতির্ষীয় ভাবধারার সূচনা

সুতরাং প্রথমে এরিষ্টটলীয় ও পরে টলেমীর জ্যোতির্ষীয় মতবাদকে আয়ত্ত ও অভ্রান্ত মনে করিয়াই মধ্যযুগের ইউরোপীয় জ্যোতিষীরা সন্তুষ্ট ছিলেন। এক আলফনসো ও তাঁহার কতিপয় সহকর্মীদের সামান্য প্রচেষ্টা ছাড়া ইউরোপের আর কোথাও জ্যোতিষে নূতন পর্যবেক্ষণের কোনরূপ চেষ্টা দেখা যায় না। নূতন পর্য্যবেক্ষণের, সুতরাং নূতন তথ্যের অভাবে, নূতন জ্যোতির্ষীয় মতবাদের অভ্যুত্থান সম্ভবপর নহে। তারপর ক্ষমতাবান খ্রীষ্টীয় দার্শনিকেরা ধর্ম্মতত্ত্বের সহিত এরিষ্টটলীয় প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও ভূকেন্দ্রীয় জ্যোতিষিক মতবাদের এমন সুশৃঙ্খল সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছিলেন যে, সরাসরি ধর্ম্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধতার আশঙ্কায় প্রাচীন জ্যোতির্ষীয় মতবাদের সহসা কোন পরিবর্ত্তনেরও আশা ছিল না।

তথাপি পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে ইউরোপে জ্যোতির্ষীয় গবেষণার ক্ষেত্রে এক নূতন উৎসাহ ও উদ্দীপনার শুভ লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে। ধীরে ধীরে রেনেশাঁর বৈপ্লবিক চিন্তাধারার প্রভাবে জ্যোতির্বিদগণ কেবলমাত্র তত্ত্বীয় আলোচনার পরিবর্ত্তে পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের প্রতি অধিকতর মনোযোগী হন। এই মনোযোগ যত বৃদ্ধি পাইল, পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা অধিকতর নির্ভুল তথ্যসমূহ যত সংগৃহীত হইতে থাকিল, টলেমীর জ্যোতিষের নানা অসঙ্গতি ক্রমশঃ ততই প্রকট হইয়া পড়িল, প্রাচীন জ্যোতিষের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে সন্দেহ ততই তীব্রতর হইতে লাগিল। নিকোলাস অব কুসা (১৪০১-১৪৬৪) তাঁহার সময়ের জ্যোতির্বিদ্ ও দার্শনিকদের 'পাণ্ডিত্যপূর্ণ অজ্ঞানতা' সম্বন্ধে এক কঠোর সমালোচনা প্রসঙ্গে এক জায়গায় বলেন যে, ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপ্তি অসীম, সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। পৃথিবীর আহ্নিক গতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। 'কোন নিশ্চল বস্তুর সহিত তুলনা সম্ভবপর হইলে তবেই গতির অস্তিত্ব প্রতীয়মান হয়; এই কারণেই পৃথিবীর গতি আমরা অনুভব করি না, কিন্তু বাস্তবিকই পৃথিবীর গতি আছে।'

জর্জ পুরবাকের (১৪২৩-১৪৬১) নেতৃত্বে পঞ্চদশ শতাব্দীতে জার্মানীতে পর্য্যবেক্ষণমূলক জ্যোতিষচর্চ্চা বিশেষ উৎসাহ লাভ করে। পুরবাক যৌবনে নিকোলাস্ অব কুসার সংস্পর্শে আসেন এবং ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র সাতাশ বৎসর বয়সে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি আলফনসোর জ্যোতির্ষীয় তালিকা ও অ্যালমাজেষ্টের নানা ভুল আবিষ্কার করেন এবং অ্যালমাজেষ্টের এক নূতন ও সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই গ্রন্থের তিনি নামকরণ করেন '*Epitome of Astronomy*'। প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দীপনা সত্ত্বেও এই কার্য্যে তিনি আশানুরূপ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। প্রথমতঃ মূল গ্রীক হইতে অনূদিত অ্যালমাজেষ্টের কোন নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য সংস্করণ না পাওয়ায় তাঁহাকে এই গ্রন্থের বহু ত্রুটিপূর্ণ ও বিকৃত সিরিয়াক অথবা আরবী তর্জ্জমার উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ এই কাজ সম্পূর্ণ করিবার পূর্ব্বেই ১৪৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আকস্মিকভাবে মাত্র আটত্রিশ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

পুরবাকের জ্যোতির্ষীয় তালিকা সংস্কারের মহাসংকল্প বৃথা যায় নাই। তাঁহার সুযোগ্য ছাত্র ও সহকর্মী জন মূলার বা রেজিওমণ্টানাস্ (১৪৩৬-১৪৭৬) গুরুদেবের আরব্ধ কার্য্য সম্পূর্ণ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পুরবাকের খ্যাতি ও প্রতিভার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট জ্যোতিষ ও গণিত শিক্ষা ও গবেষণা করিবার জন্য রেজিওমণ্টানাস ষোল বৎসর বয়সে ভিয়েনায় আসেন এবং অচিরে পুরবাকের প্রিয় শিষ্যরূপে পরিগণিত হন। গ্রীক ভাষায় লিখিত মূল অ্যালমাজেষ্টের প্রতিলিপির অভাবে পুরবাকের যে অসুবিধা হইয়াছিল কনষ্টান্টিনোপোল পতনে (১৪৫৩) বহু প্রাচীন গ্রীক গ্রন্থের মধ্যে অ্যালমাজেষ্টের কয়েকখানি প্রতিলিপি উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া ইটালীতে আনীত হইলে এই অসুবিধা দূর করিবার এক সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইল। পুরবাক বাঁচিয়া থাকিতেই অ্যালমাজেষ্টের গ্রীক প্রতিলিপির সংবাদ ভিয়েনায় পৌঁছিয়াছিল, এবং রেজিওমণ্টানাস্‌কে সঙ্গে লইয়া তিনি ইটালীতে গমন করিবার সমস্ত আয়োজনও সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে পুরবাকের ভাগ্যে ইহা আর ঘটিয়া উঠে নাই। রেজিওমণ্টানাস্ একাই ইটালীতে গিয়া এই সব প্রাচীন গ্রীক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ অধ্যয়নে দীর্ঘ সাত বৎসর অতিবাহিত করেন। এইখানে তিনি পুরবাকের *Epitome of Astronomy* সম্পূর্ণ করেন এবং নিজেও জ্যোতিষ ও গণিত সংক্রান্ত অনেক গবেষণা করেন। তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত ও সংশোধিত পুরবাকের জ্যোতির্ষীয় তালিকা প্রকাশিত হইলে জ্যোতির্ষীয় গবেষণার ইহা এক অতি মূল্যবান গ্রন্থ হিসাবে সর্ব্বত্র অভিনন্দিত হয়। এই গ্রন্থই ভাস্কো দা গামা, ভেসপুচি ও কলম্বাসের সমুদ্রপথে ভৌগোলিক অভিযানসমূহ অনুপ্রাণিত করিয়াছিল।

রেজিওমণ্টানাস ইটালী পরিত্যাগ করেন ১৪৬৮ খ্রীঃ অব্দে। ভিয়েনায় ও হাঙ্গেরীতে কিছুকাল অবস্থানের পর তিনি নুর্নব্যর্গে জ্যোতিষীয় গবেষণার জন্য আমন্ত্রিত হন। এইখানে বার্ণার্ড ওয়াল্‌টার নামে এক বিদ্যোৎসাহী ধনী ব্যবসায়ী একটি মানমন্দির স্থাপনের জন্য রেজিওমণ্টানাসকে অর্থসাহায্য করেন। নুর্নবার্গের সুদক্ষ কারিগরদের সাহায্যে তিনি এই মানমন্দিরটি তৈয়ারী করেন এবং নিখুঁত ও উন্নত ধরণের জ্যোতিষীয় যন্ত্রপাতির দ্বারা ইহাকে সুসজ্জিত করেন। জ্যোতিষীয় গবেষণার জন্য এইরূপ উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি ইহার পূর্ব্বে ইউরোপে আর কোথাও ছিল না। অবশ্য নাসিরুদ্দিন ও উলুগ্‌বেগের যন্ত্রপাতির তুলনায় রেজিওমণ্টানাসের যন্ত্রপাতি অনেক নিকৃষ্ট ছিল। এই মানমন্দির হইতে রেজিওমণ্টানাস ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ—বার্ণার্ড ওয়াল্‌টারও একজন সহকর্ম্মী ছিলেন—বহু পর্যাবেক্ষণ লিপিবদ্ধ করেন; ইহাদের মধ্যে ধূমকেতু সংক্রান্ত পর্য্যবেক্ষণগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

স্বকীয়তার দিক হইতে বিচার করিতে গেলে নিকোলাস্‌ অব কুসা, পুর্‌বাক বা রেজিওমণ্টানাস কাহারও গবেষণা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নহে। কিন্তু নিকোলাস পৃথিবীর গতির কথা প্রচার করিয়া, পুর্‌বাক ও রেজিওমণ্টানাস আ্যাল্‌ফন্‌সীয় তালিকার ও আরবী হইতে অনূদিত অ্যালমাজেষ্টের নানা দোষত্রুটির প্রতি অঙ্গুলি প্রদর্শন করিয়া প্রাচীন জ্যোতিষীয় মতবাদে সন্দেহ উদ্রেক করিলেন এবং ইহার পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনার প্রয়োজনীয়তার প্রতি জ্যোতির্বিদ্‌দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। তারপর এরিষ্টটলীয় জ্যোতিষ ও টলেমীর জ্যোতিষের পার্থক্যও ইউরোপীয় গোঁড়া পণ্ডিতদের কম বিচলিত করিল না। তাঁহারা এত কাল এরিষ্টটলের মতবাদ সর্ব্বজনগ্রাহ্য ও অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছিলেন। এখন তাহারা দেখিলেন, আর একজন প্রতিভাবান গ্রীক জ্যোতির্বিদ্‌ ক্লডিয়াস্‌ টলেমী এরিষ্টটল অপেক্ষা অনেক উন্নত ধরণের জ্যোতিষীয় মতবাদ প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই সব আবিষ্কার ও সন্দেহের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ রেনেশাঁর যুগে কোন কোন প্রগতিবাদী জ্যোতির্বিদের এইরূপ ধারণা জন্মিল যে, এতকাল নির্বিবাদে অনুসৃত গ্রীক জ্যোতিষীয় মতবাদের মধ্যে অনেক গলদ আছে এবং এই সব গলদের মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত জ্যোতিষশাস্ত্রের উন্নতির ও অগ্রগতির কোন আশা নাই। কোপার্নিকাস এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই জ্যোতিষীয় গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। প্রাচীন জ্যোতিষের অসম্পূর্ণতা ও অসঙ্গতিতে ধ্রুব বিশ্বাসের বলেই তিনি তাঁহার যুগান্তকারী সূর্যকেন্দ্রীয় জ্যোতিষীয় মতবাদ উপস্থাপিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ধ্যানের ভিতরে যে ধ্বনি হৃদয়ে এনে দেয় আলোড়ন

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

মনের শিখরে কল্পনা-মেঘ রঙে রঙে ছেয়ে রয়,
তারা কি গগনে করিতেছে চলাফেরা?
রজনীর শেষে পূষণের সাথে আনে কি অভ্যুদয়?
অস্তাচলের তিমিরপ্রান্তে কোথায় লুকাবে এরা!
নদীর স্রোতের মত যে আবেগ ছুটেছে নিরন্তর
অন্তর হ'তে নিখিল অন্তরালে,
সেই কি পাষাণ-গর্ভে রচিছে জীবনের নির্ঝর
আসে কি বাদল-অভিসারে নীল অসীম চক্রবালে?
চিরসুন্দর মধুমাসে শ্যাম বনানীর কলরবে
প্রেমের মতন প্রাণধারা বয়ে যায়।
সেই ধারা হ'তে পথে-প্রান্তরে কত না কুসুম হবে,
তারা কি নীরবে পূজা-সৌরভে ফুটিবে প্রভুর পায়?

ধ্যানের ভিতরে যে ধ্বনি হৃদয়ে এনে দেয় আলোড়ন
চিত্তভূমিতে চিৎপ্রকর্ষ লয়ে
সেই কি নিখিল ভুবনের মাঝে করিছে প্রবর্ত্তন
বিবর্ত্তনের নব নব খেলা জ্ঞানের অতীত হয়ে!
মরুধরণীর মৃগতৃষ্ণিকা মৃত্যুরে আনে ডেকে
মায়াজালে ঢাকা তপ্ত বালুর 'পরে,
বেদনাবিধুর বিদায়-মিনতি সে কি যায় পথে রেখে,
সে পথে কভু কি দূর গগনের করুণায় মেঘ ঝরে!

প্রকৃতিমায়ার সংযোগে যারে ভেবেছি বদ্ধমন
চিদাভাসে তার প্রতিবিম্বের মাঝে—
কার আবরণ পড়ে অহরহ?—আলোকের স্পন্দন
তানমাত্রায় করে স্বরাঘাত আর সঙ্গীত বাজে।
শুধাই তোমারে অরূপের চির উৎসবে রূপবাণী
নামে নামে নিতি ওঠে কি ফুটিয়া মনে?
সময়ের মহাস্রোত-মাঝে কিগো অসীমের গানখানি
চেতনায় ঢেউ তুলে দেয় দোল স্বপনে ও জাগরণে?

সবুজ-সন্ধ্যা

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

১৭

সাঁওতাল পল্লীর জোড়া মহুয়াতলাটা আজকাল প্রায় সময়েই খালি পড়িয়া থাকে।

কোন কোন দিন উতুম, মিতান বা আর কেউ আসিয়া বসে, আড্ডা তেমন জমে না, পুরনো অভ্যাসের বশেই যেন আসিয়া বসে। সকাল বিকাল এক দঙ্গল ছোট বড় সাঁওতাল মেয়ের হাসিয়া, গান গাহিয়া নদীতে জল আনিতে যাওয়া আর চোখে পড়ে না।

পল্লীতে দল বাঁধিবার মত যথেষ্ট লোক নাই, দু'চার জন যাহারা আছে, তাহারা দিনের মধ্যে এক ফাঁকে জল লইয়া আসে।

এ কয় মাসে এক এক করিয়া অনেকেই পল্লী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। পাঁচ-দশ ক্রোশ-মধ্যে যাহাদের আত্মীয়-কুটুম্ব আছে তাহারা সেই দিকে চলিয়া গিয়াছে, যাহাদের তাহা নাই তাহাদের কেহ পশ্চিমের মারাং বুরোর (বড় পাহাড়ের) গভীরতর বনে গিয়া ঘর বাঁধিয়াছে, কেহ কাতরাসের কয়লাখাদে চলিয়া গিয়াছে। মারাংবির (বড় বন) শেষ হইতে চলিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বড় বনের সাঁওতাল-পল্লীও যেন শেষ হইতে চলিয়াছে।

সবে ভোর হইয়াছে, মিতান আসিয়া লালধনকে ডাকে—লালধন জাগিয়াই ছিল, বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়। মিতান বলে মাঝিল মাঝি পশ্চিমে চলে যাচ্ছে, তোর পাওনাকড়ি ওর কাছে কিছু আছে নাকি?

লালধন বলে, 'না খুড়ো পাওনাকড়ি কিছু নাই।'

মিতান গম্ভীর হইয়া বলে, 'না গিয়েই বা করে কি? ওর অনেকগুলো কাচ্চাবাচ্চা, এখানে আগের মত শিকার মেলে না, কি খেয়ে বাঁচবে? যাচ্ছে পশ্চিমের বড় পাহাড়ে। আমিও আর বেশী দিন থাকতে পারব না বেটা, আমিও একদিন চলে যাব।

লালধনের মনটা হঠাৎ ভাঙিয়া পড়ে, সুন্দর উজ্জ্বল প্রভাতটা তাহার চোখে ক্রমে কালো হইয়া উঠে।

মিতান আর লালধন মাঝিল মাঝির ঘরের সামনে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইতিমধ্যে পল্লীতে আরও যে দু'চার জন আছে সকলেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

মাঝিল যাইবার জন্য প্রস্তুত, আয়োজনও সম্পূর্ণ। মাঝিলের কাঁধে একখানা বাঁক, তাহার একদিকে একজোড়া খরগোস-ধরা জাল অন্যদিকে ঝুড়ির মধ্যে কয়েকটা হাঁড়িকুড়ি। মাঝিলের পরিবারের মাথায় কাঁথা কাপড়ের একটা বোঁচকা, কোলে দুই বছরের শিশুকন্যা, দশ বছরের ছেলেটার হাতে খান দুই টাঙ্গী ও তীর ধনুক, আট বছরের মেয়েটার হাতে বাঁশের খাঁচায় একটা টিয়াপাখী। উপস্থিত সকলের কাছে মাঝিল মাঝির পরিবার বিদায় নেয়, মাঝিল বন্ধু মিতানের হাত ধরিয়া বলে, 'মিতা, বাপ-দাদার ভিটে ছেড়ে যেতে আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে, কিন্তু এখানে থাকলে কাচ্চাবাচ্চাদের বাঁচাতে পারব না, না খেয়ে মরে যাবে। আমার কথা শোন্, এখান থেকে সবাই পালিয়ে যা, বড় বনের সাঁওতাল-পল্লী আর টিকবে না।'

মিতান বলে, 'বুঝতে সবই পারছি মিত', পালাতে হবেই, আজ তুই যাচ্ছিস, কাল হয়ত আমি যাব—এই পল্লীতে কেউ থাকতে পারবে না।'

মাঝিলের চোখ দুটি বারে বারে সজল হইয়া উঠে। কোলের মেয়েটা অকারণে কাঁদিতে থাকে।

অবশেষে মাঝিল মাঝি পশ্চিমমুখো মারাং বুরোর দিকে রওনা হয়।

বাঁক কাঁধে আগে আগে চলে মাঝিল, তাহার পিছনে চলে মাঝিলের স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে দুটি, সবার পিছনে চলে লেজকাটা কালো রঙের শীর্ণ কুকুরটা। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহারা অরণ্যপথের বাঁকে অদৃশ্য হইয়া যায়।

লালধন ধীরে ধীরে ঘরে ফিরিয়া আসে, মনটা তাহার মোটেই ভাল নয়।

আঙিনায় আসিয়া সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। কলরব-মুখর পল্লীর অতীত ছবি, কত পূর্ণিমা রাতের রাত্রিব্যাপী নাচগান উৎসব, কত জন্ম, কত বিবাহ একে একে তাহার মনে পড়ে। আর মনে পড়ে তাহার বাপের কথা—তাহার উঠা, বসা, চলা—লালধন যেন স্বপ্ন দেখে। হঠাৎ কে যেন তাহার হাত ধরিয়া টানে, লালধন চমকিয়া উঠে। ফুলি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসে, খুব কাছে সরিয়া আসিয়া, হাত দুটি জড়াইয়া ধরিয়া দাঁড়ায়। লালধন কোন কথা কয় না, নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকে, ফুলি আরও কাছে সরিয়া আসে, আস্তে মাথাটি লালধনের কাঁধের উপর রাখে। দুই জন দুই জনের হৃৎপিণ্ডের দ্রুত স্পন্দন অনুভব করে।

খানিক পরে ফুলি আস্তে আস্তে বলে, 'একটা কথা শুনবি?'

লালধন জবাব দেয়, 'কি বলবি বল।'

ফুলি বলে, 'আমার এখানে আর একটুও থাকতে ইচ্ছে করে না।'

লালধন আশ্চর্য্য হইয়া ফুলির মুখের দিকে তাকায়, প্রশ্ন করে, 'এখানে আর থাকতে ইচ্ছে করে না?'

—না একটুও না।

—কেন বল তো?

—সবাই চলে যাচ্ছে, পল্লী যে খালি হয়ে গেল, এখানে আমি থাকতে পারব না।

—তোর বাপ রয়েছে, আমি রয়েছি, ঝকরু মাঝি রয়েছে—তবু থাকতে পারবি নে?

—ঝকরু মাঝির বৌ বলেছে কাল-পরশু ওরাও চলে যাবে।

শুনিয়া লালধন সত্যই চিন্তিত হইয়া ওঠে, এই পল্লী, এই ঘর ছাড়িয়া যাইবার কথায় সে গুরুতর ব্যথা বোধ করে।

ফুলিকে বিবাহ করিয়া এই ঘরে সংসার পাতিবার কত মধুর কল্পনা সে করিয়াছে, আজ কল্পনা সফল হইবার প্রাক্কালে কেমন করিয়া এ ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে লালধন?

ফুলি বলে, 'চল, এখান থেকে চলে যাই।'

লালধন অভিভূতের মত জবাব দেয়, 'আমি যে যাবার কথা ভাবতেও পারি না ফুলি। ওকথা ভাবতে গেলে কে যেন আমার মনটাকে ভয় দেখায়; পা দুটোকে অচল করে দেয়।'

ফুলি বলে, 'কেউ বুঝি তোকে তুক করেছে।'

লালধন বলে, 'হয়তো তাই!' ফুলি ঘুরিয়া লালধনের বুকের কাছে দাঁড়ায়, দুটি বাহু দিয়া তাহার গলা নিবিড়ভাবে জড়াইয়া ধরে, বলে—আমি তোকে টেনে নিয়ে যাব, ওসব তুকতাক আমার কাছে খাটবে না। হঠাৎ লালধন যেন বল পায়, ফুলিকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া আগ্রহের সঙ্গে বলে, তা তুই পারবি ফুলি।

ফুলি বলে, 'পারব, নিশ্চয় পারব।' লালধন ফুলির মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে, ফুলি হাসে। লালধনের সব সমস্যার যেন সমাধান হইয়া যায়—সে ফুলির মুখে চুমো খায়, বারে বারে চুমো খায়।

১৮

জ্যৈষ্ঠ মাস আসিয়া পড়ে, অরণ্যলোকের রূপ একেবারে বদলাইয়া যায়। মহুয়ার ফুল ঝরিয়া ফল বাহির হয়, পলাশের ফুল শুকাইয়া হাওয়ায় উড়িয়া যায়, কচি পাতার হালকা সবুজ রং গাঢ় সবুজে পরিণত হয়। মাঠের ঘাস মরিয়া কাঁকর আর বালু বাহির হইয়া পড়ে—এক অদৃশ্য চিত্রকর যেন বসন্তের সূক্ষ্ম সুন্দর কারুকার্য্যকে ঢাকিয়া একটা রুক্ষ মেটে রঙের পোঁচ টানিয়া দেয়।

ভোরের আবছায়া অন্ধকারে পাখীর ডাকে বন মুখর হইয়া উঠে। ঝির ঝির করিয়া একটা ঠাণ্ডা বাতাস বয়, গাছের পাতা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে, রাত্রে একটা কনোদ ফুলের মিঠা গন্ধ ভাসিয়া আসে। কেবল পাখী কেন, সকালের এই স্বল্প স্নিগ্ধ প্রহরটুকু পশুরাও উপভোগ করে।

বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে গরম বাড়িতে থাকে এবং একটা গরম বাতাস উঠে—বনের মধ্য দিয়া সারাদিন হু-হু করিয়া বহিয়া চলে। নদী-নালার জল শুকাইয়া যায়, বালু আগুনের মত তাতিয়া উঠে, পশু-পক্ষী দূরে পলাইয়া যায়।

দু'চার মাইলের মধ্যে, কোন নদীর বাঁকে পাথরের কোলে হয় তো খানিকটা জল চিক চিক করে। সে জল ঝরণার জল, পাথরের তলা দিয়া আসিয়া ডোবাটিকে পূর্ণ করিয়া রাখে, জ্যৈষ্ঠের রোদও তাহাকে শুকাইতে পারে না, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেখানে পিপাসিত প্রাণীর আনাগোনা চলে। ভোরবেলা সাঁওতালী মেয়ে কলসী লইয়া উপস্থিত হয়, পাতার ঠোঙা বানাইয়া কলসীতে জল ভরে, ডুবাইয়া জল ভরিবার মত প্রাচুর্য সেখানে নাই।

দুপুরে ক্লান্ত ঘুঘু আর বুলবুলি আসি[য়া] [পা]থরের ছায়ায় বসে, অসহ্য উত্তাপে ছোট ঠোঁট দুটি ফাঁক করিয়া হাঁপায়, খানিক পরে ঠাণ্ডা জলে ঠোঁট ডুবাইয়া গলা ফুলাইয়া বারে বারে জল খায়। বিকালের দিকে রোদের ঝাঁঝ কমিয়া আসিলে, ময়ূর তিতির আর বনমুরগী ডাকাডাকি করিয়া সপরিবারে জল খাইতে আসে।

আর খানিক পরে নদীর বুক জুড়িয়া যখন ছায়া পড়ে, তখন কদাকার হায়না পাহাড়ের নিভৃত গহ্বর হইতে বাহির হইয়া জলের ধারে আসে, সামনের বড় পা দু'খানার উপর লম্বা ঘাড়টা উঁচু করিয়া একবার চারিদিকে তাকাইয়া দেখে, তার পরে জল খাইতে সুরু করে। এমন সময় নদীর ওপারে ঝুমুর ঝুমুর আওয়াজ করিয়া বনপথ ধরিয়া ভালুক চলিয়া আসে, হায়না মুখ তুলিয়া চায়। একটু পরে নাচিয়া কুঁদিয়া সে জলের ধারে আসিয়া পড়ে, হায়না নিঃশব্দে গা ঢাকা দেয়।

সন্ধ্যা যখন আরো ঘনাইয়া আসে, বাতাস একেবারে থামিয়া যায়, পাখী আর ডাকে না তখন অতি সন্তর্পণে কান খাড়া করিয়া বার বার বাতাসে ঘ্রাণ লইয়া নদীতে নামে হরিণের পাল। বালুর উপরে তীক্ষ্ণ ক্ষুরের জোড়া জোড়া দাগ ফেলিয়া তাহারা আগাইয়া আসে, ভিড় করিয়া জল খায়, আবার অতি সাবধানে ওপারের জঙ্গলে ফিরিয়া যায়। তার পরে হঠাৎ যেন সন্ধ্যার নিস্তব্ধতা আরও গভীর হয়, অরণ্য যেন স্থির হইয়া দাঁড়ায়, বনপথ ধরিয়া একটি বিরাট বপু ধীরে ধীরে চলিয়া আসে, সে চলায় এতটুকু চাঞ্চল্য নাই এতটুকু শব্দ নাই। আবছায়া অন্ধকারেও হলুদ জমিনের উপর তাহার দেহের কালো ডোরাগুলি পরিষ্কার দেখা যায়। সম্রাটের মত বিপুল গাম্ভীর্যভরে ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া সে জলের ধারে আসে, প্রকাণ্ড মাথাটা হেঁট করিয়া জল খায়—আওয়াজ হয় চক্ চক্—চক্ চক্।

এক এক দিন হরিণের পাল নদীতে নামিয়া আবার পাড়ে গিয়া উঠে, আবার নামিয়া আসে, আবার ফিরিয়া যায়। কোন অজানা কারণে তাহাদের মন সন্দিগ্ধ হইয়া উঠে। দলের একটার হয় তো সাহস বেশী, হয়ত তৃষ্ণার তাগিদ বেশী, সে এক পা দুই পা করিয়া আগাইয়া আসে, জলের কাছে মুখ বাড়াইয়া দেয়, এমন সময় পাথরের আড়াল হইতে হুঙ্কার দিয়া ডোরাকাটা একটা প্রকাণ্ড শরীর লাফ দিয়া তাহার ঘাড়ে আসিয়া পড়ে, একবার একটা করুণ আর্তনাদ শোনা যায়, তার পরে আবার সব চুপ হইয়া যায়।

১৯

একে একে সাঁওতাল পল্লীর সকলেই চলিয়া যায়; বাকি থাকে লালধন, উত্তম আর তার মেয়ে ফুলি। ইহারাও থাকিবে না, ফুলি

লালধনকে রাজী করাইয়াছে, বর্ষার আগেই পশ্চিমের বড় পাহাড়ে চলিয়া যাইবে। ঘরের উপর লালধনের বড় মায়া, তাই ছুতায়-নাতায় কেবলি দেরি করিতেছে।

সেদিন বিকালের দিকে ফুলি তাহার ঘরের সামনে বসিয়া ফুল দিয়া খোঁপা সাজাইতেছে, লালধন আর উতুম শিকারে গিয়াছে। আজ সারাদিন বাতাস বহে নাই একটা গুমোট গরমে প্রকৃতির আত্মা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। গ্রীষ্মের মাঝামাঝি যেদিন এই রকম বাতাস বন্ধ হইয়া যায়, গরম দ্বিগুণ হইয়া উঠে, অরণ্যবাসীরা জানে সেদিন সন্ধ্যায় ঝড় তো আসিবেই, সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিও আসিবে। ফুলি দুই-এক বার পশ্চিম আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখে মেঘ উঠিতেছে কিনা। মেঘ তখনও উঠে নাই, কেবল রোদের তেজ যেন অনেক কমিয়া গিয়াছে। ফুলি চিন্তিত হইয়া উঠে, উতুম যদিও বলিয়া গিয়াছে সন্ধ্যার আগেই ফিরিবে, ভাল শিকারের সন্ধান পাইলে তাহারা যে সময়ের হিসাব করিবে না ফুলি তাহা জানে।

ছোট একখানা টিনের আরশি সামনে রাখিয়া ফুলি একটি একটি করিয়া খোঁপায় ফুল গোঁজে আর গুন গুন করিয়া একটা গান গায়। এমন সময় মহুয়াতলার দিকে পায়ের আওয়াজ পাইয়া খুশী হইয়া উঠে, আরশি আর চিরুনি লইয়া উঠিয়া পড়ে, কিন্তু পরমুহূর্তেই চুপ করিয়া দাড়ায়, কেননা যে আওয়াজটা মহুয়াতলার পথ ধরিয়া আসে সেটা স্পষ্ট জুতার আওয়াজ। মোড় ফিরিতেই ফুলি দেখে ঠিকাদার সাহেব।

ফুলিকে দেখিয়া প্রভাত আশ্চর্য হইয়া যায়, সামনে আসিয়া বলে, 'এটাই বুঝি তোদের বস্তি।'

ফুলি জবাব দেয়, 'হাঁ সাহেব।'

প্রভাত খুশী হইয়া বলে, 'সুন্দর জায়গাটা, খুব সুন্দর, আমি ঐ উচো মহুয়াগাছের নীচে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম, পাহাড়ের কোলে তোদের ঘরগুলোকে ছবির মত লাগছিল।'

ফুলি হাসিয়া বলে, 'ঘরে কিন্তু লোক নাই সাহেব।'

—তার মানে?

—পালিয়ে গেছে।

প্রভাত বিষয়টা বুঝিতে পারে, অপ্রীতিকর কথাটা চাপা দিবার চেষ্টা করিয়া বলে, 'তুই ত পালাস নি।'

ফুলি বলে, আমরাও যাব সাহেব, বর্ষার আগেই পালিয়ে যাব, তখন তুই জোড়া মহুয়া কেটে নিস।

প্রভাত হাসে, একটা সিগারেট ধরায়, আস্তে আস্তে টানে, শূন্য পল্লীর দিকে তাকাইয়া তাহার মনটাও ব্যথিত হইয়া উঠে।

প্রভাত প্রশ্ন করে, 'তোর ঘরের লোকদের ত দেখছি না?'

ফুলি বলে, 'তারা শিকারে গেছে।'

শুনিয়া প্রভাত অবাক হইয়া বলে, 'জঙ্গলে তুই একা আছিস, তোর কি একটুও ভয় করে না?'

ফুলি হাসিয়া বলে, 'জঙ্গলে আমার ভয় করে না সাহেব, জঙ্গলের বাইরে গেলে আমার ভয় করে।'

এই জংলী মেয়েটার মনস্তত্ত্ব প্রভাত যেন কিছুতেই বুঝিতে পারে না। নিঃশেষিত সিগারেটের প্রান্তটুকু ফেলিয়া দিয়া প্রভাত আগাইয়া আসে, ফুলির আঙিনার ভিতরে উঁকি মারিয়া দেখে।

ফুলি হাসে, বলে, 'কি দেখছিস সাহেব?'

প্রভাত বলে, 'দেখছি বাঘ ভালুক কিছু লুকিয়ে আছে নাকি।'

ফুলি বলে, 'এখানে না থাকলেও কাছাকাছি বহুত আছে সাহেব, দেখবি নাকি?'

প্রভাত বলে, 'দরকার নেই আমার।'

শুনিয়া ফুলি হাসিয়া উঠে।

ঐশ্বর্যের সঙ্গে যে আনন্দের সম্বন্ধ নাই, এই কুঁড়ে-ঘর ও তাহার বাসিন্দাটিকে দেখিয়া প্রভাত তাহা বুঝিতে পারে। এমন ঘরে থাকিয়াও যে লোকে এত হাসিতে পারে প্রভাত আগে তাহা জানিত না।

প্রভাত হঠাৎ প্রশ্ন করে, 'তুই আজকাল জঙ্গলে যাসনে বুঝি?'

ফুলি বলে, 'যাই ত।'

— কোথায়, আমি ত দেখতে পাইনে।

— পূব জঙ্গলে আর যাই নে সাহেব—পশ্চিমের ঐ বড় পাহাড়ে যাই।

প্রভাত একটু আশ্চর্য হইয়া বলে, 'পূবের জঙ্গলে আর যাসনে কেন?'

ফুলি জবাব দেয়, 'আমার খুশী,' তারপরে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠে।

একটা দমকা হাওয়া হঠাৎ গাছের ডাল-পালা কাঁপাইয়া বহিয়া যায়—ফুলি চমকাইয়া উঠে, পশ্চিমের আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখে কালো মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছে।

ফুলি ব্যস্ত হইয়া বলে, 'সাহেব, তুমি ছাউনিতে ফিরে যাও বড় ঝড় আসছে।'

প্রভাতও আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখে, শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করে, সন্ধ্যার আগেই কি ঝড় এসে পড়বে?

ফুলি বলে, 'হাঁ সাহেব, দেখছিস না, রিমির (মেঘ) উঠে আসছে, আর একটু পরেই ঝড় আসবে।'

আর একবার হাওয়া বহিয়া যায়, গুড়-গুড় করিয়া মেঘও ডাকিয়া উঠে।

ফুলি বলে, 'সাহেব তুই কোন পথে এখানে এসেছিস।'

প্রভাত বলে, 'জঙ্গলের পথ ত চিনি নে—নদীটার কিনারা দিয়ে চলতে চলতে এসে পড়েছি।'

ফুলি গম্ভীর হইয়া ওঠে, বলে, 'নদী ধরে ছাউনিতে যেতে এক পহর লেগে যাবে, তার আগেই ঝড় এসে পড়বে, আর সে কি ঝড়!'

প্রভাত শঙ্কিত হইয়া উঠে, জঙ্গলের পথ সে জানে না, ঝড় আসিয়া পড়িলে এক পাও সে চলিতে পারিবে না—তারপরে রাত হইলে যে কি হইবে তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে না।

সে বলে, 'ফুলি এই জঙ্গলের পথটুকু তুই আমাকে দেখিয়ে নিয়ে চল—মাঠে পড়লে আমি যেতে পারব।'

ফুলি আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখে মেঘ আরও উপরে উঠিয়াছে, প্রভাতকে বলে, 'সত্যি তুই যেতে পারবি নে সাহেব?'

—সত্যি যেতে পারব না—আমি যে পথ জানিনে। এই পরদেশী যে জঙ্গলের পথ জানে না তাহা ফুলি ভাল করিয়াই জানে। একবার পথ হারাইলে রাতভর ঘুরিয়া সে পথ পাইবে না, তাহা ছাড়া আরও বিপদ আছে। ফুলি চিন্তিত হইয়া ওঠে।

প্রভাত বলে, মাত্র দেড় মাইল ত জঙ্গল, ঝড় আসবার আগেই তুই ফিরে আসতে পারবি।

ফুলি ইতস্ততঃ করে, তার পরে আকাশের দিকে আর একবার তাকাইয়া বলে, 'চল সাহেব, জলদি চল।

ফুলি এক রকম ছুটিয়াই চলে, প্রভাত তাহাকে অনুসরণ করে।

২০

বনের পথ ধরিয়া ফুলি চলিতে থাকে, প্রভাত তাহার পিছনে চলে। কখনও ঢালু জমির উপর দিয়া ফুলি ছুটিয়া নামিয়া যায়, কখনও টিলার উঁচু পথ ধরিয়া উঠে। প্রভাত তাহার সঙ্গে তাল রাখিতে পারে না, বারে বারে পিছাইয়া পড়ে। এই মেয়েটার শক্তি ও সাহস দেখিয়া প্রভাত অবাক হইয়া যায়। গোটা দুই শুকনো নালা পার হইয়া তাহারা গভীর বনে আসিয়া পড়ে, গাছের ডাল-পালা ঠেলিয়া প্রভাতের চলিতে কষ্ট হয়—ফুলির পথে কোন জিনিষই যেন বাধা সৃষ্টি করিতে পারে না—সে অবলীলাক্রমে চলিয়া যায়।

আকাশ জুড়িয়া হঠাৎ বিদ্যুৎ খেলিয়া যায়, তারপরে কান বধির করিয়া আওয়াজ হয়।

ফুলি থমকিয়া দাঁড়ায়, মুহূর্তের জন্য সে পথ দেখিতে পায় না।

প্রভাত বলে, 'ঝড় এসে পড়ল।'

সত্যিই ঝড় আসিয়া পড়ে, হাওয়ার দাপটে গাছপালা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে। ফুলি আবার আগাইয়া চলে, কিন্তু ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করিয়া তাহারা তাড়াতাড়ি চলিতে পারে না। দেখিতে দেখিতে আকাশ কালো মেঘে ছাইয়া যায়। বিদ্যুৎ বারে বারে চমকাইতে থাকে।

ফুলি বলে, থামিস নে সাহেব, 'চলে আয়।'

ফুলি যেন কিছুতেই থামিবে না, বাতাসে তাহার চুল খুলিয়া যায়, আঁচল শাসন মানে না, অন্ধকারে পথ প্রায় দেখিতেই পাওয়া যায় না, তবু ফুলি চলিতে থাকে।

প্রভাতের মনটা ব্যথিত হইয়া উঠে, তাহারই জন্যে মেয়েটিকে আজ বিপদে পড়িতে হইয়াছে।

আরও খানিকটা পথ তাহারা চলে, ঝড় ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া উঠে, বনের মধ্যে অন্ধকার ঘনাইয়া আসে—পথ আর দেখা যায় না, দুই জনে আন্দাজে চলিতে থাকে।

ফুলি বলে, 'বনটা আর বেশী দূর নাই সাহেব, কিন্তু তাড়াতাড়ি এগোতে পারছি না।'

প্রভাত অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়ে, নিজেকে বড় অপরাধী বলিয়া মনে হয়—সে ফুলির একখানা হাত ধরে।

ফুলি হাসিয়া উঠে, বলে, 'ভয় করছে নাকি সাহেব?'

প্রভাত ফুলির অত্যন্ত কাছে আসিয়া দাঁড়ায়, বলে, 'না, ভয় করছে না, তবে বেশ ভাবনা হচ্ছে।'

চলা যেন আর যায় না—তবু দুই জনে চলার চেষ্টা করিতে থাকে। প্রভাত ফুলির পাশে পাশে চলে, মাঝে মাঝে ঝড়ের ঝাপ্‌টায় ফুলির চুল উড়িয়া প্রভাতের চোখে মুখে পড়ে, মাঝে মাঝে ফুলির দেহ তাহার বুকের অত্যন্ত কাছে আসিয়া পড়ে। এই ঝড়ের সন্ধ্যায় প্রভাতের মনে হঠাৎ আর একটা ঝড় উঠিতে থাকে। হঠাৎ ঝড়ের বেগ যেন একটু কমিয়া যায়, ঠাণ্ডা বাতাসের কয়েকটা ঝাপ্‌টা আসে, ফুলি বলিয়া উঠে—'সাহেব বিষ্টি এসে পড়ল, আর একটু তাড়াতাড়ি চল সামনে একটা মস্তবড় পাথর আছে, তার আড়ালে দাঁড়াব।' বলিতে বলিতে বৃষ্টি আসিয়া পড়ে, বৃষ্টির ঝর ঝর আওয়াজে সারা বন মুখরিত হইয়া উঠে, দুই জনে ছুটিয়া যায়—একটু পরেই দেখিতে পায় একটা প্রকাণ্ড পাথর পথ জুড়িয়া আড় হইয়া পড়িয়া আছে। দুই জনে তাহার আড়ালে গুটিসুটি হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু দাঁড়াইলে কি হইবে, এলোমেলো বাতাসের সঙ্গে জলের ঝাপ্‌টা আসিয়া তাহাদের ভিজাইয়া দেয়।

ঝড়েরও বিরাম নাই, বৃষ্টিরও বিরাম নাই। সন্ধ্যা গিয়া রাত্রি আসিয়াছে, বনের মধ্যে অন্ধকার যেন জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে। এক একবার যখন বিদ্যুৎ চমকায়, প্রভাত তখন মুহূর্তের জন্য ফুলির বৃষ্টি-ভেজা অসংবৃত রূপ দেখিতে পায়, চুল ভিজিয়া চোখের উপর মুখের উপর অনাবৃত কাঁধের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, শাড়ী ভিজিয়া সুঠাম দেহের সঙ্গে যেন মিশিয়া গিয়াছে। প্রভাতের নিজের অবস্থাও সেই রকম। সে ধীরে ধীরে ফুলির কাঁধে একখানা হাত রাখে, তার পরে তাহাকে তাঁহার অত্যন্ত কাছে টানিয়া লয়।

ফুলি কোন কথাই কয় না, বিরাট অন্ধকারের দিকে চোখ মেলিয়া সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। তাহার মনে বারে বারে একটা ভাবনা ভাসিয়া উঠে, লালধন ও তার বাপ ঘরে ফিরিয়া তাহাকে খুঁজিয়া পায় নাই, কি করিতেছে তাহারা, কি ভাবিতেছে তাহারা? কেন সে আসিল, বোধ হয় না আসিলেই ভাল হইত—ঘরে ফিরিয়া কি জবাব দিবে সে?

প্রভাত যে ফুলিকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়াছে তাহাও সে টের পায় নাই।

প্রভাত ডাকে 'ফুলি'—ফুলি কোন উত্তর দেয় না, প্রভাত আবার ডাকে, প্রভাতের অন্তর যেন সাহসী হইয়া উঠে। ফুলির দেহের স্পর্শে তাহার যেন নেশা লাগিয়া যায়, সে যতটুকু পাইয়াছে তাহার চেয়ে আরও বেশী পাইতে চায়—ফুলিকে ডাকে 'ফুলি।' ফুলি কোন জবাব দেয় না, প্রভাত অন্ধকারে ফুলির কপালের

ভিজে চুলগুলি সরাইয়া দেয়, নিজের বুকের কাছে ফুলির বুকের স্পন্দন অনুভব করে, তাহার নগ্ন বাহুটির উপর উষ্ণ হাতখানি রাখে। এতক্ষণে ফুলি যেন সচেতন হইয়া উঠে, প্রভাতের হাতখানা সরাইয়া দেয়। প্রভাত আবার ডাকে 'ফুলি।'

ফুলি জবাব দেয়, 'কি সাহেব?'

প্রভাত রুদ্ধ নিশ্বাসে বলে, 'ফুলি তুই বড় সুন্দর, আমি তোকে ভালবাসি।'

ফুলি একটু হাসে। প্রভাত আবার ফুলির কাঁধের উপর হাত রাখে, বলে, 'ফুলি তুই খুব সুন্দর।'

ফুলি বলে, 'না সাহেব, আমি জংলী মেয়ে, আমি সুন্দর না।'

প্রভাত আবার সাহসী হইয়া উঠে, ফুলিকে আবার কাছে টানিয়া নেয়, বলে, 'ফুলি তুই জংলী ফুল, তুই সত্যিই সুন্দর।'

ফুলি হাসে, বলে, 'সাহেব তুই বড় বেইমান।'

প্রভাত যেন অসহিষ্ণু হইয়া উঠে, বলে, 'না, না, ফুলি আমি সত্যি বলছি আমি তোকে ভালবাসি।'

ফুলি বলে, 'সাহেব, আমাকে যেতে দে, আমি চলে যাই, জঙ্গলের প্রায় কিনারায় আমরা এসেছি, এখান থেকে তুই ছাউনিতে যেতে পারবি।'

প্রভাত ফুলির ভিজে হাতটি ধরিয়া বলে, 'এই ঝড়ে তুই কোথায় যাবি ফুলি, আমি তোকে যেতে দেব না।'

ফুলি বলে, 'তুই পাগল হয়েছিস সাহেব।'

প্রভাত সত্যিই যেন পাগল হইয়া উঠে। বিদ্যুৎ চমকিয়া যায়, প্রভাত ফুলিকে বুকে টানিয়া লয়···মুহূর্ত্তের জন্যে ফুলির সর্ব্বাঙ্গ যেন অবশ হইয়া যায়, কিন্তু তার পরেই সে আহত পাখীর মত আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে, প্রভাতের হাত দুটি জোর করিয়া ছাড়াইয়া সরিয়া দাঁড়ায়। প্রভাত একটা ক্ষুধার্ত্ত পশুর মত ফুলিকে আবার ধরিতে চায়, ফুলি অন্ধকারের মধ্যে ছুটিয়া বাহির হইয়া যায়। প্রভাতও তাহার পিছনে ছুটে, অন্ধকারে একটা গাছের উপর গিয়া পড়ে, চিৎকার করিয়া ডাকে, 'ফুলি ফুলি।'

সে ডাকের কোন উত্তর আসে না। অরণ্য জুড়িয়া অবিরাম ধারায় বৃষ্টি পড়িতে থাকে, বাতাসে গাছপালা অস্থির হইয়া উঠে—তাহার মধ্যে ফুলি পাগলের মত ছুটিয়া চলে। পাথরে লাগিয়া তাহার কচি পা দুটি ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়, গাছে বাধিয়া সাড়ি ছিঁড়িয়া যায়, সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই—অরণ্যের বন্ধুর পথ ধরিয়া সে ছুটিয়া চলে। আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়, ক্ষণিকের জন্য বনপথ আলোকিত হইয়া উঠে, তার পর গভীরতর অন্ধকারে অরণ্য অদৃশ্য হইয়া যায়। ফুলি চলে, চলিতে চলিতে হঠাৎ ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠে।

২১

গোটা দুই বনমুরগী মারিয়া লালধন বলে, 'পাহাড়ের কোল দিয়ে চল, শুয়োর পাওয়া যাবে।'

উতুম বলে, না আর বেশী দূরে গিয়ে কাজ নেই, ঘরে ফের, আকাশের অবস্থা ভাল না, ঝড়-বৃষ্টি আসতে পারে—লালধন আকাশের দিকে তাকাইয়া আসন্ন ঝড়ের লক্ষণ পরিষ্কার দেখিতে পায় —দুই জনে ঘরের পথ ধরে। খানিকটা পথ আসিতেই পশ্চিম আকাশে কালো মেঘ ঘনাইয়া আসে, একটু একটু হাওয়া বহিতে থাকে। লালধন আর উতুম তাড়াতাড়ি চলিতে সুরু করে। ক্রমে বাতাসের বেগ বাড়িতে থাকে, মেঘ আরও উঠিয়া আসে, বন জুড়িয়া একটা নিবিড় ছায়া পড়ে। একরকম ছুটিয়াই লালধন আর উতুম যখন পল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হয় ঝড় তখন রীতিমত আসিয়া পড়িয়াছে।

ঘরের সামনে আসিয়া উতুম ডাকে, "ফুলি, এ ফুলি।" ঘরের ভিতর হইতে কোন সাড়া আসে না, উতুম ঝাঁপের দরজা ঠেলিয়া ভিতরে ঢোকে, কিন্তু সেখানেও ফুলিকে দেখিতে পায় না। তীর-ধনুক মুরগীটা রাখিয়া বাহিরে আসে, লালধনকে ডাকিয়া বলে 'আরে বেটা, ফুলি আছে এদিকে?'

লালধন নিজের ঘর হইতে জবাব দেয়, 'না।'

উতুম তখন চেঁচাইয়া ডাকে, 'এ ফুলি কোথায় গেলি বেটি'—ফুলির তবুও কোন সাড়া আসে না।

লালধন ততক্ষণে বাহিরে আসে, বলে, 'ফুলি ঘরে নেই বুঝি।'

উতুম বলে, 'না ঘরে নেই, 'ঝড় এসে পড়ল, গেল কোথায় মেয়েটা।'

লালধন বলে, 'কাছাকাছি কোথাও গেছে, এসে পড়বে।'

উতুম রাগিয়া বলে, 'ভারি সাহস হয়েছে দেখছি, মরদের চেয়েও সাহস হয়েছে যে।'

উতুম আবার ঘরে গিয়া ঢোকে, জলের কলসীটা নাড়িয়া দেখে তাহা জলে ভরা, চুপ করিয়া ঘরের মেঝেয় বসে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেও যখন ফুলি আসে না তখন চিন্তিত হইয়া পড়ে। আবার বাহিরে আসে, ডাকে, 'ফুলি এ ফুলি।' সন্ধ্যা ততক্ষণ ঘনাইয়া আসিয়াছে, আকাশ জুড়িয়া বারে বারে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে—ঝড়ের তো বিরাম নাই। একটু পরে লালধনও সেখানে আসিয়া দাঁড়ায়, সেও চিৎকার করিয়া ডাকে, কিন্তু ফুলির কোন সাড়া পাওয়া যায় না। লালধন বলে, 'নদীর ধারে খুঁজে দেখে আসি।'

উতুম লালধনের হাত চাপিয়া ধরে, বলে, 'এই আঁধারে আর ঝড়ে নদীর ধারে যাসনে, সে যদি কাছেই থাকে তা হলে চলে আসবে।'

তবুও লালধন জোড়া মহুয়াতলায় গিয়া কয়েকবার ডাকে, কিন্তু ঝড়ের শব্দে লালধনের গলার আওয়াজ ডুবিয়া যায়।

লালধন ফিরিয়া আসে, দুর্ভাবনা তাহার মনকে অবশ করিয়া ফেলে।

দুই জনে কি করিবে ভাবিয়া পায় না, শঙ্কিত উতুম আপনার মনে বলে, 'হে দেওতা, হে মহারাজ, আমি তোকে পূজো দেব, আমার বেটির যেন কোন বিপদ না হয়—আমার বেটি যেন ফিরে আসে।'

পাহাড়ের গায়ে বৃষ্টি পড়িতে সুরু করে, ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপ্‌টা আসে, আকাশ জুড়িয়া বিদ্যুৎ চমকাইয়া যায়। ক্ষণিকের আলোকে লালধন যেন উতুমের পায়ের কাছে কি একটা সাদা জিনিষ দেখিতে পায়, তাড়াতাড়ি গিয়া সেটা কুড়াইয়া লয়। অন্ধকারে দেখিতে পায় না, কিন্তু অনুভবে সেটা যে কি তাহা পরিষ্কার বুঝিতে পারে। উতুমের হাতে দিয়া বলে, 'দেখ তো এটা কি।'

উতুম বিদ্যুতের আলোয় দেখিয়া বলে, 'এ যে সিরকেটের টুকরো বেটা।'

লালধন তাহা আগেই বুঝিয়াছে, সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, তাহার মনের মধ্যে একটা সন্দেহ ঘনাইয়া আসে, সে চাপা গলায় বলে, 'বুঝলি মাঝি, ঠিকাদার সাহেব এখানে এসেছিল।'

উতুম উদ্বিগ্ন হইয়া বলে, 'সাহেব কেন আসবে বেটা।'

লালধন তিক্ত কণ্ঠে বলে, 'এসেছিল কেন আমি বুঝতে পেরেছি। সে এসেছিল, এখানে দাঁড়িয়ে সিরকেট খেয়েছিল— বুঝলি মাঝি, এ সিরকেট আমি চিনি, আমি এক দিন একটা খেয়েছিলাম।'

উতুম লালধনের উষ্ণতার হেতু বুঝিতে পারে না, আবার বলে, 'সাহেব কেন আসবে রে বেটা।'

কেন আসিবে লালধন তাহা জানে। লালধনের সন্দেহ কাটিয়া যায়, রহস্যের মীমাংসা সে মনে মনে করিয়া ফেলে। সে বলে, 'আমি জানি কেন সে আসবে। তোর বেটির সঙ্গে যে সাহেবের বড় পীরিত, রোজ জঙ্গলে যেত সাহেবকে ভেটতে—আমি নিজের চোখে একদিন দেখেছি।' বলিতে বলিতে লালধন উত্তেজিত হইয়া উঠে, তাহার মাথায় যেন গোলমাল হইয়া যায়, চেঁচাইয়া বলে, 'তোর বেটি সাহেবের সঙ্গে পালিয়ে গেছে—কোথায় পাবি তাকে খুঁজে।'

ঝম ঝম করিয়া বৃষ্টি আসিয়া পড়ে, উতুম লালধনের হাত ধরিয়া বলে, 'চল বেটা ঘরে চল, মাথা ঠাণ্ডা কর, তোর কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে।'

লালধন ঝাঁকি দিয়া উতুমের হাত ছাড়াইয়া লয়, তেমনি কর্কশ ভাবে বলে, 'ঢং করিসনে মাঝি, 'তুই সব জানিস্, তুই জেনে শুনে বেটিকে যেতে দিয়েছিস বেইমান।'

উতুম এইবার বিরক্ত হইয়া উঠে—লালধন বলে কি? সে যে এসব কথা কিছুই জানে না! না, সাহেবের সঙ্গে ফুলি যাইতেই পারে না, তাহার মেয়ে এমন কাজ কিছুতেই করিবে না। উতুম বলে, 'চুপ কর লালধন, ওসব কথা বলিস নে, আমার মেয়ে মরে যাবে তবু অমন কাজ করবে না।'

শুনিয়া লালধন হঠাৎ রাগে জ্বলিয়া উঠে, উতুমকে একটা ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দেয়, বলে, 'যেমন বাপ, তেমনি বেইমান বেটি।' সে আর সেখানে দাঁড়াইতে পারে না, মাতালের মত টলিতে টলিতে ঘরে আসিয়া ঢোকে।

কিন্তু ঘরে আসিয়া তাহার যেন দম বন্ধ হইয়া আসে, মনে হয় কে যেন তাহার বুকের উপর বসিয়া গলাটা চাপিয়া ধরিয়াছে। এলোমেলো চিন্তাগুলো দুঃস্বপ্নের মত মনের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়—ফুলি সাহেবের সঙ্গে পালাইয়া গিয়াছে—বেইমান ফুলি, ফুলি তাহাকে ভালবাসে না, এতদিন কেবল তাহাকে ঠকাইয়াছে, এতক্ষণ কোথায়, কতদূর, কাহার কাছে? আর যেন সহ্য করিতে পারে না, ঝড়বৃষ্টির মধ্যে বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়, বৃষ্টিতে ভিজিয়া যায়, ঝড়ের ঝাপ্‌টা চাবুকের মত মুখে আসিয়া লাগে—লালধন যেন খানিকটা শান্ত হয়।

বিদ্যুৎ চমকায়, মুহূর্তের জন্য জোড়া মহুয়াগাছ, নদীতে যাইবার সরু পথ, উতুমের ছোট্ট কুটির—ছবির মত ফুটিয়া উঠিয়া আবার অন্ধকারে ঢাকা পড়িয়া যায়। ঐ ছবির সঙ্গে লালধনের মনে ফুলির ছবিও ফুটিয়া উঠে, একটা তীব্র বেদনায় লালধন আর্তনাদ করিয়া উঠে। বাহিরে ভাল লাগে না, সে আবার ঘরে ফিরিয়া আসে।

বাহিরে অবিরাম ঝড় বহিতে থাকে। মনে হয় যেন একটা অশান্ত আত্মা অন্ধকারে বন ওলটপালট করিয়া কাহাকে খুঁজিতেছে অথচ পাইতেছে না। বাহিরে অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া লালধন বসিয়া থাকে।

হঠাৎ লালধন লাফাইয়া উঠে, এতক্ষণে ফুলি যদি ফিরিয়া আসিয়া থাকে? একটা শুভ সম্ভাবনায় লালধনের বুকটা টিপ্ টিপ্ করিতে থাকে। সে ঝড়ের মধ্যে বাহির হইয়া পড়ে, তাড়াতাড়ি উতুমের ঘরের দরজায় আসিয়া ডাকে, 'মাঝি মাঝি।'

উতুম সাড়া দেয়, বলে, 'ভিতরে আয় বেটা।'

লালধন ভিতরে আসে। মহুয়া তেলের ক্ষুদ্র প্রদীপের আলোয় চারিদিকে তাকায়, যাহাকে দেখিতে পাইবে আশা করিয়াছিল তাহাকে দেখিতে পায় না, বুকের ভিতরটা যেন ফাঁকা হইয়া যায়। উতুম ঘরের কোণে বসিয়াছিল, সে হাত নাড়িয়া লালধনকে বসিতে বলে। লালধন উতুমের দিকে তাকাইতে পারে না, ঘৃণা ও ক্রোধ তাহার মন এবং মস্তিষ্ককে অসংযত করিয়া তোলে। সে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতে চায়। হঠাৎ সে ঘুরিয়া দাঁড়ায়, দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলে, 'বল বুড়ো তুই জানিসনে তোর মেয়ে কোথায় গেছে? সত্যি কথা বল!'

উতুম চমকিয়া উঠে, তারপর মাথা নাড়িয়া বলে, 'বেটা তোর মাথার গোলমাল হয়ে গেছে।'

লালধন দুই পা আগাইয়া আসে, ক্ষ্যাপার মত চেঁচাইয়া বলে, 'বলবি নে বেইমান, ঝুটা বলবিনে? সব জানিস তুই, আগে আমি তোকে মারব, আর তোর বেটিকে যখন খুঁজে বার করব তখন তাকে মারব, সাঁওতালের বেটা আমি, বেইমানির সাজা আমি দেবই।'

রাগে লালধন কাঁপিতে থাকে, মনে হয় যেন আহত বাঘের মত উতুমের ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িবে।

কি ভাবিয়া লালধন আবার ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়। উতুম কাঠ হইয়া বসিয়া থাকে।

প্রহর কাটিয়া যায়, মহুয়া তেলের আলো আরও ক্ষীণ হইয়া আসে। বাহিরে ঝড় বুঝি একটু কমে। উতুমের দেহমন যেন অসাড় হইয়া গিয়াছে, সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। হঠাৎ কে যেন ঘরে আসিয়া ঢোকে, উতুম তাকাইয়া দেখে, বিস্ময়ে আনন্দে বৃদ্ধ লাফাইয়া উঠে, ডাকে, 'বেটি, বেটি, তুই এসেছিস বেটি।'

ফুলি ডাকে, 'বাবা।'

উতুম ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরে, পাগলের মত বলিতে থাকে, 'তুই ফিরে এসেছিস বেটি।' উতুমের বুকের মধ্যে ফুলি কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে।

ভিজে চুলের উপরে হাত বুলাইয়া বৃদ্ধ বলে, 'তুই কোথায় গিয়েছিলি বেটি, জঙ্গলে কি পথ হারিয়েছিলি।'

ফুলি বলে, 'না, বাবা।'

—"বল আমাকে বেটি তুই কোথায় গিয়েছিলি, সত্যি করে বল! লালধন বলছিল তুই সাহেবের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিস। সে ক্ষেপে গেছে, একেবারে ক্ষেপে গেছে।'

ফুলি চুপ করিয়া থাকে, কোন কথাই বলে না।

উতুম ফুলিকে ছাড়িয়া দেয়, তাহার মনেও কেমন যেন একটা সন্দেহ জাগিয়া উঠে, বলে, 'আমার কাছে মিছে কথা বলিসনে বেটি, তুই কোথায় গিয়েছিলি বল।'

ফুলি তার বাপের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখে, তারপর বলে, 'আমি সাহেবের সঙ্গেই গিয়েছিলাম বাবা।'

উতুমের বুকের উপর কে যেন একটা প্রচণ্ড আঘাত করে, সে দুই পা পিছাইয়া যায়—ফুলির দিকে প্রাণহীনের মত তাকাইয়া থাকে। ফুলি বাপের কাছে আসে, ধীরে ধীরে তার গলাটা জড়াইয়া ধরে। উতুমের চৈতন্য যেন ফিরিয়া আসে, গলা হইতে ফুলির হাত দুটি সরাইয়া দিবার চেষ্টা করে, ক্ষোভের সঙ্গে বলে, 'তুই সত্যিই বেইমান, লালধন তোকে মেরে ফেলবে বলেছে, সে যদি তার টাঙ্গী দিয়ে তোকে কেটে ফেলে তা হলে আমি খুশী হব।'

ফুলি তার বাপের কোলের মধ্যে মুখ লইয়া গিয়া বলে, 'বাবা কেন তুই এসব কথা বলছিস—দেওতা জানে আমি অন্যায় কিছু করি নাই, তুই আমার কথা শোন বাবা।'

উতুম বলে, সত্যি কথা বলিস।

ফুলি বলে, 'সত্যি বলছি, তুই শোন—বিকেলবেলা সাহেব আসে, সত্যিই আসে, আকাশে মেঘ দেখে আমি তাকে শিগ্‌গীর ছাউনিতে ফিরে যেতে বলি, তা না হলে বনের মধ্যে ঝড়ে পড়বে। সে বনের পথ চেনে না, আমাকে বলে বনের পথটুকু দেখিয়ে দিতে। পরদেশী মানুষ, আমি সঙ্গে না গেলে সে অন্ধকারে কিছুইতেই পথ পেত না, ঝড়-বৃষ্টিতে খানা-খন্দে পড়ে জখম হ'ত—হয়ত মরেই যেত তাই আমি সঙ্গে গেলাম। কিন্তু পথের মধ্যে ঝড়-বৃষ্টি এসে পড়ল, আমি তাড়াতাড়ি ফিরতে পারলাম না—দেরি হ'ল। আমি ছুটে ছুটে এসেছি বাবা, দেখ আমার সাড়ি ছিঁড়ে গেছে; আমার পা কেটে রক্ত পড়ছে।" ফুলি বাপের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলে, 'দেওতা জানে—আমি অন্যায় কিছু করি নাই।'

উতুম ফুলির কথা বিশ্বাস করে, তাহার মেয়েকে সে ভাল করিয়াই জানে। ফুলিকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া উতুম বলে, 'সাহেবের সঙ্গে না গেলেই ঠিক করতিস বেটি।'

হঠাৎ উতুম ফুলিকে ছাড়িয়া দিয়া চাপা গলায় বলে, 'কিন্তু লালধন একথা বিশ্বাস করবে না, সাহেবের সঙ্গে গিয়েছিলি শুনলে সে কিছুতেই তোকে ক্ষমা করবে না। সে ক্ষেপে আছে—সে একটু আগে আমাকেই গলা টিপে মারতে এসেছিল—তোকে দেখলে সে ঠিক কেটে ফেলবে, ঠিক কেটে ফেলবে, সাঁওতালবাচ্চা সে।'

উতুম অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়ে। ফুলি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। উতুম দরজার কাছে গিয়া একবার বাহিরের দিকে তাকায়, তার পরে ফুলির কাছে আসিয়া বলে, 'বেটি চল আমরা পালিয়ে যাই—সে পাগলটা আসবার আগেই আমরা পালিয়ে যাই।"

ফুলি বলে, 'কোথায় যাবি বাবা, আমি যাব না।'

উতুম ফুলির হাত চাপিয়া ধরে, বলে—'তুই লালধনকে চিনিসনে বেটি! সে যে বড়কু মাঝির ছেলে—সে কিছুতেই তোকে ক্ষমা করবে না—তোকে দেখতে পেলেই টাঙ্গী দিয়ে তোর গলাটা কেটে ফেলবে—এই বুড়ো ঠেকাতে পারবে না।'

উতুম ভাবিয়া কাঁপিয়া ওঠে। ফুলির হাত ধরিয়া জোর করিয়া টানে বলে, চল, চল, পালিয়ে যাই—সে পাগলটা আসবার আগেই পালিয়ে যাই।'

ফুলি কাতরভাবে বলে 'কোথায় যাবি বাবা?'

উতুম বলে, 'কাতরাস।'

ঘর ছাড়িয়া বাপ-বেটিতে অন্ধকারে বাহির হইয়া যায়। মহুয়া-তেলের প্রদীপটা বাতাসে দুলিয়া দুলিয়া হঠাৎ নিবিয়া যায়।

২২

সেই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে লালধন সারারাত ঘর বাহির করিতে থাকে। ঘরে আসিয়া বসিলে চিন্তা তাহাকে পাগল করিয়া তোলে, বেশীক্ষণ থাকিতে পারে না, মনে হয় বাহিরে অন্ধকারে জল-ঝড়ের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইলে ভিতরের তীব্র জ্বালাটা কমিয়া যাইবে; সে বাহিরে আসে, অন্ধকারে জোড়া মহুয়াতলায় গিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু সেখানেও শান্তি পায় না, আবার ঘরে ফিরিয়া যায়।

ফুলিকে সে ভালবাসিত, সরলভাবে, পরিপূর্ণভাবে ভালবাসিত, এই ভালবাসার মধ্যে কোন যুক্তি ছিল না, বিচার ছিল না, বন্য লালধন তাহাকে একান্তভাবেই ভালবাসিত। আজ বিশ্বাসঘাতকতার আঘাতটাও তাহার সমগ্র সত্তায় আসিয়া লাগে, যন্ত্রণায় সে উন্মাদ হইয়া উঠে।...

ঝড় ও বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে—মেঘমুক্ত আকাশে তারা দেখা দিয়াছে, ভোর হইতে আর বেশী দেরি নাই। লালধন মহুয়াতলা

হইতে উতুম মাঝির ঘরের দিকে যায়—দরজার সামনে আসিয়া চুপ করিয়া দাঁড়ায়। ঝাঁপের দরজা খোলা, ভিতরে অন্ধকার। কি যেন আশা করিয়া আসে, ঘরে ঢুকিতে চায়, কিন্তু পা উঠে না। ভিতরে কোন সাড়া নাই—লালধন ঘরে ঢুকিয়া পড়ে। আবছায়া অন্ধকারে সে ঘরের ভিতরটা অস্পষ্ট দেখিতে পায়, ঘরে মানুষ নাই। উতুম মাঝি কি পলাইয়া গিয়াছে? লালধন সন্দিগ্ধ হইয়া উঠে, ভাল করিয়া চারিদিকে তাকাইয়া দেখে—ছোট খাটিয়াখানা একপাশে পড়িয়া আছে, ঘরের কোণে খানদুই ধনুক ও টাঙ্গী দাঁড় করানো, বাঁশের আড়ের উপর পরগোশ ধরা জাল রহিয়াছে, কিন্তু একটা জিনিষ তো নাই—ফুলির সাড়ীর ছোট পুঁটলিটা। এক মুহূর্তে লালধনের সব রক্ত যেন মাথায় উঠিয়া যায়, সে চিৎকার করিয়া উঠে, পালিয়েছে—লালধন পাগলের মত অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিতে থাকে; লাথি মারিয়া পুরনো খাটিয়াখানা ভাঙিয়া ফেলে, কোণ হইতে টাঙ্গীখানা টানিয়া—ঘরের হাঁড়ি-খুড়ি জিনিষপত্র চুরমার করিয়া ফেলে, তার পরে—মাতালের মত ঘর হইতে বাহির হইয়া আসে।

লালধন জোড়া মহুয়াতলায় আসিয়া দাঁড়ায়। সবে ভোর হইয়াছে, বৃষ্টি-ভেজা বনানীর উপর কাঁচা রোদ আসিয়া পড়িয়াছে,—নদী-নালা দিয়া কলস্রোতে জল ছুটিয়া চলিয়াছে, লালধন তাকাইয়া তাকাইয়া দেখে, কিন্তু কিছুই যেন দেখিতে পায় না। বড় বড় চুলগুলি ভিজিয়া ধুলা-বালিতে জট পাকাইয়া গিয়াছে, চোখদুটি বসিয়া গিয়াছে, মনের অশান্ত রূপের মতই বাহিরের রূপটাও তাহার পাগলের মত হইয়াছে। চিন্তা করিবার ক্ষমতাও যেন তাহার নাই, মনের মধ্যে এলোমেলোভাবে আসে আবার বাহির হইয়া যায়—স্পষ্ট রূপ নেয় না। অথচ কিছু একটা সে ভাবিয়া স্থির করিতে চায়—কিছু একটা করিতে চায়।

হঠাৎ ছুটিয়া লালধন ঘরের দিকে যায়, তাহার মুখে-চোখে, তাহার সর্ব্বাঙ্গে যেন একটা দৃঢ় সঙ্কল্প ফুটিয়া উঠে—তাহার কর্তব্য সে বুঝিতে পারিয়াছে। ঘরে ঢুকিয়া কোণ হইতে বাপের বড় ধনুকখানা টানিয়া আনে, বাঁশের ছিলাটা মজবুত আছে কিনা ভাল করিয়া পরখ করে, তার পরে নিভৃত কোণ হইতে সঙ্গোপনে রাখা একটা ছোট কৌটা বাহির করিয়া আনে, সাবধানে ঢাকনা খুলিয়া দেখে, তাহার চোখদুটি অস্বাভাবিকভাবে জ্বলিয়া উঠে। সাঁওতাল শিকারী এই বিষ তাহার তীরের ফলায় মাখাইয়া শিকার করিতে যায়। আজ লালধন তাহার জীবনের সবচেয়ে বড় শিকার করিতে যাইবে, তাই গোটাকয়েক তীর বাছিয়া লইয়া যত্ন করিয়া বিষ মাখায়, উত্তেজনায় তাহার হাত কাঁপিতে থাকে। তীরের 'মোঠা' কাঁধে ফেলিয়া এক হাতে ধনুক, এক হাতে টাঙ্গী লইয়া লালধন জঙ্গলের ভিতর দিয়া ছুটিয়া চলে।

ছাউনির কাছাকাছি আসিয়া লালধন হুঁসিয়ার হইয়া চলে। শিকার দেখিলে বাঘ যেমন আড়াল আবডাল দিয়া কখনো নীচু ঝোপের ভিতর দিয়া কখনো গুঁড়ি মারিয়া অগ্রসর হয়, লালধন ঠিক সেই ভাবেই ছাউনির দিকে আগাইয়া যায়। বড় আমগাছটার নীচে ঠিকাদার সাহেবের তাঁবু, তাহার একপাশে একটু দূরে কয়েকটা পলাশগাছের ঝোপ, লালধন নিঃশব্দে তাহার আড়ালে আসিয়া বসে। ডালপালার ভিতরে লুকাইয়া সে হিংস্র দৃষ্টি মেলিয়া তাঁবুর দিকে তাকাইয়া থাকে, ছিলা-পরানো ধনুকখানা সবল হাতে শক্ত করিয়া ধরে। অনেকেই সাহেবের তাঁবুতে ঢোকে, অনেকেই বাহির হইয়া যায়, কিন্তু লালধন যাহাকে চায় তাহাকে দেখিতে পায় না। সাহেবকেও সে কয়েকবার দেখিয়াছে। তীর মারিয়া তাহাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করিয়া দিবার ইচ্ছা তাহার প্রত্যেক বারই হইয়াছে, কিন্তু প্রতি বারেই সে প্রবল চেষ্টায় নিজেকে সংযত করিয়াছে। না, প্রথমে ইহাকে নয়, প্রথমে তাহাকে। এখন না হয় একটু পরে, সকালে না হয়, দুপুরে—দুপুরে না হয়, সারা দিনের মধ্যে একবার সে এক মুহূর্তের জন্যে তাঁবুর বাহিরে আসিলেই হয়—লালধন লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে না, ফুলির বুকে তীরটা গাঁথিয়া দিবেই। লালধনের চোখ দুটি শিকার-লোলুপ বাঘের মত জ্বলিতে থাকে।

সকাল গিয়া দুপুর আসে, প্রচণ্ড রোদে পৃথিবী তাতিয়া উঠে, গরম বাতাস বহিতে সুরু করে, পশুপক্ষী তৃষ্ণার্ত হইয়া উঠে। লালধনের ক্ষুধাও নাই, পিপাসাও নাই তাহার যেন বোধশক্তিও নাই, সমস্ত চৈতন্য তাহার চোখের মধ্যে গিয়া সঞ্চিত হইয়াছে—সে অপলক দৃষ্টিতে তাঁবুর দিকে তাকাইয়া আছে। গত রাত্রিতে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, নদীতে জল আসিয়াছে—কুলিদের কাজ বন্ধ। হয়ত দু'চার দিনের মধ্যে কাজ একেবারেই বন্ধ হইয়া যাইবে, কেননা বর্ষা আসিয়া পড়িল, বড় বন কাটাও শেষ হইয়া গেল। কুলিদের ছাউনিতে আজ যথেষ্ট সোরগোল, আসন্ন ছুটির উৎসব। টাকা কামাইয়া অনেক দিন পরে তাহারা ঘরে ফিরিয়া যাইবে, একটা আনন্দময় ভবিষ্যতের আশায় তাহারা খুশী। লালধনের অতীত নাই, ভবিষ্যৎ নাই, একমাত্র বর্তমান রহিয়াছে, সে তাহার তীর-ধনুক আর সাহেবের তাঁবু।

দুপুর গিয়া অপরাহ্ন আসে, লালধন তাহার শিকারের আশায় তেমনি অটল হইয়া বসিয়া থাকে। ক্রমে মাঠ জুড়িয়া ছায়া পড়ে, উত্তপ্ত ধরণী যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, ছাউনি হইতে কুলিরা বাহির হয়। লালধন উদ্গ্রীব হইয়া বসে, ধনুকখানা শক্ত করিয়া ধরে, প্রত্যেক মুহূর্তে ফুলিকে দেখিতে পাইবার আশা করে, কিন্তু পায় না।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে, লালধনের দৃষ্টির সামনে সাহেবের তাঁবুটা ঝাপসা হইয়া উঠে, তবু সে আশা ছাড়ে না, তবু তার হাতের মুঠো শিথিল হয় না, দৃষ্টি সজাগ থাকে।

আকাশে অগণ্য তারা উঠে, গাছের পাতা কাঁপাইয়া ঠাণ্ডা বাতাস বহিয়া যায়, রাত্রি বাড়িয়া চলে। লালধন সন্তর্পণে ঝোপ হইতে বাহির হইয়া আসে, নিঃশব্দে সাহেবের তাঁবুর সামনে আসিয়া

দাঁড়ায়, ভিতরে হারিকেনের অল্প আলোয় সাহেবকে দেখিতে পায়, কিন্তু আর কাহাকেও দেখিতে পায় না। লালধন পিছাইয়া আসে, তবে কি ফুলি এখানে নাই? আমগাছটার গুঁড়ির পাশে আসিয়া দাঁড়ায়—ফুলিকে না মারিলে তাহার বুকের আগুন নিভিবে না। সাঁওতালের ছেলে যখন প্রতিহিংসা লইতে বাহির হয় তখন সহজে সে ফেরে না। দাঁতে দাঁত চাপিয়া একটা ভয়ঙ্কর শপথ করে।

গভীর রজনীর গাঢ় অন্ধকারে রক্তলোলুপ একটা হিংস্র পশুর মত লালধন সাহেবের তাঁবুর চারিদিকে নিঃশব্দে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাঁবুর ভিতরে একটু শব্দ হইলে সে চুপ করিয়া দাঁড়ায়, কান পাতিয়া শোনে, আবার সরিয়া যায়।

ঘণ্টার পরঘণ্টা কাটিয়া যায়, দীর্ঘ রাতও শেষ হইয়া আসে। আমগাছের গুঁড়িটায় ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া লালধন মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে। ফুলি তাঁবুতে নাই, ছাউনিতেও নাই, থাকিলে তাহার দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে পারিত না, দিন রাত্রের মধ্যে তাহাকে একবারও দেখিতে পাইত। ফুলি এখানে নাই, অন্য কোথাও লুকাইয়া আছে, মেয়েমানুষের শয়তানীর কাছে সে হারিয়া গেল। এইবার নিজের উপর তাহার রাগ হইল, মনে হইল যেন সে-ই অপরাধী, সে-ই অপদার্থ—একটা কঠিন দণ্ড তাহারই প্রাপ্য।

২৩

পা যেন আর তাহার দেহের বোঝাটাকে বহন করিতে পারে না—ধীরে ধীরে লালধন ঘরের দিকে ফিরিয়া আসে। জন্মাবধি এই অরণ্যপ্রান্তর সে দেখিয়াছে, আজ সে তাহাদের কিছুই চিনিতে পারে না। অরণ্যহীন কঙ্করময় টাঁড়গুলি একে একে পার হইয়া সে সোনামুক্ত নদীতে নামে। আজ নদীতে একহাঁটু জল। নদীর ওপারে বড় বনের অবশিষ্ট একটুখানি বন, তাহার ভিতর দিয়া লালধন চলে, সে চলার কোন তাগিদ নাই, কোন উদ্দেশ্য নাই—কোথায় যাইতেছে তাহাও বোধ হয় সে জানে না।

বেলা প্রায় দুপুর, লালধন জোড়া মহুয়াতলায় আসিয়া দাঁড়ায়। একটা গভীর ক্লান্তি আসিয়া তাহার সর্বাঙ্গ গ্রাস করে, সে সেইখানে বসিয়া পড়ে। সে যেন স্থান কালের অতীত হইয়া গিয়াছে, বাতাস বয়, অরণ্য মর্মর করিয়া উঠে, গাছের ডালে ঘুঘু ডাকে, মহুয়া-গাছের ছায়া দীর্ঘতর হয়, সে কিছু দেখিতেও পায় না, শুনিতেও পায় না।

হঠাৎ তাহার চৈতন্য ফিরিয়া আসে, আশ্চর্য হইয়া ভাবে—সে কি মরিয়া গিয়াছে, না বাঁচিয়া আছে। পৃথিবী আবার তাহার চোখে পড়ে, চাহিয়া চাহিয়া দেখে তাহার ছোট ঘরখানার ঝাঁপের দরজা খোলা পড়িয়া আছে, ওপাশে ফুলিদের ঘরখানার চাল একটা লতায় ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, গোটা দুই শালগাছের আড়ালে মিতান মাঝির ঘর আর নদীতে যাইবার আঁকাবাঁকা সরু পথ। সে ভাবে এসব ঘরের ভিতরে বাহিরে যে এত হাসি-গান আনন্দ-উৎসব ছিল তাহা কোথায় গেল? এ এক রহস্য বটে। পল্লীর প্রত্যেককে তাহার মনে পড়ে, মাতাল মিতান মাঝি, গুণী সোমর মাঝি, শিকারী মাঝিল মাঝি—মনে পড়ে তাহার বাপকে।

লালধন চমকিয়া উঠে, সে যেন একেবারে একা, খুঁজিলেও কাহাকে দেখিতে পাইবে না, ডাকিলেও কাহারও সাড়া পাইবে না।

লালধন উঠিয়া দাঁড়ায়, তীর ধনুক ও টাঙ্গীখানা লইয়া নদীতে যাইবার পথ ধরিয়া চলে। বৃষ্টির ফলে নদীতে ঢল নামিয়াছে, বালুচরের দীর্ঘ পিপাসা মিটিয়া গিয়াছে, ঘোলা জল কলকল শব্দে ছুটিয়া চলিয়াছে—লালধন নদী পার হইয়া যায়, ওপারের উঁচু টিলাটার উপর উঠে, প্রকাণ্ড অর্জুন গাছটার নীচে আসিয়া দাঁড়ায়। হঠাৎ সে চিৎকার করিয়া ডাকে, 'বাবা, বাবা, বাবা হো'। তাহার দুই চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়ে, সে আবার ডাকে, 'বাবা, বাবা, বাবা হো'। অরণ্য শব্দহীন, কেবল অর্জুন গাছের পাতা বাতাসে ঝর ঝর আওয়াজ করে।

সমাপ্ত

চিরন্তন রাখী

শ্রীঅরুণবরণ চক্রবর্ত্তী

"যে মুহূর্ত্তে পূর্ণ তুমি সে মুহূর্ত্তে নাই"
—রবীন্দ্রনাথ

সৃষ্টি শুধু নয় সব। যেথা পরিণতি সেথা শেষ।
যে মুহূর্ত্তে পূর্ণতার শীর্ষবিন্দুটিরে ফেলে ছুঁয়ে
প্রেমের প্রদীপ-শিখা, হ'ল প্রেম তখনি নিঃশেষ,
সবকিছু গেলো উবে মরণের শুধু এক ফুঁয়ে।

চিরন্তন করিবারে যদি চাও আমাদের প্রেমে,
শোন প্রিয়া, ধরা তবে নাহি দিও—আমিও দেব না।
যতই কাঁদুক বুক—বাহু ঘিরে যদি আসে নেমে
অজগরসম রোষ—কারো কাছে কেহ আসিব না।

নিঃশব্দ নিশুতি রাতে দু'জনারে ভাবিব দু'জনে,
গভীর দুঃখের দিনে হৃদয়-বেতারে ডাকাডাকি,
দু'জনাই পঞ্চমুখ দু'জনার প্রশংসা-গুঞ্জনে,
হাতে নয়—মনে মনে বাঁধ প্রিয়া চিরন্তন রাখী।

কাছে যদি আসি কভু—দূরে দূরে সরে থাকা চাই,
যে মুহূর্ত্তে দেহস্পর্শ, পূর্ণ প্রেম সে মুহূর্ত্তে নাই।

সাহিত্যে আদর্শের ধারা

শ্রীপ্রেমকুমার চক্রবর্ত্তী

সাহিত্যে আদর্শবাদ বিষয়টি এত ব্যাপক ও বিস্তৃত যে, অল্প কথায় ইহার তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ এবং ইহার ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের পর্য্যায় আলোচনা করা সম্ভবপর নয়। আমি সংক্ষেপে ভারতীয় এবং বিশেষভাবে বাংলা সাহিত্যে আদর্শবাদের বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। দুই-এক স্থলে মাত্র ইংরেজী ও অন্যান্য ইউরোপীয় সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা করিব। বাস্তববাদই বড় কিংবা আদর্শবাদই বড় ইহার মীমাংসা করা কঠিন ও সময়সাপেক্ষ, ইহা এখানে আলোচ্য নহে। কিন্তু আদর্শ ছাড়া যে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টি হয় না, সাহিত্য চিরন্তন ও শাশ্বত হয় না তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব মাত্র। আমাদের সম্মুখে বস্তুরূপ মৃত্তিকা ত রহিয়াছেই, কিন্তু তাহাই নিপুণ শিল্পীর হস্তে আদর্শের অনুরূপ গড়িয়া উঠে। বাস্তবতা আদর্শে রূপায়িত হইয়াই সাহিত্যের সৃষ্টি।

ধর্ম্মবিষয়ক, রাজনৈতিক, জাতীয়তাবাদমূলক বা স্বদেশ-প্রীতি-উদ্বোধক, সামাজিক প্রভৃতি বিভিন্ন আদর্শ বিভিন্ন রূপে সাহিত্যে রূপায়িত হইয়াছে। সর্ব্ব প্রকারের আদর্শ পৃথক পর্য্যায়ে কি ভাবে সাহিত্যে রূপায়িত হইয়াছে তাহা দেখাইতে হইলে একটি বিরাট গ্রন্থ রচনা করিতে হয়। সেইজন্য মোটামুটি সামগ্রিক ভাবে আদর্শের ধারা কি ভাবে আসিয়াছে তাহাই বলিতেছি। আমাদের দেশে আদর্শবাদের একটি বড় রূপ—আস্তিক ও পরমাস্তিক রূপ; তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে আদর্শবাদের সূচনা।

সাহিত্যে আদর্শবাদ আলোচনার পূর্ব্বে আমাদের জানা প্রয়োজন বাস্তববাদ ও আদর্শবাদের পার্থক্য কোথায়? দর্শন-শাস্ত্রে বহু মতবাদ আছে, তাহার মধ্যে দুইটি—বাস্তববাদ ও আদর্শবাদ। প্রথমটিতে যে সমস্ত বাহ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও প্রত্যক্ষ ভাবে জ্ঞাত বা অনুভূত তাহারই অস্তিত্ব স্বীকৃত। অপরটির মতে বস্তুর প্রকৃত অস্তিত্ব আমাদের মানসলোকে, মনন দ্বারাই বস্তু আমাদের নিকট জ্ঞাত ও প্রতীত হয়। আমাদের আলোচ্য বিষয় দর্শনশাস্ত্র নহে, কাজেই এই দুই মতবাদের বিস্তারিত বিবরণ ও ব্যাখ্যা দেওয়া এখানে সম্ভবপর নহে; তবে মোটামুটি দুইটি মতবাদের মূল ভিত্তি এই। প্রাচীন কাল হইতে পৃথিবীর ইতিহাসে যে সাহিত্য রচিত হইয়াছে তাহা কোনও বিশেষ মতবাদের সমর্থক রূপে সৃষ্ট নয়। তাহার অধিকাংশই আদর্শবাদমূলক অথবা আদর্শ ও বাস্তবের সংমিশ্রণ এবং বর্ত্তমান যুগের আদর্শ বলিয়া গৃহীত।

জড় ও চেতনে, মৃত্যু ও জীবনে, বাস্তব ও আদর্শে সমগ্র বিশ্বে চিরন্তন সংঘর্ষ এবং দ্বন্দ্ব। একটি অপরটির সহিত ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত। চেতনা আছে তাই জড় অনুভূত, জীবন আছে তাই মৃত্যুর পরিচয়। যাহা আছে যাহা পাওয়া যায় তাহা জানিয়া মানুষ যাহা পায় নাই যাহা আকাঙ্ক্ষিত দুর্ল্লভ তাহারই অনুসন্ধান করে। আমাদের চক্ষুর সম্মুখে জড় জগৎ, বাস্তব সমাজ, সংসার, বিভীষিকাময় দুঃখ-ক্লেশ ও জরা-মৃত্যু। ইহা জানিয়াও ভারতের প্রাচীনতম সাহিত্যে ধ্বনিত হইল, "অসতো মা সদ্গময়"! 'অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যের পথে লইয়া যাও।' তবে কি এই বাস্তব জগৎ সত্য নয়? আমাদের দেশের প্রাচীনতম সাহিত্য সৃষ্টি এই প্রশ্ন লইয়া। বেদের ঋষিরা বাস্তবকে উপেক্ষা করেন নাই, কিন্তু আদর্শের সন্ধান করিয়াছেন। তাঁহারা বলিলেন, "ত্বমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি," সেই চিরন্তন আদর্শ সত্য সুন্দরকে জানিয়াই মানুষ মৃত্যুকে অতিক্রম করে; "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়,"—ইহা ভিন্ন অন্য কোনও পথই নাই। তাঁহারা বলিলেন—

"যস্য ছায়ামৃতং, যস্য মৃত্যুঃ
তস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।" (ঋক্)

অর্থাৎ—জীবন ও মৃত্যু যাঁহার ছায়া সেই দেবতার শ্রীচরণেই আমরা হবি (অর্থাৎ অর্ঘ্য) অর্পণ করি। আমাদের প্রাচীনতম সাহিত্য চরম আদর্শবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। বৈদিক সাহিত্যের আদর্শ বেদান্ত, ব্রাহ্মণ প্রভৃতিতে প্রতিফলিত।

পৌরাণিক যুগে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির বহু বাস্তব ও অলৌকিক কাহিনীর মধ্যেও আদর্শবাদের বিকাশ। মহাভারতের আদর্শ শ্রীকৃষ্ণের বাণীতে গীতায় নিষ্কাম কর্ম্মে রূপায়িত। পৌরাণিক যুগের বহু কাহিনীকে কেন্দ্র করিয়া ভারতের বিরাট সাহিত্য রচিত হইয়াছে। এই সমুদয় সাহিত্যই বিশেষ আদর্শে সৃষ্ট ও আদর্শবাদী। বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যে প্রাচীন যুগের বিশেষ বিশেষ চরিত্রের উল্লেখ তুলনামূলক ও রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়।

পরবর্ত্তী যুগে কালিদাসাদি কবির কাব্যে এই সাহিত্য-স্রোতধারা নূতন পথে রূপ রস গন্ধের মাধুর্য্যে ভরিয়া উঠিল। শকুন্তলা-কাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, কালিদাস স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মিলন ঘটাইয়াছেন; বাস্তব ও আদর্শে সেতু-বন্ধন করিয়াছেন। শকুন্তলা-চরিত্র প্রকৃতির

সহিত একীভূত স্বাভাবিক বিকাশ। তরুলতা, পশুপক্ষী সকলের সহিত সে এক; অথচ স্বাভাবিক মানবীয়তা ও নারীত্ব উজ্জলরূপে প্রস্ফুটিত। দুষ্যন্ত-শকুন্তলার বহির্জগতের মিলনকে দুঃখ-খনিত পথ দিয়া লইয়া কবি তাহাদের অন্তরের মিলনকে সার্থক রূপ দিয়াছেন। বেদনা এবং অনুতাপেই দুষ্যন্তের তপস্যা ও প্রেম সার্থক হইয়াছে, বাস্তব হইতে আদর্শে পরিণতি ঘটিয়াছে। ইংরেজী সাহিত্যে সেক্সপীয়রের 'টেম্পেষ্ট' নাটকে মিরাণ্ডা-চরিত্রে সেই সম্পূর্ণতা নাই।

এই যুগের পর বহুদিন পর্য্যন্ত ভারতীয় সাহিত্য প্রাচীন সংস্কৃত ধর্ম্মতত্ত্ব অথবা পৌরাণিক কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া চলিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে প্রাচীন ধর্ম্মের আদর্শ অথবা পৌরাণিক চরিত্রের আদর্শ ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টাই দেখা যায়। সংস্কৃত ভাষার বেষ্টনী ছাড়াইয়া পৌরাণিক কাহিনীর আবর্ত্ত হইতে মুক্ত হইয়া ঠিক কোন্ সময় সর্ব্বসাধারণের সাহিত্য রচিত হইয়াছে তাহা বলা কঠিন। যে সময়ই হউক তাহা যে কোনও আদর্শবাদ এবং কোনও আদর্শের প্রেরণারই প্রতিক্রিয়া সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

আমাদের দেশের সাহিত্যে এবং বাংলা ভাষাতেও কাব্য-সাহিত্যই প্রাচীনতম। গদ্য সাহিত্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক। অতি প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্যের নিদর্শন চর্য্যা-গীতি বা চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়। ইহা সঙ্গীতমালা। ইহা ভিন্ন যাহা পাওয়া যায় তাহা দোহা-সংগ্রহ। বৌদ্ধ সহজ সাধনার গূঢ় ইঙ্গিত ও তদনুযায়ী জীবনাচরণের আনন্দকে সাধারণ স্তরের মানুষের মধ্যে সহজবোধ্য চলিত ভাষায় ব্যক্ত ও প্রচার করিবার উদ্দেশ্যেই ইহার সৃষ্টি। বিভিন্ন দোহাও অনুরূপ-ভাবে বিভিন্ন আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যেই রচিত। ইহাদের মধ্যে অতীত যুগের রাজরাজরার-গৌরবের কাহিনীও যে কিছু কিছু না থাকিত তাহা নহে। কিন্তু ইহার পরে নব উন্মেষিত বাংলা-সাহিত্যে যাহা বাংলার প্রাণ স্পর্শ করিল তাহা কৃষ্ণ-লীলার কাহিনী। চর্য্যাগীতি, দোহা ও জয়দেবের গীত-গোবিন্দের ধারায়ই পরবর্ত্তীকালে বৈষ্ণব পদাবলীর সৃষ্টি হইল।

পালরাজাদের গান, নাথ-গীতিকা, ধর্ম্মপূজার পুঁথি, গীতিকথা, রূপকথা ও পল্লীগাথা—বস্তুকে সম্মুখে রাখিয়া আদর্শের বিচিত্র রঙে কল্পনার তুলিকা বুলাইয়াছে। এই সাহিত্য রাজপুত্র রাজকন্যার কাহিনীর ন্যায় শৈশবে, বাল্যে, যৌবনে, এমন কি বার্দ্ধক্যেও স্বপ্নের মায়াজাল বুনিয়াছে—বাংলার সেই যুগে। তবুও বুঝি মন খুঁজিয়া বেড়াইত আরও কিছু পাইতে।

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির কাব্যে ঝঙ্কৃত হইল—বস্তু অপেক্ষা আদর্শ বড়, প্রাপ্তি অপেক্ষা ত্যাগ বড়। সকল দুঃখ-বেদনাই মধুর যখন প্রেমের প্রদীপ প্রজ্বলিত হয়। "জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল"; কই অরূপের সন্ধান ত পাওয়া গেল না! যখনই মনে করিয়াছি তোমার রূপ হেরিলাম, তোমায় নিকটে পাইলাম—অন্তর ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল, তোমায় পাওয়া যে বড় দুঃখের? যখন হারাইলাম জীবনের দুঃখ বেদনা পুষ্পের মত প্রস্ফুটিত হইল,—এই দুঃখ-বেদনা যে তোমারই বিরহে, তাই ত দুঃখ বেদনায় এত সুখ এত আনন্দ। আমার কলুষ স্পর্শ হইতে তোমায় দূরে রাখিতেই চাই; "লাখ লাখ যুগ" এই বেদনাতেই কাটুক। বিদ্যাপতি গাহিলেন:

> পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে,
> মঙ্গল আচার করব নিজ দেহে।
> বেদী করব হাম আপন অঙ্গমে,
> ঝাড়ু দেহব তাহে চিকুর বিছানে।

'প্রিয় যখন আমার গৃহে আসিবেন তাহার আগে আমার এই নিজ দেহে মঙ্গল আচার না করিয়া কি থাকিতে পারি? এই অশুচি দেহ মন লইয়া ত তাঁহার সেবা হয় না। আমার এই অঙ্গে তাঁহার বেদী স্থাপন করিতে হইবে—তাঁহার স্থান যে আমার অন্তরে। আমার দেহে, অন্তরে 'ঝাড়ু' দিয়া মলিনতা দূর করিব; আমার কেশ ছেদন করিয়া দেহে 'ঝাড়ু' দিব। আমি জানি না কেমন করিয়া আমার হৃদয় দেহ শুচি করিব।'

দূর গ্রামের পথে প্রভাতে, মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যার আধ-অন্ধকারে বাউল গান গাহিয়া চলে, একতারার তার ঝঙ্কার তোলে—"খাঁচার মধ্যে অচিন পাখী কমনে আসে যায়"। উদাস মনে কান পাতিয়া শুনি—কোন যুগান্তের কি অব্যক্ত বাণী ভাষা না পাইয়া আকাশে-বাতাসে কি যেন কি কথা বলিতে চায়। যাহা প্রকাশ করিতে চায় তাহা বলিতে ভাষা পায় না। যুগে যুগে তাই নব নব সুর, ছন্দ, তাল, রাগিণী, নব নব ভাষা ও সাহিত্যরস সৃষ্টি। তবুও যেন পরিষ্কার বলা হইল না, মনের খেদ মনে রহিল। সাহিত্য রহিল চির আদর্শের বাহনরূপে।

ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী সাহিত্যের স্রোত-ধারা এদেশে প্রবেশ করিল। সেই সঙ্গে বাংলাদেশে গদ্য সাহিত্যেরও আবির্ভাব হইল।

ধর্ম্মতাত্ত্বিক ও সামাজিক নানা সমস্যার দ্বন্দ্বে রাজা রাম-মোহন রায় এই নূতন গদ্য সাহিত্যের পথ উন্মুক্ত করিলেন। একান্তই সামাজিক ও ধর্ম্মতাত্ত্বিক আদর্শের প্রয়োজনে এবং বাদ-প্রতিবাদকে কেন্দ্র করিয়া ইহার উদ্ভব। প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টীয় প্রচার-কেন্দ্র হইতে প্রচারিত

পুস্তিকা সমষ্টির দামও বাংলা গদ্যসাহিত্যে কম নহে। উভয়ই বিপরীত আদর্শপন্থী।

বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম প্রায়-উপন্যাস ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "নববাবু বিলাস" তদানীন্তন নব-সৃষ্ট ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের চিত্র। তাহার পর প্যারীচাঁদ মিত্রের (ছদ্মনাম টেকচাঁদ ঠাকুর) "আলালের ঘরের দুলাল" ও কালীপ্রসন্ন সিংহের "হুতোম প্যাঁচার নক্সা"। তিনখানির বিষয় বস্তু অনেকটা এক ধরণের এবং প্রায় একই আদর্শে রচিত। বর্তমান যুগের মাপকাঠিতে ইহাদের রসসৃষ্টিকে সর্বত্র উচ্চ শ্রেণীর বলা চলে না। কেবলমাত্র বাস্তব চরিত্র অঙ্কন অথবা জীবন পর্য্যবেক্ষণই উচ্চাঙ্গের সাহিত্য নহে। মানব জীবনের জটিলতা ও মহত্ত্ব সম্বন্ধে একটা গভীর ও ব্যাপক ধারণা বা চেতনা যদি পাঠকের মনে না ফুটিয়া উঠিল তাহা হইলে সাহিত্য সৃষ্টি সার্থক হইল কিরূপে? বস্তুর প্রতিকৃতি অঙ্কন, সে তো নিছক ফটোগ্রাফী—সেখানে প্রাণের স্পন্দন নাই। শিল্পীর অঙ্কিত চিত্রে ভাবের ও চরিত্রের আভা ফুটিয়া উঠে। তাই এই সব রচনার মধ্যে যতখানি সামান্য আদর্শ ছিল সেইটুকু পাঠকের মনে রেখাপাত করিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্র বিচিত্র কাহিনীর সমাবেশে মানসরাজ্যের চরিত্র ফুটাইয়া তুলিলেন। তাঁহাদের অনেক কাহিনীই ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত। উভয়ের মধ্যেই আদর্শবাদ পরিস্ফুট। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা উন্নততর এবং তাহাতে বাস্তবতা ও আদর্শের সাম্য অধিকতর রক্ষিত। বাস্তব চরিত্রে আদর্শের তুলিকায় তিনি প্রাণ স্পন্দন আনিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের গোবিন্দলাল, ভ্রমর, বিমলা, আয়েষা প্রভৃতি চরিত্র এক একটি বিশেষ আদর্শের প্রতিরূপ।

রবীন্দ্র যুগে উপন্যাসে ঐতিহাসিকতা গৌণস্থান অধিকার করিল। সামাজিক উপন্যাসের আবির্ভাব হইল এবং সূক্ষ্মতর ও জটিলতর চরিত্রের দ্বারা ব্যাপকতর সাধারণ সামাজিক মানুষের বাস্তব ও স্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ উহাদের স্থান গ্রহণ করিল। বহির্দৃষ্টিতে বাস্তববাদের রূপ কতকটা গ্রহণ করিলেও মনস্তত্ত্বের দিকে ইহা বিচিত্র আদর্শবাদের একটি নব রূপ মাত্র। "নৌকাডুবি"কে বাস্তবতাপ্রধান উপন্যাসের প্রথম প্রয়াস বলা হয়। কিন্তু এই বাস্তবতা সাহিত্য সৃষ্টির আদর্শকে ছাপাইয়া উঠিতে পারে নাই। "গোরা"তে বিশেষ আদর্শই ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পেও বিভিন্ন আদর্শ পরিস্ফুট।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যেই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর আদর্শ ফুটিয়াছে। বিখ্যাত মনীষী ও দার্শনিক হ্যামিলটন এক স্থানে বলিয়াছেন,

"Nature conceals God and man reveals Him."

অর্থাৎ—প্রকৃতি সত্য সুন্দরকে আচ্ছাদিত করিয়া প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখে, মানুষ নানা ভাবে তাঁহাকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে। নানা সুরে নানা ছন্দে তাই তাঁর কাব্য-বীণা ঝঙ্কৃত হইয়াছে। শ্রাবণের ঘন বরিষণে বাদল বাউল গান বাজাইয়াছে, শারদ প্রাতে অরুণ আলো বর্ষাস্নাত ধরিত্রীর গাত্রে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, বসন্তে পাখী ডাকিয়াছে, ফুল ফুটিয়াছে, বাঁশী বাজিয়াছে, গ্রীষ্মের তপ্ত দিবস দারুণ অগ্নিবাণ হানিয়া হৃদয়কে তৃষাহত করিয়াছে, মধ্যাহ্নের কপোত কপোতীর কূজন মনকে উদাস করিয়াছে। রূপের মধ্যে অরূপ, সীমার মধ্যে অসীম প্রকাশিত হইয়াছেন। পুষ্প ও তাহার সৌন্দর্য্য যেমন পৃথক নয়, বাস্তব ও আদর্শ তেমনই একীভূত হইয়াছে সাহিত্য সৃষ্টিতে। জীবের আত্মিক, পরমাত্মিক এবং বাস্তবের বিচিত্র মিলন তাঁহার সাহিত্যক্ষেত্র।

সাহিত্যের এই একই ধারায় আসিলেন শরৎ চন্দ্র। তাঁহার বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি, বড়দিদি, স্বামী, নিষ্কৃতি প্রভৃতি রচনা বাঙালী পরিবারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ ও ঘাত-প্রতিঘাতের কাহিনী। বাস্তব ও আদর্শ অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। সামাজিক আদর্শ ও তাহার বিবর্তন কাহিনীগুলিতে প্রতিফলিত। রমা কি বলিতে চাহিয়াছিল? সে কি বলিতে চাহিয়াছে—

"মন চায় চক্ষু না চায় এ কি তোর দুস্তর লজ্জা?"

অথবা সে কি বলিতে চাহিয়াছে—

"চাহি না চাহি না যতবার বলি—
চাহি না সুহৃৎ চাহি না সখা?"

কোনটাই জানা যায় নাই। ইহাই সমস্যা—ইহাই শরৎ চন্দ্রের সাহিত্যরস সৃষ্টি।

শরৎ সাহিত্যে অন্য একটি বাস্তব দিক চরিত্রহীন, শ্রীকান্ত প্রভৃতিতে। ইহাতে কি আদর্শবাদ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে? কখনই নয়। প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ কিংবা আকস্মিক বিপর্যয় পৃথিবীর দৈনন্দিন স্বাভাবিক ঘটনা নয়। ইহা ঘটে সত্য। দুর্ব্বল ভিত্তর কোনও কোনও গৃহ ইহাতে ধ্বংস হইতে দেখা যায়; কিন্তু দৃঢ় পাকা ইমারতের কোনও ক্ষতি হয় না। ইহার মূলেও আদর্শবাদ। বাস্তব ঘটনার পশ্চাতে নূতন আদর্শের ইঙ্গিত।

নর ও নারীর যৌন চেতনাবোধ এবং তাহাকে কেন্দ্র করিয়া এক শ্রেণীর বাস্তব উপন্যাস রচিত হইয়াছে। যাহারা মনোজগতের আদর্শকে বাদ দিয়া, বাস্তববাদের দোহাই দিয়া, কাঙালবৃত্তিতে পথের কুড়ানো উচ্ছিষ্ট লইয়া কেবল দৈহিক ক্ষুধার নিবৃত্তিতেই মানুষের পরিচয় অন্বেষণ করে তাহারা মানুষের সত্য পরিচয় পায় নাই। আবর্জনা যে থাকে তাহা

আকর্ণ ধনুরাসন

হনুমান-আসন
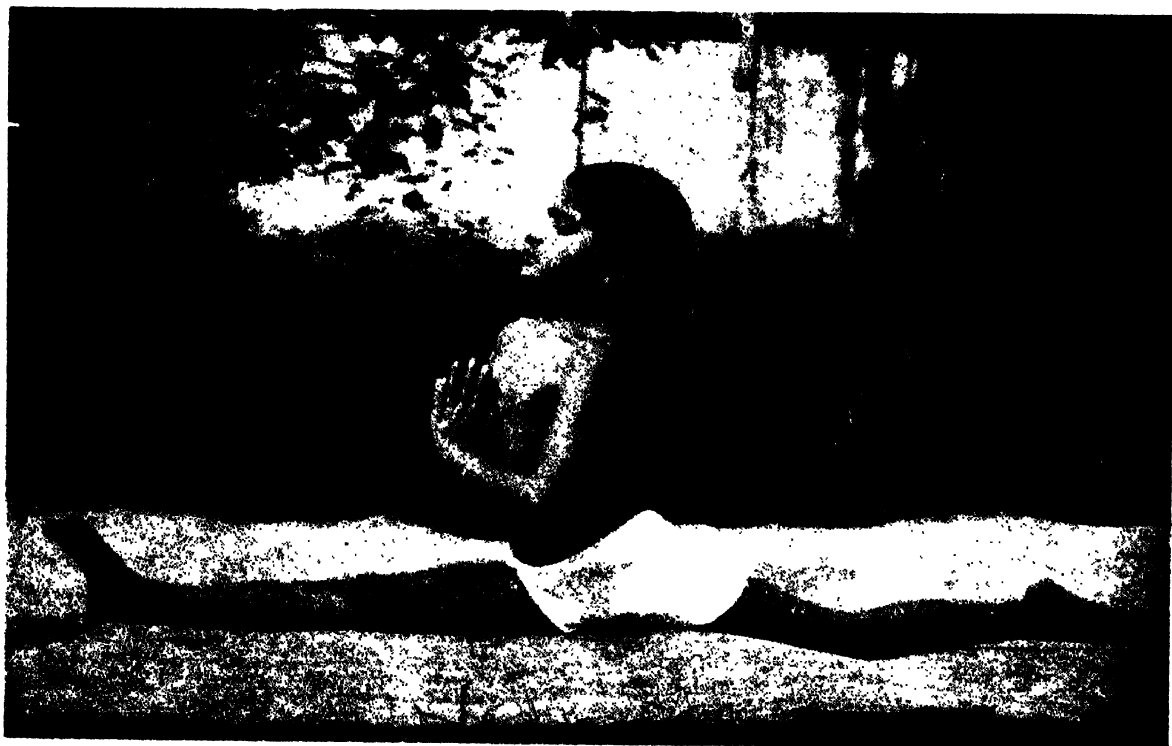
সত্য, কিন্তু পথে সেই আবর্জ্জনার রূপে আকৃষ্ট হইয়া কেহ অপেক্ষা করে না। বাস্তবকে বাদ দিয়া সংসার চলে না সত্য, কিন্তু আদর্শ ছাড়া সমাজ সংসার পশ্চাতে পড়িয়া থাকে, সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারে না। ফরাসী বিদ্রোহের প্রাক্কালে রুশো, ভল্টেয়ার প্রভৃতি তাঁহাদের লেখায় যে আদর্শের সুর ধ্বনিত করিয়াছেন পরবর্ত্তী যুগে তাহার প্রতিধ্বনি ইউ-রোপের ইতিহাস বদলাইয়া দিয়াছে। আনন্দমঠের 'বন্দে-মাতরম্' ধ্বনি নিখিল-ভারতে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। উচ্চাঙ্গ পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে নরনারীর আকর্ষণ, জীবনের ক্ষুধা-তৃষ্ণা, আনন্দভোগ আছে; কিন্তু আদর্শও আছে। তাঁহাদের চরিত্রে "Crucifixion" অর্থাৎ সংহার ও পতন যেমন একটি দিক, অপর দিকে তেমনি 'Resurrection' বা পুনর্জ্জীবন—সত্য প্রেমে ও আত্মাহুতিতে। অনুকরণে সেই আদর্শ বহু ক্ষেত্রে বিকৃত রূপ গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং আদর্শ চিরদিনই আমাদিগকে প্রেরণা দিয়াছে।

পৃথিবীর সর্ব্ব দেশে সর্ব্ব সাহিত্যেই আদর্শ বাস্তবকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। আদর্শ ছাড়া সত্যকার সাহিত্য সৃষ্টি হয় না, সমাজ গড়িয়া উঠে না, বিবর্ত্তিত হয় না। বাস্তব ও আদর্শ – দেহ ও প্রাণ।

অতি-আধুনিক

শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রুক্ষ চৈতালী দুপুরের ঝল্‌সানো রোদের বন্যা,
যেন প্রবল ধারায় নেমে এসেছে
সৌর-মণ্ডলের নাভিগর্ভ থেকে
শীর্ণ, পেটের-চামড়া-ঝুলে পড়া, আল্‌সে
ঘেয়ো কুকুরটার সঙ্গে
পাল্লা দিয়ে ঝিমুচ্ছে
জরা-জর্জ্জর আন্ধিবুড়ী পৃথিবী—
এ কবিতা আধুনিক
—অতি-আধুনিক
অকালের ক্ষণজন্মা কবি
শূন্যকুম্ভ অন্তসারহীন—
শব্দের তাণ্ডবে কাব্যলোকে হুলুস্থুল হানে।
শুধু সুসজ্জিতা শব্দ-যুবতীর সারি রূপ গুণ লজ্জা কিছু নেই।

সকলের চোখের আড়ালে সকলের জানা গুপ্তপ্রেম
ঢাক পিটিয়ে ছর্‌কট্ট করা কবিতা—
প্রেমের নিগূঢ় প্রগাঢ়তা
স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য
কল্লোলের কাগজ
আর কুষ্টিফ্রন্ট—
রসভাণ্ডার কেঁপে উঠেছে পড়ন্ত রোদ-খাওয়া
তরল রসভাণ্ডের গ্যাঁজলায়, কটুগন্ধে—
এটুকুই সব নয়
আরো আছে—
অনাদির সীমালগ্ন অনন্তের পার
বিপুল বিস্তার
কালাতীত অখণ্ড মণ্ডল
আজও ঘুরছে
ঠিক যেমন
দিন-ক্ষণের জন্মের আগের দিনেও ঘুরতে—
তারই একদিকে
যেখানে সব দিগ্‌বিদিক হারিয়ে যায়
সেইখানে—পৃথিবীর পিঠে
একটা দুষ্ট ব্রণের ফেটে-পড়া ক্ষতচিহ্ন
সৃষ্টি করেছে একটা কোণ—
বিকলাঙ্গ দৃষ্টিকোণ—
মনে হয় এই বুঝি সব—
অথ-ছন্দ-বিরাম-বিহীন অভিব্যক্তি
অভাবনীয়তার
অসম্ভব্য ছন্দ-লয়হীন
প্রলাপের প্রগল্‌ভ প্রাচুর্য্য
আকস্মিক বিহ্বলতায়
থমকে
থেমে গেছে—
কিন্তু ভুল ভেঙে যায়
কাব্যশীতলার উন্নাসিক দ্বিপদ বাহন
অতি আধুনিক কবিওয়ালার
বেপরোয়া 'বুম'করা কাব্যের আরবে।
আধুনিক শীতলার সরস্বতী সাজ
আর
অতি-আধুনিক
একক কবিদের-জনতা—
নরলোক
বাক্যহারা, বিহ্বল, বেকুফ।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[কলিকাতায় কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে 'স্বাগতা রেস্তোরাঁ'। রেস্তোরাঁটি মাঝারি ধরণের। দৃশ্যের এক পার্শ্বে প্রবেশ-দ্বার, মধ্যস্থলে ম্যানেজারের কাউণ্টার এবং অপর পার্শ্বে কেবিন অবস্থিত। লোকজন আসিতেছে, খাইতেছে, যাইতেছে। প্রবেশপথে পরিচারক লোকজনদের সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বিপরীত পার্শ্বে অবস্থিত কেবিনে লইয়া যাইতেছে। খাওয়া শেষ হইলে কেহ কেহ কাউণ্টারে আসিয়া ম্যানেজারের নিকট নিজেই বিলের টাকা দিয়া যাইতেছে। রেস্তোরাঁ-বিলাসীরা সাময়িক ঘটনা সম্পর্কে নানা প্রকার মন্তব্য করিতেছে। কখনও উত্তেজনাপূর্ণ, কখনও বা মুখরোচক রহস্যালাপে কাউণ্টারের সম্মুখবর্তী গমনাগমনের পথটি মুখরিত।]

হেড বয়। (ম্যানেজারকে) সাত নম্বর বিল চাইছে। চা দুটো, টোষ্ট চারটে।

[ম্যানেজার বিল করিয়া হেড বয়ের হাতে দিল।]

ম্যানেজার। এক ঘণ্টা বসে দু'জনে মাত্র ন' আনা! কলেজের ছোকরা তো?

হেড বয়। হাঁ, মোহনবাগান আর ইষ্টবেঙ্গল···চায়ের টেবিলেই এক রাউণ্ড হয়ে গেল।

[হেড বয় বিল লইয়া চলিয়া গেল।]

দুই জন খদ্দেরের প্রবেশ।

বয়। আসুন স্যার, আসুন।

প্রথম ব্যক্তি। কেবিন খালি আছে?

ম্যানেজার। তিন নম্বরে নিয়ে যাও।

প্রথম ব্যক্তি। (বয়ের সহিত যাইতে যাইতে দ্বিতীয় খদ্দেরের প্রতি) ওদিকে কোরিয়া এদিকে কাশ্মীর—বাজারের অবস্থা হয়েছে 'বল মা তারা দাঁড়াই কোথা?'

দ্বিতীয় ব্যক্তি। আমি বলছিলাম কি—লোহাটাই ভাল করে ধরা যাক।

[উভয়ে ভিতরে চলিয়া গেল। হেড বয় আসিয়া দাঁড়াইল।]

ম্যানেজার। [হেড বয়কে] শেয়ার মার্কেট। একটু ভাল করে দেখাশোনা করো।

হেড বয়। যাচ্ছি। তা আজকাল শেয়ার মার্কেটেও ঐ দু-কাপ চা। বড় জোর দুটো ডেভিল।

[হেড বয় চলিয়া গেল। কলেজের ছেলে দুটি ভোজন-শেষে চলিয়া যাইতেছে।]

প্রথম ছাত্র। তবু বললাম, দেখে নিও—ঐ ইষ্টবেঙ্গল ওস্তাদের মার মারবে শেষ রাত্রে।

দ্বিতীয় ছাত্র। রাখ রাখ। মোহনবাগানের দিনরাত সমান। চালাকি চলবে না। [উভয়ের প্রস্থান।]

ম্যানেজার। বেঁচে থাক বাবা ইষ্টবেঙ্গল মোহনবাগান। তবু চায়ের দোকানগুলো বাঁচিয়ে রেখেছে।

[হেড বয় আসিয়া দাঁড়াইল।]

হেড বয়। খদ্দের বটে তেরো নম্বর।

ম্যানেজার। কেন? কি হ'ল?

হেড বয়। গ্রোগ্রাসে গিলছে মশাই।

ম্যানেজার। তেরো নম্বর—[খাতা দেখিয়া] রাইস-কারি এক প্লেট, ফাউল কাটলেট দুটো, চিকেন রোষ্ট একটা। সাড়ে সাত টাকা হয়েছে।

হেড বয়। না, না—বিল চাইছে না—খেতে চাইছে আরও। মোগলাই কারি আর পুডিং।

ম্যানেজার। দাও—দাও। বেঁচে থাক বাবা চোরাবাজার।

হেড বয়। আট নম্বর বিল চাইছে।

ম্যানেজার। দুটো কাটলেট—দুটো চপ—দুটো চা। দু' টাকা এগার আনা।

[ম্যানেজার বিল লিখিয়া দিল। হেড বয় চলিয়া গেল। দুই জন যুবক বাহির হইয়া আসিল।]

প্রথম যুবক। আরে, দশ আনা পয়সা উসুল হয়ে গেল—নিম্মির ঐ একখানা নাচেই। বাকি তো সব ফাও।

দ্বিতীয় যুবক। বা-বা—সুরাইয়ার কাছে নিম্মি। সেদিন টিকিট কিনতে গিয়ে এই দ্যাখ্… [হাতের ব্যাণ্ডেজ দেখাইল]

প্রথম যুবক। হাঁ, ঐ হাতের একটা ফটো তুলে সুরাইয়াকে পাঠিয়ে দে।

[উভয়ে চলিয়া গেল।]

ম্যানেজার। বেঁচে থাকো বাবা সুরাইয়া—বেঁচে থাকো বাবা নিম্মি—তোমাদের দৌলতেই তবু চপ কাটলেটগুলো কাটছে।

[হেড বয় আসিয়া দাঁড়াইল।]

ম্যানেজার। ওহে এখন থেকে বলবে সুরাইয়া চপ—নিম্মি কাটলেট। কাটবে ভাল।

[এমন সময় দুই জন খদ্দের ভিতরে ঢুকিল]

প্রথম খদ্দের। মশাই আপনার এখানে আজকের 'আনন্দ-বাজার' আছে?

ম্যানেজার। কেবিনে বসুন। পাঠিয়ে দিচ্ছি। খেতে খেতে দেখবেন এখন।

প্রথম খদ্দের। না, না, মশাই, আগে দিন। (কাগজটি টানিয়া লইয়া) থার্ড পেজ—এই যে। (পড়িতে লাগিল) 'গত রাত্রে পুলিস বেলেঘাটার একটি বাড়ীতে হানা দিয়া তেঁতুল-বীচির একটি কারখানা আবিষ্কার করিয়াছে। খোসা ছাড়াইয়া এই তেঁতুলবীচিগুলি, আটাতে ভেজাল দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হইত। এই ব্যাপারে সাত জন ধৃত হইয়াছে। কিন্তু মালিক এখনও ফেরার।'

ম্যানেজার। ওরে বাবা—তেঁতুল-বীচিরও কারখানা!

প্রথম খদ্দের। হাঁ—কারখানা। (সঙ্গীকে দেখাইয়া) ইনি বিশ্বাস করছিলেন না।

দ্বিতীয় খদ্দের। (বন্ধুকে) তা হলে ঐ আটা—তোমার আমার পেটে যাচ্ছে? (ম্যানেজারের প্রতি) তবে আর পেটের দোষ কি বলুন? ভাতে কাঁকর, আটায় তেঁতুলবীচি, তেলে শেয়ালকাঁটা—বদহজম লেগেই আছে। (বন্ধুকে) না ভাই, আমি কিছু খাব না।

প্রথম খদ্দের। সে কি হে?

দ্বিতীয় খদ্দের। না ভাই, বাড়ীর খাবারই পেটে সইছে না। রেস্তোরাঁর খাবারে হবে কলেরা। চলো, চলো।

প্রথম খদ্দের। আরে এক পেয়ালা চা।

দ্বিতীয় খদ্দের। রেস্তোরাঁর চা তো বিষ! চলো—চলো—বাড়ী চলো খাওয়াচ্ছি।

[কাগজটি রাখিয়া দুই জনে চলিয়া গেল।]

ম্যানেজার। খবরের কাগজ রাখাও দেখছি দায় হয়ে দাঁড়াল। ত সব ভ্যাগাবণ্ড…

এর পর হেড বয়ের পশ্চাতে তেরো নম্বর কেবিনের খদ্দের আসিয়া কাউণ্টারের সামনে দাঁড়াইল। রুক্ষ কেশ—খোঁচা খোঁচা দাড়ি—বয়স বছর তিরিশ—একটি রেনকোটে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত। সুদর্শন চেহারা, কিন্তু ক্লেশ ও দৈন্যের ছাপে তাহাকে মলিন দেখাইতেছে।]

হেড বয়। তেরো নম্বরের বিল…

ম্যানেজার। (খদ্দেরের দিকে তাকাইয়া) আসুন, আসুন। (হেড বয়কে) পরে হ'ল গিয়ে মোগলাই কারি আর পুডিং আড়াই টাকা আর আট আনা—তিন টাকা। আগের ছিল রাইস-কারি এক প্লেট, ফাউল কাটলেট দুটো, চিকেন রোষ্ট একটা—সাড়ে সাত টাকা। মোট সাড়ে দশ টাকা।

[ম্যানেজার বিলটি হেড বয়ের হাতে দিল। হেড বয় বিলটি একটি প্লেটে রাখিয়া খদ্দেরের সামনে ধরিল।]

খদ্দের। (বিলটি দেখিতে দেখিতে) পান আছে—পান।

ম্যানেজার। পান—পান।

[একটি বয় পান আনিতে ছুটিল।]

খদ্দের। আর এক প্যাকেট গোল্ড ফ্লেক।

ম্যানেজার [বয়ের প্রতি] এক প্যাকেট গোল্ড ফ্লেক।

[বয় বাহিরে ছুটিল।]

[খদ্দেরকে লক্ষ্য করিয়া] খাবার-টাবারগুলো ভাল লেগেছিল তো স্যার?

খদ্দের। দু'দিন পর আজ খেলাম। ক্ষিদের মুখে সবই অমৃত। তা মন্দ নয়—খাবার বেশ ভাল।

ম্যানেজার। বাইরে থেকে আসছেন বুঝি?

খদ্দের। কেন বলুন তো?

ম্যানেজার। ঐ বর্ষাতিটা দেখে মনে হচ্ছে স্যার। এখানে বিষ্টিটিষ্টি নেই তো।

খদ্দের। কাল রাত একটায় ঘুমিয়েছিলেন বোধ হয়—ভাই টের পান নি—কলকাতায় কি বৃষ্টিটাই না হয়েছে। পথে দাঁড়িয়ে ভিজছিলাম। রিকসা করে এক মাতাল এই রেনকোটটা গায়ে চাপিয়ে গান গাইতে গাইতে যাচ্ছিল—'হেসে নাও দু'দিন বইতো নয়।' আমাকে ভিজতে দেখে মাতালটার মনে হ'ল কষ্ট। রিকসা থামিয়ে গা থেকে বর্ষাতিটা খুলে আমার দিকে ছুড়ে দিয়ে—গাইতে গাইতে চলে গেল—'হেসে নাও—দু'দিন বইতো নয়।' বন্ধুর দানটি ফেলতে পারছি না।

[বয় আসিয়া পান-সিগারেট দিল। খদ্দের পান মুখে দিয়া একটা সিগারেট ধরাইল।]

খদ্দের। ও হাঁ—আপনার বিল—পান-সিগারেটটা…

ম্যানেজার। না, না—থাক। পান-সিগারেটের জন্য কিছু দিতে হবে না স্যার। আপনি ঐ সাড়ে দশ টাকাই দিন।

খদ্দের! কিন্তু দেখুন—আমার কাছে সাড়ে দশ পয়সাও নেই।

ম্যানেজার। তার মানে?

খদ্দের। তার মানে—নেই। সত্যিই নেই—এই দেখুন।

[প্রথমে বর্ষাতির পকেট দেখাইল—তৎপর বোতাম খুলিয়া বর্ষাতিটা ফাঁক করিয়া ধরিয়া ভিতরের অবস্থা দেখাইল। খালি গা—পরনে একটি ছিন্ন মলিন কাপড়।]

ম্যানেজার। তার মানে আপনি একটি জোচ্চোর?

খদ্দের। তা আপনি বলতে পারেন। দয়া করে পুলিসে দিন।

ম্যানেজার। [ভ্যাংচি কাটিয়া] পুলিসে দিন।

"দয়া করে আমাকে পুলিসে দিন"

হেড বয়। কি সাংঘাতিক জোচ্চোর। পুলিসেই দিন স্যার।

[তখন আরও কয়েকটি বয় সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ম্যানেজার খেঁকাইয়া উঠিল।]

ম্যানেজার। পুলিসে দিন। সাড়ে দশ টাকার জন্ম পুলিসে দিয়ে সাড়ে দশ দিন কোর্টে ছুটি—আর উকিল-মোক্তারে সাড়ে দশ টাকা রোজ খরচ হোক। [বয়দের প্রতি] তোমরা আবার এখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কি? [খদ্দেরের প্রতি] যান মশাই—আপনিও যান। সকালবেলায় যত সব আপদ এসে ঘাড়ে চেপেছে।

খদ্দের। ওয়াটার-প্রুফটি রেখে যাবো?

ম্যানেজার। না মশাই, না। চোরাই মাল গছিয়ে যাবেন তো? তারপর আবার সেই থানা-পুলিসের ফ্যাসাদ। যান—যান—আচ্ছা খদ্দের জুটেছে—যান্।

খদ্দের। কোথায় কোন্ চুলোয় যাব মশাই? আমার কি আর চুলো আছে? মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি আর এই কিম্ভূতকিমাকার পোশাক দেখে আপনি আমায় এখনও চিনতে পারেন নি—দেখছি। কিন্তু এক সময় কি ছিল না গোবর্দ্ধন বাবু—যখন আপনার এখানে নগদ দাম দিয়ে অনেক সাড়ে দশ টাকার খাবারই খেয়েছি।

ম্যানেজার। [খদ্দেরের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া] এঁ্যা! চেনা চেনা মনে হচ্ছে বটে। [হঠাৎ] হাঁ—হাঁ আগে খুব আসতেন—যেতেন।

খদ্দের। যাক্—চিনতে পেরেছেন দেখছি। দেখলাম কিনা—অনেকে চিনতে পেরেও মুখ ফিরিয়ে চলে গেছে। আমার নাম ভানু চৌধুরী।

ম্যানেজার। হাঁ—হাঁ ভানু চৌধুরী। কি একটা বড় মার্চেন্ট আপিসে বড়বাবু ছিলেন না—আপনি? তবিল তছরুপের দায়ে পড়েছিলেন—

ভানু। দু'বছর জেল খেটে সম্প্রতি দায়মুক্ত হয়েছি। কিন্তু পেটের দায়ে বোধ হয় শীগ্‌গিরই আবার জেলে যেতে হবে। ভেবেছিলেম আপনার দয়াতেই সে সুযোগটি হবে।

ম্যানেজার। আবার জেলে যাবেন কেন? একটা চাকরি-বাকরি দেখে নিন না।

ভানু। কে দিচ্ছে মশাই চাকরি-বাকরি? এ ক'দিন কত দুয়ারেই ত মাথা খুঁড়লাম। আপনার এখানেই দিন না একটা চাকরি—যে কোন চাকরি—

ম্যানেজার। [ক্রুদ্ধ ভাবে] তার মানে আরো ভাল করে আমায় ফাঁসাতে চান? মানে মানে সরে পড়ুন বলছি।

ভানু। তবেই দেখুন—জেলে যাওয়া ছাড়া আর আমার পথ নেই। বিনামূল্যে থাকা আর খাওয়ার ঐ একটি পথই খোলা আছে। আচ্ছা, দেখি।

[ম্লান হাস্য। সিগারেটে একটি জোর টান দিয়া ধোঁয়া ছাড়িয়া ভানু চলিয়া গেল।]

ম্যানেজার। ওরে বাবা—কি সাংঘাতিক লোক। জেলে যেতে চাইছে! খুন করতে পারে, ডাকাতি করতে পারে। যাক—সাড়ে দশ টাকার ওপর দিয়ে খুব বেঁচে গেছি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[পরদিন ভোরবেলা। ভানু চৌধুরী একটি রোয়াকের উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। দেখা গেল—এটি একটি আপিস। উপরের সাইনবোর্ডে বড় বড় অক্ষরে লেখা

"প্রজাপতি কার্য্যালয়

২৪ ঘণ্টায় বিবাহ সংঘটন হয়।

ঘটককুলশিরোমণি

শ্রীপ্রজাপতি ভট্টাচার্য (?)"।

ভানু যেখানে শুইয়া আছে ঠিক তাহারই উপরে আর একটি লম্বা সাইনবোর্ড ঝুলিতেছে। তাহাতে লেখা:

"জরুরি ফি দিলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন এবং সুপাত্রের সন্ধান দেওয়া হয়। এইরূপ সুপাত্রের সন্ধান অন্যত্র পাইবেন না।"

[একটু পরেই প্রজাপতি ভট্টাচার্য (৭) আসিলেন। পরনে শান্তিপুরী ধুতি, গায়ে গরদের চাদর। টিকিতে জবা ফুল, ভালে চন্দন তিলক, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। দেখিলে মনে হয়—সাক্ষাৎ প্রজাপতি ব্রহ্মা।]

প্রজাপতি। ও বাবা—ইনি আবার কে। বকের ওপর দিব্যি ছন! বলি ওহে ও বাপু—

ভানু। [জাগিয়া উঠিয়া বসিল] আজ্ঞে—আজ্ঞে···

প্রজাপতি। শোবার আর জায়গা পাও নি? যত সব···

[ভানু ততক্ষণে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে।]

ভানু। আজ্ঞে একটা কাজের জন্যে···

[প্রজাপতি লোকটির আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন।]

প্রজাপতি। ও, মফস্বল থেকে আসছেন বুঝি? তা এখানে ...েকের আসুন।

(প্রজাপতি গিয়া চেয়ারে বসিলেন। ভানু পেছন পেছন আসিয়া দাড়াইল।)

প্রজাপতি। মেয়ের বিয়ে?

ভানু। আমার বিয়ে হলে তবে তো মেয়ের বিয়ে।

প্রজাপতি। ও—বুঝেছি। মশায়ের নাম ধাম?

ভানু। নাম—ভানু চৌধুরী।

প্রজাপতি। বেশ—বেশ নাম।

(প্রজাপতি নামটি খাতায় টুকিয়া লইলেন।)

প্রজাপতি। ধাম?

ভানু। ফুটপাথ।

(প্রজাপতি অবাক হইয়া ভানুর দিকে তাকাইলেন। তারপর ক্রুদ্ধ স্বরে—)

প্রজাপতি। তামাশা হচ্ছে—তামাশা?

ভানু। আমি একটা কাজ চাইছিলাম—যে-কোন কাজ। ...টি দেওয়া—বাসন মাজা—তামাক সাজা—যা বলেন।

প্রজাপতি। চেহারায় তো নবাবপুত্তুর—একেবারে মাকাল—এঁা।

ভানু। [প্রজাপতির পা ধরিতে উদ্যত] দোহাই মশাই—আর না খেয়ে থাকতে পারছি না। দু'বেলা দু'মুঠো ভাত আর মাথা গুঁজবার ঠাঁই দয়া করে দিন। মাইনে যা খুশি দেবেন।

প্রজাপতি। আঃ—ছাড়, ছাড়, পা ছাড়। সকালবেলা স্নান-... করে এলুম—দিলে ছুঁয়ে।

[ভানু চমকিয়া উঠিয়া পা ছাড়িয়া দিল।]

...শ, আমার একজন পিওনের দরকার ছিল বটে। করতে চাকরের কাজই করতে হবে। খাওয়া পরা মাইনে—ওসব দিতে পারব না। কন্যাদায়ে এখানে অনেকেই আসবে। তাদের ঘাড় ভেঙে যা নিতে পার—তাতেই চালিয়ে নিতে হবে। এখন তোমার হাতযশ আর

ভানু। বেশ—তাই হবে।

প্রজাপতি। কিন্তু তোমার এ ভোলটা খুলতে হবে বাপু—

[ভানু তৎখুনি ওয়াটার-প্রুফটি খুলিয়া ফেলিল। প্রজাপতি তার কাপড়ের অবস্থা দেখিয়া চমকিয়া উঠিল।]

ওরে বাবা। শীগগির ঐ ঘরে যাও। পুরনো জামা-কাপড় যা পাও একটা কিছু পরে নাও। ঐ কে আসছে।—যাও, যাও।

[ভানু ভিতরে চলিয়া গেল। কন্যাদায়গ্রস্ত বৃদ্ধ মহিম বাবু আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন।]

আসুন, আসুন, বসুন।

মহিম। আপনিই তো প্রজাপতি ভট্টাচার্য?

প্রজাপতি। প্রজাপতি সাত ভটচার্য। মানে আমাদের সাতপুরুষ থেকে ঘটকের ব্যবসা। আমার বাবা ছিলেন প্রজাপতি ছয়, তাঁর বাবা ছিলেন প্রজাপতি পাঁচ। মানে বুঝেছেন—আজকাল যে রকম ভুঁইফোড় প্রজাপতির দল গজাচ্ছে—এখানে তা পাবেন না। এ হচ্ছে আদি ও অকৃত্রিম প্রজাপতির বংশ।

মহিম। তা শুনেছি। আমার বুঝলেন কিনা—একটি পাত্র চাই। নিজের মেয়ে···বলতে নেই—তবে লোকে বলে—রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী।

প্রজাপতি। ও সবাই বলে। টাকা-পয়সা যদি ভাল দিতে পারেন—ও আরো বলবে। তা বেশ দাঁড়ান···

[খাতা টানিয়া লইলেন। এমন সময় জানালার ফাঁকে ভানু একবার আসিয়া উকি দিল। প্রজাপতি ও মহিম বাবু জানালার দিকে পেছন ফিরিয়া বসিয়া ছিলেন বলিয়া ভানুকে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন না। ভানু তাঁহাদের কথা শুনিতে লাগিল।]

মহিম। ঐ তো হয়েছে মশাই বিপদ। একটি মাত্র ছেলে সুরেশ—ব্রিলিয়াণ্ট ছেলে মশাই—বেরিলিতে আমার সরষের তেলের ব্যবসা দেখত। তা সে ছেলে কিনা গেল মাসে হঠাৎ কলেরায় মারা গেল। আমায় পথে বসিয়ে গেছে মশাই। পাঁচ হাজার টাকার লাইফ ইন্সিওর করেছিল। মরবার সময় নাকি বন্ধুদের বলে গেছে, আমি যেন ঐ টাকা দিয়ে রমার বিয়ে দিই। একটা মাত্র বোন—বড় ভালবাসত মশাই। একটি ভাল পাত্র দেখে দিন, যে—আমার সুরেশের অভাব পূর্ণ করতে পারে।

প্রজাপতি। আজকালকার বাজার জানেন ত মশাই। সেদিন লক্ষ্মী নার্শারি 'অধিক ফসল ফলাতে' একজোড়া বলদ কিনল মশাই—দাম ষোল শ' টাকা। এই তো হ'ল গিয়ে বাজার। তা বেশ—আপনি নাম ঠিকানা বলুন আর রেজেষ্ট্রি ফি বাবদ দশটা টাকা দিন। যদি কিছু সুবিধে করতে পারি—তখনি খবর পাবেন। এখন আপনার বরাত আর আমার হাতযশ। নাম?

মহিম। শ্রীমহিমচন্দ্র রায়।

প্রজাপতি। আপনারা?

মহিম। কায়স্থ, শাণ্ডিল্য গোত্র। ভবানন্দের বংশ।

প্রজাপতি। ঠিকানা ?

মহিম। সাত নম্বর গিরিবাবু লেন, বৌবাজার।…এই আপনার দশ টাকা ফি। আচ্ছা, তা হলে উঠি। একটু দেখবেন মশাই। নমস্কার।

[মহিমবাবুর হাত হইতে প্রজাপতি টাকা লইলেন।]

প্রজাপতি। দেখব বৈ কি। এ আমাদের অন্ন। একটু গয়না-গাঁটির জোগাড় রাখবেন।

[মহিম বাবুর প্রস্থান।]

আরে—এই বেটাচ্ছেলে গেল কোথায় ?

[ওয়াটার প্রুফ পরিহিত ভানু আসিয়া দাঁড়াইল।]

এই দেখ—এখনও ওটা ছাড় নি! এতক্ষণ করছিলে কি ? ঐ যে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন—চলে যাচ্ছেন—টাক-পড়া ঐ ভদ্রলোক, ওকে গিয়ে বলো যে—শুভ কাজে আমাদের কিছু বউনি করুন স্যার। যাও যাও—যা পাওয়া যায়—নিয়ে এসো।

ভানু। যে আজ্ঞে… [ভানু দ্রুতপদে বাহিরে চলিয়া গেল।]

তৃতীয় দৃশ্য

[মহিম রায়ের বৈঠকখানা। মহিম বাবুর কন্যা রমা ঝাড়ন হস্তে জিনিষপত্র গুছাইতেছে ও গাহিতেছে। মহিম বাবু প্রবেশ করিলেন। রমার গান থামিয়া গেল।]

মহিম। এ কি ? ডাক্তার বলেছে তোমাকে শুয়ে থাকতে। আবার তুমি কাজ-কর্ম্মে লেগে গেছ মা ?

রমা। চুপ করে শুয়ে থাকলেই আমার হার্টের অসুখটা বাড়ে বাবা। কোথায় গিয়েছিলে বাবা ? সরষের তেলের ব্যাপারীরা ফিরে গেল।

মহিম। এঃ-হে-হে। একা লোক—ক'দিক সামলাব। গুদোমে তেলগুলো জমে রইল—অথচ লোকগুলো ফিরে যাচ্ছে। কাগজ-ওয়ালারা যে রকম চেঁচাচ্ছে, আর সরকারী নজর ভেজাল তেলের ওপর যে রকম পড়েছে তাতে তাড়াতাড়ি তেলগুলো বিক্রী করতে না পারলে তো গেছি।

রমা। এতই যদি—তবে সাতসকালে কেন বেরিয়েছিলে বাবা ?

মহিম। না বেরিয়ে কি করি বল। একটু সকাল সকাল না গেলেও তো ঘটককে ধরতে পারা যায় না।

রমা। তুমি আমায় বিদেয় করবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হয়ে উঠেছ, না বাবা ?

মহিম। কি করি বল মা ? যার যাবার কথা নয়, সেই সুরেশই আমার চলে গেল। বুড়ো হয়েছি—আমি তো পা বাড়িয়েই আছি—তোর একটা হিল্লে না হলে শান্তিতে মরতেও তো পারব না মা।

[ঝির প্রবেশ।]

ঝি। বাইরে একজন বাবু এসেছেন।

রমা। তেলের ব্যাপারীদের কেউ বোধ হয় আবার ফিরে এলো।

মহিম। [ঝিকে] নিয়ে আয়—নিয়ে আয়।

[ঝি চলিয়া গেল।]

রমা। কিন্তু বাবা, দেরি করো না—অনেক বেলা হয়েছে।

[রমার অন্দরে প্রস্থান।]

[ঝি ভানুকে লইয়া আসিল এবং নিজে অন্দরে চলিয়া গেল। ভানু আসিয়াই বর্ষাতিটি খুলিয়া রাখিল, দেখা গেল পরনে ফিনফিনে কোঁচানো ধুতি—গায়ে গরদের পাঞ্জাবী। ভানু ব্যস্তভাবে মহিম বাবুকে প্রণাম করিতে গেল। মহিম বাবু তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া তাহার মুখের পানে চাহিলেন—]

মহিম। আপনি ?—তুমি—কে—চিনতে পারলাম না তো ?

ভানু। আজ্ঞে, আপনি আমাকে চিনতে পারবেন না। কিন্তু আমি আপনাকে চিনি। বেরিলিতে আপনার ফটো দেখেছি কি না—সুরেশের কাছে। সুরেশ ছিল আমার বন্ধু।

মহিম। সুরেশের বন্ধু ? আপনি কোত্থেকে আসছেন ?

ভানু। আজ্ঞে, বেরিলি থেকে। আমাকে আপনি বলে লজ্জা দেবেন না। সুরেশ আজ নেই, তাই এত পরিচয় দিতে হচ্ছে।

মহিম। তুমি কি শেষ সময় তার কাছে ছিলে ?

ভানু। শুধু ছিলাম নয়, শেষ কাজও আমাকেই করতে হয়েছে জ্যেঠামশাই।

মহিম। ও তবে তুমিই সেই রামকানাই ?

ভানু। আজ্ঞে হাঁ—রামকানাই।

মহিম। হাঁ—হাঁ—রামকানাই চৌধুরী। আমার মনে পড়েছে। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) তোমার টেলিগ্রাম আর চিঠি দুটোই একসঙ্গে পেলাম বাবা, চিঠিতে খবর পেলাম কলেরা—টেলিগ্রামে খবর পেলাম—সব শেষ। (চোখ মুছিয়া) তা তুমি এসে ভালই করেছ। বসো বাবা—বসো। রমা রমা…

[রমা আসিয়া দাঁড়াইল।]

রমা। কি বাবা ?

মহিম। আমার মেয়ে। রমা, এই তোর দাদার বন্ধু—নিজের হাতে সেবা-শুশ্রূষা করেছে—শেষ কাজ করেছে।

[রমা ও ভানু পরস্পরকে নমস্কার করিল।]

ভানু। যতক্ষণ প্রাণ ছিল—কেবল আপনাদের কথাই বলেছে কানু ভাই—রমার যাতে ভাল বিয়ে হয়—বাবাকে বলো। আমার ইন্সিওরেন্সের পাঁচ হাজার টাকা রমার বিয়ের জন্যই রইল।

মহিম। আর বিয়ে! সে-ই চলে গেল—কে খোঁজে পাত্র—কে দেয় বিয়ে! আর কেই বা দেখে আজ আমার ব্যবসা। (রমাকে) হাঁ করে দেখছিস কি ? চা দে—জলখাবার আন।

ভানু। না, না—ট্রেনেই চা খেয়েছি। চা-টা থাক। আমাকে এখখুনি যেতে হবে। এখনো হোটেল ঠিক হয় নি।

মহিম। আমি থাকতে হোটেল! তুমি বাবা যখন এসে পড়েছ তখন যে ক'দিন এখানে থাকো—এখানে আমার কাছেই থাকবে। না—মা যাও—চা না হোক জলখাবার আন।

[রমা চলিয়া গেল।]

তা তোমার জিনিষপত্র?

ভানু। সে আর বলবেন না জেঠামশাই। যথাটথা একটা কিছু নিয়েই হয়তো বেরিয়েছিলাম। বর্দ্ধমানে সকালে উঠে দেখি সব চুরি হয়ে গেছে।

মহিম। সে কি!

ভানু। আজ্ঞে হাঁ। বিছানা সুটকেশ মায় জুতো পর্য্যন্ত। ফার্ষ্ট ক্লাস স্লিপিং বার্থে এমন রাহাজানি হবে ভাবতে পারি নি।

মহিম। দিনকালের কথা আর বলো না বাবা। যে যাকে পাচ্ছে—খাচ্ছে। তা যাক—ওর জন্যে আর ভেবে লাভ নেই। চলো বাবা—উপরে চলো। ট্রেনের কাপড়চোপড় ছেড়ে ফেলে হাতমুখ ধোবে। সুরেশের কত জামা কাপড় কত জুতো পড়ে রয়েছে—তুমি পরলে সার্থক হবে। এসো বাবা।

[উভয়ের অন্দরমহলে প্রস্থান।]

—

চতুর্থ দৃশ্য

কলিকাতা প্রজাপতি কার্য্যালয়

[প্রজাপতি ভট্টাচার্য্যের আপিস। প্রজাপতি একটি কোষ্ঠী পরীক্ষা করিতেছিলেন। নবদ্বীপ বাবুর প্রবেশ]

প্রজাপতি। আসুন, আসুন নবদ্বীপবাবু—সুসংবাদ। ওঁরা কাল এসেছিলেন—তা নগদ সাত হাজার দিতেই রাজী আছেন। আপনার ছেলের কপালটি সত্যিই ভাল।

নবদ্বীপ। ছেলের কপাল ভাঙ্গ কি মন্দ—জানি না মশাই, কিন্তু আমার কপাল পুড়েছে। আপনি—আমি তো এদিকে সব ঠিকঠাক করে বসে আছি, ওদিকে ব্যাটাছেলে আমাকে কলা দেখিয়ে রেজিষ্ট্রি আপিসে কাজ সেরে ফেলেছে।

প্রজাপতি। লাভ ম্যারেজ!

নবদ্বীপ। লভ ম্যারেজ।

প্রজাপতি। এ-হে-হে হে। এত বড় দাঁওটা ফসকে গেল। আপনারও আমারও।

নবদ্বীপ। যাতে না ফসকায়—তাই করে নিন না মশাই। ছেলে না হয় বিয়ে করল না—ছেলের বাপ তো রয়েছে! (প্রজাপতি কিছু বলিতে উদ্যত হইতেই) না, না—গিন্নী অনেকদিন আগেই গত হয়েছেন।

প্রজাপতি। আপনি—সে কি মশাই!

নবদ্বীপ। চালিয়ে নিন মশাই। এ বয়সে কলকাতা শহরে কত লোক বিয়েই করে নি। কিছু না হয় কমই দিতে বলবেন। এত বড় দাঁওটা হাতছাড়া করবেন না মশাই। টু-পারসেণ্ট কমিশন না হয় বেশী নেবেন আপনি।

প্রজাপতি। তাই তো—বড়ই মুশকিলে ফেললেন। আচ্ছা দশটা টাকা রেখে যান তো—দেখি।

নবদ্বীপ। আবার টাকা? একবার তো দিয়েছি।

প্রজাপতি। সে তো দিয়েছেন মশাই ছেলের জন্যে।

নবদ্বীপ। ও বাবা—বাপের জন্যে আবার দিতে হবে? তা নিন। দেখবেন মশাই, একুল-ওকুল দু'কুল যেন না হারাই।

প্রজাপতি। (টাকাটা লইয়া) দেখি—চেষ্টা করে। তারপর আপনার বরাত আর আমার হাতযশ।

[নবদ্বীপের প্রস্থান। মহিমবাবুর প্রবেশ।]

প্রজাপতি। আরে মহিমবাবু যে—আসুন, আসুন—বসুন। অনেক দেখলুম—কিন্তু দিনকাল যা পড়েছে—তা আমাদের ত মশাই পাততাড়ি গুটোতে হয়। আট দশ হাজারের নীচে বরের বাপ তো কথাই কইতে চায় না। তা মশাই, তাই বলে কি বিয়ে ঠেকে রয়েছে? বরের বাপকে কলা দেখিয়ে এন্তার লাভ-ম্যারেজ হচ্ছে। লাভ ম্যারেজ। ফাঁকি মশাই—চারদিকে ফাঁকি। আমার তো মশাই শনির দশা পড়েছে। একে উপার্জ্জন নেই—তাতে আবার চুরি। নতুন গরদের জামা মশাই আর শান্তিপুরী ধুতি—চাকরি করতে এসে কান মলে নিয়ে গেল মশাই। করি কি বলুন··· তা যাকগে। আর দশটা টাকা দিন শেষ চেষ্টা করে দেখি।

মহিম। কষ্ট করে আর চেষ্টা করতে হবে না মশাই। মনের মত পাত্র ঘরে বসে পেয়েছি। একেই বলে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ। এখন একটা দিন দেখে দিন।

প্রজাপতি। বুঝলাম। তার মানে এ তো বরের বাপকে কলা দেখিয়ে লাভ ম্যারেজ! যাক—খুব বেঁচে গেছেন। বরাত-বরাত। তা শ্রাবণের আঠারোই মানে—এই শুক্রবারেই দিন আছে। কিন্তু যোটক টোটক বিচার···

মহিম। রাখুন মশাই যোটক-বিচার। এখন চার হাত এক করে দিতে পারলে বাঁচি—তারপর যার যেমন বরাত।

প্রজাপতি। বটেই তো—বটেই তো। কিন্তু আমার দিন দেখার ফিটা···

মহিম। একটা দিন দেখে দেবেন—তারও আবার ফি? এই সব পাপেই এত সব লভ ম্যারেজ হচ্ছে জানবেন। আচ্ছা, নমস্কার। [মহিমবাবুর প্রস্থান।]

—

পঞ্চম দৃশ্য

[মহিম রায়ের গৃহ। ভানু ও রমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ফুলশয্যার রাত্রিও প্রভাত হইয়াছে। ভানু অঘোরে ঘুমাইতেছে। রমা বিছানা হইতে নামিয়া একটি জানালা খুলিয়া দিল। সূর্য্যালোকে কক্ষ উদ্ভাসিত হইল। রমা ছুটিয়া আসিয়া ভানুকে ডাকিতে লাগিল।]

রমা। ওগো, উঠ উঠ—কত বেলা হয়ে গেছে।

ভানু। এই যা—তাই তো! এত বেলা হয়ে গেছে! (উঠিয়া বসিল) কি চমৎকার স্বপ্ন দেখছিলাম।

রমা। কি স্বপ্ন দেখছিলে?

ভানু। সুরেশ যেন আমাদের বিয়েতে এসেছে। তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হচ্ছে দেখে তার খুশি আর ধরে না।

রমা। আমাদের দু'জনকেই খুব ভালবাসতেন কি না—তাই।

ভানু। তা ঠিক। কিন্তু আজ এই আনন্দের মধ্যে—সব চেয়ে আমায় কি বিঁধছে জান? এ বিয়েতে আমায় পণ নিতে হ'ল।

রমা। দাদা ও টাকা আমার বিয়েতে আশীর্ব্বাদ দিয়েছেন। তোমাকে তো নিজেই তা বলে গেছেন। এ টাকা তুমি না নিলে দাদার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হ'ত না।

ভানু। তা ঠিক। কিন্তু তোমার বাবাও গয়না দিতে কিছু কম করেন নি।

রমা। না, না, গয়না আর কৈ দিতে পেরেছেন। দাদা এমন করে চলে যাওয়াতে সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল।

ভানু। হুঁ, তা গয়নার দরকারই বা কি? এত সোনা আমার সামনে—এত সোনা, এত সোনা। (ভানু রমার গালে মৃদু ঠোকা দিয়া আদর করিল।)

ঝি। (নেপথ্যে কণ্ঠস্বর শোনা গেল) দিদিমণি, আসব?

[রমা দরজা খুলিয়া বাহিরে গেল এবং তখনি একলা ফিরিয়া আসিল।]

রমা। কি কাণ্ড জান? আমাদের উঠতে দেরি দেখে বাবা ভেবেছেন আমার হার্টের অসুখ বুঝি বেড়েছে। ঝিকে পাঠিয়েছেন ব্যাপার কি দেখতে।

[নেপথ্যে মহিমবাবুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'রমা, ভাল আছিস মা?']

ঐ যে—নিজেই আসছেন। (রমা দরজার নিকট ছুটিয়া গিয়া) এসো বাবা—

[রমা মহিম বাবুকে ভিতরে লইয়া আসিল]

মহিম। ভাল আছিস মা?

রমা। হাঁ বাবা। তুমি আমার জন্য বড্ড বেশী ভাব।

মহিম। আর ভাবব না মা। যে ভাববে—তার হাতে তোকে তুলে দিয়েছি। বুঝলে বাবা রামকানাই—মেয়েটার যখন সাত বছর বয়স—তখন ওর মা মারা যান। আমি ব্যবসা নিয়ে থাকতাম, দেখাশোনার তেমন কেউ ছিল না। মেয়েটার স্বাস্থ্যটাই গেছে ভেঙে। আর কিছু নয়—হার্টটা বড় দুর্ব্বল। ডাক্তার বলেছে—ভারী কাজকর্ম্ম করা চলবে না, আর হাসিখুশি থাকবে সব সময়। এটা বাবা তোমাকে দেখতে হবে।

ভানু। বটেই তো—বটেই তো।

মহিম। আচ্ছা—কথাবার্ত্তা পরে হবে। তোমরা এখন—

ভানু। আপনি বসুন বাবা। (রমাকে) শোন—আমার 'বেড-টি' চাই।

রমা। আনছি। বাবা—তোমার চা-ও এখানেই দিচ্ছি।

[রমা চা আনিতে চলিয়া গেল।]

ভানু। হার্টের অসুখ এখন ঘরে ঘরে, ভেজাল তেল খেয়ে বেরি-বেরির ফল।

মহিম। ডাক্তাররা তাই বলে বটে। কিন্তু সব তেলই তো আর ভেজাল নয়।

ভানু। তা হলে একটা গল্প শুনুন। আমার এক বন্ধুর পায়ে ঘা হয়েছিল। কিছুতেই সারে না। শেষে এক কবরেজ বললেন—একটু ভেজাল সরষের তেল আনুন। খুব ভাল একটা মালিস তৈরি করে দিচ্ছি। তা ভেজাল সরষের তেল সারা কলকাতায় মিলল না।

মহিম। কেন?

ভানু। সবাই বলে—'না মশাই, ভেজাল তেল আমরা রাখি নে।' কবরেজ মশাই শুনে বললেন—'আরে মশাই, করেছেন কি। গিয়ে খাঁটি সরষের তেল চান। তবেই না পাবেন।'

[মহিমবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।]

আপনার সরষের তেল—(মহিমবাবুর চোখে চোখে চাহিল।)

মহিম। না, তা হাঁ। আজকালকার ব্যবসাই তাই। কিসে ভেজাল না চলছে বল? শাস্ত্রেই বলেছে—যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ : যাক—একটা কাজের কথাও বলি রামকানাই। সুরেশের এই অকালমৃত্যুতে আমি বসে পড়েছি। বেরিলির ব্যবসাটা বেশ ভালই চলছিল, কিন্তু গেরো দেখ—সুরেশের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে—কর্ম্মচারী জিনিষপত্র সব বেচে দিয়ে টাকাগুলো সব গাব করে একেবারে হাওয়া। সেখানে এমন একটা লোক নেই যে চিঠিপত্র লিখব।

ভানু। তা আপনিই যান না।

মহিম। কিন্তু যেখানে সুরেশ নেই সেখানে যেতে আর আমার মন চায় না।...তুমি যাবে বাবা?

ভানু। না বাবা। আমারও সেই কথা। যেখানে সুরেশ নেই, সেখানে আর না। আর তা ছাড়া ও তেলের ব্যবসায়ে আমার মন যায় না। আমি তো আপনাকে বলেছি—কাপড়ের ব্যবসাই করতাম, কাপড়ের ব্যবসাই করব।

মহিম। আবার কাপড়? বেরিলিতে তোমার কাপড়ের দোকান—তুমিই বলেছ—আগুন লেগে একদিনেই সব সাফ্ হয়ে গেল। মানুষ ঠেকেই শেখে রামকানাই। না, না বাবা—ও কাপড়-টাপড় আর নয়।

[রমার প্রবেশ। পেছনে ঝিয়ের হাতে চা ও জল-খাবারের ট্রে। রমা উভয়কে চা-খাবার পরিবেশন করিতে লাগিল।]

বুঝলে মা রমা, বাবাজীকে বলছি—বেরিলির ব্যবসাটা সুরেশের

অভাবে নয়-ছয় হয়ে যাচ্ছে। তুমি যখন ব্যবসা করবে বলেই নেমেছ—আমি বলি—তুমি বেরিলি চলে যাও। ও ব্যবসাটা আমি রমা-মার নামেই লিখে দিচ্ছি। কি বলিস্ মা ?

রমা। আমি আর কি বলব বাবা—তোমরা যা ভাল বোঝ করো।

ভানু। বেরিলিতে আপনি যান নি, তাই জানেন না। ভেজাল সরষের তেলে বেরিবেরি ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ছে দেখে কাগজ-গুলো যে রকম চেঁচাচ্ছে তাতে লোক একেবারে আগুন হয়ে রয়েছে। ধরা পড়লে আর রক্ষে নেই।

মহিম। হাঁঃ—তা হলে সুরেশ কবেই ধরা পড়ত।

ভানু। [চারিদিকে একবার সতর্ক দৃষ্টিতে তাকাইয়া গুপ্ত কথা বলিবার ছলে] তবে শুনুন- আপনারা জানেন—সুরেশ কলেরায় মারা গেছে। কিন্তু আসল কথা তা নয়। সুরেশ মার খেয়ে মরেছে। ব্যবসার স্বার্থে আমরা কলেরা কথাটা প্রচার করেছি।

মহিম। এ্যাঁ—

ভানু। আজ্ঞে হ্যাঁ। দোহাই আপনার—ঐ যমের দুয়ারে আমাদের আর ঠেলবেন না।

[মহিম বাবুর চা তাঁহার মুখে উঠিল না। পেয়ালাটি ধীরে ধীরে রাখিয়া দিলেন।]

—

ষষ্ঠ দৃশ্য

[বিশ্বম্ভরের আপিস-কক্ষ। একটি সেক্রেটারিয়েট্ টেবিলে বসিয়া মালিক বিশ্বম্ভর কোলে কাগজপত্র দেখিতেছেন। দরজার কাছে টুলের উপর একজন বেয়ারা বসিয়া আছে। আপিসের কর্মচারী কৈলাস হাঁসদা বিশ্বম্ভরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে।]

কৈলাস। এ বড় বিপদ হ'ল স্যার।

বিশ্বম্ভর। [মুখ তুলিয়া] তোমার তো চব্বিশ ঘণ্টা বিপদ লেগেই আছে। কি হয়েছে ?

কৈলাস। বড়বাজারের আপনার সেই খালি ঘরটা—

বিশ্বম্ভর। আরে—বড়বাজারে তো আমার খালি ঘর অনেক আছে। লোহাপট্টিতে আছে, গেঞ্জাপট্টিতে আছে, সোনাপট্টিতে আছে…

কৈলাস। আজ্ঞে, তেইশ নম্বর কটন ষ্ট্রীটের সেই ঘরটা—যেটা কাপড়ের দোকান ছিল।

বিশ্বম্ভর। হাঁ—সেটা তো ভাড়া দেবার কথা ছিল। ভাড়া দিয়েছ ?

কৈলাস। আজ্ঞে, সেই নিয়েই তো গোল বেধেছে। আপনার হুকুম ছিল—ওটা ঠিক এমনি ভাড়া দেওয়া হবে না। ভাড়া দেবার লোভ দেখিয়ে কিছু সেলামী কামিয়ে নেওয়া হবে।

বিশ্বম্ভর। আরে—আজকাল ঐ তো এক ব্যবসা আছে। আর কি আছে ? কিছু হ'ল ?

কৈলাস। তা মন্দ হয় নি। পাঁচ জনের কাছ থেকে ঐ একই ঘরের জন্য হাজার দশেক টাকা নগদ সেলামী পাওয়া গেছে। ক্যাশে জমা দিয়েছি। দেখে থাকবেন।

বিশ্বম্ভর। ঠিক আছে। তোমারও দু'পয়সা হয়েছে তো ?

কৈলাস। আজ্ঞে—তা হয়েছে। কিন্তু ভোগ করতে পারব বলে মনে হচ্ছে না স্যার।

বিশ্বম্ভর। কেন হে ? কি হ'ল ?

কৈলাস। আজ্ঞে, পাঁচ জনই একসঙ্গে এসে ঘরের দখল চাইছে। দারোয়ান রুখেছে—এখন মারমুখো হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে আমাকে। আপনার এই আপিস পর্যন্ত ধাওয়া করেছে।

বিশ্বম্ভর। রসিদ-টসিদ দাও নি তো ?

কৈলাস। [জিভ কাটিয়া] রসিদ ? রসিদ কি বলছেন স্যার ? আজকালকার ব্যবসায়ে আবার রসিদ আছে নাকি ? কারবার চলছে—সব মুখে মুখে।

বিশ্বম্ভর। এই তো বেশ তৈরি হয়েছে। তোমাকে কে মারে হে। যাও—তোমার কাজে যাও।

কৈলাস। দেখবেন স্যার—যেন ফেঁসে না যাই।

[কৈলাস চলিয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই ভানু তাহাকে এক রকম জোর করিয়া টানিয়া লইয়াই আপিস-কক্ষে প্রবেশ করিল।]

ভানু। সে হচ্ছে না মশাই। কে আপনার মালিক—দেখিয়ে দিন।

বিশ্বম্ভর। কে আপনি মশাই—গোল করছেন এখানে ?

ভানু। আপনিই বুঝি বিশ্বম্ভর বাবু—'রাম রাম ট্রেডিং কর্পোরেশনের' মালিক ?

বিশ্বম্ভর। হাঁ—তাতে হয়েছে কি ? ওকে ধরেছেন কেন ?

ভানু। ধরব না ? আপনারই তো গোমস্তা। আমার কাছ থেকে দু'হাজার টাকা নগদ সেলামী নিয়েছে—আপনার ঐ তেইশ নম্বর কটন ষ্ট্রীটের কাপড়ের দোকান-ঘরটার জন্য। কাল দখল দেবার কথা ছিল—গিয়ে দেখি আমার মতো আরও চার জন। তারাও একে সেলামী দিয়েছে—দখল চাইছে। দারোয়ান কিন্তু কাউকেই দখল দিচ্ছে না। দিনে-দুপুরে এই রকম জোচ্চুরি—

বিশ্বম্ভর। অবাক কাণ্ড মশাই ! কে গোমস্তা—কোথায় ঘর—কে রসিদ দিলে—কিছুই জানি না।

ভানু। রসিদ দেয় নি মশাই। কিন্তু এই লোকটা আপনার গোমস্তা বলেই বলেছে। ওখানে সব সময় বসে থাকত।

বিশ্বম্ভর। আরে—এ তো চাকরির জন্য হামেশাই ঘোরাফেরা করে। কি যেন তোমার নাম ?

কৈলাস। দীনবন্ধু সাধু খাঁ। আপনি তো আমাকে জানেন স্যার। এক বছর কাজকর্ম নেই—আপনার দুয়ারে মাথা খুঁড়ছি।

বিশ্বম্ভর। [ভানুকে] তবেই দেখুন—আপনি অনর্থক এখানে এসে গোলমাল করছেন। বড়বাজারে কম করে আমার ত্রিশটা ব্যবসা মশাই। আমার সময়ের দাম আছে।

[ভানু কৈলাসকে ছাড়িয়া দিল এবং বিশ্বম্ভরের সামনে আসিয়া হাত জোড় করিয়া বসিল—]

ভানু। দোহাই আপনার। আমাকে আপনারা এ ভাবে মারবেন না। জীবনে অনেক ঘা খেয়েছি। এমন সব ঘা খেয়েছি—আর যে কোনদিন উঠে দাঁড়াতে পারব তা ভাবি নি। হঠাৎ একটা বিয়ে করে পাঁচ হাজার টাকা বরপণ পেলাম। সংপথে থেকে—ব্যবসা করে আবার উঠে দাঁড়াব—এই আশায়—আপনার ঐ কাপড়ের দোকান-ঘরটা—

বিশ্বম্ভর। ব্যবসা ত মশাই আপনাকে দিয়ে হবে না। সংপথে থেকে ব্যবসা হয় কখনো? এই বাংলাদেশে? বাড়ী যান—ইস্কুলের একটা মাষ্টারী-টাষ্টারী দেখুন।

ভানু। আপনি শুনুন। আমি বুঝছি—আমি ঠকেছি। প্রমাণ-ট্রমান কিছু নেই। মামলা-মোকদ্দমা করেও কিছু হবে না। কিন্তু দোহাই আপনার—আমাকে এমনভাবে পথে বসাবেন না—মারবেন না। আমাকে একটা চান্স দিন—সংপথে থাকবার চান্স—লাষ্ট চান্স।

বিশ্বম্ভর। [হাসিয়া] ঐ তো বললাম—ইস্কুলে মাষ্টারী করুন। ব্যবসা-ট্যাবসা আপনাকে দিয়ে হবে না মশাই। ও আমি লোক দেখেই বুঝি। [কলিং বেল টিপিলেন]

ভানু। হুঁ। আচ্ছা।

[ভানু চলিয়া গেল।]

সপ্তম দৃশ্য

[কলিকাতার উপকণ্ঠে একটি জীর্ণ পুরাতন বাড়ীর একতলা। ভানু চৌধুরী এই বাড়ীর একতলাটি ভাড়া লইয়াছে। বাড়ীটি পুরাতন হইলেও নূতন আসবাব দ্বারা সজ্জিত। অপরাহ্ণ। ভানুর স্ত্রী রমা ঝি মানদার সহিত কথাবার্তা কহিতেছিল।]

মানদা। পুরোপুরি একমাস তো আমার কাজ হয়েছে। মাস কাবারে মাইনে না পেলে আমার কি করে চলে মা? আমারও তো পুষ্যি রয়েছে।

রমা। বাবু এলে বলে দেখি।

মানদা। তুমি তো ক'দিন বলেছ—আমিও বলেছি মা। কিন্তু বাবুর এদিকে খেয়ালই নেই।

রমা। কোন দিকেই খেয়াল নেই। তা যদি থাকত—তবে আজ আমার এমন দশা হয় মানদা!

মানদা। মিথ্যে বলো নি মা। বড়লোকের মেয়েই তুমি। তা তোমাকে কি না এই একটা পোড়ো বাড়ীতে একলা এনে তুলেছে। কি দেখে যে মা—তোমাকে তোমার বাপ ওঁর হাতে দিলেন—ভেবে পাই না আমি।

রমা। তাতে আমার দুঃখ নেই মানদা। দুঃখ শুধু এই—আমি ওঁর মন পেলাম না। যে বাবা ওঁকে এত দিলেন—তাঁর উপরে ওঁর কোন ভক্তিশ্রদ্ধা নেই। দিনরাত কি একটা খেয়ালে চলেন। এই দেখো না বেলা গড়িয়ে গেল—তবু ওঁর দেখা নেই।

মানদা। এসব লক্ষণ ভাল নয়, আর কি বলব মা। আমি বাড়ী চললাম।

[মানদা চলিয়া গেল। রমা আয়নার সামনে উঠিয়া গিয়া চুল আঁচড়াইতে লাগিল। একটু পরেই শান্ত সমাহিত মূর্ত্তিতে ভানুর প্রবেশ।]

রমা। বাড়ীর কথা ভুলে গিয়েছিলে বুঝি?

ভানু। না, ভুলব কেন।

রমা। বেলা গড়িয়ে গেল—খিদে পেল—তবে তো মনে হ'ল।

ভানু। তা মিথ্যে নয়। সত্যি ক্ষিধে পেয়েছে। খেতে দাও।

রমা। বাজারের টাকা দিয়ে গিয়েছিলে?

ভানু। এই যা—একেবারে ভুলে গিয়েছি। তা তোমার কাছে কিছু ছিল না?

রমা। থাকবে না কেন। কিন্তু সে তো আমার বাপের পয়সা। তাতে যে আবার তোমার ঘেন্না। ভাত হজম হয় না।

ভানু। ও। তা হলে আজ হরিমটর বল? মানে—হাঁড়ি চড়ে নি।

[রমা রাগে নিরুত্তর রহিল।]

(পকেট হইতে দুইখানি এক টাকার নোট বাহির করিয়া)

মানদা—মানদা কোথায়? দু'টাকার খাবার নিয়ে আসুক।

রমা। কাজে জবাব দিয়ে মানদা চলে গেছে।

ভানু। কেন?

রমা। আমার মত বিনে মাইনের দাসীবাঁদী সে নয়। মাস-কাবারে বেতন না পেয়ে কাজে জবাব দিয়ে চলে গেছে।

ভানু। না, না—সে কি? আজই আমি তাকে তার মাইনে চুকিয়ে দেব। বিকেলে এলে বলো। আপাততঃ তা হলে আমিই তবে খাবারটা নিয়ে আসছি।

রমা। দোকানের খাবারে কাজ নেই। ওসব নবাবী থাক। চালে-ডালে খিচুড়ি নামিয়ে রেখেছি। চলো।

ভানু। দাঁড়াও, চানটা সেরে নিই। আমার আবার খেয়ে উঠেই বেরুতে হবে।

[এই বলিয়া ভানু দাড়ি কামাইবার সরঞ্জাম লইয়া বসিল।]

রমা। এক মাস হ'ল শুনছি কাপড়ের ব্যবসা করবে। কি হ'ল জানতে পারি?

ভানু। কাপড়ের ব্যবসা হবে না। তোমার বাবা যেসব ব্যবসা করেন—ঐ রকম একটা কিছু করতে হবে।

রমা। তুমি তো বাবার ব্যবসাকে ম মুখ মারার ব্যবসা বল।

ভানু। যা সত্যি—তাই বলি। তা আমিও ঐ রকম ব্যবসাই ধরব, রমা।

রমা। মানে ?

"যে যাকে পাচ্ছে—খাচ্ছে"

ভানু। মানে—যে যাকে পাচ্ছে—খাচ্ছে। এই ধর তোমার বাবা—ভেজাল তেলের ব্যবসা চালিয়ে কম করে না হোক হাজার পাঁচেক লোক বেরিবেরিতে খেয়েছেন। কি দেশ রে বাবা। চালে কাঁকর, তেলে শেয়ালকাঁটা, ঘিয়ে চর্বি, দুধে জল, কুইনিনে ময়দা, ময়দায় তেঁতুল বীচি—খুনের কি ব্যবসাটা দেশে চলেছে।

[এই বলিতে বলিতে দাড়ি কামাইতে গিয়া গাল কাটিয়া গেল।]

এই যা—কেটে গেল।

রমা। ইঃ—রক্ত পড়ছে—চেপে ধর। একটু আয়োডিনও নেই।

ভানু। খুন করব ভাবছিলাম—নিজেই খুন হলাম।

রমা। সে কি ? কাকে খুন করবে ?

ভানু। কটন ষ্ট্রীটে একটা কাপড়ের দোকানঘর ভাড়া দেবে বলে আমার কাছ থেকে দু' হাজার টাকা সেলামী নিয়ে—শেষে দেখলাম—আমাকে একেবারে ঠকিয়েছে। কথাটা যখনই ভাবি—মাথায় খুন চাপে। কখন কি করে বসি—কে জানে ?

রমা। দেখো—আমাকে আবার খুন করে বসো না।

ভানু। তাও করছে। স্বামী স্ত্রীকে খুন করছে—স্ত্রী স্বামীকে খুন করছে—ছেলে খুন করছে বাপকে—বাপ খুন করছে ছেলেকে—এ সমাজে তাও তো দেখেছি। যে যাকে যেখানে পাচ্ছে—খাচ্ছে।

[এমন সময় ঝাঁকামুটের মাথায় চাল-ডাল প্রভৃতি জিনিষপত্র লইয়া মহিমবাবুর প্রবেশ।]

রমা। একি—বাবা।

মহিম। তোর চিঠি পেয়ে—কি করব ? নিজেই আসতে হ'ল। (মুটেকে) এই নামা—

[মুটে জিনিষপত্র নামাইয়া রাখিল।]

নাও। যাও। (মুটেকে পয়সা দিয়া বিদায় করিলেন।)

ভানু। এখানে মুদিখানা খুলতে এলেন নাকি ?

মহিম। মুদিখানা না খুলে আর উপায় কি ? মেয়েটা যে উপোস করে মরবে এ তো আর চোখে দেখতে পারি না। কত করে বললাম—বেরিলি যাও। না হয় আমার বাড়ীই চলো। তাও শুনলে না—মেয়েটাকে এনে তুললে শহরের বাইরে—এই পোড়া বাড়ীতে—

ভানু। আপনার বাড়ী, আপনার অন্ন আমার কাছে বিষ। তোমার বাপের অন্ন আমার মুখে রুচবে না, ও তুমিই খেয়ো।

[ভানু যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল।]

মহিম। বিষ। হুঁ। বিষ নেই—কুলোপনা চক্র।

রমা। এদ্দিন যে অন্ন মুখে রুচল—সে কি আমার বাপের টাকায় নয় ?

ভানু। না। সেটা আমার বরপণের টাকা—আমার উপার্জন। কিন্তু সে টাকাও যখন ফুরিয়েছে—আমি রোজগারে বেরুলাম। রোজগার করতে পারি খাব—না পারি না খেয়ে মরব। তবু তোমার গোষ্ঠীর পিণ্ডি আমি গিলব না।

[ভানু ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া গেল।]

—

অষ্টম দৃশ্য

[কলিকাতার এক অভিজাত পল্লীতে 'আনন্দম্' ক্লাবের জলসা-ঘর। দৃশ্যের পশ্চাদ্ভাগে একটি মঞ্চ। মঞ্চের সামনে খানিকটা খালি জায়গা। তৎপর মধ্যস্থলে একটি পার্শ্বপথ রাখিয়া দুই পাশে ছোট ছোট টেবিল এবং সাজানো চেয়ার। ভানুর কপালে প্লাষ্টারের ব্যাণ্ডেজ। 'আনন্দমে'র অন্যতম সদস্য অবিনাশ ও তিনকড়ি ভানুকে লইয়া প্রবেশ করিল। তখন সন্ধ্যা]

অবিনাশ। বয়, বয়।

[ছুটিয়া বয় আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।]

তিন পেগ্ হুইস্কি।

বয়। জী—হুজুর। [বয় চলিয়া গেল।]

অবিনাশ। [ভানুর প্রতি] সত্যিই অবাক করেছেন আপনি।

তিনকড়ি। না, না—এখনো ওঁর কোন কথা না বলাই ভাল। আরো বেশ খানিকটা রেষ্ট দরকার।

ভানু। না, না—বলুন না। ধাক্কাটা আমি সামলে নিয়েছি। জীবনে এমন সব ধাক্কা খেয়েছি—যার কাছে মোটরের এই ধাক্কা কিছুই নয়।

অবিনাশ। [তিনকড়িকে] না, না—হি ইজ অল্ রাইট। কোয়াইট এ ব্রেভ ইয়ং ম্যান্।

[এমন সময় বয় তিন পেগ হুইস্কি আনিয়া সামনে রাখিল।]

যদি কিছু জড়তা থেকেও থাকে—এখনই চাঙ্গা হয়ে উঠবেন। [ভানুকে] কি বলেন—

ভানু। হাঁ—আজ আর ওতে আমার আপত্তি নেই মিষ্টার—

অবিনাশ। অবিনাশ মিটার। ইনি তিনকড়ি বোস।

ভানু। আমি ভানু চৌধুরী।

[পরস্পরের মধ্যে নমস্কার বিনিময় এবং 'Best of Luck' বলিয়া মদ্যপান।]

অবিনাশ। সত্যিই আমাদের আপনি অবাক করেছেন মিঃ চৌধুরী। মোটরের ধাক্কা খেয়ে বাপ-চৌদ্দপুরুষ বলে গালাগাল করেন না, পুলিস-পুলিস বলে চেঁচামেচি করেন না—এ মশাই দেখলাম এই প্রথম। আচ্ছা, আপনার ব্যাপার কি বলুন তো?

ভানু। মানে—বাঁচবার সাধ আর আমার নেই।

অবিনাশ। তার মানে,—রেসে আজ বেশ কিছু গেছে।

ভানু। তা গেছে।

তিনকড়ি। তাই আপনি গাড়ী চাপা পড়ে মরতে চাইছিলেন?

ভানু। না—ঠিক তা নয়। রেস কোর্স থেকে আকাশ-পাতাল কি সব ভাবতে ভাবতে ফিরছিলাম। হঠাৎ খেলাম আপনাদের মোটরের ধাক্কা, মরলেই হয়তো বেঁচে যেতাম।

তিনকড়ি। কিন্তু জানেন—হিটলার যে হিটলার—পলিটিক্যাল রেসে কি হারটাই না হারল। তবু মরতে পারল না তো?

ভানু। মরে নি মানে?

তিনকড়ি। কেউ কি মরতে চায় মিঃ চৌধুরী? দুটো লোককে পুড়িয়ে মিত্রশক্তির মুখে সে-ই ছাই দিয়ে সরে পড়েছে। আইসল্যাণ্ডে জেলে সেজে নতুন করে রাজনৈতিক মাছ ধরবার ফিকিরে আছে।

ভানু। গুড গড। এ খবরটি কোথায় পেলেন মশাই।

অবিনাশ। আমাদের ক্লাবে এক ভদ্রলোক আছেন—ত্রিকাল বোস। একটা বড় ইন্সিওরেন্স কোম্পানির চীফ অর্গানাইজার। কিন্তু অদ্ভুত গুণতে পারেন মশাই। এই যে আজ রেসে ১২৫০৲ টাকা জিতলাম—এ মশাই তিন মাস আগে বলে রেখেছেন।

ভানু। আপত্তি না থাকে তো—আপনাদের এই অদ্ভুত লোকটির সঙ্গে একবার দেখা করতে পারি।

অবিনাশ। নিশ্চয়, নিশ্চয় আপনার মত ব্রেভ ইয়ং ম্যান্‌কে দেখলে তিনিও ভারি খুশি হবেন।

ভানু। কোথায় দেখা হবে?

অবিনাশ। কেন—আমাদের এই ক্লাবে।

ভানু। (চারিদিকে তাকাইয়া) এটি আপনাদের ক্লাব?

অবিনাশ। হাঁ—নাম শোনেন নি—'আনন্দম্'।

ভানু। না মশাই। নামটা যদি 'দুঃখম্' হতো—নিশ্চয় শুনতাম।

[অবিনাশ ও তিনকড়ি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। হঠাৎ ত্রিকাল বোসের আবির্ভাব। বয়স পঞ্চাশের উর্দ্ধে। স্যুট পরিহিত—অদ্ভুত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। মুখে পাইপ—চোখে পাঁশ্‌নে।]

ত্রিকাল। হাসো—হাসো—হাসো। বাঁচবার প্রথম নীতিই হচ্ছে—'হেসে নাও—দু'দিন বৈ তো নয়।'

ভানু। এ কি! ওঁকে আমি দেখেছি। এক বৃষ্টির রাত্রে আমি পথে দাঁড়িয়ে ভিজছিলাম। উনি রিক্সা করে যাচ্ছিলেন। আমার কষ্ট দেখে নিজের গায়ের ওয়াটার-প্রুফটা আমার গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে চলে গেলেন।

অবিনাশ। তবে ওঁর কৃপা আপনি এরই মধ্যে পেয়ে গেছেন।

[ত্রিকাল বোস ভানুর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।]

ত্রিকাল। ইয়েস—মাই বয়। Then we have already meet in a rainy night. কি নাম?

অবিনাশ। ভানু চৌধুরী। ত্রিকাল বোস।

তিনকড়ি। রেসে হেরে উনি আমাদের মোটরের তলায় পড়ে এই মূল্যবান জীবনটি অবসান করতে চেয়েছিলেন। অল্পের জন্য খুব বেঁচে গেছেন।

[ত্রিকাল বোস পকেট হইতে ম্যাগনিফাইং গ্লাস বাহির করিয়া ভানুর কপালের রেখা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।]

ত্রিকাল। আয়ু পুরোপুরি ষাট বছর—কিন্তু কয়েকটি জোর ফাঁড়া আছে। চল্লিশের পর। কিন্তু চল্লিশের আগে গুলি কর—মরবে না, আগুনে ফেল—পুড়বে না, মোটরের কথা কি বলছ তোমরা। দেখো—মোটরটাই বোধ হয় একটু জখম হয়েছে। আচ্ছা—ভাগ্যরেখাটা দেখছি।...হাঁ—ভাগ্যরেখায় কিছু মেঘ জমেছে। কিন্তু থাকবে না। স্ত্রী-ভাগ্যে ধন। বল কি হে—এর যে লক্ষপতি যোগ রয়েছে। কিন্তু সবকিছু—ঐ স্ত্রী-ভাগ্যে।

ভানু। স্ত্রী-ভাগ্যে যা হবার তা হয়ে গেছে স্যার। পাঁচ হাজার-টাকা বরপণ পেয়েছিলাম। বৌ নিয়ে নতুন সংসার পাততে হাজার-খানেক বেরিয়ে গেল। কাপড়ের দোকানের জন্য কটন ষ্ট্রীটে একটা ঘর ভাড়া নিতে গিয়ে দু'হাজার টাকা আক্কেলসেলামী দিয়েছি। বাকী ছিল দু'হাজার, তার এক হাজার টাকা খুইয়েছি—আজ রেসে।

ত্রিকাল। এ সব তো জানা কথা। কিন্তু আবার হবে। রাহু

মশাই শেষ ধাক্কাটি দিয়ে আজ সরে পড়লেন। কাল থেকে দেখবেন। অবিনাশ বাবু, তোমার কি হ'ল আজ?

অবিনাশ। You have never failed, Sir. বলেছিলেন—হাজারখানেক পাব। কিছু বেশীই পেয়েছি—১২৫০৲।

ভানু। আপনাকে আমার কিছু বলবার আছে। যদি দয়া করে শোনেন—গোপনে।

ত্রিকাল। গোপনে আবার কি বলবে হে? বলবার আছেই বা কি? টাকার অভাবে দুঃখ পাচ্ছ। এই তো?

ভানু। হাঁ—কতকটা তাই বটে।

ত্রিকাল। (অবিনাশ ও তিনকড়ির প্রতি) কৈ হে—তোমাদের শনিবারের জলসার আর কত দেরি?

অবিনাশ। আশেপাশেই বোধ হয় সব আছে—সময় হলেই আসবে।

ত্রিকাল। সুনন্দা দেবী নাকি আজ নাচবেন। দেখো—দেখো। আজ তোমাদের আসরে নতুন অতিথি এসেছে। Cheer him up. Pick him up.

[অবিনাশ ও তিনকড়ি ভিতরের দিকে চলিয়া গেল।]

ত্রিকাল। (ভানুকে) কি বলছিলুম—টাকা। টাকার অভাবে দুঃখ পাচ্ছ। এই তো? দুঃখ পাচ্ছ—Only because you are a fool. কলকাতা শহরের পথে-ঘাটে আকাশে-বাতাসে টাকা ছড়ানো রয়েছে। শুধু তুলে নিতে জানা চাই। যে তা জানে—সে বড়লোক। দুনিয়ার সবকিছু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তার করায়ত্ত। যে তা জানে না—সে-ই হচ্ছে গরীব। এ দুনিয়ার কোন কিছুতে তার অধিকার নেই।

ভানু। ঐ তুলে নেবার কৌশলটাই আমি জানতে চাই। সৎপথে থেকে—মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কত চেষ্টা করেছি···

ত্রিকাল। (উচ্চ হাস্য করিয়া) হাঃ হাঃ হাঃ—you are a fool। বেকুব বলেই করেছ। চুরি, জোচ্চুরি, ধাপ্পাবাজি, রাহাজানি—আজ এই পথেই টাকা। ধরা পড়লেই জেল—কিন্তু কোন্ ব্যবসায়ে risk না আছে বল?

[এমন সময় বিপিন মালাকারের প্রবেশ।]

বিপিন। এই যে স্যার—আপনি এখানে? আপনাকে আমি খুঁজছি।

ত্রিকাল। Yes, Malakar, what can I do for you?

বিপিন। (ভানুর প্রতি সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া—ত্রিকালকে) একটু কথা ছিল স্যার।

ত্রিকাল। না, না,—এখানে বাপু প্রাইভেট কিছু নেই। (ভানুর প্রতি) একটা ব্যবসা আছে—এরা যা করছে। সেকেণ্ড হ্যাণ্ড—সেকেণ্ড হ্যাণ্ড কেন থার্ড হ্যাণ্ড মোটর গাড়ী রং চং করে এক মোটর ইন্সিওরেন্স কোম্পানির এজেন্টের যোগসাজসে নতুন গাড়ী বলে চালিয়ে—দশ হাজার টাকার ইন্সিওর করে—নিজের হাতে পেট্রল দিয়ে সে গাড়ী পুড়িয়ে দেয়। কোম্পানি টাকাটা দিতে গিয়ে হঠাৎ এই জোচ্চুরির খবর পেয়েছে। পুলিশ এনকোয়ারি হচ্ছে। তোমাদের প্ল্যানে কোন জায়গায় একটা স্ক্রু আলগা ছিল। এখন আপসোস করে লাভ কি।

বিপিন। কিন্তু স্যার এখনও বোধ হয় বাঁচবার পথ আছে।

ত্রিকাল। আচ্ছা কাল আপিসে যেও। ভেবে দেখব। কই হে—সুনন্দা দেবীর নাচ?

বিপিন। দেখছি। (বিপিন চলিয়া গেল।)

ভানু। ইন্সিওর করে নিজের গাড়ী নিজে পুড়িয়ে—টাকা রোজগারের এ-এক বেশ ফন্দী দেখছি।

ত্রিকাল। এ সব ত এখন হামেশাই হচ্ছে! এ আর কি! বউয়ের লাইফ ইন্সিওর করে তারপর তাকে যেন-তেন-প্রকারেণ মেরে ফেলে ইন্সিওর কোম্পানির কাছ থেকে টাকা আদায় করা—এ রকম দু-দুটো কেস এই বছরেই হয়েছে। কেন—কাগজে পড় নি?

ভানু। বলেন কি স্যার?

ত্রিকাল। না, না—অবাক হবার কিছু নেই। সমাজই বল আর রাষ্ট্রই বল—সব কিছুর বুনিয়াদই হয়েছে আজ টাকা। স্নেহ, প্রীতি, মায়া, মমতা, কর্তব্য, মনুষ্যত্ব, ধর্ম—এমন কি মন্দিরের দেবতা সবকিছু ছাপিয়ে আজ জগতে একটি মাত্র শব্দই ধ্বনিত হচ্ছে—টাকা!—টাকা!—টাকা। এ দুনিয়ায় টাকার শব্দই আজ ব্রহ্ম।

[সহসা রঙ্গমঞ্চ অন্ধকার হইয়া তখনি আবার আলোকিত হইল। দেখা গেল মঞ্চের উপর নৃত্যরতা সুনন্দা। 'আনন্দমে'র সভ্যদের দ্বারা চেয়ারগুলি পূর্ণ। বলা বাহুল্য—সেখানে ত্রিকালের পার্শ্বে ভানু চৌধুরীও রহিয়াছে। নৃত্য শেষ হইল। করতালি। নৃত্যশেষে যৌবনোচ্ছলা, আনন্দোজ্জ্বলা সুনন্দা দেবী মঞ্চ হইতে তর তর করিয়া অবতরণ করিয়া পার্শ্ব পথ দিয়া আসিতে আসিতে ত্রিকাল বোসের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল।]

ত্রিকাল। পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। 'আনন্দমে'র আনন্দ—সুনন্দা দেবী। ভানু চৌধুরী। আমাদের অতিথি। 'আনন্দমে'র নতুন সভ্য।

(উভয়ের দৃষ্টি ও নমস্কার বিনিময়।)

(ক্রমশঃ)

শিল্পী শ্রীশক্তি হালদারের চিত্র-প্রদর্শনী

কিছুকাল আগে পাঁচ নম্বর গবর্ণমেন্ট প্লেসে (নর্থ) তরুণ শিল্পী শ্রীশক্তি হালদারের অঙ্কিত চিত্রাবলীর এক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। যথোচিত প্রচারের অভাবে বহু কলা-রসিকের পক্ষেই এই প্রদর্শনীর বিষয় অবগত হওয়া সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু মুষ্টিমেয় যে কয়জন সমঝদার উক্ত প্রদর্শনীতে উপস্থিত হইয়া এই উদীয়মান শিল্পীকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই এই অভিমত পোষণ করেন যে, নিষ্ঠার সঙ্গে সাধনার রত থাকিলে এই শিল্পী ভবিষ্যতে কলালক্ষ্মীর প্রসাদলাভ করিতে সমর্থ হইবেন।

এক জন টিপুরা পুরুষ

শিল্পী শক্তি হালদারের চিত্র-প্রদর্শনীতে যে জিনিষটি চিত্রামোদীর দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহা হইতেছে বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব। গতানুগতিক পন্থা পরিত্যাগ করিয়া এই শিল্পী নূতন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বিষয়বস্তুর সন্ধান করিয়াছেন এবং বিভিন্ন ছবিতে বাংলা ও আসামের আদিবাসীদের জীবনলীলাকে ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। আমাদের ঘরের পাশে যে সকল আদিম জাতির লোক যুগযুগান্তর ধরিয়া নিজেদের আচার-ব্যবহার রীতিনীতি ইত্যাদি লইয়া বাস করিতেছে, আজ তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। সাহিত্যে এবং চিত্রকলায় এই দীর্ঘকাল-উপেক্ষিত মানব-সমাজের জীবনকে রূপায়িত করিয়া তোলা যে একান্ত প্রয়োজন সে বিষয়ে আমাদের সাহিত্যিক এবং শিল্পীরা এখনো সম্যক্ সচেতন হন নাই।

অবশ্য বাংলার চিত্রকলায় আদিবাসীদের জীবনধারাকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা যে একেবারেই হয় নাই তাহা নহে। বহুদিন আগে শিল্পী অর্দ্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীহট্টের মণিপুরীদের জীবনযাপন-প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কতকগুলি ছবি আঁকেন। তন্মধ্যে দু'একটি 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইয়া চিত্রামোদীদের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিল। শিল্পী শ্রীবাসুদেব রায়ও মণিপুরী-জীবনকে কতকগুলি চিত্রে রূপায়িত করেন।

পার্ব্বত্য পথ

সাঁওতালরা আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী বলিয়া তাহাদের সম্বন্ধে বাংলা-সাহিত্যে যেমন প্রচুর আলোচনা হইয়াছে, তেমনি সাঁওতাল-জীবন সম্বন্ধে শিল্পাচার্য্য নন্দলাল বসু হইতে সুরু করিয়া বহু বিখ্যাত এবং অল্পখ্যাত শিল্পী ছবিও আঁকিয়াছেন বিস্তর। কিন্তু শুধু সাঁওতাল নহে, বাংলা এবং আসামে অন্যান্য যে সকল আদিম জাতির লোকের বাস, তাহাদের জীবন ও সমাজ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ

অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া আধুনিক শিল্পীরা যদি তাহার রূপায়ণে মনোযোগী হন তাহা হইলে তাঁহাদের সৃজনীশক্তির দানে বাংলার চিত্রকলা-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হইবে। চিত্রজগতে শক্তি হালদারের নূতন পথে যাত্রারম্ভ দেখিয়া তাই আমাদের মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে। সাঁওতাল, মণিপুরী, গারো, টিপ্‌রা প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর আদিবাসীদের সম্বন্ধে বহু ছবি তিনি আঁকিয়াছেন, তন্মধ্যে মাত্র পাঁচ-ছয়খানি প্রদর্শিত হইয়াছিল। শুধু আদিম সমাজের মানুষের ছবি আঁকিয়াই তিনি তাঁহার শিল্পকৃত্য শেষ করেন নাই, 'পাহাড়ের একাংশের দৃশ্য', 'ত্রিপুরার টিলা' প্রভৃতি ছবিতে পার্ব্বত্য প্রদেশের নিসর্গ-দৃশ্যকেও চমৎকারভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। আমাদের সবচেয়ে ভালো লাগিয়াছে তাঁহার আঁকা একটি 'টিপ্‌রা' এবং "গারোদের তরু-কুটির" এই ছবি দু'খানি। আসামের গারোরা শস্যক্ষেত্র চৌকি দিবার জন্য গাছের উপরে বাঁশ আর শণ-ঘাস দিয়া এক ধরণের কুঁড়ে ঘর (বোরাং) তৈরি করে এবং ফসল পাকিবার ঋতুতে সপরিবারে এই কুটিরে অবস্থান করে। তরুণ শিল্পী ছবিটিকে একেবারে নিখুঁতভাবে আঁকিয়াছেন। এখানি যেমন তাঁহার সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ-ক্ষমতার, তেমনি অঙ্কন-নৈপুণ্যেরও পরিচায়ক। আদিবাসীদের জীবন ও সমাজ ছাড়া অন্যান্য বিষয়বস্তু অবলম্বনে অঙ্কিত ছবিগুলির মধ্যে 'ফতেপুর সিক্রি', 'গোধূলি', 'জলকে চল' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

গারোদের তরু-কুটীর—বোরাং

নবীন পৃথিবী

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

বৈশাখ কি চিহ্ন মাত্র ? সে কি শুধু বর্ষের সূচনা ?
এনেছে কি নব সূর্য্য ? এনেছে কি নূতন বিশ্বাস ?
নূতন বিস্ময় কোন ? ভবিষ্যের উজ্জ্বল আভাস ?
আলোয় দিয়েছে মুছে অতীতের আর্ত্ত আলোচনা,
থেমে-গিয়ে পথপ্রান্তে বিগতের অশান্ত শোচনা ?
বর্ষ যায়, বর্ষ আসে। স্পর্শে তার এল কি আশ্বাস—
মানুষ শৃঙ্খলমুক্ত, হবে না সে অদৃষ্টের দাস,
সমাজে ও শাস্ত্রে হবে নূতনের বিধান-যোজনা ?

নবীন, পেয়েছ পথ ? পেয়েছ কি সত্যের সন্ধান ?
ক্ষুধাতুর অন্ন পাবে ? ভয়াতুর হবে কি নির্ভয় ?
সে-আলো এনেছ না-কি যে-আলো অম্লান, অনির্ব্বাণ ?
অমূল্য এ জীবনের কে করিবে মূল্যের নির্ণয় ?
দ্বিধা ও সন্দেহ হ'তে এ পৃথিবী পাক্ পরিত্রাণ,
নব যুগে হোক্ তবে পরিপূর্ণ মানবের জয়।

নর ও নারী

শ্রীমণীন্দ্রনাথ দাস

পৃথিবীর সমস্ত জনসংখ্যার অর্দ্ধেক পুরুষ এবং প্রায় অর্দ্ধেক নারী। সেজন্ম নর-নারীর শারীরিক ও মানসিক বৈষম্যের তুলনামূলক নিরপেক্ষ আলোচনার কতকটা প্রয়োজন আছে। এই বিষয় সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর সমাজ-সংস্থাপন ও গার্হস্থ্য-গঠন বিশেষ করিয়া নির্ভর করে। এই প্রবন্ধে স্ত্রী-পুরুষের স্বাভাবিক পার্থক্যের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করা হইবে। দেখা যাক, নর-নারীর পার্থক্য কত দূর বংশানুক্রমিক ও জন্মগত এবং কতখানি স্বোপার্জ্জিত ও পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর প্রভাবসঞ্জাত।

দৈহিক গঠন

একখানি অট্টালিকা যেমন বহুসংখ্যক ইষ্টকের দ্বারা নির্ম্মিত, সেইরূপ মানুষের শরীর অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ বা cell লইয়া গঠিত। মাইক্রোসকোপের সাহায্যে পর্য্যবেক্ষণ করিলে প্রতি দেহকোষে বিভাজনের সময় ৪৮টি সূত্রাকার পদার্থ পাওয়া যায়, উহারাই বংশবাহক ক্রোমোসোম্ (chromosome)। মানব-মানবীর প্রতি শরীর-কোষে পুরুষত্ব বা নারীত্বের ছাপ আছে। পুরুষের প্রত্যেক দেহ-কোষে বিশষত্ব-নির্দ্দেশক X ও Y ক্রোমোসোম থাকে আর স্ত্রীলোকের শরীর-কোষে বিশিষ্টতাব্যঞ্জক দুইটি X ক্রোমোসোম থাকে। অবশিষ্ট ৪৬টি ক্রোমোসোম্ উভয়ের সমান। পিতার নিকট হইতে Y ক্রোমোসোম এবং মাতার নিকট হইতে X ক্রোমোসোম প্রাপ্ত হইলে পুত্রসন্তান জন্মায় আর পিতার নিকট হইতেও X ক্রোমোসোম এবং মাতার নিকট হইতে X ক্রোমোসোম পাইলে কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে।

শিশুর বংশানুক্রমিক যৌন-পার্থক্য গর্ভস্থ অবস্থায় তৃতীয় মাসেই পরিস্ফুট হয়, কিন্তু এই প্রভেদ জন্মের পরেই স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। সদ্যজাত ছেলে-শিশুর ওজন ও উচ্চতা মেয়ে-শিশু অপেক্ষা সামান্য বেশী হইয়া থাকে—নবজাত ছেলের দৈর্ঘ্য প্রায় এক-দশমাংশ ইঞ্চি আর ওজন প্রায় আধ পাউণ্ড অধিক হয়। মেয়েরা কেবল বার হইতে চৌদ্দ বৎসর বয়সে সাধারণতঃ ঐ বয়সের ছেলেদের চেয়ে লম্বা ও ভারী হয়। পনর বৎসর হইতে ছেলেরা আবার ওজন-উচ্চতায় অধিক অগ্রসর হইতে থাকে। সাধারণতঃ মেয়েদের যৌবনারম্ভ হয় তের-চৌদ্দ বৎসরে আর ছেলেদের যৌবনাগমন হয় চৌদ্দ-পনর বৎসর বয়সে। এই সময় উভয়ের দেহে অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি হইতে বিশেষ প্রকার রাসায়নিক রস বা হর্ম্মোন নির্গত হইয়া রক্তস্রোতের সহিত সর্ব্বশরীরে সঞ্চালিত হইয়া নারীত্ব-নির্ণায়ক বা পুরুষত্ব-প্রকাশক যৌব[ন] আনয়ন করে। এই কালে বংশ-বিস্তারের জন্য পুরু[ষ] শরীরে বীজকোষ এবং স্ত্রীদেহে ডিম্বকোষ উৎপন্ন হয়। [এ] বয়সে মেয়েদের 'মাসিক ধর্ম্ম' আরম্ভ হয় এবং পরবর্ত্তী ত্রি[শ-] পঁয়ত্রিশ বৎসর কাল স্থায়ী হয়।

স্ত্রীলোকের শরীর ২৫ বৎসরে পূর্ণগঠিত হয়, পুরুষে[র] দেহ ২৭ বৎসরে সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু সাধারণতঃ ২০ বৎসরে[র] পর মেয়েদের শারীরিক বৃদ্ধি আর ঘটে না, কারণ ইহা[র] পূর্ব্বে বা অল্পকাল পরে তাহাদের জায়া ও জননী হইতে হয়। পূর্ণবয়স্ক যুবকের শরীর পূর্ণবয়স্কা যুবতীর দে[হ] অপেক্ষা আকারে বড়, ওজনে ভারী। পুরুষের দেহ কঠি[ন] পেশীবহুল, নারীর শরীর কোমল ও মেদবহুল। স্ত্রীলো[ক] সাধারণতঃ পুরুষ অপেক্ষা দৈর্ঘ্যে চার-পাঁচ ইঞ্চি ছোট হয়। নারীর ওজন পুরুষের ওজন অপেক্ষা প্রায় এক-পঞ্চমাংশ কম। নারীর বস্তিপ্রদেশ (Pelvis) পুরুষের তুলনায় চওড়া। স্ত্রীলোকের উরুর পরিধি পুরুষের উরুর বেষ্টনী অপেক্ষা গড়ে প্রায় এক ইঞ্চি বেশী। নারীর পঞ্জরাস্থি অধিকতর বক্র।

মেয়েদের মাথায় চুলের গোড়া শক্ত, সেজন্য সচরাচর টাক পড়ে না। মস্তকে কেশহীনতা ব্যাধিটি পুরুষমানুষের একচেটিয়া। তবে গণ্ড ও ওষ্ঠের উপরে কেশোদ্গম পুরুষেরই হইয়া থাকে।

রক্ত সঞ্চালন

যে জীব যত বড় ও ভারী তাহার হৃৎস্পন্দন ও শ্বাসক্রিয়া তত ধীরে। যেমন, বৃহত্তম স্থলজন্তু হস্তীর হৃদযন্ত্র মিনিটে মাত্র ২৮ বার স্পন্দিত হয়, কিন্তু অশ্বের হৃৎপিণ্ড ৪২ বার স্পন্দিত হয়। সেইরূপ অপেক্ষাকৃত গুরুভার পুরুষের নাড়ী মিনিটে ৭২ বার কম্পিত হয় আর লঘুকায়া স্ত্রীলোকের নাড়ীর গতি মিনিটে প্রায় ৮০ বার। নরশোণিতে শতকরা ১০ ভাগ অধিক রক্তকণিকা থাকায় উহা অধিকতর গাঢ় এবং উহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০৫৮। নারী রক্তে জলীয় ভাগ বেশী বলিয়া উহার আপেক্ষিক গুরুত্ব কম—প্রায় ১০৫৫। নারীর রক্তচাপ গড়ে পুরুষের রক্তচাপ অপেক্ষা ৫ হইতে ১০ মিলি-মিটার কম থাকে। পুরুষ মানুষের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপ বেশী পাওয়া যায়। স্ত্রীলোকের ভিতর সেইরূপ নিম্ন রক্তচাপের আধিক্য দেখা যায়।

শ্বাসক্রিয়া ও স্বরযন্ত্র

পুরুষমানুষ মিনিটে ১৮ বার শ্বাস গ্রহণ করে, স্ত্রীলোকের শ্বাসের গতি ইহা অপেক্ষা সামান্য বেশী। সাধারণতঃ নাড়ীর বেগ নিঃশ্বাসের তুলনায় চার গুণ দ্রুত। নারীর ফুসফুসের বায়ু-ধারণ ক্ষমতা অনেক কম। এক জন স্ত্রীলোক যেখানে মাত্র ১৩২ ঘন ইঞ্চি বাতাস গ্রহণ করিতে সক্ষম, সেখানে পুরুষ-মানুষ ২১৭ ঘন ইঞ্চি বায়ু ধারণ করিতে পারে। মানুষ ও জীবজন্তু প্রশ্বাসের সহিত অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া দেহান্তর্গত খাদ্যবস্তু দগ্ধ করে এবং নিঃশ্বাসের সহিত কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস পরিত্যাগ করে। ইহাই জীবনক্রিয়া। স্ত্রীলোকে পুরুষ অপেক্ষা প্রায় এক-পঞ্চমাংশ কম খাদ্য গ্রহণ করে। মেয়েদের ও ছেলেদের কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস নিষ্কাশনের হার যথাক্রমে ১০০ : ১৪০। ইহাতে প্রতিপন্ন হয়—মেয়েদের সাধারণ দেহক্রিয়া (general metabolism) মন্থর। শরীর-ক্রিয়া ধীরে ধীরে হইলে দেহতাপ কম হইবার কথা, সেজন্য অনেকের সিদ্ধান্ত—নারীর শারীরিক উত্তাপ সামান্য কম। কিন্তু এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের যথেষ্ট মতভেদ আছে।

রমণীর কণ্ঠস্বর সরু ও মৃদু, পুরুষের গলার শব্দ মোটা ও ভারী। পুরুষ-কণ্ঠে সেকেণ্ডে ১৯০ বার হইতে ৬৭৮ পর্য্যন্ত কম্পন উৎপন্ন হয়। নারী-স্বরযন্ত্রে সেকেণ্ডে ৫৭২ হইতে ১৬০০ বার পর্য্যন্ত কম্পন উত্থিত হয়। মেয়েদের মধ্যে তোতলামি খুব কম, তাহাদের বাগযন্ত্র অপেক্ষাকৃত উন্নত। শৈশবে মেয়েরা ছেলেদের প্রায় দুই মাস পূর্ব্বে কথা বলিতে আরম্ভ করে।

পঞ্চেন্দ্রিয়

সাধারণ দৃষ্টিশক্তি নারী পুরুষ উভয়ের প্রায় সমান, কিন্তু নারীর বর্ণবোধ অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম, বর্ণান্ধতা-ব্যাধি পুরুষ মানুষের মধ্যে দশ গুণ বেশী। পুরুষের ঘ্রাণশক্তি ও শ্রবণশক্তি অধিকতর তীক্ষ্ণ। নারীর স্পর্শেন্দ্রিয় ও আস্বাদজ্ঞান বেশী অনুভূতিসম্পন্ন। অধ্যাপক রাইনের মতে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি উভয়ের সমান।

জীবনীশক্তি

'ডায়নামোমিটার' নামক যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে—নরের দৈহিক বল নারী অপেক্ষা দেড়গুণ অধিক। ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে প্রায় দেড়গুণ বেশী ওজন বহন করিতে পারে। কঠিন শারীরিক পরিশ্রমের কার্য্যে মেয়েরা শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া পড়ে, কিন্তু বহুক্ষণব্যাপী অল্পশ্রম-সাধ্য কার্য্যে তাহারা অধিকতর সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করে।

মেয়েমানুষের শরীরে অসুখ অসুস্থতা বেশী, কারণ সাধারণ রোগব্যাধি ছাড়াও স্ত্রীদেহ-সংক্রান্ত নানা রকম অসুখে তাহাদের কষ্টভোগ করিতে হয়। তবে নারীর জীবনীশক্তি অধিক হওয়ায় সহজেই রোগ নিরাময় হয়। ইউরোপে স্ত্রীলোকের আয়ু গড়ে পুরুষ অপেক্ষা প্রায় তিন বৎসর বেশী। জন্মের পূর্ব্বে ও পরে প্রাণশক্তির এই পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। গ্রেট ব্রিটেনে জন্মের পূর্ব্বে মৃত্যুর হার এই রূপ—মৃত অবস্থায় মেয়ে-শিশু-সন্তান যদি ১০০ জন জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে ছেলে-শিশু প্রাণহীন অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয় প্রায় ১৫০ জন। আশী বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধার সংখ্যা ঐ বয়সের বৃদ্ধের সংখ্যার দ্বিগুণ। তবে এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, পৃথিবীতে পুংশিশু অধিক সংখ্যায় আগমন করে। জীবিত অবস্থায় শিশুজন্মের অনুপাত এইরূপ—১০০ মেয়ে ও ১০৬ ছেলে। বিলাতে এক বৎসর বয়সে শিশুমৃত্যুর হার যথাক্রমে ১০০ মেয়ে ও ১২০ ছেলে। পুরুষ মানুষের জন্মের অনুপাত অধিক, কিন্তু মৃত্যুর হার ততোধিক। মনে হয় পুরুষের জীবনীশক্তি অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ।

ভারতবর্ষে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় যথোচিত যত্ন লওয়া হয় না বলিয়া মেয়েদের মধ্যে ঐ সময় মৃত্যুর হার বেশী। সেজন্য এদেশে যুবতীর সম্ভাব্য আয়ুষ্কাল যুবকদের অপেক্ষা অধিক ত নয়ই, বরং কিছু কম। ভারতে ছেলে ও মেয়ের সম্ভাব্য আয়ুর অনুপাত যথাক্রমে ২৬·৯১ ও ২৬·৫৬ বৎসর।

পুরুষের সন্তানোৎপাদন-ক্ষমতা ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত (এমন কি ৯০ বছরেও) অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোকের ৪৫।৫০ বৎসরে ঋতুসমাপ্তির সঙ্গে উৎপাদিকাশক্তি বিলুপ্ত হয়।

অসুখ-অসুস্থতা

নিম্ননির্দ্দিষ্ট ব্যাধিগ্রস্ত পুরুষরোগী অধিক সংখ্যায় দেখা যায় যেমন—শ্বাসযন্ত্রের পীড়া, মূত্রপাথুরি, গাঁটের বাত (৯০%), হার্ণিয়া, মস্তিষ্কের সিফিলিস (৮০%), বহুমূত্র, অপস্মার (৭০%), নিউরাসথিনিয়া নামক স্নায়ুরোগ এবং Schizophrenia আখ্যাত মনোরোগ—যাহাতে রোগীর স্বাভাবিক আবেগ উচ্ছ্বাস হ্রাস পায় এবং বাস্তবের সহিত সম্পর্ক লোপ হয়। হেমোফিলিয়া নামক অতিরিক্ত রক্তপাত রোগটি কেবল পুরুষ-মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। যদিও মেয়েরাই এই ব্যাধি বহন করে, তথাপি তাহারা কখনও এই অসুখে আক্রান্ত হয় না। হৃৎপিণ্ডের পীড়া কিংবা উচ্চ রক্তচাপ জনিত অসুস্থতা কোন পুরুষের হইলে তাহার জীবনকালের পরিমাণ ঐরূপ রোগাক্রান্তা কোন স্ত্রীলোকের তুলনায় কিছু কম আশা করা যায়।

পরবর্ত্তী রোগগুলি নারীদের মধ্যে অধিক পরিলক্ষিত হয় যথা—স্থূলতা, থাইরয়েড গ্রন্থির অসুখ (৮৮%), পিত্তপাথুরি (৭৫%), কর্কটব্যাধি, সন্ধিবাত (৮০%), বিসর্পব্যাধি, বিবিধ স্ত্রীরোগ, উত্তেজনা—অবসন্নতা মানসিকব্যাধি (৭০%), হিষ্টিরিয়া এবং গর্ভাবস্থা সংক্রান্ত মনের রোগ।

জনসংখ্যা

সাধারণতঃ পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে নারীর সংখ্যা বেশী, আর প্রাচ্য দেশগুলিতে পুরুষের সংখ্যা বেশী। কঠোর জীবন-সংগ্রাম, যুদ্ধবিগ্রহ এবং যান্ত্রিক দুর্ঘটনা পুরুষের আয়ু হরণ করে। অপর দিকে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় অযত্ন ও অবহেলা নারীর আয়ুষ্কাল হ্রাস করে। প্রকৃতি তাই নারীর রোগ-প্রতিরোধক্ষমতা অধিক দিয়াছেন আর পুরুষের জন্মের হার অধিক করিয়াছেন। এই ব্যবস্থায় ভারসাম্য থাকিবার সম্ভাবনা। নিম্নে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ১৯২০ সনে নর-নারীর অনুপাত ও জন্মের হার যেরূপ ছিল তাহার একটি তালিকা প্রদত্ত হইল :

দেশ	প্রতি হাজার পুরুষের অনুপাতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা	প্রতি হাজার মেয়ের জন্মের অনুপাতে ছেলের জন্মের হার
জার্ম্মানী	১০৯১	১০৭২
ফ্রান্স	১১০৩	১০৫৯
ইংলণ্ড	১০৯১	১০৫২
ইটালী	১০২৮	১০৬০
গ্রীস	১০১০	১০৬৩
রাশিয়া	১২২৪	—
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	৯৬০	১০৫৭
কানাডা	৯৪০	১০৬৫
জাপান	৯৭৯	১০৪৫
ভারতবর্ষ	৯৪০	১০৮০
মিশর	৯৯৭	১০৯৩
দক্ষিণ-আফ্রিকা	৯৪৩	১০৭৬
অষ্ট্রেলিয়া	৯৬৮	১০৬২

বর্ত্তমান সময় আমেরিকায় স্ত্রীলোকের অনুপাত অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

মানসিক প্রভেদ

নর-নারী উভয়ের সাধারণ বুদ্ধি সমান। স্মৃতিশক্তি ও ভাবাবোধ মেয়েদের বেশী, ছেলেরা যুক্তিতর্কে ও বৈজ্ঞানিক সমস্যা সমাধানে অধিক পারদর্শী। কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারে ছেলেদের স্বাভাবিক যোগ্যতা বেশী। বচনকুশলতা ও বাক্‌চাতুর্য্যে মেয়েরা শ্রেষ্ঠ। নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নদর্শন মেয়েদের মধ্যে বেশী। পুরুষ মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রাধান্যলাভের অভিলাষ অতীব প্রবল, নারীর মাতৃস্নেহ সুগভীর। নারীর মন নমনীয়, পুরুষের মন দুর্দমনীয়। পুরুষের চিত্ত স্বভাবতঃই বহির্মুখী, মেয়েমানুষের মন স্বাভাবিক কারণে গৃহমুখী। নারীর মন রক্ষণশীল, প্রাচীন প্রথা ও রীতি স্ত্রীলোকেরা সযত্নে সংরক্ষণ করিয়া চলে। লজ্জা, ভয়, দুঃখ প্রভৃতি ভাবাবেগে মেয়েরা শীঘ্রই উচ্ছ্বসিত হয়, কিন্তু যৌন ব্যাপারে পুরুষ অধিক সক্রিয়, নারী অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয়। অস্বাভাবিক যৌনবিকার পুরুষের মধ্যেই সর্ব্বাধিক। ইউরোপ, আমেরিকায় আত্মহত্যার অনুপাত পুরুষ মানুষের ভিতর অধিক, কিন্তু এদেশে সামাজিক অবিচারের জন্য মেয়েদের মধ্যে আত্মহত্যার সংখ্যা বেশী। মিথ্যাভাষণ স্ত্রীলোকের ভিতর বেশী দেখা যায়, ইহার কারণ লজ্জা ও দুর্ব্বলতার জন্য তাহাদের অনেক সত্য গোপন করিয়া চলিতে হয়। অন্যান্য অপরাধপ্রবণতা পুরুষের মধ্যে অনেক বেশী। মদ্যপান ও মাদকজনিত মত্ততা পুরুষমানুষের ভিতর সাত গুণ সাধারণ।

তথাপি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, কবি, চিত্রশিল্পী, সঙ্গীত-সুরস্রষ্টা এবং ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক প্রায় সকলেই পুরুষ। অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্না নারীর সংখ্যা নগণ্য। ইহার কারণ কি? অনেকে বলেন—পুরুষজাতি অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল, সেজন্য তাহাদের মধ্যেই অসাধারণ প্রতিভা ও অস্বাভাবিক নির্ব্বুদ্ধিতা অসামান্য পুণ্য ও উৎকট পাপ সমধিক পরিদৃষ্ট হয়।

কেহ কেহ বলেন, মেয়েদের মাতৃত্বের জন্য অতিরিক্ত প্রাণশক্তি ব্যয়িত হয়, সেজন্য তাহাদের অন্য দিকে প্রতিভা-স্ফুরণের আর অবকাশ থাকে না। এই কথা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক নয়, মানবশিশু জননীর গর্ভে বর্দ্ধিত হয় দশ কোটি গুণ, আর জন্মের পরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় মাত্র কুড়ি গুণ—সুতরাং সন্তানের উপর মায়ের প্রভাব কতখানি তাহা ইহাতেই প্রমাণিত হয়। আবার অনেকের মতে—সুযোগ-সুবিধার অভাবই নারীদের প্রতিভা বিকাশের অন্তরায়। পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূল থাকিলে তাহারা পুরুষের সমকক্ষ উন্নতি-লাভ করিতে পারে।

অতএব নর-নারীকে শিক্ষা সংস্কৃতি ও স্বাস্থ্যলাভে সমান সুযোগ প্রদান করা বিধেয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার উভয়ের সমান হওয়া বাঞ্ছনীয়। তৎ-সত্ত্বেও মনে রাখা উচিত, নারী-জীবনের সার্থকতা মাতৃত্বে—সন্তান-ধারণ ও পালনে, গৃহকর্ম্ম-সম্পাদনে, সেবা-শুশ্রূষায়, দয়ায় ও ভালবাসায়। পুরুষ-প্রাণের পূর্ণতা বহির্জগতে, দুঃসাহসিক অভিযানে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে, শক্তিচর্চ্চায় এবং শিল্প-সাধনায়।

গ্রন্থপঞ্জী

1. *Man and Woman,* by Havelock Ellis.
2. *Descent of Man,* by Darwin.
3. *Psychology,* by Woodworth.
4. *Mind and Its Disorders,* by Stoddart.
5. *Psychiatry,* by Henderson and Gillespie.
6. *Science of Life,* by Wells and Huxley.
7. *Lyon's Medical Jurisprudence for India,* by Waddell.
8. *Practice of Medicine,* by Price (1950).
9. *Encyclopaedia Britannica* (1946): "Population."

যোগ

ডাঃ এস্. এম্. এস্. চারী

যোগ প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মানুষের শরীর, মন ও আত্মার উন্নতির পক্ষে ইহা একটি প্রকৃষ্ট উপায়। পূর্ব্বকালের ঋষিগণ এই উপায়টি উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন। এক হিসাবে যোগ বিজ্ঞানের পর্য্যায়ে গিয়া পড়ে। কারণ এ বিষয়ক প্রক্রিয়ার প্রতিটি স্তরে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও পরীক্ষার প্রয়োজন হয়।

যোগ মানে মূলতঃ ও মুখ্যতঃ দেহ-মন সুনিয়ন্ত্রিত করা। এই পথে জীবনের পরম সাধ্যকে লাভ করা যায়। যোগ দর্শনশাস্ত্রেরও একটি অঙ্গ। ইহার দার্শনিক ভিত্তি সুদৃঢ়।

যোগের ব্যবহারিক অর্থ মনঃসংযম। পতঞ্জলি যোগের

টিট্টিভ-আসন

প্রধান ব্যাখ্যাতা। তাঁহার মতে মানসিক বৃত্তিনিচয়ের নিয়ন্ত্রণই হইল যোগ। যোগ দ্বারা মনের এমন একটি অবস্থা ঘটানো যায় যাহার ফলে মানসিক শক্তি বহির্মুখী হইতে পারে না।

মনকে নিয়মিত করার কি প্রয়োজন? ইহার উত্তর যোগের চরম উদ্দেশ্যের মধ্যেই রহিয়াছে—আত্মানুভূতি। ভারতীয় দর্শন তিনটি মূল সূত্র স্বীকার করে—জড়, মন এবং আত্মা। এ তিনের মধ্যে জড় ও মন নশ্বর; কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর ও চিরন্তন। সুতরাং আত্মানুভূতিই যোগের চরম লক্ষ্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

প্রাণায়াম
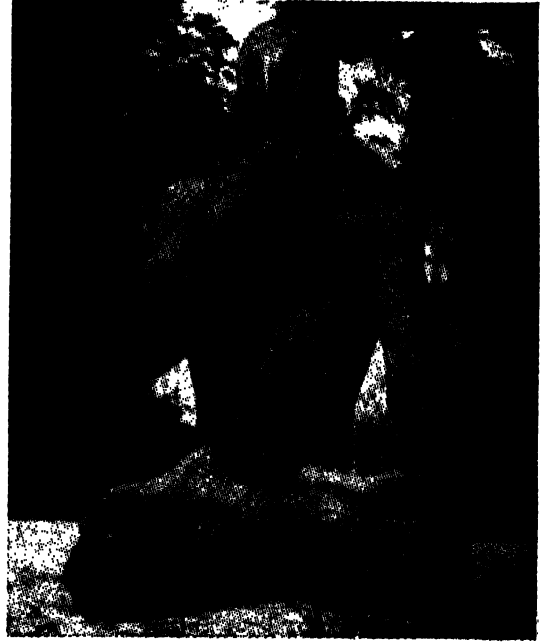
নটরাজ আসন

এই আত্মাকে আমরা কিরূপে অনুভব করিতে পারি? উপনিষদ বলেন, দেহাভ্যন্তরে হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে

আত্মার স্থান। আত্মা নিজে নিজেই কিছু জানিতে বা বুঝিতে পারে না। অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় উহা আমাদের উপলব্ধ হয়। অন্যতম জ্ঞানেন্দ্রিয় মনের মাধ্যমেই আত্মার অনুভূতি সম্ভব। মন স্বভাবতঃ চঞ্চল অদম্য ও উদ্দাম অশ্বসদৃশ। বৃত্তিগুলি সংযত করিয়া যতক্ষণ না ইহাকে আয়ত্তে আনা যায় ততক্ষণ আত্মার উপলব্ধি একরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়। যোগাসন যোগের এ[কটি] মাত্র অঙ্গ। ইহা যোগের দৈহিক দিক। মন ও আ[ত্মার] উন্নয়নও যোগের প্রধান লক্ষ্য। তথাপি যোগাভ্যাসে আস[নের] গুরুত্ব রহিয়াছে। দেহ এবং মনের এরূপ অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ [যে] দেহের উৎকর্ষ না হইলে মনের উন্নয়ন অসম্ভব। অন্যভা[বে] বলিতে গেলে মানসিক উন্নতি দেহ-শুদ্ধি সাপেক্ষ। শরী[র] ব্যাধিমুক্ত হওয়া চাই। এই কারণেই আসনের বিধি।

সর্ব্বাঙ্গাসন

সর্ব্বাঙ্গাসনের প্রকারভেদ

মনঃসংযম যোগের প্রধান কাজ। ইহার জন্য অনেক উপায় বাৎলানো হইয়াছে। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হইল আটটি যোগাঙ্গ : (১) কতকগুলি নিয়ম ও শাসনের অধীন থাকা—যেমন, জীবের বিরুদ্ধে দ্বেষ-হিংসা পোষণ না করা, সত্য কথা বলা, চুরি না করা, চিরকুমার থাকা, এবং পরদ্রব্যে নির্লোভ হওয়া ; (২) কতকগুলি ব্যক্তিগত বৃত্তির উৎকর্ষ—যেমন, দেহ-মনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, আত্ম-তৃপ্তি, যম-নিয়মাদি কৃচ্ছ সাধন, ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও ঈশ্বর আরাধনা ; (৩) যোগাসন অভ্যাস ; (৪) প্রাণায়াম ; (৫) চিত্তবৃত্তি-নিরোধ ; (৬) বাহ্যবস্তুর আকর্ষণ হইতে মনঃসংযম ; (৭) নিদিধ্যাসন এবং (৮) আত্মরতি (যোগভ্যাসের চরম পরিণতি)।

স্থির ও আরামদায়ক অবস্থায় থাকার নামই আসন। আসন অসংখ্য প্রকারের। জীবজন্তু পশুপক্ষী—সকলেরই বসিবার বা দেহ এলাইবার ধরণ অফুরন্ত। কাজেই আসনও যে নানা রকমের ও সংখ্যাবহুল হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? যোগ সম্বন্ধীয় কোন কোন গ্রন্থে চুরাশী লক্ষ আসনের কথা বলা হইয়াছে। কোন কোন গ্রন্থের মতে চুরাশীটি আসনই প্রশস্ত।

মানব-দেহাভ্যন্তরে নাড়ী, কোষ প্রভৃতি নানা অংশ আছে। আসন দ্বারা এই সকল অংশেরও ব্যায়াম হয় এবং এগুলি সুনিয়মিত থাকে। যোগাভ্যাসকারীরা বলেন, যে

সমুদয় ব্যাধি ঔষধে সারে না তাহা যোগাসন দ্বারা সারানো যাইতে পারে। আধুনিক গবেষকগণ আসনের রোগ-প্রতিষেধক গুণ সম্বন্ধেও অনেককিছু প্রমাণ করিয়াছেন। আসন দ্বারা মেরুদণ্ড নমনীয় ও তলপেটের মাংসপেশী শক্ত

বীরভদ্রাসন

হয়। ইহাতে পরিপাকযন্ত্রেরও বেশ ব্যায়াম হয় এবং উহা সক্রিয় থাকে। আসন অভ্যাসে রক্ত শোধন করে, অনাবশ্যক অতিরিক্ত মেদ ইহার ফলে নিরাকৃত হয়; শরীর একহারা হইয়া উঠে। সকলের উপরে আসন দ্বারা এণ্ডোক্রাইন্ গ্রন্থির সক্রিয়তা যথাযথ সাধিত হয়। আর ইহার উপরই

এই আসনে পৃষ্ঠের মাংসপেশীর ব্যায়াম হয়

দেহ-মনের কার্যাকারিতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। যোগাসন অভ্যাস করিলে মানুষের যৌবন অটুট থাকে, পরমায়ুও সাধারণ অবস্থার চেয়ে বাড়িয়া যায়।

ব্যায়ামে যেমন মানব-দেহের অস্থি ও মাংসপেশী সুগঠিত হয়, আসন দ্বারা শুধু তাহাই সাধিত হয় না। ইহার আরও নিগূঢ় ক্রিয়া আছে। আসনে মাত্র দেহ নয়, মনেরও ব্যায়াম হইয়া থাকে। প্রাণায়াম এবং বিহিত রীতিনীতি অনুসারে যদি আসন অনুশীলিত হয়, তাহা হইলে আশ্চর্য্যরকম মানসিক ও আত্মিক শক্তির অধিকারী হওয়া যায়। যোগীরা বিশ্বাস করেন, মূলাধারে (মেরুদণ্ডের নিম্নাংশে) কুণ্ডলিনী
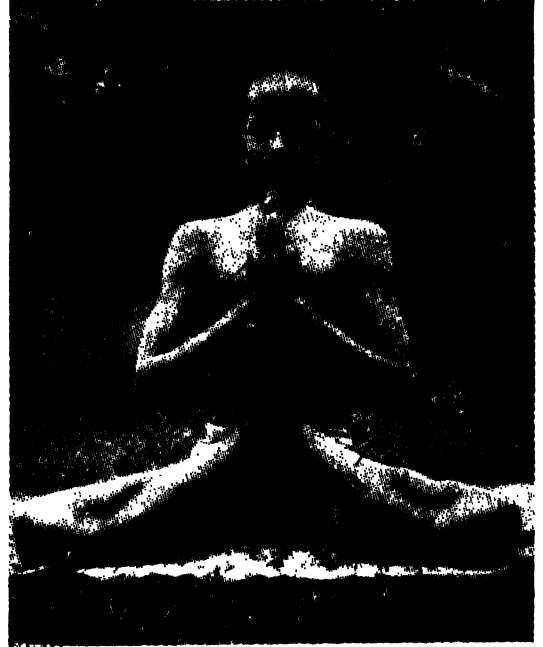
প্রার্থনা-আসন

শক্তি-স্থিত। এই শক্তি সুপ্তাবস্থায় থাকে। ইহা জাগ্রত হইলে মানুষ অসাধারণ ক্ষমতালাভ করে। প্রাণায়াম-সাহায্যে অনুশীলিত কয়েক প্রকারের আসন এই সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করে বলিয়া অনেকের ধারণা।

আধ্যাত্মিক উৎকর্ষকল্পে যোগের উপকারিতা যতই থাকুক, শরীর ও মনের দিক হইতে ইহার উপকারিতার তুলনা নাই। আসন-প্রাণায়ামের যথাযথ অনুশীলনে মানব-দেহ সম্পূর্ণ সক্রিয় থাকে।*

---

* শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক অনূদিত।

অসমাপ্তি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

কত গান গাই, কত কথা বলি',
কি বলিতে বাকি থাকে।
আমি যারে চাই, সে দুরায়মাণ,
কেমনে ধরিব তাকে ?
পঙ্ক—স্বপ্ন দেখে কমলের,
শুক্তি মুক্তা চায়,
পাথর কাঁদিছে পরশ-পাথর
হবার আকাঙ্ক্ষায়।
প্রতি পদার্থে অপার্থিবের
রহিয়াছে পরিবেশ,
অচিন্তনীয় সম্ভাবনার
হেরি নিতি উন্মেষ,
প্রকাশ করিতে চাই—
অফুরন্তকে ফুরায়ে বলার
সাধ্য আমার নাই।

২

গঠন কিছুরি করে নাই শেষ
স্বর্গীয় ভাস্কর,
সব হতে চায় নিত্য, সূক্ষ্ম,
আরও বেশী সুন্দর।
যেটুকু আভাস ইঙ্গিত পাই
ভাবি' তাই যাব কয়ে,
পরে দেখি আরও রূপের জগৎ
পড়িছে ব্যক্ত হয়ে।
যে রূপে আমার বুক ভরে ওঠে
না বলে কেমনে থাকি,
যা বলেছি তাহা শেষ কথা নহে
অনেক রয়েছে বাকি।
বিস্মিত হয়ে হেরি—
মোর চন্দ্রের পূর্ণ চন্দ্র
হতে যে রয়েছে দেরি।

৩

ভাষাও পায় নি পূর্ণ শক্তি,
দৈন্য ঘোচে নি তার,
প্রকাশ করিতে পারে না—মনের
নূতন আবিষ্কার।
অনাগত আসি সুমুখে দাঁড়ায়,
দৃষ্টি-পরিধি বাড়ে।
দেখি অকূলেরও রহিয়াছে কূল
পেতে পারা যায় তারে।
পরশমণিও পরশে না যারা
হেরি তাঁহাদের দেশ,
পলে পলে যাহা নূতন—তাহা কি
বলে করা যায় শেষ ?
মুখে না বচন স্ফুরে—
বাঁশরী কেবল আগাইতে ডাকে
ভুবন-ভোলানো সুরে।

৪

মুগ্ধ করিছে, ভুলাইছে মোরে,
অমৃতের মরীচিকা,
দেবতার নব-রূপ প্রকাশিছে
আরতির দীপশিখা।
কমলের পর কমলেতে, পূজা—
হয় না তো সমাপন,
দেখি আরও এক নীল পদ্মের
রহিয়াছে প্রয়োজন।
ইন্দীবর তো, নহে এ নয়ন
পদে দিব উপাড়িয়া—
চেয়ে থাকি শুধু রাঙা পদ পানে
জলভরা আঁখি নিয়া।
শেষ হয় নাকো কথা—
অফুরন্ত যে জীবন—রবেই
অসমাপ্তির ব্যথা।

ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেস—লক্ষ্ণৌ অধিবেশন

শ্রীমোহিনীমোহন বিশ্বাস, এম-এস্‌সি

বিগত ২রা জানুয়ারী লক্ষ্ণৌ শহরে ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের ৪০তম অধিবেশন আরম্ভ হয়। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যানিং কলেজের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত শ্রীজবাহরলাল নেহরু এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল শ্রী কে এম. মুন্সী একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ দেন এবং প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত শ্রীগোবিন্দবল্লভ পন্থ সমবেত বৈজ্ঞানিকগণকে সাদর সম্ভাষণ জানান। পণ্ডিত নেহরু স্বাধীন ভারতের গঠনমূলক কার্য্যে বৈজ্ঞানিকদিগকে সর্ব্বতোভাবে সহযোগিতা করিবার জন্য আহ্বান করেন। তিনি দেশের খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সমস্যা সমাধানের জন্য বৈজ্ঞানিকগণকে অনুরোধ করেন।

বিজ্ঞান-কংগ্রেসের মূল সভাপতি ডক্টর শ্রীদেবেন্দ্রমোহন বসু তাঁহার অভিভাষণে বলেন. "বর্ত্তমান পরিবর্ত্তনের যুগে সমগ্র এশিয়া এক সঙ্কটের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। এই বিরাট পরিবর্ত্তনের সঙ্গে আমাদিকে মানিয়ে চলতে হবে এবং বিশ্বসভায় আমাদিগকে যোগ্য আসন দখল করতে হবে।" জাতীয় সমস্যার সমাধানের জন্য বিজ্ঞান ও কারিগরী-বিদ্যার একান্ত প্রয়োজন—সভাপতি এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সহিত একমত। তিনি আশা করেন, এদেশীয় বৈজ্ঞানিকগণ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য যথাসাধ্য পরিশ্রম করিবেন। সভাপতি তাঁর ভাষণে সজীব এবং নির্জীবের গঠন-পার্থক্যের বিষয় পর্য্যালোচনা করেন। কাল-পরিবর্ত্তনের সহিত যখন উত্তাপ ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছিল তখন পৃথিবীর বুকের উপর জটিল রাসায়নিক অণু ও জলকণার সৃষ্টি হইল এবং জীবনধারণের উপযোগী উপকরণসমূহ আবির্ভূত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ জড়ের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার অনুভূত হইতে লাগিল। ক্রমে জীবকোষের গঠন-প্রণালী আবিষ্কৃত হইল এবং ইহার মধ্যে কার্ব্বোহাইড্রেট, প্রোটিন. নিউক্লিও প্রোটিন, এনজাইম প্রভৃতির সমাবেশ দেখা গেল। সরল জীবকোষ হইতে জটিল জৈব পদার্থের সৃষ্টি হইল এবং ক্রমশঃ জীবদেহ, মানবদেহ এবং তৎসহ শরীর ও মনের একত্র সমাবেশ দৃষ্ট হইতে লাগল। সভাপতি মহাশয় জড় হইতে জীবনের সৃষ্টি এবং ইহার ক্রমবিবর্ত্তনেরও একটি অতি উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক সমালোচনা করেন।

বিজ্ঞান-কংগ্রেসের বিভিন্ন শাখার উদ্বোধন-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইল এবং প্রত্যেক বিভাগের সভাপতি নিজ নিজ বিভাগের কার্য্য আরম্ভ করিলেন।

রসায়নশাখার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন ডক্টর শ্রীউমাপ্রসন্ন বসু। তিনি রসায়ন-ও শিল্প সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন, রসায়ন-শিল্পের উন্নতির জন্য বৈজ্ঞানিক-গণের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা আবশ্যক। এবিষয়ে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের গবেষণা-কর্ম্মীদের সহিত বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-সমূহের গবেষণা-কর্ম্মীদের আন্তরিক সহযোগিতা আবশ্যক। রসায়ন-শিল্পের মধ্যে ভেষজ-শিল্পের অবস্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক। সেখানে প্রতিযোগিতা এবং নূতন নূতন আবিষ্কারসমূহ পুরাতন শিল্পের উন্নতি ব্যাহত করে। যেমন 'সালফা' চিকিৎসার বিস্তারলাভের সঙ্গে 'সিরামে'র ব্যবহার কমিয়া আসে এবং ভবিষ্যতে এণ্টিবায়োটিকের ব্যাপক প্রয়োগের সঙ্গে 'সালফা' চিকিৎসার দিনও ফুরাইয়া আসিবে। উচ্চশ্রেণীর বৈজ্ঞানিকগণ যাহাতে শিল্পপ্রতিষ্ঠানে যোগ দেন তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে, কারণ রসায়ন ও ভেষজশিল্পের মান এখন অনেক উর্দ্ধে উঠিয়াছে। ডক্টর বসু ভারতীয় রসায়ন-শিল্পের উন্নতির অন্তরায়স্বরূপ কয়েকটি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (১) দেশীয় ভেষজ, রাসায়নিক প্রভৃতি শিল্পের উপর বৈদেশিক প্রতিযোগিতার চাপ। (২) উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক দ্বারা গবেষণাকার্য্যের অভাব। (৩) দেশীয় শিল্পপতিগণের মধ্যে আন্তরিক সহযোগিতার অভাব। একে অপরের শিল্পসম্পদ অনুকরণ করিয়া আত্মসাৎ করিবার প্রবৃত্তি এবং সুবিধা পাইলে পরস্পরের বিশেষজ্ঞদের অধিক বেতনে প্রলুব্ধ করিয়া লইবার প্রয়াস। (৪) জাতীয়তাবোধের অভাব। কেহ কেহ বৈদেশিক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সহিত যৌথ কারবার করিবার চেষ্টাও করিয়াছেন। (৫) অনেক শিল্পপতি শিল্পসম্পদের দোহাই দিয়া কাঁচামাল আমদানী করিয়া কেনা-বেচা করিবার চেষ্টা করেন এবং অধিক লাভ আশা করেন। (৬) বৈজ্ঞানিকদের সঙ্ঘবদ্ধ কর্ম্মপ্রচেষ্টার এবং জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়তাবোধের অভাব। ডক্টর বসু ভারতবর্ষে পেটেণ্টপ্রথার বিস্তারসাধনের প্রয়োজনীয়তার বিষয় উল্লেখ করেন। অন্য দেশে 'সালফাড্রাগ' এবং 'এণ্টি-বায়োটিক' প্রস্তুতের প্রণালীর উন্নতিসাধনের মূলে এই পেটেণ্ট আইন। সেখানে একের প্রণালী অপরে গ্রহণ করিতে না পারায় সহজেই নূতন নূতন প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং এই প্রতিযোগিতার জন্য ঔষধের মানের উন্নয়নও ক্রমশঃ হইয়াছে। ডক্টর বসু ভেষজ প্রস্তুত সম্পর্কিত অনেক সমস্যার বিষয় আলোচনা করেন এবং শিল্প-প্রসারের উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার জন্য আবেদন করেন।

পদার্থ-বিজ্ঞান-শাখার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন ডক্টর নানাসাহেব রণজী তাওদে। তিনি 'মলিকুলার স্পেক্‌ট্রাল

থিওরি' সম্বন্ধে একটি অতি উচ্চাঙ্গের ভাষণ প্রদান করেন। অণুর বর্ণচ্ছবির (spectrum) সহায্যে পদার্থের আভ্যন্তরীণ গঠনের স্বরূপ জানা সহজ হইয়াছে এবং রাসায়নিক বিশ্লেষণে যাহা পাওয়া যায় নাই, অনেক ক্ষেত্রে তাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

কৃষিবিজ্ঞান বিভাগের সভাপতিত্ব করিয় ছিলেন ডক্টর এন. পার্থসারথি। তিনি বিগত দশ বৎসরে কৃষিকার্য্যে সুপ্রজনন-বিদ্যার (genetics) প্রয়োগের কথা আলোচনা করেন। এই বিদ্যা উদ্ভিদ ও প্রাণিজগৎ উভয়ের পক্ষে সমভাবেই কার্য্যকরী। ইহাতে রসায়ন, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন বিজ্ঞানের পদ্ধতিসমূহ প্রযুক্ত হইয়াছে। মনুষ্যসমাজের উন্নতি-কল্পে এই বিদ্যার প্রয়োগে সুফল পাওয়া যাইবে। এই বিজ্ঞানের বহুবিধ নূতন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহার প্রয়োগে উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতে উভয়ত্রই আশ্চর্য্যরকম সংমিশ্রণ সম্ভব হইয়াছে এবং নূতন নূতন সুস্থ ও সবল উদ্ভিদ প্রাণী সৃষ্ট হইয়াছে। সভাপতি অনুযোগ করেন যে, এই শাস্ত্র এদেশে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে আদৌ শিক্ষণীয় বলিয়া গণ্য করা হয় নাই। দেশের ও সমাজের পক্ষে এরূপ প্রয়োজনীয় বিষয় যাহাতে বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এদেশে এতদ্বিষয়ক গবেষণাকার্য্য আরম্ভ হয় তিনি তাহার জন্য আবেদন করেন।

চিকিৎসা ও পশুচিকিৎসাবিজ্ঞান শাখার সভাপতি মেজর এস. দত্ত একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন। তিনি ভারতের গো-সম্পদের বিষয় বর্ণনা করেন। ভারতবর্ষে গো-মহিষাদির সংখ্যা সমগ্র পৃথিবীর গবাদির এক-চতুর্থাংশেরও অধিক। সমুদয় গবাদি পশু হইতে উৎপন্ন দুধ ঘি প্রভৃতি দ্রব্য এবং উহাদের দ্বারা বিভিন্ন উপায়ে লব্ধ পরিমাণ বার্ষিক প্রায় ৩৫০০ কোটি টাকা। সুতরাং দেখা যায়, অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্যদ্বারালব্ধ ধনসম্পদ অপেক্ষা ইহা বহুগুণ বেশী। এই পরিমাণ সম্পদের হেতু যাহারা তাদের উন্নতিবিধানের জন্য জাতীয় সরকারের প্রচেষ্টার ত্রুটি করা উচিত নহে। অঙ্কশাস্ত্র-শাখার সভাপতি অধ্যাপক বিষ্ণুদেব নারলিকারের অভিভাষণ বেশ পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইয়াছিল এবং সভায় বহু মূল্যবান মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি পঠিত ও সমালোচিত হইয়াছিল।

উদ্ভিদতত্ত্ব শাখার সভাপতি ডক্টর আর. কে. শকসেনা ছত্রাকের (fungus) বীজাণুনাশক শক্তি সম্বন্ধে একটি সার-গর্ভ বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন যে, ছত্রাকজাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে পাতার সবুজ পদার্থ বা ক্লোরোফিল নাই। অনেক বৃক্ষে ছত্রাক উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। পূর্ব্বে ইহাকে উদ্ভিদের পরগাছা বলিয়া মনে করা হইত। ছত্রাকসমূহের কয়েকটি শ্রেণীবিভাগ আছে। সাধারণতঃ ছত্রাকসমূহের বীজাণুনাশক শক্তির উপরই উহাদের শ্রেণীবিভাগ নির্ণয় করা হইয়াছে। উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ পরগাছা ছত্রাকের শ্রেণীবিভাগ নির্ণয় করিয়া উদ্ভিদের রোগনির্ণয় করিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং এইরূপে অনেক ক্ষেত্রে চাষীদিগকে উদ্ভিদ-রোগের পূর্ব্বাভাস দিয়া তাহার প্রতিকারের উপায় নির্দেশ করিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছেন। পেনিসিলিন, ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন, অরিওমাইসিন প্রভৃতি রোগবীজাণুনাশক ঔষধগুলি আবিষ্কৃত হইবার পর ছত্রাক-সমূহের গুণাগুণের উপর বিজ্ঞানীরা বেশী করিয়া গবেষণা আরম্ভ করিয়াছেন। ভবিষ্যতে বীজাণুসৃষ্ট সমস্ত রোগেরই এণ্টিবায়োটিক ঔষধ আবিষ্কৃত হওয়া অসম্ভব নয়।

নৃতত্ত্ব ও প্রত্নবিদ্যা শাখার সভাপতি পণ্ডিত মাধোস্বরূপ ভাট খণ্ডিত ভারতে পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে অভিভাষণ পাঠ করেন। বিপুলসংখ্যক প্রাচীন স্মৃতিসৌধ রক্ষণাবেক্ষণ এই বিভাগের প্রধান কর্ত্তব্য। এই বিভাগের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আগ্রার তাজমহল, ফতেপুর সিক্রীর দর্গা, বোম্বাইয়ের নিকট-বর্ত্তী এলিফেণ্টার গুহা প্রভৃতি প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ সুরক্ষিত করা সম্ভব হইয়াছে।

ডক্টর এন. কে. পাণিকর প্রাণিবিজ্ঞান ও কীটতত্ত্ব শাখার, অধ্যক্ষ যমুনাপ্রসাদ মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষাবিজ্ঞানবিভাগের, অধ্যক্ষ ডক্টর নারায়ণদাস কেহার শরীরতত্ত্ব ও দেহপুষ্টি বিভাগের সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ইঁহাদের নিজ নিজ বিভাগে বহু মূল্যবান গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি পঠিত ও সমালোচিত হইয়াছিল।

লক্ষ্ণৌ শহরকে বিজ্ঞান-গবেষণার অন্যতম কেন্দ্র বলা যাইতে পারে। ঐতিহাসিক ছত্রমঞ্জিল প্যালেসে অবস্থিত সেণ্ট্রাল ড্রাগ রিসার্চ ইনষ্টিটিউট এবং বীরবল সাহনী ইনষ্টি-টিউট অফ্ পেলিওবোটানি—এই দুইটি গবেষণাগার বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিজ্ঞান-কংগ্রেসে এ বৎসরও বহু খ্যাতনামা বৈদেশিক বৈজ্ঞানিক সমবেত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ডক্টর এ. আর. টড, মিঃ রিচার্ড সাউথওয়েল, প্রফেসর সি. আর. এম কুথবার্ট, মিস ইসাইল কুকসন এবং ডাঃ ষ্টেনলি হোয়াইট-নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের ৪০তম অধিবেশন সাফল্যের সহিত পরিসমাপ্ত হয়। দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানীদের সম্মেলন আশাপ্রদ ব্যাপার এবং বিজ্ঞান-সাধনার ক্ষেত্রে পরস্পরের এরূপ মিলনের সুফল অবশ্যম্ভাবী। ভারতরাষ্ট্রে জাতীয় উন্নতির জন্য আজ যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ সাফল্যের জন্য ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের সমবেত প্রচেষ্টার একান্ত প্রয়োজন।

উল্কা

শ্রীপ্রতুল গঙ্গোপাধ্যায়

[ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে অগ্নিযুগের ইতিহাস থাকিবে ভূরি ভূরি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ। কিন্তু যে বিপ্লবীরা ভয়াবহ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া জয়যাত্রার পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে জনগণের হৃদয়ের সম্পর্ক কতখানি ছিল তাহা লিপিবদ্ধ করিবার সময় আসিয়াছে। এই কাহিনী তাহারই ইঙ্গিত। ইহাতে সত্য ঘটনাই বিবৃত হইয়াছে। তবে লোকের নাম ও স্থানের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া হইল।]

দিবা দ্বিপ্রহর। রৌদ্রে আগুনের হল্কা—ঘরবাড়ী রাস্তা উত্তপ্ত—পিচঢালা রাস্তায় কুলি মজুর ফিরিওয়ালারা আঙ্গুলের উপর ভর দিয়া যেন লাফাইয়া লাফাইয়া চলিতেছে।

কর্ম্মমুখর কলিকাতা নগরীতেও কিন্তু এই দ্বিপ্রহরে গলি গলিকার গলি নীরব থাকে, মধ্যে মধ্যে ফিরিওয়ালার নিষ্ফল চিৎকার সেই নীরবতাকে প্রকট করিয়া তোলে! রজতকুমার গলির মুখে ঢুকিয়াই ১৯।৩।৯ নং-এর বাড়ী খুঁজিতে লাগিল। সে কলিকাতায় খুব কম আসিয়াছে, আসিলেও একবারে বেশী দিন থাকে নাই। প্রয়োজনীয় নম্বর খুঁজিয়া বাহির করিতে বেশ বেগ পাইতে হইতেছিল। গলির দক্ষিণ দিকটা একটা বস্তি। অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া এই বস্তি। খোলায় ছাওয়া মাটির দেয়ালের অনেকগুলি ছোট ছোট ঘর। বস্তিবাসীরা সকলেই নিতান্ত দরিদ্র। সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করিয়া ইহারা কোনরকমে অন্ন-সংস্থান করে। ইহারা কোন একটা কারখানার কুলি-মজুর নয়। ইহারা বিভিন্ন কাজে শ্রম করিয়া দু'পয়সা রোজগার করে। এই বস্তিতে অনেক বেকার লোকও আছে। বস্তির ধার ঘেঁষিয়া আশেপাশে ধনী ব্যক্তিরা জমি খরিদ করিয়া বড় বড় পাকা বাড়ী তৈরি করিয়া লইয়াছে এবং বাস করিতেছে।

দুই-এক জনের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া সদুত্তর না পাইয়া রজতকুমার নিজেই বাড়ী খুঁজিতে লাগিল। অনেক খোজাখুঁজির পর ১৯।৩ নং মিলিল বটে, কিন্তু 'ক' 'খ' কোন চিহ্ন কোথাও নাই। ভরসা করিয়া একটি দরজায় আস্তে করাঘাত করিতেই দরজা খুলিয়া গেল এবং এই অতিক্ষুদ্র ঘরে যাহার দর্শন মিলিল তিনি প্রশ্নের অপেক্ষা না করিয়াই ঝিমিয়ে পড়া জড়িত কণ্ঠে কহিলেন, "কে? নিতাই ভায়া! এস, এস, ছিলিমটা সবে চড়িয়েছি, একটা টান দিয়ে যাও বাবা!"

রজত কোন উত্তর না দিয়া দ্বিতীয় দরজার দিকে অগ্রসর হইল। সেই লোকটি তখনও বলিতেছিল—'চলে গেলে! যাও, সাধা লক্ষী পায়ে ঠেললে, পরে পস্তাতে হবে বলে দিচ্ছি।'

রজত দ্বিতীয় দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কি করিবে ভাবিতেছে এমন সময় তৃতীয় ঘরের দরজা খুলিয়া একটি সুন্দরী যুবতী বাহিরে আসিল, ঈষৎ হাসিয়া দ্বিতীয় দরজাটাকেই ইসারায় দেখাইয়া দিয়া নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করিল।

রজত এখানে একটি যুবতী মেয়ে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল, প্রথমে ভাবিল—না, এখানে হতে পারে না। কিন্তু বাড়ীর নম্বর ত ঠিকই মনে হয়। একরকম নিরুপায় হইয়াই যেন ঘরের অতিক্ষুদ্র একমাত্র জানালায় উকি দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'দেখুন ঘরে কে আছেন, এখানে কি সি, এল দাস থাকেন?'

'কে?' বলিয়া দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল কল্যাণ। আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিল, 'রজত, আয়, আয়, ইস্ রোদে যেন ভাজা ভাজা হয়ে গিয়েছিস, মুখ একেবারে লাল হয়ে গেছে!'

রজত বলিল—'রোদের আর অপরাধ কি বল, একে ত তোদের মত এখনো রৌদ্র-বৃষ্টি প্রুফ হয়ে উঠতে পারি নি, সবে পথে পা বাড়িয়েছি: তারপর মাথায় নেই ছাতা, আর পায়ের জুতো তারও তলা নেই বললেই চলে।'

কল্যাণ মৃদু হাসিয়া বলিল—'তারপর, কি করে এলি তাই বল। তোর খোঁজ নেই শুনে বড্ড ভাবনা হয়েছিল।'

রজত ঘরের চারিদিকে তাকাইয়া বলিল 'বেশ বাড়ীতে আছিস কিন্তু! এ যে একেবারে জেলখানার সেল, তার চেয়েও খারাপ। তার দরজার লোহার গরাদে বন্ধ করলেও কিছু আলো ঢোকে, কিন্তু তোর ঘরের দরজা বন্ধ করলে দিবা দ্বিপ্রহরেও আলোর চিহ্ন পর্যন্ত মিলবে না। আর প্রতিবেশী! তোমার পাশের ঘরের লোকটি ত আমায় একছিলিম টানবার জন্যই অনুরোধ করেছিল!'

কল্যাণ—'কে? ওহোঃ, তুই বুঝি ঐ গুলিখোরটার আড্ডায় ঢুকে পড়েছিলি?'

রজত—'হুঃ, তোমার পাল্লায় পড়ে শেষে গুলির আড্ডায় এসে বাস করলুম।'

কল্যাণ হাসিয়া জবাব দিল—'ওতে আর কি হয়েছে? ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিস, কল্কের গুলি না খাস ত পুলিসের গুলি ত খেতে পারবি? তাতেই হবে।' দুই বন্ধুতেই খুব খানিকটা হাসিয়া লইল।

কল্যাণ—'যাক্ এসব, আসল কথা তোর খবর, তাই এখনও তুই বললি নে।'

রজত—'বলব, তার আগে একটা কথার জবাব দে। তোর বাঁ পাশের ঘরের দরজা খুলে একটা মেয়ে বাইরে এসে তোর ঘরের ইসারা দিয়ে নিজের দরজা বন্ধ করলে। মেয়েটা তোর পরিচয় জানে নাকি?'

কল্যাণ—'আসল পরিচয় জানে না বোধ হয়, তবে আমার কাছে যে শ্রেণীর লোক আসে এমন লোক এই বস্তিতে কারও কাছে আসে না, তাই বোধ হয়—যাক্ এখন তোর কথা বল।'

রজত বলিতে সুরু করিল—'আমি কলেজ থেকে এসে দেখি মুটুকে মা খাবার দিচ্ছেন। মা বললেন, দেখ রজত মুটু এসেছে, বাছার আমার তিনদিন তিন রাত্তির খাওয়া, ঘুম নেই। চেয়ে দেখ না, চেহারাখানা কি হয়েছে। বললুম সাবান মেখে স্নান করে এস, তা বলে—না, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে, আগে খাবার দাও মাসীমা। তাই ওকে খাবার দিচ্ছি।'

"মা আরও বললেন, 'হাঁরে, শুনছি নাকি খুব ধরপাকড় সুরু হয়ে গেছে, তোর বন্ধুদের অনেকেই নাকি ধরা পড়েছে। অনেক বোমা, পিস্তল, বন্দুকও নাকি পুলিসের হাতে পড়েছে।' আমি বললাম—'হ্যাঁ মা, এ ত হবেই, মাঝে মাঝে কিছু কিছু ত ধরা পড়বেই।'

"মায়ের মুখে বিষাদের ছায়া পড়ল, মা আমাকেও খাবার দিলেন। হঠাৎ আমার ছোট ভাই দৌড়ে এসে হাত উপরে তুলে তুড়ি দিয়ে বললে—'দাদা, দাদা, এসেছে, পালাও। কে দরজা ধাক্কাচ্ছে দেখতে জানলা দিয়ে উঁকি মেরেই দেখি পুলিস, পুলিস সাহেব আমাকে দেখেই চেঁচিয়ে বললে—'এই খোকা'। আমি 'coming, Sir' বলেই জানালা বন্ধ করে তোমাদের খবর দিতে এলুম। তোমরা পালাও।'

"আমি আর মুটু খাবার ফেলেই উঠে পড়লাম, ছুটব এমন সময় মা ব্যাকুল হয়ে বললেন, 'হায়রে পোড়ারমুখোরা আমার বাছাদের খেতেও দিলে না।' বলেই মা আমাদের দু'জনের পকেটে খাবার গুঁজে দিলেন। আমরা দেয়াল টপকে পালিয়ে এলাম।"

কল্যাণ—"তখন পর্য্যন্ত বাড়ীর সবদিকটা বোধ হয় ঘিরে ফেলতে পারে নি।'

রজত—'তখনও সবটা হয় নি, কিন্তু আমরা একটা বন্দুকধারী পুলিসের সামনেই পড়েছিলাম। লাফিয়ে পড়বার সময় দেখতে পেয়েছে কিনা বুঝতে পারলাম না, কারণ পুলিসটা চেঁচিয়ে ওঠে নি। আমি বললাম—হামলোক চোর নেহি ভেইয়া, যানে দো।'

"পুলিসটি অনুচ্চ স্বরে বললে—'হাম সব জানতা। মুলুকমে হামারা এক ভাতিজা ভি তোমলোককা মাফিক বদমাস হায়। জলদি ভাগো ঠহরো মং।' ততক্ষণে মুটু কোমর থেকে রিভলবার বার করেছে। আমি ইসারা করে মুটুকে বললাম—'ওটা কোমরে গুঁজে ফেল্। ছুটে চল্।' একটু দূরে দাঁড়ানো আর একটা পুলিস জিজ্ঞাসা করলে—'ক্যায় হুয়া?' সামনের পুলিসটি বললে—কুছ নেহি, দো বেকার লউণ্ডা, রাস্তামে যা রহা, পুলিস দেখকে থাড়া হুয়া, ম্যায় ভাগা দিয়া।' আর কিছু শুনতে পেলাম না।"

কল্যাণ—'এই লোকটা মজঃফরপুরের রামনগিনা সিঙের কেউ হবে হয়ত। মুখটা চিনে রেখেছিস ত?'

রজত—'তা হতে পারে, রামনগিনা সিঙের বাবাও ত একজন কনষ্টেবল। পুলিস ত সবই প্রায় বিহারী। ভাগ্যক্রমে ওর সামনে পড়েছিলাম। এর পরে ওর খোঁজ করতে হবে।'

কল্যাণ রজতের কাঁধে চাপড় দিয়া কহিল—'আর তোর ছোট ভাইকে সাবাস। তার বয়স কত হবে রে?'

রজত—'কত আর হবে, এই আট-নয় বছর হবে।'

কল্যাণ উৎসাহিত হইয়া বলিল—'ওরও তবে আশা আছে দেখছি।'

একটু নীরব থাকিয়া, একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কল্যাণ পুনরায় বলিল—'ভালয় ভালয় যে আসতে পেরেছিস এই ঢের! তুই ত আমার বর্ত্তমান নামটাও জেনে আসিস নি। আর বস্তির মাঝে এসে খোঁজ করছিলি ডি. এন. দাসের। সাহেবি নাম কি আর বস্তিতে মানায়? ও নামটা একটা ফাঁকি মাত্র, যাক্ তুই জানবি কি করে। থাক্‌গে—এখন জামাটা খুলে স্নানটা সেরে ফেল। তার পর চারটি মুড়ি চিবিয়ে জল খেয়ে নে। অবশ্য দু'পয়সার বাতাসাও এনে দেব।'

রজত গম্ভীর হইবার ভান করিয়া বলিল, 'খুব যে অতিথি-বৎসল দেখছি! যার পকেটে পাঁচটি হাজার টাকা জল জল করছে তাকে মুড়ি আর বাতাসা দিয়েই কাজ সারতে চাইছিস! বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?' পরিহাস করিতে করিতে রজত কল্যাণের হাতে টাকাটা তুলিয়া দিতে দিতে বলিল—'বাকী টাকা মুটুর সঙ্গে আসছে।'

রজত আর গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে পারিল না, খুব খানিকটা হাসিয়া বলিল,—'খাবার পাট তুলে দিয়েছিস বুঝি আজকাল।' মুড়িতেই চলে যাচ্ছে দেখছি।

কল্যাণ হাসিয়া জবাব দিল—'আরে না পাগল, আমার এক গিন্নিমা আছেন, তিনি ভারি যত্ন করে খাওয়ান, তুই খুব খুশি হবি।' কল্যাণ হঠাৎ কথা বন্ধ করিয়া রজতকে স্নান করিবার তাড়া দিল।

রজত একটা টিনের মগ হাতে লইয়া কলতলার দিকে আগাইয়া গেল। খোলার ঘরের চালার নীচ দিয়াই ছোট রাস্তা—হেঁট হইয়া মাথা বাঁচাইয়া চলিতে হইতেছিল—পথে পা দিতে ইচ্ছা হয় না—আবর্জ্জনায় ভরা—পাশের ড্রেনটায় কতকালের ময়লা জমিয়া ছিল—ভুক্তাবশিষ্ট ভাত ডাল পচিয়া দুর্গন্ধ ছড়াইতেছিল—দুইটি ছেলে-মেয়ে নর্দ্দামার পাশে বসিয়াই মলমূত্র ত্যাগ করিতেছিল। বস্তিতে সব দরিদ্র লোকের বাস, তাহাদের মলমূত্র ত্যাগের ব্যবস্থা বিশেষ কিছুই ছিল না। যে যেখানে সুবিধা পাইত, সেখানেই বসিয়া যাইত। রজত আরও কিছুদূর অগ্রসর হইল। নিতাই ধোবার একটা গাধা রাস্তা আটকাইয়া দাঁড়াইয়া আবর্জ্জনা ছড়াইতেছিল।

রজত কলতলায় আসিয়া পৌঁছিল বটে, কিন্তু সেখানকার অবস্থা দেখিয়া স্নান করিবার শেষ ইচ্ছাটুকুও উবিয়া যাওয়ার উপক্রম হইল—একটা ভাঙ্গা চৌবাচ্চায় সামান্য কিছু জল। তৈরি হওয়ার পর হইতে কেহ এই চৌবাচ্চা পরিষ্কার করিয়াছে বলিয়া মনে হইল না—ভাত, ডাল, ডালপুরী ও বেগুনীর টুকরা, ছেঁড়া কাগজ, তরকারীর খোসা হইতে আরম্ভ করিয়া দুনিয়ার যাবতীয় খাজাখাদ্য

আশেপাশে ত নিশ্চয়ই, চৌবাচ্চার ভিতরেও ছিল। ইঞ্চি দুই শেওলা জলের সঙ্গে সঙ্গে দুলিতেছিল, সারা কলতলা শেওলায় ভর্ত্তি হইয়া এমন পিচ্ছিল যে, অতি সাবধানেও পা বাড়াইবার সাধ্য নাই! একজন লোক প্রায় উলঙ্গ হইয়া নিবিষ্ট চিত্তে শরীরের কতকগুলি ক্ষত পরিষ্কার করিতেছিল। বড় বড় ঘা, পরিষ্কার করার পর লাল টক্ টক্ করিতেছিল।

রজতের সর্ব্বশরীর ঘৃণায় রি রি করিতে লাগিল। দেহ-মন ক্লেদপূর্ণ বলিয়া বোধ করিতে লাগিল, নিজেকেই নিতান্ত অশুচি মনে হইল। বাড়ীর অবস্থা সচ্ছল ছিল, পিতামাতার নিতান্ত আদুরে সন্তান, কোন দিন এমন অবস্থায় সে পড়ে নাই। একবার ইচ্ছা হইতেছিল স্নান না করিয়াই চলিয়া যায়। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, এই ত জীবন সুরু হইল তাহার। যে আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া সমিতির কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে তাহার নিকট ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধা সমস্তই ত তুচ্ছ! এই পথে পা না বাড়াইলে মানুষের সঙ্গে সত্যিকারের পরিচয়ের সুযোগই বা তাহার মিলিত কি করিয়া? আদর্শ ও বাস্তব এই দুইয়ের সমন্বয় সম্বন্ধে এই সেদিনও তাহার এক সমপাঠী বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা হইতেছিল। বন্ধুটি বলিয়াছিল—'ও ভাই, গীতা, চণ্ডী থেকে শ্লোক আউড়ে বাহাদুরী নেওয়া যায় বটে, কিন্তু নিজের জীবনে তা কেউ ফলাতে পারে না,—এ তোমায় মানতেই হবে।'

রজত জবাব দিয়াছিল—'দেখ ভাই সুখে-দুঃখে সমানভাবে থাকা—সুখেষু বিগতস্পৃহ দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনা—এ শুধু বইয়ের কথা নয়। মানুষ চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই এ দুইয়ের সমন্বয় নিজের জীবনে অন্ততঃ কিছুটা করতে পারে, এ আমার পুরো বিশ্বাস আছে। যে সবটা পারে না সে আংশিকও পারে—তাও কম নয়। আমার সঙ্ঘযাত্রী অনেকের জীবনে যে এ সত্য আমি প্রতিদিন উপলব্ধি করছি। আমি যে এমন মানুষ আমাদের মধ্যে দেখছি।'

নিজ গৃহের প্রাসাদসম অট্টালিকার নিরবচ্ছিন্ন পবিত্রতা পরিত্যাগ করিয়া আজ এই নোংরা পল্লীর আবর্জ্জনার মধ্যেও তাহার চিত্ত-বৈকল্য ঘটিতে দিলে যে তাহার পরাজয় হইবে। তাহা হয় না! তাহা রজত হইতে দিবে না।

রজতের চিন্তাধারায় বাধা পাইল। কোন্ মুহূর্ত্তে যে কলতলায় আর এক নবাগতের সমাগম হইয়াছিল তাহা সে প্রথমে টের পায় নাই। স্নানরত লোকটির প্রতি অর্থপূর্ণ দৃষ্টি দিয়া মৃদু হাসিয়া বলিতেছিল—'কি ভায়া নবু, তখুনি বলেছিলাম কিনা—ওদিকে যাস নে।'

নবু রাগিয়া জবাব দিল—'থাম্ আমাকে শেখাসনে। বলি ধম্মপুত্তুর, তোর পটলিই বা কোন সতী-সাবিত্তির শুনি?'

ফেলারাম তখন জোর দিয়া বলিল—'হুঁ, কিসে আর কিসে, তোর ইয়ের সাথে পটলির তুলনা! আমরা হলুম গিয়ে—এই ধর না কেন প্রায় সোয়ামী-স্ত্রী! তুই জানিস ত সেই বেত্তান্ত—সেই যে...'

নবু তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিল—'রাখ তোর সেই বেত্তান্ত, আর ফুটুনি করতে হবে না। আছিস ত সেই একটাকে নিয়েই। আমরা হলুম গিয়ে—।' নবুর বুক যেন দুই হাত উঁচু হইয়া উঠিল।

ফেলারাম ততক্ষণে নরম হইয়া গিয়াছে, লজ্জিত হইয়া বলিল—'তা ভাই ঠিক, আমি কেন জানি পারি নে! কতবার পটলিকে লাথি মেরে তাড়াতে গেছি, কেমন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়, আমি আর পারি নে। এই হয়েছে আমার মুশকিল'—তাহার কণ্ঠ হইতে একটি দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

তারপর তাহার বহুবার বলা বৃত্তান্ত পুনরায় কহিয়া চলিল—কেমন করিয়া সে পটলিকে গুণ্ডার হাত হইতে মারামারি করিয়া উদ্ধার করিয়া আনিয়াছিল এবং মতলব আঁটিয়াছিল কি করিয়া তাহার সমস্ত গহনা আত্মসাৎ করিয়া তাহাকে লাথি মারিয়া তাড়াইয়া দিবে—পটলি কিন্তু তার বিন্দুবিসর্গও টের পায় নাই। সে আত্মসমর্পণ করিয়া স্বেচ্ছায় ফেলুর হাতে সরল চিত্তে সমস্ত গহনা তুলিয়া দিয়া বলিয়াছিল—'তোমার কাছে রেখে দাও নইলে গুণ্ডা-বদমায়েস আমার কাছ থেকে কেড়ে নিবে, আমাকে মেরে ফেলবে।' একদিনও তার পর আর পটলি গহনা দেখতে চায় নাই। এক দিন শুধু কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, উত্তরে ফেলারাম বলিয়াছিল—'সব বিক্রী করে খরচ করে ফেলেছি, কিছুই নেই।' পটলি শুনিয়া বলিয়াছিল 'সব!' ফেলু—'হ্যাঁ সব।' তারপর আর একদিনও সে গহনার নামও উচ্চারণ করে নাই। গল্প শেষ হইল, ফেলারামের সারা মুখে বিষাদের ছায়া পড়িল।

কল্যাণের গলার আওয়াজে রজতের চমক ভাঙ্গিল। কল্যাণ বলিতেছে—'এই এত দেরী করছিস কেন? কি করছিস?' রজত—'আসছি, আর দেরী নেই, তুই যা' বলিয়াই চৌবাচ্চার দিকে পা টিপিয়া টিপিয়া অগ্রসর হইল। কোনপ্রকারে কয়েক মগ জল মাথায় ঢালিয়াই ঘরে ফিরিয়া দেখে দরজায় তালাবন্ধ। এ কি, কল্যাণ আবার গেল কোথায়। রাস্তার উপর দৃষ্টি পড়িতেই দেখিল কল্যাণ হাসিমুখে এক হাতে একটা দইয়ের ভাঁড় আর এক হাতে কিসের একটা ঠোঙ্গা লইয়া আসিতেছে। রজত জিজ্ঞাসা করিল—'কি নিয়ে এলি আবার?'

কল্যাণ জবাব দিল—'ভাবলুম প্রথমেই তোর এতটা বরদাস্ত হবে না, তাই চার পয়সার দই ও দুই পয়সার বাতাসা নিয়ে এলাম।

রজত—'যাক, তোমার ধর্ম্মজ্ঞান আছে দেখা গেল, অতিথি-সেবা যে পরমধর্ম্ম সে জ্ঞান তোমার আছে। কিন্তু যে নোংরা জায়গায় থাক তুমি, নেয়ে উঠেও আমার গা বমি বমি করছে। মনে হচ্ছে কিছু খেলেই বুঝি উল্টে আসবে।'

কল্যাণ হো হো করিয়া পরিতৃপ্তি সহকারে খানিকটা হাসিয়া বলিল—'কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে—আরে এ যে ফল্গু-ধারা, সবুর কর ভায়া, সবুর কর, ক্রমশঃ এর আসল স্বরূপ প্রকাশ

পাবে, তখন দেখতে পাবে—কত গুণ ধরে এ কালা। এই ধর না আমাদের প্রথম লক্ষ্য হচ্ছে সি. আই. ডি. বস্তুটিকে এড়িয়ে চলা—দ্বিতীয় হচ্ছে পয়সা বাঁচানো, এ দুয়ের জন্ম এ হচ্ছে একেবারে আইডিয়াল!

রজত—'তা ত বুঝলাম, এখন কাপড় শুকাই কোথা, না ওটা শরীরের গরমেই শুকোবার নিয়ম!'

কল্যাণ—'ওটা মাঝে মাঝে করতে হয় বৈ কি! আপাততঃ রাস্তার ও পাশের ঐ দেয়ালটায় বেঁধে দিয়ে আয়, আমি চোখ রাখব'খন, নইলে কেউ তুলে নিয়ে যাবে। তারপর এসে দই-মুড়ির সদ্ব্যবহারটা সেরে ফ্যাল্। এত বেলায় আর ভাত পাওয়ার যেন আশা রাখিস নে। হোটেলে এখন ঘোড়ার ডিমও মিলবে না।'

খাইতে খাইতে দুই অন্তরঙ্গ বন্ধুতে মিলিয়া পার্টির কাজে অর্থাভাব কি করিয়া মিটানো যায় তাহাই মৃদুস্বরে আলোচনা করিতে লাগিল। মাঝে মাঝে লঘু হাস্য পরিহাসে ক্ষুদ্র ঘরের ক্ষুদ্রতর পরিসর মুখরিত করিয়া যেন বস্তির আবহাওয়ায় পবিত্র পরিবেশ আনিয়া দিল।

২

সন্ধ্যার একটু পরেই কল্যাণ আর রজত স্যার আর. এন. বিশ্বাসের—কলিকাতার অগ্রগণ্য বার-এট-ল'র—বাড়ীতে উপস্থিত হইল। দারোয়ানকে বার দুই জিজ্ঞাসা করিয়া জবাব পাইল—সাহেব বাড়ী নাই, ফিরিতে আরও আধ ঘণ্টা দেরী আছে। ভিতরে বসিবার কোন আহ্বান না পাইয়া বাড়ীর সামনে ফুটপাথেই পায়চারি করিতে লাগিল। হাঁটিতে হাঁটিতে স্যার বিশ্বাস প্রমুখ ধনী সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করিয়াই আলাপ হইতেছিল।

রজত কহিল, "এই সব স্যারের দল সত্যিই যদি আমাদের অর্থ-সাহায্য করতে প্রস্তুত হয় তা হলে আর আমাদের কোন চিন্তাই থাকে না, তবে আমাদের সংগঠনের কাজে আমরা সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করতে পারি।'

কল্যাণ—'আমি কিন্তু ভাই অত উৎসাহ বোধ করছি নে। এই লব্ধপ্রতিষ্ঠের দল কিন্তু কার্য্যকালে আজ পর্য্যন্ত একেবারে পেছপা বললেই হয়। বরং দেখেছি যাদের প্রতিষ্ঠা কম অর্থাৎ যাদের আয়ের অঙ্ক মোটা নয়, তাদের কাছ থেকেই কিছু কিছু সাহায্য পাওয়া গেছে। আরও দেখেছি নিতান্ত দরিদ্র অবস্থায় আর্থিক অনটনের মধ্যে থেকেও যারা সাহায্য করে তাদেরই যখন প্রতিষ্ঠা হয়, প্রচুর আয় বাড়ে তখন আর সাহায্য করে না। কিন্তু একটি মজার জিনিষ এই যে হাইকোর্ট বার লাইব্রেরীর অধিকাংশই মুখে ভীষণ এক্‌ট্রিমিষ্ট। কাল দুপুরে তোকে নিয়ে যাব সেখানে। দেখবি এদের কথা শুনে বোধ হবে যে স্বদেশভক্তি, বীরত্ব ও ত্যাগে এদের সমকক্ষ জগতে আর নেই। ওয়াশিংটন, গ্যারীবলডি, ম্যাটসিনি, এদের কাছে দাঁড়াতেই পারে না। অবশ্য সবাই যে এমন তা নয়। এদের মধ্যে দুই এক জন অতি শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তিও আছেন। তবে অধিকাংশই হচ্ছে মুখেন মারিতং···" কথার স্রোতে বাধা পড়িয়া একখানা প্রকাণ্ড রোলস রয়েস মোটরগাড়ী স্যার আর. এন.-এর বাড়ীর দরজায় প্রবেশ করিল।

কল্যাণ—চল রজত, বাড়ীর ভেতর যাই, এটাই হচ্ছে স্যার আর. এন.-এর গাড়ী।

স্যার আর. এন. সুসজ্জিত ঘরে সোফার উপর দেহ এলাইয়া অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষে পাইপ টানিতেছিলেন, বৈদ্যুতিক পাখার হাওয়ায় তামাকের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া ঘরটার মধ্যে গন্ধ ছড়াইতেছিল। কল্যাণ আর রজত ঘরে প্রবেশ করিতেই স্যার আর. এন. দেহ উঠাইবার ভান করিয়া কহিলেন, 'এস, এস, বস, তারপর···কি খবর বল।'

কল্যাণ—'আপনি আসতে বলেছিলেন, তাই এসেছি।'

স্যার—'ভালই করেছ; তারপর তোমাদের কাজকর্ম্ম কি রকম চলছে তাই বল দেখি।'

কল্যাণ—'তা···এক রকম চলছে, কিন্তু টাকার অভাবটাই প্রতি পদে অনুভব করছি, তার জন্ম যে আমাদের কত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে হচ্ছে তা ত আপনি ভাল করেই জানেন। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা পণ্ডশ্রমে পরিণত হচ্ছে।'

কল্যাণ আরও কি বলিতে যাইতেছিল, স্যার আর. এন. তাহাকে বাধা দিয়া কহিলেন, 'ওহে না, না, আসলে টাকাটা বলতে গেলে কিছুই নয়! চাই মানুষ, খাঁটি মানুষ।' স্যার বিশ্বাস একটু নড়িয়া জোড়ে পাইপ টানিতে লাগিলেন।

কল্যাণ বলিল, 'স্যার বিশ্বাস, আপনি ত জানেন আমাদের খাঁটি মানুষের অভাব নেই, একটা প্রকাণ্ড বড় সর্ব্বত্যাগী দল আপনার সামনে দাঁড় করাতে পারি। কিন্তু পা বাড়াতেই যে টাকার দরকার!'

স্যার আর. এন.—'না হে না, ওটা তোমাদের ভুল ধারণা; তোমরা কি বলতে চাও টাকাতেই তোমাদের সব সমস্যা মিটে যাবে। অবশ্য এটা ঠিক যে তোমাদের মত কর্ম্মী যে দেশে জন্মেছে সে দেশের উদ্ধার কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। দ্বীপান্তর, ফাঁসি উপেক্ষা করে বীরত্বের যে নিদর্শন তোমরা দেখাচ্ছ তার দৃষ্টান্ত সকলেরই অনুসরণযোগ্য। এমনি করেই তোমাদের আত্ম-ত্যাগ সফল হয়ে উঠবে।'

কথার স্রোতে বাধা পড়িল; বেয়ারা সুদৃশ্য একখানি ট্রেতে এক গ্লাস রঙিন তরল পানীয় পরিবেশন করিয়া গেল। পানীয়ের মধ্যে সোডা ওয়াটারের উত্তেজনা তখন পর্য্যন্ত মিলাইয়া যায় নাই। স্যার বিশ্বাস হাত বাড়াইয়া গ্লাসে চুমুক দিয়া কতকটা যেন চাঙ্গা হইয়া উঠিয়া বসিলেন; ক্রমশঃ চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া পরে বিস্ফারিত হইল। তিনি উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, 'এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও, মৃত্যুভয় তুচ্ছ করেই এগিয়ে যেতে হবে, না হয় দু'চার লাখ লোক মারাই যাবে, দেশে এমনিও ত দুর্ভিক্ষে মহামারীতে কত লোক কুকুর বেড়ালের মত মরছে। তার চেয়ে দেশের জন্ম প্রাণ

দিলে দেশও স্বাধীন হবে আর তোমরাও অমর হয়ে থাকবে।' স্যার বিশ্বাস পুনরায় গ্লাসে চুমুক দিলেন। শূন্য গ্লাসটা ঠক করিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন, বলিতে আরম্ভ করিলেন, 'হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গম্—কি না জানি তোমাদের গীতায় আছে বল না হে', কিন্তু তিনি উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া হাঁক দিলেন, 'বেয়ারা?' বেয়ারা আসিয়া গ্লাস পূর্ণ করিতে লাগিল।

রজত এ রকমটা আশা করে নাই। কল্যাণের গা টিপিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, 'আচ্ছা মাতালের পাল্লায় পড়া গেছে যা হোক!'

কল্যাণও অস্ফুট স্বরেই জবাব দিল, 'আরে দেখ না মজা, আসলে ঠিক আছে, মূলে ভুল নেই।'

স্যার বিশ্বাস কল্যাণ-রজতের কথাবার্তা লক্ষ্য না করিয়া বলিলেন, 'দেখ ভিক্ষে করে কারুর চিরদিন চলে না. আজ আমি তোমাদেরকে যত সাহায্যই করি না কেন তাতে তোমরা আপাততঃ হয়ত একটু লাভবান হতে পার, কিন্তু এ সাহায্য তোমাদেরকে লক্ষ্যপথে কতদূর নিয়ে যাবে সে সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তার চেয়ে আমি তোমাদের একটা স্কিম দিতে পারি. তা যদি তোমরা কাজে পরিণত করতে রাজী থাক তা হলে যে শুধু দেশের আর্থিক অবস্থাই উন্নত হবে তা নয়, দেশের লোক ফিরে পাবে তাদের হৃত স্বাস্থ্য, শিক্ষায় দেশ হয়ে উঠবে উন্নত, আর তোমাদের মত এক দল দেশপ্রাণ যুবক হয়ে উঠবে সামরিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত। সেই হবে তোমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির সুবর্ণসুযোগ!'

স্যার বিশ্বাস হয়ত আরও কিছু বলিতেন, কিন্তু তাহার কথায় বাধা পড়িল, বেয়ারা একখানা কার্ড তাহার হাতে দিল। কার্ডখানার দিকে কপাল কুঞ্চিত করিয়া অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকাইলেন এবং আগন্তুককে ভিতরে আনিবার নির্দ্দেশ দিলেন। স্যার বিশ্বাস অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। আগন্তুক ভিতরে প্রবেশ করিয়াই স্যার বিশ্বাসকে অভিবাদন জানাইয়া যাহা বলিলেন তাহার সারমর্ম্ম হইতেছে এই যে, 'হার এক্সেলেন্সি' একটা পর্দ্দা পার্টি ও তার সঙ্গে শিশুপ্রদর্শনীর আয়োজন করতে চান এবং তার জন্য চাঁদার প্রয়োজন। স্যার বিশ্বাস কত দিবেন সেই অঙ্কটাই একটা খাতায় লিখিয়া দিন।

খাতাটি বাড়াতেই স্যার বিশ্বাস পাঁচ শত টাকা লিখিয়া দিলেন, আগন্তুক স্যার বিশ্বাসের মুখের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি দিতেই স্যার বিশ্বাস বলিলেন, 'আর কত দিতে পারি বল! এই ত সেদিন ভূতপূর্ব্ব লাট বাহাদুরের মূর্ত্তি তৈয়ার করার জন্য দু' হাজার টাকা দিয়েছি!'

আগন্তুক সায় দিয়া বলিল, 'তা ত ঠিক, এই ত সেদিন আবার হোম মেম্বরকে প্রীতিভোজ দিলেন, আচ্ছা তা হলে আমি এখন আসি। আপনাকে কষ্ট দিলাম, মাফ করবেন। এখন বসবার সময় নেই, আরও অনেক জায়গায় যেতে হবে কি না, তাই।'

আগন্তুক চলিয়া যাইতেই ঘর কয়েক সেকেণ্ডের জন্য নীরব হইয়া রহিল। পাখা ঘোরার একটানা শব্দ মুহূর্ত্তের নীরবতাকে প্রকট করিয়া তুলিল। নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কল্যাণ বলিল, 'আমরা আপনার কাছে এসেছি এক প্রতিশ্রুতির জন্য। আমরা ত দেশের কাজ করবার জন্যই নেমেছি, কিন্তু অর্থাভাবে যে কিছুই হচ্ছে না। আমাদের যে বিপজ্জনক উপায়ে অর্থসংগ্রহ করতে হয় তা যেমন আমরা চাই নে তেমনি আপনিও সমর্থন করেন না। আপনি বলেছিলেন যে আমরা যদি সেই পন্থা ছেড়ে দিই তবে আপনি ও মিঃ মৈত্র আমাদের সমস্ত খরচ চালাবার ভার নেবেন, এইরূপ ভরসা আপনি দিয়েছিলেন, সে জন্যেই এসেছি।'

স্যার বিশ্বাস ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন. 'হ্যাঁ। তা ত বলেছিলাম এবং এখনও বলছি. আর করবও তাই; কিন্তু আসল কথাটা কি জান ত? সেটা হচ্ছে এই যে তোমাদের স্বাবলম্বী হওয়াই উচিত। কার্ণেগীর মত কত গরীবের ছেলে নিজের চেষ্টায় ক্রোড়পতি হয়েছে। তোমাদের মত কর্ম্মীর দ্বারা সব সম্ভব হবে। তাই ত পরে ভাবলুম যে আমরা মিছিমিছি টাকা পয়সা দিয়ে তোমাদের শক্তির স্বতঃস্ফুরণে বাধা দিই কেন?' স্যার বিশ্বাস নিজের ঈষৎ হাসিটুকুও অনেক কষ্টে চাপিয়া গেলেন।

কল্যাণ একেবারে হাল ছাড়িয়া দিতে পারিল না; সহজে হাল ছাড়িয়া দিলে তাহাদের চলে না, তাই বলিল, 'কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য ত অন্য। আমরা ত কার্ণেগীর মত ব্যক্তিগত ভাবে ক্রোড়-পতি হতে চাই নে। আমাদের উদ্দেশ্য ভিন্ন। আপনাদের সাহায্যে আমাদের সমিতির দৈনন্দিন খরচ চালাবার অনেকটা সহায়তা হতে পারে। এই ধরুন না কেন, আপনার দৈনিক আয় প্রায় হাজার টাকা। আপনি ইচ্ছে করলে, আমাদের অনেক সহায়তা করতে পারেন।'

কল্যাণ থামিবার সঙ্গে সঙ্গেই স্যার বিশ্বাস বলিলেন, 'সে দিতে ত পারিই, দেবও নিশ্চয়। হয়ত রাসবিহারী ঘোষ ও তারক পালিতের মত সর্ব্বস্বই দিয়ে যাব। এখনও ত কত কাজে দিচ্ছি, চোখের সামনেই ত দেখলে। তবে তোমাদের ভালবাসি কি না, তাই বলছি স্বাবলম্বী হও, নিজের পায়ে দাঁড়াও।'

রজত এতক্ষণ মনে মনে গজ গজ করিতেছিল, এখন আর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে না পারিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বাধ্য হইয়া কল্যাণকেও উঠিতে হইল এবং হাত তুলিয়া স্যার বিশ্বাসকে নমস্কার করিয়া বলিল, 'আচ্ছা এখন আসি তবে।'

স্যার বিশ্বাস প্রতি-নমস্কার করিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা।···কখনও বুদ্ধি পরামর্শের দরকার হয় কোন প্রকার দ্বিধা না করেই চলে এস, আর কোন খবর থাকে ত দিয়ে যেও। তোমাদেরকে কোন কাজে কৃতকার্য্য হতে দেখলে সত্যিই বড় আনন্দ পাই।'

বাড়ীর বাহির হইতে হইতে রজত কল্যাণের গা টিপিয়া বলিল, 'ওর ত আনন্দ হয়, এদিকে আমাদের যে প্রাণান্ত। একে ত খিদের পেট জলে যাচ্ছে, তার উপর পাকা তিনটি মাইল হাঁটতে হবে। তবে একটা সান্ত্বনা আছে যে এ পাড়ার বিশুদ্ধ হাওয়া সেবন করে যাওয়া হ'ল।'

কথা বলিতে বলিতে কল্যাণ আর রজত বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িতেই এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া তাহাদের মুখে শীতল প্রলেপ দিয়া গেল। আর বিশ্বাসের বাড়ীর দোতলা হইতে ভাসিয়া আসিতেছিল অর্গানযোগে নারীকণ্ঠের সঙ্গীত—'তোমারি তরে মা সঁপিনু এ দেহ তোমারি তরে মা সঁপিনু প্রাণ।'

রজত—'শোন মায়ের ভক্ত সর্ব্বস্ব সমর্পণের কথা। তা বিশ্বাস মশায় ত বুদ্ধি-পরামর্শ বিনি পয়সায় দিতে রাজী হয়েছেন।'

কল্যাণের মেজাজ খিঁচাইয়া ছিল, সে জবাব দিল, 'কি যে বকছিস তার ঠিক নেই; আমাদের চারদিকে হাত পেতে দেখতেই হবে। চারদিকে অর্থাভাব, আমরা যে করে অর্থ সংগ্রহ করি তাতে যে অনর্থক শক্তিক্ষয় হয় এবং কত বিপদের সম্মুখীন হতে হয় তা ত জানিস, আর সেই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতেও না কত শক্তি ক্ষয় হয়। তাই ত করছি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা, যদি ও পথ ছাড়তে পারি।'

ইহার পর কিছুক্ষণ উভয়ে নীরবে পথ চলিয়া কল্যাণ বলিল—'এই যা, আজ আর গিন্নীমার হোটেলে গিয়ে খাবার মিলবে না; রাস্তা থেকেই পাউরুটি কিনে নিয়ে কাজ সারতে হবে দেখছি।'

এই বন্দোবস্তটা রজতের খুব খারাপ লাগিল না—সে বলিল, 'যা হোক বাপু কর, আমার কিন্তু ভারি ঘুম পাচ্ছে, রাস্তায়ই শুয়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে—কাল সারারাত ট্রেনে একটুও ঘুমোতে পারি নি।'

* * *

বাসায় পৌঁছিয়াই তাহারা পাউরুটি খাইয়া শুইয়া পড়িল। রজত শুইতে শুইতে হাসিয়া বলিল, 'তবু দেখছি এক বিষয়ে মহা-ভাগ্য যে একটা তক্তপোষ যোগাড় হয়েছে।'

কল্যাণ—'কেবল কি তক্তপোষই দেখলি, তার উপর রাজযোগ্য তোশকখানা ত আর নজরে এল না।'

রজত অবাক হইয়া বলিল—'তোশক! তোশক আবার কোথায়? কেবল ত তক্তাই পিঠে ঠেকছে। কোন্‌কালে হয়ত এটা তোশক ছিল এখন কাঠ হয়ে গেছে।'

কল্যাণ—'এও একদিন খানাতল্লাসী করে যখন নিয়ে যাবে তখন শুতে হবে আর কোন জায়গায় মেঝের উপরে খবরের কাগজ পেতে। এ রকম কতবার হয়েছে!'

রজত—'এর আগে একবার এসে ত তাতেই শুয়েছি। বঙ্গবাসী, হিতবাদী, বসুমতী সাপ্তাহিক কাগজগুলি বেশ বড়, আমাদের দু'জন শুতে পারে। ওরা বুদ্ধি করে কাগজগুলি যেন আমাদের জন্যই বড় করেছে। একটা থ্যাঙ্কস দিলে হ'ত কাগজগুলিকে।'

তখন গ্রীষ্মকাল। গরমে রজত এপাশ ওপাশ করিয়া ছটফট্ করিতে লাগিল। তাহার অবস্থাটা উপলব্ধি করিয়া কল্যাণ একটা খবরের কাগজ ভাঁজ করিয়া বাতাস করিতে করিতে বলিল, 'নে এখন ঘুমো দেখি।'

রজত নির্লিপ্তভাবে বলিল—'বাতাস করছ, তা কর, আপত্তি করব না, কেননা অতিথি-সেবা করে পুণ্য তোমারই সঞ্চয় হচ্ছে।'

রাস্তার অপর পার্শ্বে স্থিত জমিদারের প্রাসাদ হইতে গান ভাসিয়া আসিতেছিল—'এমন চাঁদের আলো, মরি যদি সেও ভাল, সে মরণ স্বর্গ সমান।'

রজত বলিয়া চলিল—'ঐ শোন, আর এক ভাবুক চাঁদের আলোয় একেবারে মরতেই চাইছে, এদিকে গরমে আমাদের প্রাণটা ত...'

কল্যাণ রজতকে থামাইয়া দিয়া বলিল, 'চুপ করে শুয়ে থাক দেখি, আর বক্ বক্ করিস নে।'

রজত—'তোমার ঐ পাখাটা না থামালে আমার ঘুম পাবে না।'

কল্যাণ হাওয়া করা বন্ধ করিয়া বন্ধুর গায়ে সস্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল—'আর দুষ্টুমি করিস নে, এখন ঘুমিয়ে পড় দেখি, আমাদের ত আর কিছুই ঠিক নেই, কাল হয়ত আবার সারারাত ঘুমুতেই পারব না।'

কিছুক্ষণ উভয়ে চুপ করিয়া রহিল। অল্প সময়ের মধ্যেই কল্যাণ ঘুমাইয়া পড়িল। রজত অনেকক্ষণ গরমে এপাশ-ওপাশ করিয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় পড়িয়া রহিল। বোধ হয় ঘণ্টাখানেক এমনিভাবে কাটিয়াছে, হঠাৎ রজত উঠিয়া বসিয়া কল্যাণকে ধাক্কা দিয়া জাগাইয়া কহিল—'এই, শীগগির ওঠ। কল্যাণ নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে কহিল—'কেন, কি হয়েছে?'

রজত—'কেন, শুনতে পাস না, ওদিকে কি ভীষণ দাঙ্গা হচ্ছে?'

কল্যাণের তৎক্ষণে ঘুম চটিয়া গিয়াছে, ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বলিল, 'ব্যাপার কি, হয়েছে কি?'

রজত—'বেশ লোক বাপু তুমি যা হোক, কেন কিছু শুনতে পাচ্ছ না!'

কল্যাণ কয়েক সেকেণ্ড কান পাতিয়া থাকিয়া বলিল—'ও হরি, তাই বল, এ যে মাতালদের কাণ্ড! আমি ভাবলুম্ বুঝি পুলিস-টুলিস এসেছে। এ ত রোজই হচ্ছে। এটা হচ্ছে গিয়ে এই বস্তিরই কয়েক জন বাসিন্দা মদ গিলে এখন তার জের কাটাচ্ছে। এমনিধারা গালাগাল আর একে অন্যের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার, এ ত আমার নিত্যনৈমিত্তিক শ্রাব্য—এতে ভাই আমার ঘুমের ব্যাঘাত হয় না।'

রজত—'বাঃ বেশ চমৎকার জায়গায় আছিস যা হোক। কিন্তু তোর পাশের গুলিখোরের আড্ডায় কোন সাড়াশব্দ পাচ্ছি নে।'

কল্যাণ ঈষৎ হাসিয়া বলিল—'ওদের কি এখন হুঁস আছে, নেশায় সব বুঁদ হয়ে আছে, এখন ওদের টুঁ শব্দটি করার শক্তি নেই! যাক্‌গে ওরা মরুক, এখন আর কথা নয়, ঘুমিয়ে পড় দেখি!'

৩

অতি প্রত্যুষেই দরজায় করাঘাতের শব্দে কল্যাণের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সারারাত ছট্‌ফট্ করিয়া রজত শেষরাত্রির দিকে ঘুমাইয়া

পড়িয়াছিল, কাজেই তাহার ঘুম ভাঙিল না। অতি সাবধানে রজতের ঘুম ভাঙাইয়া রজতের কানের কাছে মুখ আনিয়া কল্যাণ ফিসফিস করিয়া কহিল, 'চমকাস নে, পুলিস এসেছে।'

রজত বালিশের নীচ হইতে রিভলবার বাহির করিয়া কহিল, 'গুলি করেই তবে বেরিয়ে যেতে হবে দেখছি। চল, আমি প্রস্তুত।'

কল্যাণ—'অত ব্যস্ত হসনে, আগে দেখি ব্যাপার কি? তবে তৈরী হয়ে থাকাই ভাল।' বলিয়া নিজের কোমরে হাত দিয়া ইঙ্গিত করিল যে সেও প্রস্তুত।

কল্যাণ দরজা খুলিয়া দিল; একজন পুলিশ দারোগাকে বলিল, 'এ ঘরে নয়, ঐ পাশের ঘরে চলুন।' পুলিশ গুলিখোরের দরজায় আঘাত করিল। বেচারীদের বোধ করি তখন চৈতন্য ছিল না! কয়েকবার ডাকাডাকি করিয়া শেষকালে লাথি মারিয়া দরজা ভাঙিয়া পুলিশ ভিতরে ঢুকিল।

কল্যাণ বিছানার দিকে ফিরিয়া তাকাইয়া রজতের অবস্থা দেখিয়া বলিল, 'কিরে অত হাসছিস কেন, হাসতে হাসতে যে একেবারে গড়িয়ে পড়লি।' অতি কষ্টে হাসির বেগ রোধ করিয়া রজত স্থির হইয়া বলিল, 'ওঃ বাপস কি কাণ্ডই না হয়ে যেত গুলি করে বেরিয়ে গেলে! প্রথম ত ওরা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যেত ভেবে যে গুলিখোররা ত শুধু গুলিই খায়, গুলি ত ওরা করে না। কিন্তু এরা যে তাও করে গেল।'

কল্যাণ রজতের মুখে হাত দিয়া বলিল, 'চুপ, ওরা আগে ভালয় ভালয় চলে যাক তারপর...'

রজত—'উঁহু! একটা কথা আমাকে বলতেই হবে, নইলে হাসি আমার কিছুতেই থামবে না; ধর যদি ওরা আমাদের গুলিখোর বলে ধরে নিয়ে যেত, তা হলে বাড়ীর লোকেই বা কি ভাবত আর কলেজের প্রফেসররাই বা কি মনে করত!'

কল্যাণ হাসিয়া বলিল, 'ভাববে আবার কি? ভাবত এরা সব জাহান্নামে গেছে।'

রজত কিন্তু এ জবাবে আশ্বস্ত হইতে পারিল না। লোকের ভাবাভাবির মূল্য তাহার কাছে এখনও যথেষ্ট। তাই সে তাহার কথার জের টানিয়া কহিল, 'আর আমাদের কলেজের সেই সব ছেলেরা যারা আমাদেরকে নীতিবিদ্ বলে ঠাট্টা করত? কেননা আমাদের অপরাধ ছিল এই যে আমরা কোন নেশা করি না, এমন কি সিগ্রেট পর্যন্ত খাই না, মেয়েদের দিকে তাকাই না, অশ্লীল শব্দই উচ্চারণ করি না! তারা ত আমাদের এই গুলিখোর বলে ধরা পড়বার পর নিজেদের মধ্যে বলাবলি করত—ও-সব ময়েলিষ্ট-টরেলিষ্ট সব দেখা আছে বাপু। ও-সব হচ্ছে গিয়ে লোকদেখানো বাহাদুরি, ভিতরে সব আমাদের মতই। তবে কিনা গুলি খেয়ে ধরা পড়বার ঢেঁজে নামতে পারব না। অত ডুবে জল খাওয়ার অভ্যাস আমাদের নেই, আমাদের সৎসাহস আছে, আমরা হচ্ছি সংপ্রকৃতির যা করব কুছ-পরোয়া নেহি বলেই করব।'

রজত আরও কি বলিতে যাইতেছিল, তাহাকে থামাইয়া কল্যাণ বলিল, 'তুই তাড়াতাড়ি, রিভলবার ছুটো নিয়ে খানিকক্ষণ ঘুরে ফিরে আয় দিকি; ওদের ত বিশ্বাস নেই, যদি ফিরে এসে এ ঘর তল্লাস করে তবে কিন্তু কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেড়িয়ে পড়বে।'

রজত—'বাঃ রে! তুই বুঝি এখানে ধরা দিবি! তা হবে না।'

কল্যাণ—"আঃ কেন গোলমাল করছিস? ওরা তালাস করে কিছু না পেলে এমনিই চলে যাবে। আরে বোকারাম, ওরা সি. আই. ডি নয়, আবগারী পুলিস; আমাদের খোঁজ ওরা করছে না।'

ঘণ্টাখানেক ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া রজত শুনিল, ঘর তল্লাস করে নাই। শুধু সকলের নাম ঠিকানা আর কি উপলক্ষে কলিকাতায় আসা হইয়াছে তাহা লিখিয়া লইয়াছে। বক্তব্য শেষ করিয়া কল্যাণ রজতকে হাত-মুখ ধুইয়া আসিতে বলিল, কেননা বাহির হইবার তাগিদ ছিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রজত গড় গড় করিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া গম্ভীর মুখে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইল। তাহার অবস্থা দেখিয়া কল্যাণ হাসিয়া ফেলিল, 'কিরে, একেবারে নেয়ে এলি?'

রজত এক হাত কোমরে আর এক হাতের তর্জ্জনী কল্যাণের দিকে লইয়া কহিল, 'নেয়ে মানে? শুনেছি মানুষ নাকি মরার পর নরকে যায়, তোর পাল্লায় পড়ে আমার এখন জ্যান্তেই নরক ভোগ হচ্ছে। তোর সঙ্গে আমার ভীষণ ঝগড়া হবে দেখছি।'

কল্যাণ—'তা করিস, কিন্তু আসল ব্যাপারটা খুলেই বল না।'

রজত—'তবে শোন, এই পুণ্যকাহিনী অবহিত হয়ে শোন। তোর ঐ প্রথম শ্রেণীর পায়খানায় ত অতি কষ্টে ঠেলাঠেলি করে ঢুকবার চেষ্টা করছি। আমার মনে হ'ল এই বস্তির সবাই বোধ হয় ঐ এক জায়গায়ই যায়। কি সাংঘাতিক কাণ্ড দেখলুম, একজন স্ত্রীলোক বস্ত্র সংবরণ করে বেরিয়ে আসবার আগেই একজন পুরুষ সেখানে আবার ঢুকে পড়ল, তার নাকি আবার দিনমজুরী কাজে হাজিরা দেবার সময় চলে যায়। তখন স্ত্রীলোকটি রেগে গিয়ে এমন সব অশ্রাব্য কথা উচ্চারণ করলে যে আমার মনে হ'ল হাতের মগটা ওদের মাথায় ছুঁড়ে মেরে পালিয়ে আসি। তারপর যা হোক ঢোকবার যখন সুযোগ মিলল তখন মনে হ'ল একেবারে নরককুণ্ডের মধ্যেই—কেবল কি ময়লাই তাতে আছে, বিড়ি সৃষ্টির পর থেকে পোড়া বিড়ির টুকরো সব বোধ হয় এখানেই জমেছে।'

কল্যাণ বলিতে যাইতেছিল, 'কিন্তু...' রজত তাহাকে থামাইয়া বলিল, 'রোস, এখনও আসল কথায় আসি নি। ঐ ঘরের ভিতর দিয়েই নেমে এসেছে যে পাইপটা দোতলা থেকে, সেটা ফুটো হয়ে ঝাঁঝরা হয়ে আছে। কোন মহাত্মা উপরে বসেছিলেন, তারই আশীর্বাদে আমার আজ প্রাতঃকালেই হ'ল ধারাস্নান।'

কল্যাণ হাসিয়া বলিল, 'ওটা হচ্ছে গিয়ে তোর এই বস্তির মালিকের বাড়ী। তারা থাকেন সেখানে। নীচের তলার এই পায়খানাটার ঢোকবার পথ এই নোংরা বস্তির ভেতর দিয়ে বলে ওরা এটাকে আবার ভাড়া খাটাচ্ছে। বড়লোকেরা গরীবের রক্ত

রাজা গণেশের প্রাচীনতম উল্লেখ

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

মুসলমান যুগে হিন্দু রাজা গণেশকর্তৃক সমগ্র গৌড়রাজ্য অধিকার একটি অসাধারণ ঘটনা। তাঁহার সম্বন্ধে যেখানে যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহা কণামাত্র হইলেও সাদরে সংগৃহীত ও সাবধানে আলোচিত হওয়া আবশ্যক। এসিয়াটিক সোসাইটিতে একটি সংস্কৃত গ্রন্থের পুথি রক্ষিত আছে, যাহা হইতে পনর বৎসর পূর্ব্বে একজন সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিত রাজা গণেশের সম্বন্ধে একটি অতীব মূল্যবান্ শ্লোক আবিষ্কার করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন—তিনি বাঙ্গালী নহেন, মাদ্রাজী (*Journal of the Andhra Historical Research Society*, Vol. XI, p. 174)। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে আমরা অন্য প্রসঙ্গে তাহা পুনরুদ্ধৃত করিয়াছিলাম (*Annals*, B. O. R. I., Vol. XXVIII, pp. 126-7)। এযাবৎ কোন বাঙ্গালী ঐতিহাসিকের দৃষ্টি রাজা গণেশের এই সর্ব্ব-প্রাচীন উল্লেখের উপর পতিত হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। ইহার দুইটি দুঃখজনক কারণ বিদ্যমান আছে, যাহা স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক। বঙ্গদেশ হইতে সংস্কৃতের চর্চ্চা উঠিয়া যাইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে অমুদ্রিত সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে ঐতিহাসিক উপকরণ আহরণ করা বাঙ্গালী দ্বারা আর হইয়া উঠিতেছে না—বাংলা হইতে পুথি ধারে লইয়া গিয়া বহু অবাঙ্গালী নানা বিষয়ে মূল্যবান্ গবেষণা করিয়াছেন ও করিতেছেন। দ্বিতীয়তঃ, ইতিহাসের অতি সমৃদ্ধ উপকরণ সংস্কৃত গ্রন্থ মধ্যে নিবদ্ধ থাকিলেও দুই-এক জন ছাড়া বাংলার ঐতিহাসিক সম্প্রদায় সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতগণের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করেন এবং তাহার ফলে স্থলে স্থলে এমন মারাত্মক ভ্রমে পতিত হন যে, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া দিলে অতি অপ্রীতিকর ব্যাপারের সম্মুখীন হইতে হয়। আমরা সত্যের অনুরোধে রাজা গণেশের সম্পর্কিত সদ্যঃ প্রকাশিত একটি আলোচনার বিস্ময়কর ভ্রম-প্রমাদ প্রদর্শন করিতেছি।

বগুড়ার ইতিহাস-লেখক প্রবীণ মনীষী শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন মহাশয় রাজা গণেশের বিষয়ে "হিন্দুসূত্র" হইতে চারিটি প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।* তন্মধ্যে প্রথম দুইটি কৃত্রিম রচনা। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক সুপণ্ডিত শ্রীহরিদাস দাস "বাল্যলীলাসূত্র" সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন, "এই গ্রন্থ ঐতিহাসিকদের বিচারে আধুনিক" (শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৫)। ইহার জাজ্বল্যমান কৃত্রিমতার নিদর্শন গণেশ সম্পর্কিত উদ্ধৃত শ্লোক মধ্যেই প্রকটিত রহিয়াছে। গণেশ "গ্রহ-পক্ষাক্ষি-শশধৃত মিতে" শাকে গৌড়ের একচ্ছত্র রাজা হন—তদ্দ্বারা ১২২৯ শকাব্দ অর্থাৎ ১৩০৭ খ্রীষ্টাব্দ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। কারণ, সংস্কৃত সংখ্যাকোষ অনুসারে 'অক্ষি'-পদে ২ অঙ্ক বুঝায় (৩ নহে)। গণেশের বাসস্থান লিখিত হইয়াছে "দিনাজপুরে"—অথচ খ্রীঃ ১৮শ শতাব্দীর পূর্ব্বে দিনাজপুরের অভ্যুদয় হয় নাই। বুকানন হ্যামিল্টন সাহেব প্রায় ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে তৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"I understood at tho place, that it entirely owed its consquence—first, to the residence of the raja, a very recent event…" (Dinajpur, 1833, p. 27)।

দিনাজপুর "বিজয়নগর" নামক একটি ক্ষুদ্র পরগণার অন্তর্ভুক্ত একটি গণ্ডগ্রাম ছিল। "বাল্যলীলাসূত্র" যখন রচিত হয় (১৪০৯ শকাব্দের বৈশাখ মাসে) তখন মহাপ্রভু মাত্র ১ বৎসরের শিশু। অর্থাৎ রাম না জন্মিতে রামায়ণের ন্যায় ইহাও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেই রচিত!! দ্বিতীয় "হিন্দুসূত্র" ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশও রূপকথায় পরিপূর্ণ একটি কৃত্রিম রচনা। শ্রীহরিদাস দাস লিখিয়াছেন (পৃঃ ৮২), "কিন্তু আধুনিক বলিয়া কাহারও মতে ইহা ষোড়শ শকাব্দার রচনা নহে।" জীব গোস্বামীর লঘুতোষণীতে "দনুজমর্দ্দন-ক্ষিতিপের" নামোল্লেখ প্রামাণিক বটে, কিন্তু তন্মধ্যে নামটি ছাড়া উক্ত রাজার সম্বন্ধে কোন সম্বাদ লিপিবদ্ধ নাই।

তৃতীয় "হিন্দুসূত্র"টি আগন্ত প্রমাদাত্মক, যদিও তজ্জন্য প্রভাস বাবু প্রধানতঃ দোষী নহেন। যিনি সংস্কৃতজ্ঞ হইয়াও অনবধানতা-বশতঃ সংস্কৃত বাক্যের ভ্রান্তিমূলক অন্বয় করিয়া চণ্ডী কাটিয়া মুণ্ডী করিয়াছেন তিনিই দোষী। বৃহস্পতি মিশ্র-রচিত "স্মৃতিরত্নহার" গ্রন্থের একমাত্র প্রতিলিপি এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত আছে (G. 5219)। আমরা বিশেষ সাবধানে তাহা পরীক্ষা করিয়াছি। গ্রন্থকার তাঁহার পৃষ্ঠপোষকের পরিচয় বিশদভাবে চারি শ্লোকে (৩-৬ সংখ্যক) লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—পাতাটির এক প্রান্ত ছিন্ন হওয়ায় অনেক অক্ষর বিলুপ্ত হইয়াছে। তথাপি সমগ্র বাক্যটির অন্বয় করা কোন সংস্কৃতজ্ঞের পক্ষে কঠিন নহে। প্রথম শ্লোক—

> জীযাদয়ং স "জগদত্ত"-সুতোঽতিবেল
> বৈ-বৈ-শু শৈঃ … …
> … … পা নিজভুজপ্রবিপার্জ্জিতশ্রীঃ
> শ্রীরায়রাজ্যধরনামপদং প্রপন্নঃ ॥৩

এস্থলে এবং পরবর্ত্তী ৬নং শ্লোকে লিপিকার পরিষ্কাররূপেই "জগদত্ত" নাম লিখিয়াছেন, জগদত্ত নহে। জগদত্তের পুত্র শ্রীরায়রাজ্যধর নামক কোন রাজপুরুষের জয়ঘোষণা এই মূল বাক্যের প্রতিপাদ্য। "শ্রীরায়রাজ্যধর-নামপদ" হইতে "রাজপদ" অর্থ পাওয়া যায় না। "নামপদ" অর্থাৎ সংজ্ঞাভিধানের যৌগিক

* প্রবাসী, চৈত্র ১৩৫৯, পৃঃ ৬৯০-১

অর্থ হইতে পারে না এবং বল পূর্ব্বক রাজ্যধর অর্থ রাজা করিলেও "রায়" উপাধিটির কোনই সমন্বয় হয় না। পরবর্ত্তী তিন শ্লোকে তিনটি বিশেষণ বাক্য রহিয়াছে। তন্মধ্যে শেষ দুইটির অন্বয়ে সংশয় নাই :

যো ব্রহ্মাণ্ডং কনকতুরগস্যন্দনং বিশ্বচক্রং
পৃথ্বীং কৃষ্ণাজি(ন)সুরতরূন্ ধেনুশৈলোদধীংশ্চ।
* * * (বি)খিবদবনীদেবতানামমন্দং
ভিন্দন্ দৈন্যং সপদি দধতে ধর্ম্মসূনোরভিখ্যাম্ ॥৫

যিনি (জগদত্তসুত শ্রীরায়রাজ্যধর) বিধিপূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি নানা মহাদানের অনুষ্ঠান দ্বারা ব্রাহ্মণদের দৈন্য দূর করিয়া "ধর্ম্মপুত্র" সংজ্ঞা ধারণ করিতেছেন (ধারণার্থক ভ্বাদিগণীয় আত্মনেপদী দধ্ ধাতুর প্রয়োগ লক্ষণীয়)। প্রভাসবাবু ত্রুটিতাংশের যে পূরণ করিয়াছেন ('দত্ত্বা তেভ্যোনি'-) তাহা সামান্য পরিবর্ত্তন করিলে (দত্ত্বা ভূয়ো বি-) সার্থক হয়।

জন্মাপ্তং জগদত্ততো গুণনিধের্মূর্দ্ধাভি(ষিক্তা)ন্বয়ে
দারাঃ সন্তলি···তিঃ শ্রীভাস্করাঃ সূনবঃ।
লক্ষ্মীরদ্ভুতদানভোগসুভগা মন্ত্রিত্বমুর্ব্বীভুজাম্
ইত্থং যস্য মনোরথায় কৃতিনঃ কিঞ্চিন্ন কাম্যং স্থিতম্ ॥৬

"মূর্দ্ধাভিষিক্ত" বংশে গুণনিধি জগদত্ত হইতে জন্মলাভ, উৎকৃষ্ট পত্নী, শ্রীভাস্কর পুত্র, অদ্ভুত দান-ভোগদ্বারা চরিতার্থ সম্পত্তি এবং বিভিন্ন রাজার মন্ত্রিত্বলাভ—এইরূপে যে কৃতি পুরুষ (রায় রাজ্যধরের) আর কোন কাম্য বস্তুর অভিলাষ অবশিষ্ট ছিল না। এই শ্লোকে পাওয়া যায়, রায় রাজ্যধর "মূর্দ্ধাভিষিক্ত" নামক সঙ্করজাতীয় ছিলেন—ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি। আর, বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা আবশ্যক, তাঁহার সর্ব্বোপরি শেষ কামনা ছিল "মন্ত্রিত্বমুর্ব্বীভুজাম্" (রাজাদের মন্ত্রিপদ)। অর্থাৎ তিনি স্বয়ং রাজা ছিলেন না—সমগ্র গৌড়রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি তো নিশ্চিতই নহেন।

বাকী শ্লোকটি এই :

সৈনাধিপত্যমিভসৈন্ধবতুর্য্যশঙ্খ-
ছত্রাবলীললিতকাঞ্চনরূপ্য···।
······দান বহু ভূষণঞ্চ
জল্লালদীননৃপতির্মুদিতো গুণৌঘৈঃ ॥৪

সংস্কৃত ভাষায় যাঁহাদের সামান্য জ্ঞান আছে তাঁহারা সহজেই ধরিতে পারিবেন, এই শ্লোকের একটি মাত্র অর্থই সঙ্গত ও সম্ভাবিত হইতে পারে—যাঁহাকে (যস্মৈ,অর্থাৎ যে জগদত্তসুত শ্রীরায়রাজ্যধরকে) জালাল-উদ্দীন রাজা তাঁহার গুণরাশিহেতু আনন্দিত হইয়া সেনাপতিত্ব প্রভৃতি দান করিয়াছিলেন। শ্রীরায় রাজ্যধরের ন্যায় জল্লালদীন নামটি "শ্রী"মণ্ডিত নহে—সুতরাং অনুমান হয় গ্রন্থরচনাকালে জালাল-উদ্দীন জীবিত ছিলেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধিবিশিষ্ট একজন পদস্থ সংস্কৃতের অধ্যাপক মূলবাক্যের সহিত একান্বয় করিয়া শ্লোক দুইটির অর্থ করিয়াছেন—গজদন্ত (অর্থাৎ গণেশ) সুত জল্লালদীনের জয় হউক, তিনি শ্রীরায়রাজ্যধর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং গ্রন্থকার বৃহস্পতিকে সেনাপতিত্ব প্রভৃতি দান করিয়াছিলেন (*Indian Historical Quarterly*, Vol. XVII, pp. 451-2)। এই ব্যাখ্যা সর্ব্বাংশে প্রমাদপূর্ণ ও ভ্রমাত্মক।[১] শ্লোক চারিটিতে গ্রন্থকার স্বকীয় পৃষ্ঠপোষকের প্রশস্তি রচনা করিয়া অব্যবহিত পরবর্ত্তী শ্লোকে নিজের পরিচয় দিয়া লিখিয়াছেন :

আচার্য্য ইত্যভিমতং কবিচক্র(বর্ত্তী-ত্যাখ্যাপদ)দ্বিতয়মধ্যগমমত্তো যঃ।
স শ্রীবৃহস্পতিরিমং বহুসংগ্রহার্থৈ নির্মাতি নির্মলমতিঃ স্মৃতিরত্নহারম্ ॥৭

(যিনি তাঁহার নিকট হইতে অর্থাৎ জগদত্তসুত রায় রাজ্যধর হইতে দুইটি অভিমত উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই বৃহস্পতি এই গ্রন্থ নির্ম্মাণ করেন)। অভিমত উপাধিপ্রাপ্ত গ্রন্থকারের সৈনাধিপত্যাদি অনেক উচ্চতর সম্মান প্রাপ্তির কথা পূর্ব্বে পৃষ্ঠপোষকের প্রশস্তির বিনিময়ে হঠাৎ নিতান্ত অসংলগ্নভাবে ৪নং শ্লোকে কোন প্রকারেই উল্লিখিত হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, সংস্কৃত ভাষায় উদ্দেশ্যবিধেয়ের প্রয়োগ যদৃচ্ছাকল্পিত হয় না—জগদত্ত-সুত রায় রাজ্যধর ও জলাল-উদ্দীন অভিন্ন হইলে মূলবাক্যের বিধেয়াংশে গোড়ায়ই জলাল উদ্দীনের উল্লেখ থাকিত (জীয়াদয়ং স জগদত্তসুতোঽতিবেলঃ জল্লালদীননৃপতিঃ ইত্যাদি)। এখন আছে 'সং'পদারব্ধ একটি বিশেষণ বাক্যের সর্ব্বশেষে, 'জীয়াদয়ং স' বাক্যের সহিত তাহার অভেদান্বয় একান্তভাবে অসম্ভব। তৃতীয়তঃ, গ্রন্থটিতে শত শত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নামোল্লেখ পাওয়া যায়, লিপিকার সর্ব্বত্র তাহা বিশুদ্ধাকারে লিখিয়াছেন। কিন্তু প্রথম পৃষ্ঠার গোড়ায়ই দুই স্থলে "গজদন্তে"র পরিবর্ত্তে "জগদত্ত" লিখিয়া বসিবেন, ইহা কল্পনার অতীত। চতুর্থতঃ, কাহারও নাম পর্য্যায় শব্দদ্বারা অভিহিত হইতে পারে না—রাজার নাম ছিল গণেশ, গজদন্ত নহে। রচনানিপুণ গ্রন্থকার অনায়াসে গণেশ নামই লিখিতে পারিতেন (জীয়াদয়ং স হি গণেশসুতো, প্রাপ্তং জন্ম গণেশতো), নিতান্ত মূর্খের মত তৎপরিবর্ত্তে গজদন্ত লিখিতে যাইবেন কেন? কাহারও নাম যদি 'রাজেন্দ্র' হয় তাঁহার পুত্রের পরিচয় রাজেন্দ্রসুত স্থলে 'নৃপবৃষাত্মজ' পদ দ্বারা হইতে পারে না। গ্রন্থকার বৃহস্পতি মিশ্রকে বাচস্পতি মিশ্র বলিতে কেহই অগ্রসর হইবেন না। পঞ্চমতঃ, গৌড় দেশের একচ্ছত্র অধিপতি জালাল-উদ্দীনের "রায়-রাজ্যধর" নাম-পদ দ্বারা এবং তাহার সাড়ম্বর উল্লেখ দ্বারা কি প্রকারে প্রশস্তি বা গৌরব বৃদ্ধি হইতে পারে তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য—ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রভাস বাবু স্বয়ং শ্লোকটির যে অর্থ করিয়াছেন তাহা অধিকতর ভ্রমাত্মক—আমরা তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলাম না। প্রভাস বাবুর প্রবন্ধে আর একটি "হিন্দুসূত্র" বাদ পড়িয়াছে। নগেন্দ্রনাথ বসু "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" (উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ কাণ্ড, ৩য়

১। ১৯৪২ সনে আমরা অতি সংক্ষেপে এই ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছিলাম (*I. H. Q.* XVIII, pp. 75-6)। সম্প্রতি একজন মুসলমান লেখক তৎসত্ত্বেও ঐ ভ্রান্ত মতেরই অনুসরণ করিয়াছেন (*ib.*, XXVIII, pp. 215-24)।

খণ্ড, ১৩৩৬ সাল) গ্রন্থে "গৌড়েশ্বর গণেশ দত্ত খান্" শীর্ষক প্রবন্ধে রাজা গণেশের কুল-পরিচয় ও ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন (পৃ. ৮০-৯৪)। উত্তর রাঢ়ীয় দত্ত বংশের সদানন্দ ঘটক রচিত কারিকায় পাওয়া যায় :—(পৃ. ৭০)

তার বেটা শিব নাম। অশ্বঘাটে কৈলা ধাম ॥
তার পুত্র পুণ্যবান্। শ্রীগণেশ দত্ত খান্ ॥
রঘুপতি মল্লিকে কন্যা। বিভা দিয়া হৈল ধন্যা ॥
নিজ তেজে গৌড়ের রাজা। সভে যারে কৈলা পূজা ॥
তস্য সুত যদুনাথ। অকাল কুষ্মাণ্ড হইল জাত ॥
হইল তার জাতিপাত। পৈতৃক ধর্ম্ম কুপোকাত ॥

পাটুলি দত্ত বংশের বিবরণের সহিত মিলাইয়া দেখিলে পাওয়া যায়, এই যদুনাথ বাঁশবাড়িয়া রাজবংশের আদি জমীদার "সমাজপতি" সহস্রাক্ষ দত্তের পিতৃব্য সম্পর্কিত ছিলেন (৭২ পৃ ও ১০৭ পৃ. বংশাবলী দ্রষ্টব্য)। সহস্রাক্ষ সম্রাট্ আকবরের সমকালীন—৯৮০ বঙ্গাব্দে (১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে) তিনি আকবরের নিকট হইতে 'ফরমান্' পাইয়াছিলেন।*

সহস্রাক্ষের সহিত তাঁহার পিতৃব্য যদুনাথের কালব্যবধান ১৫০ বৎসর হইতেছে! অর্থাৎ ঘটককারিকার উদ্ধৃত অংশ "কুপোকাত" হইয়া যাইতেছে এবং আচার্য্য যদুনাথ "venal heralds" বলিয়া ঘটকদের যে স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন এ স্থলে তাহা সার্থক হইতেছে। রাজা গণেশ কায়স্থ হইয়া যাইতেছেন দেখিয়া দুর্গাচন্দ্র সান্যাল "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" নামে এক রূপকথা রচনা করিয়া গণেশকে বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ করিয়া লইয়াছিলেন! সাধারণ বাঙালী, শিক্ষিতই হউক ও আর অশিক্ষিতই হউক, আচার্য্য যদুনাথ প্রমুখের লেখা আমলে আনেন না। প্রভাস বাবুর নিকটও দেখিতেছি তাহা "অবাস্তব কল্পনা" (পৃ. ৯৯৪)। তাঁহাদের নিকট বসু-সান্যালের লেখাই কি প্রকৃত ইতিহাস হইবে?

এসিয়াটিক সোসাইটিতে "সঙ্গীতশিরোমণি" নামক গ্রন্থের নাগরাক্ষর প্রতিলিপি রক্ষিত আছে (G. 1713—পত্রসংখ্যা ২-২৬, প্রথম পত্রটি পৃথক্ হস্তাক্ষর ও পৃথক্ গ্রন্থের)। গ্রন্থারম্ভে গ্রন্থরচনার বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। প্রথমাংশ যথাযথ উদ্ধৃত হইল :

সংগ্রাম(ব)ক্তিম্ ॥
অসপত্নং ব্যধাদ্রাষ্ট্রমিবরাহিমভূপতেঃ।
ব্যানম্রাখিল-ভূমিপাল-মুকুট-প্রত্যগ্র-রত্নপ্রভা—
কিৰ্ম্মীরাভবদংঘ্রিযুগ্মনখরজ্যোতির্বিতানোজ্জ্বলং ॥
কীৰ্ত্তিচ্ছত্রসুবর্ণদণ্ডসদৃশস্ফূর্জ্জৎ-প্রতাপোচ্চয়ং
লোকেস্মিন্নিবরাহিম ক্ষি(তি)পতিং কো নাশ্রয়েৎ পার্থিবঃ।
ঘনাটোপঃ গর্জ্জদ্গজতুরগসেনাজলধরৈঃ
সমং নীত্বাশক্ষঃ শকশলভসংপ্লার্চিষময়ং।
তুরুষ্কং নির্ম্মায় প্রকটিতনয়ং তস্য তনয়ং
ব্যধাদ্ গৌড়ান্ প্রৌঢ়ঃ পুনরপি শকানাং জনপদান্ ॥

আদক্ষিণোদধেরা চ হিমাদ্রেরা চ গাজনাৎ।
আগৌড়াদুজ্জ্বলং রাজ্যমিবরাহিমভূভুজঃ ॥
অস্যৈব সার্বভৌমস্য প্রতাপাৎ পৃথিবীপতিঃ।
মলিকঃ মুলুতাশাহির্মধ্যদেশাধিপোভবৎ ॥
গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে গঙ্গায়া বিপুলে তটে।
কড়াখ্যং নগরং তস্য বেণ্যা যোজনপঞ্চকে ॥ (২।১ পত্র)

অর্থাৎ জৌনপুরের সার্ব্বভৌম সম্রাট ইবরাহিমের অধীনে মধ্যদেশাধিপতি মলিক মুলুতা শাহি ত্রিবেণীর (অর্থাৎ প্রয়াগের) পাঁচ যোজন দূরে "কড়" নগরে রাজত্ব করিতেন। তিনি নানা দেশ হইতে সঙ্গীত শাস্ত্রের নানা গ্রন্থ আনাইয়াছিলেন—১৮টি গ্রন্থের নামোল্লেখ আছে। তৎপর চারিদিক হইতে "পদবাক্যপ্রমাণজ্ঞ" সঙ্গীতার্থবিশারদ পণ্ডিতদিগকে আনাইয়া প্রচুর "গ্রামহেমাম্বরাদি" দান করিয়া তাঁহাদের দ্বারা এই "সঙ্গীতশিরোমণি" গ্রন্থ রচনা করাইয়াছিলেন। গ্রন্থমধ্যে কোন পণ্ডিতের নামোল্লেখ নাই। একটি পুষ্পিকা এই—"ইতি শ্রীমলিকশরক-শ্রীমুলিতানশাহেরাদেশেন নানা-দেশীয়-পণ্ডিত-মণ্ডলীবিরচিতে সঙ্গীতশিরোমণৌ তানপ্রকাশঃ" (২৩।১ পত্র)। বোধ হয় ইব্রাহিমের ন্যায় মুলুতা শাহিও "শর্কী" বংশীয় ছিলেন বলিয়া "শরক" পদ লিখিত হইয়াছে। সৌভাগ্যবশতঃ গ্রন্থরচনার কাল স্পষ্ট ভাষায় লিখিত আছে :

অচীকরদমুং নাম্না শ্রীসঙ্গীতশিরোমণিং।
ইভরাহিমসম্রাজি শকরাজ্যং প্রশাসতি ॥
বর্ষে চতুর্দ্দশশতে পঞ্চাশীত্যধিকে গতে।
বৈক্রমাঙ্কে খবাণাগ্নিশশিসংখ্যে চ শাককে ॥ (২।২ পত্র)

১৪৮৫ বিক্রমাব্দ ও ১৩৫০ শকাব্দ ১৪২৮-২৯ খ্রীষ্টাব্দে পড়ে। লক্ষ্য করা আবশ্যক, তখন কেবল ইব্রাহিম নহে, রাজা গণেশের পুত্র জালাল-উদ্দীনও জীবিত ছিলেন। সুতরাং গণেশ-ইব্রাহিম সংঘর্ষের ইহাই প্রাচীনতম উল্লেখ এবং ইহা একাধারে হিন্দুসূত্র ও মুসলমান-সূত্র বটে—কারণ, গ্রন্থটির রচয়িতা হিন্দু পণ্ডিতগণ এবং কারয়িতা সম্ভ্রান্ত মুসলমান। ইবরাহিমের কবিত্বপূর্ণ প্রশস্তি হইতে আমরা কেবল গৌড়ঘটিত শ্লোকটির অনুবাদ প্রদান করিলাম :

এই প্রবীণ (সম্রাট্ ইবরাহিম) প্রচুর গর্ব্বসহকারে গর্জ্জনকারী হস্তী, অশ্ব ও সেনারূপ মেঘবর্ষনদ্বারা (রাজা গণেশরূপ) অগ্নিকে নিঃশঙ্কে নির্ব্বাপণ করেন (পুথিতে 'সমং' পাঠ আছে, তাহা 'শমং' হইবে), যে অগ্নিতে শকেরা (অর্থাৎ মুসলমানেরা) শলভের মত (পুড়িয়া মরিয়াছিল)। এবং সুনয়সম্পন্ন তাঁহার পুত্রকে তুরস্ক নির্ম্মাণ করিয়া গৌড়দেশকে পুনরায় শকরাজ্যে পরিণত করিয়াছিলেন।

লক্ষ্য করা আবশ্যক, এই গ্রন্থে "শক"-শব্দটি স্পষ্ট মুসলমান অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। রাজা গণেশের সহিত ইব্রাহিমের সংঘর্ষ এখন আর "ভিত্তিহীন" বলার উপায় নাই—ঐতিহাসিক সত্যরূপে গ্রহণীয়। প্রশস্তিকার রাজা গণেশকে অগ্নির সহিত তুলনা করিয়াছেন এবং সেই অগ্নিতে শকেরা শলভবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল। সুতরাং এখন প্রমাণসিদ্ধ হইতেছে যে, গণেশ মুসলমানদের উপর প্রকৃতই অত্যাচার করিয়াছিলেন এবং বিখ্যাত পীর নূর কুতুব আলমের আহ্বানে ইব্রাহিম আসিয়া তাঁহাকে দমন করেন। দেখা যাইতেছে

* *The Family History of the Bansbaria Raj*, edited by A. G. Bower, 1896, p. 4.

রিয়াজ-উস-সালাতিন ও বুকানন সাহেবের আবিষ্কৃত গ্রন্থ আধুনিক হইলেও এস্থলে তথ্যপূর্ণ। নূর কুতুবের মৃত্যু তারিখ ১০ জিলকদ ৮১৮ হিজরি (= ১১ জানুয়ারী ১৪১৬ খ্রীঃ *J. A. S. B*, 1909., p. 228); তাহার পরই গণেশ পুনঃ স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং পুত্রকে শুদ্ধি দ্বারা হিন্দু করিয়া লন। এই সময়েই দনুজমর্দ্দন ও মহেন্দ্রদেবের মুদ্রা প্রচারিত হয়—সুতরাং কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না যে, এই দুই নাম গণেশ ও তাঁহার পুত্রেরই বিরুদ্ধে। সুদূর সাগরপার হইতে চন্দ্রদ্বীপের আদি জমীদার "দনুজমর্দ্দন" রামনাথ দে আসিয়া তিন তুড়িতে জলাল্-উদ্দীনকে সরাইয়া দিয়া সমগ্র গৌড়রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন—আরব্য উপন্যাসে স্থান পাওয়ার উপযুক্ত এই গল্প ইতিহাসে চলিতে পারে না। বস্তুতঃ চন্দ্রদ্বীপের দনুজমর্দ্দন রাজা গণেশের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী, সমকালীন নহে।

সকলেই লিখিয়াছেন, রাজা গণেশের সহিত দনুজমর্দ্দনের অভিন্নতা কোন গ্রন্থে লিখিত হয় নাই। আমরা মনে করি বুকানন সাহেব পাণ্ডুয়ায় যে পুথি পাইয়াছিলেন ("a Ms. account which I procured at Peruya," Dinajpur, p. 22) তাহাতে এই অভিন্নতা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত ছিল। গণেশের সম্বন্ধে সাহেবের উক্তি এই—"Then Gonesh, a Hindu and Hakim of Dynwaj, (perhaps a petty Hindu chief of Dinajpur,) seized the government." (ঐ, p. 23) এস্থলে "Hakim of Dynwaj" পদটি দনুজ মর্দ্দন শব্দেরই ফারসী অনুবাদ—অন্যায় অধিকারী অর্থেও হাকিম শব্দের ব্যবহার আছে। ইহা ছাড়া পদটির অন্য কোন অর্থই সঙ্গত হয় না। ঐ সময়ে "দিনাজ" নামে কোন রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল না—দিনাজপুর নিতান্তই আধুনিক নাম। তাহাই আপাতদৃষ্টিতে সাহেবের নিকট এস্থলে প্রতিভাত হইলেও তিনি অত্যন্ত সংশয়াকুল ছিলেন। দিনাজপুর শহরের বিবরণমধ্যে তিনি স্পষ্টই লিখিয়াছেন :

"Whether or not, it is the same with Dynwaj, the governor (Hakim) of which, Gones usurped the government of Gaur, I cannot say." (p. 27)

নামটির মধ্যে একটি ঘ অক্ষর আছে—তদ্দারা "দনুজ"ই প্রতিপন্ন হয়, "দিনাজ" নহে। দনুজমর্দ্দনের মুদ্রা ঐ সময়ে আবিষ্কৃত হইলে সকল সন্দেহের নিরসন হইত। সুতরাং রিয়াজ ও পাণ্ডুয়ার পুথির বহুতর উক্তি অপ্রামাণিক না ধরিয়া এক্ষণে সাবধানে পুনরালোচিত হওয়ার যোগ্য।

কালবৈশাখী

শ্রীকালিদাস রায়

সহসা আসিল কালবৈশাখী
ভাঙে মড়মড়ি তরুর শাখা।
বহুদিন অনাবৃষ্টি গিয়াছে,
লঘু মেঘে আজ আকাশ ঢাকা।
চারিদিকে চলে তাণ্ডব লীলা,
তার মাঝে তবু জাগে যে আশা;
চাল উড়ে যায়, ফল ঝ'রে যায়,
উল্লাসে তবু নাচিছে চাষা।
ধূলায় আঁধার হলো চারিধার,
ধ্বংসও ভালো যায় না দেখা।
মেঘে ত্রিবর্ণ পতাকার মত
চপলা আঁকিছে চপল রেখা।
বনবৃক্ষের পাখীর কুলায়
সব গেল আজ কোথায় উড়ে!
বাসাহারা পাখী লাখে লাখে ঝড়ে
ঘুরপাক খায় আকাশ জুড়ে।

বাসাও গিয়াছে, আশাও গিয়াছে,
এখন হয়েছে আকাশ সার,
গৃহবন্ধন মুক্ত পেয়েছে
স্বাদ যে চরম স্বাধীনতার।

ঝড় যাবে থামি, বর্ষণ নামি'
ঘুচাবে কি দেশে সব অভাব?
কুড়ায়ে কোঁচড়ে কাঁচা আম, ভাবে
আপাতত শিশু পরম লাভ।
জ্যৈষ্ঠের খরা আসে দেশ-ভরা
শুকাইতে তৃণ শস্যদল,
মরুভূমিসম হবে দেশ মম
পাহাড়িয়া নদী হারাবে জল।
আষাঢ়িয়া আশা মনে যারা পোষে
তাদের হয়ত সহিবে সবি,
নব-বরষার মঙ্গলগান
গাহিতে তখন রবে না কবি।

একটি তেলুগু পল্লী

হায়দরাবাদ থেকে রাজমহেন্দ্রী

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

বন্ধুবর সর্বেশ্বর শর্ম্মা সতেরোই জানুয়ারী হায়দরাবাদ ত্যাগ করে তাঁর কর্মস্থল কব্বুরের উদ্দেশে রওনা হলেন।

বিদায় নেবার প্রাক্কালে শর্ম্মাজী বার বার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে গিয়েছিলেন—আমি যেন হায়দরাবাদে বেশী দেরি না করি। কিন্তু মুসলমান আমলের বহু ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতিবিজড়িত, সাড়ে তিন শত বৎসরের পুরনো এই বিখ্যাত নগরীর বিগত রাজমহিমার বিলীয়মান রশ্মিচ্ছটা, এখানকার বিচিত্র বর্ণের পুষ্পখচিত মনোরম উদ্যান-শোভিত প্রাসাদমালা, রাস্তার উভয় পার্শ্বে ঘনসবুজ পত্রসমন্বিত সারিবাঁধা সরল সমুন্নত বিটপীশ্রেণী, সুমনোহর বর্ত্মরাজির সুমার্জ্জিত পরিচ্ছন্নতা, অত্যুচ্চ মিনারসমূহের গঠনসৌষ্ঠব চোখের সামনে মোহজাল বিস্তার করে আমার মনকে যেন শতপাকে বেষ্টন করে ধরল। স্থির করলাম—অন্ততঃ সপ্তাহখানেক হায়দরাবাদে থেকে এখানকার মিনার, মসজিদ, রাজপ্রাসাদের কারুকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করব তন্ন তন্ন করে, আর বহুবিচিত্র মানবধারা একত্র সম্মিলিত হয়ে এখানে ভারতীয় সংস্কৃতির যে একটা বিশিষ্ট রূপ গড়ে উঠেছে, ধন্য হব তার প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করে।

হায়দরাবাদের অধিকাংশ অট্টালিকাই সাদা রঙের। সূর্য্যাস্তকালে শহরের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়ালে দূরস্থিত শ্রেণীবদ্ধ সৌধমালাকে দেখায় শুভ্রতর—অস্তগামী সূর্য্যের রক্তিম আভায় প্রদীপ্ত, উদার উন্মুক্ত সুবিস্তীর্ণ গোটা পশ্চিম আকাশটায় যেন আগুন ধরে গেছে বলে মনে হয়। সৌধশিখর, মিনার-চূড়া অস্ত সূর্য্যের কিরণসম্পাতে অপরূপ দ্যুতিমণ্ডিত হয়ে উঠে, ক্রমে শহরের শুভ্রতা অবলুপ্ত হয় সন্ধ্যার কৃষ্ণাবগুণ্ঠনে—মসী-ঢালা আকাশের বুকে পক্ষবিস্তার করে নিঃশব্দে উড়ে বেড়ায় অতিকায় বাদুড়ের ঝাঁক।

রাতের হায়দরাবাদ নবাগতের নিকট যেন এক রহস্যলোকের দ্বার উদ্ঘাটিত করে দেয়। রাজপথসমূহের উভয় পার্শ্বে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ডুম দেওয়া বৈদ্যুতিক আলোকমালার ঔজ্জ্বল্য চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। সুশোভিত বিপণিসমূহে যেন উৎসব-রজনীর আলোকসজ্জা, নানা বর্ণের বৈদ্যুতিক আলোকে উদ্ভাসিত সাইনবোর্ডগুলি ইন্দ্রধনুর বর্ণচ্ছটাকে হার মানিয়ে দীপ্যমান—আলো-ঝলমল অচেনা উর্দ্দু হরফগুলি কেমন যেন একটা রহস্যময় পরিবেশের সৃষ্টি করে নবাগতের মনকে করে তোলে মোহাবিষ্ট।

হায়দরাবাদ নগরী ভারতবর্ষের ছয়টি বৃহত্তম নগরীর অন্যতম। তাজমহল যেমন সম্রাট শাহজাহানের পত্নীপ্রেমের নিদর্শন তেমনি হায়দরাবাদ নগরী নির্ম্মাণের মূলে রয়েছে হিন্দু প্রণয়িনীর প্রতি দাক্ষিণাত্যের এক মহানুভব উদার প্রেমিক মুসলমান নৃপতির সুগভীর

প্রণয়। তিনি গোলকুণ্ডার পঞ্চম নৃপতি মহম্মদ কুলী কুতব শাহ।

ফরাসী পর্যটক টাভার্নিয়ের ভারতবর্ষে আসেন ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে। দাক্ষিণাত্যে তখন শাহীবংশের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত। গোলকুণ্ডায় রাজত্ব করছেন শাহী বংশের মুকুটমণি মহম্মদ কুলী কুতব শাহ (১৫৮০-১৬১১)। ভাগমতী নামে অপরূপ রূপলাবণ্যবতী এক হিন্দু রমণীর প্রতি নৃপতির গভীর প্রণয়াসক্তির কথা টাভার্নিয়ের লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে। কাহিনীটি চিত্তাকর্ষক :

ভাগমতী থাকেন মুসি নদীর পূর্বতীরে, আর নদীপরপারস্থ চার মাইল দূরবর্তী রাজধানী গোলকুণ্ডা থেকে রাজা এসে মিলিত হন তাঁর সঙ্গে। রাজাকে নদীর এপারে এক নগরী এবং প্রাসাদ নির্মাণের জন্যে অনুরোধ জানান ভাগমতী। কুতব শাহের উপর এই তরুণী রূপসীর প্রভাব অপরিসীম তাঁর অঙ্গুলি-হেলনে তিনি উঠেন বসেন। ভাগমতীর অনুরোধ তাঁর নিকট অলঙ্ঘনীয় আদেশ বলে মনে হ'ল—অবিলম্বে তিনি নগরী-প্রতিষ্ঠার আয়োজনে ব্যাপৃত হলেন। অনতিকালের মধ্যেই মুসী নদীর পূর্বতীরে গড়ে উঠল সৌধমালা-শোভিত সুরম্য এক নগরী। প্রণয়িনীর নামানুসারে কুতব শাহ এই নবনির্মিত নগরীর নামকরণ করলেন ভাগনগর।

মুসি নদীর উপরে 'পুরানা পুল' নামে প্রাচীন আমলের যে সেতুটি বিদ্যমান টাভার্নিয়ের শতমুখে তার গঠন-সৌষ্ঠবের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। আজ সাঁকোটি বিগতশ্রী, কিন্তু এর কাঠামোর মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য আছে, তা এখনো নবাগতের চোখ এড়িয়ে যায় না। এই পোলটিও নির্মাণ করান মহম্মদ কুলী কুতব শাহ।

তখন মুসি নদী এখনকার মত ক্ষীণকায়া ছিল না, মৌসুমী বায়ুপ্রবাহে বিপুলসলিলা নদীবক্ষ যখন উদ্বেলিত হয়ে উঠত, তখন নদী-পারাপার করা ছিল দুঃসাধ্য ব্যাপার। প্রেমিক-নৃপতি কিন্তু তাঁর প্রণয়িনীকে একদিনও না দেখে থাকতে পারতেন না। অপরিসীম কর্মব্যস্ততার মধ্যেও সময় করে নিয়ে তিনি চলে আসতেন ভাগমতীর পিত্রালয়ে এবং প্রিয়তমার প্রেমের অমৃতধারায় হৃদয়ের পাত্র পূর্ণ করে নিয়ে সেদিনই ফিরে আসতেন গোলকুণ্ডায়।

সেবার মুসি নদীতে বান ডেকেছে। তরঙ্গবিক্ষুব্ধ নদীর প্রলয়-গর্জনে আকাশ-বাতাস মুখরিত। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে নদীতে নৌকা ভাসিয়ে দিলেন নৃপতি কুতব কুলী শাহ—নদীর তুমুল গর্জন ছাপিয়ে তাঁর কানে এসে পৌঁছতে লাগল প্রিয়তমার আকুল আহ্বান। দুর্যোগরাত্রে এই দুঃসাহসিক অভিসার কুতব শাহের অন্তরে এক বিপুল উন্মাদনার সৃষ্টি করলে। তীর থেকে খানিক দূরে গিয়েই কিন্তু প্রচণ্ড তরঙ্গাভিঘাতে নৌকা বানচাল হবার
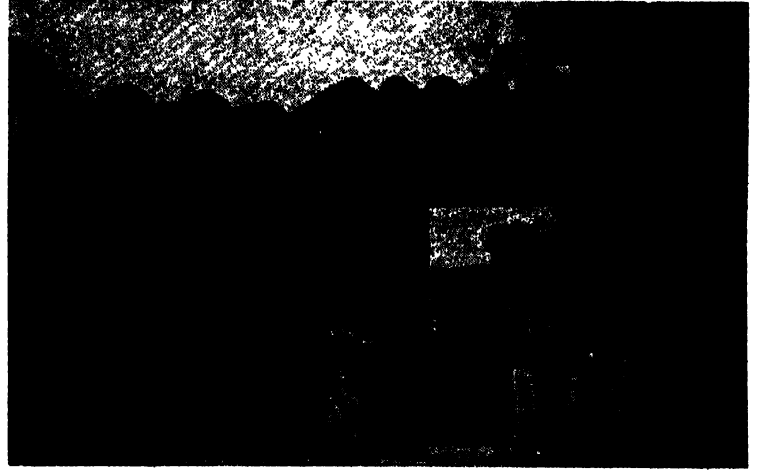
হায়দরাবাদ দুর্গের একাংশ এবং দুর্গ-তোরণ

উপক্রম। উত্তাল তরঙ্গমালা ভেদ করে অগ্রসর হওয়া হয়ে দাঁড়াল অসম্ভব। কোনও মতে প্রাণ নিয়ে সেবার রাজধানীতে ফিরে এলেন বটে কুতুব শাহ, কিন্তু এই নিদারুণ অভিজ্ঞতা তাঁর মনে এমন অনপনেয় ছাপ রাখলে যে, যাতে আর এ ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি না হয় সেজন্যে অচিরাৎ তিনি মুসি নদীর উপর এক সুদৃঢ় সাঁকো নির্মাণের আয়োজনে ব্যাপৃত হলেন। পোল নির্মাণ সম্পূর্ণ হ'ল ১৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দে—ভাগনগর প্রতিষ্ঠার চার বৎসর পরে। এমনিভাবে মুসি নদীর এপারের সঙ্গে ওপারের সংযোগ সংস্থাপিত হওয়ায় নৃপতির প্রিয়াসম্মিলনের পথ সুগম হ'ল। কিন্তু এত সুখ ভাগমতীর অদৃষ্টে বেশী দিন সহ্য হ'ল না। মৃত্যু নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এগিয়ে এসে অকালে তাঁর জীবনের উপর যবনিকা টেনে দিলে। ভাগমতীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই কিন্তু মুসলমান প্রজাদের মধ্যে একটা তীব্র অসন্তোষের অনল প্রধূমিত হয়ে উঠল। নৃপতির হিন্দু-প্রণয়িনীর নামানুসারে নূতন রাজধানীর নামকরণ হওয়াতে তাদের মধ্যে যে অপ্রীতিকর কানাঘুষা চলছে সে খবর শাহের কানে গিয়ে পৌঁছল। মুসলমান প্রজাদের মনোরঞ্জনার্থে রাজা শেষ পর্যন্ত ভাগ-নগরের নাম পরিবর্তন করলেন—এর নূতন নামকরণ হ'ল হায়দরা-বাদ। জীবিতাবস্থায় যে প্রণয়িনীকে কুতব শাহ অপরিসীম গৌরবের অধিকারিণী করেছিলেন, মৃত্যুর পরে স্বধর্মাবলম্বী প্রজাদের তুষ্ট করবার জন্যে তিনি করলেন তাঁর স্মৃতির অবমাননা।

কীর্তিমান নৃপতি ছিলেন মহম্মদ কুলী কুতব শাহ। শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, দক্ষিণ-ভারতের ইসলামিক স্থাপত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন চার মিনার তাঁরই আমলে প্লেগ রোগ-বিরতির স্মারক চিহ্ন-রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দে। তখনকার দিনে এটি ছিল সম্ভবতঃ রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণের তোরণদ্বার। অর্ধচন্দ্রাকৃতি উন্মুক্ত খিলানের উপর প্রতিষ্ঠিত, ১৮০ ফুট উচ্চ চারিটি মিনার দর্শকের মনকে বিস্ময়ে অভিভূত করে। ফরাসী-পর্যটক টাভার্নিয়ের
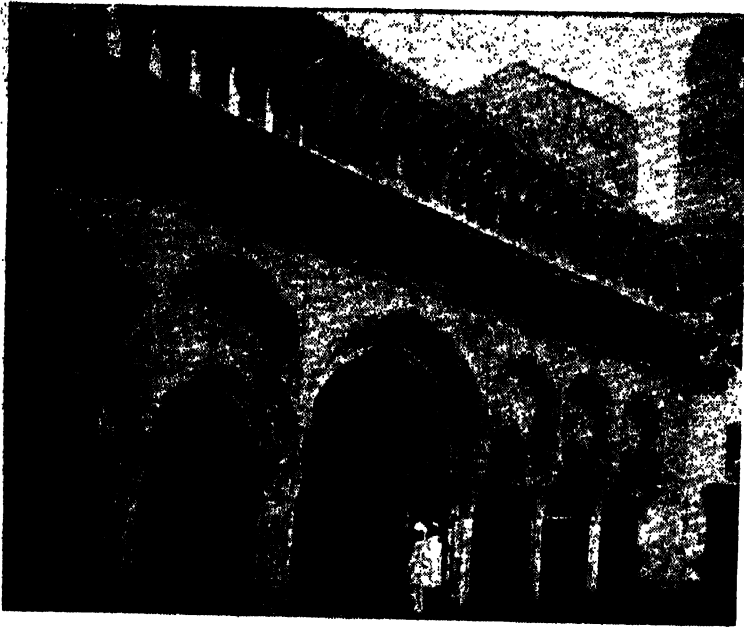
জুম্মা মসজিদের একাংশ, হায়দরাবাদ

প্রাসাদপুরী হায়দরাবাদে এসেছিলেন তার পূর্ণ গৌরবের দিনে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে তিনি লিখেছেন যে, রাজা যখন প্রজা-সাধারণকে উদ্দেশ করে কিছু বলতে চাইতেন তখন তিনি এসে বসতেন চার মিনারের এক অত্যুচ্চ, কারুকার্য্যখচিত মণ্ডপগৃহে। কি পরিকল্পনা, কি গঠনসৌষ্ঠব, কি মণ্ডন-শিল্পের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য সব দিক দিয়েই সমগ্র দক্ষিণ-ভারতে চার মিনারের জুড়ি নেই।

মহম্মদ কুতব শাহের আর এক বিরাট কীর্ত্তি মক্কা মসজিদ—হায়দরাবাদের শ্রেষ্ঠ মসজিদ এটি। এক সঙ্গে দশ হাজার লোক এর ভেতরে বসে উপাসনা করতে পারে। কুতব শাহ কর্তৃক এই ভজনালয় প্রতিষ্ঠার সূচনা হয় বটে, কিন্তু এর নির্ম্মাণকার্য্য পরিসমাপ্ত করেন দীর্ঘকাল পরে সম্রাট আওরঙ্গজেব। ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে কুতবশাহী বংশের শেষ নৃপতিকে পরাস্ত করে গোলকুণ্ডা দখল করবার পর তিনি এই কাজে হস্তক্ষেপ করেন।

হায়দরাবাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন মসজিদ হচ্ছে জামি মসজিদ বা জুম্মা মসজিদ। এটিরও নির্ম্মাতা মহম্মদ কুলী কুতব শাহ। মসজিদে একটি অনুশাসনে তাঁর উচ্ছসিত প্রশস্তি উৎকীর্ণ। ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হায়দরাবাদ ছিল মোগল সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ঐ বৎসর দাক্ষিণাত্যের নিজাম-উল-মুল্ক আশফ ঝা দিল্লী-দরবারের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করে নিজেকে স্বাধীন নৃপতি বলে ঘোষণা করলেন। হায়দরাবাদ নগরীকে তিনি নির্ব্বাচিত করলেন তাঁর রাজধানীরূপে। কুতবশাহী বংশের ক্ষমতাবিলোপের পর সুরু হ'ল আশফঝাহী বংশের অধীনে হায়দরাবাদ, তথা দক্ষিণ-ভারতের ইতিহাসের নূতন অধ্যায়।

হায়দরাবাদের বর্ত্তমান রাজপ্রমুখ এই আশফ-ঝ বংশের শেষ নিজাম। হাইকোর্ট, সিটি কলেজ, ওসমানিয়া জেনারেল হাসপাতাল, ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির গঠন-বৈশিষ্ট্য স্থাপত্যশিল্পের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের পরিচায়ক। এঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় দেখবার জন্যে এক দিন ট্যাক্সিযোগে সুধীরবাবু এবং তাঁর পুত্র-কন্যাসহ হায়দরাবাদের উপকণ্ঠস্থ আদিকিমেটের দিকে রওনা হলাম। আন্দাজ আধ ঘণ্টার মধ্যে ট্যাক্সি গিয়ে পৌঁছল নির্দ্দিষ্ট স্থানে। শহরের কোলাহল থেকে দূরে সুবিস্তীর্ণ ফাঁকা জায়গায় অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শাদা রঙের পরিচ্ছন্ন সুবিশাল রাজপ্রাসাদোপম ভবনটি ইন্দো-সারাসেনিক স্থাপত্যরীতির একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। গম্বুজের ঠিক নীচেকার মার্বেলের মেঝে এত মসৃণ যে, গাইড সতর্ক না করে দিলে পা হড়কে পড়ে যেতাম। এই বিদ্যা-নিকেতনের চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রীতিকর পরিবেশ মনকে মুগ্ধ করল। বিশ্ববিদ্যালয়-সংলগ্ন দুটি দোতলা হোষ্টেলে তিন শত ছাত্রের স্থানসঙ্কুলানের ব্যবস্থা আছে। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়-ভবনসমূহের গঠন-কৌশল দাক্ষিণাত্যের স্থাপত্যশিল্পের ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায়ের সংযোজনা করেছে, কেননা এগুলির নির্ম্মিতিতে এক দিকে যেমন হায়দরাবাদের স্থাপত্যগত ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির মর্য্যাদা যথাযথ ভাবে রক্ষিত হয়েছে, অন্য দিকে তেমনি আধুনিক কালের বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাদির প্রতিও লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখস্থিত রাস্তার ওপারের পুষ্পোদ্যানে কিছুক্ষণ বিচরণ করে আমরা মোটরে এসে উঠলাম। বিশ্ববিদ্যালয়-ভবন, ছাত্রদের হোষ্টেল, অধ্যাপকদের বাসগৃহ ইত্যাদি পেছনে ফেলে মোটর ছুটে চলল সেকেন্দ্রাবাদের পথে—শহরের ভেতরে যখন পৌঁছলাম, রাজপথ এবং সৌধমালা তখন বৈদ্যুতিক আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। চলন্ত মোটর থেকে দু'এক নজর দেখে নিয়ে ধারণা হ'ল—হায়দরাবাদের তুলনায় সেকেন্দ্রাবাদ নিম্নস্তরের শহর, এখানকার অট্টালিকাসমূহও তেমন জমকালো নয়। হায়দরাবাদ থেকে ছয় মাইল দূরবর্ত্তী এই শহরটি অতীতে ছিল ভারতের বৃহত্তম সেনানিবাসসমূহের অন্যতম। স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা মুসলমানের তুলনায় ঢের বেশী।

সেকেন্দ্রাবাদ থেকে ফেরবার পথে হোসেন সাগর নামক হ্রদের তীরে মোটর থামিয়ে, উঁচু বাঁধের রেলিঙের পাশে একটি বেঞ্চিতে বসে পড়া গেল। কৃষ্ণপক্ষের আকাশ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। এখন শীতকাল—জল অনেক নীচে। রাত্রির অন্ধকার আর নদীর জল মিশে একাকার হয়ে গেছে—অন্ধকার থেকে পৃথক করে জলের অস্তিত্ব বোঝা কঠিন। হ্রদের বুকে ভাসমান একটি লঞ্চ থেকে

বিচ্ছুরিত হচ্ছে বৈদ্যুতিক আলোকচ্ছটা, ওপারে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত বৈদ্যুতিক আলোকমালার দীপ্ত সমারোহ। তন্ময় হয়ে বসে বহুক্ষণ অন্ধকার আকাশের পটভূমিকায় এই অপরূপ আলোকসজ্জা অবলোকন করলাম, তার পর মোটর ছেড়ে দিলে। আস্তানায় পৌঁছলাম রাত নয়টা নাগাদ।

কব্বুর হইতে গোদাবরীর দৃশ্য

পরদিন সকালবেলা সুধীর বাবুদের ফার্মেসীতে বসে গল্প করছি এমন সময় ট্যাক্সিতে করে এলেন হায়দরাবাদ ষ্টেট কংগ্রেসের সেক্রেটারি বাকের আলি মির্জ্জা সাহেব। আগের দিন তাঁর পত্নী ডক্টর প্রভাবতী দাশগুপ্তার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছিল। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং সেকেন্দ্রাবাদে আমার যাবার ব্যবস্থা তিনিই করে দিয়েছিলেন। হায়দরাবাদ সম্পর্কিত কিছু ছবি এবং পুস্তিকাদি পাওয়া যে আমার একান্ত প্রয়োজন সেকথা প্রমোদ বাবুকে জানিয়েছিলাম। প্রমোদ বাবু মির্জ্জা সাহেবের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করায়ই তিনি এসেছেন। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, ঋজুদীর্ঘদেহ, রূপবান মির্জ্জা সাহেব যেন মুসলিম আভিজাত্য এবং শিষ্টাচারের প্রতীক্। তাঁর সৌজন্য আর আদবকায়দায় মুগ্ধ হলাম। তিনি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন ষ্টেট কংগ্রেসের আপিসে। আসামের আদিবাসী নাগা, মণিপুরী প্রভৃতির মধ্যে পণ্ডিত নেহরুর সফর সম্বন্ধে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা হ'ল। তারপর পাবলিক রিলেশ্যনস এণ্ড ইনফরমেশন আপিসের ডাইরেক্টরের সঙ্গে ফোনে আলাপ করে একজন লোকসহ নিজের মোটরে আমাকে তাঁর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। বলা বাহুল্য, সেখানে গিয়ে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'ল, ছবি এবং পুস্তিকাদি যোগাড় হ'ল বিস্তর।

হায়দরাবাদে এসেছিলাম ১৬ই তারিখে আর আজ ২২শে জানুয়ারী। নূতন পরিবেশে এমনি মশগুল হয়েছিলাম যে, একটা সপ্তাহ যে কি করে কেটে গেল তা টেরই পাই নি। শহরের নব নব বৈচিত্র্যের মোহ তো আছেই, তার উপর সুধীর বাবুদের আদর-যত্ন, ছেলেমেয়েদের প্রীতির ডোর, ফার্মেসীর আড্ডা, এ সকলের আকর্ষণও কম নয়। এ সব ছেড়ে যেতে খুবই কষ্ট হবে। কিন্তু উপায় নেই, 'সময় হয়েছে নিকট এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।'

২২শে তারিখেই সাড়ে চারটের এক্সপ্রেস ট্রেনে কব্বুর যাওয়া-হওয়া সাব্যস্ত করলাম এবং সেকথা জানিয়ে শর্ম্মাজীকে তার করে দিলাম। বিদেশ বিভুঁইয়ে আঁটঘাট বেঁধেই যে ভ্রমণ করা উচিত, সে খেয়াল কোন কালেই ছিল না, কিন্তু এবার ঠেকে শিখেছি। সুধীর বাবু সঙ্গে এসে ট্রেনে উঠিয়ে দিলেন। এই ট্রেন সরাসরি

সংস্কৃত কলেজ, কব্বুর

চলে যাবে বিশাখাপত্তন পর্য্যন্ত—কাজেই বেজওয়াদাতে গাড়ীবদলের হাঙ্গামা আর পোয়াতে হবে না। ট্রেন ছেড়ে দিলে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সৌধমালাশোভিত হায়দরাবাদ নগরীকে এবারের মত একবার শেষ দেখা দেখে নিলাম।

ট্রেন পরদিন বেলা নয়টায় এসে পৌঁছল কব্বুর ষ্টেশনে। নেমেই দেখি ষ্টেশন-প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে আমার তেলুগু বন্ধুরা—সদা-হাস্যময় সর্বেশ্বর ত সর্ব্বঘটে আছেনই। নাগেশ্বর রাও, বিশ্বেশ্বরাইয়া এঁরাও এসেছেন। ঈশ্বরের এই ত্রিমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করবার পর 'ঈশ্বরাসিদ্ধে প্রমাণাভাবাৎ' একথা অন্ততঃ আমার পক্ষে বলা চলে না দেখছি। কব্বুর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ, স্বল্পভাষী কে ভি এন. আপ্পারাও-ও এক পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ স্মিতহাস্যে আমাকে আপ্যায়িত করলেন।

আপ্পারাও আমাকে নিয়ে একটি ট্যাক্সিতে উঠলেন, আর সবাই আরোহণ করলেন কব্বুরের সনাতন গোযান ঝটকায়। প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা গিয়ে পৌঁছলাম মণ্ডেশ্বর শর্ম্মার বাসভবনে। খানিক বিশ্রামের পর শর্ম্মাজীর পুত্র চন্দ্রমূর্ত্তি এসে স্নানের তাগিদ দিলেন। পুণ্যসলিলা গোদাবরী আমার মনকে গভীর ভাবে আকর্ষণ করছিল। ঠিক বোঝাতে পারব না, কিন্তু মাতৃক্রোড়ের জন্য শিশুর যে আকর্ষণ এও যেন কতকটা সেই ধরণের, তাই তোলা জলে স্নান না করে মধ্যাহ্নের খররৌদ্র মাথায় করেই চলে এলাম গোদাবরী-তীরে। সেবা'র ভরা বর্ষায় দেখেছিলাম তরঙ্গবিক্ষুব্ধ গোদাবরীর উদ্দাম রূপ—এবার শীতের শেষে দেখলাম নিস্তরঙ্গ নদীর স্থির অচঞ্চল শান্ত মূর্ত্তি। বর্ষার নদীর জল ছিল ঘোলা—এখন স্বচ্ছ নির্ম্মল নীল

—নদীবক্ষ যেন একখানি অনন্তপ্রসারিত নীল কাচের মত প্রখর রৌদ্রকিরণে ঝক ঝক করছে। "সমনুষ্যমনো যথা"—গোদাবরী সম্বন্ধে মহর্ষি বাল্মীকির এই উপমা মনে পড়ল। যুগযুগান্তর পূর্বে, বর্ষার আবিলতার অবসানে গোদাবরীর যে নীলকান্তমণিসদৃশ নীলকান্তি আদিকবির নয়ন-মনের পরিতৃপ্তিবিধান করেছিল তারই বর্ণনা তিনি করে গেছেন। নদীর নীলিমা আমার নয়নে যেন নীলাঞ্জন মাখিয়ে দিলে।

কব্বুরের নিকটবর্ত্তী ভাদা পল্লীতে কয়েক জন কর্ম্মীসহ স্বামী সীতারাম (বাম দিক হ'তে তৃতীয়)

নদীর শুধু রঙের নয় রূপেরও পরিবর্ত্তন হয়েছে। নদীর বুকের বালুচরের পরিধি হয়েছে বহুগুণে বর্দ্ধিত। এপারে তামাকের ক্ষেতে ফুটে রয়েছে থোকা থোকা তামাটে রঙের ফুল। বাঁধানো ঘাটের পাশে কাছা দিয়ে সাড়ী-পরা ধোপানীরা কাপড় কাচছে, নিকটে বড় বড় ফাঁদালো হাঁড়িতে কাপড় সেদ্ধ হচ্ছে—কতকগুলো মেয়ে সেখানেই সেরে নিচ্ছে মধ্যাহ্নভোজন।

পুণ্যতোয়া গোদাবরীতে অবগাহন-স্নানে পরিতৃপ্ত হয়ে শর্ম্মাসদনে ফিরে এলাম। শর্ম্মাজীর অন্তঃপুরেই ভোজনের ব্যবস্থা হ'ল। চন্দ্রমূর্ত্তি পাশে বসে বাঙালী অতিথির নিকট অন্ধ্রদেশীয় আহার্য্যের পরিচয় দিতে লাগলেন।

অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকায় অন্ধ্র গীর্ব্বাণ বিদ্যাপীঠ-সংশ্লিষ্ট সংস্কৃত কলেজে সভার আয়োজন হ'ল। যথাসময়ে সভাস্থলে গিয়ে পৌঁছলাম। শহরের দক্ষিণ প্রান্তসীমায়, রেল ষ্টেশনের নিকটে গোদাবরী নদীর তীরে শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে প্রায় কুড়ি বিঘা পরিমিত স্থান জুড়ে বিদ্যাপীঠ এবং তৎসম্পৃক্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান অবস্থিত। প্রাচ্যবিদ্যা চর্চ্চার উদ্দেশ্যে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের, ২০শে অক্টোবর বিজয়া দশমী দিবসে পরলোকগত টাল্লাপ্রাগাড়া সূর্য্যনারায়ণ রাও কর্ত্তৃক অন্ধ্র গীর্ব্বাণ বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি একটি আবাসিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর প্রাচ্য-বিদ্যার কলেজ রূপে এটি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে।

সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার মূলে রয়েছে এক বিদ্যোৎসাহিনী, বিত্তবতী দানশীলা, অন্ধ্র মহিলার বিপুল দান—নাম তাঁর ভদ্রেয়ু যোগাইয়াম্মা। এই কলেজে বেদবেদান্ত থেকে সুরু করে যাবতীয় সংস্কৃতশাস্ত্র এবং কাব্য নাটক অলঙ্কারশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন-অধ্যাপনার জন্য যোগাইয়াম্মা ২০,০০০৲ টাকার এক ট্রাষ্ট ফণ্ড সৃষ্টি করে কয়েক জন ট্রাষ্টি নিযুক্ত করেন। এই মহীয়সী মহিলার নামানুসারেই উক্ত কলেজের নামকরণ করা হয়েছে। সংস্কৃতবিদ্যার প্রতি এরূপ অনুরাগের দৃষ্টান্ত আমাদের দেশের মহিলা-সমাজে দ্বিতীয়টি আছে কিনা সন্দেহ।

এই সংস্কৃত কলেজের অন্ত্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রকে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক কনভোকেশনের সময় ভাষাপ্রবীণ উপাধি দেওয়া হয়। আমার বিশিষ্ট তেলুগু বন্ধু শ্রীকে. ভি. এন. আপ্পারাও, এম-এ, এই কলেজের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ।

যথাসময়ে সভা আরম্ভ হ'ল। সভাপতির আসনে বৃত হলেন আপ্পারাও মহাশয়। সর্ব্বেশ্বর শর্ম্মা প্রভৃতি বক্তৃতা করলেন। আমাকে বলতে অনুরোধ করলে, আমি প্রাচীন বাংলায় সংস্কৃতের চর্চ্চা, বাঙালীর নব্যন্যায়, ইত্যাদি সম্বন্ধে দু'চার কথায় আমার বক্তব্য শেষ করলাম। রাত আটটা নাগাদ আস্তানায় ফিরে আসা গেল।

রাত্রে শয়নের ব্যবস্থা হ'ল শর্ম্মাজীর বহির্বাটীর একটি কক্ষে। রাজপথের ঠিক পাশেই ঘরটি অবস্থিত। সুমুখের মানুষ-প্রমাণ উঁচু লোহার গরাদে দেওয়া জানালা খুললে প্রশস্ত রাজপথ এবং খোলা আকাশের অনেকখানি চোখে পড়ে।

মাঝরাতে বাদ্যভাণ্ডের আওয়াজে ঘুম ভেঙে যায়। সদ্য ঘুম-ভাঙা চোখে খোলা জানালার সামনে এসে দাঁড়াই। নির্ম্মেঘ নীল আকাশে শুক্লপক্ষের খণ্ড চাঁদ—আকাশ থেকে যেন ধরণীর বুকে নেমেছে রূপালি আলোর বন্যা। মিষ্টি বাজনার আওয়াজ রচনা করেছে সুরের ইন্দ্রজাল, আর আলোকস্নাত রাজপথের উপর দিয়ে চলেছে সুবেশা, সালঙ্কারা সুন্দরী পুরনারীদের এক শোভাযাত্রা। মস্তক তাদের অনবগুণ্ঠিত, নিতম্বলম্বিত দীর্ঘ বেণীতে জড়ানো পুষ্প-মাল্য—তাদের গৌর তনুর লাবণ্য, সাড়ীর বর্ণবৈচিত্র্য, স্বর্ণালঙ্কারের ঔজ্জ্বল্য চোখের সামনে যেন মায়াজাল বিস্তার করে। মেয়েদের পেছনে ময়ূরপঙ্খী নৌকার মত আকৃতিবিশিষ্ট, ঝলমলে রঙীন বস্ত্রের আচ্ছাদনযুক্ত, মনুষ্যবাহিত ডুলিতে বরবেশে সজ্জিত এক রূপবান তরুণ। শোভাযাত্রার পুরোভাগে এবং পশ্চাতে বৈদ্যুতিক আলোকের দীপাধার।

আধ-ঘুমে আধ-জাগরণে কেমন যেন সম্মোহিতের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই শোভন শোভাযাত্রার সমারোহ অবলোকন করতে থাকি—আমার সৌন্দর্য্যপিয়াসী মনের একটা রঙীন স্বপ্ন যেন রূপ পরিগ্রহ করে নিষুপ্ত নিশীথ-নগরীর বুকের উপর রহস্যঘন পরিবেশের সৃষ্টি করেছে।

ধীরে ধীরে রাজপথের একটা বাঁকে শোভাযাত্রা অদৃশ্য হয়ে যায়,

স্বপ্নের ঘোর কিন্তু কাটে না—মিষ্টি বাজনার রেশ যেন কানে লেগে থাকে।

পর দিন ২৪শে মে সকালবেলা শহরের নিকটবর্ত্তী ভাদা পল্লী বলে একটি গ্রাম থেকে বেরিয়ে আসা গেল। অন্ধ্র প্রদেশ গঠন সম্পর্কে সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনার সময় স্বামী সীতারাম এখানে জনগণের নিকট থেকে যথেষ্ট সাড়া পেয়েছিলেন। সেদিন বিকেলে বীরমন্দিরে আর একটি সভা হ'ল।

রাজমহেন্দ্রী হইতে গোদাবরীর একটি দৃশ্য

২৫শে মে সকালে আন্দাজ আটটার সময় রাজমহেন্দ্রী গবর্ণমেণ্ট আর্টস কলেজের দু'জন ছাত্র উক্ত কলেজের অন্যতম অধ্যাপক এবং মেটকাফ হোষ্টেলের ডেপুটি ওয়ার্ডেন পি. ভেঙ্কটরামিয়ার এক পত্রসহ এসে হাজির। অধ্যাপক মশায় চিঠিতে আমাকে জানিয়েছেন যে, আজ সন্ধ্যার পরে রাজমহেন্দ্রী গবর্ণমেণ্ট আর্টস কলেজে অন্ধ্র অভ্যুদয় দিবস উদযাপিত হবে—এই উপলক্ষে কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং ছাত্রেরা আমাকে সংবর্দ্ধিত করতে চান এবং তাঁরা আমার নিকট থেকে বাংলা ও অন্ধ্রের সম্পর্ক সম্বন্ধে ভাষণ শুনতে ইচ্ছুক।

অধ্যাপক মশায়ের চিঠিতে আন্তরিকতার ভাবটি মনকে মুগ্ধ করল। তাই অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করলেও তাঁর সাদর আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে পারলাম না।

ছেলেরা চলে গেলে পর ঘরের দরজা বন্ধ করে ভাষণ রচনায় ব্যাপৃত হলাম। ঘণ্টা দুই পরে শর্ম্মাজী এসে স্নানাহারের জন্যে তাগিদ দিলেন। কিন্তু লেখা তখনো শেষ হয় নি। কাজেই স্নান-পর্ব্ব বাদ দিতে হ'ল। কোনমতে নাকে-মুখে চারটি গুঁজে আবার লিখতে বসলাম। বেলা তিনটে নাগাদ লেখা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় রাজমহেন্দ্রীর ছাত্র দুটি এসে হাজির—এখখুনি ষ্টীমার ঘাটে গিয়ে ষ্টীমলঞ্চে চাপতে হবে।

ছাত্র দু'জন আমাকে এবং সর্ব্বেশ্বর শর্ম্মাকে নিয়ে ষ্টীমার ঘাটের উদ্দেশে রওনা হ'ল। যথাস্থানে পৌঁছে শোনা গেল কি কারণে লঞ্চ আসতে ঘণ্টা দুই দেরি হবে। উঁচু পাড়ের উপর বসে গোদাবরীর শোভা দেখতে লাগলাম। নদীর বুকে পাড়ি জমিয়েছে অনেকগুলি সাদা পালতোলা নৌকা। এত দূরের থেকে তাদের দেখাচ্ছে খুব ছোট, নীল জলের উপর অপূর্ব্ব শোভার সৃষ্টি হয়েছে। ঘাটে বাঁধা একটি নৌকা থেকে কয়েকজন লোক মাথায় করে খড়ের বোঝা তুলে গরুর গাড়ীতে চাপিয়ে দিচ্ছে। তালপাতায় ছাওয়া ষ্টীমার আপিসের ঘরের পাশে অশ্বত্থ-গাছে হেলান দেওয়া, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান একটি বংশীধারী গোপালের মূর্ত্তি—মূর্ত্তিটি প্রাচীন, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গে সদ্য সবুজ এবং

গোদাবরী-বক্ষে সাঁকোর নীচে নৌকাবিহার

লাল রঙের প্রলেপ দেওয়া। অনতিদূরে একটি গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে আনমনে বসে আছে, রুক্ষকেশী কুচকালো, কজ্জল-নয়না, ঘননীলবসনা একটি তরুণী ঠিক যেন পটে আঁকা ছবিটি।

বেলা পাঁচটা নাগাদ ষ্টীমলঞ্চ ঘাটে এসে পৌঁছলো। আমরা চার জন তাতে গিয়ে আরোহণ করলাম। লঞ্চ ঘণ্টাখানেকের মধ্যে, গোদাবরী ব্রিজ অতিক্রম করে ওপারে গিয়ে পৌঁছল, একটা ট্যাক্সিতে করে বিশ-পঁচিশ মিনিটের মধ্যেই আর্টস কলেজে গিয়ে পৌঁছলাম।

মেটকাফ হোষ্টেল সংলগ্ন বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে সামিয়ানা খাটিয়ে সভার আয়োজন হয়েছে—বৈদ্যুতিক আলোকের ছটা চোখ ঝলসে দেয়। বিপুল জনসমাগম হয়েছে, মেয়েদের সংখ্যাও কম নয়—সভাস্থলে একেবারে ন স্থানং তিল ধারণং। সভাপতির আসনে বৃত হলেন শ্রী কে. রামভদ্রাও। সভায় অন্ধ্রের অনেক বিখ্যাত গুণী জ্ঞানী কবি সাহিত্যিক এবং নাট্যকারের সমাগম হয়েছিল। কলেজের উপাধ্যক্ষ মহাশয় মঞ্চের উপর আসীন বিশিষ্ট অভ্যাগতদের পরিচয় প্রদান করলে পর জনৈক ছাত্র মেটকাফ ষ্টুডেন্টস ইউনিয়নের তরফ থেকে আমাকে প্রদত্ত এক অভিনন্দন-পত্র পাঠ করলেন। তাতে আমার ব্যক্তিগত প্রশংসা শুনে লজ্জিত হলাম, কিন্তু বাংলার মনীষী এবং দেশপ্রেমিকদের প্রতি উচ্ছ্বসিত শ্রদ্ধা নিবেদন শুনে গর্ব্বে আমার বুক ফুলে উঠল। মানপত্রের উত্তরে মুখে দু'চারটি কথা বলে আমি আমার লিখিত সুদীর্ঘ ভাষণ পাঠ করলাম, শ্রোতারা ধৈর্য্য সহকারে শুনলেন।

আমার ভাষণ পাঠের পর আরও কতকগুলি বক্তৃতা হয়—বেশীর ভাগই অন্ধ্রের জাতীয় গৌরব সম্বন্ধে। তেলুগু কাব্য-সাহিত্য এবং নাট্য সাহিত্য সম্বন্ধে দু'জন সুধী ব্যক্তি বক্তৃতা করেন।

'ঘ না' নামে একটি তেলুগু নাট্যাভিনয়ের পর অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হলে, 'ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস' এবং "মেল" কাগজের দু'জন রিপোর্টার এসে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁরা আমার ভাষণের সারাংশ অনুলিখন করেছিলেন—তা আমাকে দেখিয়ে যথাযথ অনুলিখিত হয়েছে কিনা সে বিষয় নিঃসংশয় হবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তনুধ্র দেশের খবরের কাগজের রিপোর্টারদের প্রশংসা শ্রদ্ধেয় রামানন্দ বাবুর একটি লেখায় পড়েছিলাম। এঁদের কাজের নিষ্ঠা দেখলে বাস্তবিকই তারিফ করতে হয়।

ছাত্ররা হোষ্টেলে আমার এবং বন্ধু সর্ব্বেশ্বরের আহারের আয়োজন করেছিলেন। ভোজনপর্ব্ব সম্পন্ন হলে পর, তাঁরা আমাদের কব্বুরগামী ট্রেনে উঠিয়ে দিলেন। মুগ্ধ হলাম এঁদের বিনয়নম্র আচরণে।

গোদাবরী ব্রিজের উপর দিয়ে ট্রেন চলতে লাগল কব্বুরের দিকে—জ্যোৎস্নার প্লাবনে চরাচর ভেসে যাচ্ছে—শুভ্র বসনে যেন ঢাকা পড়েছে গোদাবরীর নীল কলেবর। জ্যোৎস্না বিধৌত নদী এবং তার তালীবনশোভিত তটভূমির কি অপূর্ব্ব রূপই না ফুটে উঠেছে। সুদূর অতীতে এখানকার রূপলোকে ঋষি গৌতম কোন্ অরূপ রতনের সন্ধান করেছিলেন?

চার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সাঁকো অতিক্রম করে ট্রেন এসে থামল কব্বুর ষ্টেশনে। রাত গভীর। যানবাহন চলাচল বন্ধ। জ্যোৎস্নালোকিত রাজপথ দিয়ে পায়ে হেঁটে আমরা দু'জনে সংস্কৃত কলেজে এসে পৌঁছলাম। দু'নম্বর শর্ম্মাজীর আবাসেই আমার রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা হ'ল।

বড় ভাল লাগে সর্ব্বেশ্বর শর্ম্মাকে। দারিদ্র্যব্রতধারী, ভাবে-ভোলা আদর্শবাদী লোক—স্বপ্ন দেখতে জানেন। সে রাত্রে, তাঁর কুটীরের জ্যোৎস্না ঢালা দাওয়ায় বসে কত কথা হ'ল—ভবিষ্যতের কত পরিকল্পনা, কত আশা আকাঙ্ক্ষা, কত রঙীন স্বপ্নের কথা। কল্পনা কি কর্ম্মে রূপায়িত হবে না? জ্যোৎস্নারাতের আশাদীপ্ত মধুর স্বপ্ন দিনের আলোয় বাস্তবের সংস্পর্শে শূন্যেই বিলীন হয়ে যাবে!*

* এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত কব্বুর ও রাজমহেন্দ্রীর ছবিগুলি শ্রী কে, ভি এন, আপ্পারাও এম-এ'র সৌজন্যে প্রাপ্ত।

সন্ধ্যাতারা

শ্রীকরুণাময় বসু

কালের সমুদ্রতীরে অন্যমনে আমি ছিনু একা,
উতলা সন্ধ্যার বায়ু, অকস্মাৎ তুমি দিলে দেখা
সুদূর দিগন্তশীর্ষে, হাতে ছিল সোনার প্রদীপ,
নীলাম্বরী শাড়ীপরা, ললাটেতে মেঘ রাঙা টিপ।
মুগ্ধ চোখে চেয়েছিনু, ছায়াপথে তুমি যেতে যেতে
অনেক কালের বাণী বলে গেলে নিঃশব্দ সঙ্কেতে
পরিপূর্ণ অর্থ তার অন্ধকার সমুদ্রের মাঝে
আলোক স্তম্ভের মতো চিরকাল আপনি বিরাজে।
আমাদের পথ কোথা? হালভাঙা মনের জাহাজ
কতো দূর চলে গেছে, বন্দরের চিহ্ন নাই আজ।
উদ্‌ভ্রান্ত উন্মার্গগামী লক্ষ্যহীন জীবনের শেষে
তারে কি ফিরিয়া পাবো যার খোজে ফিরি দেশে দেশে।
সন্ধ্যার বাতাস বয়, টলোমল সমুদ্রের জল,
জীবন-জিজ্ঞাসা মোর শুধাইছে, কোথা পাবি বল—
মনের মানুষ তোর? ঘনাইছে নির্জ্জন গোধূলি,
হঠাৎ দেখিনু তুমি প্রসারিলে নিঃশব্দ অঙ্গুলি।
আত্মার অন্তর হতে জ্যোতির্ময় পুরুষ একাকী
দাঁড়াল সম্মুখে মোর স্থিরদৃষ্টি ঊর্দ্ধপানে রাখি।

'নব নব বৈশাখে কবিমানস

শ্রীগোপাললাল দে

কবিগুরু 'রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন বাংলা ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে, সোমবার, ইংরেজী ১৮৬১ সালের ৭ই মে তারিখে। রসস্রষ্টা কবির, দার্শনিক কবির জগদ্ব্যাপী খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে এই বৈশাখ সুখময়, পুণ্যময় এবং অবিস্মরণীয় হইয়া উঠিয়াছে। সুদীর্ঘ জীবনের বহু বৈশাখে নববর্ষে জীবনপথ-পরিক্রমায় ক্রমবিকাশের নব দেহলীতে কবি কি প্রকার অনুভব করিয়াছেন, কি বলিয়াছেন, জানিতে ঔৎসুক্য হয়। কবির হৃদয়বীণার তারে বারে বারে কি সুর বাজিয়াছে, শুনিতে বাসনা জাগে। বস্তুতঃ মানসীতে কবি-প্রতিভার স্বকীয়ত্ব বিকাশের সূচনা, তাই বর্ত্তমান আলোচনায় প্রথমে আমরা মানসীর দিকে দৃষ্টিপাত করিব। চারু বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন, 'মানসীতে রবীন্দ্র-প্রতিভা আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে।' রবীন্দ্রনাথের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী এইখান হইতেই পাওয়া যাইবে।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের বৈশাখ, বাংলা ১২৯৫ সাল—কবি মানসী কাব্যগ্রন্থের 'ভুলে' শীর্ষক কবিতায় অনুভব করিতেছেন, তাঁহাকে এই ধরণী একদা আমন্ত্রণ করিয়াছিল, তাহারই ফলে কবির আগমন ; কিন্তু মনে হয়, ধরণী সে কথা ভুলিয়া গিয়াছে।

কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া,
এসেছি ভুলে।
তবু একবার চাও মুখ পানে,
নয়ন তুলে।

কুণ্ঠিত কবির সন্দেহ হয়, কবির কথা আজিকার সকলে ভুলিয়া গিয়াছে, তবুও তিনি আসিয়াছেন, তাহা ভুলেরই ফলে ;

তুমি যে ভুলেছ ভুলে গেছি, তাই
এসেছি ভুলে।

ক্ষুব্ধ কবি অনুযোগ করিয়া বলিতেছেন,

কাননের ফুল এরা তো ভোলে নি,
আমরা ভুলি ?
সেই তো ফুটেছে পাতায় পাতায়
কামিনীগুলি।
চাঁপা কোথা হতে এনেছে ধরিয়া
অরুণ কিরণ কোমল করিয়া
বকুল ঝরিয়া মরিবারে চায়
কাহার কুলে।

তাই তো বিশ্বাসী কবির মনে একটু আশা জাগিয়া আছে, তিনি বলিতেছেন,

কেহ ভোলে, কেউ ভোলে না যে, তাই
এসেছি ভুলে।

এই বৈশাখেই 'ভুলভাঙা' কবিতায় কবি অনুভব করিতেছেন,

বুঝেছি আমার নিশার স্বপন
হয়েছে ভোর।
মালা ছিল, তার ফুলগুলি গেছে
রয়েছে ডোর।

কবির মনে জাগিতেছে একটা উদাস নৈরাশ্যের ভাব। তিনি এখন মনে ভাবেন,

বসন্ত নাহি এ ধরায় আর আগের মতো,
জ্যোৎস্না যামিনী যৌবন হারা জীবন হত।

অতিশয় নির্ব্বেদে কবি বলিতেছেন,

বাঁশি বেজেছিল, ধরা দিনু যেই থামিল বাঁশি।
এখন কেবল চরণে শিকল কঠিন ফাঁসি।
মধুনিশা গেছে, স্মৃতি তারি আজ,
মর্ম্মে মর্ম্মে হানিতেছে লাজ,
সুখ গেছে আছে সুখের ছলনা হৃদয়ে তোর ;
প্রেম গেছে, শুধু আছে প্রাণপণ মিছে আদর।

সেইবার নববর্ষে, দেশ ও কালের এক পরিচ্ছিন্ন সংকীর্ণ সীমায়, একাকিত্বের বেদনার মধ্যে যেন জীবনের অপূর্ণতা অর্থহীনতা অনুভব করিয়া কবি-চিত্ত বেদনায় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। কবি ভালবাসেন কিন্তু প্রতিদান পান না ; কীট্‌সের মত স্পর্শকাতর কবির বেদনা তাই খেদোক্তিতে রূপায়িত হইয়াছে। তখন কবির বয়স মাত্র সাতাশ বৎসর।

পর বৎসর ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের, বাংলা ১২৯৬ সালের বৈশাখে কবির চিত্তে বহুবার প্রবেশ লাভ করিতে পারি। এই বৈশাখে কবিমানসের অনেকখানি অগ্রগতি দেখা যায়। তখন তিনি ছিলেন গাজীপুরে। ১২ই বৈশাখ 'শূন্যগৃহে' কবিতায় তিনি অনুভব করিতেছেন—'মানুষের মনে এমন প্রেম আশা সুখদুঃখময় বিচিত্রতা আছে, কিন্তু প্রেমময় সুখদুঃখবিধাতা কি কেহ নাই যিনি মানুষের সঙ্গে সঙ্গে তাহার জীবনের ভাব অনুভব করেন ? জগতের কেন্দ্রে তাহার বিধাতা কি কেবল নিয়মমাত্র, তাহার প্রাণে হৃদয় স্নেহমমতা বা দয়া বলিয়া কি কিছু নাই ?' (রবি-রশ্মি, ১ম ভাগ)

অভিমানের বেদনা এখন দূর হইয়া গিয়াছে, কবি আর পূর্ব্বের মত আত্মকেন্দ্রিক নহেন, তিনি দরদী হৃদয় দিয়া মানব সাধারণের প্রতি সহানুভূতি অনুভব করিতেছেন :

কে তুমি দিয়েছ স্নেহ মানব হৃদয়ে, কে তুমি দিয়েছ প্রিয়জন।
বিরহের অন্ধকারে কে তুমি কাঁদাও তারে
তুমিও কেন গো সাথে করো না ক্রন্দন।

১৪ই বৈশাখ 'জীবন মধ্যাহ্ন' কবিতায় কবি নিজ প্রশ্নের উত্তর পাইয়াছেন। তিনি অনুভব করিয়াছেন, 'একজন নিখিল নির্ভর অনন্ত এই দেশকালকে আচ্ছন্ন করিয়া বিদ্যমান আছেন, তিনি অপ্রকাশ হইলেও চির স্বপ্রকাশ।' তাঁহার সর্ব্বব্যাপী আনন্দ কবি অনুভব করিতেছেন :

'জগতের মর্ম্ম হতে মোর মর্ম্মস্থলে, আনিতেছে আনন্দলহরী।'

কবির মনে এখনই জাগিয়া উঠিয়াছে 'বিশ্ববোধ', 'সর্ব্বানুভূতি'

'শুধু জেগে উঠে প্রেম মঙ্গল মধুর, বেড়ে যায় জীবনের গতি
ধূলি ধৌত দুঃখ শোক শুভ্র শান্ত বেশে, ধরে যেন আনন্দ মূরতি।'

'এই বিশ্ববোধ, সর্ব্বানুভূতি, নিখিলব্যাপ্তি এবং সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় আনন্দানুভব হইতেছে রবীন্দ্রনাথের কবি জীবনের মূল কথা।' (র. র. ১ম.)

তাই ১৩ই বৈশাখ 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি' কবিতায় আটাশ বৎসর বয়স্ক যে কবি বলিয়াছেন, 'মনে হয় সৃষ্টি বুঝি বাঁধা নাই নিয়ম নিগড়ে', 'মোরা শুধু খড়কুটা, স্রোতমুখে চলিয়াছি ছুটি'—মাত্র দুই দিন পরে (১৫ই বৈশাখ) তিনিই 'প্রকৃতির প্রতি' কবিতায় বলিয়াছেন,

'যত অন্ত নাহি পাই তত জাগে মনে মহারূপ রাশি
তত বেড়ে যায় প্রেম যত পাই ব্যথা যত কাঁদি হাসি।
যত তুই দূরে যাস, তত প্রাণে লাগে ফাঁস,
যত তোরে নাহি বুঝি, তত ভালবাসি।'

২১শে বৈশাখ কবি লিখিয়াছেন, 'একাল ও সেকাল' কবিতা। আসন্ন বর্ষার বৈশাখী সূচনায় কবি অনুভব করিয়াছেন—কাল কেবল সংকীর্ণ বর্তমান দ্বারাই সীমায়িত ও পরিচ্ছিন্ন নয়, তাহার সহিত সংলগ্ন আছে এক বিরাট ঐতিহ্যময় অতীত এবং বিপুল এক অসীম সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যৎ।

বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী।
গাঢ়ছায়া সারাদিন, মধ্যাহ্ন তপনহীন,
দেখায় শ্যামলতর শ্যাম বনশ্রেণী।
আজিকে এমন দিনে পড়ে শুধু মনে
সেই দিবা অভিসার, পাগলিনী রাধিকার,
না জানি সে কবেকার দূর বৃন্দাবনে।

কিন্তু সেই অনুভূতি তো আজও রহিয়াছে,

আজো আছে বৃন্দাবন মানবের মনে।
শরতের পূর্ণিমায়, শ্রাবণের বরিষায়।
উঠে বিরহের গাথা বনে উপবনে।

এখন দেখি কবির চিত্ত দেশেকালে মানবে বিস্তৃততর ক্ষেত্রে আপনাকে অনুভব করিতেছে, তাই ২২শে বৈশাখ কবি 'কুহুধ্বনি' কবিতায় লিখিতেছেন,

নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে তাই, অতীতের মাঝে ধাই
শুনিয়া আকুল কুহুরব
বিশাল মানব প্রাণ মোর মাঝে বর্তমান
দেশ কাল করি' অভিভব।

এই নববর্ষে নূতন জন্মদিনে পদার্পণ করিবার প্রাক্কালে কবি দেশকালে ব্যক্তিত্বের সীমা অতিক্রম করিয়া ভূমানন্দের আস্বাদ লাভ করিয়াছেন। ইহার পর প্রথম বৈশাখে, নববর্ষে কবিকে দেখিতেছি 'চিত্রা'র বাসে। চৌত্রিশ বৎসর বয়স্ক কবি (১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ)। ১৩০১ সালে ৫ই বৈশাখ 'মৃত্যুর পরে' কবিতায় জীবনকে মৃত্যুর ভিতর দিয়া বুঝিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছেন। কল্পনা, অনুভূতি এবং সজ্ঞার (intuition) অপূর্ব্ব প্রকাশ এই কবিতাটি।

আজিকে হয়েছে শান্তি, জীবনের ভুল ভ্রান্তি
সব গেছে চুকে।
রাত্রিদিন ধুক ধুক তরঙ্গিত দুঃখ সুখ
থামিয়াছে বুকে।
যত কিছু ভালোমন্দ, যত কিছু দ্বিধা দ্বন্দ্ব
কিছু আর নাই।
বলো শান্তি বলো শান্তি দেহ সাথে সব ক্লান্তি
হয়ে যাক ছাই।

কবি অনুভব করিতেছেন, 'জীবন ও মৃত্যু একই প্রাণশক্তির দুইটি অবস্থা, দুইটি সংস্থিতি। মৃত্যু আসিলে জীবন সুস্পষ্ট হয়, মৃত্যুই জীবনকে সপ্রমাণ করে। মৃত্যুই জীবনকে ক্রমাগত প্রকাশ করে।' (র. র. ১ম।) তাই মৃত্যুর চেয়ে বড় সত্য জীবন। পঞ্চভূতে কবি বলিয়াছেন, "দেহটা বর্তমানেই সমাপ্ত, জীবনটা একটা চঞ্চল অসমাপ্তি—তাহার সঙ্গে লাগিয়া আছে, তাহাকে বৃহৎ ভবিষ্যতের দিকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে।'

'মানসী'তে যে অনাগত অনন্তকালের ইঙ্গিত কতকটা অস্পষ্ট ছিল, চিত্রার কালে তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

১৩০৪ সালের (১৮৯৭) ১৫ই বৈশাখ কবি লিখিয়াছেন 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা 'দুঃসময়'। এই বৈশাখে

কবিজীবনের যেন একটা পট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কবিতায় তাহারই চিহ্ন আছে।

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ-মন্থরে
সব সঙ্গীত ইঙ্গিতে গেছে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে
দিগ্-দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা—
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি অন্ধ বন্ধ করো না পাখা।

'বিগত জীবনের স্মৃতিতে কবি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া নূতন জীবনযাত্রায় পক্ষ বিস্তার করিতে যাইতেছেন। কবি জীবনের এমন এক অবস্থার দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, যাহার পূর্ণ পরিচয় তিনি অবগত নহেন; কিন্তু ফেলিয়া আসা ঐশ্বর্য্যের দিকে চাহিয়াও তিনি আর পরিতৃপ্তি পাইতেছেন না।' (অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী)

এই নূতন পথ কি? কবি এতদিন অনুভূতি, অনুরাগ ও ভাবাবেগের মধ্য দিয়া জীবন এবং জগৎ ব্যাপারকে গ্রহণ করিতেছিলেন, এখন দীপ্তবুদ্ধি, বিচারের মধ্য দিয়া তাহাদিগকে উপলব্ধি করিতে চাহেন, যাহার ফলে কর্ম্মসাধনার মধ্য দিয়া বিরাট পরিপ্রেক্ষিতে জীবন ও জগতের সম্যক্ সাযুজ্য-লাভ সম্ভব হইতে পারে। কবির বয়স তখন সাঁইত্রিশ বৎসর।

এই বৈশাখে কবি লিখিয়াছেন 'চৌর পঞ্চাশিকা' এবং 'বর্ষামঙ্গল'। চোর, সে মনোচোর, চিত্তচোর, সে সুন্দর, অনন্ত দেশকালের পটভূমিকায় 'শুধু এক নাম এক সুরে গায়', সে বিদ্যার নাম।

তবু সুন্দর চোর,
মৃত্যু হারায়ে কেঁদে কেঁদে ঘুরে
পঞ্চাশ শ্লোক তোর।
পঞ্চাশ বার ফিরিয়া ফিরিয়া
বিদ্যার নাম ঘিরিয়া ঘিরিয়া
তীব্র ব্যথায় মর্ম্ম চিরিয়া
ওগো সুন্দর চোর,
যুগে যুগে তারা কাঁদিয়া মরিছে
মূঢ় আবেগে তোর।

'বর্ষামঙ্গল' কবির শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির অন্যতম। কবির অন্তরে:

শতেক যুগের কবিদল মিলি' আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্ত মদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা,
শত শত গীত-মুখরিত বন বীথিকা।

চিরন্তনকালের কবি 'বর্ষামঙ্গলের' কবির চিত্ত দিয়া আর একবার বর্ষা সম্ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা দুই বার দেখিলাম বর্ষা-প্রেমিক কবি বৈশাখেই বর্ষাকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া স্বাগত জানাইয়াছেন।

১৩০৬ সালের (১৮৯৯) বৈশাখে কবি লিখিয়াছেন 'বৈশাখ' কবিতা, সেই কবিতায় কল্পনামধুর রসানুভূতির জীবন হইতে কবি বিদায় লইতেছেন কঠিন কঠোর কর্ম্মময় জীবনের দিকে।

তাহার পরের অবস্থায় কবিকে দেখি 'গীতাঞ্জলি'তে চরম জ্ঞান পরম সত্যোপলব্ধির সাধনায়। বৈশাখে অনুভূতির দিক দিয়া কবি বড় কম লাভবান হন নাই। 'বিশ্ব যখন নিদ্রামগন, গগন অন্ধকার' তখন কবির বীণার তারে কেহ এমন ঝঙ্কার দেয় যাহাতে তাঁহার নয়নের ঘুম চলিয়া যায়। আবার এক দিন তিনি অনুভব করেন সেই পরম বাঞ্ছিত পাশে আসিয়া বসিয়াছিল, কিন্তু হায় সেইক্ষণে কবি জাগিতে পারেন নাই। তাহার ছোঁওয়া কিন্তু তিনি পাইয়াছেন।

সেই বহুপ্রত্যাশিত কর্ম্মসাধনার আহ্বান কবি নিঃসংশয়িত-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন বলাকার যুগে। বলাকার কবিতাগুলি ১৩২১ (১৯১৪) হইতে ১৩২৩ (১৯১৬) সালের মধ্যে লেখা। ইউরোপে তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঘনঘটা। 'ওরে নবীন ওরে আমার কাঁচা' (১৫ই বৈশাখ, ১৩২১) কবিতায় বলাকা আরম্ভ, 'পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি, ওই কেটে গেল, ওরে যাত্রী' কবিতায় 'বলাকা' শেষ। প্রথমটিতে চিরজীবী চিরযুবাকে আপদ আঘাত অগ্রাহ্য করিয়া, অগ্রগতির নব-সৃষ্টির পথে কবি আহ্বান করিয়াছেন, শেষেরটিতে সেই দুর্গম পথের যাত্রীকে কবি বলিয়াছেন:

মৃত্যু তোরে দিবে হানা
দ্বারে দ্বারে পাবি মানা
এই তোর নব বৎসরের আশীর্ব্বাদ,
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।

নোবেল পুরস্কার কবি 'বলাকা' প্রকাশের আগেই (১৯১৩) লাভ করিয়াছিলেন। একই কালে কবি 'গীতি-মাল্যে'র গানগুলি রচনা করেন। কবির উপলব্ধি স্বতঃস্ফূর্ত্ত-ভাবে এইগুলিতে রূপায়িত হইয়াছে। এক শেষ বৈশাখের দিনে (৩১শে বৈশাখ ১৩২১) সুন্দরের স্পর্শ কবি সত্যই লাভ করিয়াছেন।

'এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর।'

শেষ চরণে কবি বলিয়াছেন, 'এই জীবনে ঘটালে মোর জন্মজন্মান্তর'। সাধক কবির এইখানে আসিয়া লব্ধ হইল এই জীবনেই নব জন্মলাভের অনুভূতি। এই অধ্যাত্ম-অনুভূতি তাঁহাকে সত্যদ্রষ্টা ঋষির আসনে প্রতিষ্ঠিত করিল।

তাহার পর কবির কালজয়ী প্রতিভার খ্যাতি দেশ-দেশান্তরে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। যুদ্ধবিধ্বস্ত পাশ্চাত্যের নরনারী ভারতের ঋষিকবির বাণী শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ইহার পর থেকে ভক্তের দৃষ্টিকোণ হইতে নিজেকে না দেখা কবির পক্ষে সম্ভব ছিল না। এতদিন পর্য্যন্ত ২৫শে বৈশাখ সম্পর্কে কবির কোন কবিতা পাই নাই। এখন হইতে বার বার তাহা পাওয়া যাইতেছে। বার বার দেখা যায়, কবি জীবনের যেন একটা হিসাব-নিকাশ একটা মূল্য নির্দ্ধারণে বসিয়াছেন। কখনও বা জন্মদিবসকে দিয়াছেন নিজ প্রীতিরসসিক্ত কৃতজ্ঞতা। তাঁর জন্মদিনে,—'২৫শে বৈশাখ' কবিতায় লিখিতেছেন :

আর সে একান্ত আসে
মোর পাশে
পীত উত্তরীয় তলে লয়ে মোর প্রাণ দেবতার
স্বহস্তে সজ্জিত উপহার—
নীলকান্ত আকাশের থালা,
তারি পরে ভুবনের উচ্ছলিত সুধার পেয়ালা।

১৩৪২ সালে প্রকাশিত 'শেষ সপ্তকে'র গদ্যছন্দে লেখা তেতাল্লিশসংখ্যক কবিতায় দার্শনিক দৃষ্টিতে কবি জীবনকে দেখিতেছেন :

'পঁচিশে বৈশাখ চলেছে
জন্মদিনের ধারাকে বহন করে'
মৃত্যু দিনের দিকে।
সেই চলতি আসনের উপরে বসে'
কোন্ কারিগর গাঁথছে
ছোট ছোট জন্মমৃত্যুর সীমানায়
নানা রবীন্দ্রনাথের একখানা মালা।'

১৩৪৫-এর (১৯৩৮) ২৫শে বৈশাখ কবি 'উদ্বোধন' কবিতায় লিখিতেছেন :

প্রথম যুগের উদয় দিগঙ্গনে
প্রথম দিনের উষা নেমে এল যবে
প্রকাশ পিয়াসী ধরিত্রী বনে বনে
শুধায়ে ফিরিল সুর খুঁজে পাবে কবে।
এসো এসো সেই নব সৃষ্টির কবি,
নব জাগরণ যুগ প্রভাতের রবি।

ধরিত্রীর আহ্বানে 'যে জাগায় চোখে নূতন দেখার দেখা' সেই জাগার গান রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে এযুগে আবার ধ্বনিত হইয়া উঠিল, তাই :

জাগে সুন্দর, জাগে নির্ম্মল, জাগে আনন্দময়ী—
জাগে জড়ত্ব জয়ী।

কবির বয়স তখন আটাত্তর বৎসর। 'মানসী'তে এই আহ্বানের আভাস 'ভুলে' কবিতায় পাওয়া গিয়াছিল। সুতরাং কবির কথা নিছক কল্পনা নয়, উপলব্ধির বাণী।

১৩৪৬ সালের (১৯৩৯) ২৫শে বৈশাখ পুরী হইতে কবি 'জন্মদিন' কবিতায় লিখিতেছেন :

'তোমরা রচিলে যারে
নানা অলঙ্কারে
তারে তো চিনিনে আমি
চেনেন না মোর অন্তর্যামী
তোমাদের স্বাক্ষরিত সেই মোর নামের প্রতিমা
বিধাতার সৃষ্ট সীমা
তোমাদের দৃষ্টির বাহিরে।
* * *
সে বহিয়া এনেছে যে দান
সে করে ক্ষণেক তরে অমরের ভান—

কিন্তু এত ব্যাপারের পরেও কবির মনে তাঁহার অমরতা সম্পর্কে সংশয় জাগিতেছে, তাই তিনি বলেন :

'এ কথা কল্পনা কর যবে
তখন আমার
আপন গোপন রূপকার
হাসেন কি আঁখি কোণে,
সে কথাই ভাবি মনে মনে।

পর বৎসর (১৯৪০) ১৩৪৭ সালের বৈশাখে কবি ছিলেন মংপু পাহাড়ে, মৈত্রেয়ী দেবীর অতিথিরূপে। সেইবার বিচিত্র জন্মদিন উৎসব পাহাড়ীদের লইয়া, বৌদ্ধ-বুদ্ধের স্তোত্র-স্তবে। তাহারা ফুল দিল রাশি রাশি, আর দিল লামার পোশাক। কবি লিখিতেছেন :

অপূর্ব্ব আলোকে,
মানুষ দেখিছে তার অপরূপ ভবিষ্যের রূপ,
পৃথিবীর নাট্য মঞ্চে
অঙ্কে অঙ্কে চৈতন্যের ধীরে ধীরে প্রকাশের পালা
আমি সে নাট্যের পাত্র দলে
পরিয়াছি সাজ।
আমারও আহ্বান ছিল যবনিকা সরাবার কাজে
এ আমার পরম বিস্ময়।

গর্ব্ব নয়, গৌরব নয়, অভিমান নয়, আস্ফালন নয়, 'পরম বিস্ময়'। একদা কবি নিজ জীবন-দেবতাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 'বল কোন্ পারে ভিড়িবে তোমার সোনার তরী?' সেদিন দেবতা শুধু হাসিয়াছিলেন, হয়ত আজিকার এই বিস্ময়কে 'পরম' পর্য্যায়ে আনিবার জন্য। তিনি বার বার আহ্বান করিয়া কবিকে ক্লান্ত করিয়াছেন—কিন্তু ক্ষান্ত করেন নাই, তাই অবশেষে হ'ল জয়, হ'ল জয়, 'পরম বিস্ময়'।

সেদিনের পুষ্প-উপহার কবির বড় ভাল লাগিয়াছিল, তাই লিখিয়াছেন :

'বহু যুগ বহ্নিতপ্ত তপস্যার পরে এই বর,
এই পুষ্পের দান
মানুষের জন্মদিনে উৎসর্গ করিবে আশা করি—
সেই বর মানুষের সুন্দরেরে সেই নমস্কার
আজি এল মোর হাতে
আমার জন্মের এই সার্থক স্মরণ।'

বড় আনন্দ বেদনাময় এই উৎসবটি। কবি গান গাহিয়া উঠিলেন—'কেন ধরে রাখা ও যে যাবে চলে—', 'তুমি ভুলে যেও এ রজনী, রজনী ভোর হলে।' মুখে বলিলেন, 'যাওয়া আসা এই তো নিয়ম, সহজে inevitable-কে মেনে নিতে হবে। সময় হলে যেতে তো হবেই তখন কি করবে?... সময় হয়েছে নিকট এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।'

পার্থিব জীবনের শেষ বৎসর। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে ১৩৪৮ সালের বৈশাখে, কবি তখন শান্তিনিকেতনে ছিলেন—কিছুকাল যাবৎ নিরবচ্ছিন্ন অসুস্থতার মধ্যে কাটিতেছিল—মৃত্যুদেবতার পদধ্বনি অবিরতই শোনা যাইতেছিল। সে বৎসরের জন্মদিনের কোন রচনা মিলিতেছে না। ১লা বৈশাখের অনুষ্ঠানটি শান্ত গম্ভীর পরিবেশে আশ্রম অন্তরঙ্গদের দ্বারাই উদ্‌যাপিত হইয়াছিল। অসুস্থতার জন্য কবি মন্দিরের উপাসনায় আসিতে পারেন নাই। 'উত্তরায়ণে' এই উপলক্ষ্যে কবির বিখ্যাত 'সভ্যতার সঙ্কট' নামক রচনা আচার্য্য শ্রীক্ষিতিমোহন সেন পাঠ করেন। সেই বৎসরেই কবির মহাপ্রয়াণ—১৩৪৮ সালের ২২শে শ্রাবণ (৭ই আগষ্ট ১৯৪১)। কবির জীবন সেই মহাজীবন, যাহার সম্বন্ধে গুরুগোবিন্দের মুখ দিয়া তিনি বলিয়াছেন :

'আমার জীবনে লভিয়া জীবন, জাগো রে সকল দেশ।'

কবিরা মননধর্মী, তাঁহাদের সৃষ্টি চিন্তনসৃষ্টি। মনন-ক্রিয়ার মধ্যে আছে তিনটি অবিচ্ছেদ্য অংশ (১) কিছু জানা, জ্ঞান, দীপ্তি, (২) কিছু অনুভব, আবেগ, অনুভূতি, দ্রুতি এবং (৩) কর্ম্মের প্রতি কিছু প্রেরণা। কবিরা স্বভাবতঃই অনুভূতিপ্রবণ, স্বাভাবিক গভীর অনুভূতি ও হৃদয়াবেগ লইয়াই তাঁহারা জাত হন। 'মানসী' হইতে 'চিত্রা' পর্য্যন্ত কবিগুরুর এই সহজাত হৃদয়াবেগ ও অনুভূতির প্রাধান্য দেখা যায়। 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য', 'নৈবেদ্য' রচনার কালে এই অনুভূতি ও হৃদয়াবেগের সহিত যোগ দিল প্রচুর দীপ্তি। বিচার দ্বারা, জ্ঞানের দ্বারা, ধ্যানের দ্বারা কাব্য হইল 'চিৎ' (knowing) ও 'আনন্দ'ময়। অবশেষে 'বলাকা'র যুগে তাঁহার কবিকর্ম্ম সম্পূর্ণাঙ্গ হইল কর্ম্মের প্রতি প্রবল প্রেরণা যুক্ত হইয়া। এই অংশকে বলা যায় 'সৎ' (being, living, existing)। কবির কাব্যসাধনা হইল 'সচ্চিদা-নন্দস্বরূপ'।

গ্রামের চিঠি

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

গ্রাম থেকে এলো চিঠি,—
হ'ল প্রাণ আনন্দে আকুল,
শহরের টবে-ফোটা
এ যে মেঠো আকন্দের ফুল!
'পাকিস্তান' ছাপ অঙ্গে
যেন সে লিপির সঙ্গে
পদ্মার লহরী আঁকা
লীলায়িত উচ্ছল দোদুল!
সামান্য লিপিকা নয়,—
এ যে সারা গ্রামের জীবন,
যত বার পড়ি হায়,
মন করে কেমন কেমন।

এলো স্মৃতিপথ বাহি',
গোটা দেশ 'রাঙসাতী'
এলো তার বার মাসে
খুশীভরা তেরটি পার্ব্বণ।
সেই স্নিগ্ধ পল্লীপথে
নামহীন বনপুষ্পরাশি,
গন্ধ তার মন্দ মন্দ
এই পরবাসে আসে ভাসি
প্রতিটি কথার মাঝে
বাজে—সদা কানে বাজে,—
ডাকে মোরে আর্দ্রস্বরে
দরিদ্র আমার গ্রামবাসী!

মহিলা সংবাদ

দেরাদুন ডি. এ. ভি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শ্রীঅনন্তদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সিপ্রা বন্দ্যোপাধ্যায় এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পরীক্ষায় ইংরেজীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের গত সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তাঁহাকে স্বর্ণপদক পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীসিপ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়

—

বিখ্যাত মহিলা-কবি শ্রীমতী উমা দেবী 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসের অলৌকিকত্ব' সম্বন্ধে থিসিস লিখিয়া বর্তমান বৎসরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি-ফিল ডিগ্রি লাভ করিয়াছেন।

ইনি সংস্কৃতে দুইটি গ্রুপে এবং বাংলায় প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম-এ পাস করেন। কবি হিসাবে বাংলা সাহিত্যে উমা দেবীর প্রতিষ্ঠা আছে। ইনি সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষভাবে ব্যুৎপন্ন। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে লিখিত তাঁহার বহু প্রবন্ধ সাময়িক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি অল-ইণ্ডিয়া উইমেন্স কন্ফারেন্সের একজন বিশিষ্ট কর্মী।

শ্রীউমা দেবী

—

লেডী ব্রাবোর্ণ কলেজের অধ্যক্ষা ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী এম-এ, ডি-ফিল (অক্সফোর্ড), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এই বৎসর লীলা লেক্‌চারার নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি "দশ বেদান্ত সম্প্রদায় ও বঙ্গদেশ" এই বিষয়ে ধারাবাহিক কয়েকটি বক্তৃতা দিবেন। ডক্টর চৌধুরী "নিম্বার্ক দর্শন", "বেদান্ত দর্শন", "বেদান্ত ও সুফীদর্শন", "সংস্কৃত ও প্রাকৃত নারী কবি" প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িত্রীরূপে বিদ্বৎ-সমাজে সুপরিচিতা। তিনি প্রাচ্যবাণী-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতৃ-সম্পাদিকা এবং "প্রাচ্যবাণী" গবেষণা পত্রিকার যুগ্মসম্পাদিকা। ১৯৫১ সালে তিনি পাটনায় অনুষ্ঠিত "নিখিল-ভারত প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে"র মহিলা-বিভাগের সভানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করেন।

—

মানুষের প্রেম

শ্রীউমা দেবী

১

মানুষের প্রেম এক অত্যাশ্চর্য্য রত্নের মতন
হৃদয়ের খনিমধ্যে আছে সুগোপন
পায় নি সন্ধান তার আজও কোনো জন।
সে নিবিড় গুহামধ্যে অতলান্ত দুঃখ-পারাবার,
মৃত্যুমোহ অন্ধকারে প্রাণশিখা নেভে বার বার।
শুনেছি যাত্রিক যারা, যারা তুচ্ছ করেছে জীবন,
রত্ন লালসায় যারা সর্ব্বত্যাগী রিক্ত অকিঞ্চন,
তাঁদের কাছেও মুক্ত হয় নি সে রত্ন-আচ্ছাদন।
আঁধার যৌবনচ্ছায়ে যে কুমারী স্বপ্নসম্ভাবনা,
তপস্যার ফল দানে হয় নি সে সফলসাধনা।
খনির অতলে নিত্য বিন্দু বিন্দু অশ্রুর বর্ষণ,
বিষমোহে মুগ্ধ হয়ে মৃত্যুত্বক্ অসহ্য স্পর্শন,
পিচ্ছিল সুড়ঙ্গ-পথ ভয়ালদর্শন।
সংশয়-বিকৃত চিত্ত বার বার পেয়েছে বেদনা,
উলঙ্গ জড়ের চেয়ে সত্য নয় আবৃত চেতনা।

২

মানুষের প্রেম এক অত্যাশ্চর্য্য দ্বীপের মতন
লক্ষ নাবিকের স্বপ্ন করে আকর্ষণ—
অথচ সে দ্বীপে আজো পৌঁছাতে পারে নি কোনো জন।
ভগ্ন মাস্তুলের প্রশ্নে হোক যত আহত আকাশ
অমিত ঔদার্য্যে তার কোনোখানে নাই হতাশ্বাস।
শুনেছি নাবিক যারা মৃত্যুকেও করেছে তর্জ্জন
ভ্রমেও ভাবে না যারা ধ্রুবতারা জ্যোতি নির্ব্বাপণ,
আজো তারা কোনো দ্বীপ দেখেনি সে দ্বীপের মতন।
সে দ্বীপের আলো শুধু মুহূর্ত্তেক নয়নতারায়
জ্বলে উঠে তৎক্ষণাৎ বিস্মৃতির প্রদোষে হারায়।
সে দ্বীপে যে উষা তার আলোয় কে করেছে গাহন?
ঐক্য কি পেয়েছে কোনো দু'জনের তনু আর মন
দুটি সলিতায় এক অত্যুজ্জ্বল শিখার মতন?
কে জানে সে দ্বীপ আজো আছে কি না কিংবা ডুবেছে সে,
লবণাক্ত সমুদ্রের অশ্রুসিক্ত নিভৃত প্রদেশে!

মানুষের প্রেম এক অত্যাশ্চর্য্য ফুলের মতন
অজ্ঞাতের পত্রতলে আছে সুগোপন,
অথচ সৌরভে তার পৃথিবী উন্মন।
শীতল নিরালা থেকে জনতার উত্তপ্ত প্রবাহে
জীবন-যৌবন-মন বিসর্জ্জিত মর্ম্মান্তিক দাহে।
শুনেছি স্বয়ং এসে ভগবান করেন সাধন
দুশ্চর তপস্যা কত ফিরে পেতে মানুষের মন
কল্পে কল্প সৃষ্ট হয় রূপময় অজস্র ভুবন।
দুঃখ পান ভগবান্ দুঃখময় পৃথিবীতে এসে
তবু মানুষের মন ফিরে পেতে চান ভালোবেসে।
এ শ্যামলা বসুন্ধরা মরকত-পাত্রের মতন
ভোগের নৈবেদ্য তাতে আছে অগণন—
তবু—তবু তৃপ্ত নয় মানুষের মন।
ভেঙে গেলে ভোগপাত্র সঙ্গে সঙ্গে দিব্য সুধাভারে—
তৃষিত প্রাণের পাত্র পরিপূর্ণ হয় বারে বারে।

৪

মানুষের প্রেম তার জানি না সে তুলনা কেমন–
আমি তো পাই নি খুঁজে আজো এক মানুষের মন,
দিনের পাহারা সবে শিথিল যখন—
তারার কীলক গাঁথা রহস্যের সুনীল কপাটে
নিষিদ্ধ-প্রবেশ যত বাসনারা পঙ্গু হয়ে হাঁটে।
শুনেছি যে তোমাদেরও মাঝে মাঝে ভ্রান্ত হয় মন,
প্রেমস্বপ্নে মগ্ন করো নিশা উদ্‌যাপন—
সে স্বপ্ন হঠাৎ ভাঙে ভেঙে নামে প্রভাত যখন।
তখন দর্শন আর বিজ্ঞানের কর আলোচনা
নৃতত্ত্বে ও মনস্তত্ত্বে ধাতস্থের লোকসংবেদনা।
তবুও আশ্চর্য্য এক মানুষের প্রেমের স্বপন
আশ্চর্য্য মোহের জালে বেঁধে রাখে মানুষের মন—
আমি তো চাই না মুক্তি সে বন্ধন মধুর এমন।
আশ্চর্য্য রত্নের দ্যুতি—অবিজ্ঞাত দ্বীপের লালসা,
গোপন ফুলের গন্ধে কার স্মৃতি নয় রসালসা?

বাক্সে শাকসব্জী উৎপাদন

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

শাকসব্জী উৎপাদনের প্রতি অনেক শহরবাসী আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন; তবে জমির অভাবে তাঁহাদের আগ্রহ কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন না। কিন্তু অনেক রকমের শাকসব্জী বাক্সে উৎপাদন করা যায়, এবং তাহার দ্বারা গৃহস্থের দৈনিক বাজারখরচ অনেক কম হয়, এবং টাট্‌কা শাকসব্জীও পাওয়া যায়।

এই প্রকারের শাকসব্জী উৎপাদনের জন্য সাধারণ 'প্যাকিং বাক্স' অনায়াসেই ব্যবহার করা যায়; শাকসব্জীর প্রকারভেদে বাক্স প্রস্তুত করিয়া লইতে হয় এবং বাক্সের মধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী ছয় ইঞ্চি হইতে বারো ইঞ্চি মাটি দিলেই চলে। খুব বড় বাক্স ব্যবহার না করাই ভাল, কারণ উহা খুব ভারী হইবে, নাড়াচাড়ার অসুবিধা হইবে, ভাঙিয়াও যাইতে পারে।

বাক্সের মাটি এইভাবে প্রস্তুত করা যাইতে পারে: মাটি দুই ভাগ, পাতা-সার এক ভাগ, পচা গোবর এক ভাগ এবং বালি দুই ভাগ। ইহাদের ভাল করিয়া মিশাইয়া অর্দ্ধ ইঞ্চি গর্ত্তযুক্ত চালুনিতে ছাঁকিয়া লইলে ভাল হয়; বিভিন্ন প্রকারের শাকসব্জীর প্রয়োজন অনুসারে সারের পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিতে হইবে। বাক্স হইতে জল যাহাতে সহজে গড়াইয়া যাইতে পারে তাহার জন্য বাক্সের তলদেশে এক ইঞ্চি গভীর টুকরা ইট (কিংবা মাটির বাসনের টুকরা) দিয়া একটি স্তর প্রস্তুত করিয়া লইলে ভাল হয়; উহার উপর উপরি-উক্ত প্রণালীতে প্রস্তুত সারমাটির স্তর প্রস্তুত করিতে হইবে। এই স্তরের উপরিভাগে ½ ইঞ্চি খালি জায়গা থাকিলেই চলিবে। সারমাটির স্তরটি ভাল করিয়া সমান করিয়া দিতে হইবে—উঁচুনীচু না থাকে।

কয়েক প্রকার শাকসব্জীর জন্য প্রথমে অন্য বাক্সে বা পাত্রে চারা উৎপাদন করিয়া লইতে হইবে এবং উপযুক্ত সময়ে চারা স্থানচ্যুত করিয়া আসল বাক্সে রোপণ করিতে হইবে। চারা উৎপাদন সম্বন্ধে এই বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া দরকার। প্রথম কথা: খাঁটি বীজ সংগ্রহ করিতে হইবে; দ্বিতীয় কথা, চারা উৎপাদনের জন্য মাটি ভালভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে; তিন ভাগ দোআঁশ মাটি, এক ভাগ পাতা সার এবং এক ভাগ বালির সংমিশ্রণে এই মাটি প্রস্তুত করা যায়। অর্দ্ধ ইঞ্চি চালুনি দ্বারা ইহা ছাঁকিয়া লইতে হইবে। সাত-আট ইঞ্চি গভীর টব বা বাক্সতে চারা উৎপাদন করা যায়। টবের বা বাক্সের তলদেশে ইটের কিংবা মাটির বাসনের টুকরা দিয়া একটি স্তর করিয়া লইতে হইবে; উহার উপর সারমাটির স্তর থাকিবে; এই স্তরটি ভালভাবে সমান করিয়া লইতে হইবে। ইহার উপর বীজ বপন করিতে হইবে; বপনের পর বীজগুলি পাতলা করিয়া বালি দিয়া ঢাকিয়া দিতে হইবে, এবং পাত্রগুলি বাদামী কাগজ দিয়া ঢাকিয়া দিলে ভাল হয়। জলের ঝাঁঝরির সাহায্যে জল দিতে হইবে; বীজ হইতে চারা গজাইলেই কাগজের ঢাক্‌না খুলিয়া দেওয়া দরকার—যাহাতে আলোবাতাস সহজে চলাচল করিতে পারে।

বিলাতী বেগুন, মটরশুঁটি, বিলাতী সীম, বাঁধাকপি, ফুলকপি, গাজর, বীট, শালগম, ওলকপি, মুলা, পিঁয়াজ, লেটুস, আলু, লঙ্কা এবং নানাবিধ শাকসব্জী বাক্সে উৎপাদন করা যাইতে পারে।

১। বিলাতী বেগুন: অন্য বাক্সে চারা উৎপাদন করিয়া লইতে হইবে। পটাসযুক্ত সার ব্যবহার করিলে ভাল ফল পাওয়া যায়; এক বর্গগজ পরিমাণ জমিতে এক আউন্স সলফেট্ অব পটাস ব্যবহার করা উচিত; বাক্সের উপরকার মাটির সহিত ইহা মিশাইয়া দিতে হইবে। দুই ফুট অন্তর সারি করিয়া প্রতি সারিতে দুই হইতে দেড় ফুট অন্তর চারা রোপণ করিলেই চলে। ছয়টি গাছের জন্য নয় ইঞ্চি গভীর সাড়ে সাত ফুট লম্বা এবং পাঁচ ফুট চওড়া বাক্স হইলেই চলে। গাছ এক ফুট লম্বা হইলেই গাছের সঙ্গে একটি শক্ত সরু লম্বা কাঠি বাঁধিয়া দিতে হয়; তাহা না করিলে গাছ মাটিতে হেলিয়া পড়িবে।

২। মটরশুঁটি ও বিলাতী সীম: আসল বাক্সতেই বীজ বুনিতে হয়; মটরশুঁটির বীজ এক ইঞ্চি গভীর এবং বিলাতী সীমের বীজ এক হইতে অর্দ্ধ ইঞ্চি গভীর করিয়া বুনিলেই চলে। সার হিসাবে প্রতি বর্গগজে হাড়ের গুঁড়া ও কাঠের ছাই (সমান পরিমাণে) এক মুঠা প্রয়োগ করিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। তরল সারে মটরশুঁটির উপকার বেশী হয়। এক সারি হইতে আর এক সারির দূরত্ব দুই ফুট হওয়া আবশ্যক। দুই ইঞ্চি অন্তর বীজ বুনিতে হয়, কিন্তু গাছ বড় হইলে ছয় ইঞ্চি অন্তর পাতলা করিয়া দেওয়া দরকার। বাক্সের মাটি ছয় হইতে নয় ইঞ্চি গভীর হইলেই চলে। গাছগুলি তিন-চার ইঞ্চি লম্বা হইলেই কাঠি দিয়া ঠেক্‌না দিতে হয়।

৩। বাঁধাকপি ও ফুলকপি: অন্য পাত্রে চারা উৎপাদন

করিয়া লইতে হয়। দুই ফুট অন্তর চারা আসল বাক্সে রোপণ করিতে হয়। ছয়টি কপির জন্য বাক্স ছয় ফুট লম্বা, চার ফুট চওড়া এবং নয় ইঞ্চি গভীর হইলেই চলে। বাঁধাকপির জন্য প্রতি বর্গগজে তিন আউন্স এমোনিয়াম সলফেট এবং ফুলকপির জন্য দুই ভাগ এমোনিয়ম সলফেট, এক ভাগ সুপার-ফসফেট এবং এক ভাগ সালফেট অব পটাস প্রতি বর্গগজে তিন আউন্স প্রয়োগ করিলে উত্তম ফল পাওয়া যায়।

৪। গাজর, বীট, শালগম, ওলকপি, মূলা: শুধু ওলকপি ছাড়া আসল বাক্সে সরাসরি ইহাদের বীজ বপন করা যায়। ওলকপির জন্য অন্য পাত্রে চারা উৎপাদন করিয়া লইতে হয়। তিন ভাগ সুপার ফসফেট, দুই ভাগ সলফেট অব পটাস, এক ভাগ নাইট্রেট অব সোডা এবং এক ভাগ হাঁড়ের গুঁড়া একসঙ্গে মিশাইয়া বাক্সের মাটিতে প্রতি বর্গগজে তিন আউন্স প্রয়োগ করিলে ফল ভাল হইবে। আঠারো ইঞ্চি অন্তর সারিতে এক ইঞ্চি অন্তর বীজ বুনিতে হয়, গাছ দুই ইঞ্চি লম্বা হইলে প্রথমে তিন চার ইঞ্চি অন্তর পাতলা করিয়া দিতে হয়। শেষে নয় ইঞ্চি অন্তর পাতলা করিয়া দেওয়া দরকার। পাঁচ ফুট লম্বা, তিন ফুট চওড়া এবং এক ফুট গভীর বাক্সে বারোটি গাছ উৎপাদন করা যায়।

৫। পেঁয়াজ: চারা পৃথক বাক্সে প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। আসল বাক্সে তিন চার ইঞ্চি অন্তর চারা রোপণ করিতে হয়। বাক্সের গভীরতা নয় হইতে বার ইঞ্চি হইলেই চলে।

৬। লেটুস: আসল বাক্সে ইহার বীজ বপন করা যায় কিংবা অন্য বাক্সে চারা উৎপাদন করিয়া আসল বাক্সে রোপণ করা যায়। পনর ইঞ্চি অন্তর সারি করিয়া প্রত্যেক সারিতে বারো ইঞ্চি অন্তর বীজ বপন বা চারা রোপণ করিতে হয়। ছয় ফুট লম্বা আড়াই ফুট চওড়া এবং নয় ইঞ্চি গভীর বাক্সে বারোটি গাছ উৎপাদন করা যায়। বাঁধাকপির সার এই গাছের পক্ষে উপকারী।

৭। আলু: সরাসরি বাক্সতেই আলুর বীজ বসাইতে হয়। দুই ভাগ সুপার ফসফেট, এক ভাগ সলফেট অব পটাস, এবং এক ভাগ নাইট্রেট অব সোডা একসঙ্গে মিশাইয়া প্রতি বর্গগজে এক পাউণ্ড হিসাবে প্রয়োগ করিলে ভাল ফসল পাওয়া যায়। দেড় ফুট অন্তর সারিতে নয় হইতে বারো ইঞ্চি অন্তর বীজ বসাইতে হয়, সাড়ে চার ফুট লম্বা, তিন ফুট চওড়া এবং এক ফুট গভীর বাক্স হইলেই চলে।

৮। লঙ্কা: অন্য স্থানে চারা প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। দেড় ফুট অন্তর চারা রোপণ করিতে হয়। নয় ফুট লম্বা, তিন ফুট চওড়া এবং নয় ইঞ্চি গভীর বাক্সে বারোটি গাছ উৎপন্ন করা যায়।

৯। নানাবিধ শাক: আসল বাক্সেই শাকের বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়। ছয় ইঞ্চি গভীর বাক্স হইলেই চলে।

অনেক প্রকারের দেশী শাকসবজী এইরূপ ভাবে বাক্সে উৎপাদন করা যায়।

বাক্সে শাকসবজী উৎপাদন করিতে হইলে এ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা আবশ্যক এবং যত্নেরও দরকার।*

* ১৯৫১ সনের জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী মাসের *Indian Farming*-এ প্রকাশিত প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত।

বৈষ্ণব পদাবলী

শ্রীসুধীর গুপ্ত

পদাবলী সাহিত্যের রাধিকার সাথে
অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে ভাবের আবেশে
কল্পনা কালিন্দী কূলে আনন্দের দেশে
সুন্দরের সুর-মুগ্ধ চন্দ্র-স্নিগ্ধ রাতে
অভিসারে—রাস রসে কাটিয়াছে কাল।
প্রাকৃত সংসার তাই ভাল নাহি লাগে,
স্বার্থ-বিক্ত দৈন্য-দীর্ণ ছিন্ন নানা ভাগে –
নিষ্ঠুর, নিগ্রহ-তিক্ত, কদর্য্য, করাল।

মহাজনী পদাবলী চির ইন্দ্রজাল
রচিল মানব মনে। কিশোর রাখাল
স্বপ্ন স্বর্গ রচে শুধু প্রেমে বদ্ধ মন
পিঞ্জর ভুলিয়া যায় করে সমর্পণ
আপনারে স্বপ্ন লোকে 'গোপীভাবে' ভোর
সে লাবণ্যে বস্তুও যে লাগে না কঠোর।

আদর্শ

শ্রীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী

এমনি এক শরৎ-সন্ধ্যায় বসে ছিলাম আমার নির্দ্দিষ্ট আসনে মানুষের মনুষ্যত্বহীন ব্যবহারে জর্জ্জরিত মন নিয়ে—সভ্যতার রথ-চক্রপিষ্ট মন, ডালহৌসী স্কোয়ারের অন্ধ দেয়ালে মাথাকোটা মন। আসন্ন সন্ধ্যার মন্দ পবন কিঞ্চিৎ সান্ত্বনার প্রলেপ বুলিয়ে দিচ্ছিল দেহে। কিন্তু মন? অস্ত-সূর্য্যের রক্ত-আভা কি আমার মনের জ্বালাময়ী শিখার চেয়েও রক্তিম?

বৃদ্ধ হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—"তুমি কি কাছেই কোথাও থাক?'

একটা ধাক্কা খেলাম যেন। যাঁর নীরবতাতেই চির অভ্যস্ত তাঁকে সহসা মুখর হয়ে উঠতে দেখে জবাবের অভাবে পড়লাম—একটু সামলে নিয়ে বৃদ্ধের জিজ্ঞাসু দৃষ্টিকে লক্ষ্য করে বলে উঠলাম—'হাঁ, এই যে ষ্ট্রীটের মোড়েই থাকি আমি।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করলেন তিনি আমার আপাদ-মস্তক—মলিন পরিচ্ছদ, বিশৃঙ্খল বেশ আর রুক্ষ শীর্ণ দেহ। উনবিংশ শতাব্দীর সহজ সরল সুখী চোখ পড়ল যুদ্ধোত্তর বিংশ শতাব্দীর ম্লান-ধূসর শোণ পাংশু চোখে। বিহ্বল হ'ল তাঁর দৃষ্টি। বললেন—'কাজকর্ম?'

'তারই সন্ধানে লেগে আছি সারাটি দিন।' উত্তর দিলাম আমি

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বৃদ্ধ আবার চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। তার পর অর্দ্ধ স্বগত বললেন—'কি দিনই এসেছে। ভারতমুকুট বাঙালী সমাজের কি দুর্দিন! অথচ আমাদের যৌবনে কি দিনই না ছিল। কোথায় মিলিয়ে গেল সেই স্বর্ণ-মুহূর্ত্তগুলি?'

একাল সেকালের চিরাচরিত পক্ষপাতমূলক আলোচনা শুনবার আশঙ্কা নিয়ে কান খাড়া করে চুপ করে রইলাম আমি।

বৃদ্ধ সেদিক দিয়ে গেলেন না। ধরলেন নূতন সুর। 'নিষ্ঠা দেখিনে কারুর আদর্শের প্রতি, দেখিনে আর কঠোর ত্যাগ, তপশ্চর্য্যা। ক্ষুদ্র স্বার্থের সহজ পথে মগ্ন সবাই।' বলে দু'হাতে লাঠিটি ধরলেন শক্ত করে।

একটু উষ্ণ হয়ে উঠলাম মনে মনে। আদর্শ! দিন আর রাত্রির চব্বিশটি ঘণ্টা যাদের ব্যয় হচ্ছে শুধু দুটি অন্ন খুঁটবার প্রাণান্ত প্রয়াসে, তাদের কাছেই আবার আদর্শের দাবি! আদর্শ ত তৃপ্ত দেহমনের অলস-বিলাস, শোষিত জনগণকে বিভ্রান্ত করবার জঘন্য প্রয়াস। সংগ্রামী জনগণকে ভোলাবার ইষ্টমন্ত্র। মনের মধ্যে কথাগুলো টগবগ করে উঠে ফুটন্ত জলের মত, আর তারই বিষাক্ত বাষ্পজালে আচ্ছন্ন হয়ে উঠে মন। নিরুপায় ক্রোধ জ্বলে উঠে জ্বালায় শুধু আমারই হৃদয়কে। শুষ্ক, রসহীন সে হৃদয় জ্বলতে থাকে দাউ দাউ করে। কিন্তু মশাল হয়ে ওঠে না, পারে না আর কাউকে জ্বালাতে।

নিরবচ্ছিন্ন বেকার জীবন যাপন করছি আজ তিন মাস। রোজ ক' ক্রোশ হাঁটতে হয় কে জানে, তবে সন্ধ্যার অন্ধকারে পদযুগের করুণ বিলাপ মূর্চ্ছিত সুরঝঙ্কারের মত মনের প্রান্তে গুমরে মরে। জামা আর গেঞ্জী, গায়ের ঘামে ভিজে ভিজে জবজবে হয়, শুকোয় আবার গায়েই। সাবানকাচা জামা—নুন খেয়ে খেয়ে কম্ কম্ করতে থাকে, পিঠ আর বুকের কাছটাতে কালশিটে পড়ে, ফুটো ফুটো হয়ে আসে। ওরা ত নিষ্প্রাণ—এত ধকল ওরা সইবে কেন?

ক্লান্ত দেহে আর হতাশ মনে রোজই সন্ধ্যায় তাই খোঁজ করি হেদোর পার্কে একলা নিরিবিলি বেঞ্চির। রাত্রির অপ্রতিরোধ্য সংগ্রামে দিনের পরাজয়ের ক্ষণটিতে ভাল লাগে—কাঠের আসনে বসে চোখ দুটোকে উধাও করে দিতে অট্টালিকা-অরণ্যের শীর্ষে, মেঘের গহনে, সেখানে ফুটে ওঠে লজ্জারুণ শ্রান্ত দিনের কপোল-আভা; বেদনা-গাঁথা মৃত্যু-মুহূর্ত্ত।

সুরু হয় নানান দার্শনিক তত্ত্বের আনাগোনা মনের মাঝে। আদিম মনুষ্য-সমাজে ক্লেশ ছিল সত্য, ছিল বটে নিরবচ্ছিন্ন দৈহিক সংগ্রাম প্রকৃতি আর তার সন্ততিদের সঙ্গে, কিন্তু তাতেও ছিল একটা শৌর্য্যের দীপ্তি। ছিল না তাদের পদে পদে মনুষ্যত্বের হোঁচট খাওয়া পথ, আত্ম-অবমাননার পরিবেশ, কলঙ্কময় নিষ্ফল সংগ্রাম।

একটি সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ এসে আমার পাশে বসেন প্রায় রোজই। হাতের মোটা লাঠির ওপর থুতনি চেপে সামনের দিকে চেয়ে বসে থাকেন নিশ্চুপ। তাঁর দৃষ্টি যে শুধু বাইরেই নয়, সে যে ডুব দিয়েছে তাঁর অন্তরের গভীরে, সেটা বুঝতে বিলম্ব হয় নি আমার। চার দিকে কোলাহল চঞ্চলতা, নানা লোকের আনাগোনা। এর মাঝে বৃদ্ধ তাঁর মানসিক প্রশান্তির মাঝে ডুব দিয়ে থাকেন, কিছুই স্পর্শ করে না তাঁকে।

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। রাজপথে জ্বলে ওঠে আলো। বিপণির আলোক-সজ্জা চোখ ধাঁধিয়ে দেয় উগ্রসজ্জা আধুনিকার মত। সন্ধ্যার ধূসর অঞ্চলের আড়াল থেকে কখন যে রাত্রি তার কালো হাত বাড়িয়ে বিশ্বচরাচরকে তার প্রকাণ্ড থাবায় পুরে নেয় তা থেকে যায় অজানা। ধোঁয়া আর ধুলো তারা-মিটমিট আকাশকে ঢেকে দেয় একটা পাতলা আস্তরণে। আরও পরে যান ও জনবিরল হয়ে আসে নিশীথের রাজপথ—কোথায় বহু দূরে, কল-গুঞ্জিত মহানগরীর ঊর্দ্ধে, মহা শূন্যে বাজতে থাকে কিন্নরদলের বীণ, তারই মোহময় রেশে তন্দ্রা নেমে আসে মহানগরীর দুই চোখে। বৃদ্ধ একটা নিঃশ্বাস ফেলে উঠে পড়েন, তার পর কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা চলে যান গেটের দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে। আমিও উঠি। কম্পিত পদে এগোই ক্ষুধা-খিন্ন, তৃষা-জীর্ণ দেহে।

বিনা ভূমিকায় অনেকটা আত্মগত ভাবেই বলতে থাকেন বৃদ্ধ। ঔৎসুক মনে শুনে চলি আমি সে কাহিনী :—

"সে আজ কত কাল! কলেজে পড়ি আমরা তিন জনেই। পড়ি একই ক্লাসে, থাকি একই মেসে, একই ঘরে। শুধু বন্ধুত্ব বললে খুব কমই বলা হবে। সমপ্রাণতা আর প্রীতির বাঁধন, কোমল কিন্তু দৃঢ়, বেঁধে ছিল কঠিন ভাবে—তিনটি হৃদয়কে।'

একটু থেমে রাস্তার ওপাশে দোতলা বাড়ির ছাতের উপর দিয়ে চালান করে দিলেন তাঁর দৃষ্টি—নীরব নীল নিথর শূন্য, অসীম আকাশে। স্নিগ্ধ প্রীতি উছলে উঠল সে দৃষ্টি থেকে। মুখে ছড়িয়ে পড়ল অজানা আলোক-আভা।

'আমরা তিন জনেই ছিলাম গভীর ভাবের যুবক। অগ্নিযুগের অগ্নিহোত্রীদের প্রেরণালব্ধ মনে কল্পনার ছবি আঁকতাম নানা রকম। হয়ত ছিল তা অবাস্তব ঘেঁষা, হয়ত বা ছিল অলভ্য সুদূর। তবু তা ছিল বলিষ্ঠ মধুর।' প্রাণ প্রাচুর্য্য, জীবন রস-সিঞ্চিত তাজা ফুল।

এমনি এক সন্ধ্যার অন্ধকারে মেসের ছাতে বসে আমরা তিন জন। চার দিকে অট্টালিকার অরণ্য, জনতার সমুদ্র। এখানে-ওখানে অন্ধকার কালো কালো গাছ। কাছে দূরে অগণ্য আলোক-মালা। মাথার উপরে প্রশস্ত আকাশ সীমানাহীন, মৃত পাণ্ডুর চাঁদ, নিষ্প্রভ তারা। ঝির ঝির করে বইছিল একটু হাওয়া। আমাদের প্রাণের মাঝে ফুলে ফুলে উঠছিল একটা অজানা আবেগ। স্তব্ধ নিশীথের মৌন বাণী আমাদের কানে যেন গুনগুনিয়ে শুনিয়ে দিলে আশার গান: নিয়ে এল অজানা এক আলোকের সংকেত।

আলোচনা চলছিল আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে। বি-এ পরীক্ষার পর অবকাশের মসৃণ দিনগুলিতেই এ সব আলোচনা জমত ভাল। আমি ছিলাম চিরদরিদ্র। দারিদ্র্যের দুঃসহ জ্বালা ঐ বয়সেই অনুভব করেছিলাম সমগ্র অস্থিমজ্জা দিয়ে, সমস্ত সত্তা দিয়ে। পণ ছিল তাই বড়লোক হবার। চির-অভাব-দুঃখ-উতলা মন ঝুকত না অন্য কোন দিকেই।

তাই আমি বললাম—'আমি করব ব্যবসা। আমি সফল করব আচার্য্য রায়ের স্বপ্ন। ঘুচিয়ে দেব বাঙালীর এই মিথ্যা অপবাদ, মুছিয়ে দেব দুরপনেয় কলঙ্ককালিমা।'

কুণাল একটু হাসল। ও ছিল জাত আদর্শবাদী। বলল—'লক্ষ্মী চান অনন্ত আনুগত্য। তাঁর উপাসক মন দিতে পারে না অন্য কোন দিকেই। বিত্তবানের নেই অন্য কোন বৃত্তি—ধন-বৃদ্ধিতেই একান্ত লক্ষ্য।'

একটু লজ্জা পেলাম মনে মনে। লক্ষ্মী-উপাসকের স্বার্থ-সঙ্কীর্ণ মনের চেহারা ফুটে উঠল আমার মানসপটে—তবু চেয়ে দেখলাম তার চোখঝলসানো অতুল ঐশ্বর্য্যের দীপ্তি, নীলকান্ত বৈদূর্য্যমণি আলোকিত অম্লান সুন্দর দেহ। এর মধ্যে নাই বা খোঁজ করলাম মনের।

'তুমি কি ঠিক করেছ কুণাল?' প্রশ্ন করলাম আম।

নীরবে তারা-জ্বালা আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল ও অনেক-ক্ষণ। স্বপ্নস্তিমিত হয়ে এল ওর চোখের দৃষ্টি। পাণ্ডুর খণ্ড চাঁদের ম্লান আলো ছড়িয়ে পড়ল ওর সমস্ত মুখে। ছাদের ওপর সৃষ্ট হ'ল অপরূপ এক মায়ালোক। স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে ও বলল-'আমি করব অধ্যাপনা। জ্ঞাতিগঠন আমার লক্ষ্য।'

ওর কথার জন্য নয়, ওর গলায় যেন কোন এক অনির্ব্বচনীয় সুর বেজে উঠল, শুনে রোমাঞ্চিত হ'ল সমস্ত দেহ আমার।

'জানি এতে মান নেই, নেই খ্যাতি। আছে শুধু দারিদ্র্য আর দুঃখ। কিন্তু সতিকারের দেশসেবার এ ছাড়া আর পথও নেই।'—আমার চোখে চোখ রেখে বলল কুণাল।

কুণাল বড়ঘরের ছেলে। ওর বাবা মৈমনসিংহের একজন ছোটখাটো জমিদার। তাই ওর মুখে দারিদ্র্যের উল্লেখে আশ্চর্য্য হলাম একটু।

ও যেন আমার মনের কথাটি পাঠ করল, বলল—'আশ্চর্য্য হচ্ছ? এই নিয়েই ত বাবার সঙ্গে আমার বিরোধ। বাবাকে জান ত, ভীষণ তেজী আর জেদী। তাঁর আদেশ এম এর পর ব্যারিষ্টারী পড়তে বিলেত যাওয়ার। এম এ আমি পড়ব ঠিকই, তবে বাংলায়, তার পর পারি ত সংস্কৃতে। বাবা ত এ কথা কানেই তুলতে চান না। অগ্নিশর্ম্মা হয়ে আছেন। শেষ পর্য্যন্ত ব্যাপার কতদূর গড়াবে বলা যায় না। মা থাকলেও বা একটু ভরসা থাকত, কিন্তু সেদিকেও ত ফস।'

একটু বিষণ্ণ হাসি হাসল কুণাল।

পিতা পুত্রের মতান্তরের আভাস জানা ছিল আমার। কিন্তু তা যে এমন একটা সঙ্কট সৃষ্টি করেছে তা ভাবি নি কখনো। শঙ্কিত হলাম কুণালের ভবিষ্যৎ ভেবে।

কনকের ছিল শিল্পী মন। চুপচাপ বসে শুনছিল সব এতক্ষণ। এবারে বলল,—'আমি করব সাহিত্য রচনা। নিপীড়িত মানবাত্মার অনন্ত জিজ্ঞাসাকে আমি দেব মুক্তি। পথহারাকে আমি দেখাব পথ। আমি হাঁটব না কাব্য-বীথির কুসুম-ছড়ানো পথে, কণ্টকময় মরু সাহারার মাঝখান দিয়ে হবে আমার যাত্রা, সংগ্রামী জনতার হৃদয়-শোণিত আঁকা পথে।'

এক ফালি চাঁদ তখন অনেক ওপরে। কত ওপরে? ওকে কি ছোঁয়া যাবে কোন দিন?"

বহুক্ষণ চোখ বুঁজে চুপ করে বসে রইলেন বৃদ্ধ। বর্ত্তমান ছেড়ে মন তাঁর চলে গেছে অতীতের কোন্ তীর্থলোকে—এই ধূলিমলিন কোলাহলমুখর জীবলোকের বহু ঊর্দ্ধে—মানস অভিসারের পথে, স্মৃতি-তীর্থ পরিক্রমায়।

হঠাৎ চোখ খুলে চাইলেন আমার চোখে—আর সে তো চোখ নয়, জানালা ওঁর মনের। এক ঝলক স্নিগ্ধ আলোক যেন ছড়িয়ে পড়ল আমার মুখে-চোখে। নিরুত্তাপ, নিরহঙ্কৃত, স্নিগ্ধ, শান্ত দৃষ্টি।

"দেখতে দেখতে কেটে গেল বিশ বছর।" আবার সুরু করলেন তিনি,—"কঠিন হৃদয়া শ্রীমতী লক্ষ্মী, দুরূহ-সাধনাকামী। দুষ্প্রাপ্য তাঁর পূজা-উপচার, কঠিন তাঁর বোধন-মন্ত্র। কঠোর সাধনায় মগ্ন

রইলাম অনুক্ষণ, কৃপাকটাক্ষে বঞ্চিত হলাম না শেষ পর্যন্ত। কিন্তু বেদনাহত মনে চেয়ে দেখলাম, জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টুকুই দেবী গ্রহণ করেছেন তাঁর অর্ঘ্যরূপে।

কলকাতায় ফিরলাম অনেক দিন পরে। যাকে দেখেছিলাম বালিকা, সে আজ পূর্ণযৌবনা। প্রস্ফুটিত পদ্মকলির গন্ধ-আকুল মধুকর-গুঞ্জনের শেষ নেই। কয়েকটা দিন শুধু ঘুরে বেড়ালাম। যৌবনের উন্মাদনা যেন ফিরে এল কয়েক দিনের জন্য। খুঁজে বেড়ালাম ওদের চতুর্দ্দিকে।

বিকেলবেলা। ধর্মতলার ভীড়ের ভেতর গা ছেড়ে দিয়ে হাঁটছি এস্‌প্লানেড অভিমুখে, হঠাৎ কে পেছন থেকে নাম ধরে ডাকল আমায়। পেছনে চেয়ে দেখি এক অকালবৃদ্ধ শীর্ণ ব্যক্তি। পরনে ধুতি, ফতুয়া গায়ে, গলায় চাদর, পায়ে চটি। জীর্ণ কিন্তু পরিষ্কার। কোটরগত চক্ষু দুটি জল জল করছে পরিচয়ের দীপ্তিতে। চাউনি দেখে বিস্মরণীর কালো পর্দাখানা ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ল। প্রায় চীৎকার করে বলে উঠলাম—'কুণাল!'

ম্লান হাসি খেলে গেল ওর শীর্ণ পাণ্ডুর মুখে। শান্ত সুরে বলল, —'চিনেছ তা হলে?'

মুহূর্ত্তে আলিঙ্গনবদ্ধ হলাম দু'জনে। পরে একটু অনুযোগের সুরেই বললাম,—'চেনবার তো কথাই নয়। কোথায় সেই যৌবন-দৃপ্ত ব্যায়াম-কঠিন কুণাল, আর কোথায় এই অকালবৃদ্ধ শুষ্ক শীর্ণ—'

'নর-কঙ্কাল,' যোগ করল কুণাল। বুকে হাত দিয়ে বলল,—'বাইরেরটাই সব নয়, তোমাদের কুণাল বেঁচে আছে এইখানে। আর বেঁচে আছে সে খুব ভালোভাবেই।'

ভাবরাজ্য ছেড়ে বাস্তবে নামি আমি। দ্বিধাজড়িত স্বরে বললাম, —'তা তোমার এ কি বেশ?'

'কেন?' উজ্জ্বল মুখে কুণাল বলল,—'শিক্ষাব্রতীর তো এই-ই একমাত্র বেশ। দরিদ্র দেশের দরিদ্রতম শিক্ষাব্রতী।'

মনে পড়ল অদ্ভুত আর আশ্চর্য্য এক সন্ধ্যার কথা। দূর অতীতে হারিয়ে-যাওয়া অতিপ্রিয় একটা স্বর যেন মৃদু গুঞ্জরণ তুলল মনের বাঁধা তারে। একটা আবেশে ভরে উঠল মন।

'শিল্পীর খবর কি, কুণাল?'—বলে উঠলাম সহসা।

'সে কি! তুমি কি কিছুই জান না?' ম্লান মুখে বলল কুণাল।

নীরবে মাথা নাড়লাম আমি।

'প্রকাশকদের দুয়ারে দুয়ারে মাথা ঠুকেও ওদের কঠিন প্রাণ গলাতে পারল না বেচারা।' অন্যদিকে চেয়ে বলল কুণাল।—'ওর নূতন উপন্যাসখানা, যাকে ও নিজের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি বলে ভাবত—আমল পেল না কারু কাছেই। দু'এক জন প্রকাশক রাজী হলেও পিছিয়ে গেল বাজারোরের ভয়ে। এক বেলা, আধ বেলা খেয়ে, কোনদিন উপোস দিয়ে বহু বিনিদ্র রজনী আর অনবসর দিনে অক্লান্ত প্রয়াসের এই দুর্দ্দশা ওর শিল্পী-মনে গভীর আঘাত হানল। ক্রমে ক্রমে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলল ও। যে জনসমুদ্রের মর্ম্মবাণীর ব্যাখ্যান ছিল ওর পণ, সেই জনসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে এক দিন ভেসে গেল সে। সমুদ্রের গভীরে যারা থাকে তাদের শাণিত দংষ্ট্রা ছিন্নভিন্ন করল ওর হৃদয়।

কুণালের নিষ্করুণ গভীর কণ্ঠে কেঁপে উঠল আমার বুক। অজ্ঞাত আশঙ্কা-শিহরণে ঝিম ঝিম করে উঠল মস্তিষ্ক। 'শেষে কি হ'ল ওর খুলে বল—' চীৎকার করে উঠলাম আমি স্থান কাল ভুলে।

—'আত্মহত্যা করেছে চলন্ত ট্রেনের নীচে মাথা পেতে দিয়ে' নিষ্প্রাণ সুরে বলল কুণাল।

হৃৎস্পন্দন যেন পলকের জন্য একবার থেমে আবার চলতে লাগল দ্রুততর বেগে। দু'জনেই চুপ করে রইলাম। চলমান জনস্রোত দু'ভাগ হয়ে আমাদের দু'জনার দু'দিক দিয়ে চলে যাচ্ছিল। সে স্রোতের ঢেউ মাঝে মাঝে লাগছিল আমাদের গায়ে। সব ভুলে এক বিষণ্ণ বেদনায় ভরে উঠল মন। কোথায় যেন রেডিওতে পূরবী বেজে চলেছে উদাস গভীর সুরে। আমার প্রাণে তুলল তা এক গভীর অনুরণন।

চমক ভাঙলো কুণালের কথায়। 'তুমি তো বেশ গুছিয়ে নিয়েছ দেখছি,'—আমার আপাদমস্তক ভাল করে দেখে নিয়ে বলল।—'সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছ তা হলে।'

ইচ্ছে হ'ল না এই প্রতিবেশে আমার সৌভাগ্যের ইতিবৃত্ত ওকে বলি। প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে বললাম,—'তা তোমার খবর সব বল শুনি। কোথায় আছ, কি করছ? খুব ভাল যে একটা কিছু করছ না, সে তো না বললেও বোঝা যায় স্পষ্ট।'

'ভুলে যেও না এটা যুদ্ধোত্তর পৃথিবী।' মৃদু হেসে বলল কুণাল, —'তার উপর কমনওয়েলথের আঁচল ঢাকা ভারত-ভূমিতে বাস। অধুনা পাণ্ডিত্যের দামও নির্দ্ধারিত হয় সুপারিশের জোরে। তাই দু'বার এম-এ পাশ করেও স্কুল মাষ্টারী, তাও আবার বেসরকারী স্কুলে, মাইনে? এর উল্লেখ না করাই ভাল। তবে শুনেছি চটকলের দারোয়ানেরাও আমার চেয়ে বেশী উপায় করে বেতনে আর ভাতায়।'

শুনে আশ্চর্য্য হলাম একটু, বাংলা ছাড়া বহুদিন; চমক লাগল এ সংবাদে।

হঠাৎ কুণাল আমার দু'হাত চেপে ধরে বলল,—এখানে দাঁড়িয়ে আর না। চল, আমার কুঁড়ে ঘরটি দেখবে চল। বাসায় বসে আরাম করে সব খবরাখবর নেওয়া যাবে, কি বল কল্যাণ, এ্যা?

আপত্তি করলাম। ভাল লাগছিল ওর সঙ্গে কথা বলে। ওর মধ্যে বাস করে এক নিঃসীম উদারতা যার জন্য ওর সঙ্গ লাগে ভাল, আর ওর কথায় আছে সমুদ্রের হু হু-করা হাওয়ার মত মুক্ত অবাধ গতি, মনের সব আবর্জ্জনাকে নিমেষে করে দেয় দূর।

মাণিকতলায় এক বস্তি। অন্ধকার গলিপথ আলো হাওয়া সম্পর্কহীন। দু'পাশে ছোটবড় বাড়ী, পুরাতত্ত্ববিদ্‌-আহ্বানকারী দেয়ালে দেয়ালে ঘুঁটে শুকোবার অজস্র দাগ,—নোনাধরা, বালি ঝুরঝুর দেয়াল। ড্রেনের গন্ধ, পচা তরকারির খোসার গন্ধ আ

মরা ইঁদুরের তীব্র গন্ধ বায়ুস্তরকে করে রেখেছে ভরপুর। আমার অনভ্যস্ত নাসারন্ধ্রে সুগন্ধি রুমাল গুঁজে দিলাম, তাতে ফল হ'ল উল্টো। কুণাল আপন মনে সহজভাবে আগে আগে চলেছে একান্ত নির্বিকার চিত্তে। দেখে দেখে বিস্ময় জাগে আমার। বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা মানুষকে এ কোন্ পূতিগন্ধময় নরকে টেনে এনেছে?

ছোট একতলা বাড়ী। খোলার চাল। এক-ইটের গাঁথুনির দেয়াল, একটু বেঁকে, দাঁড়িয়ে আছে তার স্বল্প গভীর ভিতের জোরে কোন রকমে। আকাঠার তেড়াবাঁকা দরজা ভেজানো ছিল, ঠেলতেই খুলে গেল। ছায়ান্ধকার কাঁচা এক ফালি উঠান, তার পরে সিমেন্ট-ওঠা বারান্দা একটুকু। পাশাপাশি ছখানা ঘর আর বারান্দারই খানিকটা ঘিরে রান্নাঘর। দূষিত বায়ুস্তরের অভিযানের কামাই নেই এখানেও। রুখবে কে ওদের?

আসতে আসতে আভাসে শুনেছিলাম কুণালের সব কথা। স্বেচ্ছাচারী পুত্রকে ক্ষমা করেন নি পিতা। পিতার আশ্রয় এবং বিষয় পেল বিমাতার সন্তানবর্গ। নির্বিকার চিত্তে সয়ে গেছে কুণাল এই পরিণতিকেও। লীলাময়ী যে চপলা-চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল কুণালের হৃদয়ে, সেও অ-ধরাই রয়ে গেল জীবনে। দরিদ্র শিক্ষকের গলায় মাল্যদান করবে কোন্ বাস্তবপন্থিনী? তার পিতা এনেছিলেন সরকারী চাকুরীর নিয়োগপত্র, উচ্চ মহলে তাঁর অপ্রতিহত প্রতাপের সাহায্যে। কিন্তু কুণাল অচল-অটল। এই প্রত্যাখ্যানের ব্যথা নিদারুণ ভাবে বাজল পিতা-পুত্রীর বক্ষে। প্রেমের সূক্ষ্ম ডোর ছিন্ন করার পক্ষে এই-ই কি যথেষ্ট নয়?

'বসো এই ঘরে আসছি আমি,'—বলে ডানদিকের ঘরটিতে আমাকে ঠেলে দিয়ে অন্তর্হিত হ'ল কুণাল। ঘরে একটি মাত্র জানালা বর্তমানে বাইরের ধোঁয়াকে ঘরে আনা ছাড়া আর কিছুই করছিল না। চোখে পড়ল সামনেই একটি তক্তপোষ, ওপরে পাতা জীর্ণ কম্বল একটি। পা মুড়ে বসে পড়লাম তার ওপরে। ঘরের অন্ধকারের সঙ্গে চক্ষুর মিতালি হবার পর চেয়ে চেয়ে দেখলাম দরিদ্রের গৃহশয্যা।

এক কোণে গোটা দুই-তিন ট্রাঙ্ক, একটার ওপর আর একটা রাখা। সম্মুখের দেয়ালে তিনটে তাক, বইয়ে ঠাসা। বই আর বই। নূতন, পুরোনো, বাঁধাই, অ-বাঁধাই, মোটা মাঝারি বই সব। এতক্ষণ লক্ষ্য করি নি, এবার চোখে পড়ল ওদিকের দেয়াল ঘেঁষে সতরঞ্চির ওপর বসে একটি ছেলে—বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ, দাড়ি-গোঁফ সমাচ্ছন্ন মুখ, লম্বা বিশৃঙ্খল চুল, ময়লা গেঞ্জী গায়ে এক মনে কি একটা বই পড়ছে চোখের সামনে ধরে। ওর কাছাকাছি, সতরঞ্চির ওপর বিছানো আরও কয়েকখানি বই। ও এমন নীরব, নিশ্চল যে ওর অবস্থিতি অনুভবই করা যায় না ঘরে। কিন্তু এই অন্ধকারে ও পড়ছে কি করে ভেবে একটু চঞ্চল হয়ে উঠলাম আমি।

এমন সময়ে ঘরে ঢুকল কুণাল। 'ইস, কি ধোঁয়া' বলে জানালাটার দিকে তাকাল একবার, তারপর বলল, 'চল, গৃহিণী বা প্রণয়ীকে দেখবে চল।'

নীরবে ওর অনুগমন করে পাশের ঘরে ঢুকলাম আমরা দু'জন। এ ঘরে দুটো জানালা। আলোও আছে একটু। ঐ রকম তক্তপোষ পাতা, তার ওপর ধপ্‌ধপে চাদর পাতা বিছানা, সে বিছানায় শুয়ে কুণালের স্ত্রী।

রোগা লোক যে এর আগে দেখি নি তা নয়, কিন্তু ঠিক এমনটি আর চোখে পড়ে নি আমার। বেতসপত্রের সঙ্গে তুলনা চলে অনায়াসে। একদা-গৌর, শীর্ণ রোগ-পাণ্ডুর মুখ, রক্তহীন। চোয়ালের হাড় দুটি ঠেলে উঠেছে সামনের দিকে, অক্ষিকোটর নিম্ন-গভীর। অবিন্যস্ত রুক্ষ কেশপাশ বালিশের ওপর দিয়ে ছড়ানো। সমস্ত দেহের প্রাণ-রস পান করে চক্ষু দুটি অত্যুজ্জ্বল, যেন জীবনের জয়-ঘোষণার অনুচ্চার শঙ্খ। নলী নলী হাত দুটো তুলল একটু নমস্কারের ভঙ্গিমায়, অস্পষ্ট স্বরে কি যেন বলল। কুণাল ব্যস্ত হয়ে বলল, 'থাক্ থাক্, কথা বলতে হবে না তোমাকে।'

শিয়রের খোলা জানালা দিয়ে অনেক দূর দেখা যায়। বস্তির এ দিকটায় একটা জলা। ভাঙ্গা মাটির কলসী, ইট, পাথর আর খোলামকুচিতে আকীর্ণ। ঐ জানালা-পথেই অস্তগমনোন্মুখ সূর্যের শেষরশ্মি ওর মুখে পড়ে একটা ক্লান্ত সকরুণ বেদনার আভাস সঞ্চার করেছে। একটু পরে ওর কোটরগত দুই চোখের কোল বেয়ে দু'ফোটা অশ্রু গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল বালিশে। কেন, কে জানে? কুণাল ব্যস্ত হয়ে মুছিয়ে দিলে আস্তে আস্তে সযত্নে।

আমি আর দাঁড়াতে পারলাম না। পালিয়ে এলাম এ ঘরে চুপি চুপি। অজানা এক ব্যথার ভার চেপে বসল বুকের ওপর। নিঃশ্বাস ভারী হয়ে এল।

একটু পরেই এল কুণাল। আমার দিকে তাকিয়ে হাসল একটু—বেদনা-ঝরা হাসি। তারপর বলল, 'সেরা রোগ। ভিখিরীর ঘরে রাজ রোগ। রাজকীয় আর কিছু ত হ'ল না জীবনে, তবু যা-হোক একটা সান্ত্বনা যে ঈশ্বর একেবারে ভুলে বসে নেই। রাজ-জনোচিত একটা কিছু দিয়ে পাঠিয়েছেন তাঁর মহা আশীর্ব্বাদ।'

উত্তেজিত হয়ে বললাম, 'এর পরেও ঈশ্বরের কথা বল কি করে তুমি? কোথায় ছিলে, আর কোথায় এসে দাঁড়িয়েছ ভাব ত একবার। বিনা অপরাধে কেন এ লাঞ্ছনা, কোন্ পাপের শাস্তি এটা?'

আমার উত্তেজনা দেখে হাসল একটু সে। সে হাসিতে কি ছিল জানি না, কিন্তু লজ্জা পেলাম মনে মনে। একটু পরে বললাম, তা আজকাল ত হাসপাতালে অনেক সুবিধে, সেখানে কোন—

হাত তুলে আমাকে থামিয়ে দিলে কুণাল। বলল, 'তুমি কোন্ রাজ্যে বাস করছ ভেবে পাই না। গরীবের জন্য নামে, কিন্তু কাজে কাদের জন্য একবার সেখানে গেলেই বুঝতে পারবে। দরিদ্র শিক্ষক-পত্নীর একান্ত স্থানাভাব। ঘুন ধরা সমাজ আর রাষ্ট্র। সুবিচার যে চাও, বিচার করবে কে?

এবার একটু উত্তেজিত মনে হ'ল ওকে। পাগল যে হয়ে যায় নি এই আশ্চর্য্য। অল্পক্ষণ মাথা নীচু করে বসে রইল কুণাল

আমার পাশে, তার পর এক সময়ে মাথা তুলে ডাকল, 'অজয় ?'

'আজ্ঞে', বলে উঠে দাঁড়াল অধ্যয়নরত ছেলেটি, উঠে এল আমাদের কাছে।

'আজ তুমি যাও অজয়'—পরম স্নেহভরে ছেলেটির কাঁধে হাত রেখে কুণাল বলল, 'আজ আমি ব্যস্ত একটু আমার এই বন্ধুটিকে নিয়ে।'

'আচ্ছা', বলে ছেলেটি ধীরপদে বেরিয়ে গেল। খোলা দরজা দিয়ে নেমে গেল অন্ধকার গলিপথে।

'এটি কে ?'—প্রশ্ন করলাম কুণালকে।

'ওই ত আমার আশার আলোক।' গভীর স্বরে বলে উঠল কুণাল। 'ওই ত বাঁচিয়ে রেখেছে আমার সমগ্র সত্তাকে এই ক্লেদাক্ত পরিবেশের মাঝে। দিক্‌-চিহ্নহীন নিরাশার গভীর কালো অন্ধকারে ও-ই আমার আকাশ-প্রদীপ। ওটি আমার ছাত্র। গরীব কিন্তু মেধাবী। প্রবেশিকায় দ্বিতীয় হ'ল। আমাদের স্কুল থেকেই পাস করল ও। সেই থেকে আমারই কাছে আসে রোজ সন্ধ্যায় পড়তে। ওদের সঙ্কীর্ণ ঘরে পড়বার জায়গাটুকুও নেই, রাত্রে জ্বালাবার কেরোসিনটুকুও ওদের সংসারে অপব্যয়। আমিই পড়াই ওকে। আমার মনের মত করে গড়ে তুলেছি ওকে। আমার শিক্ষক-জীবনের একমাত্র সাফল্য অজয়, একমাত্র গর্ব্ব।

আবেগে স্বর রুদ্ধ হয়ে এল কুণালের। একটু থেমে বলল, 'এবার এম-এ-তে প্রথম হয়েছে বাংলায়, এখন পড়ছে সংস্কৃতে।'

অজানা এক আলোর দ্যুতিতে জ্বল জ্বল করে জ্বলে উঠল কুণালের দুই চোখ। তার ভিতর কি দেখতে পেলাম আমি ? অবিনশ্বর মানবাত্মার নিয়ত ঊর্দ্ধ অভিযান—নিষ্কলঙ্ক জ্যোতির্লেখাঙ্কিত দীপ্তপথে, পরম শ্রেয়ের অভিমুখে।"

চক্ষু বুজে মৌন হয়ে রইলেন বৃদ্ধ বহুক্ষণ। আমি নির্ব্বাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম তারাভরা আকাশের দিকে। নিষ্ফলতার যত গ্লানি সব যেন মন থেকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেল। চেয়ে রইলাম বহু দূরদূরান্তের নীহারিকাপুঞ্জের দিকে, যেখানে চলছে নূতন নূতন সৃষ্টির লীলা। অসীম এ ব্রহ্মাণ্ডের কোন্ কোণে পড়ে রয়েছে এ পৃথিবী ? আর মানুষ ?

"সত্যিই...

লাক্স টয়লেট সাবান

মেখে আপনি আরও স্থুন্দর হ'তে পারেন"

শ্যামা বলেন

LUX
TOILET SOAP

যতো সাদা, ততো বিশুদ্ধ, তেমনি সুলভ

লাক্স টয়লেট সাবান

চিত্র-তারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান

LTS. 372-X52 BG

অন্য ইতিহাস—শ্রীসিদ্ধার্থ রায়। ইণ্ডিয়ানা লিমিটেড, ২।১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য—৩, টাকা।

বাংলা বিভাগের চরম দুঃখ যাহারা ভোগ করিতেছে তাহাদের কাহিনীই 'অন্য ইতিহাসের' বিষয়বস্তু। জন্ম-ভিটার মাটি হইতে চিরদিনের জন্য উৎসাদিত হইয়া জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে পৌঁছিয়া ইহারা আজ স্রোতের মুখে কুটার মত ভাসিয়া বেড়াইতেছে এবং ভারত রাষ্ট্রের ভারস্বরূপ হইয়াছে। ইহাদের লইয়া রাজনীতির খেলা জমাইতেছে কোন দল, অর্থনৈতিক সুবিধা ভোগ করিতেছে কেহ কেহ, কোন প্রতিষ্ঠান-বা সেবার দ্বারা ইহাদের দুঃখ-লাঘবের প্রয়াস পাইতেছে। এইভাবে মানুষের সমবেদনা ও লোভ-লালসা পাশাপাশি স্বর্গ নরক রচনা করিয়া চলিয়াছে। এই কাল-ব্যাধির প্রতিকার কি? তথা-কথিত নেতা, সমাজ-সংস্কারক বা শাসকমণ্ডলী ইতিকর্তব্যবিমূঢ় অসহায়ের মত জাতির মৃত্যুলক্ষণ প্রত্যক্ষ করিতেছেন, আর মহাকাল অলক্ষ্যে হাসিয়া আগাইয়া চলিতেছে। এই অসহায় ভাবটিতে গল্পের প্রাণ-বস্তু নিহিত। গল্প আরম্ভ হইয়াছে শিয়ালদহ স্টেশনের আশা-আশ্রয়হারাদের মাঝখানে। এখানে অগণিত বাস্তুহারা ও স্বজন-বিচ্ছিন্ন মানুষের মর্ম্মন্তুদ দুঃখবেদনা সবকিছুকে ছাপাইয়া প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। লেখক সেই তীব্র বেদনাদলিত ভাবোচ্ছ্বাসকে সংযত করিতে পারেন নাই। ফলে মন্তব্যগুলি দীর্ঘ হইয়া গল্পটিকে মন্থরগতি করিয়াছে এবং চরিত্রগুলিও কেমন যেন অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। গল্পের প্রথম খণ্ড বলিয়া হয়তো এমনটি হইয়াছে। পরবর্ত্তী খণ্ড বা খণ্ডগুলির ঘটনার স্রোত হয়তো চরিত্রগুলিকে পূর্ণ পরিণতির কূলে পৌঁছাইয়া দিতে পারিবে। সে যাহা হউক, পুনর্ব্বাসন সমস্যা আজ আমাদের জাতীয় জীবনের প্রধান সমস্যা হইয়াছে বলা যায়। স্বাধীনতার পূর্ণ স্বাদলাভ ও কল্যাণ কেবলমাত্র ইহারই সুষ্ঠু সমাধানে ঘটিতে পারে। এই কারণে, গল্পের দিক দিয়া যাহা না হউক স্বাধীনতার অগ্রগতি রোধকারী এই জটিল সমস্যাকে লেখক যে জনসমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছেন—তাহাতে তিনি প্রশংসার দাবি করিতে পারেন।

স্মৃতির ব্যথা—ডাঃ পাঁচুগোপাল নন্দী। প্রকাশক শ্রীসুবোধ লাল নন্দী, ৩০, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রীট, কলিকাতা-৭। মূল্য—২.৫০ টাকা।

এটি উপন্যাস নহে, একটি কাহিনী মাত্র। কোন দুর্ভাগ্য যুবকের ডায়েরি অবলম্বনে লিখিত। লেখকের এই স্বীকারোক্তির পর প্রশ্ন জাগে—সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত কাহিনীর উপন্যাস হইতে কি বাধাই বা ছিল? অবশ্য এই প্রশ্নের উত্তরও সুদীর্ঘ কাহিনী-বর্ণনার মধ্যেই পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে পল্লীচিত্রগুলি মন্দ ফুটে নাই, ঘটনাও দানা বাঁধিবার উপক্রম করিয়াছে।

শুধু কাহিনীকে সংক্ষিপ্ত করিয়া সুকৌশলে পরিবেশন করিবার দক্ষতার অভাবে ঘটনা বা চরিত্র পাঠকমনে দাগ কাটিতে পারে নাই।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

অন্যনগর—শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। দিগন্ত পাবলিশার্স, ২০২, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা—২৯। মূল্য—৩ টাকা।

লণ্ডনের লেষ্টার স্কোয়ারে একটি ভারতীয় রেস্তোরাঁ ইণ্ডিয়া গ্রীল—তার মালিক ভূপেন মল্লিক। এই রেস্তোরাঁয় ভূপেনের সহকারী রতন আর তার সাহায্যকারিণী একটি অবিবাহিতা বিদেশিনী তরুণী—আইলীন। দেশে ভূপেনের স্ত্রী-পুত্র আছে। সে নিয়মিতভাবে তাহাদের নিকট টাকা পাঠায়। কিন্তু আইলীনের সঙ্গে চলিয়াছে তাহার মন দেওয়া-নেওয়ার পালা। ওদিকে রতন থাকে লণ্ডনের দীন-দরিদ্রদের পাড়ায় অল্ডগেটের একটি বাড়ীতে যেখানে আশ্রয় লইয়াছে "সেই সব ভারতীয় যারা এসেছিল টাকা রোজগার করতে, ছোটখাটো ব্যবসা খুলতে, কিংবা জাহাজের খালাসী হয়ে, কিন্তু নানা কারণে যারা আর দেশে ফিরে যেতে পারে নি, এদেশেই সংসার পেতেছে।" লণ্ডনের এই বাড়ীটিকে কেন্দ্র করিয়াই সমালোচ্য উপন্যাসের কাহিনীটি গড়িয়া উঠিয়াছে। এই বাড়ীর বাসিন্দাদের মধ্যে রতন অবিবাহিত। তার মানসলোকে সকল সময় জাগিয়া থাকে একখানি মুখ। সে তার কল্প-লোকের সোনা-বউ। "কালো রং তার, লম্বা লম্বা চুল, আঁটসাঁট দেহের গড়ন, আর টানা টানা চোখ।" রতন ছাড়া এই বাড়ীতে থাকে দীনবন্ধু, চৌধুরী, গণেশ এবং আরো কয়েকজন। নিজের উদাসীনতার দোষে কড়লার জলে ডুবিয়া-মরা স্ত্রীর কথা ভাবিয়া দিনরাত দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে চৌধুরী; দীনবন্ধুরও দেশে স্ত্রী-পুত্র আছে, কিন্তু মনে হয়, তাহাদের সম্বন্ধে সে নির্ব্বিকার। উৎকট ইংরেজভক্ত গণেশের মুখে দিনরাত তাহার নিজের দেশের তথাকথিত নীচ শ্রেণীর খাঁটি দিশী বুলি "হালার পো হালার" ফোড়নের সঙ্গে ভুল এবং বিদঘুটে ইংরেজীর খৈ ফোটে। লিভারপুল হইতে এখানে আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করে বিশু। সে বিলাতে মেম বিবাহ করিয়াছে এই ভুয়া খবর শুনিয়া দেশে তাহার স্ত্রী দগ্ধ পুড়িয়া মরিয়াছে কেরোসিনের আগুনে। শেষ পর্য্যন্ত বিশু ভালবাসিয়া বিবাহ করিল ইংরেজ মেয়ে ক্লারাকে। নব-বিবাহিতা স্ত্রীকে অল্ডগেটের বাড়ীতে রাখিয়া বিশু জাহাজের কাজে সমুদ্রে

ল। নারীর কল্যাণ হস্তের স্পর্শে অল্ডগেটের বাড়ীটির শ্রী ফিরিয়া আসিল
ট, কিন্তু তাহা নিতান্তই স্বল্পকালস্থায়ী। এই সমস্ত স্বজনবিচ্যুত ভাগ্যহতদের
বনে দেখা দিল নানা বিপর্যয়, চৌধুরী মরিয়া বাঁচিল, ক্যারার সংস্পর্শে
াসিয়া, রতনের জীবনে জটিল আবর্তের সৃষ্টি হইল। দীনবন্ধু চলিয়া গেল
মেরিকায়, শেষ পর্যন্ত বিশু আসিয়া তাহার স্ত্রী ক্যারাকে লইয়া চলিয়া
ল। অল্ডগেটের বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া স্বজনহীন রতন আসিয়া আশ্রয়
লে আলি সাহেবের আস্তানায়।

লণ্ডন-প্রবাসী দুর্ভাগা ভারতীয়দের জীবনের যে রূপ লেখক ফুটাইয়া
লিয়াছেন, বাংলা-সাহিত্যে তাহা সম্পূর্ণ অভিনব। পড়িতে পড়িতে পদে
দ মনে হয় ঘটনাগুলি যেন চোখের সামনে ঘটিতেছে। লেখক যাহাদের
নার কাহিনী ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহাদের তিনি ভাল করিয়াই জানেন,
কর দরদ দিয়া তিনি তাহাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। সেইজন্যই সাত সমুদ্র
র নদীর পারে অন্য নগরে স্বজনবঞ্চিত যে সকল হতভাগ্য অল্ডগেটে
সিয়া বাসা বাঁধিয়াছে তাদের অন্তর্গূঢ় বেদনাকে তিনি সার্থকভাবে রূপায়িত
রিতে সক্ষম হইয়াছেন। তাই তো লোকান্তরিতা মালতীর জন্য চৌধুরীর
'কুল আকুতি আমাদের মনকে বেদনায় ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে,
পালকর্তৃক প্রতারিতা বিদেশিনী আইলীনের অপরিমেয় বেদনায় আমরা
মান হইয়া পড়ি। বিনোদ, ভূপাল, গণেশ, চৌধুরী, আইলীন সবগুলি
রিত্রই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে ও স্বকীয়তায় উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।
টপ চরিত্র হিসাবে গণেশের জুড়ি নাই। পাঠকচিত্তে সবচেয়ে বেশী ছাপ
খে রতন ও ক্যারার চরিত্র। ইহাদের মনের জটিল রহস্য উদ্ঘাটনে লেখক
ভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। চিরন্তন অতৃপ্তির বেদনায় অভিশপ্ত
নের জীবনের ট্রাজেডির সুরটি কাহিনীর উপসংহারে বড়ই করুণ ভাবে
রণিত হইয়া উঠিয়াছে। জীবনে যাহা চাহিয়াছিল তাহা সে পায় নাই,
না রূপায়িত হয় নাই বাস্তবে। তাই তো মানসলোকে সোনা-বউয়ের
ঢ় তার নিত্য অভিসার।

দৃষ্টিভঙ্গীর অভিনবত্বে, চরিত্র-চিত্রণে এবং প্রকাশ-কুশলতায় পুস্তকখানি
লা-সাহিত্যে বিশিষ্ট আসন দাবি করিতে পারে।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত (দ্বিতীয় খণ্ড)—শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
দিত। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—
ড় টাকা।

প্রথম খণ্ড প্রকাশের সাড়ে সাত বৎসর পরে গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত
য়াছে। ১৩৫২ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'প্রবাসী'তে প্রথম খণ্ডের পরিচয়
ওয়া হয়। দ্বিতীয় খণ্ডে আট হইতে চৌদ্দ সর্গের অনুবাদ আছে।
রিশিষ্ট এই খণ্ডের একটি বৈশিষ্ট্য। ইহাতে এই খণ্ডের কতকগুলি পাঠ
শোধন করা হইয়াছে এবং কতকগুলি প্রসঙ্গের তাৎপর্য বিশ্লেষণ উপলক্ষ্যে
ভিন্ন গ্রন্থের অনুরূপ প্রসঙ্গের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থের মর্মগ্রহণে
' অংশটি বিশেষ সহায়তা করিবে। অনুবাদ আক্ষরিক। অনুবাদের ভাষায়
— শব্দের বাহুল্য (স্নাপুব্রত, অভ্যর্চনা, অশ্রুবর্ষণাবিললোচনা জলনিঃস্যন্দি
রগণ, শুভজালাঙ্কিত হস্ত) লক্ষণীয়। সঙ্গে সঙ্গে 'ঘেরিয়া,' 'সিঞ্চিত,'
ীন বরষায় বরষণপীড়িত' প্রভৃতি প্রয়োগ একটু বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপনিষৎ—শ্রীচক্রবর্তী রাজগোপালাচারী।
াধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৩। মূল্য—
় টাকা।

বিভিন্ন বিষয়ে পরমহংসদেবের কতকগুলি উপদেশের তাৎপর্য-বিশ্লেষণ
' গ্রন্থের উদ্দেশ্য। উপদেশগুলি উদ্ধৃত করিয়া রাজাজী তাঁহার অপরূপ

ভঙ্গীতে সরল ভাষায় তাহাদের মর্ম-উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন—প্রসঙ্গক্রমে আনুষঙ্গিক নানা কথার অবতারণা করিয়াছেন। গ্রন্থখানি মূলতঃ তামিল ভাষায় লিখিত এবং ত্রিবাঙ্কুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশন-বিভাগের ভূতপূর্ব তত্ত্বাবধায়ক দক্ষিণ-দেশীয় বঙ্গভাষাভিজ্ঞ শ্রী পি. শেষাদ্রিকর্তৃক বঙ্গভাষায় অনূদিত। ইতিপূর্বে ইনি রাজাজীর মহাভারত বিষয়ক গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া বাঙালী পাঠকের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন লাভ করিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থে তাঁহার সেই খ্যাতি অক্ষুণ্ণ থাকিবে—বাঙালী পাঠক ইহা পড়িয়া তৃপ্তিলাভ করিবেন এবং উপকৃত হইবেন। মাঝে মাঝে ভাষার যে ত্রুটি ও মুদ্রণ-দোষ পরিলক্ষিত হয় তাহা ভবিষ্যৎ সংস্করণে সংশোধিত হওয়া সমীচীন। উপদেশগুলির কোন্‌টি কোন্ গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে তাহার নির্দেশ থাকিলে অনু-সন্ধিৎসু পাঠকের বিশেষ সুবিধা হইত। সেরূপ নির্দেশ দেওয়া সম্ভবপর কিনা প্রকাশক-সংস্থাকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

কয়েকটি বিদেশী গল্প—শ্রীগোপাল ভৌমিক। সরস্বতী লাইব্রেরী, সি. ১৮-১৯, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। মূল্য ২৸৹।

বিভিন্ন ভাষার কথাসাহিত্যিকদের ষোলটি গল্পের বঙ্গানুবাদ। গল্প-রচয়িতাদের মধ্যে আছেন কুপ্রিন, চেকভ, বুসোফ, চিরিকভ, বেন্‌সন্, ষ্টেনবেক, ওকোনেয়র, লেট্রস্, কোপি. ফেকিং, ফিল্‌হো, জেটারষ্ট্রম্, প্রাভেন্‌সাল, মিলোন, স্মিলানস্কি। অনুবাদ প্রাঞ্জল, পরিচ্ছন্ন। ভাষায় দুর্বোধ্যতা বা আড়ষ্টতা নাই। বিদেশের রত্নসম্ভারে বাংলার বাণীমন্দির সুসজ্জিত হইলে বঙ্গবাণীর গৌরব বাড়িবে। শক্তিমান সাহিত্যিকেরা এদিকে মন দিয়েছেন, ইহা সুখের বিষয়।

দধীচির অস্থি—কাফী-খাঁ। এ, মুখার্জী এণ্ড কোং লিঃ, ২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য—১৲।

বাঙালীর পুরানো গৌরব উজ্জ্বল হইয়া রহিল স্মৃতিতে। মনে পড়ে বঙ্কিম-কল্পিত সন্তান-ধর্ম, ক্ষুদিরাম-কানাইলালের আত্মদান, বঙ্গবিভাগ-নিরোধের সংগ্রাম, বাঙালীর শৌর্যবীর্যের অসংখ্য নিদর্শন। বিদেশী শাসক দীর্ঘকালের চেষ্টাতেও তাহাকে সম্পূর্ণরূপে দমন করিতে পারে নাই। কিন্তু বিদায়কালে হানিয়া গেল চরম আঘাত। দলে দলে উদ্বাস্তু হইল পথের ভিখারী, অন্য দেশে শরণার্থী। এই কি জাতির বিনাশের সূচনা? তাহার এই জীবনকথাকে রেখাচিত্রে রূপ দিয়াছেন জনপ্রিয় চিত্রকর কাফী-খাঁ। ভূমিকায় বাঙালীর আত্মরক্ষাবুদ্ধির অভাব সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা বোধ হয়, বাস্তব সত্য।

নির্মাল্য—শ্রীসুধীরঞ্জন প্রামাণিক। শান্তিপুর সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীবিশ্বমোহন প্রামাণিক কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য—১৲।

৩০ পৃষ্ঠার কবিতার বই। অধিকাংশ কবিতাই কোন-না-কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে রচিত। ভাষা ও ছন্দঃ সাবলীল। 'শান্তিপুর' কবিতায় কবি ঐ স্থানের নানা গৌরবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কণ্ট্রোলের অভিশাপ—শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ। শ্রীপ্রভাত কুমার দত্ত কর্তৃক ৩৮।২, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১২৬, মূল্য—২৲।

লেখক বর্ত্তমান খাদ্য-কণ্ট্রোলের বা নিয়ন্ত্রণের বিরোধী। এই সম্পর্কে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত তাঁহার প্রবন্ধগুলির সহিত কতককগুলি নূতন প্রবন্ধ সংযোজনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, দেশে খাদ্যশস্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণ জন্মে, সুতরাং এরূপ অবস্থায় কণ্ট্রোল রাখা কেবল নিরর্থক

নহে, অশেষ ক্ষতিকরও বটে, এবং ইহা নানা দুর্নীতির মূল। কণ্ট্রোল তুলিয়া দিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যকে স্বাভাবিক খাতে চলিতে দিলেই সমস্যার সহজ ও সুষ্ঠ সমাধান হইবে। এই প্রথায় সরকারী গুদামে খাদ্যশস্যের যে বিরাট অপচয় হয় তাহা ব্যবসায়ী কল্পনাও করিতে পারে না। 'হোর্ডিং'-এর আশঙ্কা অমূলক —সুরাবর্দির মন্ত্রিত্বের সময়ে চাউল সম্পর্কিত গোপন অনুসন্ধানের ফলেই জানা গিয়াছিল যে তথাকথিত 'হোর্ডিং' বাংলাদেশে নাই। পুস্তকের স্থানে স্থানে লেখক কোন কোন রাজনৈতিক দলের প্রতি যে সকল কটাক্ষ করিয়াছেন তাহা বাদ দিলেই ভাল হইত। কণ্ট্রোলের কড়াকড়ি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে খাদ্য-কণ্ট্রোল উঠিয়া যাইবে ইহা আশা করা যাইতে পারে। আমাদের বিশ্বাস, যাঁহারা এই বিষয়ে চিন্তা করেন তাঁহারা পুস্তকখানি পড়িলে উপকৃত হইবেন।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

সম্ভবামি যুগে যুগে—শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাবলিসার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনী অবলম্বনে রচিত তিন অঙ্কে সমাপ্ত নাটক। পরমহংসদেবের সাধক-জীবনের অধ্যায়টির নাটকীয় উপস্থাপনে লেখক বিশেষ সাফল্যলাভ করেছেন। বাগ্‌বাহুল্য পরিহার করে নাটকের সংলাপ কত উজ্জ্বল, স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ এবং আবেগ-উচ্ছল করা চলে; আলোচ্য নাটকখানি তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। কিন্তু নাটকের দৃশ্য-পরিকল্পনায় একটি মারাত্মক ত্রুটি চোখে পড়ে। সুসজ্জিত বাগানবাড়ীতে স্বামীজীর সঙ্গে বাঈজীর সাক্ষাৎকার এবং বাঈজী কর্তৃক স্বামীজীকে প্রলোভিত করার চেষ্টার দৃশ্যটি বাদ দেওয়া উচিত। ইতিহাসের দিক হইতে ঘটনাটি সত্য হইলেও, এমনকি নাটকের ক্ষেত্রে নীতিগত প্রশ্নেও আপত্তির কিছু না থাকিলেও এই দৃশ্যটি বর্জ্জনীয়। ইহার অবতারণায় রসাভাস হইয়াছে। এই দৃশ্যটি সমগ্র নাটকের প্রশান্ত সুরটি অকস্মাৎ কাটিয়া দিয়াছে।

শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী

ব্রহ্মর্ষি রজনীকান্ত—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। মহেন্দ্র, পাটনা-৬ হইতে শ্রীকামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। (১৮/০+৬২৪) পৃষ্ঠা, মূল্য সাড়ে দশ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি ঢাকা-বিক্রমপুরের অন্তর্গত বহরগ্রাম নিবাসী রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক স্বধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের জীবনী। বহরগ্রামে মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১২৫৮ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩৩২ বঙ্গাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই জীবনচরিতে দীর্ঘ পঁচাত্তর বৎসরের নানা ঘটনার বর্ণনা ত আছেই, তদুপরি প্রাচীন রাজধানী বিক্রমপুরের তথা সুর ও সেন-বংশের ইতিহাস; কৌলিন্যমর্যাদার বিবরণ; যজন-যাজন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনাদি কর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণসমাজের কথা; টোলের পড়া ও বিদ্যার্থীদের ফাকি-ফেঁয়ালি; নানা বিখ্যাত স্থানের পরিচিতি; প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য এবং দেববিগ্রহাদির তত্ত্বকথা; পল্লীবাসী ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ঘরের কথা, সমাজের সর্বশ্রেণীর সুখ-দুঃখের কাহিনী ইত্যাদি বহু বিষয় দশটি পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার রজনীকান্তের সর্বকনিষ্ঠ তনয়—ত্যাগী বৈষ্ণবপন্থী। তাঁহার রচনা-কৌশল এবং বিষয়বিন্যাস-প্রণালী প্রশংসনীয়। বিশিষ্ট ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, আচার-ব্যবহার, হিন্দুসমাজের ব্যবস্থা, নিত্যনৈমিত্তিক পূজা-উৎসবাদির বিস্তৃত বিবরণ শাস্ত্র-নির্ধারিত প্রমাণপ্রয়োগসহ ইহাতে পরিবেশিত হইয়াছে।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী
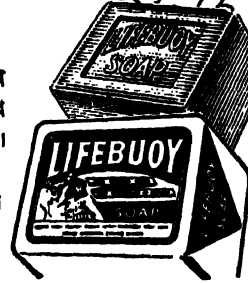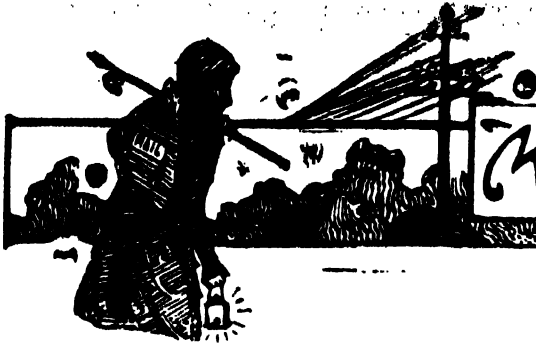
বঙ্গীয় নৌবাহন সম্মেলন, বালি

নদীমাতৃক বঙ্গে বাচখেলা এক সময় একটি প্রধান ক্রীড়া বলিয়া গণ্য ছিল। গত শতাব্দীর সপ্তম দশকে নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হিন্দুমেলার বাৎসরিক অধিবেশনগুলির একটি প্রধান অঙ্গ ছিল এই বাচখেলা। পূর্ব্বাপর এই খেলা প্রচলিত থাকিলেও তদবধি ইহার প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনোযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। তখন বাচখেলা কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে নূতন করিয়া আরম্ভ হইয়াছিল। কলিকাতার সন্নিকটে বালিতেও একটি বাচের দল ১৮৮৯ সনে গঠিত হয়। বাংলার পূর্ব্বাঞ্চলে বিজয়া দশমীতে এই বাচখেলা বিশেষ সমারোহে উদ্‌যাপিত হইত। আর ইহাতে মুসলমানগণও মুখ্যতঃ সাগ্রহে যোগদান করিত। দুঃখের বিষয়, দীর্ঘকাল যাবৎ এই বাচখেলা ইতিহাসের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতার অনতিদূরে বালি বরাবর গঙ্গার দুই তীরে এই বাচখেলা নবোদ্যমে সুরু হইয়াছে। বালির অধিবাসীরাই এই বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন। বাচখেলার পুনরুজ্জীবনে বালি-নিবাসী শ্রীযুক্ত রতনমণি চট্টোপাধ্যায়ের প্রাণপণ চেষ্টা এ সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আগ্রহশীল সহকর্ম্মীদের লইয়া তিনি পুরাতন রীতি অনুসারে একখানি বাচের নৌকা তৈয়ারি করাইতে সমর্থ হন। এই নৌকার নাম দেওয়া হইয়াছে 'অলকানন্দা'। গত ১১ই নবেম্বর (১৯৫২) পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ইহার উন্মোচন করেন। ইহার পর বাচখেলার একটি প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। এই প্রতিযোগিতায় আড়িয়াদহ, বরানগর, বেনিয়াটোলা (কলিকাতা), উত্তরপাড়া ও বালির দল যোগদান করেন। গত ২২শে মার্চ্চ বালিতে যে নৌবাহন সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হয় তাহাতে প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষিত হয়। নিম্নে বালির 'সাধারণী' হইতে এই সম্মেলনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল :

গত ২২শে মার্চ্চ ১৯৫৩ রবিবার সন্ধ্যায় বালি শান্তিরাম বিদ্যালয় ভবনে বালি রাধানাথ বাচ সমিতির উদ্যোগে বঙ্গীয় নৌবাহন সম্মেলনের অধিবেশন হয়। এরূপ সম্মেলন পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম। পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার অধ্যক্ষ শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। রাধানাথ বাচ সমিতির সভাপতি ডাক্তার শ্রীসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায় সভাপতি মহাশয় ও সমাগত সকলকে অভ্যর্থনা করেন। সম্পাদক শ্রীশঙ্করনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নৌবাহনের বিবরণী পাঠ করেন। নৌবাহনের গৌরবের দিন, পরবর্ত্তীকালে নৌবাহনের অবনতি এবং পরে আড়িয়াদহ রোয়িং ক্লব, বরাহনগর নৌবাহিনী, বেনিয়াটোলা রোয়িং ক্লব, উত্তরপাড়া লক্ষ্মীনারায়ণ, উত্তরপাড়া রোয়িং ক্লাব এবং বালি রাধানাথ বাচ সমিতির সম্মিলিত উদ্যোগে নৌবাহনের পুনরুজ্জীবনের কথা বিবরণীতে ছিল। শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (বরাহনগর), শ্রীঅনন্তদেব ঘোষাল (আড়িয়াদহ), শ্রীমদনমোহন পাল (বেনিয়াটোলা), শ্রীহৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া) নৌবাহনের উপযোগিতা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দেন। সভায় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রথম

দিনে দিনে আরও
মসৃণ ও রমণীয় ত্বক্

রেক্সোনার ক্যাডিলকে আপনার জন্যে এই যাদুটি ক'রতে দিন

রেক্সোনার ক্যাডিলযুক্ত ফেনা আপনার গায়ে বেশ ভাল ক'রে ঘ'ষে নিন ও পরে ধুয়ে ফেলুন। আপনি দেখবেন দিনে দিনে আপনার ত্বক্ আরও কতো মসৃণ, কতো নির্ম্মল হ'য়ে উঠছে।

* ত্বক্‌পোষক ও কোমলতাপ্রদ কতকগুলি তৈলের বিশেষ সংমিশ্রণের এক মালিকানী নাম

RP. 101-50 BG

রেক্সোনা প্রোপ্রাইটারি লিঃএর তরফ থেকে ভারতে প্রস্তুত

প্রস্তাবে গঙ্গার উভয় তীরস্থ গ্রাম ও শহরের যুবকগণকে নৌবাহন ও পান্‌সি নৌকা গঠনে অবহিত হইতে আহ্বান করা হয় এবং সংবাদপত্র-সম্পাদকগণকে অনুরোধ করা হয় যেন তাঁহারা বাচখেলা সম্বন্ধে উৎসাহপূর্ণ প্রবন্ধাদি লেখেন বা প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় প্রস্তাবে বিভিন্ন সমিতি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতার উল্লেখ করিয়া নৌবাহনে নব উৎসাহ সঞ্চারের কথা পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ও জনসাধারণের গোচরে আনা হয়। তৃতীয় প্রস্তাবে রাজ্যপাল মহাশয়ের প্রতিশ্রুত কাপ বা শিল্ড যোগাড় করিবার ভার শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়ের উপর দেওয়া হয়। সভাপতি মহাশয় তাঁর উদ্দীপনা-পূর্ণ বক্তৃতায় গঙ্গাবক্ষে নৌবাহনের ফলে যুবকগণের দেহ ও মনের শুচিতা ও শক্তিবৃদ্ধির কথা বলেন এবং নদীমাতৃক দেশের এই খেলাকে সর্ব্বত্র প্রসারিত করিতে আহ্বান করেন। তৎপর তিনি ঐ দিনের খেলার বিজয়ী আড়িয়াদহ রোয়িং ক্লব, বিজিত বরাহনগর নৌবাহিনী এবং বিশেষ বাচখেলায় বিজয়ী বেনিয়াটোলা রোয়িং ক্লাবকে পারিতোষিক দেন। শ্রীজ্যোৎস্নাকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় নৌবাহন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দেন। সভায় নৌবাহন সম্পর্কে স্বর্গীয় নরসিংহ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীঅমূল্য ঘোষের প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করা হয়। প্রবীণ নৌবাহন-সেবী শ্রীরবীন্দ্রকুমার মল্লিক সকলকে ধন্যবাদ দেন।"

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বর্ত্তমান বৎসরের (১৯৫২-৫৩ ইং) রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। ১৩৫৮ সালের চৈত্র মাসে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত, তাঁহার রচিত বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান (প্রথম ভাগ, বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চ্চা) নামক গ্রন্থের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁহাকে এই পুরস্কার প্রদান করিলেন।

১২৯৭ সালের ১২ই অগ্রহায়ণ কুমিল্লা নগরীতে দীনেশচন্দ্রের জন্ম হয়। তৎকালে তাঁহার পিতৃদেব পরলোকগত কৈলাসচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (১২৬০-১৩৪৫ সাল) মহাশয় কুমিল্লা জেলা-স্কুলের হেড্‌-মাষ্টার ছিলেন। ১৯১৪ ইংরেজীতে দীনেশচন্দ্র সংস্কৃতে এম-এ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া হেমচন্দ্র গোস্বামী পুরস্কার ও স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। তৎপর দুই বৎসর (১৯১৫-১৭ ইং) মাসিক ১০০৲ টাকা বৃত্তি পাইয়া কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে গবেষণা করেন। তাঁহার অধ্যাপক-জীবনের সূত্রপাত হইয়াছিল বাঁকিপুরে (১৯১৭ ইং) এবং পরে যথাক্রমে রাজসাহী (১৯১৭-২০), ঢাকা (১৯২০-২১), কলিকাতা (বেথুন কলেজ ১৯২১-২২) ও চট্টগ্রাম কলেজে (১৯২২-৩৬) সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার অধ্যাপনা করেন। সর্ব্ব-শেষে হুগলী মহসীন কলেজে দশ বৎসর (১৯৩৬-৪৬) সংস্কৃতের অধ্যাপনা করিয়া অবসর গ্রহণ করেন।

তাঁহার গবেষণা প্রধানতঃ অমুদ্রিত পুথি লইয়া—তাহা হইতে বহু নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া বিভিন্ন পত্রিকায় শতাধিক ইংরেজী ও বাংলা প্রবন্ধ তিনি প্রকাশ করিয়াছেন; তন্মধ্যে *Indian Antiquary. Journal of the Ganganath Jha Research Institute* (Allahabad), *Annals*, Bhandarkar
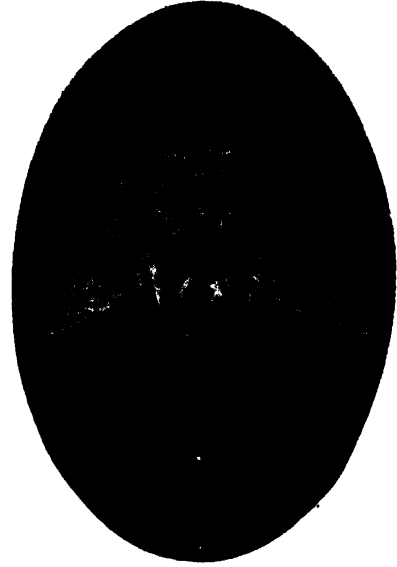
শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

Oriental Research Institute (Poona), *Indian Historical Quarterly*, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা এবং প্রবাসী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দীনেশবাবু বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুরুষোত্তমদেব-রচিত পরিভাষাবৃত্তি-জ্ঞাপকসমুচ্চয়-কারকচক্র সম্পাদন করেন।

হস্তলিখিত পুরনো কুলজী-গ্রন্থ হইতে অক্লান্ত পরিশ্রমে বহু তথ্য উদ্ধার করিয়া দীনেশচন্দ্র বাঙালীর সামাজিক তথা জাতীয় ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

প্রাচ্যবাণী মন্দিরের বার্ষিক অধিবেশন

সম্প্রতি কলিকাতা রাজভবনে প্রাচ্যবাণী মন্দিরের দশম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল ডক্টর শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় প্রধান অতিথি, শিক্ষা-মন্ত্রী শ্রীপান্নালাল বসু সভাপতি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডক্টর শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বোধকের আসন অলঙ্কৃত করেন। ডক্টর শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ও ভাইস-চ্যান্সেলার পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তে আনন্দ প্রকাশ করেন। প্রাচ্যবাণীর যুগ্ম-সম্পাদক ডক্টর শ্রীযতীন্দ্র বিমল চৌধুরী বলেন, বিগত দশ বৎসরে প্রাচ্যবাণী মন্দির হইতে আটখানির অধিক গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাচ্যবাণী মন্দিরের তত্ত্বাবধানে তিনটি সংস্কৃত চতুষ্পাঠী পরিচালিত হয়; তন্মধ্যে একটি মহিলাদিগের জন্য। নিখিল-ভারতের সর্ব্বত্র প্রাচ্যবাণী মন্দিরের শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ধপ্‌ধপে
ক'রে কাচা
ঝক্‌ঝকে
ক'রে কাচা
সান্‌লাইট
সাবানের দৌলতে
না আছড়ে কাচলেও
কাপড়চোপড় সাদা ও
ঝক্‌ঝকে ক'রে দ্যায়!
SUNLIGHT SOAP
SUNLIGHT SOAP

ভারতীয় সাহিত্যিক-সঙ্ঘ

গত ৮ই ফেব্রুয়ারী ভারতীয় সাহিত্যিক-সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় কার্য্যালয় সমিতির এক বিশেষ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ভারতীয় সাহিত্যিকদের এই মিলনক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রকার উন্নতিমূলক কার্য্যসূচী নির্দ্ধারিত হয়। এপর্য্যন্ত বিভিন্ন সাহিত্যিকের ৫৮টি রচনা অনুবাদ করাইয়া বিভিন্ন পত্রিকাদিতে প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সর্ব্বসমেত চল্লিশ জন সাহিত্যিককে বিভিন্ন সভায় সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন সাহিত্য সমিতি, সংস্কৃতিপরিষদ, বিবিধ প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগারের সহযোগিতা পাওয়া যাইতেছে। এপর্য্যন্ত কয়েকটি বড় বড় শহরে সঙ্ঘের ৮টি শাখাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। প্রত্যেক কেন্দ্রেই ভিন্ন ভাষাভাষী সাহিত্যিকদের লইয়া কাজ চলিতেছে। অনুবাদ সাহিত্যের দিকেও ভারতীয় সাহিত্যিক-সঙ্ঘের বিশেষ চেষ্টা আছে। ভাষাভাষী সাহিত্যিকদের পারস্পরিক যোগসংস্থাপন করাই এই সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য। এই সমিতির কেন্দ্রীয় কার্য্যালয় [illegible], মদন মিত্র লেন, কলিকাতা ৮।

শোক সংবাদ

১লা এপ্রিল ১৯৫৫ সনে মার্টিন কোম্পানীর সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠাতা স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা মায়ালতা দেবী তাঁহার ৬নং লোয়ার সার্কুলার রোডস্থ নিজ ভবনে করোনারি থ্রম্বোসিস রোগের আক্রমণে মুহূর্ত্তে (মাত্র দশ মিনিট কালমধ্যে) অকস্মাৎ দেহত্যাগ করিয়াছেন। মায়ালতা দেবী সেই শ্রেণীর মহিলা ছিলেন, এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে যাঁহাদের সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর সহিত আজও তুলনা করা হয়। তিনি অতুল ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন পিতৃগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং সৌভাগ্যের ক্রোড়ে লালিতা পালিতা হইয়াও অমায়িকতা, সরলতা, স্নেহশীলতা প্রভৃতি চারিত্রিক উত্তম গুণরাশির অধিকারিণী থাকায় আপামর সর্ব্বসাধারণের ঐকান্তিক স্নেহশ্রদ্ধার পাত্রী হইয়াছিলেন। জননীর নিকট হইতে শিক্ষার মধ্য দিয়া হিন্দু রমণীর চির বন্দিত মহত্তম উচ্চাদর্শ লাভ করিয়া সারাজীবন সেই অনুসারে জীবনগঠন ও পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। সেদিনে যে সকল হিন্দু বাঙালী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সমন্বয়ে জীবন ও পরিবারগঠন করিয়াছিলেন স্যার রাজেন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে একজন। তাঁর পত্নী ও কন্যাগণ বাংলাদেশের সেদিনের আদর্শ পরিবাররূপে সর্ব্বজনসমাদৃত। প্রাচীন হিন্দুসমাজের নির্দ্দেশিত নিয়মনিষ্ঠাকে শিরোধার্য্য করিয়াও যে বর্ত্তমান কালোচিত শিক্ষা ও সংস্কার গ্রহণ করিয়া উন্নতি লাভ করিতে পারা যায়, ভূদেবের মত তাঁহারও এই অভিমত ছিল। সেইহেতু মায়ালতার স্বাভাবিক গুণরাশি পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জ্জিত হইয়া আদর্শস্থানীয় হইবার অবসর প্রাপ্ত হয়। তাঁহার স্বামী মার্টিন কোম্পানীর অংশীদার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র প্রভাতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সর্ব্বতোভাবে তাঁহাকে সে সুযোগ প্রদান করিতে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। উচ্চতম রাজপুরুষগণ—কি বিদেশী কি স্বদেশীয়—রাজ্যপাল

মায়ালতা দেবী

এবং তাঁহাদের পত্নীগণ সকলেই মায়ালতা দেবীকে শুধু মৌখিক সৌজন্যই নয়, আন্তরিক শ্রদ্ধা সম্মান, ক্ষেত্রবিশেষে বিশেষ স্নেহ প্রদান করিয়াছেন।

অপরপক্ষে তাঁর পিতৃকুল, শ্বশুরকুল এবং যে কোন নিঃসম্পর্কিত আত্মীয় বা পরিচিত, অতি সাধারণ অথবা অতি দুঃস্থ পরিবারেও তাঁহার স্থান গভীর স্নেহ শ্রদ্ধা ও আন্তরিক ভালবাসার মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। কেহ কোনদিন তাঁহার অমায়িক ও আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহারে তাঁহার সঙ্গে নিজেদের অবস্থার বিন্দুমাত্র তারতম্য অনুভব করিতে পারিত না। রাজপ্রাসাদেও যেমন মধ্যবিত্ত, স্বল্পবিত্ত গৃহস্থ গৃহেও তেমনই আগ্রহে ও অকৃত্রিম দাবির মধ্য দিয়া তাঁহার সাগ্রহ আমন্ত্রণ ছিল। তিনি লোকহিতকর বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

তাঁহার দাম্পত্য পারিবারিক জীবন অত্যন্ত সুখময় ছিল। তিনি পতি, দুই কন্যা, দুই জামাতা, দুই দৌহিত্র এবং শোকসন্তপ্ত বহু আত্মীয়-পরিজন রাখিয়া গিয়াছেন।
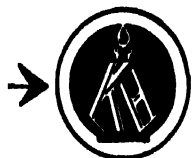
কে, হেঁ, বসুর
মহাভৃঙ্গরাজ তৈল
চুল উঠা বন্ধ করে
মাথা ঠাণ্ডা রাখে
এই মার্কা দেখে কিনুন • নকল থেকে সাবধান

আলোচনা

শ্রীদীননাথ

[গত ফাল্গুন মাসের 'প্রবাসী'তে শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র কর্তৃক লিখিত 'আঁটপুর' প্রবন্ধ সম্বন্ধে শ্রীদীননাথ দে ('অরুণোদয়', মধুপুর) লেখককে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত হইল। দীননাথবাবুর বয়স ৯১ বৎসর]

'প্রবাসী'তে তোমার আঁটপুর সম্বন্ধীয় লেখা পড়েছি। মিত্র-বংশের ইতিহাস লিখতে গোড়াতেই যে সূত্রপাত করেছ সেটা একটা চলতি গল্পের উপর নির্ভর করে লিখেছ; সে গল্পের উৎস কোন ঐতিহাসিক তথ্য নয়, কেবল ঘটকদের কুলজী গ্রন্থ, সে গ্রন্থের পনের আনা কল্পনাবিলাস এবং এক আনা কিম্বদন্তির উপর রং-ফলানো। তুমি লিখেছ, 'কথিত আছে যে বঙ্গাব্দ দ্বিতীয় শতাব্দী এবং খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে গৌড়েশ্বর আদিসুর···'। প্রথমতঃ বঙ্গাব্দের দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ প্রভৃতি শতাব্দ আদৌ ছিল না। ও অব্দ আরম্ভ হয় দশম শতাব্দ থেকে। মোগল সম্রাট আকবর যে দিন সিংহাসন আরোহণ করেন, সেই দিন হিজিরি অব্দ ছিল ৯৬৩, আমার যতদূর মনে হয়। সে সময়ে বঙ্গে মুসলমান আধিপত্য, সেইজন্য বঙ্গে সেই কি ৯৬৩ থেকে অব্দ চালু কর' হয়। আকবরের সিংহাসন আরোহণ খ্রীষ্টাব্দ ১৫৫৬ সালে, তখন থেকে ৪০০ বৎসরের পরে বঙ্গাব্দ দাঁড়িয়েছে ১৩৫৯, আর হিজরি অব্দ যদিও বঙ্গাব্দের সঙ্গে এক সংখ্যাতেই আরম্ভ হয় তবু এখন দাঁড়িয়েছে ১৩৭১।৭২, তার কারণ হিজরি অব্দের বৎসরগুলো চান্দ্র বৎসর এবং বঙ্গাব্দের বৎসর-গুলো সৌর বৎসর, চান্দ্র বৎসর দশ দিন আগে শেষ হ'য়ে যায়, সেইজন্য ৪০০ বৎসরে উভয় অব্দের বর্ষ সংখ্যায় ১১।১২ বৎসর তফাৎ হয়ে গেছে। যাহোক এখন বুঝতে পারলে যে 'বঙ্গাব্দ দ্বিতীয় শতাব্দী' নামে কোন শতাব্দী ছিল না। বঙ্গে লক্ষ্মণাব্দ বলে একটা অব্দ প্রচলিত ছিল, শেষ সেনবংশীয় রাজা লক্ষ্মণ সেন সেটা চালু করেন, বঙ্গাব্দ চালু হবার পর সে অব্দ লোপ পায়।···

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে বঙ্গদেশের রাজা ছিলেন শশাঙ্ক দেব, তার পর সপ্তম শতকে বাংলাদেশে মাৎস্যন্যায় (anarchy বা অরাজকতা) ছিল, তার পর খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বাংলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা ও সামন্ত রাজারা অরাজকতা শেষ করবার জন্য সকলে একমত হয়ে পালবংশীয় গোপালকে বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান অধিনায়ক বলে নির্ব্বাচন করলে, তখন থেকে চার শ' বৎসর যাবৎ পালবংশীয়রা বঙ্গদেশের একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন। আদিশূর নামক কোন ব্যক্তি কখনও গৌড়েশ্বর ছিল না। শূরবংশীয় একজন ক্ষুদ্র রাজা বা সামন্তর নাম পাওয়া যায়, তিনি রাঢ়ের এক অংশে রাজত্ব (তার নামটা এখন আমি ভুলে যাচ্ছি) করতেন, তার কন্যাকে বল্লাল সেন বিবাহ করেছিলেন। তুমি 'আদিশূর' লিখতে 'আদিসুর' লিখেছ। বংশটা শূর বংশ, সুর নয়। তারপর পশ্চিম থেকে ব্রাহ্মণ আনা সম্বন্ধে একটা সন্ধান পাওয়া গেছে যে রাজা শশাঙ্ক ছয় জন ব্রাহ্মণ আনিয়েছিলেন। চটবংশীয় ব্রাহ্মণ পালবংশীয় রাজাদের আমলেও ছিল। পাঁচ ব্রাহ্মণের সঙ্গে পাঁচ ক্ষত্রিয় কায়স্থ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অশ্বারোহণে ব্রাহ্মণদের শরীর রক্ষীরূপে এসেছিল, এ একটি উপন্যাসের উপযোগী বর্ণনা।

আমার মনে হয় 'ক্ষত্রিয় কায়স্থ' এ কথাটা তোমার নিজের উদ্ভাবিত। পূর্ব্বকালে কায়স্থকে ক্ষত্রিয় কেউ বলত না, কায়স্থ এক রাজকর্ম্মচারীর উপাধি, ইংরেজীতে যাকে সেক্রেটারী বলা যায়। সম্রাট অশোক (খ্রীষ্ট পূর্ব্ব তৃতীয় শতক) স্থানে স্থানে যে প্রস্তরস্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন তার একটা স্তম্ভ মধ্যভারতে আছে, তাতে রাজকর্ম্মচারীদের তালিকা খোদিত আছে, সেই তালিকাতে একজন কর্ম্মচারীর নাম আছে কায়স্থ। বাস্তবিক কায়স্থ ছিল মসীজীবী ও হিসাবরক্ষক। সেই কায়স্থকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অশ্বারোহণে আগমন করছে বললে যাত্রার সং বলে মনে হয়। বাংলাদেশে জাত সৃষ্টি করা হয়েছিল ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ও বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ এই দুই পুরাণে, ঐ পুরাণদ্বয় একাদশ কি দ্বাদশ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে লেখা হয়েছিল। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে প্রথম স্থান অবশ্য ব্রাহ্মণকে দেওয়া হয়েছে, তার পর বৃত্তি অনুসারে ৩৬ জাত সৃষ্টি করা হয়েছে—যথা, কায়স্থ, করণ, বৈদ্য, কুমোর, কামার, ছুতোর, তাঁতি, গন্ধবেণে, মালাকার, তেলি প্রভৃতি। তারপর বাকী অসংখ্য জন অন্ত্যজ অস্পৃশ্য, জল অনাচরণীয় এই সব। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই দুই শব্দের নামগন্ধও ঐ দুই পুরাণে নাই।···তারপর পঞ্চদশ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্যদেবের সমসাময়িক রঘুনন্দন এক স্মৃতি লিখে জোর গলায় প্রচার করলেন, বাংলাদেশে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণরাই দ্বিজ, আর সকল বর্ণই শূদ্র।

যাক ও সব অবান্তর বিষয় ছেড়ে এখন কথা হচ্ছে যে, পশ্চিম বাংলার মিত্র বংশের আদিপুরুষ কে; তিনি কি কুলজী গ্রন্থে কল্পিত সেই ব্যক্তি যাকে তুমি রং চড়িয়ে ক্ষত্রিয়, যোদ্ধা, অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত অশ্বারোহী বলে তাঁর গৌরব বৃদ্ধি করেছ আবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণের দেহরক্ষী (সোজা কথায় চাকর) বলেছ। আমার মতে ও রকম কল্পিত অপমানসূচক বিবরণ দিয়ে আদিপুরুষকে উপস্থিত না করলে ভাল হইত। তারপর আদিপুরুষের অধস্তন নবম বা দশম বা অন্য কোন সংখ্যা আন্দাজ ঠিক করে ধুই মিত্র ও গুই মিত্র এই দুই ব্যক্তিকে উপস্থাপিত করে ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে এসে পৌঁছলেই হ'ত। তুমি লিখেছ ধুই মিত্র, আমরা ছেলেবেলায় শুনতুম দুই মিত্র, আর একটা বচন শুনতুম 'দুই মিত্তির বঁড়যে বেহালা, গুই মিত্তির টাকি'। ঐ বচনে এটাই ইঙ্গিত করা হ'ত যে, দক্ষিণরাঢ়ি কায়স্থ এবং বঙ্গজ কায়স্থ প্রকৃতপক্ষে দুই পৃথক শ্রেণীর কায়স্থ নয়, পরন্তু এক শ্রেণীর কায়স্থ। যা হোক ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে এসে বেহালা বংশ থেকে কোন্নগর বংশের উদ্ভব, সেখান থেকে তোমাদের বংশের উদ্ভব এই সবের বর্ণনা তুমি যে সুষ্ঠুভাবে করেছ সে সব অবিশ্বাস করবার কোন কারণ নাই, কেবল কুলজী গ্রন্থের কাল্পনিক উপন্যাসের উপর যে অংশে তুমি নির্ভর করেছ সেইটাতেই আমি আপত্তি করছি।'

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

প্রবাসী

পাল্কী চলে

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

(১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৭০)

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৩শ ভাগ ১ম খণ্ড } জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০ { ২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

পঁচিশে বৈশাখ

আবার বৎসর ঘুরিয়া আসিল। এক যুগ পূর্ব্বে যে যুগপ্রবর্ত্তক মহামানবের তিরোধান হইয়াছে তাঁহারই স্মৃতিতর্পণ এবারও দীন দরিদ্র ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত বাঙালী করিল। তবে এবার যেন পূর্ব্বের সেই আবেগ কিছু হ্রাস পাইয়াছে। কবিগুরুর আবির্ভাবের কারণে আনন্দ ও শ্লাঘা জ্ঞাপন এবং তাঁহার মহাপ্রয়াণে শোকোচ্ছাস দুই-ই যেন কিছু বাঁধিগতের সুরে গাওয়া হইয়াছে। ইহার কারণ কি?

বিবেচনার সময় আসিয়াছে—দেশ রবীন্দ্রনাথের আদর্শবাদ ও কর্ম্মধারা প্রত্যক্ষ ভাবে কতটা উপলব্ধি করিয়াছে! বিচারের সময় আসিয়াছে তাঁহার প্রেরণা দেশের লোক সাক্ষাৎরূপে কতটা গ্রহণ করিয়াছে। সেই প্রেরণার ও সেই আদর্শবাদের মূল উৎস যাঁহার অন্তরে নিহিত ছিল, তিনি আমাদের ছাড়িয়া গিয়াছেন। পরিতাপের বিষয় এই যে, তাঁহার কর্ম্মধারা প্রবাহিত হইত যে সকল ক্ষেত্রে তাহারও অন্যতম কেন্দ্র আজ অযোগ্য অধিকারীর কার্য্যকলাপে নীরস ও ঊষর ভূমিতে পরিণত হইতে চলিয়াছে। সেখানে শিক্ষার ধারা চালিত হইতেছে এইরূপ এক মণ্ডলীর নির্দ্দেশে ও আদেশে যাহার আদর্শ, শিক্ষা-দীক্ষা সবকিছুই রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শনের পরিপন্থী। যে পরিবেশে আজ সেখানে শিক্ষাদান চলিতেছে তাহা রবীন্দ্রনাথ যাহাকে চিরদিন বর্জ্জনীয় ও দূষণীয় বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন তাহারই কর্কশ ও অসংস্কৃত রূপ।

"শিবম"-লোপ আজ যেন প্রকৃতই হইয়াছে। আজিকার দিনে আগের সে আনন্দও নাই, সে মৈত্রী ও বিদ্যার নির্ম্মল, স্নিগ্ধ, শাশ্বত আদর্শময় জ্যোতিও সেখানে প্রতিভাত হইতেছে না। যাহা রহিয়াছে ও যাহা বর্ত্তাইতেছে তাহা বাস্তব, কিন্তু সে বাস্তব ভঙ্গুর ও নশ্বর। তাহার নির্ভরতা শুধু আর্থিক মানের উপর, তাহার মূলে আজ কেবলমাত্র বিদ্যাপণ—প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবের।

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিতর্পণ কি আমরা এক দিনের নৃত্যগীত ও বাক্যোচ্ছাসেই করিব?

একলা চলো রে!

বিহারের কয়েকটি বাংলা ভাষাভাষী ও বাঙালী অধিবাসীপূর্ণ অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাবে, সংবিধানের অনুচ্ছেদ অনুসারে বিহারের পরিষদে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে ১২ই মে অর্থাৎ ২৯শে বৈশাখ। আলোচনা আজও শেষ হয় নাই; সুতরাং তাহার বিচার-বিবেচনা এই সংখ্যায় করা অসম্ভব। তবে এপর্য্যন্ত সেখানকার আলোচনার যে সকল বৃত্তান্ত আমরা সংবাদপত্রে, বিশেষতঃ ইংরেজী সংবাদপত্রে, পাইয়াছি তাহাতে বুঝাই যাইতেছে, "চোরা নাহি শুনে ধর্ম্মের কাহিনী"!

২২শে বৈশাখের "যুগান্তর" ঐ বিতর্কের উপর সম্পাদকীয় দিয়াছেন "অযৌক্তিক উষ্মা" শিরোনামায়। আমাদের প্রশ্ন এই যে, বিনা অধিকারে ও বিনা যোগ্যতায় প্রাপ্ত চোরাই মাল বিনা উষ্মায় ফেরত দিতে প্রস্তুত কয়জন রত্নাকরের আখ্যায়িকা, ইতিহাস বা পুরাণে পাওয়া যায়? ব্রিটিশ দস্যু তো মানভূম, সিংভূম, ছোট-নাগপুর, সাঁওতাল পরগণা এই সকল খনিজপূর্ণ ও অরণ্যময় অঞ্চল বিহারকে দিয়াছিল বিহারী তখন রাজনীতিতে অজ্ঞ ও অক্ষম ছিল বলিয়াই, যাহাতে ইংরেজের শোষণনীতি অবাধে সেখানে চলে? আজও তো যোগ্যতার অভাব সেখানকার ন্যায়নীতি ও আদর্শের অভাবে অতিশয় প্রকট! তবে উষ্মার অভাব হইবে কেন?

আমাদের উচিত এখন কর্ত্তব্য বিচার করা এবং পথনির্দ্দেশক বাছিয়া লওয়া। আইন-কানুন এদেশে তো সকল ক্ষেত্রেই লুণ্ঠক তস্করের সুবিধার পথ খুলিয়া দিয়াছে, এক্ষেত্রেও হইবে তাহাই। সুতরাং সে দিকে সহজে কিছু হইবার নহে আমাদের জানা উচিত। অনশনে দু-দশ জন মরিলেও কিছু হইবে না যদি না দেশে আত্মবোধের চেতনা আসে।

আমাদের বুঝিতে হইবে যে, অতি দুর্গম পথে আমরা পদার্পণ করিয়াছি এবং আমাদের সঙ্গী কেহই নাই। "নেতা" জাতীয় জীবের মধ্যেও অনেকের টিকি বাঁধা অন্য প্রদেশে। এই কঠিন বিপৎসঙ্কুল পথে আমাদের একলাই চলিতে হইবে।

আমাদের দাবী ন্যায্য ও ধর্ম্মসঙ্গত। মানভূম সম্পর্কে সে দাবী বিহারী নেতৃবর্গও ন্যায্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন ১৯১২ সনে। এই বিহার পরিষদের বিতর্কে শ্রীশ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐ মত বিহারের স্পীকার যথার্থ বলিয়া মানিয়াছেন। বাংলা ভাষা সম্পর্কে শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত কি তাহা আমরা জানিতে চাই। সেই মত পাইলে তাহার বিচার চলিবে।

অনুসারে পিতাই সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র মালিক এবং পিতার জীবিত অবস্থায় পুত্রদের সম্পত্তিতে কোনরূপ অধিকার নাই। এই আইন প্রধানতঃ বাংলাদেশে প্রচলিত। মিতাক্ষরা আইন বাংলাদেশ ব্যতীত ভারতের অন্যান্য প্রদেশে প্রচলিত এবং এই আইন অনুসারে পুত্রের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে পিতার পৈত্রিক সম্পত্তিতে সে সমান অধিকারী হয়। এখন দেখা যাউক, সম্পদা-শুল্ক কি ভাবে এই দুই সম্পত্তির উপর কার্য্যকরী হয়।

দায়ভাগ সংসারে পিতা যদি এক লক্ষ টাকা ও দুই ছেলে রাখিয়া মারা যান তাহা হইলে এই সম্পত্তি হইতে সম্পদা-শুল্ক আদায় করা হইবে। কারণ সম্পত্তির মূল্য নিম্নতম মানের অধিক। কিন্তু মিতাক্ষরা সংসারে যদি পিতা এক লক্ষ টাকার পৈতৃক সম্পত্তি ও দুই ছেলে রাখিয়া মারা যান তাহা হইলে সেই সম্পত্তির উপর কোন সম্পদা-শুল্ক ধার্য্য করা হইবে না। কারণ প্রত্যেক ছেলে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে পৈতৃক সম্পত্তিতে সমান ভাবে অধিকারী হইয়াছে। পিতার জীবিত অবস্থায় তাহাদের প্রত্যেকের (পিতা ও প্রত্যেক পুত্রের) অংশ এক লক্ষ টাকার এক-তৃতীয়াংশ। পিতার মৃত্যুর পর দুই ছেলের অংশ অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক হইবে, অর্থাৎ প্রত্যেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তির অধিকারী হইবে। সম্পদা-শুল্কের নিম্ন মান যদি ৫০ হাজার টাকার সম্পত্তি হয়, তাহা হইলে এই সম্পত্তির উপর কোন কর দিতে হইবে না, কারণ পিতার জীবিত অবস্থায় প্রত্যেকের অংশ ছিল তেত্রিশের একের তিন হাজার টাকার সম্পত্তি—পিতার সম্পত্তি মোট তেত্রিশের একের তিন হাজার টাকার হওয়ায়, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার অংশ নিম্নতম মানের মধ্যে থাকায় কোন শুল্ক দিতে হইবে না।

এইরূপে দেখা যায়, একই আইন সমানভাগে সকলের উপর প্রযোজ্য হইবে না। ইহা শুধু রাষ্ট্রতন্ত্রবিরোধী নহে, প্রাকৃতিক বিচারবিরোধী। আগে হিন্দু উত্তরাধিকার আইন সংশোধন করিতে হইবে—মিতাক্ষরাকে দায়ভাগে রূপান্তরিত করিতে হইবে, নচেৎ ভারতে শুধু বাংলাদেশই অন্যায়ভাবে এই আইনের আওতায় পড়িবে।

প্রস্তাবিত সম্পদা-শুল্ক আইন বিলের সাত ধারাটি অতি আপত্তিজনক। ইহা দ্বারা মিতাক্ষরা সংসারকে অযথা সুবিধা দেওয়া হইয়াছে এবং অনেক মিতাক্ষরা পরিবার বংশপরম্পরায় সম্পদা-শুল্কের আওতায় পড়িবে না। সেই জন্য মিতাক্ষরাকে দায়ভাগের পর্য্যায়ে না আনিলে সম্পদা-শুল্ক আইনটিকে কার্য্যকরী করা উচিত হইবে না। অন্যথায় সকল ক্ষেত্রেই এই বিষয়ে মিতাক্ষরার বিচার চলিবে, ইহা স্থির করা উচিত। বাংলায় সংবাদপত্র এ বিষয়ে উদাসীন কেন জানি না। অবশ্য তাঁহারা কোন্ বিষয়ে উৎসাহী তাহাও জানি না।

শিল্প নিয়ন্ত্রণ

১৯৫১ সনে যে শিল্প উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ আইন পাস হয় তাহার কার্য্যকারিতা এখনও তেমন প্রকাশ পায় নাই। তবে এই আইনে অনেক ফাঁক ছিল এবং তাহার জন্য বর্তমান কেন্দ্রীয় পরিষদে একটি সংশোধন বিল উত্থাপন করা হইয়াছে। বর্তমান আইন অনুসারে গবর্ণমেণ্ট যদি কোন ব্যক্তিগত শিল্পের ভার লইতে চাহেন তাহা হইলে প্রথমতঃ সেই শিল্পকে গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য কিছু কিছু আদেশ দিতে হইবে এবং কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে যে, সে আদেশ পালন করা হইয়াছে কি না। অন্যথায় গবর্ণমেণ্ট এই শিল্পকে নিজ হাতে লইতে পারেন। কিন্তু হঠাৎ কোন ব্যক্তিগত শিল্পকে সরকারী পরিচালনায় আনিতে পারিতেন না। সংশোধিত বিলে এই ত্রুটির পূরণ করা হইয়াছে। নূতন আইন অনুসারে গবর্ণমেণ্ট যে কোন সময়ে হঠাৎ যে কোন শিল্পকারখানার পরিচালনা নিজ হাতে লইতে পারেন।

সংশোধিত বিলের অন্য ধারায় কোন কোন দ্রব্যের সরবরাহ, বিতরণ এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা গবর্ণমেণ্টকে দেওয়া হইয়াছে। নিয়ন্ত্রিত শিল্পগুলি সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের দায়িত্ব এত অধিক যে, এইরূপ ক্ষমতা ব্যতীত প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ সম্ভবপর নয়। কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী বলিয়াছেন যে, এই ক্ষমতা ব্যক্তিগত শিল্পকে জাতীয়করণের জন্য ব্যবহার করা হইবে না, কিন্তু কোন বিশেষ শিল্পকে চালু রাখার জন্য ব্যবহৃত হইবে। কোন বিশেষ শিল্প জাতীয় অর্থনীতির পক্ষে প্রয়োজনীয় কি না তাহার বিচার করিবেন গবর্ণমেণ্ট এবং তাহার জন্য আইন আদালতের মত লইতে হইবে না।

কিন্তু মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে বাণিজ্যমন্ত্রী যাহা বলিয়াছেন তাহা সর্ব্বতোভাবে আপত্তিজনক। অর্থাৎ, গবর্ণমেণ্ট যে সকল শিল্প পরিচালনা করিবেন সেগুলি যাহাতে লাভ দেখাইতে পারে সেইভাবে মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হইবে। ইহা পুঁজিবাদী অর্থনীতির কথা। পুঁজিবাদী অর্থনীতির আদর্শ হইতেছে মুনাফালাভ, কিন্তু জাতীয় শিল্পের আদর্শ হইবে লাভ করা নয়—কার্য্যে নিয়োজিত রাখা। তবে শিল্প বিস্তৃতির ব্যাপারে শুধু এইটুকু নজর রাখা দরকার যাহাতে খরচ উঠে এবং ক্ষয়-ক্ষতি নিবারণ ও প্রসারের পথ থাকে। যদি অযোগ্য পরিচালনার জন্য গবর্ণমেণ্টের কোন শিল্প লাভ দেখাইতে না পারে তবে তাহার প্রতিকার হইবে কি যথেষ্ট পরিমাণে মূল্যবৃদ্ধি দ্বারা? ইহা প্রতিক্রিয়াশীল মনোবৃত্তির পরিচায়ক।

ভারতে প্রধানতঃ দুইটি শিল্পের কার্য্যবিধি জাতীয় স্বার্থের বিরোধী হইয়া আসিতেছে। এই দুইটি হইতেছে শর্করাশিল্প এবং বস্ত্রশিল্প। শুধু আইন করা এক কথা আর তাহাকে প্রকৃতপক্ষে কার্য্যকরী করা অন্য কথা—তাহার জন্য সৎসাহস ও সদিচ্ছা থাকা প্রয়োজন। চিনির দাম বাড়তির মুখে। নানা ওজুহাতে উৎপাদন এ বৎসর গত বৎসরের তুলনায় হ্রাস করা হইতেছে যাহাতে মুনাফার পরিমাণ বেশী থাকে। গবর্ণমেণ্ট চিনির কলের মালিকদের সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে, যদি চিনির দাম না কমে তাহা হইলে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। অতীতে এইরকম প্রহসন অনেক বার হইয়াছে। এইবার দেখা যাইবে জনস্বার্থের খাতিরে গবর্ণমেণ্ট এই সকল বেয়াড়া ও অবাধ্য শিল্পগুলিকে নূতন আইনের দ্বারা বশে আনিবার চেষ্টা করেন কিনা।

সরকারী মহলে এখনও এই জ্ঞান হয় নাই যে, যুদ্ধের দৌলতে এদেশের শিল্পের শতকরা ৮০ ভাগ গিয়াছে মুনাফাখোর জুয়াড়ীদিগের

হাতে। তাহাদের কাছে ফাঁকি দিয়া পাওয়া দুই পয়সার মূল্য কঠোর শিল্প প্রচালন ও উন্নয়ন প্রজাত দুই টাকার অধিক। এই শ্রেণীই দেশের যত দুর্নীতির আকর এবং ইহাদের বশে না আনিতে পারিলে দেশের শিল্পের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

পশ্চিমবঙ্গে জমিদারী প্রথা বিলোপ

ভারতের প্রায় প্রধান প্রধান প্রদেশগুলিতে জমিদারী প্রথা বিলোপ করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার নানা ওজুহাতে এই ব্যাপারে এত দিন হাত দেন নাই, যখন দেখিলেন যে আর দেরী করা যায় না তখন তাঁহারা জমিদারী প্রথা বিলোপের জন্য একটি বিল আইন পরিষদে উত্থাপন করিয়াছেন। বিলটি সিলেক্ট কমিটির হাতে দেওয়া হইয়াছে মতামতের জন্য।

জমিদারী প্রথা বিলোপ করিবার জন্য দাবি বহুদিন ধরিয়া করা হইতেছে যাহাতে সত্যিকার চাষী জমির মালিক হইতে পারে। বাংলাদেশে শতকরা প্রায় ১২ জন ভূমিহীন চাষী এবং শতকরা আরও ১২ জন কৃষি শ্রমিক মাত্র। বাংলাদেশে ২ কোটি ৪৮ লক্ষ লোকের মধ্যে ৩০ লক্ষ ভূমিহীন চাষী, ৩০ লক্ষ কৃষি শ্রমিক এবং প্রায় দেড় লক্ষ লোক জমির মালিক যাহারা নিজ হাতে চাষ করে না কিন্তু জমি হইতে খাজনা পায়। ইহারাই মাধ্যমিক স্বার্থবিশিষ্ট এবং মোট জনসংখ্যার ০·৬ ভাগ মাত্র।

প্রথমে ধরা যাউক ক্ষতিপূরণের ব্যাপার। বিলে ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব এইরূপ ভাবে করা হইয়াছে :

মোট আয়	ক্ষতিপূরণের পরিমাণ
প্রথম ১,০০০ টাকা কিংবা তন্নিম্নে	মোট আয়ের পনের গুণ
তৎপরবর্ত্তী ২,০০০ টাকায়	মোট আয়ের তের গুণ
তৎপরবর্ত্তী ৫,০০০ টাকায়	মোট আয়ের এগার গুণ
তৎপরবর্ত্তী ১০,০০০ টাকায়	মোট আয়ের নয় গুণ
তৎপরবর্ত্তী ২৫,০০০ টাকায়	মোট আয়ের সাত গুণ
তৎপরবর্ত্তী ৫০,০০০ টাকায়	মোট আয়ের পাঁচ গুণ
বাকী মোট আয়ের জন্য	বাকী মোট আয়ের চার গুণ

মোট আয় ধরা হইবে—গবর্ণমেণ্টকে দেয় কর বাদ দিয়া এবং প্রজার কাছ হইতে খাজনা আদায় করার খরচ বাদ দিয়া। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ হইতে দেখা যায় যে, যে জমিদারের বাৎসরিক মোট আয় এক লক্ষ টাকা তিনি ক্ষতিপূরণ বাবদ পাইবেন ৬ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা এবং যাঁহার বাৎসরিক আয় মোট ২ লক্ষ টাকা, তিনি ১০ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে পাইবেন। আর যাঁহার ১০ লক্ষ টাকা মোট বাৎসরিক আয়? তিনি পাইবেন মোট ৪২ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা।

ক্ষতিপূরণ বাবদ ৫,০০০ টাকা কিংবা এক বৎসরের মোট আয়, যাহা বেশী হইবে (কিন্তু ৫০,০০০ টাকার বেশী নয়), নগদ টাকায় দেওয়া হইবে। বাকী টাকা ২০ বৎসরে বাৎসরিক সমান কিস্তিতে পরিশোধনীয়। এই বাকী টাকার উপর গবর্ণমেণ্ট বৎসরে শতকরা তিন টাকা হিসাবে সুদ দিবেন। এখন জিজ্ঞাস্য, এই ক্ষতিপূরণের টাকা কোথা হইতে আসিবে? জনসাধারণের নিকট হইতে—হয় অতিরিক্ত কর দ্বারা কিংবা ঋণগ্রহণ দ্বারা। ঋণগ্রহণ করিলে আবার তাহার উপর সুদ দিতে হইবে।

একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, ১৭৯৩ সনে যখন বর্ত্তমান জমিদারদের পূর্ব্বপুরুষ কিংবা অন্যান্যরা ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছ হইতে জমি ধরিয়াছিলেন তখন তাঁহারা কেহই গাঁটের টাকা ফেলিয়া জমি ধরেন নাই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কর দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে জমি ধরিয়াছিলেন। প্রজাদের কাছ হইতে টাকা আদায় করিয়া গবর্ণমেণ্টকে কর দিয়াছেন এবং নিজেদের নির্দ্দিষ্ট আয় রাখিয়াছেন। অবশ্য সেই জমিদারী ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে নগদ টাকায়।

রাজ্যশাসনের প্রথম দিকে কোম্পানী যখন জমি হইতে ঠিকমত খাজনা আদায় করিতে পারিতেছিলেন না তখন তাঁহারা চিরস্থায়ী জমিদারী প্রথার প্রচলন করেন।

১৭৯৩ সনে জমিদারীর আয় ধরা হইয়াছিল চার কোটি টাকার মত। বর্ত্তমান হিসাব অনুসারে জমিদারদের আয় বৃদ্ধি পাইয়া বার কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। বিভিন্ন খনি ও মাছ ধরার ভেড়ী প্রভৃতি হইতে অতিরিক্ত আট কোটি টাকার মত বৎসরে আয় হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় খনি ইত্যাদি আয়ের মধ্যে ধরা হয় নাই। ভারতীয় রাষ্ট্রতন্ত্রে অবশ্য ক্ষতিপূরণের কথা আছে। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রতন্ত্রে ক্ষতিপূরণের কথা থাকিলেও ক্ষতিপূরণের হার নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে কোন কথাই নাই।

ক্ষতিপূরণ ব্যাপারে জমিদারদের দুই রকম শ্রেণী-বিভাগ করা উচিত—যাঁহারা ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছ হইতে অবিচ্ছিন্নভাবে জমিদারী ভোগ করিয়া আসিতেছেন এবং যাঁহারা নিজের টাকায় অন্য কোন জমিদারের নিকট হইতে জমি ক্রয় করিয়াছেন। প্রথমোক্ত শ্রেণীর পক্ষে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ দ্বিতীয় শ্রেণীর তুলনায় কম হওয়া উচিত। অনেকে মনে করেন যে, বিলে প্রস্তাবিত ক্ষতিপূরণের হার যাঁহারা নিজের টাকায় জমির যথার্থ মূল্য দিয়া জমি কিনিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে খুবই কম হইয়াছে। এ সম্বন্ধে সিলেক্ট কমিটি যথাযথ মতামত দিবেন আশা করা যায়।

আমরা মার্কসবাদের নীতি অনুযায়ী বিনা ক্ষতিপূরণে জবরদখলের (Expropriation) পক্ষপাতী নহে। ঐ নীতি আমাদের প্রাচ্য ভূমির সকল নীতির বহির্ভূত হিংসাত্মক দুর্নীতি। ইহার আদি ও অন্ত দুইয়েরই এক উদ্দেশ্য—শ্রেণী-বিরোধ। উহার ফল এইমাত্র যে "পুঁজিপতির"—অর্থাৎ যাহার কিছুমাত্র সম্পত্তি আছে—যথাসর্ব্বস্ব পুঞ্জপতি বা দলপতির কুক্ষিগত হইবে। দরিদ্র সাধারণ যে তিমিরে সেই তিমিরে থাকিবে। দলের চাঁইদের ভোগবিলাসের অন্ত থাকিবে না।

বিহারে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের পর

"নবজাগরণ" পত্রিকা ১লা চৈত্র সংখ্যার এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে ধলভূমে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের পরের অবস্থা বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন :

"বিহারের অন্যান্য স্থানের মত ধলভূমবাসীও প্রায় এক বৎসর

পূর্ব্বে জমিদারী উচ্ছেদের জন্ম যে হর্ষ প্রকাশ করিয়াছিল এত শীঘ্রই যে তাহা বিষাদে পরিণত হইবে তাহা কল্পনা করা যায় নাই। জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ হইয়া প্রজা অবশ্য জমির মালিক হয় নাই। ধলভূমরাজের বদলে বিহার সরকার এখন ধলভূমবাসীর রাজা।"

জমিদারী আমলে প্রজারা যেটুকু সুযোগ-সুবিধা পাইত এখন তাহার কোনটিই নাই, উপরন্তু "বর্ত্তমানে বিহার সরকার জমিদার এবং থানা পুলিস ও আদালতের মালিক হওয়ায় পান হইতে চূণ খসিলেই ধলভূমবাসী প্রজাদের উপর সরকারী আঘাত আসিতেছে। পূর্ব্বে দরিদ্র প্রজাদের অনেকেরই খাজনা বাকী থাকিত বা মকুব হইত। এখন কথায় কথায় সার্টিফিকেট জারী হইয়া স্থাবর-অস্থাবর ক্রোক হইতেছে। শুনিতে বিচিত্র হইলেও ইহা অতীব সত্য যে, প্রজারা এখন মনে-প্রাণে ধলভূমরাজের ক্ষমতা ফিরিয়া আসুক ইহা চায়। এ সম্বন্ধে যদি ভোট লওয়া হয় তবে প্রজারা বিপুল মতাধিক্যে রাজার প্রত্যাবর্ত্তনের পক্ষে মত দিবে।"

সরকার কর্ত্তৃক জমিদারী গ্রহণ করার পর মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত অসুবিধাগুলি দেখা দিয়াছে: প্রথমতঃ সরকার যে উচ্ছেদ-প্রথার মূলে কি কি আইন করিয়াছেন এবং প্রজাদিগকে কি কি আইন-কানুন মানিতে হইবে, তাহা কোন সরকারী কর্ম্মচারী বলিতে রাজী নন। দ্বিতীয়তঃ বর্ত্তমানে ধলভূমের কর্ম্মচারিগণ খাজনার রশিদ হিন্দীতে অথবা ইংরেজীতে দেওয়ার ফলে প্রজাদের মধ্যে খুবই অসুবিধা হইতেছে কারণ ধলভূমের অধিকাংশ প্রজাই বাংলাভাষাভাষী। তৃতীয়তঃ খাজনার রশিদ কালিতে না লিখিয়া পেন্সিলে লেখা হইতেছে। জমিদারী আমলে খারিজ-দাখিল প্রজাদের পক্ষে এক ভীষণ সমস্যার ব্যাপার ছিল। কিন্তু সরকারপক্ষ ইহার কোন সুবন্দোবস্ত করেন নাই।

বহরমপুরে পানীয় জলের সমস্যা

২১শে এপ্রিলের "মুর্শিদাবাদ সমাচার" পত্রিকা বহরমপুরে পানীয় জল সরবরাহের অবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করিয়া লিখিতেছেন, "এক্ষণে যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে যে-কোন সময় জলকল থামিয়া যাওয়ার দুঃসংবাদ সহরবাসীর কর্ণগোচর হইতে পারে এবং তাহার ফলে শহরে কি অবস্থার উদ্ভব হয়, তাহা দেখিবার অপেক্ষায় আমরা থাকিলাম।

"৫৪ বৎসর পূর্ব্বে মহারাণী স্বর্ণময়ী ও মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের দানে বহরমপুরে জলের কল স্থাপিত হয়। সেই সময় হইতে বার্জ্জ ফিলটার বা পাইপ লাইন সব একই আছে, মাত্র কয়লার ইঞ্জিনের পরিবর্ত্তে তেলের ইঞ্জিন বসাইয়া জলের কলের কিছু পরিবর্ত্তন পৌরসভা করিয়াছেন। জলসরবরাহ-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের সময় বহরমপুর শহরের জনসংখ্যা ছিল ২০,০০০, আর ১৯৫১ সনের লোকগণনায় জনসংখ্যা হইয়াছে ৫৫,৬১৩। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত তাল রাখিয়া পৌরসভা পানীয় জল সরবরাহের উন্নতিবিধানে সমর্থ হন নাই। অথচ মিউনিসিপ্যাল আইন অনুযায়ী ধার্য্য জলের ট্যাক্সের সর্ব্বোচ্চ মান এসেসমেণ্টের শতকরা সাড়ে সাত ভাগই ওয়াটার ট্যাক্স হিসাবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আদায় করা হয়। পৌরসভা ৫০টি নলকূপ বসাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কতগুলি কার্য্যকরী আছে তাহা বলা শক্ত। সরকার জলসরবরাহ সমস্যা সমাধানের জন্য ৫০,০০০৲ টাকা দিতে সম্মত হইয়াছেন, কিন্তু তাহা কবে পাওয়া যাইবে তাহা অনিশ্চিত। মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষ নিজেদের তহবিল হইতে ৪৫,০০০৲ টাকা ব্যয় করিয়া জলের ট্যাঙ্কের নিকট একটি বৃহৎ নলকূপ বসাইতেছেন। কিন্তু জল তুলিবার জন্য তেলের ইঞ্জিন এখনও আসে নাই। ইঞ্জিনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে অর্ডার গিয়াছে; কিন্তু কবে পাওয়া যাইবে সে কথা কেহ জানে না। অথচ এই গ্রীষ্মকালে পানীয় জল সরবরাহের চালু ব্যবস্থাটিও বার্জ্জ ভাঙার জন্য অচল হইতে চলিয়াছে। জল সরবরাহের একমাত্র ভরসা নলকূপ, তাহাও বর্দ্ধিষ্ণু শহরের জনসংখ্যার অনুপাতে পর্য্যাপ্ত নয়।"

পশ্চিমবাংলার মফস্বলের প্রায় সকল পৌরসভাই আজ নানা সমস্যার সম্মুখীন। অর্থাভাব তো আছেই, উপরন্তু অব্যবস্থা, অপচয় ইত্যাদির অভিযোগ চতুর্দ্দিকেই শুনা যায়। লালদীঘির মসনদে তাহার দরুণ কোনও অস্থিরতা প্রকাশ পায় নাই। ইহার কারণ পশ্চিম বাংলার বাঙালীদিগের শ্লথ স্বভাব, উদ্যোগের একান্ত অভাব ও সংহতি শব্দের সহিত পরিচয়ের অভাব। এরূপ দুর্দ্দশার মধ্যেও আমাদের চৈতন্য হয় না, ইহাই আশ্চর্য্য।

পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রীয় পরিবহনে ক্ষতি

পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রীয় পরিবহন খাতে সরকারী ক্ষতি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে "মেদিনীপুর পত্রিকা" লিখিতেছেন যে, পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র এবং এমন কি ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও যখন রাষ্ট্রীয় পরিবহন খাতে সরকারের লাভ হইতেছে পরিচালন ব্যবস্থার গুণে পশ্চিমবঙ্গে সেখানে প্রথম হইতেই লোকসান সুরু হইয়াছে। ব্যক্তিগত পরিচালনাধীনে যে সকল বাস চলে তাহার কথা না ধরিলেও চলে।

এই দুঃখজনক পরিস্থিতির কারণ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া পত্রিকাটি লিখিতেছেন: "হবেই না বা কেন? দু-একটা দফার হিসাব দেখলেই সমস্ত পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

"ডাঃ রায় বলেছেন ষ্টেটবাসের প্রথম ১৫৫টির মধ্যে ১০০টিতে ডিজেল ইঞ্জিন বসান হয়েছে এবং বর্ত্তমানে দেখা যাচ্ছে যে, অধিকাংশ ষ্টেট বাসেই ডিজেল ইঞ্জিন কিন্তু পেট্রোলের খরচ গেছে বেড়ে। আর বদলী ইঞ্জিনগুলোর কি হ'ল তা জানবার আমাদের কোন অধিকার নাই।"

মূল দোষ দুই জায়গায়। প্রথমতঃ লোক নিয়োগে। এই ষ্টেট বাস ব্যাপারে লোক নিয়োগ প্রায় সবই হইয়াছে ব্যক্তিগত, শ্রেণীগত কিংবা দলগত বিচারে। যোগ্যতার কোনও প্রশ্ন আসে নাই বলা বাহুল্য, কেননা এখানেও শ্রীবিধানচন্দ্র রায়ের মর্জ্জি ভিন্ন আর কিছুই চলে নাই।

পেট্রোল চুরি, টায়ার চুরির অভিযোগ ত পথে ঘাটে শুনা যায়, তাহার প্রমাণ কি আছে না আছে, তাহার তদন্তেরও কোন কথাও শুনা যায় নাই; সুতরাং সে বিষয়ে বিশেষ আলোচনার উপায়

নাই। শুধু এই মাত্র বলা চলে যে, উহা অসম্ভব নয়। কিন্তু গাড়ীর তত্ত্বাবধান ও তাহার চালনার ব্যাপারে দোষত্রুটি ত নিত্যই সকলের চোখে পড়ে। চালকগণ ও তত্ত্বাবধায়কগণ তাহাদের কর্ত্তব্য পালন ঠিকমত করে কিনা, উহা দেখিবার ব্যবস্থাই বা কিরূপ তাহাও লোকচক্ষুর অগোচর। এরূপ ব্যবস্থার অভাব বোধ হয় অন্য কোনও প্রদেশে নাই। প্রায় অন্য সকল প্রদেশে প্রধান মন্ত্রীর বুদ্ধি-বিবেচনায় ছাতা পড়ে নাই, সুতরাং তাঁহারা সহকারী রূপে যোগ্য লোকও দু'চার জন লইয়াছেন।

বর্দ্ধমানের হাসপাতালে রোগীদের খাদ্য ছাঁটাই

২৬শে চৈত্রের "আর্য্য" পত্রিকার এক সংবাদে প্রকাশ যে, বর্দ্ধমান জেলার হাসপাতালের রোগীদের খাদ্য ও পথ্য কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। "প্রথম শ্রেণীর খাদ্য ও পথ্যরূপে পূর্ব্বে প্রত্যহ আধ সের চাউল, ডাল দেড় ছটাক, আলু আধ পোয়া, অন্যান্য তরিতরকারী এক পোয়া, তেল দেড় কাঁচ্চা বরাদ্দ ছিল। বর্ত্তমানে উপরোক্ত পরিমাণের পরিবর্ত্তে চাউল দেড় পোয়া, ডাল এক ছটাক, আলু দেড় ছটাক, অন্যান্য তরিতরকারী তিন ছটাক ও তেল সওয়া কাঁচ্চা বরাদ্দ করা হইয়াছে। প্রকাশ, প্রতি বেলায় কোন কোন রোগীকে দশ পয়সা পরিমাণ খাদ্য সরবরাহ করা হয়। দুধ এবং সাগুর পরিমাণও হ্রাস করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। নার্স এবং সেবারত চিকিৎসকদের মধ্যেও হ্রাস পরিমাণে খাদ্য সরবরাহ করার কাণাঘুষা শুনা যাইতেছে।"

এই সম্পর্কে "দামোদর" পত্রিকা ১৮ই বৈশাখ এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিতেছেন :

"বর্দ্ধমানের হাসপাতালের প্রত্যেক রোগীর আহার্য্যের জন্য দৈনিক এক টাকা মাত্র সরকারী বরাদ্দ নিতান্তই অপ্রতুল। সে সম্পর্কে ইতিমধ্যেই বহু সমালোচনা হইয়াছে।

"কিন্তু এই এক টাকা বরাদ্দ হঠাৎ নূতন নয়, কয়েক বৎসর ধরিয়াই চলিয়া আসিতেছে। আজ হঠাৎ ঐ এক টাকার মধ্যেই এত খাদ্য কমাইয়া দেওয়া হইল কেন? বর্দ্ধমানে চাউল ও অন্যান্য দ্রব্যাদির দর পূর্ব্বাপেক্ষা নিশ্চয়ই কম, এরূপ ক্ষেত্রে যেখানে ঐ টাকাতেই বেশী খাদ্য দেওয়া উচিত ছিল, সেখানে আবার কমাইয়া দেওয়া হইল কেন কর্ত্তৃপক্ষ এ রহস্য উদ্‌ঘাটন করিবেন কি? শুনিয়াছি এখানে একটি হাসপাতাল পরিদর্শন ও পরামর্শ কমিটি আছে, জানিতে কৌতূহল হয়, তাঁহাদের খাদ্যবরাদ্দ রোগীর অনুপাতে কমিয়াছে কি না?"

কলিকাতায় বরাদ্দ কিরূপ তাহাও জানা প্রয়োজন। রোগীর পথ্য অবশ্যই পর্য্যাপ্ত হওয়া দরকার, কিন্তু তাহার পরিমাণ সকল ক্ষেত্রে সমান হওয়া সম্ভব নহে। ছয় ফুট দীর্ঘকায় ও দুই মণ ওজনের ব্যক্তির এবং পাঁচ ফুট উচ্চ ও সওয়া মণ ওজনের ব্যক্তিদ্বয়ের একই পরিমাণ খাদ্য প্রয়োজন নহে। সুতরাং উপরোক্ত রূপ হিসাব কিছু অদ্ভুত মনে হয়। এই পক্ষ বিচার করেন যাঁহারা তাঁহারা কি চিকিৎসক না হিসাব-পরীক্ষক?

তামার খনি ধর্ম্মঘট, দলীয় রাজনীতি ও সরকার

১৩ই বৈশাখের "নবজাগরণ" লিখিতেছেন :

"আজ প্রায় দুই মাস হইল মৌভাণ্ডারের তামার কারখানার ২০০০ শ্রমিক ধর্ম্মঘট করে। কারখানার শ্রমিকদের ধর্ম্মঘটের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ১০০০ ঠিকাদারের শ্রমিকদেরও অন্ন মারা যায় এবং ইহার কিছুদিনের মধ্যেই মুসাবনীর ৫০০০-এর উপর খনি-মজুরকে বাধ্যতামূলক বেকারত্বের কবলে পড়িতে হয়। কারণ তামার কারখানা না চলিলে তামার খনি হইতে পাথর তুলিবার প্রয়োজন থাকে না। দুই মাস যাবৎ ঘাটশীলা ও মুসাবনীর এতগুলি অধিবাসী মাহিনা না পাওয়ায় এই দুই স্থানের ব্যবসাদার ও দোকানদারদেরও ঘরে অন্ন নাই। কারখানা অঞ্চলের দোকান-গুলিতে সাধারণতঃ ধার দিবার প্রথা চলে এবং মাসান্তে শ্রমিকরা দোকানদারের প্রাপ্য শোধ করে। ধর্ম্মঘটের ফলে শ্রমিকরা বেতন পায় নাই; সুতরাং দোকানদারদের পুঁজিপাটাও ঘরে নাই। অর্থাৎ, সমস্ত মিলাইয়া ঘাটশীলা অঞ্চলে প্রায় ৮০০০ শ্রমিক ও তাহাদের স্ত্রীপুত্রের পেটে ভাত নাই এবং কয়েক শত দোকানদারের পুঁজিপাটা ও রোজগার শেষ।

"একথা গোপন করিয়া লাভ নাই যে সিংভূম কংগ্রেসের দুই বিবদমান দলের নেতৃবৃন্দের বিরোধের জন্যই মুসাবনী ও মৌভাণ্ডারে এই সঙ্কট দেখা দিয়াছে। মুসাবনীতে শ্রীকিশোরীমোহন উপাধ্যায়, ছোটেলাল ব্যাস এবং নারায়ণ মুখোপাধ্যায় অনায়াসে শ্রমিকদের অনেকগুলি দাবিদাওয়া পূর্ণ করায় তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা মৌভাণ্ডারেও বাড়িতে থাকে। সুতরাং মৌভাণ্ডারের নেতা শ্রীমাইকেল জনকেও বাধ্য হইয়া ধর্ম্মঘটের চূড়ান্ত উপায় অবলম্বন করিতে হয়। আমরা এই দুই কংগ্রেসী নেতার কোন্দলের গুণাগুণ লইয়া আলোচনা করিব না। আমরা ধরিয়া লইতেছি যে, মৌভাণ্ডারের শ্রমিকদের দাবী যথার্থ এবং তাঁহারা শান্তিপূর্ণ উপায়ে শেষ অবলম্বন হিসাবে ধর্ম্মঘটের আশ্রয় লইয়াছেন। কিন্তু সরকারের কি এ সম্বন্ধে কিছু করণীয় নাই?"

কিছুদিন পূর্ব্বেও বিহারের শ্রমমন্ত্রী ডঃ অনুগ্রহনারায়ণ সিংহ মুসাবনীর ধর্ম্মঘটে মধ্যস্থতা করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ ক্ষেত্রে সরকার নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা অবলম্বন করিয়াছেন। দরিদ্র শ্রমিকদের দুই মাস ধর্ম্মঘট চালাইয়া যাওয়া কি কষ্টকর সরকারের তাহা না বুঝিবার কারণ নাই। "নবজাগরণে"র কথায় :

"মৌভাণ্ডারের ধর্ম্মঘটের ব্যাপার দৃষ্টে মনে হয় কংগ্রেসের উভয় দলের নেতৃবৃন্দ হইতে সুরু করিয়া বিহারের শ্রমদপ্তর ও ভারত-সরকার সকলেই আগুন লইয়া খেলিতেছেন। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে জনস্বার্থকে বলি দেওয়া হইতেছে।"

বিহারের মন্ত্রিসভায় বর্ত্তমানে যে মূর্ত্তিগুলি বিরাজ করিতেছেন তাঁহারা ত্রিভুবনে নিজ স্বার্থ ভিন্ন অন্য কিছুর খোঁজ রাখেন কিনা সন্দেহ। বিহার এক আজগুবি দেশ। তাহার উপর কংগ্রেসের এই "কায়েথ-ভূমীহার" যুগ্মদল সোনায় সোহাগা দিয়াছে। সিংভূম ও

মানভূম তো অবিহারীর দেশ, সেখানে শতকরা আশী জন অন্য ভাষাভাষী ও অন্য জাতি-উদ্ভূত। তাহারা মরে কি বাঁচে সে কথা ভাবিবার কে আছে ?

পাটচাষের সঙ্কট ও সরকারী নীতি

বর্দ্ধমান হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক "নূতন পত্রিকা" সরকারের পাটচাষ সম্পর্কীয় নীতির সমালোচনা করিয়া লিখিতেছে যে, যদিও উত্তরোত্তর পাটের মূল্য হ্রাস পাইতেছে এবং কৃষকদের পক্ষে পাট চাষ করা ক্রমশঃই দুঃসাধ্য হইয়া উঠিতেছে তথাপি সরকার এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। ভারতের কৃষিমন্ত্রী ডঃ দেশমুখ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন কোন কোন স্থানে পাটের মূল্য মণপ্রতি ৫৲ টাকা পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। "ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক রিভিউ" পত্রিকার ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় বিশেষভাবে তদন্ত করিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করা হইয়াছিল যে, পাটের দর মণপ্রতি ১৮৲ টাকার নীচে নামিলে কৃষক পাটের চাষ বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইবে। "ক্যাপিটাল" পত্রিকার সংবাদ হইতে জানা যায় যে, গড়ে পাটের দর মণ প্রতি ১৭৲ টাকার বেশী নয়।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় বাংলার পাটচাষীদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবার আশ্বাস দিয়াছিলেন এবং শ্রীকানোরিয়ার সভাপতিত্বে একটি তদন্তকারী কমিটিও নিযুক্ত হয়; কিন্তু কানোরিয়া কমিটি পাটের ন্যূনতম মূল্য বাঁধিয়া দিবার সুপারিশ করা সত্ত্বেও ভারত-সরকার তাহা অগ্রাহ্য করেন।

পত্রিকাটি লিখিতেছেন: "১৪ই এপ্রিল তারিখের ষ্টেটসম্যান" পত্রিকা পর্য্যন্ত স্বীকার করেছেন যে, অতীতে চীনে ভারতীয় চটের 'বিরাট চাহিদা' ছিল। উপস্থিত অনুকূল রাজনীতিক আবহাওয়ার মধ্যে চীনে চট রপ্তানী করার ব্যবস্থা করে ফেলতে পারলে চটকল-গুলির যথেষ্ট সুবিধা হবে।

"কিন্তু দুঃখের বিষয় এখন অবধি সরকারী মহলে বা ভারতীয় চটকল মালিকদের পক্ষ থেকে চীনে চট রপ্তানী করার কোন প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে না।" অন্যান্য দেশের ক্রেতার সহিত সংযোগ স্থাপন করিবার জন্য যে সকল ভারতীয় মিশন বিদেশে গিয়াছিল তাহারা সকলেই ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে এবং চট উৎপাদন সংকোচনের জন্য সরকারের উপর চাপ দিতেছে। "৯ই এপ্রিল 'ক্যাপিটাল' পত্রিকায় ব্রিটিশ পর্য্যবেক্ষক জোরের সঙ্গে বলেছেন যে, ভারত সরকার খুব সম্ভবতঃ অতি শীঘ্র চট উৎপাদন সংকোচন নীতি মেনে নেবেন।"

চট ও পাট, এই দুই-ই বাংলার চাষী ও শ্রমিকের জুয়াখেলায় পর্য্যায়ে আসিয়াছে। বড় চাষী বা জোতদার জুয়ায় ঘা খাইলে সহিতে পারে, কিন্তু ছোট চাষী অর্থাৎ বাংলার অধিকাংশ চাষী ঘা খাইলে আর উঠিতে পারে না। আমাদের বিবেচনা করা প্রয়োজন চটকলগুলি লোপ পাইলে লাভ-লোকসান হিসাবে বাঙালী কোথায় দাঁড়ায়। এক দিকে জলকষ্ট, ম্যালেরিয়া, অন্য দিকে চাষের পর জলের দরকার, এ সকল কথা ভাবিলে মনে হয় যে চট ও পাট নামক "স্বর্ণঘটিত রসায়ন" সেবনকরিতেছে অবাঙালী, বাঙালী শুধু বোতল চাটিয়াই মরে, বোতল কাটিলে জিহ্বা বিদীর্ণ হয়!

জঙ্গীপুরের অর্থনৈতিক অবস্থা

১০ই বৈশাখের "ভারতী" পত্রিকার 'ওয়াকিবহাল' লিখিতেছেন যে, জঙ্গীপুর মহকুমার অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমশঃই অধিকতর শোচনীয় রূপ ধারণ করিতেছে। জঙ্গীপুর পাটচাষের একটি প্রধান কেন্দ্র। সরকারী প্রচারের ফলে ঐ মহকুমার প্রায় অর্দ্ধেকের উপর জমিতে পাটের আবাদ হইয়াছে। কিন্তু সরকার পাটের সর্ব্ব-নিম্ন মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া না দিয়া পাকিস্থানের সহিত পাটচুক্তি করিয়া পাটচাষীদের স্বার্থ উপেক্ষা করিতেছেন। ওয়াকিবহালের কথায় "যে মিল মালিকেরা অতিরিক্ত লাভ হইতে পাটচাষীদের বঞ্চিত করিয়া গত বৎসর পর্যন্ত পাটজাত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া প্রচুর লাভবান হইয়াছেন, যাঁহারা ভবিষ্যতে পাটের বিকল্পজাত দ্রব্যমূল্যের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইবার জন্য লাভের কিয়দংশ উন্নততর যন্ত্রপাতি ক্রয়ে ব্যয় করেন নাই, যাঁহারা তাঁহাদের দূরদৃষ্টির অভাব পূর্ণ করিতে চান পাটচাষীদের স্বার্থের বিনিময়ে, আজ আমাদের গবর্ণমেণ্ট পাটের মূল্যের জন্য পাটচাষীদের সেই মিল মালিকদের হাতে সমর্পণ করিয়াছেন। আজ বাজারে দশ-বারো টাকা মণ দরেও পাটের খরিদ্দার মিলিতেছে না। পাট চাষ করিয়া এবং পাটের ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া এই মহকুমার বহু লোক অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় গবর্ণমেণ্টের পাট-নীতির ফলে সে পথ রুদ্ধ হইয়াছে।"

এই সঙ্গে এই মহকুমার রেশম-শিল্প, তাঁতশিল্প, বাসন-শিল্পের উপরও আর্থিক সঙ্কটের ছায়া পড়িয়াছে। ইতিমধ্যে হঠাৎ চাউলের দর দশ-বার দিনে পনর-ষোল টাকা হইতে একুশ-বাইশ টাকা হইয়াছে। আম ঐ মহকুমার এক প্রধান ফসল এবং বহু দরিদ্র ব্যক্তি গ্রীষ্মকালের দুই মাস আম খাইয়া জীবনধারণ করিয়া থাকে। কিন্তু এ বৎসর আম না হওয়ায় সে আশাও নির্ম্মূল হইয়াছে। বৎসরের প্রথম দিকেই সেখানে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া পড়িয়াছে এবং অধিকাংশ লোক অর্দ্ধাহারে থাকিতেছে আর অখাদ্য-কুখাদ্য খাইতে সুরু করিয়াছে।

প্রাথমিক শেষ পরীক্ষা

অগ্রহায়ণ মাসের "শিক্ষাব্রতী" এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে প্রাথমিক শেষ পরীক্ষা তুলিয়া দিবার জন্য সুপারিশ করিয়া লিখিতেছেন, যেহেতু ছোট ছেলেদের পক্ষে পরীক্ষা যত কম হয় ততই ভাল; সুতরাং এই পরীক্ষা তুলিয়া দেওয়াই উচিত। উপরন্তু সরকার নিযুক্ত বিদ্যালয়-শিক্ষা-কমিটিও প্রাথমিক শেষ পরীক্ষা তুলিয়া দিবার জন্য যে সুপারিশ করিয়াছিলেন শোনা যায় সরকার নাকি সে সুপারিশ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু সরকার তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত কার্য্যে পরিণত করিতে অযথা বিলম্ব করিতেছেন।

"যে সকল ছাত্র মধ্য বা উচ্চ বিদ্যালয়ে বিদ্যালাভ করে তাহা-দিগকে এই পরীক্ষা দিতে হয় না। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সম্বন্ধেও এই কথা। তাহারা সাধারণ বার্ষিক পরীক্ষা দিয়াই উচ্চতর

শ্রেণীতে পড়িতে পারে। বাষিক পরীক্ষায় এক আধটা বিষয়ে ফেল হইলেও ক্ষতি নাই। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পরীক্ষা না দিতে পারিলেও যায় আসে না। প্রধান শিক্ষক উপযুক্ত বিবেচনা করিলে উপরের শ্রেণীতে প্রমোশন দিতে পারেন।

"যত অপরাধ কেবল সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের। তাহাদের পাবলিক একজামিনেশন রূপ অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেই হইবে—তাহা না হইলে নিস্তার নাই। কোন দুর্ঘটনার জন্য যে ছেলে পরীক্ষা দিতে পারিল না অথবা সামান্য দুই একটা ত্রুটীর জন্য কোন একটা বিষয়ে পাস করিতে পারিল না তাহার একটি বৎসর গেল। তাহাকে আবার আর এক বৎসর সেই চতুর্থ শ্রেণীতেই পড়িতে হইবে এবং পরের বৎসর প্রাথমিক পরীক্ষায় পাস করিতে হইবে। তাহা না করিলে তাহার শিক্ষার পথ সেইখানেই রুদ্ধ হইবে।

"একই শ্রেণীর বিভিন্ন ছাত্র সম্বন্ধে এই বিভিন্ন ব্যবস্থা অত্যন্ত অন্যায়।"

গ্রাম্য শিক্ষকদের শিক্ষণব্যবস্থা

দিল্লীস্থিত কেন্দ্রীয় শিক্ষা-ভবনের শিক্ষা সম্পর্কীয় রীডার (Reader in Education, Central Institute of Education, Delhi) এডোয়ার্ড এ. পিরেস ভারতে গ্রাম্য শিক্ষক শিক্ষণব্যবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া সাপ্তাহিক "পশ্চিমবঙ্গ" পত্রিকায় লিখিতেছেন :

"গ্রামশিক্ষকই জাতির স্রষ্টা। ভারতের কল্যাণ এবং উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এই বিশাল দেশের গ্রামগুলির জন্য উপযুক্ত শিক্ষক তৈয়ারী করা অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কার্য্য আর কিছু নাই। গ্রামের দেশ ভারতবর্ষ; কিন্তু সেই সকল গ্রামের জনসাধারণের অবস্থা এত হীন, তাহাদের জীবনধারণের এবং সাংস্কৃতিক মান এত নিম্নে যে গ্রাম্য শিক্ষককে কেবলমাত্র বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে পড়াইয়া ক্ষান্ত থাকিলেই চলিবে না। বিদ্যালয়ের বাহিরেও তাঁহার প্রভাব পৌঁছাইতে হইবে। গ্রামের সকলের নিকট তাঁহাকে আদর্শস্বরূপ হইতে হইবে এবং সকল প্রকার প্রগতিশীল কার্য্যে তাঁহাকে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে।

সম্প্রতি পল্লীর জনসাধারণের মধ্যে তাঁহাদের অবস্থা সম্পর্কে কিছু কিছু চেতনার সঞ্চার হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে শিক্ষাবিদ্‌গণও গ্রামের উপযোগী শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু গ্রামে শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক নির্ব্বাচন সম্পর্কে যথাযথ মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। বর্ত্তমানে কলেজে লব্ধ বিদ্যাকেই যোগ্যতার মাপকাঠি হিসাবে দেখা হয়। যথার্থ নির্ব্বাচন-প্রণালীতে এমন লোককেই গ্রাম্য শিক্ষক হিসাবে নির্ব্বাচন করা উচিত যিনি তাঁহার কর্ত্তব্যের গুরুত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন এবং তাহাতে সাফল্যলাভ করিবার মত যোগ্যতা যাঁহার আছে। যাঁহাদের এই সকল গুণ আছে তাঁহাদিগকে আকৃষ্ট করিতে হইবে।

অবিলম্বে সুচিন্তিত এবং সুপরিকল্পিত ভাবে প্রচারের মাধ্যমে উপযুক্ত লোককে গ্রাম্য শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করিতে হইবে। আমাদের স্কুল-কলেজে এই ধারণাই দেওয়া হয় যে গ্রাম্য শিক্ষকের পদ গ্রহণ করা যে-কোন ভাল ছেলের পক্ষেই অগৌরবের বিষয়। অবিলম্বে ইহার পরিবর্ত্তন ঘটাইতে হইবে।

যিনি গ্রামে শিক্ষকতা গ্রহণে অগ্রসর হইবেন গ্রাম্য সমাজ সম্পর্কে তাঁহার প্রকৃত এবং গভীর আগ্রহ থাকা অবশ্য প্রয়োজন। তাঁহাকে পরিষ্কারভাবে বুঝিতে হইবে গ্রাম্য সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা কি, এবং ভবিষ্যতে তাহা কি রূপ ধারণ করিতে পারে। গ্রাম্য সমাজকে নেতৃত্ব দিবার উপযোগী সাহস এবং দৃঢ়তা তাঁহার থাকা প্রয়োজন। সর্ব্বোপরি গ্রাম্য জীবন এবং গ্রামের জনসাধারণ সম্পর্কে তাঁহার ব্যাপক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন এবং তাঁহাদের উপর তাঁহাকে অবিচলিত আস্থা রাখিতে হইবে।

গ্রাম্য শিক্ষকের কাজ শুধু বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিলে চলিবে না। গ্রাম্য স্কুলে একমাত্র সেই সকল শিক্ষকেরই প্রয়োজন আছে যাঁহারা গ্রাম্য সমাজ-জীবনে শিকড় গাড়িয়া বসিতে পারিবেন এবং যাঁহারা সেই সমাজের জনসাধারণের আস্থা অর্জ্জন করিতে পারিবেন। স্বভাবতঃই শহর হইতে বা যে সকল বিদ্যালয়ে "অ-গ্রাম্য" (un-rural) শিক্ষা দেওয়া হয় সেখান হইতে গ্রাম্য শিক্ষক আনয়ন করা সমীচীন হইবে না, কারণ তাঁহাদের ঐ সকল গুণ না থাকিবারই সম্ভাবনা।"

বিহারের বুনিয়াদী শিক্ষণ বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক নির্ব্বাচনের যে পদ্ধতি অবলম্বিত হয় শ্রী পিরেসের মতে তাহা শিক্ষক নির্ব্বাচনের সঠিক পথের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করে। সেখানে প্রবেশার্থীদিগকে প্রথমে তিন দিন ব্যাপী শিবিরে বাস করিতে হয়, তাঁহাদিগকে সমবায় সামাজিক জীবনে অংশ গ্রহণ করিতে হয়। সেখানে নিজেদের রান্না এবং সাধারণ স্বাস্থ্যবিষয়ক ব্যাপার ছাত্রদিগকে নিজেদেরই দেখিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কার্য্যাবলীতে তাঁহাদের অংশ গ্রহণ করিতে হয়। এই সময়ের মধ্যে তাঁহাদিগকে সুতাকাটা এবং বুনিয়াদী শিক্ষার মূলনীতি সম্পর্কে পরীক্ষা দিতে হয়; বুনিয়াদী শিক্ষায় তাঁহাদের প্রকৃত আগ্রহ আছে তাহা প্রমাণ করিবার জন্য উদ্যানকৃষি এবং যে-কোন একটি শিল্পে আগ্রহ ও দক্ষতার পরিচয় দিতে হয়। অ-বুনিয়াদী (non-basic) শিক্ষণকেন্দ্রেও অনুরূপ পদ্ধতি অবলম্বিত হইলে গ্রাম্য শিক্ষক নির্ব্বাচনের সন্তোষজনক পদ্ধতি উদ্ভাবনের পথে বহুদূর অগ্রসর হওয়া যাইবে।

গ্রাম্য শিক্ষকদের প্রস্তুতির কথা বলিতে গেলে বলা যায় যে, বুনিয়াদী শিক্ষণ বিদ্যালয়গুলি ছাড়া গ্রাম্য শিক্ষকদের শিক্ষণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা কাহারও নাই।

শিক্ষণকেন্দ্র হইতে বাহিরে আসিয়া শিক্ষক যখন গ্রাম্য বিদ্যালয়ে শিক্ষাকার্য্যে ব্রতী হইবেন তখন সর্ব্বপ্রথমেই তাঁহাকে

ছাত্রদিগকে কৃষি সম্পর্কে শ্রদ্ধাবান করিয়া তুলিতে হইবে। শিশুগণ যাহাতে কৃষিকে অত্যাবশ্যক জীবিকা হিসাবে দেখিতে শিখে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য তখনই সফল হইতে পারে যখন কৃষিকে পাঠ্যসূচীর অন্যতম প্রধান বিষয় হিসাবে গ্রহণ করা হইবে। দেশের অধিকাংশ বুনিয়াদী শিক্ষণ বিদ্যালয়েই তাহা করা হইয়াছে; কিন্তু অন্যান্য বিদ্যালয়ে এই বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে অবহেলিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, গ্রাম্য সমাজের বিকাশে স্কুলের ভূমিকা সম্পর্কে ছাত্রদিগকে সজাগ করিতে হইবে। ভাবী গ্রাম্য শিক্ষককে এমনভাবে শিক্ষিত এবং উপযুক্ত করিয়া তুলিতে হইবে যাহাতে তিনি শুধু বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে পাঠদান ছাড়াও গ্রামের প্রাপ্তবয়স্কদিগকে শিক্ষা দান করিতে সক্ষম হন।

আমরা মনে করি যে, প্রত্যেক শিক্ষকেরই গ্রাম ও গ্রামকেন্দ্রিক সমাজের অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন এবং সেই কারণে গ্রামে শিক্ষাদান ও গ্রামসমাজে শিক্ষকের ভূমিকা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা, এই বিষয় দুইটিকে প্রত্যেক শিক্ষকেরই যোগ্যতার মান হিসাবে উচ্চ স্থান দেওয়া উচিত। সেই সঙ্গে শিক্ষানবীশ শিক্ষকের ঐরূপ অভিজ্ঞতা লাভের ব্যবস্থা হিসাবে তাঁহাদিগকে গ্রাম্য স্কুলে নিযুক্ত করা উচিত।

সুন্দরবনের ইতিহাস

শ্রীগিরীন্দ্রকৃষ্ণ বসু জয়নগর-মজিলপুর হইতে প্রকাশিত ২২শে চৈত্রের "বন্ধু" পত্রিকায় লিখিতেছেন, "কয়েকটি ইংরেজ পণ্ডিতের ভ্রান্ত মতানুসারে পূর্ব্বে লোকের ধারণা ছিল যে, সুন্দরবন অঞ্চল চিরকাল জঙ্গলময় ছিল; ইংরেজ রাজত্বকালে, ইংরেজের চেষ্টায় তাহা লোকবাসের উপযোগী হইয়াছে। মুষ্টিমেয় যে কয়েক জন ঐতিহাসিকের গবেষণায় এই ভ্রান্ত মত খণ্ডিত হইয়াছে শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার গবেষণায় সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, অন্যূন বার শত বৎসর পূর্ব্বে এই অঞ্চলে সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল।

"সুন্দরবনে এযাবৎ ইতিহাসসম্মত কোনও খননকার্য হয় নাই। পুষ্করিণী খনন প্রভৃতির সময় কখনও কখনও হঠাৎ ধাতু ও প্রস্তরমূর্ত্তি যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহার অধিকাংশ নষ্ট হইয়াছে, কতক দেবদেবীরূপে পূজিত হইতেছে, কতক স্থানীয় গৃহস্থের আসবাবে পরিণত হইয়াছে। বর্ত্তমানে লোকালয় বিস্তারের সঙ্গে অনেক পুষ্করিণী খনন হইতেছে। তৈলের সন্ধানেও শীঘ্রই সুন্দরবনের অনেক স্থানে খনন আরম্ভ হইবে, তখন অনেক পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হইতে পারে। কিন্তু যাঁহাদের উপর এই সব কার্য্যের ভার থাকিবে, তাঁহারা যে ইহার মূল্য বুঝিবেন এইরূপ আশা কম।

"কালিদাস বাবুর সংগ্রহরাজী ও তাঁহার আলোকচিত্র এবং পুথিগুলি অবলম্বন করিয়া যদি এই গ্রামের কোনও প্রকাশ্য স্থানে একটি মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে স্থানীয় অনেকের মনে পুরাবস্তু ও পুঁথি সংগ্রহের আগ্রহ জাগিবে এবং অনেক পুরাবস্তু রক্ষা পাইবে এবং বাংলার ইতিহাস ও ভূ-প্রকৃতির অনেক অজ্ঞাত তথ্য জানা যাইবে। কয়েক জন উৎসাহী কর্ম্মী অবসর সময়ে পুরাবস্তু ও পুথি সংগ্রহে মন দিলে একটি পূর্ণাঙ্গ "সুন্দরবন অনুসন্ধান সমিতি" গড়িয়া উঠা অসম্ভব নহে। ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা হইতে বিরাট মিউজিয়ম গড়িয়া উঠার দৃষ্টান্ত বিরল নহে।"

কালিদাস বাবুর লেখনী-প্রসূত প্রবন্ধমালা "প্রবাসী"তে প্রকাশিত হয়; সুতরাং তাঁহার লেখার সহিত আমাদের পাঠকগণের পরিচয় আছে। এই প্রস্তাবের গুরুত্ব সম্পর্কে সকলেরই অবহিত হওয়া উচিত।

সোনারপুর পরিকল্পনা

সাপ্তাহিক "পশ্চিমবঙ্গ" পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ, সোনারপুর-আরাপঞ্চ (Sonarpur Arapanch) জলনিষ্কাষণ পরিকল্পনার প্রথম অংশের কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। হল্যাণ্ড, ইংলণ্ড এবং ইটালী প্রভৃতি দেশে পাম্পের সাহায্যে জমি হইতে জল নিষ্কাষণের পদ্ধতি প্রচলিত থাকিলেও ব্যয়বহুলতার জন্য এত দিন পর্য্যন্ত ভারতে এই প্রণালী গৃহীত হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গে, সম্ভবতঃ সমগ্র ভারতেও, এই সোনারপুর-আরাপঞ্চ জলনিষ্কাষণ পরিকল্পনার দ্বারাই সর্ব্বপ্রথম জমি হইতে পাম্পের সাহায্যে জল নিষ্কাষণের প্রণালী অনুসৃত হইয়াছে।

এই পরিকল্পনাটি একটি বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ। বৃহত্তর পরিকল্পনায় ১০৫ বর্গ মাইল পরিমিত স্থান হইতে অংশতঃ পাম্পের সাহায্যে এবং অংশতঃ মাধ্যাকর্ষণ প্রণালীর সাহায্যে জল নিষ্কাষণের কথা চিন্তা করা হইয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে পরিকল্পনাভুক্ত জমির পরিমাণ কমাইয়া উত্তরে টালির নালা এবং বিদ্যাধরী নদী, পূর্ব্বে পিয়ালী নদী, দক্ষিণে উত্তর ভাগ—বারুইপুর এবং পশ্চিমে বারুইপুর হইতে গড়িয়া পর্য্যন্ত রাস্তা লইয়া গঠিত ৫৭ বর্গমাইল পরিমিত স্থানে উহার কার্য্যকারিতা সীমাবদ্ধ রাখা হয়। এই ৫৭ বর্গমাইল স্থানের মধ্যে ৩৬½ বর্গমাইল স্থান সম্পূর্ণরূপে জলমগ্ন।

পরিকল্পনানুযায়ী চারিটি বৈদ্যুতিক পাম্প বসানো হইবে। সেগুলি প্রতি মিনিটে ৩,৭৫,০০০ গ্যালন জল পাম্প করিবে। মাঝেরঘাট হইতে ৩,০০০ কিলোওয়াট পরিমাণ বিদ্যুৎ ঊর্দ্ধস্থিত তারের সাহায্যে প্রায় ১৯ মাইল দূরে লইয়া যাওয়া হইবে এবং তাহার সাহায্যে গড়িয়া, বারুইপুর এবং সোনারপুরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইবে।

বর্ত্তমানে এই অঞ্চলে কোন শস্যই উৎপন্ন হয় না। এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইবার ফলে খাদ্যশস্য এবং রবিশস্য মিলাইয়া প্রতি বৎসর অতিরিক্ত ৪,৮৫,০৬০ মণ শস্য পাওয়া যাইবে। তদুপরি প্রতি বৎসর সমপরিমাণ খড়ও পাওয়া যাইবে। সমগ্রভাবে শস্য ও খড়ের আনুমানিক মূল্য বার্ষিক ৪৪ লক্ষ টাকা।

এই পরিকল্পনার ফলে উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসনেও অনেক সাহায্য হইবে।

চীনাবাদাম

ত্রৈমাসিক "বসুন্ধরা" পত্রিকায় এক প্রবন্ধে শ্রীহরিতারণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তুলসীদাস সেনগুপ্ত চীনাবাদাম সম্পর্কে লিখিতেছেন যে, নাম শুনিয়া চীনাবাদামের উৎপত্তিস্থল চীনদেশ বলিয়া মনে হইলেও যত দূর জানা যায় চীনাবাদামের উৎপত্তিস্থল দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকা। ভাস্কো-ডা-গামার আগমনের পর খ্রীষ্টান পাদরীরা ভারতে ইহার চাষ প্রবর্ত্তন করেন এবং ক্রমে ক্রমে ইহার চাষ প্রসারলাভ করিয়া চীনাবাদাম উৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্যে ভারত আজ সর্ব্বপ্রথম স্থান (?) অধিকার করিয়া আছে। লেখকদ্বয়ের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী "ভারতে মোট ৬,৪৮২ হাজার একর জমিতে ২,৫২০ টন গোটা বাদাম উৎপন্ন হয় এবং ইহার মধ্যে একমাত্র মাদ্রাজেই চাষ হয় ৩,৪২১ হাজার একর জমিতে। মাদ্রাজের পরেই বোম্বাইয়ের স্থান (১,৭৫২ হাজার একর)। হায়দরাবাদ, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার এবং মহীশূরেও যথেষ্ট পরিমাণ চীনাবাদাম উৎপন্ন হয়। আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল দেশে সমানতালে চাষের প্রসার তথা উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, বাংলাদেশে চীনাবাদাম চাষের অনুকুল অবস্থা থাকা সত্ত্বেও কৃষকরা এইরূপ একটা মূল্যবান ফসলকে আজ পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন নাই। এমন কি বহু লোক আছেন যাঁহারা চীনাবাদাম গাছ জীবনে কখনও দেখেন নাই।"

লেখকদ্বয়ের অভিমতে নিম্নলিখিত কারণগুলি ইহার জন্য দায়ী বলিয়া মনে হয়, যথা:

"১। কৃষকেরা বাদামের চাষ সম্পর্কে এখনও অজ্ঞ রহিয়া গিয়াছেন।

২। বাদামের চাষ না জানায় এবং ঐ সময় জমিতে চাষ করার মত অন্য শস্য থাকায়, বাদাম-চাষ প্রসারলাভ করিতে পারে নাই।

৩। রোগমুক্ত এবং উৎকৃষ্ট বীজের অভাব। বাজারে যে সমস্ত বাদাম কিনিতে পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই রোগাক্রান্ত থাকে। এই কারণে বাজার হইতে বীজ কিনিয়া চাষ করিয়া লাভবান হওয়া শক্ত।

তাহা ছাড়াও বেচাকেনার অসুবিধা, তৈলনিষ্কাষণের উপযুক্ত যন্ত্রের অভাব ইত্যাদি তো আছেই।

অন্যান্য রাজ্যে তৈলবীজ-শস্যের উন্নতির জন্য বিশেষ যত্ন লওয়া হয়, ইদানীং এই রাজ্যেও তৈলবীজ-শস্যগুলিকে একটি বিশিষ্ট পর্য্যায়ে ফেলিয়া পৃথকভাবে সেগুলির উন্নতির চেষ্টা হইতেছে।"

"চীনাবাদাম মাটির নীচে হয়। চীনাবাদাম গাছের শিকড়ে এক প্রকার গুটি হয় এবং তাহাদের মধ্যে এক প্রকার জীবাণু বাতাসের নাইট্রোজেনের সাহায্যে গাছের অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য প্রস্তুত করিয়া দেয়। সেজন্য চীনাবাদাম বিনা সারেই হইতে পারে। বাদাম তুলিয়া লইবার পর গাছের যেসব শিকড় মাটির ভিতর থাকে তাহাদের গুটির মধ্যে অতিরিক্ত সার পরবর্ত্তী শস্যের জন্য থাকিয়া যায়। চীনাবাদাম শুধুই যে নীরস জমিতে জন্মিতে পারে তাহাই নহে, নীরস জমিকে সরসও করিয়া দেয়। চীনাবাদামের চাষ করিয়া এইরূপে দুই দিকে লাভবান হওয়া যায়।

"খাদ্য হিসাবে ব্যবহার ছাড়া চীনাবাদাম তৈল হিসাবেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। ইহার তৈল প্রদীপেও ব্যবহার করা চলে। সাবানের উপাদান হিসাবে এবং গ্লিসারিন তৈয়ারিতে ইহার বহুল প্রচলন আছে। পশুর চর্ব্বির পরিবর্ত্তে শিল্পকারখানায় আজকাল বাদাম ও অন্যান্য তৈলের মিশ্রণে উদ্ভিজ্জ চর্ব্বি তৈয়ারি করিয়া ব্যবহার হইতেছে। কিন্তু বাদাম তৈলের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ব্যবহার হইতেছে দালদা বা বনস্পতির উপাদান হিসাবে। তৈল নিষ্কাশনের পর যে খইল পাওয়া যায় তাহা গবাদি পশুর পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট খাদ্য। পশুখাদ্য ছাড়াও জমির সার হিসাবে এই খইল প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, কারণ উদ্ভিদের খাদ্য হিসাবেও ইহা অতি উৎকৃষ্ট।"

ইহার চাষের বিশদ বিবরণ, অর্থাৎ ডাঙ্গা জমি বা অন্য রূপে পতিত জমিতে ইহা চলে কি না এবং কিরূপ জমিতে কি ভাবে চাষ করিলে ফলন ভাল হয়, ইহার ফসল সংগ্রহের রীতি কিরূপ এবং বাজার কিরূপ—এই সকল তথ্যযুক্ত বিবরণ চাষীদের মধ্যে প্রচারিত হওয়া উচিত। প্রচারের উপায় দুই ভাবে হইতে পারে। চাষীকে সাক্ষাৎ বলিয়া এবং উদাহরণরূপে তাহার নিজের বা তাহার প্রতিবেশীর কিছু জমিতে চাষ দিয়া চীনাবাদাম ফলাইলে শ্রেষ্ঠরূপে প্রচার হয়। অন্যথায় সরকারী কৃষিক্ষেত্রে ঐ ফসল জন্মাইয়া তাহার পূর্ণ বিবরণ গ্রামে গ্রামে প্রচার করিয়া বীজের ব্যবস্থা ও সময় নির্দ্দেশ করিলে ইহা কিছুমাত্রায় সফল হইতে পারে।

কৃষিঋণ

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় আইন-পরিষদে কৃষিঋণ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে। বৎসরে পাঁচ শত হইতে আট শত কোটি টাকার মত কৃষিঋণ প্রয়োজন, সেখানে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দেয় প্রায় নয় কোটি টাকার ঋণ। ১৯৪৬ সনে দিয়াছিল মোট দেড় লক্ষ টাকার মত। সমবায় সমিতির ঋণ সাহায্য অতি নগণ্য। সেইজন্য চাষীরা বাধ্য হইয়া মহাজনদের নিকট হইতে বেশী সুদে ঋণ লইত।

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই কৃষিঋণ দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় কৃষি-ব্যাঙ্ক আছে। কৃষিঋণের মেয়াদ সাধারণতঃ ষাট বৎসর পর্য্যন্ত, সে অবস্থায় কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক কখনও সত্যিকার কৃষিঋণ দিতে পারে না। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একটি বৃহত্তর কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ব্যতীত কিছুই নহে, ইহার পক্ষে ব্যাপকভাবে দীর্ঘদিনের মেয়াদী ঋণ দেওয়া সম্ভব নহে। সেইজন্য ১৯৪৬ সনে গ্যাডগিল কমিটি একটি কেন্দ্রীয় কৃষি-ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য অনুমোদন করিয়াছিলেন। ভারত গবর্ন্মেণ্ট সেই অনুমোদন গ্রহণ করেন নাই। পরন্তু ১৯৫০ সালে গ্রাম্য ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটি বসাইয়া গ্যাডগিল কমিটির সুপারিশ

নাকচ করিয়া দিয়াছিলেন। গ্রাম্য ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটির দৃষ্টিভঙ্গীতে মস্ত ভুল ছিল যখন তাঁহারা কৃষিঋণ এবং বাণিজ্য-ঋণের মধ্যে পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইলেন না। তাঁহারা অনুমোদন করিলেন যে, গ্রামে গ্রামে কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক বসাইয়া কৃষিঋণ দেওয়া হইবে। কিন্তু ইহা কার্যকরী হইতে পারে না এবং হয়ও নাই। বাণিজ্য-ঋণ হইতেছে স্বল্পমেয়াদী, আর কৃষিঋণ দীর্ঘমেয়াদী। কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক যদি দীর্ঘমেয়াদী কৃষিঋণ দিতে যায় তাহা হইলে বিপদ ডাকিয়া আনিবে। ভারতে সমবায় সমিতি কৃষিঋণ দেওয়ার ব্যাপারে অকৃতকার্য হইয়া গিয়াছে। সেইজন্য জোড়াতালি না দিয়া যদি প্রকৃতপক্ষে কৃষিঋণের সমস্যা সমাধান করিতে হয় তাহা হইলে একটি সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় কৃষি-ব্যাঙ্ক স্থাপন করা প্রয়োজন।

ভারতে বিদেশী মিশনরী

ভারতে বিদেশী মিশনরীগণ যে কিরূপ ক্ষতিকারক কার্য্য করিতেছে সম্প্রতি কয়েকটি ঘটনা হইতে তাহা খুবই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ১৫ই এপ্রিল স্বরাষ্ট্র-সচিব ডঃ কাটজু যে বিবৃতি দেন তাহা হইতে জানা যায় যে, বর্ত্তমানে ভারতে ৬২টি ক্যাথলিক সমিতি এবং ৫০টি প্রোটেষ্টান্ট সমিতি তাহাদের নানা শাখা-প্রশাখার মাধ্যমে কার্য্য করিতেছে। ১৯৫১ সনের এপ্রিল মাস হইতে পাঁচটি খ্রীষ্টান সমিতি—একটি ব্রিটিশ ও চারিটি মার্কিন—ভারতে প্রচার-কার্য্য চালাইবার জন্য ভারত-সরকারের অনুমতি প্রার্থনা করেন। তন্মধ্যে একটির আবেদন অগ্রাহ্য করা হয়; বাকী চারিটির আবেদন ভারত-সরকারের বিবেচনাধীন আছে। ১৯৫০ সনের এপ্রিল মাস হইতে মোট ১৭৬৮ জন খ্রীষ্টান মিশনরী বিভিন্ন দেশ হইতে ভারতে আসিয়াছে। কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলি হইতে যে সমস্ত মিশনরী আসিয়াছেন তাহা এই হিসাবের অন্তর্ভুক্ত নহে। এই সকল মিশনরীর কার্য্যকলাপের ফলাফল যে কতদূর বিপজ্জনক নিম্নলিখিত তথ্য হইতে তাহা সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইবে। ২৮শে চৈত্র "যুগবাণী" লিখিতেছেন:

"আসামের নাগাপাহাড়ের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন নাগাল্যাণ্ডের আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতালাভের পর হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে তীব্র হইয়া উঠিতেছে। আড়ালে থাকিয়া কাহারা নাগাদের উস্কাইয়াছে তাহা জানিতে আমাদের প্রধানমন্ত্রী জহরলালের চার বৎসর লাগিয়াছে এবং নিজে নাগাপাহাড়ে গিয়া অপমান সহিয়া বুঝিতে হইয়াছে। সময়ে হস্তক্ষেপ করিয়া বিদেশী মিশনরীদের বিষদাঁত ভাঙিয়া দিলে এই আন্দোলন শক্ত দানা বাঁধিয়া উঠিতে পারিত না।... [নেহরুকে] যেভাবে অপমান করা হইয়াছে তাহা নাগাদের বুদ্ধিতে হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। জবাহরলালও তাহা বলিয়াছেন।...

"ব্রিটিশ শাসনের প্রথম হইতে আসামের পার্ব্বত্য অঞ্চলগুলি বিদেশী মিশনরীদের ঘাঁটি হইয়াছে। পাহাড়ের আনাচে-কানাচে গির্জ্জার ছাউনী ফেলিয়া তাহারা উহা আগলাইয়া বসিয়া আছে। জবাহরলাল বলিয়াছেন পাহাড়ীদের মধ্যে মিশনরীরা অনেক ভাল কাজ করিয়াছে। ইহাদের সৎকাজগুলি নিছক সেবাব্রত ও ধর্ম্মাচরণ মনে করিলে বিষম ভুল করা হইবে। গভীর জলের মাছের মত ইহারা ধরাছোঁয়ার মধ্যে আসে না, খোলাখুলি রাজনীতি করে না বটে, কিন্তু নিজের দেশের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধিতে তাহাদের আগ্রহ ও প্রভাব উপেক্ষা করিবার নহে।

"এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তারের অভিযানে শ্বেতাঙ্গ জাতিরা প্রথম পাঠাইত পাদ্রী, পিছনে আসিত গানবোট। বাইবেল ও বেয়নেট সাম্রাজ্যবাদীর হাতে একই হাতিয়ারের দুই মুখ। খোলাখুলি শত্রুতাকে ঠেকান যায়, কিন্তু গুপ্ত শত্রুতা ভয়াবহ। এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকা ভারত-সরকারের উচিত ছিল। বর্ম্মা গবর্ণমেণ্ট এই উদাসীনতার ফল ভোগ করিতেছে। মিশনরীরা কারেনদের দিয়া যে বিদ্রোহের আগুন জ্বালাইয়াছে তার পরিণাম কি হইবে বলা যায় না।..."

স্বামী নির্ম্মলানন্দ "প্রণব" পত্রিকায় এক প্রবন্ধে লিখিতেছেন যে, ভারত-সরকার মিশনরীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং গ্রামাঞ্চলে সমাজ-উন্নয়ন কার্য্য করিবার সুযোগদানের যে নীতি গ্রহণ করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত মারাত্মক। তাহারা এই সকল সুযোগের মাধ্যমে অজ্ঞ, দারিদ্র্যগ্রস্ত, বিশ্বাসপ্রবণ জনসাধারণের মনকে বিষাক্ত করিবার সুযোগ পাইবে। তিনি অবিলম্বে এই সকল মিশনরীর কার্য্য-কলাপ বন্ধ করিয়া দিবার দাবী করিতেছেন।

ওদিকে আমরা এক মার্কিন সংবাদ পরিবেশনে দেখিতেছি যে, ইন্দোনেশিয়া, মালয় ইত্যাদি অঞ্চলে তাহারা মিশন ও ধর্ম্মযাজনার কাজে ভারতীয়, ফিলিপিনো বা মার্কিন নিগ্রো ভিন্ন অন্য ধর্ম্ম-প্রচারকের বিরুদ্ধে তীব্র বিরোধ অনুভব করিতেছে এবং সেই কারণে শ্বেতকায়দের বাদ দিয়া মিশন চালাইবার ব্যবস্থা করিতেছে। এদেশের খ্রীষ্টান সমাজ বিশাল ও শিক্ষা-দীক্ষায় বিদেশীর সমকক্ষ লোকের অভাব তাঁহাদের নাই। সুতরাং প্রত্যেকটি বিদেশী মিশনে সম্পূর্ণ ভারতীয় ভাবাপন্ন খ্রীষ্টান নিয়োগের কোনও বাধা নাই। অতএব ঐরূপ একটি সর্ত্ত প্রত্যেক মিশনকে গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হউক যে, তাঁহাদের মিশনের প্রতি কেন্দ্রে এক জন উপযুক্ত ভারতীয় খ্রীষ্টানকে উচ্চ পদে বসাইতে হইবে এবং ঐরূপে নিযুক্ত ব্যক্তির মিশন-চালনায় সক্রিয় অধিকার থাকিবে। এইরূপ ব্যবস্থা হইলে খ্রীষ্টান সমাজের আশঙ্কা দূর হইবে এবং ভারতীয় খ্রীষ্টানগণের আত্ম-সম্মানবোধও উন্নত হইবে। যে যে মিশন এই সর্ত্ত গ্রহণ করিবে না তাহাদিগকে এদেশ হইতে অবিলম্বে দূর করাও নিতান্ত প্রয়োজন। ধর্ম্মের নামে কূটনীতির চালনা অত্যন্ত ঘৃণ্য অনাচার।

কলম্বো পরিকল্পনাধীনে কারিগরী সাহায্য ব্যবস্থা

ভি. ডি. আর্ণড টেলর কারিগরি সহযোগিতা পরিষদ কলম্বো পরিকল্পনাভুক্ত কারিগরী সহযোগিতা পরিকল্পনা সম্পর্কে ১৯৫২

সনের যে কার্য্যবিবরণী প্রকাশ করেন তাহা হইতে তথ্য আহরণ করিয়া লিখিতেছেন :

"১৯৫২ সালে কলম্বো পরিকল্পনাভুক্ত কারিগরী সহযোগিতা ব্যবস্থাধীনে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশীয় দেশগুলি যথেষ্ট পরিমাণে কারিগরী সাহায্যলাভ করে। ঐ বৎসর ৯০ জন বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন দিকে প্রেরিত হয়, তুলনায় ১৯৫১ সালে প্রেরিত হয় ৪৫ জন মাত্র। ১৯৫০ সালের জুন মাসে পরিকল্পনা কার্য্যকরী হওয়ার পর হইতে এ পর্য্যন্ত প্রেরিত বিশেষজ্ঞের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩৫। ইহার মধ্যে ৬১ জন প্রেরিত হয় যুক্তরাজ্য হইতে, ৪০ জন অষ্ট্রেলিয়া হইতে, ১৭ জন নিউজিল্যাণ্ড হইতে, ৬ জন কানাডা হইতে এবং ৫ জন ভারত হইতে। ইতিমধ্যে অবশ্য এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

এই বৎসর তালিম গ্রহণ সম্পর্কেও শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এই সময় মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা হয় ৫৩৮, গত বৎসর হয় ৩০৯। ১৯৫০ সালের জুন মাস হইতে এ পর্য্যন্ত মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা হয় ৮৪৭—ইহার মধ্যে ২৭৯ জন শিক্ষালাভ করে যুক্তরাজ্যে, ২৮৬ জন অষ্ট্রেলিয়ায়, ১১৯ জন নিউজিল্যাণ্ডে, ১০৬ জন কানাডায়, ৫৬ জন ভারতে এবং ১ জন পাকিস্থানে।"

এই কারিগরী সহযোগিতা পরিকল্পনার উৎপত্তি হয় ১৯৫০ সনে সিডনীতে এবং লণ্ডনে কলম্বো পরিকল্পনা উপদেষ্টা কমিটির অধিবেশনে। এই পরিকল্পনার উদ্যোক্তা যুক্তরাজ্য, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, সিংহল, ভারত, নিউজিল্যাণ্ড ও পাকিস্থান আলোচনার ভিত্তিতে স্থির করে যে, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়াকে প্রায় ৮০ লক্ষ পাউণ্ড পরিমাণ কারিগরী সাহায্য দেওয়া হইবে। ইহার মধ্যে ব্রিটেনের অংশ ২৮ লক্ষ পাউণ্ড। পরে পরিষদে কাম্বোডিয়া, ভিয়েৎনাম, ব্রহ্মদেশ, নেপাল ও ইন্দোনেশিয়া যোগদান করে। ফিলিপাইন ও থাইল্যাণ্ড সদস্য না হইলেও এই পরিকল্পনার সাহায্য পাইয়া থাকে।

কলম্বোতে এ সম্পর্কে আছে একটি স্থায়ী 'কারিগরী সাহায্য ব্যুরো', ইহার পরিচালন দায়িত্ব হইল ব্রিটিশ ট্রেজারীর মিঃ জিওফ্রে উইলসনের। ব্যুরো প্রধানতঃ সংযোগরক্ষী এজেন্সি হিসাবে কাজ করে, এ সম্পর্কে আসল আলাপ-আলোচনা চলে সংশ্লিষ্ট দুই গবর্ণমেণ্টের মধ্যে।

বিবরণী হইতে লক্ষ্য করা যায় যে, বিশেষজ্ঞ প্রেরণ বা তালিমি ব্যবস্থায় শিক্ষার্থী আহ্বান সম্পর্কে ভারত, পাকিস্থান ও সিংহলই বিশেষ লাভবান হয়। এই তিন দেশে মোট বিশেষজ্ঞ প্রেরিত হয় ১১৮ জন এবং এই তিন দেশ হইতে শিক্ষার্থী অন্যত্র গমন করে ৬৮৯ জন।

উন্নয়ন সম্পর্কে তিন দিকে এই সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়—পরিকল্পনা রচনা, কোন বিশেষ পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা এবং নিজেদের দেশের মধ্যে সর্ব্ববিভাগীয় কারিগরদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা। উক্ত বিবরণী হইতে দেখা যায় যে, সাহায্যের পরিমাণ তৃতীয় দিকে বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কারণ খুবই সহজ। বিদেশ হইতে বিশেষজ্ঞ আমদানী করিয়া কাজ চালান সম্ভব হইলেও দক্ষ কারিগরের অভাব এই ভাবে দূর করা সম্ভব নয়। সেজন্য দেশের মধ্যেই তাঁহাদিগকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

মিঃ আর্ণড টেলর লিখিতেছেন যে, কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধির গুরুত্ব স্বীকৃত হয় বলিয়াই ১৯৫২ সনে অধিকতর সংখ্যায় বিশেষজ্ঞ প্রেরণের ব্যবস্থা হয়। ১৯৫২ সনে সর্ব্বশুদ্ধ ৯০ জন বিশেষজ্ঞ এই অঞ্চলে আসেন এবং তাঁহাদের প্রায় সকলেই স্থানীয় কর্ম্মীদের শিক্ষাদান কার্য্যে নিযুক্ত হন।

১৯৫২ সনে এই কারিগরী সহযোগিতা ব্যবস্থাধীনে যুক্তভাবে মূলধন সাহায্য এবং কারিগরী সাহায্যের ব্যবস্থা হয়। অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড এবং কানাডার সরকার যৌথভাবে পাকিস্থানে একটি ফার্ম্মের জন্য মূল যন্ত্রপাতি সরবরাহ এবং কারিগরী সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। ১৯৫২ সনে বিশেষজ্ঞদের ব্যবহারের জন্য সাজ-সরঞ্জামের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। খড়্গপুরের কারিগরী বিদ্যালয়ের জন্য ৩৫ হাজার পাউণ্ড মূল্যের সাজ-সরঞ্জাম ব্রিটেন সরবরাহ করিতেছে।

ভারত তাহার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিকে এই ব্যবস্থাধীনে সাড়ে-সাত লক্ষ পাউণ্ড পরিমাণ সাহায্যদানের পরিকল্পনা করিয়াছে; সিংহল এই ব্যবস্থাধীনে সাহায্য করিবে ৪,০০,০০০ পাউণ্ড পরিমাণ; পাকিস্থান ১,৬১,২৯০ পাউণ্ড পরিমাণ।

মিঃ আর্ণড টেলর লিখিতেছেন :

"এই তহবিল হইতে ভারত সিংহলে পাঁচ জন বিশেষজ্ঞ প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছে, এবং পরিসংখ্যান বিজ্ঞান, চিনি-প্রস্তুত-বিজ্ঞান, শুল্ক আদায় ব্যবস্থার পরিচালন, ব্রডকাষ্টিং ও ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে সে গ্রহণ করিয়াছে অন্যান্য দেশের শিক্ষার্থীদের। ইহা ছাড়া সে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এবং অন্যান্য বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভের সুযোগ দিবার জন্য দিয়াছে ৫৫টি বৃত্তি এবং ফেলোশিপ। যুক্তরাজ্য গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতায় দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার ব্রিটিশ অঞ্চলগুলিও সিংহল হইতে শিক্ষার্থী গ্রহণ করিয়াছে, এবং ভারতের শিক্ষার্থীরাও যাহাতে সেইরূপ শিক্ষার সুযোগ লাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতেছে।"

আন্তর্জাতিক গমচুক্তি

প্রায় দুই মাসের বেশী আলোচনা চালানোর পর আমেরিকার ক্রেতা দেশগুলির সহিত যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক গমচুক্তি পুনরায় আগামী তিন বৎসরের জন্য করিতে সক্ষম হইয়াছে। এখন পর্য্যন্ত মোট ২৪টি দেশ এই চুক্তিতে সহি দিয়াছে। ভারত ও ব্রিটেন চুক্তিতে সহি করে নাই। নূতন চুক্তি অনুসারে গমের মূল্য বৃদ্ধি করা হইয়াছে—তাহারই প্রতিবাদে ভারত ও ব্রিটেন চুক্তির বাহিরে আছে। চলতি চুক্তি অনুসারে এক বুশেল গমের দাম ১.২০ হইতে ১.৮০ ডলারের মধ্যে বিক্রয় হইবে। সরবরাহ এবং চাহিদা অনুসারে গমের আন্তর্জাতিক মূল্য এই নিম্ন ও উচ্চ ক্রমের মধ্যে নিবদ্ধ থাকিবে। নূতন চুক্তি অনুসারে গমের দাম বাড়াইয়া বুশেল প্রতি

১.৫৫ ডলার হইতে ২.০৫ ডলারের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। অর্থাৎ, বাজারের অবস্থা অনুসারে এই সীমার মধ্যে মূল্যের ব্যতিক্রম হইতে পারে।

ব্রিটেন বুশেল প্রতি দুই ডলারের বেশী কিছুতেই দিতে রাজী নহে। কেবলমাত্র ০.০৫ ডলার বেশী দিতে হইবে বলিয়া ব্রিটেন নূতন চুক্তিতে যোগ দেয় নাই। চলতি চুক্তি অনুসারে ব্রিটেন বৎসরে ১৭.৭ কোটি বুশেল গম বৎসরে আমদানী করিত এবং সে ছিল সবচেয়ে বড় ক্রেতা। ব্রিটেন চুক্তির বাহিরে থাকা মানে আমেরিকার গম যথেষ্ট পরিমাণে উদ্‌বৃত্ত থাকিয়া যাইবে।

আমেরিকার বক্তব্য এই যে, তাহাকে তাহার গমচাষীকে বুশেল প্রতি ৬২ সেণ্ট করিয়া (প্রায় তিন টাকা) অনুদান দিতে হইতেছে, সেইজন্য তাহার পক্ষে গমের মূল্য হ্রাস করা মানে প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করা। উত্তরে ব্রিটেন বলে যে, শুধু আমেরিকার চাষীর কথা ভাবিলে চলিবে না, আন্তর্জাতিক বাজার ও ক্রেতার কথাও ভাবিতে হইবে। আজ যখন ব্রিটেন বুশেল প্রতি সর্বোচ্চ দর দিতেছে ১.৮৬ ডলার, তখন কেন সে তাহার বেশী দাম দিতে যাইবে। আন্তর্জাতিক চুক্তির দ্বারা যে পরিমাণ গম বিক্রয় হয় ব্রিটেন তাহার শতকরা ৩০ ভাগ কেনে এবং ভারতের প্রাপ্য পরিমাণ হইতেছে শতকরা ১০ ভাগ, অর্থাৎ এই দুইটি দেশ মিলিয়া শতকরা ৪০ ভাগ কেনে। সেইজন্য ইহাদের বাদ দিয়া আন্তর্জাতিক গমের বাজার খুব সুবিধা করিতে পারিবে না।

তবে ভারতের পক্ষেও অসুবিধা আছে। তাহার পক্ষে গম অতি অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং তাহাকে আমেরিকার কাছ হইতে গম কিনিতেই হইবে। তাই পরবর্ত্তী সংবাদে জানা যায় যে, ১৭ই এপ্রিল ভারতবর্ষ এই চুক্তিতে সহি করিয়াছে। পুরাতন চুক্তিতে ৪৬টি দেশ সহি করিয়াছিল, নূতন চুক্তিতে মোটে ২৪টি দেশ সহি করিয়াছে। চুক্তিমত ভারতবর্ষ গমের সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন মূল্য বুশেল প্রতি যথাক্রমে ২.০৫ ও ১.৫৫ ডলার হিসাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গে পঞ্চাশ বৎসরের পুস্তক প্রকাশনা

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ চৈত্র মাসের "ইমরোজ" পত্রিকায় লিখিতেছেন যে, ঢাকা শহরে বিগত অর্দ্ধশতাব্দীর প্রকাশনার ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে দেখা যায়, সেখানে গ্রন্থ প্রকাশের যে বিপুল ও ধারাবাহিক প্রয়াস চলিয়াছিল তাহা বিশেষ ভাবে বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তকের। অবশ্য সাময়িক ও মৌলিক সাহিত্যেরও একটি বিশেষ ধারা সেখানে প্রবাহিত ছিল।

বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তক প্রধানতঃ রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় অর্থাৎ টেক্সট বুক কমিটির দৌলতে সৃষ্টি হয় ও পুষ্টিলাভ করে। "কিন্তু এক বিষয়ে ঢাকার প্রকাশকগণ এক অসমসাহসিকতা এবং স্বাদেশিকতার পরিচয় ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে রেখে গেছেন—তাহা ইংরেজী সাহিত্য বই ও কপি বুক প্রকাশ করে। এ বিষয়ে এঁরা কলকাতার প্রকাশকদের ওপর টক্কর দিয়ে অগ্রণী হয়েছেন। এ গৌরব ঢাকার চিরকালের প্রাপ্য। সেকালে ইংরেজী রীডারগুলো সবই ইংরেজ লেখক ও প্রকাশকদের একচেটিয়া ছিল। এমন কি একখানা প্রাইমার পড়াতে হলেও ম্যাকমিলন কোম্পানীর King Primer পড়াতে হ'ত। পশ্চিমবঙ্গে শুধু স্বর্গীয় প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের ফার্ষ্ট বুক ছিল, তার প্রকাশকও ছিল ইংরেজ কোম্পানী। এ বিষয়ে ঢাকার দুইটি প্রকাশকের দান উল্লেখযোগ্য—একটি রিপন লাইব্রেরী ও অপরটি বেঙ্গল লাইব্রেরী।

"রিপন লাইব্রেরীর কালীপ্রসন্ন নাথ মহাশয় অত্যন্ত দুঃসাহসী প্রকাশক ছিলেন। তিনিই প্রথম এক সিরিজ ইংরেজী সাহিত্যের বই (New India Readers—V. Law revised by Laura Vaulda) এবং রিপন কপি বুক নামে এক সিরিজ ইংরেজী কপি বুক প্রকাশ করেন।"

করিমগঞ্জে বিদ্যুৎ সরবরাহের অব্যবস্থা

১৮ই বৈশাখ "যুগশক্তি" পত্রিকা এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিতেছেন যে, প্রায় ছয় মাস পূর্ব্বে করিমগঞ্জ ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর বড় মেসিনটি নষ্ট হইয়া যাইবার পর শহর ও বাজারে বিদ্যুৎ-সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। অনেক রাস্তায় আলো জ্বালান হয় না এবং বিদ্যুৎ-ব্যবহারকারিগণকে নামমাত্র বিদ্যুৎ ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। ফ্যান, রেডিও, ইলেকট্রিক মোটর চালানো প্রায় বন্ধ। জনসাধারণ এই অসুবিধা সাময়িক বিধায় মানিয়া লইয়াছিলেন; তাঁহাদিগকে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল যে, শীঘ্রই নূতন মেসিন আনা হইবে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা করা হয় নাই। কোম্পানীর বর্ত্তমান কার্য্যকলাপে বর্ত্তমান দুরবস্থার প্রতিকারের কোন আশাই পরিলক্ষিত হইতেছে না। আলোর অভাবে ব্যবসায়ী ছাত্র ছাত্রী প্রভৃতিদের বহু অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। উক্ত পত্রিকা লিখিতেছেন: "যাঁহারা বৈদ্যুতিক পাখা, মোটর, রেডিও ইত্যাদি ক্রয় করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে জানান হইয়াছে যে, এইগুলিতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করা চলিবে না। বৈদ্যুতিক সংযোগসাধনে প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া এখন সকলেই হা হুতাশ করিতেছেন।"

প্রতিকারের উপায় হিসাবে পত্রিকাটির বক্তব্য হইল যে, করিমগঞ্জ ইলেকট্রিক কোম্পানী যদি জনসাধারণের প্রয়োজন মিটাইতে অপারগ হয় তবে "কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষেরই সরকারের সঙ্গে মিলিয়া একটা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।"

খাজা নাজিমুদ্দীনের পদচ্যুতি

"সোনার বাংলা" ১২ই বৈশাখ সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিয়াছেন:

"পাকিস্থানের গবর্ণর-জেনারেল কর্ত্তৃক পাকিস্থান প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের পদচ্যুতির নির্দ্দেশদানের সংবাদ এমনই বিস্ময়কর যে সহসা প্রত্যয় হইবার মত নহে। তবে রাজনীতি নাকি এমনই জটিল ও ঘোরালো যে, যে-কোন অঘটনই ঘটাইতে সক্ষম, সাধারণ মানুষের বুদ্ধির অগম্য ভাবেই তাহার আবির্ভাব ঘটে।"

"মন্ত্রীসভার পরিবর্ত্তন কিছুমাত্র অস্বাভাবিক ব্যাপার নহে। যরূপ আকস্মিকতার সহিত নাটকীয়ভাবে নাজিম মন্ত্রীসভার পতন ঘটানো হইল তাহা বস্তুতঃই বিস্ময়কর। মাত্র কিছুদিন আগে খাজা নাজিমুদ্দীন পাকিস্থান পার্লামেন্টে তাঁহার বাজেট পাস করাইয়া লইয়াছেন। পার্লামেন্টের মুসলিম লীগ সদস্যগণ এক-বাক্যে নাজিম মন্ত্রীসভার সমর্থন করিয়াছেন। পাকিস্থানের পররাষ্ট্র ও স্বরাষ্ট্র-নীতি পার্লামেন্টের অধিকাংশ সদস্য কর্ত্তৃকও সমর্থিত হইয়াছে। আহম্মদীয় বিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে খাজা নাজিমুদ্দীন আইন-শৃঙ্খলার জন্য বলিতে গেলে কঠোর নীতিই অবলম্বন করিয়াছেন। আরও পূর্ব্বে আহম্মদীয়-বিরোধী প্রচারকার্য্য সম্পর্কে অধিকতর কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে করাচী ও লাহোরে যে অবাঞ্ছিত অশান্তি দেখা দিয়াছিল তাহা আদৌ দেখা দিত না, এমন অভিযোগ কেহ করিলে উত্তরে ইহাই বলা চলে যে, সেই জন্যও খাজা নাজিম একাই দায়ী নহেন, মোটামুটি পূর্ব্ব-অনুসৃত নীতিই খাজা নাজিমুদ্দীন অনুসরণ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে স্বয়ং গবর্ণর-জেনারেল ভিন্নমত পোষণ করিতেন—ইহাও প্রকাশ পায় নাই। মন্ত্রীসভার কোন কোন সভ্যের যোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিতে পারে, এমন কি কোন কোন মন্ত্রীর অযোগ্যতাও জনমতের বিচারে প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু সেই কারণেই প্রধানমন্ত্রীর এরূপ আকস্মিক পদচ্যুতি সম্ভব বলিয়া কেহ মনে করে নাই।"

গবর্ণর-জেনারেল ১৯৩৫ সনের গবর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া এ্যাক্টের (যাহা পাকিস্থান গ্রহণ করিয়াছে) ১০ ধারা অনুসারে খাজা নাজিমুদ্দীনকে অপসারিত করিয়া তৎস্থলে জনাব মহম্মদ আলিকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন। ব্রিটিশ আমলের গবর্ণর-জেনারেলকে প্রকৃতপ্রস্তাবে উক্ত ধারায় প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রীসভা রাখা বা না রাখার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

সুতরাং আইন ও ক্ষমতার কথা এক্ষেত্রে উঠে না। গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে পার্লামেন্টের অধিকাংশ সভ্যের মতামতের উপর মন্ত্রী-সভার অস্তিত্ব নির্ভর করে। কিন্তু পাকিস্থানের ভবিষ্যৎ গঠনতন্ত্র কিরূপ হইবে এখনও অনিশ্চিত। "সোনার বাংলা" লিখিতেছেন:

"আজ খাজা নাজিমুদ্দীনকে গবর্ণর-জেনারেল কর্ত্তৃক প্রদত্ত অযোগ্যতার সার্টিফিকেট লইয়াই প্রধানমন্ত্রীর আসন হইতে অপসারিত হইতে হইল। তবে পাকিস্থানের জনমত তাঁহাকে অযোগ্য মনে করে কিনা তাহা আজও জানা যায় নাই। খাজা নাজিমুদ্দীনের শাসনকার্য্যে অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কোথাও দ্বিমত আছে বলিয়া এতকাল শুনি নাই। অবিভক্ত বাংলার স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী, প্রধান-মন্ত্রী হিসাবে তাঁহার পরিচয় সর্ব্বজনবিদিত।"

পাকিস্থান সৃষ্টির পর তিনি পূর্ব্ব-পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং কায়েদে আজমের মৃত্যুর পর তাঁহার আসনে নাজিমুদ্দীনকেই যোগ্যতম ব্যক্তি মনে করা হয়। লিয়াকৎ আলী খাঁর হত্যার পর পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রিত্বের ভার গ্রহণ করেন এবং বর্ত্তমান গবর্ণর-জেনারেল গোলাম মহম্মদকে তাঁহার পরামর্শমতই নিযুক্ত করা হয়। ঐ নিয়োগদ্বয়ও উক্ত ১০ ধারা অনুযায়ীই করা হইয়াছিল। পরিষদের মতামত লওয়া হয় নাই।

পাকিস্থান বহু গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন। খাজা নাজিমুদ্দীনের অপসারণে এই সকল সমস্যার সমাধান হইলে সকলেই খুশী হইবেন। "সোনার বাংলা"র কথায় "কিন্তু প্রশ্ন এই খাজা নাজিমুদ্দীনকে অপসারিত করিলেই এই সকল সমস্যার নিরসন হইবে কিনা।"

বস্তুত পক্ষে এই অপসারণ সম্পর্কে যাহা লাহোর ও করাচীর কাগজে—বিশেষতঃ কয়েকটি উর্দ্দু কাগজে, যথা লাহোরের "জমিন্দার" —যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে মনে হয় এই অপসারণের পিছনে দীর্ঘকালের ষড়যন্ত্র আছে এবং খাজা সাহেব ঘটনাচক্রে ফাঁদে পা দেওয়ায় তাঁহার বিরোধী পক্ষ এই সুযোগ পায়। চক্রান্তকারী-দিগের মধ্যে এমন কি ফিরোজ-খাঁ-নুন ও কইউমের নামও শুনা যায়। জানি না তাহার মধ্যে সত্য মিথ্যা কতটা আছে।

আসল প্রশ্ন, পাকিস্থানের অভাব-অনটনের অবস্থা দূর করা। ভারতের প্রাপ্য টাকা ফাঁকি দেওয়ার যা ছিল শেষ হইয়াছে এবং ভারতের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণায় আর দেশের অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা মিটে না। খাজা নাজিমুদ্দীন এক ঢোল এক কাঁসী দিয়াই চালাইতে-ছিলেন কিন্তু তাহাতে আর কুলাইল না। বিপক্ষের লোক সুবিধা বুঝিয়া দাঁও মারিয়াছে। বলা বাহুল্য, পাকিস্থানে জনমতের কাণা-কড়িও মূল্য নাই—সে কথা পূর্ব্ব-পাকিস্থানের ভাষা আন্দোলনে পূর্ণরূপেই প্রমাণিত হইয়াছে। এখন চলিতেছে বড় বড় চাঁইদের চক্রান্ত।

আমাদের—অর্থাৎ, ভারতীয়দের পক্ষে এই বদল কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা বিচার করার সময় এখনও আসে নাই, যদিও অনেকে সে বিষয়ে নানা উদ্ভট জল্পনা-কল্পনা করিতেছেন। পূর্ব্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন যদি মহম্মদ আলি সাহেবের আনুগত্য স্বীকার করেন তবে সেখানে অন্য নূতন কিছু না হইতে পারে, অন্ততঃ আগামী বৎসরের নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে। এই আনুগত্য স্বীকার কিছুই অসম্ভব নহে।

ঢাকায় ছাত্র-ধর্ম্মঘট

গত ১১ই এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলর এক বিবৃতিদান-প্রসঙ্গে বলেন যে, যেহেতু ছাত্ররা এমন সব কাজে মাতিয়া উঠিয়াছেন, যাহা তাঁহাদের লেখাপড়ার পক্ষে খুবই ক্ষতিকর এবং "তাঁহারা রাজনৈতিক বিষয় লইয়া অননুমোদিত সভা অনুষ্ঠান, বিক্ষোভ প্রদর্শন ও ধর্ম্মঘটের আহ্বান করিয়া প্রায়ই নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গের পরিচয় দিয়া থাকেন" সেজন্য "এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিল শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কয়েকটি বিধি প্রণয়ন করিয়াছেন এবং যাঁহারা শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধে অপরাধী হইবেন তাঁহাদের শাস্তিরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অপরাধী ছাত্রদের স্কলারশিপ ও ষ্টাইপেণ্ড কাটিয়া দেওয়া, এমন কি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহিষ্কারও করিয়া দেওয়া হইবে।"

গত ১২ এপ্রিল কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রগণ ক্লাসে যোগ দেয় নাই। কাউন্সিল যে ছাত্রদের ধর্মঘট করিতে নিষেধ করিয়াছেন তাহা রদ করিবার জন্য ছাত্রদের এক সভায় ৭৪ ঘণ্টা মেয়াদের চরমপত্র দেওয়া হইয়াছে। ইহার উত্তরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দশ জন ছাত্রকে বহিষ্কারের আদেশ দান করিয়াছেন।

"সোনার বাংলা"য় প্রকাশিত এক সংবাদ অনুযায়ী ২৫শে এপ্রিল ছাত্রদের অনুষ্ঠিত এক প্রতিবাদ সভায় মওলানা আবদুল হামিদ খাঁ ভাসানী বলেন যে, "সরকার দমনমূলক আইন প্রণয়ন করিয়া দেশবাসীর গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করিয়াছেন এবং ঐ একই উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপরও নানা প্রকার বাধা-নিষেধ আরোপ করিয়া তাহাদিগকে গণতান্ত্রিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। তিনি উহার নিন্দা করেন এবং আশু প্রত্যাহার দাবী করেন।"

দেখা যাউক ইহার পর কি হয়। তবে কলিকাতায় মাঝে ছাত্রসমাজের এক ক্ষুদ্র অংশ যে ভাবে উদ্দাম গতিতে ছাত্রমণ্ডলীর ভবিষ্যৎ নষ্ট করিতে চেষ্টিত হইয়াছিল এবং সকল ব্যাপারে উচ্ছৃঙ্খলতার চূড়ান্ত করিয়াছিল, সেই বিবেচনায় মনে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের আশঙ্কার কারণ যথেষ্টই ছিল। তবে সেই আশঙ্কা দূরীকরণের পথ কি, তাহার বিচার কি ভাবে করা হইয়াছে তাহার পূর্ণ বিবরণের অভাবে কোনওরূপ আলোচনা অসম্ভব।

সকল দেশেই ছাত্রমণ্ডলী দেশের ভবিষ্যতের আশা। কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রের সকল দাবীই মানিয়া লইলে দেশের আশা-ভরসায় ছাই পড়ে। ছাত্রগণ শান্ত ভাবে ও নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া সম্যক্ বিচার করিয়া ও বয়োজ্যেষ্ঠদিগের পরামর্শ লইয়া দাবী উপস্থিত করিলেই মঙ্গল।

ষ্টীমার কোম্পানীর স্বৈরাচার

৪ঠা বৈশাখের "যুগশক্তি" লিখিতেছেন :

"ব্যবসায় কেন্দ্র হিসাবে করিমগঞ্জের গুরুত্ব সর্ব্বজনবিদিত। বর্ত্তমানে ত্রিপুরা রাজ্য তাহাদের অধিকাংশ মাল করিমগঞ্জ হইতে ক্রয় করার ফলে ইহার গুরুত্ব আরও বাড়িয়া গিয়াছে। এই অঞ্চলের অধিকাংশ মালই ষ্টীমারে আসে; কিন্তু গত চার-পাঁচ বৎসর ধরিয়া ষ্টীমারে আনীত মাল পাকিস্থান এলাকায় পথে চুরি ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। দেখা যায় পাকিস্থানে যখন যে মালের অভাব, সেই মালই বেশী চুরি যায়। ইদানীং বহু সংখ্যক বিড়ি ও জুতার বাক্স হইতে প্রায় অর্দ্ধেক মালই পথে খোয়া গিয়াছে। এদিকে ষ্টীমার কোং উক্ত মাল ওপেন ডেলিভারী দিতে প্রায়ই টালবাহানা করিয়া ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টায় আছেন। প্রকাশ যে, সহজে কাহাকেও ওপেন ডেলিভারী দেওয়া হয় না। শুধু তাই নয়, ওপেন ডেলিভারী-প্রার্থীদের উপর স্থানীয় কর্মচারীরা সময় সময় দুর্ব্ব্যবহার করিয়া থাকেন এরূপ অভিযোগও পাওয়া যাইতেছে।"

কাছাড়-সুন্দরবন ষ্টীমার সার্ভিসে ভাড়া অত্যন্ত বেশী এবং বর্ষ সময় ডেমারেজ চার্জ অতিমাত্রায় বাড়াইয়া দেওয়া হয়। কোম্পানী যথোপযুক্ত গুদাম না থাকায় বহু মাল রৌদ্র-বৃষ্টিতে নষ্ট হই ব্যবসায়ীদের ক্ষতি হইতেছে।

স্থানীয় মার্চেন্টস এসোসিয়েশন এই সকল নানাবিধ অসুবিধা কথা ষ্টীমার কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের গোচরে আনা সত্ত্বেও প্রতিকারে কোনই ব্যবস্থা হয় নাই। বিক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীরা যাহাতে রেলে সমস্ত মাল আমদানী-রপ্তানী করা যায় সেই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সহিত আলোচনার ব্যবস্থা করিতেছেন।

ফরাসী ও জার্ম্মান ইস্পাত-শিল্পপতিদের মধ্যে বিরোধ

'প্রাভদা' পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে মালচানফ লিখিতেছেন যে, ফরাসী ও পশ্চিম জার্ম্মানীর ইস্পাত-শিল্পের একীকরণের জন্য রচিত "শুম্যান পরিকল্পনা"র বাস্তব প্রয়োগের কাজে পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ক্রমবর্দ্ধমান বিরোধের ফলে বাধা পড়িতেছে এবং অখণ্ড "ইস্পাত বাজারের" উদ্বোধন স্থগিত রাখা হইতেছে। কারণ ফরাসী ও জার্ম্মান কোম্পানীগুলির মধ্যে তীব্র বিরোধের ভাব এক চরম পর্য্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্ম্মানীতে এই কথা ভাল ভাবে উপলব্ধি করা হইতেছে, ইস্পাতের বাজার হইতে শুল্কের কড়াকড়ি তুলিয়া লইলে উহার ফলে ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্ম্মানীর ইস্পাত-শিল্পমালিকদের মধ্যে দেখা দিবে এক তিক্ত জীবনমরণ সংগ্রাম।

ফ্রান্সের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, কারণ ফ্রান্সের কোক্ করার উপযুক্ত কোন কয়লা না থাকায় তাহাকে ধাতু-শোধন কারখানাগুলির প্রয়োজন মিটাইবার জন্য পশ্চিম জার্ম্মানীর রূঢ় অঞ্চল হইতে প্রচুর কয়লা আমদানী করিতে হয়। তাহা ছাড়া ফরাসী কলকারখানার টেক্‌নিক্যাল স্তর জার্ম্মানীর তুলনায় নিকৃষ্ট। পশ্চিম জার্ম্মানীর উৎপাদনের খরচ ফ্রান্সের অপেক্ষা কম। এই সকল কারণের জন্য পশ্চিম জার্ম্মানীর ইস্পাত-শিল্পপতিদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার শক্তি বেশী। মহাযুদ্ধের পরে মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণের দিক হইতে পশ্চিম ইউরোপের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে পশ্চিম জার্ম্মানী। লেখকের অভিমতে ইস্পাতের "অখণ্ড বাজার" উদ্বোধন বিলম্বিত করিবার কারণ নিঃসন্দেহ এই যে, চূড়ান্ত সংগ্রাম আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্ম্মানীর একচেটিয়া কোম্পানীগুলি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তাহাদের নিজ নিজ খুঁটি আরও শক্ত করিয়া লইতে চায়।

"অখণ্ড বাজার" অর্থে একচেটিয়া বাজার, এবং ঐ ব্যবস্থা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই নানা বিদ্বেষ ও দুর্নীতির সহায়ক হইয়াছে। ফ্রান্স ও জার্ম্মানীতে তো অহি-নকুল সম্পর্ক, সেখানে ঐরূপ ব্যবস্থা কিরূপ হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

ভারতের অধ্যাত্মসাধনা ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের উদ্ভব

অধ্যাপক শ্রীপরিতোষ দাস

বৈষ্ণব ধর্ম্মের উদ্ভবের সূত্র অনুসন্ধান করিতে গিয়া প্রথমেই মনে প্রশ্ন জাগিল—ধর্ম্ম কি বস্তু; উহার সংজ্ঞা কি। বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন, ধর্ম্ম মানুষের স্বভাবজাত বৃত্তি। কিন্তু ধর্ম্মেতিহাসের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাই—মানব-জাতির জ্ঞানবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম সম্বন্ধেও তাহার জ্ঞান এবং বিশ্বাসের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। সুতরাং ধর্ম্ম মানবের সহজাত চিত্তবৃত্তি হইলেও এক কথায় উহার সম্পূর্ণ সংজ্ঞানির্দ্দেশ করা সম্ভব নয়। দেশ বিদেশের মনীষিগণ ধর্ম্মের নানা সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্তও এই প্রশ্নের শেষ উত্তর মিলে নাই। মানবের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেশের ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক জটিল সমস্যার উদ্ভব হইতেছে। আমাদের দেশের শাস্ত্রগুলি জন্মান্তরবাদ স্বীকার করে। জন্ম দুঃখের আগার, ইহা হইতে নিষ্কৃতিলাভই পরমপুরুষার্থ। এই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া ধর্ম্মের সংজ্ঞা করা হইয়াছে, "যতোঽভ্যুদয়ঃ নিঃশ্রেয়সঃ স ধর্ম্মঃ"—যাহা হইতে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স্ অর্থাৎ মুক্তিলাভ হয় তাহা ধর্ম্ম। পৃথিবীর অনেক জাতিই জন্মান্তরে বিশ্বাস করে না, সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে এই সংজ্ঞা প্রযোজ্য হয় না।

প্রাচ্যদেশে ধর্ম্ম যে অর্থে ব্যবহৃত হয় পাশ্চাত্য দেশে 'religion' ঠিক তাহার প্রতিশব্দ বলা যাইতে পারে না।

"Religio" হইতে 'religion' শব্দের উৎপত্তি। ইহার মূল "religare" এবং "religere"। "religare" অর্থ 'একত্র বাঁধা'। আর "religere" অর্থ সাবধান হওয়া বা সতর্ক থাকা। ইহা negligere, অসাবধান হওয়া শব্দের বিপরীত। এই যে সতর্ক থাকা ইহার সঙ্গে ভয়ের ভাব জড়িত আছে।

পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকগণ 'religion' শব্দের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া নানা মত ব্যক্ত করিয়াছেন। দৃষ্টিভঙ্গীর তারতম্য বশতঃই এই সকল সংজ্ঞার মধ্যে এত সব পার্থক্য দেখা দিয়াছে।

হ্যাভলক এলিস বলিয়াছেন:

"Religion is an intuition of union with the world."

অধ্যাপক শটওয়েল বলেন:

"Religion is nothing but the submission to mystery."

ম্যাক্সমুলারের মতে:

"Religion is a subjective faculty for the apprehension of the Infisite."

জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন:

"The essence of religion is the strong and earnest direction of the *emotions* and desires towards an ideal object recognised as of the highest excellence and is rightfully paramount over all selfish objects of desire."

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বলেন:

"মানব-প্রকৃতির যে ঈশ্বরাভিমুখীন উচ্ছ্বাস তাহার নাম ধর্ম্ম। উচ্ছ্বাস বলিতে ঈশ্বরানুরাগের প্রভাবে সমস্ত মানব-প্রকৃতি—জ্ঞান, প্রীতি, ইচ্ছা এ-সকলের উর্দ্ধগতি বুঝায়।"

লুক্রেসিয়াসের মতে ঈশ্বর সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে ভয়—

"It was fear that first made gods in the world."

মনে হয়, মানব জীবনের আদিম অবস্থায় ইহাই ধর্ম্মসৃষ্টির প্রথম সোপান। ভারতীয় আর্য্যজাতির ধর্ম্মেতিহাসের দিকে একবার লক্ষ্য করিলে ইহার যাথার্থ্য উপলব্ধি হইবে। এদেশে প্রচলিত ধর্ম্মগুলির মধ্যে রুদ্র শিবোপাসনা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ধর্ম্ম। বৈদিক যুগেই শৈব ধর্ম্মের ক্রমবিকাশের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই—দেবতার ক্রোধ হইতে পরিত্রাণলাভের জন্য প্রাথমিক অবস্থায় মানবের যে কর্ম্মানুষ্ঠান তাহাই প্রথম ধর্ম্ম-কর্ম্ম এবং ইহাও আমরা লক্ষ্য করি যে, কালক্রমে ভয় ক্রমশঃ ভালবাসায় রূপান্তরিত হইতেছে, ভয়-ভক্তি ক্রমশঃ প্রেম-ভক্তিতে পরিণত হইয়া মানব-মনকে আনন্দে আপ্লুত করিতেছে—আদিতে যাহা ভীতির দেবতা রুদ্র তাহা মঙ্গলপ্রদ শিব-রূপ ধারণ করিয়াছে।

সেই আদিম যুগে চতুর্দ্দিকে প্রকৃতির প্রতিকূল আবেষ্টনের মধ্যে পতিত অসহায় মানবের মনে ভীতির উদ্রেক হইতেই যে ধর্ম্ম-কর্ম্মের স্ফুরণ হইয়াছে, ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেই উহার কারণ জানা যাইবে।

ভূতত্ত্ববিদ্গণ নির্ণয় করিয়াছেন যে, পৃথিবী-বক্ষ ইহার বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইবার পূর্ব্বে অন্ততঃ চারিবার তুষারপাতে বিধ্বস্ত হইয়াছে। শেষ তুষারপাত বর্ত্তমান কাল হইতে ষাট-সত্তর হাজার বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়া পঁচিশ হাজার বৎসর স্থায়ী ছিল। বর্ত্তমানকাল হইতে বিশ-পঁচিশ হাজার বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও অধিকাংশ দেশ তুষার-সমাচ্ছাদিত ছিল। তদুপরি তুষারকণাবাহী ঝঞ্ঝাবাত ত লাগিয়াই থাকিত।

সেই যুগে পৃথিবীর স্থানে স্থানে মানুষ যে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহার অনেক নিদর্শন প্রস্তরগাত্রে অঙ্কিত

রহিয়াছে। তাহাদের যাযাবর জীবনে পশু-শিকার ছিল জীবিকার প্রধান অবলম্বন এবং প্রাকৃতিক নানা দুর্যোগ হইতে আত্মরক্ষার জন্য গিরিগহ্বরগুলিই ছিল তাহাদের একমাত্র আশ্রয়।

বাহিরে প্রকৃতির তাণ্ডবলীলা চলিয়াছে, তাহার উপর মেরুপ্রদেশের সুদীর্ঘকালব্যাপী ঘন তমসাচ্ছন্ন রজনী। এই সকল দুর্যোগের পশ্চাতে কোন অতীন্দ্রিয় শক্তির কার্য্যকারিতা বিদ্যমান রহিয়াছে এরূপ কল্পনা করা বিচিত্র নহে। এই শক্তি চারিদিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; প্রকৃতি তাহারই তাণ্ডবলীলা সূচনা করিতেছে। এইরূপ মনোবৃত্তি হইতে সেই শক্তির প্রসন্নতালাভের জন্য ব্যাকুল উৎকণ্ঠা এবং তাহার উদ্দেশ্যে হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ পশুকে উৎসর্গ করা স্বাভাবিক। এই পশুগুলি একদিকে যেমন অতীন্দ্রিয় দেবতার উদ্দেশ্যে বলিরূপে প্রদত্ত হইত, অপর দিকে প্রাথমিক অবস্থায় সেই যুগে ইহারা মানবেরও জীবন-ধারণের প্রধান অবলম্বন ছিল। শীতের প্রকোপ হইতে শরীররক্ষণ ও প্রাকৃতিক শক্তির তাণ্ডবলীলার বিভীষিকা হইতে পরিত্রাণলাভের জন্য পর্ব্বত-গহ্বরে নিরন্তর অগ্নি জ্বালাইয়া রাখা প্রয়োজন হইত ও সেই অনলে আহার্য পশুকেও দগ্ধ করা হইত।

এস্থলে আমরা তিনটি বিষয়ের একত্র সমাবেশ লক্ষ্য করি—প্রথমতঃ, দুর্জ্ঞেয় দৈবশক্তির বিদ্যমানতা এবং তদ্দ্বারা নিরন্তর পরিবেষ্টিত হইয়া থাকা ও ঐ শক্তির প্রসন্নতালাভের জন্য উৎকণ্ঠা; সেইজন্য হৃষ্টপুষ্ট কোন পশুকে বলি প্রদান। দ্বিতীয়তঃ, আহারের জন্য সেই পশুদেহ দগ্ধ করা প্রয়োজন, সেইজন্য অগ্নিরক্ষার ব্যবস্থা। তৃতীয়তঃ, দেবতার প্রসাদরূপে সেই পশুর মাংস ভক্ষণ। এই তিনটি অবস্থার সমাবেশে যে মনোবৃত্তির উদ্ভব হওয়া স্বাভাবিক, তাহা হইতে প্রথম ধর্ম্ম-কর্ম্মের সৃষ্টি।

বাসস্থানে অগ্নিস্থাপন, দেবতার চিত্তবিনোদন-উদ্দেশ্যে তাহাতে হব্য প্রদান এবং অবশেষে হবিঃশেষ ভক্ষণ—বৈদিক যজ্ঞের এই যে তিনটি প্রধান অঙ্গ, আদিম অধিবাসীদের নিত্যনৈমিত্তিক আচরণে এই সবকয়টিই বিদ্যমান রহিয়াছে দেখিতে পাই। সেই প্রাচীন প্রস্তরযুগেই ইহার প্রবর্ত্তন হইয়াছে, ক্রমে নানাভাবে বিস্তৃতিলাভ করিয়া যজ্ঞই বৈদিক আর্য্যদিগের জীবনের প্রধান নিয়ামকের স্থান অধিকার করিয়াছিল।

যে মনোবৃত্তি হইতে সর্ব্বপ্রথম এই যজ্ঞক্রিয়ার উদ্ভব, গীতার অনবদ্য ভাষায় তাহা এভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে:

"দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥"

দেবতার প্রসন্নতালাভের জন্য এত সব অনুষ্ঠান ত অবশ্য একদিনে প্রবর্ত্তিত হয় নাই। এভাবে মানবের মনোবৃ গঠনের জন্য দীর্ঘ সময় লাগিয়াছিল। জেম্‌স্ ইহাকে "Enormous tracts of time" আখ্যা দিয়াছেন।

অনুমান সাত-আট হাজার বৎসর পূর্ব্বে রচিত প্রাচী ঋক্‌মন্ত্রগুলির মধ্য দিয়া আর্য্যজাতির জীবনযাত্রার ইতিহাসে পৃষ্ঠা যখন প্রথম উদ্‌ঘাটিত হয়, তখন আমরা দেখিতে পাই সেই অতীন্দ্রিয় শক্তি—যাহার কোপ হইতে নিষ্কৃতিলাভে জন্য হৃষ্ট বলিষ্ঠ ষাঁড়কে আহুতিদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে সেই শক্তি রুদ্র নামে অভিহিত হইতেছেন এবং ঝঞ্ঝাবাত প্রভৃতি দুর্যোগের কারণ-স্বরূপ দেবতাসমূহকে মরুৎ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। প্রাকৃতিক শক্তিনিচয় এই সকল দেবতা দ্বারা পরিচালিত হইয়া যত সব অনর্থ সংঘটন করিয়া থাকে। অশনিগর্জ্জন সহকারে পরম বিভীষিকাপ্রদ লোকবিধ্বংসী ঝঞ্ঝাবাত মরুৎগণের কার্য্য। ঋগ্বেদে মরুৎগণকে রুদ্রের পুত্র বলা হইয়াছে। রুদ্রের কোপ হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য আকুল প্রার্থনা—"মা ন স্তোকেষু তনয়েষু রীরিষঃ" (আমাদের পুত্রপৌত্রদের প্রতি হিংসা করিও না)।

অনিশ্চিত যাযাবর-জীবন পাহাড় পর্ব্বত প্রান্তরে অতিবাহিত হইত। সর্ব্বত্র কোন-না-কোন আকারে প্রাকৃতিক শক্তির ভয়াবহ রূপ প্রকাশ পাইত। ইহা হইতে রুদ্রদেবতা যে সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন এই সংস্কার ক্রমে হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়। কালের আবর্ত্তন-পথে চলিতে চলিতে ক্রমশঃ ক্রোধের প্রতিমূর্ত্তি রুদ্রদেবতারও যে একটা অনুকম্পাপূর্ণ প্রসন্ন দিক আছে বৈদিক আর্য্যগণ তাহার সন্ধান পান। রুদ্রের ক্রোধ হইতে ব্যাধির সঞ্চার হইয়াছে, তাঁহার প্রসন্নতাবিধানই ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভের উপায়—ইহা হইতে তিনি ওষধিনাথ হইলেন। তিনি ত্র্যম্বক, ভূর্ভুবঃ, স্বঃ এই তিন লোকের অধীশ্বর হইলেন, তিনি "ভুবনস্য ঈশান" সকল ভুবনের অধিপতি ও জগতের কল্যাণকারী শিবে পরিণত হইলেন।

আর্য্যদিগের আধ্যাত্মিক জ্ঞানবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ঋগ্বেদের এই দেবতা অথর্ববেদে সর্ব্বদর্শী সর্ব্বান্তর্যামী ও সর্ব্বগত ঈশ্বর হইলেন। যজুর্ব্বেদে তাঁহার মঙ্গলময় রূপ আরও বিকাশলাভ করিয়াছে। "মীঢ়ুষ্টম শিবতম শিবো নঃ সুমনাভব।"—হে অভীষ্টবর্ষী মঙ্গলময় দেবতা, তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্নমনা হও।

ক্রমে তিনি মানবের আরও নিকটতর হইয়া পরিবারের অধিপতি রূপে গৃহদেবতার আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। এক্ষণে অনূঢ়া বালিকাদের মনোমত পতি নির্ব্বাচন ব্যাপারে তিনি ঘটক।

"ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পতিবেদনং"

সুগন্ধি পুষ্পসহকারে বালিকারা ত্র্যম্বকের পূজা করিতেছে, প্রার্থনা—মনোমত পতিলাভ।

আদিতে যাহা ভয়, বিস্ময় ও ক্রোধের দেবতারূপে মানবের চিত্তকে অভিভূত করিয়া সর্ব্বপ্রথম এক অতীন্দ্রিয় শক্তিরূপে তাহার নিকট প্রকাশিত হইয়াছিলেন, সমগ্র বৈদিক সাহিত্য ব্যাপিয়া তাহা এক আরাধ্য দেবতার স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। সুতরাং কিরূপে মানবচিত্তে প্রথম ধর্ম্মজ্ঞানের সঞ্চার হয় এবং তাহা বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া অবশেষে ইহা হইতে এক বিশাল ধর্ম্মমতের সৃষ্টি হয় সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে রুদ্র দেবতার মধ্য দিয়া আমরা তাহার এক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের সন্ধান পাইতেছি। কিন্তু এত সব বিকাশসত্ত্বেও রুদ্র তাঁহার প্রথমাবস্থার যে ক্রোধ ও বিভীষিকার রূপ তাহা পরিত্যাগ করেন নাই, অথচ প্রান্তর ও অরণ্যের দেবতা মানবের গৃহের দেবতার আসন পরিগ্রহ করিয়াছেন।

এইরূপে ধর্ম্মের উৎস অনুসন্ধান করিতে গিয়া ইহাই আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, প্রথম অবস্থায় জীবনের অনিশ্চয়তা নিবন্ধন আত্মরক্ষার প্রেরণাই সকল কার্য্যের উৎস ছিল। এই জন্য এমন কোন কার্য্যই গর্হিত বলিয়া গণ্য হইত না, যাহা আত্মরক্ষার অনুকূল বলিয়া বিবেচিত হইত। ক্রমে মানবের পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন যখন স্থির-ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল, নৈতিক জীবনও বিকাশ-লাভের অবকাশ পাইল, সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর সম্বন্ধে মানবের মনোবৃত্তিও উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে উঠিতে লাগিল। হেলিওলিথিক কৃষ্টিসম্পন্ন হিব্রুজাতির যুদ্ধের ক্ষমাহীন নিষ্ঠুর দেবতা জিহোভার স্থানে খ্রীষ্ট জন্মগ্রহণ করিলেন। আমাদের দেশে প্রাচীন দেবতা রুদ্র, বরুণ ও ইন্দ্রের স্থলে বিষ্ণুনারায়ণ স্থায়ী আসন পরিগ্রহ করিলেন। সকল দেশেই প্রথম অবস্থায় প্রাকৃতিক শক্তিগুলি বিভিন্ন দেবতারূপে কল্পিত হইত। এই সকল শক্তির মূলে যে এক দেবতার কার্য্য বিদ্যমান রহিয়াছে, মানবের অন্তরে এই সত্যের বিকাশ ঘটিতে অনেক সময় লাগিয়াছিল। ইহা মানবজাতির আধ্যাত্মিক চরম উন্নতির পরিচায়ক। এই এক মূল শক্তি হইতে অপরাপর সকল শক্তির উদ্ভব—ইহা যখন মানবের অন্তরে উপলব্ধ হইল, তখন এই সকল শক্তির একত্র সমাহার দ্বারা 'ঈশ্বরে'র সৃষ্টি হইল। ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা হইতে পারেন, কিন্তু পারমার্থিক সত্য যাহা, তাহাকে ঈশ্বররূপে অভিহিত করা মানবের কল্পনার সৃষ্টি। মানবের সঙ্গে ঈশ্বরের এই যে চিরন্তন সম্বন্ধ তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পতঞ্জলি মানবকে পুরুষ আখ্যা দিয়া ঈশ্বরকে পুরুষবিশেষ বলিয়াছেন। তিনি ক্লেশ, বিপাক ও আশয় হইতে সদা মুক্ত এবং তাহাতে সকল ঐশ্বর্য্যের পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্তি হইয়াছে, অর্থাৎ তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান এবং মানবের পক্ষে সকল মঙ্গলের আকর। মানব ইহাও জানিতে পারিল যে, যদিও সে ক্লেশ, বিপাক ও আশয় হইতে মুক্ত নহে, তথাপি এই সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার তাহার অধিকার আছে। ইহা তাহার পুরুষকার বা ঐকান্তিক প্রযত্ন ও ঈশ্বরের কৃপা এতদুভয় সাপেক্ষ। ইহা হইতেই মানবের সঙ্গে ঈশ্বরের এক বিশেষ যোগ বা সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। ইহার মূলে রহিয়াছে বিশ্বাস, শরণাগতি, সাধনা ও যুক্তি। ইহা হইতে দর্শন ও ধর্ম্ম উভয়ের সৃষ্টি।

কার্য্য হইতে কারণ-নির্ণয়ের যে প্রয়াস—ইহা মানবের স্বভাবজাত বৃত্তি। এই বৃত্তির প্রেরণায় জাগতিক ব্যাপার-সকলের প্রকৃত ব্যাখ্যা কি, তাহা জানিবার প্রয়াস হইতে দর্শনের সৃষ্টি। ইহার সঙ্গে যখন ভাবপ্রবণতা মিলিত হয়, তখন তাহা ধর্ম্ম নামে অভিহিত হয়। বিষয়টা আর এক ভাবে বিচার করা যাইতে পারে—যাহা পারমার্থিক সত্তা তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ হইতেছে এক একটি মানব। সেই সমগ্র বা সমষ্টির সঙ্গে ব্যষ্টি-মানবের যে সম্বন্ধ তাহা স্থাপনের পন্থা-নির্ণয়ের প্রয়াস যখন একমাত্র নিজের বিচারশক্তির মধ্যে নিবদ্ধ থাকে তখন তাহা হইতে পারমার্থিক তত্ত্বমূলক দর্শনের সৃষ্টি হয় এবং ইহাকেই জ্ঞানমার্গ বলে—জ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরোপলব্ধির চেষ্টা। আবার এই প্রয়াসে যখন সমষ্টির প্রতি ব্যষ্টি-মানবের চিত্তের ভাবোচ্ছ্বাস মিলিত হয়, তখন তাহা ধর্ম্ম নামে অভিহিত হয় এবং ইহাই হইল ভক্তিমার্গ—হৃদয়ের আবেগ দিয়া ঈশ্বরকে স্পর্শ করিবার ব্যগ্রতা।

"Men will continue to long for union and co-operation with whole of which they are separately insignificant parts, that total perspective which, when merely intellectual, is philosophy and truth, becomes when touched with devotion to the whole, the essence and secret of religion."

যাহা সমগ্র তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য তাঁহারই অংশবিশেষ ক্ষুদ্রের যে ঐকান্তিক অনুরাগ ও নির্ভরশীলতার ভাব তাহা আরাধ্য দেবতাকে আপনার হইতেও আপনার করিয়া তুলিয়াছে।—তিনি আর্ত্তজনের বন্ধু, বিপদভঞ্জন এবং সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলের নিদান। এই সম্বন্ধ যখন গাঢ় ও ঘনিষ্ঠ হয় তখন তিনি উপাসকের যোগক্ষেম-বহনকারী হন। ঘোর দুর্দ্দিনে, যখন নিরাশার ঘন তমসা চতুর্দ্দিক হইতে ঘিরিয়া আসে, তখন তিনিই পরম সুহৃদরূপে নিকটে রহিয়াছেন, ভগ্ন ও ব্যথিত প্রাণকে সান্ত্বনা দিবার জন্য, জীবন সংগ্রামে জয়লাভের জন্য তিনিই সারথিরূপে সহায়ক রহিয়াছেন—ভক্ত এই সকল জানিতে পারে। হৃষীকেশ রূপে তিনি তাহার উপদেষ্টা ও অনুমন্তা। তাঁহার স্নেহাবেষ্টনের মধ্যে ভক্তের স্থিতি, তিনিও ভক্তের অন্তর-বাহির সর্ব্বত্র

পূর্ণ করিয়া বিরাজিত রহিয়াছেন। এইখানে মানব-জীবনের চরিতার্থতা, ইহা ধর্ম্ম। মানব-জীবনের আকাঙ্ক্ষার কিন্তু এখানেই শেষ হয় না। আধ্যাত্মিক রাজ্যের এই যে সম্বন্ধ বহির্জগতেও ইহাকে প্রতিফলিত করিয়া স্থূল জগতের মধ্য দিয়াও তাঁহার সঙ্গলাভের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়, ভক্তবাঞ্ছা-পূর্ণকারী ভগবান তখন নরদেহ ধারণপূর্ব্বক ধরাধামে অবতীর্ণ হন। পৃথিবীর সকল ধর্ম্মেই কোন-না-কোন রূপে এই তত্ত্ব স্থানলাভ করিয়াছে দেখা যায়। যে ধর্ম্মে ঈশ্বরের স্থান নাই, যথা বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম, তথায় ভগবান বুদ্ধদেব ও তীর্থঙ্কর দিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই স্থান পূর্ণ করা হইয়াছে।

মানবমাত্রেরই সখা ও সুহৃদরূপে একজন বর্ত্তমান আছেন যাঁহাতে সকল শক্তি ও সকল ঐশ্বর্য্যের পরিসমাপ্তি হইয়াছে, ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগসাধনই হইল মানব-জীবনের পূর্ণ সার্থকতা—'highest value of life'—এবং ইহাই হইল ধর্ম্মের পূর্ণ বিকাশ।

ধর্ম্মের ক্রমপর্য্যায় আলোচনা করিয়া আমরা পাইতেছি যে, মানবের আদিম যাযাবর অবস্থায় ভীতির উদ্রেক হইতে ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। উহা ক্রমশঃ পরিণতিলাভ করিয়া বৈদিক যুগে আর্য্যদের যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠানে পর্য্যবসিত হইয়াছে। যে ত্রিধারার ভক্তির স্রোত আবহমানকাল হইতে হিন্দুর জীবন-ক্ষেত্রকে রসসিক্ত এবং চরিত্রকে বলিষ্ঠ করিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে, তাহার সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রাচীন ধারার সন্ধান পাই বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডে। আর্য্যদের যাযাবর জীবনের অবসান ঘটিলে তাঁহারা যখন সপ্তসিন্ধু প্রদেশে বর্ত্তমান পঞ্জাবে স্থায়ী বসতি স্থাপন করিয়া কৃষিকার্য্যের দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তাঁহারা অনেকটা জীবনের স্থিরভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তখন আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক সর্ব্বপ্রকার বাধা বিঘ্ন দূরীভূত হইয়াছে; জীবনে শান্তিপূর্ণ নিরাপদ প্রতিষ্ঠানভূমিতে স্থিতি লাভ করিয়াছেন; সেই সময়ে আধ্যাত্মিক জীবনের জটিল প্রশ্নগুলি আর্য্যদের মনে উদিত হইতে লাগিল। এই যুগ জ্ঞান-কাণ্ডের যুগ। এই যুগে আর্য্যঋষিদের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ও জ্ঞান চরম বিকাশলাভ করিয়াছিল। এই যুগের অন্যতম ঋষি দীর্ঘতমার রচিত মন্ত্রগুলির মধ্যে আমরা এইরূপ অনেক প্রশ্ন ও সেগুলির সমাধান দেখিতে পাই। ঋগ্বেদের সূক্তের রচয়িতা ঋষি দীর্ঘতমা যে ঋগ্বেদীয় যুগের শেষ অর্দ্ধের প্রথম ভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন পণ্ডিতগণ এরূপ অনুমান করেন। তাঁহার রচিত প্রথম মণ্ডলের ১৬৪ সূক্তের চতুর্থ মন্ত্রে বলা হইয়াছে—

"প্রথম জায়মানকে কে দেখিয়াছে? যখন অস্থিরহিতা অস্থিযুক্তকে ধারণ করিল, তখন ভূমি হইতে প্রাণ ও শোণিতের সৃষ্টি হইয়াছে সত্য, কিন্তু আত্মা কোথা হইতে আসিল? কে বিদ্বানের নিকট এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে যায়?"

পরবর্ত্তী মন্ত্রে বলা হইয়াছে:

"আমি পাক্ অর্থাৎ অপক্কবুদ্ধি, মনে কিছু বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই সকল সন্দেহপদ দেবতাগণের নিকটও নিগূঢ় (দেবানামেনা নিহিতা পদানি)।"

৬ষ্ঠ মন্ত্রে:

"আমি অজ্ঞান, কিছু না জানিয়া মেধাবিগণের নিকট জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি। যিনি এই ছয় লোক স্তম্ভন করিয়াছেন, তিনি কি সেই এক, যিনি জন্মরহিতরূপে স্থিতি করেন—অজস্যরূপে কিমপিস্বিদেকম্।"

এই তিনটি মন্ত্রে যথাক্রমে "প্রথম জায়মান", "দেবানামেনা নিহিতা পদানি" (দেবতাগণের নিকটও নিগূঢ়) এবং "অজস্যরূপে" (জন্মরহিতরূপে) এই তিনটি শব্দের প্রয়োগ আছে। ইহারা সকলেই এক আদিত্যের স্তুতি-বন্দনায় প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু এক আদিত্যের চিন্তন হইতে ঋষির অন্তরে যে জগৎস্রষ্টা এক দেবতার চিন্তন উদিত হইয়াছিল তাহা বুঝা যায়।

চতুর্থ মন্ত্রে অস্থিরহিতা শব্দ প্রয়োগ দ্বারা অব্যক্তা প্রকৃতিকে বুঝাইতেছে। তাহার অস্থিযুক্তকে ধারণ করিবার মর্ম্ম—প্রকৃতি হইতে জগতের উদ্ভব। কিন্তু আত্মা কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া ঋষি বলিতেছেন, সৃষ্টিব্যাপাররূপ জটিল সমস্যার সমাধান অতি সহজে হয় না। তাঁহার এই মত দৃঢ় করিবার জন্য পরবর্ত্তী মন্ত্রে বলিতেছেন, দেবতারাও ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত নহেন—"দেবানামেনা নিহিতা পদানি"।

৬ষ্ঠ মন্ত্রের "সেই এক যিনি জন্মরহিতরূপে স্থিতি করেন," ইহা দ্বারা সৃষ্টির মূলে ঋষি যে এক শক্তির সন্ধান পাইয়াছেন তাহা বেশ বুঝা যায়। এই তত্ত্বটিকে আরও পরিষ্কার ভাষায় তিনি প্রকাশ করিয়াছেন এই সূক্তেরই ৪৬ মন্ত্রে:

"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।"

যিনি এই আদিত্য তিনি এক, মেধাবিগণ ইঁহাকে ইন্দ্র মিত্র বরুণ অগ্নি বলিয়া থাকেন। ইনি স্বর্গীয় পক্ষবিশিষ্ট ও সুন্দর গমনশীল। ইনি এক হইলেও ইঁহাকে বিপ্রগণ বহু বলিয়া বর্ণনা করেন। ইঁহাকে অগ্নি যম ও মাতরিশ্বা বলেন।

এখানে আমরা দেখিতেছি আদিত্যের চিন্তন হইতে ঋষি এক পরমেশ্বরের সন্ধান পাইয়াছেন। বিভিন্ন নামে অভিহিত হইলেও তিনি মূলে যে এক দেবতা, ঋষির মনে তাহার পরিষ্কার উপলব্ধি হইয়াছে।

এই সূক্তের ২০ ঋক্ও বিশেষ অনুধাবনের বিষয়। মন্ত্রটি এই:

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরণ্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি।"

এই মন্ত্রটি মণ্ডুক ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উদ্ধৃত হইয়াছে। উভয় উপনিষদেই "দ্বা সুপর্ণা" দুইটি শোভন পক্ষবিশিষ্ট পক্ষী দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

মন্ত্রের অর্থ—দুইটি শোভন পক্ষবিশিষ্ট পক্ষী সর্ব্বদা সংযুক্ত, সমপ্রাণ এবং একই বৃক্ষে বাস করে। ইহাদিগের মধ্যে একটি স্বাদু পিপ্পল ফল আস্বাদন করে, অপরটি করে না, শুধু দেখে।

উপনিষদগুলিতে ইহাদিগকে জীবাত্মা পরমাত্মরূপেই গ্রহণ করা হইয়াছে এবং ইহারই উপর বিশেষভাবে বৈষ্ণব দর্শন গুলি প্রতিষ্ঠিত।

অধ্যাত্মরাজ্যে নানা দেবতার মধ্য দিয়া এক দেবতার সন্ধানলাভ সে যুগের ঋষিরা পাইয়াছেন সত্য এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও উপলব্ধি করিয়াছেন যে, তাঁহাকে জানিতে হইলে তাঁহার অনুগ্রহও বিশেষ প্রয়োজন। কঠশ্রুতি বলিতেছেন ঃ

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্।"

অর্থাৎ, শুধু শাস্ত্রালোচনা ও জ্ঞানবিচার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায় না, উহা তাঁহার কৃপাসাপেক্ষ। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান-সাধনার্থীর পক্ষে শাস্ত্রালোচনা জ্ঞান বিজ্ঞান ধ্যান-ধারণামূলক পুরুষকারও যে প্রয়োজন এই শ্রুতি তাহাও জ্ঞাপন করিতেছে— "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" এই উক্তি দ্বারা। তথাপি সকলের উপরে ভগবৎকৃপা। বৈষ্ণব ধর্ম্মের যে শরণাগত্যভাব বেদের এই মন্ত্রগুলিতে তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে।

ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি রচনার সময় আর্য্যগণ উত্তরে কূর্ম্মাচল হইতে দক্ষিণে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম প্রয়াগক্ষেত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই বিস্তীর্ণ ভূভাগে প্রকৃতি যেন নিঃশেষে তাহার ধন ও সৌন্দর্য্যভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। কৃষিকার্য্যের বিঘ্নস্বরূপ অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টির আশঙ্কা এখানে তিরোহিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবামাত্র আর্য্যদিগকে যে এক সুগঠিত, সুপ্রতিষ্ঠিত শক্তিশালী অনার্য্য-জাতির সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া পড়িতে হইয়াছিল, তাহার অবসান ঘটিয়াছে। এই ক্ষণে অনার্য্যদিগের সহিত সখ্যভাব স্থাপিত হইয়া দেশময় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এইরূপ আবেষ্টনের মধ্যে ঋষি দীর্ঘতমা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। কারণ তাঁহার সময় আর্য্য ও অনার্য্যদিগের মধ্যে যে অবাধ সংস্রব চলিয়াছিল তাহার প্রমাণ— তাঁহারই ঔরসে উশিজ নামক এক অনার্য্য রমণীর গর্ভে কক্ষীবানের জন্ম হয় এবং দেখা যায় কক্ষীবান্ কোনরূপ দ্বিধা ব্যতিরেকে আর্য্যদিগের গণ্ডীর মধ্যে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার মাতা অনার্য্য বলিয়া কেহ তাঁহাকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখে নাই, পক্ষান্তরে অসাধারণ প্রতিভা ও গভীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানবলে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ঋষির আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, আমরা দেখিতেছি, তখন দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, জীবন শান্তিপূর্ণ, চিত্তবিক্ষোভের যে সকল কারণ ছিল একে একে প্রায় সবই অপনীত হইয়াছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য উপভোগের সকল অন্তরায় দূর হইয়াছে। দেশের এই শান্তিপূর্ণ অনুকূল আবেষ্টনের মধ্যে আর্য্যদিগের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা এক নূতন পথে ধাবিত হইল এবং তাহা হইল ভক্তির পথ।

জ্ঞানযোগের দ্বারা হিন্দুরা যে সত্য লাভ করিলেন শুধু দার্শনিকতত্ত্বে তাহার অবসান হইল না। সার সত্যকে 'Substance', 'Pure Being' বা 'Absolute' বলিয়া হিন্দুরা নিরস্ত হন নাই। তত্ত্বজ্ঞানে যে সত্যের উপলব্ধি হইল, সাধনার দ্বারা জীবনে তাহা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য হিন্দুরা চেষ্টিত হইলেন। হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাস প্রধানতঃ সেই সাধনারই ইতিহাস। সুতরাং তাঁহারা ব্রহ্মকে সত্য বলিয়া জানিতে পারাই চরম লক্ষ্য স্থির করিয়াছিলেন ;

'যস্তং ন বেদ কিং ঋচা করিষ্যতি।' (শ্বেতাশ্বতর)

তাঁহাকে যে জানে না, ঋগ্বেদ অর্থাৎ বেদাধ্যয়নে তাহা কি ফল হইবে ?

ইহারই পরের অবস্থায় হিন্দুদের চিন্তাধারা এক অতীন্দ্রিয় রহস্যের সন্ধান পাইল। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যবোধ হইতে এই সময়ে তাঁহাদের অনুভূতি জাগ্রত হইয়া উঠিল। তাঁহারা উপলব্ধি করিলেন—ভগবান শুধু জ্ঞানবেদ্যতত্ত্ব নহেন, তিনি রসবস্তু—তিনি আস্বাদ্য। ভগবানকে জানিলেই শুধু তাঁহাকে আস্বাদন করা যায় না। প্রাকৃত বস্তুর রসগ্রহণের জন্য রসনা নামক যেমন একটি স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয় আছে, আধ্যাত্মিক রসগ্রহণ বা আস্বাদনের জন্যও তেমনি একটি স্বতন্ত্র মনোবৃত্তি আছে—ইহার নাম ভক্তি। বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদীরা বলেন, ভক্তি পরাবিদ্যারই নামান্তর। কিন্তু উহা ঠিক নহে। ভক্তিধর্ম্মের রত্নপেটিকাস্বরূপ ভগবদ্-গীতায় বলা হইয়াছে—'ভক্ত্যাহং একয়া গ্রাহ্যঃ', অথবা 'ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া'। সুতরাং ভক্তিকে তত্ত্বজ্ঞানের সমপর্য্যায়ভুক্ত করিবার চেষ্টা বৃথা। ভগবদ্গীতায় ভক্তির অর্থ স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। উহার অর্থ সম্পূর্ণ শরণাগতি বা প্রপত্তি। ভগবানকে আশ্রয় করিতে হইবে সর্ব্বতোভাবে —'প্রভুঃ সাক্ষী গতির্ভর্ত্তা নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।' অবশ্য জ্ঞান ও ভক্তি যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বা ভিন্নধর্ম্মী, তাহাও নহে।

উভয়ই মানব-মনের ধর্ম্ম, এজন্য তাহাদের ধারা অনেক সময় এমন ভাবে মিশিয়া যায় যে, উহাদিগকে পৃথক করা কঠিন। তথাপি ফুল ও ফলের সঙ্গে, পরাগ ও পরিমলের সঙ্গে, শব্দ ও সঙ্গীতের সঙ্গে ঐক্য থাকিলেও যেমন প্রভেদ, জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে সম্বন্ধও কতকটা সেইরূপ।

ভক্তিধর্ম্ম সর্ব্বশেষে উদ্ভূত হইয়াও হিন্দুধর্ম্মের ক্ষেত্রে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তিলাভ করিয়াছে। আমি শুধু এই কথা বলিতে চাই যে, ক্রমবিবর্ত্তনের ফলে ভক্তিবাদের আবির্ভাবে কালের ঘড়িতে উন্নতির কাঁটা অনেকদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। শ্রীরামানুজাচার্য্য, নিম্বার্ক, মধ্বাচার্য্য, শ্রীচৈতন্য, তুলসীদাস, নামদেব, তুকারাম প্রভৃতির মধ্য দিয়া এই ভক্তিবাদ যেরূপ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-মণ্ডিত হইয়া ফুলে-ফলে পরিশোভিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার তুলনা জগতের কোন ধর্ম্ম-শাস্ত্রে মেলে না।

ঋগ্বেদীয় যুগে আর্য্যদিগের জীবন-ধারায় তিনটি বিভাগ দেখিতে পাই। প্রথম যাযাবর অবস্থা, তদনন্তর সপ্তসিন্ধু প্রদেশে স্থায়ীভাবে বসতিস্থাপন এবং কৃষিকার্য্যের সম্প্রসারণ। এই সময় তাঁহাদিগকে প্রাচীন অনার্য্য অধিবাসীদিগের সঙ্গে সর্ব্বদা নানারূপ সংঘর্ষের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করিতে হইত; তৃতীয় অবস্থায় সমাজ দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছে। দেশে তাঁহাদের অপ্রতিহত প্রভুত্ব, প্রতিদ্বন্দ্বী অনার্য্য অধিবাসীরা হয় দেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে, না হয় বহুক্ষেত্রে ছিন্নমূল হইয়াছে, অনেকেই তাঁহাদের বশ্যতা স্বীকার করিয়া আর্য্যগণ্ডীর মধ্যে স্থানলাভ করিয়াছে। প্রথম দুই অবস্থায় আত্মরক্ষার জন্য তাঁহাদিগকে প্রতি-নিয়ত ব্যস্ত থাকিতে হইত, কিন্তু দেশে শান্তি-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এই কল্পনাপ্রিয় জাতি আধ্যাত্মিক নানা বিষয় চিন্তনের অবসর প্রাপ্ত হইলেন। প্রথম অবস্থায় প্রকৃতির নানারূপ বিস্ময়কর দৃশ্যাবলী ও কার্য্যকলাপের প্রত্যেক ব্যাপারের মূলে এক একজন পৃথক দেবতা রহিয়াছেন, তাঁহারা এরূপ মনে করিতেন এবং চারিদিকে নানাপ্রকার শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায় আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক সর্ব্ববিধ বিপদ-আপদ হইতে রক্ষার জন্য এই সকল দেবতার স্তুতি করিতেন। এই যুগে তাঁহাদের প্রধান আরাধ্য দেবতা ছিলেন রুদ্র। তাঁহার নিকট প্রার্থনা—"মা মা হিংসীঃ।" রুদ্রের প্রসন্নতালাভের জন্য তাঁহাদের আকুল আবেদন—"রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।" পরিশেষে পারি-পার্শ্বিক প্রতিকূল অবস্থাগুলি বশে আনয়ন ও কৃষিকার্য্যের বিস্তার দ্বারা আর্য্যগণ যখন তাঁহাদিগের জীবন-যাত্রার পথ সহজ ও সুগম করিতে সমর্থ হইলেন, তখন বাহ্যপ্রকৃতির যেটি শোভন ও মঙ্গলময় দিক্ তাহার প্রতি মনোনিবেশের প্রকৃত অবসর প্রাপ্ত হইলেন। বিষ্ণু বিশেষভাবে এই সময়ের দেবতা। ক্রমে জ্ঞানবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল বিভিন্ন দেবতার কার্য্যের নিয়ন্তারূপে যে এক দেবতা রহিয়া-ছেন, কোন কোন ঋষির মনে এই ভাবেরও উদয় হইয়াছিল। ঋষি দীর্ঘতমা এই সত্য অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি সেই দেবতাকে "একং সৎ" বলিয়াছেন, কোন বিশেষ নাম দেন নাই। পরমেশ্বর নামের তখনও উৎপত্তি হয় নাই। "পরমেশ্বর" শব্দের ধাতুগত অর্থ হইতে বুঝা যায়, মানব তাহার বিচার ও চিন্তাশক্তির প্রয়োগ দ্বারা প্রাকৃতিক রাজ্যের যে সকল বিভিন্ন শক্তির খেলা—একাধারে তৎসমুদয়কে প্রকাশ করি-বার জন্য এই শব্দের সৃষ্টি করিয়াছেন। ঋষিদিগের শব্দজ্ঞান তখনও বাহ্য-ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষীভূত যে জড় জগৎ তাহাতেই নিবদ্ধ রহিয়াছে, ক্বচিৎ মানস-চিন্তাপ্রসূত অনুভূতিগুলিকে ব্যক্ত করিবার জন্য এই জড়নিরপেক্ষ দুই-একটি নামের সৃষ্টি হইয়াছে হয়ত, কিন্তু প্রধানতঃ জড়ের আশ্রয়েই তাহা ব্যক্ত করা হইত। ইন্দ্র, বিষ্ণু প্রভৃতি নামের প্রয়োগও এই রূপ অর্থ প্রকাশ করে। জীবন যখন শান্তিপূর্ণ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে সেই সময় বিষ্ণু অন্যান্য দেবতাকে অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ উচ্চতর আসনে প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন। বিষ্ণু প্রকৃতির প্রশান্ত মূর্ত্তির দেবতা। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে বিষ্ণুরই প্রাধান্য।

পূর্ব্বেই উল্লেখিত হইয়াছে যে, বর্ত্তমান কালে হিন্দুধর্ম্মের যে সকল বিভিন্ন শাখা আছে তন্মধ্যে রুদ্রশিব উপাসনাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। বৈষ্ণব ধর্ম্ম অপেক্ষা যে রুদ্র-শিবোপাসনা অধিকতর প্রাচীন, চারি শত খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে রচিত বৌদ্ধশাস্ত্র-নির্দ্দেশ হইতে তাহা জানা যায়। বুদ্ধদেবের উপদেশগুলি যে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহার নাম সুত্ত-পিটক। ইহা পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত; ইহারা 'দীর্ঘনিকায়', 'মধ্যমনিকায়', 'সংযুক্তনিকায়', 'অঙ্গোত্তরনিকায়' ও 'ক্ষুদ্রনিকায়'।

'নিদ্দেশ' ক্ষুদ্রনিকায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই গ্রন্থে তৎকালে প্রচলিত ধর্ম্মমতগুলির এক তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে রুদ্রশিব-উপাসক জটিলা নামক এক সম্প্রদায় ও বাসুদেব-বলদেব-উপাসক সম্প্রদায়ের নামোল্লেখ আছে, কিন্তু জটাধারী জটিলা সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখের মধ্যে যে সম্ভ্রম লক্ষিত হয়, বাসুদেব-বলদেবের উপাসকদিগের বেলায় তাহার অভাব রহিয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায়—সে সময় বাসুদেব-বলদেব-উপাসনা সমাজে কুসংস্কারাপন্ন নিম্নস্তরের লোকদিগের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু পতঞ্জলির সময় (অনুমান এক শত পঞ্চাশ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে) বাসুদেব সঙ্কর্ষণ উপাসনা সমাজের উন্নত স্তরের শিক্ষিত সমাজের মধ্যেও প্রসারলাভ করিয়াছে।

ইহার পর কয়েক শতাব্দী বৌদ্ধধর্মের বিশেষ অভ্যুদয়ের অবস্থা। ইতঃপূর্ব্বে সম্রাট্ অশোকের চেষ্টায় এশিয়া মহাদেশের নানা স্থানে এই ধর্ম্ম বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে। অশোক স্বীয় পুত্র মহেন্দ্রকে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া নিজের অবশিষ্ট জীবন সঙ্ঘের সেবায় উৎসর্গ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু সঙ্ঘ তাহা অপেক্ষাও বৃহত্তর ত্যাগের দাবি করিয়া বসিল। সঙ্ঘ রাজপুত্র মহেন্দ্রকে দাবি করিল। পিতাকর্তৃক যিনি রাজমুকুট মস্তকে ধারণের জন্য চিহ্নিত হইয়াছিলেন, সঙ্ঘের আহ্বানে তিনি আজ মুণ্ডিত মস্তকে ভিখারীর দণ্ড হস্তে ধারণ করিয়া ঘরের বাহির হইলেন। ধর্ম্মের জন্য এই আত্মত্যাগ মানবজাতির ইতিহাসে অতুলনীয়। সুতরাং এরূপ ঘটনা যে লোকের চিত্তে প্রবল উন্মাদনার সঞ্চার করিবে তাহা স্বাভাবিক। অচিরকালমধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িল। ক্রমে নালন্দাতে বৃহত্তম শিক্ষায়তন গড়িয়া উঠিতে লাগিল, তথায় নাগার্জ্জুন প্রভৃতি বিখ্যাত দার্শনিকগণ বৌদ্ধধর্ম্মের মূলতত্ত্বের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যায় আত্মনিয়োগ করিলেন। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে চতুর্থ শতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধমতের অপ্রতিহত প্রভাব ছিল। সেই সময় বৈদিক ধর্ম্মের সম্প্রদায়গুলি নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিল সত্য, কিন্তু একেবারে বিনষ্ট হয় নাই। গুপ্তবংশের রাজত্বকালে বৈষ্ণব ধর্ম্মের পুনর্ব্বার অভ্যুদয় হয়। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, কুমারগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্ত সকলেই বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত ছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেই স্ব স্ব আমলের মুদ্রায় নিজেদের পরম ভাগবত বলিয়াছেন—তাঁহারা ভগবৎ বাসুদেবের উপাসক ছিলেন। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর আরম্ভ হইতে পঞ্চম শতাব্দীর তৃতীয় পাদ পর্য্যন্ত তাঁহাদের রাজত্বকাল। এই সময়ের মধ্যে বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত অনেক মন্দির ও খোদিত শিলালিপির নিদর্শন নানা স্থানে পাওয়া গিয়াছে।

একদা সমগ্র হিমাচল প্রদেশ ব্যাপিয়া, এমন কি ভারতবর্ষের উত্তর দিকে পর্য্যন্ত শৈবধর্ম্ম বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। কালসহকারে বৈষ্ণব ধর্ম্ম ইহার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দণ্ডায়মান হয়। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে বর্ণিত একটি আখ্যায়িকা হইতে হিমালয়ের দক্ষিণে শিবালিক পর্ব্বত পর্য্যন্ত শিবের অপ্রতিহত প্রাধান্যের বিষয় অবগত হইতে পারা যায়। হরিদ্বার তীর্থক্ষেত্র এই পর্ব্বতোপরি অবস্থিত। এখানে প্রাচেতন দক্ষ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে কেবল মহাদেব ভিন্ন অপর সকল দেবতাই নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করেন। মহাত্মা দধীচি ইহাতে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বলেন, "যে যজ্ঞে ভগবান রুদ্র পূজিত না হন তাহাকে যজ্ঞ বা ধর্ম্ম বলা যায় না।" দক্ষ দধীচিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"মহর্ষে! ইহলোকে জটাজুটধারী শূলপাণি একাদশ রুদ্র বর্ত্তমান রহিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের মধ্যে মহাদেব কে তাহা আমি অবগত নহি।" (মহাদেবের পত্নী দক্ষকন্যা সতীর যজ্ঞস্থলে আগমন ও স্বামী-নিন্দা শ্রবণে যজ্ঞভূমিতে দেহত্যাগ, পত্নীর মৃতদেহকে স্কন্ধোপরি স্থাপনপূর্ব্বক মহাদেবের উন্মত্তভাবে বিচরণ এবং অবশেষে নারায়ণ কর্ত্তৃক এই দেহকে ৫১ খণ্ডে বিভক্তকরতঃ নানা স্থানে এই অংশগুলি পতিত হইবার আখ্যায়িকা পরবর্ত্তী পৌরাণিক যুগের সৃষ্টি।) দধীচি ইহা শুনিয়া বলিলেন, "মহাদেবের তুল্য প্রবীণ দেবতা আর কেহই নাই। তাঁহাকে যখন নিমন্ত্রণ করা হয় নাই, তখন যজ্ঞ নিশ্চয়ই পণ্ড হইবে।" ইহাতে দক্ষ বলিলেন, "যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর নিমিত্ত এই মন্ত্রপূত হবিঃ সুবর্ণপাত্রে সংস্থাপিত হইয়াছে, আমি এই যজ্ঞভাগ দ্বারা ভগবান বিষ্ণুকে পরিতৃপ্ত করিব।" এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, যজ্ঞেশ্বরের আসন বিষ্ণু অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। সমাজের উচ্চস্তরে অবস্থিত লোকদিগের শীর্ষস্থানীয় প্রজাপতি দক্ষ বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু তখনও শৈব ধর্ম্মের প্রভাব অপ্রতিহত। অতএব দক্ষের যজ্ঞ যে পণ্ড হইবে, ইহা সহজেই অনুমেয়। এই আখ্যায়িকায় অন্তরালে দুই সম্প্রদায়ের বিরোধের ইতিহাসই পাইতেছি। কিন্তু কালক্রমে বৈষ্ণব ধর্ম্মই জয়লাভ করে এবং লোকসমাজে উহার প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। এই সময় হইতে হিমালয়ের কূর্ম্মাচল প্রদেশের অন্তর্গত বদ্রীনারায়ণ পর্ব্বতশৃঙ্গদ্বয় এবং তাহাদের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে ক্রমশঃ বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রাধান্য লাভ করিতে থাকে। বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির পর হিন্দুধর্ম্মের যখন পুনরভ্যুত্থান হয় তখন শঙ্করাচার্য্য এই অঞ্চলে যোশীমঠ স্থাপনপূর্ব্বক ইহাকে হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের কেন্দ্র করেন। এখানে তিনি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করেন। শঙ্করাচার্য্য শৈব মতাবলম্বী ছিলেন। ইহার পর রামানুজ, মধ্বাচার্য্য প্রমুখ বৈষ্ণব আচার্য্যগণও এই স্থান হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া ব্রহ্মসূত্রের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দ্বারা আপন আপন বৈষ্ণব মত প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

জগদ্গুরুদ্বারের প্রবেশ-পথ

জগদ্গুরুদ্বার

শ্রীনরেন্দ্র দেব
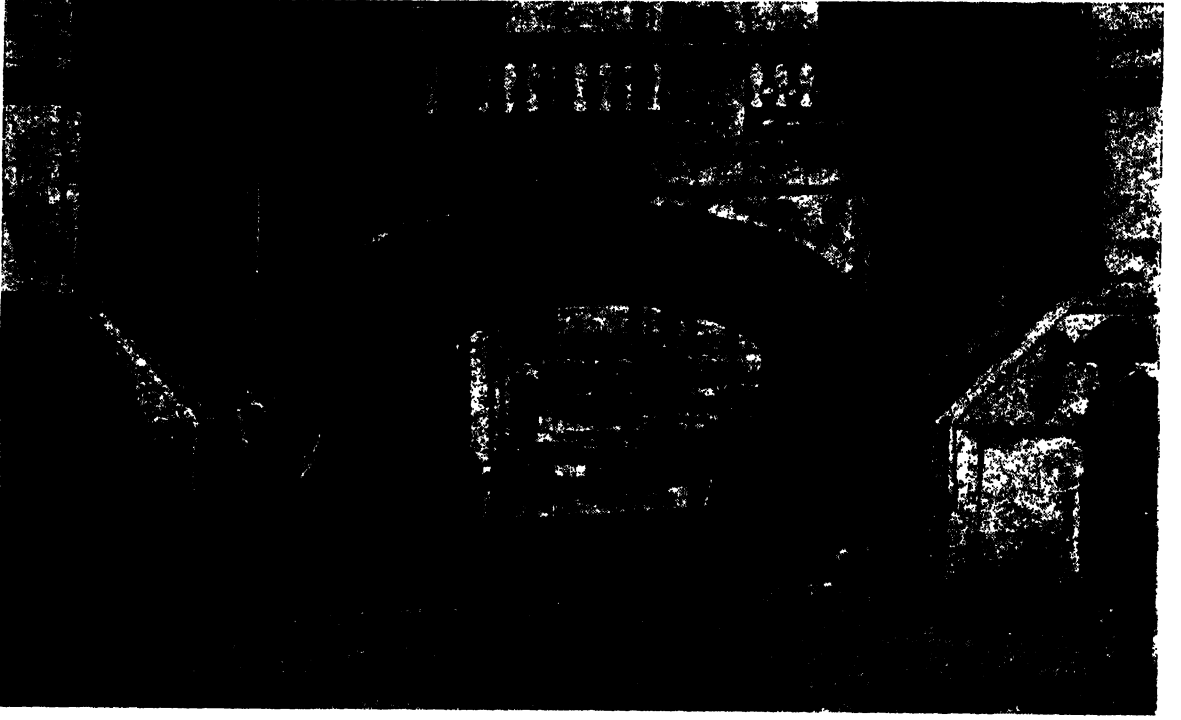
'জগদ্গুরু' বলতে আমি এখানে রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টান রাজ্যের যিনি ধর্ম্ম-সম্রাট বা প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ তাঁর কথাই বলছি। 'জগদ্গুরু-দ্বার' অর্থে তাঁরই বিরাট প্রাসাদের সামান্য একটু পরিচয় দেবার চেষ্টা করছি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন মঠের মোহন্ত-মহারাজদের রাজকীয় ঐশ্বর্য্যের খবর যারা জানেন তাঁদের পক্ষে রোমের এই মোহন্ত-মহারাজদের ব্যাপারটা বোঝা একটু সহজ হবে। অবশ্য আমি যে বিবরণ এখানে লিপিবদ্ধ করছি তা প্রায় একরকম চুম্বকেই বলা! কারণ বিশদ বিবরণ দিতে গেলে এক মাসের প্রবাসীর সমস্ত পাতাতেও কুলাবে না। যাঁরা সবিশেষ জানবার জন্য আগ্রহ বোধ করবেন তাঁদের আমি অধ্যাপক বার্টোলোমিও নোগারার লেখা *"The Portifical Monuments, Museums and Gallaries."* বইখানি একটু উল্টে-পাল্টে দেখতে অনুরোধ করব। ইনি পোপের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ডিরেক্টার-জেনারেল। বইখানি ইটালীয় ভাষায় রচিত। লণ্ডনের প্রসিদ্ধ প্রকাশক ষ্টানলি আরউইন কোম্পানীর এম্ ষ্টানলি এই বইখানির ইংরেজী অনুবাদ করে আমাদের সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

অল্প কথায় বলবার চেষ্টা করলেও পাঠকদের পক্ষে এই বর্ণনা থেকে রোমের ধর্ম্ম-সম্রাটদের বিপুল সম্পদের একটা মোটামুটি ধারণা নিশ্চয়ই হবে বলে মনে করি। একটা কথা গোড়াতেই বলে রাখি যে, একদা সুপ্রসিদ্ধ রোমের 'লাটারান' পরিবারের প্রাসাদ-সংলগ্ন যে ক্যাথিড্রাল চার্চ 'সেন্ট জন লাটারান' যা ক্যাথলিক ধর্ম্ম জগতের সমস্ত ভজনালয়ের মধ্যে মানে ও মর্য্যাদায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করতে পেরেছে, সেই 'লাটারান' ধর্ম্ম মন্দিরের মিউজিয়মের সঙ্গে 'ভ্যাটিকান' মিউজিয়মের সঞ্চিত সম্পদের একত্র সমাবেশ করলে কুবেরের ভাণ্ডারও তার কাছে লজ্জা পাবে।

'ভ্যাটিকান' বলতে রোমের ক্যাপিটল পর্ব্বতোপরি প্রতিষ্ঠিত সমস্ত দেবোত্তর সম্পত্তি এবং তার অন্তর্গত প্রাসাদগুলিও বোঝায়। বিরাট সেন্ট পীটার্স চার্চের মন্দির-সংলগ্ন মহামান্য পোপের প্রাসাদও এই ভ্যাটিকান সম্পত্তিরই অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীর নানা দিক্-দেশ থেকে সমাহৃত ভ্যাটিকানের এই সম্পদরাশি যেমনি বিপুল তেমনি অগণিত। এক দিনে সমস্ত খুঁটিয়ে দেখা কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। মুখে মুখে বর্ণনা শুনলেও আমার আশঙ্কা হয় অনেকেই সেগুলির

প্রকৃত মূল্য ও মর্য্যাদা নিরূপণ করতে পারবেন না। রোমে গিয়ে নিজের চোখে এসব দেখে এলে তবেই সেগুলির স্বরূপ সম্বন্ধে একটা সঠিক ধারণা হওয়া সম্ভব।

যদিও এ প্রবন্ধের নাম আমি 'জগদ্‌-গুরুদ্বার' দিয়েছি, কিন্তু কোনও গুরুদ্বারই ঐশ্বর্যে এর সমকক্ষ হবার স্পর্দ্ধা করতে পারে না। আমরা পঞ্জাবের দুর্গম উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের প্রসিদ্ধ শিখ গুরুদ্বার 'পাঞ্জাসাহেব' দেখে এসেছি। অমৃতশহরের 'স্বর্ণমন্দিরে' সারাদিন কাটিয়ে এসেছি। রাজোয়ারার 'নাথদ্বারে'ও রাত্রিবাস করে এসেছি। এদের ঐশ্বর্য্য দেখে একদা বিস্মিত হয়েছিলাম। কিন্তু রোমের ধর্ম্ম-সম্রাটের ঐশ্বর্য্যের তুলনায় এদের সম্পদ যেন অতি তুচ্ছ ও নগণ্য বলে মনে হয়। অবশ্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের দিক থেকে ভারতের এসব তীর্থস্থানের তুলনা হয় না, কিন্তু পার্থিব সম্পদে রোমের এই জগদগুরুদ্বার একেবারে পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় বলা চলে।

পবিত্র সোপান

বিশ্বের আদি উপাসনা-মন্দির (ভিতরের দৃশ্য)

সে যাই হোক, এদের পারমার্থিক প্রভাব যে একেবারে নেই একথা বলা চলে না। আমরা যেবার এখানে আসি, দুর্ভাগ্যক্রমে সে সময় মহামান্য পোপ 'পুণ্য-বর্ষ', বা 'Holy-Year' ঘোষণা করেছিলেন। শোনা গেল পুরাকাল থেকেই রোমের বিশ্বগুরু মোহন্ত মহারাজেরা প্রতি শতবর্ষ অন্তর একটি বর্ষকে 'হোলি-ইয়ার' বলে ঘোষণা করতেন। তারপর সে ব্যবধান ক্রমে কমে শেষে প্রতি পঞ্চাশ বৎসর অন্তর এই 'পুণ্য-বর্ষ' ঘোষিত হচ্ছিল। বর্ত্তমান জগদগুরু পোপ পৃথিবীর পাপী-তাপী মানবদের প্রতি করুণাপরবশ হয়ে প্রতি পঁচিশ বৎসর অন্তর 'হোলি-ইয়ার' ঘোষণা করা হবে বলেছেন। এর কৈফিয়ত স্বরূপ জানিয়েছেন, মানুষ এখন স্বল্পায়ু হয়ে পড়েছে; এত দীর্ঘ ব্যবধানে যদি 'পুণ্য-বর্ষ' ঘোষণা করা হয়, তা হলে অনেকেই তাঁদের জীবনে আর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার অবকাশ পায় না। এই 'হোলি-ইয়ারে' যাঁরা রোমে এসে ভ্যাটিকানের অন্তর্ভুক্ত 'সেন্ট জন ল্যাটারান চার্চ' বা 'সেন্ট পিটার্স চার্চে' অথবা 'সিক্সটাইন চ্যাপেলে' এসে উপাসনা করবার সুযোগ পাবেন তাঁদের জীবনের সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়ে তাঁরা নির্মল নবজীবন নিয়ে গৃহে ফিরতে পারবেন।

এই সময় রোমে আসা আমাদের দুর্ভাগ্য বলেছি এই জন্য যে, পৃথিবীর সকল দেশের যেখানে যত পাপী ছিল সবাই পাপক্ষয় হবার লোভে ঘটি-বাটি বেচেও প্রতিদিন দলে দলে রোমে এসে হাজির হচ্ছিলেন। সংখ্যায় তাঁরা লক্ষ লক্ষ! ফলে হোটেলে স্থানাভাব, ঘরভাড়া চতুর্গুণ বেশি; সমস্ত জিনিস দুর্মূল্য, ভীড়ের ঠেলায় পথ চলা দায়। ট্যাক্সি পাওয়া অসম্ভব। সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার, পৃথিবী জুড়ে যে এত অসংখ্য পাপী আছে—এ দেখেশুনে মনটা বেজায় খারাপ হয়ে গেল! আমাদের দেশের কুম্ভমেলা, অর্দ্ধোদয়যোগে গঙ্গাস্নান প্রভৃতি মনে পড়ছিল; মানুষের প্রকৃতি দেখা যাচ্ছে—সব দেশেই প্রায় সমান!

আমরা খ্রীষ্টান নই, সুতরাং পোপের প্রতি আমাদের কোনও ভক্তি, প্রীতি বা অনুরাগের আতিশয্য ছিল না। তবে যে মানুষটিকে পৃথিবীর অসংখ্য লোক দেবতার মতো মেনে চলে, যাঁর পাদুকা বা আলখাল্লার প্রান্তভাগ চুম্বন করতে পারলে নিজেকে তারা সৌভাগ্যবান বলে মনে করে, তাঁর প্রতি একটা অহেতুক শ্রদ্ধা

অসামান্য বলে মনে হয় না। ঢুকতে গেলে প্রবেশ-পত্র লাগে। এক জনের এক দিনের জন্য দক্ষিণা ৭৫ লীরা। এই টিকিটে কেবলমাত্র ভ্যাটিকানের নিম্নোক্ত স্থানগুলি ঘুরে দেখতে দেবে—প্রাচীন চিত্রশালা, ভাস্কর্যভাণ্ডার, 'কিয়ারামন্তি জাদুঘর', মিশরীয় জাদুঘর, 'এত্রুস্কান পুরাতত্ত্ব', পৌত্তলিক যুগের পুরাতত্ত্ব, গ্রন্থশালা, খ্রীষ্টান শিল্পকলাভবন, বর্জিয়া কক্ষ, রাফায়েল কক্ষ, লজিয়া, সিক্সটাইন চ্যাপেল, পঞ্চম নিকোলাসের চ্যাপেল ও অষ্টম আর্বানের চ্যাপেল, একরঙা প্রাচীর চিত্রের ঘর, 'অপৌরুষেয় গর্ভাধান' কক্ষ, আধুনিক চিত্রশালা, মহিলা কক্ষ, মানচিত্র কক্ষ, তিরস্করিণীশালা, ল্যাটারানের জাতি-বিজ্ঞান সংক্রান্ত মিশনরী মিউজিয়ম—যদি একদিনে সব দেখা শেষ না হয়, তবে আবার একদিনের টিকিট কিনতে হবে।
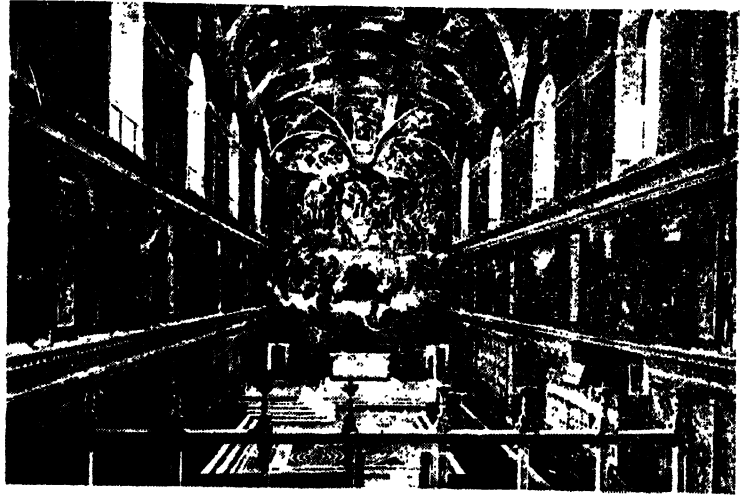
জগদ্‌গুরুর নিজস্ব ভজনালয়

ভ্যাটিকানে রোমের মহামান্য পোপেরা বসবাস করছেন প্রায় দীর্ঘ ছ'শো বছর ধরে। ইতিহাস বলে এর আগে নাকি তাঁরা 'ল্যাটারানে' অধিষ্ঠিত ছিলেন। রোম নগরটি সাতটি পাহাড় কেটে তৈরি। কাজেই সর্ব্বত্র সমতল নয়। পথ অধিকাংশই উঁচু নীচু।

পৃথিবীর প্রথম গির্জা (বাহিরের দৃশ্য)

আগেই বলেছি ভ্যাটিকানে এমন একজনও পোপ ছিলেন না যিনি ভ্যাটিকানকে সমৃদ্ধ করবার জন্য তার সৌন্দর্য্য, মর্য্যাদা ও ঐশ্বর্য্য বাড়াবার জন্য কিছু-না-কিছু দিয়ে এই তীর্থস্থানকে রমণীয় ও বিশ্বের বরণীয় করে তোলেন নি। খ্রীষ্টান ধর্ম্ম জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূজনীয় ব্যক্তির যোগ্য অধিষ্ঠান হয়ে উঠেছিল এই 'ভ্যাটিকান'—শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নব নব ঐশ্বর্য্য ও সম্পদের অকুণ্ঠ সাহায্যে। জগতের প্রাধানতম ধর্ম্মাধ্যক্ষগণ এখানে তাঁদের অক্ষয় স্মৃতি রেখে গেছেন, যাঁদের সামান্য একটু কৃপা লাভের জন্য পৃথিবীর কত রাজা, কত সাম্রাজ্য একদা লালায়িত ছিল।

মহাত্মা সেন্ট পীটারের পবিত্র আসনে এ পর্যন্ত পরের পর অন্ততঃ ২৬০ জন পোপ অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। কেউ কেউ এই আসনের সম্মান ও মর্য্যাদা রক্ষার জন্য লীলাক্রমে জীবন উৎসর্গ করেছেন, কেউ বা মহাপুরুষ রূপে পূজিত হয়েছেন। ভ্যাটিকানের ইতিহাস প্রাচীন মানবের শিক্ষা ও সভ্যতার ইতিহাস। গণতান্ত্রিক জড়বাদের সঙ্গে পারমার্থিক অধ্যাত্মবাদের নিরন্তর যুদ্ধের সকরুণ কাহিনী। উচ্ছৃঙ্খলতার বিরুদ্ধে নিয়ম-শৃঙ্খলার দ্বৈরথ। মিথ্যার সঙ্গে সত্যের দ্বন্দ্ব। দাসত্বের অবনততার বিরুদ্ধে মুক্তি-পিয়াসার বলিষ্ঠ বিদ্রোহ। সুদীর্ঘ কুড়িটি শতাব্দী আজ মহাকালের যবনিকার অন্তরালে চলে গেছে। এই কুড়িটি শতাব্দীব্যাপী ভ্যাটিকানের যে ইতিহাস—তারই মধ্যে ওতপ্রোতভাবে রয়েছে সারা পৃথিবীর উত্থান-পতনের ইতিহাস। কত ঝড়ঝঞ্ঝার প্রবল দুর্য্যোগ, কত বিরোধের দুর্ব্বার বহ্নি-শিখা অগণিত দেশ ও জাতিকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্মাবশেষ মাত্র করে দিয়েছে। পুরুষপরম্পরায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কত বিপদের আশঙ্কা, কত সর্ব্বনাশের ভয়, মানুষের মনকে চঞ্চল ও অস্থির করে তুলেছে। ডুবে গেছে কত দেশ, লুপ্ত হয়ে গেছে কত সভ্যতা, সংস্কৃতির ঘটেছে শোচনীয় বিকৃতি, কিন্তু ভ্যাটিকানের দিব্য অস্তিত্ব আজও অক্ষয় হয়ে রয়েছে। যদিও সে প্রভাব আর নেই,, ভ্যাটিকান এখন আর কোনও রাজার

জগতের সবচেয়ে বৃহৎ প্রার্থনা গৃহ (বাহিরের দৃশ্য)

বারে ঝেড়ে ফেলে দিতেও ত কোন দেশের কাউকেই দেখলাম না আজ পর্য্যন্ত। কুমারী মাতার গর্ভে শিশু যীশুর জন্মলাভ ইত্যাদি হরেকরকম উদ্ভট কাহিনীই বাইবেলে আছে। আমাদের পুরাণকেও হার মানায়! সেই সব অলৌকিক ও আশ্চর্য্য ঘটনা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হবে একমাত্র তাঁদেরই কাছে, যাঁরা এই বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান-অধ্যুষিত জগতে 'অপৌরুষেয় গর্ভাধান'ও সম্ভব বলে বিশ্বাস করেন। ভারতবাসী হিন্দুরা যখনই মানবের মধ্যে দেবত্বার আবির্ভাব কল্পনা করেছেন তখনই তাঁকে বলেছেন 'অযোনি-সম্ভবা'—মাতৃগর্ভে তার জন্ম নয়! যীশুর জন্মের জন্য মেরী মাতার এই 'অপৌরুষেয় গর্ভাধান' অনেকটা সেই জাতীয়ই। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হতে দেখি দৈবকী উদরে। নইলে ভক্তগণের মন চায় না এ কথা মানতে যে, ভগবানও পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হন অতি সাধারণ মানুষেরই মত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, জগতের সব মানুষই কম-বেশী কুসংস্কারাচ্ছন্ন। কোনও ধর্ম্মই এ থেকে রেহাই পায় নি।

এই 'সেন্ট পীটার্স চার্চ্চ' একদা সাধু সেন্ট পীটারের সমাধির উপর রচিত হয়েছিল। ইনি ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ বলে পরিচিত। প্রভু যীশুখ্রীষ্টের দ্বাদশ জন পার্ষদের মধ্যে ইনি ছিলেন অন্যতম। প্রভু যীশু এঁদের নানা দেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য পাঠিয়েছিলেন। রোমের ইতিহাস-বিশ্রুত নৃশংস সম্রাট 'নীরো' এই খ্রীষ্টান সাধুকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করেন। বহুবার এ গির্জ্জার সংস্কারের ফলে সেন্ট পীটার ক্রমে অনুপম হয়ে উঠেছিল। ১৭৬ বৎসর লেগেছিল এই ধর্ম্ম-মন্দিরটির নির্ম্মাণ শেষ হতে। প্রসিদ্ধ স্থাপত্য-শিল্পী ব্রামান্তের পরিকল্পনাকে ঈষৎ অদল বদল করে এর রূপ দিয়েছিলেন একে একে র‍্যাফায়েল, সান্ জেকো, মাইকেল এঞ্জেলো, মাদের্নো, বের্নিনী প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত শিল্পী-বৃন্দ। এর বহির্দৃশ্য যেমন সুন্দর অভ্যন্তরপ্রদেশও তেমনি অপূর্ব্ব! বিরাটের এমন সুসমঞ্জস রূপ, বিশালতার মধ্যে এমন একটা আশ্চর্য্য সঙ্গতির সুষমা সহজে চোখে পড়ে না। এ যেন মহাভারতের মত একখানি মহাকাব্য! যিনি অনাদি ও অনন্ত, অসীম যাঁর মহিমা, অপার যাঁর করুণা, যিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' তাঁর উপাসনার যোগ্য দেউল বলেই মনে হয় এই সেন্ট পীটার্স চার্চ্চকে!

এই দেবদেউলকে অবলম্বন করেই এর চারিপাশে গড়ে উঠেছে রোমের 'ভ্যাটিকান'—যাকে 'জগদ্গুরুধাম' বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হবে না। কারণ জগতের যেখানে যত রোমান কাথলিক খ্রীষ্টান আছেন সকলেই জানেন এইখানেই তাঁদের মুক্তিদাতা মহাগুরু অশেষ মান্যবর শ্রীমন্মহারাজ পোপের শ্রীপাট বা পুণ্য নিবাস। এই ভ্যাটিকানের প্রধান প্রবেশদ্বার ব্রোঞ্জের তৈরি। এত বড় তোরণ-

শাসনের অধীন বা অন্তর্ভুক্ত নয়। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী 'ভ্যাটিকান' নিজেদের একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাজ্য বলে ঘোষণা করেছিল। আজ পর্য্যন্ত কেউ এ ঘোষণার বিরুদ্ধাচরণ করবার সাহস করে নি। অতবড় যে দুর্দ্ধর্ষ মুসোলিনী তাকেও 'ভ্যাটিকান'-গ্রাসের লোভ সংবরণ করতে হয়েছিল।

ভ্যাটিকান যে কেবলমাত্র তার অধ্যাত্ম শক্তির জোরে বা তার পারমার্থিক বিভূতির প্রভাবে আপন অস্তিত্ব বজায় রেখেছে একথা বলতে পারলে সুখী হতাম। কিন্তু তা হয় নি। পোপকে সৈন্য রাখতে হয়েছিল। 'ধর্ম্মসেনা' হলেও তারা সংগ্রামে ছিল ধুরন্ধর। আজও ভ্যাটিকানের প্রবেশদ্বারে দেখা যায় সৈনিকরা পাহারা দিচ্ছে এবং সবচেয়ে যেটা দুর্বোধ্য সে হচ্ছে ভ্যাটিকানের এই প্রহরীরা কেউ রোমান বা ইটালিয়ান নয়। এরা সুইস গার্ড। বোধ করি পৃথিবীর সকল দেশের সৈন্যগণের পোশাক অপেক্ষা পোপের রক্ষীবাহিনীর পোশাক সবচেয়ে জমকাল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রচলিত রং চং করা উজ্জ্বল পোশাকে তারা আজও সুসজ্জিত হয়ে আছে। বর্ত্তমান জগতের কোনও স্থানকে যদি প্রকৃতই 'অচলায়তন' বলা চলে তবে সে এই রোমের 'ভ্যাটিকান'। এঁরা পরিবর্ত্তন-বিরোধী।

ভ্যাটিকানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হ'ল 'সেন্ট পীটার্স চার্চ্চ'। পৃথিবীতে আর কোন দেশেই এত বড় একটি গীর্জ্জার অস্তিত্ব নেই। এই চার্চ্চ কেবলমাত্র আকারেই বড় নয়, ঐশ্বর্য্যেও কেউ এর সমকক্ষ নয়। একে অবলম্বন করেই আজ ভ্যাটিকান অঞ্চল একটি পৃথক রাজ্যরূপে গড়ে উঠেছে। ভক্তের বিবিধ দান, প্রণামী, পূজা এবং মানত ইত্যাদিই ভ্যাটিকান রাজ্যের প্রধান রাজস্ব। কুসংস্কার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত—এমন কোনও মানুষই পৃথিবীর কোনও দেশে নেই। এ সম্পর্কে ভারতবাসীর বদনামটাই পৃথিবীর হাটে জোর গলায় রটান হয়েছে বটে, কিন্তু এটাকে একে-

দ্বার পৃথিবীতে অল্পই দেখা যায়। ইটালিয়ানরা এই তোরণদ্বারকে বলে 'জেকা'! মহাপুরুষদের প্রাসাদে পৌঁছবার যে সোপানশ্রেণী তাকে বলা হয় 'পবিত্র সোপান'! শুধু মুখেই বলা হয় না, যথার্থই এ গৃহের পবিত্রতা আজও সুরক্ষিত। তিন থাক সিঁড়ির প্রথম কয়েকটি ধাপকে বিশেষভাবে পবিত্র মনে করা হয়, কারণ এগুলি জেরজালেমের যে রোমান শাসনকর্তা পন্টিয়াক্ পাইলেট তাঁর সরকারী আবাস থেকে ক্রুশদের পর এ সিঁড়িগুলি উপড়ে আনা হয়েছিল। কারণ প্রভু যীশুখ্রীষ্টের পবিত্র পাদস্পর্শ পেয়েছিল এক দিন এই সিঁড়িগুলি। স্বতরাং "এই মাটিতে মৃদঙ্গ হয়" বলে যাঁরা শ্রীগৌরাঙ্গের চরণস্পর্শে পবিত্রভূমিতে গড়াগড়ি যান তাঁদের আমরা উপহাস করতে পারি কি? এই সোপানশ্রেণীর হর্ম্ম্যমুখের পরিকল্পনা করেছিলেন অমর শিল্পী ফন্তানা। এর দু'পাশের দেওয়ালে দুটি করে যুগ্ম মর্ম্মরমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। একটি মূর্ত্তিতে বিশ্বাসঘাতক জুদা খৃষ্টকে চুম্বন করছে। অপরটিতে রোমান পাইলেট সমবেত জনতার সম্মুখে যীশুকে এনে দেখাচ্ছেন।

পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ উপাসনা-মন্দির (ভিতরের দৃশ্য)

পূর্ব্বেই বলেছি, ভ্যাটিকানের সমস্ত প্রাসাদের সবিস্তারে বর্ণনা দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। স্বতরাং আমি কেবল বিশেষ উল্লেখযোগ্য দু'চারটির কথা বলে আমার এই জগদ্গুরুদ্বারের পরিচয় শেষ করব। কারণ ভ্যাটিকানের এই প্রাসাদগুলিকে একটি ছোটখাটো 'ব্রহ্মাণ্ড' বলা চলে। নানা অদ্ভুত আকারের খাম-খেয়ালী কল্পনায় গড়া অথচ রুচিরম্য ও বহু ব্যয়সাপেক্ষ বিরাট সব জমকালো বাড়ী। এদের ঘরের সংখ্যাই হবে এগার শতের উপর। ঘরগুলিকে এক একটি সুবৃহৎ 'হল' বলা চলে। প্রত্যেকটি ঘর একেবারে পৃথিবীর নানা দেশের নানা যুগের সংগৃহীত বহু মূল্য ও বহু বিচিত্র ঐশ্বর্য্যে ভরা।

ভ্যাটিকান লাইব্রেরী বা গ্রন্থাগারের কথাই আগে বলি। কারণ এর প্রতি আকর্ষণ ছিল আমাদের সবচেয়ে বেশী। পোপ পঞ্চম সিক্সটাসের আদেশে ফন্তানার পরিকল্পনা অনুসারে এই বিরাট গ্রন্থশালা নির্ম্মিত হয়েছিল। এর মধ্যে অনেকগুলি বড় বড় হল-ঘর আছে, প্রত্যেকটি ঘর অসংখ্য প্রাচীর চিত্র বা 'ফ্রেস্কো' ছবিতে অলঙ্কৃত। এই ফ্রেস্কো চিত্রগুলি সমস্তই সপ্তদশ শতাব্দীর চিত্রকলা-পদ্ধতি অনুসারে অঙ্কিত। গ্রন্থশালার বাম পার্শ্বের একটি মহলে সেই পৃথিবীখ্যাত প্রাচীর চিত্রখানি আছে—"আলদোব্রান্দিনীর বিবাহ"। এই গ্রন্থশালায় প্রায় চার লক্ষাধিক বই সংগৃহীত আছে। এর মধ্যে অধিকাংশই দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তক। প্যালাতাইন ও আর্বাইন্ গ্রন্থাগার দুটি একসঙ্গে যুক্ত হওয়ায় 'ভ্যাটিকান লাইব্রেরী' হয়ে উঠেছে প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

ভ্যাটিকান প্রাসাদের মধ্যে সিক্সটাইন চ্যাপেল নামে পোপের নিজস্ব যে একটি ক্ষুদ্র ভজনালয় আছে সেটির উল্লেখ না করলে কিন্তু জগদ্গুরুদ্বারের অঙ্গহানি ঘটবে। পোপ চতুর্থ সিক্সটাসের আদেশে ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে এই ভজনালয়টি নির্ম্মিত হয়েছিল। এটি আবার একটি শ্বেতমর্ম্মর যবনিকার দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত করা আছে। এই পর্দার মধ্যভাগে একটি কাঠের দরজা আঁটা। দ্বারের উপর পোপ দশম ইনোসেন্টের কৌলীন্য-চিহ্ন উৎকীর্ণ করা আছে। এই সিক্সটাস ভজনালয়ের দু'পাশের দেওয়ালে দ্বাদশটি প্রাচীর-চিত্র অঙ্কিত আছে। এই ফ্রেস্কোগুলি সবই যীশু ও মোজেসের জীবনের ঘটনাবলী নিয়ে আঁকা। এঁকেছেন বিশ্বশ্রুত শিল্পী মাইকেল এঞ্জেলো। সুদীর্ঘ তিন বৎসর সময় লেগেছিল তাঁর এই বারখানি প্রাচীর-চিত্র শেষ করতে।

'জগদ্গুরুদ্বার' বন্ধ করবার আগে খৃষ্ট জগতে সর্ব্বপ্রথম স্থাপিত রোমের যে প্রাচীনতম ক্যাথেড্রাল সেই সেন্ট জন ল্যাটারান গির্জ্জার একটু পরিচয় দিয়ে এ প্রবন্ধ শেষ করব। এই ক্যাথেড্রালকে বলা হয় পৃথিবীর সকল গির্জ্জার আদি জননী। এটি সর্ব্বপ্রথম ১৪ থেকে ৩৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নৃপতি কনষ্টানটাইন কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। সেইজন্য এর আর একটি নাম 'কনষ্ট্যান্টাইনিয়ানা'। এটি বহু বার ধ্বংস হয়েছে এবং বহু বার পুনর্গঠিত হয়েছে। ১৩০৮ খৃষ্টাব্দে এক প্রচণ্ড অগ্নিদাহে এটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়েছিল, কিন্তু পোপ পঞ্চম ক্লেমেণ্ট সত্বর এটিকে পুনর্নির্ম্মাণ করান। ১৩৬১ সনে বৈশ্বানরের কোপে এটি আবার পুড়ে যায়। তখন পোপ পঞ্চম আর্বান এটিকে পুনরায় তৈরি করতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তিনি শেষ করে যেতে পারেন নি। এর পর পোপ পঞ্চম মার্টিন এতে হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনিও সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন

নি। শেষে পোপ দশম ইনোসেন্ট সপ্তদশ শতাব্দীতে এটিকে সম্পূর্ণ করে তোলেন। বড় গির্জাকে ইটালীয় ভাষায় বলে 'বাসিলিকা'। শিল্পী বোরোমিনীর কীর্ত্তি এই 'সেন্ট জন বাসিলিকা। তিনি সেকালের প্রাচীন স্থাপত্যকলার অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন। কাজেই তাঁর আন্তরিক যত্নে ও পরিশ্রমে ল্যাটারানের এই আদি উপাসনা মন্দিরটি পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল। সেন্ট জন ভজনালয়ের আমুখ বা সামনের দিকটা একটু পরিবর্ত্তন করেছিলেন আলেসাণ্ড্রো গ্যালিলাই অষ্টাদশ শতাব্দীতে। অর্থাৎ, ক্রমে ক্রমে এর খোল ও নলিচা দুই-ই বদলে গেছে, কিন্তু তালপুকুর নামটি আজও আছে। আর আছে আজও অক্ষুণ্ন অবস্থায় এর মধ্যে সঞ্চিত বিপুল ঐশ্বর্য্য ও সম্পদ।

সেন্ট জন ল্যাটারানের গির্জ্জার ভিতর দিকটি ভারি চমৎকার। ভিতরে পর পর সারিবন্দি পাঁচটি ফুকর আছে। অসংখ্য স্মরণিকা ও স্মৃতিস্তম্ভ এবং মূল্যবান ভাস্কর্য্য শিল্প এর মধ্যে সংগৃহীত আছে। এর প্রাচীরগাত্রে যে-সব ফ্রেস্কো চিত্র অঙ্কিত আছে বিশেষজ্ঞেরা বলেন সেগুলি নাকি মহামূল্যবান।

নদীয়ার চাষ-আবাদ ও আদর্শ কৃষিক্ষেত্র

শ্রীসারদাচরণ চক্রবর্ত্তী

নদীয়ার অধিকাংশ জমিতেই আশুধান কিংবা পাট, মেস্তা প্রভৃতি ফসল উৎপন্ন করিয়া পরে তাহাতে রবিশস্যের চাষ হয়। নদী-বিল-সংলগ্ন নীচু জমিতে বৎসরের অধিকাংশ সময় রস থাকে বলিয়া তাহাতে লাল আলু, ইক্ষু প্রভৃতির চাষ হয়। এ সকল জমিতে বিশেষ কোন সার প্রয়োগ না করিয়া ধান, পাট, রবিশস্যও অধিক পরিমাণে হয়। পটল, উচ্ছে, ফুটি প্রভৃতিও এ সকল জমিতে ভাল জন্মে। জলের অসুবিধার জন্য কচিৎ গোল আলুর চাষ হয়। বেগুন, বিলাতী বেগুন, পটল প্রভৃতি সকল রকম উঁচু জমিতে হয়। আমন ধান বপনোপযোগী জমির পরিমাণ কম; প্রথমোক্ত জমির পরিমাণই বেশী। এ সকল জমিতে যে ভাবে চাষ হয় তাহাতে হিসাব করিয়া দেখিলে লাভ হয় না। কয়েক গাড়ী গোবরসার ভিন্ন অন্য কোন সার দেওয়া হয় না। দুর্ব্বৎসর না হইলে বিঘাপ্রতি ৪ মণ ধান ও চার মণ রবিশস্য পাওয়া যায়। নদীর ও বিলের ধারের নীচু জমিতে বৎসরের অধিকাংশ সময় রস থাকাতে ফসল প্রায় দ্বিগুণ হয়। সকল রকম জমিতেই গোবরসার, পচা খৈল, সবুজ সার, এমোনিয়াম সালফেট, হাড়ের গুঁড়া প্রভৃতি প্রয়োগ করিলে ফলন দ্বিগুণ হয়। অতিরিক্ত বৃষ্টির জন্য সময়মত নিড়ানো সম্ভব হয় না বলিয়া মাঝে মাঝে আশুধান হয় না, বৃষ্টির অভাবে প্রায় বৎসরই উঁচু জমিতে রবিশস্য হয় না। এমতাবস্থায় রবিশস্যের পরিবর্ত্তে আশুধানের সহিত কাপাস বুনিলে ফসল পাওয়া বিষয়ে অনেকটা নিশ্চিত হওয়া যায়। অতিরিক্ত বৃষ্টি কি অন্যবিধ কারণে ধান না হইলেও জমিতে চাষ দিয়া কলাই দেওয়া যায়, উপরন্তু কার্পাস ত হইবেই।

উপযুক্ত সার প্রয়োগ দ্বারা প্রতিবাসী চাষীদের তুলনায় দ্বিগুণ ধান পাইয়াছি। ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াও তাহারা নিজ নিজ জমিতে সার প্রয়োগে সম্মত হয় নাই। অধিকাংশ চাষীই গরীব। বীজ সংগ্রহ করিতেই বিব্রত হয়। কাজেই সার বাবদ কিছু ব্যয় করার টাকার যোগাড় তাহাদের হয় না। বহু চাষীকে সার ক্রয়ের জন্য টাকা দিতে চাহিয়াও বিফলমনোরথ হইয়াছি, তাহারা এজন্য ঋণ করিতে অনিচ্ছুক। যাহাদের টাকা আছে তাহারাও ইহার উপকারিতা বুঝিতে চায় না। প্রতি বৎসর ক্রমাগত সুফল দেখাইতে পারিলেই আশা করি, তাহারা ইহা গ্রহণ করিবে। গোবর ভিন্ন অন্য সারের উপকারিতা তাহারা স্বীকার করিতে চায় না।

কেহ হাল বলদ রাখিয়া নিজে ধানের ও অন্যান্য ফসলের সহিত কাপাস উৎপাদন করিলে পর লাভবান হইবে। অন্ততঃ ১০/ বিঘা চাষ করিলেও সে নিজের জন্য মাসিক ৬০৲ রাখিলে বাৎসরিক ৭২০৲, গরু বলদ রাখিবার খরচ মাসিক ১০৲ হিসাবে ১২০৲ এবং বীজ, সার ও নগদ মজুরি বাবদ ৫০০৲ মোট বাৎসরিক খরচ ১৩৪০৲ টাকা উৎপন্ন ফসলের মূল্য হইতে পাইবে সন্দেহ নাই। একটি লাঙ্গলে পনর বিঘা পর্য্যন্ত জমির চাষ করা যায়। বাকী পাঁচ বিঘায় বেগুন, লঙ্কা, কুমড়া, লাউ, পটল, পেঁপে, কলা, লাল আলু প্রভৃতি ফসল উৎপাদন করিলে বাৎসরিক পাঁচ শত টাকার মত খরচ করিয়া অন্ততঃ ১৫০০৲ টাকার ফসল পাইবে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কোন শিক্ষিত যুবক একজন চাষীর সাহায্যে এভাবে চাষ করিলে নিজের পারিশ্রমিক বাবদ মাসিক অন্ততঃ ১০০৲ পাইতে পারেন। চাষের সহিত গাভী, হাঁস, মুরগী, ছাগল প্রভৃতি পোষণ করিলে পরিবারভুক্ত ছেলেমেয়েরা সকলেই নিজ নিজ যোগ্যতানুযায়ী কাজ করিয়া পারিবারিক আয়বৃদ্ধির সহায়ক হইতে পারিবে। যাহাদের
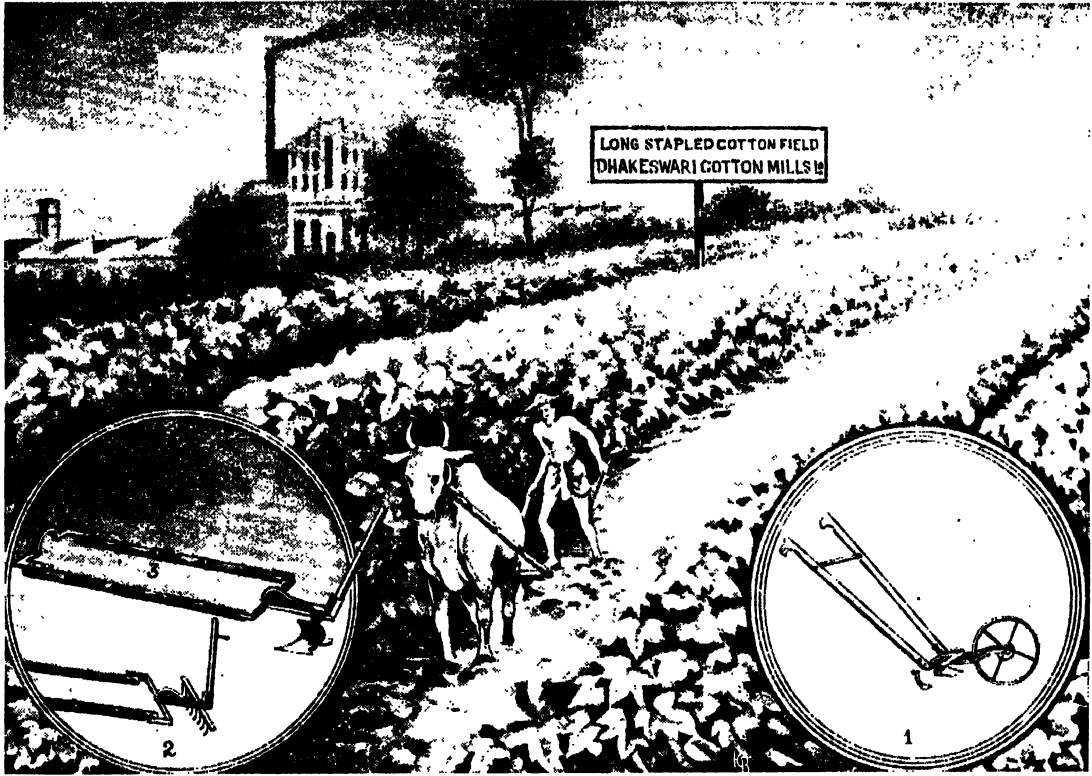
ঢাকেশ্বরী মিল-ক্ষেত্রে এক-গরু লাঙ্গল চাষ এবং হাত-লাঙ্গল ও বিদে

নিজের জমি, ঘর, লাঙ্গল, বলদ প্রভৃতি নাই, তাহাদের এ-জন্য প্রায় ৩০০০৲, চাষের জন্য ২০০০৲ এবং দুবৎসরের জন্য ফসল না হইলে পর বৎসরের কাজ চালাইবার নিমিত্ত ১০০০৲ মোট ৬০০০৲ হাতে লইয়া এবম্বিধ কার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে। জমির চারিদিকে ভাল বেড়া দিয়া গরু, ছাগল, চোরের হাত হইতে ফসল রক্ষা করিতে না পারিলে চাষে কোন ফলই দেখা যাইবে না। প্রথম অবস্থায় কাঁটা তারের বেড়া দিয়া জমি ঘিরিতে হইবে। এদেশে উইয়ের উৎপাতে খুঁটি ও বেড়া ঠিক রাখিতে প্রতি বৎসর বহু টাকা ব্যয় হয়। এজন্য বেড়া দিয়া প্রথম বৎসরই বেড়ার সীমানার মাটি কোপাইয়া উঁচু আইল বাঁধিতে হইবে। এই আলুগা মাটিতে বর্ষার প্রারম্ভে বাব্‌লা, খেজুর, নিম, কাঁঠালের বীজ, আমের আঁটি খুব ঘনভাবে পুঁতিয়া দিতে হইবে। আলুগা মাটিতে বর্ষার জলে এ সকল চারা দুই-তিন বৎসর-মধ্যে শক্ত স্থায়ী বেড়ার কাজ করিবে এবং ক্রমে ইহা হইতে একটা স্থায়ী আয়েরও পথ হইবে। ঝাড়গ্রাম কৃষি-কলেজের চারি শত বিঘা জমি কাঁটা-তারের বেড়া না দিয়াই গত বৎসর হইতে এভাবে ঘিরিয়া দিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে।

নদীয়ার অধিকাংশ জমিই শুষ্ক, কাজেই বৃষ্টির সময় ভিন্ন অন্য সময়ে ফসল জন্মানো কঠিন। এখানে সাধারণ কৃষকেরা সারা বৎসর পরিশ্রম করিয়া কষ্টে-সৃষ্টে জীবন-ধারণ করে। প্রচলিত নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়া, অবস্থানুযায়ী কিভাবে এখানকার কৃষিকে লাভজনক করা যায় তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে এবং কতকগুলি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র চালাইয়া তদনুযায়ী চাষ আবাদ করাইতে পারিলে ইহাদের উন্নতি-বিধান হইবে। এখানে জমিতে জল দিবার জন্য সাধারণতঃ পুষ্করিণী কিংবা ইন্দারার জল ব্যবহৃত হয়। অধিকাংশ স্থলে ১৫ হাত নীচে ইন্দারার জল পাওয়া যায়। পানের জন্য ও ঘর-সংসারের অন্যান্য কাজের নিমিত্ত এই জল ব্যবহৃত হয়। চৈত্র-বৈশাখ মাসে কৃষিকার্য্যের জন্য জল লইতে হইলে প্রত্যহ ২।১ কাঠা করিয়া ১ বিঘা জমিতে জল দেওয়া সম্ভব হওয়া সত্ত্বেও এভাবে ইন্দারার জল খরচ করিলে ঘর-সংসারের কাজের জন্য জলের অভাব হয়। অধিকাংশের পক্ষেই এ প্রকার জল পাওয়ার সম্ভাবনাও নাই। কাজেই এই ধরণের আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে, বর্ষায় জন্মে এ প্রকার ফসল করিলেই সাধারণ চাষীর উপকার হইবে।

এখানকার কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব কম চাষীই আয়-ব্যয়ের হিসাব করিয়া চাষ করে, তাহারা সার কিংবা জলের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ও ভাবে না। আমি বহুদিন যাবৎ এইরূপ আদর্শ কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া আশপাশে চাষী-

এক-গরু চালিত লাঙ্গল
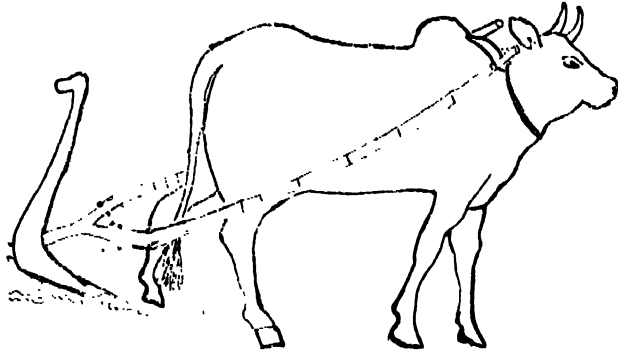
হাতে চালানো লাঙ্গল

দিগকে উন্নত প্রণালীর চাসের উপকারিতা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। রয়্যাল এগ্রিকালচারাল কমিশনে সাক্ষ্য দিবার পর তদানীন্তন প্রসিদ্ধ সাময়িকী 'ওয়েলফেয়ার' পত্রিকায় "My Impression on the Central Farm in Dacca" শীর্ষক প্রবন্ধে এ বিষয়ে আমার মত প্রকাশ করিলে তখনকার ডাইরেক্টর অব এগ্রিকালচার মিঃ ফিনলে আদর্শ কৃষি-প্রসারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে কেহ 'ডিমনস্ট্রেশন' ফার্ম করিলে তাহাকে কৃষি-বিভাগ হইতে সাহায্য দিবার ব্যবস্থা থাকিলেও ইহার ফলাফলের বিষয় আশপাশের কৃষকদের মধ্যে প্রচারের কোন ব্যবস্থা নাই। ১৯৩৯ সন হইতে বিভিন্ন সরকারী পরিকল্পনানুযায়ী বাংলায় লম্বা আঁশের কার্পাস চাষ করায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, এখানে উঁচু জমিতে সর্ব্বত্রই কার্পাস ভাল জন্মে। দুর্ভাগ্য-ক্রমে এত দীর্ঘকালের চেষ্টায়ও বাংলায় ইহার প্রবর্ত্তন হয় নাই। চাষীদিগকে নানাভাবে সাহায্য করিবার ব্যবস্থা থাকিলেও গত বৎসরের কৃতী উৎপাদকদের মধ্যে অনেকেই এ বৎসর ইহার চাষ করে নাই। গতানুগতিক প্রথায় হাজার একর জমিতে কার্পাস-চাষে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় না করিয়া, অন্ততঃ কয়েকটি ক্ষেত্রে অল্প কয়েক একর জমিতে ইহার লাভজনক চাষ করিয়া তাহার আয়-ব্যয়ের হিসাব সাধারণ্যে প্রচার করিলে চাষীরা ইহার উৎপাদনে আকৃষ্ট হইত এবং ইহার প্রতি তাহাদের মনে স্থায়ী অনুরাগের সৃষ্টি হইত। বহু সংবাদপত্রও এই পদ্ধতি সমর্থন করিয়াছেন। কার্পাস-চাষের ব্যয় কমাইবার জন্য আমেরিকার ক্ষুদ্র চাষীদের অনুকরণে এক-গরুচালিত লাঙ্গল, বিদে প্রভৃতির প্রচলন আবশ্যক।

পনর বৎসর পূর্ব্বে ঢাকেশ্বরী কটন মিলের প্রধান কৃষিকর্ম্মী হিসাবে ১৯৩৬ সন হইতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কার্পাস—মিশরীয় কার্পাসের চাষ আরম্ভ করি। নানারকম প্রতিকূল অবস্থা ও বহু বাধা-বিঘ্নের মধ্যে আজ পর্য্যন্তও ইহার চাষ করিয়া আসিতেছি এবং বাংলার মাটিতেও অন্যান্য কার্পাসের ন্যায় ইহাও যে সহজে হয় সেকথা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছি। সুখের বিষয়, সরকারী কৃষি-বিভাগ গত তিন বৎসর যাবৎ আমাকে এক একর জমিতে ইহার চাষের খরচ দিতেছেন। কিন্তু দেশে এ প্রকার একটি মূল্যবান কার্পাস চাষের প্রচলন-বিষয়ে কোন ব্যবস্থা হয় নাই। ঢাকা হইতে বহিরাগত হিসাবে এখানে অবস্থান করিয়া নদীয়ার ফুলিয়াবয়রা গ্রামে নানা অসুবিধার মধ্যে বহু আশা ও উৎসাহ লইয়া ইহার চাষ করিয়া আসিতেছি। ইহা ৮০নং সূতা প্রস্তুতির উপযোগী মূল্যবান কার্পাস। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ইহার প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং বিভিন্ন মিল এ জাতীয় কার্পাস বিদেশ হইতে আমদানী করিতে প্রতি বৎসর কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়া থাকে। নদীয়ার মাটিতে ইহার ভাল ফলন হয়। অন্যান্য কার্পাসের ন্যায় ইহার উৎপাদন যত্ন ও ব্যয়সাপেক্ষ বলিয়া এ প্রকার আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে ইহার চাষ হওয়া আবশ্যক। সমাজ-উন্নয়ন-পরিকল্পনা ব্যাপারে জনগণের সহযোগিতা আহ্বান করা হইতেছে। এমতাবস্থায় ফুলিয়া এলাকা-মধ্যে এবং ফুলিয়া কলোনী ফার্ম্মে এ প্রকার ক্ষুদ্রায়তনের কৃষিক্ষেত্রে লাভজনক চাষ দেখাইতে পারিলে, সাধারণ চাষীদের বিশেষ উপকার হইবে। চাষকে লাভজনক করিবে—এই সর্ত্তে স্থানীয় অভিজ্ঞ বহু চাষী উপযুক্ত পারি-শ্রমিক পাইলে এইরূপ কার্য্যে অগ্রসর হইবে আশা করা যায়। পেন্‌সনপ্রাপ্ত সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে উপযুক্ত বেতনে চাকুরি দেওয়ার নিয়ম আছে, কিন্তু কোন দিন সরকারী কাজ করে নাই এ প্রকার কৃতী কর্ম্মীর যোগ্যতা অনুযায়ী কাজের জন্য বেতন কিংবা সম্মান-মূল্য দেওয়ার ব্যবস্থা কোন সরকারী বিভাগে নাই। সমাজ-উন্নয়ন-কার্য্য বিভাগ যে মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া কাজ করিতেছেন তাহাতে এ প্রকার পারিশ্রমিক দেওয়ার ব্যবস্থা করা সমীচীন। তাঁহারা এ প্রকার আদর্শ কৃষিক্ষেত্রের আবশ্যকতা আছে মনে করিয়া অবিলম্বে তদনুযায়ী কার্যে প্রবৃত্ত হইলে দেশের কল্যাণ হইবে।

উল্কা

শ্রীপ্রতুল গঙ্গোপাধ্যায়

৪

কিছু দিন পর এক দিন মধ্যাহ্নে কল্যাণ ও রজত এক বস্তির গোলার ঘরের হোটেলে উপস্থিত হইল। কল্যাণ বলিল—"এই হ'ল আমার গিন্নীমার হোটেল। ঐ দেখ ঘরের দাওয়ায় পা ছড়িয়ে বসে গিন্নীমা পয়সা গুনছে।"

চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রজত কহিল, "দেখ, সংসারে সব জিনিষের মধ্যেই বোধ হয় একটা সামঞ্জস্য আছে। তোর বাসস্থানের সঙ্গে এই হোটেলের ঘরবাড়ী আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার একটা আশ্চর্য মিল আছে।"

কল্যাণ কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করিয়া কহিল, "খবরদার, আমার গিন্নীমার হোটেলের নিন্দে করিস নে? দু' আনায় এমন ডাল, ভাত, মাছ, তরকারি আর টক, এই কলকাতায় আর কোথায় পাবি বল ত? মফস্বলেও কোন শহরের হোটেলে তিন চারি আনার কমে ভাত জোটে না।"

এই কথোপকথনের মধ্যেই গিন্নী ডাকিয়া কহিল, "ও কল্যাণ, দরজায় দাঁড়িয়ে কি গল্প করছ। যাও শিগগীর খেয়ে নাও।"

তাহারা বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। গিন্নী পুনরায় বলিতে লাগিল, "এত দিন কোথায় ছিলে? সেদিন রাত্তিরে খেতে এলে না, আমি অনেক রাত্তির পর্য্যন্ত ভাত ঢেকে রেখে তোমার অপেক্ষায় বসে ছিলাম। তার পর আর ত তোমার কোন পাত্তাই নেই। যাক্, খেতে বসে যাও। অ: ঝি! দুখানা জায়গা করে দে না মা।"

ঝি তখন সবেমাত্র সকলের দৃষ্টিপথেই স্নান আরম্ভ করিয়াছিল। সে অনুনাসিক স্বরে বলিল, "জায়গা আছে গো, ঐ হোথা ঐ বাবুর পাশেই আছে। আচ্ছা, সাফ করে দিচ্ছি।"

ঝি আসিয়া একটুক্‌রা অতি নোংরা ভিজা নেকড়া দিয়া দুখানা আসনের সম্মুখভাগ মুছিয়া দিয়া গেল। কল্যাণ ও রজত আহারে বসিল।

ঝির সর্ব্বাঙ্গ বাহিয়া জল ঝরিতেছিল। যাহারা খাইতেছিল তাহাদের কাহারও কাহারও পাতে দু'চার ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়ায় সমস্বরে চেঁচাইয়া উঠিল, "এ্যা:, এ কি করলে ঝি! গা'টা মুছেই আসতে না হয়।"

ঝি ছাড়িবার পাত্র নয়। ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "দুটি বাবু খেতে এসেছে, তাই তাড়াতাড়ি জায়গা সাফ করতে এলাম, দু'ফোঁটা জল না হয় পড়েছেই, তাতে যেন যজ্ঞি নষ্ট হ'ল! দেখ না একবার রকমটা, কেমন চেঁচিয়ে উঠল—যেন চৌকিদার।"

আহারে লিপ্ত একজন প্রৌঢ় বলিলেন, "ওহে চেপে যাও, আর ঘাঁটিও না, রণরঙ্গিণী ক্ষেপে গেলে শুধু জলের ফোঁটা নয়, গোবর-ছড়া দেবে।"

দুই-তিন জন যুবক এই ব্যাপার লইয়া নিজেদের মধ্যে হাসিঠাট্টা করিতে লাগিল।

পাচক আসিয়া কল্যাণ আর রজতকে পরিবেশন করিয়া গেল—"মোটা অপরিষ্কার চালের ভাত, পাকা শুকনো পোকায় খাওয়া তরকারি, অতি ক্ষুদ্র মাছের টুকরো—ভাল করিয়া অভ্যাস না করিলে এত ছোট করিয়া মাছ কাটা যায় না! ঠাকুর মশাই বোধ হয়, এই মাত্র গঞ্জিকা প্রস্তুত করিতেছিলেন, তাড়াতাড়িতে ভাল করিয়া হাত না ধুইয়াই পরিবেশন করিয়া গেলেন।

কল্যাণ খাইতে আরম্ভ করিয়া দিল। রজত সহাস্যে নীচু গলায় কহিল, "কল্যাণ, দেখ আমাদের ত নেশা করার বিধি নেই, এমন কি তামাক খাওয়া পর্য্যন্ত নিষেধ! আজ কিন্তু ভাই গাঁজা খাওয়া হয়ে গেল। এই দেখ তরকারিতে কেমন গন্ধ!"

কল্যাণ বুঝাইয়া বলিল, "খেতে বসে অশ্রদ্ধা করে খেতে নেই, কিছু মনে না করে খেতে আরম্ভ কর্।"

কল্যাণ ও রজত নীরবে খাইতে লাগিল। ভোজনরত আর এক জন লোক বলিল, "ও গিন্নী, মাছের টুকরো এত সরু করে কাট কেন, আর একটু পুরু রাখতে বলবে।"

সেই প্রৌঢ় লোকটি বলিল, "কেন ভাই আপশোশ করছ, দেখ দেখি কত সুবিধে! বিয়ে না করেও গিন্নী পেয়েছ, সে আবার যত্ন করে খাওয়াচ্ছে, আর কি চাই বল ত?"

রজতের হাসি পাইতেছিল, সে নীচু গলায় কল্যাণকে কহিল, "ওদের বাহাদুরি আছে কিন্তু, প্রায় ওয়ান-সিক্সটিন্‌থ ইঞ্চি পুরু করে ধারালো বঁটিতে মাছ কাটা দেখবার জিনিষ বটে!"

কথা বলিতে বলিতে দুই-তিন বার জোরে নিঃশ্বাস লইয়া রজত কহিল, "আচ্ছা কল্যাণ, একটা দুর্গন্ধ পাচ্ছিস না? এ কি এই মাছের গন্ধ, না ঐ ড্রেনের গন্ধ?"

কল্যাণ রাগ করিয়া কহিল, "কাল থেকে যদি আর তোকে নিয়ে এই হোটেলে আসি?"

পাশেই ড্রেন, তাহাতে ভাত, ডাল, তরকারি পচিয়া দুর্গন্ধ ছড়াইতেছিল। চারিদিকে মাছি ভন্ ভন্ করিতেছে। ঘরের ভিতরকার ছাদ ঝুলে ভর্ত্তি।

রজতের জলের প্রয়োজন হওয়াতে ঝি একখানা পাতলা ছেঁড়া গামছা পরিয়া ঘরের ভিতরে আসিয়া জল দিয়া গেল। মাথা তুলিলে কি দৃশ্য দেখিয়া ফেলিবে এই আশঙ্কায় রজত মাথা নীচু করিয়াই বসিয়া রহিল। একে ত এই নোংরা ঘরে বসিয়া এমনি খাদ্য তাহার গলাধঃকরণ হইতেছিল না, তার উপর ঝির এই বীভৎস দৃশ্য দেখিয়া তাহার ক্ষুধাতৃষ্ণা একেবারে উবিয়া গেল! কতক্ষণে ছুটিয়া পালাইবে তাহাই ভাবিতে লাগিল। রজতের

মুখের দিকে চাহিয়া কল্যাণ সমস্ত অবস্থাটা উপলব্ধি করিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল, "যা পারিস খেয়ে নে, বেশী খেয়ে কাজ নেই, বাসায় ফিরে না হয় যা-কিছু কিনে খাস।"

পাচক ঠাকুরের সর্ব্বাঙ্গ দদ্রু-শোভিত। বিশেষতঃ মলিন পরিধেয়ে আবৃত দেহাংশে চর্ম্মরোগ বোধ হয় অত্যধিক ছিল; সে রোগাক্রান্ত স্থান কণ্ডুয়ন করিতে করিতে দরজার ধারে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কার কি চাই বল, বেলা হয়ে গেছে, আমার আবার নাইতে খেতে হবে।"

কল্যাণ রজতের অবস্থা বুঝিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "আমাদের কিছু লাগবে না ঠাকুর মশাই।"

এক ব্যক্তি বলিল, "আর চারটে ভাত দিয়ে যাও ঠাকুর।"

ঠাকুর ভাত পরিবেশন করিয়া ঝির সঙ্গে বকাবকি আরম্ভ করিল, "অল্প করে চাল ধুয়ে দিস কেন? এখন হাঁড়িতে যে ভাত আছে তাতে আমাদের তুজনের ত হবে না! আমি আর এখন ভাত রাঁধতে পারব না, দেখি তুই কোন্ ছাই খাস।"

ঝি ত ইহার মধ্যে নিজের দোষ কিছুই দেখিতে পাইল না, সুতরাং উভয়ের তুমুল ঝগড়া বাধিয়া গেল।

কয়েকটি ভিক্ষুক বালক-বালিকা ভুক্তাবশিষ্ট ঝুটাকাঁটার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল। তুই-তিন জন ড্রেনে খাদ্য খুঁজিতেছিল। তুর্গন্ধ বলিয়া রজত মাছের টুকরো খাইতে পারে নাই। ভুক্তাবশিষ্টের সঙ্গে এই মাছের টুকরোটাও ঝি ডাষ্টবিনে ফেলিয়া দিয়াছিল। ঐ মাছের টুকরোটার অধিকার লইয়া কয়েক জন ভিক্ষুক বালক-বালিকার মধ্যে ভীষণ কলহ আরম্ভ হইল।

একটি বালিকাকে শান্ত ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া পাচকঠাকুর বলিল, "কি রে তোর বুঝি কিছুই জোটে নি? অ ঝি দে ত ওকে চারটে ভাত।"

ঝি কহিল, "তোমার দরদ থাকে ত তোমার থালা থেকেই দাও না।"

পাচকঠাকুর, "ওরে অন্নদান মহাপুণ্য, শাস্ত্রে লিখেছে।"

ঝি, "রেখে দাও তোমার শাস্তর। পুণ্যি তুমিই কর না।"

এই অল্পক্ষণ আগে যে তুমুল ঝগড়া হইয়া গেল তাহার বিন্দুমাত্রও প্রকাশ নাই এই বাক্যালাপের মধ্যে।

ঝির অংশের ভাত দেওয়ার অসুবিধাও ছিল। সে নিজে হোটেলে আহার করে না। নিজের অংশের ভাত তরকারি আপন বাসস্থানে লইয়া যায়। তাহার বৃদ্ধা চলৎ-শক্তিহীনা মা এবং তাহার নিজের তিন বৎসরের শিশু-সন্তানের সঙ্গে ভাগ করিয়া খায়। শিশুটিকে বৃদ্ধা মায়ের কাছে রাখিয়া ঝি চাকুরিতে বাহির হয়। ভাত-তরকারি অবশ্য একটু বেশী করিয়াই লয়। ঠাকুরের সঙ্গে খাতির করিয়াই তাহার এ কাজ করা সম্ভব হয়। ঝিও এর বদলে ঠাকুরকে গিন্নীমার ঘর হইতে বেশী করিয়া পান চুরি করিয়া আনিয়া দেয়। ঝির এই শিশুটির জন্মদাতা এই হোটেলেই পূর্ব্বে আহার করিত। শিশুটির ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংবাদ পাওয়ার পর সে এই হোটেল পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র আহারের ব্যবস্থা করিয়াছে, নিজের বাসস্থানও পরিবর্ত্তন করিয়াছে। ঝির সঙ্গে এক দিন রাস্তায় দেখা হইয়াছিল, নানা ছলে নিজের ঠিকানার কথাটা এড়াইয়া ভরসা দিয়া কহিয়াছিল, "বাড়ী গিয়ে বড্ড অসুখে ভুগে এলাম, তা তোমার কোন চিন্তা নেই ঝি, এক দিন তোমার বাড়ী গিয়ে টাকা দিয়ে আসব'খন, এখন ত সঙ্গে কিছুই নেই। বড্ড জরুরি কাজে যাচ্ছি, এখন যাই, তুমি কিছু ভেব না।" এই কথা বলিতে বলিতে সে দ্রুত চলিয়া গেল।

বৃদ্ধা মাতা ও শিশুসন্তানের কথা মনে করিয়া ঝির অন্নদান করিয়া পুণ্যসঞ্চয়ের প্রবৃত্তি হইল না। পাচকঠাকুর নিজের থালার ভাত তরকারি মেয়েটিকে দিয়া বলিল, "আর এই হোটেলে আসবি ত তোকে ঠেঙিয়ে হাড় গুঁড়ো করে দেব। দূর হ এখান থেকে।"

দূর হইতে গিন্নীমা এই কাণ্ড দেখিয়া কহিল, "অ ঠাকুরমশাই, প্রায়ই ত তোমার খাবার তুমি ভিক্ষুককে দিয়ে দাও, এমন করে ক'দিন চলে? এ সব আর করো না। যাও চাট্টে চাল ফুটিয়ে নিয়ে খাওগে।"

পাচকঠাকুর গিন্নীমার উদারতা উপেক্ষা করিয়া গর্ব্বভরে কহিল, "আমার দরকার নেই, উপোসকে আমি ভয় করি নে। নেড়ীর সঙ্গে রাগ করে কত দিন উপোস করেছি! নেড়ীর সাজা কম হ'ত না—আমাকে ফেলে সে ত আর খেতে পারত না! এক দিন ত ঝগড়া করে আমার হাত কামড়ে দিলে, এই দেখ তার দাগ এখনও আছে।"

মৃতা স্ত্রীর কথা স্মরণ করিয়া পাচকঠাকুরের কথার খেই হারাইয়া গেল, ঝিকে সম্বোধন করিয়া অসংলগ্নভাবে কহিতে লাগিল, "ও থাকলে আমার আর কি চিন্তা ছিল? তা হলে কি আর এই বুড়ো বয়সে বাতের ব্যামো নিয়ে হোটেলে হাঁড়ি ঠেলি! পায়ের উপর পা দিয়ে আরাম করে বসে খেতাম।···ও আমায় কিছুতেই উপোস করতে দিত না। এক দিন চুলের মুঠি ধরে খুব মেরে ছিলুম···তার পর বুঝলে ঝি···"

ঝি—"এখন আর কিছু শুনব না, বেলা পড়ে গেছে, আমি চললাম।"—ঝি চলিয়া গেল।

পুরাতন স্মৃতি পাচকঠাকুরের হৃদয় উদ্বেলিত করিয়া তুলিল। তাহার মনের মধ্যে কি রকম মোচড় দিয়া উঠিতে লাগিল। সে তাড়াতাড়ি আর এক ছিলিম গাঁজা সাজিতে বসিয়া গেল এবং গুন গুন করিয়া ধরা গলায় গাহিতে লাগিল—তারা কোন্ অপরাধে এ দীর্ঘ মেয়াদে, সংসার গারদে থাকি বল্।

কল্যাণ ও রজত আহার শেষ করিয়া গিন্নীর নিকট গিয়া হোটেলের পাওনা মিটাইয়া দিল। গিন্নী পয়সা গুনিয়া বলিল, "এ কি! বেশী দিয়ে ফেললে যে!"

কল্যাণ—"ও তোমার কাছে থাক, রোজই ত এসে খাই, দেনা থাকার চেয়ে পাওনা থাকাই ভাল।"

ঘরের ভিতরটা দিনের বেলায়ও অন্ধকার। ভিতরে গলা

বাড়াইয়া উঁকি মারিয়া কল্যাণ জিজ্ঞাসা করিল, "মুখুজ্যে মশায় কেমন আছেন !"

গিন্নী দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল, "ভাল নয় বাবা, কাল রাত্তিরে বড্ড কষ্ট গেছে, এখন বোধ হয় একটু ঘুমুচ্ছে।"

কল্যাণ—"এখন আমরা যাই, বিশেষ কাজ আছে, রাত্তিরে আসব'খন।"

তাহারা বাহির হইয়া গেলে গিন্নী চেঁচাইয়া বলিল, "সেদিনের মত আবার না খেয়ে থেক না যেন।"

হোটেল হইতে বাহির হইয়া দুই বন্ধু দ্রুত গতিতে ডালহৌসী স্কোয়ারের দিকে রওনা হইল। উভয়ের বুকপকেটে আড়াই হাজার করিয়া পাঁচ হাজার টাকার নোট ছিল। ডাচ্ ব্যাঙ্কের মারফত বিদেশে সমিতির প্রেরিত সভের নিকট পাঠাইতে হইবে।

৫

সন্ধ্যার পর রজত বস্তিতে ফিরিয়া দেখিল পুরুষেরা অনেকেই সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করিয়া ঘরে ফিরিয়াছে। হাত মুখ ধুইয়া কেহ কেহ এক জায়গায় বসিয়া গল্পগুজব করিতেছে। একজন তার স্ত্রীর সঙ্গে বিষম কলহ সুরু করিয়াছে। স্ত্রীর ইচ্ছা স্বামীর উপার্জ্জিত পয়সা নিজের হাতে লয়, তাই সেই স্বামীর পকেটে হাত দিয়াছে অমনি স্বামীটি ক্ষেপিয়া গিয়া স্ত্রীকে গালি দিতে লাগিল—তবে রে শালী, আমি আনলাম সারাদিন রোদে রোদে ঘুরে একেবারে ভাজাপোড়া হয়ে, আর ও নেবে সেই পয়সা।

স্ত্রী—"তা নইলে এখুনি সব নেশা করে কি কি করে ফুঁকে দিলে, কাল পিণ্ডি গিলবে কোত্থেকে শুনি? ডাক্তার বলেছে বিছানায় পড়া ছেলেটাকে একটু দুধ দিতে: দুধ থাক, একটু সাবু কিনে যে দেব সেই পয়সা নেই।..."

স্বামী—"গিলব তোর মাথা...তবে হ্যাঃ, ফেরবার পথে ছেলেটার জন্য সাবু নিয়ে আসব।"

স্ত্রী তিক্ত কণ্ঠেই জবাব দিল, "তখন নেশায় বুঁদ হয়ে আসবে, সাবু যা আনবে তা আমার জানা আছে।"

একজন তার ঘরে কেরোসিনের ডিবা জ্বালাইয়া একখানা পুরোনো ছেঁড়া কৃত্তিবাসী রামায়ণ সুর করিয়া পড়িতে বসিল।

আর এক ঘরে এক ব্যক্তি এক খণ্ড বেত হাতে লইয়া বাতির ধারে ছেলেকে পড়াইতে বসিয়াছে। ছেলে পড়িবে কি, আড়চোখে বারে বারে বেতটাই কেবল দেখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই বাপ ছেলের পিঠে কয়েক ঘা বসাইয়া ধাক্কা মারিয়া উঠাইয়া দিয়া বলিতে লাগিল—যাঃ শালার ছেলের লেখাপড়া যদি কিছু হয়! যেমন গাছ তেমন ত ফল! ডুমুরগাছে কি আর আম ফলবে। আমার বাপ আমার পিঠে খড়ম ভেঙে, জলবিছুটি দিয়ে পিঠমোড়া করে বেঁধে রেখে, না খাইয়ে ঘরে বন্ধ করে রেখেও কিছু করতে পারে নি; আর আমি পারব এই শুয়োরের বাচ্চাকে মানুষ করতে! মরবি শালার ছেলে লোকের লাথিঝাঁটা খেয়ে! ভাগ্ হিয়াসে, আজ রাতে খানা নেহি মিলেগা।"

গৃহিণীকে ডাকিয়া কহিল, "ও হারামজাদার আজ খাওয়া বন্ধ।"

গৃহিণীর তখনও ঘরে ধূপ জ্বালিয়া এবং দীপ দেখাইয়া সন্ধ্যা দেওয়া শেষ হয় নাই। তাড়াতাড়িও কিছু ছিল না, ভাঁড়ার শূন্য সুতরাং রাঁধাবাড়ার কোন কাজও ছিল না। সে লক্ষ্মীর পটের সম্মুখে ছোট ঘটিতে জল ভরিয়া রাখিল ও প্রদীপ জ্বালাইয়া দিল। তার পর হাঁটু গাড়িয়া উপুড় হইয়া মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া স্বামী-পুত্রের দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছিল; বোধ করি, দারিদ্র্যদুঃখের কথাও দেবতার কাছে নিবেদন করিতেছিল। স্বামীর সব কথাই তার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। সে আস্তে আস্তে উঠিয়া উদাসভাবে কহিল, "হাঁ, আজ সকলেরই বন্ধ! ঘরে খাবার কি আছে শুনি? থাকবার মধ্যে আছে আমার রক্তমাংসশূন্য এই কখানা হাড়, তাই বাপবেটায় চিবিয়ে খেয়ো।"

অতি সত্য কথা শুনিয়াও কিন্তু কর্ত্তার রাগ হইল না, সে বলিল, "হাঃ, আমার খাবার ভাবনা, একটা রাত্তিরে কি যায় আসে! দেখিস কাল কত খাবার নিয়ে আসি। আজ সারা রাত্তির জেগে কাগজের ফুল, পুতুল তৈরি করব, কাল তাই না বিক্রী করে..."

স্ত্রী কিন্তু এতক্ষণে সত্যসত্যই চটিয়া গিয়াছে, স্বামীকে বাধা দিয়া কহিল, "সেই পয়সায় আমার ছেরাদ্দ হবে;...মর্ বেহায়া মিনসে, মর্, মর্..."

পিতামাতার কলহের এই সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিয়া ছেলেটি এক দৌড়ে পাড়ার অন্যান্য ছেলেদের কাছে গিয়া বসিল এবং অভিভাবকদের বিড়ি চুরি করার ফন্দি আঁটিতে লাগিল।

রজত কলতলায় যাইতেই "ও বাবুমশাই" বলিয়া ডাক শুনিতে পাইল। পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, যাহারা একত্র বসিয়া নিজেদের সুখদুঃখের কথা বলিতেছিল তাহারাই ডাকিতেছে। তাহাদের কাছে যাইতেই এক জন কহিল, "আচ্ছা বাবুমশাই, আমরা ত সব মুখ্যুমানুষ, আপনি বলুন ত...এই যে সব শুনছি স্বদেশী হাঙ্গামার কথা, এই যে নানা জায়গায় বোমা মারছে, গেল বছর ত বড়লাটের ঘাড়েই নাকি বোমা মেরেছিল, এই ত গেল হপ্তায় গোলদিঘীতে সাঁঝের বেলাতেই হাজার লোকের সামনে কোন এক পুলিসের কর্ত্তাকে গুলি করে মারলে...আমি ত ওখান দিয়েই যাচ্ছিলুম, পষ্ট দেখলুম যারা গুলি করে পালাচ্ছে তারা সব ভদ্রলোকের ছেলের মত, গুণ্ডা ত নয়। যাকে মারলে তার পকেটেও হাত দেয় নি, মনিব্যাগ ঘড়ি কিছুই নেয় নি। এসব কারা বাবু?"

রজত বলিল, "কি জানি কি করে বলব, থাকি ত নিজের কাজের ধান্দায়।"

এক জন বলিল, "আমি শুনেছি ওরা নাকি ইংরেজ তাড়িয়ে দেশ স্বাধীন করবে।"

ইহার পর কেহ বলিল স্বাধীন করিতে পারিবে, কেহ বলিল পারিবে না এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই নিজেদের ভিতর তুমুল তর্ক

বাধিয়া গেল। তর্কের মীমাংসা করিতে না পারিয়া তাহারা আবার রজতকেই মধ্যস্থ মানিল।

এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা বাবু, দেশ স্বাধীন হলে কি হবে? ইংরেজ কি একেবারে যাবে?"

রজত—"যাবে বৈ কি!"

এক জন রজতের কথা শেষ হইতে না হইতেই জিজ্ঞাসা করিল, "ইংরেজ যে যাবে তাদের কাছ থেকে সব পাস করিয়ে আনতে হবে না? তাদের কি কোন হুকুমই খাটবে না।"

রজত পুনরায় কহিল, "ইংরেজ যাবে বৈ কি, লড়াই করে স্বাধীনতা পেলে তাদের কোন হুকুমই আর খাটবে না।"

আর এক জন জোর দিয়া বলিল, "নিশ্চয়ই ইংরেজ যাবে। তখন এই বাবুরাই ত রাজা হবে। তখন আর এই সাদা চামড়ার ফুটুনি খাটবে না। ওই যে কথায় কথায় গ্যাড ম্যাড করে তেড়ে এসে লাথি মেরে গরীবের পিলে ফাটান তা আর চলবে না। দেখে নিও, হ্যাঁঃ।" বলিয়াই সে বুক ফুলাইয়া গর্ব্বিত দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিল।

আর এক জন জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা বাবু, আপনারা ত রাজা হবেন, আমাদের এই গরীবের দিকে চাইবেন ত?"

অন্য এক জন বলিল, "দেশ স্বাধীন হলে, আপনারা কর্ত্তা হলে আমরা একটু খেতে পরতে পাব ত? আর কিছু দরকার নেই··· এই দু'বেলা দু'মুঠো ভাত, একটু নুন আর···"

খাওয়া-পরার কথা উঠিতেই সকলে উৎসুক হইয়া একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিল, সকলেই প্রায় এক সঙ্গেই যেন কথা কহিতে চাহিল। উপরোক্ত ব্যক্তির কথা শেষ হওয়ার আগেই আর এক জন নিজের পরিহিত ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডের দিকে চাহিয়া বলিল, "আর এক সঙ্গে দুখানা আস্ত কাপড়।"

তাহার কথা শেষ না হইতেই অপর এক জন তাহার স্ত্রীর পরিহিত ছিন্ন মলিন বসনের কথা ভাবিয়া বিষণ্ণভাবে বলিল, "আজ্ঞে, আমরা বেটাছেলেদের কোমরে ছেঁড়া কাপড় জড়িয়ে রাখলেও এক রকম চলে, কিন্তু ইস্তিরীদের? তাদের জন্য দুখানা আস্ত কাপড় ত চাই-ই।"

এক ব্যক্তি যার ছেলেমেয়ের অসুখ-বিসুখ সর্ব্বদা লাগিয়াই আছে। সে বলিল, "আর ছেলেপেলের অসুখ হলে দু-দাগ অসুধ। আর কিছু চাই না।"

প্রথমে যে ব্যক্তি বলিয়াছিল যে বাবুরাই রাজা হবেন, সেই যেন বিজ্ঞভাবে সকলের কথা সংক্ষেপ করিয়া বলিল, "দেশ স্বাধীন হলে, বড় বড় বাবুদের হাতে সব কর্ত্তৃত্ব এসে গেলে আমাদের এই সব দুঃখ ঘুচবে···না বাবু? আমাদের যে কত দুঃখ বাবু, আর আমাদেরই বা কেন. এই যে আমাদের কল্যাণবাবু— আজ বড় দুঃখে পড়েই ত কারখানায় সারাদিন হাতুড়ি পিটছেন।"

কল্যাণ নিজেকে পুলিসের সন্দেহ হইতে রক্ষা করিবার জন্য, মেহনতী লোকের মধ্যে মিশিবার সুযোগ হিসাবে এবং সমিতির খরচ বাঁচাইয়া নিজের উপার্জ্জনে নিজের ভরণ-পোষণের নিমিত্ত একটা ছোট লোহার কারখানায় মিস্ত্রির কঠোর কাজ লইয়াছিল। সমিতির বিশেষ কাজ থাকিলে, কাজে অনুপস্থিত থাকিয়া পরদিন পীড়া কিংবা অন্য অছিলায় ছুটি মঞ্জুর করাইয়া লইত। দিনমজুরি হিসাবে কাজ করিত। অনুপস্থিত থাকিলে সেদিন আর উপার্জ্জন হইত না।

রজত সব কথা খুলিয়া বলিতে পারে না। তবুও কিছু বলিবার এই সুযোগ ছাড়িতে চাহিল না। সংক্ষেপে অতি সাবধানে উপস্থিত সকলকে বলিল, "তোমরা সবাই যোগ না দিলে শুধু বাবুরা কিছুই করতে পারবে না। বাবুরা আর ক'জন···সব ত তোমরাই; দেশ ত তোমাদেরই···। বাবুরা ত না হয় পরাধীন অবস্থায়ই ইংরেজের চাকুরি করে, তাদের লুটের সাহায্য করে—তাদের বুটের লাথি খেয়েও কোনমতে ভাত জোটাতে পারবে। কিন্তু দেশ স্বাধীন না হলে তোমাদের···?"

ইহার বেশী আর অগ্রসর হওয়া বোধ হয় নিরাপদ নয় মনে করিয়া রজত বলিল, "যাক গে এসব কথা।"

কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারেই যেন রজতের মুখ থেকে বাহির হইতে লাগিল, "বাবুরা আর ক'জন, তারা আর কি করতে পারে। ক'জনই-বা সব ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে···

এক জন বলিল, "কেন? বাবুদের বোমা আছে, পিস্তল আছে, বুদ্ধি আছে।"

রজত আজ ইহাদের কিছু বলিবেই, তবুও সাবধানে যতদূর সম্ভব বলা যায়—

"এই বোমা, পিস্তল তৈয়ার করবে কে? মাথায় বয়েই বা আনবে কে? রেল, মোটর, গাড়ী, নৌকা—এসব চালিয়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যাবে কে? আর এসব ছুঁড়বেই বা কে? বোমা, পিস্তল ছোঁড়বার জন্য হাজার হাজার লোক আসবেই বা কোত্থেকে? শুধু বুদ্ধিতেই ত আর হয় না? বুদ্ধি খাটাবে কে? জনকয়েক বাবু আর কি করতে পারে! নিজের ভাত কাপড়ই জোটাতে পারে না তোমরা মেহনত করে পয়দা না করলে। যাক্ এসব কথা, এখন উঠি।'

একজন বলিল, "তা ঠিক, বাবুরা এত মেহনত করতে পারবে কেন?"

আর একজন, "তা হলে ত বাবু এই যে খাওয়া-পরার কথা হচ্ছিল, এও তা হলে আমাদের মত মুখ্যুরাই পয়দা করে! ক্ষেতেও আমরাই চাষ করি আর কাপড়ও আমরাই বুনি—মোট বই, কল চালাই, আবার গরু দিয়ে হাল চালাই।"

আর একজন উৎসাহিত হইয়া বলিল,—"তা হলেও আমরা যখন পয়দা করি তখন আমরাই মালিক! তবে আমরা খেতে-পরতে পাই না কেন?"

এই প্রশ্ন শুনিয়া একজন মন্তব্য করিল, "তোমার যেমন বুদ্ধি! গরু গাড়ীতে করে মাল টানে, কাজেই মালের মালিক হ'ল গরু!

ধোপার গাধা কাপড়ের মোট বয়, তাই গাধাই হ'ল কাপড়ের মালিক! যত সব গাঁজাখুরি কথা!"

তখন রজত আর কথা না কহিয়া পারিল না, "না, তোমরা মানুষ, তোমরা গরুও নও, গাধাও নও। তোমাদের শক্তি আছে, বুদ্ধিও আছে, কিন্তু তা যে আছে তা তোমরা জান না—তোমরাই যে মেহনত করে সব পয়দা কর—তোমরাই যে আসল মালিক, তা তোমরা জান না, তাই তোমরা মালিক হয়েও খেতে-পরতে পাও না।"

কথা জমিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিল না। কাছাকাছি কোথাও গুলির আওয়াজ শোনা গেল এবং একটু পরেই একটা লোক বস্তিতে দৌড়াইয়া ঢুকিল। বস্তির লোক কিন্তু মোটেই আশ্চর্য্য হইল না। যে যার নিজের কাজেই ব্যস্ত রহিল। নানা রকমের লোক—চোর, গুণ্ডা, বদমায়েস বস্তিতে থাকে-এমনি করিয়াই তারা অনুসরণকারীদের এড়াইয়া আসে। লোকটা কাছে আসিতেই রজত ছুটিয়া গিয়া তাহাকে লইয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। সেখানে থাকাও নিরাপদ নয় মনে করিয়া তাহাকে লইয়া ঐ আড্ডায় আসিয়া বসিয়া পড়িল। এবার কিন্তু সকলের চোখে-মুখে কৌতূহল ফুটিয়া উঠিল, দুই একজন নবাগতের আগমনে অস্বস্তি বোধ করিয়া নিজের ঘরে উঠিয়া গেল। তাহা বুঝিয়া রজতই কথা কহিল, "আসল লোককে না পেয়ে পুলিস এই নির্দ্দোষ পথিককেই ধরবার জন্ম তাড়া করেছে। একে কোথায় লুকিয়ে রাখি বল ত ভাই।"

উপস্থিত অনেকেই নিজের মনোমত পরামর্শ দিতে লাগিল। এক জন বলিল, "আমি ত গুলি খাই, চলুন গুলির আড্ডায় যাই। ওখানে স্বদেশী-ধরা পুলিস আসবে না।"

তাহারা গুলির আড্ডায় গিয়া নেশাখোরদের সঙ্গে পড়িয়া রহিল।

অনুসরণকারী পুলিস আসিয়া বস্তির লোকদের জিজ্ঞাসা করিল কেহ এদিকে আসিয়াছে কিনা। যাহারা বসিয়া গল্প করিতেছিল তাহারা বলিল, "না পুলিস বাবু আমরা ত দেখি নাই। তবে কে যেন ঐ দিক দিয়ে দৌড়ে রাস্তার দিকে গেল।"

রাস্তায় ঢুকিবার পথেই ছিল গুলিখোরের ঘরটা। পুলিস সেখানে ঢুকিয়া নেশায় আচ্ছন্ন সকলকেই লাথি মারিয়া বা লাঠির গুঁতা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেহই কিছু বলিতে পারিল না।

৬

সেদিন রাত্রিতে কল্যাণ ও রজত গিন্নীর হোটেলে আহার করিতে যাওয়া মাত্রই গিন্নি ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল, "কল্যাণ, তোমরা শিগগীর করে খেয়ে নাও—তারপর একটু এদিকে এস, মুখুজ্যের অবস্থাটা আজ জানি কেমন মনে হচ্ছে—ব্যারামটা বেড়েছে বলে বোধ হচ্ছে।"

কল্যাণ কহিল, "আগে মুখুজ্যে মশাইকে একবার দেখেই যাই, পরে খাব'খন।"

গিন্নী বাধা দিয়া কহিল, "না না, আগে খেয়ে এস।"

তাহারা খাইতে বসিল। মুখুজ্যের ঘর হইতে ঘন ঘন কাসির শব্দ আসিতে লাগিল। খাওয়া প্রায় অর্দ্ধেক শেষ হইয়াছে, এমন সময় গিন্নী আসিয়া ম্লান মুখে দরজার ধারে দাঁড়াইল। তাহাদের আহার শেষ হইতে দেরি দেখিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। একটু পরেই কিন্তু গিন্নী পুনরায় ফিরিয়া আসিল। তাহাকে দেখিয়া কল্যাণ বলিল, "গিন্নীমা, আমরা এখখুনি আসছি, তুমি যাও, মুখুজ্যের কাছে বস গিয়ে।"

গিন্নী—"না না, তোমাদের তাড়াতাড়ি করবার দরকার নেই। খাওয়া শেষ করেই এস।"

কল্যাণ ও রজত তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করিয়া মুখুজ্যের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। মুখুজ্যের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন, ঘন ঘন গলা দিয়া রক্ত উঠিতেছিল—ঘন ঘন কাসি হইতেছে, মুখুজ্যে একটা নড়বড়ে তক্তপোষের উপর ছিন্ন মলিন শয্যায় শায়িত। মেঝের উপরই থুথু ও রক্ত ফেলিতেছেন। গিন্নীর আঁচলেও খানিকটা রক্ত। গিন্নী মাঝে মাঝে তাহার আঁচল দিয়াই মুখুজ্যের মুখ মুছিয়া দিতেছিল।

ঘরে একটি মাত্র ক্ষুদ্র জানালা—তাহাও ভাল করিয়া বন্ধ করা আছে, বাতাস লাগিয়া পাছে ব্যারাম বৃদ্ধি পায় এই আশঙ্কায়। যক্ষ্মা রোগীর থুথুতে সমস্ত ঘরের আবহাওয়া থম থম করিতেছিল। ঘরের নানা জায়গায় থুথু আঠার মত লাগিয়া ছিল।

কিছুক্ষণ স্থির থাকার পর মুখুজ্যের কাসি ও রক্তবমি পুনরায় সুরু হইল। বুকেও অত্যন্ত বেদনাবোধ হইতে লাগিল। কল্যাণ রোগীর পার্শ্বে তক্তপোষের উপর বসিয়া মুখুজ্যের বুকে হাত বুলাইতে লাগিল। জীর্ণ তক্তপোষ মড় মড় করিয়া উঠিল।

বৃদ্ধ মুখুজ্যের কণ্ঠ ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, তিনি অস্ফুট স্বরে কি বলিতে চাহিলেন। কল্যাণ তাঁহাকে বাধা দিয়া কহিল, "মুখুজ্যে মশাই এখন কথা বলবেন না, একটু জিরিয়ে নিন্।"

মুখুজ্যে ইসারা করিয়া গিন্নীকে নিকটে ডাকিল, অতি কষ্টে ক্ষীণ কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "বাধা দিও না, আর একটু পরে কথা বলার শক্তি যা আছে তাও ফুরিয়ে যাবে। কল্যাণ, বুড়ীকে দেখো, ও বড় দুঃখী। সারাটা জীবন দুঃখই পেয়েছে, আর এই দুঃখের কারণও আমিই—নইলে ওর কিসের অভাব ছিল। ধনী সম্মানী বংশের মেয়ে, শ্বশুরকুল ত একরকম জমিদারই ছিল। আমিই ত···কলঙ্কের বোঝা ওর মাথায় চাপিয়ে ওকে পথের ভিখারী করেছি।"

মুখুজ্যে ক্লান্ত হইয়া পড়িল। বৃদ্ধা গিন্নীর দুই চোখ দিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। অশ্রুজড়িত আকুল কণ্ঠে গিন্নী বলিতে লাগিল, "ওগো অমন করে বলো না, তুমি ত কোন অপরাধ করো নি, আমিই যে নিজের ধর্ম্মরক্ষার জন্ম নিজের

ইচ্ছায়ই কলঙ্কের ডালি মাথায় তুলে নিয়েছি।" গিন্নী সাড়ীর আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে লাগিল।

মুখুজ্যে পুনরায় বলিতে লাগিল, "হ্যাঁ...একথা ঠিক... ভগবানের বিধান ত আমরা একটুও ভাঙি নি, মানুষের তৈরি বিধি অমান্য করেই ত সারাটা জীবন আমরা মানুষের হাতে লাঞ্ছনা অপমান সয়ে এলাম।"

কথা শেষ করিতে করিতেই মুখুজ্যের ভীষণ কাসি আরম্ভ হইল। গলা দিয়া ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠিতে লাগিল। ঘণ্টাদুয়ের মধ্যে মুখুজ্যে মশায়ের মৃত্যু হইল। কল্যাণ ও রজতই সংকারের ব্যবস্থা করিল। শবদাহ শেষ করিয়া গঙ্গার ঘাট হইতে ফিরিবার পথে রজত জিজ্ঞাসা করিল—'মুখুজ্যের সঙ্গে গিন্নির সম্পর্কটা কিন্তু ঠিক বুঝতে পারি নি।'

কল্যাণ সবই জানিত, বলিতে লাগিল, "এদের জীবন বড়ই বিচিত্র—নাটক-নভেলেই এমনি ঘটে; কিন্তু এদের জীবনে তাই সত্যি হয়ে উঠেছে। গিন্নীর যখন নয় কি দশ বৎসর বয়স তখন ওর সঙ্গে বিয়ে হয় এক জমিদারপুত্রের—তিনি ছিলেন পুরোমাত্রায় মাতাল আর লম্পট। যদ্দিন গিন্নী ছিল বালিকা আর কিশোরী তদ্দিন তার মনে স্বামী নিয়ে প্রশ্ন জাগে নি; যৌবনোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু তার মন এই মাতালের প্রতি বিরূপ হ'ল—পারল না আর তাকে স্বামী বলে গ্রহণ করতে—এক রাত্রির জন্যেও সে স্বামীর ঘরে যেতে রাজী হয় নি। অবশ্য স্বামী-দেবতার তাতে কোন অসুবিধে ছিল না—কেননা রাত্তিরে প্রায়ই সে ঘরে থাকত না। মুখুজ্যে ছিল তার স্বামীর জমিদারীরই এক গোমস্তার ছেলে। ক্রমে এই মুখুজ্যে ও গিন্নী পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। এই আকর্ষণই হয় গভীর প্রেমে পরিণত। তারপর এক দিন এরা উভয়ে গৃহত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হয়। শুনে হয়ত অবাক্ হয়ে যাবি যে উভয়ে উভয়কে ভালবাসত। কিন্তু গৃহত্যাগ করার আগে অবৈধ দৈহিক সম্পর্ক এদের মধ্যে একেবারেই ঘটে নি। এরা গৃহত্যাগ করে সোজা এসে উপস্থিত হ'ল কলকাতায়। দু'জনে কালীঘাটে গঙ্গাস্নান করে মা কালীর সামনে দুটি মালা নিয়ে বসে প্রার্থনা করলে—'মা, কোন পুরুতঠাকুর ত আমাদের বিয়ে দেবে না, কোন সমাজও আমাদের নেবে না—মা, তোমারই সামনে আজ আমাদের বিয়ে হ'ল, আশীর্ব্বাদ করো মা, আজ থেকে জীবনের সমস্ত লাঞ্ছনা ও নির্যাতন আমরা দু'জনে যেন মাথা উঁচু রেখে হাসিমুখে সইতে পারি।' এই প্রার্থনা জানিয়ে উভয়ে মালা বদল করল—গিন্নী নিজের কপালে সিঁদুর পরে নিলে। তারপর আজ পর্য্যন্ত তারা স্বামী-স্ত্রীরূপেই বাস করে এসেছে।"

৭

বাসায় ফিরিতে কল্যাণ ও রজতের ভোর হইয়া গেল। ঘরে ঢুকিবার উপায় ছিল না, একজন লোক মাতাল বেহুঁস হইয়া দরজা আটকাইয়া পড়িয়া ছিল।

"আরে এ যে আমাদের বস্তির নিতাই ধোবা। চল ওকে ওর ঘরে রেখে আসি।" তাহারা দুই জনে নিতাইকে ধরাধরি করিয়া উঠাইল। নিতাই সুরাজড়িত কণ্ঠে কেবলই বলিতে লাগিল, "কোন শালাশালীর ধার আমি ধারি নে, আমি নিজের পয়সায় নেশা খাই।" এই নেশা খাওয়া লইয়া বোধ হয় স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া হইয়া থাকিবে তাই গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল, "যাও, আমি ঘরে যাব না, ও শালীর মুখ যদি আর দেখি, তবে আমি বাপের কুপুত্তুর।"

কিছু দূরে এই বস্তিরই চার-পাঁচটি ছেলে—বছর সাত-আটেকের—নিতাইয়ের দিকে আঙুল দেখাইয়া কি বলাবলি করিতেছিল—ইহাদের মধ্যে নিতাইয়ের ছেলেও ছিল। হঠাৎ কি হইল বলা যায় না,—কথাবলাবলি আর কৌতুক মগ্ন ঝগড়ায় পরিণত হইল। প্রথমে গালাগালি, পরে হাতাহাতি ও অশ্রাব্য গালিগালাজ—পরস্পরের মা ও ভগ্নীকে লক্ষ্য ও উল্লেখ করিয়া। সঙ্গে সঙ্গে নানা-প্রকার অঙ্গভঙ্গীও করিতে লাগিল।

রজত ও কল্যাণ কোন মতে নিতাইকে তাহার ঘরে রাখিয়া ফিরিবার পথে দেখিল বস্তিরই দু'জন অভিভাবকগোছের লোক কলহে লিপ্ত ছেলেদের ধরিয়া ভীষণ ভাবে প্রহার করিতেছে আর কুৎসিত ভাষায় গালাগালি করিতেছে।

কল্যাণ ছুটিয়া আসিয়া অভিভাবকদের থামাইয়া বলিল, "এ কি ভাই, ছোট ছেলেদের কি এমনি করে মারতে আছে? ওদের কি দোষ ভাই, ওরা ত আজন্ম এই রকমই দেখছে, শুনছে! বড়রা যদি খারাপ কথা বলে আর খারাপ কাজ করে, তা হলে ছোটরাও ত তাই করবে।"

কল্যাণের কথা একান্তই ছেলেমানুষি মনে করিয়া প্রথম ব্যক্তি বলিল, "হুঃ, কি যে বলেন তার ঠিক নেই; আমরা বড়রা যা করব ছোটরাও কি তাই করবে! যে বয়সের যা—বলেও ত একটা কথা আছে বাবু? এ কেমনধারা বিবেচনা আপনাদের? আমরা নেশা করব বলে ওরাও কি তাই করবে নাকি? আমরা মুখ খিস্তি করি বলে কি ওদেরও তাই করতে দেব নাকি? কি যে বলেন? তা কি কখনও হতে পারে?. বড়রা তা হলে আছি কি করতে? ওদের ত আর এমনি করে বয়ে যেতে দিতে পারি না? মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব না!"

দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহার কথায় সায় দিবার জন্য বলিল—"তা যা বলেছ ভায়া। শুনবে তাজ্জব কথা, এই সেদিন কিছু দিশী মদ এনে রেখেছি, আর এই ব্যাটার ছেলে হারামজাদা শুয়ারকা বাচ্চা তারই খানিক এক চুমুকে দিলে মেরে! শালার ব্যাটা ত শেষে বমি করে যায় আর কি! ওর গর্ভধারিণীও ভাবলে সত্যিই বুঝি ওর ছেলে মরে গেল! আর অমনি জুড়ে দিলে মড়াকান্না। আমি সইতে পারলুম না। মা বেটা দুটোকেই দিলাম ঠেঙানি। হুঁঃ, ছেলেপিলেকে কড়া শাসনে না রাখলে বয়ে ত যাবেই।"

কল্যাণ কহিল, "না ভাই শুধু কড়া শাসন করলেই ভাল হয় না,

কোন সংশোধনই হয় না! চোখের সামনে ছেলেরা যা দেখে সেটাই হ'ল আসল শিক্ষা। এমনি করে দেখে যা শিক্ষা পাবে তা ত ওদের মন থেকে মুছে ফেলতে পারবে না—মেরে হাড় গুঁড়ো করে দিলেও নয়।

কল্যাণের যুক্তি মনে রেখাপাত করিলেও চির দিনের অভ্যাস এক দিনে উড়াইয়া দিতে বলিলে তাহা কে বিশ্বাস করিতে পারে বা অন্তর দিয়া গ্রহণ করিতে পারে। তাই প্রথম ব্যক্তি ব্যঙ্গ করিয়া কহিল, "তবেই হয়েছে! আমরা সব নেশা করব না, ভদ্দর-লোকের মত খারাপ কথা মুখে আনব না, তার পর (অঙ্গভঙ্গী করিয়া) সবই দেব ছেড়ে! আর তাই দেখে আমাদের ছেলেরা হবে ভাল! মরে আবার জন্ম নিতে হবে দেখছি! কি বল হে ভায়া?"—কথা শেষ করিয়া কনুই দিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ঠেলা দিয়া উভয়েই হাসিয়া উঠিল।

হাসি থামিলে দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল, "বাবু মশায়, যারা খেতে পায় না, পরতে পায় না, কুকুর বেড়ালের মতই যাদের দিন কাটছে—তাদের আবার ভাল কথা, তাদের আবার ভাল চলা! এ যে গরীবের বিলাসিতা, আর বড়লোকীর নকল বাবু। এ সব বাবুয়ানা কি আমাদের মানায় বাবু? পেটের চিন্তায় যাদের চক্ষু হয়ে থাকে চড়কগাছ, তাদের কি আর বড়লোকের মত ছেলেদেরকে ভাল কথা আর ভাল চলন শেখাবার সাধ্য আছে?"

তাহার কথার রেশ টানিয়া প্রথম ব্যক্তি কহিল, "আমরা নেশা করি কি সাধে! তবুও ত দু'দণ্ড ভুলে থাকতে পারি। নইলে যে পাগল হয়ে যেতাম বাবু। আপনিই ক'দিন পারেন দেখুন না। আজ অভাবে পড়েই না ভদ্দরলোকের সঙ্গ ছেড়ে আমাদের সঙ্গী হয়েছেন। ক'দিন আর কথাবার্তা চলন-বলন বজায় রাখতে পারেন, দেখুন একবার। বেশী দিন নয়—আমি বুকে টোকা মেরেই বলতে পারি! শরীর থেকে বাবুয়ানা প্রায় খসে গেছেই, এখন মন থেকে মুছে যেতে যে ক'দিন! তার পর আমাদের মতই তাড়ির ভাঁড় নিয়ে বসে যাবেন আর কি!"

দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় কহিতে লাগিল, "তবুও যে ছেলেদের আমরা মানা করি, শাসন করি, তা শুধু ওদের ওপর মায়ায় পড়ে বাবু। জানি, ওরাও এক দিন পা বাড়াবে এ পথেই, তবুও চোখের সামনে দেখলে বারণ না করে পারি নে। মিথ্যে আশায় বুক ভরে ওঠে, ওদের জীবন হয় ত এমনি কাটবে না—ওদের কেন নষ্ট হতে দিই।"

তাদের এই অজ্ঞতায় কল্যাণের চোখে বেদনার ছায়া নামিয়া আসিল; কিন্তু এই জন্তে ত আর এদের দোষী করতে পারে না। তাই বুঝাইয়া দিবার চেষ্টায় বলিতে লাগিল, "কিন্তু ভাই, ভাল হয়ে থাকা ত বড়মানুষদের—ভদ্রলোকদের একচেটে নয়? তাদের গলদের কথা ত আর তোমরা জান না। তারাও নেশা করে, তাদের মধ্যেও আছে দুষ্ট লোক। লেখাপড়া জেনেও যারা এমনি অধঃপাতের পথে যায়, তারা যে তোমাদের চেয়েও খারাপ। তোমাদের সরলতাটুকু তাদের থাকে না, তাই তারা চলে যায় সংশোধনের বাইরে। তোমরা না বুঝে কর, ওরা যে সব জেনে বুঝেও করে। তাই তোমাদের আশা আছে, তাদের আশা কম। তোমরা কুপথে যাও অভাবে, অনটনে, তোমাদের কিছুই নেই বলে। ওরা যায় স্বভাবে, অনেক আছে বলে, পরিশ্রম না করেই অনেক পায় বলে।"

বড়লোকের কুকীর্ত্তি-কাহিনী ভাল লাগিলেও চিরদিনের সংস্কার-বশে তাহা সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করিতে মনে দ্বিধা জাগে, তাই দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল, "তা বাবু যাই বলেন না কেন, আমাদের মত হতভাগা বাপের হতচ্ছাড়া ছেলেরা নীচেই নেমে যাবে। উঠতে আর পারবে না। আমরা তবু হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে দু'মুঠো ভাত যোগাড় করি, কিন্তু এই হতভাগারা তাও পারবে না বাবু। কাজই জুটবে না, তা কাজ করে পয়সা রোজগার ত দূরের কথা। এরা কাজ না পেয়ে বেকার বসে থেকে শেষে হবে চোর, পকেটমার, না হয় গুণ্ডা। দুঃখে দুঃখেই এদের জীবন যাবে।"

কল্যাণ বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "না ভাই, অদৃষ্ট মেনে বসে থাকলে ত চলবে না, মানুষ ত আর এই অবস্থায় বেঁচে থাকতে জন্মায় নি? তোমাদের সবাইকে এর বিপক্ষে দাঁড়াতে হবে, বিদ্রোহ করতে হবে অন্নাভাবে দিন কাটাবার বিরুদ্ধে। আর এই জন্তেই তোমাদের ভাল হয়ে উঠতে হবে। নইলে ছেলেপিলের দুঃখদুর্দ্দশা দূর করবে কি করে। তখন দেখবে তোমাদের এই হতচ্ছাড়া ছেলেদেরই অনেকে মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠবে, মানুষের দুঃখমোচনের পথ নিজেদের জীবন দিয়েই এরা দেখিয়ে যাবে।"

ভবিষ্যতের স্বপ্নে কল্যাণের চক্ষু জ্বল জ্বল করিয়া উঠিল। উত্তেজনায় রজতের দিকে ফিরিয়া কহিতে লাগিল, "জানিস রজত, এই হতভাগ্য ছেলের দল বঞ্চিত-সর্ব্বহারার দুঃখময় জীবনের পাঠশালায় শিক্ষা পাচ্ছে দুঃখজয়ের প্রথম বর্ণমালা। তাই আমার বিশ্বাস—মানুষের দুঃখজয়ের মন্ত্র এক দিন এদের প্রাণেই উঠবে বেজে, আর এদের কণ্ঠেই ধ্বনিত হবে এই পরম জয়ের বাণী।"

কল্যাণ মুহূর্ত্তের জন্ম আত্মহারা হইয়া গেল। ছেলেদের একে একে কোলে টানিয়া আদর করিতে করিতে বলিতে লাগিল, "কিরে, পারবি নে তোরা মানুষের মত মানুষ হতে, খারাপ কথা না বলে, খারাপ কাজ না করে। পারবি নে তোরা ভাল হতে?"

ছেলেরা কিছু না বুঝিয়াই বলিয়া উঠিল, "পারব বাবু মশাই, পারব। আমরা সব পারব। আর ভাল হতে তাও আমরা পারব। কিন্তু ঐ যে বললেন খারাপ কথা আর খারাপ কাজ, সে আবার কি বাবু মশাই? আর ভাল হওয়াটাই বা কি বাবু?"

এই তথাকথিত অনুন্নত অশিক্ষিত শ্রেণীর ছোট ছেলেদের বুঝাইবার মত ভাষা হঠাৎ ভাবিয়া না পাইয়া কল্যাণ একটু বিব্রত বোধ করিল। ভাল হওয়ার পরিমাপ বোঝানো যায় তাহাকেই যাহার মন্দ জ্ঞান আছে, কিন্তু তাহারা ভালমন্দের কোন কিছুই জানে না—

বিশেষ করিয়া এই নিরক্ষর ছোট ছেলের দল—তাহাদের কি করিয়া বুঝাইবে, সেই ভাষা হঠাৎ খুঁজিয়া পাইল না। হাতে তখন সময়ও খুব কম, অন্ত কাজ আছে। কিন্তু কিছু না বলাও যুক্তিসঙ্গত নয়। আর এক দিনেই এক কথায় সব বুঝানো সম্ভবও নয়। কল্যাণ বলিল, "বিকেলের দিকে তোদের অনেক আশ্চর্য গল্প শোনাব, তখন সব বুঝতে পারবি।"

ছাড়া পাইয়া ছেলের দল হৈ চৈ করিয়া চলিয়া গেল। তাহাদেরই পথের দিকে চাহিয়া রজত নিজেদের ঘরের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিতে লাগিল, "আচ্ছা কল্যাণ, এ এলাকায় ছোটদের জন্ম অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়, আর বড়দের জন্ম নৈশ বিদ্যালয় খুলে দিলে কেমন হয়?"

কল্যাণ হাসিয়া বলিল, "তা হলেই আমাদেরকে এখান থেকে পালাতে হবে রজত। যে-কোনও ভাল কাজই যে ব্রিটিশের গোয়েন্দা পুলিস সন্দেহের চোখে দেখে। তারা সন্দেহ করে—বিপ্লবী ছাড়া এ কাজ আর কে করবে। আমরা যারা এই কলকাতা শহরে যাপন করছি পলাতক জীবন, তাদের জন্ম এ কাজ নয় ভাই। দু'দিনেই সুরু হবে গোয়েন্দার আনাগোনা। বর্দ্ধমান-দামোদর-বন্যার কথা এর মধ্যে ভুলে গেলি? এ ত সেদিনের কথা রজত? সেখানে সেবাকার্যে যোগদান করে অনেকেই পুলিসের সন্দেহভাজন হয়েছে। এই কলকাতাতেই ক'জনকে গোয়েন্দা পুলিসের আপিসে ধরে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে—তারা দামোদর-বন্যায় সেবাকার্যে যোগদান করেছিল কিনা?

৮

রজত ও কল্যাণ নিজেদের ঘরের দরজার কাছে আসিতেই দেখিল—বাড়ীওয়ালীর সঙ্গে তাহার মেয়ের বিষম ঝগড়া বাধিয়াছে। তাহাদের উপস্থিতির জন্ম বাড়ীওয়ালী যেন অপেক্ষা করিয়াই ছিল! দেখিবামাত্র কল্যাণকেই মধ্যস্থ মানিয়া চাপা কণ্ঠে কহিতে লাগিল, "দেখ ত বাছা, তোমাদের ত জ্ঞান-বুদ্ধি আছে, সব ত বোঝ, জামাই এসে বসে আছে, আর পোড়ারমুখী জামাইয়ের বাড়ী যাবে না! আমি জামাইকে বলেছি ওকে বেঁধে ছেঁদে জোর করে নিয়ে যেতে।"

"আমায় সেখানে পাঠালে আমি হয় বিষ খাব, না হয় গলায় দড়ি দেব"—ঘর হইতে বলিল মেয়ে।

এই দুই উল্টা স্রোতের সমন্বয় কি করিয়া করিবে এবং কি-ই বা বলিবে কল্যাণ তাহা ভাবিয়া না পাইয়া নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াইল; কিন্তু কল্যাণের গতি থামিয়া গেল মঞ্জরীর আবির্ভাবে। দুয়ারে দাঁড়াইয়া কল্যাণের মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া মঞ্জরী শান্তভাবে বলিল, "আপনারা যাই হোন, সব কথা বোঝবার ক্ষমতা আপনাদের নেই, যা বোঝেন না তাতে কথা বলতে আসবেন না, নিজের কাজে যান।" কথাগুলি শ্রুতিকটু হইলেও উত্তেজনার লেশমাত্র ছিল না।

"দেখলে ত বাছা মেয়ের ব্যাভারটা। পোড়ারমুখী ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতেও জানে না।" ঝঙ্কার দিয়া কহিল বাড়ীওয়ালী।

কল্যাণ শান্তভাবে কহিল, "সত্যিই ত মা, আমরা এতে কি বলতে পারি বলুন! মেয়ে ত আপনার নির্বোধ নয়, বুদ্ধি-বিবেচনাও আছে। ন্যায়-অন্যায় বোধও আছে। সময়মত ভাল কাজ করার ক্ষমতাও আছে। ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওকে দিয়ে কেউ কিছু করাতে পারবে না, করানো ঠিকও নয়।"

"তা যা বলেছ, সবতাতেই হতভাগীর একেবারে ধনুকভাঙ্গা পণ! কিন্তু এখন করি কি?" ছোট্ট করিয়া সমস্যাটিকেই পুনরাবৃত্তি করিল বাড়ীওয়ালী।

মঞ্জরীর মুখে এতক্ষণে ফুটিয়া উঠিয়াছে তৃপ্তি ও আনন্দের আভা। এই মধ্যস্থতার মধ্যে আর থাকা অর্থহীন মনে করিয়া রজত ও কল্যাণ ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। রজত বিছানায় গা এলাইয়া দিল। গলির উল্টা দিকের বাড়ীর দোতলা হইতে নারী-কণ্ঠের সুললিত সঙ্গীত ভাসিয়া আসিতেছিল। রজত চোখ বুঁজিয়া গানটিকে ভাল করিয়া শুনিবার চেষ্টা করিতেছিল। কল্যাণকে কহিল, "দেখ কল্যাণ, পাড়াপড়শীর প্রাণে একটু দয়া থাকেই, দেখ দেখি, আমাদের জন্যে কেমন মধুর কণ্ঠে গান গাইছে।"

"কি যে বলিস তার ঠিক নেই" কল্যাণ কহিল।

গান হঠাৎ থামিয়া যাওয়াতে রজত চাহিয়া দেখিল, যে যুবতী অগানযোগে গাহিতেছিল তাহারই কাঁধে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে এক যুবক—বোধ হয় তাহার স্বামী। রজত তাড়াতাড়ি চোখ ফিরাইয়া লইল। কহিল, "কি হে, রাতে ত আর ঘুম হ'ল না, এদিকে ক্ষিদের যে পেট জ্বলে যাচ্ছে, কিছু খাওয়াবে-টাওয়াবে না?"

কল্যাণ কহিল, "উঠে দেখ, ঐ কোণে একটি পুঁটলিতে চারটে শুকনো চিঁড়ে আছে, খেতে পারিস কিনা একবার চেষ্টা করে দেখ।"

রজত পুঁটলিটা খুলিয়া বলিল, "এ দাঁতে কাটবে না, শেষে আবার ডেন্টিষ্টের কাছে যেতে হবে।"

কল্যাণ, "শুকনো না খেতে পারিস ত ঐ মগটার জলে ভিজিয়ে নে।"

এই চিঁড়াপর্ব্ব কতদূর গড়াইত বলা যায় না। বাধা পাইল এক যুবকের প্রবেশে। যুবকটি কল্যাণের হাতে একখানি পত্র দিল। পত্র পড়িয়া কল্যাণ রজতকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "নে, তৈরি হয়ে নে, এখখুনি বেরুতে হবে। অনেক অস্ত্রশস্ত্র ও বোমা তৈরির মালমশলা এসেছে—এগুলো সামলাতে হবে, আর যারা এগুলো নিয়ে এসেছে তাদেরও খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করতে হবে।"

রজত হাসিয়া কহিল, "তবেই হ'ল, এই সাধের চিঁড়ে খাওয়া আর অদৃষ্টে নেই।"

"চল্, রাস্তায় মুড়ি কিনে খাব'খন।" কল্যাণ বলিল।

তাহারা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল। রাস্তায় মুড়ি কিনিয়া পকেটে পুরিয়া লইল। চিবাইতে চিবাইতে অগ্রসর হইল গন্তব্য স্থানের দিকে।

দশ বার দিনের জন্ম রজত অন্যত্র গিয়াছিল। ছোটনাগপুরের

এমন পাহাড় ও জঙ্গলে এই কয়দিন কাটাইয়া আসিয়াছে যেখানে কোন সংবাদপত্র যায় না। কাছাকাছি কোন রেলষ্টেশন নাই। যাতায়াতের আধুনিক সুব্যবস্থা নাই। ডাকঘর নাই পাঁচ-সাত মাইলের মধ্যে। রজতের নামে কোন চিঠিপত্র আসিবে না—এই ব্যবস্থাই ছিল। বহু দূরে এক কয়লার খনিতে সমিতির সভ্য ছিল, রজত কোন অঞ্চলে ছিল তাহা ঐ সভ্যের জানা ছিল। বিশেষ প্রয়োজনে এই সভ্যই রজতের খোঁজখবর লইবে এইরূপ ব্যবস্থা ছিল।

ফিরিয়া হাওড়া ষ্টেশনে ট্রেন হইতে নামিতেই রজতের মনে হইল কোথায় গিয়া উঠা নিরাপদ হইবে তাহা স্থির করিয়া অগ্রসর হওয়া উচিত। এই কয়েক দিনের মধ্যে শহরে নিজেদের অবস্থা কি হইয়াছে কিছুই তাহার জানা নাই। সমস্ত আবহাওয়া ছিল নানাপ্রকার সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। সমিতির কার্য্য যেমন দ্রুত-গতিতে অগ্রসর হইতেছিল, তেমনি পুলিসের দৃষ্টিও ছিল জাগ্রত। কাজেই কোথায় পুলিস ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে তাহা না জানিয়া কাহারও বাসায় কিংবা নিজেদেরই কোন আড্ডায় হঠাৎ গিয়া উঠা নিরাপদ নয় মনে করিয়া রজত একখানা খবরের কাগজ কিনিল বিশেষ কোন ধরপাকড়ের ও খানাতল্লাসীর সংবাদ আছে কিনা তাহা দেখিবার জন্য।

কাগজ খুলিয়াই দেখিল, 'বোমার কারখানা, বহুলোক গ্রেপ্তার, নানাস্থানে খানাতল্লাসী'—কিন্তু কোন কোন বাড়ী খানাতল্লাসী হইয়াছে, কে কে ধরা পড়িয়াছে তাহার কিছুই খবরের কাগজে ছাপায় নাই।

মনে নানা সন্দেহ রাখিয়াও রজত আশ্রয়ের সন্ধানে অন্ততঃ খোঁজখবর মিলিবে এই আশা করিয়া গিয়া উঠিল তাহারই পরিচিত এক পুরাতন মেসে। সেখানে যে ঘরে তাহার এক সহকর্মী বন্ধু থাকিত, সে ঘরে তাহাকে না পাইয়া ঐ ঘরের অপর এক জন বোর্ডারকে তাহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিল। প্রত্যুত্তরে সেই বোর্ডার হাতকড়ি পরিলে যেমন হয় তেমনভাবে দুই হাত একত্র করিয়া দেখাইয়া চোখের ইঙ্গিত করিল। রজত আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

সেখান হইতে বাহির হইয়া অন্য এক পরিচিত বাড়ীর কাছা-কাছি আসিতেই দেখিতে পাইল যে বাড়ী খানাতল্লাসী হইতেছে। সাধারণ পোশাক পরিহিত গোয়েন্দার সন্দিগ্ধ দৃষ্টি তাহার উপর পড়িয়াছে দেখিতে পাইয়া সে সেখান হইতে সরিয়া পড়িল।

তার পর রজত অন্য এক জায়গায় একটা দোতলা খোলার ঘরে নিজেদের গোপন আড্ডার দরজার ধারে যাওয়ামাত্রই ভিতর হইতে কয়েক জন লোক 'কে? কে? ধর, ধর' বলিতে বলিতে ছুটিয়া আসিল। রজত পড়ি কি মরি করিয়া কাঠের ভাঙা সিঁড়ি বাহিয়া নামিতে গিয়া মাঝখানেই ভাঙা-জীর্ণ নড়বড়ে সিঁড়ি হুড়মুড় করিয়া ভাঙিয়া পড়িল। মুহূর্ত্তে রজত এক লাফে নীচে নামিয়া ছুটিয়া বাহিরে আসিল এবং ঐ বস্তিরই একটা ছোট নোংরা গলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া অদৃশ্য হইল।

এ গলি সে গলি করিয়া অতি সন্তর্পণে রজত আসিয়া উপস্থিত হইল গণি খলিফার গলিতে। নিজেদের ঘরের দাওয়ায় পা দেওয়া-মাত্রই মঞ্জরী বাহিরে আসিয়া রজতের হাত ধরিয়া তাহাকে তাহার নিজের ঘরে লইয়া গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। রজত আশ্চর্য্য হইয়া গেল এবং এই দুশ্চরিত্রা মেয়েটা হাত চাপিয়া ধরাতে হত-বুদ্ধি হইয়া গেল।

'হাত ধরে আপনাকে ছুঁয়ে ফেলেছি, পরে না হয় স্নান করে ফেলবেন।' সকৌতুক কণ্ঠে কহিল মঞ্জরী।

রজত নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, 'কি? ব্যাপার কি?'

নিজের ঠোঁটের উপর তর্জ্জনী রাখিয়া মঞ্জরী কহিল, 'চুপ, একটু আস্তে বলুন, পরশু বাড়ী খানাতল্লাস হয়েছে, কল্যাণবাবু ধরা পড়েছে, বোমা না কি যেন পুলিস তল্লাসী করে পেয়েছে—আরও দু'জন ধরা পড়েছে না জেনে ঘরে ঢুকতে গিয়ে। তারা ত আগে থেকে টের পায় নি যে ঘরে পুলিস ওৎ পেতে বসে আছে। কয়েকটা গোয়েন্দা ঘরের ভিতর চুপ করে বসে থাকে তাদের ধরবার জন্য যারা না জেনে ঘরে ঢোকে। এখন ওদের মধ্যে কেউ কেউ বাইরে গেছে, এক জন বোধ হয় ঘরে আছে।'

এমন সময় বাহিরে কয়েক জন লোকের পায়ের শব্দ হওয়ায় মঞ্জরী ব্যস্ত হইয়া কহিল, 'শীগ্‌গির খাটে উঠে বিছানার চাদর মুড়ি দিয়ে দেয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে পড়ুন।'

'ওরা যদি সন্দেহ করে যে এ ঘরে লোক আছে—চোখ বুজে অন্ধের মত ধরা না দিয়ে বরং সামনে দাঁড়িয়ে লড়ে দেখা যাক্—ধরা পড়ার আগে দু'একটা ঘায়েল হবেই।' রিভলবারে তাড়াতাড়ি গুলি ভরিয়া লইয়া বলিল রজত।

মঞ্জরী বলিল, 'ওসবের দরকার হবে না, কোন ভয় নেই, ওরা জানে যে আমার ঘরে লোক আসে। আমি আসলে যে কি তা ওদের জানা আছে। ওরা এটাও জানে যে স্বদেশীরা এমনি জায়গায় আসে না। নিন্ তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ুন।'

রজত তবুও বিছানায় শুইতে ইতস্ততঃ করিতেছিল। মঞ্জরী ব্যস্ত হইয়া কহিল, "শিগগীর, শিগগীর, দেরি করবেন না, বিপদে পড়লে আপনারা আঁস্তাকুড় মাড়িয়েও ত পালান, এ না হয় তাই হ'ল।"

তবুও রজতকে ইতস্তত করিতে দেখিয়া মঞ্জরী গায়ে হাত দিয়া কহিল, "উঠুন, উঠুন, বিছানায় উঠে পড়ুন।"

"আচ্ছা তাই করছি" বলিয়া রজত বিছানায় উঠিয়া চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল। মঞ্জরী বিছানার পাশে বসিল।

কয়েক সেকেণ্ডের জন্য ঘরে নীরবতা নামিয়া আসিল। একটু পরেই বাড়ীওয়ালী ঘরে উঁকি মারিয়া মেয়েকে ইসারায় ডাকিয়া চাপা স্বরে কহিতে লাগিল, "ছিঃ মঞ্জরী, তুই না এসব ছেড়ে দিয়েছিস, তবে এসব আবার কি? আজ না জামাই আসবার কথা! যদি এসে পড়ে! তোর একটুকুও লজ্জা নেই পোড়ারমুখী!"

"আঃ তুমি থাম মা"—বিরক্ত হইয়া মঞ্জরী জবাব দিল।

এমন সময় মনে হইল কে যেন আস্তে আস্তে আসিয়া দরজার ধারে দাঁড়াইল। একটু আশঙ্কিত হইয়া মঞ্জরী উঁকি মারিয়া দেখিয়াই প্রথমেই রজতের ওষ্ঠদ্বয় তর্জনী দিয়া চাপিয়া ধরিয়া ইসারা করিল। একটু পরেই দরজা কতকটা খুলিয়া বাহিরে আসিল। ছোট দারোগা বাবুটি মুচকি হাসিয়া বলিল, "পাহারা দিতে এলুম গো। তোমার ঘরে বসে নজর রাখার বেশ সুবিধা হবে। তাই না! ঘরে আর কেউ নেই ত?" বলিয়াই দারোগাবাবু বেশ ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হাসিতে লাগিল।

"তা হলে ত বেশ হ'ত কিন্তু মুশকিল হ'ল যে? এই একটু আগেই মিন্সে এসেছে।" মঞ্জরীর কথা শুনিবামাত্রই ছোট দারোগাবাবু ভ্রূকুটি করিয়া বলিল—"কে?"

মঞ্জরী ধীরভাবে জবাব দিল—"কে আবার! আমার স্বামী যে গো। খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। আপনি এখুনি যান, নইলে যে রাগী মানুষ, টের পেলে আমায় খুনই করে ফেলবে। আর এমনি চেঁচামিচি সুরু করে দেবে যে সে বড় বিশ্রী কাণ্ড হবে। পাড়ায় আর মুখ দেখানো যাবে না, আর ওঘরের থানার লোক-গুলোই কি ভাববে বলুন তো।"

ছোট দারোগা চলিয়া গেল। ওদিকে রজত এই সব কথা শুনিয়া লজ্জায় সঙ্কোচে এতটুকু হইয়া গেল, নিজেকে অত্যন্ত অশুচি বোধ করিল। এই মুহূর্তে ছুটিয়া বাহির হইয়া যাইতে পারিলে সে যেন বাঁচিয়া যায়।

ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া রজতের অবস্থাটা উপলব্ধি করিয়া চাপা হাসিতে মঞ্জরীর সমস্ত শরীর দুলিয়া উঠিল। যথাসম্ভব গম্ভীর হইবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "ইস্ বড্ড যে ছটফট কচ্ছেন, কি হ'ল দেখি?" কথা বলিতে বলিতেই বিছানার ধারে গিয়া রজতের পিঠের নীচে বিছানা হাতড়াইয়া কহিল—'কৈ? ছারপোকা কি পিঁপড়ে কিছুই নেই ত। তবে জলবিছুটী লেগে নেই ত?'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রজতের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "ওঃ, তাই ত, একটা ক্যাঁকড়াবিছে কামড়াচ্ছে ত।"

রজত চকিত হইয়া উঠিয়া পড়িল, বিছানার দিকে চাহিয়া বলিল, "এঁ্যা, কই, না ত?"

"ও আমার কপাল, আমি কি বলছি দেহে কামড়াচ্ছে! মনের ভিতরটা যে হুল ফুটিয়ে ঝাঁজরা করে দিচ্ছে", কহিল মঞ্জরী।

রজত এই কথায় বিরক্ত হইয়া গম্ভীর ভাবে ঈষৎ তীব্র কণ্ঠে বলিল, "থামুন, এখন এসব হেঁয়ালী কাব্যের সময় নয়, আমাকে এখন যেতে হবে।"

"হ্যাঁ, যাবেনই ত! ওদিকে বাইরে আপনাকে পাবার আশায় যারা অপেক্ষা করছে তারা একটু স্থির হয়ে বসুক, না হয় ঘরের মেঝের পা এলিয়ে দিয়ে ঘুমোক, কিংবা দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঝিমোক, অথবা যা হোক একটা কিছু করুক, তবে ত যাবেন! সজের ঐ একটা রিভলবারে কুলোবে না! যতই রাগ করুন না কেন এখন আমার কথামত আপনাকে চলতেই হবে।" সকৌতুকে কহিল মঞ্জরী।

রজত ক্রমশঃই অস্থির ও বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। সে কহিল, "যাক তোমার কথা শিগগীর শেষ করে ফেল" এবং কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই পাশ ফিরিয়া রহিল।

মঞ্জরীর সমস্ত সত্তার মধ্যে কিসের এক অনুপ্রেরণা সঞ্জাত হইতেছিল তাহা বলা যায় না। সে রজতের ইঙ্গিত অগ্রাহ্য করিয়া তাহার গায়ে হাত দিয়া নিজের দিকে ফিরাইবার চেষ্টা করিয়া অনুনয়ের স্বরে কহিতে লাগিল, "দয়া করে আর একটু হেঁয়ালী করতে দিন। শুনুন—আচ্ছা এখন যদি আমরা দু'জনেই মরি তা হলে কে স্বর্গে আর কে নরকে যাবে বলুন ত?"

রজত বিরক্ত হইয়াই ছিল, এই প্রশ্নের উত্তরে মঞ্জরীকে জব্দ করিতে পারিবে মনে করিয়া কহিল, "স্বর্গ-নরক বলে দুটো নির্দিষ্ট স্থান আছে তা আমি মানি নে। তবে থেকে থাকলে তুমি কোথায় যাবে তা কি তুমি জান না?"

মঞ্জরী আঘাতটা গ্রাহ্য করিল না। এই উত্তরে আশ্চর্য্যও হইল না, কিংবা দমিবার কোনও লক্ষণ দেখাইল না। সে কহিতে লাগিল, "না জানি না। তবে স্বর্গে যেমন দেবতাদের স্থান আছে তেমনি অপ্সরা এবং মেনকা রম্ভাদেরও স্থান আছে, যেতেও পারি সেখানে। তবে আপনি যে যাবেন না তা কিন্তু ঠিক, কেননা সেখানকার অপ্সরা, মেনকা, রম্ভা আর সোমরস পান কিন্তু আপনার সইবে না।'

"স্বর্গরাজ্য-উদ্ধারের সংগ্রামে, দেবাসুর-যুদ্ধে অপ্সরা, মেনকা, সোমরস পান নিশ্চয়ই বন্ধ রাখতে হয়েছিল। সময় থাকলে কচ ও দেবযানীর গল্পটা বলতুম"—উত্তর দিল রজত।

মঞ্জরী বলিল, "গল্পটা আমি জানি, যাত্রার পালাগানে দেখেছি। স্বর্গ-উদ্ধারের কাজে দেবতার ছেলে কচ অসুরের মেয়ে দেবযানীর ভালবাসা ত্যাগ করে এল। এই যেমন দেশের কাজের জন্য আপনারা খুন ডাকাতি করেন তেমনি কচ দেবযানীর বুকটা ভেঙে দিয়ে অন্যায় করে এল। আপনারা তা করবেন সমর্থন।"

"নিশ্চয়ই সমর্থন করব। কচ অন্যায় করে নি, নিজের দেশের উদ্ধারের জন্য একটা মেয়ের ভালবাসা ত্যাগ করে এল। কচ একাজ না করে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকলে পৃথিবী এত বড় একটা মহৎ দৃষ্টান্ত থেকে বঞ্চিত হ'ত।" জোর দিয়া কহিল রজত।

"মহৎ দৃষ্টান্ত! হয়ত তাই। আচ্ছা, মহৎ কাজ করতে গেলেই যে একটি নিরপরাধ প্রাণকে শাস্তি দিতে হবে, নইলে তা হবে না—এ কিন্তু ঠিক বুঝে উঠতে পারলুম না! আচ্ছা দুটো বড় কাজ কি এক সঙ্গে করা যায় না? মনের জোর থাকলেও নয়? তারা কি পরস্পরবিরোধী?" এতদূর কহিয়া মঞ্জরী চুপ করিল।

রজত বলিল, "মনের খুব জোর থাকলে হয়ত পারা যায়। কিন্তু এতবড় দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে আবার অনর্থক একটা পরীক্ষায়

নিজেকে ফেলা কেন? সব দিক বজায় রেখে দেশের কাজ হয় না, দেশের জন্ম আত্মবিসর্জন করা যায় না।"

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব রহিল। মঞ্জরীই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কহিল, "সেই সাধু ও পতিতার গল্পটা শুনেছেন ত? মৃত্যুর পর অমৃতপ্ত পতিতার আত্মাকে নিয়ে গেল বিষ্ণুদূত। দেহটার কিছু খেল শেয়াল-কুকুরে আর কিছুটা গেল পচে। সাধুর নিষ্পাপ দেহটা চন্দনকাঠ ও ঘি দিয়ে, কীর্ত্তন করতে করতে পোড়ানো হ'ল। আত্মাটা কিন্তু নিয়ে গেল যমদূত। সে সাধুকে বলেছিল, 'অসৎ কাজের বিরোধী হয়েও তুমি সর্ব্বদা অসৎ চিন্তা করতে। নিজে অসৎ কাজ না করলেও অসৎ কাজে লিপ্ত পাপীর নিন্দা করতে করতে অসৎ চিত্রই তোমার মনকে করে রাখত সর্ব্বদা আচ্ছন্ন।"

রজত বলিল, "গল্প এখন থাক্। তবে এইটুকু শুনে রাখ—কোন অসৎ কাজের চিত্র আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করে নেই বা আচ্ছন্ন করে থাকে না। আমাদের এক চিন্তা এক কাজ—দেশের পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করে সর্ব্বসাধারণের সুখের পথ খুলে দেওয়া।"

আর অপেক্ষা করা মোটেই সমীচীন নয় মনে করিয়া কোমরে বাঁধা রিভলবারে হাত দিয়া পুনরায় কহিল, "থাক্ এখন যাওয়ার বন্দোবস্ত কর—"

"যাবেনই ত, আপনাকে মুখের কথায় ধরে রাখে কার সাধ্য। পাশের ঘরেই কিন্তু হাতকড়ি নিয়ে লোক বসে আছে—যদি ধরিয়ে দিই"—গম্ভীর হইবার চেষ্টা করিয়া কহিল মঞ্জরী।

রজত একটু চকিত হইয়া উঠিয়া বসিল ও মঞ্জরীর মুখের দিকে তাকাইল। পরক্ষণেই হাসিয়া ফেলিল, বলিল, "নাঃ, তুমি এ সব পার না, তোমার দ্বারা এ সম্ভব নয়।"

মঞ্জরী খুশীতে ঝলমল করিয়া উঠিল। লঘু পরিহাসের লোভ সামলাইতে পারিল না, বলিল, "ইস, এত দূর। বড্ড তাড়াতাড়ি এগোচ্ছেন কিন্তু, সাবধান!"

"সাবধান আমাদের হতে হয় না। মনের মধ্যে আর কিছু স্থানই পায় না, কোন ফাঁকই নেই। সর্ব্বক্ষণ এমন কাজে ও চিন্তায় ডুবে থাকতে হয় যার সার কথা হচ্ছে ত্যাগ ও আত্ম-বিসর্জন। বিপ্লবের প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুবরণ করবার জন্তে প্রতি মুহূর্ত্তে প্রস্তুত হয়ে থাকতে হয়।"—উত্তর দিল রজত।

এতক্ষণে মঞ্জরী সত্যই নিজেকে পরাজিত বলিয়া মনে করিল। অনুনয়ের স্বরে রজতের হাত ধরিয়া কহিল, "আচ্ছা তামাশা থাক্। আপনারা কি কিছুতেই বাঁধা পড়েন না?"

রজত বলিল, "একটা কথা তোমায় বলে রাখি মঞ্জরী—মনে রেখ,—স্বভাবে, চরিত্রে, আচারে, ব্যবহারে—এক কথায় কায়মনো-বাক্যে আমাদের আদর্শমত না হলে আমাদের সম্পূর্ণ আপনজন হওয়া যায় না। এই হ'ল আমাদের প্রেম, ভালবাসা, কৃতজ্ঞতা, দয়া, মায়ামমতার একমাত্র মাপকাঠি। এক পথে চলেই আমরা দুই চিরসাথী, ভিন্ন পথে গেলে আমাদের কেউ নয়। যে আমা-দের আপনজন তার জন্ত প্রাণ দিতে পারি, আবার বিপথে গেলে খুনও করতে পারি। তবে হাঁ, সুবিধে পেলে অনেক অবাঞ্ছিতকেই কাজে লাগাই—যেমন তোমারই ভাষায় বলতে গেলে আঁস্তাকুড় মাড়িয়েও পালাই। এমন মানুষগুলিকে এমন ভাবে ভালবাসতে পার?"—প্রশ্ন করিয়া রজত বক্তব্য শেষ করিল।

"তা মুখে বলে আর কি হবে"—দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল মঞ্জরী। একটু যেন অন্যমনস্ক হইল। পরমুহূর্ত্তেই ধীরে ধীরে বলিল, "উঠুন, এবার হয় ত যেতে পারবেন। আচ্ছা একটু অপেক্ষা করুন, আমি বাইরের অবস্থাটা একটু দেখে আসি, ততক্ষণ আপনি চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকুন। আপনার জুতো এমনি করে রেখে যাচ্ছি যাতে জানলার ফাঁক দিয়ে কেউ দেখলে পুরুষের জুতো বলেই মনে করবে, স্ত্রীলোকের নয়।"

মঞ্জরী দরজা খুলিয়া বাহিরের বারান্দায় গেল, একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া বাড়ীর ভিতরের দিকে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে একটা থালায় কিছু ভাত তরকারী লইয়া আসিয়া কহিল, "উঠুন, স্নান করার সুবিধে হবে না, চারটি খেয়ে নিন্—তার পর চলে যাবেন।"

এ সময়ে মঞ্জরী কোথা হইতে ভাত তরকারী লইয়া আসিল ভাবিয়া রজত ইতস্ততঃ করিতেছিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া মঞ্জরী কহিল, "উঠুন, খেতে বসুন, দুশ্চরিত্রা মেয়েকে যখন বিশ্বাস করতে পারেন তখন তার হাতে খেতেও পারেন। দেখুন অবস্থায় পড়েই সব হয়—ভালও মন্দ হয়, মন্দও ভাল হয়, আগে থেকে ভাল বা মন্দ হয়ে কেউ জন্মায় না।"

"আমি তা বলছি নে, আমি ভাবছি যে তুমি হয়ত তোমার খাবারটাই দিয়ে দিলে—পরে তুমি কি খাবে?"—শান্ত ভাবে জবাব দিল রজত।

"আচ্ছা, হয়েছে, হয়েছে, এখন তাড়াতাড়ি উঠে খেয়ে নিন। মেয়েদের উপর অত দরদ দেখাতে নেই—লোকে নিন্দে করবে।"—মঞ্জরী পরিহাসের সুরে বলিল।

"করুক, আমাদের খুনে বলে, ডাকাত বলে ইংরেজ যা বলতে শিখিয়ে দেয় লোকে তাই বলে, আরও না হয় কিছু বললে। আমি ভাবছি এই অসময়ে তোমার খাবার কোত্থেকে জুটবে। কিছু কিনে খেতে হলেও ত পয়সা লাগবে।"—কহিল রজত।

"বেশ, বেশ, আমরা গরীব—ভাত, ডাল যা খাবেন তার দাম দিয়ে যাবেন তা হলেই হবে।"—ব্যঙ্গ করিয়া কহিল মঞ্জরী।

রজত একটু ক্ষুব্ধ হইয়া কহিল, "দেখ, আমরা মানুষ খুন করতে পারি, কিন্তু তাকে অপমান করতে পারি নে।"

উভয়েই গম্ভীর হইয়া গেল। আর কথা বাড়ানো ঠিক হইবে না বিবেচনা করিয়া রজত আহারে বসিয়া গেল। নীরবে আহার শেষ করিয়া ঘরের ভিতরেই মুখ ধুইয়া ফেলিল।

এতক্ষণের একটানা নীরবতা ভঙ্গ করিল মঞ্জরী, "পান তামাক

ত আপনাদের কাউকেই কখনও খেতে দেখি নি। খাবেন? আমার কাছে সব আছে।"

রজত কহিল, "না, আমরা খাই নে, তবে কোন কোন অবস্থায় আর দশ জনের এক জনই, আলাদা কিছু নই দেখাবার জন্ত পান তামাক সবই খাই। কুলিগিরি করতে গিয়ে যেমন খইনি খাই তেমনি আবার নৌকো বাইতে গিয়ে তামাক টানি।"

মঞ্জরীর আরও কথা বাড়াইবার ইচ্ছা থাকিলেও চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া ঘরের পিছন দিকের দরজা দিয়া রজতকে বাহির হইয়া যাইতে সাহায্য করিল। মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া সেও পান চিবাইতে চিবাইতে সামনের দরজা দিয়া বারান্দায় আসিল, পাশের ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া পুলিস প্রহরীদের সঙ্গে গল্প আরম্ভ করিয়া দিল এবং সকলকে এক একটা পান খাইতে দিল।

ক্রমশঃ

পরশুরাম

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

কাহাকেও দিলে বজ্র বা বীণা, কারেও দণ্ড, পাশ,
আমাকে দিয়াছ পরশু ধরার ত্রাস।
আমি করিলাম ধরা নিঃক্ষত্রিয়,
স্থির জেনেছিনু হবে উহা তব প্রিয়,
দুষ্কৃতি-দলে দণ্ড দেওয়াই ছিল মোর অভিলাষ।

২

যাহারা দুষ্ট, আনে অনিষ্ট, ধনী হয়ে পরধনে—
জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ নিজেদিকে প্রভু গণে,
স্ফীত যারা, হয়ে মারণাস্ত্রেতে বলী,
শাসে ধরা—কূট নীতিতে সুকৌশলী,
নাশিয়া তাদিকে, ভাবিনু মুক্ত করিব জগজ্জনে।

৩

ষড়যন্ত্রের যন্ত্র চূর্ণি, দুর্জনে করি বধ—
ভাবিনু করিব মানবে সুখী ও সৎ।
ধর্মরাজ্য সাধ্য না হোক গড়া,
বাসের যোগ্য করিব বসুন্ধরা,
তাপিত ধরণী হবে আশ্রম শান্ত-রসাস্পদ।

৪

তাহাই পুণ্য যাহা করা যায় তব প্রীত্যর্থে,—
কলুষের দাগ লাগে না কো গাত্রে,
তোমার লাগিয়া মরি যদি পাপ নাই,
তোমার লাগিয়া মারি যদি পাপ নাই,
ইহাই করেছি ধ্যান ও মনন দিবসে ও রাত্রে।

৫

নাশিয়া শাসিয়া, আত্মপ্রসাদ কিন্তু এলো না মনে,
সংশয় শুধু জাগিছে সঙ্গোপনে।
যেই পথ দিয়ে চলে তব জয়রথ—
অপরাধীরাই গড়ে দেয় সেই পথ,
তাহাদেরো বুঝি প্রয়োজন আছে তাই ভাবি ক্ষণে ক্ষণে

৬

পরশুকে শুধু বড় করিলাম ভাবিনু উহাই সব,
উহাতে আসিল নূতন উপপ্লব।
পাপ যে আসিছে পুণ্যের রূপ ধরি,
শান্তি আসিছে সকল শান্তি হরি',
হিংসার দ্বারা হিংসার রোধ হ'ল না তো সম্ভব?

৭

অত্যাচারী ও অবিবেকী সাথে করি ঘোর সংগ্রাম
শ্রান্ত ক্লান্ত মাগি আমি বিশ্রাম।
পাপীর ধ্বংসে হ'ল না তো পাপ শেষ,
হ'ল না দিব্য জীবনের উন্মেষ,
বিফল পরশু—ধরা কেঁদে ডাকে 'এসো রাম প্রাণারাম'।

৮

পোড়ায়ে পিটায়ে লৌহ-ধরণী করিতে নারিনু সোনা
তবু বৃথা নয় মোর এই আরাধনা।
শুধু হ্রাস করি হিংস্রদের ভিড়,
নত করি খর্ব অতি-দর্পীর শির,
হে পরশমণি,—তুমি পরশের বাড়ানু সম্ভাবনা।

কালিদাসের সাহিত্যে নারী

শ্রীচিন্ময়ী পাঠক

মহাকবি কালিদাসের সাহিত্যে নারী-চরিত্র পুরুষ-চরিত্র অপেক্ষা মধুর ও আকর্ষণীয়। পুরুষ-চরিত্রগুলি গতানুগতিক রীতিতে রচিত হইয়াছে, কিন্তু নারী-চিত্রে তাঁহার প্রতিভার বৈশিষ্ট্যের ছাপ বিদ্যমান। তাঁহার অধিকাংশ নারী-চরিত্র পৌরাণিক। তাঁহার উমা, শকুন্তলা, উর্ব্বশী, ইন্দুমতী মানসকন্যা নহে। তাহাদের জন্ম সুপ্রাচীন পুরাণ ও ইতিহাস-গুলিতে। কিন্তু মহাকবির কাব্যে দেখি তাহাদের নূতন রূপে। পুরাতন পৌরাণিক কাঠামোগুলির উপর স্বকীয় কল্পনার মাধুর্য্য দিয়া তিনি যে নবীন প্রতিমা গড়িলেন, তাহাতে পৌরাণিক চিত্রের কোন বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান নাই। কালি-দাসের কাব্যে ও নাটকের মধ্যে আছে নারীর সম্পূর্ণ নূতন মূর্ত্তি-কল্পনার প্রয়াস—মানবীকে দেবীর আসনে অধিষ্ঠিত করিবার বিপুল ইচ্ছা। রামায়ণ ও মহাভারত ব্যতীত অধিকাংশ সংস্কৃত-কাব্যের নায়িকা রক্ত-মাংসে গড়া পুত্তলিকা, যাহা দৈহিক সৌন্দর্য্যে মানবের মনে শুধু কামনার উদ্রেক করে। কিন্তু কালিদাস দেখাইলেন এই রক্তে মাংসে গড়া পুত্তলিকার মাঝে আছে স্বর্গের সুষমা। দৈহিক-লাবণ্যে মানব-মনের কামনার চরিতার্থতাই নারী-জীবনের চরম লক্ষ্য নহে; গেটে শকুন্তলা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, 'Wouldst thou the earth and heaven itself in one sole name combine'—সেই স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের শুভমিলনেই নারী-জীবনের পরিপূর্ণতা। উমা ও শকুন্তলা এই পরিপূর্ণতার গৌরবে গরীয়সী। মর্ত্ত্যের প্রেম ও স্বর্গের পবিত্র নির্ম্মলতা মিশিয়া তাহাদের জীবনে স্নিগ্ধ মাধুর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

শকুন্তলা-নাটক ও কুমারসম্ভব কাব্যে কালিদাস দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, দৈহিক সৌন্দর্য্যটুকুই নারীর শ্রেষ্ঠ সম্বল নহে। উমা ও শকুন্তলার রূপ অবর্ণনীয়। তাহাদের সৌন্দর্য্য-মহিমা কীর্ত্তন করিতে কবির ছন্দের ভাণ্ডার বুঝি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। মনে হয় যেন তাহাদের নবযৌবনোদ্ভিন্ন রূপ-মাধুরী প্রভাতরল জ্যোতির্লেখার ন্যায় এই ধূলার ধরণীর সামগ্রী নহে। সে রূপ 'উন্মীলিতং তূলিকয়েব চিত্রং, সূর্য্যাংশুভির্ভিন্নমিবারবিন্দম্'—তূলিকায় অঙ্কিত চিত্রের ন্যায়, রবির আলোকে বিকশিত অরবিন্দের ন্যায়। কিন্তু বাহিরের এই রূপ-মাধুরী খর্ব্ব করিয়া অন্তরের রূপ-মাধুরীর প্রকাশই নারীর প্রকৃত সৌন্দর্য্য, তাহাতেই তাহার প্রকৃত পরিচয়। শকুন্তলার যে অলৌকিক রূপে মুগ্ধ হইয়া দুষ্মন্ত ভাবিয়াছিলেন,

'চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিতসত্ত্বযোগা
রূপোচ্চয়েন মনসা বিধিনা কৃতা নু।'

(অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, ২য় অঃ)

'বিধাতা জগতের সমগ্র রূপরাশি একত্র সংগ্রহপূর্ব্বক কল্পনার দ্বারা চিত্রে অঙ্কন করিয়া তাহাতে প্রাণসংযোগ করিয়াছেন'—সেই অপরূপ যৌবনশ্রীও শকুন্তলাকে রক্ষা করিতে পারিল না। সে রূপের দ্যুতি দুষ্মন্তের অন্তরে শুধু কামনার উদ্রেক করিয়াছিল, পবিত্র প্রেমের বীজ বপন করিতে পারে নাই। তাই অভিশাপের তাপে সে মোহঘোর কাটিয়া গেল। কিন্তু সুদীর্ঘব্রতচারণে প্রথম যৌবনের গ্লানি দগ্ধ হইয়া শকুন্তলার যে পরমকল্যাণময়ী করুণমূর্ত্তি বিকসিত হইয়াছে—'বসনে পরিধূসরে বসানা, নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণী'—মলিন বসন পরিহিতা, নিয়ত ব্রত আচরণে ক্লিষ্টা, একবেণীধরা—সে মূর্ত্তিকে কে প্রত্যাখ্যান করিবে? দুষ্মন্তের সকল অন্তর ভরিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে উচ্ছ্বসিত প্রেমের প্লাবন বহিয়া গেল।

তেমনই কুমারসম্ভব কাব্যে পর্য্যাপ্তযৌবনপুঞ্জে অবনমিতা উমা যখন সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার ন্যায় গিরিশের পদপ্রান্তে প্রণাম করিলেন, তাঁহার কর্ণ হইতে পল্লব ও অলক হইতে নবকর্ণিকার মঞ্জরী ঝরিয়া পড়িল, মহাদেবের করে জপমালা অর্পণ করিতে তাঁহার অঙ্গস্পর্শ করিলেন, তখন যোগীর চিত্তও ক্ষণতরে বিচলিত হইল। কিন্তু

"অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে অকস্মাৎ উদ্ভাসমান এই যে হর্ষ, দেবতা ইহাকে বিশ্বাস করিলেন না, সরোষে ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন।"

তবে যখন গৌরী মৌঞ্জীমেখলার দ্বারা অঙ্গে বল্কল বাঁধিয়া ধ্যানাসনে বসিলেন, তখন সেই পিঙ্গলজটাধারিণী দিবসে শশি-কলার ন্যায় কর্শিত তপস্বিনীর নিকট সংশয়রহিত সম্পূর্ণ হৃদয়ে ত্রিলোচন আপনাকে সমর্পণ করিলেন। তাই রবীন্দ্র-নাথ বলিয়াছেন,

"ললিতদেহের সৌন্দর্য্যই নারীর পরমগৌরব, চরমসৌন্দর্য্য নহে। ...লাবণ্য-পরাক্রান্ত যৌবনকে পরাকৃত করিয়া শকুন্তলার ও পার্ব্বতীর নিরাভরণা মনোময়ী কান্তি অমলা জ্যোতির্লেখার মত উদিত হইল। প্রার্থিতকে সে সৌন্দর্য্য বিচলিত করিল না, চরিতার্থ করিয়া দিল। তাহার মধ্যে লজ্জা আঘাত আলোড়ন রহিল না; সেই সৌন্দর্য্যের বন্ধনকে আত্মা সাদরে বরণ করিল, তাহার মধ্যে নিজের পরাজয় অনুভব করিল না।" (প্রাচীন সাহিত্য)

যে উন্মত্তপ্রেমে নারী প্রিয়জন ব্যতীত সমস্ত বিশ্বকে ভুলিয়া যায়, কর্ত্তব্যজ্ঞান রহিত হয়, নারীর সে প্রেমে কল্যাণ

নাই। সে প্রেম—"যতির তপোবনে তপোভঙ্গরূপে, গৃহীর গৃহপ্রাঙ্গণে সংসারধর্ম্মের অকস্মাৎ পরাভবরূপে আবির্ভূত হয়, তাহা ব্যাধির মত অঙ্গকে নষ্ট করে বটে, কিন্তু নিজের বিনাশকেও নিজে বহন করিয়া আনে।" শকুন্তলা দুষ্যন্তের প্রেমে আত্মহারা হইয়া বিশ্বকে ভুলিলেন। তাই এল দুর্ব্বাসার অভিশাপ কালবৈশাখীর ঝড়ের মত নবীন আশার মুকুলকে চূর্ণ করিতে:

"বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমানসা
তপোধনং বেত্সি ন মামুপস্থিতম্।
স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোঽপি সন্
কথাং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতামিব।"

(অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, চতুর্থ অঙ্ক)

'তুই যে পুরুষকে একমনে চিন্তা করিতে করিতে অতিথি-রূপে উপস্থিত এই তপোধনের সৎকার করিলি না, অতএব যেমন মদ্যপানোন্মত্ত ব্যক্তি প্রথমে যে কথা বলে, আবার তাহাকে সেই কথা বলিলে যেমন কোনমতেই তাহা মনে করিয়া বলিতে পারে না, তেমনি তোর সেই প্রিয় ব্যক্তিকে যথেচ্ছরূপে মনে করিয়া দিলেও সে ব্যক্তি কোনক্রমেই তোকে মনে করিবে না।'

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'যাহা মরণীয় যাক মরে'। কামনা-বাসনার মধ্যে যাহা কিছু দুর্ব্বল তাহাই মরণীয়। কালিদাস তাঁহার আদর্শ নায়িকার মধ্যে কামনার সেই দুর্ব্বলতার ভস্ম দেখিতে চান। তাই সুদীর্ঘ বিরহের মধ্য দিয়া শকুন্তলার প্রেমের পরিশুদ্ধি ঘটাইলেন। কামনার কলুষতা দূর হইল। 'যে প্রেম অচ্ছোদসরসী তীরে প্রিয়তমের মৃতদেহ সম্মুখে রাখিয়া বিরহ-রজনীর যুগান্ত যাপন করে, অন্তরে ভাব-সম্মিলনের অমৃতনিষেকে ভাবী মিলনের আশাকে সঞ্জীবিত রাখে'—মারীচের তপোবনে সেই সাত্ত্বিক প্রেমের 'লিরিক'-মূর্চ্ছনা শরীরী হইয়া নিয়মক্ষামমুখী একবেণীধরা বিরহিণীর বেশে বিরহকে জ্যোতির্ম্ময় করিয়া রাখিল। প্রথম যৌবনে যাহা ছিল সম্ভোগস্পৃহায় মলিন এখন তাহা হইল মন্দাকিনীর স্বচ্ছধারার ন্যায় নির্ম্মল ও পবিত্র। ইহার স্পর্শে শকুন্তলার চিত্ত বিকশিত হইল, পরাজয়ের গ্লানি মুছিয়া গেল। তাই মিলনকালে শকুন্তলা দুষ্যন্তের কোন অপরাধই লইলেন না। দুঃখিনী নারীর নয়নে অশ্রুর বন্যা বহিয়া গেল, বিগলিতচিত্তে প্রিয়তমের চরণে অঞ্জলি দান করিলেন। "যুবক-যুবতীর মোহমুগ্ধ প্রেমে এত ক্ষমা কোথায়? ভরত-জননী যেমন পুত্রকে জঠরে ধারণ করিয়াছিলেন, সহিষ্ণুতাময়ী ক্ষমাকেও তেমনি শকুন্তলা তপোবনে বসিয়া আপনার অন্তরের মধ্যে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিলেন।" বালক ভরত যখন দুষ্যন্তকে দেখিয়া কহিল, "অজ্জ! এসো কো বি পুরিস মং পুত্তক ত্তি সসিণেহং আলিঙ্গদি"—মা, কে এই পুরুষ আমাকে 'পুত্র' বলিয়া সস্নেহে আলিঙ্গন করিতেছেন,—তখন শকুন্তলা প্রত্যাখ্যানকারী দুষ্যন্তকে দেখিয়া এক মুহূর্ত্তে তাঁহার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া কহিলেন, 'বচ্ছে! দে ভাঅহেআইং পুচ্ছেহি'—'বৎস, আপনার ভাগ্যকে প্রশ্ন কর।' এই উক্তির মধ্যে কোন নিরুদ্ধ অভিমানের উত্তাপ নাই, কোন অনুযোগের গ্লানি নাই। যে পবিত্র প্রেমের মঙ্গল জ্যোতিতে তাঁহার চিত্ত উদ্ভাসিত, তাহার সম্মুখে কোন দীনতার স্থান নাই। ইহাই ভারতীয় নারীর প্রকৃত পরিচয়। সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর কন্যা জানকী দেবী শ্রীরামচন্দ্রের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়াছিলেন। তপস্বিনী উমাও ধূর্জ্জটির কোন অভাব, কোন দৈন্য দেখিতে পান নাই। প্রত্যাখ্যাত হইয়াও তাঁহাকেই সুন্দর করিয়া দেখিয়াছিলেন। সম্মুখে প্রত্যাখ্যানকারী মহাদেবকে দেখিয়া পার্ব্বতীর যে অনুভূতি:

'—বেপথুমতী সরসাঙ্গযষ্টি-
র্নিক্ষেপণায় পদমুদ্ধৃতমুদ্বহন্তী।
মার্গাচলব্যতিকরাকুলিতেব সিন্ধুঃ
শৈলাধিরাজতনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ।'

(কুমারসম্ভবম্, পঞ্চম সর্গ)

'পর্ব্বতরাজতনয়া উমা সেই মহাদেবকে দেখিয়া কাঁপিতে লাগিলেন, তাঁহার অঙ্গ হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হইতে লাগিল এবং তিনি নিক্ষেপ করিবার জন্য একখানি চরণ উত্তোলন করিয়া তাহা সেই ভাবেই বহন করিতে লাগিলেন, তাহাতে পথিমধ্যস্থ পর্ব্বত কর্ত্তৃক অবরুদ্ধা নদীর ন্যায় তিনি যাইতেও পারেন নাই, থাকিতেও পারেন নাই।'

'ইহার মধ্যে দয়িতের প্রতি পূর্ব্বাপরাধের জন্য কোন ঘৃণা নাই, কোন অভিমান নাই। অগ্নিমিত্রের মহিষী ধারিণী দেবীও সেইরূপ স্বামীর সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া মালবিকার সহিত তাঁহার মিলন ঘটাইলেন। কারণ পবিত্র প্রেমের অভিষেক দীনতার সকল কালিমা ধুইয়া মুছিয়া নির্ম্মল করিয়া লয়, সঙ্কীর্ণ স্বার্থের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া চিত্ত উন্মুক্ত, উদার করিয়া তুলে। এই পবিত্র প্রেমে উদ্ভাসিতা নারীর যে মঙ্গলকান্তি, নির্ম্মল শোভা, ইহার মধ্যে কি শান্তি, কি শ্রী, কি সম্পূর্ণতা। ইহার মধ্যে সমস্ত চেষ্টার অবসান, সমস্ত সজ্জার শেষ পরিণতি।—ইহার মধ্যে ইন্দ্রসভার কোন প্রয়াস নাই, মদনের কোন মোহ নাই, বসন্তের কোন আনুকূল্য নাই—এখন ইহা আপনার নির্ম্মলতায় মঙ্গলতায় আপনি অক্ষুব্ধ, আপনি সম্পূর্ণ।' (প্রাচীন সাহিত্য)

কালিদাস আরও দেখাইলেন যে নারীর সৌন্দর্য্যের চরম বিকাশ তাহার মাতৃমূর্ত্তিতে। যে লতা শুধু পুষ্পই বহন

করে, ফল বহন করে না, তাহার সম্পূর্ণতা কোথায়? সেই জন্য মনু রমণীদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ'—তাঁহারা সন্তানকে জন্ম দেন বলিয়া মহাভাগা, পূজনীয়া ও গৃহের দীপ্তিস্বরূপা। নারীর উচ্ছল প্রস্ফুটিত যৌবনশ্রী উপেক্ষা করিতে পারা যায়, কিন্তু তাহার কল্যাণময়ী মাতৃমূর্ত্তি শ্রদ্ধার সামগ্রী। তাহাতে প্রবৃত্তির চাঞ্চল্য নাই, সৌন্দর্য্যের মোহ নাই, আছে ধ্রুবনিষ্ঠার একাগ্রতা, আছে কল্যাণের কমনীয় দ্যুতি। সেইজন্য উদ্ভিন্ন-যৌবনা অক্লিষ্টকান্তি শকুন্তলাকে দুষ্মন্ত প্রত্যাখ্যান করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু স্নেহব্যাকুলা, করুণাময়ী ভরত-জননীর চরণে শ্রদ্ধার অঞ্জলী দান করিলেন। মেঘদূত কাব্যেও দেখি প্রিয়ার কথা বলিতে গিয়া বিরহী যক্ষের প্রথমেই মনে পড়িল কৃতকপুত্র মন্দার বৃক্ষ ও প্রিয়ার মাতৃ-মূর্ত্তি—

'যস্যোপান্তে কৃতকতনয়ঃ কান্তয়া বর্দ্ধিতো মে
হস্তপ্রাপ্যস্তবকনমিতো বালমন্দারবৃক্ষঃ।' (উত্তর মেঘ)

'যাহার নিকটে কৃতকপুত্র ক্ষুদ্র মন্দার বৃক্ষ রহিয়াছে যাহাকে আমার প্রিয়া পালন করে এবং যাহা হস্তপ্রাপ্য স্তবক ভারে অবনমিত।'

জননী পদ আমাদের দেশের নারীর প্রধান পদ। নারী হৃদয়ের যে শুভজ্যোতিঃ মিলন স্পৃহার ক্ষুদ্রতায় আবদ্ধ থাকে, তাহা মাতৃত্বের উন্মুক্ত রাজপথে বাহির হইয়া বিশ্বকে আলোকিত ও পবিত্র করে, ধূলার ধরণীতে স্বর্গ গড়িয়া তুলে। তাই কালিদাস তাঁহার কাব্যে ও নাটকে নারীকে শুধু 'গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ' রূপে আঁকিলেন না, আঁকিলেন তাহাদের কল্যাণময়ী ভরত-জননী মূর্ত্তি, কুমার-জননী মূর্ত্তি। এই জননী মূর্ত্তির দীপ্তি তাহাদের সকল সৌন্দর্য্যকে আরও মধুর করিয়া রাখিয়াছে।

বহুবল্লভ রাজার অন্তঃপুরে কত 'সুখলব্ধা প্রেয়সী ক্ষণ-কালীন সৌভাগ্যের স্মৃতিটুকু মাত্র লইয়া অনাদরের অন্ধকারের অনাবশ্যক জীবন যাপন করিত।' হংসপদিকা ছিলেন এমনি একজন দুষ্যন্তের হতভাগিনী প্রেয়সী, ধারিণী ও ইরাবতী অগ্নিমিত্রের প্রেয়সী। এক দিন প্রণয়ের অঞ্জলি তাহাদের চরণে অর্পিত হইয়াছিল, তাহাদের স্তুতি গীত হইয়াছিল। সে সৌভাগ্যের দিন অতীত হইলে তাহাদের শূন্য মন্দিরে ধ্বনিত হইল বীণার করুণ মূর্চ্ছনা—

অভিনবমধুলোলুপস্ত্বং তথা পরিচুম্ব্য চূতমঞ্জরীম্।
কমলবসতিমাত্রনির্বৃতো মধুকর! বিস্মৃতোঽস্যেনাং কথম্।

নবমধুলোভী ওগো মধুকর! চূতমঞ্জরী চুম্বন করিয়া কমল-নিবাসের প্রীতি কেমন করিয়া ভুলিলে?

এই সব অভাগিনী রমণীদের কালিদাস ভুলিতে পারেন নাই। করুণাঘন দৃষ্টি মেলিয়া তিনি দেখিয়াছেন তাহাদের অন্তরের গোপনলোকে লুকান স্বর্গের সুষমা, যাহা নিয়তির রুদ্র রোষেও বিষাক্ত হয় নাই। অগ্নিমিত্রের প্রবঞ্চনায় ব্যথিত হইয়া যে ইরাবতী ভাবিয়াছিলেন—

'অবিস্সসণীআ পুরিসা। অত্তণো বঞ্চণবঅণং পমাণীকরিঅ অকৃখিতাএ বাহজনগীদসদহীদচিত্তাএ হরিণীএ বিঅ এদং ন বিণ্ণাদং।'

পুরুষদিগকে বিশ্বাস করিতে নাই। শঠের প্রবঞ্চনাপূর্ণ বাক্য বিশ্বাস করিয়া প্রতারিত হইয়াছিলাম। ব্যাধসঙ্গীতমুগ্ধচিত্ত হরিণীর ন্যায় আমি ইহার শঠতা পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই। তিনিই এক দিন অনুতপ্ত হইয়া বলিয়াছিলেন—

'আমি শিষ্টাচার লঙ্ঘন করিয়া প্রভুর নিকট অপরাধ করিয়াছি।' স্বামী অন্যের প্রতি অনুরক্ত, ইহা জানিয়াও স্ত্রীর অভিমান বা অসন্তোষ প্রকাশ অপরাধ—ইহাই ভারতীয় নারীর অভিমত। পতির কল্যাণের জন্য, পতির সুখের জন্য আপনার সর্ব্বস্ব বিসর্জন দিতেও তাহার কোন কুণ্ঠা নাই। তাই অন্তরের সকল বেদনা গোপন করিয়াও অগ্নি-মিত্রের মহিষী ধারিণী স্বামীর হস্তে অবগুণ্ঠনবতী মালবিকাকে অর্পণ করিয়া বলিয়াছিলেন—'অজ্জউত্তো দাণিং ইমং পড়িচ্ছদু—

'আর্য্যপুত্র, ইহাকে গ্রহণ করুন।' স্বামীর সুখের জন্য স্ত্রীর এই অপূর্ব্ব ত্যাগ অন্য দেশের সমাজে বিরল। কিন্তু কালিদাস ভারতের কবি। ভারতীয় নারীর আদর্শ তাঁহার অবিদিত নহে। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকে নববধূ শকুন্তলার প্রতি কণ্বের যে উপদেশ—

'কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে,
ভর্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ।' ইত্যাদি
(অভিঃ শকুঃ, ৪র্থ অঙ্ক)

'সপত্নীদের সহিত প্রিয় সখীর ন্যায় ব্যবহার করিবে, রুষ্ট হইয়া স্বামী-বিপ্রকৃত হইলেও বিপরীত আচরণ করিবে না' ইত্যাদি, তাহা চিরন্তন আদর্শবাণীর প্রতিধ্বনি মাত্র। তাই কালিদাসের প্রতিটি নারীচিত্রের মধ্য দিয়া ভারতের আদর্শ নারীর চিত্র সম্পূর্ণরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

পঞ্জিকা-সংস্কারের কথা

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বাগল

বর্ত্তমান ভারত-সরকারের শিল্প-বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের ভারতীয় পঞ্জিকা সংস্কার কমিটি পঞ্জিকা সংস্কারের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। নয়া দিল্লীতে গত ২১শে হইতে ২৩শে ফেব্রুয়ারী (১৯৫৩) পর্য্যন্ত কমিটির প্রথম বৈঠক শেষ হয়। কমিটির সভ্যগণ একমত হইয়া প্রস্তাব করেন যে, সমগ্র ভারতের জন্য বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে একটি জাতীয় সৌরপঞ্জী থাকিবে। ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য 'সৌরপঞ্জী'র সহিত চান্দ্রপঞ্জিকা যোগ করিয়া দেওয়া উচিত হইবে। বর্ত্তমান 'মহাবিষুব সংক্রমণ' তারিখ ২১শে মার্চ্চের পর দিন। এই দিন হইতে সায়নমতে নববর্ষ গণনা করা হইবে। এই সায়ন বর্ষ প্রবর্ত্তন সম্পর্কে গত বৎসর* 'যুগান্তরে' "প্রাচীন ভারতের ঋতুচক্রাবর্ত্তন" প্রবন্ধে কতক আলোচনা করিয়াছিলাম। বর্ত্তমান সময়ে পঞ্জিকা-সংস্কার বিষয় আরও অধিক আলোচিত হওয়া আবশ্যক। কাজে কাজেই সংস্কারের কারণসহ কতক ইতিবৃত্ত দেওয়া হইল।

অয়নগতিবশতঃ ভারতবর্ষের বর্ষারম্ভ ও ঋতুর মুখ অনেক বার ঘুরিয়া পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই কারণেই স্থির নক্ষত্র-তালিকার প্রারম্ভস্থানও বার বার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাহার নিদর্শন আমরা বৈদিক কৃষ্টির ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যে পাইতেছি। রাশিকৃত নক্ষত্রসমষ্টি লইয়া রাশিচক্র কল্পিত হইয়াছে। এই রাশিচক্রকে প্রায় স্থির বলা চলে। বহু বর্ষেও উহার কোন অনুভূতিগম্য গতি লক্ষ্য করা যায় না। এই রাশিচক্রের উপরে বিষুবের বার্ষিক ৫০ সেকেণ্ড করিয়া মৃদুভাবের বক্রগতি হয়। অয়নগতির আবর্ত্তন সম্পূর্ণ রাশিচক্রে (৩৬০°) ২৫৯২০ সৌরবর্ষে শেষ হয়, কাজেই ২৫৯২০ সৌরবর্ষে এক সৌরবর্ষ বৃদ্ধি পায়। এই এক বর্ষের সংশোধন করিয়া 'বাস্তব সায়নবর্ষ' গণনা করিয়া লইতে হয়। অয়নগতি সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত দেখা যায়। কিন্তু বর্ত্তমান জ্যোতির্বিজ্ঞানিগণ প্রায়ই একমত হইয়া উহার বার্ষিক মধ্য-গতির মান ৫০ সেকেণ্ড ধরিয়াছেন। অয়নগতি যদি না থাকিত তাহা হইলে বর্ষ ও ঋতুর মুখ চিরকাল একই নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকিত। কোনই পরিবর্ত্তন হইত না। অয়নগতির জন্যই সূর্য্যের 'মহাবিষুব সংক্রমণ'-স্থান স্থির নক্ষত্রস্থান হইতে পিছাইয়া রাশিচক্রের বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন নক্ষত্রে, মহাবিষুব সংক্রমণ হইয়া সায়ন বর্ষারম্ভ হয়। সূর্য্যের মহাবিষুব সংক্রমণ স্থানে অবস্থান হইতে এবং ঐ স্থান হইতে দূরে অবস্থানভেদে ঋতুর মুখ ঘুরিয়া পরিবর্ত্তন হয়। স্থির মেষ-ক্রান্তিপাতে অশ্বিনী নক্ষত্রে, সূর্য্যের অবস্থান হইতে সকল সময় ঋতুর আরম্ভ হয় না। যখন ঐ স্থানে সূর্য্যের মহাবিষুব সংক্রমণ হয় তখনই সায়ন ও নিরয়ন বর্ষ, মাস ও ঋতুর ঐক্য থাকে। কিন্তু মহাবিষুব সংক্রমণ-স্থান প্রায়ই স্থির নক্ষত্র-স্থান হইতে পিছাইয়া সায়নবর্ষ ও ঋতুর মুখ ঘুরিয়া পরিবর্ত্তন হয়। অয়নগতি ২১৬০ সৌরবর্ষে একরাশি (৩০° × ১২ বর্ষ) পিছাইয়া, ১ মাস পরে মহাবিষুব সংক্রমণ হইয়া সায়নবর্ষের পরিবর্ত্তন হয়। এই পরিবর্ত্তনের সহিত ঋতুর মুখ ঘুরিয়া যায়।

বৈদিক ঋষিগণ অয়নগতির জন্য সময় সময় আবশ্যকবোধে তিন রকম বর্ষ ব্যবহার করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন। যথা—চান্দ্রবর্ষ, নাক্ষত্র বা নিরয়নবর্ষ, অয়নান্ত বা সায়নবর্ষ। তাঁহারা যজ্ঞ করিবার জন্যই বর্ষ ও ঋতুর যথাযথ অবস্থান নির্ণয় করিতেন। যজ্ঞ এবং বর্ষ তাঁহাদের কাছে একই অর্থবোধক ছিল। বর্ত্তমানে 'মহাবিষুব সংক্রমণ' পূর্ব্বের স্থির মেষ রাশির প্রথম অশ্বিনী নক্ষত্রে হয় না। বক্রগতিতে ঐ স্থান হইতে মহাবিষুব সংক্রমণ মীনরাশির ২৩° উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে আসিয়াছে, তাহাতে পূর্ব্বের নির্দ্দিষ্ট ১লা বৈশাখ হইতে ২৩ দিন পিছাইয়া ৭ চৈত্র (২১ মার্চ্চ) মহাবিষুব সংক্রমণ হইতেছে। তাহাতে সায়নবর্ষ ৮ই চৈত্র আরম্ভ হয়। অথচ নববর্ষ গণনা বর্ত্তমানেও ১লা বৈশাখ হইতেছে। এই বৈষম্য-ভাবের জন্যই পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট মাসের তুলনায় ঋতুর অনৈক্য দেখা যায়। এই নিয়মে পূর্ব্বের মাস নির্দ্দিষ্ট রাখিয়া সায়ন-বর্ষ পিছাইলে মাসের সহিত ঋতুর বিপর্য্যয় অনিবার্য্য হইবে, ভারতের জনগণের প্রাণশক্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর ঋতুসকলের আশ্চর্য্যজনক প্রভাব বিদ্যমান আছে। ঋতুর প্রভাব সূর্য্যের মহাবিষুব সংক্রমণ-স্থানে অবস্থান হইতে, এবং তাহার দূরত্বভেদে হয়। ভারতীয় চরিত্রের বিকাশ, তাহার জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ হইতে অর্থ নৈতিক সমস্যার সমাধান যাবতীয় বর্ষচক্র এবং ঋতুচক্রের আবর্ত্তনে মহাবৈচিত্র্যভাব আনয়ন করে। বাস্তব দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে বর্ষ ও ঋতুর অনৈক্যে ঐ সকল ভাবের বিকল্প আনয়ন করিতেছে, কাজেই বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বর্ত্তমান সময় সায়নবর্ষ প্রবর্ত্তন করিয়া ঋতুর ঐক্য রক্ষা করা আবশ্যক।

আমাদের বর্ষমাস এবং ঋতুগণনা ইত্যাদি চন্দ্র সূর্য্যের আবর্ত্তন হইতে করা হয়। সূর্য্যগতি হইতে সৌরমাস, চন্দ্রের গতি হইতে চান্দ্রমাস গণিত হয়—সৌরমাসের গড় দিন-সংখ্যা ৩০ দিন; বর্ষের গড়সংখ্যা ৩৬৫ দিন। সৌরমাসের

* 'যুগান্তর', ১১ মে ১৯৫২

ব্রহ্মদেশের সিংকালিঙে প্রধানমন্ত্রী শ্রীজবাহরলাল নেহ্‌রু কর্তৃক বর্ম্মী বাহিনীর একটি 'গার্ড অব অনার' পরিদর্শন
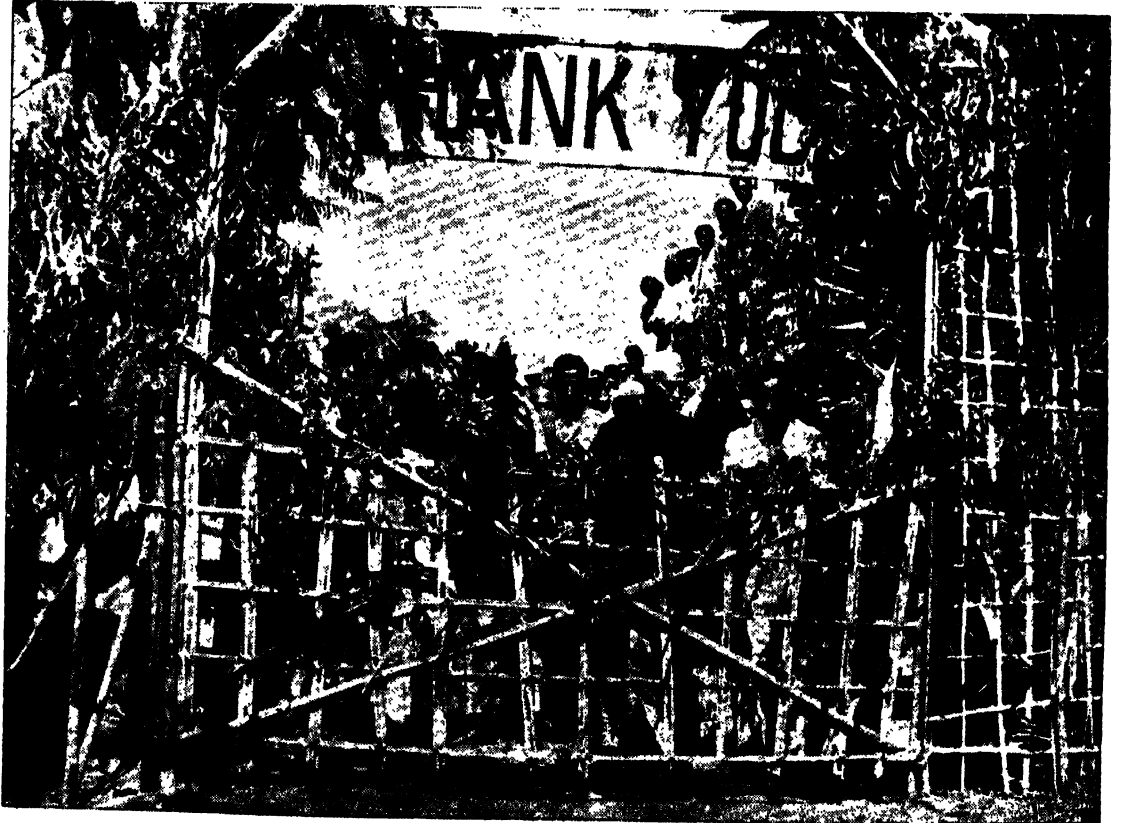
শ্রীজবাহরলাল নেহ্‌রু কর্তৃক লুসাই পাহাড়ে 'আইজল-লুংলে' রাজপথের উদ্বোধন

জাপানী প্রথায় ধানের চাষ

'চুঁচুড়া, এগ্রিকালচার‍্যাল ট্রেনিং স্কুলে' জনৈকা স্ত্রীলোক কর্তৃক যন্ত্র-সাহায্যে ধানমাড়াই

'চুঁচুড়া, এগ্রিকালচার‍্যাল ট্রেনিং স্কুলে'র জনৈক ছাত্র জাপানী লাঙ্গল দ্বারা ধানচাষে রত

[পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার-বিভাগের সৌজন্যে

তুলনায় চান্দ্র মাসের গড় দিনসংখ্যা ২৯½ হয়, বর্ষে গড়-সংখ্যা ৩৫৪ দিন হয়। সৌরবর্ষ, চান্দ্রবর্ষ হইতে ১১ দিন কম। এই সংখ্যা সৌরবর্ষের সহিত যোগ করিয়া, 'সৌর-চান্দ্র বর্ষের' (Luni-solar year) ঐক্য রক্ষা করা হয়। 'মাঃ' শব্দ চন্দ্রবোধক, চন্দ্রের এক নাম 'মাসকৃত' হইতে মাস শব্দ সৃষ্টি হইয়াছে। পণ্ডিতগণের মতে ইংরেজী Moon হইতে Month শব্দ উদ্ভূত। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের প্রায় তিন ভাগ লোকে ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য চান্দ্রমাস ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রতিদিনকার ব্যবহারিক কর্ম্মে সৌরমাস ব্যবহার করা হইতেছে। এই 'সৌর-চান্দ্র' দুই কালমান হইতে নাক্ষত্র বা নিরয়ণ বর্ষ; অয়নান্ত বা সায়ন বর্ষ গণনা হয়। নাক্ষত্র বা নিরয়ণ বর্ষ কোন স্থির নক্ষত্র— যেমন, মেষরাশির ১ম অশ্বিনী-নক্ষত্র-স্থান হইতে সূর্য্যগতি আরম্ভ করিয়া পুনরায় ঐ স্থানে প্রবেশের সময়কে নাক্ষত্র বা নিরয়ণবর্ষ বলে।

অয়নান্ত বা সায়নবর্ষ : রাশিচক্রের সহিত বিষুবের সর্ব্বোচ্চ ছেদবিন্দু-স্থানে সূর্য্য-সংক্রমণকে মহাবিষুব সংক্রমণ বলে। ঐ মহাবিষুব সংক্রমণ-স্থান হইতে সূর্য্যগতি আরম্ভ করিয়া পুনরায় ঐ স্থানে পৌঁছিবার সময়কে অয়নান্ত বা সায়নবর্ষ বলে। নক্ষত্র স্থির, অতএব নাক্ষত্র বা নিরয়ণবর্ষও স্থির। অয়ন গতিশীল, অতএব অয়নান্ত বা সায়নবর্ষ সচল। নাক্ষত্রবর্ষের সূক্ষ্ম পরিমাণ ৩৬৫ দিন ৬ ঘ. ৯ মি. ৯·৭ সে. আর সায়নবর্ষের সূক্ষ্ম পরিমাণ ৩৬৫ দিন ৫ ঘ. ৪৮ মি. ৪·৫ সে. হয়। নাক্ষত্রবর্ষ হইতে সায়নবর্ষ ২০ মি. ২৩·৫ সে. কম হয়—এই নাক্ষত্রবর্ষকে যদি স্থির সময়ের মানদণ্ড ধরা যায়, তাহা হইলে দুই সহস্র বর্ষের কাছাকাছি ঋতুসকল এক চান্দ্র মাস (২৯½ দিন) পিছাইয়া পরিবর্ত্তিত হইবে। বৈদিক যুগের ঋষিগণ চান্দ্রবর্ষ, নাক্ষত্রবর্ষ এবং সায়নবর্ষ এই তিন প্রকার বর্ষই ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য আবশ্যকবোধে ব্যবহার করিতেন। কিন্তু ঋতুর ঐক্যবিধান করিয়া সায়নবর্ষই তাঁহারা অধিক ব্যবহার করিতেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

ভারতবর্ষে বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন রাজার প্রভাবে এই সৌর এবং চান্দ্রবর্ষ হইতে অনেক রকম বর্ষের প্রচলন হইয়াছিল। সেই বর্ষ সকল যথাক্রমে যুধিষ্ঠিরাব্দ, বিক্রমসম্বৎ, শকাব্দ, হিজিরা, বঙ্গাব্দ, ফসলী, বিলায়তী বা আমলীবর্ষ। এই বর্ষসকল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বর্ত্তমানে চলিতেছে। রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব-সময় যুধিষ্ঠিরাব্দ; বিক্রমাদিত্যের সময় বিক্রমসম্বৎ; শালিবাহন রাজা কর্ত্তৃক 'শক' জাতিকে পরাভূত করিবার পর শকাব্দ প্রবর্ত্তন করা হইয়াছিল। মুসলমান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হজরত মহম্মদের মক্কা হইতে মদিনা পলায়নের তারিখ হইতে চান্দ্র হিজিরা বর্ষের প্রচলন হইয়াছিল। মুসলমানগণ এই হিজিরা বর্ষ হইতে ধর্ম্ম উৎসব করিয়া থাকেন, হিজিরা বর্ষের গড় দিনসংখ্যা ৩৫৪ দিন, সৌরবর্ষের গড় দিনসংখ্যা ৩৬৫ দিন। বাদশাহ আকবর ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী ২।৩ রবি ৯৬৩ হিজিরা সনে সিংহাসন আরোহণ করিয়া রাজকার্য্যের অসুবিধা দূর করিবার জন্য হিজিরা চান্দ্রবর্ষকে সৌরবর্ষে পরিণত করেন। এই সৌরবর্ষে চান্দ্র হিজিরা বর্ষ সংযোগ রাখিয়া মুসলমানগণের ধর্ম্মানুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। তারপর এই পরিবর্ত্তিত সৌরবর্ষ হইতে ভারতবর্ষে নানারকম বর্ষ প্রবর্ত্তিত হয়। যথা—বঙ্গাব্দ, ফসলী, বিলায়তী বা আমলীবর্ষ। আকবরের রাজ্যাভিষেক, চান্দ্র হিজিরা ৯৬৩কে আরম্ভ ধরিয়া বঙ্গাব্দ, ফসলী এবং বিলায়তী সন গণিত হইয়াছে। বঙ্গাব্দ ১লা বৈশাখ, ফসলী চান্দ্র ১লা আশ্বিন এবং বিলায়তী সন সৌর ১লা আশ্বিন হইতে গণিত হয়। এইজন্য বঙ্গাব্দ, ফসলী ও বিলায়তী একই ৯৬৩ হিজিরা হইতে গণিত হইলেও বঙ্গাব্দ, ফসলী ও বিলায়তীবর্ষের কয়েক মাসের পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। এই সকল বর্ষ যাবতীয় সৌরে পরিবর্ত্তিত হিজিরা সন হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। আকবর এই বর্ষসকলকে এক কথায় Tarikh Elahi অর্থাৎ বড় অব্দ বলিতেন। এই বিষয়—*Book of Indian Eras* (1883) গ্রন্থের ৮২ পৃষ্ঠা হইতে কতক প্রমাণ দেওয়া হইল :

"The Fasli era owes its origin to Akbar's love of innovation. It should properly be dated from the time of his own accession or the '2nd Rabiussani' in the Hijra year 963 or 14th February, 1556 A.D. but the actual solar reckonings of the Fasli system in Bengal begins with the 1st Baisakh of the Hindu solar year. It is altogether a mongrel era the first 963 years being purely lunar ones of the Hijra calendar after which the years are purely solar ones. The Bengali *sanh* beginning with the 1st of the Hindu 'Baisakh,' the Fasli of Northern India with the 1st of the lunar 'Aswini' and the Vilayati with 1st of the solar Aswins."

বর্ত্তমানেও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এই সকল বর্ষের ব্যবহার চলিতেছে। এক অখণ্ড জাতির পক্ষে নানারকম বর্ষ ব্যবহার কোন প্রকারেই সমীচীন নয়। কারণ একই ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে থাকিয়া নানারকম বর্ষ ব্যবহারে মানবীয় ভাবের আদান-প্রদানে দারুণ বৈষম্য থাকিয়া যায়। তাহাতে জাতির সংহতি-শক্তি শিথিল হইয়া পড়ে। বর্ত্তমান স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রীয় কর্ণধারগণের পক্ষে এই বৈষম্য ভাব জীয়াইয়া রাখা সঙ্গত নয়। কাজেই বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে সমগ্র ভারতের জন্য বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে একটি জাতীয় সৌর-পঞ্জিকা গণনা করিয়া ২১ মার্চ্চের পরদিন হইতে বাস্তব সায়ন বর্ষ প্রবর্ত্তন আবশ্যক।

প্রাচীন বৈদিক যুগের বর্ষারম্ভের পরিবর্ত্তনে দেখানো যাইতেছে যে, ঋগ্‌বেদের সময় খ্রীষ্টপূর্ব্ব ছয় হাজার বর্ষে, পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে, মহাবিষুব সংক্রমণ-সময় হইতে কৃত্তিকা-কাল খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩ হাজার বর্ষ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান সময়ের নাক্ষত্র মাসের নাম পাওয়া যায় না। তখন ঋতুযুক্ত মাস মিলে। শতপথব্রাহ্মণে, ষড়ঋতু মাসের নাম আছে। যথা—

১। মধু-মাধববসন্ত ঋতু। এই সময় বনস্পতিসকল নবপল্লবে, পুষ্পে সজ্জিত হয়। ২। শুক্র (পরিষ্কার) -শুচি (নির্ম্মল)=গ্রীষ্ম। এই সময় সূর্য্যরশ্মি প্রখর হয়। ৩। নভস্-নভস্য=বর্ষা—মেঘ জল বর্ষণ করে। ৪। ঈষ-উর্জ্জ (খাদ্য)=শরৎ—এই সময় ধান্য জন্মে। ৫। সহস্-সহস্য=শীত—হিমে প্রাণীসকলকে নিজ শক্তিতে সহনশীল করায়। ৬। তপস্-তপস্য=হেমন্ত ঋতু। বৃক্ষাদি পত্রসজ্জা ত্যাগ করিয়া তপঃমূর্ত্তি ধারণ করে।

এই সকল অর্থে বিশেষ ভাবে বুঝা যায় যে, বৈদিক যুগে বর্ত্তমানের প্রচলিত নাক্ষত্র মাস ছিল না। ঋতুযুক্ত মাসই ছিল। প্রাচীন বৈদিক যুগে মাত্র কয়েকটি নক্ষত্রের নামকরণ করা হইয়াছিল। যথা—অঘা (মঘা), অর্জ্জুনী (ফল্গুনী) মৃগশিরা, মৃগব্যাধ ইত্যাদি। তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৪-৪-১০) ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (১-৫-১) প্রথমে নক্ষত্র-সকলের নামকরণ করা হইয়াছিল। বালগঙ্গাধর তিলকের মতে উহার সময় খ্রীষ্টপূর্ব্ব তিন হাজার বর্ষ। তখন কৃত্তিকা নক্ষত্রে মহাবিষুব সংক্রমণ হইয়াছিল। এই সময় পুনর্ব্বসু নক্ষত্র হইতে অয়ন পিছাইয়া কৃত্তিকা নক্ষত্রে আসায় নক্ষত্র-তালিকার আরম্ভ কৃত্তিকা হইতে হইল। তাহার নিদর্শন আমরা বর্ত্তমান সময়ও ফলিত জ্যোতিষের নাক্ষত্রিকী দশা-গণনায় পাইতেছি। ফলিত জ্যোতিষে 'কৃত্তিকা নক্ষত্র'কে প্রথম ধরিয়া দশারম্ভ গণিত হইয়া থাকে। কালক্রমে 'কৃত্তিকানক্ষত্র' হইতে অয়ন যে সময় পিছাইয়া মেষরাশির প্রথম অশ্বিনী নক্ষত্রে আসিয়া মহাবিষুব সংক্রমণ হইল, তখন আবার নক্ষত্র তালিকার পরিবর্ত্তন দেখা গেল। তখন অশ্বিনী নক্ষত্রই নক্ষত্র-তালিকায় প্রথম স্থান পাইল। বর্ত্তমানেও এই নিয়ম চলিতেছে। নক্ষত্র-তালিকায় অশ্বিনী নক্ষত্রই প্রথম বলিয়া গণ্য করা হইতেছে। অথচ মহাবিষুব সংক্রমণ, মেষরাশির অশ্বিনী-স্থান হইতে ২৩° পিছাইয়া মীন রাশির উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্রে আসিয়া মহাবিষুব সংক্রমণ হইতেছে। নক্ষত্র-তালিকার কোনই পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। পূর্ব্বে ১লা বৈশাখ অশ্বিনী নক্ষত্রে মহাবিষুব সংক্রমণ হইত, বর্ত্তমানে ৭ই চৈত্র উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্রে মহাবিষুব সংক্রমণ হইতেছে। মহাবিষুব সংক্রমণ-স্থানে সূর্য্যের অবস্থান হইতে ১৮০° বিপরীত নক্ষত্রে চন্দ্রের পূর্ণত্বলাভ হইতে নাক্ষত্র মাসের নাম হইয়াছে।

এই নিয়মে অশ্বিনী নক্ষত্রে সূর্য্যের মহাবিষুব সংক্রমণ-স্থানের ১৮০° বিপরীত বিশাখা নক্ষত্রে চন্দ্রের পূর্ণত্ব হইতে নাক্ষত্র মাসের নাম বৈশাখ হইয়াছে। নক্ষত্র স্থির; অতএব নাক্ষত্র মাসও যে স্থির একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অয়ন গতিশীল, অতএব সায়নবর্ষও গতিশীল। তাহা হইলে মাস পূর্ব্বে যেখানে ছিল, বর্ত্তমানেও সেইখানেই আছে। কিন্তু সায়নবর্ষ স্থির মাস হইতে ২৩ দিন সরিয়া আসিয়াছে। এই জন্য স্থির মাসের তুলনায় ঋতুসকলের কতক অনৈক্য হইতেছে। পূর্ব্ব-সংশোধনের নিয়মে বর্ত্তমানে উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্রকে নক্ষত্র-তালিকার আরম্ভ ধরিয়া নাক্ষত্র মাস এবং বর্ষঋতুর সংস্কার করা আবশ্যক। উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্রে, সূর্য্যের মহাবিষুব সংক্রমণের স্থান হইতে ১৮০° বিপরীত উত্তর ফল্গুনী নক্ষত্রে চন্দ্রের পূর্ণত্ব হইতে নাক্ষত্র মাসের নাম ফাল্গুন হয়। তাহাতে সায়ন নববর্ষের নাম বৈশাখ না হইয়া ফাল্গুন মাস হয়। এই নিয়মে নববর্ষের প্রথম মাস ফাল্গুন রাখিয়া সায়নবর্ষ ও ঋতুর ঐক্য রক্ষা করা যায় কিনা তাহা বিচার করা আবশ্যক। বৈদিক ঋষিগণ মহাবিষুব-স্থানের নক্ষত্র হইতে বর্ষারম্ভ গণনা করিতেন। তাহার প্রমাণ খ্রীঃ পূঃ চারি হাজার বর্ষে মৃগশিরা নক্ষত্রে 'মহাবিষুব সংক্রমণ' হইতে পাই। সূর্য্য মৃগশিরায় আসিলে বর্ষারম্ভ হইত বলিয়া বর্ষের নাম মৃগের অগ্রভাগ (শির) হইতে অগ্র-হায়ণ (বর্ষ) হইল। বর্ত্তমানে এই নিয়মে সূর্য্য মহাবিষুব সংক্রমণ-দিন উত্তর ভাদ্রপদে থাকে, কাজেই ঐ নক্ষত্রকে অবলম্বন করিয়া বর্ষের নাম হওয়া উচিত কিনা তাহা বিচার্য্য। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের (খ্রীঃ পূঃ ১২শ বর্ষ) এই নিয়মে বর্ষারম্ভ করা হইয়াছিল। তখন ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে সূর্য্যের মহাবিষুব সংক্রমণ-স্থানে অমাবস্যা হইতে বর্ষারম্ভ গণিত হইত।

ঐ সময় ঋতুসকল পূর্ব্বের তুলনায় প্রায় ১৪ দিন সরিয়াছিল। অতএব বর্ষারম্ভ পূর্ণিমা হইতে না ধরিয়া অমাবস্যা হইতে ধরা হইল এবং মাসের সহিত ঋতুর সামঞ্জস্য করা হইয়াছিল।

বৈদিক যুগের প্রারম্ভে উত্তরায়ণে মহাবিষুব সংক্রমণ-সময় হিমঋতুর আবির্ভাব হইতে ঋষিগণ হিমবর্ষ গণনা করিলেন। তখন বর্ষের নাম হিমবর্ষ রাখা হইয়াছিল। তাঁহারা দেবতার নিকটে শত হিম আয়ু কামনা করিতেন। তারপরে অয়ন গতিবশতঃ মহাবিষুব সংক্রমণ যখন হিম ঋতু হইতে পিছাইয়া শরৎ ঋতুতে পৌঁছিল তখন হইতে বর্ষের নাম শরৎ হইল। ঐ সময় রুদ্র নক্ষত্রে মহাবিষুব সংক্রমণ হয়। তখন রুদ্রযজ্ঞ করা হইত। 'রুদ্র নক্ষত্রের' বর্ত্তমান নাম আর্দ্রা। পুরাণে এই আর্দ্রা নক্ষত্রকে হৈমবতী বলে। হৈমবতী চিরতুষারাবৃত পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের কন্যা। ঋষিগণ

তখন দেবতার নিকটে শত শরৎ জীবিত থাকিবার প্রার্থনা করিতেন। এই শরৎবর্ষ হিমবর্ষের ৮ চান্দ্রমাস গত হইয়া নবমী তিথির সন্ধি-সময় আরম্ভ হইয়াছিল। এই সময় শরৎ-বর্ষের উৎসব হইত। বর্ত্তমানে বিজয়া দশমীর উৎসব প্রাচীন বৈদিক যুগের নব বর্ষারম্ভের স্মৃতি। বর্ত্তমানে নববর্ষের উৎসব আমরা ১লা বৈশাখ, অশ্বিনী নক্ষত্রে সূর্য্যের প্রবেশ-সময় করিয়া থাকি। বিজয়া দশমীর শারদ নববর্ষের স্মৃতি আমরা এখন ভুলিয়া গিয়াছি। বর্ত্তমানে সায়নবর্ষ ধরিয়া নববর্ষের বিচার করিলে, ১লা বৈশাখ না হইয়া ৮ই চৈত্র নববর্ষের উৎসব হওয়া উচিত। প্রাচীন যুগ হইতে বর্ত্তমান সময় অবধি বর্ষারম্ভ, ঋতুর পরিবর্ত্তন, সায়নবর্ষের সহিত ঋতুর ঐক্যসংস্কার বিষয় সাধারণ ভাবে আলোচনা করা হইল।

সৌর বর্ষের সংস্কার সম্পর্কে, দ্বাদশ গ্রেগরী এবং পারস্যের জ্যোতিবিদ্ ও কবি ওমর খৈয়ামের সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। কারণ উভয়ের বর্ষপঞ্জী-সংস্কার বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞানসম্মত। ইউরোপে ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, আগাষ্টাস্ সিজারের সংশোধিত জুলিয়াস পঞ্জী প্রচলিত ছিল। এই সময় পোপ ১২শ গ্রেগরী সৌরবর্ষ পঞ্জী-সংস্কার করিলেন। জুলিয়াস সিজারের মতে প্রত্যেক চারি বর্ষে এক দিন বৃদ্ধি ধরা হইত। তাহাতে সৌরদিন ২৩ ঘ. ১৫ মি. ২ সে.; ব্যবহারিক দিন ২৪ ঘণ্টা হইত। সৌরদিন হইতে ব্যবহারিক দিন ৪৫ মি. বৃদ্ধি হইত। অতএব চারি বর্ষে ব্যবহারিক একদিন যোগ করায় চারি বর্ষে ৪৫ মি. ভুল হইত। এই নিয়মে প্রত্যেক চারি শত বর্ষের তিন দিন ভুল হয়। সেই জন্য গ্রেগরী নির্দ্দেশ দিলেন যে, প্রত্যেক চারি শত বর্ষে তিনটি লীপ ইয়ার ধরিয়া সংশোধন করিতে হইবে। এই সংশোধনে চারি শত বর্ষে তিন দিন বাদ পড়িল। এই সংশোধনের পরেও সামান্য ভুল রহিল। এই ভুল তিন হাজার দুই শত বর্ষে মাত্র এক দিন হয়। গ্রেগরী কৃত সংশোধন ব্রিটেনে ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গ্রহণ করা হয় নাই। তাহার ফলে সংস্কারের পঞ্জীর তুলনায় ব্রিটেনের পঞ্জীতে মোট এগার দিন ভুল জমা হইয়াছিল। সুতরাং ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে এগার দিন ত্যাগ করিয়া ২রা সেপ্টেম্বরকে ১৩ই সেপ্টেম্বর ধরা হইল। বর্ত্তমানে ইউরোপে প্রায় সর্ব্বত্রই গ্রেগরী-সংস্কার পঞ্জী প্রচলিত আছে।

কিন্তু গ্রেগরীর পঞ্জিকা-সংস্কার হইতে ওমর খৈয়ামের সৌরপঞ্জী সংস্কার অধিকতর সূক্ষ্ম। পারস্য সম্রাট মালিকশাহ ১১শ খ্রীষ্টাব্দে ওমরকে হিজিরা চান্দ্র পঞ্জীর সহিত সৌরপঞ্জী সংস্কারের নির্দ্দেশ করিলেন।

জ্যোতিষী ওমর চান্দ্রপঞ্জীর সহিত সৌরপঞ্জীর সংস্কারের জন্য পারস্যের 'ইস্পাহান মানমন্দিরে' বসিয়া গগন পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা সৌরপঞ্জী গণনা করিলেন। তিনি মহাবিষুব সংক্রমণ-দিন ১৫ই মার্চ্চ শুক্রবার ১০৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ঐ গণনা শেষ করিলেন এবং ঐ দিন মধ্যাহ্ন হইতে দিবারম্ভ ও বর্ষারম্ভ ধরিলেন। ওমর সৌরবর্ষ ৩৬৫ দিন ৫ ঘ. ৪৯ মি. ধরিলেন। ইহা বর্ত্তমান সৌরবর্ষ হইতে মাত্র কয়েক সেকেণ্ড অধিক। ওমরের পূর্ব্বে মীনরাশিতে সূর্য্যের প্রবেশের সময় হইতে বর্ষারম্ভ গণিত হইত। ওমর উহা সংশোধন করিয়া সূর্য্যের মেষরাশিতে প্রবেশ সময় ১৫ই মার্চ্চ মধ্যাহ্ন হইতে দিনের আরম্ভ ধরিলেন। ঐ দিন ওমরের পঞ্জীর প্রথম দিন। তিনি বৎসরের ১২ মাসকে প্রথম দিকের ১১ মাস সমান ৩০ দিন গণিয়া শেষের মাসটিকে ৩৫ দিন ধরিলেন। তাহাতে সাধারণ বর্ষের দিন সংখ্যা ৩৬৫ দিন হইল, কোন ভগ্নাংশ থাকিল না। এই নিয়মে তিনি প্রত্যেক ৪র্থ বর্ষে শেষের (১২ সংখ্যক) মাস ৩৬ দিন ধরিয়া সেই বৎসরের দিনের সংখ্যা ৩৬৬ দিন পাইলেন। ওমরের পঞ্জীর ৩২ বর্ষে ৩৬৬ দিন থাকিলেও তাহাকে নির্দ্দিষ্ট ৩৬৫ দিন ধরিয়া লইলেন। এই নিয়মে তেত্রিশ বর্ষচক্রাবর্ত্তনে ৩৬৬ দিন গণিত হইল। ওমর এই তেত্রিশ বর্ষের একটি বর্ষপঞ্জী নির্দ্দিষ্ট ধরিয়া উহা হইতে ২৫টি সাধারণ বর্ষ, আটটি ৩৬৬ দিনের বৎসর ধরিলেন। এই নিয়মে দশ হাজার বর্ষে ৩৬৫·২৪২৪ সৌর দিন হয়। বর্ত্তমান প্রচলিত গ্রেগরী পঞ্জিকায় দশ হাজার বর্ষে ৩৬৫·২৪২৫ সৌর দিন হয়।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম নিয়মে দশ হাজার সৌরবর্ষে ৩৬৫·২৪২২ দিন হয়। ওমরের গণনায় দশ হাজার সৌরবর্ষে মাত্র দুই দিন ভুল থাকে। গ্রেগরী-সংস্কারে দশ হাজার বর্ষে তিন দিনের ভুল থাকে। কাজেই বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে গণনা করিলে গ্রেগরী-সংস্কার হইতে ওমরের বর্ষপঞ্জী-সংস্কার অধিক শুদ্ধ হইবে। ওমরের এই বর্ষপঞ্জী তাতার সম্রাটগণ বন্ধ করিয়া পুনরায় হিজিরা চান্দ্রপঞ্জী প্রচলন করিলেন। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে পার্শীগণের মধ্যে ওমরের সংশোধিত পঞ্জিকার প্রচলন আছে।

পঞ্জিকা-সংস্কারের মোটামুটি ইতিবৃত্ত দেওয়া হইল। ভারত-সরকারের পঞ্জিকা সংস্কার কমিটি এ সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন আশা করি।

গ্রন্থপঞ্জী:

১। আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি।
২। *The Arion—The Arctic Home in Vedas*—Tilak.
৩। *Book of Indian Eras*—Cunningham.
৪। *Encyclopedia of Astrology*—N. de Vore,

নবম দৃশ্য

[ভানু চৌধুরীর শয়ন-কক্ষ। মানদা বিছানা করিতেছিল। ভানুর প্রবেশ।]

ভানু। এই যে—মানদা। যাক—তবে তুমি যাও নি।

মানদা। টাকা না পেলে কি করে যাই বাবু। আর টাকা পেলে কেন যাব বলুন ?

ভানু। (পকেট হইতে দুইখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া মানদাকে দিল) তোমার মাইনে। (আর একখানি নোট বাহির করিয়া) রেশনের টাকা। (আর একখানি নোট বাহির করিয়া) বাজার।

[মানদার চোখ কপালে উঠিল।]

রমা কোথায় ?

মানদা। ছাদে পায়চারি করছেন। আজ একদানা ভাত মুখে দেন নি।. আমি ডেকে দিচ্ছি। আপনি একটু—

[ইঙ্গিত করিয়া মানদা চলিয়া গেল। ভানু তাহার বাহিরের পোশাক খুলিয়া রাখিয়া আয়নার সম্মুখে গিয়া চুল আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে গুন গুন করিয়া গাহিতে লাগিল—'হেসে নাও—দু'দিন বৈ তো নয়।'

রমা প্রবেশ করিল। বিছানায় গিয়া বসিল। ভানু চিরুণীটি রাখিয়া ধীরে ধীরে রমার সম্মুখে আসিয়া বসিল।]

ভানু। আমায় ক্ষমা করো রমা।

[ভানু রমার হাত ধরিল। রমা অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না।]

ভানু। কেঁদো না রমা, ওঠ। আনন্দ করো। আজ তোমার স্বামী রোজগার করে এনেছে। এই নাও।

[সে পকেট হইতে নোট বাহির করিয়া ক্রমাগত রমার গায়ে ছুঁড়িয়া দিতে লাগিল।]

রমা। (বাধা দিয়া) রাখো—রাখো—একি !

[সে নোটগুলি কুড়াইয়া লইল।]

ভানু। পুরো দু'হাজার। না, না—দেড়শ' টাকা কম আছে। কুড়ি টাকা ঝির মাইনে—দশ টাকা রেশন—দশ টাকা বাজার। মানদাকে দিয়েছি। আর একশ' দশ টাকার এই আংটিটা—তোমার জন্য।

[রমার হাত টানিয়া আনিয়া আংটি পরাইয়া দিল।]

তোমাকে আমার প্রথম দান। পছন্দ হয়েছে ?

রমা। খু-ব। কিন্তু এত টাকা এক দিনে রোজগার করলে। কিসে ?

ভানু। শেয়ার মার্কেটে। এমন আরো কত রোজগার হবে—তুমি দেখো। শোন—রাগ করে তো এখান থেকে চলে গেলাম। আকাশ-পাতাল কি ভাবতে ভাবতে হঠাৎ দেখি—গঙ্গার ধারে গিয়ে পৌঁচেছি। সামনে বসে আছেন—ছাই-ভস্ম মেখে এক সাধুবাবা। ইশারা করে ডাকলেন। কপালটা দেখলেন। হেসে বললেন—আরে বেটা গঙ্গায় ডুবে মরা কি এতই সোজা! তোকে যে সংসারে এখনো অনেক হাবুডুবু খেতে হবে। শেয়ার-মার্কেটটা ঘুরে বাড়ী যা। আরে বেটা—স্ত্রীভাগ্যে তোর ধন। স্ত্রীকে পুজো কর—সব হবে—তোর সব হবে। কিন্তু বেটা—হিসেব করে খরচ করবি। যে টাকা পাবি—তা দিয়ে আজই একটা মোটা রকমের জীবন-বীমা করে ফেল। নইলে বেটা—তোর টাকা—জোয়ারের জল—ভাটায় বেরিয়ে যাবে।

রমা। বলো কি ?

ভানু। আর বলো কি। কথাগুলো শুনে আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠলো। পায়ের ধুলো নিয়ে ছুটে গেলাম শেয়ার-মার্কেটে। গিয়েই দেখি—আমারই এক বন্ধু ওখানকার মস্ত বড় দালাল। খুলে বললাম তাকে—এই সাধুর কথা। শুনে বন্ধুটি আমার নামে শেয়ার ধরল। হুড়হুড় করে চলে এল আমার হাতে দু'হাজার টাকা।

রমা। বলো কি ?

ভানু। আর বলো কি! সাধুবাবার নাম স্মরণ করতে করতে.

তখনই ছুটলাম ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর আপিসে। তখন আপিস প্রায় বন্ধ হয়-হয়। মরিয়া হয়ে আমি ঢুকলাম। এজেন্টকে বললাম —দশ হাজার টাকায় লাইফ্ ইন্সিওর করব—জয়েণ্ট লাইফ। মানে আমি মারা গেলে—টাকাটা পাবে তুমি। আর আমার যদি কপাল পোড়ে—তোমার একটা কিছু হয়—তবে টাকাটা পাবো আমি।

রমা। (হাসিয়া) কপাল তোমার পুড়বে না। আমি মারা গেলে তুমি দশ হাজার পাবে—সঙ্গে সঙ্গে আর একটা বিয়ে করবে।

ভানু। (হাসিয়া) হাঁ—করব। তা করব।

রমা। (অভিমানভরে ভানুর প্রতি তাকাইয়া) হুঁ।

ভানু। (প্রতিধ্বনি করিয়া) হুঁ। কাজেই তোমাকে বাঁচতে হবে। শরীরের দিকে নজর দিতে হবে। ভালো খেতে-পরতে হবে। রাতদিন ঘ্যান্ ঘ্যান্ প্যান্ প্যান্ না করে একটু ফলে ফুলে ভরে ওঠ দেখি—যাতে চোখ দুটো আর না ফেরাতে পারি। নাও—ইন্সিওরের এই কাগজটায় তোমার সই লাগবে। সই দাও।

[ভানু কাগজপত্র বাহির করিয়া রমার সামনে ধরিল।]

এই যে—এইখানে—লেখ—র-মা-চৌ-ধু-রী।

[রমা সই করিতে লাগিল]

বাঃ—সুন্দর লেখা! চমৎকার।

—

দশম দৃশ্য

['আনন্দম্' ক্লাবের জলসাঘর। ভানু এবং অন্যান্য সভ্যরা ফরাসে বসিয়া আছেন। সুনন্দা দেবী এবং আরও কয়েকজন মহিলাও আছেন। ত্রিকাল বোস মঞ্চের উপর দণ্ডায়মান।]

ত্রিকাল। আমাদের 'আনন্দম্' ক্লাবের নিয়মমত আমাদের নবাগত বন্ধু ভানু চৌধুরী আমাদের আজকে গল্প শোনাবেন—তাঁর জীবনের পুথি থেকে।

ভানু। আমি?

ত্রিকাল। হ্যাঁ ভাই, তুমি।

সুনন্দা। বলুন ভানু বাবু, আপনার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় রাত্রির কাহিনী। আমাদের এখানে এই-ই নিয়ম।

[ঘন ঘন করতালি। ত্রিকাল বোস নামিয়া আসিয়া বসিলেন। ভানু মঞ্চে গিয়া দাঁড়াইল।]

ভানু। জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় রাত—আমার পক্ষে যেমন দুঃখের—তেমনি কৌতুকের। শুনুন তবে। ম্যানেজার ছিলাম কলকাতার এক বিখ্যাত ফার্মের। নাম বললে সবাই চিনবেন—ফার্মটিকেও—ফার্মের মালিকটিকেও। মালিকের দান-ধ্যানের খবর প্রায়ই ফলাও করে খবরের কাগজের প্রথম পাতায় ছাপা হয়। লোকে ধন্য ধন্য করে। সরকারকে ইন্‌কাম ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া নিয়ে এ হেন মালিকের সঙ্গে আমার এক দিন মতান্তর হ'ল। বললাম—ব্রিটিশ আমলে যা করেছেন—করেছেন। এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে, এটা ছাড়ুন। তিনি মুখে বললেন—তা বটেই তো—তা বটেই তো। সেইদিন সন্ধ্যারাতে তবিল তছরুপের মিথ্যে চার্জ্জ দিয়ে তিনি আমায় পুলিসের হাতে তুলে দিলেন। তাঁর দিকে অবাক হয়ে যেই তাকিয়েছি—মনে হ'ল আমার সামনে একটা শেয়াল দাঁড়িয়ে আছে। পুলিস-হাজতে বসে সেই রাত্রে যেন আমি তৃতীয় নয়ন লাভ করলাম। যার দিকে তাকাই—তাকেই মনে হয় একটি জন্তু। অবশ্য তার মধ্যে ভালমন্দ সবই দেখলাম। ভাল লোকদের মধ্যে দেখলাম—গরু, ভেড়া, ছাগল, গাধা—দু'একটি ভাল কুকুরও দেখলাম। কিন্তু বেশীর ভাগই দেখলাম—বাঘ, শেয়াল, কুমীর আর সাপ।

সুনন্দা। সুন্দরবনটা কলকাতার খুব কাছে। সেই জন্যেই হয় ত—

ভানু। তা হবে। দেখলাম রাতের অন্ধকারে মানুষবেশী জানোয়ারগুলোও ঘুরে বেড়াচ্ছে—কেবল চেষ্টা—কে কার রক্ত খাবে।

ত্রিকাল। Quite a correct picture, my boy. That's the world we live in. I congratulate you on the discovery.—এই হচ্ছে আমাদের সমাজের সত্যিকার ছবি।

ভানু। যাক, বিচারে আমার দু'বছর জেল হ'ল। সেই যে চাকরি গেল—জেল থেকে ছাড়া পেয়ে দুয়ারে দুয়ারে মাথা খুঁড়েও আর আমার চাকরি জুটল না। আমার কপালে কে যেন লোহা পুড়িয়ে লিখে দিয়েছে—"এ লোকটা চোর। এ লোকটা জোচ্চোর।" আশ্চর্য্য সেই মিথ্যা লিখন কিছুতেই আমি তুলে ফেলতে পারলাম না। আজও না—আজও না। মিথ্যাটাই আমার জীবনে সবচেয়ে বড় সত্য হয়ে দাঁড়াল।

[ভানু মঞ্চ হইতে নামিয়া মধ্যবর্ত্তী পথ দিয়া যাইতেছিল। ত্রিকালের নিকট পৌঁছিতেই তিনি তাহার হাত ধরিয়া আটকাইলেন ও উঠিয়া দাঁড়াইলেন।]

ত্রিকাল। কিন্তু সেজন্য দুঃখ করো না বন্ধু। অনুতাপও করো না। Rather rebel against this order of things. Pay them back in their own coin. হাত গুটিয়ে বসে হা-হুতোশ করলে—এক দিন দেখবে তোমাকেও পিষে মেরে ফেলেছে। না-না, মিথ্যা নয়। জগৎকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করার জন্যে ঋষিদের উদাত্ত আহ্বান ব্যর্থ হয়েছে। ব্যর্থ হয়েছেন—খ্রীষ্ট, বুদ্ধ, চৈতন্য। ব্যর্থ হয়েছেন—রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, গান্ধী। স্বর্গরাজ্য নেমে আসে নি। অধর্ম্মের অভ্যুত্থানই চলেছে—সগৌরবে—আজও। নিপীড়িত—নির্য্যাতিত—তোমার আমার কাছে আজ একমাত্র পথ—কণ্টকেনৈব কণ্টকম। শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।

[ডাইনিং রুমে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।]

খাবার ঘণ্টা বাজল। নইলে আজ আমি আরও কিছু বলতাম।

চল। Eat, drink and be merry—হেসে নাও দু'দিন বৈ ত নয়।

[সকলে খাবারঘরের দিকে চলিয়া গেল। কিন্তু একটু পরেই ভানুকে লইয়া সুনন্দা ফিরিয়া আসিল]

সুনন্দা। হাঁ—এই ঘরটাই বেশ নিরিবিলি আছে। মন খুলে কথা বলা চলবে। বসুন।

[নেপথ্যে বয়ের প্রতি]

হাঁ—আমাদের খাবার এখানে দাও।

[উভয়ে বসিয়া কথাবার্তা সুরু করিল। কথাবার্তার মধ্যে বয় আসিয়া তাহাদের খাবার রাখিয়া গেল। খাইতে খাইতে কথা হইতে লাগিল।]

সুনন্দা। প্রথম দর্শনেই বুঝেছিলাম—আপনি অসাধারণ। কিন্তু এত অসাধারণ তা ভাবতে পারি নি। কথা শুনতে শুনতে আপনাকে আমরা মাল্যদান করতেও ভুলে গেছি। [কবরী হইতে মালা খুলিয়া লইয়া ভানুর কণ্ঠে দিয়া] আমার এ মালা আপনার।

ভানু। সুন্দরীর হাতে এমন সুন্দর মালা আমি পেলাম এই প্রথম।

সুনন্দা। কেন আপনার বৌ নেই ?

ভানু। বৌ ? হাঁ—আছে। বিয়ে একটা করেছি বটে—কিন্তু সেও টাকার জন্যে। আমাদের জীবনে হাসি বলুন—উচ্ছাস বলুন—আনন্দ বলুন, যা কিছু—সব টাকা রোজগারের ফন্দী আর ফিকির।

[ভানু মালাটা টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিল।]

সুনন্দা। বিয়ে করেছেন টাকার জন্য ? আপনি তবে আপনার স্ত্রীকে ভালবাসেন না ?

ভানু। টাকা যদি থাকত—তবে অবশ্য এ মেয়েকে আমি বিয়ে করতাম না সুনন্দা দেবী।

সুনন্দা। টাকা থাকলে কাকে বিয়ে করতেন ভানু বাবু ?

ভানু। আজ যখন আমার টাকা নেই—সে আলোচনা করে লাভ নেই সুনন্দা দেবী। কিন্তু আপনি বিয়ে করেন নি কেন ? জীবনের এই ভরা-বসন্তে আজও আপনি একা কেন সুনন্দা দেবী ?

সুনন্দা। হয় ত আমার জীবন-দেবতা নিঃস্ব। এ ষ্টেশনে আসবার টিকিট কাটতে পারছেন না।

[সুনন্দা ও ভানু দুই জনেই হাসিয়া উঠিল।]

ভানু। কিন্তু প্রেম কি দুর্নিবার নয় ? তা কি টাকার বাধা মানে ?

সুনন্দা। আমাদের জীবনেরই একটা ঘটনা বলছি। আপনার প্রশ্নের উত্তর পাবেন।

ভানু। বলুন, বলুন।

সুনন্দা। আমার বাবা ছিলেন এক অধ্যাপক। দরিদ্র অধ্যাপক। অপরূপ রূপসী এক সহপাঠিনীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়।

ভানু। লভ ম্যারেজ ?

সুনন্দা। লভ ম্যারেজ। বাবা মাইনে পেতেন ১২৫৲। ছোট সংসারটাও ভাল করে চলবার কথা নয়। তবে তাঁদের মনে ছিল প্রেম। তাই জীবনে ছিল না দুঃখ।

ভানু। প্রেম দুর্নিবার। টাকার বাধা সে মানে না।

সুনন্দা। মানে কিনা দেখুন। এক লক্ষপতি ছিলেন কলেজ কমিটির প্রেসিডেণ্ট। কলেজের এক প্রাইজের দিনে বাবার সঙ্গে তিনি মাকে দেখেন। আলাপ হ'ল। প্রেমের সংসারে রাহু এল। প্রমোশনের প্রলোভন বাবা তুচ্ছ করলেন, তখন সুরু হ'ল নির্যাতন। মা আমাকে কোলে নিয়ে বাবাকে বললেন—"এখানে থাকলে—তোমার জীবন যাবে। চল—আজই আমরা পালিয়ে যাই দেশে।"

ভানু। তার পর ? পালিয়ে গেলেন ?

সুনন্দা। না। বাবা রাজী হলেন না। বললেন—'এখানে আইন আছে, পুলিস আছে, সরকার আছে। এখানে যদি রক্ষা না পাই—গ্রামে দেশে—সেখানে কে রক্ষা করবে। বাবা পুলিস কমিশনারকে খবর দিতে গেলেন। পুলিস কমিশনার পিঠ চাপড়ে বললেন 'কিছু ভয় নেই।' বাড়ীতে ফিরে দেখেন—আমি ঘুমিয়ে আছি, মা নেই।

ভানু। ও ! তবে টাকারই জয় হ'ল।

সুনন্দা। টাকারই জয় হ'ল।

ভানু। তার পর ? [নেপথ্যে ঘণ্টাধ্বনি।]

সুনন্দা। ঐ জলসার ঘণ্টা বাজল। আজ আর বলা হ'ল না।

মঞ্চে নৃত্যরতা সুনন্দা

[রঙ্গমঞ্চ অন্ধকার হইয়া গেল। আলোকিত হইলে দেখা গেল সভ্যগণ করাসে উপবিষ্ট। মঞ্চে নৃত্যরতা সুনন্দা]

একাদশ দৃশ্য

[ভানু শয়নকক্ষে বসিয়া লাইফ ইন্সিওরের পলিসি দেখিতেছিল। রমা চা লইয়া আসিল।]

রমা। এত মনোযোগ দিয়ে কি দেখছ?

ভানু। লাইফ ইন্সিওরের পলিসিটা আজ এই সকালের ডাকে এলো। দশ হাজার টাকার পলিসি—নাও তুলে রাখো। হারায় না যেন।

রমা। যাই বলো—ওটা অলক্ষুণে জিনিষ—ও আমি ছোঁব না। রাখতে হয় তুমি রাখো।

ভানু। অলক্ষুণে জিনিষ! তুমি আমি যে মরি—সঙ্গে সঙ্গে দশ হাজার টাকা। কত বড় একটা বল-ভরসা। আরে, মরতে তো এক দিন হবেই। বলি—আমরা ত কেউ আর অমর নই।

রমা। মরব—আমিই মরব। হার্টের অসুখটা এখানে এসে আমার বেড়েই গেল। তুমি সারাদিন বাড়ী থাকো না। এক এক সময় এমন হয়—

ভানু। ডাক্তার সেন ওপরের ফ্লাটে থাকেন বলেই আমি নিশ্চিন্ত মনে বাইরে কাজের ধান্দায় ঘুরি। তোমাকে ঠিক মেয়ের মতন দেখছেন। বাড়াবাড়ি হলে—ওঁকে তুমি খবর দিলেই পারো।

রমা। তা দিই বৈ কি। কিন্তু এই পোড়ো বাড়ীতে একলা থাকতে কেমন আমার গা ছম ছম করে।

[মানদা চায়ের কাপ ইত্যাদি লইয়া যাইতে আসিয়াছে। রমার এই কথায় সে বলিল—]

মানদা। [ভানুকে] আপনি বাড়ী ফিরতে রাত করবেন না বাবু। মা একলা থাকতে ভয় পান। আমার বাড়ী যেতে অত রাত হয়—আমারও ত কাচ্চা-বাচ্চা আছে।

ভানু। কাজের ধান্দায় ফিরতে হয়। রাত হয়ে যায়। আচ্ছা দেখব।

[মানদা চলিয়া গেল। ভানু উঠিয়া একটা জামা গায়ে দিল।]

রমা। কি যে তোমার কাজ হচ্ছে—তাও তো বুঝি না।

ভানু। এমন কপাল। এত চেষ্টা করছি—কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। সাধুবাবারও আর দেখা নেই। আজ আবার বাড়ী-ভাড়া শুনতে হবে।

রমা। বাড়ীটা ছাড়ো। এত বড় একটা পোড়ো বাড়ী। এই বাড়ীটাই অপয়া।

ভানু। ও। তা হলে তুমিও শুনেছ?

রমা। কি?

ভানু। এ বাড়ীতে একটি মেয়ে নাকি গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল।

রমা। না, তা ত শুনি নি। কে মরেছিল? কবে? কোথায়? কোন্ ঘরে?

ভানু। তাতে কি—ওসব বাজে। ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। চলি। দুর্গা, দুর্গা।

রমা। ওগো—তুমি যেও না। আমার ভয় করছে।

ভানু। কি বিপদ! একশ' বছরের পুরনো বাড়ী। খুব কম করে জন ত্রিশেক লোক এ বাড়ীতে—হয়তো এই ঘরেই মরেছে। কিন্তু আমি ত তাই বলে কাজকর্ম্ম ছেড়ে বাড়ীতে বসে থাকতে পারি না। না, না—ওসব নিয়ে মাথা খারাপ করো না। আমি ফিরব—শীগগিরই ফিরব…

[ভানুর প্রস্থান। রমা দুই হাতে বুক চাপিয়া বিছানায় বসিয়া পড়িল। ছাদের কড়ি-কাঠের দিকে নিবদ্ধ-দৃষ্টি হইয়া কাঁপিয়া উঠিল। চোখ বুঁজিয়া বিছানায় এলাইয়া পড়িল। মঞ্চ অন্ধকার হইয়া গেল. ক্ষণপরে আলোকিত হইলে দেখা গেল—শয্যায় চাদরে আপাদ-মস্তক আচ্ছাদিতা রমা। মানদা পাশে বসিয়া আছে। ভানু দরজায় মৃদু করাঘাত করিল। মানদা গিয়া দরজা খুলিয়া দিল।]

ভানু। [মৃদু কণ্ঠে মানদাকে] কেমন আছে?

মানদা। কৈ আর ভালো। আজ সারাদিনই কেবল ভূতের ভয়ে কাঁপছেন। বুকের যন্ত্রণাটাও বেড়ে গেছে। এই সবে একটু ঘুমের মতো হয়েছে।

ভানু। ডাক্তার এসেছিলেন?

মানদা। হাঁ—এসেছিলেন।

ভানু। কি বললেন?

মানদা। ইংরেজীতে কি সব বললেন—ছাই বুঝলাম না।

ভানু। ওষুধ দিয়ে গেছেন?

মানদা। হাঁ—দিয়েছেন।

ভানু। আমি খেয়ে এসেছি—তুমি বাড়ী যেতে পার।

[মানদা চলিয়া গেল। ভানু পোশাক খুলিয়া রাখিল এবং রমার ঘুম ভাঙাইবার উদ্দেশ্যে একটি ভারী বই হাতে লইয়া ইচ্ছা করিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল। রমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল।]

রমা। কে? কে ওখানে?

ভানু। আমি—আমি।

[ভানু রমার কাছে গিয়া বসিল।]

রমা। ওগো—আমাকে তুমি বাবার ওখানে পাঠিয়ে দাও। এখানে একলা থাকলে আমি বাঁচব না।

ভানু। সবাই তাই বলছে বটে। বাড়ীটা ভাল নয়। রাত্রে নাকি কি সব—যাক, তুমি একটু সেরে উঠলেই আমি এ বাড়ী ছেড়ে দেব।

রমা। এ বাড়ী ছাড়লেই আমি সেরে উঠব। তুমি আমায় নিয়ে চল—এখখুনি চল। চুপ—ঐ শোন—

ভানু। কৈ? হুঁ। না—ও কিছু নয়। তুমি একটু ঘুমোও—একটু ঘুমোও রমা।

রমা। তুমি কিছু শুনলে না? কেমন একটা গোঙানির শব্দ?

ভানু। ও কিছু না—যত সব বাজে—নাও, এখন একটু চোখ বোজ। আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

রমা। তুমি আমার কাছ থেকে যাবে না বলো?

ভানু। আমি ত কাছেই রয়েছি—সারা রাত কাছেই থাকব। তুমি ঘুমোও রমা।

[নীরবতা। ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক। পেচকের চীৎকার। কুকুরের ঘেউ। দেয়ালঘড়ির টিক্ টিক্—সবকিছু মিলিয়া একটা ভয়াবহ—থমথমে ভাব সৃষ্টি করিল। মঞ্চ অন্ধকার হইয়া গেল।

পুনরায় আলোকিত হইলে দেখা গেল—রমা ঘুমাইতেছে, অস্বাভাবিক, অতিদীর্ঘ একটি নারীমূর্ত্তি দরজায় দণ্ডায়মান। নারীমূর্ত্তিটি অট্টহাস্য করিয়া উঠিল—'হাঃ হাঃ হাঃ।'

'হাঃ হাঃ হাঃ"

রমার ঘুম ভাঙিয়া গেল—ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল—অগ্রসরমাণ ঐ বিকট মূর্ত্তিটি দেখিয়া সে তখনই আর্ত্তনাদ করিয়া শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। বলা বাহুল্য, মূর্ত্তিটি আর কেহ নহে—ভানু স্বয়ং। দেখা গেল একটি কলসীর হইয়াছিল। ঊর্দ্ধবাহু হওয়াতে ক... বিকট বদন। ঐ ... ছিল। চকিতে ভানু কলসী মুক্ত করিয়া লইল। ... রাখিল—সাড়ীটি সাজাইয়া ... ছুটিয়া গেল—রমার শয্যায়।]

ভানু। রমা! রমা! রমা!

[কোন সাড়া না পাইয়া ভানু রমার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিল—তাহাতে জীবনের স্পন্দন নাই। ভা... ছুটিয়া জানালায় গেল। চীৎকার করিতে লাগিল।]

ডাক্তার সেন! ডাক্তার সেন! শীগগির আসুন। আমা স্ত্রীর বোধ হয় হার্টফেল্ হয়েছে। ডাক্তার সেন! ডাক্তার সেন ডাক্তার সেন!

[যবনিকা পড়িল]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

['আনন্দমে'র একটি নিভৃত কক্ষ। সন্ধ্যা। ত্রিকা... ও ভানু আলাপ করিতেছিল।]

ভানু। আপনাদের সাহায্যেই claim-টা এত সহজে settle হয়েছে।

ত্রিকাল। হবেই—হবেই—হতে বাধ্য। ক্লাবের ক... অবশ্য তুমি ভোল নি—শতকরা পঁচিশ টাকা।

ভানু। দশ হাজারের ২৫%—এই আড়াই হাজার টাকা যেমন নিয়ম—আমি নগদই দিচ্ছি।

[ভানু এক বাণ্ডিল নোট ত্রিকালের হাতে দিল।]

ত্রিকাল: But I hope this is only the beginning of an end. এই শেষ নয়—এ শুধু আরম্ভ। কি বল?

ভানু। না, না—একটু দম নিতে দিন। তার সেই শেষ চীৎকারটা আমার কানে এখনো বাজছে।

ত্রিকাল। Don't be sentimental, my boy. ব্যবসাতে হৃদয়ের কোন দাম নেই—স্থান নেই।

ভানু। না, না—ভাববেন না—আমি অনুতাপ করছি। ওর বাপ ভেজাল সরষের তেল খাইয়ে বেরিবেরিতে অন্ততঃ হাজার লোক শেষ করেছে। এটা তার nemesis।

ত্রিকাল। As I told you—pay them back in their own coin—শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ। শাস্ত্রের কথা। এ না হলে আজকের এ দুনিয়ায় তুমি দাঁড়াতে পারবে না। ওদের পায়ের চাপে তুমি পিষে মরবে।...তোমার এখন তিরিশ চলছে না?

[পুনরায় ফোনে বলিতে লাগিলেন ।]

না, না, লভ ম্যারেজ-ট্যারেজ নয়···আপনি শিগ্‌গীর এক বার খা করবেন।···হাঁ—হাঁ, 'আনন্দমে'ই আসবেন।···হাঁ—হাঁ··· নন্দা দেবীর সঙ্গে দেখা করলেই চলবে।

[রিসিভার রাখিয়া দিলেন ।]

ভানু। কিন্তু আপনি সর্ব্বনাশ করলেন। ঐ প্রজাপতি তের আমি চাকরি নিয়েছিলাম। তাঁর গরদের জামা কাপড় চুরি র উধাও হয়েছিলাম যে!

ত্রিকাল। আরে—ওরা সব আমার বন্ধুলোক।

[সুনন্দার প্রবেশ ।]

এই যে সুনন্দা—এসো, এসো। প্রজাপতি সাত আসবেন ত্রীর খোঁজ নিয়ে—চৌধুরীর জন্তে। তুমি দেখে শুনে ভাল একটি পাত্রী বেছে দিও। তোমরা বসো, আমি আসছি।

[ত্রিকাল বোস চলিয়া গেলেন ।]

সুনন্দা। বিয়ে করছেন?

ভানু। বিয়ে করছি বলতে পারি না—ব্যবসা করছি।

সুনন্দা। কি রকম পাত্রী আপনার পছন্দ বলুন তো?

ভানু। ব্যবসার জন্ত—না বিয়ের জন্ত?

সুনন্দা। যদি বলি বিয়ের জন্ত।

ভানু। পছন্দের কথা যদি বলেন—বলতে পারি। পাব কিনা জানি না।

সুনন্দা। বলুন না—জেনে রাখতে দোষ কি।

ভানু। বলতে আমার ঘণ্টাখানেক সময় লাগবে।

সুনন্দা। ওরে বাবা—ঘণ্টাখানেক!

ভানু। লাগবে না? সারা জীবনের একটা স্বপ্ন-উচ্ছ্বাসের কথা—কাব্যের কথা। তবে হাঁ—এক মিনিটেও বলতে পারি।

সুনন্দা। তাই বলুন—এক মিনিটেই বলুন। এ জীবনে অত কথা শোনবার সময় কোথায়?

[কোন্নগরের এক জমিদারবাড়ীতে ভানুর বিবাহ। বাসরঘর। গান শেষ হইলে মেয়েরা বাহির হইয়া গেল। কয়েকটি ছেলেমেয়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। নববধূ ঘুমের ভান করিয়া রহিয়াছে। ভানু সিগারেট খাইতেছে। নহবৎ হইতে সানাইয়ের মূর্চ্ছনা ভাসিয়া আসিতেছে।]

ভানু। ছবি—ছবি—বাবা রে এমন লজ্জাও কখনো দেখিনি। ওগো শুনছ—

[ভানু তাহাকে জাগাইল। ছবি উঠিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া স্বামীর দিকে তাকাইল।]

সেই কখন থেকে ডাকছি—আমার গলাটা শুকিয়ে গেছে। এখানে জল কোনখানে দেখছি না—আমাকে একটু জল দিতে পার?

[ছবি কুঁজো হইতে জল ভরিয়া দিল।]

চুপ করে রইলে যে? দুটো কথা কও। বোবা ত নও।

[মেয়েটি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—সে বোবা।]

এঁ্যা—তুমি বোবা? কেউ তো বলে নি। না, না, বলো—সত্যিই কি তুমি বোবা?

[মেয়েটি পুনরায় ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—সে বোবা। তাহার চক্ষে জল আসিল। প্রজাপতি ভট্টাচার্য্য সাতের প্রবেশ।]

প্রজাপতি। এই যে বাবাজী—আমি না এসে পারলাম না। আমাকে এখনই—এই কোন্নগর থেকেই চন্দননগর ছুটতে হচ্ছে। সেখানেও আবার আজ শেষ লগ্নে আর একটা বিয়ে। তা চলে যাবার আগে—আশীর্ব্বাদ করতে এলাম।

ভানু। আপনি যে এত বড় শয়তান—তা জানতাম না। একটা বোবা মেয়েকে গছিয়ে খুব প্রতিশোধ নিলেন—যা হোক। একটা গরদের জামা আর একটা শান্তিপুরী ধুতির দাম সুদে-আসলে উসুল করলেন।

প্রজাপতি। জয় গুরু। জয় গুরু—এ তুমি কি বলছ? এত্তে

চটবার কি আছে? টাকা পয়সা দিতে তো কিছু কসুর করে নি বাপু। পাঁচ হাজার টাকা নগদ দিয়েছে, গা-ভরা গয়না দিয়েছে—দানসামগ্রীই বা কি কম দিয়েছে? বোবা মেয়ে বলেই দোজবরেও এত দিয়েছে। ও ধরো না বাবাজী। পেটে পেলে পিঠে সয়।

ভানু। আপনি এখন যান দেখি।

প্রজাপতি। যেতে বলছ—যাচ্ছি। বিদায়টা না হয় দু'দিন পরেই নেব—যখন বুঝবে বোবা বউ নিয়ে ঘর করায় কি শান্তি—কি আরাম। বলব কি বাবাজী—বাংলাদেশের ঘরে ঘরে এক একটি কুরুক্ষেত্র। জানি তো—আসি বাবাজী—আসি মা।

[ছবি প্রজাপতিকে প্রণাম করিল।]

নামেই বোবা—নইলে রূপে লক্ষ্মী—গুণে সরস্বতী। সুখী হও মা, সুখী হও।

—

তৃতীয় দৃশ্য

[ভানুর ঘর। সাজ-সজ্জা এবং আসবাবপত্রের অনেক উন্নতি হইয়াছে। ভানু ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়াইয়া দাড়ি কামাইবার উদ্যোগ করিতেছে। মানদা কাপে গরম জল লইয়া আসিল।]

ভানু। মানদা, তোমার মা কি করছেন?

মানদা। চা করছেন।

[মানদা চলিয়া যাইতেছিল। ভানু বলিল—]

ভানু। এ বৌ—কেমন হ'ল মানদা?

মানদা। খুব ভাল হয়েছে।

ভানু। কিন্তু বোবা তো—ঐ এক দোষেই মাটি করেছে।

মানদা। যা বলেছেন বাবু—তবু কানে শুনতে পান।

ভানু। জন্মবোবা নয় কিনা মানদা, তাই। টাইফয়েড হওয়াতে কথা বন্ধ হয়েছে। তা, ও লিখতে পড়তে জানে। আর, বুদ্ধিশুদ্ধিও আছে—কি বল মানদা?

মানদা। তা আছে বাবু—খুব আছে। কেবল বিপদ হয়েছে এই যে—ওর হাত-পা নাড়া বুঝতে বুঝতেই আমার দিনের অর্দ্ধেক কেটে যাচ্ছে।

ভানু। তার জন্যে কি—মাইনে তোমার বাড়িয়ে দেব। বাপের বাড়ী থেকে তো—চাকর-বাকর সঙ্গে দিতে চেয়েছিল—কিন্তু তা আমি নেব কেন? দু'জন তো লোক, তা তুমিই চালিয়ে নিতে পারবে।

মানদা। এই যে, মা চা এনেছেন।

[ছবির প্রবেশ ও মানদার প্রস্থান।]

ভানু। বসো।

[ছবি চেয়ারে বসিল। ভানু চায়ে চুমুক দিল।]

ভানু। বাঃ বেশ চা হয়েছে।

[ছবির চোখে মুখে আনন্দ ফুটিয়া উঠিল]

ভানু। তোমার এখানে কোন অসুবিধা হচ্ছে না ত?

[ছবি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—'না'।]

বাড়ীটা বড় পুরনো—না?

[ছবি সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল।]

এ বাড়ীতে থাকতে তোমার ভয় করছে না ত।

[ছবি মাথা নাড়িয়া জানাইল—'না']

ভয় পাও না? বটে!

[ছবি চট করিয়া প্যাডের কাগজে কি লিখিয়া ভানুর হাতে দিল।]

ভানু। (পাঠ) "তুমি কাছে আছ—তাই।" [হাসিয়া উঠিল] বাঃ—বেশ লেখা ত তোমার। সত্যি—তোমার হাতের লেখাটি বেশ।

[ছবি সলজ্জ হাসি হাসিয়া মাথা নাড়িয়া জানাইল—'না'।]

ভানু। হাঁ—হাঁ। নামও ছবি—লেখাও ছবি। সত্যি চমৎকার লেখা—আমার চেয়ে অনেক ভাল।

[ছবি সলজ্জ হাসিয়া বারে বারে মাথা নাড়িয়া জানাইল—'না'।]

ভানু। আচ্ছা, দাঁড়াও। [ভানু উঠিয়া গিয়া আলমারি খুলিল। তাহা হইতে ইন্সিওরেন্সের কিছু ফর্ম বাহির করিয়া আনিল।]

ভানু। এই কাগজগুলো কি বল ত?

[ছবি পড়িতে চেষ্টা করিল। কিন্তু পারিল না। হতাশ ভাবে স্বামীর দিকে তাকাইল।]

ভানু। তুমি ইংরেজী জান না?

[ছবি মাথা নাড়িয়া জানাইল—'না'।]

ভানু। বেশ ত—আমরা এখন স্বাধীন হয়েছি। বাংলাতেই লিখব। এই আমি আমার নাম লিখলাম। এরই নীচে তুমি লেখ দেখি—তোমার নাম।

[ছবি স্বামীর মুখের দিকে একবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাইয়া তাহার নাম লিখিল।]

ভানু। না, এটা ত তেমন সুন্দর হ'ল না। আচ্ছা—এই-খানে আবার আমি লিখছি। এর নীচে তুমি আবার লেখ দেখি তোমার নাম।

[ছবি এইবার ধীরে ধীরে খুব সুন্দর করিয়া তাহার নাম লিখিল।]

ভানু। বাঃ—বাঃ—চমৎকার। যে দেখবে—সে-ই বলবে—তোমার লেখা আমার চেয়ে অনেক ভাল।

[ভানু কাগজ দুইটি পকেটে পুরিয়া বলিল—]

ভানু। আচ্ছা—আমি তবে আসি। জরুরি একটা কাজ আছে।

[ছবি হঠাৎ গিয়া তাহাকে আটকাইল। ইঙ্গিতে বলিল—একটু দাঁড়াও। ভানু দাঁড়াইল। ছবি ছুটিয়া গিয়া কি লিখিয়া ভানুর হাতে দিল।]

ভানু। [পাঠ] বেশি রাত ক'র না। আমি দেখেছি ঠাণ্ডা ভাত তুমি খেতে পার না। [ছবিকে] বটে।

[ছবি জানাইল—হাঁ।]

ভানু। আচ্ছা—আচ্ছা, সকালেই ফিরব।

[ভানু চলিয়া গেল। ছবি দরজায় দাঁড়াইয়া ভানুকে দেখিতে লাগিল। পরে ছুটিয়া বাতায়নে গিয়া সেখান হইতে দেখা যায় কিনা—দেখিতে লাগিল। গৃহকর্ম্মরতা মানদা ঘরে প্রবেশ করিল।]

মানদা। বাবু—চলে গেলেন?

[ছবি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—'হাঁ'।

মানদা। মন খারাপ করছে?

[ছবি লজ্জারক্তিম হাসি হাসিল।]

মানদা। শোন—বাবু বেশী রাতে বাড়ী ফিরলে খুব কান্না-কাটি ক'র।

[ছবি অর্থহীন হাসি হাসিল।]

মানদা। না, না, শোন। আমারও ত একটা ঘর-সংসার আছে। আমি এখানে বেশী রাত থাকতে পারি না। আর— তোমাকেও একলা এ বাড়ীতে ফেলে যেতে আমার ভয় করে।

[ছবি ইঙ্গিতে জানাইল—'তুমি যেও—আমি থাকব।']

মানদা—না, না—তা হয় না। এ বাড়ীটা ভাল নয়। আর শোন নি বুঝি—তোমার আগে যে বউ ছিল—সে এ বাড়ীতে রাত্রে কি সব দেখে ভয়ে মারা গেছে।

[ছবির মুখে আতঙ্ক ফুটিয়া উঠিল।]

মানদা। বাবুকে আজ খুব করে ধরবে। এ বাড়ী ছাড়তেই হবে। এ বাড়ীতে থাকলে তুমি বাঁচবে না—কেউ বাঁচবে না। এটা ভুতুড়ে বাড়ী!

[ছবি ভয়ে মানদাকে জড়াইয়া ধরিল।]

ক্রমশঃ

কৃত্রিম খাদ্য

শ্রীবেলা দেবী

খাদ্যসমস্যা কেবল ভারতবর্ষেরই সমস্যা নহে, ইহা পৃথিবীর সকল দেশেরই সমস্যা এবং সেজন্য ইহার সমাধানের নিমিত্ত বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার প্রচেষ্টা চলিতেছে। কৃত্রিম খাদ্য সম্বন্ধে আমরাও যে চিন্তা করিতে শুরু করিয়াছি তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। সম্প্রতি সংবাদপত্রে দেখিয়াছি, বাঙ্গালোরের সেণ্ট্রাল ফুড এণ্ড টেক্নোলজিক্যাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের ডাইরেক্টর ডাঃ সুব্রহ্মণ্য কৃত্রিম চাউল প্রস্তুতের যন্ত্রপাতি সংগ্রহের জন্য ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং ইটালী যাইতেছেন। বর্ত্তমানে সকল বিষয়ে অগ্রসর দেশ হইতেছে আমেরিকা। সেখানকার রিসার্চ অব দি কেমিক্যাল কোম্পানীর ডাইরেক্টর জেকব রসিন এ বিষয়ে তাঁহার চিন্তাধারা 'দি রোড টু এবানডেন্স নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ম্যাক্স ঈষ্টম্যানের সহিত জেকব রসিনের যে আলোচনা হইয়াছিল তাহা রিডার্স ডাইজেষ্টের ১৯৫২ সনের অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই মূল্যবান আলোচনার সারাংশ নিম্নে দেওয়া গেল:

"আমাদের রুটি দাও"—এই প্রার্থনা ইতিহাসের প্রথম হইতেই পৃথিবীর বহু নরনারীর ভীত কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া আসিতেছে এবং এমন কোন মুহূর্ত্ত বিরল যখন পৃথিবীর কোথাও না কোথাও অনশনে মৃত্যু ঘটিতেছে না।

এই অবস্থা ক্রমেই ভয়াবহ আকার ধারণ করিতেছে। জনসংখ্যা যেভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে প্রতি সত্তর বৎসরে এই সংখ্যা দ্বিগুণ হইতে থাকিবে। রাসায়নিক বিজ্ঞান কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত "আশ্চর্য্য ঔষধগুলি" এবিষয়ে আরও সাহায্য করিতেছে। কিন্তু খাদ্য কোথা হইতে আসে? কি করিব আমরা? এইরূপ নানা প্রশ্ন সকলেই করিতেছেন, কিন্তু উত্তর পাওয়া যাইতেছে না।

অথচ উত্তর খুবই সহজ। খাদ্যের জন্য মানুষের মারামারির কথাই যে সকল দেশের ইতিহাসকে লিখিয়া রাখিতে হইয়াছে তাহার কারণ খাদ্যের জন্য মানুষকে নির্ভর করিতে হয় শস্যের উপর অর্থাৎ প্রকৃতির উপর। এমন কি মাংস—তাও আসে শস্য হইতে, অথচ ক্ষেত্রজাত শস্যগুলিকে খাদ্যপ্রস্তুতকারী কল বা কারখানা হিসাবে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায় ইহাদের গতি অত্যন্ত ধীর, ইহারা একেবারে অকেজো এবং অপচয়বহুল।

বাস্তবিক কৃষিকে যদি একটি বৃহৎ খাদ্যের কারখানা মনে করা হয়, তাহা হইলে দেখা যায় শিল্প হিসাবে ইহার স্থান অতি নিম্নে। ইহার জন্য এত বেশী জায়গার প্রয়োজন হয় যে তাহা ধারণা করা প্রায় অসম্ভব। বিপুলসংখ্যক লোককে এই কারখানার কাজে লাগিয়া থাকিতে হয়। কোন কোন দেশে প্রায় সমগ্র জনসংখ্যাই এই একটি কাজ লইয়াই আছে।

১৯৪৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রে নব্বই লক্ষ লোক কৃষিকাজ করিত। তাহাদের ফসলের ডলার-মূল্যের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশী রাসায়নিক শিল্পাগারগুলিতে হইয়াছে অথচ লোক খাটিয়াছে মাত্র সাত লক্ষ। ইহা সম্ভব হইয়াছে এই কারণে যে, কারখানার কাজ সমগ্র বৎসর ব্যাপিয়া চলে, বৃষ্টি বা রৌদ্রের উপর নির্ভর করে না এবং যাহা

উৎপাদন করিতে শস্যক্ষেত্রগুলির কয়েক মাস লাগে, কারখানা তাহা কয়েকদিনে প্রস্তুত করিয়া ফেলিতে পারে।

কারখানা হইতে যে মাল তৈরি হয়, তাহার সমস্তটাই কাজে লাগে। গমক্ষেত্রের কতটা অংশ রুটিতে পরিণত হয়?

শস্যের অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত না হইলে মানুষ খাদ্যসমস্যার সমাধান করিতে পারিবে না। খাদ্য ব্যতীত অন্যান্য ব্যাপারে এই মুক্তি বহুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। রং এবং গন্ধদ্রব্য লইয়া এই মুক্তি অভিযানের সুরু হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে দেড় লক্ষ একর জমিতে নীল জন্মানো হইত। ঐ শতাব্দীর শেষের দিকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা ইহার মূলসূত্র আবিষ্কৃত হইল এবং সস্তায় কাজ হইতে লাগিল। ফলে কুড়ি বৎসরের মধ্যে নীলের চাষ উঠিয়া গেল; অথচ ইহার চাহিদা বাৎসরিক সত্তর হইতে এক কোটি আশী লক্ষ পাউণ্ড বাড়িয়া গিয়াছে। স্বাভাবিক রং এখন কৃত্রিম রঙের নিকট সম্পূর্ণ পরাজয় স্বীকার করিয়াছে।

এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে। এগুলি সম্ভব হইয়াছে মাত্র কয়েক জনের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে। আরও বড় রকমের প্রেরণা এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কত কি সম্ভব হইতে পারে তাহার উদাহরণ দেখা গিয়াছে মহাযুদ্ধের সময়। দেশ এক দিন মরিয়া হইয়া রাসায়নিকদের নিকট হইতে চাহিয়াছিল কৃত্রিম রবার এবং কৃত্রিম কুইনিন। কৃত্রিম রবারের টায়ার এখন বাস্তব টায়ারের চেয়ে বিশ হইতে চল্লিশ গুণ শ্রেষ্ঠ এবং শতকরা বিশ ভাগ সস্তা।

রং, গন্ধদ্রব্য, রবার, ঔষধ প্রভৃতির ক্ষেত্রে জয়লাভের পর রসায়ন জীবনের অবশ্য-প্রয়োজনীয় জিনিষগুলির উপর আক্রমণ সুরু করিয়াছে: যথা খাদ্য এবং বস্ত্র। বস্ত্র সম্বন্ধে দেখা যায় কৃত্রিম ফাইবারের বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ ৩০০,০০,০০,০০০ পাউণ্ডেরও ঊর্দ্ধে—পৃথিবীর প্রতি নরনারী ও শিশুর জন্য ইহাতে দেড় পাউণ্ড কৃত্রিম বস্ত্র হয়। এইভাবে দেখা যায়—তুলা, পশম, পাট প্রভৃতি প্রত্যেকটির কৃত্রিম উৎপাদন স্বাভাবিকের চেয়ে প্রত্যেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হইয়াছে।

খাদ্যব্যাপারে কিন্তু আমাদের একটি কুসংস্কার আছে যাহা উন্নতির প্রতিবন্ধক। আমাদের ধারণা যে কৃত্রিম খাদ্য অপেক্ষা স্বাভাবিক খাদ্য শ্রেষ্ঠতর এবং অধিকতর স্বাস্থ্যকর; কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে বিচার করিয়া দেখিলে কি দাঁড়ায়? আমরা যাহাকে স্বাভাবিক খাদ্য বলি, তাহা কতকগুলি রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণ এবং সেগুলি যখন আমরা রান্না করিয়া গ্রহণ করি তখন আর মোটেই স্বাভাবিক থাকে না। আমাদের হজমশক্তির সহায়তা অথবা স্বাদের সুবিধার জন্য কোন্ স্বাভাবিক খাদ্যকে না রন্ধন বা অন্য উপায়ে অস্বাভাবিক করিয়া তবে গ্রহণ করি? ইহা কি স্বভাব বা প্রকৃতির নিকট হইতে যেভাবে পাওয়া যায় সেই অবস্থাকে আরও উৎকৃষ্ট করিবার জন্য রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্য গ্রহণ নয়?

খাদ্য দেখিতে ভাল হইবে এবং খাইতে সুস্বাদু হইবে. ইহা আমাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা। রাসায়নিক এই সকল দিকও দেখিবেন বৈকি! কৃত্রিম খাদ্য খাওয়া মানে কয়েকটি বড়ি খাইয়া ফেলা নয়। এদিকে বিজ্ঞান অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে।

আমাদের খাদ্য তিন প্রকারের;- কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট এবং প্রোটিন। কার্বোহাইড্রেটই আমাদের দৈনিক খাদ্যের দুই-তৃতীয়াংশ এবং ইহা প্রস্তুত করা খুবই সহজ। প্রস্তুতের এক উপায় হইল শস্য যেভাবে কাজ করে তাহার অনুসরণ করা। সূর্য্যের তাপের সাহায্যে বাহিরের কার্বন ডায়োক্সাইডকে শস্য ষ্টার্চে পরিণত করিয়া লয়। ইহাকে বলে 'ফটো সিন্থেসিস' এবং ইহা যে কিভাবে হয় তাহা জানিবার চেষ্টা আমেরিকার গবেষণাগারে এটম গবেষণার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছিল। এটম বোমা আবিষ্কৃত হইল প্রথমেই, যেহেতু ২০০,০০,০০,০০০ ডলার ইহার জন্য ব্যয় করা হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গবেষণাগারের জন্য যে সামান্য অর্থব্যয় হয় তাহারই সাহায্যে ফটো সিন্থেসিস কতকটা অগ্রসর হইয়াছে। ২০০,০০,০০,০০০ ডলারের অনেক কম ব্যয় করিয়া আমরা শুধু বায়ু হইতে সূর্য্যালোকের সাহায্যে আমাদের প্রাত্যহিক খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারিতাম।

কিন্তু শস্যকে অনুসরণের প্রয়োজন নাই। ফটো সিন্থেসিস ছাড়া অন্য উপায়ে কার্বোহাইড্রেট প্রস্তুত করা যায় অর্থাৎ যেভাবে রবার বস্ত্র হইয়াছে তদনুরূপভাবে। আমার মনে হয় আমরা যে কৃত্রিম শ্বেতসার প্রস্তুত করিতে পারি নাই, কেবল কৃত্রিম রবার করিতে পারিয়াছি, তাহার কারণ উপযুক্ত অর্থসাহায্যের অভাব।

মাংসের প্রোটিন প্রস্তুত কিন্তু খুব সহজ নয়, কারণ ইহার উপাদানগুলি বড় জটিল। তবে আমাদের শরীর খাঁটি প্রোটিন চায় না; প্রোটিন যাহা হইতে হয় অর্থাৎ আমিনো এসিডস ইহাই শরীরের জন্য দরকার। আমরা যে প্রোটিন খাই তাহা দেহের ভিতর আমিনো এসিডে পরিণত হয় এবং পুনরায় নিজস্ব প্রোটিন-আকার ধারণ করে। আমিনো এসিড অনেকভাবেই প্রস্তুত করা যায়।

তৃতীয় উপাদান অর্থাৎ ফ্যাট প্রস্তুত করা আরও সহজ। ওলিওমারগারিম্ নামক যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা স্বাভাবিক ফ্যাটকে শীঘ্রই স্থানচ্যুত করিবে বলিয়া মনে হয়।

রসায়ন এইভাবে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। এখন প্রশ্ন এই যে, যদি আমাদের বাঁচিয়া থাকিতে হয় তাহা হইলে এই অগ্রগতি যাহাতে আরও দ্রুত হয় সে বিষয়ে আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছি না কেন? আমাদের মানসিক জড়তা ত্যাগ করিতে হইবে এবং বিশ্বাস করিতে হইবে যে, রাসায়নিক শিল্পাগারগুলিকে অর্থ সাহায্য করিলে তাহারা শস্যক্ষেত্রগুলি অপেক্ষা অনেক কম মূল্যে শ্রেষ্ঠতর উপাদানসমূহের উৎপাদন দেখাইতে পারিবে। একেবারে অনশনে মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আর দেরি করা কেন?

উৎকলের চক্রক্ষেত্রে

শ্রীসাধনা চট্টোপাধ্যায়

শরতের এক খর দ্বিপ্রহরে ভুবনেশ্বরে আসিয়া পৌঁছিলাম।

ষ্টেশনের বাহিরে আসিতেই যাহার হাতে পড়িলাম সে পাণ্ডা নহে, একটি দ্বাদশবর্ষীয় বালক। উড়িয়া বালক, শ্যামবর্ণ নাদুসনুদুস। সে ভুবনেশ্বর গ্র্যাণ্ড হোটেলের বিজ্ঞাপন বিলি করিতেছিল। বেচারা যাত্রী-শিকার বিভাগে নবাগত, কথা বলিতে অপারগ; কিন্তু চোখের ভাষায় অনুকম্পা টানিয়া আনে। ভুবনেশ্বরে ভাল হোটেলের অভাব বলিয়া পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম। কাজেই এই কিশোর চারণের আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিলাম না।

ভুবনেশ্বর হিন্দুর পুরাতন তীর্থক্ষেত্র—ভুবনেশ্বর প্রখ্যাত স্বাস্থ্যনিবাস আর ভুবনেশ্বর নব-উড়িষ্যার ভবিষ্য রাজধানী।; এগুলির সমাবেশে ভুবনেশ্বর মহিমময়।

হোটেল হইতে মন্দির প্রায় এক মাইল। পাকা রাস্তা, কিন্তু ধুলিধূসরিত। বিকালে শুধু দূর হইতে মন্দির দেখিতে বাহির হইলাম; পরের দিন সকালে স্নানান্তে দেবদর্শনের ইচ্ছা রহিল।

ভুবনেশ্বরের পঞ্চ-ক্রোশের মধ্যে অসংখ্য প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দির। দেবতা সর্ব্বত্রই শিব। মন্দির ভগ্ন কিন্তু প্রায়
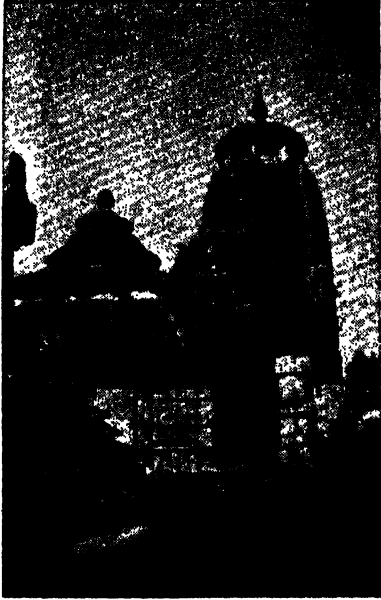
শ্রীভুবনেশ্বরের মন্দির

গৌরী কুণ্ড—কেদার ও গৌরী মন্দির

যানবাহনের মধ্যে ভরসা একমাত্র সাইকেল-রিক্সা। হোটেলটি মন্দিরের পথে; ষ্টেশন হইতে দুই মাইলের উপর। রিক্সা-চালক পথ-সংক্ষেপের জন্য মাঠের পথে চলিতে লাগিল। পথ-সংক্ষেপ হয়ত হইল সত্যই, কিন্তু সময়-সংক্ষেপ হইল না। দুইটি রিক্সার একটি সহসা বিকলাঙ্গ হইয়া 'জবাব' দিল। কানের সঙ্গে মাথাকেও থামিতে হইল।

হোটেলটি সাধারণ, কিন্তু বাড়ীটি সুন্দর আর বাঙালী মালিকের ব্যবহারটি মিষ্ট। আমরাও অল্প আয়াসে মাথা গুঁজিবার মত স্থান পাইয়া বর্ত্তিয়া গেলাম।
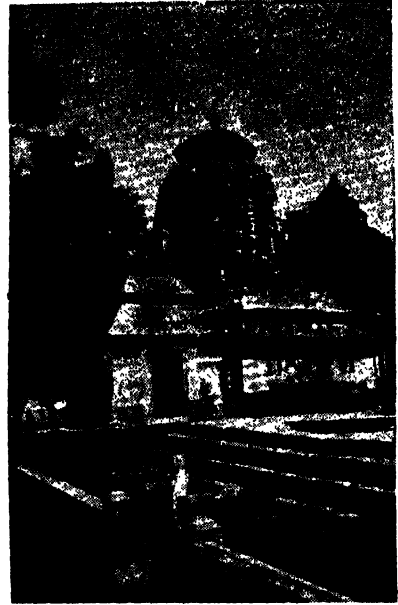
সর্ব্বক্ষেত্রেই বিচিত্র কারুকার্য্যময়। অতি অল্পসংখ্যক মন্দিরেই দেবতা পূজিত হন। যে জনপদের স্মৃতিচিহ্ন ইহারা ধারণ করিয়া আছে তাহা যে অতিবিস্তৃত ও জনবহুল ছিল ইহাতে সন্দেহ নাই। তবে, হয়ত যুগে যুগে পট-পরিবর্ত্তন হইয়াছে; ভগবান বুদ্ধ শিবরূপে দেখা দিয়াছেন; অশোক-স্তম্ভ হিন্দু-সজ্জায় নবজন্ম লাভ করিয়াছে।

ধানের ক্ষেতের মধ্য দিয়া পথ। এদিকে ওদিকে ভগ্ন মন্দিরের সারি। অদূরে ঘন বনানীর প্রান্তরেখা; তাহার মধ্য হইতেও ভগ্ন দেউলের দেহ উঁকিঝুঁকি মারিতেছে।

মোড় ফিরিতেই বিন্দুসরোবর। প্রকাণ্ড দীঘি—পাড় বাঁধানো। বাঁধানো পাড়ের দুই দিকে প্রশস্ত রাস্তা। জলাশয়ের মধ্যস্থলে এক ক্ষুদ্রকায় মন্দির। সেখানে বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন হইতে বাইশ দিন ব্যাপী শ্রীভুবনেশ্বরের 'চন্দনযাত্রা' হয়। এই চন্দনযাত্রা পুরীর শ্রীজগন্নাথদেবের চন্দনযাত্রার অনুরূপ। আর রথযাত্রাও হয় সেই পুরীরই মত। সে উৎসব হয় নয় দিন ব্যাপী—আষাঢ় মাসে।

মুক্তেশ্বরের মন্দির

বিন্দুসরোবরের তীর হইতে মন্দিরের দৃশ্যটি অপরূপ। মুক্ত আকাশের কোলে দেবতার বিজয় বৈজয়ন্তী! শুধু চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে; দেখিয়া সাধ মিটে না। সরোবরের এক কোণে ক্ষুদ্র বাজার—ছোটখাটো দোকান আর ধর্ম্মশালা। ধর্ম্মশালায় তীর্থযাত্রীর ভিড় সর্ব্বদা লাগিয়াই আছে। বাজারের ধার দিয়া রাস্তা সোজা পোষ্ট আপিসের দিকে গিয়াছে—তাহার পাশে মন্দিরের সিংহদরজা। সত্যই সিংহদরজা—দুই পাশে দুই বৌদ্ধযুগের সিংহ দ্বার আগলাইয়া আছে।

দরজা দিয়া প্রবেশ করিতেই প্রস্তরনির্ম্মিত বিস্তৃত চত্বর। চত্বরের মধ্যস্থলে শ্রীভুবনেশ্বরের অত্যুচ্চ মন্দির। সম্মুখে গরুড়-কৃষ্ণ স্তম্ভ—হয়ত অশোকস্তম্ভের পরিবর্ত্তিত সংস্করণ। মন্দির গাণ্ডীব-শীর্ষ; তাহার স্কন্ধে রক্তপতাকা।

ভুবনেশ্বর চক্রক্ষেত্র বা কৃষ্ণক্ষেত্র। ক্ষেত্রাধিপতি অনন্ত বাসুদেব; তাঁহার পত্নী লক্ষ্মীদেবী। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবতা হরিহর। প্রস্তর-বেদিকার উপর গোলাকৃতি প্রস্তর-মূর্ত্তি। মূর্ত্তির এক দিক ঈষৎ শ্বেতাভ, অন্য দিক ঘোর কৃষ্ণ। এখানে হরি ও হর একত্র হইয়াছেন; এরূপ মিলনের দৃশ্য ভারতবর্ষের অন্য কোথাও আছে কিনা জানি না। প্রস্তর-বেদিকার কোন কোন স্থান ফাটা। তাহার নীচে জলের উৎস আছে; সর্ব্বদা অল্প অল্প করিয়া জল চুয়াইয়া উঠিতেছে।

গর্ভগৃহ অন্ধকারময় ও অসংস্কৃত। অভ্যন্তরভাগেও
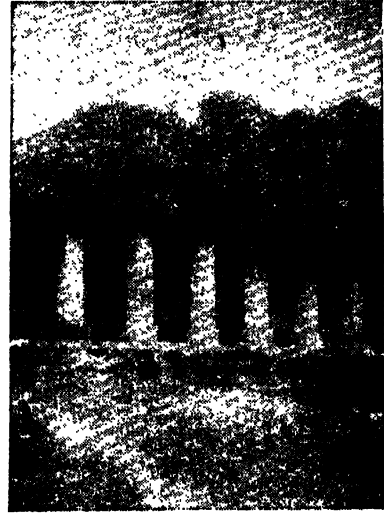
উদয়গিরিতে গুহার সারি

স্থানে স্থানে ধ্বংসের চিহ্ন বিদ্যমান। বেদিকার রূপ আর মূর্ত্তির অবশিষ্টাংশ দেখিয়া মনে হয় এখানেও শিবলিঙ্গই প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভুবনেশ্বরের আশেপাশের সকল মন্দিরের দেবতাই শিব। এখানেও সে মূর্ত্তি থাকাই স্বাভাবিক। হয়ত সে দেবতা কালাপাহাড়ের রোষ এড়াইতে পারেন নাই; নির্ম্মম, ধর্ম্মদ্বেষী দস্যুর আঘাত তিনি বুক পাতিয়া লইয়াছেন।

জনশ্রুতি কিন্তু অন্যরূপ। কালাপাহাড়ের আগমন-সংবাদে উপায়ান্তর না দেখিয়া পাণ্ডার দল মন্দিরের মধ্যে রাশি রাশি ধান ঠাসিয়া রাখিয়া দেয়। দেবমূর্ত্তি ধানের নীচে আত্মগোপন করিয়া থাকে। ক্রুদ্ধ দস্যু সে দেবতার সন্ধান পায় না, কিন্তু সে ধান্য-ভাণ্ডারে অগ্নিসংযোগ করিয়া তাহার বিদ্বেষ চরিতার্থ করে।

মন্দিরের বহিরঙ্গের চিত্র প্রায় স্বাভাবিক। সেখানে ধ্বংসের চিহ্ন কোথাও খুব সুস্পষ্ট নহে। একখানি অযত্ন-রক্ষিত চিত্র, কিন্তু রূপে ও রসে টলমল। ভাস্কর্য্যের এই অপূর্ব্ব নিদর্শন দেখিয়া দেখিয়া ক্লান্তি আসে না; শুধু চাহিয়া

থাকিতেই ইচ্ছা হয়। মন্দিরের গায়ে মহাভারতের বহু কথা চিত্রে প্রতিফলিত হইয়া আছে; সেগুলিকে উদ্ধার করিতে চক্ষু ও মনকে যথোচিত সময় দিতে হয়। মন্দিরের চত্বরে চারি পাশে আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির। সেখানকার দেবতা ভুবনেশ্বরী, পার্ব্বতী, অন্নপূর্ণা, ষষ্ঠী ও সাবিত্রী।

উদয়গিরিতে গণেশগুহার সম্মুখভাগ—হস্তীপৃষ্ঠে খুক্
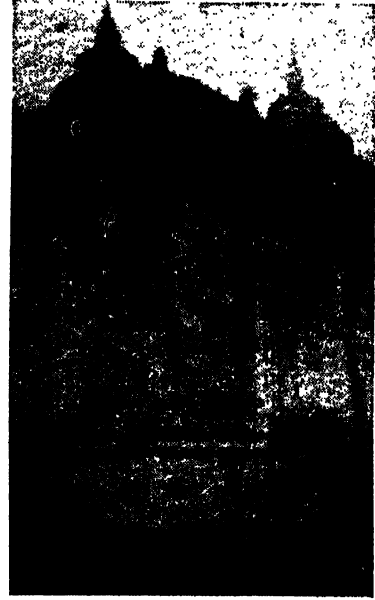
বাহিরে প্রস্তর-বেদিকার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষ আছে। পাণ্ডাদের মতে সেটি কল্পবৃক্ষ। তাহার নিকট প্রার্থনা করিলে সে প্রার্থনা বিফলে যায় না। বৃক্ষটির উচ্চতা প্রায় দুই ফুট; ইহার হ্রাসবৃদ্ধি নাই। ইহাও জনশ্রুতি।

মন্দির হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে 'কেদার-গৌরী' কুণ্ড। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কুণ্ড তিনটি। প্রথমতঃ দুধকুণ্ড—সেখানেই প্রকৃত জলের উৎস। সেখান হইতে জল প্রথমতঃ কেদারকুণ্ডে ও পরে গৌরীকুণ্ডে গিয়া পড়ে। গৌরীকুণ্ডে স্নান করিতে দেওয়া হয় আর প্রতিদিন স্নানার্থীর সংখ্যাও সেখানে হয় যথেষ্ট। দুধকুণ্ডের জল শীতল ও ঘোলাটে। নানা প্রকার প্রকৃতিজাত রাসায়নিক দ্রব্য যে তাহাতে মিশ্রিত আছে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। জল কিন্তু সুপেয় —আর শুধু সুপেয় নয় অতিশয় হিতকারী, উদরাময় রোগের অব্যর্থ ঔষধ। প্রধানতঃ এই দুধকুণ্ডের দৌলতেই ভুবনেশ্বর প্রখ্যাত স্বাস্থ্যনিবাস। প্রতিদিন ভাঁড়ে ভাঁড়ে জল স্বাস্থ্যকামীর ঘরে যায় আর হোটেলেও এই জল সরবরাহ করিয়া উহার আভিজাত্য রক্ষা করা হয়। কুণ্ডের পাশে মন্দির—একটির দেবতা কেদার, অন্যটির গৌরী। আশেপাশে আরও অনেক মন্দির আছে; তন্মধ্যে সিদ্ধেশ্বর, মুক্তেশ্বর, মেঘেশ্বর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

তার পর খণ্ডগিরি আর উদয়গিরি।

পুরাতন শহর হইতে প্রায় ছয় মাইল দূরে এই সুবিখ্যাত গিরিযুগল শিল্পীর খ্যাতি ও ধর্ম্মের আখ্যান বহন করিয়া

খণ্ডগিরির জৈন মন্দির

দণ্ডায়মান। রাজপথের এক পার্শ্বে উদয়গিরি; অপর পার্শ্বে খণ্ডগিরি। উভয় গিরিতেই সারি সারি গুহা—পর্ব্বতাঙ্গ হইতে খোদিত। অজন্তা ও ইলোরার ক্ষুদ্র সংস্করণ। ইলোরারই মত বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দুখণ্ডে বিভক্ত। তবে এখানে উদয়গিরির সমস্তটাই হিন্দুখণ্ড আর খণ্ডগিরিতে হিন্দু ও জৈনের সংমিশ্রণ। বৌদ্ধখণ্ডের চিহ্ন কোথায়ও বিশেষ কিছু নাই; তবে পুরাকালে যে ছিল সেকথা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না।

গুহাগুলির স্তম্ভ, প্রাকার প্রায়শঃই ভগ্ন। মূর্ত্তি যাহা আছে তাহাও অঙ্গহীন। তথাপি অনেক গুহার শোভা এখনও অপরূপ। উদয়গিরির একটি গুহায় ব্রাহ্মীলিপিতে একটি অনুশাসন উৎকীর্ণ আছে। আর এই গিরির বাঘগুহা ও গণেশগুহা উল্লেখযোগ্য। বাঘগুহার সমস্তটা একটা বাঘের মুখের মত আর গণেশগুহার সম্মুখে হস্তিযুগলের মূর্ত্তি মনোরম।

খণ্ডগিরির শীর্ষদেশে দিগম্বর জৈন মন্দির। তীর্থঙ্কর আদিনাথ। মূল মন্দিরের পার্শ্বে অন্য একটি মন্দিরে

পরেশনাথের প্রস্তর-রচিত বিরাট মূর্ত্তি। মন্দিরের চত্বর বাঁধানো; সেখান হইতে সমতল ভূমির দৃশ্য অতি সুন্দর। পর্ব্বতশীর্ষের এই জৈন মন্দিরটি বহুদূর হইতে দেখা যায়;
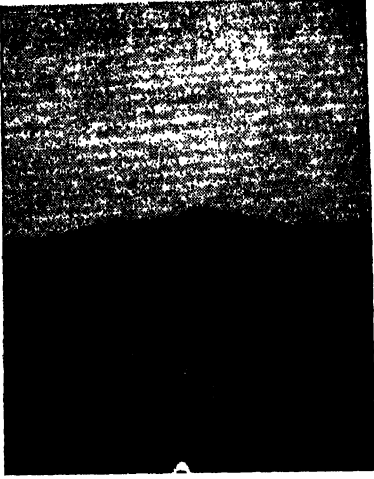
খণ্ডগিরি হইতে উদয়গিরির দৃশ্য

চারিদিকের শ্যামল চিত্রপটের মধ্যে ইহার ধবল দেহের শোভা অপরূপ বলিয়া মনে হয়।

গিরিযুগল হইতে পুরাতন ভুবনেশ্বরে আসিতে নূতন ভুবনেশ্বরের দৃশ্য চোখে পড়ে। নব উৎকলের রাজধানী ভুবনেশ্বর—তাহাকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার বিরাট প্রচেষ্টা চলিতেছে। নূতন হাইকোর্ট, নূতন বিধানসভা-ভবন, নূতন বাজার—নূতন শিক্ষায়তন। ভুবনেশ্বরের নূতন কলেবর সৃষ্টি হইতেছে। সে অঙ্গরাগের ব্যয় অপরিসীম। এখন মাত্র কাঠামো তৈয়ারি হইতেছে, তবে ব্যয়ের অনুপাতে শোভার সৃষ্টি হইবে কি না সন্দেহ। স্রষ্টাদের উৎসাহের অভাব নাই বরং আতিশয্য আছে।

স্থানীয় বিমানঘাটিটি ছোট। সপ্তাহে মাত্র তিন দিন বিমান এখানে থামে—কলিকাতা হইতে বাঙ্গালোর যাতায়াতের পথে। বিমান কোম্পানীর কর্ম্মচারীটি সজ্জন। তিনি আমাদের সুখ-সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমার শিশু কন্যাটিকে সমস্ত জিনিষ ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখাইতে লাগিলেন। এখান হইতেও ভাবী রাজধানীর নবরূপ চোখে পড়িল, আর পড়িল ভুবনেশ্বর মন্দিরের গাণ্ডীব-শীর্ষ। এই পুরাতন ভাস্কর্যের পার্শ্বে নূতন সৃষ্টি হীনপ্রভ। আবার যুক্তকরে পুরাতনকেই নমস্কার করিলাম। আকাশপথ হইতেও গাণ্ডীব-শীর্ষ মন্দিরকেই দেখিতে লাগিলাম।

একটি কবিতা

আ. ন. ম. বজলুর রশীদ

সাগরের বাষ্প নীল আকাশের নীলে মিশে মেঘের অঙ্গনে
প্রেমের বর্ষণ সে কি অবিরাম পিপাসার্ত আমার প্রাঙ্গণে—
তোমার মধুর প্রেম, কি সে শান্তি তৃপ্তি আহা প্রাণের সঞ্চার
তৃণে তৃণে রোমাঞ্চিত আনন্দ-সুবাস বুকে রজনীগন্ধার—
অরূপণ স্পর্শ তার প্রাণবন্ত করে মৃত শুষ্ক ধরণীরে
রসসিক্ত তন্বী তরু পল্লবিত মঞ্জরিত শালের বীথিরে।
অদূরে মেলিছে পাখা অবিশ্রান্ত পল্লবনে মরালের দল—
শ্বেত শুভ্র রক্তবর্ণে অফুরন্ত আনন্দের আবেগে চঞ্চল।
উদাস হয়েছে মন—পশ্চিমের মেঘাচ্ছন্ন অস্পষ্ট আকাশ
বাষ্পভারে নম্রনত—দিগন্তরে সচকিত বিদ্যুৎ আভাস—
আলোকে আলোকে কোন্ অরূপের অকস্মাৎ জ্যোতির স্বাক্ষর—
সবুজের রঙে রঙে—রসসিক্ত করবীর রক্তিম অন্তর
মধুরসে ভরপুর, উচ্ছ সিত পত্রপুটে আবেগ সঞ্চার—
মাটি আর মেঘে মেঘে নীলে নীলে প্রাণের বিস্তার
রসে রসে অবিরাম, নৃত্যচ্ছন্দে গন্ধেগানে অশ্রান্ত বর্ষণে—
একাকী বিচ্ছিন্ন আমি, সঙ্গীহীন অন্তরের গভীর নির্জ্জনে
শুধু তপ্ত হাহাশ্বাস—উদ্বেলিত সাগরের অশ্রান্ত ক্রন্দন
মুক্ত তবু তৃপ্তিহীন বাসনার কামনার অসংখ্য বন্ধন—
পঙ্কের আবর্ত রচি—মুক্ত করি পরিপূর্ণ আপনারে কবে—
শুভ্র মরালের মত যোগ দিব প্রিয় তব রসের উৎসবে।

রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের রাজ্যাভিষেক

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

আগামী ২রা জুন ইংলণ্ডের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান বিপুল সমারোহে উদযাপিত হইবে। গত বড়দিন উপলক্ষে প্রদত্ত বেতার-ভাষণে রাণী এলিজাবেথ আসন্ন অভিষেক-উৎসবের কথা স্মরণ করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি নিজের জীবন সকলের

রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ

সেবায় উৎসর্গ করিবেন। এই সময়ে রাণী এলিজাবেথ এবং রাজপরিবারের অন্যান্য কৃতী মহিলা ও পুরুষদের ব্যক্তিগত জীবন-কথা সম্বন্ধে আলোচনা, আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে এপ্রিল রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের জন্ম হয়—তিনি ইয়র্কের ডিউক এবং ডাচেসের প্রথম সন্তান। জন্মের পাঁচ সপ্তাহ পরে বাকিংহাম প্রাসাদের গীর্জ্জায় তাঁহার নামকরণ করা হয় এলিজাবেথ আলেক্জাণ্ড্রা মেরী।

তাঁহার জন্মের অব্যবহিত পরে লণ্ডনের ১৪৫ পিকাডিলির যে-বাড়ীতে তাঁহার পিতামাতা উঠিয়া আসেন সেই বাড়ীতে, এবং রিচমণ্ড পার্কের হোয়াইট লজ, পিতামহ পঞ্চম জর্জ্জ এবং পিতামহী রাণী মেরীর পল্লী-নিকেতন প্রভৃতি বিভিন্ন আবাসে তাঁহার শৈশবকাল অতিবাহিত হয়। তাঁহার বয়স যখন ছয় বৎসর তখন ইয়র্কের ডিউক এবং ডাচেস উইণ্ডসর গ্রেট পার্কের রয়্যাল লজে উঠিয়া আসেন।

রাজকুমারী এলিজাবেথ এবং তাঁহার ছোট বোন প্রিন্সেস

ডিউক অব এডিনবরা

মার্গারেট গৃহে মিস ম্যারিয়ন ক্রফোর্ড (অধুনা মিসেস জর্জ্জ বুথলে) নামক এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্রাজুয়েট স্কচ মহিলার নিকট বিদ্যা অর্জ্জন করেন। ডিউক অব ইয়র্ক রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জ রূপে সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলে পর রাজকুমারী এলিজাবেথ নিয়মতান্ত্রিক ইতিহাস, আইন ইত্যাদি অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ইটনের তদানীন্তন ভাইস-প্রভোষ্ট মিঃ হেনরি মার্টেনের নিকট তিনি এই সকল বিষয়ে বিশেষ পাঠ গ্রহণ করিতেন।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারী জনকল্যাণমূলক নানা ব্যাপারে যোগদান করিতে লাগিলেন। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে চৌদ্দ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে তিনি তাঁহার প্রথম বেতার-বক্তৃতা প্রদান করেন—ব্রিটেন এবং কমনওয়েলথের শিশুদের উদ্দেশে সেই বেতার-ভাষণ প্রদত্ত হয়। ১৯৪২-এর গোড়ার দিকে রাজকুমারী

লিজাবেথ গ্রেনেডিয়ার গার্ডের কর্ণেলরূপে নিযুক্ত হন এবং ষোড়শ ম্মদিনে তিনি রেজিমেণ্ট পরিদর্শন করেন—সেই তাঁর সর্ব্বসাধারণের হিত যোগাযোগের সূচনা।

রাণীমাতা রাণী এলিজাবেথ

ইহার পর অত্যন্ত তৎপরতার সহিত তিনি সরকারী কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিতে থাকেন এবং সেই সকল কর্ম্মের প্রতি সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি দিন দিন অধিকতর রূপে আকৃষ্ট হইতে থাকে। তিনি বরাবর সঙ্গীতানুরাগিণী এবং পিয়ানো বাদনে নিপুণা। সতর বৎসর বয়সে তিনি 'রয়্যাল কলেজ অব মিউজিকে'র প্রেসিডেণ্টের পদ গ্রহণ করেন। ১৯৪৩ সনের শরৎকালে তিনি প্রথম সরকারীভাবে উক্ত কলেজ পরিদর্শন করেন। তদুপলক্ষে অনুষ্ঠিত একটি কনসার্টে উপস্থিত থাকিয়া তিনি পুরস্কার প্রদান করেন। রাজ্যমধ্যে রাজা এবং রাণীর সফরের সময় তিনি তাঁদের অনুগামিনী হইয়া বিবিধ দায়িত্বপূর্ণ সরকারী কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিলেন। হেকনিস্থ 'রাণী এলিজাবেথ শিশু হাসপাতালে'র প্রেসিডেণ্ট হইবার পর ইহার উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে তিনি বক্তৃতা করেন—সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে একাকীভাবে ইহাই তাঁহার প্রথম বক্তৃতা। 'ন্যাশনাল সোসাইটি ফর দি প্রিভেনশন অব ক্রুয়েলটি টু চিল্ড্রেন'-এর (শিশুদের প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রতিরোধক জাতীয় সমিতি) প্রেসিডেণ্টরূপে প্রথম তিনি একাকীভাবে লণ্ডন নগরীতে গমন করেন। ইটালিয়ান যুদ্ধক্ষেত্রে ভ্রমণব্যপদেশে রাজা ষষ্ঠ জর্জের অনুপস্থিতিকালে, অষ্টাদশ জন্মদিনের অব্যবহিত পরে তিনি অন্যতম কাউন্সিলর অব ষ্টেট নিযুক্ত হন।

অল্প বয়স হইতেই রাজকুমারী এলিজাবেথ একদিকে যেমন শিল্পকলা এবং সঙ্গীতের সমঝদার, অন্যদিকে বিবিধ ক্রীড়া-কৌতুকের প্রতিও তাঁর গভীর অনুরাগ। তাঁর অশ্বপ্রীতি অপরিসীম—বালিকা-বয়স হইতেই অশ্বারোহণে তিনি বিশেষ নিপুণা। সন্তরণ-বিদ্যায়ও তিনি পারদর্শিনী। ঐকান্তিক চেষ্টায় তিনি নিমজ্জমান ব্যক্তির প্রাণরক্ষার কৌশলাদি আয়ত্ত করেন এবং ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে বাথ ক্লাবে 'চিল্ড্রেন্স চ্যালেঞ্জ শিল্ড' নামক পুরস্কার লাভ করেন। সখের থিয়েটার তাঁহার আর একটি প্রিয় ব্যসন।

প্রিন্স এলিজাবেথ যখন গার্ল গাইড হন তখন তাঁহার বয়স এগার বৎসর মাত্র। নিজের কৃতিত্বের জন্য তিনি প্রথম বাকিংহাম প্রাসাদের গাইড কোম্পানির পেট্রল লীডার নির্ব্বাচিত হন এবং অবশেষে তিনি সি রেঞ্জারের পদ লাভ করেন। ষোল বৎসর বয়ঃক্রমকালে যুদ্ধের সময় অন্যান্য ষোড়শবর্ষীয়াদের সঙ্গে তিনি নিজের নাম রেজিষ্টারী করান। যুদ্ধের পর তিনি জুনিয়ার কম্যাণ্ডারের পদে উন্নীত হন। ১৯৪৯ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে উইমেন্স রয়্যাল আর্মি কোর গঠিত হইবার পর তিনি প্রথমে অনারারি সিনিয়র কনট্রোলার এবং পরে অনারারি ব্রিগেডিয়ারের সম্মানজনক পদ লাভ করেন। রাণী হইবার পর তিনি এই পদ ত্যাগ করেন।

১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের শীতকালে যখন তিনি এইচ-এম-এস ভ্যানগার্ড নামক যুদ্ধজাহাজ জলে ভাসান তখন তাহাতে প্রথম তাঁহার ব্যক্তিগত পতাকা উড্ডীন করেন। যুদ্ধাবসানকালের পর হইতে জনকল্যাণমূলক কার্য্যে রাজকুমারী এলিজাবেথের উত্তরোত্তর অধিকতর সময় ব্যয় হইতে থাকে। অনেকগুলি সমিতি তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা ও সভাপতিত্বের জন্য আবেদন জানায় এবং জনহিতকর অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষে তিনি সমগ্র ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ পরিভ্রমণ করেন। স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসীরা ছোটবেলা হইতেই তাঁহাকে জানিত, কেননা তাঁহার অনেকগুলি ছুটির দিন সেখানে অতিবাহিত হইয়াছিল। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে স্কটল্যাণ্ডে প্রথম তিনি একক ভাবে সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত হন। সেই সময় পিতামাতার সঙ্গে ভ্রমণকালে এডিনবরায় ওয়াই-এম-সি'র জন্য তাঁহাকে টাকার থলি প্রদান করা হয়।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে পিতামাতার সঙ্গে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা পর্য্যটনে যান। এই ভ্রমণকালে রাজকুমারী তাঁহার একবিংশতিতম জন্মদিবসের অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত করেন। এতদুপলক্ষে কেপটাউন হইতে তিনি কমনওয়েলথের অধিবাসীবৃন্দের নিকট একটি বেতার-ভাষণ প্রদান করেন।

দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে রাজ-পরিবারের প্রত্যাবর্ত্তনের অনতিকাল পরেই রাজা ঘোষণা করিলেন যে, তিনি রাজকুমারী এলিজাবেথ এবং লেফটেনাণ্ট ফিলিপ মাউণ্টব্যাটেনের আসন্ন বিবাহে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। প্রিন্স এণ্ড্রুর পুত্র লেফটেনাণ্ট মাউণ্টব্যাটেন জন্মিয়াছিলেন গ্রীসের প্রিন্স ফিলিপ রূপে, কিন্তু ব্রিটিশ

প্রজা হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাঁর রাজকীয় উপাধি বর্জন করেন। ডেনমার্কের রাজা নবম ক্রিষ্টিয়ান ছিলেন তাঁর অতিবৃদ্ধ পিতামহ এবং মাতৃপক্ষের দিক দিয়া তিনি রাণী ভিক্টোরিয়ার প্র-প্র-পৌত্র। তিনি এবং রাজকুমারী এলিজাবেথ বহু বর্ষ ধরিয়া পরস্পরকে জানিতেন—কেননা প্রিন্স ফিলিপের বাল্যকাল অতিবাহিত হয় ব্রিটেনে স্কুলে এবং তাঁহার খুল্লতাত লর্ড মাউন্টব্যাটেনের আলয়ে।

ডিউক অব এডিনবরা

১৯২১ সনের ১০ই জুন ডিউক অব এডিনবরার (প্রিন্স ফিলিপ) জন্ম হয়। তিনি গ্রীসের প্রিন্স এণ্ড্রুর পুত্র। প্রিন্স ফিলিপ স্বীয় রাজকীয় পদবী পরিত্যাগ করিয়া যখন ব্রিটিশ প্রজা হইলেন তখন তাঁহার মাতৃকুলের পদবী মাউণ্টব্যাটেন নামে হইল তাঁহার বংশ-পরিচিতি, কেননা তাঁহার পিতৃকুলের কোন পারিবারিক পদবী ছিল না।

প্রিন্সেস মার্গারেট

প্রিন্সেস রয়্যাল

মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে রাজকুমারী এলিজাবেথের বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৭ সনের ২০শে নবেম্বর। এই বিবাহ অনুষ্ঠানের অব্যবহিত পূর্ব্বে মাউন্টব্যাটেনকে ডিউক অব এডিনবরা অভিধা প্রদান করা হয়। পর বৎসর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী প্রিন্স চার্লসের এবং ১৯৫০ সনে তাঁর বোন প্রিন্সেস এনের জন্ম হয়। বিবাহের পর স্বামীর সঙ্গে এলিজাবেথ ফ্রান্স, গ্রীস, ইটালী প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেন। কর্ম্মোপলক্ষে স্বামীর মাল্টায় অবস্থানকালে তিনি বহু বার ঐ স্থান পরিদর্শন করেন।

কেনিয়া ভ্রমণকালে এলিজাবেথ তাঁর পিতার মৃত্যুসংবাদ পান। ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তিনি রাণী হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার চিত্ত তখন সদ্য পিতৃবিয়োগের বেদনায় ভারাক্রান্ত।

প্রিন্স ফিলিপ অল্প বয়সে ব্রিটেনে চলিয়া আসেন বিদ্যার্জ্জনের জন্য। স্কটল্যাণ্ডের এলগিনের নিকটবর্ত্তী গর্ডনসটাউনে অধ্যয়নকালে তিনি এক জন উৎকৃষ্ট খেলোয়াড় রূপে পরিচিত ছিলেন।

১৯৩৯ সনে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া প্রিন্স ফিলিপ নৌ-বিভাগের কেডেট হন। তিনি যখন রয়্যাল ন্যাভাল কলেজের ছাত্র তখন ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়া উঠে। ১৯৪০ সনের জানুয়ারী মাসে তিনি একটি যুদ্ধ-জাহাজের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী রূপে সমুদ্রে যান এবং বিভিন্ন রণতরীতে দায়িত্বপূর্ণ কাজ করিয়া অবশেষে ১৯৪২-এর অক্টোবর মাসে 'ওয়ালেস' ডেষ্ট্রয়ারের প্রথম লেফটেনাণ্টের পদে উন্নীত হন। জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন এবং খুল্লতাত লর্ড মাউন্টব্যাটেনের এ-ডি-সি রূপে কিছুকাল কার্য্য করেন।

১৯৪৭ সনের জুলাই মাসে লেফটেনাণ্ট মাউন্টব্যাটেনের

(১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ব্রিটিশ প্রজা হইবার পর তিনি তাঁর রাজকীয় পদবী বর্জ্জন করেন) সহিত প্রিন্সেস এলিজাবেথের বিবাহ-বন্ধনের স্বীকৃতির কথা (engagement) ঘোষিত হয়। ১৯৪৭ সনের ২০শে নবেম্বর ওয়েষ্টমিন্‌সটার এবেতে বিবাহ-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানের অব্যবহিত পূর্ব্বে লেফটেনাণ্ট মাউণ্টব্যাটেন রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জের নিকট হইতে 'ডিউক অব এডিনবরা' অভিধা লাভ করেন।

ডিউক অব গ্লষ্টার

বিজ্ঞানের প্রতি ডিউক অব এডিনবরার গভীর অনুরাগ। 'দি ব্রিটিশ এসোসিয়েশন ফর দি এডভান্সমেণ্ট অব সায়েন্স' নামক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান ১৯৫১ সনে সভাপতি হইবার জন্য তাঁহাকে আমন্ত্রণ করে। ক্রীড়া-কৌতুকের প্রতি এখনও তাঁহার সমান অনুরাগ বিদ্যমান।

ডিউক অব এডিনবরা কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অনারারী ডিগ্রীলাভ করিয়াছেন। তিনি ওয়েলস এবং এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার। ১৯৫১ সনে তিনি প্রিভি কাউন্সিলার হন।

রাণীমাতা রাণী এলিজাবেথ

ষ্ট্রাথমোরের চতুর্দ্দশ আর্লের সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা, বর্ত্তমান রাজ্ঞী দ্বিতীয় এলিজাবেথের মাতা, এলিজাবেথের জন্ম হয় ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে সেণ্ট পল্‌স্ ওয়াল্ডেনবারিতে। ইনি স্কটল্যাণ্ডের বোয়েস-লায়ন রাজবংশের কন্যা।

গৃহেই এলিজাবেথ বোয়েস-লায়নের শিক্ষা আরম্ভ হয়। সঙ্গীতানুরাগী পরিবারে তাঁহার জন্ম, শৈশবকাল হইতেই পিয়ানো বাদন এবং সঙ্গীতের উপর তাঁর বিশেষ ঝোঁক দেখা যায়। ভাষা-শিক্ষার প্রতিও অল্প বয়সেই তাঁর বিশেষ আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়—মাত্র দশ বৎসর বয়সে ফরাসী ভাষায় তিনি অনর্গল কথা বলিতে পারিতেন। উত্তর জীবনে যুদ্ধকালে ফ্রান্সের নারীদের উদ্দেশে ফরাসী ভাষায় বেতার-বক্তৃতা প্রদান করিয়া তিনি বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এলিজাবেথের পিতামাতা প্রায়ই রাজপরিবারের লোকেদের স্বগৃহে প্রীতিভোজে আমন্ত্রণ করিতেন। ফলে উভয় পরিবারের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়। ১৯২৩ সনের জানুয়ারী মাসে রাজার দ্বিতীয় পুত্র ডিউক অব ইয়র্কের সঙ্গে তাঁহার আসন্ন বিবাহের কথা ঘোষিত হয়। ওয়েষ্টমিনষ্টার এবেতে ২৬শে এপ্রিল এই বিবাহ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

১৯৩৬ সনে ব্রিটেনের এই সুখী রাজপরিবারে অপ্রত্যাশিত এবং আকস্মিক বিপর্যয় দেখা দেয়। রাজা পঞ্চম জর্জ্জ জানুয়ারী মাসে পরলোক গমন করেন, ওদিকে রাজা অষ্টম এডওয়ার্ড করেন সিংহাসনত্যাগ। তখন সিংহাসনে আরোহণপূর্ব্বক রাজকীয় দায়িত্ব গ্রহণ করিবার জন্য আমন্ত্রণ আসিল ডিউক এবং ডাচেস অব ইয়র্কের নিকট। ১৯৩৭ সনের ১২ই মে তাঁহাদের অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাণী স্বেচ্ছায় নানা দুঃখ ও বিপদ বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। ১৯৪০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে বাকিংহাম প্যালেসে যখন বোমাবর্ষণ হয় তখন তিনি সেখানেই ছিলেন এবং রাজার সঙ্গে তিনি বোমাবিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহ পরিদর্শন করেন।

১৯৪৮ সনে রাজা এবং রাণী তাঁদের বিবাহের রজতজয়ন্তী উৎসবের অনুষ্ঠান করেন। রাণীমাতা এলিজাবেথ বহু সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত আছেন। তিনি অনেকগুলি রেজিমেণ্টের কর্ণেল-ইন-চীফ এবং কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনারারী ডিগ্রিধারিণী।

প্রিন্সেস মার্গারেট

১৯৩০ সনের আগষ্ট মাসে গ্লামিসে রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জ এবং রাণী এলিজাবেথের কনিষ্ঠা কন্যা মার্গারেটের জন্ম হয়।

তাঁহার বয়স যখন আঠার বৎসর মাত্র তখন তিনি নেদারল্যাণ্ডস-এ গমন করেন এবং রাণী জুলিয়ানার রাজ্যাভিষেকে রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জের প্রতিনিধিত্ব করেন।

প্রিন্সেস মার্গারেট "ইংলিশ ফোক ড্যান্স এণ্ড সঙ সোসাইটি" ইত্যাদি বহু প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষিকা। ১৯৫১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ভূতপূর্ব্ব রাজার অসুস্থতার সময় যে পাঁচ জন কাউন্সিলার নিযুক্ত হন তিনি ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম।

প্রিন্সেস রয়্যাল

প্রিন্সেস রয়্যাল রাজা পঞ্চম জর্জ্জ এবং রাণী মেরীর একমাত্র কন্যা। ১৮৯৭ সনের ২৫শে এপ্রিল স্যাণ্ড্রিংহামের ইয়র্ক কটেজে তাঁহার জন্ম হয়। গীর্জ্জায় তাঁহার নামকরণ করা হয় আলেকজাণ্ড্রা এলিস মেরী। গৃহেই তিনি বিদ্যা অর্জ্জন করেন—সাধারণ পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার প্রতিও তাঁহার বিশেষ আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়।

প্রিন্সেস রয়্যাল হাসপাতাল এবং নার্সিং-এর কার্য্যে বরাবর উৎসাহী—বিশেষতঃ শিশুকল্যাণমূলক কার্য্যে তাঁহার নিষ্ঠার তুলনা নাই।

ডাচেস অব গ্লষ্টার

১৯২২ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে ওয়েষ্টমিনস্টার এবেতে ভাইকাউণ্ট লাসেলস-এর (পরবর্তীকালে হেয়ারউডের ষষ্ঠ আর্ল) সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

১৯৩২ সনে রাজা পঞ্চম জর্জ্জ প্রিন্সেস মেরীকে প্রিন্সেস রয়্যাল উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৩৯, '৪৩, '৪৪ এবং '৪৭ এই কয়টি বৎসরে রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জের অনুপস্থিতিকালে প্রিন্সেস রয়্যাল অন্যতম কাউন্সিলাররূপে কার্য্য করেন। ১৯৫১ সনে লিড্‌স ইউনিভার্সিটি তাঁহাকে চ্যান্সেলার নিযুক্ত করিয়া এক নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন—প্রিন্সেস রয়্যালই ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা-চ্যান্সেলার।

ডিউক অব গ্লষ্টার

ডিউক অব গ্লষ্টার রাজা পঞ্চম জর্জ্জের তৃতীয় পুত্র—১৯০০ সনের ৩১শে মার্চ্চ তাঁহার জন্মতারিখ। ইটনে আর্মি ক্লাসে ভর্ত্তি হইয়া তিনি রয়্যাল মিলিটারি কলেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২৮ সনে তিনি ডিউক অব গ্লষ্টার উপাধি লাভ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি আর্মিতে যোগদান করেন এবং ফ্রান্সে বোমাবর্ষণের সময় সামান্য রকম আহত হন। ১৯৪১ এবং '৪২এ মিলিটারি মিশন উপলক্ষে তিনি জিব্রাল্টার যাত্রা করেন। অতঃপর মধ্যপ্রাচ্যে ভ্রমণকালে তিনি সিংহল এবং ভারতবর্ষে গমন করেন।

ডাচেস অব কেণ্ট

১৯৪৪ সনে তিনি অষ্ট্রেলিয়ার গবর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন। সেখানে তিনি দুই বৎসর (১৯৪৫-৪৭) কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

ডিউক অব গ্লষ্টার একজন পেশাদার সৈনিক। কিন্তু সৈনিক বৃত্তির ন্যায় কৃষিকর্ম্মেও তাঁর সমান আনন্দ, উৎসাহ ও অনুরাগ। অষ্ট্রেলিয়া যাওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি নিজে তাঁর বার্ণওয়েল মেনর খাসতালুকস্থিত ফার্ম্ম পরিচালনা করিতেন। ১৯৩৫ সনে লেডী এলিস মণ্টেগু-ডগলাস-স্কটের সহিত ডিউক অব গ্লষ্টারের বিবাহ হয়।

ডিউক অব কেণ্ট

১৯৩৫ সনের ৯ই অক্টোবর ডিউক অব কেণ্টের জন্ম হয়।

ডিউকের অভিধা লাভ না করা পর্য্যন্ত তিনি প্রিন্স এডওয়ার্ড অব কেন্ট এই আখ্যায় পরিচিত ছিলেন। ১৯৪২ সনে বিমান-দুর্ঘটনায় পিতার শোচনীয় মৃত্যুর পর তিনি ডিউক হন। তিনি ক্রীড়াকৌতুকের বিশেষ অনুরাগী। যন্ত্রশিল্পের প্রতি অনুরাগ তিনি তাঁর পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছেন।

ডাচেস অব কেন্ট

১৯০৬ সনের ১৩ই ডিসেম্বর এথেন্সে ডাচেস অব কেন্ট-এর (প্রিন্সেস মেরিনা) জন্ম হয়। তিনি গ্রীসের প্রিন্স নিকোলাসের সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা।

জ্যেষ্ঠা ভগিনী এবং ভগ্নিপতীর আলয়ে অবস্থানকালে প্রিন্স জর্জের (রাজা পঞ্চম জর্জের তৃতীয় পুত্র) সহিত তাঁহার পূর্ব্বরাগের পালা সুরু হয়। ইঁহাদের বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় ১৯৩৪ সনের ২৯শে নবেম্বর। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রিন্স ডিউক অব কেন্ট অভিধা লাভ করেন। ১৯৪২ সনে ডিউক অব কেন্টের শোকাবহ মৃত্যুর পর ডাচেস তাঁর স্বামীর অসমাপ্ত বহু কার্য্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন।*

* ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিসেস কর্ত্তৃক প্রদত্ত তথ্যাদি অবলম্বনে

রবীন্দ্র-কাব্যে নারী

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

জগতের বহু কবিই লেখনীমুখে নারী-চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথও নারীকে অর্দ্ধেক মানবী এবং অর্দ্ধেক কল্পনা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। নারীর অর্দ্ধেক স্ফুট এবং অর্দ্ধেক অস্ফুট, রহস্যঘন। বস্তুতঃ নারীর সমস্ত রহস্য যদি সহজেই ধরা পড়িয়া যায়, তাহা হইলে ত নারীর প্রতি আকর্ষণই কমিয়া যাইবার কথা। জগতের বহু শ্রেষ্ঠ কবি নারী তথা প্রেয়সীকে অপরিচয়ের ঘন রহস্যের কুহেলী যবনিকার অন্তরালে রাখিয়া দিয়াছেন। দান্তের বিয়াত্রিচ—যাঁহাকে উপজীব্য করিয়া "ডিভাইন কমেডির" মত অমর কাব্যের সৃষ্টি, সেই নারী-প্রেয়সীকে চোখে দেখিবার মত দান্তের সাহস ছিল না। কি জানি পরিচয়ের কষ্টিপাথরে যাচাই করিতে গেলে যদি সোনা রাঙ হইয়া যায়। সিডনি প্রমুখ 'রোম্যানটিক লাভ-পোয়েটস' তাঁহাদের 'লেডি-লাভ'দের সম্বন্ধে অনেক গালভরা কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু রঙ-ছুট হইবার ভয়ে তাঁহারা প্রিয়াকে শো-কেসে রাখিয়া দিয়াছেন—হয় ত দৈনন্দিন জীবনের মালিন্যের সংস্পর্শে আসিয়া প্রিয়ার সমস্তটুকু মাধুর্য্যই নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। দূরত্ব কল্পনাকে প্রবুদ্ধ করে, নৈকট্যে স্বপ্নভঙ্গের সম্ভাবনাই অধিক।

রবীন্দ্রনাথ কোথাও নারীকে এড়াইয়া চলেন নাই। নারীর দেহ-বর্ণনাতে রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতার সূচনা। প্রাচীন অনেক সংস্কৃত কাব্যের মত আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্ব্বের কবিতায় নারীর পুঙ্খানুপুঙ্খ দেহ-বর্ণনা দেখিতে পাই। তবে সংস্কৃত-সাহিত্যের সহিত রবীন্দ্রনাথের মূলগত পার্থক্য এই যে, নারীর দেহকে তিনি নিছক লালসার লীলাভূমি বলিয়া বর্ণনা করেন নাই। তিনি প্রিয়াকে সৌন্দর্য্যের নগ্ন আভরণ পরাইয়াছেন, কিন্তু বিন্দুমাত্র অসংযম প্রকাশ করেন নাই, বরং অজ্ঞাত, অপ্রকাশিত চাপল্যের জন্য পূর্ব্ব হইতে ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়াছেন—

হে প্রিয়তমা
চপলতা আজি যদি ঘটে তবে
করিয়ো ক্ষমা।

কবির নারী-রূপ-বর্ণনা পবিত্র। অচ্ছোদ সরসী-নীরে উদ্ভিন্ন-যৌবনা স্নানরতা তরুণীকে পুষ্প-শর হানিয়াও মীনকেতুকে পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছে। শূন্য তূণ ও ধনু পদপ্রান্তে সমর্পণ করিয়া দেবীকে অর্ঘ্য প্রদান করিতে হইয়াছে। নারীর রূপকে রবীন্দ্রনাথ একান্তভাবে ভোগের সামগ্রী করিয়া তুলিতে পারেন নাই। তাই রাজকন্যার নিদ্রিত রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন—

পত্রপুটে রয়েছে যেন ঢাকা
অনাঘ্রাত পূজার ফুল দুটি

অপূর্ব্ব শুচিতার সহিত তিনি রাজকন্যার মুকুলিত যৌবনকে অঙ্কিত করিয়াছেন।

রবীন্দ্র-কাব্য সৌন্দর্য্য-সাধনায় ভরপুর, রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য্যের খণ্ড-ছিন্ন রূপ দেখেন নাই, তিনি দেখিয়াছিলেন সমগ্র রূপ এবং দেখাইয়াছেন কোন খণ্ড সৌন্দর্য্যই আপনাতে আপনি পরিসমাপ্ত নহে। তাঁহার উর্ব্বশী কবিতা সৌন্দর্য্য-সাধনার চরম দৃষ্টান্ত। উর্ব্বশী স্বর্গের অপ্সরী, সে সাধারণ নারী নয়, মাতা নয়, কন্যা নয়, বধূ নয়, সে যে সৌন্দর্য্যের প্রতীক। এই সৌন্দর্য্যই সমগ্র জগতকে পরিচালিত করিতেছে। সে যে চিরযৌবনা। সৌন্দর্য্যের আবার বাল্য বার্দ্ধক্য কোথায়? সে যে চির-পরিপূর্ণা।

"A thing of beauty is a joy for ever."

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য্য-সাধনার মধ্যেও আমরা বিশুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গী এবং সংযমের পরিচয় পাই। যে প্রিয়া রাত্রে প্রেয়সীর রূপে আসেন, তিনিই আবার প্রভাতে দেবীর বেশে কবিকে সম্ভ্রম-ভরে দূরে অবনত শিরে দাঁড়াইয়া থাকিতে প্রবৃত্ত করেন। রবীন্দ্র-

নাথ দেখিয়াছেন নারীর দুইটি মূর্ত্তি, একটি রসঘন প্রিয়া-মূর্ত্তি, অপরটি মঙ্গলময়ী বিশ্বপালিনী জননী-মূর্ত্তি। এক জন ফাল্গুনের পাত্র ভরিয়া মন-প্রাণ হরণ করে, অপর জন কল্যাণরূপিণী জগদ্ধাত্রী।

রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা নারীর দেহ-বর্ণনাতে আরম্ভ হইয়া দেহাতীতের পানে যাত্রা করিয়াছে। ইহা যেন আর এক সীমা ছাড়িয়া অসীমের পানে যাত্রা। ইংরেজী সাহিত্যে সপ্তদশ শতাব্দীতে আমরা Donne প্রভৃতি মরমী কবিদের কাব্যেও দেখিতে পাই, দেহকে আত্মার আধার রূপে রূপায়িত করা হইয়াছে। রবীন্দ্র-কাব্যেও পূর্ব্ব-পর্য্যায়ের রূপ পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে রসে উন্নীত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের মানসী নারী ক্রমে মানবীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। কিন্তু সেই মানবী একা নয়, তাহার চারিপাশে প্রকৃতির ঘন আবেষ্টন। মানবী-প্রেয়সী যখন কবির অন্তরে পুলক-শিহরণ জাগাইয়া তোলে, যখন কবি অন্তর দিয়া মানবী-প্রেয়সীর উপস্থিতি অনুভব করেন, বর্ষার মেঘ-মেদুর দিনে যখন কবি গাহিয়া উঠেন—'এমন দিনে তারে বলা যায়'—তখন কি মানবী-প্রেয়সীর ঠিক পাশেই প্রকৃতি তাহার বর্ণ সম্ভার লইয়া উপস্থিত থাকে না?

তুমি এলে আগে আগে দীপ লয়ে করে
তব পাছে পাছে বিশ্ব পশিল অন্তরে।

রবীন্দ্রনাথের নারী শাশ্বতী। সে শাশ্বত পুরুষকেই ভালবাসে। এ ভালবাসার সম্বন্ধ নিত্য কালের। চিরন্তনী নারী ও চিরন্তন পুরুষ পরস্পর পরস্পরকে শত রূপে শত বার যুগযুগান্তর এবং জন্মজন্মান্তর ধরিয়া ভালবাসিয়া আসিতেছে। এ ভালবাসা অনন্ত, অসীম। এ ভালবাসার খেলায় আঘাত নাই, অবহেলা নাই, আছে অনন্ত মিলন।

আমরা দু'জনে করিয়াছি খেলা
কোটি প্রেমিকের মাঝে।
বিরহবিধুর নয়ন-সলিলে
মিলন-মধুর লাজে।
পুরাতন প্রেম নিত্য-নূতন সাজে।

কিন্তু কালের যাত্রার ধ্বনি রবীন্দ্রনাথ শুনিতে পাইয়াছিলেন। তাই তিনি নারীকে শুধু 'মৃদুনি কুসুমাদপি' করিয়াই আঁকেন নাই, স্থল-বিশেষে রবীন্দ্রনাথের নারী 'বজ্রাদপি কঠোরাণি'। দিগ্বিজয়ী অর্জ্জুনকেও রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদার নিকট নতিস্বীকার করিতে হইয়াছে। সাধারণতঃ নারী পুরুষের চাটুবাক্যে অথবা প্রণয়ের গদ গদ ভাবে আত্মবিস্মৃত হইয়া, আপন সত্তা হারাইয়া ফেলে। কিন্তু প্রেমের একান্ত বন্ধনে নারী যেখানে পুরুষের সমব্রতধারিণী, পুরুষের সমস্তকিছুর সমভাগী সেখানেই তাহার পূর্ণ-গৌরব। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা বলিতেছেন:

দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নই।

চিত্রাঙ্গদা দেবীও নহে, সামান্যা রমণীও নহে। মদনদত্ত সৌন্দর্য্যে কুরূপা চিত্রাঙ্গদা অর্জ্জুনের মনোরাজ্য জয় করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার চরম গৌরব সে জয়ে নয়। সে তখনই বিজয়িনী হইবে যখন অর্জ্জুনের জীবনে প্রতি দিবসের কর্ম্মে সে সত্য হইয়া রহিবে। মধুযামিনীর আশ্লেষ চুম্বন চিত্রাঙ্গদার দেহে আবেশ আনিলেও, মনে শান্তি আনিয়া দিতে পারে নাই।

সাম্প্রতিক যুগ সমস্যার যুগ। এ যুগের নারীর অসূর্য্যম্পশ্যা থাকিয়া 'ভবন-শিখিরে নাচাইলে' চলিবে না, কারণ এ যুগে নারীর পদাঘাতে অশোককুঞ্জ ফুটিয়া উঠে না, মুখের মদিরাতে বকুলও ফুল্ল হয় না। রবীন্দ্রনাথ সত্যদ্রষ্টা কবি। তিনি যুগধর্ম্মের প্রয়োজন পূর্ব্ব হইতেই বুঝিয়াছিলেন। তাই "সেকাল" কবিতাতে তিনি আধুনিকা নারীর প্রশস্তির প্রস্তাবনা করিয়াছেন:

পরেন বটে জুতো মোজা
চলেন বটে সোজা সোজা
বলেন বটে কথাবার্ত্তা
অন্যদেশীর চালে,
তবু দেখ সেই কটাক্ষ
আঁখির কোণে দিচ্ছে সাক্ষ্য
যেমনটি ঠিক দেখা যেত
কালিদাসের কালে।

এ যুগের নারী সর্ব্বতোভাবে পুরুষের সহধর্ম্মিণী, সে পুরুষের কর্ম্ম-সহচরী। তাহার সাহচর্য্যে পুরুষ কঠোর জীবন-সংগ্রামে জয়ী হয়। এ যুগে পুরুষের পাশে নারী না থাকিলে পুরুষ নিষ্প্রভ হইয়া পড়িবে। এ যুগের নারী হইবে শক্তির অংশসম্ভূতা বীরাঙ্গনা, অথচ কোমলাঙ্গী, স্নেহময়ী, প্রেম-মুকুলিতা। রবীন্দ্রনাথ 'মহুয়া'তে বীরাঙ্গনা প্রেমিকা নারীর বর্ণনা করিয়াছেন। সে নারী শুধু বাসর-শয়ন রচনা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিবে না—

আমরা দুজনে স্বর্গখেলনা
গড়িব না ধরণীতে।

সে চলতি পথের যাত্রী—সবলা, প্রগতিশীলা, নব যুগের সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া চলিতে চায়। আঘাত সহ্য করিবার শক্তি তাহার যথেষ্ট আছে।

'মহুয়া'তে নারীর স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগ্রত হইয়াছে। এখানে সে পুরুষের সত্যিকারের জীবন-সঙ্গিনী এবং সহধর্ম্মিণী। জীবনের বন্ধুর পথে চলিতে চলিতে কতই না জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়। পুরুষ সেই সব সমস্যা একান্ত আপন করিয়া হৃদয়ের গোপন প্রদেশে লুকায়িত রাখে। 'মহুয়া'র নারী পুরুষের সমান অধিকার চায়। জটিল সমস্যার সমাধানে সে পুরুষকে বুদ্ধি দিয়া, সামর্থ্য দিয়া সাহায্য করিতে চায়। সে দুঃখের পসরা হাসিমুখে বহন করিয়া জীবনের কণ্টকময় পথে পুরুষের সঙ্গে অগ্রসর হইয়া বিজয়-গৌরব অর্জ্জন করিতে চায়। প্রণয়ের ফাঁকা বুলিতে সে আর ভুলিবে না।

যেখানে সে ফাঁকি ধরিতে পারিবে সেইখান হইতেই অকপটে সরিয়া দাঁড়াইবে। "দায়মোচন" কবিতাটিতে নারী তাহার প্রিয়তমকে প্রেমের ঋণ হইতে মুক্তি দিতেছে। মিথ্যা চাটুবাক্যে সে আর ভুলিবে না—

প্রেমেরে বাড়াতে গিয়ে মিশাব না ফাঁকি,
সীমারে মানিয়া তার মর্য্যাদা রাখি
যা পেয়েছি সেই মোর অক্ষয় ধন
যা পাই নি বড় সেই নয়।

এখানে নারী অতি বড় প্রেমিকা। অতি বড় প্রেমিকা না হইলে এমন কথা এত সহজে বলা যায় না। একদা রাধা আক্ষেপ করিয়াছিলেন—

সই কেমনে ধরিব হিয়া
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙিনা দিয়া।

এখানে শ্রীরাধার পরাজয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নারী বিজয়িনী। 'বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না, তাহা দূরে ঠেলিয়া দিবারও ক্ষমতা রাখে।'

শেষের কবিতায় 'লাবণ্য'ও রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। লাবণ্য 'মিতা'কে বলিয়াছে—

সব-চেয়ে সত্য মোর, সেই মৃত্যুঞ্জয়
সে আমার প্রেম।
তারে আমি রাখিয়া এলেম
অপরিবর্ত্তন অর্ঘ্য তোমার উদ্দেশে।

প্রেমই নারী-জীবনের সোনার কাঠি। ইহাই নারীকে পুষ্পিত, মঞ্জরিত, সঞ্জীবিত করে। লাবণ্য সেই প্রেমের বিদ্যুচ্চমক অমিতের মধ্যে লক্ষ্য করিয়া একদা তাহাকে নিঃসংকোচে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া ধন্য হইয়াছিল। যতটুকু সে পাইয়াছিল তাহার মধ্যে ফাঁক বা ফাঁকির বিন্দুবিসর্গও ছিল না। তাহার পর পরিবর্ত্তনের স্রোতে গা ভাসাইয়া অমিত অন্য কূলে জাগিয়া উঠিল। লাবণ্যও ভাসিয়া গেল, সে-ও কূল পাইল। যত দিন অমিত ছিল, লাবণ্যও ছিল। তাহার পর একে অপরের জীবনে মৃত। তবুও তাহারা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে অপরিবর্ত্তনের মিলন-রাখী বাঁধিয়া দিয়া বলিল—এ বন্ধন অক্ষয় হোক্।

জীবন বসন্ত

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

ফাল্গুন এসেছে ফিরে জীবনের বসন্তে তোমার,
হে কবি, তোমারে দেখি জাগে মোর পরম বিস্ময়,
মনের যৌবন তব তিলমাত্র হয় নাই ক্ষয়,
বিহঙ্গ-ঝঙ্কারে আজও শিহরিয়া ওঠ বার বার।
নাহি জানি মাখিয়াছ কি অঞ্জন আঁখিতে তোমার,
নিত্য তুমি পৃথিবীর নবতম রূপ দেখ তাই,
বসন্তের অন্তঃপুর গোপন যে কিছু রাখে নাই,
তোমার সম্মুখে কবি অজানার খুলে গেছে দ্বার।

আমরা অকবি যত পথমাঝে ভিড় ক'রে থাকি,
বুঝি না ফুলের ভাষা, শুনি না নতুন কোনো সুর,
বসন্ত নিরাশ হয়ে ফিরে যায় ব্যর্থ ডাক ডাকি,
কল্পনা-নর্ত্তকী হায় নিরর্থক বাজায় নূপুর।
হে কবি, লও তো বাঁশী, বাজাও সে জাগরণী-গান,
কবি করো অকবিরে, শিহরিয়া উঠুক পাষাণ।*

* শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহার "ফাল্গুনে" কবিতা পাঠে

মঃ

শ্রীঅমরকুমার দত্ত

কায়ার বাঁধন কায়াহীন রূপে ফুটিল মর্ম্মমুকুরে,
তনুরুচিময় অতনু মিলন—মিলাল জীবন-বঁধুরে;
অরুণ আসিয়া খুলিল সেথায় উষসীর অবগুণ্ঠন,
চির-পলাতকা তৃষাতুরে দিল চির চাওয়া চুম্বন।

রজনীতে যারা মিলন-রভসে মিলিল বাহুর ডোরে,
ফুল-মালিকার ব্যবধানটুকু সহে নি ঘুমের ঘোরে,
সেই মিলনের পূর্ণ পাত্রে কনক-কিরণধারা
অমিয় জীবন দিয়ে গেল এনে ভাঙিয়া দেহের কারা

রূপ-মালঞ্চে অরূপ প্রেমের সোনালি স্বপন-ছায়া,
ফুটাইল ফুল দেহের প্রান্তে—মোহন মধুর মায়া,
তাহারি পরশ আবেশ বিভোর বিধুর-হিয়ার কথা
উষসীর রাঙা ওষ্ঠের 'পরে এনে দিল ব্যাকুলতা।

স্রোতোবহা মালিনী

শ্রীগৌরী চৌধুরী

প্রস্তাবনা

লঘু মেঘের পাল তুলে, স্রোতোবহা মালিনীর মন্দাক্রান্তা তালে দুলে দুলে ময়ূরপঙ্খী চলেছে উজ্জয়িনীর নন্দনতীর হতে অলকার রসতীর্থে। নীচে বহুদূরে মহাকালের দুস্তর লবণাম্বুরাশি—তারই ওপারের তমালতালীবনরাজিনীলা তন্বী তটরেখা দূরগত কোন মোহভরা স্বপ্নের মত চোখে পড়ে আরোহীর। এই অতুলন তরণীখানির সূত্রধর হলেন—মহাশিল্পী কালিদাস, রসিকজনের কান্ত-কবি কালিদাস।

প্রথম যাঁহার কাব্যকূজন সুরবাণীর কুঞ্জবনে
যৌবনেরই মদিরসুধায় মত্ত ঋতুর আবাহনে,
অগ্নিমিত্র-মালবিকা, পুরূরবা ও উর্বশীর
প্রেম-কাহিনী পরাণ পেল ইন্দ্রজালে যাঁর লেখনীর :
নির্বাসনে বিধুর-হিয়া কোন্ বিরহীর বার্তা বহি'
আকাশ-গাঙ্গে ভাসলো মেঘ—বইল বাতাস রহি রহি' ;
কীর্ত্তি-উজল রঘুর যত বংশধরের বন্দনে
যজ্ঞে হ'ল অর্ঘ্য-রচা ছন্দ-ফুল-চন্দনে :
অ-রূপ-হরণ মদন-দহন শিবের সনে অপর্ণার
পরিণয়ের মধুরগীতি গাইছে আজও কাব্য যাঁর—

তাঁরই পরিণত বয়সের পরিপূর্ণ সৃষ্টি "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্"।

উদয়ভানুর সাতরঙা আলোয় ঝলমল সানুমান্ হেমকূটের শিখর হতে যে রঙের ঝরণা বইলো তারই বর্ণে অনুরঞ্জিত তূলিকা দিয়ে কল্পলতার শ্যাম-অংশুকে আঁকা শকুন্তলার অনবদ্য আলেখ্যখানি—

যতবার হেরি বিস্ময় লাগে
মুগ্ধচিত্তে সংশয় জাগে—
রেখাবন্ধনে বন্দী রূপের ছন্দোমাঝে
প্রাণের স্পন্দে জেগেছে কি মনোরমা ?
নিখিলের যত রূপ আহরিয়া যত্নে রচা
এ কি বিধাতার নূতনা তিলোত্তমা ?

গুণীর সুরলোকে রম্যরাগিণীর তানবিস্তার হ'ল যে যন্ত্রে, সেটি বৈরাগীর একতারা নয়—সরস্বতীর আপন-হাতের প্রসাদধন্য বহুতন্ত্রী বীণা—তার সুরের ঝঙ্কারে বারে বারে পর্য্যুৎসুক হয় মন, যেন মনে পড়ে যায়—

ভুলে যাওয়া কোন্ দূরজনমের স্মৃতির কবিতাগুলি
আধো-বিস্মৃতির অবগুণ্ঠনে ঢাকা—

তার মিড়ে মিড়ে, গমকে গমকে মানুষের দুঃখসুখের হাসি-কান্নার মিলন-বিরহের কাহিনী—আস্থায়ী-তে ভুবনবিজয়ী পুষ্পধনুর পূজন-বন্দন, অন্তরা-য় শাপিত দর্পিত মদনের ভস্ম-অপমান শয্যা-রচনা, আভোগে তপোদগ্ধ পূতশুদ্ধ অলদর্চি-তনু অনঙ্গের অর্চনা। সব মিলে একটি পরিপূর্ণ ঐকতান—যার সুরস্রবমায় মুগ্ধ হ'ল অভিভূত হ'ল রসপিপাসু বিদগ্ধজনের চিত্তমন।

'শকুন্তলা'র প্রথম তিনটি অঙ্কে দেখি শান্তগম্ভীর আশ্রমপদেও যৌবনের কেতন উড়িয়েছেন কবি—

রসাল-শাখে লতিয়ে-ওঠা ফুল নবমল্লিকায়
অনুরাগে মেললো আঁখি ফুলকুমারী—
উৎপলেরই গন্ধভরা মৃদু মৃদু বইলো বায়—
সংগোপনে মদন এলো স্বপ্নচারী ॥

যে দুর্বিনীত দুষ্ট মধুকর আকুল করেছিল শকুন্তলাকে, সে এল দুষ্মন্তের ছদ্মবেশে, সুরু হ'ল নবমল্লিকার আত্মনিবেদনের পালা। মালিনীর তীরে সৈকতবালুকায় বিশ্রম্ভালাপে মত্ত হ'ল হংসমিথুন, সপ্তপর্ণের উগ্র সুরভি ছড়াল দিগন্তরে। চতুর্থ অঙ্কে ফুলের স্বপ্নভঙ্গের আয়োজন—নেপথ্যে—

কান্তের ধ্যানে আপনা-হারায়ে জানে নি সে হায়,
কুটিরদুয়ারে কে অতিথি এসে ফিরে চলে যায়—

—অপমানিতের অভিশাপে তাই রাজমধুকরের মনে চূতমঞ্জরীর স্মৃতির প্রদীপশিখা গেল নিভে, মালিনীর জলকণাবাহী অরবিন্দের সুরভি-মাখানো উদাস বাতাস মেঘপ্রতিচ্ছন্দ প্রাসাদের অলিন্দে গিয়ে পৌঁছাল না আর। তারই রূঢ় অভিঘাত পঞ্চম অঙ্কে—

দ্বিপ্রহরের প্রখর আলোকে
গোধূলি-স্বপ্ন টুটিল পলকে,
ইন্দ্রধনুর মিলালো রংবাহার—
মদিরা-সুরভি-পরিমল-হারা
বেদনা-আহত ফুল দিশাহারা
—পাপড়ি-ঝরার সময় এলো যে তার।

কিন্তু ঝরাফুলের কান্না দিয়েই শেষ হয় নি মহাকবির কাব্য—তাঁর উপসংহার মহত্তর, মধুরতর। তাই রিক্তফুলের তপস্যা সার্থক করে এসেছে ফলের আশীর্ব্বাদ—

পাপড়ির নির্মোক আধারেই খসেছে,
মদিরা-পাত্রখানি শূন্য :
প্রেমের পরমবাণী শুনেছে সে শুনেছে
ফলভারে ফুল আজ ধন্য ॥

—

আমুখ

নাটকের কথাবস্তুর সূত্রটি যিনি ধরিয়ে দেন দর্শকদের হাতে—তিনিই সূত্রধার। সূত্রধার এবং নটীর সংলাপের মধ্য দিয়ে সুকৌশলে বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হয় সংস্কৃত নাটকে। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'-এ নটীর সঙ্গীতে বিমুগ্ধ সূত্রধার একটি সামান্য উপমার সাহায্যে মৃগানুসারী রাজা দুষ্মন্তকে এনে ফেলেছেন রঙ্গমঞ্চে। তারই প্রস্তুতি সূত্রধারের গ্রীষ্মবর্ণনায়; গ্রীষ্মের যে দিকটি উপভোগক্ষম, তারই বর্ণনা করছেন তিনি—

স্নানগসলিলাবগাহাঃ পাটলসংসর্গিসুরভিবনবাতাঃ।
প্রচ্ছায়সুলভনিদ্রা দিবসাঃ পরিণামরমণীয়াঃ॥
জলে জলে আজ অবগাহনের আবাহন,
পাটলে চুমিয়া বনবায় হলো সুরভি;
বিটপিছায়ায় তন্দ্রাজড়িমা আনে—
দগ্ধদিনের স্নিগ্ধ যে অবসান।

শান্তরসের সিদ্ধকবি কালিদাস। তাঁর কাব্যসরিৎ বয় মালিনীর কুলুকুলু ছন্দে—গোদাবরীর গদগদনদং নাদে নয়। তাই তাঁর বৈশাখের বর্ণনায় নটরাজের রুদ্র ডমরু কোথাও বাজে নি। সেদিনকার সেই বিস্মৃত নিদাঘে দগ্ধতাম্র দিগন্তের পারে, আগুনের অক্ষরে কি বাণী ফুটে উঠেছিল—তা 'শকুন্তলা' নাটকের কোথাও লেখা নেই।

নায়িকা শকুন্তলার তনুদেহ যে পরিবাধাপেলব—গ্রীষ্ম-আতপে সন্তপ্ত হবেন তিনি, তাই মরমী-কবির দরদ-ছোঁয়ায়, বেতসকুঞ্জ হ'ল ছায়া-নিবিড়, প্রচ্ছায়সুলভ হ'ল সপ্তপর্ণ-বেদিকা, পাতায়-ভরা পাদপদল ছায়ার আঁচল বিছাল পথে পথে, মালিনীর ঢেউ হতে চুরি করা জল নিয়ে বাতাস বইল স্নিগ্ধ হয়ে—সঙ্গে তার পাটল-সপ্তপর্ণ-অরবিন্দের সুরভি।

কবির শান্ত বিবিক্ত কাব্যকুটিরের বহিরঙ্গনে যখন রুদ্র অতিথি 'অয়মহং ভোঃ' বলে এসে দাঁড়াল, তখন কাব্য রচনায় অনন্যমানস কবি শুনতে পেলেন না সে অতিথিনিবেদিতম্—উপেক্ষিতের অভিশাপে দলিত মথিত হ'ল তাঁর তপোবনের নিভৃত শান্তি। কিন্তু অভিশাপের কালিমাকে অক্ষয় করে রাখলেন না কালিদাস—পরিণামকে করলেন রমণীয়। মর্ত্যের ধূলার মধ্য দিয়ে তাঁর পুষ্পক এসে থামল মিলনস্বর্গের সিংহদ্বারে—বাল-অরুণের রক্ত কিরণাঘাতে যেখানে ঝলমলিয়ে উঠেছে হেমকূটের সোনার শিখর, মন্দার গন্ধে আকুল হয়েছে বাতাস, স্বর্ণকমল থরে থরে ফুটেছে স্বর্গঙ্গার জলে।

সূত্রধারের নির্দেশে সমাগত দর্শকবৃন্দের চিত্তবিনোদনের জন্য গান ধরলেন নটী—

ঈষদীষচ্চুম্বিতানি ভ্রমরৈঃ সুকুমারকেসরশিখানি।
অবতংসয়ন্তি দয়মানাঃ প্রমদাঃ শিরীষকুসুমানি॥

কান্ত অলির আলতোচুমায়
পিয়াসী অধর ভরে নি' যে হায়—
তাইতো শিরীষে তরুণীরা করে সোহাগে কর্ণ-অলংকার
—পেলব পরাগে কোমল-পরশ কেসর তার।

মহাকবির কাব্য গভীর ব্যঞ্জনায় ভরা। তাঁর নিপুণ হাতে চয়ন করা শব্দরাশির নেপথ্যে অন্তঃসলিলা বয়ে চলে অনাগতের কাহিনী। ভ্রমর প্রিয়ের ক্ষণিক চুম্বনের স্মৃতি বুকে নিয়ে যে শিরীষ দুঃসহ প্রতীক্ষায় কাল কাটায়, সে ত সকৃৎকৃতপ্রণয়া অবমানিতা লাঞ্ছিতা শকুন্তলা। একটি একটি করে অঙ্গুরীয়ের অক্ষর গোণা শেষ হয়ে যায়—তবু হস্তিনাপুরের রাজরথের চক্রঘর্ঘর শোনা যায় না তপোবন-দ্বারে। বিনা আহ্বানেই প্রিয় অভিসারে ছুটে চলে আতুর অন্তর, কিন্তু স্বীকৃতি মেলে না। রুদ্ধ দুয়ারে ব্যাকুল করাঘাত ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। শিরীষের আরণ্য-আসবে আর তৃপ্তি নেই ভ্রমরের—পদ্মিনীর মত্ত-মদিরা মুগ্ধ করেছে তাকে। কিন্তু প্রত্যাখ্যানের বেদনায় আকুল হয়ে শিরীষ ঝরল না অকালে—অপ্সরাতীর্থের শিলা-পটে মুক্তির বাণী হ'ল লেখা, পৃথিবীর ঊর্দ্ধলোকে অদিতিমায়ের স্নেহ-চ্ছায়ায় নিভৃত তপশ্চরণে লজ্জাহতার পরম সান্ত্বনা মিলল।

গান শুনে দর্শকবৃন্দ বিমোহিত, সূত্রধার আত্মহারা।—সম্বিৎ যখন ফিরল, তখন বললেন উচ্ছ্বসিত প্রশংসায়—

তবাস্মি গীতরাগেণ হারিণা প্রসভং হৃতঃ।
এষ রাজেব দুষ্মন্তঃ সারঙ্গেনাতিরংহসা॥
নিয়ে গেল কোন্ সুদূরে তোমার গানের সুরদোলায়,
রাজাধিরাজ দুষ্মন্তে হরিণ যেমন পথ ভোলায়।

'শকুন্তলা' কাব্যখানি বিস্মৃতির বিনিস্যূতোয় গাঁথা—তারই সূচনা সূত্রধারের আত্মবিস্মরণে। সপ্তপর্ণের তলা দিয়ে, বালতরু-বীথিকার পাশে পাশে স্বপ্নকুহেলিভরা দীর্ঘ সরণী গিয়েছে এঁকে বেঁকে, চলতে গিয়ে বারে বারে দিশা হারায় বিভ্রান্তপথিক—নবমালিকার কুসুমস্তবকে এ কোন্ নন্দনের মোহন সৌরভ? মালিনীর তরঙ্গসঙ্গীতে এ কোন্ স্বপ্নলোকের আনন্দ-আভাস?

অভিভূত সূত্রধারের উপমার সূত্র ধরে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলেন মৃগানুসারী রাজা দুষ্মন্ত। হাতে তাঁর উদ্যত ধনুর্ব্বাণ—মৃগরূপধারী পলায়মান যজ্ঞপুরুষের পিছনে পিছনে যেন ছুটে চলেছেন রোষদীপ্ত, রুদ্রমূর্ত্তি পিনাকপাণি।

—

হারিণা প্রসভং হৃতঃ
মৃগানুসরণে—
একসারের পিছনে পিছনে ধেয়ে আসে ঐ রথ তোমার—
কিসের লালসে পাগল হয়েছ—কস্তুরী, না কি শিং বাহার?

হরিণ ছুটেছে ঊর্দ্ধশ্বাসে—যেন উড়ে চলেছে শূন্যের ওপর দিয়ে—

পিছু-ধাওয়া রথপানে	মুহুর্মুহু ফিরে চায়
হেলায়ে গ্রীবাখানি	সুমধুর ভঙ্গিমায়;
আধো-খাওয়া তৃণগুলি	শ্রমভরে অসহায়
বিবৃত মুখ হ'তে	খসে পড়ে পথে হায়।

অধৈর্য্য হলেন রাজা—হাতের কাছে এসেও শিকার বুঝি ফসকে যায়।—ইঙ্গিত করলেন সারথিকে—আরও জোরে, আরও জোরে চালাও রথ। রাজ-নির্দ্দেশে সারথি শিথিল করে দিলে অশ্বরশ্মি

রথ চলেছে বায়ুবেগে—সূর্য্য আর ইন্দ্রের তুরঙ্গদেরও হার মানিয়েছে রথের ঘোড়ারা। হরিণের দ্রুতগতির স্পর্দ্ধা সইতে না পেরে আশ্চর্য্যবেগে ছুটে চলেছে তারা; কানগুলি খাড়া হয়ে উঠেছে, চামর শিখা দোলে না, দীর্ঘ পাদবিক্রমে শরীর গেছে সমান হয়ে, খুরের আঘাতে ওড়া ধূলিজালকে পিছনে ফেলে রেখে দুরন্ত বেগে ওরা ছুটেছে।

রাজরক্ষিতব্যানি তপোবনানি নাম। ক্ষণিক আনন্দের মোহে সে রাজধর্ম বিস্মৃত হয়েছেন মৃগয়াব্যসনী দুষ্মন্ত। উজান-বায়ে

হায়বক্তের নিষেধ-সঙ্কেত, রথপতাকার চীনাংশুকখানি পিছন ফিরে তাকায় বারে বারে, তবু ভ্রূক্ষেপ নেই রাজার।

অবশেষে রথ কাছে এসে পড়ল। ধনুকে শরযোজনা করলেন দুষ্যন্ত—আর রক্ষা নেই কৃষ্ণসারের। তীর ছুঁড়তে যাবেন—এমন সময়ে সহসা শুনতে পেলেন তাপসকণ্ঠের নিষেধ বাণী—"মারবেন্ না, মহারাজ, মারবেন্ না, এটি আশ্রমের হরিণ।"

দুষ্যন্তের নির্দেশে সারথি রথ থামাল। ভয়ব্যাকুলিত মৃগ-শিশুটিকে হাত দিয়ে আড়াল করে এগিয়ে এলেন তিন জন তাপস—করুণগম্ভীর কণ্ঠে বললেন—

> ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোঽয়মস্মিন্
> মৃদুনি মৃগশরীরে পুষ্পরাশাবিবাগ্নিঃ।
> ক বত হরিণকানাং জীবিতঞ্চাতিলোলং
> ক চ নিশিতনিপাতা বজ্রসারাঃ শরাস্তে॥
> বাণ মেরো না এই সুকুমার হরিণ শিশুর গায়,
> ফুলরাশিতে আগুন দেবে—এতই নিঠুর হায়?
> কোথায়, রাজা, হরিণশিশুর ভীরু কোমল প্রাণ,
> কোথায় বা ঐ বজ্রকঠোর তীক্ষ্ণ তোমার বাণ।

তাতকণ্বের ধ্যানগম্ভীর স্নেহে, মাতা গৌতমীর স্নিগ্ধ বাৎসল্যে, পিয়সহি অনসূয়া প্রিয়ম্বদার উচ্ছলিত ভালবাসায় বেড়ে-ওঠা শকুন্তলা—আশ্রমের হরিণশিশুটির মতই সরলকোমল অসহায়; তাই তাকে ঘিরে অরণ্যলক্ষ্মীর আকুল মিনতি—"মৃদু এ মৃগদেহে মেরো না শর।"

ঋষি-নির্দেশ শিরোধার্য্য করে উদ্যত সায়ক তূণে ফিরিয়ে নেন রাজা তখনকার মত—কিন্তু বৃক্ষবাটিকার অন্তরালে দাঁড়িয়ে ধনুকে শরযোজনা করেন নতুন করে। সোমতীর্থের অঞ্জলি ব্যর্থ হয়, বাণ-বিদ্ধা হরিণীর আর্তনাদ প্রতিধ্বনি তোলে দিকে দিগন্তে। পুষ্প-রাশিতে আগুন লেগেছে—সংস্কারের অনল-আলিঙ্গনে ভস্ম হ'ল বন-জ্যোৎস্নার পত্রসম্ভার।

রাজার সৌজন্যে সন্তুষ্ট হয়ে তাপসেরা বললেন—

> জন্ম যস্য পুরোর্বংশে যুক্তরূপমিদং তব।
> পুত্রমেবংগুণোপেতং চক্রবর্তিনমাপ্নুহি॥
> পুরুর কুলে জন্ম তোমার, রাজন্,
> এ তো তারই যোগ্য সমাচরণ;
> পুত্র লভ'—তোমার দিনু বর—
> এমন গুণে গুণী রাজেশ্বর।

বহুবল্লভ হয়েও রাজা অপত্যের আশীর্ব্বাদ হতে বঞ্চিত। পৌত্রের কামনায় ব্রত আচরণ করেন রাজমাতা, বংশলোপের আশঙ্কায় রাজার অন্তর সতত উদ্বিগ্ন—সন্তানের বুভুক্ষা তাঁর তৃষিত হৃদয়ে। তাই পরম বাঞ্ছিত এই আশীর্ব্বাণী লাভ করে ধন্য হলেন দুষ্যন্ত—সম্ভ্রমভরে শির নত করে গ্রহণ করলেন ঋষিদের অব্যর্থ শুভকামনা।

রাজাকে তপোবন পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানিয়ে ঋষিরা বিদায় নিলেন—তাঁদের সমিদাহরণের বেলা বয়ে যায়। স্রোতোবহা মালিনীর তীরে ঐ দেখা যায় কুলপতি কণ্বের আশ্রম। সেখানে আছেন কণ্বনন্দিনী শকুন্তলা—তারই উপর অতিথিসৎকারের ভার অর্পণ করে দেশান্তরে গেছেন মহর্ষি—অভ্যর্থনায় ত্রুটি হবে না রাজার।

রথ চলেছে। রাজা বললেন সারথিকে—তপোবনের কাছেই এসে পড়েছি আমরা; দেখছ না?—

> নীবারাঃ শুকগর্ভকোটরমুখভ্রষ্টাস্তরূণামধঃ
> প্রস্নিগ্ধাঃ কচিদিঙ্গুদীফলভিদঃ সূচ্যন্ত এবোপলাঃ।
> বিশ্বাসোপগমাদভিন্নগতয়ঃ শব্দং সহন্তে মৃগা—
> স্তোয়াধারপথাশ্চ বল্কলশিখানিষ্যন্দরেখাঙ্কিতাঃ॥
> শুকপাখীদের কোটর হ'তে খসি'
> রয়েছে প'ড়ে পাদপতলে নীবারকণার রাশি,
> ইঙ্গুদীফল নিতুই ভাঙা হয়—
> তৈলে তারই চিকণ শিলাচয়;
> আপন মনে হরিণ বেড়ায় চরে,
> রথ দেখেও পালায় না তো ডরে।
> বাকল হ'তে ঝরা জলের রেখা
> জলাশয়ের পথগুলিতে আঁকা।

সারথি থামালো রথ। সামনেই আশ্রমের প্রবেশতোরণ—ভবিতব্যের মুক্তদ্বারের প্রসন্ন অভ্যর্থনা। আশ্রমে প্রবেশ করতে যাবেন—এমন সময়ে রাজার দক্ষিণবাহুতে জাগলো শুভস্পন্দন। বিস্মিত হয়ে রাজা বললেন মনে মনে—

> শান্তমিদমাশ্রমপদং স্ফুরতি চ বাহুঃ কুতঃ ফলমিহাস্য।
> অথবা ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্বত্র।
> এই তপোবন শান্তিভরা অচঞ্চল—
> বাহু তবু মুহুর্মুহু উঠছে কেঁপে;
> কেমন ক'রে মিলবে হেথা ভাগ্যফল
> ভবিতব্যের দুয়ার কি রয় বিশ্ব ব্যেপে?

একটু আগেই ঋষিদের কাছে পেয়েছেন পুত্রলাভের আশীর্বাদ—পরক্ষণেই দিব্যস্ত্রীলাভের আশ্বাস মিললো বাহুস্পন্দনে। এ হেন সময় বৃক্ষবাটিকার দক্ষিণে কিশোরীকণ্ঠের আহ্বান শোনা গেল—"এই দিকে, সই, এই দিকে।" উৎসুক দৃষ্টি মেলে রাজা দেখলেন—হাস্যচঞ্চলা রঙ্গবিহ্বলা তিন জন তাপসকন্যা এগিয়ে আসছেন—কক্ষে তাঁদের সেচনঘট, তনুদেহে দৃঢ়পিনদ্ধ বল্কলবসন, অঙ্গে অঙ্গে উচ্ছল লাবণ্য।

রাজা মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন—

> শুদ্ধান্তদুর্লভমিদং বপুরাশ্রমবাসিনো যদি জনস্য।
> দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ॥
> রাজপুরীতেও পাইনে তো এই বনবালাদের অতুল রূপের তুল,—
> কাননলতার হার মানালো বনলতিকা, ভাঙলো আমার ভুল।

রূপের সাজানো পসরা দেখে দেখে পীড়িত হয়েছে চক্ষু—বনদুহিতার অ-সাধিত দেহশোভা ভালো লাগল তাঁর। সৌন্দর্য্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দেখতে হলে যেতে হবে তাঁরই অন্তঃপুরে—এই ছিল দুষ্যন্তের চিরপোষিত অভিমান। সে দর্প চূর্ণ হ'ল বনবল্লরীর কুসুমাঘাতে।

নবকুসুমযৌবনা বনজ্যোৎস্না

কৌতূহল অদম্য হয়ে উঠল। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে রাজা শুনতে লাগলেন তিন সখীর বিশ্রম্ভালাপ; মনকে প্রবোধ দিলেন—প্রজার স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্য গুপ্তচরবৃত্তি তো রাজধর্মেরই অঙ্গ।

সখীদের রঙ্গ-পরিহাস চলেছে। অনসূয়ার সম্ভাষণে রাজা চিনে নিলেন কণ্বদুহিতা শকুন্তলাকে। তিন সখীর মধ্যে বয়সে তিনি কনিষ্ঠা, সৌন্দর্যে শ্রেষ্ঠা—তিন থেকে একে কেন্দ্রীভূত হ'ল রাজার মন। আশ্রমের গুরুদায়িত্ব পালনে মহর্ষি কণ্ব নিযুক্ত করেছেন এই সুকুমারী কিশোরীকে—এই ভেবে তাঁর প্রতি বিরূপ হ'ল অন্তর। মহর্ষির কি বিবেচনা নেই।

ইদং কিলাব্যাজমনোহরং বপুস্তপঃক্ষমং সাধয়িতুং য ইচ্ছতি।
ধ্রুবং স নীলোৎপলপত্রধারয়া শমীলতাং ছেত্তুমৃষির্ব্যবস্যতি॥
কায়কোমল কান্তি—একি তপশ্চরণ করতে পারে?
শমীলতার যায় কি কাটা নীলোৎপলের পত্রধারে?

শকুন্তলার অঙ্গে রয়েছে—কলহংসচিত্রিত দুকুলবসন নয়, অনাড়ম্বর বল্কলমাত্র; কিন্তু তাতে তাঁর দেহরুচি কিছুমাত্র ম্লান হয় নি—উজ্জ্বলতর হয়েছে বরং। সৌন্দর্য্য অপেক্ষা রাখে না অলঙ্করণের—

সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।
শৈবালেরও স্পর্শে কমল আপন শোভা হারায় না,
মলিন হলেও চাঁদের কালো চাঁদের সুধা ঝরায় না।

ক্রমেই মুগ্ধ হচ্ছেন রাজা। শকুন্তলার সৌন্দর্য্য ফুলের মত আপনি ফুটে ওঠা—আরণ্যপ্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন তিনি। হাওয়ায় কাঁপা কেসরগাছের ব্যগ্র শাখাবাহু হাতছানি দিয়ে তাঁকে ডাকে—সখীর আহ্বানে সাড়া দিতে তাঁর দেরী হয় না। কোমল হাতে কেসরশাখা জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন শকুন্তলা—পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা পল্লবিনী লতিকা যেন—

অধরঃ কিসলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারিণৌ বাহূ।
কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্॥
কিসলয়-রক্তিমা অধরে উঠেছে ফুটি'—
কোমল-শাখা যেন সুকুমার বাহু-দুটি;
বিকচ সারা দেহে যৌবন-মাধুরী—
তনু নয়, মরি মরি, এ যে তনু-বল্লরী।

সহকার শাখে লতিয়ে ওঠা নবমালিকায় ফুল ধরেছে স্তবকে স্তবকে—বনজ্যোৎস্না তার নাম, শকুন্তলার আদর করে দেওয়া। নববধূর ফুলসজ্জা তন্ময় হয়ে দেখছেন শকুন্তলা—এমন সময় ঘটল বিপদ। মল্লিকার ফুলাসন ছেড়ে একটি ভ্রমর গুনগুনিয়ে এল তাঁর মুখপানে—হয়ত বা নূতন মধুর আশায়। শঙ্কিত হয়ে উঠলেন শকুন্তলা—ত্রস্ত হাতে বার বার বাধা দিতে লাগলেন ধৃষ্ট মধুলোভীকে।

ওদিকে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে তৃষিত হলেন দুষ্যন্ত—শকুন্তলার চকিত নয়নপাতের প্রসাদলাভ করছে মধুকর, পান করছে তাঁর অধরমদিরা, কানে ঢালছে মৃদুগুঞ্জন—এ ঈর্ষ্যা রাখবার জায়গা নেই তাঁর। বিহ্বলা শকুন্তলার ভয়ভঙ্গিমা, পিপাসু নয়ন মেলে নিরীক্ষণ করলেন বার বার—

যতো যতঃ ষট্চরণোঽভিবর্ততে
ততস্ততঃ প্রেরিতলোললোচনা।
বিবর্তিতভ্রূরিয়মদ্য শিক্ষতে
ভয়াদকামাপি হি দৃষ্টিবিভ্রমম্॥

যে পথে অলি ধায়	মদিরা মদনের
সে দিক পানে চায়	পান না ক'রে এ র
বাঁকায়ে ভুরুখানি	ভয়েই শেখা হ'ল
চকিত দিঠি হানি'।	দৃষ্টি কৌশল।

ভ্রমর বাধা মানে না কিছুতে—স্থান হতে স্থানান্তরে অনুবর্তন করে চলে। নিরুপায় হয়ে শকুন্তলা ডাকেন সখীদের—'ভোমরার জ্বালায় আকুল হলাম, তোরা আমায় রক্ষা কর্।' সখীরা বলেন পরিহাস করে—'আমরা রক্ষা করবার কে? দুষ্যন্তকে ডাক্।'

রাজা দেখলেন আত্মপ্রকাশের এই তো অবসর। নিমেষে অন্তরাল ছেড়ে বেরিয়ে এলেন তিনি—অভিনবমধুলোলুপ উন্মত্ত মধুকর, ছদ্মবেশ ধরা সাধ্য নয় সরলা আশ্রমবালিকার। সর্বনাশা অলির ফুল-অভিসার সুরু হ'ল নূতন বেশে—ন এব দুষ্টো বিরমতি।

অনসূয়া জানালেন সবিনয়ে—এমন কিছুই হয় নি, শুধু একটি ভ্রমরের জ্বালায় কাতর হয়েছিলেন তাঁদের প্রিয়সখী, তার জন্যে উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই। তার পর শিষ্টহাস্যে স্বাগত জানালেন অতিথিকে। পুষ্পিত সপ্তপর্ণের তলায় বিস্তৃত বেদিকা—ভোর-বেলাকার শীতল ছায়া স্নিগ্ধ হয়ে ঘিরেছে তাকে, মন্দবাতাসে ঝরা-ফুলের আলপনা হয়েছে আঁকা, তারই ওপর অতিথিকে বসিয়ে সখীরা ঘিরে বসলেন তাঁকে—শিষ্টালাপ সুরু হ'ল।

এদিকে রাজার দর্শনে শকুন্তলার অন্তরে জেগেছে তপোবন-বিরোধী বিকার—এক অনাস্বাদিতপূর্ব মধুর লজ্জা বারে বারে শিহরণ তোলে তাঁর কুমারীহৃদয়ে। ব্রীড়ায় বিনম্র হয়ে তিনি বসে থাকেন অধোমুখে, অনুভব করেন আগন্তুকের উৎসুক দৃষ্টি তাঁরই ওপর নিপতিত। আগন্তুক ও সখীদ্বয়ের মধ্যে উত্তর-প্রত্যুত্তরের জাল বোনা হয় তাঁকেই ঘিরে।

প্রথম আলাপের পর কৌতূহলী রাজাকে অনসূয়া শোনালেন শকুন্তলার বৃত্তান্ত—বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গে তাঁর জন্ম, অপ্সরা মেনকার কন্যা তিনি। রাজা মন্তব্য করলেন শুনে—

মানুষীষু কথং বা স্যাদস্য রূপস্য সম্ভবঃ।
ন প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ॥
এমন রূপের উৎস-নির্ঝর বয় কি কভু মর্ত্যলোকে?
প্রভাতরল তড়িৎশিখা খেলে না তো মাটির বুকে।

প্রশ্ন হতে প্রশ্নান্তরে চলেন রাজা—তরঙ্গের পর তরঙ্গ। শকুন্তলা যে ক্ষত্রিয় কন্যা তা তিনি জেনেছেন।—কিন্তু সন্দেহ জাগে মনে—ইনি কি দেবদত্তা, আজীবন ব্রহ্মচারিণী, না, যোগ্য পাত্রে সম্প্রদানেরই সঙ্কল্প রাখেন কুলপতি?

প্রিয়ম্বদার প্রিয়বচনে নিরসন হ'ল সংশয়ের—উপযুক্ত পাত্র পেলে বিবাহে আপত্তি করবেন না তাত কণ্ব।

দ্বিধামুক্ত হলেন দুষ্যন্ত—উত্তর মিলেছে বাহুস্পন্দনের ; আনন্দের অসহ আবেগে কম্পিত হতে লাগল তাঁর মন—

ভব হৃদয় সাভিলাষং সম্প্রতি সন্দেহনির্ণয়ো জাতঃ।
আশঙ্কসে যদগ্নিং তদিদং স্পর্শক্ষমং রত্নম্॥

সন্দেহ আঁধিয়ার ঘুচে যায়—
মন মোর বুক বাঁধ ভরসায় :
আগুন এ তো নয় দহন ভরা—
উজল মণি এ যে আলোকঝরা।

ক্রমশঃই লজ্জায় অধীর হয়ে উঠছেন শকুন্তলা—কোন গতিকে পালাতে পারলে বাঁচেন। বুদ্ধি যোগাল অবশেষে—কৃত্রিম রোষে অনসূয়াকে বললেন—'সখি, গৌতমী-মায়ের কাছে প্রিয়ম্বদার নামে নালিশ করতে চললাম—কি সব যা তা বলছে।' প্রিয়ম্বদা পথ-রোধ করে দাঁড়ালেন—'আমার দু' কলসী জল শোধ না করে কোথায় যাও ?'

রাজা এতক্ষণ স্মিতহাস্যে উপভোগ করছিলেন সখীদের কপট কলহ। এইবার বাধা দিয়ে বললেন—'ভদ্রে, আলবাল সেচনে ক্লান্ত হয়েছেন আপনার সখী। দেখছেন না ?—

স্রস্তাংসাবতিমাত্রলোহিততলৌ বাহূ ঘটোৎক্ষেপনাদ্—
অদ্যাপি স্তনবেপথুং জনয়তি শ্বাসঃ প্রমাণাধিকঃ।
বদ্ধং কর্ণশিরীষরোধি বদনে ঘর্মাম্ভসাং জালকং
বন্ধে স্রংসিনি চৈকহস্তযমিতাঃ পর্যাকুলা মূর্দ্ধজাঃ॥

অংস বিনত, জলভৃঙ্গারবহনে
করতলদুটি দ্বিগুণ অরুণবরণি—
স্বেদবিন্দুর চন্দন-পরা আননে
কর্ণশিরীষ থামায়েছে তার দোলনি।
পরিশ্রমের দীর্ঘনিশ্বাসে হায়
কোমল বক্ষ এখনও বেপথু-ভরা,
কবরী-শিথিল, কুন্তলভার তাই
একটি করের ত্রস্ত শাসনে ধরা।

এবারের মত ছেড়ে দিন এঁকে ; আপনার ঋণ আমিই শোধ করব। অঙ্গুলি হতে অঙ্গুরীয় খুলে বাড়িয়ে ধরলেন রাজা—তাতে উৎকীর্ণ রয়েছে তাঁর নাম। সম্রান্ত অতিথির পরিচয় পেয়ে দুই সখী পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন—ইনি তা হলে রাজা দুষ্যন্ত স্বয়ং ?

'আপনার বাক্যেই ঋণশোধ হ'ল সখীর—প্রয়োজন নেই অঙ্গুরীয়ের'—বললেন প্রিয়ম্বদা। এদিকে রাজার লক্ষ্য অনুক্ষণ নিবদ্ধ রয়েছে শকুন্তলার ওপর—রাজার অনুরাগের প্রতিধ্বনি কি জেগেছে তাঁর হৃদয়েও ? হ্যাঁ, নিঃসন্দেহ হলেন দুষ্যন্ত—প্রীতির প্রতিবচন মিলেছে শকুন্তলার মৌন লজ্জায়, তাঁর নীরব বসে-থাকায়, তাঁর নম্রনত নয়নপাতে—

বাচং ন মিশ্রয়তি যদ্যপি মদ্বচোভিঃ
কর্ণং দদাত্যবহিতা ময়ি ভাষমাণে।
কামং ন তিষ্ঠতি মদাননসম্মুখীয়ং
ভূয়িষ্ঠমন্যবিষয়া ন তু দৃষ্টিরস্যাঃ॥

আমার সনে মিশায় না তো বচন—
ব্যগ্র হ'য়ে শুনছে শুধু মোর কথা ;
দেখতে আমায় মেলছে না তো নয়ন—
দৃষ্টি তবু অন্যখানেও নয় পাতা।

হরিণের পিছনে ছুটতে ছুটতে রাজা বহু দূরে ফেলে এসেছিলেন আপন সৈন্যদল। তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে তারা এসে পড়েছে এতক্ষণে। অশ্বের খুরধ্বনিতে, রথচক্রের ঘর্ঘরে, সৈন্যদের কোলাহলে, মুহূর্তে উচ্চকিত হয়ে উঠল বনস্থলী। তপোবনবাসীদের সতর্ক করে দিয়ে বৈখানসের সাবধানবাণী জাগল নেপথ্যে—'মৃগয়াবিহারী দুষ্যন্তের পদার্পণ ঘটেছে অরণ্যে—তপোবনের মৃগকুল সামলাও।'

তুরগখুরহতস্তথা হি রেণু
বিটপবিষক্তজলার্দ্রবল্কলেষু।
পততি পরিণতারুণপ্রকাশঃ
শলভসমূহ ইবাশ্রমদ্রুমেষু॥

ঘোড়ার খুরের আঘাত লেগে অরুণ-রাঙা ধুলার রাশি
তপোবনের বাকলঝোলা গাছের শাখায় পড়ছে আসি'
আকাশজোড়া লক্ষ শত
পঙ্গপালের দলের মত।

আর রথের শব্দে ভয় পেয়ে এক মত্তমাতঙ্গ দুরন্ত বেগে ছুটে আসছে এদিক পানে—ধর্মারণ্য ধ্বংস হয় বুঝি।

পর্য্যাকুল হলেন তিন সখী। রাজোচিত গাম্ভীর্যে তাঁদের আশ্বাস দিলেন দুষ্যন্ত—এখনই তিনি প্রতীকার করবেন আশ্রম-পীড়ার। আবার আসবার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিলেন তাঁরা।

যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি মৃগয়া সেরে নিয়ে নগরে ফিরে যাবেন—এই ছিল রাজার সঙ্কল্প। কিন্তু শকুন্তলাকে দেখার পর নগর গমনের উৎসাহ তিরোহিত হ'ল—তপোবনের কাছেই শিবির-সন্নিবেশের সিদ্ধান্ত করলেন মনে মনে। পা যেন আর উঠতে চায় না আশ্রম ছেড়ে। অবাধ্য আঁখি বারে বারে ফিরে তাকায় পিছনে—যেখানে সখীসনে শকুন্তলা চলেছেন কুরবকশাখে আঁচল বাধিয়ে চরণে ফুটিয়ে দর্ভাঙ্কুর—

গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্তুতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য॥

শরীর আমার সমুখ পানে ধায়,
মন পিছনে তাকায়—সমুৎসুক ;
কেতন যেন চলছে উজান বায়—
পিছনে তার উড়ছে চীনাংশুক।

যেতে হ'ল তবু। বৃক্ষবাটিকার ওপার হতে কর্তব্যের আহ্বান এসেছে, তাকে উপেক্ষা করা চলে না। অনিচ্ছুক পায়ে এগিয়ে চললেন রাজা—সপ্তপর্ণবেদিকার মধুস্বপ্ন পিছনে পড়ে রইল।

—

রতিসুখভর প্রার্থনা কুরুতে
দুঁহু দোঁহে চায়

তপোবনের বাইরেই শিবিরসন্নিবেশ করছেন দুষ্যন্ত—মৃগয়ায় মন নেই আর। কান্তার সন্ধান মিলেছে পুষ্পধনুর প্রসাদে তাই

অনুধ্যানে নি-ঘুম শর্ব্বরী যাপন করেন রাজা। শকুন্তলার ব্যবহারগুলি আদ্যোপান্ত পর্য্যালোচনা করে দেখেন মনে মনে। কখনও মনে হয়—তাঁর অনুরাগেরই পরিচয় বহন করছে তারা। পরক্ষণেই রাশ টেনে ধরেন মনের—শকুন্তলার স্বাভাবিক আচরণের কল্পিত তাৎপর্য্য আবিষ্কার করে কেন তিনি প্রবঞ্চিত করছেন আপন হৃদয়কে ?—

স্নিগ্ধং বীক্ষিতমন্যতোঽপি নয়নে যৎপ্রেরয়ন্ত্যা তয়া
যাতং যচ্চ নিতম্বয়োর্গুরুতয়া মন্দং বিলাসাদিব।
মা গা ইত্যুপরুদ্ধয়া যদপি সা সাসূয়মুক্তা সখী
সর্বং তৎ কিল মৎপরায়ণমহো কামী স্বতাং পশ্যতি।

আনপানে যবে চাহিল স্নিগ্ধ নয়ানে—
আমারই বরণে মনে হ'ল সে যে চাহনি।
নিতম্বভারে চলেছিল মন্থগমনে—
মনে ভাবিলাম এ তো বিলাসের চলনি।
যেওনা যেওনা ব'লে সখী যবে সাধিল—
যাহা কিছু তারে কহিল যেন গো রুষিয়া—
মনে হ'ল মোর সবই তো আমারই কারণে:
আপনা-দরশী হায় কামিজন হিয়া।

দারুণ গ্রীষ্মের খরদুপুরে মৃগের পিছনে পিছনে বন হতে বনান্তরে ছুটে ছুটে সহ্যের শেষসীমায় এসে উপনীত হয়েছেন রাজবয়স্য মাধব্য—অনিয়মে অনিদ্রায় অনাহারে শরীর মন পরিশ্রান্ত, অনভ্যস্ত অশ্বারোহণে দেহের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে অসহ্য ব্যথা। অসুস্থ শরীরের দোহাই দেখিয়ে রাজার কাছ থেকে আজ ছুটি চেয়ে নিয়ে দিনটা কাটাবেন নিশ্চিন্ত নিদ্রায়—এই ভাবছিলেন তিনি বসে বসে। এমন সময় দেখলেন রাজা এই দিকেই আসছেন—সঙ্গে তাঁর বনফুলের-মালা-গলায় ধনু-হাতে যবনীর দল। দণ্ডকাষ্ঠে ভর দিয়ে ত্রিভঙ্গমুরারি হয়ে অতিকষ্টে দাঁড়িয়ে রইলেন মাধব্য—বয়স্যের করুণা উদ্রেক করতে হবে তো!

আসতেই রাজার কাছে আর্জি জানালেন—'আতুরের মত আমাকে ছেড়ে দাও বন্ধু—দিনরাত মৃগয়া করে করে আমি আর আমাতে নেই—বিশ্রাম করতে না পেলে মরে যাব।'

রাজা ভাবতে লাগলেন—কি করা যায়। এদিকে বয়স্যের এই অবস্থা, ওদিকে তাঁর নিজেরও চিত্ত হয়েছে মৃগয়া-বিমুখ—হরিণ মারতে গেলেই মনে পড়ে যায় সেই চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা শকুন্তলার কথা, হাত থেকে খসে পড়ে ধনুর্বাণ—এমন করে কি মৃগয়া করা চলে ?

ন নময়িতুমধিজ্যমস্মি শক্তো
ধনুরিদমাহিতসায়কং মৃগেষু।
সহবসতিমুপেত্য যৈঃ প্রিয়ায়াঃ
কৃত ইব মুগ্ধবিলোকিতোপদেশঃ॥

একসাথে থেকে প্রিয়ারে আমার মোহনচাহনি শিখালো যারা
সেই মৃগপানে ধনুটি আমার কেমনে নোয়াই. নিঠুর-পারা ?

হেসে বললেন মাধব্যকে—'বন্ধু, তোমার কথাই রইল—মৃগয়া আজ থাক।'

সেনাপতিকে আহ্বান করে জানিয়ে দিলেন আদেশ—মৃগয়া হবে না আজ—একটা দিন নিশ্চিন্তে কাটাক্ অরণ্যের অধিবাসীরা—

গাহন্তাং মহিষা নিপানসলিলং শৃঙ্গৈর্মুহুস্তাড়িতম্
ছায়াবদ্ধকদম্বকং মৃগকুলং রোমন্থমভ্যস্যতু।
বিস্রব্ধং ক্রিয়তাং বরাহততিভির্মুস্তাক্ষতিঃ পল্বলে
বিশ্রামং লভতামিদং চ শিথিলজ্যাবন্ধমস্মদ্ধনুঃ॥

পল্বলে আজ শৃঙ্গমাতনে হোক্ মহিষের সলিলখেলা,
বিটপিছায়ায় তৃণরোমন্থে হরিণদলের কাটুক বেলা;
বন্যবরাহ মুস্তাধ্বংস আরামে করুক সরোবরে—
শিথিল বাঁধন ধনুটি আমার বিরাম লভুক দিন-ভরে।

বন ঘেরাও করতে যারা বেরিয়ে গেছে আগেই, তাদেরও ডেকে নিতে বললেন তিনি। কাছেই তপোবন—মৃগয়াকোলাহলে বিঘ্ন ঘটবে ঋষিদের ধর্ম্মাচরণে। বলা তো যায় না—

শমপ্রধানেষু তপোধনেষু
গূঢ়ং হি দাহাত্মকমস্তি তেজঃ।
স্পর্শানুকূলা ইব সূর্যকান্তা
স্তদন্যতেজোঽভিভবাদ্বমন্তি॥

তপস্বীদের শান্তক্ষমার অন্তরালে
দহনভরা আগুন তো—তাই শঙ্কা মানি;
অন্য তেজের আঘাত পেলেই উঠবে জ্বলে
—অগ্নিভরা স্নিগ্ধ যেন সূর্যমণি।

সেনাপতি চলে গেলেন আজ্ঞা নিয়ে। পরিজনদের বিদায় দিলেন রাজা। বয়স্যকে এর আগেই জানিয়েছেন শকুন্তলার কথা: এবার পরামর্শ চাই তাঁর—কি ছলে আশ্রমে প্রবেশ করবেন আবার ? কেমন করে লাভ করবেন সেই পরমবাঞ্ছিতার সাক্ষাৎকার ?

সে কথা তুলতেই মাধব্য বললেন ব্যঙ্গ করে—ভো, বয়স্য, তাপসকন্যায় অনুরাগী হলে শেষটায়। উত্তরে রাজা জানালেন—বন্ধু, নিঃসংশয়েই জেনেছি ক্ষত্রপরিগ্রহক্ষমা তিনি, পুরুর বংশধরের চিত্ত কখনও ধাবিত হয় না নিষিদ্ধ বস্তুর আকর্ষণে। জানতে চাও তাঁর পরিচয় ? শোন তবে—

সুরযুবতিসম্ভবং কিল মুনেরপত্যং তদুজ্ঝিতাধিগতম্।
অর্কস্যোপরি শিথিলং চ্যুতমিব নবমালিকাকুসুমম্॥

অমরাবতীর অঙ্গনা, সখে, প্রসূতি তার—
জনক-জননী ত্যজেছিল অবহেলে;
কণ্বের কোলে মিলেছিল স্নেহ অসহায়ার,
পরিচয় তাই কণ্বদুহিতা ব'লে।
বায়ুভরে খসি' অর্কে পড়েছে নবমালিকার ফুল—
দূর হ'তে হেরি অর্ককুসুম ব'লে আঁখি করে ভুল।

রাজা ভেবেই পান না—কেমন করে বর্ণনা করবেন সেই অপরূপ রূপমাধুরী। মেঘবরণ কেশদাম, ভ্রমরকৃষ্ণ আঁখিতারকা, মৃণালসম বাহু—এমনি করে প্রতি অঙ্গের রূপব্যাখ্যানে কি বয়স্যের সামনে উপস্থিত করতে পারবেন তাঁর অবর্ণনীয়া মানসসুন্দরীকে ? না, সে চেষ্টা করে লাভ নেই, সে আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যকে বোঝানো যায় না বিশ্লেষণে—মুগ্ধ বিস্ময়ে শুধু বলতে হয়—

চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিতসত্ত্বযোগা
রূপোচ্চয়েন মনসা বিধিনা কৃতানু।
স্ত্রীরত্নসৃষ্টিরপরা প্রতিভাতি সা মে
ধাতুর্বিভুত্বমনুচিন্ত্য বপুশ্চ তস্যাঃ॥
রেখাবন্ধনে বন্দী রূপের ছন্দোমাঝে
প্রাণের স্পন্দে জেগেছে কি মনোরমা?
নিখিলের যত রূপ আহরিয়া যত্নে-রচা
এ কি বিধাতার নূতনা তিলোত্তমা?

রূপবতীদের শিরোভূষণ তিনি—সুন্দরীদের রূপ-অভিমানের উপায় রইল না আর।

কি জানি, কোন্ ভাগ্যবান লাভ করবে এই অতুলন রমণীরত্ন—কার হাতে বিধাতা তুলে দেবেন এই অখণ্ড পুণ্যরাশি—

অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলূনং কররুহৈর্
অনাবিদ্ধং রত্নং মধু নবমনাস্বাদিতরসম্…
সদ্যফোটা কুসুম এ যে
কেউ করেনি ঘ্রাণ;
পাপড়ি-কোষে নূতন মধু—
কেউ করেনি পান।
লতার শাখায় শিউরে ওঠা
নবীন কিশলয়;
রূপে উজ্জল অলখ মণি—
ভূষণ কারও নয়।

উচ্ছ্বাসে বাধা দিলেন মাধব্য। তপস্বিকন্যার দর্শনমাত্রেই কেন এত উল্লসিত হয়ে উঠেছেন রাজা? অপর পক্ষের কথাটা কি ভেবে দেখেছেন তিনি? অনুরাগের আশ্বাস কি মিলেছে শকুন্তলার কোনও বাক্যে বা ব্যবহারে?

হাঁ, নিশ্চিন্ত হতে পারেন তিনি। স্বভাবতঃই অপ্রগল্ভ আচরণ তপস্বিকন্যার—তবু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে যেটুকু ধরা পড়েছে প্রমাণের পক্ষে তা-ই যথেষ্ট—

অভিমুখে ময়ি সংহৃতমীক্ষিতং
হসিতমন্যনিমিত্তকৃতোদয়ম্।
বিনয়বারিতবৃত্তি-রতস্তয়া
ন বিবৃতো মদনো ন চ সংবৃতঃ॥
চাইনু যখন নয়ন মেলে—আঁখি নামালো,
অন্য কথার দোহাই তুলে হাসি ঝরালো।
মনসিজে গোপন ক'রে রাখলো না সে—
উজাড় করেও দিলো না তো—বিনয়বশে।

তা ছাড়া চলে যাবার সময় বার বার ছল করে পিছন ফিরে তাঁকেই দেখছিলেন শকুন্তলা—তা-ও চোখ এড়ায় নি রাজার—

দর্ভাঙ্কুরেণ চরণঃ ক্ষত ইত্যকাণ্ডে
তন্বী স্থিতা কতিচিদেব পদানি গত্বা।
আসীদ্বিবৃত্তবদনা চ বিমোচয়ন্তী
শাখাসু বল্কলমসক্তমপি দ্রুমাণাম্॥
বেঁধেনি, তবুও দর্ভাঙ্কুরে চরণ বিঁধেছে ব'লে
কিছুদূর চলি থেমেছিল অকারণে।
বাধেনি শাখায়,—তবু বল্কল উন্মোচনের ছলে
মুখখানি ফিরায়ে চেয়েছিল ক্ষণে ক্ষণে।

আর আপত্তি করবার উপায় রইল না মাধব্যের—এবার তা হলে দিতেই হয় পরামর্শ। বেশী ভাবতে হ'ল না। উপায় আপনিই এসে উপস্থিত হ'ল শিবিরদ্বারে। দুটি মুনি বালককে দিয়ে রাজাকে আহ্বান করে পাঠিয়েছেন তাপসেরা—রাক্ষসেরা এসে দূষিত করে দিচ্ছে তাঁদের যজ্ঞবেদী, আহুতি ব্যর্থ হচ্ছে বারে বারে—তাই রাজাকে যেতে হবে রক্ষোনিধনে। দরিদ্র আশ্রমবাসীর ক্ষমতা নেই অনায়াস অভ্যর্থনায়—তাই শুধুমাত্র সারথিটিকে সঙ্গে নিয়ে রাজা যেন পদার্পণ করেন তপোবনে—ধন্য হবেন তাঁরা। 'বয়স্য সিদ্ধি যেচে এল তোমার দ্বারে'—রঙ্গ করে বললেন মাধব্য।

এমন সময় দৌবারিক এসে খবর দিল—হস্তিনাপুর থেকে করভ এসেছে রাজমাতার সন্দেশ বহন করে—পৌত্রকামনায় ব্রত-আচরণ করছেন তিনি, উপস্থিত হয়ে তাঁর ব্রত উদ্ধার করে দিতে হবে রাজাকে।

মহা দ্বিধায় পড়লেন দুষ্যন্ত। এদিকে তপস্বীদের আহ্বান, ওদিকে মাতৃ-অনুজ্ঞা—কোন্‌টা রাখেন, কোন্‌টা ছাড়েন।

সমাধান মিলল অবশেষে—'বন্ধু, তুমি ত মায়ের ছেলের মত, তুমিই গিয়ে আমার বদলে তাঁর পুত্রকৃত্য সম্পন্ন করে দাও। তাঁকে জানিও, তপস্বীদের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করলে হয়ত তাঁদের বিরাগ-ভাজন হব আমি। সৈন্যসামন্তদেরও তোমার সঙ্গেই পাঠিয়ে দিচ্ছি—এখানে থেকে শুধুই আশ্রমপীড়া উৎপাদন করছে ওরা।'

রাক্ষস-খোক্কসের ব্যাপার শুনেই ভয়ে বুক দুরু দুরু করছিল মাধব্যের। রাজার প্রস্তাব শুনে হাতে চাঁদ পেলেন যেন। কোথায় রাক্ষসদের বিকট চেহারা দেখে ভয়ে হিমসিম খাওয়া, আর কোথায় এই রথে চড়ে—আগে সৈন্য, পাছে সৈন্য—দিব্যি রাজার চালে খোস-মেজাজে রাজধানীর পথে পাড়ি দেওয়া। 'তা হলে যুবরাজই হলাম বল?'—খুশীতে ঝলমল করে উঠলেন মাধব্য।

বন্ধুর কাছে হাজার বড়াই করুন না কেন, রাজা মনে মনে ঠিকই জানছেন—শকুন্তলাকে দেখবার জন্যই তাঁর এই ব্যগ্রতা, ঋষি সন্তোষণের এই মিথ্যা অজুহাত। রাজ-অন্তঃপুরে অবাধ গতি-বিধি বয়স্যের—হয়ত কোন দিন অন্তঃপুরিকাদের কাছে প্রকাশ করে দেবেন তাঁর এই প্রণয়কাহিনী। তাই যাবার আগে বন্ধুর হাত দুটি ধরে বার বার করে বলে দিলেন 'সখে মাধব্য, ঋষিদের অনুরোধেই তপোবনে যাচ্ছি, শকুন্তলার ব্যাপারটা সত্যি বলে ভেব না যেন—

ক বয়ং ক চ পরোক্ষমন্মথো মৃগশাবৈঃ সমমেধিতো জনঃ।
পরিহাসবিজল্পিতং সখে পরমার্থেন ন গৃহ্যতাং বচঃ॥
যা কিছু বলেছি, পরিহাস সেটা—
কোথায় বা আমি, বুঝে দেখ এটা,
মৃগশাবকের সাথে বেড়ে-ওঠা
কোথা বা বন্যবালা?
কিছু নাহি জানে মদনের রীতি
নাহি জানে ছলাকলা।

লোকলস্কর সৈন্যসামন্ত নিয়ে চলে গেলেন মাধব্য। রইলেন

শুধু রাজা। একটু পরেই যে নির্মম খেলার মত্ত হবেন তিনি—তার সাক্ষী রইল না হস্তিনাপুরের একটি প্রাণীও। এ কাহিনী একমাত্র প্রকাশ হবার সম্ভাবনা ছিল যার দ্বারা সেই মাধব্যেরও মুখ বন্ধ করে দিলেন স্তোকবাক্যে প্রতারিত করে। কুশলী রাজার বাক্‌চাতুর্যে ভুললেন মৃৎপিণ্ডবুদ্ধি রাজবিদূষক।

—

ঈষদীষচ্চুম্বিতানি ভ্রমরৈঃ
অলিগুঞ্জন

তপোবনে ব্যস্ততা জেগেছে—শকুন্তলা অসুস্থ। নিদারুণ দাহ জ্বালায় দগ্ধ হচ্ছে তাঁর শরীর। মালিনীর তীরে ছায়ায়-ঘেরা বেতস কুঞ্জ—সেইখানেই কুসুমশয্যায় শয়ন করে আছেন তিনি। সখীরা বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন শীতল উশীরানুলেপন, পদ্মের পেলব মৃণাল, নলিনীপত্রের স্নিগ্ধ ব্যজন। কুলপতির আদরের দুলালী তিনি—তাঁর কোন বিপত্তি ঘটলে মর্মাহত হবেন মহর্ষি। তাই তাঁর পীড়া উপশমের জন্য যা-কিছু করা দরকার সবই করতে প্রস্তুত আছেন সখীরা!

তপস্বিকার্য্য শেষ হয়ে গেছে দুষ্মন্তের। বাণ সন্ধান করতে হয় নি—দূর থেকে ধনুকের টঙ্কার শুনেই ভয়ে পালিয়ে গেছে রাক্ষসের দল।

শ্রমক্লান্ত শরীরে শকুন্তলার কথা নূতন করে মনে পড়ল রাজার। তপস্বীদের তপস্তেজের অগ্নিব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করে কোনরকমেই কি উদ্ধার করে নিয়ে আসা যায় না সেই পরমদুর্লভাকে?

হে অনঙ্গদেব, তোমার ঐ ফুলধনু দিয়ে তুমি প্রতারিত করে বেড়াচ্ছ বিশ্বের হতভাগ্য প্রণয়িকুলকে—চন্দ্রমা-ও কম যা'ন্ না—

বিসৃজতি হিমগর্ভৈরগ্নিমিন্দুর্ময়ূখৈস্—
ত্বমপি কুসুমবাণান্ বজ্রসারীকরোষি।
কোমল ফুলে সায়ক তোমার গড়া—
বজ্র হ'য়ে বাজে বুকে কেন?
চাঁদের সুধা শীতলতায় ভরা
আমায় কেন দহে অনল হেন?

তোমার ঐ পুষ্পশরে এত অনল জ্বালা কোথা থেকে আহরণ করলে? ও! বুঝেছি এতক্ষণে—

অদ্যাপি নূনং হরকোপবহ্নিস্ত্বয়ি জ্বলত্যৌর্ব ইবাম্বুরাশৌ
ত্বমন্যথা মন্মথ! মদ্বিধানাং ভস্মাবশেষঃ কথমেবমুষ্ণঃ॥
রুদ্ররোষের বহ্নিজ্বালা জ্বলছে আজও তোমার বুকে
সাগরজলে অনলরাশির মত;
নইলে, বল, দগ্ধদেহের আগুন-নেভা ভস্মমাঝে
কেমন করে রইল দাহন এত?

খর গ্রীষ্মের তপ্ত বেলা। মাথার ওপর আগুন ছড়ায় মধ্যদিনের সূর্য্য। এমন দিনে সসখীজনা শকুন্তলা মালিনীর তীরে লতাকুঞ্জে অবসর যাপন করেন—সেখানেই যাওয়া যাক তা হলে। ওদিকে সূর্য্য, এদিকে মন্মথ—এই দ্বিবিধ তাপ অসহ্য হয়ে উঠেছে। স্নিগ্ধ নিকুঞ্জচ্ছায়ে কান্তার দর্শনে উপশম হবে দহন-জ্বালায়।

বালপাদপবীথি ধরে এগিয়ে চললেন রাজা—সুবাসে সুগন্ধে হাওয়ার ছায়ায় মনোরম তরুবীথিকা—

শক্যমরবিন্দসুরভিঃ কণবাহী মালিনীতরঙ্গাণাম্।
অঙ্গৈরনঙ্গতপ্তৈরবিরলমালিঙ্গিতুং পবনঃ॥
মালিনীর ঢেউ হতে চুরি-করা—জলে-ভরা
পদ্মগন্ধ হরা
বহে বায়—
বারে বারে ছুঁয়ে যায়
মদন তাপিত তনু-মন।

পথ শেষ হয়েছে বেতসপরিবৃত লতামণ্ডপের দুয়ারে এসে—সেইখানে শুভ্র বালুকার ওপর দেখা যায় সবে-আঁকা পদচিহ্ন। গাছের আড়াল দিয়ে উঁকি-ঝুঁকি মারতেই দর্শন মিলল সেই মনোরথ-প্রিয়তমার। কুসুমাস্তৃত শিলাপট্টে শুয়ে আছেন তিনি—পদ্মের পাতা দিয়ে বীজন করছেন সখীরা—

বক্ষোদেশে উশীর লেপন করা
কমল হাতে মৃণাল-বলয় শিথিল করে-পরা—

কিসের অসুস্থতা এ? গ্রীষ্ম-আতপেই সন্তপ্ত হয়েছেন শকুন্তলা, না, দগ্ধ হচ্ছেন আপন মনের নিগূঢ় প্রণয়-বেদনায়?—রাজা ভাবতে লাগলেন।

উদ্বেগে আকুল হয়েছেন অনসূয়া-প্রিয়ংবদা। সখীর মনস্তাপের কারণ যে অনুমান করতে পারছেন না তা নয়—কিন্তু অনভিজ্ঞ তাঁরা, মনসিজের সঙ্গে পরিচয় শুধু বইয়ের পাতায়। তাই ভেবেই পান না কি করবেন। অনেক মন্ত্রণা পরামর্শের পর সমস্ত সংকোচ ঝেড়ে ফেলে প্রশ্ন করলেন অবশেষে—'সখি শকুন্তলে, কি তোমার মনস্তাপের কারণ, খুলে বল আমাদের—যথাসাধ্য প্রতীকার করব আমরা। সখীদের পীড়াপীড়িতে শকুন্তলা বলতে বাধ্য হলেন তাঁর মনোগত আধিহেতু—রাজর্ষি দুষ্মন্তের অনুরাগিণী তিনি, তাঁর সঙ্গে শীঘ্র মিলন না ঘটলে এ জীবন আর রাখবেন না।

সব শুনে সখীরা অভিনন্দিত করলেন তাঁকে—মহানদী ত রত্নাকরকেই বরণ করে, সহকার ছাড়া কারই বা ক্ষমতা আছে পল্লবিতা মাধবীলতার ভারসহনে?

শকুন্তলার কথা শুনে উল্লসিত হয়েছিলেন পাদপান্তরিত দুষ্মন্ত, সখীদের কথায় আনন্দ বেড়ে গেল আরও—বিশাখা নক্ষত্র দুটি যে চন্দ্রলেখারই অনুবর্ত্তন করবে, এতে আর আশ্চর্য্যের কি আছে?

কেমন করে পূর্ণ করা যায় শকুন্তলার মনোরথ—ভাবতে লাগলেন সখীরা। রাজা যে শকুন্তলার প্রতি অনুরক্ত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই প্রিয়ংবদার—তাঁর শুধু চিন্তা কি করে ব্যবস্থা করবেন নিভৃত মিলনের? 'কি করে বুঝলি?' সরল সংশয়ে প্রশ্ন করলেন অনসূয়া। প্রিয়ংবদা বললেন—'লক্ষ্য কি করনি সখীর প্রতি রাজার প্রেমস্নিগ্ধ ব্যাকুল দৃষ্টিপাত? দেখ নি রাত্রিজাগরণে কৃশ হয়ে গেছে তাঁর শরীর এই ক'দিনে?'

ঠিকই বলেছে প্রিয়ংবদা—রাজা সায় দিলেন মনে মনে—

ইদমশিশিরৈরন্তস্তাপাদ্বিবর্ণমণীকৃতং

নিশি নিশি ভুজন্যস্তাপাঙ্গপ্রসর্পিভিরশ্রুভিঃ।
অনভিলুলিতজ্যাঘাতাঙ্কং মুহূর্মণিবন্ধনাৎ
কনকবলয়ং স্রস্তং স্রস্তং ময়া প্রতিসার্যতে॥
নিদ্রাবিহনে কেটে যায় কত বিরহবিধুর নিশি
অঝোরধারায় ঝরে আঁখিলোর উষ্ণনিশাসে মিশি।
প্রকোষ্ঠ হতে কনকবলয় খসে যায় বারে বার—
সতত তপ্ত-অশ্রু-সেচনে বিবর্ণ মণি তার।

উপায় মিলল অবশেষে—প্রিয়ম্বদাই প্রস্তাব করলেন। ললিত-ছন্দোবন্ধে শকুন্তলা লিখুন প্রণয় লিপিকা, নির্মাল্যের ফুলের মধ্যে গোপন করে পাঠিয়ে দেওয়া হবে রাজার কাছে—সাড়া না দিয়ে কি পারবেন তিনি?

রাজী হলেন শকুন্তলা। সুকুমার নলিনীপত্রে নখের আঁচড় টেনে লিখলেন সরল ছাঁদে:

তব ন জানে হৃদয়ং মম পুনঃ কামো দিবাপি রাত্রাবপি
নির্ঘৃণ তপতি বলীয়স্ত্বয়ি বৃত্তমনোরথাঙ্গানি॥
(তুজ্ঝ ন আনে হিঅঅং মম উন কামো দিবাবি রত্তিম্মি।
নিগ্ঘিন তবই বলীঅং তুই বুত্তমনোরহাইং অঙ্গাইং॥)
নিঠুর, তোমার মন জানি নে, আমার কথা বলব বা কি?
হৃদয়ে মোর দিবানিশি জ্বলছে আগুন ধিকি ধিকি।

সখীদের পড়ে শোনালেন লজ্জাজড়িত ভীরুকণ্ঠে। আশা-নিরাশার দোদুল দোলায় কম্পিত হচ্ছে তাঁর হৃদয়—কি জানি যদি প্রতিদান না মেলে, যদি অবজ্ঞায় রাজা প্রত্যাখ্যান করেন এই ব্যাকুল আবেদন?

চকিতে গাছের আড়াল ছেড়ে নাটকীয় ভঙ্গিমায় বেরিয়ে এলেন দুষ্মন্ত—উত্তর যোগাতে দেরী হয় না নাগরিকবৃত্তিনিপুণ প্রণয়-বিলাসীর। বললেন অলকার ঝঙ্কৃত নিপুণ ছন্দোবন্ধে, অনুপ্রাসের শিঞ্জন তুলে—

তপতি তনুগাত্রি মদনস্ত্বামনিশং মাং পুনর্দহত্যেব।
গ্লপয়তি যথা শশাঙ্কং ন তথা হি কুমুদ্বতীং দিবসঃ॥
সুতনু, তোমায় ফুলধনু শুধু তাপিত করে
আমারে অনুখন দহে।
দিনের আলোয় চাঁদেরে যেমন মলিন করে
এমন কুমুদীরে নহে।

হর্ষোৎফুল্ল বচনে স্বাগত জানালেন সখীরা, শিলাসনে বসালেন সমাদর করে। এই নাও সখি, মনোরথ আপনি এসে উপস্থিত হয়েছে তোমার কুঞ্জদ্বারে।

'অনসূয়া, ঐ দেখ, হরিণছানাটা বুঝি আকুল হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে মাকে, চল্ তো দেখি—' চলে গেলেন দুই সখী প্রণয়ি-যুগলকে নিভৃত কূজনগুঞ্জনের অবসর দিয়ে। সখীর সৌভাগ্যে আর সন্দেহ নেই তাঁদের, সংশয় নেই রাজার আন্তরিকতায়।

অভ্যস্ত প্রেমিকের তৎপরতা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন দুষ্মন্ত। সখীরা চলে গেছেন একলা ফেলে—তাতে ভয় পাওয়ার কি আছে? তিনি তো রয়েছেন—দরকার হলে নলিনীপত্রের স্নিগ্ধ হাওয়া দিয়ে সযত্নে মুছে দেবেন তাঁর স্বেদবিন্দু, তাঁর পদ্মতাম্র চরণ দুখানি অঙ্কে রেখে সংবাহন করে দেবেন নিপুণ অঙ্গুলিচালনায়। ও কি! শকুন্তলা চলে যেতে চাইছেন কেন? বেলা তো পড়ে নি এখনও। পীড়িত শরীর নিয়ে কুসুমশয়ন ছেড়ে আতপে যাওয়া কি উচিত হবে তাঁর? অভিভাবকদের তিরস্কারের আশঙ্কা করেন শকুন্তলা? কেন, তিনি কি শোনেন নি—বহু রাজর্ষিকন্যা গান্ধর্বপরিণয়ে আবদ্ধ হয়ে পরে সানন্দ অভিনন্দন লাভ করেছেন গুরুজনদের কাছে?

'তবু যেতে দিন্ আমাকে'—শকুন্তলা ভেঙে পড়লেন অসহায় মিনতিতে—'সখীদের আর একবার জিজ্ঞাসা করে দেখি।'

বাধা মানেন না দুঃসাহসী দুষ্মন্ত—মদিরাপিপাসু মত্ত মধুকর। এমন সময় নেপথ্যে শোনা গেল সঙ্কেতবাণী—'চক্রবাকবধূকে, বিদায় দাও সহচরকে, রজনী নেমেছে ঐ।'

আর্য্যা গৌতমী আসছেন তাঁর আদরের শকুন্তলার খোঁজ নিতে। ত্বরিতে গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়লেন দুষ্মন্ত।

অনসূয়া-প্রিয়ম্বদাকে সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করলেন মা গৌতমী। সস্নেহে শির আঘ্রাণ করে আদরিণীর কুশল শুধালেন বার বার—পবিত্র শান্তিজল ছিটিয়ে দিলেন আরোগ্যকামনায়। তারপর সঙ্গে করে নিয়ে চললেন কুটিরে; অপরাহ্নের ম্লান ছায়া ঘনিয়েছে চারিদিকে—উটজে ফেরাই এখন ভাল।

সন্তাপহারক লতাবলয়কে আবার আসবার প্রতিশ্রুতি জানিয়ে চলে গেলেন শকুন্তলা। শূন্য কুঞ্জে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইলেন রাজা—যেতে পা সরছে না তাঁর—

তস্যাঃ পুষ্পময়ী শরীরলুলিতা শয্যা শিলায়ামিয়ং
ক্লান্তো মন্মথলেখ এষ নলিনীপত্রে নখৈরর্পিতঃ।
হস্তাদ্‌ভ্রষ্টমিদং বিসাভরণমিত্যাসজ্জমানেক্ষণো
নির্গন্তুং সহসা ন বেতসগৃহাচ্ছক্নোমি শূন্যাদপি॥
শূন্য—তবু এ বেতসকুঞ্জ তারই স্মৃতি দিয়ে ভরা,
চলে যেতে তাই চরণ ওঠে না ত্বরা।
শিলায় বিছানো সে ফুল-শয়ন,
পাণি-হ'তে-খসা বিস-আভরণ;
নলিনীপত্রে রচেছিল প্রিয়া নখের আখর টানি'—
লুকায় হোথায় সেই প্রেমলিপিখানি।

যেতে হ'ল কিন্তু। সোমযজ্ঞের সায়ংকালীন অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়েছে—বেদিতে জ্বলেছে হুতাশন। তারই চারিদিকে ভয়ঙ্কর ছায়ামূর্ত্তি সব ঘুরে বেড়াচ্ছে—যজ্ঞ নষ্ট হয় বুঝি! কোথায় সেই ভয়হরণ নিখিলশরণ দুষ্মন্ত? ছুটে গেলেন রাজা—কর্ত্তব্যে ত্রুটি নেই তাঁর।

—

অপ্রিয়ং সংবৃত্তম্ অঘটন

দুই সখীর মধ্যস্থতায় গোপন পরিণয়ে আবদ্ধ হয়েছেন দুষ্মন্ত-শকুন্তলা। কেউ-ই জানে না বিবাহের কথা—এমন কি, মা-গৌতমীও না।

তপস্বিকার্য্য সমাপ্ত করে শকুন্তলার হৃদয় শূন্য করে দিয়ে হস্তিনাপুরে ফিরে গেছেন দুষ্মন্ত—যাবার আগে আশ্বাস দিয়েছেন বার বার করে—

অঙ্গুরীয় দিলেম করে,
দিনে দিনে একটি ক'রে
আখর গুণো।
দিনগণনা শেষ না হ'তে
বাহক আমার তোমার নিতে
আসবে, জেনো।

—তবু মন মানে না অনসূয়ার। দুষ্যন্তের অন্তঃপুরে কত রূপবতীর মেলা। বসনভূষণের ছটায়, প্রসাধনের ঘটায়, বিলাসে বিভবে ঝল্‌মল্ করছে হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদ। সেখানে পৌঁছে রাজার কি আর মনে থাকবে বনের মেয়ে শকুন্তলার কথা? চারিদিকের সমারোহের মধ্যে বসে হয়ত লজ্জিত হবেন আপন ক্ষণিক মোহের কথা স্মরণ করে—পথের প্রেমকে ঘরে ঠাঁই দেওয়ার কথা মনেও আনবেন না।

প্রিয়ম্বদার কিন্তু সে আশঙ্কা নেই—অমন মধুর চেহারায় এতখানি নিষ্ঠুরতা কি সম্ভব কখনও? সোমতীর্থ হতে ফিরে এসে এসব শোনার পর তাত কণ্ব কি বলবেন—এই হ'ল তাঁর ভাবনা।

নানা কথা কইতে কইতে দুই সখীতে ফুল তুলছেন—পূজা করতে হবে শকুন্তলার সৌভাগ্যদেবতার। এমন সময় নেপথ্যে অতিথির আত্মঘোষণা শোনা গেল—'অয়মহং ভোঃ।' কুটিরে তো শকুন্তলা আছেন—তিনিই দেবেন পাদ্য-অর্ঘ্য, সখীরা ভাবলেন।

কিন্তু হায়, কুটিরে আজ থেকেও নেই শকুন্তলা—শূন্যহৃদয়ে ভাবছেন দূরগত দুষ্যন্তের কথা। ভর্তৃচিন্তায় আত্মহারা তিনি। অতিথির আগমন জানতে পারলেন না। অপমানিত দুর্ব্বাসার ক্রোধানল জ্বলে উঠল মুহূর্ত্তে—আঃ অতিথিপরিভাবিনি, যার ধ্যানে জ্ঞান হারিয়ে অনাদর করলি আমাকে, সে তোকে ভুলে যাবে, মনে করিয়ে দিলেও চিনবে না—প্রমত্ত যেমন মনে রাখে না আপন প্রতিশ্রুতি।

বজ্রাঘাত হ'ল যেন। ছুটে এলেন প্রিয়ম্বদা, পা জড়িয়ে ধরে মিনতি করলেন—'ক্ষমা করুন ক্ষমা করুন, অজ্ঞান দুহিতার এই প্রথম অপরাধ।' অত সহজে কি নরম হন্ সুলভকোপ মহর্ষি দুর্ব্বাসা? অনেক অনুনয়ের পর কঠিন হৃদয় বিগলিত হ'ল একটু, 'অভিজ্ঞানদর্শনে অবসান হবে অভিশাপের'—বলেই অন্তর্হিত হলেন সহসা; এই বিপত্তিটা ঘটাবার জন্যই যেন এসেছিলেন।

এদিকে কুটিরে বসে আছেন ভাববিভোরা শকুন্তলা—পটে-আঁকা ছবি যেন। এত যে কাণ্ড ঘটে গেল ওদিকে—কিছুই জানতে পারলেন না তিনি। অনুকম্পাবশে সখীরাও তাঁকে শোনালেন না এই নিদারুণ সংবাদ—রক্ষিতব্যা খলু প্রকৃতিপেলবা প্রিয়সখী। শাপমোচনের উপায় যখন মিলেছে তখন কি হবে তাঁর কোমল মনে ব্যথা দিয়ে? সুকুমার নবমালিকায় উষ্ণজল সিঞ্চন করবে কোন্ নিষ্ঠুর।

শকুন্তলার ভাগ্যবিধাতা ক্রূর হাসি হাসলেন অলক্ষ্যে। রথের মধ্যে বসে সহসা বুক কেঁপে উঠল দুষ্যন্তের—কি এক অঘটন ঘটে গেল যেন···কোথাকার কোন্ নদীতীর হতে মধুগন্ধভরা বাতাস আসছে ভেসে···কার যেন করুণ নয়নে সজল মিনতি 'ভুলো না, ভুলো না'···

নাঃ, কাল রাতে স্বপ্ন দেখেছেন বোধ হয়, কিংবা গত জনমের কোন বিস্মৃত স্মৃতি জেগেছে অবচেতন মনে। উদাস হলেন রাজা।

—

যাস্যত্যদ্য শকুন্তলা—শকুন্তলা যাবে আজ

সব ঘুম-ভাঙা তপোবন। রাত্রির কালো আঁধার কেটে গিয়ে একটু একটু করে ফর্সা হচ্ছে আকাশ। কুটিরের চালে নিশ্চিন্তে নিদ্রা দিচ্ছিল ময়ূর—সকালের আলো চোখে লাগতে জেগে উঠল। বেদিপ্রান্তে রাত্রির শয়ন ছেড়ে আড়ামোড়া ভাঙছে হরিণ।

প্রবাস হতে প্রত্যাবর্ত্তন করেছেন কুলপতি। তাঁরই আদেশে এক তাপসকুমার বাইরে এসে দেখছেন—বেলা কতটা হ'ল। এসে দেখেন—ও মা! সকাল হয়ে গেছে যে!

যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনাম্
আবিষ্কৃতোঽরুণপুরঃসর একতোঽর্কঃ···
নিশাকর ঐ নিশা-অবসানে
চলেছে অস্তশিখরের পানে
—ক্লান্তছবি;
পুবদিগন্তে ঐ হ'ল আঁকা
বাল-অরুণের রক্তিম লেখা
—উদিছে রবি।

দয়িতের করস্পর্শে চোখ মেলেছে কমল। কিন্তু ম্লান হয়ে গেছে কুমুদিনী। সরোবর আলো করে ফুটে উঠেছিল রাত্রে—একরাশ শুভ্র হাসি যেন। এখন মুদে গেছে আঁখিপাত, পরিম্লান হয়েছে দেহশোভা—

অন্তর্হিতে শশিনি সৈব কুমুদ্বতী মে
দৃষ্টিং ন নন্দয়তি সংস্মরণীয়শোভা।
ইষ্টপ্রবাসজনিতান্যবলাজনস্য
দুঃখানি নূনমতিমাত্রসুদুঃসহানি॥
চাঁদের বিহনে কুমুদ-বধূর হেরি না সে শোভা আর—
বিরহের জ্বালা না জানি কতই প্রোষিতভর্তৃকার।

—চন্দ্রবংশাবতংস দুষ্যন্তের বিরহব্যথায় যে কাতর হবেন শকুন্তলা,—এ আর বিচিত্র কি!

মন ভাল নেই অনসূয়ার। তাঁর আর কোন কাজেই হাত-পা আসছে না। সরলহৃদয়া সখীটি তাঁর অপাত্রে হৃদয় সমর্পণ করলেন শেষকালে! কৈ, এতদিন হয়ে গেল, এখনও তো হস্তিনাপুরের রাজ-চতুর্দ্দোল এল না শকুন্তলাকে নিয়ে যেতে? এল না এক ছত্র চিঠিও! দুর্ব্বাসার শাপের ফলেই এসব ঘটছে না তো? তা হলে কারও হাত দিয়ে রাজার-দেওয়া অঙ্গুরীয়টি পাঠিয়ে দেবেন নাকি এক বার? কাকেই বা বলা যায়। তপস্বীদের কারোই তো সময় নেই—নিজের নিজের ধর্ম্মাচরণ নিয়ে ব্যস্ত তাঁরা। তাত কণ্বের কাছে গেলে তো সমাধান মেলে। কিন্তু সেদিকেও যে মুশকিল! নিভৃত-পরিণয়ের কাহিনী শুনলে তিনি হয়ত তিরস্কার করবেন শকুন্তলাকে। আকাশপাতাল ভাবতে লাগলেন অনসূয়া।

এমন সময় প্রিয়ম্বদা এলেন শুভসন্দেশ বহন করে—'ওঠ অনসূয়া, শকুন্তলার যাবার আয়োজন করতে হবে।'

কি ব্যাপার?

একটু আগেই প্রিয়ম্বদা গিয়েছিলেন সখীর কাছে রাত্রে ভাল ঘুম হয়েছিল কিনা জানতে। গিয়ে দেখেন লজ্জাবনতমুখী শকুন্তলাকে আলিঙ্গন করে স্বয়ং তাত কাশ্যপ বলছেন—'যজ্ঞধূমে দৃষ্টি আচ্ছন্ন থাকা সত্ত্বেও ভগবানের কৃপায় যজমানের আহুতি পাবকেই পড়ল। বৎসে, সংশিষ্যদত্তা বিদ্যার মতই অশোচনীয়া হয়েছ তুমি। দুঃখ করো না—আজকেই তুমি স্বামীর কাছে যাবে ঋষিপ্রতিরক্ষিতা হয়ে।'

আনন্দে আর বাক্য সরছে না অনসূয়ার—গদগদকণ্ঠে শুধালেন, 'তাত কণ্ব কেমন করে জানলেন শকুন্তলার কথা?'

সব খবরই এনেছেন প্রিয়ম্বদা। যজ্ঞ করবার জন্য নিত্যকার মত আজও অগ্নিগৃহে প্রবেশ করেছিলেন তাত কণ্ব, এমন সময় শুনলেন অশরীরী কণ্ঠে উদাত্ত বাণী—'হে ব্রহ্মন্, পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য দুষ্যন্তের আহিত তেজ ধারণ করে আছেন তোমার কন্যা—অগ্নিগর্ভা শমীর মত।'

ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠলেন দুই সখী—কোথায় মৃগরোচনা, কোথায় তীর্থমৃত্তিকা, কোথায় দূর্বাকিশলয়? সকল আনন্দের মধ্যেও মাঝে মাঝে কাঁটার মত বিঁধতে লাগল—এত তাড়াতাড়ি চলে যাবেন শকুন্তলা? আজকেই? এখনই?

সমস্ত তপোবনে ব্যস্ততা জেগে উঠল—শকুন্তলা আজ চিরকালের মত চলে যাবেন তপোবন ছেড়ে—বনলক্ষ্মীর আদরের ধন আশ্রম-ললামভূতা শকুন্তলা। 'শার্ঙ্গরব, কোথায় তুমি? শারদ্বত, এখনও কি সাজসজ্জা শেষ হ'ল না তোমার?' এই সব বিচিত্র আহ্বান-ধ্বনি শোনা যেতে লাগল বয়োজ্যেষ্ঠ মুনিদের। মালিনীর জলে শুভস্নান করিয়ে, হস্তে নীবারগুচ্ছ দিয়ে, স্বস্তিবাচন উচ্চারণ করতে করতে শকুন্তলাকে নিয়ে এলেন মাতৃস্থানীয়া মুনিপত্নীরা। 'বীর-প্রসবিনী হও বাছা'—আশীর্ব্বাদ করলেন এক জন তাপসী। 'স্বামীসোহাগিনী হও'—বললেন আর এক জন।

সখীদের সাজিয়ে দেবার পালা এবার। শকুন্তলার চোখে জল আসতে লাগল বার বার—এই শেষ! আর কখনই অনসূয়া-প্রিয়ম্বদা আদর করে সাজিয়ে দেবে না তাঁকে। কোথায় থাকবেন তিনি, আর কোথায় থাকবে সখীরা!

এমন সুন্দর রূপ শকুন্তলার, আভরণ হলে মানাতো ভাল। আশ্রমে কোথায় পাবেন বসন-ভূষণ-প্রসাধন? মন খুঁতখুঁত করতে লাগল সখীদের।

বেশীক্ষণ দুঃখ করতে হ'ল না। সঙ্গে সঙ্গেই এসে উপস্থিত হ'ল গৌতম আর নারদ—হাতে তাদের বধূসজ্জার উপকরণসম্ভার। 'কোথায় পেলি বাবা এসব?' বিস্ময়ে শুধোলেন গৌতমী। উত্তরে তারা বললে—তাত কাশ্যপ আমাদের বললেন শকুন্তলার জন্য পুষ্পচয়ন করতে। আমরা গিয়ে সাজি হাতে দাঁড়াতেই—

> ক্ষৌমং কেনচিদিন্দুপাণ্ডু-তরুণা মাঙ্গল্যমাবিষ্কৃতং
> নিষ্ঠ্যূতশ্চরণোপরাগসুলভো লাক্ষারসঃ কেনচিৎ।
> অন্যেভ্যো বনদেবতাকরতলৈরাপর্বভাগোত্থিতৈর্
> দত্তান্যাভরণানি নঃ কিসলয়োদ্ভেদপ্রতিদ্বন্দ্বিভিঃ॥
> জ্যোছনা-শুভ্র দুকুলবসন কেউ দিল স্নেহভরে,
> লাক্ষা কেউ বা অলক্তকের তরে;
> হেরিনু কোথাও কিশলয়সম বনদেবীদের করে
> সজ্জার লাগি আভরণ থরে থরে।

বৃত্তান্ত শুনে আনন্দে অধীর হলেন সকলে—নিঃসন্দেহে শকুন্তলার ভাবী সৌভাগ্যেরই সূচনা করছে এই অলৌকিক ব্যাপার। অনভ্যস্ত তবু নিপুণ হাতে সাজিয়ে দিলেন তাঁরা প্রিয়সখীকে। বসনে-ভূষণে লজ্জায় সজ্জায় অপরূপ হয়ে উঠলেন শকুন্তলা।

বহু কষ্টে আপনাকে সংযত করে রেখেছেন তাত কাশ্যপ—তাঁর স্নেহের দুলালী শকুন্তলা আজ চলে যাবে। উৎকণ্ঠায় আকুল হয়ে উঠেছে হৃদয়, গভীর বেদনার অশ্রুবাষ্প ঠেলে ঠেলে উঠছে কণ্ঠে, চিন্তাশক্তি যেন হারিয়ে গেছে। আজন্ম ব্রহ্মচারী তিনি—তাঁর সংযমকঠোর হৃদয়ে যদি এত স্নেহ, এত মমতা, তবে না জানি কন্যাকে বিদায় দেবার সময় কোন্ ব্যথার পারাবারে নিমগ্ন হন গৃহবাসী স্নেহান্ধ জনকেরা।

লজ্জানতা শকুন্তলাকে প্রাণভরে আশীর্ব্বাদ করলেন মহর্ষি। তারপর তাঁকে নিয়ে প্রদক্ষিণ করলেন সদ্যোহুত যজ্ঞহুতাশন—তাঁর কণ্ঠোচ্চারিত উদাত্ত ঋগ্মন্ত্রের প্রতিধ্বনি ছড়াল দূরে দূরান্তরে।

যাত্রামঙ্গল সমাপ্ত হয়েছে। গুরুজনদের প্রণাম করেছেন শকুন্তলা। যাঁরা তাঁকে পৌঁছে দিতে যাবেন, তাঁরাও সকলে এসে গেছেন—শার্ঙ্গরব, শারদ্বত আর আর্যা গৌতমী।

এবার বিদায়ের পালা। শকুন্তলার আজন্মসাথী তপোবনের বৃক্ষকুল—এদেরই স্নেহচ্ছায়ায় তিনি বেড়ে উঠেছেন এতটুকু থেকে, সোদরস্নেহে আলবালসেচন করেছেন সকালে-সন্ধ্যায়, এদের সকলেরই প্রিয়সখী তিনি। কণ্ব তা জানেন ভালভাবেই। তাই প্রথমেই আশ্রমের তরুলতাকে ডাক দিয়ে বললেন—

> ভোঃ ভোঃ সন্নিহিতাস্তপোবনতরবঃ
> পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্বপীতেষু যা
> নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্।
> আদ্যে বঃ কুসুমপ্রসূতিসময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ
> সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্বৈরনুজ্ঞায়তাম্॥
> তোমাদের আগে না দিয়ে যে জল জলপান কভু করে নি,
> প্রসাধনে ছিল অনুরাগ—তবু পল্লবটিও ছেঁড়ে নি,
> হর্ষে মেতেছে তোমাদের শাখে প্রথম ফুটিলে ফুল—
> মাগে সে বিদায়, অনুমতি দাও, হে কাননতরুকুল।

কণ্বের বচন শেষ না হতেই কোকিল ডেকে উঠল কোথা থেকে। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, শকুন্তলার পতিগৃহগমন অনুমোদন করেছে তাঁর বনবাসবন্ধুরা—তাই প্রতিবচন দিল কুহুরবে।

শুধু বৃক্ষলতা নয়; বনদেবতারাও প্রসন্নমনে শুভাশংসন

জানালেন শকুন্তলাকে। অশরীরী কণ্ঠে তাঁদের আশীর্ব্বাণী শোনা গেল আকাশে—

রম্যান্তরঃ কমলিনীহরিতৈঃ সরোভি-
শ্ছায়াদ্রুমৈর্নিয়মিতার্কময়ূখতাপঃ।
ভূয়াৎ কুশেশয়রজোমৃদুরেণুরস্যাঃ
শান্তানুকুলপবনশ্চ শিবশ্চ পন্থাঃ॥

পথটি তোমার সুন্দর হোক্ পদ্মলেরই স্নিগ্ধ-চাওয়ায়
শ্যামল হ'ল সলিল যেথায় পদ্মপাতার সবুজ-ছোওয়ায়।
ছায়ার আঁচল বিছাক্ পথে পাতায়-ভরা পাদপগুলি,
পদ্মরেণুর মতই কোমল হোক্ সে তোমার পথের ধূলি।
পবন বহুক্ মন্দমধুর,
বিঘ্নবিপদ্ যাক্ সুদূর। (ক্রমশঃ)

পর্ব্বতের আত্মকথা

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

বিরাট এক পর্ব্বত আমি, গগনের বক্ষ ভেদি'—
অপরূপ মূর্ত্তি ধরি' রয়েছি উচ্চ শিরে,
এসো না কখ্খনো গো আমার এই বক্ষতলায়
দে'খো সব তফাৎ থেকে আমার এই মূর্ত্তিটিরে।

বুকে মোর আসবে যে সেই যে মোরে বাসবে ভালো
তাহারা দেখবে আমার জটাতে মন্দাকিনী,
জটায় ঐ চূড়ায় তারা দেখিবে চাঁদের ফালি
আমার ঐ ঝর্ণাগুলি বাজাবে ঝিনিক্ ঝিনি।

তাহারা দেখবে আমার রূপেতে স্বপ্নপুরী
শিলায় এই বক্ষেতে মোর করুণার গঙ্গা গলে,
ধবল এই অঙ্গ'পরে হাজারো মেঘের খেলা
বুকেতে গৌরীহরের মিলনের দীপ্তি জ্বলে।

অপরূপ মূর্ত্তি আমার, করুণার শিব যে আমি
আমার এই আঁখির কাজল যদিও চন্দ্র তপন,
যদিও ভক্তে আমায় দেখেছে আত্মভোলা
তবুও নই তো আমি খাঁটি ঠিক শিবের মতন।

আমারও বুকের মাঝে রয়েছে তীব্র জ্বালা
দেহের এই গহ্বরে মোর লাখে লাখ সর্প পুষি,
কত না ব্যাঘ্র সেথায় রয়েছে ওৎ পাতিয়া
ঝাঁপিয়ে কখ্ন পড়ে' নিবে সে রক্ত চুষি।

করুণার দৃষ্টি দিয়ে যদিও বৃষ্টি ঝরাই
বনেরি ঔষধিতে মরণের দর্প হরি,
সাধু আর ভক্তদেরে যদিও বক্ষে রাখি
নাশিতে শয়তানেরে ক্রোধেতে বজ্র ধরি।

আসিবে আমার বুকে প্রেমিক ও শিল্পী যারা
আমার এই স্বপ্নলোকের তাহারাই চন্দনা গো,
আমার এই জঙ্গলেতে যত সব শঙ্কা আছে
তারা সব অর্ঘ্যে দিবে তাহাদের বন্দনা গো।

যাহারা সত্যি সাধু আমাকে চিত্ত দেছে
আমার ঐ সর্পেরি দল তাদেরে ধরবে ছাড়ি,
আমার ঐ গর্ত্ত থেকে বাঘেরা বাইরে এসে
সাধুদের চরণ-তলায় দিবে যে বক্ষ পাতি।

আসিবে আমার বুকে শুধু সব কবি ধ্যানী—
যাহাদের চিত্ত-মাঝে ভরা পাপ বঞ্চনা গো,
তারা সব তফাৎ থেকো, তাহাদের ধ্বংস লাগি'
জানি না বক্ষে কখন্ বাজাব ঝঞ্চনা গো।

যে চোখে অঙ্কিত মোর তপন আর চাঁদের কাজল
সে চোখে হঠাৎ কখন জ্বলিবে প্রলয়-আগুন,
জানি না এক নিমেষে আমার এই প্রলয়-ক্রোধে
কখন ঐ ভস্ম হয়ে লোটাবে লক্ষ ফাগুন।

এ কথা স্মরণ রেখো—কাঁটাতে অঙ্গ ভরি
দেবেরি চরণ লাগি ফোটে যে নীলোৎপল,
যে সাপের রুদ্র ফণা হরিকে ছত্র ধরে
তাহারি মৃত্যুফণায় গরজে বিষ-ছোবল্।

হুঁসিয়ার শয়তানেরা তারা সব তফাৎ থাকুক্
কপটের ধ্বংসে বহি' প্রলয়ের তীব্র জ্বালা,
মহতের জন্যে শুধু পাতা মোর বক্ষখানি
আমার এই কণ্ঠে দোলে তাদেরি কণ্ঠমালা।

সূর্যকেন্দ্রীয় পরিকল্পনার গোড়াপত্তন

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন, এম্-এস্‌সি

২

নিকোলাস কোপার্নিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩)

মিকোলা কোপেনিগ, ল্যাটিন নিকোলাস কোপার্নিকাস, পোল্যাণ্ডের পোমেরানিয়া প্রদেশের অন্তর্গত ভিস্‌চুলার তীরবর্তী থর্ণ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারী। তাঁহার পিতার জন্মস্থান ক্রাকাও, কিন্তু তাঁহার পূর্বপুরুষেরা ছিলেন জার্মানীর সাইলেসিয়ার অধিবাসী। এই সাইলেসিয়ার এক সম্ভ্রান্ত বংশে কোপার্নিকাসের মাতাও জন্মগ্রহণ করেন। এজন্য কোপার্নিকাসের পোলিশ অথবা জার্মান জাতীয়তা সম্বন্ধে অনেক বিতর্ক ও মতদ্বৈধ আছে এবং এখনও ইহার কোন সন্তোষজনক মীমাংসা হয় নাই। সম্ভ্রান্ত ধনীবংশে জন্মগ্রহণের ফলে সর্বপ্রকার উচ্চ-শিক্ষার সুযোগ তাঁহার ঘটিয়াছিল। তিনি তিন বৎসর ক্রাকাও বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিবাহিত করেন; এইখানে এলবার্ট ব্রুড-জিউস্কির সংস্পর্শে আসিয়া তিনি গণিত ও জ্যোতিষে আকৃষ্ট হন এবং নানা জ্যোতিষীয় যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও পর্যবেক্ষণ-কৌশল আয়ত্ত করেন। সে যুগে ধর্ম সংস্থায় উচ্চপদ অথবা ব্যবহারিক জীবনে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভের প্রকৃষ্ট পথ ছিল আইন ও চিকিৎসা-বিদ্যা অধ্যয়ন এবং এই দুই শাস্ত্রে পারদর্শিতা অর্জন। তাই গণিত ও জ্যোতিষে যথেষ্ট অনুরাগ সত্ত্বেও তাঁহার প্রধান অধ্যয়নের বিষয় ছিল আইন ও চিকিৎসাশাস্ত্র। ক্রাকাও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পর এই দুই শাস্ত্রে অধিকতর জ্ঞানলাভের আশায় তিনি দীর্ঘ দশ বৎসর বোলোনা, পাদুয়া, ফেরারা প্রভৃতি ইটালীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। বোলোনায় বিদ্যাভ্যাসের সময় তিনি তথাকার প্রথিত-যশা জ্যোতিষের অধ্যাপক পিথাগোরাস-পন্থী ডোমিনিকো দি নোভারোর শিক্ষকতার দ্বারা বিশেষ-ভাবে প্রভাবান্বিত হন। এইরূপ জানা যায় যে, কোপার্নি-কাস ও নোভারো এই সময়ে বোলোনায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জ্যোতিষীয় পর্যবেক্ষণ গ্রহণ করিয়াছিলেন; এতদ্ব্যতীত 'এল্‌মাজেষ্টে'র নানা ভুলভ্রান্তি এবং পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যের সহিত এই গ্রন্থের বর্ণিত বিষয়ের নানা অসঙ্গতি গুরু-শিষ্যের প্রধান আলোচনার বিষয় ছিল। ইটালীতে, বিশেষতঃ বোলোনায়, অবস্থানকালে কোপার্নিকাস যে প্রথম জ্যোতিষীয় সংস্কার সাধনের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা লাভ করেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শিক্ষা সমাপনান্তে কোপার্নিকাস ফ্রাউয়েনবুর্গ গীর্জার ক্যাননের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত দীর্ঘ একত্রিশ বৎসর তিনি এই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। জ্যোতিষ ও গণিত চর্চা তাঁহার অবসর সময়ের প্রধান গবেষণার বিষয় হইলেও রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি নানা বৈষয়িক ব্যাপারেও তাঁহাকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে দেখা যায়। পোল্যাণ্ডের রাজা ও টিউ-টনিক রাজন্যবর্গের সম্পত্তিগত বিবাদ মিটাইবার জন্য তিনি অনেকবার মধ্যস্থতা করেন। মুদ্রা সংস্কার ব্যাপারে পোলিশ সরকারের অনুরোধে কোপার্নিকাস একবার অতি মূল্যবান এক রিপোর্ট প্রণয়ন করিয়াছিলেন, এই রিপোর্টের পরামর্শ অনুযায়ী সরকার পোলিশ-মুদ্রার সংস্কার সাধন করেন। সাহিত্যে, কাব্যে ও চিত্রাঙ্কনেও তাঁহার যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। তিনি কবিতা লিখিতেন এবং কয়েকটি চিত্রও আঁকিয়া গিয়াছেন; তন্মধ্যে নিজের একটি প্রতিকৃতি উল্লেখযোগ্য।

বাহির হইতে দেখিলে মনে হইবে, জ্যোতিষ ও গণিতীয় গবেষণার দিক হইতে কোপার্নিকাসের এই দীর্ঘ একত্রিশ বৎসরকাল নিতান্তই উল্লেখযোগ্যহীন ভাবে কাটিয়াছিল। বস্তুতঃ প্রতিটি অবসর মুহূর্ত তিনি ব্যয় করিয়াছিলেন জ্যোতিষীয় পরিকল্পনার উন্নতি সাধনে। সম্ভবতঃ ইটালীতে বিদ্যা শিক্ষার সময় সূর্যকেন্দ্রীয় পরিকল্পনার কথা প্রথম তাঁহার মাথায় আসিয়াছিল। ইহাকে একটি কার্যকরী পরিকল্পনার দাঁড় করাইতে হইলে নির্ভুল গণনার দ্বারা দেখাইতে হইবে যে, গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতি ও জ্যোতিষীয় ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণের ফলে যেমন যেমন সংঘটিত হইতে দেখা যায় এই পরিকল্পনাও অবিকল সেই প্রকার ঘটনাবলীরই নির্দেশ দিতেছে। পৃথিবীর গতির ও সূর্যকেন্দ্রীয় ব্রহ্মাণ্ড পরিকল্পনার কথা যে নূতন নহে, কোপার্নিকাস ইহা অবগত ছিলেন। তিনি সাইরাকিউজবাসী হিসেটাস্ পৃথিবীর গতিতে বিশ্বাস করিতেন। প্লুটার্কের রচনায় দেখা যায়, প্রাচীনকালের অনেকেরই এইরূপ অভিমত ছিল। কিন্তু ইহারা কেহই গণিতের সুদৃঢ় ভিত্তিতে এই পরিকল্পনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করেন নাই। গণিতের ভিত্তিতে ভূকেন্দ্রীয় পরিকল্পনার বুনিয়াদ রচনা করিবার সাফল্যই টলেমীর জ্যোতিষের ব্যাপক স্বীকৃতি ও সমাদর লাভের এবং দীর্ঘকাল স্থায়িত্বের প্রধান কারণ। সুতরাং ভূকেন্দ্রীয় জ্যোতিষ অপেক্ষা সূর্যকেন্দ্রীয় জ্যোতিষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে হইলে গণিতের প্রয়োগ দ্বারা দেখাইতে হইবে যে, এই শেষোক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী সমগ্র জ্যোতিষীয় সমস্যার অধিকতর সন্তোষজনক মীমাংসা সম্ভবপর। কোপার্নিকাস

এই দুরূহ প্রচেষ্টায় দীর্ঘ একত্রিশ বৎসর নীরবে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

সৌরজগতের অভিনব পরিকল্পনার প্রকাশ বিদ্বৎসমাজে ও ধর্মসংস্থার কর্তৃপক্ষমহলে যে দারুণ অসন্তোষ, তীব্র সমালোচনা ও বিরুদ্ধতার সৃষ্টি করিবে, ইহা কোপার্নিকাস বরাবরই আশঙ্কা করিয়াছিলেন। তাই সর্বপ্রকার সাবধানতা অবলম্বন করিয়া আঁট-ঘাট বাঁধিয়া ধীরে ধীরে গবেষণার ফল গ্রন্থাকারে তিনি লিপিবদ্ধ করেন এবং এই গ্রন্থ বহু পূর্বে শেষ হইলেও ইহার পরিবর্তনে ও সংশোধনে বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত করেন। তথাপি তিনি যে এক অভিনব জ্যোতিষীয় পরিকল্পনা রচনায় ব্যস্ত এবং পৃথিবীর গতিই যে ইহার কেন্দ্রীয় বিষয়, ইহা ক্রমশঃ প্রকাশ হইয়া পড়ে। অচিরে বন্ধুমহলে এই সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা সুরু হয়; অনেকে তাঁহার অভিনব মতবাদ সম্বন্ধে অবহিত হইতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করে। বন্ধুদের অনুরোধে কোপার্নিকাস অবশেষে তাঁহার জ্যোতিষীয় মতবাদের এক সংক্ষিপ্তসার *Commentariolus* ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। ইহাতে তাঁহার মূল গ্রন্থের পরিণত চিন্তাধারাই লিপিবদ্ধ হয়, শুধু বাদ দেওয়া হয় গণিতীয় অংশগুলি।

Commentariolus প্রকাশের দীর্ঘ দশ বৎসরের মধ্যেও কোপার্নিকাস তাঁহার মূল ও সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশে কোনরূপ উৎসাহ দেখান নাই। ভিটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের তরুণ অধ্যাপক জর্জ জোয়াকিম্ (ইনি ল্যাটিন রেটিকাস্ নামেই অধিক প্রসিদ্ধ) কোপার্নিকাসের জ্যোতিষীয় মতবাদের কথা শুনিয়াছিলেন। সূর্যকেন্দ্রীয় মতবাদের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া রেটিকাস কিছুদিন কোপার্নিকাসের নিকট গবেষণা করেন এবং সেই সূত্রে তাঁহার সমগ্র পাণ্ডুলিপি পাঠ করিবার আশাতীত সুযোগ লাভ করেন। রেটিকাসের আগ্রহে ও পীড়াপীড়িতে কোপার্নিকাস শেষ পর্যন্ত গ্রন্থ প্রকাশে সম্মত হন এবং রেটিকাসের উপর এই ভার অর্পণ করেন। *Nicolai Copernici torinensis de revolutionibus orbium coelestium Libri VI* নামে এই গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় নুর্নবার্গ হইতে ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে। কথিত আছে, মুদ্রণের পর এই গ্রন্থের একটি প্রতিলিপি যখন কোপার্নিকাসের হাতে আসিয়া পৌঁছিল, তিনি তখন মৃত্যুশয্যায় অবশ ও সংজ্ঞাহীন।

কোপার্নিকাসের জ্যোতিষীয় মতবাদ

আর্থার বেরি লিখিয়াছেন, সমগ্র জ্যোতির্বিদ্যার সাহিত্যে কোপার্নিকাসের *De revolutionibus*-এর সহিত তুলনা হইতে পারে কেবলমাত্র টলেমীর *Almagest*-এর ও নিউটনের *Principia*-র।* যে কেন্দ্রীয় ধারণার জন্য ইহার এই বৈশিষ্ট্য তাহা হইতেছে, আপাতদৃষ্টিতে গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কের যে সকল গতি আমরা লক্ষ্য করি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহা তাহাদের আসল গতি নহে। গতিশীল পৃথিবীর উপর অবস্থিত পর্যবেক্ষকের গতির জন্য গ্রহ-নক্ষত্রের এইরূপ আপাত গতি প্রতীয়মান হইয়া থাকে। অর্থাৎ জ্যোতিষ্কদের যে গতি আমরা দেখি ইহা তাহাদের আসল গতি নহে, আপেক্ষিক গতি। গ্রন্থের প্রারম্ভে কোপার্নিকাস তাই প্রথমেই আপেক্ষিক গতির অবতারণা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "আমরা বস্তু-নিচয়ের যে সব গতি দেখি তাহা দর্শকের নিজের গতির জন্য হইতে পারে, অথবা যে বস্তুকে দেখিতেছি তাহার গতির জন্য, অথবা বস্তু ও দর্শক উভয়ের গতির জন্যও হইতে পারে।...পৃথিবীর যদি কোন গতি থাকে, তবে পৃথিবীর বাহিরে অবস্থিত প্রত্যেক বস্তুতেই সেই গতি প্রতিভাত হইবে, অবশ্য বিপরীত দিকে।" বিষয়টি পরিষ্কার ভাবে বুঝাইবার জন্য তিনি ভার্জিল হইতে একটি ছত্র উদ্ধৃত করেন, যেখানে অ্যানিস্ বলিতেছে, "Prohehimur portu, terraeque urbesque recedunt", অর্থাৎ আমরা পোতাশ্রয় ছাড়িয়া পাড়ি দিলাম, আর দেশ ও নগর দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল।

কোপার্নিকাস বলেন, প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্‌দের ধারণা অনুযায়ী স্থির নক্ষত্রদের গোলক প্রতিদিনে যে একবার আবর্তিত হইতে দেখা যায় তাহা সত্য সত্যই এই গোলকের নিজস্ব আবর্তনের জন্য নহে, পৃথিবী অক্ষের চতুর্দিকে দিনে একবার আবর্তিত হয় বলিয়া স্থির নাক্ষত্র গোলকের এই আপাত আবর্তন পরিলক্ষিত হয়। তিনি স্বীকার করেন, পৃথিবীর এই আহ্নিক গতির কথা তাঁহার বহু পূর্বে পিথাগোরীয় জ্যোতির্বিদ গ্রীক হেরাক্লিডেস্ ও একফ্যান্টাস্ বলিয়া গিয়াছেন এবং সাইরাকিউজবাসী নিসেটাস্‌ও ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। সূর্যের বার্ষিক গতি সম্বন্ধে কোপার্নিকাস বলেন যে, পৃথিবীর পরিবর্তে সূর্যকে কেন্দ্রস্থলে নিশ্চল অবস্থায় কল্পনা করিয়া পৃথিবীকে যদি সূর্যের চারিদিকে পরিক্রমণরত মনে করা যায় তাহা হইলে ভূপৃষ্ঠস্থ দর্শক আগের মতই সূর্যের বাৎসরিক পরিক্রমণ লক্ষ্য করিবে। শুধু তাহাই নহে, পৃথিবীর এইরূপ বার্ষিক গতির ফলে গ্রহদের আপাত গতিরও অনেক তারতম্য হইবে। পৃথিবীকে নিশ্চল মনে করিবার জন্য প্রাচীন জ্যোতির্বিদেরা বহু কৌশল খাটাইয়াও গ্রহদের খামখেয়ালী গতির সন্তোষজনক সমাধান আবিষ্কার করিতে পারে নাই। বৃত্তের পর

---

* *A Short History of Astronomy*, A Berry, pp. 99.

যুক্ত চাপাইয়া সমগ্র পরিকল্পনাকে তাঁহারা অস্বাভাবিক ও অনাবশ্যকভাবে জটিল করিয়া তুলিয়াছিলেন। সূর্যকে ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে অবস্থিত জ্ঞান করিয়া অন্যান্য গ্রহের মত পৃথিবীকেও যদি সূর্যের চারিদিকে পরিক্রমণরত মনে করা যায় তাহা হইলে অনায়াসে বহু দুরূহ জ্যোতিষীয় সমস্যার সমাধান হইয়া যায়।

এইভাবে পৃথিবীর উপর একসঙ্গে আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি চাপাইয়া ও পৃথিবীর স্থলে সূর্যকে ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কোপার্নিকাস যে পরিকল্পনা উপস্থাপিত করিলেন তাঁহার নিজের ভাষায় (বঙ্গানুবাদ) ইহার বর্ণনা হইল এইরূপ :

"প্রথমে ও সবার উপরে বিরাজ করিতেছে স্থির নক্ষত্রের গোলক ; এই গোলক ও ইহার অন্তর্ভুক্ত সকল বস্তু নিশ্চল। প্রকৃতপক্ষে ইহাই ব্রহ্মাণ্ডের কাঠামো এবং এই কাঠামোর প্রচ্ছদ-পটেই অন্যান্য জ্যোতিষ্কের গতি ও স্থিতি নির্ধারিত হইয়া থাকে। যদিচ অনেকের ধারণা এই নাক্ষত্র গোলক এক রকম ভাবে আবর্তিত হইতেছে, তথাপি আমরা পৃথিবীর গতির যে তত্ত্ব প্রস্তাব করিতে যাইতেছি তাহাতে ইহার এইরূপ আপাত আবর্তনের অন্য প্রকার কারণ নির্দিষ্ট হইবে। গতিশীল বস্তুদের মধ্যে প্রথমেই আসে শনি ; ইহা ত্রিশ বৎসরে একবার কক্ষা-পরিক্রমা সম্পূর্ণ করে। তারপর বৃহস্পতি বার বৎসরে একবার পরিক্রমণ করে। তারপর দুই বৎসরে একবার ঘুরিয়া আসে মঙ্গল। ক্রমিক পর্যায়ে চতুর্থ কক্ষায় বৎসরে একবার পরিক্রমণ করে পৃথিবী এ কথা আগেই আমরা বলিয়াছি। পৃথিবীর সহিত আবর্তিত হয় চন্দ্রের পরিবৃত্ত। পঞ্চম স্থানে শুক্র নয় মাসে একবার ঘুরিয়া আসে। তারপর বুধ অধিকার করিয়া আছে ষষ্ঠস্থান, তাহার ভ্রমণ কাল আশী দিন। ইহাদের সকলের মধ্যস্থলে অধিষ্ঠিত সূর্য। এই অতি চমৎকার মন্দিরের মধ্যে ইহা অপেক্ষা শ্রেয় আর কোথায় এই প্রদীপের স্থান হইবে যেখান হইতে তার আলোকচ্ছটায় একই কালে সকল বস্তুই উদ্ভাসিত হইতে পারে ? অতি সঙ্গত কারণেই কেহ ইহাকে (সূর্যকে) বলিয়াছেন বিশ্বের প্রদীপ, কেহ বিশ্বাত্মা, কেহ বা আবার বিশ্বপালক,—ইহাই ত্রিস্মেজিস্তাস্ (Trismegisthus), দৃশ্যমান ভগবান, সোফক্লসের ইলেক্ট্রা, সকলের আরাধ্য দেবতা, এবং এইখানে যেন রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া সূর্য তাহাকে কেন্দ্র করিয়া পরিক্রমণরত গ্রহ-পরিবারকে শাসন করিতেছে।"*
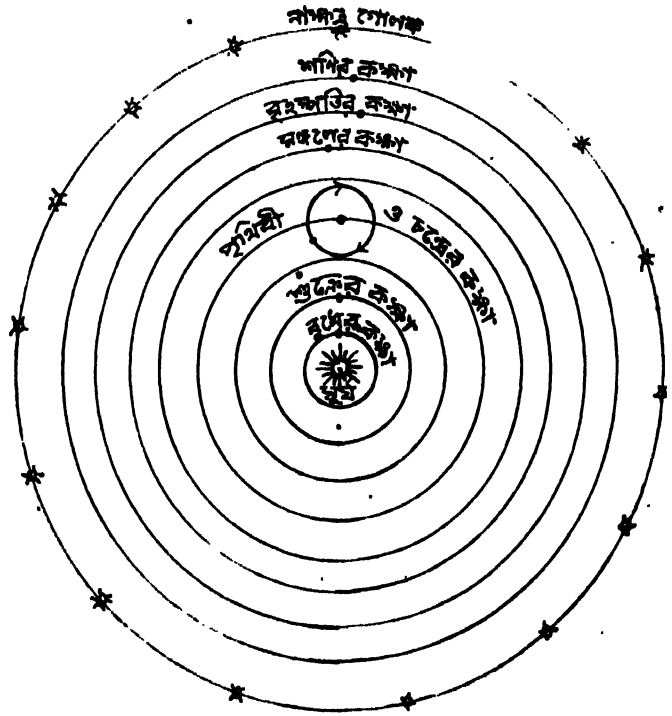
১। কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রীয় ব্রহ্মাণ্ড-পরিকল্পনা

গ্রীক জ্যোতিষের আমল হইতেই পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে কতকগুলি আপত্তি ছিল। প্রথমতঃ পৃথিবীর মত এত বড় ও এত ভারী এক নিরেট বস্তুর আহ্নিক গতি থাকিলে আবর্তনের বেগে ইহা ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা হইয়া পড়িবার কথা। তারপর ভূপৃষ্ঠের সহিত দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ নহে এইরূপ জিনিষের উড়িয়া যাইবার বা পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবার সম্ভাবনা বর্তমান। পৃথিবীর আহ্নিকগতি পরিকল্পনা করিবার পথে উপরোক্ত অসুবিধার কথা টলেমী নিজেই আলোচনা করিয়াছিলেন। কোপার্নিকাস ইহার উত্তরে বলিলেন, পৃথিবী অপেক্ষা নাক্ষত্র গোলক বহুগুণ বড়। দিনে একবার সম্পূর্ণরূপে আবর্তিত হইতে হইলে অসম্ভব দ্রুতগতিতে এই আবর্তন সংঘটিত হইতে হইবে। তাহার ফলে গোটা নাক্ষত্র গোলকই ত শতধা ভাঙ্গিয়া পড়িবার কথা। তাহা যদি না হইতে পারে পৃথিবীর গতির বেলায়ই বা এ আশঙ্কা কেন ?

* *De revolutionibus orbium caelestium*, lib. I. cap. X ; ইংরেজী অনুবাদ W. C. D. এবং M. D Whetham ; *Readings in the Literature of Science*, Cambridge, 1924.

আলগা বা হালকা জিনিষগুলি আহ্নিক গতির জন্য ভূপৃষ্ঠ হইতে উৎক্ষিপ্ত হয় না কেন, ইহার সদুত্তর অবশ্য কোপার্নিকাস দিতে পারেন নাই।

অন্যান্য গ্রহদের মত বৃত্তাকারে শূন্যপথে পৃথিবীর পরিক্রমণ কল্পনা করিবার আর একটি প্রধান আপত্তি এই ছিল যে, ইহাতে নক্ষত্রদের এক আপাত গতি প্রতীয়মান হইবে। কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী বিস্তর পর্যবেক্ষণ সত্ত্বেও নক্ষত্রদের কোনরূপ গতি আবিষ্কৃত হয় নাই। কোপার্নিকাস এই আপত্তি সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। এই আপত্তি দূর করিবার উদ্দেশ্যে তিনি নাক্ষত্র গোলককে অতি প্রকাণ্ড ও পৃথিবী হইতে বহুদূরে অবস্থিত কল্পনা করিলেন। এই দূরত্বের জন্য নক্ষত্রের আপাত গতি বা লম্বন (parallax) অনুভূত হইবে না। কোপার্নিকাস নাক্ষত্র লম্বনের প্রশ্ন সুকৌশলে এড়াইয়া গেলেও পরবর্তী জ্যোতির্বিদেরা সহজে নিরস্ত হইলেন না। নির্ভুল পর্যবেক্ষণের নানা উন্নতি সত্ত্বেও যখন নক্ষত্রের এতটুকু লম্বন ধরা পড়িল না, তখন সৌরজগতে বিশ্বাসী জ্যোতির্বিদদের মনেও নূতন করিয়া সন্দেহ জাগিয়াছিল। নাক্ষত্র লম্বন অবশ্য এখন আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং কোন কোন নক্ষত্রের ক্ষেত্রে এই লম্বন প্রায় এক মিনিটের মত।
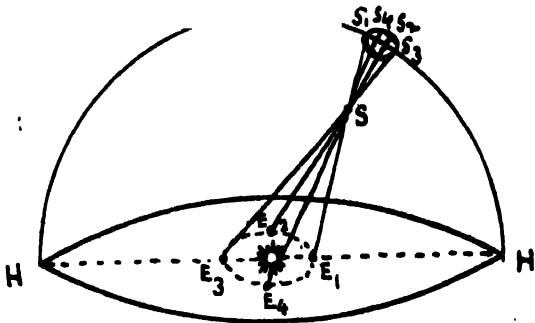
২। নক্ষত্রের লম্বন

কোপার্নিকাসের পরিকল্পনায় গ্রহদের আপাত খাপছাড়া গতির অতি সহজ ও সরল ব্যাখ্যা সম্ভবপর হয়। এই খাপছাড়া গতির কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। পৃথিবীকে নিশ্চল ভাবিবার জন্য এই অদ্ভুত গতির কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা বহুকাল সম্ভবপর হয় নাই। বুধ ও শুক্র গ্রহের বেলায় পরিবৃত্তের সাহায্যে হেরাক্লিডেস্ অব পাণ্টুস্ সর্বপ্রথম এই অদ্ভুত গতির কারণ নির্দেশের চেষ্টা করেন। টলেমী হেরাক্লিডেসের পরিকল্পনা আরও সম্প্রসারিত করিয়া এবং পরিবৃত্ত ও ডেফারেণ্টের সাহায্যে এই একই সমস্যার কতকটা সমাধান করিয়াছিলেন। কোপার্নিকাস বলিলেন, টলেমীর পরিকল্পনায় গ্রহদের স্বাভাবিক বৃত্তপথে পরিক্রমণ ছাড়াও আবার যে এক একটি কল্পিত পরিবৃত্তপথে ঘুরাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল, পৃথিবীর পরিক্রমণ মানিয়া লইতে অস্বীকারই তাহার একমাত্র কারণ। বস্তুতঃ টলেমীর এই পরিবৃত্তগুলি পৃথিবীর কক্ষা-পরিক্রমারই প্রতিবিম্বস্বরূপ। সুতরাং নির্দিষ্ট কক্ষায় পৃথিবীর গতি স্বীকার করিলে পরিবৃত্তের জটিল ও অবাস্তব অবতারণা নিষ্প্রয়োজন। বিষয়টি আরও কিছু পরিষ্কার করিয়া বলা দরকার।

মনে করা যাক, ৩নং চিত্রে S সূর্যের অবস্থান নির্দেশ করিতেছে, ক্ষুদ্রতম বৃত্ত $E_1 E_2 E_3 F_4$ পৃথিবীর কক্ষা, পরবর্তী বৃত্ত $M_1 M_2 \cdots M_9$ মঙ্গল গ্রহের কক্ষা এবং $Z_1 Z_2 \cdots Z_9$ নাক্ষত্র গোলক বা রাশিচক্র। আমরা জানি পৃথিবী বৎসরে একবার তাহার কক্ষা ভ্রমণ করিয়া আসে এবং মঙ্গল গ্রহের কক্ষা-পরিক্রমা করিতে লাগে প্রায় দুই বৎসর। মনে করা যাক, পর্যবেক্ষণের আরম্ভে পৃথিবী E_1 ও মঙ্গল M_1 -এ অবস্থান করিতেছে। তিন মাস পর পর পৃথিবী ও মঙ্গলের অবস্থান যথাক্রমে $E_2, E_3, E_4, E_1, E_2, \cdots$ এবং M_2, M_3, M_4, M_5, M_6 ইত্যাদির দ্বারা নির্দিষ্ট হইবে। এখন $E_1 M_1, E_2 M_2, E_3 M_3, E_4 M_4$ ইত্যাদি সরল রেখাগুলি রাশিচক্র পর্যন্ত বাড়াইয়া দিলে পৃথিবী হইতে মঙ্গল গ্রহকে যথাক্রমে Z_1, Z_2, Z_3, Z_4 ইত্যাদি স্থানে দেখা যাইবে। মঙ্গল গ্রহ নিজ কক্ষায় অবশ্য সমান বেগে অগ্রসর হইতেছে; কিন্তু ভ্রাম্যমাণ পৃথিবী হইতে দেখিবার জন্য মনে হইবে এই গ্রহ রাশিচক্রে যেন Z_1 হইতে Z_2, Z_3, Z_4-এ অসমান বেগে অগ্রসর হইতেছে। এই বেগ যে অসমান তাহা $Z_1 Z_2, Z_2 Z_3, Z_3 Z_4$ ইত্যাদির দূরত্ব মাপিলেই বুঝা যাইবে। তারপর পৃথিবী যখন E_2, E_3 বিন্দুতে আর মঙ্গল M_2, M_3-তে, তখন মঙ্গলগ্রহকে ক্রমশঃ পৃথিবী হইতে দূরে সরিয়া যাইতে দেখা যাইবে। পক্ষান্তরে পৃথিবী ও মঙ্গল গ্রহের অবস্থান যখন E_1 ও M_1 -এর অব্যবহিত পূর্বে ও পরে তখন এই দুই গ্রহের গতির পার্থক্যের জন্য মনে হইবে মঙ্গল গ্রহ হঠাৎ যেন দিক পরিবর্তন করিয়া ও ঘুরপাক খাইয়া আবার আগের মত চলিতেছে। পৃথিবীর F_4 হইতে E_1 ও মঙ্গল গ্রহের M_8 হইতে M_9 -এ যাইবার সময়ও আর একবার এই প্রকার পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে। রাশিচক্রে মঙ্গল গ্রহের এইরূপ আপাত দিকপরিবর্তন চিত্রে ফাঁস বা লুপের সাহায্যে দেখানো হইয়াছে।

পৃথিবীর গতি কল্পনা করিয়া গ্রহদের আপাত গতির জটিল ব্যাখ্যায় কোপার্নিকাস যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিলেও এই সাফল্য তাঁহার সম্পূর্ণ হয় নাই। গ্রহগতি সংক্রান্ত আরও কতকগুলি অসমতার চূড়ান্ত সমাধানে তিনি বিফল হইয়াছিলেন। সৌরজগতের চাবিকাঠি হাতে পাইয়াও শেষ পর্যন্ত রহস্যের দ্বার তিনি পরিপূর্ণভাবে উন্মুক্ত করিতে
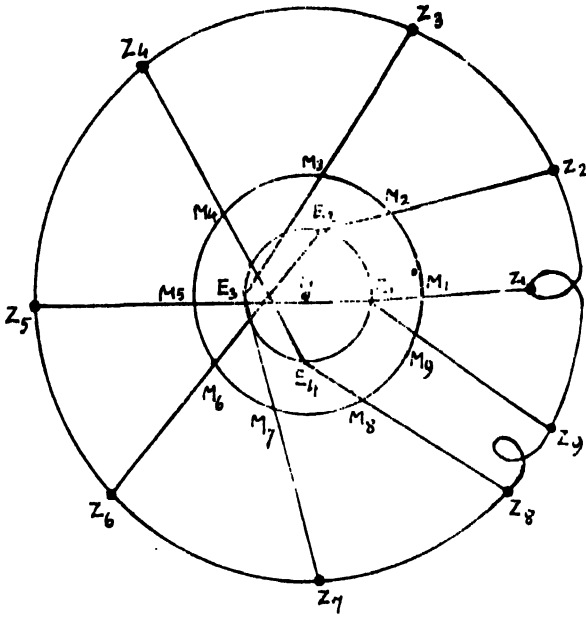
৩। সূর্য্যকেন্দ্রীয় পরিকল্পনা অনুসারে মঙ্গলগ্রহের অসমান গতির ব্যাখ্যা

পারিলেন না। আমরা এখন জানি, ইহার জন্ম শুধু প্রয়োজন ছিল বৃত্তের পরিবর্তে উপবৃত্ত পথে গ্রহদের পরিক্রমণ কল্পনা করা। এই সামান্ত অথচ অতীব গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনের অভাবে পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যের সহিত তত্ত্বীয় গণনার ফল মিলাইবার অধিকাংশ চেষ্টাই তাঁহার একরূপ বলিতে গেলে পণ্ডশ্রম হইয়াছিল। কেপ্‌লার এই পরিবর্তনটি সাধন করেন ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু পিথাগোরীয় ও এরিষ্টটেলীয় মতবাদের প্রভাব কাটাইয়া কোপার্নিকাস কিছুতেই ভাবিতে পারেন নাই যে, সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ ও একান্ত স্বাভাবিক বৃত্ত ছাড়া আর কোন জ্যামিতিক রেখাপথে জ্যোতিষ্কদের মত স্বর্গীয় বস্তুদের আকাশ পরিক্রমা সম্ভবপর। সুতরাং অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে টলেমীর সেই পুরাতন কৌশল উৎকেন্দ্রীয় বৃত্ত ও পরিবৃত্তের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইল। সূর্যকে গ্রহদের কক্ষার ঠিক কেন্দ্রস্থলে না বসাইয়া কতকটা দূরে সরাইয়া বসাইলেন এবং কয়েকটি গ্রহের উপর একটি করিয়া পরিবৃত্ত চাপাইলেন। তথাপি তাঁহার সান্ত্বনা এইটুকু রহিল যে, টলেমী যেখানে ৭৯ বৃত্ত ব্যবহার করিয়াছিলেন সেখানে তাঁহার ৩৪টি অধিক বৃত্তের প্রয়োজন হয় নাই।

সৌরজগতের ভিত্তিতে কোপার্নিকাস ক্রান্তিবিন্দুর অয়ন-চলনের প্রকৃত কারণ নির্ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। অয়নচলনের আবিষ্কর্তা স্বয়ং হিপার্কাসের ধারণা ছিল, বিষুব-বৃত্ত (celestial equater) ধীরে ধীরে পূর্ব হইতে পশ্চিমে সরিয়া যাইবার ফলে অয়ন-চলন সংঘটিত হইয়া থাকে। সূর্যের পরিবর্তে পৃথিবীর গতি স্বীকার করায় বিষুবরৃত্ত ও ভূবিষুব দুইই এক হইয়া পড়িল। এখন বিষুবৃত্তের গতির অর্থই ভূবিষুবের গতি। তারপর এই গতির একটি প্রধান সর্ত্ত এই যে, বিষুববৃত্তের গতির জন্ত বিষুবরত্ত ও ক্রান্তিবৃত্তের অন্তবর্তী কোণের কোন তারতম্য হয় না। অর্থাৎ ভূবিষুব ও ক্রান্তি-বৃত্তের অন্তবর্তী কোণ সব সময়ে অপরিবর্তিত থাকিবে। এই অন্তবর্তী কোণ বলিতে যে দুই সমতল ক্ষেত্রের উপর ভূবিষুব ও ক্রান্তিবৃত্ত অবস্থিত সেই দুই সমতল ক্ষেত্রের ঘন কোণকে বুঝিতে হইবে। আমরা জানি পৃথিবীর অক্ষরেখা ভূবিষুব সমতলের উপর লম্বভাবে অবস্থিত; সুতরাং ভূবিষুবের গতির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর অক্ষরেখাও ঘুর্ণ্যমাণ লাট্টুর অক্ষরেখার মত ধীরে ধীরে চক্রাকারে শূন্থে আবর্তিত হইয়া থাকে। পৃথিবীর অক্ষরেখাকে মহাশূন্যে স্থির নাক্ষত্র গোলক পর্যন্ত প্রসারিত কল্পনা করিলে এই অক্ষরেখা নাক্ষত্র গোলকের উপর ধীরে ধীরে একটি বৃত্ত রচনা করিতে থাকিবে
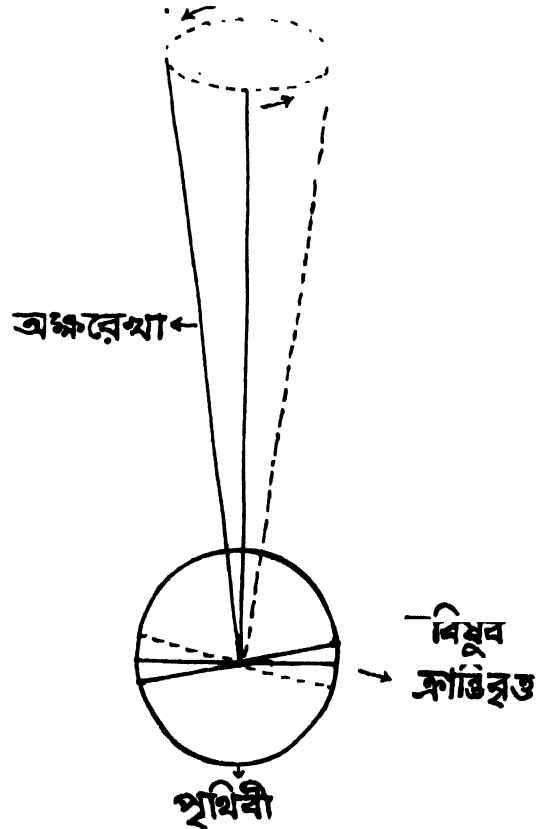
৪। অয়ন-চলনের কারণ: পৃথিবীর অক্ষরেখা ঘূর্ণ্যমান লাট্টুর অক্ষের ন্যায় আবর্তিত হইতেছে

(৪নং চিত্র)। এই বৃত্ত রচনায় কাল ২৬,০০০ বৎসর। অয়ন-চলন, অর্থাৎ পৃথিবীর অক্ষরেখার উপরোক্ত গতির জন্ত মেরুদ্বয়ের অবস্থানও ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইতেছে।

২১৭০ অব্দে সপ্তর্ষি মণ্ডলের (Ursa major) পুলস্ত্য ও অত্রি নক্ষত্রদ্বয় স্পর্শ করিয়া একটি সরল রেখা টানিলে যে দিক পাওয়া যায় তাহার সমান্তরাল ভাবে পৃথিবীর অক্ষ-রেখার অবস্থান ছিল। আল্‌ফা ড্রাকোনিস্ তখন ধ্রুব নক্ষত্র। বর্ত্তমানে পৃথিবীর অক্ষরেখা পুলহ ও ক্রতু নক্ষত্রদ্বয় স্পর্শ করিয়া যে কাল্পনিক রেখা পাওয়া যায় তাহার সহিত সমান্তরালভাবে অবস্থান করে। এই রেখার উপরে অবস্থিত ও লঘু সপ্তর্ষি মণ্ডলের (Ursa minor) অন্তর্গত প্রধান নক্ষত্র সাইনোসুরা এখন ধ্রুব নক্ষত্র। পূর্ববর্তী বিভিন্ন শতাব্দীতে আমাদের ধ্রুব নক্ষত্রের অবস্থান কিরূপ ছিল তাহা ৫নং চিত্রে দ্রষ্টব্য।
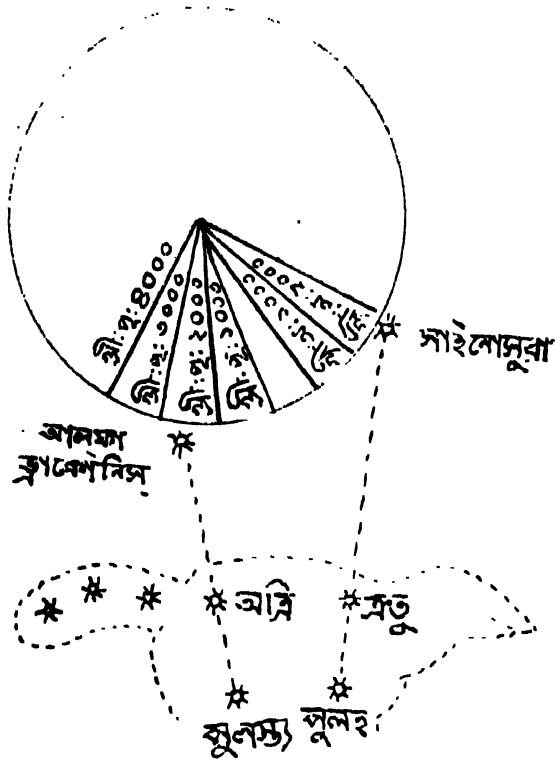
৫। অয়ন-চলনের জন্য ধ্রুব নক্ষত্রের স্থানপরিবর্ত্তন

কোপার্নিকাসের জ্যোতিষীয় পরিকল্পনা এবং এই পরিকল্পনার সাহায্যে নানা জ্যোতিষীয় প্রশ্নের সহজ মীমাংসার কয়েকটি দৃষ্টান্ত আলোচিত হইল। ইহা ছাড়া তিনি ঋতু পরিবর্তন, গ্রহ, উপগ্রহ ও চন্দ্র সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছিলেন এবং প্রায় সমস্ত বিষয়েই প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্‌দের অপেক্ষা তাঁহার প্রস্তাবিত সমাধান ও ব্যাখ্যা অনেক বেশী উন্নত ধরণের হইয়াছিল। তথাপি কোপার্নিকাসের বিরুদ্ধে প্রধান নালিশ এই যে, তিনি জ্যোতিষীয় পর্যবেক্ষণের উপর বিশেষ কোন গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। 'এলমেজেষ্টে' প্রদত্ত তথ্য ও তালিকাই ছিল তাঁহার প্রধান অবলম্বন। এই তথ্যের মধ্যে যে ভুল থাকিতে পারে, তাহা নির্ণয়ের জন্য নূতন করিয়া জ্যোতিষীয় পর্যবেক্ষণের ও যন্ত্রপাতির সংস্কার ও উন্নতি সাধন যে একান্ত প্রয়োজন, কোপার্নিকাস সে বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন না। ভুল ও সন্দেহজনক তথ্যের উপর নির্ভর করিবার ফলে অনেক ক্ষেত্রে তাঁহার ব্যাখ্যা আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করিতে পারে নাই, এবং অনাবশ্যকভাবে তিনি সমাধানগুলিকে জটিল করিয়া তুলিয়াছিলেন।

কোপার্নিকাসের স্বকীয়তা

কোপার্নিকাসের স্বকীয়তা সম্বন্ধে অনেকে প্রশ্ন তুলিয়া থাকেন। টলেমীর এলমেজেষ্টের নিকট তাঁহার ঋণ অপূরণীয়। এলমেজেষ্টের তথ্য ও তালিকাই ছিল তাঁহার জ্যোতিষীয় মতবাদের মূল ভিত্তি। তারপর অনেকটা এই বিখ্যাত গ্রন্থের অনুকরণেই তিনি *De revolutionibus*-এর কাঠামো রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার বহুপূর্বে গ্রীক জ্যোতির্বিদেরা—পিথাগোরীয় ফিলোলাউস, আরিষ্টার্কাস অব সামোস—এইরূপ পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সাধারণভাবে ভূকেন্দ্রীয় ব্রহ্মাণ্ড পরিকল্পনা স্বীকৃতি লাভ করিলেও সূর্যকেন্দ্রীয় পরিকল্পনার সম্ভাব্যতা কোন সময়েই জ্যোতির্বিদ্‌দের মন হইতে একেবারে মুছিয়া যায় নাই। মধ্যযুগের প্রথমভাগে মার্টিয়ানাস্ ক্যাপেলা তাঁহার দার্শনিক আলোচনায় ইহার অস্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। কোপার্নিকাসের কিছু পূর্বে নিকোলাস্ অব কুসাও পৃথিবীর গতির কথা উল্লেখ করেন। মুসলমান জ্যোতির্বিদ্‌দের মধ্যেও অনেকে পৃথিবীর গতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রী.) পৃথিবীর আহ্নিক গতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু মত ব্যক্ত করা এক জিনিষ, এবং সেই মতের বিচারে দৃশ্যমান নানা ঘটনার সুষ্ঠু ব্যাখ্যা ও সমাধানের দ্বারা তাহার শ্রেষ্ঠত্ব ও অভ্রান্ততা প্রমাণ করা আর এক জিনিষ। সূর্যকেন্দ্রীয় পরিকল্পনার প্রথম উল্লেখ যতই সুপ্রাচীন হউক এই পরিকল্পনা অনুযায়ী নানা জ্যোতিষীয় ঘটনা, গ্রহের গতি, ক্রান্তিবিন্দুর অয়ন-চলন, ঋতু পরিবর্তন প্রভৃতি নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করিতে কোপার্নিকাসের পূর্বে আর কোন ইউরোপীয় জ্যোতির্বিদ সমর্থ হন নাই। এইখানেই কোপার্নিকাসের কৃতিত্ব ও স্বকীয়তা।

তারপর যে সময়ে কোপার্নিকাস জন্মিয়াছিলেন সে সময়ে সূর্যকেন্দ্রীয় পরিকল্পনার অনুকূলে মত ব্যক্ত করিবার মধ্যেও

যথেষ্ট স্বকীয়তা ও নির্ভীকতা ছিল। দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া যে পরিকল্পনা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের সমর্থন লাভ করিয়া আসিয়াছে, যাহা প্রত্যেক নরনারীর ধ্যান, ধারণা ও বিশ্বাসের সহিত ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া গিয়াছিল তাহাতে শুধু সন্দেহ প্রকাশ নহে, তাহার ঠিক বিপরীত একটি মতবাদকে প্রকৃত সত্য বলিয়া উপলব্ধি করা, গাণিতিক পদ্ধতি ও যুক্তির দ্বারা তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা এবং ধর্ম সংস্থার সম্ভাব্য বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া উপেক্ষা করিয়া শেষ পর্যন্ত দৃঢ়তার সহিত এই মত ব্যক্ত করা একমাত্র অনন্যসাধারণ মনীষা ও প্রতিভার ক্ষেত্রেই সম্ভবপর।

শুধু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হিসাবেই সূর্যকেন্দ্রীয় মতবাদ যুগান্তকারী নহে। মানুষের সমগ্র চিন্তাধারায় ইহা এক মহা বিপ্লব সূচনা করিল। এতকাল মানুষ জানিয়া আসিয়াছিল, তাহার প্রিয় ও সাধের আবাসভূমি এই পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থল। একমাত্র তাহার জন্যই একদা সৃষ্ট হইয়াছিল এই পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্রগণ; তাহার সুবিধার জন্যই গ্রহদের আবর্তন ও কক্ষা-পরিক্রমণ; তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ ও ভবিষ্যতের সহিত এই সব জ্যোতিষ্কলোকের নিবিড় সম্বন্ধ। ঐ নিশ্চল নক্ষত্রলোকে চিরশান্তির স্বর্গ বিরাজ করিতেছে, এক দিন সেইখানে তাহার স্থান হইবে। কোপার্নিকাসের জ্যোতিষ এইরূপ বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করিল। পৃথিবী আর ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে নহে; অন্যান্য ছন্নছাড়া গ্রহদের মত সেও তাহার সমস্ত সৃষ্টি লইয়া মহাশূন্যে অনবরত ঘুরপাক খাইয়া হয়রাণ হইতেছে। নক্ষত্রলোকও আগের মত আর নিকটে নাই; মহাশূন্যে অবিশ্বাস্য ও কল্পনাতীত দূরত্বে নাকি তাহার অবস্থান। কোপার্নিকাসের কিছু পরে ব্রুণো জানাইলেন মহাশূন্য অনন্ত এবং ইহাতে একাধিক ব্রহ্মাণ্ডলোক বিরাজ করিতেছে। এইরূপ পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ সহসা নিজেকে অতি ক্ষুদ্র ও অসহায় মনে করিল। এক অতি ক্ষুদ্র ভ্রাম্যমাণ গ্রহের নগণ্য অধিবাসী হিসাবে তাহার সৃষ্টিকে বিধাতার এক বিরাট প্রহসন বলিয়া মনে হইল। এইরূপ অবস্থায় ধর্ম-সংস্থা যে প্রমাদ গণিবে এবং ইহার প্রচার বন্ধ করিতে সর্বশক্তি নিয়োগ করিবে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই।

অবশ্য *De revolutionibus* প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ইহার বৈপ্লবিক সম্ভাবনার কথা লোকে বুঝিতে পারে নাই। গ্রন্থের জটিল গাণিতিক আলোচনার চাপে কেন্দ্রীয় মতবাদ অনেকটা চাপা পড়িয়াছিল। অল্পসংখ্যক বিজ্ঞানী ও জ্যোতিবিদ্ কেবল কোপার্নিকাসের মতবাদের অভিনবত্ব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। প্রথম দিকে রাইনহোল্ড্, জন ফিল্ড্, রবার্ট রেকর্ড, টমাস্ ডিগ্‌স্ কোপার্নিকাসের মতবাদ প্রচারে সাহায্য করেন। সূর্যকেন্দ্রীয় মতবাদের দার্শনিক গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন জিওর্দানো ব্রুণো। টাইকো ব্রাহে নিজে কোপার্নিকাসের ঘোর বিরোধী হইলেও নোভা বা নূতন নক্ষত্রের আবিষ্কার করিয়া সনাতন জ্যোতিষের দুর্বলতাই প্রমাণ করেন। গ্যালিলিওর দূরবীক্ষণ যন্ত্র ও নানা জ্যোতির্ময় আবিষ্কার কোপার্নিকাসের অনুকূলেই রায় দিল। কেপ্‌লার সূর্যকেন্দ্রীয় পরিকল্পনাকে স্বীকার করিয়া অগ্রসর হইবার ফলেই গ্রহদের গতি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ নিয়মগুলি আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এইখানে এ কথাও মনে রাখা দরকার যে, অনেক বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ বহুকাল পর্যন্ত কোপার্নিকাসের মতবাদে আস্থা স্থাপন করেন নাই। ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে নিউটন যে বৎসর কেম্ব্রিজে অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন সেই বৎসর কোপার্নিকাসের জ্যোতিষের বিরুদ্ধে এক সন্দর্ভ রচনার জন্য উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কসিমো দি মেডিচিকে বিশেষভাবে সম্মানিত করে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্যারী মানমন্দিরের অধ্যক্ষ ও বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ক্যাসিনি (১৬২৫-১৭১২) কোপার্নিকাসের জ্যোতিষের ঘোর বিরোধী ছিলেন। সেই সময়ে প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ে সূর্যকেন্দ্রীয় জ্যোতিষ গণনার দিক হইতে সুবিধাজনক কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একটি মিথ্যা মতবাদ হিসাবে শিক্ষা দেওয়া হইত। আমেরিকার ইয়েল ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় বহুদিন পর্যন্ত একই সঙ্গে টলেমী ও কোপার্নিকাসের জ্যোতির্ময় মতবাদ সমান গুরুত্বের সহিত শিক্ষা দিয়া আসিয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ১৮২২ সনে রোমান চার্চ প্রথম সরকারী ভাবে ঘোষণা করে যে, এইবার হইতে কোপার্নিকাসের জ্যোতির্ময় মতবাদ ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃত ব্যাখ্যা হিসাবে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষা দেওয়া যাইবে।

পিঙ্গল পথ

শ্রীসুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

একটা বেণীইন মেয়ের বিবর্ণ বেণীর মত এলিয়ে পড়ে আছে পথটা। পাথুরে মাটির কাঁচা রাস্তা। লাল কাঁকরের চটানের বুক চিরে গিয়ে মিশেছে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সদর সড়কে।

বহু পুরনো পথটা। দু'পাশের বাড়ীগুলো আরও প্রাচীন। অর্দ্ধেকের ওপর পড়ে গেছে, ভিটের ওপর গজিয়ে উঠেছে এক জায়গায় একটা বিরাট বটগাছ। পড়ি-পড়ি করছে পাশের বাড়ীটা, বন-আঁকোড়ের সহস্র শেকড় তার অস্থি-পঞ্জর গ্রাস করে ইট-কাঠগুলো জড়িয়ে ধরে আছে।

বাড়ীটার পূর্ব্বদিকের ঘরখানা সেই জোরেই বোধ হয় পড়ে নি এখনও। মাঝের পানদুই কড়ি টালি-বরগা সমেত ঝুলে এসেছে, মাথা খাড়া করে হাঁটা চলে না, তবু থাকা চলে ভেতরে। শতাব্দী পূর্ব্বের ইমারতের ভগ্নাংশ। সমস্ত কুঠরিটার মধ্যে জানালার ব্যবস্থা নেই, কিন্তু দেয়ালের লম্বা-চওড়া ফাটল দিয়ে পশ্চিমে সূর্য্যের আলো আসে। খোয়া-উঠা, সেঁতানো মেঝের হাড়ে গরম রোদের তাপ লাগে তখন একটু।

এই ঘরটির সংলগ্ন জগমোহন। তিন ভাগের মত ছাদটা ধসে গেছে, ইটের স্তূপের উপর নীল আকাশ দেখা যায়। বাকী অংশটুকু শেকড়ে জড়িয়ে আটক হয়ে আছে।

উঠানের এক পাশটায় ভেরেণ্ডাগাছের সারি, খেজুরপাতা বেঁধে বেড়া দেওয়া। রাস্তাটার কোল ঘেঁসে এক স্তবক চাপগাদা আর পাথুরে ফুল—হলদে, জরদা, লাল। পাঁকাটি-কাঠির মত তালগাছ একটা নিঃসঙ্গ একাকিত্বে আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে পথের পাশে।

বেড়ার কতকটা ফাঁকা—এইটেই বাড়ীর দরজা। কুলকাঁটার উপর খেজুরপাতা ঢাকা আগড় একটি। রাস্তার ওপাশে মন্দির। থাম-চত্বরের শিল্পরীতি দেখলে অনুমান করা যায়, মন্দিরের গঠন ছিল নবরত্ন শ্রেণীর; চূড়াগুলো ভেঙে পড়ে আশেপাশে জমে রয়েছে। বিছুটি আর কালকাসুন্দির জঙ্গল গজিয়েছে তার উপর। মন্দিরের ছাদের পরিবর্ত্তে এখন একটা তালপাতার টাট টাঙানো। সেটাও পচে শুকিয়ে উঠেছে। রোদ-বৃষ্টির উপর সামান্য একটু প্রতিবাদ তুলে আছে মাত্র।

শ্যামসুন্দরের মন্দির।

জগমোহনের উপর জীর্ণ চাটাইয়ে বসে ভাগবতভূষণ তাকালেন পথটার দিকে। মন্দিরের ছায়াটা যেন পূবদিকে হেলে পড়েছে মনে হ'ল। ধড়মড় করে উঠে পড়ে ডাকলেন, সুষমা!

মেয়ে ঘরের ভেতর রামায়ণ পড়ছিল। আস্তে আস্তে বাইরে এসে বলল, এখনও যে বেলা পড়ে নি, বাবা। এত রোদে যেতে পারবে না।

কিন্তু রাস্তা যে অনেকটা মা।

তাই ত বলছি বাবা। বুড়োমানুষ, এই ভত্তি বোশেখের দুপুরে এতখানি পথ হেঁটে গেলে—

ভাগবতভূষণের মুখে স্নিগ্ধ হাসি ফুটে উঠল; রাস্তায় পড়ে যাব, না রে? আরে পাগলী, এত দিন যাচ্ছি, পড়লাম না, আর আজকের রোদেই পড়ে যাব? দে দে, ছাতাটা আর পুঁথিটা এনে দে।

তবু সুষমা প্রতিবাদ করে; দিনের পর দিন ঐ ভাঙা শরীরের উপর এ অত্যাচার—না না, বাবা, আজকের দিনটা একটু পরে যেয়ো। তুমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছ না, একবার না হয় পথটায় দাঁড়িয়ে দেখ, যেন আগুন ঝরছে।

আচ্ছা, তাই হবে মা। তুই যখন যেতেই দিবি না—বৃদ্ধ ভাগবতভূষণ ছেঁড়া চাটাইখানায় আবার বসে পড়লেন।

মাইল দেড়েক দূরে গোপীনাথপুর। সেই ঠাকুরতলায় শনি-মঙ্গলবারে গিয়ে পুথি পড়েন, সামান্য চাল-ডাল, আলু-বেগুন, দু'চার আনা পয়সা সংগ্রহ হয়। শ্যামসুন্দরের সেবা, এবং বাপ ও মেয়ের সেদ্ধ ভাত তাইতেই কয়েক দিন চলে যায়। আবার কোন দিন যেতে না পারলে অনশন-অর্দ্ধাশনের সে বড় করুণ ইতিহাস। সামনের ঐ বিশীর্ণ, বিবর্ণ পথটা ছাড়া সে কাহিনীর সঙ্গে আর কারও পরিচয় নেই।

গ্রামটাকে সীমাবদ্ধ করে রাস্তাটা গিয়ে মিশেছে দ্বারকেশ্বর নদীতে। প্রায় দু'শ বছর আগে এই রাস্তা ধরে পাশাপাশি পাঁচ জন অশ্বারোহী বর্গীদস্যু ছুটে চলতে পারত, দলে দলে তারা এই পথেই অমিত বিক্রমে অভিযান চালিয়েছিল মল্লভূমের রাজধানী বিষ্ণুপুর থেকে বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত।

বড় সড়কের উপর শ্যামসুন্দরের ভাঙা মন্দির তখন নূতন যৌবনে ভাস্বর, দূরদূরান্তের আগন্তুক এর নবরত্নের কিরীট মুগ্ধ নয়নে দেখত। প্রশস্ত পথটার উপর দাঁড়িয়ে থাকত পথিক ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

গ্রামের এই দিকটাই এখন পোড়ো হয়ে গেছে, প্রায় সবাই এগিয়ে উঠে গেছে পূবদিকটায়। সেই নূতন লোকালয়ের পাশ দিয়ে নূতন চওড়া রাস্তা বের হয়ে গেছে দ্বারকেশ্বরের ঘাট পর্য্যন্ত। এদিকে লোক যাতায়াত নেই, পথটাও যেন বাসি ফুলের মত শুকিয়ে উঠেছে, সরলরেখার মত সরু হয়ে পড়েছে। স্মৃতির অবগুণ্ঠন সরালে ভাগবতভূষণ যেন এখনও অনেককিছু দেখতে পান। দিনশেষের একটু আলো, অন্ধকারের কোলে দিনান্তের শেষ রশ্মিটুকু।

ছানিপড়া চোখ মেলে এই পথেরই শেষের দিক তাকিয়ে ছিলেন তিনি। শ্যামসুন্দরের মন্দির পেছনে রেখে কত কাল, কত যুগ ধরে পদচিহ্ন রেখে চলে গেছেন তিনি এই শুকনো মাটির দেহটার উপর পায়ের ছাপ এঁকে। অপরাহ্নে যাওয়া, সন্ধ্যার পর আসা।

ভক্তিরত্নাকর আর চৈতন্যচরিতামৃত শিয়রের দিকে ছোট একটি কাঠের পিঁড়িতে সযত্ন-রক্ষিত, সমস্ত স্থানটি চন্দন-সুরভিত। পথের দু'পাশের ইট-সুরকি আকীর্ণ জঙ্গলের মধ্যে কেবলমাত্র এই স্থানটুকুই যেন শান্তিনিকেতন। খেজুর-চাটাইয়ে দেহটা এলিয়ে দিয়ে ভাগবতভূষণ স্থবির হাতটা পিঁড়ির দিকে একটু এগিয়ে দেন, কিন্তু পড়তে মন সরে না। অন্নের চিন্তা, যজন, যাজন, অধ্যয়নের আকর্ষণকে ডুবিয়ে ফেলে। অর্থহীন মনে হয় অঙ্গরাগ, নামাবলী, জীবনের সাধনা।

মঙ্গলবারের পূর্ণিমা, গোপীনাথপুরের ঠাকুরতলায় পুথি পড়ার যোগ এই দিন একটি। প্রায় সপ্তাহখানেক উদরের শূন্যতাকে ভরিয়ে রেখে আসছেন শুধু শ্রান্তিহীন আশা দিয়ে—বৈশাখী পূর্ণিমায় কয়েক সপ্তাহের সংস্থানই হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার, দিনকাল পালটে যাচ্ছে, তাঁর অনেকদিনের বাঁধা আসনে হয়ত আর কেউ এসে বসে পড়বে। গত শনিবার এমনি একটি কানাঘুষা কথা পথে আসতে আসতে শুনেছিলেন যেন ভাগবতভূষণ। ভাসা ভাসা চোখে দেখেছিলেন তাদের এই পথের সীমানায়—গোপীনাথপুরেরই লোক বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু কানে যেকথা ভেসে আসছিল, অন্তরের তিরিশ বছরের বিশ্বাস তা গ্রহণ করতে পারে নি। ওখানকার এক তরুণ যুবক ন্যায়রত্ন-তর্কতীর্থ উপাধি নিয়ে কাশী থেকে সদ্য ফিরেছে, এককালে ভাগবতভূষণের কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল সে। তাকে দিয়েই বুঝি ওখানে এবার পুথি পড়াবার কথা উঠেছে। কিন্তু আকৈশোর নিষ্ঠা কি জ্ঞানবৃদ্ধ ভাগবতভূষণের শিষ্য ভুলে যাবে? অনুদার পৃথিবীতে বিবর্ণ পথটাও শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত মানুষের পদধূলি গ্রহণ করে, ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ হয়ে উঠবে এত শীঘ্র অকৃতজ্ঞ?

ধীরে ধীরে ভাগবতভূষণ মাথা নাড়েন, মুখে ফুটে ওঠে স্নিগ্ধ হাসি একটু। অঙ্গরাগের চন্দনগন্ধ সূর্য্যের উত্তাপটাকে চাঁদের ধারার মত পবিত্র করে তোলে। কৃষ্ণপ্রেমের মধুর প্রলেপ লাগে সমস্ত দীনতার উপর। মনের মধ্যে ভাগবত-কথা অনুরণিত হয়:

> ফুল ফল ভরি ডাল পড়ে প্রভু পায়।
> বন্ধু দেখি বন্ধু যেন ভেট লইয়া যায়।
> প্রতিবৃক্ষ লতা প্রভু করে আলিঙ্গন।
> পুষ্পাদি ধ্যান করেন কৃষ্ণে সমর্পণ।

পথটা কিন্তু একলা পড়ে পড়ে ঝিমুচ্ছে। টকটকে চাপগাঁদা পথের পাশে নেতিয়ে পড়েছে, পাতলা পাথুরে ফুলের বেগুনে পাপড়ি ঝরে পড়ার মত অবস্থা।

রাস্তার ওপাশে কালো পাথরে কোঁদা মোহন-শ্যামের মাথার উপর তালপাতার শুকনো চাটখানার সির সির করে রোদের আগুন জ্বলছে, পথের উপরের লকলকে শিখা গিয়ে মিশছে ওখানে। লাল-কাঁকুরে পাথরের চটানের নীচে যেন গলানো লোহা ফুটছে টগবগ করে। তারও পিছনে বিছুটি-কালকাসুন্দির ঝোপের শেষ প্রান্তে ভাগবতভূষণের সহোদর রমণীমোহনের নূতন সাদা-বাড়ীর চিলেকোঠা ধূম্রনীল আকাশের দিকে উঠে গেছে।

ভাগবতভূষণের চোখ দুটো রোদের ঝাঁজে করকর করে উঠল। চোখ ফিরিয়ে নিলেন তিনি পথের উপরে, পথ যেন ডাকছে তাঁকে; সময় এবার হয়েছে, যেতে হবে, স্পষ্ট ডাক শুনতে পেলেন তিনি। পথের উপর নিরবলম্ব তালগাছটির ছায়াটা এতক্ষণ কায়ার সঙ্গে মিশে এক হয়ে ছিল, সূর্য্যদেব দাঁড়িয়ে ছিলেন ঠিক মাথার উপরে; এবার যেন পূবদিকে ছায়াটা একটু হেলে এসেছে মনে হ'ল। মানুষও দু'এক জন পথে বের হয়েছে।

চাষা এক জন হাট করে ফিরছে, চলেছে লাফিয়ে লাফিয়ে, আগুনের ঝলক বাঁচিয়ে।

ভাগবতভূষণ চকিত হয়ে ডাক দিলেন, সুষমা!

এই ত আমি গেলাম, বাবা।

—না রে, বেলাটা পড়ে গেল। দে মা, লণ্ঠনটা, পুথিটা—

রামায়ণের সীতার বনবাসের ছবিটা খোলা অবস্থায় সামনে পড়ে আছে, সুষমার চোখ নিবদ্ধ হয়ে ছিল সুমুখের সীমাহীন শূন্যতার মধ্যে। একটু কষ্টে হাতের উপর ভর দিয়ে উঠে এল আবার, বাবার কাছে দাঁড়াল স্থাণুর মত। অভাব এবং অসুখে মুখের উপর তপঃক্লিষ্ট উমার শীর্ণতা।

ক্ষীণদৃষ্টি বৃদ্ধ তাকালেন সুষমার দিকে, বললেন, আজ আবার পূর্ণিমা; বেলাবেলি না গেলে যদি ছেলে-ছোকরা কেউ সেখানে বসে পড়ে তো মুশকিল, বুঝলি?

গোপীনাথপুরের ঠাকুরতলায় আজ তিরিশ বছর পরে ছোকরা এক জন বসে পড়বে? কি বলছ বাবা?

শিশুর অসহায়তা ফুটে উঠল ভাগবতভূষণের মুখে: সেদিন শুনছিলুম এমনি একটা কথা। আমার আবার এই—দেখতেও একটু কষ্ট হয় কিনা, তাই বোধ হয়—

সুষমা সহসা উত্তর দিতে পারে না, স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অলস শরীরটা ক্রমশঃ ঋজু হয়ে ওঠে, মলিন মুখের উপর তীক্ষ্ণ কাঠিন্য দেখা দেয়। ভক্তিরত্নাকর, চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ বহুবার শুনেছে সে তার বাবার কাছে—প্রাচীন ভারতের তমসার তীরে ঋষিদের বেদগানের কথা মনে হয়েছে তখন তার। এখনকার নব্যযুবক কোথায় পাবে সে ভাব-গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠ? চলে যেতে যেতে সুষমা বলে, ভগবানের নামে এই ছেলেখেলা ভগবান সহ্য করবেন না, তুমি দেখো।

একটু পরে পিতাকে সাজিয়ে নামাবলীটি তুলে দিলে সুষমা, আর হাতে দিলে লণ্ঠন ও পুথি। পথের উপর থমকে থমকে কালবৈশাখীর উড়ো ঝড় ধূলির ঘূর্ণাবর্ত্তে বয়ে চলেছে। তালপাতার

আগড়টা খুলে দাঁড়াল মেয়ে। ভাগবতভূষণ সস্নেহে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, ভটচায খুড়ো ঠিকই বলেছিল সেদিন, এত কাহিল হয়ে গেছিস কেন রে? কিন্তু পরমুহূর্তেই গভীর বিস্ময়ে বলে উঠলেন, তোর যে জ্বর মা!

নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে সুষমা বলল, না বাবা, ও কিছু নয়। গরমে অমন মনে হচ্ছে।

তাই হয়ত হবে, বলে পথের ওপারে দাঁড়িয়ে ভাগবতভূষণ পুরাতন নামাবলী-বাঁধা পুঁথিটি ও ছাতাটি শ্যামসুন্দরের মন্দিরের সামনে নামালেন, প্রণিপাত করলেন মাথা নত করে। তার পর যেন কোন সম্মোহনে পা বাড়িয়ে চললেন সেই পথে। দু'পাশে সুবিস্তীর্ণ কঠিন প্রান্তর, মাঝে মাঝে আধ-শুকনো দূর্বাঘাস আর চোরকাঁটা। শান্ত, নিঝুম হয়ে আছে যেন গৈরিক প্রকৃতি। এমন পরিবেশে একটা নীরব কথা ভেসে ওঠে, ভাগবতভূষণ প্রতিটি পদ পথের উপর ফেলবার সময় তার পরিচয় পান, পথ তাঁকে ডাকে, অবিরাম আহ্বান করে। তালিমারা ছাতা-মাথায় লণ্ঠন-হাতে শনি-মঙ্গলবারে এমনি সময়ে পথের চড়াইটাতে দেখা যায় এক প্রাচীন ব্রাহ্মণ চলেছেন, আগুনের হলকাগুলো শুষতে শুষতে চলেছেন ঋষিকল্প এক পাঠক।...

তালপাতার বেড়ার উপর হাত রেখে চড়াইটার শেষপ্রান্ত পর্যন্ত দৃষ্টি প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে আছে সুষমা। খোলা চুলগুলো ধুলোর সঙ্গে উড়ছে, সাঁ সাঁ করে বাতাসের একটা শুষ্ক শব্দ সমস্ত পথটায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। শান্ত, কঠিন, নীরব সে। তারকেশ্বরের গা ঘেঁসে ভাগবতভূষণের ছায়াটা ধীরে ধীরে উৎরাইটার নীচে মিলিয়ে গেল। আগড়টা টেনে বন্ধ করে সে ফিরে এল তার ঘরে। সমস্ত শরীরটা ঘামে ভিজে গেছে, হাঁপাচ্ছে সে।

এমনিভাবে কেটে গেছে কতক্ষণ, হুঁসও নেই। বোধ হয় দু-এক ঘণ্টাই হবে। দিনান্তের সূর্যটা লালচে হয়ে তার দেয়ালের ফাটলের সামনে এসে পড়েছে—তখন খেয়াল হ'ল উঠতে হবে। এ বেলার সব কাজই বাকী।

উঠতে হবে, কিন্তু আজ শক্তি নেই যেন পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার। বেশ শীত শীত করছে, শরীরটা থেকে থেকে শিউরে উঠছে। এমনি হয় গত চার-পাঁচ মাস, শীতটা চেপে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই পৌষ মাস হতে। একটা তীব্র বিষের ক্রিয়ার মত দেহটা দুর্বল মনে হয়, চোখমুখ থেকে জ্বালাটা ছড়িয়ে পড়ে শিরায় শিরায়। জ্বরটা স্তিমিত হয়ে পড়ে সন্ধ্যার পর। কপালে ফুটে ওঠে তখন বিন্দু বিন্দু ঘাম।

সুষমা বুঝতে পারে সবই, দুরন্ত ব্যাধি চোখের পাণ্ডুরতায় স্বাক্ষর রেখে গেছে। জানে সে এর অনিবার্য পরিণতি, সুস্নিগ্ধ শুভ্র এক পরিপূর্ণ বিস্মৃতি। চিকিৎসার ব্যবস্থা অন্নহীন সংসারে—কথাটা প্রথম মনে উঠতে তার হাসি পেয়ে গিয়েছিল। তার পর যখন রোগের সমগ্র রূপটাই সে স্পষ্ট করে দেখতে পেয়েছে, তখন থেকেই একটা নিস্পৃহ ঔদাসীন্যে জীবনের বাকি পথটুকু চলে যাচ্ছে পা দুটো টেনে টেনে।

পশ্চিম রাঢ়ের ধূসর গোধূলি। আসন্ন সন্ধ্যা উদাস হয়ে উঠেছে, নোনা-ধরা পোড়ো বাড়ীটা অন্ধকার আর জঙ্গলের মধ্যে যেন ঝিমিয়ে পড়েছে এরই মধ্যে। একটি মহিলা আগড় ঠেলে একেবারে ভেতরে এসে ডাকলেন, সুষমা!

—কাকীমা? এস।

দুর্দান্ত রমণীমোহনের স্ত্রী, অন্ধকার ছাড়া এ-ধারে তাঁর আসবার উপায় নেই। অর্থের জোরে নরকে হয় করা যায়—একটির পর একটি জালিয়াতিতে ভাগবতভূষণের সবকিছু গ্রাস করেছেন রমণীমোহন। নীরব অশ্রুর নির্ঝরিণী দিয়ে স্ত্রী জয়াবতী অন্তর্যামীর কাছে ক্ষমা-প্রার্থনা করেন, আর কিছু পারেন না করতে। হাতে সামান্য সেরখানেক চালের একটা পুঁটলি, সেটা নিয়েই অতি বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে তিনি।

ম্লান হাসল সুষমা। বসো, কাকীমা। হাতে কি তোমার? ও বুঝেছি—

জয়াবতী—এনেছিলাম তোর জন্যে। কিন্তু থাক, আমি মলে পিণ্ডি দিবি।

সুষমা—কি যে বল তুমি!

জয়াবতী সুষমার পাশটাতেই বসে পড়লেন। গায়ে হাত দিলেন, যেমন দিয়ে থাকেন এখানে এলেই, একটু চমকালেন না, শান্ত, নিষ্প্রাণ গলায় বললেন, আমি কবে মরতে পারব, জানিস মা? তোর জ্বরটা যে যাচ্ছে না, দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম। আমার হাতে কিছু দেয় না, সে-ত জানিস, দু'একটা গয়না খুলে দেব, তাও নিবি না, আমি জানি। তাই জিজ্ঞাসা করছি, আমি কবে মরব বল দিকি?

সুষমা তাড়াতাড়ি মুখখানি মুছে ফেলে হাসবার চেষ্টা করে বলে, আমি ভাল আছি, কাকীমা। যা রোদ, তাই এমন মনে হচ্ছে।

জয়াবতীর মুখের কাঠিন্য কিন্তু স্পষ্টতর হ'ল। জানিস, তোর কাকা তোদের এই ঘরবাড়ী, ভিটেমাটি, কবেকার একটা এক শ' টাকার দলিলে গোপনে ডিক্রী করে নীলাম করিয়ে নিয়েছে। আজ বিকেলবেলা নীলাম জারি হয়ে গেছে। নীলামী ক্রোকের ঢ্যাঁটরা সারা গাঁ-টা ঘুরছে। ঘৃণাক্ষরে বিন্দুবিসর্গ জানতে দেয় নি আমায়, পথে বেরিয়ে এখন শুনলাম। আর জানতে পারলেই বা কি করতে পারতাম! মাসে একটি বারের বেশী বের পর্যন্ত হতে পারি না ভয়ে।

কলের মত কথা বলে যাচ্ছেন জয়াবতী, প্রাণহীন পুতুলের মত শুনছে সুষমা। সেই তার আপন কাকা, তাঁর এই স্ত্রী, সুষমার কাকীমা। নিষ্কলঙ্ক মুখ বেদনায় তামাটে হয়ে উঠেছে, যেন নিজেরই অপরাধের গুরু ভার মাথা নত করে দিয়েছে তাঁর। কিন্তু

ক্ষণ মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, কি হবে মা? কোথায় থাকবেন বটঠাকুর?

সুষমার মুখের সেই প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যের কিন্তু একটুও পরিবর্ত্তন হ'ল না, বলল, শ্যামসুন্দর চালিয়ে দেবেন, তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, কাকীমা।

হঠাৎ ঈশান কোণে সেই প্রাচীন বটগাছটার নীচে একটা কোলাহল শোনা গেল, তার পর কয়েকটা ঢাকের কর্কশ শব্দ সন্ধ্যার ঘনায়মান স্তব্ধতা খান খান করে ছড়িয়ে পড়ল। ভাগবতভূষণের বসতবাড়ী ক্রোকের ঘোষণা হ'ল, ভাঙা ইটের স্তূপ আর কালকাসুন্দির জঙ্গলের মধ্যে নিশান উঠল নক্ষত্রদেশের সীমানা পর্য্যন্ত দখল জানিয়ে। ত্রস্ত হরিণীর মত জয়াবতীর বুকটা কেঁপে উঠল, দীর্ঘায়ত চোখের কালো মণি পাথরের মত নিস্পন্দ, নিথর। দেয়ালের ফাটল দিয়ে স্পষ্ট দেখতে পেলেন তিনি স্বামীকে - দাঁড়িয়ে থেকে তদারক কচ্ছেন সবকিছু। এ বাড়ীতে জয়াবতীকে দেখলে কি অঘটন ঘটবে, সুষমারও তা জানা আছে। লজ্জায়, শঙ্কায় কুঁকড়ে উঠলেন তিনি।

আকস্মিক উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়েছিল সুষমা। উঁকি মেরে দেখল এক লহমায় সবকিছু, সমারোহের অর্থ পরিষ্কার হয়ে গেল। কিন্তু পা একটু নড়ল না, ঠোঁট একটুও কাঁপল না—আকাশের গ্রহ-তারা, নেবুলারাজির মতই অচঞ্চল। নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, অন্ধকার হয়ে আসছে কাকীমা, পেছনের এই পথটা দিয়ে তোমায় একটু এগিয়ে দি চল। কেউ দেখতে পাবে না।

জয়াবতী বসে আছেন তেমনি অপলক দৃষ্টিতে বটগাছটার দিকে তাকিয়ে, শব্দস্পর্শের জগৎ থেকে অনেকখানি দূরে। সুষমা তাঁর হাত ধরে মৃদু টান দিলে এবার: এস।

জঙ্গল-ঘেরা ঘুপসি, আঁকাবাঁকা পথে কিছুক্ষণ চলবার পর জয়াবতী পাগলের মত বিড় বিড় করে বলে উঠলেন, এই পাপেই নিঃসন্তান আমি, আর ছেলেমেয়ে হলে একটাও বাঁচত না কিন্তু। তোকে কেন এত ভালবাসতে গেলাম মেয়ের মত। তাই বোধ হয় তোর শরীর এমনিধারা—যা তুই বাড়ী যা সুষমা, আর আমি কখনও আসব না।

ত্বরিত পদে চলে গেলেন জয়াবতী অদ্ভুত ভাবে।

মাসান্তে গা ঢাকা দিয়ে কোন রকমে হয়ত একটি বার এসে তিনি দেখে যেতেন সুষমাকে। আর তিনি আসবেন না। যদি স্বামীর অপরাধ কোন বিধিনিয়ন্ত্রিত পথে স্নেহের পাত্রী মেয়েটার উপর পড়ে, এই তাঁর ভয়। সুষমাকে না-দেখার চিন্তাতেই হয় ত তিনি পাগল হয়ে যাবেন। তবু কাকীমা আসবেন না। মাসের শেষের দিকে শনি-মঙ্গল বারের সন্ধ্যায় সুষমা খেজুরপাতার আগড় খুলে মাঝাতার আমলের পথের পাশে তৃষিত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকবে বিছুটি জঙ্গলের মধ্যে সঙ্কীর্ণ পায়ে-চলার রাস্তার দিকে। কিন্তু তারই কল্যাণের জন্যে জয়াবতী কাকীমা আর আসবেন না। তখন হয় ত তালগাছটার সোজাসুজি সাদা বাড়ীটার চিলেকোঠায় সায়ংকালের শুকতারার মত দেখা যাবে এক কল্যাণময়ী রমণীর অস্পষ্ট ছায়ামূর্ত্তি। কিন্তু তিনি বুকভরা স্নেহ নিয়ে ভাঙা বাড়ীর আগড় ঠেলে সুষমার কাছে আর আসবেন না।

সামান্য একটু তেলে সলতেটা ভিজিয়ে তুলসীতলায় নামিয়ে দিয়েছে প্রদীপটি সুষমা, তার পর বসে আছে। সর্ব্বহারার মালিন্য তার মুখে চোখে, সারা অঙ্গে। দাওয়ার উপর নোনাধরা একটা থামে মাথাটা হেলান দেওয়া, ইটের গুঁড়ো চুল বেয়ে গায়ের উপর ঝরে পড়ছে। তাকিয়ে আছে সামনের দিকে, পথটা যেখানে দিগন্ত-জোড়া চটানের অন্ধকারে মিশে গেছে। কিন্তু দেখা যায় পরিষ্কার, পূর্ণ চাঁদের আলোয় ঝকঝকে তলোয়ারের ফলার মত পথটা চলে গেছে উৎরাই বেয়ে তারকেশ্বরের দিকে।

কাকীমার দানের কথা মনে নেই। চাল বাড়ন্ত, বাবা মা ফিরলে একটি কণা নেই হাঁড়িতে দেবার। উঠবারও শক্তি নেই, মাথাটা ঝাঁ ঝাঁ করছে বাইরে ঝিঁঝিঁ পোকার অশ্রান্ত গুঞ্জনের সঙ্গে সুর মিলিয়ে। জ্বরটা ছেড়ে এসেছে বোধ হয়, কিন্তু ছেড়ে আসছে শরীরটাকে মৃতপ্রায়, অবসন্ন করে দিয়ে—রক্তকণিকাগুলো যেন ঘাম হয়ে ঝরে পড়ছে।

উপর থেকে এ পথে কে যেন ধীরে ধীরে নেমে আসছেন উৎরাই বেয়ে। চাঁদের আলোয় দেখা যায় লঘু পদে এগিয়ে আসছেন ভাগবতভূষণ। খুব ধীরে, অতি লঘু পদে। এমন ভাবে চোরের মত আসার অর্থ সুষমা জানে, দু'চার মাস পর পর কখনও কখনও এমনি সসঙ্কোচে, থেমে থেমে আসেন তিনি।

নিস্পৃহ দৃষ্টি মেলে সুষমা চুপচাপ বসে দেখছে শুধু। একটা বাঁকা সরীসৃপের মত পথটা চিক চিক করছে জ্যোৎস্নায়, সমস্ত মূক প্রকৃতির মধ্যে স্খলিত পদে ক্রমশঃ ভাগবতভূষণ কাছে আসছেন। অন্তরের ব্যর্থতা নিয়ে আসছেন এক পূজারী—রিক্ত, একাকী। সন্তর্পণে নিঃশব্দে শ্যামসুন্দরের মন্দিরের সামনে এসে তিনি লণ্ঠন, ছাতা ও পুঁথি নামালেন, তার পর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। পুনরায় নতজানু হয়ে যুক্ত কর মাথায় ঠেকালেন দেবতার উদ্দেশে।

আলোটা পর্য্যন্ত তিনি আজ জ্বালিয়ে আনেন নি। বিশ্বের হতাশা তাঁর চোখে মুখে।

মেয়ে একটু একটু করে এসে পিছনে দাঁড়াল, ডাকল, বাবা।

যেন ধরা পড়ে গেছেন, এমনি ভাবে চমকে উঠে ভাগবতভূষণ বললেন, কিছু যে হ'ল না মা।

—পুঁথি পড়াই হয় নি?

—সেখানে নূতন লোক বসেছে।

তেমনি নতজানু হয়ে বসে তিনি। ঝাপসা দৃষ্টি মেয়ের মুখের উপর পড়েছে, কিন্তু পরিষ্কার ঠাওর করে উঠতে পারছেন না কিছুই। বিহ্বল ভাবে কতক্ষণ কেটে গেল, তখন বললেন, তোর কাকা আমাদের ভিটেবাড়ীটা বুঝি নীলাম ক্রোক করে নিয়েছে আজ, রাস্তায় বিশ্বনাথ কামার বললে।

—ওসব মিথ্যে কথা, তুমি মুখ হাত ধোবে এস।

জীবনবীমা ব্যবসায়ের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ—কাহার স্বার্থে ?

শ্রীকরুণাকুমার নন্দী

২

পূর্ব প্রবন্ধে জীবনবীমা ব্যবসায়ের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ হইবার প্রাক্কালে বীমাকারীর স্বার্থসংরক্ষণ ব্যবস্থার কি আয়োজন প্রচলিত ছিল তাহার বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে। এই আলোচনার দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ করা গিয়াছে যে, প্রচলিত আইনের দ্বারা বীমা কোম্পানীর পরিচালকদের হাত এমন ভাবে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল যে, সেই আইনের নির্দ্দেশ সম্পূর্ণ মানিয়া চলিলে পরিচালকের দোষে বীমাকারীর স্বার্থে অপঘাত লাগিবার আশঙ্কা একরকম ছিল না বলিলেই হয়। যে সকল ক্ষেত্রে আইনের নির্দ্দেশ উপেক্ষা করিবার ফলে বীমাকারীর স্বার্থে আঘাত লাগিয়াছিল বলিয়া দাবি করা হইয়াছে, সরকারী কণ্ট্রোলার মহাশয়কেই সে জন্য সম্পূর্ণ দায়ী করা উচিত। আইনের নির্দ্দেশ উপেক্ষা বা অমান্য করিলে বীমা কোম্পানীগুলির পরিচালকগোষ্ঠীকে সমষ্টি ও ও ব্যক্তিগত দুই ভাবেই দায়ী করার আয়োজন আইনে লিপিবদ্ধ করা ছিল। এই আইন প্রয়োগ করিবার হর্তা-কর্তা ছিলেন কণ্ট্রোলার, ক্ষেত্রবিশেষে তাহা না করিবার জন্য তাঁহাকে দণ্ডিত করাই উচিত ছিল। কিন্তু তাহার বদলে দোষীকে পুরস্কৃত করিয়া রাষ্ট্রায়ত্তকরণের দ্বারা সমগ্র ভারতীয় জীবনবীমা ব্যবসায়টিকেই এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র বীমাকর্মী ও গৌণভাবে লক্ষ লক্ষ বীমাকারী-দিগকেও দণ্ডিত করা হইল!

অতএব বীমাকারীর স্বার্থরক্ষার তাগিদে জীবনবীমা ব্যবসায়ের সামগ্রিক রাষ্ট্রায়ত্তকরণ একটা অজুহাত মাত্র, আসল উদ্দেশ্য অন্য এবং তাহা খুব প্রচ্ছন্নও নহে। বস্তুতঃ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণের দ্বারা বীমাকারীর স্বার্থ অধিকতর সুরক্ষিত হইল বা উহা বিপদগ্রস্তই হইয়া পড়িল সে কথাটাও বিচার করিয়া দেখিবার মত। অল্পদিন পূর্বে ষ্টেটসম্যান পত্রিকার "চিঠিপত্র" বিভাগে একটি পত্র প্রকাশিত হইতে দেখিয়াছিলাম। এই পত্রপ্রেরক জানাইতেছেন যে, সাধারণতঃ তিনি তাঁহার নিজের জীবনের উপরে গৃহীত বীমাপত্র বাবদ চাঁদার টাকা নির্দিষ্ট সর্বশেষ দিনে দিতে অভ্যস্ত ছিলেন। রাষ্ট্রায়ত্তকরণের পর ঐ ভাবেই সর্বশেষ দিনে তিনি পিয়ন মারফত চাঁদার টাকা পাঠাইয়া দেন, কিন্তু এঁদের সময়ের অভাবের অজুহাতে ঐদিন চাঁদার টাকা—বড় বেশী কাজ এবং এখন শেষ মুহূর্ত্তে টাকা লইয়া রসিদ দিবার সময় নাই এই অজুহাতে—লইতে অস্বীকার করিয়া ফেরত পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সর্বশেষ নির্দিষ্ট দিনে চাঁদা দিবার মৌলিক অধিকার বীমাকারীকে বীমাপত্রের সর্ত অনুযায়ী দেওয়া হইয়াছে, কোনও অজুহাতেই কেহ তাহার এই মৌলিক অধিকার কাড়িয়া লইতে পারে না। লক্ষ লক্ষ বীমাকারী এই ভাবেই সর্বদা তাহাদের দেয় চাঁদার কিস্তী দিয়া থাকে। এভাবে শেষ দিনে ইচ্ছামত চাঁদার টাকা লইতে অস্বীকার করিলে কত বীমাপত্র যে ল্যাপ্স হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই ভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত বীমা সংস্থায় কত রকমে যে বীমাকারীর স্বার্থ বিপদগ্রস্ত হইবে তাহা অনুমানে বলা কঠিন। কিন্তু সরকারী অধিকাংশ ব্যাপারেই যেমন হইয়া থাকে, সাধারণের বৃহত্তর স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব সরকারী কর্মচারীদের ইচ্ছা বা অভিরুচির উপরে নির্ভর করিয়া থাকিলে, এক্ষেত্রেও যে অনুরূপ হইবে না তাহার নিশ্চয়তা কোথায়? যে কেহ কখনও কোন সরকারী দপ্তরের সহিত কারবার করিয়াছেন তাঁহারাই এই উক্তির তাৎপর্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিবেন।

বীমা কোম্পানীগুলির পরিচালনায় যখন জীবনবীমা ব্যবসায় চলিত তখন বীমাকারীর স্বার্থ সংরক্ষণের সবার চেয়ে নিশ্চিত ব্যবস্থা ছিল বিভিন্ন বীমা কোম্পানীর মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা। পূর্ব প্রবন্ধেই দেখান হইয়াছে কি করিয়া এই পারস্পরিক প্রতিযোগিতার ফলে সম্প্রতি বীমাপত্রের চাঁদার হার প্রভূত পরিমাণে কমিয়া গিয়াছিল। এই ক্ষেত্রে ভারত সরকারের রাষ্ট্রায়ত্ত বীমা সংস্থাই এখন একক ব্যবসায়ী বা monopolists হইয়া বসায় এই প্রতি-যোগিতার অবসর আর থাকিবে না। তাহার ফলে নানা ভাবে বীমাকারীর অর্থের অপচয় ঘটিয়া চাঁদার হার যে আবার বাড়িয়া যাইবে না একথা কে বলিতে পারে?

যাহা হোক, বীমাকারীর স্বার্থরক্ষার কথা যদি কেবল-মাত্র অজুহাত, তবে জীবনবীমা ব্যবসায়ের রাষ্ট্রায়ত্তকরণের আসল উদ্দেশ্য কি? পূর্বেই বলিয়াছি, আসল উদ্দেশ্য খুব প্রচ্ছন্ন ছিল না। বক্তৃতায়, বিবৃতিতে, নানা ভাবে সরকার পক্ষ হইতে এই উদ্দেশ্য বেশ স্পষ্ট করিয়াই ব্যক্ত করা হই-য়াছে। সরকারী দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে দেশের ধনসংস্থার (economy) রাষ্ট্রায়ত্ত বিভাগে

(public Sector) ন্যূনাধিক ৫,০০০ পাঁচ হাজার কোটি টাকা পুঁজি লগ্নীর প্রয়োজন হইবে হিসাব করা হইয়াছে। যতপ্রকার সম্ভাব্য উপায় হইতে যতটা সম্ভব অর্থ সংগ্রহের আয়োজন করিয়াও হিসাবে আরও অন্ততঃ ১২০০ কোটি টাকার পুঁজির ঘাটতি পূরণ করা দরকার হইবে। নূতন ট্যাক্সের আমদানী, সরকারী ব্যয়সঙ্কোচ ইত্যাদি ধরিয়া লইয়াও আরও প্রায় ৯০০ কোটি টাকার ঘাটতি থাকিয়া যায়। জীবনবীমা ব্যবসায় রাষ্ট্রায়ত্তকরণের দ্বারা উহার সঞ্চিত আমানতী প্রায় ৪০০ কোটি টাকার লগ্নী সরকারের আয়ত্তে আসিয়াছে। ইহা লগ্নী করা অর্থ এবং ইহার শতকরা প্রায় ৬৬ ভাগই সরকারী ঋণে লগ্নী করা ছিল। কিন্তু এই ৪০০ কোটি টাকা লগ্নীর ঋণমূল্য বা credit value সরকারী আয়ত্তের মধ্যে থাকিবে। ইহা ছাড়া জীবনবীমা ব্যবসায়ের বার্ষিক নীট লগ্নীযোগ্য আয় বা investable surplus (অর্থাৎ সকল প্রকার ব্যয় ও দায় মিটাইয়া যে অর্থ লগ্নীর জন্য অবশিষ্ট থাকে) বর্তমান হারে দাঁড়ায় প্রায় বাৎসরিক ৩৫।৪০ কোটি টাকায়। জীবনবীমা ব্যবসায় দ্রুত প্রগতিতে আগাইয়া চলিতেছিল। কিছুকাল পূর্বের অর্থমূল্যের উঠ্‌তি-পড়্‌তির কারণে এই প্রগতির গতি সাময়িক ভাবে দুই-এক বৎসরের জন্য ব্যাহত হইলেও সাধারণ অবস্থায় এ ব্যবসায়ে বার্ষিক শতকরা ২০।২৫ ভাগ স্ফীতি খুবই সম্ভাব্য বলিয়া মনে হয়। যদি মোটামুটি শতকরা বার্ষিক ২০ ভাগ স্ফীতির গতি অব্যাহত রাখিতে পারা যায় তবে এই ব্যবসায়ের দ্বারা ৫ বৎসরে মোট ২৬০ কোটি টাকা নীট লগ্নীর জন্য অবশিষ্ট থাকিবার কথা। অর্থাৎ এক জীবনবীমা ব্যবসায়ের সামগ্রিক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের দ্বারা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পুঁজির ঘাটতির অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ বা তাহারও বেশী পূরণ করিয়া লওয়া সম্ভব হইতে পারে। রাষ্ট্রায়ত্তকরণ ব্যাপারটাও এমন কঠিন কিছু নহে, রাষ্ট্রশক্তি আয়ত্তেই রহিয়াছে, তাহার জোরে কাড়িয়া লইলে কে বাধা দিতে পারে? অবশ্য এই কাড়িয়া লওয়াটাকে পৃষ্ঠপোষকের বিপুল সংখ্যাধিক্যের জোরে পার্লামেন্টে আইনের সঙ্গতি ও সম্মতি দিলেই চলিবে। হইয়াছেও তাহাই।

স্বাধীনতার পর হইতে কোন কোন ব্যবসা সরকারপক্ষ হইতে অনুরূপ ভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত ইহার পূর্বেও করা হইয়াছে। কিন্তু কেবল এক বিমান-পরিবহন ব্যবসায়টিকে বাদ দিলে অন্য কোনও ক্ষেত্রেই এমন সামগ্রিক রাষ্ট্রায়ত্তকরণ করা হয় নাই। বিমান-পরিবহন ব্যবসায়টির কথা একটু ভিন্ন। এই ব্যবসায়টি অনেকটা সরকারী অর্থসাহায্যের উপরে নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কেবলমাত্র আভ্যন্তরদেশীয় পরিবহন ক্ষেত্রেই ইহা রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইয়াছে। অর্থ বাণিজ্যের (credit industry) ক্ষেত্রে জীবনবীমা ব্যবসায়ের উপরে হাত দিবার পূর্বে কেবল এক ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কটিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইয়াছিল। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, কেবলমাত্র ঐ ব্যাঙ্কটিকেই এভাবে সরকারী হাতে তুলিয়া লওয়া হইয়াছে, দেশের সামগ্রিক ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়টিকে নহে। এ ক্ষেত্রে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কায়েমী আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা যাহা ছিল তাহার কোন অদলবদল করা হয় নাই, কেবল মালিকানা স্বত্ব প্রভৃত ক্ষতিপূরণ স্বীকার করিয়া পূর্ব অংশীদারদের হাত হইতে সরকারী হাতে তুলিয়া লওয়া হইয়াছে মাত্র।

জীবনবীমা ব্যবসায়ের বেলা রাষ্ট্রায়ত্তকরণ ব্যবস্থায় নতুন পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। এদেশে সর্বসাকুল্যে ১৫৭টি দেশী কোম্পানী কেবলমাত্র জীবনবীমা ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল এবং আরও ৪১টি দেশী কোম্পানী অন্যান্য ধরনের বীমা ব্যবসায়ের সঙ্গে জীবনবীমা ব্যবসায়ও করিত। উল্লেখযোগ্য যে, শেষোক্ত দলের মধ্যে ভারতীয় জীবনবীমা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বৃহত্তম কোম্পানীটিও ছিল। ইহা ছাড়া আরও ১৯টি বিদেশী কোম্পানী অন্যান্য ব্যবসায়ের সঙ্গে জীবনবীমা ব্যবসায়ও করিত। রাষ্ট্রায়ত্তকরণের দ্বারা এদেশে যত দেশী ও বিদেশী কোম্পানী জীবনবীমা ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল তাহাদের সামগ্রিক জীবনবীমা ব্যবসায়টি ও তৎসম্পর্কিত আয়, তহবিল ইত্যাদি সকলই রাষ্ট্রাধীন করিয়া লওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ ২১৭টি বড়, মাঝারি, ছোট নানা আকারের বিভিন্ন জীবনবীমা সংস্থা মিলিয়া যে কাজটুকু করিত তাহা সমগ্র ভাবে একটি একক রাষ্ট্রাধীন সংস্থায় পরিণত করিয়া লওয়া হইল।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কটিকে যখন রাষ্ট্রাধীন করিয়া লওয়া হইয়াছিল তখন তাহার চলমান বা functional দিকটায় কোনও আকস্মিক আঘাত লাগে নাই। ব্যাঙ্কের সকল শাখাপ্রশাখা সমেত এটি যেমন চলিতেছিল তেমনই চলিতে লাগিল, কেবল মালিকানা বদল হইল মাত্র। জীবনবীমা ব্যবসায়ে প্রযুক্ত ২১৭টি কোম্পানী ও তাহাদের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখাগুলিকে কিন্তু নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজিবার প্রয়োজন হইল। পূর্বে প্রত্যেক কোম্পানী আইনের নির্দেশের গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া আপন আপন বিভিন্ন নীতি অনুযায়ী তাহাদের ব্যবসায় চালাইত। তাহাদের চাঁদার হার পরস্পর হইতে ভিন্ন ছিল, বীমাকারীর সহিত চুক্তিপত্রে বিভিন্ন কোম্পানীর মধ্যে নানা রকমের বৈচিত্র্য ছিল, মুনাফার হার কম বেশী ছিল। সমগ্র ব্যবসায়টিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া এক কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত জীবনবীমা সংস্থার মধ্যে এতগুলি বিভিন্ন কোম্পানীকে আনিয়া ফেলিতে তাহাদের

ব্যবসায় প্রণালী ইত্যাদি সকলই একটি একক (uniform) নিয়ম ও প্রণালীর মধ্যে বাঁধিয়া লওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়িল। অর্থাৎ, সমগ্র ব্যবসায়টিকে একটা নির্দিষ্ট ছাঁচে নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজিতে হইল। ৮৫ বৎসর ধরিয়া চলতি ক্রমবর্ধমান এবং নানা বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ এরূপ একটি বিভিন্ন পরিচালনায় নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়কে সামগ্রিক ভাবে ঢালিয়া সাজা সহজ নয় সমীচীনও বোধ হয় নয়। যাহা হউক এই ঢালিয়া সাজার কাজ বর্তমানে চলিতেছে, কবে ইহা সম্পূর্ণ হইবে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। কিন্তু ইতিমধ্যে এই নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজার হিড়িকে চলতি কাজ অবশ্যম্ভাবী ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। বীমাকর্মীদের নিকট হইতে যাহা শোনা যায় তাহাতে মনে হয় যে, নূতন বীমাপত্রের ক্ষেত্রে চলতি কাজের পরিমাণ তাহার স্বাভাবিক অঙ্কের প্রায় এক-দশমাংশে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। অতটা যদি নাও হইয়া থাকে তবু যে চলতি কাজের পরিমাণ সাংঘাতিক ভাবে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

জীবনবীমা ব্যবসায়টি অন্যান্য নানা বিভিন্ন প্রকারের ব্যবসায় হইতে একেবারেই অন্য রকম। ইহাকে গাণিতিক বা mathematical ব্যবসায় বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। জীবনবীমা ব্যবসায়ের নিয়মের ধারা এবং ইহার চলতি প্রণালী সম্পূর্ণ ভাবে গাণিতিক হিসাবের উপরে ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত। সেই কারণে জীবনবীমা ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি ও ইহার চলতি প্রণালী জীবনবীমা ব্যবসায়ের গাণিতিক প্রক্রিয়ায় শিক্ষিত অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞের নিয়ন্ত্রণের উপরে বহুল পরিমাণে নির্ভর করিয়া থাকে। শুনা যায় যে, রাষ্ট্রাধীন নূতন জীবনবীমাধিকরণ প্রতিষ্ঠা করিবার কাজে ঐ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির সাহায্য ও পরামর্শ সরকারপক্ষ হইতে লওয়া হইয়াছিল। কিন্তু এই নূতন জীবনবীমাধিকরণ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করিবার কাজেও যে এ প্রকার বিশেষজ্ঞের বিশেষ প্রয়োজন হইতে পারে সে ধারণা সম্ভবতঃ সরকারী মহলে স্বীকৃত হয় নাই।

এই প্রসঙ্গে ভারতীয় জীবনবীমা ব্যবসায়ের অতীত ইতিহাসের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন। এই ব্যবসায়ের সুরু হইতে অনেকদিন পর্যন্ত পুঁজিপতি বা ব্যবসায়ীদিগের ধারণা ছিল যে, বীমা-বিশেষজ্ঞ বা এ্যাকচুয়ারীর দ্বারা জীবনবীমা কোম্পানীগুলির চাঁদার হার ইত্যাদি এবং বীমাপত্রের সর্তাদির খসড়া করাইয়া লওয়া এবং প্রতি ত্রৈবার্ষিক, চতুর্বার্ষিক বা পঞ্চবার্ষিক হিসাবনিকাশ করাইয়া লইলেই জীবনবীমা ব্যবসায় সুষ্ঠুভাবে চলিতে পারে। কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা ও দৈনন্দিন পরিচালনা, ইহার তহবিল লগ্নীকরণ ইত্যাদি অন্যান্য সকল রকম পরিচালন নিয়ন্ত্রণ কাজে এ সকল বিশেষজ্ঞের বিশেষ কোনও কাজ নাই। এ ধারণা যে আজিও একেবারে মুছিয়া গিয়াছে তাহাও নহে। এভাবে সাধারণ ব্যবসায়ীর নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাধীনে বহু জীবনবীমা কোম্পানী বড়ও হইয়াছে ইহাও সত্য। কিন্তু সমস্ত দিক দিয়া বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অন্যান্য কোম্পানীগুলির তুলনায় যে সকল কোম্পানীর পরিচালন-দায়িত্ব বিশেষ ভাবে শিক্ষিত ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বীমা-বিশেষজ্ঞদের উপরে ন্যস্ত ছিল, সেগুলি অনেক বেশী দক্ষতার সঙ্গে ও সুষ্ঠু ভাবে কাজ করিয়াছে, কম খরচে বেশী পরিমাণ কাজ করিতে পারিয়াছে, বীমাকারীর স্বার্থ নানা দিক দিয়া অধিকতর সুরক্ষিত রহিয়াছে এবং তাহাদের প্রগতির গতি বিজ্ঞানোনুমোদিত পথে দ্রুততর পরিণতি লাভ করিয়াছে।

সরকারী জীবনবীমাধিকরণে দুই-চারিটি দক্ষ বীমা বিশেষজ্ঞকে যে লওয়া হয় নাই তাহা নহে। কিন্তু এই সামগ্রিক (monopolist) নূতন অধিকরণের সকল ব্যবস্থাপনায় তাঁহাদের পিছে সরাইয়া দিয়া যাঁহারা সম্মুখে আগাইয়া আসিয়াছেন তাঁহাদের না আছে কোন বিজ্ঞানানুমোদিত বিশেষজ্ঞ শিক্ষা, না আছে জীবনবীমা ব্যবসায় পরিচালনে কোনও বিশেষ পূর্বার্জিত অভিজ্ঞতা। দুইটি ব্যক্তি বিশেষ করিয়া এই রাষ্ট্রায়ত্ত জীবনবীমাধিকরণের সর্বাধিনায়কের ভূমিকায় অভিনয় করিতেছেন দেখা যাইতেছে। তাঁহাদের একজন ভারত সরকারের রাজস্ব ও অসামরিক ব্যয় দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীএম. সি. শাহ ও অন্য জন ভারত সরকারের অর্থ বিভাগের অন্যতম কর্মসচিব শ্রীএইচ এম প্যাটেল। ইঁহাদের এক সরকারী ক্ষমতার জোর ছাড়া এইরূপ একটা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার গুরু দায়িত্ব লইবার মত অভিজ্ঞতা বা দক্ষতা কোনটাই আছে বলিয়া শুনাও যায় নাই, দেখাও যাইতেছে না। অথচ অর্থদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ধুরন্ধর শ্রেষ্ঠ শ্রী কৃষ্ণমাচারী কি করিয়া ইঁহাদের এরূপ দায়িত্বপূর্ণ কাজে বহাল করিলেন তাহা ভাবিয়া আশ্চর্য হইতে হয়। একমাত্র কারণ হইতে পারে যে, ইঁহারা দু'জনেই অর্থমন্ত্রী মহাশয়ের অনুগত তাঁবেদার এবং অর্থমন্ত্রী ইঁহাদের মাধ্যমে এই বিরাট প্রতিষ্ঠানটির উপরে নিজস্ব ক্ষমতা অপ্রতিহত রাখিবার সুযোগ পাইবেন।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে অঙ্কের দিক দিয়া বিচার করিলে রাষ্ট্রায়ত্ত জীবনবীমাধিকরণ বর্তমানে এদেশের বৃহত্তম ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। সঞ্চিত ও বার্ষিক চলতি নীট আমদানীর দিক হইতে বিচার করিলে একমাত্র রেলওয়ে
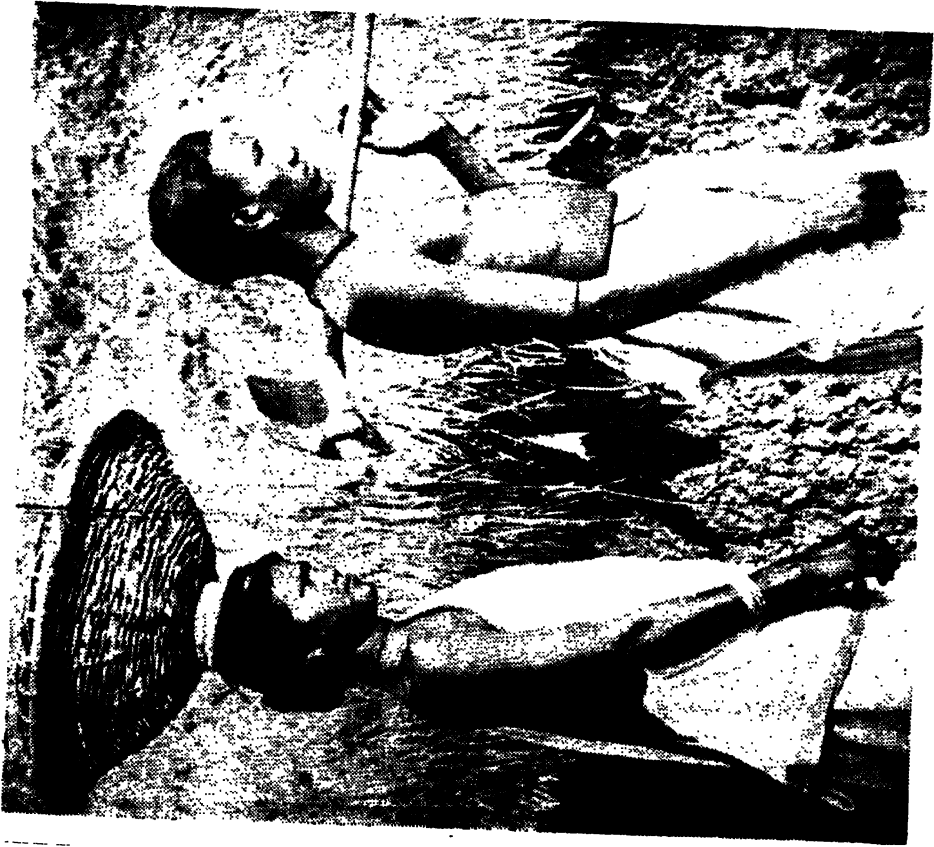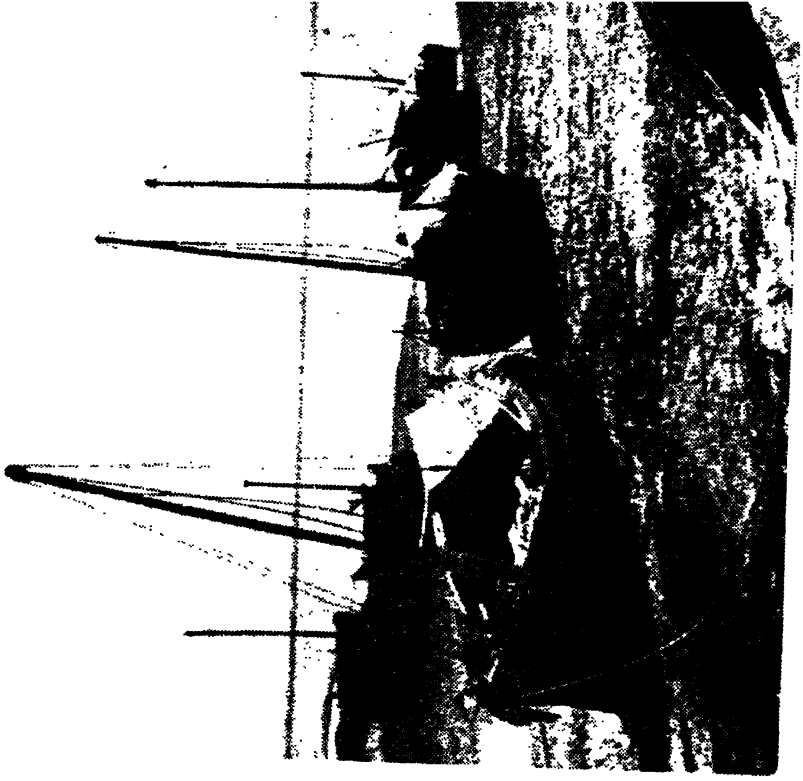
কাজের ডাক [ফোটো—শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ

ডাঙ্গায় পরিত্যক্ত [ফোটো—শ্রীবিনয়ভূষণ ।

সফদারগঞ্জ বিমানঘাটিতে শ্রীভি. কে. কৃষ্ণমেনন এবং ডাঃ সৈয়দ মামুদসহ জার্মানীর ফেডারাল রিপাব্লিকের পররাষ্ট্রসচিব ডাঃ হাইনরিখ ফন ব্রেণ্টানো

দেরাদুনে আই-এ-এফ অফিসারদের 'সিলেকশ্যন বোর্ডের' সমক্ষে কর্ম্মপ্রার্থীদের একটি যৌথ-কৃত্য সম্পাদন

্যতীত আর এমন কোনও একক একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এখন এদেশে নাই যাহা কোনও রকমেই এই প্রতিষ্ঠানটির সমকক্ষতা দাবী করিতে পারে। এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালন ব্যবস্থাপনায় অসাধারণ দক্ষতা ও সাবধানতার প্রয়োজন সহজেই অনুমিত হইবে। দুইটি গুণের একত্র সমাবেশেই কেবল এরূপ প্রয়োজনীয় দক্ষতা লাভ হইতে পারে—এ ব্যবসায়ের বৈজ্ঞানিক পরিচালন-প্রণালীতে সর্বোচ্চতম বিশেষজ্ঞ শিক্ষা ও এই ব্যবসায় পরিচালনায় প্রভুত পূর্ব অভিজ্ঞতা। দুঃখের বিষয়, এমন সব ব্যক্তি এরূপ বিরাট একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ভার নিজেদের হাতে তুলিয়া লইয়াছেন, যাঁহারা এই দুইটি অবশ্য প্রয়োজনীয় গুণের কোনটারই অধিকারী নন। ফলে এ পর্য্যন্ত ইহার ব্যবস্থাপনায় যাহা ঘটিয়াছে তাহাতে একটা অসম্ভব জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে মাত্র, কার্য্যকরী কোনও ব্যবস্থাই হয় নাই।

অনুপযুক্ত ব্যক্তির উপর বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার ভার পড়িলে তাহাতে যে কেবল জটিলতারই সৃষ্টি হয় শুধু তাহাই নহে, নানা অন্যায় ও অবিচারও হইয়া থাকে। জীবন বীমা ব্যবসায়ের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ প্রক্রিয়ায় এভাবে অত্যন্ত বেশী পরিমাণ অন্যায় ও অবিচার যে এ পর্য্যন্ত হইয়াছে এবং তাহা অপনোদন প্রচেষ্টায় যাহারা ভুক্তভোগী তাহাদের সকল আবেদন যে সরাসরি অগ্রাহ্য করা হইয়াছে তাহার ভুরি ভুরি প্রমাণ নিত্যই পাওয়া যাইতেছে। কোন কোন অঞ্চলে পূর্বেকার কোম্পানী-বিশেষের ভূতপূর্ব কর্মচারীরা কিম্বা বিশেষ করিয়া বাছাই করা কোন কোন কোম্পানী বিশেষের কর্মচারীদের বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ পদগুলিতে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে এবং ইঁহাদের চেয়ে দক্ষতর, এমনকি পূর্বে উচ্চতর পদে প্রতিষ্ঠিত অনেককে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট পদ লইতে বাধ্য করা হইয়াছে, কিম্বা যাঁহারা তাহাতে স্বীকৃত হন নাই, তাঁহাদের কোনও পদই জোটে নাই। এরূপ ভুরি ভুরি উদাহরণ লেখকের নিজেরই জানা আছে। একটি বিভাগীয় দপ্তরে (Divisional office) ম্যানেজার করা হইয়াছে এমন একজনকে যিনি মাত্র ৮ বৎসর পূর্বে একটি কোম্পানীর শাখা দপ্তরের কেরাণীর পদ হইতে শাখা-অধ্যক্ষের পদ পাইয়াছিলেন এবং যাঁহাকে সেই কোম্পানী ক্রমে বড় মাঝারী এবং অবশেষে ছোট্ট একটি শাখা আপিসে স্থানান্তরিত করা প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন। সেই একই দপ্তরে এমন আর একজনকে সামান্য ডেভেলপমেণ্ট এ্যাসিষ্ট্যাণ্টের পদে বহাল করা হইয়াছে যিনি বড় বড় কোম্পানীর বৃহত্তম শাখা আপিস দীর্ঘকাল ধরিয়া কৃতিত্বের সঙ্গে পরিচালনা করিয়া আসিয়াছেন। আবার একটা আঞ্চলিক দপ্তরের সর্বাধিনায়ক করিয়া এমন একজনকে বসান হইয়াছে যিনি বুক ঠুকিয়া অধিকতর ল্যাপ্স হইবে জানিয়াও বার্ষিক ব্যবসায়ের অঙ্ক স্ফীত করিতে এবং এই লইয়া প্রকাশ্যে বড়াই করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না। এই মহাত্মাটি একটি কোম্পানীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন এবং ইনি একচুয়ারীও বটেন। একদা তাঁহার পরিচালনায় কোম্পানীটির আপাতঃ ব্যবসার পরিমাণ বাড়িলেও ল্যাপ্স যে অপেক্ষাকৃত আরও বেশী বাড়িতেছে এ প্রশ্নের জবাবে একটি বীমাকর্মী সভায় নির্লজ্জের মত তিনি বলিতে দ্বিধা করেন নাই যে ল্যাপ্স লইয়া অনর্থক লোকে মাথা ঘামাইয়া থাকে—ব্যবসায়ের পরিমাণের দ্রুত ও বৃহদায়তন প্রসার লাভ করিতে হইলে, অনুপাতের অধিক ল্যাপ্স অবশ্যম্ভাবী এমনকি লাভজনকও বটে। জীবনবীমা ব্যবসায়ের গাণিতিক ভিত্তির সহিত যাঁহারা সামান্যমাত্র পরিচিত আছেন, তাঁহারাই জানেন যে, কমপক্ষে ৩ বৎসর চলিবার পূর্বে প্রতিটি ল্যাপ্স হওয়া পলিসি একদিক দিয়া যেমন কোম্পানীর—অর্থাৎ স্থায়ী বীমাকারীর আর্থিক স্বার্থহানিকর, তেমনি সমগ্র জীবনবীমা ব্যবসায়ের দিক দিয়াও ঐগুলি সুনামের হানিকর। তথাপি যেভাবে আমাদের দেশে জীবনবীমা ব্যবসায় পরিচালিত হয়, যাহাদের দিয়া বীমাপত্র বিক্রয়ের ব্যবস্থাপনা করিতে হয়, তাহাতে অন্য প্রগতিশীল দেশের তুলনায় আমাদের দেশে ল্যাপ্সের পরিমাণ অবশ্যম্ভাবী ভাবে কিছু বেশী সর্বদাই হইয়াছে। সকল সুপরিচালিত বীমাকোম্পানীই সর্বদা ঐদিকে নজর রাখেন এবং অনবরতঃই নানা ব্যবস্থা ও সর্ত্তের দ্বারা ল্যাপ্সের পরিমাণ কমাইবার চেষ্টা সততই করিয়া থাকেন। কেহ ল্যাপ্স বাড়া ভাল এ বলিয়া বড়াই করেন নাই। কিন্তু বর্তমান রাষ্ট্রায়ত্ত জীবনবীমাধিকরণের এই নবনিযুক্ত আঞ্চলিক সর্বাধিনায়ক বা 'Zonal Manager'টি এককালে তাহাও করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। সম্ভবতঃ তিনি যখন পূর্ববর্ণিত কোম্পানীটির সর্বাধিনায়কের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তখন তাঁহার ব্যক্তিগত আয়ের খানিকটা তাঁহার পরিচালনাধীন কোম্পানীর বার্ষিক ব্যবসায়ের পরিমাণের উপরে নির্ভরশীল ছিল। সে যাহাই হউক, শিক্ষিত ও দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত বিশেষজ্ঞ ম্যানেজারের পক্ষে এ ভাবে ল্যাপ্সের গুণকীর্তন হইতে এটুকু স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে এ রকম মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তিকে বীমাকারী স্বার্থজড়িত দায়িত্বপূর্ণ ও তদনুযায়ী ক্ষমতাসম্পন্ন পদে প্রতিষ্ঠিত করায় বিপদ ঘটা অসম্ভব নহে।

এ দুই একটি ঘটনার উল্লেখ করার আসল উদ্দেশ্য এই যে, নূতন জীবনবীমাধিকরণে ক্ষমতা ও দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠালাভ যে কেবলমাত্র শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভর করিতেছে তাহা নহে। রাষ্ট্রায়ত্ত জীবনবীমাধিকরণে যাঁহাদের, অন্ততঃ কোন কোন অঞ্চলে, গুরুদায়িত্বপূর্ণ কাজে

বহাল করা হইয়াছে, প্রতিযোগিতামূলক কার্য্যকুশলতা ও অভিজ্ঞতা, কিম্বা পুর্বার্জিত সুনাম ও দক্ষতার উপরেই মাত্র তাঁহাদের নিয়োগ নির্ভর করে নাই। অবশ্যম্ভাবীরূপে ইঁহাদের অন্ততঃ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, নিয়োগ করা হইয়াছে ব্যক্তিগত প্রভাব ও অনুরূপ কোন কারণে। সাধারণের মনে এরূপ একটা ধারণা যে ইহার মধ্যেই বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই এবং ইহার ফল যে নূতন রাষ্ট্রায়ত্ত বীমা সংস্থার পক্ষে কিরূপ বিষময় হইতে পারে তাহার সম্যক্ ধারণা প্যাটেল-শাহ্ জোটের আছে কিনা জানি না।

পুর্বেই যথাসম্ভব বিস্তারিতভাবে দেখান হইয়াছে যে, মোটের উপরে কোম্পানীসমুহের ব্যক্তিগত পরিচালনাধীনে এই ব্যবসায় চলিতে থাকার কালে, দায়িত্বহীন কিম্বা অসৎ পরিচালনার দ্বারা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বীমাকারীর স্বার্থে অপঘাত লাগিবার দায়িত্ব ঐ সকল কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীর যতটা ছিল, সরকারী বীমাকন্ট্রোলারের নিজেরও তাহার কম ছিল না। তিনি তাঁহার দায়িত্ব যথাযথভাবে বহন করিলে এবং আইন-নির্দিষ্ট কর্তব্য নিরপেক্ষ ভাবে পালন করিলে এরূপ ঘটা সম্ভব হইত না। ইহার দ্বারা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার ফলেও সরকারী সততার উপরে সাধারণের আস্থা এক প্রকার ছিল না বলিলেই হয়। সেই অবস্থায় নূতন রাষ্ট্রায়ত্ত জীবনবীমা সংস্থার উপরে এমনি সাধারণের আস্থা গড়িয়া তোলা কঠিন হইত। তাহার উপরে দায়িত্বপূর্ণ ও ক্ষমতাবান পদে এই নতুন সংস্থার কর্মকর্তা নিয়োগের যে প্রণালী এ পর্যন্ত কোন কোন অঞ্চলে অবলম্বিত হইয়াছে তাহার দ্বারা এই আস্থার অবশিষ্টাংশও সমূলে ধ্বংস করিয়া ফেলা হইতেছে। অন্যপক্ষে নিম্ন পদাধিকারীদিগকে লইয়া ইঁহারা যে খেলা খেলিতে সুরু করিয়াছেন তাহার দ্বারা রীতিমত ভয়াবহ অবস্থারই সৃষ্টি হইয়াছে।

ইহা সর্বজনবিদিত প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, জীবনবীমা ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি ইহার বীমাপত্র বিক্রয় আয়োজনের উপরে। এই আয়োজনটির এদেশে কায়েমী প্রতিকৃতিতে নানারকম বৈচিত্র্য অবস্থিত ছিল। কিন্তু মোটামুটি এই আয়োজনের সামগ্রিক আকারে প্রধানতঃ তিনটি স্তরভেদ ছিল। কোম্পানী ও বীমাপত্র-ক্রেতার অন্তর্বর্তী ব্যবধান পূর্ণ হইত অর্গানাইজার, ইন্সপেক্টার ইত্যাদি কোম্পানীর বেতনভোগী কর্মচারী, স্পেশাল এজেণ্ট ও এজেণ্টদিগের দ্বারা। মোটামুটি বীমাপত্র বিক্রয়ে প্রাথমিক বা 'primary' দায়িত্ব বহন করিত এজেণ্টগোষ্ঠী। কিন্তু এজেণ্টদিগের নিকট হইতে কাজ আদায় করিবার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকিত কমিশনভোগী স্পেশাল এজেণ্ট বা বেতনভোগী ইন্সপেক্টার, অর্গ্যানাইজার কিম্বা সময়ে সময়ে একাধারে উভয়েরই উপরে। পূর্ব অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যে, কোম্পানীর বেতনভোগী ইন্সপেক্টার বা অর্গানাইজার ইত্যাদির সাহায্য ব্যতীত কেবল মাত্র এজেণ্ট বা স্পেশাল এজেণ্টদের দ্বারা আশানুরূপ ফললাভ হওয়া সম্ভব হয় না। এই মোটামুটি কাঠামো অনুযায়ীই প্রধানতঃ সকল জীবনবীমা কোম্পানীর বীমাপত্র বিক্রয় আয়োজন গড়িয়া তোলা হইয়াছিল। অবশ্য ইহার মধ্যেও বিভিন্ন কোম্পানীর আয়োজনে নানা রকম-ফের ছিলই।

সাধারণতঃ এই আয়োজনে কোম্পানীর বেতনভোগী কর্মচারীদের অবস্থাই ছিল সবচেয়ে অনিশ্চয়তাপূর্ণ। কোন কোন কোম্পানী অবশ্য ইঁহাদিগকে তাহাদের নিজেদের কায়েমী কর্মচারীগোষ্ঠীর অন্যতম বলিয়া গ্রহণ করিতেন এবং তাঁহাদের চাকুরী পাকা বনিয়াদের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভারতের সর্বাগ্রগণ্য বীমাকোম্পানীগুলির অন্যতম একটিতে এইরূপ ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল এবং ইহার অনুসরণে কোম্পানীর ব্যবসায়ের সর্বদিক দিয়া প্রভূত উন্নতিও হইতেছিল। বার্ষিক ব্যবসায়ের পরিমাণে যেমন এই কোম্পানীটি সর্বাগ্রে ছিলেন, তেমনি পরিচালন ব্যয়ও ছিল ইঁহাদের প্রায় নিম্নতম স্তরে—অন্যদিকে বীমাকারীদিগের মধ্যে বণ্টনযোগ্য মুনাফার হারও ছিল ইঁহাদের প্রায় সর্বোচ্চ হারে।

এই প্রসঙ্গে এই কোম্পানীটির বিক্রয় আয়োজনের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা সমীচিন। এই কোম্পানীটির প্রায় শৈশব হইতেই—ইহা ভারতের প্রাচীনতম জীবনবীমা কোম্পানীগুলির অন্যতম—একটা সুনির্দিষ্ট ও বিজ্ঞানানুমোদিত ধারায় ইহার বিক্রয় আয়োজনের কাঠামো গড়িয়া তুলিয়াছিল। কোম্পানী ও বীমাকারীর অন্তর্বর্তী কেবলমাত্র দুই স্তরের কর্মী লইয়া ইহা কাজ করিত, এক, কোম্পানীর বেতনভোগী ইন্সপেক্টার ও দ্বিতীয়, ইন্সপেক্টারের অধীনস্থ কমিশনভোগী এজেণ্ট। ইন্সপেক্টাররা কোম্পানীর পাকা কর্মচারী ছিলেন এবং তাঁহাদের চাকুরীর স্থায়িত্ব ও অবসর গ্রহণের নিয়মাবলী মোটামুটি কোম্পানীর অন্যান্য সকল কর্মচারীর অনুরূপ ছিল। ইঁহাদের কাজ ছিল, কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় পরিচালকের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিয়া কোম্পানীর এজেণ্ট সংগ্রহ করা, তাহাদিগকে পরিচালনা করা এবং মোটামুটি কোম্পানীর ব্যবসায়ের উত্তরোত্তর উন্নতি ও প্রসারকল্পে চেষ্টা করা। অন্যান্য অধিকাংশ ভারতীয় জীবনবীমা কোম্পানীর বিক্রয় আয়োজন ব্যবস্থা এরূপ পদ্ধতিতে পরিচালিত হইত না। তাহাদের প্রায় সবাকারই অধীনস্থ বেতনভোগী ইন্‌স্পেক্টার বা অর্গ্যানাইজারদের চাকুরী ব্যবসায়ের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল থাকিত। বস্তুতঃ, তাহাদের চাকুরী প্রায় অন্য সকল ক্ষেত্রেই ব্যবসায়ের পরি-

মাণের সর্তাধীন ছিল। যদি কেহ ব্যবসায়ের পরিমানের সর্ত পুরণে অক্ষম হইতেন, তবে তাঁহার চাকুরী থাকা না থাকা সম্পূর্ণ কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের দয়ার উপরে নির্ভর করিত। আবার অনেক ক্ষেত্রেই এই সর্তটি এমন ভাবে আরোপ করা হইত যে, ইন্সপেক্টার কিম্বা অর্গ্যানাজারের মাসিক বেতন পাওয়া না পাওয়া মাসিক বা ত্রৈমাসিক ব্যবসায়ের পরিমাণ অনুযায়ী নির্ভর করিত।

বলা বাহুল্য, জীবনবীমা ব্যবসায়ের বিক্রয় আয়োজন ব্যবস্থার নিয়োক্ত পদ্ধতি না ছিল সম্পূর্ণ বিজ্ঞানানুমোদিত না লাভজনক। মানুষের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা তাহার দৈনন্দিন জীবিকার উপায়ের স্থায়িত্ব ও নির্ভরশীলতা। ইহারই উপরে তাহার বিশ্বস্ততার মান এবং পরিশ্রমের প্রেরণা বহুল পরিমানে নির্ভর করে। অন্যপক্ষে জীবনবীমা ব্যবসায়ের লাভজনক প্রগতি অনেকটা পরিমানে নির্ভর করে পরিচালন ব্যয়ের ক্রমিক সঙ্কোচনে। দৈনন্দিন ব্যবসায়ের পরিমানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল আনুপাতিক বেতন বা ভাতা দ্বারা এই দুয়ের কোনটাই সম্ভব হয় না। সেই কারণে ভারতের প্রায় দুই শতাধিক চলতি জীবনবীমা কোম্পানীর মধ্যে সত্যকার প্রগতিশীল ছিল মাত্র গুটিকয়েক বিশিষ্ট কোম্পানী। বস্তুতঃ,ইহাদের মধ্যে মাত্র ছয়টি কোম্পানী সকল কোম্পানীর মিলিত বাৰ্ষিক ব্যবসায়ের পরিমাণের শতকরা ৬৫ ভাগ নিজেদের দখলে আনিয়া ফেলিয়াছিল। জীবনবীমা কর্মচারীদের পক্ষ হইতে সেই কারণে রাষ্ট্রায়ত্তকরণের সংবাদটি আপাতঃ শুভ সংবাদ বলিয়াই মনে হইয়াছিল। তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে, নূতন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার অধীনে তাঁহাদের চাকুরীর মান, স্থায়িত্ব ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় সকলকার চেয়ে প্রগতিশীল কোম্পানীর প্রণালীর অনুযায়ী পাকা হইবে এবং এই কাজে তাঁহারা কায়মনে তাঁহাদের সকল কৌশল, সকল দক্ষতা নিয়োগ করিবার সুযোগ লাভ করিবেন। ইহার দ্বারা ইঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা এবং রাষ্ট্রায়ত্ত জীবনবীমা সংস্থা উভয়েই এমন একটা সহজ পারস্পরিক সহযোগিতায় সম্বদ্ধ হইবেন যে, উভয় পক্ষই তাহার দ্বারা লাভবান হইবেন। এ পর্যন্ত কিন্তু ঠিক তাহার উল্টাটাই হইয়াছে। নূতন রাষ্ট্রায়ত্ত বীমাধিকরণ বিলের পার্লামেন্টে আলোচনা-প্রসঙ্গে মন্ত্রী শ্রীএম. সি. শাহ্ যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতেই ইঁহাদের মতলবের স্পষ্ট আভাস পাওয়া গিয়াছিল। বেতনভোগী ক্ষেত্রকর্মীদের (field workers) বিষয় উল্লেখ করিয়া শ্রীশাহ্ তখন বলিয়াছিলেন যে, ঐ স্তরের জীবনবীমা কর্মীদের একটা আপাতঃদৃষ্ট বেতন ধার্য করা থাকিলেও বস্তুতঃ তাঁহারা মূলতঃ কমিশনভোগী কর্মচারী—কেননা তাঁহাদের বেতনের অনুপাত সম্পূর্ণ ব্যবসায়ের পরিমাণের সঙ্গে যুক্ত। শ্রীশাহ্ এই উক্তির দ্বারা কেবল যে জীবনবীমা ব্যবসায় সম্বন্ধে তাঁহার অজ্ঞতা প্রমাণ করিয়াছিলেন তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে ঐ ব্যবসায়ে এদেশে ক্ষেত্রকর্মীদের উপর প্রযোজ্য বিভিন্ন কোম্পানীর প্রণালীর বিভিন্নতা এবং সর্বোপরি চলতি বীমা আইনের নির্দেশসমূহ সম্বন্ধেও একাধারে তাঁহার অজ্ঞতার প্রমাণ দিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে বহুকাল পূর্বের একটা ঘটনা মনে পড়িতেছে। স্বরাজ্য দলের অধীনে যখন কলিকাতার পৌরসংস্থা বা করপোরেশন কাজ করিতেছিল, সেই সময়ে চৌরঙ্গী রোডের দুরবস্থা সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে গিয়া স্টেটসম্যান সম্পাদকীয় স্তম্ভে লেখেন যে, স্বরাজ্য দলের পক্ষ হইতে কলিকাতা পৌরসংস্থার প্রধান কর্মসচিব সুভাষবাবু একদা প্রচার করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা এই পৌরসংস্থার মারফত চিৎপুর রোডকে চৌরঙ্গী রোডের সমপর্যায়ে উন্নীত করিবেন। চিৎপুর রোডকে যদিও ইঁহারা এখনও চৌরঙ্গীর পর্যায়ে উন্নীত করিয়া উঠিতে পারেন নাই, তবে চৌরঙ্গীকে যে ইঁহারা চিৎপুর রোডের পর্যায়ে নামাইয়া আনিয়াছেন সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। ইহাও কম বাহাদুরী নহে। ভারতীয় জীবনবীমা ব্যবসায়ের সম্পূর্ণ রাষ্ট্রায়ত্তকরণ ও তৎপরবর্তী ব্যবস্থার দ্বারা শাহ্-প্যাটেল জোটে মিলিয়া প্রায় অনুরূপ ভাবেই এই ব্যবসায়ের মান ইহার পূর্বতন নিকৃষ্টতম উদাহরণের সমান স্তরে নামাইয়া আনিবার চেষ্টা প্রথম হইতেই প্রাণপণে করিতে সুরু করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

স্থানাভাবে এই বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা সম্ভব হইল না। তবে যেটুকু বলা হইয়াছে তাহার দ্বারাই স্পষ্ট অনুমিত হইবে যে, রাষ্ট্রায়ত্ত জীবনবীমা ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ এদেশে ঘোরতর মসীময় সম্ভাবনায় আবৃত। জ্ঞান, দক্ষতা, পূর্বার্জিত অভিজ্ঞতা, এ সকলের কোনটারই কোন মূল্য সরকার পক্ষের কর্মকর্তারা দিতেছেন না। এমনকি কর্মচারী নিয়োগে যে সামান্যতম সততা ও সুবিচারপ্রবণতা প্রয়োজন তাহারও প্রয়োগের স্পষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। ইহার উপরে আছে দায়িত্বহীনতার অসাধারণ উদাহরণসমূহ। রাষ্ট্রায়ত্তকরণের পর সরকার পক্ষ হইতে সকল এজেন্টদিগকে জানান হয় যে, তাঁহাদের আর লাইসেন্স প্রয়োজন হইবে না। ফলে কেহই লাইসেন্স রিনিউয়ালের দরখাস্ত করেন নাই। তাহার পর আবার বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয় যে, বীমা আইন যতদিন প্রত্যাহার না করা হইয়াছে ততদিন লাইসেন্স লইতেই হইবে অতএব যাঁহাদের লাইসেন্সের মেয়াদ ফুরাইয়া গিয়াছে, তাঁহাদিগকে ৩০৲ জরিমানা দিতে হইবে। ইহাতে কেহই রাজী না হওয়ার ফলে অবশেষে দিল্লী হইতে নির্দেশ আসিয়াছে যে, যাঁহাদের লাইসেন্সের মেয়াদ ফুরাইয়া গিয়াছে

তাঁহারা পুরাতন লাইসেন্স 'রিনিউ' না করিয়া নূতন লাইসেন্স লইলেই সকল গোলযোগ মিটিয়া যাইবে। কিন্তু একবার লাইসেন্স লইলে উহা নূতন করিয়া রিনিউ না করিলে নূতন লাইসেন্স দিবার নিয়ম নাই। তাহা হইলে দরখাস্ত-কারীকে হলপ করিয়া বলিতে হইবে তিনি পূর্বে কখনও আর লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত করেন নাই। অর্থাৎ বীমা দপ্তর হইতে সরকারী ভাবে জীবনবীমা এজেন্টদিগকে হলপ করিয়া মিথ্যা কথা বলিতে প্ররোচিত করা হইতেছে।

অতএব সব দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যাইতেছে যে, জীবনবীমা ব্যবসায়ের রাষ্ট্রায়ত্তকরণের দ্বারা না বীমাকারী না বীমাকর্মী কাহারই স্বার্থ সংরক্ষিত হইবার ভরসা নাই, পরন্তু উভয়েরই স্বার্থসমূহ বিপদ্‌গ্রস্ত হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, সরকারপক্ষ হইতে যে আশা করা হইয়াছিল—ইহার দ্বারা তাঁহাদের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী যোজনার অন্ততঃ আংশিক রসদ সংগ্রহ করা সহজ হইবে, তাহার সম্ভাবনাও সুদূরপরাহত। যে ধারায় এবং প্রণালীতে নূতন রাষ্ট্রায়ত্ত জীবনবীমা ব্যবসায়ের পরিচালন ব্যবস্থা সুরু হইয়াছে, তাহার দ্বারা সমগ্র ব্যবসায়টিরই সমূলে বিনষ্টির সম্ভাবনা স্পষ্ট চোখের সামনে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এই আশঙ্কা অতি ভয়াবহ আশঙ্কা। জীবনবীমা ব্যবসায়টি যদি এভাবে নষ্ট করিয়া ফেলা হয় তাহা হইলে দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারী কেবল যে এককালীন ক্ষতিগ্রস্ত হইবে শুধু তাহাই নহে, তাহাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা পর্যন্ত ভীষণ ভাবে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িবে, এবং এই বিপদের সবচেয়ে কঠিন আঘাত আসিয়া লাগিবে সমাজের সেই অংশে যেখানে সঞ্চিত থাকে দেশের চিন্তা ও ভাবধারার সমগ্র ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, যাহারা দারিদ্র্য ও বঞ্চনার মধ্য দিয়াও দেশের জীবনকে রূপ, রস ও ভাবের ঐশ্বর্যে চিরকাল সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে।

তবে কি জীবনবীমা রাষ্ট্রায়ত্তকরণে কাহারও স্বার্থ নাই? —এ প্রশ্নের জবাব স্পষ্ট করিয়াই দেওয়া প্রয়োজন। যাহাদের স্বার্থ স্বভাবতঃ জীবনবীমা ব্যবসায়ের গতি ও প্রকৃতির উপরে নির্ভরশীল—তাহাদের কাহারও স্বার্থ যে ইহার দ্বারা সংরক্ষিত হইবার আশা নাই, তাহার আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। কিন্তু এই ব্যবস্থার দ্বারা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতের সামগ্রিক জীবনবীমা ব্যবসায়ের ভাগ্যনিয়ন্তা হইয়া যাঁহারা বসিয়াছেন, বসিতেছেন বা ভবিষ্যতে বসিবেন, তাঁহাদের ব্যক্তি-গত স্বার্থ সমৃদ্ধিলাভ করিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ইহাতে আছে

নবীনের আবির্ভাব

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

বসন্তের শেষ প্রান্তে এলে তুমি নব আগন্তুক,
শ্যামলা ধরণী হ'ল স্বর্ণোজ্জ্বলা করি রৌদ্রস্নান,
নীলাম্বর পানে ওঠে আত্মহারা আলোকের তান,
ঈপ্সিত, তোমার তরে আনন্দিত প্রকৃতি উন্মুখ।
কনকের বর্ণ ধরে স্পর্শে তব—চম্পক উৎসুক,
কোথা থেকে ভেসে আসে মৃদু আম্রমুকুলের ঘ্রাণ,
মৌমাছি গুঞ্জরি' ফেরে নিদ্রাতুর মধ্যাহ্নের গান,
তোমার পানে যে চেয়ে ভুলে গেছি সব দুঃখসুখ।

স্মৃতির সঞ্চিত রসে রসায়িত রূপ কি তোমার,
কে জানে আশার রঙে রঞ্জিত কি করেছি তোমারে ?
অতীত ও ভবিষ্যৎ মিলেছে কি তোমার মাঝার ?
চেনা কি অচেনা তুমি ? অপরূপে কে বুঝিতে পারে!
তোমারে বন্দনা করি, হে নবীন, ধর উপহার,
সাজায়ে এনেছি ডালা স্নিগ্ধ শুভ্র মল্লিকা-সম্ভারে।

সুবোধের সংসার

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

বেলা ন'টা, ক্লান্ত পদে বাড়ীর দরজায় আসিয়া সুবোধ কড়া নাড়ে। ভিতর হইতে কোন সাড়া আসে না, সুবোধ আবার কড়া নাড়ে। এইবার চাকর বিশু আসিয়া দরজা খুলিয়া দেয়, সুবোধ ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভাঙিয়া দোতলায় ওঠে, তার পরে একপ্রান্তে নিজের ঘরটিতে ঢুকিয়া ইজিচেয়ারে বসিয়া পড়ে।

ব্যারাকপুরের এক বড় কারখানায় সুবোধ ফোরম্যান, রাত্রে তাহার ডিউটি। প্রথম প্রথম সে কখনও দিনে, কখনও রাত্রে কাজ করিয়াছে, কিন্তু কয়েক বছর হইল বরাবর রাত্রেই কাজ করিতেছে। ইহাতে আয় অনেক বেশী, সুবোধ ইচ্ছা করিয়াই এই ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। টালিগঞ্জ হইতে ব্যারাকপুর অনেক দূর, কারখানায় পৌঁছিতে এক ঘণ্টারও বেশী সময় লাগে, তাই সন্ধ্যা ছয়টায় সে বাড়ী হইতে বাহির হয়। এদিকে আবার সকালে বাড়ী পৌঁছিতেও তাহার ন'টা বাজিয়া যায়।

বিশু আসিয়া পায়ের কাছে জুতা খুলিতে বসে। চোখ বুঁজিয়া সুবোধ প্রশ্ন করে "বীণু কোথায় রে?" বিশু বলে "আজ্ঞে চান করছেন দিদিমণি। আপনার শরীরটা আজ কেমন, কাল যে বলেছিলেন ভাল নেই?" "আজ ভালই আছি" বলে সুবোধ। "রোজ রোজ রাত জাগা শরীরে সইবে কত" দরদ দিয়া বলে বিশু। সুবোধ চোখ বুঁজিয়াই জবাব দেয় "হুঁ।"

ঠাকুর চা-টোষ্ট আনিয়া পাশে টিপয়ের উপর রাখে। চায়ে চুমুক দিয়া সুবোধ বলে "খবরের কাগজখানা নিয়ে আয় বিশু।" বিশু কাগজ আনিয়া হাতে দেয়, সুবোধ কাগজ খুলিয়া ইজিচেয়ারে পা এলাইয়া দিয়া বসে।

"এই যে এসেছ বাবা" বাহির হইতে বলে বীণু। কাগজ নামাইয়া সুবোধ বলে, "হ্যাঁরে, তোর চান হয়েছে!" বীণু জবাব দেয়, "এই ত হ'ল। মা আজ তোমার জন্যে আড়াই মিনিট দেরি করে বাড়ী থেকে বেরুল, তোমার আসতে আজ বড্ড দেরি হয়েছে।" সুবোধ বলে, "হ্যাঁ, প্রায় মিনিটপাঁচেক দেরি হয়েছে, সেই ব্যারাকপুর থেকে ট্রামে-বাসে টালিগঞ্জ আসা—বুঝতেই পারিস। একবার এদিকে আয় ত মা।" দরজার ভিতর দিয়া নাকটুকু বাহির করিয়া বীণু বলে, "আমি যে খেতে যাচ্ছি বাবা।"—'বলছিলাম কি—" সুবোধের কথাটা শেষ করিতে না দিয়া ছুটিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে বীণু বলে, "একদম সময় নেই বাবা, দশটা বাজে, স্কুলে যেতে হবে।"

সুবোধ আবার খবরের কাগজ তুলিয়া লয়। পাশের ঘরে বীণু গুন গুন করিয়া রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়, সুবোধ বোঝে সে স্কুলে যাইবার জন্য কাপড় বদলাইয়া প্রস্তুত হইতেছে। একটু পরে দুম করিয়া দরজা বন্ধ হইয়া যায়, খুট্ খুট্ আওয়াজ করিয়া একজোড়া জুতা বারান্দা পার হইয়া সিঁড়ি দিয়া একতলায় নামিয়া যায়।

ঘড়িতে দশটা বাজে, বিশু আসিয়া বলে, "বাবু চান করুন।" কাগজ ফেলিয়া দিয়া একটা মস্ত বড় হাই তুলিয়া সুবোধ বলে, "বাড়ীর সব খবর ভাল ত।" বিশু বলে,"আজ্ঞে খবর সব ভাল—তবে ঐ বসবার ঘরে ফুলদানিটা হঠাৎ পড়ে ভেঙে গেছে।"—"বড় সুন্দর জিনিষটা ছিল"—বলে সুবোধ।

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আর দিদিমণির জন্যে একটা নতুন টেবিল-ল্যাম্প কেনা হয়েছে।"

—"বেশ বেশ।"

—মা আজকাল সাড়ে আটটায় আপিসে যান—বড্ড খাটুনি পড়েছে।

—কেন?

—আপিসে লোক ছাঁটাই হয়েছে।

—তাই নাকি!

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ফিরতেও আজকাল অনেক দেরি হয়।

—হুঁ।

—কাল রাত্রে মামাবাবু বেড়াতে এসেছিলেন।

—তাই নাকি!

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তাঁর মেজ মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে।

—ভাল কথা।

—শ্যামবাজারের নবীনবাবুর ছেলে, এম-এ পাস, সরকারী কাজ করে।

—ভাল কথা।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তিন হাজার টাকা পণ দিতে হবে, তা ছাড়া গহনাপত্র।

—তা এমন আর বেশী কি।

—দিদিমণির জন্তে এমনি একটি ছেলে যদি পাওয়া যায়।

উঠিয়া দাঁড়ায় সুবোধ, চিন্তিত ভাবে বলে "তাই ত।"

স্নান আহার শেষ করিয়া সুবোধ আসিয়া ঘরে বসে। বিশু ভিটামিনের পিল আনিয়া হাতে দেয়, পানের ডিবা ও সিগারেটের টিন আনিয়া কাছে রাখে। সুবোধ পান মুখে দিয়া টিন হইতে একটা সিগারেট তুলিয়া ধরায়। ঘরের দরজাটা টানিয়া দিয়া বাহির হইয়া যাইতে যাইতে বিশু বলে "মা চিঠি লিখে রেখে গেছেন টেবিলের উপর।" সুবোধ উঠিয়া টেবিলের উপর হইতে চিঠিখানা তুলিয়া লইয়া বিছানায় আসিয়া বসে, তার পরে বালিশের উপর কাত হইয়া চিঠি খুলিয়া পড়িতে সুরু করে—

শ্রীচরণেষু—

আশা করি আমার আগের চিঠি পেয়েছ। কিছুদিন তোমার চিঠি না পেয়ে চিন্তিত আছি। দাঁতের ব্যথাটা আজকাল কেমন? গত রবিবার ডাক্তার দেখাবার কথা বলেছিলাম, ডাক্তার দেখিয়েছ কিনা জানিও। যদি না দেখিয়ে থাক তা হলে অবশ্য দেখাবে।

আমি একপ্রকার আছি। পুরনো চশমাতে কাজ চলছিল না, তাই এক জোড়া নূতন চশমা তৈরি করিয়েছি। বীণুর পরীক্ষা এসে পড়ল, তাকে পড়াবার জন্তে একজন টিউটার রেখে দিয়েছি। রাত্রে এক ঘণ্টা করে পড়ায়।

চিঠির উত্তর অবশ্য দিও।

ইতি—

তোমার রমা

চিঠি পড়া শেষ করিয়া সুবোধ কাত হইয়া চোখ বুঁজিয়া শোয়।

চায়ের ট্রে হাতে করিয়া বিশু নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিলেও সুবোধ টের পায়। চোখ বুঁজিয়া থাকিলেও অভ্যাসমত ঠিক চারটায় তাহার ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে। হাত মুখ ধুইয়া জানালার ধারে চেয়ার টানিয়া সে বসে, পেয়ালায় চা ঢালিয়া দিয়া বিশু জামাকাপড় গুছাইবার কাজে লাগে। চায়ের পেয়ালা তুলিয়া লইয়া একটি আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া সুবোধ বাহিরের দিকে তাকায়। গলির ওপারে একতলা বাড়ীটার পিছনে যে আমগাছটা এত দিন ধূলিধূসর রুক্ষ চেহারা লইয়া দাঁড়াইয়াছিল সে কখন কোন ফাঁকে পুঞ্জ পুঞ্জ রক্তাভ কচি পাতায় সাজিয়া অপূর্ব্ব হইয়া উঠিয়াছে। সুবোধ অবাক হইয়া সেই দিকে তাকাইয়া থাকে। হঠাৎ যেন তাহার মনে হয় চারিপাশে একটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, বাতাসে এক মৃদু উষ্ণতা অনুভব করে, একটা সৌগন্ধ্য পায়। ভিতরে ভাব উদ্বেল হইয়া উঠে, ক্রমে সে ভাব ভাষা হইয়া তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসে :

> আজিকার দিন না ফুরাতে
> হবে মোর এ আশা পুরাতে—
> শুধু এবারের মত বসন্তের ফুল যত
> যাব মোরা দুজনে কুড়াতে।

বিশু জুতা পালিশ করিতেছিল, সুবোধ তাহাকে বলে, "আহা, রবীন্দ্রনাথ ঠিক মনের কথাটি বলেন, বিশু তুই বুঝিস কিছু।" মাথা নাড়িয়া বিশু বলে, "আজ্ঞে না।" সুবোধ বলে, "এর মানে হচ্ছে এই যে, জীবন তো শেষ হয়ে এল, অন্ততঃ এই বসন্তের ফুল আমরা দু'জনে একসঙ্গে কুড়াব; অর্থাৎ, তোমার আমার ভালবাসা, অর্থাৎ—না, তুই এ সব বুঝবি নে।" ঘাড় নাড়িয়া বিশু বলে, "আজ্ঞে না।"—"নাই বা বুঝলি, শুনেও আনন্দ আছে শোন—

> আবর্ত্তিয়া ঋতুমাল্য করে জপ, করে আরাধন
> দিন গুনে গুনে
> সার্থক হ'ল যে তার বিরহের বিচিত্র সাধন
> মধুর ফাল্গুনে।
> হেরিনু উত্তরী তব, হে তরুণ, অরুণ আকাশে,
> শুনিনু চরণধ্বনি দক্ষিণের বাতাসে বাতাসে,
> মিলন-মাঙ্গল্য-হোম প্রজ্জ্বলিত পলাশে পলাশে
> রক্তিম আগুনে॥

হঠাৎ হুটপাট করিয়া কয়েকটি মেয়ে উপরে উঠিয়া আসে, পাশের ঘরে একটা বিষম হট্টগোল লাগিয়া যায়—কেউ হাসে, কেউ গান গায়, কেউ চেয়ার উল্টাইয়া দেয়, কেউ টেবিল ধরিয়া টানে। সুবোধ কবিতার পংক্তি ভুলিয়া যায়। বিশু উৎকণ্ঠিত হইয়া বলে, "দিদিমণির বন্ধুরা এসেছেন।" এমন সময় সেই হট্টগোলের উপরে বীণুর কণ্ঠস্বর শোনা যায়, "বিশু, ওরে বিশু—চা নিয়ে আয়, বিসকিট আর মাখনের কৌটো, বিশু, কোথায় গেলি বিশু, বিশু বিশু—" বিশু ছুটিয়া বাহির হইয়া যায়।

সুবোধ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, হঠাৎ ঘড়ির দিকে চোখ পড়িতে চমকাইয়া ওঠে—সাড়ে পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে যে—এক চুমুকে পেয়ালার ঠাণ্ডা চা শেষ করিয়া সে উঠিয়া পড়ে। তাড়াতাড়ি পোশাক পরিতে গিয়া সার্টের বোতাম ছিঁড়িয়া ফেলে, টাই খুঁজিয়া পায় না, এক বার ক্ষীণ কণ্ঠে বিশুকে ডাকে, কিন্তু সে ডাক বিশুর কান পর্য্যন্ত পৌঁছায় না। কোনরকমে পোশাক পরা শেষ করিয়া

[সু]বোধ কাগজ টানিয়া চিঠি লিখতে বসে—সে লেখে—
[ক]ল্যাণীয়াসু
তোমার চিঠি পেয়ে বিশেষ সুখী হলাম। আমার দাঁতের [ব্য]থা অনেকটা কম, ডাক্তার দেখাবার দরকার হয় নাই। [তু]মি চশমা বানিয়ে ভালই করেছ। বীণুর টিউটার রাখা [ঠি]ক হয়েছে। আশা করি তোমার শরীর ভাল আছে। চিঠি লেখো। ইতি—
তোমার সু

খামে বন্ধ করিয়া চিঠিখানা টেবিলের উপর রাখিয়া সুবোধ বাহির হইয়া যায়। বারান্দার প্রান্ত হইতে হঠাৎ সে কি ভাবিয়া ফিরিয়া ঘরে আসে, চিঠিখানা খুলিয়া আবার লেখে—

পুনশ্চ, কাল লাঞ্চের ছুটির সময় জি-পি-ওর সামনে একটু দাঁড়াতে পারবে কি? আমি ঐ সময়ে এসে এক মিনিটের জন্যে দেখা করতাম—একটা বিশেষ কথা আছে।

সুবোধ চিঠি বন্ধ করিয়া টেবিলের উপর রাখে, তার পরে তাড়াতাড়ি পথে গিয়া নামে।

পল্লীবাসীর সমস্যা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

নির্বাচন পর্ব্ব শেষ হইয়া গিয়াছে, কংগ্রেস বিজয়ী হইয়াছেন, নিজে-[দে]র আসনে বসিয়াছেন। পল্লীবাসিগণই কংগ্রেসকে বিজয়ী করিয়া-[ছে]ন এবং পুনরায় তাঁহাদের গদীতে বসাইয়াছেন। এই নির্ব্বাচন পর্ব্বে কত পরিমাণ অর্থ ধ্বংস হইয়াছে জানি না এবং যাঁহারা জিতিয়াছেন ও যাঁহারা হারিয়াছেন তাঁহারা প্রত্যেকে কত অর্থ-ব্যয় করিয়াছেন তাহাও জানি না। তবে কাহারও কাহারও সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না। কেহ কেহ বলেন, অমুক লোক ষাট হাজার টাকা খরচ করিয়াছেন, কেহ কেহ বলেন অমুক লোক এক লক্ষ টাকা খরচ করিয়াছেন, আবার কেহ কেহ বলেন—অমুক লোক দুই লক্ষ টাকা খরচ করিয়াছেন। শুনিতে পাই নির্ব্বাচন পর্ব্বে নামিলে অন্ততঃ পনর-কুড়ি হাজার টাকার দরকার। কিন্তু পল্লী-অঞ্চলের এমন কয়েকজনকে জানি—যাঁহারা নির্ব্বাচনে জিতিয়াছেন বা যাঁহারা হারিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে এত টাকা ব্যয় করা মোটেই সম্ভব নয়। তবে কোথা হইতে তাঁহারা এত টাকা পাইলেন? কেহ বলেন "পার্টি ফণ্ড" হইতে পাইয়াছেন, কেহ বলেন অন্য স্থান হইতে পাইয়াছেন, আবার কেহ কেহ যাহা বলেন তাহা লিপিবদ্ধ না করাই ভাল। "পার্টি ফণ্ড" হইতে নির্ব্বাচনের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ পাইতে হইলে কি কি গুণ থাকা দরকার বা কি কি সর্ত্তে সেই অর্থ পাওয়া যায় তাহাও জানি না; জানা থাকিলে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতাম। এই প্রসঙ্গে এই কথা তোলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, এই গণতন্ত্রের যুগে যেখানে সকলের সমান অধিকার, সমান সুযোগ ও সুবিধা—দারিদ্র্যবশতঃ বহু উপযুক্ত ব্যক্তি নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে নামিতে পারেন না; শহরের ও পল্লী-অঞ্চলের এমন অনেক ব্যক্তিকে জানি যাঁহারা নির্ব্বাচনে দাঁড়াইয়া সফল হইলে বিধানসভায় বা লোকসভায় জনসাধারণের উপযুক্ত প্রতিনিধি হইতে পারিতেন এবং তাঁহাদের দ্বারা বিধানসভা বা লোকসভা অলঙ্কৃত হইত—আর বহু ক্ষেত্রে জনসাধারণ উপকৃত হইত। তাঁহারা কেবল 'হাত তোলা'র দলে থাকিতেন না। কিন্তু প্রধানতঃ দারিদ্র্যবশতঃই নির্ব্বাচনের কাছে-ধারে ঘেঁসিতে পারেন না। এই ত আমাদের গণতন্ত্র—সকলের সমান সুযোগ ও সুবিধা!

এই গণতন্ত্রেও প্রায় সব কাজেই প্রচুর অর্থের দরকার—দরিদ্রের কোন স্থান নাই—তাহার যতই যোগ্যতা থাকুক না। নির্ব্বাচন আর কিছুই নয়, টাকা লইয়া "ছিনিমিনি" খেলা মাত্র। শহরে বা পল্লী-অঞ্চলে এই যে টাকা লইয়া "ছিনিমিনি" খেলা চলিল, তাহার দ্বারা জনসাধারণ কতটুকু উপকৃত হইল জানি না। কেবল যে নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বেই টাকার ছড়াছড়ি হইয়াছে, তাহা নহে; পালার শেষে যাঁহারা জয়ী হইয়াছেন তাঁহাদের লইয়া শোভাযাত্রার বহর দেখিয়া বিমূঢ় হইয়াছি। অনেক ক্ষেত্রে ইহা বর্ব্বরতার সীমাও অতি-ক্রম করিয়াছে। এই সকল শোভাযাত্রাতেও প্রচুর অর্থ ব্যয় হই-য়াছে। একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণ যুবক নির্ব্বাচনে বিজয়ী কোন উচ্চ-শিক্ষিত ও ধনীব্যক্তির মহত্ত্বের কথা বলিতেছিলেন; তাঁহার মহত্ত্বের যে সকল উদাহরণ দিতে ছিলেন সকল উদাহরণই তাঁহার সাফল্যের প্রধান সহায়ক ছিল। এক বন্ধু সেই যুবকটিকে বলিলেন—তুমি ত অর্থাভাবহেতু তোমার বিবাহযোগ্যা ভগিনীর বিবাহ দিতে পারিতেছ না—কিছু আর্থিক সাহায্যের জন্য এই ধনী ও মহৎ ব্যক্তির কাছে যাও না কেন, এই ধনী ও মহৎ ব্যক্তিটি ত নির্ব্বাচনে অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন—তোমাকে অন্ততঃ দু'এক শত টাকা সাহায্য করিতে পারেন। দরিদ্র যুবকটি উত্তর করিল—টাকা ত আমি পাবই না,

করিলাম। সঙ্গে দুইজন বন্ধু। আমাদের দেখাদেখি আর একদল যুবক গরুর গাড়ীতে আমাদের অনুসরণ করিল।

আরামবাগের প্রায় দেড় ক্রোশ দক্ষিণে রাজা রণজিৎ রায়ের দীঘি। এখান হইতে আট মাইলের কম নহে। শস্যহীন বিস্তীর্ণ মাঠ পড়িয়া আছে, তাহার উপর দিয়া গরুর গাড়ীর পথ। চাকার নাভিতে সম্ভবতঃ তৈলের অভাবে আমাদের গাড়ীটি ক্রন্দন করিতে করিতে চলিয়াছে। জমির আলির উপর কখনও উঠিতেছে, কখনও বা ঝাকানি দিয়া নামিতেছে। মাথার উপর নক্ষত্র-খচিত নির্মল নভোমণ্ডল, দক্ষিণ হইতে প্রবাহিত মৃদুমন্দ পবন-হিল্লোল। প্রকৃতির সেই উদার মহিমায় প্রাণমন ভরিয়া গেল। রাত্রি ক্রমে গভীর হইল। প্রায় তিন মাইল যাইবার পর সরকারী পাকা রাস্তা। সেখানে স্নানযাত্রীর ভিড়। অগণিত গরুর গাড়ী সারি দিয়া চলিয়াছে, সুতরাং আমাদের গতি মন্থর হইয়া পড়িল। ইহার উপর দুই-একটা মোটরগাড়ী ধূলা উড়াইয়া এবং তীব্র আলোকে চোখ ধাঁধাইয়া আমাদের যাত্রাপথ দুর্গম করিয়া তুলিতে লাগিল। একটা মোটরের ভেঁপুর শব্দে হতচকিত হইয়া আমাদের সম্মুখের গাড়ীর গরুগুলা পথভ্রষ্ট হইয়া গেল। বাঁধা রাস্তার দুই দিকে নীচু জমি; সামলাইতে না পারিয়া গাড়ীখানা একেবারে উল্‌টাইয়া গেল। আরোহীদিগকে উদ্ধার করিতে গিয়া দেখি, তাহারা সমান, তাহারাও বারুণী স্নান করিতে চলিয়াছে। দৈবক্রমে তাহারা কেহ আহত হয় নাই। 'মায়ের কৃপায় এ যাত্রা তাহারা বাঁচিয়া গেল।

"মায়ের কৃপা। কি রকম?" জিজ্ঞাসা করিলাম।

বন্ধু বলিলেন, "মা যে ঐ দীঘির পাড়ে শাঁখারীর কাছে শাঁখা পরেছিলেন, জানেন না?"

"না, জানি নে। বলুন না, গল্পটা।"

"গল্প নয় মশায়, সত্য ঘটনা। স্বয়ং মা ভগবতী রাজা রণজিৎ রায়ের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেই কন্যা রাজাকে ছলনা করবার জন্য প্রায়ই বলতেন, 'বাবা, আমি যাই, আমি যাই!' একদিন কর্মব্যস্ত রাজা বিরক্ত হয়ে বলে ফেললেন, 'আচ্ছা, কোথায় যেতে চাস, যা।' মা অমনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে দীঘির পাড়ে বটতলায় বসে রইলেন···"

'বলুন না, থামলেন কেন?"

"দাঁড়ান, গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।···হ্যাঁ, তার পর এক শাঁখারী সেই পথ দিয়ে শাঁখা বেচতে যাচ্ছিল। মা তাকে ডেকে বললেন 'আমার দু'হাতে দশগাছা শাঁখা পরিয়ে দাও।' শাঁখারী বললে, 'সে কি বাছা! দশগাছা শাঁখা পরবে কি!' সে তো আর জানে না যে তিনিই স্বয়ং দশভূজা। মা বললেন, 'আমি রাজা রণজিৎ রায়ের মেয়ে।' রাজার মেয়ে শুনে শাঁখারী শাঁখা পরিয়ে দিলে। মা বললেন, 'যাও, বাবার কাছে দাম নাও গে।'···

গল্পের শেষটা আমার জানা ছিল। তথাপি আগ্রহ প্রকাশ করিলাম, "তার পর···তার পর···"

"তার পর শাঁখারী রাজার কাছে গিয়ে শাঁখার দাম চাইলে। রাজার মনে সন্দেহ হ'ল, 'মেয়ে আমার দশগাছা শাঁখা পরেছে!' দীঘির পাড়ে বটতলায় এসে তিনি মেয়ের নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। তখন দীঘির জলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল শাঁখা-পরা দশটি হাত। রাজা বুঝলেন, মা এসেছিলেন তাঁর মেয়ে হয়ে, ছলনা করে চলে গেলেন। আর মায়ের হাতে শাঁখা পরিয়ে শাঁখারীর জীবনও হ'ল ধন্য। এই জন্যই তো দীঘির মাহাত্ম্য। মেলায় দীঘির মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বই পাওয়া যায়।"

গল্পটি তন্ময় হইয়া শুনিলাম। এমন গল্প তো নূতন নহে, বাঁকুড়া জেলায় অন্ততঃ তিনটি স্থানে শুনিয়াছি। কিন্তু সে প্রসঙ্গ আলোচনার এ স্থান নয়। দীঘির মাহাত্ম্য কিছু না থাকিলে লোকে নিকটস্থ দ্বারকেশ্বর নদ ফেলিয়া সেখানে বারুণী-স্নান করিতে যাইবে কেন? আমি বিশ্বাস না করিলে কি হইবে, সহস্র সহস্র লোকে বিশ্বাস করে এবং বিশ্বাসের অনুরূপ ফলও হয়ত লাভ করে।

গল্প করিতে করিতে দীঘির নিকটবর্তী হইয়া পড়িলাম। রাত্রি তৃতীয় প্রহর শেষ হইতে চলিয়াছে। পশ্চাতের গাড়ীতে আমাদের অনুযাত্রীর দল গান জুড়িয়া দিয়াছে। দূর হইতে অসংখ্য ডে-লাইটের আলো দৃষ্টিগোচর হইল। ক্রমশঃ জনকোলাহল শ্রুতি-পথে প্রবেশ করিল। একদণ্ডের মধ্যে দীঘির পাড়ে উপস্থিত হইলাম। কত যে গরুর গাড়ী আসিয়া সেখানে বিশ্রাম করিতেছে, গণিতে পারা যায় না। আমরাও গাড়ী ছাড়িয়া দীঘির উত্তর পাড়ে নামিয়া পড়িলাম। সারি সারি দোকানপাট। রাত্রি-কাল, তাই ক্রয়-বিক্রয় অতি অল্পই হইতেছে। পাল টাঙাইয়া অথবা খড় দিয়া অস্থায়ী ঘর বাঁধিয়া দোকান করিয়াছে, দোকানে দোকানে উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে। বিস্তীর্ণ দীঘির উত্তর পারে নানা দ্রব্যের দোকান বসিয়াছে, অন্য পারগুলি তখনও প্রায় জন-শূন্য। দীঘি প্রকাণ্ড, চারি পাড় একবার প্রদক্ষিণ করিতে প্রায় আধ ঘণ্টা সময় লাগে। দীঘি প্রদক্ষিণ করিয়া আমরা যখন দক্ষিণ পাড়ে উপস্থিত হইলাম, তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।

উত্তর পাড়ে অশ্বত্থ বৃক্ষের সারি, তাহাদের ফাঁকে ফাঁকে দোকানের আলো দেখা যাইতেছে। অশ্বত্থ-বীথির মাথার উপরটা সহসা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে পূর্ব্বদিগন্তের উপর কৃষ্ণা-ত্রয়োদশীর ক্ষীণতনু পাণ্ডুবর্ণ কলাচন্দ্র উদিত হইলেন। পার্শ্বে শতভিষা নক্ষত্র দীপ্তি পাইতেছে। ক্ষয়রোগাক্রান্ত চন্দ্রদেবকে ক্রোড়ে লইয়া শতভিষা যেন শতপ্রকার ভেষজ প্রয়োগে চিকিৎসা করিতেছে। এ দৃশ্যটি কখনও ভুলিব না। দেখিতে দেখিতে সে মায়াময় দৃশ্য অস্পষ্ট হইয়া গেল, পূর্ব্ব-গগনে অরুণ-রাগ প্রকাশিত হইল। দীঘির পাড়ে স্নানার্থীদের ভিড় জমিতে লাগিল। উষাকালে রণজিৎ রায়ের দীঘিতে স্নান করিলাম। কচি আম বিক্রয় হইতেছিল; স্নানান্তে কয়েকটা ক্রয় করিয়া দীঘির জলে নিক্ষেপ করিলাম; স্নান করিয়া দান করিতে হয়। দানগ্রহণের লোকের অভাব নাই। দীঘির পাড়ে ভিক্ষুকেরা কেহ বা হাত

পাতিয়া, কেহ বা কাপড় পাতিয়া বসিয়া আছে। সাধ্যমত দান করিয়া পশ্চিম পাড়ের দিকে অগ্রসর হইলাম। তখন কাতারে কাতারে অগণিত নরনারী স্নান করিতে আসিতেছে। স্নান করিয়া দীঘির নির্মল জল তাহারা কর্দমাক্ত করিয়া তুলিতেছে। ঘাটের পাশে কেহ বা সাবিত্রী-সত্যবানের প্রতিমা করিয়া রাখিয়াছে এবং লৌহ-বলয় ও সিন্দুরের একটি ছোট দোকান করিয়াছে। সীমন্তিনী-রা স্নানান্তে লৌহ-বলয় ক্রয় করিয়া সাবিত্রীর হাতে পরাইয়া দিতেছে এবং সিঁথির উপর সিন্দুর দিয়া প্রণাম করিতেছে। স্নানের পর সকলেই এক অঞ্জলি কচি আম দীঘির জলে নিক্ষেপ করিতেছে। এদিন কেহ আম্র ভক্ষণ করে নাই; বারুণীর দিন দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে নিবেদন করিয়া আম্র ভক্ষণ আরম্ভ করিবে।

দীঘির পাড়ে আর লোক ধরে না। এই মেলার উল্লেখযোগ্য ব্যাপার কদলী-বিক্রয়। একপ্রকার পরিপুষ্ট কদলী প্রচুর আমদানী হয়। যাহারা মেলা দেখিতে আসে তাহারা অন্ততঃ কচড়া কলা অবশ্যই ক্রয় করিবে। এই কদলী সুলভ অথচ সুস্বাদু। ইহা ব্যতীত মাদুর-পাখা, ঝুড়ি-ঝাকা, বাবুইদড়ি, জঙ্গল-জোয়াল, মরিচ-মসলা, শাক-সব্জী—সকল দ্রব্যের অসংখ্য দোকান আসিয়াছে। লোকে বাছিয়া বাছিয়া দরদস্তুর করিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করিতেছে। চা, পান, বিড়ির দোকান, মুড়ি-মিঠাই-সন্দেশের দোকান, মনিহারী দোকান এবং পবিত্র হিন্দু হোটেলের অভাব নাই। লোহার দ্রব্য এবং কাঁসার বাসনের দোকানও দুই-চারিটা বসিয়াছে। একস্থানে ফটোগ্রাফির দোকানে তৎক্ষণাৎ ফটো তোলা হইতেছে; অন্য একস্থানে ম্যাজিক হইতেছে, আর এক স্থলে নাগর-দোলায় চড়িয়া বালক-বালিকারা ঘুরিতেছে। এক পারে মাইক সংযোগ করিয়া এক সাধু ও তাঁহার অনুচর-গণ 'হরেকৃষ্ণ' নাম গাহিতেছেন, আর এক পারে একদল ছোকরা মাইক লাগাইয়া সিনেমার হিন্দী গান জুড়িয়া দিয়াছে। এক জন ঔষধের দালাল 'হারমনি' বাজাইয়া ভাটিয়ালী সুরে নিজের ঔষধের গুণগান করিতেছে। গলাটি মিষ্ট, লোক জমিয়া যাইতেছে। একটা মোটরগাড়ীতে এমপ্লিফায়ার দিয়া গ্রামোফোন রেকর্ডে গান হইতেছে, গান শুনিতে লোক জমিলে এক দালাল একটা কবিরাজী ঔষধের মহিমা ব্যাখ্যা করিতেছে। জনতার মধ্যে একটা অতিকায় হাতী মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতেছে। বালকবালিকারা কৌতুক করিয়া তাহার সম্মুখে একটা কলা অথবা একটা পয়সা লইয়া ধরিতেছে। হস্তী কলাটি লইয়া স্বয়ং ভক্ষণ করিতেছে এবং পয়সাটি শুঁড়ের সাহায্যে তুলিয়া মাহুতের হাতে দিতেছে। নিকটবর্তী বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রসংস্থাগুলি জলছত্র খুলিয়াছে; তৃষ্ণার্ত লোকেরা সেখানে গিয়া জলপান করিতেছে। স্থানে স্থানে পুলিস পাহারা দিতেছে এবং প্রয়োজন হইলে জনতা নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। মেলা ঘুরিতে দেখিতে এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে করিতে বেলা দশটা বাজিয়া গেল। অনেক চেষ্টা করিয়াও দীঘির মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কোনও বই পাইলাম না। গরুর গাড়ীতে পুনর্যাত্রা করিলাম।

বারুণীর দিন স্মৃতিতে গঙ্গা-স্নান বিহিত হইয়াছে। অনেকেই সেদিন গঙ্গাস্নান করেন। আমার দেখা দুইটি বারুণী-স্নানের মধ্যে একটি ধারা-স্নান, অপরটি দীঘি-স্নান। বারুণী উপলক্ষে নানা স্থানে নানাবিধ উৎসব হয়; এখানে কেবল দুইটি স্থানের উৎসব বর্ণিত হইল। স্মৃতিতে বারুণী স্নানে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। স্মৃতিকার বলিতেছেন, বহু শত সূর্যগ্রহণ কালে গঙ্গা-স্নানের যে ফল, একবার মাত্র বারুণী-স্নানে সেই ফললাভ করা যায়। ভারতের কোটি কোটি নরনারী শাস্ত্রের সেই বিধান অদ্যাপি মানিয়া চলিতেছে এবং বারুণী-স্নানে পুণ্য সঞ্চয়ের মানসে বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া দূরদূরান্তর হইতে পুণ্য-জলাশয়ের তীরে সমবেত হইতেছে। লোকসমাগম হইলেই মেলা বসে, সেটা উপলক্ষ মাত্র ছিল। এখনকার কথা অবশ্য স্বতন্ত্র, অনেকে শুধু মেলা দেখিতেই যায়।

কিন্তু 'বারুণী' নামের অর্থ কি? স্মৃতিকার বারুণী-স্নানে এত গুরুত্ব দিলেন কেন? কতকাল ধরিয়া ভারতবাসী এই উৎসব প্রতিপালন করিতেছে? এখানে এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।

চৈত্র মাসের কৃষ্ণা-ত্রয়োদশীতে বারুণী। সেদিন চন্দ্র শতভিষা নক্ষত্রে থাকেন। ভারতীয় জ্যোতিষ যাঁহারা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, এক এক নক্ষত্রের এক এক দেবতা বা অধিপতি কল্পিত হইয়াছিলেন। যেমন, অশ্বিনীর অধিপতি অশ্বী, ভরণীর যম, কৃত্তিকার অগ্নি, রোহিণীর ব্রহ্মা, ইত্যাদি।* শতভিষা নক্ষত্রের অধিপতি হইলেন বরুণ। বরুণের সহিত সম্পর্কযুক্ত শতভিষা নক্ষত্রেরই নাম বারুণী। 'বারুণী-স্নানে'র অর্থ—যে তিথিতে চন্দ্র বারুণী অর্থাৎ শতভিষা নক্ষত্রে অবস্থান করেন সেই তিথিতে স্নান। কিন্তু চন্দ্র তো প্রত্যেক মাসেই একদিন করিয়া শতভিষা নক্ষত্রে থাকেন, তাই বলিয়া প্রত্যেক মাসেই তো বারুণীস্নান হয় না। ইহা হইতে বুঝিয়াছি বারুণী-দিনের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল।

স্মৃতিতে বারুণী-স্নানের এত মাহাত্ম্যের কারণ এই যে এককালে সেদিন নববর্ষ আরম্ভ হইত। নববর্ষ-দিবসটিকে স্মরণীয় করিবার জন্য নানাবিধ ধর্মানুষ্ঠান বিহিত হইয়া থাকে; স্নান-দান তাহাদের অন্যতম। বিজয়া দশমীর বিজয়যাত্রা, দ্যূত-প্রতিপদের দ্যূতক্রীড়া, দোলপূর্ণিমার আনন্দোৎসব, কোজাগরীর রাত্রিজাগরণ দশহরার গঙ্গাস্নান, এ সমস্তই নববর্ষোৎসবের লক্ষণ। বিশাল ভারতভূমির ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন দিবসে নববর্ষারম্ভের দৃষ্টান্ত অদ্যাপি পরিলক্ষিত হয়; প্রাচীনকালেও নিশ্চয় এইরূপ ছিল। বিগত বর্ষের সকল মালিন্য, সকল পাপ-তাপ—পুণ্য জলাশয়ের জলে ধৌত করিয়া নববর্ষে আমরা শুচি হইতে ইচ্ছা করি এবং দরিদ্রকে দান করিয়া মানবসেবায় ব্রতী হই। ভারত-কৃষ্টির সেই আদি-

* নক্ষত্রের অধিপতি-কল্পনার মূলে কি তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহা গবেষণার বিষয় এবং বিশদ আলোচনাসাপেক্ষ।

কাল হইতে স্নান ও দান পুণ্যানুষ্ঠানের বিশেষ অঙ্গরূপে পরিগণিত হইয়াছে। কিন্তু স্নান-দান বিশেষ বিশেষ 'যোগে'ই বিহিত হইয়াছে। এই 'যোগ' জ্যোতিষিক যোগ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহা নববর্ষারম্ভের শুভ দিবস। পিতৃ-পুরুষের উদ্দেশে আত্মফল নিবেদন শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের অনুবন্ধ মাত্র; ইহাও প্রাচীন-কালে নববর্ষ দিবসে অনুষ্ঠিত হইত।

কতকাল পূর্ব্বে বারুণীর দিন নববর্ষ আরম্ভ হইত? জ্যোতি-র্গণিতের সাহায্য লইয়া সেই কাল নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিতেছি। আমরা দেখিয়াছি, এককালে বারুণীর দিন নববর্ষ আরম্ভ হইত। নববর্ষ যে-কোন দিনে আরম্ভ হইতে পারে না, ইহার জন্ম বিশেষ জ্যোতিষিক যোগের প্রয়োজন হয়। এই জ্যোতিষিক যোগ বলিতে অয়নাদি অথবা বিষুব-সংক্রান্তি বুঝায়। বৎসরে দুই অয়ন ও দুই বিষুব। এক্ষণে ৭ই চৈত্র মহাবিষুব সংক্রান্তি হয়। বারুণী-স্নান কোন কোন বৎসর ৭ই চৈত্রের পূর্ব্বেও হইয়া থাকে। প্রাচীন-কালে চৈত্রমাসে মহাবিষুব-সংক্রান্তি হইতে পারিত না। অতএব বারুণী-স্নানের যোগ বিষুব-সংক্রান্তিতে নহে। মহাবিষুবের পূর্ব্ববর্ত্তী যোগ উত্তরায়ণ। অতএব নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়, উত্তরায়ণ দিনেই বারুণী-স্নান বিহিত হইয়াছিল। চৈত্র কৃষ্ণা-ত্রয়োদশী তিথি চৈত্র মাসের মাঝামাঝি ধরিতে পারা যায়। ইহা হইতে বুঝিতেছি, যে-কালে চৈত্র মাসের মাঝামাঝি রবির উত্তরায়ণ হইত, বারুণী-স্নানে সেই কালের স্মৃতি রক্ষিত আছে। সে কত কালের কথা? এখন ৭ই পৌষ রবির উত্তরায়ণ হয়। অতএব অয়ন দিন:

পৌষের ২২ দিন $=\frac{3}{4}$ মাস
মাঘ ৩০ দিন $=$ ১ মাস
ফাল্গুন ৩০ দিন $=$ ১ মাস
চৈত্রের ১৫ দিন $=\frac{1}{2}$ মাস

মোট $=$ ৩$\frac{1}{4}$ মাস

তদবধি ৩$\frac{1}{4}$ মাস পশ্চাদগত হইয়াছে। অয়নদিন একমাস পশ্চাদ্‌গত হইতে ২১৬০ বৎসর লাগে; অতএব ৩$\frac{1}{4}$ মাস পশ্চাদগত হইতে ২১৬০ $\times$ ৩$\frac{1}{4}$ $=$ ৭০২০ বৎসর, স্থূলতঃ ৭০০০ বৎসর লাগিয়াছে। সুতরাং খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৫০০০ অব্দ চৈত্র-কৃষ্ণা-ত্রয়োদশীতে রবির উত্তরায়ণ হইয়াছিল; বারুণী-স্নানে সেই স্মৃ[তি] রক্ষিত হইয়াছে।

অন্য উপায়েও এই কাল নির্ণীত হইতে পারে। পূর্ব্বে উল্লে[খ] করিয়াছি, বারুণীর দিন চন্দ্র শতভিষা নক্ষত্রে থাকেন। শতভি[ষা] চতুর্ব্বিংশ নক্ষত্র; অর্থাৎ অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রগণনায় ইহার স্থা[ন] চতুর্বিংশতিতম। কৃষ্ণা-ত্রয়োদশীতে রবি ও চন্দ্রের দূরত্ব হয় দু[ই] নক্ষত্র-ভাগ। অতএব সেদিন রবি থাকেন ষড়বিংশ নক্ষত্রে, উত্ত[র] ভদ্রপদায়; দোলপূর্ণিমার দিন রবি পূর্ব্বভদ্রপদা নক্ষত্রে থাকেন দোলপূর্ণিমায় অদ্যাবধি ছয় সহস্র বৎসর পূর্ব্বের উত্তরায়ণ দিনে[র] স্মৃতি রক্ষিত আছে।* অয়নদিন শনৈঃ শনৈঃ পশ্চাদগত হইতেছে এক নক্ষত্র-ভাগ পশ্চাদগত হইতে প্রায় সহস্র বৎসর সময় লাগে অতএব, যদি অদ্যাবধি ছয় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে দোলপূর্ণিমায় দি[ন] (রবির পূর্ব্বভদ্রপদায় অবস্থিতিকালে) উত্তরায়ণ হইয়া থা[কে] তবে নিশ্চয় অদ্যাবধি সাত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বারুণীর দিন (র[বির] উত্তরভদ্রপদায় অবস্থিতি কালে) উত্তরায়ণ হইয়াছিল। যাঁহা[রা] জানেন, ভারতে আর্য্য-সভ্যতার বয়স চারি সহস্র বৎসরের অ[ধিক] নহে, তাঁহাদিগকে একবার এ বিষয়ে চিন্তা করিতে অনুরো[ধ] করিতেছি।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। স্মৃতিতে বারুণীর দি[ন] 'মধু-কৃষ্ণা-ত্রয়োদশী' ব্রতের বিধান আছে। চৈত্র মাসের আ[র] নাম 'মধু'। যজুর্ব্বেদের কালে মধু-মাধব, শুক্র-শুচি, ইষ-উ[র্জ] ইত্যাদি ঋতু সম্বন্ধীয় মাস-নামের প্রচলন ছিল। যেকালে মধু[-] মাধব, এই দুই মাসে বসন্ত ঋতু ছিল, 'মধু-কৃষ্ণা-ত্রয়োদশী'[তে] সেই কালের ইঙ্গিত পাইতেছি। মধুমাস তখন বসন্ত-ঋতুর প্র[থম] মাস ছিল। যজুর্ব্বেদেই এই গণনা প্রসিদ্ধ আছে। আভ্যন্ত[রীণ] জ্যোতিষিক প্রমাণে যজুর্ব্বেদের কাল খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২৫০০ অ[ব্দের] নিকটবর্ত্তী বলিয়া অনুমিত হয়। অতএব মধু-কৃষ্ণা-ত্রয়োদ[শী] ব্রতে প্রায় ৪৫০০ বৎসরের পুরাতন স্মৃতি বিজড়িত আছে। [ক]কালের প্রাচীন ইতিহাস ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্ব্বণের মধ্য দিয়া আ[মরা] বাঁচাইয়া রাখিয়াছি, ভাবিলে বিস্ময়ে বিহ্বল হইতে হয় এবং হৃ[দয়] আনন্দে পরিপ্লুত হয়।

* পূজাপার্ব্বণ (দোলযাত্রা)—আচার্য্য যোগেশচন্দ্র [রায়] বিদ্যানিধি।
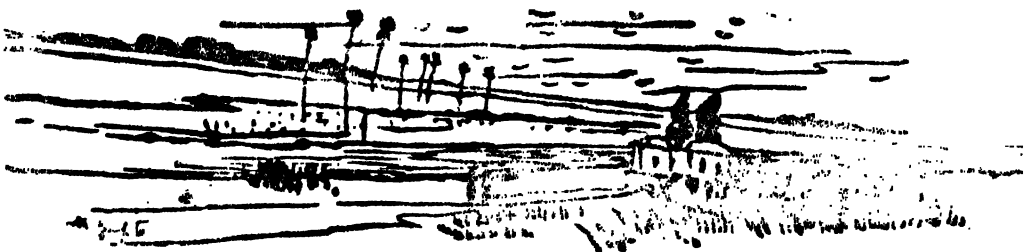
রবীন্দ্র-প্রসঙ্গে

শ্রীঅবনীনাথ রায়

বয়সের অঙ্কে আমার অর্দ্ধ শতাব্দী অতীত হয়েছে অনেক দিন। এখন পিছন ফিরে তাকাতে পারি। স্মৃতি-রোমন্থনের বিলাস এখন আমার প্রাপ্য। কিন্তু শুধুই কি বিলাস! পিছনে যা ফেলে এসেছি তার সবকিছুই আজ অপরূপ মহিমায় রঞ্জিত হয়ে ভেসে উঠছে। যা পেয়েছি তার পাওয়া যেন সার্থক হয়, যা পাই নি তার জন্য যেন মনে ক্ষোভ বহন না করি!

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ সে একেবারে আকস্মিক। তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছানো আমার পক্ষে দুরূহ ছিল। তিনি ছিলেন বীরভূম জেলার শান্তিনিকেতনের আশ্রম-গুরু, আমি ছিলাম যশোহর জেলার কোন পাড়াগাঁয়ের দরিদ্র পরিবারের নগণ্য সন্তান। তিনি তখনও নোবেল পুরস্কার পান নি, কিন্তু বাংলা কাব্যের কীর্ত্তি-শিখর তাঁর জ্যোতিতে তখন সমুদ্ভাসিত। ইংরেজী ১৯১১ সন। রবীন্দ্রনাথ এবং আমার মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান তা মানুষের বুদ্ধিতে সেদিন কোন মতেই অতিক্রমণীয় ছিল না; কিন্তু ঘটনাস্রোতে তা সম্ভব হ'ল। তাই ঘটনাটি এইবার বলছি।

তখন ব্রিটিশ শাসনের পীড়ন-নীতির যুগ। দেশকে স্বাধীন করার নির্ভীক চেষ্টা যেমন এক দিক দিয়ে চলছে, তেমনি অপর দিকে পুলিসের এবং গুপ্তচরের দৌরাত্ম্যে মানুষ তখন সন্ত্রস্ত। বাংলাকে দুই ভাগে বিভক্ত করে বাঙালীকেও ছিন্নভিন্ন করে দেওয়ার চেষ্টা লর্ড কার্জ্জন করেছিলেন। তারই প্রতিবাদকল্পে "ভাই ভাই, ঠাঁই ঠাঁই, ভেদ নাই, ভেদ নাই" এই মন্ত্র উচ্চারণ করে বাংলা ৩০শে আশ্বিন তারিখে ভায়েদের হাতে রাখী বেঁধে দেওয়ার বিধি নেতারা প্রবর্ত্তন করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল এই সত্য স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে, আমরা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বাস করলেও আসলে আমরা পৃথক নই—আমরা পরস্পরের ভাই। সেদিন অরন্ধনেরও ব্যবস্থা থাকত। রাখীবন্ধন পুণ্য ব্রত বলেই সেদিন গণ্য হ'ত। আমিও রাখীবন্ধনকে সেই ভাবেই নিয়েছিলাম। আমাদের গ্রামে আমি এবং আমার আর একটি বন্ধু ৩০-এ আশ্বিন রাখী বেঁধে বেড়িয়েছিলাম। গ্রামের এক ভদ্রলোক ছিলেন অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট এবং স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান। তিনি তখন চেষ্টা করছিলেন নানা রকমে সরকারের মনোরঞ্জন করতে, যার ফলে তিনি 'রায় বাহাদুর' খেতাব লাভ করতে পারেন, আমাদের রাখীবন্ধন করার ঘটনাটি তাঁর স্বার্থসিদ্ধির পক্ষে খুব লোভনীয় বলে মনে হ'ল। তিনি তা পল্লবিত করে কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করলেন। এই রিপোর্টের ফলে আমি এবং আমার বন্ধু দুই বৎসরের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হয়ে গেলাম।

পি. মুখার্জ্জি বা ফণীন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন তখন প্রেসিডেন্সী ডিভিশনের ইনসপেক্টার অব স্কুলস। আমাদের গ্রামের সঙ্গে তাঁর কিছু আত্মীয়তার যোগ ছিল। বাল্যকালে আমাদের গ্রামের স্কুলে তিনি পড়েছিলেন। তাঁর এক আত্মীয়ের কাছ থেকে চিঠি সংগ্রহ করে মুখার্জ্জি সাহেবকে ধরা গেল। তিনি ছিলেন অতিরিক্ত মাত্রায় সাহেবী মেজাজের। বেশ মনে পড়ে অত্যধিক সিগার খাওয়ার ফলে তাঁর দাঁতগুলি কালো হয়ে গিয়েছিল। বালিগঞ্জে ঝাউতলা রোডে তিনি থাকতেন। যাই হোক, তাঁর সুপারিশে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমার বহিষ্করণ এক বছরের জন্য মাফ হয়ে গেল।

এই সব কারণে গ্রামের স্কুলের উপর আমার রাগ হয়ে গিয়েছিল। যদি পারি ত অন্য জায়গায় পড়ি, এই রকম তখন মনের ভাব। অথচ যাই-ই বা কোথায়? এই মনোভাব নিয়ে কলিকাতায় একদিন বেড়াতে এলাম। আমাদের গ্রামের এক ভদ্রলোক রবীন্দ্রনাথের জমিদারী এষ্টেটে চাকরি করতেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে একদিন সকালবেলা ৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, জোড়াসাঁকোয় গেলাম। তাঁকে সমস্ত বলায় তিনি বললেন, তা এক কাজ কর না—বাবুমশায়কে একবার বলে দেখ না। উনি যদি মনে করেন, শান্তিনিকেতনে ওঁর স্কুলে তোমাকে নিয়ে যেতে পারেন। বাবুমশায় মানে রবীন্দ্রনাথ।

আমি বললাম, তা কি আর নেবেন?

হাজারিদা সাহস দিয়ে বললেন, চেষ্টা করতে দোষ কি?

একখানি শ্লেটে নাম লিখে হাজারিদা-ই পাঠিয়ে দিলেন।

তার পর বসে আছি ত বসেই আছি, কোন সাড়াশব্দ নেই। বোধ হয় ঘণ্টখানেক হবে।

দেখলাম দোতলার বারান্দা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন। আমি জমিদারী সেরেস্তার বারান্দায় যেখানটায় বসে ছিলাম, দোতলা থেকে সে জায়গাটা দেখা যায়। একটু পরে দেখি রবীন্দ্রনাথ হাতছানি দিয়ে আমাকে ডাকছেন। পুনঃপুনঃ অনুরোধ করা সত্ত্বেও যে দারোয়ানেরা আমাকে রবীন্দ্রনাথের দরবারে হাজির করে নি, তাদের মধ্যে তিন জন দেখি তিন দিক থেকে তখন আমার কাছে ছুটে এসেছে। তারা এক রকম ধরেই আমাকে রবীন্দ্রনাথের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের প্রথম অনুভূতিটা এখনও স্মরণ করতে পারি। সময় প্রাতঃকাল—কবি তাঁর অভ্যস্ত পোশাক পরে চটি পায়ে ধীরে ধীরে হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন। দীর্ঘকায়—লম্বা ছয়

ফুটেরও অধিক, কাঁচা পাকা দাড়ি, গৌরবর্ণ—রক্তের জ্যোতিঃ যেন গাত্রাবরণ ফুটে বেরুচ্ছে। চোখে পাঁসনে চশমা।

আমি যেতেই কবি থেমে দাঁড়ালেন। প্রণাম করতে হবে—হাজারি-দা বলে দিয়েছিলেন—আমি ভক্তিভরে কবির পদধূলি মাথায় নিয়ে প্রণাম করে দাঁড়'লাম।

কবি বললেন, কি গো, তোমার কোথায় বাড়ী ?

রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর এই আমি প্রথম শুনলাম। মনে হ'ল একাধিক বীণার তার যেন এক সঙ্গে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল। মানুষের কণ্ঠস্বর যে এত মিষ্টি হয়, ইতিপূর্ব্বে আমার সে ধারণা ছিল না।

তখন আমার পনের বৎসর বয়স—তবু মনে করতে পারি যে, ঐ কণ্ঠস্বরের মিষ্টতায় আমার কান জুড়িয়ে গিয়েছিল।

বাড়ী বললে কবি আমাদের গ্রাম চিনলেন—কারণ আমাদের গ্রামের দুই জন ভদ্রলোক ইতিপূর্ব্বে ঠাকুর এষ্টেটে ম্যানেজারি করেছিলেন।

আমি তাঁদের কেউ হই কি না জিজ্ঞাসা করার পর কবি একেবারে হঠাৎ আমাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি শান্তিনিকেতনে যাবে ?

আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম এবং মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম যে তিনি আমার প্রাণের কথা শুনেছেন।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, তা হলে তুমি পরশু দিন এখানে এসো—বেলা বারোটার গাড়ীতে আমরা বোলপুর যাব।

নির্দিষ্ট দিনে আমি কবির জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলাম—আমার সঙ্গে জিনিষপত্র বিশেষ কিছুই ছিল না।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমরা শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে পৌঁছে গেলাম। বোলপুর ষ্টেশন থেকে কবিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে একখানি ঘোড়ার গাড়ি এসেছিল। আশ্রমে প্রবেশ করার মুখে খুব একটা মিষ্টি ফুলের গন্ধ আমাকে অভিভূত করেছিল, একথা মনে আছে। পরের দিন সকালে দেখলাম সেটা মধুমালতী ফুলের গন্ধ—একটা দোতলা বাড়ীর গা বেয়ে গাছটি উপরে উঠে গেছে।

ভোজনাগারে রাত্রের আহার গ্রহণ করার পর সে রাত্রিটা গেষ্টরুমে কাটল। এই গেষ্টরুম তখন ছিল 'শান্তিনিকেতন' নামক দোতলা বাড়ীটার নীচের তলায়। পাশেই থাকতেন কবির ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পরের দিন সকালে উঠেই শুনি কবি আমাকে খুঁজছেন। আমি গেলে আমাকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়ে দিলেন এবং আশ্রমের আন্ত বিভাগে আমার থাকবার স্থান হ'ল।

এর পর প্রতিদিনের ব্যবহারিক জীবনে কবির কাছ থেকে যে স্নেহমমতা এবং সহৃদয়তা পেয়েছি, তার তুলনা বিরল। তিনি যে সব বিষয়েই কত বড়, তাঁর তুলনা যে একমাত্র তিনিই—একথা বোঝার বয়স তখন নয়। তাই তাঁর স্নেহের পরিপূর্ণ মর্য্যাদা তখন দিতে পারি নি—তাঁর লেখা কত চিঠি ছিল, একবার আমার পিসেমশায়ের বাড়ী যাওয়ার পথে সব হারিয়ে ফেলি। এবড়োখেবড়ো কাগজে কবিতা লিখে তাঁর কাছে নিয়ে যেতাম—দুপুরবেলা তিনি যখন শান্তিনিকেতনের 'হলে' বসে চিঠি লিখতেন, তখন তাঁর কাছে গিয়ে বলতাম, আমার কবিতা কারেক্ট করে দিন। আশ্চর্য্যের বিষয় কোন দিন বিরক্ত হন নি, তাড়িয়ে দেন নি—হাসিমুখে কবিতা সংশোধন করে দিয়েছেন। আজ তাই মনে মনে ভাবি, আর চোখ জলে ভরে আসে।

রবীন্দ্রনাথ কোন বিষয়েই 'না' বলতে জানতেন না। কোথায় যেন পড়েছিলাম অজিত বাবু (অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী) রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পদ্মায় বোটে বাস করেছিলেন। একবার গ্রীষ্মের ছুটির প্রাক্কালে আমি বায়না ধরলাম, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শিলাইদা যাব। তিনি রাজী হলেন। সঙ্গে ছিলেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তখন সেই সময় রবীন্দ্রনাথ আর পদ্মায় বোটে থাকতেন না—তখন "কুঠীবাড়ী" তৈরী হয়েছে। এখানে থাকার বিবরণ আমি ইতিপূর্ব্বে অন্যত্র লিখেছি।

রবীন্দ্রনাথের স্নেহের, প্রীতির, মহানুভবতার ছোটখাটো কাহিনী আমি ইতিপূর্ব্বে অনেক লিখেছি—তবু যেন মনে হয় সে কাহিনী ফুরাবার নয়। তার কারণ সে কাহিনীর জন্মস্থান আমার চিত্তভূমি—সেখানে সে সব স্মৃতি বিচিত্র রঙে অনুরঞ্জিত হচ্ছে—সে পুরানো হতে পারে না।

সেই স্মৃতির অতল থেকে আর একটি ঘটনা উদ্ধৃত করে এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করব।

আমি যখন মীরাটে ছিলাম তখন আমার এক হিন্দুস্থানী বন্ধু ছিলেন—তাঁর নাম ভগবৎ দয়াল। তিনি দিল্লীর রামযশ কলেজ থেকে ইংরেজীতে এম-এ পাস করে পিলানী কলেজে অধ্যাপকতা করেন—এখন মিঃ বিড়লার প্রাইভেট সেক্রেটারী হয়েছেন। তিনি এক বার প্রস্তাব করলেন যে, তিনি বাংলাদেশ দেখতে আসবেন—আর বাংলাদেশের মহাপুরুষদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করবেন। তাঁর ধারণা ছিল এই যে, বাংলাদেশের বরিশাল জেলা দেখলেই বাংলাদেশ দেখা হ'ল এবং রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে দেখলেই বাংলাদেশের মহাপুরুষদের দর্শনলাভ শেষ হ'ল। করলেনও তাই—কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি বাংলাদেশ পরিক্রমা করে মীরাটে ফিরে এলেন। যে রাত্রে মীরাটে ফিরলেন তার পরদিন সকালেই তিনি আমার বাসায় এসে হাজির। আমার কাঁধে একটা প্রকাণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, "How the hell Tagore knows you so deeply—he was speaking of you for half an hour"। ভগবৎ দয়ালের তখন ভাব এসে গিয়েছিল। সাধারণতঃ তিনি হিন্দীতেই আমাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতেন—কখনো বা ইংরেজীতে—বাংলাও কিছু কিছু বুঝতেন, যদিও বলতে পারতেন না। বাঙালীদের মত তিনি ধুতি কামিজই পরতেন—তাঁর রঙ ছিল তপ্ত কাঞ্চনের মত। তাঁকে বাঙালী বলে ভুল করা অস্বাভাবিক ছিল না।

ঘটেছিল ও তাই—রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রণাম করে দাঁড়িয়ে

বলেছিলেন, তিনি মীরাট থেকে এসেছেন। মীরাটের কথা উঠতেই রবীন্দ্রনাথ আমাকে স্মরণ করেছেন এবং আধ ঘণ্টা ধরে কিছু বলেছেন। ভগবৎ দয়ালের কাছ থেকে না রাম না গঙ্গা কোনরূপ প্রত্যুত্তর না পেয়ে রবীন্দ্রনাথের হুশ হয়েছে যে, যাকে উদ্দেশ্য করে কথা বলছেন তিনি বাঙালী ত? তখন রবীন্দ্রনাথ ভগবৎ দয়ালের দিকে ফিরে তাকিয়েছেন এবং তাঁর মুখ দেখে বুঝতে পেরেছেন যে, তিনি তাঁর বক্তব্য বড় একটা বুঝতে পারেন নি। তারপর ক্ষমা চেয়েছেন। ভগবৎ দয়াল সঙ্কুচিত হয়ে বলেছেন—না, না, এতে তাঁর কিছুমাত্র অপরাধ হয় নি—সব কথা বুঝতে না পারলেও তাঁর অনুপম কথাগুলি তিনি উপভোগ করেছেন এবং মাঝপথে বাধা দিয়ে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হতে চান নি।

এই ত গেল ঘটনা। এখন ভগবৎ দয়ালের সমস্যা হ'ল এই যে, রবীন্দ্রনাথের মত এক জন বিশ্ববিশ্রুত ব্যক্তি উত্তরপ্রদেশের এক জন সাধারণ প্রবাসী বাঙালীর সম্বন্ধে আধ ঘণ্টা ধরে কি বললেন। আমাদের দেশে বড়লোক বলতে তাঁদের বোঝায় যাঁদের দরজায় দারোয়ানের বাহুল্য এবং যাঁদের বস্ম ভেদ করে গৃহস্বামীর কাছ পর্যন্ত পৌঁছানো দুরূহ ব্যাপার। তাঁরা সকলের সঙ্গে পরিচয় রাখেন না বা পরিচয় থাকলেও স্বীকার করেন না—কারণ, তাঁদের পরিচয়-স্বীকৃতির মানদণ্ড নির্ভর করে পরিচিতের সাংসারিক অবস্থা বা ষ্টেটাসের উপর। তাঁর ধারণা রবীন্দ্রনাথও ত সেই ধরনের বড়লোক—আভিজাত্যে, ধনে, মানে, যশে একেবারে উদ্ভাসিত। তাঁর সঙ্গে পরিচয় রাখার দাবি করতে পারেন তিনি—ধনে, মানে, আভিজাত্যে যিনি তাঁর সমকক্ষ—অন্ততঃ কাছাকাছি। সেই রবীন্দ্রনাথ আমার মত এক জন সামান্য লোকের সঙ্গে শুধু সম্বন্ধ-স্বীকারই করলেন না, তাঁর প্রসঙ্গে একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। এ ব্যাপার ভগবৎ দয়ালের কাছে প্রহেলিকা বলে তো বোধ হবেই।

ভগবৎ দয়ালের কাছে আমি সেদিন যে উত্তর দিয়েছিলাম সেটা আজও মনে আছে। আমি ভগবৎ দয়ালকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আচ্ছা, টেগোর আমার কথা এমন করে বলেছেন দেখে তুমি ত একেবারে অবাক হয়ে গেছ। মনে কর, তাঁর যদি কোন সন্তান মীরাটে থাকত এবং তুমি যদি তার কাছ থেকে গেছ এমন হ'ত, তবে তিনি কি তার কথা অমন করে বলতেন না? এর মানে কি এই যে, সেই ছেলে গুণে জ্ঞানে বিত্তাবত্তায় একেবারে পিতার সমকক্ষ?

ভগবৎ দয়াল আমতা আমতা করতে লাগল। বললে, সে আলাদা কথা—তা হয়ত তিনি বলতেন···কিন্তু এ ত সে রকম নয়···

আমি বুঝতে পারলাম রবীন্দ্রনাথের সন্তান বলে আমি যে স্থান নিয়েছি তাতে ভগবৎ দয়ালের মন সায় দিচ্ছে না।

আমি কথাটা ঘুরিয়ে আর এক রকম করে বললাম। বললাম, মনে কর টেগোরের যদি কোন অনুগত প্রিয় জন মীরাটে থাকত এবং তুমি যদি তার কাছ থেকে যেতে, তবে কবি তার কথাও কি অমনি করে বলতেন না?

এখানে আর একটা কথাও জানিয়ে রাখতে পারি। প্রিয় ভৃত্য সম্বন্ধে পর্যন্ত তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন। রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ভৃত্য উমাচরণের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের স্নেহের অন্ত ছিল না—এ আমরা নিজের চোখে দেখেছি।

ভগবৎ দয়াল কি বুঝল জানি না, খুশী হ'ল কি না তা-ও বলতে পারি না, কিন্তু সে আর কথা বাড়াল না। বাড়ী চলে গেল।

জীবনে আমাদের এই ভুলই হয়। মহাপুরুষদেরও আমরা নিজেদের প্রচলিত বাটখারায় ওজন করি এবং তার সঙ্গে না মিললেই দোষারোপ করি। ভুলে যাই যে, প্রচলিত মাপকাঠির সীমাকে অতিক্রম করেছেন বলেই তাঁরা মহাপুরুষ, তাঁদের হৃদয়ের ঔদার্য এবং বিস্তৃতি সীমাহীন—তাঁদেরই স্নেহরসধারায় যুগে যুগে মানুষ তৃপ্ত হয়েছে, জ্বালা জুড়িয়েছে, জীবনপথের পাথেয় সংগ্রহ করেছে।

পঁচিশে বৈশাখ

আ. ন. ম. বজলুর রশীদ

বিশ্ববাসী শোনো শোনো অমৃতের পুত্র আমি শোনো—
পেয়েছি আলোর স্বাদ, এই স্বাদ হয়তো কখনো
আসিবে জীবনে ফিরে—অকস্মাৎ অন্য জন্মান্তরে
প্রতিটি প্রভাতে। দেখি অন্ধকার দূরে যায় সরে
পূর্বাচলে আদিত্যের হিরণ্ময় নিঃশব্দ প্রকাশ
পৃথিবীতে, এই জন্মে কত মুক্ত প্রাঙ্গন আকাশ
পেয়েছে তাহার স্পর্শ। ধন্য আমি, ঘাসের ডগায়
রাতের শিশিরবিন্দু ঝলোমলো প্রসন্ন লতায়—
নতুন পাতার মেলা ফুলে ফুলে শালমঞ্জরীতে—
সূর্যের সরাগ স্পর্শ সপ্তপর্ণে রক্তকরবীতে
এই মুখে চোখে আহা, ভরে যায় তৃপ্তিতে হৃদয়
জীবন ফুলের মত, কত বর্ণ রস গন্ধময়।
আছে দুঃখ মৃত্যু, তবু পৃথিবীর মাটিতে প্রথম
জেনেছি সুন্দর তুমি—অপরূপ তুমি প্রিয়তম;
এখানে তৃণের সাথে ভাগ করে লয়েছি প্রসাদ
তোমার প্রেমের। বন্ধু, জীবনের তিক্ততা বিষাদ
ভুলেছি। আশ্চর্য কত রাত্রি নামে বিবর্ণ প্রান্তরে
অথবা অবাক স্বপ্নে, সংখ্যাতীত দুঃসহ প্রহরে
তিমিরের প্রান্তে তুমি, জানিলাম প্রাণের আত্মায়
পঁচিশে বৈশাখে তাই রেখে যাই আমার প্রণাম।

আশায় আশায়

শ্রীরামশঙ্কর চৌধুরী

—বসে কে? বিনোদিনী নাকি? জিজ্ঞেস করল জগু।

সদর শহর থেকে রাত্রি নয়টার শেষ বাস 'আগমনী' এসে থামল ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের পাকা রাস্তার উপর। পৌঁছতে রাত্রি হয় বাসটার। ঠিক সময়ে কোন দিনই আসে না। কখনও রাত্রি দশটা কখনও বা আরও অধিক। ঘুমিয়ে পড়ে সারা গ্রামখানি। নামো কুলির বাউরীদের ঘরের দরজায় 'আগুড়' পড়ে যায়। জেগে থাকে শুধু বাস ষ্ট্যাণ্ডের কয়েকটি দোকান। যাত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ চা খায়। দূরের যাত্রীদের খাবার ব্যবস্থাও করে। সারাটা রাত তারা দাতব্য চিকিৎসালয়ের বারান্দাটায় পড়ে থাকে সকালের অপেক্ষায়। জেগে থাকে রাস্তার অপর পারের রাণীসায়রের পাড়ের উপর ছোট্ট চালাঘরটায় গোষ্ঠ বাউরী। বসে বসে পুকুর পাহারা দেয়—কেউ যাতে মাছ চুরি করে না নিয়ে যেতে পারে! জেগে থাকে কয়েকটি অর্দ্ধ-উলঙ্গ কালো মানুষ। চায়ের দোকানের এক পাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে থাকে বাসের প্রতীক্ষায়, দু' চার পয়সা রোজগারের আশায়। একটা কুকুর রাস্তার উপর পড়ে-থাকা বেঞ্চির পাশে বসে লাল ফেলে। আর এদের সঙ্গেই জেগে বসে থাকে বিনোদিনী। সারাটা দিন বাবুদের ঘরে খেটে এসে সন্ধ্যায় নিজের ঘরে ঢোকে। বুড়ো বাপ নেপাল খানদারকে খাইয়ে দিয়ে শুতে বলে, এসে বাইরে বসে থাকে।

প্রত্যহই এই ঘটনা ঘটে! কিসের একটা দুর্দ্দমনীয় আকর্ষণ তাকে টেনে এনে বাইরে বসিয়ে দেয়! কতবার মানা করেছে নেপাল, সে মানা কানে তুলে নি বিনোদিনী। আজও তাই এসে বসেছিল। যতক্ষণ বাসটা না এসে পৌঁছয় ততক্ষণ বিনোদিনীর দৃষ্টি থাকে সামনে প্রসারিত। কান দুটো সজাগ থাকে একটা যান্ত্রিক শব্দ শুনবার আশায়, মাঝে মাঝে প্রান্তরের উপর দিয়ে এক ঝলক পাগলা হাওয়া এসে ওর বুকের আঁচল উড়িয়ে দেয়, পরিপাটি করে বেঁধে রাখা মাথার চুলের গুচ্ছকে স্থানচ্যুত করে দেয়। শিউরে উঠে বিনোদিনী। চমকে উঠে আশগাছের শুকনো পাতার কম্পনে। একটা অদ্ভুত শব্দে ভীত হয়ে কয়েকটা শেয়াল আখের ক্ষেত থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে রাস্তার ধারে দাঁড়ায়। একবার পিছন ফিরে দেখে নেয় কেউ আসছে কি না, তার পরেই চলে যায়। এই সব দেখতে দেখতেই সময় কেটে যায় বিনোদিনীর। সন্ধ্যা হতে রাত্রি এগারোটার এ পাড়ার ইতিহাস বিশদ ভাবে বলে দিতে পারে বিনোদিনী। কখনও কখনও এই পরিবেশ তার কাছে অসহ্য মনে হয়। মনে হয়—এখান থেকে, এই গ্রাম থেকে দূরে, বহু দূরে গিয়ে বাস করে। আবার কখনও ভালবাসতেও মনে হয় তার। এই পরিবেশের মধ্যে যে তার আত্মিক জীব[ন] তার জৈব জীবন আছে জড়িয়ে। ঐ প্রান্তর, ঐ আখক্ষে[ত] ঐ পাগলা হাওয়া, এমনকি ভীত-সন্ত্রস্ত শেয়ালগুলোও [তার] কাছে অত্যন্ত আপন বলে মনে হয়। কোন কোন দিন এ[দের] একটার অদর্শনে কষ্ট পায় বিনোদিনী।

জগু বাউরী 'আগমনী' বাসের ক্লীনার। সংসারাস্তই পা[য়] কিন্তু মাইনের জন্য সে এ চাকরি নেয় নি। তার সাধ, [সে] ড্রাইভার হবে। হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সে গাড়ী চালা[বে।] আশপাশের পরিদৃশ্যমান জগৎটার চেহারা ক্ষণে ক্ষণে প্রতিফ[লিত] হবে তার গাড়ীর মাডগার্ডের উপর। গর্ব্বে তার বুকখানা [ফুলে] উঠবে। তখন তার চাহিদা কত হবে। সবাই চাইবে [এই] ড্রাইভারকে। তাই গাড়ী-পরিষ্কারকের চাকরি নিয়েই ঢুকে[ছে] জগু 'আগমনী' কোম্পানীতে। কাজ তাকে সবই করতে হ[য়।] ইঞ্জিনে জল ভরা, গাড়ীর 'বডি' পরিষ্কার করা। কোন কল[কব্জা] বিগড়ে গেলে গাড়ীর নীচে চিৎ হয়ে শুয়ে তাই পুঙ্খানুপুঙ্খ[রূপে] পরীক্ষা করা—এমনকি ড্রাইভার কণ্ডাক্টারের কাপড়-জা[মায়] সাবান লাগিয়ে দেওয়া, তাদের ফাই-ফরমাশ খাটা কাজও ত[াকে] করতে হয়। রাত্রিতে গাড়ীটাকে গ্যারেজে তুলে দিয়ে [গাড়ীর] বেঞ্চগুলি পরিষ্কার করে ড্রাইভার আর কণ্ডাক্টারের বি[ছানা] পেতে দিয়ে বাড়ীতে ফিরে সে।

আজও ফিরছিল।

বিনোদিনী জিজ্ঞেস করলে, গাড়ীর পেসিঞ্জার সব [...] নাকি জগু?

—হ। আজ পেসিঞ্জারই নাই। একেবারে ফাঁকা গ[াড়ী] লিয়ে আইলুম। এমনি দিনকতক চললে কোম্পানী [লাটে] উঠবেক।

একটা ভারী নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল বিনোদিনীর বুক ঠে[লে।] সে উঠে দাঁড়াল।

জগু একটা বিড়ি বের করে ধরাল। বিনোদিনীর হ[াতে] একটা সিগারেট তুলে দিয়ে বলল, লে খা।

সিগারেটটা মুঠোর মধ্যে রেখে বিনোদিনী জিজ্ঞেস ক[রে,] শহর থেকে আসছিস, কিছু লোতুন খবর আনিস নাই জগু?

জগু জানে কোন্ নতুন খবরের আশায় এমন নিঃসঙ্গ অ[বস্থায়] আজ তিন মাস এই দরজার গোড়ায় বসে থাকে বিনো[দিনী।] কিন্তু প্রত্যহ তাকে ব্যথা দিতে কষ্টই অনুভব করে জগু। যা সত্য তাই বলতে হয়।

—না রে। ঢের কাজ যে নিশ্বাস ফেলবার সময় পাই না। তার খবর নিবি কি ?

মেয়েটার উপর কেমন যেন একটা সহানুভূতি জাগে জগুর অন্তরে। ওর দুঃখের একটুখানি পরশ হয়ত জগুর মনে গিয়ে ছোঁয়া লাগায়। তাই বললে 'আজ ঢের রাত হৈছে, বিনোদিনী শুগা যা, কাল নিয়ে আসব খবর।' খবর—একটি খবরের জন্য আজ তিনটি মাস এমনি ভাবে দিন কাটছে বিনোদিনীর। একটি খবরের আশায় এমনি ভাবে বাইরে এসে বসে থাকে বিনোদিনী। কিন্তু সব দিনই তাকে হতাশ হয়ে উঠে যেতে হয়, আজও তাই।

—দেখিস ভুলিস না জগু। কুম্পানীকে কৈয়ে চুক্‌সা সোময় নিয়ে নিবি না হয়—বলল বিনোদিনী।

তখন বেশ খানিকটা দূরে চলে গিয়েছে জগু। হয়ত তার কথা জগুর কানেই গেল না। সে কোন উত্তরই দিল না। শুধু নেড়াত জানালে—হাঁ, তাই করবে।

অতিভূষণ চক্রবর্তী নকুলের মনিব ছিল না। অতিভূষণ গাঁয়ের মালিক। হাজার বিঘা জমির একচ্ছত্র অধিপতি। এ ছাড়া আছে পাহাড়-জঙ্গল। অতিভূষণের কাঁটা-পাহাড়ী জঙ্গলের পাশেই দীর্ঘকাল ধরে পড়ে-থাকা একটা জায়গায় গরু চরাত নকুল। সকাল হলেই বাড়ী-বাড়ী গিয়ে গাঁয়ের গরুগুলিকে গোয়াল থেকে খুলে নিয়ে যেত কাঁটা-পাহাড়ীর মাঠে। এই খানেই গাঁয়ের বাথান। এটাই গোচারণভূমি। গরুগুলি মনের আনন্দে মাটিতে মুখ লাগিয়ে কচ কচ করে ছিঁড়ে নিয়ে আসত ঘাসগুলিকে ভিতের সাহায্যে। জাবর কাটত। আর নকুল একটা গাছের ছায়ায় বসে আপন মনে সুর ভাঁজত। সুরের লহরী সৃষ্টি করত নকুল—কবি নকুল, গায়ক নকুল। সন্ধ্যাবেলায় গরুর ক্ষুরের আঘাতে গ্রামের ধূলি রাস্তায় যবনিকা রচনা করত। ওদের নিয়েই ওর জীবন—ওরাই ওর সারা দিনের সঙ্গী। সন্ধ্যায় গোয়ালে গরুগুলিকে বেঁধে দিয়ে বলত—আজকার মতন থাক আবার কাল সকালে যাবি। ওদের আদর করে গলকম্বলে একবার হাত বুলিয়ে দিত। ঊর্দ্ধমুখে তাকিয়ে থাকত গরুগুলি। হয়ত ওর বিচ্ছেদ ওদের সহ্য হ'ত না। হাসত নকুল ওদের রকম দেখে।

রাত্রির খাওয়া-দাওয়ার পর গানের আসর বসত নেপালের ঘরে। ছোট্ট উঠানের উপর একটা চাটাই বিছিয়ে দিত বিনোদিনী। নেপাল তার ঢোলটা কোলের উপর নিয়ে বসত। সুর গাইত নেপাল—'কালা আমার বেলায় তুমি শুধু কালা হে।' গোরা পাগলার ঝুমুর ওর গলায় খেলত ভাল, যারা শুনত তারা মুগ্ধ হয়ে যেত। বিনোদিনীর আর গৃহস্থালির কাজ করা হ'ত না। হাতের কাজ ছেড়ে দিয়ে এসে বসত অদূরে। মুগ্ধ হয়ে গান শুনত আর মনে মনে তারিফ করত, তারই সঙ্গে একটি গোপন বাসনাও উঁকি মারত তার মনে। কিন্তু সে বাসনাকে কোনদিন প্রকাশ হতে দেয় নি বিনোদিনী। আশঙ্কা হ'ত,পাছে যেটুকু চিত্ত ভাবে পাচ্ছে—সেটুকুও না হারিয়ে যায়! এমনিতেই গাঁয়ের লোকে, পাড়ার লোকে তার নাম দিয়েছে 'ভাতারখাওকী'। নেপাল দু' দুবার বিয়ে দিয়েছিল বিনোদিনীর, দু' বারই তাকে বিধবা হতে হয়েছে। এর পর নেপাল আবার চেষ্টা করেছিল মেয়ের সাঙা দেবার, কিন্তু আপত্তি তুলেছিল বিনোদিনীই। তাই আর সে পথে এগোয় নি নেপাল। সেদিনের অনিচ্ছার আচ্ছাদনে কোথায় একটি বাসনার বীজ হয়ত অনাদৃত হয়ে পড়েছিল, আজ তাকে অঙ্কুরে পরিণত হতে দেখে পুলক-শিহরণ জাগত তার শুকিয়ে-যাওয়া যৌবন-সরসীর নীরে। নব অঙ্কুরটিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠত বিনোদিনী। একটুখানি পরশ পাবার আশায় মাঝে মাঝে তামাক সেজে নিয়ে আসত সে, আপত্তি করত নকুল। নেপালকে বলত, আমি থাকতে আবার বিনোদিনী কেনে শুরুচী! হাসত নেপাল। নকুল বিনোদিনীর হাত থেকে কল্‌কেটা কেড়ে নিয়ে বলত, বিনোদিনীর অমন সোনার রং আগুনের তাপে গৈলে যাবেক যে!

সোনার রং অবশ্য নয় বিনোদিনীর। তবু প্রশংসা শুনে খুশীই হ'ত সে। আস্তে আস্তে বলত, গলে গেলেই বা কার কি ক্ষতি শুনি ?

—সে তুইই জানিস—বলে হেসে উঠত নকুল।

নকুলের মনের কথাটা শুনতে সাধ হ'ত বিনোদিনীর, কিন্তু নকুল বড় দুষ্ট। পীড়াপীড়ি করেও তার মুখ থেকে কোন কথা বের করা যেত না। শুধু বলত, সময় হৈলে বৈলব!

মাঝ রাত্রি পর্যন্ত চলত ঝুমুরগান। আগমনী বাসের কনডাক্টার একবার উঁকি মেরে যেত বাইরে থেকে। তার পর গিয়ে হয়ত ঘুমিয়েই পড়ত বাসের ভিতর। নামো কুলির বাউরীদের এই নৈশ আসর সারা গ্রামে ছড়িয়ে-থাকা নৈঃশব্দ্যের গায়ে আঘাত হানত। আখক্ষেত থেকে শৃগালগুলো বেরিয়ে এসে বাউরীদের হাঁস মুরগী ধরতে পারত না।

গান শুনতে শুনতে কোন্ সময় খালি মাটির উপরই শুয়ে পড়ত বিনোদিনী, ঘুমিয়ে যেত। নকুল তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে সুর করে গাইত :

শুন বিনোদিনী রাই
ভূমিশয্যা ছাড় এবার—
তোমার ধুলায় অঙ্গ সাজে নাই।

ঘুম ভেঙে যেত বিনোদিনীর—তবু যেন উঠতে মন চাইত না। তাই ছল করে পড়ে থাকত মাটিতে। নেপাল বলত, উয়াকে উঠাঞে দে নকুল, শুক্ আইসে বিছানায়।

নকুল হাত ধরে তুলে দিয়ে বলত—'সাঙ্গ হৈল ব্রজের মেলা, শুগে বিনু এই বেলা।'

হেসে উঠত বিনোদিনী। চুপি চুপি বলত, কাল মেলা বৈসবেক ত।

এমনিই চলছিল জীবনের সাবলীল গতি। কোথাও বাধা নেই—বিঘ্নহীন। অকস্মাৎ কোথা থেকে একটা প্রতিবন্ধ এসে

থামিয়ে দিল ধারার গতি। আবর্ত্তিত হ'ল জীবনস্রোত। গুমরে গুমরে উঠল ফেনপুঞ্জ। বাধাকে সরিয়ে দেবার জন্ম দেখা দিল আবদ্ধ স্নেহের সংগ্রাম।

নেপালের বাড়ীতে আসা অকস্মাৎ বন্ধ হয়ে গেল নকুলের। সান্ধ্য আসরের অভাবে নেপালের ছোট্ট উঠানখানি খাঁ খাঁ করতে লাগল। নৈশ বাতাসের তরঙ্গে তরঙ্গে ভেসে-যাওয়া নেপালের কণ্ঠসঙ্গীতের মূর্চ্ছনা হয়ে গেল বন্ধ। হাঁপিয়ে উঠল নেপাল। তার ঢোলটার গায়ে জমে গেল ধুলো। একদিন বিনোদিনীকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, নকুল আর আসে না কেনে বিনি? তুই কি কিছু কয়্যাছিস উয়াকে?

বিনোদিনীরও ঐ জিজ্ঞাসা। কিন্তু সাহস করে সে শুধাতে পারে নি তার বাবাকে। আজ বাপের প্রশ্নের উত্তরে বলল, আসে না কেনে তা আমি কি কৈরে জানব। আমি কি কইব শুনি?

অভিমানে গুমরে গুমরে উঠল তার বুক। বারকয়েক সে গিয়েছিল নকুলের বাড়ীতে। নকুলের সঙ্গে দেখা হয় নি—সাহস করে নকুলের মাকেও জিজ্ঞেস করতে পারে নি বিনোদিনী। এক এক বার ঐ মানুষটার উপরও তার রাগ হ'ল, এ কেমনতর আচরণ?

—না আমি কইছি নাই উ কথা।

বলি যদি কিছু কয়্যাছিস। একবার খোঁজ লে বিনু।

খোঁজ নিল বিনোদিনী। পেল সন্ধান। না আসার কারণ জানতে পারল নকুলের মার কাছ থেকেই।

—আমার বাবা ত তুমার ব্যাটার তরে ক্ষ্যাপে গেইছে খুড়ি!

—আ বাছা উয়ার কি আর এখন ঘরে থিতি আছে। ক্ষ্যাপে গেইছে বাছা, নকুলও আমার ক্ষ্যাপে গেইছে। বলে, আজ তিন-চার পুরুষের অধিকার এমনি ছাড়্যা দিব? তাই বটে, বাছা আজ ত লোতুন লয়—ঐ খাঁটীপাহাড়ীর তলেই ত এই গাঁয়ের গোরু চরে—তা লোতুন হুকুম দিয়াছে চকরবর্তী, উঠ্যানে গোরু চরান বন্ধ হয়্যা গেইছে। ই কেরেই ত খাচ্ছিলুম বাছা, এখন খাওয়াও— আর বলতে পারল না নকুলের মা। সব ব্যাপারটা সম্যক উপলব্ধি করল বিনোদিনী।

দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ চক্রবর্তীর। হাজার বিঘা জমির আয়েও দিন চলে না—তাই খাজনা চেয়েছিল চক্রবর্ত্তী নকুলের কাছে— গোরুপ্রতি এক আনা! আর তা না দিতে পারলে গোরু চরানো বন্ধ। সুদের কারবার করে বড়লোক হয়েছে চক্রবর্ত্তী, তাই সবকিছুতে সুদের অঙ্কই কষে সে।

মনে মনে নকুলকে তারিফ করে বলল, ইটা অন্যায় কৈরেছে চকরবর্তী। তুই ত বাছা উয়াদের ঘরে কাজ করিস, শুনেছি কর্ত্তা নাকি তুখে ভালবাসে, একবার কয়্যা দেখবি—যদি টুকচা লয়্যা কৈরে।

—সে লোক অহি চকরবর্তী লয় খুড়ি। তুমি ত জান উ কেমন লোক। না পারে এমন কাজ নাই, না করে এমন অন্যায় নাই।

সত্যই তাই। প্রতিপক্ষকে জব্দ করবার জন্য, নিজের মাথা নিজের হাতে কাটিয়ে দিতে পারে। তার চেয়েও শক্ত কাজ করার কথাও জানে বিনোদিনী। মানুষকে খুন করতে ওর প্রাণে কষ্ট হয় না।...

হঠাৎ একটা ছবি মনে হতেই শিউরে উঠল বিনোদিনী। চক্রবর্ত্তীর বাবা এক সময় চিকিৎসালয় করতে জমি পুকুর আরো সব কি কি দান করেছিলেন দশকে। সে জমির উপর পাকা ঘর তুলে হয়েছিল চিকিৎসালয়। তার চিকিৎসক ছিলেন মণীন্দ্র রায়। বুড়ো চক্রবর্ত্তী মরে যাওয়ার পর অহি চক্রবর্ত্তী উক্ত দান করা জমি ফিরে পাবার জন্য একদিন নোটিস দিল চিকিৎসককে। কিন্তু দানের সর্ত্ত ছিল যতদিন চিকিৎসালয় থাকবে ততদিন জমি থাকবে চিকিৎসালয়ের। তাই উত্তর দিয়েছিলেন মণীন্দ্র রায়। কিন্তু এর পরিণাম হয়েছিল বড় মর্ম্মন্তুদ। একদিন চিকিৎসককে তার নিজের বাড়ীতেই রক্তাক্ত অবস্থায় মৃত দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। কারা তার গলাটা কেটে দিয়েছিল, আজও তার হদিস হয় নি। কিন্তু বিনোদিনী জানে। যে পুলিস এসেছিল তদন্তে তাদের কাছে ঘটনাচক্রে সব শুনেছে সে। পাপ কখনো ঢাকা থাকে না। ঐ খুনের সঙ্গে অহিভূষণের নামটা জড়িয়ে আছে, কিন্তু মুখ ফুটে কেউ বলতে সাহস করে না।

তাই আজ আশঙ্কায় তার বুক ঢিপ ঢিপ করে উঠল। নকুলের মা কোন জবাবই দিল না। মুখখানি দুশ্চিন্তায় শুকিয়ে গেল। নকুলের মাকে নীরব থাকতে দেখে বিনোদিনী বলল, চকরবর্তীদের সাথ লিয়াই কৈরে কেউ কি ট্যাকতে পারাছে খুড়ি?

—তুই একবার উয়াকে বুঝায়ে বল বিনু।

যেমন করেই হোক্ নকুলকে এই সর্ব্বনাশা পথ থেকে টেনে নিয়ে আসবার জন্য বিনোদিনী উঠে পড়ে লাগল। কিন্তু যাকে টেনে আনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তার সঙ্গেই দেখা হ'ল না বিনোদিনীর। সারাটা দিনের মধ্যে ঘরে বা গাঁয়ে তাকে পাওয়া যায় না। কোথায় যায়, কি করে কেউই বলতে পারে না— এমনকি নকুলের মা-ও নয়। জিজ্ঞেস করতে একদিন বলেছিল নকুলের মা, কোথায় যায় কি করে তাই কি আমাকেই কয় বিনু।

—রাতে ঘরকে আসে ত?

—কখন আসে, কখন আসে না। উয়ার দশা দেখে আমার বড় ভয় হয় বিটি। কাজ নাই আমাদের গোরু চরাঞে খাবার। দশটা লয় পাঁচটা লয়—ঐ একটি—

শেষ করে আর বলতে পারে নি নকুলের মা। বেদনার শক্ত একটা পিণ্ড গলায় আটকে গিয়েছিল।

বাবুদের বাড়ীর কাজ সেরে ফিরতে ইদানীং একটু রাত্রিই হয় বিনোদিনীর। বড় বাবুর সম্বন্ধী তাঁর পরিবার নিয়ে এসেছেন।

সঙ্গে কয়েকটা কাচ্চাবাচ্চাও আছে। কাঁখে-পিঠে বৌটার ছেলে। ওদের আসাতে কাজ বেড়ে গেছে বিনোদিনীর, সম্বন্ধীবাবুর ছেলেদের খানিক খেলাতে হয়, কোলে নিয়ে ঘুরতে হয়। তার পর সকলের খাওয়া-দাওয়া চুকলে ছুটি পায় বিনোদিনী। যখন ফিরে, তখন গ্রামের রাস্তায় আর লোক দেখা যায় না। থম্ থম্ করে রাস্তা। নির্জ্জনতার যেমন একটা সুন্দর রূপ আছে, অবস্থা-বিশেষে তাই আবার ভয়াবহ হয়েও দেখা দেয়। দু'পা চলতেও ভয় লাগে। একমনেই ফিরছিল বিনোদিনী। হঠাৎ নকুলের বাড়ীতে কয়েকটা মানুষকে ঢুকতে দেখে থমকে দাঁড়াল সে, শরীরটা কেঁপে উঠল। অকস্মাৎ মণীন্দ্র রায়ের মৃতদেহটার কথা মনে পড়তেই ভয়ে অসাড় হয়ে গেল বিনোদিনীর শরীর। খানিক দাঁড়িয়ে রইল অন্ধকার রাস্তার উপর। তার পর সাহসে ভর করে এগিয়ে চলল। ঔৎসুক্য জাগল তার মনে। চুপি চুপি পা ফেলে এগিয়ে এল। নকুলের দরজার গোড়ায় এসে থামল। কান পেতে শুনবার চেষ্টা করল আগন্তুকদের আলাপ-আলোচনা। কিছুই শোনা গেল না। ছাড়া ছাড়া কয়েকটা কথা যা ওর কানে এসে প্রবেশ করল—তা দিয়ে সম্যক্ অর্থ বোধ করা যায় না। সে কি করবে তাই ভাবছিল—এমনি সময় ভিতর থেকে একটি পুরুষের কণ্ঠ ভেসে এল, উঠ্যানে দাঁড়াএ আছিস কে?

ধরা পড়বার আশঙ্কায় দ্রুত পায়ে চলে যাবার চেষ্টা করতেই কে একজন ছুটে এসে তার শাড়ীর আঁচলটা ধরে জিজ্ঞেস করল, কে তুই?

—আমি, আস্তে আস্তে উত্তর দিল বিনোদিনী।

—ও বিনোদিনী! আড়ালে দাঁড়াএ কি আমাদের পরামর্শ শুনছিলি? শুধাল নকুল।

এত দিন যাকে খুঁজছিল বিনোদিনী আজ তাকেই সামনে পেয়ে, যে কথা বলার প্রয়োজন অথচ বলা হয় নি, তাই বলবার জন্য তৈরী হ'ল সে। একবার মনে হ'ল হাতে ধরে বলে, 'তুমি এই সব্বনাশা পথ হৈতে সরাএ আইস'—কিন্তু বলা হ'ল না। পরিহাস করবার একটা বাসনা জাগল তার। বলল, হুঁ। রাতের অন্ধকারে এমন সব সলা করা ভাল লয় গো! চকরবর্তীর অনেক চোখ আর কান আছে।

—তা ত দেখতেই পাচ্ছি, না হৈলে তুই এমন অন্ধকারে দাঁড়াএ রইবি কেনে?

—তা যার মুন খাই তার গুণ গাইতে ত হবেই! নকুলের হাতটায় ধরে গাঢ় স্বরে অনুরোধ করল বিনোদিনী. চকরবর্তীর সাথ লিয়াই কৈর না গো!

—ক্যানে?

—ভাল হবেক নাই। জলে বাস কৈরে কি কুমীরের সাথ লিয়াই করা চলে?

কথাটা শুনে হঠাৎ একঝলক রক্ত উঠে গেল নকুলের মাথায়। এক ঝাপটায় হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বিনোদিনীর গালে সজোরে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে নকুল, বলল—যা তুর পলাকে (মুনিব) যায়্যা বলগা বিনোদিনী, যে জলে কুমীরই শুধু থাকে না—কুমীরকে ঘায়েল করবার মত জীবও থাকে।

কথা কয়টি বলেই হন্ হন্ করে চলে গেল নকুল।

প্রস্তুত হয়েও কিন্তু চোখে জল বেরুল না বিনোদিনীর। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়তে লাগল তার। নাসারন্ধ্রের আবরণ [illegible] ক্ষণে ক্ষণে ফুলে ফুলে উঠল। অভিমানে ভেঙে পড়ল বিনোদিনী। গায়ে শক্তি আছে নকুলের—তারই পরিচয় দিয়ে গেল ও। বেদনার জ্বালাটা কমতেই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল তার।

পরদিন যথারীতি বাবুদের ঘরে গেল বিনোদিনী। ওর প্রথম কাজই হচ্ছে বড়বাবুর ঘর থেকে গত রাত্রের উচ্ছিষ্টের থালাটা নিয়ে আসা। তাই আনতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল বিনোদিনী। পরক্ষণেই আবার কি ভেবে থালাটা তুলে নিয়ে ফিরে আসবার পথেই স্বয়ং অহিভূষণ বললেন, তোর মুখ দেখে মনে হচ্ছে তোর একটা কিছু হয়েছে বিনু?

—না, কিছু না।

—আমার কাছে আবার লজ্জা কি বিনু! বল, কি বলবি। এ কি, তোর গালটা ফুলো দেখছি যে।

বিনোদিনী কিছুই বললে না। মাটির দিকে তাকিয়ে রইল।

এবার ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন চক্রবর্ত্তী—কি হয়েছে?

—কিছু না।

—মিথ্যা কথা। বল।

অহিভূষণের গুরুগম্ভীর গলা শুনে চমকে উঠল বিনোদিনী। মুখ তুলে আর তাকাতে পারল না।

—আমি বুঝেছি, কাল রাতে হয়ত কোথাও গিয়েছিলি?

কোন উত্তর দিতে পারল না বিনোদিনী।

—কোথায় গিয়েছিলি? কার কাছে?—ধমক দিয়ে উঠলেন চক্রবর্ত্তী। কেমন যেন ঘাবড়ে গেল বিনোদিনী। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গত রাত্রের ঘটনা অকস্মাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

হেসে উঠলেন চক্রবর্ত্তী। চমকে উঠল বিনোদিনী।

একটা সাদা কাগজ বের করে দিয়ে চক্রবর্ত্তী বললেন, এই জায়গায় একটা ছাপ দিয়ে দে আঙুলের।

যন্ত্রচালিতের মত তাই করল বিনোদিনী।

বিনোদিনী চলে যাবার সময় শুনল—চক্রবর্ত্তী আপন মনেই বলছেন, বড়ই বেড়ে উঠছে লোক্‌গুলা!

জীবনধারা আবার সহজ রাস্তা ধরল। কোন হাঙ্গামা নেই গ্রামে। মাঝে একদিন নেপালই নকুলকে টেনে আনল বাড়ীতে। হাতে ধরে পাশে বসিয়ে বলল, গানবাজনা একেবারে ছাড়াই দিলি নকুল।

বিনু বলছিল, ঘরটায় আর টেকা যায় না বাবা! সত্যিই রে নকুল—বুড়া হ য়েছি মিথ্যা কথা কইব নাই, আমারও কেমন

কেমন লাগে। গান না করিস—নাই করলি, আইসে বসতে পারিস ত দু' দণ্ড। কেনে আসিস না?

নকুল বুঝল এ সমস্ত প্রশ্ন বৃদ্ধ নেপালের নয়—এ সব বিনোদিনীর। আজও আসত না নকুল—নেহাত জোর করে ধরে নিয়ে এসেছে নেপাল—ওকে গুরু বলে স্বীকার করেছে—তাই প্রত্যাখ্যান করতে পারে নি, এসেছে। কিন্তু সেদিনের সেই ব্যবহারের পর আর বিনোদিনীর মুখ দেখবে না বলেই স্থির করেছিল নকুল। তাই নেপালের কথার জবাবে বলল, কেনে আসি না তা তুমার বিটিকেই জিগ্যাস কৈরবে গুরুজী।

বিনোদিনীর প্রসঙ্গ আসতেই একবার পাশের দিকে তাকিয়ে দেখল নেপাল। তার পাশেই দাঁড়িয়েছিল বিনোদিনী, কোন্ সময় যে বাইরে চলে গেছে টেরও পায় নি। বিনোদিনীকে ডাকল নেপাল।

—আজ তবে উঠি গুরুজী। রাত বাড়ছে।

উঠে পড়ল নকুল। বিনোদিনীর পাশ দিয়েই হন্ হন্ করে গেল চলে। একটুখানি গায়ের হাওয়া লাগল বিনোদিনীর শরীরে। মনে হ'ল নকুলের পা দুটো জড়িয়ে ধরে বলে, 'ওগো আমার অপরাধ নিও না।' কিন্তু তা বলবার সুযোগই দিল না নকুল। যে পথ দিয়ে গেল নকুল, খানিকক্ষণ সেই পথের পানে তাকিয়ে থেকে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল বিনোদিনীর বুক ঠেলে। নিজেই চমকে উঠল নিঃশ্বাসের শব্দে!

—বিনোদিনী! ও বিনু, আর বাইরে থাকিস না মা, এবারে নিয়র পড়বেক যে। ভিতর থেকেই হাঁক দিল নেপাল।

বিনোদিনী লঘু পায়ে ভিতরে গিয়ে আপনার বিছানায় শুল। কতক্ষণ এ-পাশ ও-পাশ করল। উঠে জল খেল, আবার শুল, কিন্তু কিছুতেই চোখে ঘুম এল না। পাশে অন্য একটা বিছানা থেকে নেপালের নাকডাকার শব্দ আসছে। বড় অসোয়াস্তি মনে হ'ল তার। কোথায় একটা কুকুর চীৎকার করে উঠল তীব্র ভাবে!

থম্ থম্ করছে রাত্রি। নিঃশব্দে এগিয়ে যাচ্ছে প্রহর। আখ-ক্ষেতের ওপারের বিহারীনাথের চূড়া থেকে নেমে আসছে হাওয়া। ছটফট করে উঠছে ষষ্ঠীতলার বুড়ো বটগাছের পাতাগুলো। একটা পাখীর ডানার ঝাপটে আন্দোলিত হয়ে উঠছে বটগাছের কয়েকটা প্রশাখা। ভয় পেয়ে একই সঙ্গে কতকগুলো পাখী উঠছে চীৎকার করে। ঘুম বিনোদিনীর হবে না। বিছানাটা কণ্টক মনে হচ্ছে তার। উঠে বসল সে। ভেজানো দরজাটা একটু খুলে দিতেই বাইরে থেকে ঠাণ্ডা হাওয়ার সঙ্গে ভেসে এল একটা উৎকট পচা গন্ধ। একটা বেড়াল মরেছে। মরেছে নয়, মেরেছে ওকে চক্রবর্তীর নাতি! হয়ত কেউ টেনে এনে বাউরীপাড়ায় ফেলে দিয়ে গেছে। পচনক্রিয়া সুরু হয়েছে মৃত বেড়ালটার দেহে। তারই গন্ধ সমস্ত বায়ুমণ্ডলকে বিষাক্ত করে তুলেছে। নাঃ, অসহ্য এই গন্ধ। নাকের উপর আঁচল চেপে ধরল বিনোদিনী তার পর উঠে এল বাইরে। ওর পদশব্দে ভীত হয়ে কি একটা জানোয়ার তড়াক করে গেল পালিয়ে। সেদিকে খেয়াল নেই বিনোদিনীর। একবার মুক্ত আকাশের পানে তাকাল—অসংখ্য তারা। ওদের দেখে মনে পড়ল বাপের কাছে শোনা গল্প—"উয়ারা তারা লয় বিনু; উয়ারা সব মহাপুরুষ, মরে তারা হ'য়াছে। ঐ বিরসপতি, ঐ সাত ভাই চম্পা, ঐ কালপুরুষ—

তারাদের পানে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিজের কথা ভুলেই গিয়েছিল বিনোদিনী। হঠাৎ একটা টর্চের তীব্র আলো তার গায়ে এসে লাগতেই শিউরে উঠল ও। আলোর রেখা অনুসরণ করল তার দৃষ্টি।

অদূরে চক্রবর্তীর বাগানবাড়ীটায় দেখা গেল কয়েকজন মানুষকে। মনে পড়ল, আজ চক্রবর্তী থানায় গিয়েছিল সকালে। থানার পুলিস কিংবা বাইরের অভ্যাগত এলে ঐ বাগানবাড়ীতেই তাদের থাকতে দেয় চক্রবর্তী। কিন্তু আজ কে ওদের শিকার? মনে পড়ল চক্রবর্তীর কথা। সেদিন বলেছিল, 'একদিনেই ঝেড়ে দিব ওর রংতামাশা। তোর গায়ে ও হাত দেয়?' এই কথার সঙ্গে পুলিসের এই নৈশ অভিযানের একটা যোগসূত্র আবিষ্কার করে শিউরে উঠল বিনোদিনী। ওরা হয়ত ধরতেই আসছে নকুলকে। আর ভাববারও সময় নেই বিনোদিনীর। দরজাটা খোলাই রইল। পিঠে ছড়িয়ে পড়ল খোপা থেকে বিচ্যুত চুলের গুচ্ছ—শাড়ীটা পাল্‌টাবার কথাও মনে হ'ল না তার। প্রাঙ্গণ ছেড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল সে। একটা পথচারী কুকুর সন্তর্পণে এসে তার আঁচলের অগ্রভাগটা শুঁকে নিঃশব্দেই গেল চলে।

বিনোদিনী নকুলের দরজায় এসে দাঁড়াল সন্তর্পণে। ডাকল চাপা স্বরে—প্রথম নকুলের মাকে, তার পর নকুলকে। উঠে এল নকুল। চোখে ঘুম জড়ানো; দরজা খুলতেই একটি নারী-মূর্ত্তি দেখে চমকে উঠল নকুল—কে?

—আমি।

—বিনোদিনী। এই শেষ রাতে? কি হঁয়াছে। গুরুজী—

—ভাল আছে। বেশী কথা বলবার সময় নেই—তাই অকস্মাৎ নকুলের হাত দুটি ধরে বলল, আমি তুমার কাছে কখন কিছু চাই নাই, আজ আমার এক-টি কথা রাখ।

—বল, কি কথা।

—বল রাখবে।

—রাখবার মতন হৈলে রাখব।

—আমার গা ছুঁয়্যা কও।

রাত্রিশেষে এইরূপ নাটকীয় দৃশ্যের জন্য প্রস্তুত ছিল না নকুল। মনে মনে খানিকটা বিরক্তই হ'ল। এই মেয়েটা বেজায় স্ফূর্ত্তি করেছে তাদের দলের। চক্রবর্তীর হুকুমের বিরুদ্ধে নকুল জড়ো করেছিল অনেককেই। বলেছিল তাদের—তার বেদনার কাহিনী। বলেছিল, 'আজ খাজনা না হলে গরু চরানো বন্ধ হ'ল—কাল

সংগের রাস্তায় চলা বন্ধ হবে। সবাই তৈরী হচ্ছিল তারই বিরুদ্ধে। এমনি সময়েই বিনোদিনীর জন্ম সব পণ্ড হয়েছে।

—বেশ তাই কইলাম। বল এখন। বিরক্তিভরেই বলল নকুল।

—তুমাকে এখুনি এখান থাক্যা চৈলে যাত্যা হবেক।

—কেনে?

—না হৈলে যা করবে ঠিক কৈরেছ তা যে হবেক নাই।

—কিসে বুঝলি।

—পুলিস আস্যাছে গাঁয়ে। উয়ারা তুমাকে—যাও এখুনি যাও! আর বেশী বলতে পারল না বিনোদিনী। তার সময়ও পেল না। কাদের পদশব্দ যেন এগিয়ে এল নিকটে।

—তুমি যাও উয়ারা আসছে।

—উয়ারা যে আমাকেই ধৈরতে আসছে কি করে জানলি?

—জানি জানি—আমি সব জানি। তুমি যাও।

নকুলকে একরূপ ঠেলেই বের করে দিল বিনোদিনী। তার পর আগন্তুকদের পদশব্দ লক্ষ্য করে এগিয়ে চলল সে। যেতে হ'ল না বেশী দূর।—খানিকটা গিয়েই থমকে দাঁড়াল বিনোদিনী একপাশে।

—কৌন্ হায়? একজন গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করল।

প্রথম কোন উত্তরই দিল না বিনোদিনী। যেমন দাঁড়িয়ে ছিল, তেমনি রইল।

—কৌন্ হায়? আবার প্রশ্ন করল দারোগাসাহেব।

—আমি বিনোদিনী নেপাল থানদারের বিটি!

—কে? বিনোদিনী?

হঁ গো বাবুরা। আস্তে আস্তে এগিয়ে এল বিনোদিনী। বিনোদিনী পরিচিত এদের কাছে।

তা এত রাতে কোথায় গিয়েছিলি?

—যাই নাই গো যাচ্ছিলুম বাগানবাড়ীতে। বাপকে ঘুম্ পাড়াতে যায়্যা নিজেও ঘুমায় গেইছিলুম কিনা—তাই রাত হয়্যা গেইছে। বলি দারোগাসাহেব, এই রাতে কুথায়? রণে দিতে নাকি? ফিক্ করে হেসে উঠল বিনোদিনী।

সব কথা বলা চলে না। তাই প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে দারোগা বলল, নিজেদের কাজ করতে যাচ্ছি।

—তা হলে কি আমি ফিরে যাব! একটা শাণিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল বিনোদিনী।

দারোগার লালসাভরা দৃষ্টি যুবতী বিনোদিনীর সারা অঙ্গে খেলে গেল।

—চল আমি আসছি।

দারোগা তার দলবল নিয়ে এগিয়ে গেলেন। দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখলে বিনোদিনী। ওরা নকুলের দরজায় গিয়ে আঘাত করল। দরজা খুলে গেল, পুলিসবাহিনী ভিতরে ঢুকল এবং খানিক পরে বেরিয়ে এল। পায় নি আসামীকে।

একটা নির্ভাবনার নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল বিনোদিনীর বুক থেকে।

কিছুদিন কেটে যাওয়ার পর একদিন একটা আদালতের চিঠি এসে হাজির হ'ল বিনোদিনীর কাছে। বিনোদিনীকে একটা নির্দিষ্ট তারিখে আদালতে হাজির হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

চক্রবর্তীর লোকেই ওকে নিয়ে গেল আদালতে। আদালত-গৃহে গিয়ে একপাশে খানিকক্ষণ বসে থাকবার পরেই যে দৃশ্য নজরে পড়ল তা দেখতে হবে বলে কল্পনা করে নি বিনোদিনী। ওরই সামনে দিয়ে নকুলকে হাতকড়া লাগিয়ে নিয়ে গিয়ে কাঠগড়ায় দাঁড় করাল। বিনোদিনীর বুকে কে যেন হাতুড়ি মারল জোরে জোরে। নিজের হৃদপিণ্ডের আওয়াজ ও নিজেই শুনতে পেল। জিভখানি কেমন শুকনো শুকনো মনে হ'ল।

নকুলকে বিচারক বললেন, যা বলবে সত্য বলবে।

নকুল হলফ করেই বলল, হুজুর গাঁয়ের ঐ একটি গরু চরাবার জায়গা আর হুজুর আমার ওতেই বাঁচ্যা থাকতে হয়। সেই জায়গার উপর গরুপিছু এক আনা খাজনা ধরলেক চক্রবর্তীবাবু। কোথায় পাই বলুন। তার উপর উ জমির কখনও খাজনা ছিল না।

বিপক্ষের উকীল বললে, এ সব বাজে কথা হুজুর। এ জমিদারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল, জমিদারকে তার প্রাণনাশ করবে বলে শাসিয়েছিল—জোট তৈরি করছিল গ্রামে। আর এই রাস্তা হতে বিনোদিনী বাউরীন, তাকে ফেরাতে গিয়েই হয়েছিল নিগৃহীতা। পাষণ্ড নকুল বাউরী—সেই অবলা নারীর উপর হাত চালাতে কসুর করে নি।

—না হুজুর এসব মিথ্যা। চীৎকার করে বলে উঠল নকুল।

—মিথ্যা কি সত্যি তার প্রমাণ হুজুরের কাছেই আছে। আর আছে বিনোদিনী বাউরীন।

বিনোদিনীর ডাক পড়ল সাক্ষ্য দেবার। কম্পিত চরণে এগিয়ে গেল বিনোদিনী। নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে দাঁড়াল মাথা নীচু করে।

উকীল জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে মা, এই নকুল বাউরী মেরেছিল না? সত্য বলবে মা! মিথ্যা বললে সাজা হয়ে যাবে।

তাই হোক, সাজাই হোক তার। কিন্তু সে একথা কিছুতেই বলতে পারবে না।

—আচ্ছা দেখত মা, এই কাগজে তুমি হাকিম সাহেবকে কি বল নি এই অত্যাচারের প্রতিকার করবার জন্ত। এটা ত তোমারই টিপসই মা!

এক মুহূর্তে কাগজের দিকে তাকিয়ে—বলল, হাঁ।

বিনোদিনীর সাক্ষ্যে তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়ে গেল নকুলের।...

বাড়ীতে এসে কত কাঁদল বিনোদিনী। আপনার মৃত্যুকামনা করল। এ তুই কি করলি হতভাগিনী! দেখা হলে একবার তার

পায়ে ধরে মাপ চেয়ে নেবে বিনোদিনী। একবার শুধু বলবে—'তুমি বিশ্বাস কর—সজ্ঞানে এ কাজ আমি করি নি।' তাই ওর মুক্তির দিন গোনে বিনোদিনী। দুটি মাস কেটে গেছে—এই তৃতীয় মাস। তাই শেষ বাসের যাত্রীর অপেক্ষায় থাকে দরজায় বসে। জগুকে বলেছিল, কেমন আছে নকুল তাই জেনে আসতে।

বুড়ো নেপাল ভিতর থেকে ডাকল, আর বিনু ইবারে ত আইসে।

অসহযোগ আন্দোলন

শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়

১৯২০ সন। দেশের রাজনীতিক হাওয়া বড় এলোমেলো—বড় গোলমেলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। ইংরেজ ঘোষণা করেছিল, গণতন্ত্রকে রক্ষা করবার জন্যই এই যুদ্ধ—এই সাধু উদ্দেশ্য মাথায় নিয়েই মিত্রশক্তি যুদ্ধে নেমেছে। ভারতবাসী আশামুগ্ধ হয়ে সেই কথায় বিশ্বাস করেছিল। ভারতীয় নেতারা যুদ্ধে ইংরেজের সহায়তা নানাভাবে করেছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন ইংরেজ ও মিত্রশক্তির জয় হলে ভারতেও সত্যকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে—অর্থাৎ ভারতবর্ষ স্বরাজ লাভ করবে। কিন্তু দেখা গেল, সব যেন ক্রমশঃ ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। মিত্রশক্তির জয় হ'ল। জয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে ইংরেজ শাসন আরও কড়া, আরও কঠিন, আরও কুৎসিত এবং বর্ব্বর হয়ে উঠতে লাগল। কোথায় বা গণতন্ত্র, কোথায় বা স্বরাজের পথে যাত্রা—এ যে দেখি শুধু স্বেচ্ছাতন্ত্র, স্বরাজের সকল পথেই যে কাঁটা পড়ে গেল। ইংরেজ গণতন্ত্রের জন্যে লড়াই করেছে। গণতন্ত্র লাভ করবার আশায় ভারতবর্ষ ইংরেজের যুদ্ধে কোটি কোটি টাকা দিয়েছে, লক্ষ লক্ষ লোককে ইংরেজের রণক্ষেত্রে পাঠিয়েছে, সর্ব্বরকমে ইংরেজের সহায়তা করেছে। আর যুদ্ধ জয় হবার পরই কি না ভারতে রৌলট আইন পাস হ'ল—যে আইনে উকিল নেই, দলিল নেই, আপীল নেই, যে আইনের বলে যাকে ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা ইংরেজ গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়ে জেলখানায় আটক করে রাখতে পারে। যুদ্ধ জয় হ'ল—কিন্তু ভারতে ইংরেজের অত্যাচারের মাত্রা বেড়েই যেতে লাগল। পঞ্জাবে সামরিক আইন জারী হ'ল—মানুষকে নিয়ত অপমান ও নির্যাতন সহ্য করতে হতে লাগল। তার পর রামনবমীর পুণ্যদিনে অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগে প্রায় এক হাজার হিন্দু-মুসলমান-শিখ নরনারী শিশুকে একান্ত অসহায় অবস্থায় অভূতপূর্ব্ব নৃশংসতা প্রদর্শন করে অকারণে মিথ্যা অজুহাতে গুলী করে হত্যা করা হ'ল। রক্তের নদী বয়ে গেল। কি সে বুককাটা কান্না—সে ক্রন্দন অমৃতসর থেকে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ল। পৈশাচিক হত্যার সেই মর্ম্মঘাতী আঘাত ভারতের প্রদেশে প্রদেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, ভারতের প্রতি অঙ্গে সুকঠোর অনুভূতি জাগাল—জালিয়ানওয়ালার বেদনা ভারতবাসীর মর্ম্মে প্রবেশ করল। দুঃখের আঘাতে ভারতবর্ষ এক সাড়ায় চঞ্চল হয়ে উঠল—তার প্রাণময় অপগুতা এর আগে বুঝি এমন করে আর কখনও অনুভূত হয় নি। একদিকে যেমন তার সকল আশায় ছাই পড়ল, অপরদিকে তেমনি ভারতীয় জনগণের চেতনায় প্রতিকারের সঙ্কল্প ধীরে ধীরে কঠোর ও কঠিন হয়ে উঠতে লাগল। প্রতিকার চাই—মানবতায় এত বড় অপমান ভারতবর্ষ সহ্য করবে না। এমনি করেই বজ্র-বেদনায় ভাগ্যবিধাতা ভারতের জাগরণ ঘটালেন।

১৯২০ সনের ১লা আগষ্ট ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা লোকমান্য তিলক বোম্বাইয়ে দেহত্যাগ করলেন। "স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার"—এই ছিল লোকমান্যের বাণী। লোকমান্যের প্রতিভা ছিল অলোকসামান্য, কর্ম্মশক্তিও ছিল অনুপম। ১৯০৫ সন পর্য্যন্ত ভারতীয় কংগ্রেস বিশ্বাস করেছিল যে, তাদের আবেদন-নিবেদন ও নিপুণ ওকালতীতে ইংরেজের মন ভিজবে এবং স্বরাজ পাওয়া যাবে ইংরেজের কৃপণ হাতের দান-স্বরূপে—দফায় দফায়। তিলক-অরবিন্দ-লাজপৎ রায় প্রমুখ নেতাগণ কংগ্রেসের মোড় ফিরিয়ে দিলেন। অসহায়ভাবে ইংরেজের মুখ-চাওয়া ঘুচিয়ে তাঁরা কংগ্রেসের ভিতর আত্মশক্তি উদ্বোধনের পথ খুলে দিলেন। সেজন্য ইংরেজের হাতে তাঁদের লাঞ্ছনার অন্ত রইল না। এদিকে বাঙ্গালী যুবক বুকে গীতা এবং হাতে রিভলবার নিয়ে ফাঁসীর মঞ্চে নির্ভীক পদক্ষেপে আরোহণ করল। ভারতবর্ষ জুড়ে সে কি বিস্ময়! এইরূপে জাতি আত্মশক্তির সন্ধান পেয়ে গেল।

এইবার এল সেই শক্তি প্রয়োগের পালা। দুঃখ ও অপমানের নির্ম্মম আঘাতে ভারতের অন্তর থেকে এই প্রার্থনা ধ্বনিত হয়ে উঠল

"এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময়
দূর করি দাও তুমি সর্ব্ব তুচ্ছ ভয়
রাজভয়, লোকভয়, মৃত্যুভয় আর—"

তখন সঙ্কটভয়ত্রাতারূপে ভারতের কর্ম্মক্ষেত্রে এসে দাঁড়ালেন গান্ধীজী। লোকমান্য তিলকের পর তিনিই ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী

নেতা। অসহযোগের অস্ত্র তাঁর হাতে। যুদ্ধ ইংরেজের সঙ্গে—লক্ষ্য ভারতের স্বাধীনতা। যুদ্ধে হিংসা বা অসত্যের পথে যাওয়া চলবে না। অসহযোগে সত্য ও অহিংসাই হবে আশ্রয়। অসহযোগের উদয় দেখেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "পৃথিবীতে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যলাভের ইতিহাস রক্তধারায় পঙ্কিল, অপহরণ ও দস্যুবৃত্তির দ্বারা কলঙ্কিত। কিন্তু পরস্পরকে হনন না করে, হত্যাকাণ্ডের আশ্রয় না নিয়েও যে স্বাধীনতা লাভ করা যেতে পারে, গান্ধীজী তার পথ দেখিয়েছেন।···মহাত্মা যদি বীরপুরুষ হতেন বা লড়াই করতেন তবে আমরা এমনি করে আজ তাঁকে স্মরণ করতাম না। কিন্তু এই যে একটা অনুশাসন, মরব তবু মারব না এবং এই করেই জয়ী হব—এ একটা মস্ত বড় কথা, এ একটা বাণী। এটা চাতুরী কিংবা কার্য্যোদ্ধারের বিষয়িক পরামর্শ নয়—মনুষ্যত্বের যুদ্ধ, ধর্ম্মযুদ্ধ, নৈতিক যুদ্ধ। মহাত্মা নম্র অহিংস্র নীতি গ্রহণ করেছেন, আর চতুর্দ্দিকে তাঁর জয় বিস্তার হচ্ছে।"

অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্ত্তনের সঙ্গে ভারতবর্ষের জয় বিস্তার সুরু হয়ে গেল।

১৯২০ সনের আগষ্ট মাসের প্রথম দিকে কলকাতায় ভারতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হ'ল। এই অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন পঞ্জাবকেশরী স্বনামধন্য লালা লাজপৎ রায়। ইংরেজের দরবারে বহুবর্ষব্যাপী আবেদন-নিবেদন ব্যর্থ হয়েছে। এইবার আপন শক্তির প্রয়োগে স্বাধীনতা অর্জ্জনের পালা সুরু হ'ল। সারা ভারতবর্ষ থেকে কত শত প্রতিনিধি এই যুগপ্রবর্ত্তনকারী কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। অসহযোগ-প্রস্তাব এই কংগ্রেসে অদৃষ্টপূর্ব্ব উৎসাহের সহিত গৃহীত হ'ল। প্রস্তাবের সারমর্ম্ম এই—যেহেতু খিলাফৎ ব্যাপারে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি তীব্র অবিচার করেছে এবং যেহেতু পঞ্জাব প্রদেশে লাহোর ও অমৃতসর প্রভৃতি স্থানে যে অত্যাচার সংঘটিত হয়েছে তার প্রতিকার না করে বরং একান্ত দাম্ভিকতার সহিত ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট সেই অত্যাচার ও অত্যাচারীর সমর্থন করেছে সেইহেতু প্রতিকারের উপায় স্বরূপ কংগ্রেস ভারতবর্ষের জনগণকে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সহিত অহিংস অসহযোগ করতে আহ্বান করছে। অসহযোগের প্রথম পর্ব্বে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আহ্বান এল—যাঁরা ইংরেজের খেতাব বা টাইটেলধারী তাঁরা খেতাব ত্যাগ করুন, যাঁরা ইংরেজের কাউন্সিল প্রভৃতির সদস্য তাঁরা সদস্যপদ ছেড়ে দিন, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজে পড়ায় ও পড়ে—তাঁরা সেই স্কুল-কলেজ পরিত্যাগ করে দেশের কাজে নেমে আসুন, আর আইন-ব্যবসায়ী উকীল ব্যারিষ্টার আদালতে তাঁদের কার্য্য বন্ধ করে দিন। স্কুল-কলেজ, কাউন্সিল আদালতের কার্য্যে দেশের লোকের সম্মতি ও সহযোগ আছে বলেই ইংরেজের জোর, ইংরেজের শাসনচক্র এই দেশের লোকের হাতেই তাই চলছে। এখন সেই হাত সরিয়ে নেওয়া হোক। হিংসা নয়, বিদ্বেষ নয়, অসত্য নয়—অহিংসা ও সত্যের পথে দেশের সর্ব্বত্র এই অসহযোগ চলতে থাক, তা হলেই দেশের লোকের মনে একদিকে যেমন আত্মবিশ্বাস জেগে উঠতে থাকবে, অপরদিকে তেমনি শাসনচক্রের গতিবেগ ধীরে ধীরে কমে এসে ক্রমশঃ বন্ধ হয়ে আসবে—

অসহযোগের সঙ্গে গঠনকর্ম্মপন্থা নির্দ্দেশ করা হ'ল। দেশের গ্রামে গ্রামে লক্ষ লক্ষ চরকা চলতে থাক—গ্রামগুলি অন্নবস্ত্রের জন্ত কারও মুখ না চায়। সর্ব্বত্র হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব দৃঢ় করবার চেষ্টা করা হোক। মাদকদ্রব্য ব্যবহার সর্ব্বত্র বন্ধ করা হোক। আর হিন্দুসমাজে অস্পৃশ্যতারূপ মহাপাপের মূলোৎপাটন করা হোক। আর মহামতি তিলকের স্মরণার্থ তিলক-স্বরাজ-ভাণ্ডার স্থাপিত হ'ল। দেশের লোকের কাছ থেকে কংগ্রেস ও গান্ধীজী সেই ভাণ্ডারে এক কোটি টাকা দান চাইলেন :

"ক্রোড় টাকা কার ভিক্ষাঝুলিতে অপরূপ অবদান!"

ভারতবর্ষের মরা গাঙে যেন বান এসে পড়ল—

"এবার তোর মরা গাঙে বান্ এসেছে
জয় মা বলে ভাসা তরী।"

মহা-আন্দোলনের আলোড়নে দেশের গ্রাম-শহর সর্ব্বত্র সে কি বিপুল প্রাণকম্প! শহরের শিক্ষিত জনগণের গণ্ডী ছাড়িয়ে অসহযোগ আন্দোলন শত মুখে শত দিকে লক্ষ লক্ষ গ্রামে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার সহকর্ম্মীগণ দেশের দিকে দিকে হিমালয় হতে কুমারিকা এবং দ্বারকা হতে পুরী পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র প্রচারকার্য্য চালাতে লাগলেন। ইংরেজ সরকারের সঙ্গে অসহযোগের কারণে যদি নির্য্যাতন আসে তবে হাসিমুখে বুক পেতে তা নিতে হবে। কিন্তু কোন আঘাতের প্রতিঘাত করা চলবে না। অসহযোগী সত্য পালন করবে, হিংসার পথ ছাড়বে, নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে আপন কার্য্য করে অগ্রসর হবে—সর্ব্বত্র নির্ভীক ও নম্র হয়ে থাকবে।

অনেক লোক খেতাব ছাড়লেন, অনেক সদস্য কাউন্সিল ছাড়লেন, অনেক উকীল আদালত ছাড়লেন—দক্ষিণে রাজাগোপালাচারী, উত্তরপ্রদেশে মতিলাল, জওহরলাল, বোম্বাই অঞ্চলে বল্লভভাই, বিহারে রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং তাঁদের অনুবর্ত্তীগণ। বাংলার ব্যারিষ্টার সি, আর, দাশ—তাঁর অত বড় ব্যারিষ্টারী ছেড়ে পথে এসে দাঁড়ালেন। বিমুগ্ধ জনগণ তাঁকে তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বলে বরণ করে নিল। সুভাষচন্দ্র ২৫ বৎসর বয়সে আই-সি-এস পাস করে সবেমাত্র বিলাত থেকে ভারত অভিমুখে জাহাজে রওনা হয়েছেন—অসহযোগের সংবাদ পেয়ে তিনি স্বর্গসুখদায়ক সেই আই-সি-এস চাকরি তৃণবৎ পরিত্যাগ করে সমুদ্রজলে ভাসিয়ে দিলেন। ভারতের সর্ব্বত্র বিশেষ করে বাংলায় ছাত্রগণ স্কুল-কলেজ খালি করে দিয়ে চলে এল। অসহযোগের মধ্য দিয়ে দেশ আত্মসম্বিৎ ফিরে পেল। কংগ্রেসের পরিচালনায় ও গান্ধীজীর অলোকসামান্য নেতৃত্বশক্তির বলে দেশের সর্ব্বত্র কাজের বন্যা এসে পড়ল।

কর্ম্মপথে জেগে উঠল দেশপ্রেম, দেশাত্মবোধ, সংহতি, সেবাবুদ্ধি; স্বাধীনতা লাভের জন্য অক্লান্ত চেষ্টা, অপরাজের আশা, অকুতো-

জড়তা। যারা ছিল ছায়াভয়চকিতমূঢ়, তারা আজকার যাদুস্পর্শে অসাধ্য সাধনের পথে যাত্রা করল।

চরকা চালাবার সে কি বিপুল প্রয়াস। ছাত্র ও যুবকদের সে কি উৎসাহ উদ্যম! শহরের সৌখীন ছেলেরা আরাম ও বিলাস ভুলে গ্রামের দিকে যাত্রা করল। গ্রামে গ্রামে সব জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হতে লাগল। বন্যা বা মহামারীর সময় তারা গ্রামের লোকের সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করতে লাগল। চরকার সুতায় গ্রামের তাঁতে খদ্দর উৎপাদন হতে লাগল। কর্ম্মীদের অঙ্গে এই নূতন মোটা বস্ত্র নূতন শোভা এনে দিল। দেশের সর্ব্বত্র কংগ্রেস কমিটি স্থাপিত হতে লাগল। লক্ষ লক্ষ লোক কংগ্রেস সদস্য হ'ল। লক্ষ লক্ষ লোক চরকা ও খদ্দর গ্রহণ, সাম্প্রদায়িক ঐক্য স্থাপন, মাদকদ্রব্য বর্জ্জন এবং অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের কথা লক্ষ লক্ষ লোককে বুঝিয়ে দেওয়া হতে লাগল। ১৯২১, ৩০শে জুনের মধ্যে তিলক-স্বরাজ-ভাণ্ডারে এক কোটি টাকা সংগ্রহের উৎসাহ ভারতের প্রতি গ্রামে সাড়া জাগাল। প্রদেশে প্রদেশে গঠনকর্ম্মের প্রতিযোগিতায় ঢেউ উঠল। ঐ তারিখের মধ্যে ২০ লক্ষ চরকা চালাবার কাজ শেষ করবার জন্যেও সাড়া পড়ে গেল। জড়তাগ্রস্ত অতি প্রাচীন ভারতীয় সমাজে এইরূপে নূতন প্রাণের স্পন্দন জাগল—নূতন কর্ম্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান সর্ব্বত্র শুরু হয়ে গেল। ভারতের এই নবজাগরণে প্রভু ইংরেজ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। ভারতবাসীকে শান্ত ও সংযত করবার জন্যে তাঁরা রাজার প্রতিনিধি হিসাবে ডিউক অব কনটকে এদেশে পাঠালেন। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ডিউককে সবিনয়ে বয়কট করা হ'ল। অন্যায়ের প্রতিকার না হলে রাজপ্রতিনিধি ডিউককে ভারতবর্ষ স্বাগত সম্ভাষণ জানাতে পারে না। ডিউকের আগমনে হরতাল ঘোষণা করা হ'ল। বোম্বাই, এলাহাবাদ, কলকাতা প্রভৃতি সহরে কোথাও জনসাধারণ ডিউক দর্শনে গেল না। মনে পড়ে খিদিরপুর ডক জেলে তখন আমরা প্রায় দেড় হাজার কয়েদীর অনেকে শীতের দিনে গঙ্গাতীরে রৌদ্রে বসে আছি। রব উঠে গেল—ডিউকের জাহাজ আসছে—ডিউক কলকাতা ছেড়ে রেঙ্গুন যাচ্ছেন। অমনি শত শত কয়েদী—শিক্ষিত-অশিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান, যুবক-বৃদ্ধ, ছাত্র-মজুর প্রভৃতি সকলে মুখ ফিরিয়ে উল্টা মুখে বসে গেল। এরা সব সরকার পক্ষ থেকে হরতাল বে-আইনী ঘোষণার পর হরতালের উদ্যোগ দেখিয়ে জেলখানায় এসেছিল। এইরূপে অসহযোগ আন্দোলনে ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য সুস্পষ্টরূপে জেগে উঠল। ভারতবাসীর ভয় ভাঙল, ভারত জুড়ে স্বরাজের আশা জাগল, ভারতবাসী লক্ষ্য সাধনের জন্যে নির্যাতন সহ্য করবার প্রথম পাঠ পেয়ে গেল।

তার পর একে একে সকলে কারারুদ্ধ হলেন। দেশবন্ধু আলিপুর জেলে বন্দী হলেন। জেলা, মহকুমা সর্ব্বত্র জেল ভর্ত্তি হয়ে গেল। শেষে মহাত্মা গান্ধীকে ইংরেজ গ্রেপ্তার করে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করল। এই হ'ল অসহযোগের প্রথম কথা। অসহযোগ—আইন অমান্য ও সত্যাগ্রহ মূলতঃ একই ব্যাপার, এক সূত্রে গাঁথা। একে একে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে তার প্রকাশ হয়ে, নব ইতিহাস রচিত হতে হতে শেষে ১৯৪৭, ১৫ই আগষ্ট আমাদের পরাধীনতা শৃঙ্খল মোচন হয়ে গেল।*

---

* অল-ইণ্ডিয়া রেডিও—কলিকাতা কেন্দ্রে কথিত ও রেডিও-কর্ত্তৃপক্ষের সৌজন্যে প্রকাশিত।

করুণানিধানকে

শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক

কল্পনা-কালিন্দী-তীর্থে ললিত মধুর গীতি লীলায়িত মনে
প্রকৃতিপূজার কবি নির্জ্জনে নৈবেদ্য হাতে অঙ্গনের বনে
তুমি যে অপরাজিতা। বাসন্তিক পৃথিবীর ফোটা ফুলে ফলে
পাহাড়ে প্রান্তরে প্রেম রূপে বর্ণে অনুভূতিধারা কলজলে,
তালীবনে তমালের গেরুয়া মাটির গুনি একতারা গান
তোমার সঙ্গীতে হ'ল নিত্য গাওয়া, মাঝে মাঝে দীপ-অর্ঘ্য দান
তুলসীমঞ্চের চকে। জীবনে সৌন্দর্য্য নিত্য বুঝি শান্তিপুরে
ছন্দে ভরে পদাবলী ধৈবত ও গান্ধারের নিরুদ্ধ যে সুরে

স্নিগ্ধ সৃষ্টি শতনরী। ঝর্ণারই রূপালী তরল জলস্রাবি
হৃদয়ে সুষুপ্ত স্বপ্ন ধানদূর্ব্বা শান্তিজল নিয়ে দেয় পাড়ি
আকাশ সুনীল প্রেমে, মন তবু মাটিভেজা সবুজের ঘাসে
মাঘের শিশিরে মিশে প্রকৃতির অশ্বাসের নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে—
এ শাশ্বত পৃথিবীর গীতারতি প্রসাদীর দিলে বর্ণ ফুল
করুণানিধান, মন স্নেহ দিয়ে ভালবেসে মানুষের কূল।

পোলাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী মিঃ যোশেফ সিরাঙ্কিউইজ এবং মাদাম সিরাঙ্কিউইজের সহিত
আলাপনরত ডক্টর এস রাধাকৃষ্ণন

ভারত সরকারের টাঁকশাল, আলিপুর

টাঁকশালে মুদ্রা তৈরি

টাঁকশালে কর্মরত যন্ত্র

নির্ব্বাচনী কথা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার সাধারণ নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে ; সঙ্গে সঙ্গে লোকসভারও নির্ব্বাচন হইয়া গেল। নির্ব্বাচনের ফলাফল লইয়া সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় মন্তব্যে ও সাধারণের চিঠি-পত্রে নানারূপ আলাপ-আলোচনা হইতেছে। সম্মিলিত বামপন্থীরা নাকি এবার খুব জনমতের সমর্থনলাভ করিয়াছেন ; হিন্দু মহাসভা নাকি একেবারে উঠিয়া গিয়াছে ইত্যাদি। আমরা এখানে কতকগুলি তথ্য দিয়া সাধারণভাবে আলোচনা করিব। পরে নির্ব্বাচনের যে মূল ভিত্তি নির্ব্বাচকমণ্ডলী তৎসম্বন্ধে বিশদ ভাবে বলিব।

এবারকার সাধারণ নির্ব্বাচনে কোন দল বিধানসভায় কতটি ভোট ও কয়টি আসন পাইয়াছে এবং ১৯৫২ সনের নির্ব্বাচনে কতটি ভোট ও কয়টি আসন পাইয়াছিল তাহার তুলনা করিব :

১৯৫৭

দল	আসন	শতকরা হিসাব	ভোটসংখ্যা	শতকরা হিসাব
কংগ্রেস	১৫২	৬০˙৩	৪৭,৩৪,৩০৫	৫১˙৩
কম্যুনিষ্ট	৪৬	১৮˙২	১৮,০৩,৫০০	১৯˙৬
প্রজা-সোশ্যালিষ্ট	২১	৮˙৩	১০,৩২,৭২৩	১১˙২
ফ: ব্লক (মা:)	১০	৪˙০	৪,৫০,৪১৪	৪˙৯
জনসঙ্ঘ	০	০	১,০৭,০১৯	১˙২
হিন্দুমহাসভা	০	০	২,০৫,৬৪৪	২˙২
লোকসেবক সঙ্ঘ	৭	২˙৭	১,৪০,৭০০	১˙৫
স্বতন্ত্র	১০	৪˙০	৪,২৫,৫৬৬	৪˙৬
অন্যান্য দল	৬	২˙৫	৩,১৮,০৫৮	৩˙৫
মোট	২৫২	১০০	৯২,২১,৯২৯	১০০

১৯৫২

আসন	শতকরা হিসাব	ভোটসংখ্যা	শতকরা হিসাব
১৪৯	৬২˙৯	২৮,৯৭,৮৮১	৩৮˙৯
২৮	১১˙৮	৮,০০,৯৩১	১০˙৮
*১৫	৬˙৩	৮,৮২,৮৩০	১১˙৯
৮	৩˙৩	৩,৯৩,৫৯৭	৫˙৩
৯	৩˙৮	৪,১৭,৮৭৯	৫˙৬
৪	১˙৭	১,৭৬,৭৬২	২˙৪
...		...	
২৪	১০˙২	১৮,৭৪,৪৪৫	২৫˙১
২৩৭	১০০	৭৪,৪৪,২২৫	১০০

উপরের ভোটের ফলাফল হইতে জানা যায় যে, গত বারে কংগ্রেস শতকরা ৩৮˙৯টি ভোট পাইয়া শতকরা ৬২˙৯টি আসন দখল করিয়াছিল। ইহা ভোটের অনুপাতে খুব বেশী। এইবারে কংগ্রেস শতকরা ৫১˙৩টি ভোট পাইয়া শতকরা ৬০˙৩টি আসন দখল করিয়াছে। এবারে কংগ্রেস ভোট পাইয়াছে বেশী, কিন্তু আসন দখল করিয়াছে কম। গত বারে বিধানসভায় কংগ্রেসদলকে পুরাপুরি জনপ্রতিনিধি দল বলা চলিত না ; এইবারে কিন্তু কংগ্রেস ন্যায্য ভাবে এই দাবি করিতে পারে, কারণ উহা অর্দ্ধেকের উপর ভোট পাইয়াছে। পক্ষান্তরে কম্যুনিষ্টগণ ভোটের তুলনায় কিছু অল্পসংখ্যক আসন পাইয়াছে। জনসঙ্ঘের ভোট পূর্ব্বাপেক্ষা শতকরা হিসাবে ও সংখ্যা হিসাবে খুব কমিয়া গিয়াছে। হিন্দু মহাসভা একটি আসনও দখল করিতে না পারিলেও উহার প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা বাড়িয়াছে শতকরা ১৯˙৪ করিয়া এবং অনুপাতও প্রায় সমান আছে। হিন্দু মহাসভার পরাজয়ের প্রধান কারণ যে যে স্থানে উহা প্রবল ছিল সেই সব স্থানের নির্ব্বাচনকেন্দ্রগুলিকে এমন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে যে, কোন নির্ব্বাচনকেন্দ্রেই উহা সংখ্যাগরিষ্ঠ হইতে পারে নাই। ইংরেজীতে যাহাকে "জেরিম্যানডারিং" বলে তাহাই করা হইয়াছে। ফল সব সময়েই যে কংগ্রেসের অনুকূল হইয়াছে তাহা বলা চলে না। কলিকাতায় কংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয়ের ইহা একটি অন্যতম প্রধান কারণ। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ শ্রীবিধানচন্দ্র রায় হারিতে হারিতে রহিয়া গেলেন। কম্যুনিষ্ট নেতা শ্রীজ্যোতি বসুর—বরাহনগর নির্ব্বাচনকেন্দ্র পুনর্গঠন করার ফলে সুবিধা হইয়া গেল। স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের পরাজয়ের ইহা একটি প্রধান কারণ ; পক্ষান্তরে উপমন্ত্রী তরুণকান্তি ঘোষের সুবিধা হইয়া গেল।

নির্ব্বাচনকেন্দ্র পুনর্গঠন

আমাদের সংবিধানের ৮২ ধারা মতে প্রত্যেক দশ বৎসর অন্তর নির্ব্বাচনকেন্দ্র পুনর্গঠন করা হইবে। ইহার ভাল দিকও আছে, মন্দ দিকও আছে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে আসনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া উচিত ; আবার কোন স্থানের লোকসংখ্যা কমিয়া

* ১৯৫২ সনের সোশ্যালিষ্ট পার্টি ও কৃষক-মজদুর প্রজা পার্টি একত্র করিয়া এইটি দেখান হইয়াছে।

যাইলে আসনসংখ্যা কমা উচিত। কিন্তু বারবার নির্ব্বাচনকেন্দ্র পুনর্গঠনের ফলে নির্ব্বাচিত জয়ী প্রতিনিধির বা নির্ব্বাচনপ্রার্থীর জনসংযোগের অসুবিধা হয় ও আগ্রহ কমিয়া যায়। এইটি গণতন্ত্রের পক্ষে হিতকর নহে।

আবার নির্ব্বাচনকেন্দ্রগুলি এমনভাবে গঠিত হয় বা গঠিত হইতে বাধ্য যে, কেন্দ্রের স্বাভাবিক রাজনৈতিক চেতনা উদ্বুদ্ধ হইতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। ১নং নির্ব্বাচনকেন্দ্র "ক" মিউনিসিপ্যালিটির খানিকটা ও "খ" মিউনিসিপ্যালিটির খানিকটা ও "গ" ইউনিয়ন বোর্ড লইয়া গঠিত। ইহার লোকজনের সাধারণ স্বায়ত্তশাসন বিষয়ক স্বার্থ বিভিন্ন; সহজে রাজনৈতিক চেতনা দানা বাঁধিতে পারে না। গ্রাম-পঞ্চায়েত স্থাপিত হইলে যেমন "জেরিম্যান্ডারিং"-এর সুবিধা হইবে তেমনি রাজনৈতিক চেতনা এখনকার অপেক্ষা সহজেই দানা বাঁধিতে পারিবে।

এই বিষয়টি রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীদের ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীসংখ্যা

গত নির্ব্বাচনে বহু দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থী নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে নামিয়াছিলেন। ফলে সাধারণ ভোটার সহজেই বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। এবারে বামপন্থীরা একজোট বাঁধায় দলের সংখ্যা ও প্রার্থীর সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে মনে হয়, ছোট ছোট দলগুলি উঠিয়া যাইবে। তিনটি আদর্শবাদী দল হইবে; যথা: বামপন্থী দল, মধ্যপন্থী দল ও দক্ষিণপন্থী দল। কংগ্রেস হইবে দক্ষিণপন্থী, জনসঙ্ঘ ও হিন্দু মহাসভা প্রভৃতি হইবে মধ্যপন্থী এবং কম্যুনিষ্ট প্রভৃতি দল বামপন্থী হইবে।

গত বারে প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ১১৮৭ জন। প্রত্যেকটি আসনের জন্য গড়ে ৫ জন করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এবারে ৯৩০ জন প্রার্থী দাঁড়াইয়াছেন—গড়ে প্রত্যেকটি আসনের জন্য ৩·৭ জন করিয়া দাঁড়াইয়াছেন। গত বারে স্বতন্ত্রপ্রার্থীর সংখ্যা ৭৫০ জন ছিল এবারে কমিয়া ৩৪৮ জনে দাঁড়াইয়াছে।

নির্ব্বাচকমণ্ডলী

এইবার আমরা নির্ব্বাচকমণ্ডলী লইয়া একটু বিশদ আলোচনা করিব।

নির্ব্বাচনের কথা আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই নির্ব্বাচকমণ্ডলীর কথা আইসে। আমাদের সংবিধান অনুসারে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীর ভোটের অধিকার আছে। সংবিধানের ৩২৮ ধারায় লিখিত আছে যে, 'যিনিই ভারতের নাগরিক এবং যাঁহার বয়স একুশ বৎসরের কম নহে' তিনিই ভোটাধিকার পাইবেন"। এখন একুশ বৎসরের অর্থ কি? আমরা সাধারণতঃ কুড়ি উত্তীর্ণ হইয়া একুশে পা দিলেই বয়স একুশ বৎসর বলি। যেমন রামের বয়স ১৩৬৪ সালের ১লা বৈশাখ ২০ বৎসর ১ দিন—রাম একুশে পা দিল, আমরা রামের বয়স একুশ বলি। ভারতীয় সাবালকত্ব আইনের (ইং ১৮৭৫ সনের ৯ আইন) ৪ ধারামতে একবিংশতিতম জন্মদিনে ২১ পূর্ণ হইবে এবং সেইদিন তিনি সাবালক হইবেন। রাম ১৩৬৫ সালের ১লা বৈশাখ ভোটাধিকার পাইবেন। প্রশ্ন হইতে পারে, ভারতীয় সাবালকত্ব আইন আমাদের সংবিধানের ধারায় প্রযুক্ত হইবে কিনা? শ্রীযুক্ত দুর্গাদাসবাবু তাঁহার বহু সুধীজন প্রশংসিত ভারতীয় সংবিধানের সুবিখ্যাত "ব্যাখ্যা"য় এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভোটারের তালিকা প্রস্তুত করার সময় এই বিষয়ে আদৌ লক্ষ্য রাখা হয় নাই এবং এ বিষয়ে যাঁহারা তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের কোনও আদেশ দেন নাই।

১৯৫১ সনের সেন্সাসের হিসাব অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের বয়স-বিভাগ এইরূপ:

বয়স	প্রতি হাজারে
০	২৮·০
১-৪	৯১·০
৫-১৪	২৩৫·৭
১৫-২৪	১৯৯·৮
২৫-৩৪	১৭২·০
৩৫-৪৪	১২০·৭
৪৫-৫৪	৮১·২
৫৫-৬৪	৪৫·০
৬৫-৭৪	২০·৩
৭৫-এর উপর	৮·৩
অনির্দিষ্ট	০·৮

যাহারা ২৪-এর উপর তাহাদের অনুপাত হাজারকরা ৪৪৭·৩ জন।

এইরূপ ভাবে বয়স বিভাগ করিবার হেতু, আমাদের দেশে লোকে বয়স বলিবার সময় সাধারণতঃ বয়স ৩০, ৪০, ৫০···এইরূপ বলে, যাহারা আর একটু সঠিক ভাবে বলেন, তাঁহারা ২০, ২৫,৩০, ৩৫···এইরূপ ভাবে বলে। এইভাবে বয়স-বিভাগ করিলে প্রকৃত বয়সের সহিত কথিত বয়সের খুব কাছাকাছি মিলিয়া যায়—দেখা গিয়াছে।

এক্ষণে ১৫-২৪-এর মধ্যে কতজনের বয়স ২২-২৪ হইতেছে দেখা দরকার। এ বিষয়ে ১৯২১ সনের সেন্সাস রিপোর্টের ২৩৫ পৃষ্ঠায় একটি সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসাবে পরিমার্জ্জিত বয়স-বিভাগ দেখান হইয়াছে। এটি যদিও সমগ্র বঙ্গের তথাপি পশ্চিমবঙ্গের বয়স-বিভাগের সহিত ইহার বেশী তফাৎ হইবার কারণ নাই। আবশ্যক পরিমার্জ্জিত বয়স-বিভাগ স্ত্রী-পুরুষভেদে নিম্নে দিলাম:

প্রতি ১,০০,০০০ লোকের মধ্যে

	বয়স	পুরুষ	স্ত্রী
	১৫	২,১৫৯	২,১৬০
	১৬	২,১১২	২,১১৩
	১৭	২,০৮৬	২,০৮৫
	১৮	২,০২৩	২,০২০
	১৯	১,৯৮৩	১,৯৭৮
	২০	১৯,৪৬	১,৯৫৭
	২১	১,৯০৯	১,৯০০
	২২	১,৮৭৭	১,৮৬৮
	২৩	১,৮৪০	১,৮৩১
	২৪	১,৮০৪	১,৭৯৩
	২৫	১,৭৬৮	১,৭৫৪
(ক)	১৫-২৪	১৯,৭৩৯	১৯,৭০৯
(খ)	২২-২৪	৫,৫২১	৫,৪৯২
(গ)	(ক)-এর শতকরা	২৮.০	২৭.৪
	গড় :	২৭.৭	

এমতে পূর্ব্বোক্ত ১৯৯.৮ হইতে ইহার শতকরা ২৭.৭ ; অর্থাৎ ৫৫.৪ জন ৪৪৭.৩ জনে যোগ দিতে হইবে। এই হিসাবে ২১-এর উপর লোকের অনুপাত হাজারকরা ৫০২.৭ জনে দাঁড়ায়। জনসংখ্যার অর্দ্ধেকের উপর লোক ভোটের অধিকার পাইয়াছেন। আর এই ভোটের অধিকার স্ত্রী-পুরুষনির্ব্বিশেষে সকলেই প্রাপ্ত হইয়াছেন।

যাঁহারা প্রাপ্তবয়স্ক ভারতীয় নাগরিক বলিয়া ভোটের অধিকার পাইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অর্দ্ধেকের বেশ কিছুর উপর ৪০-এর কম বয়সের। আমাদের দেশ গরম দেশ, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সহজেই লোকে স্থবিরত্ব প্রাপ্ত হন। এজন্য যাঁহাদের বেশী বয়স হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে স্থবির বা অথর্ব্বদের অনুপাত অনেক বেশী ; তাঁহাদের পক্ষে পায়ে হাঁটিয়া, বিশেষ করিয়া রাস্তাঘাটবিহীন পল্লী-অঞ্চলে অনেক সময় খাল-বিল পার হইয়া ভোট দিতে আসা কষ্টকর। এজন্য যাঁহারা ভোটগ্রহণকেন্দ্রে আসিয়া ভোট দিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অধিকবয়স্ক লোকেদের, বিশেষ করিয়া যাঁহারা বৃদ্ধ হইয়াছেন, ভোটার তালিকায় তাঁহাদের সংখ্যাগত যে অনুপাত তদপেক্ষা তাঁহাদের সংখ্যা কম হওয়ার সম্ভাবনা অধিক এবং তাহাই স্বাভাবিক।

বয়স্ক লোকেরা সাধারণতঃ "স্থিতিশীল" বা conservative। একে ত তাঁহাদের সংখ্যা কম ; তাহার উপর তাঁহারা ভোট দিতে আসিতে না পারার দরুন তাঁহাদের মতাবলম্বীদের বা তাঁহারা যাঁহাকে ভোট দিবেন তাঁহার ভোটে পরাজয়ের সম্ভাবনা অধিক। যে মতবাদ অল্পবয়স্কদের মনে লাগিবে বা মনে ধরিবে সেই মতবাদেরই সহজে জয়ী হইবার সম্ভাবনা। এই প্রসঙ্গে শহর ও পল্লী অঞ্চলে স্ত্রী-পুরুষ ভেদে যাঁহারা অবিবাহিত—যাঁহারা বিবাহ করিয়া সংসার পালনের দায়িত্ব লন নাই ; যাঁহারা সহজে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনে সায় দিবেন বা বৈপ্লবিক আন্দোলনে যোগ দিবেন, তাঁহাদের শতকরা অনুপাত নিম্নে দিলাম :

১৯৫১ সনের সেন্সাস অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে
এই বয়সের ১০০ লোকের মধ্যে অবিবাহিত

বয়স-বিভাগ	পুরুষ		স্ত্রী	
	শহর	পল্লী অঞ্চল	শহর	পল্লী অঞ্চল
১৫-২৪	৬২.৫	৫৬.৬	২৪.৮	১০.৫
২৫-৩৪	২০.৮	১১.২	৩.৮	১.৬
৩৫-৪৪	৬.৪	৩.৫	১.৪	০.৫

উপরোক্ত হিসাব হইতে দেখা যায় যে, শহরে সর্ব্ববয়সে অবিবাহিতদের অনুপাত কি পুরুষের মধ্যে, কি স্ত্রীলোকের মধ্যে অধিক। একই বয়সের লোকেদের মধ্যে পুরুষ-অবিবাহিতদের সংখ্যা ও অনুপাত স্ত্রীলোক-অবিবাহিতাদের অপেক্ষা বেশী। এইটি হওয়াই স্বাভাবিক ; কারণ আমাদের দেশে স্বামী স্ত্রী অপেক্ষা বয়সে বড়। ১৯২১ সনের হিসাব অনুযায়ী গড়ে পুরুষের বিবাহের বয়স ২০.৭৩ বৎসর ; আর স্ত্রীলোকের ১২.০৩ বৎসর। বয়সের পার্থক্য ৮.৭০ বৎসর।

শারদা আইন পাস হওয়ার দরুন, লোকের মতিগতির পরিবর্ত্তন হওয়ার দরুন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে কি পুরুষ, কি স্ত্রী সকলেই বর্ত্তমানে বেশী বয়সে বিবাহ করেন। ২০-এর পূর্ব্বে পুরুষরা ত বিবাহ করেনই না ; ২০-এর কম বয়সে বিবাহিতা স্ত্রীলোকের অনুপাত ও সংখ্যা দ্রুত কমিয়া আসিতেছে। এই কারণে স্বামী-স্ত্রীর বয়সের পার্থক্য পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

অবিবাহিতদের মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের যে আনুপাতিক পার্থক্য দৃষ্ট হয় তাহা হইতে একথা বলা চলে যে, স্ত্রীলোকেরা "স্থিতিশীল" বা conservative ; আর পুরুষরা যে-কোন উদ্ভট বা উৎকট অথবা বৈপ্লবিক মতবাদ সহজেই গ্রহণ করিতে পারেন। শহর অঞ্চলে, যেখানে লোকে পল্লীর শান্ত পরিবেশ হইতে দূরে, যেখানে নিজের বাপ মা ভাইবোন হইতে দূরে বাস করেন, যেখানে অবিবাহিতদের অনুপাত বেশী সেখানে উদ্ভট, উৎকট বা বৈপ্লবিক মতবাদ সহজেই জয়যুক্ত হইতে পারে।

এবারকার নির্ব্বাচনে কলিকাতায় ও তাহার আশেপাশের শিল্পাঞ্চলে, বামপন্থীরা যে জয়ী হইয়াছেন, তাহার অন্যতম প্রধান কারণ এই সামাজিক পরিবেশ। ইহার উপর আরও একটি কারণ হইতেছে যে, ভোটারদের মধ্যে কম বয়সের ভোটারদের অনুপাত বাড়িতেছে। স্বাভাবিক কারণেই এইটি হইতেছে। আর ইহার উপর আছে বয়সের হিসাব না করিয়া ভোটারতালিকায় নাম উঠানো।

বর্ত্তমানে দেশের লোকসংখ্যা প্রতি দশ বৎসরে শতকরা মোটা-মুটি ১০ জন করিয়া বাড়িতেছে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি-হেতু ভোটারের সংখ্যাও শতকরা ৫ করিয়া বাড়িবে। এক্ষণে যাহারা ভোটার

আছেন তাহাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক আগামী ৫ বৎসরের মধ্যে মারা যাইবেন। ১,০০০ হাজার ভোটারের মধ্যে মোটামুটি হিসাবে ৫ বৎসরে ৫×১০ জন মারা গেল। বর্ত্তমান ভোটারদের মধ্যে ৯৫০ জন ৫ বৎসর বাদে জীবিত থাকিবেন। মোট ভোটারের সংখ্যা আবার ১,০০০ হইতে ১০,৫০ জন হইবে: অর্থাৎ নূতন ১০৫০—৯৫০=১০০ জন ভোটার শ্রেণীভুক্ত হইবেন। ইঁহাদের সকলেরই বয়স ২১ হইতে ২৬-এর মধ্যে হইবে। ইঁহাদের অনুপাত হইতেছে শতকরা ৯'৫ জন। আর ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই অবিবাহিত। দ্রুত লোকসংখ্যাবৃদ্ধির সহিত এই অনুপাত আরও বাড়িবে।

যদি লোকসংখ্যা আরও দ্রুত বাড়িতে থাকে তাহা হইলে এই অনুপাত আরও বেশী হইবার সম্ভাবনা। অন্যবিধ আর্থিক ও সামাজিক কারণে বিবাহে অনিচ্ছা বাড়িয়া যাইতেছে। যাহারা বিবাহ করিতেছেন তাঁহারাও বেশী বয়সে বিবাহ করিতেছেন এবং ছেলে 'মানুষ' হইবার পূর্ব্বেই মারা যাইতেছেন। এজন্য ভবিষ্যতের নাগরিকদের পূর্ব্বের ন্যায় "মানুষ" করিতে পারিতেছেন না। এই সব নূতন নাগরিকদের মধ্যে পূর্ব্বের ন্যায় বয়সের প্রতি সম্মান; ধর্ম্মভাব, সুশিক্ষা, নিয়মানুবর্ত্তিতা ও শ্রদ্ধা-ভক্তির আশা করিতে পারা যায় না। তাঁহারা সহজেই নূতন নূতন বুলির দাস বা তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারেন। এই বিষয়টির প্রতি আমাদের দেশের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা, সমাজ-বিজ্ঞানীরা যদি দৃষ্টি দেন ত ভাল হয়।

ভুয়া ভোট

১৯৫২ সনের সাধারণ নির্ব্বাচনের সময় যে ভোটার তালিকা প্রস্তুত হইয়াছিল তাহাতে ১,২৪,৯৭,১১৪ জনের নাম ভোটার হিসাবে স্থান পাইয়াছিল। এই তালিকায় ১৯৫০ সনের জন-প্রতিনিধিত্ব আইনের ২১ ধারা অনুসারে ১৯৫০ সনের ১লা মার্চ্চ তারিখে যাঁহারা প্রাপ্তবয়স্ক তাঁহাদের নাম লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। যাঁহাদের নাম ভোটার তালিকায় আছে তাঁহারা ১৯৫১ সনের সেন্সাসের সময় (অর্থাৎ ১৯৫১ সনের ১লা মার্চ্চ তারিখে) সকলেই ২২ পার হইয়াছেন। এইরূপ লোকের অনুপাত হাজারকরা ৪৮৪ জন।

১৯৫১ সনে আদমশুমারির হিসাব অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের (চন্দননগর বাদে—কেননা তখন পর্য্যন্ত চন্দননগর পশ্চিমবঙ্গভুক্ত হয় নাই) লোকসংখ্যা ২,৪৮,১০,৩০৮ জন। ইহার মধ্যে আছে বৈদেশিক নাগরিক—যাঁহারা ভারত-রাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ী আদৌ ভারতের ভোটার হইতে পারেন না। এইরূপ বৈদেশিক নাগরিকদের সংখ্যা ৩,০৮,১৮৭ জন। আর আছেন উদ্বাস্তুগণ, উদ্বাস্তুদের সংখ্যা হইতেছে ২০,৯৯,০৭১ জন। ইঁহারা পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্থান ছেড়ে বিভিন্ন বৎসরে ভারতে আসিয়াছেন নিম্নলিখিত সংখ্যা অনুযায়ী:

	পূর্ব্ব পাকিস্থান	পশ্চিম পাকিস্থান
১৯৪৬	৪৪,৬২৪	—
১৯৪৭	৩,৭৭,৮৯৯	৮,০৬২
১৯৪৮	৪,১৯,০১৮	১,৯৯৫
১৯৪৯	২,৭৩,৫৯২	৬৬৯
১৯৫০	৯,২৫,১৮৫	৫২৮
১৯৫১	৩০,৮৭৯	৭৩
	২০,৭১,১৯৭	১১,৩২৭

আমাদের সংবিধানের ৬ ধারায় এইরূপ বিধান আছে যে যাঁহারা পাকিস্থান হইতে ১৯৪৮ সনের ১৯শে জুলাই বা ঐ তারিখের পর ভারতে আসিয়াছেন তাঁহারা উপযুক্ত ভারতীয় কর্ম্মচারীর নিকট দেশীয়করণ (naturalisation) করিলে ভারতীয় নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবেন, কিন্তু দেশীয়করণ-জন্য আবেদন করিবার পূর্ব্বে তাহাদিগকে অন্ততঃ ছয় মাস ভারতে বাস করিতে হইবে।

এমতে ১৯৪৯ সনের ১লা অক্টোবরের পরে যাঁহারা ভারতে আসিয়াছেন, ১৯৫০ সনের ১লা মার্চ্চ তারিখে তাঁহারা কিছুতেই ভারতের নাগরিক হইতে পারেন না। এজন্য উপরোক্ত উদ্বাস্তুসংখ্যা হইতে আমরা ১৯৫০ ও ১৯৫১ সনে যাঁহারা ভারতে আসিয়াছেন তাঁহাদের বাদ দিলাম। এইরূপ উদ্বাস্তুর সংখ্যা পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্থান হিসাবে নিম্নে দেওয়া হইল:

	পূর্ব্ব পাকিস্থান	পশ্চিম পাকিস্থান
১৯৫০	৯,২৫,১৮৫	৫২৮
১৯৫১	৩০,৮৭৯	৭৩
মোট	৯,৫৬,০৬৪	৬০১

১৯৪৯ সনে যাঁহারা ভারতে আসিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোককে বাদ দেওয়া উচিত। এমতে পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যা হইতে প্রথমে আমরা বৈদেশিক নাগরিকদের সংখ্যা বাদ দিলাম। যথা:

২,৪৮,১০,৩০৮
৩,০৮,১৮৭
―――――
২,৪৫,০২,১২১

১৯৫০ ও ১৯৫১ সনে যাঁহারা পাকিস্থান হইতে ভারতে আসিয়াছেন, শেষোক্ত সংখ্যা হইতে তাঁহাদের সংখ্যা বাদ দিলাম:

২,৪৫,০২,১২১
৯,৫৬,৬৬৫
―――――
২,৩৫,৪৫,৪৫৬

সর্ব্বশেষ জনসংখ্যার ভিত্তিতে ভোটার তালিকায় ভোটারের অনুপাত হইতেছে হাজারকরা ৫৩০'৮ জন। যেখানে ৪৮৪ জন ভোটার হইবেন সেখানে হইয়াছেন ৫৩০'৮ জন। হাজারে

(৫৩০ ৮—৪৮৪'০=)৪৬'৮ জনের ভোটের তালিকায় স্থান পাওয়া উচিত নহে, অথচ স্থান পাইয়াছে। তবুও ১৯৪৯ সনে পাকিস্থান হইতে ভারতে আগত কোনও উদ্বাস্তুকে বাদ দেওয়া হয় নাই।

এইরূপ বেশী ভোটার হইবার কারণ—যাঁহাদের ভোটার হইবার বয়স হয় নাই এইরূপ বহুলোক ভোটারের তালিকায় স্থান পাইয়াছে; যাঁহাদের নাম প্রাথমিক তালিকায় স্থান পাইয়াছিল তাঁহারা মৃত হইলেও চূড়ান্ত তালিকায় তাঁহাদের নাম কাটিয়া দেওয়া হয় নাই, যাঁহারা দেশে থাকেন তাঁহাদের নাম দেশের তালিকায় ও এক-আধবার অন্যত্র কার্য্যোপলক্ষে আসিয়াছিলেন বলিয়া সেখানেও দুইবার করিয়া লেখানো হইয়াছে, এবং এমন বহু লোকের নাম লেখানো হইয়াছে যাহাদের অস্তিত্ব আদৌ নাই।

এইরূপ হইবার প্রধান কারণ—তালিকা প্রস্তুতকারকদের টাকা-প্রতি এতগুলি নাম দিতে হইবে এইরূপ সরকারী নির্দ্দেশ থাকায় তাহারা যত পারে নাম ঢুকাইয়া দিয়াছে ও সেই হিসাবে টাকা লইয়াছে। তাহাদের তৈরী তালিকা সঠিক হইল কিনা দেখিবার কোনরূপ ব্যবস্থা ছিল না। "শিশু-রাষ্ট্র", "প্রথম নির্ব্বাচন" ইত্যাদি কৈফিয়ত সৃষ্টি করিয়া কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের দায় এড়াইয়া গিয়াছেন। গণতন্ত্রের ভিত্তিমূল ভোটারের তালিকায় বহু ভুল থাকিয়া গেল। যে সরিষা দিয়া ভূত তাড়াইব তাহারই মধ্যে ভূত প্রবেশ করিল।

এইবারে ১৯৫৭ সনে পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায় ১,৫১,১৮,০৬১ জনের নাম লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। গত বারের তুলনায় ভোটার-সংখ্যা বাড়িয়াছে ২৬,৩০,৩৪৭ জন—শতকরা ২০'৮ জন করিয়া। এই বৃদ্ধির কারণ:

(১) পশ্চিমবঙ্গের এলাকা বৃদ্ধি—চন্দননগর, পুরুলিয়া ও কিষেণগঞ্জের কিয়দংশ পশ্চিমবঙ্গভুক্ত হইয়াছে, (২) লোকসংখ্যা বৃদ্ধি—লোকসংখ্যা বৃদ্ধি দুই কারণে হইয়াছে, (ক) জন্ম ও মৃত্যুহারের তারতম্য হিসাবে স্বাভাবিক বৃদ্ধি, আর (খ) উদ্বাস্তু আগমন, এবং (৩) পূর্ব্বের ন্যায় ভোটার তালিকায় ভুলভ্রান্তি।

পশ্চিমবঙ্গের এলাকা বৃদ্ধির জন্য বিধানসভার আসন ২৩৮ হইতে বাড়িয়া ২৫২ হইয়াছে। এই বৃদ্ধি ১৯৫১ সনের সেন্সাস অনুসারে লোকসংখ্যাবৃদ্ধির অনুপাতে হইয়াছে। এলাকা বৃদ্ধির জন্য ভোটার-সংখ্যা বাড়িয়াছে মোটামুটি হিসাবে শতকরা ৫'৯ জন বা ৮,৬৪,০০০ জন।

এবারকার ভোটার-তালিকা ১৯৫৬ সনের ১লা মার্চ্চ তারিখের ভিত্তিতে তৈয়ারী হইয়াছে। গত ছয় বৎসরে (১৯৫৬—১৯৫০=৬) স্বাভাবিক কারণে লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে এইরূপ:

হাজারকরা

সন	জন্মহার	মৃত্যুহার	বৃদ্ধি
১৯৫০	১৬'৭	১০'৩	৬'৪
১৯৫১	২১'৯	১৩'০	৮'৯
১৯৫২	২৩'১	১০'৮	১২'৩
১৯৫৩	২২'৭	১০'২	১২'৫
১৯৫৪	২১'৯	৯'১	১২'৮

পাঁচ বৎসরে গড় বার্ষিক বৃদ্ধি হাজারকরা ১০'৬ জন করিয়া এইভাবে ৬ বৎসরে বৃদ্ধি হইয়াছে হাজারকরা ৬৩'৬ জন বা শতক ৬'৪ জন করিয়া। সুতরাং স্বাভাবিক কারণে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হেতু ভোটার-সংখ্যা শতকরা ৬'৪ জন বাড়িতে পারে।

সরকারী পুনর্ব্বাসন দপ্তর হইতে প্রকাশিত পুস্তিকায় দেখা হইয়াছে যে, ১৯৫৬ সনের শেষ পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বা সংখ্যা ৩০,৮৮,০০০। ইহাদের মধ্যে ১৯৫৫ সনে আসিয়াছে ৩,২০,০০০—ইহারা কেহই ভোটার হইতে পারেন না। ইহা সংখ্যা বাদ দিলে যাঁহাদের মধ্য হইতে ভোটার হইতে পা এইরূপ উদ্বাস্তুর সংখ্যা ২৭,৬৮,০০০। ইহাদের মধ্যে আব আমাদের পূর্ব্ব হিসাব অনুযায়ী ১১,১৪,৫৩২ জনের মধ্য হই প্রাপ্তবয়স্কেরা পূর্ব্বেই ভোটার হইয়াছেন। সুতরাং নূতন ভোট হইতে পারেন তাহার পরে নবাগত উদ্বাস্তুদের মধ্য হইতে এইরূপ উদ্বাস্তুর সংখ্যা ১৪,৫৩,০০০ আর ইহাদের মধ্য হই প্রাপ্তবয়স্কের সংখ্যা—৭,০৩,০০০ জন। উদ্বাস্তু আগমনের ভোটার-সংখ্যা বাড়িয়াছে শতকরা ৫'৬ জন করিয়া!

এই তিনটির সমষ্টি করিলে মোট বৃদ্ধি দাঁড়ায় শতকরা ১৭ জন। কিন্তু বাড়িয়াছে শতকরা ২০'৮ জন। বক্রী বৃদ্ধি (২০'৮—১৭'৯=২'৯)—আমাদের মতে ভোটার তালিকার ভুলভ্রান্তির জ

পূর্ব্বের ভোটার-তালিকায় ভুলভ্রান্তি ছিল শতকরা ৪'৭ হিসাবে। এইবারে ইহাতে ২'৯ জন যোগ করিতে হইবে। মো ভুলভ্রান্তির পরিমাণ শতকরা ৭'৬ জনে দাঁড়ায়। প্রত্যেক জনের মধ্যে ১ জন ভুয়া ভোটার।

এইমাত্র দেখিলাম, শতকরা ৭ জন ভুয়া ভোটার। রামবা শ্যামবাবুকে ভোটে হারাইলেন। কিন্তু রামবাবুর ভোট-সং যদি শ্যামবাবুর ভোট-সংখ্যা অপেক্ষা শতকরা ৭-এর কম হয় তা হইলে মনে সন্দেহ থাকিয়া যায় যে, রামবাবু প্রকৃতপক্ষে ভোটে জ হইয়াছেন, না ভুয়া ভোটের সাহায্যে জনসাধারণের প্রতিনি সাজিয়াছেন। এই ভুয়া ভোট দিবার ব্যাপার কিরূপ ব্যাপক ভা চলিয়াছিল, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত তাহার দুই-একটি উদাহ দিব।

কলিকাতার কোন লোকসভার নির্ব্বাচনে কলিকা কর্পোরেশনের বহু কুলি, মেথর ও ধাঙ্গড়দের ভোটার সাজাইবা ভার কোন কাউন্সিলার লন। কোন ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রীর বাড়ী উঠানে তাহাদের দাঁড় করাইয়া তালিম দেওয়া হইল—তোমা নাম "সুমেরু চামার", তোমার বাপের নাম "ভুখন চামার", তু থাক "৪নং গলাকাটা লেনে"। পাশের লোককে শিখানো হইল— তোমার নাম "রামচরিত্তর ওঝা" তোমার বাপের নাম "দিনুদাস" তুমি থাকো "দশ-এক-বি মাসকাটা লেনে।" এই রকম চলিতে লাগিল। সকলকে তেলেভাজা সিঙ্গাড়া ও বোঁদে খাইতে দেওয় হইল। বলা হইল, যে ভোট দিয়া হাতে কালির দাগ দেখাইতে পারিবে তাহাকে এক টাকা করিয়া বকশিশ দেওয়া হইবে।

"সুমেরু চামার" ভোট দিতে গেল, প্রতিপক্ষের লোক চেঁচাইয়া তাহাকে বাপের নাম বলিতে বলিল। "সুমেরু চামার" ভড়কাইয়া গেল, বলিল 'বাপকে নামতো পুরজামে লিখা হ্যায়, হামকো কাঁহে পুছতা"। সুমেরুর ভোট দেওয়া হইল না বা বকশিশ মিলিল না। রামচরিত্তর কিন্তু পড়া ঠিক ঠিক বলিল—ভোট দিল ও বকশিশ পাইল।

ভোট দিতে যাইয়া শুনিলাম যে, আমার মাতাঠাকুরাণী মৃত্যুর ৬ বৎসর পরে ভোট দিয়া গিয়াছেন! দুর্ভাগ্যবশতঃ এই অধম সন্তানকে দেখা দিলেন না। ব্যাপক ভাবে ভুয়া ভোট দেওয়া আজকালকার নির্ব্বাচনে যেন রেওয়াজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমানে ভোটারের সংখ্যা খুব বাড়িয়াছে, এক-একটি নির্ব্বাচনকেন্দ্রে ৫০।৬০ হাজার ভোটার—এজন্য ভুয়া ভোট দেওয়া সহজ, একথা বলিলে চলিবে না।

যেখানে ভোটারের সংখ্যা খুব সীমাবদ্ধ সেখানেও কিরূপ ব্যাপক ভাবে ভুয়া ভোট দেওয়া হইত বা হয় তাহার একটি উদাহরণ দিব। উদাহরণটি পুরাতন হইলেও এখনওও খাটে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের ভোটার হইতে হইলে সম্পত্তি থাকা দরকার। ১৯৩০ সনের ৫নং মুসলমান নির্ব্বাচন-কেন্দ্রে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ছিল ৬৭৯ জন; ইহাদের মধ্যে ৪৮৭ জন ভোট দেন। শতকরা ৭২ জন পুরুষ ভোটার ভোট দেন। স্ত্রী ভোটারদের সংখ্যা ছিল ২১০ জন; ইহাদের মধ্যে ২০৮ জন ভোট দিয়াছিলেন বলিয়া কাগজে প্রকাশ। অর্থাৎ শতকরা ৯৯ জন স্ত্রীলোক ভোট দিয়াছিল। সেবারকার কর্পোরেশনের নির্ব্বাচনে ইহাই হইল সবচেয়ে বেশী ভোট। এই যে মুসলমান-ঘরানা স্ত্রীলোকগণ ভোট দিয়া গেলেন বলিয়া কাগজে প্রকাশ তাঁহারা কেহই ভোট দিতে আসেন নাই। তাঁহারা ঘরানা পর্দ্দানশীন স্ত্রীলোক বলিয়া বড় বড় মোটরে করিয়া বোরখা-পরিহিত বাইজীরা আসিয়া তাঁহাদের হইয়া ভোট দিয়া গেল। ইহাকে প্রকৃত নির্ব্বাচন না বলিয়া নির্ব্বাচনের প্রহসন বলা সঙ্গত।

বিত্তশালিনী ঘরানা পর্দ্দানশীন স্ত্রীলোকদের বেলায় যদি এইরূপ প্রতারণা সম্ভব হয়, তাহা হইলে গণভোটের যুগে কলিকাতা শহরে—যেখানে পাশের বাড়ীর লোক প্রতিবেশীর কোন খবর রাখেন না, সেখানে যে কি হয় বা হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়।

ইলেকশান কমিশন প্রথম সর্ব্বভারতীয় নির্ব্বাচনের ফলাফল আলোচনাকালে লিখিয়াছেন যে, ৮,৮৬,১২,১৭১ জন ভোট দিয়াছিলেন। কেবলমাত্র ২৩০৬টি ক্ষেত্রে ভোট দিতে আসিলে তাহাদের চ্যালেঞ্জ করা হয় এবং ইহাদের মধ্যে ১৭৩২টি আপত্তি নাকচ করা হয়। জাল-ভোটার সাজিয়া আসার সংখ্যা ৫৭৪টি মাত্র। এত অল্পসংখ্যক চ্যালেঞ্জ হইবার কারণ—চ্যালেঞ্জ করিতে হইলে প্রথমে ১০৲ টাকা জমা দিতে হয়। পোলিং এজেণ্টদের কাছে নগদ প্রায়ই এত টাকা থাকে না। একজনকে চ্যালেঞ্জ করা হইল; জাল সাব্যস্ত হইল; কিন্তু সেই ১০৲ টাকা তৎক্ষণাৎ ফেরত দেওয়া হইল না। ভোট গ্রহণ শেষ হইলে ঐ ১০৲ টাকা ফেরত দেওয়া হইবে—ইহাই নিয়ম করা হইয়াছিল। এজন্য বহু ক্ষেত্রে জাল-ভোটারদের চ্যালেঞ্জ করা সম্ভব হয় নাই। এক-একটি নির্ব্বাচক মণ্ডলীতে বহু ভোটগ্রহণকেন্দ্র থাকে। সমগ্র ভারতে গড়ে প্রত্যেক নির্ব্বাচকমণ্ডলীতে ভোটগ্রহণকেন্দ্রের সংখ্যা ৭৩টি। প্রত্যেক ভোটগ্রহণকেন্দ্রে চ্যালেঞ্জ করিবার জন্য এত টাকা কোন প্রার্থীই তাঁহার পোলিং এজেণ্টগণের নিকট দিতে পারেন না।

প্রথম নির্ব্বাচনে কিরূপ ব্যাপকভাবে জাল-ভোট দেওয়া হইয়াছিল তাহার একটি আন্দাজ পাওয়া যাইবে "টেণ্ডার ভোটের" সংখ্যা হইতে। ইলেকশান কমিশন বলিয়াছেন যে, সমগ্র ভারতে মাত্র ৫৮,৮৮৭টি "টেণ্ডার ভোট" দেওয়া হইয়াছিল। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, যেখানে ৮,৮৬,১২,১৭১ জন ভোট দিয়াছেন সেখানে এই সংখ্যা অতি নগণ্য। প্রতি ১০,০০০ হাজারে "টেণ্ডার ভোটের" সংখ্যা ৬.৬টি মাত্র। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে এই সংখ্যা নগণ্য নহে।

আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলির—তা কি কংগ্রেস কি কম্যুনিষ্ট বা অন্য দল, বহু শাখা-সমিতি আছে। এই সব রাজনৈতিক দলগুলি বা তাহাদের শাখা-সমিতিগুলি নির্ব্বাচনের সময় কে প্রার্থী দাঁড়াইবেন, না দাঁড়াইবেন; কোন প্রতিপক্ষ দলের প্রার্থীর কি কি কেচ্ছা আছে, ভোটের মিটিং কোথায় কোথায় করিতে হইবে, কি কি পোষ্টার ছাপাইতে হইবে, কোন কোন বিষয়ে হাতে লেখা বাণী মায় কেচ্ছা দেয়ালের গায়ে মারিতে হইবে ইত্যাদি বিষয়ে যে রকম আগ্রহ দেখান ও দিনের পর দিন সন্ধ্যা হইতে রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত যেরূপ জটলা করেন ও যে প্রকার উৎসাহ দেখান তাহার তুলনায় ইহার শতভাগের এক ভাগ আগ্রহ ও উৎসাহ ভোটার-তালিকা প্রণয়নের সময় যদি তাঁহারা দেখাইতেন তাহা হইলে এইরূপ ভুল-ভ্রান্তিপূর্ণ ভোটার তালিকা হইত না, জাল-ভোট দিবার সুযোগ-সুবিধা হইত না; দেশের মঙ্গল হইত, জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনারও উন্মেষ ঘটিত। আগামীবারে ভোটার-তালিকা তৈয়ারী হইবার সময় তাঁহারা এ বিষয়ে কি সজাগ হইবেন ও নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিবেন?

শুধু রাজনৈতিক দলগুলি বা তাঁহাদের কর্ম্মীদের দোষ দিই কেন? শিক্ষিত ব্যক্তিরাই বা কি করেন? ভোটের সময় ট্রামে, বাসে বা চায়ের দোকানে অথবা ট্রেনের কামরায় বসিয়া ডাঃ বিধান রায়ের দোষ-সংখ্যা ১০১টি বা ৯৯টি, জ্যোতিবাবু কত ভাল লোক বা কত বদ লোক ইত্যাদি বিষয়ে যে উৎসাহ দেখাই বা তর্ক করি তাহার শতাংশও যদি নিজ নিজ বাড়ীর লোকের বা নিজের আশেপাশের লোকের নাম ভোটার তালিকায় উঠিল কিনা ও যে সকল মৃত ব্যক্তির নাম আছে তাহা কাটিয়া দেওয়া হইল কিনা ইত্যাদি বিষয়ে দেখাইতাম তাহা হইলে দেশের ও সমাজের মঙ্গল হইত।

জাল ভোট

এইরূপ ভুয়া ভোটারের নাম ভোটার তালিকায় থাকার সুযোগ প্রত্যেক প্রার্থীই বা তাঁহার দলের লোক নির্ব্বাচনের সময় লন। এ বিষয়ে সকল দলের সকল প্রার্থীই যেন সমান ; জাল-ভোট চালানো বিষয়ে কেহই মনে হয় কম যান না। তবে ভোটে হারিয়া যাইলে অপর পক্ষ যে বেশী পরিমাণ জাল ভোট দিয়াছিলেন এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া কিছু ক্ষোভ মিটানো যায়। আর যিনি নির্ব্বাচিত হইলেন তিনি ত প্রকৃতপক্ষে জয়ী হন নাই বা আসলে জনসাধারণের প্রতিনিধি নহেন, জাল-ভোটের প্রতিনিধি এই বলিয়া হয়ত কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করা যায়।

একজন ভোট দিতে আসিয়া দেখিল তাহার নাম জাল করিয়া অপর এক ব্যক্তি ভোট দিয়া গিয়াছে। কর্তৃপক্ষ বলিলেন যে, তোমার ভোট হইয়া গিয়াছে। তথাপি যদি সেই ব্যক্তি চলিয়া না গিয়া ভোট দিতে চাহে, তবে আসে তাহার সনাক্তকরণ-পর্ব্ব। এই সনাক্তকরণ-পর্ব্ব জাল-ভোটারের সনাক্তকরণ-পর্ব্ব অপেক্ষা শক্ত। তাহাকে প্রমাণ করিতে হইবে যে, সে সেই গ্রামের বা সেই স্থানের সেই নামের সেই ব্যক্তি। সনাক্তকরণ শেষ হইলে তাঁহাকে আলাদা ভোটপত্র দেওয়া হইবে। এই ভোটপত্র তাঁহার মনোমত প্রার্থীর বাক্সে ফেলিতে দেওয়া হইবে না—তিনি যাহাকে ভোট দিতে চাহেন সেই সেই প্রার্থীর নাম কর্তৃপক্ষকে বলিতে হইবে। কর্তৃপক্ষ সেই সেই প্রার্থীর নাম সেই ভোটপত্রে লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন ও আলাদা একটি নামে রাখিয়া দিবেন। ইহাতে ভোটের গোপনীয়তা রক্ষিত হইল না। আর এই "টেণ্ডার-ভোট" কাজে আসিবে কখন ? যদি কোনও প্রার্থীর নির্ব্বাচন-নাকচের মামলা হয় তখন নির্ব্বাচনী-আদালতের জজেরা এই "টেণ্ডার-ভোট" অক্ত প্রমাণ গ্রহণের পর ব্যবহার করিবেন। এইরূপ উৎসাহী ভোটার সর্ব্ব দেশেই কম—আমাদের দেশে আরও কম।

আমাদের ধারণা ১০০টি জাল ভোটে একজন এইরূপ "টেণ্ডার-ভোট" দাখিল করেন। এই ধারণা সত্য হইলে জাল-ভোটের সংখ্যা ৬·৬ হয়। ইহা যতই ভ্রান্ত হউক না কেন, প্রথম সাধারণ নির্ব্বাচনে বহু জাল-ভোট পাচার হইয়া গিয়াছে, একথা নিঃসন্দেহে জোর করিয়া বলা চলে।

এইবারকার নির্ব্বাচনে এই সম্বন্ধে অনেকটা উন্নতি হইয়াছে বটে, তথাপি বহু জাল-ভোট দেওয়া সম্ভব হইয়াছে।

শিক্ষিত ভোটারের সংখ্যা

আমাদের দেশে লিখন-পঠনক্ষম লোকের সংখ্যা খুব কম। লিখিতে পড়িতে জানিলেই যে তিনি শিক্ষিত একথা বলা যায় না, তবে লিখন-পঠনক্ষমতা শিক্ষার একটি মাপকাঠি—এই হিসাবে লিখন-পঠনক্ষম লোকের সংখ্যা হইতে শিক্ষিতের সংখ্যা বা অনুপাতের একটা হিসাব পাওয়া যায়।

ভারতে লিখন-পঠনক্ষম লোকের অনুপাত শতকরা ১৬·৬ জন। এইজন্য সংবাদপত্রে ও সাধারণ আলোচনায় প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় যে, আমাদের দেশে মাত্র দুই আনা লোক শিক্ষিত। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের প্রতি এই উক্তি প্রযোজ্য নহে। পশ্চিমবঙ্গে লিখন-পঠনক্ষম লোকের সংখ্যা ১৯৫১ সনের আদমশুমারি হইতে যে নমুনা-তালিকা (Sample Table) প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, শতকরা ২২ জন 'শিক্ষিত'। যদি আমরা কেবলমাত্র ২৪ বৎসর বয়সের উপর লোকের হিসাব ধরি তাহা হইলে এই অনুপাত বৃদ্ধি পাইয়া শতকরা ২৫·৮ হইতেছে। আর ২১-এর উপর লোকের হিসাব ধরিলে এই অনুপাত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া শতকরা ২৬·১-এ দাঁড়ায়। এইরূপ হইবার কারণ দেশে দ্রুত শিক্ষার প্রসার যত দিন যাইবে এই অনুপাত তত বাড়িবে। ইহা ছাড়া আরও এক কারণে লিখন-পঠনক্ষম লোকের অনুপাত বাড়িবে—দেশে বয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে ও হইতেছে এবং বয়স্করাও অতি আগ্রহের সহিত এই সুযোগ গ্রহণ করিতেছে।

আমাদের মনে হয় যে, বর্ত্তমান ১৯৫৭ সনে নির্ব্বাচকদের মধ্যে শতকরা ৩০ জন লিখন-পঠনক্ষম।

কলিকাতা শহরে লিখন-পঠনক্ষম ব্যক্তির অনুপাত শতকরা ৪৫·৭। আর যাহারা ২৪ বৎসরের উপর তাঁহাদের মধ্যে অনুপাত শতকরা ৫১·৪ জন। বর্ত্তমানে নির্ব্বাচকদের মধ্যে আমাদের আন্দাজ (estimate) অনুযায়ী শতকরা ৬০-এর কাছাকাছি। কলিকাতায় কংগ্রেস ২৬টি আসনের মধ্যে ৮টি আসন পাইয়াছেন, ইহা কি শিক্ষিত ভোটারদের কংগ্রেসের প্রতি বিরূপ হওয়ার ফল, না অন্য কিছু ?

ভোটারদের সাম্প্রদায়িকতা

আমাদের দেশে ভোটারদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব খুব প্রবল। মুসলমান মুসলমানকে ভোট দিবেন ; পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয় পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয়কে ভোট দিবেন ; মাহিষ্য মাহিষ্যকে ভোট দিবেন ইত্যাদি। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিহারের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। আর আমাদের রাজনৈতিক দলগুলি—কি কংগ্রেস, কি কম্যুনিষ্ট সকলেই এই বিষয়টি জানেন ও প্রার্থী মনোনয়নের সময় ইহার প্রশ্রয় দেন। যে অঞ্চলে হিন্দী ভাষাভাষীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সে অঞ্চলে হিন্দীভাষী প্রার্থী দাঁড় করাইলেন ; যে অঞ্চলে পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয় সংখ্যাগরিষ্ঠ সে অঞ্চলে পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয় প্রার্থী দাঁড় করাইলেন ; যে অঞ্চলে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ সে অঞ্চলে মুসলমান প্রার্থী দাঁড় করাইলেন।

আর ভোটাররাও প্রার্থীর জাতি দেখিয়া ভোট দিলেন। রাজনৈতিক মতবাদ পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। মুসলমানদের মধ্যে এই উগ্র সাম্প্রদায়িক ভাব সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। ইহার কারণ প্রধানতঃ দুইটি : (১) তাঁহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস ও কোরানের উপদেশ। কোরানের নবম সুরায় আছে :

"O true believers, take not your fathers or your brethren for friends, if they love infidelity above faith."

ইহার অনুবাদ দিলাম না। আবার আছে :

"O true believers, verily the idolaters are unclean ; let them not therefore come near unto the holy temple after this year."

ঐ সুরায় অন্যত্র আছে :

"It is not allowed unto the prophet, nor those who are true believers, that they pray for idolaters, although they be of kin."

(২) ১৯২০ হইতে ১৯৪৭ সন পর্য্যন্ত পৃথক নির্ব্বাচনপ্রথা ছিল। এই প্রথায় যদিও মুসলমান কেবলমাত্র মুসলমানকে ভোট দিতে বাধ্য তথাপি যে মুসলমান যত অধিকমাত্রায় সাম্প্রদায়িক তিনি তত বেশী ভোট পাইয়াছেন। ১৯৪৬ সনে বাংলায় যে নির্ব্বাচন হইয়াছিল তাহাতে মুসলিম লীগের ন্যায় উগ্র সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান ভোট পাইয়াছিল ২০,৩৬,৭৭৫টি, আর জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা ভোট পাইয়াছিলেন ১,৭৯,১৮৯টি—যদিও শেষোক্তরা অধিকতর শিক্ষিত ও অর্থশালী। ১০০০ মুসলীম ভোটের মধ্যে জাতীয়তাবাদীরা পাইয়াছিলেন মাত্র ৮১টি। ১১৯টি মুসলমান আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ দখল করে ১১৪টি আসন, কংগ্রেসী মুসলমান মাত্র ৪টি ও ১ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী। দিল্লীর ৩০টি আসনের একটিতেও কংগ্রেস বহু চেষ্টা করিয়া মুসলমানপ্রার্থী দাঁড় করাইতে পারেন নাই—নির্ব্বাচিত করা ত দূরের কথা।

শুধু বাংলায় নহে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সর্ব্বত্র—কি মুসলমানগরিষ্ঠ প্রদেশ, কি মুসলমানলঘিষ্ঠ প্রদেশে, জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা কম ভোট পাইয়াছিলেন। নিম্নে আমরা প্রদেশ অনুযায়ী তথ্যগুলি দিলাম। যথা :

প্রদেশ	জাতীয়তাবাদী মুসলমান কত ভোট পাইয়াছেন	মুসলিম লীগ কত ভোট পাইয়াছেন	জাতীয়তাবাদী মুসলমান মোট মুসলমান ভোটের শতকরা কত ভোট পাইয়াছেন
আসাম	৩১,১৯৭	১,৫৮,১৯০	১৬·৫
বিহার	৩৯,৫১৮	১,৪৬,০৭৮	২১·৩
বাংলা	১,৭৯,১৮৯	২০,৩৬,৭৭৫	৮·১
বোম্বাই	৫,৯৮৬	২,৫১,৩৩১	২·৩
মধ্যপ্রদেশ	৫৩১	৪৬,৮৮৯	০·১
মাদ্রাজ	৮,২৮৮	৩,০৭,৩৯৮	২·৬
উঃ পঃ সীমান্ত	৭,৮৭৫	১,৪৭,৮৮০	৫·০
উড়িষ্যা	৪৩১	৪,৩৩৬	০·১
পঞ্জাব	৪১,৬০৮	৬,৭৯,৯২৩	৫·৭
সিন্ধু	৩৫,৩০৫	১,৯৯,৬৫১	১৫·০
ইউ, পি	১,১৫,০০০	৫,২২,৭০৫	১৮·০
সমগ্র ভারত	৪,৬৪,৮২৮	৪৫,০১,১৫৬	৯·৩

সাম্প্রদায়িকতাবোধ কিরূপ বাড়িয়া গিয়াছে তাহা নিম্নের উদাহরণ হইতে বুঝা যাইবে। জেলা ২৪ পরগণার ভাঙ্গড় নির্ব্বাচনকেন্দ্রে ভোটারদের মধ্যে পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয়েরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। তৎপরেই মুসলমানেরা। এই কেন্দ্রে দুইটি আসন—দুইটি পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয়েরা দখল করেন ১৯৫২ সনের নির্ব্বাচনে—একজন কংগ্রেসী, অপর জন কম্যুনিষ্ট। কংগ্রেসী পাইয়াছিলেন ১৬,৯৪৩টি ভোট, কম্যুনিষ্ট পাইয়াছিলেন ১৬,১৭৬টি ভোট। বর্ণহিন্দু কংগ্রেসী পাইয়াছিলেন ১১৯৭০টি ভোট, বর্ণহিন্দু-কম্যুনিষ্ট পাইয়াছিলেন ১৫,৪৩৬টি ভোট।

বর্ত্তমান (১৯৫৭) নির্ব্বাচনে লোকসভায় ডায়মণ্ডহারবার নির্ব্বাচন-কেন্দ্রেও এই ভাব দেখা যায়। এই কেন্দ্রে পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয়েরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ও প্রতিপত্তিশালী। কম্যুনিষ্ট-তপশীলী পাইয়াছেন ২,৪৭,১৮৫ ভোট, কংগ্রেসী-তপশীলী পাইয়াছেন ২,৪৫,২৬৮ ভোট। ইঁহারা উভয়েই নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। যে কম্যুনিষ্ট সদস্য পরাজিত হইয়াছেন তিনি পাইয়াছেন ২,৪৪,৭৬৩টি ভোট। এই কেন্দ্রে ২১,৮৫০টি ভোট বাতিল হইয়াছে। অর্থাৎ একজন ভোটার একই ব্যক্তিকে ২টি ভোট দিয়াছেন—যাহা তিনি দিতে পারেন না। যাঁহারা গণনার সময় উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা বলেন, এই সব ভোট তপশীলী প্রার্থীদের বাক্স হইতে বাহির হইয়াছে। ইঁহারা যদি জাতি হিসাবে ভোট না দিয়া রাজনৈতিক দল হিসাবে দিতেন তাহা হইলে দুইটি আসনই একটি রাজনৈতিক দল পাইতেন।

দুঃখের বিষয়, সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে, ও রাজনৈতিক দলসমূহ প্রকারান্তরে ইহার প্রশ্রয় দিতেছেন।

এই সাম্প্রদায়িকতার ফলে বহু ভোট নষ্ট হইতেছে। তপশীলী-ভোটার তাঁহার দুইটি ভোটই তপশীলী প্রার্থীর বাক্সে দিলেন—ফলে তাঁহার একটি ভোট নষ্ট হইল। নষ্ট হয় হউক, অপর বর্ণহিন্দু-প্রার্থীও পাইল না। এ বিষয়ে 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকায় একজন দক্ষিণ ভারতীয় যে তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন তাহা নিম্নে দিলাম :

লোকসভায় নির্ব্বাচন-কেন্দ্র	ভোটারের সংখ্যা	যে ভোট দেওয়া হইয়াছে	বাতিল ভোট
সাহাপুর	৭,৭৮,৯৫৫	৬,২৩,৭১৪	২৭,৫০১
মাহবুবনগর	৭,৬৩,৫৬০	৫,৮৩,৭১৫	৩,৭৫,৩৩১
ফৈজাবাদ	৮,১১,৭৮৯	৬,৭৫,৬০৯	৬০,৬৫৫
ফুলপুর	৭,০৯,২৭৭	৬,৪৯,৬০৭	৩২,৭৪৫
চিদম্বরম	৮,৪৬,০৫৯	৮,২৫,০০১	৬৪,৭৬১
মোট	৩৯,০৯,৬৪০	৩৩,৫৭,৬৪৬	৫,৬০,৯৯৩

মোট প্রদত্ত ভোটের মধ্যে শতকরা ১৬·৬টি ভোট নষ্ট হইল। দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে অধিকাংশ বাতিল ভোট তপশীলী-প্রার্থীর বাক্স হইতে পাওয়া গিয়াছে। এবিষয়ে ইলেকশান কমিশনের তদন্ত করা দরকার।

রাজনৈতিক আগ্রহ

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও কংগ্রেসী দলের নেতা। তাঁহাকে নির্ব্বাচনে পরাজিত করিতে পারিলে প্রতিপক্ষ

দলের, বিশেষ করিয়া সম্মিলিত পন্থাপন্থীদলের, বিশেষ লাভ হইবে; এজন্ত তাঁহারা চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই—এমনকি মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক জিগীর ও উস্কানি অবধি দিয়াছিলেন। অপর পক্ষে কংগ্রেস ও বিধানচন্দ্র দ্বারে দ্বারে ভোট ভিক্ষা করিয়া ঘুরিয়াছেন, নাখোদা মসজিদের ইমামদের 'দোওয়া' লইয়াছেন। বিধানচন্দ্র যে নির্ব্বাচন-কেন্দ্র হইতে দাঁড়াইয়াছিলেন তাহা হইল কলিকাতার মধ্যস্থিত বহুবাজার-কেন্দ্র। ভোটারদের সংখ্যা ৬৩,২২৯ জন—ইহার মধ্যে ২৪ হাজার মুসলমান, হিন্দু ৩৫ হাজার, চীনা ভোটার ১ হাজার—ইহা ছাড়া পার্শী, শিখ ও জৈন ইত্যাদি আছেন। এই নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে ৩ জন প্রার্থী দাঁড়াইয়াছিলেন। কে কত ভোট পাইয়াছিলেন নিয়ে দেওয়া হইল :

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়	—	১৫,৫৫০
মহম্মদ ইসমাইল	—	১৫,০১০
মহেন্দ্রকুমার ঘোষ	—	৫০০
বাতিল	—	৩৮
		৩১,০৯৮
টেণ্ডার-ভোট		১০২

প্রকৃত ভোটার ভোট দিতে আসিয়া যদি দেখেন তাঁহার পক্ষে অপর একজন ভোট দিয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে তিনি টেণ্ডার-ভোট দেন। এই ভোট ভোটগণনার সময় ধরা হয় না। পরে নির্ব্বাচনী-মামলা হইলে এই ভোট সম্বন্ধে রায় অনুযায়ী ব্যবস্থা করা হয়। দেখা যায় জাল-জুয়াচুরিসমেত শতকরা ৪৯.২ জন ভোট দিয়াছিলেন। বাকী শতকরা ৫০.৮ জন ভোট দিতে আসেন নাই। কারণ কি? প্রধান কারণ—সাধারণ ভোটারদের মধ্যে রাজনৈতিক আগ্রহের অভাব। আরও কতকগুলি ছোট ছোট কারণ আছে, যেমন মৃত ব্যক্তির নাম ভোটার তালিকায় থাকা, এক নাম দুই বার থাকা, ভুয়া ভোটারদের নাম থাকা—যাহার সংখ্যা শতকরা ৭.৮ জন হইবে, ভোটের সময় ভোটগ্রহণকেন্দ্র হইতে বহু দূরে থাকা, শারীরিক অসুস্থতা ইত্যাদি। এই সব ছোট ছোট কারণ বাদ দিলেও দেখা যায় ভোটারদের না আসার প্রধান কারণ রাজনৈতিক আগ্রহের অভাব।

১৯৫২ সনের সাধারণ নির্ব্বাচনে একটি নির্ব্বাচন-কেন্দ্র হইতে বিনা বাধায় একজন প্রার্থী নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এবারেও ১ জন প্রার্থী বিনা বাধায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। যে যে নির্ব্বাচন কেন্দ্রে ২টি করিয়া আসন সেখানে প্রত্যেক ভোটারদের ২টি করিয়া ভোট। এইরূপ বহু কেন্দ্র আছে। সেজন্ত ভোটের সংখ্যা হইতে কয় জন ভোটার ভোট দিতে আসিয়াছিল তাহা বলা যায় না। গত বারে যে যে কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ করা হইয়াছিল সেই সেই কেন্দ্রের মোট যত ভোট তাহার মধ্যে যে সংখ্যক ভোট বিভিন্ন প্রার্থীরা পাইয়াছিলেন তাহার হিসাব করিয়া ইলেকশান কমিশন দেখাইয়াছেন—পশ্চিমবঙ্গে শতকরা ৪২টি ভোট দেওয়া হইয়াছিল।

এইবারে ভোটারের সংখ্যা বাড়িয়াছে শতকরা ২০.৮ জন করিয়া। আর প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা বাড়িয়াছে শতকরা ২৩.৯টি হিসাবে। সুতরাং ভোটদানের আগ্রহ মোটামুটি হিসাবে বাড়িয়াছে ২৩.৯—২০.৮=৩.১। পূর্ব্বের শতকরা ৪২-এ এই সংখ্যা যোগ করিয়া আমরা পাই শতকরা ৪৫। ভোটারদের ভোট দিবার আগ্রহ বাড়িলেও খুব কম হারে বাড়িয়াছে। ইউরোপ, আমেরিকায় সাধারণতঃ শতকরা ৮০ জন ভোট দেয়। আগামী বারে যদি ডবল নির্ব্বাচন-কেন্দ্র উঠিয়া যায় তাহা হইলে ভোটদানের পরিমাণ আরও বাড়িবে বলিয়া আশা করা যায়।

শ্রীদীপক চৌধুরী

সুতপার বিবৃতি

এক

ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে মহীতোষের কথা মনে পড়ল প্রথম। কি করে যে সে এত কাছে এসে পড়ল ভেবে আশ্চর্য হলাম খুবই। পুরুষমানুষকে কাছে আসতে দেব না বলেই ত আমি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা চেয়েছিলাম। প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে টাকাগুলো আমি মুঠোর মধ্যে ধরে রেখেছিলাম সারাদিন। রাত্রে বিছানায় গিয়ে যখন এলিয়ে পড়লাম তখন একশ' টাকার বড় নোট দুখানা আমার সঙ্গেই ছিল। সে রাত্রির রোমাঞ্চ আমার নারীজীবনের একমাত্র কুশল-সংবাদ।

আমার দু'পাশে নোট দুখানা পড়েছিল। ঘরে আলো জেলে রেখেছিলাম। সারারাত তেল পুড়ল। ওদের ভাল করে দেখবার জন্যে পলতের মুখে আগুন রেখেছিলাম প্রচুর। ভোর না হওয়া পর্যন্ত আগুনের তেজ সেদিন কমে নি।

শুধু একটা রাত্রির মধ্যে তাদের দেখবার সাধ আমার ফুরিয়ে যায় নি। দ্বিতীয় দিন মধ্যরাত্রে মনে হয়েছিল, দুটো নোট জোড়া লেগে এক হয়ে গেল। ক্রমে ক্রমে তার হাত-পা গজাল। চোখও ফুটল শ' টাকার নোটের। তৃতীয় রাত্রির সুরুতে বোধ হয় সেই কাগজখানাই পুরুষমানুষ হ'ল।

দেখতে বেশ লম্বাচওড়া। লাল টুকটুকে ঠোঁটের ভাঁজে মৃদু মৃদু হাসি। আমি দেখলাম, লোভের ঢেউ লেগে লেগে হাসির রেখাটি ভাঙছে। তার পর পলতেটার পরমায়ু গেল ফুরিয়ে। ঘরময় অন্ধকারের নেশা। আমার দেহের সৈকতে পূর্বরাগের পুলক।

আর বেশীদূর ওকে এগোতে দিই নি। ঘটনাটা পাঁচ বছরের পুরনো, তবু আমার মনে আছে ওকে আমি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম মেঝের ওপর। পা দিয়ে মাড়িয়ে দিয়েছিলাম শ' টাকার নোট। সেই রাত্রির ইতিহাসে আজও বোধ হয় আমার হিংস্রতার দাগ লেগে আছে। আমার নবলব্ধ স্বাধীনতার প্রমাণ আমি রেখে এসেছি!

দুশ' টাকা আমার প্রথম উপার্জন। আমার একলার। আমার মুঠোর মধ্যে শ'টাকার নোট দুখানা মাথা গুঁজে পড়ে ছিল বাহাত্তর ঘণ্টার ওপর। ওদের আর্তনাদের ভাষা আমি অনুভব করেছি বটে, কিন্তু মুক্তি তাদের দিই নি। মাত্র বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে আমি বুঝেছিলাম, সমাজের মুঠো এবার আলগা হয়েছে। আমার জীবনের ত্রিশটা বছর তারই মুঠোয় আবদ্ধ হয়ে ছিল।

চতুর্থ দিন সকালবেলা মাসীমাকে বলেছিলাম,"এই নাও টাকা। এবার থেকে আমরা তোমার সত্যিকারের পেইং গেষ্ট হলাম।"

"কাল বুঝি মাইনে পেয়েছিস?" জিজ্ঞাসা করলেন মাসীমা।

বললাম, "কাল নয়, মাইনে পেয়েছি পয়লা তারিখে।"

"তবে যে পয়লা তারিখে আমি টাকা চাইলাম, তুই বললি —না বাপু তোদের ব্যাপার কিছু বুঝি না। দিগম্বর মুদী কাল আমায় জানিয়ে গেছে বাকিতে আর এক পয়সার নুনও দিতে পারবে না। তপা, তোরা কি মাসীমার দুঃখ কোন দিনই দেখতে পাবি নে? এবার বোধ হয় হোটেলের দরজা বন্ধ করতে হবে। পরের ঝক্কি বয়ে বেড়াবার বয়স আর নেই।"

নোট দুখানা মাসীমার হাতে গুঁজে দিয়ে বলেছিলাম, "পরের ঝক্কি বইবে না ত কি করবে তুমি? তোমার নিজের ঝক্কি ত কিছু নেই। মাসীমা, তোমার হোটেলের দরজা খোলা রেখেছেন পঞ্চানন ঠাকুর। চেষ্টা করলেও তুমি বন্ধ করতে পারবে না।"

"না বাপু, তোদের কথা আমি বুঝি না। পয়লা তারিখে টাকা ক'টা দিয়ে দিলে দিগম্বর কাল আমায় এমন করে কথা শোনাতে পারত না।"

মনের কথা সেদিন মাসীমার কাছে চেপে গিয়েছিলাম। পয়লা তারিখে কেন টাকা দিই নি তার কারণটা তাঁকে বলি নি। দিগম্বরের অপমান তাঁকে বিঁধেছিল। পরে একদিন বলেছিলাম, "মাসীমা, প্রথম মাসের মাইনে যেদিন পেলাম সেদিন আমার কি মনে হয়েছিল জান?"

"তুই বল, আমি শুনি।"

"আমার সারা জীবনের দাসত্ব সব ঘুচে গেল।"

"বলিস কি তপা? এই ত সেদিন দস্যু ইংরেজরা দেড় শ' বছরের দাসত্ব সব ঘুচিয়ে দিয়ে ভারতবর্ষের বন্দর থেকে বিদায় নিয়ে গেল—ওরে ওরা যে গেল তাও ত কম দিন হয় নি—" মনে মনে হিসেব করে মাসীমাই আবার বললেন,"হ্যাঁ, পাঁচ বছর হয়ে গেছে। অথচ তুই বলছিস তোর দাসত্ব ঘুচল এ মাসের পয়লা তারিখে!"

"মাসীমা, তুমি ছাড়া আমার মনের কথা কেউ বুঝবে না। ইংরেজদের সঙ্গে আমার পরিচয় খুব কম। কিন্তু তুমি নিজেই

ত দেখেছ, সমাজ আমায় মুক্তি দেয় নি। স্বদেশের চেনা লোকগুলোই ত আমার পায়ে শেকল পরিয়েছিল। এবার আমি স্বাধীন। টাকার স্বাধীনতা যার নেই সে ত সর্বহারা! মাসীমা, পয়লা তারিখে তোমায় টাকা দিই নি তার কারণ, আমি পরীক্ষা করে বুঝতে চেয়েছিলাম যে, সত্যিই আমি স্বাধীন কিনা। কোন তারিখে টাকা দেব তা কি আমার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে না? করে, নিশ্চয়ই করে। ইচ্ছে না থাকলে তোমায় আমি চার তারিখের সকালবেলায়ও টাকা দিতাম না।"

"দিগম্বর যে আমায় অপমান করল?"

"আমার মুক্তির দিনটিতে দিগম্বরের কথা মনে পড়ে নি।"

আমার কথা শুনে মাসীমা সেদিন কি ভেবেছিলেন জানি না। জানবার চেষ্টাও করি নি।

মহীতোষ আজ আসবে। ছ'মাস আগে সে আমায় ময়দান থেকে তুলে নিয়ে এসে সরকার-কুঠিতে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রয়োজন আমি অস্বীকার করি নি। সেই জন্যেই আমি তাকে দ্বিতীয় বার আসবার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছিলাম। সে এসেছিল। আমার সঙ্গে দেখা হয় নি। একতলায় নেমে আসবার মত শক্তি আমার ছিল না। বুকের ডান দিকটাতে আঘাত লেগেছিল খুব। মাসীমা দেখেছিলেন, আধ ইঞ্চির মত গর্ত হয়েছিল দুটো পাঁজরার মাঝখানে। মাসীমার বিশ্বাস, জুতোর তলায় লোহার নাল বাঁধা না থাকলে ক্ষতের গভীরতা আধ ইঞ্চির চেয়ে কমই হ'ত।"

আমি আরোগ্য হয়ে উঠেছি। পনর দিনের বেশী ছুটি আমায় নিতে হয় নি। মহীতোষের কাছে শুনেছি, লাহিড়ী সাহেব আমার খোঁজ নেন নি। মাদ্রাজী স্টেনোর কাজ তিনি পছন্দ করেন। পছন্দ যে করেন তার প্রমাণ আমি পেয়েছি। পনর দিন পরে কাজে যোগ দেওয়ার সময় ছোট সাহেবের সঙ্গে যখন আমার প্রথম দেখা হয় তখন তিনি ফাইলের দিকে চেয়ে বলেছিলেন, "আরও দু'এক মাসের ছুটি নিলেই ত পারতেন। বড্ড শুকিয়ে গেছেন।"

তিনি বোধ হয় সেই মুহূর্তে সুয়েজখালের কথা ভাবছিলেন। খালটায় প্রচুর জল থাকা সত্ত্বেও একটা জাহাজও ভারতবর্ষের বন্দরে এসে পৌঁছতে পারছে না। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সুরুতেই লাভের অঙ্ক শুকিয়ে যাচ্ছে। আমি জানি, তিনি আমায় দেখেন নি। আগের চেয়ে শরীর আমার খারাপ হয় নি। আমি এত বেশী রোগা যে শুকিয়ে যাওয়ার মত আধ ইঞ্চি মাংসও আমার উদ্বৃত্ত নেই। আমি তাঁকে বলেছিলাম, "আমি ভাল হয়ে উঠেছি। ছুটি নেওয়ার দরকার নেই স্যার।"

"তা হলে নোট নিন।" এই বলে ছোট সাহেব ফাইল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। ব্যস্ততার মাঝখানে হঠাৎ তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "বেশী দিনের ছুটি চেয়ে আপনি কি বড়বাবুর কাছে লোক পাঠান নি?"

"না স্যার।"

"তা হলে—আচ্ছা নোট নিন। হ্যাঁ দেখুন, আজ যেন পাঁচটার সময় চলে যাবেন না, পাঁচটার পরেও কাজ করতে হবে। খুব প্রেশার আছে আজ। চিঠিপত্র অনেক জমে রয়েছে। গত পনর দিনে কোন কাজই হয় নি। সুন্দরম্ বলে যে মাদ্রাজী ছেলেটি আছে তার স্পীড বড় কম।"

বললাম, "ছেলেমানুষ, আস্তে আস্তে স্পীড তার বাড়বে।"

তার পর ছ'মাস কেটে গেছে। মহীতোষ এর মধ্যে সরকার-কুঠিতে এসেছে বারদশেক। কিন্তু কয়েক দিন তার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। পাঁচটার মধ্যে তাকে গড়িয়ায় পৌঁছবার সময় দিয়ে আমি গড়িয়া থেকে বেরিয়ে এসেছি তিনটের আগে। রবিবারের ছুটির দিনগুলো আমি সরকার-কুঠিতে বসে নষ্ট করতে চাই নি। একদিন মাসীমা আমায় বলেছিলেন, "তপা, মহীতোষ সেই রাত আটটা পর্যন্ত বসে বসে চলে গেল। এ কি রকম ব্যবহার?"

"কেন? কি করলাম?"

"তুই তাকে পাঁচটার সময় আসতে বলেছিলি না?"

"বলেছিলাম। তোমরা কি তার সঙ্গে কথা কও নি?"

"মহীতোষ আমাদের সঙ্গে কথা কইতে আসে না। তুই ত খুকী নোস—তোকে কি আমায় নতুন করে বর্ণপরিচয় শেখাতে হবে? তা ছাড়া এই নিয়ে তুই বোধ হয় চার দিন ওর সঙ্গে ইয়ারকি মারলি।"

"ইয়ারকি?"

"তা নয় ত কি? ওকে পাঁচটার সময় আসবার জন্যে বলে এলি আর তুই রাত ন'টা পর্যন্ত বাড়ী নেই। হ্যাঁ রে, ব্যাপারটা কি?"

ভেবে চিন্তে মাসীমাকে জবাব দিয়েছিলাম, "পরীক্ষা করে দেখলাম, আমার স্বাধীনতা আজও অটুট আছে কিনা। শুধু কথা দেওয়ার অধিকার থাকলে চলবে কেন? কথা ভাঙার অধিকারও আমার থাকা চাই। মাসীমা, পরাধীনতার ফাঁস অনেক সময় চোখে দেখে চেনা যায় না, হাত দিয়ে নেড়েচেড়ে দেখতে হয়।"

"বলিস কি তপা! ওই মহীতোষই না তোকে ময়দান থেকে তুলে নিয়ে এসেছিল?"

"আবার ওই মহীতোষরাই একদিন পায়ের তলায় মাড়িয়ে দিতে পারে।"

"না বাপু তোর কথা আমি বুঝতে পারি না। ওরে ও তপা, বল্ ত কি চাস্ তুই ?"

"আগুন। শতাব্দীর গায়ে গলিত মাংসের কুচিগুলো বাদুড়ের মত ঝুলছে। আগুনের গোলা মেরে মেরে ওদের পুড়িয়ে দিতে চাই। এ আগুন কেউ নেভাতে পারবে না। গড়িয়ার খালে জল নেই। মাসীমা, কাল যখন আমি ফিরলাম তখন বেশ রাত হয়েছে। খালের দিক থেকে কি রকম একটা আওয়াজ আসছিল। আমি গিয়ে উপস্থিত হলাম তোমার গোয়ালের পেছন দিকটাতে। তুমি বল, ওই জায়গায় জলের গভীরতা সবচেয়ে বেশী। দেখবার জন্যে মুখ নিচু করলাম আমি। হঠাৎ আমার মাথার ওপর দিয়ে হাওয়া বইতে লাগল, গরম হাওয়া। হাওয়াতে আওয়াজ ছিল। মুহূর্তের মধ্যে আমি দেখলাম, জল সব শুকিয়ে গেল! খালের বুকটা আমার চেয়েও শুকনো হয়ে উঠল। মাসীমা, কাল রাত্রে লালুদার নিশ্বাস আমার গায়ে লেগেছে।"

হাতের পাঞ্জা প্রসারিত করে মাসীমা তাঁর দু'হাত দিয়ে কান দুটো ঢেকে ফেলেছিলেন।

সকালের দিকে ঘুম ভাঙল আজ। রবিবার বলে বিছানায় শুয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। ওপাশের খুপরিটাতে কোন সাড়াশব্দ নেই, রতন এখনও ঘুমুচ্ছে। গত দু'রাত্রি খুবই কষ্ট পেয়েছে সে।

রতন আগে আমার ঘরেই ঘুমাত, আলাদা বিছানায়। গত এক মাস থেকে ওকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমারই ঘরের সংলগ্ন ছোট্ট একটা বারান্দা ছিল, কঞ্চির বেড়া দিয়ে বারান্দাটাকে ঘিরে দিয়েছেন মাসীমা। খরচ যা লেগেছিল সবই আমি দিয়েছি।

বিছানায় শুয়ে টেবিলের দিকে হাত বাড়ালাম। ঘড়িটা টেনে নিয়ে দেখলাম পৌনে আটটা। এবার উঠতে হয়। মহীতোষকে আসতে বলেছি বারোটার মধ্যে। মহীতোষ আজ মাসীমার হোটেলে খেতে আসবে, কাল তাকে আমি নেমন্তন্ন করে এসেছি। বলরামকে নিয়ে ষষ্ঠীদার বাজারে যাওয়ার কথা আছে। বেশী খরচার জন্যে কাল রাত্রিতেই ষষ্ঠীদাকে কুড়িটা টাকা আমি দিয়ে রেখেছিলাম। বোধ হয় এতক্ষণে সে ফিরে এসেছে।

হাতমুখ ধুয়ে তৈরী হতে মিনিট পনর লাগল। ছুটির দিনে বিন্দুমাত্র তাড়া ছিল না। তবুও তাড়াতাড়ি করে কাপড়-চোপড় বদলে নিয়েছি। একতলায় নামতে হবে, রান্নার দায়িত্ব শুধু মাসীমার একলার নয়, আমারও। হ্যারিসন রোডের হোটেলে যা রান্না হয় তার স্বাদ নাকি গত পাঁচ বছরের মধ্যে একটুও বদলায় নি। মহীতোষ আজ নতুন স্বাদের অন্বেষণে সরকার-কুঠিতে আসছে।

সিঁড়ির মুখেই দেখা হয়ে গেল ষষ্ঠীদার সঙ্গে। বলরামের মাথায় মস্ত বড় ঝুড়ি। পোনা মাছের ল্যাজটা ঝুড়ির ওপর দিয়ে বাইরে বেরিয়ে রয়েছে। ষষ্ঠীদা সেই দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল, হাসিতে তার জয়ের বিজ্ঞাপন। বাজারের সবচেয়ে বড় পোনা মাছটা আজ তার সামর্থ্যের ঝুড়িতে লম্বা হয়ে শুয়ে রয়েছে।

আমাকে দেখে বলরামও দাঁড়িয়ে রইল। চৌদ্দ বছর বয়সের বলরামের মাথায় কুড়ি টাকার বাজার। আনন্দে আর গর্বে বলরাম তার বুকের ছাতি চওড়া করবার চেষ্টা করছিল। খালি গা, শার্ট দুটো আজকাল ষষ্ঠীদার বাক্সেই থাকে। আমি দেখলাম, কুড়ি টাকার সওদা থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে জল পড়ছে বলরামের বুকে। হঠাৎ মনে হয়, সারাটা পথ সে কাঁদতে কাঁদতে আসছে, হয় ত কেঁদেছে, কিন্তু এ কান্না আনন্দের।

ষষ্ঠীদা বলরামকে ইশারা করল। তার পর দুজনে চলে গেল রান্নাঘরের দিকে। সিঁড়ির মুখে আমিই শুধু দাঁড়িয়ে রইলাম একা।

দাঁড়িয়ে থাকতেই আমি চেয়েছিলাম। পেছন থেকে ষষ্ঠীদাকে দেখছিলাম আমি। লোকটির মধ্যে কি অদ্ভুত পরিবর্তন এসেছে!

মাসীমার হোটেলে আমার চেয়েও ষষ্ঠীদা পুরনো বাসিন্দা। ষষ্ঠীদাকে কেউ কখনও কথা বলতে শোনে নি। হ্যাঁ এবং না দুটি শব্দ দিয়েই সে সারা পৃথিবীর সঙ্গে কথার সম্পর্ক বজায় রেখেছে। মেসোমশাই বলেন, গত দশ বছরের মধ্যে ষষ্ঠীদা নাকি দশটার বেশী কথা বলে নি। এমন একটি অবাঙালী চরিত্রের দিকে চেয়ে মাসীমা বলেন—ষষ্ঠীর মনে বিদ্বেষ আছে। হয় ত এ বিদ্বেষ ওর সংসারের প্রতি, কিন্তু এমন নিঃশব্দে ত কাউকে কখনও বিদ্বেষ পোষণ করতে দেখি নি। তপা, এই ধরনের বিদ্বেষ বড় সাংঘাতিক—এর চেয়ে মারাত্মক রকমের বিষ সাপের মুখে ত দূরের কথা, বৈজ্ঞানিকদের বইয়ে পর্যন্ত নেই।

মাসীমার কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না, কিন্তু অবিশ্বাসই বা করি কি করে?

এক তলার চানঘরের পাশে ষষ্ঠীদা থাকে। ঘরখানা খুবই ছোট, চানঘরের ভেজা আবহাওয়া সারা দিনে শুকোয় না বলে তার নিজের ঘরখানা আর্দ্রতার আক্রমণ থেকে মুক্তি পায় না। মেসোমশায়ের কাছে শুনেছি, ষষ্ঠীদা যখন প্রথম এল তখন সে দোতলার বড় ঘরখানাতেই ছিল। মাসের প্রথম তারিখে টাকাপয়সা সে চুকিয়েও দিত। তার পর

বছর তিন পরে তাকে নিচে নেমে আসতে হয়। হয় ত সরকারকুঠির পলস্তারার মত তার আয়ের পলস্তারাও খসে পড়েছিল। অল্প ভাড়ার সবচেয়ে খারাপ ঘরে এসে তাকে একদিন আশ্রয় নিতে হ'ল। ষষ্ঠীদার অতীত ইতিহাস হয় ত মাসীমাই শুধু জানেন।

বিজয়বাবু নাকি মাঝে মাঝে মাঝরাত্রিতে দেখেন যে, লণ্ঠন জ্বালিয়ে ষষ্ঠীদা বুকের তলায় বালিশ দিয়ে বিছানায় শুয়ে লেখাপড়া করে। বিজয়বাবু উঁকি দিয়ে দেখেছেন, ষষ্ঠীদার হাতে কলম, ফাউন্টেন পেন। সামনে তার একটা বাঁধানো খাতা। বিজয়বাবুর খবর শুনে মাসীমা সেদিন হেসে হেসে খুন! তিনি আমাদের ডেকে বলতে লাগলেন, "বিজয় মাষ্টারের কথা শোন্—ষষ্ঠীর হাতে নাকি ও ফাউন্টেন পেন দেখেছে।"

আমি বলেছিলাম, "বিজয়বাবু হয়ত ঠিকই দেখেছেন। কেন, ষষ্ঠীদা কি ফাউন্টেন পেন কিনতে পারে না?"

"পারবে না কেন? ষষ্ঠীর যদি একটা ফাউন্টেন পেন থাকে, আমি নিশ্চয়ই দেখতাম। ষষ্ঠীর যা ঐশ্বর্য তার কোন কিছুই গোপন নেই। তা ছাড়া, কলম দিয়ে ও কি লিখবে? বিজয় বোধ হয় হাতে ওর তুলি দেখেছে। ষষ্ঠী আজকাল প্রধান নায়িকাদের ছাড়া অন্ত কারও মুখে রং মাখায় না। চিত্রতারকাদের বাড়ী যায় ষষ্ঠী। ও হচ্ছে গিয়ে আজকাল ও লাইনের শিল্পীসম্রাট। বলি ও বিজয়, তোমার কি ইস্কুলে যাওয়ার সময় হয় নি? পুরো মাইনে নিচ্ছ, লেট হলে চলবে কেন? ষষ্ঠীকে নিয়ে অমন ঠাট্টা করো না বাছা। লেখাপড়ার লাইন হচ্ছে গিয়ে তোমাদের—হ্যাঁ রে তপা, তোরও কি আজ আপিস নেই? লেট হলে ছোটসাহেব রাগ করবেন না?"

মাসীমা জানতেন, সেদিন আমাদের আপিস বন্ধ ছিল। তবুও তিনি আমায় আপিসে যাওয়ার জন্যে তাগাদা দিতে লাগলেন বার বার। আমি বুঝতে পারলাম, ষষ্ঠীদার গোপন খবর নিয়ে তিনি আর আলোচনা করতে চান না। হয়ত তিনি মনে মনে ব্যথা পেয়েছেন। তিনি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করতেন যে ষষ্ঠীদার কোন ঐশ্বর্যই তাঁর চোখে গোপন নেই। কিংবা ফাউন্টেন পেনের গোপন ঐশ্বর্য তিনি একাই জানতে চান বলে মাসীমা আমাদের সামনে হেসে হেসে ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।

রান্নাঘরে এসে দেখি বলরাম মাথা থেকে ঝুড়িটা তার নামিয়ে ফেলেছে। ষষ্ঠীদা লিস্ট দেখে দেখে জিনিষগুলো সব মিলিয়ে মেঝের উপর রাখছে। মাসীমা বসে ছিলেন সামনেই।

সরকার-কুঠিতে দু'জন রাঁধুনি বামুন দরকার, কিন্তু শম্ভু ঠাকুর একলাই রাঁধে। মাসীমাকে অবশ্য সারা সকালই রান্নাঘরে থাকতে হয়। তিনি বলেন, "ভাড়া করা লোক দিয়ে সংসারের সব কাজ চলে না। বিশেষ করে খাবার জিনিস মেয়েদের হাতেই থাকা উচিত।"

আমাকে দেখতে পেয়ে মাসীমা জিজ্ঞাসা করলেন, "তুই এখানে কি করতে এলি?"

বললাম, "তোমাকে খানিকটা সাহায্য করতে চাই।"

"সাহায্য? ও বুঝতে পেরেছি—বলরাম, মাছটা তোল ত ঝুড়ি থেকে।" মাসীমা মুখ নিচু করে হাসতে লাগলেন।

আমি জানি, মাসীমা আমায় ভুল বুঝলেন। জিজ্ঞাসা করলাম, "হাসছ যে?"

"না বাপু, দু'একটা রান্না তুই নিজে হাতে আজ রাঁধ্। হ্যাঁ রে, মহীতোষ ত বাঙাল, খুব ঝাল খায় বুঝি?"

ঝুড়ি থেকে মাছটা টেনে তুলতে গিয়ে বলরাম দেখি চেয়ে রয়েছে মাসীমার দিকে। হাত থেকে ওর পোনা-মাছটা পড়ে গেল মেঝের উপর। রান্নাঘর থেকে সে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

আমি বললাম, "কোথায় যাচ্ছিস বলরাম? দাঁড়া, মাছটা যে তোকেই কেটে দিতে হবে।"

"পারব না?"

"কেন? এত বড় মাছ মাসীমা ত কাটতে পারবেন না।"

"আমিও পারব না—"

"কেন কি হ'ল?"

"তোমরা আমাদের বাঙাল বল কেন?"

বলরামের কথা শুনে মাসীমা উঠে এসে ওকে জড়িয়ে ধরলেন। হাসতে হাসতে বললেন, "আয় বাছা, আয়—পেটে ভাত নেই, কিন্তু মেজাজ আছে ষোল আনা। বলরাম, তুই যদি মাছটা কেটে না দিস, তা হলে আমরা সবাই আজ উপোস করে থাকব!"

বলরাম ফিরে এল। আমি এবার বললাম, "ষষ্ঠীদা যে তোকে দিনরাত রিফিউজীর বাচ্চা বলে গাল দেয় তখন ত তোর গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগে না—"

বঁটির মুখে পোনামাছের ঘাড়টা ঠেকিয়ে দিয়ে বলরাম বলল, "ষষ্ঠীদা আমায় গাল দেয় না, ভালবাসে।"

পোনামাছ তখন দু'টুকরো হয়ে মাটিতে পড়ে গেছে। মাসীমা মুখ টিপে হাসতে হাসতে বললেন, "ভালবাসে? তোকে কেন ভালবাসতে যাবে রে মুখপোড়া? ষষ্ঠী কি তার মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ে দেবে?"

"ষষ্ঠীদা নিজেই ত বিয়ে করে নি।" এই বলে বলরাম

উঠে পড়ল। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে সে বলল, "আমি আসছি, টাইগারের থালাটা নিয়ে আসি। রক্তটুকু ধরে রাখব।"

তাজা মাছ, ঘাড় থেকে অনেকটা রক্ত পড়েছে। মেসো মশাই একটা কুকুর পোষেন। তার নাম হচ্ছে টাইগার। এতদিন কুকুরটার যত্নআত্তি কিছু হয় নি। বলরাম আসবার পর থেকে টাইগারের গায়ে জোর বেড়েছে। রাত্রি জেগে পাহারা দেয় সে। নতুন লোক দেখলে দিনের বেলায়ও চেঁচায়।

বলরাম বেরিয়ে যাওয়ার পরে মাসীমা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। আমি দেখলাম, তিনি মাছটার ঘাড়ের দিকে এক-দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন, তাজা রক্ত ক্রমে ক্রমে শুকিয়ে উঠেছে। আমি বুঝতে পারলাম, বিয়াল্লিশের সেই পুরনো দৃশ্যটা মাসীমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে।

বলরাম ফিরে আসবার আগে ষষ্ঠীদা বলল, কুড়ি টাকায় কুলোয় নি তপাদি, তিনটে টাকা তোমার বেশী খরচ হয়েছে। আমি এবার চলি আজও আমায় ডিউটিতে যেতে হবে।"

"কখন ফিরবে?"

"তিনটের মধ্যে! তোমরা খেয়ে নিও—"

"তা কি করে হয় ষষ্ঠীদা?"

এই সময় বলরাম ফিরে এসে ঘোষণা করল, "মাসীমা নতুন লোক এসেছে।"

"ক'জন?" জিজ্ঞাসা করলেন মাসীমা।

"একজন?"

"দাঁড়া, আমি যাচ্ছি। তপা, বলরামকে দিয়ে মাছটা কাটিয়ে নিস—"

মাসীমার পিছু পিছু ষষ্ঠীদাও ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

টাইগার নতুন মানুষ দেখেছে। রান্নাঘরে বসে আমি ওর গলার আওয়াজ পাচ্ছিলাম। বড্ড বেশী ঘেউ ঘেউ করছে। মাছ কাটতে কাটতে বলরাম বলল, "দুটো রক্ত খেলেই মুখ ওর বন্ধ হয়ে যাবে।"

"দুটোতে বোধ হয় বন্ধ হবে না, এত বেশী রক্ত খাওয়াচ্ছিস ওকে—"

"দেখবে? যাই—" বলরাম উঠে পড়ছিল, আমি বললাম, "না, থাক, বেলা বাড়ছে, তাড়াতাড়ি রান্না চাপাতে হবে। মশলাবাটাও হয় নি—"

"সব আমি ঠিক করে দেব। আচ্ছা তপাদি, মহীতোষ-বাবু তোমাদের আপিসে কাজ করেন?"

"হ্যাঁ।"

"আমায় একটা কাজ দাও না তোমাদের আপিসে? মাইনে বেশী দিতে হবে না।"

"কম মাইনের কাজ ত আমাদের আপিসে নেই।"

আমার কথা শুনে বলরাম গম্ভীর হয়ে গেল। অন্যমনস্ক ভাবে টুকরোগুলো গুনতে লাগল সে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "টাকা দিয়ে কি করবি?"

"মাসীমাকে দেব। একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না। আমায় তুমি বুঝিয়ে দেবে তপাদি?"

"দেব। কি কথা রে?"

শম্ভু ঠাকুরের দিকে মাছের থালাটা এগিয়ে দিয়ে বলরাম জিজ্ঞাসা করল, "দু'মুঠো ভাতের জন্যে মানুষকে সারাদিন কাজ করতে হয় কেন? কাজ করলেই খেতে পাব, আর কাজ না করলে উপোস করব এমন নিয়ম কে তৈরি করেছে তপাদি?"

সহসা জবাব দিতে পারলাম না। জবাব দিলামও না। আমি শুধু জিজ্ঞাসা করলাম ওকে, "কাজ করতে তোর ভাল লাগে না?"

"না।"

"তবে কি করতে চাস তুই?"

"বাঁশী বাজাতে চাই।"

"কৈ, আমরা ত কেউ তোর বাঁশী শুনি নি?"

"টাইগার শুনেছে। আর—আর ষষ্ঠীদাও শুনেছে। গেল রবিবার আমরা তিন জনাতে মিলে হাঁটতে হাঁটতে চলে গিয়েছিলাম অনেক দূরে। এখান থেকে প্রায় তিন ক্রোশ দক্ষিণে। ষষ্ঠীদা হাঁফিয়ে পড়ল, একটা পুকুরের পাড়ে এসে বসলাম আমরা। ষষ্ঠীদা বলল, পুকুরটার নাম হচ্ছে মান্নাদের গড়া। পাঁচ-দশ মিনিট জিরিয়ে নিলাম আমি, তার পর বাঁশী বাজাতে লাগলাম। প্রায় এক ঘণ্টা একটানা বাজালাম। ষষ্ঠীদা বলল, 'টাইগার ঘুমিয়ে পড়েছে। এ বাজনা কলকাতার মত ছোট ছোট স্টুডিওতে দাম পাবে না। বলরাম, এ হচ্ছে কুচো চিংড়ির দেশ। তোকে বোম্বাই যেতে হবে, আমি নিয়ে যাব। সেখানকার ফিল্ম কোম্পানীতে আমার কাজের অভাব হবে না। এখন বাড়ী চল, অনেক বেলা হয়ে গেল।' তপাদি, আমি বাঁশী বাজাই, দাম দিয়ে কি করব? কিন্তু ষষ্ঠীদা বলে, দাম না দিলে টাইগারকে আধখানা গৎও শোনাতে পারবি নে। কলকাতা হচ্ছে গিয়ে নগদ কার-বারের জায়গা। ভাবছি, আমি আবার বাবা যতীন কলোনীতেই ফিরে যাব।"

টাইগারের গলার আওয়াজ আবার শুনতে পেলাম। বলরাম বলল, "নতুন লোক দেখেছে, বাবুটি সাহেবের মত দেখতে। আমাদের এখানে মানাবে না।"

"মহীতোষবাবুকে মানাবে?"

"হ্যাঁ—মাসীমার হোটেলের যুগ্যি লোক তিনি। কবে তিনি এখানে থাকতে আসবেন তপাদি?"

ইতিমধ্যে টাইগার দরজার বাইরে অপেক্ষা করছিল, বলরামকে ডাকতে এসেছে সে। একেবারে সম্পূর্ণ নতুন লোক না হলে টাইগার এতটা বিচলিত হয়ে পড়ত না। বলরামকে বললাম, "যা ত একবার দেখে আয় কে এল।"

একটু বাদে মাসীমা নিজেই এসে ঢুকলেন রান্নাঘরে। একটু কুঁজো হয়ে হাঁটেন তিনি। মুখ দেখে কিছুই আমি বুঝতে পারলাম না। বোধ হয় পয়লা তারিখে আগাম টাকা দেওয়ার মত লোক নয়। মাসীমার হোটেলে যারা আসে তারা সব বাকীতে খাওয়ার খদ্দের।

পিঁড়িটা টেনে নিয়ে মাসীমা বসলেন। একটু জিরিয়ে নিয়ে তিনি বলতে লাগলেন, "আজ ত সরকার-কুঠি একেবারে ভাঙ্গা। দেখাবার মত কিছু নেই এখানে। তবুও সাহেবটি সব দেখতে চাইলেন, বাগানটা দেখলেন ঘুরে ঘুরে। আম আর কাঁঠালগাছগুলো মরে যাচ্ছে দেখে দুঃখপ্রকাশ করলেন তিনি। পেছন দিকটাতেও নিয়ে গেলাম, গড়িয়াখালে জল নেই, তাও দেখলেন তিনি।"

"এত বেশী দেখালে কেন, পয়লা তারিখে টাকা দেবেন ত?"

"তা তুই যাই বলিস না কেন, আমাদের চণ্ডীর গণনায় ভুল থাকে না। ও বলে, সময় হলে সৌভাগ্য নিজে থেকে মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। তপা, সাহেবটি দোতলার ঘরগুলোও সব দেখলেন। বাইরে থেকে তোর ঘরটাও আমি দেখালাম। দিনদুপুরে দরজায় তালা লাগিয়ে এসেছিস কেন?" প্রশ্ন করে মাসীমাই তাঁর নিজের জবাব তৈরি করলেন, "সৌভাগ্য যখন আসে তখন সে তালা ভেঙেই ঘরে ঢুকে পড়ে। ওরে ও তপা, কাপড়টা বদলে আয়। মুখে একটু পাউডার মাখিস মা। না, না, নতুন করে কনে' সাজতে তোকে বলছি না রে মুখপুড়ী! তোর দিকে যে কেউ একবার মুখ তুলে চায় না—অমন করছিস কেন? মুখ তুলে কেউ চেয়ে দেখলেই গায়ে ফোস্কা পড়ে নাকি? এবার যা, ছোটসাহেব তোকে ডাকছেন।"

"কে!"

'লাহিড়ী সাহেব। গাড়ি নিয়ে একাই বেড়াতে বেরিয়েছিলেন ভোরবেলা। উত্তরভাগ পর্যন্ত গিয়েছিলেন—সাহেবটি বড় ভালমানুষ রে তপা! চা পাঠাচ্ছি। হ্যাঁ রে, মাসীমার হোটেলে আজ তাঁকে খেতে বল্ না। এখানে উদ্বৃত্ত কিছু নেই বটে, কিন্তু অভাবও ত কিছু দেখতে পাচ্ছি নে।"

উনুনে কেটলী চাপালেন মাসীমা।

ক্রমশঃ

পিয়েত্রো দেল্লা ভেল্লী

শ্রীপ্রেমকুমার চক্রবর্ত্তী

অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে বহু বিদেশী পর্য্যটকের আগমন হইয়াছে। তাঁহারা অনেকে বিভিন্ন উদ্দেশ্য লইয়া এ দেশে আসিয়াছিলেন। কেহ রাজদূত হিসাবে, কেহ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে, কেহ ধর্ম্মপিপাসু তীর্থযাত্রী রূপে, অথবা জ্ঞান ও পুণ্য অর্জ্জনের নিমিত্ত এবং নিছক দেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যেও যে আসেন নাই এমন নহে। এই পর্য্যটকগণের লিখিত ভ্রমণ-কাহিনী ও লিপি ভারতবর্ষের তদানীন্তন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থার উপর যথেষ্ট আলোকসম্পাত করিয়াছে। এই সকল পর্য্যটকের অনেকে ইটালী দেশীয় ছিলেন। মার্কোপোলো, আন্দ্রিয়া কোর্শালী, ফিলিপ্পো সাসেট্টি ও পিয়েত্রো দেল্লা ভেল্লী প্রভৃতির নাম তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এই শেষোক্ত ইটালীয় পর্য্যটক পিয়েত্রো দেল্লা ভেল্লী সম্বন্ধে ও তাঁহার লিখিত পত্রাবলীতে প্রকাশিত ভারতবর্ষ সম্পর্কীয় বিবরণীর বিষয় এই প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

সাসেট্টির পরবর্ত্তী পর্য্যটক পিয়েত্রো দেল্লা ভেল্লী ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল বিখ্যাত রোমনগরীতে কোনও এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। সেই কারণে প্রাচীন রোম নগরের নাগরিক বলিয়া তিনি গর্ব্বও অনুভব করিতেন। যোদ্ধা ও উচ্চশিক্ষিত সমাজের একজন বিশিষ্ট নাগরিক বলিয়া তাঁহার সম্মান ছিল। সঙ্গীতকলাতেও তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। প্রথম যৌবনে উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। তৎপরে জীবনের একটি বিশেষ অবস্থায় প্রণয়ে ব্যর্থমনোরথ হইয়া জ্ঞান ও পুণ্য অর্জ্জনের নিমিত্ত তিনি বিদেশ পর্য্যটনে যাত্রা করায় সঙ্কল্প করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু সুবিখ্যাত চিকিৎসক মেরীও সিপানোর পরামর্শ গ্রহণ করিবার জন্য নেপলস নগরীতে গমন করেন। এই বন্ধু মেরীও সিপানোকে সম্বোধন করিয়াই বিদেশ পর্য্যটনকালে তিনি তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী সম্বলিত চুয়ান্নখানি পত্র

লিখিয়াছিলেন। এই পত্রাবলী তাঁহার মৃত্যুর পর, ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে ২১শে এপ্রিল প্রকাশিত হয়। ১৬৫৮-১৬৬৩ অব্দে রোম নগরীর জনৈক পুস্তক বিক্রেতা, গিওপিয়েত্রো বেল্লোরী "পরিব্রাজক পিয়েত্রো দেল্লা ভেল্লীর ভ্রমণ-কাহিনী ও পণ্ডিত বন্ধু মেরীও সিপানোকে লিখিত পত্রাবলী" এই শিরোনামায় একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। এই পুস্তকখানি তিন খণ্ডে বিভক্ত—(১) তুরস্ক, (২) পারস্য ও (৩) ভারতবর্ষ। এই পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডেই আমার আলোচনা বিশেষভাবে আবদ্ধ রাখিব।

দেল্লা ভেল্লী বিদেশযাত্রাকালে আপনাকে তীর্থযাত্রী বলিয়া ঘোষণা করেন। ১৬১৪ অব্দের ৮ই জুন তিনি নেপল্‌স নগরী হইতে সর্বপ্রথম ইটালীয় ভূমি পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টীয় পবিত্রধাম জেরুজালেমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। তাঁহার দীর্ঘ ভ্রমণকালে এই নেপল্‌স নগরীর ও তাঁহার বিশিষ্ট বন্ধু সিপানোর প্রতি প্রবল আকর্ষণ তাঁহার চিত্তকে সর্বদা অধিকার করিয়াছিল। ১৬১৮ সনের যে মাসে পারস্য হইতে লিখিত পত্রে এই আকর্ষণের কথা বিশেষ ভাবে জানা যায়। তিনি নেপল্‌স নগরীর প্রাচীন সৌধমালা, অধিবাসী, সমুদ্র, আকাশ বাতাস সকলেরই স্বপ্ন দেখিতেছেন। তদুপরি বন্ধু সিপানোর স্মৃতি এক মুহূর্তের জন্যও চিত্ত হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারেন নাই। সিপানোর প্রতি এই আকর্ষণই এই পত্রাবলী রচনার একটি প্রধান কারণ বলিয়া অনুমান করা যায়।

১৬১৭ সনের ১৮ই ডিসেম্বর তারিখের পত্র হইতে জানা যায়, পারস্য দেশেই তিনি সর্বপ্রথম ভারতবাসীদের সংস্পর্শে আসেন। এই পত্রে তিনি লিখিতেছেন যে, বিভিন্ন ভারতীয়গণের ধর্মানুষ্ঠান, রীতিনীতি ও প্রথার বহু পার্থক্য লক্ষ্য করিয়াছেন। নিষ্ঠাবান ভারতীয়েরা জীবহত্যা করিতেন না। তাঁহারা কীটপতঙ্গ এমনকি ছারপোকা পর্যন্ত অতি সন্তর্পণে অঙ্গুলির সাহায্যে ধরিয়া কোনও রূপ আঘাত না হানিয়া মৃত্তিকার উপর ছাড়িয়া দিতেন। ভারতীয়গণ অনেক সময় পিঞ্জরাবদ্ধ পশুপক্ষী অধিক মূল্যে ক্রয় করিয়াও মুক্তি দিতেন বলিয়া তিনি লিখিয়াছেন। এই সম্পর্কে একটি কৌতুকপ্রদ ঘটনার কথা তাঁহার পত্রে উল্লেখ করিয়াছেন। জনৈক অভারতীয় খ্রীষ্টান ভারতীয় পোষাক পরিধান করিয়া বাজার হইতে কতিপয় পক্ষী ক্রয় করে। বিক্রেতা খ্রীষ্টান ক্রেতার নিকট হইতে মূল্য পাওয়া মাত্র পিঞ্জর দ্বার খুলিয়া পক্ষীগুলিকে উড়াইয়া দেয়। ইহাতে সেই খ্রীষ্টান ক্রেতা অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া উঠে। তখন বিক্রেতা বুঝিতে পারে যে, তাহার ক্রেতা ভারতীয় নহে এবং অত্যন্ত অপ্রস্তুত অবস্থায় বিপদাপন্ন হইয়া পড়ে। উপস্থিত অপরাপর পথচারীর ব্যঙ্গবিদ্রূপে বিক্রেতা তখন মূল্য ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হয়। দেল্লা ভেল্লীর এই পত্র হইতে সুস্পষ্ট ভাবে বুঝা যায় যে, সেই সময় বহু ভারতীয় ব্যবসায়ী বাণিজ্যোপলক্ষ্যে পারস্য দেশে বসবাস করিতেন। সম্ভবতঃ তাঁহা-

ভারতীয় ধর্মানুষ্ঠানের বিভিন্নতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। এই পত্রে ভারতীয়গণের গো-সেবাও যে ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গ তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি পারস্য দেশেও ভারতীয়গণের গো-শৃঙ্গ অনেক সময় স্বর্ণ ও অলঙ্কারাদি ভূষিত দেখিয়াছেন।

পারস্য দেশ হইতে লিখিত উপরোক্ত পত্রের পাঁচ বৎসর পরে (২২শে মার্চ, ১৬২৩) সুরাট হইতে গো-সেবা ও ভারতবর্ষের পশু-চিকিৎসালয় সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণসহ একটি পত্র লেখেন। এই সকল পশু-চিকিৎসালয়ে তিনি সকল প্রকার গৃহপালিত পশু-পক্ষী চিকিৎসা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে অনুমিত হয় যে, বর্তমানকালের পশু-চিকিৎসালয়সমূহ হইতে উহারা বিশেষ নিকৃষ্ট ছিল না। এই পত্রে তিনি একটি ইন্দুর শাবককে পক্ষীপালকের সাহায্যে দুগ্ধ সেবন করাইতে দেখিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বিভিন্ন শ্রেণীর পশু ও পক্ষীর জন্য পৃথক পৃথক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসালয়েরও উল্লেখ তাঁহার পত্রে আছে। গো-সংরক্ষণের ও গো-হত্যা নিবারণের নানাবিধ ব্যবস্থার কথাও তিনি বর্ণনা করিয়াছেন।

পিয়েত্রো দেল্লা ভেল্লী ভারতের কেবল মাত্র ধর্মব্যবস্থা, সামাজিক রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহারের বর্ণনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহার পত্রে অনেক স্থলে জ্ঞানগর্ভ তথ্য ও জ্ঞানস্পৃহার পরিচয়ও যথেষ্ট পাওয়া যায়। ১৬২২ অব্দের ২১শে নভেম্বরের পত্রে এবং পূর্বোল্লিখিত ১৬২৩ অব্দের পত্রেও তিনি ভারতবর্ষের প্রাচীন ভাষা 'সংস্কৃতে'র প্রতি পাশ্চাত্য জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনিই সম্ভব সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য জগৎকে জ্ঞাপন করেন যে, ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি ভারতের 'সংস্কৃত' শাস্ত্র ও সাহিত্যে নিবদ্ধ। তাঁহার বক্তব্য বুঝাইবার চেষ্টায় তিনি লিখিতেছেন যে, ইউরোপে 'লাটিন' ভাষা যেমন প্রাচীন পাশ্চাত্য কৃষ্টির বাহক তেমনি 'সংস্কৃত' ভাষা ভারতীয় কৃষ্টির বাহক; ইহাই ভারতীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর ভাষা। তাঁহার এই পত্রাবলী প্রকাশিত হইবার পর পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর মনোযোগ ক্রমশঃ সংস্কৃত সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট হইতে থাকে।

অপর এক স্থানে তিনি লিখিয়াছেন, প্রাচীন দেবদেবী, অদ্ভুত আকারের মূর্তি (গণেশ, নরসিংহ প্রভৃতি) এবং পৌরাণিক উপাখ্যান প্রভৃতির বাহ্য রূপই দেখিয়াছি, কিন্তু চক্ষুর অগোচরে তাহার অন্তর্নিহিত কোনও গূঢ় অর্থ ও ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাও আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ হয়ত বিশেষ উদ্দেশ্যে বহু উচ্চ দর্শন ও নৈতিক শিক্ষা ইহাদের মধ্যে লুক্কায়িত রাখিয়াছেন। এই সকল কথা নিঃসন্দেহে দেল্লা ভেল্লীর চিন্তাশীলতার পরিচয় প্রদান করে।

ভারতীয় ধর্ম সাধনা ও সামাজিক রীতিনীতির বহু বর্ণনাও দেল্লা ভেল্লী তাঁহার পত্রাবলীতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

১৬২২ ও ১৬২৩ অব্দে লিখিত পত্রাবলীতে ভারতীয়

আছে। তিনি একস্থানে লিখিতেছেন, "মন্দির দর্শনান্তে বাহিরে আসিতে নগরীর অপর পার্শ্বে প্রবাহিত সবরমতী নদী দৃষ্টিগোচর হইল। নদীর তীরে প্রখর রৌদ্রে বহু যোগী উপবিষ্ট রহিয়াছেন দেখিতে পাইলাম। যোগিগণের উলঙ্গ দেহ শ্মশানভস্মে আচ্ছাদিত এবং বদন ও মস্তক দীর্ঘ শ্মশ্রু ও জটামণ্ডিত। এই যোগীরা অতি কঠোর জীবন ধারণ করেন। তাঁহারা গার্হস্থ্য জীবন ত্যাগ করিয়া সকল প্রকার পার্থিব সম্পদ পরিহার করেন। ইঁহারা ব্রাহ্মণ প্রভৃতির ন্যায় বংশপরম্পরায় যোগী হন না। ইঁহারা এই জীবন ব্যক্তিগত ভাবে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছেন। ইঁহারা ভিক্ষায় জীবন অতিবাহিত করেন ও পথে প্রান্তরে বনে জঙ্গলে, মন্দির অলিন্দে বাস করেন। ইঁহাদের দৈহিক কৃচ্ছ্র সাধনার ক্ষমতা অসাধারণ।" ইঁহাদের যৌগিক প্রক্রিয়া অনেক বিষয় বিজ্ঞানসম্মত বলিয়া দেল্লা ভেল্লা মনে করিতেন। তিনি লিখিতেছেন যে পৃথিবীর সকল দেশেই ভাল ও মন্দ উভয়ই দেখিতে পাওয়া যায়। যোগিগণের মধ্যে অনেক ভণ্ড দুশ্চরিত্র থাকে বলিয়া তিনি শুনিয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও অনেক যোগীর অদ্ভুত প্রাণায়ামের শক্তি ও ভেষজ দ্রব্যের গুণ সম্বন্ধে আশ্চর্য্য জ্ঞান তিনি অবলোকন করিয়াছেন বলিয়া লিখিয়াছেন। দেল্লা ভেল্লার ভাল ও মন্দ উভয় দিক সম্বন্ধে বর্ণনা ও আলোচনা তাঁহার পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতা এবং শিক্ষিত মনের পরিচয় প্রদান করে।

১৬২৩, ২২শে নভেম্বর তিনি ইক্কেরী (সৌরাষ্ট্র?) হইতে তাঁহার বন্ধুকে লিখিতেছেন, "অপরাহ্নে সহরে প্রত্যাগমনকালে একটি রমণীকে অশ্বপৃষ্ঠে নগরের পথে ভ্রমণ করিতে দেখিলাম। শুনিলাম তাহার স্বামী বিয়োগ হইয়াছে এবং সে ভারতীয় প্রথা অনুসারে স্বেচ্ছায় স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিয়া সহমরণ বরণ করিতে যাইবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই রমণী কি বলিতেছিল বুঝিতে পারিলাম না কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বর অতি করুণ ও বেদনাতুর মনে হইল। ভাষা না বুঝিলেও তাহার আলুলায়িত কেশদাম বেষ্টিত মুক্ত বদনমণ্ডলে শোকের আভাস লক্ষ্য করিলাম। তাহার পশ্চাতে আরও বহু নরনারী তাহার অনুগমন করিতেছিল, ইঁহারা সম্ভবত আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব হইবে। তাহার সম্মুখে একটি বাদকদের দল বাদ্য বাজাইয়া অগ্রসর হইতেছিল। রমণীর বদনমণ্ডল অতি করুণ হইলেও লক্ষ্য করিলাম তাহা অতি স্থির ও অকম্প। তাহার চক্ষু অশ্রুপরিপ্লুত নহে। ভাষা জ্ঞানের অভাব সত্ত্বেও আমি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম যে নিজের মৃত্যুর জন্য বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় নাই, তাহার স্বামী শোকেই সে অভিভূত। এই প্রথা যতই বর্ব্বর ও নির্দ্দয় হউক না কেন, এই রমণীর নির্ভীকতা, প্রেম ও ঔদার্য্যের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না।" দেল্লা ভেল্লা অতঃপর লিখিতেছেন, তিনি সহমরণের সময়ও উপস্থিত ছিলেন। তিনি সেই রমণীকে বিবাহ বাসরের নববধূ বেশে অলঙ্কার ভূষিতা অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। তাহাকে প্রফুল্লচিত্তে হাসিয়া কথা বলিতেও দেখিলেন। তিনি তাহার সহিত পরিচিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সে নিজেই তাঁহার নিকট উঠিয়া আসিল এবং বিনা দ্বিধায় আলাপ করিল। সেই রমণী বলিল, তাহার নাম গিরিক্কমা (Giaccama=গিরিকুমারী?)। আমি তাহাকে এই কার্য্য হইতে বিরত হইবার জন্য অনেক প্রকার যুক্তি দেখাইলাম। সে তাহাতে হাসিয়া উত্তর করিল যে, সে স্বেচ্ছায় ও স্বাধীনচিত্তেই সতীদাহ বরণ করিতেছে এবং কেহই তাহাকে প্ররোচিত করে নাই। সে বলিল, তাহার স্বামীর অপর দুইটি পত্নী বর্ত্তমান আছে, তাহারা সহমরণে সম্মত হয় নাই এবং কেহ তাহাদিগকে এই কার্য্যে বাধ্যও করে নাই।

দেল্লা ভেল্লার বিবরণী হইতে এই অনুমান করা যায় যে, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ হইতে কোনও কোনও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সতীদাহ সম্বন্ধে মনোভাবের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। এই ক্রম পরিবর্ত্তিত মনোভাবের ফলেই দেল্লা ভেল্লার পর্য্যটনকালের দুই শত বৎসর পরে (১৮২৯) সতীদাহ প্রথা রহিত করা সম্ভব হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা চলে।

প্রায় দ্বাদশ বৎসর কাল বিদেশ পর্য্যটনের পর দেল্লা ভেল্লা স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন ও ১৬৫২ সনের ২১শে এপ্রিল দেহত্যাগ করেন।

তাঁহার পত্রাবলী হইতে জানা যায় যে, তিনি জীবনের একটি বৃহৎ সত্য জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহা হইল পৃথিবীর সর্ব্বদেশের মনুষ্যই এক, তাহাদের দোষ ও গুণ, ভাল ও মন্দ সর্ব্বতোভাবে মানবীয়। সকল দেশেই জনমত ও দেশীয় প্রথাসমূহ মানুষের উপর অবশ্যই প্রভাব বিস্তার করে। মানুষের দুঃখ বেদনা অনুভব করিবার মত উদার হৃদয় তাঁহার ছিল এবং সেই জন্যই তাহাদের সম্বন্ধে অনেক বিষয় ঠিক ঠিক ভাবে তিনি তাঁহার পত্রাবলীতে লিখিতে পারিয়াছেন। অন্যান্য বহু বিদেশীর ন্যায় ধর্ম্ম সম্পর্কে তাঁহার অনেক মতামত সঙ্কীর্ণ বলিয়া অনুভূত হইলেও তাঁহার বর্ণনায় কোথাও স্বেচ্ছাকৃত ভ্রান্তি দেখা যায় না।*

---

* যোশেফ ড লরেঞ্জোর একটি প্রবন্ধ অবলম্বনে।

রূপলোকের সন্ধানে

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

অনুকূল ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, অনুপম শ্রীমণ্ডিত শিল্পকলা-সম্পদ ইত্যাদির জন্যে ইউরোপের রূপলোক ইটালীর প্রতি প্রাচীন-কাল থেকেই পৃথিবীর সকল অংশের পর্যটকদের অনুরাগ আছে এবং তা চিরকাল থাকবে বলেও আশা করা যায়। যেমন বিপুল খ্যাতি এর সমুদ্রস্নান এবং তপোকেন্দ্রসমূহের তেমনি এদেশের স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পর্ব্বত এবং সমুদ্রতীরস্থ স্বাস্থ্যনিবাস, এর মন্দির এবং পুণ্যস্থানসমূহের কথাও সর্ব্বত্র প্রচারিত।

মা ও ছেলে [শিল্পী · পেরুজিনো

ইটালীতে ভ্রমণ-সংস্থার সংগঠন অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের। মাত্র অর্দ্ধ শতাব্দীর অনধিককাল যাবং এর অস্তিত্ব। এই ক্ষেত্রে প্রথম আবির্ভাব হয় 'দি টুরিং ক্লাবে'র—এর অব্যবহিত পরে গড়ে উঠে 'দি এসোসিয়েংসিওন পার ইল মোভিমেন্তো ফরেসতিয়েরি', 'দি এসোসিয়েংসিওন দেগলি আলবারগেত্তোরি' (হোটেলরক্ষক-দের সঙ্ঘ) প্রভৃতি সংস্থা—এদের কর্ম্মক্ষেত্র কিন্তু ছিল সীমাবদ্ধ।

অবশেষে বেসরকারী উদ্যোগের পরিপূরক হিসাবে রাষ্ট্রীয় কর্ম্ম-প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল এবং রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে 'ই-এন-আই-টি'; সি-আই-টি এবং সকলের শেষে 'দাইরে-ংসিওন, জেনারেইল, পার ইল, তুরিসমো' নামক সংস্থাত্রয় গঠিত হওয়ার পরই ইটালীতে প্রকৃতপক্ষে সংগঠিত ভ্রমণ-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হ'ল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্বে ভ্রমণ-ব্যবস্থা সংগঠিত জাতীয় উদ্যোগরূপে বিশেষ উৎকর্ষলাভ করে। কিন্তু যুদ্ধের দরুন ব্যাহত হয় এর কর্ম্ম প্রচেষ্টা এবং প্রগতি—ক্ষয়ক্ষতি ও দুঃখ দুর্দ্দশার সে এক দী

সংগ্রামরত যোদ্ধা
(ক্যাপিটোলিন্ মিউজিয়মে রোমান আমলের প্রস্তরমূর্ত্তি)

কাহিনী। যুদ্ধের ফলে বিনষ্ট হ'ল শিল্পকর্ম্মের মূল্যবান নিদর্শনসমূহ, ভস্মীভূত হ'ল রেলষ্টেশনগুলি, ভেঙে চুরমার হ'ল রেলপথ, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল কারখানাসমূহ—ভ্রমণ-ব্যবস্থার উপর যুদ্ধের এই ধ্বংস-লীলার প্রতিক্রিয়া হ'ল গুরুতর। যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু প্রাগযুদ্ধকালীন কার্য্যকারিতা পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে পুনর্গঠনকার্য্যে

কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করল ইটালিয়ান ষ্টেট রেলওয়েসমূহ। বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া এখনও পুরোপুরি হয়ে ওঠে নি বটে, কিন্তু রেলওয়ে বর্ত্তমানে পূর্ণোদ্যমে কর্ম্মরত এবং ইউরোপের প্রধান ট্রাঙ্ক লাইনগুলোর সহিত যোগাযোগ-ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে পুনঃপ্রবর্ত্তিত হয়েছে। যেমন আকাশপথ, রাজপথ, সমুদ্র, নদী, হ্রদ প্রভৃতির, তেমনি তথাকথিত গৌণ (econd ary) রেলপথসমূহের উপর দিয়েও যানবাহন চলাচলের সম্প্রসারণ এবং উন্নয়ন হচ্ছে।

ফলসম্ভারসহ নবীন যুবক [শিল্পী—কারাভাজ্জিও
(রোম, বোরঘিজ গ্যালারি)

যুদ্ধের দরুন ব্যাপক ক্ষতি হওয়া সত্বেও যানবাহন চলাচল-ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়েছে। একদিকে যেমন পর্য্যাপ্ত রাজপথগুলি পর্য্যটকবাহী যানবাহন চলাচলের প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ, অন্যদিকে তেমনি সমুদ্রপথে যাতায়াত-ব্যবস্থাও প্রাগযুদ্ধকালীন অবস্থার সমস্তরে পৌঁছতে সমর্থ হয়েছে। আকাশপথে গমনাগমন-ব্যবস্থারও উন্নতি এবং বিকাশসাধন হচ্ছে।

যুদ্ধের সময় থেকে সাগরপারস্থিত দেশসমূহ হতে আগত পর্য্যটকদের সংখ্যা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এটা বুঝতে পারা যায় যে, এই শ্রেণীর ভ্রমণকারীদের যাতায়াতের সুষ্ঠু ব্যবস্থার দরুন ইটালীর জাতীয় অর্থনীতি পরিপূর্ণভাবে উপকৃত হচ্ছে।

ইটালীতে প্রতি বৎসর বিদেশ থেকে কত পর্য্যটকের সমাগম হয় সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক। ১৯৪৯ সনে বিদেশাগত পর্য্যটকের মোট সংখ্যা ছিল প্রায় পঁয়ত্রিশ লক্ষ—এ হচ্ছে ১৯৪৮ সনের সামগ্রিক সংখ্যার দ্বিগুণেরও অধিক (উক্ত বৎসরে ঐ সংখ্যা ছিল ১৫ লক্ষের কিছু বেশী। কাজেই এ আশা পোষণ করা যাচ্ছে যে, ১৯৩৭ সনে বৈদেশিক পর্য্যটকের যে সর্ব্বোচ্চ সংখ্যা ৫০,১৮,৭০৬ জন বলে নির্দ্ধারিত হয়েছিল, একটা পরিমের সময়ের মধ্যে আবার তাতে পৌঁছানো যেতে পারে।

এটা নির্দ্দেশ করা বেশ চিত্তাকর্ষক বলে গণ্য হবে যে, ১৯৪৯ সনে যে ১২,০২,২৩৬ জন বৈদেশিক পর্য্যটক ইটালীতে আসে তন্মধ্যে এক-তৃতীয়াংশেরও অধিক ভ্রমণ করেছিল রেলপথে আর সুইজারল্যাণ্ড থেকে আগত ভ্রমণকারীর সংখ্যাই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

খ্রীষ্টকে সমাধিস্থকরণ [শিল্পী—রাফেল
(রোম, বোরঘিজ গ্যালারি)

নীচেকার পরিসংখ্যান থেকে বুঝতে পারা যাবে, যথাক্রমে ১৯৪৮ এবং ১৯৪৯ সনে কোন্ কোন্ দেশ থেকে বিভিন্ন পর্য্যটকদল ইটালীতে প্রবেশ করেছিল এবং তাদের সংখ্যাই বা কত ছিল :

রেলপথে		
ফ্রান্স	১৩৫,৭৪২	৩৭৩,৭৩৪
সুইজারল্যাণ্ড	৫৩১,০৩৫	৬৮১,৩৫৪
অষ্ট্রিয়া	১৬৫,৩৯৭	১২৯,২১৬
যুগোশ্লাভিয়া	১১,৬৯৩	১৭,৮৭২
স্থলপথে		
ফ্রান্স	১৪৪,৭৬৮	৬৭৩,৬৫০
সুইজারল্যাণ্ড	৩৭৩,৮৭০	১,১৫৭,৫৩১
অষ্ট্রিয়া	১০০,৪০৭	১২৬,৭০৭
যুগোশ্লাভিয়া	৮,৮৩৮	২২,৫৭২
সমুদ্রপথে	৫০,৮৬৯	৯১,৯৪৮
আকাশপথে	৬৮,৪৩২	১২৭,০৩৭
মোট	১,৫৯০,০৩৩	৩,৪০১,৬৬২

"দি ইটালিয়ান ষ্টেট রেলওয়ে"
(এই রেলপথে ট্রেনে ইটালির যে-কোনো স্থানে আরামে দ্রুত পৌঁছানো যায়)

"পপুলার হোটেল", তরুণ-তরুণী এবং পারিবারিক দলের হোস্টেল এবং আরো, সমুদ্রতীরস্থ এবং পার্ব্বত্য আশ্রয়স্থলও আছে যা মুখ্যতঃ ব্যবসায়িক প্রণালীতে সংগঠিত নয়। সাধারণ হোটেল সংস্থাসমূহ থেকে সেগুলো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের এবং বিদেশাগত পর্যটকদের এক ভগ্নাংশের মাত্র স্থানসঙ্কুলান তাতে হতে পারে।

রোম নগরীর প্রতি বৈদেশিক পর্যটকদের আকর্ষণ অপরিসীম—নগরীর শোভা এবং প্রাসাদ ইত্যাদির অতুলনীয় সৌন্দর্য তো আছেই, তা ছাড়া এখানকার আর্ট গ্যালারি এবং মিউজিয়মগুলিতে সংরক্ষিত ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনসমূহ বিদেশাগত কলারসিকদের বিস্ময়ে মুগ্ধ করে যেন এক নিরুপম রূপলোকের দ্বার উদ্ঘাটিত করে দেয়। বোর্ঘেজ গ্যালারিতে রাফেল, কারাভাজ্জিও প্রভৃতি শিল্পীদের আঁকা ছবি এবং ক্যাপিটোলিন মিউজিয়মে রোমান আমলের ভাস্কর্য দেখে মুগ্ধ হতে হয়। এ সবের সঙ্গে স্মৃত অতীতের ঐতিহ্য এবং ঐশ্বর্য্য সমৃদ্ধ এই মহানগরীতে বৈদেশিক পর্যটকদের ভিড় লেগেই আছে। একে তো নগরীর জনসংখ্যা অত্যধিক, তার উপর বহিরাগত অবিরাম জনস্রোতের দরুন এখানকার বাসস্থান-সমস্যা নিরতিশয় গুরুতর আকার ধারণ করেছে। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে বাসগৃহের অভাব দূরীকরণার্থ রোমের পৌরসভা (Municipality) বর্তমান ব্লকসমূহের উপরে অতিরিক্ত তলা নির্ম্মাণের অনুমতি দিয়ে জরুরি আদেশ জারী করেন। উপরন্তু পৌরসভা অধিকৃত জমিগুলি গৃহের অবস্থিতি স্থান (Building Site) অত্যন্ত অনুকূল সর্ত্তে 'কোঅপারেটিভ' বিল্ডিং সোসাইটি-সমূহের নিকট হস্তান্তরিত করা হয় এবং কতিপয় বীমা কোম্পানী ও অন্যান্য বৃহৎ প্রতিষ্ঠানকে গৃহনির্ম্মাণকার্য্যে অধিকতর মূলধন বিনিয়োগের জন্য অনুরোধ করা হয়। কিন্তু যদিও এসম্পর্কে অনেক-কিছু করা হয়েছে তথাপি সমস্যাটি যে আকার ধারণ করেছে তাতে এর সমাধান ঢের বেশী কঠিন বলে মনে হয়।

হোটেলে স্থানসঙ্কুলান অবশ্য ভ্রমণকারীদের যাতায়াত-ব্যবস্থার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত একটি সমস্যা। ১৯৫০ সনের জুন মাসে জেনোয়ার নের্ভিতে অনুষ্ঠিত প্রথম 'টুরিজম ফর ওয়ার্কার্স কংগ্রেসে' ঘোষিত হয় যে ইটালীতে পান্থশালা, শয্যাসম্বলিত সাময়িক থাকাখাওয়ার জায়গা বা শয্যা সংখ্যা প্রায় ৫৬০ 000, তন্মধ্যে প্রায় ২০০ 000টিই পর্যটকসাধারণের জন্য নির্দিষ্ট। গত কয়েক বৎসর যাবৎ ভ্রমণকারীদের হার যে পরিমাণে বাড়ছে এবং আগামী বৎসরগুলিতে তা যেরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে তদনুযায়ী বাসস্থানের সংখ্যা বাড়ানোর দিকেও যে অবহিত হতে হবে তা স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয়। ভ্রাম্যমাণ পারিবারিক দল এবং মাঝারি আকারের দলগুলির জন্য প্রয়োজনীয় স্বল্পমূল্যের বাসস্থানের তুলনায় হোটেলগুলিতে বিলাস নিবাসের (Luxury accommodation) সংখ্যা সম্ভবতঃ ঢের বেশী। অবশ্য বহুসংখ্যক তথাকথিত

ভ্রমণকারীদের যাতায়াতকে—তা ব্যক্তিগতই হোক বা সমষ্টিগতই হোক—উৎসাহিত করবার জন্যে সম্প্রতি ইটালিয়ান ষ্টেট রেল-

ওয়ে কর্তৃক অভাবনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদত্ত হচ্ছে। যেমন : পরিবারসমূহের জন্য নিম্নমূল্যের টিকেট, রিটার্ন টিকেটের বিশেষভাবে মূল্যহ্রাস, 'সার্কুলার টিকেট' নামে এক ধরনের বিশেষ সুবিধাজনক মূল্যের টিকেট, 'বড় দলের' টিকেট ইত্যাদি। শেষোক্তটির মূলনীতি হচ্ছে এই যে, "দল যত বড় হবে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের ভাড়া পড়বে তত কম।" ভ্রাম্যমাণ জনসাধারণ এই সকল সুযোগসুবিধাকে এরূপ প্রসন্ন মনে গ্রহণ করেছে যে, রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ এগুলোর অধিকতর উৎকর্ষবিধানকল্পে মনোযোগী হয়েছেন।
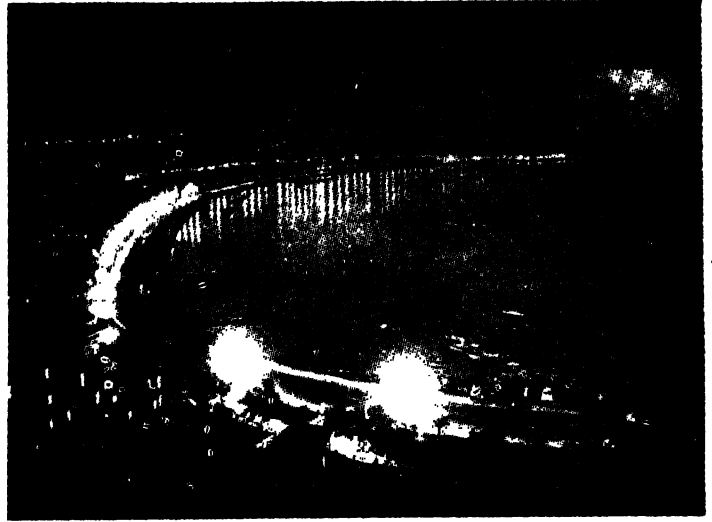
নেপলস—নৈশ দৃশ্য

কাপরির একটি দৃশ্য

'টুরিষ্ট ট্রেন' চালু হয়েছে বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ—যাদের অর্থসংস্থান কম সেই সকল টুরিষ্ট এবং ভ্রাম্যমাণ জনসাধারণের মধ্যে যারা প্রাচুর্য থেকে বঞ্চিত এই উভয় শ্রেণীর লোকেদের উপকারার্থে। টুরিষ্ট ট্রেনগুলিতে দিনের মধ্যে ফিরে আসা ভাড়া (Day-return fare) খুব বেশী রকম হ্রাসপ্রাপ্ত করা হয়েছে এবং সাধারণ কৌতুহলোদ্দীপক স্থানসমূহ পরিদর্শন ব্যাপারে সহায়তাকল্পে গাইডের ব্যবস্থা করা হয়েছে—খাদ্য এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য খরচ ধরে নেওয়া হয় ভাড়ার মধ্যেই। এটি হচ্ছে একটি অভিনব উদ্যোগ; ইটালীয় রেলওয়ের ইতিহাসে এ ধরনের নজীর আর নেই। এর জন্যে প্রয়োজন হয়েছে অনেক অতিরিক্ত কাজের এবং একটি বিশেষ সংস্থা গঠনের, কিন্তু ফল যা হয়েছে তা খুবই সন্তোষজনক বলতে হবে।

টুরিষ্ট ট্রেনগুলি এ পর্যন্ত কেবলমাত্র রবিবার দিনেই চলাচল করবে এ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মাইল হিসাবেও দূরত্বকেও সীমিত করা হয়েছে—ঊর্দ্ধকল্পে ২৫০ কিলোমিটারে অথবা তিন ঘণ্টার ট্রেন-ভ্রমণে। অবশ্য কালেভদ্রে এর ব্যতিক্রম হয়—যখন নির্দ্ধারিত সর্বোচ্চ দূরত্ব থেকে দূরবর্তী স্থানে জনসাধারণের পক্ষে চিত্তাকর্ষক শিল্পপ্রদর্শনী, খেলাধূলো বা অনুবিধ ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়। এই সকল রবিবাসরীয় ভ্রমণপর্বের মধ্যে কোন কোনটি—দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় রোম নেপলস-কাপরি অথবা বোলোগনা-ট্রেন্টো, কিংবা জেনোয়া-কোমোর কথা—প্রত্যেক ট্রেনে এক হাজারেরও অধিক যাত্রীকে আকৃষ্ট করেছে। ত্রিয়েস্তে থেকে ভেনিস পর্যন্ত এক যাত্রায় একটি মাত্র ট্রেনে মোট .৮০০ যাত্রী ভ্রমণ করেছিল।

পাশ্চাত্ত্যে রূপরসিকের স্বর্গলোক যদি কোথাও থাকে তো তা এই ইটালীতে। র‍্যাফেল, মাইকেল এঞ্জেলো এবং লিওনার্দো দা ভিঞ্চির মত শ্রেষ্ঠ রূপকারদের আবির্ভাব হয়েছিল এদেশে—তাঁদের রূপসৃষ্টির শ্রেষ্ঠ নিদর্শনসমূহ দেখে যাঁরা নয়ন সার্থক করতে চান, আকুল আগ্রহে তাঁরা ছুটে আসেন এদেশে। শিল্পকলানুরাগীর পরম পবিত্র তীর্থভূমি এই দেশ, প্রকৃতি এদেশের পথেঘাটে যেন সৌন্দর্য্যের

চণ্ডীগীত, পাঁচালী, মনসার ভাসান, কবি, পীরের গীত, জারিগীত, পুতুলনাচ, কুস্তিখেলা, নৌকা বাইচ, ঘোড়াদৌড় হইয়া রাজবাড়ীর মান থাকিত।"২ এই গ্রন্থের প্রকাশকাল সিপাহীবিদ্রোহের সময়। ইহা হইতে বোঝা যায়—এদেশেও লোকসঙ্গীত এবং সংস্কৃতির অভাব ছিল না। কেবল ঐ প্রাণবৃত্তি ও হৃদয়ধর্মের নিদর্শনগুলি ক্রমে আমাদের কাছে অবহেলিতই হয়ে এসেছে।

নদীয়ার এই গানগুলির আঞ্চলিক নাম "বালাকি" হইলেও ভনিতাহীন একটি বন্দনাগীতে "বোলান" কথাটির উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ গানগুলি বোলান শ্রেণীরই। আমাদের গ্রামীণ কবির "বন্দনাগান" হতে কিছু উদ্ধৃত করছি :

এসগো মা সরস্বতী কি বলিতে জানি।
ওগো প্রথমে বন্দিব মায়ের চরণ দুখানি॥
এসগো মা সরস্বতী স্কন্ধে দে মা পা।
গলায় দে মা সুরধনী, স্কন্ধে সুর বায়॥
এসগো মা সরস্বতী বসগো মা রথে।
বুলান বলিতে হবে বালকের সাথে॥
যে বুলান বলিবা মাগো তাই বলিব আমি।
দশের মাঝে ভাঙ্গলে বুলান লজ্জা পাবে তুমি॥

গ্রামীণ গায়নদের খাতায় যেমন লেখা আছে—এখানে ঠিক সেই ভাবেই উদ্ধৃত করা হ'ল। এই বন্দনা গান দীর্ঘ। এখানে সমস্ত উদ্ধৃত করা গেল না। এই বন্দনাগানে নদীয়ার দেবদেবীদেরই অধিক উল্লেখ আছে। অন্য একটি গানের ভনিতায়ও এই "বোলান" গানের স্বীকৃতি আছে। যেমন—

হরিদাস ভনে বুলান গাহে গঙ্গাধর।
বদন ভরিয়ে ডাক রাম গদাধর॥

সুতরাং আমার মনে হয় পল্লীকবিরা বোলান গানই রচনা করেছিলেন। এই "বোলান" গানের আলোচনা আমাদের সাহিত্যে তেমন হয় নি। সম্প্রতি শ্রীঅমরেন্দু মিত্র বীরভূমের কয়েকটি বোলান গান প্রকাশ করেছেন।৩ কবি বিজয়গুপ্ত লিখেছেন—

বনমধ্যে বেলা অবশেষ সঙ্গে কেহ নাই।
ডাকিলে বোলান না দেও ভরসা পাই।৪

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় এই বোলান শব্দের অর্থ করেছেন "জবাব"। হরিদাস পালিত মহাশয়ও গম্ভীরাগ্রন্থে "জবাব" নামক গানের কথা বলেছেন। আবার অধ্যাপক শ্রীসুকুমার সেন মহাশয় "বোলানে"র যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য —"ছড়া কেটে ঢোল-কাঁসির সঙ্গতে গান ধর্ম ও শিবের গাজনে গাওয়া হ'ত। এই ছড়া আর্যা বা তর্জা নামে পরিচিত। বাঁধা ছড়ার সাহায্যে আসরে যে উত্তর-প্রত্যুত্তর চলত তাকে বলা হয় দাঁড়া কবি। ধর্মঠাকুর বা শিবের গাজন উৎসবে মূল সন্ন্যাসী গাঁয়ের পথে পথে ঘুরে যে তর্জা ছড়া বলত, তার বিশিষ্ট নাম বোলান।"৫ নদীয়ার এই গানগুলি গাজন উৎসবের জন্যে রচিত। গাজন উৎসবেই এগুলি গীত হয়। সন্ন্যাসীদের সহ গায়নদল গ্রামের পথে বের হয়। ঢোল, কাঁসি ও বাঁশীসহ ছড়া ও গান পরিবেশিত হয়। নীলপূজার দুই-তিন দিন পূর্ব্ব হতে গায়নরাই এ বিষয়ে মুখ্যস্থান অধিকার করে। পূজা উৎসবের চাঁদা সংগ্রহের জন্য গ্রামে গ্রামে প্রতিটি বাড়ীতে এই সমস্ত গানগুলি পরিবেশন করা হয়। গায়নগণ দুই দলে বিভক্ত হয়ে গান করে। প্রত্যেক গায়নের পায়ে ঘুঙুর থাকে। প্রথম দল সুরের সূচনা করে ও কথাবস্তু আরম্ভ করে—দ্বিতীয় দল সেই সুর ও কথাকে তরঙ্গায়িত করে ও গ্রাম্য বৈশিষ্ট্যের আবহাওয়া সৃষ্টি করে। এর সঙ্গে ঢাক, ঢোল, কাঁসি ও বাঁশীর প্রভাবও কম নয়। সঙ্গীত পরিবেশনের এই লক্ষণ প্রকৃত বোলান গানেরই অনুরূপ। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে এই সঙ্গীতগুলির বালাকি নাম হ'ল কেন? চড়কপূজার প্রধান পাণ্ডাকে বালা বলে। শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য মহাশয় "নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্যকবিতা" শীর্ষক প্রবন্ধে এই বালা ও চড়কপূজা সম্বন্ধে অনেক কথা লিখেছেন। তিনি এক স্থলে বলেছেন—'বালা নামক চড়কপূজার পাণ্ডা সমস্ত দিন উপবাস করিয়া চৈত্রের ভীষণ রৌদ্রে লোকের বাড়ী বাড়ী যে গীতগান করিয়া থাকে, তাহার সুর, ভাব, নৃত্য ও অঙ্গবিন্যাস শুনিলে ইহা যে অনার্য জাতির উপাসনার অঙ্গ তাহা আপনি স্মৃতিতে আইসে না।......ইহা ছাড়া বালা মহাশয় নানা মুনির দশ অবতার বর্ণনা করিতে বৈষ্ণব কবি মহাত্মা জয়দেবের উপরেও একহাত চাল চালাইয়া থাকেন। এই দশঅবতার বর্ণনাকালে বালাগণ বন্দনা-নামে একটি শ্লোক বলিয়া থাকে ......এইভাবে কোন সময় শ্লোক, কোন সময় গীত গাইয়া বালা মহাশয় চড়ক উৎসবে প্রধান পাণ্ডাগিরি করিয়া থাকেন।"৬

আমাদের এই অঞ্চলে গাজনের মূল সন্ন্যাসীকে অদ্যাপি কেহ কেহ বালা বলেন। সম্ভবতঃ এই বালা হতেই 'বালাকি' কথাটি এসেছে। বালার, বালা সংশ্লিষ্ট ও বালা প্রভাবিত গানগুলিই 'বালাকি'।

গাজন ও গোষ্ঠবিহার এই দুই অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ করেই এই গানগুলি রচিত হয়েছে। গানগুলি আনুষ্ঠানিক। গানগুলি কোন প্রকার ভাবমূলক না হয়ে আখ্যানমূলক। চিরপরিচিত ধর্মগ্রন্থ বা সাহিত্য হতে এই আখ্যানভাগ গৃহীত। আবৃত্তি করার পরিবর্তে এগুলি গীত হয়। এর ছন্দ, প্রকাশভঙ্গী ও সুরে লোক-বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। সেজন্য এগুলি গীতিকাশ্রেণীর। যদিও শিব-পূজাই এই গীতগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য—তথাপি দেখা যায় শিববন্দনা-

২। সঙ্গীত রত্নাকর—বটতলা হইতে প্রকাশিত।

৩। বোলান গান—সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৬২তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

৪। "চণ্ডীর ছলনা" অধ্যায়।

৫। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম।

৬। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১২শ বর্ষ।

মূলক গান একেবারে কম। এখানে শিবকে রামায়ণ, মহাভারত, শচীমাতা, নিমাই, নন্দ, যশোদা, কৃষ্ণবলরাম, মেনকা, উমা, রাধা-কৃষ্ণ-বিষয়ক সঙ্গীতও শোনানো হয়। গম্ভীরা এবং বালা মহাশয়ের উৎসবেও এইরূপ বিবিধ প্রকার গান পরিবেশনের দৃষ্টান্ত আছে। এই গ্রাম্য অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেবদেবী ও বিভিন্ন শাস্ত্রকাহিনীর অবাধ মিশ্রণ দেখা যায়। ইহা এই অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির একটি বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য। এখানকার গ্রামীণ কবি রামায়ণকথা শিবকে শোনায় ও ভনিতা করে :

রামলীলা মধুর কথা মধুর ভারতী।
সংক্ষেপেতে কহিলাম কথা শুন শূলপাণি॥

কৃষ্ণের ননীচুরি আখ্যানও শিবকে শোনানো হয়। গীতিকার শেষ অংশটুকু এইরূপ :

কাল সকালে যাব আমি মাতুলের বাড়ী।
মোহন বাঁশী বাঁধা দিয়ে নিব নবনীর কড়ি॥
এ দেশেতে থাকিব না মা অন্য দেশে যাব।
পরের মাকে মা বলিয়ে উদর পুরে খাব॥
অর্জুনচন্দ্র দাসে বলে ভাবিয়ে ভবানী।
সংক্ষেপেতে কহিলাম কথা শুন শূলপাণি॥

রাধাকৃষ্ণের প্রেম ও অনুরাগের কাহিনী বর্ণনা করেও পল্লীকবি শিবের কাছে গান শোনার প্রার্থনা করেন :

কাঁকে কুম্ভ বিনোদিনী জল আনিতে যায়।
ধীরে ধীরে কালো কানাই রাধিকারে চায়॥
জল পরো জল পরো রাধে, বিরাজ কেন মন।
আমায় দেখে রাগলে ঢেকে কত রাজার ধন॥
আপনার ধনেরে কানাই আপনি রাখি ঢেকে।
এখান হতে যাওরে কানাই কে এনেছে ডেকে।
কেহ ত আনে নাই ডেকে এসেছি আপনি।
তাতে কেন ব্যাজার হলে রাধে বিনোদিনী॥

শিবের গাজনে এই ভাবে কৃষ্ণকাহিনী অগ্রসর হয়। কিন্তু গ্রামীণ কবি শেষে ভনিতা করেন :

শ্রীকেশবচন্দ্র দাসে কহে ভাবিয়ে ভবানী।
(আর) সংক্ষেপেতে কহিলাম কথা শুন শূলপাণি॥

কৃষ্ণবিষয়ক এই গানগুলি সম্ভবতঃ গোষ্ঠবিহার উৎসবের জন্য রচিত। কারণ গাজন ও চড়ক উৎসবের পরেই এখানে গোষ্ঠ-বিহার হয়। কিন্তু সম্প্রতি গাজন উৎসবই মুখ্য—গোষ্ঠবিহার যেন গাজনের জের। এই অঞ্চলে গোপ বা ঘোষেদের সংখ্যা একটু বেশী। সেজন্য এইরূপ কৃষ্ণকাহিনী সাধারণের প্রিয় হওয়াই স্বাভাবিক। এই সমস্ত গীতিকার কবিরা খুব শিক্ষিত নহেন, বরং অধিকাংশই নিরক্ষর। কিন্তু নিরক্ষর হলেও এই সব কবি অনেক সময় ভদ্রসমাজের নিকট যাতায়াত করেন এবং সেখান হতেই পুরাণের তত্ত্ব ও ভদ্রজন-ব্যবহৃত শব্দ শিক্ষা করেন। আমাদের এই দল মধ্যে প্রহ্লাদচন্দ্র ভরদ্বাজের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর স্মৃতি এই অঞ্চলের প্রবীণ লোকের মুখে আজও শোনা যায়। এখানে তাঁর উমাবিষয়ক তিনটি গীতিকা উল্লেখ করছি :—

১

মাগো আগে যদি জানতাম তোর জামাই করে এত ছলনা।
ঐ বরণ করতে আমরা সকলে মরতে আসতাম না॥
তুমি পাষাণী, তোমার কন্যা ঈশানী, রাণী জামাই পেলে
মনের মত নামটি শূলপাণি।
কিন্তু বিধাতা ঘটালো দোষ নারদ হোল এক দোষী॥

রাণী এই বুঝি তোর জামাই সদাশিব কৈলাসবাসী
যোগেন্দ্র যোগ তপস্বী উদাসী কি সন্ন্যাসী তা দেখে পায়
দারুণ হাঁসি॥
মাগো ঐ আবার এসেছে দেখ নারদ দেব ঋষি।
এখন উমায় উমায় কাঁদতে দিগে কাঁদগে মা দিবানিশি॥

বিদায় দে মা গৃহে যাই ওগো ও রাজমহিষী।
রাণী গো তোমার জামাই হলেন গঙ্গাধর,
অনাদি অনাদ্যে কান্ত অন্ত পাওয়া ভার।
দেখ উলঙ্গ হয় কেবা কোথায়, বর বেশেতে আসি॥

ভাল বলি কিসে ভাল না বললে মরণ হবে শেষে।
যদি বলি ভাল নয় অমনি সবে ভুতে পায়।
অবশেষে শত্রুগণ হাসে।

মাগো শিব পূজে শিব জামাতা পেলে তোমার পুণ্যেরি ফলে।
ঐ আদর করে এনে আমাদের কি লজ্জা দিলে॥
প্রহ্লাদ পাটনী বিনয় কহিছে রাণী,
ওগো আপন আপন গৃহে এখন যায় গো সবধনী।
দেখ শিব জামাই পেলে রাণী, নারদ হ'ল এক দোষী॥

২

ওগো যোগানন্দে যোগমায়ারূপিণী আছেন গিরিনন্দিনী।
ঐ গৌরী নিতে বরবেশেতে এলেন শূলপাণি॥
গিরিবর রাজন উমায় করলে তর্পণ।
আনন্দিত হয়ে রাণী করতে যায় বরণ॥
আবার সঙ্গিনীগণ কয় রাণীকে এ আবার মা কি বালাই।

ছি, ছি লজ্জায় মলাম মলাম রাণী গো দেখে তোর জামাই।
বরণ করা থাক সাথে—পথ পেলাম না পালাতে
হাতের ফুল রয়েছে হাতে,
মাগো কেমন করে করবো বরণ দেখে চক্ষেতে,
যদি ফিরিয়ে নয়ন করবো বরণ তাতে অব্যাহতি নয়

মনে এখন ভাবি তাই মাগো করলে কি গোঁসাই ।
হলো একি দায় পাছে ভুজঙ্গেতে খায় ।
ঐ নাগফণী দংশালো পাছে নাগভূতে বা ধায় ।
দেখ ভূত ভুজঙ্গ লয়ে সঙ্গ উলঙ্গ হয় কে কোথায় ॥
মাগো একি রকম লয়ে এসেছ যেন কালান্তকে যম ।
কারোর চতুর্মুখ, কারে দেখি চতুর্ভুজ
কেউ আবার বলছে বো, ব্যোম্ বোম্ ॥

আমার মনের মানস পূর্ণ হলো ও-শিব হবে উমার বর ।
ঐ দেখ কত এনেছে ঋষিবর নেংটা দিগম্বর ॥
প্রহ্লাদ কাতরে বলে রানী তোমায় কাঁদালে ।
কত মুনি ঋষি কাঁদে বসে নারদের ছলে ॥
আমি যৌন তরী লয়ে কাঁদি পারে যেতে পারি নে ॥

মাগো মিলন হোল ভাল
উমার কপালে বিধি এই লিখেছিল ।
আমি যেমন পাষাণী কন্যে তেমনি ঈশানী, জামাই শূলপাণি,
এ জামাই শ্বশুর যিনি তিনি ত অচল ।
আমার মনের দুঃখ বলি আর কারে এ দুঃখে মলেও যাবে না ।
মাগো মা কন্যা গর্ভে ধরে যে জনা ও তার প্রতি হয়
অশেষ যন্ত্রণা ॥

প্রহ্লাদ কহে ও রাজরাণী ভেবো না তুমি
বেদে শুনেছি আমি দক্ষালয় যজ্ঞভঙ্গি,
হিমালয় হয় উলঙ্গ আরও বা কত রঙ্গ দেখিবা তুমি ।
মাগো আমার অঙ্গ তরঙ্গেতে কেবল ঢেউ গুনে ।
লয়ে—ভগ্নতরী ভেবে মরি পারে যেতে পারি নে ।

৩

গিরি নিবাসিনী ধনী কেন মা বল অকারণ
একে ত বুক ফেটে যায় উমারে হেরে
আবার তোমরা সব করছো জ্বালাতন ॥
চণ্ডী পূজে চণ্ডী পেয়ে হরষিত মন করলাম দাত্রী সমর্পণ ।
লজ্জায় মান পরিহরি, আর যে না বরণ করি,
চাতুরী ত্রিপুরারি করেন কি কারণ ।
আমার শঙ্করী শঙ্করে দিব ছিল বাসনা ।
এ যে বহুরূপে চুপে চুপে করে মুনির ছলনা ।

মাগো করলাম কি কিবা হোল খেদেতে প্রাণ বাঁচে না ।
প্রমাদ ঘটালে যে দেবঋষ ।
উমার বর এনে দিল যেন সন্ন্যাসী ।
মাগো আগে জানতে পারলে পরে এমন কর্ম হ'ত না ॥

বিধি বাদী হয়ে আজ দিলে একি যন্ত্রণা ।
কন্যাসন্তান হলে মাগো এ বড় বালাই
ওমা লজ্জায় মরে যাই ।
যাতনা সয় না প্রাণে দিলাম ছাই আপন মানে,
পাছে বা মরি প্রাণে কিসে বা প্রাণ বাঁচাই ॥
তোরা সকল ধনী করিস না মিছে ।
দেখে জামাই রঙ্গ জ্বলছে অঙ্গ জল দিলে জুড়াবে না ॥

এ ছাড়া একটি শচী-নিমাই বিষয়ক ও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক দুটি গীতিকা প্রহ্লাদের নামে প্রচলিত আছে। এখানে সবগুলি উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়। গ্রামীণ গায়নাদের মুখে শুনেছি, ভণিতাহীন গীতিকাগুলিও নাকি প্রহ্লাদের রচিত। এই প্রহ্লাদচন্দ্র তরফদার প্রায় সত্তর বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন—এই সংবাদ তাঁর আত্মীয় শ্রীসতীশচন্দ্র তরফদারের কাছে জেনেছি। প্রহ্লাদের বাসস্থান ছিল শিবনিবাসের পার্শ্ববর্তী গ্রাম পারচন্দননগরে। তিনি জাতিতে পাটনী। সতীশচন্দ্রকে তাঁদের জাতিকথা জিজ্ঞাসা করলে বলেছিলেন তাঁরা রামায়ণান্তর্গত মাধববংশীয়। এই মাধব নাকি রামচন্দ্রকে খেয়ায় পার করেছিলেন। প্রহ্লাদেরও পেশা ছিল খেয়া দেওয়া। তাঁর রচিত কবিতাতেই এর ইঙ্গিত আছে। শোনা যায় তিনি রামায়ণ মহাভারত ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ও দাশরথি রায়ের পাঁচালীর সঙ্গে বেশ পরিচিত ছিলেন। ছোটবেলা হতেই গানবাজনায় তাঁর গভীর স্পৃহা ছিল। যৌবন কাল হতেই তিনি মুখে মুখে গান রচনা করতেন। পরে কৃষ্ণপুরের ঘোষেদের মধ্যে তিনি একটি গানের দল তৈরি করেন। এখানেই তাঁর গান কয়টির সন্ধান পাওয়া গেছে। তাঁর আরও অনেক গান নাকি পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে ছড়িয়ে রয়েছে। প্রহ্লাদের পিতার নাম ছিল সদাশিব। প্রহ্লাদের দুই পুত্র, কার্তিক ও গণেশ। উভয়েই পরলোকগমন করেছেন। গণেশ অপুত্রক। কার্তিকের দুই পুত্র জীবিত। নন্দলাল ও কালীপদ। এদের জাতিপেশাই সম্বল।

সাজা

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বাড়ীর আবহাওয়াটা শান্তিপূর্ণ নয়; বয়স্থ যারা তারা বেশ একটু সন্ত্রস্তই, ছোটদের মধ্যে একটা চাপা চাঞ্চল্যের ভাব আছে। অথচ ব্যাপারটা বিশেষ এমন কিছু নয়—ললিতমোহনের সেই নূতন গোলাপ গাছটায় আবার একটা ফুল ফুটছে।

কিন্তু বাইরে থেকে বিশেষ এমন কিছু মনে না হলেও পরিবারটির আভ্যন্তরিক জীবনে বিষয়টি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ছোট্ট গোলাপবাগানটুকু ললিতমোহনের প্রাণ বললেও চলে। কিন্তু পাঁচটা ছেলেপুলে নিয়ে সংসার, তাদের বাগানের সখ নেই বটে তবে ফুলের সখ ললিতমোহনের চেয়ে কিছু কম নয়। যতক্ষণ থাকে বাড়ীতে ললিত বাগান নিয়েই থাকে, কিন্তু রূপকথার ফুলগাছ-আগলানো বুড়ীর মত অষ্টপ্রহর তো পাহারায় বসে থাকা সম্ভব নয়, কাজ আছে, তার কামাই আছে; এই রকম অবসরে বাগানের ওপর প্রায়ই উৎপাত এসে পড়ে। ফুল অদৃশ্য হয়। চুরিই তো, গুছিয়ে ধীরেসুস্থে তোলা নয়, ভাঙে ভাঙা ডাল, ছেঁড়া পাতায় বাগান তছনছ হয়ে থাকে। এর পর ললিতমোহনের যে প্রতিক্রিয়া তাতে দোষী-নির্দোষের কিছু বাছবিচার থাকে না। কান্নাকাটি, আপসানি, বড়দের বকাবকি, সব মিলিয়ে একটা যেন ঝড় বয়ে যায় বাড়ীর ওপর দিয়ে।

অবশ্য রোজ নয়; ললিতমোহনের অনুপস্থিতিতে সাবধানও তো থাকে সবাই। কিন্তু কড়া পাহারার মধ্যে থাকার জন্যই যেন এক এক সময় দেখা যায় ছেলেমেয়েগুলি চুরি বিদ্যায় আরও সূক্ষ্ম হয়ে উঠছে, কোন্ ফাঁকতালে কি হয়ে যায়, ব্যাপারটা আর সব দিনের তুলনায় একেবারে গুরুতর হয়ে উঠে। এই রকমটা হয়েছিল যখন এই গোলাপগাছেরই প্রথম ফুলটি ফোটে; সে এক মহামারী কাণ্ড। আবার এই ফুটছে, কি যে হবে কেউ বুঝে উঠতে পারছে না।

এই গাছটি বাগানের মধ্যে সবচেয়ে সেরা। ফুলের দিক দিয়ে আর মূল্যের দিক দিয়ে তো বটেই, তা ভিন্ন আভিজাত্যের দিক দিয়েও এর দোসর এ বাগানে তো নেই-ই, সারা শহরের মধ্যে আছে কি না জানা নেই ললিতের। লক্ষ্ণৌয়ের একটি অভিজাত গোলাপ-বাগিচা থেকে বহু আয়াসে এবং প্রচুর অর্থব্যয়ে সংগ্রহ করা। এর আদিপুরুষ শোনা যায় নবাব আমলে নবাব-হারেমেই ফুল যোগাত। গাছটি যেদিন বংশ-কাহিনী নিয়ে প্রথমে এল এ বাড়ীতে, সবারই মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল।

আশঙ্কা ফলল যেদিন প্রথম ফুলটি ফুটল...এবং চুরি গেল।

ছেলেমেয়েদের ওপর দিয়ে যা হবার তা তো হ'লই, অন্য বারের চেয়ে বেশী করেই হ'ল, একটা গোলাপ ফুল নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি করবার জন্য বড়দের তরফ থেকে যে প্রতিবাদটা উঠল তার ফলে ললিতমোহন আক্রোশের বশে নিজের হাতেই বাগানের গাছপালা ছিঁড়ে উপড়ে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে যাচ্ছিল বাগানটা, বাধা পেয়ে আহারত্যাগ করল, তাতেও আক্রোশ না মেটায় দিনদুয়েক বাড়ীছাড়াই হয়ে রইল।...গাছটিকে ভালবাসে ললিত ছাড়াও এমন লোকের অভাব নেই বাড়ীতে, কিন্তু যারা খুব ভালোবাসে তারাও খানিকটা আতঙ্কের দৃষ্টিতে দেখে। ক্রোধে-অভিমানে ললিত যেদিন বাগানটাকে নিঃশেষ করতে উদ্যত হয়েছিল সেদিন তার অস্ত্রের প্রথম আঘাতটা এই গাছটির ওপরেই এসে পড়েছিল, যাদের মনে লেগেছিল তারাও মনে করেছিল আপদ গেছে; কিন্তু সেই কোন্ যুগের বেগমদের আশীর্ব্বাদ শিরে বহন করছে, গাছটি আবার ধীরে ধীরে গজিয়ে উঠল।

আবার একটি কুঁড়ি ধরল, কিশলয়ের ওড়নায় একটি ছোট মরকতের বুটি; আস্তে আস্তে রূপান্তর ঘটছে, অভিজাত পুষ্প, তার কুঁড়িটাই কত বড়। সবুজের ফাঁকে ফাঁকে গোলাপীর রেখা বেরিয়ে আসছে, প্রসারিত হয়ে উঠছে—পান্নার মুখে চুনির হাসি। তার পর আস্তে আস্তে সেই হাসি বিকশিত হয়ে উঠছে, পাপড়িগুলি বৃন্তের ওপর পড়ছে এলিয়ে এলিয়ে।

একটি ফুলেই সমস্ত বাগানটিকে আলো করে দিচ্ছে।

ললিতমোহন বলছে—এ ফুল গেলে সে যা কাণ্ড করবে, সেটা কারুর কল্পনাতেও আনতে পারে না।

একটা চাপা অশান্তি লেগে রয়েছে বাড়ীর আবহাওয়ায়। চোখ পড়লে চোখ ফেরানো যায় না, তবু তাড়াতাড়ি ফুটে উঠে ঝরে গেলেই সবাই বাঁচে যেন।

ততদূর আর পৌঁছাতে হ'ল না কিন্তু।

সে দুঃখের কাহিনী বলতে গেলে রুচিরার একটু পরিচয় দিয়ে আরম্ভ করতে হয়।

মেয়েটি ললিতমোহনের ভাইঝি, মেয়েদের মিডল স্কুলের ছাত্রী, এইবার এই স্কুল ছেড়ে হাই স্কুলে গিয়ে উঠবে।

পূর্বেই বলেছি, কড়া পাহারার মধ্যে থেকে ফুল সরাতে হয় বলে যতগুলি এ লাইনে রয়েছে—ছেলেমেয়েই গুটি-সাতেক—সবগুলি কম-বেশ করে বেশ দক্ষ। তার মধ্যে, বয়সে সবচেয়ে বড় না হলেও এই মেয়েটি আবার সবার ওপরে যায়। এর কারচুপির আর একটা বিশেষত্ব এই যে, চুরি ধরা পড়লেও চোরাই মাল যে কোথায় যায় তার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। রহস্যটা অবশ্য খুব গভীর নয়, তবে এমন ধরণের যে কারও সন্দেহ সে পথে অগ্রসর হতে পারে না। চোরে-চোরে এক ধরণের ভ্রাতৃত্ববোধের মিল থাকে, সবার গোপন কথা সবাই কিছু কিছু জানে, রুচিরা কিন্তু তার কাজের এটুকু খুব সন্তর্পণে সবার কাছ থেকে আড়াল করে রেখেছে।

ও ওদের স্কুলের বড় দিদিমণি অর্থাৎ প্রধান শিক্ষয়িত্রীকে ফুল যোগায়। অবশ্য নিত্য নয়, পাবে কোথায়? তবে পাঁচ সাত দশদিন অন্তর যেটি সেরা সেটি একেবারে বাছাই করা। না, এই চৌর্যবৃত্তির মধ্যে তিনিও যে লিপ্ত আছেন এমন নয়। তিনি সাদা মনেই ছাত্রীর উপহার গ্রহণ করে যাচ্ছেন, তবে একদিন প্রশংসা করে বলেছিলেন—"তোমার কাকার দেখছি বাগানের খুব সখ" সেই থেকেই চলছে ব্যাপারটা।

এই উপহার দেওয়ার ব্যাপারটাও আড়ালে রেখেছে রুচিরা, যাতে করে আলোচনাটাও বাইরের দিকে গড়াতে আসতে পায় না। যেদিন সংগ্রহ হয় ফুল, স্কুল বসবার বেশ খানিক আগে থাকতেই গিয়ে উপস্থিত হয়, একেবারে দিদিমণির বাসায়, প্রশংসায়, আহ্লাদে দীপ্ত হয়ে ওঠেন তিনি।

"বাঃ, কি চমৎকার ফুল। তোমাদের বাগানের নিশ্চয়? এ রকম ফুল আর এখানে কার বাগানেই বা আছে? তা আনলে কি করে? তোমার কাকা শুনেছি ফুল সম্বন্ধে বড্ড কড়া।"

"তিনি নিজেই তো তুলে দিলেন দিদিমণি।" একটু হেসে বলে রুচিরা।

"সত্যি নাকি ...?"

"বড্ড ভালবাসেন যে আমায়..."

"সত্যি অবিশ্যি বুঝতে পারা যায়, ভালবাসার মতন মেয়েই তুমি; আর কাকাই তো নিজের। তা তোমায় দিলেন, তাঁর ইচ্ছেটা নিশ্চয় তোমার কাছেই থাকে। যদি খোঁজ করে দেখেন..."

আবার একটু হাসে রুচিরা। বলে—

"ফুলটা তুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—দিলাম তো, কিন্তু করবি কি বল দিকিন। বললাম—ঘরে রেখে দোব ফুলদানিতে।...বললেন—সেটা কি ঠিক? কোন একটা ভাল জিনিস পেলে সব চেয়ে যাকে ভালবাসা যায়, কি ভক্তি করা যায় তাকে দেওয়া উচিত, এই যেমন তুই ভাইঝি, সবচেয়ে ভালবাসি তোকে, তাই তোকেই দিলাম আমি। তা তুই সবচেয়ে কাকে ভালবাসিস কি ভক্তি করিস?... বললাম স্কুলের বড় দিদিমণিকে।...বললেন—তা হলে তাঁকেই দেবে। গুরুজনও তো তিনি।...কাকা আবার মাঝে মাঝে ধর্ম উপদেশও তো দেন আমাদের..."

ফুল সরবরাহের সঙ্গে যে ধরণের ভূমিকা থাকে তার একটা নমুনা দেওয়া হল। এর পর ওদিকেও কোন সন্দেহের অবকাশ থাকবার কথা নয়।

ভক্তির আতিশয্যেই যে দুষ্কর্মটা হয়ে যাচ্ছে এমন মনে করবার অবশ্য কোন কারণ নেই। ভাল ফুল সংগ্রহ করবার একটা স্বাভাবিক আনন্দ আছে, বিশেষ করে ছোটদের মধ্যে, যদি চোখ লুকিয়ে সংগ্রহ করতে হয় ত আনন্দটা আরও বেশী, আবার সে আনন্দ আরও উচ্চাঙ্গের হয়ে ওঠে যদি আরও পাঁচজনের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে সবার চোখে দেওয়া যায় ফাঁকি।

তার পর চোরাই মাল নিজের ভোগে লাগল কি পরের ভোগে সেটা তেমন বড় কথা নয় তো। এ তো ব্যবসা নয়, নিছক আনন্দ।

একটু স্বার্থের গন্ধ হয়ত থাকে লেগে, স্কুলের কর্ত্রীই তো। একটু বেশীও হয়ত থাকে কখনও কখনও; সামনেই বাৎসরিক পরীক্ষাটা পড়ছে। ফলাফল একটু ভাল দেখিয়ে যেতে পারলেই তো সুনাম।

শুক্লপক্ষের চাঁদের মত ফুলটি পূর্ণতর হয়ে উঠছে দিন দিন। যতই পূর্ণতর হয়ে উঠছে, আকাশের নক্ষত্রের মতই আর যা যা ফুল—ললিতের বাগানের বাছাবাছা ফুলই সব—সবগুলিই যেন নিষ্প্রভ হয়ে আসছে। সাত জোড়া চোখ লোভাতুর দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে থাকে—ঘরের জানালার ফাঁকে, ও বারান্দার কোণ থেকে, ঝোপ ও ঝাড়ের আড়াল থেকে। বাড়ীর সবাই সতর্ক। সকলেও, যখন না হৈ-হৈটা উঠছে এবার।

তার পর উঠল হৈ-হৈ।

উঠল বলার চেয়ে ওঠার উপক্রম হ'ল বলাই ঠিক।

এক জায়গায় আটকে গিয়েছিল ললিত। রাত হয়ে গেছে, প্রায় ন'টা; হন্তদন্ত হয়েই এসে একেবারে বাগানে ঢুকেছিল, যেমন ওর রেওয়াজ; ফুলটি নেই!

অন্য বার ঐখান থেকেই আরম্ভ হয়, হাতের কাছে ওদের যাকে পায় তার ওপরই ঝাল ঝাড়তে ঝাড়তে ঢোকে বাড়ীতে, আজ আর তা নয়, সমস্ত রাগটা চেপে হন হন করে চৌকাঠ পর্যন্ত এগিয়ে এল, তার পরেই বাড়ী কাঁপিয়ে এক হুঙ্কার—"মা, পোড়ারমুখী অরুচি কোথায়? ফুলটা সরিয়েছে!"

অত বড় বাড়ীটায় যেখানে য আওয়াজ উঠছিল সব সঙ্গে সঙ্গে গেল থেমে। তার পর যেন সাড়া ফিরে এল—

"নিলে তুলে! এত সাবধানের মধ্যে থেকেও!...কি সব ছেলেপুলে বাবা!...তা ওই যে তুলেছে..."

"ও-ই—ও-ই আর কেউ নয়—কোথায় সে?...আমি বেরুবার সময় যেমন পৈঠের ওপর ভালমানুষের মতন বসেছিল—তখুনি টের পেয়েছিলাম ফুলটার পরমায়ু শেষ হয়ে এসেছে—তা আমার ফুলের পরমায়ু শেষ হলে ওর পরমায়ুও শেষ আজ—কোথায় সে? কোথায় গেলি? কোথায় থাকতে পারিস লুকিয়ে দেখছি আমি—কতক্ষণ থাকতে পারিস..."

এ-ঘর, ও-ঘর এ-বারান্দা ও-বারান্দা করে গজ্রাতে গজ্রাতে ওপরতলায় চলে গেল। সবাই শিউরে রয়েছে, একটা অনর্থ ঘটবেই। ভাজ বলছে—"ওই কাণ্ড। দিন্ শেষ করে—মেয়েছেলের এত বাড়! উনি না শেষ করতে পারেন আমি আছি..."

এক ধার থেকে ওপরের ঘরগুলো দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছে ললিত। শিকারকে কোণঠাসা করে এনেই যেন গর্জনটা গেছে কমে, যেটুকু আছে—একটা চাপা ফোঁস-ফোঁসানি। সব ঘর দেখে নিয়ে একেবারে শেষের ঘরটার চৌকাঠের সামনে এসে দাঁড়াল; তারই ঘর এটা। আন্দাজ ভুল নয়, রয়েছে রুচিরা এবং যেভাবে হাত দুটো গলার কাছে জড়ো করে গুটিসুটি মেরে আলমারিটা ঘেঁষে অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে রয়েছে, কাজটা যে ওর-ই তাতে আর সন্দেহ থাকে না।

নিঃসন্দিগ্ধ কণ্ঠেই প্রশ্ন করল ললিত—"ফুল কোথায়? বল্ নয়ত..."

বলবার অবস্থা নেই; রুচিরা শুধু ঘাড়টা ঘুরিয়ে ঘরের অন্যদিকে খাটটার ওপর দৃষ্টিপাত করল...ললিত চৌকাঠ ডিঙিয়ে তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দাঁড়াল।

পূবের জানলা দিয়ে ঢালা জ্যোৎস্না এসে চাপা রঙের বেড-কভারটার ওপর পড়েছে। নববধূ শুক্লা সমস্ত শরীরটি ঘুমের কোলে এলিয়ে দিয়ে আছে শুয়ে। আজকাল ঘুমাতে তো তেমন করে পারে না বেচারী, এই রকম অবসর খুঁজে একটু আশা মিটিয়ে নেয়।

সেই গোলাপটি—প্রায় পূর্ণপুষ্ট—খোঁপার পাশে বালিশের ওপর রয়েছে পড়ে। এক বৃন্তে দুটি ফুটন্ত ফুল।

স্পষ্টই তো বোঝা যায়, আর উপায় না দেখে তাড়াতাড়ি বুদ্ধি করে নূতন কাকীমার খোঁপায় গুঁজে দিতে গিয়েছিল রুচিরা, অতি ত্রস্ত বলেই পেরে ওঠে নি।

না, অত অকৃতজ্ঞ কি মানুষ হতে পারে? কিন্তু তবু একটা সাজা দিতে হয় বৈকি—লোকদেখানো; একেবারে অত গনগনে হয়ে ঠেলে উঠল।

রাগটা যেন অতি কষ্টে চেপে দোরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল—"বেরো পোড়ারমুখী—এখুনি বেরো—আর আর সাত দিন তুই ঢুকতে পারবি না এ ঘরে...বেরুলি?"

অকৃতজ্ঞ নয়। দিত না নিশ্চয়, এটুকুও সাজা!...কিন্তু, দেখতে হবে না নিশ্চিন্ত হয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ? তার পর ভাইঝির অসম্পূর্ণ কাজটুকু সম্পূর্ণ করে আস্তে আস্তে ঘুম ভাঙাতে হবে না শুক্লার?

নন্দঋষি
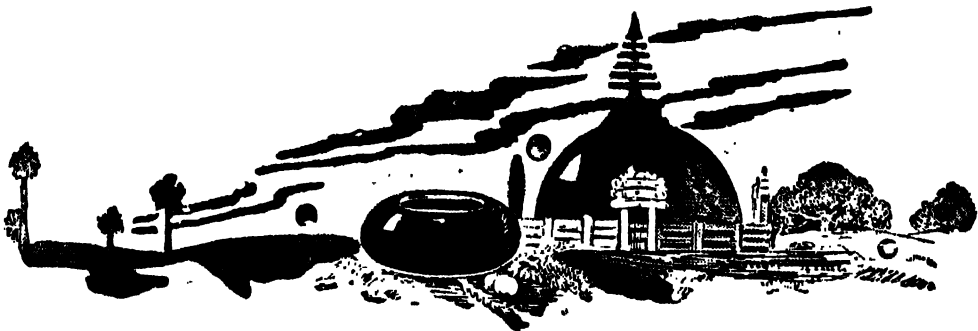
(১৩৭৭—১৪৩৮)

অধ্যাপক শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়

খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকে কাশ্মীরে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় কাশ্মীরের সাংস্কৃতিক জীবনে ঘোরতর দুর্দ্দিন চলিতেছিল। মুসলমান বিজয় কাশ্মীরের সংস্কৃতিকে নবজীবন দান করে। চতুর্দ্দশ শতকে কাশ্মীর-দুহিতা লল্ল যোগেশ্বরী ধর্ম্মসমন্বয়ের সাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহার কণ্ঠে যে সাম্য ও সমন্বয়ের বাণী উদগীত হইয়াছিল, কাশ্মীরের জীবন-দর্শনে আজও বুঝি তাহার রেশ শুনিতে পাওয়া যায়।

লল্ল যোগেশ্বরী যে পথের পথিকৃৎ, তাঁহার শিষ্য শেখ নুরউদ্দিন সেই পথেরই অন্যতম অমর পথিক। নুরউদ্দিনের ধমনীতে রাজরক্ত প্রবাহিত হইত। তাঁহার প্রপিতামহ কিস্তওয়ার-এ রাজত্ব করিতেন। তিনি হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। গৃহযুদ্ধে তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় পরিবারবর্গ কাশ্মীর উপত্যকায় কাইমুতে বসবাস করিতে থাকেন। তাঁহার পৌত্র অর্থাৎ নুরউদ্দিনের পিতা শেখ সালারউদ্দিন পৈতৃক ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

১৩৭৭ খ্রীষ্টাব্দে কাইমুতে নুরউদ্দিন ভূমিষ্ঠ হন। জনশ্রুতি এই যে, সদ্যোজাত নুরউদ্দিন মাতৃস্তন্য পান না করায় তাঁহাকে লল্ল যোগেশ্বরীর নিকট লইয়া যাওয়া হয়। তিনি নুরউদ্দিনকে বলিলেন যে, তাঁহার বৈরাগ্য-মর্কট বৈরাগ্য। শিশু কি বুঝিল সেই জানে। কিন্তু ইহার পর হইতে নাকি সে স্তন্যপানে আপত্তি করে নাই।

নুরউদ্দিন বাল্যকাল হইতেই গতানুগতিকতার উপর বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। ধর্ম্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং গতানুগতিক শিক্ষার উপর তাঁহার আস্থা ছিল না। নির্জ্জনতাপ্রিয় বালক প্রহরের পর প্রহর গভীর চিন্তায় আত্মহারা হইয়া থাকিত। সে কি চিন্তা করিত সে-ই জানে। চারিপাশে কি ঘটিতেছে তাহার প্রতি তাহার কোন লক্ষ্যই থাকিত না। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পাড়াপ্রতিবেশী সকলের চোখেই নুরউদ্দিনের চালচলন বিসদৃশ, অস্বাভাবিক মনে হইত। যাহাকে লইয়া আলোচনা চলিত সে কিন্তু নির্ব্বিকার। নুরউদ্দিন তখন সত্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যস্ত, সংসারের স্তুতিনিন্দায় তাঁহার কি যায় আসে? নুরউদ্দিন অনন্তের ডাক শুনিতে পাইয়াছেন। অনন্তের সুরে নিজের জীবন-বীণায় তার বাঁধিবার দুশ্চর তপস্যায় তিনি প্রবৃত্ত। কে কি ভাবিল বা বলিল তাহার প্রতি মনোযোগ দেওয়ার অবসর তাঁহার কৈ?

নুরউদ্দিন ইহার পর লল্লেশ্বরীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। গুরুর কৃপায় তাঁহার সমস্ত সন্দেহ দূর হইল। তাঁহার মানসমুকুল সহস্রদল পদ্ম হইয়া ফুটিয়া উঠিল। পরম প্রশান্তিতে তাঁহার অন্তর ভরিয়া গেল।

নুরউদ্দিন বরাবর শান্ত, সংযত জীবনযাপন করিয়াছেন। তিনি আজীবন ধর্ম্মসমন্বয়ের সাধনা করিয়াছেন। তিনি বলিতেন যে, সমস্ত ধর্ম্মই মূলতঃ এক। বিশ্বমানবের ভ্রাতৃত্ব তৎপ্রচারিত ধর্ম্মের মূলসূত্র। মাংস, পেঁয়াজ, রসুন প্রভৃতি উত্তেজক দ্রব্য তিনি স্পর্শও করিতেন না। জীবনের শেষভাগে দুধ এবং মধুও তিনি ত্যাগ করিয়াছিলেন। ১৪৩৮ সনে একষট্টি বৎসর বয়সে তিনি দেহরক্ষা করেন। বুদশাহ (১৪২০-১৪৭০) এই সময় কাশ্মীরের সুলতান। তিনি নুরউদ্দিনের শবানুগমন করিয়া তাঁহার আত্মার শান্তি ও মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

কাশ্মীর উপত্যকার চার-এ নুরউদ্দিনকে সমাহিত করা হয়। তাঁহার জীবনের শেষভাগ চারেই অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি হিন্দু, মুসলমান সকলেরই শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। শিখধর্ম্মের প্রবর্ত্তক গুরু নানকের মত তিনিও 'হিন্দুকা গুরু, মুসলমানকা পীর' —অর্থাৎ, হিন্দুর গুরু এবং মুসলমানের পীর ছিলেন।* চারে প্রতিষ্ঠিত নুরউদ্দিনের সমাধিমন্দির কাশ্মীরবাসীর পরম পবিত্র তীর্থস্থান। প্রতি বৎসর তাঁহার মৃত্যুদিবসে এখানে বহু যাত্রীসমাগম হয়। হিন্দু-মুসলমান সকলেই তাঁহাকে কাশ্মীর উপত্যকার রক্ষক এবং অধিষ্ঠাতৃ মহাপুরুষ মনে করে। লল্ল যোগেশ্বরীর ন্যায় তাঁহার পবিত্র স্মৃতিও কাশ্মীরের জনচিত্তে অমর হইয়া রহিয়াছে।

কাশ্মীরবাসী হিন্দুগণ মনে করেন যে, জাতিতে মুসলমান হইলেও নুরউদ্দিন প্রকৃত প্রস্তাবে অতি উন্নত স্তরের হিন্দুসাধক ছিলেন। তাঁহাদের নিকট তিনি সহজানন্দ নামে পরিচিত। হিন্দু ভক্তগণ কর্ত্তৃক তদীয় বাণী এবং উপদেশ ঋষিনামা গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে। এই পুস্তক সারদা লিপিতে† লিখিত। নুরউদ্দিনের মৃত্যুর প্রায় দুই শত বৎসর পরে তাঁহার ভক্ত শিষ্য নাসিরউদ্দিন গাজী ফারসি ভাষায় গুরুর জীবনকাহিনী এবং তাঁহার উপদেশাবলী ফারসি

---

* পাঞ্জাবে গুরু নানক সম্বন্ধে বলা হয়—

"গুরু নানক শাহ ফকির

হিন্দুকা গুরু মুসলমানকা পীর"

† পূর্ব্বে কাশ্মীরী ভাষা সারদা লিপিতে লিখিত হইত।

অক্ষরে লিপিবদ্ধ করেন। ফারসি অক্ষরে লিখিত নুরউদ্দিনের উপদেশাবলী নুরনামা নামে পরিচিত।

কাশ্মীর উপত্যকার সাধারণ মানুষের নিকট নুরউদ্দিন নন্দঋষি নামেই সমধিক পরিচিত। তাঁহার মৃত্যুর প্রায় চারি শত বৎসর পর, উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে কাশ্মীরের আফগান শাসনকর্তা আতা মোহাম্মদ খাঁ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। কাশ্মীরবাসীর মনোরঞ্জনের জন্য তিনি নুরউদ্দিনের নামে মুদ্রা প্রচলিত করেন। এই মুদ্রার এক দিকে "হে নুরউদ্দিন, হে বিশ্বপতি" এবং অপর দিকে "এই সংসার গলিত মাংস, ইহার নিকট হইতে যাহারা কিছু প্রত্যাশা করে তাহারা কুকুর"—এই কথা কয়টি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। প্রথম শিখগুরু নানক এবং দশম শিখগুরু গোবিন্দ সিংহ ভিন্ন আর কোন ধর্মগুরুর নামে মুদ্রা প্রচলনের কথা আমরা জানি না। পঞ্জাবকেশরী মহারাজা রণজিৎ সিংহের নানকশাহী মুদ্রায় ইঁহাদের নাম পাওয়া যায়।

ভগবৎপ্রেম এবং ভগভক্তি নন্দঋষির জীবনবেদের মর্ম্মকথা। তাঁহার একটি বাণীতে পাই—

"প্রেমের আগুনে যে জ্বলিতেছে, সে নিজেই ত মূর্ত্তিমান প্রেম, কাঞ্চনের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় প্রেমিকের সত্তা। প্রেমের অগ্নিশিখায় হৃদয়মন উদ্ভাসিত হইলে তবেই ত অনন্তের সন্ধান পাওয়া যায়।"

অপর একটি বাণীতে নুরউদ্দিন ভগবৎ-প্রেমকে একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে ব্যথিতা জননীর শোকের সহিত তুলনা করিয়াছেন। শোকার্ত্তা জননীর ন্যায় ভগবৎ-প্রেমিকের চোখেও ঘুম থাকে না।

লল্লেশ্বরীর মত নুরউদ্দিনও বলিতেন যে, সাধনার পথে বাধা বিপত্তিতে নিরুৎসাহ হইলে চলিবে না। অন্তরের মণিকোঠায় সত্য ও প্রেমের দীপ জ্বালিবার প্রয়াস—প্রতিকূল প্রভাবে হয়ত বার বার ব্যর্থ হইয়া যাইবে।' কিন্তু সত্যসন্ধানী সাধককে বাধা ও ব্যর্থতার মধ্য দিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে—'জীবন-কণ্টক পথে যেতে হবে নীরবে একাকী—সুখে দুঃখে ধৈর্য্য ধরি, বিরলে মুছিয়া অশ্রু-আঁখি,···।' ধৈর্য্য এবং নিষ্ঠার সহিত লাগিয়া থাকিলে সাধনায় সিদ্ধি সুনিশ্চিত।

একটি বাণীতে নুরউদ্দিন বলিতেছেন, "বিধাতার আঘাতের বিরুদ্ধে নিজেকে বর্ম্মাবৃত করিও না। তাঁহার উদ্যত খড়্গের আঘাত এড়াইবার জন্য মুখ সরাইয়া লইও না। দারিদ্র্যকে চিনির মত মধুর মনে করিও। তবেই ইহলোক এবং পরলোকে মর্য্যাদা লাভ করিবে।"

এ সুর আমাদের অপরিচিত নয়। 'বিধাতার বিধানকে বরণ করিয়া লও'—এই ত শাশ্বত ভারত-আত্মার মৃত্যুহীন বাণী।

নুরউদ্দিন সম্বন্ধে প্রচলিত বহু কাহিনীর মধ্যে একটির উল্লেখ করিতেছি। একবার নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি এক গৃহস্থের বাড়ীতে উপস্থিত হন। শতছিন্ন মলিনবসন-পরিহিত নুরউদ্দিনকে ভোজন-সভায় উপস্থিত হইতে দেওয়া হইল না। বাড়ী ফিরিয়া খুব দামী কাপড়জামা পরিয়া নুরউদ্দিন দ্বিতীয় বার নিমন্ত্রণ-ভবনে উপস্থিত হইলেন। এইবার মহাসমাদরে তাঁহাকে খাওয়ার জায়গায় লইয়া যাওয়া হইল। খাবার দেওয়ার পর সকলে অবাক হইয়া দেখিল যে, নুরউদ্দিন কিছুই খাইতেছেন না; নিজের জামার লম্বা আস্তিন এবং চোগার নীচের দিক খাওয়ার জিনিষের উপর রাখিয়া চুপচাপ বসিয়া আছেন। গৃহস্বামী এবং অন্যান্য অতিথিগণ এই অদ্ভুত আচরণের কারণ জানিতে চাহিলে নুরউদ্দিন বলিলেন যে, তাঁহার জামাকাপড়কেই ত খাইতে দেওয়া হইয়াছে, তাঁহাকে নয়। মুখের মত জবাব পাইয়া সকলেই চুপ করিয়া রহিল।

নুরউদ্দিনের জীবদ্দশায় বহু লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কোন স্বতন্ত্র ধর্ম্মসম্প্রদায় গঠন করেন নাই। প্রধান প্রধান শিষ্যদিগের মধ্যে বাবা নাসিরউদ্দিনই গুরুর সর্ব্বাধিক প্রিয়পাত্র ছিলেন। গুরু শিষ্যকে আদর করিয়া নসরু বলিয়া ডাকিতেন। নাসিরউদ্দিনকে সম্বোধন করিয়া রচিত নুরউদ্দিনের একটি কবিতায় তাঁহার নিজের অতীত জীবনের আভাস পাওয়া যায়—

এমন দিন গিয়াছে যখন নদীর কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া হইতে নসরু, নিজেকে বাঁচাইবার কোন আবরণ আমার ছিল না। মণ্ড এবং অর্দ্ধ-সিদ্ধ শাকসব্জিই ছিল আমার জীবনধারণের একমাত্র উপায়।

নসরু, আবার এমন দিনও গিয়াছে যখন প্রিয়া আমার পাশে ছিল। গরম কম্বলেরও সেদিন অভাব হয় নাই। তখন মাছ এবং অন্যান্য খাদ্যও জুটিয়াছে।

নুরউদ্দিনের মৃত্যুর পর কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহার প্রধান প্রধান শিষ্যগণের চেষ্টায় একটি ধর্ম্মসম্প্রদায় গঠিত হয়। এই সম্প্রদায়-ভুক্ত সকলকেই ঋষি বা বাবা বলা হইত। মুসলমান হইলেও ইঁহারা ধর্ম্ম-সমন্বয়ের বাণী প্রচার করিতেন। ইঁহাদের ধর্ম্মনিষ্ঠা, ত্যাগপরায়ণতা এবং চরিত্রমাধুর্য্য কাশ্মীরে ইসলাম প্রচারে সহায়তা করিয়াছে।* কাশ্মীরের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনও ঋষি-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হইয়াছে। ঋষিগণ কোন দিনই রাষ্ট্রের আনুকূল্য বা পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইঁহাদের আদর্শনিষ্ঠা এবং চরিত্রের দৃঢ়তা কাশ্মীরবাসীর আধ্যাত্মিক জীবনকে সমৃদ্ধ করিয়াছে।

বাদশাহ জাহাঙ্গীর স্বীয় জীবনস্মৃতিতে মুক্তকণ্ঠে ইঁহাদের

---

* "The Muslim mystics, well-known as Rishis or Babas or hermits, considerably furthered the spread of Islam by their extreme piety or self-abnegation which influenced the people to a change of creed."—Kashmir, by Ghulam Mahiyi'd Din Sufi, vol. I, p. 36.

প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ঋষিগণ শাস্ত্রজ্ঞ বা পণ্ডিত নন, কিন্তু ভণ্ড বা প্রতারকও তাঁহারা নন। ইঁহারা কাহাকেও কটু কথা বলেন না। ইঁহারা নির্লোভ এবং কিছুই বাঞ্ছা করেন না। ইঁহারা কেহই বিবাহ করেন না। মাংস ইঁহারা খান না। ইঁহারা ফলবান বৃক্ষ রোপণ করেন। কিন্তু নিজেদের রোপিত বৃক্ষের ফলভোগের কামনা ইঁহারা করেন না। পরের সুবিধার জন্যই ঋষিগণ বৃক্ষ রোপণ করেন। সংখ্যায় ইঁহারা ন্যূনাধিক দুই সহস্র।

সারনাথে

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

১

সাবধান পদক্ষেপে চলি ফিরি চত্বরে চত্বরে।
বিশীর্ণ পাণ্ডুর কত শিলালিপি পড়ে যে নয়নে!
চৈত্যের কঙ্কাল কত শিলায়িত মৃত্তিকার 'পরে।
মৈত্রীর মিতালী ক্ষেত্রে হারানো অতীতে পড়ে মনে।

২

মৃগদাব সারনাথ, আলোর আলোক-তীর্থ এ যে!
কত না মুহূর্ত্ত হেথা অক্ষয় হয়েছে প্রেমামৃতে।
প্রজ্ঞার প্রথম বাণী বুদ্ধকণ্ঠে উঠেছিল বেজে।
স্মরণের স্বর্ণরেখা আজো লেগা স্তূপে চারিভিতে।

রত্নোদ্ধারে ব্রতী নহি, জ্ঞানের ডুবারী নহি জানি।
সত্যের সাক্ষাৎ পাব সে এষণা কিছুমাত্র নাই।
অতীত অতলে মন তবু ডুবে খুঁজে নিতে বাণী।
ভগ্ন সংঘারামে যদি ইতিহাস এতটুকু পাই।

৪

শতাব্দীর ধূলিচাপা নষ্টপৃষ্ঠ মহা ইতিহাস
মরণের মুঠো হতে ছিনাইয়া রেখেছে আপনা।
হারাণো মানিক কত, কত ঝরা কুসুমের বাস
হেথা হোথা স্তূপ-স্তম্ভে ছড়ায়ে রয়েছে কণা কণা।

৫

ধামেক স্তূপের শীর্ষ মিশে যেন নীলিমার নীলে।
সবুজের পটভূমে রবি-কর-বর্ণালি-বিলাস।
অনন্তের পদপ্রান্তে অনিত্যের নিয়ত মিছিলে।
প্রীতিকামী প্রসন্নতা উচ্ছলিয়া উঠে বারোমাস।

৬

মারজয়ী অমিতাভ, পঞ্চজন প্রিয় শিষ্য সাথে
হেথা এই সারনাথে প্রচারেন অহিংসার কথা।
দাবদগ্ধ মানবের অন্তর্গূঢ় মর্ম্মবেদনাতে
শান্তির প্রলেপ দানে স্নিগ্ধ পরলোকের বারতা।

৭

অশোকের মৈত্রী-স্বপ্ন মূর্ত্ত হেথা চিহ্নিত পাষাণে।
স্তরে স্তরে থরে থরে সারনাথে তের নিদর্শন।
সিংহ-শীর্ষ-স্তম্ভ, চক্র, কি অপূর্ব্ব ভাবাবেগ আনে।
শিল্পের চাতুর্য্যে মুগ্ধ চিরদিন করে পণমন।

৮

বুকে নিয়ে কত কথা প্রান্তরেতে ঘুমায় অতীত।
আজো হয় মৌন-স্তূপ মুখরিত মন্ত্র গুঞ্জরণে।
ভিক্ষুকণ্ঠে ধর্ম্ম-সঙ্ঘ-স্মরণের মহিমা ধ্বনিত
প্রেমঘন তথাগতে বার বার পড়ে আজো মনে।

"তারা নাচতে ভালবাসে"

শ্রীএস. এন. ব্যানার্জ্জি

গত তিন বৎসর যাবৎ কলিকাতা মূকবধির বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা তাদের বার্ষিক উৎসব-দিনগুলিতে কতকগুলি নৃত্যানুষ্ঠান প্রদর্শন করে আসছে। গত বার্ষিক উৎসব-দিবসে তাদের দ্বারা শকুন্তলা নাটকের একটি দৃশ্যের নৃত্যাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দৃশ্যপট উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল আশ্রমে তপস্যায় রত ঋষি কণ্ব। প্রবেশ করল আশ্রমশিশুরা, আহরণ করতে লাগল ফল এবং ফুল—বিশ্বছন্দের তালে তালে আনন্দে নৃত্য করতে লাগল তারা। তাদের খেলার সাথী একটি বাজপাখীও নাচতে থাকে তাদের সঙ্গে। ঋষির কাছে গিয়ে তারা তাঁর পায়ে দেয় ফল-পুষ্পের অর্ঘ্য। মুনিবর উঠেন তাঁর আসন থেকে, আশীর্ব্বাদ করেন শিশুদের—নাচিয়ে শিশুর দলটি তখন মঞ্চ পরিত্যাগ করে।

তার পর এক দিক থেকে বাজপাখীটি আবার এসে মঞ্চে প্রবেশ করে, মঞ্চের আর এক দিক থেকে তীরধনুসহ এসে আবির্ভূত হন রাজা—বাজপাখীটির পশ্চাদ্ধাবন করেন তিনি।

নৃত্য করতে করতে প্রবেশ করে শকুন্তলা—নিজের অন্তরে নিহিত জীবনানন্দ অভিব্যক্ত হয় তার চরণছন্দে। তার সখীরাও এসে হাজির হয়। ঋষির জন্য আপন অর্ঘ্য নিয়ে চলে যায় শকুন্তলা। পুনরায় প্রবেশ করেন মৃগের পশ্চাদ্ধাবনরত রাজা—রাজার সৌন্দর্য্যে বিস্মিত হয় সখীরা। মঞ্চে আবার দেখা দেয় শকুন্তলা—নৃত্যপরা সখীরা তাকে বলে রাজার উপস্থিতির কথা—শকুন্তলার অন্তরে প্রদীপ্ত হয়ে উঠে প্রেমের প্রথম স্ফুলিঙ্গ। নিজের আহৃত পুষ্পসমূহ দ্বারা মাল্যরচনা করতে বসে যায় সে—সখীরা চলে যায় তাকে একাকিনী ফেলে।

পুনরায় প্রবেশ করে নৃপতি কর্ত্তৃক বিতাড়িত বাজপাখী, এবার সে আশ্রয় নেয় শকুন্তলার পেছনে। মঞ্চে আবার দেখা যায় রাজাকে। শকুন্তলার অনুপম সৌন্দর্য্যে অভিভূত হন রাজা, হাঁটু গেড়ে বসে তাকে প্রেমনিবেদন করেন তিনি। রাজার গলদেশে পুষ্পমাল্য পরিয়ে দেয় শকুন্তলা—তার পর পরস্পরের হাতধরাধরি করে আনন্দ-নৃত্যে মেতে উঠেন তাঁরা। আবার আসে সখীরা এবং নৃত্য করে তাঁদের সঙ্গে—যবনিকা নেমে আসে।

নৃত্যানুষ্ঠান শেষ হলে পর কয়েক জন ব্যক্তি আমাকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। বালিকাদের হর্ষপ্রদীপ্ত আননগুলো থেকে প্রতীয়মান হচ্ছিল যে, তারা খুব আনন্দ উপভোগ করেছে, কিন্তু কেমন করে উপভোগ করবে তারা—তারা যে বধির! ঐকতানের সঙ্গে তালই বা রাখতে পেরেছিল তারা কেমন করে।

সেদিন দিল্লী থেকে একজন বিশিষ্ট ভদ্রমহিলা আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। কলিকাতায় আসবার আগে দিল্লীতে তিনি ড. হেলেন কেলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। ড. কেলার যে গানবাজনা ভালোবাসেন এতে তিনি প্রবল বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন।

সাধারণতঃ সঙ্গীতের দুটি অংশ আছে—সুর এবং তাল। অবশ্য পরিপূর্ণ মাত্রায় সঙ্গীত উপলব্ধি করতে হলে বুঝতে হবে এর উভয় অংশকেই। ড. হেলেন কেলার বধির হয়েছিলেন অতি শৈশবকালে এবং সঙ্গীতের সুর সম্বন্ধে তাঁর ন্যূনতম ধারণাও নেই কেবলমাত্র এইটুকু ছাড়া যে, স্পর্শের দ্বারা তিনি স্বরগ্রামের ঊর্দ্ধসীমাসমূহের বিভিন্নতা উপলব্ধি করতে পারেন। কিন্তু তাঁর আশ্চর্য্যজনক ভাবে উৎকর্ষপ্রাপ্ত স্পর্শের দ্বারা তিনি গীতবাদ্যের ছন্দায়িত গতি অনুভব এবং উপভোগ করেন। এটা বলা অবশ্য অতিশয়োক্তি হবে যে, আমরা—শ্রবণশক্তিসম্পন্ন লোকেরা, গীতবাদ্য যেমন ভালবাসি ড. হেলেন কেলারও তেমনি ভালবাসেন। কিন্তু একথা বলা পুরোপুরিই সমীচীন হবে যে, ছন্দ বা তালের প্রতি তাঁর অনুরাগ আছে এবং একথা বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হবে না যে, আমাদের অনেকের চেয়ে উৎকৃষ্টতর-

রূপে তিনি ছন্দ ও তাল বোঝেন এবং ভালবাসেন—কেন-না সুন্দর জিনিষ উপলব্ধি করবার মত একটি অনন্তসাধারণ মনের অধিকারিণী তিনি।

এখন আমাদের বিদ্যালয়ের বালিকাদের দ্বারা প্রদর্শিত নৃত্যানুষ্ঠান প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসা যাক।

কি ভাবে ঐকতানের সঙ্গে তাল রাখতে পেরেছিল তারা? এ প্রশ্নের জবাব কিন্তু খুবই সহজ। তারা তো ঐকতানের অনুসরণ করে নি, বরং ঐকতানই অনুসরণ করেছিল তাদের। বস্তুতঃ একজন নৃত্যকারী সেই ছন্দেই নৃত্য করে, যা আছে তার অন্তরে নিহিত, নিজের আত্মায় যে ছন্দের স্পন্দন অনুভব করে তাই রূপায়িত হয়ে ওঠে তার চরণছন্দে। ইসাডোরা ডানকানের মত একজন মহীয়সী নৃত্যশিল্পী তাঁর নৃত্য সম্বন্ধে যা বলেছেন তা এখানে আমি উদ্ধৃত করছি: "মঞ্চের উপরে যাবার আগে আমাকে অবশ্যই আমার আত্মার ভিতরে রাখতে হবে একটি 'মোটর'। সেটি যখন সক্রিয় হতে আরম্ভ হবে তখন আমার পদদ্বয়, বাহুদুটি এবং আমার সারা দেহ সঞ্চালিত হবে আমার ইচ্ছানিরপেক্ষ ভাবে। কিন্তু আমার আত্মায় সেই মোটর রাখবার সময় যদি আমি না পাই তা হলে আমি নাচতে পারি না।" আত্মায় এই মোটর রাখাই হচ্ছে দিব্য নৃত্য-সৃষ্টির প্রথম উপজীব্য। যা আয়তনে বিরাট এবং হাওয়ায় পালের মত ফুলে ওঠে—তেমনি সহায়ক একটি ঐকতান নৃত্যশিল্পীকে—আত্মাকে আহ্বানকারী সঙ্গীত শুনতে এবং অন্তরসত্তার বিরাট শক্তির উপস্থিতি অনুভব করতে আর তাঁর সঙ্গে দিব্যানন্দে নৃত্য করতে সাহায্য করে।

আমার মূক নৃত্যকারিণীদের দুর্ভাগ্য এই যে, নিজেদের পদদ্বয়, বাহুযুগল এবং শরীর দোলানোর আগে সঙ্গীত শ্রবণ করবার ক্ষমতা থেকে তারা ছিল বঞ্চিত। কিন্তু তাদের ভিতরে আছে এমন এক আত্মা যার কল্যাণে তারা বিশ্বছন্দ অনুভব ও জীবনানন্দ উপভোগ করতে এবং তাদের অন্তরে বাস করছে যে মহাশক্তি, তাঁর সহিত যোগাযোগ স্থাপনে সমর্থ হয়। একবার যদি তাঁরা এই অনুভূতির স্পর্শটুকু পর্য্যন্ত পায় তা হলে অন্তরের অন্তরে তারা যে ভাবাবেগ অনুভব করে তারই ছন্দে ছন্দে তারা নৃত্য করে আনন্দে। আত্মা যখন আনন্দে নৃত্য করে তখন ঐকতানের প্রয়োজন তাদের কিসের? প্রত্যেকেই হতে পারে না নৃত্যকারিণী—তা সে শ্রবণশক্তিসম্পন্ন হোক, কিংবা বধিরই হোক—এর জন্যে তার অনুভব থাকা একান্ত প্রয়োজন।

যে ছোট মেয়েটি বাজপাখীর ভূমিকাকে রূপ দিয়েছিল সে প্রায় নিরবচ্ছিন্ন ভাবে আন্দাজ আধ ঘণ্টাকাল ছিল মঞ্চের উপরে। নৃত্যানুষ্ঠান যতই এগোতে লাগল ততই আমি অনুভব করতে লাগলাম যে, বালিকাটি হারিয়ে ফেলেছে তার আপন ব্যক্তিত্বকে আর ডুবে গেছে বাজপাখীর নর্ত্তন-কুর্দ্দনের মধ্যে। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যাঁরা, তাঁদেরও অভিমত তাই। প্রিয়প্রতীক্ষমাণা শকুন্তলার ব্যাকুল প্রতীক্ষা ফুটে উঠেছিল তার আননে, স্মিতহাস্যে এবং লীলায়িত দেহভঙ্গীতে।

সকলেই হতে পারে না শ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পী। তার মধ্যে থাকা উচিত সেই সৌন্দর্য্য, সেই কবিত্ব, সেই সত্য যা তাকে নিয়ে যাবে উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে—তার আত্মাকে লীন করে দেবার জন্যে মহান বিশ্বাত্মার সঙ্গে। কোন মূক বালিকার ভেতরে যদি থাকে সেই আত্মা এবং সে যদি পায় সুযোগ ও উৎসাহ তবে ডানকান বা নিজিনিস্কি কিংবা প্যাভলোভার মত শ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পী না হলেও সেও হতে পারে একজন প্রকৃত নৃত্যশিল্পী। শারীরিক দিক দিয়ে তার একটি নিদারুণ ক্রটি আছে এই যে, সে গান শুনতে পায় না। কিন্তু সে এমন জড়বুদ্ধি নয় যে, তাকে মৃতের সামিল বলে, সকল ভাবাবেগের নিকট পাষাণবৎ বলে একপাশে ঠেলে রাখতে হবে—যাবতীয় স্বাভাবিক ভাবাবেগের অধি-কারিণী সে—তাকে দিতে হবে সেগুলির বিকাশসাধনের সুযোগ এবং উৎসাহ।
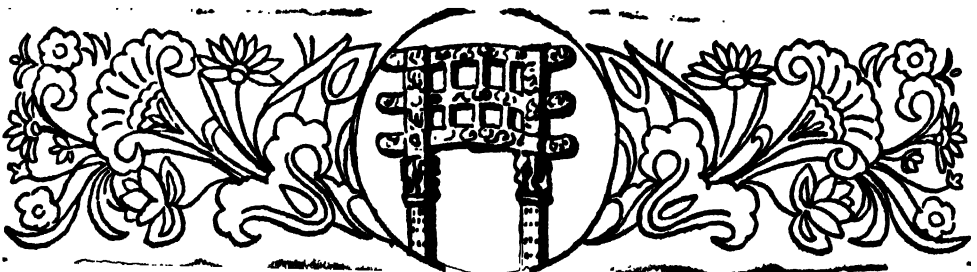
তরুণ মূকবধির শিল্পী সতীশ গুজরাল

শ্রীআম্মু কৃষ্ণস্বামী

"আমার মনে হয়, সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের তরফ থেকে না এলেই ভাল করতেন আপনি।" এই হেঁয়ালিপূর্ণ কথাগুলি দ্বারাই প্রথম সাক্ষাৎকারের সময় স্বাগত করলেন আমাকে আজকের দিনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী সতীশ গুজরাল। তিনি যদি শিল্পী না হতেন তা হ'লে তাঁর এই উক্তি বিশেষ ভাবে বিব্রত করে তুলত আমাকে। আমি জানতাম এ ধরনের কথা বলবার সপক্ষে যুক্তি ছিল তাঁর—অচিরেই আমি কল্যাণ দৃষ্টিকোণের প্রতি তাঁর চরম ঔদাসীন্যের হেতু উপলব্ধি করতে পারলাম। নিষ্ঠাবান পিতামাতার স্পর্শকাতর শিশু সতীশ গুজরাল শ্রবণশক্তি হারান দশ বৎসর বয়সে—এক অসুখের সময় মাত্রাতিরিক্ত ঔষধ সেবনের ফলে। তিনি এক মূক-বধির বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন, কিন্তু এক মাস হাজিরা দেওয়ার পরই তিনি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করলেন—কেননা সেখানে গিয়ে তাঁর এই অনুভূতি হ'ল যে তিনি সাধারণ মানুষের চেয়ে পৃথক ধরনের। তাঁর মধ্যে যে অদ্ভুত একটা কিছু ঘটেছে সে বিষয়ে যে তিনি সচেতন ছিলেন তা তিনি স্মরণ করতে পারলেন। গৃহের স্নেহতপ্ত এবং আরামপ্রদ পরিবেশে এ অনুভূতি তাঁর হয় নি। "কিন্তু অন্য শিশুদের সাহচর্য্যে", তিনি বললেন,"আমি আমার ভিতরে এমন একটা নিঃসঙ্গতা অনুভব করলাম যা আমার সত্তাকে করে দিয়েছিল চূর্ণবিচূর্ণ।"—কাজেই সেখানে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে তিনি পারলেন না। তাঁর শিক্ষার তত্ত্বাবধান করা হতে লাগল গৃহের হৃদ্যতম পরিবেশে। গুজরাল সঙ্গত ভাবেই এ কথা মেনে নিতে অস্বীকার করলেন যে, তিনি একজন স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে আলাদা ধরনের, আর তাঁর বধিরতা দৈহিক ত্রুটিও যদি হয় তা হলেও —সম্পূর্ণ বধিরতাকে পর্য্যন্ত সামান্য অসুখের বাড়া আর কিছু বলে গণ্য করা যেতে পারে না। নিজের দায়িত্ব বহনের উপযোগী ভাবে জীবনযাত্রা অনুশাসিত করতে সমর্থ হয়ে একজন বয়স্ক ব্যক্তিরূপে যখন তিনি সংসারের মুখোমুখি দাঁড়ালেন—কেবলমাত্র তখনই তাঁকে তীব্রভাবে সচেতন হতে হ'ল চতুষ্পার্শ্বের নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে, এমন এক জগৎ সম্বন্ধে যা তাঁকে তার শ্রবণশক্তির বিনষ্টি ভুলতে দিতে প্রত্যাখ্যান করলে। এমনি ভাবে তাঁর জীবনে যে ব্যর্থতার আবির্ভাব ঘটেছিল, সেই ব্যর্থতাই কিন্তু গড়ে পিটে তৈরি করেছে গুজরালকে—আজ গুজরাল যা হয়েছেন তা কিন্তু সেই ব্যর্থতারই শুভ পরিণাম।

"আপনি জানেন", বললেন সতীশ গুজরাল "মানুষের মধ্যে আছে অভ্যুত্থানের একটি স্বাভাবিক এষণা। আমাদের মধ্যে বেশীর ভাগই চাই 'একলা চলতে', নিজেদের সহজ সরল জীবনযাপন করতে, কিন্তু তা করতে দেওয়া হয় না আমাদের।

অনেক দিক দিয়ে ভাগ্যবান ছিলেন গুজরাল। এমন এক পরিবেশের মধ্যে তিনি বেড়ে উঠেন যেখানে তাঁর অধ্যয়ন এবং অনুশীলনের জন্য ছিল শিল্পকলা, দর্শন এবং সাহিত্য। সাহিত্য ছিল প্রারম্ভিক পন্থাসমূহের অন্যতম যার সাহায্যে তিনি চিনতে পেরেছিলেন নিজের বাইরের জগৎকে। দুঃখদুর্গতিভোগ কাকে বলে তা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করতে পেরেছিলেন তিনি। এই অনুভূতির মাত্রা আরও প্রবলতর হয় এই বিষয়টির দরুন যে, অন্যান্য অনেক উৎসাহী জাতীয়তাবাদী দেশভক্তের ন্যায় তাঁর পরিবারের লোকেদের ভাগ্যেও জুটেছিল অশেষ দুঃখ-দুর্গতি এবং অভাব-অনটন। এই দুঃখ-দুর্গতিই তাকে দিয়েছিল মানুষের প্রতি মানুষের আচরণের হৃদয়হীনতা উপলব্ধি করবার সূক্ষ্ম দৃষ্টি।

জীবনের এই অন্ধকারাচ্ছন্ন দিক সতীশ গুজরালকে সমাজের মনস্তাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহের হেতুসমূহ, আচরণ এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে গভীরতর ভাবে চিন্তা করতে প্রণোদিত করেছে। তিনি যা দেখলেন তা তাঁকে করল নিরাশ, কেননা, তিনি বললেন—"কোন জাতি যখন আর্থিক দিক দিয়ে অনুন্নত হয় তখনও সে টিকে থাকতে পারে, কিন্তু জাতি যখন মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে অনুন্নত হয় তখন নৈতিক দিক দিয়ে এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়ে থাকে। এইটিই হচ্ছে আমাদের যুগের ট্রাজেডি। কিছুকাল পূর্ব্বে আমি বিশ্বাস করতাম যে, দীর্ঘকালান্তরে এ সবের পরিবর্ত্তন হবে। কিন্তু লোকেরা যদিও বধির অথবা অন্য যে-কোন ধরনের দৈহিক অপটু লোকেদের সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়ে সম্পর্ক রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন তথাপি ভাবাবেগের দিক দিয়ে কিন্তু তারা সমস্তরের মানুষ হিসাবে তাদের গ্রহণ করতে নারাজ। আমি দেখতে পাচ্ছি যে, আমাদের

সভ্যতার যা বিকাশপ্রাপ্ত হয়েছে সে হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তি। আমাদের ভাবাবেগসমূহ কিন্তু রয়ে গেছে ঠিক তেমনিধারাই যেমনটি ছিল প্রস্তরযুগে। এর পরিচয় পাওয়া যায়— দৈহিক দিক দিয়ে অপটু লোকেদের সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং কর্ম্ম-সন্ধানের ব্যাপারে লোকেরা যে ভাবে তাদের অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করবার চেষ্টা করে, তা থেকে।

গুজরাল অতঃপর রাজনৈতিক মতবাদের মধ্যে আশ্রয়-সন্ধান করলেন এই আশায় যে, তা তাকে চতুষ্পার্শ্বস্থ তিক্ততা থেকে নিষ্ক্রমণের একটি পথপ্রদর্শন করবে। কম্যুনিজম হবে, তিনি ভাবলেন, বেরিয়ে যাবার সুবর্ণসরণী, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও অচিরেই এই উপলব্ধি তাঁর হ'ল যে, এতে অনেকের অধিকতর অন্নসংস্থান হয় বটে, কিন্তু তা প্রভাবিত করতে পারে না হৃদয়বিদীর্ণকারী মূলগত ভাবাবেগ-সমূহকে।

"চিত্রকলার চর্চ্চায় যখন আমি প্রবৃত্ত হলাম তখনও এই বিষাদ—এই তীব্র যন্ত্রণা। লোকেরা বললে এইটেই সবটুকু নয়—একটি উজ্জ্বলতর দিকও আছে। কিন্তু আমি দেখছি যে, আমি তথাকথিত বীরপনায় বিশ্বাস করি না। লোকে চেষ্টা করে এবং সংগ্রাম করে—শুধু নিঃশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকবার জন্যে যে বিরাট সাফল্য অর্জ্জিত হয়, সেইটেই ত বীরোচিত।" এই জীবন-দর্শনের মুখ্য অংশ হচ্ছে এই যে, এতৎসমুদয় সত্ত্বেও মানুষের অস্তিত্ব মানবীয় মর্য্যাদা লাভ করে চেষ্টা করবার নিমিত্ত।

সতীশ গুজরাল ভ্রমণ করেছেন ব্যাপক ভাবে, সর্ব্বত্রই তিনি বধির সঙ্ঘগুলো দেখেছেন এবং নিজের বক্তব্য বলেছেন। বধিরদের যে জিনিষটি দেওয়া হয় না, তা হচ্ছে মানবীয় মর্য্যাদা। "এই সকল হতভাগ্য"—এই মনোভাবই সর্ব্বদা বিদ্যমান এবং তিনি বললেন, যে সকল বধির লোকেদের তিনি দেখতে পেয়েছেন তারা নৈতিক দিক দিয়ে ভেঙে পড়েছে—কেননা নিজেদের ভাগ্য নিয়ে তারা হয়েছে সন্তুষ্ট।

আমি তাঁকে নিয়ে গেলাম বিষয়ান্তরে—তাঁর চিত্রকলা এবং তার পেছনে যে উদ্দেশ্য এবং বাণী নিহিত আছে সেই প্রসঙ্গে। "শিল্পকলায়" সতীশ গুজরাল আমাকে বললেন—"আপনি এগিয়ে যান কোন চরিতার্থতার দিকে। সংসারের অর্দ্ধেকই হচ্ছে শিল্পকলা। কৃত্রিম ভাবে আপনি সৃষ্টি করেন সেই মায়া; জীবন যা থেকে আপনাকে বঞ্চিত করেছে। অদৃষ্টের বিরুদ্ধে এই হচ্ছে আমার শেষ প্রতিরক্ষা। আমার চিত্রকলা প্রদর্শন করে অধিকতর গতিবেগ এবং এই গতি থেকে সৃষ্টি হয় শব্দের—যা থেকে আমি বঞ্চিত। অনুরূপ ভাবে আপনি যখন দুঃখকে এরূপ জোরালো ভাবে চিত্রিত করেন, আনন্দের প্রয়োজনীয়তা তখন উপলব্ধ হয় প্রবলতররূপে। লোকেদের আমি কানাগলিতে নিয়ে যাই না। আমার চিত্রকলার সবলতা যখন তারা দেখে, তখন তারা নিজেরাই দণ্ডায়মান হয় প্রচণ্ডতার শক্তিনিচয়ের বিরুদ্ধে। বিষাদের মত আনন্দও রয়েছে অন্তরে এবং তার কথা বলতে হবে এমন বিশ্বজনীন উপায়ে যে তার কল্যাণে আমরা একে দেখা অপেক্ষা বরং অনুভব করতে সক্ষম হব। মুখ বুজে শান্ত হাসি হেসে তিনি আরও বললেন, "সময় সময় আমি দেখি লোকেরা চিত্রকলার দিকে তাকিয়ে চার দিকে ঘুরে বেড়ায়—কিন্তু প্রায় কিছুই তারা লক্ষ্য করে না, কিছুই তারা দেখে না—কেবল এগিয়ে চলে তারা একটা থেকে আর একটার দিকে। এই সকল লোকেরা দৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন, এরাই হচ্ছে সেই সকল লোক যারা শ্রবণশক্তিরও অধিকারী, কিন্তু হায় সেই শ্রবণশক্তি বুঝতে পারে না বীটোফোনের সিম্ফনির সঙ্গে টোঙ্গাওয়ালার গানের পার্থক্য। আমি মনে করি এরাই প্রকৃতপক্ষে দৈহিক দিক দিয়ে অপটু।"

তিরুভাল্লার মূকবধির বিদ্যালয়

শ্রীডি. পালচৌধুরী

কেরলরাজ্যে আমাদের প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শনোপলক্ষে আমার ভ্রমণকালে আমি দেখিতে পাই যে, তিরুভাল্লার মূকবধির বিদ্যালয়ই হইতেছে উক্ত রাজ্যে স্বেচ্ছামূলক প্রচেষ্টায় পরিচালিত, দৈহিক দিক দিয়া অপটু বালক-বালিকাদের একমাত্র প্রতিষ্ঠান।

১৯৩৮ সনে পাল্লোমে মাত্র পাঁচটি শিশু লইয়া ঐ বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয় এবং ১৯৪১ সনে উহা স্থানান্তরিত হয় তিরুভাল্লায়। ১৯৫২ সনে দান, চাঁদা এবং রাজ্য সরকারের অর্থানুকূল্যে নির্মিত একটি পাকাবাড়ীতে এই প্রতিষ্ঠানটিকে জায়গা দেওয়া হইয়াছে। জাতি এবং ধর্ম্ম-বিশ্বাসনির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মূকবধির শিশুদের ভর্ত্তি করা হয় এই বিদ্যালয়ে। সাধারণতঃ, কেবলমাত্র দশ বৎসরের নিম্নবয়স্ক শিশুদেরই এই বিদ্যালয়ে লওয়া হয় এবং তাহাদের ষোল বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাহারা এখানে থাকে। হাজিরা-বহিতে ৮৪ জন ছাত্রছাত্রীর নাম লিখিত আছে, তন্মধ্যে ৫৬ জন বালক এবং ২৮ জন বালিকা। এই সকল বালক-বালিকা হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুসলমান ইত্যাদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। নিম্নতম শ্রেণীতে ভর্ত্তি-হওয়া একটি শিশুকে আট বৎসরের জন্য একটি নির্দ্দিষ্ট শিক্ষণক্রমের অনুসরণ করিতে হয়; ইহার পরিসমাপ্তির পর সে এমন সুষ্ঠুভাবে কথা বলিতে সমর্থ হয় যে, অপরে তাহার বক্তব্য বুঝিতে পারে এবং ওষ্ঠ-পঠনের (Lip-reading) সাহায্যে সে অপরের স্বাভাবিক কথাবার্ত্তার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে। কথন এবং ওষ্ঠ পঠনের শিক্ষাদান ছাড়া শিশুদের লিখিতে ও পড়িতে, সহজ আঁক কষিতে শেখানো হয় এবং ভূগোল, ইতিহাস, প্রকৃতি-অধ্যয়ন (Nature study) ইত্যাদি বিষয়েও তাহারা জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া থাকে। খাদ্যশস্যের চাষ, মৌমাছিপালন, হাঁসমুরগীপালন, রান্নাবান্না ইত্যাদিও তাহারা করে। বিদ্যালয়ের ছুটির পরে শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে বহির্গৃহ (outdoor) খেলাধুলাও পরিচালিত হয়। শিক্ষণপ্রাপ্ত পরিচালনাধীনে একটি জুনিয়ার স্কাউট ট্রুপও আছে। টিচার আছেন সবসুদ্ধ ১৫ জন, তন্মধ্যে ৭ জন শিক্ষিকা, একজন পুরুষ টিচার এবং দুই জন শিক্ষিকা নিজেরাই মূকবধির। বিদ্যালয়ের শিশুরা যাহাতে জীবিকার জন্য একটি যথোপযুক্ত বৃত্তি বাছিয়া লইতে পারে তদুদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদের সহায়তায় প্রতিষ্ঠানটি তাহাদিগকে বিভিন্ন কারুশিক্ষাদান-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়াছে। বিদ্যালয়ে বালক-বালিকাদিগকে যে সকল কারুশিল্প শিক্ষা দেওয়া হয় তন্মধ্যে কতকগুলি হইতেছে—মাদুর তৈরি, দর্জ্জির কাজ এবং তাঁতবোনা।

বোর্ডিং গৃহ—মাত্র তিনটি ছাড়া আর সকল শিশুই অবস্থান করে বোর্ডিং বিভাগে। একজন মেট্রন বা তত্ত্বাবধায়িকা খাদ্যাদি যোগানো বিভাগ এবং শিশুদের সাধারণ কল্যাণকর্ম্মাদির তত্ত্বাবধান করেন।

পরিচালনা—বিদ্যালয়ের পরিচালনা কার্য্য নির্ব্বাহিত হয় সাত জন সদস্যের একটি কমিটি দ্বারা, তন্মধ্যে একজন হইতেছেন ম্যানেজার। নানা সম্প্রদায়ের এবং বিভিন্ন কল্যাণ-মূলক ব্যাপারের প্রতিনিধি ষোলজন সদস্য লইয়া গঠিত একটি উপদেষ্টা পরিষদও (Advisory Council) আছে।

আর্থিক অবস্থা—শিশুদের মধ্যে অধিকাংশই অত্যন্ত দরিদ্র পরিবার হইতে আগত বলিয়া বোর্ডিং এবং টুইশুনের খরচ দিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। ৮৪ জন ছাত্রের মধ্যে কেবলমাত্র পনের জন পুরা বেতন অর্থাৎ বোর্ডিং এবং টুইশুনের জন্য বৎসরে ১৮০৲ টাকা দিতেছে, ২০ জন দেয় অর্দ্ধেক বেতন, বাদবাকী সকলে অবস্থান এবং শিক্ষালাভ করিতেছে বিনামূল্যে। বিদ্যালয় চালাইবার জন্য প্রতিষ্ঠানটির গড়পড়তা বার্ষিক খরচ হইতেছে ১৪,০০০৲ টাকা। এই প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মপ্রচেষ্টা পরিচালনাকল্পে যে সকল সূত্রে অর্থসাহায্য পাওয়া যায় তন্মধ্যে বদান্য ব্যক্তিদের দান, বেতনাদি সংগ্রহ, মিশ্র (compound) কৃষি, রাজ্যসরকার এবং মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতির অর্থানুকূল্য—এই সকল প্রধান।

কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদ ১৯৫৫-৫৬ সনের জন্য অর্থ-সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছিলেন ৪,০০০৲ টাকা। এই প্রতিষ্ঠান যাহাতে অধিকতরসংখ্যক দৈহিক দিক দিয়া অপটু শিশুদের মধ্যে নিজের কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে সম্প্রসারিত করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে পর্ষদ একটি পঞ্চবার্ষিক ২৫,০০০৲ টাকা সাহায্যদানের নিমিত্ত ইহাকে নির্ব্বাচন করিয়াছেন।

সোভিয়েট রাষ্ট্রে মূকবধিরদের কল্যাণ-প্রচেষ্টা

পি. সুটিয়াজিন

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে একটি স্বেচ্ছামূলক সমাজ-সংস্থারূপে প্রতিষ্ঠিত "দি অল রাশিয়ান সোসাইটি অব ডেফ মিউটস" (নিখিল রুশীয় মূকবধির সমিতি) এখন রাশিয়ান ফেডারেশনের যাবতীয় মূক-বধিরদের ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করিতেছে। সমস্ত সোভিয়েট রিপাবলিকগুলিতে অনুরূপ সমিতিসমূহ বিদ্যমান আছে।

বিভিন্ন উদ্যোগ এবং আপিসের কর্ম্মকর্তৃগণ মূক এবং বধিরদের স্বেচ্ছায় কাজে নিয়োগ করিয়া থাকেন এবং কলা-কৌশলের জটিলতা আয়ত্ত করা এবং শ্রমের উন্নত ধরনের যোগ্যতা অর্জ্জন করার পক্ষে প্রয়োজনীয় যাবতীয় অবস্থার বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন।

সোভিয়েট শিল্পের অনেকগুলি বৃহৎ উদ্যোগে ২০ জন কিংবা তদপেক্ষা অধিকসংখ্যক মূকবধিরের এক একটি দলকে কর্ম্মরত অবস্থায় দেখা যাইতে পারে। কোন কোন শিল্পোদ্যোগে—দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়—দি ষ্টালিনগ্রাড এণ্ড চেলিয়াবিনসক ট্রাক্টার প্ল্যাণ্টস, মস্কো ভাডিমির ঈলিচ লেনিন ওয়ার্কস এবং অপর কয়েকটির কথা—তাদের সংখ্যা ১০০ হইতে ৫০০ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

উৎকৃষ্ট শ্রবণ-শক্তিসম্পন্ন, অপিচ সাঙ্কেতিক ভাষার (Sign language) সহিত পরিচিত কতিপয় দোভাষীকে এই সকল গ্রুপের প্রত্যেকটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা হইয়াছে। বাদবাকী কর্ম্মী, ইঞ্জিনীয়ার এবং যন্ত্রশিল্পীদের (Technicians) সহিত মনের ভাব প্রকাশে ইহারা প্রত্যহ তাহাদিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন। এই সকল দোভাষীরা আছেন প্রশাসন বিভাগের বেতনভোগীদের তালিকায়।

সুতরাং বধির কর্ম্মী এটা অনুভব করে না যে, সে তার উদ্যোগের যৌথ কর্ম্মপ্রচেষ্টা হইতে পৃথকীকৃত। যেখানেই বধিরদের কর্ম্মে নিয়োগ করা হোক না কেন সেখানেই তাহারা শ্রবণশক্তিসম্পন্ন কর্ম্মীদের মত একই মজুরি পায় এবং প্রায়ই উৎপাদনের ক্ষেত্রে তাহারা সেরা কর্ম্মী বলিয়া প্রমাণিত হয়।

ভালিয়া ৎসাপারিনা দেশের অন্যতম প্রধান বয়নশিল্প-কেন্দ্র ইভানোভো অঞ্চলের এক তন্তুবায়দের পরিবারে জন্মিয়াছেন বলিয়া গর্ব্বানুভব করিতেন। তাঁর বাবা, মা, ভাই এবং দুটি বোন ইয়ুসকায়া যন্ত্রশিল্পের কারখানায় কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন।

অতি শৈশবকাল হইতেই ভালিয়া একজন বয়নশিল্পী হইবার স্বপ্ন দেখিতেন এবং ১৯৪৯ সনে যখন তিনি মূকবধিরদের একটি বিদ্যালয় হইতে গ্রাজুয়েট হইলেন তখন দৃঢ়তার সহিত সঙ্কল্প করিলেন—"আমি হইব একজন বয়নশিল্পী।" তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য কিন্তু সকল প্রকার চেষ্টাই করা হইল। "এ বড় কঠিন ব্যবসা" তাঁকে বলা হইল—"বরং দর্জ্জি হতে শেখ।" বালিকাটি কিন্তু নিবৃত্ত হইল না, অবশেষে শিক্ষানবিসরূপে একটি বয়নশিল্পের কারখানায় কাজ করিতে গেল।

ভালিয়া ৎসাপারিনা আজ ইয়ুসকায়া বস্ত্রশিল্পের কারখানার একজন অভিজ্ঞ বয়নশিল্পী এবং যুগপৎ আটটি তাঁত চালাইতে পারেন তিনি।

তিনি একজন উৎকৃষ্ট বয়নশিল্পী এবং কারখানায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমাজকর্ম্মী"—এ কথা বলেন ভালিয়ার ফোরম্যান।

এই বালিকাটি "অল রাশিয়ান সোসাইটি অব ডেফ-মিউটসে"র কারখানা সংগঠনের (Factory organisation) প্রেসিডেণ্ট এবং উক্ত সমিতির আঞ্চলিক কর্ম্মেও তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই সংগঠনের সদস্যদের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন তিনি ঘনিষ্ঠভাবে, তাহাদের মধ্যে তিনি সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষামূলক কার্য্যপরিচালনা করেন এবং যাহাতে তাহারা দৈনন্দিন খবর এবং সাম্প্রতিকতম সাহিত্যকর্ম্মের সহিত তাল রাখিয়া চলিতে পারে সেদিকেও লক্ষ্য রাখেন।

উৎপাদনে উৎকৃষ্ট কর্ম্মের জন্য ভালিয়াকে পুনঃ পুনঃ পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে, তা ছাড়া তিনি দুইটি যোগ্যতার মানপত্রও (Testimonials of merit) পাইয়াছেন। গত বৎসর তিনি অবকাশ যাপন করিয়াছিলেন কৃষ্ণসাগরের তীরবর্ত্তী গেলেন্দঝিকস্থ মূকবধিরদের একটি স্বাস্থ্য-নিবাসে।

"অল রাশিয়ান সোসাইটি অব ডেফ-মিউটস"-এর সদস্যদের মধ্যে ভালিয়ার মত এমন হাজার হাজার কর্ম্মী আছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কারখানা-সমূহের টেকনিকাল স্কুল বা কারিগরি বিদ্যালয়ের, 'ট্রেড' স্কুল অথবা বাণিজ্যিক বিদ্যালয় প্রভৃতির ছাত্র কিংবা গ্রাজুয়েট। বধির শিশুদের ৩৩১ নং মস্কো বিদ্যালয়ের সুবর্ণপদকপ্রাপ্ত গ্রাজুয়েট "আইগোর উবোগোভ" "মেটালারজিক্যাল

ফ্যাকাল্টি অব দি মস্কো ষ্টীল ইনষ্টিটিউট" নামক প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন ১৯৫০ সনে।

১৯৫৫ সনে উক্ত প্রতিষ্ঠান হইতে গ্রাজুয়েট হইয়া উবোগোভ "মেটালারজিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারের ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হন। অতঃপর, চীনা প্রজাতন্ত্রে এক প্ল্যান্টের জন্য একটি ষ্টীল ফাউণ্ড্রি বা ইস্পাত ঢালাইয়ের কারখানার এবং ভারতে একটি মেটালারজিক্যাল বা ধাতুবিদ্যাসংক্রান্ত প্ল্যান্টের অপর একটি প্রোজেক্টের পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারিয়া এই তরুণ ইঞ্জিনীয়ার প্রভূত আনন্দ এবং উদ্দীপনা লাভ করেন।

ভারতের প্লান্টে উবোগোভকে বিশেষ ভাবে কঠোর পরিশ্রম করিতে হয় পরিকল্পিত 'ফার্নেস'গুলির কৃতিসাধ্যতা (feasibility) সম্পর্কে ভারতীয় বিশেষজ্ঞদের সন্দেহ নিরসন করিবার নিমিত্ত।

এখনও পর্য্যন্ত সংক্ষিপ্ত তাঁর কর্ম্মজীবনে উবোগোভ কতকগুলি চিত্তাকর্ষক টেকনিক্যাল প্রোজেক্টের কার্য্যকরীকরণে সহায়তা করিয়াছেন। মূক-বধিরদিগকে পেশা দিয়া জীবন-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত রাখা এবং তাহাদের যথোচিত কর্ম্মলাভের ব্যাপারে উক্ত সোসাইটির উৎপাদন শিক্ষণ-কেন্দ্রসমূহ (The Production Training Centres) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে।

অল রাশিয়ান সোসাইটি অব ডেফ-মিউটস-এর ছেচল্লিশটি বিভাগের অধীনে অধুনা উৎপাদন শিক্ষণকেন্দ্র আছে ৫৬টি। সোসাইটির অন্তর্ভুক্ত এই সকল উদ্যোগ হইতে প্রতি বৎসর শত শত মূক-বধির বিভিন্ন ব্যবসা এবং পেশায় নৈপুণ্য অর্জ্জন করিয়া বাহির হইয়া আসে—এই সকল নারী এবং পুরুষকে পরিকল্পিত প্রণালীতে রাজ্য অথবা সমবায়মূলক উদ্যোগসমূহের কাজে লাগাইয়া দেওয়া হয়।

বধির এবং মূক-বধিরদিগকে সাফল্যের সহিত কাজে লাগানো হইয়াছে—কৃষিকর্ম্মে ভূঁইচাষী (Tillers of the Soil), গবাদি গৃহপালিত জন্তুর পোষক, উদ্যানরচনাকারী, মালী, কৃষি-যন্ত্রপাতি সারানো কারিগর (repair mechanics)—এমনকি ট্রাক্টার ড্রাইভার এবং কম্বাইন্ অপারেটার প্রভৃতি বিভিন্ন রূপে।

ইহাদের মধ্যে অনেকে আবার কৃষি-সংক্রান্ত তাহাদের কর্ম্মকে সংযোজিত করে সক্রিয় সমাজকর্ম্মের সহিত।

ক্রাসনেডোর অঞ্চলের যৌথ কার্ম্মের ধাতুশিল্পী নিকোলাই পেসিজিন শ্রবণশক্তি হারান শৈশবেই, মানুষের কণ্ঠস্বর যে কিসের মত তা তিনি স্মরণ করিতে পারেন না কিংবা যে ধাতু তিনি নাড়াচাড়া করেন তার ঝনৎকার তাঁর কানে প্রবেশ করে না। ইহার দরুন যৌথ কার্ম্মের ধাতুশিল্পী-গোষ্ঠীর নেতৃরূপে তাঁহার কর্ম্ম কিন্তু ব্যাহত হয় না।

পেসিজিন ছাড়া এই কার্ম্মে কর্ম্মরত আরও কুড়িজন বধির এবং মূক-বধির আছেন। তাঁহাদের মধ্যে সকলেই সমিতির একটি প্রাথমিক সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত—পেসিজিন হইতেছেন এই গ্রুপের চেয়ারম্যান। যৌথ কার্ম্মে মূক-বধিরদের জন্য বিশেষ ক্লাবগৃহের ব্যবস্থা করিয়াছেন যেখানে ছুটির দিনে বা কর্ম্মাবসানে সকল মূক-বধির একত্রিত হয়—বন্ধু-বান্ধবদের সহিত গল্পগাছা করা, বই, দৈনিক পত্র এবং মাসিক পত্র পাঠ, দাবাখেলা বা সতরঞ্চ খেলা ইত্যাদির জন্য। জাতীয় অর্থনীতির অন্যান্য সমুদয় ক্ষেত্রের ন্যায়, কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত বধির এবং মূক-বধিরগণকেও তাদের কাজের জন্য, অন্যান্য কর্ম্মীরা যা পায় তার সমান হারে মজুরি দেওয়া হয়। তাহারা তাহাদের নিজ সম্পত্তিও অর্জ্জন করিয়াছে: কুটীর এবং ভূমিখণ্ড, গরুবাছুর, হাঁসমুরগী এবং অন্যান্য গৃহপালিত জন্তু। যৌথ কার্ম্মে তাহাদের কাজের জন্য তাহারা যে মজুরি অর্জ্জন করে তাহার সঙ্গে তাহাদের গৃহ হইতে লব্ধ আয় যুক্ত হইয়া তাহাদের স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণভাবে অবস্থানের ব্যবস্থা হয়।

"দি অল রাশিয়ান সোসাইটি অব ডেফ-মিউটস" যেমন প্রতিনিয়ত ব্যাপৃত থাকে সেই সকল মূক এবং মূকবধির শিশু ও বয়স্কদের লালন-পালন এবং শিক্ষাদান লইয়া যাহারা কোন বিদ্যালয়গত শিক্ষা পায় নাই তেমনই ইহার লক্ষ্য থাকে সারা দেশে ছড়ানো বধির এবং মূকবধিরদের সাংস্কৃতিক শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্প্রসারণ, সদস্যদের যেমন সখের কলাচর্চ্চায় প্রচেষ্টায় তেমনি শরীর-চর্চ্চা এবং খেলাধুলায় উৎসাহ দান।

কেবলমাত্র "আরএসএফএসআরআর"-এই বিদ্যালয়ে যাওয়ার বয়সী এবং প্রাগ-বিদ্যালয় বয়সী সকল বধির এবং মূকবধির শিশুদের প্রতিপালনের জন্য ২২০টি বিশেষ বিদ্যালয় এবং প্রাগ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান আছে।

ওখানে মূকবধিরদের জন্য আছে দুইটি মাধ্যমিক করেসপণ্ডেন্স বিদ্যালয়, বয়স্কদের জন্য ৪৫১টি স্কুল এবং প্রাথমিক স্কুলের ক্লাস, তা ছাড়া মাধ্যমিক কারিগরি বিদ্যালয় (Technical School) এবং উচ্চতর বিদ্যালয়গুলিতে বধির এবং মূকবধিরদের জন্য বিশেষ কোর্স বা শিক্ষাক্রমেরও ব্যবস্থা আছে।

এদেশে আছে বধির এবং মূকবধিরদের জন্য ১০০টি বিশেষ সংস্কৃতি ভবন, প্রেক্ষাগৃহসমন্বিত প্রতিষ্ঠানসমূহ, পাঠাগার, তাদের নিজস্ব সিনেমার সরঞ্জাম, টেলিভিশন সেট ইত্যাদি। এই সমস্ত ক্লাবের লাইব্রেরীতে পুস্তকের সংখ্যা ২০০,০০০।

এই সকল ক্লাব ব্যতিরেকে শহরে, গ্রামে এবং যে সকল উদ্যোগে বধির এবং মূকবধির দলকে কর্ম্মে নিয়োগ করা হইয়াছে তৎসমুদয়ে সবসুদ্ধ আরও ৩১০টি ক্লাবগৃহ আছে।

সোসাইটির সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সখের অভিনয়কলাদি ব্যাপকভাবে পরিব্যাপ্ত। সবগুলি ক্লাবেরই তাদের নিজস্ব অভিনয় এবং নৃত্য বৃত্তি (circles) আছে।

বধির শিল্পীদের অভিনয় এবং অন্যান্য প্রদর্শনসমূহে আনুষঙ্গিক হিসাবে ঘোষকদের কখনও পরিবেশিত হয় এবং নৃত্যগুলি নিয়মমাফিক অনুষ্ঠিত হয়, পিয়ানো অথবা করডিয়ন নামক বাদ্যযন্ত্রের সুরচ্ছন্দে—ফলে ইহা দর্শকদের মধ্যে যাহারা শুনিতে পায় তাহাদের পক্ষে হইয়া উঠে অধিকতর উপভোগ্য।

সোসাইটির সদস্যদের মধ্যে খেলাধুলার শিক্ষণ ব্যাপক ভিত্তিতে প্রসারিত হইয়াছে। বধির এবং মূকবধিরদের মধ্যে দেহানুশীলনকারীদের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে পনের হাজারে। বধির এবং মূকবধিরদের ক্লাবগুলিতে বহুসংখ্যক খেলাধুলার বিভাগ আছে। যথা: লঘু ব্যায়াম, ভলিবল, বাস্কেট বল, স্কি-ক্রীড়া, আইস (তুষার) হকি, দাবাখেলা, ভ্রমণকারীদের বিভাগ ইত্যাদি। প্রায়শঃই সকলরকম ক্রীড়া-কৌতুকের আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা হইয়া থাকে।

১৯৫৬ সনের নভেম্বর মাসে রাশিয়ান ফেডারেশন এবং উক্রেইনিয়ান রিপাব্লিকের মূকবধিরদের প্রধান টিমগুলির মধ্যে একটি দাবাক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় জয়ী হইয়াছিল 'আরএসএফএসআর'-এর টিম।

ক্লাবগুলির কার্য্যসূচীতে সিনেমা দীর্ঘকাল ধরিয়াই সুদৃঢ় স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছে। সোভিয়েট ফিল্ম ফ্যাক্টরীসমূহ বধিরদের জন্য অভিধাসম্বলিত সবাক চিত্র নির্ম্মাণ করে। এই সকল ফিল্ম পূর্ব্বনির্দ্ধারিত পথে দেশের সর্ব্বত্র বধির এবং মূকবধিরদের বিভিন্ন ক্লাবে প্রেরিত হয়।

সিনেমা অনুষ্ঠানে দোভাষীরা অভিধাবিহীন ফিল্মগুলির বিষয়বস্তু বুঝাইয়া দেয়।

১৯৫৬ সনে সমিতির কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক পর্ষদের (The Central Administrative Board) আদেশে নির্ম্মিত "of those who cannot hear" বা "যারা শুনতে পায় না" নামক লোকরঞ্জক, চার অংশে বিভক্ত বিজ্ঞানানুগ ফিল্মটিতে চিত্রায়িত হইয়াছে—ইউএসএসআর-এর বিশেষ প্রাগ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠানসমূহে, বাণিজ্য বিদ্যালয়ে (Trade School), মাধ্যমিক এবং উচ্চতর বিদ্যালয়সমূহে মূকবধির শিশু, কিশোর এবং বয়স্কদের প্রতিপালন ও শিক্ষণের জটিল পদ্ধতি। কৃষি ও শিল্পে বধির এবং মূকবধিরগণ কিভাবে কাজ করে; বৈজ্ঞানিক এবং সমাজকর্ম্মে কিভাবে তাহারা অংশ গ্রহণ করে, কেমন করিয়া তাহারা থাকে এবং আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করে তাহাও ঐ ফিল্মে দেখানো হইয়াছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের সমস্ত রিপাব্লিকের সমিতিসমূহের ক্লাবগুলিতে উক্ত ফিল্মটি ব্যাপকভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং বাহিরেও কোন কোন দেশের জাতীয় সংগঠনে প্রেরিত হইয়াছে।

দি অল রাশিয়ান সোসাইটি অব ডেফ-মিউটস—যাহা সোভিয়েট ইউনিয়নে এ ধরণের সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন সংস্থা—অন্যান্য ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির অনুরূপ সমিতিসমূহের সহিত সতত স্বকীয় অভিজ্ঞতার বিনিময় করিয়া আসিতেছে। বিদেশের মূকবধিরদের সমিতি, ইউনিয়ন, সঙ্ঘ প্রভৃতির সহিত উক্ত সংস্থা ব্যাপক সংযোগ রক্ষা করিয়া চলে।

১৯৫৫ সনের আগষ্ট মাসে যুগোশ্লাভিয়ার জাগ্রেব নগরীতে অনুষ্ঠিত মূকবধিরদের দ্বিতীয় বিশ্ব কংগ্রেসে—যাহাতে ৩৪টি বিভিন্ন দেশ হইতে বধিরদের জাতীয় ইউ-নিয়নের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশ গ্রহণ করেন—সোভিয়েট প্রতিনিধি দল কর্তৃক সোভিয়েট ইউনিয়নে বধির এবং মূকবধিরদের মধ্যে অনুষ্ঠিত কৃত্য সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট পঠিত হয়। সোভিয়েট প্রতিনিধি দলের এই রিপোর্ট কংগ্রেস কর্তৃক সমাদরে গৃহীত হয়। উক্ত কংগ্রেসে যেমন অল-রাশিয়ান সোসাইটি অব দি ডেফ-মিউটস-এর প্রতিনিধিবৃন্দ তেমনি সারা ভারত মূকবধির সমিতির প্রতিনিধিগণও মূক-বধিরদের ওয়ার্লড ফেডারেশন বা বিশ্ব সমবায় প্রতিষ্ঠানের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন।

দি অল রাশিয়ান সোসাইটি অফ ডেফ-মিউটস আজ বধির এবং মূকবধিরদের যাবতীয় সেবামূলক উন্নয়নকার্য্য চালাইয়া যাইবার মহান্ কৃত্যে এবং তাহাদের সাংস্কৃতিক স্তর ও জীবনচর্য্যার মানের উন্নতিবিধানে ব্রতী হইয়াছে।

"হরিজন"

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী
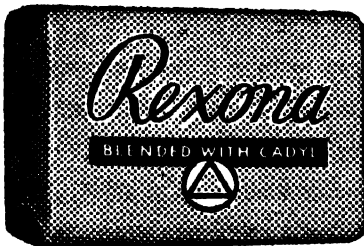
পৌষের (১৩৬৩) 'প্রবাসী'তে শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয়ের "হরিজন সেবায় অর্থসাহায্য" শীর্ষক লেখাটি পড়ে এ সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলতে প্রবৃত্ত হয়েছি।

১৯৫১-৫২ সনে আমি কয়েক মাস দিল্লীতে ছিলাম। সেই সময়ে আমার ভগিনী করুণা সেন দিল্লীতে বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্রে কাজ করতেন। মাঝে মাঝে তিনি হরিজন কলোনীতে বয়স্কদের পাঠশালাগুলি পরিদর্শন করতে যেতেন। কৌতূহলবশে আমিও তাঁর সঙ্গে যেতাম। হরিজনকেন্দ্রেও গিয়েছিলাম কয়দিন।

মধ্যে কলোনী বা নিবাসভূমি। পাকা দোতলা বাড়ীর সমষ্টি। শুনলাম আড়াই শ' ঘর হরিজন পরিবার তাতে আছেন। পুরুষদের মধ্যে বি-এ, আই-এ পাসও দু' একজন আছেন। পাকা দোতলা বাড়ী ছাড়া একতলা টিনের ঘরও অনেকগুলি আছে। ঠিক খানিকটা আমাদের গ্রে ষ্ট্রীটের করোগেটের চালে পাথরচাপা ঘরগুলির মত ঘর। তেমনি সামনে খাটিয়া পাতা—খাটিয়ার পাশে উনুন, কাঠ, কয়লা, খাবার, ফেরীওয়ালা, শিশু-বালক-বালিকা সমন্বিত সে নিবাসগুলি। অতি বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও অশক্ত দু'এক জন সেখানে শুয়ে-বসে আছে দেখতাম।

পাকা দোতলার অধিবাসী ও একতলার বস্তির অধিবাসীদের মধ্যে কোন শ্রেণী বা বর্ণভেদ আছে কিনা জানি না। অবশ্য এ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করি নি। সেকথা যাক্। কি কি দেখলাম তাই বলি।

গেটের ভেতরে ঢুকেই খানিকটা গেলে বাঁদিকে পড়ে হরিজন কলোনীর বাড়ীগুলি। সকল জায়গাতেই আজকাল যখন বাড়ীঘর দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে, তখন এই সকল চমৎকার দোতলা বাড়ী, বড় বড় জানালা-দরজা, রৌদ্রভরা লম্বা বারান্দা দেখে বেশ ভাল লাগছিল। মনে হচ্ছিল বেশ উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা আছে নিশ্চয়।

বাঁদিকে খানিকটা উচুনীচু জমি। তার ওপারে দেয়াল-ঘেরা গান্ধীজীর বাসগৃহ ও বাল্মীকি-মন্দির।

'কলোনী' বিভাগে ডানদিকে একটি ছোট ঘর। সেখানে গুটিকতক আলমারী, চরকা, তকলী, লাটাই ও সুতা। আলমারীতে ছিল রঙীন সুতার কারুকার্য্য করা চটের থলি, চাদর আর ঝাড়ন-জাতীয় কিছু জিনিষ। বেতের কাজের নমুনা দু'একটা মোড়া যেন ছিল বলে মনে হচ্ছে। সেগুলি সংরক্ষণের এবং দেখানোর ভার ছিল একজন মরাঠী মহিলার উপর। শেখানোর দায়িত্বও ন্যস্ত হয়েছিল তাঁরই উপর; শিক্ষার্থী অবশ্য কেউ ছিল না। দ্রব্য-সংগ্রহও ছিল অতি অল্প। মনে হ'ল শেখানোটা গৌণ, আসলে দর্শকদের দেখাবার জন্যেই সেগুলো সাজানো আছে। নিকটেই চারদিক খোলা উপরে মস্ত একটি নাটমন্দিরগোছের দালান। সেইখানেই সকালে বসে শিশুদের এবং বালক-বালিকাদের পাঠশালা আর রাত্রে সেটা হয় বয়স্ক নারী ও পুরুষের পাঠশালা।

সকালে ঝুড়ি কুলো (ওদের ভাষায় চামচ) ঝাটা হাতে বয়স্ক নর-নারী সব বেরিয়ে যায় মিউনিসিপ্যালিটির নানা কাজে। রাস্তা-ঘাট ঝাট দেওয়া, ড্রেন, খোলা ড্রেন পরিষ্কার করা, পুরনো দিল্লীর সনাতন প্রথার শৌচাগার সাফ করা ইত্যাদি এ ধরনের যাবতীয় কাজের ভার তাদের উপর। কাজ সেরে তারা ঘরে ফেরে সম্ভবতঃ দুটো-আড়াইটায়। তার পর স্নান, রান্না খাওয়া আছে। তখন ডিসেম্বর মাস—অগ্রহায়ণ-পৌষের শীত, সাড়ে পাঁচটায়ও অন্ধকার। পাকা বাড়ীগুলির বারান্দায় লেপ-তোশক কাঁথা-নেকড়া শুকাচ্ছে। বয়স্ক লোকজন নেই বললেই চলে। কাঁচা বাড়ীগুলির সামনে খাটিয়া পেতে বসে দু'একজন বুড়োবুড়ী, আশপাশে মাছি মাটি-কাদা জঞ্জালের মধ্যে শিশুরা খেলা করছে।

ওপাশে স্কুল বসেছে আটটায়। আড়াই শ' পরিবারের মধ্য থেকে মোট পঁয়ত্রিশটি বালক-বালিকা পড়তে এসেছে। যারা বয়সে কিছু বড় তারা জীবিকার দায়ে বা প্রয়োজনে মা-বাপের সঙ্গে কাজে বেরিয়েছে বোধ হয়। মোটামুটি ঘরপিছু বা পরিবারপিছু চারটি সন্তানও যদি ধরি, তা হলে ছাত্রছাত্রীর শতকরা সংখ্যা কত হয় তা ভেবে দেখা প্রয়োজন।

সেখানে ছিল ভাইয়ের কোলে ছোট্ট বোন, বোনের কোলে কাঁদনে ভাই—মুখ চোখ নাক যতদূর নোংরা হতে পারে। ছোটদের হাতে রুটি, মোয়া, চীনেবাদাম, নাকে-চোখে জল। সকলে পড়তে বসল। পরিদর্শিকাকে দেখে কর্ম্মে নিযুক্ত শিক্ষয়িত্রী যথাসম্ভব তাদের কান্না থামাতে ও পরিষ্কার করতে চেষ্টা করতে লাগলেন, জল গামছা তোয়ালে নিয়ে। এগারটা অবধি স্কুল চলল। বড় দু'একটি বালক-বালিকা খুব চটপটে দেখলাম।

সন্ধ্যার পরে বয়স্কদের পাঠশালা। সেখানে আমরা দেখতে পেলাম পাঁচ-সাত জন নরনারী। বাকি মেয়েরা অনেকেই রুটি করতে গেছে, কেউ গেছে ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়াতে—কেউ বা বিশ্রাম করছে। একে সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনি, তার উপর দিল্লীর দারুণ শীতে স্বল্প শীতবস্ত্র গায়ে দিয়ে বসে, প্রথম ভাগের 'লাল' 'লালা' 'নল' 'নালা' (বয়স্কদের পড়ায় বর্ণপরিচয় নেই, আছে বাক্যপরিচয়) এবং দ্বিতীয় পুস্তকের "শেঠজী বগগীমে সওয়ার হোকর শয়েল করনে গয়ে" অর্থ শেঠজী গাড়ী চড়ে বেড়াতে গেলেন—

ইত্যাদি মূল্যবান বাক্য পড়তে তাদের তেমন উৎসাহবোধ না হওয়াই স্বাভাবিক।

পুরুষের সংখ্যা মেয়েদের চেয়ে বেশী হয় সত্য, কিন্তু তাদেরও খাটুনির পর আমোদ-প্রমোদ এবং গান-বাজনা ইত্যাদি অন্য খেয়াল-খুশি যেটা প্রয়োজন। সাধারণতঃ নারীদের ও পুরুষদের পাঠশালা আলাদাই বসে। মেয়েরা কিসের জন্যে লেখাপড়া শিখতে চায়, দু'এক জায়গায় সেকথা জিজ্ঞাসা করলাম। তরুণী মেয়েরা—পড়াশুনা তারা ভালই করে—সলজ্জ ভাবে বলে, স্বামীর চিঠিপত্র এলে পড়তে পারবে আর নিজেরাই লিখতেও পারবে। মায়েরা বললে, বিদেশগত সন্তানদের খোঁজখবর নিতে ও দিতে পারবে।

যাক শেষ অবধি কে পড়েছিল কতদূর জানি না। তবে তখন নানা প্রতিকূল অবস্থার দরুন তিন মাসেও যে প্রথম ভাগ বা প্রথম পাঠ শেষ হয় নি তা জানি। বয়স্কদের সময় নেই, অবসর নেই। বয়স্কা মেয়েদের বাইরে জীবিকার কাজ ত আছেই, তদুপরি আছে ঘরের কাজ, সন্তানপালন, লৌকিকতা ইত্যাদি। জননী এবং গৃহিণীরা যখন পাঠশালায় পাঠাভ্যাস করেন তখন ঘর থেকে প্রায়ই ডাক আসে—খোকা কাঁদছে, খুকীর জ্বর এসেছে, দেখা করতে এসেছে কেউ···। সুতরাং লেখাপড়া শিকেয় তোলা থাকে, হন্তদন্ত হয়ে তাঁদের ছুটতে হয় ঘরের পানে।

এর পরে একদিন হরিজনকেন্দ্রে বাল্মীকি-আশ্রমে গিয়ে আমরা উপস্থিত হলাম। গান্ধীজীর ঘরখানি পরিষ্কারই রয়েছে। বাল্মীকির মূর্তিসমন্বিত মন্দিরও একটি রয়েছে। শান্ত পরিবেশ। সেখানে রয়েছেন এক জন বাঙালী মহিলা (নোয়াখালির) যাঁর সঙ্গে শ্রীযুক্ত প্যারীলালজীর (গান্ধী-চরিত লেখক) বিবাহ হয়েছে। ডাঃ সুশীলা নায়ারের ভাই তিনি।

দু'চারটি কথাবার্তার পর আমরা ফিরলাম।

কয়েকটি কথা মনে হয়ে ছল সেদিন, বলবার সুযোগ পাই নি। আজ বলি। প্রথম হ'ল এই: হরিজনদের 'হরিজন' রেখেই শিক্ষা দেওয়াতে তারা কি সত্যই সাধারণের মত শিক্ষা পাবার সুযোগ পাচ্ছে? তাদের পরিবেশ, তাদের জীবিকা অর্জনের কাজের ধারা—তাদের ছেলেমেয়েদের 'মানুষ' হবার পথে কি পরিপন্থী হয়ে দাঁড়াচ্ছে না? যদি সকালে-বিকালে বালকবালিকারা দিনমজুরি বা জীবিকার জন্য চাকরি করে তা হলে কখন তারা লেখাপড়া শিখবে? এবং যদিই বা শেখে, কি লাভ হবে তাদের? সমাজের কোন খানে তারা সম্মানিত মানুষের মত জীবনযাপন করতে পারবে—গান্ধীজীর দীর্ঘকালের সেবাধর্ম এবং আন্দোলন সত্ত্বেও তারা কি এতদিনে কোথাও প্রতিষ্ঠালাভ করতে পেরেছে? কোন্ উন্নত স্তরের জীবন ও জীবিকা জুটেছে এদের অদৃষ্টে?

অপরিচ্ছন্ন শিশু এবং বালক-বালিকাগুলিকে দেখে মনে হ'ল তাদের জন্য 'নূতন উষার স্বর্ণদ্বার' যে আজও অর্গলবদ্ধ। ভাল বাড়ীঘর তৈরী হয়েছে দেখে এসেছি। কিন্তু উন্নত পরিবেশ কোথায়?

যে জ্ঞান তাদের নূতন জগতের নূতন আলোর সন্ধান দেবে, আশা আশ্বাস, কল্পনা জাগাবে তাদের মনে, সে জ্ঞানের সন্ধান কি তারা পেয়েছে? জাতে, জীবিকায় (জমাদার ভাঙ্গী) শিক্ষাতেও কেন হরিজন তারা? এ শিক্ষা কোন্ শিক্ষা?

এবার হরিজনসেবার সাহায্য সম্বন্ধে একটু বলি। দিল্লীতে লোকে বলে যে, গান্ধীজীর হরিজন ফণ্ডে প্রায় দু'আড়াই কোটি টাকা ছিল এবং এখনও আছে। সে টাকা সমগ্র ভারতবর্ষের জনসাধারণের নিকট থেকে সংগৃহীত—কোন এক জনের বা প্রদেশবিশেষের দান নয়। সে টাকা কার কাছে গচ্ছিত আছে? কে বা কারা তার হিসাব-কিতাবের কর্তা? সেই টাকা কেন ঐ তথাকথিত 'হরিজন' শিশুগুলির জন্য খরচ করা হয় না? কেন চিরদিনের জন্য প্রগতির দ্বার রুদ্ধ থাকবে তাদের নিকট? তৃতীয়তঃ, হরিজন নাম অথবা সংজ্ঞাই বা কেন? শ্রেণীগত নাম তাদের নাই-বা হ'ল। 'হরিজন' নামটি যে তাদের পৃথক করে দিচ্ছে সাধারণ মানুষদের থেকে।

পরিকল্পনা ও বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত

স্মরণ থাকতে পারে, প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার আমলে ভারত আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ব্যাঙ্কের কাছে ঋণ চেয়েছিল। কিন্তু ব্যাঙ্কের কাছ থেকে তেমন সাড়া পাওয়া যায় নি। শুধু তাই নয়—পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত কয়েকটা কাজ ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ পছন্দ করেন নি। মোট কথা হ'ল এই যে, যে আশা নিয়ে ভারত আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ব্যাঙ্কের কাছে ঋণের জন্য প্রার্থনা জানিয়েছিল সে আশা সফল হয় নি। এটা সত্যি দুঃখের বিষয়, ব্যাঙ্ক ভারতের প্রয়োজনের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে চান নি। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, ব্যাঙ্ক পৃথিবীর এমন কতকগুলো দেশকে কর্জ দিয়েছেন যেগুলো আয়তনের দিক থেকে ক্ষুদ্রতর। শুধু তাই নয়। এগুলোর লোকসংখ্যা যেরূপ কম সেরকম এগুলোর আভ্যন্তরীণ সম্পদও তেমন নেই। অথচ ব্যাঙ্ক ভারতের প্রয়োজন ভালভাবে বিবেচনা করতে চান নি। ফলে, ভারতের প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কাজের জন্য যে বৈদেশিক মুদ্রার দরকার ছিল, ভারত ব্যাঙ্কের কাছ থেকে সে মুদ্রা পায় নি। বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ব্যাঙ্কের প্রধানতম উদ্দেশ্য হচ্ছে অনুন্নত এলাকার উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা। তা ছাড়া সকলেরই হয়ত জানা আছে, ব্যাঙ্কটির পিছনে বিশ্বের প্রায় প্রত্যেকটি দেশের প্রচেষ্টা রয়েছে। যাতে সামগ্রিক ভাবে সমস্ত বিশ্বের উন্নতি সাধিত হতে পারে সেজন্য যখন এই ব্যাঙ্কটি স্থাপন করা হ'ল তখন কোন জাতি কিংবা বর্ণ অথবা ভৌগোলিক অবস্থানের প্রশ্ন উঠে নি। কাজেই প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার আমলে ভারতের প্রতি ব্যাঙ্ক যে বৈষম্যমূলক মনোভাব প্রদর্শন করেছেন, সে মনোভাব কিছুতেই সমর্থন করা চলে না।

অনুমান করা হয়েছে, দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার আমলে বেসরকারী স্তরে দু'হাজার কোটি টাকারও বেশী খরচ করা হবে। অর্থাৎ, সরকারী এবং বেসরকারী উভয় স্তরে মোট সাড়ে সাত হাজার থেকে আট হাজার কোটি টাকা ব্যয়ের সম্ভাবনা আছে। বাইরে থেকে কলকব্জা যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য উপকরণ আমদানীর জন্য এর বিরাট অংশ শেষ হয়ে যাবে। একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এজন্য প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা দরকার। সকলেরই হয় ত জানা আছে, মূল হিসাব অনুযায়ী পাঁচ বছরে প্রায় এক হাজার এক শত বিশ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা ঘাটতি পড়বে বলে অনুমান করা হয়েছিল। ব্রিটেনে ভারতের যে তহবিল গচ্ছিত রয়েছে সে তহবিল থেকে বিদেশী পাওনাদারদের দাবি মিটাবার জন্য দু'শত কোটি টাকার মত তোলা যেতে পারে বলে ভারত সরকার আশা করেছেন। এ ছাড়া, আমাদের দেশে যে সব শিল্প রয়েছে, বাইরে থেকে সে সব শিল্পও প্রায় এক শত কোটি টাকা ঋণ পেতে পারে। কাজেই বাকী বৈদেশিক মুদ্রার জন্য বিশ্বব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য দেশের সরকারী ও বেসরকারী লগ্নী সংস্থার উপর নির্ভর করা ছাড়া ভারতের গত্যন্তর নেই। কাজেই মূল হিসাবে উল্লিখিত টাকার উপর আরও চার-পাঁচ শত কোটি টাকা বরাদ্দ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় বৈদেশিক সাহায্যের গুরুত্ব বিশেষ ভাবে বেড়ে গেছে। অবশ্য এই চার-পাঁচ শত কোটি টাকার মধ্যে কত বৈদেশিক মুদ্রা দরকার হবে সেটা এখনও পর্য্যন্ত নিশ্চিত ভাবে জানা যায় নি। তবে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে যে ভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে মনোমালিন্য চলছে—বিশেষ করে মিশরের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-ফরাসী সামরিক অভিযানের পরে যেভাবে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের তীব্রতা বেড়ে গেছে, তাতে মনে হয়, আন্তর্জাতিক বাজারে দর চড়বার এবং বাইরে থেকে মাল আমদানীর জন্য মাশুল বৃদ্ধি পাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। জানা গিয়েছে, আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ব্যাঙ্কের বিশেষজ্ঞদল ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেছেন। প্রথমতঃ, ট্রম্বের কারখানায় বাষ্প থেকে আরো অধিকতর পরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভবপর কিনা সে সম্বন্ধে এঁরা তদন্ত করেছেন। দ্বিতীয়তঃ, ভারতের জাহাজ চলাচল এবং বন্দর উন্নয়নের ব্যবস্থা সম্বন্ধে এঁরা খোঁজখবর নিয়েছেন। তৃতীয় বিষয় হ'ল, দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের দুটো নয়া পরিকল্পনা। চতুর্থতঃ, ব্যাঙ্কের বিশেষজ্ঞদল কয়না এবং বিয়াস নদী থেকে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা সম্পর্কে তদন্ত করেছেন। পঞ্চম বিষয় হচ্ছে, ভারতের রেলপথ-প্রসার। এজন্য এক হাজার কোটি টাকা লগ্নী করার কথা চলছে। এ ছাড়া ব্যাঙ্কের বিশেষজ্ঞদল ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর কারখানা দ্বিতীয় দফা প্রসারের সম্ভাবনা সম্বন্ধে তদন্ত সমাপ্ত করেছেন। প্রচারিত খবরে প্রকাশ, ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ এই কোম্পানীকে দু' কোটি ডলার ঋণ দিতে রাজী হয়েছেন। আশা করা যাচ্ছে, অদূর-ভবিষ্যতে ব্যাঙ্ক অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় তদন্ত চালাবেন।

ভারতের দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, যে সব উন্নয়নমূলক কাজের ব্যবস্থা হয়েছে সে সব কাজের অনেকগুলোই সরকার নিজে পরিচালনা করবেন। সরকারী পরিচালনায় জন্য নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে বরাদ্দীকৃত টাকার মোট পরিমাণ হ'ল চার হাজার আট শত কোটি টাকা। মাত্র অল্প কয়েকদিন আগে বরাদ্দীকৃত টাকার উপর এ বাবদ আরো

দেখুন! মাত্র অর্দ্ধেক

সানলাইট সাবানেই

এত সব জামাকাপড় কাচা যায়!

সানলাইটের ফেনার আধিক্যই এর কারণ !

ফেণার আধিক্যের দরুণই সানলাইট সাবান এত ক্রিয়াশীল। আপনি দেখে অবাক হয়ে যাবেন যে মাত্র অর্দ্ধেকটা সানলাইটে কতগুলি জামাকাপড় কাচা যায়!

সানলাইটের এই অতিরিক্ত ফেণার দরুণই প্রতিটী ময়লার কণা দূর হয়ে যায়—জামাকাপড় হয়ে ওঠে আশ্চর্য্যরকম সাদা এবং উজ্জ্বল!

সানলাইটের ফেণার আধিক্যের দরুণই জামাকাপড় বিনা আছাড়ে পরিষ্কার হয়। তার মানে আপনার জামাকাপড় টেঁকে আরও অনেক বেশী দিন।

ভারতে প্রস্তুত

সানলাইট জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে

S. 243-X52 BG

চার-পাঁচ শত কোটি টাকা খরচ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। শেষ পর্য্যন্ত যে বৈদেশিক মুদ্রা ঘাটতি পড়বে তা প্রধানতঃ চারটি উপায়ে পূরণ করা যেতে পারে। প্রথম উপায় হ'ল, আন্তর্জ্জাতিক পুনর্গঠন ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ গ্রহণ করা। এই ব্যাঙ্কের কাছ থেকে দু'ধরনের ঋণ নেওয়া যেতে পারে, যথা: দীর্ঘ এবং স্বল্পমেয়াদী ঋণ। এক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক। সে প্রশ্ন হ'ল, কোনপ্রকার সুদ দাবি না করে বিশ্বব্যাঙ্ক কোন দেশকে ঋণ দিতে পারেন কিনা। এই প্রশ্নের উত্তর খুব সহজ। অর্থাৎ, যেহেতু বিশ্বব্যাঙ্ক ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচালিত সেহেতু বিনা সুদে ঋণ দেওয়া বিশ্বব্যাঙ্কের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

দ্বিতীয়তঃ, আন্তর্জ্জাতিক টাকার বাজারে ঋণপত্র বিক্রী করে ভারত ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করতে পারেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, নিউইয়র্ক, প্যারিস, লণ্ডন ইত্যাদি হ'ল আন্তর্জ্জাতিক টাকার বাজারের প্রধান কেন্দ্রস্থল। কেন্দ্রস্থলগুলিতে যে সব বেসরকারী লগ্নীকারী রয়েছেন তাঁদের কাছে ঋণপত্র বিক্রী করার জন্য ভারত সরকারের পক্ষে ঐকান্তিক ভাবে চেষ্টা করা দরকার। অনেকেরই হয়ত জানা আছে, মাত্র অল্প কয়েক দিন আগে শ্রীবি. কে. নেহরু এবং আরো কয়েকজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী লণ্ডন, প্যারিস ইত্যাদি স্থান পরিদর্শন করেছেন। এঁদের এই সফর খুব গুরুত্বপূর্ণ। ভারত সরকারের অর্থ-মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে এই সফরের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বলা হয়েছে, সফরটির আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে আন্তর্জ্জাতিক টাকার বাজারে ভারত সরকার কর্ত্তৃক ঋণপত্র বিক্রী করার সম্ভাবনা সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া। যাঁরা সফরে গিয়েছিলেন তাঁরা সবাই বলেছেন, আগে ঋণপত্র বিক্রীর যে সম্ভাবনা দেখা গিয়েছে সে সম্ভাবনা অনেক বেড়ে গেছে, কারণ তাঁরা যেখানে গিয়েছেন সেখানে ঋণপত্র ক্রয় করার আগ্রহ লক্ষ্য করেছেন।

তৃতীয়তঃ, বৈদেশিক সরকারের কাছ থেকে দীর্ঘ এবং স্বল্প উভয় মেয়াদী ঋণ এবং সাহায্য গ্রহণ করেও বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করা যেতে পারে। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আশ্বাস দিয়েছেন, এতদিন পর্য্যন্ত মার্কিন সরকারের পক্ষ থেকে ভারতকে যে ঋণ এবং সাহায্য দেওয়া হয়েছে সে ঋণ এবং সাহায্যের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দেওয়া হবে। প্রচারিত খবরে প্রকাশ, রুশ সরকারও এই মর্ম্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, ভারতকে বারো বছরের মেয়াদে যন্ত্রপাতি এবং কলকব্জা সরবরাহ করা হবে। অনুমান করা হয়েছে, এই যন্ত্রপাতি এবং কলকব্জার মোট মূল্য এক শত কোটি টাকার বেশী। রাশিয়া কেবলমাত্র বার্ষিক আড়াই শতাংশ সুদ দাবি করেছেন। এখানে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। এই কারখানার জন্য প্রচুর যন্ত্রপাতি দরকার। কিন্তু যন্ত্রপাতির সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করা ভারতের পক্ষে কষ্টকর। হয়ত পরিশোধ করার ক্ষমতা আপাততঃ ভারতের নেই। কাজেই যন্ত্রপাতির মূল্য বাবদ একটি অংশ ঋণ দিতে চুক্তিবদ্ধ হয়ে কয়েকটি ব্রিটিশ ব্যাঙ্ক ভারতের উপকার করেছেন। অবশ্য প্রদত্ত ঋণের জন্য অন্যান্য দেশ যে হারে সুদ দাবি করেন সে হারের চাইতে ব্রিটিশ কোম্পানীগুলির সুদের হার অনেক বেশী। তবুও ভারতের অসুবিধা দূর করার জন্য ব্রিটিশ ব্যাঙ্কগুলি যে সহানুভূতি দেখিয়েছেন সেজন্য ভারত কৃতজ্ঞ।

চতুর্থ উপায় হ'ল, আন্তর্জ্জাতিক ফিন্যান্স কর্পোরেশনের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করা। মাত্র অল্প কয়েকদিন আগে এই কর্পোরেশনটি গঠিত হয়েছে। আন্তর্জ্জাতিক পুনর্গঠন ব্যাঙ্কের সঙ্গে এর নিবিড় সংস্রব রয়েছে। বেসরকারী শিল্পে দীর্ঘমেয়াদী লগ্নীর ব্যবস্থা করা কর্পোরেশনটির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। ইচ্ছা করলে ভারত এর সাহায্য গ্রহণ করতে পারে।

"বাংলার জাগরণ"

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

উনবিংশ শতাব্দী সমগ্র বিশ্বের পক্ষে, এবং বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষের পক্ষে একটি অতীব গৌরবময় যুগ। 'বিশেষ করিয়া' বলিতেছি এই জন্য যে, বহু শতাব্দীর পরাধীনতার মধ্যেও ইহা এই শতাব্দীতে—প্রধানতঃ ইহার প্রথমার্দ্ধে, নিজেকে যেন খুঁজিয়া পাইয়াছিল। এই আত্মবোধ বা আত্মমর্য্যাদা ও গৌরববোধ এদেশবাসীদের ঐ সময়ের এবং পরবর্ত্তীকালের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূলীভূত কারণ। ধর্ম্মবোধ, সামাজিকতা, শিক্ষা-সাহিত্য সংস্কৃতি সকল ক্ষেত্রেই নিজস্ব শক্তির উৎসের সন্ধান তাঁহারা পান এবং এতদ্‌বিষয়ে স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠার জন্য সর্ব্বশক্তি বিনিয়োগ করিতে অগ্রসর হন। গত শতাব্দীর এই জাগরণ একদিনে বা অকস্মাৎ হয় নাই। এ বিষয়ের আলোচনাকালে ইহার প্রস্তুতি-যুগের কথাও কমবেশী আমাদের জানা দরকার। কোন সন-তারিখ উল্লেখ দ্বারা কোন বিশেষ যুগের সূচনা হইল সঠিক বলা যায় না। তবে আলোচনার সুবিধার নিমিত্ত আমরা সচরাচর এরূপ সন-তারিখের আশ্রয় লই। এদিক দিয়া বলিতে গেলে, গত শতাব্দীর বাংলার জাগরণের প্রস্তুতি-কালের সূচনা হয় ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের 'রেগুলেটিং এক্ট', ১৭৭৪ সনে (মতান্তরে, ১৭৭২) রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব এবং ১৭৮৪ সনে বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হইতে। এ-কথা যেন আমরা না ভুলি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদ এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এতদিন অসম্পূর্ণ বা ভাসা-ভাসা ছিল। গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে এই যুগটি লইয়া বিশেষ অনুসন্ধান, গবেষণা ও আলোচনা হইয়া আসিতেছে। সরকারী বেসরকারী রেকর্ডস বা দলিল-দস্তাবেজ, সমসাময়িক ব্যক্তি ও ভ্রমণকারীদের প্রত্যক্ষীভূত রচনা, বিভিন্ন শিক্ষা-সাহিত্য সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানের রিপোর্ট বা কার্য্যবিবরণী, মুদ্রিত ও অমুদ্রিত চিঠিপত্র, দিনলিপি, মনীষীদের আত্মজীবনী, এবং সমকালীন সাহিত্য—সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র প্রভৃতির ভিত্তিতে আলোচনা গবেষণার নূতন নূতন পথ অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। আমাদের সমাজ-জীবন সম্বন্ধে এতদিনকার অজ্ঞানতা এবং ভাসা-ভাসা জ্ঞান নিরাকৃত হইয়া পুরাপুরি ও তথ্য নির্ভর জ্ঞানলাভ শিক্ষিত সাধারণের পক্ষে সম্ভব হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় নব্যসংস্কৃতি ও নবজাগরণের কাহিনী এখন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নিকটও উপেক্ষিত নয়। এ বিষয়টি উচ্চতম শিক্ষার পাঠ্য-তালিকার মধ্যেও এখন স্থান পাইয়াছে। নবাবিষ্কৃত তথ্যাদির ভিত্তিতে বাংলার রেনেসাঁস বা নবজাগরণের একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার সময় হয়ত আসিয়াছে। আমরা কাজী আবদুল ওদুদ লিখিত উপরের শিরোনামার পুস্তকখানি* পাইয়া এই ভাবিয়া আশ্বস্ত হই যে, এত দিনে হয় ত বাংলার নবজাগরণের একখানি নির্ভরযোগ্য ইতিহাস আমরা পাইলাম। বিশেষতঃ তিনি যখন নিজেই 'মুখবন্ধে' লিখিয়াছেন, "...বিষয়টি সম্বন্ধে চিন্তা, ভাবনা ও আলাপ-আলোচনা করে আসছি গত ত্রিশ বৎসর ধরে।"

'রেনেসাঁস' (জাগরণ বা নবজাগরণ) সম্বন্ধে কোন কিছু বলিতে হইলে, এই গুরুত্বপূর্ণ কথাটির নিগূঢ়ার্থ সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। একখানি প্রামাণিক অভিধানে 'রেনেসাস' শব্দটির এইরূপ মানে দেওয়া হইয়াছে :

"A new birth ; resurrection ; revival. 2. Specif., the revival of letters, and then of art, which marks the transition from medieval to modern history. The renaissance began in Italy in the 14th century and gradually spread over Western Europe, until the domination of scholasticism, of feudalism, and of the Church in secular matters was displaced by nationalism. Its precursor was 'The Revival of Learning', incident upon the recovery of classical Greek and Roman literature, led by Petrarch and Boccaccio and resulting in humanism. The movement soon extended to and transformed manners, philosophy, science, religion, politics, and art. The fall of Constantinople in 1453 sent many Greek scholars into exile throughout Europe. The passage of the Cape of Good Hope and the discovery of America, the invention of printing and paper-making, the acquisition of the Mariners' Compass, the contemporaneous spread of the reformation and the study of ancient classical art, all contributed to the renaissance."—*New Standard Dictionary*, vol. III, p. 2084.

'চেম্বার্স টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ডিকশনারি' ("Mid-Century Version") এবং অক্সফোর্ড ডিকশনারিতেও সংক্ষেপে উক্ত বিশদ ব্যাখ্যাই সমর্থিত হইয়াছে। 'কাজী আবদুল ওদুদ কৃত 'রেনেসাসে'র ব্যাখ্যাও ইহার কাছাকাছি খানিকটা গিয়াছে। তিনি

---

* বাংলার জাগরণ। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩। পৃঃ ২০০। মূল্য তিন টাকা।

লিখিয়াছেন : "এই অভিব্যক্তির সাধারণ নাম রেনেসাস, অর্থাৎ নবজন্ম। সাধারণতঃ তিনটি ধারায় ভাগ করে দেখা যেতে পারে এই নবজন্মকে—প্রাচীন জ্ঞান ও কাব্যকলার নূতন আবিষ্কার, জীবন সম্বন্ধে মানুষের নূতন আশা আনন্দ, ধর্ম্ম বা জীবনাদর্শ সম্বন্ধে নূতন বোধ" (পৃঃ ১)। আভিধানিকঅর্থ কিন্তু আরও ব্যাপক। 'রেনেসাস' অর্থ—পুনর্জন্ম, পুনরুজ্জীবন, পুনরুত্থান ; প্রথমে সাহিত্য, পরে শিল্পের পুনরুজ্জীবন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ইটালিতে এবং ক্রমে পশ্চিম ইউরোপ পরিব্যাপ্ত রেনেসাসের কথা বলা হইয়াছে। সমাজের রীতিনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম, রাজনীতি এবং শিল্পকলায় আশ্চর্য্য উৎকর্ষ সাধিত হয় ইহার কল্যাণে। ইউরোপে নানা কারণে এই রেনেসাস সম্ভব হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটি হইল 'reformation' বা ধর্ম্মসংস্কার। তাই বলিয়া রেনেসাসের মানে শুধু রিফর্মেশ্যন বা ধর্ম্মসংস্কার অথবা ধর্ম্মসংস্কার আন্দোলন নয়। আবার, রিফর্মেশ্যনও রেনেসাস নহে। তবে একটি অন্যটির পরিপূরক এবং পরস্পর-সম্বন্ধ এইমাত্র বলা যায়।

কিন্তু কাজী আবদুল ওদুদের পুস্তক-পাঠে পাঠক-পাঠিকার মনে এই প্রতীতি জন্মিবার বিশেষ অবকাশ ঘটে যে, তিনি বাংলার রেনেসাসকে 'রিফর্মেশ্যন' বা ধর্ম্মসংস্কার আন্দোলনের সমতুল অথবা সমানার্থবাচক মনে করিয়াছেন। আর এইখানেই যত গোল বাধিয়াছে—একপেশে আলোচনার আবর্ত্তে চিন্তার স্বচ্ছতাও পদে পদে ব্যাহত হইয়াছে। রাজা রামমোহন রায় হইতে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন এবং পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার হইতে শশধর তর্কচূড়ামণিকে প্রতিপক্ষ দাঁড় করাইয়া, এক পক্ষের প্রতি ঐকান্তিক পক্ষপাতিত্ব এবং অন্য পক্ষের প্রতি সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচরণ করিয়া, বিচারকের স্থলে লেখক এডভোকেটের আসন গ্রহণ করিয়াছেন। ইতিহাসের মানদণ্ডে বিচার করিলে তাঁহার পুস্তকের এই একটি গুরুতর ত্রুটি। রাজা রামমোহন রায় যুগন্ধর মহাপুরুষ। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা তথা ভারতবর্ষের জাতীয় ইতিহাসে তাঁহার স্থান সুদৃঢ়, এমনকি সকলের শীর্ষে—একথা আজিকার দিনে অস্বীকার করিলে বিশেষ প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে নিঃসন্দেহ। রামমোহন চিন্তাকে মুক্তি দিয়াছেন, ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যাখ্যায় যুক্তির আশ্রয় লইয়াছেন, শ্রেয়ঃকে প্রেয়ের উপরে স্থান দান করিয়াছেন, মুসলমান ও খ্রীষ্টান শাস্ত্রকে সুনির্দিষ্টরূপে আলোচনান্তে উভয়ের সত্য শাশ্বত-রূপ পরিষ্কার রূপে ধরিয়াছেন—সবই সত্য। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তিনি হিন্দুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র বেদান্তকে অগ্রাহ্য করেন নাই, ব্রাহ্মসমাজকে সর্ব্বধর্ম্মাশ্রয়ীদের জন্য স্থান করিয়া দিলেও বেদপাঠ ব্রাহ্মণ দ্বারা পর্দ্দার আড়ালে করাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, নির্দিষ্ট দিনে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের বিদায়ের ব্যবস্থাও করা হয়। তবে লেখক এ সকল দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, তৎকালীন হিন্দুসমাজ কত অপোগণ্ড, অনুন্নত, অসাড়, সুতরাং নিকৃষ্ট ছিল। যে সমাজে রামমোহন জন্মিয়াছিলেন, রামমোহনের কীর্ত্তিকথা বর্ণনা প্রসঙ্গে সে সমাজ সম্বন্ধে পাঠকের মনে এই ধারণাই জন্মাইবার চেষ্টা হইয়াছে। রেনেসাসকে গ্রহণ করিবার মত, বা রামমোহনের জীবনাদর্শ বুঝিবার মত শক্তি কি হিন্দুসমাজের কাহারও ছিল না ? জমি উষর হইলে বীজ তো অঙ্কুরিত হয় না। হিন্দুসমাজ উষর হইলে এরূপ শ্রেষ্ঠ মানুষের আবির্ভাব হইল কিরূপে ? 'প্রচলিত' হিন্দুধর্ম্ম ও সমকালীন হিন্দুসমাজকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করায় লেখকের একটি অবাঞ্ছিত obsession বা মানসিক আবিষ্টতা প্রকট হইয়া পড়ে না কি ?

ডিরোজিও এবং তাঁহার শিষ্যদলের কথা বলিতে গিয়াও তিনি হিন্দুসমাজের উপর একহাত লইয়াছেন। 'প্রচলিত' হিন্দুধর্ম্মের উপর এই শিষ্যদল ঘোরতর বিরূপ ছিলেন, একারণ রক্ষণশীল হিন্দুদের নিকট তাঁহারা 'বিপ্লবী' আখ্যাও পান। তথাপি মাত্র দুই-এক জন খ্রীষ্টান হইয়া গেলেও অধিকাংশই কিন্তু ক্রমে সমাজে স্থিতিলাভ করেন এবং স্বজাতীয়দের সর্ব্বপ্রকার উন্নতিসাধনে সবিশেষ তৎপর হন। তাঁহারা কেহ কেহ ছাত্রাবস্থায়ই নিজ হিন্দুসমাজের দুঃস্থ সন্তানদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বিনা বেতনে শিক্ষাদান করিতে আরম্ভ করেন। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়াও লেখক স্থানে স্থানে বিরূপ মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন। রামমোহনকে যেমন 'বিচিত্র মানসিক সংকীর্ণতা ও অনুন্নত ছিল যাদের পরিচয় তাদের নিয়ে'। (পৃ. ৭৮) কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল, দেবেন্দ্রনাথ-কেশবচন্দ্রকেও সেইরূপ করিতে হয়। দেবেন্দ্রনাথ অপেক্ষা কেশবচন্দ্রের মধ্যে গ্রন্থকার পূর্ণতর জীবনাদর্শ লক্ষ্য করিয়াছেন, কেননা তাঁহার মতে তিনি হিন্দুত্বের গণ্ডী ছাড়াইয়া ছিলেন এবং বিশ্বমানবত্বে উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও লেখকের বিরূপ সমালোচনা হইতে রেহাই পান নাই, যেহেতু নববিধানের মূলমন্ত্রস্বরূপ তিনি 'সর্ব্ব ধর্ম্মই সত্য' এই কথা প্রচার করিয়াছিলেন। 'সর্ব্ব ধর্ম্ম সত্য' হইলে তো 'বহুনিন্দিত' হিন্দুধর্ম্মও সত্য হইয়া যায়। লেখক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার হিন্দু 'obsession' সে সে স্থলেও সত্যনির্ণয়ে ব্যাঘাত ঘটাইয়াছে। "ব্রহ্ম সমস্ত জগতের ঈশ্বর, কিন্তু তিনি বিশেষ রূপে ভারতবর্ষের ব্রহ্ম।...এইজন্য সর্ব্বাগ্রে ভারতবর্ষে ইহাকে বিশেষ রূপে রোপণ করিতে হইবে।"—রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি লেখকের আদৌ পছন্দসই নয়। ইহা হইতে তিনি এইরূপ মন্তব্য করেন যে, "প্রকৃত ধর্ম্মবোধ এইকালে রবীন্দ্রনাথের অন্তরে জাগে নি" (পৃঃ ১৭০)। হিন্দুদের সংস্পর্শ বেশী করিয়া করায় দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কেও লেখক এইরূপ উক্তি করিতে ক্ষান্ত হন নাই : "কিন্তু ভগবৎ-অনুরাগ শুধু যে সমাজকল্যাণধর্ম্মী হয় তা নয়, অনড় সংস্কার ও আচার, ভুকতাক এসবের সঙ্গেও তাকে সংযুক্ত দেখা যায়..." (পৃ.৯৪-৫)। মনীষী রাজনারায়ণ বসুর "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতাবিষয়ক প্রস্তাব" সম্পর্কে লেখকের ঘোরতর বিরাগের কারণও বুঝিতে বিলম্ব হয় না। তিনি এমন একটি যুগান্তকারী সারগর্ভ রচনায় মধ্যে পাইয়াছেন "পরিবর্ত্তনবিরোধী মনোভাব"। অথচ, এই বক্তৃতাটি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন :
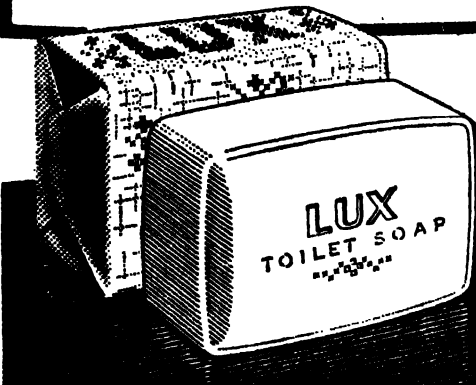
"তিনি [রাজনারায়ণ বসু] বলেন যে, ব্রহ্মোপাসনাই হিন্দু-ধর্ম্ম। অতএব ব্রহ্মোপাসনা যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কেবল তাহার সমর্থন করা তাঁহার উদ্দেশ্য। এ দেশের সাধারণ ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠধর্ম্ম—কিন্তু আমাদের দেশের চলিত ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, এমন কথা তিনি বলেন না। যে ধর্ম্মকে তিনি শ্রেষ্ঠ বলেন, তৎসম্বন্ধে লোকের বড় মতভেদ নাই। পরব্রহ্মের উপাসনা—সকল ধর্ম্মের অন্তর্গত—সকলেরই সারভাগ।"

লেখক কি এ কথাগুলির তাৎপর্য্য অনুধাবন করিয়াছেন ?

বঙ্কিমচন্দ্রের উপরে লেখকের বিরূপতা, নানারূপ যুক্তি-জালের আবরণের মধ্যেও, অতি স্পষ্ট হইয়া ধরা দিয়াছে। শিল্পী ও প্রচারক—এই দুই রূপে লেখক বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার প্রধান ত্রুটি নাকি তাঁহার "হিন্দুঐতিহ্য-গর্ব্ব"। লেখকের মতে "বঙ্কিমচন্দ্রের ভিতরে সার্থক চিন্তা ও অসার্থক চিন্তা যে এমত জট পাকিয়েছে সেই জটিল বন্ধ মোচন করতে না পারলে একালে তাঁর চিন্তা থেকে তেমন সুফল লাভের আশা নেই। তাঁর যে শ্রেষ্ঠ অবলম্বন জাতীয় ঐতিহ্য-গর্ব্ব আজকার জগতে সে চিন্তার অকিঞ্চিৎকরতা—শুধু অকিঞ্চিৎকরতা নয়, বিপদসঙ্কুলতা—প্রমাণিত হয়েছে। শিল্পী হিসাবে তাঁর গৌরব অবশ্য আজও অক্ষুণ্ণ,··· শিল্পীরূপেই বঙ্কিমচন্দ্রের মহত্ত্ব অবিসংবাদিত, চিন্তানেতারূপে তাঁর ত্রুটি সত্যই বড়ো রকমের···" (পৃ, ১০২-৩)। পুনশ্চ লেখক বলিতেছেন, "দেশের ও জাতির পুনর্গঠনকরূপে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি যে পরিচ্ছন্ন নয়, তাঁর বহু প্রমাণ তাঁর কৃষ্ণচরিত্র, ধর্ম্মতত্ত্ব, বঙ্গদেশের কৃষক প্রভৃতি বিখ্যাত আলোচনায় রয়েছে (পৃ, ১০২)।" লেখক বলেন, "অবশ্য দেশ তাঁকে দিয়েছে, অথবা এক সময় দিয়েছিল, ঋষির মর্য্যাদা—স্বদেশ-প্রেমের মন্ত্রদ্রষ্টা জ্ঞানে। ব্যাপারটা ভেবে দেখবার মতো ! ··কিন্তু তাঁর মন্ত্রের যে মহাত্রুটি তাও চিন্তনীয়—সেই মন্ত্রের হোতা আসলে সত্য বা ভগবান নন, সেই মন্ত্রের হোতা উগ্র জাতীয়তা।···তাঁর কোন কোন রচনায় দেশের লোকদের এই মনোভাবের সমর্থন যে নেই তাও নয় (পৃ, ১০২)।" বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনকালেও গ্রন্থকার গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি ভুলিয়া গিয়াছেন বলিয়াই মনে হইতেছে। বঙ্গের রেনেসাঁস বা বাংলার জাগরণই তাঁহার আলোচ্য। রেনেসাঁসের সংজ্ঞা আমরা পূর্ব্বে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্রে এবং তাঁহার রচনাবলীতে (কি রসসাহিত্য, কি মননসাহিত্য) ইহার লক্ষণগুলি তিনি পরিষ্কার দেখিতে পান নাই। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প, ইতিহাস, প্রাচীন সাহিত্য, humanism বা মানবিকতা এবং Nationatism বা জাতীয়তা—এসবের মধ্যেই তো রেনেসাঁসের প্রকৃত লক্ষণগুলি খুঁজিতে হইবে। আর এই কথাটি ভুলিলেও চলিবে না—বঙ্কিমচন্দ্রের কালকে আধুনিক যুগের মানদণ্ডে বিচার করা সমীচীন নয়। সাময়িককে শাশ্বতের পর্য্যায়ে ফেলিয়া আমরা ভুল করি। শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র আদর্শ মানুষকে দেখিয়াছেন। বঙ্গদেশের কৃষকের মধ্যে 'জমিদারী চাই না' জিগীর থাকা কিরূপে সম্ভব? এ তো অতি আধুনিক বুলি! বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার উগ্র জাতীয়তার ফল 'সন্ত্রাসবাদ'ও নাকি প্রশ্রয় পাইয়াছে। পাঠক লক্ষ্য করিবেন, গ্রন্থকার স্বদেশীযুগের 'বিপ্লব' বা 'বিপ্লববাদ' এবং পরবর্ত্তী কালের বিপ্লবকর্ম্মকেও বরাবর 'সন্ত্রাসবাদ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ; একটি বারও 'বিপ্লব' বা 'বিপ্লববাদ' বলেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে গ্রন্থকারের মন্তব্য পাঠে প্রতীতি জন্মে যে, উদার দৃষ্টি লইয়া বঙ্কিম-সাহিত্য গভীর ভাবে অধ্যয়ন ও অনুশীলন করার এখনও বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে।

কতকগুলি কথার প্রয়োগে লেখকের বিশেষ অনুরক্তি দেখিতেছি। 'সন্ত্রাসবাদ' কথাটি সম্বন্ধে এই মাত্র বলিলাম। 'হিন্দু-জাতীয়তাবাদ', 'হিন্দু-জাতীয়তাবাদী', 'হিন্দু-ঐতিহ্য-গৌরব', 'তুকতাক', 'কবি-খেউড়ের সেই হীরক যুগে', 'সঙ্কীর্ণ মানসিকতা'—আর কত উল্লেখ করিব ? হিন্দুরা বড় 'অপরাধী' কেননা তাঁহারা 'জাতীয়তা' বা 'ন্যাশনালিজম্'-এর উন্মেষে সর্ব্বপ্রথম প্রয়াসী হইয়াছিলেন। কিন্তু একথা সত্য যে, মুসলমানেরা জাতীয়তাবাদের প্রশ্রয় বড় একটা দেন নাই ; পরে, জাতীয়তাবাদী হইলেও তাঁহারা বেশীর ভাগই মুসলমান বা মুসলিমই রহিয়া গিয়াছিলেন। সে যুগের একটি অনুষ্ঠানের সঙ্গে শুধু 'হিন্দু' নামের সংযোগ দেখি—সেটি 'হিন্দু মেলা'—অথচ আর সকল প্রতিষ্ঠানই তো অসাম্প্রদায়িক, যেমন—বেঙ্গল ল্যাণ্ডহোল্ডার্স এসোসিয়েশন, বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান লীগ, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়ান্স, ইণ্ডিয়ান রিফর্ম এসোসিয়েশন—আর কত নাম করিব ? অন্যপক্ষে মুসলমান-প্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলির নাম দেখুন : ন্যাশন্যাল মোহামেডান এসোসিয়েশন, মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি, মোসলেম এডুকেশ্যনাল কনফারেন্স, আঞ্জুমান ইসলাম। এমনকি যাঁহারা 'বুদ্ধির মুক্তি'র ("Emancipation of the Intellect") উদ্যোক্তা ও সমর্থক, তাঁহাদের প্রতিষ্ঠান 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' নামটিতেও 'মুসলমান', 'মোহামেডান' বা মুসলিম শব্দটি সংযুক্ত। উগ্র সাম্প্রদায়িকতা তথা স্বাতন্ত্র্যবাদী মুসলমানদের কথা আলোচনাপ্রসঙ্গে গ্রন্থকার স্বভাবতঃই সংযমের পরিচয় দিয়াছেন ; এমনকি সেই ওহাবীদের সম্পর্কেও, যাহাদের "War-Song" বা সমর-সঙ্গীতের শেষ চরণ দুইটি ছিল :

"Fill the uttermost ends of India with Islam, so that
No sounds may be herd but 'Allah Allah' "

পুস্তকখানিতে বহু অসতর্ক উক্তি রহিয়াছে। তথ্যগত ভুল-ভ্রান্তিও নজরে পড়িল। এখানে কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করি। "ধর্ম্মসমাজ" নয়, ধর্ম্মসভা। (পৃ, ২৫) ; 'Partheon' নহে, "Parthenon", ডিরোজিও পত্রিকাখানি বাহির করেন নাই, এখানি তাঁহার ছাত্রদের কাগজ (পৃ, ৫২ পাদটীকা)। সুরাপান-নিবারণী আন্দোলনের জন্য বিখ্যাত হইয়াছিলেন 'প্যারীচাঁদ মিত্র' নহেন, প্যারীচরণ সরকার (পৃ, ৫৬) ; 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন', না—বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি ? (পৃ, ৬৬-৭) ;

'১৮৩৪ সনের রিপোর্ট' (পৃ, ৭০)—কাহার রিপোর্ট? নিষ্কর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা সুরু হয় ১৮৩৬ সনে, ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে নহে (পৃ, ১১৯-২০); ফারসি হইতে আদালতের ভাষা ইংরেজীতে পরিবর্ত্তিত হয় ১৮৩৯ সনের জানুয়ারী হইতে, '১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে' নহে পৃ, ১১৯)। "হিন্দু কলেজ ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিণত" হয় নাই (পৃ, ১২২, ১২৪), হইয়াছে ১৮৫৪ সনে, পুরাপুরি ভাবে ১৮৫৫ সনে; পূর্ব্ব সন হইতেই মুসলমান ছাত্রও এখানে ভর্ত্তি হইতে থাকে। 'ডক্টর চক্রবর্ত্তী' কে—লেখকের তা জানা নাই (পৃ, ১২২)। ইনি সুবিখ্যাত ডাক্তার সূর্য্যকুমার গুডিব চক্রবর্ত্তী। "একমাত্র প্যারীচাঁদ মিত্র ভিন্ন দেশের সাহিত্যে অবশ্য ডিরোজিওপন্থীরা কিছু দান করতে পারেন নি" (পৃ, ৫৬),—এ উক্তি ঠিক নয়। জ্ঞানান্বেষণ-সম্পাদক রসিককৃষ্ণ মল্লিকের কথা, এবং মাসিকপত্রে'র অন্যতর সম্পাদক রাধানাথ শিকদারের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, ডিরোজিও-শিষ্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা-সাহিত্য-সাধনা তো সর্ব্বজনবিদিত ও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আলোচ্য পুস্তকখানি ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত—বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ছয়টি বক্তৃতার সমষ্টি। "বাংলার জাগরণ" বা রেনেসাস সম্বন্ধে সুদীর্ঘ কালব্যাপী আলোচনার পর লেখক যে পুস্তক রচনা করিয়াছেন তাহা আমাদের আশা পূর্ণ করিতে পারে নাই। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার "জাগরণ" হয় নানা দিকে, বিভিন্ন বিষয়ে, আর ইংরেজী শিক্ষা, পাশ্চাত্ত্য দর্শন-সাহিত্য-ইতিহাস, সংবাদপত্র প্রভৃতি আমাদের আত্মস্থ করিয়া তুলিবার প্রধান সহায় হয়। নিজেদের হৃত এবং বিস্মৃত গৌরব সম্বন্ধে আমরা সচেতন হই। তখন প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য চর্চ্চায় নূতন করিয়া আমরা উদ্বুদ্ধ হইলাম। সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, বাংলা সাহিত্য সাংস্কৃতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক সভা-সমিতি, দেশবাসী-পরিকল্পিত বিবিধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এই সকলের সমবেত প্রচেষ্টার ফলে আসে বাংলার জাগরণ বা রেনেসাস। গ্রন্থকার আলোচ্য পুস্তকের ঐ সময়ের কতকগুলি বিষয়ের, বিশেষ করিয়া ধর্ম্মভিত্তিক মতবাদের, অনুকূল ও বিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য কিছু কিছু তথ্যপরিবেশনেরও প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু আসল বিষয় হইতে বহু দূরে সরিয়া যাওয়ায় পুস্তকখানির উদ্দেশ্য আশানুরূপ সফল হয় নাই। যে উদার দৃষ্টিভঙ্গী থাকিলে বাংলার নবজাগরণের একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস রচনা করা যাইত, বর্ত্তমান পুস্তকে তাহার অভাব আমাদিগকে পীড়া দিয়াছে।

অসমতল

শ্রীরবিদাস সাহা রায়

দূর থেকে দেখতে পেয়েছিল অমল, একটি মেয়ে বাড়ীর নম্বর খুঁজতে খুঁজতে আসছে। হয়ত পথ ভুল করেছে মেয়েটি। নতুবা ঐ চেহারার আর ঐ পোশাকের মেয়ে এই বস্তি অঞ্চলে আসবে কেন? ঐ সব মেয়ের এ জায়গায় কোন আত্মীয় বা পরিচিত লোক থাকারও কথা নয়।

অমল আবার চা খেতে সুরু করল। বিস্বাদ—মিষ্টিহীন চা। রোজকার অভ্যাস, তাই ছাড়তে পারে না, নইলে এই দুগ্ধ-বর্জ্জিত ও শর্করাশূন্য চা খেয়ে খেয়ে যে লিভারটার বারটা বাজিয়ে দিচ্ছে তা কি আর জানে না অমল?

স্বাদহীন চায়ের বাটিতে চুমুক দিয়ে আবার সে বাইরের দিকে তাকাল—মেয়েটি এদিকেই আসছে। ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে আসছে মেয়েটির মুখ, সুন্দর চেহারা। খুব করসা না হলেও গায়ের রঙে ঔজ্জ্বল্য আছে। শাড়ী পরেছে দামী।

তবু বেশীক্ষণ চেয়ে থাকতে অমলের ভাল লাগে না। নিত্য নূতন মেয়ের দিকে চেয়ে থাকার উৎসাহ অমলের চলে গেছে। কেবল বয়সের দিক দিয়েই নয়—মনের দিক দিয়েও। সংসারের পেষণযন্ত্রে জীবনের রস কেমন করে ধীরে ধীরে শুকিয়ে গেছে, কেমন করে কবে থেকে জীবনের স্বপ্নময় রঙীন দিনগুলি হয়ে উঠেছে রুক্ষ, ধোঁয়াটে—অমল তা হিসেব করে বলতে পারে না।

তবু বয়সের দিক দিয়ে না হলেও মনের দিক দিয়ে অনেক বুড়োটে হয়ে গেছে অমল। তাই আগ্রহের সঙ্গে নয়—কৌতূহলের সঙ্গেই সে তাকাতে লাগল মেয়েটির দিকে।

এবার অনেক কাছে এসে গেছে মেয়েটি। অমলের ঘরেরই প্রায় কাছাকাছি। কেমন যেন লাগল অমলের! অনেকটা চেনা চেনা মুখ—অথচ চিনতে পারছে না। সে যেন আগে মেয়েটিকে দেখেছে অনেকবার—একটি অতি-পরিচিত মুখের ছবি যেন ভেসে উঠছে ঐ মুখের চেহারায়।

অমলেরই ঘরের কাছাকাছি এসে জিজ্ঞেস করল—এখানে কি অমল রায় থাকেন?

যেন একটা ধাক্কা খেয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল অমল। অর্দ্ধ-ভুক্ত গরম চা পেয়ালার মধ্যে একটা ঝাঁকুনি খেয়ে যেন ধূমায়িত অগ্নিগিরির উদ্গার তুলল।

ততক্ষণে মেয়েটি এগিয়ে এল আরও কাছে।—আরে, এই যে অমলদা!—বলে তার ঘরের দিকেই পা বাড়াল।

—ইস, কি খোঁজাটাই না খুঁজলাম এতক্ষণ ধরে! কি জায়গায় তুমি থাক অমলদা। মেয়েটি মনের আক্ষেপ জানাল।

ঘরের ভেতর ঢুকে অমলের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল মেয়েটি।—ইস, কি চেহারা হয়ে গেছে তোমার! চেনাই যায় না।

অমলের ঠোঁটের ফাঁকে একটুখানি হাসি নেমে এল।

বলল মেয়েটি—আমি ত চিনতে পারলাম তোমাকে, তুমি আমাকে চিনতে পারলে কি?

চিনতে পেরেও অমলের একটু খুশী হওয়া উচিত ছিল। সাদর অভ্যর্থনা করা উচিত ছিল মেয়েটিকে। অন্ততঃ বলা উচিত ছিল—অনেক দিন পর তোমাকে দেখলাম, সুমিত্রা। এত দিন পর মনে পড়ল তোমার হতভাগ্য অমলদাকে?

কিন্তু বলতে পারল না। নিজের দীনতায় নিজেই সে সঙ্কুচিত। আনন্দ-উচ্ছলতার রাশটিকে যেন পেছন দিক থেকে টেনে ধরেছে তার দেহের সমস্ত শিরা-উপশিরাগুলি।

অভ্যর্থনার অপেক্ষা রাখল না মেয়েটি। নিজেই বসে পড়ল জীর্ণ তক্তাপোশটার উপর। শাড়ীর চাকচিক্য তক্তপোশের উপর বিছানো ছিন্ন মলিন চাদরটাকে যেন লজ্জায় কুঁচকে দিল।

বলল মেয়েটি—খুব ত গল্প লিখছ আজকাল। অনেক দিন পর আবার লিখতে সুরু করেছ বুঝি? যা হোক্, তাই তোমার ঠিকানাটা কাগজের আপিস থেকে পেয়ে গেলাম। টাকা পাচ্ছ নিশ্চয়ই। বাংলা দেশের কাগজগুলি নাকি আজকাল টাকা দেয় লেখকদের। কিন্তু এ কি হাল করেছ ঘরটার?

ঘরের চারটি দেয়ালের দিকে দু'চোখের দৃষ্টি ঘোরাতে ঘোরাতে হেসে উঠল মেয়েটি। ওর বেশভূষার আভিজাত্য যেন ব্যঙ্গ করে উঠল ঘরটিকে।

আরও সঙ্কুচিত হ'ল অমল।

এমন সময় ঘরে ঢুকল সন্ধ্যা—অমলের মেয়ে, বছরপাঁচেক বয়স হয়েছে। একটি অপরিচিত স্ত্রীলোককে ঘরে দেখেই সন্ধ্যা থমকে দাঁড়াল। তার পর অমলকে বলল—মায়ের কাপড়টা দাও ত বাবা।

ঘরের এক পাশে দড়িতে ঝুলানো কাপড়চোপড়। তার থেকে একখানা শাড়ী নিয়ে অমল সন্ধ্যার দিকে ছুঁড়ে দিল। সন্ধ্যা সেটা নিয়ে চলে গেল কলতলার দিকে।

একটু পরেই অমলের স্ত্রী অদিতি ঢুকল ঘরে। সুমিত্রার মনে হ'ল যেন এ মানুষ নয়, কাপড়জামায় ঢাকা একটি চলন্ত কঙ্কাল।

সুমিত্রা একটু চমকেই উঠল যেন। বলল—একি অমলদা, এই তোমার বউ? আমাদের বৌদি?

অদিতি সুমিত্রার দিকে চেয়ে একটু হাসল। হাসির ভেতর আন্তরিকতা থাকলেও শুষ্ক নীরস সে হাসি।

এবার কথা বলল অমল—বেঁচে যখন আছে তখন বৌদিই বলবে বৈকি। কিন্তু না বেঁচে থাকাটাই ছিল স্বাভাবিক।

অদিতিই কথাটার বিশ্লেষণ করে দিল—যে অসুখে পড়েছিলাম ভাই।

অমল আবার ভুল ধরিয়ে দিল তার—পড়েছিলে বললে কেন? বল—পড়ে আছি। চিরকালই ত অসুখে ভুগছ তুমি?

সুমিত্রা জিজ্ঞেস করল—বিয়ে করলেই বা কবে আবার বৌয়ের অসুখও ধরালে কবে?

অমল জবাব দিল—প্রায় সাত বছর।

সুমিত্রা বলল—ইস, এতদিন হয়ে গেল? জানতেও পারলাম না?

অমল তাকাল সুমিত্রার মাথার দিকে। সিঁথিতে সিন্দুর—বিবাহিত জীবনের সাক্ষ্য দিচ্ছে। বলল—তুমিও কি খবর আমাকে দিয়েছিলে?

সুমিত্রা জবাব দিল—কি করে জানাব? তুমি কি আমাকে ঠিকানাটা জানিয়ে ডুব মেরেছিলে?

লজ্জিত হ'ল অমল।

সুমিত্রা বলল—একটা কথা বলব, চল একটু রাস্তায়, নিরিবিলি।

অমল বলল—এত ব্যস্ত কেন? বসো, চা খাও আগে।

সুমিত্রা যেন এবার ব্যস্ততার ভাব দেখাল—মাপ কর, আজ অনেক বার চা খাওয়া হয়ে গেছে, আর মোটেই খাব না।

হাতজোড় করে এমন কাতর অনুনয় জানাল সুমিত্রা, যাতে অনুরোধের চেয়ে প্রত্যাখ্যানটাই স্পষ্ট হয়ে উঠল। অর্থাৎ, এই পরিবেশে তার রুচিতে বাধে বলেই যেন এই প্রত্যাখ্যান—এ কথাই সে প্রকারান্তরে জানিয়ে দিল।

কাজেই অমল আর অনুরোধ করল না। নিঃশব্দে সুমিত্রার সঙ্গে রাস্তার দিকে যাবার জন্য পা বাড়াল।

খানিকটা চলে রাস্তার বাঁক ঘুরে দুজনেই একটু থামল। একটু নির্জন এই পথটা। সুমিত্রা বলল—একটা জিনিষ তোমাকে দেবার জন্য নিয়ে এসেছি, নিতে আপত্তি করবে না ত?

অমল একটু অবাক হ'ল। জিজ্ঞেস করল—এমন কি জিনিস?

—আগে প্রতিজ্ঞা কর তবে দেখাচ্ছি।

—প্রতিজ্ঞা করলাম।

সুমিত্রা তার হাতের ছোট ব্যাগটা খুলে বের করল আরও ছোট একটা জিনিস। হাতের মুঠোয় সেটা ধরে এগিয়ে দিল অমলের দিকে। বলল, এই নাও।

অমল হাত বাড়িয়ে নিল জিনিসটা। কিন্তু নিয়েই আবার চমকে উঠল। বলল, এটা ফেরত দিলে যে!

সুমিত্রা বলল, এটার কি প্রয়োজন আছে আর?

অমল বলল, এককালে আমাদের দু'জনের পরিচয় ছিল, এটা তারই স্মরণ-চিহ্ন। লকেটের এপিঠে রয়েছে তোমার নাম আর ওপিঠে রয়েছে আমার। আমাদের বিয়ে হয় নি বলে কি আজ এর কোন দাম নেই?

সুমিত্রা বলল, দামের প্রশ্ন এখানে নয়। দামী জিনিসের প্রয়োজন সব মানুষের সব সময় থাকে না।

অমল জিজ্ঞেস করল, কেন একথা বলছ সুমিত্রা?

সুমিত্রা জবাব দিল, আমার সংসার আছে, ভবিষ্যৎ আছে। সেখানে এটাকে রেখে একটা দ্বন্দ্ব রাখতে চাই না।

অমল স্তব্ধ হয়ে রইল।

সুমিত্রা বলে যেতে লাগল, এটাকে এতদিন পরম যত্নেই রেখে এসেছিলাম অমলদা। কিন্তু কিছুদিন আগে হঠাৎ আমার স্বামীর চোখে পড়ে যায়, সে থেকেই হ'ল তাঁর সঙ্গে আমার মনান্তর।

—তা হলে এটাকে নষ্ট করে ফেললেই পারতে। জের টেনে এত দূর নিয়ে যাবার কোনই দরকার ছিল না।

—অনেক আশাতেই এটাকে যত্ন করে রেখেছিলাম অমলদা। কথা বলতে গিয়েই যেন হঠাৎ থেমে গেল সুমিত্রা।

অমল জিজ্ঞেস করল, থামলে যে!

সুমিত্রা বলল, কৈ, তুমি তো আমার স্বামীর কথা কিছুই জিজ্ঞেস করলে না অমলদা? একটু থেমে আবার বলল—ওঃ, আমার গা-ভর্তি গয়না দেখেই বুঝি বুঝতে পেরেছ আমার স্বামী খুব বড়লোক? তা ঠিক। কিন্তু বড়লোক স্বামীর কাছে পড়লেই কি শুধু মেয়েরা সুখী হয়?

অমল বলল, আমার তো তাই মনে হয় সুমিত্রা?

সুমিত্রা বলল, সেটা তোমার ভুল অমল-দা। গল্প লেখো তবু এ কথাটা বুঝতে পার না? টাকা সব সময় সুখ দিতে পারে না। সুখভোগ করতে হলে ভাগ্য চাই। আমার এ বিয়ে হয়েছিল অনেকটা জেঠামশাইয়ের চক্রান্তে। তাঁরই আপিসের পার্টনার। কিন্তু কিছুদিন পরেই জানতে পারলাম তাঁর চরিত্রে রয়েছে অনেক অমার্জনীয় কলঙ্ক।

—তার পর?

—যার নিজের ভেতর গলদ থাকে সে অপরের গলদও খুঁজে বেড়ায়। আমাকেও তিনি সন্দেহ করতে লাগলেন।

—তার পর?

—তার পর একদিন তাঁর চোখে পড়ে গেল এই সরু হারে ঝুলানো লকেটটা। জিজ্ঞেস করলেন—এটা কি?

—তুমি কি বললে?

—আমি সত্যি কথাই বললাম।

কাঁটা দিয়ে উঠল অমলের সর্বাঙ্গ। সর্বনাশ, তুমি বললে?

সুমিত্রা বলল, ভয় নেই, ঘাবড়ে যেও না। নিজেদের অমর্যাদা করে কিছুই বলি নি। শুধু বলেছি, কলেজে পড়ার সময় তোমার সঙ্গে আলাপ ছিল, আমার জন্মদিনে তুমি এটা উপহার দিয়েছিলে।

ধৈর্য্যের বাঁধ মানছিল না অমলের। জিজ্ঞেস করল—তার পর কি হ'ল ?

সুমিত্রা জবাব দিল—তার পর স্বামী তোমার খবর জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, তার খবর আর জানি না, অনেক দিন দেখাসাক্ষাৎ নেই। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতে চাইলেন না। আমি বললাম, এত বড় সত্য কথাটা যখন বলতে পেরেছি তখন এ কথাটাও সত্য বলে ধরে নিতে পার।—স্বামী তা বিশ্বাস করলেন কিনা জানি না, কিন্তু সেই থেকে ভয়ানক গম্ভীর হয়ে গেলেন। আমার সঙ্গে যেটুকু তাঁর মনের যোগাযোগ ছিল তা-ও বুঝি ছিন্ন হয়ে গেল।

অমল বলল, এটা যখন এত সংশয়ের কারণ হয়ে উঠেছিল তখন ছুড়ে ফেলে দিলেই পারতে।

—কিন্তু তা দিই নি শুধু আমার স্বামীর উপর অভিমানের বশবর্ত্তী হয়ে। ভেবেছিলাম তাঁর অন্যায়ের প্রতিশোধ নেব। নিজের ভেতর এত কলঙ্ক, এত অন্যায় থাকতেও অপরের সামান্য একটু ত্রুটি কেন মানুষ সহ্য করতে পারে না বলতে পারো ?

অমল নির্ব্বাক।

সুমিত্রা বলল, অনেকদিন পর তোমার খোঁজ পেয়ে দেখতে ইচ্ছা হ'ল তোমাকে। তাই দেখে গেলাম।

—কিন্তু এ না দেখাও যে ভাল ছিল সুমিত্রা।

—হয় তো ভাল ছিল। কিন্তু মনটা হয় তো আমার হাল্কা হ'ত না। সারা জীবন একটা বোঝা নিয়েই থাকতাম। যাক্, নিজের কথা অনেক বলা হ'ল। তোমাদের কথা হ'ল না কিছুই। অভাব-অনটনের মধ্যে আছ তা দেখেই বুঝতে পারছি, কিন্তু তবু মনে হয় ভালই আছ।

—কেমন করে বুঝলে ?

—রুগ্না তোমার স্ত্রী, সুরূপাও সে নয়—তবু তাকে নিয়ে ঘর করছ তো ? আর আমি রুগ্না নই, কুরূপাও বোধ হয় নই, তবু ঘর করতে পারছি কৈ ? তাই তো বলি শুধু অর্থই সব সময় মানুষকে সুখ দিতে পারে না।

অমল জিজ্ঞেস করল—তোমার স্বামীর আর খবর তো কিছু বললে না সুমিত্রা ?

সুমিত্রা এবার চলতে সুরু করল। চলতে চলতে জবাব দিল—আর বলেই বা কি হবে ? অনেকদিন ধরে তাঁর কোন খোঁজ নেই।

কেঁপে উঠল অমল। খোঁজ নেই ? কেন ?

—সে কথা জিজ্ঞেস করো না অমল-দা।

—তোমাদের ঠিকানাটা তো বললে না ?

—সেটাও জিজ্ঞেস করো না।

সুমিত্রা চলার গতি তখন বাড়িয়ে দিয়েছে। অমল ভাবল ছুটে গিয়ে তাকে ধরে। কিন্তু পা বাড়াতে গিয়েও থেমে গেল। হাতের মুঠোর মধ্যে তখন ভারী হয়ে উঠেছে হারসুদ্ধ লকেটটা। সুমিত্রার কাছে দাম না থাকলেও অমলের কাছে এটার দাম আজ অনেক। মর্য্যাদা হিসাবে না হলেও ধাতব মূল্য হিসাবে।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে তাঁহার চারি খণ্ডে সমাপ্ত রবীন্দ্র-জীবনীর জন্য এবার (১৯৫৬-৫৭) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ হইতে রবীন্দ্র-পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। প্রভাতকুমার সুদীর্ঘ কাল যাবৎ একাগ্র নিষ্ঠায় সাহিত্যসাধনায় ব্যাপৃত আছেন। 'রবীন্দ্র-জীবনী' তাঁহার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। এই সাহিত্যসাধকের শ্রেষ্ঠ সম্মান-লাভে সাহিত্যানুরাগী মাত্রেই আনন্দিত হইয়াছেন।

নদীয়া জেলার রাণাঘাট শহরে ১১ই শ্রাবণ, ১২৯৮ (২৭শে জুলাই, ১৮৯১) প্রভাতকুমারের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রাণাঘাটের উকিল ছিলেন। প্রভাতকুমারের বিদ্যারম্ভ হয় রাণাঘাট পালচৌধুরী স্কুলে। ১৯০৬ সনে তিনি গিরিডি স্কুলে ভর্ত্তি হন। ১৯০৫-এর ৭ই আগষ্ট লর্ড কার্জ্জন-কৃত বঙ্গ-বিভাগ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-সভায় যোগদানের অপরাধে গিরিডি স্কুল হইতে তিনি বিতাড়িত হন। অতঃপর জাতীয় শিক্ষাপরিষদের পরীক্ষায় ইতিহাসে প্রথম স্থান এবং গুণানুসারে পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তিলাভ করেন। সেই সময় অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, সখারাম গণেশ দেউস্কর, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সুধীবৃন্দের সান্নিধ্যলাভ করেন। অসুস্থতার জন্য কলিকাতার কলেজ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া ১৯০৯-এর নবেম্বর মাসে শান্তি-নিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে আসেন এবং ১৯১০ হইতে ১৯১৬-এর ডিসেম্বর অবধি ব্রহ্মবিদ্যালয়ে শিক্ষকতা-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। অতঃপর ১৯১৭-১৯১৮ অক্টোবর পর্য্যন্ত। কলিকাতা সিটি কলেজের গ্রন্থাগারিক পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯১৮ সনেই আবার শান্তি-নিকেতনে চলিয়া যান এবং ঐ বৎসরের অক্টোবর হইতে ১৯৫৪ সনের ২৭-এ জুলাই পর্য্যন্ত সেখানে বিশ্বভারতীর কর্ম্মী; পাঠভবন, শিক্ষাভবনের অধ্যাপক ও গ্রন্থাগারিকরূপে কর্ম্মময় জীবনযাপন করেন। এইরূপ কর্ম্মব্যস্ত জীবনেও ১৯২১ সনে তিনি বিখ্যাত ফরাসী প্রাচ্যবিদ্ সিলভ্যাঁলেভির নিকট শিক্ষা ও গবেষণা কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। ১৯১৯ সনে পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের কন্যা সুধাময়ী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১৯২৭ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে বৃহত্তর ভারত সম্বন্ধে তাঁহাকে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিতে হয়। ১৯২৭ সনে তিনি রবীন্দ্র-নাথের সহিত পশ্চিম ভারত ভ্রমণ করেন। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়াও তিনি বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৯২৭-১৯৩০ সনে জাতীয় শিক্ষাপরিষদে (বর্ত্তমান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) 'হেমচন্দ্র বসু মল্লিক অধ্যাপকরূপে বৃহত্তর ভারতে হিন্দু ও বৌদ্ধ-সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহাকে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিতে হয়। বাংলাভাষায় এবং সাহিত্যে

শ্রেষ্ঠ গবেষণার জন্য ১৯৫৩ সনে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত 'সরোজিনী বসু' স্বর্ণ-পদক লাভ করেন। ১৯৪১ সনে পাবনা জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলনে সভাপতির পদে বৃত হন। ১৯৫৫ সনে প্রভাতকুমার খিদিরপুরে নিখিল-বঙ্গ গ্রন্থাগার সম্মেলনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ১৯৫০ সনে আলিগড় বিশ্ব-বিদ্যালয়ে তিনি বিশিষ্ট বক্তারূপে আমন্ত্রিত হন, কিন্তু বিশেষ কারণে যাওয়া হয় নাই। প্রভাতকুমার নিখিল-ভারত গ্রন্থাগার পরিষদের সহ-সভাপতি। ১৯৫৪ সনে তিনি নিখিল-বঙ্গ গ্রন্থাগার পরিষদেরও সভাপতি হন। ইহা ছাড়া আরও নানা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট আছেন।

প্রভাতকুমার বর্তমানে একটি জ্ঞানকোষ এবং পৃথিবীর ইতিহাস রচনায় লিপ্ত আছেন। তা ছাড়া বাংলাভাষায় দশমিক বর্গীকরণ সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া লিখিতেছেন।

প্রভাতকুমারের পুস্তকাবলীর নাম প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল-সহ এখানে প্রদত্ত হইল: শুধু রবীন্দ্র-জীবনীর দ্বিতীয় সংস্করণের চারিটি খণ্ডের প্রথম প্রকাশের সময় দেওয়া হইয়াছে।

১। প্রাচীন ইতিহাসের গল্প। (আচার্য্য যদুনাথ সরকারের ভূমিকা সম্বলিত) ১৩১৯।

২। ভারত পরিচয়। (আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ভূমিকা সম্বলিত) ১৩২৮।

৩। ভারতে জাতীয় আন্দোলন। (ভূমিকা—রামানন্দ চট্টো-পাধ্যায়)। ১৩৩১।

৪। বঙ্গপরিচয়। হৃষীকেশ সিরিজ ১৯নং।

১ম খণ্ড—১৩৪৩ বঙ্গাব্দ

২য় খণ্ড—১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ।

৫। ইতিহাসের দপ্তর: পুরানো ভারত। ১৩৩৮।

৬। দশমিক বর্গীকরণ বা Melvil প্রবর্ত্তিত Decimal Classification অনুসারে বাংলা লাইব্রেরী গ্রন্থ বর্গীকরণ পদ্ধতি। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ।

৭। জ্ঞান-ভারতী বা সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ। (ভূমিকা—রবীন্দ্র-নাথ ঠাকুর)।

১ম খণ্ড—১৩৪৭

২য় খণ্ড – ১৩৪৮।

৮। রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী। ১৩৩৯।
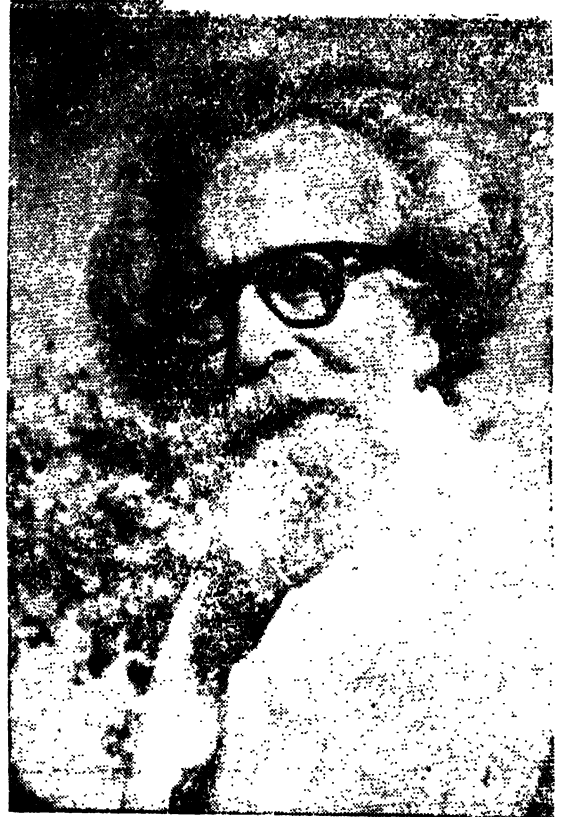
শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

৯। রবীন্দ্র-জীবনী ও রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রবেশক। ১ম খণ্ড (১৩৪০); ২য় খণ্ড (১৩৪৩)।

১০। রবীন্দ্র-বর্ষপঞ্জী। ১৩৩৮।

১১। রবীন্দ্র-জীবনী (২য় সংস্করণ) ও রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রবেশক [পরিবর্দ্ধিত ১৩৫৩, ১৩৫৫, ১৩৫৯]।

১ম খণ্ড—১৩৫৩

২য় খণ্ড—১৩৫৫

৩য় খণ্ড—১৩৫৯

৪র্থ খণ্ড—১৩৬৩।

১২। Indian Literature in China and the Far East, 1931.

দেশ-বিদেশের কথা

সরকারী টাঁকশালে নূতন দশমিক মুদ্রা নির্ম্মাণ

গত ১লা এপ্রিল হইতে ভারতে দশমিক বর্গের নূতন মুদ্রা চালু হইয়াছে—ইতিমধ্যে আলিপুর, বোম্বাই এবং হায়দরাবাদ এই তিন জায়গায় তিনটি সরকারী টাকশাল সপ্তাহে ৫৪ ঘণ্টা কাজ করিয়া এক নয়া পয়সা এবং দুই, পাঁচ ও দশ নয়া পয়সা এই চারিটি এককের প্রায় ৬১ কোটি খণ্ড নূতন মুদ্রা তৈরি করিয়াছে। ইহাদের সম্মিলিত উৎপাদন হইতেছে প্রতি মাসে প্রায় আট কোটি মুদ্রাখণ্ড।

এই নূতন মুদ্রার বৃহদংশ তৈরী হইয়াছে এবং হইবে দুই কোটি বিশ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে ভারত সরকারের পুনর্নির্ম্মিত আলিপুরস্থ টাঁকশালে। কলিকাতার নিকটে ৮৭ বিঘা জমি জুড়িয়া অবস্থিত প্ল্যান্ট এলাকাসহ আলিপুর টাকশাল আধুনিকতম সাজ-সরঞ্জাম সমন্বিত এবং প্রত্যহ ১২ লক্ষ মুদ্রাখণ্ড তৈরি করিবার ক্ষমতা ইহার আছে।

১৯৫৭ সনের ১লা এপ্রিলের পর হইতেই তিনটি টাকশাল তাহাদের সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া কাজ করিতেছে। ইহা আশা করা যায় যে, ১৯৫৭ সনের জুনের শেষে তাহারা অতিরিক্ত ২৩ কোটি মুদ্রাখণ্ড তৈরি করিবে।

শরৎকুমার চট্টোপাধ্যায়

গত ১১ই মার্চ্চ বাঁকুড়ার প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ স্থানীয় টাউন উচ্চ-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান শিক্ষক শরৎকুমার চট্টোপাধ্যায় বাঁকুড়া শহরে তাঁহার নিজ বাসভবনে সজ্ঞানে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৫৩ বৎসর মাত্র।

বাঁকুড়ার বিখ্যাত চট্টোপাধ্যায় পরিবারে ১৯০৪ সনের ১৪ই জুলাই শরৎকুমার চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায় 'জেলার' ছিলেন। 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিয়ু'র প্রতিষ্ঠাতা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় শরৎকুমার চট্টোপাধ্যায়ের খুল্লতাত।

ছাত্রজীবনে শরৎকুমার চট্টোপাধ্যায় বিশেষ মেধাবী ছাত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বাঁকুড়া জেলা স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করিয়া তিনি স্থানীয় ক্রিশ্চান কলেজে ভর্ত্তি হন। উক্ত কলেজ হইতে বি-এসসি পরীক্ষায় সাফল্যের সহিত উত্তীর্ণ হন। তার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ হইতে ফলিত রসায়নে প্রথম বিভাগে চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। তিনি কিছুকাল উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণাকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। পরে অনিবার্য্য কারণে বাঁকুড়ায় ফিরিতে বাধ্য হন এবং বাঁকুড়া টাউন উচ্চ-(ইংরাজী) বিদ্যালয় ও দি স্বস্তিকা ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ওয়ার্কস প্রতিষ্ঠা করেন।

শরৎকুমার সারাজীবন জেলার এই স্কুলটির উন্নতিবিধানে ব্যাপৃত ছিলেন। সুদীর্ঘ ২০ বৎসর কাল (১৯৩৭-১৯৫৭) শিক্ষকতাকার্য্যে নিযুক্ত থাকাকালে তিনি বহু শত দরিদ্র ছাত্রকে শিক্ষালাভের সুযোগ দিয়াছিলেন। বাঁকুড়া জেলার শিক্ষক সমিতির তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট সভ্য। চিকিৎসাশাস্ত্রেও তাঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি ছিলেন মিষ্টভাষী, সহনশীল, আদর্শ, বিনয়ী গৃহস্থ।

জগদীশ গুপ্ত

বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক জগদীশ গুপ্ত গত ২রা বৈশাখ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭১ বৎসর হইয়াছিল।

১৮৮৬ সনে ফরিদপুর জেলার মেঘচামীতে জগদীশ গুপ্তের জন্ম হয়। তাঁহার বাল্যকাল মফঃস্বলেই কাটে। অতঃপর তিনি কলি-

কাতায় পড়িতে আসেন। সিটি কলেজিয়েট স্কুল হইতে এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাস করিয়া তিনি কলেজে ভর্ত্তি হন। কিন্তু অনিবার্য্য কারণে পড়াশুনা ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। আদালতে পত্র ও দলিল লেখার কাজ করিয়া তাঁহাকে সংসার খরচ চালাইতে হইত। এই কাজে তাঁহাকে যশোহর, পাবনা, বীরভূম প্রভৃতি জেলার নানা স্থানে যাইতে হইত। এই উপলক্ষে মনুষ্যচরিত্র সম্বন্ধে তিনি যে বিপুল অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন, পরবর্ত্তীকালে তাহা তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে বিশেষ ভাবে সহায়ক হইয়াছিল।

কবিতা রচনা দ্বারা জগদীশ গুপ্তের সাহিত্যিক জীবনের সূচনা হয়। প্রথম বয়সে তিনি ভাওয়ালের কবি গোবিন্দ দাসের আদর্শে কবিতা লিখিতেন। 'অক্ষরা' নামে তাঁহার একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কিন্তু তিনি প্রতিষ্ঠালাভ করেন অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে কথাসাহিত্যিক রূপে। তাঁহার রচিত গল্পগুলি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল, তন্মধ্যে কতকগুলি বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিবার দাবি রাখে।

কল্লোল, কালিকলম, বঙ্গবাণী, আত্মশক্তি প্রভৃতি নানা পত্রিকায় তাঁহার অজস্র রচনা প্রকাশিত হইত। 'প্রবাসী'তেও তাঁহার কতকগুলি শ্রেষ্ঠ গল্প বাহির হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং প্রমথ চৌধুরী তাঁহার গল্প-রচনা-শক্তির উচ্ছসিত প্রশংসা করেন। ক্রমে একজন শ্রেষ্ঠ গল্পকাররূপে জগদীশচন্দ্র বিপুল খ্যাতির অধিকারী হন। ঔপন্যাসিকরূপেও তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে—বিনোদিনী, শুভিনী, রতি ও বিরতি, অসাধু সিদ্ধার্থ, দয়ানন্দ মল্লিক ও মল্লিকা, তাতল সৈকতে, লঘুগুরু, মেঘাবৃত অশনি, দুলালের দোলা, তৃষিত সৃক্কণী, শ্রীমতী ইত্যাদি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

শেষ জীবনে একদিকে যেমন ব্যাধির আক্রমণে জগদীশবাবুর শরীর ভাঙিয়া পড়িয়াছিল, অন্য দিকে তেমনই নিদারুণ অর্থাভাবের মধ্যে তাঁহাকে দিনাতিপাত করিতে হইত—এই সময় প্রধানতঃ তাঁহাকে নির্ভর করিতে হয় সরকার-প্রদত্ত মাসিক বৃত্তির উপর। কিন্তু এই শোচনীয় এবং সঙ্কটজনক অবস্থায়ও তাঁহার সাহিত্যচর্চ্চার বিরাম ছিল না—এই সময়েও যুগান্তর সাময়িকী এবং অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় তাঁহার বহু গল্প ও রঙ্গ-কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। কিছুকাল আগে বসুমতী সাহিত্যমন্দির হইতে জগদীশ গুপ্তের একখানি গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়াছে।

সঙ্গীতেও জগদীশ গুপ্ত বিশেষ পারদর্শিতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, বেহালা বাদনে তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। এই একনিষ্ঠ সাহিত্য-সাধকের তিরোধানে বাংলা সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি হইল।
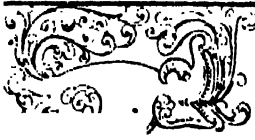
আলোচনা

বেদে জন্মান্তরবাদ

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

মাঘ ১৩৬৩-র প্রবাসীতে "শ্রীকৃষ্ণ ও গীতা" নামক প্রবন্ধে শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয় লিখিয়াছেন, "জন্মান্তরবাদ বেদের কালে সৃষ্ট হয় নাই (পৃঃ ৪৯৪)।" ইহা যথার্থ বলিয়া মনে হয় না। ঋগ্বেদ সংহিতার ৪ ২৭।১ ঋক এইরূপ :—

গর্ভেনু সন্নন্বেষামবেদমহং দেবানাং জনিমানি বিশ্বা।
শতং মাপুর আয়সীররক্ষন্নধ শ্যেনো জবসা নিরদীয়ম্॥

ঋষি বামদেব বলিতেছেন, "আমি গর্ভে অবস্থানকালে দেবতাদের জন্মকথা জানিতে পারিয়াছিলাম. আমাকে শত (বহুসংখ্যক) লৌহময় নগর রক্ষা করিয়াছিল (যেমন লৌহময় নগর ত্যাগ করিয়া বাহিরে যাওয়া দুরূহ, সেইরূপ দেহব্যতিরিক্ত আত্মাকে জানা দুরূহ। এখানে দেহকে লৌহময় নগরের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।) অধুনা আমি শ্যেনপক্ষীর ন্যায় বেগে নির্গত হইয়াছি (অর্থাৎ দেহাত্মভাব পরিত্যাগ করিয়া আবরণহীন আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছি।)"

এখানে বামদেব স্মরণ করিতেছেন, তিনি পূর্বে বহুবার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ঋগ্বেদের নিম্নলিখিত মন্ত্রেও পুনর্জন্মবাদের উল্লেখ পাওয়া যায় :

সূর্যং চক্ষুর্গচ্ছতু বাতমাত্মা
দ্যাং চ গচ্ছ পৃথিবীং চ ধর্মণা।
অপো বা গচ্ছ যদি তত্র তে হিতম্
ওষধীষু প্রতিতিষ্ঠা শরীরৈঃ। ১০-১৬-৩

মৃত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে, "তোমার চক্ষু সূর্যকে প্রাপ্ত হউক, তোমার প্রাণ বায়ুকে প্রাপ্ত হউক। (অথবা) তুমি ধর্মের দ্বারা (যজ্ঞাদি কর্মের ফলে) স্বর্গগমন কর এবং পৃথিবীতেও (গমন কর) অথবা জল (বা অন্তরীক্ষে) গমন কর। যদি তোমার কর্মফল সেইরূপে (থাকে)। অথবা উদ্ভিদের মধ্যে তোমার অবয়বের দ্বারা অবস্থান কর।" এখানে পরলোক নিম্নলিখিত কয় প্রকার গতির উল্লেখ করা হইয়াছে—(১) ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা মোক্ষ। মোক্ষ হইলে সূক্ষ্ম শরীর অবশিষ্ট থাকে না। সূক্ষ্ম শরীরের বিভিন্ন অংশ (চক্ষু, প্রাণ প্রভৃতি অংশ) তাহাদের অধিষ্ঠাতা দেবতাদের মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। চক্ষু সূর্যে বিলীন হয়, প্রাণ বায়ু দেবতাতে বিলীন হয়। এইরূপ অন্য অংশও। (২) দ্বিতীয় পথ পিতৃযান মার্গ নামে পরিচিত যজ্ঞাদি পুণ্য কর্মের ফলে স্বর্গে গিয়া সুখভোগ করা হয়, তাহার পর পুণ্য ফুরাইলে

পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। এই পথ সম্বন্ধে গীতাতে বলা হইয়াছে :—

> ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপাঃ
> যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
> তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক
> মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥ ৯।২০
> তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
> ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
> এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্নাঃ
> গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ ৯:২১

"যাঁহারা যজ্ঞের কর্মকাণ্ড অনুসরণ করে তাহারা (যজ্ঞাবশিষ্ট) সোমপান করিয়া পাপমুক্ত হয়, তাহারা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গ কামনা করে, পুণ্যময় ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয় এবং উৎকৃষ্ট দ্রব্যসকল ভোগ করে। বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া যখন পুণ্য ক্ষীণ হয় তখন তাহারা মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করে। এই ভাবে সকামকর্মীরা পৃথিবী ও স্বর্গের মধ্যে যাতায়াত করে।" ছান্দোগ্য বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষদেও পিতৃযানের উল্লেখ আছে। (৩) তৃতীয় পথ, জল বা অন্তরীক্ষে গমন, অথবা উদ্ভিদের মধ্যে অবস্থান করা। উপনিষদে এই পথকে "জায়স্ব ম্রিয়স্ব ইত্যেতৎ তৃতীয়ং স্থানং" (ছান্দোগ্য উপনিষদ ৫।১০।৮) বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। ইহারা ঈশ্বরের পূজা করে না, পুণ্যকর্মও করে না। ইহারা কীটপতঙ্গ প্রভৃতি ক্ষুদ্র প্রাণী হইয়া বার বার জন্মগ্রহণ করে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ঋগ্বেদের পূর্বোধৃত শ্লোকে নরক ভিন্ন অন্য তিনটি মৃত্যুর পরবর্তী পথ এবং পুনর্জন্মের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। মৃত আত্মীয়কে লক্ষ্য করিয়া এই শ্লোক বলা হইয়াছে। তিনি যে নরকে যাইতে পারেন একথা মৃত্যুর সময় তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা সঙ্গত হয় না।

এই প্রবন্ধে লেখক মহাশয় বলিয়াছেন যে, বেদ ও উপনিষদে অবতারবাদের উল্লেখ নাই। ইহাও ঠিক নহে। ঋগ্বেদ সংহিতার ৬।৪৭।১৮। ঋকে বলা হইয়াছে, "ইন্দ্রোমায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" অর্থাৎ পরমেশ্বর মায়াশক্তির দ্বারা বহু রূপ গ্রহণ করেন। ইহাই অবতারবাদের মূলতত্ত্ব। ঋগ্বেদ সংহিতার ৭।১০০।৪ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, বিষ্ণু তাঁহার ভক্তদিগকে "উরুক্ষিতি" অর্থাৎ বিস্তীর্ণ ভূমি প্রদান করিয়াছিলেন। এই শ্লোকে বিষ্ণুর বিশেষণ রূপে "সুজনিমা" শব্দ ব্যবহার হইয়াছে। অর্থাৎ যাঁহার "জনিম" বা জন্ম-সকল "সু" অর্থাৎ শোভন, যাঁহার জন্মসকল শ্রবণ কীর্ত্তন প্রভৃতি করিলে সুখলাভ হয় (সায়নভাষ্য)। ইহাতেও দেখা যায় যে, বিষ্ণুর অনেক জন্ম ছিল। অর্থাৎ ইহা অবতারবাদ সমর্থন করে। কেনোপনিষদে দৃষ্ট হয়, ব্রহ্ম একটি মনোহর মূর্তি ধারণ করিয়া দেবগণের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই সকল উক্তি অবতারবাদের সমর্থক বলিয়া মনে হয়।

এই বৈশাখে

শ্রীপ্রভাকর মাঝি

এই বৈশাখে তোমাকে নূতন করে'
পেলাম মনের সকল উষ্ণতায়।
শরৎকে নয়, হেমন্তকেও নয়—
মন-বিহঙ্গ বোশেখকে পেতে চায়।

বাইরে সেদিন ঝড়ের হুহুঙ্কার,
প্রলয়ঙ্কর বজ্রের গর্জ্জন।
অন্ধ আকাশে খর বিদ্যুৎ জ্বলে,
দেবে ও দৈত্যে বেধেছে বুঝি বা রণ!

ঠক্ ঠকা ঠক্ কাঁপছে বসুন্ধরা
টাইমপিসের থেমে যায় স্পন্দন।
সহসা গোপন গুণ্ঠন খুলে দিয়ে
করলে নিজেকে নিঃশেষে অর্পণ।

দুরু-দুরু ঐ ঝড়ের দোলাতে বুঝি
মনেতেও দোলা লেগেছিল নিশ্চয়।
এসেছিলে কাছে, হৃদয়ের কাছাকাছি,
পেলাম তোমার সমগ্র পরিচয়।

সেদিন তোমার পড়েছি চোখের ভাষা,
পড়েছি কপোত-বক্ষের ধুক্ ধুক্।
কেউ যেন নাই সুদূরে বা অন্তিকে,
কেবল দুইটি অন্তর উৎসুক।

ভুললাম ঝড় সেদিন তোমাকে পেয়ে
বৈশাখে তাই ভালবাসি সব চেয়ে।

পৌরাণিকী—গিরীন্দ্রশেখর বসু। প্রাচ্য বাণীমন্দির গ্রন্থমালা—দশম পুষ্প। ৩ ফেডারেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪। মূল্য ২॥০ টাকা।

ডক্টর গিরীন্দ্রশেখর বসুর প্রতিভা বহুমুখী। তিনি একাধারে ছিলেন মনোবৈজ্ঞানিক, পুরাণার্থবিৎ, চিকিৎসক এবং সাহিত্যিক। "স্বপ্ন" প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার আশ্চর্য্য অন্তর্দৃষ্টি এবং মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। "গীতা"-ব্যাখ্যায় তাঁহার বিপুল শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। "পুরাণ-প্রবেশ" পাঠে পাঠক বুঝিতে পারিবেন ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধার করিতে হইলে পুরাণ ছাড়া গতি নাই। আলোচ্য গ্রন্থখানি বেদ ও পুরাণ বিষয়ক সাতটি প্রবন্ধের সমষ্টি। ডক্টর বসুর পরলোকগমনের পর এই প্রবন্ধগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়া প্রাচ্য বাণীমন্দির পাঠকের ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। 'নিবেদনে' কন্যা শ্রীমতী দুর্গাবতী ঘোষ এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন। অন্যতর সম্পাদক ডক্টর রমা চৌধুরী গিরীন্দ্রশেখরের স্মৃতির প্রতি 'শ্রদ্ধার্ঘ' প্রদান করিয়া তাঁহাকে ঋষি-কবি আখ্যা দিয়াছেন। জ্ঞানের মধ্য দিয়া গিরীন্দ্রশেখর আনন্দ পাইয়াছেন এবং আনন্দ বিতরণ করিয়াছেন। পুস্তকের কলেবর বৃহৎ না হইলেও এক-একটি প্রবন্ধের বিষয়বস্তু লইয়া এক-একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচিত হইতে পারিত। "প্রাচীন ভারতে সভ্যতার উদ্ভব" প্রবন্ধে সুদূর অতীতের সভ্যতা, সংস্কৃতি, বিদ্যা, শিক্ষা, ধর্ম্ম, ভাষা, আচার-ব্যবহার এবং জীবনযাত্রা-প্রণালী লইয়া প্রাচীন ভারতবর্ষের জীবন্ত চিত্র আমাদের চোখের সম্মুখে সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়া ওঠে। "ঋগ্বেদে ইন্দ্র" প্রবন্ধে গ্রন্থকার বলিতেছেন, ইলাবৃতবর্ষের অপর নাম স্বর্গ। এই স্বর্গ ভৌম স্বর্গ। ভার বা কৈসরের ন্যায় ইলাবৃতবর্ষের সম্রাটগণের সাধারণ নাম ইন্দ্র। ইন্দ্র এক নয়—বহু। বিপশ্চিৎ, যশস্বি, শিবি, বিভু, মনোজব, পুরন্দর প্রভৃতি প্রধান প্রধান ইন্দ্রগণের নাম পুরাণে ধৃত হইয়াছে। ইলাবৃতবর্ষ, কাশ্মীর, বিন্ধ্যের ভারত পর্য্যায়ক্রমে স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, মর্ত্ত, অথবা দেবলোক, পিতৃলোক ও মর্ত্তলোক, অথবা ইলা, সরস্বতী ও ভারতী নামে পরিচিত ছিল। দক্ষিণাপথ পাতাল। দেব ও অসুরগণ একই দেশের অধিবাসী এবং জ্ঞাতি ছিলেন। দুই দলের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ প্রায়ই লাগিয়া থাকিত। কখনও কখনও অসুরগণ প্রবল হইত। পরবর্ত্তী কালের আসিরিয়ার সেমেটিক অসুরগণ হইতে ইহারা ভিন্ন। বৃত্র তদানীন্তন ইন্দ্রকে যুদ্ধে অষ্টাদশ বার পরাজিত করেন। ত্বষ্টা ইন্দ্রকে বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া দিলে ইন্দ্র তদ্দ্বারা বৃত্রকে হনন করেন। বজ্র অস্থিনির্ম্মিত (স্কন্দ পুরাণ)। প্রথমে সম্রাট ইন্দ্র নরেন্দ্ররূপে সম্মান পাইতেন। সম্মানার্হ অতিথিকে মানপত্র প্রদানের ন্যায়—আমন্ত্রিত ইন্দ্রকে অভ্যর্থনা করা হইত। এই অভ্যর্থনার নাম ছিল যজ্ঞ। সম্মানার্হ অতিথিকে বলা হইত যজ্ঞপুরুষ। ইন্দ্রগণ লুপ্ত হইলেও ইন্দ্রযজ্ঞ লুপ্ত হয় নাই। ক্রমে ইন্দ্র অন্তরীক্ষ-দেব, আকাশ-দেব বা অন্তরীক্ষ-দেবে এবং পরিশেষে পরম দেবে পরিণত হইয়াছেন। ইহা বুঝিতে হইলে পৌরাণিক 'দিবি-আরোহণ তত্ত্ব' এবং 'অবতার-তত্ত্ব' বুঝিতে হইবে। আদিতে শূর-বীরগণের উদ্দেশ্যেই বৈদিক সূক্তগুলি রচিত হইয়াছিল। পুরুষের রাম-প্রবাদের মত সংস্কৃত মানবের চিরন্তন কামনাসমূহ ঋষির মনে প্রতিফলিত এবং নির্ব্বিকারে ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়াই বেদ অপৌরুষেয়, ঋষি মন্ত্রদ্রষ্টা।

পুরাকালের রাজাদের নাম, কীর্ত্তিকলাপ এবং বংশবৃত্তান্ত কালনির্দ্দেশসহ পুরাণে ধৃত হইয়াছে। পুরাণই প্রাচীন কালের 'হিষ্ট্রি' বা ইতিবৃত্ত। তৃতীয় প্রবন্ধে 'পৌরাণিক গাথা'-সমূহ বর্ণিত হইয়াছে। পুলস্ত্যপুত্র নিদাঘ কেমন করিয়া শ্বশুরের নিকট হইতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেন চতুর্থ প্রবন্ধে তাহার কথা আছে। রজি ছিলেন ভারতবর্ষের নৃপতি। তিনি ইন্দ্রকে জয় করিয়া স্বর্গের রাজা হইয়াছিলেন। পঞ্চম প্রবন্ধ এই রজি রাজার কাহিনী। "কি নাম রাখা যায়?" প্রবন্ধে গ্রন্থকার মনুসংহিতা এবং বিষ্ণু প্রভৃতি পুরাণের নামকরণের বিধিনিষেধ সম্পর্কে আলোচনা করিয়া আধুনিক কালের নামসমূহের সহিত অতীত কালের নামের তুলনা করিয়াছেন। সপ্তম প্রবন্ধে "পুরাণে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়"-এর কথা সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। বিষয়ের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিবার অনায়াস ক্ষমতা ছিল বলিয়া গিরীন্দ্রশেখর তাঁহার বক্তব্য এত সহজ ও সরলভাবে প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন। চিন্তার স্বচ্ছতা এবং প্রকাশের স্পষ্টতা তাঁহার রচনার বৈশিষ্ট্য। "পৌরাণিকী"-পাঠে পাঠক জ্ঞানের সহিত গভীর আনন্দ লাভ করিবেন।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ—স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী। রয়টার্স সিণ্ডিকেট, ৮৭ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২॥০ টাকা।

সাধন-জগতে একটি কথা প্রচলিত আছে—অধিকারীভেদ। অধিকারী-ভেদে পরমতত্ত্বের প্রকাশধারা বিভিন্ন হইয়া থাকে। একই রাগের নানা রূপান্তর, একই ছন্দের নানা সুর, একই পরম বস্তুর নানা মূর্ত্তি-কল্পনা। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায়—"বাড়ীতে একটা বড় মাছ এলে ঝোল ঝাল করিয়া রেখে মা ছেলেদের পাতে দেন, যার পেটে যা সয়।" আলোচ্য গ্রন্থের শ্লোকগুলি পড়িবার সময় এই কথাগুলিই বার বার মনে হইয়াছে।

শ্লোকগুলি মূলতঃ সংস্কৃতে রচিত—স্বচ্ছন্দ বাংলা অনুবাদও করিয়াছেন স্বামীজীর অনুবাদ মূলানুসারী তো বটেই, গভীর অর্থব্যঞ্জকও। এগুলি ছন্দে এবং সুরে অপূর্ব্ব, শুধু বক্তব্যকে প্রাঞ্জল ও স্পষ্ট করে নাই, একটি ভাবগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া দিয়া অনুভূতির ক্ষেত্রটিকে প্রশস্ত করিয়াছে। স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর অন্তরালে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের গুণাভাস-গঠিত ভাবঘন স্বরূপটি উপলব্ধি করা যায় ইহার দ্বারা।

ইষ্ট, গুরু ও সাধন, এই তিন পর্ব্বে শ্লোকগুলিকে ভাগ করিয়াছেন কবি, মাঝে মাঝে ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। যাঁরা আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু এবং আত্মিক পিপাসায় পীড়িত—তাঁদের সংশয়, বেদনা ও ভয়-ভাবনা মোচনের আশ্বাস শ্লোকগুলির মধ্যে নিহিত। সর্ব্বসাধারণের পক্ষে এই তত্ত্বগুলি সহজবোধ্য।

যাবার বেলায়—ডাঃ শ্রীশচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। মূল্য ২।০ টাকা।

গল্পের বই। সংগ্রহটিতে—অভিসারিকা, মা, অতিথি, চোর, সাগর-বেলায় প্রভৃতি নয়টি গল্প আছে। লেখক ভূমিকায় বলিয়াছেন, গল্পগুলি অনেক দিন পূর্ব্বের লেখা।

গল্পগুলি পড়িবার সময় লেখকের এই স্বীকৃতিটুকু স্মরণ করা আবশ্যক। কারণ ইতিমধ্যে ছোটগল্পের ক্ষেত্রে বাংলা-সাহিত্য পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। রচনাশৈলী, প্রকাশভঙ্গী, বিষয়বস্তুনির্ব্বাচন প্রভৃতি নানা দিক দিয়াই উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, বৈচিত্র্যাস্বাদলুব্ধ পাঠকের রুচিও বদলাইয়াছে। আলোচ্য সংগ্রহের গল্পগুলি পরিবর্ত্তিত রুচির সঙ্গে ঠিকমত না মিলিলেও

পারে, কিন্তু এগুলিতে যে অকপট সাহিত্য-প্রীতির পরিচয় আছে তাহা পাঠক-মাত্রেই স্বীকার করিবেন।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

বিশ্বসভ্যতার ধারা—শ্রীহরিপদ ঘোষাল। নিউ বুক ষ্টল পক্ষে শ্রীগোপালচন্দ্র পান কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দশ টাকা।

গ্রন্থকার শিক্ষাবিদ্। আলোচ্য গ্রন্থখানি তাঁহার সুদীর্ঘ মনন-সাধনার স্বাক্ষর বহন করিতেছে। বিশ্বসভ্যতার দূরপ্রসারী বনিয়াদ কেমন করিয়া যুগ হইতে যুগান্তরের মধ্য দিয়া বিভিন্ন জাতির অবদানপুষ্ট হইয়া এক বিরাট রূপ ধারণ করিল, গ্রন্থকার বর্তমান গ্রন্থে তাহারই এক পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করিয়াছেন। জনশক্তি এবং পশুবল, যান্ত্রিক অথবা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দ্বারা জাতির সভ্যতার পরিমাপ হয় না। জাতির মনন-সাধনার ইতিহাস লুক্কায়িত থাকে তাহার দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা জ্ঞানচয়ন-স্পৃহার সীমাহীন ব্যাপ্তির মধ্যে। ইহাই যথার্থ সভ্যতার নিদর্শন। মারণাস্ত্র সংস্কৃতি ও সভ্যতার দ্যোতক নহে। মৃত্যুভয়ভীত ও মদমত্ত হন্তারক মানুষের কর্ণে এই নিত্য সত্যের পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন ছিল। গ্রন্থকার সে প্রয়োজন পূর্ণ করিয়াছেন। মানুষের আত্মার স্বাক্ষর যেখানে সেখানেই সভ্যতার শতদল বিকশিত হইয়া উঠে। মানবসত্তার দুইটি দিক—ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয়। ভারতীয় সভ্যতা ইন্দ্রিয়কে স্বীকার করিয়াও অতীন্দ্রিয়বাদকে পরম সত্য বলিয়াছে। লোকায়ত-দর্শন ভারতবর্ষে উপেক্ষিত হয় নাই। পরমার্থ-দর্শন শ্রদ্ধার সহিত স্বীকৃত হইয়াছে। তাই আমাদের দর্শন অতীন্দ্রিয়বাদীর পরম জ্ঞানান্বেষণের আলোকে ভাস্বর। গ্রীস ও ইটালীতেও আমরা আমাদের সমধর্মী সভ্যতার বিকাশ লক্ষ্য করিয়াছি। তাহারাও শ্রেয়কে পরিত্যাগ না করিয়া যে ভূয়োদর্শন সারা পৃথিবীকে দিয়া গেল তাহার তুলনা নাই। প্রেয়ের মোহ হইতে মুক্ত এই সভ্যতা-ত্রয়ী শ্রেয়ের সাধনায় আত্ম-নিমগ্ন রহিল। একদিকে সর্বযুগীয় অধ্যাত্মদর্শন, অতীন্দ্রিয়বাদ এবং অন্য-দিকে সর্বকালিক গাণপত্যবাদ—ইহাদের ক্রমিক উত্থান-পতন বিশ্বসভ্যতাকে চিহ্নিত করিয়াছে। ইহাদের সমন্বয়েই বিশ্বসভ্যতার সুবিশাল দেউল নির্মিত। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সভ্যতানিচয়ের অপরূপ বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও তাহাদের মূলগত ঐক্যটির কথা গ্রন্থকার নিপুণভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাহা যেমন মনোজ্ঞ তেমনি পাণ্ডিত্যপূর্ণ। বিভিন্ন সভ্যতার সমন্বয়ীকরণ করিয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন, 'বিভিন্ন সভ্যতার মহৎ সৃষ্টিগুলির সমন্বয়ে যে মানস-জাগরণ তার নাম বিশ্বসভ্যতা'।

আদান এবং প্রদানের মধ্য দিয়া ব্যক্তি এবং জাতি আপন আপন অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখে। এই দেওয়া-নেওয়াই জাতির জীবনে মহৎ সম্ভাবনার প্রতীক্। গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, অসূয়া, হিংসার মধ্য দিয়া জাতির প্রতিভার যথার্থ স্ফুরণ হয় না। হিংসার সর্বপ্রকার মালিন্যকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়া এ যুগের ইতিহাস লিখিত হইবে। প্রসঙ্গক্রমে গ্রন্থকার ইংরেজদের জাতীয় পতাকাকে নেলসন ও ট্রাফালগারের স্মারক বলিয়াছেন। ইহা জাতিবিদ্বেষের প্ররোচনা দান করে। ইংরেজ জাতির জাতীয় পতাকা তাহার ডারউইন, সেক্সপীয়র ও নিউটনকে স্মরণ করায় না। ইউরোপীয় সভ্যতা বস্তুতান্ত্রিক। তাই হিংসা ও দ্বেষের প্রাবল্য সে সভ্যতার অঙ্গভূষণ হইয়াছে। ইসলাম এই বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতাকে আশ্রয় করিয়াছে। চীনা সভ্যতাও লেখকের মতে বস্তুতান্ত্রিক। এশীয় সভ্যতার অন্যতম অগ্রনায়ক ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ চীনা জীবনবাদকে প্রভাবান্বিত করিয়া তাহার আত্মনিষ্ঠ ভাবটুকু সৃজনে সহায়তা করিয়াছিল। এইভাবে গ্রন্থকার সভ্যতার চরিধারার আলোচনা করিয়া তাহাদের পারস্পরিক আদান-প্রদানের কাহিনীটুকু সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন প্রায় অর্দ্ধশত সুলিখিত ইতিহাস-পর্বে। গ্রন্থকার কোন মৌলিক গবেষণার দাবি রাখেন না। তবু এ কথা অনস্বীকার্য্য যে, এই ধরনের গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

ভারতে স্বাধীনতার ইতিহাস—শ্রীরণজিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ৪৪।৬, মুরারিপুকুর রোড, কলিকাতা-১১। পৃষ্ঠা ২৯৫+৪৮; দাম ৩, টাকা।

গ্রন্থখানি যে ইতিহাস সে কথা গ্রন্থকার নামকরণেই প্রকাশ করেছেন। কিন্তু গ্রন্থখানির বাংলা নামটি ছাড়াও একটি ইংরেজী নামও আছে—"The Discovery of India's Independency." তবে এটি পাঠক-পাঠিকাগণের সুবিধার্থে ইংরেজীতে ব্যাখ্যাও হতে পারে। আবার, গ্রন্থের বিষয়বস্তুর পরিচয় অথবা মর্যাদা বৃদ্ধিকল্পে ব্যবহৃত হওয়াও অসম্ভব নয়। এই রীতি গ্রন্থমধ্যেও অনুসরণ করা হয়েছে। প্রায় প্রত্যেক আলোচ্য বিষয়ের দুটি করে নাম—একটি বাংলা, অপরটি ইংরেজী। যেমন "জীবন-সঙ্গীত" Validity of Life; "আনন্দ-ভেল" The Field of Pleasure ইত্যাদি। গ্রন্থখানিতে বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দী, ইংরেজী প্রভৃতি বিবিধ ভাষায় বিচিত্র গদ্যে পদ্যে নানা বিষয় লেখা হয়েছে, লেখা হয়নি কেবল ইতিহাস। অগণিত মুদ্রাকর প্রমাদে অভিনব শব্দ প্রয়োগে ও বানানে গ্রন্থখানি "কিউরিওতে" পরিণত হয়েছে। শ্রীজবাহরলাল নেহরুর নামের পূর্বে লেখক "পণ্ডিত" শব্দটি ব্যবহারের কৈফিয়ত পাদটীকায় দিয়েছেন: "the period written this, the Pandit was in existence not suppression the commentators" এবং "শ্যামাপ্রসাদ প্রয়াণে" খেদ করেছেন, "কাশ্মীর! কাশ্মীর! বিকট অরাতি-স্বেদ নুসল্ আকার ত্রিদিব" ইত্যাদি। আমরা বলি, বুঝ সাধু যে জান সন্ধান।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

মানুষ চিত্তরঞ্জন—শ্রীঅপর্ণা দেবী। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৯৩ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭। পৃ. ৩৪৬। মূল্য পাঁচ টাকা আট আনা।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের এক সময়ে পুরোভাগে ছিলেন। বিখ্যাত ব্যারিষ্টার সি. আর. দাশ মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের প্রাক্কালে বিপুল আয়ের আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া মাতৃভূমির সেবায় পুরাপুরি আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি তখন স্বদেশবাসীর চিত্ত এতখানি জয় করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা স্বাভাবিক ভাবেই তাঁহাকে "দেশবন্ধু" আখ্যা দিয়াছেন। বর্তমানেও 'দেশবন্ধু' বলিতে আমরা আর কাহাকেও বুঝি না, বুঝি সর্বত্যাগী চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়কে। ইহার পূর্বে তিনি 'দাশ সাহেব' ছিলেন, ঐ সময় হইতে হইলেন 'দেশবন্ধু'। কিন্তু 'দাশ সাহেব' কিরূপে 'দেশবন্ধু' হইলেন এই বিষয়টি হয়ত আধুনিকেরা তেমন তলাইয়া দেখিবার অবকাশ পান না। তাই "মানুষ চিত্তরঞ্জন" গ্রন্থখানির আজ এত সার্থকতা! 'দেশবন্ধু' চিত্তরঞ্জন চিরকাল স্বদেশগতপ্রাণ ছিলেন। স্বদেশীয় ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতির ছিলেন তিনি একনিষ্ঠ সাধক। বাহিরে ছিলেন তিনি 'দাশ সাহেব' বা 'সাহেব', কিন্তু অন্তরে ছিলেন তিনি খাঁটি বাঙালী—ভারতবাসী। স্বদেশবাসীর দুঃখদৈন্যের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিত অবিরাম; তিনি প্রচুর আয় করেন, সাধারণ মনোবৃত্তিসম্পন্ন হইলে বিপুল বিত্তের অধিকারী হইতে পারিতেন, কিন্তু তাহা তিনি হন নাই। তিনি যেমন প্রচুর আয় করিয়াছেন তেমনি স্বদেশবাসীদের মধ্যে দুই হাতে বিলাইয়া দিয়াছেন। তিনি 'হিসাবী' দাতা ছিলেন না। সব সময়ে যে, দান সুপাত্রে পড়িত তাহাও বলা যায় না। তাঁহার গভীর মানবপ্রীতির সম্মুখে এ সকল হিসাব বা বিবেচনা ছিল অতি তুচ্ছ। 'নরনারায়ণে'র প্রতি অফুরন্ত দরদ, অপরিসীম প্রেম তাঁহার সাহেবিয়ানার ভিতরে ফল্গুনদীর মত প্রবহমাণ ছিল। অসহযোগের 'সোনার কাঠি' স্পর্শে তাহা লোকচক্ষুর সম্মুখে অতি প্রবল হইয়া দেখা দিল। আমরা এই সময় রাজনীতি ক্ষেত্রেই চিত্তরঞ্জনকে প্রতিষ্ঠিত দেখি। কিন্তু রাজনীতিকে ভারতমাতার বন্ধনমুক্তির উপযোগী ও শক্তিশালী করিতে হইলে যে সর্বত্যাগব্রত প্রয়োজন ছিল,

চিত্তরঞ্জন নিজের জীবন দিয়া তাহা করিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মৃত্যুতে স্বল্প কথায় এই সত্যটিই প্রকাশ করিয়াছিলেন। বড়ই দুঃখের বিষয়, এমন মানবদরদী স্বদেশপ্রেমিক চিত্তরঞ্জনের জীবনকাহিনী রচনায় বাঙালী মনীষা অগ্রসর হয় নাই। আলোচ্য পুস্তকখানিতে এই অভাব পূরণের কথঞ্চিৎ প্রয়াস আছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম।

দেশবন্ধুর ছোটবড় কয়েকখানি জীবনী আছে। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁহার একখানি ইংরেজী জীবনী লেখেন খ্যাতনামা সাংবাদিক পৃথ্বীশচন্দ্র রায়। নানা কারণে এই সকল পুস্তকের অধিকাংশই আমাদিগকে পাঠ করিতে হইয়াছে। দেশবন্ধুর রাজনৈতিক কার্য্যকলাপের কথাই এ সমুদয়ে কমবেশী আলোচিত হইয়াছে। স্বদেশী যুগে বিপ্লব-আন্দোলনের সঙ্গে তাঁহার যোগাযোগের কথা অন্য সূত্রে জানিয়া লইতে হয়। কিন্তু 'দরদী' চিত্তরঞ্জন বা 'মানুষ' চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে যে সকল কাহিনী আমরা সে যুগে শুনিতাম, তিনি যে কত বড় দাতা, তাঁহার প্রাণ অপরের দুঃখে কত গভীর ভাবে ব্যাকুল হইয়া উঠে, নানা ঘটনার মধ্যে এ সমুদয় প্রকাশ পাইত ; আমরা শৈশবে ও কৈশোরে লোকমুখে ইহা শুনিতাম, শুনিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইতাম। এখন স্বীকার করি, তথাকথিত চিত্তরঞ্জন-জীবনী গ্রন্থগুলি ইহার অনুল্লেখে বড়ই অপূর্ণ বলিয়া মনে হইত। মানুষ চিত্তরঞ্জনকে বরাবর খুঁজিয়াছি, আলোচ্য পুস্তকখানি যে সে আকাঙ্ক্ষা খানিকটাও পূর্ণ করিতে পারিয়াছে এজন্য ইহাকে অভিনন্দিত করি। বিখ্যাত দাশ-পরিবারের নত খুঁটিনাটি তথ্য, আচার-আচরণের ধারা, সামাজিকতা, ঐতিহ্য প্রভৃতি—যাহা অন্যের পক্ষে জানা সম্ভবপর ছিল না, লেখিকা নিজ অভিজ্ঞতা হইতে তৎসমুদয় লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকৃত 'দেশবন্ধু'কে জানিবার ও বুঝিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। 'মানুষ' চিত্তরঞ্জন দেশমাতার সর্ব্বপ্রকার শ্রীবৃদ্ধিরই প্রয়াসী ছিলেন। বাংলার ভাষা সাহিত্য লোক-সংস্কৃতি—এক কথায় বাঙালী জীবনের বিভিন্নমুখী কল্যাণপ্রয়াসে তাঁহার দান ও কৃতি সর্ব্বদা স্মরণীয়। লেখিকা বিভিন্ন অধ্যায়ে এ সকল বিষয়ও বিবৃত করিয়াছেন। আবার 'মানুষ' চিত্তরঞ্জন রাজনীতিজ্ঞ, রাষ্ট্রনেতাও বটেন। লেখিকা স্বতঃই এ বিষয়টিরও আলোচনা করিয়াছেন। 'মানুষ' চিত্তরঞ্জন কতকগুলি বিষয়ে 'পাইওনীয়ার' বা অগ্রদূতের সম্মানের দাবি রাখেন। অসহযোগের মূল ভাবনা তাঁহাতেই প্রথম আসে। স্বরাজ্য দল গঠনের ভাবনা, কলিকাতা করপোরেশনের মত বিরাট পৌর প্রতিষ্ঠানকে দরিদ্র-নারায়ণের সেবা-প্রতিষ্ঠানে রূপায়ণ-প্রয়াস—এ সকলের কৃতিত্ব আর কাহার প্রাপ্য? চিত্তরঞ্জনের অসহযোগ-পরবর্ত্তী কার্য্যাবলীকে অনেকে 'নেতিবাচক' বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান, কিন্তু রচনাত্মক কার্য্যেও যে তাঁহার তৎপরতা কম ছিল না—সমসাময়িক ইতিহাস যাঁহারা আলোচনা করিবেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। চিত্তরঞ্জনের কৃতিত্ব ও গুণাপকর্ষের অপব্যাখ্যা আমরা অনেক উচ্চমহলেও দেখিতে পাই। কিন্তু এ সকল সর্ব্বথা নিন্দনীয়। 'মানুষ চিত্তরঞ্জনে' দেশবন্ধু-জীবনের বহু তথ্য যথাযথ বিবৃত হইয়াছে। একখানি পূর্ণাঙ্গ জীবনী-গ্রন্থের উপকরণ ইহার মধ্যে আছে। এ কারণেও পুস্তকখানির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার্য্য।

মহাসোভিয়েত—শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী। সিটিজেন্স, ৬ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। পৃ. ১৭৮। মূল্য তিন টাকা আট আনা। চিত্র-সম্বলিত।

সোভিয়েট রাশিয়া সম্বন্ধে একটা বিরূপ মনোভাব কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সাধারণের মধ্যে বলবৎ ছিল। রাশিয়া সম্পর্কে তথ্যবহুল রচনা, ত্রিশ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই আমরা পড়িয়া আসিতেছি। ওয়েব-দম্পতির বিখ্যাত পুস্তক, পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর সোভিয়েট-ভ্রমণ, রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠি সোভিয়েট রাষ্ট্রব্যবস্থার ভালর দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান রাশিয়ার বিরুদ্ধ প্রচারকার্য্য এত গভীর ও এরূপ ব্যাপক যে, তাহার মধ্যে ঐ সব প্রখ্যাত পণ্ডিত মনীষী ও কবিশ্রেষ্ঠের রচনাও তলাইয়া গিয়াছিল। এখন আবার রাশিয়ার দিকে জগদ্বাসীর নজর পড়িয়াছে। কেননা বিশ্বরাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সোভিয়েট রাশিয়ার শক্তি প্রবল বলিয়া প্রতীতি জন্মিতেছে। স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর ভারত রাষ্ট্রের সন্দেহ সোভিয়েট রাশিয়ার সম্পর্কে অনেকটা রদবদল হইয়াছে, আমরা সোভিয়েটকে 'বন্ধু'-রাষ্ট্র বলিয়া গণ্য করিতেছি। এখন ভারতবর্ষ হইতে প্রতিনিধিদল রাশিয়ায় আকছার যাইতেছেন, ওদেশ হইতেও আসিতেছেন ; রাষ্ট্রনেতারাও পারস্পরিক সম্প্রীতিসূচক উভয় দেশ 'পরিদর্শন' করিতেছেন। রাশিয়া সম্পর্কে বাংলায় পুস্তকে ও পত্রিকায়—প্রত্যক্ষদর্শীদের দ্বারা নানা তথ্যও পরিবেশিত হইতেছে।

আলোচ্য পুস্তকখানিও যে এইরূপ একটি রচনা, নাম হইতেই তাহা বুঝা যায়। তবে প্রচলিত পুস্তকগুলির অপেক্ষা এখানিতে বৈশিষ্ট্যও প্রচুর রহিয়াছে। লেখিকা মুখ্যতঃ সোভিয়েট-পরিভ্রমণে যান নাই, তিনি গিয়াছিলেন ১৯৫৫ সনে সুইজারল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত বিশ্বমাতৃসম্মেলনে অন্যান্য ভারতীয় মহিলা প্রতিনিধি সমভিব্যাহারে যোগ দিতে। সম্মেলনের কাজ হইয়া গেলে তিনি সোভিয়েট রাশিয়ায় যান। তাঁহার ও অন্যান্য ভারতীয় প্রতিনিধিদের ভ্রমণ-ব্যবস্থা সরকার পক্ষ হইতে করা হয় বটে, কিন্তু তাঁহাদের ইচ্ছামতই তাঁহারা কয়েকটি অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। এই বইখানিতে লেখিকা মস্কো, লেনিনগ্রাড এবং উজবেকিস্তানের অভিজ্ঞতার কথা বিবৃত করিয়াছেন। মস্কো ও লেনিনগ্রাডের কথা অন্যান্য রচনায়ও পাঠ করিয়াছি। বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলের বিষয় পণ্ডিত নেহরুর সাম্প্রতিক সফরের বৃত্তান্তের মধ্যেও জানিয়া লইয়াছি। কিন্তু উজবেকিস্তানের মত একটি মরুদেশ মাত্র ষোল-সতর বৎসরের ঐকান্তিক প্রয়াসে কেমন করিয়া এক সজলা সুফলা প্রান্তরে পরিণত হইয়াছে—এই কাহিনী পড়িয়া চমৎকৃত হইয়াছি। এই প্রসঙ্গে বার-তের বৎসর পূর্ব্বের কথা মনে পড়ে। যুদ্ধশেষের মুখে ড. মেঘনাদ সাহা প্রমুখ এক দল ভারতীয় বৈজ্ঞানিককে সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠান টেনেসি ভ্যালি পর্য্যবেক্ষণের জন্য। এই উপত্যকা ছিল সুবিস্তৃত মরু-প্রান্তর। বৈজ্ঞানিক উপায়ে এ প্রদেশ সুজলা সুফলা ও সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। এখানে আজ কমলালেবু সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের চাহিদা মিটাইয়া থাকে। ড. সাহা ১৯৪৫ সনে মেদিনীপুর সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতিরূপে যে দীপ্ত ও দীর্ঘ ভাষণ দিয়াছিলেন তাহা শ্রোতৃবর্গ মন্ত্রমুগ্ধবৎ শ্রবণ করেন এবং আমরা সব তথ্য জানিয়া বড়ই বিস্ময় বোধ করি। আলোচ্য পুস্তকখানিতে গ্রন্থকর্ত্রীর মরুময় উজবেকিস্তানের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনের কথা শুনিয়া পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছে। উজবেকিস্তান মুসলমান-অধ্যুষিত। এ স্থানের অধিবাসীরা যুগ-যুগ-সঞ্চিত সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার কাটাইয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্মের গোঁড়ামি, কুসংস্কারের অত্যাচার, অজ্ঞতার তামস কত অল্প সময়ের মধ্যে নূতন বিধানের প্রবর্ত্তনের বলে তাহারা কাটাইয়া উঠিয়াছে ভাবিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। কৃষি-শিল্পে দেশটি সমৃদ্ধ হইয়াছে। কারখানা স্থাপিত হইয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রচুর উৎপন্ন হইতেছে। সমগ্র রাশিয়ায় তুলা সরবরাহ হয় একদা ঊষর এবং বর্ত্তমানে উর্ব্বর উজবেকিস্তান হইতে। সাধারণ শ্রমিক নরনারী শিল্প কারখানায় শুধু শ্রম খাটাইয়াই ক্ষান্ত হয় না, এ সকল পরিচালনায়ও তাহাদের দায়িত্ব এবং কর্তৃত্ব স্বীকৃত। শ্রমিক নরনারীর স্বাস্থ্যরক্ষার আয়োজন যথেষ্ট। শিশু ও কিশোরদের খাদ্য, শিক্ষা প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত সহজেই চোখে পড়ে।

"মস্কোতে রবীন্দ্রনাথ"-রচয়িত্রীর বাচনভঙ্গী এবং বর্ণনা-পারিপাট্যের সঙ্গে প্রবাসীর পাঠক-পাঠিকা সুপরিচিত। 'মহাসোভিয়েট' পুস্তকেও তাঁহার রচনাশৈলীর অনুপম নিদর্শন চোখে পড়ে। তাহার লিপিকৌশলে সোভিয়েটের যে-যে অংশের কথা তিনি বর্ণনা করিয়াছেন তাহা যেন চোখের সম্মুখে চিত্রের মত প্রকট হইয়াছে। পুস্তকখানির বিষয়বস্তু অতি দরদ দিয়া লেখা। সোভিয়েটের অঞ্চলবিশেষে তিনি যেসব নূতন ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, স্থানে স্থানে স্বদেশের সঙ্গে তুলনা করিয়া তাহার মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা আমাদের বুঝাইয়া দিয়াছেন। পুস্তকখানির প্রকাশ সময়োপযোগীও বটে। ইহা পাঠে দেশবাসী উপকৃত হইবেন আমরা এই আশা পোষণ করি।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

অর্চ্চনা
শ্রীশ্রীমুনি সিং

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ

আরণ্য শোভা [ফোটো : শ্রীঅলক দে

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৭শ ভাগ ১ম খণ্ড } জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৪ { ২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

পশ্চিম বাংলার অবস্থা

নির্ব্বাচন ত হইয়া গিয়াছে। মন্ত্রীসভা নিয়োগও প্রায় সর্ব্বত্রই হইয়া গিয়াছে। এখন বাকী আছে কিছুদিনের মত নির্ব্বাচনের ফলাফল লইয়া বিভিন্ন দলের বড়কর্ত্তাদের বাজে বক্তৃতা ও তাহারই পথেঘাটে চর্ব্বিতচর্ব্বণ। দেশের দুরবস্থা বর্দ্ধিতই হইবে এবং দেশের লোকের দুঃখকষ্টও উত্তরোত্তর বাড়িবে।

নির্ব্বাচনে কলের পুতুলের মত চালিত হইলেই এইরূপ ঘটে। দুইবার একই রকম হইল এবং অপর বারও এইরূপই ঘটিবে যদি না দেশের লোকের চৈতন্য উদয় হয়। যদি না হয় তবে বাঙালীর দুর্গতির সীমা থাকিবে না। এখনই ত ভারতে তাহার স্থান সর্ব্ব-পশ্চাতে—সর্ব্বনিম্নে, এমনই যোগ্য লোকদের আমরা প্রতিনিধি-রূপে বা অধিকারীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি।

অন্যান্য প্রদেশের মধ্যে কেরলে এক নূতন ব্যবস্থার পরীক্ষা চলিতেছে, সেখানে শুধুমাত্র বলা যায় "ফলেন পরিচীয়তে।" কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা সম্বন্ধে আমাদের বলিবার অধিকার নাই, কেননা লোকসভায় আমাদের ওজন কম এবং ব্যক্তিত্ব হিসাবে গণ্যমান্য লোকও আমরা এবার বিশেষ পাঠাই নাই। সুতরাং যেখানে, ভারের অভাবের সঙ্গে ধারেরও অভাব যুক্ত হইয়াছে সেখানে কোনও কথা বলা আমাদের পক্ষে অনধিকারচর্চ্চা। বুদ্ধিমান বাঙালীর বুদ্ধির পরিচয় এমনই হইয়াছে লোকসভায়! কাজে কাজেই ঘরের কথা আলোচনা করাই শ্রেয়ঃ, যদিও তাহাতেও কোন কাজ অগ্রসর হইবে না।

এই যে নূতন বাজেটে বাঙালী মধ্যবিত্তের গঙ্গাপ্রাপ্তির ব্যবস্থা হইতেছে সে বিষয়ে আমাদের প্রান্তীয় সরকার ত একেবারে নাচার। কেননা ভিক্ষার ঝুলি যাহার সম্বল, যাহার পরভৃবৃত্তির উপর নির্ভর, সে কোন্ সাহসে কেন্দ্রীয় সরকারকে ঘাঁটাইবে? যাহার মুখপাত্র বলিতে কেহ নাই, লোকসভায় তাহার মতামতেরই বা কি মূল্য?

যদি মূল্য কিছু থাকিত তবে বলিতাম এখন প্রত্যেক প্রতিনিধির কাছে হাজার হাজার চিঠি যাওয়া প্রয়োজন যে, অর্থদপ্তর-মন্ত্রী কৃষ্ণমাচারীর নিকট প্রতিশ্রুতি আদায় কর—দেশের লোকের রক্তমাংস শুষিয়া এই যে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় ঘৃতাহুতি দেওয়ার আয়োজন হইতেছে, তাহার বজ্রকাল পূর্ণ হইলে—অর্থাৎ ১৯৬১ সনে—বাংলা ও বাঙালী পূর্ণরূপে সচ্ছল ও সাবলীল ভাব পাইবে। অন্যথায় এই আকাশকুসুমে প্রয়োজন নাই। এবং যদি কোনরূপ প্রতিশ্রুতিই না পাওয়া যায় তবে বাংলা দেশে আইন অমান্য আন্দোলনের পূর্ণ আয়োজন আরম্ভ করিতে হইবে।

প্রথম আইন অমান্য আন্দোলনে ও লবণ আন্দোলনে পশ্চিম-বঙ্গই শেষ পর্য্যন্ত লড়িয়াছিল সকল বাধা-বিঘ্ন, অত্যাচার ও দমন-নীতি অগ্রাহ্য করিয়া। অবশ্য তখনকার আন্দোলনে নেতৃত্ব ছিল অন্যরূপ, এবং কংগ্রেসও এইরূপ জাহান্নামে যায় নাই।

যাহাই হউক, সে সব কথা এখন অবান্তর। এখন প্রথম কথা হইল, দেশের যে শ্রাদ্ধের আয়োজন চলিতেছে সে বিষয়ে করা হইবে কি? মন্ত্রীসভার তালিকা ও দপ্তরের ফিরিস্তি এইবারেরই "বিবিধ প্রসঙ্গে" অন্যত্র দেওয়া হইয়াছে। যোগ্য লোক যে তাহাতে নাই তাহা নহে, কিন্তু দপ্তরগুলির বাঁটোয়ারা নিরীক্ষণ করিয়া মনে হয় যে, এবার শ্রাদ্ধ গড়াইবে আরও অধিক। কেন মনে হইতেছে তাহাও কিছু বলা দরকার।

পশ্চিমবঙ্গে শান্তি-শৃঙ্খলার ব্যাপার এমনিই শোচনীয়। কাগজে নানাপ্রকার স্তোকবাক্য প্রকাশিত হয়, কিন্তু আমাদের মত ভুক্তভোগী মাত্রেই জানে যে, এদেশে অসংখ্য চুরি-চামারি—এমন-কি খুনজখম—নিরন্তর ঘটিতেছে যাহার কোন কিনারাও হয় না এবং তাহার সংবাদও প্রকাশিত হয় না। দেশে নিরাপত্তা বলিয়া কোনও কিছু নাই। এমত অবস্থায় পুলিস ও সংরক্ষণের ভার পাইল কে তাহা দেখুন!

শিক্ষায় বাঙালী ছিল কোথায় এবং গত নয় বৎসরে নামিয়া দাঁড়াইয়াছে কোথায়? এ অবস্থায় সে-দপ্তরে ডাক্তার রায়ের ষষ্ঠাংশ মাত্র যথেষ্ট!

বাংলার পথ-ঘাটের অবস্থা যে কি তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। শুধুমাত্র ইহা বলিলেই হইবে যে, ভারতের বৃহত্তম নগরী কলিকাতার উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব্ব-পশ্চিমের দশটি বৃহৎ রাজপথের পঞ্চাশ মাইল বিস্তৃতিতে কোথায়ও দুই শত গজ পথ নাই যাহা পূর্ণ মেরামতি অবস্থায় আছে। বাঙালীর গৃহ ও বাসস্থান ত এখন বস্তীতে ও ভগ্ন কুটীরে। এমত অবস্থায় পূর্ত্ত, গৃহ ও বাসস্থানের দপ্তর পূর্ব্ববৎ রাখাই ঠিক হইয়াছে। কেননা দেশের সন্তানের চিতা সাজানো যখন চলিতেছে তখন তাহার দেশের পথঘাট ও ঘরবাড়ী শ্মশানে পরিণত হওয়াই শ্রেয়ঃ।

পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যসঙ্কট

পশ্চিমবঙ্গ পুনরায় এক ভয়াবহ খাদ্যসঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে। প্রায় প্রতি জেলা হইতেই অন্নাভাবের সংবাদ আসিতেছে। অবস্থা যেরূপ তাহাতে রাজ্যে নূতন করিয়া দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে বিস্মিত হইবার কিছু থাকিবে না। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসরকার বলিয়াছেন, খাদ্যপরিস্থিতিতে শঙ্কিত হইবার কারণ নাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বলিয়াছেন, বর্ত্তমান খাদ্যসঙ্কটের মূলে রহিয়াছে বন্যাজনিত ফসলহানি এবং মজুতদারী। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা মুদ্রাস্ফীতিরও উল্লেখ করিয়াছেন। মজুতদারী যদি বর্ত্তমান খাদ্যসঙ্কটের অন্যতম প্রধান কারণ হইয়া থাকে তবে মজুতদারদিগকে তাঁহাদের মজুত চাউল ন্যায্যমূল্যে বিক্রয় করিতে বাধ্য করা এবং খাদ্যশস্য মজুত রাখিয়া কালোবাজার সৃষ্টিতে উৎসাহ দেওয়ার জন্য তাহাদিগের কঠোর শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সরকার এ বিষয়ে কি করিয়াছেন তাহা সাধারণ এখনও জানে না।

প্রায় সর্ব্বত্রই খাদ্যসঙ্কট তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে। মুর্শিদাবাদের কান্দী মহকুমার দুরবস্থা দৈনিক সংবাদপত্রে বিস্তারিত প্রকাশিত হইয়াছে। মফস্বল হইতে প্রকাশিত যে সকল সংবাদপত্র আমাদের নিকট আসে, বিভিন্ন স্থানে খাদ্যসঙ্কট সম্বন্ধে তাহাদের কয়েকটির অভিমত আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এই সকল বর্ণনা হইতে খাদ্যাভাবের গভীরতার ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে।

বর্দ্ধমান হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক "দামোদর" পত্রিকা "সাতান্নর মন্বন্তর" শীর্ষক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ৩রা মে লিখিয়াছেন, "সরকার পূর্ব্ব হইতে সচেতন ও সাবধান হইলেন না,—এদিকে বর্দ্ধমানের ন্যায় জেলার নানা স্থানে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া নামিয়া আসিয়াছে। অতর্কিতে এই বিপদ আসে নাই—সময়মত বিজ্ঞপ্তি দিয়াই আসিয়াছে। সরকারের এ কথা অজানা নহে যে, এই জেলার কোন কোন অংশে উপর্য্যুপরি তিন বৎসর ব্যাপকভাবে শস্যহানি হইয়াছে। অধিকাংশ স্থলেই অনাবৃষ্টির জন্যও এবং বিগত বন্যা ও জলপ্লাবনে যেরূপ ব্যাপকভাবে শস্যহানি হইয়াছে—এরূপ সচরাচর দেখা যায় নাই। ধান্য ও চাউলের দর হু হু করিয়া বাড়িয়া বর্ত্তমানে সাধারণ মানুষের নাগালের বাহিরে। যে শস্য জন্মিয়াছে তাহার মধ্যে দরিদ্র চাষী ধান উঠিবার পরই ক্ষুধার অন্ন হইতে দেনা শোধ করিয়াছে। মধ্যবিত্ত চাষী সংসারের জন্য বাধ্য হইয়া ধান নিঃশেষ করিয়াছে এবং যাঁহারা সঙ্গতিসম্পন্ন, শত শত মণ ধান্য যাঁহারা মড়াই বাঁধিয়া লাভের আশায় রাখেন, এ বৎসর দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শুনিয়াই বর্ত্তমান মোটা দরে ধান্যলক্ষ্মীকে বিদায় দিয়া থোক টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিতেছেন। পল্লী-অঞ্চলে কোথাও কোথাও এমন অবস্থা হইয়াছে যে, টাকা দিয়াও ধান্য পাওয়া যাইতেছে না। এই ত সবেমাত্র বৈশাখ চলিতেছে, ইতিমধ্যেই ধানের দর ১৪।০ টাকা এবং চাউলের দর ২৫ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। পল্লী-অঞ্চলের ক্ষেতমজুর, দরিদ্র চাষী, মধ্যবিত্ত এমনকি এক শত বিঘা জমির মালিকের বাড়ীতেও ধান্য নাই। সম্মুখে বর্ষা আসিতেছে, আগামী ফসল উঠিতেও অন্ততঃপক্ষে ছয় মাস লাগিবে। কিন্তু এই দারুণ বিপদকে দেশ কেমন করিয়া কাটাইয়া উঠিবে?"

মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক "ভারতী" পত্রিকা ২রা মে এক দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধে জঙ্গীপুর মহকুমার শোচনীয় খাদ্যপরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করিয়া লিখিতেছেন যে, মুর্শিদাবাদ জেলায় সুনিশ্চিতভাবে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া পড়িয়াছে। জঙ্গীপুর মহকুমার পরিস্থিতি বর্ণনা সম্পর্কে "ভারতী" লিখিতেছেন,

"অতিবৃষ্টি, অসময়ে বৃষ্টি ও প্লাবনের ফলে এই মহকুমারও বিভিন্ন অঞ্চল বিশেষ করিয়া সমসেরগঞ্জ, ফরাক্কা ও সুতি থানায় বহু স্থানে এবার বিপুল শস্যহানি ঘটিয়াছে। রাঢ় অঞ্চলেও এবার ফসল অন্যান্য বছরের তুলনায় অর্দ্ধেকেরও কম হইয়াছে। রবিশস্য মহকুমার সর্ব্বত্রই ব্যাপকভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। শীতকালীন ঝড়বৃষ্টির ফলে এই মহকুমায় প্রায় পাঁচ হাজার গরু ও মহিষ প্রাণ হারাইয়াছে। আম ও কাঁঠালের বাগানে কোন ফলই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না ও সর্ব্বশেষে প্রচণ্ড রৌদ্রতাপে এবং দীর্ঘদিন বৃষ্টির অভাবে মহকুমার দিয়াড় অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকার সমস্ত জমি ধান শুকাইয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহার উপর প্রতিদিনই অগ্নিকাণ্ডের ফলে গ্রামাঞ্চলের লোকের ক্ষয়ক্ষতি লাগিয়াই আছে। এই অবস্থায় এই মহকুমার মানুষ আজ সম্পূর্ণ নিঃসহায় ও বিপন্ন। এখনই এতদঞ্চলে চালের দর ২৩।২৪ টাকা মণ, কাজেই আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে যে এই দর কি দাঁড়াইবে তাহা সঠিকভাবে অনুমান না করা গেলেও চাল যে অধিকতর দুর্মূল্য হইবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। অন্যান্য বৎসর এই মহকুমার সংলগ্ন বীরভূম এলাকা হইতে প্রচুর চাল-ধান আমদানী হইয়া থাকে। কিন্তু এ বৎসর বীরভূমেই যেরূপ খাদ্যাভাব তাহাতে সেদিক হইতেও খাদ্য আমদানী হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। এ ছাড়া মহকুমার সীমান্ত অঞ্চলের গলিপথে প্রতিনিয়তই যে খাদ্যবস্তু পাকিস্থানে পাচার হইতেছে তাহার পরিমাণও বড় কম নহে।"

"মুর্শিদাবাদ পত্রিকা" লিখিতেছেন যে, মুর্শিদাবাদ অনেকদিন হইতেই খাদ্যের দিক হইতে ঘাটতি জেলা। এতদিন পার্শ্ববর্ত্তী বর্দ্ধমান ও বীরভূম জেলা হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানী করিয়া জেলার খাদ্যশস্যের ঘাটতি মিটান হইত। এবারে বন্যা এবং পরে অনাবৃষ্টির ফলে মুর্শিদাবাদে প্রায় কোন ফসলই হয় নাই, উপরন্তু পার্শ্ববর্ত্তী জেলাগুলিতেও ফসল হয় নাই। গৃহস্থের ঘরে যাহা কিছু সঞ্চিত ছিল বন্যায় সে সকল গিয়াছে। এ অবস্থায় আশু ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে মুর্শিদাবাদে দুর্ভিক্ষ রোধ করা প্রায় অসাধ্য হইয়া পড়িবে।

দৃষ্টান্ত আর বাড়াইয়া লাভ নাই। পশ্চিমবঙ্গের সর্ব্বত্রই খাদ্যপরিস্থিতি প্রায় একই প্রকার। সরকার দুর্গত অঞ্চলে টেষ্ট

রিলিফের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, উহা ভাল কথা। কিন্তু সরকারী আচরণ এবং কর্ম্মপদ্ধতি দেখিয়া মনে হয় না যে, তাঁহারা সমস্যার প্রকৃত রূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

খাদ্য-পরিস্থিতির প্রতিকার

পশ্চিম বাংলার খাদ্য-পরিস্থিতি দিন দিন শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অভিমত এই যে, যদিও প্রদেশের কোনও কোনও জায়গায় ধান-উৎপাদন ভালরকম হয় নাই, তথাপি খাদ্য-পরিস্থিতি তেমন আশঙ্কাজনক কিছু নয়। কতকগুলি জেলায় সম্ভবপর সাহায্যকার্য্য সুরু করা হইবে বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং প্রায় ১২টি জেলায় কিছু পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত বণ্টন-ব্যবস্থা প্রচলন করা হইবে। খাদ্যমন্ত্রীর হিসাবমত নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও অন্যান্য বন্যাপ্লাবিত জেলাগুলির উৎপাদন-ব্যর্থতা সত্ত্বেও এই বৎসর পশ্চিম বাংলায় মোট ৪২ লক্ষ টন ধান উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার ১০ শতাংশ বীজ ও অপচয় বাবদ বাদ দিলে আভ্যন্তরিক খরচের জন্য থাকে প্রায় ৩৮ লক্ষ টন এবং গত বৎসরের তুলনায় ইহা ৩ লক্ষ টন বেশী। তাঁহার হিসাবমত বর্ত্তমানে পশ্চিম বাংলার জনসংখ্যা প্রায় ২ কোটি ৮০ লক্ষ এবং বৎসরে গড়পড়তায় মাথাপিছু ৪ মণ ১০ সের হিসাবে বাংলা দেশের মোট প্রয়োজন ৪২ লক্ষ টন। সুতরাং মোট ঘাটতির পরিমাণ হইবে ৪ লক্ষ টন। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া পশ্চিম বাংলা বৎসরে প্রায় দেড় লক্ষ টন করিয়া চাউল অন্যান্য প্রদেশ হইতে আমদানী করে, কিন্তু প্রায় সমপরিমাণ চাউল বাংলা দেশের বাহিরে রপ্তানী করিত।

কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, কাগজেকলমে হিসাব দেখান সোজা এবং সেই কারণে হিসাব ঠিক থাকিলেও আসলে জিনিষের (অর্থাৎ ধানের) ঘাটতি আছে। চাউলের মূল্য কোন কোন জেলায় প্রায় ৩০ টাকা মণে দাঁড়াইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষের কৈফিয়ত এই যে, জমির মালিকরা চাউল ধরিয়া রাখিয়াছে চড়া দামে বিক্রয় করিবার আশায়, ইহা অবশ্য সম্ভবপর। কিন্তু ইহার প্রতিকার-ব্যবস্থা সরকার কি অবলম্বন করিয়াছেন? ইহার দুইটি প্রতিকার-ব্যবস্থা আছে। প্রথমতঃ, যাহা পাকিস্থান সরকার অবলম্বন করিয়াছেন; অর্থাৎ সৈন্য দ্বারা গ্রামের সমস্ত বাড়ী তল্লাসী করা এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধান, কিংবা চাউল পাইলে তাহার জন্য যথোপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারতবর্ষ অবশ্য এইরূপ কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে রাজী হইবে না। দ্বিতীয় উপায় হইতেছে যে, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ হইতে এবং প্রয়োজন হইলে ভারতবর্ষের বাহির হইতে প্রচুর পরিমাণে চাউল আমদানী করা। আভ্যন্তরিক চোরাগুপ্তাকে হঠাইতে হইলে প্রয়োজন প্রচুর সরবরাহ রক্ষা এবং তাহার জন্য চাউল আমদানী করা। চাউলের প্রচুর সরবরাহ থাকিলে জমির মালিকরা আর গুপ্তভাবে চাউল জমাইয়া রাখিবে না। পাকিস্থানে বর্ত্তমানে চাউলের খুবই অভাব, সুতরাং সেখানে গুপ্তভাবে চাউল অবশ্যই চালান যাইতেছে, এ সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তৃপক্ষের আরও সজাগ ও সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

পশ্চিম বাংলার খাদ্যমন্ত্রীর হিসাব অনুসারে প্রায় তিন লক্ষ চাষী ছয় লক্ষ মণ ধান আটক করিয়া রাখিয়াছে ভবিষ্যতে চড়া দামে বিক্রয় করিবার আশায়। পশ্চিম বাংলায় চাউলের অভাবের কারণ যাহাই হউক না কেন, ইহার সত্বর প্রতিবিধান করা প্রয়োজন, তাহা না হইলে জনসাধারণের অনাহারে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিবে। তবে নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে তাহা ব্যর্থ হইয়া যাইবে, কারণ তাহাতে চোরাকারবার আরও বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া আমদানী দ্বারা সরবরাহের প্রাচুর্য্য বজায় রাখা প্রয়োজন। বর্ত্তমানে চাউলের ঘাটতি হইতে দুইটি জিনিষ প্রতীয়মান হয়। প্রথমতঃ, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা খাদ্য উৎপাদনে ভারতকে স্বাবলম্বী করিতে পারে নাই, শুধু তাহাই নহে বহু-বিঘোষিত নদী-পরিকল্পনাগুলিও দেশের মানুষকে এবং কৃষিকে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় (যথা, বন্যা) হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। নদী-পরিকল্পনার পরিকল্পনাতেই যেন গলদ আছে এবং গত দুই বৎসরের বন্যার ধ্বংসলীলা দেখিয়া প্রশ্ন জাগে যে, নদী-পরিকল্পনার কার্য্যকারিতা বাস্তবিক পক্ষে কতখানি আছে। ১৯৫৬ সনে যে ভীষণ বন্যা বাংলাদেশের কয়েকটি জেলায় ঘটিয়াছে, তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে নদী-পরিকল্পনাগুলি যদি নাও থাকিত তাহা হইলেও ইহার চেয়ে ভীষণতর কিছু হইতে পারিত না। দ্বিতীয়তঃ, খাদ্যশস্যের পরিসংখ্যান ব্যাপারে যথেষ্ট গোঁজামিল আছে, তাই কাগজেকলমের হিসাব বাস্তবে কার্য্যকরী হয় না।

কেন্দ্রীয় বাজেট

এ বৎসরের কেন্দ্রীয় বাজেট কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর শ্যেনদৃষ্টির আঘাতে জর্জ্জরিত, তিনি দেশের কোন স্তরের লোককেই তাঁহার করবাণের আঘাত হইতে রেহাই দেন নাই। ক্ষমতা থাকা এক জিনিষ, তাহার অপব্যবহার অন্য জিনিষ। অর্থমন্ত্রী গাওনা গাইয়াছেন যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে বাঁচাইতে হইলে এইরূপ ব্যাপক ভাবে করজাল বিস্তার ব্যতীত তাঁহার আর কোন গত্যন্তর ছিল না। তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য মানুষকে বাঁচানো নয়, পরিকল্পনাকে বাঁচানো। অর্থকে সবাই বোঝে, কিন্তু অর্থনৈতিক ব্যাপারকে সবাই বোঝে না, এবং বোঝে না বলিয়াই যত অনর্থের সৃষ্টি হয়। ১৯৫৬ সনের বাজেট হইতেই কর্ত্তৃপক্ষ অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় দিয়া আসিতেছেন এবং এক ভুলের কুফলকে চাপিতে গিয়া আরও ভুল করিয়া বসিতেছেন। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দোহাই দিয়া আইনপরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ সভাবৃন্দ দ্বারা বাজেট গৃহীত হইতে পারে, কিন্তু তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়কে প্রতিরোধ করা সম্ভবপর নহে।

উৎপাদক দ্রব্য ব্যতীত ও ব্যবহারিক দ্রব্যের উপর যে উচ্চহারে

কর বসান হইল তাহাতে দ্রব্যমূল্য অতিরিক্ত অনুপাতে বৃদ্ধি পাইতে বাধ্য। শুধু যে চা চিনি প্রভৃতির মূল্য বৃদ্ধি পাইবে তাহা নহে, ইহাদের মূল্যবৃদ্ধির প্রভাবে সমস্ত জীবনযাত্রার মান দুর্মূল্য হইয়া উঠিবে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা যখন বাস্তব ভিত্তি ত্যাগ করিয়া কল্পনাপ্রবণ হইয়া ওঠে তখন তাহা জাতির পক্ষে দুঃখময় হইয়া উঠে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য আগামী বৎসর সরকারী ক্ষেত্রে ৯০০ শত কোটি টাকা খরচ করা হইবে এবং সেই টাকা সংগ্রহের জন্য এই করজালের বেড়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। এবারকার নূতন বাজেটে বহু প্রকার কর সৃষ্টি করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে ধনকর ও ব্যয়কর বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। রেলপথের উপরও যাত্রীবহন ও মালবহন উভয় মূল্য ৫ হইতে ১৫ শতাংশ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ধনকর স্থাপনের প্রধান কারণ এই যে, বর্ত্তমানে যে আয়করের ব্যবস্থা আছে তাহার দ্বারা প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণের করপ্রদান ক্ষমতার যথাযথ বিচার সম্ভবপর হয় না এবং সেই কারণে আয়করকে ন্যায়সঙ্গত করিবার জন্য ধনকর স্থাপন করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা নাকি আয়কর ফাঁকি খানিকটা বন্ধ করা যাইবে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি, অবিভক্ত হিন্দু যৌথ সম্পত্তি এবং কোম্পানী সম্পত্তির উপর এই কর ধার্য্য করা হইবে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির ক্ষেত্রে যেখানে সম্পদমূল্য দুই লক্ষ টাকার উর্দ্ধে এবং অবিভক্ত হিন্দু যৌথ সম্পত্তির ক্ষেত্রে যেখানে সম্পত্তির মূল্য তিন লক্ষ টাকার উর্দ্ধে সেখানে প্রথম দশ লক্ষ টাকার সম্পত্তির উপর অর্দ্ধ-শতাংশ হারে কর প্রদান করিতে হইবে, তার পরের দশ লক্ষ টাকার উপর এক শতাংশ হারে এবং বাদবাকী সম্পত্তির মূল্যের দেড় শতাংশ হারে কর ধার্য্য করা হইবে। কোম্পানীর সম্পত্তির ক্ষেত্রে পাঁচ লক্ষ টাকার সম্পত্তি পর্য্যন্ত অব্যাহতি পাইবে। কিন্তু এই ধনকরের আওতা হইতে কয়েকপ্রকার সম্পত্তিকে বাদ দেওয়া হইয়াছে, যথা : কৃষিজমি, ধর্ম্ম কিংবা দানসংক্রান্ত ট্রাষ্ট সম্পত্তি, জীবনবীমার টাকা ইত্যাদি। তবে মোট পঁচিশ হাজার টাকার মূল্য পর্য্যন্ত সম্পত্তি রেহাই পাইবে। ট্রাষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে; বহুক্ষেত্রে আয়করকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য ট্রাষ্ট সম্পত্তি সৃষ্টি করা হয়। যদিও ইহা আইনতঃ ট্রাষ্ট সম্পত্তি কিন্তু কার্য্যতঃ ইহা ব্যক্তিগত সম্পত্তি মাত্র এবং এইপ্রকার সম্পত্তি হইতে ব্যক্তিরাই আয় ভোগ করে। কার্য্যতঃ দুই লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের সম্পত্তিও রেহাই পাইবে।

এবারকার বাজেটে আর একটি নূতন প্রত্যক্ষকর স্থাপন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, ইহা ব্যয়কর। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্ ক্যাল্ডরের অনুমোদনের উপর ভিত্তি করিয়া এই ব্যয়কর ধার্য্য করা হইবে। এই করব্যবস্থা ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ নূতন এবং পৃথিবীর অন্য কোন দেশেও ইহার প্রচলন আছে বলিয়া শোনা যায় না। ভারতবর্ষে ইহা একটি নূতন অভিজ্ঞতা। যে সকল ব্যক্তিগত সম্পত্তির মূল্য আয়করের জন্য নির্দ্ধারিত বৎসরে ষাট হাজার টাকার অন্যূন সেই সকল সম্পত্তির উপর এই কর আরোপিত হইবে।

বাৎসরিক খরচের উপর ক্রমবর্দ্ধিত হারে কর আদায় করা হইবে। ১০ হাজার টাকা খরচ পর্য্যন্ত ১০ শতাংশ হারে কর ধার্য্য হইবে, ১০ হাজার হইতে ২০ হাজার টাকা পর্য্যন্ত খরচের উপর ২০ শতাংশ হারে, ২০ হাজার হইতে ৩০ হাজার টাকার বাৎসরিক খরচের উপর ৪০ শতাংশ হারে, এবং বাৎসরিক খরচ ৫০ হাজার টাকার অধিক হইলে করের হার হইবে শত শতাংশ।

সুতরাং নূতন বাজেট অনুসারে ভারতবর্ষে প্রত্যক্ষকর হইবে : আয়কর, সম্পদাশুল্ক, ধনকর ও ব্যয়কর। ধনকর ও ব্যয়কর পরস্পরবিরোধী, অর্থাৎ ব্যয় বেশী হইলে তাহার জন্য অধিক হারে কর দিতে হইবে, কিন্তু ব্যয় কম হইলে ধনবৃদ্ধি হইবে এবং অতিরিক্ত ধনবৃদ্ধির জন্য কর দিতে হইবে। অর্থাৎ ব্যয় করিলেও কর দিতে হইবে, না করিলেও কর দিতে হইবে, ধনকর ও ব্যয়কর পরস্পর প্রতিরোধক ও পরিপূরক। কিন্তু বিষয়টি কার্য্যতঃ অত সোজা হইবে না, কারণ ধনকরের আওতা হইতে এত বিষয়কে বাদ দেওয়া হইয়াছে যে জনসাধারণ ব্যক্তিগত ব্যবহারিক খরচ কমাইয়া সেই সকল বিষয়ে সম্পত্তি ক্রয় করিবে যেগুলি ধনকরের ব্যতিক্রমের মধ্যে পড়ে। ইহাতে দেশের লোকের টাকার জমা বৃদ্ধি পাইবে, কিন্তু শিল্প-মূলধন বৃদ্ধি (যাহার বৃদ্ধি দেশের পক্ষে বর্ত্তমানে অতীব প্রয়োজনীয়) সেই পরিমাণে ব্যাহত হইবে।

নূতন বাজেটে করধার্য্য-ব্যবস্থার মোট ফলাফল দেখা যায় যে, ধনিকশ্রেণীর উপর হইতে করভার লাঘব করিয়া দিয়া মধ্যবিত্ত-শ্রেণী ও নিম্নমধ্যবিত্তশ্রেণীর উপর প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ করভারের বেড়াজাল ব্যাপকভাবে বিস্তৃত করা হইতেছে। আয়করের ন্যূনতম সীমা ৪,২০০ টাকা হইতে বাৎসরিক আয়ের ন্যূনতম সীমা ৩,০০০ টাকায় নামাইয়া আনা হইয়াছে, ইহার ফলে যাহার মাসিক আয় ২৫০৲ টাকার কিঞ্চিদধিক তাহাকেও কর দিতে হইবে। কিন্তু আয়কর ও অতিরিক্ত আয়করের উচ্চতম হারকে হ্রাস করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অনুপার্জ্জিত আয়ের উপর হইতে করের হার ৯২ শতাংশ হইতে বর্ত্তমানে উচ্চতম হার ৮৪ শতাংশে হ্রাস করা হইয়াছে এবং উপার্জ্জিত আয়ের উপর উচ্চতম করের হার ৯২ শতাংশ হইতে ৭৭ শতাংশে নামাইয়া আনা হইয়াছে ইহার ফলে নাকি দেশে শিল্পমূলধন বৃদ্ধি পাইবে, অন্ততঃ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তাহাই মনে করেন।

পরোক্ষ করব্যবস্থাকে এমন ব্যাপকভাবে বিস্তৃত করা হইয়াছে যে, আপামর জনসাধারণ ইহার আওতায় পড়িবে। দেশলাই, চা, চিনি, পোষ্টকার্ড, কাগজ, কেরোসিন তেল, রেলের ভাড়া বৃদ্ধি প্রভৃতি বেশ প্রবল ভাবেই জনসাধারণকে নিষ্পেষণ করিবে। শুধু কেন্দ্রীয় করবৃদ্ধিই শেষ কথা নহে, ইহার পরে আছে প্রাদেশিক করব্যবস্থা, মূল্যবৃদ্ধি ও জীবনমান মূল্যবৃদ্ধি। কর্ত্তৃপক্ষের শত চেষ্টা সত্ত্বেও আজ দ্রব্যমূল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধির দিকে। গত বৎসরের তুলনায় পাইকারী মূল্যমান প্রায় ৩৫ পার্সেণ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। কেবলমাত্র খাদ্যদ্রব্যের মূল্য ৪৭ পার্সেণ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং চাউলের মূল্য

বৃদ্ধি পাইয়াছে ৮১ পয়েণ্ট। ভবিষ্যতে খাদ্যশস্য সরবরাহের অবস্থা তেমন আশাপ্রদ নহে এবং মূল্য আরও বৃদ্ধি পাইবে।

দেশে ঘাটতি ব্যয়ের ফলে মুদ্রাস্ফীতি হইতেছে এবং ভবিষ্যতে আরও হইতে বাধ্য। সরকারী চিন্তাধারা পরস্পরবিরোধী, যথা, মুদ্রাস্ফীতিকে প্রতিরোধ করিতে হইলে ব্যবহারিক দ্রব্য অধিক পরিমাণে আমদানী করা প্রয়োজন, কিন্তু কর্তৃপক্ষ ব্যবহারিক দ্রব্যের আমদানী ক্রমশঃ কমাইয়া দিতেছেন এবং ইহার ফলে শুধু যে মূল্যমান আরও বৃদ্ধি পাইবে তাহা নহে, রাষ্ট্রের আমদানী শুল্কও বহুলাংশে হ্রাস পাইবে। বাজেটের হিসাব অনুযায়ী সরকারের প্রায় ৩৩ কোটি টাকা মাত্র ঘাটতি পড়িতেছিল এবং এই টাকা কিছু পরিমাণে উচ্চ আয়ের উপর প্রত্যক্ষকর বৃদ্ধি দ্বারা এবং কিছু পরিমাণে জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ হিসাবে গ্রহণ করিয়া ঘাটতি মিটানো সম্ভবপর হইত। ৩৩ কোটি টাকা ঘাটতি মিটানোর জন্য অর্থমন্ত্রী তুলিতেছেন প্রায় ৮৮ কোটি টাকা এবং তাহার জন্য অধিকাংশ অবশ্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের উপর করধার্য্য হইতেছে যাহার ফলে দেশের সমস্ত অর্থনৈতিক জীবন আজ বিক্ষুব্ধ ও আলোড়িত।

আসানসোলে পুলিশ অফিসারের রহস্যজনক মৃত্যু

আসানসোল থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা মতিলাল সরকারকে এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময় একরাত্রে বুলেটবিদ্ধ অবস্থায় মৃত দেখিতে পাওয়া যায়। সংবাদে প্রকাশ যে, শ্রীসরকার রাত্রে ডিউটিতে বাহির হইবার পর আর ফিরিয়া আসেন নাই। করোনার তাহার রায়ে বলিয়াছেন যে শ্রীসরকার সম্ভবতঃ আত্মহত্যা করিয়াছেন। কিন্তু পুলিশের ধারণা ইহা আত্মহত্যা নহে, একটি খুন।

থানা অফিসারের এইরূপ রহস্যজনক মৃত্যু সম্পর্কে এক সম্পাদকীয় আলোচনায় স্থানীয় সাপ্তাহিক "বঙ্গবাণী" লিখিতেছেন, "এই মৃত্যু যদি হত্যা হইয়া থাকে (ঘটনা দেখিয়া যাহা অনেকের মনে বিশ্বাস) তাহা হইলে প্রকৃত দোষীর এত দিনে ধরা পড়া উচিত ছিল।"

হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে পুলিশী তদন্তের মামুলি রীতির সমালোচনা করিয়া "বঙ্গবাণী" লিখিতেছেন,

"অনেক সময় পুলিশ কেসে মুখরক্ষার জন্য দুর্ব্বল ও অপ্রচুর প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও একজনকে ধরিয়া চালান দেওয়া হয় এবং নিম্ন ও দায়রা আদালতে কয়েক মাস মোকদ্দমা চলার পর এই ব্যক্তি দুর্ব্বল ও অপ্রচুর প্রমাণের ফাঁকে সন্দেহের অবকাশে খালাস পাইয়া বাহির হইয়া আসে। অনেক পুলিশ-মোকদ্দমাতেই এই প্রকার হইতে দেখা যায়। কয়েক মাস পরে এই তথাকথিত আসামী যখন মুক্তিলাভ করে তখন জনসাধারণ হয়ত ঘটনার কথা ভুলিয়া যায়, সংবাদপত্রও সেই পুরাতন কাহিনী লইয়া আর নূতন করিয়া আন্দোলন আরম্ভ করে না এবং পুলিশ কেসও হয়ত এইখানেই খামাচাপা পড়িয়া যায়। Investigating officer বা তদন্তকারী পুলিশ কর্ম্মচারীও হয়ত এই বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন—চালান ত একজনকে দিয়াছিলাম, কিন্তু দায়রায় টিকিল না তার আমি কি করিব।

"মতিলাল সরকারের মৃত্যু ব্যাপারে কোন Investigating officer যেন এই প্রকার আত্মপ্রসাদ লাভের চেষ্টা না করেন। দুর্ব্বল ও অপ্রচুর প্রমাণবিশিষ্ট কতকটা সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে চালান দিয়া তাড়াতাড়ি এই গুরুতর ব্যাপারের নিষ্পত্তি করিবার চেষ্টা না করিয়া তাঁহারা প্রকৃত অপরাধীকে বাহির করিবার চেষ্টা করুন এবং তাহার বিরুদ্ধে সন্দেহের অবকাশবর্জ্জিত অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপিত করুন। ইহাতে তাঁহাদের জাল যদি বড় ও গভীর করিয়া ফেলিতে হয় তাহাও করণীয় এবং সময় যদি লাগে তাহাও সহনীয়। মোট কথা এই চাঞ্চল্যকর ঘটনায় প্রকৃত দোষীর শাস্তিই জনসাধারণের কাম্য। গণআন্দোলনের ফলে তাড়াহুড়া করিয়া অকাট্য প্রমাণবর্জ্জিত কেবলমাত্র সন্দেহভাজন কোন ব্যক্তিকে চালান দিয়া তদন্তকারী পুলিশ যেন এই ঘটনার উপর একটা ছেদ টানিবার চেষ্টা না করেন।"

বেতিয়া প্রত্যাগত উদ্বাস্তু

হাওড়া ও শিয়ালদহে যে উদ্বাস্তুর দল রহিয়াছে তাহাদের লইয়া একটা আন্দোলন গঠনের চেষ্টা একদল লোক করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে কয়েকজন আছেন যাঁহারা ভাবের উচ্ছ্বাসে বাস্তবের কথা ভুলিয়া কাণ্ডজ্ঞানবিহীন কাজ করিয়া বসেন। কিন্তু আর একদল এই দুর্ভাগা ছিন্নমূল নরনারী ও শিশুর দুঃখ যন্ত্রনা নিজেদের এবং নিজদলীয়দের, ঘৃণ্য স্বার্থের কাজে লাগাইতে উৎসুক। ডাক্তার রায় সকলকেই উদ্দেশ্য করিয়া একটি বিবৃতি দিয়াছেন, যাহা আংশিক ভাবে আমরা "আনন্দবাজার পত্রিকা" হইতে উদ্ধৃত করিলাম। কিন্তু এই অবস্থার উৎপত্তি হইয়াছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্বাস্তু সম্পর্কে অতি বিশৃঙ্খল ও বুদ্ধিবিবেচনাহীন কার্য্যকলাপের ফলে:

"গত ২৬শে বৈশাখ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বি. সি. রায় বেতিয়াপ্রত্যাগত উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে ইহাদের খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করার দাবি মানিয়া লওয়া সম্ভব নয়। তিনি বলিয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণই যেখানে খাদ্যাভাবে রহিয়াছেন, সেখানে নূতন করিয়া ইহাদের খাদ্য-সংস্থানের দায়িত্ব সরকার কিভাবে লইবেন? উপরন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই উদ্বাস্তুদের জন্য বিহার সরকারকে ওদিকে সাহায্যও করিয়াছেন।

"হাওড়া ও শিয়ালদহে অবস্থানকারী উদ্বাস্তুদের বেতিয়ায় প্রত্যাবর্ত্তনই সমস্যা সমাধানের পথ বলিয়া উল্লেখ করিয়া ডাঃ রায় প্রস্তাব করিয়াছেন—ইচ্ছা করিলে উদ্বাস্তুনেতৃবৃন্দও ইহাদের সহিত যাইতে পারেন এবং বেতিয়ার ট্রানজিট ক্যাম্পসমূহে যদি কোন গলদ থাকে, তাহা দূর করার চেষ্টা করিতে পারেন। বিহার ও কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই উহাতে সম্মতি দিয়াছেন।

"উপসংহারে ডাঃ রায় উদ্বাস্তুদের লইয়া গণ-আন্দোলনের বিপদ সম্পর্কে অবহিত হওয়ায় জন্য সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন দেশবাসীর প্রতি আবেদন জানাইয়াছেন।

"ডাঃ রায় তাঁহার বিবৃতিতে বলিয়াছেন—জনসাধারণ পশ্চিম-বঙ্গের উদ্বাস্তু পরিস্থিতি অবগত আছেন।

"মোট ৩১ লক্ষের অধিক উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছে, তন্মধ্যে প্রায় ১৯ লক্ষ নিজেদের চেষ্টায় কিংবা সরকারী সাহায্যে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অবশিষ্ট উদ্বাস্তুদের মধ্যে ক্যাম্পে অবস্থান-কারিগণ ব্যতীত অপর সকলে কোন-না-কোন প্রকারে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। বর্তমান সময়ে পশ্চিমবঙ্গের ক্যাম্পগুলিতে প্রায় ২ লক্ষ ১০ হাজার লোক আছে, তন্মধ্যে আশ্রয়সমূহে অশক্ত লোকদের জন্য নির্মিত নিবাসসমূহে অবস্থান-কারী ৫৪ হাজারের ভরণপোষণ সরকারকে তাঁহাদের স্থায়ী দায় হিসাবে নির্ব্বাহ করিতে হইবে। অবশিষ্ট লোকদের মধ্যে ১৯৫৪ সনের জুনের পূর্ব্বে আগত ৫০ হাজার এবং তৎপর আগত ১ লক্ষ ৭১ হাজারের সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন মন্ত্রণালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত হয় যে, ১৯৫৪ সনের পর আগত সকল লোকের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করিবেন এবং তাহাদিগকে পুনর্ব্বসতির জন্য পশ্চিমবঙ্গের বাহিরের স্থানসমূহে লইয়া যাওয়া হইবে। পশ্চিম-বঙ্গে উদ্বাস্তুদের বসবাসের জন্য জমি পাওয়া যায় না বলিয়া এই সিদ্ধান্ত করা আবশ্যক হয়। সংখ্যায় ১ লক্ষ ৭১ হাজার এই সকল উদ্বাস্তুকে পশ্চিমবঙ্গে ট্রানজিট ক্যাম্প-গুলিতে রাখা হয়। এতদ্ব্যতীত ৩৩ হাজার উদ্বাস্তুকে পার্শ্ববর্ত্তী বিহার ও উড়িষ্যা রাজ্যে ট্রানজিট ক্যাম্পগুলিতে রাখা হয়। অন্যান্য রাজ্যে পুনর্বাসনের ব্যবস্থাসাপেক্ষ উদ্বাস্তুদিগকে খাদ্য ও আশ্রয় দিবার উদ্দেশ্যে এই ট্রানজিট ক্যাম্পগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

"বিহারে প্রেরিত ২৮ হাজার উদ্বাস্তুর মধ্যে ৫ হাজারের পুনর্ব্বাসন হইয়াছে, অবশিষ্ট ২৩ হাজার পুনর্ব্বাসনের অপেক্ষায় বেতিয়ায় ট্রানজিট ক্যাম্পগুলিতে অবস্থান করিতেছে।

"কোন কোন মহল হইতে অনবরত দাবি করা হইতেছে—শিয়ালদহ ও হাওড়ার এই দশ হাজার লোকের জন্য এখানেই খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ইহাদের খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়—রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার ইহা বুঝাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও সাম্প্রতিক উদ্বাস্তু আন্দোলনগুলির নেতৃবৃন্দ উহা স্বীকার করিয়া লইতেছেন না। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গে ইহাদের খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করার পক্ষে যে বহু অসুবিধা আছে—ইহা স্পষ্ট। এই সব লোকের দুঃখ-দুর্দ্দশার প্রতি তাঁহারা যে কম সহানুভূতিশীল তাহা নহে বা যে কষ্টের মধ্য দিয়া ইহারা দিন কাটাইতেছে কাহারও চেয়ে তাঁহারা ইহা কম বোঝেন না। কিন্তু যখন দেখা যায় খাদ্য ও আশ্রয়ের প্রত্যাশী এই উদ্বাস্তুরা যাহারা তাহাদের খাদ্য যোগাইতেছে তাহাদের তাড়াইয়া দেয়, তাহাদের সহানুভূতির অপমান করে, শিশুদের জন্য আনীত দুগ্ধ নর্দ্দমায় নিক্ষেপ করে—তখন সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন প্রতিটি মানুষই ভালভাবে বুঝিতে পারেন যে, এই আন্দোলন যত না সহানুভূতি-সঞ্জাত, তার চেয়েও বেশী রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

"এই সব কারণেই একটি প্রস্তাব উঠিয়াছে এবং এখানে উহার পুনরুক্তি করা হইতেছে। প্রস্তাবটি হইল—বেতিয়া হইতে আগত উদ্বাস্তুদের প্রতি দরদী বলিয়া যাঁহারা পরিচিত, উদ্বাস্তুদের উপর তাঁহাদের কোন প্রভাব থাকিলে তাঁহাদের উচিত ইহারা যাহাতে বেতিয়ায় ফিরিয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করা। সেখানে ইহাদের খাদ্য ও আশ্রয় দেওয়া হইবে। ইচ্ছা করিলে এই সব ভদ্রলোকও উদ্বাস্তুদের সহিত যাইতে পারেন এবং বেতিয়া ট্রানজিট ক্যাম্প-সমূহের যদি কোন গলদ থাকে, তাহা দূর করার ব্যবস্থা করিতে পারেন। বিহার ও কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই এই ব্যাপারে সম্মতি দিয়াছেন।

"এমতাবস্থায় উদ্বাস্তুদের মুখপাত্র বলিয়া কথিত ভদ্রলোকদের দাবির সারবত্তা উপলব্ধি করা যায় না। আর উদ্বাস্তু আসিবে না এবং ১৫ দিন পরে এই উদ্বাস্তুরা যে-যার পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া যাইবে—এই ভরসায় ১৫ দিনের জন্য ইহাদের খাদ্য ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিতে তাঁহারা বলিতেছেন। উদ্বাস্তুদের হইয়া যাঁহারা কথা বলেন তাঁহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি বা দল এ সম্পর্কে কোন গ্যারান্টি দিতে পারেন না।

"এই সব ভদ্রলোকের বোঝা উচিত যে, তাঁহারা যে-কোনও আন্দোলনে উদ্যোগী হউন না কেন—উহাতে বিরোধের সৃষ্টি হইবে।"

পশ্চিমবঙ্গের নির্ব্বাচন

পশ্চিমবঙ্গের নির্ব্বাচনে কতকস্থলে কংগ্রেস হটিতে বাধ্য হয়। তৎসম্বন্ধে সরকারী তদন্তের এক অংশ নিম্নে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' হইতে উদ্ধৃত হইল :

"বিগত সাধারণ নির্ব্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষতঃ কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী শিল্প-এলাকাগুলিতে বামপন্থী দলগুলির সাফল্যের কারণ সম্পর্কে এক্ষণে নয়াদিল্লীর উচ্চতম সরকারী পর্য্যায়ে বিচার-বিশ্লেষণ করা হইতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

সম্প্রতি দিল্লীতে এই সম্পর্কে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের পদস্থ পুলিশ কর্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রকাশ, তাঁহারা ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সমক্ষে বামপন্থী এবং অন্যান্য দল-গুলির সাফল্যের ব্যাপার সম্পর্কে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কতকগুলি কারণ উপস্থাপিত করেন: ১। নিম্নমধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক বেকারসমস্যা; ২। পশ্চিমবঙ্গের সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে তীব্র সরকার-বিরোধী মনোভাব। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর কর্ত্তৃক আহূত ঐ বৈঠকে অন্যান্য রাজ্যের পুলিস অফিসারগণও যোগদান করেন।

প্রকাশ, ঐ বৈঠকে এইরূপ প্রস্তাব করা হয় যে, কলিকাতায় ও শিল্পাঞ্চলগুলিতে বিবিধ চাকুরিতে কর্ম্মরত যে ৮ লক্ষ পাকিস্থানী নাগরিক আছে, পশ্চিমবঙ্গের নিম্নমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকার-সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত তাহাদের স্থলে ভারতীয় নাগরিক

নিয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রকাশ, ভারত সরকার নাকি এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। আরও প্রকাশ, দিল্লীর নির্দ্দেশে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নাকি বর্ত্তমানে ঐ প্রস্তাবের সম্ভাব্যতা সম্পর্কেও খোঁজখবর করিতেছেন।

জানা যায়, কলিকাতার চল্লিশটি প্রতিষ্ঠান পুলিস কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়াছেন যে, তাঁহাদের অধীনে যে সকল পাকিস্থানী কাজ করে, তাহারা "অপরিহার্য্য"। মাত্র দশটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে জানানো হইয়াছে যে, ঐগুলিতে পাকিস্থানীদের পরিবর্ত্তে ভারতীয়দের নিয়োগ করা যাইতে পারে। এই তদন্তকার্য্য এখনও শেষ হয় নাই।

কলিকাতা ও শহরতলী অঞ্চলে সাধারণ নির্ব্বাচন সম্পর্কে পুলিস যে অনুসন্ধান চালায় উহার ফলে এই ব্যাপারে কতকগুলি উল্লেখ-যোগ্য তথ্য উদঘাটিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ: ১। সরকারী কর্ম্মচারীদের অধিকাংশই বামপন্থী প্রার্থীদের অনুকূলে ভোট দিয়াছেন, ২। নির্ব্বাচন উপলক্ষে কর্ত্তব্যরত অনুমান ৩০ হাজার পুলিস কর্ম্মচারীর মধ্যে অধিকাংশই ভোট দিতে পারেন নাই, কারণ তাঁহাদের সর্ব্বদাই এদিক-ওদিক চলাফেরা করিতে হইয়াছে। পুলিসের বিশ্বাস, ঐ সকল পুলিস কর্ম্মচারী ভোট দেওয়ার সুযোগ পাইলে আরও কতিপয় বামপন্থী দল প্রার্থী হয় ত নির্ব্বাচনে জয়যুক্ত হইতে পারিতেন।

রাজ্য সরকার সরকারী দপ্তর ভবনের ক্যান্টিন হলে লাউড স্পীকার মারফত নির্ব্বাচনের ফলাফল ঘোষণার ব্যবস্থা করিয়া-ছিলেন। প্রকাশ, বামপন্থী প্রার্থীর জয় ঘোষিত হওয়ামাত্রই উহা তথায় সমবেত সরকারী কর্ম্মচারীদের দ্বারা বিপুল ভাবে অভিনন্দিত হয়। আরও প্রকাশ, কংগ্রেস প্রার্থীর পরাজয়ে সরকারী কর্ম্মচারী-দের মধ্যে প্রচণ্ড আনন্দের সাড়া পড়িয়া যায়। এই ধরনের সরকার-বিরোধী অভিব্যক্তির ফলে নাকি শেষ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টকে ঐ ব্যবস্থা বাতিল করিয়া দিতে হয়।

রাজ্য বিধানসভায় কম্যুনিষ্ট দলের শক্তিবৃদ্ধি কি জনসাধারণের উপর ঐ দলের প্রভাব বিস্তারের সূচনা করে? এতৎসম্পর্কেও পুলিস কর্ত্তৃক অনুসন্ধান চালানো হয়। প্রকাশ, তদন্ত করিয়া পুলিস যে সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছে তাহাতে ঐ দলের প্রভাব প্রকৃতই বিস্তৃত হইয়াছে কিনা তৎসম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ রহিয়াছে। ঐ তদন্তের ফলে নাকি জানা যায় যে, ১। সংহত প্রচারকার্য্যের ফলে কম্যুনিষ্টদল জনসাধারণকে বহুল পরিমাণে বিভ্রান্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে; ২। এই দলের অর্থ ও জনবল থাকায় দল-প্রচারিত পুস্তকাদি বহুসংখ্যক লোকের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া সম্ভব হইয়াছে; ৩। কম্যুনিষ্ট দলে বহুসংখ্যক 'হোল-টাইমার' (সকল সময়ের জন্ত কর্ম্মী) আছেন; ৪। প্রধান প্রধান ভারতীয় ভাষায় এই দলের নিজস্ব সংবাদপত্র আছে এবং প্রধান প্রধান ভাষায় অধিকাংশ ভাষায়ই একাধিক সংবাদপত্র আছে; ৫। রাশিয়া ও চীন হইতে ভারতে প্রেরিত প্রচার-পুস্তিকাসমূহ ব্যাপকভাবে বিক্রয় হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট দলের উনবিংশ কংগ্রেসে ষ্টালিন কর্ত্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতায় ১৩,৫৯১টি কপি বিক্রয় হয়। তবে এই প্রকার ব্যাপক বিক্রয়ের অন্যতম কারণ হইতেছে ঐ সকল পুস্তিকার সস্তা দর।

পণ্ডিত নেহরু ও কংগ্রেস

কংগ্রেসের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে পণ্ডিত নেহরুর কিছু চেতনার উদয় হইয়াছে মনে হয়। তাঁহার মতামত সম্প্রতি আনন্দবাজার পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা নীচে দেওয়া হইল।

অবশ্য চৈতন্যলাভ করা ভাল কথা। কিন্তু তাহার পরিণতি কি হয় সেইটাই আসল। সে বিষয়ে পণ্ডিত নেহরু যে বিশেষ সচেষ্ট তাহা মনে হয় না।—

"নয়াদিল্লী, ২রা মে—প্রধানমন্ত্রী নেহরু কংগ্রেসসেবীদিগকে কংগ্রেসের সততার খ্যাতি বজায় রাখিতে, ভারতের যুবকশ্রেণীর মনো-ভাব উপলব্ধি করিতে এবং দেশে নূতন শক্তির স্ফুরণের বিষয় মনে রাখিয়া জনসাধারণের বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরণাদাতারূপে কাজ করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

গত মাসে অনুষ্ঠিত প্রদেশ কংগ্রেসসমূহের সভাপতি ও সম্পাদক-বৃন্দের গোপন বৈঠকে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ অধোগতির হেতু বিশ্লেষণ করিয়া প্রধানমন্ত্রী পূর্ব্বোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির মুখপত্র 'ইকনমিক রিভিয়ু' অধুনাতন সংখ্যায় এই প্রথম বার বক্তৃতাটি প্রকাশিত হইয়াছে।

পণ্ডিত নেহরু বলেন, "কংগ্রেসসেবীদের সততা এবং তাঁহাদের ত্যাগ ও ব্রতনিষ্ঠা খ্যাতির জন্তই পূর্ব্বে কংগ্রেসের এমন শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল। আমি একথা বলি না যে, প্রত্যেকেই এরূপ আচরণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা কংগ্রেসসেবীদের সততা এবং জাতির জন্ত সেবা ও ত্যাগের সুনামের ফল। আগের মত আর তেমন কংগ্রেসের সুনাম নাই। আমি অবশ্য ব্যক্তিবিশেষের কথা বলিতেছি না। ব্যক্তিগতভাবে কাহারও কাহারও খ্যাতি থাকিতে পারে। নির্ব্বাচনের সময় আমরা বহু রকমের এবং অন্ত সময় সততাহীনতার অভিযোগ পাইয়া থাকি। এরূপ অভিযোগও আমাদের কানে আসে যে, কংগ্রেসসেবীরা পদলোলুপ, পরস্পর বিবদমান এবং উপদল গঠনকারী। আদর্শভিত্তিক উপদল গঠনের বিরোধী আমি নই। কিন্তু যখন শুধু ব্যক্তিগত কারণেই এই সব উপদল ও সংঘাতের সৃষ্টি হইয়া থাকে তখন স্বভাবতঃই জনসাধারণের শ্রদ্ধা কমিয়া যায়। সাধারণ কংগ্রেসসেবীর প্রতি জনসাধারণের আর তেমন শ্রদ্ধাও নাই। তবে ব্যক্তিগতভাবে কোন কোন কংগ্রেসসেবী এখনও সেরূপ শ্রদ্ধার অধিকারী হইতে পারেন, কিন্তু গড়পড়তা সাধারণ কংগ্রেসসেবীর প্রতি জনসাধারণের কোন আস্থা নাই। প্রত্যেক কংগ্রেসসেবীই পদ আঁকড়াইয়া থাকিতে চাহেন। যখনই পদলোভ কাহাকেও পাইয়া বসে তখনই কংগ্রেসের শক্তিসঞ্চারী মৌলিক উপাদানও নষ্ট হইয়া যায়।"

তিনি প্রশ্ন করেন, "কংগ্রেস কতটা পরিমাণ বয়স্ক লোকদের সংখ্যা এবং কতটাই বা এখানে নূতন চিন্তাধারা ও নবীনদের প্রবেশাধিকার ঘটিয়াছে? যাঁহারা নূতন করিয়া চিন্তা করিবার ক্ষমতা হারাইয়াছেন ও যাঁহাদের ধারণা-শক্তির অভাব, তাঁহারা সংখ্যায় কত এবং প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেস যুবসমাজের সহিত কতটুকু সংস্পর্শ বজায় রাখিতে পারিয়াছে?"

উহার জবাবে তিনি বলেন, "যুবসমাজের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এখনও কিছু আছে। কংগ্রেসে অসংখ্য যুবক আছে, বহু নূতন বিভাগও খোলা হইয়াছে এবং উহার মাধ্যমে চমৎকার কাজও হইয়াছে। কিন্তু স্থানে স্থানে ছাত্ররা কমবেশী আমাদের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য ও ভোট সংগ্রহে বিশেষ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে। কেহ কেহ তাহাদের কাজকে ছেলেমানুষি বলিতে পারেন, এবং কেহ বলিতে পারেন যে, তাহারা শৃঙ্খলাপরায়ণ নহে। কিন্তু আসল কথা হইল এই যে, তাহাদের সহিত আমাদের কোন যোগাযোগ নাই। আর তাহারা কংগ্রেসকে পছন্দ করিলেও কোন কোন কংগ্রেসসেবীর প্রতি তাহাদের আদৌ কোন শ্রদ্ধা নাই।"

"কংগ্রেস যে শক্তিকে মুক্ত করিয়াছে তাহার সহিত কংগ্রেস-সেবীদের তাল রাখিতে আহ্বান জানাইয়া তিনি মন্তব্য করেন, 'জনসাধারণের উৎসাহ উদ্দীপনাই কংগ্রেসের সম্বল। যে মুহূর্ত্তে জনতার উদ্দীপনা উহার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যাইবে, সেই মুহূর্ত্তেই উহার অবস্থা কাহিল হইবে। তবে পরিস্থিতি এখনও এত শোচনীয় নয়। তবে বিপদ উপলব্ধির জন্য আমি কতকটা বাড়াইয়া বলিতেছি। কংগ্রেসের বর্ত্তমান অধোগতির হেতু এই যে, যেসব সচ্চরিত্র ও কঠোর পরিশ্রমী ব্যক্তি একদা কংগ্রেসের মেরুদণ্ড ও শক্তির আধারস্বরূপ ছিলেন, তাঁহারা আর এক্ষণে ক্রিয়াশীল নহেন। আমি ইচ্ছা করিয়াই এ বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করিতেছি। যেহেতু ক্ষেত্রবিশেষে কম্যুনিষ্ট পার্টি, অন্যত্র অপর কোন কোন দল এবং অন্য কোন ক্ষেত্রে হয়ত অপরাপর বিরুদ্ধ শক্তি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সক্রিয়। ইহার ফলে যে জনোৎসাহ কংগ্রেসের এত দিনের সম্বল তাহাই হয়ত তাহার বিরুদ্ধে কাজে লাগান হইতে পারে। প্রবাদ আছে, যাঁহারা বিপ্লবের স্রষ্টা, বিপ্লব তাঁহাদিগকেই উদরসাৎ করিয়া ফেলে। সে বিপ্লব ফ্রান্সে, রাশিয়া বা অন্য যে কোন স্থানের হইতে পারে। অবশ্য আমাদের বিপ্লব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের। তবে যে শক্তির স্রষ্টা কংগ্রেস নিজেই, সেই শক্তিই কংগ্রেসকে পিছনে ফেলিয়া আজ অগ্রগামী। সুতরাং উহাকে আমাদের উপলব্ধি করিতে হইবে এবং উহার সহিত তাল রাখিতেও হইবে।"

তিনি আরও বলেন, "৩৪ বছর আগে আমরা গণ-আন্দোলনের সূত্রপাত করি। উহা আমরা পরিচালনা করিয়া লাভবানও হইয়াছি। কিন্তু স্বতন্ত্র ধরনের আন্দোলন মাথাচাড়া দেওয়ায় আমরা পশ্চাদগামী হইয়াছি। এজন্য আমরা নানারূপ অভিযোগ করিয়া থাকি। উহা সত্য হইতে পারে, আবার না-ও হইতে পারে। তবে আসল ব্যাপার এই, আমরা সেকেলে হইয়া গিয়াছি। প্রতিষ্ঠান-গতভাবে আমাদের যৌবনোচিত গতি ও শক্তি আর নাই, আমরা এখন তাল সামলাইতে পারিতেছি না। বরং অনিশ্চিত সম্ভাবনাকে আমরা আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছি। তবে মোদ্দা কথা এই যে, প্রত্যেক সংস্থা এবং বৃহৎ শক্তিই মানসিক উৎকর্ষের উপর নির্ভরশীল। ধীশক্তির নেতৃত্ব ছাড়া কেহ বেশী দিন টিকিয়া থাকিতে পারে না। অর্থাৎ, মানসিক ও ধীশক্তির নেতৃত্বই এক্ষেত্রে নিয়ন্তা। দ্বিতীয়তঃ, সংস্থার অন্তর্নিহিত প্রেরণা, ধর্মপ্রচারকের উদ্দীপনা, ব্রতনিষ্ঠা ও ব্রত উদযাপনের কর্মধারা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই দুইটি মুখ্য শক্তি যে-কোন সংস্থার প্রাণস্বরূপ।

ভারতে আমরা যে সাফল্য লাভ করিয়াছি, তাহা বহুলাংশে কৃষক ও পল্লীবাসীদের জন্যই সম্ভব হইয়াছে। আমরা মোটামুটি শহরবাসীদের সমর্থন হারাইতেছি। অতীতে মস্তিষ্কজীবীদের সাহায্য তেমন না পাইলেও চলিতে পারিত। কারণ মুক্তিযুদ্ধে শৃঙ্খলাপরায়ণ সেনাদলের প্রয়োজন ছিল বেশী। কিন্তু বিষয়টির গুরুত্ব এখন খুব বাড়িয়াছে।

কোন সমস্যার প্রকৃতি ও ব্যাপকতা হৃদয়ঙ্গম না করিলে তাহার প্রতিকারের উপায় নিরূপণ করিয়া লাভ নাই। আমি মনে করি, কংগ্রেসের টিকিয়া থাকার প্রকৃত ও অন্তর্নিহিত শক্তিই খালি নাই, উহার আগাইয়া যাইবার ক্ষমতাও আছে। অবশ্য এই বিষয়টি উপলব্ধি করার এবং যথোচিতভাবে কাজে লাগান প্রয়োজন। যদি ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান অথবা জাতিবিশেষের সহজাত ব্যর্থতা থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার কোন প্রতিকার নাই। যদি কেহ ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে তাহার বুদ্ধিশুদ্ধি ও কর্মোৎসাহ লোপ পায়, সে আশাভঙ্গ ও নিরুদ্যম হইয়া পড়ে। ইহাই সহজাত ব্যর্থতার অর্থ। যে-কোন সংস্থার পক্ষেও ইহা খাটে। তবে কংগ্রেসে যে এমন অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, আমি একথা বলি না। কিন্তু সম্ভাব্য অবস্থা সম্পর্কে আমাদের সতর্ক হইতে হইবে। যেহেতু বহু কংগ্রেসসেবীর সে অবস্থা ঘটিয়াছে।

যেখানে সমস্যা প্রাদেশিক অথবা সাম্প্রদায়িক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, সেখানে জনসাধারণকে যুক্তিতর্ক দ্বারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সারবত্তা বুঝাইয়া দিতে হইবে। সাধারণ লোকের ঐক্যবোধ নষ্ট হইতে পারে, যেহেতু বিভেদপ্রবণ প্রবৃত্তির স্ফুরণ হইয়াছে। আমার বিশ্বাস, কংগ্রেসের প্রধান কাজই হইল, ভারতের ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষা করা।

গত পাঁচ, সাত, আট ও নয় বছরে বিভিন্ন কংগ্রেস সরকার দেশে মোটামুটি ভাল কাজই করিয়াছেন। ভারতের বাহিরে আমাদের বিরুদ্ধবাদীরাও আমাদের স্বদেশবাসীদের চেয়ে বেশী মাত্রায় এ বিষয়টি উপলব্ধি করিয়া থাকেন। মার্কিন নাগরিক ডাঃ এপলবি ভারতে দুই-তিন বার আসিয়াছেন। তিনি কঠোর সমালোচক, সবকিছুই তিনি সমালোচকের দৃষ্টি দিয়া বিচার করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও বলিয়াছেন যে, ভারত বহু বিষয়ে চমৎকার কৃতিত্বের পরিচয় দিলেও প্রত্যেকে গবর্ণমেন্টের সমালোচনায় পঞ্চমুখ, ইহাতে সত্যই

অবাক হইতে হয়। প্রকৃতপক্ষে আমাদের প্রতিটি কৃত কর্ম্মকে হেয় প্রতিপন্ন করাই অনেকের কাজ। ভারতে বহুকিছুর সমালোচনা করা যাইতে পারে বলিয়াই এ জাতীয় সমালোচনা করা সহজ। আমাদের বহুবিধ বিরুদ্ধতার বিরুদ্ধে লড়িতে হইতেছে। বহু শতাব্দীর জাড্য ও স্বভাবদোষ নাশের এবং বৈষয়িক পাঁক উদ্ধারের কাজ আমাদের করিতে হইতেছে। আমরা সেই অচল অবস্থা ও পঙ্ককুণ্ড হইতে মুক্তি লাভ করিতেছি। জনসাধারণের নিকট কংগ্রেসকে তাহার ব্যাখ্যা করিতে হইবে।"

সংবিধানের প্রতি আনুগত্য

বিধানসভার এবং পার্লামেন্টের নির্ব্বাচিত সদস্যদিগকে বিধান-সভায় যোগদানের পূর্ব্বে ভারতীয় সংবিধানের প্রতি আনুগত্য জানাইয়া একটি শপথ গ্রহণ করিতে হয়। প্রত্যেক সদস্যকেই ঐ শপথ গ্রহণ করিতে হয় এবং পশ্চিমবঙ্গের নবনির্ব্বাচিত সদস্যগণও ঐ শপথ গ্রহণ করিবেন। সাম্প্রতিক নির্ব্বাচনে ভারতের এমনকি পশ্চিমবঙ্গেরও কয়েকটি অঞ্চলে এক ধরনের লোক নির্ব্বাচনে জয়ী হইবার জন্য রাষ্ট্রদ্রোহী এবং সাম্প্রদায়িক প্রচারের সাহায্য গ্রহণ করেন। পশ্চিমবঙ্গে মুর্শিদাবাদে এইরূপ রাষ্ট্রদ্রোহী প্রচার চরমে উঠে। যাঁহারা নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে রা দ্রোহী প্রচারের আশ্রয় লইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে যে সকল প্রার্থী নির্ব্বাচনে সাফল্য লাভ করিয়াছেন তাঁহারাও বিধানসভায় যোগদানের সময় সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের শপথ লইবেন। এই ধরনের সদস্যদের শপথ সম্পর্কে আলোচনা করিয়া ২১শে এপ্রিল এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "মুর্শিদাবাদ সমাচার" পত্রিকা লিখিতেছেন:

"বিধানসভার সদস্য হিসাবে শপথ গ্রহণের সময় ভারতীয় সংবিধান সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার কথা তুলিয়া দস্তখত যাঁরা করিয়াছেন, সদস্য নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে অর্থাৎ নির্ব্বাচনের সময় তাঁহারা সংবিধান-বিরোধী কোন কার্য্য করিয়াছেন কিনা সে সম্বন্ধে সংবাদ সত্য হইলে, তাঁহাদের সদস্যপদ বাতিল সম্পর্কে কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা করা উচিত কিনা, তাহাও চিন্তা করা প্রয়োজন। সদস্য নির্ব্বাচিত হইলে সংবিধানের প্রতি অবিচল আনুগত্যের শপথ যাঁহারা করিতেছেন, নির্ব্বাচন-বৈতরণী অতিক্রম করিতে তাঁহারা সংবিধানিক আনুগত্যের কি জাতীয় পরিচয় দিয়াছেন, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান লইলে, শপথকারী সদস্যদের অনেকের সম্বন্ধেই নিষ্ঠা-হীনতার পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে।

"মুর্শিদাবাদ জেলার কয়েকটি নির্ব্বাচন-কেন্দ্রে কয়েক ব্যক্তি গত নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে যেভাবে ধর্ম্মসভার নামে ভোটের জন্য প্রচারকার্য্য চালাইয়াছেন, তাহা হইতে ধারণা জন্মে যে, নির্ব্বাচনের সময় বিধানসভায় নির্ব্বাচনপ্রার্থী সম্প্রদায়বিশেষের বিশেষ এক শ্রেণীর লোক বিধানসভায় প্রবেশের জন্য সংবিধান-বিরোধী কার্য্য ও উক্তির দ্বারা প্রচারকার্য্য চালাইতে পশ্চাদপদ হন না। তাঁহাদেরই কেহ যদি নির্ব্বাচনে ভোটাধিক্যে জয়ী হইয়া বিধানসভায় যান এবং সেখানে সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন, তখন মনে হয় যে, এই শপথের ভিতর আন্তরিকতার অভাব থাকিয়া গিয়াছে।"

"মুর্শিদাবাদ সমাচারের" মন্তব্য বিশেষ সমীচীন বলিয়াই আমরা মনে করি। পৃথিবীর অপর কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকদের দায়িত্বশীল অংশের মধ্যে এইরূপ রাষ্ট্রবিরোধী মনোভাব নাই। গণতন্ত্রের সার্থক রূপায়ণে এই অন্তর্ঘাতী মনোভাব বিশেষভাবেই পরিপন্থী। ইহাতে শাসক এবং শাসিত শ্রেণী উভয়ের আচরণের মধ্যেই সন্দেহ ও অনাবশ্যক কঠোরতা দেখা দেয়, যাহার চরম পরিণতি ঘটে নিরঙ্কুশ একনায়কত্বে স্বেচ্ছাচারিতায়। গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা যেরূপ সরকারের দায়িত্ব, গণতন্ত্রবিরোধী শক্তিগুলিকে কঠোরভাবে দমন করাও সরকারের সেইরূপ কর্ত্তব্য। কিন্তু সরকারী দলও সুবিধাবাদী, সেহেতু তাহারা অপরাপর দল এবং ব্যক্তিবিশেষের অসাধু আচরণের শাস্তি বিধানে বিশেষ তৎপরতা দেখাইতে পারেন না। এইরূপ পরিস্থিতি ভবিষ্যৎ বিপদের সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ—ইহার প্রতিকার সম্ভব একমাত্র ক্রমবর্দ্ধমান গণচেতনা এবং আন্দোলনের দ্বারা। কিন্তু এই আন্দোলন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং দলবিশেষের সঙ্কীর্ণ স্বার্থসাধনের যন্ত্রে পরিণত হইতেছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা

১৭ই এপ্রিল নূতন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। পণ্ডিত নেহরুর নেতৃত্বে গঠিত এই মন্ত্রীসভায় উনচল্লিশ জন সদস্য রহিয়াছেন। পুরাতন মন্ত্রীসভার সদস্যদের মধ্য হইতে যাঁহারা পুনঃ-নির্ব্বাচিত হন তাঁহাদের মধ্যে এক শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ এবং শ্রীমহাবীর ত্যাগী ব্যতীত আর সকলেই নূতন মন্ত্রীসভায় স্থান পাইয়াছেন। কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটে মাত্র একজন নূতন সদস্য স্থান পাইয়াছেন; তিনি হইলেন বোম্বাইয়ের শ্রীসদাশিব কানুজী পাতিল। ক্যাবিনেটে বাংলা দেশ হইতে কোন সদস্য নাই, তবে রাষ্ট্রমন্ত্রীদের মধ্যে শ্রীঅশোক সেন, শ্রীহুমায়ুন কবীর এবং শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না বাংলা দেশ হইতে আছেন। উনচল্লিশ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র দুই জন মহিলা আছেন—শ্রীমতী লক্ষ্মী মেনন ও শ্রীমতী ভায়োলেট আল্ভা। শ্রীকৃষ্ণ মেনন হইয়াছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

মন্ত্রীসভার নূতন সদস্যদের নাম:

১। শ্রীজবাহরলাল নেহরু, প্রধানমন্ত্রী—পররাষ্ট্র ও পর-মাণবিক শক্তি; ২। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ—শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা; ৩। শ্রীগোবিন্দবল্লভ পন্থ—স্বরাষ্ট্র; ৪। শ্রীমোরারজী দেশাই—বাণিজ্য ও শিল্প; ৫। শ্রীজগজীবন রাম—রেলওয়ে; ৬। শ্রীগুলজারীলাল নন্দ—শ্রম, নিয়োগ ও পরিকল্পনা; ৭। শ্রীটি. টি. কৃষ্ণমাচারী—অর্থ; ৮। শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী—পরিবহন ও যোগাযোগ; ৯। সর্দ্দার শরণ সিং—ইস্পাত, খনি ও জ্বালানি; ১০। শ্রীকে. সি. রেড্ডী—পূর্ত্ত, গৃহনির্ম্মাণ ও

সরবরাহ ; ১১। শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন—খাদ্য ও কৃষি ; ১২। শ্রীভি কে কৃষ্ণমেনন—প্রতিরক্ষা ; ১৩। শ্রীসদাশিব কানুজী পাতিল—সেচ ও বিদ্যুৎ।

রাষ্ট্রমন্ত্রী

১। শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহ—সংসদীয় বিষয় ; ২। শ্রীবালকৃষ্ণন বিশ্বনাথ কেশকার—তথ্য ও বেতার ; ৩। শ্রীডি পি. কারমারকর—স্বাস্থ্য ; ৪। ডাঃ পাঞ্জাবরাও এস. দেশমুখ—খাদ্য ও কৃষি ; ৫। শ্রীকে. ডি. মালবীয়—ইস্পাত, খনি ও জ্বালানি ; ৬। শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না—পুনর্বাসন ; ৭। শ্রীনিত্যানন্দ কানুনগো—বাণিজ্য ও শিল্প ; ৮। শ্রীরাজ বাহাদুর—পরিবহন ও যোগাযোগ ; ৯। শ্রীবি. এন. দাতার—স্বরাষ্ট্র ; ১০। শ্রীএম. এম. শাহ—বাণিজ্য ও শিল্প ; ১১। শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দে—সমষ্টি উন্নয়ন ; ১২। শ্রীঅশোককুমার সেন—আইন ; ১৩। ডাঃ কে. এল. শ্রীমালী—শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা ; ১৪। শ্রীহুমায়ুন কবীর—পরিবহন ও যোগাযোগ।

উপমন্ত্রী

১। সর্দার সুরজিৎ সিং মাজিথিয়া—প্রতিরক্ষা ; ২। শ্রীআবিদ আলী—শ্রম ; ৩। শ্রীঅনিলকুমার চন্দ—পররাষ্ট্র ; ৪। শ্রীএম. ভি. কৃষ্ণাপ্পা—খাদ্য ও কৃষি ; ৫। শ্রীজয়সুখলাল হাতী—সেচ ও বিদ্যুৎ ; ৬। শ্রীসতীশ চন্দ্র—বাণিজ্য ও শিল্প ; ৭। শ্রীশ্যামানন্দ মিশ্র—পরিকল্পনা ; ৮। শ্রীবলীরাম ভগৎ—অর্থ ; ৯। ডাঃ মনোমোহন দাশ—শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা ; ১০। শ্রীশাহ নওয়াজ খান—রেল ; ১১। শ্রীমতী লক্ষ্মী এন. মেনন—পররাষ্ট্র ; ১২। শ্রীমতী ভায়োলেট আলভা—(পরে ঘোষণা করা হইবে)।

পশ্চিমবঙ্গের নূতন মন্ত্রীসভা

২৬শে এপ্রিল (১৩ই বৈশাখ, ১৩৬৪) দার্জ্জিলিঙে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের নূতন মন্ত্রীমণ্ডলী শপথ গ্রহণ করেন। আটাশ জন মন্ত্রীবিশিষ্ট নূতন মন্ত্রীসভায় তের জন মন্ত্রী, তিন জন রাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বার জন উপমন্ত্রী আছেন। নূতন ক্যাবিনেটে চার জন নূতন সদস্য আছেন, তাঁহারা হইলেন শ্রীভূপতি মজুমদার, শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ, আবদুস সত্তার এবং শ্রীসিদ্ধার্থ রায়। পরে পরাজিত স্পীকার শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়কেও নাকি ক্যাবিনেটে লওয়া হইবে।

নবনিযুক্ত মন্ত্রীদের নাম ও দপ্তর নিম্নরূপ :

ক্যাবিনেট মন্ত্রী—

ডাঃ শ্রীবিধানচন্দ্র রায় মুখ্যমন্ত্রী—স্বরাষ্ট্র (পুলিস ও প্রতিরক্ষা বাদে), অর্থ, শিক্ষা, উন্নয়ন, সমবায়, কুটিরশিল্প।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন—খাদ্য, সাহায্য, সরবরাহ এবং উদ্বাস্তু সাহায্য ও পুনর্ব্বাসন।

শ্রীকালীপদ মুখার্জ্জি—পুলিস ও অসামরিক প্রতিরক্ষা।

শ্রীখগেন্দ্র দাশগুপ্ত—পূর্ত্ত ও গৃহ, বাসস্থান।

শ্রীঅজয় মুখার্জ্জি—সেচ ও জলপথ।

শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর—বন, মৎস্য ও পশুপালন।

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ বর্ম্মণ—আবগারী।

ডাঃ আর. আমেদ—কৃষি, পশুপালন ও বন (বন ও মৎস্য-বিভাগীয় বিষয় ব্যতীত)।

শ্রীঈশ্বরদাস জালান—স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও পঞ্চায়েৎ।

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ—ভূমি ও ভূমি রাজস্ব।

শ্রীভূপতি মজুমদার—শিল্প ও বাণিজ্য।

শ্রীসিদ্ধার্থ রায়—বিচার, আইন ও উপজাতি কল্যাণ।

জনাব আবদুস সত্তার—শ্রম।

রাষ্ট্রমন্ত্রী—

শ্রীমতী পূরবী মুখার্জ্জি—কারা ও উদ্বাস্তু সাহায্য ও পুনর্ব্বাসন।

শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ—উন্নয়ন ও উদ্বাস্তু সাহায্য ও পুনর্ব্বাসন।

ডাঃ শ্রীঅনাথবন্ধু রায়—স্বাস্থ্য।

উপমন্ত্রী—

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় সিংহ—পরিবহন।

শ্রীসৌরীন্দ্র মিশ্র—শিক্ষা।

শ্রীতেনজিং ওয়াংদি—উপজাতি কল্যাণ।

শ্রীস্মরজিৎ ব্যানার্জ্জি—কৃষি, পশুপালন ও বন।

শ্রীরজনীকান্ত প্রামাণিক—সাহায্য ও সরবরাহ।

শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়—সরবরাহ, সমবায়।

সৈয়দ কাজেম আলি মির্জ্জা—কুটীর ও ছোটখাটো শিল্প।

ডাঃ জিয়াউল হক—স্বাস্থ্য।

শ্রীমতী মায়া ব্যানার্জ্জি—উদ্বাস্তু সাহায্য ও পুনর্ব্বাসন।

শ্রীচারুচন্দ্র মহান্তি—খাদ্য, সাহায্য ও সরবরাহ।

শ্রীজগন্নাথ কোলে—প্রচার।

শ্রীনরবাহাদুর গুরুং—শ্রম।

নূতন মন্ত্রীসভায় রদবদল সম্পর্কে "যুগান্তরে"র ষ্টাফ রিপোর্টার লিখিতেছেন :

বিদায়ী ক্যাবিনেটের নয়জন সদস্য নূতন ক্যাবিনেটে স্থান পাইয়াছেন এবং চার জন নূতন সদস্যকে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই চার জনের মধ্যে অবশ্য শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ ও শ্রীভূপতি মজুমদার ডাঃ রায়ের প্রথম মন্ত্রীসভায় ছিলেন। জনাব আবদুস সত্তার ও শ্রীসিদ্ধার্থ রায় এই প্রথম বিধানসভায় ও মন্ত্রীসভায় আসিলেন।

তিন জন রাষ্ট্রমন্ত্রীর মধ্যে দুই জন পূর্ব্বেকার মন্ত্রীমণ্ডলীতে উপমন্ত্রী ছিলেন। এইবার তাঁহাদের পদোন্নতি ঘটিল। ডাঃ অনাথবন্ধু রায় নবাগত।

উপমন্ত্রীদের মধ্যে অর্দ্ধেকই নবাগত। বাকী ছয় জন আগেও উপমন্ত্রী ছিলেন।

বিদায়ী মন্ত্রীমণ্ডলীতে ১৫ জন মন্ত্রী, একজন রাষ্ট্রমন্ত্রী ও ১২জন উপমন্ত্রী ছিলেন। ইহা ছাড়া তিন জন পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী ছিলেন। ক্যাবিনেট মর্য্যাদাসম্পন্ন মন্ত্রীর সংখ্যা এবার দুই জন কম

হইলেও মন্ত্রীমণ্ডলীর সদস্যদের মোট সংখ্যা এইবারও ২৮ জনই রহিয়াছে।

বিগত মন্ত্রীসভার ১৫ জন মন্ত্রীর ভিতরে ছয় জন এবার বাদ পড়িয়াছেন। ইহার মধ্যে তিন জন—শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র, ডাঃ শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীজীবনরতন ধর নির্ব্বাচনে পরাজিত হইয়াছেন, দুই জন—শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা ও শ্রীরাধাগোবিন্দ রায়, নির্ব্বাচনে দাঁড়ান নাই এবং শ্রীমতী রেণুকা রায় লোকসভার সদস্যা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

শ্রীগোপিকাবিলাস সেন একমাত্র রাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। তিনি নির্ব্বাচনে পরাজিত হওয়ায় পদচ্যুত হইয়াছেন এবং তাঁহার স্থানে তিন জন রাষ্ট্রমন্ত্রী আসিয়াছেন।

যে সাত জন উপমন্ত্রী গত নির্ব্বাচনে জয়লাভ করিয়া আসিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র জনাব স্কুর বাদে আর সকলেই পুনরায় স্থান লাভ করিয়াছেন। দুই জন উপমন্ত্রী উপরের পদে গিয়াছেন, দুই জন—শ্রীবীজেশচন্দ্র সেন ও শ্রীশিবকুমার রায়, নির্ব্বাচনে হারিয়া গিয়াছেন এবং উপমন্ত্রী শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মৌলিক নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নাই।

পুরাতন মন্ত্রীমণ্ডলীর যে সকল সদস্য পুনঃনির্ব্বাচিত হইয়া বিধান-সভায় ফিরিয়া আসিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র জনাব স্কুরই এইবার বাদ পড়িলেন।

গতবারের তুলনায় এইবার মন্ত্রীমণ্ডলীতে মুসলমান প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। গতবার একজন মুসলমান মন্ত্রী ও একজন মুসলমান উপমন্ত্রী ছিলেন। এইবার মুসলমান সদস্যদের মধ্য হইতে দুই জন মন্ত্রী ও দুই জন উপমন্ত্রী গ্রহণ করা হইয়াছে।

পূর্ব্বের মতই মন্ত্রীসভায় তপশীলভুক্ত জাতির দুই জন সদস্যকে স্থান দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু একজন মাত্র সদস্যা মন্ত্রীসভায় মহিলাদের যে প্রতিনিধিত্ব করিতেছিলেন এইবার তাহা রাখা হয় নাই। তবে রাষ্ট্রমন্ত্রীদের মধ্যে একজন ও উপমন্ত্রীদের মধ্যে আর একজন মহিলা আছেন। পূর্ব্বের মতই একজন তপশীলভুক্ত উপজাতির উপমন্ত্রী আছেন।

দার্জ্জিলিং জেলা হইতে যে একমাত্র সদস্য এইবার কংগ্রেস টিকেটে বিধানসভায় নির্ব্বাচিত হইয়া আসিয়াছেন এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরূপে নির্ব্বাচিত যে সদস্যটি পরে কংগ্রেস পরিষদ দলে যোগ দিয়াছেন তাঁহারা উভয়েই উপমন্ত্রীরূপে মন্ত্রীমণ্ডলীতে স্থান লাভ করিয়াছেন। এই মন্ত্রীমণ্ডলীতে জেলা হিসাবে চব্বিশ পরগণার প্রতিনিধি সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। এই জেলা হইতে পাঁচ জনকে লওয়া হইয়াছে। কলিকাতা হইতে ডাঃ রায় সহ তিনজন এবং বাঁকুড়া হইতে তিন জনকে গ্রহণ করা হইয়াছে। মেদিনীপুর হইতে তিন জন, জলপাইগুড়ি হইতে একজন, পশ্চিম দিনাজপুর হইতে একজন, মুর্শিদাবাদ ও হুগলী হইতে দুই জন করিয়া, বর্দ্ধমান জেলা হইতে একজন, নদীয়া মালদহ ও কুচবিহার হইতে একজন করিয়া সদস্য গৃহীত হইয়াছেন।

মন্ত্রীমণ্ডলীতে বিধান পরিষদের দুই জন সদস্য আছেন। তাঁহারা হইলেন শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়।

পুরুলিয়ার সমস্যা

১০ই বৈশাখ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে পুরুলিয়ার সমস্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করিয়া "সংগঠন" পত্রিকা লিখিতেছেন যে, পুরুলিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা বড় সমস্যা জলাভাব। জলের অভাবে কৃষিকার্য্য বিশেষভাবে ব্যাহত হইতেছে; পানীয় জলের অভাবে দারুণ গ্রীষ্মে গ্রামবাসীদের দুর্গতির শেষ নাই। পুরুলিয়ার সর্ব্বত্রই আজ জলসরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করা সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্যরূপে স্বীকৃত হওয়া উচিত।

"সংগঠন" লিখিতেছেন, "পুরুলিয়া জেলার অধিবাসীরা আজ সর্ব্বপ্রকারে পশ্চিমবঙ্গবাসীদের মধ্যে অনগ্রসর। পেটের অন্ন নাই, পরনের বস্ত্র নাই, তৃষ্ণায় জল নাই, রোগের ঔষধপথ্য নাই, মাথা গুঁজিবার মত সকলের ঘর নাই। তাহার উপর পঞ্চকোট বাঁধের ফলে (D. V. C.) দশ হাজার নরনারী নিরাশ্রয়। তাহাদের পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা আজও হইল না।

"পুরুলিয়াবাসীর সমস্যাগুলি নির্ণয় ও সমাধানের উপায় নির্ণয়ের জন্য আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে একটি কমিশন নিয়োগ করিতে অনুরোধ জানাই এবং অবিলম্বে তাহার কার্য্য আরম্ভ করিতে অনুরোধ করি।"

পুরুলিয়ার সমস্যা সমাধান সম্পর্কে কয়েকটি প্রস্তাব করিয়া পত্রিকাটি লিখিতেছেন যে, পুরুলিয়াবাসীর অনগ্রসরতার কথা স্মরণ রাখিয়া তাহাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা দরকার। এই জেলার জমিও অপেক্ষাকৃত অনুর্ব্বর; জমির সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ (ceiling) নির্ণয়ের সময় এই কথাটি স্মরণ রাখা বিশেষ প্রয়োজন। পুরুলিয়ার বনগুলি ধ্বংসোন্মুখ, উহাদের রক্ষার ব্যবস্থা করা আশু প্রয়োজন। উপরন্তু পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলা বিশেষতঃ বাঁকুড়ার সহিত পুরুলিয়ার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিসাধনও করা প্রয়োজন।

পুরুলিয়া সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নীতির সমালোচনা করিয়া "সংগঠন" লিখিতেছেন যে, রাজ্যপালের বক্তৃতায় পুরুলিয়া সম্পর্কে কোনও উল্লেখই নাই। খাজনার হার এবং স্কুলের শিক্ষক তথা সরকারী চাকুরিয়াদের প্রতি সরকারের সুস্পষ্ট নীতি এখনও ঘোষণা করা হয় নাই। "স্কুলের শিক্ষকদিগকে বা আরও অন্যান্য সরকারী চাকুরিয়াদিগকে আর কতদিন বিহারের স্কেল-এ বেতন লইতে হইবে? শুধু তাই নয় আর কতদিন পশ্চিমবঙ্গ সরকার পুরুলিয়ার স্কুলগুলিতে বিহারের শিক্ষাব্যবস্থা চালু রাখিবেন?" "সংগঠন" প্রশ্ন করিতেছেন।

ত্রিপুরায় রেলপথ

ভারতের সর্ব্বত্রই খাদ্য এবং অন্যান্য নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যেও খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে;

কিন্তু ত্রিপুরার ক্ষেত্রে এই মূল্যবৃদ্ধি তীব্রতর রূপ ধারণ করিয়াছে। এই পরিস্থিতির মূলে কয়েকটি বিশেষ কারণ রহিয়াছে। ত্রিপুরার সহিত ভারতের অন্য অংশের রেলপথে যোগাযোগের কোনও ব্যবস্থা নাই। ত্রিপুরাকে সকল সরবরাহের জন্যই পশ্চিমবঙ্গের উপর প্রধানতঃ নির্ভর করিতে হয়। কোন কারণে যখন পশ্চিমবঙ্গ হইতে সরবরাহ-ব্যবস্থা বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন করিমগঞ্জ হইতে অতিরিক্ত খরচে জিনিষপত্র আমদানী করিতে হয়। পশ্চিমবঙ্গ হইতে ত্রিপুরায় মালপত্র আমদানীর উপায় বিমানপথ এবং পূর্ব্ব-পাকিস্থানের রেলপথ। বিমানপথে মালপত্র আমদানী বিশেষ ব্যয়সাপেক্ষ এবং পূর্ব্বপাকিস্থানের রেলপথে সরবরাহ ব্যবস্থাও যথাযথ কার্য্যকরী হয় না। ত্রিপুরার বাজারে সর্ব্ববিধ দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির ইহাই অন্যতম প্রধান কারণ।

ত্রিপুরার বর্ত্তমান খাদ্যসঙ্কট প্রতিরোধের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কুড়ি হাজার টন চাউল মঞ্জুর করিয়াছেন। এই চাউলের প্রায় সবটাই কলিকাতা হইতে পাকিস্থান-পথে আমদানী হইবে। কিন্তু কেবলমাত্র চাউল আমদানী করিলেই ত্রিপুরার চলে না—অন্যান্য নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যও আমদানী করিতে হয়, কিন্তু যে পরিমাণ মাল ত্রিপুরায় আসে এবং ত্রিপুরা হইতে রপ্তানি হয় তাহা বহন করার ক্ষমতা পূর্ব্বপাকিস্থান রেলওয়ের নাই। বিমানযোগে এই সকল পণ্য আমদানী-রপ্তানির অসুবিধা সহজেই অনুমেয়। এই অবস্থায় স্বভাবতঃই চাউল আমদানীকে অগ্রাধিকার দেওয়ায় প্রয়োজনীয় অন্যান্য নিত্যব্যবহার্য্য সামগ্রী আমদানীতে ব্যাঘাত ঘটিতেছে, ফলে বাজারে অন্যান্য দ্রব্যও মহার্ঘ হইয়াছে।

ত্রিপুরার বর্ত্তমান দুরবস্থার আলোচনা করিয়া স্থানীয় সাপ্তাহিক "সেবক" লিখিতেছেন, "একমাত্র বিমান সার্ভিস ও পাক রেলওয়ের উপর নির্ভরশীল থাকায় ইহার সব রকম অসুবিধা ত্রিপুরার সাধারণ লোককেই বহন করিতে হয়। এই জন্যই আমরা প্রথম হইতেই ত্রিপুরায় রেল লাইন স্থাপন করার প্রস্তাব করিয়া আসিতেছি। ত্রিপুরায় রেল লাইন স্থাপিত হইলে সাধারণ লোক উপকৃত হইবে, সরকারের উন্নয়ন-পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইতে সাহায্য করিবে, আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর হইবে এবং নূতন নূতন শিল্প গড়িয়া উঠার সুযোগ আসিবে।"

আসামে বাঙালী পরীক্ষার্থীদের অসুবিধা

১৩ই বৈশাখ 'যুগশক্তি' আসামের পরীক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থা সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়াছেন, প্রাসঙ্গিক বোধে আমরা তাহা বিনা মন্তব্যে তুলিয়া দিলাম :

"ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা চলিতেছে। ইংরেজী তৃতীয় প্রশ্নপত্রে মাতৃভাষা হইতে ইংরেজীতে অনুবাদের অংশ অসমীয়ার চেয়ে বাংলা কঠিন হইয়াছে। এই অভিযোগ প্রায় প্রতি বৎসরই করা হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন মডারেশন করার সময় তাহা সকলের চোখ এড়াইয়া যায়। ভূগোলের প্রশ্নও কঠিন হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ করা হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয় এই দুই ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনা করিলে পরীক্ষার্থীদের প্রতি সুবিচার করা হইবে।"

করিমগঞ্জে খাদ্যপরিস্থিতি

আসামের করিমগঞ্জ জেলায় চাউলের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাইকারী ২৪৲ টাকার কম মূল্যের কোনপ্রকার চাউল নাই, খুচরা মূল্য ২৭৲ টাকায় উঠিয়াছে। কিন্তু মূল্যবৃদ্ধি এখানেই থামে নাই—ক্রমশঃ উহা বাড়তির দিকে।

করিমগঞ্জে চাউল-সঙ্কটের কারণ সম্পর্কে আলোচনা করিয়া এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে স্থানীয় "যুগশক্তি" পত্রিকা লিখিতেছেন যে, গত বৎসর বন্যার সময়ও করিমগঞ্জে চাউলের এরূপ অভাব ঘটে নাই। কিন্তু সরকারী নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার ফলে এ বৎসর প্রকৃতপক্ষে কোন স্থানীয় ব্যবসায়ীর নিকটই চাউল নাই।

"যুগশক্তি" লিখিতেছেন, "গত ডিসেম্বর মাস হইতে গবর্ণমেণ্ট দুইটি স্বতন্ত্র আইন প্রণয়নপূর্ব্বক প্রথমতঃ আসাম ও অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে ধান-চাউলের ব্যবসা পারমিট ব্যতীত নিষিদ্ধ করেন। দ্বিতীয় আইনে সীমান্তবর্ত্তী কাছাড় ও কতিপয় জেলার বাহিরে ধান-চাউল আমদানী-রপ্তানি নিষিদ্ধ করেন এবং কতিপয় এলাকাকে নোটিফাইড এরিয়া ঘোষণাপূর্ব্বক তথায় আমদানী-রপ্তানী খুব কড়াভাবে পারমিট দ্বারা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করেন। করিমগঞ্জ মহকুমার নোটিফাইড অঞ্চল অতিমাত্রায় ঘাটতি এলাকা—বাহির হইতে ধান-চাউল আমদানী ছাড়া এই অঞ্চলের লোকের উপায় নাই। এইসব ও অন্যান্য কারণ বিবেচনায় আমরা এতদঞ্চলকে নোটিফাইড এরিয়া ঘোষিত করার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছিলাম। সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আমরা উক্ত ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের কুফলের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম। স্থানীয় মার্চেণ্টস এসোসিয়েশন হইতেও দীর্ঘ স্মারকলিপি মারফত প্রতিবাদ জানান হইয়াছিল। তখন সরবরাহমন্ত্রী ও সেক্রেটারী করিমগঞ্জ আগমন করতঃ ব্যবসায়ী ও জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনায় দৃঢ়ভাবে এই আশ্বাস দেন যে, কোন অবস্থায়ই করিমগঞ্জ এলাকায় আমদানী-রপ্তানীর কোনপ্রকার অসুবিধা ঘটিবে না, স্বাভাবিক ব্যবসায় চালু থাকিবে এবং সাধারণ ক্রেতার কোনপ্রকার দুর্ভোগ হইবে না।—কেবল বাহাতে পাকিস্থানে খাদ্যশস্য চোরাই পথে চালান না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখার জন্যই এই ব্যবস্থা।"

জনসাধারণ এবং ক্রেতার কোনরূপ অসুবিধা হইবে না বলিয়া সরকার যে আশ্বাস দিয়াছিলেন, কার্য্যক্ষেত্রে তাহা কোনদিক হইতেই রক্ষিত হয় নাই। এখন কেবল শিলচর এবং হাইলাকান্দি হইতে মাত্র চাউল আমদানীর পারমিট দেওয়া হয়। কিন্তু সামান্য কয়েক মণ চাউলের পারমিটের জন্য যে পরিমাণ অসুবিধা সহ্য করিতে হয় তাহাতে অনেক সাধু ব্যবসায়ীই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন এবং কোন কোন ব্যবসায়ী চাউলের কারবারই বন্ধ করিয়া

দিয়াছেন। উপরন্তু হাইলাকান্দির খাদ্যপরিস্থিতির ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া হাইলাকান্দির মহকুমা-শাসক চাউল রপ্তানীর জন্য পারমিট দিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন। ইহা ব্যতীত শিলচর এবং হাইলাকান্দি অঞ্চলেও চাউলের মূল্য বৃদ্ধির দিকে।

পাকিস্থানে চাউল গুপ্তপথে রপ্তানী হইতেছে বলিয়া যে প্রচার করা হয় তাহার উল্লেখ করিয়া "যুগশক্তি" লিখিতেছেন, "বর্ত্তমানে এখানকার (করিমগঞ্জের) সহিত পাকিস্থানভুক্ত সীমান্ত এলাকার চাউলের মূল্যের যে পার্থক্য তাহাতে শতকরা ৪০।৪২৲ টাকা বেসরকারী বাট্টা তদুপরি বেআইনী চালানের খেসারত দিয়া ধান-চাউলের চোরাকারবার বর্ত্তমানে মোটেই লাভজনক নহে।"

অর্থাৎ, করিমগঞ্জের বর্ত্তমান খাদ্যসঙ্কটের জন্য প্রধানভাবে দায়ী দ্বিধাগ্রস্ত সরকারী নীতি।

পেট্রোল সন্ধানে

পশ্চিম বাংলায় খনিজ তৈল আছে কি না সে বিষয়ে শেষ নিষ্পত্তির চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। ঐ বিষয়ের সংবাদ আমরা নীচে আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

অবশ্য খনিজ তৈলের আকর পশ্চিম বাংলায় পাওয়া যাইলে যে এ অঞ্চলে পেট্রোল সস্তা হইবে তাহা নয়। কেননা দেশের টাকা শুধু দেশের মন্ত্রীমণ্ডল ও তাঁহাদের লোকসভা এবং বিধানসভার অনুচরবর্গের সমৃদ্ধির জন্য। জনসাধারণ 'চিনির বলদে'র অবস্থায় থাকিবে।

"রবিবার মধ্যাহ্নে শেষ বৈশাখের তপ্ত রৌদ্র তখন তাতার দস্যুর মত মাঠময় ঝাঁপাইয়া পড়িতেছিল। কলিকাতা হইতে আগত একদল সাংবাদিক তখন আশাভরা চোখে ১৪৭ ফুট উচ্চ ইস্পাতের মিনারটির দিকে চাহিয়াছিলেন। ব্যস্ত-ব্যস্ত ফটোগ্রাফারগণ একের পর এক ফটো তুলিতেছিলেন। সেই সময়, ঠিক সেই সময় বর্দ্ধমান শহর হইতে প্রায় পাঁচ মাইল পূর্ব্বে বর্দ্ধমান-কালনা রাজপথের ধারে এক গ্রামে ষ্ট্যান-ভ্যাক অয়েল কোম্পানীর সুদক্ষ একদল ইঞ্জিনীয়ার এবং ভূতাত্ত্বিক মাটির মধ্যে পাইপ বসাইয়া তৈল অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন।

"পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম আনুষ্ঠানিক ভাবে পেট্রোলের অনুসন্ধান সুরু হইল। সেই দিক দিয়া এই রবিবারটি পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন।

"এই তৈলকূপ হইতেই পেট্রোল পাওয়া যাইবে কিনা, সেকথা অবশ্য এখনই বলা শক্ত। অন্ততঃ বিশেষজ্ঞগণ জোর দিয়া বলিতে পারেন না। তবে ইঁহাদের প্রচেষ্টা যদি ফলবতী হয়, যদি পশ্চিম বঙ্গের অন্যতম ভূগর্ভ অকৃপণ হস্তে তাহার ভাণ্ডার খুলিয়া দেয়, তবে নানা সমস্যায়, নানা দুর্দ্দশায় প্রপীড়িত পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যলক্ষ্মী আবার যে সুপ্রসন্না হইবেন, পশ্চিমবঙ্গের সমৃদ্ধি আবার যে নূতন জোয়ারে পূর্ণ হইয়া উঠিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

"ভূতাত্ত্বিকগণ নানাবিধ লক্ষণ পরীক্ষা করিয়া পরীক্ষামূলক তৈল-কূপ খননের জন্য বর্ত্তমান স্থানটি নির্ব্বাচন করিয়াছেন। বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ারগণ ধরিত্রীর অন্তঃস্থলে লম্বা লম্বা পাইপ চালাইয়া পেট্রোলের গোপন ভাণ্ডারের নাগাল পাইবার চেষ্টা করিতেছেন। ষ্ট্যান-ভ্যাক অয়েল কোম্পানী লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া পরীক্ষা চালাইতেছেন। ভারত সরকার সর্ব্বপ্রকার সাহায্য দিতেছেন।

"রবিবার সমাগত সাংবাদিকগণকে উদ্দেশ করিয়া ষ্ট্যান-ভ্যাকের চীফ জিওলজিষ্ট মিঃ আর. জি. প্রোগ বলেন, এই স্থানে তৈল পাইবার "ভাল সম্ভাবনা আছে।" আর এই অঞ্চলে যদি তৈল মেলে, তবে "কাজ করিবারও যথেষ্ট সুবিধা আছে।" অবশ্য তৈল যে "এখানে আছেই, সে সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নাই।"

"পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫০ সন হইতেই তৈল সম্পর্কে অনুসন্ধান সুরু হইয়াছে। ১৯৫১ সনে এরোপ্লেনযোগে এই সম্পর্কে জরিপও করা হয়। তার পর হইতে ক্রমাগত ভূস্তর পরীক্ষা সুরু হয়। ১৯৫৪ সনে ১০ হাজার বর্গ মাইল স্থানে নানারূপ পরীক্ষা চলে।"

তদন্তের প্রহসন

১৯৫৬ সনের সেপ্টেম্বর মাসে দক্ষিণ-ভারতের মহবুবনগর নামক স্থানে একটি সেতুর অংশবিশেষ ধ্বসিয়া যাওয়ায় শতাধিক লোকের জীবননাশ ঘটে। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই দক্ষিণ-ভারতে অনুরূপ আর একটি দুর্ঘটনায় বহু লোকের জীবনান্ত হয়। এইরূপ ঘন ঘন রেল দুর্ঘটনায় জনচিত্তে যে আলোড়নের সূচনা হয়, আসন্ন নির্ব্বাচনের কথা চিন্তা করিয়া সরকার তাহাতে উদাসীন থাকিতে পারেন না। ফলে, বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি এস. এল. টি. দেশাইকে লইয়া গঠিত একটি অনুসন্ধান কমিশনের উপর এই রেল-দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানের ভার দেওয়া হয়। অনুসন্ধানের পর বিচারপতি দেশাই যে রিপোর্ট দেন তাহাতে বলা হয় যে, উক্ত সেতুর তলা দিয়া জলনিকাশের উপযুক্ত ব্যবস্থা না করায় জন্যই ঐরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। রেলের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ ব্রীজের গার্ডের উপর সকল দোষ চাপাইবার যে চেষ্টা করেন শ্রীদেশাই তাহাতে সম্মত হন নাই। তাঁহার রিপোর্টের সারমর্ম্ম হইল যে, ইঞ্জিনীয়ারদের ব্যর্থতার জন্যই দুর্ঘটনা ঘটিতে পারিয়াছে।

ভারত সরকার দেশাই কমিশনের রিপোর্ট মানিয়া লইতে অস্বীকার করিয়াছেন। সরকারের অভিমতে ঐ ঘটনার জন্য কাহাকেও দায়ী করা যায় না। সরকার তাঁহাদের এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে কতকগুলি যুক্তিও দেখাইয়াছেন।

ভারত সরকারের এইরূপ সিদ্ধান্তে সর্ব্বত্রই বিস্ময়ের সঞ্চার হইয়াছে। সরকার বস্তুতঃপক্ষে বিভাগীয় ইনস্পেক্টরের রিপোর্টকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। তাঁহাদের যদি এইরূপ উদ্দেশ্য পূর্ব্ব হইতেই স্থির থাকিত তাহা হইলে এইরূপ অনুসন্ধান কমিশন নিয়োগের প্রহসন না করাই উচিত ছিল। পৃথিবীতে বোধ হয় আমাদের দেশই একমাত্র রাষ্ট্র যেখানে নিরপেক্ষ অভিমতের কোন মূল্য দেওয়া হয় না। কুচবিহারে গুলীচালনা সম্পর্কে তদন্ত হইল, রিপোর্ট

প্রকাশিত হইল না—সরকার সেই রিপোর্টের উপর কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন—জনসাধারণ তাহা জানিতে পারিল না। ট্রামভাড়া বৃদ্ধি-সংক্রান্ত আন্দোলনে পুলিশী নির্যাতন সম্পর্কিত অনুসন্ধান কমিশনের রিপোর্ট ছাপাইয়া পোড়াইয়া ফেলা হইল, কিন্তু প্রকাশিত হইল না। এইবার সরকার অনুগ্রহ করিয়া তদন্ত কমিশনের রায় প্রকাশিত করিয়াছেন; কিন্তু তদনুযায়ী কার্য্য করিতে অসম্মত হইয়াছেন।

সরকার নিজের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিদের লইয়াই কমিশন গঠন করেন, কিন্তু তথাপি সরকার সেই সকল কমিশনের রায় স্বীকার করিতে পারেন না কেন জনসাধারণ তাহা বুঝিতে অক্ষম। একজন হাইকোর্টের বিচারপতির অভিমত অপেক্ষা একজন বিভাগীয় ইনস্পেক্টরের রিপোর্ট কি কারণে সরকারের নিকট অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে হইয়াছে তাহাও অনেকের বোধগম্য হয় নাই। পর পর এতগুলি ট্রেণ দুর্ঘটনায় শত শত লোক নিহত হইল, অথচ তাহার জন্য কেহই দায়ী নহে—এ কথা মানিয়া লওয়া কাহারও পক্ষেই সম্ভব নহে।

পাকিস্থানে যুক্তনির্ব্বাচন ব্যবস্থা

প্রায় ছয় মাস পূর্ব্বে ঢাকায় পাকিস্থান জাতীয় পরিষদের এক অধিবেশনে কেবলমাত্র পূর্ব্ব-পাকিস্থানের জন্য হিন্দু-মুসলমানের যুক্তনির্ব্বাচন ব্যবস্থা গৃহীত হয়। পশ্চিম পাকিস্থানের রাজনীতিবিদগণ এই নূতন ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। ফলে পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানের প্রতিনিধিদের মধ্যে এক রফা হয় এই সর্ত্তে যে, যুক্তনির্ব্বাচন ব্যবস্থা পাকিস্থানের সর্ব্বত্র চালু না করিয়া কেবলমাত্র পূর্ব্ব-পাকিস্থানেই করা হইবে।

কিন্তু গত ২৪শে এপ্রিল পাকিস্থান জাতীয় পরিষদ (পার্লামেণ্ট) আর এক প্রস্তাবে সমগ্র পাকিস্থানের জন্যই হিন্দু মুসলমানের যুক্ত নির্ব্বাচন ব্যবস্থা প্রচলনের সিদ্ধান্ত করিয়া মুসলিম লীগের দ্বিজাতি-তত্ত্বের উপর চিরকালের মত কুঠারাঘাত করিয়াছেন। হিন্দুমুসলমান পৃথক জাতি এবং তাহারা একসঙ্গে থাকিতে পারে না—উহাই ছিল মুসলিম লীগের মূলমন্ত্র! কিন্তু লীগসৃষ্ট পাকিস্থানেই হিন্দু-মুসলমান যুক্ত নির্ব্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে হইল। ইতিহাসকে অস্বীকার করিয়া যে বেশীদিন চলা যায় না ইহা তাহার এক নূতন দৃষ্টান্ত।

বিতর্কের সময় পশ্চিম পাকিস্থানের স্বতন্ত্র প্রতিনিধি মিঞা ইফতিকার উদ্দীন লীগ সদস্যদের উদ্দেশে বলেন যে, তাঁহাদের নীতির ফলে ভারত খণ্ডিত হইয়া পাকিস্থান সৃষ্ট হইয়াছে; তাহারা যেন পুনরায় ঐ নীতির দ্বারা পাকিস্থানের মধ্যে আবার একটি নূতন হিন্দুস্থান সৃষ্টি না করেন।

পূর্ব্ব-পাকিস্থানের স্বায়ত্তশাসন দাবি

সম্প্রতি পূর্ব্ব-পাকিস্থানের বিধানসভা কার্য্যতঃ সর্ব্বসম্মতিক্রমে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানাইয়া এক প্রস্তাব পাস করেন। সরকার এবং বিরোধীপক্ষের প্রায় সকল সদস্যই প্রস্তাবটির পক্ষে ভোট দেন। কিন্তু পূর্ব্ব-পাকিস্থানের জনসাধারণের এইরূপ সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্তকে পাকিস্থান কেন্দ্রীয় সরকার, বিশেষতঃ জনাব সুরাবর্দী বিদ্রূপ করিয়া উড়াইয়া দেন। পশ্চিম পাকিস্থানের কোন কোন লীগ নেতা পূর্ব্ব-পাকিস্থান বিধানসভার এই সিদ্ধান্তের মধ্যে ভারতীয় "চক্রান্ত"ও দেখিতে পান।

পূর্ব্ব-পাকিস্থানের অন্তর্গত শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত "জনশক্তি" পত্রিকা পূর্ব্বপাকিস্থানের স্বায়ত্তশাসনের দাবির প্রতি পশ্চিম পাকিস্থানের নেতৃবৃন্দের বিরূপ মনোভাবের সমালোচনা করিয়া লিখিতেছেন যে, পশ্চিম পাকিস্থানের স্বার্থসন্ধানী নেতৃবৃন্দ পূর্ব্ব-পাকিস্থানের স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে আজ পাকিস্থানের মৌলিক পরিকল্পনার বিরোধী বলিতেছেন, অথচ ইংরেজী ১৯৪০ সনে লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশনে পাকিস্থান দাবি করিয়া যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল তাহাতে ভারতের দুই প্রান্তে অবস্থিত পাকিস্থানের দুই অংশ স্বায়ত্তশাসন এবং সার্ব্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন হইবে এইরূপ বলা হইয়াছিল।

প্রতিরক্ষা পররাষ্ট্র এবং মুদ্রাব্যবস্থা এক রাখিয়াও পূর্ব্ব-পাকিস্থানকে স্বায়ত্তশাসনদানে পশ্চিম পাকিস্থানের নেতৃবৃন্দের এই অনিচ্ছার সহিত পশ্চিম পাকিস্থানের বর্ত্তমান রাজনীতির তুলনা করিয়া "জনশক্তি" লিখিতেছেন:

"পশ্চিম পাকিস্থানের চারটি প্রদেশকে এক ইউনিটের ভিতরে বাঁধিয়া রাখিয়া সংহতি বাড়াইবার যে প্রচেষ্টা করা হইয়াছিল, বৎসর শেষ হইতে না হইতেই সেই এক-ইউনিট ব্যবস্থাকে বাতিল করিয়া দিয়া পশ্চিম পাকিস্থানকে পুনরায় ৪টি প্রদেশে বিভক্ত করার জন্য জনমত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। ক্ষমতাসীন দল ছলে বলে কৌশলে যে ব্যবস্থা দেশের লোকের উপর জোর করিয়া চাপাইয়াছিলেন তাহাকে আর বেশী দিন জোড়াতালি দিয়া বজায় রাখিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। একই ভৌগোলিক সীমানার ভিতরে থাকিয়াও পশ্চিম পাকিস্থানের ৪টি প্রদেশ স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য ফিরিয়া পাইবার জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠিয়াছে।"

অথচ শত শত মাইলব্যাপী ভৌগোলিক ব্যবধানকে অস্বীকার করিয়া পূর্ব্ব-পাকিস্থানকে এক জোয়ালে বাঁধিয়া রাখিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে।

পাকিস্থান-প্রতিষ্ঠার পর হইতে পূর্ব্ব-পাকিস্থানের উপর কিরূপ শোষণ চালানো হইতেছে তাহার বিবরণ দিয়া "জনশক্তি" লিখিতেছেন:

"বিগত ৯ বৎসর যাবৎ—পূর্ব্ব-পাকিস্থানকে কিভাবে শোষণ করা হইয়াছে তাহার বিবরণ সময় সময় প্রকাশিত হইয়াছে। পাকিস্থান-প্রতিষ্ঠার পর প্রথম আট বৎসরে পূর্ব্ব-পাকিস্থান কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের তহবিলে মোট ১১১ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছিল। উহা হইতে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট আট বৎসরে পূর্ব্ব-পাকিস্থানের জন্য ব্যয় করিয়াছেন সর্ব্বমোট ৪৬ কোটি ৪৯ লক্ষ

টাকা। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট আট বৎসরে মোট রাজস্ব আদায় করিয়াছিলেন ৯১৫ কোটি ৪ লক্ষ টাকা—উহা হইতে করাচীর উন্নয়নের জন্ত খরচ করিয়াছেন ৫৩০ কোটি টাকা। মূলধন খাতে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট ২৮৩ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন—তাহা হইতে পূর্ব্ব-পাকিস্থান পাইয়াছে ৩২ কোটি টাকা। দেশরক্ষা খাতে সামরিক বিভাগের জন্ত কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট ৪০০ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন, তন্মধ্যে পূর্ব্ব-পাকিস্থানে ব্যয়িত হইয়াছে মাত্র ১৪ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা।

"শুধু যে রাজস্বের ন্যায্য অংশ হইতেই পূর্ব্ব-পাকিস্থানকে বঞ্চিত করা হইয়াছে তাহা নহে, বিদেশী মুদ্রা বণ্টনের ব্যাপারেও এই কয় বৎসর যাবৎ পূর্ব্বপাকিস্থানের প্রতি ঘোরতর অবিচার চলিয়াছে। পূর্ব্ব-পাকিস্থান ৪২১ কোটি ২১ লক্ষ টাকা রপ্তানি-বাণিজ্যের দ্বারা উপার্জ্জন করিয়াছিল, তাহা হইতে আমদানী-খাতে পূর্ব্ব-পাকিস্থানকে মাত্র ১৬৭ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে, অথচ পশ্চিম-পাকিস্থান রপ্তানি-বাণিজ্যের দ্বারা ৩৪২ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়া আমদানী-খাতে ৪১১ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকার অংশ পাইয়াছে।

"পাটের রপ্তানী দ্বারা ১৯৪৮ সনে পূর্ব্ব পাকিস্থান ১৫৬ কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা অর্জ্জন করিয়াছিল। মুদ্রামূল্য সম্পর্কে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বনাশা বুদ্ধির ফলে পাট রপ্তানি দ্বারা অধুনা মাত্র ১৮ কোটি টাকা উপার্জ্জন করা সম্ভব হইতেছে।

"কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিবৎসর সামরিক বিভাগের জন্ত পশ্চিম-পাকিস্থানে ৮০ কোটি টাকা ব্যয় করিতেছেন। মুদ্রাস্ফীতির হাত হইতে সেই প্রদেশকে রক্ষা করার জন্ত সেখানে দ্রুত শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়িয়া তোলা হইতেছে—পূর্ব্বপাকিস্থান ইহার অংশ হইতে সম্পূর্ণরূপেই বঞ্চিত।

এইরূপ সর্ব্বাত্মক শোষণের ফলে পূর্ব্ব-পাকিস্থান স্বভাবতঃই আজ দেউলিয়া হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্ব-পাকিস্থানের অস্তিত্ব রক্ষার জন্তই আজ পূর্ব্বপাকিস্থানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন অবশ্য-প্রয়োজন।

উপসংহারে "জনশক্তি" লিখিতেছেন :

"মৌলানা আবদুল হামিদ খাঁ ভাসানী সাহেব পূর্ব্ব পাকিস্থানের এই দাবি আদায়ের জন্ত যে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদান করিয়াছেন, সমগ্র প্রদেশের লোক তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। আঞ্চলিক স্বায়ত্ত-শাসনের এই দাবি লক্ষ কণ্ঠে ঘোষিত হইতেছে। পশ্চিম পাকি-স্থানের বন্ধুগণ এখনও স্থির বুদ্ধিতে বিষয়টি বিবেচনা করিবেন আমরা এই আশা পোষণ করিতেছি।"

কেনিয়ায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ

পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র, বিশেষতঃ সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জনসাধারণের উপর নির্যাতনের নানারূপ অভিযোগ করেন। সেই অভিযোগ আংশিকভাবে নিশ্চয়ই সত্য। কিন্তু উক্ত রাষ্ট্রগুলি সম্বন্ধে নিজেদের আচরণের কথা চাপিয়া যান। সোভিয়েটের বিরুদ্ধে এই সকল রাষ্ট্র যে বিশ্বব্যাপী অভিযান চালাইয়াছে তাহার সমর্থনে বলা হয় যে, একনায়কত্ব-শাসিত কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রে ব্যক্তিস্বাধীনতার কোন মূল্য নাই, কেবলমাত্র পাশ্চাত্ত্য "গণতন্ত্র"গুলিতেই ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার মানিয়া চলা হয়।

ব্রিটেন পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রগোষ্ঠীর কমিউনিষ্ট-বিরোধী অভিযানের অন্যতম নেতা এবং গণতন্ত্রেরও অন্যতম ধ্বজাধারী। ব্রিটিশ-শাসিত কেনিয়ায় কেনিয়ার অধিবাসী কিকিউদের ব্যক্তিস্বাধীনতা কিরূপ রক্ষিত হইতেছে, নিম্নলিখিত বিবরণটি হইতে তাহা বুঝা যাইবে। ইহার যথাযথ তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিবার জন্ত এখনে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তথ্যগুলি সকলই ব্রিটিশ সরকারী সূত্র হইতে প্রাপ্ত।

ব্রিটিশ সরকার কর্ত্তৃক প্রচারিত এক বিবরণীতে বলা হইয়াছে যে, কেনিয়ার সামগ্রিক অবস্থার 'উন্নতি' হইয়াছে। 'উন্নতি'র ফলে কেনিয়ার জেলে আটক মাউ মাউ সমর্থকের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার পরও আটাশ হাজার রহিয়াছে। প্রত্যেক মাসে দেড় হাজার হইতে দুই হাজার বন্দী মুক্তি পাওয়ার পরও এখন আটাশ হাজার কিকিউ নাগরিক কেবলমাত্র সন্দেহবশে ব্যক্তিস্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত রহিয়াছেন। এই আটাশ হাজার কিকিউ ব্যতীত আরও সাত হাজার কিকিউ নাগরিক বন্দী রহিয়াছেন মাউ মাউ সংঘের সদস্য-পদের "অপরাধে"র জন্ত।

এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত যে সকল 'অপরাধে'র জন্ত মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইত তাহাদের মধ্যে একটি হইল মাউ মাউ শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করা বা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিবার অপরাধ। "সন্দেহ-জনক" ব্যক্তিদের সহিত সংস্রব রক্ষা করা বা তাহাদের সাহায্য করার অপরাধের শাস্তি ছিল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। সরকার এখন মহানুভবতার সহিত ঘোষণা করিয়াছেন—এখন সংস্রবজনিত অপ-রাধের দণ্ড হইবে দশ বৎসর।

পশ্চিমবঙ্গ চিকিৎসকদের সমস্যাবলী

গত ১১ই ও ১২ই মে তারিখে চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত নবব্যারাকপুরে (মধ্যমগ্রামে) ষোড়শ বঙ্গীয় প্রাদেশিক চিকিৎসক সম্মেলনের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ডাঃ শ্রীনীহাররঞ্জন মুন্সী এবং উদ্বোধন করেন ডাঃ শ্রীঅমলকুমার রায়-চৌধুরী। সভাপতি এবং উদ্বোধক উভয়েই পশ্চিমবঙ্গে চিকিৎসক ও চিকিৎসাবিষয়ক বিভিন্ন সমস্যার উল্লেখ করেন।

উদ্বোধনী ভাষণদান-প্রসঙ্গে ডাঃ রায়চৌধুরী সাম্প্রতিককালে চিকিৎসক এবং জনসাধারণের মধ্যে সম্পর্কের অবনতির উল্লেখ করিয়া বলেন যে, জনসাধারণের সহিত চিকিৎসকগণ যদি একটি হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখিতে অসমর্থ হন তবে তাহাতে সকলেরই সমূহ ক্ষতি।

পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য-সমস্যার উল্লেখ করিয়া ডাঃ রায়চৌধুরী

বলেন যে, একটি উপযুক্ত স্বাস্থ্যসংরক্ষণ পরিকল্পনায় তিনটি প্রধান অংশ থাকে। সেগুলি হইতেছে: (১) চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা, (২) চিকিৎসা-সাহায্য এবং (৩) চিকিৎসাবিদ্যাসংক্রান্ত গবেষণা। স্বাস্থ্য সম্পর্কে কোন পরিকল্পনা রচনা করিতে হইলে এই তিনটি বিষয়ের প্রতি সমান গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে। কিন্তু এই-গুলিকে দেশের অবস্থার সহিত সুসমঞ্জস করিয়া লইতে হইবে।

পশ্চিমবঙ্গে চিকিৎসাদান-পদ্ধতির সমালোচনা করিয়া ডাঃ রায়চৌধুরী বলেন, প্রচলিত চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষণ-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ রূপে ত্রুটিপূর্ণ এবং ইহা দ্বারা সমাজ-কল্যাণের কোন আদর্শেরই বাস্তব রূপায়ণে সাহায্য হইতে পারে না। এই বিষয় সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় তিনি কঠোর সমালোচনা করেন।

ডাঃ রায়চৌধুরী বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষণ-পদ্ধতি সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া উহার উন্নতিবিধানের জন্য সুপারিশ-দানের নিমিত্ত অবিলম্বেই একটি কমিশন নিয়োগ করা উচিত।

চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষণ-ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্কে সরকারী মনোভাবের সমালোচনা করিয়া ডাঃ রায়চৌধুরী বলেন, কি কারণে সরকার এই প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া দেখিতে অসম্মত তাহা তিনি বুঝিতে অক্ষম। তবে সরকার যদি নিজেকে গণতান্ত্রিক বলিয়া অভিহিত করেন তবে ভারতীয় চিকিৎসক সমিতির মত প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবের প্রতি তাহাদের সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা উচিত।

রাজ্যের জনসাধারণকে চিকিৎসাব্যাপারে সাহায্যদানের প্রশ্নটি অবশ্যই জটিল, কিন্তু সরকারী প্রচেষ্টায় এখনই অনেকদূর অগ্রসর হওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০ বৎসরের মধ্যে চিকিৎসা-ব্যবস্থার জাতীয়করণ করিবেন বলা হইয়াছে। ডাঃ রায়-চৌধুরী বলেন, এই জাতীয়করণ আরও অল্প সময়ে সম্ভব নহে কেন—তিনি তাহা বুঝিতে পারেন না। কেবল যদি আর্থিক কারণেই তাহা অসম্ভব হয় তবে কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত রাজ্য-সরকারকে উপযুক্ত আর্থিক সাহায্য করা—যাহাতে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্যসংরক্ষণ ব্যবস্থার পরিপূর্ণ জাতীয়করণ সম্ভব হয়।

তবে ইত্যবসরে সরকার যাহাতে বিভিন্ন বৃত্তিজীবীদের সাহায্যার্থে চিকিৎসকদিগকে সংগঠিত করেন তজ্জন্য ডাঃ রায়চৌধুরী সরকারকে পরামর্শ দিয়াছেন। পরে এই সাংগঠনিক কেন্দ্রগুলিতে বিস্তৃততর-ভাবে জাতীয়করণ করা সহজতর হইবে।

উপযুক্ত আয়ের অভাবে অনেক চিকিৎসক অপরাপর জীবিকা গ্রহণ করিতেছেন। ইহা বিশেষ উদ্বেগের বিষয় এবং ইহাতে জাতীয় শক্তির অপচয় ঘটিতেছে। জাতীয় স্বার্থেই এ বিষয়ে আশু নজর দেওয়া প্রয়োজন। গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসকদের অবস্থা বিশেষ-ভাবেই শোচনীয়। তাঁহারা যে কিরূপ দুরবস্থায় দিন কাটাইতেছেন, শহরের অধিবাসীদের পক্ষে তাহা অনুমান করা কঠিন। যে সকল চিকিৎসক এই সব অসুবিধা সহ্য করিয়া গ্রামবাসীদিগের সেবা করিয়া যাইতেছেন, সরকার তাহাদের সাহায্যের জন্য কোন ব্যবস্থা না করায় ডাঃ রায়চৌধুরী ক্ষোভ প্রকাশ করেন। গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্যব্যবস্থা সম্পর্কে পর্যালোচনা করিবার জন্য সরকারী এবং বেসরকারী সদস্য লইয়া একটি হেল্‌থ বোর্ড গঠন করিবার জন্য তিনি পরামর্শ দিয়াছেন।

ডাঃ রায়চৌধুরী বলেন, যখন ডাক্তারগণ অন্নাভাবে কষ্ট পাইতেছেন এবং জনসাধারণ বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে তখন ব্যয়বহুল এবং জমকালো অট্টালিকা ও পরিকল্পনা বিদ্রূপাত্মক মনে হয়। তিনি বলেন, জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য প্রয়োজন হইলে ক্ষেত্রবিশেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং গ্রেট ব্রিটেন হইতে পশ্চাতে পড়িয়া থাকাও ভাল।

ডাঃ রায়চৌধুরী বলেন, ভারতে চিকিৎসাবিষয়ক যে গবেষণা চলিতেছে তাহার সহিত দেশের প্রয়োজনের কোন সম্পর্ক নাই। আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যায় রোগ সারানো অপেক্ষা রোগ প্রতিরোধ করাকেই অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়। আমাদের দেশেও সুস্থ, সবল নাগরিক গঠনের উদ্দেশ্যেই চিকিৎসাবিষয়ক গবেষণা পরিচালিত হওয়া উচিত।

সভাপতির ভাষণদান প্রসঙ্গে ডাঃ শ্রীনীহারকুমার মুন্সী বলেন, যাঁহারা মনে করেন যে, ভারতে স্বাস্থ্যসংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়াছে, তাঁহারা বিশেষরূপে ভ্রান্ত। এক ম্যালেরিয়া ব্যতীত আর কোন রোগকেই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় নাই।

তিনি সরকারী আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের কঠোর সমালোচনা করিয়া বলেন, সমাজতান্ত্রিক ভারতের আদর্শ এবং কর্মপন্থা সাম্রাজ্য-বাদশাসিত ভারতের ন্যায় একরূপ হইতে পারে কি? গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসকদের দুরবস্থার উল্লেখ করিয়া ডাঃ মুন্সী বলেন যে, ভারতের অধিকাংশ জনসাধারণ গ্রামেই বাস করে; সুতরাং গ্রামাঞ্চলের চিকিৎসকদের অবস্থার প্রতি অবিলম্বেই সরকারের মনোযোগ দেওয়া দরকার। পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী আড়াই কোটি, কিন্তু পাস-করা ডাক্তারের সংখ্যা মাত্র ১৬,০০০। এইরূপ অবস্থায় ডাক্তারের সংখ্যাধিক্য ঘটিয়াছে বলা চলে না। ডাঃ মুন্সী বলেন যে, এখন হইতেই গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসার জন্য সরকারী সাহায্যের প্রবর্তন করা উচিত। ইহাতে ভবিষ্যতে স্বাস্থ্যসংরক্ষণ-ব্যবস্থার জাতীয়করণ করা সহজতর হইবে।

লাইফ ইনসুরেন্স ব্যবস্থার জাতীয়করণের ফলে যে বহুসংখ্যক ডাক্তার কর্মহীন হইয়াছেন, ডাঃ মুন্সী তাঁহাদের সমস্যার কথাও উল্লেখ করেন।

কয়েকটি হাসপাতালে চিকিৎসকদের দুর্নীতি সম্পর্কে যে সকল অভিযোগ উঠিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া ডাঃ মুন্সী বলেন যে, এই বিষয়ের গুরুত্ব কোন রূপেই ন্যূন করিয়া দেখা চলে না, কিন্তু একশ্রেণীর সংবাদে ডাক্তারের বিরুদ্ধে যে অভিযান আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে সমস্যা সমাধানে সাহায্য হইবে না।

নাট্যকার ভাস

শ্রীউমা দেবী

প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্যের নাট্যকারগণের মধ্যে মহাকবি ভাস অবিসংবাদিতরূপে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। উনিশ শ' বার সনের আগে ভাসের নাম ও যশ শোনা যেত মাত্র, তাঁর নাটকের কোন সন্ধান তখনও পাওয়া যায় নি। উনিশ শ' বার থেকে পনেরোর মধ্যে গণপতি শাস্ত্রী ভাসের তেরখানি নাটক ত্রিবান্দ্রুর থেকে প্রকাশিত করেন কিন্তু এগুলির মধ্যে কোনটিতেই গ্রন্থকারের নাম বা রচনাকালের কোন উল্লেখ নেই। এ জন্য সত্যসত্যই এগুলি ভাসের রচনা কিনা—এ নিয়ে বহু বিতর্ক উপস্থিত হয়েছে। উভয় পক্ষই প্রচুর যুক্তির অবতারণা করেছেন। এগুলি ভাসের মৌলিক নাটক নয়—মূল নাটক থেকে গৃহীত হয়েছে মাত্র—এমন কথাও উঠেছে। নাট্য-শৈলীর দিক থেকেও ভরতের নাট্যশাস্ত্রে অনুমোদিত রীতির বহু ব্যত্যয় ঘটেছে। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও ঐ তেরটি নাটক ভাসের রচিত বলেই এখন মেনে নেওয়া হয়েছে, কারণ নাটকগুলির মধ্যে লেখকের নাট্যপ্রতিভার যে বলিষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায় সেই প্রাচীন যুগে কালিদাসের পরবর্তী বা পূর্ববর্তী নাট্যকারদের মধ্যে একমাত্র ভাস ব্যতীত সে পরিচয় নিয়ে আর কেউই দাঁড়াতে পারেন না। ভাসের নাট্যপ্রতিভার অসামান্যতার কথা পরবর্তী বহু গ্রন্থকার বলে গেছেন। কালিদাস তাঁর মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে ভাসের নাট্য-প্রতিভার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। বাণভট্ট তাঁর হর্ষচরিতে ভাসের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। বাক্‌পতি তাঁর গৌড়বাহে এবং রাজশেখর তাঁর একাধিক গ্রন্থে ভাসের শক্তিমত্তার প্রশংসা করেন। এ ছাড়াও বামন, অভিনবগুপ্ত প্রমুখ আলঙ্কারিকগণ কর্তৃক নাট্যসূত্র-ব্যাখ্যানে ভাসের বিভিন্ন নাটকের কথা উল্লিখিত হয়েছে।

অবশ্য এ কথা ঠিক যে, কালিদাসের নাট্যনির্মিতি-কৌশলের সুমার্জিত রূপটি আমরা ভাসে পাই না, কিন্তু বক্তব্য বস্তুর সহজসৌন্দর্য্য ও অনায়াস-সুকুমার ঋজুতা ভাসের নাটকগুলিকে এমন একটি রূপ দিয়েছে যা পূর্ববর্তী নাট্যকার অশ্বঘোষ ও পরবর্তী নাট্যকার শূদ্রকাদির কোন নাটকেই পাওয়া যায় না। রচনাশৈলীর সাবলীলতা ও ঋজুতা তাঁর নাটকের ঘটনাবলীর মধ্যেও স্পষ্টরূপেই বর্তমান। সংস্কৃত নাটকে বর্ণনামূলক বা কবিত্বধ্যাপক শ্লোকপ্রাচুর্য অনেক ক্ষেত্রেই রচনাশৈলীর ভারস্বরূপ হয়ে থাকে। বিক্রমোর্বশী নাটকে স্বয়ং কালিদাসও এ দোষ থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। তরু-লতা-পশু-পক্ষীকে উদ্দেশ্য করে উর্বশীবিরহাতুর রাজার আত্মোচ্ছ্বাসের কাব্যগত মূল্য যাই থাক, নাটকীয় সৌন্দর্যের ঋজুতাকে তা রক্ষা করতে পারে নি। মৃচ্ছকটিকেও বসন্তসেনা এবং বিটের বর্ষাবর্ণনার মধ্যে ও বিদূষকের বসন্তসেনার প্রাসাদবর্ণনার মধ্যে এই অসংযত নাট্যবিরোধী কাব্যোচ্ছ্বাস পাওয়া যায়। কিন্তু ভাস তাঁর নাটকে এই শ্লোকগুলিকে কোথাও ঔচিত্যের সীমা লঙ্ঘন করে নাটকীয় ঘটনাপ্রবাহের অগ্রগতিকে ব্যাহত করতে দেন নি। এ দিক দিয়ে তাঁর রচনাশৈলীর সঙ্গে এপিক-কাব্যের রচনাশৈলীর তুলনা হতে পারে।

রামায়ণ-মহাভারতের মত মহাকাব্যের প্রভাব যে ভাসের উপর কম ছিল না তার আরও একটি প্রমাণ তাঁর নাটকের বিষয়বস্তুর নির্ব্বাচনের মধ্যে পাওয়া যায়। রামায়ণ থেকে তিনি প্রতিমা ও অভিষেক নাটকের বিষয়বস্তু গ্রহণ করেছেন। মহাভারত থেকে মধ্যমব্যায়োগ, দূতকাব্য, দূত-ঘটোৎকচ, কর্ণভার, উরুভঙ্গ এবং পঞ্চরাত্র—এই ছ'টি নাটকের বিষয়বস্তু গ্রহণ করেছেন।

প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে যে, বিষয়বস্তু নির্ব্বাচন ব্যাপারে ভাস যে বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন অন্য কোন সংস্কৃত-নাট্যকারের নাট্যকৃতিতে সে বৈচিত্র্য পাওয়া যায় না। কৃষ্ণ-কথা নিয়ে বালচরিত নামে একটি নাটক তিনি রচনা করেন। গুণাঢ্যের বৃহৎকথার কাহিনী নিয়ে রচিত তাঁর স্বপ্নবাসবদত্তা ও প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ। অবিমারক ও দরিদ্রচারুদত্ত—নাটক দুটি লৌকিক কাহিনী বা কল্পিত কাহিনী নিয়ে রচিত। শেষের নাটকটি বিশেষ সম্ভাবনাপূর্ণ ছিল যদিও এটিকে অসমাপ্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। নাটকগুলির বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য থেকে এটি স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, নাট্যকার হিসাবে কোন একটি বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে ভাস নিজেকে বেঁধে রাখেন নি।

মহাকাব্যের বিষয়বস্তু নিয়ে যে নাটকগুলি ভাস রচনা করেছেন, সেগুলিতেও অনেক সঙ্কট তিনি স্বাভাবিক প্রতিভাবলে কাটিয়ে উঠেছেন। ভাস যদি এপিক-কাব্যকার হতেন তা হলে এপিক-কাব্যের একটি মহৎ দোষকে তিনি এড়াতে পারতেন না। এ দোষ হচ্ছে বর্ণনার অনুচিত

সীমাহীন উচ্ছ্বাস। সমুদ্রের তরঙ্গ-ভঙ্গের মত উপমার পর উপমা হিল্লোলিত হ'য়ে চলেছে—কাব্যের ঘন সৌরভে অন্তশ্চেতনা নিঃসাড়, সুদীর্ঘ সমাসবন্ধনে জর্জরিত পদগুলি অর্থকে বয়ে নিয়ে চলেছে ক্লিষ্ট হয়ে—এ শৈলী নাটকে সর্বথা বর্জনীয়। তাই নাট্যকার ভাসকে এ রীতি বর্জন করে চলতে হয়েছে। ফলে এপিকের নিষ্কলঙ্ক সাবলীল সহজ রূপটিকে তিনি নাটকে ধরে দিতে পেরেছেন।

আরও কথা—কাব্যে কবির যে ভাবমানস মূর্ত হয়ে ওঠে নাটকে তা সম্ভব হয় না। সেখানে চরিত্রের প্রকৃতিকে অনুসরণ করে কথার জাল ফেলতে হয়, কাজেই বাধ্য হয়েই নাট্যকারকে আত্মগোপন করতে হয়। এ জন্যেও আমরা নাটকে ভাববস্তুর একটি সংহত রূপ দেখতে পাই। ভাসের নাটকে ভাবপ্রকৃতির এই সরল অভিব্যক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রূপদক্ষতা। সুরুচি ও ঔচিত্যবোধ তাঁকে রাজ-কবিকুলের জটিল কারুকার্যমণ্ডিত কাব্যনির্মিতির পক্ষপাতী করে নি। তাঁর কাব্যনির্মিতির এই সঙ্গতি ও সুষমাবোধ কালিদাসকেও যে প্রভাবান্বিত করেছিল তার বহুল উদাহরণ উভয়ের নাটক থেকে দেখানো যেতে পারে।

অবশ্য এ কথা ঠিক যে, কালিদাসের কাব্যপ্রতিভার সুমার্জিত রূপটি জনচিত্তকে অধিক মুগ্ধ করেছে। ভাসের অনুসরণে যে সকল ভাবকে তিনি তাঁর নাটকে গ্রহণ করেছেন সেগুলিতেও তাঁর প্রতিভার মায়াদণ্ডস্পর্শে রূপান্তর ঘটেছে। ভাসের প্রতিমা নাটকে প্রথম অঙ্কে সীতা যেখানে লীলারঙ্গিণী হয়ে বল্কল পরিধান করেছেন সেখানে তাঁর সখীর একটি উক্তি আছে—"সব্বসোহণীঅং সুরূবং ণাম"—অর্থাৎ সুরূপার সবই শোভা। নাটকস্থ পাত্রপাত্রীর মুখে এর চেয়ে অলঙ্কৃত কোন উক্তির প্রয়োজন হয় না। তবু কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের প্রথম অঙ্কে দুষ্যন্ত যখন বলেন :

"সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্॥"
—শৈবালে আচ্ছন্ন কমল আরো রমণীয়,
কলঙ্কের মলিন চিহ্নে চন্দ্র আরো সুন্দর,
বল্কলপরিধানা এই তন্বীও আরো মনোহর,
মধুর যার আকৃতি—কি না তার আভরণ ?

তখন কালিদাসের কবিকর্মের মার্জিত নৈপুণ্যে কার চিত্ত না অধিক মুগ্ধ হয় !

ভাসের অভিষেক নাটকের তৃতীয় অঙ্কে আছে—

"যস্যাং ন প্রিয়মণ্ডনাপি মহিষী দেবস্য মন্দোদরী
স্নেহাল্লুম্পতি পল্লবান্ ন চ পুনর্বীজন্তি যস্যাং ভয়াৎ।
বীজন্তো মলয়ানিলা অপি করৈরস্পৃষ্টবালদ্রুমাঃ
সেয়ং শক্ররিপোরশোকবনিকা ভগ্নেতি বিজ্ঞাপ্যতাম্॥"

—শক্ররিপু রাবণের অশোকবন ভগ্ন হয়েছে—একথা জানাও। আহা—এই অশোকবনের তরুণ তরুগুলিকে কেউ স্পর্শও করত না, ভয়ে প্রবহমাণ মলয়ানিল এর পল্লবগুলিকে আন্দোলিত করত না, এমনকি প্রসাধনে উৎসুক মন্দোদরীও এ বনের পল্লব কখনও ছিন্ন করেন নি।

অনুরূপ একটি শ্লোক শকুন্তলা নাটকেরও চতুর্থ অঙ্কে আছে—

"পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি পয়ো যুষ্মাস্বপীতেষু যা
নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্
আদ্যে বঃ কুসুমপ্রসূতিসময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্বৈরনুজ্ঞায়তাম্॥

—তোমাদের জলপান না করিয়ে যে প্রথমে জলপান করে না, আভরণপ্রিয়া হয়েও যে স্নেহবশতঃ তোমাদের নূতন কিশলয় ছিন্ন করে না, তোমাদের নূতন কুসুম-শোভা দেখে যার পরম আনন্দ—আজ তোমাদের সেই শকুন্তলা স্বামীগৃহে চলেছে। তোমরা তাকে অনুমতি দাও।

পাঠকমাত্রেই লক্ষ্য করবেন যে, সাদৃশ্যটি শুধু অর্থের দিক দিয়েই নয়; শব্দ ব্যবহারের ধ্বনিকৌশলটিও অনুরূপ। "প্রিয়মণ্ডনা", "স্নেহাৎ", "পল্লবান্", "সেয়ং" ইত্যাদি শব্দ উভয় শ্লোকেই বর্তমান।

ভাসের বালচরিত নাটকের প্রথম অঙ্কে দেবকীর একটি মানস-সঙ্কটের বর্ণনা আছে। যখন তিনি বসুদেবের হাতে কৃষ্ণকে তুলে দিয়ে স্বস্থানে ফিরে যাচ্ছেন তখন—

"হৃদয়েনেহ তত্রাদৈর্দ্বিধাভূতেব গচ্ছতি।
যথা নভসি তোয়ে চ চন্দ্রলেখা দ্বিধাকৃতা॥"

—স্থির আকাশে ও চঞ্চল জলে চন্দ্রলেখা যেমন দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে যায় তেমনি তাঁর দ্বিধাবিভক্ত হৃদয় চলেছে একদিকে এগিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে আর অন্যদিকে ক্লান্ত দেহ ফিরে চলেছে কারাগারের ভূমিশয্যায়।

শকুন্তলা নাটকের প্রথম অঙ্কেও অনুরূপ একটি শ্লোক আছে—যখন মাতৃ আজ্ঞায় দুষ্যন্ত ফিরে চলেছেন রাজধানীতে তখন আশ্রমবাসিনী শকুন্তলার জন্য আশ্রমবাসে উৎসুক দুষ্যন্ত বলছেন—

"গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য॥"

—বাতাসের বিরুদ্ধে নিয়ে চলা চীনাংশুকের মত শরীর

যত এগিয়ে চলেছে সম্মুখদিকে, অস্থির চিত্ত ততই পিছনে ফিরে চাইছে।

স্বপ্নবাসবদত্তার প্রথম অঙ্কের "বিশ্রব্ধং হরিণাচরন্ত্যচকিতা দেশাগতপ্রত্যয়াঃ"—এই পংক্তিটিকে একটু পরিবর্তিত ভাবে পাচ্ছি শকুন্তলা নাটকের প্রথম অঙ্কে—"বিশ্বাসোপগমাদ-ভিন্নগতয়ঃ শব্দং সহন্তে মৃগাঃ" এই পংক্তিটিতে।

প্রতিমা নাটকের তৃতীয় অঙ্কে রথবেগের বর্ণনায়—"রজশ্চাশ্বোদ্ধতং পততি পুরতো নানুপততি"—পংক্তিটির অর্থটিকে শকুন্তলা-নাটকের প্রথম অঙ্কে রথবেগের বর্ণনায় কালিদাস অন্য ভাষায় বলেছেন—"আশ্বোদ্ধতৈরপি রজোভিঃ অলঙ্ঘনীয়াঃ।"

অবশ্য রথবেগের এই বর্ণনায় কালিদাস আরও বেশী বর্ণসম্পাত করেছেন। ভাস যেখানে শুধুমাত্র একটি শ্লোকে রথাশ্ববেগের বর্ণনায় গতির তীব্রতা বোঝাবার জন্য "দ্রুমা ধাবন্তীব" গাছগুলি যেন দৌড়ে চলেছে—বলে আরম্ভ করেছেন কালিদাস সেখানে একটি ধাবমান মৃগশিশুর অত্যাশ্চর্য বর্ণনা দিয়ে রথগতির অতুলনীয় আপেক্ষিক তীব্রতা দেখিয়ে বলছেন:

"গ্রীবাভঙ্গাভিরামং মুহুরনুপততি স্যন্দনে দত্তদৃষ্টিঃ
পশ্চার্দ্ধেন প্রবিষ্টঃ শরপতনভয়াদ্ ভূয়সা পূর্বকায়ম্।
দর্ভৈরর্দ্ধাবলীঢ়ৈঃ শ্রমবিবৃতমুখভ্রংশিভিঃ কীর্ণবর্ত্মা
পশ্যোদগ্রপ্লুতত্বাদ্ বিয়তি বহুতরং স্তোকমুর্ব্যাং প্রয়াতি॥"

—অভিনব গ্রীবাভঙ্গি করে মৃগটি মুহুর্মুহু পশ্চাদ্ধাবিত রথের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করছে। শরপতন ভয়ে দেহের পশ্চার্দ্ধের অধিকাংশই যেন পূর্বার্দ্ধে প্রবিষ্ট হয়েছে। দ্রুত ধাবনের ক্লান্তিতে ঈষদ্ উন্মুক্ত মুখ থেকে অর্ধচর্বিত কুশতৃণ স্খলিত হয়ে পথে বিকীর্ণ হয়েছে—দেখুন—দেখুন—দ্রুত উল্লম্ফনের জন্য মনে হচ্ছে যেন শূন্যপথেই মৃগটি ধাবিত হচ্ছে—ভূপৃষ্ঠ স্পর্শ করছে মাত্র।

রথগতির একটি চিত্তগ্রাহী বাস্তবানুগ বর্ণনা দিয়েছেন ভাস:

"দ্রুমা ধাবন্তীব দ্রুতরথগতিক্ষীণবিষয়া
নদীবোদ্ধৃতাম্বুর্নিপততি মহী নেমিবিবরে।
অরব্যক্তির্নষ্টা স্থিতমিব জবাচ্চক্রবলয়ং
রজশ্চাশ্বোদ্ধতং পততি পুরতো নানুপততি॥"

—বৃক্ষগুলি ধেয়ে চলেছে, রথের বেগে মনে হচ্ছে যে, তাদের মধ্যেকার স্থান হঠাৎ সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে। জলপূর্ণ নদীর মতন উচ্ছ্বসিত হয়ে যেন ভূমিভাগ রথনেমির ফাঁকে ফাঁকে প্রবেশ করছে। নেমির অরগুলি আর স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায় না—বেগবশে ঘূর্ণমান চক্রগুলি যেন স্থির হয়ে গেছে। অশ্বক্ষুর থেকে উত্থিত ধূলিরাশি সম্মুখেই পতিত হচ্ছে—রথের অনুগামী হতে পারছে না।

শকুন্তলার প্রথম অঙ্কে কালিদাসের বর্ণনা অনুরূপ হলেও আরও বেশি চমৎকৃতিজনক কারণ আরও বেশি তথ্যবহুল ও বাস্তবানুগ। তিনি বলেছেন:

"মুক্তেষু রশ্মিষু নিরায়তপূর্বকায়া
নিষ্কম্পচামরশিখা নিভৃতোর্দ্ধকর্ণাঃ।
আত্মোদ্ধতৈরপি রজোভিরলঙ্ঘনীয়া
ধাবন্ত্যমী মৃগজবাক্ষময়েব রথ্যাঃ॥"

"যদালোকে সূক্ষ্মং ব্রজতি সহসা তদ্বিপুলতাং
যদর্দ্ধেবিচ্ছিন্নং ভবতি কৃতসন্ধানমিব তৎ।
প্রকৃত্যা যদ্‌বক্রং তদপি সমরেখং নয়নয়ো
র্ন মে পার্শ্বে কিঞ্চিৎ ক্ষণমপি ন দূরে রথজবাৎ॥"

—রথরজ্জু শিথিল করে দেওয়াতে অশ্বগুলি দেহাগ্রভাগ নিঃশেষে বিস্তারিত করে যেন মৃগের দ্রুত ধাবনশক্তিকে সহ্য করতে না পেরে ছুটে চলেছে—তাদের চামরশিখা নিশ্চল, কর্ণদেশ উন্নত ও নিস্পন্দ এবং স্বীয় ক্ষুরোৎক্ষিপ্ত ধূলিকেও যেন তারা লঙ্ঘন করতে পারছে না।...রথের বেগে দূরস্থ সূক্ষ্ম বস্তুকে মুহূর্তমধ্যে বিপুল, বিভক্ত বস্তুকে অবিভক্ত ও বক্র বস্তুকে ঋজু ব'লে মনে হচ্ছে। কোন বস্তুই মুহূর্তের জন্যও পার্শ্বস্থ বা দূরস্থ বলে অনুভূত হচ্ছে না।

মানুষের সাধারণ সুখ-দুঃখকে সহজ সরল ও অনাড়ম্বর ভাষায় প্রকাশ করতে ভাসের তুলনা পাওয়া বিরল। তাঁর প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ নাটকে কন্যার বিবাহের পর আসন্ন বিরহ-কল্পনায় ব্যথিতচিত্ত মায়ের উক্তি আছে—

"অদত্তেতি আগতা লজ্জা দত্তেতি ব্যথিতং মনঃ।
ধর্মস্নেহান্তরে ন্যস্তা দুঃখিতা খলু মাতরঃ॥

—কন্যা দান করা ধর্ম, কন্যাকে কাছে রাখতে চায় স্নেহ। অদত্তা কন্যা লজ্জার কারণ—দত্তা কন্যা বেদনার কারণ। ধর্ম ও স্নেহের মধ্যে পড়ে মায়েরা শুধু দুঃখভোগই করে থাকে।

আনন্দ বেদনাময় কন্যাবাৎসল্যের এই কথাই কালিদাসও তাঁর শকুন্তলাকাব্যের চতুর্থ অঙ্কে বলেছেন:

"যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ং সংস্পৃষ্টমুৎকণ্ঠয়া
কণ্ঠঃ স্তম্ভিতবাষ্পবৃত্তিকলুষশ্চিন্তাজড়ং দর্শনম্।
বৈক্লব্যং মম তাবদীদৃশমিদং স্নেহাদরণ্যৌকসঃ
পীড্যন্তে গৃহিণঃ কথং নু তনয়াবিশ্লেষদুঃখৈর্নবৈঃ॥

—আজ শকুন্তলার যাবার দিন! হৃদয় উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে। কণ্ঠ বাষ্পগদ্‌গদ স্তম্ভিত! চিন্তামগ্ন দৃষ্টি তাই আচ্ছন্ন। আমি বনবাসী তবু তনয়াবিরহ দুঃখে আমার এই দশা—না জানি গৃহীদের এতে কতই কষ্ট!

উপরে উদ্ধৃত দুটি শ্লোকে প্রথমটির অনাড়ম্বর সহজ প্রকাশে ও দ্বিতীয়টির বিশ্লেষণাত্মক ভাবগাম্ভীর্যে ভাসের বিশুদ্ধ নাট্যকলা ও কালিদাসের কাব্যাশ্রয়ী নাট্যকলার বিশিষ্ট স্বাদ পাঠকমাত্রেরই অনুভবগম্য।

এই ভাবে ভাসের বহু শ্লোকের ভাব কালিদাসের কাব্যে এক নূতন রূপ গ্রহণ করেছে। ভাসের মত শক্তিমান্ নাট্যকারের প্রভাব যে কালিদাসের মত শক্তিমান্ পরবর্তী নাট্যকারের উপর থাকবে এ অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার।

শুধু শ্লোকবিশেষের ভাবের সম্বন্ধেই নয়, নাটকের বিভিন্ন পরিস্থিতি ও চরিত্রকল্পনাতেও কালিদাসের উপর ভাসের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। ভাসের প্রতিমা নাটকের পঞ্চম অঙ্কে আছে—রাম সীতাকে বলছেন, আশ্রমের তরু-লতা, মৃগশিশু, পশুপক্ষী, বিন্ধ্যগিরি ও নদীদের নিকট থেকে বিদায় চেয়ে নিতে। সেখানে সীতার আসন্ন বিরহদুঃখে সন্তাপিত হয়েছে তরুলতা ও হরিণশিশু—যাকে সীতা পুত্রের মত পালন করেছেন। ঠিক এইরূপ একটি প্রকৃতিদুহিতার চরিত্রকল্পনা আমরা শকুন্তলার চতুর্থ অঙ্কে পাই যেখানে আশ্রমপালিত শকুন্তলা তপোবনের তরুলতা, মৃগশিশু, সখী প্রভৃতির কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন। প্রতিমা নাটকে সীতার পালিত মৃগ যেমন ভরতকে অবিশ্বাস করেছিল তেমনি শকুন্তলা নাটকে শকুন্তলার পালিত মৃগ-শিশুও দুষ্মন্তকে অবিশ্বাস করেছে। স্বপ্নবাসবদত্তা নাটকের বহু ঘটনা ও কথার সঙ্গেও এই ভাবে শকুন্তলা নাটকের সাদৃশ্য আছে।

ছোটখাটো স্পষ্ট ও উজ্জ্বল প্রবাদ রচনায় ভাস ও কালিদাস উভয়েরই সমান কৃতিত্ব। ড্রামাটিক আয়রণি বা নাট্যোচিত বাগ্‌ভঙ্গিবিশেষের পরিস্থাপনায় উভয়েই সমান কৃতী। তবে অলঙ্কার সংরচনায় ভাসের রুচি যেমন সরল ও সুকুমার কালিদাসের রুচি তেমনি বিচিত্র ও উজ্জ্বল।

ভাস প্রধানতঃ বীররসের পরিবেশক কিন্তু শৃঙ্গাররসের পরিবেশকরূপেও তিনি কম শক্তিশালী নন। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও আদিযুগের নাট্যকাররূপে আজিকের কতকগুলি অমার্জনীয় ত্রুটিকে তিনি এড়িয়ে যেতে পারেন নি। এই শ্রেণীর ত্রুটি কিন্তু আমরা কালিদাসে পাই না। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে কাল-জ্ঞানের কথা। প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই প্রবেশ করে একই ব্যক্তি এমন একটি ঘটনার বর্ণনা দিলেন যে ঘটনা ঘটতে বহু সময়ের প্রয়োজন হয়। তাঁর অভিষেক নাটকের শঙ্কুকর্ণের বিবৃতি এখানে স্মরণীয়।

ভাসের স্বপ্নবাসবদত্তা তাঁর নাটকগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছে যেমন অভিজ্ঞান-শকুন্তলা নাটক কালিদাসের নাটকগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছে। এই দুটি নাটকেই নাট্যনির্মিতির একটি অপূর্ব কৌশলকে আমরা প্রত্যক্ষ করি—পাই পরিপূর্ণ জীবনদর্শন, পাই নাট্য ও কাব্যের এক অননুকরণীয় সমন্বয়।

প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রে নাট্যনির্মিতির যে সর্বাঙ্গীন একটি পরিপূর্ণ আদর্শ ছিল—সে আদর্শ আজকের দিনেও সর্বতোভাবে ও সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য। রসের একটি স্থির বিন্দুকে লক্ষ্য রেখে নানা ঘটনার মাধ্যমে চরিত্র সৃষ্টির সঙ্গতি নাটক রচনার একটি সর্বকালীন আদর্শ। শুধুমাত্র ঘটনার চমৎকারিতা কিংবা চরিত্রসৃষ্টির অক্লান্ত প্রয়াস নাটকের ভাবসাম্যকে নষ্ট করে। প্রাচীন নাট্যাদর্শে তাই চিত্তকে উদ্দীপ্ত ও বিস্তৃত করে যে রস তারই অনুকূল করে ঘটনা-সংযোজন ও চরিত্রসৃষ্টির কল্পনা ছিল।

আরও একটি কথা এই যে, মনুষ্যত্বের একটি আদর্শকেও সেই প্রাচীনযুগের নাট্যকার ধরে দিতেন দর্শক ও পাঠকের সম্মুখে। জটিল ও অসুস্থ চরিত্র থেকে জটিল মনস্তাত্ত্বিক বিক্রিয়া বিশ্লেষণের প্রণালীতে কোন অন্তর্নিহিত মহত্ত্বকে আবিষ্কার করবার চেষ্টাও তাঁরা করেন নি। আনন্দ পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণকে যুক্ত করে তাঁরা নাট্যাদর্শের যে ধ্রুবতারাকে সাহিত্যগগনে উদিত রেখে গেছেন আজকের দিনেও সেই কথা বিশেষ করে স্মরণ করা যেতে পারে।

প্রতিঘাত

শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল

দোকান থেকে বাড়ী ফিরে সদর দরজা থেকেই যুগল হাঁক পাড়তে থাকে, কি গো রান্না হ'ল ?

তার গলা শুনে ছেলেমেয়েরা ভয়ে জড়সড়। স্ত্রী শশব্যস্ত। রাঁধতে রাঁধতে উঠে দাঁড়িয়ে দরজার বাইরে তাকায়। উঠোন পেরিয়ে একেবারে রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায় যুগল। বগলে খেরোর বটুয়া, হাতে ছাতা। কোঁচকানো কপালে ঘাম। মোটা ভুরুর ছাঁচতলায় বাঁকা চোখের রূঢ় চাউনি—তাচ্ছিল্যভরা। গোঁফদাড়ি কামানো। খোঁচা চুল তেলে খেঁসে ছাঁটা। গলায় তুলসীর মালা। বেঁটে, আঁটসাঁট শরীর। গায়ের রং কালো। হাতগুলো লোমশ।

দরজায় দাঁড়িয়েই ভেতরের পানে চেয়ে বলে ওঠে, এখনও রান্না হয় নি ?

আগুনের আঁচে আতপ্ত মুখ না তুলেই উমা বলে, হয়ে এল। যাও না, হাতমুখ ধুয়ে নাও। ডাকছি।

মুখ কুঁচকিয়ে চোখ ঘুলিয়ে যুগল হুমকি দেয়, হুঁ ! ডাকছি। সবই খুশিমত ; কিছুই ত হয় নি এখনও। একটু হুঁসপর্ব যদি আছে। বলে গেলাম না, হরিসভায় ভাগবত পাঠ হচ্ছে।

খুন্তি নাড়তে নাড়তে উমা বলে, বেশ ত যাও না। এই ত তরকারিটা নামিয়ে রুটি ক'খানা সেঁকে দোব। ময়দা মাখা রয়েছে।

—তবেই আর কি ? মাথা কিনে নিয়েছ ? সুশী কি করছে ? গেল কোন্ চুলোয় ? রুটি ক'খানা বেলে দিতে পারে না ?

দশ-এগার বছরের মেয়ে সুশীলা। ঘরের দাওয়ায় বেরিয়ে এসে শঙ্কিত কণ্ঠে বলে, এই যে আমি। খোকা কাঁদছিল তাই ভোলাচ্ছিলুম।

ঘরের দিকে যেতে যেতে যুগল বললে, কাঁদছিল কেন ? হতভাগা ছেলের দিনরাত কান্না। মেরে পস্তা খুলে দিচ্ছি দাঁড়াও। তবে কান্না থামবে।

ঘরের ভেতর ঢুকেই যুগল হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, বুড়ী, তুই কি করছিস ওখানে ? লাথি মেরে মুখ ভেঙে দেব। উঠে আয় ওখান থেকে।

উমা রাঁধতে রাঁধতে অসহায় দৃষ্টিতে ভেতর পানে তাকায়।

সুশী এসে দরজায় দাঁড়ায়।

—দে মা, রুটি ক'খানা বেলে দে। হরিসভা যাবে। ভীরু পাখীর মত সুশী রান্নাঘরে ঢোকে। চুপি চুপি মাকে জিজ্ঞেস করে, ফিরতে অনেক রাত হবে, না মা ?

—হ্যাঁ। উমা তার মুখের পানে চেয়ে মৃদু হাসে। সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাসও ফেলে। ছেলেমেয়েরা বাপকে কেউ ভালবাসে না। বাপ যতক্ষণ বাইরে থাকে ততক্ষণ তারা হাত-পা মেলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। বাপ বাড়ী এলেই তারা নিজেদের গুটিয়ে নেয়। তারা ভয়ে কাঁটা। তাদের দম বন্ধ হয়ে আসে।

ঘরের ভেতর থেকে কাঁচের বাসনভাণ্ডার শব্দ আসে। মা ও মেয়ে একসঙ্গে চমকে ওঠে।

সুশী বলে, পলটু বোধ হয় গ্লাস ভাঙলে। মার খেয়ে মরবে।

মার আরম্ভ হয়ে গেছে। দমাদম্ কিল, চড়। চিলের মত চেঁচাচ্ছে ছেলেটা। ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছে যুগল, গ্লাসটা ভেঙে চুরমার করে দিল। লক্ষ্মীছাড়ার সংসার। হতভাগা, হাবাতের দল, কিছু রাখবে না। সব তছনছ করে দিল।

হাঁপাতে হাঁপাতে উমা ছুটে এসে ছেলেটাকে যুগলের কবল থেকে মুক্ত করে নেয়।

স্বামীর অগ্নিমূর্তির পানে চোখ তুলে তাকাবার সাহস হয় না উমার। বুড়ীকে জিজ্ঞেস করে, কেমন করে ভাঙল রে ? হাত-টাত কাটে নি ত ?

বুড়ী কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ফুরসত দিল না যুগল। মেয়েটার চুলের মুঠি ধরে তার পিঠে দিল একটা চাপড় বসিয়ে। বললে, এই হারামজাদা মেয়েকে বললুম এক গেলাস জল দিতে। উনি জলভরতি গেলাসটা বসিয়ে দিলেন ঐ হতভাগার সামনে। ব্যস্ ! এক টানে দিল সাবাড় করে। কোত্থেকে সব এসেছে ? হাড়ে টক। হতভাগার দল।

ছেলেটাকে বাইরে বসিয়ে দিয়ে এসে, উমা নিঃশব্দে ভাঙা কাচের টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিল।

বুড়ী কাঁদছে, মুখে হাত চাপা দিয়ে ভয়ে ভয়ে। পাছে শব্দ হলে আবার মার খেতে হয়।

যুগল আপনমনে গজরাচ্ছে, নবাবী করে কাচের গেলাস বের না করলে চলে না।

উমা কোন কথা বললে না।

দুমদাম শব্দ করে যুগল উমাকে হুমকি দিয়ে বলে উঠল, চুলোর ছাই তোমার রান্না হবে না এমনি চলে যাব।

তার মুখের দিকে না চেয়েই উমা বললে, এস না। রান্না ত হয়ে গেছে। সুশী রুটি সেঁকছে।

উমার এ সব গা-সওয়া। এই তাদের স্বামীস্ত্রীর প্রাত্যহিক জীবনের ধারা। এই তার স্বামীর নিয়ম-সেবা। বারো বছরের বিবাহিত জীবনে এ তাদের দৈনন্দিন ব্যাপার। মার খেয়ে খেয়ে উমার গায়ের ছাল-চামড়া পুরু হয়ে গেছে। এসব আর তাঁকে স্পর্শ করে না। তার চোখের জল শুকিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে শুধু মাতৃহৃদয়ের তন্ত্রীগুলো ঝনঝন করে ওঠে তার সন্তানদের ব্যথায়—তাদের উর্ধশ্বাস কাতরতায়।

বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবার সময় যুগল ছেলেটার সামনে গিয়ে ধমক দিল, ইস্! এখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না হচ্ছে? চোপ। চোপ। নইলে এখখুনি তুলে আছাড় দোব।

উমা নিঃশব্দে ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে চলে গেল। সুশী অসহায় দৃষ্টি মেলে মায়ের পানে তাকাল।

যুগল চোখের বাইরে যেতেই ছেলেটা চুপ করল। বুড়ী কোথায় গা-ঢাকা দিয়েছিল, বেরিয়ে এসে মায়ের কাছে বসল। উমা মনে মনে হাসল। কিন্তু তার বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল।

সুশী মায়ের মুখের পানে চেয়ে মনে মনে বল পায়। কিছুক্ষণ পরে সে আস্তে আস্তে বললে, আচ্ছা মা, বাবা অমন করে কেন? কারুকে কি বাবার ভাল লাগে না? আমাদের একটা ভাই, তাকে কোনদিন একটু আদর করতে ইচ্ছে যায় না? আরও ত পাঁচ জনের বাবা দেখেছি। ছেলে-মেয়ের সঙ্গে খেলা করে, হাসে, গল্প বলে। কত আদর করে। আমি চেয়ে চেয়ে দেখি আর মনে মনে ভাবি, আমাদের বাবা অমন কেন?

উমা যে কি বলবে ভেবে পায় না। সুশী ত আর কচি খুকীটি নয়। তার চোখ ফুটেছে। সংসারকে সে দেখতে শিখেছে, বুঝতে শিখেছে। তার কাছে আর লুকোবে কেমন করে?

উমা বললে, ও ঠিক যে আমাদের দেখতে পারে না বা ঘেন্না করে তা নয়। বোধ হয় ও ইচ্ছে করলেও পারে না, বা ওর শক্তি নেই ভাল ব্যবহার করবার।

প্রশ্নভরা চোখে সুশী মায়ের পানে তাকায়। উমা বলে, কুঁজো, খোঁড়া দেখেছিস ত? তাদের অঙ্গ বিকল, ওর মন বিকল; পেঁচালো। ও অন্যায়কে ন্যায় ভাবে, ন্যায়কে অন্যায় ভাবে। ও কারুকে ভাল চোখে দেখতে শেখে নি।

উমা চুপ করে তাদের পানে চেয়ে থাকে। হঠাৎ সন্তান তিনটিকে কাছে টেনে নেয়। নিবিড় ভাবে বুকে জড়িয়ে ধরে। পক্ষীমাতা যেমন করে শাবককে পক্ষপুটে ঢেকে রাখে আঘাতের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে।

ছেলেটাকে কোলে আর দু'হাতের বেষ্টনে মেয়ে দুটিকে আঁকড়ে ধরে সে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল।

কি যেন ভাবছে সে। ভাবনার মাঝে ডুবে সে যেন শক্তি-সঞ্চয় করছে—বাঁচবার শক্তি, সন্তানদের মানুষের মত বাঁচাবার শক্তি।

সে মা। মায়ের কর্তব্য, সন্তানের প্রতি মায়ের কর্তব্য-বোধ তার বুকের তলায় ঝনঝনিয়ে বেজে উঠেছে। সে এই দীর্ঘকাল—প্রায় এক যুগ, জড়ের মত অমানুষিক অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করেছে, তবু স্বামীর অধিকারকে সে কোনদিন ক্ষুণ্ণ করে নি। কিন্তু তার সন্তানদের ওপর এই হৃদয়হীন ব্যবহার সে সহ্য করবে না, কিছুতেই না। এই আতঙ্কের পাষাণভারে ওদের শরীর বাড়তে পারছে না, মন বাড়তে পারছে না। বাপের মত ওদের মনও বিকল হয়ে যাবে, ওরা হাসতে ভুলে যাবে।

উমা হঠাৎ গা-ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ায়। বলে, দেখ, তোরা আর ওকে ভয় করিস নি। একটুও ভয় করবি না, বুঝলি? আমি দেখব কেমন করে তোদের গায়ে ও হাত তোলে কিংবা হুমকি দেয়। আমি যতক্ষণ আছি তোদের কোন ভয়-ভাবনা নেই, তোরা যত পারবি হাসবি, খেলবি, নাচবি, গাইবি। যা বলে বলবে, ওর কথা আমি বুঝব, আমার কথা তোরা শুনবি।

অবাক হয়ে গেছে সুশী মায়ের মুখের পানে চেয়ে। মায়ের এ চেহারা সে আর কখনও দেখে নি। মায়ের মুখখানা আগুনের মালসার মত গনগনে। বড় বড় চোখ দুটো আরও বড় হয়ে জ্বলে উঠেছে, গলার স্বর গেছে বদলে।

মুখের ওপর থেকে ভাসা চুলগুলো সরিয়ে দিতে দিতে উমা বললে, হ্যাঁ, এখন থেকে আমাদের বদলাতে হবে, আর এমন ভাবে চলতে পারে না।

সুশী ভয়জড়িত স্বরে বললে, কিন্তু তোমাকে যে মারবে মা।

—আমি বুঝব তোকে ভাবতে হবে না।

বারো বছর। বিবাহিত জীবনের প্রথম বারোটি বছর তার কোথা দিয়ে কেমন করে যে কেটে গেছে এই স্বামী নামক অপূর্ব্ব জীবটির মর্জির ওপর ভর করে, তার মনেও পড়ে না। অতীত তার অস্পষ্ট ও ঘোলাটে। তবু একথা মনে আছে, স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্যবোধকে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে এসেছে সে নিঃশব্দে মুখ বুজে, কোন দিন কোন নালিশ জানায় নি। 'যার অদৃষ্টে যেমন জোটে'—ভেবেই মনকে সান্ত্বনা দিয়ে এসেছে। জীবনকে ঘোরালো করে তোলে নি। স্বামীর অধিকার যেখানে চরম সেখানে লড়াই করে লাভ নেই ভেবেই সে সব কিছু নীরবে সহ্য করছে। ধর্মের সনাতন ভিতকে আলগা হতে দেয় নি, অনেক ঝড়ঝাপটা তার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। স্ত্রীর কোন অধিকারই সে পায় নি, দাবিও করে নি কোনদিন। টাকা-পয়সা যখন যা দয়া করে স্বামী তাকে দিয়েছে তাই হাত পেতে নিয়েছে। নিজের গয়নার ওপর তার অধিকার নেই। লোহার সিন্দুকে তোলা থাকে, দরকার হলে চাইতে হয় স্বামীর কাছে। লোহার সিন্দুকের চাবি থাকে স্বামীর কাছে। এই দীর্ঘ বারো বছরের মধ্যে সে কখনও চাবি হাতে পায় নি, সিন্দুক খোলবার অধিকার পায় নি।

যুগলের সোনারূপার কারবার, নিজের দোকান। অবস্থা সচ্ছলই বলা চলে। কিন্তু সংসারে সচ্ছলতার কোন নিদর্শন মেলে না, বরং অভাবের ছায়া আছে। যুগল অতিরিক্ত কৃপণ এবং তার মর্জির ওপর কারুর কথা বলবার সাহস নেই। সে যা হাত তুলে দেয় তাতেই উমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়, সে মুখ ফুটে কিছু চায় নি।

কেন চায় নি ?

দীর্ঘ অতীতের বিড়ম্বিত জীবনের পানে চেয়ে সে শিউরে ওঠে। তার নিজের ওপর রাগ হয়, তার হৃদপিণ্ডটা মোচড়াতে থাকে। নিজের বাকি জীবনটাকে হয়ত সে স্বামীর ইচ্ছার যুপকাষ্ঠে বলি দিতে পারত, কিন্তু সে ঠেকেছে তার ছেলেমেয়েদের মুখের পানে চেয়ে। তাদের জীবনকে সে এমন ভাবে বিড়ম্বিত হতে দেবে না, তাদের জন্য তাকে স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করতে হবে। উচিত-অনুচিত, নিয়ম-অনিয়ম, ন্যায়-অন্যায়ের সব বাধা ডিঙিয়ে বুক ফুলিয়ে সে তার সন্তানদের আড়াল করে দাঁড়াবে।

ছেলেদের ঘুম পাড়িয়ে সে স্বামীর কাছে গিয়ে বললে, কাল আমি ছেলেদের নিয়ে কলকাতা যাব, দিদির কাছে।

—তার মানে ?

—মানে আমার শরীরে কুলোচ্ছে না। শরীর আমার ভাল নেই। একবার ডাক্তারকে দেখাব।

—এখানে কি ডাক্তারবদ্যি নেই নাকি ? আর কি এমন অসুখ যে কলকাতা গিয়ে একেবারে বড় ডাক্তারকে দেখাতে হবে ?

উমা গলায় জোর দিয়ে বললে, দরকার বুঝলে তাই করতে হবে। শুনে রাখ, কাল আমি যাচ্ছি, ফিরতে দেরি হতে পারে। তোমার রান্নার জন্যে কাল সকালে লোকের ব্যবস্থা করবে।

নাক সিঁটকে মুখ বেঁকিয়ে যুগল বললে, তোমার হুকুম নাকি ?

—হুকুম না হলেও আমার ইচ্ছে।

—তোমার ইচ্ছেতেই আমাকে চলতে হবে নাকি ?

—বারো বছর তোমার ইচ্ছেয় আমি চলেছি মুখ বুঁজে। এখন থেকে ঠিক তেমনি ভাবে তোমাকে চলতে হবে আমার ইচ্ছেয়।

যুগল চমকে উঠল তার গলার রূঢ় স্বরে, তার কথা বলার ভঙ্গিমায়। এ স্বর ত সে শোনে নি কোন দিন, সে বিছানায় উঠে বসল। ঝলসে উঠল, তোমার হয়েছে কি ? পাগল হলে নাকি ?

গম্ভীর ভাবে উমা উত্তর দিল, তা না হলে ডাক্তার দেখাতে যাচ্ছি কেন ? ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে ছেলেদের ঘুম ভাঙিও না, ঘুমোও।

আলো নিবিয়ে দিয়ে উমা ছেলেদের বিছানায় নেমে গেল।

এ ত স্পর্ধা হ'ল কেমন করে। নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়েছে।

গজরাতে লাগল যুগল।

সত্যিই যুগল অবাক হয়ে গেছে। এ ত উমার মত নয়, উমার হ'ল কি ?

নিজের মাথাও গরম হয়ে উঠল, ঘুম এল না।

ভোরের দিকে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। রোজই উমা ভোরে উঠে নীচে নেমে যায়। নীচে থেকে ওপরে এসে সে যুগলের ফতুয়ার পকেট থেকে আস্তে আস্তে লোহার সিন্দুকের চাবিটা নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে সিন্দুক খুলল। যুগল ঘুমোচ্ছে, মাঝের দরজাটার শিকল তুলে দিল। সিন্দুক থেকে চুপি চুপি বের করল, নিজের গয়নার বাক্স। স্বর্ণীর হার চুড়ি। আর নিল দু'শ টাকার খুচরো নোট।

সিন্দুক বন্ধ করে আবার চাবিটা যথাস্থানে রেখে দিল। যুগল জানতেও পারলে না।

সকালে ঘুম থেকে উঠে যুগল যায় প্রত্যহ গয়লাবাড়ী দুধ

আনতে। তার পর চা খেয়ে বাজার করে দিয়ে দোকানে যায়। দুপুরে আবার বাড়ীতে খেতে আসে।

ঘুম থেকে উঠে সিঁড়ি কাঁপিয়ে যুগল নীচে এল। রান্নাঘর থেকে উঁকি মেরে উমা দেখলে তার মুখখানা দুর্বাসার মত আগুনে আছে।

মুখ ধুয়ে যুগল বললে, সুশী যা, গয়লাবাড়ী থেকে দুধ নিয়ে আয়।

ঘরের ভেতর থেকে কঠোর আদেশের ভঙ্গিতে উমা বলে উঠল, না। সুশী গয়লাবাড়ী যেতে পারবে না, কাজ করছে সে।

উমা যুগলের গায়ে যেন বোমা ছুঁড়ে মেরেছে। আঘাতের তীব্রতায় সে ছটফট করতে করতে রান্নাঘরের দোরে গিয়ে বললে, কাজ ? এটা কাজ নয় ?

—না, এটা ওর কাজ নয়। ভদ্রঘরের কচি মেয়ে এক মাইল পথ ভেঙে ঘটি হাতে নিয়ে একা যাবে গয়লাবাড়ী দুধ আনতে ? না, ও যাবে না।

রান্নাঘরের দোরের বাজু চেপে ধরে ভঙ্গিটাকে বেশ শক্ত করেই দাঁড়িয়ে আছে উমা। মায়ের মুখের চেহারা আর গলার স্বর শুনে উঠোনে দাঁড়িয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে সুশী। যুগলও ভড়কে গেছে, দাঁতে দাঁত চেপে সে থমকে দাঁড়িয়েছে।

উমার দাঁড়াবার দৃপ্ত ভঙ্গীতে, মুখের কাঠিন্যে, বহ্নিদীপ্ত চোখের দৃষ্টিতে আর কণ্ঠের ঝাঁঝে যুগল ভয় পেয়েছে। ভয় পাবারই কথা, এ মূর্তি তার চোখে অভিনব। উমা চিরদিন দাঁড়িয়ে মার খেয়েছে, কখনও প্রতিবাদ করে নি, কখনও মুখ ঘুরিয়ে রুখে দাঁড়ায় নি। তাই যুগলের সন্দেহ হ'ল হয়ত মাথাখারাপের লক্ষণ। নইলে এ সাহস, এ স্পর্দ্ধা রাতারাতি হ'ল কেমন করে ?

উমা মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ডাকলে, সুশী, ঘরে এসে চা ছেঁকে দাও।

বাজার থেকে যুগল ফিরে এলে, রান্নাঘর থেকেই উমা বললে, দোকান যাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করে যেও, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

যুগলের মুখখানা বেলুনের মত কেঁপে ফুলে উঠল। সে মুহূর্তকাল থমকে দাঁড়াল।

এ বলে কি ? 'তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে, দেখা করে যেও।'

যে এতকাল শুধু তার কথাই শুনে এসেছে, মাথা নীচু করে নিঃশব্দে, আজ সে মাথা তুলে হুকুম করছে। মাথাখারাপ ছাড়া আর কি ? নইলে—হুঁ।

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে একটা অস্ফুট শব্দ করে যুগল ওপরে উঠে গেল।

উমা ওপরে উঠে যাচ্ছিল। সুশী তাকে বাধা দিয়ে বললে, কেন যাচ্ছ মা ? মারধোর করবে আবার।

—ইস্! এমনি আর কি ? তুই যা! তরকারি কুটগে।

উমা সামনে এসে দাঁড়াল। তার পানে চেয়ে যুগলের মনে হ'ল উমার চেহারার ঢেউ যেন বদলে গেছে। এ যেন সে উমা নয়, তার উপর যেন কেউ ভর করেছে।

উমা সোজা তার চোখে চোখ রেখে বললে—শোন। তোমার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে চাই।

যুগল কি বলতে যাচ্ছিল। উমা তার মুখের সামনে আঙুল নেড়ে ধমকের সুরে বলে উঠল, গাঁ গাঁ করে ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ো না। আমি যা বলি, আগে স্থির হয়ে শোন।

যুগল ভাল করে তাকে দেখে নিল। উমা বটে ত, না আর কেউ ? সে যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না।

উমা আঁট হয়ে বসে গম্ভীর ভাবে বললে, দিন বদলেছে। এখন তোমার চাল বদলাতে হবে। তোমার চোখরাঙানি, হুমকি আর হাততোলার ওপর চিরদিন চলতে পারে না।

—কি করতে হবে ?

—আমার ছেলেমেয়েদের ভদ্রঘরের ছেলেমেয়ের মত খাইয়ে, পরিয়ে, লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তুলতে হবে, এই হ'ল এক নম্বর। দু'নম্বর হচ্ছে, বাড়ীতে ঝি-চাকর চাই। আমার মেয়েদের আমি ঝিয়ের মত সংসারের কাজ করতে দোব না বা আমিও আর করব না। তিন নম্বর, আমার কিছু টাকা চাই। ছেলেমেয়েদের ভাল কাপড় জামা কেনবার জন্যে আর কলকাতা যাওয়া-আসার খরচের জন্যে।

যুগলের চোখ দুটো কোটর ফেটে বেরিয়ে এল। সে গর্জে উঠল, কেন, আমি রেস্কোর্সের বাজি জিতেছি নাকি ? টাকা, টাকা খোলামকুচি, না ?

উমা ধমক দিল, চেঁচাচ্ছ কেন ? ভদ্রলোকের মত অন্ততঃ একটা দিন কথা বল না। না দাও, বল, না, দোব না। আমি পারি, আমার ক্ষমতা থাকে, আদায় করে নোব।

—মুখ সামলে কথা বল। জুতিয়ে মুখ ভেঙে দোব। নবাবী করতে এসেছ ? কি আমার রাজরাণী, ঝি চাই, চাকর চাই, টাকা চাই। বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও আমার বাড়ী থেকে। ঘাড় ধরে সব বের করে দোব। কিচ্ছু দোব না, একটি তামার পয়সাও নয়।

উমা বুক ফুলিয়ে চোখ রাঙিয়ে সোজা হয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

বললে, ছোটলোকের মত ইতরোমো করো না, মুখ ছোট করো না। অনেক সহ্য করেছি, আর করব না মনে রেখ।

ক্ষিপ্তের মত যুগল হঠাৎ ছাতাটা দিয়ে উমার কপালে সজোরে মেরে দিল। কপালটা কেটে মুখের ওপর রক্ত গড়িয়ে পড়ল। যুগল আক্রোশে ফুলতে ফুলতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

বাড়ীতে খেতে এসে যুগল অবাক হয়ে গেল। কেউ নেই। তাদের পুরনো ঝি পার্বতীর মা বললে, বউদি আমায় কাজে বাহাল করে গেছে। রান্নাঘরে তোমার ভাত ঢাকা আছে।

সত্যিই উমা ছেলেমেয়ে নিয়ে কলকাতা চলে গেল। এও সম্ভব? কিন্তু হঠাৎ এত স্পর্দ্ধা উমার হ'ল কেমন করে?... কেন হ'ল?

কোথায় যেন একটা আগুনের ধোঁয়া দেখতে পেলে যুগল।

তার বুকের নীচেটা ধড়াস্ করে উঠল। লোহার সিন্দুক খুলে গয়না নিয়ে গেছে, টাকাও নিয়ে গেছে। তা হলে ত ব্যবস্থা কায়েমী করেই গেছে।

উমা ছেলেমেয়েদের নিয়ে দিদির বাড়ী এসেছে। দিদি ওর চেয়ে বয়সে অনেক বড়। উমা সব কথাই তাকে স্পষ্ট বললে—যুগলের বদমেজাজ, দুর্ব্যবহার ও নির্যাতনের কথা, নিজের ও ছেলেমেয়েদের দুঃখের ধারাবাহিক কাহিনী। কোন কথাই সে গোপন করলে না।

উমার ভগ্নীপতি পরেশবাবু রসিক লোক। সব শুনে হাসতে হাসতে বললে, মাথা খারাপ করেই যখন এখানে এসেছিস, দিনকতক মাথা খারাপ করেই থাক্। এ খবর শুনলেই কর্তার মাথার ব্যামো সেরে যাবে। মাঝে মাঝে চোখের আড়াল হওয়াটা দরকার।

পরেশবাবুর চিঠি পেয়ে যুগল এল উমাকে দেখতে, কিন্তু দেখা হ'ল না উমার সঙ্গে। পরেশবাবু যুগলকে বললে, তোমার ওপর ওর জাতক্রোধ। থাকতে থাকতে চিৎকার করছে, আমি ওকে খুন করব। আমার ছেলেমেয়েদের খেতে দেয় না, তাদের মেরে আধমরা করে দেয়। তোমাকে দেখলেই ও ক্ষেপে উঠবে। তাই কোবরেজ মশায়ের নিষেধ।

যুগলের মুখ গেল মরার মত ফ্যাকাশে হয়ে। সে মুখ তুলে পরেশবাবুর দিকে চাইতে পারলে না।

গম্ভীর মুখ কালো করে পরেশবাবু বললে, কোবরেজ মশায় বিশেষজ্ঞ। তিনি স্পষ্টই বলছেন, দুশ্চিন্তায় দুর্ব্যবহারে মনমরা হয়ে রোগটা জন্মেছে। আতঙ্কের আঘাতে বেচারীর স্নায়ুগুলো দুর্বল হয়ে গেছে।

যুগল নিঃশব্দে মাথা হেঁট করে বসে রইল।

দিদি বলে, শুধু কি তাই?—ছেলেমেয়েগুলোর অবস্থা দেখ দিকি? বাছারা আমার ভয়ে কাঁটা। বাপ এসেছে শুনে ভয়ে ঘরের কোণে গিয়ে মুখ লুকিয়েছে। তুমি ওদের বাপ না পেয়াদা? এদিকে গলায় কণ্ঠি পরেছ। হরিসভায় গিয়ে কেত্তন গাও শুনতে পাই।

যুগল যে কি বলবে ভেবে পেলে না। লজ্জায় সে মাথা তুলতে পারলে না।

দিদি বললেন, ও ভাল হলেও তোমার সঙ্গে আর ঘর করবে বলে ত মনে হয় না। বলে, 'আমরা আলাদা থাকব, আমাদের খোরাকির ব্যবস্থা করে দিক।'

যুগলের মুখখানা শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল। সে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বললে, মাথার গোলমাল ত।

—গোলমাল ত বাধিয়ে দিলে তুমি। এখন ঠেলা সামলাও।

স্ত্রীর গায়ে বা মেয়েদের গায়ে যারা হাত তোলে, তাদের মত কাপুরুষ সংসারে বিরল। যুগলও ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ী ফিরে এল। উমার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত হ'ল না। দেখা করতে সাহস হ'ল না পরেশবাবুর কথা শুনে।

প্রতি সপ্তাহে যুগল আসে কলকাতায়, ফল মিষ্টি হাতে নিয়ে। ছেলেমেয়েদের কাছে ডেকে আদর করে, হাসে গল্প করে।

আড়ালে দাঁড়িয়ে উমা দেখে আর মনে মনে হাসে।

পরেশবাবু জিজ্ঞেস করেন, কি রে, ওষুধ ধরেছে?

চোখে ঝিলিক দিয়ে উমা হাসে।

পরেশবাবু বলেন, এ রোগের একমাত্র দাওয়াই হ'ল ফাষ্টিং, যাকে বলে অনশন। বুনো বাঘ নিয়ে ত খেল দেখানো চলে না। সার্কাসের বাঘকে না খাইয়ে শুকিয়ে নির্জীব করে তোলে, তবে না বশ করতে হয়।

উমার মুখখানা সঙ্কোচে রাঙা হয়ে ওঠে।

যুগলের মনের ভিতরটা ছটফট করতে থাকে উমাকে দেখবার জন্যে, কিন্তু কবিরাজের নিষেধ, পরেশবাবুর সতর্কতা। পরেশবাবু তার ধৈর্যের চরম পরীক্ষা নিয়ে তাকে সহিষ্ণু করে তুলতে চান। বিচ্ছেদের আগুনে পুড়িয়ে তাকে খাঁটি করে নেবার ইচ্ছা তাঁর।

উমা মনে মনে হাসে। আড়াল থেকে যুগলকে দেখে তার মনে হয় সে যেন হঠাৎ বুড়ো হয়ে গেছে। রগের চুল গুলো সাদা হয়েছে, মুখে চিন্তার রেখা পড়েছে, কপালের শিরাগুলো ফুলে উঠেছে। স্বামীর ম্লান মুখের পানে চেয়ে

তার মনে মায়া জাগে, নিজেকে নিষ্ঠুর মনে হয়। তার নিষ্ঠুরতার আঘাত কিন্তু যুগলের মুখে হাসি ফুটিয়েছে। পাষাণ ফেটে জল বেরিয়েছে। সে ছেলেমেয়েকে কাছে পেলে হাসে, সে হাসিতে প্রাণধর্মের প্রকাশ। তার স্বভাবকাঠিন্য অনেকটা নম্র হয়ে এসেছে।

উমার মনে আশা জাগে—হয়ত মতিগতি বদলাতে পারে।

যুগলের জীবনে উমা ছিল অনেকটা আলো-বাতাসের মত। কাছে থাকলে বোঝা যায় না। দূরে সরে গেলে দম বন্ধ হয়ে আসে, প্রাণ আইঢাই করতে থাকে। উমার অভাবে যুগলের অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে সেই রকম। খালি বাড়ীতে তার দম আটকে আসে। রাত্রির অন্ধকারে একা ঘরে সে হাঁপিয়ে ওঠে, বিভীষিকা দেখে। মনে হয় ঘরের ছাদটা আস্তে আস্তে নেমে আসছে, এখুনি তার বুকে চেপে তাকে পিষে ফেলবে। সে আতঙ্কে শিউরে ওঠে, ভয়ে চোখ বুজতে পারে না।

সে একমনে উমাকে ভাবে। যেসব কথা পূর্বে কোন দিন মনেও হয় নি সেই সব চিন্তা তার মনের মাঝে জটলা করে। উমা, উমা, উমা। উমা ছাড়া আর কোন কিছুই যে ভাবতে পারে না সে। তন্ময় হয়ে যায় উমার চিন্তায়, চোখ দুটি বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। এরই নাম কি বিরহ? সে হরিসভায় কথকতা শুনেছে—শ্রীমতীর শত-বর্ষের বিরহের কথা। যুগলের মনে হয়, উমার বিচ্ছেদ দুঃসহ হলেও তার চিন্তা মধুর, এর মাঝে যেন একটা আনন্দ আছে, মাধুর্য আছে।

তার মনের চেহারা ছিল নিতান্ত স্থূল। এ সব সূক্ষ্ম অনুভূতি ছিল না তার কোনদিন। তার মনে হয় উমা দূরে গিয়ে তার সবচেয়ে কাছে এসেছে, এত কাছে তাকে পায় নি সে কোন দিন।

বাড়ী ফিরে সে চমকে ওঠে। মনে হয় তেলচিটে, হলুদের ছোপলাগানো শাড়ির আঁচল বিছিয়ে ভূমিশয্যায় ক্লান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছে উমা, আর সে চেঁচিয়ে বাড়ী মাথায় করছে। তারই প্রতিক্রিয়া আজ তার বুকে ভারী হয়ে পাথরের মত চেপে বসেছে।

সে ছটফট করে বাড়ীময় ঘুরে বেড়ায় এ ঘরে থেকে ও ঘরে। তার মনে হয় ধাক্কা দিয়ে দিয়ে তার মনের দোর খুলতে না পেরে হতাশ হয়ে অভিমানে উমা দূরে সরে গেছে। আসলে দেহকামনার ঊর্দ্ধে মিলন তাদের হয় নি। এবার উমা চোখের আড়ালে গিয়ে তার চোখ খুলে দিয়েছে।

লোকচক্ষে উমার দীর্ঘ অনুপস্থিতির একটা সঙ্গত কৈফিয়ত খাড়া করবার জন্তই বোধ হয় যুগল বাড়ীতে মিস্ত্রী লাগাল। পুরনো বাড়ী ভেঙে নতুন করে মেরামত করাল। ইটের ওপর থেকে নোনাধরা বালি খসিয়ে নতুন করে পলস্তারা ধরাল, নতুন করে রং করাল, নতুন করে ইলেক্‌ট্রিকের লাইন বদলাল। ঘসিয়ে-মাজিয়ে বাড়ীখানার ভোল বদলে দিল।

আবার নতুন করে সে সংসার পাতবে। পুরনো উমাকে নতুন করে সেই সংসারে প্রতিষ্ঠা করবে, নতুন করে সে জীবনকে গড়ে তুলবে।

আর কিছু সে ভাবতে পারে না—সংসার ছাড়া, উমা ছাড়া, নিজের ছেলেমেয়েদের ছাড়া আর কোন কথা তার চিন্তায় আসে না। তাদের মুখে হাসি ফোটানোই হবে এখন তার জীবন-সাধনা।

কলকাতায় সোনাপটিতে গিনি কিনতে আসে যুগল। অবিনাশ আঢ্যির সঙ্গে তার ছেলেবেলার আলাপ। অবিনাশের দোকানেই সে কেনাবেচা করে। সময়ে সময়ে বৌ-বাজারে অবিনাশের বাড়ীতে এসেও ওঠে।

রবিবার—দোকান বন্ধ। শেয়ালদা স্টেশন থেকে সোজা সে অবিনাশের বাড়ীতে গিয়ে উঠল, সঙ্গে ছিল কিছু পুরনো সোনারূপো। সেগুলোর ব্যবস্থা করে তার পর সে ছেলেমেয়েদের দেখতে যাবে। আর যদি উমার সঙ্গে দেখা হয়, সেই আশা।

ছলনাময়ী আশা যে অপার করুণাময়ীর রূপ ধরে নিকটেই দাঁড়িয়ে আছে সে বুঝবে কেমন করে?

অবিনাশের বাড়ী ঢুকেই যুগল রীতিমত চমকে উঠল। মাটিতে পা দুটো যেন পুঁতে গেল।

ওপরে উঠবার সিঁড়ির পাশে দাঁড়িয়ে আছে উমা অবিনাশের বউয়ের হাত ধরে।

যুগল নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না। উমাই বটে ত! না, আর কেউ?

তার চেনা উমার সঙ্গে যেন এর মিল নেই। রং অনেক ফরসা হয়েছে, শরীরে মাংস হয়েছে। দেহের ঢেউ বদলেছে, হাসির ছাঁদের পরিবর্তন হয়েছে। একখানা ছাপা শাড়িতে তাকে অপরূপ মানিয়েছে।

উমাও অবাক হয়ে গেছে তাকে দেখে। মাথায় শাড়ির আঁচলটা তুলে দিয়ে সে মুখ নীচু করল। অবিনাশের বউ উমার গায়ে ধাক্কা দিয়ে হাসতে হাসতে বললে, ঢেউয়ের পিঠে ফেনা।

উমা ভাবলে, হয়ত ও-বাড়ী থেকে খবর পেয়ে যুগল এখানে এসেছে।

অবিনাশের বউ যুগলকে বললে, কি গো, অমন করে দাঁড়ালে যে? একে কখনও দেখ নি নাকি?

যুগল প্রকৃতিস্থ হয়ে হাসতে হাসতে বললে, আমার ঘরের লক্ষ্মীটিকে যে তোমরা এখানে এনে বন্দী করে রেখেছ, জানব কেমন করে?

উমার ভয় হ'ল পাছে ভেতরের কথা যুগল ফাঁস করে দেয় এদের কাছে। সে চোখ তুলে সোজা যুগলের পানে তাকাল। যুগল ভয় পেলে তার দৃষ্টির কাঠিন্যে।

যুগল দিশাহারা হয়ে গেছে। পালছেঁড়া নৌকো যেন তরঙ্গের সঙ্গে কানামাছি খেলছে।

তার ধৈর্য আর সবুর মানছে না। এখনই উমার সঙ্গে একটা আপোষ করতে না পারলে যেন সে স্থির হতে পারছে না। উমাকে চোখের আড়াল করতে তার ভরসা হচ্ছে না, পাছে সে তার সঙ্গে দেখা না করেই দিদির বাড়ী চলে যায়। উমার মন ফেরাবার জন্য সে যে-কোন মূল্য দিতে আজ প্রস্তুত। এ যোগাযোগ তার প্রত্যাশার অতীত।

অবিনাশ বললে, তোর বউ এখানে রয়েছে বলিস নি ত? সেদিন হঠাৎ সিনেমায় দেখা হ'ল তাই জানতে পারলাম। বউ আজ ওকে নিয়ে এসেছে।

যুগল ঢোঁক গিলে জড়িয়ে জড়িয়ে বললে, হাঁ, এই কদিন হ'ল ওর দিদির ওখানে এসেছে। ছেলেদের সঙ্গে আনে নি বুঝি?

—না, একাই এসেছে।

—ছেলেটা ভাল আছে ত? শরীরটা ভাল ছিল না কিনা?

অবিনাশ বললে, জিজ্ঞেস কর্ না ভেতরে গিয়ে।

অবিনাশের বউ কাঁসিতে জলখাবার সাজাচ্ছিল। ছেলের ছুঁতো করে যুগল ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। বললে, ওখানে ছেলেটা আবার কান্নাকাটি করবে না ত?

অবিনাশের বউ কটাক্ষ হেনে জবাব দিল, ছেলের বাপ গিয়ে ছেলেমেয়েদের চার্জ নিক্ না। ও আমার সঙ্গে সিনেমা যাচ্ছে।

উমা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে গম্ভীর অধস্ফুট স্বরে বললে, তুমি দিদির ওখানে যাও। ছেলেমেয়েদের খানিকটা ঘুরিয়ে নিয়ে এস। আমি ফিরলে তার পর তুমি বাড়ী যেয়ো।

উমার বলার ভঙ্গীটা প্রায় আদেশের কাছাকাছি। যুগল প্রথমটা চমকে গেল, কিন্তু রাগ হ'ল না। সে অপরাধীর মত ভঙ্গীতে বললে, তোমার শরীর যে এত খারাপ হয়েছিল, আমি জানতাম না।

উমা মনে মনে হাসল। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বললে, আমার শরীর তোমার ত জানবার কথা নয়।

যুগল হঠাৎ মেঝেয় বসে পড়ল তার পায়ের কাছে। বললে, আমি দোষ করেছি, তোমার কাছে মাপ চাইছি।

উমা পিছিয়ে সরে গেল, ঘরের আলগা দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। বললে, তুমি বড়, তুমি সংসারের হর্তাকর্তা। তোমার আবার দোষ কি?

উমা ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। যুগল কাকুতি করে বললে, যেও না, আমায় দয়া কর। বল কবে বাড়ী যাবে? আমি আর একা থাকতে পারছি না।

মুখ টিপে হাসল উমা। বললে, কেন, তুমি ত একা থাকতেই ভালবাস।

—মোটেই না। ভুল তুমিই করেছিলে। নিজেকে এত সস্তা করে আমার চোখের সামনে ধরেছিলে যে, তোমার দাম বুঝতে দাও নি, আমিও বুঝবার চেষ্টা করি নি।

উমা হেসে ফেললে।

যুগল বললে, অনেক আগেই তোমার কঠিন হওয়া উচিত ছিল। উচিত ছিল আমাকে ধাক্কা দিয়ে, আমার চোখে আঙুল দিয়ে নিজেকে দেখিয়ে দেওয়া।

মধুর হাসি হেসে উমা কি বলতে গেল। যুগল হঠাৎ তার হাত দু'খানি ধরে বললে, যথেষ্ট হয়েছে, সন্ধি কর যে-কোন সর্তে। তোমার সর্তই আমি মেনে চলব।

প্রশ্নভরা চোখ তুলে উমা তার পানে তাকাল।

যুগল বললে, চাল বদলে দিয়েছ। এত দিন তুমি যেমন নিঃশব্দে আমার কথা মেনে এসেছ, আমি এখন থেকে ঠিক তেমনি ভাবেই তোমার সব কথা মানব।

উমা মনে মনে লজ্জা পেল।

বৈষ্ণব পদকর্ত্তা দ্বিজ চণ্ডীদাস

শ্রীবেলা দাশগুপ্তা

বাংলার সাহিত্য-রসিকসমাজে চণ্ডীদাসের নাম সুপরিচিত। বহুকাল ধরিয়া চণ্ডীদাসের পদাবলী বাংলার জনসাধারণের সাহিত্যরস-পিপাসার পরিতৃপ্তিসাধন করিয়া আসিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কবির জীবনী জটিল সমস্যাজালে জড়িত। চণ্ডীদাস-জীবনীর উপকরণের অপ্রতুলতা এই সমস্যাসৃষ্টির কারণ নহে, বৈষ্ণব ও সহজিয়া সাহিত্যের উপকরণগুলিই এই সমস্যাসৃষ্টির জন্য প্রধানতঃ দায়ী। এই সমস্যার গ্রন্থি মোচন করিয়াই পদকর্ত্তা চণ্ডীদাসের পরিচয়লাভ করিতে হইবে।

বিখ্যাত পদাবলীর রচয়িতা চণ্ডীদাস কে?

বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাসে একজন চণ্ডীদাসের সন্ধান পাওয়া যায়, তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। সনাতন গোস্বামী বৃহৎ-বৈষ্ণব তোষণী টীকায় চণ্ডীদাসের কাব্যান্তর্গত দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের উল্লেখ করিয়াছেন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য 'চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি ও রায়ের 'নাটকগীতি'র রসাস্বাদন করিতেন; শ্রীচৈতন্যমঙ্গল রচয়িতা জয়ানন্দ মিশ্র জানাইয়াছেন, "জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন তারা করিল প্রকাশ।"

বৈষ্ণব-সহজিয়া-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাদি এবং চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত রাগাত্মিকা পদ হইতে চণ্ডীদাস-জীবনীর নূতন উপকরণ সংগৃহীত হয়। মুকুন্দদাসের সিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়, আকিঞ্চনদাসের বিবর্ত্তবিলাস ও চণ্ডীদাস ভনিতার রাগাত্মিক পদ হইতে জানা যায়—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পদকর্ত্তা চণ্ডীদাসের পদাবলী আস্বাদন করিতেন। চণ্ডীদাস ছিলেন পরকীয়া প্রেমের সাধক, বাশুলীর আদেশে তিনি এই সাধন-সংক্রান্ত পদ রচনা করেন, রজকিনী বা ধোবানীর আশ্রয়ে অর্থাৎ রজকঝিয়ারী তারা বা রামীর আশ্রয়ে তিনি সহজসাধন করিতেন।

বিভিন্ন বৈষ্ণব পদকর্ত্তা তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি চণ্ডীদাসের বন্দনা করিয়াছেন। এই সকল পদ হইতে জানা যায়—তিনি ছিলেন অপূর্ব্ব কবিত্বশক্তিসম্পন্ন। মহাপ্রভু তাঁহার পদাবলীর রসাস্বাদন করিতেন, বাশুলী আদেশে তিনি 'যুগল রসের' গীত রচনা করেন। কেহ কেহ চণ্ডীদাসের সাধনসঙ্গিনীরও উল্লেখ করিয়াছেন।

বৈষ্ণব সাহিত্যের এই সকল প্রমাণানুসারে এই জ্ঞানলাভ হয় যে, চণ্ডীদাস একজন প্রাচীন কবি, এবং ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, কারণ মহাপ্রভু তাঁহার পদের রসাস্বাদন করিতেন; তিনি সহজিয়া সাধক হইলেও সকলের নমস্য, কারণ তাঁহার পদাবলী কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিয়া সকলকে আকুল করিয়াছে।

বৈষ্ণব-পদাবলী-রসিক জন বহুদিন হইতেই চণ্ডীদাসের উৎকৃষ্ট পদাবলীর সুমধুর রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত হইয়া আসিতেছিলেন। তাঁহাদের মনে ১৩০৫ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চণ্ডীদাস সম্বন্ধে কোন সংশয় ছিল না। ইতিমধ্যে বিভিন্ন পুথি হইতে চণ্ডীদাসের পদগুলি সঙ্কলনের কাজে কেহ কেহ অগ্রসর হইয়াছিলেন। চণ্ডীদাসের এই পদগুলি সাহিত্য-রসিকদের মনে অভূতপূর্ব্ব সাড়া জাগাইয়াছিল। কিন্তু ১৩০৫ সালে নীলরতন মুখোপাধ্যায় বীরভূমের নান্নুর গ্রামনিবাসী এক ব্রাহ্মণের নিকট হইতে চণ্ডীদাস ভনিতার রাসলীলার ৭১টি পদ সংগ্রহ করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশ করেন। পদাবলী-অভিজ্ঞেরা এই পদগুলির প্রশংসা করিতে পারিলেন না, বরং এই সময়ে তাঁহাদের মনে সন্দেহের বীজ উপ্ত হইল। সতীশচন্দ্র রায় ১৩২০ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (২য় সংখ্যা) চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত সকল পদই যে কবিশ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাসের নহে, এই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। ইহার পরে বাংলা ১৩২১ সালে ব্যোমকেশ মুস্তফী চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলাবিষয়ক ৬২টি সম্পূর্ণ ও একটি খণ্ডিত পদ পরিষৎ-পত্রিকায় (২১শ ভাগ) প্রকাশ করেন। চণ্ডীদাস পদাবলীর সুরের সহিত সুপরিচিত পণ্ডিতদের নিকট পদগুলি নিতান্তই অপরিচিত বোধ হইল। এই পুথির পরিচয়-প্রসঙ্গে ব্যোমকেশ মুস্তফী লিখিয়াছেন—"আমি যেভাবে দেখিয়াছি তাহাতে এখানিকে সে চণ্ডীদাসের রচনা বলিতে একটুকুও সাহস হয় না।"

শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলার পদগুলিই পণ্ডিতদের সংশয়ান্বিত করিয়াছিল। ইহার পরে ১৩২৩ সালে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভের সম্পাদনায় বড়ু চণ্ডীদাস ভনিতাযুক্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্য প্রকাশিত হইলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। পণ্ডিতগণ সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলেন, ভাব ভাষা ও বিষয়বস্তু কোন দিকেই এই কাব্য পূর্ব্ব-প্রচলিত পদাবলীর সমগোত্রীয় নহে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এই গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁহার মনের সংশয় প্রকাশ করিয়া লিখিলেন—"তবে কি আমাদের চিরপরিচিত চণ্ডীদাস আর এই নবাবিষ্কৃত চণ্ডীদাস এক চণ্ডীদাস নহেন?" এইভাবেই চণ্ডীদাস ও তাঁহার পদাবলী যে সমস্যার সৃষ্টি করিল, তাহা আরও জটিল আকার ধারণ করিল দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইবার পরে।

মণীন্দ্রমোহন বসু দুইখানি অপ্রকাশিত পুথি হইতে ১১০টি নূতন পদ সংগ্রহ করিয়া ১৩৩৩-৩৪ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় এবং দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীসংগ্রহের দুইটি খণ্ড ১৩৪১ ও ১৩৪৪ সালে প্রকাশ করেন। তিনি কয়েকটি প্রবন্ধে ও এই পদাবলীর ভূমিকায় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন, চণ্ডীদাস একজন নহেন, দুইজন; একজন খাঁটি বড়ু চণ্ডীদাস ও অপরজন খাঁটি দীন চণ্ডীদাস; এই দুই চণ্ডীদাস ভিন্ন অন্য চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব কোনমতেই স্বীকার্য্য নহে।

কিন্তু সতীশচন্দ্র রায় চণ্ডীদাস ভনিতার উৎকৃষ্ট পদগুলিকে দীন চণ্ডীদাসের ন্যায় একজন তৃতীয় শ্রেণীর কবির রচনারূপে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি পদকল্পতরুর ভূমিকায় লিখিলেন : "এই দীন চণ্ডীদাসের ভাল ও মন্দ বহু পদাবলীর বিশেষ আলোচনা করিয়া আমরা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিয়াছি যে, ইহার মত তৃতীয় শ্রেণীর একজন কবির দ্বারা চণ্ডীদাস ও দ্বিজ চণ্ডীদাস ভনিতার উৎকৃষ্ট পদাবলী রচিত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।" শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ও দীন চণ্ডীদাসের পদগুলির সহিত চণ্ডীদাস ভনিতার উৎকৃষ্ট পদগুলির পার্থক্য স্বীকার করিলেন, (বীরভূম বিবরণ, ৩য় খণ্ড)। এই-ভাবেই চণ্ডীদাস সমস্যাটি ক্রমশঃই জটিলতর হইয়া উঠে।

ইতিমধ্যে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ১৩৩৩ সালের প্রবাসীতে 'ছাতনার চণ্ডীদাস' শীর্ষক প্রবন্ধে বাসলী সেবক এক চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব জানাইয়া আর একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিলেন, কারণ এতদিন বীরভূমের নান্নুরকেই চণ্ডীদাসের লীলাস্থল জানিয়া সকলে নিশ্চিন্ত ছিলেন।

এই ক্রমবর্দ্ধমান চণ্ডীদাস-সমস্যাটি বৈষ্ণবপদাবলী-বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে। যাঁহারা এই সমস্যার সমাধানকল্পে প্রবন্ধাদি রচনায় হস্তক্ষেপ করেন, তাঁহাদের মধ্যে নলিনীকান্ত ভট্টশালী, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুকুমার সেন, সতীশচন্দ্র রায়, মহম্মদ শহীদুল্লাহের নাম উল্লেখযোগ্য। নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধে প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, চণ্ডীদাস একজন, তিনিই বিভিন্ন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন কাব্য ও পদাবলী রচনা করেন। (ভারতবর্ষ, ১৩৩৪ সাল, ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যা।)

অধ্যাপক সুকুমার সেন চণ্ডীদাসের রচনাবলীকে প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন—এই দুই চণ্ডীদাসের রচনাভেদে ভাগ করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে, বড়ু চণ্ডীদাস প্রাচীন এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন কাব্য ও উৎকৃষ্ট পদাবলীর রচয়িতা এবং দীন ও দ্বিজ ইত্যাদি ভনিতার চণ্ডীদাস অর্ব্বাচীন, তিনিই অবশিষ্ট পদাবলীর রচয়িতা। চণ্ডীদাসের নিবাসস্থল সম্বন্ধে তাঁহার মত এই যে, চণ্ডীদাস যে ছাতনার অধিবাসী তাহা প্রমাণের চেষ্টা আধুনিক। (বিচিত্র সাহিত্য, চণ্ডীদাস সমস্যা।)

সতীশচন্দ্র রায় দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া দৃঢ়তার সহিত মন্তব্য করিয়াছেন—"আমরা দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভনিতার উৎকৃষ্ট পদগুলিকে বরং বড়ু চণ্ডীদাসের বলিয়াও মানিতে রাজী আছি, কিন্তু দীন চণ্ডীদাসকে কিছুতেই দ্বিজ বলিয়া মানিতে পারি না।" (পদকল্পতরুর ভূমিকা।) চণ্ডীদাসের নিবাস সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ কোন মতবাদের পরিচয় পাওয়া যায় না। 'চণ্ডীদাসের রাধিকার কলঙ্কভঞ্জন' শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় শ্রীচৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রণেতা বড়ু চণ্ডীদাস এবং কৃষ্ণলীলা বিষয়ক সমগ্র পদের রচয়িতা দীন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাঁহার মতে দীন চণ্ডীদাস নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য ও ছাতনার অধিবাসী, সেই জন্যই তাঁহার পদে বাশুলীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়: (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪০, ৩য় সংখ্যা।) মুহম্মদ শহীদুল্লাহের মতে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন প্রণেতা বড়ু চণ্ডীদাস ভিন্ন আরও দুই জন চণ্ডীদাস পদ রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা দ্বিজ ও দীন চণ্ডীদাস। (পরিষৎ-পত্রিকা, ৬০বর্ষ, ২য় সংখ্যা।)

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, চণ্ডীদাস-সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া সমালোচকগণ একমত হইতে পারেন নাই।

চণ্ডীদাস ভনিতাযুক্ত কাব্য ও যে সকল পদাবলী এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে দুই যুগোপযোগী ভাবধারার বৈশিষ্ট্য সকল সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। বড়ু চণ্ডীদাস ভনিতা-যুক্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যের ভাব, ভাষা ও রসের ধারা শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক বা পরবর্ত্তী যুগের শ্রীকৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্য-নাটকাদি এবং রসশাস্ত্রের সিদ্ধান্তের অনুরূপ নহে, কিন্তু চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত পদাবলীসমূহ শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক বৈষ্ণবাচার্য্যদের শ্রীকৃষ্ণ-লীলা ও রস-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাদির অনুসরণেই রচিত। চণ্ডীদাস-পদাবলী অনুসারে কন্দর্পনিন্দিত কান্তি, কালিয়াবরণ শ্যামবন্ধুর রূপ দর্শনে শ্রীরাধিকা প্রথমাবধি আত্মহারা, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রাধা প্রথম দর্শনেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্তা নহেন, প্রথম পরিচয়ের পরেও বারংবার তাঁহার নিবেদিত প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। পদাবলী অনুসারে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমিলনের সহায়ক সখী বা সখাগণ, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে এই সখী বা সখার কোন প্রয়োজন স্বীকৃত হয় নাই। পদাবলীতে চন্দ্রাবলী শ্রীরাধিকার প্রতিনায়িকা, এই কাব্যে তিনি শ্রীরাধার সহিত অভিন্ন। এই সকল বিরুদ্ধ ভাববস্তুর সমাবেশ ও ভাষা-বৈশিষ্ট্য এই কাব্যের প্রাচীনত্বের সূচনা করে। এই কাব্যের দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডই সম্ভবতঃ সনাতন গোস্বামীর উদ্দিষ্ট দান ও নৌকালীলা। সুতরাং চৈতন্যপূর্ব্বযুগে যে এক বাসলীসেবক বড়ু-চণ্ডীদাস ভনিতায় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্য রচনা করেন, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। ভাষাবিশেষজ্ঞদের মতে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-কাব্য চতুর্দ্দশ শতাব্দীর রচনা, মুহম্মদ শহীদুল্লাহও এই মত সমর্থন করিয়াছেন। ছাতনার সামন্তরাজবংশের অনুগৃহীত কৃষ্ণপ্রসাদ সেন "ছাতনার রাজবংশ পরিচয়ে" সামন্তরাজ হামীর উত্তরের রাজ্য-কালে এক চণ্ডীদাসের কৃষ্ণলীলাকাব্য রচনার উল্লেখ করেন। (যোগেশচন্দ্র রায় সম্পাদিত চণ্ডীদাসচরিত।) এই প্রমাণানুসারে ১৩৫৩-১৪০৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকাব্য রচিত বলিয়া সাব্যস্ত হয়। এই রচনাকাল পূর্ব্বোক্ত অনুমানের পরিপোষক। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে যে কবি শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনকাব্য রচনা করিয়াছেন, চৈতন্যোত্তর যুগে রচিত পদের তিনি রচয়িতা হইতে পারেন না, একথা স্বীকার্য্য।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকাব্য ভিন্ন দ্বিজ, দীন, আদি, কবি ইত্যাদি বিশেষণযুক্ত চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত বহু পদাবলী এযাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে। [illegible]

চণ্ডীদাস ভনিতার কৃষ্ণলীলা বিষয়ক একখানি খণ্ডিত পদাবলীর পুথি আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি খণ্ডিতাংশগুলি অন্যান্য পুথি বা চণ্ডীদাস পদের অন্যান্য সঙ্কলন হইতে সংগ্রহ করিয়া পূরণ করিয়াছেন এবং দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী নামে প্রকাশ করিয়াছেন। এই দুই হাজার পদের চিহ্নবিশিষ্ট পুথিতে দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীই শুধু সংগৃহীত হইয়াছিল, সম্পূর্ণ পুথি আবিষ্কৃত না হইলে তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। তবে এই পুথির প্রমাণানুসারে ধার্য্য হয় যে, চণ্ডীদাসের পদাবলীর সংখ্যা দুই হাজারের অধিক।

মণীন্দ্রমোহন বসু দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীতে বড়ু, দ্বিজ, দীন ইত্যাদি বিভিন্ন ভনিতার পদ সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু অনেক পদ রচনাবৈশিষ্ট্যে দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীর সমগোত্রীয় নহে বলিয়া তাঁহার মতে সন্দেহজনক। দৃষ্টান্তস্বরূপ পূর্ব্বরাগ পর্য্যায়ের কয়েকটি পদের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, দীন চণ্ডীদাসের পূর্ব্বরাগের সম্পূর্ণ পালাটি আবিষ্কৃত হয় নাই, মণীন্দ্রমোহন বসু অন্যান্য সঙ্কলনগ্রন্থ হইতে পদ সংগ্রহ করিয়া পালাটি পূরণ করিয়াছেন। শ্রীরাধার রূপবর্ণনামূলক চণ্ডীদাস ভনিতার 'তড়িৎবরণী হরিণীনয়নী', 'নবীন কিশোরী মেঘের বিজুরী', 'পথে হুড়াহুড়ি দেখিলু নাগরী', 'দেখি অসকালে দেখিলু যে ভালে', ইত্যাদি চণ্ডীদাস ভনিতার পদ; 'সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম', 'সোনার নাতিনী এমন যে কেনি', ইত্যাদি দ্বিজ চণ্ডীদাস ভনিতার পদ; 'এ ধনি এ ধনি বচন শুন', 'সে যে নাগর গুণের ধাম', ইত্যাদি বড়ু চণ্ডীদাসের পদ এবং আরও অনেক প্রচলিত পদকে তিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস এবং পদাবলী রচয়িতা দীন চণ্ডীদাসের রচনাবৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন নহে বলিয়া জাল ও সন্দেহজনক—এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ পূর্ব্বোক্ত সুচিন্তিত প্রবন্ধটিতে বড়ু, দ্বিজ, দীন প্রভৃতি বিভিন্ন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও বড়ু চণ্ডীদাস ভনিতার, 'সে যে বৃষভানু সুতা', 'শুনলো রাজার ঝি', 'বন্ধুর লাগিয়া সেজ বিছাইনু', প্রভৃতি পর্য্যায়ের পদকে কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কবির রচনা প্রমাণিত না হওয়ায় মণীন্দ্রমোহন বসুর ন্যায় এগুলিকে জাল সাব্যস্ত করিয়াছেন। এইরূপ সংশয়ের ক্ষেত্রে দীন এবং বড়ু চণ্ডীদাসের রচনার ভাব ও বিষয়বস্তুর সহিত না মিলিলেই দ্বিজ বা বড়ু চণ্ডীদাস ভনিতার পদগুলিকে জাল কিংবা সন্দেহজনক ধার্য্য করিবার পূর্ব্বে প্রাচীন গ্রন্থের প্রমাণানুসারে পদগুলি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কি না তাহার বিচার প্রয়োজন।

বৈষ্ণব ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণলীলা স্মরণ ও কীর্ত্তনের উদ্দেশ্যে বহু পদাবলীর সৃষ্টি করিয়াছেন। কেহ কেহ একই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদকর্ত্তার পদাবলী সংগ্রহ করিয়া পালার আকারে গ্রথিত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই সংগ্রহকর্ত্তারা তৎকালপ্রচলিত বিখ্যাত পদকর্ত্তাদের পদ হইতেই রস-পরিপোষক অধিকসংখ্যক পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃতসমুদ্র এবং নরহরি (ঘনশ্যাম) চক্রবর্ত্তীর গীত-চন্দ্রোদয় এইরূপ দুইখানি সংগ্রহগ্রন্থ। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে সঙ্কলিত এই দুই পদ-সংগ্রহ গ্রন্থে দ্বিজ চণ্ডীদাস, বড়ু চণ্ডীদাস ও চণ্ডীদাস ভনিতার পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। রাধামোহন ঠাকুর চণ্ডীদাস ভনিতার মোট নয়টি পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন—বড়ু চণ্ডীদাস ভনিতার পদ চারিটি, দ্বিজ চণ্ডীদাস ভনিতার পদ দুইটি এবং অবশিষ্ট পদ চণ্ডীদাস ভনিতার। গীত-চন্দ্রোদয়ের প্রথম ভাগে পূর্ব্বরাগ পর্য্যায়ের এক হাজারের অধিক পদের মধ্যে (অন্যান্য পর্য্যায়ের পদ আবিষ্কৃত হয় নাই) চণ্ডীদাস ভনিতার পদ মোট চব্বিশটি। ইহার মধ্যে দ্বিজ চণ্ডীদাস ভনিতার পদ দুইটি, বড়ু চণ্ডীদাস ভনিতার পদ দুটি ও অবশিষ্ট পদগুলি শুধু চণ্ডীদাস ভনিতার। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দীন চণ্ডীদাস পদাবলীর পূর্ব্বরাগ পালায় যে কয়টি পদ মণীন্দ্রমোহন বসু সন্দেহজনক সাব্যস্ত করিয়াছেন, সেই পদগুলি গীতচন্দ্রোদয়ের পূর্ব্বরাগ পালার অন্যতম উৎকৃষ্ট পদ এবং মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কর্ত্তৃক বিবেচিত সন্দেহজনক বড়ু চণ্ডীদাসের পদ—পদামৃতসমুদ্র ও গীতচন্দ্রোদয় উভয় গ্রন্থেই উদ্ধৃত হইয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে সঙ্কলিত, বিশ্বভারতী পুথিশালার পদমেরু গ্রন্থ ও বৈষ্ণবদাসের পদকল্পতরু গ্রন্থে দ্বিজ, বড়ু ও চণ্ডীদাস ভনিতার পূর্ব্বোক্ত পদগুলি এবং অতিরিক্ত আরও অনেক পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। গীতচন্দ্রোদয়ের পূর্ব্বরাগ পালার চব্বিশটি পদের মধ্যে পদমেরুতে আটটি ও পদকল্পতরুতে ২৪টি পদই উদ্ধৃত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, পূর্ব্বোক্ত সমালোচকদ্বয়ের জাল বা সন্দেহজনক বিবেচিত পদগুলিও ইহাতে বাদ যায় নাই।

দীন চণ্ডীদাসের আক্ষেপানুরাগের সম্পূর্ণ পালাটিও আবিষ্কৃত হয় নাই। সম্পাদক মহাশয় নীলরতন মুখোপাধ্যায়ের চণ্ডীদাস পদাবলী হইতে পদ আহরণ করিয়া পালাটি সজ্জিত করিয়াছেন। দীন চণ্ডীদাসের ভনিতায় এই পর্য্যায়ের যে অংশ প্রকাশিত হইয়াছে, সেই অংশের পদগুলির সহিত পদকল্পতরুর আক্ষেপানুরাগের যে পদপালা পূরণার্থে ইহাতে গৃহীত হইয়াছে তাহার তুলনা করিয়া দেখিলেই দুই কবির পার্থক্য সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়িবে। এই পর্য্যায়ে পদকল্পতরুর, 'সকলি আমার দোষ হে বন্ধু সকলি আমার দোষ,' 'কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান,' 'তোমারে বুঝাই বন্ধু তোমারে বুঝাই,' 'সজনি লো সই,' 'কালো গরলের জ্বালা,' 'বন্ত নিবারিয়ে চিতে নিবার না যায় রে', ইত্যাদি দ্বিজ চণ্ডীদাস ও চণ্ডীদাস ভনিতার পদগুলি দীন চণ্ডীদাসের পদের তুলনায় ভাব ও কবিত্বের বিচারে অনেক উৎকৃষ্ট। পদামৃতসমুদ্রে আক্ষেপানুরাগ পর্য্যায়ে মাত্র একটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, গীত-চন্দ্রোদয়ের সম্পূর্ণ গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং এই পর্য্যায়ের পদগুলির অকৃত্রিমতা বিচারে পূর্ব্বোক্ত পদমেরু প্রমাণই গ্রহণযোগ্য। পদমেরু গ্রন্থে এই পর্য্যায়ে পঁচিশটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে এবং পদকল্পতরুর ঐ উৎকৃষ্ট পদগুলি এই গ্রন্থেরও অন্যতম উৎকৃষ্ট পদ। সুতরাং আক্ষেপানুরাগ পর্য্যায়ের এই পদগুলি দীন চণ্ডীদাসের পদ প্রমাণিত না হইলেও এগুলির অকৃত্রিমতার সন্দেহ করা যায় না।

পূর্ব্বোক্ত সমালোচকদ্বয়ের সংশয়িত পদগুলি যে ভিত্তিহীন নহে এবং দীন ও প্রাচীন বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা-বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন না হইলেই যে কোন পদ কৃত্রিম সাব্যস্ত হয় না, পূর্ব্ব-আলোচনা হইতে তাহাই প্রতিপন্ন হইবে। এক্ষেত্রে প্রাচীন সংগ্রহগ্রন্থের প্রমাণানুসারে অকৃত্রিম নির্দ্ধার্য্য পদগুলিকে অন্ত কবির রচনারূপে গ্রহণ করিলেই এই সমস্যার মীমাংসা হয়।

উপরের আলোচনায় বড়ু চণ্ডীদাস ভনিতার পদ ও পূর্ব্বরাগ এবং আক্ষেপানুরাগ পর্য্যায়ের উৎকৃষ্ট পদগুলি যে অকৃত্রিম তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। এই পদগুলি বিচার করিয়া অন্ততঃ দুইজন চণ্ডীদাসের রচনা-বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। বড়ু চণ্ডীদাস ভনিতার পদগুলি বেশীর ভাগ একাবলী পয়ার ছন্দে রচিত এবং কবিত্বের বিচারে পূর্ব্ব-আলোচিত দ্বিজ ও চণ্ডীদাস ভনিতার অনেক পদের তুলনায় নিকৃষ্ট। ভাব, ভাষা ও রচনারীতির বিচারে দ্বিজ চণ্ডীদাস এবং চণ্ডীদাস ভনিতার পদগুলিকে পৃথক সাব্যস্ত করা যায় না, সুতরাং এই পদগুলি একজনের রচিত এবং তিনি বড়ু চণ্ডীদাস হইতে স্বতন্ত্র। পূর্ব্বোক্ত উৎকৃষ্ট পদগুলির কয়েকটিতে 'বাশুলী আদেশে'র উল্লেখ আছে। পদগুলির এই বৈশিষ্ট্য অনুসারে এই কবি সম্বন্ধে বলা যায় যে, বাশুলীভক্ত কোন চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক উৎকৃষ্ট পদ রচনা করিয়াছেন এবং কোন কোন পদে তিনি দ্বিজ চণ্ডীদাস ভনিতা ব্যবহার করিয়াছেন। অন্য চণ্ডীদাসের সহিত পার্থক্যনির্দ্দেশের জন্য এই পদকর্ত্তাকে 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' নামে অভিহিত করাই সঙ্গত।

দ্বিজ চণ্ডীদাস ভনিতায় পদামৃতসমুদ্রে একটি, গীত চন্দ্রোদয়ে দুইটি, পদমেরুতে সাতটি এবং পদকল্পতরুতে কুড়িটি মাত্র পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং এই পদকর্ত্তা দ্বিজ চণ্ডীদাস ভনিতা অপেক্ষা চণ্ডীদাস ভনিতায় অধিক পদ রচনা করিয়াছেন অনুমান করা যায়। দীন এবং বড়ু চণ্ডীদাসও চণ্ডীদাস ভনিতায় পদ রচনা করিয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু চণ্ডীদাসের উৎকৃষ্ট পদাবলীর যে একটি বিশেষ সুরের সঙ্গে সাহিত্যরসিক বাঙ্গালী সুপরিচিত, সেই সুরেরই মাধুর্য্য দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদগুলিকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। দীনেশচন্দ্র সেন চণ্ডীদাসের যে একটিমাত্র সুরের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন সে সুর এই দ্বিজ চণ্ডীদাসের এবং সতীশচন্দ্র রায় দীন চণ্ডীদাসের রচনার তুলনায় উৎকৃষ্ট পদাবলীর রচয়িতা যে তৃতীয় চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব অনুমান করিয়াছিলেন তিনিই এই দ্বিজ চণ্ডীদাস। বাঙালী এই দ্বিজ চণ্ডীদাসেরই উৎকৃষ্ট পদাবলীর রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত।

দ্বিজ চণ্ডীদাসের আবির্ভাবকাল

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের মধ্যে সঙ্কলিত সুপণ্ডিত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর ক্ষণদাগীত চিন্তামণি ও দীনবন্ধু দাসের সঙ্কীর্ত্তনামৃতে চণ্ডীদাস ভনিতার কোনও পদ উদ্ধৃত হয় নাই। এই দুইখানি সংগ্রহ-গ্রন্থে চণ্ডীদাস ভনিতার কোনও গ্রহণযোগ্য মনে করেন নাই, দ্বিতীয়তঃ, দ্বিজ চণ্ডীদাসের কোন পদ তাঁহাদের সময়ে প্রচলিত ছিল না। দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদ রচিত হইবার অনতিবিলম্বে ইহাদের প্রচার হইয়াছিল এবং প্রচারিত হইবামাত্র লোকের মন জয় করিয়াছিল—বৈষ্ণবসমাজে ও কীর্ত্তন-গানের আসরে সমাদৃত হইয়াছিল, এ সকল অনুমান অসঙ্গত নহে। পদামৃতসমুদ্র ও পরবর্ত্তী প্রত্যেক পদ-সংগ্রহ গ্রন্থে চণ্ডীদাসের পদ একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছে। সুতরাং এই গ্রন্থাদির প্রমাণানুসারে বুঝা যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশকের মধ্যে দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। অতএব পদকর্ত্তা সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন অনুমান করা যাইতে পারে।

দ্বিজ চণ্ডীদাসের দেশ

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-প্রণেতা বড়ু চণ্ডীদাস নিজেকে বাসলীর সেবকরূপে পরিচয় দিয়াছেন, দ্বিজ চণ্ডীদাস বাশুলীর আদেশে পদাবলী রচনার উল্লেখ করিয়াছেন। বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে তাঁহার নিবাসস্থলের বা বাসলীদেবীর অধিষ্ঠানক্ষেত্রের পরিচয় নাই, দ্বিজ চণ্ডীদাসের একটি পদে বাশুলীদেবীকে নান্নুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। 'কানুর পিরিতি চন্দনের রীতি'—এই পদোক্ত নান্নুরের ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব হইলে চণ্ডীদাসের 'দেশ' সমস্যার সমাধান হয়।

বিশেষজ্ঞদের কাহারও মতে বীরভূমের 'নান্নুর' গ্রামই চণ্ডীদাসের লীলাভূমি, কাহারও মতে তিনি ছাতনার নান্নুর গ্রামের অধিবাসী। ঐতিহাসিক প্রমাণানুসারে ছাতনার বাসলীদেবীর প্রাচীন ঐতিহ্য স্বীকার করিতে হয়। ছাতনার সামন্তরাজ হামীর উত্তরের রাজত্বকালে শিলামূর্ত্তিতে বাসলীর অধিষ্ঠান হয় (চণ্ডীদাস-চরিত—কৃষ্ণপ্রসাদ সেন)। ১৪৭৫ শকে এই রাজবংশের উত্তর রায় বা দ্বিতীয় হামীর উত্তর বাসলীর যে মন্দির নির্ম্মাণ করান, তাহার প্রাচীরবেষ্টনের ইটে ১৪৭৫ শক ও ছাতনা নাগরেশ উত্তর রায়ের নাম লেখা দেখিতে পাওয়া যায়। (ছাতনা রাজবংশের পরিচয়ের ভূমিকা, যোগেশচন্দ্র রায়)। যোগেশচন্দ্র রায় একটি প্রবন্ধে চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত ইটেরও পরিচয় দিয়াছেন। পদ্মলোচন শর্ম্মার বাসলীমাহাত্ম্য, উদয় সেন ও কৃষ্ণপ্রসাদ সেনের চণ্ডীদাস-চরিত, কৃষ্ণপ্রসাদ সেনের ছাতনার রাজবংশের পরিচয়, সর্ব্বোপরি ইটের লেখা হইতে ছাতনার বাসলীদেবীর প্রাচীনত্ব স্বীকার করিতে হয়। যোগেশচন্দ্র বিশেষ অনুসন্ধানের ফলে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, বীরভূমের বাশুলী বা বিশালাক্ষীর কোনও প্রাচীন ঐতিহ্য নাই (প্রবাসী, ১৩৩৩)। সুতরাং যে বাসলী-সেবক চণ্ডীদাস চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে কাব্যরচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত এই ছাতনার বাসলীর সম্পর্ক স্বীকার করা অযৌক্তিক নহে। ছাতনার বাসলীকে কৃষ্ণপ্রসাদ সেন ভবের ভবানী চণ্ডী-তারার সহিত

the discrepancy lies between 12 and 16 million tons. The official statistics of food production are thus probably underestimated by something of the order of 20 or 25 per cent for India as a whole."

ভারতবর্ষের খাদ্যমন্ত্রী রফি আমেদ কিদোয়াই খাদ্যশস্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়াছেন :

"The food position of India has much improved than it was two years ago. He expects that India will be able to feed her people this year with the food produced in this country. If the food produced in the country continues to improve in this way, within next four years India will not only feed her own people but will be able to export food to other countries also."

উপরোক্ত মন্তব্য হইতে জানা যায়, খাদ্য সম্বন্ধে রাশিতথ্যের অঙ্কটি যদি শতকরা ২০ ভাগ বর্দ্ধিত করা যায় তাহা হইলে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে ফসলের পরিমাণ যাহা আশা করা গিয়াছে, বর্ত্তমান সময়ে দেশে তাহাই রহিয়াছে। পরিকল্পনার পূর্ব্বে যদি নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান পাওয়া সম্ভব হইত তাহা হইলে পরিকল্পনার ধারা অন্য রূপ হইত। অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে একইরূপ মন্তব্য করা যাইতে পারে। অতএব নির্ভরযোগ্য তথ্যাদির অভাবে পরিকল্পনা রচনায় বিশেষ গলদ রহিয়া গিয়াছে।

এখন শিল্পের কথা ধরা যাক্। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—শিল্প সম্প্রসারণ নির্ভর করিবে প্রাইভেট সেক্টরের উপর। প্রশ্ন হইতেছে যে, পাবলিক সেক্টরে টাকা দিবার পর দেশে সঞ্চিত অর্থ কত থাকিবে? শিল্প উন্নয়নের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তাহা কি সংগ্রহ হইবে? এই সম্বন্ধে কমিশনও সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন :

"The fulfilment of the targets set forth will depend to a great extent on the ability of the private sector to implement the programmes scheduled. This in turn depends mainly on the availability of finance. Since there are large demands on the limited savings available in the country it will be necessary during the period of the Plan to canalise the available capital into high priority lines through control of capital issues."

শিল্পের প্রসার সম্বন্ধে যাহা ধরা হইয়াছে তাহা বাস্তবে পরিণত হইবে কিনা সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে।

পরিকল্পনায় অন্যান্য বিষয় যাহা আলোচিত হইয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিলাম না, কিন্তু একথা বলা চলে সেগুলি বিশ্লেষণ করিলে এরূপ বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে।

প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু এবং পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যেরা বার বার বলিয়াছেন, দেশের জনসাধারণের সহযোগিতা ও সহানুভূতি না পাইলে বর্ত্তমান পরিকল্পনা কিছুতেই সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারিবে না।

"Public co-operation and public opinion constitute the principal force and sanction behind planning. It is vital to the success of the Plan that action by the agencies of the Government should be inspired by an understanding of the role of the people and supported by practical steps to enlist their enthusiastic participation."

কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে যাঁহাদের জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ আছে তাঁহারা জানেন যে, সাধারণ লোক এবং সরকারের মধ্যে সম্বন্ধ কি। সরকারের উপর জনসাধারণের তেমন আস্থা নাই। স্বাধীনতার পর দেশবাসী আশা করিয়াছিল এবার বুঝি তাহাদের দুঃখমোচন হইবে। কিন্তু জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা ক্রমশঃই শোচনীয় হইতেছে, এমতাবস্থায় সরকার যদি বিশ্বাস ফিরাইয়া আনিতে না পারেন তাহা হইলে পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে। আমরা এখনও পর্য্যন্ত গ্রামাঞ্চলে গ্রামবাসীদের সহিত সরকারী কর্ম্মচারীদের ভালভাবে মেলামেশা করিতে দেখি না। সরকার যদি সহযোগিতা আশা করেন তাহা হইলে সরকারী প্রতিনিধিদের গ্রামে আসিয়া পরিকল্পনা কি তাহা গ্রামবাসীদের বুঝাইতে হইবে, শুধু বেতার বক্তৃতা বা কাগজে বিবৃতি দিয়া কিছুই হইবে না। গ্রামে গ্রামে সংগঠন তৈয়ারী করিতে হইবে, যেগুলি পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত করিবে। আমরা এখনও পর্য্যন্ত কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।

গিরীন্দ্রশেখর বসু

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

ভারতের, তথা সমগ্র জগতের, সুবিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ ও শিক্ষাব্রতী, সর্বজনবরেণ্য ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয় আজ আর ইহজগতে নাই। বিগত ৩রা জুন ১৯৫৩, বুধবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় এই মহামনীষীর গৌরবোজ্জ্বল জীবনদীপ অকালে নির্বাপিত হয়েছে। কিন্তু যে আলো তিনি তাঁর সমগ্র জীবন ধরে বিকিরণ করে গেছেন, তার বিলুপ্তিসাধন হবে না কোন দিন।

"অথ তত উর্ধ্ব উদেত্য নৈবোদেতা নাস্তমেতৈকল এব মধ্যে স্থাতা।" (ছান্দোগ্যোপনিষদ ৩-১১-১)

"সূর্য যখন পার্থিব সীমা অতিক্রম করে উর্ধ্বে উদিত হন, তখন তিনি আর উদিতও হন না, অস্তও যান না, একাকীই মধ্যস্থলে অবস্থিতি করেন।"

উদয়াস্তবিহীন আদিত্যের মতই তাঁর স্থির জ্যোতিঃ চিরকাল ভবিষ্যবংশীয়দের জ্ঞান ও ধর্মের দুর্গম পথে আলোক বিতরণ করবে, নিঃসন্দেহ।

ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ের অত্যাশ্চর্য বিদ্যাবত্তা এবং গবেষণার ক্ষেত্রে অনুপম দানের বিষয় সকলেই জানেন। সজন্য সে সম্বন্ধে আজ আর নূতন করে কিছু বলবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাঁর মধ্যে যে অপূর্ব সুন্দর, সরল, সরস মানুষটি লুকিয়ে ছিল, যার সামান্য মাত্র পরিচয় পেয়েই আমরা ধন্য হয়েছিলাম, সেই বিষয়েই অতি সামান্য দু'একটি কথা মাত্র বলে আমি তাঁর অমর আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করব।

ডাঃ বসুর সঙ্গে সুদীর্ঘ কাল ধরে অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। তিনি ছিলেন আমাদের সকলেরই পরম আদরের "ডাক্তার বাবু"। আমাদের পরিবারের বা বন্ধুবান্ধবমণ্ডলীর কারও কাছেই এই "ডাক্তারবাবু" নামটির ব্যাখ্যার আর প্রয়োজন হ'ত না, কারণ তিনিই ছিলেন আমাদের কাছে একক ও অদ্বিতীয়। বহু দিন পরে, পরিবারে নূতন অতিথিদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য নূতন চিকিৎসকদেরও প্রবেশ ঘটেছিল এবং সেজন্য তারা নিজেরাই তাঁর নামকরণ করে নিয়েছিল: "ভাল ডাক্তারবাবু"। এই সুমিষ্ট নামটির মধ্যেই নিহিত হয়ে আছে তাঁর অপূর্ব মধুর ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ রূপটি।

ভাল যে তিনি কত ছিলেন এবং কত দিক্ দিয়েই, বর্ণনার শক্তি আমার নেই। তবে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, এই ভালর উৎস ছিল তাঁর ক্ষেত্রে সহস্রমুখী—ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রতি ক্ষেত্রেই তাঁর অসংখ্য পরিচয় পেয়ে আমরা শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করেছি। এর মধ্যে প্রধানতম ছিল তাঁর অতুলনীয় স্নেহঘন হৃদয়টি। মনে পড়ে বহু দিন আগেকার কথা—তখন আমরা শিশু মাত্র। আমরা তখন বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রের বাড়ীতে থাকতাম এবং গিরীন্দ্রশেখর ছিলেন আমাদের অতি নিকট প্রতিবেশী। আমাদের অসুস্থ মাকে দেখতে তিনি প্রথম যেদিন আসেন, সেদিন মায়ের পালঙ্কের নিরাপদ আড়াল থেকে আমরা তিন বোনে উঁকি মেরে মেরে দেখছিলাম সেই নূতন মানুষটিকে, কিন্তু তিনি এদিকে চাওয়া মাত্রই টুপ টুপ করে বসে পড়ছিলাম। আজও মনে পড়ে সেদিন দেখেছিলাম তাঁর যে হাস্যসমুজ্জ্বল, স্নেহসুকোমল, শিবতুল্য মূর্তিটি। অপরিচয়ের গণ্ডী কাটিয়ে সেই যে তিনি পালঙ্কের আড়াল থেকে আমাদের ধরে নিয়ে বসালেন তাঁর কোলে, সেই স্থান থেকে আমরা তিন বোন কোনদিনই আর বিচ্যুত হই নি। চিকিৎসক রূপে তিনি এসেছিলেন, কিন্তু প্রথম দিন থেকেই তিনি স্থান নিয়ে নিলেন আমাদের নিকটতম আত্মীয়জনরূপে, আমাদের পরিবারের ও মাতুল-পরিবারের "Frind, philosopher and guide" রূপে। জানি না কোন্ সৌভাগ্যবলে আমরা এই সুদীর্ঘকাল ধরে তাঁর হৃদয়োত্থ স্নেহধারায় নিরন্তর সিক্ত হয়েছি।

তার পর আমরা আমাদের নিজেদের বাড়ীতে চলে এলাম। তখন তিনি বঙ্গের, তথা ভারতের উদীয়মান বৈজ্ঞানিক, যশ ও অর্থের শিখরে সমাসীন। কিন্তু তাঁর কর্মব্যস্ত জীবনের শত সহস্র কাজের মধ্যেও তিনি প্রত্যহ সকালে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও আমাদের বাড়ী আসতেন। আমরা সমস্তক্ষণ এই সময়টির জন্য অপেক্ষা করে থাকতাম—যেই না দেখতাম তাঁর অতি পরিচিত শিখ ড্রাইভারকে, অমনি আমরা উর্ধ্বশ্বাসে যে পারি আগে ঢুকে পড়তাম এই পড়বার ঘরটিতে যেখানে বসে আজ আমি এই শ্রদ্ধাঞ্জলি লিখছি। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, কে আগে তাঁকে সারাদিনের সঞ্চিত অভিযোগ শোনাব, সমস্যার সমাধান চাইব। বোনের সঙ্গে ঝগড়া, মায়ের প্রতি অভিমান, বন্ধুদের সঙ্গে মতবিরোধ প্রভৃতি আমাদের নিজেদের কাছে তখন গুরুতর, কিন্তু তাঁর কাছে তুচ্ছাতিতুচ্ছ ও হাস্যকর কত ব্যাপার নিয়েই না আমরা তাঁকে প্রত্যহ উদ্ব্যস্ত করে তুলতাম; আর তিনি কি গভীর স্নেহের সঙ্গে আমাদের সেই সমস্ত ব্যাপারে

সাহায্য করতেন—সেকথা ভেবে এখন আর চোখের জল রাখতে পারছি না। পরে উত্তরজীবনে সত্যই যখন নানা গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে আমাদের, তখন ঠিক একই ভাবে নিকটতম বন্ধুর মতই তাঁর কাছে ছুটে গিয়েছি, অকপটে তাঁর কাছে বলেছি সব কথা; ঠিক সেই ছোট-বেলার মতই তাঁর পরামর্শ ও আশীর্বাদ নিয়ে ফিরে এসেছি পরিতৃপ্ত মনে। আজ পর্যন্ত মনে পড়ে না কোনও কাজ করেছি তাঁর সস্নেহ পরামর্শ না শুনে, আজ পর্যন্ত মনে পড়ে না কোন কাজে আমরা অনুতপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি তাঁর পরামর্শ শুনে। এই অপূর্ব স্নেহমমতার সামান্য অংশও যাঁরা পেয়েছেন তাঁরাই আজ আমাদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলবেন যে, পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর মতই কি সুগভীর, কি পবিত্র, কি নিঃস্বার্থ ছিল সেই স্নেহ—পরিবারের গণ্ডী অতিক্রম করে যা আমাদের মত বাইরের বহু লোককে ধন্য করে-ছিল।

ডাক্তারবাবুর আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি কোনদিনই কোন অবস্থাতেই কোন লোকের উপর নিজের মতামত জোর করে চাপাতে চাইতেন না। তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল যে, প্রত্যেক মানুষই বিচারবুদ্ধিশীল স্বাধীন কর্তা। প্রত্যেকের ভেতরই চিন্তা করে ভালটিকে গ্রহণ করবার ক্ষমতা নিহিত আছে। এই ভালটিকেই যদি সে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে, তবেই হবে তার প্রকৃত ভাল হওয়া, এ কাজ আর বাইরের কারও নয়। সেজন্য আমরা যখন নিতান্ত বালিকা তখনও তিনি আমাদের সঙ্গে ঠিক সমান সমান ভাবেই সব বিষয়ে আলোচনা করতেন, যুক্তি দিয়েই আমাদের সব জিনিষ বোঝাতে চেষ্টা করতেন, নিজের সু-উচ্চ শিখর থেকে তিনি অনায়াসে নেমে আসতেন আমাদেরই স্তরে। একটি দিনের জন্যও তিনি আমাদের বুঝতে দেন নি যে, আমরা ছোট, আমরা অজ্ঞ বলে তাঁর কথাই আমাদের নির্বিচারে মেনে নিতে হবে মাথা নীচু করে। উপরন্তু তিনি আমাদের সব কথাই প্রথমে গভীর সহানুভূতির সঙ্গেই শুনতেন, এবং পরে প্রয়োজন হলে কেবল যুক্তির সাহায্যেই আমাদের কল্যাণের পথে অগ্রসর করে দিতেন। বর্তমান জগতের চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেই দেখা যাবে যে, এটি কত মহৎ, অথচ কত দুষ্প্রাপ্য গুণ। আজ পরিবারে পরিবারে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, জাতিতে জাতিতে বিরোধ এত প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে কেন? তার প্রধান কারণ, পরমতে তীব্র অশ্রদ্ধা, এবং যুক্তিবিচারের সরল, সুবিস্তৃত পথ পরিত্যাগ করে অন্ধ ধারণার বশবর্তিতা। সেজন্য ডাক্তার বাবুর এই অপূর্ব উদারতা, পরমতসহিষ্ণুতা, সহানুভূতি ও যুক্তিবিচারমূলক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী আজ বিশেষ করে, শ্রদ্ধার সঙ্গে বারংবার স্মরণ করি।

এই সঙ্গে আর একটি বিষয়ও বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। প্রায়ই দেখা যায় যে, যুক্তিতর্কের পথে অনিবার্য ভাবে এসে পড়ে উগ্রতা ও তিক্ততা। একজন আর একজনকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে বোঝাতে লেগে যায় দু'জনের মধ্যেই বিবাদ, যার পরিসমাপ্তি হয় অতি শোচনীয় আত্মীয় বা বন্ধুবিচ্ছেদে। কিন্তু চিরদিন দেখেছি ডাক্তার বাবুর এক অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা—তাঁর কাছে কত শত লোক নিজেদের সমস্যা-সমাধান, বিবাদনিষ্পত্তি প্রভৃতি "Thankless job"-এর জন্যে গিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে নিরন্তর যুক্তিতর্কে রত হয়েও তিনি একটি দিনের জন্যও ক্রুদ্ধ হয়ে কারো সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করেন নি। আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি যে, তাঁকে জীবনে কোন বিষয়ে উত্তপ্ত বা চঞ্চল হতে দেখি নি, কারও সঙ্গে কোনদিন বিবাদে প্রবৃত্ত হতেও দেখি নি। সকলের বিরোধ-ভঞ্জন তিনি করতেন, কিন্তু তাঁর যুক্তিপ্রণালী এরূপ অত্যাশ্চর্য ছিল যে, কেবল তিনি নিজেই যে কারও ওপর ক্রুদ্ধ হতেন না, তাই নয়, অন্যেরাও কেউ তাঁর ওপর বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ হতে পারত না। কোমলতার সঙ্গে যে তেজস্বিতা, স্নেহপ্রবণতার সঙ্গে যে ন্যায়পরায়ণতা তাঁর চরিত্রের মূল ভিত্তি ছিল, তারই আভাস পাওয়া যেত তাঁর সুদৃঢ় অথচ সুকোমল ব্যবহারে। সত্যই তিনি ছিলেন অজাতশত্রু।

তাঁর চরিত্রের আর একটি দিক শিশুকাল থেকেই আমাদের বিশেষ আকৃষ্ট করত—তা হ'ল তাঁর অপূর্ব সুশৃঙ্খলতা, নিয়মানুবর্তিতা ও সময়জ্ঞান। ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রত্যেক কাজই অতি সুনিপুণ ভাবে, শৃঙ্খলার সঙ্গে, নিয়ম ও সময় অনুযায়ী করা ছিল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ। আমরা ছোটবেলায় অবাক হয়ে দেখতাম যে, প্রত্যেক দিনের মধ্যে এক দিনও তিনি নির্দিষ্ট সময়ের এক মিনিটও আগে বা পরে আসতেন না। তাঁর কর্মনৈপুণ্যের প্রতি আমাদের এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আমাদের ছোট ছোট প্রতিটি কাজে—যেমন বন্ধুদের চা-পান উৎসব, জন্মদিনে খেলাধুলার ব্যবস্থা প্রভৃতিতে—আমাদের সুগৃহিণী মায়ের সস্নেহ আয়োজন উপেক্ষা করেও আমরা ছুটে যেতাম তাঁরই পরামর্শ গ্রহণে এবং তিনিও বিনা দ্বিধায় ছোটদের সঙ্গে ছোট হয়ে, গম্ভীর হয়ে আমাদের সঙ্গে খাদ্য-তালিকা নিরূপণ করতে বসে যেতেন মহোৎসাহে, যেন কতই না গুরুতর বিষয় সে সব! তখন অত বুঝতাম না, কিন্তু আজ সংসারের কঠোর পরিবেশের মধ্যে বুঝি, কি

সুকঠিন কাজ এই মনের শিশুসুলভ সরসতা বজায় রেখে চলা—শিশুর সঙ্গে শিশু হতে পারা।

ডাক্তার বাবুর সৌন্দর্যপ্রিয়তাও ছিল অসাধারণ। কোন দিন কোন কাজ তাঁকে অবহেলা বা অপরিষ্কার করে করতে দেখি নি। যেমন, আমরা হয়ত তাঁর কাছ থেকে সামান্য একখানি বই চেয়ে পাঠিয়েছি। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই বইখানি নিজের হাতে মোটা বাদামী কাগজে মুড়ে সুদৃশ্য ফিতে দিয়ে সুন্দর করে বেঁধে উপরে তাঁর ছাপার মত সুন্দর অক্ষরে নাম ঠিকানা লিখে পাঠিয়ে দিলেন—এ বাড়ী থেকে ও বাড়ীই ত মাত্র, তাও এত কাণ্ড! এই রকম সুন্দর ও সুশৃঙ্খল ছিল তাঁর প্রত্যেকটি কাজ।

ডাক্তার বাবুর অধ্যয়নপ্রিয়তার কথাও সুবিদিত। তাঁর গ্রন্থাগার একটি বিশিষ্ট সম্পদ। কিন্তু সেই অসংখ্য গ্রন্থের প্রত্যেকটির জন্য তাঁর দরদ ছিল অসীম। তাঁর গ্রন্থাগারটি ছিল আমাদের অতি প্রিয় স্থান। সেখানে সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম—ছাদ পর্যন্ত উঁচু কাঁচের আলমারী, স্তরে স্তরে বই সাজানো, প্রত্যেকটি সুন্দর করে বাঁধানো ও সংখ্যানুসারে সজ্জিত,—প্রত্যেকটিই যেন তাঁর প্রাণের স্পর্শে সজীব! তার মধ্যে সমাসীন এক জ্ঞানতপস্বী—জ্ঞান যাঁর প্রাণকে শুষ্ককঠোর না করে করে তুলেছে সরস সজীব। সেজন্য তিনি যে কেবল শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকই ছিলেন, তাই নয়, তার চেয়েও বেশী ছিলেন কবি-ক্রান্তদর্শী, সৌন্দর্য-পিয়াসী। জ্ঞানের মাধ্যমে তিনি যে কেবল পুথিগত বিদ্যারই সন্ধান পেয়েছিলেন তাই নয়, তার চেয়েও বেশী পেয়েছিলেন, জগতের অন্তঃস্থলে যে সৌন্দর্য ও আনন্দের নির্ঝরধারা নিরন্তর প্রবাহিত হচ্ছে, তারই মূল উৎসের। জ্ঞানের চরমোৎকর্ষ এই আনন্দের আভাস প্রতিফলিত হয়েছিল তাঁর সমগ্র জীবনে—তাঁর শান্ত সস্মিত আননে, তাঁর সরস মধুর ব্যবহারে, তাঁর শিশুসুলভ সজীবতায় ও কোমলতায়।

ডাক্তারবাবুর কথা লিখতে গেলে শেষ হবে না। তাঁর অসংখ্য সদ্‌গুণের মধ্যে মাত্র দু'একটির অতি সামান্য উল্লেখ আমি করলাম। আজ তিনি যে নেই, সেকথা যেন আমরা ভাবতেই পারি না। আমাদের বহু জনের জীবনকে শূন্য করে তিনি আজ চলে গেছেন; কিন্তু মানুষের পরিণতি যে শূন্যতায় নয়, একথা আমার তাঁর কাছেই শেখা। আজ মনে পড়ে কত দিন আগের কথা, যেদিন আমাদের পরম স্নেহময়ী জননী অকস্মাৎ আমাদের ছেড়ে চলে যান। সেদিন শোকে মুহ্যমানা আমরা তিন বোনে কেবল পরলোকে নয়, ইহলোকেও বিশ্বাস হারিয়েছিলাম—নিদারুণ অভিমানে সত্য, ন্যায় বা ধর্ম কোনও কিছুর প্রতি যেন আমরা আর আস্থা রাখতে চাই নি। তখন ডাক্তার বাবুই আমাদের জীবনে বিশ্বাস ফিরিয়ে এনেছিলেন—তিনি আমাকে বলেছিলেন—"তুমি ত দর্শনের ছাত্রী, তুমি অন্ততঃ বুঝবে যে জগতে কোনও ভাল জিনিষেরই শেষ হয় না, হতে পারে না—কি ভাবে, কিরূপে, কি উপায়ে এটি হয়, আমরা তা জানি না সত্য, কিন্তু এটি হয়ই হয়।" তাঁর সেই বাণী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে আজ স্থির বিশ্বাসে যেন বলি—আমাদের পরম আদরের, পরম শ্রদ্ধার, "ভাল ডাক্তার বাবু"র পরম ভালোর শেষ নেই। চরম শোকের দিনেও এই বিশ্বাসই আজ আমাদের সান্ত্বনা দিক্‌—বিশ্বের অন্তর্দেশে যে সত্য, শিব ও সুন্দরের অমৃতধারা নিরন্তর উৎসারিত হচ্ছে, তাঁর প্রতি কোন দিনও যেন শ্রদ্ধা না হারাই; যিনি রুদ্র, তিনিই যে আবার শিব, সেকথাও যেন কোনদিনও না ভুলি।

ডাক্তার বাবুর অতি প্রিয় উপনিষদের ভাষাতেই আজ প্রার্থনা নিবেদন করি:

> "যম! ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ তেজো যত্তে
> রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি॥"
>
> (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ৫-১৫-১)

"হে মৃত্যুদেবতা, তোমার রশ্মিসমূহকে সংযত কর, তোমার তেজ সংবরণ কর, যাতে তোমার যে কল্যাণতম রূপ তা আমি দর্শন করতে পারি।"

লুতা ও সুতা

শ্রীকালিদাস রায়

কল্পনার পক্ষিরাজ চড়িয়া গগনে
ধাও তুমি যেথা রাজে সেই কল্পদ্রুম।
কেন তোলো ফুলগুলি কে জানে যতনে
দু'হাতে ছড়ায়ে যাও আকাশকুসুম।

সে ফুল কুড়ায় যারা স্বপ্নের লূতায়
মালা গাঁথে, গলি ঝরি খসি যায় সবি।
আমিও কুড়াই ফুল, সত্যের সুতায়
মালা গাঁথি সারা রাতি, তাই আসি কবি।

ভিটের মায়া

শ্রীনির্ম্মলকান্তি মজুমদার

রমজান আলি ছিল আমাদেরই চাষী প্রজা। যৌবনে তার গায়ে ছিল অসাধারণ শক্তি। সে একাধারে কৃষাণ ও গাড়োয়ান। প্রয়োজন হলেই মনিবের গাড়ী নিয়ে এ গ্রামে ও গ্রামে যাতায়াত করত। দানগঞ্জের হাট থেকে মাল আনতে হবে, দেবগ্রাম ষ্টেশনে সোয়ারী নিয়ে যেতে হবে-- রমজান হাসিমুখে প্রস্তুত। গাড়ী বইবার জন্ম আমাদের দুটি বলদ কিনিয়েছিল রমজান নিজে পছন্দ করে। আদর করে নাম রেখেছিল 'পূর্ণিমা' আর 'মাতলা'। নামের ভালোমন্দ বিচার করব না, কিন্তু এটা ঠিক যে বলদজোড়া তার মতই বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল তারই যত্নে। রমজানের বিরাট দেহ ও বিপুল দাড়ির উপর গৃহস্বামীর ছিল অটল বিশ্বাস। আমারও যে ছিল না তা নয়। একটি ঘটনা বলি। আমার বয়স তখন দশ কি বার, রমজানের বয়স চল্লিশের উপর। এক দিন সন্ধ্যার পর হঠাৎ ঠিক হ'ল রাত্রি একটার ট্রেনে আমাদের কলকাতা রওনা হতে হবে বিশেষ জরুরি কাজে। বাবা ডেকে পাঠালেন রমজানকে। বেচারী সারা দুপুর লাঙল টেনে ক্লান্ত। সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে খাওয়া-দাওয়া সেরে তামাক খাচ্ছিল। বাবার তলবে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। বাবা বললেন—রমজান, এখন আটটা বেজেছে; গোছগাছ করে সাড়ে দশটার আগে বেরুতে পারব না, একটার গাড়ী ধরিয়ে দিতে পারবে?

রমজান বললে—হাঁ, হুজুর। আপনি তৈরি হয়ে নেন, কোন ভাবনা নেই। আমি পূর্ণিমা-মাতলাকে ভাল করে খাইয়ে গাড়ী সাজিয়ে আনছি।

যথাসময়ে আমরা যাত্রা করলাম দেবগ্রামের পথে। বর্ষার রাত। আকাশ ঘন মেঘে ঢাকা। কোলের মানুষ চেনা যায় না। মাঠঘাট সব একাকার—'একখানি অন্ধকার অনন্ত ভুবনে'। ছ-মাইল পথ—নোয়াশার বিল পার হতে হবে—জামতলার কাদায় চাকা বসে যাবে। বাবা ভেবেই সারা—কোন কথা বলেন না। টিপি টিপি বৃষ্টি পড়ে। ছইয়ের উপর শব্দ হয়। গামছা মাথায় ভূতের মত ঠায় বসে গাড়ী চালায় রমজান—দু'হাতে লেজ মলে মূক স্নেহাস্পদ দুটির আর থেকে থেকে হেঁকে বলে—'বাবা চল, বাবা চল।' আমি ভয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুম ভেঙে দেখি গাড়ী নামানো হয়েছে, অদূরে ষ্টেশনের আলো দেখা যাচ্ছে। রমজান বাবাকে বলছে—"কর্তাবাবু, সময় আছে, এই মাশুর পাখা পড়ল।" বাবা বার বার রমজানের পিঠ চাপড়ালেন। এর অর্থ 'সাবাস', 'বহুত আচ্ছা' বা 'বলিহারি'। যাঁরা অল্প কথার মানুষ তাঁদের ভাবের ব্যঞ্জনা হয় অঙ্গভঙ্গীতে।

সেদিনের কথা ভুলি নি। যখন ভাবি অবাক্ হয়ে যাই—বয়স যার অত হয়েছে সে কেমন করে সেই বর্ষামুখর গভীর রাত্রে নীরন্ধ্র অন্ধকারে পথহীন পথে ছ'মাইল দূর দেবগ্রামে নির্বিঘ্নে যাত্রী-বোঝাই গাড়ী চালিয়ে এনেছিল। আজ সে সাহস আমাদের নেই, সে শক্তিও আমরা হারিয়ে ফেলেছি। এখন অল্পেতেই চুল পাকে, কৃত্রিম দাঁতে ঠাট বজায় রাখতে হয়। তখন রক্তের প্রাচুর্য্য ছিল, কিন্তু চাপ ছিল না। এখন রক্ত কমে এসেছে কিন্তু চাপ বেড়েছে। অনশনে অর্দ্ধাশনে জীবন কাটাতে হয়। সভ্যতার পরিণতি কি এই!

রমজান ছিল একেবারে নিরক্ষর—যাকে বলে "পেটে বোমা মারলে 'ক' বেরোয় না।" তার চৌদ্দ পুরুষ কখনও পাঠশালার চৌকাঠ মাড়ায় নি। বংশের ইতিহাস যাই হোক, শিক্ষিত পরিবারের পরিবেষ্টনীতে থেকে সে লেখাপড়ার মর্য্যাদা বুঝতে শিখেছিল। তার জোয়ান ছেলেটি মারা যায় অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে একটি মাত্র ছেলে রেখে। রমজান অনেক কষ্টে মানুষ করে নাতিকে। সে ম্যাট্রিক পাস করে নিকটবর্ত্তী স্কুল থেকে। আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চাকরিতে ঢুকেছি। আমাদের পরিবারের গ্রামে যাতায়াত প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে তবে যোগাযোগ সম্পূর্ণ ছিন্ন হয় নি। পল্লীমঙ্গল সমিতির উপদেষ্টা হিসাবে আমি মাঝে মাঝে যাওয়া-আসা করতাম, গ্রামবাসীদের সুখ দুঃখের কিছু কিছু খবরও রাখতাম। এমনি সময়ে সহসা রমজানের আবির্ভাব হ'ল আমাদের কলকাতার বাসায়। সেদিন ছুটি—বোধ হয় রবিবার। রমজানের সঙ্গে একটি আঠার-উনিশ বছরের যুবক। তাকে দেখিয়ে রমজান বললে—দাদাবাবু, এ আমার নাতি মঞ্জুর। মেটিরির সেনবাবুদের ইস্কুল থেকে পাস দিয়েছে। আমার বড় ইস্কুলে পড়াবার ক্ষমতা নেই—একপুরুষে আর কত দূর হবে? এই বাপ-মরা ছেলেটার একটা হিল্লে করে দাও। কর্ত্তা বাবু নেই, কাকে ধরব? মল্লিকবাবুরা সব বেলাতফেরতা—তাঁদের কাছে ঘেঁষতে সাহস হয় না। বুড়ো হয়েছি, আর খাটতে পারি নে। ছেলেটার একটা গতি হলে আমি আরাম পাই।

ছেলেবেলায় রমজানের কোলে পিঠে মানুষ হয়েছি। স্নেহ-ভালবাসার ঋণ পরিশোধ করা যায় না, তবু তার সামান্য প্রয়াসেও তৃপ্তি আছে। রমজানকে ভরসা দিলাম সাধ্যমত চেষ্টা করব। আমার এক নিকট-আত্মীয় ভারত-সরকারে বড় চাকরি করতেন। তাঁর খুব প্রতিপত্তি। মঞ্জুরের জন্ম তাঁকে অনুরোধ করলাম। তিনিও কথা দিলেন। ভাগ্য কারও গড়তে হয় না—আপনিই উদয় হয়। মাসতিনেকের মধ্যেই ভারত-সরকারের কলকাতার আপিসে মঞ্জুরের চাকরি হয়ে গেল।

মঞ্জুরের চাকরি হওয়ার পর রমজান আর কলকাতায় আসে নি। তখনকার দিনে তার কলকাতা আসা আর আমাদের লণ্ডন যাওয়ার

ধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। রমজানের চিঠি পেয়েছিলাম মাস-নেক পরে। চিঠিখানা গ্রামের পণ্ডিতমশায়ের লেখা রমজানের থামত। চিঠিতে লেখা ছিল :

দাদাবাবু, মঞ্জুরের সরকারী কাজ করে দিয়েছ। আশমান থকে কর্তাবাবু তোমাকে আশীর্ব্বাদ করবেন। খোদার কৃপায় তুমি মুলুকের বাদশা হবে। আর কি বলব? খানসামাকে মনে রাখবে।

তার পর কেটেছে বছরের পর বছর। বাদশা না হলেও জীবনে নিকটা প্রতিষ্ঠালাভ করেছি। মাঝে মাঝে রমজানের ভবিষ্যদ্-াণী মনে পড়ে। অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করি। রমজান ত নসামা নয়—পরিবারেরই একজন। আমার হৃদয়ে সে শ্রদ্ধার াসন অধিকার করে আছে।...

১৯৪৭ সালের শেষাশেষি। মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনার আনু-নিক বিভাগ অনুযায়ী আমাদের অঞ্চলটা পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত য়েছিল; র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদে চলে এল হিন্দুস্থানে। হারানো নিস ফিরে পাওয়ার একটা বিশেষ আনন্দ আছে। সামান্য বিষয়েই টা অনুভব করা যায়। দেশ, জন্মস্থান, পূর্ব্বপুরুষের সহস্র স্মৃতি-জড়িত পুণ্যতীর্থ ফিরে পাওয়ার আনন্দ শুধু অনুভূতির ব্যাপার নয়, ভিভূত হওয়ার ব্যাপার। যে গ্রামকে প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম, র জন্য শয়নে স্বপনে ইদানীং কোন বেদনাই পেতাম না, ১৮ই গষ্টের পর থেকে তারই আকর্ষণ আমাকে পেয়ে বসল। শুনতে লাম পল্লীমায়ের আহ্বান। সে আহ্বান কি উপেক্ষা করা যায়?

১৯৪৮। গ্রামে এসেছি। রাজনৈতিক ঝড়ে প্রকৃতির রঙ লায় না, কিন্তু দেশের রূপ বদলায়। আমাদের গ্রামের চেহারা েছে অন্য রকম। মুসলমানপাড়া ফাঁকা। কয়েক ঘর ছাড়া সবাই লিয়েছে পাকিস্থানে। শুনি এখনও মাটি কামড়ে পড়ে আছে া রমজান। রমজানকে দেখতে যাই। দীর্ঘকাল পরে প্রবাসীর াবর্তন সত্যই অভাবনীয়। বিভক্ত বাংলার দাঙ্গা-হাঙ্গামার ল মুসলমানের গৃহে পদার্পণ আরও অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। ান প্রথমটা বিশ্বাস করে না। শেষে আমার গলার আওয়াজ য় লাঠিতে ভর করে সে বেরিয়ে আসে ঘরের দাওয়ায়। তার ক্ষণ দাঁড়াবার শক্তি নেই, চোখেও একদম দেখতে পায় না। র রকমে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে ধপ করে বসে পড়ে মেঝের আমাকে বসতে অনুরোধ জানিয়ে। জরার আক্রমণে নিঃশেষিত ছ সকল শক্তি, সমস্ত পৌরুষ। এ যে তেজীয়ান রমজানের ! দেখে আঁৎকে উঠি। একটু সামলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করি মজান, তুমি এখানেই রয়েছ?

—আছি বৈ কি, দাদাবাবু। সাতপুরুষের ভিটে ছেড়ে র করে যাব?

—মঞ্জুর কোথায়?

—সে ঢাকা জেলায় জয়দেবপুরে আছে। এক রাজবাড়ীতে তার দপ্তরখানা। আমাকে যাবার জন্তে হামেশা পত্তর দেয়। আমি যাই কি করে? দাদাবাবু, সে তোমাদের ভুলতে পারে, আমি পারি নে।

রমজানের দৃষ্টিহীন নেত্রে নামে অশ্রুর বাদল। কৃতঘ্নতা যেমন মর্ম্মান্তিক, কৃতজ্ঞতা তেমনি মর্ম্মস্পর্শী। কৃতঘ্নতা মানুষকে নামিয়ে দেয় পশুর পর্য্যায়ে, কৃতজ্ঞতা তাকে বসায় দেবতার আসনে।

আমি বলি—রমজান, তোমার যাওয়াই ভাল। চোখ নেই, একা মানুষ।

—দাদাবাবু, প্রায় চার কুড়ি বছর এখানেই কাটল। এ গাঁয়ের পথ-ঘাট, খানা-ডোবা, বনবাদাড় সবই আমার জানা। চোখ না থাকলেও ঠাওর হয়। আলাই মোড়লের নাতনী পাশেই থাকে। সে দেখাশোনা করে। তা ছাড়া তোমরা আছ। আমি মরলে কি আর মাটি দেবার ব্যবস্থা হবে না? দেখ দাদাবাবু, যারা ছেড়ে গিয়েছে তাদের চেয়েও যারা আপন তারা শুয়ে আছে ঐ পাকুড়গাছের তলায়। ওখানে গিয়ে যখন বসি তখন কোথা দিয়ে আমার দিন কেটে যায় খেয়াল থাকে না। ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। কত চেনা মুখ দেখতে পাই। ভাবি যেন ওদের আশ্রয়েই আছি। ছেলেছোকরাদের কাছে গেলে ওরা এই অকেজো বুড়োকে কোণে ঠেলে রাখবে থলের মত। কিন্তু এরা আমায় ভালবাসে। এদের কাছে আমি যে আজও সেই কাঁচা বয়সের রমাই।

রমজান কিছুক্ষণ নিষ্প্রভ নয়নে চেয়ে থাকে অদূর কবর-সারির পানে। আমার অন্তর ভরে ওঠে করুণায়। আবার বলতে সুরু করল রমজান—আমরা তোমরা-চোমরা নই, মুখ্যু-সুখ্যু, মেটে ঘরের মেঠো মানুষ। কিসে কি হয় বুঝি নে। তবে এটা বুঝি যে দেশ বাঁটোয়ারায় ষোল আনাই লোকসান হয়েছে। যারা ভিন্ন দেশে গিয়েছে তাদের মনেও কষ্ট, আর যারা ভিন্ন দেশে এয়েছে তাদের মনেও কষ্ট। ঘরে ঘরে লাঠালাঠি করলে কি আর আল্লার দয়া হয়?

রমজানকে সান্ত্বনা দিয়ে বলি—দুই বাংলা হয়ত আবার এক হয়ে যাবে। অস্বাভাবিক অবস্থা বেশী দিন টিকতে পারে না।

রমজানের দীপ্তিহারা চোখে খেলে যায় ক্ষণিকের বিদ্যুল্লেখা। বলে—দাদাবাবু, এমন দিন কি হবে? আমি দেখতে পাব না। কিন্তু একটা কথা বলে রাখি। সেদিন যদি সত্যিই আসে তো কবরের নীচেও আনন্দ করব।

রমজান আলি খাঁটি বাঙালী। চিত্ত শ্রদ্ধায় নত হয়, তার কাছে বিদায় নিই।

গ্রীষ্মের বেলা অনেকখানি গড়িয়েছে। চনচনে রোদে গাছের চুড়োগুলো চকমক করে। চিরু শেখের চনমনে ছেলেটা বাঁশতলার ডোবায় ডুব দেয় আর মাথা তোলে। শুকনো খেজুরগাছের উপর দিয়ে দাঁড়কাক উড়ে যায় কা কা করে। মনটা হু হু করে ওঠে। বায়স-কণ্ঠের কর্কশ স্বরে যেন অমঙ্গল ঝরে পড়ে। ভাবি রমজানের কথা—বিভক্ত বাংলার সীমারেখার এপারেও সুখ নেই, ওপারেও সুখ নেই।

পরিবারের গণ্ডি

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

প্রশ্ন হইতেছে, আমাদের আধুনিক সমাজ জীবনে পরিবারের পরিসর ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িতেছে কেন? স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা আর বৃদ্ধ পিতামাতা লইয়াই এখন আসল সংসার। এতদধিক অন্য সকলে মূল পরিবার-বৃত্তের বহির্ভূত।

অত্যাধুনিক পরিবার আবার হুবহু পাশ্চাত্য সমাজ-জীবনের অনুকরণে রচিত। সেখানে বৃদ্ধ পিতামাতার স্থান নাই, আর স্থান নাই বিবাহিত পুত্র-কন্যার। আমাদের দেশে অত্যাধুনিক পরিবারের সংখ্যা এখনও অবশ্য মুষ্টিমেয়: কাজেই উহা আমাদের আলোচনার বাহিরে।

অথচ চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও এই পরিবার-বৃত্তের পরিধি বহু বিস্তৃত ছিল। শুধু গ্রামিক জীবনে নহে, নাগরিক জীবনেও।

কেহ কেহ মনে করেন, এই পরিবর্ত্তন নিছক স্বার্থপ্রণোদিত। কাহারও কাহারও মতে ইহা পূর্ব্বতন গ্রামিক সমাজের ধ্বংসের পরিণতি। কাহারও মতে ইহা স্রেফ আধুনিক জীবন-সংগ্রামের পরিণাম আর আর্থিক অনটন। আবার কেহ কেহ ইহাকে অর্থনৈতিক চাপ ও নূতন মনোবৃত্তি এতদুভয়ের ফল বলিয়া মনে করেন।

কারণগুলি একে একে বিচার করিয়া দেখা যাক্।

প্রথমতঃ, নিছক স্বার্থের কথা। মানুষ স্বভাবতঃই আত্মকেন্দ্রিক। নিজেকে কেন্দ্র করিয়াই তাহার জীবন। আনন্দই তাহার জীবনের মূলসূত্র। আনন্দ যেখানে ব্যাহত হয় সেখানে তাহার স্বার্থ ও জীবন সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। ফলে জীবনবৃত্তের পরিধিও সঙ্কুচিত হইতে থাকে। পিতামহ যেখানে দূরসম্পর্কীয় অথবা গ্রামসম্পর্কীয় মাসতুত শ্যালককন্যার অন্নপ্রাশনে দু'দশ টাকার তত্ত্ব করিয়া প্রচুর আনন্দ পাইতেন, পিতা শুধু সেরূপ কাজের সংবাদ রাখিতেন মাত্র। পুত্র আবার এ সংবাদকেও বাহুল্য মনে করেন। কিন্তু পিতামহ যেখানে অন্নপ্রাশনের তত্ত্ব করিতেন, পিতা সেখানে গ্রামে মাইনর স্কুল স্থাপন করিতেন আর পুত্র সেখানে দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা করিলেন। আনন্দদায়ক বস্তুর পরিবর্ত্তন হইল মাত্র: ইহাকে স্বার্থপরতা আখ্যা দেওয়া চলে কি?

ফলকথা, পিতামহের ছিল প্রচুর অবসর আর বহির্জগতের সঙ্গে পরিচয় ছিল তাঁহার অল্প। তাঁহার আনন্দের উৎস ছিল ঘরের কোণের [illegible]ণী। পিতা বদ্ধ জলাশয়ে স্নান অপেক্ষা স্রোতস্বিনীতে অবগাহন পছন্দ ক[illegible]রিলেন, আবার পুত্র হয়ত কালক্রমে সমুদ্র-স্নানের পক্ষপাতী হইয়া উঠি[illegible]লেন। বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্কের ফলে নিষ্কর্ম্মা পরোপজীবীর মূল্য[illegible]বোধ কমিয়া গেল আর সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের প[illegible] সঙ্কুচিত হইল। কাজেই সাধারণক্ষেত্রে নিছক স্বার্থবোধ পরিবারকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে একথা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না।

তার পরের কথা, গ্রামিক সমাজের ধ্বংসের উপর এই পরিবর্ত্তনের ভিত্তি।

গ্রামিক সমাজ বিলুপ্ত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই নাগরিক সমাজ গড়িয়া উঠিতেছিল। অবশ্য প্রারম্ভের নাগরিক সমাজ আধুনিক নাগরিক সমাজ হইতে বহুলাংশে বিভিন্ন। তখনকার নাগরিক সমাজ ছিল গ্রামিক ও নাগরিক সমাজের অপূর্ব্ব মিশ্রণ। অনেকটা এখনকার কলিকাতার বালীগঞ্জের মত। বালীগঞ্জে পূর্ব্ববঙ্গের বাসিন্দারা আলাপে, ব্যবহারে, কথায়-বার্ত্তায়, নীতি-নিয়মে এখনও পুরাপুরি পশ্চিমবঙ্গবাসী হইতে পারেন নাই; অর্থাৎ তাঁহাদের নাগরিক সমাজ এখনও খানিকটা গ্রামিক রহিয়া গিয়াছে।

তখনকার দিনে নগরের স্থায়ী বাসিন্দাদের কথা ছাড়িয়া দিলে, নগরে পরিবার লইয়া বাস করিত অল্পসংখ্যক লোক। এক গ্রামের বা এক পরগণার যে সকল লোক একই শহরে বাস করিত তাহাদের মধ্যে হৃদ্যতা ছিল যথেষ্ট। আর তাহারাই যখন বৎসরান্তে শারদীয়া পূজার সময় গ্রামে যাইত তখন ভোল বদলাইয়া একেবারে গ্রামিক সমাজের মুখপাত্র হইয়া বসিত। আপিসের কোটপ্যাণ্ট-পরা পুরাদস্তুর সাহেবটিকে বাড়ীতে ধুতি পরিয়া খালি গায়ে বসিয়া থাকিতে দেখিলে একটু বিভ্রম হইবারই কথা।

কিন্তু যাহা বলিতেছিলাম: প্রারম্ভের নাগরিক সমাজে পরিবারের পরিসর সঙ্কুচিত ছিল না। বরং বনেদী ঘরের গৌরব রক্ষার্থ বৃত্তের পরিসর হয়ত কিছু বাড়াইয়া দিতে হইত। তারপর নগরের অস্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে যাঁহারা ক্রমশঃ স্থায়ী হইতে লাগিলেন তাঁহাদের পরিবার-গোষ্ঠীতে আশ্রিত ছাত্র ও বেকারের সংখ্যা বড় কম হইল না। ফলে পরিবারের পরিসর ও তাহার মূল্যবোধ প্রধানতঃ প্রায় অক্ষুণ্ণই রহিল। প্রভূত পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র গত বিশ-পঁচিশ বৎসরের মধ্যে। কাজেই গ্রামিক সমাজের বিলুপ্তি এই পরিবর্ত্তনের প্রত্যক্ষ কারণ একথা বলা চলে না; যদিও সামান্য পরোক্ষ কারণ বলা যাইতে পারে।

তারপর জীবন-সংগ্রাম ও আর্থিক অসঙ্গতির কথা।

সর্ব্বপ্রকার সঙ্কোচনের জন্য আধুনিক অর্থব্যবস্থাকে দায়ী করা আমাদের মজ্জাগত স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোন যুগেরই অর্থনীতি নিখুঁত নহে; ইহাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। দেশের সহিত বহির্জগতের নিরন্তর সংঘাতে ইহার জন্ম, সেই সংঘাতবেগেই ইহার গতি ও পরিণতি। সে বেগে সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু তাহা যে কেবল সঙ্কোচ, ও সম্প্রসারণের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিবে এমন কোন কথা নাই। মানুষের মন নিছক অর্থব্যবস্থার দাস নহে। স্বাভাবিক মন হিসাবী, কিন্তু অস্বাভাবিকভাবে নয়। বেহিসাবী মন ঋণ করিয়াও দরিদ্র-ভোজন করায়,

আবার অতি হিসাবী মন নিজের অশন-বসনের জন্ত অত্যাবশ্তক ব্যয়েও পরাঙ্মুখ। ইহা সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে লক্ষিত হয়। কাজেই একমাত্র অর্থব্যবস্থাকে এই পরিবর্ত্তনের জন্ত দায়ী করা অসঙ্গত।

জীবনে সংগ্রামের হ্রাস-বৃদ্ধি আছে। সংগ্রাম জীবনরক্ষার জন্ত কি জীবনের মানবৃদ্ধির জন্ত সে কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু সংগ্রামে যাহা সাহায্য করে, যাহা প্রেরণা যোগায় তাহাকে কি কেহ পরিত্যাগ করে? স্নেহ, প্রেম, ভালবাসাই সে প্রেরণা যোগায়, কাজেই সংগ্রামের সঙ্গী হিসাবে স্ত্রী-পুত্রকে অবলম্বন করিবার প্রয়াস স্বাভাবিক। আবার সে স্ত্রী-পুত্রকন্তাও যদি স্নেহহীন হয় তবে তাহাদের মূল্যবোধ কমিয়া যায়। আত্মজ অপেক্ষা যে ভ্রাতুষ্পুত্র প্রিয় হয়; আত্মজা অপেক্ষা যে পালিতা কন্তা বেশী স্নেহ লাভ করে ইহা তো নিত্যই দেখা যায়। স্নেহরসেই মন সঞ্জীবিত হয়—কর্ত্তব্যবোধে নহে। পরিবার-পরিধির যে অংশ স্নেহদানে পরাঙ্মুখ হইল তাহারা যে ক্রমশঃ বৃত্ত হইতে খসিয়া পড়িবে তাহা আর বিচিত্র কি?

আধুনিক শিক্ষা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিপোষক। নিষ্কর্ম্মা, পরোপজীবীরও নিজের মূল্যবোধ বাড়িয়া গিয়াছে। সেও গৃহস্বামীর তুল্যমূল্য হইতে চায়—অন্তে পরে কা কথা? সকল স্বজনই গৃহস্বামীর সুখ-সুবিধার সমান দাবি করিয়া বসে। তাহা না পাইলে বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়; ঘোরতর ঈর্ষার দাহ সমগ্র পরিবারের বন্ধন শিথিল করিয়া দেয়। সেবাদান অপেক্ষা সেবাগ্রহণে লোক উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছে। স্নেহদান না করিয়াই স্নেহলাভে তাহার অদম্য আকাঙ্ক্ষা। তাহার সে আকাঙ্ক্ষা কে মিটাইবে?

এদিকে আমাদের জীবনযাত্রার আদর্শও ভ্রান্তপথে চলিয়াছে। প্রভূত ধনোপার্জ্জন ও প্রচুর সুখ-সম্ভোগ ইহাই এখন জীবনযাত্রার আদর্শ ও মানদণ্ড। ইউরোপ ও আমেরিকার সহিত পাল্লা দিয়া এই মানবৃদ্ধির চেষ্টা চলিতেছে। আমাদের দেশ আমেরিকা নহে; দেশের উৎপাদন-শক্তি নিতান্ত সীমাবদ্ধ। কাজেই দেশে ভোগাবস্তুর অভাব অবশ্যম্ভাবী, আর সে ভোগে সকলকে যথাযোগ্য ভাগ দিবার মত শিক্ষা আমাদের নাই।

অন্যান্য শক্তিশালী ও অর্থসম্পদে সমৃদ্ধ দেশের জীবনযাত্রার সঙ্গে অশোভন পাল্লা দিতে গিয়া আমাদের বুদ্ধি বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। জীবনের আদর্শ শুধু প্রচুর ভোগেচ্ছায় পরিণত হইয়াছে। আর তাহার উপর জুটিয়াছে আধুনিক শিক্ষা—যে শিক্ষায় শক্তি আহরণ অপেক্ষা শক্তির পরিচয় দিবার প্রয়াস সমধিক।

কিন্তু ইহা নিছক অকল্যাণের পথ নহে। পরিবারের বৃত্তকে ছোট করিলেই যে মানুষ মনুষ্যত্বহীন হয় এ কথা অশ্রদ্ধেয়। বরং যাহা শুষ্ক, ক্লান্তিকর ও যুগধর্ম্মের অনুপযোগী তাহা সর্ব্বথা ত্যাজ্য। যাহার সঙ্গে প্রাণের সম্পর্ক নাই তাহা মানবতার পরিপোষক নহে।

বিবর্ত্তন

শ্রীমহাদেব রায়

১

পৌষের মাঠে স্তব্ধ সে সুর কিসে?
ধানের-গাড়িতে গাড়োয়ান নির্বাক্‌,
এই তো সেদিনও গাহিতে গাহিতে হেসে,
চালাত বলদে লাঙ্গুলে দিয়া পাক।

২

শত অভাবেও ছিল হর্ষের কথা
কবে কোথা দিয়া নামে ম্লান ছায়া মুখে,
কষিতে হিসাব ভরি' উঠে যত ব্যথা
আশার-ফানুসে চির-অনাগত সুখে।

৩

চাষীর মেয়েরা আসে না কুড়াতে শীষ
মাঠের-ফাটলে ঝরা শীষ তাই কাঁদে,
গ্রামের লক্ষ্মী হেরিছে নির্নিমিষ
দিগন্ত-জোড়া পলিটিক্‌স্‌-এর ফাঁদে।

৪

সংক্রান্তির মকর-মেলাতে নাই
খঞ্জনি, কি কীর্ত্তনীয়ার সুর,
গলা ফাটাইয়া বুঝাইতে চায় মিছে
আকাশকুসুম কাহিনীরে ধুরন্ধর।

৫

বুভুক্ষু চাহে বুক-ভরা অমৃত,
শুষ্ক ভাষণে কোথা তার সন্ধান?
পৌষ-পার্বণে হৃদয়ের পালা শেষ,
বেসুরা শোনায় বুদ্ধিজীবীর গান।

রবীন্দ্রনাথের কাছে কয়েক মিনিট

শ্রীপ্রতাপকুমার সেনগুপ্ত

আমার মনে রবীন্দ্রনাথের ছবি যে ভাবে আঁকা আছে তারই কথা একটু বলতে পারি।

আমি তখন কলেজের ছাত্র। ওয়াই-এম-সি-এ'র হোষ্টেলে থাকি, প্রতি বৎসর এই হোষ্টেল থেকে একটি দল ফুটবল খেলতে শান্তিনিকেতনে যায়। সেবার আমি গেলাম দলের অধিনায়ক হয়ে—তখন জুলাই মাস ১৯৩৮ সাল। আমাদের সঙ্গে গিয়েছিলেন শ্রীঅনিল চন্দ ও শ্রীক্ষিতীশ রায় (ওয়াই-এম-সি-এ'র প্রাক্তন হোষ্টেলবাসী)। রবীন্দ্রনাথ তখন 'শ্যামলী'তে ছিলেন। বারান্দায় একটা আরাম কেদারা পেতে চুপচাপ তিনি বসে আছেন। ক্ষিতীশবাবু আমাকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন—"তুমিই তবে দলের সর্দ্দার, আচ্ছা খেলার ফল কি হ'ল?" উত্তর দিলাম "ড্র হয়েছে।" তিনি হাসতে হাসতে বললেন, "তোমরা তো খুব ভদ্রলোক। যারাই এখানে আসে তারাই আমাদের হারিয়ে দিয়ে যায়।" আমিও হেসে জবাব দিলাম—"আপনাদের দল সত্যিই শক্তিশালী ছিল, তবে আমরাও ভদ্রতার খাতিরে ইচ্ছা করেই আপনাদের দলকে হারাই নি।"

পরিচয়ের পালা চলল অন্য সকলের সঙ্গে। সেই সুযোগে আমি রবীন্দ্রনাথের ঘরের মধ্যে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে নিলাম। লোভ সামলাতে না পেরে শোবার ঘরে ঢুকে পড়লাম। সুন্দর বিছানা, পরিপাটী করে সাজানো। তখন আমার অল্প বয়স, ভারি ইচ্ছা হ'ল বিছানায় একটু বসি। এত বড় মহাপুরুষের বিছানায় একটু বসতে পারলেও জীবন সার্থক হয়। অতি সন্তর্পণে এদিক-ওদিক তাকিয়ে চট করে বসে পড়লাম বিছানার উপর। ঘর থেকে কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এলাম সকলের মাঝে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়াই নি; তিনি একটু মুচকি হাসি হেসে আমাকে বললেন—"কি হে সর্দ্দার, না হয় একটু শুতেও তো পারতে।" ভয়ানক লজ্জিত হলাম সবার সামনে, সকলে মিলে হাসতে আরম্ভ করল।

এর পরে ফটো তোলবার পালা। ফটোগ্রাফার ছেলেটি নূতন ফটো তোলা শিখছে। সে রবীন্দ্রনাথের কাছে ফটো তুলবার অনুমতি চাইল। সহাস্যে তিনি উত্তর দিলেন—'অনুমতি দিতে পারি যদি আমাকে কপি পাঠাও'। সকলে দাঁড়িয়ে গেল গুরুদেবের পাশে। আমি একটু এগিয়ে এসে দাঁড়ালাম তাঁর চেয়ারের হাতলের কাছে। ফটোগ্রাফার এক বার সামনে এক বার পিছনে গিয়ে ফোকাস ঠিক করতে লাগল। তার পর একটু অসহিষ্ণু ভাবে আমার দিকে চেয়ে সে বলল, "তোমার শরীরটা পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু মাথাটা বাদ পড়ে যাচ্ছে।" রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন—"'নীল ডাউন' হয়ে আমার পাশে বসে পড়।" বসলাম হাঁটু গেড়ে। ফটোগ্রাফার তখন কিন্তু নার্ভাস হয়ে পড়েছে। হাত কাঁপতে কাঁপতে সে টিপে দিলে। এর পরে রবীন্দ্রনাথ আমার পিঠে হাত দিয়ে বললেন—"সর্দ্দার, স্কুলের অভ্যাস ভুলে গিয়েছিলে, না? আবার এ বয়সেও 'নীল ডাউন' হতে হ'ল।" সকলে হো হো করে হেসে উঠল।

যে মন সমগ্র দেশ, সমগ্র পৃথিবীর চিন্তায় মগ্ন সেই মন সুযোগ পেলেই সামান্য লোকদের নিয়ে রসিকতা করত—এইটেই একান্ত বিস্ময়কর। কলকাতায় হোষ্টেলে ফিরে ক্ষণে ক্ষণে তাঁর কথা মনে হয়েছে। বছর ঘুরলে আবার শান্তিনিকেতনে খেলতে যাব—তাঁর দর্শনলাভ করব—এই আশায় ছিলাম। পরের বছরও গিয়েছি, কিন্তু সে সময়ে তিনি ছিলেন অন্যত্র। একাকী শ্যামলীর কাছে কাছে ঘুরে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে পূর্ব্ব বৎসরের সহজ, সরল ও রসিক রবীন্দ্রনাথের কথা ভেবেছিলাম। সেই দিনটির কথা আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।*

* রবীন্দ্র-সভায় কথিত।

করো না এমন ভুল

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

আকাশের বুকে এক ফালি বাঁকা চাঁদ,
অস্ত পারেতে ধীরে ধীরে ডুবে যায়;
মন্থর মেঘে কত যেন অবসাদ,
নিজের আঁচলে চাঁদেরে লুকোতে চায়।

স্পন্দনহীনা প্রকৃতি দাঁড়ায়ে রয়—
বিদায়ী চাঁদের নীরব হিমানী ঝরে;
তরুবীথিতল আঁধারেতে ছায়াময়,
জোনাকীর দল ওড়ে না তাহার 'পরে।

শুভ্র যূথিকা তাকায় চাঁদের পানে,
অপলক আঁখি অশ্রুতে ছলছল্;
না-বলা কথার কত ব্যথা আজি হানে,
বেদনা-বিধুর হৃদিখানি উচ্ছল।

ধরণীর মেয়ে ক'রো না এমন ভুল,
দূর বঁধুয়ায় বেসো না কখন ভালো;
বেদনা তোমার কোথাও পাবে না কূল,
আঁখিতে তোমার মিলাবে শতেক আলো।

আলোচনা

"ছত্রভোগের অধিকারী রামচন্দ্র খান"

শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল

'প্রবাসী'র মাঘ সংখ্যায় (১৩৫৯) ছত্রভোগ শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুত কালিদাস দত্ত লিখিয়াছেন—"ছত্রভোগের শাসনকর্ত্তা চৈতন্ত ভাগবতোক্ত রামচন্দ্র খাঁ কে ছিলেন, তাহার কোন উল্লেখ কোথাও নাই। তিনি উক্ত পুরন্দর খাঁর বংশের কেহ হওয়া অসম্ভব নহে।" এই রামচন্দ্র খান সম্পর্কে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। কালিদাসবাবু যেমন রামচন্দ্র খানকে পুরন্দর খাঁর বংশের কেহ হওয়া সম্ভব মনে করিয়াছেন, তেমনই কেহ কেহ আবার তাঁহাকে পুরন্দর খাঁর সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন তাঁহার বাসস্থান হুগলী জেলার অন্তর্গত ভদ্রকালী গ্রামে (হুগলী জেলার ইতিহাস, মাসিক বসুমতী, চৈত্র, ১৩৪৩)। ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন 'অশ্বমেধ পর্বের' রচয়িতা রামচন্দ্র খান এবং ছত্রভোগের অধিকারী রামচন্দ্র খান একই ব্যক্তি হওয়া সম্ভব মনে করেন। দুঃখের বিষয়, প্রাপ্ত দুইখানি পুথিতে কবির আত্ম-পরিচয়ে মিল নাই; একটির পাঠ অনুসারে পিতার নাম কাশীনাথ, নিবাস রাঢ়দেশে দন্ত-সিমলিয়া-ডাঙ্গা গ্রামে, জাতি কায়স্থ; অপরটির পাঠ অনুযায়ী পিতার নাম মধুসূদন, নিবাস জঙ্গীপুর, জাতি ব্রাহ্মণ। ডঃ সেনের মতে ছত্রভোগের রামচন্দ্র খান ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না। (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১৩৫৫)।

'বাকলা'র ইতিহাস (১৯১৫)-প্রণেতা রোহিণীকুমার সেন লিখিয়াছেন—"লাখুটিয়ার রায় বংশ বঙ্গদেশের গৌরব বর্দ্ধন করিয়া সর্ব্বত্র প্রখ্যাত হইয়াছে। মহামতি রামচন্দ্র খাঁ সর্ব্বপ্রথমে বাখরগঞ্জ জেলায় এই বংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। ইনি বঙ্গ ও উড়িষ্যার সীমান্তবর্ত্তী দেশসমূহের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কালক্রমে দুরদৃষ্ট নিবন্ধন নবাবের রোষানলে পতিত হইয়া এই জেলার দক্ষিণপ্রান্তে একটি উপনিবেশ স্থাপন করেন। ইনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন···। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ ইঁহারই সহায়তায় বঙ্গদেশ হইতে শ্রীক্ষেত্রে গমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।" রোহিণীবাবু তাঁহার ইতিহাসে রামচন্দ্র খানের একটি বংশলতাও সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এই রায়বংশ জাতিতে ব্রাহ্মণ। মেদিনীপুরের ইতিহাস-লেখক শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু প্রভৃতিও রামচন্দ্র খান সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে অধিক নজির দেখাইতে বিরত রহিলাম।

রামচন্দ্র খান ছত্রভোগ বা দক্ষিণরাজ্যের সেনাপতি অথবা ফৌজদার ছিলেন। তাঁহার মুখে বৃন্দাবন দাস পরিচয় দিয়াছেন—"মুঞি সে নস্কর হেথাকার মোর ভার।" আমরা অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছি ছত্রভোগ ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে এখনও খাঁ ও নস্কর পদবীযুক্ত একই বংশের বহু লোক বাস করিতেছেন। ইঁহারা পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় জাতি। ইঁহারা নিজেদের রামচন্দ্র খানের বংশধর বলিয়া দাবি করেন। উক্ত অঞ্চলের জগদীশপুর গ্রামনিবাসী শ্রীভূষণচন্দ্র নস্করের গৃহে রামচন্দ্র খানের যে বংশলতাটি রক্ষিত আছে, রাইচরণ সরদার মহাশয় তাঁহার 'মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র' নামক পুস্তকে তাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন (১৩৪৮)।

ধপ্ধপে
ক'রে কাচা
ঝক্ঝকে
ক'রে কাচা
সান্‌লাইট্
সাবানের দৌলতে
না আছড়ে কাচলেও
কাপড়চোপড় সাদা ও
ঝক্ঝকে ক'রে দ্যায়!
SUNLIGHT
SOAP
SUNLIGHT SOAP

S. 204-50 BG

অশোকের অনুশাসন

ডক্টর শ্রীমনোমোহন ঘোষ, এম-এ, পিএইচ-ডি

প্রায় বাইশ শত বৎসর পূর্বে মৌর্যরাজ অশোক মানবকল্যাণ—তথা সর্বভূত-কল্যাণের যে সুমহান্ আদর্শ রাজধর্মপালনের মধ্য দিয়া প্রচারের চেষ্টা করেছিলেন, সে আদর্শের আকর্ষণ যে আজও শিথিল হয় নি, এর সুস্পষ্ট প্রমাণ হচ্ছে অশোক-স্তম্ভের শিরোভূষণকে ভারতীয় গণতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় মুদ্রাচিহ্ন হিসাবে স্বীকৃতি।

এই ঘটনার পর থেকে অশোকের ইতিহাস আমাদের কাছে লাভ করেছে এক অভিনব মহিমা। আর এই মহামানবের জীবন সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল হয়েছে অধিকতর জাগ্রত। তার ফলে অশোকের সম্পর্কে লেখা প্রচলিত বইগুলি পড়ে আমাদের আর তৃপ্তি হচ্ছে না। কিন্তু এজন্যে লেখকরাই সম্পূর্ণ দায়ী নন, যদিও তাঁদের সকলকে এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া সম্ভবপর নয়। যেমন কোনও সুপরিচিত ঐতিহাসিক খুব উৎসাহের সঙ্গে অশোককে রোমসম্রাট কনষ্টান্টাইনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কিন্তু উক্ত ঐতিহাসিক খবর রাখেন নি যে, ঐ খ্যাতনামা রোমসম্রাটের খ্রীষ্টভক্তি ছিল একান্তভাবে উদ্দেশ্যমূলক ও স্বার্থপ্রণোদিত।

তাঁর সম্বন্ধে কোনও পাশ্চাত্ত্য ঐতিহাসিক বলেছেন:

"It was Constantine's interest to gain affection of his numerous Christian subjects in his struggle with his rival; it was probably only his self-interest which led him at first to adopt it."

কিন্তু অশোকের বৌদ্ধ ধর্মানুরাগ ও বুদ্ধভক্তি সম্বন্ধে ঘটনাটি এর একান্ত বিপরীত। কলিঙ্গ-বিজয়ে সাফল্যলাভের পরে বিজিত নরনারীগণের মর্মন্তুদ দুর্দ্দশা দেখে যে সুগভীর অনুশোচনা তিনি অনুভব করেছিলেন, তাই তাঁকে দিয়েছিল অহিংসার ধর্মে এমন দৃঢ় অভিরুচি।

আবার কেউ কেউ অশোককে সাধারণ শ্রেণীর ধর্মোন্মাদ মনে করেছেন, কিন্তু এ মত তাঁর অনুশাসনগুলির দ্বারা সমর্থিত হয় না। অথচ এই অনুশাসনগুলিই হ'ল আমাদের অশোক সম্বন্ধীয় জ্ঞানের সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক উৎস। দুর্ভাগ্যবশতঃ কালের আক্রমণে এগুলি স্থানে স্থানে ভগ্ন ও অস্পষ্ট হয়ে গেছে; আর ভাষাও এদের স্থানে স্থানে দুর্বোধ্য বা অবোধ্য হয়ে রয়েছে। নানা সুযোগ্য বিদ্বন্মণ্ডলীর চেষ্টায় এই অনুশাসনগুলির অর্থ ক্রমশঃ অনেকটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে। এখন থেকে প্রায় এক শ' বছর আগে জেমস্ প্রিন্সেপ্ এই লিপিগুলির কয়েকটির পাঠোদ্ধার করে এদের অর্থ-নির্ণয়ের সূত্রপাত করেন। তার পরে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজাণ্ডার কানিংহাম কর্তৃক তৎকাল পর্যন্ত আবিষ্কৃত অশোকানুশাসনগুলির মূল অনুবাদ ও টিপ্পনীসহ এক সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। ফরাসী পণ্ডিত এমিল সেনার এতৎসম্পর্কিত গ্রন্থ প্রকাশ করেন ১৮৮১ থেকে ১৮৮৮ অব্দের মধ্যে। এই দুখানি পুস্তক অশোক অনুশাসনের মর্ম উদ্ঘাটনে যথেষ্ট সহায়তা করলেও পরবর্তীকালের বিভিন্ন পণ্ডিতের গবেষণায় এবং ঐতিহাসিক জ্ঞান বৃদ্ধির ফলে এখন সেকেলে হয়ে গেছে।

কানিংহামের বইয়ের উপর নির্ভর করেই কৃষ্ণবিহারী সেন ১৮৯২ সালে "অশোক চরিত" রচনা করেন। এখানিই বোধ হয় আধুনিক ভারতীয় ভাষায় রচিত অশোক-সম্পর্কিত সর্বপ্রথম পুস্তক। তাঁরই প্রবর্ত্তিত ধারায় চারুচন্দ্র বসু লিখেছিলেন "অশোক বা প্রিয়দর্শী" (১৯১১)। আর কানিংহামেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে ১৯১৫ সালে চারুচন্দ্র বসু ও ললিতমোহন কর বাংলা অনুবাদসহ "অশোক অনুশাসন" প্রকাশ করেন। পণ্ডিত রামাবতার শর্মার সংস্কৃত অনুবাদসহ প্রকাশিত "প্রিয়দর্শি-প্রশস্তয়ঃ"ও এ জাতীয় গ্রন্থ (১৯১৫)। এ সকল বই প্রকাশের পর প্রসিদ্ধ প্রাচীন-লিপি-বিশারদ গৌরীশঙ্কর হীরাচাদ ওঝা পণ্ডিত শ্যামসুন্দর দাসের সহযোগিতায় সংস্কৃত ও হিন্দী অনুবাদযুক্ত যে "অশোককী ধর্মলিপিয়াঁ" প্রকাশ করেন তাতে কিছু কিছু নূতন তথ্য ও মতামত ছিল। এ সকল ছাড়া কলিকাতা ও পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত এবং যথাক্রমে ভাণ্ডারকর, মজুমদার এবং উলনার দ্বারা সম্পাদিত মূল অশোক অনুশাসনগুলির অভিনব সংস্করণও উক্ত লিপিগুলির পঠন-পাঠনের বিশেষ সাহায্য করেছে। তবে এ সকলেরই উপরে স্থান দিতে হয় হুলটজ্‌শ (E Hultzosch) প্রণীত ও ভারত-সরকার প্রকাশিত *Inscriptions of Asoka* নামক গ্রন্থকে।

কানিংহাম ও সেনারের বই বের হওয়ার পর থেকে ১৯২৫ সালের আগে পর্যন্ত অশোক অনুশাসন সম্বন্ধে ভারতবর্ষে ও পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহের নানা বিদ্বৎপরিষদের দ্বারা যে সকল মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল হুলটজশ-এর বহুমূল্য গবেষণাত্মক পুস্তকে সে সকলের যথাযোগ্য উল্লেখ ও আলোচনা থাকায় অশোক-সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জ্জনের পক্ষে উহা তখন অপরিহার্য্য বিবেচিত হয়েছিল। কিন্তু এ গ্রন্থেরও মতামত এখন আর নির্ব্বিচারে গৃহীত হয় না—যেহেতু অশোক-সম্পর্কিত গবেষণা ক্রমেই অগ্রসর হয়ে চলেছে। হুলটজশের বই বের হওয়ার পরে আরও তিন স্থানে অশোকের অনুশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে। এর ফলেই অনুশাসনগুলির সম্বন্ধে নিত্যনূতন গবেষণার ক্ষেত্র ক্রমশঃ প্রবর্দ্ধমান। এই ক্ষেত্রের আকর্ষণ যে সকল বিদ্বান্ অনুভব করেছিলেন তাঁদের মধ্যে পরলোকগত বেণীমাধব বড়ুয়ার নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। মৃত্যুর পূর্ব্বে ১৯৪৩ ও ১৯৪৬ সালে তিনি এই অশোকানুশাসন সম্বন্ধে দুখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করে গিয়েছেন। বৌদ্ধধর্ম ও পালি সাহিত্যে অধ্যাপক বড়ুয়ার যে সুগভীর জ্ঞান ছিল তার ফলে তিনি অশোকানুশাসন-গুলি সম্পর্কিত নানা সমস্যার উপর নূতন আলোকপাত করতে

পেয়েছেন। প্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত ঝুল ব্লক (Jules Block) প্রণীত অশোকানুশাসন ১৯৫০ সালের তুলনায় অনেক সংক্ষিপ্ত এবং এখানি মুখ্যতঃ পূর্ব্ববর্ত্তীদের মতামতের সারসংগ্রহমূলক। তবে এর স্থানে স্থানে মূল্যবান ইঙ্গিত আছে।

ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় অশোকানুশাসনগুলি সম্বন্ধে মূল্যবান গ্রন্থ থাকলেও ভারতীয় ভাষায় এদের সম্পর্কে প্রামাণিক রচনা এক রকম ছিল না বললেই চলে। ভারত ইতিহাসে অশোকের বিশিষ্ট স্থানের ও দানের কথা বিবেচনা করলে এ অভাব খুবই লজ্জাজনক মনে করতে হয়। কিন্তু যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য থাকা সত্ত্বেও অশোক অনুশাসনগুলির অন্তবিধ মূল্যবত্তার দিকও আছে। প্রায় দু' হাজার বৎসর পূর্ব্বে রচিত অশোকের নির্দ্দেশ একালের মানুষের কাছেও নিষ্প্রয়োজন হয়ে যায় নি এবং তাদের একটি বর্ত্তমানের লোকেদের বিশেষ করে মনে রাখা উচিত। সেটি হচ্ছে: "অল্পব্যয়তা ও অল্পভাণ্ডতা সাধু" (সিরনার শিলানুশাসন) অর্থাৎ অতিরিক্ত খরচ না করা এবং স্বল্পপরিমাণে অর্থসঞ্চয় করাই প্রশংসনীয়। সমাজের অধিকাংশ লোক যদি এই নির্দ্দেশের অন্তর্নিহিত আদর্শকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করে, তবে ধনিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম বর্ত্তমান জগৎকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে তার নিশ্চিত অবসান হতে পারে। এই শ্রেণীর নির্দ্দেশে অশোকের অনুশাসনগুলি পরিপূর্ণ। কাজেই ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রত্যেক নাগরিক যদি এই অনুশাসনগুলির মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করতে পারে তবে তারা নিজেরা হবে সুখী এবং রাষ্ট্রকেও করবে সুদৃঢ় এবং শান্তিপূর্ণ। কিন্তু ইংরেজীর নানা উপযোগিতা থাকলেও সে ভাষার ভিতর দিয়ে উক্ত কাজটি সুসম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। তাই ডক্টর শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন সম্পাদিত সদ্যপ্রকাশিত "অশোক লিপি" আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের ভাণ্ডারে এক মহামূল্য দান বলে বিবেচিত হবে।* এই গ্রন্থে ডক্টর সেন অশোক-প্রচারিত অনুশাসনগুলির মূলানুগত প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ যথোচিত টীকা-টিপ্পনী-সহ প্রকাশ করেছেন এবং সর্ব্বশেষে মূল (প্রাকৃত) অনুশাসনগুলিও দিয়েছেন। তদুপরি বিস্তৃত ভূমিকার নানা প্রসঙ্গের মধ্যে তিনি অশোক ও বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়, অশোকের ধর্ম্ম, অশোকের রাজনীতি ও তাহার ফল এবং অশোকের অন্তঃপ্রকৃতির আভাস সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ আলোচনা করেছেন, তার ফলে অশোকের ব্যক্তিত্ব ও ইতিহাস-পাঠকের নিকট অধিকতর সুস্পষ্ট হয়েছে। ডক্টর সেনের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীই এ বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত ও মতামতকে এরূপ বৈশিষ্ট্যদান করেছে। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ নেই। ডক্টর সেন তাঁর কাজ বেশ নিপুণভাবে সুসম্পন্ন করেছেন। পণ্ডিতবর্গের নানা বিতর্কজালের গহন থেকে প্রামাণিক মতগুলি নির্ভুলভাবে নির্ব্বাচন করেছেন, আর স্থানে স্থানে পূর্ব্ববর্ত্তীদের ভ্রমও সংশোধন করেছেন। মোটের উপর বলা যায় যে, তিনি জার্ম্মানীর বিখ্যাত ভারত-তত্ত্বজ্ঞ শুব্রিং (W. Schubring) এবং লুডর্স (H. Lueders) প্রভৃতি অধ্যাপকের কাছে যে দুর্লভ জ্ঞানলাভ করে এসেছেন তার বেশ সদ্ব্যবহার করেছেন তিনি বাঙালী পাঠকের উপকারার্থে। তাঁর এই বই বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে বললে মোটেই অত্যুক্তি করা হবে না।

* অশোকলিপি—ডক্টর অমূল্যচন্দ্র সেন সম্পাদিত: ইণ্ডিয়ান পাবলিসিটি সোসাইটি, ২১নং, বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা; ১৯৫৩, ডিমাই, অষ্টাংশ ১৬৮ পৃঃ; মূল্য ৮৲।

স্মরণী

শ্রীশান্তি পাল

হেমন্তের হৈম আলো ঢাকে কুয়াশায়,
পথ-প্রান্তে কুন্দকলি কাঁপে থরথরে,
বন-কুসুমিকা ভয়ে মাগিছে বিদায়,
হেরিতেছে সূর্য্যমুখী কি বিস্ময়ভরে!
বাসনার বহ্নি জ্বালি' ব'সে আছি একা,
আপনারে দগ্ধ করি সপ্তপর্ণ তলে,
স্বপ্নাকীর্ণ স্মৃতি-পথে যদি পাই দেখা
সেই দুটি কালো আঁখি সদা ঢলঢলে!
যুগে যুগে কল্পে কল্পে মনে রেখো সখি,
নিগূঢ় কি সূত্র দিয়ে বাঁধিয়াছ মোরে
বিচ্ছেদের সে কি ব্যথা উঠিছে ঝলকি
বাহির হইতে তাহা কে বুঝিবে ওরে!
আপনার অস্তিত্বরে খুঁজে নাহি পাই,
এই আছি, এই নাই,—হারাই হারাই!

হে আমার সূর্য্যমুখী অনন্ত-যৌবনা—
ক'রো না জর্জ্জর আর বিষ-দিগ্ধ বাণে;
বসন্ত আসিছে ফিরে প্রসন্ন-নয়না,
রাত্রিদিন শান্তিহীন কোন পথে টানে!
আকাশের শ্যাম-নীলে স্বর্ণ-রক্তিমায়,
উচ্ছলিত বনভূমি তীব্র-রসোচ্ছ্বাসে—
কোকিলের কলস্বরে মত্ত মূর্চ্ছনায়,
দিগন্তের দ্বার খুলি, এস প্রিয়ে পাশে।
দিনান্তের অবসানে চেয়ে আছি হায়!
দক্ষিণ সমীর বহে পলাশের বনে—
অস্তমিত সান্ধ্যসূর্য্য দূর নীলিমায়,
শুষ্কশাখা মুঞ্জরিছে মন্ত্র গুঞ্জরণে;
কল্পনার রথ ছুটে মানসের তীরে
শুকতারা সকৌতুকী চাহে ফিরে ফিরে!

"উপনিষদের উপদেশাবলী"

শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ

ভারতীয় সর্বশাস্ত্রের মুকুটমণি উপনিষৎ। ইহার প্রাচীন নাম—শ্রুতিশিরঃ বা জ্ঞানকাণ্ড। সকল দর্শনশাস্ত্রের মূল—উপনিষৎ। ইহারই নাম বেদান্ত। লেখক বৈদিক সাহিত্যের সাধারণ সমীক্ষা (a general review of Vedic literature) নামক অধ্যায়ে দেখাইয়াছেন,—বেদ দুইভাগে বিভক্ত (১) মন্ত্রভাগ বা কর্মকাণ্ড (২) ব্রাহ্মণভাগ—ইহার অংশবিশেষ বা অগ্রভাগ আরণ্যক ও উপনিষৎ—জ্ঞানকাণ্ড। এক বেদবৃক্ষের দুইটি কাণ্ড ও বহু শাখা থাকিলেও তাহা একই তত্ত্বরসে পরিপুষ্ট। উভয়ের মধ্যে যদি তত্ত্ববিরোধ হয়, তাহা হইলে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ-শাস্ত্র বেদের স্বরূপই ব্যাহত হয়। গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে, বেদ ও উপনিষদের মধ্যে তত্ত্ববিরোধ হইয়াছে বলিয়া যাঁহারা ঘোষণা করিয়াছেন, তাঁহাদের তত্ত্বদর্শন সমীচীনভাবে হয় নাই। প্রমাণ—বেদ ও উপনিষদের আভ্যন্তরীণ বাণী যে সকল পাশ্চাত্ত্য মনীষী কর্মকাণ্ড-ঋগ্বেদাদি হইতে জ্ঞানকাণ্ড উপনিষৎকে নূতন বিদ্রোহী মত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য লেখক ঋগ্বেদ হইতে একাত্মবাদের মন্ত্রগুলি উদ্ধৃত করিয়া উপনিষৎ হইতে কর্মপ্রবৃত্তিদায়ক অর্থাৎ অনুষ্ঠানমূলক বাক্যগুলি উপন্যস্ত করিয়া দেখাইয়াছেন। বেদেও একেশ্বরবাদ ব্যতীত বহু দেবতার অস্তিত্ব স্বীকৃত, উপনিষদেও বহু দেবতার উল্লেখ ও অস্তিত্ব সমভাবেই স্বীকৃত। বেদেও যাগ-যজ্ঞাদি দ্বারা স্বর্গফলের উল্লেখ আছে, উপনিষদেও সেই কথাই ঘোষিত হইয়াছে, উপনিষদে কোথায়ও বলা হয় নাই যে, যাগযজ্ঞাদি হইতে স্বর্গলাভ হয় না। ইহা যে শাশ্বত নহে—পুণ্যক্ষয়ে স্বর্গ হইতে পতন হইয়া থাকে, ইহা উপনিষৎ বলিয়াছেন। বেদ (কর্মকাণ্ড) কোথায়ও বলেন নাই যে, স্বর্গ চিরস্থায়ী; ইহা হইতে কখনও পতন হইবে না। বরং উভয় কাণ্ডের সামঞ্জস্যবিধান এইভাবে করা হইয়াছে যে, ফলকামনারহিত হইয়া যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিলেও তাহা ব্রহ্মাববোধের অনুকূল হইয়া থাকে, ইহা উপনিষদের স্পষ্ট সিদ্ধান্ত। সুতরাং ঋগাদি বেদ ও উপনিষদের মধ্যে তত্ত্ববিরোধ নাই, ফলেরও পার্থক্য নাই।

এই গ্রন্থে উপনিষদের প্রকৃত স্বরূপ, বৈদিক ধর্মের প্রতিপাদ্য সত্যই যে পূর্ণ সত্য ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। শোপেনহাওয়ার প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক-গণ উপনিষদের বাণীকে 'জীবনের শান্তি ও মরণের সান্ত্বনা' রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে।

ইহাতে বিবিধ প্রমাণের আলোচনা প্রসঙ্গে চার্বাক হইতে অদ্বৈতবাদী পর্য্যন্ত সকলের মতবাদ উল্লিখিত হইয়াছে। বিশ্বসৃষ্টি নামক অধ্যায়ে উপনিষৎসম্মত সৃষ্টিরহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। চিরকুহেলিকাচ্ছন্ন এই বিশ্ব-সৃষ্টিরহস্য উপনিষদে কোন্ আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে তাহা লেখক সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। নাস্তিক্যবাদের খণ্ডন ও ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্তৃত্ব প্রমাণিত করিয়াছেন।

পঞ্চম অধ্যায়ে চৈতন্যের বিভিন্ন বিকাশ, ষষ্ঠ অধ্যায়ে মৃত্যুর পরপারে আত্মার অস্তিত্ব—তৎপরবর্ত্তী অধ্যায়ে ঈশ্বর ও আত্মার আলোচনায় শ্রীশঙ্করা-চার্য-মতেও আত্মার মুক্তির প্রাক্কাল পর্য্যন্ত বৈধকর্মের অনুষ্ঠান যে আবশ্যক তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। বর্ত্তমানকালে বেদান্তের নামে অনেক কল্পিত মতবাদ চলিতেছে, অনেক সময়ে তাহা অজ্ঞতাপ্রসূত। গতানুগতিকতা-বশতঃ অথবা আলস্যবশতঃ যাহা চলিতেছে তাহার প্রতিকার না হইলেও এই গ্রন্থপাঠে অজ্ঞতাপ্রসূত অনাচার নিবৃত্তি হইতে পারে।

মনুষ্যজীবন কি উদ্দেশ্যবিহীন? জীবনের লক্ষ্য কি—এই বিষয় লইয়া একটি অধ্যায় লিখিত হইয়াছে। অন্ন-বস্ত্র সমস্যার সমাধান রূপ আধুনিক সুখ-সাধনই কি মনুষ্যজীবনের চরম লক্ষ্য না—ঊর্দ্ধে আরও কিছু আছে? —এ সমস্ত বিষয়ই এই অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে।

সত্যের উপলব্ধি যদি উপনিষদের উপদেশ বিষয় হয়, তাহা হইলে তাহার উপায় কি? নবম অধ্যায়ে ইহার এবং দশম অধ্যায়ে মুক্তির আলোচনা বিশদ-ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে।

একাদশ অধ্যায়ে বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনের মতবাদগুলি সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়টি অনেক ছাত্রের পক্ষেও বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। যাঁহারা ভারতীয় দর্শনের স্থূল ও মূল কথাগুলি জানিতে চাহেন তাঁহাদের পক্ষে এই অধ্যায়টি বিশেষ উপকারে লাগিবে। শেষ অধ্যায়ে অন্যান্য ধর্মের সহিত তুলনায় বৈদিকধর্মের প্রতিপাদ্য সত্য যে পূর্ণাঙ্গ তাহা লেখক তাঁহার স্বচ্ছ, সবল ও পক্ষপাতরহিত দৃষ্টিতে প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে ভ্রমসংশোধন-তালিকায় অতিরিক্ত কয়েকটি মুদ্রাকর প্রমাদ পরিদৃষ্ট হইল। কতিপয় পরিচ্ছেদে দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা আরও একটু বিশদ হইলে ভাল হইত।

প্রায় সাত শত বৎসর রাজনৈতিক পরাধীনতার ফলে ভারতের বুদ্ধির পরাধীনতাও ঘটিয়াছিল। আজ স্বাধীনতার উষালোকে সেই পরাধীনতার মোহান্ধকার হইতে মুক্ত হইবার সময় আসিয়াছে। এই সময়ে গ্রন্থকারের এই গ্রন্থ রচনা পক্ষে বিশেষ প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই।

বেদান্তদর্শনের সহিত হিন্দুর জীবনযাত্রার সম্বন্ধ অতি নিবিড়, এখনও এই দর্শন হিন্দুর নিকট জীবন্ত, নিত্য উপাসনায়, তীর্থকৃত্যে, সংস্কারে, স্তবস্তুতিতে সর্বত্র বেদান্তদর্শন পরিস্ফুট। অন্য কোনও দেশের কোনও দর্শন এইভাবে জাতীয় জীবনের সহিত জড়িত নহে। এজন্য এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।*

---

* *The Teachings of Upanishads*—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্-এ। ৩২৬ পৃষ্ঠা। মূল্য দশ টাকা।

পুস্তক পরিচয়

কাল-কল্লোল—শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় সন্স লিমিটেড। ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৪॥০ গা।

বিংশ শতাব্দী রাষ্ট্র তথা সমাজের ক্ষেত্রে বিরাট একটা আলোড়নের। কথাটা আবার সারা পৃথিবীর পক্ষে যতটা সত্য, ভারতবর্ষ এবং তার আরও বিশেষ করে বাংলাদেশের পক্ষে যেন তার চেয়ে আরও বেশী সত্য। এই শতাব্দীর গোড়া থেকে এর আরম্ভ, কিন্তু দুটি মহাযুদ্ধের এই আলোড়ন যেন আরও সংক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর টা সাময়িক আশা জেগেছিল অনেকের মনে যে হয়তো এবার শান্তির সারা বিশ্বে একটা সঙ্গত এবং কায়েমী রাষ্ট্র-ব্যবস্থা হয়ে সমাজচেতনাও একটা কায়েমী রূপ পরিগ্রহ করে আশ্বস্ত হবে। কিন্তু দেখা গেল মহাযুদ্ধ আসলে দ্বিতীয় এক মহাযুদ্ধের ভূমিকা মাত্র। প্রথম মহাযুদ্ধ হ'ল দ্বিতীয় দশকের শেষভাগে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আরম্ভ চতুর্থ দশকের একেবারে শেষে; এই সমস্ত সময়টা পৃথিবী সুস্থির হয়ে থিতিয়ে জিরিয়ে গমকে কোথায় অন্ধ আবেগে একটা বিপুল উৎসের দিকেই এগিয়ে চলেছে।

বাংলা (বিশেষ করে বাংলার কথাই ধরা যাক) প্রথম মহাযুদ্ধে কতকটা নির্লিপ্ত ছিল; কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আসতেই তার বিস্তৃতি ও গতিবেগের সঙ্গে তার আবর্তে পড়ে গেল। এর মধ্যেই ১৯৪২, এর মধ্যেই মন্ত্রীমিশন প্রভৃতির ভাঁওতা, এর মধ্যেই কলিকাতা-নোয়াখালির হানাহানি, এর মধ্যেই স্বাধীনতা (?), যা অন্ততঃ বাংলার পক্ষে অভিশাপের রূপান্তর হয়ে দেখা দিলে, তারপর, এর মধ্যেই র‍্যাড্‌ক্লিফ রোয়েদাদ। বাংলার রাষ্ট্র এবং সমাজ-জীবন এমন একটা বিক্ষোভের মধ্যে পড়ে গেল, যার তুলনা তার সমস্ত ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

এই বাহ্যিক ঘটনা-প্রবাহের সঙ্গে আভ্যন্তরিক যে চিন্তাপ্রবাহ তারও একটা হিসাব রেখে যেতে হয়; কেননা চিন্তাই তো ঘটনা-সংঘাতের মূলে। মোটামুটি বলা যায় প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত পৃথিবীতে রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রধানতঃ

সাম্রাজ্যবাদেরই জয়জয়কার চলছিল; প্রথম মহাযুদ্ধ শেষের দিকে এই চিন্তাধারার উপর সাম্যবাদের প্রথম প্রচণ্ড আঘাত হানে এবং যুদ্ধের বিরতি, পরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আরম্ভ, প্রসার এবং বিরতির মধ্যে দিয়েও এই ভাবধারাটি দিন দিন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই যে চিন্তা-জগতের সংঘাত, অন্ততঃ ভারতে আর একটি মতবাদ এর মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে একটা সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টায় হ'ল প্রবৃত্ত। এতে ক্ষমায়, সত্যে, দাক্ষিণ্যে, আত্মবিলোপে কল্যাণকে আরও সহজ মূর্তিতে দেখবার প্রয়াস আছে। তবু শুধু তৃতীয় এক ধারা বলেই কর্ম এবং চিন্তাজগতে আলোড়নটা আরও জটিল হয়ে ওঠে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের এই ইতিহাসটুকু না জানলে, 'কাল-কল্লোল' বইখানি বোঝা যাবে না, কেননা এই ইতিহাসই হ'ল এর পটভূমি।

কাল-কল্লোল মূলতঃ একখানি রাজনীতিক উপন্যাসই। তবে রাজনীতি আর সমাজের মধ্যে, সমাজেও ব্যষ্টি আর সমষ্টির মধ্যে, কোথায় কোনটি শেষ হয়ে কোনটির আরম্ভ তা ঠিক দাগ কেটে হিসেব হয় না—এবং এই কথাটুকু লেখক বরাবর সামনে রেখে গেছেন বলে শুষ্ক সমস্যার পর্যায় থেকে বইখানি মানব-মানসের আলেখ্য হিসাবে সুন্দর ভাবেই সার্থক হয়ে উঠেছে। এর চরিত্রগুলি খুবই সজীব, সবল; কতকটা টাইপ চরিত্র হলেও বুদ্ধির দীপ্তিতে এবং হৃদয়ের দ্বন্দ্ব-আবেগে সবগুলিই বাস্তব মানুষ, মাত্র কতকগুলো 'Ism'এর যন্ত্রাংশ নয়। আমরা একসঙ্গে দেখতে পাচ্ছি মলয়-সুচিত্রাকে মণীশ-অণিমাকে, আর প্রশান্ত-শুভা-মালতীকে। এদের সবাই নূতন যুগের আলোয় প্রভাবিত, যদিও খানিকটা আলাদা আলাদা ভাবেই সে প্রভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠায় তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে গেছে—এক যদি মেয়ে-চরিত্রগুলির চিন্তাধারায় একটু বেশী মমতা এসে গিয়ে থাকতে পারে। সাময়িক রাজনীতির পরিবেশে মুখ্যতঃ এদের ক'জনের চিন্তা ও কর্মধারা গল্পের প্রবাহকে সামনে ঠেলে নিয়ে গেছে। এদের সবার জীবনেই মতবাদের সামঞ্জস্য তুল্যভাবে বজায় থাকে নি, অন্ততঃ যাকে মূল নায়ক বলা চলে—প্রশান্ত—তার জীবনে থাকে নি। কিন্তু চরিত্রের দৃঢ়তা আদর্শ হিসাবে যত বড়ই হোক, বাস্তব হিসাবে তো একমাত্র সত্য নয়, তাই দ্বিধায়-প্রশ্নে, ত্রুটিতে-স্খলনে প্রশান্ত সেদিক দিয়েও কম সার্থক হয়ে ওঠে নি।

লেখক একদা 'শাশ্বত পিপাসা', 'মায়াজাল' লিখে সাহিত্য-আসরে তার প্রতিষ্ঠা কায়েম করে নিয়েছিলেন—সরল, অনাড়ম্বর বাঙালী-পারিবারিক জীবনের নিখুঁত চিত্র দিয়ে। 'কাল-কল্লোল' তাঁর শক্তির আর একটা দিক এবং সম্পূর্ণ একটা অন্য ধরণের বিকাশ দেখলাম। এই অর্ধ শতাব্দীর সমস্ত যুগটিকে এমন নিপুণভাবে ধরে দিয়েছেন এবং এরই টানা-পোড়েনে তাঁর উপন্যাসের ঘটনাগুলি এমনভাবে টেনে নিয়ে গেছেন যে চমৎকৃত হতে হয়। আরও একটি কথা বোধ হয় স্বচ্ছন্দেই বলা চলে—সংলাপের সজীবতায় 'কাল-কল্লোল' তাঁর পূর্বের সব লেখাকেই ছাড়িয়ে গেছে।

প্লটের বাঁধুনিটা বোধ হয় জায়গায় জায়গায় আল্‌গা ঠেকবে অনেকের নিকট। আমাদের কিন্তু মনে হয়—লেখককে এটি জ্ঞাতসারেই করতে হয়েছে। একটানা একটা স্রোতের যুগ নয়, কত উজান-ভাঁটি-আবর্ত, এ যুগকে অবলম্বন করে যে কাহিনী হবে রচিত, তাকে একটু খণ্ডিত-দ্বিধাগ্রস্ত গতিতেই যে এগুতে হবে।

চিন্তাশীল পাঠকসমাজ বইখানিকে একটি সার্থক সৃষ্টি বলে অভিনন্দিত করে নেবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

শ্রীমদ্ভাগবত (সংক্ষিপ্ত আখ্যানভাগ)—শ্রীগুণদাচরণ সেন। প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য—৫৲।

মূল ভাগবত গ্রন্থ অতীব দুরূহ এবং বঙ্গদেশে তাহার বহু সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থ সাধারণের পাঠোপযোগী একটি উৎকৃষ্ট সারসঙ্কলন এবং যাহারা সংস্কৃতজ্ঞ নহেন বিশেষ করিয়া তাঁহাদের সমাদরের বস্তু। আমরা ইহা পাঠ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়াছি, কারণ ঠিক এ জাতীয় গ্রন্থ পূর্বে আমাদের দৃষ্টিতে পড়ে নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। গ্রন্থকার প্রকৃতই বর্তমান দেশকালের অবস্থা দেখিয়া একটি মহৎ কার্য্য সাধন করিয়াছেন এবং আমরা আশা করি তিনি ভাগবতের তত্ত্বাংশ ও স্তবাংশ এই ভাবে সঙ্কলন করিয়া পরিপূর্ণ সাফল্যের অধিকারী

হইবেন। অধুনা বাঙ্গলা গ্রন্থে উদ্ধৃত সংস্কৃত বচনাদি ভ্রম-প্রমাদবর্জিত হইতে প্রায় দেখা যায় না—অধিকাংশ স্থলেই ক্ষুব্ধারজনক ছাপার ভুল থাকে। বর্তমান গ্রন্থে কোনপ্রকার ভুল আমরা দেখি নাই—গ্রন্থকারের শুচিশুদ্ধ ভাবপূর্ণ ভাষায় স্বচ্ছতা কোথাও কুণ্ঠিত বা মলিন হয় নাই।

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

শকুন্তলা—শ্রীসতীন্দ্রনাথ লাহা। ৩৩বি, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য—আড়াই টাকা।

শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ লাহা এম-এ রচিত সচিত্র শকুন্তলা বইখানি দেখিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম। সতীন্দ্র বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, আবার তার সঙ্গে গুণী চিত্রকর। অমর কবি কালিদাসের অমর সৃষ্টি অভিজ্ঞান শকুন্তলাকে তিনি সুন্দর বাঙ্গলায় ছেলে-মেয়েদের উপযোগী করিয়া চমৎকার ভাবে ধরিয়া দিয়াছেন এবং নিজের আঁকা প্রায় কুড়িখানি মনোহর চিত্র দ্বারা বইখানির মূল্য আরও বাড়াইয়া দিয়াছেন। ছবি ও লেখা পরস্পরের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিয়াছে। এই শকুন্তলা চিত্রগুলি চিত্রকর হিসাবে শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করিবে। তাঁহার ভাষা সুন্দর, বলিবার ভঙ্গী সুন্দর এবং তদনুরূপ সুন্দর রেখায় ও বর্ণে কালিদাস-বর্ণিত নাটকের আখ্যানকে রূপ দিবার সার্থক চেষ্টা। এরূপ মণিকাঞ্চন সংযোগ দুর্লভ বস্তু। আশা করি, এই বইয়ের উপযুক্ত সমাদর হইবে।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথের জীবনকথা—ডাঃ শ্রীঅমূল্যরতন চক্রবর্ত্তী। ১২৩ নং লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-১৪। পৃষ্ঠা ১২১। মূল্য—৪৲।

১৮৮৪ সনের ২১ সেপ্টেম্বর ত্রিপুরা জেলার শ্রীকাইল গ্রামে এক দরিদ্র অথচ সম্ভ্রান্ত পরিবারে নরেন্দ্রনাথ দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই তিনি মাতৃহারা হন। পিতা ছিলেন দরিদ্র শিক্ষাব্রতী, সুদূর চট্টগ্রামে চাকুরি করিতেন। এই শোচনীয় অবস্থা সত্ত্বেও নরেন্দ্রনাথের শিক্ষার আগ্রহ কম ছিল না। নিতান্ত বাল্যকালেই তরকারি বিক্রয় করিয়া, এমন কি জমি নিড়াইয়া নরেন্দ্র নিজের পাঠের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় যখন মেডিক্যাল কলেজে পড়িতেন তখন খিদিরপুর ডকে নৈশ শ্রমিকের কাজ করিয়া পড়ার খরচ সংগ্রহ করিতেন। এই সকল কাহিনী গল্পের মত শুনাইলেও সত্য—গ্রন্থকার নরেন্দ্রনাথের নিজ মুখে শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পুস্তকখানি খুবই চিত্তাকর্ষক, কিন্তু দুঃখের বিষয় এইরূপ কৃতী বঙ্গ-সন্তানের পূর্ণাঙ্গ জীবনী এই পুস্তকে পাওয়া যায় না। ক্যাপ্টেন দত্ত আত্মপ্রচারবিমুখ ছিলেন এবং গ্রন্থকারের নিকট তিনি যে আত্মকাহিনী ব্যক্ত করেন, তাহাও তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রকাশ করিতে বলিয়াছিলেন। ক্যাপ্টেন দত্ত প্রকাশ্য ভাবে রাষ্ট্রনীতিতে যোগদান না করিলেও কংগ্রেসের একজন শক্তিমান সমর্থক ছিলেন—ইহা অনেকেরই জানা ছিল। তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি দ্বারা দেশের আর্থিক উন্নয়ন। জীবনে অতি সামান্য অবস্থা হইতে তিনি সবিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। যখনই যাহার নিকট হইতে তিনি সামান্যতম সাহায্য পাইয়াছেন তাহা সমস্ত জীবন কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ রাখিয়াছেন এবং প্রতিদান দিতে বিস্মৃত হন নাই। তিনি নিজ গ্রামবাসিগণের জন্য 'বাণীপীঠ'—শ্রীকাইল কলেজ ও কে, কে, উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গ পাকিস্থানরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরও গ্রামবাসিগণের সহিত তাঁহার যোগসূত্র ছিন্ন হয় নাই। তিনি দেশবিভাগের শোচনীয় পরিণতিতে খুবই বেদনা অনুভব করিয়া-

ছিলেন। বঙ্গল ইমিউনিটি নামক প্রতিষ্ঠানটি প্রধানতঃ তাঁহারই কর্ম্মতৎপরতায় বর্ত্তমান অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। ইহা ব্যতীত ওয়েষ্ট বেঙ্গল ল্যাণ্ড ডেভেলপ্মেণ্ট কোম্পানী লিঃ, র‍্যাডিক্যাল ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ, ইণ্ডিয়ান রিসার্চ্চ-ইনষ্টিটিউট লিঃ, ভারতী প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং কোম্পানী লিঃ, এন্, এণ্টন এণ্ড কোং লিঃ, নবশক্তি নিউজ পেপার্স কোং লিঃ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান তাঁহার অদম্য কর্ম্মশক্তির পরিচায়ক। দেশের বহু লোক এই সকল প্রতিষ্ঠানে কাজ করিয়া জীবিকা অর্জ্জনের সুযোগ পাইতেছে। নরেন্দ্রনাথ অকৃতদার ছিলেন। ১৯৪৯ সনের ৬ই এপ্রিল এই কর্ম্মবীর পরলোকগমন করেন। বাংলার যুবকসম্প্রদায় এই কৃতী বাঙালীর জীবনকথা পাঠ করিলে কর্ম্মে অনুপ্রেরণা লাভ করিবে।

পশ্চিমবঙ্গের অর্থকথা—শ্রীবিমলেন্দু ঘোষ। বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়, গ্রাম কুলগাছিয়া, পোঃ মহিষরেখা, জেলা হাওড়া। পৃষ্ঠা ৯৩। মূল্য ৪৲ টাকা।

বঙ্গদেশকে অর্থনৈতিক দিক দিয়া ভাগ করা চলে না। কিন্তু ঐতিহাসিক কারণে আজ বঙ্গদেশ দ্বিধাবিভক্ত। ইহা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের অর্থকথা বলিবার ও জানিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। বঙ্গদেশ কিঞ্চিদধিক পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে বিভক্ত হইলেও এ পর্য্যন্ত কেবল পশ্চিমবঙ্গের সম্পর্কে এরূপ অর্থনৈতিক ভূগোল দুই-একখানি মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাও তথ্যাদির দিক দিয়া খুবই অসম্পূর্ণ। বর্তমান গ্রন্থেও লেখক এই ত্রুটির কথা স্বীকার করিয়াছেন যদিও ইহাতে বহুল পরিমাণে নূতন তথ্যাদি দেওয়া হইয়াছে। যে গতিতে দেশ অগ্রসর হইতেছে এবং নূতন নূতন তথ্যাদি যেভাবে সংগৃহীত হইতেছে তাহাতে যে-কোন তথ্যসঙ্কলন অল্প দিনেই পুরাতন হইয়া পড়ে। যাহা হউক, পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক আর্থিক পরিচয় হিসাবে এই সুলিখিত গ্রন্থখানি বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। অবিভক্ত বঙ্গের অর্থনৈতিক রূপ হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা শহর-গ্রাম, মৃত্তিকা-বৃষ্টিপাত, নদী-জলসম্পদ, কৃষিসম্পদ, পাটশস্য, আঁশ ও ইক্ষুজাতীয় পদার্থ, তৈলবীজ, প্রাণিসম্পদ, মৎস্য, অরণ্য, খনিজ সম্পদ, নানারূপ বৃহৎ শিল্প ও কুটীরশিল্প, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, দামোদর-ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা ও জলসেচ এবং প্রদেশের আয়-ব্যয় প্রভৃতি বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে পুস্তকখানি পূর্ণ। পুস্তকের প্রারম্ভে পাঁচখানি মানচিত্র থাকায় আলোচ্য বিষয়গুলি বুঝিতে পাঠকের খুবই সুবিধা হইবে।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

মনোবৈজ্ঞানিক—শ্রীসত্যেন সিংহ। দাশগুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ৫৪।৩ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য—১।৷০।

লেখকের প্রথম রচনা, কিন্তু নাটকখানি ঘটনাবিন্যাসের পারিপাট্যে উপভোগ্য। মনোবিজ্ঞানবিদ্ ডাক্তার সুবিমল রায়চৌধুরীর কক্ষে প্রথম দৃশ্যের অবতারণা। তখন হইতেই নাটকখানি কৌতূহলোদ্দীপক হইয়া উঠিয়াছে। অস্বাভাবিকত্বের পর্য্যায়ে লইয়া না গিয়া ঘটনাবলীকে শেষ পর্য্যন্ত চিত্তাকর্ষক করিয়া তোলা নূতন লেখকের পক্ষে কৃতিত্বের কথা।

তদবধি—শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য। মায়া গ্রন্থাগার, কদমকুঁয়া, পাটনা। মূল্য—১৲।

প্রেমস্মৃতিকরুণ একচল্লিশটি শোক-কবিতা। ক্ষুদ্রকায় চতুর্দশপদী কবিতাগুলি প্রগাঢ় অনুভূতির মনোরম প্রকাশ।

"রবীন্দ্রের 'স্মরণে'র প্রথম কবিতা
পড়ায়ে শুনাতেছিনু—সেদিনের কথা।

* * *

"আমি যবে থাকিব না, লিখো দয়া করে'
এমনি কবিতা তুমি।" তখন কি জানি
এত সত্য হবে তব শ্রীমুখের বাণী?'

অসীমের অন্বেষণ—কবিরাজ শ্রীঅভয়পদ রায়। আয়ুর্বেদীয় ধন্বন্তরিভবন; ১৯৭ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—১।০।

যোগসাধনা-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। শরীর এবং মনের সম্বন্ধ বুঝাইয়া লেখক অধ্যাত্ম-উপলব্ধির পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন।

কি করা যাবে?—ডাঃ শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়। চুঁচুড়া। মূল্য—২।৷০।

লেখক গল্পের ভঙ্গীতে সময়, বৃত্তি, উদ্দেশ্য এবং উৎসাহ সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার মূল বক্তব্য, ঐকান্তিকভাবে চেষ্টা করিলে মানুষ নিশ্চয়ই জীবনে সাফল্য অর্জন করিতে পারে।

তটিনীর তটে—শ্রীকানাইলাল গোস্বামী। চয়নিকা, ১৪০এ, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা। মূল্য—১।৷০।

গম্ভীর ও হালকা কয়েকটি পদ্যের সমষ্টি। চেষ্টা করিলে রচয়িতা কবিতাও লিখিতে পারিতেন, দুই-এক স্থানে তাহার আভাস পাইলাম।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শতশ্লোকী গীতা—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। ৩ শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট, কলিকাতা-২০ হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য—দেড় টাকা।

ইহাতে গীতার সাত শত শ্লোকের মধ্যে উৎকৃষ্ট এক শত শ্লোক বাছিয়া লইয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যাঁহাদের সমগ্র গীতা পড়িবার সুবিধা হয় না গ্রন্থখানিকে তাঁহাদের উপযোগী করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহাতে শ্লোকের মূল, প্রত্যেক শব্দের অর্থ, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে।
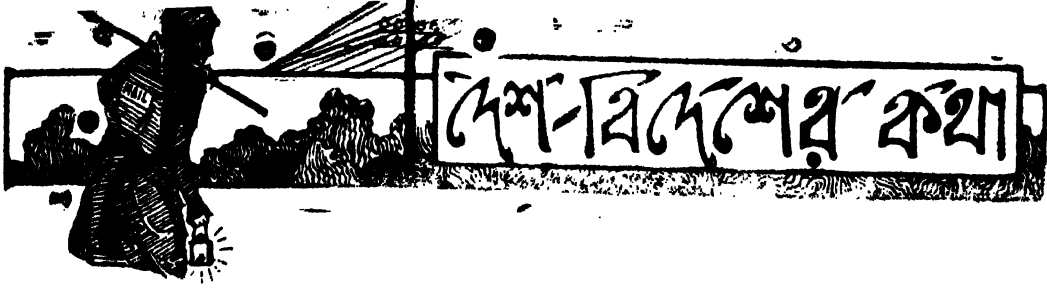
ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

সাধারণ সমিতির বার্ষিক অধিবেশন

গত ১২ই এপ্রিল ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বালিগঞ্জস্থ প্রধান কার্য্যালয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সমিতির বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সঙ্ঘ-সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দজী মহারাজ এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। উহাতে ১৩৫৮ সালের কার্য্য-বিবরণী আলোচিত হয় এবং ১৩৫৭ সালের আয়ব্যয়ের একটি পরীক্ষিত হিসাব উপস্থাপিত করা হয়। আলোচ্য বর্ষে সঙ্ঘের উদ্যোগে নানাবিধ পুণ্যকৃত্য এবং জনকল্যাণমূলক কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়। যথা :—(১) ধর্ম্মপ্রচার—৬টি প্রচারক-বাহিনী বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ, বোম্বাই, গুজরাট ও বরোদা রাজ্যে ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে নিয়োজিত ছিল। তা ছাড়া অনেকগুলি বিরাট মহোৎসব ও সম্মেলন, ধর্ম্মসভা ইত্যাদিও অনুষ্ঠিত হয় এবং দক্ষিণ আমেরিকায়ও একটি সাংস্কৃতিক মিশন প্রেরণ করা হয়।

(২) তীর্থসংস্কার—গয়া, কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, পুরী, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থস্থানে, সঙ্ঘের তীর্থকেন্দ্রগুলির যাত্রিনিবাস সমূহে এই বৎসর ২৮,৮৪১ জন যাত্রীকে আশ্রয়দান, ৮,৫৬৭ জনকে আহার্য্য প্রদান ২৬২ জনকে পাথেয় সাহায্য করা হয় এবং ৪৩,১৫১ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়।

(৩) শিক্ষা-বিস্তার :—আলোচ্য বর্ষে সঙ্ঘের চেষ্টায় বাংলা, বিহার, উড়িষ্যায় ২৮টি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হয়। সঙ্ঘ ভারতের বাহিরেও শিক্ষাপ্রচার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে হিন্দী ভাষাকে বিদ্যালয়সমূহে অবশ্যপাঠ্য রূপে প্রবর্ত্তনের জন্য চেষ্টা করা হয় এবং সেখানেও দুইটি হিন্দী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়

(৪) জনসেবা :—আলোচ্য বর্ষে সঙ্ঘ কলিকাতায় প্রধান কার্য্যালয়, শিয়ালদহ ষ্টেশন ও ডায়মণ্ডহারবারে কর্ম্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া ২০ হাজার দুঃস্থ উদ্বাস্তুকে খাদ্য বস্ত্র অর্থ ঔষধপথ্যাদি সাহায্য প্রদান করিয়াছে। ডায়মণ্ডহারবারে উদ্বাস্তুদের জন্য
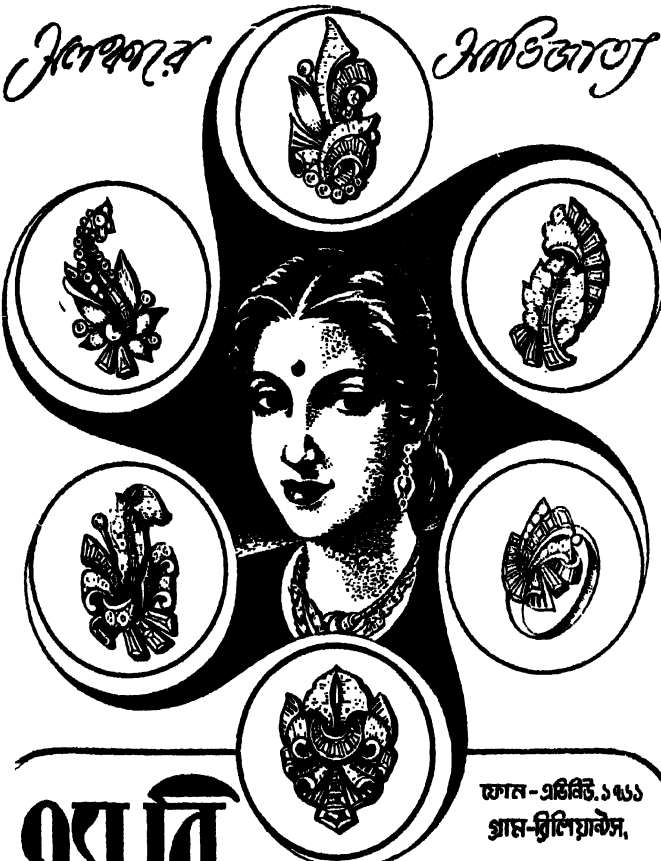
একটি শিল্প-শিক্ষা-শিবির পরিচালিত হয় এবং একটি বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়। ১০টি দুগ্ধ-বিতরণী-কেন্দ্র খুলিয়া প্রত্যহ ৩,৭০৭জনকে দুগ্ধ বিতরণ করা হয়। ১৩টি দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে ৬৩,২৫০জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়। এতদ্ব্যতীত, গয়াধামে পিতৃপক্ষ মেলা, কাশীধামে অন্নকূট মেলা, সাগরসঙ্গমে গঙ্গাসাগর মেলা, কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণ মেলা, এবং পুরীধামে রথযাত্রা মেলায় সেবাকার্য্য পরিচালিত হয়।

(৫) সমাজসংস্কার :—আলোচ্য বর্ষে ১৭৮টি গ্রাম-সংগঠন-কেন্দ্র হইতে অস্পৃশ্যতা-দূরীকরণ, আদিবাসী-সংগঠন এবং অনগ্রসর হিন্দু সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য জনসভার আয়োজন হয়। রক্ষীদল শিক্ষাকেন্দ্র, দাতব্য চিকিৎসালয়, ব্যায়ামাগার, গ্রন্থাগার, নূতন গ্রাম-সংগঠন কেন্দ্র, ধর্ম্মগোলা ইত্যাদি স্থাপিত হয়।

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ

গত ২৮শে চৈত্র হইতে ৩০শে চৈত্র এই তিন দিন কলিকাতা কলেজ স্কোয়ারস্থ মহাবোধি সোসাইটি হলে আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের একবিংশতিতম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। বর্ষীয়ান সাংবাদিক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি কবিরাজ শ্রীবগলাকুমার মজুমদার একটি সুচিন্তিত এবং সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। এই অনুষ্ঠানের প্রথম দিবসের অধিবেশনে কবিরাজ শ্রীবিমলানন্দ তর্কতীর্থ, দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশনে কবিরাজ শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এবং তৃতীয় দিবসের অধিবেশনে কবিরাজ শ্রীরাখালদাস সেনশর্ম্মা সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে এবার নানা প্রবন্ধ ও আলোচনা সম্বলিত যে পরিষদ-বার্ষিকী প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। দেশে আয়ুর্ব্বেদ বিষয়ক জ্ঞানবিস্তারের জন্য এই প্রতিষ্ঠানের উৎসাহ এবং উদ্যম প্রশংসনীয়।

নাকড়া কোন্দা উচ্চ বিদ্যালয় সুবর্ণজয়ন্তী

নাকড়া কোন্দা উচ্চ বিদ্যালয়ের (বীরভূম) প্রতিষ্ঠাকাল ১৯০৮ সালে। এই বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পর ৫০ বৎসর অতিবাহিত হওয়ায় গত ৪ঠা এপ্রিল উক্ত বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে ইহার সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। চারিটি তোরণের পর বৃহৎ সভামণ্ডপটি বিভিন্ন প্রকারের সুদৃশ্য প্রাচীর-পত্রের দ্বারা

সুশোভিত করা হয়। এ অঞ্চলে এইরূপ অনুষ্ঠান এই প্রথম হওয়াতে জনসাধারণের মধ্যে বেশ সাড়া পড়িয়া যায়। সভাস্থলে প্রায় ছয় হাজার লোকের সমাগম হয়। সাধারণ সভার অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ভারতীয় কয়লাখনির মালিক সঙ্ঘের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ও বীরভূম জেলা বোর্ডের বর্ত্তমান চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়।

প্রাতে সাতটায় বিদ্যালয়-গৃহে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত গীত হয়। সমাগত মহিলাগণ শুভ শঙ্খধ্বনি দ্বারা উৎসবের উদ্বোধন করেন। এই বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠাতা দানবীর পরলোকগত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পূর্ণাবয়ব তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন ও মাল্য দান করেন পণ্ডিত শিবরামশঙ্কর গোস্বামী মহাশয়। সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করিলে স্কুলের রিপোর্ট পাঠ করা হয়। অতঃপর প্রাক্তন ছাত্র শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সরকার, কথাসাহিত্যিক শ্রীকালীপদ ঘটক ও শিক্ষাব্রতী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠাতার জীবনী, এবং এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ইঁহাদের বক্তৃতার পর প্রধান শিক্ষক সুসাহিত্যিক শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতীয় ভাবধারার পুনঃপ্রবর্ত্তনের জন্য শিক্ষাবিভাগের ও অভিভাবকদের পূর্ণ সহযোগিতার আহ্বান জানাইয়া হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন। পরিশেষে সভাপতি মহাশয় শিক্ষার রূপ, শিক্ষকের স্থান, বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার গলদ এবং প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত যোগাযোগ সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত ভাষণে কতকগুলি কার্য্যকরী পন্থার নির্দ্দেশ প্রদান করেন।

অপরাহ্নে আর একটি সভায় সভাপতিরূপে আচার্য্য শ্রীক্ষিতি-মোহন সেনশাস্ত্রী মহাশয় বর্ত্তমান শিক্ষাধারার সহিত প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার আদর্শের সংঘাত ও ফলাফল সম্বন্ধে সুচিন্তিত ভাষণ প্রদান করেন। তিনি ছাত্রদিগকে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনায় উদ্বুদ্ধ হইতে অনুরোধ করেন। বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠাতার মহানুভবতা ও বদান্যতার কথা উল্লেখ করিয়া পাশাপাশি অবস্থিত সেবায়তন, শিক্ষায়তনের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক শাস্ত্রী মহাশয় বলেন এই দুইটি সেবা-প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই সেই মহাপ্রাণ জীবিত রহিয়াছেন—প্রতিষ্ঠাতা হরিশ্চন্দ্রের পৃথক ভাবে আলোকচিত্র স্থাপনের আর সার্থকতা কোথায়?

প্রাক্তন ছাত্রদের সম্মেলনে সভাপতি বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সাম্প্রতিক চীনভ্রমণের অভিজ্ঞতায় ভারতীয় শিক্ষা ও সমাজ-ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করেন। শ্রীকালীপদ ঘটক মহাশয়কে সভাপতি করিয়া প্রাক্তন ছাত্রদের পুনর্মিলন সমিতি গঠন করিবার জন্য এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সন্ধ্যায় জলযোগের পর বিদ্যালয়-গৃহটি বিচিত্র আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয় ও জনৈক প্রাক্তন ছাত্রের স্বহস্তনির্ম্মিত আতস-বাজীর খেলা দেখিয়া সকলে প্রীত হন। রাত্রে বর্ত্তমান ছাত্রদের "সিরাজদ্দৌলা" ও পরদিন রাত্রে প্রাক্তন ছাত্রদের "কর্ণার্জ্জুন" নাটকের অভিনয় বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল।

হিরণ্ময়ী মিত্র

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শারীর-সংস্থানবিদ্ (Anatomist) খ্যাতনামা চিকিৎসক ও অস্ত্রোপচারবিশারদ এবং পারদর্শী পশু-চিকিৎসক পরলোকগত পশুপতি মিত্র মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী হিরণ্ময়ী মিত্র গত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ ৭৩ বৎসর বয়সে কলিকাতায় তাঁহার একডালিয়া রোডস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন।

উদারচেতা ও ধর্ম্মপরায়ণা হিরণ্ময়ী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এষ্টেটের দেওয়ানজী স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার দে বিশ্বাসের কনিষ্ঠা কন্যা ছিলেন। প্রসন্নবাবুর সহিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্যর আশুতোষের পিতা ডাঃ গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও জষ্টিস স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভগবান-চন্দ্র বসু (স্যর জগদীশচন্দ্র বসুর পিতা), ঢাকার নবাব খাজা আবদুল গণি প্রভৃতির সহিত শিক্ষা-বিস্তার ও জনকল্যাণকর কার্য্যে সংশ্লিষ্ট ঢাকা আবগারী কমিশনার অফিসের ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয় হিরণ্ময়ীর দাদামহাশয়

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
প্রতিষ্ঠিত

প্রবা

।গ, ১৩৬০

মীরা সো

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

বন্দিনী

শ্রীতিলক বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম : ১৯০১

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মৃত্যু : ২৩শে জুন ১৯৫৩

[শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদারের সৌজন্যে]

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৩শ ভাগ
১ম খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩৬০

৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

কলিকাতায় অরাজক

বিগত ষোল দিন যাবৎ কলিকাতায় ট্রামের দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া এক পয়সা বৃদ্ধির দরুণ এক আন্দোলন চলিতেছে। ইহাতে এই মহানগরীর কয়েক বৃহৎ অংশে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে এখানকার অবস্থা ক্রমেই আশঙ্কাজনক হইয়া দাঁড়াইতেছে। লিখিবার সময় (২রশে আষাঢ়) কলিকাতায় ট্রাম সবই বন্ধ, ষ্টেট বাস অদৃশ্য ও দোকান-পাট এবং কাজ-কারবারও প্রায় অচল।

বলা বাহুল্য, এইরূপ অবস্থায় কলিকাতার ভয়ত্রস্ত জনসাধারণ অতি অসহায় অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। অন্য দিকে এই নগরের অধিবাসীদিগের মধ্যে এক অংশ ক্রমেই উচ্ছৃঙ্খলতাতে মাৎস্যন্যায় প্রবর্তনের চেষ্টায় অগ্রসর হইতেছে যাহার ফলে অবস্থার অবনতি অনেক দূর গড়াইয়াছে। অথচ এইরূপ অধোগতির পরিণাম কি হইবে সে বিষয়ে চিন্তা অতি অল্প লোকেই করিতেছেন।

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনও কিছু বলা চলে না, কেননা চতুর্দিকেই অনিশ্চয়তার ছায়া এখনও রহিয়াছে। যাহা ঘটিয়াছে তাহাতে সাধারণ নাগরিকের বিভ্রান্ত জড়ভরত তুল্য অবস্থা, দায়িত্বজ্ঞানশূন্য লোকের স্বৈরাচার, কংগ্রেসের ক্লীবত্ব ও শাসনতন্ত্র-চালকদিগের অক্ষমতা এ সকলই অতি পরিস্ফুট হইয়া গিয়াছে।

আজ সমস্ত দেশের সাধারণ লোকের জীবিকানির্ব্বাহ দুর্ব্বহ হইয়া পড়িয়াছে। এ অবস্থায় সমস্ত কারণ বিশদভাবে জ্ঞাপন না করিয়া জীবিকার সহিত নিগূঢ়ভাবে যুক্ত কোন কিছুতে মূল্যবৃদ্ধির অনুমতি দেওয়ার অর্থ ই ধূমায়িত অসন্তোষে আহুতি প্রদান এবং সেই সঙ্গে স্বৈরাচারের সুযোগ প্রদান। পশ্চিমবঙ্গের অধিকারীবর্গের ইহা শুধু দারুণ অবিবেচনা নহে, ইহা তাঁহাদের অযোগ্যতারও নিদর্শন। অযোগ্যতা এই কারণে যে, যাঁহারা সাধারণের প্রতিনিধি সাজিয়া শাসনতন্ত্রে অধিকার গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য সাধারণের সহিত যোগরক্ষা ও সম্প্রীতি রক্ষা। যেখানে সেই যোগের অভাবের পরিচয় তাঁহারা দিয়াছেন সেখানেই তাঁহাদের যোগ্যতার অভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। "ভোটে জিতিয়াছি অতএব যথেচ্ছাচার করিব" এরূপ মনোভাব একনায়কত্বের দেশে চলে, জনমতে প্রতিষ্ঠিত সাধারণ গণতন্ত্রে উহা অচল।

কিন্তু তবুও বলিব এই ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধি উপলক্ষ মাত্র। সাধারণের জীবন দুর্ব্বহ হইবার বহু কারণ রহিয়াছে, এবং সে সকল কারণ ট্রামভাড়া অপেক্ষা পরিমাণেও অধিক এবং জীবিকার সহিত ঘনিষ্ঠতর ভাবে যুক্ত। জীবন ধারণের প্রধান সমস্যা অন্নবস্ত্রের। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই দুইয়েরই দাম বাড়িয়াছে—বিশেষতঃ বস্ত্রের। অথচ ইহা লইয়া কোনও আন্দোলন হয় নাই, দৈনিক সংবাদ-পত্রেও ধারাবাহিক ভাবে বিষোদ্গার হয় নাই, যেমন এখন কয়েকটিতে চলিতেছে। যাহারা বর্ত্তমান "গণ-আন্দোলনের" উদ্গাতা তাঁহারাও একথা এত দিনে বুঝিয়াছেন, কেননা পনর দিন আন্দোলন চালাইয়া তাঁহারা সবেমাত্র কলাই "খুড়ি" বলিয়া অন্ন-বস্ত্রের প্রশ্ন এই আন্দোলনে যুক্ত করিয়াছেন।

এক দিকে জীবিকানিস্কাশনের কঠোর পরীক্ষা এবং সেই সঙ্গে যুক্ত বাঙালী জীবনের ব্যর্থতা ও বেকার অবস্থা, অন্য দিকে অতৃপ্ত ক্ষমতা-লালসা এই আগুন জ্বালিয়াছে। আমরা কিছুদিন যাবৎ ভাবোচ্ছ্বাসে ভাসিয়া চলায় এতই অভ্যস্ত হইয়াছি যে, ইহার পরিণতি কোথায় তাহা ভাবিবারও চেষ্টা করিতে পারিতেছি না। মানুষের শরীর ও মন রোগাক্রান্ত হইলে ক্রমাগত উত্তেজকের আকাঙ্ক্ষা জন্মায়। আমাদের জাতীয় জীবন ও মনের অবস্থা ক্রমে ঐদিকে চলিয়াছে। কবীর মহাসত্যই বলিয়াছিলেন:

"সাঁচে কোই ন পতীজই, ঝুঠে জগ পতিয়ায়,
গলী গলী গোরস ফিরৈ, মদিরা বৈঠি বিকায়।"

তাই আজ অপ্রিয় সত্যের কোনও সমাদর নাই, আছে মদিরার চাহিদা—সংবাদপত্রে ও "নেতার" বচনে। নেতার বচনে ও সংবাদ-পত্রের কলমে উত্তেজকের পরিবেশনে অপরিণত মস্তিষ্কের বিকৃতি অবশ্যম্ভাবী এবং উহাতে দেশে মাৎস্যন্যায়ের প্রবর্তন হইবেই জানিয়াও কি "সারকুলেশন" দেবতার সম্মুখে সবকিছু আহুতি দিতে হইবে? কাজ-কারবার বন্ধ হইলে সংবাদপত্রই-বা কিনিবে কে?

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বাংলার আজ ঘোর দুর্দিন। এই দুর্দিন আরও তীব্র বেদনাদায়ক হইয়াছে বাংলায় কৃতী সন্তানের অভাবে। যে দেশের সন্তান এক দিন সমগ্র ভারতে বাংলার মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, যাঁহাদের বুদ্ধিমত্তা, কার্যকুশলতা ও কর্তব্যজ্ঞান এক দিন দেশব্যাপী খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল, সে দেশ আজ যেন হীনতার দোষে অভিশপ্ত।

এই অভাব আরও নিদারুণ হইল শ্যামাপ্রসাদের দেহাবসানে। নির্ভীক, শক্তিমান ও কর্তব্যনিষ্ঠ দেশসেবকরূপে তাঁহার পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন নাই। তবুও আজ আমরা স্মরণ করি যেভাবে দুঃসময়ে শত বিপদ-আপদকে তুচ্ছ করিয়া বাংলার এই খ্যাতিমান সন্তান দেশের ও দশের সেবায় অগ্রসর হইয়াছিলেন।

মনে পড়ে ১৯৪২ সনের পূর্ববঙ্গের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা। সে সময়ে কি ভাবে শ্যামাপ্রসাদ শত বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া পূর্ববঙ্গের হিন্দুর মান-ইজ্জৎ ও ধনপ্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মনে পড়ে পঞ্চাশের মন্বন্তরের কথা। ব্রিটিশ রাজের নিষেধ অবহেলায় ঠেলিয়া কিরূপ বলিষ্ঠ ভাবে তিনি মুক্তকণ্ঠে সরকারের ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা জগৎকে জানাইয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা আনয়ন করান। মনে পড়ে ১৯৪৫ সনের আই. এন. এ. দিবসের সরকারী চণ্ডনীতির তাণ্ডবে কি ভাবে তিনি অগ্রসর হইয়াছিলেন তাঁহার প্রিয় ছাত্রদলের রক্ষায়। মনে পড়ে ১৯৪৬ সনের নোয়াখালীর পৈশাচিক ঘটনাবলীর মধ্যে কিরূপে শ্যামাপ্রসাদ অগ্রসর হইয়াছিলেন আর্তের সাহায্যার্থে। দুঃস্থের কল্যাণ ও আর্তের ত্রাণে কতশত কথা মনে পড়ে সেই সঙ্গে। দুঃখ দারিদ্র্য অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বাংলার তথা ভারতমাতার এই উজ্জ্বলরত্ন নির্মল-চরিত্র কৃতী সন্তানের নিকট আবেদন করিয়া প্রত্যাখ্যাত কেহ কি কখনও হইয়াছিল? বাঙালী অ-বাঙালীর প্রভেদ তাঁহার কাছে ছিল না সে কথা তো তিনি প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন তাঁহার শেষ বলিদানে।

তাঁহার সকল মতবাদ ছিল বলিষ্ঠ এবং সকল বিষয়ে তাঁহার চিন্তাধারার স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট ছিল। কিন্তু আচার ব্যবহারে তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য এতই পরিব্যাপ্ত ছিল যে, মতবাদে বিরোধ হইলেও তাহাতে দ্বেষ বা হিংসার চিহ্ন থাকিত না।

এইরূপ দেশপ্রিয় সুসন্তানের শোচনীয় অবস্থায় মৃত্যুতে দেশে শোকোচ্ছ্বাস ও ক্ষোভের স্রোত বহিবে আশ্চর্য কি? কিন্তু এই শোকোচ্ছ্বাস ও ক্ষোভ যে পথে প্রবাহিত হইলে শ্যামাপ্রসাদের চরম আহুতি তাঁহার ঈপ্সিত ফলদায়ক হইত তাহা হইবার কোনও লক্ষণ এখনও দেখা যাইতেছে না। উহার কারণ খুঁজিলে বর্তমানে বাঙালী-জীবনের ব্যর্থতার সকল দিক দেখিতে হয়।

কিভাবে এইরূপ একটি মহামূল্যবান জীবন অকালে নষ্ট হইল তাহার বিচার অত্যাবশ্যক, নতুবা এই দরিদ্র জাতিকে আরও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেই হইবে। আশ্চর্য এই মাত্র যে, আমরা এতই ক্ষীণতেজ যে দুই দিন প্রবল উচ্ছ্বাস দেখাইয়া তাহার পরই সকল কথা ভুলিয়া অন্য উন্মাদনার খোঁজে [illegible]তে থাকি। শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুতে কর্তৃপক্ষের কর্তব্যবিচ্যুতির কথা তাঁহার শোকাতুরা মাতার পত্রের অক্ষরে অক্ষরে রহিয়াছে।

যোগমায়া দেবী ও নেহরু পত্রাবলী

শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা মুখার্জী,

জেনেভা হইতে কায়রো যাত্রার প্রাক্কালে আপনার পুত্র ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া আমি গভীর দুঃখানুভব করি। সংবাদ পাইয়া আমি মর্মাহত হইয়াছি। যদিও রাজনীতিতে আমাদের মধ্যে মতভেদ ছিল, তথাপি আমি তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতাম, আমার সঙ্গে তাঁহার যথেষ্ট বন্ধুত্ব ছিল। আপনি তাঁহার মাতা, এ আঘাত আপনার পক্ষে নিদারুণ হইবে সন্দেহ নাই। আপনার দুঃখ লাঘব করিতে পারি এরূপ কোন কথা বলিবার শক্তি আমার নাই।

আপনার শোকে সহানুভূতি জানাইবার জন্য আমি কায়রো হইতে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নিকট তার করি। ডঃ শ্যামাপ্রসাদবাবুর মৃত্যু কারাগারের মধ্যে ঘটিয়াছে উহা আমার নিকট গভীর দুঃখের বিষয়। প্রায় পাঁচ সপ্তাহ পূর্বে আমি যখন কাশ্মীর যাই, তাঁহাকে কিরূপ অবস্থায় রাখা হইয়াছে এবং তাঁহার স্বাস্থ্য কিরূপ আছে এ সম্পর্কে তখন আমি অনুসন্ধান করি। আমি জানিতে পারি যে, তাঁহাকে কারাগারে রাখা হয় নাই। শ্রীনগরে বিখ্যাত ডালহ্রদের তীরবর্তী এক বেসরকারী বাংলোতে তাঁহাকে রাখা হইয়াছে। আমি আরও জানিতে পারি যে, কাশ্মীর গবর্ণমেণ্ট তাঁহার যথাসম্ভব সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করিতেছেন। ঐ সময়ে উহা জানিতে পারিয়া আমি সন্তুষ্ট হই। প্রকৃতপক্ষে আমার মনে হয়, কাশ্মীরের স্বাস্থ্যপ্রদ আবহাওয়ায় ডঃ মুখোপাধ্যায়ের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে।

কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাহা হয় নাই। এজন্য দুঃখ ও আঘাত অধিকতরভাবে অনুভব করিতেছি। আমার মনে হয়, ঘটনার উপর মানুষের কোন হাত নাই, যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহা আমাদের সকলকেই মানিয়া লইতে হয়।

আপনি আমার শ্রদ্ধেয়া; আপনি আমার দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ের সশ্রদ্ধ নিবেদন গ্রহণ করুন। যদি আমার দ্বারা আপনার কোন-প্রকার কাজ হইতে পারে, উহা জানাইতে দ্বিধা করিবেন না।

৩০শে জুন, নয়াদিল্লী। ভবদীয়

জওহরলাল নেহরু

প্রিয় নেহরু, ৪ঠা জুলাই।

২রা জুলাই ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নিকট হইতে আপনার ৩০শে জুনের পত্র পাইয়াছি। আপনার শোকপ্রকাশ এবং সহানুভূতির জন্য ধন্যবাদ।

আমার প্রিয়পুত্রের মৃত্যুতে আজ সমগ্র জাতি শোকপ্রকাশ করিতেছে। আমার পুত্র শহীদের মৃত্যু বরণ করিয়াছে। আমি তাহার মাতা, এজন্য এ দুঃখ আমার পক্ষে আরও গভীরতর। কোন সান্ত্বনা পাইবার জন্য আপনার নিকট এ পত্র লিখিতেছি না। আমি আপনার নিকট ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষার দাবি করিতেছি। বিনা বিচারে বন্দীরূপে আমার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে। আপনার পত্রে

আপনি জানাইয়াছেন যে, কাশ্মীর গবর্ন্মেণ্ট তাঁহাদের যথাকর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। আপনি যে সংবাদ পাইয়াছেন উহা হইতেই আপনার এ ধারণা হইয়া থাকিবে। কিন্তু যাঁহাদের আচরণ বিচার্য বিষয়, তাঁহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত এ সংবাদের মূল্য কি? আপনি বলিয়াছেন, আমার পুত্রের বন্দীদশায় আপনি কাশ্মীর গিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত আপনার হৃদ্যতার কথাও আপনি জানাইয়াছেন; কিন্তু কেন আপনি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার স্বাস্থ্যের অবস্থা এবং বন্দীদশায় কিরূপ অবস্থায় কালযাপন করিতেছে দেখিয়া আসেন নাই?

তাহার মৃত্যু রহস্যাবৃত! তাহার বন্দীদশায় কাশ্মীর গবর্ন্মেণ্টের নিকট হইতে আমি প্রথম সংবাদ পাইলাম যে, আমার পুত্র আর ইহজগতে নাই এবং তাহাও আমার পুত্রের মৃত্যুর অন্ততঃ দুই ঘণ্টা পরে। ইহা খুব অদ্ভুত ও বিস্ময়ের বিষয় নয় কি? কিরূপ নিষ্ঠুর প্রহেলিকাময় ভাষায় সংবাদটি প্রেরণ করা হইয়াছিল? হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার পরে ঐ সংবাদ জানাইয়া আমার পুত্র যে তার করে তাহাও তাহার মৃত্যুসংবাদ পৌঁছিবার পরে আমি পাই। বন্দী অবস্থার প্রথম হইতে আমার পুত্রের স্বাস্থ্য ভাল ছিল না এ সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। একাধিকবার সে পীড়িত হইয়াছে এবং ঐ পীড়া কয়েক দিন ধরিয়া চলিয়াছে। কাশ্মীর গবর্ন্মেণ্ট অথবা আপনার গবর্ন্মেণ্ট এ সম্পর্কে আমাকে এবং আমার পরিবারকে কোন কিছু জানান নাই কেন? এমন কি, তাহাকে যখন হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়, সে সংবাদও তাঁহারা আমাদের অথবা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে জানানো প্রয়োজন মনে করেন নাই। কাশ্মীর গবর্ন্মেণ্ট আমার পুত্রের স্বাস্থ্যের প্রকৃত অবস্থা জানিবার কোন চেষ্টা করেন নাই এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সেবা ও জরুরী চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন নাই। এমন কি, আমার পুত্র বার বার পীড়িত হওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা সতর্ক হন নাই। ইহার ফলেই এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। সুস্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে যে, আমার পুত্র যে ক্রমান্বয়ে নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে ইহা ২২শে জুন সকালেই সে বুঝিতে পারিয়াছিল। তাহার নিজের মুখের কথাই ইহার প্রমাণ, কিন্তু গবর্ন্মেণ্ট এ বিষয়ে কি করিয়াছেন? চিকিৎসার অন্যায়ভাবে বিলম্ব, বিবেচনাহীনভাবে হাসপাতালে স্থানান্তরিতকরণ, দুই জন সহবন্দীকে হাসপাতালে যাইতে দিতে অসম্মতি—এ সমস্তই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হৃদয়হীনতার পরিচায়ক। শ্যামাপ্রসাদ ভাল আছে এ সম্পর্কে তাহার নিজের পত্রের একটা-দুইটা বিচ্ছিন্ন কথা দ্বারা গবর্ন্মেণ্ট ও চিকিৎসকদের দায়িত্ব স্খালন করা যায় না।

পত্রের এই সকল কথার মূল্য কি? কেহ কি মনে করেন যে, তাহার মত ব্যক্তি আত্মীয়স্বজন হইতে বহু দূরে বন্দীদশায় পত্রের মারফত অভিযোগ করিবে অথবা পীড়ার আনুপূর্বিক বিবরণ জানাইবে? এ সম্পর্কে গবর্ন্মেণ্টের দায়িত্ব অপরিসীম এবং গুরুতর। তাঁহাদের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ এই যে, তাঁহারা তাঁহাদের অবশ্য কর্তব্য উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং উহা পালন করেন নাই। বন্দীদশায় শ্যামাপ্রসাদের সুখ সুবিধার কথা আপনি উল্লেখ করিয়াছেন। এ সম্পর্কে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। কাশ্মীর গবর্ন্মেণ্ট অবাধে পারিবারিক পত্র বিনিময় করিতে দেন নাই। কয়েকটি পত্র অর্পণে অন্যায়ভাবে বিলম্ব হইয়াছে এবং কয়েকখানি পত্র রহস্যজনকভাবে উধাও হইয়াছে। পারিবারিক সংবাদ, বিশেষভাবে পীড়িতা কন্যা ও আমার জন্য তাহার উদ্বেগ বেদনাদায়ক হইয়াছে। তাহার ১৫ই জুনের পত্র আমরা ২৭শে জুন পাইয়াছি, ইহা শুনিয়া আপনি বিস্মিত হইবেন কি? ২৪শে জুন অর্থাৎ মৃতদেহ পাঠাইবার এক দিন পরে একটি প্যাকেটে করিয়া কাশ্মীর গবর্ন্মেণ্ট ঐ পত্রগুলি প্রেরণ করেন। আমি এবং এখানকার আরও অনেকে যে পত্র লিখিয়াছিলাম উহাও ঐ প্যাকেটে ছিল। ১১ই জুন ও ১৬ই জুন ঐ সকল পত্র শ্রীনগরে পৌঁছিয়াছিল, কিন্তু ঐ পত্র তাহাকে দেওয়া হয় নাই। ইহার দ্বারা মানসিক দিক হইতে তাহার উপর উৎপীড়ন করা হইয়াছে।

আমার পুত্র বহুবার ভ্রমণ করিবার সুবিধা চাহিয়াছে। কিন্তু তাহাকে এই সুবিধা দেওয়া হয় নাই। ইহা শারীরিক উৎপীড়ন নয় কি? আপনি বলিয়াছেন যে তাহাকে কারাগারে না রাখিয়া "বিখ্যাত ডালহ্রদের তীরে বেসরকারী বাংলোতে রাখা হইয়াছিল," ইহাতে আমি বিস্ময় ও লজ্জা অনুভব করিতেছি। স্বল্পপরিসর প্রাঙ্গনসহ একটি ক্ষুদ্র বাংলোতে দিবারাত্র সশস্ত্র প্রহরীবেষ্টিত অবস্থায় অবস্থান করিতে হইয়াছে। স্বর্ণপিঞ্জরবদ্ধ বন্দী সুখে থাকে ইহাই আপনার বলিবার অভিপ্রায় কি? এই প্রচারকার্যে আমি দুঃখানুভব করিতেছি। তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা কি হইয়াছিল আমি জানি না। আমি শুনিয়াছি, এ সম্পর্কে সরকারী রিপোর্ট পরস্পর-বিরোধী। বিশিষ্ট চিকিৎসকগণ এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এ ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষকে অন্যায়ভাবে শৈথিল্য প্রদর্শন করা হইয়াছে ইহা নিঃসন্দেহ। এ সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্ত প্রয়োজন।

আমার প্রিয়পুত্রের মৃত্যুতে আমি শোকপ্রকাশ করিতেছি না। স্বাধীন ভারতের নির্ভীক সন্তান বিনা বিচারে বন্দীদশায় শোচনীয় এবং রহস্যজনক মৃত্যু বরণ করিয়াছে। এ সম্পর্কে অবিলম্বে নিরপেক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ কর্তৃক প্রকাশ্য তদন্ত হউক, মাতার পক্ষ হইতে ইহাই দাবী। যে চলিয়া গিয়াছে, কিছুতেই তাহাকে আর ফিরাইয়া আনিতে পারা যাইবে না, আমি জানি। কিন্তু স্বাধীন দেশে কি অবস্থায় এই শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিল এবং আপনার গবর্ন্মেণ্ট এ সম্পর্কে কি করিয়াছে, দেশবাসী তাহা বিবেচনা করুন ইহাই আমি চাই।

যদি কেহ কোথাও অন্যায় করিয়া থাকে, সে যত বড় ব্যক্তিই হউক না কেন, তাহার বিচার হউক এবং স্বাধীন দেশে আর কোন মাতা যেন এরূপ শোচনীয় দুর্ঘটনায় অশ্রুপাত না করে।

আপনি আমার জন্য কোন কাজ করিতে পারেন কি না, জানিতে চাহিয়াছেন এবং দ্বিধাহীনচিত্তে উহা জানাইতে বলিয়া

ছেন। আমার ও দেশমাতার পক্ষ হইতে আমার এই দাবী জানাইলাম। সত্য প্রকাশে ভগবান আপনাকে শক্তি দিন।

পত্র শেষ করিবার পূর্ব্বে একটি বিশেষ বিষয় আপনাকে জানাইতে চাই। শ্যামাপ্রসাদের ব্যক্তিগত দিনলিপি ও তাহার পাণ্ডুলিপিসমূহ কাশ্মীর গবর্মেণ্ট প্রত্যর্পণ করেন নাই। এ সম্পর্কে বক্সী গোলাম মহম্মদ ও আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের মধ্যে যে পত্র বিনিময় হইয়াছে তাহা এই সঙ্গে দেওয়া হইল। দিনলিপি ও পাণ্ডুলিপিগুলি যদি কাশ্মীর গবর্মেণ্টের নিকট হইতে উদ্ধার করিয়া দিতে পারেন তবে বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকিব। উহা নিশ্চয়ই তাঁহাদের নিকট আছে।

আশীর্ব্বাদিকা
শোকাতুরা যোগমায়া দেবী

শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা মুখার্জ্জী, নয়াদিল্লী, ৫ই জুলাই।

আপনার ৪ঠা জুলাই-এর পত্রের জন্য ধন্যবাদ। আমি এইমাত্র উহা পাইয়াছি।

প্রিয়পুত্রের মৃত্যুতে আপনার দুঃখ ও মানসিক ক্লেশ আমি বুঝিতে পারি। আপনি যে আঘাত পাইয়াছেন, আমার কোন কথাই উহা লাঘব করিতে পারিবে না।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদের বন্দীদশা ও মৃত্যুর বিষয় যথাসম্ভব জানিবার পূর্ব্বে আমি আপনার নিকট পত্র লিখি নাই। ইহার পর আমি আরও অনুসন্ধান করিয়াছি। এরূপ সব ব্যক্তির নিকট হইতে সন্ধান লইয়াছি যাঁহারা এ সম্পর্কে জানেন। আমি আপনাকে জানাইতে চাই, আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি যে, এ সম্পর্কে কোন কিছু রহস্যজনক নাই। ডঃ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি যত্নের কোন ত্রুটি হয় নাই।

কাশ্মীরের পত্র বিমানযোগে পাঠানো হয় এবং বিমানের যাতায়াত অনিয়মিত। আবহাওয়ার জন্য কোন সময়ে হয়ত এক সপ্তাহ যাবৎ বিমান যাত্রা করে না। আজ প্রায় এক সপ্তাহ হইল কাশ্মীরে বিমান যায় নাই। আমি নিজে যে সমস্ত সরকারী পত্র লিখিয়াছি তাহাও যাইতে বিলম্ব ঘটিতেছে।

আমি প্রায় দশ বৎসর জেলে কাটাইয়াছি। বন্দীর মনোভাব কি এবং কি অবস্থার মধ্যে তাহাকে থাকিতে হয় তাহার কতকটা আমি জানি।

যে দিন আকস্মিকভাবে ডঃ শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু হয়, কাশ্মীর গবর্মেণ্টের প্রধানমন্ত্রী টেলিফোনযোগে উহা বিচারপতি মুখোপাধ্যায়কে জানাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি সুযোগ পান নাই। ইহা ভিন্ন তিনি সরাসরি কথা বলিতে পারেন নাই। সংবাদটি অপারেটরের মারফত গিয়াছে, ফলে উহা বিকৃত হইয়াছে।

ডঃ মুখোপাধ্যায়ের দিনলিপি ও অন্যান্য কাগজপত্র সম্পর্কে বক্সী গোলাম মহম্মদকে জানাইলাম। যদি কোন কাগজপত্র থাকে তবে তিনি নিশ্চয়ই উহা পাঠাইয়া দিবেন। ভবদীয়

জবাহরলাল নেহরু।

প্রীতিভাজনেষু, ৯ই জুলাই।

আপনার ৫ই জুলাই লিখিত পত্র ৭ই তারিখে আমার হস্তগত হইয়াছে।

সমগ্র ব্যাপারের ইহা একটি বেদনাদায়ক ভাষ্য। রহস্য উন্মোচনে সহায়তা করিবার পরিবর্ত্তে আপনার মনোভাব ইহাকে গভীরতর করিয়াছে। আমি প্রকাশ্য তদন্তেরই দাবি জানাইয়াছিলাম। আমি আপনাকে আপনার সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট সিদ্ধান্ত জ্ঞাপনের জন্য অনুরোধ করি নাই। সমগ্র ব্যাপারে আপনার মনোভাব এক্ষণে সুবিদিত। ভারতের জনসাধারণ এবং গর্ভধারিণীরূপে আমাকে ইহার যাথার্থ্য সম্পর্কে নিঃসন্দেহ করিতে হইবে। অনেকের মনে বদ্ধমূল সংশয় বিদ্যমান। এক্ষণে প্রকাশ, নিরপেক্ষ ও আশু তদন্ত প্রয়োজন।

আমার পত্রে বিভিন্ন বিষয় উত্থাপিত হইয়াছে; উহাদের উত্তর দেওয়া হয় নাই। আমি আপনাকে সুস্পষ্ট ভাবে বলিয়াছি যে, কয়েকটি প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রমাণের উপযোগী সাক্ষ্য-প্রমাণ আমার নিকট আছে। আপনি তাহা জানিতে অথবা বিচার করিতে আদৌ ইচ্ছুক নহেন। আপনার বক্তব্য এই যে, কোন কোন ঘটনা জানার সুযোগ হইয়াছে, এমন সব ব্যক্তির নিকট আপনি তথ্যানুসন্ধান করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার এই, তাঁহার পরিবারের লোকজন হিসাবে আমাদিগকে পর্য্যন্ত সমগ্র বিষয়ে আলোকপাত করিবার উপযুক্ত বলিয়া গণ্য করা হইতেছে না। ইহা সত্ত্বেও আপনি আপনার সিদ্ধান্তকে অকপট বলিয়া অভিহিত করেন।

কাশ্মীরে বিমানযোগে ডাক প্রেরণ ব্যবস্থায় গোলযোগের উল্লেখ করায় ইতরবিশেষ কিছু হইতেছে না। ইহাতে চিঠিপত্র নিখোঁজ হওয়ার এবং বহু ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক বিলম্বের হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আপনি যদি আমার পত্র যত্নের সহিত অনুধাবন করিবার কষ্ট স্বীকার করিতেন তাহা হইলে আপনি এজাতীয় সহজ অজুহাত দিতে ইতস্ততঃ করিতেন বলিয়া আমি মনে করি। চিঠিপত্রের খামের উপরে যে সব ডাকচিহ্ন রহিয়াছে, তদ্দ্বারা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আপনার প্রদত্ত তথ্য অমূলক বলিয়া প্রতিপাদিত হয়।

আপনার কারাজীবনের অভিজ্ঞতা সকলেই জ্ঞাত আছে। এক সময়ে উহা আমাদের জাতীয় গর্ব্বের বস্তু ছিল; কিন্তু আপনি বিদেশী রাজত্বে কারাবাস করিয়াছিলেন; পক্ষান্তরে আমার পুত্র জাতীয় সরকারের অধীনে বিনা বিচারে আটক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিয়াছে। ইংরেজ রাজত্বে যদি কারাগারে এ ধরণের শোকাবহ ও রহস্যাবৃত ব্যাপার ঘটিত, তাহা হইলে অবস্থা কিরূপ হইত?

আপনাকে আর অধিক লেখা নিষ্ফল। আপনি প্রকৃত তথ্যের সম্মুখীন হইতে ভীত। আমার পুত্রের মৃত্যুর জন্য আমি কাশ্মীর সরকারকে দায়ী সাব্যস্ত করিতেছি। এ ব্যাপারে আপনার গবর্মেণ্টের যোগসাজস ছিল বলিয়া আমি দোষারোপ করিতেছি। বেপরোয়া প্রতারণার জন্য আপনি আপনার সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিতে পারেন। কিন্তু সত্য প্রকাশ হইবেই। এক দিন ইহার জন্য ভারতবাসী ও ভগবানের নিকট জবাবদিহি করিতে হইবে।

আমাদের মধ্যে যে পত্রালাপ হইয়াছে তাহা আমি প্রকাশ

করিতেছি। ভারতবাসীই প্রধান মন্ত্রীর ব্যর্থতার বিচার করিয়া যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করুক। ভবদীয়া শোকাতুরা
যোগমায়া দেবী

পৃথিবীর স্বর্ণ উৎপাদন

১৯৫১ সনে স্বর্ণ উৎপাদনে কিছু মন্দা পড়িয়াছিল, কিন্তু ১৯৫২ সনে স্বর্ণ উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া ২.৬৪ কোটি আউন্স দাঁড়াইয়াছে। নিম্নে স্বর্ণ উৎপাদনের হিসাব দেওয়া হইল :

(হাজার আউন্স হিসাবে)

	১৯৪৬	১৯৫১	১৯৫২	১৯৫১ সনের তুলনায় ১৯৫২ সনে উৎপাদন বৃদ্ধির শতকরা
দক্ষিণ আফ্রিকা—	১১,৯২৭	১১,৫১৬	১১,৮০০	+২.৫
কানাডা—	২,৮২৮	৪,৩৯২	৪,৪৭০	+১.৩
সোভিয়েট রাশিয়া—	২,০০০	২,০০০	২,০০০	—
আমেরিকার যুক্তরাজ্য—	১,৪ ২	১,৮৪৫	১,৯৩৮	+২.৩
অষ্ট্রেলিয়া—	৮২৪	৮৯৬	৯৭৮	+৯.২
দক্ষিণ রোডেশিয়া—	৫৪৫	৪৮৭	৪৯৭	+২.১
ভারতবর্ষ—	১৩২	২২৬	২৪৩	+৭.৫
পৃথিবীর মোট উৎপাদন	২৬,৫৩৯	২৬,০১৮	২৬,৪০০	+১.৫
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ	১৭,১৯৩	১৮,৬৮৪	১৯,১০০	+২.৭
" " শতকরা ভাগ	৭৩.০	৭১.৫	৭২.৩	+১.১
দ. আফ্রিকার " "	৫০.১	৪৪.৩	৪৪.৭	+০.৯

গত বৎসর পৃথিবীর খোলা বাজারে মোট ১.২ কোটি আউন্স খাটি সোনা বিক্রী হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১ কোটি আউন্স নূতন সোনা। দক্ষিণ আফ্রিকা ও কানাডা ব্যতীত কমনওয়েলথের অন্যান্য দেশ এবং উপনিবেশগুলি যাহারা স্বর্ণ উৎপাদন করে, গিনি সোনা বিক্রয় করিবার বাধ্যতা হইতে রেহাই পাইয়াছে এবং খাটি সোনার বার এখন বিক্রী করিতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকা ব্যতীত আফ্রিকার অন্যান্য স্বর্ণ উৎপাদককারী দেশগুলি নিজেদের উৎপাদনের কেবলমাত্র শতকরা ৪০ ভাগ সোনা পৃথিবীর খোলা বাজারে বিক্রয় করিতে পারিত; বর্তমানে তাহারা নিজেদের সকল উৎপন্ন সোনা বাজারে বিক্রয় করিবার অনুমতি পাইয়াছে। কানাডার গবর্ণমেণ্ট স্বর্ণ উৎপাদনের অতিরিক্ত খরচের জন্য ওদেশের স্বর্ণখনিগুলিকে অনুদান দিয়া সাহায্য করেন এবং এই অনুদানের হার বৃদ্ধি করায় কানাডার সোনার দাম একটু বেশী, তাই খোলা বাজারে ইহার চাহিদা অপেক্ষাকৃত অল্প। ওখানকার স্বর্ণ উৎপাদনকারীরা সরকারী বিভাগ দ্বারা সোনা বিক্রয় করে। যদি দক্ষিণ আফ্রিকা তাহার উৎপন্ন সোনার সবটাই বাজারে বিক্রয় করিতে রাজী হয় তাহা হইলে পৃথিবীর মুক্ত বাজারে সোনার দাম যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাইবে—এই ভয়েই সে এই বিষয়ে রাজী হয় না।

বিলাতে ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের সোনার ক্রয়ের হার হইতেছে—এক আউন্স খাটি সোনার বারের জন্য ২৪৮ শিলিং এবং প্রতি গিনির জন্য ৫৮ শিং। অল্প পরিমাণে রপ্তানীর জন্য নির্দ্ধারিত সোনা ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড ২৫২ শিলিং প্রতি আউন্সের জন্য লয়। গত বৎসর হইতে এই ব্যাঙ্ক লণ্ডনের কতকগুলি ফার্ম্মকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছে যাহারা কমনওয়েলথ ও উপনিবেশে উৎপন্ন সোনা ষ্টার্লিং অঞ্চলের বাহিরে ডলারের বিপক্ষে বিক্রয় করিবে।

দূর প্রাচ্যের বাজারে দুইটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছে। প্রথমটি হইতেছে, ১৯৫২ সনের ৩০শে অক্টোবর থাইল্যাণ্ডের গবর্ণমেণ্ট একটি সমিতি গঠন করিয়াছেন এবং সমিতি বিদেশ হইতে সোনা আমদানী করিয়া দেশে স্বাধীন ভাবে বিক্রয় করিবে। দ্বিতীয়টি হইতেছে, চীনের কাণ্টন সোনার বাজার মাও-সেতুং গবর্ণমেণ্ট বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। গত কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও চীনের সাদা বাজারে সোনা আউন্স প্রতি ৫০ ডলারে বিক্রয় হইয়াছে। কিন্তু কাণ্টন বাজার ছিল ফাটকাবাজারের আস্তানা, তাই ফাটকা বন্ধ করিবার জন্য ঐ বাজারটি একেবারেই বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বোম্বাইয়ের বুলিয়ন এসোসিয়েশনও এমনি একটি "গ্যাংষ্টারের আড্ডা" যাহারা সোনার ফাটকা বাজারে কোটি কোটি টাকা লাভ করিতেছে এবং ভারতের বাজারে সোনার দর পৃথিবীর বাজারের সোনার দর হইতে অত্যধিক হারে ফাটকার দ্বারা রক্ষা করিতেছে। ইহাদের বিলোপসাধন করাও অনতিবিলম্ব প্রয়োজন।

গত বৎসর মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ইউরোপের খোলা বাজারে সোনার দাম ছিল প্রতি আউন্স ৩৯ ডলার। তাহার পরে বোম্বাইয়ের বাজারে হঠাৎ মন্দা পড়ায় সোনার দর নামিয়া আসে ৩৬·২৫ ডলারে। মে মাসের প্রথম দিক সোনার দাম ছিল ৩৭ ডলার আউন্স প্রতি, কিন্তু শেষের দিকে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের সোনা ক্রয়ের দরুন সোনার দাম কিছু বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়ায় ৩৭·৫০ ডলারে। ইহার পর সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য সোনার দাম নামিয়া আসে ৩৬·৭৫ ডলারে গত নবেম্বর মাসে। ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে পিনে গবর্ণমেণ্টের পতনের পর ফরাসী সরকার আবার সোনা কিনিতে আরম্ভ করায় সোনার দাম ৩৭·৫০ ডলারে দাঁড়ায়।

এই দামে অবশ্য সোনা ভারতের বাজারে পাওয়া যায় না। বোম্বাই বুলিয়ান এসোসিয়েশনের ফাটকাবাজির কল্যাণে এবং গবর্ণমেণ্টের সক্রিয় সহযোগিতায় এখানে এক ভরি সোনার যাহা দাম পৃথিবীর নিয়ন্ত্রিত বাজারে সেই দামে প্রায় আড়াই ভরি সোনা পাওয়া যায়। তাই ভারতবর্ষকে বলা হয় যে, সোনার গুপ্ত আমদানীর স্বর্গরাজ্য।

রৌপ্য পরিস্থিতি

গত বৎসর ইউরোপ ও আমেরিকার রৌপ্য উৎপাদন ১৯৫১ সনের তুলনায় শতকরা তিন হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫২ সনে মোট ১৪·১ কোটি আউন্স রৌপ্য উৎপন্ন হইয়াছিল এবং ১৯৫১ সনে ছিল ১৩·৬৯ কোটি আউন্স। নিম্নে রৌপ্য উৎপাদনের তালিকা দেওয়া হইল :

(কোটি আউন্সে)

	১৯৫০	১৯৫১	১৯৫২	১৯৫২ সনে ১৯৫১ সনের উপর বৃদ্ধি বা হ্রাসের হার
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	৪·২১	৪·০০	৪·০৫	+১·৩
মেক্সিকো	৪·৯১	৪·৩৮	৪·৫০	+২·৭
কানাডা	২·৩২	২·৪২	২·৫০	+৩·৩
পেরু	১·৩৪	১·৪৯	১·৭০	+১৪·১
বলিভিয়া	০·৬৬	০·৭২	০·৬০	−১৬·৭
অন্যান্য দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার দেশসমূহ	০·৬৯	০·৬৮	০·৭০	+১০·৩
পশ্চিম-জগতের মোট	১৪·১৩	১৪·৬৯	১৫·১০	+৩·০
অস্ট্রেলিয়া	১·০৫	১·০৫	১·১০	+৪·৪
জাপান	—	০·১০	০·[illegible]	+[illegible]
পশ্চিম-জগতের বাহিরে মোট	১·১৫	১·২১	১·২৫	—
পৃথিবীর মোট উৎপাদন (আংশিক)	১৬·৭৩	১৬·৬২	১৭·২০	+৩·১

এখানে বলা প্রয়োজন যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যে রৌপ্য উৎপাদন হয় তাহা বাজারে ছাড়া হয় না, কারণ আমেরিকার গবর্মেণ্ট তাহা নিয়ন্ত্রিত মূল্যে ক্রয় করিয়া লন। ১৯৫২ সনের ৩০শে নভেম্বর মার্কিন গবর্মেণ্টের মোট মজুত রৌপ্য ও রৌপ্য মুদ্রার পরিমাণ ছিল ২০৩,০৬ কোটি আউন্স এবং ১৯৫১ সনের ডিসেম্বর মাসে ছিল [illegible] কোটি আউন্স।

লেণ্ড-লীজ রৌপ্য (Lend-Lease Silver): মার্কিন গবর্মেণ্ট বিভিন্ন বিদেশী গবর্মেণ্টকে প্রায় ৪১.০৭ কোটি আউন্স রৌপ্য লেণ্ড-লীজ অনুসারে ধার দিয়াছেন—ইহার মধ্যে ভারত ও পাকিস্তানের অংশ হইতেছে ২২.৮০ কোটি আউন্স। জাপানী সন্ধি-চুক্তি ১৯৫২ সনের এপ্রিল মাসে অনুমোদিত হয় এবং সেই সময় হইতে পাঁচ বৎসরের মধ্যে এই ঋণের রৌপ্য আমেরিকা সরকারকে ফেরত দিতে হইবে। নিম্ন তালিকায় কোন্ কোন্ দেশ কি পরিমাণে লেণ্ড লীজ রৌপ্য ধার লইয়াছে তাহা দেওয়া হইল :

	কোটি আউন্স
ভারত ও পাকিস্তান	২২,৮০
ব্রিটেন	৮.৮১
নেদারল্যাণ্ডস	৫.৬৭
আরব	২.২৩
অষ্ট্রেলিয়া	১.১৮
ইথিওপিয়া	০.৫৪
ফিজি দ্বীপপুঞ্জ	০.০২

ভারতবর্ষ তাহার দেয় রৌপ্য ফেরত দিতে স্বীকৃত হইয়াছে। ১৯৪৬ সনের মে মাসে ভারত-সরকার রৌপ্যমুদ্রাকে মুদ্রাবহির্ভূত করিয়া দিয়াছেন, অর্থাৎ এগুলি আইনতঃ আর এদেশের মুদ্রা নয়। এই রৌপ্যমুদ্রা গলাইয়া প্রায় ৩০ কোটি আউন্স রৌপ্য পাওয়া যাইবে এবং তদ্দ্বারা আমেরিকার ঋণ পরিশোধ দেওয়া হইবে। ব্রিটেনও রৌপ্যকে মুদ্রাবহির্ভূত করিয়া দিয়াছে।

গত বৎসরের মে মাস পর্যন্ত আমেরিকায় এক আউন্স রৌপ্যের মূল্য ছিল ৮৮ সেণ্ট (=প্রায় ৪৵০), তাহার পর মূল্য হ্রাস পাইয়া ৮২¾ সেণ্টে দাঁড়ায়। বৎসরের শেষের দিকে মূল্য ৮৩¼ সেণ্টে বৃদ্ধি পায়। ব্রিটেনে গত বৎসর প্রতি আউন্স রৌপ্যের মূল্য ছিল ৭২¾ পেন্স। মুদ্রার জন্য আমেরিকার ৫.৭৩ কোটি আউন্স রৌপ্য প্রয়োজন হয় এবং অন্যান্য দেশের প্রয়োজন হইতেছে ৪.৬৮ কোটি আউন্স।

লৌহ ও ইস্পাতশিল্পের বর্ত্তমান পরিস্থিতি

ভারতবর্ষে তিনটি প্রধান লৌহ ও ইস্পাত কারখানা আছে, যথা, টাটা, ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী এবং মহীশূর লৌহ কারখানা। এইগুলি সংযুক্ত কারখানা—কাঁচা লোহা, ইস্পাত ও ইস্পাত দ্রব্য প্রস্তুত করে। এই তিনটির মধ্যে টাটার কারখানাই সবচেয়ে বড় ও মহীশূরের কারখানা সবচেয়ে ছোট। ইহাদের মোট নিয়োজিত মূলধন হইতেছে ৬১ কোটি টাকা এবং প্রায় ৬০ হাজার শ্রমিক কাজ করে। বৎসরে ইহারা ১৮,৭৮,০০০ কাঁচা লোহা ও ১০,৫০,০০০ ইস্পাত তৈয়ার করিতে পারে। কাঁচা লোহা ও ইস্পাতের উৎপাদন ক্রমবর্দ্ধমান।

১৯৪১ সনে কাঁচা লোহার উৎপাদন হইয়াছিল ২০ লক্ষ টন এবং ১৯৪২ সনে ১১·৩০ লক্ষ টন ইস্পাত তৈয়ার হইয়াছিল। তার পর নূতন যন্ত্রপাতির অভাবে উৎপাদন হ্রাস পায়। ১৯৪৮ সন হইতে ইস্পাতের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে, যদিও কাঁচা লোহার উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। নিম্নে কাঁচা লোহা ও ইস্পাতের উৎপাদন হার দেওয়া গেল :

	কাঁচা লোহা : টন	ইস্পাত : টন
১৯৪৮	৩২৬,০৯৮	৮৫৫,৮১৫
১৯৪৯	৪২৭,৫৭৫	৯২৬,৮৯১
১৯৫০	২৩০,৪৫৭	৯৭৮,১০০
১৯৫১	২৮৭,২০৩	১০,৫০,১১১
১৯৫২	৩১৯,৮০৮	১০,৭৫,৮৮২

ভারতবর্ষে উচ্চশ্রেণীর লোহার খনি যথেষ্ট পরিমাণে আছে। এদেশে খনির লোহায় গড়পড়তা শতকরা ৬০ হইতে ৬৯ ভাগ লোহা থাকে—ইউরোপের গড়পড়তা শতকরা ৪০ ভাগ এবং আমেরিকায় শতকরা ৫০ করিয়া খনির লোহায় লোহা থাকে। কিন্তু আমাদের মেটালারজিক্যাল কয়লা যাহা ইস্পাত তৈয়ারীর জন্য অতিশয় প্রয়োজনীয়, অত্যল্প আছে—মোট ১,৫০০ হইতে ২,০০০ মিলিয়ন টন।

ভারতবর্ষকে বিদেশ হইতে স্পেলটার কিংবা জিঙ্ক, টিন টাংষ্টেন, নিকেল ক্রোমিয়াম এবং ক্রোমস্পার আমদানী করিতে হয়। মধ্য-প্রদেশে সম্প্রতি ক্রোমস্পারের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু কাজ এখনও আরম্ভ হয় নাই। মোটের উপর ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের অবস্থা অতি আশাপ্রদ এবং ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

ইস্পাত শিল্প ভারতবর্ষ এখনও স্বাবলম্বী হয় নাই, বিদেশ হইতে ইস্পাত দ্রব্য আমদানী করিতে হয়। ভারতবর্ষ ১৯৪৯ সনে ৩,৯৮,০০০, ১৯৫০ সনে ২,৮৪,০০০, ১৯৫১ সালে ১,৭৮,০০০ এবং ১৯৫২ সনে ১,৮৫,১২০ টন ইস্পাত দ্রব্য আমদানী করিয়াছে। ১৯৪৬ সনে আয়রণ এবং ষ্টীল প্যানেল অনুমান করেন যে, ২০ লক্ষ টন ইস্পাত ভারতের পক্ষে বৎসরে প্রয়োজন। ইহাদের হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :

		০০০ টন
যুদ্ধ-পূর্ব্ব গড়পড়তা প্রয়োজন	...	১,০০০
যুদ্ধ পরবর্ত্তী কৃষির প্রয়োজন—		
(ক) কৃষিকার্য্যের যন্ত্রপাতি	...	২৫০
(খ) গঠনকার্য্যের জন্য	...	২০৫
রেলপথের প্রয়োজন	...	৩০০
জল-বিদ্যুৎ পরিকল্পনা	...	৬০
পথঘাট	...	১০
প্রাদেশিক প্রয়োজন	...	২০০
	মোট	২,০২৫

১৯৪৭ সালে উপদেষ্টা পরিকল্পনা বোর্ড অভিমত প্রকাশ করেন যে, এই প্রয়োজনের হিসাব অতিরিক্তভাবে ধরা হইয়াছে। তাঁহাদের মতে বৎসরে ১৫ লক্ষ টন ইস্পাতদ্রব্য ভারতের প্রয়োজন। কিন্তু অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজন অনুসারে ইস্পাতের চাহিদা ক্রমশঃ বাড়তির দিকে যাইবে। ১৯৫০ সনে এশিয়া এবং দূর-প্রাচ্যের অর্থ নৈতিক কমিশন হিসাব করেন যে, ১৯৫৪ সন নাগাদ ভারতের বাৎসরিক ইস্পাতের খরচ ২৯ লক্ষ টনে দাঁড়াইবে।

যুদ্ধ-পূর্ব্বকালে রেলপথ ও ইমারত তৈয়ারীর জন্য মোট ইস্পাত খরচের শতকরা ৬৫ ভাগ হইত। ইহাদের প্রয়োজন বর্ত্তমানেও অধিক, তাহা ছাড়াও নদী-উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ, কৃষি-উন্নয়ন, ইঞ্জিন তৈয়ারী, মোটরগাড়ী তৈয়ারী, জাহাজ নির্ম্মাণ, যন্ত্রপাতির কারখানা, কাপড়ের কল প্রভৃতির জন্য অধিকতর পরিমাণে ইস্পাতের প্রয়োজন। ১৯৫২ সনে ২৩ লক্ষ টন ইস্পাতের প্রয়োজন ছিল এবং ১৯৫৭ সনে ভারতের চাহিদা অত্যধিক হইবে বলিয়া পরিকল্পনা কমিশনের অভিমত।

ভারতে ইস্পাত শিল্পের পক্ষে যথেষ্ট প্রাকৃতিক সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কোন নূতন ইস্পাত শিল্প প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করা হয় নাই। অর্থের অভাবই নাকি ইহার প্রধান কারণ। নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা না করিয়া বর্ত্তমান ইস্পাত শিল্পকে সাহায্য করার নীতি গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিয়াছেন। সেই অনুসারে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল কোম্পানীকে পাঁচ কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং আজ পর্য্যন্ত আড়াই কোটি টাকা দিয়াছেন।

ভারতে বাৎসরিক ৩ কোটি টন কয়লা উৎপাদনের মধ্যে প্রায় ১ কোটি টন থাকে মেটালারজিক্যাল কয়লা। লৌহ ও ইস্পাত শিল্প বৎসরে প্রায় ৪০হাজার টনের মত এইরূপ কয়লা ব্যবহার করে, বাকী ৬০ হইতে ৭০ হাজার টন মেটালারজিক্যাল কয়লায় অপচয় হয়। এই অপচয় বন্ধ করিবার জন্য পরিকল্পনা কমিশন অভিমত দিয়াছেন যে, এইরূপ কয়লা উৎপাদনকারীদের কিছু কিছু কয়লা উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিতে হইবে এবং নিম্নশ্রেণীর কয়লা উৎপাদনের জন্য নূতন খনিতে কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। ক্রুপ-রেন প্রথায় কাঁচা লোহা উৎপাদন করিলে উচ্চশ্রেণীর কয়লা অপচয় যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাইবে। এই প্রথা অনুসারে জার্ম্মানীর ক্রুপ ইস্পাত শিল্প কারখানা কাঁচা লোহা উৎপাদন করে।

মহীশূর ষ্টীল কারখানা তাহাদের কার্য্য বিস্তার করিতেছে এবং এই বৎসরের শেষে তাহাদের বাৎসরিক উৎপাদন ৪০ হাজার হইতে বৃদ্ধি পাইয়া এক লক্ষ টনে দাঁড়াইবে। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী তাহাদের কারখানা বিস্তৃত করিতেছে এবং ১৯৫৩-৫৪ সনে তাহাদের ইস্পাত উৎপাদন-ক্ষমতা বর্দ্ধিত হইবে বাৎসরিক ৩,৪৫,০০০ হাজার টনে। এই কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে প্রায় ৩১·৭ কোটি টাকার প্রয়োজন। ইহারা বিশ্বব্যাঙ্ক হইতে ৩১·৫ মিলিয়ন ডলার ঋণ পাইয়াছে। কারখানার উন্নতি হইলে ইহারা বৎসরে অতিরিক্ত ৩,৫০,০০০ টন ইস্পাত প্রস্তুত করিতে পারিবে। টাটা ২২·৭১ কোটি টাকা দিয়া তাহাদের কারখানা বিস্তৃত করিবে। ১৯৫৭ সন হইতে তাহারা বৎসরে ৯,৩১,০০০ টন ইস্পাত তৈয়ার করিতে পারিবে। গবর্ণমেণ্ট নিজে একটি ষ্টীল কারখানা খুলিতে মনস্থ করিয়াছেন। একটি জাপানী কোম্পানীর সহিত এ বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল, কিন্তু কার্য্যকরী হয় নাই। এখন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্বব্যাঙ্কের সহিত আলোচনা চলিতেছে যাহাতে তাহারা টাকা দিয়া সাহায্য করে ও প্রতিষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে। এই কারখানাটি সম্পূর্ণ করিতে মোট ২৫ হইতে ৩০ কোটি টাকা খরচ হইবে।

হাতে-তৈয়ারী কাগজের কথা

ডাঃ সমরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় "বসুন্ধরা" পত্রিকায় লিখিতেছেন, ভারতে মুসলিম রাজত্বের গোড়ার দিকে বাংলাদেশে কাগজ তৈয়ারী শিল্পের পত্তন হয়। যতদিন পর্য্যন্ত যন্ত্রে তৈয়ারী বিদেশী কাগজ এদেশে আসে নাই—অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্য্যন্ত, প্রাচীন পদ্ধতিতে হাতে-তৈয়ারি কাগজেরই বিপুল আধিপত্য ছিল। যন্ত্রে প্রস্তুত কাগজ আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্প প্রচণ্ড আঘাত পায় এবং প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে না পারিয়া অনেককেই তাঁহাদের প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ করিয়া দিতে হয়। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে হুগলি জেলার মহানাদ, সাহাবাজার, দশঘরা, বালি দেওয়ানগঞ্জ, গঙ্গানগর; হাওড়া জেলার আমতা থানায় ময়নাম; মুর্শিদাবাদ জেলায় কুষ্টপুর, মহাদেবনগর, সামশেরগঞ্জ এবং ধুলিয়ানগঞ্জ আর দার্জ্জিলিং জেলায় কালিম্পঙের কাছে কয়েকটি জায়গায় হাতে-তৈয়ারী কাগজের কারখানা ছিল। সে সময় ৫০-৫৫টি পরিবার তথা ২০০ হইতে ৫০০ শ্রমিক এই শিল্পে নিয়োজিত

ছিল আর বর্ত্তমানে বড় জোর ২০-২৫টি পরিবার তথা ৮০ হইতে ১০০ জন লোক নিয়োজিত রহিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও বৎসরের সকল সময় তাহাদের কাজ চলে না, শুধু বিশেষ বিশেষ মরশুমেই কাজ চলে। বর্ত্তমানে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত স্থানে এই কাজ চলিতেছে : (১) হাওড়া জেলার আমতা থানায় ময়নাম, (২) হুগলি জেলায় দশঘরা, (৩) মুর্শিদাবাদ জেলায় মহাদেবনগর, (৪) দার্জ্জিলিং জেলার কালিম্পং অঞ্চলে একটি বা দুইটি গ্রাম।

ডাঃ গঙ্গোপাধ্যায় লিখিতেছেন, হাতে-তৈয়ারীর যে পদ্ধতি এখন প্রচলিত আছে তাহা একালের পক্ষে নিতান্তই অনুপযোগী, কাগজও ভাল জাতের হয় না। তাহার কারণ পড়তা-খরচ কমাইবার জন্য নিম্নস্তরের কাঁচামাল ব্যবহারের ঝোঁক। মণ্ড তৈয়ারী এবং কাগজ চকচকে করিবার ব্যবস্থাও ভাল নহে। হাতে-তৈয়ারী কাগজের শিল্পের পদ্ধতিকে আধুনিক প্রণালীতে উন্নত করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি পথিকৃৎ পরিকল্পনায় কাজ করিতেছেন।

দেশে এখন কাগজের চাহিদা প্রতি বৎসর ২,২০,০০০ টন, আর ভারতীয় কাগজ শিল্পের মোট বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ ১,৫০,০০০ টন। স্পষ্টতঃই দেশের উৎপাদন আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইবার পক্ষেও প্রচুর নহে। সুতরাং হাতে-তৈয়ারী কাগজের উন্নতি সাধন করিতে পারিলে এবং পড়তা-খরচ আরও কমাইতে পারিলে হাতে-তৈয়ারি কাগজ বাজারে বেশ একটি স্থান অধিকার করিতে পারে। ভারতের উচ্চস্তরের হাতে-তৈয়ারি কাগজের চাহিদা মিটাইবার জন্য বাহির হইতে আমদানীর উপর নির্ভর করিতে হয়। এ সকল কাগজ হইতেছে সাধারণতঃ চিত্রীদের আর স্থপতিদের ব্যবহার্য্য চিত্রাঙ্কনের কাগজ, দলিলের কাগজ, ছাঁকনির (ফিলটার) কাগজ, অদলবদল-অযোগ্য কাগজ, মোটা বোর্ড, নিমন্ত্রণপত্রের ভাল কার্ড, বীমার পলিসির কাগজ, শেয়ার সার্টিফিকেটের কাগজ, ডিপ্লোমার কাগজ প্রভৃতি। সহজে ছেঁড়ে না বলিয়া এবং খুব টেঁকসই বলিয়া হাতে তৈয়ারি কাগজই এদের পক্ষে বেশী উপযোগী। সাধারণ কাগজ ছাড়াও এই সকল কাগজ তৈয়ারি করিলে এই শিল্প আবার বাঁচিয়া উঠিবার সুযোগ পাইতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গে কৃষি-গবেষণা

১৯২৮ সনে ভারতীয় কৃষিবিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে কৃষি-গবেষণা দ্রুত গতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু স্বাধীনতার পূর্ব্বে পশ্চিমবঙ্গে এরূপ গবেষণাগারের কোন অস্তিত্বই ছিল না। গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে কয়েকটি কৃষিগবেষণাগার স্থাপিত হইয়াছে। দেশ-বিভাগের পর সর্ব্বপ্রথম অসুবিধা দেখা দেয় পাটশিল্পের ক্ষেত্রে। যদিও চটকলগুলির প্রায় সবকয়টিই পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত অথচ পাটের জমির অধিকাংশই পড়ে পূর্ব্ববঙ্গে। সুখের বিষয়, পাটের চাহিদার প্রায় ৭৬ ভাগ এখন ভারতেই উৎপন্ন হইতেছে এবং তাহার বেশীর ভাগই উৎপন্ন হইতেছে পশ্চিমবঙ্গে। যাহাতে খাদ্যফসল চাষের জমির উপর বিশেষ চাপ না পড়ে সেই উদ্দেশ্যে বিশেষ গবেষণার জন্য সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্যমন্ত্রী শ্রী রফি আহম্মদ কিদোয়াই ব্যারাকপুরের নিকট নীলগঞ্জে একটি স্থায়ী গবেষণাগারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিয়াছেন। বঙ্গবিভাগের পর কলিকাতার উপকণ্ঠে টালিগঞ্জে কৃষিগবেষণাবিভাগের যে সকল কর্ম্মচারী পশ্চিমবঙ্গে আসেন তাঁহাদের লইয়া একটি গবেষণাগার চালু করা হইয়াছে। সেখানে মৃত্তিকা ও সারের পরীক্ষা, বিভিন্ন বীজের উন্নতিসাধন, কীটপতঙ্গ নিবারণ, ব্যাধির প্রতিষেধ, আলুচাষের উন্নতি এবং নূতন শস্য আবাদের সম্ভাবনা প্রভৃতি বিষয়ের উপর গবেষণা চলিতেছে। গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে টালিগঞ্জে গবেষণাগারটিকে একটি কৃষিমহাবিদ্যালয়ে পরিণত করা হইয়াছে—বাংলাদেশে ইহাই সর্ব্বপ্রথম কৃষিমহাবিদ্যালয়। তাড়াতাড়ি বাড়ীতে বিদ্যালয়ে কাজকর্ম্ম পরিচালনার ফলে কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বড় অসুবিধা হইতেছে একটি কৃষিক্ষেত্রের অভাব। মহাবিদ্যালয়ের সন্নিকটে ত্রিশ একরের একটি কৃষিক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের হাতেকলমে শিক্ষা দেওয়া হয়—বাস্তবশিক্ষার পক্ষে তাহা নিতান্তই অপর্য্যাপ্ত।

"বসুন্ধরা" পত্রিকায় উপরোক্ত তথ্য পরিবেশন করিয়া শ্রীযতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিতেছেন যে, সম্প্রতি কৃষিগবেষণা সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা শোনা যাইতেছে; অনেকেই বলিয়াছেন—কৃষিগবেষণার ফল কৃষকসমাজের ভিতর ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয় নাই। ইহার একটি কারণ হইতেছে এই যে, গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে কৃষকদের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদিগকে শিক্ষা না দেওয়ার ফলে কৃষিবিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ ছাত্রেরা বহুক্ষেত্রে কৃষকদের বাস্তব সমস্যা উপলব্ধি করিতে পারেন না বা তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থাও করিতে পারেন না। তাঁহাদের পরামর্শ ব্যবস্থা বহুক্ষেত্রেই কার্য্যকরী হয় না এবং তাঁহারা কৃষকদিগের আস্থা অর্জ্জন করিতে পারেন না। সেজন্য শিক্ষার্থীরা যাহাতে কৃষকদের বাস্তব অবস্থার অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কৃষিগবেষণার গুরুত্ব সম্পর্কে শ্রীচক্রবর্ত্তী বলিতেছেন যে, বর্ত্তমান অবস্থায় কেবলমাত্র উন্নত ধরণের বীজ ব্যবহার করিয়াই বিভিন্ন ফসলের ফলন শতকরা ২০ হইতে ২৫ ভাগ বৃদ্ধি করা সম্ভব।

পশ্চিমবঙ্গে পাটচাষ

ডাঃ সৌরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "বসুন্ধরা" পত্রিকায় পশ্চিম বাংলায় পাটের কীটশত্রু ও তাহার প্রতিকার শীর্ষক এক প্রবন্ধে লিখিতেছেন যে, বর্তমান বৎসরে আনুমানিক প্রায় ৬॥ লক্ষ একর জমিতে পাটচাষ হইবে। একর প্রতি বিশ মণ পাট পাইলে উৎপন্ন পাটের পরিমাণ দাঁড়াইবে ১ কোটি ৩০ লক্ষ মণ। যদি ধরা যায়, শতকরা ৫ ভাগ ফসল কীটশত্রুর আক্রমণে নষ্ট হয় (যদিও তাহা অপেক্ষা অনেক বেশীই নষ্ট হয়) তবে প্রায় ৫ লক্ষ ২০ হাজার মণ পাট নষ্ট হইবে।

ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিতেছেন, "পাটের সবচেয়ে ক্ষতিকারক ঘোড়াপোকা। এরা এক রকম প্রজাপতির (মথ) কীড়া।…যে বছর বৃষ্টি কম হয়, সেই বছরই এদের আক্রমণ বৃদ্ধি পায়…পাট

গাছের ডগার পাতা খাওয়া দেখলেই বুঝতে হবে যে, ঘোড়াপোকার আক্রমণ হয়েছে। গাছের ডগা নষ্ট হওয়াতে ডগার নিচে থেকে নূতন ডাল গজায়। তার ফলে এসব গাছের পাটের আঁশ যথেষ্ট লম্বা হয় না ও সেজন্য সেই পাটের দাম কম হয়।"

প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিতেছেন, "আক্রমণের প্রথম অবস্থায় হাতে করে বেছে কেরোসিন মিশ্রিত জলে ফেলে ধ্বংস করা যেতে পারে। পাটক্ষেতের মধ্যে ও চারিধারে বাঁশ পুঁতে পাখি বসার বন্দোবস্ত করতে হবে, কারণ কাক, ময়না প্রভৃতি পাখী এই পোকা খেতে ভালবাসে; যদি আক্রমণ খুব বেশী হয় ও প্রথম উপায়ে পোকার দমন না হয় তবে বেনজিন হেক্সাক্লোরাইড নামে এক বিষাক্ত ঔষধের গুঁড়ো একর প্রতি ১০ থেকে ১৫ সের হিসাবে ছড়িয়ে দিতে হবে।" এই ঔষধ ছড়াইবার এক রকম যন্ত্র আছে যাহার সাহায্যে একটি লোক এক দিনে প্রায় ৮০ বিঘা জমিতে ঔষধ ছড়াইতে পারে।

ঘোড়াপোকা ব্যতীত পাটগাছে অনেক সময় এক রকম শুঁয়াপোকা দেখা দেয়। এরা এক প্রকার প্রজাপতির কীড়া। ছোট অবস্থায় কীড়াগুলি পাতার সবুজ অংশ খায়, আর যখন বড় হয় তখন পায় সব অংশই খাইয়া ফেলে, ফলে পাতাগুলি জালের মত হয়। প্রতিকারের উপায় মোটামুটি ঘোড়াপোকা দমনের অনুরূপ।

পাটগাছ যখন ছোট থাকে তখন কাতরিপোকা নামে এক প্রকার সবুজ রঙের কীড়া দেখা দেয়। বৃষ্টির অভাব হইলে এই পোকার প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পায় এবং গাছ ছাঁটা-সার হয়। ছোট অবস্থায় গাছের প্রতি নজর রাখিলেই আক্রমণ রুখিতে পারা যায়। ছোট ছোট ছেলেদের সাহায্যে ডিমের গাদা সংগ্রহ করিয়া নষ্ট করিয়া দিলে আক্রমণ বেশী হইবার সুযোগ থাকে না। আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইলে বেনজিন হেক্সাক্লোরাইড একর প্রতি ১০-১৫ সের ছড়াইয়া দিতে হইবে।

দেশে চুরি-ডাকাতির হিড়িক

দেশের সর্বত্র চুরি-ডাকাতি এবং নানারূপ বিশৃঙ্খলার সংবাদ প্রত্যহই অধিকতর সংখ্যায় শুনা যাইতেছে। কেবল যে অশিক্ষিত ব্যক্তিরাই এই সমাজবিরোধী কাজে লিপ্ত আছে তাহা নহে, বহু শিক্ষিত ব্যক্তিও এই সকল কাজের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে সংশ্লিষ্ট। ক্রমবর্দ্ধমান দুর্নীতির চাপে সমাজের কাঠামো আজ ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। এই সমস্যার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া "ভারতী" লিখিতেছেন, সমাজের সকলের সহযোগিতা ব্যতীত মুষ্টিমেয় পুলিসের পক্ষে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব নহে। "কিন্তু একথাও মিথ্যা নহে যদি এই মুষ্টিমেয় ব্যক্তিরাও তাঁহাদের কর্ত্তব্য যথাযথ পালন করিতেন ও তাঁহাদের নৈতিক মান প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন তবে দেশের যথেষ্ট কল্যাণ সাধিত হইত।" পুলিস বিভাগের নিষ্ক্রিয়তার সমালোচনা করিয়া পত্রিকাটি বলিতেছেন, "দরিদ্র জনসাধারণের কষ্টার্জ্জিত অর্থের একটি মোটা অংশ যাহারা গ্রহণ করিতেছেন তাঁহাদের পক্ষে এই নির্দ্দিকল্প মনোভাব পরিত্যাগ করিয়া জনসেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়াই একান্ত বাঞ্ছনীয়"।

হাসপাতালে চিকিৎসা-বিভ্রাট

১০শে আষাঢ় তারিখের "দামোদর" পত্রিকায় বর্দ্ধমান জেলার হাসপাতালে এক চিকিৎসা-বিভ্রাটের বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত সংবাদে প্রকাশ, গত ১লা জুলাই হাসপাতালের আউট-ডোরের ইনচার্জ আর. এম. ও. যখন বাহিরে ছিলেন তখন বেলা প্রায় ১২টার সময় শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মণ্ডল নামক এক ব্যক্তিকে হাড়-ভাঙ্গা অবস্থায় আনা হইলে কতিপয় জুনিয়র হাউস সার্জ্জন উক্ত ব্যক্তিকে অজ্ঞান করিয়া হাড় বসাইতে গেলে রোগীর দম বন্ধ হইয়া যায়। ইহাতে ভয় পাইয়া রোগীর হৃদ্‌যন্ত্রে একটি ইন্‌জেকশন দিবার চেষ্টা হইলে ইন্‌জেকশনের সূচটি ভাঙিয়া ভিতরে থাকিয়া যায়। সূচটি বাহির করিবার জন্য খোঁচাখুঁচি করার পর রোগীকে ১নং সার্জ্জিক্যাল ওয়ার্ডের ২০নং বেডে ভর্ত্তি করা হয় এবং ২রা জুলাই অপারেশন করিয়া প্রায় দেড় ইঞ্চি সূচটি বাহির করা হয়।

এই সঙ্গে ১০শে জুনের "মুর্শিদাবাদ সমাচার" পত্রিকায় প্রকাশিত আর একটি সংবাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। সংবাদে প্রকাশ, ২০শে জুন বেলা ১০টার সময় ১০ মাইল দূরবর্ত্তী স্থান হইতে ষোড়শ বর্ষীয় যুবক ডিলাল সেখ তাহার ৫৮ বৎসর বয়স্ক রুগ্ন পিতাকে লইয়া আসিয়া বহরমপুর সদর হাসপাতালে ভর্ত্তি করে। পরদিন সকালে আসিয়া সে দেখে যে তাহার পিতাকে হাসপাতাল হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সেই বৃদ্ধ গাছতলায় বসিয়া ধুঁকিতেছে। পাঁচ জনের পরামর্শে সেই বালক তখন পিতাকে লইয়া নিকটবর্ত্তী ডাঃ ত্রিভঙ্গমোহন সেনের বাসায় রাখে। সেখানে পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, বৃদ্ধের peritonitis হইয়াছে এবং রোগ কঠিন; বেলা ১২টা নাগাদ রোগীর মৃত্যু হয়।

এই বিবরণী প্রদান করিয়া "প্রসাদ" উক্ত পত্রিকায় প্রশ্ন করিতেছেন: এক্ষণে প্রশ্ন, লসকরী সেখের (বৃদ্ধের) মৃত্যুর জন্য দায়ী কে?

পরীক্ষায় পাস-ফেল সমস্যা

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় "শিক্ষক" পত্রিকা উক্ত বিষয়ের উপর এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিতেছেন, অন্যান্য বৎসরের মত আই-এ, আই-এসসি পরীক্ষার ফলাফল অভিভাবক মহলে গভীর বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছে। শোনা যাইতেছে, বি-এ ও বি-এসসি পরীক্ষার ফলও অনুরূপ নৈরাশ্যজনক হইবে। উক্ত মন্তব্যে বলা হইয়াছে: পরীক্ষায় বেশী পাস না হইলে দেশে শিক্ষা বিস্তার হয় না অথবা কড়া করিয়া উত্তর দেখিয়া ছাত্রদের বেশী ফেল না করিলে দেশে উচ্চ-শিক্ষার মানদণ্ড নীচু হইয়া যাইবে, এই দুই মতের কোনটিকেই সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

'শিক্ষক' লিখিতেছেন: "পরীক্ষার মানদণ্ড দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা এবং ছাত্রদের বয়স ও বুদ্ধিবৃত্তির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়াই নির্দ্ধারিত হওয়া কর্ত্তব্য। পরীক্ষার মানদণ্ড উচ্চ হইলেই

দেশের শিক্ষার উন্নতি হয়—ইহা মনে করা ভুল। দুঃখের বিষয়, ইদানীং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষীয়দের মধ্যে কাহারও কাহারও এই ভুল ধারণা। ফেলের সংখ্যা আজকাল দেশে যে এত বেশী হইতেছে এই প্রকার মনোভাব তাহার অন্যতম কারণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকগণকে এই সকল ভ্রান্ত মতাবলম্বীকে সংযত করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া পরীক্ষার সাফল্য অনায়াসলভ্য করিবার প্রস্তাব কখনও গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। সব দিক দিয়া বিচার করিলে আমাদের মনে হয় শতকরা ৩০ নম্বর প্রত্যেক বিষয়েই পাস নম্বর এবং এগ্রিগেট পাস নম্বর শতকরা ৩৩ হইলে কাহারও দিক দিয়া ন্যায়সঙ্গত কোনও অভিযোগের কারণ থাকে না। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাদের ইহাই করিতে অনুরোধ করিতেছি। সাপ্লিমেণ্টারী পরীক্ষার দাবি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, এক বিষয়ে যাহারা ফেল করিবে তাহাদের দ্বিতীয় বার পরীক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত।"

পরীক্ষার মান ইদানীং কিছু উচ্চ করিবার চেষ্টা চলিতেছে। সমগ্র ভারতে শিক্ষিত বাঙালী-যুবকের স্থান অন্য প্রদেশের যুবকদিগের সহিত সমান রাখিতে হইলে উহা নিতান্তই প্রয়োজন। এই জন্য আমরা পাস নম্বর শতকরা ৩০ এবং এগ্রিগেট শতকরা ৩৩ করা পছন্দ করিতেছি না। পূর্ব্বের এক সংখ্যায় আমরা দেখাইয়াছি যে, যে সকল কলেজের ছাত্র লেখাপড়া করিয়াছে সে সকল কলেজে শতকরা ৫০।৬০ এমন কি ৮০।৯০ পর্য্যন্ত ছেলে পাস হইয়াছে। যদি পরীক্ষা যথার্থই কঠোর হইত তবে ইহা কি সম্ভব ছিল? সাপ্লিমেণ্টারী সম্বন্ধে আমরা একমত, উহা করা উচিত।

শিক্ষাব্যবস্থা দলনে বিহার-সরকার

"নবজাগরণ" পত্রিকার ২৪শে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় বিহার সরকার কর্তৃক শিক্ষাব্যবস্থা দলনের এক চমকপ্রদ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। বিহার সরকারের স্বরূপ সম্পর্কে যাহাদের কোন সংশয় রহিয়াছে এই ঘটনায় তাঁহাদের চক্ষুরুন্মীলন হইবে বলিয়া আশা করি।

উক্ত পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ, ১৯৪৩ সালে ধলভূমের রাজা শ্রীজগদীশচন্দ্র ধবলদেব মহাশয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং রাজ এষ্টেটের তদানীন্তন ম্যানেজার শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর উদ্যোগে কয়েক সহস্র লোক অধ্যুষিত ঘাটশীলা শহরে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজাবাহাদুরের নামে স্কুলটির নামকরণ হয় এবং তদবধি ধলভূম রাজএষ্টেট স্কুলের যাবতীয় ঘাটতির সংস্থান করিয়াছেন। ১৯৪৫ সালে শ্রীগোকুলচন্দ্র পাইন নামক এক জন সুযোগ্য ব্যক্তি ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন, এবং পরে বিদ্যালয়টি সরকারী অনুমোদন লাভ করে। ঐ সময় (১৯৪৫) হইতেই নিম্নতম শ্রেণী হইতে হিন্দীভাষা ভার্ণাকুলার হিসাবে প্রবর্ত্তিত হয়। বর্ত্তমানে বিদ্যালয়ে পাঁচ জন হিন্দীভাষী শিক্ষক আছেন এবং শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক হিন্দী শিক্ষা সম্বন্ধে যে সকল নির্দ্দেশ জারী করা হয় এ যাবৎ স্কুল-কর্তৃপক্ষ তাহার প্রত্যেকটি মানিয়া চলিতেছেন। বিদ্যালয়ের শতকরা ৯৬ জন ছাত্র বাংলাভাষী, সেইজন্য শিক্ষার মাধ্যম অবশ্য বাংলাই আছে। বিহারের বাংলা ও উড়িয়াভাষী অঞ্চলের জনসাধারণের উপর বিহার সরকার জোর করিয়া হিন্দী ভাষা চাপাইবার যে নীতি গ্রহণ করিয়াছেন তদ্দ্বারা প্রণোদিত হইয়া সিংভূমের ধলভূম ও সেরাইকেলা মহকুমার ডেপুটি ইনস্পেক্টর অব স্কুলস বরাবর স্কুল-কর্তৃপক্ষকে চতুর্থ শ্রেণী হইতে শিক্ষার মাধ্যম হিন্দী করিবার জন্য চাপ দিয়া আসিতেছেন। কিন্তু কখনও কোন লিখিত নির্দ্দেশ দেওয়া হয় নাই।

যাহাই হউক, এই বিদ্যালয়ের উপর সরকারী রোষাগ্নির প্রকোপ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সরকার পক্ষ হইতে হিন্দী শিক্ষা দেওয়া হইতেছে না বলিয়া অভিযোগ করা হইতে থাকে। যদিও প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সেই অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয় তথাপি তাহার নিবৃত্তি ঘটে না। নানারূপ ছোটখাট ব্যাপারে স্কুলের বিরুদ্ধে সরকার হস্তক্ষেপ করিতে চেষ্টা করেন। কোন শিক্ষা-সম্মেলনে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অবিলম্বে হিন্দীকে সর্ব্বশ্রেণীর শিক্ষার মাধ্যম করার সরকারী প্রস্তাবের বিরোধিতার জন্য তাঁহাকে সরকার হইতে সতর্ক করিয়া দেওয়া হয়।

পূর্ব্বে ধলভূমরাজ এষ্টেট-স্কুলের যাবতীয় ঘাটতি পূরণ করিতেন। ১৯৫০ সালে সরকার ধলভূমরাজ এষ্টেটের পরিচালনা ভার লইবার পর স্কুলের ঘাটতি পূরণের জন্য অর্থের আবেদন করিলে এষ্টেট এস-ডি-ও ফরমান জারী করেন যে, স্কুল কমিটির পরিবর্ত্তনসাধন করিয়া কমিটির সভাপতি ও সম্পাদকের পদে সরকারী কর্ম্মচারী নিয়োগ না করিলে সাহায্য পাওয়া যাইবে না। অথচ আইনতঃ সরকার তখন পরিচালক মাত্র এবং রাজাবাহাদুরের নির্দ্দেশে তাঁহারই অর্থ এই প্রতিষ্ঠানে দিতে হইবে বলিয়া এ সম্বন্ধে সরকারের কোন বক্তব্যই থাকিতে পারে না। বিহার সরকার রাজ্যের শিক্ষকদের জন্য যে মাগ্‌গীভাতা মঞ্জুর করেন, বহু আবেদন-নিবেদন সত্ত্বেও তাহা এই বিদ্যালয়কে দেওয়া হয় নাই। ইহার ফলে ১৯৫০-৫১ সালের শিক্ষকদের পাওনা টাকাই মারা গিয়াছে। ১৯৫০ সালে ডিভিশনাল ইন্সপেক্টর অব স্কুলস "সরকারী কর্ম্মনীতির বিরোধিতা"র জন্য প্রধানশিক্ষক মহাশয়ের অপসারণের দাবি করেন। কিন্তু বিনা কারণে কমিটি প্রধানশিক্ষকের বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে অসম্মত হন। সরকারপক্ষ তখন স্কুলের অনুমোদন প্রত্যাহারের ভয় দেখান এবং সেই অবস্থা এখনও চলিতেছে। এই একই কারণে স্কুলের পাওনা পনর হাজার ছয় শত টাকা আজ বহু দিন হইল শিক্ষাবিভাগীয় কর্তৃপক্ষ আটক করিয়া রাখিয়াছেন।

মন্তব্যে "নবজাগরণ" লিখিতেছেন, "সরকার এবং সরকারী কর্ম্মচারিগণ দুরভিসন্ধি দ্বারা পরিচালিত ও পক্ষপাতদুষ্ট হইলে জনসাধারণের শত সৎ প্রচেষ্টাকে কিভাবে ধ্বংস করিতে পারেন এই ঘটনা তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ।"

বিহারে মাহালী সম্প্রদায়ের দুরবস্থা

৭ই আষাঢ়ের "নবজাগরণে" সম্পাদকীয় মন্তব্যে বিহারে মাহালী সম্প্রদায়ের প্রতি সরকারী বৈষম্যমূলক নীতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ

করা হইয়াছে। মাহালীরা সংখ্যায় প্রায় দশ হাজার, তাহাদের আবাসস্থল প্রধানতঃ সিংভূম জেলায় মনোহরপুর, সোনুয়া এবং চক্রধরপুর প্রভৃতি অঞ্চল। ইহারা অধিকাংশই ভূমিহীন। ইহাদের প্রধান উপজীবিকা বাঁশ ও বাঁশজাত দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ ও বিক্রয়। তাহারা নিকটস্থ জঙ্গল হইতে অপেক্ষাকৃত কম দরে বাঁশ কিনিয়া নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া উক্ত অঞ্চলে এবং নিকটস্থ শহরগুলিতে বিক্রয় করিত এবং ইহাই ছিল তাহাদের জীবনধারণের একমাত্র উপায়।

১৯৪৮ সনে পর্য্যন্ত মাহালীরা বনাঞ্চল হইতে ৬ পয়সা দরে বাঁশ ক্রয় করিত। "নবজাগরণে"র ভাষায় "কিন্তু সরকারের উদার অন্তঃকরণে এতখানি অবিচার সহ্য হইল না। তাহারা ইজারার বন্দোবস্ত করিলেন। ১৯৪৯ সনে শীহরজীবন পাঠক উক্ত বনাঞ্চল ইজারা লন। তিনি সদাশয় ব্যক্তি, রাতারাতি বাঁশের দর ৬ পয়সা হইতে ।৵০ করিয়া ক্ষান্ত হইলেন। মাহালীরা চোখে অন্ধকার দেখিল। তাহার পর শীহরজীবন পাঠকের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে রামগোপালজী নামে এক কন্ট্রাক্টর এই বনাঞ্চল ইজারা লইয়া একেবারে নির্ভেজাল রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া বসেন। তিনি ছয় পয়সার বাঁশ ।৵০ আনা মূল্যে বিক্রয় করিতেন। অবশ্য দুই-একটা ধমক দিয়া নিরীহ অশিক্ষিত মাহালীদের নিকট হইতে একটি বাঁশের মূল্য ৷০ হইতে ৷৵০ পর্য্যন্ত আদায় করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইয়াছেন, এমন কথা শুনি নাই।"

অতঃপর শীতাহাজারা সিং নামক এক কন্ট্রাক্টরকে বার বৎসরের জন্য এই বনাঞ্চল ইজারা দেওয়া হইলে তিনি উক্ত অঞ্চলের সমস্ত বাঁশ অন্যত্র চালান দিতে সুরু করিলেন। ফলে "দশ হাজার মাহালী সম্প্রদায় স্ত্রী পুরুষ ও শিশু সকলের উপবাস করা ছাড়া দ্বিতীয় কোন পন্থা নাই। গ্রামবাসী গৃহস্থের নিকট হইতে কিছু বাঁশ ক্রয় করিলে মহামান্য ইজারা সাহেবের কাছে তাহা তাঁহার ইজারা লওয়া অঞ্চল হইতে চুরি করা বাঁশ হইয়া দাঁড়ায়। শুধু তাহাই নহে, সুযোগ ও সুবিধামত তিনি নিজের এই মতকে আইনানুযায়ী প্রতিষ্ঠা করিতেও চেষ্টা করেন।"

১৯৫২ সনের শেষ দিকে এইরূপ শোচনীয় অবস্থার প্রতিকারের জন্য দেড় শত মাহালী ডেপুটি কমিশনারের নিকট এক আবেদন করিলে তাহার উত্তরে ডেপুটি কমিশনার সাহেব রায় দেন যে, মাহালীদের জন্য পৃথক 'কূপ' থাকিবে এবং তাহারা সেই সকল কূপ হইতে নিয়মিত বাঁশ পাইবে। "নবজাগরণ" লিখিতেছেন, "কিন্তু আজও মাহালীদের জন্য কূপ খোলা হয় নাই।"

কুটির-শিল্পকে সাহায্য করাই হইতেছে সরকারের ঘোষিত নীতি, কিন্তু এই ভাবে এই দশ হাজার নরনারীর অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থাকে বাতিল করিবার কারণ কি তাহা বুঝা দুঃসাধ্য। সিংভূমে কৃষি-কার্য্যের উপযোগী উর্ব্বর জমি অল্প। ঐ অঞ্চলের প্রধান সম্পদ খনি ও বন। খনিগুলি ইতিমধ্যেই ধনী মালিক গোষ্ঠীর করায়ত্ত হইয়াছে। পত্রিকার মতে "জঙ্গল বিভাগে প্রত্যহ যে অনাচার চলিতেছে এবং সরকার যেরূপ সততার সহিত জঙ্গল বিভাগীয় দুর্নীতি দূর করার প্রচেষ্টা পরিহার করিতেছেন তাহাতে এই জঙ্গলখণ্ডের অধিবাসীদের সরকারবিরোধী ও পৃথক ঝাড়খণ্ড গঠনের মনোবৃত্তি প্রবল হইতেছে। বিহার সরকার কি এখনও অবস্থার গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া খগাত সলিলে ডুবিবার পথ বন্ধ করিবেন না?"

আসামে সরকারী অপব্যয়

"যুগশক্তি" পত্রিকার ১২ই আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় যে, আসাম সরকারের হোমগার্ড খাতে পনর লক্ষ টাকা অপব্যয় হইয়াছে এবং তাহার মধ্যে প্রায় সাত লক্ষ টাকার কোন হিসাবই পাওয়া যাইতেছে না। কিছুদিন হইতেই আসাম হোমগার্ড খাতে বহু অর্থ অপব্যবহার করা হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ শোনা যাইতেছিল। আসাম বিধান পরিষদেও এই সম্পর্কে সরকারকে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হয়। ফলে সরকার হোমগার্ড বিভাগের হিসাবপত্রাদি পুনরায় পরীক্ষা করিবার জন্য নূতন হিসাবপরীক্ষক নিযুক্ত করেন।

নির্ভরযোগ্য মহল হইতে প্রাপ্ত সংবাদে নাকি আরও প্রকাশ পাইয়াছে যে, "রাজ্যের একাউণ্টেণ্ট জেনারেল কর্ত্তৃক তাঁহার রিপোর্টে হোমগার্ডের আঞ্চলিক কমাণ্ডারদের কেস রেজিষ্টার রাখা বিষয়ে অনিয়ম হওয়ার কথা উল্লেখ না করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষ তরফ হইতে অনুরোধ জানানো হয়।" হিসাব-পরীক্ষকদের নিকট প্রয়োজনীয় নথিপত্রও সংশ্লিষ্ট মহল দেখাইতে পারেন নাই। সেজন্য সরকার হিসাব-পরীক্ষকদিগের কার্য্যকাল আরও ছয় মাস বাড়াইয়া দিয়াছেন। প্রয়োজনীয় নথিপত্রের অভাবে অর্থদপ্তরের প্রায় আট লক্ষ টাকার ক্ষতি হইতেছে।

বর্ত্তমান হিসাব-পরীক্ষক দেখিয়াছেন যে, হাজার হাজার টাকা খরচ করা হইলেও তাহার কোন হিসাব রাখা হয় নাই। কি কারণে অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে তাহারও কোন হদিস নাই। "উত্তর লক্ষীমপুরের হিসাব পরীক্ষার ফল হইতে জানা যায় যে, পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার বেশি অর্থের অপব্যবহার করা হইয়াছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, বহু হোমগার্ড তাঁহাদের বেতন ও অন্যান্য পারিতোষিক প্রভৃতি পান নাই বলিয়া সরকারের কাছে অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন। অথচ সম্প্রতি হিসাব-পরীক্ষকগণ যে নথিপত্র পাইয়াছেন তাহাতে হোমগার্ডদের বেতনাদি দেওয়া হইয়াছে বলিয়া দেখান হইয়াছে।"

ভারতে বিদেশী মিশনরী

ভারতের স্বরাষ্ট্রসচিব ডঃ কৈলাসনাথ কাটজু ভারতে বিদেশী মিশনরীদের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে যে বিবৃতি প্রদান করেন তাহার প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া ভারতের কতিপয় খ্রীষ্টান প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষ যে একটি সংযুক্ত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন সেই সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীমগনভাই প্রভুদাস দেশাই "হরিজন" পত্রিকায় লিখিতেছেন, "কোন এক ধর্ম্মাবলম্বীদের বা উহাদের ধর্ম্মমতের

শ্রেষ্ঠত্বাভিমান কোন ধর্ম্মমতনিরপেক্ষ রাষ্ট্র স্বীকার করিতে পারে না। অথচ এই শ্রেষ্ঠত্বাভিমানই হইল মিশনরীদের প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন ধর্ম্ম প্রচারের মূলসূত্র। একথা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে যে, বাস্তবিক কোনও বিশেষ ধর্ম্মমতের শ্রেষ্ঠত্বের কোন প্রশ্ন নাই, কারণ কোন একটি ধর্ম্মমতকে জীবন দিয়া আচরণ করিলে ও অন্তরে হৃদয়ঙ্গম করিলে সেই পথে ঈশ্বর উপলব্ধি হইয়া থাকে। আবার কোন ধর্ম্মমতেরই পক্ষে ঐরূপ দাবি চলে না যে, তাহা সর্ব্বাংশে অদ্বিতীয় সত্য এবং তাহাতে মানবোচিত ত্রুটিবিচ্যুতি একেবারেই নাই। নিজের উপলব্ধি দ্বারাই আত্মার দর্শন হয়। কোন এক বিশেষ ধর্ম্মমতের মধ্যে ইহা সীমাবদ্ধ নহে।"

এদেশে বিদেশী মিশনরীদের কার্য্যকলাপের অপর দিক আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখিতেছেন, "বেয়নেট বা টোটাভরা আগ্নেয়াস্ত্রাদি কিছুই সঙ্গে না লইয়া আদি যুগে যে সকল খ্রীষ্টান পাদরী ধর্ম্মপ্রচারে দূরদেশে চলিয়া গিয়াছিলেন ভারতের খ্রীষ্টান মিশনগুলি কিন্তু সেই ভাবে এদেশে আসেন নাই। পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক অভিযানের সহায়ক অঙ্গরূপে তাঁহারা ভারতে আসিয়াছিলেন ইহা ভুলিলে চলিবে না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে সে কাহিনী অতীতে পরিণত হইয়াছে।"

সুতরাং মিশন কর্তৃপক্ষের সংযুক্ত বিবৃতিতে ভারতে বিদেশী মিশনগুলির কার্য্যকলাপের জন্য তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিবার যে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে তাহা মানিয়া লওয়া যায় না। মিশনরীগণ এদেশে হাসপাতাল, বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপন বিষয়ে যে উপকারের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার উত্তরে শিদেশাই বলিতেছেন যে, এই সকল প্রতিষ্ঠান কখনই আত্মিক পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে পারে না, বা ধর্ম্মান্তর গ্রহণে প্রলুব্ধ করিতে পারে না। "আত্মিক পরিবর্ত্তন আধ্যাত্মিক ব্যাপার। আধ্যাত্মিক প্রগতির স্বকীয় নিয়মাদি আছে। তাহার জন্য হাসপাতাল, ডাক্তারখানা, কলেজ, স্কুল, কুষ্ঠাশ্রম ইত্যাদি পার্থিব ও স্থূল বস্তুতান্ত্রিক সহায়তার প্রয়োজন হয় না।"

ডাক্তারদিগের প্রতি ডঃ প্রসাদের আবেদন

গত মার্চ্চ মাসে নাগপুরে একটি মেডিক্যাল কলেজ উদ্‌ঘাটন উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ যে ভাষণ প্রদান করেন তাহার এক সারাংশ ২৭শে জুনের "হরিজন" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত ভাষণে ডঃ প্রসাদ ডাক্তারদিগের প্রতি আবেদন করিয়া বলিয়াছেন যে, রোগীদিগের রোগ উপশম করিয়াই ডাক্তারদের কর্ত্তব্য শেষ হয় না; বরং জনসাধারণের মধ্যে রোগের উৎপত্তি না হয় তদ্বিষয়ে প্রযত্ন করাই ডাক্তারদের মুখ্য কর্ম্ম হওয়া উচিত। "অর্থাৎ যে বৃত্তি তাঁহাদিগকে জীবিকা দিয়া থাকে তাহার ক্ষেত্র ক্রমশঃ সঙ্কুচিত করিয়া শেষ অবধি উহার বিলোপ ঘটাইবার জন্য ডাক্তারদিগকে সচেতনভাবে প্রয়াস করিতে হইবে।"

কিন্তু আমাদের দরিদ্র দেশে রোগশোক শীঘ্র লুপ্ত হইবার আশা নাই; সেজন্য এখনও বহুকাল ডাক্তারদিগের প্রয়োজন থাকিবে। ডঃ প্রসাদ ডাক্তারদিগকে অনুরোধ করিয়া বলিতেছেন যে, তাঁহারা যেন ভারতের পল্লী অঞ্চলের অবস্থা সর্ব্বদা স্মরণে রাখেন এবং সেই অবস্থার চাহিদা মিটাইবার যোগ্য করিয়া তাঁহাদের কর্ম্মপদ্ধতি গড়িয়া তুলেন। আমাদের দেশে আজ দুইটি চিকিৎসাপদ্ধতি প্রচলিত আছে: একটি পাশ্চাত্য অপরটি দেশীয়। বর্ত্তমানে সাধারণভাবে দেশীয় পদ্ধতিকে অবৈজ্ঞানিক বলিয়া উড়াইয়া দিবার একটি প্রবল ঝোঁক ডাক্তারদের মধ্যে দেখা যায়। ডঃ প্রসাদ চিকিৎসকদিগকে এই ঝোঁক পরিহারপূর্ব্বক দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতিগুলি অধ্যয়ন করিয়া উহাদের মধ্যে যাহা উপকারী এবং বিজ্ঞানসম্মত তাহা খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। যাহাতে দরিদ্রসাধারণ সহজেই রোগের কারণ এবং প্রতিকার সম্পর্কে অবহিত হইতে পারেন তাহার জন্য সর্ব্বপ্রকার প্রযত্ন করা চিকিৎসকদের অন্যতম কর্ত্তব্য হওয়া উচিত। চিকিৎসকগণ "আধুনিক বিজ্ঞান অবশ্যই চর্চ্চা করিবেন, উহার উপকার লইবেন, সাধ্যমত উহাতে নূতন জ্ঞানের অর্ঘ্য দিবেন, কিন্তু সেই সঙ্গে অন্যান্য চিকিৎসাপদ্ধতির দিকেও মনোযোগ দিবেন, বিনা বিচারে উহাদের বাতিল করিয়া দিবেন না, কারণ জনস্বাস্থ্য সমস্যার সমাধান করিতে হইলে চিকিৎসার বিভিন্ন পদ্ধতির সহযোগে রোগের সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে।

পূর্ব্ব পাকিস্থানে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি

"সোনার বাংলা" পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ, "পূর্ব্বপাকিস্থানে সর্ব্বত্রই নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহের মূল্যমান ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। স্থানীয় উৎপন্নদ্রব্যগুলির মূল্যবৃদ্ধি তো ঘটিয়াছেই, উপরন্তু বিদেশ হইতে আমদানীকৃত দ্রব্যগুলির মূল্যমানের ঊর্দ্ধগতিও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যাইতেছে। জনসাধারণ অবশ্য রাষ্ট্রের বৃহত্তর কল্যাণের মুখ চাহিয়া সকল অসুবিধাই নীরবে সহ্য করিতেছে—ইহার জন্য তাহাদিগকে প্রচুর ত্যাগ স্বীকার করিতে হইতেছে।

পরিস্থিতির গুরুত্ব সম্পর্কে উক্ত পত্রিকার ১লা আষাঢ় সংখ্যায় সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হইয়াছে, "জনগণের ক্রয়শক্তি সঙ্কটপূর্ব্ব অবস্থার তুলনায় অর্দ্ধেক কিংবা তাহারও কমে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অবস্থায় জিনিষপত্রের মূল্য বৃদ্ধি তাহাদের বোঝার উপর শাকের আঁটির কার্য্য করিবে। তাহাদের সেই নির্ব্বিকার সহনশীলতায় ফাটল ধরিলেও আশ্চর্য্য হইবার কিছু থাকিবে না। এইজন্য আমরা সরকারের মনোযোগ এই দিকে আকর্ষণ করিতেছি। সরকার বর্ত্তমান মূল্যবৃদ্ধি রোধকল্পে এখনই নজর না দিলে বাজারের নিয়ন্ত্রণ হাতছাড়া হইয়া যাইতে পারে।"

পাকিস্থানী রাজনীতি

লাহোর হইতে প্রকাশিত ইংরেজী সাপ্তাহিক "ষ্টার" পত্রিকার ঢাকা সংবাদদাতা লিখিতেছেন, মুস্লিম লীগের সভাপতিত্ব এবং গণপরিষদে লীগদলের নেতৃত্ব ত্যাগ করিবার পর খাজা নাজিমুদ্দীন আর গণপরিষদের সদস্য থাকিবেন কি না সে সম্পর্কে প্রবল জল্পনা-কল্পনা চলিয়াছে। সংবাদদাতার মতে তিনি পদত্যাগ করিলে তাহা সুসঙ্গতই হইবে এবং কেহই আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন না।

উক্ত সংবাদদাতা লিখিতেছেন, সকল ঘটনা হইতে একটি

সিদ্ধান্ত স্পষ্ট হইয়াছে যে, সরকার এবং প্রধান রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব কোন এক ব্যক্তির উপর ন্যস্ত হইলে তাহা সরকার অথবা রাজনৈতিক দল কাহারও স্বার্থের অনুকূল হয় না। খাজা নাজিমুদ্দীন নিজেও এই ব্যবস্থার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। অন্ততঃ ঢাকার লীগের মুখপত্র মৌলানা মহম্মদ আক্রাম খাঁর "আজাদ" পত্রিকা সকল সময়েই উভয় পদের এক নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

সম্প্রতি পঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী মালিক ফিরোজ খাঁ নুন পঞ্জাব প্রাদেশিক লীগের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই সংবাদ কোন মহলেই উৎসাহ সঞ্চার করিতে পারে নাই, পরন্তু এমন কি মুসলিম লীগ মহলেও এই নির্ব্বাচনের কড়া সমালোচনা শোনা যাইতেছে। লব্ধ অভিজ্ঞতা হইতেই তাহারা এই বিরূপ মন্তব্য করিতেছেন। পূর্ব্ব পাকিস্থানেও মিঃ নুরুল আমীন প্রধানমন্ত্রী ও লীগ সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত আছেন। তাহার বিপদ এখনও কাটিয়াছে বলিয়া মনে করা যায় না। তিনি লীগ এবং সরকার এই উভয়কেই রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ।

ব্রহ্মে চিয়াং-বাহিনী

উ. থেইন্‌ঝোফ ব্রহ্মে কুয়োমিনটাঙ-বাহিনীর অনুপ্রবেশের ইতিবৃত্ত সম্পর্কে আলোচনা-প্রসঙ্গে লিখিতেছেন, ১৯৫০ সনে চীনের মুক্তিফৌজ কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া তাহারা প্রথমে ব্রহ্মদেশে প্রবেশ করে, তখন তাহাদের সংখ্যা ১৫০০ জনের বেশী ছিল না। চীনের লোকায়ত্ত সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণকার্য্য চালাইবার জন্য চিয়াং-কাইশেক তাইওয়ান (ফরমোজা) হইতে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও লোকজন পাঠাইয়া এই দলের শক্তি বৃদ্ধি করেন, ফলে এই বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া বর্তমানে ১২০০০ দাঁড়াইয়াছে। ব্রহ্ম হইতে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় যে, এই সৈন্যদল মার্কিন মেশিনগান, ট্রেঞ্চমর্টার, রাইফেল, ট্যাঙ্ক-ধ্বংসী কামান ও হাতবোমা ইত্যাদি আমেরিকান অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। ১৯৫২ সনে এই বাহিনী চীন আক্রমণের পর বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসে এবং ব্রহ্মবাসীদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালাইতে থাকে। ব্রহ্ম-জনগণের দাবির সমর্থনে ব্রহ্মের সশস্ত্রবাহিনী কয়েকটি অঞ্চল হইতে ইহাদিগকে বিতাড়িত করে। জাতিসঙ্ঘে ব্রহ্মদেশ এই বাহিনীর অপসারণের প্রস্তাব তুলিলে কুয়োমিন্‌টাঙ-বাহিনীর আক্রমণাত্মক কার্য্যের নিন্দাবাদ করিয়া এবং অগৌণে তাহাদের নিরস্ত্রীকরণ ও ব্রহ্মদেশ হইতে তাহাদের অপসারণের দাবি জানাইয়া মেক্সিকো কর্ত্তৃক আনীত এক প্রস্তাব সাধারণ-পরিষদ কর্ত্তৃক গৃহীত হয়।

কিন্তু "কুয়োমিন্‌টাঙ" এই প্রস্তাব অনুযায়ী কার্য্য করে নাই। জাতিসঙ্ঘের দরবারে যখন ব্রহ্মের অভিযোগ আলোচিত হইতেছিল ঠিক সেই সময়েই কুয়োমিন্‌টাঙ-বাহিনী রেঙ্গুনের পাঁচ শত কিলো-মিটার দক্ষিণ-পূর্ব্বে নূতন 'ফ্রন্ট' খুলিয়া বসে। অতঃপর বিভিন্ন স্থানে কুয়োমিন্‌টাঙ ও ব্রহ্ম-বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষের সংবাদ আসে। মাসাধিককাল পূর্ব্বে ব্যাঙ্ককে ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড, মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র ও কুয়োমিনটাঙের প্রতিনিধি দলের এক আলোচনা-বৈঠক আরম্ভ হয়। সেই আলোচনা-বৈঠক এখনও শেষ হয় নাই। কুয়োমিন্‌টাঙ পক্ষ সৈন্যাপসারণের প্রশ্নাবলী সম্পর্কে আলোচনা চালাইয়া লইয়া চলিয়াছে, কালক্ষেপ করিবার জন্য তাহারা সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিতেছে। জুন মাসের প্রথম দিকে তাহাদের আলোচনা বৈঠকের প্রতিনিধি চিয়াং-কাইশেকের সহিত আলোচনা করিবার জন্য তাইওয়ান দ্বীপে যান। সেখানে তাহার অযথা বিলম্বে রেঙ্গুনের সরকারী মহলে বিস্ময়ের সৃষ্টি হইয়াছে। এই বিলম্বের আসল অর্থ হইতেছে যে, কোন প্রকারে বর্ষা পর্যন্ত অপেক্ষা করা। কারণ বর্ষা শুরু হইলে কুয়োমিন্‌টাঙ বাহিনীকে অপসারিত করা কার্য্যতঃ অসম্ভব হইবে।

সোভিয়েট ইউনিয়নে কে কত আয়কর দেয়

"টাসে"র এক সংবাদে প্রকাশ, সোভিয়েট ইউনিয়নে কারখানার শ্রমিক, অফিসের কর্মচারী, স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জন করেন এমন সব নাগরিককে আয়কর দিতে হয়। কারখানা ও অফিসের কর্ম্মচারীদের মধ্যে যাহাদের মাসিক আয় ২৬০ রুবলের বেশী নহে তাঁহাদিগকে আয়কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। পেনসনভোগীদের পেনসনের পরিমাণ যাহাই হউক না কেন আয়কর দিতে হয় না। প্রতি মাসে শ্রমিকদের পূর্ব্ববর্ত্তী মাসের আয় হইতে নিম্নলিখিত হারে আয়কর কাটা হয়:

মাসিক আয়ের পরিমাণ	দেয় কর
৪০০ রুবল	১৮ রুবল
৫০০ „	[illegible] „
৬০০ „	[illegible] „
৭৫০ „	[illegible] „
১০০০ „	[illegible] „
১৫০০ „	১৪১ „
ইত্যাদি	ইত্যাদি

সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ আয়কর কাহারও আয়ের শতকরা ১৩ ভাগের বেশী হয় না। যে সকল শ্রমিকের উপর চার বা ততোধিক নির্ভরশীল পোষ্য আছে তাহাদের আয়করের হার অনেক কম।

১৯৪১ সনে নিঃসন্তান নাগরিকও অনধিক দুই সন্তানের পিতামাতার জন্য একটি ট্যাক্স বসানো হয়। ২০ হইতে ৫০ বৎসরের পুরুষ এবং ২০ হইতে ৪৫ বৎসরের মেয়েদের ক্ষেত্রে কোন সন্তান না থাকিলে আয়ের শতকরা ৬ ভাগ, একটি সন্তান থাকিলে শতকরা এক ভাগ এবং দুইটি সন্তান থাকিলে শতকরা অর্দ্ধ ভাগ কর দিতে হয়। তিন বা ততোধিক সন্তান যাহাদের আছে তাহাদিগকে এই কর দিতে হয় না। সৈনিক ও তাহার স্ত্রী, কর্ম্মক্ষমতাহীন ব্যক্তি, এবং যাহাদের পুত্র বা কন্যা মহাযুদ্ধে প্রাণ হারাইয়াছেন বা নিখোঁজ হইয়াছেন তাঁহাদিগকে কর হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছে।

"টাসে"র আর এক সংবাদে সোভিয়েট ইউনিয়নে বাড়ীভাড়া সম্পর্কে একটি ধারণা দিবার চেষ্টা হইয়াছে। তাহাতে প্রকাশ,

সোবিয়েৎ দেশের শহরগুলির বেশীর ভাগ বাসভবন রাষ্ট্রের সম্পত্তি এবং বিধিবদ্ধ আইন অনুযায়ী প্রতি বর্গ মিটার (প্রায় পৌনেএগার বর্গ ফুট) ফ্লোর স্পেস বা থাকিবার জায়গার মাসিক ভাড়া এক রুবল ৩২ কোপেকের বেশী হইতে পারিবে না। এই হিসাবের মধ্যে রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, পায়খানা, স্নানাগার, হল ও বারান্দা ধরা হয় না। সুতরাং ৩৮-৪০ বর্গ মিটার আয়তনের (প্রায় ৩৮০-৪৫০ বর্গফুট) ফ্ল্যাটের জন্য মাসে ৪৬-৫২ রুবলের বেশি ভাড়া দিতে হয় না।

কলকারখানার শ্রমিক ও অফিসের কর্মচারীদের বাড়ীভাড়ার পরিমাণ সাধারণতঃ তাহাদের আয়ের বিশ ভাগের এক ভাগের বেশী হয় না। রাষ্ট্র কর্তৃক নির্দিষ্ট বাড়ীভাড়া বাঁধিয়া দেওয়া হয় এবং এই নির্দিষ্ট ভাড়া বৃদ্ধি করিবার অধিকার কাহারও নাই। যথেচ্ছ ভাড়া বৃদ্ধি করিলে আইনানুযায়ী দণ্ড পাইতে হয়।

ত্রিশক্তির ওয়াশিংটন বৈঠক

ওয়াশিংটনে ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের যে বৈঠক চলিতেছে সে সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে লণ্ডন "ডেলী হেরাল্ড" পত্রিকার কূটনৈতিক সংবাদদাতা মিঃ চবলিউ এন্. ইউয়ার লিখিতেছেন যে, এই সম্মেলনকে বারমুডা সম্মেলনের বিকল্প বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে। বারমুডা সম্মেলন সত্য সত্যই স্থগিত রাখা হইয়াছে। লণ্ডনে ব্যক্তিগত এবং রাজনৈতিক কারণে অনেকে আশা করেন যে এই (বারমুডা) সম্মেলন হয়ত আর বেশী দিন স্থগিত রাখার প্রয়োজন হইবে না।

উক্ত সংবাদদাতার মতে ওয়াশিংটন সম্মেলনকে বারমুডা সম্মেলনের ভূমিকা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এই সম্মেলনের আলোচনা হইবে প্রাথমিক বিষয়গুলি। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যে ভাবে দ্রুত পরিবর্তিত হইতেছে তাহাতে এই ভাবে যুক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং আলোচনার ব্যবস্থা কেবল যে বাঞ্ছনীয় তাহা নয়, অত্যাবশ্যকও।

বারমুডা সম্মেলন প্রস্তাবিত হইবার পর হইতে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশেষ পরিবর্তনের লক্ষণ প্রকাশ পায়। জার্মানী এবং কোরিয়ায় উভয় ক্ষেত্রেই অবস্থার অভাবিত পরিবর্তন লক্ষিত হয়।

পূর্ব বার্লিন এবং সোভিয়েট এলাকায় শ্রমিকদের আকস্মিক বিদ্রোহ এবং পূর্ব জার্মান সরকারের সত্বর সুবিধাদানের ব্যবস্থা হইতে মনে হয় যে, সমগ্র সমস্যা পুনরায় বিবেচনা করিয়া দেখিবার প্রয়োজন আছে, পরিস্থিতি সত্যই অনিশ্চিত।

কোরিয়ার অবস্থাও সেই প্রকার। এক মাস পূর্বে সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষর হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল, কিন্তু প্রেসিডেণ্ট সীংম্যান রী এবং তাঁহার সরকার সমস্ত সমস্যা অকস্মাৎ এমন ভাবে জটিল করিয়া তুলেন যে, আশু সন্ধির আশা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে, সমগ্র ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দেহ যেন আরও তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। রী-রবার্টসন আলোচনার পর অবস্থা আরও অনিশ্চিত হইয়াছে।

এশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটে মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ এশিয়া এবং অন্যান্য স্বাধীন দেশগুলিতে বৈষয়িক, কারিগরি ও সামরিক সাহায্য দানের উদ্দেশ্যে ৫৫০ কোটী ডলার ব্যয়বরাদ্দের পরিকল্পনা সম্পর্কে এক বিতর্ক প্রসঙ্গে নিউইয়র্ক হইতে নির্ব্বাচিত রিপাবলিকান সিনেটর মিঃ এইচ. আলেকজাণ্ডার স্মিথ বলেন যে, সকল জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীনতা অর্জনের অধিকারের স্বীকৃতির উপর ভিত্তি করিয়াই এশিয়ায় মার্কিন নীতি পরিচালিত হইবে। তিনি বলেন, এশিয়াবাসীকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য সকল প্রকার সাম্রাজ্যবাদেরই বিরোধী এবং "দারিদ্র্য ও কম্যুনিজম এই উভয়প্রকার নিপীড়ন হইতে মুক্ত করিবার জন্য এশিয়াবাসীদের সাহায্য করিতে প্রস্তুত।" মিঃ স্মিথ বলেন যে, যাহাতে এশিয়াবাসিগণ ভয় হইতে মুক্ত এবং আত্মনির্ভরশীল হইয়া বিশ্বের গঠনমূলক কাজে তাহাদের সকল প্রচেষ্টাকে নিয়োজিত করিতে পারেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সে বিষয়ে সাহায্য করা উচিত।

ভারতবর্ষ এবং পাকিস্থানকে কারিগরি ও বৈষয়িক সাহায্যদানের উদ্দেশ্যে ১২ কোটী ৩৫ লক্ষ ডলার ব্যয়বরাদ্দের এক আলোচনা প্রসঙ্গে সিনেটর স্মিথ বলেন, "এই বিলে বরাদ্দ অর্থ দ্বারা যে কাজ সম্পন্ন হইবে তাহা খুবই সামান্য কিন্তু ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানে বৈষয়িক উন্নয়নের যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহার সাফল্য অথবা ব্যর্থতা নির্ণীত হইবে এই ক্ষুদ্র কাজের মধ্য দিয়া। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অঙ্গীকার দেওয়া ঐ সব পরিকল্পনা যদি ব্যর্থ হইয়া যায়, তাহা হইলে ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানে স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে যে পরীক্ষা চলিয়াছে তাহাও ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে।" তিনি বলেন যে, ভারত ও পাকিস্থানের উন্নতিতে এবং সেখানে গণতন্ত্রের বিস্তারের ফলে যুক্তরাষ্ট্রেরও উপকার হইয়াছে, "কারণ তাহাদের নিকট অন্য যে পথ খোলা ছিল, তা ছিল কম্যুনিষ্ট চীনের ন্যায় বিদ্রোহীকরণ ও সার্বিকতাবাদের পথ।"

মিঃ স্মিথের মতে এই দুই দেশের বৈষয়িক জীবনকে শক্তিশালী করা যুক্তরাষ্ট্রের কর্ত্তব্য। এই কর্ম্মপন্থার সমর্থনে তিনি বলেন, "ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানের মিলিত কার্য্যের ফলে দূরপ্রাচ্য ও মধ্য-প্রাচ্যের সঙ্গে মিত্রতার বন্ধন আরও শক্তিশালী হইয়া উঠিবে। প্রকাশ্যভাবে নিরপেক্ষ হওয়া সত্ত্বেও এই দুই দেশের সম্মিলিত কর্ম্মপন্থা গ্রহণের পক্ষে ইহার অপেক্ষা বড় যুক্তি আর নাই।"

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্র্যাটিক দলের নেতা মিঃ অ্যাডলাই ষ্টিভেনসন তাঁহার সাম্প্রতিক বিশ্বপরিক্রমা সম্পর্কে "লুক" পত্রিকায় এক প্রবন্ধে লিখিতেছেন, তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস যে বিশ্বশান্তি এশিয়ার উপরই নির্ভর করিতেছে। তিন মাস যাবৎ এশিয়ার নানাস্থানে ঘুরিয়া তাঁহার ধারণা হইয়াছে যে, "প্রাচীন সভ্যতার এই বিরাট ক্ষেত্রের অধিবাসীবৃন্দ এবং নূতন জাতিসমূহ লক্ষ লক্ষ দুর্গত জনের উন্নততর জীবনযাত্রা-প্রণালীর পক্ষে একনায়কতন্ত্র ও স্বাধীনতা-বাদের মধ্যে কোনটি যে সহায়ক হইবে তাহা স্বাধীনভাবেই বিচার

করিতে পারেন।" এশিয়ার দেশগুলিতে তিনি গণতন্ত্রের প্রতি অনুরাগ লক্ষ্য করিয়াছেন, "তবে ভাগ্যনির্ণয়ের এই নূতন মঞ্চক্ষেত্রে এশিয়ায় ভারতের নেহরুর মত অথবা পাকিস্তানের মোহম্মদ আলীর মত নেতা গণতন্ত্রকে যে কতখানি কার্য্যকরী করিতে পারিবে তাহার সম্পর্কে কিছু বলিতে হইলে আরও কয়েক বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে।"

এশিয়ার নেতৃবৃন্দ স্বাধীনতার জন্য প্রভূত ত্যাগবরণ ও সংগ্রাম করিয়াছেন। "ঐ নেতৃবৃন্দের মধ্যে অধিকাংশই প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের উপর আস্থাসম্পন্ন এবং উৎসাহ ও উদ্দীপনার জন্য অনেকেই বৈপ্লবিক ও গণতান্ত্রিক আমেরিকার উপর নির্ভর করিতেছেন।"

মার্কিন ভাইসপ্রেসিডেণ্টের এসিয়া ভ্রমণ

প্রথমে মিঃ অ্যাডলাই ষ্টিভেন্‌সন, পরে মিঃ ডালেস এশিয়ার দেশগুলি ভ্রমণ করিয়া যাইবার পর ওয়াশিংটন হইতে ৩১ জুলাই তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ, প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার ও পররাষ্ট্রসচিব মিঃ জন ফষ্টার ডালেসের বিশেষ অনুরোধক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট রিচার্ড এম. নিক্‌সন বর্তমান বৎসরের শেষের দিকে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি হিসাবে দূরপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়া সফরে বাহির হইবেন।

'মার্কিনবার্তা'র সংবাদে প্রকাশ, ভাইস-প্রেসিডেণ্ট নিক্‌সন যে সকল দেশ ভ্রমণ করিবেন, সেই সকল দেশের নেতৃবৃন্দের সহিত পরিচিত হইবেন এবং তাঁহাদের মতামত শুনিয়া আসিবেন। ইহা ব্যতীত ঐ সকল দেশবাসীর প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের এবং ব্যক্তিগতভাবে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের পক্ষ হইতে তিনি আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিবেন, প্রকৃতপক্ষে অভিজ্ঞতা অর্জনই তাঁহার এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য বলা হইয়াছে।

বিদেশে যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্যশস্য দান

বিদেশী রাষ্ট্রগুলিতে বন্যা বা ঐ প্রকারের কোন জরুরী অবস্থা দেখা দিলে যাহাতে অবিলম্বে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বৃত্ত কৃষিপণ্য তাহাদের সাহায্যের জন্য পাঠান যায় সেইরূপ ক্ষমতা প্রার্থনা করিয়া প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার গত ১০শে জুন কংগ্রেসের কাছে আবেদন জানাইয়াছেন। ১৯৫১ সনে ভারতকে যে গম ঋণ দেওয়া হইয়াছিল এবং সম্প্রতি পাকিস্তানকে যে ১০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য ঋণ দেওয়া হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার বলেন যে, উভয় ক্ষেত্রেই যদিও পণ্য ঋণদান কর্পোরেশনের মজুত পণ্য হইতে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে, তথাপি উভয় ক্ষেত্রেই কংগ্রেসকে অতিরিক্ত কাজের চাপ থাকা সত্ত্বেও এই জরুরী পরিকল্পনা বিবেচনা করিতে হইয়াছে। ফলে শুধু যে কংগ্রেসের কাজের বোঝা বাড়িয়াছে তাহাই নহে, জরুরী সাহায্যপ্রার্থী দেশকে আশানুরূপ দ্রুত সাহায্য দেওয়া সম্ভব হয় নাই। ভবিষ্যতে যাহাতে এইরূপ বিলম্ব না ঘটিতে পারে সেই হেতু তিনি প্রেসিডেণ্টের জন্য এই ক্ষমতা প্রার্থনা করিতেছেন, কিন্তু কেবলমাত্র দুর্ভিক্ষ অথবা অন্যান্য জরুরী অবস্থায় সাহায্য করিবার মধ্যেই এই ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকিবে।

তিনি বলেন, এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য এবং পারস্পরিক সাহায্য চুক্তির মূল উদ্দেশ্য এক নহে। তাঁহার কথায় "আমাদের মিত্ররাষ্ট্রবর্গকে তাহাদের দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক ও দেশরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করিতে সাহায্য করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিধান করাই পারস্পরিক নিরাপত্তা পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। আমি এখন যে পরিকল্পনাটির প্রস্তাব করিতেছি, অস্বাভাবিক ও জরুরী সমস্যার নিরসনই উহার উদ্দেশ্য।

প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের এই প্রস্তাব বৈদেশিক সম্পর্ক কমিটির সভাপতি সিনেটর আলেকজাণ্ডার ওয়াইলি এবং ডেমোক্র্যাটিক সিনেটর হার্বার্ট লেম্যানের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করিয়াছে।

রোজেনবার্গ দম্পতির ফাঁসী

গত ১৯শে জুন জুলিয়াস ও ইথেল রোজেনবার্গের ইলেকট্রিক চেয়ারে মৃত্যু হইয়াছে। সুপ্রীম কোর্ট মৃত্যুদণ্ড স্থগিত রাখিবার জন্য বিচারপতি ডগলাসের রায় নাকচ করিয়া দিবার পর শেষ মুহূর্ত্তে করুণা প্রার্থনা করিয়া প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের নিকট যে আবেদন প্রেরণ করা হয় প্রেসিডেণ্ট তাহাও নাকচ করিয়া দেন। তবে মৃত্যুর ঠিক পূর্ব্বে প্রেসিডেণ্টের পক্ষ হইতে একরূপ আশ্বাস দেওয়া হয় যে, যদি রোজেনবার্গ-দম্পতি সকল কথা খুলিয়া বলিতে সম্মত থাকেন তবে তাঁহাদের প্রাণ রক্ষা করা যাইতে পারে, কিন্তু তাঁহারা বলেন যে, "আমরা সত্য কথাই বলিয়াছি।"

এই মামলার ফলে আমেরিকায় এক কৌতূহলোদ্দীপক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। বিচারপতি ডগলাস আইনানুযায়ী মৃত্যুদণ্ড স্থগিত রাখিবার জন্য রায় প্রদান করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে কংগ্রেসের সম্মুখে অভিযুক্ত করিতে এক সজ্ঞবদ্ধ চেষ্টা চলিতেছে।

এই মামলার এক সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদান করিয়া "মার্কিনবার্তা" লিখিতেছেন যে, গুপ্তচর বৃত্তির ষড়যন্ত্রের জন্য এবং বিশেষ করিয়া একটি বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট আমেরিকার গোপন আণবিক তথ্য ফাঁস করিয়া দেওয়ার জন্য রোজেনবার্গ-দম্পতি ১৯৫১ সনের ৫ই এপ্রিল মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। যে সকল আদালত রোজেনবার্গদের আপীল-সমূহ বিবেচনা করিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকেই এই যুক্তিতে দণ্ডাদেশ বাতিল করিতে অসম্মত হয় যে, ১৯৫১ সনের মার্চ্চ মাসে তাঁহাদের বিচারের সময় যে মূল সাক্ষ্য প্রদান করা হয়, তাহা তাঁহাদের অপরাধ প্রমাণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট। ১৯৫০ সনে রোজেনবার্গ-দম্পতিকে গ্রেপ্তার করা হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার অভিযোগ করেন যে, রোজেনবার্গ-দম্পতি আণবিক বোমা-সংক্রান্ত গোপন তথ্য ফাঁস করিবার একটি চক্রান্তের কেন্দ্র। মিসেস ইথেল রোজেনবার্গের ভ্রাতা ডেভিড গ্রীনগ্লাস যখন নিউ মেক্সিকোর আণবিক পরীক্ষা-কেন্দ্রে আর্মি-সার্জেণ্ট নিযুক্ত ছিলেন, তখন তাঁহার নিকট হইতে এই গোপন তথ্য সংগৃহীত হয়।

১৯৫১ সনের ৬ই মার্চ মামলা আরম্ভ হয়। মার্কিন সরকার অভিযোগ সপ্রমাণের জন্য ২৩ জন সাক্ষী উপস্থিত করেন। সাক্ষ্য হইতে দেখা যায় যে, রোজেনবার্গ-দম্পতি গ্রীনগ্লাসের সামরিক দিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ পদের সুযোগ গ্রহণ করিতে কালবিলম্ব করেন নাই এবং নক্সা প্রভৃতি সংগ্রহ করিবার জন্য তাহাকে প্ররোচিত করেন। ৫ই এপ্রিল রোজেনবার্গদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় এবং এই ষড়যন্ত্রে অংশ গ্রহণের অপরাধে গ্রীনগ্লাসকে পনর বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

রায় প্রকাশের পরদিন অর্থাৎ ১৯৫১ সনের ৬ই এপ্রিল আসামী পক্ষের এটর্নীগণ পুনরায় নূতন করিয়া বিচারের জন্য আবেদন করেন। সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া রোজেনবার্গ-দম্পতির দণ্ডাদেশ বাতিল করিবার জন্য রোজেনবার্গের কৌঁসুলী এযাবৎ যত চেষ্টা করিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নরূপ:

১০ই জানুয়ারী ১৯৫২: যুক্তরাষ্ট্রের সারকিট কোর্ট অব আপীলে দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হয় এবং ২৫শে ফেব্রুয়ারী ইহা অগ্রাহ্য হয়। ১৩শে মার্চ আপীল অগ্রাহ্য করিবার বিরুদ্ধে পুনরায় শুনানীর আবেদন করা হইলে ১৯৫২ সনের ৮ই এপ্রিল আবেদন নামঞ্জুর করা হয়। ঐ বৎসর ১৭ই নবেম্বর সুপ্রীম কোর্ট এই সিদ্ধান্ত বহাল রাখেন। ১০ই ডিসেম্বর দক্ষিণ নিউইয়র্কের জেলা-আদালতে মৃত্যুদণ্ড স্থগিত ও দণ্ডাদেশ প্রত্যাহারের আবেদন করা হইলে তাহা অগ্রাহ্য করা হয়। ৩০শে ডিসেম্বর জেলা-আদালত আসামীগণকে প্রেসিডেণ্টের দয়াভিক্ষা করিবার জন্য নির্দেশ দেয়। ৩১শে ডিসেম্বর আপীল আদালত জেলা-আদালতের সিদ্ধান্তই সমর্থন করেন। ১৯৫৩ সনের ১১ই ফেব্রুয়ারী প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার ক্ষমা প্রদর্শন করিতে অস্বীকার করেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারী আপীল আদালত সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক পুনর্বিবেচিত না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুদণ্ড স্থগিত রাখিবার আবেদন মঞ্জুর করেন। ৩০শে মার্চ সারকিট কোর্ট অব আপীলের সিদ্ধান্ত বাতিল করিবার জন্য সুপ্রীম কোর্টের নিকট আবেদন করা হইলে সারকিট কোর্ট পুনর্বিবেচনার আবেদন নামঞ্জুর করেন। ২৫শে মে তৃতীয় বার আপীলের আবেদন সুপ্রীম কোর্ট অগ্রাহ্য করেন। ২৬শে মে প্রধান বিচারপতি ফ্রেড এম. ভিনসন মৃত্যুদণ্ডাদেশ স্থগিত রাখিতে অস্বীকার করেন। ২৭শে মে আপীল আদালতে দণ্ডাদেশ হ্রাস করিবার আবেদন করা হইলে ২রা জুন তাহা নামঞ্জুর করা হয়, মৃত্যুদণ্ডাদেশ স্থগিত রাখিতেও অস্বীকার করা হয়। ২৭শে মে জেলা-আদালতে এই মর্মে আবেদন করা হয় যে, ভ্রমক্রমে মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদান করা হইয়াছে, অতএব উহাকে হ্রাস করা হউক অথবা প্রত্যাহার করা হউক। ১লা জুন ঐ আবেদন অগ্রাহ্য হয়। ২রা জুন উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল আদালতে আপীল করা হয়। ৫ই জুন আপীল আদালতে আবেদন অগ্রাহ্য করা হয়। ৬ই জুন নূতন সাক্ষ্যের ভিত্তিতে নূতন করিয়া বিচার করিবার জন্য জেলা-আদালতে আবেদন করা হইলে ৮ই জুন তাহা অগ্রাহ্য হয়। ১২ই জুন আপীল আদালত উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল অগ্রাহ্য করে।

"মার্কিনবার্তা" জানাইতেছেন যে, রোজেনবার্গরা ন্যায়বিচার পান নাই বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়াছে যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদপত্র এবং ধর্মীয় ও জাতীয় সংস্থাসমূহ প্রকাশ্য ভাবে তাহার নিন্দা করিয়াছে। মার্কিন ব্যক্তিস্বাধীনতা সঙ্ঘ বলেন, "রোজেনবার্গ দম্পতির উপর এই দণ্ডাদেশ প্রদান করিয়া ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করা হয় নাই।" "ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটরে"র সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মন্তব্য করা হইয়াছে, "রোজেনবার্গ-দম্পতির বক্তব্য বিচারালয় পুরাপুরিই শুনিয়াছে এবং সেই সম্বন্ধে সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছে।"

কিন্তু রোজেনবার্গ মামলার এই সরকারী বিবরণীর বাহিরে ইহার অপর একটি দিক রহিয়াছে যাহা ভারতবাসীর নিকট তত স্পষ্ট নহে। বিচারের আরম্ভে সরকার পক্ষ যে সকল সাক্ষীকে উপস্থিত করিবেন বলিয়াছিলেন সেই সব সাক্ষীর মধ্যে ছিলেন আমেরিকার বিখ্যাত আণবিক বৈজ্ঞানিক ডাঃ হ্যারল্ড ই. উরে এবং অধ্যাপক ওপেনহিমার। কিন্তু কোনও কারণে সরকার পক্ষ ডাঃ উরে বা অধ্যাপক ওপেনহিমার কাহাকেও সাক্ষ্য হিসাবে উপস্থিত করেন নাই। ডাঃ উরে এই বিচারকে সম্পূর্ণ ভাবে অন্যায় বলিয়াছেন। অধ্যাপক আইনষ্টাইন প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীরাও এই দণ্ডের কঠোরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছেন, এমন কি স্বয়ং পোপ পর্যন্ত রোজেনবার্গ-দম্পতির প্রতি দয়া প্রদর্শনের জন্য অনুরোধ জানাইয়াছিলেন।

লণ্ডন হইতে ২০শে জুন প্রেরিত সংবাদে রয়টার জানাইতেছেন যে, বিভিন্ন দেশের পত্রপত্রিকাই এই দণ্ডদান সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছে। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত ফাঁসোয়া মরিয়াক বলিয়াছেন, "আমি বিশ্বাস করি রোজেনবার্গ-দম্পতি নির্দোষ।" প্যারিসের উদারপন্থী পত্রিকা এবং নিরপেক্ষ ল মঁ (Le Monde) লিখিতেছেন, "মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা ভুল হইয়াছে।" মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি ফ্রাঙ্কফুর্টার বলিয়াছেন যে, ন্যায় বিচারের সকল সুবিধা দেওয়া হয় নাই বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহার মধ্যে কিছু সত্য আছে। তিনি বলেন, আণবিক শক্তি আইন বা গুপ্তচরবৃত্তি আইন এই দুইয়ের কোন্‌টির দ্বারা রোজেনবার্গ-দম্পতির বিচার হইবে সে সম্পর্কে অভিযোক্তা ও অভিযুক্ত উভয় পক্ষকেই বলিবার সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহার নাগরিককে দোষী সাব্যস্ত করিয়া দণ্ড দিলে বিদেশের কাহারও সে বিষয়ে কিছু করিবার অধিকার বা ক্ষমতা নাই। যদি ইহা সত্য হয় যে, ঐ দম্পতি দেশদ্রোহিতা ও বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়াছেন তবে তাঁহাদের দণ্ড হওয়া উচিত সন্দেহ নাই। কিন্তু সাধারণতন্ত্র-চালিত দেশে বিচার ও দণ্ড দুই-ই সন্দেহের অতীত হওয়া উচিত। এই ব্যাপারে, যে কারণেই হউক, বহু লোকের মনে একটা সন্দেহ জাগিয়াছে যে, হয় ত প্রাণদণ্ড এক্ষেত্রে না হইলেও হইতে পারিত। সে সন্দেহ যথার্থ কিনা বিচারের পূর্ণ তথ্য আমাদের সম্মুখে নাই, সুতরাং সে বিষয়ে মন্তব্য অবান্তর।

শাহজাদা দারাশুকো

শাহজাহানের শেষ দরবার

[১৮ই মে ১৬৫৮ খ্রীঃ]

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো

সামুগড় যুদ্ধের মাত্র এগার দিন পূর্ব্বে শাহজাদা দারার বিদায়-সম্বর্দ্ধনার জন্য আগ্রা দুর্গের দরবার-ই আমে আহূত অনন্যসাধারণ আড়ম্বরপূর্ণ দরবারই সম্রাট শাহজাহানের শেষ দরবার, দারার এই "রুখসত" [প্রস্থানের অনুমতি] পিতা ও ভগ্নী জাহানারার নিকট হইতে শেষ বিদায়। এই দরবার উপলক্ষ্য করিয়া সুবিলাসী দিল্লীশ্বরের অপরিমেয় ঐশ্বর্য্য ও সাম্রাজ্যাভিমানের অচিরস্থবিলাস,—এই যুগে অতীতের রঙীন স্বপ্ন, অর্ব্বাচীনের কল্পনাবিলাস।

জাঠ মারাঠা-ইংরেজ দানব মর্দ্দিত মোগলের এই ইন্দ্রপুরীর দরবারগৃহ ও রাজান্তঃপুরের বর্ত্তমান শোকাবহ কঙ্কালের বাস্তব রূপ প্রদান ঐতিহাসিকের অতি সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও নজীর প্রমাণের গণ্ডীর মধ্যে সম্ভব নয়। ধ্যান-ধারণায় ঐতিহাসিক হয়ত উহার ছায়াদর্শনলাভ করিতে পারে, কিন্তু ঐ অস্থিপঞ্জরে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে না।

মধ্যযুগের সাহিত্য, ইতিহাস, বিদেশীয়গণের ভ্রমণবৃত্তান্ত, মোগলচিত্রকলা, পুরাতত্ত্ব এবং দিল্লী-আগ্রার ধূলিধূসর ও বিলুপ্তপ্রায় অলিখিত লোককাহিনীর মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর এবং হয়ত সত্য,—উহা তিল তিল সংগ্রহ করিয়া মোগল ইতিহাসে তিলোত্তমা সৃষ্টির প্রয়াস গরীবের পক্ষে ছেঁড়া চাটাইয়ের উপর শুইয়া সোনার ইটে কাফুরের খামিরায় গাঁথা সাত মহল রাজবাড়ীর মধ্যে সালঙ্কারা ঘুমন্ত রাজকন্যার কাহিনী শুনাইবার বাতিক নিরাপদ নয়; তবে বিস্মৃতি অপেক্ষা বাস্তবতার কাছাকাছি স্বপ্ন হয়ত ভবিষ্যতে সত্যের স্বরূপ নির্ণয়ের সহায়ক হইতে পারে। ঐতিহাসিকের কিন্তু স্বপ্নেও সোয়াস্তি নাই, কারণ সে তাহার সংশয়াত্মক বিচার-বুদ্ধিকে ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিলে উহাই দুঃস্বপ্নের মত বুকের উপর চাপিয়া বসে।

২

আগ্রাদুর্গে শাহজাহানের দেওয়ান-ই-আম দালানে তাজমহলের অম্লান রূপসজ্জা নাই, সুকুমার শিল্পকলার রত্ন-দুকুল নাই, মোতিমসজিদের বিবিধ প্রস্তরসমাবেশে বর্ণ-বৈচিত্র্য নাই; এমন কি মসনদ-ঝরোকা ব্যতীত অন্যত্র সাধারণ সাদা মার্বেল পাথরও বিশেষ নাই। মসনদ-ঝরোকায় যাহা কিছু মর্ম্মর পাথরের কাজ আছে উহাও ফতেপুরসিক্রীর মসজিদ প্রাঙ্গণস্থ সেলিম চিশ্‌তীর মকবরার তুলনায় কিছুই নয়। সুবিলাসী সুরুচিসম্পন্ন সম্রাটের প্রকাণ্ড দরবার-গৃহের এই দৈন্য কেন? শাহানশাহ এই ক্ষেত্রে কিছু সস্তার কাজ সারিয়াছেন, লাল বেলেপাথরের উপর মর্ম্মরপাথরের চূণ-খামিরার মোটা আস্তর লাগাইয়া ঠাট বজায় রাখা হইয়াছে মাত্র; এইখানে সৌন্দর্য্যের মালমসলার অভাব স্থপতিকারের সুরুচি ও নৈপুণ্যগুণে হয়ত লোকের চোখে পড়ে না। যিনি তাজের সমাধির মসৃণ মর্ম্মর পাথরের গায়ে রংবেরং পাথরের ফুল ফুটাইয়াছেন [*Pietra dura*], দিল্লীর শাহীমহলে স্বর্গ-নদীর [নহর্-ই-বিহিশ্‌ত] খাতে পাথরের বৈচিত্র্যময় ঢেউ তুলিয়াছেন, দরবার-ই আমে তিনি প্রস্তরের সজ্জায় উদাসীন হইলেন কেন?

আসল কথা, দেওয়ান-ই আমে যাহা স্থায়ী কিছু ছিল এবং এখনও আছে উহা ইহার আসল দরবারী চেহারা নহে, বড়লোকের বাড়ীতে যাত্রার ভাঙা আসর, বাঁশ-খুঁটির মানান-সই কাঠামো,—অথচ মোগলের দরবার-ই-আমে আসিলেই রুমী-বাগীশ ঐশ্বর্য্যস্পর্দ্ধী ইরাণের ইল্‌চীর [রাজদূত] চক্ষু চড়কগাছ হইত, ইউরোপীয় পর্য্যটকগণ হতভম্ব হইতেন, দরবারী ঐতিহাসিকের কবি-কবি ভাব হইত, মোল্লারা কেতাবী নজরে দেখিত এই দরবার হজরত সুলেমান নবীর* তখ্‌ত-গাহ,—যাদু এবং "জিন দেও"র কাণ্ডকারখানা।

শাহজাহানের বাপ পিতামহের আমলে খোলা ময়দানে "বারগাহ" তাঁবুর (reception tent) ছায়ায় আম বা প্রকাশ্য দরবার বসিত। তিনিই সর্ব্বপ্রথম দিল্লী-আগ্রার দেওয়ান-ই-আম প্রাসাদ প্রস্তুত করান। সেকালে খোলা ময়দানের এক অংশে লাল কাপড়-মোড়া কাঠের ঘেরার (red railing) মধ্যে সিংহাসনের সম্মুখে উচ্চপদস্থ মনসব-

* হজরত সুলেমান নবী (B.b. Solomon, son of David) খোদার বরকতে শয়তান, জিন ও "দেও"গুলির উপর হুকুম চালাইতেন। যে গালিচার উপর তাঁহার দরবার বসিত সেই গালিচা যাদুবলে তাঁহার পুরা ফৌজকে লইয়া সকালবেলা বায়েত-উল্‌-মোকদ্দস জিরুসালেম (সিরিয়ার রাজধানী) হইতে উড়িয়া সন্ধ্যাবেলা আফগানিস্থানের তখত-ই-সুলেমান পাহাড়ের উপর নামিত। দুনিয়ার সমস্ত পাখী আকাশ জুড়িয়া তাঁহার ভ্রাম্যমাণ গালিচায় রোদ লাগিতে দিত না।

দার, উজীর, মীরবখ্‌শী প্রভৃতি অভিজাতবর্গের দাঁড়াইবার স্থান ছিল, বাদবাকী এই লাল বেষ্টনীর বাহিরে। শাহ-জাহানের নবনির্ম্মিত সভাগৃহে লাল বেষ্টনীর পর ক্রমশঃ ক্ষুদ্রতর এবং সিংহাসনের অধিকতর নিকটবর্ত্তী পর পর আরও দুইটি রূপা ও সোনার বেষ্টনী ছিল। বাহিরের প্রাচীরবেষ্টিত ময়দানে পূর্ব্ববৎ "বারগাহ্" কিংবা "গুলাল-বার" তাঁবু ও সামিয়ানার নীচে নয় শতী এবং ইহার নিম্নতর মনসবদারবর্গ, অর্থী, প্রত্যাশী এবং দর্শকগণের দাঁড়াইবার নিয়ম ছিল। এই দেওয়ান-ই-আম দরবার ব্যতীত অন্য সময়ে বাহিরের ফটকে তালা-চাবি বন্ধ হইয়া থাকিত; সুতরাং অন্দরমহলের ফরাশ্ [বস্ত্রাগারের ভৃত্য], ভিস্তী প্রভৃতি ব্যতীত বাহিরের কোন লোকের নজর এই স্থানে পড়িত না। শাহজাহান এই জন্যই অস্থানে অপব্যয় করেন নাই; এই সভাগৃহ সোনার ইট তৈয়ারী হইলেও উহার নীচে উপরে দামী গালিচা ও মখমল-বনাতে দরবারের সময় ঢাকা পড়িত, সোনা কোথায়ও হয়ত নজরে পড়িত না। তাঁবুকে প্রাসাদোপম এবং পাকা দালানকে গালিচা বনাতে জমকালো তাঁবু করিতে না পারিলে বাদশাহী শান্ কোথায়?

৩

দেওয়ান-ই-আম তিন দিকে খোলা তিন সারি যুগ্ম-স্তম্ভের উপরে ছাদবিশিষ্ট এবং মালালঙ্কারী (foliated) খিলানবিথীত্রয় শোভিত শাহী "বারাদরী"। এই দালানকে অন্তঃপুরস্থ মচ্ছীভবন চকের দ্বিতল বারান্দার পশ্চিম পিঠে উহার সমান উচ্চ একতলা বাহির-বারান্দা বলা যাইতে পারে। দৈর্ঘ্যে প্রায় ৬৭ গজ, প্রস্থ ২২ গজ এক ইঞ্চি এবং সম্মুখস্থ ভূমিতল হইতে ৪ ফুট উচ্চ ভিত্তির উপর এই সভাগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। সভাগৃহের মধ্যভাগে পশ্চিমাংশে মচ্ছীভবনের দোতলা হাওয়া-মহলের সহিত সংলগ্ন এবং সংযোগদ্বারযুক্ত অনতিপরিসর সিংহাসন-অলিন্দ বা মসনদ-ঝরোকা। মর্ম্মর পাথরের তিনটি (পিছনে পর পর) খিলানের উপর শাহানশাহের তখ্‌ত-গাহ্ অর্থাৎ ময়ূর-সিংহাসনের এই পাদপীঠ অবস্থিত; উপরে পুরুষপ্রমাণ উচ্চ মর্ম্মর-প্রস্তর নির্ম্মিত সুকুমার ক্ষুদ্র স্তম্ভসংবিষ্ট খিলানযুক্ত বৃত্তাকার ঢালু [curvilinear] ছাদ, পিছনে ডান দিকে এক জন লোক (ভিতর হইতে) যাতায়াতের উপযুক্ত একটি ছোট দরজা, বামদিকে প্রায় ঐ মাপের দ্বার-রক্ষিত সিঁড়ি নীচে সভাগৃহতল পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। উচ্চতায় এই সিংহাসন মণ্ডপ নিমন্ত্রিত উদ্বাহু মানবেরও সুখলভ্য নহে;

এই জন্য সিংহাসনের সামনে নীচে চারপায়াযুক্ত প্রায় দেড়-হাত উচ্চ মর্ম্মর পাথরের ছোট চৌকি। লোকে এই আসনকে "বৈঠক" বা উজীর আজমের বসিবার স্থান বলে; আসলে কিন্তু উজীরেরও দরবারে বসিবার হুকুম ছিল না; ইহার উপর দাঁড়াইয়া তিনি আরজি পেশ করিতেন, কিংবা সম্রাটকে জ্ঞাতব্য বিষয় নিবেদন করিতেন। সিংহাসন-মণ্ডপের নীচে সম্মুখস্থ খিলান ও সিঁড়ির মধ্যবর্ত্তী স্থানে তিন দিকে চলা-চলের পথ ছাড়িয়া ছোট লাল বেষ্টনীর মধ্যে কুনিশ-গাহ্, অর্থাৎ কুনিশ করিয়া সম্রাটের দৃষ্টিপথে আহুত ব্যক্তির দাঁড়াইবার স্থান। ইহার দুই দিকে সোনার আবেষ্টনী (railing) মধ্যে উম্‌দাত উল্-মুল্‌ক অর্থাৎ পাঁচ হাজারী ও তদূর্দ্ধ মনসবধারী অভিজাতবর্গের স্থান। স্বর্ণ-বেষ্টনীর কিঞ্চিৎ পিছনে অনুরূপ দীর্ঘতর এবং প্রশস্ততর রৌপ্য-বেষ্টনী [railing], উহার পিছনে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে পশ্চিম বারান্দায় সভাগৃহের সম্মুখভাগ জুড়িয়া বহুমূল্য বস্ত্রসজ্জিত দারু-বেষ্টনী। রৌপ্য বেষ্টনীর মধ্যে সারিবদ্ধভাবে "জাত সওয়ার" পদমর্য্যাদা [seniority of rank and status] অনুসারে বামে দক্ষিণে, সম্মুখে পিছনে নির্দ্দিষ্ট তিন হাজারী হইতে সাড়ে চার হাজারী মনসবদারগণের, এবং কাষ্ঠ-বেষ্টনীর মধ্যে হাজারী হইতে আড়াই-হাজারীগণের স্থান।

সম্রাট এবং দরবার-সভার দৃষ্টির অন্তরালে দেওয়ান-ই-আমের দক্ষিণ বারান্দায় যাঁহাদের নাম মনসব-প্রাপ্তির জন্য কিংবা খেলাত প্রাপ্তির জন্য নির্ব্বাচিত বিশিষ্ট ব্যক্তি (যথা রাও ছত্রশাল হাড়ার সন্তান ও জ্ঞাতিপ্রধানগণ), অথচ মনসবদার নহেন—তাঁহারা অপেক্ষা করিতেন। এই স্থান আমীরগণের আরামগাহ বা কার্পেটসজ্জিত সে কালের lounge বলা যাইতে পারে। দরবার বসিবার পূর্ব্বে তাঁহারা এইখানে বসিয়া আলাপাদি করিতেন। এই দিকের সিঁড়ির নীচে উচ্চপদস্থ আমীরগণের পরিচারকবর্গের অপেক্ষা করিবার জায়গা। উত্তর বারান্দায় পটগৃহের এক অংশে দরবারের দানসামগ্রী—যথা তাম্রমুদ্রার [দাম] হাজারী তোড়ার স্তূপ, এক শত সিক্কা টাকা ভর্ত্তি থলিয়ার গাদা, আশরফী ভরা গালা ও রেশমী থারিতা (bag), নয়, সাত, পাঁচ ও তিন প্রস্ত [*parcha*] খিলাতের স্তূপ, রত্নখচিত তরবারি কাটার [dagger], জমধার (broadsword) ও অন্যান্য দ্রব্য। এইখানে সংশ্লিষ্ট বিভাগের দারোগা, মুস্তৌফী ও কেরানীগণের ছোটখাট অস্থায়ী দপ্তর। সম্রাট যাহাদিগকে যাহা দিবেন উহাদের নাম ও দ্রব্যাদির ফিরিস্তি পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইত, এবং প্রত্যেক জিনিষের উপর প্রাপকের নামের কাগজ আঁটা থাকিত। সম্রাট নজরস্বরূপ যে সমস্ত জিনিষ, টাকা, আশরফী গ্রহণ করিতেন ঐগুলি নজর-তহবিলের খাজাঞ্চীর

অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণ এইখানে জমা করিয়া লইত। এই বারান্দায় পর্দ্দায় ঘেরা পোশাক পরিবার কামরা। সম্রাটের হুকুম হইলে দরবারে অনুগৃহীত ব্যক্তিগণ এইখানে নূতন খেলাত বস্ত্র পরিধান কিংবা অস্ত্রাদি ধারণ করিয়া দরবারে সম্রাটকে "তসলীম" করিতেন।

দেওয়ান-ই-আমের সম্মুখে ইষ্টক-প্রাচীর রক্ষিত ৫০০ ফুট দীর্ঘ ৩৭০ ফুট প্রস্থ সুষমা দরবার-প্রাঙ্গণ। এই ময়দানের পশ্চিম সীমায় কাঠের পাল্লাযুক্ত বিরাট ত্রিপোলিয়া তোরণ। এই তিন দরজাযুক্ত ফটকের মধ্য দরজা সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত ও উচ্চ, কিন্তু পাশের ছোট দরজা দুইটির মধ্য দিয়াও হাতী যাতায়াত করিতে পারিত। এই ফটকের উপরে দরবারী নহবতখানা। শাহজাদা হইতে সাধারণ প্রজা পর্য্যন্ত সকলের জন্য ইহাই একমাত্র প্রবেশ ও নির্গম পথ [বর্ত্তমানে নিশ্চিহ্ন]; দরবার ছাড়া অন্য দিন ইহা তালাবদ্ধ থাকিত। এই ময়দানের চারিদিকে চার-রশি অর্থাৎ প্রায় ৩২।৩৩ হাত জায়গা ছাড়িয়া মধ্যস্থলে আকবরশাহী বার-গাহ্ (reception tent) খাটাইয়া উহার ভিতরে সিংহাসনের মুখোমুখি পট-মণ্ডপের মধ্যে নরশতী হইতে বিশ্‌তি (বিশ জনের নায়ক) পর্য্যন্ত মনসবদারগণের স্থান করা হইত। এই বারগাহ্ এবং ফটকের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বারগাহ্-সংলগ্ন শামিয়ানার ছায়ায় মোটা শতরঞ্জীর উপর রঙীন মাদুর বিছাইয়া দর্শক এবং অর্থী-প্রত্যর্থীগণের দাঁড়াইবার স্থান করা হইত।

৪

সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বে ভারতবর্ষে ঐশ্বর্য্যের ভরা জোয়ার। হিন্দুস্থান তখন ধনসম্পদে একালের মার্কিণ মুলুক—সোনারূপা হীরাজহরত পৃথিবী ঘুরিয়া আসিয়া যে দেশে শেষ সমাধিলাভ করিত, দুনিয়ার প্রায় একচেটিয়া বাজারে যে দেশের বেচিবার কাঁচা-পাকা মাল ছিল অফুরন্ত ও অসংখ্য রকমের, বাহির হইতে শুধু আমদানী হইত হীরা-জহরত ইরাণ-তুরাণের ঘোড়া, রুমী বনাত, ইরাণী গালিচা, বিলাতী আয়না-পিস্তল এবং কয়েকটি চটকদার অপ্রয়োজনীয় শখের জিনিষ।

মোগল দরবার ছিল মধ্যযুগে দেশ-বিদেশের রত্ন আকর্ষণ-কারী শক্তিমান্ চুম্বক-প্রস্তর; মোগল সাম্রাজ্যে প্রজার ঘরে জহুরীর চোরাবাজারে দুর্লভ হীরা, মণিমুক্তা কিংবা রাজাদের সভায় মনুষ্য-রত্ন আত্মগোপন করিবার উপায় ছিল না। আকবরের আমলে বাদশাহী চরের শ্যেনচক্ষু প্রাচীন বিদ্যার পুঁথি, অনাদৃত বিদ্যা এবং গুণী-জ্ঞানী মনুষ্যরত্ন খুঁজিয়া বেড়াইত। জাহাঙ্গীর ছিলেন স্ত্রী-রত্ন, সুপেয় শরাব, সুনিপুণ চিত্র ও চিত্র-শিল্পী, দুনিয়ার আজব জানোয়ার পশু-পক্ষীর সন্ধানে। জাহাঙ্গীর বাদশাহ "রত্নের" খবর পাইলে ন্যায় অন্যায় বিচার হারাইয়া ফেলিতেন, স্থান-অস্থান বিবেচনা করিতেন না।*

পিতৃপিতামহের এই লোভ সম্রাট শাহজাহানের মধ্যে তৃপ্তির অতীত রত্নলালসায় পরিণত হইয়াছিল। শাহজাহানের ঐশ্বর্য্যের পরিমাপ ময়ূর-সিংহাসন নহে। ময়ূর-সিংহাসনের উপযুক্ত সভামণ্ডপে, দরবার-সজ্জার গালিচা-বনাত এবং সম্রাটের দরবারী পোশাক অস্ত্রণে আরও এক রত্ন-সিংহাসনের ধন প্রোথিত ছিল।

শাহজাহানের দরবার-মজলিস, ঈদ, শাহজাদাগণের বিবাহ-উৎসব ও শোভাযাত্রার সর্ব্বাপেক্ষা বিশদ ও চিত্তাকর্ষক বর্ণনা মহম্মদ সালেহ কাম্বোলিখিত ইতিহাসে পাওয়া যায়; কিন্তু তিনি অলকার যক্ষ—অলকাপুরী ছাড়িয়া রামগিরিতে আসিবার দুর্ভাগ্য তাঁহার হয় নাই; সুতরাং প্রবাসী কিংবা পর্য্যটকের চোখে দিল্লী দরবারের ঐশ্বর্য্যচ্ছটা ও খুঁটিনাটি ব্যাপার বর্ণনা করিবার তাঁহার প্রয়োজন হয় নাই—কিম্পুরুষ বর্ষের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য কিন্নরের মুখে ভাষা পায় না। এতদ্দেশীয় ঐতিহাসিকের অত্যুক্তি ও অস্পষ্টতা দোষ বিদেশীয় পর্য্যটকগণের ভ্রমণ-কাহিনীর সাহায্যে কথঞ্চিৎ দূর করা যায়; কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বাজার গুজব শুনিয়াছেন, কেহ কেহ বর্ণান্ধ, কেহ চোখে দেখিয়াও উল্টা দেখিয়াছেন—যথা টেরী সাহেব কর্ত্তৃক হাতীর কপালের কাছাকাছি উহার লম্বমান অণ্ডকোষ-দর্শন।†

শাহজাহানের রাজত্বকালে এই আসুরিক ঐশ্বর্য্যের আড়ালে এদেশে দুঃখ-দৈন্য, ধনী ও শাসকের শোষণ, গরীবের অনশন-অর্দ্ধাশন সবই ছিল, অথচ শহরে দরবারে মধ্যবিত্ত, এমন কি ছা-পোষা গরীবের চালচলন ও কাপড়-চোপড়ে অঠেল ঠাট, দরবারীগণের আমিরী শানের কথাই নাই। দেশীয় বিদেশীয় সমস্ত লেখক রাজদ্বারে, দরবারে অন্দর-

* লাভের আশায় হীরানন্দ জহুরী এক লাখ টাকায় এক খণ্ড হীরা গোপনে কিনিয়াছিল। জাহাঙ্গীর এই খবর পাইয়া তাহার কাছে কৈফিয়ত তলব করিলেন। প্রাণ বাঁচাইবার জন্য হীরানন্দ জানাইল, হুজুর! খবর ঠিক; তবে কোন দিন যদি গরীবের বাড়ীতে জাহাঁপনার কদম-মোবারকের মেহেরবাণীর ধূলা গোলামের মাথায় পড়ে তাহা হইলে গরীবের হেসিয়ৎমাফিক্ কিছু নজর দাখিল করিবার জন্যই এই সামান্য জিনিষ যোগাড় করা হইয়াছে! বলা বাহুল্য, আলা হজরত দেরী করিলেন না, হীরানন্দের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইয়া দক্ষিণাস্বরূপ ঐ হীরকখণ্ড লইয়া আসিলেন; বাদশাহী চেলা-চামুণ্ডা দলকে সন্তুষ্ট করিতে কৃপণের বোধ হয় আরও পঞ্চাশ হাজার বাহির হইয়া গেল। (**Forster**, ***Early Travels***, [**Hawkins**],)

† টেরী সাহেব (১৬১৬-১৯ খ্রীঃ) লিখিয়াছেন, "...the males testicles lye about their forehead and females (female's) teats are betwixt her forelegs .." (Forster, *Early Travels in India*, p. 307)

মহলে প্রায় সব বস্তুই "রত্নজড়িত" [ফাঃ মোরাচ্ছা] কিংবা "studed with jewels" লিখিয়াছেন; সোনা ছাড়া কথাই নাই, রূপা কদাচিৎ; সেগুলি আবার "মিনা"র চটক ছাড়া নজরেই পড়ে না। বেগম-বাদশাহ ও ভারিক্কি আমীরের পোশাকে ঢাকাই ও বুরহানপুরী মসলিন ছাড়া কোরা সাদা অপাঙ্‌ক্তেয়, সাদা থান সেকালেও বাঙ্গালী বিধবা ও পাকা-দাড়ি কাজী-মোল্লা ছাড়া অন্য কেহ কদাচিৎ ব্যবহার করিত। সাদার কদর থাকিলে হিন্দুস্থানে "রং-রেজ" ব্যবসা জাঁকিয়া বসিত না। মসলীনের সুবিধা তিন প্রস্ত পোশাক* পরিলেও গায়ের রং, জহরতের ঝলক ঢাকা পড়ে না, অথচ আরামের হানি হয় না।

যখন বয়স ছিল তখন বাদশাহ আহমদাবাদের উজ্জ্বল রঙীন মখমল পছন্দ করিতেন, বৈচিত্র্যের মোহে তিনি মর্ম্মরের শুভ্র আভিজাত্য বিবিধ বর্ণভাস্বর প্রস্তরের পুষ্পিত-পট দ্বারা [*pietra dura*] সজ্জিত করিয়া চিত্র-বস্ত্রানুকারী করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, শাহী ঘোড়া ও পালকীর ডাণ্ডা, শায়েস্তা খাঁর ওজুর বদনা, জাফর খাঁর হুক্কা, বেগম সাহেবার দাসীর গায়ে, খলিউল্লা খাঁর বিবির পায়ে লাখ টাকার চটি জুতায় বড়লোকের ঘরে সেকালে সোনা মুক্তা চুনীর ছড়াছড়ি—পড়িলেই মনে হয় ইহা যেন রাজা ভোজের সভা-পণ্ডিতের বাড়ীতে জঞ্জালের গাদা হইতে ডালিমের দানা ভ্রমে চুনীর টুকরা গিলিয়া পোষা টিয়া পাখীর মরিবার অবস্থা! রাজা-বাদশাহ, উজীর-আমীর জমিদার-মনসবদারের জীবন-যাত্রার ব্যাপারে শাহী ঠাট না হয় মানিয়া লওয়া গেল; কিন্তু মামুলী মনসবদারের আমীরী ভড়ং, মুচ্ছুদ্দীর দেওয়ানজী-চাল, বিশ টাকা মাহিনার সওয়ারের গায়ে আকবরী সিক্কায় ১॥০ গজের বাকৃতার লম্বা আঙ্গরাখা এবং ঘরে বিবির জন্য কমপক্ষে ছয় টাকা গজের আকবরশাহী মলমল "ডোরিয়া" [বাং—ডুরে] ছিটের ইজার-শালোয়ার, জরদোজী ফুলদার আঙ্গিয়া, কাশ্মীরী শালের ওড়নী বা দোপট্টা [সাধু—রুহপট্টা], নাকে হীরার নথ, কানে মোতির দুল, গলায় চুনী-মুক্তার হার, পায়ে জড়োয়া মখমলের চটি কেমন করিয়া সম্ভব হয়?

অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। এই যুগের মত সেকালেও সমাজে ভড়ং বজায় রাখিবার তাগিদে সস্তায় আমীরী করিবার অনুকূল ব্যবস্থা ছিল—যথা, বার রকমের হীরা, ষোল রকমের মুক্তা, বার কিসিমের চুনী পান্না। আকবরশাহী আমলে সর্ব্ব নিকৃষ্ট শ্রেণীর হীরার রতির দাম ১৸০ আনা হইতে।০ আনা, মুক্তা দশ দাম অর্থাৎ।০ হইতে ৵০, চুনী ও অন্যান্য পাথর পৌনে মোহর ["ইলাহী"=১০৲] হইতে চার আনা। গরীবের জন্য ইহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট শ্রেণীর হীরা-চুনী-মুক্তা আরও সস্তায় বাজারে পাওয়া যাইত, তবে আবুলফজল দাম লিখেন নাই।* এই দেশে ছোট চাকুরিয়া এবং খানদানী গরীবের চিরকালই সেই এক অবস্থা—যাহাকে বলে "ঘরে ঠেঁটি-গামছা, বাহিরে জামা-জোড়া"। পাঠান খাঁ সাহেব যখন দরবারে যাইতেন তখন পোশাকে তিনি একজন হোম্‌রা-চোমরা বাহাদুর, দামী ঘোড়ার উপর সওয়ার, আগে পিছে ঐ দিনের জন্য দোস্তের নিকট হইতে ধার-করা, না হয় ভাড়াটে চাকর-নোকর। দরবার হইতে ফিরিয়া ঘরের চৌকাঠ পার হইলেই তাঁহার কোমরে লুঙ্গী, মাথায় ছেঁড়া কাপড়ের রুমালে বাঁধা বাবরী চুল এবং চাটাইয়ের উপর বসিয়া সস্তা বাসি গোমাংসের কালিয়া সহযোগে চাপাটী-চর্ব্বণ কিংবা অগত্যা নিরামিষ খিচুড়ী ভক্ষণ।† বোধ হয় এই শ্রেণীর শেখ সৈয়দেরও প্রায় এই রকম অবস্থা, বেচারা পাঠানের খাম্‌কা বদনাম। ইহাতে অবাক্ হওয়ার কিছুই নাই; লেপাফা দুরস্ত না রাখিলে কোন কালেই চলে না। কলিকাতার মেসের "কার্ত্তিক" বাবুর ঘরে পায়খানায় সকাল সন্ধ্যায় লাল গামছা, দ্বিপ্রহরে আপিসের ধুতি জামা, দিনান্তে গিলা-কোঁচান শান্তিপুরী; কিংবা বড়-বাজারের বাটপাড়িয়ার ঘরে ময়লা ধুতি কাটা ফতুয়া আহারে আচারসহ শুকনো রুটি এবং আড়তে যাওয়ার সময়, মাথায় জয়পুরী "চীরা"; হাতে পেঁচদার মোটা তাগা, গলায় হার, গোঁফে চবচবে কাঁচা ঘি। মীর্জ্জাই ভড়ঙে লক্ষ্ণৌর জুড়ি এখনও নাই। কাশ্মীরী মহল্লায়, চকে এবং হালে হজরতগঞ্জে দেখিতে পাইবেন মীর্জ্জা সাহেবের গায়ে সন্ধ্যাবেলা ধোপা বাড়ীর ভাড়া-করা ধবধবে চুড়িদার পায়জামা; মিহি চিকন দোজী আঙ্গরাখার ঝুল, মাথায় মলমলের টুপী কিংবা পাগড়ী; জামার এক জেবে ছোলা ভাজা, অন্য জেবে গুটিকয়েক এলাচ; চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি; পরিচিত লোক কেহ নজরে পড়িলেই তাড়াতাড়ি ছোলা ভাজা গিলিয়া মুখে এলাচী অর্পণ এবং নিতান্ত সপ্রতিভ ভাবে বিনয়-নম্র সম্ভাষণ ও দুই-চারিটা এলাচী রুমালের উপর রাখিয়া "ইলায়চী কবুল ফরমাইয়ে, জনাব!" আসলে যাহাই হউক, লক্ষ্ণৌর অবস্থা-বিপর্য্যয়গ্রস্ত খানদানী মুসলমান পুরাতনের ধারা এখনও বজায় রাখিয়াছে;—মুখে বড় বড় কথা, "হাঁ"

* কথিত আছে, কন্যা জেব্-উন্নিসা তিন পরত মসলীনের পুরা পোশাক পরিয়া একদিন আওরঙ্গজেবের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বিরক্তির সহিত মুখ ফিরাইয়া বলিয়াছিলেন,—আরও ভদ্রভাবে তোমাদের পোশাক পরা উচিত

* দ্রষ্টব্য—*Ain* i, p. 15

† দ্রষ্টব্য—Irvine, *Storia do Mogor* ii, p 433

ছাড়া "না" নাই ; ঘরে মোটা চালের হলদে রং করা ভাত খাইয়া বাহিরে "চৌগুনী" [উৎকৃষ্ট পোলাও] ও খাসা "বালাই"র [বাং—মালাই] গল্প ও ঢেকুর তোলা তাঁহার স্বভাব। মীর্জ্জা পারতপক্ষে তাঁহা মিথ্যা কথা বলিবেন না, তবে বাজে নান্-রুটি খাইলে বলিবেন, "নাসিরী পরওয়াটা", চাকা মুলা ভাজা তাঁহার শায়েস্তা জবানে "মূলীকা কাবাব," বেগুন-পোড়া "বাইগন্ কা কোপ্তা" ; সুতরাং এ-কাল ও সে-কালে হিন্দুস্থানীর রুচি ও মনোবৃত্তির মধ্যে বিশেষ বিপর্য্যয় এই যাবৎ দেখা যায় না।

যাহা হউক, ঐতিহাসিক এই ক্ষেত্রে অসহায়, পূর্ব্ববর্ত্তীরা মোগল দরবার যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, তাহাকে সেই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া দেখিতে হইবে—বাদবাকী পাঠকের মর্জ্জি।

৫

শাহ-বুরুজ প্রাসাদের দ্বিতল অলিন্দে অষ্টকোণাকৃতি সুরম্য গম্বুজাকৃতি ছত্রীর সম্মুখে সম্রাট শাহজাহান অপরাহ্ণে অন্দরমহলের দরবারে বসিয়া আছেন। মোগল বাদশাহের অন্তঃপুর একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ সুশৃঙ্খল ব্যবস্থায় পরিচালিত নারী-রাজ্য, যেখানে শাহান্শাহ একমাত্র পূর্ণাঙ্গ পুরুষ। এই-খানে সিপাহী-শান্ত্রী, চাবুক-হাজত-ফাঁসি, দেওয়ানী দপ্তর, মালখানা (treasury), দলিল-দস্তাবেজের মুহাফিজখানা (archives), বক্শী, আরজ্-বেগী, মীরসামান ইত্যাদি কর্ম্মচারী, মক্তব, নাচওয়ালী, নটগুরু সকলই ছিল। ভৃত্য ও পদাধিকারিগণ সকলেই ক্রীত দাসদাসী ; অল্পসংখ্যক বিবাহিত স্ত্রীলোক দিনে কাজ করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে শহরে চলিয়া যাইত। মোগল সম্রাটের সদরে অন্দরে গৌরীসেনের কারবার নাই ;—কড়া-ক্রান্তি, হীরা-জহরত, জামা-জুতা, কার্পেট-সুজ্নী প্রত্যেক জিনিষের কড়াকড়ি হিসাব—শাসন-ব্যবস্থা ভিতরে বাহিরে "কাগজী-রাজ" (red tapism)। রাজধানী কিংবা সফরে অবসর সময়ে সম্রাট স্বয়ং অন্তঃপুরের এবং পুরবাসিনীগণের অভাব-অভিযোগ শুনিতেন, বেগম-গণের নারী-দেওয়ান ও মুস্তৌফী হুজুরে হিসাব দাখিল করিত। এই সমস্ত কাজের পর সম্রাট আত্মীয়া কুটুম্বিনী-গণকে দর্শন দিতেন। গুপ্ত রাজনৈতিক বৈঠক ও দরবার ছাড়া অন্য দিনে শাহ্-বুরুজে গল্পের মজলিস ও নাচের মহড়া হইত। মমতাজের মৃত্যুর পর হইতে তিনি বেগম মহলে কদাচিৎ পদার্পণ করিতেন, তাঁহার অধিকাংশ সময় এই অলিন্দেই কাটিয়া যাইত—নিয়তির নিয়মে এইখানেই তাঁহার কারাবাস ও অন্তিমদশার আঁধার ঘনাইয়া আসিতেছিল।

দারার বিদায়-সম্বর্দ্ধনার উৎসব অন্তঃপুরেও তরঙ্গ তুলিয়াছে, সম্রাটের শ্যালিকাদ্বয় এবং শ্যালক সায়েস্তা খাঁর বেগম তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। কিছুক্ষণ পরে প্রধানা প্রতিহারিণী কুর্নিশ করিয়া নিবেদন করিল, জাহাঁপনা সলামৎ! "দীন"-দুনিয়ার রৌশণ দৌলত-মদার শাহ বুলন্দ-ইক্বাল এবং মদার্-উল্-মহাম্ উজীর-আজম বাহাদুরের সওয়ারী "গোসল-খানা"-র বাহিরে বান্দাগান্-ই-আলা হজরতের (অর্থ—স্বয়ংসম্রাট) হুকুমের অপেক্ষা করিতেছে।* সম্রাট তাঁহাদিগকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া শাহ-বুরুজে উপস্থিত করিবার আদেশ দিলেন। অতঃপর দৃশ্যপট পরি-বর্ত্তিত হইল। সম্রাট তাঁহার শয়ন-কক্ষে এবং বেগমগণ নীচে অন্দরমহলে প্রস্থান করিলেন, নারী প্রতিহারিণী, শান্ত্রী, ছত্র-চামরধারিণী ও ব্যজনরতা পরিচারিকা ("পাখোয়া"—হাত-পাখা দিয়া বাতাস দেওয়ার জন্য) সকলেই স্ব স্ব স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। প্রভুর সমপদস্থ কিংবা তাঁহার উপরিস্থ ব্যতীত অন্য পুরুষের সামনে অন্দরমহলের বাঁদী চেড়ীরা উপস্থিত থাকিবার নিয়ম ছিল না ; এই জন্য শাহী-মহলে এবং অভিজাতবর্গের ঘরে এক প্রস্থ নারী এবং এক প্রস্থ খোজা ভৃত্য রাখিবার রেওয়াজ ছিল। ইতিমধ্যে খোজাগণ দাসীদের স্থানে কর্ত্তব্যরত হইল, ফরাশের গালিচা ইত্যাদি বদলাইয়া এবং চারিদিকে কানাতের পর্দ্দার ঘের্ লাগাইয়া উহাকে গুপ্ত-মন্ত্রণাকক্ষে রূপান্তরিত করা হইল।

৬

ভ্রাতৃবিগ্রহ আরম্ভ হওয়ার কিছুদিন পরে পদচ্যুত মীর জুমলার স্থানে দারার সুপারিশে সম্রাট জাফর খাঁকে প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। খলিলুল্লা খাঁ এবং শায়েস্তা খাঁর সহিত দারার বিরোধ দূর করিবার জন্যও সম্রাট প্রথম হইতেই ব্যগ্র ছিলেন, অবশেষে তাঁহাদের সহিত একটা আপোষরফা হইয়াছিল। ইহাদের মন্সব বাড়াইয়া খলিলুল্লা খাঁ-কে "মীর-বক্শী" [সামরিক দপ্তরের সর্ব্বোচ্চ মন্ত্রী] এবং শায়েস্তা খাঁ-কে "আমীর-উল-ওমরা" উপাধির দ্বারা সম্মানিত করা হয়। জাফর খাঁ ভাল মানুষ, অপর দুইটি গভীর জলের মাছ। পূর্ব্বে দারার সহিত কিঞ্চিৎ মনোমালিন্য থাকিলেও প্রধানমন্ত্রী হইয়া জাফর খাঁ দারার শুভচিন্তক হইয়াছিলেন, ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পরেও শেষ পর্য্যন্ত নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সহিত সম্রাটের সেবা করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব শত্রুর সহিত মিত্রতার

---

* শব্দার্থ—

"দীন"=ধর্ম্ম ; শাহ বুলন্দ-ইকবাল্=দারার পিতৃদত্ত উপাধি

দৌলত-মদার্=(abode of felicity) ; সৌভাগ্যের আশ্রয়

মদার্-উল্-মহাম্—(centre of important affairs) ; প্রধান উজীরের সম্মান-সূচক উপাধি। গোসল-খানা, স্নানাগার নহে, দেওয়ান-ই-খাস

ব্যাপারে চাণক্য ও চাচা সাদী-র সাবধান বাণী ভুলিয়া দারা তাঁহার প্রিয়ভাষী মাতুল শায়েস্তা খাঁ ও মেসো খলিলুল্লাকে হিতাকাঙ্ক্ষী রূপে মাত্রার অধিক বিশ্বাস করিয়া বসিলেন। খলিলুল্লার দাপট ও বড় বড় কথায় ভুলিয়া সম্রাট তাঁহাকে বাদশাহী ফৌজ ও তোপখানা সহ ঢোলপুরের ঘাটি আগ্‌লাইবার জন্য ইহার সপ্তাহ পূর্ব্বেই ঐখানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। খলিলুল্লা খাঁ বানু দরবারী, অভিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ যোদ্ধা; এই জন্য সম্রাটের ভরসা ছিল দারার কাঁচা বুদ্ধি ও হঠকারিতার রাশ টানিয়া রাখিবার জন্য তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি;—বিশেষতঃ রক্তপাত ঘটাইয়া আওরঙ্গজেবের সঙ্গে আপোষের রাস্তা তিনি পারতপক্ষে বন্ধ করিবেন না; বিদ্রোহী শাহজাদাগণ তাঁহাকে সমীহ্ করিয়া হয়ত যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবে;—এক কথায় সম্রাট তাঁহাকে নামতঃ না হইলেও কার্য্যতঃ এই অভিযানে শাহজাদার আতালিকের ক্ষমতা অর্পণ করিয়া কিছু নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন।

শাহী গুরজ-বরদারগণ সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া শাহজাদা ও উজীর-আজমকে সম্রাটের আদেশ জ্ঞাপন করিল। তাঁহারা পালকী হইতে নামিয়া পদব্রজে শাহ-বুরুজে চলিলেন। সম্রাটের আসন দূর হইতে দৃষ্টিগোচর হওয়া মাত্র তাঁহারা জুতা ছাড়িয়া নগ্নপদে (অবশ্য মৌজা ও পা-তাবা পায়ে ছিল) অগ্রসর হইলেন, এবং দুই জনেই শাহান্‌-শাহ-র কদম্‌-বোসী (পদ-চুম্বন) করিয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে কিছু দূরে আসন গ্রহণ করিলেন। কিছুক্ষণ প্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তার পর স্থির হইল শাহজাদার অনুপস্থিতি সময়ে জাফর খাঁ দুর্গরক্ষার ভার গ্রহণ করিবেন এবং শায়েস্তা খাঁ নিজ তাবিনের ফৌজ লইয়া শহর রক্ষার জন্য মোতায়েন থাকিবেন, অবশিষ্ট বাদশাহী ফৌজ শাহজাদার সহিত ঢোলপুরে কুচ করিবে এবং সুলেমান শুকোর প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত আত্মরক্ষামূলক কৌশল অবলম্বন করা হইবে। ইহার পর জাফর খাঁ বিদায়ের অনুমতি লইয়া দেওয়ান-ই-আমে চলিয়া গেলেন।

পিতা-পুত্রের এই শেষ একান্ত সাক্ষাৎকার সময় শাহজাহান ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলিলেন, কাতর কণ্ঠে বার বার সেই এক কথা—পারতপক্ষে যুদ্ধে নামিও না; মীরবক্‌শী এবং প্রধান সেনাধ্যক্ষগণের মতের বিরুদ্ধে কাজ করিবে না; আক্রান্ত না হইলে সংঘর্ষ এড়াইয়া যাইবে, দিনের খবর দিনে পাঠাইবে ইত্যাদি। এই সময়ে দরবার-ই-আমে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সময়মত সম্রাটের যাত্রার বাজনা বাজিয়া উঠিল। জাফর খাঁ-র প্রস্থানের পর ঐখানে ভগ্নী জাহানারা ও শাহজাদার মাসীদ্বয় দারার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। দারা পিতার পদচুম্বন এবং বেগমগণকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া বিদায় প্রার্থনা করিলেন। বিদায়ের সময় খলিলুল্লা খাঁর স্ত্রী নাকি কানে কানে দারাকে কিছু বলিয়াছিলেন; তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ দিল-দরিয়া মেজাজে মাসীর আশঙ্কা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন।

দারা বিদায় লইবার পর শাহীমহলে যাত্রার সাড়া পড়িল।

৭

সোনার "সুখপাল" চতুর্দ্দোলে বসিয়া সম্রাট মচ্ছীভবনের পথে দরবারে চলিলেন। সর্ব্বাগ্রে সুবর্ণ ও রৌপ্যদণ্ডধারী দরবারী ভৃত্যবর্গ; "সুখপালের" পুরোভাগে রাজদণ্ডের প্রতীক রত্নজড়িত "ত্রিশির" [with three knobs at the head], সুবর্ণ গদা (গুর্‌জ) স্কন্ধে সম্রাটের মহাপ্রতীহার, এবং পশ্চাতে ভীমদর্শনা দশপ্রহরণধারিণী নারী-দেহরক্ষী* পদাতির পঙ্‌ক্তি; হজরত সুলেমান নবীর হুকুমে অজানা দেশের পরী-রাণীগণ যেন শাহান্‌ শাহকে লইয়া আকাশমার্গে চলিয়াছে। সুখপাল-বাহিকাগণ সংখ্যায় আট জন, প্রত্যেকেই উদ্ভিন্ন যৌবনা তন্বী, পরিধানে ইরাণী পোশাক, গায়ে হিন্দুস্থানী জড়োয়া অলঙ্কারের বহর, কেবল নাকে নথ-বেসর নাই। সম্রাটের নিকট কোন স্ত্রীলোকের পর্দ্দা বাধ্যতামূলক নহে; সুতরাং অন্দর মহলে বোর্‌খা-র বিভীষিকা নাই।

শাহান শাহ্-র সওয়ারীর পশ্চাতে বেগমগণের সোনা-রূপার পালকী এবং অনবগুণ্ঠিতা কিঙ্করীবৃন্দ রূপের ঝলক তুলিয়া দরবার দেখিবার জন্য চলিয়াছে। মচ্ছীভবনের সরন্ধ্র প্রস্তর বাতায়ন শোভিত পশ্চিম বারান্দার সমস্ত স্থান ফরাস জাজিম গালিচায় আবৃত, ডানদিকে সম্রাটকুমারীগণ এবং অন্যান্য বেগমগণের জন্য পদমর্য্যাদা অনুসারে সংরক্ষিত সুরম্য মখমলের "দীবান" [বসিবার আসন]; প্রাচীরের গায়ে ভিতরে বাহিরে সূক্ষ্ম জরির ডবল পর্দ্দা। এই বারান্দা হইতে সিংহাসনমণ্ডপে সিংহাসন পর্য্যন্ত সম্রাটের জন্য পদার্পণ-বস্ত্র পাতা হইয়াছে। এইখানেই সুখপাল হইতে তাঁহার অবতরণ স্থান।

৮

পিতামহ আকবরের কীর্ত্তি এবং ঐশ্বর্য্যস্পর্দ্ধী সম্রাট শাহজাহানের দরবার-ই-আম সাম্রাজ্যের রত্নভাণ্ডার ও শাহী ফরাসখানা (বস্ত্রাগার) উজাড় করিয়া মায়াপুরীর ন্যায় সজ্জিত হইয়াছে। সভাগৃহের সম্মুখস্থ বিরাট ময়দানের মধ্যভাগে

* পরবর্ত্তীকালে এই শ্রেণীর একজন চামুণ্ডাকে বিশেষ সাহস ও বিশ্বস্ততার পুরস্কার স্বরূপ সম্রাট মহম্মদ শাহ "রজিলা" "রস্তম-ই-হিন্দ" খেতাব দিয়াছিলেন।

উহার তিন-চতুর্থাংশ স্থান ব্যাপিয়া আকবরশাহী "বার-গাহ্"* তাঁবুর নীচে বস্ত্রমণ্ডপের উপরিভাগে জাহাঙ্গীর শাহী আমলের মাঙ্গলিক "দল-বাদল"† শামিয়ানা। খুঁটিগুলি সব রূপার পাতে মোড়া। লাল শামিয়ানার কেন্দ্রস্থলে সোনার তারে সূর্য্যের প্রতীক্, চতুর্দ্দিকে নানা বর্ণে নবগ্রহ এবং দ্বাদশ রাশির জ্যোতিষ-সম্মত নক্সা। নীচে দেওয়ান-ই-আমের বহিরঙ্গ স্বরূপ সুবৃহৎ বস্ত্রমণ্ডপ। ইহার ফরাসের উপর লাল শালু কাপড়ের দীর্ঘ প্রাবরণ রাজমার্গের ন্যায় এই মণ্ডপকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া পশ্চিমে ইষ্টক প্রাচীরস্থ তোরণ পথ হইতে পূর্ব্বদিকে দেওয়ান-ই-আমের সিঁড়ি পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। পশ্চিম দিক হইতে বস্ত্রমণ্ডপের প্রবেশ পথে চিত্রবস্ত্র সজ্জিত তোরণদ্বার, উপরে রত্নজড়িত সুবর্ণদণ্ড-লগ্ন শ্বেত-কৃষ্ণ চামর কলাপ শোভিত শাহী "তুমান্-তোঘ্" পতাকা। এই তোরণ দ্বার ছাড়িয়া মণ্ডপের পশ্চাৎ ও উভয় পার্শ্বে কানাতের ঘের, পূর্ব্বদিকে খোলা; কানাতের বাহিরে চতুর্দ্দিকে সীমা-নির্দ্দেশক বস্ত্র কঞ্চুকাবৃত দারুবেষ্টনী। শালুর রাস্তার উভয় পার্শ্বে মণ্ডপের খুঁটিগুলির কোমরের সহিত আড়াআড়ি বাঁধা ছিট কাপড়ের দড়ি দিয়া ইহাকে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা খণ্ডশঃ বিভক্ত করা হইয়াছে। এই বন্ধনীগুলির মধ্যে সর্ব্বপ্রথম সারিতে নয়-শতী এবং পশ্চাতে ক্রমশঃ নিম্নতর মনসবদার-গণের দাঁড়াইবার স্থান,—সর্ব্বপশ্চাতে অর্থী-প্রত্যর্থী ও দর্শকগণ। বস্ত্রমণ্ডপের নীচে মোটা শতরঞ্জীর উপর ছিট-কাপড়ের ফরাশ, উহার উপরে সম্মুখভাগের কয়েক সারিতে গালিচা জাজিম, পরে সুজনী; সর্ব্বপশ্চাতে রঙ্গীন মাদুর। মণ্ডপ-তোরণের বাহিরে মোটা ফরাশের উপর সাধারণ মাদুর পাতা; এইখানে জুতা ছাড়িয়া মণ্ডপে প্রবেশ করিতে হয়।

দেওয়ান-ই-আমের প্রাঙ্গণ মধ্যস্থিত এই বস্ত্রমণ্ডপ এবং প্রাসাদের উঠিবার সিঁড়ির মধ্যে তিন "রশি" অর্থাৎ প্রায় ২৪ হাত প্রস্ত খোলা রাস্তা, এই রাস্তার উপরে অন্য একটি সামিয়ানা বস্ত্রমণ্ডপ এবং দরবার-গৃহের ছাদকে সংযুক্ত করিয়াছে, রাস্তার উপরও মোটা ফরাশ পাতা হইয়াছে। প্রাসাদের সিঁড়ির প্রত্যেক ধাপের উপর গালিচার আস্তরণ এবং দুই পাশে সুগন্ধ দ্রব্য জ্বালাইবার স্বর্ণমণ্ডিত বড় বড় "আতশ-কদাহ্" বা অগ্নিভাণ্ড। উপরে উঠিয়া সিংহাসন-ঝরোকার পাদদেশে গালিচাবৃত "কুর্নিশ-গাহ্" অর্থাৎ সম্রাটকে কুর্নিশ-তস্লীম* প্রণিপাত করিবার নির্দ্দিষ্ট স্থান, (ভক্তি গদগদ হইয়া মফস্বলের প্রাচীন হিন্দুদের মধ্যে কেহ কেহ এইখানে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিত)। ইহার দুই দিকে খোলা বারান্দায় পর পর স্বর্ণ রৌপ্য ও বস্ত্রসজ্জিত দারুবেষ্টনীর মধ্যে বিশিষ্ট অভিজাতবর্গের গালিচা-বিছান দাঁড়াইবার স্থান "জাত" (rank) হিসাবে পায়ের নীচে গালিচার দাম।

দরবার-গৃহের স্তম্ভবীথিসমূহের প্রস্তরদেহ স্বর্ণতন্তু-পুষ্পিত তুর্কী বনাতের রক্তনিচোলাবৃত, গলদেশে রেশমী বন্ধনমালিকা হইতে রেশম গুচ্ছের দোলায়মান বেণী, শিরোদেশে (capital of pillars) রত্নানুকারী স্ফটিকের মালা উষ্ণীষের "শির-প্যাঁচের" ন্যায় শোভমান। খিলানগুলির [তিন সারি, প্রত্যেক সারিতে নয়টি খুপী (? bay)], মাথার উপরে শালের সাজ, শালের জরিদার চওড়া কিনারা "মুখের" উপর [স্তম্ভদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানের উপরাংশ] ওড়নার ন্যায় ঝুলিয়া পড়িয়াছে; উপরে স্তম্ভধৃত ছাদে (ceiling, not roof) ফিরিঙ্গী বনাতের প্রাবরণ (tapestry), প্রাচীরগাত্রে সুবৃহৎ কাশ্মীরী "নামদা"র (ফাঃ নামদ ?) উপাবরণের (hangings) উপর সূচীশিল্পে চেণার গাছ, ফলনমিত আঙ্গুরের লতা ও নানাবিধ ফুল।

এই প্রাসাদের মধ্যবর্ত্তী শাহান্ শাহ-র "তখত্ গাহ্" বা সিংহাসনের পাদপীঠ যেন এই বিদায় অভিনন্দন উপলক্ষ্যে

---

* The *Bargah*, when large, is able to contain more than ten thousand people. It takes a thousand farrashes a week to erect it with the help of machines. . . . If plain (*i.e.*, without brodace, velvet or gold ornaments), a *bargah* costs 10,000 rupees and upwards, whilst the price of one full of ornaments is unlimited. —(*Ain i* p. 53).

একজন আধুনিক গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—

"The enclosure outside the pillared hall, like the *Gulal Bari* (Red Enclosure) of the Delhi Fort. . . ." —Ashraf Husain: *Guide to Agra Fort*, p. 13).

Gulal Bari বোধ হয় ইহা আকবরশাহী "Gulalbar" তাঁবুর বিকৃত নাম। ইহার জন্য নিতান্ত কমপক্ষে ১০০ গজ সমচতুষ্কোণ জমির দরকার হইত। (*Ain i*, p 45) দরবারের জন্য Gulalbar ব্যবহৃত হইত না; ইহা ছিল একটি বস্ত্রনির্ম্মিত চলমান শাহী মহল বিশেষ।

† দলবাদল জস অম্বর ছাবা, সসি সুরজ তেহি মই বনাবা
পহিলে বারহ রাসি বনাএ[য়ে]. তৌ সব নখত উহা লিখিলাএ [য়ে]
কবি ওসমানকৃত "চিত্রাবলী" পৃঃ ৮

* "His Majesty (Akbar) has commanded the palm of the right hand to be placed on the forehead, and the head to be bent downwards. This mode of saluting in the language of the present age, is called *kornish*, and signifies that the saluter has placed his head . . . as a present, and has made himself in obedience ready for any service that may be required of him.

The salutation, called *taslim* in placing the back of the right hand on the ground, and then raising it gently till the person stands erect, when he puts the palm of his hand upon the crown of his head, which pleasing manner of saluting signifies that he is ready to give himself as an offering. . . .

. . . Upon taking leave, or presentation, or upon receiving a *mansab*, a *jagir* or a dress of honour, or an elephant, or a horse, the rule is make *three taslms*; but only one on all other occasions, when salaries are paid or presents are made. . . . (*Ain-i-Akbari*, Blochmann; *Ain* 74. p. 158).

হজরত সুলেমান নবীর অশরীরী "জিন" (spirit)-গণ আসিয়াই সাজাইয়া রাখিয়াছে। দরবারের দিনে উহার ঢালু (curvilenear) ছাদ বুটিদার জরির কাপড় (cloth of gold) দ্বারা আবৃত করা হইয়াছে; উহার কিনারায় মুক্তা-চুনীর ঝালর। এই মণ্ডপের নিম্নভাগেও জরদৌজী বনাতের ঘের ভূমিতলস্থ গালিচার উপর পড়িয়া রঙের ঢেউ তুলিয়াছে। মণ্ডপের মর্ম্মরস্তম্ভ চতুষ্টয়ও বহুবিধ মণি-খচিত চীনাংশুকের উত্তরীয় দ্বারা সজ্জিত হইয়া রত্নস্তম্ভের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে; স্তম্ভের শিরোভাগে মাঙ্গলিক শ্বেতচমরী-পুচ্ছ। সিংহাসন-পীঠের উপরিভাগে তিন দিকে [পূর্ব্ব ব্যতীত] সুবর্ণ দণ্ডের রক্ষা-বেষ্টনী, সম্মুখে দুইটি রত্নমণ্ডিত সোনার ধূপদানী [ফাঃ—"উদ্-সোজ"], উপরে ছাদের নীচে সোনালী কাপড়ের ঝালরদার ক্ষুদ্র চন্দ্রাতপ। উহার ছায়ায় সম্রাটের ময়ূর-সিংহাসন শাহী জহরৎ-খানার কয়েদ-মুক্ত হইয়া এই চন্দ্রাতপে তাঁহার কদম-মোবারকের অপেক্ষা করিতেছে।

শাহী দরবারের "কবি-সম্রাট" মোল্লা কুদসী এই তখত্-ই-তাউসের শান্ এবং শাহজাহানী শৌকৎ বর্ণনা করিয়া এক মস্‌নবী (ফার্সি কবিতালহরী) লিখিয়াছিলেন এবং উহা এই সিংহাসনগাত্রে সম্রাটের আদেশে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ইরাণী কবির ভাষা ঐতিহাসিক কোথায় পাইবে? সুতরাং কাব্যরসিকগণ দরবারী ইতিহাস বাদশাহ-নামায় ছাপার অক্ষরে উহা পড়িতে পারেন।

সাদা কথায় এই ময়ূর-সিংহাসন* সোনার পায়া ও কাঠামের উপর সোনার তক্তার ছাউনী খাট বিশেষ, অনেকাংশে বিষ্ণুমণ্ডপে ঠাকুরের সিংহাসনের মত। এই সিংহাসন প্রস্তুত করিবার জন্য প্রথম দফায় এক লক্ষ তোলা সোনা এবং প্রায় আড়াই সের হীরাচুনী পান্না ইত্যাদি দেওয়া হইয়াছিল। এই খাট বা মসনদের উপরে দরবারের সময় তিন প্রস্ত গালিচা ও জড়োয়া মখ্‌মলের আস্তরণ বিছাইয়া পিছনে বড় শাহী তাকিয়া এবং সামনে ছোট দুইটি তাকিয়া বসান হইত; এই তাকিয়াগুলির উপর কাবুল-ইরাণে প্রস্তুত জড়োয়া "তাকিয়া-নামদ" (coverlet)। বড় শাহী তাকিয়ার পশ্চাৎ দেশে সুবর্ণদণ্ডের মাথায় মুক্তার ঝালরদার রত্নমণ্ডিত শাহী শ্বেতছত্র। সামনে ছোট তাকিয়াদ্বয়কে আড়াল করিয়া স্থাপিত হইত দুই দিকে মুখোমুখি দুইটি রত্নময়ূর। আম-দরবারে নাচের মহড়া নাই; সুতরাং ময়ূরও পেখম ধরে নাই। খোদাতালা ময়ূরকে মোরগের মত পায়ের উপর খাড়া করিয়া অবিচার করিয়াছিলেন, শাহান্‌শার ইন্সাফে ময়ূরের পা, মায় নখাগ্র পর্য্যন্ত "মোরাচ্ছা" বা রত্নমণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। রঙের বাহার থাকিলেও আসল ময়ূরের গলায় মালার মত কিছুই খোদাতালা বখ্‌শিশ করেন নাই; কিন্তু মোহনমালা না হইলে বাদশাহী ময়ূরকে মানাইবে কেন? এই জন্য এই ময়ূর-যুগলের গলায় বসান (inlay) বদক্‌শানী চুনী, পেগুর নীলা, মিশরের সবুজ পান্না (yokut), তুতীকরণ (Tut'corn, মাদ্রাজ) ও বাহেরিন উপসাগরের মুক্তা ইত্যাদি রত্নসমুচ্চয়-শোভিত হার খোদার কুদরতকে হার মানাইয়াছে। ইহার মধ্যে একটি ময়ূরের হারের ধুগ্‌ধুগীর শেষ মুক্তাদানা*—যাহা বুকের উপর পড়িয়াছে—উহার দামই প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা, ইহার জুড়ি আর একটি মুক্তা অন্য ময়ূরের জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই—আলা হজরতের জপমালার (তসবী) মধ্যেও চল্লিশ হাজারের বেশী দামের মুক্তাফল ছিল না।

যাহা হউক, এই সমস্ত মণি-মাণিক্য হজরত সুলেমান নবীর তাঁবেদার "শয়তান" কোন স্থান হইতে চুরি করে নাই, কিংবা "জিন্" ডুবুরী বাহেরিন উপসাগরে ডুব দিয়া মুক্তা উঠাইয়া আনে নাই। হিন্দুস্থানের মাটি মানুষের পরিশ্রমেই সোনা ফলাইয়াছে, এই দেশে বংশানুক্রমিক চর্চ্চায় উন্নততর শিল্পকলার যাদু দেশ-বিদেশ হইতে দুষ্প্রাপ্য রত্নরাজি আকর্ষণ করিয়া যুগে যুগে এইভাবে রাজদরবার সাজাইয়াছে, কিন্তু প্রজার দুর্গতি ঘুচে নাই।

প্রধানমন্ত্রী জাফর খাঁ ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ আমীরগণ সম্রাটের পক্ষ হইতে দারাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য দেওয়ান-ই-আমের ফটকে অপেক্ষা করিতেছিলেন, ভিতরে গোধূলির স্নিগ্ধতা নামিয়া আসিয়াছে, বিরাট ময়দানের মধ্যভাগে বস্ত্র-মণ্ডপ হস্তী ও অশ্বতরঙ্গ বিক্ষুব্ধ জনসমুদ্রে পতাকাশোভিত অর্ণবপোতের ন্যায় শোভমান। ফটকের সামনে পাল্কী হইতে নামিয়া সানুচর শাহজাদা প্রধান মন্ত্রীর পশ্চাতে পদব্রজে চলিলেন এবং বস্ত্রমণ্ডপের তোরণের বাহিরে সকলেই জুতা খুলিয়া মণ্ডপ-মধ্যবর্ত্তী পথে সিংহাসন-অলিন্দের দিকে অগ্রসর হইলেন, জনতার জয়ধ্বনি ও সেনানীগণের মোবারকবাদে দরবার-প্রাঙ্গণ কাঁপিয়া উঠিল।

অল্পক্ষণ পরেই গম্ভীরতর বাদ্যধ্বনি সম্রাটের আগমন ঘোষণা

* ময়ূর-সিংহাসনের তক্তা পায়া ময়ূর ইত্যাদি বিভিন্ন অংশ বাক্সবন্দী হইয়া অন্দরমহলের রত্নভাণ্ডারে রক্ষিত হইত। কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে ও নওরোজের উৎসব-দরবারে শিল্পিগণ এই সমস্ত অংশ জোড়া লাগাইয়া সিংহাসন খাড়া করিত।

* *Tavernier*, edited by Ball; ii, 103 ". . . which . . . is suspended from the neck of a peacock made of precious stones and rests on the breast . . ."
—Abdul Aziz, *Imperial Treasury of the Indian Mughuls*, p. 360.

করিল। মহাপ্রতীহারপুরঃসর স্বয়ং সম্রাট কোষবদ্ধ রাজ-তরবারির উপর ভর করিয়া জরাকম্পিত পাদক্ষেপে মস্‌নদ-ঝরোকায় প্রবেশ করিবামাত্র "বাদশাহ্ সালামৎ", "জাঁহাপনা সালামৎ" ধ্বনিতে শাহীমহল প্রতিধ্বনিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে প্রধান নকীব সিংহাসনের নিম্নদেশ হইতে তীক্ষ্ণ মোরগকণ্ঠে শাহান্‌শাহ্-র কুলজী ও প্রশস্তি পাঠ আরম্ভ করিল, এবং আমীর ও রাজন্যবর্গ সকলেই স্ব স্ব স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া আনতমস্তকে হিন্দুস্থানী প্রথায় হাতজোড় করিয়া "জোহার" জানাইলেন। অপূর্ব্ব রাজন্যপ্রভায় উদ্ভাসিত দরবারগৃহ ও চত্বরের দিকে দিল্লীশ্বর ঋজুদেহে ও স্থিরনেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রত্যভিবাদনচ্ছলে দক্ষিণহস্তের রত্নজপমালা উঠাইয়া প্রজাবর্গকে বরাভয় দান করিলেন। অতঃপর দেহরক্ষীর* হাতে রাজতরবারি অর্পণপূর্ব্বক সবিতৃমণ্ডলস্থিত নারায়ণের ন্যায় তিনি সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন।

সম্রাটের পরিধানে মস্‌লীনের সাদা হিন্দুস্থানী পোশাক, মাথায় সাদা "দস্তার" [পাগড়ী], শির-প্যাঁচের (উষ্ণীষ-বন্ধনী) উপর সাদা বকের পালকযুক্ত তুর্রা, গলায় মুক্তার প্রালম্বিকা "মোহনমালা", ডান হাতে তস্‌বী, অঙ্গুলীসমূহের অঙ্গুরীয়প্রভা সম্মুখস্থ রত্নময়ূরের পৃষ্ঠে বিদ্যুৎচমক ভ্রম জন্মাইয়াছে। তাঁহার পরিচ্ছদ ও আভূষণ আড়ম্বর ও বাহুল্য-বর্জ্জিত, অথচ উহার মধ্যে মোগল্‌-ভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠতম রত্নরাজি দেদীপ্যমান। শাহান্‌শাহ্-র শিরপ্যাঁচ বা উষ্ণীষ-বেষ্টনীর মধ্যেই চব্বিশটা মুক্তাদানা ও পাঁচ খণ্ড চুনী (ruby) ; এই সমস্ত চুনীর মধ্যমণি-খণ্ড ললাটের উপর অগ্নিগর্ভ হর-নেত্রের ন্যায় ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। ইহা ওজনে ২৮৮ রতি, সরকারী হিসাবে দাম মাত্র দুই লাখ টাকা ; (*Badshah-nama* ii 391)।

মোগল সম্রাটের উষ্ণীষে পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত একাধিক বৃহৎ হীরকখণ্ড ছিল, কিন্তু এইগুলির মধ্যে কোন্ হীরক শাহ্‌জাহানের রাজ্যচ্যুতির একাশী বৎসর পরে নাদির শাহ্‌কে মোহিত করিয়া তাঁহার নিকট হইতে "কোহিনূর" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল—উহা কেহ সঠিক বলিতে পারে না।* এই উষ্ণীষের উপরিভাগে "তুর্‌রা"য় [উষ্ণীষ-মণ্ডন] রাজলক্ষ্মীর শুভ্র কীর্ত্তি বিন্দুর ন্যায় শোভমান ছোট পেয়ারার আকৃতি [guava-shaped] একটি বৃহৎ মুক্তাদানা (ওজন ৪৭ রতি ; দাম ৫০,০০০৲—*Badshah-nama*)।

সম্রাটের গলায় কোমর পর্য্যন্ত লম্বমান কয়েক লহর মোহনমালায় কয় শত মুক্তার দানা ছিল সে হিসাব কেহ রাখিয়া যায় নাই। মুক্তার কাঠামোর মধ্যে শাহজাহান নিজের এক ছবি আবদুল্লা কুতব্ শাহকে উপহার পাঠাইবার সময় উহা টাঙ্গাইবার জন্য মুক্তা-গাঁথা সরু দড়িও দিয়াছিলেন, ইহা হইতে সম্রাটের গলায় মুক্তার সংখ্যা ও দাম অনুমান করিতে হয়। দরবারী ইতিহাসে দেখা যায়, সম্রাটের দুইটি জপমালা বা তস্‌বী ছিল। প্রত্যেক দুই খণ্ড ইয়াকুতের (সবুজ পাথর, কচুরি পানার রং) ; মধ্যে এক এক দানা মুক্তা এই তস্‌বীর মধ্যে ছিল। দুইটি তস্‌বীতে দরবারী ইতিহাস অনুসারে ১২০ দানা মুক্তা ছিল এবং পাথর সমেত মোট দাম বিশ লক্ষ টাকা, জপমালার "সুমেরু" বা মধ্য-মুক্তার ওজন ৩২ রতি, দাম ৪০,০০০৲। এই দুইটি পছন্দ না

---

* বাদশাহ্-নামায় দেখা যায় শাহজাহানের রাজত্বের প্রথম ভাগে রাজা বিঠলদাস গৌর এই সম্মানের অধিকারী ছিলেন। অন্দরমহল হইতে সিংহাসন-মণ্ডপে প্রবেশ করিয়া সম্রাট ইঁহার হাতে রাজতরবারি রাখিয়া চটিজুতা ছাড়িয়া শাহী গালিচায় সুখাসনে (cross-legged) উপবিষ্ট হইতেন। সম্রাটের তরবারি ও পাদুকা রাজার হেফাজতে থাকিত।

বিঠলদাসের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র অর্জ্জুনসিংহ গৌর সম্ভবতঃ এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। ধর্ম্মাতের যুদ্ধে অর্জ্জুনসিংহের পর কাহাকে ঐ স্থান দেওয়া হইয়াছিল জানা যায় না। আকবরের আমল হইতে সম্রাটগণের দেহরক্ষী রাজপুতই ছিল।

* হিন্দুর পরবর্ত্তী রূপকথা অনুসারে এই "কোহিনূর" যদুবংশের সেই বিবদমান "স্যমন্তক" মণি, কিংবা শ্রীকৃষ্ণের গলার হারের "ধুগ্ ধুগী" কৌস্তুভ রত্নও হইতে পারে! উহা কোথা হইতে কেমন করিয়া দিল্লীর ভাণ্ডারে আসিয়া পড়িল,—এই প্রশ্ন নিতান্ত অরসিক না হইলে কেহ তুলিবেন না। রত্নের গতিবিধি মানুষের অদৃষ্টের ন্যায় বিচিত্র ও দুজ্ঞেয়। মহীশূরের কোন অজ্ঞাত মন্দিরে লুক্কায়িত সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকে কানা করিয়া কোন্ চোর রুশ সম্রাটের রাজদণ্ডের জন্য Orloff Diamond জোগাড় করিয়াছিল কে বলিতে পারে?

যাহা হউক, Prof. Maskelyne বলেন, বাবর বাদশাহ আগ্রায় ইব্রাহিম লোদীর রাজকোষে ২২১.৬ রতি ওজনের যে হীরা পাইয়াছিলেন, এবং যাহার দাম "দুনিয়ার আড়াই দিনের খাই-খরচা" বলিয়া জনপ্রবাদে পরিণত হইয়াছিল—উহাই ইতিহাস-বিশ্রুত "কোহিনূর" [Manucci, I. 91, p. 556]। এক লাখ দেড় লাখ টাকার হীরাকে শাহজাহান আমলই দিতেন না। এক লাখ টাকা দামের এক টুকরা হীরা তিনি দারাকে দিয়াছিলেন, দেড় লাখ টাকার আর এক খণ্ড কাবা-শরীফে মোমবাতি জ্বালাইবার জন্য এক "খন্দিল" বা candle-stick-এ লাগাইয়া মক্কা পাঠাইয়াছিলেন। দরবারী ঐতিহাসিক ওয়ারেস লিখিয়াছেন, "উজীর-আজম মোয়াজ্জম খাঁ [মীরজুমলা] ২১৬ রতি ওজনের এক খণ্ড হীরক "পেশকশ্" হিসাবে উপহার দিয়াছিলেন (১৭ই ডিসেম্বর, ১৬৫৫ খ্রীঃ)। সম্রাটের আদেশে উহার দাম দুই লক্ষ ষোল হাজার টাকা বহিতে লেখা হইয়াছে (*Badshah-nama*, part III *MS.*) এই মীরজুমলা-হীরককে কেহ কেহ পরবর্ত্তী কালের "কোহিনূর" হীরক বলিয়া অনুমান করেন।

Tavernier গোলকুণ্ডার সুলতান আবদুল্লা কুতব্ শাহ্‌র কাছে এক খণ্ড হীরা চারি লক্ষ টাকা দামেও কিনিতে পারেন নাই। গোলকুণ্ডা বিজয়ের পর ইহা আওরঙ্গজেবের হাতে পড়িয়াছিল। Prof. Maskelyne বলেন, ইহাই নাদির শাহ্‌র কবলে পড়িয়া দরিয়া-নূর (জ্যোতি-সমুদ্র) নামে পরিচিত হইয়াছিল। আওরঙ্গজেবের নিকট প্রেরিত (ওজন আড়াই আউন্স?) প্রায় পাঁচ হাজার পাউণ্ড দামের এক খণ্ড হীরা মারাঠা দস্যুগণ লুঠ করিয়াছিল। [Forster, *Eng. Factory Records*, 1661-64, p. 119]

হওয়ায় শাহজাহান পাঁচ খণ্ড চুনী ও ত্রিশ দানা দামী মুক্তার ছোট তস্‌বী প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, দাম ৮ লক্ষ টাকা। ইহাই তিনি সাধারণতঃ জপ করিতেন, অন্ততঃ পোশাকের অঙ্গস্বরূপ ডান করে রাখিতেন।

মোগল যুগে তুর্কী পশমী লম্বা কোট "চারকোব্‌" জামা [বর্ত্তমান সংস্করণে লক্ষ্ণৌ শিরওয়ানী] ব্যতীত অন্য কোন জামায় "কলার" কিংবা বোতাম থাকিত না। সুতী কাপড়ের জামা আঙ্গরাখায় কাপড়ের টানা (strings) ব্যবহার হইত। জাহাঙ্গীর বাদশাহ্‌র বোতামদার নাদিরী-জামা দরবারে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল—এই জামায় মুক্তার দানার "তুক্‌মা" (বোতাম) ব্যবহৃত হইত। আকবর ও জাহাঙ্গীর চিশ্‌তীপীরের কান-ফোঁড়া বান্দা ছিলেন এবং দুই কানে রাজপুত রাজাদের ন্যায় মোতির কুণ্ডল পরিতেন, দুইটি দামী চুনীর মাঝখানে মুক্তার একটি বড় দানা এই কুণ্ডলে থাকিত। শাহজাহান গোঁড়া মুসলমান, কুণ্ডল ধারণ করিবার লোভে তিনি শরিয়ত উপেক্ষা করিয়া কান ফোঁড়াইতে রাজী হইবার ব্যক্তি নহেন।

যাহা হউক্, শাহজাহানের চটি জুতায় কয় শত মুক্তা ও কয় টুক্‌রা দামী পাথর ছিল এবং উহার কত দাম ইতিহাসে লেখা নাই। যাঁহার ছোট শালীর পায়ে লাখ টাকার চটি ছিল বলিয়া জানা যায় তাঁহার দরবারী পাদুকায় হয়ত ইহার দ্বিগুণ দামের হীরা-জহরত ছিল। সেই কালে দরবারে "heel" ছাড়া চটি জুতাই ফ্যাশন ছিল, এই মোগলাই চটি* হয়ত শাহশুজার সহিত সরাসরি ঢাকা গিয়াছিল, কিংবা পরে লক্ষ্ণৌর নবাবী দরবার হইয়া মুর্শিদাবাদ-কলিকাতা পৌঁছিয়াছিল। সে যুগে আট আনায় সাধারণ গরীব ভদ্র-লোকের ব্যবহার্য্য এই ধরণের চটি পাওয়া যাইত, আওরঙ্গজেব বন্দী পিতাকে মরিবার পূর্ব্বে এই দামের এক জোড়া চটি খোজা এতবার খাঁর মারফত কিনিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

১১

সম্রাট্ আসন গ্রহণ করিবার পর পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত কার্য-ক্রম অনুসারে দরবার আরম্ভ হইল। সর্ব্বপ্রথমে প্রধান মন্ত্রী জাফর খাঁ দারাকে সঙ্গে লইয়া কুর্ণিশ করিবার জায়গায় উপস্থিত হইলেন, নকীব তারস্বরে শাহজাদার খেতাব মনসব ইত্যাদি যথারীতি ঘোষণা করিল। জাফর খাঁ কুর্ণিশ করিয়া পিছনে সরিয়া গেলেন। বড় বড় রেকাবে জরির কাপড়ে ঢাকা নজর-সামগ্রী লইয়া দারার ভৃত্যগণ সারিবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান ছিল। দারা তস্‌লীম করিয়া নজর পেশ করিলেন; খান্-ই-সামান্ দারার হাত হইতে নজরের থালা গ্রহণ করিয়া গুরুজ-বরদারের হাতে সম্রাটের সামনে পেশ করিলেন। শাহানশাহ্ ঐ সমস্ত থালার এক একটি মাত্র জিনিষ স্পর্শ ও দৃষ্টিপূত করিয়া শাহজাদার নজর "মাপ" করিলেন—অর্থাৎ কিছুমাত্র গ্রহণ না করিয়া ঐগুলি যিনি দিয়াছেন তাঁহাকেই পরোক্ষে বক্‌শিশ করিলেন। এই অনুগ্রহের জন্য দারা দ্বিতীয় বার তস্‌লীম করিয়া অনুমতিক্রমে পিতার কদম-বোসী (পদ চুম্বন) করিলেন। সম্রাট তাঁহাকে মোবারক-বাদ জানাইয়া আসন গ্রহণ করিবার হুকুম দিলেন। সিংহাসনের ডান দিকে মস্‌নদ অপেক্ষা নীচু ছোট সোনার চৌকী শাহ-জাদার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। তিনি আবার জমিন্-বোস্ (ভূমি চুম্বন) করিয়া উহার গালিচায় "দোজানু" (হাঁটু গাড়িয়া "উষ্ট্রাসনে") হইয়া উপবেশন করিলেন।

ইহার পরে কুমার সিপহ্‌র শুকোর নজর পেশ হইল; তিনি সম্রাটের আদেশে মস্‌নদের বাম দিকে দণ্ডায়মান রহিলেন। এই ভাবে সামন্ত রাজবর্গ ও উচ্চপদস্থ আমীর-গণের নজর পেশ্ হইল, শাহানশাহ্ সকলের নজর "মাপ" করিলেন—আজ তিনি গ্রহীতা নহেন।

নজরের পালা সাঙ্গ হইবার পর দেহরক্ষী সেনা এবং শাহী পশুশালার চতুষ্পদদিগের মুজ্‌রা বা অভিবাদন। প্রথমে কবচাবৃত জমকালো পোশাক পরিহিত দেহরক্ষী আহদী অশ্বসাদি চত্বর পরিক্রমা করিয়া সম্রাটকে অভিবাদনপূর্ব্বক ফটকের পথে বাহির হইয়া গেল। ইহাদের পরে দুই শত আড়াই শত খাসা ঘোড়া, সবগুলির গায়ে জড়োয়া সোনার সাজ। ঘোড়ার পরে শতাধিক খাসা (royal) হাতী; এই গুলির মধ্যে পাট-হাতী (আওরঙ্গ-গজ) মনসব হিসাবে সর্ব্ব-প্রধান। মনসবদারী পদমর্য্যাদা অনুসারে ইহাদের গায়ে জড়োয়া কিংবা সোনা-রূপার সাজ (harness); এবং প্রত্যেকটা খাসা হাতীর সঙ্গে আগে পিছে আট-দশটা বাক্‌বাকে পিতলের সাজে চাকর-হাতী; কোন কোন রাজহস্তী বিশেষ অধিকার বলে সপরিবারে দরবারে আসিয়াছেন। দেওয়ান-ই-আমের

---

* বেগম-বাদশাহ্‌র পোশাকী চটির তলি—যাহাতে মাটি লাগিবার কথা নয়—অত্যন্ত হালকা এবং আগাগোড়া সমান হইত; অর্থাৎ গালিচার পক্ষে ক্ষতিকর heel থাকিত না; উপরে কার্পেটের গায়ে জরির কাজ, এবং দামী পাথর বসান হইত। পুরনো ফ্যাশনের চটির ন্যায় বেগমদের চটির মাথা চেপ্‌টা হইত; কিন্তু পুরুষের চটি তলার ডগায় এক অতিরিক্ত পুরু ও দীর্ঘতর পটির উপর ভর করিয়া মাথা চাড়া দিয়া উঠিত, এবং সাপের মাথায় উঁচু ফণা কিংবা নৌকার পালের মত মাথা পিছনে হেলাইয়া সদর্পে পুরুষত্ব জাহির করিত।

পুরুষের জন্য বাহিরে ব্যবহার্য্য নাগ্‌রা-জুতার গড়নেও ঐপ্রকার উদ্ধত ভাব ছিল, পরে পরে উহার মাথায় "তুর্‌রার" মত চামড়ার সরু ফালির দীর্ঘ শিং লাগাইয়া জঙ্গী চেহারা করা হইত। আজকাল হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবীর আমীরী জুতায়, পাঠানের পেরেক্-বহুল চারি সের ওজনের জাহাজী নাগ্‌রায়—যাহা সকরে মালিকের মাথার নীচে বালিশের কাজও করে—উহার রকমারি দেখা যায়।

নীচে চলাচলের পথে মাহুতের সঙ্কেতে বিশিষ্ট হাতীগুলি পাকা দরবারীর মত আলাহজরতকে শুঁড় মাটিতে ঠেকাইয়া আবার বক্রভাবে মাথার উপর রাখিয়া "তস্‌লীম" জানাইল। হাতীর পরে উষ্ট্রশালার ক্ষুদ্র নালিকাস্ত্রবাহী (শোতর-নাল) জঙ্গী উটের কাতার মুজ্‌রায় উপস্থিত হইল।

ইহার পরে শাহজাদা দারার নিজ তাবিনের সেনাবাহিনী ও হাতী ঘোড়ার মহড়ার (review) হুকুম হইল; অধিকন্তু সম্রাট ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন দেওয়ান-ই-আম হইতে শাহ-জাদা এবং তাঁহার অনুগামী রাজা ও মনসবদারগণের সওয়ারী পতাকা বাদ্য সমেত বিজয়-যাত্রা করিবেন। এইরূপ সম্মান আকবর-জাহাঙ্গীরের আমলে কোন শাহজাদার ভাগ্যে ঘটে নাই; সুতরাং ইহা নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। যাহা হউক্, কিছুক্ষণ পরে বাহির হইতে বিদায়ী শোভাযাত্রার অপেক্ষমাণ মিছিল মোড় ঘুরিয়া চত্বরে প্রবেশ করিল। দারা আসন ত্যাগ করিয়া সম্রাটকে অভিবাদনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিলেন, তাঁহার নিজ তাবিন মহড়ায় উপস্থিত হইল। অশ্বারোহী, হস্তী ও পদাতিবর্গ সুশৃঙ্খল ভাবে দেওয়ান-ই-আমের সম্মুখস্থ দরবারী রাস্তা হইতে সম্রাটকে অভিবাদন করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল, চত্বরে কিছুক্ষণের জন্য যুদ্ধের আবর্ত্ত সৃষ্টি হইল।

১২

অতঃপর সম্রাট খেলাত বিতরণের হুকুম দিলেন। ক্রমানুসারে অনুগৃহীত ব্যক্তিগণের নাম ডাকা আরম্ভ হইল। দারা নীচে নামিয়া "তস্‌লীম"* করিলেন এবং খেলাতের খাসা হাতী ঘোড়া, বস্ত্র, রত্নখচিত তরবারি ইত্যাদি প্রত্যেক সামগ্রীর নাম উল্লেখের সঙ্গে হাত জোড় করিয়া মাথা নোয়াইয়া নিঃশব্দে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। ইহার পরে উজীর-আজম, মীর-সামান ও গুরুজ্‌বরদারগণ শাহজাদাকে খেলাত পরিধানের তাঁবুতে লইয়া গেলেন এবং আমীর-উল্‌-ওমরা শায়েস্তা খাঁ প্রধান মন্ত্রীর পরিবর্ত্তে নাম ডাকিয়া খেলাত ঘোষণা করিতে লাগিলেন; দারার পরে কুমার সিপহর শুকো, রুস্তম খাঁ, রাও ছত্রসাল ইত্যাদির নাম ডাকা হইল। খেলাতের পোশাক ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া এবং Token delivery জ্ঞাপক হাতীর অঙ্কুশ ও ঘোড়ার লাগাম, রথের সারথির চাবুক হাতে লইয়া দারা পুনরায় সিংহাসনের নীচে দাঁড়াইয়া তিন বার তস্‌লীম করিলেন এবং উপরে গিয়া সম্রাটের পদচুম্বন করিলেন। অন্যান্য যাঁহারা খেলাত পাইলেন তাঁহারাও পর পর খেলাত পরিধান করিয়া তিন তিন বার তস্‌লীম্ করিবার পর স্ব স্ব স্থানে দণ্ডায়মান রহিলেন। এই দিনের ন্যায় এত বেশী সংখ্যক খেলাত কোন দরবারে বিতরণ করা হয় নাই। যাঁহারা দামী খেলাত পান নাই তাঁহারাও নগদ এক হাজার হইতে এক শত টাকার তোড়া উপহার পাইয়াছিলেন।

রাও ছত্রসাল এই দরবারে বিশেষ ভাবে সম্মানিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে দামী খেলাত, খাসা হাতী-ঘোড়া এবং রত্নমণ্ডিত অস্ত্রশস্ত্র ব্যতীত মনসব ও জায়গীরে ইজাফা (বৃদ্ধি) দেওয়া হইয়াছিল। বুন্দীকবির উক্তি অনুসারে সম্রাট রাও ছত্রসালকে নিজের কাছে ডাকাইয়া দারাকে তাঁহার হাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা পুত্র পৌত্র ও জ্ঞাতিগণের ষোল জনের খেলাত মঞ্জুর হইয়াছিল। প্রথমে তাঁহার পুত্র কুমার ভগবন্ত সিংহের* ডাক পড়িল। তিনি তস্‌লীম করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, অথচ খেলাত লইবেন না। এই বেয়াদবীর দরুণ একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল, বাদশাহী খেলাত প্রত্যাখ্যান একটা অচিন্তনীয় ব্যাপার। বেগতিক দেখিয়া রাও ছত্রসাল আগাইয়া আসিয়া নিবেদন করিলেন, এই হতভাগা শাহজাদা আওরঙ্গজেবের চাকরী গ্রহণ করিয়া শুধু আমার কথায় দরবারে আসিয়াছে; সে আমাদের শত্রু, সুতরাং খেলাত পাইতে পারে না। শাহজাহান রাজপুতকে বিলক্ষণ চিনিতেন। তিনি ঈষৎ হাসিয়া রাও ছত্রসালকে বলিলেন, উহাতে দোষ কি? আওরঙ্গজেবও আমার পুত্র। ভগবন্ত সিংহ কিছুতেই রাজী না হওয়ায় সম্রাট অগত্যা তাঁহাকে দরবার হইতে প্রস্থানের অনুমতি দিলেন। ইহার পর দরবারে উপস্থিত নাবালক কনিষ্ঠকুমার (চতুর্থ) ভারতসিংহ, এবং

* আকবর কুর্ণিশ ও তস্‌লীম করিবার কায়দা উদ্ভাবন এবং প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তস্‌লীমের নিয়ম: মাথা আস্তে আস্তে নীচু করিয়া ডান হাতের পিঠ মাটিতে রাখিবে; অতঃপর সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া ঐ তালের তালু মাথায় রাখিবে।

খেলাত জায়গীর ইত্যাদি বকশিশ হইলে গ্রহীতা তিন বার তস্‌লীম্ করিবে, বেতনাদি গ্রহণের সময় এক্‌বার (দ্রষ্টব্য *Ain.* i, p. 158)

* কুমার ভগবন্ত সিংহ বুঁদীর উত্তরাধিকারী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই। এইজন্য তিনি স্বতন্ত্র ঠিকানা (জায়গীর) স্থাপন করিবার জন্য কৃতসংকল্প ছিলেন। ধর্ম্মাতের যুদ্ধের পর তিনি আওরঙ্গজেবের নিকট উপস্থিত হইয়া চাকরী গ্রহণ করেন। রাও ছত্রসাল তাঁহাকে বুন্দী আসিবার জন্য আদেশ দেওয়ায় ভগবন্ত সিংহ আওরঙ্গজেবের নিকট কথা দিয়াছিলেন তিনি অন্য কাহারও চাকরী স্বীকার করিবেন না; এইজন্য তিনি দৃঢ়তার সহিত সম্রাটের খেলাত প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। সামুগড়ের যুদ্ধে তিনি আওরঙ্গজেবের পক্ষে অসীম শৌর্য্য প্রদর্শন করেন। রাজ্যারোহণের পর তিনি কুমারকে পুরস্কারস্বরূপ বুঁদীর গদি দিতে চাহিয়াছিলেন। ভগবন্ত সিংহ এই প্রস্তাব ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়াছিলেন পিতা যাঁহাকে বুঁদীর গদি দিয়াছেন তাঁহাকে যদি রাজ্যচ্যুত করিবার কেহ চেষ্টা করে তিনি বুঁদীর পক্ষ হইয়া লড়িবেন। তিনি বারা ও মৌ স্বতন্ত্র জায়গীর লাভ করিয়া সন্তুষ্ট ছিলেন (বংশ ভাস্কর: পৃঃ ২৬৭৯)। ইহাই সে কালের আদর্শ ক্ষত্রিয় চরিত্র। চতুর মুসলমান প্রথম হইতে রাজপুত চরিত্রের ন্যায়ান্যায়-নিরপেক্ষ স্বামিধর্ম্মের দুর্ব্বলতা পূর্ণভাবে কাজে লাগাইয়াছিল।

বুন্দীরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা খুল্লতাত ইত্যাদি পনর জন সেনা-নায়ক খেলাত ও পুরস্কার গ্রহণ করিলেন।

১৩

দেওয়ান-ই-আমের চত্বরে যাত্রার বিজয়-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল, সম্রাট-প্রদত্ত সুসজ্জিত (সপ্তাশ্ববাহিত ?) "রথ"* দরবার-গৃহের পাদদেশে শাহজাদাকে লইয়া প্রস্থান করিবার জন্য প্রস্তুত। শাহজাহান এতক্ষণ লোকচক্ষুর গোচরে পুত্রের প্রতিও প্রজানির্বিশেষ রাজধর্ম্মের দুঃস্থ রক্ষা করিয়া আসিতে-ছিলেন; কিন্তু বিদায় প্রার্থনা করিয়া দারা তাঁহার পদস্পর্শ করিবামাত্র তিনি একেবারে ভাঙিয়া পড়িলেন। সিংহাসন হইতে উঠিয়া নিতান্ত প্রাকৃতজনের ন্যায় আকুলভাবে পুত্রকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন, কিছুক্ষণ পরে আত্মসংবরণ করিয়া পুত্রের বিজয় কামনার্থ "সুরা-ফাতেহা" আবৃত্তি করিলেন, চারিদিকে তুমুল হর্ষ ও জয়ধ্বনি উত্থিত হইল। সম্রাট আদেশ দিলেন, দেওয়ান-ই-আমের সিঁড়ি হইতেই শাহজাদা রথে পদার্পণ করিবেন, সেনানীগণ অশ্বারূঢ় এবং সৈন্যগণ সামরিক কায়দায় ব্যূহবদ্ধ হইয়া তাঁহার অনুগমন করিবে, শাহজাদার বাদ্যভাণ্ড কোথাও নিস্তব্ধ হইবে না, পতাকা অবনমিত হইবে না।

দারা পিতার আশীর্ব্বাদ লইয়া দক্ষিণমুখী হইয়া রথে উপবেশন করিলেন। তখন দেওয়ান-ই-আমের চত্বরে গোধূলির আবছায়ার উপর অন্ধকার নামিয়া আসিতেছে; তাঁবুর বাহিরে চতুর্দ্দিকে অনতিপরিসর সঞ্চরণ মার্গে দারার রথ মধ্যস্থলে রাখিয়া সামন্তবর্গ ও যোদ্ধৃগণ পরিচালিত অশ্বারোহী, ভল্লধারী পদাতিক, বন্দুকচী ও হস্তিযূথ ঠাসাঠাসি হইয়া বিরাট অজগরের মত মন্থরগতিতে ফটকের দিকে চলিয়াছে। সিংহাসনমণ্ডপ হইতে দারার রথ দৃষ্টির ঈষৎ বাহির হওয়া মাত্র বৃদ্ধ সম্রাট রাজদণ্ডের উপর ভর করিয়া নীচে নামিয়া সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া রহিলেন। সেখান হইতে তিনি উদাসচিত্তে আকুল নয়নে চত্বর হইতে শেষ যোদ্ধার নিষ্ক্রমণ পর্য্যন্ত চাহিয়াই রহিলেন; আজ যেন দুনিয়ায় তিনি নিতান্ত নিঃসঙ্গ।

শাহজাহানের ঐ শীর্ণ জরাকুব্জ রত্নদণ্ডাশ্রিত শুভ্র দেহযষ্টি বাহ্যজ্ঞানরহিত চিত্রপুত্তলিকাবৎ স্থাণু হইলেও তাঁহার মন আশা-নিরাশার ঘূর্ণাবর্ত্তে, ভবিতব্যের গোলক-ধাঁধায় খেই-হারা হইয়া ঘুরিতেছিল। যাহারা চলিয়া গেল তাহারা কি আবার ফিরিবে? ইহা কি শেষ বিসর্জ্জন, না বিজয়ী হইয়া পুনরাগমনের জন্য পুত্রের সাময়িক বিদায়? পিতার প্রাণের এই আকুল জিজ্ঞাসার কে উত্তর দিবে? মহাকাল নীরব, আড়ালে নিয়তির নিষ্ঠুর ভ্রূকুটি।

১৪

দরবারের বহ্বাড়ম্বরে সেই দিন দারার যাত্রাই পণ্ড হইল। তিনি দেওয়ান-ই-আমের ফটক পার হইয়া কিছু দূরে নিজের হাতীতে চড়িলেন। সেদিন যাত্রা স্থগিত রহিল, সকলেই বিশ্রামার্থ স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া গেলেন। জাহানারা বেগমের নিজ প্রাসাদে ফিরিয়া যাওয়ার অবকাশ বাকী জীবনে আর হইল না।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল। এই সন্ধ্যায় হিন্দু-মুসলমানের মিলন-স্বপ্ন, মোগল সাম্রাজ্যের দৃপ্ত গৌরবচ্ছটা সবই আঁধারে মিলাইয়া গেল, দারা-শাহজাহান ও জাহানারার জীবন-নাট্যের বিয়োগান্ত শেষ অঙ্ক কালরাত্রির আঁধারেই অভিনীত হইল। দরবার-ই-আম হইতে ইহাই পিতা-পুত্রের—তথা ঐতিহাসিকের শেষ বিদায়।

* "রথ" শব্দ এখনও অপ্রচলিত নয়। কাম্বো-র *Amal-i-salih* ও লাহোরী-ওয়ারেসের *Badshah nama* গ্রন্থে একাধিক বার রথের উল্লেখ পাওয়া যায়। দিল্লী অঞ্চলে এক্কা গাড়ীকে "রথ" বলা হয়; অন্যত্র সাধারণতঃ ছপ্পরওয়ালা গরুর গাড়ীকেও রথ বলে। প্রাচীন রথের নমুনা রাজপুতানার জায়গীরদারগণের চারি ঘোড়ার জুড়ী গাড়ীতে দেখা যায়। হিন্দু সংস্কার অনুসারে দক্ষিণ দিকে বিজয়-যাত্রায় রথই শুভ। শাহজাহান গোঁড়া মুসলমান হইলেও আপৎকালে হিন্দু সংস্কার মানিয়া চলিতেন; এই জন্যই তিনি রথের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই রথে কয়টি ঘোড়া ছিল জানা যায়না। *Haft iqlim* বা সপ্তখণ্ড পৃথিবীর বিজয়-সূচক সাতটা ঘোড়া থাকাই সম্ভব।

শুদ্ধিপত্র (পূর্ব্ব সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধের)

পৃঃ ২৭২ দ্বিতীয় কলম—পং ১০	"ঠাঁট"	স্থলে	ঠাট	পড়িতে হইবে
„ ২৭৬ প্রথম „ —„ ৪	"কর্ত্তৃক"	„	অথবা	„ „
„ „ „ „ —„ ১৮	"খোলা ছিল"	„	খোলা হইয়াছিল	„ „
„ ২৭৭ দ্বিতীয় „ —„ ২০	"যাইলেন"	„	যাইবেন	„ „
„ „ পাদটীকা —„ ১	"নূরজাহান পূর্ব্বে"	„	নূরজাহান হইবার পূর্ব্বে	„ „
„ ২৭৯ দ্বিতীয় কলম— „ ৩	"দুর্গ প্রাকারের"	„	কোট্‌গুল্ম	„ „
„ ২৮১ „ „ —„ ৬	"জরবা"	„	"জব্‌রা"	„ „
„ „ „ „ —„ ৭	"কিঘাই"	„	কিয়াই	„ „
„ „ „ „ —„ ৩৯	"দাড়ি, গোঁফ গালপাট্টা"	„	দাড়ি-গালপাট্টা	„ „

বৈদিক কাহিনী

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ

পুরাণমধ্যে বহু উপাখ্যান পাওয়া যায় যাহার ঘটনাসমাবেশ বহুলাংশে অলৌকিক ও অতিজাগতিক, বাস্তবে উহা সম্ভব নহে। পণ্ডিতদিগের কেহ কেহ ঐ সকল কাহিনীকে রূপক বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, আবার কাহারও মতে উহা গভীর আধ্যাত্মিক অর্থপূর্ণ। কাহিনীর তাৎপর্য বা গুপ্ত অর্থ যাহাই হউক, পুরাণবর্ণিত অনেক ঘটনা যে অতিপ্রাকৃত তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

পুরাণ-প্রণেতারা ঐ সকল কাহিনীর জনক ছিলেন না—তাঁহারা ছিলেন প্রচলিত কাহিনীর ধারক। মুখে মুখে যাহা কিংবদন্তীরূপে চলিয়া আসিতেছিল, তাহাকেই তাঁহারা পূর্ণ রূপ দিয়া পুরাণমধ্যে গাঁথিয়া রাখিলেন। সুদূর অতীত হইতে মানব-মন কল্পনাসম্ভারে গল্প রচনা করিয়া আসিতেছে। এখনকার সময়ে উপন্যাস পরিকল্পনায় যেমন বাস্তবকে অতিক্রম করা চলে না, পুরাকালের কাহিনী-কল্পনার সেরূপ সীমা নির্দিষ্ট ছিল না—অতিজাগতিক কল্পনার বাধা ছিল না। বরং দেখা যায় প্রাচীন ও মধ্যযুগের মানুষ অতিজাগতিক কথাকেই অধিকতর প্রশ্রয় দিতেন। সীমাবদ্ধ শক্তিবিশিষ্ট মানুষ অপেক্ষা অপরিসীম অলৌকিক শক্তিবিশিষ্ট অতিমানুষ শ্রেণীর জীবের কল্পনা তাঁহারা করিতেন। ইঁহারা স্বর্গলোকের অধিবাসী দেবতা। ইচ্ছানুসারে পৃথিবীতে আসিতেন, মানুষকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতেন, তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে সুখসমৃদ্ধিশালী করিতেন। দেবতাদিগের অনুগ্রহে বিপদ কাটিয়া যায়, বিত্তসম্পদ লাভ করিতে পারা যায় এরূপ ধারণা হইতে মানব-মন এখনও মুক্ত নহে। প্রাচীনকালের লোকের মনে এই ধারণা আরও প্রবল ছিল, তাহারই ফলে ঐ সকল অলৌকিক গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে।

কেবল পৌরাণিক যুগে নহে, প্রাচীনতম রচনা ঋগ্বেদেও দেখা যায় বৈদিক ঋষিদের মধ্যেও দেবতাদিগের সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত ছিল। বৈদিক কাহিনীগুলি অনেক ক্ষেত্রেই দেবতাদিগের স্তবস্তুতিতে তাঁহাদের কার্যকলাপের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ মাত্র ;—পৌরাণিক কাহিনীর ন্যায় পূর্ণাবয়ব উপাখ্যান নহে।

পুরাণে দেব-ভিষক্ যুগল-অশ্বিনীকুমারের কথা পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে ইঁহারা অশ্বিদ্বয়। অশ্বিদ্বয়ের সম্বন্ধে কয়েকটি কাহিনী আছে।

এক সময় গোতম ঋষি মরুভূমিতে অবস্থান করিতেছিলেন। মরুভূমিতে জল পাওয়া যায় না ; এ কারণ অশ্বিদ্বয় অন্যদেশ হইতে একটি কূপ উঠাইয়া আনিয়া ঐ কূপ গোতমের নিকট রাখিয়া দিয়াছিলেন। ঋষির স্নান ও পানের জন্য জল পাইবার সুবিধা হইবে বলিয়া অশ্বিদ্বয় ঐ কূপের মুখ নিম্নদিকে ও তলদেশ ঊর্দ্ধদিকে করিয়া স্থাপন করিয়াছিলেন।

চ্যবন ঋষি বার্দ্ধক্যে জীর্ণাঙ্গ হইলে তাঁহার পুত্রেরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। ঋষি অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করিলে অশ্বিদ্বয় তাঁহার জরা দূর করিয়া যৌবন দান করিয়াছিলেন।

খেল নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম ছিল বিশ্‌পলা। তৎকালে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও কেহ কেহ যুদ্ধ করিতে যাইতেন। কোনও যুদ্ধে বিশ্‌পলার একটি পা ছিন্ন হইয়া যায়। খেলের পুরোহিত অগস্ত্য, অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করিলে অশ্বিদ্বয় রাত্রিতে আসিয়া বিশ্‌পলার জঙ্ঘার সহিত লৌহময় পা সংযোজিত করিয়া দিয়াছিলেন।

বৃষাগিরের পুত্র ঋজ্রাশ্ব এক জন রাজর্ষি ছিলেন। অশ্বিদ্বয়ের বাহন গর্দভ, ঋজ্রাশ্বের নিকট আসিয়া বৃকীতে পরিণত হইয়াছিল। সেই বৃকীর আহারার্থ ঋজ্রাশ্ব পৌরজনের বহু মেস খণ্ড খণ্ড করিয়া দিয়াছিলেন। পৌরজনের এই প্রকার অপকার করার জন্য তাঁহার পিতা বৃষাগির তাঁহাকে নেত্রহীন করিয়াছিলেন। ঋজ্রাশ্ব অন্ধ হইয়া অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করেন। অশ্বিদ্বয় তাঁহার অন্ধত্ব দূর করেন।

রেভ ঋষিকে অসুরেরা দড়ি দিয়া বাঁধিয়া একদা সন্ধ্যাকালে কূপমধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিল। ঋষি দশ রাত্রি নয় দিন অশ্বিদ্বয়ের স্তব করেন। দশম দিন প্রাতে অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে কূপ হইতে উদ্ধার করেন।

কক্ষীবানের কন্যা ঘোষা কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন। এই কারণ তাঁহাকে বিবাহ না দিয়া পিতৃগৃহে রাখা হইয়াছিল। অশ্বিদ্বয়ের অনুগ্রহে তিনি কুষ্ঠরোগ হইতে নিরাময় হন ও পতিলাভ করেন।

রাজর্ষি বিমদ স্বয়ম্বরে কন্যালাভ করিয়া নিজ রাজ্যে ফিরিতেছিলেন। পথে অন্যান্য রাজগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া কন্যা কাড়িয়া লন। অশ্বিদ্বয় সহায়তা করিয়া ঐ কন্যাকে তাঁহাদের নিজেদের রথে আরোহণ করাইয়া বিমদের নিকট পৌঁছাইয়া দেন।

তুগ্র নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। তিনি দ্বীপান্তরবর্তী শত্রুদিগের উপদ্রবে ক্লিষ্ট হইয়া তাঁহার পুত্র ভুজ্যুকে শত্রু

জয় করিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। ভুজ্যু সসৈন্যে নৌকায় সমুদ্রমধ্যে অনেক দূর গমন করিলে নৌকা ভাঙিয়া যায়। ভুজ্যু অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করিলে তাঁহারা সসৈন্যে ভুজ্যুকে আপনাদিগের পোতে করিয়া তিন দিন তিন রাত্রিতে তুগ্রের নিকট পৌঁছাইয়া দেন।

অশ্বিদ্বয়ের স্তুতিতে আছে :

অথর্বার পুত্র দধীচি ঋষি অশ্বমস্তক ধারণ করিয়া তোমাদিগকে মধুবিদ্যা শিখাইয়াছিলেন। ঋঃ বেঃ ১।১১৬।১২

এই উক্তির সহিত যে কাহিনী জড়িত তাহা এইরূপ :

ইন্দ্র দধীচিকে মধুবিদ্যা দান করিয়াছিলেন। কথা ছিল এই বিদ্যা তিনি আর কাহাকেও শিখাইতে পারিবেন না। শিখাইলে ইন্দ্র তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিবেন। অশ্বিদ্বয় প্রথমে দধীচির মাথা কাটিয়া তাঁহাকে অশ্বের মাথা পরাইয়া দিলেন। অশ্ব-মস্তক দধীচি অশ্বিদ্বয়কে মধুবিদ্যা উপদেশ করিলেন। ইন্দ্র পূর্ব কথামত তাঁহার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। অশ্বিদ্বয় তখন দধীচির স্কন্ধে তাঁহার নিজের মাথা লাগাইয়া দিলেন।

অশ্বিদ্বয় সম্বন্ধে আরও কয়েকটি উক্তি পাওয়া যায় :

তাঁহারা পেদু নামক রাজর্ষিকে শ্বেতবর্ণ অশ্ব দান করিয়াছিলেন। এই অশ্ব তাঁহার বহু যুদ্ধজয়ের হেতু হইয়াছিল। অত্রি ঋষি চতুর্দিক হইতে দীপ্যমান অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছিলেন। অশ্বিদ্বয় জলদ্বারা অগ্নি নির্বাপিত করিয়া তাঁহাকে অক্ষত শরীরে উদ্ধার করিয়াছিলেন। বধ্রিমতী পুত্রহীনা ছিলেন। অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে হিরণ্যহস্ত নামক পুত্র দান করিয়াছিলেন। বর্তিকা (চড়াই-এর ন্যায় একপ্রকার ক্ষুদ্র পাখী) অরণ্যের এক বৃকমুখে পতিত হইলে অশ্বিদ্বয় তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। ঋঃ বেঃ ১।১১৬।৬,৮,১৩,১৪।

নিরুক্তকার যাস্ক বলেন—'বর্তিকা', যাহা বার বার প্রত্যাবর্তন করে, অর্থাৎ উষা* ; এবং 'বৃক' যিনি আলোক দ্বারা জগৎকে আবৃত করেন, অর্থাৎ সূর্য। সূর্য উষার পশ্চাতে আসিয়া তাহাকে ধৃত করেন এবং অশ্বিদ্বয় তাহাকে ছাড়াইয়া দেন।

ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবতা, নানা নৈসর্গিক ব্যাপারের কল্পিত অধিপতি। বেদের এই যুগ্মদেবতা অশ্বিদ্বয় কাহারা ?

প্রাচীন আর্যেরা প্রকৃতির কোন্ দৃশ্যকে অশ্বিদ্বয় নামে পূজা করিতেন ? কেহ বলেন, ইঁহারা দ্যাবাপৃথিবী (স্বর্গ ও পৃথিবী), কেহ বলেন, দিন ও রাত্রি, কাহারও মতে, ইঁহারা চন্দ্র ও সূর্য। [তৎ কৌ অশ্বিনৌ। দ্যাবা পৃথিব্যৌ ইতি একে অহোরাত্রৌ ইতি একে সূর্যচন্দ্রমসৌ ইতি একে—যাস্ক।] সূর্যের আলো আকাশপথে ধাবিত হয়। এ কারণ আলোক-রশ্মি ঋগ্বেদে অশ্ব বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কাজেই অশ্বিদ্বয়ের সহিত আলোকরশ্মির সম্বন্ধ থাকার সম্ভাবনা। নিরুক্তকার যাস্কের মতে অর্ধরাত্রির পর হইতে প্রাতঃকালের পূর্ব পর্যন্ত, আলো-অন্ধকার-সমন্বিত সময়ের দেবতা অশ্বিদ্বয় কল্পিত হইতেন।

ইন্দ্রের সম্বন্ধে কাহিনী আছে তিনি একদা ক্রীড়াপরায়ণ হইয়া অশ্বী হইতে গাভী উৎপন্ন করিয়াছিলেন। বেদে কিরণসমূহকে অশ্ব ও গাভী উভয়ের সহিতই তুলনা করা হইয়াছে। [রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবিতায় 'আলোক-ধেনু' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন কিঞ্চিৎ ভিন্ন অর্থে।] অশ্ব ও গাভী একার্থবাচক। এ কারণ অশ্ব হইতে গরুর জন্ম হইল এই কল্পনার মূল অনুমান করা কঠিন নহে।

গাভী মনুষ্যদিগের যেমন অতিশয় প্রিয় পশু ছিল, দেবলোকে দেবতাদেরও তেমনি বহু গাভী থাকিত। এই গাভী আদিতে পশু-গাভী ছিল না, ছিল 'আলো-ধেনু।' কাহিনীতে আছে—

পণি নামক অসুরেরা দেবলোক হইতে গাভী হরণ করিয়া অন্ধকারে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। ইন্দ্র মরুদ্‌গণের সহিত তাহা উদ্ধার করিয়াছিলেন। ব্যাধ যেরূপ মৃগের অন্বেষণে কুক্কুর প্রেরণ করে, ইন্দ্রও সেইরূপ দেব-কুক্কুরী সরমাকে গাভীর সন্ধানে পাঠান। সরমা কহিল, হে ইন্দ্র যদি তুমি আমার শিশুদিগকে গাভীর দুগ্ধ পান করিতে দাও তাহা হইলে আমি অপহৃত গাভীর সন্ধানে যাইব। ইন্দ্র সম্মত হইলে সরমা অসুরদিগের মধ্যে যাইয়া তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করে ও লুক্কায়িত গাভীর সংবাদ আনিয়া দেয়। গাভীর সন্ধানে সরমা পণিদিগের নিকট উপস্থিত হইলে, সরমা ও পণিদিগের মধ্যে কথোপকথন হয়। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলে সমগ্র ১০৮ সূক্তটি এই কথোপকথন।

পণিগণ জিজ্ঞাসা করিল—

হে সরমা, কি উদ্দেশ্য লইয়া তুমি এখানে আসিয়াছ ? এ স্থান অতি দূরের পথ। পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিপাত করিলে এ পথ অতিক্রম করা যায় না। কয় রাত্রি ধরিয়া তুমি আসিয়াছ ? নদীর জল কিরূপে পার হইলে ? আমাদের নিকট এমন কি পদার্থ আছে যাহার জন্য তুমি আসিয়াছ ?

সরমা বলিল—

হে পণিগণ, আমি ইন্দ্রের দূতীস্বরূপ প্রেরিত হইয়া আসিয়াছি। তোমরা যে অনেক গোধন সংগ্রহ করিয়াছ, তাহা গ্রহণ করাই আমার অভিপ্রায়। জল আমাকে রক্ষা

* ঋগ্বেদে 'উষা' হ্রস্ব 'উ'।

করিয়াছেন, কেননা জলের ভয় হইলে আমি হয়ত তাহাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইব। এইরূপে জল পার হইয়াছি।

পণিগণ—

হে সরমা, যে ইন্দ্রের দূতী হইয়া তুমি দূরদেশ হইতে আসিয়াছ, সেই ইন্দ্র কিরূপ?—তিনি দেখিতে কেমন? (কী দৃঙ্ঙিন্দ্রঃ সরমে, কা দৃশীকা)। তিনি আসুন, আমরা তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিব। তিনি আমাদিগের গাভী-সমূহ গ্রহণ করিয়া উহার সত্ত্বাধিকারী হউন।

সরমা—

যে ইন্দ্রের দূতী হইয়া দূরদেশ হইতে আসিয়াছি, সেই ইন্দ্রকে পরাজয় করে এমন কেহ নাই। তিনিই সকলকে পরাজিত করেন। হে পণিগণ, নিশ্চয়ই তোমরা ইন্দ্রের হস্তে নিহত হইয়া শয়ন করিবে (হতা ইন্দ্রেণ পণয়ঃ শয়ধ্বে)।

পণিগণ—

হে সুন্দরী সরমা (সরমে সুভগে), তুমি স্বর্গের শেষ সীমা হইতে আসিতেছ, এ কারণ এই সকল গাভীর মধ্য হইতে যতগুলি তোমার ইচ্ছা হয় ততগুলি গাভী তোমাকে দিতেছি। বিনা যুদ্ধে কে-ই বা তোমাকে ইহা দিত! আমাদিগের অনেক তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ অস্ত্র আছে।

সরমা—

হে পণিগণ, তোমাদের এই প্রকার উক্তি যোদ্ধার উপযুক্ত নহে। তোমাদের শরীরে পাপ রহিয়াছে, ইন্দ্রের বাণ যেন তোমাদের উপর পতিত না হয়। তোমাদের গৃহে আসিবার পথ যেন দেবতারা আক্রমণ না করেন। বৃহস্পতি তোমা-দিগকে যেন ক্লেশ না দেন।

পণিগণ—

হে সরমা, আমাদিগের গাভী, অশ্ব ও অন্যান্য অনেক সম্পত্তি, চতুর্দিকে পর্বত দ্বারা সুরক্ষিত। যাঁহারা উহা উত্তম রূপে রক্ষা করিতে পারে এইরূপ বীর পণিগণ ঐ ধন রক্ষা করিতেছে। গাভীর শব্দ শুনিয়া তুমি এখানে আসিয়াছ, কিন্তু বৃথাই তোমার আসা হইয়াছে।

সরমা—

অযাস্য ঋষি, অঙ্গিরার সন্তানগণ এবং নবগুগণ সোমপানে বলদীপ্ত হইয়া আসিবেন। তাঁহারা এই বহুসংখ্যক গাভী ভাগ করিয়া লইবেন। তখন তোমাদের এই সদর্প উক্তি ত্যাগ করিতে হইবে।

পণিগণ—

হে সরমা, দেবতারা তোমাকে ভয় দেখাইয়া এখানে পাঠাইয়াছেন, তাই তুমি আসিয়াছ। আমরা তোমাকে ভগিনী বলিয়া গ্রহণ করিতেছি, তুমি আর ফিরিয়া যাইও না (স্বসারং ত্বা কৃণবৈ মা পুনর্গা)। হে সুভগে, তোমাকে এই গোধনের ভাগ দিতেছি।

সরমা—

ভাই-ভগিনীর কথা আমি বুঝি না (নাহং বেদ ভ্রাতৃত্বং নো স্বসৃত্বং)। ইন্দ্র ও পরাক্রমশালী অঙ্গিরার সন্তানেরা সমস্তই জানেন। গাভী পাইবার জন্য আমাকে তাঁহারা সুরক্ষিত করিয়া পাঠাইয়াছেন, আমি তাঁহাদিগের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছি। হে পণিগণ, এখান হইতে তোমরা দূরে পলায়ন কর।

হে পণিগণ, দূরে পলায়ন কর। গাভীরা কষ্ট পাইতেছে। এই পর্বত পরিত্যাগ করিয়া তাহারা ধর্মের আশ্রয়ে গমন করুক। বৃহস্পতি, সোম, সোম-প্রস্তুতকারী প্রস্তরগণ,* ঋষিগণ, মেধাবীগণ এই সকল গুপ্তস্থানস্থিত গাভীদিগের কথা জানিতে পারিয়াছেন।

পণিগণ আর্যদিগেরই বিশেষ এক গোষ্ঠী ছিলেন। তাঁহারা অর্থান্বেষী ব্যবসায়ী ছিলেন—ধন অর্জনের জন্য সমুদ্র-পথে বাণিজ্য করিতেন। পণ্ডিতেরা বলেন, পরবর্তী কালে 'বণিক' শব্দ 'পণি' বা 'পণিক' হইতে উদ্ভূত (বৈশ্যস্তু ব্যবহর্তা বিট্ বাতিকঃ পণিকো বণিক্—রাজনির্ঘণ্ট) 'পণ্য' 'আপণ' ও 'বিপণি' শব্দের মূলও এই বৈদিক 'পণি'।

বল নামে এক অসুর দেবতাদের গাভী অপহরণ করিয়া গহ্বর মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। ইন্দ্র সসৈন্যে গহ্বর বেষ্টন করিয়া গাভী উদ্ধার করেন।

এই সকল কাহিনীর মূলে সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও দিঙ্মণ্ডলে আলো-অন্ধকারের খেলা বিদ্যমান রহিয়াছে।

ঋগ্বেদে ঋভু অথবা ঋভুগণ নামে দেবতার উল্লেখ আছে। ঋভুগণ সম্বন্ধে একটি আখ্যান আছে। অঙ্গিরাপুত্র সুধন্বার ঋভু, বিভু ও বাজ নামে তিন পুত্র ছিলেন। তাঁহারা সৎকর্ম করিয়া দেবত্ব লাভ করেন। সায়ণাচার্যের ভাষ্যে আছে সূর্যরশ্মিসমূহও ঋভুগণ বলিয়া কথিত হন (আদিত্যরশ্ময়োঽপি ঋভব উচ্যন্তে)। ঋভুগণ একদা সোমপানে প্রবৃত্ত ছিলেন। দেবতারা তাঁহাদিগকে চিনিতে না পারিয়া উঁহারা কে তাহা জানিবার জন্য অগ্নিকে ঋভুগণের নিকট পাঠাইয়া দেন। অগ্নি আসিয়া দেখিলেন তাঁহারা তিন জনই দেখিতে

* পাথরের উপর পাথর দিয়া ছেঁচিয়া সোমলতা হইতে সোমরস প্রস্তুত হইত। ঐ প্রস্তর ঋগ্বেদের ঋষিদিগের নিকট দেবতা কল্পিত হইতেন।

একপ্রকার। ইহা দেখিয়া অগ্নিও ঋভুগণের রূপ ধারণ করিয়া সোম পান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কোনও ঋষির একটি গাভী মরিয়া গিয়াছিল। ঋষি গাভীটির বৎসের জন্য দুঃখ অনুভব করিয়া ঋভুর স্তুতি করেন। ঋভু একটি গাভী নির্মাণ করিয়া তাহার দেহ মৃত গাভীর চর্মদ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন ও বৎসটিকে সেই গাভীর সহিত যুক্ত করিয়া দিলেন।

ইন্দ্রের সম্বন্ধে যে কয়েকটি কাহিনী আছে, তাহার মধ্যে বৃত্রকে বধ করার বিবরণ কিছু বিস্তৃত। 'বৃত্র' অর্থে জল-রোধক মেঘ। ইন্দ্র তাহাকে বজ্রের দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া বধ করেন, ফলে পৃথিবীতে বারিপাত হয়। বারিপাতের ফলে পৃথিবী উর্বরা ও নদীসমূহ জলপূর্ণ হয়। ইন্দ্র কর্তৃক বৃত্র-সংহারের মূল ইহাই।

কৃষ্ণ নামে এক কৃষ্ণবর্ণ অসুর ও তাহার দশ সহস্র অনুচর মানুষের উপর অতিশয় অত্যাচার করিত। ইন্দ্র কৃষ্ণাসুর ও তাহার অনুচরদিগকে বধ করেন।

রুরুর পুত্র রাজর্ষি কুৎস শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া ইন্দ্রকে আহ্বান করেন। ইন্দ্র কুৎসের শত্রুদিগকে বিনাশ করেন। এই সূত্রে ইন্দ্র ও কুৎসের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মে। একদা ইন্দ্র কুৎসকে লইয়া দেবলোকে নিজ-গৃহে গমন করিলে ইন্দ্রের স্ত্রী উভয়ের সমান রূপ দেখিয়া কে ইন্দ্র কে কুৎস চিনিতে না পারিয়া সংশয়ান্বিত হইয়াছিলেন।

দুর্গহ রাজার পুত্র পুরুকুৎস কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। রাজ্য অরাজক হইল দেখিয়া তাঁহার মহিষী পুত্রলাভের ইচ্ছায় সমাগত সপ্তর্ষিগণের পূজা করেন। সপ্তর্ষিগণ প্রীত হইয়া রাজ্ঞীকে ইন্দ্র ও বরুণের যজ্ঞ করিতে উপদেশ দেন। ইন্দ্র ও বরুণের যজ্ঞ করিয়া রাজ্ঞী ত্রসদস্যুকে প্রাপ্ত হন। ত্রসদস্যু ইন্দ্রের ন্যায় শত্রুবিনাশী ও অর্ধ-দেবতা হইয়াছিলেন।

অত্রির কন্যা অপালা চর্মরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতার মস্তক কেশশূন্য ও ক্ষেত্র ফলশূন্য হইয়াছিল। ইন্দ্র তাঁহাদের সকল দোষ দূর করেন। ইন্দ্র নিজের সামর্থ্যে সূর্যরথের একটি চক্র হরণ করিয়াছিলেন (১।১৭৫।৪)। অর্থাৎ সূর্যের রথে পূর্বে দুইটি চাকা ছিল, ইন্দ্র বাহুবলে তাহার একটি হরণ করিয়াছিলেন।

বেদোক্ত কোন একটি মাত্র উক্তি হইতে ভাষ্যকার কর্তৃক এই সকল কাহিনী কল্পিত হইয়াছে তাহা নহে একই কাহিনীর বহুবার উল্লেখ থাকায় ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, ঐ সকল কাহিনী বৈদিক ঋষিদিগের মধ্যে সুপ্রচলিত ছিল।

সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে মানবসভ্যতার উন্মেষকাল হইতে কাহিনী রচনার সূত্রপাত হইয়াছে। সেই সূত্র কালের স্রোতে মানবমনের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হইয়াছে, পরিবর্দ্ধিতও হইয়াছে। আর্যজাতির মধ্যে মূলে যে কাহিনী প্রচলিত ছিল বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন আর্য-গোষ্ঠীর মধ্যে তাহাই অপরূপ রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে—বিরাট মহাকাব্য রচিত হইয়াছে।

পণ্ডিতপ্রবর ম্যাক্সমূলার মনে করেন, পণিগণ কর্তৃক দেবলোকের গাভীহরণের কাহিনী প্রাতঃকালের প্রকৃতি সম্বন্ধীয় উপমা। তাঁহার মতে সুরমা (দেবকুক্কুরী) উষার একটি নাম। গাভীগণ অর্থাৎ সূর্যরশ্মি অন্ধকার দ্বারা অপহৃত হইয়াছিল। উষা আসিয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়া আলোকের সন্ধান দিলেন। তাহার পর আলোক-দেব ইন্দ্র, অন্ধকারের সহিত যুদ্ধ করিয়া দেব-গাভী উদ্ধার করিলেন। হোমার-রচিত গ্রীক্ ভাষার মহাকাব্য ট্রয়-যুদ্ধ পণিগণের গাভীহরণের রূপান্তর মাত্র। বাল্মীকি-রচিত রামায়ণে সীতাহরণ ও রাবণকে বধ করিয়া সীতা-উদ্ধারের মূলেও এই একই বৈদিক কাহিনী। বৈদিক ইন্দ্র রামায়ণে রাম নামে অভিহিত হইয়াছেন ইহা মনে করিবার মত উক্তিও ঋগ্বেদে রহিয়াছে।

নিত্য বৃন্দাবন

শ্রীসুধীর গুপ্ত

বৃন্দাবনে অবসন্ন গোধূলির ছায়া
নামিয়াছে কুঞ্জবনে, যমুনা-সলিলে
অস্ত-সূর্য্য, সন্ধ্যাতারা এ যুগলে মিলে
ঘনায়ে তুলেছে এক মোহময়ী মায়া।
গৃহগামী কৃষ্ণ-ধেনু ; যমুনার তীরে
মোহন বেণুর সুরে ঘুরে সমীরণ ;
স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে সায়াহ্ন-গগন।
বস্তু-লোক পার হয়ে ভাবের গভীরে
ডুবে যায় রাধিকার রস-বৃন্দাবন।
দিবসের ভুলে-থাকা বাউল স্বপন
আকুল করিয়া তুলে ; অভিসার আশা
অন্তরে বাজায়ে যায় অনন্তের ভাষা।
নিত্য দিন ছায়া-নামা এই বৃন্দাবন,
কৃষ্ণ-স্বপ্ন-মুগ্ধ করে শ্রান্ত রাধা-মন।

রাণী এলিজাবেথের রাজ্যাভিষেক
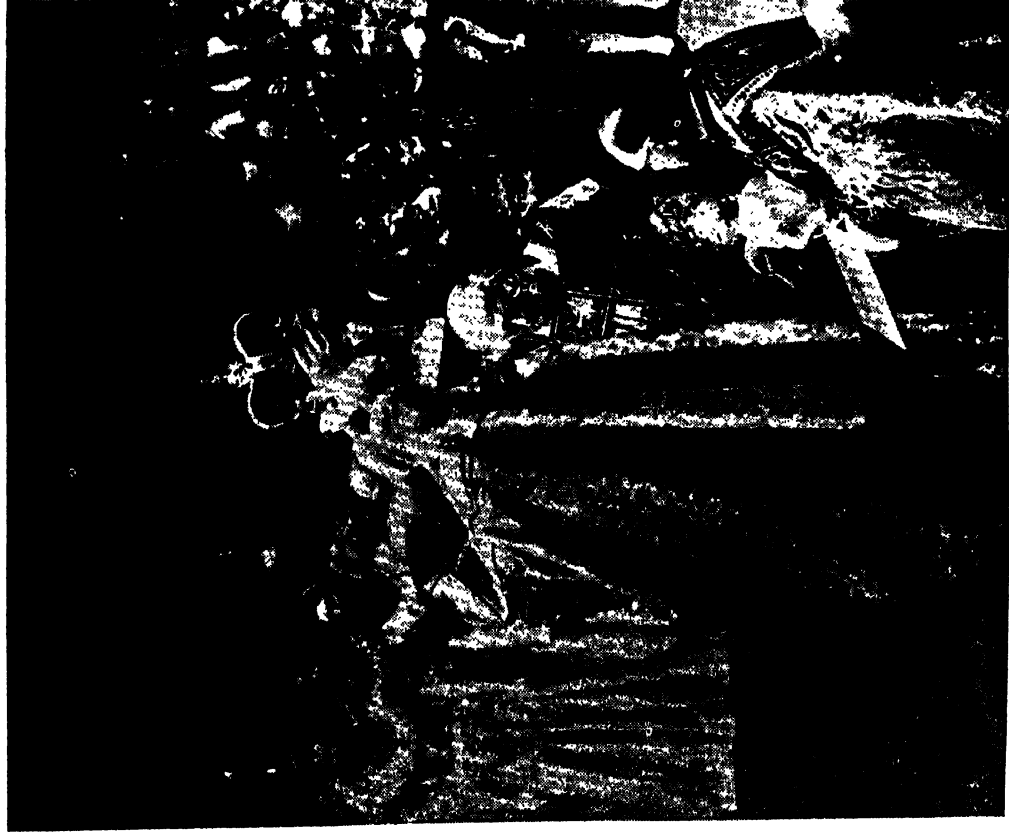
ওয়েষ্টমিনষ্টার এবেতে রাণী এলিজাবেথ কর্তৃক মস্তকে রাজমুকুট ধারণ

রাজ্যাভিষেক-দিবসে বাকিংহাম প্রাসাদে গৃহীত রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের প্রতিকৃতি

পূর্ণকুম্ভ [ভাস্কর শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

বর্ণসঙ্কট

শ্রীকানাইলাল গাঙ্গুলী

১

কলিকাতা-বালিগঞ্জে আমাদের বন্ধু তপনদের বাড়ীতে বিকেলে আমাদের আড্ডা বসত। সেদিন বিকেলে আমরা এক বিশিষ্ট ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করেছি তাঁর গল্প শোনবার জন্যে। আমরা জানতাম তিনি অনেক দেশ ঘুরেছেন, অনেক কিছু শিখেছেন আর এমন কাজ নেই যাতে হাত দেন নি। এ রকম ব্যক্তির আর কিছু হোক বা না হোক প্রচুর অভিজ্ঞতা হয়। আর তিনি এই সব অভিজ্ঞতা থেকে মালমশলা সংগ্রহ করে বেশ রসিয়ে রসিয়ে গল্প বলতে পারতেন। সেদিন বেশ বাদলাবেলা, বৃষ্টি সবে থেমেছে, আমরা উৎসুক হয়ে বসে আছি কখন তিনি আসেন—এমন সময়ে আবার ঝমঝম বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল। ভদ্রলোকের গাড়ী ছিল, তিনি তো নিশ্চয় আসবেন। আমরা জানি তিনি বহু দেশ ঘুরে একটা গুণ অর্জ্জন করেছেন, তাঁর কথায় কখনও খেলাপ হয় না। কিন্তু আমাদের দুঃখ হতে লাগল সেই সব বন্ধুর জন্যে যাঁরা তখনও এসে পৌঁছয় নি। আহা, কেউ হয়তো এখন হ্যারিসন রোড কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের মোড়ে এক হাঁটু জল ভাঙছে, কারও মাথায় হয় তো মুষল-ধারায় বৃষ্টি পড়ছে, আর সব চেয়ে খারাপ—কেউ হয়তো কোন ট্রাম বা বাসে গাদাগাদি ঠাসাঠাসি করে বসে আছে, রাস্তার জলে গাড়ী আটকে গেছে। কিন্তু ঐ ভদ্রলোকের গল্প শোনার আকর্ষণ এতই প্রবল যে একে একে সকলে উপস্থিত হ'ল। বাড়ীর ভেতর থেকে গরম গরম চা এল, আর কোন উত্তম খাদ্য যে ঘৃতপক্ক হচ্ছে, আঘ্রাণে তা বেশ অনুভূত হয়ে উঠল।

এই রকম আড্ডা আমাদের প্রায় রোজই হ'ত। মাঝে মাঝে আড্ডাটা বেশ জমত। এমন বাদল, তাতে এমন গরম গরম চা ও অমন উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত হচ্ছে, আর আশা করা যাচ্ছে ভদ্রলোকের গল্প বেশ মজার হবে, মনে হচ্ছে আজও আড্ডাটা ভাল রকম জমবে। অনেকের ধারণা এ রকম আড্ডা একেবারে বাজে, এতে শুধু সময় নষ্ট হয়। তাই কি? ভেবে দেখুন, হয়তো এই রকম কোন আড্ডাতেই, তা যেখানেই হোক, বাড়ীতে বা কাফেতে কিংবা কারাগারে, ফরাসী বিপ্লব বা রুশিয়ায় অক্টোবর বিপ্লবের সঙ্কল্প গৃহীত হয়েছে, অথবা হয়তো কোনও বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদের মাথায় একটা বড় আবিষ্কারের বীজ উপ্ত হয়েছে বা কোন শিল্পীর চিত্তে একটা কল্পনা জন্ম নিয়েছে, অথবা হয়তো পৃথিবীতে যত দানবীয় কাণ্ড ঘটেছে তার মতলব দানা বেঁধেছে! সুতরাং আড্ডাকে একেবারে যা তা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাই বলে ভাববেন না আমাদের আড্ডা এমন গুরুতর কিছু ছিল। আপিসে কলম পিষে বা স্কুল কলেজে সারাদিন চেঁচিয়ে অথবা আদালতে তিক্তবিরক্ত হয়ে আমরা বিকেলে তপনদের বাড়ীতে একত্র হতাম স্রেফ গল্প করার জন্যে।

আমরা সকলে উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করছি, এমন সময়ে সেই দারুণ বৃষ্টির মধ্যেই তাঁর গাড়ী যথাসময়ে বাড়ীর দোরগোড়ায় থামল। তপন ছুটে গেল তাঁকে অভ্যর্থনা করতে। সৌম্যমূর্ত্তি বয়স্ক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকতেই আমরা দাঁড়িয়ে উঠলাম, সকলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করে দেওয়া হ'ল। আমরা বসতে না বসতে আবার এক প্রস্থ গরম চা ও তার সঙ্গে গরম গরম ফুলকো লুচি ও মাংস এনে হাজির। বাইরে অবিরাম ঝমঝম ঝমঝম বৃষ্টির আওয়াজ চলছে, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে—মেঘ ডাকছে কড় কড় কড় কড়, আর আমরা আরামে বসে গরম চা ও লুচির সদ্ব্যবহার আরম্ভ করলাম এবং আমাদের গল্প আরম্ভ হয়ে গেল। কেন জানি না এ কথা ও-কথার পর সেদিন দর্শনের আলোচনা সুরু হয়ে গেল—হয়তো আমরা জানতাম ভদ্রলোকের এক বিশেষ দার্শনিক মত আছে, তাই অমনটা হ'ল। কিন্তু কিছুক্ষণ আলোচনার পর সকলেরই খেয়াল হ'ল, কৈ তিনি তো এ আলোচনায় যোগ দিচ্ছেন না? আমরা একটু বিস্মিত হলাম—ভদ্রলোক কেন চুপ করে রয়েছেন। আমাদের এক জন জিজ্ঞাসা করলে, "কই আপনি তো কোন মত প্রকাশ করছেন না? এই প্রচণ্ড বৃষ্টি কি তার জন্যে দায়ী?" তিনি একটু হেসে বললেন, "বৃষ্টিতে দর্শন-চিন্তা আরও ক্ষুরধার হয়। রবীন্দ্রনাথের বাদলের কবিতাগুলো পড়ুন না। তা আপনারা কি দর্শনচর্চার জন্যে আমাকে এখানে এনেছেন?"

"না, না! আমরা আপনার গল্প শুনতে চাই। তবে…"

"তবে আর কি! গল্পের মধ্যেই আমার দার্শনিক মত প্রকাশ পাবে।"

"সর্ব্বনাশ! না, না, আমরা আপনার দার্শনিক মতের ব্যাখ্যান শুনতে চাই না, আমরা চাই আপনার কাছে একটা রসালো গল্প শুনতে।"

তিনি হেসে উঠে বললেন, "বেশ ত, তাই হবে! কিন্তু আপনারা কি বলতে চান, যে যেমন গল্পই লিখুক বা বলুক তাতে তার দার্শনিক মতের পরিচয় থাকে না?"

"সব সময়ে নয়! এই ধরুন ভূতের গল্প বা সাপের গল্প, শিকার-কাহিনী বা রূপকথা এসবে কোন দার্শনিক মত প্রকাশ করার স্থান থাকে না। অথবা ধরুন এমন বাদলে বিরহীর মর্ম্মবেদনা নিবেদন। তাতে নিশ্চয় দর্শন থাকে না।"

"থাকে! এর কোনটাই জীবনের বাইরে নয়। জীবনের সম্বন্ধে কিছু বলতে বা লিখতে গেলেই বক্তার বা লেখকের দর্শনটাও প্রকাশ পায়।"

"কেউ যদি তা গোপন করে ?"

"তার উপায় নেই। তার অজ্ঞাতে তার মত ধরা পড়বেই, শুধু সেটা ঠিক ঠিক বোঝার ক্ষমতা থাকা চাই।"

"ঠিক বুঝলাম না। তা যাক্, আপনি একটা গল্প সুরু করুন।"

"কিসের গল্প শুনতে চান আপনারা ?"

"সেটা আপনিই ঠিক করুন।"

"কি চান ? ঘটনাবহুল চমকদার গল্প, না ঘটনাবিরল এমন কাহিনী যা সত্যি ঘটেছে ও আমার হৃদয়-মনকে বেশ নাড়া দিয়েছে ?"

আমি বললাম, "দ্বিতীয়টা। এই বাদলে তা বেশ জমবে।"

তিনি বললেন, "আপনি রসিক লোক! তা হলে শুনুন। তখন আমার বয়স অল্প, আমি এক জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন-শাস্ত্র অধ্যয়ন করি।"

এক জন বললে, "কোন ইউনিভার্সিটিতে ?"

আমি বললাম, "সে সংবাদ নিষ্প্রয়োজন।"

উনি বললেন, "আপনি সমঝদার! হ্যাঁ, আমি এক জার্মান ইউনিভার্সিটিতে রসায়ন-শাস্ত্রের ছাত্র ছিলাম। একটা ল্যাবরেটরিতে আমরা জন বার গবেষক ডক্টরেট থিসিসের কাজ করতাম। আর ফ্যানি ছিল আমাদের ল্যাবরেটরির মক্ষিরাণী। রোজ বেলা প্রায় একটার সময় আমাদের ল্যাবরোটরিতে হঠাৎ এক বিদ্যুৎঝলকের মতন তার আবির্ভাব হ'ত। আমরা সকাল সাতটায় কাজ আরম্ভ করতাম, আর প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা ধরে নাগাড়ে মন দিয়ে কাজ করে যেতাম। প্রায় সাড়ে বারটার সময়ে সকলের মন উসখুস করে উঠত। কখন-সে আসে! কেউ কেবল দরজার দিকে তাকায়, কেউ জানালার কাছে গিয়ে পাইপ ধরায়, কেউ বা অন্যের টেবিলে গিয়ে গল্প জুড়ে দেয়। তখন থেকে একটার মধ্যে যে-কোন সময়ে দরজায় যেন একটা দীপ-শিখা দপ করে জ্বলে উঠত—ফ্যানি এল! অমনি সকলে চঞ্চল হয়ে উঠত, কেউ আরামের নিশ্বাস ফেলে বলত, 'বাঁচা গেল!' কেউ বলে উঠত, "Endlich! (অর্থাৎ at last!)", কেউ বা একটা লাফ দিয়ে উঠত, কেউ বা আনন্দে শিস দিয়ে উঠত, কেউ বা গুনগুনিয়ে গান গেয়ে উঠত, আর প্রত্যেকে তখন তড়িঘড়ি বুনসেন বার্ণার নিভিয়ে বা টরিসেলি পাম্পের জল বন্ধ করে হাতের কাজ ফেলে উঁচু টুলটা টেনে এনে একটা প্রকাণ্ড টেবিলের চারদিকে বসে যেত। ফ্যানি যখন দরজার গোড়া থেকে সেই টেবিলের কাছে আসত, মনে হ'ত একটা জমাট-বাঁধা বিদ্যুৎ চমকাতে চমকাতে এল, তার যৌবনপুষ্পিত দেহলতার প্রত্যেক গতিতে এমনি একটা দ্যুতি বিচ্ছুরিত হ'ত, তার বিম্বাধরের স্মিত হাসিটুকু এমনি একটা কিরণ বিকিরণ করত, তার স্বর্ণোজ্জ্বল কবরী এমনি ঝকমক করত আর তার আয়ত নীল নয়নে এমনি তড়িৎ খেলত! টেবিলে একটা বড় টিপয়ের উপর এক প্রকাণ্ড কাঁচের পাত্রে জল চড়িয়ে তার তলায় এক বৃহৎ গোল বার্ণার জ্বালিয়ে দেওয়া হ'ত আর প্রত্যেকে পকেট থেকে এক গোছা স্যাণ্ড-উইচ বার করত—দ্বিপ্রহরের আহার। কফি তৈরি করার ভার নিত স্বয়ং ফ্যানি এবং জল ফুটে উঠার পূর্ব্বেই তার হাস্যপরিহাস আরম্ভ হয়ে যেত। প্রায় এক ঘণ্টা সে সেখানে থাকত, আর এই সময়টায় আমরা সব যন্ত্রপাতি ভুলে জৈব রসায়নের যত বিচিত্র সঙ্কেত ও তার ভাষা বিস্মৃত হয়ে এক মায়াপুরীতে বিচরণ করতাম, আর ফ্যানি আমাদের নিয়ে কি মজাটা যে করত তার সরস বর্ণনা দেওয়া কঠিন।

তার দুই কুরঙ্গ নয়ন কখনও এর উপর কখনও ওর উপর দামিনীর মতন চমকাত আর তার ক্ষুরধার পরিহাস সে বেচারাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলত। কখনও কাউকে দুটো মোলায়েম কথা বলে হয়ত কৃতার্থ করত, আবার পরমুহূর্ত্তেই টিট্‌কারি করে মুক্তাঝরানো উচ্চ হাসির দ্বারা আমাদের অন্তর ঝঙ্কৃত করত। তার দীপশিখার মতন অঙ্গুলিগুলির দ্বারা কখনও সে কপোল থেকে অলক সরাত, বা তার কেশবিন্যাস সম্বরণ করত, তার উদ্ভিন্ন-যৌবনচঞ্চল হাস্য-লাস্য আমাদের প্রাণে এক রঙ্গীন সুরের তরঙ্গ তুলত, আর তার উন্মাদক কুন্তলবাস আমাদিগকে মজিয়ে রাখত। কেউ যদি সংযমের বাঁধ হারিয়ে একটা বেফাঁস কথা বলে ফেলত, তো সে তার গালে এক ঠোনা মেরে হেসে উঠত।

"সে বুঝি খুব সুন্দরী ছিল ?" আমাদের একজন উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল। আর একজন বললে, "তার বয়স কত ছিল ?" আমি বললাম, "এ সব প্রশ্ন অবান্তর। বোঝা গেল সে ছিল রসিকা, সুন্দরী ও নবযৌবনসম্পন্না। এই যথেষ্ট।"

তিনি খুশী হয়ে বললেন, "আপনি সত্যিই রসিক!...সে চলে গেলে, প্রথমটা একটু ফাঁকা লাগত, মনে হ'ত ল্যাবরেটরি অন্ধকার হয়ে গেল, কিন্তু অল্প পরেই আমরা সরস মনে, নবীন উৎসাহে কাজ আরম্ভ করতাম, যেন সকলের মধ্যে নবজীবন এসে যেত, আর কাজ চলত রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত। তখন যেন আমাদের মাথা খুলে যেত, পরিশ্রমে কোন ক্লান্তি হ'ত না।"

এক জন বললে, "কিন্তু সে ত নিশ্চয় আসত একজনের জন্যে। সে ভাগ্যবান কি আপনি ? এমন প্রশ্ন অনুচিত হ'ল না আশা করি।"

তিনি বললেন, "বিলক্ষণ! সৌভাগ্যের বিষয়—না।"

সে বললে, "সৌভাগ্যের বিষয়! কেন ?"

তিনি একটু হেসে বললেন, "ভেবেই দেখুন ?"

আমি বললাম, "উনি ঠিক বলেছেন, তা হলে কি আর ওঁর স্ত্রী বাঙালী মেয়ে হতেন ? না আমরা আজ ওঁকে এখানে এমন গল্প বলার জন্যে আস্ত পেতুম ?"

তিনি বললেন, "আপনি ঠিক বোঝেন! না, সে আমার জন্যে আসত না।"

বন্ধু বললে, "তবে কার জন্যে ?"

তিনি বললেন, "তা বললে, এতক্ষণ যা বললুম তাতে বরফ-জল ঢালা হবে।"

"তবু বলুন।"

"সে আসত তার স্বামীর খাবার নিয়ে।"

"অ্যাঁ!"

"হ্যাঁ! আমাদের মধ্যে একজন ছিল তার স্বামী। অতএব আর সকলের ভাগ্যে জুটত এক সৌরভে ভরা মনোরম পুষ্পের শুধু দূর থেকে দর্শন, আর ঐ মাত্র এক ঘণ্টার জন্যে আলাপ।"

"তার ভাগ্যবান স্বামীটির সম্বন্ধে কি কিছু বলবেন?"

"নিশ্চয়, তা না হলে আর গল্প হবে কি? তার নাম ছিল মেঙ্গেলে। উভয়ের মিল ছিল শুধু কেশের ও চক্ষুর বর্ণে—ফ্যানির বিপুল কুঞ্চিত কেশ ছিল সোনালী, মেঙ্গেলেরও ঘন, ঈষৎ কুঞ্চিত কেশ ছিল সোনালী, ফ্যানির বিস্তৃত দুই চোখ ছিল নীল, মেঙ্গেলের ক্ষুদ্র দুই চোখও ছিল নীল। বস্, আর সবই অমিল। ফ্যানি ছিল এমনি তন্বী ও সুকোমল যে মনে হ'ত পায়ের তলায় যদি সে একটা ফুলও মাড়ায় তো সে ফুলের বুঝি কিছু হবে না, আর মেঙ্গেলেকে দেখলে মনে হ'ত এ যেন একটা বিশাল শালবৃক্ষ! সত্যি, আমি অমন অতিকায় মানুষ পূর্ব্বে কখনও দেখি নি। সে যখন হাঁটত, মনে হ'ত জায়গাটা যেন কাঁপছে। অথচ তাকে ঠিক স্থূল বলা চলে না, যদিও তার শরীর কিছু মেদবিশিষ্ট ছিল। কিন্তু মানুষ যে অত বলশালী হতে পারে তা শুধু মহাভারতে ভীমসেনের বর্ণনায় পড়েছি, কখনও চক্ষে দেখি নি। সে যদি কুস্তিগীর বা মুষ্টিযোদ্ধা হ'ত তো অনায়াসে দিগ্বিজয়ী হতে পারত, কিন্তু সে পথ না নিয়ে সে যে কেন রসায়নের মৌলিক গবেষণা করতে এসেছিল তা কখনও বুঝতে পারি নি। জানেনই ত ভগবান কাউকে ভীমসেনের মত শরীর দেবেন আবার অর্জ্জুনের মতন বুদ্ধিও দেবেন এত দয়ালু তিনি নন।

"নিয়ম বেঁধে রোজ সকাল দশটায় আমাদের প্রফেসর আসতেন আমাদের প্রত্যেকের কাজ কেমন এগোচ্ছে তাই দেখতে ও তাঁর নির্দ্দেশ দিতে। আমাদের সকলের উপরই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন, কিন্তু তাঁর যত মাথা ব্যথা হ'ত মেঙ্গেলে বেচারাকে নিয়ে। এক এক দিন তিনি ক্ষেপে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠতেন, "তুমি এখানে এসেছ কেন, মুষ্টিযোদ্ধা হও না?" মেঙ্গেলে মুখ চুণ করে মাথা চুলকাত, কোন উত্তর দিত না, আর তিনি বিরক্ত হয়ে ল্যাবরেটরি থেকে চলে যেতেন উচ্চৈঃস্বরে বলতে বলতে, 'unmoeglich! unmoeglich!! (অর্থাৎ, অসম্ভব! অসম্ভব!!)' ভাগ্যে তিনি সকলের শেষে তার কাছে যেতেন! তারপর আমাদের মাথাব্যথা পড়ে যেত মেঙ্গেলেকে সাহায্য করায়, পাছে প্রফেসার একদিন সত্যিই তাকে ল্যাবরেটরি থেকে তাড়িয়ে দেন!"

"সত্যিই তা তা হলে আপনাদের মৌচাক যেত ভেঙ্গে।"

"হয়ত মনের কোণে সে ভয়ও ছিল। কিন্তু তা না হলেও যে আমরা তাকে সাহায্য করতাম না এমন নির্দ্দয় ধারণা আমাদের সম্বন্ধে করবেন না। তা যাই হোক, আমরা তাকে প্রাণপণে সাহায্য করতাম, কিন্তু তারও ত একটা সীমা ছিল? অত নিরেট মাথায় কিছু ঢোকানো বড়ই কঠিন হয়ে উঠত। অবশ্য ফ্যানি সেখানে এলে তাকে ঘুণাক্ষরেও আমরা এসব কথার কিছুই বলতাম না। তার জন্যে মেঙ্গেলে আমাদের কাছে বড় কৃতজ্ঞ হ'ত। তার একটা গুণ ছিল, প্রফেসর তাকে যা খুশী বলুন সে কখনও রেগে উঠত না। ঐ লোক রেগে উঠলে যে কি কাণ্ডটা হ'ত তা তো অনুমান করে নিতেই পারেন।"

"কিন্তু তার স্ত্রী যে আপনাদের সঙ্গে অমন ফষ্টিনষ্টি করত তাতে তার কিছু হ'ত না?"

"না! সেটা অবশ্য ফ্যানির স্বামীর পক্ষে, তা সে যেই হোক, সম্ভব ছিল না। আর মেঙ্গেলে ত ছিল ফ্যানির কাছে একটা অতিকায় শিশুমাত্র! স্বামী-স্ত্রীর অমন সম্বন্ধ আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নি। আমার মনে হ'ত ঠিক যেন একটা মোমের পুতুল মাহুত হয়ে একটা হাতীকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আপনাদের মনে হয়ত প্রশ্ন উঠেছে, কি দেখে ফ্যানি অমন লোককে বিয়ে করলে? এ প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা আমি করব না, গল্পটা শেষ পর্য্যন্ত শুনে এর উত্তর আপনারা নিজেরাই পাবেন আশা করি।"

এই অবধি বলে তিনি একটু বাইরে গেলেন। পরস্পরের মুখ দেখে আমরা বুঝলাম, সকলেই উৎসুক পরে কি হ'ল জানতে।

২

তিনি ফিরে এলেন, আমরা সব চুপচাপ। তিনি আরম্ভ করলেন, "একদিন আমরা ফ্যানিকে ঘিরে বসে আছি, ফ্যানি আমাদের সঙ্গে ঐ রকম ঠাট্টাতামাসা করছে এমন সময়ে খবর এল যে পরের দিন ল্যাবরেটরি বন্ধ থাকবে। সেই সংবাদ পেয়ে ফ্যানির উপস্থিতি সত্ত্বেও মেঙ্গেলের ও আমার ছাড়া আর সকলের মুখ চুণ হয়ে গেল।"

"ছুটির খবর পেয়ে ছাত্রদের মুখ চুণ হয়ে গেল?"

"তা আর বলেন কেন, ঐ ছিল আমারও বিপদ! জার্ম্মান ছাত্ররাই যেন সৃষ্টিছাড়া! এক কাপ কালো কফি আর মার্গারিন মাখানো কালো রুটি খেয়ে যে সেই সকাল সাতটায় কাজ আরম্ভ করত, রাত আটটা পর্য্যন্ত নাগাড়ে কাজ করে যেত। শুধু দুপুরে এক ঘণ্টার ছুটি করে নিত ফ্যানির সঙ্গে গল্পগুজব করার জন্যে আর তাদের কয়েকটা স্যাণ্ডউইচ চিবানোর জন্যে। ভাগ্যে ফ্যানি আসত তাই তারা এক কাপ করে উপাদেয় কফি পেত এবং এক ঘণ্টা সময় নষ্ট করত, না হলে ঐ এক ঘণ্টা যে দশ পনেরো মিনিটে দাঁড়াত তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। বললে বিশ্বাস করবেন? একবার সন্ধ্যায় ঐ রকম ছুটির খবর এল অমনি আমাদের ল্যাবরেটরির সকল গবেষকের এক ডেপুটেশ্যন প্রফেসরের কাছে গিয়ে হাজির, আমাকেও বাধ্য হয়ে তাদের সঙ্গে যেতে হ'ল, কি?—না, তারা ছুটি চায় না, পরের দিনও ল্যাবরেটরিতে কাজ করবে।"

"কি ভয়ানক! তারপর?"

"রসিকা ফ্যানি বুঝেছিল তাদের মনের ভাব। সে হাসিমুখে প্রস্তাব করলে, কাল ছুটি! চলুন আমরা সকলে ইসার নদীর ধারে 'গ্রুনেওয়াল্ড' কাননে সারাদিন কাটিয়ে আসি!' অমনি

সকলের মুখে হাসি ফুটল। বলাই বাহুল্য, সকলে উৎসাহের সঙ্গে রাজী হয়ে গেল। তখন ফ্যানি বললে, 'কিন্তু এক সর্তে, প্রত্যেকে তার বান্ধবী সঙ্গে আনবে, তা সে গুপ্ত হোক বা প্রকাশ্য হোক, তার সঙ্গে এন্‌গেজমেণ্ট হয়ে থাক বা না থাক। কেমন, সকলে রাজী?' সকলে রাজী হ'ল। ফ্যানির কাছে রাজী না হয়ে উপায় ছিল কারও? একটু গররাজীর ভাব প্রকাশ করলেই তাকে ফ্যানি তীক্ষ্ণ শ্লেষের বাণে তখখুনি ক্ষতবিক্ষত করে ফেলত না? শুধু আমাকে সে রেহাই দিলে, কারণ সে জানত আমার সত্যিই কোন বান্ধবী ছিল না। এ বিষয়ে ভারতীয় ছাত্র যে সৃষ্টিছাড়া হয় তা তারা জানত।

"তখন মে মাস। ওদেশের মে মাসকে আমরা ঠিক নিদাঘ বলব না, বলব অনেকটা আমাদের দেশের বসন্ত। তাই দেখুন না, যে নবজীবন অনিবার্য্য গতিতে সহস্র সহস্র বৎসরের জমাট-বাঁধা আত্মকেন্দ্রিক সভ্যতার কঠিন স্তর ভেদ করে সর্ব্বত্র অঙ্কুরিত হচ্ছে, অনেক স্থানে ইতিমধ্যেই অপূর্ব্ব ফুলফলশোভিত বৃক্ষলতায় পরিণত হয়েছে, তার জয়ন্তীর তারিখ পয়লা মে? সেই ছুটি পড়ল আলো-ফুল-হাসিভরা মে মাসের এক ঝরঝরে দিনে। আমাদের মিলনের স্থান হ'ল গ্রীনওয়াল্‌ড অর্থাৎ হরিৎ বন। শহরের উপকণ্ঠে যে উপবন, তার ভেতর দিয়ে অনতিপ্রসর গিরি-নদী ইসার এঁকেবেঁকে সূর্য্যের আলোয় ঝিকমিক করে উপল-মুখরিত পথে বিসর্পিত। এমনি দেখলে মনে হবে, নদীর দুই কূল দিগন্তবিস্তৃত এই অরণ্যে প্রকৃতি বুঝি স্বেচ্ছায়, আপন অনাবিল গতির বেগে তরুলতা, তৃণগুল্ম, ফুলফলে বিকশিত হয়েছে, তার অগণিত শাখায়-পাতায়, ঝোপে-কুঞ্জে ঝঙ্কৃত হচ্ছে অসংখ্য পাখীর কুজন, মধুকরের কলগুঞ্জন, আর স্বচ্ছতোয়া নির্ঝরিণীর কুলকুল রব। মনে হয়, মানুষের হাতে গড়া জনকোলাহলপূর্ণ শহরের দৈত্যের মতন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকার ব্যাদান থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে নিসর্গের নিরাময় নন্দনে স্থান পাওয়া গেল। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় এখানেও মানুষের নিপুণ মঙ্গল হস্ত প্রকৃতির স্বেচ্ছাচারিতার দৌরাত্ম্য থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে এই সুন্দর কাননকে সুন্দরতর করে তুলেছে। এই মনোরম বিপিনে, ইসারের তীরে, আমরা সকাল প্রায় দশটায় সকলে সমবেত হলাম। আমি ছাড়া আর প্রত্যেকের কক্ষপুটে এক একটি হাস্যময়ী তরুণী।"

"আর আপনি গেলেন একা?"

"কি করব? তখনও তো কেউ আমার জীবনে আসে নি। রাস্তা থেকে তো কাউকে ধরে নিয়ে যেতে পারি না।"

"ওরা সকলেই ছিল বিবাহিত?"

"এক মেক্‌লে ছাড়া আর কেউ নয়।"

"বটে! তা হলে তাদের অমন সঙ্গিনী জুটল কি করে?"

"এও জানেন না? ওদের দেশে মেয়েরা বাঞ্ছিত যুবকদের সঙ্গে ঐ রকম অবাধে মেলামেশা করে, আর তাদের স্বামীলাভের এই একমাত্র উপায়। ওখানে তো কোন পিতার মাথাব্যথা নেই কন্যার সম্বন্ধ স্থির করে বিয়ে দেওয়া।"

"তা হলে তো আপনারও একটি সঙ্গিনী জুটতে পারত?"

"তা পারত বৈকি! কিন্তু আমার জীবন দেখে বুঝছেন না, আমি কোন বিদেশিনীকে বিবাহ করতে চাই নি?"

"ও! তা বেশ আপনি এখন গল্প বলুন।"

"তাদের এক বসন্তোৎসব আরম্ভ হয়ে গেল. আর কুন্দশুভ্র, অকুণ্ঠিতা ফ্যানি হ'ল সেই উৎসবের অধিনায়িকা। তার নীল আয়ত লোচনের বিলোল কটাক্ষে সকলকে মোহিত করে, তার বিম্বাধরের হাসির ঝঙ্কারে চারিদিক মুখরিত করে, তার স্বর্ণবর্ণ বিপুল কুন্তল নাচিয়ে নাচিয়ে, তার যূথিকাশুভ্র মরাল গ্রীবা হেলিয়ে দুলিয়ে, তার লাবণ্যশিখার স্থায় অঙ্গুলি সঞ্চালন করে সকল যুগলমূর্ত্তিকে নিয়ে এমন লুকোচুরি, নাচানাচি, হাসিঠাট্টা, হৈ-হুল্লোড়ের সৃষ্টি করলে যে মনে হ'ল যেন নন্দন কাননে বনদেবীরা তাদের সহচরদের সঙ্গে কেলি করছে আর তাদের পরিচালনা করছে অনন্তযৌবনা, আকুলঅঞ্চলা, বিদ্যুৎচঞ্চলা, অনন্তরঙ্গিণী, ভুবন-মোহিনী স্বয়ং ভেনাস! তার লীলাবিলাসে সেই মনোহর বিপিনের তরুপল্লব যেন পুলকে শিউরে উঠল, নির্ঝর যেন আনন্দমুখর হয়ে উঠল, পাখীরা কলরব করে উঠল।"

"বাঃ! আচ্ছা আপনি কি করলেন?"

"তা আর বলেন কেন? ফ্যানি হয়তো ভেবেছিল আমি বেচারা একা তাই তার অর্দ্ধাঙ্গী মেক্‌লেকে আমার সাথী করে নদীর ধারে এক ঝোপের পাশে আমাদের দু'জনকে বসিয়ে দিলে। তাতে অবশ্য আমাদের কোন অসুবিধা হ'ল না, কারণ সেখান থেকে সেই বনকেলি পরিষ্কার দেখতে পেলাম এবং দর্শকের আনন্দ উপভোগ করতে লাগলাম। এমন দৃশ্যের দর্শকের পুলকও বড় কম হয় না! কখনও তারা গোল হয়ে নৃত্য করে আর সেই বৃত্তের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে ফ্যানি তার কোকিল কণ্ঠে গান গেয়ে তাদের নৃত্য পরিচালনা করে কখনও তারা ফ্যানির চোখ-ইশারায় জোড়ায় জোড়ায় অন্তর্হিত হয়, আবার ফ্যানির ডাকে একত্র হয় ও একটা মিলিত খেলা আরম্ভ করে। কখনও লুকোচুরি খেলা করে, কখনও ফ্যানি গান করে আর তারা সমস্বরে তার সঙ্গে গাইতে গাইতে বলড্যান্স করে, কখনও করে মধ্যযুগের মিনুএট্ নাচ, কখনও করে ব্যাভেরিয়ার পাহাড়ী নাচ, তার সঙ্গে চলে তাদের সমস্বরে "উ পু পু পু" চীৎকার! এই দৃশ্য আমরা বিভোর হয়ে দেখছি, কতক্ষণ খেয়াল নেই, হঠাৎ ফ্যানির ইসারায় এক এক যুগলমূর্ত্তি কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেল তার ঠিক নেই। তখন কোথাও শোনা যাচ্ছে নারীকণ্ঠের 'হি, হি, হি, হি!', কোথাও শোনা যাচ্ছে পুরুষ-কণ্ঠের 'হা, হা, হা, হা!', কোথাও বা নারী-কণ্ঠের ভর্ৎসনা, কোথাও বা মিলিত-কণ্ঠের 'হো, হো, হো, হো!' আর চারিদিক থেকে কানে আসছে শুষ্কপত্রের খস্‌খস্ শব্দ, ফ্যানির কোকিলকণ্ঠের 'টু, টু!' আর 'হি, হি, হি, হি,' হাসি। হঠাৎ প্রমোদচঞ্চলা ফ্যানি 'খিল, খিল, খিল, খিল'

করে হাসতে হাসতে তার মেখলা সম্বরণ করতে করতে আমাদের সামনে দিয়ে ছুটে এক লতাগুল্মের ঝোপের আড়ালে চপলার মতন অদৃশ্য হ'ল!

"তাই দেখে অভিভূত হয়ে মেঙ্গেলে আমাকে বললে, 'আমার স্ত্রীর মতন এমন মোহিনী সুন্দরী আর কখনও কোথাও দেখেছেন?'

'আপনার স্ত্রী পরমাসুন্দরী, তা নিঃসন্দেহ।'

'জানেন, আমি অতি কষ্টে এক বর্ণসঙ্করের হাত থেকে ওকে উদ্ধার করে বিয়ে করেছি!'

মেঙ্গেলের মুখে অকস্মাৎ এমন কথা শুনে আমি একটু চমকে উঠলাম, কারণ আমি জানতাম না যে ও হিটলার-ভক্ত। একটু হেসে বললাম, 'আপনি ওকে বিয়ে করেছেন না ও আপনাকে কৃপা করেছে?'

আমার প্রশ্নে তার যেন ভ্যাবাচাকা লাগল। কিছু পরে অর্থটা বুঝে, তার প্রকাণ্ড মুখ হাঁ করে হা, হা, হা, হা করে হেসে উঠে বললে, 'তা ঠিক বলেছেন! কিন্তু এটা তো মানবেন, ও একটি খাঁটি নর্ডিক মেয়ে আর আমি এক জন খাঁটি নর্ডিক পুরুষ, এমন বিবাহ খুবই বাঞ্ছনীয়?'

'ফ্যানির কৃপায় আপনি খুব ভাগ্যবান বটে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আপনার প্রতি ওর কৃপা অক্ষুণ্ণ থাকুক।'

ও আমার কথার অর্থ ঠিক বুঝতে পারল না। শুধু এইটুকু বুঝলে যে আমি একটা রহস্য করলাম। অমন লোকের আর সব সহ্য হয়, কিন্তু নিজের স্ত্রীর সম্বন্ধে এ ধরণের হেঁয়ালির কথা সঠিক বুঝতে না পারলে মনে মনে গুমরে ওঠে। কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে হঠাৎ সে কথার ফোয়ারা ছোটালে। যা অনর্গল বকে গেল তার অর্থ দাঁড়ায় এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি হচ্ছে 'নর্ডিক রেস'। পৃথিবীতে যা কিছু সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়েছে তা নর্ডিক রেসই করেছে। দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য এ সব নর্ডিক মানুষের মাথা থেকেই বেরিয়েছে। নিম্নতর জাতির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে এমন উৎকৃষ্ট জাতির অবনতি হলে পৃথিবীর সর্ব্বনাশ হবে। তা কিছুতেই হতে দেওয়া উচিত নয়। ফরাসী, ইটালীয়, স্প্যানিশ ইত্যাদি জাতির উদাহরণেই তা বোঝা যায়। এরা পূর্ব্বে বিশুদ্ধ আর্য্য ছিল, কিন্তু বর্ণসঙ্করত্বের দোষে এরা এখন অধঃপতিত হয়েছে, এমন কি আমরাও নাকি এককালে আর্য্য ছিলাম, এখন এই দোষেই আমাদেরও পতন হয়েছে। আর সেমিটিক, স্লাভ, মোঙ্গলীয় জাতি নিম্নস্তরের মানুষ এবং আফ্রিকার নিগ্রোরা তো মনুষ্যপদবাচ্যই নয়। এখন এক জার্ম্মান ও ইংরেজ জাতিই খাঁটি নর্ডিক রয়ে গেছে—তাই এরা পৃথিবীর শাসক হয়েছে, চিরকাল তাই থাকবে ও পৃথিবীর মঙ্গলের জন্যে থাকা উচিত। ফ্যানি এই খাঁটি নর্ডিক জাতির কন্যা, বর্ণসঙ্করত্বের মতন মারাত্মক পাপ থেকে তাকে উদ্ধার করে মেঙ্গেলে জার্ম্মানীর তথা সমস্ত পৃথিবীর কল্যাণ করেছে। এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহই থাকা উচিত নয়···ইত্যাদি, ইত্যাদি।

শুনে আমি প্রথমটা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমার হঠাৎ মনে হ'ল এরই পূর্ব্বপুরুষ ছিল অসভ্য গথ, ভিসিগথ, অস্ট্রোগথ, যারা এই দেশ থেকে বন্যার মতন বার হয়ে ইউরোপ প্লাবিত করেছে এবং প্রাচীন গ্রীস ও রোমের সভ্যতা ডুবিয়ে দিয়েছে। তারপর বহু শতাব্দী ধরে এদেশে সভ্যতার পলি পড়ে এ জাত সভ্য হয়ে উঠেছে বটে, কিন্তু এখনও এখানে এই রকম বর্ব্বর মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। আমার মন বিরক্তিতে ভরে গেল, আমি বললাম, 'দেখুন, আপনার বক্তব্য ঠিক হ'ল না। আমরা যেমনই হই এটা ঠিক —আমরা ইংরেজের কবল থেকে নিশ্চয় মুক্ত হব। জাপানীরা নিশ্চয় নর্ডিক রেস নয়, তারা কখনও পরাধীন হবে না। আর পোলাণ্ডের সীমা থেকে কামস্কাটকা পর্য্যন্ত এই বিশাল ভূখণ্ডে যে নূতন সভ্যতা উঠেছে, যাতে রুশ, জর্জীয়, উজবেকী, তাতার, মোঙ্গল প্রভৃতি বহু জাতির সমন্বয় হয়েছে এবং এদের মিলিত শক্তি এমন দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে যে এখানে আপনাদের তথাকথিত নর্ডিক রেসের সাম্রাজ্যবাদ কখনও দন্তস্ফুট করতে পারবে বলে ত মনে হয় না।'

এই কথা শুনে মেঙ্গেলে ক্ষেপে গেল! তার বিশাল বদন ভীষণ আকার ধারণ করলে এবং সে উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠল, 'ঐ অপদার্থ ষ্টালিনের কথা বলছেন? ঐ শয়তান পৃথিবীর যে কত ক্ষতি করেছে তার কি কোন ইয়ত্তা আছে? কিন্তু ঐ পাষণ্ড ত শুধু ইহুদীদেরই ক্রীড়নক! রুশিয়ার আসল শাসক হচ্ছে ট্রটস্কি, বুখারিন, কামেনেক, জিনোভিভ, রাইকভ, র‍্যাডেক প্রভৃতি, যারা সকলে ইহুদী। এটা জানেন না, কম্যুনিজম আর কিছুই নয়, শুধু সভ্যতার দ্বন্দ্বে পরাজিত ইহুদীদের প্রতিশোধ নেবার একটা শয়তানী ফন্দি? কিন্তু নিশ্চয় জানবেন, আমরাই একে সমূলে উৎপাটন করব—নিশ্চয় করব! নিশ্চয় করব! নিশ্চয় করব!'

সে তার বিরাশি সিক্কার মুষ্টি শূন্যে ছুঁড়তে লাগল। তার এই উত্তেজনা দেখে আমার বুকটা একটু কেঁপে উঠল। মনে মনে ভাবলাম, 'ষ্টালিনের মহা ভাগ্য যে এই ক্রুদ্ধ দৈত্যের সামনে তিনি এখন নেই!' ওর কথার কোন উত্তর দিতে আমার কেমন ভয় হ'ল। হঠাৎ পেছন থেকে এসে ফ্যানি তার চোখ চেপে ধরলে। ঐ ক্রুদ্ধ স্যামসন তৎক্ষণাৎ এক ভিজে বিড়ালের মতন শান্ত হয়ে গেল। ফ্যানি আমার দিকে চেয়ে একটু ফিকে হেসে বললে, 'মাপ করবেন, আমার এই বালক একটু অবুঝ। আশা করি, ও আপনাকে বেশী বিরক্ত করে নি?'

আমি বললাম, 'না, ওর কথা আমার কাছে খুব মজার লাগছিল।'

ফ্যানি—'তবু ভাল! ওর অমন চীৎকার শুনে আমার ভয় হয়েছিল, ও বুঝি আপনার সঙ্গে ঝগড়াই করে বসেছে?'

এই বলে ফ্যানি মেঙ্গেলের কান দুটো ধরে ভর্ৎসনা করতে সুরু করলে, 'এ কি করছিলে দুষ্টু ছেলে? ছিঃ! অমন করে চেঁচাচ্ছিলে কেন, অ্যাঁ? সকলে যে ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে, ছিঃ!···' আর মেঙ্গেলে হাসতে লাগল, 'হে, হে, হে,—হে, হে, হে!' এবং ফ্যানির পিঠে আস্তে আস্তে হাত বুলোতে লাগল। ফ্যানি ঐ নর্ডিক

দৈত্যের সোনালী ফুল মুঠোর মধ্যে ধরে তার প্রকাণ্ড মাথাকে অবলীলাক্রমে ঝাঁকুনি দিতে লাগল। হঠাৎ ফ্যানি তার বক্ষলগ্না হয়ে তাকে একটি চুম্বন দিলে, আর তার কানে কানে কি বললে। মেঙ্গেলে উল্লাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে ফ্যানিকে ঠিক একটা পুতুলের মতন শূন্যে তুলে নিয়ে সে স্থান থেকে অদৃশ্য হ'ল।

আমি বললাম, "মাপ করবেন, এ কি হিটলারের রাজত্বে ঘটেছিল?"

তিনি বললেন, "না, এটা ঘটেছিল ১৯২৫ সালে। তবে তখন হিটলারের আন্দোলন আরম্ভ হয়ে গেছে।"

৩

"পরের দিন সকালে ঠিক আগের মতনই ল্যাবরেটরির কাজ আরম্ভ হ'ল। বেলা প্রায় একটার সময়ে ঠিক অন্য দিনের মতন রহস্যময়ী ফ্যানির আবির্ভাব হ'ল। সেদিন যেন আমাদের সঙ্গে ফ্যানির সম্বন্ধ, যদিও আসলে কিছু নেই তবু, আরও যেন ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল এবং তার রঙ্গরস বিশেষ ভাবে জমে উঠল। আগের দিন অমন চেঁচিয়ে উঠেছিল বলে সেদিন মেঙ্গেলে বেচারাকে সকলে নাজেহাল করে তুললে, আমিই শেষটায় তাকে উদ্ধার করি। তাই দেখে ফ্যানি ভারি খুশী হ'ল। সে বুঝলে, আমার মনে ঐ ব্যাপারের জন্যে মেঙ্গেলের উপর রাগ বা বিরক্তি সৃষ্টি হয় নি, আর সত্যিই ত, মেঙ্গেলে ব্যক্তিগতভাবে আমাকে অপমান ত করে নি, তার যা মত তাই সে প্রকাশ করেছিল, তবে উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল—এই যা তার দোষ হয়েছিল। আমি ভাবলাম এইখানেই ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেল। কিন্তু তা হ'ল না।

"পরিষ্কার বুঝলাম সে মনে মনে আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে সুরু করেছে—যদিও আমিই তাকে প্রধানতঃ সাহায্য করতাম। আমি ইতিপূর্ব্বে দেশেও প্রচুর রসায়ন-শাস্ত্রের মৌলিক গবেষণা করেছিলাম—আর সকলের চেয়ে আমার অভিজ্ঞতা বেশী ছিল। আমি তাকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে লাগলাম, কিন্তু বেশ বুঝলাম তার মন আর আমার উপদেশ গ্রহণ করে না। হয়ত তার হঠাৎ হুঁস হ'ল, আমি ত আর নর্ডিক নই আর সে খাঁটি নর্ডিক, সে আবার আমার উপদেশ কি নেবে? কিন্তু সেই ল্যাবরেটরিতে তাকে সত্যিকারের সাহায্য করার মতন শক্তি ও ধৈর্য্য আর কারও ছিল না। এতে ক্ষতি অবশ্য তারই হ'ল। সে মাস যেতে না যেতেই প্রফেসর তাকে স্পষ্টই বলে দিলেন, মৌলিক গবেষণার কাজ তার দ্বারা হবে না, সে যেন অন্যত্র যায়। আমাদের মধুচক্র সত্যিই ভেঙ্গে গেল। মক্ষিরাণী আর এল না।"

"কি দুঃখের কথা! ছাত্রেরা কি তারপর রোজ দুপুরে সত্যিই স্যাণ্ডউইচ ক'টা তাড়াতাড়ি চিবিয়ে নিয়ে আবার কাজ আরম্ভ করে দিত?"

"হয়ত তাই করত! আমি ঠিক জানি না, কারণ তারপর থেকে আমি বেলা সাড়ে বারটার সময়ে ইউনিভার্সিটির নিকটবর্ত্তী এক রেস্তোরাঁয় মধ্যাহ্ন-ভোজন করতে চলে যেতাম। এর পর বছরখানেক কেটে গেল, আমার ডক্টরেটের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এল। বড় আশা মনে জেগেছে, ডক্টরেট ডিগ্রী নিয়ে শীঘ্রই দেশে ফিরব এমন সময়ে সেই ল্যাবরেটরিতে একজনের অভাবনীয় আবির্ভাব হ'ল।"

"ফ্যানি এল?"

"না।"

"আর তার কোন সন্ধানই আপনারা করেন নি?"

"আমি অন্ততঃ করি নি। যদিও মন প্রায়ই চাইত খোঁজ করতে। প্রায় এক বৎসর ধরে যে সুষমাময়ী নিত্য এসে আমাদের প্রাণমন অমন সৌরভে ভরিয়ে দিত, তাকে হঠাৎ ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। যদিও তার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ ছিল না, তবুও কেমন যেন একটা অন্তরের যোগ হয়ে গিয়েছিল। তার অসামান্য রূপলাবণ্য আর তার সেই মন-মাতানো হাসি প্রায়ই আমার চিত্তে ভেসে উঠত। তাই ত সাড়ে বারটা বাজলেই আর ল্যাবরেটরিতে তিষ্ঠতে পারতাম না, ছুটে বেরিয়ে যেতাম ঐ রেস্তোরাঁয়! হয়ত আপনারা বলবেন এমন চিন্তা করা অন্যায়। অন্যায় ত বটেই, কিন্তু অস্বীকার করাও হবে ভণ্ডামি। অনেক সময়ে ইচ্ছাটা খুব প্রবল হ'ত বটে—একে ওকে জিজ্ঞাসা করে তাদের ঠিকানাটা নিয়ে তাদের বাড়ীতে একবার হাজির হবার, কিন্তু আমার উপর সেই শালপ্রাংশু নর্ডিক স্বামীর বিদ্বেষের কথা ভেবে আর এগোতে ভরসা হ'ত না। আপনারা হয়ত বলবেন, এটা ভীরুতা—তা বলুন। আর তাদের সঙ্গে মিশে হ'তই বা কি? ফ্যানির সঙ্গে একবার দেখা করা বৈ ত নয়?

"তাও বটে! তবে এ কার আবির্ভাব হ'ল আপনাদের ল্যাবরেটরিতে? আবার ঐ রকম এক রূপসীর?"

"না। এক নিগ্রো গবেষকের।"

"অ্যাঁ!"

"হ্যাঁ।"

"জার্ম্মানীতেও তা সম্ভব হ'ল?"

"কেন হবে না? সেটা ত তখন নাৎসি জার্ম্মানী ছিল না। প্রাক্‌হিটলারী জার্ম্মানীর ভাইমার কনষ্টিটিউশানের কথা শুনেছেন ত? সে জার্ম্মানী সত্যিই ডেমোক্র্যাটিক ছিল। পৃথিবীর যত রাজনৈতিক পলাতকদের একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিল তখনকার জার্ম্মানী। শিল্পে, বিজ্ঞানে, দর্শনে, সাহিত্যে মানুষের সকল রকম মনীষা-বিকাশে সেখানে পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। সত্যি, এখন আর ভাবা যায় না, জার্ম্মানী এককালে এমনটি ছিল। তখনও হিটলারের তর্জ্জন-গর্জ্জন শোনা যেত বটে, তবে সেটা যে কেমন তার একটু নমুনা পেলেন, কিন্তু কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি তাকে ততটা গ্রাহ্যের মধ্যে নিত না। সে যাই হোক, ঐ নিগ্রো যুবককে দেখে আমি ভারি খুশী হলাম। ভাবলাম, এরাও তা হলে বেশ এগোচ্ছে! কিন্তু তার আবির্ভাব আর সব গবেষকের মনে যেন ভীতির সঞ্চার করলে! দেখলাম, তারা তাকে এড়িয়ে চলে। তাই দেখে, তার উপর আমার দরদ হ'ল। মনে হ'ল,

পৃথিবীর যত কালো, হলদে, তামাটে, 'অলিভ'রঙের মানুষ, যার ত্বকে 'পিগমেণ্ট' (বর্ণ) সৃষ্টি করতে পারে, এক সূত্রে গ্রথিত। শ্বেত সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদিগকে শাসন ও শোষণ করবার যেন ভগবদ্দত্ত অধিকার পেয়েছে মনে করে। আমিও কালো মানুষ, কিন্তু এরা যে আমার সঙ্গে এমন করে মেলামেশা করে তার প্রধান কারণ ভারতবর্ষের গৌরবময় অতীত ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য এদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, তা না হলে হয়ত আমার সঙ্গেও এরা এমনি ব্যবহার করত। আমি নিজে হতে ঐ নিগ্রো যুবকের সঙ্গে আলাপ করলাম। আর সকলের মনোভাব বুঝতে তার বিলম্ব হয় নি, এই আবহাওয়ায় আমাকে পেয়ে তার যেন ধড়ে প্রাণ এল। আমাদের পরিচয় হ'ল। তার নাম ছিল বোগা। সে ছিল আবিসিনীয়ার এক সাধারণ গৃহস্থের ছেলে, দেখলে মনে হ'ত বয়স মাত্র কুড়ি কি একুশ। এক জার্ম্মান মিশনরী তাকে বাল্যকালেই জার্ম্মানীতে এনে মানুষ করেছে, কাজেই জার্ম্মান তার মাতৃভাষার মত হয়ে গিয়েছিল। তার পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল ঠিক জার্ম্মানদেরই মত, কিন্তু স্বল্প আলাপেই বুঝলাম তার মন ছিল ভিন্ন গড়নের।

"তার বর্ণ ছিল ঘোর কৃষ্ণ। এত কালো যে দূর থেকে তাকে আসতে দেখলে মনে হ'ত যেন একটা জমাটবাঁধা অন্ধকার এগিয়ে আসছে। শুনেছি, একবার এক জার্ম্মান মেয়ে তাকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এত বিস্মিত হয়েছিল যে নিজেকে আর সামলাতে না পেরে ছুটে এসে তার হাতে আঙুল ঘষে দেখলে রং উঠে কি না! কিন্তু তার শরীরের সৌষ্ঠব দেখে মুগ্ধ হতে হয়। দৈর্ঘ্যে ছয় ফুটের উপর, ক্ষীণ কটি, বিস্তৃত বক্ষ, পেশীপুষ্ট বলিষ্ঠ দীর্ঘ বাহুদ্বয়, সুগঠিত দীর্ঘ দুই উরু ও জঙ্ঘা, বলিষ্ঠ গ্রীবা শরীরে কোথাও মেদবাহুল্য নেই, একটা দীর্ঘ যষ্টির মতন সোজা হয়ে দাঁড়ায়। যখন চলে, মনে হয় এর প্রয়াসহীন গতিশীলতা ও চলার ভঙ্গী ঠিক এক শার্দ্দূলের মতন, ইচ্ছে করলেই দশ ফুট দূরে লাফিয়ে গিয়ে ঠিক এমনি অনায়াস গতিতে হাঁটতে থাকবে। এর শরীরে যে অসাধারণ শক্তি তা নিঃসন্দেহ, কিন্তু তার বিশেষত্ব হচ্ছে একটা দৃশ্যমান স্বাভাবিক তৎপরতা, যার অভাব মেঙ্গেলের মধ্যে ছিল, যদিও মেঙ্গেলের শারীরিক শক্তি এর চেয়ে ঢের বেশী।

"মনের তুলনা করলে উভয়কে প্রথমটা সরল মনে হবে, কিন্তু মেঙ্গেলের সরলতা নির্ব্বোধের আর বোগার সরলতা বালকের, যে জানবার জন্যে সব সময়ে ব্যগ্র, উন্মুখ। সঙ্গীত বোগার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নৃত্যচঞ্চল করে তোলে, মেঙ্গেলের উপর তার কোন ক্রিয়াই হয় না। আধুনিক বা প্রাচীন যে-কোন চিত্র দেখলে বোগা উল্লসিত হয়ে দেখে আর এমন সব মৌলিক মন্তব্য প্রকাশ করে যে শুনলে বিস্মিত হতে হয়, মেঙ্গেলে সেটা মন দিয়ে না দেখেই যা কোথাও শুনেছে তাই আওড়াবে। মোট কথা, বোগা যেন জীবনের প্রথম ধাপে, সর্ব্বথা বিকাশোন্মুখ, আর মেঙ্গেলে, যদিও বয়স মাত্র পঁচিশ, তবু যেন এক বয়োবৃদ্ধ অতিকায় মানুষ যার বিকাশ বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু গবেষণার ক্ষেত্রে উভয়ের বুদ্ধির পরিমাণ প্রায় এক। তবে, প্রফেসর এক অত্যন্ত সহজ সমস্যার সমাধান করার কাজ একে দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, এর উপর তিনি কখনও বিরক্ত হতেন না, ধৈর্য্যের সঙ্গে একে বোঝাবার চেষ্টা করতেন। আমার অধ্যাপকের উপর অত্যন্ত শ্রদ্ধা হ'ল। সকল দেশেই সত্যিকারের শিল্পী, সাহিত্যিক ও বিজ্ঞানবিদ সাম্রাজ্যবাদীদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হয় বটে। আমিও উৎসাহের সঙ্গে তাকে সাহায্য করতে আরম্ভ করলাম। সে স্বভাবতঃই আমার প্রতি অতিশয় কৃতজ্ঞ হয়ে উঠল। তার ডক্টরেট থিসিসের কাজ ধীরে ধীরে এগোতে লাগল।

"ল্যাবরেটরির এক অলিখিত নিয়ম আছে যে, ঘনিষ্ঠতা যতই হোক, কেউ কারো ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করে না, যতক্ষণ না ল্যাবরেটরির গণ্ডীর বাইরে বন্ধুত্ব হয়। কাজেই মাসের পর মাস যদিও তাকে সাহায্য করতাম, তার সঙ্গে আলাপ করতাম, এমন কি এক সঙ্গে প্রায়ই ঐ রেস্তোরাঁয় আহার করতে যেতাম, তবু তার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে কখনও কোন প্রশ্ন করি নি। একদিন সে আমাকে পরের রবিবার বিকেলে তার গৃহে চায়ের নিমন্ত্রণ করলে, এবং বললে আমি যদি আসি ত তার স্ত্রী বড় সন্তুষ্ট হবে।

আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি বিবাহিত?'

'হাঁ।'

'এত অল্প বয়সে?'

'অল্প বয়স কেন বলছেন? আমার বয়স ত্রিশ।'

'সত্যি?' আমি অতিশয় বিস্মিত হলাম, কারণ আমার ধারণা হয়েছিল—ওর বয়স কুড়ি কি একুশ। সে যাই হোক, আমি আনন্দের সঙ্গে তার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। আমি পূর্ব্বে কখনও নিগ্রো ভদ্রমহিলা দেখি নি, সুতরাং একটু কৌতূহলও হ'ল।

"নির্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে আমি তার গৃহে উপস্থিত হলাম। বোগা আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করে এক ছোট দুই-ঘর-ফ্ল্যাটের বসবার ঘরে বসালে। ঘরটিতে গরীবানা সামান্য আসবাবপত্র, কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, জানালায় সুন্দর পর্দা, দেয়ালে মাত্র দুখানি ছবি, একটি কার্ল মার্ক্সের, অপরটি লেনিনের। টেবিলে কেক ও স্যাণ্ডউইচ সাজানো রয়েছে। কিন্তু গৃহকর্ত্রী সেখানে নেই। বোগা বললে, 'আমার স্ত্রী এখখুনি আসছেন।' অকস্মাৎ সামনের দরজার পর্দা সরিয়ে হাতে এক টি-পট নিয়ে প্রবেশ করলে ফ্যানি! আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে হাঁ করে তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ফ্যানি একটু মুচকি হেসে টি-পটটা টেবিলে রেখে, আমার কাছে এগিয়ে এসে আমার দুই হাত তার দুটি হাতে নিয়ে আমার দিকে সস্নেহে চেয়ে বললে, 'আজ থেকে আমরা ভাই-বোন,' একটু থেমে বললে, 'দাদা এস, চা খাবে।' আমি যন্ত্রচালিতের মত টেবিলে গিয়ে বসলাম। ফ্যানি আমার পাশেই বসে আমার কাঁধে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমি কি চাও, চা না কফি? দুই-ই আছে।' আমি বললাম, 'চা'। ফ্যানি বললে, 'জানতাম, তাই চা এনেছি, আমার কর্ত্তা কিন্তু কফি পছন্দ করেন।' যেন এক মন্ত্রশক্তিতে আমার মনের

দীর্ঘ দিনের জমাট বাঁধা কুয়াটিকা পরিষ্কার হয়ে গেল। অনুভব করলাম, আমি যেন দেশে এসেছি আর আমার পাশে বসে আমারই স্নেহময়ী ভগ্নী। সে রহস্যময়ী, রঙ্গিণী, বিদ্যুৎচঞ্চলা ফ্যানি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সব সহজ সরল হয়ে গেল।

খুব সহজ ভাবে গল্প-গুজব, পান-ভোজনাদি হ'ল। একবার বোগা উঠে গেল সিগারেট কিনে আনতে, সে ধূমপান করে না, আমার জন্যে তার ব্যবস্থা করতে ভুলে গিয়েছিল। আমি ফ্যানিকে স্বচ্ছন্দে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ছেলেলে বুঝি তোমাকে বড় কষ্ট দিয়েছিল?' তার দুই গাল লাল হয়ে উঠল, সে মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে লজ্জায় ম্রিয়মাণ হয়ে নীরবে ঘাড় হেঁট করে রইল।

চকোর

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

চঞ্চল আমি, চকোর ক্ষুদ্র পাখী—
প্রান্তরের এক প্রান্তে একাকী থাকি।
পেয়েছি পক্ষ, পেয়েছি চঞ্চু,
বেড়াই আহার খুঁজি,
এ দেহ কতই ভঙ্গুর তাহা বুঝি।
হেরি 'বাবুই'-এর খাসা বাসা-বোনা
শ্যেনের দাপট ক্রূর,
আহত কপোত করে মোরে ব্যথাতুর।

২

শুনি কোকিলের কুহু ও শ্যামার শিস্‌,
কি মধুকণ্ঠ দিয়াছেন জগদীশ!
হেরি মরালের গতি সুন্দর,
ময়ূরের নৃত্য,
আনন্দে মোর ভরে ওঠে চিত্ত।
ও ঐশ্বর্য্য উহাদের থাক
হেরি হয়ে প্রীতিকামী—
আমি যা পেয়েছি তাতেই তুষ্ট আমি।

দীন অধিবাসী আমি বটি ধরণীর,
আকাঙ্ক্ষা মোর আকাশে বেঁধেছে নীড়।
গরুড়ের সাথে মোর জ্ঞাতিত্ব
স্মরি আমি অহরহ,
স্বর্গে মর্ত্তে বিচ্ছেদ দুঃসহ।
ভুলে যাই আমি গোটা এ ভুবন—
ভুলে যাই মোর গৃহ,
গগনের চাঁদ হইয়াছে আত্মীয়।

৪

দিবস রজনী দুই মোর নিশীথিনী
আমার অরূপ চাঁদকেও আমি চিনি।
তারা-কুচি দিয়ে গড়া ছায়াপথ
ভুলায় আমার মন,
রাগের ও পথে পেয়েছি নিমন্ত্রণ।
আমার চন্দ্র কখনো কৃষ্ণ,
স্বর্ণবর্ণ কভু,
তিনি এক মোর, বহু রূপ তাঁর তবু।

৫

বুঝি তাঁরি কাছে যাবারি লাগি এ পাখা,
কণ্ঠের কাজ কেবল তাঁহাকে ডাকা।
শুধু খড় কুটা কীট পতঙ্গে
আর সুখ নাহি পাই,
চাহিনাকো তাহা, যাতে সুধাকণা নাই
তোমরাও এসো ডাকি সবাকারে,
বলি আমি দিবাযামী,
পাষাণের চাঁদে অমৃত পেয়েছি আমি।

তন্ময়তায় বিভোর হইয়া থাকি,
আর বেশী কিছু দেখিতে চায় না আঁখি
আমার সাধনা মোর আরাধনা
আঁধারেতে চাঁদ-গেলা,
তাহাই আমার জীবন, তাহাই খেলা।
ওই বাসা বাঁধা, ওই হাসা-কাঁদা
আর নাহি ভাল লাগে,
সুধা-পারাবার সুমুখে আমার জাগে।

চিকিৎসালয়-প্রাঙ্গণে সমবেত ভিখারী কুষ্ঠীদের মধ্যে কলিকাতার মহামান্য লর্ড বিশপ ও রেভাঃ সেন

কুষ্ঠীসেবাধন্য রেভারেণ্ড সেন

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

নব্য-ভারতের অন্যতম স্রষ্টা বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের একটি কবিতায় আছে :

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন—সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

মানবসেবা ও যুগধর্ম সম্বন্ধে অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, "দরিদ্র দীন দুঃখী অধঃপতিত পীড়িত এরাই তোমার উপাস্য দেবতা হউক। মানব সেবাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা।"

সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই সেবাকে পরম ধর্ম্ম বলা হইয়াছে। যাঁহারা এই সেবাধর্ম্মকে জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করেন, তাঁহারা সকলের নমস্য। জগতে এরূপ সেবাধর্ম্মী নর-নারীর সংখ্যা অধিক না থাকিলেও, কোনকালেই একেবারে ইহার অভাব ঘটে নাই, কাহারও কাহারও নিকট পীড়িতের সেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয়। কেহ কেহ আবার কুষ্ঠরোগীর সেবাকেই সেবাধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা মনে করিয়া তাহাদের কল্যাণ-সাধনে জীবন উৎসর্গ করিয়া থাকেন।

কান্তকবি রজনীকান্তের একটি নীতিমূলক কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :

"মহাবীর শিখ এক পথ বহি' যায়,
পথ-পার্শ্বে কুষ্ঠরোগী পড়িয়া ধরায় ;
বেদনায় হতভাগ্য করিছে চীৎকার,
ক্ষতস্থান বহি' তার পড়ে রক্তধার।
দেখিয়া বীরের মনে দয়া উপজিল,
শিরস্ত্রাণ খুলি তার ক্ষত বাঁধি দিল ;
শিরস্ত্রাণ কহে, "মাথে ছিলাম নগণ্য ;
কুষ্ঠীর চরণে প'ড়ে হইলাম ধন্য।"

কবি এখানে বীরের মস্তকের ভূষণকে কুষ্ঠরোগীর চরণে ফেলিয়া ধন্য করিয়াছেন। সেবাধর্ম্মকেই তিনি শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন।

বৈদিক যুগ ও পৌরাণিক যুগের ইতিহাস আলোচনায় জানিতে পারা যায় যে, ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতেই কুষ্ঠব্যাধির প্রকোপ ছিল। বৌদ্ধ যুগে, বিশেষতঃ সম্রাট অশোকের সময়ে কুষ্ঠ-রোগীদের চিকিৎসার জন্য পৃথক আরোগ্যশালা ছিল। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে রোগ-পরিচয় রোগ-নির্ণয় ও ভেষজের বিধান প্রভৃতি সহ কুষ্ঠ-রোগ-চিকিৎসার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে। বর্ত্তমানে লোকালয় হইতে দূরে কুষ্ঠরোগীদের রাখার যেরূপ বিধান আছে, প্রাচীনকালেও সেইরূপ ছিল।

পশ্চিমবঙ্গে কুষ্ঠরোগীর মোট সংখ্যা দুই লক্ষ। ইহাদের মধ্যে ৫০,০০০ সংক্রামক রোগী। কুষ্ঠরোগীদের সম্বন্ধে সরকারী

বিবরণী হইতে জানিতে পারা যায় যে, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, নদীয়া, হুগলী, হাওড়া, মালদহ, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, চব্বিশ-পরগণা এবং রাজধানী কলিকাতা সর্ব্বত্র এই রোগ বিদ্যমান। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বাঁকুড়া জেলাতেই কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা অত্যধিক, মোট ৩৫,০০০ হাজার। জেলাসমূহের গড়পড়তা হিসাবে বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর এবং আসানসোল খনি-অঞ্চলেই কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।
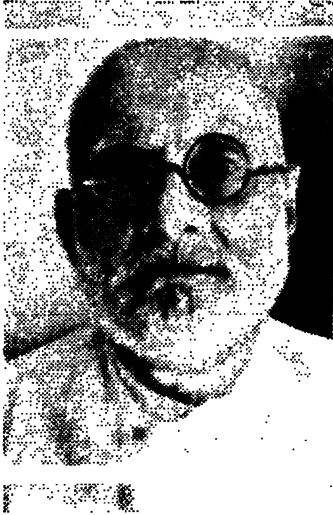
কুষ্ঠীসেবানন্দ
রেভাঃ প্রেমানন্দ অনাথনাথ সেন

কলিকাতা শহরের পথে-ঘাটে হাটে-বাজারে সর্ব্বত্রই কুষ্ঠরোগী দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে কুষ্ঠরোগীর মোট সংখ্যা ২০,০০০ হাজার। তন্মধ্যে সংক্রামক রোগী প্রায় ৫,০০০। এই সংক্রামক রোগীদের দ্বারা সহজেই নীরোগ ব্যক্তির দেহে কুষ্ঠরোগ সংক্রামিত হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহার প্রতিকারকল্পে মিউনিসিপ্যালিটি বা সরকার আশানুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন না। শহরের পূর্ব্বপ্রান্তে গোবরা অঞ্চলে এতকাল ধরিয়া যে সুবৃহৎ সরকারী কুষ্ঠ হাসপাতালটি ছিল তাহা বাঁকুড়ায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। তবে জনসাধারণের প্রতিবাদের দরুন হাসপাতালের দ্বার একবারে বন্ধ করা হয় নাই, এখনও স্বল্পসংখ্যক কুষ্ঠরোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা গোবরায় রাখা হইয়াছে। তবে কতদিন থাকিবে বলা যায় না। এতদ্ব্যতীত কলিকাতায় আর একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান 'ট্রপিক্যাল স্কুল অফ্ মেডিসিনে'ও কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা করা হয়, এখানে রোগী রাখিবার কিন্তু কোন ব্যবস্থা নাই। ভারতের বেসরকারী চিকিৎসকগণের সর্ব্বপ্রধান সমিতি—'ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশনে'র বঙ্গীয় শাখা সম্প্রতি গোবরার হাসপাতাল তুলিয়া দেওয়ার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন এবং কলিকাতায় কুষ্ঠরোগীদে যথোচিত চিকিৎসার জন্য অন্ততঃ ৫০০ 'বেড'যুক্ত একটি হাসপাতা রাখা একান্ত আবশ্যক বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

কলিকাতায় সরকারী ও বেসরকারী অনেকগুলি হাসপাতাল এ চিকিৎসালয় রহিয়াছে। সেখানে বিভিন্ন ব্যাধিতে আক্রান্ত সহস্র সহ লোক চিকিৎসিত হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে দুরন্ত কুষ্ঠব্যাধি সমাজ জীবনে দারুণ নৈরাশ্য এবং বেদনার সৃষ্টি করিয়াছে, যে রোগ ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে বহু পরিবারের শান্তি-সুখ ধ্বংস করিতেছে—তাহা প্রতিবিধানের জন্য রাষ্ট্র বা সমাজের সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিরা এখন সম্যক্ অবহিত নহেন।

কলিকাতায় "প্রেমানন্দ কুষ্ঠ চিকিৎসালয়" জাতি-ধর্ম্ম ও ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর কুষ্ঠরোগাক্রান্ত নর-নারীর বিনা ব্যয়ে চিকিৎসার একমাত্র বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। সেবাব্রতী রেভা প্রেমানন্দ অনাথনাথ সেন ইহার প্রতিষ্ঠাতা। জনসাধারণ ইহাকে বিশেষভাবে না জানিলেও, গত অর্দ্ধ শতাব্দীকাল ধরিয়া এই মহা নগরীতে যাঁহারা সমাজসেবা-কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই রেভাঃ পি এ. এন্. সেনের নামের সহিত সুপরিচিত তাঁহার গুণমুগ্ধ সুহৃদ এবং ভক্তের সংখ্যাও অল্প নহে। বর্ত্তমানে রেভাঃ সেন অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন এবং কর্ম্মজীবন হইতে অবসরগ্রহণপূর্ব্বক বাঁচিতে থাকিয়া ভগবৎচিন্তায় কালাতিপাত করিতেছেন। কুষ্ঠীসেবানন্দ এই দেবতুল্যচরিত্র সমাজ-কর্ম্মীর জীবনকথা এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়ার সম্ভ্রান্ত সেন-বংশের সন্তান অনাথনাথ সেন ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা স্বর্গত উমানারায়ণ সেন অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ী ছিলেন। প্রাচুর্য্যের মধ্যেই অনাথনাথের শৈশব, বাল্য ও কৈশোর জীবন অতিবাহিত হয়। তাঁহার অনেকগুলি ভ্রাতা ও ভগ্নী ছিল। বাল্যকাল হইতেই গরীবদুঃখীদের প্রতি তাঁহার বিশেষ দয়ার ভাব প্রকাশ পায়। অনেক সময় তিনি গোপনে ভিখারীদের পয়সা, কাপড় জামা ও গৃহস্থালির ব্যবহার্য্য অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রীও দান করিতেন। পল্লীর ভিখারীগণ বালকের দয়ার বিষয় জানিত এবং অনেক সময় কিছু পাইবার আশায় বাড়ীর সম্মুখের রাস্তায় অপেক্ষা করিত। অনাথনাথ উপরের জানালা হইতে দেখিতে পাইলেই তাঁহার দান নীচে রাস্তায় ফেলিয়া দিতেন। দান করিয়া সত্য কথা বলিলে, তাঁহার পিতামাতা কখনও পুত্রকে ভর্ৎসনা করেন নাই। বরং দয়াবতী মাতা পুত্রকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া আদর করিয়া বলিতেন, "তোর অনাথনাথ নাম রাখা সার্থক হয়েছে।" মাতার কথা স্মরণ হইলে এই বৃদ্ধ বয়সেও রেভাঃ সেনের চক্ষে অশ্রুধারা বহিতে থাকে।

বাল্যকাল হইতেই অনাথনাথ ধর্ম্মভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি হরিসভায় উপস্থিত থাকিয়া নামগানে যোগদান করিতেন। গুপ্তিপাড়ায় থাকিলে তিনি হরি-সংকীর্ত্তন দলের সহিত গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গান গাহিয়া বেড়াইতেন। কিশোর বয়সেই অনাথনাথ

গয়া, কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, হৃষীকেশ ও লছমন-ঝোলা প্রভৃতি হিন্দুর পবিত্র তীর্থস্থানসমূহ ঘুরিয়া আসেন এবং সন্ন্যাসী ও ফকিরদের সঙ্গ করেন। কিন্তু এ সকলে তাঁহার আত্মা যেন কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছিল না। এই সময় তিনি এক যুব আন্দোলনে যোগদান করেন। হিন্দুদের সামাজিক রীতি-নীতির সংস্কার করাই এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল। ব্রাহ্ম-সমাজের তরুণেরাই প্রধানতঃ ইহার উদ্যোক্তা ছিলেন। অনাথনাথ ব্রাহ্মসমাজেও যোগদান করিতে থাকেন।

তৎকালে এক দিকে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র স্থাপিত নববিধান সমাজ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এবং অন্য দিকে অক্সফোর্ড মিশন, স্কটিশ চার্চ ও চার্চ মিশনরী সোসাইটির খ্রীষ্টান মিশনরীরা হিন্দু-সমাজের শিক্ষিত তরুণগণকে স্ব স্ব দলে আনিবার জন্য বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন অক্সফোর্ড মিশন অনাথনাথের বাসভবনের নিকটে চোরবাগান মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীটে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই মিশনের কয়েক জন পূতচরিত্র মিশনরীর সহিত তরুণ অনাথনাথের পরিচয় হয়, ফাদার ওয়াকার তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। আত্মীয়-পরিজনেরা খ্রীষ্টান মিশনরীদের সহিত বালকের মেলামেশা পছন্দ করিতেন না, কিন্তু অনাথনাথের পিতা ছেলের সাধু-সংসর্গে বাধা দেওয়া সঙ্গত মনে করেন নাই। কিন্তু তিনি তখন আদৌ ভাবিতেও পারেন নাই যে, ঐ সাধু ব্যক্তিরাই একদিন তাঁহার প্রিয় পুত্রকে হিন্দুসমাজ হইতে কাড়িয়া লইবেন।

অনাথনাথ অতি যত্নের সহিত খ্রীষ্টান ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেল পড়িতে আরম্ভ করেন। পাপী মানবের প্রতি যীশুখ্রীষ্টের ভালবাসার বিবরণ তাঁহার অন্তরকে স্পর্শ করে এবং তিনি এই মানবত্রাণকর্ত্তার মহৎ জীবনের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়া উঠেন। যীশুর জীবনকথা, তাঁহার অমূল্য উপদেশাবলী ও অসামান্য আত্মত্যাগ ক্রমে তরুণ অনাথ-নাথকে এরূপ মুগ্ধ করে যে, তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ইহার পরই গৃহীত ধর্ম্ম সম্বন্ধে আরও অধিক জ্ঞানলাভ এবং এক জন মিশনরীতে পরিণত হইবার জন্য নব-দীক্ষিত অনাথনাথ খ্রীষ্টান-ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠের উদ্দেশ্যে বিশপ স কলেজে যোগদান করেন।

রেভাঃ সেন কয়েক বৎসরের জন্য কলিকাতা ওয়াই. এম. সি-এর কলেজ ব্রাঞ্চের সেক্রেটারী হইয়াছিলেন। সে সময় তিনি কলি-কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন। পরে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ চার্চ মিশনরী সোসাইটিতে একজন মিশনরীরূপে যোগদানের জন্য আহ্বান আসিলে, তিনি সপরিবারে তথায় গিয়া সেণ্ট পল্‌স কলেজের হাতার মধ্যে বাস করিতে থাকেন। এইখানে কার্য্যে নিযুক্ত থাকা-কালেই কলিকাতার বস্তিসমূহের অধিবাসী অনুন্নত, অস্পৃশ্য ও সমাজ-পরিত্যক্ত নরনারীদের প্রতি দয়ার্দ্রহৃদয় রেভাঃ সেনের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। বস্তিসমূহের মধ্যে তিনি কুষ্ঠরোগাক্রান্ত শত শত ভিক্ষুক দেখিতে পান। চিকিৎসার অভাবে এই সকল অবজ্ঞাত এবং উপেক্ষিত লোকের দুর্গতি ও তাহাদের শিশু-সন্তানগণের সম্পূর্ণ অনাদৃত অবস্থা তাঁহার অন্তরকে বিশেষভাবে ব্যথিত করে। রেভাঃ সেনের এই মর্ম্মবেদনার ফলে, তাঁহারই অক্লান্ত চেষ্টায় কলিকাতা মহানগরীতে বিনা ব্যয়ে কুষ্ঠরোগীদের চিকিৎসার একমাত্র বেসরকারী প্রতিষ্ঠান প্রথম স্থাপিত হয়।

প্রেমানন্দ কুষ্ঠ-চিকিৎসালয়

রেভাঃ সেন ১৯১৭ সনে গোবরা কুষ্ঠ-হাসপাতালের ফিরিঙ্গী ও ভারতীয় খ্রীষ্টান রোগীদের ধর্ম্মোপদেশ দানের ভার গ্রহণ করেন। সেই সময় সমগ্র কলিকাতা শহর ও নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের মধ্যে ইহাই ছিল একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেখানে কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা এবং রোগীদের আশ্রয় দান করা হইত। তিনি এই সময় লক্ষ্য করেন যে, ক্ষত সারিলেই রোগীদের হাসপাতাল হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া হয় এবং তাহারা শহরের মধ্যস্থ নিজ নিজ বস্তিতে ফিরিয়া যায়। কলিকাতায় এইরূপ একটি বস্তিতে রেভাঃ সেন ৪৫ জন খ্রীষ্টান কুষ্ঠরোগীর সন্ধান পান এবং অনুসন্ধানে আরও জানিতে পারেন যে, নিকটবর্ত্তী ঘন বসতিপূর্ণ বস্তি অঞ্চলে দুই শতের অধিক ভিখারী কুষ্ঠরোগী বাস করিতেছে। ইহারা কোনরূপ যত্নই পায় না এবং চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষার অভাবে নিতান্ত অসহায়ের মত মৃত্যুকে বরণ করে। সে সময় কোন ডাক্তারও কুষ্ঠরোগীকে চিকিৎসার জন্য যাইতে চাহিতেন না।

ভিখারী-কুষ্ঠরোগীদের সমস্যায় রেভারেণ্ড সেন বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়েন। প্রথমে তিনি মাত্র খ্রীষ্টান রোগীদের সন্ধান পাইলেও ক্রমে ২৫৯ আপার সারকুলার রোডস্থ সি. এম. এস সিমেটারি (গোরস্থান) সংলগ্ন খোলা জমিতে, খ্রীষ্টান ছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের কুষ্ঠরোগীও তাঁহার নিকট সমবেত হইতে থাকে। এইরূপ শত শত রোগীকে তিনি দেখিতে পান। তিনি বুঝিতে পারেন যে, এই সকল অবজ্ঞাত ভিখারী-কুষ্ঠীরা চারিদিকে রোগ বিস্তার করিয়া কলিকাতার স্বাস্থ্যের ভয়াবহ ক্ষতি-সাধন করিতেছে। গোরস্থান-সংলগ্ন যে গৃহটি সৎকারকারীদের বিশ্রামের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, রেভাঃ সেন সে সময় তাহা স্বীয় সমাজসেবা কর্ম্মে ব্যবহারের জন্য অনুমতি পাইয়া-ছিলেন। এই গৃহেই তাঁহার কুষ্ঠীসেবা-কার্য্যের সূত্রপাত হয়।

১৯১৯ সনের জানুয়ারী মাসে রেভাঃ সেন এক বিবৃতিতে বাংলা-সরকারকে কলিকাতা শহরের কুষ্ঠী-ভিখারী-সমস্যার কথা জ্ঞাপন করেন এবং তাহাদের সকলের জন্য শহর হইতে দূরে পৃথক এক কলোনী স্থাপনের প্রস্তাব করেন। বাংলার ব্যবস্থাপক সভায় ঐ বৎসর জুলাই মাসে রেভাঃ সেনের প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। স্যর ফ্রাঙ্ক কার্টার এবং লেপার মিশনের প্রচেষ্টায় অল্পকাল মধ্যে উহার জন্য মেদিনীপুর জেলায় ১৫০ একর জমি সংগৃহীত হয় এবং গৃহাদি নির্ম্মাণ ও কলোনী স্থাপনের জন্য সরকার অর্থ ব্যয় করিতে স্বীকৃত হন। কিন্তু এ বিষয়ে কাজ অগ্রসর হয় নাই।

প্রেমানন্দ কুষ্ঠ-চিকিৎসালয়—কালীঘাট শাখা

১৯২০ সনে স্যর হেনরী হুইলারের সভাপতিত্বে ৩রা হইতে ৬ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত কলিকাতায় 'অল্ ইণ্ডিয়া লেপার কন্‌ফারেন্সে'র যে অধিবেশন হয় তাহাতেও রেভাঃ সেন এই মহানগরীর ভিখারী কুষ্ঠরোগীদের চিকিৎসার একান্ত অভাবের কথা উল্লেখ করেন। সে সময় সরকারের পক্ষ হইতে স্যর লিওনার্ড রজার্স উত্তর দিয়াছিলেন যে, শীঘ্রই হাসপাতালের বহির্বিভাগে কুষ্ঠরোগীদের জন্য উন্নততর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইবে। ঐ বৎসরেই তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের হেল্‌থ অফিসার ডাঃ এইচ. এম. ক্রেক্ সাহেবের কাছেও আবেদন জানান যে, আর কালবিলম্ব না করিয়া ভিখারী কুষ্ঠ রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক।

কয় বৎসর ধরিয়া কেবল আবেদন-নিবেদন করিয়াই রেভাঃ সেন কুষ্ঠরোগীদের প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই। তিনি প্রতি বৎসর বড়দিনের সময় এক সপ্তাহকাল যতগুলি সম্ভব ভিক্ষা-জীবী-কুষ্ঠরোগীদের একত্রিত করিয়া ভোজ দেওয়া এবং শীত-বস্ত্র প্রদানের ব্যবস্থা করেন। ১৯১৯ সনে প্রথম বর্ষে ইহার জন্য যে ব্যয় হয়, তাহা স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও স্যর ফ্রাঙ্ক কার্টার সমানভাবে বহন করিয়াছিলেন। ১৯২২ সনের এই বার্ষিক অনুষ্ঠানে কলিকাতা কর্পোরেশনের তদানীন্তন চেয়ারম্যান সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহোদয় উপস্থিত হইয়া রেভাঃ সেনের সহিত কলিকাতা নগরীর কুষ্ঠীভিখারী-সমস্যার বিষয়ে আলোচনা করেন। তাঁহার নির্দ্দেশমত রেভাঃ সেন ঐ স্থানে উপাসনাগৃহে ভিখারী কুষ্ঠ-রোগীদের চিকিৎসার জন্য একটি ছোট ডাক্তারখানা খুলিবার প্রস্তাব কর্পোরেশনে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, কিন্তু স্থানীয় প্রতিবাসীরা প্রবলভাবে আপত্তি করায় কর্পোরেশন সে সময় কোন সহায়তা করিতে পারেন নাই।

১৯২৩ সনের শেষভাগে রেভাঃ সেন নিজেই একটি ছোট ডাক্তারখানা স্থাপন করেন। এই সময় সুবিখ্যাত ঔষধবিক্রেতা বটকৃষ্ণ পাল কোম্পানী তাঁহাকে প্রথম দফায় প্রায় ৫০০৲ টাকা মূল্যের ঔষধ দান করিয়া সবিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। একজন খ্রীষ্টান ডাক্তারও বিনা পারিশ্রমিকে নিয়মিতভাবে ডাক্তারখানায় উপস্থিত থাকিয়া কুষ্ঠরোগীদের চিকিৎসা করিতে সম্মত হন। ১৯২৩ সনের ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে আনুষ্ঠানিক ভাবে ডাক্তারখানার উদ্বোধন করা হয়। কলিকাতার মহামান্য লর্ড বিশপ (সমগ্র ভারত, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলের সর্ব্বপ্রধান পাদ্‌রী) মহোদয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া এই শুভ প্রচেষ্টাকে তাঁহার আশীর্ব্বাণীর দ্বারা বিশেষ গৌরবান্বিত করেন। সেদিন ৩০০ শত ভিখারী-কুষ্ঠরোগী নব-প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসানিকেতনে উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাই কলিকাতা মহানগরীতে বিনাব্যয়ে কুষ্ঠরোগীদের চিকিৎসার একমাত্র বেসরকারী চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার ইতিকথা।

আশ্চর্য্যের বিষয়, আজ ৩০ বৎসর পরে এই ১৯৫৩ সনেও সমাজের অবজ্ঞাত এবং অবহেলিত কুষ্ঠরোগীদের চিকিৎসার জন্য রেভাঃ সেন প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসালয় ব্যতীত কলিকাতায় আর কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় নাই। অথচ সরকারী হিসাব অনুযায়ী দেখা যায়, এই মহানগরীতে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে।

রেভাঃ সেন যেরূপভাবে স্বহস্তে ভিখারী কুষ্ঠরোগীদের সেবা করিতে থাকেন, তাহা দেখিয়া অনেকেই মুগ্ধ হইয়া যান। লোক-মুখে তাঁহার আদর্শ সেবার কথা ক্রমশঃ বাহিরে প্রকাশ হইতে থাকে। ১৯২৪ সনের প্রথমেই কলিকাতা কর্পোরেশন উক্ত চিকিৎসালয়ের জন্য বার্ষিক ৩০০০৲ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করেন। সেই সময় প্রতিষ্ঠাতা রেভাঃ সেনকে সেক্রেটরী করিয়া একটি পরিচালক সমিতিও গঠিত হয়।

চিকিৎসালয়ে আগত কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তখন এক জন ডাক্তারের পক্ষে সকল রোগীর চিকিৎসা করা অসম্ভব হইয়া পড়ে এবং আর এক জন ডাক্তারের সহায়তা আবশ্যক হয়। কার্য্যবৃদ্ধির সঙ্গে চিকিৎসালয়ে স্থানেরও অভাব অনুভূত হয় এবং সেজন্য আর একটি ঘর তৈরি করানো হয়। এত দিন ডাক্তারেরা সাময়িকভাবে উপস্থিত হইয়া রোগীদের চিকিৎসা করিতেছিলেন, কিন্তু ১৯২৬ সনের এপ্রিল মাসে সকল সময় কার্য্য করিবার জন্য একজন এম-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মেডিক্যাল অফিসার নিযুক্ত করিতে হয়। রেভাঃ সেন সর্ব্বক্ষণ নিজে সেবকভাবে চিকিৎসালয়ের কার্য্যে সহায়তা করিতে থাকেন।

অনাথনাথ বুঝিয়াছিলেন, উত্তর কলিকাতার সারকুলার রোডে

মাণিকতলা বাজার অঞ্চলে স্থাপিত এই একটিমাত্র চিকিৎসালয় দ্বারা দক্ষিণ অঞ্চলে যে অসংখ্য কুষ্ঠী-ভিখারী রহিয়াছে তাহাদের চিকিৎসার কোন সুবিধা হইবে না। সেজন্য তিনি কালীঘাটে একটি শাখা চিকিৎসালয় স্থাপনের সঙ্কল্প করেন। কর্পোরেশন সেন মহাশয়ের প্রস্তাব সমর্থন করিল, কালীঘাটে মহিম হালদার ষ্ট্রীটে, ১৯২৬ সনের ১৫ই নবেম্বর তারিখে দ্বিতীয় একটি কুষ্ঠ চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন করা হয়। কর্পোরেশন এজন্য বার্ষিক আরও ২০০০৲ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করেন। সকল সময়ের জন্য এখানে একজন এল্‌. এম্‌. এফ্‌. ডাক্তার নিযুক্ত করা হয়।

মাণিকতলার চিকিৎসালয় মূলতঃ ভিখারী কুষ্ঠীদের চিকিৎসার জন্য স্থাপিত হইলেও ক্রমশঃ বিত্তহীন ভদ্রঘরের নরনারীও অনেকে চিকিৎসার জন্য এখানে আসিতে আরম্ভ করেন। তখন

চিকিৎসালয় মধ্যে কুষ্ঠরোগীদের পরীক্ষা করা হইতেছে

চিকিৎসালয়ের আয়তন আবার বৃদ্ধি করিতে হয়। কর্পোরেশন, লেপার মিশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এবং বাংলার লাট বাহাদুর-প্রদত্ত অর্থে ও অন্যান্য ক্ষুদ্র দানের সাহায্যে উহা সুসম্পন্ন হইয়াছিল। এই সময় মেডিকাল অফিসারের এক জন সহকারী ডাক্তার, দুই জন কম্পাউণ্ডার, দুই জন ড্রেসার এবং অন্য দুই জন সহযোগীকেও নিযুক্ত করা হয়। চিকিৎসালয়ের বার্ষিক ব্যয় (কালীঘাট শাখা সহ) দশ হাজার টাকার ঊর্দ্ধে উঠিয়া যায়। স্থাপনার পর প্রথম বর্ষে (১৯২৪) যেখানে ২৪০০ রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছিল, ১৯২৮ সনে সেখানে মোট রোগীর সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ১১,০০০ হাজার। অল্পকাল পূর্ব্বে কার্য্য আরম্ভ করা হইলেও ঐ বৎসর কালীঘাট শাখা চিকিৎসালয়ে মোট রোগীর সংখ্যা হইয়াছিল প্রায় ৪,৩০০ শত।

রেভাঃ সেনের একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, কলিকাতা মহানগরীর বিভিন্ন কেন্দ্রে একটি করিয়া কুষ্ঠ-চিকিৎসালয় স্থাপন করা, কিন্তু তাহা সম্ভবপর হয় নাই। তবে তাঁহার অদম্য প্রচেষ্টা ও কুষ্ঠীদের প্রতি আন্তরিক দরদ এবং সাধারণের বদান্যতায় ক্রমশঃ চিকিৎসালয়ের কার্য্যের প্রসার হইতে থাকে। ১৯৩১ সনের রিপোর্টে দেখা যায় যে, ঐ বৎসর মাণিকতলায় আগত রোগীর সংখ্যা ২৬,০০০ হাজারের উপর এবং কালীঘাট শাখায় ঐ সংখ্যা প্রায় ১০,২০০ শত।

সমাজকল্যাণমূলক কার্য্যে অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং বয়োবৃদ্ধির ফলে ক্রমশঃ অনাথনাথের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া পড়ে। চিকিৎসক ও বন্ধুবর্গের পরামর্শে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া কর্ম্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হয়। ১৯৩১ সনের মাঝামাঝি তিনি উপযুক্ত কর্ম্মীদের হস্তে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কুষ্ঠ-চিকিৎসালয়ের ভার অর্পণ করিয়া সস্ত্রীক রাঁচিতে গিয়া বাস করিতে সুরু করেন। সে সময় সেনজায়াও বিশেষ রুগ্ন এবং প্রায় দৃষ্টিশক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন।

সেন মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী অনুগৃহীতা সেনও রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে তিনি ধর্ম্মান্তরিত স্বামীর সংসারের ভার গ্রহণ করেন। স্কুলে শিক্ষালাভ না করিলেও তিনি নিজের অক্লান্ত চেষ্টায় ইংরেজী, উর্দু, হিন্দী ও বাংলায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি এই চারিটি ভাষায় অনর্গল কথাবার্ত্তা বলিতে সক্ষম হন। স্বামীর মত সেনজায়াও সমাজ-সেবা কার্য্যে বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেন। দরিদ্র, অনুন্নত, জাতিচ্যুত লোকেদের এবং বিপন্না পতিতা নারীদের জন্যও তিনি অন্তরে বিশেষ বেদনা অনুভব করিতেন। দুর্গত নারী ও শিশুদের কল্যাণকল্পে কলিকাতায় যে "আশা সদন" প্রতিষ্ঠিত হয় তিনিই তাহার প্রাণস্বরূপ ছিলেন। ইহার প্রতিষ্ঠার মূলে রহিয়াছে মুখ্যতঃ তাঁহার উৎসাহ ও উদ্যম। জাতি ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলপ্রকার নারী-কল্যাণমূলক কার্য্যের সহিত তাঁহার সংযোগ ছিল। সেনপত্নী কলিকাতার 'লেডিজ কস্‌মোপোলিটান ক্লাবে'র সভানেত্রী, ওয়াই. ডব্লু. সি.-এর সহ-সভানেত্রী এবং নিখিল-ভারত মহিলা কনফারেন্সের অন্যতম সদস্যা ছিলেন। তাঁহাদের দুইটি পুত্র ও দুইটি কন্যা জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু ভগবান অকালে ইহাদিগকে নিজের কাছে টানিয়া লইয়া পিতামাতা উভয়কে সমাজকল্যাণমূলক কার্য্যের জন্য অখণ্ড অবসর দান করেন।

কলিকাতার অক্লান্ত কর্ম্মজীবন হইতে সেন মহাশয়ের অবসর-গ্রহণের পর, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসালয়ের জন্য ১৩,০০০ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি দ্বিতল ভবন নির্ম্মিত হয়। তাঁহার ভারত ও

ইংলণ্ডস্থিত সুহৃদবর্গের বদান্যতায় ইহা সম্ভবপর হইয়াছিল। এই সময় সংলগ্ন ল্যাবরেটরীর যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য গবর্ণমেণ্ট আরও ২০০০৲ টাকা দিয়াছিলেন। ১৯৪০ সনের ২৭শে জুলাই তারিখে কলিকাতার তদানীন্তন মেয়র এ. আর, সিদ্দিকী এই নূতন ভবনের দ্বারোদঘাটন করেন। রাঁচি হইতে আসিয়া সেন মহাশয় এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হয়, "প্রেমানন্দ কুষ্ঠ চিকিৎসালয়"।

১৯৪২ সনের ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে রাঁচিতে সেনজায়া দেহত্যাগ করেন।

কুষ্ঠীদের একান্ত দরদী বন্ধু ও সেবক রেভাঃ সেন প্রতিষ্ঠিত এই একমাত্র বেসরকারী চিকিৎসালয় ও ইহার কালীঘাট শাখা কলিকাতা মহানগরীতে কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা ও উহার প্রসার নিবারণকল্পে যে অক্লান্ত প্রচেষ্টা করিতেছে তাহার তুলনা বিরল। চিকিৎসালয়ের ১৯৫০-৫১ সনের বার্ষিক বিবরণীতে প্রকাশ, ঐ বর্ষে মাণিকতলার প্রধান চিকিৎসালয়ে মোট ৫৪,০০০ হাজার এবং কালীঘাটের শাখা চিকিৎসালয়ে মোট ২২,১০০ শত কুষ্ঠরোগী চিকিৎসিত হইয়াছে। এই বৎসর চিকিৎসালয় পরিচালনায় যে সাড়ে বাইশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে, তাহার মধ্যে ৫০০০৲ টাকা পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং ৫০০০৲ কলিকাতা কর্পোরেশন দিয়াছেন। অন্যান্য বদান্য ব্যক্তিদের ক্ষুদ্র বৃহৎ দান হইতে মোট ১২,০০০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে এবং ঘাটতি পড়িয়াছে ৫০০৲ শত টাকা।

কলিকাতায় সরকারী ও বেসরকারী হাসপাতালের সংখ্যা খুব কম নহে। বহু দানশীল দেশবাসী হাসপাতালের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা দানও করিয়া থাকেন। কিন্তু সমাজে উপেক্ষিত ও অবহেলিত কুষ্ঠরোগীদের জন্য কেন যে তাঁহাদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠে না, বলিতে পারি না। যদি তাঁহাদের অন্তরে কুষ্ঠরোগীদের জন্য দরদ থাকিত, তবে রেভাঃ সেনের প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসালয়ের পরে ত্রিশ বৎসরে আমরা কলিকাতায় আরও কয়েকটি কুষ্ঠ-চিকিৎসালয়ের উদ্ভব দেখিতে পাইতাম।

আমার পরম সৌভাগ্য যে, গত বৎসরে কয়েকদিনের জন্য রেভাঃ সেন যখন কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সহিত পরিচয়ের সুযোগ ঘটে। দেবচরিত্র বৃদ্ধের সৌম্য মূর্ত্তি দর্শনে ও শিশুর মত সরল কথাবার্ত্তায় আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তাঁহার সংস্পর্শে মনে হইয়াছিল—এতকাল ধরিয়া যিনি দুর্গত নরনারীর দুঃখদুর্দ্দশা মোচনের কার্য্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, এখন তিনি যেন সকল সময়ই ভগবৎ প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া রহিয়াছেন।

ভারতের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মাননীয়া অমৃত কাউর গত ২রা মার্চ তারিখে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী এদেশে কুষ্ঠরোগ চিকিৎসায় মোট ১,০৪,৯৪,০০০৲ টাকা ব্যয় করা হইবে। সমগ্র ভারতে কুষ্ঠরোগ-প্রতিকার প্রচেষ্টায় এই অর্থ যথেষ্ট কিনা, তাহা বিশেষজ্ঞরাই বিচার করিবেন, তবে আমরা ইহার মধ্যে একটু আশার আলোক দেখিতে পাইতেছি।

কাব্য-লোকে হ'ল কালজয়ী

শ্রীমহাদেব রায়

পূর্ণতার গৌরব তোমার আষাঢ়ের প্রথম দিবসে,
পাঠাইলে, কবি, কল্পনার কল্পলোকে পূর্ণ প্রাণ-রসে ;—
নিখিলের বিরহ-বেদনা বহি' চলে বিশ্বের বান্ধব,
মর-লোক হতে অমরায় বিতরিয়া বিপুল বৈভব।
স্বর্গে-মর্ত্ত্যে গড়িলে বিরহে মিলনের মণির-সোপান,
চির অমলিন প্রণয়ের বার্ত্তা-পথ করিয়া নির্ম্মাণ,
রিক্ত-হিয়া চির-বিরহীর হাহাকার যায় মিলাইয়া,
পূর্ণতার কী যে ছবি, কবি, দেখেছিলে দিব্যদৃষ্টি দিয়া।
দেবতাত্মা কবি দেখেছিলে অমরার প্রেমিক যক্ষেরে,
উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের গতি-পথে কার্য্য-ভার লজ্ঘিয়া কুবেরে
নিবেদিতে সম্ভ্রমে-বিলীন অন্তরের গোপন-বারতা
প্রভু-ভৃত্য বন্ধনের যথা ঊর্দ্ধলোকে চির-অনিত্যতা।
অন্ধ প্রেম তবু পথ-হারা—অভিশপ্ত নামিল ধরায়,
দিব্য দাহে দীপ্ত হিয়া তার দগ্ধ কাঞ্চনের গরিমায়,
কষিত-কাঞ্চন দীপ্ত প্রেমে যথাস্থলে পাঠালে ফিরায়ে,
দিব্যতার বার্ত্তা বহিবার যোগ্য দূতী চলিল সকাশে।
মর্ত্ত্যের বিরহ হতে যার মিলনের দিব্যধামে গতি,
অনন্ত কালের বক্ষে তার দৌত্য-পথে সুবিমল জ্যোতি,
দেশে দেশে সঞ্চারিয়া তার শুষ্ক-প্রাণে পূর্ণের পরশ
কাব্য-লোকে হ'ল কাল-জয়ী আষাঢ়ের প্রথম দিবস।

রবীন্দ্র-কাব্যের শেষ পর্যায়

শ্রীতপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্যগুলিকে বিচার করিতে গেলে ঠিক কোন্ পটভূমির উপর রাখিয়া বিচার করিলে সুবিচার হইবে সে সম্বন্ধে মনে প্রশ্ন জাগে। জীবনের রঙ্গমঞ্চ যদি বার বার বদলাইতে থাকে তাহা হইলে সাহিত্যকেও বার বার বিভিন্ন ভঙ্গী আয়ত্ত করিতে হয়। সাহিত্যে আধুনিকতা তাহাকেই বলি, সাহিত্য যেখানে সমসাময়িক সমাজ-চেতনাকে বিস্মৃত হয় না এবং পাঠকের সমাজ-বুদ্ধিকে ক্ষুন্ন করে না। রবীন্দ্রনাথের জীবনের সুদীর্ঘ সাহিত্য-সাধনায় বার বার এই রঙ্গমঞ্চের পটপরিবর্তন হইয়াছে; রবীন্দ্র-সাহিত্যকে বার বার 'আধুনিক' হইতে হইয়াছে। অথচ আধুনিকতার তাগিদে কবি তাঁহার সাহিত্যের মূলগত আদর্শকে, শাশ্বত অবলম্বনকে কখনও ত্যাগ করেন নাই। একই কথা শুধুমাত্র নূতন ভঙ্গী লইয়া নবকলেবরে প্রকাশলাভ করিয়াছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যে যাহা সনাতন, যাহা শাশ্বত, তাহাই সাময়িকতার খাতিরে নূতন ধ্বনি আয়ত্ত করিয়াছে মাত্র, কিন্তু আপনার ধর্মকে বিস্মৃত হয় নাই। রবীন্দ্র-সাহিত্য তাই শাশ্বতকালের কোন একটি অংশে 'আধুনিক' হইয়া উঠিতে পারে নাই, রবীন্দ্র-সাহিত্যের আধুনিকতা শাশ্বতকালের। জীবনের সত্যকে কবি সমসাময়িক সমাজ-চেতনার মধ্য দিয়াই উপলব্ধি করিয়াছেন—ইহাই রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতা। এই আধুনিকতা না থাকিলে জীবনের রঙ্গমঞ্চের পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কবির সাহিত্যের ধারাও রুদ্ধ হইয়া যাইত। সাহিত্যের আনন্দের ভোজে কবি আর নূতন কিছু পরিবেশন করিতে পারিতেন না।

এই সাহিত্যের আনন্দের ভোজে, জীবনের পরিবর্তিত পটভূমিকায় কবি আমাদের কি পরিবেশন করিলেন এবং কেমন ভাবে পরিবেশন করিলেন, সেকথা আলোচনা করিয়া দেখা যাক। প্রথমেই, 'শেষের কবিতা'য় নূতন যুগের নূতন 'প্রেসিডেন্ট' নিবারণ চক্রবর্তীর জবানিতে কবি তৎকালীন সমাজ-চেতনা ও সাহিত্যবোধের বিদ্রোহী প্রকৃতির কথা ব্যক্ত করিলেন। বলিলেন—"রবিঠাকুরের রচনা প্রিমিটিভ, নতুন প্রেসিডেন্টের কাছে চাই কড়া লাইনের খাড়া লাইনের রচনা—তীরের মত, বর্শার ফলার মত, কাঁটার মত, ফুলের মত নয়; বিদ্যুতের রেখার মত ন্যুর‍্যালজিয়ার ব্যথার মত, খোঁচাওয়ালা, কোণওয়ালা, গথিক গির্জার ছাঁদে, মন্দিরের মণ্ডপের ছাঁদে নয়; এমন কি যদি চটকল, পাটকল অথবা সেক্রেটারিয়েট বিল্‌ডিঙের আদলে হয়, ক্ষতি নেই।" 'নিবারণ চক্রবর্তী'র কাব্য আসিল তাহার নূতন ভঙ্গী, নূতন বক্তব্য লইয়া। কিন্তু আনন্দের ভোজে কবি আমাদের শেষ পর্যন্ত দিলেন কি?—সুনীতি বাবুর বাংলা ভাষাতত্ত্বের বই সঙ্গে লইয়া, চরমতম আধুনিকতা ঘোষণা করিয়া যে অমিত রায় শিলঙ পাহাড়ে বেড়াইতে গেল, আপনার প্রেম-জীবনের পরিণতিতে সে যে শেষের কবিতাটি খুঁজিয়া পাইল, সে কবিতা হইল 'রবি ঠাকুরের'। তাহাতে রবীন্দ্রনাথেরই প্রেমের সনাতন আদর্শ—"বিচ্ছেদের হোমবহ্নি হতে পূজামূর্তি ধরি প্রেম দেখা দিল দুঃখের আলোতে।"

রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতার ভঙ্গীই এই। যে বাণী তাঁহার শাশ্বত, তাহাকেই তিনি যুগোপযোগী ভঙ্গীতে প্রকাশ করিয়াছেন। ভঙ্গীর অভিনবত্বে আমরা মনে করি—কবি বুঝি নূতন কথা বলিলেন, কবির জীবনদর্শন বুঝি তাহার সনাতন পথ ছাড়িয়া আধুনিকতার পথ ধরিল। কিন্তু তাহা কদাচ হয় নাই, কবির জীবনদর্শন কোথাও বদলাইয়া যায় নাই; যাহা বদলাইয়াছে, তাহা হইল তাঁহার প্রকাশের ভঙ্গীটি। কবির যে সুন্দরের স্বপ্ন-সাধনা, আধুনিকতার তাগিদে তাহাই বস্তুকে জয় করিতে চলিয়াছে নূতন আয়োজনে। তাই "কিনু গোয়ালার গলি'তে, যেখানে জমে ওঠে পচে ওঠে আমের খোসা ও আঁটি, কাঁঠালের ভূঁতি, মাছের কানকা, মরা বেড়ালের ছানা,"—সেখানেও,

"হঠাৎ সন্ধ্যায়
সিন্ধু বারোয়াঁয় লাগে তান,
সমস্ত আকাশে বাজে
অনাদি কালের বিরহ-বেদনা।
তখনি মুহূর্তে ধরা পড়ে
এ গলিটা ঘোর মিছে
দুর্বিষহ মাতালের প্রলাপের মতো।
এ গান যেখানে সত্য
অনন্ত গোধূলি লগ্নে
সেইখানে
বহি চলে ধলেশ্বরী,
তীরে তমালের ঘন ছায়া—
আঙিনাতে
যে আছে অপেক্ষা ক'রে তার
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর।"

এইখানেই আমাদের 'আধুনিকতা' সচেতন হইয়া প্রশ্ন করে। কবি তাহার উত্তরে বলেন—

"আমারে শুধাও যবে, 'এরে কভু বলে বাস্তবিক ?'
আমি বলি, 'কখনো না, আমি রোমান্টিক।'
যেথা ঐ বাস্তব জগৎ
সেখানে আনাগোনার পথ
আছে মোর চেনা।
সেথাকার দেনা
শোধ করি—সে নহে কথায় তাহা জানি—
তাহার আহ্বান আমি মানি।
দৈন্য সেথা, ব্যাধি সেথা, সেথায় কুশ্রীতা,
সেথায় রমণী দস্যুভীতা—
সেথায় উত্তরী ফেলি পরি বর্ম ;
সেথায় নির্মম কর্ম ;
সেথা ত্যাগ, সেথা দুঃখ, সেথা ভেরী বাজুক 'মা ভৈঃ'
শৌখিন বাস্তব যেন সেথা নাহি হই।
সেথায় সুন্দর যেন ভৈরবের সাথে
চলে হাতে হাতে।"

যে কবিতাটি উদ্ধৃত করিলাম, ইহা 'নবজাতকে'র কবিতা। নবজাতক নাম শুনিয়া হঠাৎ ভ্রম হইতে পারে, এ বুঝি একেবারে নূতন, কিন্তু এ কাব্য নূতন নহে। ইহার কথা পরে বলা যাইবে। তাহার আগে 'শেষসপ্তক' কাব্যের কথা বলা যাক।

এখানে একটি কবিতার মধ্যে কবির শিল্পসাধনার সেই রহস্যের সন্ধান পাই যাহাতে কবি একই কালে বর্তমানের জীবনরসকে গ্রহণ করিতেছেন এবং সেই গ্রহণের মধ্য দিয়াই কবির শাশ্বতের সাধনা অব্যাহত থাকিতেছে। কবি বলিতেছেন—

"এই নিত্য বহমান অনিত্যের স্রোতে
আত্মবিস্মৃত চলতি প্রাণের হিল্লোল ;
তার কাঁপনে আমার মন ঝলমল করছে
কৃষ্ণচূড়ার পাতার মতো।
অঞ্জলি ভরে এই তো পাচ্ছি
সদ্য মুহূর্তের দান,
এর সত্যে নেই কোনো সংশয়, কোনো বিরোধ।"

নিত্য বহমান এই অনিত্যের স্রোত হইতে কবি প্রাণের রস সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহাকে ফিরাইয়া দেন নাই। কিন্তু সেই প্রাণের রসে নিত্য নবীন হইয়া উঠিয়া কবি যাহার সাধনা করিতেছেন তাহা হইল এই—

সেই অন্ধকারকে সাধনা করি
যার মধ্যে স্তব্ধ বসে আছেন
বিশ্বচিত্রের রূপকার, যিনি নামের অতীত,
প্রকাশিত যিনি আনন্দে।

'শেষসপ্তক' কাব্যে মহাকালের এমনই একটি ভূমিকা আছে, যে মহাকাল মৃত্যুর ছন্দে লীলায়িত। জীবনের সাময়িক প্রকাশগুলিকে খণ্ডকালের ভূমিকায় একান্ত করিয়া দেখিলেই সেগুলিকে তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়, অথবা সেগুলির তুচ্ছতা প্রকাশ পায়। 'শেষসপ্তক' কাব্যে কবি জীবনের খণ্ডপ্রকাশের মধ্যে অপূর্ব রসের সন্ধান পাইয়াছেন, তাহাকে মৃত্যুর ভূমিকায়, মহাকালের ভূমিকায় দেখিয়া। তুচ্ছ আলাপের ফাঁকে প্রিয়ের মুখে যে একটি অমৃতরেখা চমক দিয়া যায়, অন্তরের যে একটি অস্ফুট আবেগ অন্তরতম আবেদনের সঙ্কোচ কাটাইয়া ভাষা লাভ করে, তাহাতেই কালের বীণায় মুহূর্তের আনন্দবেদনা বাজিয়া উঠিয়া আগামী জন্ম-জন্মান্তরেও যেন তাহা প্রসারিত হইয়া যায়। তখন এই নিমেষটির বাহিরে আর যাহা কিছু রহিয়াছে তাহাকেই গৌণ বলিয়া মনে হয়। কারণ সেগুলি সাময়িক, আর এখানে সাময়িকতার মধ্যে চিরন্তনের দ্যোতনা। 'শেষসপ্তক' কাব্যে সাময়িকতার মধ্যে চিরন্তনের সেই দ্যুতি রসঘন হইয়া উঠিয়াছে। কবি বলিতেছেন :

আমার এই কালের কাছের জগতে
আমি ভ্রমণ করতে বেরিয়েছি দূরের পথিক।
তার আধুনিকের ছিদ্রতার ফাঁকে ফাঁকে
দেখা দিয়েছে চিরকালের রহস্য।
সহমরণের বধূ
বুঝি এমনি করেই দেখতে পায়
মৃত্যুর ছিন্ন পর্দার ভিতর দিয়ে
নূতন চোখে
চিরজীবনের অম্লান স্বরূপ।

শেষসপ্তকের পর আমরা একেবারে 'প্রান্তিক' কাব্যের কথা বলিব, যেখানে "অস্ত সিন্ধুকূলে এসে রবি, পূরব দিগন্ত পানে পাঠাইল অন্তিম পূরবী।" এখানে কবিকে তাঁহার অধ্যাত্ম-জীবনের নূতন রঙ্গমঞ্চে দেখিতে পাই। পরিণত পরিপক্ক ফলের মত কবির বৃদ্ধ চেতনা আপনাতে আপনি আনন্দিত। কবির সেই ধ্যানী ঋষিমূর্তিকে আমরা দেখি আমাদের চেয়ে অনেক দূরে এক ঊর্দ্ধলোকে। কবি আপনার আধ্যাত্মিক জীবনকে অনুসরণ করিয়া জীবনের এই যে প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন এখানে তিনি উপনিষদের ঋষির মত বিশ্বদেবতার কাছে আপনার জীবনের অঞ্জলি লইয়া আসিয়াছেন। আপনার জীবনের আধ্যাত্মিক সাধনার ফল কবির কাব্যের অর্ঘ্য। কবি বলিতেছেন :

সৃষ্টিকাজে আমার আহ্বান
বিরাট নেপথ্যলোকে তাঁর আসনের ছায়াতলে।
পুরাতন আপনার ধ্বংসোন্মুখ মলিন জীর্ণতা
ফেলিয়া পশ্চাতে, রিক্ত হস্তে মোরে বিরচিতে হবে
নূতন জীবনচ্ছবি শূন্য দিগন্তের ভূমিকায়।

এই নূতন জীবনচ্ছবি কিসের, তাহার নবীনতা কোন্‌খানে ? কবি বলেন :

বুঝি এই যাত্রা মোর স্বপ্নের অরণ্যবীথিপারে
পূর্ব-ইতিহাসধৌত অকলঙ্ক প্রথমের পানে—
যে প্রথম বারে বারে ফিরে আসে বিশ্বের সৃষ্টিতে
কখনো বা অগ্নিবর্ষী প্রচণ্ডের প্রলয় হুঙ্কারে
কখনো বা অকস্মাৎ স্বপ্নভাঙা পরম বিস্ময়ে
শুকতারা নিমন্ত্রিত আলোকের উৎসব-প্রাঙ্গণে।

—অর্থাৎ, যাহা সনাতন, যাহা শাশ্বত, যাহা শুধুমাত্র আধুনিক নয়, সর্বকালের আধুনিক, তাহারই জন্য পশ্চাতের সহচরকে ত্যাগ করিতে হইবে। বেদনার যত সম্পদ, কামনার যত রঙীন ব্যর্থতা—সে সকলকে মৃত্যুর অধিকারে রাখিয়া দূরে-চাওয়া আকাশে যে চির-পথিকের আহ্বান শোনা যাইতেছে, কবি তাহারই অনুগামী হইবেন। কবি এই অর্থে আধুনিক। আধুনিক—তাঁহার জীবনে চেতনার প্রবাহকে নিত্য তরঙ্গিত করিয়া রাখার মধ্যে, জীবনের সাধনাকে নিত্য নব রূপে অনুভব করার মধ্যে। কিন্তু সাধনা যেন মহতের সাধনা, শ্রেয়ের সাধনা হয়। কবি তাই বলিতেছেন:

নক্ষত্র বেদীর তলে আসি
একা স্তব্ধ দাঁড়াইয়া ঊর্ধ্বে চেয়ে কহি জোড় হাতে—
হে পূষণ, সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মিজাল,
এবার প্রকাশ করো তোমার কল্যাণতম রূপ,
দেখি তারে যে-পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক।

আমাদের সঙ্কীর্ণ আধুনিকতার দৃষ্টিতে প্রান্তিকের এই কবিকে আমাদের 'escapist' বা পলায়নী মনোবৃত্তিসম্পন্ন বলিয়া মনে হইতে পারে। 'সেঁজুতি' কাব্যে কবি আমাদের সেই সংশয় দূর করিতে চাহিলেন। বলিলেন:

আমার মনে একটুও নেই বৈকুণ্ঠের আশা—
ঐখানে মোর বাসা
যে মাটিতে শিউরে ওঠে ঘাস
যার পরে ঐ মন্ত্র পড়ে দক্ষিণে বাতাস।
চিরদিনের আলোক জ্বালা নীল আকাশের নীচে
যাত্রা আমার নৃত্যপাগল নটরাজের পিছে।

যাহাকে আমরা পলায়ন বলিতেছি, কবি বলিলেন—মহাকালের স্রোতের মধ্যে রাখিয়া দেখিলে তাহাকে আর পলায়ন বলিয়া বোধ হইবে না। দেখিব, সূর্য-তারা সেই পলায়নের তরণী বাহিতেছে, চিরধাবমান নিখিলবিশ্ব এই পলায়নেরই চিত্র।—

অচঞ্চলের অমৃত বরিষে
চঞ্চলতার নাচে
বিশ্বলীলা তো দেখি কেবলি সে
নেই নেই করে আছে।

কবি বলিলেন, তাঁহাকে যেন আমরা ভুল না বুঝি; এক দিন যখন আমাদের যৌবনের আবেগের সুরে তাঁহার সুর মিলিয়াছিল, তখন যেমন বিনা সংশয়ে তাঁহাকে আমাদেরই লোক বলিয়া চিনিয়াছিলাম, তেমনি আজও যখন তিনি 'ছুটির মহাদেশে'র দিকে যাত্রী, তখনও যেন তাঁহাকে আপনার লোক বলিয়া চিনিয়া লইতে পারি। বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া বিকশিত হইয়া আমাদের জীবন একটা পরিণতির মধ্যে সার্থকতা লাভ করে। কৈশোর, তারুণ্য, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্দ্ধক্যের মধ্য দিয়া তাহার পরিচয়। এক একটি বিশেষ অবস্থায় জীবনের একটি বিশেষ বাণী আছে, একটি বিশিষ্ট প্রকাশ আছে, কিন্তু সমগ্র জীবনের ভূমিকায় কোনটিই চরম ও একমাত্র নয় এবং কোনটির সহিত কোনটি বিচ্ছিন্ন নয়। এই যেমন মানবজীবনের দিক দিয়া, তেমনি সমাজগত ও জাতিগতভাবে যুগমানসের দিক দিয়া বিভিন্ন যুগে আমাদের জীবনের বিভিন্ন প্রকাশ দেখা যায়। বিভিন্ন যুগেরও এক একটি বিভিন্ন বাণী রহিয়াছে। কিন্তু কোন একটি বিশেষ যুগের বাণীকেই মুখ্য করিয়া তুলিয়া অন্য যুগের কবিকে ছাঁটিয়া ফেলা চলে না, পরন্তু তাহার সহিত যোগ-সূত্রটি খুঁজিতে হয়। রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের আজকের যুগ এখনও উদ্ধত তারুণ্যের যুগ। তাই রবীন্দ্র-সাহিত্যের সেই যৌবনের জয়গানের সুরটি হয়তো আমাদের সুরে মিলিতেছে, 'প্রান্তিকে'র 'অন্তিম পূরবী' হয়তো মিলিতেছে না। কিন্তু সাহিত্যের আনন্দের ভোজে আমরা আজিকার দাবির ক্ষুধা লইয়াই থাকিব না, চিরন্তনের তৃষ্ণাকেও জাগাইয়া রাখিব। তাহা হইলেই আমাদের আধুনিকতার মধ্যে শাশ্বতের বাণী আসন লাভ করিতে পারিবে এবং তখন সন্ধ্যার তারার দিকে যে কবি তরণী বাহিয়া চলিয়াছেন তাঁহাকে আমরা 'আমাদেরি লোক' বলিয়া চিনিতে পারিব।

সেঁজুতির পর 'নবজাতক' কাব্য। এখানে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংসোন্মত্ত জীবনের কল্লোল নূতন রঙ্গমঞ্চ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে। 'প্রান্তিকে' এই মহাযুদ্ধের আয়োজনের হুঙ্কার কবির ধ্যানকে স্পর্শ করিয়াছিল। কবি দেখিয়াছিলেন, 'নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস।' তাহারই উত্তপ্ত বাতাস কবিকে সন্ধ্যার তারার দিকে তরণী বাহিতে দিল না, কবিকে নূতন আগন্তুকের আবাহন-গান রচনা করিতে হইল। এই যে নূতন কাব্য জন্ম লইল, এ কাব্যে নবজাতক কে? কবি কি মহাযুদ্ধের প্লাবনের মধ্যে তাঁহার এতদিনের আশা-ভরসাকে, আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাকে, শান্তির প্রতি বিশ্বাসকে হারাইয়া ফেলিলেন? সত্যই কি কবি শান্তির বাণী ব্যর্থ পরিহাসে পরিণত হইবে বলিয়া মনে করিলেন? তাহা নহে। কবিরই সনাতন জীবন-বাণী অগ্নি-দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া নবীনতর হইয়া উঠিল। কবির সেই সনাতন বিশ্বাসই জীবনের নূতন পট-

ভূমিকায় নূতন রূপ লাভ করিল। কবি নবীন আগন্তুককে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন,—

নরদেবতার পূজায় এনেছ
কী নব সম্ভাষণ।
অমর লোকের কী গান এসেছ শুনে।
তরুণ বীরের তূণে
কোন্ মহাস্ত্র বেঁধেছ কটির প'রে
অমঙ্গলের সাথে সংগ্রামের তরে।
রক্ত প্লাবনে পঙ্কিল পথে বিদ্বেষে বিচ্ছেদে
হয়তো রচিবে মিলনতীর্থ শান্তির বাঁধ বেঁধে।

বলিলেন,—

সেই বিনাশের প্রচণ্ড মহাবেগে
একদিন শেষে বিপুল বীর্য শান্তি উঠিবে জেগে।
মিছে করিব না ভয়
ক্ষোভ জেগেছিল, তাহারে করিব জয়।
জমা হয়েছিল আরামের লোভে দুর্বলতার রাশি
লাগুক তাহাতে লাগুক আগুন—
ভস্মে ফেলুক গ্রাসি।

এই বিপুল বীর্য শান্তি—এই নূতন বিশ্বাস—ইহাই হইল কবির নবজাতক। চতুর্দিকের ধ্বংসের মধ্যে এই নবজাতকের জন্মলগ্নে যে শঙ্খধ্বনি তাহাতে অখণ্ডের, পূর্ণতার জয়ধ্বনিই ঘোষিত হইয়াছে। কবি বলিয়াছেন—

যাহা রুগ্ন, যাহা ভগ্ন, যাহা মগ্ন পঙ্কস্তর তলে
আত্মপ্রবঞ্চনা ছলে
তাহারে করি না অস্বীকার
* * *
অপূর্ণ শক্তির এই বিকৃতির সহস্র লক্ষণ
দেখিয়াছি চারিদিকে সারাক্ষণ
চিরন্তন মানবের মহিমারে তবু
উপহাস করি নাই কভু,
প্রত্যক্ষ দেখেছি যথা
দৃষ্টির সম্মুখে মোর হিমাদ্রিরাজের সমগ্রতা,
গুহাগহ্বরের যত ভাঙাচোরা রেখাগুলো তারে
পারে না বিদ্রূপ করিবারে—
যতকিছু খণ্ড নিয়ে অখণ্ডেরে দেখেছি তেমনি
জীবনের শেষ কাব্যে আজি তারে দিব জয়ধ্বনি।

'সানাই' কাব্যে কবি জীবনের ঐকতান সঙ্গীতের কথা বলিয়াছেন। জীবনের নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে, ছন্দভাঙা নানা অসঙ্গতির মধ্যে 'সানাই লাগায় তার সারঙের তান'। জীবনের একটি অখণ্ড সুর রহিয়াছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বিচ্ছিন্নতার মধ্যে সেই সুরটি একটি পরিপূর্ণ সঙ্গীতের ভূমিকা রচনা করিয়া দিতে চাহিতেছে। তাহার চরম পরিণতি কোন সাময়িক কালে কোন বিশেষ রূপের মধ্যে নহে, কিন্তু কালের অঞ্জলিপুটে তাহা রূপ হইতে রূপান্তরে পূর্ণতর হইয়া উঠিতেছে :

মনে ভাবি, এই সুর প্রত্যহের অবরোধ 'পরে
যতবার গভীর আঘাত করে
ততবার ধীরে ধীরে কিছু কিছু খুলে দিয়ে যায়
ভাবী যুগ আরম্ভের অজানা পর্যায়।
নিকটের দুঃখদ্বন্দ্ব, নিকটের অপূর্ণতা তাই
সব ভুলে যাই;
মন যেন ফিরে
সেই অলক্ষ্যের তীরে তীরে
যেথাকার রাত্রিদিন দিনহারা রাতে
পদ্মের কোরক-সম প্রচ্ছন্ন রয়েছে আপনাতে॥

ইহার পর আমরা 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য', 'জন্মদিনে' এই কাব্যত্রয়ের কথা বলিব। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় বহির্বিশ্বের মরণোৎসবের মধ্যেও কবি যেমন নূতন বিশ্বাসের জন্ম দিলেন, দিলেন অখণ্ডের জয়ধ্বনি, এখন যখন আপনার জীবনের উপর মৃত্যুর স্পর্শ আসিয়া পড়িল, তখনও কবি আবাহন করিলেন মৃত্যুর অতীত অমৃতময় জীবনকে। রোগের সৌভাগ্য লইয়া আরোগ্যলক্ষ্মীর আবির্ভাবকে তিনি দেখিলেন। এই আরোগ্য শুধু দেহের নহে, ইহা আত্মার আরোগ্য। মৃত্যুর ভূমিকায় জীবনের শাশ্বত রূপ কবির কাছে আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কবি দেখিলেন—"অনিঃশেষ প্রাণ, অনিঃশেষ মরণের স্রোতে ভাসমান চলমান রূপহীন যে বিরাট, সেই মহাক্ষণে আছে তবু ক্ষণে ক্ষণে নেই।" ব্যাধির যন্ত্রণায় কবির চেতনার বিকার ঘটিল না, দেহের বিকার আত্মাকে বিকৃত করিল না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জীবনের যে বিকার, কবির কাছে তাহা জীবনের দেহের বিকারের মতই, জীবনের শাশ্বত মহিমাকে তাহা কবিদৃষ্টির কাছে বিকৃত করিতে পারে নাই। কবির প্রার্থনার সুর সেই একই রহিয়া গেল। কবি বলিলেন—হে প্রভাতসূর্য, তোমার জ্যোতির কেন্দ্রে আপনার শুভ্রতম রূপকে উজ্জ্বল করিয়া দেখিব,—আমার প্রভাত-ধ্যানকে সেই শক্তি দিয়া আলোকিত কর, দুর্বল প্রাণের দৈন্যকে পরাভূত রজনীর অপমানের সঙ্গে হিরণ্ময় ঐশ্বর্যাঘাতে দূর করিয়া দাও। তখন—

এই ঘন আবরণ উঠে গেলে
অবিচ্ছেদে দেখা দিবে
দেশহীন কালহীন আদি জ্যোতি,
শাশ্বত প্রকাশ পারাবার
সূর্য যেথা করে সন্ধ্যাস্নান
যেথায় নক্ষত্র যত মহাকায় বুদ্বুদের মতো
উঠিতেছে ফুটিতেছে—
সেথায় নিশান্তে যাত্রী আমি
চৈতন্যসাগর তীর্থপথে॥

মৃত্যু সাধারণতঃ আমাদের মধ্যে জীবনের প্রতি একটা অবিশ্বাস আনিয়া দেয়, আমাদের এতদিনের ধ্যান-ধারণাকে

উলট-পালট করিয়া দেয়, আমাদের সত্য করে বিকৃত। রবীন্দ্রনাথ জীবন সম্বন্ধে যে আনন্দবোধ জাগাইয়া রাখিয়াছিলেন, যে সত্যের বাণী ঘোষণা করিয়াছিলেন, মৃত্যুর ভূমিকায় দেখিলাম—কবি সেখান হইতে সরিয়া গেলেন না, পরন্তু কবিচিত্ত যেন তাহাকেই নিবিড়তর করিয়া আশ্রয় করিল। যে দ্বিধা আনিতে পারিত, যে ফাঁকিকে কবি হয়তো ভুলিয়া থাকিতে পারিতেন, যে অনভিজ্ঞতা কবিকে ছলনা করিত, মৃত্যুর ধারায় স্নাত হইয়া কবি সেই সকল পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া গেলেন। এখন আর সংশয় করিবার কিছু রহিল না। বলিলেন,—

শেষ স্পর্শ নিয়ে যবে যাব ধরণীর
বলে যাব তোমার ধূলির
তিলক পরেছি ভালে
দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে।
সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মূরতি
এই জেনে এ ধুলায় রাখিনু প্রণতি।

বলিলেন,—

এ জীবনে সুন্দরের পেয়েছি মধুর আশীর্বাদ
মানুষের প্রীতিপাত্রে পাই তাঁরি সুধার আস্বাদ
দুঃসহ দুঃখের দিনে
অক্ষত অপরাজিত আত্মারে লয়েছি আমি চিনে
আসন্ন মৃত্যুর ছায়া যেদিন করেছি অনুভব
সেদিন ভয়ের হাতে হয় নি দুর্বল পরাভব।

ইহাই তো আত্মার আরোগ্য; ইহাই তো মৃত্যুর দান। এই আরোগ্য লইয়া কবি নূতন জন্মদিনে পদার্পণ করিলেন। এ জন্ম হইল পুরাতন-আমি হইতে নূতন-আমিতে জন্ম এবং সেই নূতন-আমি হইতে দূরের-আমিকে অনুভব করা। কবি বলেন, "নব জন্মদিন তারে বলি আঁধারের মন্ত্র পড়ি সন্ধ্যা যারে জাগায় আলোকে।" সেই আলোকে কবি তাঁহার দূরের আমির দূরত্বকে অনুভব করিলেন—

যে মহাদূরত্ব আছে নিখিল বিশ্বের মর্মস্থানে
তারি আজ দেখিনু প্রতিমা
গিরীন্দ্রের সিংহাসন 'পরে।
আজি এই জন্মদিনে
দূরত্বের অনুভব অন্তরে নিবিড় হয়ে এল।

* * *

আমার দূরত্ব আমি দেখিলাম তেমনি দুর্গমে
অলক্ষ্য পথের যাত্রী, অজানা তাহার পরিণাম।
আজি এই জন্মদিনে
দূরের পথিক সেই তাহারি শুনিনু পদক্ষেপ
নির্জন সমুদ্রতীর হতে।

এই দূরের আমি হইল কবির সম্পূর্ণ-আমি; তাঁহার আজিকার নূতন-আমি, সেই দূরের আমি—সেই সম্পূর্ণ-আমির দিকে চলিয়াছে। তাই—

আজ সব কথা
মনে হয় শুধু মুখরতা,
তারা এসে থামিয়াছে
পুরাতন সে মন্ত্রের কাছে
ধ্বনিতেছে যাহা সেই নৈঃশব্দ্যচূড়ায়
সকল সংশয় তর্ক যে মৌনের গভীরে ফুরায়।

* * *

আমার আমির ধারা মিলে যেথা যাবে ক্রমে ক্রমে
পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগরসঙ্গমে।

তাহারই দিকে চাহিয়া কবি প্রার্থনা করিতেছেন—হে সূর্য, অপাবৃত করো তোমার আলোক আবরণ; তোমার অন্তরতম পরম জ্যোতির মধ্যে দেখি আপনার আত্মার স্বরূপ।

এইভাবে দেখি, কি মহাযুদ্ধ, কি মৃত্যু, কেহই কবিকে তাঁহার শাশ্বত সত্য হইতে সরাইয়া আনিতে পারে নাই। কবির শেষ কাব্য 'শেষ লেখা'য় কবি ইহাকে জীবনের ছলনা বলিয়াছেন, ইহাকে মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বলিয়াছেন। বলিয়াছেন—

একমাত্র অস্ত্র তার দেখেছিনু—
কষ্টের বিকৃত ভান, ত্রাসের বিকট ভঙ্গী যত—
অন্ধকারে ছলনার ভূমিকা তাহার॥
যতবার ভয়ের মুখোশ তার করেছি বিশ্বাস
ততবার হয়েছে অনর্থ পরাজয়।

কিন্তু,

অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার॥

কবি-চিত্ত তাই সকল সময়েই সাময়িকতার ব্যাধি-মুক্ত হইতে চাহিয়াছে এবং বিশ্বজীবন-প্রবাহকে কবি নিত্য-কালের মধ্যে দেখিতে চাহিয়াছেন। এই নিত্যকালের জীবন-প্রবাহে কবি সেই সকল মানুষকেই চিরকালের বলিয়া জানিয়াছেন,—যাহারা কাজ করে। "যারা চিরকাল টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল। যারা মাঠে মাঠে বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।" এই জীবন-প্রবাহে রাজছত্র, সাম্রাজ্যজাল, রণডঙ্কা—এ সকল হইল সাময়িকতার স্ফীতি। কিন্তু—

রাজছত্র ভেঙে পড়ে, রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে
জয়স্তম্ভ মূঢ়সম অর্থ তার ভোলে
রক্তমাখা অস্ত্র হাতে যত রক্ত আঁখি
শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি।
শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ 'পরে
ওরা কাজ করে।

এখন, রবীন্দ্র-সাহিত্য যে শ্রেয়ের সাধনাকে প্রকাশ করিয়াছে তাহাতে সেই স্বরসাধনায় ইহাদের জীবনের বহু সুর প্রবেশ করিতে পারে নাই। ইহাদের জীবনের সহিত কবির জীবন যুক্ত হইতে পারে নাই। তাই কবি আপনার

সুরের অপূর্ণতাকে স্বীকার করিয়াছেন, স্বীকার করিয়াছেন যে তাঁহার কবিতা সর্বত্রগামী হইতে পারিল না। কবির এই স্বীকৃতিকে আমরা যেন ভুল না বুঝি। এ কথা আমরা যেন মনে না করি যে, যে পথে রবীন্দ্র-সাহিত্য যাইতে পারে নাই, বাংলা সাহিত্যের পরবর্তীকালের গতি কেবল মাত্র তাহারই দিকে, অথবা তথাকথিত 'গণসাহিত্যই' বাংলা সাহিত্যের পরিণতি। বাংলা সাহিত্যের যে অবহেলিত দিকটির কথা কবি বলিয়াছেন, আগামীকালের যে অখ্যাত-জনের নির্বাক মনের কবিকে কবি আহ্বান জানাইয়াছেন, 'সাহিত্যের ঐকতান সংগীত সভার' মধ্যে রাখিয়া বিষয়টিকে বুঝিতে হইবে। সেই কবির গান যেন নিখিলের ঐকতান সঙ্গীতের বিচিত্র সুরের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া আপনাকে মিশাইতে পারে; তাহা যেন সঙ্গীত-সভার অন্য সকল সুরকে আচ্ছন্ন করিয়া আপনাকেই একমাত্র করিয়া না তোলে, তাহা করিলে তাহা সঙ্গীত না হইয়া কলরব হইয়া উঠিবে, সুর না হইয়া আওয়াজ হইয়া উঠিবে। সেই কবির একতারার তারটি পিতলের হইতে পারে, তামার হইতে পারে, কিন্তু তাহার সুরটি যেন 'সানাইয়ের' মূল সুরের সহিত বাঁধিয়া লওয়া হয় নতুবা সুরসঙ্গতির অভাবে রসিকচিত্তের কাছে তাহার কোন আবেদন থাকিবে না। এই সুর-সঙ্গতিকে যাঁহারা মানিয়া লইতে চাহেন না, তাঁহারা জীবনের ও সাহিত্যের সত্য মূল্য দিতে পারেন না। তাঁহাদের বক্তব্য 'প্রচার' হইয়া উঠে, 'সঙ্গীত' হইয়া উঠে না, তাই রবীন্দ্রনাথ যখন বলিয়াছেন—'যে আছে মাটির কাছাকাছি, সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি'; সেই সঙ্গে কবি এ কথাও বলিয়াছেন—'সেটা সত্য হোক; শুধু ভঙ্গী দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ'। কবি মনে করেন, যাহারা মাটির কাছাকাছি আছে, যে কবি তাহাদের কথা বলিবেন, তাঁহাকে তাহাদের সহিত কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা স্থাপন করিতে হইবে, তাহা হইলে তাহাদের জীবনের মধ্যেও তিনি সাহিত্যের ঐকতান সঙ্গীত-সভার উপযুক্ত সুর খুঁজিয়া পাইবেন। নতুবা বাহির হইতে দেখিলে শুধু শৌখীন বাস্তবতা, শৌখীন মজদুরি দেখানো হইবে, তাহাতে বিশ্বসঙ্গীতের উপাদান থাকিবে না। এই প্রসঙ্গে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সমসাময়িক এক নবীন সাহিত্যিকের রচনাকে উদ্দেশ্য করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহাতেই 'মাটির কাছাকাছি' কবিকে তিনি কিভাবে স্বীকার করেন তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। কবি নবীন সাহিত্যিককে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন—

> "যে মানুষ মাটির কাছাকাছি আছে, তাকেই তুমি নানাদিক থেকে দেখাতে গিয়েছ।...একদিন পরিণতি সহকারে যখন তোমার প্রতিভা সরলতার ভঙ্গী ছেড়ে দিয়ে যথার্থ সরল হয়ে উঠবে, যখন সে বলিষ্ঠ তুলি দিয়ে মানুষকে বড়ো করে আঁকবে, সাহিত্যে চিরজীবী মনুষ্যত্বকে চিরন্তন আকার দেবে, সেইদিন তুমি ধন্য হবে—বাংলা সাহিত্যে ভারতীর তুমি নূতন আসন রচনা করবে।"

'চিরজীবী মনুষ্যত্বকে চিরন্তন আকার' দান করা—ইহাই রবীন্দ্র-জীবনের তথা রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূল কথা। রবীন্দ্র-কাব্যের শেষ পর্যায়েও এই কথাই প্রকাশ পাইয়াছে। চিরজীবী মনুষ্যত্বের মহিমা রবীন্দ্র-সাহিত্যে শেষ পর্যন্ত কোথাও ম্লান হইয়া যায় নাই।

তুমি কবি শ্যামলীর

আ. ন. ম. বজলুর রশীদ

শ্রাবণের অবিশ্রান্ত বর্ষণের রসধারা মেঘের বিস্তার
মৃত পৃথিবীর বুকে সজীব সবুজ শান্ত প্রাণের সঞ্চার—
তৃণে তৃণে মালতীর মাধবীর পরিচিত তৃষিত লতায়
ফুলের সুবাসে বর্ণে মৃত্তিকার জাগরণ রসের ধারায়—
কোথা ছিল এত রূপ সবুজের সমারোহ গন্ধ ছিল না ত',
কোথাও ছিল না মৃত্যু সুপ্ত প্রাণ-চেতনায় সুপ্ত রসস্নাত
অমৃতের বুকে ছিল—আচ্ছন্ন গভীর ঘন অন্ধ-আবরণ
অন্ধকার-বিস্মরণ অকস্মাৎ সুন্দরের করুণা-বর্ষণ,
বিপুল প্রাণের সৃষ্টি—শোনো তাই পৃথিবীর অধিবাসী শোনো—
তাঁকে জেনে এই মৃত্যু পার হতে হবে, শুধু অন্য পথ কোনো—
অন্য পথ নাহি আর। এই শান্তি তৃপ্তি আর দূর মেঘদল
এই তৃণ তরুলতা—এই মাটি প্রাণরসে বিপুল চঞ্চল—
বিরাট প্রাণের লীলা তৃণ থেকে নক্ষত্রের জ্যোতির কণায়
আকাশের নীলপথে শুভ্রপক্ষ মরালের বক্ষ-কম্পনায়
মমতার উষ্ণতায়। জন্মমৃত্যু আলোছায়া একসূত্রে নিত্য একাকার।
বিচ্ছিন্ন আমার দৃষ্টি—তাই এই ব্যবধান অমর আত্মার
অসংখ্য লাঞ্ছনা দুঃখ—তুমি কবি শ্যামলীর শালবীথিকার
সুন্দরের প্রাণলীলা দেখেছ উন্মুক্ত করি মৃত্যুর দুয়ার
জীবনের সম্ভাবনা—মুক্তি-তৃপ্তি অফুরান অনন্ত জীবন
অখণ্ড প্রাণের লীলা লোকে লোকে শুধু প্রাণ-রসের বর্ষণ।

এসেছিলে তুমি তাই

(বাইশে শ্রাবণ)

শ্রীকরুণাময় বসু

এসেছিলে তুমি তাই গগনকোণায়
ঘনায় নবীন মেঘ চিকণ সোনায় ;
মল্লিকার ছায়াবনতল
ফুলের নিশ্বাস লেগে হয়েছে উতল ;
বৃত্তাকারে শূন্যে ওড়ে নীলকণ্ঠ পায়রার ঝাঁক,
উন্মন পদ্মের বন, দূর হতে মায়াময় অরণ্যের ডাক।

এসেছিলে তুমি তাই মনের সূতায়
ছোট ছোট প্রেম লয়ে স্বপ্ন গাঁথি মায়ামুক্তায়
অশ্রুজলে সিক্ত করি · ছোট ছোট কুঁড়ের দাওয়ায়
মানুষের সুখদুঃখ, হাসিখেলা সারাবেলা পদ্মগন্ধী বনের হাওয়ায় ;
ঝরে পড়ে চাঁপা, যুঁই, বকুল, কেতকী, বেলা, মল্লিকা, টগর ;
সবুজ আরণ্য রঙ ভারতের আত্মার প্রতীক,
চাইনে আকাশচুম্বী উদ্ধত প্রাসাদশীর্ষ, চাইনে নগর।

এসেছিলে তুমি তাই এজীবনে কতো লোকসান,
মণিমুক্তা, ঝিলিমিলি প্রবাল ঝিনুক অশ্রুজলে দিয়েছি ভাসান ;
এ জীবনে কতো লোকসান।
এসেছিলে তুমি তাই এ জীবনে কত হ'ল লাভ,
অসীম অপরিমেয় তার কোন নেই পরিমাপ ;
স্বর্ণরশ্মি কেঁপে ওঠে পদ্মবনে শুক্তিশুভ্র মর্মর-সকাল ;
আবার চাঁপার রঙে জোৎস্না নামে, সাগরের জলে যেন চিত্রলেখা পরী সব
পেতে রাখে জাল।
কখনো ঘনায় মেঘ আষাঢ়ের পড়ন্ত বেলায়,
অরণ্যে মেদুর ছায়া, অলস খেলায়
বয়ে যায় উদাসীন দিন ;
বনে চরে সবুজ ময়ূর, বনে ফেরে উদাসী হরিণ।

তোমারে পেয়েছি কাছে তাই মোর মনের খাতায়
অনেক সবুজ দাগ মায়াময় অনুরাগে আঁকা আছে পাতায় পাতায়।
অনেক ফুলের স্বপ্ন, অনেক পথের কথা, পাহাড়ের গান,—
এই সব স্মৃতি নিয়ে ভরে আছে মনের বাগান।

এসেছিলে তুমি তাই ভেঙে পড়ে অন্ধকার পাষাণ-প্রাচীর,—
নিশীথের বন্দী আত্মা মুক্তি পেল ভোরের আলোয়, দেখা যায় সমুদ্রের তীর।
তাই তো অশান্ত মন পাড়ি দেয় সমুদ্রের দেশে,
যেখানে সূর্যের জন্ম, জন্মান্তর শুক্তির আত্মার, চাঁদ ওঠে ভেসে।
এখনো মানুষ কাঁদে, এখনো মশাল জ্বলে দূরে,
পথ হাঁটি ভোরবেলা, সন্ধ্যারাতে, পথ হাঁটি দুপুর রোদ্দুরে।
মানুষের কাছে যাই, ডাক দিয়ে যাই ঘুরে ঘুরে,
অশ্রুর অশ্রুত শব্দ ভাষা কি পাবে না আর হাসির নূপুরে ?

দূর হতে ডাক শুনি, জ্যোতির্ময় দেবতার ডাক,—
যেতে হবে দূর আরো দূর ;
পার হয়ে লবঙ্গ ও দারুচিনি দ্বীপ, চরে যেথা মনের ময়ূর।
যেখানে সবুজ ক্ষেতে সোনার ফসল,
টলটলে দীঘিজলে ছায়া ফেলে কাঁপিছে উৎপল ;
রূপালি নদীর জলে ঝিলিমিলি রামধনু রঙ,
ভিজে রাতে কার হাতে বেজে ওঠে করুণ সারঙ ?
পৃথিবীর এই ছবি, এই স্বপ্ন তুমি দেছ এনে,
এখনো দুর্যোগ রাত্রি, পার হবো ক্লান্ত হাতে
জীবনের দাঁড় টেনে টেনে।

বাইশে শ্রাবণ

শ্রীকানাই সামন্ত

বর্ণে গন্ধে রূপে রসে ঝঙ্কৃত আকৃতি
সর্বত্র ছড়ায়ে দিলে—তোমার কণ্ঠের গীতদ্যুতি
এ বিশ্বের দশ দিকে সুনীলে সবুজে,
আলোকে ছায়ায়, তৃণে,
কুন্দে কাশে, উৎফুল্ল অম্বুজে,

আজি হতে শতেক সহস্র বর্ষ পরে
তরুণী-অন্তরে
মিলন-বিরহ-বেদনায় ছলোছলো অশ্রুর আভাসে,
উর্দ্ধোৎসুক তাপসের তমোপরাভব অভিলাষে,
শিশুর অহেতু সুখে, মনোবনবাসে

অশ্রান্ত অস্ফুট শত মর্মরে কম্পনে
কুজনে গুঞ্জনে গানে
আলো-ঝলকনে।

তোমারে হারাতে পারি অন্তরে বাহিরে হেন ঠাঁই
নাই নাই কোথাও যে নাই।
তোমার কণ্ঠের গীতদ্যুতি
সর্ব্বত্র ছড়ায়ে দিলে—
রূপে রসে বিচিত্র আকুতি।

তবুও সান্ত্বনা নাহি পাই।
আনন্দঘন সে তনু
দর্শনের স্পর্শনের সব সীমানাই
পার হয়ে গেছে হায় আজি।
হে কবি, তোমারি কণ্ঠে উঠিবে না বাজি
তব গান অনাগত চিররাত্রি দিন—
তোমারি অঙ্গুলিঘাতে মায়াবী সে বীণ
তার বেঁধেছিলে যার—
দীপ্ত রবিরশ্মি আর তারার কিরণে
অপরূপ রজতে হিরণে।

পঁচিশে বৈশাখ

শ্রীসুবোধ রায়

পঁচিশে বৈশাখ
দ্বারে দ্বারে দিল ডাক্।
সাজাইয়া অর্ঘ্যডালা,
গাঁথিয়া কুসুমমালা,
তার লাগি রচিয়াছি কোন্ অভ্যর্থনা ?
উৎসবের গৃহতলে বিচিত্র আল্পনা,
পুষ্পসজ্জা, দীপালোক, মুখর ভাষণ,
তাই দিয়ে শেষ হবে এ দিনের কবি সম্ভাষণ ?
জীবনের সযত্নসঞ্চয়,
দিনেকের আড়ম্বরে আপনারে করিবে কি ক্ষয় ?

তার পরে ?—বিস্মরণ মাঝে
পুনঃ যদি ডুবে যাই আপনার চিরাভ্যস্ত কাজে,
মানুষের দুঃখে আর বেদনায় রহি উদাসীন,
আত্মতৃপ্ত স্বার্থমাঝে কাটে যদি দিন,
তবে আমাদের মাঝে ব্যর্থ হবে কবি-উপাসনা,
ব্যর্থ হবে এ জীবনে সেই মহাকবির সাধনা।

সবিতা যে জ্যোতির্ম্ময় ;—প্রতিদিন
দিকে দিকে, কালে কালে, তাঁহার আহ্বান অন্তহীন।
সে আহ্বানে অন্তর ভরিয়া
উচ্চারিব পূজামন্ত্র তাঁহারে স্মরিয়া,—
যিনি দিয়াছেন বাণী, প্রতি কণ্ঠে নব নব সুর,
যাঁর দানে এ ধরণী হইয়াছে সুন্দর মধুর,

মিথ্যা ও অন্যায়-নাশা যাঁর বহ্নি-গান
রুদ্রের নর্ত্তনছন্দে নিত্য স্পন্দমান
যাঁর সত্য শান্ত ধ্রুবপদ
বাণীর মানস-সরে স্নিগ্ধ কোকনদ।

যেথা মিথ্যা, অত্যাচার, ধনিকের বণিকের লোভ,
অসহায় বঞ্চিতের রুদ্ধ চিত্তক্ষোভ
যেথায় ঘনালো,—
গ্লানির কলঙ্ককালি যেথা রোধে জীবনের আলো,—
সেথা হোক্ আমাদের দৃপ্ত অভিযান ;
মানব-কল্যাণকর্ম্মে করি আত্মদান,
দূরে ফেলি বাদ-বিসম্বাদ,
ত্যাগের আনন্দমাঝে লভি যেন অমৃতের স্বাদ।
প্রত্যহের ধূলি হতে ঊর্দ্ধে তুলি শির,
ভয়শূন্য চিত্ত যেন সত্য-মন্ত্র-মাঝে রহে স্থির।

মোদের জীবন
নিত্য যবে বিছাইবে মৃত্যুজয়ী প্রেমের আসন,
অভ্রভেদী মানবের আশা
আমাদের বাক্যে, কর্ম্মে পাবে যবে ভাষা,—
তখন সম্পূর্ণ হবে কবি-উপাসনা,
আমাদের মাঝে তাঁর নবজন্ম—সুচিরবন্দনা।

খানসামা

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

সাতটা বেজে গেছে, রৌদ্রের সোনালী আলোয় ঘর ঝলমল্ করছে, কিন্তু তুলসীর খোঁজ নেই— চায়ের জল আজ আর হবে না মনে হচ্ছে। ঘাসীর ম 'তুলসীম্মা', 'তুলসীম্মা' করে ডেকে হয়রান। চায়ের আশা ছেড়ে মনে মনে তৈরি করছি—তুলসীর উপর কোন্ ভাষায় রাগটা প্রকাশ করব, এমনি সময় তুলসী ধীরে ধীরে এসে উনুন ধরাবার চেষ্টা করতে লাগল। তাকে ধমকে দিতে গিয়ে মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেলাম। যে তুলসীর দাপটে পাড়া তোলপাড়, যার বাক্যবাণে প্রতিবেশীরা সন্ত্রস্ত, সেই তুলসীর আজ হ'ল কি? আষাঢ়ের মেঘের মত কালো মুখখানা থমথম করছে, এখনই বুঝি জল ঝরবে। "তোর হ'ল কি তুলসী?" একথা জিজ্ঞেস করতেই সে ডুকরে কেঁদে উঠল। বললে, "খানসামা আজ আমাকে মেরেছে।" আমি ত হতভম্ব! বললাম, "এ বুড়ো বয়সেও তোদের মারপিট চলে? চৌদ্দ-ছেলের মা হলি, তুই খানসামার মার খেতে গেলি কেন?"

সে কপাল থাপড়ে বললে, "আমার নসিব।" আঁচলের খুঁটে চোখের জল মুছতে মুছতে বলতে লাগল,"বাঈ, শোন, আমার দুঃখের কাহিনী। যদি বলি তোমারও দুঃখ হবে। বাপ আমাকে বিয়ে দিলে এগার বছর বয়সে। বিয়ে হবার আগ পর্যন্ত আমাকে বাপ ছেলের পোশাক পরিয়ে রেখেছিল। হাফশার্ট আর হাফপ্যান্ট পরে বাপের সব ফরমাশ তালিম করেছি। আমার বাবা জব্বলপুরে কাজ করত, সে ছিল একজন নামকরা "বেকার"। সাহেব-মেমদের ফরমাশমত কত যে খাবার তৈরি করত বলতে পারি না। কত রকমের স্যাণ্ডউইচ, প্যানকেক, আর সাহেবী মিষ্টি, তার শেষ নেই। আমরা মাদ্রাজী, দু'ভাই, তিন-বোন। বোনদের মধ্যে আমিই ছোট। আমি মুখ বুঁজে বাপের ফরমায়েশী সব কাজ করতাম বলে, বাপ আমাকে বড় ভালবাসত। সুপের হাড় ভেঙ্গে ভেঙ্গে তার মজ্জাগুলো আমাকে খাওয়াত, বলত, "খা বেটি, তোর গায়ে জোর হবে, ভাল কাজ করতে পারবি।" আজ যে, বাঈসাহেব, তোমার কাজ এমনভাবে করতে পারছি, সে শুধু ছেলেবেলায় বাপ আমাকে এমনি নানা রকমের পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়াত বলে।

"বিয়ে প্রায় ঠিক, বড় ভাই এসে বেঁকে বসল। বড় ভাই একজন বড় অফিসারের ড্রাইভার ছিল, বেশ মোটা মাইনে পেত সে। পাত্র দেখে বলল, আমার এতটুকুন বোনকে এর হাতে দেব না। কিন্তু ভাইয়ের আপত্তি টিকল না। বয়স বেশী হলেও আমার বাপ-মার খানসামাকে পছন্দ হ'ল। মা-বাপ আছে, বাড়ীর অবস্থা ভাল, তা ছাড়া পাত্র বুরহানপুরের ডাকবাংলোর খানসামা। বাপ বললে, 'মেয়ে আমার সুখে থাকবে ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না'—বিয়ে ঠিক হয়ে গেল।

"মগনী (মঙ্গলাচরণ আশীর্ব্বাদ) হয়ে গেল, বরপক্ষের তরফ থেকে আমার জন্য মাদ্রাজী শাড়ী এল, কানের দুল এল, ফুলতোলা পেটিকোট, ঝকমকে সিল্কের ব্লাউজ, এসব অনেককিছু দিলে, দেখে আমার কি ফুর্ত্তি। ভাই শুধু মুখ ভার করে রইল। মোটে ত এগার বছর বয়স, দুনিয়া চিনি না, নূতন শাড়ী-কাপড় দেখে আনন্দে বিভোর হলাম, এ আনন্দের নীচে যে দুঃখের বোঝা আমার কপালে ছিল তা কি জানতাম!

"বেশ ধুমধাম করেই বিয়ে হ'ল। বাপের আমার বেশ রোজগার ছিল, তাই জিনিষপত্রও অনেক দিলে। কানে সোনার কমুল (দুল), হাতে রূপার মোটা মোটা কড়া পট্টিল (বালা), গলায় আড্ডিকে (হার), পায়ে নেঁকী (মল)। তখন সোনার ভরি ছিল বিশ টাকা, কাজেই আমাদের গায়েও দু'চারখানা সোনার গয়না উঠত।

"বিয়ের সাত-পাকের পর বর গলায় মঙ্গলসূত্র পরিয়ে দিলে। বাজনা বেজে উঠল। পরের দিন সমস্ত জ্ঞাতি-ভাইদের নিয়ে ভোজ হ'ল। তারপর আমি শ্বশুরবাড়ী যাত্রা করলাম, শ্বশুর-শাশুড়ী সবাই আমাকে নিয়ে জব্বলপুর তাদের বাড়ীতে চলল। সেখানেও বাড়ী-ভরা লোক, বিয়ের বহু করণ-কারণ শেষ হ'ল। আট-দশ দিন হৈ-চৈয়ের ভিতর কেটে গেল, নূতনত্বও ফুরিয়ে গেল—বাপ-মায়ের জন্য মন কেমন করতে লাগল। খানসামা তার কর্ম্মস্থলে ফিরে গেল, আমি জব্বলপুরেই রইলাম। ঘরে শ্বশুর শাশুড়ী আর বড় দু' ননদ। একদিন ভোরে উঠে মনটা কেমন উদাস হয়ে গেল, কোন কাজ করতে মন বসে না। চুপ করে বসে আছি, এমন সময় শাশুড়ী উঠে এল। শাশুড়ী এসে খনখনে গলায় বললে, "কি গো নবাবের বেটি, রোদে ঘর ভরে গেছে, কোন কাজ-কর্ম্ম করবার নাম নেই কেন?" তার পর উস্কোখুস্কো চুল আর এলোমেলো কাপড় দেখে বলে উঠল, "লজ্জা করে না এত বড় মেয়ে, ঘুম থেকে উঠে বসে আছে, স্নান নেই, কপালে সিন্দুর নেই, কি অলক্ষুণে মেয়ে, কাল থেকে ভোরে উঠে স্নান করে কপালে সিন্দুর দিয়ে তবে উঠোনে গোবর-জলের ছড়া দিবি, আমি ঘুম থেকে উঠেই তোর ঐ অলক্ষুণে মুখ দেখতে চাই নে, আমার বেটা কি মরে গেছে?" আমি ত একেবারে থ' হয়ে গেলাম, চোখ দিয়ে দর-দর করে জল ঝরতে লাগল। আমি অতটুকুন বয়সেই বড় জেদী আর অভিমানী ছিলাম। তাই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, কাল থেকে এরা উঠবার আগেই আমি বাসি কাজ শেষ করে রাখব, আর যেন এমন কথা শুনতে না হয়, আমি কেমন বাপের বেটি এদের দেখিয়ে দেব।

"আর একদিনের কথা, আজকালের মত তখন ত জিনিষপত্র এত আক্রা ছিল না, তাই আমাদের মত লোকের ঘরেও বেশ পেতল তামা-কাঁসার বাসন ছিল। শাশুড়ী ননদ দিব্যি চা খেয়ে পান

চিবুতে বসত, আর আমাকে একরাশ বাসন বের করে দিত ঘষতে; আমি এত ছোট হাতে এত বড় বড় বাসন ঘষতে পারলে ত? শাশুড়ী এসে বলত, "কি কাজের ছিরি। এত বড় মেয়ে বাসনটা পর্য্যন্ত ঘষতে পারে না, কি বউই না ঘরে এনেছিলাম। উঠ, বসে বসে আর বাসন ঘষতে হবে না, এমনি উবু হয়ে বসে গায়ের জোরে ঘষ, তবে ত জলের হাণ্ডাগুলো সাফ হবে। বাপ-মা কি খেতেও দেয় নি, গায়ে জোর নেই?" উঠতে বসতে বাপ-মায়ের খোঁটা শুনতে শুনতে আমার স্বভাব রুক্ষ হয়ে উঠল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম—'যদি বাপের বেটি হই, তবে তোমাদের কাছে দয়া ভিক্ষে করব না—এমন চমৎকার কাজ করব যে তোমাদের চোখ ছানাবড়া হবে। পরদিন থেকে ভোরে উঠে স্নান করে চুল আঁচড়ে কপালে সিন্দুর দিয়ে, সমস্ত উঠোন নিকিয়ে রাখলাম। তার পর যত ঘড়া-কলসী সব মেজে জল ভরে রাখলাম। যখন রোদ্দুরে চারদিক ভরে গেছে, তখন শাশুড়ী ননদ ঘুম থেকে উঠল।' শাশুড়ী আমার কাজ দেখে বললে, "হাঁ, এই ত সুমতি হয়েছে। দিব্যি কাজ করতে পারে।" ননদ মুখটা একটু ঘুরিয়ে নিলে। এক দিন দু'দিন, চার দিন সমান তালে কাজ করে গেলাম, পাঁচ দিনের দিন কেঁপে জ্বর উঠল। জীবনে এত কাজ করি নি। এত অল্প বয়সে এত খাটুনি সইল না। মাথা যেন যন্ত্রণায় ছিঁড়ে পড়তে লাগল। উঠতে পারছি না, শুয়েই রইলাম। অন্য দিনের মত বেলা হ'ল, শাশুড়ী ননদ যথারীতি ঘুম থেকে উঠে দেখে কিনা সব বাসি পাট পড়ে আছে। চায়ের জল উনুনে চড়ে নি। দেখে ত মেজাজ তিরিক্ষে, ননদ গট গট করতে করতে এসে এক টান মেরে আমাকে বললে, 'ওগো নবাবপত্নী উঠুন, আজ আর ঘরের কাজ হবে না নাকি।' আমি বললুম, 'আমার শরীরটা ভাল নেই।' ননদ খুব রাগ করে জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, 'উঠ, উঠ, চায়ের জল বসিয়ে দে। চা না খেয়ে মাথা গরম হয়ে গেছে।" কি করব উঠে গিয়ে স্নান করলাম, বাসি কাজ করলাম, শাশুড়ী ননদকে চা তৈরি করে খাওয়ালাম, তার পর আর বলতে পারি নে। যখন আমার ঠিকমত জ্ঞান হ'ল দেখলাম বাপের বাড়ীতে আছি। মা বললে আমি নাকি জ্বরে বেহুঁস হয়েছিলাম, তার পেয়ে বাবা আমাকে নিয়ে এসেছে। বাঁচবার আশা ছিল না। চৌদ্দ দিন পর আমার জ্বর ছাড়ল। শরীর এত দুর্ব্বল যে উঠতে পারি না। যা হোক, বাপ-মায়ের যত্নে পুরো দু'মাসে আমি সুস্থ হয়ে উঠলাম। খবর পেয়ে শাশুড়ী নিয়ে যেতে চাইল। বিনি পয়সার বাঁদী কিনা। কিন্তু বাপ দিলে না, বললে এত ছোট মেয়ে দেব না। ছ' মাস পর খানসামা আমাকে নিতে এল। খানসামা কথাবার্ত্তায় অতি ভদ্র ছিল, তার ব্যবহারে খুশী হয়ে বাপ আমাকে তার সঙ্গে পাঠিয়ে দিলে। আমি বুরহানপুরে পরিবার এলাম।

"ডাকবাংলার পেছনে ছোট্ট দুখানা ঘর, একটু বারান্দা—এক-ফালি জমি। ঘরগুলোর মাকড়সার জাল, কালির ঝুল, বিছানা বাসন-কোসন নোংরা, আমি কোমর বেঁধে কাজে লেগে গেলাম। দেয়ালের চালের ঝুল কালি ঝেড়ে, লাল মাটি দিয়ে সব নিকিয়ে ফেললাম। উঠোন ঝেঁটিয়ে গোবরমাটি দিয়ে নিকিয়ে ঝকঝকে তকতকে করে তুললাম। খানসামার আনন্দের অন্ত নেই। বলে, 'আমার কি লক্ষ্মীছাড়া ঘর হয়েছিল। এখন ঘরে লক্ষ্মী এসেছে, ঘরের শ্রী ফিরেছে।' কখনও কখনও খানসামা আদর করে বলত, 'এত খাটিস নে, অসুখে পড়বি।' খানসামা বাড়ী না থাকলে এধার-ওধার ঘুরে আমি দু-চারটা ফুলের গাছ, লঙ্কার গাছ উঠোনের কোণাতে লাগাতাম। আনন্দে আমার দিন কেটে যেতে লাগল।

"দু'মাস পরের কথা। একদিন দেখি খানসামার সঙ্গে এক জন মেয়েলোক আসছে। দেখতে বেশ সুন্দরী, মোটাসোটা, রং ফর্সা, সুন্দর রঙীন শাড়ী-পরা, গায়ে দু'চারখানা গয়নাও আছে। খানসামা খুব হাসিখুশী। আমাকে ডেকে বললে, 'ও তুলসী, তাড়াতাড়ি বেশ ভাল করে কয়েকটা পরোটা ভেজে আর চা করে দে ত।' আমি ভাবলাম—খানসামার কোন কুটুম হবে বোধ হয়। তাড়াতাড়ি পরোটা ভেজে চা করে দিলাম। তারা দু'জনে দিব্যি গল্প করতে করতে খাওয়া-দাওয়া করল, তার পর মেয়েলোকটি চলে গেল। খানসামাকে পরিচয় জিজ্ঞেস করাতে বললে, তার কোন নিকট কুটুম। প্রায়ই মেয়েলোকটি বাড়ীতে আসতে লাগল। সে আসতেই খানসামার হাসি-ঠাট্টা পুরোদমে চলে। আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারি না, কিন্তু তখনও আমার মনে সন্দেহের বিষ ঢোকে নি। এক দিন বাড়ীতে মেয়েলোকটি এসে বেশ কয়েক দিন থেকে গেল। বাড়ীতে কি খাওয়ার ধুম, খানসামা মাংস কিনে নিয়ে আসে, আমি বসে রান্না করি, মেয়েলোকটি খায়, তখন কি বুঝতাম যে এটিই আমার জীবনের শনিগ্রহ!"

তুলসীর মুখে যেন খই ফুটছে, সে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। আমি তাকে সহানুভূতি দেখিয়ে বললাম, 'আচ্ছা এবার তুই আমাকে এক পেয়ালা চা করে দে দিকি, আর এক দিন তোর কাহিনী শুনব।' সে চোখ মুছতে মুছতে কাজ করতে লাগল। বাস্তবিকই তুলসীকে তারিফ করবার মত বহু গুণ ছিল। এত বুদ্ধি রাখে, আর কাজ এত সুন্দর পরিপাটী যে মন খুশী হয়ে উঠে। মেজাজটা তিরিক্ষি হলেও তার কাজ করবার ক্ষমতা ছিল যথেষ্ট, দশ-বিশ জনের রকমারি রান্না ইঙ্গিতে তৈরি করে ফেলে। তার দুরবস্থা দেখে সত্যি দুঃখ হয়। এতগুলো ছেলেমেয়ে, এদের খাওয়া-দাওয়া, কাপড়-চোপড়ের খরচ কিছুই কুলিয়ে উঠতে পারে না। আমি মাইনে দিচ্ছি মন্দ নয়, তা ছাড়া খানসামাও বেশ রোজগার করে, তবু তাদের অভাব দূর হয় না। আর তাই মাঝে মাঝে শুরু হয় এই খিটিমিটি। অভাবের তাড়নায় প্রায়ই তাদের সংসারে ভীষণ অশান্তি আর ঝগড়া আরম্ভ হয়ে যায়।

দু'চার দিন তুলসী চুপচাপ মনমরা হয়ে রইল। আমিও আর তার দিকে বেশী মন দিতে পারি না। সে তার কাজ করে যেতে লাগল চোখের জল মুছতে মুছতে। কিন্তু রান্নায় মন নেই, ডালে

নুন আছে ত তরকারীতে লঙ্কা নেই, সবাই বিরক্ত হয়ে গেল। এ রকম করে বার মাস কি করে চলবে ভেবে পাই না।

এক দিন তুলসীকে বললাম, তোর যদি রান্নায় মন না থাকে তবে আমি তোকে কি করে রাখি বল?

তুলসী কেঁদে ফেললে, বললে,"বাঈ, আমাকে ভগবান কেন নেন না, আমি ত আর এ জ্বালা সইতে পারি না। চৌদ্দটি সন্তান পেটে ধরেছি, নিজে খেয়ে না খেয়ে তাদের মানুষ করেছি। ছয়টি ভগবান কেড়ে নিয়েছেন। আমার বড় দুটি ছেলে যদি আজ বেঁচে থাকত, তবে কি আমি এই অভাবের তাড়না সইতাম? আমার জীবনে কি সুখ আছে? এই যে আমার ছেলেটা দেখছ, এত বড় জোয়ান হয়েছে, মাসে পঞ্চাশ-ষাট টাকা কামাতে পারে, কিন্তু রোজগার করবে না, আলসের হাঁড়ি! ঘুম থেকে উঠেই নবাবজাদার গরম চা-রুটি চাই, দু'বেলা পেটভরা খাবার চাই, জোয়ারের রুটি খাবে না, গমের রুটি চাই, কুমড়ো, বেগুন খাবে না, মাছ চাই—কোত্থেকে আমি মাছ মাংস দিয়ে সুখাদ্য যোগাই, এক মুখ নয় যে তার খুশীমত খাওয়াব। ছেলের বাপ খানসামা চায়—দু'বেলা পেট ভরে খাবে, ঘরে এসে আরাম চাইবে, টাকার কথা তুললে বলবে, কোত্থেকে টাকা আসবে সে কি জানে? সে রোজ ছেলেমেয়েদের বলে, "মর্ তোরা মর্, তোদের গোষ্ঠীর জন্যে আমার পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই, বেরিয়ে যা তোরা।' বাঈ, বলো, মা হয়ে এ অলক্ষুণে কথা শোনা কি কষ্টের। ভগবানকে বলি কেন আমার মত গরীবের ঘরে এতগুলো সন্তান দিয়েছ, এ আমার পাপের শাস্তি নয় ত কি? খানসামা চায়—সে নিশ্চিন্তে বসে থাকবে, আমি রাঁধব, বাড়ব, খাওয়াব, ছেলে মানুষ করব, তার সেবা করব, এমন কি টাকাও রোজগার করে সবার পেট ভরাব, সে দিব্যি তোয়াজে থাকবে, আর পান চিবুবে। সে আবার মরদ? পুলিসের নাম শুনলে ভয়ে কাঁপতে থাকে, তবে তার যত বীরত্ব সব আমার উপর।" তুলসী রাগে ফুলতে লাগল, বললে, "তার আক্কেল কি রকম দেখ বাঈ সাহেব, আমি সারাদিন খেটে-খুটে রাতে ঘুমুই মড়ার মত, কোলের দেড় বছরের মেয়েটা দুধ খেতে চাইলে তাকে সুদ্ধ একটা থাপ্পড় লাগিয়ে দিই, আর খানসামা ডাক-বাংলা থেকে রাত বারোটায় ফিরে এসে আমাকে ডেকে তুলবে। বলবে, "এই তুলসী সারাদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার পায়ে ব্যথা হয়ে গেছে, টিপে দে।" নয় ত বলবে, "আমার পায়ের পাতার মাংসগুলো ফেটে ফেটে হাঁ করে আছে, চলতে পারি নে, দে ত তেল-পেঁয়াজ গরম করে লাগিয়ে। চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসি, হাই তুলতে তুলতে পায়ের খরখরে চামড়াগুলো কেটে দি, তার পর তেল-পেঁয়াজ গরম করে হাঁ-করা মাংসের মুখগুলোতে ছ্যাঁক করে লাগিয়ে দি, বলো মা রাত বারোটার সময় ঘুম থেকে উঠে যদি এই ধরণের সেবা করতে হয় ত কেমন লাগে? আমার জন্য ত স্বর্গের দুয়ার খোলাই আছে। যে কয়টা টাকা রোজগার করছি, তা পর্যন্ত ছিনিয়ে নিচ্ছে, আমার রোজগারের টাকা যা, এক-টুকরো নূতন কাপড় আজ পর্যন্ত আমার গায়ে উঠেছে বলতে পারব না। এই অভাবের সঙ্গে আর এমন স্বামীর সঙ্গে ঘর করে আমি হয়রান; আর পারি নে। তবু খানসামার তৃপ্তি নেই; ও ত মানুষ নয়, নচ্ছার, বদমায়েস শয়তান। আমি তার সঙ্গে আর থাকব না। তোমার ওদিকে যে একটা-দুটো ঘর বাড়তি পড়ে আছে, তার একটাতে আমাকে থাকতে দাও না? আমার হাত দুটো যত দিন আছে তত দিন আমার ভাতের অভাব হবে না।"

আমি বললাম, "তুই-ই শুধু বলছিস, খানসামা বদমায়েস, কিন্তু আমরা ত দেখছি দিব্যি ভালমানুষ, কেমন আদব-কায়দা জানে, সাত চড়েও মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না, তা তোর সঙ্গে এমন খারাপ ব্যবহার করে কেন?"

এ কথায় তুলসী তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল, বললে, "তোমরা ত তার বাইরের মুখোশ দেখেছ, ভেতরে যে ও কি চিজ, কি বজ্জাত জান না। সেদিন ত বাঈ সাহেব তুমি আমার দুঃখের কথা শেষ করতে দাও নি, আজ আমি তোমাকে সব না শুনিয়ে ছাড়ব না। ওই যে সুন্দর মেয়েলোকটা খানসামার কাছে আসত তোমাকে বলেছিলাম, ও কে জান? আমার ত তখন অল্প বয়স, সংসারের হালচাল খুব বেশী বুঝতাম না। একদিন আমার পড়শী আর একটি বউ, বেশ বড়সড়, তার একটা বাচ্চাও হয়েছে বছরদুয়েকের, আমাকে হেসে হেসে বললে, 'ও তুলসী তুই কাকে এত সেবা দিস লো, ও কে জানিস?' আমি বললাম, 'ও ত খানসামার কুটুম।' বউটি ত হেসে ফেটে পড়ল, বললে, "হাঁ বড় পেয়ারের কুটুমই বটে'—বলে আমার কানে ফিস ফিস করে অনেককিছু বলে গেল।

"আমি তোমাকে কি বলব মা, হঠাৎ যেন দুনিয়া আমার চোখে বদলে গেল। সব তেতো, বিস্বাদ, আমি গুম হয়ে খানিকক্ষণ বসে রইলাম, আমার মাথা কান যেন ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল, ঘরের কোন কাজ করতে আমার হাত উঠল না, রান্না করলাম না, ঘর ঝাঁট দিলাম না, চুপ করে ঘরের পেছনে বসে রইলাম।

"খানসামা রোজই ডাকবাংলার কাজ শেষ করে বেলা দুটোর সময় ঘরে ফিরে খানাপিনা করে। সেদিনও ঠিক সময়ে ফিরল। ঘরে ঢুকে দেখে সব এলোমেলো পড়ে আছে, রান্নাবান্না কিছু হয় নি, অবাক হয়ে চেঁচিয়ে আমার নাম ধরে ডাকতে লাগল। আমি পাথরের মত বসে রইলাম, কোন জবাব দিলাম না। পাড়াপ্রতিবেশীদের ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'তুলসী কোথায়?' ওরা বললে, 'ঘরেই ত আছে। কোথাও ত যেতে দেখি নি।' খানসামা হন্তদন্ত হয়ে ঘরের পেছনে ছুটে এল, আমাকে দেখেই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল, বললে, "আজ এ কোন্ ধরণের তামাসা, খাওয়া-দাওয়া নেই, আমি উপোস থাকব না কি?' আমি বললাম, 'আমি তোর বাঁদী নাকি, যে হুকুমমত কাজ করব? যা না তোর পেয়ারের প্রেমিক আমার কাছে।' যেই না একথা শোনা, অমনি খানসামা একটা লাফ মেরে এসে আমার চুলের ঝুঁটি

ধরে বলল, 'যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা, বাঁদী নয় ত কি ? চল শিগ্‌গীর রান্না করতে।' আমারও যেন গোঁ ধরে গেল, বললাম, 'যাব না ত ঘরে, আমি আমার মা-বাবার কাছে চলে যাব। অমন চরিত্তের লোকের কাছে থাকব না।' আর যায় কোথা। খানসামা এক লাথি মেরে বললে, 'তুই কোথাকার লাটের মেয়ে, আমার ঘর করবি নে। অমন চরিত্তের লোকের ঘর করবি নে ? আমি কি ঔরৎ নাকি ? আমি হলাম মরদ, দু' দশ টাকা কামাই, মদ খাব, যা খুশি তা করব, তবে ত আমাদের মানসম্মান থাকে।' আমাকে মারতে মারতে একটা পাথরের উপর ফেলে দিলে। কপালটা কেটে রক্ত পড়তে লাগল। আমার চীৎকার শুনে পাড়াপড়শীরা এসে খানসামাকে টেনে নিয়ে যায়। বলে, 'আচ্চা কর কি, বাচ্চা বউটা ত মারা যাবে!'

"আমি হাত দিয়ে কপালের রক্ত মুছি, আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি, ও মাগী যদি এমুখো হয়—তবে তাকে আমার ধারালো মাংস কাটবার কাটারি দিয়ে দু'টুকরো করব। বুড়ীরা এসে আমাকে ধরে তুলে বললে, 'বউ তুই এখনও ছোট আছিস—তাই দুনিয়ার রীত জানিস নে। পুরুষরা অমন হয়ে থাকে—ওরা মদ খায়, ঘরের বউকে ধরে মারপিট করে—ওদের কথা অত ধরতে নেই।'

"মনে মনে একটা শপথ করে দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরলাম—অমন স্বামীর দয়া চাইব না।

"আমি নিজের মনে কাজ করে যাই—খানসামা আসে ভাত বেড়ে দিই—চুপচাপ খেয়ে যায়—কেউ কারও সঙ্গে কথা বলি না। এ ভাবে চার পাঁচ দিন কেটে গেছে। এক দিন খানসামা ডাক-বাংলায় চলে গেছে। আমিও দোরগোড়ায় চুপ করে বসে আছি। অদৃষ্টের কথা ভাবছি, এমন সময় দেখি সেই রঙ্গিনী হেলে দুলে আসছে। মুখে একগাল পান—আমাকে দেখে বললে, 'এ তুলসী, চুপ করে বসে আছিস কেন ? খানসামা কোথায় ?' আমি অমনি তড়াক্ করে উঠে ঘরের ভিতর গিয়ে আমার কাটারিখানা নিয়ে বের হয়ে বললাম, 'দেখ, ঘরে পা দিয়েছিস কি তোর মুণ্ডু ধড় থেকে আলাদা করে দেব—সর্বনাশী আমার সর্বনাশ করতে এসেছিস।'

"আমার রণরঙ্গিণী মূর্তি দেখে শ্রোণি আম্মা 'ও মাগো, আমাকে খুন করে ফেললে,' বলে ঊর্দ্ধশ্বাসে দে ছুট! তা দেখে আমার যা হাসি—আমি পাগলের মত হো হো করে হাসতে লাগলাম। তার পর পা ছড়িয়ে বসে ডুকরে কেঁদে উঠলাম, মন কেমন বিষিয়ে গেল—হা হা ভগবান আমি কি করে বাকী জীবন কাটাব। খানিক পরে রান্না চাপিয়ে ভাবতে লাগলাম। হঠাৎ মনে হ'ল বাপ-মা বিয়ে দিয়ে দিয়েছে—গরীবের মেয়ে বাপের উপর চিরকাল কিছু থাকতে পারব না—ভাই, ভায়ের বৌ হয়ত পছন্দ করবে না—দু'দিন পর তাড়িয়ে দেবে—তা হলে স্বামী ছাড়া আমার গতি কি ? স্বামীও যদি পরের বশ হয় তবে আমার দিন কাটবে কি করে। আমাকে ধৈর্য্য ধরে চলতেই হবে—স্বামীকে হাত করতেই হবে। স্বভাবটা আমার বড় দজ্জাল, স্বভাব বদলাতে হবে।

'তারপর কি বলব বাঈ, সত্যি ভগবানের আশীর্ব্বাদে ধীরে ধীরে খানসামার স্বভাব বদলাতে পারলাম, একে একে ছেলেমেয়ে এসে ঘর ভরতে লাগল। তখনকার দিনে জিনিষ কত সস্তা ছিল—টাকায় ১৬ সের দুধ, দু' তিন টাকা চালের মণ, চার পয়সা আলুর সের—সে সব কথা যদি এখন বলি—আজকালকার ছেলেমেয়েরা বলবে নেশা করে গল্প ঝাড়ছে। তখন হিন্দুস্থানে বহু সাহেব মেম ছিল। ওরা আসত ডাকবাংলায়। দু'দিন থাকত, মুঠি ভরে বকশিশ দিয়ে যেত। আমি কিছু কিছু করে টাকা জমিয়ে শেষে একটা গ্রামোফোন কিনলাম, সখ করে একটা হারমোনিয়ামও কিনলাম। খানসামার সাইকেল হ'ল, ঘড়ি হ'ল। দুটো গরু পুষলাম, এদের দেখবার জন্য একটা বাচ্চা চাকরও রাখলাম। তুমি হয়ত বাঈ বিশ্বেস করবে না, ভগবানের দয়ায় দু'চারখানা সোনার গয়নাও হ'ল। তামা পেতলের বাসন-কোসনও করলাম, সুখ তখন আমার কানায় কানায়। কিন্তু কিছুকাল বাদ আমার সেই সুখের সংসারে আগুন লাগল। খানসামা একদিন শক্ত অসুখে পড়ল, আমার এক ছোট ভাই এল বেড়াতে, তাকে দু'দিন খানসামার বদলে কাজ করতে বললাম। সে একদিন এক সাহেবের অনেক টাকা পয়সা চুরি করল, ফলে শেষ পর্য্যন্ত খানসামার আঠারো বছরের চাক্‌রিটি গেল। অন্য জায়গায়ও চাক্‌রি পায় না। আট-নয়টা ছেলেমেয়ে আর স্বামী-স্ত্রী—দশ-এগার জনের খরচ কি করে চলে! তার উপর আবার এল আকাল, হাতের যা পুঁজিপাটা ছিল সব ভেঙ্গে খেতে লাগলাম। তারপর একে একে সোনাদানা গেল, গ্রামোফোন গেল, হারমোনিয়াম গেল, গাই বিক্রী করলাম, বাসন বিক্রী করলাম, একেবারে ফতুর হলাম। ভেবে ভেবে খানসামার মাথার চুল পেকে গেল। এখন যে আমি ঘণ্টায় ঘণ্টায় পান চিবুই, এটা আগে ছিল না। খানসামা মদ ছেড়ে দিয়ে পান খাওয়া অভ্যাস করেছিল, আমাকেও খাওয়া শেখাল। সেই যে পানের আদত হ'ল, তা আজও ছাড়তে পারছি না। পেটে ভাত না পড়লেও চলে, কিন্তু ঘণ্টায় ঘণ্টায় পান চিবুনো চাই, আর চাই দিনে তিন-চার বার চা, তাতে দুধও লাগে না, গুড়ও নয়। শুধু চা-সেদ্ধ জল একটু নুন দিয়ে খেয়ে নিই, তাতেই যেন শরীরে বল পাই! আচ্ছা, বাঈসাহেব, তুমি সত্যি করে বল দিকিন, সত্যি কি আমাকে বুড়ী দেখায় ? আমাকে ত চৌদ্দ ছেলের মা বলে কেউ বিশ্বাস করত না, অত বড় ছেলেকে লোকে আমার ভাই বলত। এখন আমার পেটে অন্ন নেই, একবেলা আধপেটা, একবেলা উপোস, পরনে বস্ত্র নেই, ছেঁড়া শাড়ী তালি দিয়ে পরি। আমার শরীরের কি হাল হয়েছে।" বলে করুণ নয়নে নিজের সারা দেহে চোখ বুলোতে লাগল। সত্যি চেয়ে দেখলাম, লম্বা ছিপছিপে মেয়েলোকটি, ধারের নাক চোখ, বয়সকালে হয়ত তার শ্যাম দেহ লাবণ্যে টলমল করত, কিন্তু এখন সে মূর্ত্তি কঙ্কালে পরিণত, মাথায় একরাশ চুল রুক্ষ জটার মত, বড় বড় কালো চোখ দুটি কোটরগত, দুটি জীর্ণ হাতে কালো শিরা বেরিয়ে আছে। মনটা ব্যথায় ভরে উঠল।

সেদিন তার দুরবস্থা দেখে তার মাইনে খানিকটা বাড়িয়ে

দিলাম, আমাদের বাংলোর বাইরের একটা কামরার চাবি দিয়ে বললাম, "ওখানকার বাক্সে জিনিষগুলো অন্য ঘরে রেখে, ঘরটা পরিষ্কার করে তুই থাক।"

সেদিন আমাদের রান্নার পর সারাটা দুপুর সে তার ছোট মেয়েটাকে নিয়ে ঘর থেকে সব বাক্সে জিনিষপত্র সরিয়ে দেয়ালের, ঘরের চালের সব ঝুল ঝেড়ে ঝাঁটপাট দিয়ে রাখল। পরদিন রান্নার পর আবার সে দুপুরে তার মেয়েকে নিয়ে, ঘরের পাথরের মেঝে ধুয়ে মুছে ঝক্‌ঝকে করে তুলল, তারপর তালা দিয়ে রাখল। পরদিন ঘর শুকালে জিনিষপত্র নিয়ে চলে আসবে। তার মুখে একটু ম্লান হাসি ও উৎসাহ দেখা গেল।

কিন্তু পরদিন সে কাজ করতে এসেই তালার চাবি ফিরিয়ে দিয়ে বললে, "এই চাবি নিয়ে নাও, আমার আর ঘরের দরকার নেই।" তার মুখের ভাবটা সুবিধের নয়। আমি বললাম, "চাবি ফিরিয়ে দিলি কেন, তুই না দু'দিন ধরে এত কষ্ট করে ঘর-দোর পরিষ্কার করলি, এখন আবার কি হ'ল?" সে কোন উত্তর না দিয়ে গম্ভীর-ভাবে কাজ করে যেতে লাগল।

তারপর থেকেই কিছুদিন যাবৎ লক্ষ্য করতে লাগলাম যে, তুলসীর চালচলন, স্বভাব যেন বদলে যাচ্ছে। সেই মুখরা তুলসী যেন মূক হয়ে গেছে। সে দিন-রাত্ত আমার সংসারে ও তার নিজের সংসারে অসম্ভব খাটতে লাগল। শেষরাতে উঠে তার ঘরের সব বাসন-কোসন ঘষে, জল ভরে, স্নান করে ঠিক সময়ে আমার এখানে এসে যেত। খুব মন দিয়ে রান্না-বান্না করে বাড়ী চলে যেত। দুপুরে দেখতাম সে তার ছেলেমেয়ের একরাশ কাপড় কাচছে, যেন ধোপার ভাটি বসেছে, আবার ঠিক চারটায় এসে চা জলখাবার দিয়ে রান্না-বান্না করে চলে যেত। তারপর কলতলা থেকে বালতি বালতি জল ভরে নিজের ঘরে নিত।

এতদিন ধরে দেখছি, শুনছি, খানসামা বাড়ী এলেই, দিনেই হোক আর রাতেই হোক, প্রায়ই তার আর তুলসীর কথাকাটাকাটি, ঝগড়া সুরু হ'ত, হাওয়ায় তাদের চেঁচামেচি টুকরো টুকরো ঝগড়ার কথা ভেসে আসত; আজকাল একেবারে চুপচাপ, কোন কিছু শোনা যায় না। কি ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছি নে। একদিন তার মেয়েকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, "হ্যাঁরে তোর মায়ের কি হয়েছে বল্ ত? সারাদিন কেবল মুখ বুঁজে কাজ করে, তোরা সব ভাই-বোন ঘরের কাজ করতে পারিস নে?" সে থতমত খেয়ে বললে, "জানি নে আম্মার কি হয়েছে, আমাদের কিছু করতে দেয় না। সে নিজের হাতে ঘরের সব কাজ করে, আমরা কিছু করতে গেলে তেড়ে মারতে আসে। রাতেও তোমার রান্না শেষ করে এসে এখানে বাবার জন্য দশ-এগারটা অবধি বসে থাকে, তা শুধু বসে থাকবে না, ঘরের যত ছেঁড়া কাপড় জামা সেলাই করে, বাবা এলে খেতে দেয়, পান সেজে দেয়, তার বিছানা পেতে দেয়।" আমি অবাক হয়ে গেলাম।

আমি শুধু চেয়ে দেখি তুলসীর চোখে যেন একটা অস্বাভাবিক জ্যোতি, পোড়াকাঠ দেহে যেন একটা দৃঢ়তা। মুখে হাসি নেই, সর্ব্বদেহে যেন একটা কঠোর প্রতিজ্ঞা, আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না, একদিন বললাম, "তুলসী তুই একি করছিস, আমি ত দেখেছি, তুই আমার ঘরের কাজ করে তোর নিজের বাড়ীর সব কাজ করছিস, এক মুহূর্ত বিশ্রাম নিচ্ছিস না, তোর এত বড় বড় ছেলে-মেয়েগুলো বসে বসে খাচ্ছে। খানসামা দিব্যি খাচ্ছে-দাচ্ছে পান চিবুচ্ছে, আর তুই এ কি হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে মরছিস, এ ভাবে চললে ত তুই মারা যাবি।" এবার তুলসী আর নিজেকে সামলাতে পারল না, তার দু'চোখ দিয়ে দর-দর করে জল ঝরতে লাগল, বললে, "বাঈ দু'হাত জোড় করি, আশীর্ব্বাদ কর যেন ভগবান পায়ে ঠাঁই দেন।" আমি বললাম, "তুলসী তুই না আলাদা হয়ে থাকবার ব্যবস্থা করেছিলি তার কি হ'ল?"

"হাঁ, নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিলাম মা, তা আর হ'ল না।"

"কেন?"

"সে নচ্ছারের জন্যে।"

"সে কি রকম?"

তুলসী বললে, "তোমরা ত জান না সে কি রকম লোক। সে নিজে যেমন দুনিয়াটাও তেমনি মনে করে। সেদিন আমি আমার মালপত্তর নিয়ে চলে আসব ঠিক করেছি। খানসামা এলে বললাম, 'তোমার সঙ্গে আমার ত হরদম খিটিমিটি চলছে, আমি আলাদা থাকবার ব্যবস্থা করেছি। অমনি সে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল, রুখে বলতে লাগল, 'তা ত যাবিই।' একটা অকথ্য গালি দিয়ে বললে, 'বেইমান! এত দিন তোকে খাওয়ালাম পরালাম, এখন কিনা বুড়ো হয়েছি তাই আমাকে ছেড়ে যাচ্ছিস। তোর কি, আমি মরলে আপদ ফুরোতো, আর একটা বিয়ে করতে পারতিস, এখন দেখছিস মরছি নে, তাই আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছিস। বোধ হয়, তোদের বংশের রীতিই এই যে স্বামী বুড়ো হলে তাকে ছেড়ে চলে যায়।" এই কথা বলতে বলতে তুলসীর কোটরগত দুটো চোখ দিয়ে যেন তীব্র জ্বালা বিচ্ছুরিত হতে লাগল। সে বললে, এই জঘন্য কথা আর বংশের নিন্দা শুনে আমার মাথায় যেন খুন চেপে যাচ্ছে বাঈ। কিন্তু আমি লোক হাসিয়ে গলায় দড়ি দেব না, তাকে ছেড়েও যাব না, কিন্তু তাকে দিনে দিনে দেখিয়ে দেব, আমি কেমন বাপের বেটি, আমি কেমন কাজ করতে পারি না, আর কেমন বেইমান। আর জন্মে তার কাছে ধার করেছিলাম, তাই এ জন্মে গতর দিয়ে তা শোধ করে মরব।" এই বলে সে ধীরে ধীরে চলে গেল।

আমি স্তব্ধ নির্ব্বাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম। ঘোর দারিদ্র্যের প্রতীক, রুক্ষকেশা, ছিন্নবসনা, অনশনক্লিষ্টা, কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ওই কঙ্কালসার নারীমূর্ত্তির পানে।

যুগোশ্লাভিয়ার উন্নতির উৎস

শ্রীঅজিতকুমার বসু

নবীন যুগোশ্লাভিয়া নানা কারণে সারা দুনিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। সম্প্রতি সেখান হইতে যে-এক শুভেচ্ছা মিশন ভারতে আসিয়াছিলেন, তাহাতে যুগোশ্লাভিয়া সম্বন্ধে ভারতের আগ্রহ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

শ্লাভ ভাষায় "যুগ" অর্থে দক্ষিণ। তাই যুগোশ্লাভিয়া দক্ষিণী শ্লাভদের দেশ। ছয়টি রিপাব্লিক বা প্রদেশ লইয়া এই দেশ গঠিত—শ্লোভেনিয়া, ক্রোটিয়া, বোসনিয়া, হার্জেগোভিনা, সার্বিয়া, মণ্টেনেগ্রো এবং ম্যাসিডোনিয়া। ইহার পরিধি এক লক্ষ বর্গমাইল—আয়তনে যুক্তরাজ্য অপেক্ষা সামান্য বড় এবং লোকসংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ। বল্কান এলাকায় এইটি বৃহত্তম দেশ। এদেশে চারটি প্রধান ভাষা প্রচলিত—ক্রোটীয়, সার্বীয়, শ্লোভেনীয় এবং ম্যাসিডোনীয়। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে যেমন সাদৃশ্য আছে, তেমন নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যও আছে। ইহার উত্তর হইতে পূর্ব দিক পর্যন্ত অষ্ট্রিয়া এবং হাঙ্গেরী, রুমানিয়া ও বুলগেরিয়া—এই তিনটি সোভিয়েট গোষ্ঠীভুক্ত রাষ্ট্রের দ্বারা বেষ্টিত। দক্ষিণে গ্রীস ও আলবানিয়া এবং দক্ষিণ হইতে পশ্চিমের কাছ বরাবর আড্রিয়াটিক সাগর ও পশ্চিমে ত্রিয়েষ্ট অবস্থিত। এই ত্রিয়েষ্ট লইয়া ইটালীর সহিত যুগোশ্লাভিয়ার বিরোধ আছে এবং ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির অপচেষ্টায় এই বিরোধ পাকিয়াই আছে—যেমন সোভিয়েটের অবিরাম উস্কানিতে অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী প্রভৃতি রাষ্ট্রের সহিত ইহার বিরোধ বাধিয়াই আছে। নদ-নদী, বনসম্পদ, পর্বত, অসংখ্য হ্রদ ইত্যাদি যুগোশ্লাভিয়াকে যেমন প্রাকৃতিক সম্পদে ও শোভায় ভূষিত করিয়া রাখিয়াছে, তেমনই তৈল, লৌহ ও অন্যান্য বহুবিধ খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য তাহার শিল্প ও কৃষি-সমৃদ্ধির সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণ ও নিশ্চিত করিয়া রাখিয়াছে।

যুগোশ্লাভদের পূর্বপুরুষেরা ছিল উত্তরদিকস্থ কার্পেথিয়ান পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী। ষষ্ঠ শতাব্দীতে তাহারা বল্কান অঞ্চলে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করে এবং প্রায় দুই শত বৎসর ধরিয়া তাহারা আসিয়া এক-একটি রাষ্ট্র বা রাজ্য গঠন করে। অষ্টম শতাব্দীতে শ্লাভ সভ্যতা বেশ একটি নির্দিষ্ট রূপ ধারণ করিয়া উন্নতি করিতে থাকে এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তাহার চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। তাহার পর হইতেই আবার পতন আরম্ভ হয়।

অতীতে যুগোশ্লাভিয়ার সম্পদে বৈদেশিক আক্রমণকারীরা প্রলুব্ধ হয়। তুর্কীরা সার্বিয়া আক্রমণ করে। সার্বিয়া তখন বেশ শক্তিশালী রাষ্ট্র। সার্বীয়রা আক্রমণকারীদের প্রতিহত করিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই। কিন্তু অবশেষে, ১৩৮৯ সালে সার্বিয়া তুর্কীদের কবলিত হয়। ক্রমাগত পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া তুর্কীরা দক্ষিণ শ্লাভ দেশগুলির একটি না একটির উপর আক্রমণ চালাইয়াছে, কিন্তু তাহাদিগকে সর্বত্রই প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। তাই একমাত্র বোসনিয়া (১৪৬৩ সনে) ও হার্জেগোভিনা (১৪৮৩ সনে) ব্যতীত আর কোন অংশ তাহারা অধিকার করিতে পারে নাই। দক্ষিণী শ্লাভদের এই বাধার দরুন তুর্কীরা আর উত্তরে অগ্রসর হইতে বা শান্তিতে রাজত্ব করিতে না পারায় ইউরোপীয় অন্যান্য দেশের সংস্কৃতি যে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া উন্নত হইতে পারিয়াছে—একথা স্বীকার করিতেই হইবে।

তাই বলিয়া অপর ইউরোপীয় দেশগুলি কিন্তু যুগোশ্লাভিয়াকে রেহাই দেয় নাই। অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরী ইহার উপর আক্রমণ চালাইয়া কতক অংশ দখল করে এবং ইটালী ডালমাটিয়াসন উপকূলের উপর শতাব্দীব্যাপী শ্যেনদৃষ্টি রাখিয়াছে। এতৎ সত্ত্বেও দক্ষিণী শ্লাভরা তাহাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আসিয়াছে। তাহা ছাড়া অপরাজেয় মণ্টেনেগ্রোদের বীরত্ব শ্লাভদের জাতীয়তা ও স্বাতন্ত্র্যের বহ্নিশিখাকে অবিরাম প্রজ্বলিত রাখিয়াছে, তাহাদের উদ্দীপ্ত করিয়াছে। তাই তাহাদের স্বাধীনতা আন্দোলন আবার ক্রমশঃ দানা বাঁধিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণী শ্লাভদের একীকরণের আন্দোলনের শক্তিও বৃদ্ধি পাইয়া আসিয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীতে এই উভয় আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে এবং স্থানে স্থানে গরিলা যুদ্ধও দেখা দেয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক হইতে তাহা বিশেষ জোরালো হইয়া উঠে, ১৮০৪ সনে সার্বিয়াবাসীরা বিদ্রোহ করিয়া সাফল্যলাভ করে। স্থানে স্থানে আরও বহু বিদ্রোহের সূচনা হয়। তবে শেষ পর্যন্ত প্রথম মহাযুদ্ধের পরই তাহারা তুর্কী ও অষ্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের কবলমুক্ত হইতে সক্ষম হয়। তখন দেশে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা কিন্তু এমন কোন পরিবর্তন আনিতে পারে নাই, যাহার ফলে যুগোশ্লাভদের প্রাত্যাহিক জীবনের দুঃখভার কিঞ্চিৎ লাঘব হইতে পারে। প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও যুগোশ্লাভিয়ায় শিল্প প্রসার লাভ করিতে পারে নাই; বিদেশীদের নিকট সস্তায় কাঁচা মাল বিক্রয়ের এবং উচ্চমূল্যে বিদেশী পণ্যদ্রব্য ক্রয়ের কেন্দ্র হিসাবেই যুগোশ্লাভিয়া থাকিয়া গিয়াছিল। তাই তাহার

অবস্থাও ইউরোপের মধ্যে অতি দরিদ্র ছিল। এদেশের শিক্ষার মান খুবই নিম্ন ছিল, মানুষের গড় আয়ু কম ছিল এবং বেকারসমস্যা অত্যন্ত ব্যাপক ছিল। সামান্য কলকারখানা বা শিল্প যাহা ছিল তাহাতে যে পরিমাণ পুঁজি খাটিত তন্মধ্যে বিদেশী পুঁজি ছিল বস্ত্র শিল্পে ৯২%,—দেশলাই, তামা, সিসা ও বক্সাইট শিল্পে পুরাপুরি, জাহাজে ৭০%, চিনিতে ৬৮%, এবং কয়লায় ৫৫%। শ্রমিকদের মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী অবস্থার মধ্যে জীবন যাপন করিতে হইত। অকর্মণ্য রাজা এবং রাজসরকার বিদেশী বণিক ও ধনীদের তাঁবেদার হইয়াই শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেন।

কৃষি এবং কৃষকদের অবস্থা আরও খারাপ ছিল। যুগোশ্লাভিয়া ছিল কৃষিপ্রধান দেশ এবং ইহার তিন-চতুর্থাংশ লোক ছিল কৃষি-নির্ভর। কিন্তু কৃষি ও ভূমি-ব্যবস্থা ছিল অতি পুরাতন। উপরন্তু শতকরা মাত্র পাঁচ জনের হাতেই ছিল অধিকাংশ জমি। ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকের সংখ্যা ছিল পাঁচ লক্ষাধিক এবং সমপরিমাণ ছিল ভাগচাষী। কৃষকদের সারা বৎসর কাজ জুটিত না; বেকারদশা এবং অনাহারে দিন গুজরানই ছিল তাহাদের অদৃষ্টলিপি।

এই সব কারণেই দেশের সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন করিয়া জনহিতকর ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা গভীর ভাবে অনুভূত হইতে থাকে। ইহাই পরিশেষে, প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে, বৈপ্লবিক আন্দোলনে পর্যবসিত হয়। যুগোশ্লাভিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে এই আন্দোলন চলিতে থাকে। মার্শাল টিটোর ন্যায় রুশিয়া হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত নেতৃবৃন্দই আসলে এই আন্দোলনের পরিচালক ছিলেন। ক্রমশঃ অন্যান্য বহু প্রগতিবাদী দল, উপদল, ব্যক্তি, ট্রেড ইউনিয়নের কর্ম্মী প্রভৃতি ইহাদের সহিত মিলিত হন এবং অবশেষে তাঁহারা "পিপ্‌ল্‌স্ ফ্রন্ট" গঠন করিয়া ফ্যাসিষ্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করেন।

ইতিমধ্যে রুশিয়া ও জার্মানী তথা ষ্টালিন ও হিটলারের মধ্যে পারস্পরিক মৈত্রী এবং অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে পর ইউরোপে যুদ্ধের আগুন জ্বলিয়া উঠে। দেখিতে দেখিতে হিটলারের দুর্ধর্ষ বাহিনী ইউরোপের এক একটি দেশ গ্রাস করিয়া ফেলিল। ফরাসীর মত শক্তিও ইহাকে প্রতিরোধ করিতে পারিল না। অতি অল্প কালের মধ্যেই সমগ্র পশ্চিম ইউরোপ এবং যুগোশ্লাভিয়া ব্যতীত সমগ্র বল্কান দেশ ফাসিষ্ট বাহিনীর নিকট নতিস্বীকার করিল।

১৯৪১ সনের ১৫ই মে রুশিয়া আক্রমণের জন্য নাকি হিটলারের পরিকল্পনা ছিল। পশ্চাতে যাহাতে আর কোন বাধা না থাকে, তাই তাহারা যুগোশ্লাভিয়ার উপর নজর দিল। পঁচিশে মার্চ যুগোশ্লাভিয়ার রাজা তথা রাজ-সরকার হিটলার তথা ফাসিষ্ট চক্র-শক্তির সহিত ভিয়েনায় চুক্তি করিয়া তাহাদের নিকট বশ্যতাস্বীকার করিল। কিন্তু স্বাধীনতাপ্রিয় দেশবাসী এবং জাতির বৈপ্লবিক শক্তি সে চুক্তি স্বীকার করিল না। দুই দিন পরই, ২৭শে মার্চ তাহাদের প্রতিবাদে যুগোশ্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেড চমকিত হইয়া উঠিল। পথে পথে আওয়াজ উঠিল, "বশ্যতা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ", "চুক্তি অপেক্ষা যুদ্ধই বাঞ্ছনীয়!" দেশের দিকে দিকে তাহা পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। রাজ-সরকারের পতন হইল এবং রাজা পলায়ন করিলেন। রাজার চুক্তি জনগণের দেশপ্রীতির আগুনে ভস্মীভূত হইল। তখনও কিন্তু সোভিয়েট রুশিয়া ফাসিষ্ট আক্রমণকারীদের মিত্র হিসাবেই থাকিয়া গেল—যুগোশ্লাভ কম্যুনিষ্ট পার্টির কার্যক্রম তাহাদের মনঃপূত হয় নাই।

অবশেষে ১৬ই এপ্রিল্ জার্মানীর তিন শতাধিক বোমারু বিমান ঝাঁক বাঁধিয়া আসিয়া বেলগ্রেডের উপর আক্রমণ করিল, পঁচিশ সহস্রাধিক নরনারীকে হত্যা করিয়া বেলগ্রেড সহরকে তাহারা ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিল। অতঃপর চারিদিক হইতে জার্মানী, ইটালী এবং তাহাদের তাঁবেদার বুলগেরীয় ও রুমানীয় বাহিনী যুগোশ্লাভিয়াকে আক্রমণ করিল। ইহারই ফলে হিটলারের রুশিয়া আক্রমণ বিলম্বিত হইল এবং এই বিলম্বের জন্যই হিটলারের বাহিনী পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে শীতকালের পূর্বে মস্কোর নিকটবর্তী হইতে পারে নাই। যুগোশ্লাভিয়ার যুদ্ধে হিটলারকে লিপ্ত হইতে না হইলে মস্কো তথা রুশিয়ার যুদ্ধের অবস্থা যে কিরূপ হইতে পারিত তাহা সহজেই অনুমেয়।

যুগোশ্লাভরা কিন্তু দমিল না, অকুতোভয়ে যুদ্ধ করিয়া চলিল। শত্রুর নিকট হইতে দখল-করা সামান্য অস্ত্রশস্ত্র এবং কৃষি-যন্ত্রপাতিই গোড়ার দিকে তাহাদের প্রধান অবলম্বন ছিল। গরিলা যুদ্ধে তাহারা শত্রুকে পর্যুদস্ত করিয়া তুলিল। ১৯৪১ সনের শেষের দিকে তাহাদের মাত্র ৪১০০০ জন যোদ্ধা ছিল। ১৯৪৪ সনে তাহাদের সংখ্যা চার লক্ষাধিক হইল এবং ১৯৪৫ সনে আট লক্ষাধিক যোদ্ধা লইয়া যথারীতি "জাতীয় মুক্তি ফৌজ" (National Liberation Army) গঠন করা হয়। শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে তখন প্রতিরোধ চলিতে থাকে। তাহারই জন্য হিটলারকে যুগোশ্লাভিয়ার রণক্ষেত্রে ১০ লক্ষাধিক সৈন্য নিযুক্ত রাখিতে হইয়াছিল। সুতরাং ইহা অনস্বীকার্য যে যুগোশ্লাভদের এই বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ রুশিয়া সমেত অন্যান্য রণক্ষেত্রের ফাসি-বিরোধী বাহিনীকে পরোক্ষভাবে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিল। অথচ কার্যতঃ যুগোশ্লাভদের একক ভাবেই লড়াই করিতে হইয়াছিল। টিটো এবং টিটোর

দলবলকে মিত্রপক্ষ প্রথম দিকে কোন সহায়তাই প্রদান করে নাই ; ইহারা সাহায্য দিয়াছিল মুখোসধারী মিহাইলভিসের মত ফাসিষ্ট গুপ্তচরদের। অবশ্য ইহাদের স্বরূপ প্রকাশ পাইতেই "মুক্তিফৌজ" মিত্রপক্ষের স্বীকৃতিলাভ করিয়াছিল।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এতৎসত্ত্বেও যুগোশ্লাভিয়ার এই পরাক্রান্ত মুক্তিফৌজ এবং টিটো প্রমুখ নেতৃবৃন্দ রুশিয়ার কুনজরেই রহিয়া গেলেন। ইঙ্গ-মাকিনের তাঁবেদার দালাল বলিয়া ইহাদের বিরুদ্ধে প্রচার চলিতেই লাগিল, যদিও রুশিয়াও সেই ইঙ্গ-মাকিন শিবিরেই মিত্র হিসাবে পরে যোগদান করিয়াছিল।

দক্ষিণী শ্লাভরা আজ একই পতাকাতলে একতাবদ্ধ। যুগোশ্লাভিয়ার ফেডারেল পিপ্‌লস রিপাব্লিকের পতাকাতলে আজ তাহারা জাগ্রত স্বাধীন জাতি হিসাবে উন্নতশিরে দণ্ডায়মান। এক নূতন অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় বনিয়াদের উপর তাহাদের সামাজিক কাঠামো গড়িয়া উঠিতেছে। যুদ্ধের মধ্যেই এ বনিয়াদের পত্তন হইয়াছে। এক একটি গ্রাম, এক একটি শহরকে শত্রুর কবল হইতে মুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিফৌজ জনগণের সরকারের স্তম্ভ হিসাবে গণ-সমিতি (পিপ্‌লস কমিটি) অর্থাৎ পঞ্চায়েৎ-সরকার, নির্বাচিত করিয়া স্থানীয় শাসন ও উন্নয়নের কর্তৃত্ব তাহাদের হাতে তুলিয়া দিয়াছে। ১৯৪১ সনেই ইহা সুরু হয়। ১৯৪২ সনের শেষের দিকে এই সব পঞ্চায়েৎ-সরকারের প্রতিনিধিরা মিলিত হইয়া "ফ্যাসী-বিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলন পরিষদ" গঠন করেন। এই পরিষদ ১৯৪২ সনের ২৯শে নবেম্বর পুনরায় বোসনিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে মিলিত হইয়া মুক্তি পরিষদ (National Committee for the libration of Yugoslavia) নামে এক অস্থায়ী সরকার গঠন করেন। তাঁহারা সেইখানে স্বাধীন যুগোশ্লাভিয়ার শাসন ও সংস্কার-সংক্রান্ত কয়েকটি মূল নীতিও নির্ধারিত করেন।

অতঃপর, ১৯৪৫ সনের ১১ই নবেম্বর, যুগোশ্লাভিয়া হইতে ফাসিষ্ট বাহিনীর মূলোচ্ছেদ করা হইলে পর, গোপন গণ-ভোটে এক বিধান পরিষদ (Constituent Assembly) নির্বাচিত হয়। ২৯শে তারিখে এই পরিষদ যুগোশ্লাভিয়াকে "পিপ্‌লস রিপাব্লিক" বলিয়া ঘোষণা করেন এবং দুই মাস বিশদ আলোচনার পর পরিষদ ১৯৪৬ সনের ৩১শে জানুয়ারী শাসনতন্ত্র রচনা করেন। অতঃপর এই পরিষদকেই যথাবিধি প্রথম জাতীয় পরিষদে (National Assembly) রূপান্তরিত করা হয়। বিধিমত চার বৎসর পরে, ১৯৫০ সনের ২৬শে মার্চ, ১৮ বৎসর ও তদূর্ধ বৎসরবয়স্ক সকল নরনারীর গোপন ভোটে দ্বিতীয় জাতীয় পরিষদ গঠিত হয়।

দুইটি পরিষদ লইয়া এই জাতীয় পরিষদ গঠিত—(১) ফেডারেল কাউন্সিল এবং (২) কাউন্সিল অব নেশন্যালিটিজ। জাতীয় পরিষদের একটি প্রিসিডিয়াম (কর্তৃমণ্ডল) এবং একটি মন্ত্রিমণ্ডল (একৃজিকিউটিভ) থাকে। (সম্প্রতি শাসনতন্ত্র সংশোধন করিয়া কিছু পরিবর্তন করা হইয়াছে।) পরিষদের সদস্যরাই ইঁহাদের নির্বাচিত করেন এবং প্রয়োজন হইলে অপসারিতও করিতে পারেন। সংশ্লিষ্ট রিপাব্লিক-(প্রদেশ) গুলিতেও অনুরূপ ব্যবস্থা আছে। মার্শাল জোসিপ ব্রোজ টিটো সাম্প্রতিক সংশোধনের পূর্ব পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। নূতন শাসনতন্ত্রানুযায়ী তিনিই প্রেসিডেণ্ট হইয়াছেন বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে।

বিধিমতে পিপ্‌লস কমিটিগুলিই শাসনযন্ত্রের স্তম্ভস্বরূপ। স্থানীয় সকল উন্নয়নমূলক কার্য এই কমিটিই করিয়া থাকেন। এই কমিটি মাসে অন্ততঃ এক বার বৈঠক করিয়া অতীত কার্যাবলীর আলোচনাদি করেন এবং ভবিষ্যৎ কার্যক্রম ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। স্থানীয় অধিবাসীরা এই আলোচনায় যোগদান করিতে পারেন। জনসাধারণ প্রকাশ্যভাবে এবং সভা সমিতি ইত্যাদিতে কমিটির কার্যকলাপের সমালোচনা করিতে এবং কৈফিয়ৎ দাবি করিতে পারেন। প্রয়োজনবোধে তাঁহারা কমিটির সদস্যদের যে-কোন সময় পদত্যাগ করাইতে পারেন। এই কমিটি গণভোটে নির্বাচিত হয়। কমিটিকে সাহায্য করিবার জন্য আবার বিভিন্ন কমিটি ও কমিশন থাকে। এই ভাবে দেশ শাসন ও উন্নয়নের কার্যে জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

শ্রমিকদের বেলায়, নিজ নিজ কারখানার শ্রমিকদের স্বার্থ অবাধে রক্ষা করিবার জন্য যেমন ট্রেড ইউনিয়ন আছে, তেমনই আবার শ্রমিকদের দ্বারা নির্বাচিত 'ওয়ার্কার্স কাউন্সিল' আছে, যাহা কারখানা পরিচালনার দায়িত্ব বহন করে। কাউন্সিলের সদস্যদের মধ্যে অন্ততঃ এক-চতুর্থাংশ খাস শ্রমিক হওয়া চাই। ১৯৫০ সনে এই সব কাউন্সিলের হাতে অধিকতর পরিমাণে কারখানা পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে। এইভাবে দেশের আর্থিক ব্যবস্থায় জনসাধারণের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা হইতেছে। মূল কথা, দেশের সর্বাঙ্গীণ ক্ষমতা ধাপে ধাপে বিকেন্দ্রীকৃত হইতেছে।

নবীন যুগোশ্লাভিয়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি ও অনুন্নত জাতিগুলির উন্নতি কামনা করে। তাহাদের বিশ্বাস, বর্তমানে সম্মিলিত জাতি-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠান এবং তাহাদের দ্বারা নির্ধারিত নীতিই শান্তিরক্ষার পথ। যুগোশ্লাভিয়া বৃহৎ ও শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির 'প্রভাবাধীন এলাকা' হিসাবে বিশ্বকে বিভক্ত করার বিরোধী। তাহাদের মতে সকল রাষ্ট্রের বা জাতির বিশ্ব-সঙ্ঘে সমান অধিকার থাকা দরকার, যাহা বর্তমানে নাই। সোভিয়েট রাষ্ট্রগোষ্ঠী ও সোভিয়েট অনুগত

কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলি যে "পঞ্চশক্তির চুক্তি"র কথা বলিতেছে, তাহার বিরোধিতা করিয়া বলা হইয়াছে যে, ইহাতে ক্ষুদ্র, দুর্বল ও অনুন্নত দেশ তথা জাতিগুলির উপর বৃহৎ ও শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহের মোড়লি করিবার অধিকারকে স্বীকার করিয়া তাহাকেই কায়েম রাখা হইবে মাত্র। সেই জন্য যুগোশ্লাভিয়া পরস্পরবিরোধী দুই বৃহৎ শক্তি-সমবায়ের কোন পক্ষেই যোগ দিবে না।

দীর্ঘকাল দারিদ্র্যের কবলিত যুগোশ্লাভিয়ার যাহা কিছু বা সম্পদ ছিল, যুদ্ধে তাহাও ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। গত যুদ্ধে প্রতি নয় জনের মধ্যে এক জন যুগোশ্লাভ হত (মোট সংখ্যা ১৭,০৬,০০০ জন) ও উক্ত আনুপাতিক হিসাবে তিন জনের অঙ্গহানি হইয়াছিল। প্রধান প্রধান দেশগুলির যা লোকক্ষয় হইয়াছিল ইহা তাহার এক-তৃতীয়াংশ। ধন ও সম্পদ ক্ষয় হইয়াছিল ৯.১ মিলিয়ার্ড ডলার। ইহা উক্ত প্রধান জাতিগুলির মিলিত ক্ষতির ১৭শ শতাংশ। এখানে ৩৫ লক্ষাধিক লোক গৃহহীন হইয়াছিল এবং গবাদি পশু ও কৃষি-প্রতিষ্ঠানাদির ক্ষতিও হইয়াছিল যথেষ্ট। অধিকাংশ খনি, কারখানা ও বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্রাদি সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়াছিল।

কিন্তু ইহাতেও যুগোশ্লাভদের দৃঢ়তা এবং আত্মবিশ্বাস অটুট ছিল। তাহারা একদিকে যেমন আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছে, অন্য দিকে তেমনই সঙ্গে সঙ্গে দেশ পুনর্গঠনের কার্যে প্রাণপণে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। যখনই যে অংশ শত্রুকবলমুক্ত হইয়াছে তখনই সেখানে পিপ্‌লস কমিটি গঠন করিয়া উন্নয়নকার্য সুরু করিয়াছে। যুদ্ধের শেষের দিকে, ১৯৪৪ সনের শেষভাগে, সমগ্র জাতি নবোদ্যমে পুনর্গঠনের কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। কৃষকদের হাতে জমি দেওয়া হইয়াছে এবং শিল্প, ব্যাঙ্ক, যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও যানবাহন, বৈদেশিক বাণিজ্য প্রভৃতির জাতীয়করণ করা হইয়াছে। উপরন্তু ওয়ার্কার্স কমিটি (কর্ম্মীপরিষদ) গঠন করিয়া উদ্যোগ-ক্ষমতা বহুল পরিমাণে জনসাধারণের হাতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। কৃষক ও শ্রমিকদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ১৯৪৬ সনের মধ্যেই, অর্থাৎ যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর বৎসরাধিক কালের মধ্যে, দেশকে শিল্প, সম্পদ ও উৎপাদনের দিক দিয়া যুদ্ধপূর্ব অবস্থায় ফিরাইয়া আনা হইয়াছে।

অতঃপর ১৯৪৭ সনে প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়। অন্যান্য বহু কাজের মধ্যে প্রধানতঃ স্থির হয় যে, ১৯৫১ সনের মধ্যে ১৯৩৯ সনের তুলনায় জাতীয় আয় ১৩২ মিলিয়ার্ড হইতে ২৩৫ মিলিয়ার্ডে অর্থাৎ শতকরা ১৯৩ ভাগ এবং উৎপাদন ২০৩ মিলিয়ার্ড হইতে ৩৩৬ মিলিয়ার্ডে অর্থাৎ শতকরা ১৮০ ভাগ বৃদ্ধি করা হইবে।

কার্যতঃ বহু ক্ষেত্রেই চার বৎসরের মধ্যে উৎপাদন পরিকল্পনাকে ছাপাইয়া গিয়াছে। বিশেষজ্ঞ, বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনিয়ার তথা শ্রমিকের দারুণ অভাব থাক' সত্ত্বেও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কাছে তাহা তুচ্ছ প্রমাণিত হইয়াছে। বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া প্রধান প্রধান ক্ষেত্রে নিম্নরূপ ফল পাওয়া গিয়াছে :

	১৯৩৯	১৯৪৭	১৯৪৮	১৯৫০
	নিম্নভিত্তি	উৎপাদনের শতকরা হার		
কয়লা	১০০	১৫৭	৩৪২	২৬৫
সিসা ও দস্তা	১০০	১৮১	৩৩০	৪৭৯
লোহা ও ইস্পাত	১০০	১৬৭	২৬০	২৯০
তৈল	১০০	...	৬২৬০	...

[এতদ্ব্যতীত বিজলীশক্তি, রাসায়নিক ও গৃহনির্মাণ-দ্রব্য, কাঠ, কাগজ, বস্ত্র, চামড়া ও জুতা, রবার, খাদ্য, তামাক, ফিল্ম প্রভৃতি শিল্পে ১৯৪৬ সনে যেখানে উৎপাদন ছিল ২৬.৬ সেখানে ১৯৪৭, '৪৮ ও '৪৯ সনে যথাক্রমে ৪৬.১, ৭০.৮ ও ৪২.৬ উৎপাদন হইয়াছে। তাহা ছাড়া মোটরগাড়ী, ট্রাক্টর, বিজলী যন্ত্রপাতি ও বিজলী-উৎপাদক জেনারেটর প্রভৃতিও প্রস্তুত হইতেছে। এমন সব দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে যাহা ইতিপূর্বে যুগোশ্লাভিয়ায় কখনও তৈরি হয় নাই। রেলপথ, রাস্তাঘাট, রেলগাড়ী এবং অন্যান্য যানবাহন ও যোগাযোগ-ব্যবস্থা এবং চলাচলের ক্ষেত্রেও সমধিক উন্নতি হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন শহর ও স্বাস্থ্যকর বহু গৃহাদিও নির্মিত হইয়াছে এবং হইতেছে।

জনকল্যাণ ক্ষেত্রেও উন্নতি হইয়াছে অভূতপূর্ব। প্রথমতঃ সকলেরই ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা, অকাল মৃত্যু ও বৃদ্ধ বয়সের সংস্থান এবং রোগভোগকালীন সুব্যবস্থার জন্য সামাজিক বীমার (Social Insurance) ব্যাপক ব্যবস্থা হইয়াছে। বিনা খরচে চিকিৎসা এবং পেন্সন ও বিশ্রামের ব্যবস্থা হইয়াছে। জননী ও শিশুদের রক্ষার এবং রোগনিবারণের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। সকল বালকবালিকার জন্য বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং শতকরা আশী জন উচ্চশিক্ষার্থী সরকারের নিকট হইতে আর্থিক সহায়তা পাইয়া থাকে। প্রসূতিচর্যার ব্যাপক ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রসূতিকে সর্ববিধ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়, উপরন্তু সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে অতিরিক্ত অর্থ প্রসূতিকে দেওয়া হইয়া থাকে।

যুগোশ্লাভিয়ায় বেকার-সমস্যা সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়াছে বলা চলে। প্রকৃতপক্ষে সেখানে কাজের অভাব নাই, অভাব লোকের। কৃষকদের হাতে জমি দেওয়া হইয়াছে। সমবায় প্রথায় চাষ করিবার জন্য তাহাদিগকে নানা ভাবে উৎসাহ দেওয়া হয়। তবে ইহা স্বেচ্ছামূলক, বাধ্যতামূলক নহে।

সরকারী কৃষিবিভাগ হইতে কৃষকদের সব দিক দিয়া সাহায্য ও শিক্ষা দেওয়া হয়, সঙ্গে সঙ্গে প্রচারও করা হয়। ১৯৪৫ সনে মাত্র ৩১টি কৃষি সমবায় ক্ষেত্র ছিল। ১৯৫০ সনে তাহার সংখ্যা ৭০০০ হইয়াছে এবং সভ্যসংখ্যা ৩,৫০,০০০টি পরিবার। সমগ্র চাষের জমির শতকরা ২৬ ভাগ সমবায় ও সরকারী কৃষিক্ষেত্রের অন্তর্গত হইয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষেত্রের উদাহরণ দেখিয়া দ্রুত সমবায় কৃষিক্ষেত্রের প্রসার হইতেছে। কৃষি-যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইয়াছে। নদীতে বাঁধ বাঁধিয়া ব্যাপক সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থাও হইয়াছে। এক কথায় মাত্র সাত বৎসরের মধ্যে যুগোশ্লাভিয়া সকল দিক দিয়া যে উন্নতি করিয়াছে এবং দেশের মধ্যে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা অতুলনীয়।

ভারতের প্রশ্নই উঠে না। যে সোভিয়েট রুশিয়া আমাদের নিকট নিজ দেশের উন্নতির কথা সগৌরবে ঘোষণা এবং যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে অনর্গল প্রচার করিয়া চলিয়াছে সেই রুশিয়াতেই-বা কি হইয়াছিল? রুশ-বিপ্লবের পরবর্তী এক যুগ কাটিয়াছে ব্যর্থতা, দুঃখ, দুর্দশা, দুর্ভিক্ষ, অনাহার ও অপমৃত্যুতে। শিল্পোৎপাদনে অবনতি ত ঘটিয়াছিলই, কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদন নামিয়াছিল—১৯২০ সনে, ৫ কোটি টনে। অথচ যুদ্ধের পূর্বে সেখানে গড় উৎপাদন ছিল ৮ কোটি টন। তাই রুশিয়ার কর্ণধাররা পিছাইয়া দাঁড়াইয়া "নিউ ইকনমিক পলিসি" গ্রহণ করিয়াছিলেন। সর্বক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও লাভের পুনঃপ্রবর্তন করা হইয়াছিল এবং বিদেশী, এমন কি মাকিনী, আর্থিক সাহায্য পর্যন্ত গৃহীত হইয়াছিল। অপর দিকে আর্থিক অবনতির দরুন যে বিক্ষোভ দেখা দিতেছিল, তাহা দমন করিবার জন্য ব্যাপক ধরপাকড়, জরুরি "বিচার", হত্যা, দাস-শিবিরে অন্তরীণ প্রভৃতি এবং সর্বপ্রকার নাগরিক অধিকার হরণ করা হইয়াছিল। আজও তাহার শেষ হয় নাই।

কিন্তু তথাপি আজও যুগোশ্লাভ সরকার ও তথাকার কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দকে রুশিয়া ও কোমিনফর্ম রাষ্ট্রগুলি অবিরাম "দেশদ্রোহী", "ইঙ্গ-মার্কিন চর" প্রভৃতি আখ্যা প্রদানে কুণ্ঠা বোধ করিতেছে না। "ট্রটস্কিপন্থী"র মতই "টিটোপন্থী" শব্দটিও রুশ তথা কম্যুনিষ্ট ভাষায় এক গালিগালাজের পর্যায়ভুক্তও হইয়াছে।

১৯৪৮ সনের জুন মাসে "কোমিনফর্ম" হইতে যুগোশ্লাভিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টিকে বহিষ্কৃত করা হয়। অতঃপর কোমিনফর্ম সারা দুনিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টিকে যুগোশ্লাভ-সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিতে নির্দেশ দেয় এবং যুগোশ্লাভ কম্যুনিষ্টদিগকে তাহাদের সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে উস্কানি দিতে থাকে। যুগোশ্লাভিয়াকে ধ্বংস করিবার জন্য তথা রুশিয়ার কবলে আনিবার নিমিত্ত কোমিনফর্মের নির্দেশে সোভিয়েট রাষ্ট্রগোষ্ঠী তাহার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ ঘোষণা করিয়া সর্বপ্রকার লেনদেন বন্ধ করে। ইতিপূর্বে যুগোশ্লাভিয়ার বাণিজ্যের শতকরা ৬০ ভাগের অধিক এই সব রাষ্ট্রের সহিতই চলিত। এই বহির্বাণিজ্যের উপরই যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্য বহুল পরিমাণে নির্ভরশীল ছিল তাহা সোভিয়েটের অবিদিত ছিল না। তাই পরিকল্পনাকে বানচাল করিয়া সরকারকে পর্যুদস্ত করিবার অভিসন্ধিতেই আর্থিক অবরোধ করা হইয়াছিল। অন্যান্য রাষ্ট্রের মত যুগোশ্লাভিয়াকেও সোভিয়েট কল-কারখানার কাঁচামাল সরবরাহের উপযোগী কৃষিভিত্তিক ঘাঁটি হিসাবে রাখিতেই রুশিয়া চাহিয়াছিল। যুগোশ্লাভিয়া তাহা স্বীকার করিবে কেন! সেখানকার অধিবাসীরা আত্মশক্তির স্বাদ পাইয়াছে, তাহারা যে দুর্ধর্ষ জার্মান বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে। রুশিয়ার সহিত মৈত্রী তাহারা চায়, কিন্তু বশ্যতাস্বীকার করানো যাইবে কেন! তাই তাহাদের বিরুদ্ধে অবিরাম প্রচার, প্ররোচনা, সীমান্ত সংঘর্ষ সত্ত্বেও যুগোশ্লাভরা দমে নাই, তাহারা পরিকল্পনাকে সফল করিয়া তুলিয়াছে। ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি যদিও আপাততঃ স্পষ্টতঃ কোন বিরোধিতা করিতেছে না, কিন্তু সুবিধা পাইলে তাহারাও যুগোশ্লাভিয়াকে ছাড়িবে না। কেননা পুঁজি খাটাইয়া শোষণ করাই যাহাদের ধর্ম, তাহারা সমাজতন্ত্রী সরকারকে ঘায়েল করিতে সদাই জাগ্রত থাকিবে। ত্রিয়েস্ত তাহারই সূত্র—তাহাও যুগোশ্লাভিয়ার অজ্ঞাত নয়। পরোয়া না করিয়াই দৃঢ় পদে তাহারা আগাইয়া চলিয়াছে। তাই যুগোশ্লাভিয়া আজ বিশ্বের নিপীড়িত জাতিসমূহের নিকট এক নবতর উদ্দীপনার উৎস হিসাবে প্রতিভাত হইতেছে; যে সব অনুন্নত দেশ নূতন স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, যুগোশ্লাভিয়া তাহাদের পথের সন্ধান দিতেছে।

কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও একটি কথা ভুলিলে চলিবে না যে, রুশিয়ার মতই যুগোশ্লাভিয়াতেও কম্যুনিষ্ট পার্টি ব্যতীত আর কোন দল গঠন করার অধিকার নাই। উভয় কম্যুনিষ্ট পার্টিই মূলতঃ এক। ইহা একটি মূলগত প্রশ্ন। ইহারই উপর ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের তথা মনুষ্যসমাজের বিকাশ ও নিরাপত্তা নির্ভর করিতেছে। অবশ্য কার্যক্ষেত্রে রুশিয়ার শাসন-ব্যবস্থার সহিত এখানকার শাসন-ব্যবস্থার বহু পার্থক্য আছে। যুগোশ্লাভিয়ায় ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি স্বাধীনভাবে খাটাইবার সুযোগ আছে। তবে শেষ পর্যন্ত কোন্ দিকে যাইবে তাহাও দেখিবার বিষয়। আশা করা যায়, এ দিক দিয়াও যুগোশ্লাভিয়া পথপ্রদর্শক হইবে, বিশ্বের জনগণের সমষ্টিগত মঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হইবে।
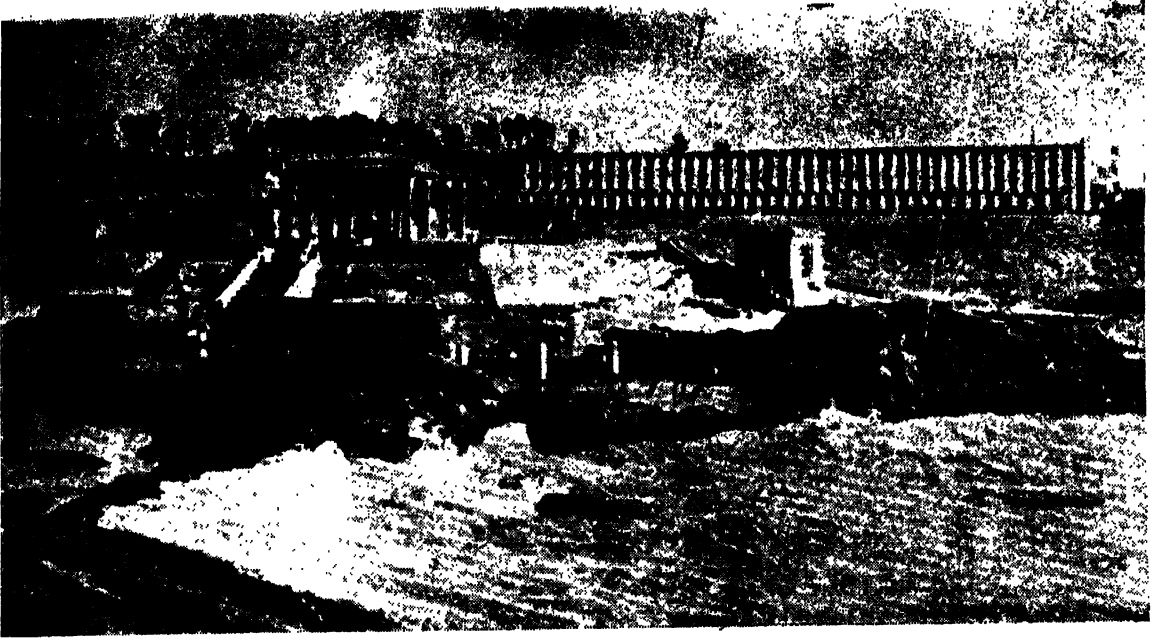
কুমারিকা অন্তরীপ

ত্রিবাঙ্কুরের রূপ

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

অপ্রত্যাশিত তো বটেই, যা দেখেছি তা অভাবনীয়। জনশ্রুতি বলে দক্ষিণ-ভারত মন্দিরের দেশ। অন্ততঃ ও দেশ থেকে ফিরে এসে যাঁরাই নিজেদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন তাঁরাই লিখেছেন মন্দিরের কথা। আমরাও মন্দির দেখবার আশা নিয়ে কলকাতা থেকে যাত্রা করেছিলাম। ভেবেছিলাম কেবল হিন্দুর ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য বিদ্যার জলন্ত নিদর্শনই নয়, মুসলমান ধর্ম্মের ছোঁয়া বাঁচিয়ে যে হিন্দু সংস্কৃতি ঐসব মন্দিরের চারিদিকে শত শতাব্দীর পরেও অক্ষুণ্ণ পবিত্রতায় সগর্ব্বে ও সগৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বলে শুনেছি তাই দেখে চর্ম্মচক্ষু সার্থক করব। প্রার্থিত বস্তুর দর্শন-লাভ ভাগ্যে ঘটে নি এমন কথা বলতে চাই নে। কিন্তু উপরি যা দেখেছি তাই মনে গাঁথা হয়ে রয়েছে।

মন্দির নয়, প্রকৃতি। অন্ততঃ ত্রিবাঙ্কুরের বৈশিষ্ট্য ও আকর্ষণ রাজ্যস্থ মন্দিরের মধ্যে ততটা নেই যত আছে তার অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদে,—তার তাল-নারিকেল-কদলীকুঞ্জের শ্যামলিমায়, মেঘচুম্বী পর্ব্বতমালার প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যে, শ্বাপদসঙ্কুল দুর্ভেদ্য অরণ্যের নিবিড় অন্ধকারে আর কন্যাকুমারীর মন্দিরের পাদমূলে সম্মিলিত তিন সমুদ্রের মর্ম্মতল থেকে উচ্ছ্বসিত প্রার্থনা-সঙ্গীতের অন্তহীন মূর্চ্ছনায়।

বাঙালী কেন, পূর্ব্ববঙ্গবাসী হয়েও স্বীকার করতে একটুও দ্বিধা নেই যে ত্রিবাঙ্কুরে যে সবুজের সমারোহ দেখে এসেছি বাংলার মনোমুগ্ধকর শ্যামলিমা তার কাছে হার মেনে যায়।

ঢোকবার মুখেই আভাস পেয়েছিলাম। সাদার্ণ রেলওয়ের শেনকোটা ষ্টেশন ছাড়তেই দূরের পাহাড় এগিয়ে আসছে মনে হ'ল। সেটা অবশ্য চোখের ভ্রম। ভাল করে বুঝলাম যখন আমাদের গাড়ীখানা গিয়ে একেবারে পাহাড়ের কুক্ষির মধ্যে ঢুকে পড়ল। এটা বাক্যের অলঙ্কার নয়, বাস্তব সত্য। গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নের খর রৌদ্রও দেখতে দেখতে যখন অমানিশার গভীর অন্ধকারে রূপান্তরিত হয়ে গেল তখন বুঝলাম যে পাহাড়ের ভিতর দিয়ে সুড়ঙ্গ কেটে রেলগাড়ীর জন্য পথ করা হয়েছে। সহযাত্রীরাও বুঝিয়ে বললেন, মাদ্রাজ থেকে ত্রিবাঙ্কুরে প্রবেশ করছি আমরা, গাড়ীর পিছনে আর একখানি ইঞ্জিন লাগানো হয়েছে, গাড়ী সমতল ছেড়ে ইতিমধ্যেই পাহাড়ের গা বেয়ে অনেক উঁচুতে উঠে গিয়েছে। কি যে ঘটেছে তা মিনিট দশেক জঠরে অবস্থানের যন্ত্রণা ভোগ করে বাইরে এসে দিনের আলোকে পাহাড়ের উজ্জ্বল প্রকৃতির রূপ দেখে ঠিক বুঝতে পারলাম।

পাহাড়ের গা বেয়ে সাপের মত এঁকে বেঁকে গাড়ী চলেছে। এক একটা বাঁক এত ছোট যে কামরার জানালার ভিতর দিয়ে মুখ বাড়িয়েই সামনের ইঞ্জিনখানি বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। ডান দিকে পাহাড়,—কেটে দেয়ালের মতই মসৃণ করা হয়েছে। কত উঁচু তা গাড়ীর ভিতর থেকে বুঝবার জো নেই। বাম দিকে খাদ। বেশ গভীর। তবু মাটি দেখা যায়। খাদের যেখানে শেষ সেখান থেকে আবার আর একটা পাহাড় উঠেছে। মাদুরা ছাড়বার পরেই দিক-চক্রবালে যে পাহাড় চোখে পড়েছিল তা মনে হয়েছিল নগ্ন পাথর।

তারই কোলের উপর এসে ভুল ভাঙল। দেখলাম যে পাহাড় নিরাবরণ তো নয়ই, তৃণ-গুল্ম-মহীরুহের রাজকীয় সজ্জায় সমৃদ্ধ। হঠাৎ চোখের সামনে ঝলক দিয়ে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল কৃষ্ণচূড়ার ছোট খাটো একটি উপবন। শাখায় শাখায় ফুল,—পাথরের কালি আর অরণ্যের শ্যামলিমার পটভূমিকায় আরও বেশী লাল। সে কি রক্ত না আগুনের শিখার মত? সহযাত্রী লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি বন্ধুও উৎসাহ ও উত্তেজনায় প্রায় আসন থেকে লাফিয়ে উঠে চেঁচিয়ে বললেন,—অতুলনীয়।
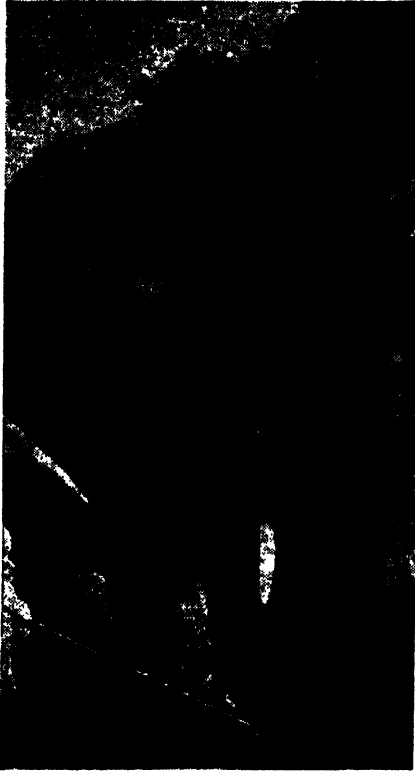
বন্য হস্তী

কিন্তু পট তখন কেবল উঠছে। সামনে স্তরে স্তরে অপেক্ষা করছে অভাবনীয় সৌন্দর্য্য, বিপুলতর বিস্ময়। কৃষ্ণচূড়ার উদ্ধত সৌন্দর্য্যের বিদ্যুদ্দীপ্তিতে ঝলসানো চোখ দুটিকে জুড়িয়ে দিয়ে হাজারখানেক ফুট নীচের উপত্যকায় ফুটে উঠল অদৃষ্টপূর্ব্ব সবুজের সমারোহ। সমান্তরাল দুটি পাহাড়ের মাঝখানে নাতিপ্রশস্ত সমতল ভূমিতে ধানের চাষ হয়েছে :—প্রকৃতির স্নেহ আর মানুষের শ্রমস্পর্শে পাথরের বুক চিরে কচি কচি ধানের চারা মাথা চাড়া দিয়ে জেগে উঠেছে, ঘোষণা করছে দুর্জ্জয় প্রাণের সার্থক বিজয়-অভিযান। অত উঁচু থেকে ক্ষেতের সঙ্গে ক্ষেতের পার্থক্য যদিও বা আবছায়া ভাবে বোঝা যায়, চারা ও চারার দূরত্ব বা চারার সঙ্গে চারার পার্থক্য একেবারেই চোখে পড়ে না। মনে হয়, ক্ষেত তো নয়, সবুজ, মসৃণ এক একখানি গালিচা পাতা রয়েছে। যেখানে ধানের ক্ষেত নাই সেখানে কদলী বা নারিকেলকুঞ্জ। ওদের পাতাও কচি ধানের পাতার মতই সবুজ, হয়তো বা তেমনই কোমল। কুঞ্জের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে চোখে পড়ে লাল টালির ছাদওয়ালা ছোট ছোট ঘর বা গৃহসমষ্টি। গড়ন বাংলার দোচালা ঘরের মত, কিন্তু দুটি চালকে যোগ করেছে যে আবরণ সেটা দেখতে কতকটা ডিঙ্গি-নৌকার মত। কোন কোন ঘরের টালির ছাদ গোলাকার—বর্ম্মা-মুলুকের প্যাগোডার মত দেখতে। আড়ম্বর নেই, উদ্ধত আত্ম-প্রচার নেই, কিন্তু অপূর্ব্ব সুন্দর।

এই হ'ল গিয়ে ত্রিবাঙ্কুরের ভূমিকা।

হঠাৎ প্রস্তরফলকে বড় বড় ইংরেজী অক্ষরের লেখা চোখে পড়ল, "ঘাট-অংশের অবসান" অর্থাৎ—পাহাড়-কাটা পথের শেষ হয়ে এল। নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসলাম—হঠাৎ স্বপ্নমধুর ঘুম ভেঙে জেগে উঠলাম যেন।

মুগ্ধ হয়েছিলাম নিশ্চয়ই, কিন্তু খুব বেশী বিস্মিত হই নি। একেবারে নূতন দৃশ্য নয়। ছোটনাগপুরের পাহাড়ের গা ঘেঁষা আঁকা-বাঁকা পথে রেলগাড়ীতে ভ্রমণ করেছি। এই সেদিনও বোম্বাই থেকে পুণা এবং পুণা থেকে আবার বোম্বাই আসতে অধিত্যকা-উপত্যকার ভীষণ মধুর সৌন্দর্য্য চোখভরে দেখে এসেছি, সুড়ঙ্গের পর সুড়ঙ্গের সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে বসে দিশাহারা হয়ে আধুনিক বিশ্বকর্ম্মাদের শক্তি ও শিল্পনৈপুণ্যের তারিফ করেছি। শুধু তাই নয়, জলপাইগুড়ি জেলায় দুয়ার অঞ্চলে সংরক্ষিত অরণ্যের ভয়ঙ্কর রূপও চোখে দেখা আছে। এ সবের তুলনায় এমন কি-ই বা আর দেখেছি। উচ্চতা তো মাত্র ১৩০০ ফুট। আর পথের দৈর্ঘ্য মাইল ত্রিশেকের বেশী নয়। যা দেখে এলাম তার প্রায় সবই তো আগের দেখা দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি মাত্র!

ভাবনা এই পথে চললেও মন ঠিক সায় দিলে না—পরিচিত অনেক কিছু দেখলেও অদৃষ্টপূর্ব্ব বিশেষ কিছুও নিশ্চয়ই দেখেছি। খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই অবাধ্য মন সায় পেয়ে গেল যেন। আবার চোখে পড়ল অদৃষ্টপূর্ব্ব সবুজের সমারোহ।

বেশ বুঝতে পারছিলাম গাড়ী তখনও নামছে। রেলপথের দুই ধারে যা চোখে পড়তে লাগল তা আর পাহাড় নয়, টিবি। তারই ঢালু গায়ে লাল টালির দোচালা ঘর। সংখ্যায় বেশী নয়। আট-দশখানা ঘর বা বাড়ী নিয়ে এক একখানি গ্রাম। অগণিত কদলীর ঝাড় আর নারিকেলের কুঞ্জ পরম স্নেহে তাকে ঢেকে রেখেছে।

মাঝে মাঝে গাড়ী থামতে লাগল। ছোট ছোট ষ্টেশন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আপিস ঘরের আধখানা চালাও কলা বা নারিকেলের পাতার আবরণে আধ-ঢাকা। ষ্টেশনে প্রচুর খাদ্য ও পানীয়। চা ও কাফি তো আছেই, তা ছাড়া বন্ধ বোতল বা ঢাকনি-ঢাকা গ্লাসে লেমনেড জাতীয় পানীয়। কেউ কেউ হেঁকে যাচ্ছে আঙুরের রস—অবশ্য কৃত্রিম।

কৃত্রিমতা নেই কেবল কলে। প্রতি ষ্টেশনেই প্রচুর আম ও কলা নজরে পড়তে লাগল। কত যে বর্ণ আর গড়ন সেই সব কলার তার আর ইয়ত্তা নেই। হলুদ আর সবুজ রঙ তো আছেই, তার উপর লাল রঙের কলাও চোখে পড়ল কাঁদি কাঁদি। ঠিক লাল নয়,—পূর্ব্ববঙ্গে যাকে সিঁদুরে আম বলে তার যা বর্ণবিন্যাস তারই প্রতিরূপ।

নেই কেবল ডাব। শুধু শেনকোটা থেকে ত্রিবান্দ্রমের পথেই নয়—ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের ভিতরে হাজার মাইলেরও বেশী পথ হয় ট্রেনে, নয় মোটরগাড়ীতে ভ্রমণ করেছি, কিন্তু পাতি পাতি করে অনুসন্ধান করে কোথাও একটি ডাব পাই নি। এত বেশী যে দেশে নারিকেলের গাছ এবং নারিকেলের উপচার ছাড়া যে দেশে
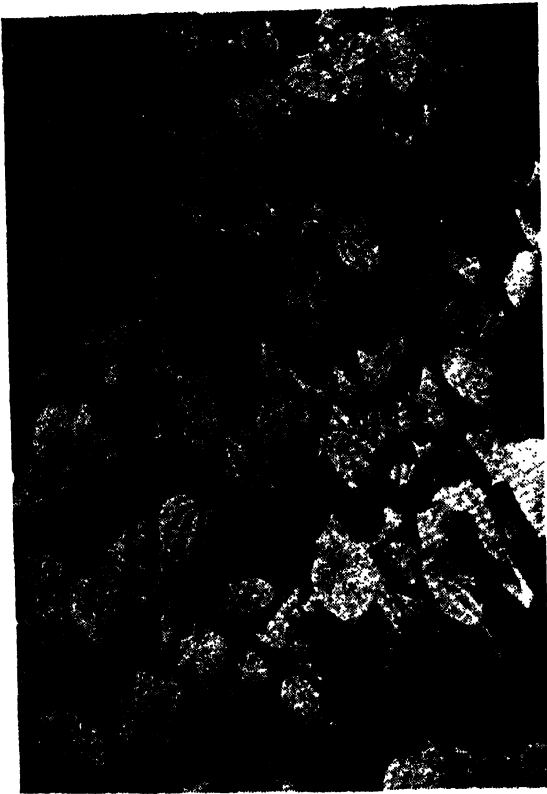
মরিচের ক্ষেত

চাটনি পর্য্যন্ত রাখা হয় না সে দেশে পান করবার জন্য কেন ডাবের জল পাওয়া যায় না তা ভেবে বিস্মিত হয়েছিলাম। পরে বুঝতে পেরেছি যে কারণটা অর্থনৈতিক। নারিকেল ও দেশের অন্যতম প্রধান সম্পদ। কাঁচা অবস্থায় জলের জন্য একটি ফল কেটে ফেললে উৎপাদকের আর্থিক লোকসান হয়; জলের জন্য যে মূল্য পাওয়া যেতে পারে তাতে সম্পূর্ণ ক্ষতি পূরণ হয় না।

কুইলন ষ্টেশন (শেনকোটা থেকে প্রায় ষাট মাইল) পার হবার পর দৃশ্যপটের পরিবর্ত্তন হ'ল। পাহাড় আর চোখে পড়ে না, এমন কি টিবিও নয়। ইতিপূর্ব্বে মাটির রঙ লক্ষ্য করেছিলাম

পল্লীভাসল জলপ্রপাত

কোথাও লাল কোথাও কালো। এখন মনে হ'ল যে মাটিই আর দেখা যাচ্ছে না। রেলপথের ডান দিকে কেবলই বালি। বাম দিকে মনে হ'ল বালির সঙ্গে মাটির কিছু মিশাল আছে। রেলগাড়ীর গতিও ক্রমশঃই কমে আসছিল। অনুমান করলাম যে আমরা পাহাড় ছেড়ে কেবল সমতল ভূমিতেই নেমে আসি নি, সমুদ্রের পারে, আরব সাগরের প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছি।

কিন্তু ঐ বালির উপরেই প্রাণলীলার যে অভিব্যক্তি চোখে পড়ল তা দেখে বিস্ময় আর আনন্দের সীমা রইল না। বালির সঙ্গে মরুভূমির ধারণা আমাদের মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে। বালিকে আমরা মনে করি নিষ্ফলতার প্রতীক। কিন্তু ত্রিবাঙ্কুরের রাজধানী ত্রিবান্দ্রমের কাছাকাছি এসে নিছক বালির শয্যার উপরেই সবুজের যে বিপুল সমারোহ চোখে পড়ল তা গঙ্গা বা পদ্মার উপকূলেও খুব বেশী দেখা যায় না। সেই নারিকেল আর কদলীর উপবন। দু'দিকেই বসতি—ডান দিকে কম, বাম দিকে বেশ ঘন। টালির ঘরের পাশে পাশে নারিকেলের পাতার ছাওয়া কুঁড়েঘরের আবির্ভাব হয়েছে—নগরের উপকণ্ঠে অনিবার্য্য ধনবৈষম্যের নিদর্শন। কিন্তু কলা আর নারিকেল গাছের সংখ্যার সঙ্গে ঘর বা বাড়ীর সংখ্যার কোন তুলনাই হয় না। আরও নানা জাতীয় গাছ, ঝোপ ঝাড় চোখে পড়ল। মনে হ'ল যে গাছই এদেশের নিয়ম, মানুষ বা তার বাসগৃহ নিয়মের ব্যতিক্রম।

কি লম্বা নারিকেলগাছ আর কেমন সুপুষ্ট, সতেজ তাদের পত্রগুচ্ছ। হাতচারেক ফাঁকে ফাঁকে এক-একটি গাছ আর দু'ধারেই এই সযত্ন-রোপিত নারিকেল গাছের সারি চলেছে। সামনে, দক্ষিণে, বামে—যত দূর দৃষ্টি চলে তত দূরই ঐ একই দৃশ্য।

কোভালামের দৃশ্য
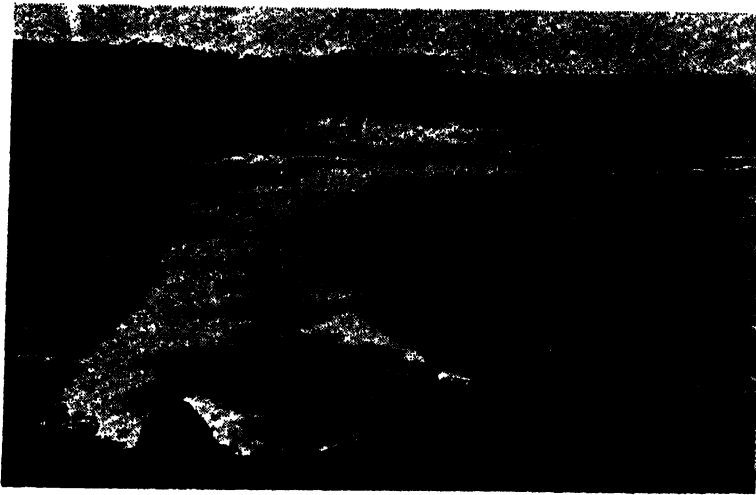
উপরে গাছের মাথায় মাথায়, পাতায় পাতায় মেশামেশি। নীচে ছোট ছোট ঘরের টালি বা পাতার চালের উপর শ্যামল পল্লবের স্নিগ্ধ ছায়া। আঙিনায় রোদ টুকরা হয়ে তেরছা হয়ে যদিও বা এসে পড়েছে, তাতে উত্তাপ একেবারেই নেই—আসার একমাত্র উদ্দেশ্যই যেন সোনালী রোদের আলপনা দিয়ে দেয়াল ও উঠানকে সাজিয়ে দেওয়া। কদলীকুঞ্জের নীচে আলো-ছায়ার লুকোচুরি খেলা চলছে।

জ্ঞান হয়ে অবধি কতবার পড়েছি বাংলার পল্লীর ছন্দমধুর বর্ণনা—'ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি'। সেদিন মনে হ'ল ঐ বর্ণনার যাথার্থ্য এই সুদূর প্রবাসে এসে গভীরভাবে উপলব্ধি করলাম।

একে দু'দিকেই বালি, তায় দিগন্ত পর্যান্ত নারিকেল আর কদলীর বীথি, ওদিকে আবার রাজধানী ত্রিবান্দ্রম শহর ক্রমেই এগিয়ে আসছিল। সুতরাং নিঃসংশয়েই বিশ্বাস করেছিলাম যে পাহাড় পার হয়ে সমতলভূমিতে এসে পড়েছি, দেখতে পেয়েছি ত্রিবাঙ্কুরের অনবগুণ্ঠিত আসল রূপ।

সে যে কত বড় ভুল তা পর দিন দিবালোকে ত্রিবান্দ্রম শহর দেখেও বুঝতে পারি নি। বুঝলাম অপরাহ্ণে রাজ্যের সংবাদ-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে।

মন্ত্রীমহোদয় সাংবাদিক সম্মেলনের সভাপতি ও প্রতিনিধিবৃন্দকে অভ্যর্থনা করবার জন্ত এক চায়ের মজলিশের আয়োজন করেছিলেন। স্থানটি ভূতপূর্ব্ব মহারাজার অন্ততম প্রাসাদ—বর্ত্তমানে রাজ্য সরকারের অতিথি-ভবন। সরকারী-পরিবহন বিভাগের দুখানি জমকালো বাস এসে আমাদের নিয়ে গেল। গোড়াতে তেমন অসাধারণ মনে হয় নি—ঢেউ-তোলা পথ কত শহরেই ত আছে। প্রকাণ্ড দেউড়ী পার হয়ে বড় বড় কাঁকর-বিছানো প্রশস্তপথ বেয়ে বাস যখন উপরের দিকে উঠতে আরম্ভ করল তখনও তেমন সচেতন হই নি। মনে করেছিলাম যে সামন্ততন্ত্রের যিনি ধারক ও বাহক, লক্ষ লক্ষ প্রজার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা প্রবলপ্রতাপ সেই মহারাজার প্রাসাদ একটু উঁচুতে ত হবেই। কিন্তু বার কয়েক ঘুরপাক খেয়ে প্রাসাদের প্রাঙ্গণে বাস থামবার পর নীচে নেমেই যা দেখলাম তাতে আগের দিনের ভুল ত ভাঙলই, সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত অন্তরখানি এক নিমেষেই জলদদর্শন মুগ্ধ ময়ূরের মত নেচে উঠল।

সে সত্যই অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্য।

আমাদের ডান দিকে অনেক দূরে আরব সাগরের নীল জল অস্তোন্মুখ সূর্য্যের সোনালী আলোকে চিক চিক করে জলছে। বাকি তিন দিকেই পাহাড়। না, ত্রিবাঙ্কুর সমতল ভূমি মোটেই নয়।

যতদূর দৃষ্টি চলে পাহাড়ের পর পাহাড়। ছোট বড়র পার্থক্য নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু পাহাড় সবই। আমরা যে দাঁড়িয়ে আছি সে-ও পাহাড়—তুলনায় সবচেয়ে উঁচু নয়, কিন্তু বেশ উঁচু। অসংখ্যের অন্ততম সে। একটির যেখানে শেষ অপরটির সেখানে আরম্ভ। দূরের সমুদ্র প্রত্যক্ষ দর্শনের বিষয়বস্তু না হলে বলতাম যে এর যেটুকু সমতল বলে মনে হয় তা অধিত্যকা—অপেক্ষাকৃত নীচু পাহাড়ের চওড়া মাথাটা। যেদিকে তাকাই, সেদিকেই দেখি অন্তহীন পর্ব্বত-শ্রেণী স্তরে স্তরে সাজান রয়েছে।

কিন্তু এগুলি যে পাহাড় তা অনুমান-সাপেক্ষ। প্রত্যক্ষ দর্শনের বিষয়বস্তু পাথর নয়, ঘন সবুজের বিচিত্র প্রাণচঞ্চল অভিব্যক্তি। আর সেই জন্তই অভিজ্ঞ চোখেও মায়া-কাজলের বিহ্বলতা, মোহ-মুক্ত সাংবাদিকের সমালোচনাপ্রবণ চিত্তেও অদৃষ্টপূর্ব্ব অভিনবত্বের মাতাল করা উপলব্ধি।

এও সমুদ্র—জলের নয়, বর্ণের। সবুজের সমুদ্র অতীতের কোন এক দুর্য্যোগময় দিনে ঝঞ্চার কষাঘাতে অসংখ্য তরঙ্গ তুলে গর্জ্জে উঠে সন্ধ্যার প্রাক্কালে অস্তোন্মুখ সূর্য্যের ক্ষণিক আত্ম-প্রকাশের মুহূর্ত্তে না জানি কোন যাদুকরের মন্ত্রসঙ্কেতে অকস্মাৎ স্তব্ধ, নীথর হয়ে গিয়েছিল। আজ যেন সেই ঘনীভূত সবুজের সমুদ্রকেই প্রত্যক্ষ করলাম।

সেই ঘনবিন্যস্ত নারিকেল আর কদলীকুঞ্জের চোখ জুড়ান শ্যামলিমা। উপর থেকে দেখে মনে হ'ল যে ওর মধ্যে সূচী প্রবেশ-যোগ্য ফাঁকও বোধ করি নেই। অমন যে রাজধানী ত্রিবান্দ্রমের বিলাতী গড়নের বিরাট এক একটি অট্টালিকা, নিরবচ্ছিন্ন শ্যাম শোভার ঘন আস্তরণের নীচে তাও অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

পল্লী নয়, জনপদ নয়। সঙ্গের এক কল্পনাকুশল বন্ধু বললেন, ত্রিবাঙ্কুর দেশটাই এক নিরবচ্ছিন্ন কুঞ্জ।

মিথ্যা নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু অসম্পূর্ণ সত্য। প্রমাণ মিলল, দিন

দুয়েক পর। ত্রিবাঙ্কুর ছাড়বার পর বুঝতে পারলাম যে প্রকৃতি এদেশে যেমন চটুল তেমনি ভয়ঙ্করও।

রাজ্য সরকারের প্রচার অধিকর্তা বললেন সরকারী পশুসদনের (পশুশালা নয়) কথা, যেখানে বন্য পশুদিগকে রক্ষা করার জন্য শিকারীর প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়েছে, পশুদিগকে দেওয়া হয়েছে নির্ভয়ে স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে স্বাধীন, মুক্ত জীবনযাপন করবার নিরঙ্কুশ অধিকার। কথাটা বলেই নিরস্ত হলেন না তিনি, সরকারের তরফ থেকে রীতিমত আমাদের নিমন্ত্রণ করলেন ঐ পশুসদন দেখতে।

উৎসাহ ও প্রত্যাশায় অধীর হয়ে উঠল মন। এই কিছুদিন আগেই আমাদের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজবাহরলাল নেহেরু ঐ পশুসদন দেখতে গিয়েছিলেন; আমরা সাংবাদিকরা সব কাগজেই খুব ফলাও করে ছেপেছিলাম সেই খবর। কি যে ছেপেছিলাম তা তেমন মনে এল না, কিন্তু চকিতে মনে পড়ে গেল ইংরেজী সাময়িকপত্রে পড়া আমেরিকার জাতীয় পার্কের বিবরণ, রূপালী পর্দার উপরে দেখা টার্জ্জন জাতীয় ছবিতে নানা রকম বন্য জন্তুর আরণ্য জীবনসুলভ সহজ স্বচ্ছন্দ বিচরণ ও আহার অন্বেষণের অসংখ্য চিত্র। শোনা কথা যে পর্দার ছবি তুলবার জন্য ত বটেই আর কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্যও অনেক পরিব্রাজকই ঐ সব পশুসদনে গিয়ে বন্য-জীবনের সহজ অভিব্যক্তি দু'চোখ ভরে দর্শন করে আসেন। নিজের কল্পনাও উদ্দাম হয়ে উঠল, কবির রচনাকে মনের মত রূপান্তরিত করে মনের আশাকে প্রকাশ করে ফেললাম—হরিণ সাথে হরিণী আসি চাহিবে দীন নয়নে, বাঘের সাথে আসিবে বাঘিনী। দেশে কাজের তাড়া থাকলেও এত বড় একটা সুযোগ হারাতে মন চাইল না, অনেক দেখা জিনিস নূতন করে দেখতে হবে জেনেও—যেমন নদীর বাঁধ, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ইত্যাদি—অন্যথা পশুসদনে পশু জীবনের পাশবিকতাকে প্রত্যক্ষ করবার আশায় সুদীর্ঘ চার দিন সফর করতে সানন্দে রাজী হয়ে গেলাম।

সন্ধ্যার পরেই যাত্রা করবার কথা ছিল, কিন্তু গাড়ী যখন ছাড়ল তখন প্রায় বারটা বাজে। কার্য্য-কারণের সুদীর্ঘ শৃঙ্খলের সে-ও একটা অর্থময় গ্রন্থি। রাত্রির রূপ দেখবার চোখ যার নেই সেও রাতের ত্রিবাঙ্কুর দেখবার সুযোগ পেয়ে গেল।

কত বড় এবং কত গভীর সত্যই না দ্বিজেন্দ্রলাল চন্দ্রগুপ্ত

মুন্নার

নাটকের প্রথম দৃশ্যেই তাঁর কল্পনাসৃষ্ট সেকেন্দর শাহকে দিয়ে বলিয়েছিলেন—"কি বিচিত্র এই দেশ!" নিতান্তই ছোট শহর ত্রিবান্দ্রম। সরকারী বাস খোলা পথ পেয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যেই তাকে পিছনে ফেলে কোটায়ামের দিকে এগিয়ে চলল। কিন্তু তাকে ছাড়তে পারলাম না—না শহর, না জাগ্রত জীবন।

দুপুর রাত; পথে আমাদের দুখানা বাস ছাড়া আর কোন যান-বাহন নেই; বাসের ভিতরে খাড়া বসেও আমাদের চোখ ঘুমে ঢুলু ঢুলু। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে পথ দিয়ে লোক চলেছে। চার পাঁচ জনের ছোটখাটো এক একটি জটলা,—একক পথিকও অনেক চোখে পড়ল। কারও হাতেই লণ্ঠন নেই। তার চেয়েও আশ্চর্য্য ব্যাপার—কারও হাতেই অস্ত্রশস্ত্র তো দূরের কথা, এক গাছা লাঠি পর্য্যন্ত নেই। হঠাৎ চোখের সামনে ঝলসে উঠল রাশি রাশি আলো। গঞ্জের মত একটু জায়গা। পথের দু'ধারে দোকান-পাট। সবই খোলা,—পানের দোকান, কাফিখানা তো বটেই, মুদী দোকান পর্য্যন্ত। কাফিখানায় লোকজন বসে খানাপিনা করছে। প্রায় দোকানেই বিজলীর আলো। যার নেই, তার কেরোসিনের ডে-লাইট।

ঠিক এমনই গঞ্জ চোখে পড়তে লাগল পনের-কুড়ি মিনিট পরে পরেই। আলোয় ঝলমল, লোকজনের চলাফেরায় কথাবার্ত্তায় সরগরম। রেলগাড়ীতে চলতে গিয়ে দেখেছি, রাত বারোটার পর অনেক বড় ষ্টেশনেও এক কাপ চা-ও পাওয়া যায় না। ত্রিবাঙ্কুরের এই মোটর চলার পথে একেবারে তার বিপরীত। আমার সহযাত্রী কেউ কেউ চা-কাফি তো বটেই, দু'একজন ভরপেট ইডলী-ডোসা খেয়ে নিলে।
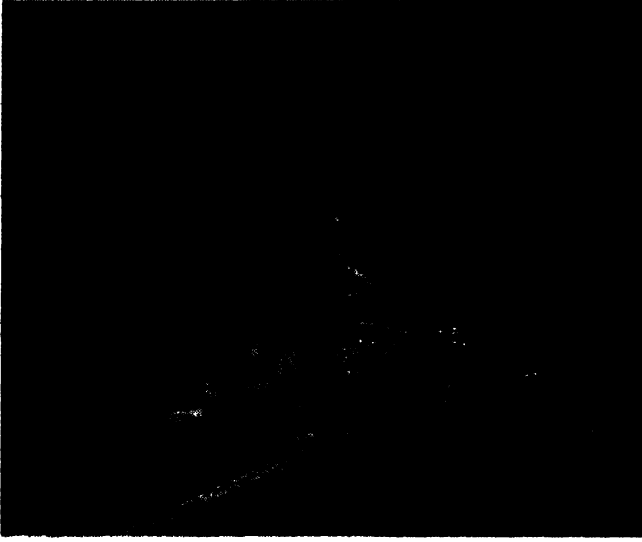
পণ্ডসদনের পথ

মাঝে মাঝে চোখে পড়ল, হয়তো একটিমাত্র দোকান। সম্পূর্ণ খোলা, আলো জ্বলছে। কিন্তু দোকানী নিজে ঘুমিয়ে পড়েছে। একক পথিকের থালি হাতে পথ চলার দৃশ্যের সঙ্গে মনে মনে মিলিয়ে অনুমান করতে বাধ্য হলাম, এদেশে চোর-ডাকাতের ভয় নিশ্চয়ই খুব কম।

কোটায়াম পর্য্যন্ত পথ ঐ একরকম। খানিকটা হয়তো একেবারে নির্জ্জন, পথের দু'ধারে স্তূপীকৃত অন্ধকার। কিন্তু তার পরেই কোলাহলমুখর এক একটি গঞ্জ। এরই একটি জায়গায় গাড়ী থামলে একেবারে থ' হয়ে গেলাম—কম করেও শ' পাঁচেক লোকের ভিড়ে জায়গাটি গম গম করছে। খোঁজ নিয়ে জানলাম যে সেইমাত্র একটি জনসভা শেষ হয়েছে,—ক'দিন পরেই পঞ্চায়েতের নির্ব্বাচন কি না, তাই!

আশ্চর্য্য এ দেশের জনসচেতনতা!

কোটায়ামের সরকারী বিশ্রাম-ভবনের প্রাঙ্গণে এসে বাস যখন থামল তখন রাত প্রায় তিনটা। বেশ বড় বাড়ী, অনেকগুলি ঘর, দামী সুসজ্জিত আসবাব পত্র—আমাদের এদিকের ডাক-বাংলোর তুলনায় রাজপ্রাসাদ আর কি। কিন্তু আমরা দলে ভারী—সংখ্যায় প্রায় চল্লিশ জন। সুতরাং অধিকাংশকেই ধরাশয্যা গ্রহণ করতে হ'ল। কেউ কেউ নিজের বিছানাটা পেতে নিলে, কারও আবার তারও তর সইল না। ঘণ্টা দুয়েক তো শোওয়া, তার জন্য আবার?—এমনি মনের ভাব।

ভোরের চা বিশ্রাম-ভবনেই পাওয়া গেল। প্রাতরাশ মিলল চলতি পথে গাড়ী থামিয়ে শহরের এক কাফিখানায়। সম্পূর্ণ স্বদেশী ব্যবস্থা। নিরামিষ তো বটেই, তার উপর একেবারে স্থানীয় প্রাতরাশ। কিন্তু এ কয়দিনে আমাদের অনেকেই ইডলী-ডোসার সঙ্গে প্রায় প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন। যাঁরা পড়েন নি, বা না পড়বার ভান করছিলেন তাঁরাও পরিমাণে নিতান্ত কম খেলেন না। তার পরেই আবার যাত্রা সুরু হ'ল।

শহর ছাড়তেই আবার ত্রিবাঙ্কুরের সেই বিশিষ্ট রূপ। সমতল ভূমি কি পার্ব্বত্য অঞ্চল হলপ করে বলবার জো নেই। জনপদ না বলে উপায় নেই, কিন্তু অরণ্য বললেও সত্যের অপলাপ করা হয় না। খটখটে পথ দিয়ে তর তর করে গাড়ী ছুটে চলেছে, চোখে পড়বার মত বাঁক একটাও নেই। পথের দু'ধারেই সারি সারি ঘর—অধিকাংশই একতলা, আকারে ছোট, উপরে টালি বা পাতার চাল। কিন্তু ফাঁকা যা, তা ঐ পথটুকু। পথের দুদিকেই গাছ। সেই নারিকেল আর কদলী তো আছেই তা ছাড়া আরও অনেক জাতীয় গাছ,—নারিকেল গাছের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখবার জন্যই যেন আকাশের দিকে অনেকটা এগিয়ে গিয়ে তার পর ডালপালা বিস্তার করেছে। এমন একখানা ঘর চোখে পড়ে না যা আকাশের নীচে, গাছের নীচে নয়। এ সব ঘরের প্রাঙ্গণে রোদ আসে ভয়ে ভয়ে, চুপি চুপি,—অভিভাবকের শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে অমনোযোগী দুষ্ট ছেলের স্কুল পালানো খেলার সাথীর মত। ছায়া এখানে অন্ধকারের সমগোত্রীয়। আর দিগন্ত? সে যে এখানে দর্শনের বস্তুই নয়। চোখের দৃষ্টি বার বার ব্যাহত হয়ে কেমন যেন পীড়া বোধ করছিল —যদিও যাতে বাধা পাচ্ছিল তার রং প্রায় অবিশ্রান্ত রকমেই সবুজ।

একজন সহযাত্রী বলেই ফেললেন, কেমন যেন একঘেয়ে মনে হচ্ছে।

একঘেয়ে কেন?

সেই এক নারিকেল আর কদলীর সমারোহ কি না! ত্রিবাঙ্কুরে ঢুকে অবধিই তো দেখছি!

বাঃ রে, তা কেন?—স্থানীয় যিনি সঙ্গে যাচ্ছিলেন তিনি ভ্রম ভেঙ্গে দিলেন। চিনিয়ে দিলেন রবার আর সেই গোলমরিচের গাছ যার প্রবল আকর্ষণে প্রতীচ্যের প্রলুব্ধ বণিক সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আমাদের দেশে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন।

আর কেবলই কি রবার ও গোলমরিচ? পরিচিত বলেই হয়তো এতক্ষণ যা আমাদের নজর এড়িয়ে গিয়েছিল সেই আম আর কাঁঠালের গাছ,—ফলের ভারে নুয়েই পড়ছে যেন। বসতি থেকে আরও একটু দূরে দৃষ্টিকে প্রসারিত করতে পারলে দেখা যায় শাল, পিয়াল ও তমালের ছড়াছড়ি।

কেবল সৌন্দর্য্যই নয়, ত্রিবাঙ্কুরের ঐশ্বর্য্যও বিপুল।

বেলা এগারটার কাছাকাছি গাড়ী এসে একটা জায়গায় থামল। গঞ্জের মতই এ জায়গাটিতে অনেক দোকান-পসার। কনডাক্টর আমাদের বললেন—চা, কাফি বা খাবার ইচ্ছা হলে খেয়ে নিন। গায়ে-পড়া ঐ উপদেশের মূল্য বুঝতে সময় লেগেছিল আমাদের।

জায়গাটার নাম এখন আর মনে নাই। কিন্তু সেটা ছেড়ে খানিকটা দূর এগোতেই পথের ধারে পাথরের ফলকে লেখা দুটি শব্দ চোখে পড়ল—"ঘাট সেকসন", মানে, পার্ব্বত্য পথের আরম্ভ।

অতীতের অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত মানসিক বল ত ছিলই, তার উপর ছিল অজ্ঞতাপ্রসূত বেপরোয়া ভাব। সেই মুহূর্তে কল্পনাও করতে পারি নি যে সভ্যতাকে পিছনে ফেলে আমরা বর্বরতার সন্ধানে যাত্রা করছি।

বে-পরোয়া ভাব বেড়েই চলছিল পথিপার্শ্বস্থ প্রস্তর ফলকের লেখাগুলি দেখে। সমুদ্র থেকে এক শত ফুট উঁচু—দেড় শত ফুট, দুই শত ফুট ইত্যাদি। ভয় পাবার মত কিছু নিশ্চয়ই নয়।

কিন্তু কৌতূহল সচেতন হয়ে উঠল। সেটা স্বাভাবিক। দু'পাশের দৃশ্যপটের পরিবর্ত্তন হয়েছে, বদলে গিয়েছে চলার পথের রূপ। জনপদ দূরের কথা, ঘর-বাড়ীই আর বড় একটা চোখে পড়ে না। কলা আর নারিকেল গাছের সংখ্যা ক্রমশঃই কমে আসছে। রাজপথের সে বিস্তৃতি আর নেই; বাঁক আসছে ঘন ঘন; সামনের দিকে হাত কয়েকের বেশী চোখে পড়ে না; ড্রাইভার ঘন ঘন হর্ন বাজাচ্ছে; পাশেও এক দিকে খাড়া পাহাড়ের একটা কালি চোখে পড়ে মাত্র—প্রায় তার গা ঘেঁসে বাস চলেছে; কেবল এক দিকে বিপুল বিস্তৃতি—সেই সুদূরপ্রসারী সবুজের অচঞ্চল তরঙ্গলীলা।

কি কারণে এক জায়গায় বাস থেমেছিল, তাতেই আলোক-চিত্রশিল্পী জনৈক সহযাত্রীর কল্পনা উদ্দাম হয়ে উঠল। জায়গাটি সুন্দর—খাদের দিকে পিঠ দিয়ে পশ্চাতের শ্যামলিমাসমৃদ্ধ গিরি-শ্রেণীর পটভূমিকায় সকলের একখানি ছবি নিতে হবে। ভারি ত দৃশ্য, এমন কত দেখা গেছে। দু'একজন তাচ্ছিল্য করে বললেন। কিন্তু গাড়ী থেকে নামবার পর খাদের কাছাকাছি এসে ঐ তাচ্ছিল্যের ভাবটা বজায় রাখা অনেকের পক্ষেই আর সম্ভব হ'ল না। দৃশ্যপট অসাধারণ না হোক যেখানে দাঁড়িয়ে ফটো তোলাতে হবে সেখান থেকে খাদের গভীরতা সমতলের অধিবাসীর প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার মানদণ্ডে সাধারণ পদবাচ্য নিশ্চয়ই নয়।

বেশ উঁচুতে উঠে গিয়েছিলাম, কিন্তু বাস আরও উঁচুতে উঠতে লাগল। সবটাই অবশ্য ওঠা নয়—পাহাড়ের পথে উঁচুতে উঠতে হলেই মাঝে মাঝে নীচে নামতেই হয়। আমরাও নামছিলাম—নেমে লোকালয়ের মুখ দেখে মনে মনে হয়ত স্বস্তির নিশ্বাসও ফেলেছিলাম। কিন্তু মোটের উপর উঠছিলামই বেশী। সেটা এক সময়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আওতায় এসে গেল।

উপত্যকার সঙ্গে পর্ব্বতের সানুদেশের পার্থক্য ত নিশ্চয়ই, নীচে গাছের সঙ্গে গাছের পার্থক্যও এতক্ষণ বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল।

পিচি বাঁধের দৃশ্য

এখন ক্রমশঃই সেটা যেন লোপ পেয়ে যাচ্ছে; চোখে ভাল করে কিছু দেখাই যায় না—হঠাৎ কুয়াশার উদয় হয়েছে যেন; বাতাস বেশ হাল্কা, বেশ মিষ্টি রকমের ঠাণ্ডা; ড্রাইভার অনবরত হর্ণ বাজাচ্ছেই, বাঁক আসছে ঘন ঘন; এমনি একটা মোড় ফেরবার মুখে হঠাৎ নীচের দিকে চোখ পড়তেই সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল—পথের যেখানে শেষ, অর্থাৎ খাদের যেখানে আরম্ভ, গাড়ীর চাকা সেই সীমারেখাটিকে ঘেঁষে চলেছে যে! যদি—

ভাবনাটা দানা বাঁধবার আগেই বাসখানি যেখানে গিয়ে পৌঁছল সেটি একটি জনপদের মত। চকিতে চোখে পড়ল পাথর কি কাঠের ফলকে লেখা রয়েছে, চিথিরপুরম, মানে চিত্রপুর।

বাস থামল না, আরও কয়েকটি ঘুরপাক খেয়ে মিনিট তিনেকের মধ্যেই চিত্রপুরের সরকারী বিশ্রাম-ভবনের প্রাঙ্গণে স্থির হয়ে দাঁড়াল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি আমাদের মাথার উপরকার চিরপরিচিত মেঘচিত্রিত আকাশটি ইতি-মধ্যে অনেক নীচে নেমে গিয়েছে।

হাজারিবাগ, রাঁচী, পুণা নয়, একেবারে দার্জিলিঙের দৃশ্য। অভাব কেবল তুষারমৌলী হিমালয়ের অতুলনীয় পটভূমিকার।

ক্রমশঃ

বাংলার মন্দির

শ্রীপঞ্চানন রায়, কাব্যতীর্থ

চেতুয়া দাসপুরের গড়বেষ্টিত কাঁটা বাঁশের ঝাড়যুক্ত গোস্বামী-ভিটা চৈতন্যসম্প্রদায়ের পাঠক গোস্বামীর পাট। গড়ের উপরের প্রাচীন পুলটি খিলানে গঠিত। শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক বক্রেশ্বর গোস্বামীর শিষ্য গোপালগুরু। তাঁহার শিষ্য গোবিন্দরাম গোস্বামী হইতে এই বংশের উৎপত্তি। গোবিন্দরামের পুত্র কৃষ্ণরাম পাঠক, তাঁহার পুত্র বলরাম সুত বিনোদমোহন সুত যদুনাথ পাঠক। নানা স্থানে ইঁহাদের শিষ্য রহিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল পাল লিখিত 'বক্রেশ্বরচরিতে' এই বংশের বিস্তৃত বিবরণ আছে। বর্ত্তমানে এই বংশ লুপ্ত। গোস্বামীকুলের প্রধান দেবতা গোবিন্দজীউ। শ্রাবণের কৃষ্ণা একাদশীতে ইঁহার প্রধান উৎসব হয়। প্রত্যহ ভোগ-রাগের ব্যবস্থা আছে। ইঁহার প্রধান মন্দিরটি পঞ্চরত্ন। ইহা সুঠাম ও বহু পুত্তলিকামণ্ডিত। নির্ম্মাণকাল ১৭২০ শকাব্দা বা ১২০৫ সাল। সম্মুখে নাটমন্দির বা আটচালা। পশ্চিমে একটি ক্ষুদ্রাকৃতি নবরত্ন। মন্দিরগুলি চূড়া ও কোণবিশিষ্ট এবং সম্মুখের গাত্র অলঙ্কারে শোভিত। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে মন্দিরটির সংস্কার করা হয়। তখনও দাসপুরের প্রাচীন শিল্পীকুলের কেহ কেহ ছিলেন। তাঁহাদের একজন জীর্ণ পুত্তলিকাগুলিও নূতন করিয়া গড়িয়া দেন। দাসপুর পলসপাই রাস্তাপথের পূর্ব্ব পার্শ্বে এই গোস্বামী-ভিটা।

রাণাপুরের প্রামাণিকদের নবরত্ন

সুরতপুরের হাজারীদের পঞ্চরত্ন

এই স্থান হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে গেঁড়িবুড়ি নামক একরত্ন মন্দির। ইহাতে অলঙ্করণ বা পুত্তলিকা বিরল। চূড়াটি ছত্রাকার। একটি পোড়া মাটীর ফলকে "শুভমস্তু শকাব্দা ১৬৭৯ সন ১১৬৪" লিখিত আছে। প্রবাদ কোন কৃষক লাঙ্গল দিয়া চাষ করিতে করিতে সিমলা দীঘিতে জল পান করিতে গিয়া নিমজ্জিত হয়। ঐ দিন বলিহারপুরের রায়বংশের গিরীশচন্দ্র স্বপ্ন দেখেন যে, কৃষক যথাসময়ে দেবদেবীগণের মূর্ত্তিসহ উঠিয়া আসিবে। ইহার পর দেবীর প্রত্যাদেশে গিরীশ রায় উক্ত মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া জলগর্ভ হইতে আনীত দেবদেবীগণকে তন্মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। বিশালাক্ষী, কালী, ধর্ম্ম প্রভৃতি দেবতার সংখ্যা আটটি। শীতলার ধ্যানে গেঁড়ি-বুড়ির পূজা হয়। সোলাঙ্কি জাতীয় ব্যক্তিগণ বিশেষ অনুষ্ঠান করিয়া তামার আংটি ধারণ করেন। তখন তাঁহারা পণ্ডিত উপাধিতে ভূষিত হইয়া দেবীর পূজক হন। শিলামূর্ত্তিটি ধর্ম্মকূর্ম্মাকৃতি—দীর্ঘ নাসাবিশিষ্ট মুখ সিন্দূরলিপ্ত। দেবীর নিকট পশুবলি হয়, কিন্তু ইহার যূপকাষ্ঠ পোঁতা হয় পথের দক্ষিণাংশে, কারণ রাস্তাটি বলি-হারপুরহাট গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছে, আর ঐ সকল গ্রামের উত্তরাংশে বিষ্ণুভক্ত ও দক্ষিণাংশে শক্তিভক্তের বাস। মন্দিরের

পিছনে যে দীঘিটি গেঁড়িবুড়ি দীঘি নামে পরিচিত—তাহা কিন্তু দাসপুরের আনন্দময়ী কালীমাতার সম্পত্তি ছিল, এখন হস্তান্তরিত হইয়াছে। নিত্যপূজার ব্যয় নির্ব্বাহ হয় বর্দ্ধমানরাজ-প্রদত্ত গেঁড়ি-বুড়ি সম্পত্তি হইতে।

বলিহারপুর গ্রামটি সম্ভবতঃ ভান রাজ্যের বলিহার নগরী ছিল। এখানকার সৌকালীন ঘোষবংশীয় দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ রায়-পরিবার প্রাচীনতম অধিবাসী। ইঁহাদের জ্ঞাতিকুল তমলুক কেলোমালের বিখ্যাত ঘোষ বংশ, জকপুরের রায় বংশ, বাঁড়পুরের মজুমদার বংশ ও কোলাঘাটের ঘোষবংশ। জকপুরের দর্পনারায়ণ রায় সেকালে মেদিনী-পুরের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি ছিলেন। উক্ত সকল শাখার লোকেরাই বলিহারপুর হইতে উঠিয়া গিয়া পূর্ব্বকথিত স্থানসমূহে বসবাস করিয়া প্রধান বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। এই বংশে বহু কৃতী পুরুষ জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহাদের গৃহদেবতা ব্রজরাজকিশোরের একরত্ন মন্দিরটি অলঙ্কার ও পুত্তলিকাশোভিত, সুঠাম। ইহার ছত্রাকার চূড়ার কোণও কোথাও খাঁজযুক্ত। ইহা ১৬৯৪ শকাব্দে নির্ম্মিত। এই মন্দিরে পূর্ব্বে কার্ত্তিক মাসে অহোরাত্র নামকীর্ত্তন হইত। বলিহারপুরের বিখ্যাত তান্ত্রিক ভট্টাচার্য্য বাণীভূষণের বংশ ইঁহাদের পুরোহিত। বাণীভূষণ এ অঞ্চলে অষ্টাদশভুজা দুর্গাপূজা প্রবর্ত্তন করেন। রায়বাটীর নিকটে একটি মাটির মন্দিরের কবাটে দশাবতার প্রভৃতি মূর্ত্তি সুষ্ঠু ভাবে উৎকীর্ণ।

বারোয়ারীতলার পার্শ্বের একটি খাঁজযুক্ত পঞ্চরত্ন মন্দিরে লিপি :—শুভমস্তু শকাব্দা ১৭০৯ সন ১১৯৪ সাল। ইহার গাত্রের পুত্তলিকাগুলির মসৃণতা লক্ষণীয়। নদীর স্রোতকে মন্দিরগাত্রের কারুশিল্পে রূপ দেওয়া হইয়াছে। পাশে পথের লাইন। রামলীলা প্রভৃতির সুঠাম পুত্তলিকা লক্ষণীয়। মন্দিরটি পরিত্যক্ত। হাটগেছিয়ার রায় বংশের পঞ্চরত্ন মন্দিরটি বাং সন ১১৯৯ সালে নির্ম্মিত।

দাসপুর পলসপাই পথের তিন মাইলের পর কামালড়িহি গ্রামের অষ্টশাল শিব-মন্দিরটি প্রাচীন। ইহাতে পুত্তলিকা আছে। এই গ্রামের বেরাদের অষ্টশাল শিবালয়ের লিপি "শ্রীশ্রী—সকাব্দা —সন ১২৪২ ২৬শে জ্যৈষ্ঠ শ্রী···।" সাহাচক গ্রামের অষ্টশাল আধুনিক, কিন্তু সোনখালি হাটের অষ্টশাল শিবমন্দিরটি প্রাচীন ও বৃহদাকার—ইহা ১৬৯৫ শক ও ১১৭৯ সালে নির্ম্মিত। দুইটি ফলকে শকাব্দা, সন ও দাতার নাম লিখিত। নিকটে সরলা গ্রামে ৺গম্ভীরচরণ সিংহ প্রতিষ্ঠিত পঞ্চরত্নে ১১২৯ সাল লিখিত। এই সিংহবংশ নদীয়া রাণাঘাটের নিকটবর্ত্তী আড়ুলিয়া গ্রাম হইতে মোগল সরকারের কর্ম্মসূত্রে আসিয়া এখানে বসবাস সুরু করেন। ইঁহারা দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ। দুর্গাপ্রতিমার কার্ত্তিক ও গণেশ উপরে থাকেন।

মণ্ডলঘাট পরগণার পলসপাই গ্রামে খালের ওপারে মাখন-মাইতির শ্রীধরজীউর উৎকলীয় রীতির মন্দিরের ঊর্দ্ধভাগ কড়ি-বরগার সাহায্যে নির্ম্মিত। উহাতে লিপি :—শকাব্দা ১৭৫৬। সন ১২৪১ সাল গোবিন্দরাম মাইতি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ভিতরে লক্ষ্মীদেবীও আছেন। কংসাবতীর তীরবর্ত্তী খুকুড়দহ গ্রামের খুকুড়চণ্ডীর অষ্টশালটি এই অঞ্চলের বৃহত্তম মন্দির। রাইমণি রোড যেদিকে গোপীগঞ্জে গিয়াছে সেইখানে চাইপাট গ্রাম। গ্রামে কয়েক সহস্র লোকের বাস ও সাতটি পাড়ারই প্রত্যেকটির আয়তন

সুরতপুরের রায়েদের পঞ্চরত্ন ও দেউল

এক একটি ক্ষুদ্র গ্রামের মত। এই গ্রামের মন্দিরগুলির মধ্যে অষ্টশাল শ্রেণীর শিব-মন্দিরটি ১৭৩৫ শক বা সন ১২২০ সালে নির্ম্মিত। অপর দুইটি শিবালয়ের একটি ১৭৫২ শক বা ১২৩৫ সালে, অন্যটি ১২৪৯ সালে নির্ম্মিত। বেলডাঙ্গা গ্রামের একটি অষ্ট-শালের লিপি "শ্রীশ্রীমদনমোহন প্রতিষ্ঠা। সন ১২৩৯ সাল। শকাব্দা ১৭৫৪ মাহ ২৫ ফাল্গুন। শ্রীইন্দ্রনারায়ণ মণ্ডল। সাং চাই-পাট মণ্ডলঘাট পরগণা (?)। মন্দিরে অধুনা ধাতুময়ী সিংহবাহিনী জগদ্ধাত্রী দেবী বিরাজিতা। মাহিষ্যজাতী ব্রাহ্মণবংশ দেবীর পূজক।

ক্ষেপুতেশ্বরী প্রসিদ্ধ দেবতা। ক্ষেপুত গ্রামে তাঁহার অষ্টশালে লিপি "শুভমস্তু শকাব্দা ১৭০১"। মন্দিরমধ্যে কৃষ্ণপ্রস্তরের দেবী-মূর্ত্তি। এই গ্রামের সাবর্ণ রায়চৌধুরীগণ কলিকাতার সাবেক জমিদার বড়িষার সাবর্ণ চৌধুরী বংশের জ্ঞাতি। এখানে এই বৃহৎ ত্রিচূড় অষ্টশালে ভিন্ন ধরণের পুত্তলিকা বিদ্যমান—এই শিবমন্দিরটির সন্নিকটে শিলাময় সূর্য্যমূর্ত্তি ও বটতলায় বটুক ভৈরব শ্রেণীর পঞ্চানন ঠাকুর। বিদ্যালয়ের সন্নিধানে একটি চাঁদনী শিবমন্দির আছে। প্রাচীনকালে এখানে বৌদ্ধ কিম্বা রাজগণের কাছারিবাটী ছিল, আর তাঁহাদের বসতবাটী ছিল রায়চৌধুরিগণের বাস্তুতে। একটি বিরাট ভগ্ন বুদ্ধমূর্ত্তি এখানে পাওয়া গিয়াছে। উত্তরবাড়ের চক্রবর্ত্তী-বাটীর দুর্গামণ্ডপ লিপিযুক্ত। এখানে এক জলাশয়ের মধ্যে একটি জাহাজের মাস্তল নিমজ্জিত অবস্থায় আছে।

রাধাকান্তপুর গ্রামের দুইটি মন্দিরের কথা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। এই গ্রাম দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থপ্রধান। এখানকার তালুকদার বসুবংশ বনিয়াদী ঘর। ইঁহাদেরও দুর্গাপ্রতিমার কার্ত্তিক, গণেশ উপরে থাকেন। এই বংশের পঞ্চরত্ন মন্দিরটি সন ১১৭৭ সালে নির্ম্মিত। এই বংশীয় তারিণীশঙ্কর বসুর নিকট "কায়স্থ জাতির

মৃত্যাভ কুলার্জি" নামক খাতা ছিল। এই গ্রামের হাড়লাস স্থাপিত প্রাচীন অষ্টশালাটির দেবতা হাড়কেশ্বর—পরিচালক গিরীশচন্দ্র দাস ও রামবিষ্ণু ঘোষ কর্তৃক মন্দিরটি ১৩০২ সালে ১১ই শ্রাবণ সংস্কৃত হয়। এখানকার শঙ্খকার দত্তগণের পঞ্চরত্ন সুঠাম ও পুত্তলিকাযুক্ত। ভিতরে সিঁড়ি। চূণ-বালির পলস্তারায় লিপি—শকাব্দা ১৭৬৮। সন ১২৫৩ সাল।

বলিহারপুরের গেঁড়িবুড়ির একরত্ন মন্দির

সেকেন্দারী গ্রামটি সমৃদ্ধ রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের একটি সমাজ। এখানেও বৈশাখী অমাবস্যায় সমারোহে শ্মশানকালী পূজা হয়। এখানকার কয়েকটা মন্দিরের মধ্যে উৎকলশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের নবরত্ন ও চতুঃশাল উল্লেখযোগ্য। সোল্লান গ্রামের সানিগ্রাহীদের পঞ্চরত্ন পুত্তলিকাবহুল ও সুন্দর। ভবানীপুরের অধিকারীদের পঞ্চরত্নটি প্রাচীন। চাঁদনী ও অষ্টসালাদি এ অঞ্চলে বিস্তর।

সরবেড়িয়া গ্রামে কয়েকটি চাঁদনী মন্দির আছে। এখানকার সত্যনারায়ণের নবরত্ন বিখ্যাত—ইহার সম্মুখে নাটমন্দির। নবরত্ন-মধ্যে সত্যনারায়ণ,—ফকিরবেশী সত্যনারায়ণ ও সত্যনারায়ণের মাতা বর্তমান। সত্যনারায়ণ এই অঞ্চলে জাগ্রত দেবতা। ইহার পূজক তন্তুবায় জাতীয়। ইহার ঔষধ মাদুলী প্রভৃতি ধারণ করিয়া নাকি অনেকের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। ভুবনেশ্বর—এখানকার বিখ্যাত স্বয়ম্ভু লিঙ্গ—ইহার মন্দিরটি চাঁদনী রীতির। চৈত্রসংক্রান্তিতে এখানে মেলা হয়। মকারামপুরে কয়েকটি উৎকৃষ্ট অষ্টশাল ও পঞ্চরত্ন আছে। ধর্ম্মসাগর গ্রামে অষ্টশাল ও চাঁদনী রীতির মন্দির বর্ত্তমান। এখানকার নাপিত জাতীয় বিষয়ীবংশের কাশীনাথ বিষয়ী রেশম-ব্যবসায়ে ধনী ও বিখ্যাত লোক ছিলেন। ইহার বাটীতে চাঁদনীরীতির মন্দির ও উৎকলীয় দেউল আছে। এই স্থানের মাহিষ্যবাজী চক্রবর্তীবংশের ভিটা ধর্ম্মাসন নামে কথিত। ইহাদের চাঁদনী মন্দির ১৭৫০ শকে নির্ম্মিত। বংশটি এখন লুপ্ত। ধানখাল গ্রামের এক মাহিষ্যবাজী ব্রাহ্মণ "কবিসম্ভবম্" নামক সংস্কৃত মহাকাব্য লিখিয়াছিলেন। এই গ্রামে রেশম-কুঠি ছিল। এখানকার পঞ্চরত্ন, ভোগশালা ও অষ্টশাল বরদা নিমবাজারের পঞ্চারাম মিস্ত্রী সন ১২৯৬ সালে ৩০শে বৈশাখ নির্ম্মাণ করেন।

কিশোরপুর গ্রামটি কংসাবতীর তীরে। এখানে একটি সুঠাম পঞ্চরত্ন আছে।

রাজনগর গ্রাম বাংলার শিবাজী শোভা সিংহের রাজধানী ছিল। এই গ্রামের বসুবংশ সম্ভ্রান্ত। ইহারা হুগলী জেলা হইতে আসিয়া এখানে বসবাস সুরু করেন। ইহাদের গৃহদেবতার চাঁদনী ও শিবের অষ্টশাল আধুনিক। রাজনগর হাটে উৎকলরীতির একটি মন্দির আছে। নিকটে অগড়েশ্বরের অষ্টশাল। গোকুলনগরে মধ্যশ্রেণী ব্রাহ্মণদিগের একটি বিশিষ্ট সমাজ আছে। এখানে চাঁদনী ও অষ্টশাল-রীতির কয়েকটি মন্দির বিদ্যমান। ঝুমঝুমি গ্রামের অষ্টশাল শিবালয়টি ১৭৭৫ শকাব্দা বা ১২৬০ সালে নির্ম্মিত। ইহাতে অনেকখানি অস্পষ্ট লিপি ছিল। মন্দিরের সম্মুখভাগ ধ্বসিয়া গিয়া লিপি নষ্ট হইয়াছে। নূতন ভাবে মন্দিরের সংস্কার করা হইয়াছে।

সুরতপুর গ্রামটি এক সময় রেশম-ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত ছিল। এখানে ও পার্শ্ববর্ত্তী গুড়লি গ্রামে ইংরেজ মালিকগণের কয়েকটি রেশমের কুঠি ছিল। তুঁত চাষ ও কুঠিতে কাজ করিয়া বহু লোকের অন্নসংস্থান হইত—অভাব না থাকায় এই সকল স্থানের অধিবাসিগণের মন স্বভাবতঃই শিল্পচর্চ্চায় অভিনিবিষ্ট হইত। এই গ্রামের কয়েকটি সুঠাম মন্দিরের অস্তিত্ব গ্রামবাসিগণের উন্নত রুচির পরিচয় প্রদান করে। এখানকার কনৌজ-ব্রাহ্মণ হাজারী বংশ বর্গীর হাঙ্গামায় বীরত্ব দেখাইয়া বর্দ্ধমানের ভূস্বামী কীর্ত্তিচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ও প্রচুর ভূসম্পত্তির মালিক হন। ইহাদের পঞ্চরত্ন মন্দিরযুক্ত ঠাকুরবাড়ী ও অতিথিশালা এই গ্রামের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান ছিল। পঞ্চরত্নের খাঁজযুক্ত চূড়াগুলি পুরাতন রীতির—এই মন্দিরে পোড়ামাটির ফলকে তিন সারি লিপি : শুভমস্তু শকাব্দা ১৬৭৭। সন ১১৬০ (?) সাল। মন্দিরের দেবতার প্রাত্যহিক ভোগ ও তাহা দ্বারা অতিথিসংকারের ব্যবস্থা ছিল। এখন দেবতা গড়বেতায় স্থানান্তরিত, মন্দির ধ্বংস-প্রায়। এই গ্রামের শীতলামাতার পঞ্চরত্ন ও কনৌজ-ব্রাহ্মণ যদুনাথ রায়দিগের পঞ্চরত্ন ও দেউলযুগল একই সময়ে নির্ম্মিত। এই মন্দিরগুলির গঠনকালে শিল্পীদ্বয় পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়। রায়েদের শিল্পীর মন্দির নির্ম্মাণ-কৌশল ও পৌরাণিক পুত্তলিকাদি উন্নততর হওয়ায় সে জয়ী হইয়া পুরস্কার লাভ করে। এখন রায় বংশ লুপ্ত ও মন্দির জঙ্গলাকীর্ণ। শীতলা মন্দিরে দুইটি লিপি আছে—একটি সম্মুখের গাত্রের ক্ষুদ্র ফলকে, অপরটি উত্তর দিকের দেয়ালের বহির্ভাগে। শেষোক্ত লিপি—"শ্রীশ্রীশীতলা মাতা সকাব্দা ১৭৭১সন ১২৫৬ সাল তারিখ ১৮ বৈশাখ

পরিচারক হংসভূষণ- হাজরা মিস্ত্রী শ্রীঠাকুরদাস সেন।" গাত্রে কৃষ্ণলীলা, নৌকা, রথ, দুর্গা, দুইটি বজরা আর সামাজিক চিত্রের পুত্তলিকাসমূহ উৎকীর্ণ। খোপে অবতারাদি মূর্ত্তি। সম্মুখের ফলকেও ১৭৭১ লেখা। নিকটে শিবের অষ্টশাল।

রায়েদের ঠাকুরবাটীর দরজার বৃত্তমধ্যে সাত সারি লিপি :— "৺শ্রীশ্রীরোঘুনাথ জী সকাব্দ ০৭৭ সন ১২৫৫ পঞ্চান সাল তারিখ ২৪ কার্ত্তিক বনাদয়ারম্ভ সন ১২৫৬ চৌপায় সন ২৭ জৈষ্ঠ ছক্রবার বেলা দুই দণ্ড থাকিতে সাঙ্গ।" প্রাচীরঘেরা ঠাকুরবাড়ীর মধ্যে পঞ্চরত্ন ও দুই পাশে উৎকলীয় দেউল। পঞ্চরত্ন-গাত্রের পুত্তলিকা বিন্যাস এইরূপ :—সম্মুখের গাত্রের তিন খণ্ডের প্রথমে উপরে দণ্ডায়মান পাঁচটি পুত্তলিকা, শায়িত পুত্তলের উপর গজ, মধ্যে তক্তপোষে উপবিষ্ট পুত্তলের মস্তকে ছত্র। এক পাশে পাঁচ জন অন্য পাশে চার জন সাথী। মধ্যে দ্বিতীয় স্তরের প্রথম ভাগে শবোপরি দুইটি পদ্মে উপবিষ্টা চতুর্ভুজা দেবী, দুই জন ব্যজনরতা সখীর হাতে দুইটি পাখা। ঐ স্তরের মধ্যে কন্তা। নিম্নে বামে নরনারীর যুদ্ধ। ডাহিনে বৃহৎমূর্ত্তি কৃষ্ণ কর্ত্তৃক গজাসুর বধ। মাঝের খাটালে ছত্রনিম্নে আসীন রামসীতা—দুই পাশে হনুমান প্রভৃতি নয়টি মূর্ত্তি। ডাহিনের খাটালের উপরে আটটি পুত্তলিকা, একটি পাখী। মধ্যে দুই পাশে দুই নৌকা —কমলে কামিনীর কোলে গণেশ। মন্দিরে লিপি নাই। খিড়কীর দরজার উপরে বৃষমূর্ত্তি।

এই গ্রামে আরও কয়েকটি চাদনী ও উৎকলীয় রীতির দেবালয় আছে। মল্লেশ্বরের চাঁদনীর সম্মুখভাগ রঙ্গমঞ্চের ন্যায়—মন্দিরটি আধুনিক। উহাতে লিপি :—"শ্রীশ্রী৺মল্লেশ্বর জীউ শকাব্দা ১৮৫৮ সন ১৩৪৩ সাল। পরিচারক শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী দিগর। মন্দীর দেশ-স্থাপিত ৺ভাগবৎ ভুঞার পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দ্রনারায়ণ ভুঞা। সাং সুরেতপুর তস্য পত্নী শ্রীমতী রজনীবালা দাসী ও প্রতিষ্ঠা শ্রীমতী হীরেনবালা দাসী শ্রীরাখালচন্দ্র মিস্ত্রী সাং রাজনগর। মন্দিরমধ্যে স্বয়ম্ভূ লিঙ্গ, বাহিরের চত্বরে গৌরীপট্ট ও তিনটি ষষ্ঠীমূর্ত্তি। দেবতা জাগ্রত—গাজনে সমারোহ হয়। গ্রামটি জঙ্গলাকীর্ণ ও প্রায় জনশূন্য হইয়া গিয়াছে। বৈশাখী চতুর্দ্দশীতে এখানে বারোয়ারী রক্ষাকালী পূজা হয়। অতীত গৌরবের ক্ষীণ স্মৃতি মাত্র এখন বর্ত্তমান।

নিকটবর্ত্তী ডিহি-চেতুয়া রাজনগর পথের যেখান হইতে সুরতপুর পথ বাহির হইয়াছে তাহার পাশেই সুরানয়নপুর গ্রামে শম্ভুনাথের উৎকলীয় দেউল ও শীতলমোতার অষ্টশাল। দেউলে লিপি :— "শ্রীশ্রীসোম্ভুনাথ জীউ—৺শুভমস্ত শকাব্দা ১৭৫৮ সন ১২৪৩ সাল আরম্ভ ১৪ অঘান সাঙ্গ ২২ মাঘ (?) শ্রীদুলাল দাস মদক সাকীম হরিরামপুর।" মন্দিরশীর্ষের আমলাটি বৃহৎ ও গাত্রে কয়েকটি পুত্তলিকার ফলক।

ডিহি-চেতুয়া গ্রামে প্রাচীন নিম্বার্ক মঠ ও চাঁদ খাঁ পীরের সমাধি বর্ত্তমান। গৌড়ের বাদশাহ হোসেন শাহের আমলে পীর সাহেব এদেশে আসেন। নিকটে বলরাম বাজার গ্রামে দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ চৌধুরিগণের গড়বেষ্টিত বাস্তু ও ৺গোপীনাথজীউর চাঁদনী মন্দির। মন্দিরটি প্রাচীন—ইহাতে কোন লিপি বা পুত্তলিকা নাই। দেবতার প্রত্যহ দশ সের চাউলের ভোগের ব্যবস্থা আছে। অভ্যাগতগণকে বিতরণের পর অবশিষ্ট ভোগ সেবায়েতগণ গ্রহণ করেন। সন ১১৯৯ সালে বর্দ্ধমান রাজের একটি সনন্দবলে চৌধুরিগণ এই দেবতা ও চারিশত বিঘা ভূসম্পত্তির মালিক হন। বর্দ্ধমান, উচিত-

দাসপুরের গোস্বামীদের গোবিন্দজীউর পঞ্চরত্ন
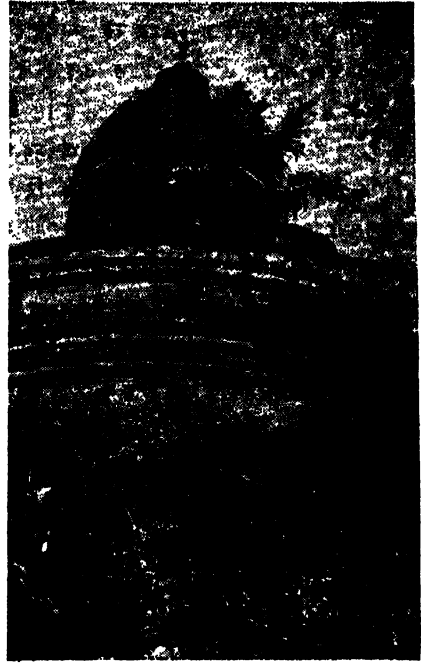
পুর ইহাদের আদি নিবাস ছিল। কোন একটি তর্কে রাজাকে পরাস্ত করিয়া চৌধুরিগণের পূর্ব্বপুরুষ এই দেবতা ও সম্পত্তি লাভ করেন। ইহাদের আগমনের পূর্ব্বাবধি এখানে দেবসেবার ব্যবস্থা ছিল। পূর্ব্বতন মালিকের কেহ না থাকায় সম্ভবতঃ ইহা বর্দ্ধমানরাজের খাস হইয়াছিল। চৌধুরিগণ এই দুর্দ্দিনেও দেবসেবা অনেকাংশে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। ইহাদের খিড়কীপুকুরের মাঝখানে জলহরি নামক ইষ্টক-মন্দির আছে। এই স্থানে মোগল সরকারের একটি শাসনকেন্দ্র ছিল। কাজির ডাঙ্গা নামক বাস্তু আজিও তাহার সাক্ষ্যস্বরূপ বর্ত্তমান।

লাওদা গ্রামের বেলালগণ সোলাঙ্কিযাজী ব্রাহ্মণ, ইহাদের গৃহ-দেবতার পঞ্চরত্ন বহু পুত্তলিকামণ্ডিত, কিন্তু মন্দিরটির পটভূমি মনোরম নহে। গোপালপুর গ্রামটি দাসপুর হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে ঈশান কোণে। কথিত আছে—আত্মারাম মিত্র নামক ঘৃতকৌশিক গোত্রীয় ব্রাহ্মণ জীবিকা অর্জ্জনের উদ্দেশ্যে এদেশে আসায় কান্যকুব্জস্থ জ্ঞাতিগণ তাঁহাকে বর্জ্জন করেন। তিনি অগত্যা মধ্যশ্রেণীর কন্যা গ্রহণ করিয়া এদেশে বাস করেন। তাঁহার পুত্রদ্বয় মুক্তারাম ও মাণিকরাম কৃষ্ণযাত্রার দলে অভিনয় করিয়া বর্দ্ধমানের রাণীর স্নেহের

পাত্রও ভিক্ষাপুত্র হইবার সৌভাগ্য লাভ করেন। রাজা ইহাদিগকে প্রায় তিন হাজার বিঘা নিষ্কর জমি দান করেন। ইহাদের গৃহদেবতা দামোদরের প্রাচীন মন্দিরটি চাঁদনীরীতির মণ্ডপযুক্ত ও বর্দ্ধমানের ঐ রীতির দেবালয়ের অনুকরণে নির্ম্মিত। হর্ম্ম্যতলে স্তম্ভগুচ্ছগুলি মাত্র এখন বর্ত্তমান। দুইটি অষ্টশাল শিবালয়ে লিপির ফলক আচ্ছাদিত। রাসমঞ্চটি ত্রিতল নবরত্ন—সোপানযুক্ত। নৈমিত্তিক উৎসবাদি এখানে সাড়ম্বরে হইত—এখন বহু অংশীদার হওয়ায় তেমন জাঁকজমক হয় না। এখান হইতে একক্রোশ পশ্চিমে কোটালপুরে কয়েকটি বিভিন্ন রীতির মন্দির আছে। শ্রীপঞ্চমীর সময় এখানে মেলা বসে। নিকটবর্ত্তী খাজাপুর গ্রামের পালেদের বাড়ীতে একটি প্রাচীন সূর্য্যঘড়ি আছে। এতদ্দেশে বিরল একটি শ্বেতচন্দনের গাছও এখানে বিদ্যমান।

জোংকাসুরগড় গ্রামটি সম্ভবতঃ বাংলার শিবাজীর পিতামহের স্মৃতিবিজড়িত স্থান। এখানে কয়েকটি কামান পাওয়া গিয়াছে। এখানকার শেষ নারায়ণজীউর অস্থল বৈকুণ্ঠপুর নিম্বার্কমঠের শাখা। তাম্বুলি জাতীয় পালগণ এখানকার সঙ্গতিপন্ন বাসিন্দা। ইহাদের প্রাসাদ ও মন্দির আছে। কলিকাতা খিদিরপুরের রমানাথ পাল লেন ইহাদেরই পূর্ব্বপুরুষের নামে—সেখানে ইহারা বিস্তৃত ব্যবসায়ের মালিক। রাণীচকে একটি ষ্টীমার ষ্টেশন আছে। এখানে একটি বিশাল মন্দির বর্ত্তমান। এই গ্রামের অষ্টশাল শিবালয়টির উর্দ্ধাধঃ উভয় চতুঃশালই পুত্তলিকামণ্ডিত ও সুগঠিত। সম্প্রতি রূপনারায়ণ নদের ভাঙ্গনে মন্দিরটি বিপন্ন। চেষ্টা করিলে কারু-শিল্পের এই অপূর্ব্ব নিদর্শনটিকে এখনও রক্ষা করিতে পারা যায়।

দাসপুরের যে গোস্বামীদের কথা প্রথমেই বলিয়াছি, তাঁহাদের শিষ্য রাণাপুরনিবাসী তন্তুবায় প্রামাণিক বংশ গুরুপীঠে পূর্ব্বোক্ত গোবিন্দজীউর মন্দিরটি নির্ম্মাণ করান। রাণাপুর গ্রামটি নিম-তলার পূর্ব্বাংশে অবস্থিত। সূত্র ও বস্ত্র ব্যবসায়ে প্রামাণিকগণ ধনী হন। ইহাদের গৃহদেবতার নবরত্নটি সুঠাম ও দেউলচূড়। ভিতরে সোপান। সম্মুখের গাত্রে নিম্ন হইতে উর্দ্ধের পঞ্চরত্ন পর্য্যন্ত পুত্তলিকাবিন্যস্ত, খোপগুলির পাশে উর্দ্ধাধঃলম্বিত গ্রন্থিশ্রেণী। এরূপ গ্রন্থি হাওড়া গড়ভবানীপুরের ভুরশিট রাজকুলের পরিত্যক্ত মন্দির ও মেদিনীপুর পুড়াপাটের পালেদের মন্দিরে দেখা যায়। মন্দিরের সম্মুখ দক্ষিণ দিকে। পশ্চিম অংশেও অলিন্দে স্তম্ভ এবং দ্বার। সম্মুখের গাত্রে ও খোপসমূহে রামলীলা, কৃষ্ণলীলা আর শিবলীলা সম্পর্কিত পুত্তলিকাসমূহ বিন্যস্ত। গণেশ, কার্ত্তিক, লক্ষ্মী ও সরস্বতী শিবলীলায় স্থান পাইয়াছেন। এক স্থানে আছেন জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রা। খোপে দশাবতার মধ্যে পৃথক জগন্নাথ। সর্ব্বাংশ-ব্যাপী এরূপ পুত্তলিকার ফলক অন্যত্র দেখা যায় না। উর্দ্ধ ও নিম্নাংশের কোণগুলিতে হস্তীমুখ। নালীসমূহ মকরমুখ। নিম্নাংশের কার্নিসের নীচে চারিটি ফলকে লিপি :—"শ্রীশ্রীরামজী। শুভমস্তু শকাব্দা ১৭২৩। সন ১২০৮ সাল নবকায় (?) ৩ জ্যৈষ্ঠ। শ্রীগুরুচরণে সরণং।" উর্দ্ধ পঞ্চরত্নের খোপগুলিতেও পুত্তলিকা বিন্যাস করা হইয়াছে। সম্মুখে দ্বারের কবাটে চার সারি পুত্তলিকা খোদিত—ইহা দারুশিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। মূর্ত্তিগুলি সুঠাম ও ও বৈষ্ণবাচার সম্পর্কীয়। একটি মৃদঙ্গবাদকও আছে। পূর্ব্বে মন্দিরে রামচন্দ্রের মোহর ছিল, এখন তাহা অপহৃত। মন্দিরগাত্রে স্থানে স্থানে কক্ষা ও অলঙ্কার বিদ্যমান। চূড়াগুলিতে লৌহদণ্ড—চক্রসমূহ লুপ্ত।

দাসপুরের অগণিত মন্দিরের মধ্যে মাত্র কতকগুলিরই আলোচনা এই প্রবন্ধে করা হইল। একদা এখানকার শিল্পিগণের খ্যাতি দূর-দূরান্তরে প্রচারিত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, সেই শিল্পীকুল প্রায় লুপ্ত, নূতন সৃষ্টি ও সংস্কারের সম্ভাবনাও কমিয়া আসিয়াছে বলিয় মনে হয়।*

---

* প্রবন্ধের ফটোগুলি লেখক কর্ত্তৃক গৃহীত।

মৃত্যুঞ্জয়ী শ্যামাপ্রসাদ

শ্রীঅমরকুমার দত্ত

অস্ত গেল দিবাকর? নামিয়া আসিল অন্ধকার
দুঃসময়ে আজ বঙ্গের অঙ্গনে? রুদ্ধ হ'ল সব
বীর্য্যবান্ চেতনার জ্যোতির্ম্ময় প্রবাহ দুর্ব্বার?
মুক্তিকামী মানবের মেঘমন্দ্র হইল নীরব?

দিশাহারা নরনারী ব্যথাভরে করে অনুভব—
নির্ব্বান্ধব হ'ল তারা, দুঃখরাতি হ'ল দুর্নিবার;
মহাস্রোতে গেল চলে—সব যোদ্ধা, পুরুষ পুঙ্গব
মাতৃযজ্ঞে অর্ঘ্য দিয়া নিজ নিজ স্বাধীন সত্তার।

হৃতগর্ব্বা, নিষ্পেষিতা, দুর্ভাগিনী, হে বঙ্গজননি!
কাঁদিবে কি শূন্য কোলে জাগি এই রজনী আঁধার?
বীর পুত্র তব গত? ঔদ্ধত্যের উদ্যত অশনি
পড়েছে কি উন্নত পর্ব্বতশিরে—করেছে সংহার?

নহে, নহে। পৌরুষের মহাভিক্ষু শার্দ্দূল সন্তান
বঙ্গের "প্রসাদ" আজ কারাগৃহে লভিল নির্ব্বাণ।

মায়িকা

(তিন অঙ্ক নাটক)

শ্রীসুবোধ বসু

চরিত্রলিপি

পুরুষ

প্রদোষ ...	ধনী যুবক
চাটুজ্যেসাহেব	ঐ অংশীদার
প্রভাত	শ্রমিক-বন্ধু। সেবার সঙ্গী
সত্য	ঐ
বৃদ্ধ রায়মশায়	মমতা ও সেবার বাবা
গণেশ	মমতার ভৃত্য
মাইতি বাবু, শিবু-সর্দ্দার	শ্রমিক-প্রতিনিধি

ডাক্তার, পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টর, মোটর-চালক, দারোয়ানগণ,
কেষ্ট ও তরুণ প্রভৃতি যুবকগণ ও শ্রমিকগণ

স্ত্রী

মমতা ...	মেয়ে-স্কুলের হেড মিষ্ট্রেস
সেবা	ঐ বোন। শ্রমিক-বন্ধু
মিনু ও লক্ষ্মী	মমতার ছাত্রী

তিনটি সাঁওতাল রমণী

প্রথম অঙ্ক

১ম দৃশ্য

[বন-প্রান্ত। বেলা আন্দাজ আড়াইটা-তিনটা। বনাভ্যন্তর হইতে দূরে রাজপথের অস্পষ্ট আভাস। দু'একটা মোটর চলিয়া যাইবার শব্দ।

একটি প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়িতে বাইশ-তেইশ বছরের একটি সুন্দরী তরুণী দাঁড়াইয়া একাগ্র দৃষ্টিতে রাজপথের দিকে লক্ষ্য করিতেছে। তাহার কাছাকাছি বৎসর চল্লিশ-বিয়াল্লিশের মোটাসোটা পালোয়ান-গোছের একটি যুবক দণ্ডায়মান। অ-কামানো দাড়িতে ইহার মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন; অলস ভাবে সে একটা মোটা বর্ম্মা চুরুট টানিতেছে।]

তরুণী। (রাস্তার দিক হইতে চোখ ফিরাইয়া) দেখ প্রভাত-দা এ রকম চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে ভাল হবে না বলছি। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ঢালাও রাস্তা দিয়ে বাবুরা নির্ব্বিবাদে দামী দামী গাড়ী হাঁকিয়ে ধুলো উড়িয়ে চলে যাবেন, তা দেখবার জন্তই কি সারাটা দুপুর ধরে' এখানে দাঁড়িয়ে আছি?...

প্রভাত। উঁহু, দুপুরে বেরুনো আমাদের মোটেই ঠিক হয় নি। আমি তখুনি বলেছিলাম, সেবা, এ সব কাজে সন্ধ্যে না হলে জুৎ হয় না।

সেবা। তুমি চুপ কর ত। ঢের পরামর্শ শুনেছি। এবার যা করতে বলি, অনুগ্রহ করে তাই কর। এত লোককে অনাহারে মরতে দেখেও কি করে যে তোমরা স্থির থাকতে পার, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুরুট টানতে পার—

প্রভাত। [দ্রুত চুরুট নামাইয়া] আহা, করতে হবে কি বল না। শুধু শুধু চুরুটের উপর কটাক্ষ করছ কেন। আমার মতই আত্মত্যাগের ব্রত নিয়ে এই বেচারি নিজেকে ধীরে ধীরে নিঃশেষ করে...

সেবা। যথেষ্ট রসিকতা হয়েছে, এবার থাম। আজ সন্ধ্যার আগে যেমন করেই হোক কিছু টাকার জোগাড় করা চাই। উপোস করে ওরা আর কতদিন মনোবল রক্ষা করতে পারবে শুনি? আমি সারা বস্তিকেই আজ আশ্বাস দিয়ে এসেছি; যেমন করেই হোক আজ ওদের সবার জরুরী অভাবগুলি দূর করব, পেট ভরে খাওয়াব...

প্রভাত। এটা খুবই সদুদ্দেশ্য সন্দেহ নেই, এখন টাকাটা ওঠাতে পারলে এই সদুদ্দেশ্য সাধনে কোনই আর অসুবিধে থাকে না। কিন্তু মাত্র একটা মোটর-বিহারীর ট্যাঁকে সারা বস্তিকে খাওয়াবার মত রেস্ত থাকবে কি?

সেবা। [অসন্তুষ্ট স্বরে] টীকাটিপ্পনী ছেড়ে তুমি যদি আদত কাজের দিকে মন দিতে তবে একটা কেন, এতক্ষণে আধ ডজন মোটর-বিহারীকে...(দূরে চাহিয়া) উই, উই দেখ, আর একটা বোধ হয় আসছে। গঙ্গারামপুরের বাঁকটার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখ ...আর একটুও দেরি নয়। তৈরি হও, দু'পাঁচ মিনিটের মধ্যেই গাড়ীটা কাছে এসে পড়বে। তোমাকে শুধু সেই পাথরের চাপড়াটা রাস্তার মধ্যিখানে ঠেলে আনতে হবে, আর কিছুই করতে হবে না। বাকি যা কিছু করবার, সব আমিই করব। [ব্লাউজের ভিতর হইতে পিস্তল বাহির করিল।]

প্রভাত। [আপত্তির স্বরে] উহুঁ, উহুঁ, ওটা এখন নয়। গাড়ীর লোকবল কিরূপ, তাদের কাছেও আগ্নেয়াস্ত্র আছে কিনা, আগে এসব বুঝে নিয়ে তবেই ওটা বার করার প্রশ্ন উঠবে। প্রথমে অহিংস 'এপ্রোচ'ই নিরাপদ। বিনীত স্বরে বলা যাক: 'বাথ-দিয়া কোলিয়ারির উপবাসী ধর্ম্মঘটকারী শ্রমিকদের সাহায্যার্থে যৎ-কিঞ্চিৎ ভিক্ষা দিয়ে যেতে আজ্ঞা হয়।...'

সেবা। তুমি একটা যাচ্ছেতাই কাপুরুষ, প্রভাত-দা। তোমার এতটা নৈতিক অবনতি হয়েছে জানলে কখনই তোমাকে সঙ্গে আনতাম না, কোলিয়ারীর ফটকের সামনে পিকেটিঙে দাঁড় করিয়ে রেখে আসতাম।...ক্যাপিটালিষ্ট শ্রেণীর কাছে তুমি ধর্ম্মঘটীদের জন্ত চাঁদা পেতে আশা কর। ওসব চলত মহাভারতের যুগে, যখন প্রার্থনায় প্রীত হয়ে দেবতারা নিজেদেরই মৃত্যুবাণ শত্রুর হাতে তুলে দিতেন। কিন্তু আর কথা নয়, চলে এস...[দূরে মোটরগাড়ীর

তীব্র হর্ন] ঐ শোন, কাছে এসে পড়েছে। মুখটা আগে থাকতেই ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর দেখতে করে নাও; কাজের সময় এই দরকারী জিনিষটা স্রেফ ভুলে না বস···[পিস্তল বাগাইয়া অগ্রসর]।

প্রভাত। [অনুসরণ করিয়া] কিছু ভেব না, এই দুপুর রোদ্দুরে পাঁচ-মুণে পাথরটা রাস্তার মধ্যিখানে টেনে আনতে আপ্-সেই মুখের চেহারা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে। কিন্তু খবরদার, পিস্তলটা আবার যেন ছুঁড়ে বস না; তাতে অনর্থক অনর্থ ঘটবে!

সেবা। ঘটুক। তার ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি এবার চলে এস ত··· [উভয়ের প্রস্থান]

[নেপথ্যে মোটর আগাইয়া আসার শব্দ। বারম্বার হর্নের ধ্বনি, যেন সামনে বাধা আবিষ্কার করিয়াছে।]

[একটা গুলির শব্দ। 'হ্যাণ্ডস আপ' এর দুরত্ব-ক্ষীণ আদেশ।

ক্ষণকাল পরে সেবার পিস্তলের উদ্যত মুখের আগে আগে দুই হাত উচু করিয়া বৎসর ত্রিবিশের সম্ভ্রান্ত ও বুদ্ধিমান চেহারার একটি যুবকের প্রবেশ। ইহার পরনে দামী ট্রাউজার্স ও পুরু সিল্কের বুশ-শার্ট; পায়ে মোটা সোল্-এর দামী জুতা।

ইহাদের পশ্চাতে উর্দি পরা মোটর-চালকের ও তাহার পিছনে পিছনে প্রভাতের প্রবেশ। পকেটে আঙুল পুরিয়া প্রভাত একটা পিস্তলের মত আকার সৃষ্টি করিয়াছে এবং তাহা মোটর চালকের প্রতি তাক করিয়া রাখিয়াছে। তাহার চোখে মুখে ভয়ঙ্কর ভাব ফুটাইবার হাস্যকর প্রয়াস।]

সেবা। [যুবকের প্রতি] খবরদার, হাত নামাতে চেষ্টা করবেন না। তা হলেই গুলি খেয়ে মরতে হবে। সঙ্গে টাকা-পয়সা যা আছে, বের করে দিন্—

যুবক। তা হলে যে আবার হাতটা নামাতে হয়। হাত উচু করে রাখতে বললেন না? এক কাজ করুন না, আপনিই বরঞ্চ পকেটে হাত ঢুকিয়ে যা নেবার নিয়ে নিন, আমি হাত দুটা উচু করেই থাকি—

সেবা। ভারি অভদ্র ত আপনি? বিনা পরিচয়ে একজন ভদ্রমহিলা আপনার পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেবে! নিন্, হাত নামিয়ে যা আছে চটপট বের করে দিন্, আমাদের দেরি করবার সময় নেই। যা আছে, সব বের করুন—

প্রভাত। [সোফারকেও হাত নামাইতে উদ্যত দেখিয়া] আরে, না না। তোমার নামিয়ে কাজ নেই। তুমি ওয়ার্কার, আমাদের কমরেড। তোমার পয়সা তোমার পকেটেই থাকুক, শুধু দয়া করে হাত দুখানা উচু করেই থাক, বাছাধন—

সেবা। [যুবক মনিব্যাগ বাহির করিলে] দিন্, ছুঁড়ে দিন্। (ছুঁড়িয়া-দেওয়া ব্যাগ তুলিল ও দ্রুত টাকা গুনিয়া) একশো সাতাশ টাকা ন' আনা এক পয়সা। ব্যস।

যুবক। ন' আনা! গুণতে ভুল করেন নি ত? মানে, ১৭ আনা এক পয়সা থাকার কথা, যদি না—

সেবা। শেম। এত বড় গাড়ী হাঁকিয়ে চলেছেন, অথচ সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছেন মাত্র এক শো সাতাশটা টাকা! ও রকম ভাবে আমাদের ঠকাবার মানেটা কি শুনি? এটা রীতিমত একটা···

যুবক। [বিনীত কণ্ঠে] সত্যি ভারি অপরাধ হয়ে গেছে। আপনারা পিস্তল বাগিয়ে রাস্তার ধারে অপেক্ষা করে আছেন জানলে নিশ্চয়ই এত সামান্য নিয়ে বের হতাম না। শুধু পেট্রোল কেনার পয়সা সঙ্গে নিয়েই···

সেবা। হাওয়া খেতে বেরিয়ে পড়েছেন! স্বার্থপরতার একটা মাত্রা থাকা উচিত।···চতুর্দ্দিকে অসহায় মানুষ অনশনে ছটফট করছে, অসুস্থ শিশু চিকিৎসার অভাবে মারা যাচ্ছে, মেয়েরা লজ্জা নিবারণের উপযুক্ত কাপড় জোগাড় করতে পারছে না, আর আপনি তাদেরই ঘরের সামনে দিয়ে ঢাউস মোটর গাড়ীর পেট পেট্রোলে ভরতি করে টাকার অন্ত্যেষ্টি করতে করতে হাওয়া খেতে ছুটে চলেছেন।···কি করেন আপনি?

যুবক। বলা যেতে পারে, জমির উপস্বত্ব ভোগ করি··· মানে···

সেবা। জমিদার?

যুবক। অনেকটা। তবে এগ্রিকালচার নয়, বরঞ্চ ইণ্ডাস্ট্রি···

সেবা। [তাচ্ছিল্যের সঙ্গে] মালিক?

যুবক। আইনতঃ মালিক কোম্পানীর শেয়ার-হোল্ডারেরা। আমরা তাদের সেবা করে থাকি ম্যানেজিং এজেন্টস হিসেবে···

সেবা। তাই বলুন। সেবা বলবেন না। সেবা নাম নিয়ে কাউকে আমি ঠাট্টা করতে দেব না।···

যুবক। আমি অত্যন্ত দুঃখিত। সেবা কথাটা সুন্দর বলেই ব্যবহার করেছিলাম; আপনার আপত্তি আছে জানলে কখনোই···

সেবা। থাক, থাক। যথেষ্ট বিনয় হয়েছে। [প্রভাতের প্রতি] প্রভাত-দা, তুমি না মোটর চালাতে শিখেছিলে? চল, তবে এর গাড়িটা নিয়েই আমরা এগোই···

প্রভাত। পারলে মন্দ হ'ত না। কিন্তু একবার একসিডেন্ট করবার পর কি আর এগোনো যাবে? ঐ জন্যেই তো একসিডেন্টে আমার আপত্তি···

যুবক। কোথায় যাবেন? আমিই আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসি। তাতে দু'পক্ষেরই সুবিধে হয়···

সেবা। [ধমকের সুরে] তা হয় বৈকি। ঘণ্টায় ষাট মাইল হিসেবে গাড়ি চালিয়ে সর্ব্বপ্রথম পুলিস ষ্টেশনে নিয়ে হাজির করতে পারেন! নিজেকে খুব চালাক ঠাউরেছেন, না? [পিস্তল বাগাইয়া] আরও বেশী টাকা নিয়ে বের হন নি কেন, শুনি? ম্যানেজিং এজেন্ট! গরিবের রক্তে সিন্দুক ভরে তুলছেন, অথচ তাদের কাজে টাকা দেবার সময়ই যত আটিকুঁটি!···[প্রভাতকে]

তুমি যে এমন অপদার্থ, প্রভাত-দা, তা আমি কখনই ভাবি নি। তোমাদের পাড়ায় সেই কার ভাঙা মোটরে তুমি ড্রাইভিং শিখছ, তাই এতদিন শুনে এসেছি। এতদিনেও যে চালাতে শেখ নি, তা কি করে জানব? সুবিধেমত গাড়ীটাও পাওয়া গিয়েছিল, অথচ তোমার অকর্ম্মণ্যতার জন্য···

প্রভাত। কিছু ভেব না, এদিকে যতই কম বাস চলুক, সন্ধ্যের মধ্যে কি আর একটাও পাওয়া যাবে না?···

সেবা। তোমার যেমন বুদ্ধি! বাস পাওয়া গেলেই কি! তাতে চড়া মানেই হাজতে গিয়ে হাজির হওয়া। [যুবককে ইঙ্গিতে দেখাইয়া] যাবার পথে এঁরা কি আর থানায় থানায় খবর দিয়ে যেতে কসুর করবেন···

যুবক। না, না! আমরা মোটেই তা করব না। একেই যথেষ্ট টাকা সঙ্গে না আনায় লজ্জিত হয়ে আছি, তার উপর কখনও এমন···

সেবা। যান, যান। আপনাদের ক্যাপিটালিষ্টদের জানতে আমার বাকি নেই। আপনারা সাপের মত খল। পরকে, এক্স-প্লয়ট' করতে করতে আপনারা নৈতিক অবনতির এমন নীচের ধাপে এসে পৌঁছেছেন যে, বিশ্বাসঘাতকতা করা আপনাদের কাছে ডাল ভাতের মত সহজ।···হাজার হাজার খাটিয়েকে ঠকিয়ে আপনারা ব্যাঙ্কের অঙ্ক বাড়াচ্ছেন, প্রাসাদ তুলছেন, ঢাউস মোটরগাড়ি চেপে হাওয়া খেতে বেরুচ্ছেন। অথচ মজদুরেরা খেয়ে বাঁচবার জন্য যেই দু' পয়সা মজুরি বাড়াবার দাবি করল অমনি···

যুবক। দেখুন, এটা একটু অত্যুক্তি করে ফেলছেন। মজুরেরা মাইনে বাড়াবার কায়দা খুব ভালো করেই জানে; প্রয়োজন হলেই তারা দাবি মিটিয়ে নিয়ে থাকে। এরা তো ইস্কুলের মাষ্টার বা আপিসের কেরানীদের মতো নিরীহ প্রাণী নয় যে, মুখ বুঁজে কষ্ট সহ্য করবে। বরঞ্চ এদের অসহিষ্ণুতায়···

সেবা। চেহারা দেখে আপনার সম্বন্ধে আমার কতকটা ভালো ধারণা হয়েছিল। এখন দেখছি, সব ক্যাপিটালিষ্টই সমান!··· যান, শীগ্‌গির চলে যান। গাড়ীটা নিয়েই যেতে পারেন। প্রভাত-দা যখন চালাতে পারবে না, তখন ওটা আটকে রেখে লাভ নেই।···যান্। [প্রভাতকে] ওকেও ছেড়ে দাও, প্রভাত-দা···

যুবক। আপনাদের পৌঁছে দিতে আমার কিছু কষ্ট হ'ত না। অনর্থক সন্দেহ করে নিজেদেরই অসুবিধে করছেন।···

সেবা। [ধমকাইয়া] থাক, আর আত্মীয়তা করতে হবে না। একেই আপনার মত নির্লজ্জ ক্যাপিটালিষ্ট দেখলে আমার মাথায় রক্ত চড়ে যায়; তার ওপর সারা দুপুর রোদে তেতে, তেষ্টায় গলা কাঠ হয়ে, ভয়ঙ্কর হয়ে আছি। কখন পিস্তলের ট্রিগারে আঙুলের টিপুনি পড়ে যায়···

যুবক। তেষ্টা পেয়েছে তা এতক্ষণ বলেন নি কেন? আমার গাড়িতে খুব ঠাণ্ডা জল আছে। অনায়াসেই জল খেয়ে সুস্থ হয়ে···

সেবা। [পিস্তল উদ্যত করিয়া] যান, চলে যান বলছি। আর একটি কথাও নয়। চলে যান···[পিস্তলের মুখ শূন্যে তুলিয়া ফাঁকা আওয়াজ করিল।]

যুবক। অগত্যা! আচ্ছা, তা হলে চলি। নমস্কার। মিছিমিছি আপনাদের এতটা মেহন্নত করালাম, অথচ আগে জানলে অনায়াসেই আরও কিছু টাকা সঙ্গে আনতে পারতাম···

[প্রস্থানোদ্যোগ]

সেবা। দাঁড়ান। আপনাদের কিছু বিশ্বেস নেই।··· [প্রভাতকে] চল, প্রভাত-দা, এদের একেবারে রওনা করে দিয়ে আসি···

প্রভাত। তা ত বটেই। অভ্যর্থনা করে এনেছিলাম; এবার 'সি-অফ' না করলে চলবে কেন···চল···

[সকলের প্রস্থান]

পট-পতন

—

প্রথম অঙ্ক

২য় দৃশ্য

[বাংলো-প্যাটার্ণের বাড়ীর বসিবার কামরা। রাস্তার দিকের দেওয়ালের মাঝামাঝি কাচের দরজা; দরজাটা ভেজানো। ইহার দু'দিকে দুটি কাচের জানালার কাচে রঙিন পর্দ্দা আঁটা।

ঘরের একপ্রান্তে একটি ছোটখাটো পড়ার টেবিলে এক গাদা পরীক্ষার খাতা লইয়া বৎসর আটত্রিশ-উনচল্লিশের সম্ভ্রান্তদর্শন এক বিধবা মহিলা খাতা দেখায় ব্যস্ত আছেন। তাঁর পরনে কালোপেড়ে শাড়ি ও সাদা ব্লাউজ।

কামরার অপর অংশে সাদা-ঢাকনায় ঢাকা মাঝারি-সাইজের একটি টেবিলের চারদিকে গোটাকয়েক চেয়ার। এই দুইয়ের মধ্যখানে কম্বাস্‌-এ মোড়া মেঝের উপর একটা কৌচ এবং আরও কয়েকটা আরামদায়ক বেতের চেয়ার। দেওয়ালের কাছে একটা ছোট টেবিলে একটা পোর্টেবল গ্রামোফোন, ইহার নীচের তাকে রেকর্ডের বাক্স। দেয়ালে এখানে সেখানে কতকগুলি ফটো টাঙানো।]

[খাতা পরীক্ষায় ব্যস্ত গৃহস্বামিনী মমতার পিছনের দরজা দিয়া ভিতর হইতে ভৃত্য গণেশের প্রবেশ।]

গণেশ। [সামান্য দ্বিধা করিয়া] এবার কি চায়ের জায়গা লাগিয়ে দেব, মা? চারটে বেজে গেছে···

মমতা। [ফিরিয়া] যারা চা খায় তারা তো ভোরেই চলে গেছে। জায়গা লাগিয়ে কাজ নেই; তুই নিজেই বরঞ্চ আমাকে এক কাপ চা তৈরি করে দিয়ে যা, বাবা···খাতাগুলো দেখে ফেলতে হবে···

গণেশ। মাসিমা কি তা হলে আজকে আর ফিরে আসছেন না?···

মমতা। তাই তো কথা। তবু তুই তৈরি থাকিস। হট করে কখন সে দলবল নিয়ে হাজির হয়, কিছু তো ঠিক নেই।··· তখন···[বাহিরের দরজায় খুট খুট শব্দ] দেখ্ তো গণেশ, বাইরের দরজা কে খুট খুট করে নাড়ছে···

[গণেশ আগাইয়া গিয়া দরজা খুলিল। ছুটি শাড়ি-পরা বারো তের বছরের মেয়ে লজ্জায় জড়সড়ভাবে ভিতরে প্রবেশ করিল।]

১ম মেয়ে। [গণেশ-ক] দিদিমণি বাড়ী আছেন ?···

মমতা। কে, মিনু ? এস। এস লক্ষ্মী। এত রোদ্দুরে বেরিয়েছ কেন ?···

মিনু। [জড়সড়ভাবে] এখন চারটে বেজে গেছে দিদিমণি। লক্ষ্মী বলছে, প্রাইজ নাকি পরশু হবে না, পিছিয়ে যাবে। তাই জিজ্ঞেস করতে···

মমতা। [সবিস্ময়ে] পিছিয়ে যাবে! কেন ?

লক্ষ্মী। সবাই বলছে, দিদিমণি···

মমতা। সবাই! কৈ আমি তো জানি নে! অথচ আমারই তো সবচেয়ে বেশী জানার কথা···(প্রস্থানোদ্যত গণেশকে) তুই এক কাজ কর, গণেশ। বরঞ্চ এদের জন্য চায়ের জায়গা করে দে···

লক্ষ্মী। আমি চা খাই নে দিদিমণি। বাবা বলেন, চা খাওয়া খুবই···

মমতা। গুরুজনের কথা তবে খুবই মান্য কর দেখছি। বেশ তো, চা না-ই খেলে। গণেশের ভাঁড়ারে অন্য খাবারও আছে, কি বলিস গণেশ ? যা, টেবিলটা সাজা। এদের সঙ্গে বসেই···

মিনু। [সসঙ্কোচে] আমরা খাবারও খেয়ে এসেছি, দিদিমণি···

মমতা। ঠিক আছে। অল্প একটু খেলে কিছু হবে না। [গণেশের প্রস্থান]···তার পর, প্রাইজ হচ্ছে না কেন, লক্ষ্মী ?

লক্ষ্মী। দাদারা শুনে এসেছেন কোত্থেকে জানি। এখানকার কোলিয়ারিগুলোতেও নাকি বাঘদিয়ার কোলিয়ারির মত ধর্ম্মঘট সুরু হবে। রোজ মিটিং হচ্ছে। প্রাইজের দিন নাচ-গান হলে ওরা নাকি জোর করেই সব ভেঙে দেবে···

মমতা। তাও কখনও দেয়! কিছু ভয় নেই, যেমন ঠিক আছে, তেমনি হবে। কাল সন্ধ্যায় ষ্টেজ-রিহার্সেল; তার পর পরশু বিকেলে দেখা যাবে, কে কতটা ভালো করতে পার···

মিনু। লক্ষ্মীকে বলে দিন না, দিদিমণি, ও যেন অত আস্তে না গায়, তা হলে আমার নাচেও ভুল হয়ে যায়···

[প্লেট ইত্যাদিসহ গণেশের প্রবেশ ও খাওয়ার টেবিলটার দিকে অগ্রসর।]

লক্ষ্মী। আহা, নিজেই ভুল করো; এখন আমার গানে দোষ ধরা হচ্ছে। নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা ··

মমতা। আচ্ছা, সে আমি কাল দেখব। কিন্তু সব্বারই খুব ভালো করা চাই; লাট-সাহেবকে খুশি করতে হবে তো। তোমাদের ভালবাসেন বলেই না তিনি এতদূরে তোমাদের স্কুলের প্রাইজে আসতে রাজী হয়েছেন। স্বাধীন ভারতের আমাদের নিজেদের দেশী লাট-সাহেব কিনা··· [গণেশের প্রস্থান]

লক্ষ্মী। দেশী লোক, তো লাট 'সাহেব' কেন দিদিমণি ?

মমতা। [সহাস্যে] সাহেবও আমাদের দেশী কথা, উর্দ্দু থেকে এসেছে। ইংরেজী কথার মধ্যে ঐ লাটটি; লর্ড শব্দের অপভ্রংশ। আজকাল লাট-সাহেবের জন্য পরিভাষা ঠিক হয়েছে—রাজ্যপাল। তুমি বরঞ্চ সেটিই ব্যবহার করো··· [মিনুর মিটিমিটি হাস্য] দেশী নাম হবে···

[বাহিরের দিকে একটা প্রবল ঝংঝরে শব্দ। সকলে সচকিত হইল।]

মিনু। [সহাস্যে] ঐ, ডাক্তারবাবু!

লক্ষ্মী। এই ঝংঝরে মোটরগাড়ীর শব্দ শুনলেই বুকের ভেতরটা কাঁপতে থাকে—যা নিষ্ঠুর ডাক্তারেরা!···বড়দা বলেন, এ রকম গাড়ী থাকার খুব সুবিধে; ভেঁপু টিপতে হয় না, লোকেরা নিজেরাই সাবধান হয়ে সামনে থেকে পালিয়ে যায়!···

মিনু। ওরকম বলো না, লক্ষ্মী। অসুখ হলে ডাক্তারবাবু খুব তেতো ওষুধ দিয়ে দেবেন।

[বাহিরে কণ্ঠধ্বনি। গাড়ির মতোই ঝংঝরে সাজে, গলায় ষ্টেথিস্কোপ ঝুলাইয়া মধ্যবয়স্ক ডাক্তার চৌধুরীর প্রবেশ।]

ডাক্তার। [ভেতরে ঢুকিয়া] ভেতরে আসতে পারি কি, মিসেস সেন ?

মমতা। আসুন, ডাক্তার চৌধুরী। বসুন···

ডাক্তার। না, বসব না। কল্-এ যাচ্ছি। ভাবলাম, আপনাকে খবরটা দিয়ে যাই···

[মিনু ও লক্ষ্মী উদ্বিগ্নভাবে দৃষ্টিবিনিময় করিল। ভাবখানা এই এবার ধর্ম্মঘট সুরু হওয়ার ও প্রাইজ-বন্ধের খবর শুনিতে হইবে।]

প্রেসিডেণ্ট আর সেক্রেটারী দু'জনের সঙ্গেই কথা হ'ল। মনে আপনার সেই প্রস্তাবটা সম্বন্ধে। খুব রাজী মনে হ'ল না। দু'জনেই বললেন, বিজনেসের অবস্থা খারাপ, কোলিয়ারিগুলো সবই ডিপ্রেশনে মার খাচ্ছে, কখন কি হয় কিছু ঠিক নেই। যে কোন সময়েই লেবার হাঙ্গামা সুরু হতে পারে। এ অবস্থায় মাষ্টারদের মাইনে বাড়াবার প্রস্তাব স্যাংশন্ করতে পারা যাবে কি!···তবেই বুঝছেন, কর্ত্তৃপক্ষের টেম্পার! আমার কি, আমি কমিটিতেও ওঠাতে পারি; কিন্তু কোলিয়ারির মালিকদের মতলব না থাকলে···

মমতা। [গম্ভীরভাবে] হ্যাঁ, তা তো বটেই।···অথচ আমরা কোলিয়ারির ইস্কুলের শিক্ষক না হয়ে কোলিয়ারির মজুর হলে আমাদের এই সামান্য দাবি কর্ত্তৃপক্ষ এত সহজে প্রত্যাখ্যান করতে পারতেন কিনা, তাই ভাবি···

ডাক্তার। ক্ষেপেছেন। মজুরেরা যে নিজেদের দাবি আদায় করে নিতে জানে। কাজ বন্ধ হলে মালিকের মুনাফা মারা যায়। পারবেন আপনারা ষ্ট্রাইক করতে? আর করলেই বা কি? সরলমতি বালক-বালিকা ছাড়া তাতে আর কারুর গায়েই আঁচড়টি পড়বে না…[উচ্চহাস্য করিয়া মিনু ও লক্ষ্মীর প্রতি] কি গো, ঠাকরুণেরা, দিদিমণির কাছে কি করছ? ছুটো ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে যাব নাকি? [মমতাকে] তা হলে, চলি, মিসেস সেন। এ নিয়ে পরে আলোচনা করব; এদিকে আমার রোগীরা অপেক্ষা করে আছে, আমি হাজির না-হওয়া পর্য্যন্ত ভবলীলা পর্য্যন্ত ত্যাগ করতে পারছে না…[মিনু ও লক্ষ্মীর চাপা হাস্য]

মমতা। আচ্ছা, আসুন। পরশু নিশ্চয়ই যেন যাবেন।

ডাক্তার। [চলিতে চলিতে থামিয়া] কোথায়?

মমতা। প্রাইজ-ডের কথা বলছি। সেদিন যেন আবার রোগীর অজুহাত দেখাবেন না…

ডাক্তার। মুশকিল তো ঐখানে! অসুখ-বিসুখগুলো এমন বদমাস যে লাট-বেলাটকে পর্য্যন্ত পরোয়া করে না।…যাব বৈ কি, নিশ্চয়ই যাব। এই ঠাক্‌রুণেরাই নাচ-গান করবে তো? নাচতে গিয়ে ঠ্যাং ভেঙে গেলে, আমাকেই তো ঠ্যাং জোড়া লাগাতে হবে, হাজির না থাকলে চলবে কেন?

[উচ্চহাস্য করিয়া প্রস্থান।]

মমতা। এস, মেয়েরা। চায়ের টেবিলে এসে বস। [বাহিরে প্রথম দৃশ্যশ্রুত মোটরের হর্ন] এ আবার কার গাড়ীর হর্ন! বাড়ীর সামনেই দাঁড়াল না। [মেয়েদের] বেরিয়ে একটু দেখ তো। [মিনু ও লক্ষ্মীর প্রস্থান]…ক্লাস এক্সারসাইজের এই খাতাগুলো আজ আর দেখা হ'ল না।…[ডাকিয়া] তোর কতদূর, গণেশ। যা হয়েছে এবার নিয়ে আয়…(খাতার বাণ্ডিল বাঁধিতে লাগিল)

[লক্ষ্মী ও মিনুর আগে আগে প্রথম দৃশ্যের যুবকটির প্রবেশ।]

যুবক। দিদি, আমি এসেছি। [মমতা দ্রুত ফিরিয়া তাকাইল] ভয়ানক চা-তেষ্টা পেয়ে গেল; ভাবলাম, আপনার কাছেই একবার ঘুরে যাই…

মমতা। [সবিস্ময়ে] প্রদোষ! এস, এস। কি আশ্চর্য্য! তুমি আসতে পার, এ আমি ভাবতেও পারি নি। দিদির এ যে আশাতীত সৌভাগ্য!…

প্রদোষ। [কৌচে বসিয়া] দেখুন দিদি, এ রকম অনুযোগ করবেন না। মাত্র দু'বছর আগেও আপনার কাছে এসে গেছি। আমার সময় কোথায়? আমি এখন একজন কোল্-কিং। গত ক'বছর যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় ব্যস্ত ছিলাম; এখন আবার পোষ্ট-ওয়ার্‌ হাঙ্গামা নিয়ে পড়েছি। দেশ-স্বাধীন হলেও ছুটি নেওয়ার স্বাধীনতা হয় নি …কোথায়, চা থাকে তো তাড়াতাড়ি দিন্‌, এখুনি আবার…

মমতা। দিচ্ছি, বসো। তোমার তো তাড়া লেগেই আছে! …(ছাত্রীদের প্রতি) এসো, তোমরাও এসে টেবিলে বসো…

[খাদ্যাদিসহ গণেশের প্রবেশ] যা, খাবারগুলো রেখে চটপট চায়ের জলটা নিয়ে আয় তো, বাবা।…তারপর, হঠাৎ পথ ভুল করে এসে পড়ো নি তো প্রদোষ?…

প্রদোষ। পথ ঠিক চিনে এসেছি, দিদি। গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড দিয়ে ছুটতে ছুটতে সুপরিচিত মাইল-পোষ্টটা নজরে পড়ে গেল; শোফারকে তাড়াতাড়ি মোড় নিতে বললাম।…কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে নিতান্ত ডানপিটেদেরও আপন-জনের কথা মনে পড়ে যায়…

[গণেশের প্রস্থান]

মমতা। [উদ্বেগের সহিত] দুর্ঘটনা! কি দুর্ঘটনা?…

প্রদোষ। আর বলেন কেন! ভারি নাকাল হয়েছি। এক মেয়ে-ডাকাতের হাতে পড়েছিলাম। রাস্তার ঠিক মাঝামাঝি প্রকাণ্ড এক পাথরের চাপড়া ফেলে রেখেছিল; বাধ্য হয়ে মোটর থামাতে হ'ল। তখন তিনি স্বয়ং পিস্তল-হস্তে আবির্ভূতা হলেন; পিস্তল তাগ করেই গাড়ী থেকে নামিয়ে জঙ্গলের ভেতর টেনে নিয়ে গেলেন।…সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়েছে, দিদি; সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়েছে! মানে, মনিব্যাগের প্রায় সওয়া শো টাকা!…

[চায়ের পাত্র হাতে গণেশের প্রবেশ]

মমতা। বলো কি! দিন-দুপুরে! কোনও রকম অত্যাচার-টত্যাচার করেনি তো!

প্রদোষ। কিচ্ছুটি নয়। গায়ে আঁচড়টি পর্য্যন্ত দেয় নি। ভারি দয়াবতী ডাকাতনী মনে হ'ল। নইলে, যা অপরাধ করেছি, তাতে অন্ত কেউ হলে…

মমতা। কি অপরাধ?

[গণেশের প্রস্থান]

প্রদোষ। খুব গুরুতর অপরাধ! এত বড় গাড়ী হাঁকিয়ে যাচ্ছি, অথচ মনিব্যাগে মাত্র সওয়া শো টাকা, এ কি কম বেয়াদপি? এতে গাড়ী আটকাবার হাঙ্গামা পোষাবে কেন। কিন্তু এরা ভারি ভদ্রলোক। একটু মাত্র ধমক দিয়েই ছেড়ে দিলে। এমন কি, মোটরটা পর্য্যন্ত বেদখল করেনি—বেচারীরা কেউ গাড়ী চালাতে পারে না কিনা।…সঙ্গীকে নিয়ে বীরাঙ্গনাটি 'সি-অফ' পর্য্যন্ত করে দিয়ে গেলেন, এমন বিনয়ী! গাড়ীর ভেতর, ঠিক পা রাখবার জায়গাতেই চামড়ার ব্যাগে কোম্পানীর বারো হাজার টাকা চুপচাপ পড়েছিল, সেদিকে একবার দৃষ্টিপাতও করলে না! [উচ্চ হাস্য]… দিন, চা দিন। ভয়ানক তেষ্টা পেয়েছে। [মমতার দেওয়া চায়ের পেয়ালা হাতে লইয়া তাহাতে এক চুমুক দিয়া] আঃ! আপনার বাড়ীর চায়ের তুলনা হয় না, দিদি। আমার কখনও কখনও মনে হয়, এসব ঝামেলা চুলোয় বলে ঝেঁটিয়ে ফেলে আপনার বাংলোটার পাশে ঠিক এই রকম আর একটা বাংলো তৈরি করে বসে যাই; আপনার ইস্কুলেই একটি চাকরি নিয়ে…

মমতা। একই সঙ্গে উপোস করতে সুরু কর, কেমন?

[নিম্‌কির প্লেট প্রদান]

প্রদোষ। এখন চা আর নিম্‌কি দেখে উপোসের কথা বিশেষ

হবে কেন ?···আমাদের মাষ্টারদের আমরা উপোস করাই, না ? কঠিন, বাস্তব মাল ছাড়া আর কিছুর সার্থকতা আমরা বুঝিনে। অধ্যাপক, ফিলজফার, আর্টিষ্টকে আমরা না খাইয়ে রাখি। আর প্রদোষ গুপ্তের মত যারা বাস্তব মাল উৎপাদন করে—তা সে মাল দেখতে যতই ময়লা হোক না কেন—তাদের অর্থ আর আরাম, কোনওটারই অভাব হয় না।···এই দেখুন না, একই বছর, একই তারিখে, একই ট্রেনে আপনি আর আমি ভাগ্য-পরীক্ষায় এ অঞ্চলে যাত্রা করে এসেছিলাম; আপনি মেয়ে-ইস্কুলে মাষ্টারি নিয়ে পরিবারের স্বল্প আয় বাড়াতে এসেছিলেন, আর আমি এসেছিলাম বেকার-নাম ঘুচাবার জন্য, চাষবাস সুরু করতে।···জমির ইজারা নিলাম, ধানক্ষেত করব। তুচ্ছ ধান! বরাতে থাকলে ধান কয়লা হয়ে দাঁড়ায়! জমির তলায় খনি বেরিয়ে গেল! পার্টনার জুটল, শ্রীভগবানের কৃপায় দ্বিতীয় মহাসমরও সুরু হয়ে গেল। প্রদোষ গুপ্ত আজ কোল-কিং; বিশ হাজার টাকার গাড়ী হাঁকায়। আর শিক্ষয়িত্রী মমতা সেন ?—দিনের পর দিন যে নিঃশব্দে নিঃস্বার্থভাবে জ্ঞান বিতরণ করছে, শিশুদের মানুষ করে তুলছে, তার জন্য দেড় শো টাকাই যথেষ্ট! কি বলেন, দিদি, যথেষ্ট নয় ?···

মমতা। না, ভাই। এ কথা বলো না। নিজেরও যোগ্যতা থাকা চাই। যে পরিশ্রম তুমি করেছ···

প্রদোষ। তার দশ গুণ পরিশ্রমেও আমার শতাংশ উপার্জ্জন করা যায় না, দিদি। এফিশিয়েন্সি, বুদ্ধি, কল্পনা, নেতৃত্ব, এ সবই গৌণ, মুখ্য হচ্ছে 'লাক্', ভাগ্য। হয় ধনীর ছেলে হবে, অনেক ক্যাপিটাল আর সুবিধাজনক আত্মীয়-বন্ধু থাকবে, আর নয় ত আমার মত পিওর 'লাক্'।···আমাকে যখন ইউনিভার্সিটি থেকে 'কেরীয়র্' লেকচার দিতে ডাকে, তখন হেসে মরি। ধনী হবার, ভাল চাকরি পাওয়ার প্রধানতম উপায়—একসিডেন্ট, বরাত। বরাতকে বন্দী করার কোনও প্রক্রিয়াই আমার জানা নাই। কিন্তু তা তো আর বক্তৃতায় বলা চলে না···যাকগে। আপনার বাবা কেমন আছেন ? প্রথম বার ট্রেনে চেনা হবার পর বোধ হয় আরও একবার তাঁকে দেখেছি···

মমতা। খুব ভালো আর কোথায়। তারপর খুকীকে নিয়ে এমন ভাবনায় থাকেন। আজও দুপুরে একটা টেলিগ্রাম করেছেন···

প্রদোষ। খুকীটি কে ?

মমতা। আমার ছোট বোন।···সে আবার একজন লেবার লীডার হয়ে উঠছে কি না। দলবল নিয়ে এখানে এসে হাজির। বাঘদিয়া না কোথাকার কোলিয়ারিতে ধর্ম্মঘট হচ্ছে, তাই চালাতে এসেছে···

প্রদোষ। [চোখ তুলিয়া কৃত্রিম অসন্তোষ সহকারে] একথা আগে জানলে কখ্খনো আপনার বাড়ীতে আমি চা খেতাম না···

মমতা। (সবিস্ময়ে) কেন ?

প্রদোষ। আবার জিজ্ঞেস করছেন কেন ? এই বাঘদিয়া কোলিয়ারির নতুন ম্যানেজিং এজেন্টস কারা জানেন ? ম্যানেজিং এজেন্সির অর্দ্ধেক অংশীদার কে, খোঁজ রাখেন ? কোথায় আপনার বোন ? ডাকুন তাকে, একবার তর্ক হয়ে যাক···

মমতা। তার উপায় নেই। আজ সকালেই সে দলবল নিয়ে বাঘদিয়া রওনা হয়ে গেছে। নইলে সানন্দেই সে তোমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করত; তর্কে তার মোটেই অরুচি নেই··· [ছাত্রীদের] তোমাদের খাওয়া হয়েছে ? নাও, এই বাটিটাতে হাত ধুয়ে নাও···

প্রদোষ। ছাত্রী ?

মমতা। হাঁ। তোমাদের ধর্ম্মঘটের ছোঁয়াচ এখান পর্য্যন্ত পৌঁছে ওদের পরশু দিনের প্রাইজের উৎসব মাটি করে দেয় কি না, এরা সেই ভয়ে আছে। [মেয়েদের] গুপ্ত সাহেবকে নেমন্তন্ন করে দাও না তোমাদের প্রাইজে হাজির থাকবার জন্যে···

লক্ষ্মী। [সলজ্জ ভাবে] তবে একটা ছাপানো চিঠি বের করে দিন···

প্রদোষ। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করলে ত্রুটি থেকে যায়। এই তো মুখে মুখেই নিমন্ত্রণ নিয়ে গেলাম। কিন্তু পরশু সকালেই আমি কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি; কি করে হাজির হব, বল ?···কি হবে প্রাইজে ? গান-টান হবে ?···

মমতা। [মেয়েদের] আচ্ছা, তোমরা এক কাজ কর না; এঁকে তোমাদের সেই 'সমুদ্রগীতি'টা দেখিয়ে দাও না। এই সঙ্গে একবার রিহার্সেলও হয়ে যাবে···

প্রদোষ। তা হলে তো চমৎকার হয়। এই অজুহাতে এখানে অনায়াসে আরও আধ ঘণ্টা থেকে যেতে পারি। পার্টনার চাটুজ্যেসাহেব আমার পথ চেয়ে চেয়ে অস্থির হয়ে উঠছেন, এটা কল্পনা করা কম আনন্দদায়ক নয়, বেচারী! কিন্তু দেরি করলে চলবে না।···যাও তো, কি শিখেছ, দেখাও। দেরি করলে দিদিমণির কাছে নালিশ করে বকুনি খাওয়াব···

লক্ষ্মী ও মিনু পরস্পরের কানে ফিসফাস করিল।

লক্ষ্মী। গ্রামোফোনে সেই রেকর্ডটা দেব, দিদিমণি ?···

মমতা। দেবে বৈকি। অর্কেষ্ট্রা চাই তো। [মিনুকে] ঐ টেবিলটার ড্রয়ারেই তোমাদের ঘুঙুরগুলো আছে, চট করে পরে নাও···[মেয়েদের তথাকরণ]···আজ রাতটা এখানে থেকেই যাও না, প্রদোষ। কাল সকালের আগে তো ধর্ম্মঘটিদের নাগাল পাবে না···

প্রদোষ। ওরে সর্ব্বনাশ! লোভ দেখিয়ে আর কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করবেন না, দিদি।···আজ রাতটা ভারি মূল্যবান। আমাকে আর চাটুজ্যেসাহেবকে আজ রাতেই কোলিয়ারির ম্যানেজার এঁদের সঙ্গে সলাপরামর্শ করে একটা ব্যবস্থা ঠিক করতে হবে। অনির্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত ধর্ম্মঘট চলতে দেওয়া যেতে পারে না···

মমতা। তবে কাল রাতে এখানে এসে খেয়ো···

প্রদোষ। ভয়ানক লোভ হচ্ছে, দিদি। [ভাবিয়া] আচ্ছা,

বেশ, খাব দিদি···[গ্রামোফোনে বাজিয়া উঠিল] এইবার তাড়াতাড়ি শুনে নেওয়া যাক···

[গ্রামোফোনের কাছে দাঁড়াইয়া লক্ষ্মীর গান এবং ঘরের মধ্যস্থলে মিন্নুর নৃত্য]

তরঙ্গ,
আসে তরঙ্গ,
সিন্ধুর তরঙ্গ।
আসে কল্লোলে,
অযুত হিল্লোলে
কত যে মনোহর স্রোতের ভঙ্গ।
বলাকার মতো আসে ফেনপুঞ্জ
বাজে ডম্বুরা গুরু-গম্ভীরা
ঝিনুকে জলে সুমধুর গুঞ্জ।
চাঁদ,
উঠেছে চাঁদ,
পূর্ণিমার চাঁদ।
সিন্ধুর জল
হলো চঞ্চল
ফেনিল সমুদ্র আজি উন্মাদ।
ওড়ে ফেনার ফুল বুদ্বুদ ওঠে
সাগর-চিত্ত পুলক-ক্ষিপ্ত
তরঙ্গ লুটায় বালুকার তটে।

প্রদোষ। [হাততালিসহ] গুড! চমৎকার!···এর জন্য দু'জনেই আমার কাছ থেকে দুটো সোনার মেডেল পুরস্কার পেলে···

মমতা। না, না, তা কেন···

প্রদোষ। আমি খুশি হয়েছি কি না, তা আপনার খুশির ওপর নির্ভর করছে না, দিদি···(মেয়েদের) তোমরা ঠিকই পেয়ে গেছ! সঙ্গে আমার নিজের টাকা একটিও নেই, আমি মেডেল কিনেই পাঠিয়ে দেব; প্রাইজের দিনই তোমরা পেয়ে যাবে, দেখো। স্পেশাল শো-র পুরস্কারও স্পেশাল হয় কি না! (উঠিয়া) আর দেরি করবার উপায় নেই, দিদি। চলি···

[দরজার দিকে আগাইতে আগাইতে সহসা দেয়ালের একটি ফটোর প্রতি আকৃষ্ট হইল।]

মমতা। কালকের নেমন্তন্নটা যেন ভুলে যেয়ো না, ভাই। গরিব দিদির রান্না যেন ফেলা না যায়···

প্রদোষ। [ফটো লক্ষ্য করিতে করিতে] ক্ষেপেছেন। এই দুর্দিনের বাজারে কেউ নেমন্তন্নের কথা ভোলে!···এটা কার ফটো, দিদি?···

মমতা। ঐ তো খুকীর ফটো!···অমনি কিন্তু দেখতে আরও সুন্দর! অথচ দেখ তো কাণ্ড! কোথায় বিয়ে-থা করবে, ছেলেপুলে হবে, ঘর-সংসার করে সুখী হবে, তা নয় দলবল জুটিয়ে হৈ-চৈ করে বেড়াচ্ছে!···

প্রদোষ। [প্রস্থানোদ্যত] আপনি ভারি সেকেলে। আজকাল কেউ সুখী হতে চায় না, দিদি। সবাই সংগ্রাম করতে চায়।··· চলি···

[প্রস্থান]

[মমতা দরজার কাছে আগাইয়া গেল।]

পট-পতন

—

দ্বিতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

[একটা বেড়ার ঘরের অভ্যন্তর। ইহার একপ্রান্তে কয়েকটা চাল ইত্যাদির বস্তা। অপর প্রান্তে একটা ষ্টোভ, ডেকচি, কুকার ও চায়ের বাসনপত্র। ঘরের মাঝখানে একটা নড়বড়ে টেবিলের চার ধারে কয়েকটা ভেনেস্তা ও টিনের চেয়ার। টেবিলের উপর একটা পোর্টেবল্ টাইপরাইটার ও বিভিন্ন ফাইল। টেবিলের তলায় কতকগুলো পোষ্টারের বাণ্ডিল। ঘরের বেড়ায় বিভিন্ন পোষ্টার আঁটা, যথা: "ধর্ম্মঘট জিততে হবে"; "মরব তবু হারব না"; "মালিকের জুলুম চলবে না। দুনিয়ার মজদুর এক হও।"

এই টেবিলের সম্মুখে বসিয়া সত্য একটা লম্বা হিসাবের খাতায় হিসাব লিখিতেছে। সত্য প্রভাতের বয়সী, কিন্তু শান্ত প্রকৃতির ও নীরব কর্ম্মী। অন্য একটি যুবক কেষ্ট মেঝেয় বসিয়া প্রাণপণে ষ্টোভে পাম্প করিতেছে, কিন্তু ধরাইতে পারিতেছে না।

সত্য। [হিসাব হইতে চোখ তুলিয়া] তিন নম্বর বস্তিতে ক' মণ ডাল গিয়েছে, কেষ্ট?···

কেষ্ট। [ষ্টোভ পাম্পে বিরত হইয়া] ডাল! কৈ, ওখানে তো আমাকে ডাল দিতে বলা হয় নি। আমি তো শুধু চালই···

সত্য। তবেই হয়েছে। একেই ওরা খাপ্পা হয়ে আছে, তারপর আবার যদি সেখানে ডাল না যায়, তবে কি আর রক্ষে আছে। রাতে খিচুড়ি খাবে বলে ওরা সেই কখন আপিসে খবর দিয়ে গেছে, ইদিকে···

কেষ্ট। খিচুড়ি খাবে! ওরে বাবা, এ যে রীতিমত হুকুম-ফরমাশ দেখছি! খিচুড়ি পেলে আমরাই যে বর্ত্তে যাই, সত্যদা।

সত্য। ও রকম বলতে নেই। মজুরদের সেবা করতে এসে কি তাদের তাচ্ছিল্য করতে আছে। তা হলে ক্যাপিটালিষ্টদের সঙ্গে আমাদের তফাৎ কোথায়? ধর্ম্মঘটে জিততে হলে ভাল করে খাইয়ে দাইয়ে মজদুরের মনোবল রক্ষা করতে হবে ত। তিন নম্বর বস্তিটাই আবার বেশী গোলমাল করছে। সেবা বলছিল···

কেষ্ট। তা হলে সেবা-দি নিজেই হয় ত ডালের বস্তা নিয়ে গেছেন। সঙ্গে কিছু পেঁয়াজ, আদা আর ঘি দিয়ে দিলে উৎকৃষ্ট খিচুড়ি রান্না হতে পারত। তা হলে আর ষ্টোভ জ্বালাবার চেষ্টায়

গলদঘর্ম হতে হ'ত না, দিব্যি সেখানে হাজির হয়ে পাততাড়ি পাতাতাম!—দেখুন দেখি, সত্যদা, এ কি ব্যাটাছেলের কাজ! রান্না করবে মেয়েরা। অথচ আমাকে ইদিকে···

সত্য। আরে ছাই, কুকারটাই জ্বালিয়ে নাও না। কেন ও সব হাঙ্গামা করছ—

কেষ্ট। আগে চা তৈরি করে না খেলে রান্না করবার জোর আসবে কোত্থেকে, সত্যদা? সারাটা বিকেল বস্তিতে বস্তিতে চাল আর লেক্‌চার বিতরণ করে গায়ে কি আর তাগদ অবশিষ্ট আছে। অথচ তাতেও ব্যাটারা সন্তুষ্ট নয়; হুমকি দেখাচ্ছে, কালই গিয়ে কয়লা কাটা সুরু করবে। যেন মালিকের সঙ্গে ঝগড়া করে ওদের মাইনে বাড়িয়ে দেওয়ার সকল দায় আমাদের—ওরা থেকে থেকে শুধু হুমকি দেখাবে।···একেবারে একের নম্বর বেইমান···

সত্য। ওরা শিশু বৈ ত নয়, কেষ্ট। ওদের ওপর কি রাগ করতে আছে। মালিক ত এরই সুযোগ নিয়ে ওদের শোষণ করে। আমরাও যদি এদের ছেলেমানুষিতে বিরক্ত হয়ে এদের ত্যাগ করি, তবে এরা দাঁড়ায় কোথায়?

[শূন্য বস্তা কাঁধে প্রভাতের প্রবেশ]

সত্য। এই যে, প্রভাত। তার পর, তোমার ওদিকের খবর কি? চাল পেয়ে···

প্রভাত। [এক দিকে বস্তা ছুড়িয়া] খুব খুশি। খুব খুশি। খুশি হয়ে সরষের তেল, ডাল, নুন, আলু আর কিছু পরিমাণ ধেনোর ফরমাশ করে পাঠিয়েছে। মনোবল বজায় রাখতে হবে ত? সেবা কই, এখনও ফিরে আসে নি বুঝি? মারা যাবে মেয়েটা। মেয়েদের ঐ ত দোষ, একবার যদি মাতবে, তবে আর মাত্রাজ্ঞান থাকে না।···[কেষ্টকে] কি রে, কেষ্ট, চা করেছিস নাকি? দে দেখি বাবা, এক সসপ্যান্···

কেষ্ট। সবই তৈরি আছে প্রভাত-দা। শুধু এই ষ্টোভটা নিয়েই যা একটু মুশকিলে পড়েছি। দেখুন, ধরাতে পারেন কিনা···

প্রভাত। অপদার্থ, অপদার্থ! যদি সামান্য একটা ষ্টোভও ধরাতে না পারবি, তবে ষ্ট্রাইক-পরিচালনা করতে এসেছিস কেন। ও চেষ্টা ত্যাগ কর। কালই দোকানে নিয়ে গিয়েছিলাম। ওরা বললে, সারা বার্ণারই পাল্‌টাতে হবে। নে, বাইরে থেকে তিনটে ইট এনে [টেবিলের তলা দেখাইয়া] ঐ পোষ্টারগুলির সাহায্যে একটু আগুন ধরাবার চেষ্টা কর, বাবা। ওগুলোর আর প্রয়োজন নেই। কাল সকালেই ষ্ট্রাইকের একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে; তখন অনর্থক পোষ্টারগুলো ফেলা যাবে···[জামা টানিয়া খুলিল]

সত্য। আরে সর্ব্বনাশ! সেবা এসে তা হলে কি আর কাউকে আস্ত রাখবে। যা হয় সে আসবার পরে করো। ইতিমধ্যে তোমার চালের হিসেবটা করে ফেললে কেন—

প্রভাত। তা করে ফেল; শুধু এই অধমের কণ্ঠ থেকে হিসেব অঙ্ক কেন, একটু চিঁচিঁ শব্দও আর বেরুবে না। রুদ্ররস, করুণরস, হাস্যরস এবং রসদ বিতরণ করতে করতে আকণ্ঠ দেউলে হয়ে গেছি। (কেষ্টকে) আর দেরি করিস নে, কেষ্ট। আমি বলছি, পোষ্টারের আর দরকার হবে না। ওগুলি এবার চা-সেবায়···

[সেবার প্রবেশ। সঙ্গে দুই জন যুবক। ইহাদের হাতে নিঃশেষিত বস্তা।]

প্রভাত। এই যে, সেবা। এস বংসে। [কেষ্টকে নিরস্ত হইবার ইঙ্গিত] তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হ'ল, এটা কম আনন্দের কথা নয়। নইলে দুপুরবেলার আয়ের বহর দেখে [সেবার বিরক্ত ভাব] নিতান্ত ভড়কে গিয়েছিলাম। ভাবলাম, মজদুর ভাইদের তুমি যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছিলে তা বোধ হয়—

সেবা। [অন্যতম সঙ্গী যুবকের প্রতি] তরুণ, তুমি আর দেরি করো না ত, ভাই। [বস্তার দিক দেখাইয়া] বাঁ দিকের তৃতীয় বস্তাটি তুলে নিয়ে চটপট চলে যাও ত···[যুবকের তথাকরণ] আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হ'ল, এইটেই বড় কথা নয়। বড় কথা এই, মালিকের সঙ্গে কাল সকালে যে বড় রকমের লড়াই হবে, পেট ভরে খাওয়ার পর মজদুরেরা সেই লড়াই লড়বার উপযুক্ত বল পাবে। খালি পেটে সবচেয়ে বড় যোদ্ধাও লড়তে পারে না।···

প্রভাত। তা হলে তিন নম্বর বস্তির মেজাজও ফিরিয়ে দিয়ে এসেছ, বল?

সেবা। কেন, তিন নম্বর বস্তি এমন কি দোষ করেছিল? দুষ্ট লোকে যা-ই রটিয়ে বেড়াবে, তা-ই কি বিশ্বেস করে নিতে হবে? ওদের মোড়লেরা এল। আমি তাদের ধর্ম্মঘটের তাৎপর্য্য, আর এতে মজদুরদের দায়িত্ব সম্বন্ধে বুঝিয়ে দেওয়ার পর তারা এক বাক্যে বললে: "কখ্‌খনই আমরা নেমকহারামি করব না। মজদুরদের স্বার্থ এক। একথা ভাবলে আমাদের সকলকারই ক্ষতি।···না-খেয়ে না-পেয়ে আমাদের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আজ প্রথমে চাল, আর এখন ডাল পাওয়ার পর আমরা আরও অনেক দিন লড়তে পারব।"···[সত্যর প্রতি] আচ্ছা, সত্যদা, ওদের জন্য কিছু আলু আর পেঁয়াজের যোগাড় হতে পারে না? ওরা বলছিল···এই ধর, যদি দু'পাঁচ সেরও পাওয়া যায়, তবে অন্ততঃ তিন নম্বর বস্তিতে···

সত্য। পাগল! এত রাত্তিরে এ অঞ্চলে আলু পাব কোথায়?···

প্রভাত। ওহে সত্য, ষ্ট্রাইক চালানো অত সহজ নয়। তিন নম্বর বস্তি একটা প্রব্লেম বস্তি। মালিক পক্ষের শিবু-সর্দ্দারের সেখানে অখণ্ড প্রতাপ। তাদের মনোবল রক্ষা শুধু খিচুড়িতে হয় না; তার সঙ্গে আলুভাজা, অন্ততঃ আলুসিদ্ধ চাই। তোমার তা এন্টিসিপেট করা উচিত ছিল।···[সেবাকে] কিন্তু বৃথা চেষ্টা, সেবাময়ী। তিন নম্বর বস্তিকে হাতে রাখা দেবতার অসাধ্য। ওরা শহুরে ভোটারের মত, একজনের গাড়ী চড়ে পোলিং-বুথে যাবে, আর এক প্রতিদ্বন্দ্বীর ক্যাম্পে গিয়ে খাবে, কিন্তু ভোট দেবে তৃতীয় ব্যক্তিকে। ওদের আশা ছেড়ে দাও···

সেবা। অত সহজে আমি হাল ছাড়ি নি। কেন, ওরা কি বাঘ, ভালুক না সাপ যে কৃতজ্ঞতাবোধ থাকবে না? সারা ষ্ট্রাইকটা

ধরে' ওদের আমরা কম সাহায্য করেছি ? আর এসব হাঙ্গামা ত ওদেরই জন্ম। এসব নিশ্চয়ই ওরা বুঝবে। বুঝবে কে ওদের বন্ধু, আর কে ওদের···

[উত্তেজিতভাবে তরুণের প্রবেশ]

কি ব্যাপার ?···

তরুণ। লুঠ করে নিয়েছে। আমার ডালের বস্তা লুঠ করে নিয়েছে ! প্রভাত-দা, আসুন ত আপনারা। শীগ্‌গির আসুন। ব্যাটাদের একবার দেখে নিই···

সেবা। লুঠ করে নিয়েছে ! কারা ? কি করে ?···

তরুণ। কেবল বস্তিটার মুখে ঢুকেছি, আর অমনি গোটা চার-পাঁচ লোক চারদিক থেকে এসে ঘিরে ফেলল। বলল, "দিয়ে দে, আমরাই বেঁটে নেব।"···আমি ওদের চিনি ; সব ক'টাই শিবু-সর্দ্দারের দলের লোক।···আমি বললাম, "সরে যাও। যাকে দেবার, আমিই দেব।" তখন ওদের একটা বললে, "কে তোকে সর্দ্দারি করতে বলেছে। বস্তির সর্দ্দার আমরা।" বলেই বস্তা ধরে এক টান। সঙ্গে সঙ্গে বাকিগুলোও গায়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে···

সেবা। [চোখে আগুন বাহির করিয়া] এস, প্রভাত-দা। আমিও যাচ্ছি। গুণ্ডামি কিছুতেই সহ্য করা হবে না। মালিকের দালালেরা যে জুলুম করে মজুরদের ভয় দেখিয়ে কাজে টানবে, তা কিছুতেই বরদাস্ত করা হবে না।···চল, এখ্‌খুনি চল···

প্রভাত। [অনুত্তেজিত কণ্ঠে] তার আগে চা-টা খেয়ে নিলে হ'ত না, সেবা ?···

সেবা। [আহত ও রুষ্ট] উঃ, তুমি মানুষকে পাগল করতে পার, প্রভাত-দা।···এমন জরুরি প্রয়োজনেও তুমি এতটুকু ত্যাগ স্বীকার করতে পার না···

প্রভাত। ত্যাগ খুবই স্বীকার করতে পারি। তবে চা-টা খেয়ে গেলে মেজাজ আর বুদ্ধি দু-ই ধাতস্থ থাকত।···তা যেমন জরুরি বলছ, চল। ব্যাটা ডাল-চোরদের আগে ডালনা বানিয়ে দিয়ে আসি···

[সকলের প্রস্থান]

পট-পতন

—

দ্বিতীয় অঙ্ক

২য় দৃশ্য

[কোলিয়ারির প্রধান-ফটকের অভ্যন্তর। ফটকের উপর দ্বিতল দালান ; ইহার নীচতলা দিয়াই প্রবেশ-পথ। প্রবেশ-পথের একপ্রান্ত দিয়া সিঁড়ি দোতলায় উঠিয়া গিয়াছে দেখা যায়।

ফটক আধ-খোলা ; বাহিরে কোলাহলপরায়ণ মজুরের ভিড়ের আভাস।

ভিতরের দিকে প্রবেশ-দরজার কাছাকাছি কোলিয়ারির ম্যানেজার ও আরও কয়েক জন কর্ম্মচারী বাহিরের দিকে তাকাইয়া উদ্বিগ্নমুখে দণ্ডায়মান ; কাছে লাঠিধারী দুই জন দারোয়ান। আরও ভিতরে, সিঁড়ির কাছাকাছি সম্ভ্রান্ত ও বলিষ্ঠ চেহারার স্যুট-পরা মধ্যবয়স্ক এক ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পাইপ টানিতেছেন ; ইনি ম্যানেজিং এজেন্সির অন্যতম কর্ত্তা মিঃ চাটার্জ্জি। তাঁর পাশেই অনুগত ভৃত্যের মত শিবু-সর্দ্দার দাঁড়াইয়া আছে।

সকলের পিছনে যথাসম্ভব দূরে এক সারি নেপালী দারোয়ান। ইহাদের ক'জনের হাতে বন্দুক। বাহিরে মজদুরদের হাঁক : "লাল ঝাণ্ডার জয়" ; "মজুরের দাবি মানতে হবে" ; "ম্যানেজারের শাস্তি চাই" ; "নিজের দল ঠিক রাখো" ; "কাজে যাওয়া চলবে না।"

এই ধ্বনি থামার সঙ্গে সঙ্গে আবার অন্য ধ্বনি উঠিল : "আমরা কাজকে যাব" ; "এই তুরা পথ ছেড়ে দে" ; "পেটের জ্বালায় মরে গিলাম ; "হেই জোয়ানরা, কাজকে চল, কাজকে চল" ইত্যাদি।

শিবু। [চাটুজ্যের প্রতি] শুনলেন, শুনলেন হুজুর ? শুনলেন তো ?···সব ব্যবস্থা করে রেখেছি ; একটা ইসারা করামাত্র এরা সব সুড়্‌সুড় করে এসে কাজে লাগবে···

চাটুজ্যে। লাগবে, তো লাগছে না কেন ? বাধাটা কোথায় ?

শিবু। আজ্ঞে, একটু রয়ে-সয়ে করতে হচ্ছে। দেখছেন তো, কলকাতার বাবুদের দল রঘুনাথের দলকে কি রকম উস্কে রেখেছে। ওদের ঠেলে আসতে গেলে মজুরে মজুরে দাঙ্গা বেধে যাবে···ওরা ঠেকাতে আসবে কিনা। দল বেঁধে, কলকাতার সেই ঠাকরুণকে সামনে রেখে, সব দাঁড়িয়ে আছে···

চাটুজ্যে। বাধা দেবে ! যারা কাজে আসতে চায়, তাদের বাধা দিলে তা আমি বরদাস্ত করব মনে কর ? [বন্দুকধারীদের দেখাইয়া] এরা সব তৈরি আছে।···ডাক তোমার লোকদের, দেখি কার ঘাড়ে ক'টা মাথা তাদের ঠেকায়···

শিবু। [আমতা আমতা করিয়া] ডাকব বৈ কি, এখুনি ডাকব। আমাদের ভয় কাকে ? ধর্ম্মঘট করে বেকার হয়ে নিজেদেরই ক্ষতি করছি বৈ তো নয়।···তবে কিনা, হুজুর, লেখা-লেখিটা আগে পাকা হয়ে থাক···

চাটুজ্যে। [অসন্তুষ্ট মুখে] লেখালেখিটা তো হচ্ছেই ওপর-তলায় ; তোমাদের মাইতিবাবু তো সেখানে বসেই আছেন, তবে আর ভয়টা কি ? যে কথা দিয়েছি, তার একটুও নড়চড় হবে না। টাকায় চার আনা করে হাজিরে বাড়বে ; তা ছাড়া আর যা যা বলেছি সবই পাবে।···ভয় বরঞ্চ তোমাদের নিয়ে। কুলোকের কুপরামর্শে তোমার দলের লোকেরা আবার না বিগ্‌ড়ে বসে।··· যাও দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে হাঁক দাও ; বল, সব কাজে আয়, কোম্পানীর সঙ্গে বোঝাপড়া হয়ে গেছে, ঝগড়া মিটে গেছে। যাও, [দেখাইয়া] ঐখানে ঐ ম্যানেজারবাবুর কাছে দাঁড়িয়ে হাঁক দাও···

শিবু। [অনিচ্ছাসত্ত্বে আগাইয়া] এই তোরা শুনছিস, আমি ডাকছি, শিবু-সর্দ্দার। মালিকের সঙ্গে বুঝ-পড়া হয়ে গেছে।

টাকায় চার আনা করে হাজিরে বাড়বে ; আরও সব দাবি মালিক মেনে নিয়েছে। মালিক আমাদের দুঃখ বুঝেছে। ধর্ম্মঘট তুলে নিয়েছি।...আয়, সব চলে আয়। যে মরদ হোস্ কাজে চলে আয়। আমাদের জয় হয়েছে। জয় লাল-ঝাণ্ডার জয়। জয় দয়ালু মালিকের জয়।...

[বাহিরে বিরাট গর্জ্জন উঠিল। একদল কাজে যোগ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে ; অন্য দল বিপরীত ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে।

ফটকের কাছ হইতে ম্যানেজার বাবু ছুটিয়া চাটুজ্যে-সাহেবের কাছে আসিলেন এবং তাহার কানে কানে উত্তেজিতভাবে কি বলিলেন।]

চাটুজ্যে। এত বড় সাধা ! এ আমি সইব না, কিছুতেই সইব না। কি করে এদের শায়েস্তা করতে হয়, আমি জানি... [পিছনের নেপালীদের প্রতি], এই, চলা আও, চলা আও তুম্‌লোগ্‌। সামনা চলা আও...ফায়ার করব, ফায়ার করব...এ আমি কিছুতেই বরদাস্ত করব না...চলা আও সব...

[নেপালীদের দ্রুত অগ্রসর। এমন সময় ছুটিয়া সেবার ভিতরে প্রবেশ। তাহার পিছনে সত্য, কেষ্ট ও তরুণ। অবশেষে অলসগতিতে প্রভাতেরও প্রবেশ।]

সেবা। [চাটুজ্যের প্রতি] আপনারা এ কি আরম্ভ করেছেন, শুনি ? মজুরে মজুরে মারামারি বাধিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চান ?...

চাটুজ্যে। আত্মপ্রসাদ আমরা লাভ করতে চাইনে। সে চান আপনারা। আমরা কাজ চাই। যারা কাজে আসতে চায়, আপনারা কেন তাদের বাধা দিচ্ছেন ?...মজুরেরা কাজে লাগতে চায়...

সেবা। না, তারা চায় না। আপনারা কতগুলি ভাড়াটে দালাল জুটিয়ে দল ভাঙতে চেষ্টা করছেন। মজুরদের দাবি অর্দ্ধেকও আপনারা মেনে নেন নি। ম্যানেজারের শাস্তির কথা আপনাদের সর্ত্তে উল্লেখ পর্যন্ত নেই ; জুলুমবাজদের শাস্তির কোনও কথা নেই। টাকায় আট আনা মজুরি বাড়াবার দাবির মাত্র অর্দ্ধেক দাবি মঞ্জুর করে আপনারা যথেষ্ট দয়া করেছেন, মনে করছেন...

চাটুজ্যে। দয়া করেছি মনে করি নি, জুলুম মেনে নিয়েছি, মনে করেছি। কি আপনারা মনে করেন ? কোলিয়ারিগুলো টাকার গাছ, নাড়া দিলেই নিত্য মজুরি বেড়ে চলবে ?...পঁচিশ পার্সেণ্ট মজুরি বাড়ানো ছেলেখেলা নয়। টাকায় দু'আনার বেশী আমি কিছুতেই দিতাম না, শুধু আমার পার্টনার...

সেবা। দেবেন না মানে ? দেবেন না কেন ? যাদের হাড়-ভাঙা পরিশ্রমের ফলে মুনাফা লুটছেন, তাদের কি বেঁচে থাকার উপযুক্ত মজুরিও দেবেন না ? এ বছর যে টাকা লাভ করেছেন, তার ক' ভাগ মজুরদের দিয়েছেন ? কতটা তাদের জন্ম ব্যয় করেছেন ? কতটা...

চাটুজ্যে। তা হলে আপনার বক্তব্যটা হচ্ছে, কোম্পানীর য মুনাফা হয়, তার শতকরা এক-শো টাকাই লেবারের মধ্যে বেঁটে দিতে হবে ! কোম্পানীর সবটাই লেবার নয়, মনে রাখবেন তার আরও হাজারটা খরচ আছে। যে বছর কোম্পানীতে লোকসা যায়, সে বছর মজুর বা মজুরের বান্ধবেরা ঘাটতি পূরণ করতে আ না !...ক' ভাগ মজুরদের দিয়েছি ! ওসব বক্তৃতা শহরের মজদুর মিটিঙে করবেন, হাততালি পাবেন ; ফাঁক পেলে হয়তো আইন সভায়ও ঢুকে পড়তে পারেন। কিন্তু কাজে বাধা দিতে আসবে না।...অধিকাংশ মজুর কাজে ফিরতে চায়। নিজেদের মাতব্বর বজায় রাখবার জন্ম আপনারা তাদের বাধা দিচ্ছেন। এ জুলু আমি সইব না। প্রয়োজন হলে কি করে জোর খাটাতে হয় ত আমি জানি...

সেবা। [উচ্চস্বরে] জোর শুধু আপনারই একচেটে নয় জোর আমরাও খাটাতে জানি। আমিও দেখে নেব কি ক আপনার ভাড়াটে দালালেরা মজুরদের আপনার কোলিয়ারি গোলামি করতে নিয়ে আসে।...[সত্যর প্রতি] যাও ত সত্যদা, সবাইকে তৈরি থাকতে বল। মালিক দাঙ্গা চা রক্ত চায়...

[ফটক দিয়া জনৈক পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টরের প্রবেশ]

এর উচিত-জবাব দেবার জন্ম সবাইকে তৈরি থাকতে বল দরকার হলে রক্ত-গঙ্গা।...

[সত্যর প্রস্থান]

পুঃ ইন্‌স্পেক্টর। [চাটুজ্যেকে স্যালুট করিয়া] শান্তিভঙ্গে কোনও রকম আশঙ্কা উপস্থিত হলে আমাদের হস্তক্ষেপ করার অ আছে। বাইরের উত্তেজনা আশঙ্কাজনক। আমরা কি ক করতে পারি, স্যর ?...

চাটুজ্যে। [সেবাকে দেখাইয়া] তার দরকার হয়েছে কিন এঁকেই জিজ্ঞেস করুন। শান্তিভঙ্গ আমাদের দিক থেকে হবার ক নয়। আমার মজুরেরা কাজে ফিরতে চায়, কিন্তু তাদের বা দেওয়া হচ্ছে। এটা নিশ্চয়ই আমাদের অপরাধ নয়। কাদে ইচ্ছায় মারামারি বাধবার উপক্রম হয়েছে আশা করি [সিঁড়ি দি একটা পাকানো কাগজ হাতে প্রদোষকে নামিয়া আসিতে দে গেল। ইহার পিছনে চাদর-গলায় মাইতিবাবু] তা আপনা ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে না।...বলুন ত মশায়, এ কি র জুলুম ? প্রতি টাকায় চার আনা করে মজুরি বাড়িয়ে দিয়েছি, ত একদল এজিটেটরকে খুশী করতে পারছি নে। উল্টে এক দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্যে...

[প্রদোষ নীচে নামিয়া আসিয়াছে।]

পুঃ ইন্‌স্পেক্টর। [সেবার প্রতি] শান্তি ও শৃঙ্খল রক্ষায় খাতিরে আপনাকে আমি এরেষ্ট করতে বাধ্য হচ্ছি মিস্...

[গ্রেপ্তার করিতে অগ্রসর

প্রদোষ। [পিছন হইতে] কি খবর, ইন্‌স্পেক্টরবাবু। কাকে এরেষ্ট করছেন ?

[ইন্‌স্পেক্টর ফিরিয়া তাকাইলেন। সেবার বিস্ময়। হাত নাড়িয়া প্রভাতের হতাশা-জ্ঞাপন।]

একটু দাঁড়ান, মশায়। এ কাজটি আর করবেন না। আগুনে আর ঘৃতাহুতি দিয়ে কাজ নেই। [ইন্‌স্পেক্টর নিরস্ত হইল] এতে হিতে বিপরীত হবে। [চাটুজ্যের প্রতি] এই নিন, চাটুজ্যেসাহেব, কাগজটাতে আপনিও একটা সই মেরে দিন। আমার আর মাইতিবাবুর দস্তখত হয়ে গেছে, আপনারটা হলে শান্তিচুক্তি পাকা হয়ে যাবে। [ইন্‌স্পেক্টরকে] এই চুক্তির পর আশা করি আপনাদের হস্তক্ষেপের আর দরকারই হবে না···

ইন্‌স্পেক্টর। [হতাশভাবে] তবে তো ভালই হয়। বেশ, তা হলে আমি চলি···

[স্যালুট করিয়া প্রস্থানোদ্যোগ।]

প্রদোষ। নমস্কার, আসুন। আপনাদের মশায়, মজুরেরা আমাদের চেয়েও কম পছন্দ করে···[হাস্য]

[ইন্‌স্পেক্টরের প্রস্থান। চুক্তিপত্রে চাটুজ্যের স্বাক্ষরদান। প্রদোষ ইহা লইয়া মাইতিকে দিল।]

যান, মাইতিবাবু, আপনার লোকদের এটা দেখান গিয়ে। এর সর্ত্তে যদি কেউ ঠকে থাকে তবে আমরাই ঠকেছি···

[শেষের কথা কয়টি প্রদোষ সেবার দিকে কিঞ্চিৎ ফিরিয়া কহিল। মাইতির কাগজসহ প্রস্থান।]

[সেবার প্রতি] তার পর, সেবা দেবী, খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে। সেই সেখান থেকে পায়ে হেঁটেই আসতে হয় নি তো ?···

সেবা। [প্রশ্ন উপেক্ষা করিয়া] ষড়যন্ত্র। একটা গভীর ষড়যন্ত্র ! মজুরের স্বার্থ বিপন্ন করার এটা একটা জঘন্য চক্রান্ত। এ আমরা কিছুতেই সহ্য করব না। যেমন করেই হোক··· [সচিৎকারে] কেউ কাজে আসতে পারবে না, খবরদার। একজনও কাজে আসতে পারবে না। প্রভাত-দা, তরুণ, কেষ্ট তোমরা শুয়ে পড় ফটকের উপর, শুয়ে পড়···

[ছুটিয়া বাহির হইবার উদ্যোগ। এমন সময় শিবু কর্ত্তৃক আনীত তিনটি ক্রুদ্ধ সাঁওতাল রমণীর প্রবেশ।]

১ম রমণী। এই মেঁয়েটা আমাদের একদম চৌপাট করে দিলেক। কেনে আমাদের টেকচিস ? ছড়্যে মেঁয়া, পালাই যা। ভাগ্···

২য় রমণী। আমরা আপন কাজে লাইগব। তর কথা নাই শুনব। আমরা বেকার হঁয়ে মইরে গেলাম যে। আমরা কারু কথা নাই শুনব···

৩য় রমণী। তুঁই ডাইনি বটিস। তুঁই আমাদের মরাবি। আমাদের মরদগুলাকেও মরাবি, ছেইলাগুলাকেও মরাবি। তুঁই কেনে নাই মরছিস···

সেবা। [আহতভাবে] অকৃতজ্ঞ ! অকৃতজ্ঞ ! গত দশ দিন ধরে দিনরাত্র এদের সেবা করেছি। এদের খাওয়ার টাকা সংগ্রহ করবার জন্য [আড়চোখে প্রদোষকে দেখিয়া] নীতিধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতেও পিছপা হই নি। তার প্রতিদানে···

রমণীত্রয় মিলিতভাবে। তুঁই ডাহিন। তুঁই আমাদের সবগুলাকে মরায়ে ছাড়ায়ে ছাড়বি। তুঁ পালা। ভাগ্। আমাদিকে কাজ করতে দে। তুঁই বদমাস। তুঁই শয়তান বটিস। তুঁ হারামি বটিস···

প্রদোষ। [ধমকের কণ্ঠে] চুপ্ কর। যা, বাইরে যা। কলের বাঁশী বাজলে তবে কাজে আসবি। এখন পালা···[শিবুর ইঙ্গিতে রমণীত্রয়ের প্রস্থান] আর অপমান যেচে নিয়ে লাভ নেই, সেবা দেবী। আপনারা হেরে গেছেন। আমাদের সর্ত্তে ধর্ম্মঘটীরা কাজে ফিরতে রাজি হয়েছে। কাজ করে তারা খেয়ে বাঁচবে। ধর্ম্মঘট ভেঙে গেছে, ধর্ম্মঘট ভেঙে গেছে···

[কান ফাটাইয়া কারখানার সাইরেনের শব্দ হইল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে মজুর ফটক প্রায় ভাঙিয়া ফেলিয়া বন্যার জলের মত ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিল।]

সেবা। চক্রান্ত ! ঘৃণিত চক্রান্ত। নির্লজ্জ চক্রান্ত··

[দ্রুত প্রস্থান। অনুচরদের ধীরে অনুসরণ।—আরও মজুরের প্রবেশ। প্রদোষ ও কর্ত্তৃপক্ষের প্রস্থান। মাদলসহ একদল সাঁওতাল স্ত্রী-পুরুষের সোল্লাস নৃত্য-গীত।]

পট-পতন

ক্রমশঃ

জনগণনায় পশ্চিমবঙ্গের পরিচয়

শ্রীভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

সহস্রাধিক পৃষ্ঠার বিরাট দুই খণ্ডে বিভক্ত বঙ্গের প্রথম জনগণনার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৫১ সনের ১লা মার্চ্চ যে দশক শেষ হইয়াছিল তাহা বাংলার, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গের, অতি দুঃসময়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্বিতীয় বৎসরে এই দশক আরম্ভ হয়। প্রথম বৎসরের শেষ মাসে জাপান যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তাহার পর হইতে কলিকাতায় বোমাপতন, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দুর্ম্মূল্যতার জন্ম, কর্ম্মহীন অথবা অসামরিক কার্য্যে নিযুক্ত জনগণের দারুণ ক্লেশ, মেদিনীপুর ও চব্বিশ-পরগণার বিস্তৃত অঞ্চলে প্রলয়ঙ্কর ঝড়, পঞ্চাশের মন্বন্তর—পর পর এই সকল দুর্ব্বিপাক দেখা দিতে লাগিল। মন্বন্তরের পর বৎসর দেশব্যাপী মহামারীর প্রাদুর্ভাব হইল এবং তৎপরবর্ত্তী বৎসরে যুদ্ধের অবসানে লক্ষ লক্ষ লোক বেকার হইয়া মুদ্রাস্ফীতি, দুর্ম্মূল্যতা, চোরাবাজার প্রভৃতির কবলে পতিত হইল। ১৯৪৬-এর প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ও কলিকাতার হত্যাকাণ্ড বঙ্গভঙ্গের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দিল। ঠিক এক বৎসর পরে বাংলাদেশ দ্বিধাবিভক্ত হইল এবং পশ্চিমবঙ্গ ভারতরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইল। তদবধি বাস্তুহারাদের আগমনে ক্ষুদ্র রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক কাঠামো ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। এই সকল বিপর্য্যয়ের ফলে এবং অন্যান্য বহু কারণে পশ্চিমবঙ্গের জনগণের আর্থিক ও অন্যবিধ পরিবর্ত্তনের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে উল্লিখিত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে। দ্বিতীয় খণ্ড লোক-পরিচয়, জীবিকা, বয়স, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সারণী (tables), উদ্বাস্তু এবং বিবিধ—এই ছয় ভাগে বিভক্ত। গণনার ফল দ্বিতীয় খণ্ডে সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ড এই রাজ্যের গণনার অধিকর্ত্তা কর্ত্তৃক লিখিত, ইহা দ্বিতীয় খণ্ডের সংখ্যার ব্যাখ্যা ও নূতন তথ্যে পূর্ণ।

ইহা ভারতের নবম জনগণনা। জনগণনা না বলিয়া ইহাকে জনপরিচয় বলিলে বিষয়ের সহিত সঙ্গতি রক্ষা পায়। দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয় বিভাগ হইতে বুঝিতে পারা যায়—কত বিভিন্ন বিষয়ে জন-সমষ্টির পরিচয় সংগৃহীত হইয়াছে। ১৯৫১ সনের জনগণনার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যবান ও ব্যাপকতার দিক দিয়া প্রধান হইতেছে ভারতের প্রত্যেক গ্রামের নাম, আয়তন, খানার (household) সংখ্যা, লোক—নারী ও পুরুষের সংখ্যা, সাক্ষরদের সংখ্যা এবং কৃষি ও অকৃষিবর্গের আটটি জীবিকায় জনগণের উপবিভাগ সম্বলিত গ্রামের ডাইরেক্টরী। পশ্চিমবঙ্গে ৩৯,১৫১টি গ্রামের এই সকল বিবরণ প্রকাশিত হইবে। ইহার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইতেছে—ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে প্রত্যেক জেলার সাধারণ বিবরণ ও গণনার প্রাপ্ত পরিসংখ্যানের প্রকাশ। জাতীয় নাগরিক তালিকা (National Register of Citizens) প্রভৃতি ইহার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য। ভারতের প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তির নাম ও অন্যান্য বিবরণ এই তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। জনগণকে বিভিন্ন আর্থিক পর্য্যায়ে বিভক্ত করা ইহার অপর একটি বিশেষত্ব। অন্য কোন জনগণনায় পরিবারের আকার, গঠন প্রভৃতির পরিচয় গ্রহণ করা হয় নাই। এবারেই প্রথম পরিবারের সারণী (table) রচিত হইয়াছে।

গণ-পরিচয়

পশ্চিমবঙ্গের ২,৪৮,১০,৩০৮ জন লোকের পরিচয় সংগ্রহ করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে পুরুষ ১,৩৩,৪৫,৪৪১ ; স্ত্রী ১,১৪,৬৪,৮৬৭। চন্দননগর ও সিকিমের লোকসংখ্যা যথাক্রমে ৪৯,৯০৯ ও ৩৭,১২৫। 'ক' শ্রেণীর নয়টি রাজ্যের মধ্যে আয়তনে ক্ষুদ্রতম হইলেও জনসংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গের স্থান পঞ্চম। প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা এ রাজ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কম। উড়িষ্যায় পুরুষের হাজারপ্রতি নারী ১,০২২ ; মাদ্রাজে ১,০০৬ ; বোম্বাই, মধ্য-প্রদেশ, উত্তর-প্রদেশ ও বিহারে ঐ হার ৯০০ শতের উপর। আসামে ৮৭৯, পঞ্জাবে ৮৬৩ কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ৮৫৯। এই হারের স্বল্পতার কারণ দুইটি—পশ্চিম-বঙ্গের সাধারণ লোকের মধ্যে নারীর সংখ্যার ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হওয়া ও নারীদিগকে দেশে রাখিয়া অর্থোপার্জ্জনের জন্ম এই রাজ্যে বহিরা-গতের সংখ্যাবৃদ্ধি। পশ্চিমবঙ্গের সাতটি নগরীতে প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা মাত্র ৬০০। অন্যান্য শহরে ঐ আনুপাতিক সংখ্যা—হাজারকরা ৭৪৪ জন। গ্রামাঞ্চলে প্রতি হাজার পুরুষে নারীর হার ৯৩৭, পৌরাঞ্চলে ৬৫৭। বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম হইতে অর্থোপার্জ্জনের জন্ম যাহারা আসিয়াছে তাহাদের প্রতিহাজার পুরুষে নারী পল্লী ও শহরে যথাক্রমে ৬৪২ ও ৩৩৫। উহার গড় হার ৪২৬। অন্যান্য রাজ্য হইতে আগতদের মধ্যে প্রতি হাজার পুরুষে নারীর হার গড়ে ৪৫২, গ্রামাঞ্চলে ৫৩৭ ও পৌরাঞ্চলে ৪৩৯। বহিরাগতদের মধ্যে নারীর সংখ্যাল্পতা প্রমাণিত করে যে, তাহারা পশ্চিমবঙ্গের অস্থায়ী বাসিন্দা, অর্থোপার্জ্জনের বয়স উত্তীর্ণ হইয়া গেলেই নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। তাহারা পশ্চিমবঙ্গের অর্থ উপার্জ্জন করিয়া লইয়া গিয়া অন্যত্র ব্যয় করে, তাহাদের উপার্জ্জিত অর্থে এই রাজ্য লাভবান হয় না। স্ত্রী-পুরুষের হারের এই বৈষম্য সমাজে এক অকল্যাণকর পরিবেশের সৃষ্টি করিয়া থাকে।

বিভিন্ন জাতি ও শ্রেণীর লোক লইয়া পশ্চিমবঙ্গের জনসমষ্টি গঠিত। অভারতীয় নাগরিকের মোট সংখ্যা ৩,০৮,১৮৭ ; তন্মধ্যে পুরুষ ১,৮৯,৯২৮ ও নারী ১,১৮,২৫৯। ইহাদের মধ্যে পাকিস্থান হইতে আগত পুরুষ ১,৬৩,৭১৫ এবং স্ত্রী ১,০৩,৩৯৫। নেপালী নাগরিকদের পুরুষ ১০,৩৩৩, স্ত্রী ৪,২৮৪। ব্রিটিশ নাগরিক পুরুষ ৬,৯৯০, নারী ৪,৮৬৭। চীন-গণতন্ত্রের নাগরিক-সংখ্যা ৮,০৪০।

পশ্চিমবঙ্গে অবাঙালী ভারতীয় আছে ১৮,৮১,৭৩১। ১৯২১ সনে এই সংখ্যা ছিল ১৩,৩৪,০০০। ত্রিশ বৎসরে ভারতীয় বহিরাগতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ। অন্য প্রদেশের যে সকল লোকের জন্ম পশ্চিমবঙ্গে এই হিসাবে তাহাদিগকে ধরা হয় নাই। ভাষার দিক দিয়া বিচার করিলে অবাঙালী ভারতীয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ২০ লক্ষ। উদ্বাস্তুর সংখ্যা ছিল ২০,৯৯,০৭১। পশ্চিমবঙ্গের প্রতি ১২ জন লোকের মধ্যে ১ জন উদ্বাস্তু এবং প্রতি ১৬ জনের ১ জন ভারতীয় অবাঙালী। গত ৭০ বৎসর ধরিয়া পশ্চিমবঙ্গে অবাঙালীর সংখ্যা কিরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা নিম্নে প্রদর্শিত জনসংখ্যায় বহিরাগতের শতকরা হার হইতে বুঝা যাইবে :

১৮৮১	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৪১	১৯৫১
২'২	৪'১	৬'৬	৮'৫	৮'৯	৮'৪	৯'৫	১৮'৫ (উদ্বাস্তু৮'৫)

বহিরাগতের আগমনের ক্রমবর্দ্ধমান হার হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, যদিও পশ্চিমবঙ্গে বাঙালীর অন্ন জোটা ভার, তথাপি বহিরাগতের অর্থোপার্জ্জনের পন্থা এখনও বিদ্যমান। বিগত ষাট বৎসরের জনসংখ্যা ছিল এইরূপ :

প্রায় ২০ লক্ষ ; উদ্বাস্তু ২০,৯৯,০৭১ ; তপশীলী হিন্দু ৪৭ লক্ষ ও খণ্ডজাতি পৌনে বার লক্ষ।

বসতির ধারা

পশ্চিমবঙ্গের আয়তন ৩০,৭৭৫ বর্গমাইল। লোকবসতির ঘনতা প্রতি বর্গমাইলে দার্জ্জিলিং জেলায় ৩৭১ হইতে কলিকাতায় ৭৮,৮৫৮ পর্য্যন্ত বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার। কালিম্পং মহকুমায় গরুবাথান থানায় আছে লোকপিছু ৩১,৬০৮ বর্গগজ ভূমি আর জোড়াবাগানে মাথাপিছু ১০ বর্গগজেরও কম। কলিকাতা, বৃহত্তর কলিকাতা ও অন্যান্য শিল্পাঞ্চলে জনসমাবেশ সর্ব্বাধিক। রাজ্যের ১৩·৪ শতাংশ স্থানে ৬৩টি নগর ও শহর সমন্বিত ১০৪টি থানায় বাস করে ৪২'৭ শতাংশ লোক। এই অঞ্চলের ঘনতা ১,০৫০-এর বেশী। রাজ্যের আয়তনের শতকরা ১·৩৭ ভাগে বাস করে জনসংখ্যার ২১·৭৩ ভাগ লোক। এই অঞ্চলের ঘনতা প্রতি বর্গমাইলে ১২,৭০০।

পশ্চিমবঙ্গের প্রায় এক-চতুর্থাংশ লোক বাস করে নগরে ও

	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৪১	১৯৫১
মোট জনসংখ্যা	১,৪৬,৪৯,৮৫০	১,৫৮,৩৪,০১০	১,৬৭,৯২,৮৯০	১,৬৪,০০,৮৩৭	১,৭৬,৬৩,৪২৭	২,১৮,৩৭,২০৫	২,৪৮,১০,৩০৮
বহিরাগত	৬,৮৭,৬৬২	১০,৪৫,৩১৪	১৪,২৮,০৭৫	১৪,৬০,০৫৪	১৪,৭৭,৯০৫	২০,৭৬,২০৪	৪৬,০০,৬৭২
পশ্চিমবঙ্গ হইতে অন্য রাজ্যে গিয়াছিল	১,০১,৩০৫	৬৬,১২১	২,৬২,০১০	১,৯১,২০০	১,৫৫,৭৮১	১,৮৫,৭৫৩	৩,১১,১১৬
এই রাজ্যের প্রকৃত বাসিন্দা	১.৪০,৬৩,৪৯৩	১,৪৮,৫৪,৮১৭	১,৫৬,২৬,৭৩৫	১,৫১,৩১,৯৮৩	১,৬৩,৪১,৩০৩	১,৯৯,৪৬,৮৪৪	২,০৫,২০,৭৫১

পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দার মধ্যেও বহুসংখ্যক অবাঙালী আছে। তাহারা নিজ নিজ দেশ পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গদেশকেই স্থায়ী বাসভূমিরূপে গ্রহণ করিয়াছে। রাজ্যের 'প্রকৃত' অধিবাসিগণও বহু শ্রেণীতে বিভক্ত। সংবিধানে নির্দ্দিষ্ট বিশেষ সুবিধাদানের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি পশ্চিমবঙ্গের ৫৮টি অনগ্রসর জাতিকে তপশীলভুক্ত জাতি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তপশীলী খণ্ড জাতির সংখ্যা সাত। তপশীলী জাতিদের মধ্যে বাগদি সংখ্যাগরিষ্ঠ : তাহাদের সংখ্যা নয় লক্ষের উপর। দ্বিতীয় স্থান সাড়ে সাত লক্ষ রাজবংশীর। পোদেরা সংখ্যায় প্রায় ছয় লক্ষ। সোয়া তিন লক্ষের উপর আছে বাউড়ী। পশ্চিমবঙ্গে নমঃশূদ্রের সংখ্যা সোয়া তিন লক্ষ। সাতচল্লিশ লক্ষ তপশীলীদের মধ্যে এই পাঁচটি জাতির সংখ্যাই উনত্রিশ লক্ষ।

তপশীলী খণ্ড জাতিদের মধ্যে সাঁওতাল সাড়ে আট লক্ষ। ওড়াওঁদের সংখ্যা দুই লক্ষ। মুণ্ডা আছে এক লক্ষের কাছাকাছি। ইহা ছাড়া আছে লেপচা, মেচ, ভুটিয়া ও ম্রু। খণ্ডজাতির মোট সংখ্যা প্রায় পৌনে বার লক্ষ। জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ এই সকল তপশীলী ও খণ্ডজাতীয়। আহার, পরিচ্ছদ, ভাব, ভাষা ও ধর্ম্মে ইংরেজের অনুসরণকারী এংলো-ইণ্ডিয়ান আছে সাড়ে একত্রিশ হাজার। পশ্চিমবঙ্গের জনগণের গঠন দাঁড়াইতেছে এইরূপ : অভারতীয় নাগরিক ৩,০৪,১৮৭ ; ভারতীয় অবাঙালী

শহরে। প্রতি হাজার লোকের ১৪৫ জন থাকে সাতটি নগরে। বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলী, মুর্শিদাবাদ ও মালদহ ব্যতীত অন্যান্য জেলায় ২০ বৎসরে শহরের বাসিন্দা বাড়িয়া গিয়াছে দ্বিগুণেরও বেশী।

পল্লী অঞ্চলের বসতির ঘনতা গড়ে ৬১০। ক শ্রেণীর রাজ্যের মধ্যে বসতির ঘনতা পশ্চিমবঙ্গে সর্ব্বাধিক, প্রতি বর্গমাইলে গড়ে ৮০৬ জনের বাস। জনবিরল, রক্ষিতবনাঞ্চল সুন্দরবনের ১,৬৩০ মাইল বাদ দিয়া হিসাব করিলে বসতির ঘনতা হয় ৮৫১। নদীগর্ভ ও অন্যান্য জলভাগ না ধরিয়া ঘনতা দাঁড়ায় ৮৭৫। ঘনবসতির দিক দিয়া পৃথিবীতে জাপানের স্থান প্রথম। দ্বিতীয় স্থান পশ্চিমবঙ্গের।

লোকবৃদ্ধির হার

দশ বৎসরে পশ্চিমবঙ্গের লোক বৃদ্ধি পাইয়াছে ১২'৭। ইহা জনগণের স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার নহে। উদ্বাস্তু ও বহিরাগতদিগকে বাদ দিলে বৃদ্ধির হার দাঁড়াইবে শতকরা একেরও কম।

জীবিকার পরিচয়

এই জনগণনায় জনগণের জীবিকার পরিচয়ই অধিকতর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। সাংখ্যিক খণ্ডের (Tables volume) সোয়া পাঁচ

শত পৃষ্ঠার মধ্যে ৩০০ পৃষ্ঠা আর্থিক তথ্যে পরিপূর্ণ। ধর্ম ও জাতির বিবরণ শেষ হইয়াছে মাত্র আট পৃষ্ঠায়। জনসমষ্টিকে প্রথম প্রধান দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—আত্মনির্ভরশীল ও পরোপজীবী। পশ্চিমবঙ্গে আত্মনির্ভরশীল লোকের সংখ্যা ৭৮,১৬,৭৫০ এবং পরোপজীবীর সংখ্যা ১,৬৯,৯৩,৫৫৮। পরোপজীবীদের মধ্যে ৭,৮৭,৩১০ জন অল্প কিছু উপার্জ্জন করিয়া থাকে; কিন্তু তাহাদের উপার্জ্জিত অর্থে নিজেদের সম্পূর্ণ ভরণপোষণ হয় না। মুখ্যতঃ অর্থোপার্জ্জনের জন্যই পশ্চিমবঙ্গে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে লোক আসিয়া থাকে। উপার্জ্জনক্ষম বয়সে (১৫-৫৫) ইহারা এখানে আসে। বড়বাজারের অধিবাসীদের শতকরা ৯৭ জন এই বয়সের লোক। পরনির্ভরশীল লোক ইহাদের মধ্যে কম—ইহা ধরিয়া লওয়া চলে। প্রায় ২০ লক্ষ অবাঙালী ভারতীয়ের মধ্যে অন্ততঃ ১০ লক্ষ নিশ্চয়ই আত্মনির্ভরশীল। ইহা ছাড়াও রহিয়াছে অভারতীয় বহিরাগত। সুতরাং বাঙালী স্বাবলম্বীর সংখ্যা সম্ভবতঃ ৬৫ লক্ষের বেশী হইবে না। পক্ষান্তরে বহিরাগতদের মধ্যে নাবালক ও বৃদ্ধের সংখ্যা কম থাকায় বাংলার 'প্রকৃত' অধিবাসী পরোপজীবীর সংখ্যাই অধিক।

উপার্জ্জকের সংখ্যা যে ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হিসাব হইতে বুঝা যাইবে :

	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৫১
উপার্জ্জনক্ষম (১৫-৫৫) লোক শতকরা	৫৩'৩	৫৪'২	৫৪'০	৫৭'৪
কৃষিজীবী উপার্জ্জকের শতকরা হার	১৯'৮	২৩'৪	১৮'৫	১৪'৯
অ-কৃষিজীবী উপার্জ্জকের হার	১৭'৭	১৬'১	১৪'৩	১৬'৬
উভয়ের মিলিত উপার্জ্জকের হার	৪১'১	৩৯'৫	৩২'৮	৩১'৫

দেখা যায়, ৫৭'৪ জন কর্ম্মক্ষম ব্যক্তির মধ্যে মাত্র ৩১'৫ জন উপার্জ্জক। ইহা সাময়িক ব্যাপার নহে, ক্রমাবনতির ধারার পরিণতি। কৃষিজীবী উপার্জ্জকের হার ১৯'৮ হইতে নামিয়া আসিয়াছে ১৪'৯-তে। কৃষিজীবী সমাজের কর্ম্মহীনের দলের ঠাঁই হয় নাই অ-কৃষি উপজীবিকাতেও। কারণ উপরের সংখ্যা হইতে পাওয়া যায়—চল্লিশ বৎসরে অ-কৃষি উপজীবিকার উপার্জ্জকের হার একই রূপ রহিয়াছে, বৃদ্ধি পায় নাই।

১,১৪,৬৪,৮৬৭ জন নারীর মধ্যে মাত্র ১০,৩৯,৮৬২ জন স্বাবলম্বী। উপার্জ্জক নারীর সংখ্যা ১৯১১ সন হইতে দ্রুত হ্রাস পাইতেছে। ১৯১১ সনের প্রতি ১০০ নারীকর্ম্মীর স্থলে ১৯৫১ সনে আছে মাত্র ৭১ জন। ইহার মধ্যেও চা বাগান, কয়লার খনি, শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে অবাঙালী নারী-শ্রমিকের সংখ্যা বেশী। এ রাজ্যের জনগণনার অধিকর্ত্তা উপার্জ্জনশীলা নারীর সংখ্যাহ্রাসের দুইটি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'ভদ্র' প্রতিবেশীদের অনুকরণে অনগ্রসর জাতির লোকেরা নারীদিগকে বাহিরের কর্ম্মক্ষেত্র হইতে সরাইয়া আনিয়াছে। মেয়েদের কাজ করিয়া অর্থোপার্জ্জন করা বহুক্ষেত্রে মর্য্যাদাহানিকর বিবেচিত হইতেছে। নারীদের কর্ম্মক্ষেত্রের সঙ্কোচন অথবা বিলোপসাধন ইহার অন্যতম কারণ। চালের কলের প্রতিষ্ঠা ব্যবসায় হিসাবে ধান ভানা বন্ধ করিয়াছে। মুড়ি, চিঁড়া ইত্যাদি খাদ্য প্রস্তুত এবং ডাল তৈরি করা ছিল মেয়েদের, বিশেষতঃ বিধবা ও প্রায় আশ্রয়হীনা মেয়েদের একচেটিয়া। এই ক্ষেত্রে প্রতি দশ হাজারে ১৯১১ সনে ছিল ১১৯ জন নারীকর্ম্মী, ১৯৫১ সনে তাহাদের সংখ্যা ৪৫। গোচারণ-ভূমির অভাবে গোপালনের বৃত্তিতে স্বাবলম্বী কর্ম্মী ১৯১১ সনের ১০৫ হইতে ১০·এ নামিয়া আসিয়াছে দুধ, দই, ঘি, মাখন দুর্ল্লভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গয়লা-বৌয়ের কাজ কমিয়া গিয়াছে। তাঁতের কাজে বহু নারীর অন্নের সংস্থান হইত। তাহাতেও লক্ষণীয় অবনতি ঘটিয়াছে। জনগণনার সংখ্যায় এইরূপ আরও অনেক ক্ষেত্রে নারীকর্ম্মী-সংখ্যা হ্রাসের পরিচয় পাওয়া যায়।

জনগণনার অধিকর্ত্তা উপসংহারে বলিয়াছেন : 'মোটের উপর লোকবৃদ্ধির সহিত সমতা রক্ষা করিয়া উপজীবিকা বৃদ্ধি হয় নাই; বরং উহা বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে।···দিন দিন বেশী লোক কৃষির আয়ের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইতেছে। পৌরাঞ্চলে কর্ম্ম ও জীবিকার বৃহৎ অংশ বহিরাগতদের হস্তগত।···ক্রমবর্দ্ধমান সংখ্যায় নারীগণ ভরণপোষণের জন্য পুরুষের বশ্যতাস্বীকারে বাধ্য হইতেছে। চতুর্দ্দিক হইতে কর্ম্মক্ষেত্র সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে। প্রত্যেক পরিবার কেবলমাত্র প্রধান উপার্জ্জকের উপর নির্ভরশীল হইয়া উঠিতেছে। দুর্দ্দিনে বিপদ প্রতিরোধের ক্ষমতা হ্রাস পাইতেছে।' বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহাই পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক পরিচয়।

এই রাজ্যের অর্দ্ধেকের অনেক বেশী লোক আর্থিক হিসাবে নিষ্ক্রিয়। আর্থিক বিষয়ের আলোচনায় তাহাদের আর স্থান থাকিবে না। যাহারা আত্মনির্ভরশীল তাহাদিগকেই বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। মোট জনসংখ্যার ১,৪১,৯৫,১৬১ কৃষিজীবী এবং ১,০৬,১৫,১৪৭ জন অ-কৃষিজীবী। কৃষিজীবীদের ৩৬,৯৪,৬১ জন আত্মনির্ভরশীল। ইহাদের ১৮,৭১,৪৮৩ জন জোতদার অর্থাৎ ইহারা নিজেদের জমিতে শস্য উৎপাদন করিয়া থাকে; ৭,৪৭,৮৪ জন ভাগচাষী; ১০,৩৬,৩৬৫ জন কৃষিমজুর এবং ৩৮,৯১৭ জন চাষের জমির খাজানা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এই চারি শ্রেণী জনগণনার ভাষায় জীবিকার ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী নামে পরিচিত।

অ-কৃষিজীবী স্বাবলম্বীর সংখ্যা ৪১,২২,১৪০। তন্মধ্যে পেন্সন 'কোম্পানীর' কাগজ প্রভৃতি অ-কৃষি আয়ের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিগণ, ভিক্ষুক, ভবঘুরে, আশ্রমের অধিবাসী প্রভৃতি স্বাবলম্বী হইলে অর্থোৎপাদনে সাহায্য করে না। এই শ্রেণীর সংখ্যা ১,১৩,৭৯৬ অবশিষ্ট ৪০,০৮,৩৪৪ জনকে তাহাদের কর্ম্মানুসারে মনিব, কর্ম্মচারী ও স্বাধীন কর্ম্মী এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। অর্থোপার্জ্জনের জন্য কেহ যদি একজন লোকও স্থায়ী ভাবে নিযুক্ত করিয়া থাকে তবে সে মনিব (employer)। যে ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার আছে সে মনিব; উকীলের মুহুরি থাকিলে সেই উকীল মনিব অপরের কাজ করিয়া যে অর্থোপার্জ্জন করে সে কর্ম্মচারী (employee)। অর্থোপার্জ্জনের জন্য যে অপরের চাকরি ক

না অথবা নিজে কোন লোক নিযুক্ত করে না তাহাকে বলা হইয়াছে স্বাধীন কর্ম্মী (independent worker)। বাড়ীর ভৃত্য যাহার আছে অর্থনীতির ভাষায় সে মনিব নহে। কারণ সেই ভৃত্য অর্থোপার্জ্জনে সাহায্য করে না। সরকারী আপিসের বড়কর্ত্তা বহু লোক নিযুক্ত করিতে পারেন, কিন্তু তিনি নিজে মনিব নহেন, কর্ম্মচারী মাত্র। ৪০,০৮,৩৪৪ জনের মধ্যে ৯৮,৫২৬ মনিব, ২৫,২৪,৪৫২ কর্ম্মচারী এবং ১৩,৮৫,৩৬৬ জন স্বাধীন কর্ম্মী।

পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার ৪২·৮ শতাংশ অ-কৃষিজীবী। ক-শ্রেণীর রাজ্যের মধ্যে ইহাই সর্ব্বোচ্চ হার। বোম্বাই রাজ্যে ৩৮·৫ শতাংশ অ-কৃষিজীবী। অ-কৃষিজীবীদের চার শ্রেণী হইতেছে—শিল্প, বাণিজ্য, পরিবহন, বিবিধ চাকুরি ও অন্যান্য বৃত্তি। ইহারা যথাক্রমে উপজীবিকার ৫, ৬, ৭ ও ৮ এর শ্রেণী (Livelihood Classes V, VI, VII and VIII) নামে পরিচিত। স্বাবলম্বী ব্যক্তিদের মধ্যে ১৬,৬৫,৬৭৫ জন শিল্পে, ৭,৭৪,৮১৬ জন বাণিজ্যে, ৩,২৬,০৫৪ জন পরিবহনে এবং ১৩,৫৫,৫৯৫ জন বিবিধ চাকুরি ও অন্যান্য বৃত্তিতে নিযুক্ত ছিল।

অ-কৃষি বৃত্তির চার প্রধান শ্রেণী ১০ ডিভিসন, ৮৮ সবডিভিসন এবং ১৬৩ গ্রূপে বিভক্ত। বৃত্তি অনুসারে প্রত্যেক লোককে ইহার এক এক গ্রূপে ফেলা হইয়াছে। কোন্ গ্রূপে কত জন লোক তাহার হিসাব সাংখ্যিক খণ্ডে (Tables volume) পাওয়া যায়। এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন। স্বাবলম্বী ব্যক্তির পোষ্যদিগকে তাহার নিজ বৃত্তির মধ্যে দেখানো হইয়াছে। জেলা-শাসকের প্রত্যেকটি পোষ্যের বৃত্তি দেখান হইয়াছে 'জেলা-শাসক'। সকল পরোপজীবীর সম্বন্ধেই এই নিয়ম। যখন বলা হয় পশ্চিমবঙ্গে শতকরা ৫৭·২ জন কৃষিজীবী ও ৪২·৮ জন অ-কৃষিজীবী—তখন বুঝিতে হইবে স্বাবলম্বী ও তাহাদের পোষ্যদের মিলিত হার ঐরূপ।

পশ্চিমবঙ্গে অ-কৃষিজীবীদের হার গড়ে সর্ব্বোচ্চ হইলেও বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, পশ্চিম দিনাজপুর ও কোচবিহারের জনসংখ্যার শতকরা ৮০ জনের বেশী কৃষির উপর নির্ভরশীল। মুর্শিদাবাদ ও মালদহে কৃষিজীবীর হার ৬৩ হইতে ৭১। হাওড়া ও কলিকাতা এবং দার্জ্জিলিং ও জলপাইগুড়ি—এই চার জেলাতেই শুধু কৃষিজীবী অপেক্ষা অ-কৃষিজীবী অধিক। এখানে বলা আবশ্যক যে, চা-বাগান অ-কৃষি শিল্প বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। সুতরাং বলিতে হয়, কৃষি ক্ষেত্রের লোক ধারণের ক্ষমতা প্রায় শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ভবিষ্যতে অ-কৃষি উপজীবিকা যে এই রাজ্যের জনগণের প্রধান অবলম্বন হইবে তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

কৃষি ও তপশীলী সম্প্রদায়

এই রাজ্যের কৃষির এক বড় অংশ তপশিলী সম্প্রদায়ের হাতে রহিয়াছে। মোট কৃষিজীবী ১,৪১,৯৫,১৬১-এর মধ্যে তপশীলী হিন্দুর সংখ্যা ৩২,৬৪,৯০০ এবং তপশিলী খণ্ডজাতির সংখ্যা ৯,২১,২০০। ইহারা মোট কৃষিজীবীর যথাক্রমে ২৩ ও ৬·৫ শতাংশ: ৪৬,৯৬,২০৫ জন তপশিলী হিন্দুর ৩২,৬৪,৯০০ জনই কৃষিজীবী। ১১,৬৫,৩৩৭ জন খণ্ডজাতীয় লোকের মধ্যে ৯,২১,২০০ কৃষির উপর নির্ভরশীল। উভয় তপশিলী সম্প্রদায় মিলিয়া ভাগচাষীদের ৪০·৮ এবং ভূমিহীন কৃষি মজুরদের ৪৫·৮ শতাংশ ইহারা। ইহাদের জীবনযাত্রার মান অতি নিম্ন, ভাগচাষী বা কৃষি-মজুর রূপে মাটি খুঁড়িয়া কোন প্রকারে দু'মুঠা অন্নের সংস্থান হইলে ইহাদের চলিয়া যায়। উচ্চাকাঙ্ক্ষা ইহাদের নাই। ফলে ইহাদের হাতে ন্যস্ত জমির চাষ ভাল হয় না, উৎপাদন হয় কম। এইরূপ অলাভজনক কৃষির পরিণাম অপরিসীম দারিদ্র্য, ব্যাধি, অস্বাস্থ্য ও জন্মমৃত্যুর উচ্চ হার। রাজ্যের খাদ্য ও অর্থকরী শস্যোৎপাদনের ভার ইহাদের উপর থাকায় উৎপাদনে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়।

বহিরাগতদের বৃত্তি

অ-কৃষি বৃত্তির প্রতিই বহিরাগতদের আকর্ষণ বেশী। অ-কৃষিজীবীদের প্রায় এক-ষষ্ঠাংশ বহিরাগত। শিল্পাঞ্চলে ও চা-বাগানে এই হার এক-পঞ্চমাংশ। শিল্পে নিযুক্ত লোকদের এক-পঞ্চমাংশের অধিক, ব্যবসায়ের এক-ষষ্ঠাংশ ও পরিবহনের এক-তৃতীয়াংশ লোক বহিরাগত। দরোয়ান, মুটিয়া, মুচি, গোয়ালা, গাড়োয়ান, মাঝি, পাচক ও পুলিসের কাজের জন্য হিন্দুস্থানীর আগমনের স্রোত এখনও অব্যাহত রহিয়াছে। ব্যবসায়ী আসে রাজপুতানা ও বোম্বাই হইতে। মধ্যপ্রদেশ ও মধ্যভারতের লোকের স্থান চা-বাগানে এবং অন্যান্য ব্যবসায়ে। কলিকাতার ব্যবসায়ে লিপ্ত লোকদের ২৬·৮ শতাংশ হিন্দুস্থানী। ছোটনাগপুরের মালভূমি হইতে আগতদের কর্ম্মস্থল কৃষিক্ষেত্র অথবা খনি অঞ্চল।

প্রতি ১০,০০০ বহিরাগতের বিভিন্ন উপজীবিকায় বণ্টনের ধারা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে:

	নিজ জমি চাষ	ভাগচাষী	কৃষিমজুর	খাজনাভোগী	শিল্প	ব্যবসায়	পরিবহন	বিবিধ
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
মোট	৪০৭	২৫৩	৩৬২	২৫	৩,৬৯৯	১,৭৬৩	১,২১০	২,২৮১
গ্রামাঞ্চলে	১,৩৪১	৮১৯	১,১৮৩	৩৫	৩,৭৯০	৭৩৭	৪৩৩	১,৬৬২
পৌরাঞ্চলে	৩৩	২৬	৩৩	২২	৩,৬৬২	২,১৭৪	১,৫২১	২,৫২৯

উদ্বাস্তগণের জীবিকার নমুনা প্রতি ১০,০০০ উদ্বাস্তর মধ্যে

	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
মোট	৮১৬	৯৭৬	৫৩৮	৪৬	১,৫৭৬	২,০২৪	৩৫৬	৩,৬৬৮
গ্রামাঞ্চলে	১,৫৪৩	১,৯০৮	১,০৩৪	৩১	১,০৭৬	১,০৮১	১৩৩	৩,১৯৪
পৌরাঞ্চলে	৯০	৪২	৪২	৬১	২,০৭৬	২,৯৬৬	৫৮০	৪,১৪৩

উদ্বাস্তুগণের জীবিকার ধারা সম্বন্ধে জনগণনার অধিকর্ত্তার অভিমত সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইতেছে :

'উদ্বাস্তুগণের চিত্র সন্তোষজনক নহে। শিল্পাঞ্চলে ও পশ্চিমাঞ্চলে ভাগচাষী এবং কৃষিমজুরের সংখ্যা অতি অল্প। জোতদারের সংখ্যা মন্দ নয়, কিন্তু দুইটি কৃষি-অঞ্চলে তাহাদের সংখ্যা ভারতীয় অবাঙালীর সংখ্যা হইতে কম। পৌরাঞ্চলে জোতদার দেখিয়া মনে হয় ইহারা পূর্ব্ববঙ্গের জমির মালিক বলিয়া জোতদার লিখাইয়াছিল। উদ্বাস্তুগণ জমির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে সাহস পাইতেছে না। অকৃষি গৌণ উপজীবিকা সঙ্গে রাখা চাই। শহরে ও গ্রামাঞ্চলে বহু ছোট ছোট ব্যবসায়ী রহিয়াছে। যাহারা নূতন দেশে স্থায়ী হইয়া বসিতে পারে নাই তাহাদের পক্ষে ইহা শুভ নহে। হঠাৎ বাজারের পরিবর্ত্তনে তাহাদের পথে দাঁড়াইতে হইতে পারে। ইহা অপেক্ষাও উদ্বেগজনক বিবিধ জীবিকার ক্ষেত্রে বহু লোকের সমাবেশ। ইহাতে বুঝা যায়, খাদ্য উৎপাদন বা শিল্পের চাকা ঘুরাইবার কাজে ইহাদের প্রাধান্য নাই; ইহারা রাজ্যের সম্পদবৃদ্ধির সাহায্য না করিয়া অনুৎপাদক ধন ক্ষয়ের বৃত্তিতে লিপ্ত।

(আয়তনের শতাংশে)

	মালিক	পত্তনীদার	রায়ত	কোর্ফা রায় (খাসে)
ব্রাহ্মণ	৭৫'৭৭	৬৫'৫	৪৮'৬৩	৭'৫
কায়স্থ	১০'৮২	৭'৮৭	৩·৬৩	২'৬
মুসলমান	২'০৬	৭'৮৮	৯'৮১	২২'৯১
সদ্গোপ	'৯৫	৬'৩৭	১০'০০	১৬'২২
কলু ও তেলি	'১২	'৭৫	৫'৪৮	৫'৬৩
অস্পৃশ্য—				
বাউড়ি	'১১	'০৩	'১৫	২'৬৩
বাগদি	—	'১৪	'২৫	৫'৩৮
ডোম	—	'০০২	'২৩	২'০১
হাড়ি	'০৯	'০১	'২৫	১'৫
মাল	'০০৩	'০০৩	'০৫	২'০
খণ্ডজাতি—				
সাঁওতাল	'০০০৬	—	'৫৭	৪'১৩

বিভিন্ন রাজ্যের জনগণের বিভিন্ন বৃত্তিতে বণ্টন

	মোট কৃষি	জোতদার ১	ভাগচাষী ২	কৃষি-মজুর ৩	খাজনাভোগী ৪	মোট অকৃষি	শিল্প ৫	ব্যবসায় ৬	পরিবহন ৭	বিবিধ ৮
পশ্চিমবঙ্গ	৫৭'২১	৩২'৩৪	১২'০১	১২'২৬	০'৬০	৪২'৭৯	১৫'৩৬	৯'৩২	৩'০৫	১৫'০৬
আসাম	৭৩'৩৪	৫৭'৮৯	১২'৮১	১'৭৪	০'৯৬	২৬'৬৬	১৪'৬৮	৩:৯০	১'২৮	৬'৮০
বিহার	৮৬'০৪	৫৫'২৯	৮'২৭	২১'৮৭	০'৬১	১৩'৯৬	৩'৯৪	৩'৪০	০'৭২	৫'৯০
বোম্বাই	৬১'৪৬	৪০'৭৪	৯'৬৯	৯'০৫	১'৯৮	৩৮'৫৪	১৩'৭৬	৭ ৬১	২'২৩	১৪'৯৪
মধ্যপ্রদেশ	৭৬'০০	৪৯'৫০	৪'৪৭	২০'৪১	১'৬২	২৪'০০	১০'৬০	৪'৩৯	১'৪৭	৭'৫৪
মাদ্রাজ	৬৪'৯৩	৩৪'৯৫	৯'৫৮	১৮'২৩	২'১৭	৩৫'০৭	১২'৩৫	৬'৬৯	১'৬৮	১৪'৩৫
মহীশূর	৬৯'৯০	৫৫'৪৬	৪'৭৬	৬'৭৯	২'৮৯	৩০'১০	১০'২৪	৫'৫৭	১'১৬	১৩'১৩
উড়িষ্যা	৭৯'২৮	৫৯'৫৩	৫'৯৪	১২'৩১	১'৫০	২০'৭২	৬'৩৩	২'৯১	০'৫৩	১০'৯৫
উত্তর প্রদেশ	৭৪'১৯	৬২'২৭	৫'১৫	৫'৭১	১'০৬	২৫'৮১	৮'৩৮	৫'০৩	১'৩৬	১১'০৪
বিন্ধ্য প্রদেশ	৮৭'১২	৬২'৬১	৬'৬৬	১৭'৬২	০'৫৩	১২'৮৮	৪'৬০	২'৮০	০'৪৩	৫'০৫

এই বিবরণে পশ্চিমবঙ্গের কৃষির অবস্থা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। নিজের জমি নিজে অথবা নিজ তত্ত্বাবধানে এই রাজ্যে চাষ করা হয় সর্ব্বাপেক্ষা কম। জমি ও উৎপাদনের অবনতি ইহার নিশ্চিত ফল। ভাগচাষীর হার আসাম ব্যতীত অপর সকল প্রদেশ হইতে অনেক বেশী। পশ্চিমবঙ্গের ভাগচাষী কাহারা এবং তাহাদের দ্বারা কিরূপ চাষ হয় পূর্ব্বে দেখানো হইয়াছে। তুলনায় কৃষি-মজুরের হারও বেশী। বুঝা যাইতেছে, জমির যাহারা মালিক তাহারা অনেকেই জমির ফল ভোগ করে মাত্র, কৃষির উন্নতির চেষ্টা করে না। এই মালিক কাহারা?—বীরভূমের সিউড়ি, খয়রাসোল ও দুবরাজপুর থানায়, ১৯৩২ সনে দেখা গিয়াছে এইরূপ—

ঐ তিন থানায় জনসংখ্যায় ৬'৪৮ ব্রাহ্মণ; ১১'৪২ শতাংশ বাউড়ি। কিন্তু লোকের অনুপাতে ব্রাহ্মণেরা অনেক বেশী জমির মালিক। কায়স্থের সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। পক্ষান্তরে বাউড়ি প্রভৃতি কৃষিজীবী লোকেদের অনুপাতে জমির মালিকানা নগণ্য। ইহারাই উচ্চবর্ণের ভাগচাষী। অ-চাষীগণ জমির বিরাট অংশের মালিক; জাতচাষী উৎপন্ন শস্যের অর্দ্ধেক খাজানা দিয়া উৎপাদনের ব্যয় ও মজুরী বাবদ বাকী অর্দ্ধেক পাইয়া থাকে। এই তিনটি থানার লোকজনের বৃত্তির পরিসংখ্যান সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের 'টাইপ' বা নমুনা হিসাবে ধরা যায় কিনা ভাবিবার বিষয়।

শহরে অ-কৃষি বৃত্তির হার

	মোট জনসংখ্যার কত শতাংশের অ-কৃষি বৃত্তি	মোট জনসংখ্যার কত অংশের শহরে বাস	পৌর জনগণের কত শতাংশ				শহরে অ-কৃষি বৃত্তির মোট হার
			শিল্প	ব্যবসায়	পরিবহন	বিবিধ	
আসাম	২৬'৭	৪'৬	১৬'৫	২৭'৬	৭'২	৪২'২	৯৩'৫
মধ্যপ্রদেশ	২৪'০	১৩'৫	২৭'৮	১৯'৯	৭'৫	২৯'১	৮৪'৩
উড়িষ্যা	২০'৭	৪'১	১৩'৩	১৭'৫	৫'৬	৪৯'৬	৮৬'০
মহীশূর	৩০'১	২৪'০	২৮'৬	১৭'৯	৪'২	৩৫'৯	৮৬'৬
বোম্বাই	৩৮'৫	৩১'১	২৮'৯	১৯'২	৫'২	৩১'২	৮৪'৫
পঞ্জাব	৩৫'৫	১৯'০	১২'০	২৯'০	৪'০	৪৫'০	৯০'০
মাদ্রাজ	৩৫'১	১৯'৬	২৪'০	১৯'০	৬'০	৩৪'০	৮৩'০
উত্তর প্রদেশ	২৫'৮	১৩'৬	২৪'৯	২১'৯	৬'২	৩৪'৬	৮৭'৬
বিহার	১৪'০	৬'৭	—	—	—	—	৭৭'০
পশ্চিমবঙ্গ	৪২'৮	২৪'৮	২৮'৭	২৪'২	৯'৩	৩৩'৬	৯৫'৮
ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন	৪৫'২	১৬'০	২৪'৭	১৪'৯	৬'৬	২৯'০	৭৫'২

অ-কৃষিজীবীর হারে ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের পরেই পশ্চিমবঙ্গের স্থান। অ-কৃষিবৃত্তির শতকরা ৯৫.৮ ভাগই পৌরাঞ্চলে। জনসংখ্যার ৭৫'২ ভাগের বাস গ্রামাঞ্চলে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে অ-কৃষি বৃত্তি মাত্র ৪'২ ভাগ। এই সংখ্যা গ্রাম-শিল্পের অবনতির সূচক। কৃষির উপর অতিরিক্ত চাপের পরিচয়ও ইহাতে পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন উপজীবিকার শ্রেণীতে স্বাবলম্বী, পরোপজীবী ও উপার্জ্জক পরোপজীবীর শতকরা হারের বিবরণ দিয়া আমরা এই প্রসঙ্গের আলোচনা শেষ করিব :

উপজীবিকার শ্রেণী	জনসংখ্যার শতাংশ	দ্বিতীয় কলমের শতাংশ		
		স্বাবলম্বী	পরোপজীবী	উপার্জ্জক পরোপজীবী
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১ জোতদার	৩২'৩	২৩'৩	৭৩'০	৩'৭
২ ভাগচাষী	১২'০	২৫'১	৬৯'৯	৫'০
৩ কৃষি-মজুর	১২'৩	৩৪'১	৬১'৩	৪'৬
৪ খাজনাভোগী	০'৬	২৬'১	৭১'৬	২.৩
৫ শিল্প	১৫'৪	৪৩'৭	৫৪'২	২'১
৬ ব্যবসায়	৯'৩	৩৩'৫	৬৫'০	১'৫
৭ পরিবহন	৩'০	৪৩'১	৫৫'৭	১'২
৮ বিবিধ	১৫.১	৩৬'৩	৬১'৮	১'৯
কৃষি-শ্রেণীর মোট	৫৭'২	২৬'০	৬৯'৮	৪'২
অ-কৃষি শ্রেণীর মোট	৪২'৮	৩৮'৮	৫৯'৩	১'৯
সর্ব্বমোট	১০০'০	৩১'৫	৬৫'৩	৩'২

বয়স

গণনার সময় সংগৃহীত হইলেও ব্যয় ও সময় সংক্ষেপের জন্য সকল লোকের বয়স লইয়া সারণী প্রস্তুত করা হয় নাই। উদ্বাস্তু বাদে অন্যদের শতকরা মাত্র ১০ জনের বয়সের সারণী প্রকাশিত হইয়াছে। এক নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বাছাই করা ২২,৭৬,৯২৫ জনের বয়সের শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। নিজের বয়স অনেকে ঠিক করিয়া বলিতে পারে না। কেহ বা ইচ্ছা করিয়াই বয়স বাড়াইয়া বা কমাইয়া বলে। এই ত্রুটি এড়াইবার উদ্দেশ্যে সকল বয়স বিভক্ত করা হইয়াছে ১০টি গ্রুপে। এক বৎসরে নিম্নবয়স্কদের গ্রুপ ০; ১—৪ দ্বিতীয় গ্রুপ। তাহার পর ৫—১৪, ১৫—২৪ প্রভৃতি ১০ বৎসরের গ্রুপের পর শেষটি ৭৫ ও তদূর্দ্ধ। অপর এক সারণীতে প্রতি বৎসরের হিসাবও করা হইয়াছে।

সংখ্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বাঙালীর স্বল্পায়ুতার পরিচয় পাওয়া যায়। বাল্যকালের বিপদ কাটাইয়া ৫—১৪ বয়সে পৌঁছিলে মৃত্যু ঘটে অপেক্ষাকৃত কম। ১৫—২৪-এ সংখ্যা হ্রাস পাইতে আরম্ভ করে। তাহার পর হ্রাস দ্রুত। ৬৪ ডিঙাইয়া গিয়াছে মাত্র ৪৬,২৭৮। ৭৫ ও তদূর্দ্ধ মাত্র ১৮,৯৬০। প্রতি বৎসরের হিসাবে দেখা যায় ২৫ বৎসরের পর লোকসংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাইয়াছে। পৌনে তেইশ লক্ষ লোকের মধ্যে ১০০ বৎসর বয়সের পুরুষ ৫৩ ও নারী ৫৯। তদূর্দ্ধে পুরুষ ৩৫ এবং নারী ৬২।

সেন্সাস সুপারিন্টেন্ডেন্ট লিখিয়াছেন, 'গড়পড়তা বয়স এখনও খুব কম রহিয়াছে, সাধারণ ভাবে ২৫—পুরুষের ২৭, নারীর ২৫।'

বিবাহ

জনসংখ্যার শতকরা ১০ জনের যে সংখ্যা উপরে দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে অবিবাহিত, বিবাহিত, বিধবা, বিপত্নীক বা বিবাহ-বিচ্ছেদকারীদের সংখ্যা ও হার দেখানো হইয়াছে। শর্দা আইন অমান্য করিয়া ৫—১৪ বৎসরে বিবাহ হইয়াছে এই বয়সের বালকদের ২·৪ শতাংশ। বালিকাদের ১৫·৮ শতাংশ বিবাহিতা। বিধবা বা বিবাহ-বিচ্ছেদকারী ০·৪ শতাংশ। ১৫—২৪ বৎসরের ৮২·৩ শতাংশ মেয়ে বিবাহিতা। ঐ বয়সের বিবাহিত পুরুষ মাত্র ৪০·৯ শতাংশ। ২৫—৩৪ বয়সে বিবাহিত পুরুষ ও নারীর হার প্রায় সমান, ৮৩·০ এবং ৮৪·৫। ৩৫—৪৪ বৎসর বয়সে পুরুষ ৮৯·৯ ও নারী ৬৯·১ বিবাহিত। বিধবা নারী ৩০·৩, বিপত্নীক পুরুষ মাত্র ৫·৮। পুরুষ পুনর্বিবাহ করিয়া বিবাহিতের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে। বিধবা-বিবাহের অভাবে এই বয়সের বিবাহিতা নারীর সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। বিপত্নীকেরা বিবাহ করিয়াছে কম বয়সের নারী। ইহার পর হইতে বিবাহিতা নারীর হার দ্রুত হ্রাস ও বিধবার হার সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ৫৫ বৎসর হইতে বিবাহিত পুরুষের হার ধীরে ধীরে কমিতেছে ও বিপত্নীকের হার বৃদ্ধি পাইতেছে। ঐ বয়সে বিপত্নীকত্ব ঘুচানো কঠিন।

শিক্ষার বিবরণ

যাহারা সরল ভাষায় লিখিত চিঠি পড়িতে পারে এবং নিজেরা বন্ধুবান্ধবের নিকট সরল ভাষায় চিঠি লিখিতে সক্ষম অথচ কোন লিখিত পরীক্ষায় পাস করে নাই তাহারাই এবারের জনগণনায় 'literate' বা সাক্ষর। যাহারা লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ তাহাদিগকে বিভিন্ন পরীক্ষা অনুসারে নানা ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। পরিবারের মধ্যে শিক্ষিতা বিদুষী নারীগণ, গুরুগৃহে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রাচ্য-বিদ্যার মহা পণ্ডিতগণ এবং অন্যান্য স্বয়ং-শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এবার literate শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। বিভিন্ন রাজ্যের 'শিক্ষিতে'র হার নিম্নে প্রদত্ত হইল :

শিক্ষায় ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন সকল রাজ্যকে পিছনে ফেলিয়া গিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ ও বোম্বাই চলিয়াছে হাত ধরাধরি করিয়া। পৌরাঞ্চলের শিক্ষার হারে আসাম বাংলাকে পশ্চাতে রাখিয়াছে। ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে শিক্ষিতা নারীর হার পশ্চিমবঙ্গের তিন গুণ। জনশিক্ষায় উত্তর প্রদেশের স্থান নিম্নতম। নারীদের ৯৬·৪ শতাংশ নিরক্ষর। শহরে শিক্ষিতা নারীর হার পশ্চিমবঙ্গের অর্দ্ধেক।

এই রাজ্যের ৬০,৮৭,৭৯৭ জন 'শিক্ষিতে'র মধ্যে ৪১,৪৩,২৬২ জন literate-শ্রেণীভুক্ত। ১৩,৪৭,১১১ জন মধ্য স্কুল (Middle School) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। মোট 'শিক্ষিতে'র মধ্যে ৫৪,৯০,৩৭৩ জন আধুনিক বিদ্যার প্রাথমিক জ্ঞানলাভের পূর্ব্বেই বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়াছে। অবশিষ্ট ছয় লক্ষের মধ্যে ৩,৫২,২৬৮ জন ম্যাট্রিক বা তাহার সমতুল্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণের সংখ্যা ১,০৩,৬৪১ ; গ্রাজুয়েট ৫৯,৩৫৯। স্নাতকোত্তরদের সংখ্যা ১৩,০৯৬। ট্রেনিং-প্রাপ্ত শিক্ষক ১৬,২২১। ডাক্তারি পাস ১৬,১৫৫। ব্যবসায়-সংক্রান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১০,৫৫৩। আইন পরীক্ষায় পাস ১০,৩৮০। ইঞ্জিনীয়র ৬,০১০। বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রায় দুই হাজারের মধ্যে ১,৪৫৪ জনের ব্রিটিশ, ১৯১ আমেরিকান, ১৬২ জনের ইউরোপ মহাদেশীয় এবং ১৬০ জনের অন্যান্য বিদেশী ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা আছে।

প্রতি ১০০ জন 'শিক্ষিতে'র ৩৮·৪ জন কৃষি ও ৬১·৬ জন অ-কৃষিবর্গের অন্তর্ভুক্ত। ইহার অর্থ এই যে, শতকরা ৩৮·৪ জন শিক্ষিত লোকের অপর কোন উপার্জ্জন হইতে জমির আয় অধিক। কৃষিজীবী ম্যাট্রিকুলেট ১৫·৫ ও অ-কৃষিজীবী ৮৪·৫। গ্রাজুয়েটের হার যথাক্রমে ১০·৩ ও ৮৯·৭।

ট্রেনিং-প্রাপ্ত শিক্ষকদের ৪২·৬ জন কৃষিজীবী। তাহাদের শিক্ষকতার আয় অপেক্ষা জমির আয় বেশী। শিক্ষকতা ইহাদের মুখ্য নহে, গৌণ উপজীবিকা। জীবনধারণোপযোগী বেতন না

জনসংখ্যার শতকরা হার

	সকল লোক			গ্রামাঞ্চলের লোক			পৌরাঞ্চলের লোক		
	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
আসাম	১৮·১	২৭·১	৭·৮	১৬·৫	২৫·৪	৬·৬	৫০·৩	৫৮·৮	৩৭·৮
মধ্যপ্রদেশ	১৩·৫	২১·৯	৫·০	৯·৯	১৭·৩	২·৬	৩৬·১	৪৯·৭	২১·৩
উড়িষ্যা	১৫·৮	২৭·৩	৪·৫	১৪·৯	২৬·২	৩·৯	৩৭·৫	৫১·৭	২১·৪
মহীশূর	২০·৬	৩০·৪	১০·৩	১৪·৫	২৩·৮	৪·৯	৩৯·৭	৫০·৬	২৭·৮
বোম্বাই	২৪·১	৩৪·৯	১২·৬	১৬·৯	২৬·৬	৬·৯	৪০·৬	৫২·০	২৬·৭
পঞ্জাব	১৬·৫	২২·৫	৯·৫	১২·০	১৭·৫	৫·৮	৩৫·৬	৪৩·৩	২৬·১
মাদ্রাজ	১৯·৩	২৮·৫	১০·১	১৫·৪	২৩·৯	৬·৯	৩৫·৪	৪৭·১	২৩·৪
উত্তর প্রদেশ	১০·৮	১৭·৪	৩·৬	৭·৮	১৩·৬	১·৫	৩০·০	৪০·১	১৭·৬
বিহার	১১·৯	১৯·৯	৩·৮	১০·২	১২·৬	৩·৩	২৯·২	৪০·৮	১৫·১
পশ্চিমবঙ্গ	২৪·৫	৩৪·৭	১২·৭	১৭·৭	২৮·১	৬·৭	৪৫·২	৫১·৮	৩৫·১
ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন	৪৫·৮	৫৪·৮	৩৭·০	৪৪·৮	৫৩·৮	৩৬·০	৫১·৩	৬০·০	৪২·৪

পাইয়াও পাঠশালার শিক্ষকেরা যে কাজ করিয়া যান ইহাই তাহার প্রধান কারণ।

রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় 'শিক্ষিতের আংশিক পরিচয় নিম্নের পরিসংখ্যানে পাওয়া যাইবে :

৫ হইতে ১৪ বৎসরের নারীর মধ্যে ১০ বৎসরে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি পাইয়াছে ৬৬ শতাংশ। অল্প বয়স্কদের মহলে শিক্ষার তাগিদ পৌঁছিয়াছে।

	লোক	মোট শিক্ষিত	ম্যাট্রিক	কলা ও বিজ্ঞানের গ্রাজুয়েট
চব্বিশ পরগণা	৪৬,০৯,৩০৯	১২,৫৮,৭১৪	৬৫,৪৫৬	৮,৪০৭
মেদিনীপুর	৩৩,৫৯,০২২	৭,৭৮,২৬৮	১৯,৭০১	৩,২৬৬
কলিকাতা	২৫,৪৮,৬৭৭	১৩,৫৩,৯০৯	১,৩২,২৮২	৩১,১৩৫
বর্দ্ধমান	২১,৯১,৬৬৭	৪,৫২,৫৩৬	৩০,৬৬৩	৩,৬০৯
মুর্শিদাবাদ	১৭,১৫,৭৫৯	২,২৪,০২৫	১১,৪৩২	১,৬০৯
হাওড়া	১৬,১১,৩৭৩	৪,৫৭,১৪৬	২৫,৮২৪	২,৬২৩
হুগলী	১৫,৫৪,৩২০	৩,৮৩,২১৯	১৭,৫৫২	২,৫৪১
বাঁকুড়া	১৩,১৯,২৫৯	২,২৭,০৪৫	৭,৯২৭	৯৬৩
নদীয়া	১১,৪৪,৯২৪	২,৪১,৪১৪	১২,১০৩	১,৫০৩
বীরভূম	১০,৬৬,৮৮৯	১,৮৮,৪৩৩	৭,৪৯৯	১,০৭৭
মালদহ	৯,৩৭,৫৮০	৮৯,৭৫৮	৩,০৯৭	৩৪৭
জলপাইগুড়ি	৯,১৪,৫৩৮	১,৩২,২৮৬	৭,২৯৯	৮০৪
পশ্চিম-দিনাজপুর	৭,২০,৫৭৩	১,০৬,১২৭	৩,২৫৩	৩৪৮
কোচবিহার	৬,৭১,১৫৮	১ ০১,২৯৬	৩,২৪৯	৪৫৫
দার্জিলিং	৪,৪৫,২৬০	৯৪,০২১	৪,৯৩১	৬৭২

লিখনপঠন ক্ষমতার দিক হইতে উদ্বাস্তুগণ স্থানীয় অধিবাসী অপেক্ষা অধিক অগ্রসর।

শিক্ষার অগ্রগতি

প্রতি হাজারে

	বয়স ৫-৯ ১-৩-৫১	বয়স ৫-৯ ১-৩-৪১	বয়স ৫-১৪ ১-৩-৫১	বয়স ৫-১৪ ১-৩-৪১	বয়স ৫ ও তদূর্দ্ধ ১-৩-৫১	বয়স ৫ ও তদূর্দ্ধ ১-৩-৪১	বয়স ১৫ ও তদূর্দ্ধ ১-৩-৫১
মোট পুরুষ	১৮৮	১৩৭	২৮২	২০৭	৩৬৬	৩৩৩	৩৯৫
গ্রামাঞ্চলে	১৫২	—	২৩০	—	২৯৫	—	৩২০
পৌরাঞ্চলে	৩২৫	—	৪৬৩	—	৫৪৫	—	৫৬৬
মোট নারী	৯৯	৬৬	১৫৬	৯৪	১৫১	৯৮	১৪৯
গ্রামাঞ্চলে	৬০	—	৯৬	—	৮২	—	৭৬
পৌরাঞ্চলে	২৫৩	—	৩৭৫	—	৪০৬	—	৪১৮

১৯৪১ সনে গ্রামাঞ্চল ও পৌরাঞ্চলে বিভাগের নিয়ম ছিল না। ১৫ ও তদূর্দ্ধ বয়সের হিসাবও ছিল না।

উপরের বিবরণে নারীশিক্ষার প্রগতি বিশেষ লক্ষনীয়। শিক্ষায় নারী ও পুরুষের ব্যবধান ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে। বয়স যত কম পুরুষ ও নারীর শিক্ষিতের সংখ্যার ব্যবধানও তত কম। ১৫ ও তদূর্দ্ধ বয়সে এই ব্যবধান অত্যন্ত বেশী। অধিক বয়সের নারীদের নিরক্ষরতা এই ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে।

ভাষার কথা

পশ্চিমবঙ্গে মোট ১১৬টি ভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে খণ্ডজাতীয় ভাষা একটি। খণ্ডজাতীয় ভাষা নামে কোন ভাষা নাই। কিন্তু গণনাকারী ঐরূপ লিখিয়াছিলেন বলিয়া উহা প্রদর্শিত হইয়াছে। ২,৯৩,৬৪৯ জনের 'খণ্ডজাতীয় ভাষা। ইহা ব্যতীত অবাঙালী ভারতীয় ভাষা ৭৭, এশিয়ার অন্যান্য দেশের ভাষা ১৮ এবং অন্যান্য মহাদেশের ভাষা ২০। ২,০৯,৯৪,৩৭৪ জনের মাতৃভাষা বাংলা, হিন্দীভাষী ১৫,৭৪,৭৮৬, উড়িয়া ভাষী ১,৮২,২৭৫ জন। মাতৃভাষা নহে, অথচ কাজকর্মে ব্যবহার করিতে পারে এইরূপ বাংলা জানা লোক ৭,৭৮,৩৩১, হিন্দী বলিতে পারে ৪,৪৩,৫৪৪, নেপালী বলে ২,১৭,৭১১ জন।

রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান

বিগত ২রা জুন লণ্ডনের ওয়েষ্টমিনষ্টার এবেতে রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান বিপুল সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী কাল পরে আবার এক জন রাণী ব্রিটেনের সিংহাসনে বসিলেন। উক্ত দিবসে অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকলাপ এবং জাঁকজমক লক্ষ লক্ষ লোক হয় চর্ম্মচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, নয়ত টেলিভিশনের মাধ্যমে দেখিয়াছে। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে যে সকল চলচ্চিত্র গৃহীত হইয়াছে, সারা পৃথিবীতে অরও লক্ষ লক্ষ নর-নারী তাহা দেখিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও দেখিবে।

এই উৎসবে সমারোহ এবং ক্রিয়াকর্ম্মাদির প্রাচুর্য ছিল। কমনওয়েলথ এবং বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ, রাজপরিবারের ব্যক্তিগণ, ক্যাবিনেটের মন্ত্রী, রাষ্ট্রদূত, সমরপরিষদের সভ্য, বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারী সকলেই হয় তাহাদের ঝলমলে ইউনিফর্ম্ম অথবা সাদা-সিধে প্রভাতী পোশাক পরিয়া অভিষেক-উৎসব-ক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছিলেন। প্রারম্ভ হইতে উপসংহার পর্যান্ত উৎসবের যাবতীয় অনুষ্ঠান সুষ্ঠু এবং নিখুঁত ভাবে প্রতিপালিত হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে সারা পৃথিবীর লোকেরা রাণীর প্রতি ব্রিটিশ প্রজাদের আনুগত্যের নিদর্শন দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছে।

রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ উত্তরাধিকারসূত্রে মাত্র সাতাশ বৎসর বয়সে বর্ত্তমান জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গৌরবময় পদাধিকার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পরলোক-গমনের পর অর্দ্ধ শতাব্দীর ব্যবধানে দ্বিতীয় এলিজাবেথের সিংহাসনা-রোহণ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে পৃথিবীতে কত গুরুতর পরিবর্তন হইয়া গেল। সমাজের সাধারণ চেহারাই বদলাইয়া গিয়াছে, ইংলণ্ডের সিংহাসন কিন্তু আজও কায়েম হইয়া রহিয়াছে।

রাণীর প্রজাদের মধ্যে বেশীর ভাগই অনায়াসে সেদিনের কথা স্মরণ করিতে পারেন যেদিন ডিউক এবং ডাচেস অব ইয়র্কের লণ্ডনস্থ ভবনে তাঁহাদের কন্যা প্রিন্সেস এলিজাবেথ আলেকজান্দ্রা মেরীর জন্ম হয়। বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারী নানা বিষয়ে কৃতিত্ব অর্জ্জন করিতে লাগিলেন, জনসাধারণ গভীর কৌতূহলের সহিত তাহা লক্ষ্য করিতে লাগিল।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারই মত মহারাণী ভিক্টোরিয়ার বংশের অন্যতম ধারাবাহী ডিউক অব এডিনবরার সঙ্গে তাঁহার শুভ পরিণয়কালে এবং তাঁহাদের নয়নমণিস্বরূপ প্রিন্স চার্লস ও প্রিন্সেস এই দুটি সন্তান জাত হইলে প্রজাসাধারণও তাঁহার সুখের অংশভাগী হইয়াছিল। জনসাধারণের কল্পনা এবং ভাবনা ইদানীং এই রাজ-পরিবারকে কেন্দ্র করিয়াই আবর্ত্তিত। রাণী স্বয়ং শুধু যে সুমাতা এবং আদর্শ জায়া তাহাই নহেন, তিনি কমনওয়েলথেরও প্রধানা। তাঁহার চেয়ে চার বৎসরের বড় তাঁহার দীর্ঘকায় সুদর্শন স্বামী নৌবিভাগের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরূপে যে কর্ম্মদক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা বিস্ময়কর। কৰ্ম্মিতকর্ম্মা কাজের লোক তিনি। তাঁহার মধ্যে নাবিকের বহুশ্রুত হাসিখুশী ভাব ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার এক অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ হইয়াছে। ছোট্ট প্রিন্স এবং প্রিন্সেস এমন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে প্রতিপালিত হইতেছে যাহাতে এই বয়সেই সাধারণের প্রতি তাহাদের দায় সম্বন্ধে অস্ফুট চেতনা তাহাদের মনে জাগিতে পারে। তাহারা যে শ্রেষ্ঠ অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, উত্তরজীবনে যেন তাহার ঐতিহ্যের মর্যাদা রক্ষা করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত বলিয়া গণ্য হইতে সক্ষম হয় সেই দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়। অবশ্য তাই বলিয়া যে তাহাদিগকে স্ফূর্ত্তি আমোদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়া থাকে তেমন নহে।

মাতার সিংহাসনারোহণের সঙ্গে সঙ্গে প্রিন্স চার্লস 'ডিউক অব কর্ণওয়াল' হইলেন—সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারীমাত্রেই এই পদবীতে ভূষিত হইয়া থাকেন। সম্ভবতঃ পরবর্ত্তীকালে রাণী তাঁহাকে "প্রিন্স অব ওয়েলস্" অভিধা প্রদান করিবেন। গত ১৪ই তারিখে প্রিন্সের চার বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইয়াছে।

রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের পূর্ব্বে প্রথম এলিজাবেথ, এান এবং ভিক্টোরিয়া এই তিন জন রাণী ইংলণ্ডের সিংহাসন অলঙ্কৃত করেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই রাজত্বকালে ইংলণ্ডের ইতিহাসে নবযুগের সূচনা হয়। কিন্তু রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ এমন কতকগুলি সুযোগ সুবিধার অধিকারিণী হইলেন যাহা ইংলণ্ডের আর কোন রাণী ভোগ করিতে পারেন নাই। রাণী এলিজাবেথের পার্শ্বে আছেন তাঁহার মাতা যিনি এক জন ভূতপূর্ব্ব রাজমহিষী, যাঁর জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ। আর আছেন তাঁর কনিষ্ঠা ভগিনী প্রিন্সেস মার্গারেট যিনি তাঁহার ব্যক্তিগত অনেক সুখদুঃখের অংশভাগিনী। এতদ্ব্যতীত আছেন ডিউক ও ডাচেস অব গ্লষ্টার, ডাচেস অব কেন্ট, প্রিন্সেস রয়্যাল প্রমুখ রাজপরিবারের অন্যান্য অন্তরঙ্গ আত্মীয়স্বজন যাঁহারা ইংলণ্ডের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছেন।

রাণী এলিজাবেথ যেখানে যান সেখানেই যেন খুশীর হাওয়া বহাইয়া দেন, ইহাই তাঁহার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মুগ্ধকারী। ইহা তাঁহার সকল সাধারণ কর্ম্মানুষ্ঠানে সঞ্চারিত হয় এবং তাঁহার পারিবারিক জীবনের আনন্দ সর্ব্বত্র প্রতিফলিত হইয়া থাকে।

রাণী এলিজাবেথের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানে কমনওয়েলথের বিভিন্ন দেশ হইতে যে সকল সৈন্যবাহিনী যোগদান করিয়াছে, তন্মধ্যে আছে ভারতীয় গুর্খারা। অভিষেক-শোভাযাত্রা-পথের উভয়পার্শ্বে অপেক্ষমাণ অগণিত ব্রিটিশ নরনারী উচ্চ হর্ষধ্বনি দ্বারা এই সমস্ত শক্তসমর্থ কষ্টসহিষ্ণু খর্ব্বকায় সৈনিকদিগকে অভিনন্দিত করিয়াছে। ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে সেদিন প্রভাতেই এই চমকপ্রদ সংবাদ আসিয়া পৌঁছে—একজন নিউজিল্যাণ্ডবাসী এবং একজন ভারতীয় শের্পা মাউণ্ট এভারেষ্টের সর্ব্বোচ্চ শিখর আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন—এই গুর্খা সৈন্যদের বাসভূমি নেপালেই এভারেষ্ট বিজয়ী শের্পা তেনসিং-এর জন্ম।

মাকালু হইতে এভারেষ্ট-শৃঙ্গের দৃশ্য

এভারেষ্ট-বিজয় প্রসঙ্গ

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

১

বিগত ২৯শে মে তারিখে ভারতীয় শেরপা তেনজিং নোর্কে এভারেষ্ট-শৃঙ্গশীর্ষে পৌঁছিয়া এভারেষ্ট-বিজয়-অভিযান সুসম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গী ছিলেন নিউজিল্যাণ্ডবাসী ক্যাপ্টেন হিলারী। তেনজিং প্রথম পৌঁছেন, তাঁহার পরেই উপনীত হন হিলারী। এই অভিযানের নেতা কর্ণেল হাণ্ট। তিনি ইংরেজ সেনানীরূপে বাংলাদেশে এক সময়ে যুগপৎ খ্যাতি ও অখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সে কথা আজ আর তুলিব না। প্রথমে তেনজিং এবং তাঁহার অব্যবহিত পরে হিলারী এভারেষ্ট-শৃঙ্গে পৌঁছিলেও, বিজয়-সম্মান সমগ্র অভিযানকারীমণ্ডলীরই প্রাপ্য—একথা ফলাও করিয়া বলা হইতেছে। এ সম্মান উক্ত মণ্ডলীর প্রাপ্য হইলেও সর্ব্বাগ্রে যে তেনজিং এভারেষ্ট-শীর্ষে পৌঁছিয়াছিলেন একথা অস্বীকার করিবার উপায় আছে কি?

তেনজিং সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা হইয়া গিয়াছে। এই প্রসঙ্গে এখনও নানা প্রশ্ন তোলা হইতেছে। আমরা এখানে এ সকল সম্বন্ধে দু-চার কথা মাত্র বলিব। তেনজিঙের জন্মভূমি নেপাল রাজ্যের অন্তর্গত। কিন্তু তিনি বহুকাল দার্জ্জিলিঙে বাংলার অধিবাসীরূপে বসবাস করিতেছেন। বাংলা তথা ভারতরাষ্ট্রকেই তিনি স্বদেশ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার দুই কন্যা বাংলার রাজ্য-সরকারের বৃত্তিভোগী হইয়া পড়াশুনায় রত। কাজেই তেনজিং বাঙালী কি নেপালী সে বিতর্কের অবকাশ এখন কোথায়? ইহা আমাদের পক্ষে খুবই গৌরবের কথা যে, তেনজিংই সর্ব্বপ্রথম ভারতরাষ্ট্রের ত্রিবর্ণ পতাকা এভারেষ্ট শীর্ষে উড়াইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তেনজিং দীর্ঘকাল যাবৎ এভারেষ্ট অভিযান-কারীদের সঙ্গী হইয়া তাঁহাদের সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন, একথাও আজ অবিদিত নাই।

২

এই প্রসঙ্গ হইতে আর একটি বিষয়ে আমরা যাইতেছি। তেনজিং যে শ্রেণীভুক্ত তাঁহারা পর্ব্বতারোহণে বরাবরই দক্ষ। এভারেষ্ট-অভিযানকারীরা ভারতীয় শেরপাদের সাহায্য ছাড়া এযাবৎ এক পাও অগ্রসর হইতে সমর্থ হন নাই। অভিযান-কারীরা একথা বিশেষ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিলেও বহির্জগতের পক্ষে ইহা জানা তেমন সম্ভব ছিল না। কিছুকাল পূর্ব্বেও

তাহারা মাত্র 'porter' বা 'কুলি' বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত ছিল। এই পোর্টার বা তথাকথিত শের্পা কুলীদের গুণপনার কথা *Everest 1933* গ্রন্থে এভারেষ্ট অভিযানের (১৯৩৩) নেতা হিউ রাটলেজ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। সুউচ্চ পর্ব্বতে শের্পারা অতি সহজভাবে বিচরণ করিতে

রংবাক বৌদ্ধমঠ। পশ্চাতে এভারেষ্ট শৃঙ্গ

অভ্যস্ত। তাহাদের সহায়তা প্রত্যেক অভিযানকারী দলের পক্ষেই অপরিহার্য্য। বহুক্ষেত্রে তাহারাই অভিযানকারীদের আগে আগে মালপত্র, সাজসরঞ্জাম লইয়া চলে, অভিযানকারীরা তাহাদের পশ্চাদনুসরণ করিয়া থাকে। উক্ত পুস্তকে (পৃ, ১০৯-১০) রাটলেজ শের্পাদের সম্বন্ধে লিখিতেছেন :

"I have never seen a finer body of men. As to shelter for the night anything would do. After a merry salute, and with no pause for rest, they fell to upon the moraine boulders, rolling them into position to make sangars. A few outer flies from Whymper tents were stretched overhead, and soon the smoke began to rise from the few sticks of firewood they had brought up; the tsampa was cooking in the post; song and laughter proceeded from every sangar, and the whack of the dice-box on its leathern pad, banged down from each man with a shout of optimistic import, showed that all was well and that Sola Khombu was thoroughly at home. Would they carry up to Camp III? Of course they would and higher. Among them was Narbu Yishe, the 'purana miles' (Urdu-Latin for old soldier) of 1924 . . . These men solved the transport problem. We gave them what spare boots we could, though always ready to tackle the glacier in their anything but waterproof gear. They were a grand lot impervious to cold and fatigue, and apparently unaffected by any superstitious dread of the mountain."

রাটলেজ এই মর্ম্মে বলেন যে, শের্পাদের মত এমন এক দল সবল সুস্থ লোক তিনি আর কখনও দেখেন নাই। তাহারা আসিয়াই বড় বড় প্রস্তরখণ্ড টানিয়া সমান করিয়া লইল। কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল, রন্ধন আরম্ভ হইয়াছে! গানে হাসিতে ইহারা মশগুল। সাড়ে উনিশ হাজার ফুট উঁচু স্থানকে তাহারা যেন গৃহকোণ করিয়া লইয়াছে। শীত ও ক্লান্তিতে তাহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই। পাহাড়ের ভয় তাহাদের স্পর্শ করিতে পারে না। রাটলেজ শের্পা দলের অন্তর্ভুক্ত নরবু য়িশি নামক একজন শের্পার উল্লেখ করিয়াছেন। এই শের্পা ১৯২৪ সনের অভিযানে যোগ দিয়া বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল। বার্দ্ধক্য হেতু এই শের্পাটি তাহাদের সঙ্গে বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। ঝড়-ঝঞ্ঝা বা হিমবাহের মধ্যেও অতি সামান্য মাত্র আচ্ছাদনেই শের্পারা স্বকর্ত্তব্য সম্পাদনে লাগিয়া যাইতে দ্বিধা করে না। পূর্ব্বেকার অভিযানের এমন একটি দিনের কথা উল্লেখ করিয়া শের্পাদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে :

"The climbers were heroic, but no words of praise can be too high for those native porters who risked their lives to take them warming drinks."

অর্থাৎ, "অভিযানকারীরা বীর বটে, কিন্তু ভারতীয় শের্পাদের বীরত্বের প্রশংসার ভাষা নাই। এই দুর্দ্দিনের মধ্যেও তাহারা নিজেদের জীবন তুচ্ছ করিয়া উষ্ণ পানীয় লইয়া আসিতে ইতস্ততঃ করে নাই।"

রাটলেজ পঞ্চম তাঁবুতে (২৫,০০০ ফুট) রওনা হইবার প্রাক্কালে তাঁহাদের বীরত্ব এবং আত্মপ্রত্যয় সম্বন্ধে তাঁহার পুস্তকে (পৃ, ১১৪-৫) এইরূপ সাক্ষ্য রাখিয়াছেন :

"One can treat these porters as fellow mountaineers and I explained the whole plan to them. They responded at once. 'Don't be anxious. We mean to do our bit and carry those loads as far as we possibly can You'll see tomorrow. Then it's up to the sahibs to climb the mountain.' There was no noisy demonstration, just a quiet statement of fact and a complete self confidence."

প্রত্যেক অভিযানকারী দলই শের্পাদের কৃতিত্ব সম্যক্

হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। তবে রাটলেজ যেরূপ সহজ-সরল ভাবে তাহাদের শক্তিসামর্থ্য, কষ্টসহিষ্ণুতা ও কর্ত্তব্য-পরায়ণতার কথা বলিয়াছেন, এমনটি আর কোথাও দেখা যায় নাই। শের্পাদের পর্ব্বতারোহণ-পটুতার তুলনা নাই। এ-হেন শের্পাদেরই এক জন যে অবশেষে এভারেষ্ট-শৃঙ্গশীর্ষে আরোহণে সমর্থ হইলেন ইহা আদৌ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

৩

এভারেষ্ট-শৃঙ্গ বিজয় প্রসঙ্গে আরও কতকগুলি কথা উঠিয়াছে। 'মাউণ্ট এভারেষ্ট' যে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ তাহা জানা যায় ১৮৫২ সন নাগাদ কলিকাতার সার্ভে আপিসে বসিয়া। এই সর্ব্ব-স্বীকৃত ও সর্ব্বজনবিদিত ঘটনাটি সম্প্রতি একখানি পুস্তকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হইয়াছে। ডব্লিউ. এইচ. মারে *The Story of Everest* (1953) পুস্তকে এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নূতন কথা শুনাইয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই কথা, হয়ত 'নূতন' বলিয়াই, কোনরূপ যাচাই মাত্র না করিয়া একটি বাংলা সাপ্তাহিকের প্রবন্ধ-বিশেষে ঘটা করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। মারে লিখিতেছেন :

"The commonly accepted story that the height of Everest was first discovered by the Bengali chief computer, Radhanath Sikhdar, is not correct. Radhanath Sikhdar was transferred from Delra Dun to the Surveyor-General's office in Calcutta in 1849, and was at no time employed in computing the heights of Everest and neighbouring peaks. The computer responsible for that work was an Anglo-Indian, named Hennessey, who was assisted by many other computers in the field office at Delra Dun. They arrived at the figure of 29,002 feet for Everest in 1852. The traditional story of the computer's rushing into the Surveyor-General's room with the news is unsubstantiated, but may be true."—(*The Story of Everest, Appendix*, p. 185.)

এই পুস্তকখানি মাত্র এই বৎসর প্রকাশিত হইয়াছে। উপরের উদ্ধৃত অংশে লেখক কয়েকটি নূতন মত ব্যক্ত করিয়াছেন। (১) রাধানাথ শিকদার দেরাদুন হইতে কলিকাতায় সারভেয়ার-জেনারেলের আপিসে স্থানান্তরিত হন ১৮৪৯ সনে, এবং তিনি কখনও এভারেষ্ট বা পার্শ্ববর্ত্তী শৃঙ্গ-গুলির উচ্চতা গণনায় নিযুক্ত ছিলেন না। (২) এই সকল শৃঙ্গের গণনাকার্য্যের ভার ছিল হেনেসি নামক জনৈক এংলো-ইণ্ডিয়ানের উপর; তিনি দেরাদুনে বসিয়া অন্য গণনাকারীদের সহযোগে এই গণনাকার্য্য সমাধা করেন। (৩) তাঁহারাই গণনা করিয়া এভারেষ্ট-শৃঙ্গের ২৯,০০২ ফুট উচ্চতা নির্ণয় করেন। (৪) গণনার অব্যবহিত পরবর্ত্তী এভারেষ্ট-আবিষ্কারের গল্পটি সত্য হইলেও হইতে পারে।

গল্পটি হয়ত কতকটা মুখরোচক বলিয়াই ইহা একেবারে উড়াইয়া দিতে লেখক তেমন অভিলাষী হন নাই। কিন্তু তিনি কি কি প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া অপর সিদ্ধান্ত-গুলিতে উপনীত হইয়াছেন তাহার কোন উল্লেখ নাই। পক্ষান্তরে ভারতীয় জরীপ বিভাগের বহু খ্যাতনামা কর্ম্মী বিভিন্ন সময়ে নানা প্রবন্ধে ও পুস্তকে অন্য কথাই বলিয়াছেন। আমরা এখানে তাহার কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা

দুই জন শের্পা। ১৯৩৩ সালে, ইহারা ৬নং ক্যাম্পে ২৭,৪০০ ফুট উচ্চে ভারী ভারী মালপত্র লইয়া উঠিয়াছিল। অভিযানকারীরা ইহাদিগকে "টাইগার" (বাঘ) আখ্যা দিয়াছেন।

শেষ করিব। পাঠক ইহা হইতে মারের উক্তির যাথার্থ্য যাচাই করিয়া লইতে পারিবেন। তবে দেখিতেছি, রাধানাথ শিকদার যে ১৮৪৯ সনে দেরাদুন ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসেন এবং এখানেই স্থায়ীভাবে কর্ম্ম করিতে থাকেন তাহা সকলেই স্বীকার করিতেছেন।

৪

ক্লেমেণ্ট আর মারখাম *A Memoir on the Indian Surveys* (1871) পুস্তকে হিমালয়ের শৃঙ্গগুলি পর্য্য-বেক্ষণ সম্পর্কে এই মর্ম্মে লেখেন যে, ১৮৪৫-৫০ এই কয় বৎসরের মধ্যে হিমালয়ের উনআশীটি পর্ব্বত-শৃঙ্গের উচ্চতা পর্য্যবেক্ষণ করা হয়। ইহাদের মধ্যে একত্রিশটির নাম জানা

যায় ও জরীপ বিভাগ তাহা গ্রহণ করেন। অবশিষ্টগুলি ১, ২, ৩ এইরূপ সংখ্যা দ্বারা নির্ণীত হয়। ভাবী এভারেষ্ট-শৃঙ্গ ছিল ইহাদের মধ্যে পনর সংখ্যক (K XV)।

এই পনর সংখ্যক শৃঙ্গটি ১৮৪৯ সনের পূর্ব্বেই ছয়টি বিভিন্ন স্থান হইতে, জরীপ বিভাগের অন্যতম কর্ম্মী জে. ও. নিকলসন ২৪ ইঞ্চি থিওডোলাইট যন্ত্র-সাহায্যে পর্য্যবেক্ষণ করেন। এ স্থানগুলির প্রত্যেকটি মূল শৃঙ্গ হইতে শতাধিক মাইল দূরে অবস্থিত। অন্যান্য শৃঙ্গের মত এই শৃঙ্গটিরও

এভারেষ্টের উচ্চতা নির্ণয়কারী রাধানাথ শিকদার

পর্য্যবেক্ষণের ফল গণিয়া বাহির করিবার জন্য কলিকাতার মূল আপিসে পাঠানো হইল। এখানে বলা আবশ্যক যে, পর্য্যবেক্ষিত পনর সংখ্যক শৃঙ্গটি যে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ তাহা পর্য্যবেক্ষকের ধারণায় আদৌ আসে নাই, আসা তখন সম্ভবও ছিল না। ১৮৫২ সন নাগাদ এই শৃঙ্গটি পর্য্যবেক্ষণের ফল জানা যায়। ভারতীয় জরীপ বিভাগের পদস্থ কর্ম্মী এস. জি. বারার্ড লণ্ডনস্থ ১৯০৪, ১০ই নবেম্বর সংখ্যা *Nature* পত্রিকায় "Mount Everest : the Story of a Long Controversy" শীর্ষক প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে লেখেন :

"About 1852, the chief computer of the office at Calcutta informed Sir Andrew Waugh that a peak designated XV had been found to be higher than any other hitherto measured in the world. This peak has been discovered by the computers to have been discovered from six different stations; on no occasion had the observer suspected that he was viewing through the telescope the highest point of the earth."

উক্ত তথ্যটি ১৯০৭ সনে ভারত-সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত এস. জি. বারার্ড ও এইচ. এইচ. হেডেন কৃত *A Sketch of the Geography and Geology of Himalaya Mountains and Tibet* নামক পুস্তকে পুরাপুরি স্বীকৃত হয়। ১৯৩৩ সনে প্রকাশিত ইহার পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণেও এ কথা স্বীকৃত হইয়াছে।

১৮৫২ সন নাগাদ কলিকাতার কেন্দ্রীয় আপিসে বসিয়াই যে রাধানাথ শিকদারের তত্ত্বাবধানে গণনাকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল, জরীপ বিভাগের আরও বহু বিশেষজ্ঞ কর্ম্মী এবং গ্রন্থকার তাহা নিজ নিজ পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এভারেস্ট-শৃঙ্গ-অভিযানকারীরাও স্ব-স্ব গ্রন্থে এ বিষয়টির উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ *Mount Everest. The Reconnaissance, 1921* এবং *First Over Everest. The Houston Mount Everest Expedition, 1933* পুস্তকের উল্লেখ করা যাইতে পারে। কাজেই মারের পুস্তকে যে উক্তি করা হইয়াছে—দেরাদুনে ফিল্ড আপিসে বসিয়া এভারেষ্ট-শৃঙ্গের গণনাকার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহা আদৌ গ্রহণযোগ্য নহে।

৫

উপরের উদ্ধৃতি হইতে জানা যাইতেছে, রাধানাথ শিকদার কলিকাতার কেন্দ্রীয় আপিসে বসিয়া গণনাকার্য্যে লিপ্ত থাকাকালে তিনিই প্রথম ইহার সর্ব্বোচ্চতা সম্যক্ জানিতে সক্ষম হন। তিনি ইহা জানিয়াই অবিলম্বে সার্ভেয়ার-জেনারেল এনড্রু ওয়'কে জানান। রাধানাথ শিকদার যে প্রধান গণনাকারীরূপে এভারেষ্টের সর্ব্বোচ্চতা জানিতে পারেন *Mount Everest, The Reconnaissance, 1921* নামক পুস্তকেও তাহার এইরূপ স্পষ্ট উল্লেখ আছে :

"The observations were recorded, but the resulting height was not completed till three years later, and then one day the Chief Computer rushed in the room of the Surveyor-General, Sir Andrew Waugh, breathlessly exclaiming, 'Sir! I have discovered the highest mountain in the world.'"

সুবিখ্যাত ভূতাত্ত্বিক এবং জরীপ বিভাগের কর্ম্মী মেজর কেনেথ মেসন ১৯২৮ সনে সিমলায় একটি বক্তৃতা-প্রসঙ্গে রাধানাথের উপরের উক্তির পুনরুল্লেখ করেন। লণ্ডনস্থ রয়্যাল জিওগ্র্যাফিক্যাল সোসাইটির সদস্য ক্যাপটেন নোয়েল রাধানাথ শিকদারকে এভারেস্টের সর্ব্বোচ্চতা আবিষ্কারের সম্মান দিয়াছেন।

তৃতীয় দশকের প্রথম দিকে মেসন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূগোলের অধ্যাপক ও বিখ্যাত 'হিমালয়ান জার্নালে'র

সম্পাদক পদে বৃত ছিলেন। বর্ত্তমান লেখক তখন তাঁহার উক্তির যাথার্থ্য সম্বন্ধে জানিতে চাহিলে জবাবে তিনি বলিয়াছিলেন যে, বিষয়টি তাঁহার ঠিক স্মরণ হইতেছে না। বস্তুতঃ তৃতীয় দশকের প্রথমে যখন এভারেষ্ট-শৃঙ্গ আবিষ্কার সম্পর্কে আলোচনা হইতে থাকে তখন ইংরেজ লেখকগণ পূর্ব্ব মতামত অনেকটা বিশেষিত করিতে আরম্ভ করেন। বারার্ড ও হেডেন তাঁহাদের পুস্তকের নূতন সংস্করণে (১৯৩৩) ১৯৪-৬ পৃষ্ঠায় "The Discovery of Everest" শীর্ষক অধ্যায়ে নানা দিক হইতে আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এভারেষ্ট-শৃঙ্গ আবিষ্কারের কৃতিত্ব ও গৌরব সমগ্র জরীপ বিভাগের, কোন একক ব্যক্তির নহে; তবে রাধানাথ শিকদারের কৃতিত্বও অস্বীকার করা যায় না।

সে যাহা হউক, এই মতই এতদিন চলিয়া আসিতেছিল, কিন্তু সম্প্রতি দেখিতেছি, এরূপ সিদ্ধান্তের উপরও নানা দিক হইতে বিনা প্রমাণ-প্রয়োগে বিশেষ আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে। এভারেষ্ট-শৃঙ্গের দেশীয় নাম লইয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া আলোচনা চলিয়াছিল। স্বাধীনতালাভের পরেও এ বিষয়ে নূতন করিয়া আলোচনা সুরু হয়। তখনও রাধানাথ শিকদারের কৃতিত্ব অপহ্নবের প্রয়াস দেখিয়াছি। কিন্তু কলিকাতায় যে আদৌ গণনাই হয় নাই এবং এক জন এংলো-ইণ্ডিয়ানের তত্ত্বাবধানে দেরাদুনের ফিল্ড অফিসে বসিয়াই গণনাকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল, এরূপ কথা ইতিপূর্ব্বে কখনও শুনা যায় নাই।

বড়ই পরিতাপের বিষয়, ইদানীন্তনকালে রাধানাথ শিকদার শুধু 'কম্পিউটার' বা গণনাকারী রূপেই পরিচিত হইতেছেন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক রূপে তিনি দেশে-বিদেশে যে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা যেন আমরা এক প্রকার ভুলিতেই বসিয়াছি! বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির বিজ্ঞান-বিভাগের পক্ষে তিনি আবহাওয়া-বিষয়ক একখানি মৌলিক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। 'ম্যানুয়েল অফ সার্ভেয়িং' নামক ভারত-সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ত্রিকোণমিতিক জরীপ বিভাগের প্রামাণিক পুস্তকখানির জটিলতম গাণিতিক অংশ রাধানাথ শিকদারেরই

ক্যাপ্টেন হিলারীকে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ একটি পদক পরাইতেছেন

রচনা। তিনি জার্ম্মানীর ব্যাভেরিয়ার বিদগ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানেও সদস্যরূপে গৃহীত হন। এত দিন বাঙালী সন্তান এভারেষ্টের সর্ব্বোচ্চতা নির্দ্ধারণে কার্যতঃ সহায়তা করিয়াছিলেন, আজ বাংলার তেনজিং এভারেষ্ট-শৃঙ্গ আরোহণে সাফল্যলাভ করিয়া দেশ-বিদেশে সম্মানিত হইতেছেন। ইহা আমাদের পক্ষে বিশেষ গৌরবের কথা।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের তিরোধানে ভারতবর্ষ এক জন বিরাট পুরুষ হারাইল, গত ২২শে জুন সুদূর কাশ্মীরে যে অবস্থায় তাঁহার অকাল ও আকস্মিক মৃত্যু ঘটিয়াছে, তাহা খুবই বেদনাদায়ক এবং হৃদয়বিদারক। তাঁহার আটক, বন্দী অবস্থায় তাঁহার স্বাস্থ্য, রোগনির্ণয় ও উপযুক্ত চিকিৎসা সম্বন্ধে কোনদিন কোন সঠিক তথ্য উদ্ঘাটিত হইবে কিনা জানি না। পৃথিবীর কোন দেশে শ্যামাপ্রসাদের ন্যায় জনপ্রিয় নেতার জীবনের অবসান অনুরূপ অবস্থায় ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার মৃত্যুসংবাদ তড়িৎপ্রবাহের ন্যায় সমগ্র বাংলার জনমানসকে হতচকিত করিয়াছে। জাতি ধর্ম-নির্বিশেষে আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে সেদিন যে চাঞ্চল্য এবং বিচলিত অবস্থা পরিলক্ষিত হইয়াছিল তাহা অভূতপূর্ব। তাঁহার প্রতি শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনের জন্য উক্ত দিন দমদম বিমান ঘাঁটি হইতে ভবানীপুর পর্যন্ত দশ মাইলব্যাপী বিস্তৃত রাজপথে সন্ধ্যা হইতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি দণ্ডায়মান থাকিয়া যে নীরব শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছে তাহার দ্বারাই অনুভূত হয় তাঁহার জনপ্রিয়তা। দিনান্তের ক্লান্তিকে অস্বীকার করিয়া ক্ষুব্ধ জনতার এই আবেগবিহ্বল শ্রদ্ধাঞ্জলি চিরকাল স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

ধনী, নির্ধন, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, সর্বশ্রেণীর ব্যক্তিদের জন্য তাঁহার ভবনের দ্বার যে কেবল উন্মুক্ত থাকিত তাহা নহে, তাঁহার বিশাল হৃদয়ও সবাইকে অনুক্ষণ আহ্বান জানাইত; বিরাট মানুষ তাঁহার বিশাল বক্ষ ও প্রশস্ত বাহুদ্বয় দ্বারা সকলকেই সমান শ্রদ্ধা, প্রীতি ও স্নেহ সহকারে আলিঙ্গন করিতেন। অসংখ্য ব্যক্তি তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, প্রত্যেকের সহিত তিনি সহাস্যবদনে কথা বলিয়াছেন, প্রত্যেককেই সাহায্য করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন; এমন লোক বোধ হয় অল্পই আছেন যিনি বলিবেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক তিনি কোন-না-কোন রকমে উপকৃত হন নাই।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বহুমুখী প্রতিভা, কর্মশক্তি এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁহার অবদান তাঁহার জীবনী-লেখকগণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিবেন। আমি কতকগুলি ব্যক্তিগত ঘটনার উল্লেখ করিয়া তাঁহার প্রতি আজ শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতেছি। অবশ্য এক্ষেত্রে ইহা বলিয়া রাখা অবান্তর হইবে না যে, ঘটনাগুলি ক্ষুদ্র এবং ব্যক্তিগত হইলেও তাহার মধ্য দিয়া তাঁহার চরিত্রের বহুদিক উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে।

দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরকাল আমি তাঁহার সহিত পরিচিত ছিলাম। কি জানি কেন প্রথম দিন হইতেই তিনি আমাকে শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথম সাক্ষাতের পর হইতে বহু উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া তিনি গৌরবের উচ্চ শিখরে আসীন হইয়াছিলেন, কিন্তু আমার প্রতি তাঁহার প্রীতি প্রথম দিনের মতই নবীন এবং অটুট ছিল। মধুপুরে তাঁহার খুবই সান্নিধ্যে আসিয়াছিলাম। তাঁহার স্বর্গীয়া সহধর্মিণীর সহিত আমার স্বর্গগতা সহধর্মিণীর বিশেষ সম্প্রীতি ছিল। মধুপুরেই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে বিভিন্ন রূপে দেখিবার সুযোগ হইত—কখনও বা বালকসুলভ সরল সুন্দর মনোভাব, কখনও বা দেশের সমস্যাসমূহ সমাধানের চিন্তায় বিভোর, আবার কখনও বা তাস খেলিবার জন্য অতিশয় ব্যগ্র। মধুপুরে দিনের পর দিন দেখিয়াছি দ্বিপ্রহরে মিত্র ইনষ্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক স্বর্গীয় নির্মলচন্দ্র মিত্র ও বিখ্যাত মনোবৈজ্ঞানিক সুহৃৎ চন্দ্র মিত্রকে তাস খেলিবার জন্য ডাকের পর ডাক। আমি তাস খেলায় অনভিজ্ঞ, সেইজন্য আমার ডাক পড়িত না; কিন্তু খেলিবার সময় আমায় সেখানে উপস্থিত থাকিতে হইত।

আমার এক জন মুসলমান চাপরাসী ছিল, তাহার নাম ছিল মীরুখান্। পূজার ছুটিতে আমি যখন মধুপুর যাইতাম মীরুখানও আমার সঙ্গে যাইত। সে সুন্দর রান্না করিতে জানিত। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দের কাঁঠালতলার বাড়ীতে মীরুখান রান্না করিত। নানাবিধ হাসিঠাট্টার মধ্যে খবরের কাগজের উপর বসিয়া কলাপাতায় শ্যামাপ্রসাদবাবুর সহিত আমাদের খাওয়া হইত। তখন কে জানিত যে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পরবর্তীকালে এইরূপ জনপ্রিয় নেতার আসন গ্রহণ করিবেন। তিনি নিজেও হাসিতে জানিতেন এবং অন্যকেও হাসাইতে পারিতেন। মধুপুরেই তাঁহার বাড়ীতে এক দিন শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের সহিত পরিচয় করিয়া দিবার সময় আমার সম্বন্ধে বলিলেন: He is an author of three books, but of five children, অর্থাৎ ইনি তিনখানি পুস্তকের লেখক এবং পাঁচটি সন্তানের পিতা। এই কথা শুনিয়া উপস্থিত সকলেই হাসিতে লাগিলেন।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ধৈর্যের সীমা বাস্তবিকই বিস্ময়কর ছিল। প্রতিদিন প্রত্যুষ হইতে রাত্রি পর্যন্ত কত রকমের লোক কত ধরণের কাজের জন্য তাঁহার নিকট আসিতেন তাহা সকলেই জানেন। সকলের সঙ্গেই হাসি-মুখে কথা। এক দিন এক জন যুবককে একখানি পত্র দিয়া তিনি বলিলেন, "আমি তোমার কথা D. P. I.-কে

(শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা) বলিয়াছি, তুমি এই চিঠি লইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিও।" যুবকটি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে লাগিল, ডি-পি-আই কে, তাঁহার কোথায় আপিস, কোথা দিয়া যাইতে হয়, কোন তলায় তাঁহার আপিস ইত্যাদি; শ্যামাপ্রসাদবাবু তাঁহার প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর হাসিমুখেই দিতে লাগিলেন; বিরক্তিকর কোন লক্ষণ ছিল না; বরং আমি বিরক্ত হইয়া বলিয়া ফেলিলাম "এত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অপেক্ষা একে আপনি ডি-পি-আই-এর নিকট লইয়া যান, না হয় ডি-পি-আইকেই এর সঙ্গে দেখা করিবার জন্য বলুন।" উত্তরে শ্যামাপ্রসাদবাবু বলিয়াছিলেন, "এর চেয়ে অনেকের অনেক বেশী প্রশ্নের উত্তর আমাকে দিতে হয়।" তাহার পর যুবকটির প্রতি অতিশয় সহানুভূতি সম্পন্ন হইয়া বলিলেন, "এরা পাড়াগাঁয়ের ছেলে, শহুরে নয়।" পল্লী অঞ্চলের ছাত্রদের প্রতি তাঁহার এই দরদ দেখিয়া আমি অভিভূত হইয়া গেলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে লজ্জিত হইলাম।

আর এক দিন—যখন তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী, সকলের সঙ্গে দেখা করিয়া রাত্রি প্রায় দশটার সময় সিঁড়ি দিয়া নামিতেছেন, সিঁড়িতেই এক দল দর্শনলাভেচ্ছু যুবক তাঁহাকে আক্রমণ করিল; তিনি তাঁহাদের বলিলেন "আর পারছি না, সকাল আটটার সময় বেরিয়েছিলাম, সমস্ত দিন খাই নি, এখন খেতে যাচ্ছি।" কে কার কথা শোনে? সিঁড়ির নীচের বারান্দায় দাঁড়াইয়া কথা বলিতে বলিতে অন্ততঃ ১৫ মিনিট কাটিয়া গেল; আমি অতি বিনয়ের সহিত যুবকগণকে তাঁহার ক্লান্তির কথা বলাতে যুবকগণ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল। এই সময়কার আর এক দিনের কথা—রাত প্রায় সাড়ে নয়টা পৌনে দশটার সময় আমি তাঁহার বাড়ীতে গিয়াছি, তিনি তখন তাঁহার বসিবার ঘর হইতে বাহির হইয়া সামনের ছাদে আসিয়াছেন; সঙ্গে তখনও পাঁচ-সাত জন লোক ছিলেন—আমাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "কি দেবেনবাবু, কি খবর?" আমি বলিলাম, "কোনও খবরই নাই, আপনি কেমন আছেন দেখিতে আসিয়াছি", তখন তিনি বলিলেন, "আজ দুই-তিনশ' লোকের মধ্যে আপনিই বলিলেন—'কোন খবর নাই, কেবল দেখিতে আসিয়াছি'।" আর এক দিনের ঘটনা বলি—তখন তিনি অবিভক্ত বাংলার অর্থ-সচিব; প্রায় পাচটা-ছ'টার সময় রাইটার্স বিল্ডিংস হইতে ফিরিয়াই তিনি তাঁহার বসিবার ঘরে গেলেন। সম্মুখের ছাদে ও বারান্দায় এবং ঘরে তাঁহার জন্য অনেক লোক অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি চেয়ারে বসিবার পর এক জন ভৃত্য গামছা, চটিজুতা প্রভৃতি আনিল, তিনি জামা খুলিয়া দিলেন, জুতা খুলিয়া চটিজুতা পরিলেন, গামছায় গা মুছিলেন, গায়ে কেবল গেঞ্জি রহিল। সকল ক্লান্তি দূরে ঠেলিয়া দিয়া সহাস্যবদনে কথা বলিতে লাগিলেন। একটু পরেই তাঁহার ভৃত্য আসিয়া টেবিলের উপর চা, জলখাবার রাখিয়া গেল। সেইদিকে কোন দৃষ্টি না দিয়াই তিনি সকলের সহিত আলাপ-আলোচনা করিতে লাগিলেন, এই সময় তাঁহার এক পুত্র আসিয়া পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে চা, জলখাবার খাইবার কথা স্মরণ করাইয়া দিল। তিনি তখন চায়ের বাটি আগাইয়া দিয়া আমাকে বলিলেন, "চা খান;" আমি চা খাইলাম না। তাঁহাকে বলিলাম, "আপনি খান।" ক্রমশঃ লোকের ভীড় জমিতে লাগিল। তাঁহার চা ও জলখাবার খাওয়া হইল না, অন্য কাজের জন্য ভৃত্য যখন ঘরে আসিয়াছিল, তাহাকে চায়ের বাটি ও জলখাবার লইয়া যাইবার জন্য বলিলেন, সে লইয়া গেল। অতি ধৈর্যসহকারে তন্ময় হইয়া নানা ব্যক্তির সহিত নানা বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলেন। এমনি করিয়া শ্যামাপ্রসাদবাবু আপনার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে অস্বীকার করিয়া জনসেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করিয়া কলিকাতা আসিবার কয়েক দিন পরেই তিনি কাঁচড়াপাড়ায় উদ্বাস্তু কলোনীতে গমন করিয়াছিলেন। অনেকের সহিত আমিও গিয়াছিলাম। সেখানে তাঁহার সাদর অভ্যর্থনা দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। অভ্যর্থনার কথা যাউক, তিনি দুই-তিন ঘণ্টা ধরিয়া প্রত্যেক উদ্বাস্তু পরিবারের তাঁবুতে গমন করিলেন, তাহাদের সান্ত্বনা দিলেন; কিন্তু সদাহাস্যময় মুখ হইতে হাসি কোথায় চলিয়া গেল; মুখ দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা গেল তাঁহার হৃদয় বেদনায় ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। আচ্ছাদনবিহীন স্থানে গাছের তলায় সদ্য-প্রসূতা মা ও শিশুকে দেখিয়া তিনি অতিশয় চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিলেন, আমি দূরে ছিলাম, আমার ডাক পড়িল—আমি আসিতেই বলিলেন, "humanity uprooted"। সেই দিনই বুঝিয়াছিলাম—উদ্বাস্তুদের জন্য তাঁহার প্রাণের ব্যথা কত গভীর, কত তীব্র।

তিনি যখন অবিভক্ত বাংলার অর্থসচিব ছিলেন তখন আপিস হইতে ফিরিবার সময় প্রায়ই তাঁহার বাড়ীতে যাইতাম। তাঁহার কথাবার্তায় প্রকাশ পাইত—তিনি সচিবের আসনে বসিয়াও এক দিনের জন্য সুখী হন নাই; মেদিনীপুরের পর্যুদস্ত অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়া তিনি দু'একটি জঘন্য লাঞ্ছনার কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ক'বছর চাকরী করছেন?" আমি বলিলাম, "আটাশ বছর।" তিনি উত্তর করিলেন, "কি করে আটাশ বছর ধরে কাজ করছেন? আপনার চাকরীর চেয়ে ত আমার চাকরী অনেক বড়, এই দশ-এগার মাসেই যে

আমি অস্থির হয়ে পড়েছি।" ইহার কিছুদিন পরেই তিনি তদানীন্তন বাংলা সরকারের কুখ্যাত মেদিনীপুর নীতির প্রতিবাদে মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন। সম্মান এবং অর্থের লালসা অপেক্ষা জনসেবাই ছিল তাঁহার আদর্শ। তারই ফলে মন্ত্রিত্বের সুখাসন পরিত্যাগ করিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই।

ব্যক্তিগত ভাবে আমি তাঁহার নিকটে বহু বিষয়ে ঋণী। কিন্তু তিনি আমার প্রতি এবং আমার সন্তানদের প্রতি যে স্নেহ ও সহানুভূতি দেখাইয়াছেন তাহা জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিব। আমার তৃতীয়া কন্যা মল্লিকাকে তিনি নিজের কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন। কেবলমাত্র একদিনের ঘটনা বলিতেছি, তখন তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সদস্য ; দিল্লী হইতে কলিকাতায় আসিতেছেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য হাওড়া ষ্টেশন লোকে লোকারণ্য, আমিও জনতার মধ্যে একজন ছিলাম। তিনি গাড়ী হইতে নামিয়া আমাকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দেবেনবাবু, মলি কেমন আছে ?" মল্লিকার ডাক-নাম মলি। আর এক দিনের ঘটনা বলিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করিব। তিনি তখন অবিভক্ত বাংলার মন্ত্রী। তাঁহার কন্যার বিবাহের দিন আপিস হইতে ফিরিবার পথে বিবাহ বাসরে উপস্থিত হইতেই তিনি বলিলেন, "এই পোষাকে কেন ? বাড়ী যান, ধুতি পরে আসুন, আসবার সময় মলিকে নিয়ে আসবেন—সে সমস্ত রাত্তির বাসর-ঘরে থাকবে।" এই বলিয়া আমার জন্য মোটরের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আমার স্ত্রী তখন অসুস্থ ছিলেন ; শ্যামাপ্রসাদবাবু জানিতেন, তিনি আসিতে পারিবেন না। এইরূপ স্নেহ সচরাচর দেখা যায় না।

আমার স্ত্রীর প্রতিও তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তিনি যখন অবিভক্ত বাংলার অর্থসচিব ছিলেন আমার সরকারী কাজ সংক্রান্ত কোনও এক বিষয় তাঁহার অনুমোদনের জন্য তাঁহার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আপিস হইতে ফিরিবার পথে সন্ধ্যার সময় তাঁর বাড়ীতে প্রায়ই যাইতাম। একদিন তিনি বলিলেন, আমার কাজ সংক্রান্ত বিষয়টির বিরুদ্ধে বিভাগীয় সেক্রেটারী বিরুদ্ধ মত দেওয়ার জন্য তিনি উহা অনুমোদন করিতে পারেন নাই। এই কথা শুনিয়া আমি দুঃখিত হইয়া এবং তাঁহার উপর অভিমানবশতঃ তৎক্ষণাৎ বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। বাড়ীতে ফিরিয়া আমার স্ত্রীকে সব কথা বলিলাম, আমার স্ত্রী আমাকে বলিলেন, "অত উত্তেজিত হচ্ছ কেন ? দেখই না তিনি কি করেন।" ইহার পর অভিমান করিয়া তাঁহার গৃহে সাত-আট দিন আমি যাই নাই। কিন্তু পরে জানিতে পারিয়াছিলাম যেদিন সন্ধ্যার সময় তিনি আমায় বলিয়াছিলেন যে, তিনি বিষয়টি অনুমোদন করেন নাই, সেই দিনই আপিসে ছিলাম তিনি আমার সহিত কৌতুক করিয়াই বলিয়াছিলেন যে, তিনি বিষয়টি অনুমোদন করেন নাই। সাত-আট দিন পর যখন তাঁহার কাছে যাইলাম তখন তিনি বলিলেন, "এতদিন রাগ করিয়া আসেন নাই বুঝি ?" আমি উত্তরে বলিলাম, ঠিকই বলিয়াছেন এবং আমার স্ত্রীর মন্তব্যের কথা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলাম। তিনি শুনিয়া বলিলেন, "তিনি বুদ্ধিমতী—তিনিই ত আপনাকে চালান।"

দেশের কৃষির উন্নতির প্রতি এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকগণকে কৃষিকার্য্যে উৎসাহিত করিবার দিকে তাঁহার প্রবল আগ্রহ ও চেষ্টা ছিল। তাঁহারই উদ্যোগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ব্যারাকপুরে প্রথম কৃষি-কলেজ স্থাপিত হয়। কৃষিকার্য্য সম্পর্কে উপদেশের জন্য বহু যুবককে তিনি আমার নিকট প্রায়ই প্রেরণ করিতেন।

শেষবার দিল্লী যাইবার পূর্ব্বে তিনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, দিল্লী হইতে ফিরিয়া আমার গ্রামে (আঁটপুর) গমন করিবেন ও আঁটপুরে স্বামী বিবেকানন্দ এবং প্রেমানন্দের স্মৃতি-মন্দির স্থাপনের জন্য যে কমিটি গঠিত হইবে তিনি তাঁহার সভাপতির পদ গ্রহণ করিবেন। বিধাতার বিধানে তিনি সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারিলেন না। আঁটপুর গ্রাম তাঁহার শুভাগমনে বঞ্চিত হইল, তাহা আমার নিকট বিশেষ আক্ষেপস্বরূপ এবং ইহা আঁটপুরবাসিগণের নিকট চিরকাল পরিতাপের বিষয় হইয়া থাকিবে।

আজ তাঁহার সম্পর্কে কত কথাই না মনে আসিতেছে। যে ঘটনাগুলির উল্লেখ করিলাম তাহা নগণ্য, কিন্তু আজ স্মৃতির আলোকে ক্ষুদ্র ঘটনাবলী ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে শ্যামাপ্রসাদবাবুর অকালপ্রয়াণ যে সমগ্র ভারতের পক্ষে নিদারুণ ক্ষতি সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিশেষ করিয়া বাংলার এই জাতীয় দুর্দ্দিনে বাংলার রাজনৈতিক এবং সমাজ নৈতিক জীবনে তাঁহার শূন্যস্থান বিশেষভাবে অনুভূত হইবে কিন্তু তাঁহার মহাপ্রয়াণ সমগ্র ভারতবাসীকে যেরূপ আন্দোলিত করিয়াছে তাহার মাধ্যমেই প্রকাশ পাইয়া ভারতীয় জনমানসে তাঁহার স্থান। মহাকাল তাঁহা আমাদের মধ্য হইতে ছিনাইয়া লইয়াছে সত্য। কিন্তু তাঁহ চরিত্রের বিদ্যুতালোক অন্ধকারের মধ্য দিয়া আমাদের চলিতে সহায়তা করিবে। নরদেহে তিনি থাকিবেন সত্য, কিন্তু তাঁহার স্মৃতি আমাদের মনে চির জাগ থাকিবে। পরিশেষে কবির কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ কি

"যাঁহার অমর স্থান
প্রেমের আসনে
ক্ষতি তার ক্ষতি নয়
মৃত্যুর শাসনে।"

গান

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল

ভৈরবী—একতাল

গগনে পবনে ধ্বনিছে সুর ওম্—ওম্—ওম্
ভূলোক দ্যুলোক পুলকে পূরিয়া ওম্—ওম্—ওম্!
ভয় নাই তোর ভয় নাই ওরে,
শিবসুন্দর ত্রিভুবন জুড়ে;
বাণী তাঁর উঠে হৃদয়-গভীরে ওম্—ওম্—ওম্!
যেথা যাই আমি আছে তাঁর কোল
জন্ম-মরণ তাঁরি স্নেহ-দোল
ওরে মূঢ় মন গাও অনুখন ওম্—ওম্—ওম্!
মুখে লয়ে এই অভয়-মন্ত্র
ঝঙ্কৃত রাখ এ-বীণাযন্ত্র
এ-লোকে ও-লোকে যে লোকেই থাক
আনন্দে বল ওম্॥

	২´				৩				0				১			
II	সা	মা	মা	|	মা	মা	মা	|	জ্ঞা	জ্ঞা	ঋা	|	সা	-া	-া	I
	গ	গ	নে		প	ব	নে		ধ্ব	নি	ছে		সু	০	র্	

২´				৩				0				১			
দা	-া	-জ্ঞা	|	ঋা	-া	-া	|	সা	-া	-া	|	-া	-া	-া	I
ও	০	ম্		ও	০	ম্		ও	০	০		০	ম্	০	

২´				৩				0				১			
সা	পা	পা	|	পা	পা	দা	|	পণা	দণা	দা	|	পা	পা	পা	I
ভূ	লো	ক		দ্যু	লো	ক		পু	ল	কে		পূ	রি	য়া	

২´				৩				0				১			
পা	-মপা	-দা	|	দদা	-া	পা	|	মা	-া	-া	|	-া	-া	-া	II
ও	০০	ম্		ও০	০	ম্		ও	০	০		০	ম্	০	

২´ ৩ ০ ১
[ণা]
II { মা -দা দা | -া দা -ণা | ণা -র্সা র্সা | -া র্সা র্সণা
{ ভ য় না ই তো র্ ভ য়্ না ই ও রে০

২´ ৩ ০ ১
র্সা র্ঋা র্ঋা | -া র্ঋা -র্জ্ঞা | র্সা র্জ্ঞা র্ঋা | -া র্সা র্সা }
শি ব সু ন্ দ র্ ত্রি ভু ব ন্ জু ড়ে }

২´ ৩ ০ ১
দা র্সা র্সা | -া র্ঋা র্সা | ণা র্সা ণা | দা পা পা
বা ণী তাঁ র্ উ ঠে হৃ দ য় গ ভী রে

২´ ৩ ০ ১
পা -মপা -দা | দদা -া পা | মা -া -া | -া -া -া
ও ০০ ম্ ও ০ ম্ ও ০ ০ ০ ম্ ০

২´ ৩ ০ ১
[ণা]
II { সা সা সা | -া সা ঋা | জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | -মা মা -া
{ যে পা যা ই আ মি আ ছে তাঁ র্ কো ল্

২´ ৩ ০ ১
জ্ঞা -া জ্ঞা | রা জ্ঞা -া | জ্ঞা মা জ্ঞা | ঋা সা -া }
জ ন্ ম ম র ণ্ তাঁ রি স্নে হ দো ল্ }

২´ ৩ ০ ১
সা পা পা | পা পা ণা | ণদা -া দা | দা পা -া
ও রে মু ঢ় ম ন্ গা ও অ সু খ ন্

২´ ৩ ০ ১
দা -া -মা | দা -া -া | পর্সা -া -া | -া -া -া
ও ০ ম্ ও ০ ম্ ও ০ ০ ০ ম্ ০

২´ ৩ ০ ১
[ণা]
{ মা দা দা | দা দা -ণা | ণা র্সা র্সা | র্সা -া র্গা
{ মু খে দ য়ে এ ই অ ভ য় ম ন্ ত্

২´ ৩ ০ ১
র্ঋা -া র্ঋা | র্ঋা র্ঋা র্জ্ঞা | র্সা র্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্জ্ঞর্ঋা র্সা } I
ঝ ঙ্ কৃ ত রা থ এ বী ণা য ন্ত্র

২´ ৩ ০ ১
দা র্সা র্সা | র্সা র্ঋা র্সা | ণা র্সা ণা | -দা পা পা I
এ লো কে ও লো কে যে লো কে ই থা ক

২´ ৩ ০
পা পা -দা | দা পা পা | মা -া -া | -া -া -া I
আ ন ন্ দে ব ল ও ০ ০ ০ ম্

২´ ৩ ০ ১
দা -া -জ্ঞা | ঋা -া -া | সা -া -া | -া -া -া II
ও ০ ম ও ০ ন্ ও ০ ০ ০ ম্ ০

শ্যামাপ্রসাদ

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

১

নির্ম্মল দিগন্ত আর নির্ম্মেঘ গগন—হ'ল বজ্রাঘাত,
নিদারুণ দুর্ভাগ্যের সীমা নাই, অন্ত নাই বুঝি,
নিয়তির এ নিষ্ঠুর পরিহাস কেন, কেন—পুছি,
যার পরে যত আশা চ'লে যায় সে-ই অকস্মাৎ।
ভাগ্যহীনা বঙ্গভূমি, এত আশা—এল না প্রভাত,
অন্তর-আকাশ হ'তে সমুজ্জ্বল আলো গেল মুছি,
তোমার সে প্রিয় পুত্র কোথা মাগো, কোথায় সে—খুঁজি,
অপূর্ব্ব মহিমা এক অস্তাচলে গেল তারি সাথ।

মুক্তি কি পেয়েছে শ্যামা? কি আগ্রহে শুধায় জননী।
বন্দী কে করিবে তারে, সে সাহসী, সে নির্ভীক বীর,
লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে আজ শোন শোন তার জয়ধ্বনি,
সে বিজয়ী, কারো কাছে নত কভু হয়নিকো শির।
প্রাণে প্রাণে স্থান যার সে মহান্, নেতা তারে গণি,
অমর সন্তান সে যে জ্যোতির্ম্ময় এ জন্মভূমির।

২

বাংলার নহ শুধু, প্রিয় পুত্র তুমি ভারতের,
যে ভারত ধর্ম্মক্ষেত্র, যে ভারত অখণ্ড অক্ষয়,
বৈচিত্র্যের মাঝে যার বিরাজে অপূর্ব্ব সমন্বয়,
সে এক দেখেছ তুমি, হে পথিক অভ্রান্ত পথের।
করিলে জীবন দিয়া উদ্‌যাপন জীবন-ব্রতের,
পারেনিকো বাধা দিতে উদ্ধতের ধৃষ্ট অবিনয়,
তোমার মাভৈঃ মন্ত্রে মেঘমন্দ্রে বাজিল অভয়,
অচ্ছেদ্য বন্ধনে তুমি বিচ্ছিন্নেরে বেঁধে দিলে ফের।

সহস্রের হৃদয়েতে শ্রদ্ধার যে সিংহাসন পাতা,
তোমার স্বদেশ-প্রেমে এতটুকু ছিল নাকো খাদ।
মহা-মিলনের বাণী—সে বাণীর তুমিই উদ্গাতা,
হে মুক্ত, তোমার গতি হ'ল আজ সর্ব্বত্র অবাধ।
ললাটে বিজয়-টীকা এঁকে দিল স্বয়ং বিধাতা,
তোমার বন্দনা গাহি হে বরেণ্য, হে শ্যামাপ্রসাদ।

ইতিহাসের উপেক্ষিত

অধ্যাপক শ্রীসুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলার মসনদকে কেন্দ্র করে গৌড়-রাজমহল-মুর্শিদাবাদ এবং পলাশীতে শতাব্দীর পর শতাব্দী যে খেলা চলেছিল, তার আখ্যানের নামই সে যুগের বাংলার ইতিহাস। আসলে কিন্তু এ এক বিশেষ ধরণের যান্ত্রিক পণ্য, কঙ্কালসার ঘটনাপঞ্জী; শুকনো, কঠিনরূপে সীমায়িত শাসনতান্ত্রিক ইতিবৃত্ত। অর্থাৎ —রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন, রাজবংশমালা ও জয়পরাজয়ের কাগজপত্র, ধারাবিবরণী। এর মধ্যে স্থান পেয়েছেন শুধু তাঁরাই যাঁরা সৌভাগ্যের তিলক পরে পর্য্যায়ক্রমে অধীশ্বর হয়ে উঠেছেন।

কিন্তু এই বিশেষ একটি মসনদ হতে দূরে, দেশের মাটি-জলের সঙ্গে মিশে যে অগণিত ছোট ছোট স্বাধীন রাজা ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যেও দেশের সম্পদ ও সভ্যতা যুগের পর যুগ রক্ষা করে গেছেন, তাদের স্মৃতি সেই ট্রেড-মার্ক-চিহ্নিত ইতিহাসের ফলকে বড় একটা রেখাপাত করে নি। বোধ হয় টুকরো গোছের রাজত্বের মধ্যে কোন বড় রকমের 'পলিটিক্‌স্' (রাষ্ট্রনীতি) ছিল না বলে। সত্যিই তো, যেখানে পলিটিক্‌স্ নেই, সেখানে আবার 'হিষ্ট্রি' (ইতিহাস) কিসের।

তবু একথা স্বীকার করতেই হবে, খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত সংস্কৃতির সংহত রূপই হচ্ছে প্রকৃত ইতিহাস। দৃষ্টিভঙ্গী একটু উদার করলেই দেখা যাবে যে, জটিল পলিটিক্‌সহীন অনেক ছোট রাজ্যের অবদানও এদিকে কম নয়।

বাংলার পশ্চিম সীমান্তের প্রাচীন মল্লভূম একথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। বর্তমান বাঁকুড়া জেলা এবং মেদিনীপুর, হুগলী, বর্ধমান, মানভূম ও সাঁওতাল পরগণার কতক অংশ জুড়ে এই রাজত্ব বিস্তৃত ছিল।(১) খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতক থেকে দীর্ঘ এগার শ' বৎসর এখানকার রাজারা সগৌরবে রাজত্ব করে গেছেন। খরস্রোতা নদীর ধারে, ঘনজঙ্গলে ঘেরা বিষ্ণুপুর ছিল এঁদের রাজধানী। দেশ রক্ষা করত অষ্ট্রিক-গোষ্ঠীর অনুন্নত কিন্তু দুর্ধর্ষ বাগ্‌দী, সাঁওতাল জাতীয় সৈনিকেরা। এই পরিবেশের মধ্যেও এখানে যে উন্নত শ্রেণীর কলা ও শিল্পের বিকাশলাভ হয়েছিল, তা ইতিহাসের গৌরবের বস্তু।

এই দিক্‌কার বিভিন্ন বিষয় স্বতন্ত্র প্রবন্ধে অ ইতিহাসের দরবারে একটি ঐতিহ্যপূর্ণ দেশ কতখানি অবজ্ঞাত হয়ে এসেছে, তার কথা সংক্ষেপে বক প্রয়োজন। মল্লভূমের যথাযথ মূল্য নির্ধারণ করা স্ কথা অবশ্য নয়, বিবিধ তথ্য, দলিল-দস্তাবেজ ইতস্ত আছে। তবু দু'একটি প্রাচীন গ্রন্থে এই লুপ্ত দেশটির যা ধরা পড়ে, বাংলার ইতিহাসের কয়েকটি পৃষ্ঠা করবার পক্ষে তাই বোধ হয় যথেষ্ট।

সমগ্র বাংলা এবং ভারতসাম্রাজ্য সম্বন্ধে হল্‌ওয়েল কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনা লিপিবদ্ধ করে গেছেন বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৭৬৬ পলাশীর যুদ্ধের নয় বৎসর, এবং দেওয়ানী লাভের এ পরে। প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল জানা যায় না, দুষ্প্রাপ্য। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মল্লভূমের শাসন করেন ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ দেওয়ানী পাওয়ার বৎসর পরে। পলাশীর আম্রকাননে রাজনৈতিক অবসান তখন হয়ে গেছে, বাংলার মসনদ পরহস্তগ স্বাধীনতার একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্র তখনও বাংলার আকাশে মিটি মিটি জ্বলছিল।

হলওয়েলের বর্ণনায় দেখতে পাই, রাজা গোপা বিষ্ণুপুর রাজ্য বহুদূরবিস্তৃত, রাজ্যের আয় বা থেকে চল্লিশ লক্ষ টাকা। বহিঃশত্রু কতবার চেষ্টা এখানকার স্বাধীনতার পতাকা পদদলিত করতে, অনুভব করেছে মল্লভূমের কতখানি শক্তি এর পেছনে সুজা খাঁর রাজত্বকালের প্রারম্ভে এক প্রবল অ বাহিনীকে মল্লভূম দখলে আনবার জন্যে পাঠানো হ মল্লভূমরাজ নবাবসৈন্যের গতিপথে কোন বাধা দি কিন্তু যখন একটি বিশেষ স্থানে শত্রুবাহিনী এসে তখন নিঃশব্দে তিনি নদীর বাঁধ কেটে দিলেন। স্রোতের ধারা প্রত্যেকটি সৈনিককে চক্ষের পলকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।২

---

(1) "To the north it is believed to have stretched as far as the modern Damin-i-koh in the Santal Parganas, to the south it comprised part of Midnapore, and to the east part of Burdwan; and inscriptions found at Panchet in the Manbhum district show that on the west it included part of Chota Nagpur." —(*Bengal District Gazetteers*: *Bankura*, p. 21).

(2) "This district produces an annual re between thirty to forty lac; but from the of their situation, he (Gopal Singh) is perf most independent Rajah of *Indostan*; h always in his power to overflow his count drown an enemy that comes against him: as at the beginning of Soujah Khan's governme sent a strong body of horse to reduce him:

হলওয়েল মন্তব্য করেছেন যে, মল্লরাজ দিল্লী বা বাংলার নবাবের পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন, বলা যায় না। সেলামী বা উপহার হিসাবে তিনি দরবারে কখনও পনর হাজার, কখনও কুড়ি হাজার টাকা পাঠিয়ে দিতেন, এই মাত্র। আবার ইচ্ছা না হলে কয়েক বছর কিছুই পাঠাতেন না।৩ এমনধারা বেপরোয়া এক ক্ষুদে রাজাকে ধরা সম্ভব হলে অবশ্য সুবা-বাংলার কারাগারে তাঁকে পচে মরতে হ'ত। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্গ, মানুষের গড়া প্রাকার, পরিখা ইত্যাদি অতিক্রম করে মল্লরাজকে বন্দী করা সহজসাধ্য ছিল না। তাই হলওয়েল একে হিন্দুস্থানের সর্বাপেক্ষা স্বাধীনচেতা রাজা বলে মনে করেছেন; মন্তব্য করেছেন, এমন একটি সুখী রাজ্য-খণ্ডকে বিপর্যস্ত করা নিছক নিষ্ঠুরতা।

এই গ্রন্থে মল্লভূমের সুখশান্তিপূর্ণ রাজত্বের যে চিত্র পাই, তা পূর্ণাঙ্গ এবং রূপকথার মতই অপূর্ব। প্রাচীন ভারতের নিষ্ঠা এবং সততা, সৌন্দর্য্য এবং পবিত্রতা এই মল্লভূমেই তখনও দেখা যেত। চুরি-ডাকাতির কথা অবিশ্বাস্য ছিল, স্বাধীন মানুষ নিজের সম্পত্তি নিরুপদ্রবে ভোগ করত। পথিক, বণিক, বিদেশী পর্যটক নিঃশঙ্ক চিত্তে চলাফেরা করত, বসবাস করত দেশের মধ্যে। সামান্য একটা হারানো জিনিষও নষ্ট হ'ত না, নিকটের কোন একটা গাছের দিকে তাকালেই টাঙানো আছে দেখা যেত। ঘণ্টা বাজিয়ে ঘুরে বেড়াত রাজকর্মচারীরা এই সব কথা ঘোষণা করে। এই ছিল দেশের নিয়ম। শস্যে, শিল্পে, সম্পদে রাজধানী বিষ্ণুপুর ছিল অলকাপুরীর মত নয়নাভিরাম।৪

এ বর্ণনা পড়লে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে বণিক, শাসক, ও পর্যটক ঐতিহাসিক হলওয়েলের কল্পনার রঙে অনুরঞ্জিত। কিন্তু তিনি যেখানে কল্পনারঞ্জিত ইতিহাসের গণ্ডীতে এসে গেছেন, সেখানে তাঁর ভাষণেরও ভিত্তি সত্যবস্তু, এটা নিঃসন্দেহ।

তবু ইতিহাসের মনুসংহিতায় মল্লভূম হরিজন!

বীরভূম এবং মল্লভূমের শাসনভার ইংরেজ বণিক হাতে নেয় ১৭৮৭ সালে; চার্লস্ ষ্টুয়ার্ট তাঁর প্রামাণিক "বাংলার ইতিহাস" গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন ১৮০৩ সালে। আমলা-তান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর উর্ধ্বে উঠলেই তিনি তখনও মল্লভূমের আকাশে গোধূলির গরিমাময় আলো একটু দেখতে পেতেন। কিন্তু তিনি "বিষ্ণুপুরের জমিদারে"র উল্লেখ করেছেন মাত্র একবার এবং তাও প্রসঙ্গক্রমে। সপ্তদশ শতকের শেষ-পাদে বাংলার ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে এই প্রসঙ্গ এসে পড়েছে। দিল্লী থেকে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত তখন আওরঙ্গজেব ও মুর্শিদ কুলিখাঁর শাসন চলছে, হিন্দুরা এ দু'জনের ভয়ে সন্ত্রস্ত। কিন্তু বাংলার নবাব মল্লরাজকে জমিজমা-সংক্রান্ত কড়া আইন থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন, যেহেতু তাঁকে শায়েস্তা করা দুঃসাধ্য ব্যাপার, আক্রমণকারীই তাঁর হাতে নাস্তানাবুদ হয়ে যেত।৫

ষ্টুয়ার্টের অনেক পরে ইতিহাস রচনায় হাত দিলেন স্যার উইলিয়ম্ হাণ্টার। "*Annals of Rural Bengal*"-এর ভূমিকায় ঘোষণা করলেন (১৮৬৮), তিনি লিখবেন শুধু জনগণের বিবরণ, শাসক-গোষ্ঠীর আখ্যান নয়। কিন্তু মল্ল-ভূম ও বীরভূমের জনগণের ইতিবৃত্ত রচনা করতে গিয়ে তিনি লিখে বসলেন, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় কর্তৃত্ব কেমন করে ধীরে ধীরে কোম্পানীর হাতে এসে পড়ল সে কাহিনী। শেষের দিকে খোলাখুলি ভাবে তিনি কিছু বাণীও দিয়ে ফেলেছেন; সংক্ষেপে এই কথা বলেছেন যে, তাঁরা (ইংরেজেরা) খ্রীষ্টীয় মানবপ্রেমের আদর্শে প্রজাপালনে ব্যাপৃত হয়েছেন।৬ আর এই খ্রীষ্টীয় মানবিকতার প্রভাবে রাজদণ্ড হাতে আসতেই তাঁর "জনগণে"র বিবরণীর উপরও যবনিকা পড়ে গেল। আসলে তাঁর গ্রন্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে ইংরেজের ভারত-জয়ের প্রথম পর্বের ইতিকথা।

কিন্তু তাঁর পাকাপোক্ত আমলাতান্ত্রিক নিরপেক্ষ তথ্য-

---

suffered to advance far into his country; then opening the dams of the river he destroyed them to a man. This action discouraged any subsequent attempts to reduce him . . ." (*Interesting Historical Events Relative to the Provinces of Bengal and the Empire of Indostan,* by J. Z. Holwell, 2nd Ed., p. 197).

(3) "As it is; he can hardly be said to acknowledge any allegiance to the Mogul or Subah; some years deigning to send to him an acknowledgement, by way of *salamy* (or present) of 15,000 rupees; sometimes 20,000; and some years not anything at all; as he happens to be disposed."—(*Ibid.*, p. 198.)

(4) "But, in truth, it would be almost cruelty to molest these happy people; for in this district, are the only vestiges of the beauty, purity, piety, regularity, equity and strictness of ancient Indostan government. Here the property, as well as the liberty of the people, are inviolate. Here, no robberies are heard of, either private or public: the traveller on his entering this district becomes the immediate care of the government; . . . If anything is lost, the person who finds it, hangs it upon the next tree . . . the officer . . . orders immediate publication of the same by beat of tomtom or drum."—(*Ibid,* p. 199).

(5) ". . . upon any invasion of the district, he (the zemindar of Mallabhum) retired to places inaccessible to his pursuers, and annoyed them severely in their retreat."—(Charles Stewart. *History of Bengal,* p. 320).

(6) "In short, we are attempting to govern according to the principles of Christian humanity." —*Annals of Rural Bengal,* p. 260).

বিশ্বাস তারিফ করবার মত। এখানে আমরা পাই—মল্লরাজ নীচু গোত্রের হলেও ক্ষাত্রধর্মী; তিনি কখনও কর দিয়ে বাংলার নবাবের বন্ধুত্ব অর্জন করেছেন, কখনও কিছুই না দিয়ে শত্রুতাসাধনও করেছেন, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বশ্যতাস্বীকার করেন নি কোন দিনই।৭ এই গ্রন্থেরই অন্যত্র বিষ্ণুপুর রাজবংশকে বাংলার শীর্ষস্থানীয় গোষ্ঠীর অন্যতম বলে মন্তব্য করা হয়েছে।৮

মল্লভূম সম্বন্ধে ধারাবাহিক আলোচনা আজ পর্য্যন্ত হয়নি, অনেক টুকরো তথ্য এদিক-ওদিক ছড়িয়ে আছে, এই মাত্র। কিন্তু ঐতিহাসিকের সন্ধানী দৃষ্টির সামনে ধরলে এই টুকরো কথা থেকেই একটি অখণ্ড আখ্যানের ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে।

এবার এদেশের ঐতিহাসিকদের রচনায় মল্লভূম কতটুকু স্থান পেয়েছে সে সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মুদ্রা, মূর্তি, দলিল-দস্তাবেজ থেকে কর্ণসুবর্ণের স্থানবিশেষের অনেক তথ্যমূলক ইতিবৃত্ত আমাদের শুনিয়েছেন। কিন্তু মল্লভূমের মত ঐতিহ্যপূর্ণ স্থান তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারল না।

বাংলার জনগণের ইতিহাস রচনায় দীনেশচন্দ্র সেনের দান স্মরণীয়। অবশ্য তাঁর অনেক উক্তি ভাবপ্রবণতার আবর্তে পড়ে ইতিহাসের মুক্ত সোজা পথে আসবার অবকাশ পায় নি। "ভক্তিরত্নাকরে"র মত চরিত্রপূজামূলক মধ্যযুগীয় ধর্মগ্রন্থকে ইতিহাসের ভিত্ত করেই তিনি মাঝে মাঝে বিভ্রান্ত হয়েছেন, তবু একথা মানতেই হবে যে, "বনবিষ্ণুপুরে"র আখ্যান রচনায় তিনি যে দরদী মনের পরিচয় দিয়েছেন, তার উৎস হচ্ছে বস্তু-নিষ্ঠা ও স্বদেশপ্রেম। রাজবংশের কুলজীর উল্লেখ করে তিনি বলেছেন,"এত দীর্ঘকালের এরূপ সন-তারিখ সংবলিত ইতিহাস বোধ হয় বাংলাদেশে ত্রিপুরা ছাড়া আর কোন রাজবংশের নাই।" ("বৃহৎ-বঙ্গ", দ্বিতীয় খণ্ড, ১১০৮ পৃঃ)। নিজের গবেষণার উপর ভিত্তি করে মল্লভূমের ইতিহাসকে তিনি যে ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, তা সজীব, বাংলার গণজীবনের সত্যকার চিত্র তাতে রূপায়িত হয়েছে। রাজধানী-ঘেঁষা ঘটনা-চক্রের শুষ্ক, গতানুগতিক "ক্রনিক্যাল" এ নয়। "বৃহৎ-বঙ্গের" যথার্থ মূল্য এইখানেই।

(7) "The Rajas of Bishnupur or Mallabhum were pseudo-Rajputs of aboriginal origin, who were sometimes the enemies, sometimes the allies, and sometimes the tributaries of the governors, but were never completely subjugated."—*Bengal*, Vol. VII, p. 215.

(8) ". . . at one time one of the most important dynasties in Bengal."—(*Ibid*, Vol. VIII, p. 248).

আচার্য্য যদুনাথ সরকার সম্পাদিত "বাংলার ইতি[illegible] অতুলনীয় গ্রন্থ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিভিন্ন অংশের লেখ[illegible] "হিষ্ট্রী" দেখেছেন সেখানেই বেশী যেখানে "পলিটিক্সে"র [illegible] গন্ধে বাতাস হয়েছে ভরপুর। রবীন্দ্রনাথ খেদ করে বলে[illegible] এসব ইতিহাস হচ্ছে "নিশীথ রাত্রের দুঃস্বপ্ন।" বারোভুঁই[illegible] হয়ত অনেকেই ভুঁইফোড় এবং দস্যুসর্দার, যেমন প্রথম [illegible] অনেকটা ছিলেন মরাঠা জাতির নূতন ইতিহাস-স্রষ্টা শিবা[illegible] তবু এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, এই শ্রে[illegible] সর্দাররাই বাংলার এক সঙ্কট সময়ে জনসংস্কৃতির ধারক ও ব[illegible] ছিলেন। কিন্তু ইতিহাসে বারোভুঁইয়ারা সেটুকু স্বীকৃতি[illegible] করতে পারেন নি। মল্লরাজ তো প্রায় বারোভুঁইয়াদের [illegible] পর্য্যায়ের, সুতরাং তিনিও যথোচিত সম্মানপ্রাপ্তি থেকে ব[illegible] হয়েছেন! পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে "জমিদার"রূপে কো[illegible] কোথাও পাদটীকায় তাঁর উল্লেখ আছে। কয়েক শত[illegible] ধরে বাংলাদেশের এক বিস্তৃত ভূখণ্ডের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করে[illegible] তিনি "রাজা" হতে পারলেন না! বাংলার মসনদ দখল করলে অন্ততঃ ঘন ঘন রাজধানীর সংস্পর্শে না এলে, বোধ "রাজা" হওয়া যায় না। মল্লরাজের সে কৌলীন্য ছিল তাই ইতিহাসে তিনি অবজ্ঞাতই রয়ে গেলেন।

বাংলার রূপান্তর বর্ণনা করতে গিয়ে ডঃ শ্রীরাধাক[illegible] মুখোপাধ্যায় একটি সুন্দর উক্তি করেছেন। জরাসন্ধ, পৌ[illegible] বাসুদেব স্বাধীন বাংলার যে ঐতিহ্য প্রাচীন যুগে গ[illegible] তুলেছিলেন, মোগল ও পাঠান যুগে চাঁদরায়, প্রতাপাদি[illegible] সীতারামের মধ্যে তারই পরিণতিলাভ ঘটেছিল। [illegible] নাটকের শেষ অঙ্কে দেখতে পাই ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে বর্ধম[illegible] ও বিষ্ণুপুর-রাজের মিলিত অভিযান (Dr. Radhakam[illegible] Mookerjee; *The Changing Face of Bengal*, 34)। রাজনীতি, রণনীতির চেয়ে বড় নীতি সংস্কৃতি স্বাধীন[illegible] রক্ষার ঐকান্তিক প্রয়াস। এই নিরিখে বিচার করলে ইতি[illegible] হাসের উচ্চ মঞ্চে মল্লভূমকে একটুখানি স্থান ছেড়ে না দেও[illegible] বোধ হয় সমীচীন হবে না।

হাণ্টার সাহেব বলেছেন, ইংলণ্ডের প্রত্যেক জেলা, প্র[illegible] প্রত্যেক গ্রামের লিপিবদ্ধ ইতিহাস আছে; কি[illegible] ভারতের অনেক প্রদেশের আয়তন ইংলণ্ডের থেকে ব[illegible] হলেও তার কোন স্বতন্ত্র ইতিহাস নেই। ইংলণ্ডের ওয়েল[illegible] এর আয়তনের অনুরূপ ছিল এককালে মল্লভূমের সীমানা—ঐ ভূমি ছিল শিল্পে, সঙ্গীতে, সাহিত্যে পূর্ণ সভ্যতা প্রতীক। ঐতিহাসিক এর লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করে[illegible] জনসাধারণ অনেকখানি প্রেরণা লাভ করবে।

কর্ণেল টড্ অনেক পরিশ্রম, অনেক অনুসন্ধানের প[illegible] রাজস্থানের ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন। বাংলা[illegible]

জাতীয় ইতিহাস রচনার জন্ত আজ এইরূপ গবেষকের এবং আঞ্চলিক গবেষণাগারের প্রয়োজন অত্যধিক। রাশিয়ায় এইভাবে দেশকে কেমন করে উন্নত করে তোলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের আলোচনায় তা সুস্পষ্ট: "রাশিয়ার region study অর্থাৎ স্থানিক তথ্য সাধনের উদ্যোগ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। এই সব স্থানে তত্তৎ স্থানের অতীত ইতিহাস এবং অতীত ও বর্তমানের আর্থিক অবস্থার অনুসন্ধান হয়।"

আশা এবং আনন্দের কথা, পুরাতত্ত্ব উদ্ধারের জন্যে আমাদের দেশের সংশ্লিষ্ট বিভাগ সচেষ্ট হয়েছেন। ইতিমধ্যেই অনেক কর্মচারী দক্ষিণ-ভারতের হামপি, বিজয়নগর প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করেছেন। এই বিভাগে জনৈক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী জানাচ্ছেন,

"দেশের বিচ্ছিন্ন ঐতিহাসিক তথ্যের যেখানেই যেটুকু সন্ধান পাওয়া যাবে, পুরাতত্ত্ব বিভাগের কাজই হচ্ছে তাকে খুঁজে বের করে ইতিহাসের ছিন্ন সূত্রকে সংগ্রথিত করা।...গুণ্টুর জেলার অমরাবতী খনথশালা ও নাগার্জুন পাহাড় খনন করে বহু ঐতিহাসিক তথ্যপ্রাপ্তিতে ভারত-ইতিহাস সমৃদ্ধ হয়েছে।"

মল্লভূমের মত খণ্ডদেশগুলির পুরাতত্ত্বগুলির উদ্ধার হলে বাংলার ইতিহাসও সমৃদ্ধ হবে। বঙ্কিমচন্দ্রের আকাঙ্ক্ষা ছিল, "বাংলার একটি সম্পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস চাই।" সে ইতিহাস শুধু কেন্দ্রীয় রাজধানী এবং বড় বড় রাজা বাদশাহের ইতিহাস নয়, ভুঁইয়া, সামন্ত, স্বাধীনতাকামী জমিদারদেরও ইতিহাস। সে ইতিহাস যেদিন লেখা হবে, সেদিন বাংলার সত্যকার ইতিহাস জানা যাবে।

দুধের কথা

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়

বর্তমান ভারতে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় গো-মহিষাদি প্রাণীর সংখ্যা বাড়িয়াছে। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে মোট সংখ্যা ছিল প্রায় ২৮,২০,০০,০০০টি। ভারতের গো-মহিষাদি প্রাণীর পরিসংখ্যান যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য নহে। তাহা হইলেও একটা মোটামুটি ধারণা করিতে পারা যাইবে।

	মোট সংখ্যা
গরু, ষাঁড়, বলদ ইত্যাদি প্রায়	১৬,৬৭,৩৯,০০০
মহিষ	৪,০৭,৩২,০০০
ছাগল	৪,০৩,০২,০০০

বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষের সংখ্যা বর্তমান ভারতে প্রায় ৬,১০,০০,০০০; এবং দুগ্ধবতী ছাগীর সংখ্যা প্রায় ৮০,০০,০০০। ইহাদের মধ্যে শতকরা ছয়টির বেশী শহর অঞ্চলে বাস করে না। বাকি সবই থাকে পল্লীতে।

ভারতের সর্ব্বত্রই গরু, মহিষ এবং ছাগীর দুধ খাওয়ার রেওয়াজ আছে। পূর্ব্বাঞ্চলে গরুর দুধের প্রতি আসক্তি একটু বেশী, পশ্চিমে মহিষের দুধই জনপ্রিয়। ছাগদুগ্ধ সাধারণতঃ রুগ্ন ও অপুষ্ট নর-নারীর জন্তই ব্যবহৃত হয়। অবশ্য ইহার ব্যতিক্রম যে না আছে তেমন নহে। ছাগীর দুধ সাধারণতঃ লোকে বড় একটা পছন্দ করে না। গরু ও মহিষের দুধেরই চলন বেশী। গরুর দুধ প্রধানতঃ খাইবার জন্তই ব্যবহৃত হয়। দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি—ঘি, মাখন, সর, ছানা, খোয়াক্ষীর ইত্যাদির জন্ত মহিষের দুধের চাহিদা অত্যধিক।

বর্তমান ভারতে ঠিক কত টাকার দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি পাওয়া যায় তাহা জানিবার উপায় নাই। এই বিষয়ে সঠিক হিসাব সংগৃহীত হয় নাই। বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন যে, এখন ভারতে বৎসরে প্রায় ৫,৪২৭ লক্ষ মণ দুধের যোগান হয়। শ্রীযুক্ত জ্ঞানপ্রকাশ কাপুর ভারতে দুগ্ধ সরবরাহের যে একটি হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।* ইহা হইতে দেখা যায় যে, হাতে দোহা দুধের পরিমাণ বৎসরে প্রায় ৪,৮১৬ লক্ষ মণ।

দুগ্ধের যোগান
(লক্ষ মণ)

	গরুর দুধ	মহিষের দুধ	ছাগীর দুধ	মোট
মোট যোগান—	২,৭২১·৮	২,৯২১·৯	১৮৩·২	৫,৮২৬·৯
বাছুরে খায়—	৬৫৯·৪	৩০২·২	৪৯·৮	১,০১১·৪
হাতে দোহা দুধের মোট যোগান—	২,০৬২·৪	২,৬১৯·৭	১৩৩·৪	৪,৮১৫·৫
মালিকগণ নিজেরা রাখে—	৬১৪·০	২০৪·০	৬৭·০	৮৮৬·০
বিক্রয়ের জন্য বাজারে সরবরাহ হয়—	১,৪৪৮·৪	২৪১৪·৭	৬৬·৪	৩,৯২৯·৫

এই পরিমাণ দুধের কতটাই বা দুধ হিসাবে লোকে খায় এবং কি পরিমাণ দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি তৈরির জন্ত ব্যয় হয়?

* এগ্রিকালচারাল্ রিসোর্সেস্ অব্ দি ইণ্ডিয়ান্ ইউনিয়ন—কমার্স, জুলাই ১৯৫২।

দুধ হিসাবে ভারতের লোকে খায় প্রায় ১,৭৪·৯৬ লক্ষ মণ। আর,

		(লক্ষ মণ হিসাবে)
ঘিয়ের	জন্য ব্যয় হয়—	২,০৮৫·১৬
দধির	,, ,, ,,—	৪৩৮·৪৪
মাখনের	,, ,, ,,—	৩০১·৮৫
খোয়াক্ষীর	,, ,, ,,—	১৯৯·৫০
আইসক্রীমের	,, ,, ,,—	১৯·৯৬
সরের	,, ,, ,,—	২৯·৬৩

উৎপন্ন দুধের মোট পরিমাণের সহিত শতকরা হিসাব করিয়া দেখাইলে দেখা যাইবে যে, ভারতবাসী

দুধ	হিসাবে	খায়	—	৩৬·২
ঘি	,,	,,	—	৪৩·৩
দধি	,,	,,	—	৯·১
মাখন	,,	,,	—	৬·৩
খোয়াক্ষীর	,,	,,	—	৪·১
আইসক্রীম	,,	,,	—	০·৪
সর	,,	,,	—	০·৬

দুধের চাহিদা বেশী শহরাঞ্চলে। অথচ ভারতের গ্রামেই বাস করে বেশী লোক, শতকরা প্রায় ৮০ জন। দুগ্ধবতী গাভী, মহিষ ও ছাগীরও শতকরা প্রায় ৯৪টি থাকে পল্লী-অঞ্চলেই। তথাপি গ্রামে দুধের চাহিদা বেশী নাই। ইহার কারণ বোধ হয়, অধিকাংশ পল্লীবাসীর অর্থাভাব। সুবিধা থাকিলেই গ্রামের দুধ শহরে চালান হইয়া বেশী দামে বিক্রয় হয়।

একটি আশ্চর্য্য বিষয় লক্ষ্য করিবার মত যে সকল অঞ্চলে জনপ্রতি দুধের চাহিদা বেশী সেই সব স্থানেই প্রতি গবাদি পশুর হিসাবেও দুধের সরবরাহ অধিক।

বর্ত্তমান ভারতে দৈনিক মাথাপিছু দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের গড় কাটতি মাত্র ৫·৪৫ আউন্স। সুইডেন্, ডেন্মার্ক, ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশের তুলনায় ভারতবাসী দুধ ও দুধ থেকে তৈরি জিনিস অনেক কম খায়। ভারতে দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের মাথাপিছু কাটতি :

সৌরাষ্ট্রে ১৮·৭৮ আউন্স, পঞ্জাবে ১৬·৮৯ আউন্স, রাজস্থানে ১৫·৭২ আউন্স, উত্তর প্রদেশে ৭·১৬ আউন্স, মধ্য-প্রদেশে ২·০০ আউন্স, উড়িষ্যায় ২·৬৪ আউন্স, এবং আ[illegible] ১·২৩ আউন্স। আর বঙ্গদেশে ? হিসাব করিয়া দেখা[illegible] দুঃখ হয়। পশ্চিমবঙ্গের সর্ব্বত্র প্রত্যেক বাঙালী যাহ[illegible] আরও বেশী দুধ খাইতে পারে তজ্জন্য সচেষ্ট হওয়া রা[illegible] কর্ত্তব্য নহে কি ?

পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, এই কলিকাতা শহ[illegible] ব্যক্তিগত চেষ্টার ফলে খাঁটি গরুর দুধ (টোন্‌ড মিল্ক ব[illegible] টানা দুধ নহে) বর্ত্তমান বাজারদর অপেক্ষা অল্পমূল্যে পা[illegible] সম্ভবপর। রাষ্ট্রের সাহায্যলাভ করিলে কি গ্রামে, কি বা[illegible] অল্পমূল্যে খাঁটি দুধ সরবরাহ করা অসাধ্য নহে। অবশ্য সে[illegible] চাই সততা, দেশের কল্যাণকামনা এবং ইউরোপ আমেরি[illegible] অন্ধ অনুকরণে অনাবশ্যক ব্যয়বাহুল্যমূলক ব্যবস্থা হই[illegible] বিরত থাকা। ব্যয়বহুল ব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়াও গরু[illegible] সুস্থ, সবল ও রোগমুক্ত করা এবং দুগ্ধ বিশুদ্ধ রাখা সম্ভব[illegible] হইয়াছে। জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার প্রতি ল[illegible] রাখিয়া স্থানকালানুযায়ী ব্যবস্থা করাই সমীচীন।

সততা ও দেশের কল্যাণকামনা সম্বন্ধে বলিতে গিয়া এ[illegible] ঘটনা বিবৃত করিতেছি। জাপানে জনৈক দুগ্ধব্যবসা[illegible] বাড়ীতে থাকিয়া এক বাঙালী ছাত্র লেখাপড়া করিতে[illegible] ব্যবসা ভালই চলিতেছিল। হঠাৎ কি কারণে দুধের পরিম[illegible] কমিয়া গেল। ব্যবসায়ী চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। বাঙা[illegible] ছাত্র ব্যবসায়ীর কন্যাকে পরামর্শ দিলেন যে, এই সাম[illegible] ঘাটতি অল্প জল মিশাইলেই তো পূরণ হইতে পারে। ক[illegible] পিতাকে সেকথা জানাইল। দুগ্ধব্যবসায়ী ছাত্রটিকে ডাকি[illegible] বলিলেন, "মহাশয়, এত দিন আমি বুঝিতে পারি ন[illegible] যে ভারতবাসীর বিদ্যা, বুদ্ধি, শক্তি ও সাহস থাকিতেও অ[illegible] সংখ্যক ইংরেজ কি করিয়া ত্রিশ কোটি ভারতবাসী[illegible] পরাধীন রাখিতে পারে। কিন্তু দুধের ঘাটতি পূরণ করিব[illegible] জন্য আপনি আমার কন্যাকে যে পরামর্শ দিয়াছেন তা[illegible] হইতে আজ আমি পরিষ্কার বুঝিতে পারিতেছি—কে[illegible] দুর্ব্বলতার সুযোগে ইংরেজ আপনাদিগকে পদানত রাখিত[illegible] পারিয়াছে। জল-মেশানো দুধ যদি আমি যোগাই তা[illegible] হইলে তাহা খাইয়া আমার দেশবাসীরই স্বাস্থ্য নষ্ট হই[illegible] যাইবে। ইহাদ্বারা আমার দেশের অনিষ্টই করা হইবে দেশের ক্ষতি করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নহে।"
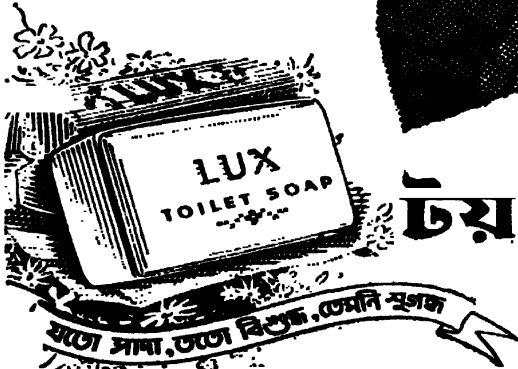
সাজা

শ্রীঅনিলবরণ ঘোষ

গোমরামুখে ছোট নাতনী দুটো মেঝের উপর রাজ্যের বিছানা করছে। কাজ ভাগ করা; কিছু বলার উপায় নেই। তা ছাড়া নিজেরাই ওরা বেছে নিয়েছে এ কাজ।

বসে থাকতে পারে না হৈমবতী। সত্তরের উপর তার বয়স। বিশ বছর আগে স্বামীর মৃত্যুর পর একমাত্র মেয়ের বাড়ী এসে উঠেছিল। সে অবধি এখানেই রয়ে গেছে।

কোমর বাঁকিয়ে এগিয়ে আসে বৃদ্ধা। জানে নাতনীরা তার সাহায্য নেবে না। তবু কি বসে থাকা যায় ঐ কচি কচি পরিশ্রান্ত অসন্তুষ্ট শুকনো মুখগুলি দেখে।

তোশকের একটা কোণ কুঁচকে ছিল। ঠিক করে দেবার জন্য হাত বাড়ায় সে।

তা দেখে ছোট নাতনীন আঁৎকে ওঠে।

এই···এই খবরদার! বিছানায় হাত দিও না! বা-রে। তা হলে আমরা বিছানা করব না কিন্তু বলে দিচ্ছি··-

আমি ধরলে কি তোদের বিছানা ক্ষয়ে যাবে?

হ্যাঃ হ্যাঃ—তুমি এখন সরে বস দিকি।—বড় বোনটি ফোড়ন দেয়।

হঠাৎ বুড়ি চটে যায়। বরফের মত ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষটি আজকাল এমনি কারণে অকারণে হঠাৎই চটে যায়।

বড্ড কাজের হয়েছিস রে মুখপুড়িরা। ছেঁড়া তোশক বিছিয়েই এত! আর আমরা—

নাতনীরা জানে এখন আরম্ভ হবে দিদিমার মুখে বহুবার শোনা সে সব গল্প। সেই সিংহথাবা পালঙ্ক, রেশমী চাদর আর আধ হাত পুরু তুলতুলে তোশকের কাহিনী।

থাক থাক আর গল্প ঝাড়তে হবে না। এখান থেকে যাবে কি না বল—

নইলে—নইলে কি করবি তোরা? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। উষা—ও উষা! দেখে যা তোর মেয়েরা কেমন আমাকে শাসাচ্ছে।

মায়ের পক্ষ নিয়ে মেয়েদের শাসন করতে উষা কিন্তু আসে না। পাশের ঘরের থেকে তার হাঁক শোনা যায়।

রুবি—ডলি! কি হচ্ছে সব? মা তুমি এ ঘরে চলে এস। ওদের মজা দেখাচ্ছি—

হাঁটুর উপর হাতের ভর দিয়ে বৃদ্ধা উঠে দাঁড়ায়। বিড় বিড় করে কি বলতে বলতে পাশের ঘরে এসে কন্যার পাশে বসে।

বুঝলি উষা: মেয়েদের একটু শাসন করিস। শেষে যে ··· করতে গিয়ে ···ক জ্বালাতন করে মারবে।

বিরাট পরিবারের রান্না শেষ করে উষা শুয়েছিল চুপ করে। মার প্যানপ্যানানির আমল দেবার মত অবস্থা তার নয়।

মেয়ের নীরবতাকেই সমর্থন মনে করে বুড়ি আরও একটু কাছে এগিয়ে বসে। একটু একটু করে বাড়তে থাকে তার ক্ষোভ।

বুঝলি: ঐ ডলিটারই বড্ড জিবে ঝাল। এখন থেকে শাসন না করলে পরে আর বাগ মানানো যাবে না। আমার মাসী-শাশুড়ীর এক মেয়ে ছিল ঠিক এমনি। যেন জিব দিয়ে লঙ্কা ঝরত। খুব ধুমধাম করে বিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সোয়ামীর ঘর করতে পারে নি মেয়েটা। বুঝলি উষি! আমার ভাবনা হচ্ছে ঐ ডলিটার না জানি কি হয়?

কানের পোকা খুলে ফেলবার ফিকির বাবা। ভাবলাম চুপ করে থাকলে থেমে যাবে। তা নয়—কেবল পেঁ-ভাজা! এই আগুনের তাত থেকে এলাম। আবার এই···

বুড়ি যেন ধাক্কা খেয়ে থেমে যায়। ভ্রূ কুঁচকে ঘোলাটে দৃষ্টিতে মেয়ের পাণ্ডুর মুখের দিকে তাকায়। ঢলঢলে মুখখানা ওর শুকিয়ে কেমন পাংশু হয়ে গিয়েছে।

হঠাৎ ক্রোধোদ্রেক। তার ইচ্ছা হয় চিৎকার করে গালাগাল দিতে নাতি-নাতীন ভরা প্রকাণ্ড গুষ্টিটাকে। এই বিরাট গুষ্টির পিণ্ডি চটকেই ত মেয়ের আজ এ হাল। ওদের কিছু বললে মেয়ের রাগ হয়। তাই বলে কি ভালমন্দ কিছু বলা যাবে না। মেয়েই যদি না রইল ত ওরা কে?

কিন্তু কান্না যে পায় বুড়ীর। আরও এগিয়ে এসে মেয়ের আড়ড় পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে, কাল থেকে আগুনের ধারে যাস নি উষি। তোর দিকে চাইলে যে বুকটা কেঁপে ওঠে। আগে আমাকে যেতে দে মা! তারপর তোর খুশীমত চলিস।

উষা চুপ করে শুয়ে থাকে! পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সেও এ স্নেহের পরশটুকু মনকে ছুঁয়ে যায়।

আর ওদের আক্কেলকেও বলিহারি দিই। মেয়ে ত আমারও তুই। কৈ এমন ত করিস নি। পায়ের উপর পা তুলে গল্প করছে। ইস্কুলে কলেজে যাবে। সারাদিন সেজে গুজে থাকবে! যেন ডানাকাটা পরী সব। আমার মেয়ে হলে নোড়া দিয়ে—

নিঃশব্দে উষা উঠে যায়।

মেয়েকে উঠতে দেখেই বুড়ীর আক্ষেপ থেমে যায়। মেয়ের শীর্ণ অপরিস্রয়মান দেহের দিকে চেয়ে মাথা নাড়ে। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে থেমে থেমে, পুরু পুরু ঠোঁট দুটি থরথর করে কাঁপে। আর একটু শুয়ে থাকলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত। ও মরবেই, নির্ঘাত মরবে। একেবারে বোকা।

ধপ্‌ধপে
ক'রে কাচা
ঝক্‌ঝকে
ক'রে কাচা
সানলাইট্‌
সাবানের দৌলতে
না আছড়ে কাচলেও
কাপড়চোপড় সাদা ও
ঝক্‌ঝকে ক'রে দ্যায়!
SUNLIGHT
SOAP
GUARANTEED
SUNLIGHT SOAP
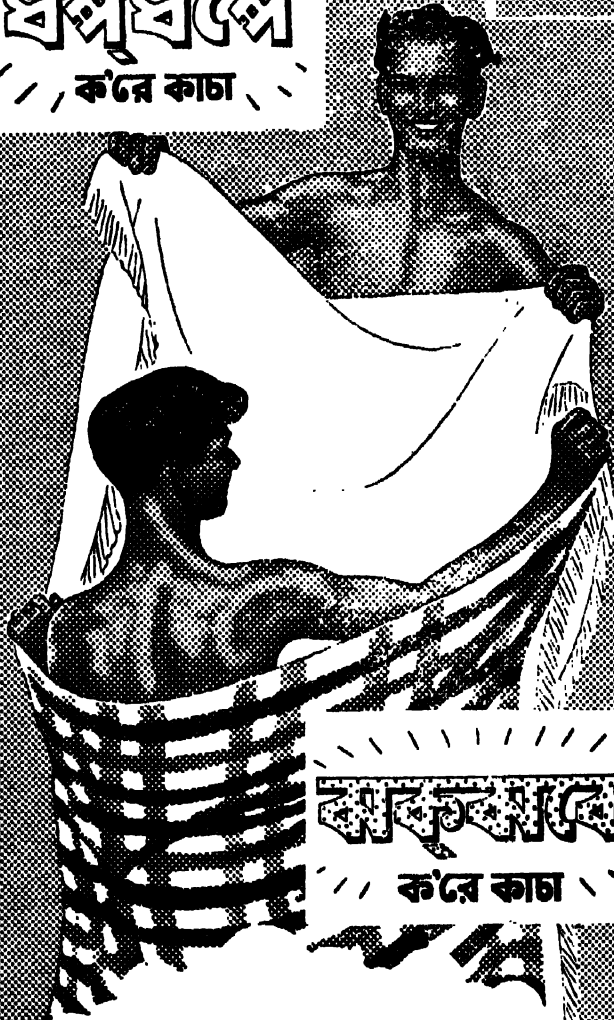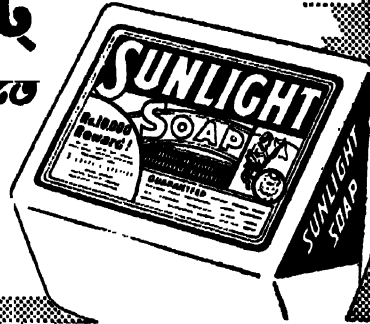
নিত্যকার মত সেদিন রাতে দুখানা হাতে তৈরি আটার রুটি ও আধপোটাক দুধ নিয়ে মার ঘরে ঢোকে উষা।

ঘরে আলো জ্বালে নি হৈমবতী। হাওয়ার ভয়ে দরজা-জানালা বন্ধ করে রেখেছে। ঘরের মধ্যে একটা ভ্যাপসা গন্ধ ও ঘুটঘুটে অন্ধকার। বাঁ হাত দিয়ে সুইচটা টিপে আলো জ্বালায় উষা।

তক্তপোশের উপর কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে বৃদ্ধা। মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে ছোট্ট মেয়ের মত পিট্ পিট্ করে তার দু' চোখ।

"উঠে খেয়ে নাও মা। দুধটা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।"

হৈমবতী উঠে বসে। চকিতে মেয়ের মুখের দিকে একটু চেয়ে নিয়ে বলে, একটা কথা বলব উষি! বলেই লজ্জায় বৃদ্ধার মুখ ফ্যাকাসে লাল হয়ে যায়।

"কি বলবে বলে ফেল" -সংক্ষেপে উত্তর দেয় উষা।

"না—থাক।—এই এমন কিছু কথা নয়। অনেক দিন ধরেই একটা জিনিষ খেতে ইচ্ছে করছে। একটা রসগোল্লা খাওয়াতে পারিস।"

আজকাল এমন ধারা আব্দার প্রায়ই ওঠে। অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে উষা। বলে, এই রাত দুপুরে তোমার জন্যে কে রসগোল্লা আনতে যাবে মা? কাল এনে দেবে। এখন এটুকু খেয়ে নাও।

বৃদ্ধা আর দ্বিরুক্তি করে না। রুটি দুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে দুধে ভিজিয়ে খেয়ে মুখ ধুয়ে বিছানায় উঠে যায়।

ভাদ্রের সূর্য্য হেলে পড়েছে পশ্চিমে। রান্না ঘরে বাড়ীর মেয়েরা খেতে বসেছে। হৈমবতী থপ থপ করে দরজার চৌকাঠের বাইরে এসে বসে। ওর সঙ্গে সঙ্গে সবাই খাচ্ছে, হাসি মস্করাও চলছে। একাগ্র দৃষ্টিতে বৃদ্ধা তাকিয়ে দেখছে ভাতগুলির ওঠানামা। মিন্‌মিনে গলায় হঠাৎ সে চেঁচিয়ে ওঠে, অমন সাদা সাদা ভাতগুলো কেন খাচ্ছিস উষি। একটু ঝোল মেখে নে—

কেউ কান দেয় না বৃদ্ধার কথায়।

খাওয়া হয়ে যায়। যার যার থালায় উচ্ছিষ্ট তুলে হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসে ওরা।

অন্যান্য দিন বৃদ্ধা এর আগেই সরে যায়। আজ সে বসেই আছে। ভাবছিল সে, এই ধবধবে বড় বড় চালা মাছ খেতে কত ভালবাসত উষার বাপ। যেদিন চাদা মাছ রান্না হ'ত সেদিন অন্য কিছু ছুঁয়েও দেখত না সে।

হঠাৎ স্বপ্ন তার ভেঙ্গে যায়। আইবুড়ী বড় নাতনীটা ছুঁয়ে দিয়েছে তাকে।

একেবারে ফেটে পড়ে হৈমবতী।

অত বড় মেয়ে এটুকু খেয়াল নেই। বিধবামানুষ বসে আছি, মাছহাতে ছুয়ে দিলে। এ অ-বেলায় এখন নাইতে হবে। বলি—চোখ দুটো কি ক্ষয়ে গেছে? এ বয়সে যে আমরা মেয়ের বিয়ে দিয়েছি।

কাঁটা ঘায়ে যেন নূনের ছিটা পড়ে, জ্বলে ওঠে অশ্রু। বিয়ে না হওয়ার জন্যে তো ও দায়ী নয়, কুরূপা সে নয়। মানে—টাকা পয়সার অভাবে ঠিক সময়ে বিয়ের চেষ্টাই হয় নি।

"বিয়ে নিয়ে রোজ খোঁটা দেওয়া—পেছনে লাগা কেন।"—কান্নায় ফেটে পড়ে অশ্রু।

"কি—কি বললি তুই? এ্যাঃ! ওরে উষা রে—তোর বাড়ীতে আছি বলে এত কথা শুনতে হচ্ছে আমাকে। কর্ত্তা! কোথায় তুমি? আমাকে নিয়ে যাও গো···

সুর করে চীৎকার করে ওঠে হৈমবতী।

উষা বেরিয়ে আসে। অশ্রুকে ঠেলে দেয় ঘরে। মাকে নিয়ে আসে কলের ধারে।

বেশ কিছুদিন জ্বরে ভুগে বড় নাতি ভাত পথ্য করেছে। বড্ড রোগা হয়ে গেছে। দাদু দিদিমার হাতেই মানুষ হয়েছে সে। বাড়ীর মধ্যে উষার পরই নীরুর উপর টান রয়েছে হৈমবতীর।

অশক্ত দেহেও নীরুর ঘর ছাড়ে নি বৃদ্ধা। তার এ অধিকারকে স্বীকার করে নিয়ে কেউ আর তাকে ঘাটায় নি।

ডাক্তার ফল খেতে বলে গেছে নীরুকে। নাত-বৌ পোয়াতি-মানুষ। পাশের ঘরে শুয়ে আছে সে। উষা রান্নাঘরে।

"কাউকে ডেকে দাও দিদিমা: একটা আপেল কেটে দিয়ে যাক্—"

চক্ চক্ করে ওঠে বৃদ্ধার দুই চোখ। নীরুর দেড় বছরের ছেলেটা কোলে নিয়ে উৎসাহে প্রায় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে সে। শুধু মাত্র বসে থাকা ছাড়া নীরুর এ ব্যারামে তাকে কিছু করতে দেওয়া হয় নি। এক দিন কেউ ছিল না ঘরে। সেদিন হাত-পাখাটা তুলে নীরুর মাথায় হাওয়া করতে গিয়ে দু'বার পাখাটা তার নাকে লাগিয়ে ফেলেছিল। নীরু ধমকে উঠতেই সে লজ্জিত হয়ে পাখা ফেলে চলে এসেছিল।

কিন্তু এখনও যে সে উষাকে আলু কেটে দেয়। তা হলে আপেল কাটতে পারবে না?

নীরু পাশ ফিরে শুয়ে আছে, সহজে আর এ পাশ হবে না।

ছোট বঁটি ও একটা আপেল নিয়ে হৈমবতী বসে। মাঝামাঝি করে কেটে ফেলে আপেল। নীরুর খোকন এগিয়ে আসে। বাঁ-হাত দিয়ে তাকে সরিয়ে দিয়ে বুড়ী আপেলের খণ্ড করে।

খোকন আবার হাত বাড়িয়েছে। আপেল কাটাও হয়ে গেছে। হৈমবতী বঁটি কাৎ করে।

একটা সুতীক্ষ্ণ চীৎকারে ছোট বাড়ীটা কেঁপে ওঠে। খোকনের ডান হাতের আঙুল কেটে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে।

বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে নীরু। পাশের ঘর থেকে ছুটে আসে বৌমা, রান্নাঘর থেকে উষা।

বুকের মাঝে খোকনকে চেপে ধরে থর থর করে কাঁপছে হৈমবতী।

মার কোল থেকে খোকনকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল ঊষা।

অন্ধকার ঘরে পড়ে থাকে হৈমবতী। কাঁদতে চায়। বুকটা গুমরে ওঠে। কিন্তু কান্না আসে না, চোখে জল নামে না—শুধু জ্বালা। এ যে অসহ্য—

সবাই এড়িয়ে চলে। দূর থেকে তাকায়। এ যে দুঃসহ।

অনুযোগ—বকুনি কেন ওরা দেয় না? খোকনের আঙুল কাটার জন্যে তাকে দোষী করে এসে গালাগাল দিক্। তা হলেও যে বাঁচা যায়।

তক্তপোশ ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা হয় না। অসহ্য লাগে আলো। অন্ধকারই ভাল। আকাশের সূর্য্য অস্তোন্মুখ। রাতের আর দেরি নেই।

বাঙ্গলা ধাতু ও ক্রিয়া

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মাইতি, এম-এ

বাঙ্গলায় প্রত্যয়ান্ত ধাতুর চারি বিভাগের মধ্যে সনন্ত ও যঙন্ত এতদুভয়ের বিরলতা সত্ত্বেও যাহা বিশেষ লক্ষণীয় তাহা এই যে, চারি প্রকার প্রত্যয়ান্ত ধাতুই আ-প্রত্যয় যোগে গঠিত হয়। ফলে তাহাদের বিভাগ-স্বরূপ নির্ণয়ে যে অসুবিধা দেখা দেয় তাহা নিরসন জন্য বিশেষভাবে বুঝিয়া একটি সিদ্ধান্ত খাড়া করা প্রয়োজন। সংস্কৃতে সনন্ত ও যঙন্ত ধাতুর অভ্যস্ত লক্ষণ একেবারে সংশয় রহিত বলিয়া বাঙ্গলায় এই মাপকাঠির দ্বারা এতদুভয়ের অন্য দুই বিভাগ হইতে পার্থক্য ধরা যায়, কিন্তু সনন্ত ও যঙন্তের মধ্যে পার্থক্যটুকু কেবলমাত্র অর্থ ধরিয়া বাঙ্গলায় নির্দ্ধারণ করা ছাড়া উপায় নাই। এই জন্য দেখি স্থা (স্থা- তিষ্ঠা) ধাতুর মধ্যে ইচ্ছা অর্থ থাকায় ইহা সনন্ত ধাতু কিন্তু ক | ক-|-আ =ককা (কথা বলিবার পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করা) ধাতুর মধ্যে পুনঃ পুনঃ অর্থ থাকায় ইহা যঙন্ত নাম। বাকী ণিজন্ত ও নাম ধাতুর মধ্যে সহজ পার্থক্য লক্ষ্য করিবার এই যে, ণিজন্ত ধাতু অন্য ধাতু হইতে উৎপন্ন হয় আর নামধাতু নাম বা প্রাতিপদিক হইতে উৎপন্ন হয়, কিন্তু পার্থক্যবিচারের এই সহজ নিয়মটি বাঙ্গলার পক্ষে যথেষ্ট নহে।

কয়েকটি সংস্কৃত ধাতুর তদ্ভব রূপ বাঙ্গলায় আ-প্রভৃতি প্রত্যয়-যোগে পুনরায় ধাতু হইয়া ক্রিয়ারূপ প্রাপ্ত হয়। আ-প্রভৃতি প্রত্যয়-ফলে ঐ সকল ধাতুর মধ্যে ণিজন্ত, সনন্ত বা যঙন্ত কোন অর্থই আসে না; যথাঃ লাফা (লম্ফ লাফ--আ) ইত্যাদি। আবার কয়েকটি সংস্কৃত ধাতুর মূল রূপের ব্যবহার বাঙ্গলায় নাই কিন্তু ঐ সকল ধাতু আ-প্রভৃতি প্রত্যয় পাইয়া ব্যবহারে আসে, যথাঃ পলা (পল্-চু, প; গতৌ-|-আ), কুটা (কুট্-চু, আ, প্রতাপনে+আ) ইত্যাদি। এই উভয় প্রকার ধাতুর মধ্যে মূল ধাতুর অর্থ মাত্র বর্ত্তমান থাকে বলিয়া প্রত্যয়ান্ত ধাতুবিভাগের মধ্যে ইহাদের কোন্ শ্রেণীভুক্ত করা উচিত তাহা নির্ণয় করা প্রয়োজন।

মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ মহাভাষ্যে নামধাতুর বিচার বিষয়ক সুপ আত্মনঃ ক্যচ; পাণিনি—৩.১.৮ সূত্রের "সুপ" ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—অথ সুপ গ্রহণম কিমর্থম্।…নাহস্ত্যত্র বিশেষঃ সুবন্তাদুৎপত্তৌ সত্যাং প্রাতিপদিকাদ্বা।…ইদং তর্হি প্রয়োজনম্, সুবন্তাদুৎপত্তির্যথাস্যাদ্ধাতো র্মাভূদিতি। এতদপি নাস্তি প্রয়োজনং, ধাতোঃ সন্নিধীয়তে স বাধকো ভবিষ্যতি।—কাজেই আত্মন অর্থাৎ ইচ্ছা অর্থ প্রকাশিত হইলেও, অভ্যস্ত না হইলে সনন্ত হইবে না, আবশ্যক বোধে নামধাতু পরিগণিত হইতে পারে। এই সূত্রানুসারে বাঙ্গলায় আ-প্রভৃতি প্রত্যয়ান্ত তদ্ভব বা তৎসম ধাতুকে (যথা: ঘষ্‌টা, চলকা প্রভৃতি) অভ্যস্ত লক্ষণ বা প্রয়োজক অর্থ-অভাবে নামধাতু রূপে পরিগণিত করিতে বাধা নাই, যদিচ এরূপ বিস্তারিত অর্থ বাঙ্গলার নিজস্ব এবং সংস্কৃত ব্যাকরণে অগ্রাহ্য।

তবে পতঞ্জলি-নির্দ্ধারিত একমাত্র অর্থ ধরিয়া পার্থক্য বিচ ছাড়া কয়েক স্থলে অন্য প্রকারেও বাঙ্গলা ণিজন্ত ও নামধাতুর পার্থক্য ধরা যায়। চল, ঘুম্, ঘষ্ প্রভৃতি ধাতুর ণিজন্ত রূপ প্রত্যয় ফলে পাই, কিন্তু নামধাতু গঠনে যথাক্রমে কা ও টা প্র আবশ্যক হয়। এখানে বলা প্রয়োজন এই যে, "সা"-প্রত্য "ঘুমসা" নামধাতু মধ্যে পাই তাহা "ঘুম্" ধাতু হইতে নহে, চক্ প্রভৃতি শব্দের ন্যায় ধ্বন্যাত্মক শব্দ।

অনুরূপ টিস্, টিপ্ প্রভৃতি ধ্বন্যাত্মক শব্দের উত্তর কা প্রত্যয়, প্রভৃতি ধ্বনির উত্তর লা-প্রত্যয় করিয়াও বাঙ্গলায় নামধাতু গ হয়। এখন প্রশ্ন জাগে যে ধ্বনির এই ধাতু-ক্ষমতার কারণ মীমাংসামতে—উচ্চারণের দ্বারা শব্দের উৎপত্তি হয় না, পূর্ব্বসিদ্ধ শব্দের অভিব্যক্তি মাত্র হইয়া থাকে এবং এই অভিব্য প্রযত্নসাধ্য। এই কারণে ঐ মতে ধ্বন্যাত্মক শব্দও নিত্য। প্রযত্নফলে উহার অভিব্যক্তি হয় বলিয়া উহার মধ্যে যে ধাতু-ক্ষ তাহা মানিতে হয় এবং হিন্দুদর্শনমতে কোনও রূপে ধ্বন্যা শব্দের ধাতুত্ব সিদ্ধ হয় না বলিয়া কারণ অনুসন্ধানের জন্য আধু ভাষাতত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।

বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ Franz Bopp-এর মতে:

A verb in the most restricted meaning of the t is that part of speech by which a subject is corre with its attribute. According to this definitior would appear that there can exist only one v namely, the substantive verb in Latin "esse", English "to be"... (Analytical Comparison of Sanskrit, Greek, Latin and Teutonic Languages.)

ক্রিয়ার নিম্নরূপে এই substantive verb-ই মূল ক্রিয় nonfinite অর্থাৎ অসমাপিকা অবস্থায় রাখিয়া তাহার সহিত হয় এবং ক্রিয়ার শক্তি সংযোজন করে: এই substantive ve সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে বাঙ্গলা পুরাঘটিত ও ঘটমান কাল অনুপ্রযুক্ত "আছ" ধাতুর কথাও আসিয়া পড়ে। বস্তুতঃ এই ধাতু, to be অর্থক সংস্কৃতে প্রযুক্ত আস (as) ধাতুর সমপর্য্যায় এবং ইহার অতীত রূপে যে আদিভাগস্থিত আ-বর্ণের লোপ তাহা অতীত কাল রূপে প্রযুক্ত "ছিল" রূপ হইতে ধরা যায়।

বাঙ্গলা নামধাতু গঠনে প্রযুক্ত "লা, সা ও কা" যে "ল আছ, ও কর" ধাতুর সংক্ষিপ্ত অংশ তাহা Bopp এবং পূর্ব্বস্থ সিদ্ধান্ত (যথা: Terminations, which are now seperable parts of a verb, were originally in pendent words) হইতে পাওয়া যায়। অন্যতম ভাষাতত্ত্ব Hirt উল্লিখিত সূত্রের words স্থলে verb-ই সিদ্ধান্ত করিয়াছে

ধ্বন্যাত্মক শব্দ-উদ্ভূত নামধাতুগুলি ছাড়া অন্য নামধাতুগুলিরও ণিজন্ত ধাতু হইতে পার্থক্য Bopp-এর স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত দ্বারা পাওয়া যায়। সেমিটিক গোষ্ঠীর ভাষাগুলির ধাতুলক্ষণ বিচার করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, এই গোষ্ঠীর ধাতুগুলির বিশেষত্ব এই যে, ইহারা তিন বর্ণাত্মক এবং দুই অক্ষরে (syllable) গঠিত অর্থাৎ দ্ব্যচ; অথচ সংস্কৃত বা আর্যগোষ্ঠীর ভাষাগুলির ধাতু একাচ (one-syllabled) মাত্র। উল্লিখিত বাঙ্গলা নামধাতুগুলিতে আমরা প্রায়ই দেখিতে পাইতেছি যে, মূল প্রাতিপদিকের মধ্যে অক্ষর প্রথমতঃ স্বরান্ত হইলেও নামধাতুর প্রত্যয় পাইলেই নিজ স্বর হারাইয়া (যথা: চাবুক চাবকা, কোদাল কোদলা ইত্যাদি) সম্ভবতঃ মুসলমান যুগের প্রভাবে সেমিটিক গোষ্ঠীর ভাষানুযায়ী দ্ব্যচে (two-syllabled) পরিণত হয়; ণিজন্ত ধাতুর এরূপ অবস্থা কুত্রাপি হয় না।

Franz Bopp-এর উক্ত দুই সিদ্ধান্ত বাঙ্গলায় স্বীকৃত হইলেও, আমরা কিন্তু প্রত্যয়মাত্রই এককালে সম্পূর্ণ শব্দ ছিল তাঁহার এই মতের আংশিক বিরোধী। বাঙ্গলায় বিভক্তির বহু লক্ষণ প্রত্যয় অনুযায়ী হইলেও বিভক্তি ও প্রত্যয়ের মধ্যে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে তাহা Scheidius ও Rask-এর মতের পরিবর্ত্তিত Bopp-এর অন্য সিদ্ধান্ত হইতে এবং বাঙ্গলা নিজস্ব লক্ষণ-বিচারে বেশ বুঝিতে পারি। উক্ত ভাষাতাত্ত্বিকগণের মত এই যে ক্রিয়াবিভক্তি পুরুষবাচক সর্ব্বনাম হইতে উদ্ভূত (The personal endings of verbs are identified with the corresponding pronouns)। বাস্তবিক বাঙ্গলা ক্রিয়ারূপের অতীত উত্তমপুরুষ রূপে যে "আমি" বা "অম" ব্যবহার করা হয় তাহা "আমি" শব্দের রূপান্তরে উৎপন্ন বলিয়া স্পষ্টই প্রতীত হয় এবং বোধ হয় ই-অংশ বর্ত্তমান উত্তম পুরুষের বিভক্তি—আর খুব সম্ভব অম-এর প্রথমাংশ অ-বর্ণ ভবিষ্যৎ কালের ঐ পুরুষ বিভক্তি। বাকি বিভক্তিগুলির মধ্যে এ বর্ণকেও আমরা সর্ব্বনাম রূপে বাঙ্গলায় দেখিতে পাই। যথা:—কে এর ইত্যাদি)

তিঙ্ ছাড়িয়া সুপ্ বিভক্তিগুলির মধ্যেও আমরা বাঙ্গলা পদের আভাস পাই এবং এই দিক দিয়া বিচারে উক্ত তিন জন পণ্ডিতের মতানুযায়ী বাঙ্গলা বিভক্তিগুলির শব্দত্ব বা পদত্ব প্রমাণ পাই বটে, কিন্তু সন্ধির দিক দিয়া বিচারে বাঙ্গলার এই উভয় শ্রেণীর বিভক্তির সহিত প্রত্যয় ও শব্দের পার্থক্য লক্ষিত হয়। বাঙ্গলায় বিভক্তি মাত্রই সন্ধি এড়াইয়া চলে; প্রত্যয়ও ভ-সংজ্ঞা (যচিভম্: পা ১।৪।১৮) পাইলে ঐরূপ লক্ষণ প্রকাশ করে, নচেৎ শব্দ বা পদের ন্যায় সন্ধি-নিয়ম মানিয়া চলে। অতএব উক্ত পণ্ডিতদের মত বিভক্তি-সম্পর্কে প্রযোজ্য হইলেও বাঙ্গলা বিভক্তিগুলি যে পদ ও প্রত্যয় হইতে স্বতন্ত্র লক্ষণযুক্ত তাহা মানিতে হয় এবং প্রত্যয় সমূহ এককালে শব্দ ছিল—এই মত প্রত্যয়, অন্ততঃ সমূহ তদ্ধিত সম্বন্ধে খাটে না। বস্তুতঃ Bopp পৃথিবীর ভাষাসমূহের যে ত্রিবিধ বিভাগ স্বীকার করিয়াছেন—তাহা সত্য
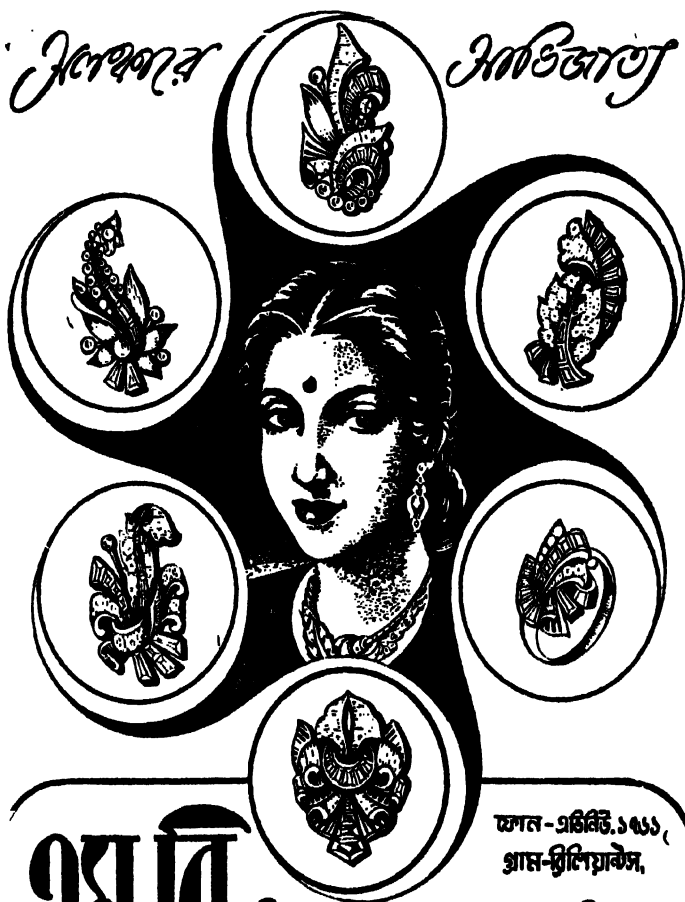
না হইলেও, দ্বিতীয় বিভাগ হইতে তৃতীয় বিভাগে ক্রমোন্নতি বিষয়ে তাঁহার আলোচনায় সূত্র বা ইঙ্গিতের অভাব স্বীকার করিতে হয়, কেননা বাঙ্গলা নামধাতুর সূক্ষ্ম আলোচনা দ্বারা ঐরূপ ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

সংস্কৃত মতে চারি প্রকার প্রত্যয়ান্ত ধাতুকে ভ্বাদিগণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বাঙ্গলায় কিন্তু সেরূপ হয় না, বরং এই চারি শ্রেণীর প্রত্যয়ান্ত ধাতুকে রূপ অনুসারে বিভিন্ন 'গণ'-শ্রেণীভুক্ত না রাখিয়া উপায় নাই। এই জন্যই অন্য লক্ষণ ধরিয়া বাঙ্গলা ধাতুর স্বতন্ত্র বিভাগ লক্ষ্য করা প্রয়োজন, ইংরেজী মতে ধাতুর, অর্থ এবং রূপ অনুসারে (১) Transitive, (২) Intransitive বিভাগ ছাড়া (৩) Defective বা Anomalous ও (৪) Irregular এই স্বতন্ত্র বিভাগ ধরা হয় এবং Defective Verb-এর এক শ্রেণীকে Auxiliary (সাহায্যকারী ক্রিয়াও বলা হয়। বাঙ্গলায় এরূপ বিভাগ-বিবেচনারও প্রয়োজন আছে, কেননা নিত্যরূপ বা সাধারণ রূপ ছাড়া অন্যরূপ গঠনে "আছ" ধাতুর অনুপ্রয়োগ আবশ্যক হয়।

বাঙ্গলা সংযুক্ত ভাবনা অর্থাৎ Subjunctive Mood-এর বাক্যে মূল বাক্যের ক্রিয়া অতীত কালের হইলে অনুপর্যায়ী ব ক্রিয়াকেও ঐরূপ অতীত কালের করিয়া বলিতে হয়। আ স্থির বিশ্বাস এই যে, বাঙ্গলায় ইংরেজীর ন্যায় Seque of Tense নাই, কিন্তু ঐ ভ্রম উপরোক্ত বাক্য এবং কাল, বৈ (contrast), প্রকার বা পরিমাণ (manner or ex'c ও স্থানসূচক আপেক্ষিক (যথাঃ—যখন…তখন, যাই…অ যতক্ষণ…ততক্ষণ, যতদিন…ততদিন, বটে…কিন্তু, হয়ত… ভাগো…তাই, আগে…পরে, এমন…যে, এরূপ…যে, যেম তেমন, যেরূপ…সেরূপ, যেখানে…সেখানে) যোগে গঠিত ব লক্ষ্য করিলে ধরা পড়ে। এই 'Spilting of Tense' f পৃথিবীর বহু ভাষার যে একটি বিশেষত্ব তাহা অটো জেস্‌পার্‌ তাঁহার *The Philosophy of Grammar* গ্রন্থের একটি অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছেন। তবে ঐ আলোচনা প্রত্যক্ষ পরোক্ষ উক্তি (direct and indirect speech) সংশ্র বলিয়া বাঙ্গলায় এ বিষয়ে আলোচনায় কিছু অগ্রসর হ আবশ্যক।

অধ্যাপক অটো জেস্‌পারসেন তাঁহার গ্রন্থের উক্ত অধ্যা

পরোক্ষ উক্তির দ্বিবিধ বিভাগে স্বীকার করিয়াছেন এবং এক বিভাগের নাম Dependent Speech আর অন্য বিভাগের নাম Represented Speech বলিয়াছেন। Dependent Speech এর সংজ্ঞা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—It is generally made dependent on an immediately preceeding verb, কিন্তু অন্যটির কোনও সংজ্ঞা না দিয়া কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন (*The Philosophy of Grammar*, pages 190-1)। এই উভয় প্রকার বাক্যশ্রেণী যে জিজ্ঞাসাসূচক পরোক্ষ উক্তিতে মিলে তাহা উক্ত অধ্যায়ের অন্তর্গত "Questions in indirect speech" প্রসঙ্গের মুখবন্ধেই ব্যক্ত করিয়া দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গে পরবর্তী আলোচনায় উক্ত শ্রেণীর উক্তিতে Shifting of Tense অর্থাৎ প্রচলিত ব্যাকরণ অনুসারে Sequence of Tense নিয়মের প্রভাব দেখাইয়া দিয়াছেন।

বাংলায় "কি" জিজ্ঞাসাসূচক বাক্যের দুই প্রকার রূপ দেখা যায়। একটি শুধু এই শব্দযুক্তরূপ, আর অন্যটি হইতেছে এই "কি" শব্দের পূর্বে "না" শব্দ বসান রূপ, "না" শব্দ বসাইবার ফলে শুধু যে এরূপ বাক্যের ক্রিয়ায় নেতি অর্থ আসে না তাহা নহে, সাধারণ অনুজ্ঞা বাক্যেও "না" শব্দের এরূপ প্রয়োগে নেতি অর্থ পাই না। এরূপ অনুজ্ঞা বাক্যে এই "না" নেতির পরিবর্তে জোর অর্থই সূচনা করে কিন্তু জিজ্ঞাসা সূচনায় বর্তমান (ভবিষ্যৎ নহে) কালসূচক ক্রিয়ার সহিত অতীত কাল রূপ প্রযুক্ত বাক্যের পরোক্ষ উক্তিতে অদ্ভুত ভাবে আমরা ঐ Shifting of Tenses দেখিতে পাই। "রাম হরিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—তুমি যাইতেছ নাকি"—বাক্যের পরোক্ষ উক্তিতে—"রাম হরিকে—সে যাইতেছিল নাকি—জিজ্ঞাসা করিয়াছিল"—বাক্য রূপ পাই। এখানে প্রত্যক্ষ উক্তির পরোক্ষ রূপ পরিবর্তনে সর্বনামেরও পরিবর্তন হওয়ায় ইহা অটো জেসপারসের মতানুসারে Represented Speech মাত্র। কিন্তু যদি "রাম হরিকে বলিয়াছিল—তুমি যাইতেছ নাকি" প্রত্যক্ষ উক্তিকে উপরোক্ত পরোক্ষ রূপে পরিবর্তন করা হয় তবে প্রত্যক্ষ বাক্যের "বল" ধাতুকে "জিজ্ঞাসা কর" ধাতুতে পরিবর্তনের ফলে ইহার Dependent Speech সংজ্ঞা হয়। অতএব দেখা যাইতেছে ধাতুর উপর নির্ভর করিয়া বাংলায় পরোক্ষ উক্তির দ্বিবিধ সংজ্ঞা হইতে পারে।

করে দেখ (প্রথম খণ্ড)—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিষদ, ৯৩ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য এক টাকা চারি আনা।

আলোচ্য পুস্তকখানিকে বিজ্ঞানশিক্ষার প্রথম ভাগ বলা যায়। অনায়াস-প্রাপ্য কয়েকটি উপকরণের সাহায্যে সহজ উপায়ে অনেকগুলি কৌতূহলজনক বস্তু নির্ম্মাণের পদ্ধতি লেখক এই পুস্তকে দিয়াছেন, যাহা নির্ম্মাণের কৌশলে ও উদ্ভাবনের কৃতিত্বে বালক-নির্ম্মাতাদের আনন্দ বর্দ্ধন করিবে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ গাছের পাতায় ফটোগ্রাফী, ঘূর্ণায়মান জলচক্র ও সর্প, পলতেশূন্য বাতি, পিস্তলধনুক, চুম্বকবড়শী, তরল বায়ু, স্বয়ংক্রিয় ফোয়ারা, বিদ্যুৎখেলা, পেরিস্কোপ, সাইফন প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়। লেখক বিজ্ঞানের সাধক, সেই সাধনার যৎকিঞ্চিৎ এই ভাবে শিশুমনোরঞ্জনে প্রয়োগ করিয়া শিশুচিত্তকে বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছেন। একাধারে ইন্দ্রজাল ও বিজ্ঞানের খেলাগুলি শিখিয়া শিশুরা শুধু আনন্দ উপভোগই করিবে না, এমনিভাবে বস্তুর ক্রিয়া ও গুণ সম্বন্ধে অবহিত হইয়া ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের ব্যবহারিকক্ষেত্রে অধিকতর দক্ষতা অর্জ্জনের সুযোগ পাইবে।

প্রত্যেকটি খেলাকে ছবির দ্বারা সহজবোধ্য ও চিত্তাকর্ষক করা হইয়াছে।

উপনিষদের উক্তি—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ৮৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য দশ আনা।

অন্ন যেমন দেহের পুষ্টি, বেদ-উপনিষদে তেমনি ভারতীয় মনের প্রসার। বিদেশী শাসনের চাপে পড়িয়া সংস্কৃত ভাষা আমরা প্রায় বিস্মৃত হইয়াছি। কিন্তু ভাবগত সংস্কৃতিক আমাদের রক্তে মজ্জায় মিশিয়া আছে। আমরা অনেকে প্রতি দিনের কর্ম্মে চিন্তায় বেদ-উপনিষদের বাণী স্মরণ করি—এখনও বা অতি-প্রাতে দু'একটি শ্লোক আবৃত্তি করিয়া থাকি—যদিও আবৃত্তিকালে শুদ্ধাশুদ্ধ প্রয়োগ সম্বন্ধে আমরা সচেতন নহি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনধারার উপর উপনিষদের বাণীর প্রভাব লক্ষ্য করিয়াই লেখক কয়েকখানি উপনিষদ হইতে প্রসিদ্ধ কয়েকটি শ্লোক বাংলা ব্যাখ্যাসহ এই পুস্তকে সন্নিবদ্ধ করিয়াছেন—শ্লোকের উৎপত্তি-তাৎপর্য্যও সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর এই বহু প্রচলিত উক্তিগুলির শুদ্ধ প্রয়োগ সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারিব বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এইটিই উপনিষদের উক্তি সঙ্কলনের আসল উদ্দেশ্য নহে। উক্তিগুলির অন্তর্নিহিত তত্ত্বের সহিত পরিচিত হইলে পূর্ণাঙ্গ উপনিষদ পাঠের আগ্রহ জন্মিবে এবং সংস্কৃতির ধারা রক্ষা করাও সুসাধ্য হইবে—এইটিই আমাদের পক্ষে পরম লাভ।

বিশ শতকের বাংলা-সাহিত্য! প্রথম খণ্ড (উপন্যাস)—শ্রীঅনিল বিশ্বাস। জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স, ১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম পাঁচ টাকা।

লেখক 'বিশ শতকের বাংলা-সাহিত্যের প্রথম খণ্ডে' ১৯০১ হইতে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত বাংলা ভাষায় রচিত প্রায় সমস্ত উপন্যাস ও রচয়িতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শুধু পরিচয় নহে, লেখক ও তাঁহাদের রচনা সম্বন্ধে কিছু কিছু মন্তব্যও আছে—যাহা সংক্ষিপ্ত সমালোচনা-গোত্রীয়। এইভাবে অর্দ্ধ শতাব্দীসৃষ্ট উপন্যাস-সাহিত্যের পরিক্রমা মোটেই সহজসাধ্য নহে, পদে পদে ত্রুটি-স্খলনের সম্ভাবনা।

প্রথমেই প্রশ্ন হইতে পারে, এই বাহান্ন বৎসরে বাংলা-সাহিত্যে যত উপন্যাস লিখিত হইয়াছে তাহার সবগুলিই নির্ব্বিচারে সাহিত্যপদবাচ্য

ওড়িয়া সাহিত্য—শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন।

অসমীয়া সাহিত্য—শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ ৯১, ৯২। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২।

প্রাদেশিক সাহিত্য সম্পর্কে বাংলা ভাষায় বিধিবদ্ধ আলোচনার পরিমাণ অত্যন্ত কম। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কখনও কখনও সামান্য কিছু কিছু আলোচনার পরিচয় পাওয়া যায়—মাঝে মাঝে দুই একখানি বইয়ের অনুবাদ ও অনুবাদের অনুবাদও দেখিতে পাওয়া যায়। তবে কোন ব্যাপক প্রচেষ্টা বা কোন সাহিত্যের বিস্তৃত পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রকাশের কথা শোনা যায় না। অথচ কোন কোন প্রাদেশিক সাহিত্যের পরিপুষ্টিসাধনে ও উন্নতিবিধানে বাঙালীর কৃতিত্বের প্রচুর নিদর্শন বর্তমান রহিয়াছে। এই অবস্থায় বিশ্বভারতী প্রকাশন বিভাগ বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালায় আলোচ্য পুস্তিকা দুইখানি প্রকাশ করিয়া সাহিত্যরসিক মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। পুস্তিকা দুইখানিতে সংক্ষিপ্তভাবে বাংলার দুই প্রতিবেশী প্রদেশের সাহিত্যের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। দুই ক্ষেত্রেই নানারূপ বৈশিষ্ট্যের কৌতূহলোদ্দীপক দৃষ্টান্ত পরিবেশিত হইয়াছে। আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গেই আছে বাংলা তথা অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ ঐক্যসূত্রের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। এইগুলি আলোচনা করিয়া পাঠক জ্ঞান ও আনন্দলাভ করিবেন সন্দেহ নাই। অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যের এইরূপ বিবরণ সংকলিত হইলে বাংলা সাহিত্যের একটা বড় অভাব দূরীভূত হইবে। ভারতকে ও ভারতবাসীকে জানিবার চিনিবার পক্ষে এ জাতীয় পুস্তক অপরিহার্য।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প—শ্রীবীরেন্দ্রলাল ধর। সাহিত্য চয়নিকা, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য—২

ছোটদের গল্প-উপন্যাস-রচনায় গ্রন্থকার খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার লেখার বিশেষত্ব এই যে, অনেক জানিবার কথাও তিনি সুন্দরভাবে গল্পের মধ্য দিয়া বলিয়া যান। আলোচ্য পুস্তকে পনরটি উপভোগ্য গল্প সঙ্কলিত হইয়াছে। ছেলেমেয়েরা পড়িয়া যে আনন্দ পাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

পদার্থবিদ্যার নবযুগ—শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। লোকশিক্ষা মালা। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। পৃষ্ঠা ৩, মূল্য ২, টাকা।

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য দীর্ঘকাল পদার্থবিদ্যার অধ্যাপন করিয়াছেন। কি করিয়া দুরূহ বিষয়কে সরল, সহজ করিয়া বুঝাইতে হয় তা চারুবাবুর বিশেষভাবে জানা আছে। বাংলা ভাষার উপর চারুবাবুর অসাধারণ দখল। আলোচ্য পুস্তকখানিতে তিনি পদার্থবিদ্যায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে যে নবযুগ আরম্ভ হইয়াছে তাহার বিষয় অতি সরল সহজ ভাষায় সাধারণ পাঠককে বুঝাইয়া দিয়াছেন। ইংরেজীতে বিজ্ঞানের দুরূহ তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য বহু গ্রন্থ আছে; বাংলায় এইরূপ পুস্তকের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। সে হিসাবে আলোচ্য পুস্তকখানি বঙ্গভারতীর একটি বিশেষ সম্পদ। এই পুস্তক প্রকাশের ফলে লোকশিক্ষার পথ সুগম হইয়াছে। ইহাতে বিখ্যাত ভারতীয় ও অ-ভারতীয় বহু বৈজ্ঞানিকের ছবি আছে। বিষয়বস্তু বুঝাইবার জন্য ও অনেক চিত্র আছে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

সন্ধান—শ্রীধীরেন দাশ। বীডাস কর্নার, ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬। মূল্য—আড়াই টাকা

যে সমস্ত অনাথ অনাশ্রিত ছেলে গুণ্ডাদের আড্ডায় থাকিয়া চুরি বাটপাড়ি প্রভৃতি নানা অপকর্মে অভ্যস্ত হয় তাহাদের দুঃখ-বেদনার কাহিনী অবলম্বনে লেখক এই উপন্যাসখানি রচনা করিয়াছেন। কালোবরণ যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় চাকরি করিতে গেলেন তাহার ভাগ্নে নিমাই তখন নিতান্ত শিশু। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে কলিকাতায় ফিরিয়া কালোবরণ শুনিলেন—দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে তাঁহার ভগ্নী ও ভগ্নীপতি দুজনেই অকালে মরিয়াছে, আর তাহাদের ছেলের কোন পাত্তাই নাই। তখন তিনি তাহার সন্ধানে রত হইলেন। এই সূত্রে গুণ্ডা ইয়াসিনের আড্ডায় যে সকল অনাথ ছেলে চুরি, পকেটমারা ইত্যাদিতে পাকাপোক্ত হয় তাহাদের তিনি আবিষ্কার করিলেন, কিন্তু ভাগ্নের কোনো পাত্তা মিলিল না। ওদিকে নিমাই অনেক ঘাটের জল খাইয়া অবশেষে গুণ্ডার দলে ভিড়িল, কিন্তু 'বড় বিদ্যায়' অপটুতার জন্য তাহাকে শুধু ভিক্ষাবৃত্তিতে হাত পাকাইতে হইল। কালোবরণের বন্ধু কুণালবাবুর চেষ্টায় কলিকাতার অনতিদূরে গড়িয়া উঠিল এক শিশুসদন। সেখানে ইয়াসিনের আড্ডার সকল অনাথ চোর বদমায়েস ছেলেদের আশ্রয় মিলিল—শেষ পর্যন্ত নিমাইও আসিয়া এখানে জুটিল। কালোবরণ তাহাদিগকে দিলেন নূতন পথের সন্ধান।

উপন্যাসখানি উদ্দেশ্যমূলক—ইহাতে অনাথ ছেলেদের সমস্যা ও তাহার সমাধানের ইঙ্গিত আছে। কিন্তু প্রতিপাদ্য বুঝাইবার জন্য লেখককে দীর্ঘ বক্তৃতার অবতারণা করিতে হয় নাই। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়াই তাহার বক্তব্য পরিস্ফুট হইয়াছে। অসহায় শিশুদের জন্য লেখকের অপরিসীম দরদ বইয়ের ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। নিমাইকে লেখক একেবারে জীবন্ত করিয়া আঁকিয়াছেন। এক এক জায়গার বর্ণনা এত করুণ ও মর্মস্পর্শী হইয়াছে যে, নীড়চ্যুত স্নেহবঞ্চিত অসহায় অনাথ ছোট ছেলেটির জন্য করুণায় মমতায় বুক ভরিয়া ওঠে। মহানগরীর সকল অনাথ এবং আশ্রয়হীন শিশুর বেদনা যেন নিমাইয়ের মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে।

এরাই মানুষ শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য এক টাকা চারি আনা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ আমাদের দেশের কয়েক জন শ্রেষ্ঠ মানব এবং রাণী ভবানী, পরমহংস-

দেবের সহধর্ম্মিণী শ্রীমা, রাণী ভবানী এই তিনজন মহীয়সী মহিলার জীবনী হইতে লেখক এমন কতকগুলি ঘটনা নির্ব্বাচিত করিয়া বর্ত্তমান পুস্তকে পরিবেশন করিয়াছেন যেগুলিতে মনুষ্যত্বের বিরাট মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া আমাদের বিস্ময়ের পরিসীমা থাকে না। বইখানি ছোটদের উপযোগী সহজ সরল ভাষায় লিখিত—লেখকের বলিবার ভঙ্গীটি চিত্তাকর্ষক। কাহিনীগুলি পাঠ করিয়া অল্পবয়স্ক বালক-বালিকারা একদিকে যেমন বিমল আনন্দ লাভ করিবে অন্যদিকে তেমনি মনুষ্যত্বের আদর্শেও অনুপ্রাণিত হইবে। কতকগুলি সুন্দর রেখাচিত্র এবং মনোরম প্রচ্ছদপট বইখানিকে ছোটদের নিকট রীতিমত লোভনীয় করিয়া তুলিবে।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল-চরিতামৃত (২য় সং)—শ্রীমৎস্বামী ওঙ্কারানন্দ পরিব্রাজকাবধূত প্রণীত এবং নবদ্বীপ মহানির্বাণ মঠ হইতে শ্রীমৎস্বামী নিত্যমানন্দ পরিব্রাজকাবধূত কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৪+৩৮৯+৮। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থে যাঁহার চরিতামৃত সঙ্কলিত হইয়াছে, তিনি কলিকাতা মহানগরীর এক বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারের সন্তান হইলেও আশৈশব সন্ন্যাসধর্ম্মের অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার জন্ম হইতে মৃত্যু বা সমাধি পর্যন্ত বহু ঘটনাই অলৌকিক মহিমায় পরিপূর্ণ। ইনি যথোচিত শিক্ষালাভের পর রাজকীয় কর্ম্মেও কিছুদিন যোগ্যতার সহিত নিযুক্ত থাকিয়া পরে সর্ব্বত্যাগী অবধূত সন্ন্যাসজীবন যাপন করেন। দক্ষিণ কলিকাতায় রাসবিহারী এভেন্যুর উত্তরাংশে অবস্থিত বিখ্যাত মহানির্বাণ মঠ ইঁহারই সমাধি-মন্দির। ইনি ছিলেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভক্ত-চূড়ামণি রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সম্পর্কিত ভ্রাতা। নিত্যসিদ্ধ নির্জ্জনতাপ্রিয় এই সাধুপুরুষ প্রথম দর্শন হইতেই পরমহংসদেবের কাছে সমাদর লাভ করেন। তাঁহার আত্মগোপনশীলতা অত্যন্ত বেশী ছিল বলিয়া তাঁহার প্রচার তেমন হয় নাই। গ্রন্থকার বহু আয়াসে প্রায় শতবর্ষ পূর্বেকার তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া এক দুঃসাধ্য কাজ সম্পাদন করিয়াছেন। গ্রন্থের আদিলীলা অংশে চারিটি অধ্যায়ে জন্ম হইতে দীক্ষা ও সন্ন্যাস গ্রহণ; মধ্যলীলায় এগারোটি অধ্যায়ে বিভিন্ন স্থানে পর্যটন ও লোক-কল্যাণ সাধন এবং অন্ত্যলীলায় তিনটি অধ্যায়ে মহিমাবিকাশ, মঠাদি স্থাপন ও লীলাবসান ইত্যাদি বিষয়গুলি হৃদয়গ্রাহীভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইনি সমন্বয়বাদী ছিলেন। কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান—যেখানে রামকৃষ্ণ সমাধি মঠ বর্তমান তাহা শ্রীমন্নিত্যগোপালদেবের অর্থেই বেনামীতে তদীয় সম্পর্কিত ভ্রাতা রামচন্দ্র দত্তের নামে ক্রয় এবং তাঁহারই আন্তরিক ইচ্ছায় ইহার সমাধিমঠে পরিণতি ইত্যাদি বহু তথ্য গ্রন্থপাঠে অবগত হওয়া যায়।

শ্রীমন্নিত্যগোপাল রচিত সমন্বয়মূলক প্রায় পঁচিশখানি গ্রন্থ আছে, সেসব হইতে সমালোচ্য গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রায় একাত্তরটি মূল্যবান উপদেশ পরিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভে ত্রিবর্ণে নিত্যপ্রতিকৃতি মনোজ্ঞ হইয়াছে। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইতে দেখিয়া পাঠকগণের অধ্যাত্ম রুচিবৃদ্ধির প্রমাণ পাওয়া গেল।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

স্মৃতিচিত্র—শ্রীপ্রতিমা দেবী। সিগনেট প্রেস, ১০।২ এলগিন রোড, কলিকাতা-২০। মূল্য দুই টাকা চারি আনা।

শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবীর 'স্মৃতিচিত্র' কিছু কিছু আমরা ইতিপূর্বে পত্রিকায় পাঠ করিয়াছি। তখনই ইহা আমাদিগের বিশেষ কৌতূহলের উদ্রেক করিয়াছে। সুমুদ্রিত ও সুচিত্রিত পুস্তকে ইহা সম্পূর্ণ গ্রথিত করিয়া পাঠকপাঠিকাদের পরিবেশন করা হইয়াছে। ইহাতে অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বেকার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর আবহাওয়ার, বিশেষতঃ গগনেন্দ্র-অবনীন্দ্র-পরিবারের সুষ্ঠু পরিবেশের কথা আমরা জানিতে পারি। লেখিকা শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী। শৈশবে ও কৈশোরে মাতুল-পরিবারের সামাজিক, পারিবারিক বহুবিধ আচার-অনুষ্ঠানের কথা, বৃদ্ধা পিতামহীকে কেন্দ্র করিয়া যে একটি আশ্চর্য্য আবেষ্টনী গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার বিষয় এবং মাতুল অবনীন্দ্রনাথের নিজ মুখ হইতে তাঁহার শিল্পসাধনার বর্ণনা পাঠকের শুধু চিত্তবিনোদনই করিবে না, তাঁহাকে নানা বিষয় জানিতে অধিকতর কৌতূহলী করিয়া তুলিবে। এমন একখানি পুস্তক প্রকাশে বাংলা-সাহিত্য সমৃদ্ধ হইল নিঃসন্দেহ।

চলার পথে—শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী। প্রসাদী সাহিত্য সদন, ১।২।৭ দমদম রোড, কলিকাতা-২। পৃষ্ঠা ১৮৭। মূল্য তিন টাকা।

লেখক সুকবি বলিয়া প্রসিদ্ধ। তবে গদ্যরচনাকেও যে তিনি কাব্য-রসাপ্লুত করিয়া তুলিতে পারেন, আলোচ্য পুস্তকখানি পাঠে তাহা আমরা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারিলাম। 'চলার পথে' নামকরণ সত্যই সার্থক হইয়াছে। কারণ লেখক ইহাতে জীবনের আনুপূর্বিক কাহিনী সংবদ্ধ না করিয়া বিশেষ বিশেষ ঘটনার সমাবেশ করিয়াছেন। তাহাতে ধারা-বাহিকতার চমৎকারিত্ব ইহাতে এতটুকুও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। পুস্তকখানি একবার পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া উঠা যায় না। বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব, ভাষার সাবলীলতা এবং বর্ণনাভঙ্গীর নৈপুণ্য পাঠককে একেবারে শেষ পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যায়। মূলতঃ জীবনাখ্যায়িকা শ্রেণীভুক্ত হইলেও এখানি যে রসসাহিত্যের পর্য্যায়ে গিয়া পড়িয়াছে তাহা অবশ্যই বলা চলে।

লেখক 'চাঁদীর চামচ' মুখে লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সুখভোগ তাঁহার ভাগ্যে বেশীদিন ঘটে নাই। তিনি কৈশোরেই 'পথে'র আহ্বান শুনিয়াছিলেন, তাই তিনি পথের বাহির হইয়াছেন জীবনাদর্শের সাধনায়। স্বদেশসেবা এবং তাহার জন্য দুঃখভোগ লেখকের জীবনকে ধন্য করিয়াছে। লেখকের কবিসত্তা কিন্তু ক্রমশঃই পরিণতির দিকে চলিয়াছে। তিনি গৃহে, পথে, বন্দীশালায় ও অন্তরীণ-জীবনে কত দৈবদুর্বিপাকের বিচিত্র ঘটনা ও বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের সম্মুখীন হইয়াছেন, কিন্তু তিনি কোন ক্ষেত্রেই আপন বৈশিষ্ট্য হারান নাই। তাঁহার কবিমানস দোর্দণ্ডপ্রতাপ পুলিস ও গোয়েন্দা কর্ম্মীকেও স্ববশে আনিতে সক্ষম হইয়াছে। শৈশবে মাতামহ-গৃহে বাস হইতে প্রৌঢ়ে বন্দীজীবন পর্য্যন্ত তিনি নানা বিচিত্র ঘটনার বর্ণনা করিয়াছেন। এগুলির অধিকাংশই মনে গভীর রেখাপাত করে। ছোট ছোট অধ্যায়ের ভাবব্যঞ্জক পৃথক পৃথক নাম দেওয়া হইয়াছে। বক্সার বন্দীজীবনের বিশ্লেষণমূলক বর্ণনায় ভবিষ্যতে কম্যুনিষ্ট দল কিরূপে এতখানি দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে তাহার নির্দ্দেশ পাইতেছি। ফরিদপুরের অন্তর্গত দৌলতদিয়ায় অন্তরীণ থাকাকালীন বহু বিষয়ও পাঠকের করুণ হৃদয়তন্ত্রীতে দোলা দেয়। গোয়েন্দা পুলিসের চোখে ধূলা দিয়া দারোগাবাবুর মারফত লেখার বাণ্ডিল কলিকাতায় প্রেরণ, বন্দীদের না খাওয়াইয়া তাঁহার স্ত্রীর চর্ব্যচোষ্য গ্রহণে অসম্মতি, দৌলতদিয়া ত্যাগের প্রাক্কালে বৃদ্ধ পোষ্টমাষ্টারের আহ্বানে তাঁহার গৃহে স্ত্রী ও কন্যাদের সম্মুখে 'মাতোয়ালা মজদুর' কবিতা পাঠ ইত্যাদি বহু ঘটনা বড়ই চিত্তাকর্ষক এবং করুণ রসের উদ্দীপক। এরূপ পুস্তক প্রকাশে আমরা গ্রন্থকারকে ধন্যবাদ দিই। পুস্তকে বেশী ছাপার ভুল থাকিলে তাহা বড়ই দুঃখের কথা হয়। ভবিষ্যৎ সংস্করণে ভ্রমপ্রমাদ নিরসনে অবহিত হইলে ভাল হয়।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড

প্রতিষ্ঠিত
ভাদ্র, ১৩৬০
মীরা স্নো

সায়ংকালে

শ্রী কালীসাধন সামন্ত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

পক র প্রাকৃক

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য"

৫৩শ ভাগ ১ম খণ্ড | ভাদ্র, ১৩৬০ | ৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

স্বাধীনতা দিবস

ভারতের স্বাধীনতার ছয় বৎসর পূর্ণ হইয়া গেল। এখনও আমাদের মনে স্বাধীনতা যে কি বস্তু তাহার সম্যক্ ও সত্য রূপ প্রকাশ পাইল না। পথে, ঘাটে, মাঠে, ময়দানে, এদেশের—বিশেষতঃ বাংলা দেশের বাকবাগীশদিগের মুখে এই স্বাধীনতার মুখর বর্ণনা পাইতেছি শুধু: "ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যয়"।

বুঝিলাম এই স্বাধীনতা মিথ্যা। তবে সাচ্চা স্বাধীনতার রূপই বা কি এবং এত বড় দেশের, ৩৬ কোটি লোকের স্বাধীনতা মিথ্যায় পরিণত হইলই বা কি দোষে বা কাহার দোষে?

ইংরেজী এক ব্যঙ্গকৌতুকপূর্ণ পুস্তকে মিশরের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময়ের এক গল্প অনেক দিন পূর্ব্বে পড়িয়াছিলাম। পড়িবার সময় মনে ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছিল অনুন্নত দেশের স্বাধীনতার ব্যাপারে ঐরূপ বিদ্রূপ করায়, কিন্তু এখন ভাবি যে হয়ত বা উহাতে যতটা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ দেখিয়াছিলাম ঠিক ততটা ছিল না। গল্পটা এইরূপ:

মিশরের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সংবাদ সারা দেশে তুরী-ভেরী ও ঢোল শহরতযোগে ঘোষিত হওয়ার পর গ্রাম ও নগরের চাষাভুষা লোকের মনে প্রশ্ন জাগে যে, "ইস্‌টিক্‌লাল" (জাতীয়তাবাদরূপ স্বাধীনতা) কি পদার্থ? এক গণ্ডগ্রামের প্রধান মাতব্বররা শেষ পর্য্যন্ত নিকটস্থ শহরের "রইস বালাদিয়ের" (মেয়র) নিকটে জনগণের মুখপাত্ররূপে উপস্থিত হইয়া "ইসটিক্‌লাল" দর্শন করিতে চাহেন। মেয়র মহাশয়ের হতভম্ব-নির্ব্বাক্ অবস্থা দেখিয়া প্রধান মাতব্বর বলেন:

"আমরা উহাকে লইয়া যাইব না। আপনি আপনার কর্ম্মচারী কাহাকেও বলুন 'স্বাধীনতা'র মুখে লাগাম বাঁধিয়া আমাদের সামনে ঘুরাইয়া লইয়া যাউক। আমরা শুধু উহাকে নিরীক্ষণ করিয়া ফিরিয়া যাইব। গ্রামের লোকে জিজ্ঞাসা করিতেছে উহা কিরূপ জীব।" এই গল্পে মিশরের জনসাধারণের স্বাধীনতা সম্পর্কে জ্ঞান লইয়া অবজ্ঞা প্রকাশ করা হইয়াছে না? এইরূপ বিদ্রূপে রাগের কারণ রহিয়াছে নয় কি?

কিন্তু ভাবিয়া দেখুন আপনি, আমি, তিনি, অর্থাৎ আমরা সকলে, এ বিষয়ে ঐ গল্পের মিশরি মোড়লদের অপেক্ষা কতটা অগ্রসর। স্বাধীনতার পূর্ণ রূপের ধ্যান আমরা কয়জনে কতটুকু করিয়াছি বা করিতেছি? স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণে আমরা কয়জন অগ্রসর হইয়াছি? দায়িত্বজ্ঞান ও স্বাধীনতা কি অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত নহে অর্থাৎ একের বিহনে অন্যের অস্তিত্বই অসম্ভব নহে কি? ইংরেজ জাতি প্রায় নয় শত বৎসরের স্বাধীনতা রক্ষায় যে শিক্ষালাভ করিয়াছে তাহা তাহাদের ভাষায় এই মূলমন্ত্রে আছে, "Eternal vigilance is the price of Liberty"—অর্থাৎ, "স্বাধীনতা রক্ষার জন্য চিরন্তন সজাগ প্রচেষ্টাই তাহার মূল্য।" এই মূল্যদানে আমরা কে কি ভাবে সম্মতি জানাইয়াছি?

স্বাধীনতার অর্থ কি যথেচ্ছাচার? তবে একের স্বার্থে অনেকের ক্ষতিই প্রকৃত স্বাধীনতা। "কর্ত্তব্য তোমার, স্বাধীনতা আমার" ইহাই তবে স্বাধীনতার মূলমন্ত্র এবং ইহার ব্যতিক্রম হইলেই "ইয়ে আজাদি ঝুটা"।

কর্ত্তৃপক্ষের দোষ ক্ষালনের জন্য ওকালতির দায় আমাদের নহে। তাঁহাদের দায়িত্ব, অর্থাৎ শাসনতন্ত্র ও রাষ্ট্রতন্ত্রের অধিকারীবর্গের দায়িত্ব জনসাধারণের—ব্যক্তিবিশেষ অপেক্ষা শত সহস্রগুণ অধিক। সে দায়িত্ব পালনে ত্রুটি হইলেই তাহার কঠোর সমালোচনা প্রয়োজন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু আমাদের দায়িত্ব কি ঐ সমালোচনা পর্য্যন্তই, আমরা কি ক্রীতদাসের মত অধিকারী প্রভুর উপর ইহকালের সকল ভার অর্পণ করাই শ্রেয় মনে করি?

অনর্থক লেখা দীর্ঘ করার প্রয়োজন নাই। স্বাধীনতা মিথ্যা শুধু তাহার নিকট, যাহার অন্তরের ক্রীতদাস দায়িত্ব গ্রহণে অনিচ্ছুক এবং এক প্রভুর স্থলে অন্যকে অভিষিক্ত করাই যাহার একমাত্র লক্ষ্য। পৌরুষযুক্ত কর্ম্মঠ সজাগ লোকের স্বাধীনতা কেহই নষ্ট করিতে বা মিথ্যায় পরিণত করিতে পারে না। ইহাই আমাদের দেশের শতসহস্র স্বাধীনতার পূজারী আত্মদানে প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন।

রাজনীতির ক্ষেত্র আজ এতই দূষিত ও দুর্নীতিপূর্ণ যে উহা দেশের লোকের ন্যায়-অন্যায় সত্য-অসত্যের জ্ঞান নষ্ট করিতেছে। রাজনীতি অর্থে দলগত স্বার্থ ও ব্যক্তিগত ক্ষমতা লালসাই দাঁড়াইয়াছে এবং তাহার ফলে উহাতে জাতির সমাজ ও জীবনের সকল ক্ষেত্র, এমন কি খেলাধূলার ক্ষেত্রও কলুষিত করিতেছে।

সম্প্রতি বহরমপুর পৌরসভা আন্তঃ-জেলা ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ানশিপ বিজয়ী মুর্শিদাবাদ জেলা দলকে নাগরিক সম্বর্দ্ধনা জানান। এই উপলক্ষে "মুর্শিদাবাদ সমাচার" পত্রিকা এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে মুর্শিদাবাদ ক্রীড়াজগৎ সম্পর্কে কয়েকটি তাৎপর্য্যপূর্ণ মন্তব্য করেন। ইহা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের ক্রীড়াজগৎ সম্পর্কেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

অতীতে মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন খেলোয়াড় বাংলা বা ভারতের প্রতিনিধিরূপে বিদেশে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু কখনও কাহাকেও নাগরিক সম্বর্দ্ধনা জানান হয় নাই। উক্ত পত্রিকার মতে "জেলা ক্রিকেট দলের ক্যাপ্টেন যদি একজন কমিশনার না হইতেন তাহা হইলে ক্রিকেট খেলা সম্পর্কে পৌরসভা কতখানি উৎসাহী হইতেন তাহা অনুমানসাপেক্ষ।"

পত্রিকাটি লিখিতেছেন, "মোটের উপর জেলায় খেলাধূলা পরিচালনার ব্যাপারে যেমন, পৌর সম্বর্দ্ধনাতেও তেমনি দলীয় পলিটিক্স সুপ্রকাশিত হইয়াছে।" মুর্শিদাবাদ জেলা স্পোর্টস এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই দলাদলি চলিতেছিল। তবে প্রথম দিকে এই দলাদলি গঠনমূলক কার্য্যেই প্রকাশ পাইত; পত্রিকাটির কথায় "তখন যাঁহারা খেলা লইয়া রাজনীতি করিতেন, তাঁহারা ক্রীড়া প্রসারের প্রচেষ্টায় বিরত হইতেন না, এম. ডি. এস. এ-র উন্নতির পথে বাধা দিতেন না এবং বিরোধী হইলেও অপর কোন দল ভাল কাজ করিলে তাঁহারা যথাসাধ্য সহযোগিতা করিতেন।" লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যখনই এসোসিয়েশনের অর্থ-ভাণ্ডার পূর্ণ থাকে তখনই দলাদলির তীব্রতা বৃদ্ধি পায়।

এই স্বাধীনতার নূতন বর্ষের আরম্ভে আমাদের সকলের বুঝিতে হইবে স্বাধীনতার অর্থ রাজনীতি নহে। রাজনীতি স্বাধীনতার একটা অঙ্গমাত্র এবং বর্ত্তমানে উহা যেরূপ ক্লেদপূর্ণ তাহাতে উহাকে অধমাঙ্গই বলা উচিত।

স্বাধীনতা দিবসে ভারতের উচ্চতম অধিকারীর বক্তৃতার প্রথমাংশ উল্লেখযোগ্য, তাহা আমরা নিম্নে দিলাম :

শ্রীনেহরু বলেন, "অদ্য ভারতের সপ্তম স্বাধীনতা দিবস। যে মহামানব ভারতের জন্য স্বাধীনতা আনিয়াছেন, সেই মহাত্মা গান্ধীর উদ্দেশে আজ সর্ব্বাগ্রে আমাদের প্রণাম নিবেদন করিতে হইবে। এই মৃত জাতির দেহে যে লোকোত্তর মানব প্রাণসঞ্চার করিয়া নবজীবনের জোয়ার প্রবাহিত করিয়াছেন, আজ সমগ্র ভারতের তাবৎ নরনারী শ্রদ্ধাসন্নতচিত্তে সেই জাতির জনককে স্মরণ করিতেছে। গান্ধীজী ছিলেন মহাপুরুষ। তাঁহার সমগ্র জীবন আমাদের কাছে এক মহান্ দৃষ্টান্ত হইয়া আছে। তিনি এ দেশের সামনে মহান্ আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। আজ আমাদিগকে সেই আদর্শ স্মরণে আনিতে হইবে এবং আমাদের জীবনে ও কর্ম্মে তাঁহার সেই সকল আদর্শকে রূপায়িত করিতে হইবে। ইহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা যদি তাঁহার প্রদর্শিত পথে না চলি, তাহা হইলে আমরা দুর্ব্বল হইয়া পড়িব এবং আমরা কোন কাজই করিতে সমর্থ হইব না।" দেশের সম্মুখে যে সকল সমস্যা দেখা দিয়াছে, পণ্ডিত নেহরু সেই সম্পর্কে উল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "আজ আমাদের কর্ত্তব্য কি?"

"আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য হইল, আমাদিগকে আমাদের স্বাধীনতাকে রক্ষা করিতে হইবে।"

কথাগুলি গুরুত্বপূর্ণ, যদিও বক্তা এবং তাঁহার সহকারীবর্গ ক্রমেই ঐ আদর্শচ্যুত হইয়া পড়িতেছেন। কিন্তু সেজন্য আমাদের জ্ঞান মোহাচ্ছন্ন হওয়া উচিত নহে।

ঘরের কথা শেষে বলি। পশ্চিমবাংলার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এখানকার মুখ্যমন্ত্রী ঐদিনে বলিয়াছেন :

"পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য ৬৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ ব্যয় হইবে সমাজকল্যাণে, ১৬ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা সেচকার্য্যে, ১৫ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা পরিবহনে ও ১০ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা কৃষি ও গ্রামোন্নয়নে।

পশ্চিমবঙ্গে আমরা সমাজ-কল্যাণেরই উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছি। ১৯৪৮-৪৯ সালে শিক্ষাখাতে আড়াই কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছিল, এখন ৪ কোটিরও উপর ব্যয় করা হইতেছে। নূতন নূতন বিদ্যালয় ও কারিগরী শিক্ষায়তন খুলিয়া শিক্ষার পথ প্রসারিত করা হইয়াছে। ১৯৪৮-৪৯ সালে চিকিৎসাসাহায্যের পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা, এখন উহা বাড়াইয়া ৩ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা করা হইয়াছে। ফলে হাসপাতালের সংখ্যা ৩১৬টি হইতে বাড়িয়া ৪৪১টি হইয়াছে। বর্ত্তমানে হাসপাতালগুলিতে যক্ষ্মারোগীর বেডের সংখ্যা ১৮২৩; দুই বৎসর পূর্ব্বে এই সংখ্যা অর্দ্ধেক ছিল। পূর্ব্বেকার তুলনায় এখন বিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়া সেচকার্য্য চলিতেছে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাহিরে আমরা একটি বৃহৎ পরিকল্পনার রূপায়ণ করিয়াছি। সেটি হইতেছে ৩৭ বর্গমাইল জলাভূমি উদ্ধারের জন্য ৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সোণারপুর-আড়াপঞ্চ জল নিষ্কাশন পরিকল্পনা। ইতিমধ্যেই ২৬ বর্গমাইল অঞ্চলের জল নিষ্কাশিত করিয়া ১৫০০০ একর জমিতে চাষ সুরু করা হইয়াছে। আমাদের ১৫ কোটি টাকার ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা আগামী বৎসরে সমাপ্ত হইবে। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার কাজ ক্রমশঃ আগাইয়া যাইতেছে। এই পরিকল্পনায় আমাদের অংশ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। সুতরাং ঐ দুইটি পরিকল্পনার কাজ শেষ হইলে আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইব।

বেকার-সমস্যা—বিশেষ করিয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেকার-সমস্যা যেমনি বিরাট, তেমনি উহার সমাধান করাও দুরূহ। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা কায়িক পরিশ্রম করিয়া জীবিকার্জ্জনে অভ্যস্ত নহে বলিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় তাহারা জীবন-সংগ্রামে হতাশ হইয়া

তাই শিল্পে কর্ম্মসংস্থানও কঠিন হইয়া পড়িতেছে। আবার ছোট-খাট শিল্প ও কুটীরশিল্প খুলিতে গেলে শিক্ষা ও পরিচালন-ক্ষমতা থাকা চাই। এই সব শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, কিন্তু সবই সময়-সাপেক্ষ, একথা মনে রাখিতে হইবে।

এখন কঠোর কর্ম্মেরই সময়—কর্ম্মই মানুষকে বাঁচাইয়া রাখে, রাষ্ট্রকে অগ্রগতির পথে লইয়া যায়—কিন্তু কর্ম্ম সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। আমাদিগকে শিক্ষা করিতে হইবে শ্রমের মর্য্যাদা এবং কঠোর সংকর্ম্ম, যাহা আমাদের দেহ-মনকে শক্তিশালী ও উজ্জীবিত করিয়া তুলিবে। আমাদের হাতে সাত শতেরও অধিক পরিকল্পনা রহিয়াছে—হাজার হাজার শিক্ষিত যুবকের কর্ম্মসংস্থানই এই সব পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।"

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতার উল্লিখিত অংশের শেষটুকুই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। বাঙালীর জীবনের সকল ব্যর্থতার মূলে কর্ম্মবিমুখতা ও কাজে ফাঁকি। এখন চিন্তার অভাবে ও জ্ঞান অর্জ্জনে আলস্যের কারণে তাহার যে একমাত্র সহায় বুদ্ধিমত্তা, তাহাও ক্ষীণ ও বিভ্রান্ত হইতেছে। জ্ঞানের ও বুদ্ধিবিচারের আকর যে সকল পুস্তক, সে সকলের বিক্রয় সারা ভারতের মধ্যে সকলের চেয়ে কম বোধ হয় আজ বাংলাদেশে এবং সেই জন্যই এখানে স্বাধীনতা মিথ্যা ঠেকে।

কাশ্মীর

কাশ্মীরের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে এক অকল্পিত নাটকীয় পরিস্থিতি আসিয়াছে। দৈনিক সংবাদপত্রে তাহার মূল বিবৃতি এইরূপে দেওয়া হইয়াছে :

"শ্রীনগর, ৯ই আগষ্ট—কাশ্মীরের সদর-ই-রিয়াসৎ রাজ্যের মুখ্য-মন্ত্রী শেখ মহম্মদ আব্দুল্লাকে পদচ্যুত করিয়াছেন এবং মন্ত্রিসভাকে বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কাশ্মীর-কর্ত্তৃপক্ষ শেখ মহম্মদ আব্দুল্লা ও মীর্জ্জা আফজল বেগকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন।

প্রাক্তন মন্ত্রিসভার উপ-প্রধানমন্ত্রী বক্সী গোলাম মহম্মদ আজ ভোর সাড়ে চারটায় মুখ্যমন্ত্রীর পদে মনোনীত হইয়া শপথ গ্রহণ করেন।

সদর-ই-রিয়াসৎ কর্ত্তৃক প্রচারিত নির্দ্দেশনামায় মন্ত্রিসভার অভ্যন্তরে প্রবল মতবিরোধের কথা উল্লেখ করিয়া বলা হয় যে, মন্ত্রি-সভা জনগণের সমর্থন হারাইয়াছেন এই মর্ম্মে মন্ত্রিসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। নির্দ্দেশনামায় বলা হইয়াছে, —বর্ত্তমানে এরূপ এক অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যাহাতে নির্দ্দোষ ও সুষ্ঠু-ভাবে শাসন পরিচালন অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং সদর-ই-রিয়াসৎ শেখ মহম্মদ আব্দুল্লাকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ হইতে অপসারিত করিয়াছেন এবং তাঁহার পরিচালনাধীন মন্ত্রিসভা বাতিল করিয়া দিয়াছেন।

সদর-ই-রিয়াসতের নির্দ্দেশনামায় আরও বলা হইয়াছে যে, যৌথ-দায়িত্বের ভিত্তিতে আব্দুল্লা-মন্ত্রিসভার কার্য্য পরিচালনা অসম্ভব হইয়া পড়ে এবং তাহার ফলে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সংহতি জনগণ সদর-ই-রিয়াসতরূপে আমার উপর যে দায়িত্ব ও ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন তদনুযায়ী আমি জম্মু ও কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী পদ হইতে শেখ মহম্মদ আব্দুল্লাকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া দিতেছি।

সদর-ই-রিয়াসতের এই নির্দ্দেশনামা আজ ভোর সাড়ে চারটায় তাঁহার বাসভবন হইতে প্রচার করা হইয়াছে। সদর-ই-রিয়াসত ইহার পর পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সহকারী নেতা বক্সী গোলাম মহম্মদকে মন্ত্রিসভা গঠনে আমন্ত্রণ জানান। বক্সী গোলাম মহম্মদ এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া আজ ভোর সাড়ে চারটায় প্রধানমন্ত্রীরূপে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। নূতন প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ অনুযায়ী শ্রীগিরিধারীলাল ডোগরা রাষ্ট্রমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং তিনিও শপথ গ্রহণ করিয়াছেন।

ইহার পরের সংবাদে আরও দুই জন মন্ত্রী নিয়োগ এবং শপথ গ্রহণের কথা আছে। মন্ত্রীসভা এখন সম্পূর্ণ। দুই জন উপমন্ত্রীও গৃহীত হইয়াছেন।

দশ সপ্তাহ ধরিয়া মন্ত্রিসভা ও জাতীয় সম্মেলনের মধ্যে মতভেদ এবং শেখ আব্দুল্লার অদ্ভুত ও বিতর্কমূলক উক্তির ফলে যে গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল, শেখ আব্দুল্লার পদচ্যুতিতে তাহা চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে। গত কয়েক মাস ধরিয়াই মন্ত্রিসভার মধ্যে উত্তেজনার ভাব চলিতেছিল। মন্ত্রিসভার ভিতরে এবং বাহিরে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ আব্দুল্লার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, অযোগ্যতা এবং স্বেচ্ছাচারের অভিযোগ করা হইতে-ছিল। সর্ব্বশেষে ভারত-কাশ্মীর সম্পর্কে শেখ আব্দুল্লার সম্পূর্ণ বিপরীত মনোভাব ব্যক্ত হওয়ায় তাঁহার সহযোগী এবং সমর্থকদের মধ্যে বিস্ময়ের সৃষ্টি হইয়াছিল অথচ দিল্লী হইতেও এই বিষয়ে কোন-রূপ সাহায্য আসিতেছিল না, কেননা ইহা সম্পূর্ণ আভ্যন্তরীণ ব্যাপার, নেতৃবৃন্দের দ্বারাই ইহার মীমাংসা হওয়ার দরকার।

পর্য্যবেক্ষকগণ বলেন যে, শেখ আব্দুল্লা জনগণ এবং তাঁহার সমর্থকদের যে আস্থা হারাইতেছিলেন তাহাতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবার জন্যই ক্ষীয়মাণ সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন—তাঁহার সাম্প্রতিক উক্তিগুলিতে সেই প্রচেষ্টাই পরিস্ফুট হইয়াছে।

এই পদচ্যুতিতে শেখ আব্দুল্লা চরম আঘাত পাইয়াছেন সন্দেহ নাই—নিজের নেতৃত্বের উপরে তাঁহার একান্ত বিশ্বাস ছিল। কিন্তু তাহা হইলেও সবই যে সুষ্ঠুভাবে চলিতেছে না সেজন্য অস্বস্তিবোধও করিতেছিলেন।

গত ৭ই আগষ্ট শ্রীশ্যামলাল সরাফ প্রধানমন্ত্রী আব্দুল্লার নির্দ্দেশ সত্ত্বেও পদত্যাগে অস্বীকার করিয়া বিদ্রোহ করার পরই মন্ত্রিসভায় ভাঙ্গন দেখা দিল। নিম্নলিখিত কারণে মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য শেখ আব্দুল্লার নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছেন :

(১) সমস্ত সরকারী কাজেই শেখ আব্দুল্লার স্বেচ্ছাচারমূলক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে শাসনপরিচালনা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল এবং মন্ত্রিসভার যৌথ-দায়িত্ব পরিহাসের বস্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

(২) রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারে বিশেষভাবে দুর্নীতি এবং অযোগ্যতার দরুন জনগণের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইতেছিল।

(৩) ওয়াজির কমিটির রিপোর্ট অবহেলা করা হইয়াছে।

(৪) সর্ব্বোপরি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তির ফলে কাশ্মীর রাজ্যে বিভেদসৃষ্টিকারী দলের শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইচ্ছা করিয়াই দিল্লী চুক্তিকে কার্যকরী করিতে বিলম্ব এবং এই সঙ্কট সৃষ্টির জন্যও আব্দুল্লাকে দায়ী করা হইয়াছে।

মন্ত্রিসভার নেতার সঙ্গে মতভেদ এইরূপ গুরুতর ও প্রকট হইয়া উঠিয়াছে যে, এখন আর শাসন পরিচালনা সম্পর্কে একটা সাধারণ-সম্মত নীতি গ্রহণ এবং সুষ্ঠুভাবে শাসন পরিচালনা সম্ভব নয় বলিয়া মন্ত্রিসভার বেশীর ভাগ সদস্য স্থিরনিশ্চয় হইয়াছিলেন। যৌথ-দায়িত্বের নীতি সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করিয়া রাজস্বমন্ত্রী মির্জা আফজল বেগ যে সকল প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়াছেন সে সকল শেখ আব্দুল্লা সমর্থন করায় মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন।

"শ্রীনগর, ১০ই আগষ্ট—এক্ষণে জানা গিয়াছে যে, আব্দুল্লার মন্ত্রিসভার পদচ্যুতির সময় ভারতের বিরুদ্ধে এক সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। এই ষড়যন্ত্রের নেতা মীর্জা আফজল বেগ কাশ্মীরের জনৈক ভূতপূর্ব্ব সরকারী কর্ম্মচারীর মারফতে করাচীর সহিত সরাসরিভাবে সংযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে মীর্জা আফজল বেগের লোকজন যুদ্ধবিরতি সীমারেখার অপর দিককার লোকজনের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন। জানা যায়, কাশ্মীর গণ-পরিষদের জনৈক সদস্য উরীর অপরদিকস্থ উচ্চ পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিয়া পাঁচ-সাত বার 'আজাদ কাশ্মীর' এলাকা ঘুরিয়া বেগের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ লইয়া আসে।

প্রকাশ, সদর-ই-রিয়াসং যদি সময়মত হস্তক্ষেপ না করিতেন, তবে গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইত।"

কিছুদিন যাবং শ্রীনগরের পাকিস্থানপন্থী ব্যক্তিদের সহিত, বিশেষ ভাবে তথাকথিত পাকিস্থান-সমর্থক রাজনৈতিক সম্মেলনের সভাপতি মহীদিন কারার সহিত, মীর্জা আফজল বেগের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা দেখা যাইতেছিল। বস্তুতঃ ইহাও জানা গিয়াছিল যে, উক্ত রাজনৈতিক সম্মেলনের গঠনের পূর্ব্বে মহীদিন কারা প্রকাশ্যভাবে একটি পাকিস্থান-সমর্থক সংস্থা গঠন ও কাশ্মীরের বিশেষতঃ শ্রীনগর শহরের পাকিস্থান-পন্থী জনগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করার খসড়া প্রস্তাব লইয়া মীর্জা আফজল বেগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

কাশ্মীর সরকারের দুই জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী (বর্ত্তমানে উভয়কেই গ্রেপ্তার করা হইয়াছে) বেগ ও কারার মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানে দূতের কাজ করিয়াছেন।

শেখ আব্দুল্লার পতনে পাকিস্থানে বিশেষ চাঞ্চল্য লক্ষিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী উভয়েই নয়া-দিল্লী আসিয়াছেন, সুতরাং এ বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশের সময় এখনও আসে নাই। কিন্তু অযোগ্য লোকের উপর পণ্ডিত নেহরুর বিশ্বাস যে কিরূপ, এই ব্যাপার তাহার চরম দৃষ্টান্ত।

নেতাজীর জন্মস্থল

নিম্নলিখিত সংবাদটি দেশের জনসাধারণের অধিকাংশকেই আনন্দ দান করিবে। দেশপ্রেমের জ্বলন্ত পাবক-সম প্রতীকের জন্মস্থল এক মহাতীর্থে পরিণত হওয়া উচিত। দরিদ্রের সেবা সেরূপ স্থলের উপযুক্ত কার্য্য :

"কটক, ১০ই আগষ্ট—অদ্য এখানে জানা গেল, উড়িষ্যা সরকার স্বর্গত শরৎচন্দ্র বসুর উত্তরাধিকারিগণের নিকট হইতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মস্থান, কটকের 'জানকীনাথ ভবন' খরিদের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

মালিকানা স্বত্ব হস্তান্তরিত হওয়ার পর নেতাজী সেবাসদনকে ঐ ভবনটি প্রদানের প্রশ্ন বিবেচনা করা হইবে। এই ভবনটিও পাওয়া যাইবে, এইরূপ অনুমান করিয়া উক্ত সেবাসদন গত বৎসর হইতে জানকীনাথ ভবনের ঠিক বিপরীত দিকে, এক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে একটি হাসপাতাল স্থাপন করিয়াছেন।"

দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন ও রাও কমিটি

দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের কার্যকলাপ লইয়া কিছুদিন যাবৎ দেশে আলোচনা চলিতেছে। কর্পোরেশনের ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা কি হইতে পারে সে সম্বন্ধে অভিমত দেওয়ার জন্য ভারত-সরকার রাও কমিটিকে নিযুক্ত করেন। রাও কমিটি অভিমত দিয়াছেন, সরকারী কর্পোরেশনের নীতি হইতেছে যে, মন্ত্রী-পরিষদের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা থাকিবে না এবং কর্পোরেশনের উপর দেশের আইন-পরিষদ ও গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত। বিভাগীয় মন্ত্রী কেবলমাত্র সাধারণ নীতি নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন, কর্পোরেশন নিজে বিশদ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে। এই সম্বন্ধে কমিটি অধ্যাপক হ্যসনের মত অনুমোদন করিয়া বলেন, জাতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে এবং সরকারী কর্পোরেশনের দৈনন্দিন কার্য্যকলাপের উপর দেশের আইন-পরিষদের কোন ক্ষমতা না থাকাই বাঞ্ছনীয়। রাও কমিটির মত এই যে, যদি আইন-পরিষদে সরকারী কর্পোরেশনের কার্য্য-কলাপের উপর প্রশ্ন করিবার রীতি প্রচলিত থাকে তাহা হইলে কর্পোরেশন নিজেদের দায়িত্ব সব সময়ে এড়াইয়া চলার চেষ্টা করিবে, অর্থাৎ, কোন কাজ করা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিবার দায়িত্ব নিজেরা সহজে গ্রহণ করিবে না। ফলে কর্পোরেশনের কার্য্যের ব্যাঘাত হইবে—যে দোষ সরকারী বিভাগসমূহের বিশেষত্ব।

এই ব্যাপারে রাও কমিটি এষ্টিমেট কমিটি হইতে ভিন্ন মত পোষণ করেন। এষ্টিমেট কমিটির মতে দেশের যাবতীয় নদী-উন্নয়ন পরিকল্পনার উপর কেন্দ্রীয় আইন-পরিষদের পূর্ণ ক্ষমতা থাকিবে এবং

পূর্ব্বসম্মতি প্রয়োজন। রাও কমিটি আইন-পরিষদের এইরূপ ক্ষমতার বিপক্ষে। দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনে কোন সভ্য নিয়োগ করিতে হইলে সংশ্লিষ্ট প্রদেশগুলির অনুমোদন প্রয়োজন হয়—রাও কমিটি এইরূপ অনুমোদনের বিপক্ষে। কমিটি বলেন যে, এই প্রকার একটি জাতীয় কর্পোরেশনে প্রাদেশিক ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব নির্দ্ধারণ করা অবাঞ্ছনীয়। রাও কমিটির মতে সরকারী কর্পোরেশনগুলির নিম্নলিখিত দায়িত্ব ও ক্ষমতা থাকিবে :

১। যখন কোন পরিকল্পনা বিশদভাবে অনুসন্ধান করা হইয়াছে এবং গবর্মেণ্ট নির্দ্দিষ্ট হিসাব অনুমোদন করিয়াছেন কেবলমাত্র তখনই কর্পোরেশন স্থাপন করা হইবে।

২। অনুমোদিত নির্দ্দিষ্ট হিসাবের মধ্যে কর্পোরেশনের পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করিবার ক্ষমতা থাকিবে, এই ব্যাপারে কর্পোরেশন সম্পূর্ণ স্বাধীন। ইহা পরিকল্পনার কোন পরিবর্ত্তনসাধন করিতে পারিবে না। কেবলমাত্র গবর্মেণ্ট পরিকল্পনার পরিবর্ত্তন করিতে পারেন।

৩। যদি পরিকল্পনার খরচ বৃদ্ধি করিতে হয় তাহা হইলে কর্পোরেশনকে গবর্মেণ্টের নিকট তদনুযায়ী প্রস্তাব করিতে হইবে।

৪। পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ হইবার পর ইহার ব্যবসায়িক ব্যবহারের সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকিবে কর্পোরেশনের হাতে। সেচ, যানবাহন, বন্যানিয়ন্ত্রণ, বিদ্যুৎসরবরাহ প্রভৃতি কর্পোরেশন কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে।

৫। অব্যবসায়িক কার্য্যাবলী যথা, ভূমিসংরক্ষণ, বনবৃদ্ধি ইত্যাদির পরিকল্পনা কর্পোরেশন কর্ত্তৃক সরকারের নিকট পেশ করা হইবে। সরকারী অনুমোদন অনুযায়ী এইরূপ পরিকল্পনাসমূহ কার্য্যকরী করা হইবে।

৬। কর্পোরেশনের বাজেট প্রস্তাব সরকারী অনুমোদনসাপেক্ষ।

৭। ১৯৫৩ সালের "এয়ার কর্পোরেশনস্ এক্ট" অনুযায়ী গবর্মেণ্টের ক্ষমতা থাকিবে নদী-উন্নয়ন কর্পোরেশনগুলিকে তাহাদের কর্ত্তব্যপালনের জন্য নির্দ্দেশ দেওয়ার।

কমিটির অভিমত সম্বন্ধে অনেক কিছু বলিবার আছে। তবে ইহা নিশ্চিত যে, সরকারী কর্পোরেশনগুলির গলদ ও অনিয়মিত কার্য্যাবলী ভারতীয় আইন-পরিষদ ও এষ্টিমেট কমিটির অনুসন্ধানী দৃষ্টির দ্বারাই প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাদের অত্যধিক স্বাধীনতাই ইহাদের গলদের কারণ—স্বাধীনতার অভাব নহে। কর্পোরেশনগুলির নিজেদের কার্য্যাবলী নিয়ন্ত্রণের স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন ঠিকই, কিন্তু সেই স্বাধীনতার ব্যবহার আইনসঙ্গত হওয়া চাই। যাঁহারা টাকা দিতেছেন—অর্থাৎ গবর্মেণ্ট—তাঁহাদের কাছে কর্পোরেশনগুলি অবশ্যই দায়ী থাকিবে। সরকারী কর্পোরেশনগুলি যৌথ কোম্পানীর সামিল যাহার শেয়ার-হোল্ডার ভারতীয় আইন-পরিষদ, কেন্দ্রীয় সরকার হইতেছেন বোর্ড অব ডিরেক্টার্স এবং কর্পোরেশনের কার্য্যকরী সমিতি হইতেছেন ম্যানেজিং এজেন্টস। আইন-পরিষদ কর্পোরেশনের কার্য্যকরী সমিতি দ্বারাই পরিচালিত হইবে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনসাপেক্ষ থাকিবে। মূল গলদ হয় কর্পোরেশন গঠনে যোগ্য লোকের অভাবে। আমাদের মনে হয় সেখানে যোগ্যতর লোক বসাইলে অনেক দোষ শোধরান যায়।

পাটশিল্পে সঙ্কট

ভারতের পাটশিল্প বর্ত্তমানে সঙ্কটের মধ্য দিয়া যাইতেছে। শিল্পজাত পাটদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে জমিয়া গিয়াছে। গত বৎসর ৯৪৫ হাজার টন শিল্পজাত পাটদ্রব্য তৈয়ার হয় এবং তাহার আগের বৎসর হইয়াছিল ৮৫৮ হাজার টন। গত বৎসর মিলগুলি মোট ৭.৩৫ কোটি বেল কাঁচা পাট পায় এবং ভারত বিভাগের পর তাহারা এই প্রথম বার প্রয়োজনমত কাঁচা পাটের সরবরাহ পাইয়াছে। এই বৎসর জুন মাসে মিলগুলির নিকট মোট ১৩৩ হাজার টন উৎপন্ন পাটদ্রব্য মজুত ছিল।

বিদেশে ভারতীয় পাটদ্রব্যের চাহিদা ইদানীং হ্রাস পাইতেছে। ইহার প্রধান কারণ—ইউরোপের জুটমিলগুলির প্রতিযোগিতা, কাগজ ও কাপড়ের ব্যাগের অধিকতর ব্যবহার এবং পাকিস্থানী কাঁচা পাটের সাহায্যে পৃথিবীর বহু দেশে নূতন পাটশিল্প স্থাপন। পাটজাত দ্রব্যের বাজার বৃদ্ধি করিবার জন্য ভারতবর্ষ আমেরিকা, ব্রিটেন, অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ডে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিল।

ভারতের পাটদ্রব্যের রপ্তানী হ্রাস পাইবার আরও দুইটি কারণ হইতেছে অত্যধিক রপ্তানী শুল্ক ও উচ্চশ্রেণীর পাট-উৎপাদন হ্রাস। এই বৎসর মার্চ মাস হইতে ব্যাগের উপর রপ্তানী শুল্ক টন প্রতি ১৭৫ টাকা হইতে ৮০ টাকায় হ্রাস করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু পাট-কাপড়ের উপর রপ্তানী শুল্ক টন প্রতি ২৭৫ টাকায় অপরিবর্ত্তিত আছে। ব্যাগের উপর হইতে রপ্তানী শুল্ক হ্রাস করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও আশানুরূপ রপ্তানী বৃদ্ধি পায় নাই। এইজন্য ভারতীয় জুট-মিলস এসোসিয়েশন ঠিক করিয়াছেন যে, মিলগুলির শতকরা সাড়ে সাত ভাগ তাঁত বন্ধ করিয়া রাখিবেন। গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া দিয়াছেন।

চলতি বৎসরে পাটের বাজার উঠিবে আশা করা যাইতেছে। কিন্তু এই বৎসর পাকিস্থান ও ভারতবর্ষ উভয় দেশেই কাঁচা পাটের উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে, ফলে পাটের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। তাহার জন্য কাগজ ও কাপড়ের ব্যাগ অপেক্ষাকৃত সস্তা হইবে এবং পাট-ব্যাগকে কঠিনতর প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইবে।

ইউরোপের মিলগুলি পাকিস্থানী পাট আর সস্তায় পাইবে না। পাকিস্থান ভারতে রপ্তানী পাটের উপর হইতে অতিরিক্ত শুল্ক তুলিয়া লওয়াতে ভারতীয় ও ইউরোপীয় মিলগুলি একই মূল্যে পাকিস্থানী পাট পাইবে। অধিকন্তু, এই বৎসরের জুলাই মাস হইতে ভারত-সরকার কয়েক প্রকার পাটদ্রব্যের উপর হইতে রপ্তানী-শুল্ক একেবারে তুলিয়া লইয়াছেন। ইহাতে রপ্তানী বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু ভারতীয় মিলগুলির উন্নত ধরণের যন্ত্র অতীব প্রয়োজন, তাহা না হইলে ইউ-

রোপীয় মিলগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিবে না।

সদ্যপ্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, বিদেশে ভারতের পাটদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং কাঁচা পাটের মূল্যও বাড়তির দিকে।

ষ্টার্লিং চুক্তি

গত ২০শে জুলাই ভারত ও ব্রিটেন ষ্টার্লিং ব্যালান্স খরচ সম্বন্ধে একটি চুক্তি সহি করিয়াছে। এই চুক্তি ১৯৫৭ সনের ৩০শে জুন পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। তবে এই নূতন চুক্তিতে নূতন কোন সর্ত যোগ করা হয় নাই, বর্তমান চুক্তিগুলিকে অনুমোদন করা হইয়াছে মাত্র। ভারতবর্ষের ষ্টার্লিং ব্যালান্স দুইটি কারণে জমা হইয়াছে। প্রথমতঃ, ভারতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের খাতে উদ্বৃত্ত বিলাতে ষ্টার্লিঙে জমা রাখা হয়, এবং দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ মিত্রশক্তিকে যে সকল সমরোপকরণ সরবরাহ করে সেই বাবদ ভারতের ষ্টার্লিং আয় প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এই জমা ষ্টার্লিং ভারতের সম্পত্তি এবং ব্রিটেন এককালীন শোধ দিতে অসমর্থ হওয়ায় কিস্তিতে শোধ দেওয়ার চুক্তি করা হইয়াছে। ১৯৪৭ সনের আগষ্ট মাসে প্রথম ষ্টার্লিং চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিলাতে ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ডে দুইটি হিসাব খুলিয়াছে—১নং একাউণ্ট ও ২নং একাউণ্ট। তখন ভারতের মোট জমা ষ্টার্লিঙের পরিমাণ ছিল প্রায় ষোল শ' কোটি টাকা। চলতি হিসাব ১নং একাউণ্টে জমা থাকিবে এবং বাকী পরিমাণ ষ্টার্লিং মেয়াদী জমা হিসাবে ২নং একাউণ্টে জমা আছে।

এই বৎসরের জুলাই মাসের চুক্তি অনুসারে চলতি হিসাবে (১নং একাউণ্টে) ৩১০ মিঃ পাঃ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের চালু নোটের বিপক্ষে জমা থাকিবে। এই জমা ষ্টার্লিং চলতি খরচের জন্য ব্যবহার করা যাইবে না। ইহা ব্যতীত ১নং একাউণ্টে ২নং একাউণ্ট হইতে বৎসরে ৩৫ মিঃ পাঃ বদলী করা হইবে এবং এই টাকা আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের জন্য খরচ করা যাইবে। ১নং একাউণ্টে ৩১০ মিঃ পাঃ ব্যতীত কার্যকরী জমার পরিমাণ ৩০ মিঃ পাঃ ন্যূন জমা হিসাবে থাকিবে। ইহার পরিমাণ হ্রাস পাইলে ২নং একাউণ্ট হইতে জমা ষ্টার্লিং বদলী করা হইবে—কিন্তু এই বদলীর পরিমাণ বৎসরে ৩৫ মিঃ পাঃ'র বেশী হইতে পারিবে না। এই পরিমাণ ষ্টার্লিং হইতে বৎসরে ১৫ মিঃ পাঃ ডলার খরচের জন্য পাওয়া যাইবে।

গত কয়েক বৎসরের ষ্টার্লিং খরচ হইতে ইহা প্রমাণ হয় যে, ভারতবর্ষ বৎসরে যে পরিমাণ ষ্টার্লিং পাইতে পারে তাহার অনেক কম খরচ করে। ১৯৫১ সনের ১লা জুলাই ভারতের মোট মজুত ষ্টার্লিঙের পরিমাণ ছিল ৬৪৩.০৬ মিঃ পাঃ—ইহার মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত ছিল ৯০ মিঃ পাঃ ১নং একাউণ্টে। চুক্তি অনুসারে ভারতবর্ষ এই দুই বৎসরে এই ৯০ মিঃ পাঃ ব্যতীত আরও ৭০ মিঃ পাঃ ষ্টার্লিং খরচ করিতে পারিত। যদি ভারতবর্ষ এই মোট ১৬০ মিঃ পাঃ ধার্য্য ষ্টার্লিং হইতে খরচ করিত তাহা হইলে এই বৎসরের জুন মাসে ভারতের জমা ষ্টার্লিঙের পরিমাণ হ্রাস পাইয়া ৪৮৩.০৬ মিঃ পাঃ দাঁড়াইত। কিন্তু এই বৎসরের জুলাই মাসে ভারতের মজুত ষ্টার্লিঙের পরিমাণ ছিল ৫৩৩.৬৮ মিঃ পাঃ, অর্থাৎ নিয়মমত খরচ করিলে যাহা থাকিত তাহার চেয়েও ৫০.৬২ মিঃ পাঃ বেশী আছে। এই উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং লইয়া ভারতবর্ষ আগামী তিন বৎসরে মোট ১৫৫.৬২ মিঃ পাঃ খরচ করিতে পারিবে।

গম পরিস্থিতি

সম্প্রতি যে আন্তর্জাতিক গম চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে তাহাতে ব্রিটেন যোগ দেয় নাই, কারণ গম-উৎপাদক দেশগুলি এবারে গমের মূল্য বুশেল প্রতি ৫ সেণ্ট বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছে। গত বারে গমের বুশেল প্রতি সর্ব্বোচ্চ মূল্য ছিল ২ ডলার, এবারে চুক্তিমূল্য হইয়াছে বুশেল প্রতি ২.০৫ ডলার। ভারতবর্ষ চুক্তিতে যোগ দিয়াছে, কিন্তু ব্রিটেন দেয় নাই। আন্তর্জাতিক গমের বাজারে ব্রিটেনই হইতেছে সবচেয়ে বড় ক্রেতা। সে এবারে পৃথিবীর খোলা বাজার হইতে গম কিনিবে স্থির করিয়াছে, তাই আন্তর্জাতিক চুক্তির মধ্যে এবারে আসে নাই। এই চুক্তি অনুসারে বিক্রেতা দেশগুলি গমের নির্দ্ধারিত সর্ব্বোচ্চ মূল্য অর্থাৎ বুশেল প্রতি ২.০৫ ডলারের বেশী দাবী করিতে পারিবে না, কিন্তু বিক্রেতা দেশগুলি যদি নির্দ্ধারিত সর্ব্বনিম্ন মূল্য অর্থাৎ বুশেল প্রতি ১.৫৫ ডলারে বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক হয় তাহা হইলে ক্রেতা দেশগুলি সেই মূল্যে কিনিতে বাধ্য থাকিবে। এই সর্ত্ত ব্যতীত ক্রেতা এবং বিক্রেতা দেশগুলি পৃথিবীর মুক্ত বাজারে যে দামে ইচ্ছা এবং যে কোনও পরিমাণে ক্রয়-বিক্রয় করিতে পারিবে। ব্রিটেন আন্তর্জাতিক গম-চুক্তিতে যোগ না দিয়া বুদ্ধিমানের কাজ করিয়াছে।

এ বৎসর গমের উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায় আন্তর্জাতিক বাজার হইয়াছে ক্রেতার বাজার। আর্জেন্টিনা, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর প্রধান গম-উৎপাদক দেশ, তবে আর্জেন্টিনা আন্তর্জাতিক চুক্তিতে যোগ দেয় নাই। ১৯৫৩-৫৪ সালে এই চারিটি দেশের মোট সরবরাহের পরিমাণ (অর্থাৎ গত বৎসরের উদ্বৃত্ত ও এ বৎসরের উৎপাদন মিলিয়া) দাঁড়াইয়াছে ৩৩৫ কোটি বুশেল—গত বৎসরের সরবরাহের পরিমাণ ছিল ৩১৪ কোটি বুশেল। আর্জেন্টিনার গত বৎসরের উদ্বৃত্ত গমের পরিমাণ আছে ১৮ কোটি বুশেল, অষ্ট্রেলিয়ার ১০ কোটি বুশেল, কানাডার ৪৩ কোটি বুশেল এবং আমেরিকার ৫৮ কোটি বুশেল। এই দেশগুলির চলতি বৎসরের উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে আর্জেন্টিনার ২৯ কোটি বুশেল, অষ্ট্রেলিয়ার ১৭ কোটি বুশেল, কানাডার ৩৯ কোটি বুশেল এবং আমেরিকার ১১৭ কোটি বুশেল। ইহাদের আভ্যন্তরিক খরচ হইবে ১০৬ কোটি বুশেল এবং রপ্তানীর জন্য উদ্বৃত্ত থাকিবে ২২৮ কোটি বুশেল। এই বৎসর রপ্তানী হইবে প্রায় ৮৮ কোটী বুশেল (গত বৎসর হইয়াছিল ৮০ কোটি বুশেল) এবং পরের বৎসরের জন্য মজুত থাকিবে ১৪০ কোটি বুশেল।

অধিক উৎপাদনের জন্য গম প্রত্যেক বৎসরই উদ্বৃত্ত থাকিয়া যাইতেছে, ফলে গমের মূল্য হ্রাস পাইতে বাধ্য। তাই এই বৎসর গমের মূল্য বৃদ্ধি করা অত্যন্ত অযৌক্তিক হইয়াছে। অধিকন্তু ব্রিটেন চুক্তির বাহিরে রহিয়াছে এবং সে জোর দিবে যাহাতে মুক্ত বাজারে গমের মূল্য আরও হ্রাস পায়। তবে একথাও ঠিক যে, যদিও ক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকিবে অল্প মূল্যে গম ক্রয়ের জন্য, কিন্তু বিক্রেতাদের সংখ্যা অল্প হওয়ায় তাহারা ক্রেতাদের এই প্রতিযোগিতা অনেকাংশে রোধ করিতে পারিবে। গত বৎসর ২২.৭ মিঃ টন গম রপ্তানী হইয়াছিল, তার মধ্যে ৭.৭ মিঃ টন গম রপ্তানী হইয়াছিল খোলা বাজার হইতে। এ বৎসর খোলা বাজার হইতে প্রায় ১২.৫ মিঃ টন গম রপ্তানী হইবে, কারণ ব্রিটেন এবারে খোলা বাজারের বড় ক্রেতা। তাই এবারে নিয়ন্ত্রিত বাজার হইতে মোট ১২ মিঃ টন গম রপ্তানী হইবার সম্ভাবনা। এই অবস্থায় আমেরিকা মুশকিলে পড়িয়াছে।

ভারতে আফিম উৎপাদন

অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে আফিমের প্রচলন থাকিলেও ঠিক কি ভাবে ইহা ভারতে প্রচলিত হয় তাহা জানা যায় না। আফিমের আদি বাসস্থান এশিয়া মাইনর। সেখান হইতে আরবেরা ইহা ভারত ও চীনে লইয়া আসে। মুঘল যুগে আফিম উৎপাদন বাদশাহদের একচেটিয়া কারবার ছিল। তার পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সুপরিকল্পিত পন্থায় আফিমের ব্যবসা আরম্ভ করে এবং চীনে আফিম রপ্তানী করিয়া প্রভূত লাভ করে। এক সময়ে চীনে আফিম রপ্তানীই ছিল ভারতের রাজস্ব সংগ্রহের প্রধান পন্থা। আজ ৪০ বৎসর হইল চীনে ভারতের আফিম রপ্তানী একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের লাইসেন্স বলে আফিম বা পোস্ত গাছ আবাদ করিতে দেওয়া হয় এবং তাহাও উত্তরপ্রদেশ, মধ্য-ভারত, রাজস্থান ও হিমাচল প্রদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। চাষী তাহার উৎপন্ন সমস্ত কাঁচা আফিম নির্দিষ্ট মূল্যে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট বিক্রয় করিয়া দিতে বাধ্য থাকে।

কাঁচা ফুলের বীজাধারের গায়ে আঁচড়াইয়া দিলে যে রস বাহির হইয়া আসে তাহা হইতেই আফিম তৈরি হয়। আঁচড়ানো অংশ দিয়া নির্গত রস ফুলের আধারের গায়ের উপর জমিয়া থাকে ; পরের দিন তাহা সংগ্রহ করা হয় ; উহাই কাঁচা আফিম। চাষীরা ইহা রৌদ্রে শুকাইয়া সরকারী অফিসারের নিকট বিক্রয় করে। সরকারী আফিমের কারখানায় এই দ্রব্য আরও শোধন করিয়া আফিম তৈরি হয় এবং কেবলমাত্র গাজীপুর ও নীমচের সরকারী কারখানাতেই আফিম প্রস্তুত হয়। শোধনের পর অতি অল্প পরিমাণ আফিম বিক্রয়ের জন্য রাজ্য সরকারসমূহের মধ্যে বণ্টন করা হয় এবং বাকীটা বৈজ্ঞানিক ও ভেষজ প্রয়োজনে বিদেশে রপ্তানী করা হইয়া থাকে।

১৯০৫-৬ সনে ভারতে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার একর জমিতে আফিমের আবাদ হইত; আজ এখানে মাত্র ৭০ হাজার একর জমিতে আবাদ হয়। ১৯৫০-৫১ সনে ৬৯,৭২৫ একর জমিতে ১৩,৭০০ মণ এবং ১৯৫১-৫২ সনে ৫৬,১৯০ একর জমিতে ৯,০৪৫ মণ আফিম উৎপন্ন হইয়াছিল।

ভারতে আফিম আমদানী নিষিদ্ধ। স্বাধীনতা লাভের পর আফিমের রপ্তানী বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৭-৪৮ সনে ২৫ টন, ১৯৪৮-৪৯ সনে ৩৫ টন, ১৯৪৯-৫০ সনে ১৭২ টন এবং ১৯৫০-৫১ সনে ৩৪৮ টন আফিম রপ্তানী হইয়াছিল।

আবগারী আফিম কারখানার তৈরি মূল্যে রাজ্য সরকারগুলির নিকট বিক্রয় করা হয়। ইহার বর্তমান দর সের প্রতি ৫৬/০ আনা। ইহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন লাভ হয় না। গাজীপুর বা নীমচের কারখানা হইতে আফিম পাইবার পর রাজ্য সরকার তাহার উপর উচ্চহারে শুল্ক ধার্য করিয়া থাকেন। কোনও একটি রাজ্যে এক সের আফিমের উপর ১১২০ টাকা হারে শুল্ক ধার্য করা হইয়াছে। আফিম বিক্রয়ের জন্য অত্যধিক লাইসেন্স ফিও আদায় করা হইয়া থাকে। ফলে ক্রেতাদিগকে আফিমের জন্য অত্যধিক মূল্য দিতে হওয়ায় স্বভাবতঃই লোকে সহজে আফিমের মারাত্মক নেশার বশীভূত হইতে চাহিবে না। কেবলমাত্র আফিম রপ্তানী করিয়া এবং স্বদেশে ও বিদেশে আফিমজাত উপক্ষার বিক্রয় করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের লাভ হইয়া থাকে।

১৯৪৫ সনে কেন্দ্রীয় সরকার গাজীপুরের কারখানার সঙ্গে উপক্ষার তৈরির একটি কারখানাও খোলেন এবং এই সময় হইতেই আফিমজাত ভেষজ তৈরি আরম্ভ হয়। গত কয়েক বৎসর যাবৎ ঐ কারখানায় মরফিন, কোডেইন ও নারকোটিন এবং ইহাদের ধাতব লবণ তৈরি করা হইতেছে। ভেষজ হিসাবে এগুলি খুবই মূল্যবান। ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ উপক্ষারজাত যে সকল ভেষজ সরবরাহ করিতেছে তাহার তুলনায় এই কারখানায় প্রস্তুত দ্রব্যাদি অনেক উচ্চশ্রেণীর এবং দামও অনেক কম। ঐ কারখানা ভারতের উপক্ষার ও উপক্ষারজাত ভেষজের চাহিদা পুরাপুরি মিটাইয়া গত কয়েক বৎসর হইল মধ্যপ্রাচ্য, দূরপ্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের গুরুত্বপূর্ণ বাজারে এই সকল দ্রব্য রপ্তানী করিতেছে। গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া দেশে উপক্ষার বিক্রয়ের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৪৭-৪৮ সনে যেখানে ৫১৫ পাউণ্ড বিক্রয় হইয়াছিল, ১৯৫০-৫১ সনে সেখানে ১,৪৩০ পাউণ্ড এবং ১৯৫১-৫২ সনে ১,১৯৮ পাউণ্ড বিক্রয় হইয়াছে। ১৯৫১-৫২ সনে বিদেশে ১,৪৭৯ পাউণ্ড উপক্ষার রপ্তানী হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলি সম্প্রতি আফিম নিয়ন্ত্রণের যে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে এখন অতি অল্পসংখ্যক মাত্র আফিমখোর রহিয়া গিয়াছে। ভারত-সরকার এই ভয়াবহ নেশার মূলোৎপাটনের জন্য সেবনোপযোগী আফিম ধীরে ধীরে বিতরণের পরিমাণ হ্রাস করিয়া কয়েক বৎসর পর তাহা একেবারে বন্ধ করিয়া দিবেন।

বার্ণপুরে শ্রমিক আন্দোলন

গুলিচালনার ফলে সম্প্রতি বার্ণপুরে সাত জন শ্রমিকের মৃত্যু হওয়ায় দেশবাসীর দৃষ্টি বার্ণপুরের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। এই সম্পর্কে ৮ই শ্রাবণের "বর্দ্ধমান বাণী"তে স্বাক্ষরিত এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে জনাব আবদুস সাত্তার এম. পি. লিখিতেছেন, "মালিক বা মালিকপক্ষীয় ব্যক্তিগণই ইহার জন্য দায়ী। বেতন, মজুরী, বোনাস লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহা সালিশী বোর্ডের নিকট পাঠাইবার রীতি আছে। চটমিলের শ্রমিকেরা যে বোনাসের কথা তুলিয়াছে তাহা অযৌক্তিক মনে করিলে মালিকপক্ষ সালিশী বোর্ডের নিকট উপস্থিত করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা হয় নাই। আজকের দিনে মালিকের এ মনোভাব শোভনও নহে, বাঞ্ছনীয় নহে।"

মালিকেরা দাবি করিয়াছিলেন যেন শ্রমিকগণ ইউনিয়নের মারফত তাঁহাদের দাবি পেশ করেন। আপাতদৃষ্টিতে মালিকদের এই দাবি যুক্তিসঙ্গত মনে হইলেও সাত্তার সাহেব তাহা মানেন না; কারণ "বার্ণপুর ইউনিয়নের উপর শ্রমিকদের কোন আস্থা ছিল না—এই ইউনিয়নের কর্ম্মকর্তাকে তাহারা সন্দেহের চোখে দেখিত। মালিকপক্ষের অহেতুক ইউনিয়ন-প্রীতি তাহাদের এই সন্দেহকে আরও বাড়াইয়া তুলিল। ইউনিয়নের কার্য্য-নির্ব্বাহক পরিষদের পুনর্গঠন ও কর্ম্মকর্তাদের পুনর্নির্ব্বাচন শ্রমিকদের প্রধানতম দাবি হইল। এই দাবি মালিকপক্ষ মানিয়া লইলে এবং সরকার ইহার জন্য মালিকপক্ষকে চাপ দিলে বার্ণপুর বিরোধের মীমাংসা বহু পূর্ব্বে হইয়া যাইত।"

বার্ণপুরে এই শ্রমিক-মালিক বিরোধের দরুণ ইস্পাতের উৎপাদন হ্রাস পাইবার ফলে জাতীয় ক্ষতি হইতেছে। জনাব সাত্তার লিখিতেছেন, "মালিকের জিদের জন্য এই অস্বস্তিকর অবস্থা কারখানায় আর চলিতে দেওয়া জাতীয় স্বার্থে কোন প্রকারেই বাঞ্ছনীয় হইবে না।" ইতিমধ্যেই মীমাংসার যে প্রচেষ্টা সুরু হইয়াছে তিনি তাহাকে অভ্যর্থনা জানান।

এই ব্যাপার সম্পর্কে একটি বিষয়ে দুই-তিনটি কাগজ ভিন্ন আর সকলেই দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজনীয় মনে করেন নাই, সুতরাং সম্পাদকীয় মন্তব্যে তাহা বাদ পড়িয়াছে। সেটি হইল সালিশী হইবে কাহাকে লইয়া? এই শোচনীয় ব্যাপারে কংগ্রেসের মধ্যে দলাদলি হওয়ার ফলে ইউনিয়ন দখলের পালা চলিতেছে। ফলে শ্রমিক ও মালিক দুই-ই নাজেহাল হইতেছে। ইউনিয়ন যদি এক দল নেতাকে বহিষ্কার করিয়া অন্য দলকে প্রতিষ্ঠিত করে তবেই ইহার মীমাংসা হয়। যদি তখনও মালিক সালিশীতে আপত্তি করিত তখন ঐরূপ সম্পাদকীয় যুক্তিযুক্ত হইত।

শ্রমিক, মালিক ও সরকার এই তিন পক্ষ লইয়া এইরূপ সমস্যার সমাধান হয়। শ্রমিক যদি সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে দাবি উপস্থিত না করে তবে তিনের স্থলে বহু পক্ষ হইয়া যায় ও সালিশ সম্ভব হয় না। এ কথা ত সকলেই জানে। কিন্তু সে বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া মালিককে দোষী সাব্যস্ত করিয়া লেখাও সহজ এবং তাহাতে কোনও তীব্র সমালোচনার ভয়ও থাকে না।

এ ক্ষেত্রে যাঁহারা ইউনিয়নে দলাদলি আনিয়া উহাকে ক্ষীণবল ও সালিশীর অযোগ্য করিয়া ফেলিতেছেন, তাঁহাদের দোষ কাহারও অপেক্ষা কম নহে। শ্রমিকেরা বার্ণপুর ইউনিয়নের উপর আস্থাবান নহে ইহা বলা তখনই সম্ভব যখন তাহাদের অধিকাংশ উহার কর্তৃপক্ষের উপর অনাস্থা প্রস্তাব সম্পূর্ণ অহিংস ভাবে পাস করিতে পারিবে। বর্তমানে শ্রমিক লইয়া রাজনৈতিক ছিনিমিনি খেলা চলিতেছে, শ্রমিকের স্বার্থে নয়, রাষ্ট্রের স্বার্থে নয়, শুধু দলগত স্বার্থের কারণে। এ কথা অস্বীকার করা চলে না।

বর্দ্ধমান হইতে চাউল রপ্তানী বন্ধের দাবী

২৪শে জুলাই "দামোদর" পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ যে, বর্দ্ধমান পৌরসভার অধিবেশনে এক প্রস্তাবে আগামী শীতকালে ফসল না হওয়া পর্য্যন্ত বর্দ্ধমান জেলার বাহিরে ধান ও চাউল রপ্তানী বন্ধ করিয়া অবিলম্বে শহরের সকল মহল্লায় সকল শ্রেণীর লোকদের একটি করিয়া এবং মিউনিসিপালিটির কর্মচারীদের জন্য স্বতন্ত্র একটি দোকান হইতে নির্দ্ধারিত মূল্যে চাউল সরবরাহ করিতে সরকারকে অনুরোধ করা হয়। এ সম্পর্কে সরকারের সহিত আলোচনা চালাইবার জন্য পৌরপতি ও অপর দুই জন সদস্যের উপর ভার দেওয়া হইয়াছে।

চাউলের দাম নামাইবার জন্য জেলা হইতে রপ্তানী বন্ধ করার দাবী এতদিন পরে হইতেছে! সঙ্গে সঙ্গে সস্তায় চাউল বিক্রয়ের ব্যবস্থাও চাওয়া হইতেছে। দুই-ই সঙ্গত সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই সঙ্গে লেভী প্রথার নিন্দাবাদের সামঞ্জস্য কিরূপে থাকে আমরা বুঝি না। ধানের পুঁজি যাহার সে যদৃচ্ছ মূল্যে যেখানে খুসী বিক্রয় করিবে এবং গরীবে সস্তায় চাউল পাইবে এরূপ দাবী এক বাংলা দেশেই সম্ভব।

উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত এজেন্সীর শাসন-সংস্কার

সম্প্রতি এক সংবাদে প্রকাশ, ভারত-সরকার আসামের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত এজেন্সী (নেফা)র শাসন সংস্কারের যে প্রস্তাব আনিয়াছিলেন আসামের বিভিন্ন দলের সম্মিলিত প্রতিবাদ-আন্দোলনের পর তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। এই আন্দোলনকে কংগ্রেস, কম্যুনিষ্ট, প্রজা-সমাজতন্ত্রী প্রভৃতি সকল দলই সমর্থন করেন। কংগ্রেস এই আন্দোলনে যোগদান করিবার অব্যবহিত পরেই অবশ্য সরিয়া দাঁড়ায়। কম্যুনিষ্টরাও এ সম্পর্কে তাহাদের মনোভাব বিশ্লেষণ করিয়া বিবৃতি দিতে বাধ্য হয়। কার্য্যতঃ দেখা যায় যে, ভারত-সরকারের মনোভাব পরিবর্তনের সংবাদ প্রকাশিত হইবার পরেও প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল ও অসম জাতীয় মহাসভা এবং আসাম উপত্যকার কয়েকটি সংবাদপত্র আন্দোলন পরিত্যাগের পক্ষপাতী নহেন।

নেফা বলিতে আসামের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তবর্তী পার্ব্বত্য

জাতীয় বিস্তীর্ণ এলাকাকে বুঝায়। এই অঞ্চল চীন, ব্রহ্মদেশ ও তিব্বতের সীমান্তে। উহা বহু জাতির বাসস্থান এবং ইহার রাজনৈতিক গুরুত্ব খুবই বেশী। এই অঞ্চলে বহু ভাষা প্রচলিত আছে এবং অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় নয় লক্ষ। তাহারা প্রকৃতপক্ষে আদিম অবস্থায় রহিয়াছে। এত দিন পর্যন্ত এই অঞ্চল আসাম রাজ্যের শাসন এলাকার বাহিরে রাখিয়া কেন্দ্রীয় সরকার আসামের রাজ্যপাল মারফত সরাসরি উহার শাসনকার্য চালাইয়া আসিতেছিলেন। সরকারী প্রস্তাবে উক্ত এলাকায় একজন উচ্চক্ষমতা-সম্পন্ন কমিশনার নিয়োগের কথা বলা হইয়াছিল। এই প্রস্তাবের বিরোধিতার কারণস্বরূপ বলা হয় যে, উক্ত প্রশাসনিক সংস্কারই ভারত-সরকারের লক্ষ্য নহে---আরও ব্যাপক পার্বত্য অঞ্চল ও সমতলভূমি (নাগা পাহাড়, লুসাই পাহাড়, উত্তর কাছাড় এবং হয়ত বা কাছাড় জেলা, মণিপুর ও ত্রিপুরা রাজ্য ইত্যাদি) লইয়া একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। এরূপ করা হইলে অতঃপর আসামের অবশিষ্ট অংশ হয়ত আর 'ক' শ্রেণীর রাজ্যরূপে পরিগণিত না হইয়া একটি চীফ কমিশনার-শাসিত রাজ্যে পরিণত হইবে।

এই সম্পর্কে এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে "যুগশক্তি" লিখিতেছেন, "উল্লিখিত আন্দোলনের গতি-প্রকৃতির প্রতি যাঁহারা মনোযোগ দিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, একমাত্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় কতিপয় নেতাই ইহাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। সমতল বা পার্বত্য এলাকাবাসী উপজাতীয় নেতাদের কেহ এই আন্দোলনে যোগ দেওয়া দূরে থাকুক ইহার সপক্ষেও কোন অভিমত দিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ পায় নাই। উপরন্তু কোন উপজাতীয় মন্ত্রীর উক্তিতে বরং আন্দোলনকারীদের প্রতিকূল মনোভাবই ব্যক্ত হইয়াছে।"

৬ই শ্রাবণের "সুরমা" পত্রিকা ঐ বিষয়ের উপর এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিতেছেন, কমিশনার নিয়োগের প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া যাঁহারা বলিতেছেন যে ইহাতে আসাম খণ্ডিত হইবে তাঁহারা আসামের গোদ শাসনের অন্তর্গত শ্রীহট্ট জেলাকে ষড়যন্ত্র মূলে পাকিস্থানে পাঠাইতে দ্বিধা করেন নাই। "তাহাই সব নহে। আসাম সরকারের ভুলে র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ মতে ভারতের প্রাপ্য শ্রীহট্টের বারটি থানার বিশাল অঞ্চল দাবী না করায় আজও তাহা পাকিস্থানের অধীন রহিয়াছে। আসামের এই ভুলের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। সম্প্রতি কাছাড়ের হিন্দু-মুসলমান সাত জন এম. এল. এ. ও লোকাল বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, বার ও মোক্তার লাইব্রেরীর সম্পাদকগণ এক যুক্ত আবেদন করিয়া ঐ বারটি থানার এই বিষয় আসন্ন ইন্দো-পাক আলোচনার তালিকাভুক্ত করার দাবি করায় আসামের একখানি দৈনিক পত্রিকা উপহাস করিয়াছেন। উহারাই আবার আসামের disintegration-এর কথা তুলিয়া আজ হৈ চৈ আরম্ভ করিয়াছেন !!!"

পত্রিকাটি আরও লিখিতেছেন, "আমরা বাধ্যতামূলক না হইলে রাজ্যের গণ্ডীকে সঙ্কুচিত করার সমর্থন করি না···আসামের সীমানা সঙ্কুচিত না করিয়া সম্ভব হইলে শুধু নেফা কেন মণিপুর ও ত্রিপুরা রাজ্যসহ একই শাসন-ব্যবস্থার আমলে আনিতে পারিলে ভাল হইত। কিন্তু যে উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি থাকিলে তাহা সম্ভবপর—দুর্ভাগ্যক্রমে, আসামের শাসকবর্গের নিকট তাহার নিতান্ত অভাব। এইরূপ বিস্তীর্ণ এলাকার এতগুলি ভাষা ও কৃষ্টির বাহক বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির লোকগুলিকে একত্রিত রাখা, তাহাদের মনে আস্থা ও শ্রদ্ধা সৃজন করা বর্তমান নেতৃত্বের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। মণিপুর ও ত্রিপুরা দৃঢ়ভাবে আসামের অধীনে আসিতে অস্বীকার করিয়াছে। নেফার জনমত নিশ্চয়ই একই জবাব দিবে। আসামের অন্তর্গত পার্বত্য জেলাগুলির মধ্যে আসাম সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ক্রমবর্দ্ধমান। কৃষ্টিগত বিজয়ের অভিযান লক্ষ্য করিয়া সকলেই ক্ষুব্ধ।"

আসামে অনসমীয়াদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ

৬ই শ্রাবণ 'সুরমা' পত্রিকা "আসাম কোন্ পথে ?" শীর্ষক এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিতেছেন, "আসামে অনসমীয়া নিশ্চিহ্ন করার নীতি গৃহীত হইয়াছে। বিস্ময়ের কথা, ইহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন কোন দপ্তরও অংশীদার। দৃষ্টান্তস্বরূপ ডাকবিভাগের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। আসাম সার্কেল বলিতে ডাকবিভাগের ব্যবস্থামতে আসাম রাজ্য, মণিপুর ও ত্রিপুরা বুঝায়। এই এলাকার প্রধান ভাষা আসামী, বাংলা ও মণিপুরী। এই বিস্তীর্ণ এলাকায় অসমীয়ার সংখ্যা ৩০ লক্ষ, বাঙালীর সংখ্যা ৩২ লক্ষ ও মণিপুরীর সংখ্যা ১২ লক্ষের কম হইবে না। তথাপি ডাকবিভাগ নূতন বিধান করিয়া যাহাতে কাছাড় ও ত্রিপুরার বাঙালীরা ও মণিপুরীরা প্রতিযোগিতা করিতে না পারে তজ্জন্য এই সার্কেলের আঞ্চলিক ভাষা করিয়াছেন 'অসমীয়া'। বাঙালী ও মণিপুরী ছেলেরা অসমীয়া শিক্ষার সুযোগ না পাইবার ফলে প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে না, সুতরাং বিভাগীয় পরীক্ষায় খাটি অসমীয়ারাই কৃতিত্ব লাভ করিবে। পার্বত্য জাতীয় লোকদের জন্যও একই অন্তরায় সৃষ্টি করিয়া রাখা হইয়াছে। চাকুরীর ব্যাপার ছাড়াও শিক্ষাক্ষেত্রেও এই জাতীয় সঙ্কীর্ণতা থাকায় যোগ্য ছাত্ররা বৃত্তিশিক্ষা কলেজগুলিতে ভর্ত্তি হইতে পারে না। এই বৎসর কৃষিবিজ্ঞানে শতকরা একশত জন ফেল করিয়া যে রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছে তাহার প্রধান কারণ ছাত্র ভর্ত্তি-সম্পর্কিত সরকারী মূল নীতি। যোগ্য ছাত্ররা ভর্ত্তি হইতে পারে না, তাই অযোগ্য ছাত্র দ্বারা স্থান পূরণ করিতে হয়, সুতরাং ফল এইরূপ হইয়া থাকে। শিক্ষা ও চাকুরী ক্ষেত্রে ক্রমবর্দ্ধমান অযোগ্যতার ইহাই অন্যতম কারণ। কিন্তু সরকার নীতি পরিবর্তনে পরাঙ্মুখ।"

২০শে শ্রাবণ অপর এক সম্পাদকীয় মন্তব্য-প্রসঙ্গে "সুরমা" লিখিতেছেন, "কাছাড়, ত্রিপুরা, মণিপুর ও লুসাই পাহাড়কে লইয়া যখন ১৯৪৮ সালে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি পৃথক কংগ্রেস প্রদেশ গঠনের নির্দ্দেশ দেন তৎকালে এই অঞ্চলের স্থানীয় ভাষা বাংলা ও মণিপুরী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। পরবর্তীকালে উক্ত সিদ্ধান্তের

পরিবর্তন করিয়া এই ভূখণ্ডকে আসাম কংগ্রেসের অধীনস্থ করার নির্দেশ দিলেও স্থানীয় ভাষাকে মানিয়া লইতে আসাম প্রদেশ কংগ্রেসকে নির্দেশ দেন। ডাক বিভাগ অন্য বহু সার্কেলে একাধিক ভাষা স্থানীয় ভাষা রূপে মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু আসামের বেলা তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। এখানে একক সংখ্যাগুরু বাঙালী। অসমীয়ারা দ্বিতীয় স্থান ও মণিপুরী তৃতীয় স্থান অধিকার করে। এই অবস্থায় একমাত্র অসমীয়া ভাষা গ্রহণ করার কারণ আসাম রাজ্যের বর্তমান রাষ্ট্রনায়কদের মনস্তুষ্টি ব্যতীত কিছুই হইতে পারে না। আসাম, মণিপুর ও ত্রিপুরা রাজ্যের চিন্তাশীল ও দেশকল্যাণকামী ব্যক্তি মাত্রের কর্তব্য অবিলম্বে দুষ্ট চক্র হইতে এই এলাকাকে মুক্ত করা। আমরা আশা করি, নেহাত বাঁচিবার তাগিদে জনসাধারণ ইহাদের কর্তব্য পালনে পশ্চাৎপদ হইবেন না। রাজনৈতিক দলগুলির দুঃখজনক নীরবতা লক্ষ্য করিয়া কাছাড়ের সাংবাদিকগণ এই আহ্বান দিয়াছেন। ইহাদের এই আহ্বান কি ব্যর্থ হইবে?"

বাঙালীর দলাদলি ও সঙ্কীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি যতদিন থাকিবে ততদিন এই অবস্থা চলিবে। দশ জন যদি সমাজের বা দেশের উপকারের জন্য এইরূপ অন্যায় অনাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ান তবে লোভ দেখাইয়া বিশ জনকে তাঁহাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করান কিছুই মুশকিল নহে। আর ঐ বিশ জনের মধ্যে তথাকথিত "গণনায়ক"ও দু'চার জন থাকিবেন পালের গোদা হিসাবে। "সুরমা"-সম্পাদক যে রাজনৈতিক দলগুলির "দুঃখজনক নীরবতা" লক্ষ্য করিয়াছেন তাহারও মূলে দলগত স্বার্থ—যাহার সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বার্থও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। দেশে এখন সকল প্রকার নীচতা ও হীনতারই জয়গান চলিতেছে দলগত ভাবে ও ব্যক্তিগত ভাবে। বাঙালীর জীবন-সন্ধ্যায় এইরূপই হইয়া থাকে।

শিলচরে পাপ ব্যবসায়

২০শে শ্রাবণের "সুরমা" পত্রিকা লিখিতেছেন, "নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার ও উদ্বাস্তুদের দারিদ্র্যের সুযোগ লইয়া ঐ সব পরিবারের বয়স্কা কন্যাদের সর্বনাশের পথে টানিয়া আনিবার জন্য শিলচরে এক শ্রেণীর লোক পাপ ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে বলিয়া 'সুরমা' নির্ভরযোগ্য সূত্রে সংবাদ পাইয়াছে। কাজ সংগ্রহ করিবার ছলে ভীতি ও প্রলোভন দ্বারা নারী সংগ্রহ করা হয়। মালুগ্রাম ওয়ার্ডের বর্তমান রাজনীতি ক্ষেত্রে অতি পরিচিত জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে সম্প্রতি এই বিষয়ে নানা বৈঠকে প্রকাশ্য ভাবেই আলোচনা হইতেছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহার কর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় নাই।"

কলিকাতায় এই ঘৃণিত ব্যবসায় মাঝে অতি মুক্তভাবেই প্রসার লাভ করিয়াছিল। "মাসাজ ক্লিনিক" নামে বহু প্রতিষ্ঠানে এই পাপের ব্যাপার চলিতেছিল। ইহা ছাড়াও বহু অঞ্চলে নীচ লোকে অসংখ্য নারীকে পাপের পথে জীবিকা উপার্জনে লাগায়। দেশের লোকের দৃষ্টি এ বিষয়ে ইতিপূর্বেও আমরা বহু বার আকৃষ্ট করিয়াছি। কিন্তু ফল সেরূপ কিছু হয় নাই।

মানুষের অন্তরে যে পাশব প্রবৃত্তি সকল আছে, কিছুদিন যাবৎ সে সকলেরই উদ্দাম গতির পথ খুলিয়া দেওয়া হইতেছে। ফলে বাংলা দেশে দেড় শতাব্দীর সমাজ-সংস্কার যাহা হইয়াছিল তাহাও ধ্বংস হইতে চলিয়াছে।

সংযুক্ত কেরালা প্রদেশ গঠনের দাবী

উত্তরে গোকর্ণম্ হইতে দক্ষিণে কন্যাকুমারী এবং পূর্বে পশ্চিমঘাট হইতে পশ্চিমে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডের নাম কেরালা। অতি প্রাচীনকাল হইতেই কেরালা একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র ছিল। ৮৩২ সনে কয়েকজন সামন্ত প্রভুর মধ্যে এই দেশটি ভাগ হইয়া যায় এবং ব্রিটিশ আমলে এই ভাগ আরও স্পষ্ট হইয়া তিনটি একক গঠিত হয়, যথা (১) ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য, (২) কোচিন রাজ্য এবং (৩) মাদ্রাজ রাজ্যের অন্তর্গত পশ্চিম উপকূলের অঞ্চলগুলি। বর্তমানে ত্রিবাঙ্কুর এবং কোচিনের মিলন ঘটিয়াছে এখন বাকী অংশটুকু ইহাদের সঙ্গে জুড়িয়া দিলেই নূতন কেরালা রাজ্যের সংগঠন সম্ভব হইতে পারে।

সংযুক্ত কেরালার দাবী সর্বপ্রথম তোলেন কেরালা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি। ১৯৪৮ সনে কেরালা প্রাদেশিক কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির এক সভায় সংযুক্ত কেরালা রাজ্য গঠনের জন্য আন্দোলন করিবার উদ্দেশ্যে একটি সাব-কমিটি গঠিত হয়। ঐ সাব-কমিটির উদ্যোগে ত্রিচুরে একটি সম্মেলন হয় এবং তাহাতে সভাপতিত্ব করেন কোচিনের মহারাজা। ঐ সম্মেলনে ত্রিবাঙ্কুর হইতে ৪৫০ জন প্রতিনিধি, কোচিন হইতে ২০০, মালাবার, কাসেরগোড় এবং গুদালুর হইতে ৬৫০ জন এবং কেরালার বাহিরের মলয়ালীদের ৪০ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। সম্মেলনে ১০০ জন সদস্য লইয়া একটি পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৪৯ সনে ত্রিবাঙ্কুরের আলওয়েতে দ্বিতীয় সম্মেলন হয় এবং তাহাতে উক্ত পরিষদের সভ্যগণ, ত্রিবাঙ্কুর এবং কোচিন বিধান-পরিষদের সভ্যগণ, কেরালা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভ্যগণ এবং মালাবার হইতে নির্বাচিত মাদ্রাজ বিধানসভা ও আইন-পরিষদের সদস্যগণ এবং গণপরিষদের কেরালা হইতে নির্বাচিত সদস্যগণ যোগদান করেন। ১৯৪৯ সনের নবেম্বর মাসে পালঘাটে অনুরূপ আর একটি সম্মেলন হয়। এই সকল সম্মেলনের ফলে সংযুক্ত কেরালার দাবী জনগণের মনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

সংযুক্ত কেরালা প্রদেশ গঠনের দাবী যে খুবই যুক্তিযুক্ত, ডার কমিশন এবং জয়পুর কংগ্রেস নিয়োজিত ভাষাভিত্তিক রাজ্য কমিটিও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। উভয়েই স্বীকার করিয়াছেন যে, এতগুর বহুভাষী অঞ্চলের সহিত যুক্ত থাকার ফলে অতীতে কেরালার যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। কমিশন স্বীকার করিয়াছেন, নিজ সরকারের অধীনে কেরালার অবস্থা উন্নতিলাভ করিবে।

ডার কমিশন ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের জন্য যে কয়টি সর্ত আরোপ করিয়াছেন কেরালা তাহার প্রত্যেকটি পূরণ করে। শাসনতান্ত্রিক দিক হইতে ইহার সুদৃঢ় ভিত্তি আছে। ভৌগোলিক

ঐতিহ্য সকল দিক হইতেই কেরালা স্বতন্ত্র রাজ্যরূপে পরিগণিত হইবার দাবী রাখে। ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোতে কেরালা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। প্ল্যানিং কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য হইতে দেখা যায় যে, কেরালা হইতে লঙ্কা রপ্তানী করিয়া ভারত ২০ কোটি টাকা বিদেশী মুদ্রা পায়।

সম্প্রতি ১৯৫৩ সনের জুন মাসে মলয়াল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি এক প্রস্তাবে সংযুক্ত কেরালা গঠনের বিরুদ্ধে মত দিয়াছে, এই মলয়াল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি মালাবার জেলা-কংগ্রেস কমিটির নামান্তর মাত্র। অন্ধ্র-প্রদেশ গঠিত হইবার পর অবশিষ্ট মাদ্রাজ রাজ্যের সহিত ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের মিলনের সুপারিশ ইঁহারা করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গত সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস মালাবার জেলা হইতে লোকসভার ছয়টি আসনের মধ্যে মাত্র একটি এবং মাদ্রাজ বিধানসভার ২৯টি আসনের মাত্র ৪টি লাভ করে।

৮ই আগষ্টের "ভিজিল" পত্রিকায় উপরোক্ত তথ্য পরিবেশন করিয়া লোকসভার সদস্য কে. এ. দামোদর মেনন লিখিতেছেন, মালাবার কংগ্রেসের এই অদ্ভুত প্রস্তাবে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া কেরালার জনগণ সংযুক্ত কেরালা গঠনের আন্দোলন চালাইয়া যাইবেন।

আমরা—বাঙালীরাই দাবি ঠিক মত চালাইতে পারি না; সুতরাং অবস্থা "যে তিমিরে সেই তিমিরে" থাকিতেছে।

মাদ্রাজ রাজ্যের নূতন শিক্ষা পরিকল্পনা

সম্প্রতি মাদ্রাজের নূতন শিক্ষা-পরিকল্পনা সম্পর্কে রাজ্যের বিধান সভায় এক বিতর্কের সময় ভোটগণনার ফলে সরকার পক্ষ বিরোধী-দলের নিকট পরাজিত হন। এই নূতন শিক্ষা-পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে "ভিজিল" পত্রিকায় এক প্রবন্ধে মাদ্রাজ রাজ্য বিধানসভার সদস্য শ্রী টি. বিশ্বনাথন লিখিতেছেন যে, ৩২,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৮২ লক্ষ ছাত্র এই নূতন পরিকল্পনার প্রভাবে পড়িবে। পরিকল্পনার প্রণেতারা দাবী করেন যে, ইহার বলে আরও ৩৬ লক্ষ শিশু শিক্ষালাভের সুযোগ পাইবে। তাঁহারা বলেন, যে সকল ক্ষেত্রে বুনিয়াদী শিক্ষা সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই এই পরিকল্পনা সে সকল ক্ষেত্রেও সাফল্যমণ্ডিত হইবে। প্রথম দিকে প্রধানমন্ত্রী রাজাজী বলিয়াছিলেন, এই পরিকল্পনা যে কেবলমাত্র সার্বজনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের সাহায্য করিবে তাহাই নহে, ইহার ফলে গ্রাম্য কারিগরিশিল্পেরও প্রভূত উন্নতি সাধিত হইবে।

গোড়ার দিকে পরিকল্পনাটি যেভাবে উপস্থিত করা হইয়াছিল তাহা হইতে জানা যায় পরিকল্পনাটি মোটামুটি এইরূপ: (১) বিদ্যালয়ের ঘণ্টা সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা হইতে কমাইয়া তিন ঘণ্টা করা এবং দ্বিতীয় বার তিন ঘণ্টার আর এক ক্লাস করা। (২) বিদ্যালয়ের পরে শিক্ষক অথবা মাতা শিশুদিগকে গ্রামের বিভিন্ন কারিগরদের কারখানাতে কাজের জন্য লইয়া যাইবেন। (৩) রাখিবেন এবং তাহাদের উন্নতির সম্পর্কে রিপোর্ট দিবেন। বিদ্যালয়ের ঘণ্টা কমাইলেও অধীতব্য বিষয়ের সংখ্যা হ্রাস করা হইবে না।

প্রদেশের সর্বত্র সকল শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে এই পরিকল্পনার বিরোধিতা আসিয়াছে। অতিরিক্ত কোন পারিশ্রমিক না পাইয়াও ছয় ঘণ্টা খাটিতে হইবে বলিয়া শিক্ষকগণ ইহার বিরুদ্ধে। শিশুদের প্রকৃতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এই বলিয়া সমালোচনা করিয়াছেন যে, শিশুরা গ্রামে কারিগরদের কারখানা বা বাড়ীতে নিয়মিতরূপে শিক্ষানবিশী করিতে উৎসাহ বোধ করিবে না।

সমালোচকদের মধ্যে দ্রাবিড় কাঝাগম (Dravida Kazhagam) এবং দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাঝাগম (Dravida Munnatra Kazhagam)-এর সমালোচনাই সর্বাপেক্ষা তীব্র। দেশের সর্বত্রই এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হইতেছিল। তুতিকোরিনে গুলিবর্ষণের ফলে সাত জন নিহত হয়। এইরূপ অবস্থায় ২৯শে জুলাই বিধান সভায় পরিবর্তিত প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনার আলোচনা শুরু হয়। প্রধানমন্ত্রী অনেকবার বলিয়াছিলেন মাদক নিষেধ অপেক্ষাও এই পরিকল্পনা তাঁহার নিকট অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। তিনি এবং শিক্ষাসচিব বেতারে এ সম্পর্কে ভাষণ দেন। শিক্ষা-অধিকর্তাকে প্রাথমিক শিক্ষকদের সম্মেলন আহ্বান করিয়া পরিকল্পনা বুঝাইয়া দিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। ঐ দিন পরিষদ ভবনের চতুর্দিকে নগর-পুলিস আইনের ৪১ ধারা অনুযায়ী সকল শোভাযাত্রা এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা হয়।

জনৈক সদস্য ২৮ তারিখে স্পীকারের নিকট এক নোটিশে জানাইয়াছিলেন যে, ২৯ তারিখ তিনি উক্ত বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করিবেন। যখন সরকারপক্ষ হইতেই বিষয়টির অবতারণা করা হইল তখন তিনি তাঁহার নোটিশ প্রত্যাহার করেন। ভোটে যখন সরকারপক্ষের পরাজয় হইল তখন সরকারপক্ষ এই নোটিশ প্রত্যাহারের কথা উল্লেখ করিয়া যুক্তি দেখান যে, ভোটের ফলাফলের ফলে মন্ত্রিসভার প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করা হয় নাই, নচেৎ ঐ নোটিশ প্রত্যাহার করা হইত না। প্রধানমন্ত্রী রাজাজী তাঁহার বক্তৃতার পর দলনিরপেক্ষভাবে সকল সভ্যকে ইচ্ছামত (open vote) ভোটদানের জন্য আহ্বান জানান। বিরোধীপক্ষ হইতে কংগ্রেসদলের "হুইপ" তুলিয়া লওয়ার কথা ঘোষণা করিবার আহ্বান জানাইলে সরকারপক্ষ হইতে প্রধানমন্ত্রী কোন 'হুইপে'র অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কিন্তু স্পষ্টতঃই 'হুইপ' ছিল। বিরোধীপক্ষ প্রথমে পরিকল্পনাটি বাতিল করিয়া দিবার জন্য এক প্রস্তাব আনিলে তাহার পক্ষে ও বিপক্ষে সমান ভোট হয়। স্পীকার তাঁহার নির্ধারক ভোট (casting vote) দ্বারা সরকারপক্ষকে সমর্থন করিলে স্থিতাবস্থা বজায় থাকে। পরিকল্পনাটি স্থগিত রাখিবার জন্য বিরোধীপক্ষ দ্বিতীয় যে প্রস্তাবটি পেশ করেন তাহাতে সরকারপক্ষ দুই ভোটে পরাজিত হন। পর দিন অনেকেই

আশা করিয়াছিলেন যে, সরকার পদত্যাগ করিবেন। কিন্তু তাহা না হওয়াতে বিরোধীপক্ষ হইতে একটি পয়েন্ট অব অর্ডার তুলিয়া বলা হইল যে, সংবিধানের ১৬৪(২) ধারা অনুযায়ী মন্ত্রিমণ্ডলী বিধান সভার নিকট দায়ী, এবং যেহেতু বিধানসভায় মন্ত্রিমণ্ডলীর প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করা হইয়াছে সেহেতু সরকারের পদত্যাগ করা উচিত। প্রধানমন্ত্রী এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন না। আর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান যে, বিধানসভার প্রস্তাব কার্যকরী করা তাঁহার পক্ষে বাধ্যতামূলক নহে। তখন একটি বিশেষাধিকারের (point of privilege) প্রশ্ন তুলিয়া জিজ্ঞাসা করা হইল যে, পরিকল্পনাটি স্থগিত রাখিবার জন্য বিধানসভার আদেশমূলক প্রস্তাবকে (mandatory resolution) উপেক্ষা করিয়া প্রধানমন্ত্রী সভাকে অবমাননা করিয়াছেন কিনা। স্পীকার প্রশ্নের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া পরে উত্তর দিবেন বলেন এবং অনির্দিষ্টকালের জন্য সভার অধিবেশন স্থগিত থাকে।

পূর্ব্ববঙ্গের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা

"সোনার বাংলা"র সংবাদে প্রকাশ, ২২শে জুলাই করাচীতে এক সাক্ষাৎকারে পূর্ব্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী জনাব নুরুল আমীন বলেন যে, তিনি পূর্ব্ববঙ্গের মন্ত্রিসভা রদবদলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। উহার ফলে বর্তমান মন্ত্রীমণ্ডলীর কোন কোন সভ্য হয়ত পুনর্গঠিত মন্ত্রিসভা হইতে বাদ পড়িবেন। তবে নূতন মন্ত্রীসভার সদস্যসংখ্যা কত অথবা কবে তাহা গঠিত হইবে সে সম্পর্কে তিনি কিছু বলিতে সম্মত হন না। তিনি আরও বলেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় তাঁহার যোগদান সম্পর্কে কোনও প্রস্তাব এখনও বিবেচনা করা হয় নাই। করাচীতে অবস্থানকালে প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ আলীর সহিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় পূর্ব্ববঙ্গ হইতে সদস্য গ্রহণ সম্পর্কে তাঁহার আলোচনা হইলেও কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নাই।

জনাব আমীন ঘোষণা করেন যে, আগামী বৎসরের গোড়ার দিকে পূর্ব্ববঙ্গে নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। বিরোধী দলগুলি নির্ব্বাচনে মুসলিম লীগের জয় সম্পর্কে সন্দিহান হইলেও তিনি জয় সম্বন্ধে সুনিশ্চিত।

খাদ্যাবস্থা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন : পূর্ব্ববঙ্গ অত্যন্ত সঙ্কটের মধ্য দিয়া কালাতিপাত করিতেছে। তবে আউশ কাটার সময় হইয়াছে এবং পশ্চিম পাকিস্থান হইতে চাউল সরবরাহ শুরু হইয়াছে। জুলাই মাসের শেষভাগের মধ্যেই আশী হাজার টন চাউল চট্টগ্রাম বন্দরে পৌছিবে এবং অবশিষ্ট পঁয়তাল্লিশ হাজার টন কিস্তিবন্দী হারে প্রতি মাসে পনর হাজার টন করিয়া প্রেরণ করা হইবে।

তিনি আরও বলেন যে, গঙ্গা-কপোতাক্ষ পরিকল্পনা সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধানকার্য্য চালানো হইতেছে। সমগ্র পরিকল্পনাটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া কার্য্যকরী করা হইবে। তিনি বলেন যে, দুই বৎসর পর প্রায় পাঁচ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রথম অংশের কাজ সমাপ্ত হইলে প্রদেশের চাউল উৎপাদন প্রায় এক লক্ষ টন বৃদ্ধি পাইবে। তিনি পাটের দরের উন্নতির কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণের ফলে পাটচাষিগণ পাটের ন্যায্য মূল্য লাভ করিবেন।

জনাব নুরুল আমিন বলেন যে, আগষ্ট মাস হইতে চন্দ্রঘোনা কাগজের কলে উৎপাদন সুরু হইবে। ইহা পাকিস্থানের শিল্পোন্নয়নের ইতিহাসে নবযুগের সূচনা করিবে।

পাকিস্থানের পথে ১৫ হাজার টাকার মাল আটক

১৯শে শ্রাবণের "মুর্শিদাবাদ সমাচার" পত্রিকার এক সংবাদে প্রকাশ, গত ২১শে জুলাই কালীগঞ্জের নিকট ৫২ বাণ্ডিল সুতা, এভারেডি রেডিও ও টর্চের ব্যাটারী, ছোট এলাচি, শাঁখা, কাচের চুড়ি, সাবান, কাপড়, ছিট, সুতার গুটি ইত্যাদি এক ট্রাক বোঝাই আনুমানিক সাড়ে পনর হাজার টাকার মাল ধরা পড়িয়াছে। উক্ত মালের মালিকের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তবে পরস্পর শুনা যায় যে, উক্ত ব্যবসায়ী বহুদিন ধরিয়াই জলঙ্গী পথে পাকিস্থানে ব্যবসায় করিতেছে। এখন নৌকাপথে অবৈধ মাল পাচারের খুব সুবিধা হইয়াছে।

এইরূপ পাচার তো চতুর্দ্দিকেই চলিতেছে। দেশের নৈতিক অবনতি অনেক দূর গড়াইয়াছে ঐ কারণে। ইহার প্রতিকার তখনই সম্ভব হইবে যখন সংবাদপত্রে ঐরূপ লোক ও তাহাদের সহায়কদিগের নামধাম প্রকাশিত হইবে এবং সম্পাদকীয়ে ঐরূপ চোরাচালানীদিগের উপর প্রবল কশাঘাত চলিবে। এই কাজে ঘুষ দেওয়া ও লওয়া দু-ই চলে, নহিলে ইহা সম্ভব হয় না, অন্ততঃ পক্ষে এইরূপ হাজারের হিসাবে। সেই ঘুষখোরদিগেরও নামধাম প্রকাশিত হওয়া উচিত।

তিব্বতের অতীত ও বর্তমান

এম্. কাপিস্তা লিখিতেছেন, "তিব্বত একটি ভোজনপাত্রের মত। উহার চারদিকে পর্ব্বতশ্রেণীর কিনারা। এই সুবৃহৎ আয়তনের মধ্যে এক সঙ্গে গ্রেট ব্রিটেন, আয়ারলণ্ড, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, হলাণ্ড ও বেলজিয়মকে অনায়াসে ধরানো যায়।" তিব্বতের জলবায়ু বড়ই কঠোর, শীতের তীব্রতা খুবই বেশী। দেশটি উদ্ভিদ সম্পদে অত্যন্ত দীন। একমাত্র দক্ষিণ অঞ্চলে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় দেবদারু, উইলো ও ঝাউজাতীয় গাছ দেখা যায়, কখন কখন জরদ আলু, পীচ ও নাসপাতির গাছ দৃষ্টিগোচর হয়।

পূর্ব্বে দেশের প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ জমি ছিল সামন্ত প্রভুদের হাতে, শতকরা ২০ ভাগ মঠ বা বৌদ্ধ-বিহারগুলির হাতে এবং শতকরা ৪০ ভাগ সরকারের হাতে। এই শেষোক্ত ৪০ ভাগ পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতনের পরিবর্ত্তে দেওয়া হইয়াছে। অবশিষ্ট মাত্র শতকরা ১০ ভাগ জমি ছিল কৃষকদের হাতে। প্রকৃত প্রস্তাবে এই কৃষকরা ছিল দাস মাত্র। জমি লইয়া তাহারা এক প্রভুর হাত হইতে আর এক প্রভুর অধীন হইত। তিব্বতের কৃষি শোচনীয়ভাবে পশ্চাৎপদ ছিল।

পশুসম্পদের (প্রায় ৪ লক্ষ দীর্ঘকেশ ইয়াক, ১০ লক্ষ ছাগল ও ৫০ লক্ষ পার্ব্বত্য ভেড়া) অধিকাংশেরই মালিক সামন্ত প্রভুরা ও মঠ বা বিহারগুলি। কৃষকরা সামন্তপ্রভুর নিকট হইতে গরু-ভেড়া ইত্যাদি ভাড়া লইত এবং একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে ঐ গবাদি পশু ফিরাইয়া দিত উহাদের সমস্ত নবজাত বৎসসহ।

কয়েকটি কুটীরশিল্পের কারখানা ও একটি টাঁকশাল ব্যতীত শ্রমশিল্প বলিতে তিব্বতে কিছুই ছিল না।

তিব্বতের জীবনে মঠবিহারগুলির অসাধারণ প্রভাব ছিল। প্রত্যেক পরিবার হইতে উহার দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুত্রসন্তানকে মঠে পাঠাইতে হইত লামা হইবার জন্য। 'লামা' শব্দের অর্থ জ্ঞানী। আজ তিব্বতে ৩৪০০টি বিহার ও তিন লক্ষ লামা আছে। লামাদের ট্যাক্স দিতে হইত না; সৈনিক হইতে হইত না। লোকে তাহাদের জিনিষপত্র দিত নৈবেদ্য ও উপঢৌকন হিসাবে।

৩০ লক্ষ লোকের দেশ তিব্বতে একটিও হাসপাতাল ছিল না। তিব্বতের ঔষধ বিখ্যাত হইলেও মারী ও সংক্রামক ব্যাধিতে তাহা শক্তিহীন এবং ভাল ডাক্তারের সংখ্যাও ছিল অত্যন্ত নগণ্য।

সমগ্র তিব্বতে উচ্চ বিদ্যালয় ছিল তিনটি। ভাবী পদস্থ রাজকর্ম্মচারী হইবার জন্য এই তিনটি বিদ্যালয়ে অভিজাত শ্রেণীর ছেলেরা পড়িত। তদ্ব্যতীত কয়েকটি বেসরকারী বিদ্যালয়ও ছিল; সেখানে অল্পবয়স্ক ছেলেদের প্রার্থনা ও লেখাপড়া শেখান হইত।

১৯৫১ সনের ২৩শে মে তিব্বত-চীন চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পর তিব্বতের নবজন্মের সূচনা হয়। কিছুকাল পূর্ব্বেও লাসার পশ্চিমে বিস্তীর্ণ প্রান্তর শূন্য পড়িয়া ছিল। ১৯৫১ সনের নবেম্বর মাসে জনগণের মুক্তিফৌজের লোকজন এই সুবিশাল পতিত জমি উদ্ধারের কাজে হাত দেয়। ইতিমধ্যেই তাহারা ৫০০০ একর জমিতে চাষ করিয়াছে এবং যে সকল জলসেচ খাল খনন করিয়াছে তাহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৭ মাইল। নূতন শস্যের আবাদ করিবার জন্য মধ্য-চীন হইতে কৃষিবিদ্‌রা আসিয়াছেন।

১৯৫২ সনের আগষ্ট মাসে লাসাতে এক বৃহৎ পলিক্লিনিকের উদ্বোধন করা হইয়াছে। সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হইতেছে।

ভারত-মার্কিন কারিগরি সহযোগিতার দুই বৎসর

৭ই আগষ্টের "আমেরিকান রিপোর্টার" হইতে জানা যায় যে, ১৯৫৩ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত দুই বৎসরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস ভারতবর্ষকে মোট ৪৭ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা দিয়াছেন। কারিগরি সহযোগিতা চুক্তিতে কৃষি উৎপাদন সমস্যাটির উপর সর্ব্বাপেক্ষা বেশী জোর দেওয়া হয়। দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পক্ষে যে পরিমাণ রাসায়নিক সারের প্রয়োজন সেই পরিমাণে তাহা ভারতে উৎপন্ন হয় না বলিয়া বিদেশ হইতে মোট ১ লক্ষ ৮৬ হাজার টন রাসায়নিক সার আমদানী করিবার পরিকল্পনা হইয়াছে এবং এ পৌঁছিয়াছে। এ সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যদানের পরিমাণ ১ কোটি ৪৫ লক্ষ ৮০ হাজার ৯২৭ ডলার এবং সিন্ধ্রি কারখানার প্রসারে যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যের পরিমাণ ৭৭ হাজার ডলার। যন্ত্রপাতির বর্দ্ধিত চাহিদা মিটাইবার জন্য বিদেশ হইতে ১ লক্ষ ১০ হাজার টন লৌহ ও ইস্পাত আমদানীর পরিকল্পনা করা হইয়াছে এবং যুক্তরাষ্ট্র হইতে ৪২ হাজার ৭৭৮ টন ভারতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই পরিকল্পনায় যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যের পরিমাণ ১ কোটি ৬৮ লক্ষ ৮৫ হাজার ডলার। পঙ্গপাল নিরোধ পরিকল্পনার জন্য দেওয়া হইয়াছে ৪ লক্ষ ৫৫ হাজার ডলার এবং তিনটি মার্কিন বিমান হইতে মার্কিন বৈমানিকগণ ঔষধ ছিটাইয়া দিবার কাযে নিযুক্ত আছেন। মাটির গুণাগুণ পরীক্ষা করিবার যন্ত্রপাতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরবরাহ করিতে এবং বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ দিয়া সাহায্যদানের ব্যবস্থা করিতে যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যের পরিমাণ ২ লক্ষ ডলার।

সামুদ্রিক মাছ ধরিবার এবং ব্যবসা পরিকল্পনার জন্য ২৪ লক্ষ ৬২ হাজার ডলার দেওয়া হইয়াছে। ২ কোটি ১৫ লক্ষ ডলার দেওয়া হইয়াছে নলকূপ বসাইয়া জলসেচের ব্যবস্থা করিবার জন্য। সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যের পরিমাণ ১ কোটি ৫ লক্ষ ৯৬ হাজার ডলার।

শিক্ষিত গ্রামকর্ম্মী তৈরি করিবার উদ্দেশ্যে সমগ্র ভারতে ৩৪টি শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হইয়াছে। ফোর্ড ফাউণ্ডেশন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এবং ভারত-মার্কিন কর্ম্মসূচী অনুযায়ী এই কেন্দ্র পরিচালনার ব্যয় বহন করা হইয়া থাকে। এই পরিকল্পনায় যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যের পরিমাণ ২ লক্ষ ৯৯ হাজার ২০০ ডলার।

ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ভারত-মার্কিন পরিকল্পনায় ৪ হাজার ১০০ টন ডি. ডি. টি. ভারতে আমদানী করা হইয়াছে। ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক ঔষধের বড়িও আমদানী করা হইয়াছে ৪০ লক্ষের উপর। এই জন্য ৫৮ লক্ষ ৪৮ হাজার ডলার দেওয়া হইয়াছে। বন-গবেষণা, নূতন বন-রচনা এবং দেরাদুনের বন-গবেষণা প্রতিষ্ঠানে যে কাগজের কল প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিয়াছে তাহার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় করিবার জন্য সাহায্যের পরিমাণ ৩ লক্ষ ১৪ হাজার ডলার।

নদী-উপত্যকা-উন্নয়ন পরিকল্পনার কাযে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ক্রয় করিবার জন্য ভারত-মার্কিন পরিকল্পনায় ৯০ লক্ষাধিক ডলার অনুমোদিত হইয়াছে এবং উড়িষ্যার হীরাকুণ্ড বাধ, বোম্বাই রাজ্যের কাকড়াপার, মাহি, ঘটপ্রভা ও গঙ্গাপুর পরিকল্পনায়, মহীশূরের ভুঙ্গা এমিকাটে (বাঁধে), রাজস্থানের জোয়াই, রাজস্থান ও মধ্যভারতের চম্বল, উত্তরপ্রদেশের পার্থার বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং সৌরাষ্ট্রের আরও ছয়টি ক্ষুদ্রতর পরিকল্পনার কার্য্যে এই অর্থ বিনিয়োগ হইয়াছে। দামোদর পরিকল্পনায় মার্কিন ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিস সাহায্য করিয়াছেন ২ লক্ষ ৮৫ হাজার ডলার এবং যুক্তরাষ্ট্র হইতে সাহায্যদান

করা হইয়াছে নদী-উপত্যকা পরিকল্পনায় ১ কোটি ১ লক্ষ ৮৬ হাজার ৮৭৩ ডলার।

ভারত-মার্কিন কারিগরী সহযোগিতা চুক্তি অনুযায়ী ১৯৫৩ সনের ১লা জুলাই পর্যন্ত ৯২ জন মার্কিন কারিগর ভারতে ছিলেন এবং তাঁহাদের অধিকাংশই কৃষিসম্প্রসারণ কার্যে বিশেষজ্ঞ।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস

নিউইয়র্ক হইতে ২১শে জুলাই এক ঘোষণায় রকফেলার ফাউণ্ডেশন জানাইয়েছে যে, ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম এবং উহার পরবর্তী অধ্যায় রচনার জন্য দিল্লীর ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্সকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে ৪৭,৮০০ ডলার মুদ্রা দিয়া সাহায্য করা হইবে। ইহার পরিচালন-ভার শ্রী ভি. পি. মেননের উপর দেওয়া হইবে। উক্ত ঘোষণায় আরও প্রকাশ, ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনা এবং মহাত্মা গান্ধী ও নেহরুর নৈতিক ও সামাজিক দর্শনের তুলনামূলক পাঠের জন্য জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া কলেজের অধ্যক্ষ এস. আবিদ হোসেনকে দেওয়া হইবে ১০,০০০ ডলার।

তদ্ব্যতীত ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিক্যাল কলেজকেও বিভিন্ন পরিমাণ সাহায্য দেওয়া হইবে। ১৯৫৩ সনের দ্বিতীয় কোয়ার্টারে সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিবর্গকে উক্ত ফাউণ্ডেশনের পক্ষ হইতে মোট ৭৮,০০০ ডলার দিয়া সাহায্য করা হইবে।

এই সকল সাহায্যের আকার পরিমাণ মোটা। কিন্তু আমাদের কঠোর অভিজ্ঞতায় আমরা দেখিয়াছি যে, এ টাকা খরচও হইতেছে বেশ "লেফাফাদুরস্ত" ভাবে। অর্থাৎ, প্রত্যেক পয়সার খরচে পাঁচটা সই ও তিনটা হিসাব পরীক্ষার ছাপ পড়িতেছে। কিন্তু দেশের লোকের লাভ হইতেছে অল্পই। ইহার কারণ প্রতি ক্ষেত্রে অতি অযোগ্য লোকের হাতে খরচের ভার দেওয়া হইতেছে। "কাজের ভার" লিখিলাম না, কেননা টাকাগুলি প্রায় সবই অকাজেই ব্যয় হয়। ভি. পি. মেনন জাতীয় লোকের যোগ্যতার নিদর্শন এখনও সাধারণের চক্ষে ধরা পড়ে নাই। ভারতে বিপ্লববাদের ইতিহাসের ব্যাপারেও অতি অযোগ্য লোকের হাতেই প্রারম্ভিক কাজ পড়িয়াছে। তবে "যেন তেন প্রকারেণ বন্দরক্ষ ধনক্ষয়" হইবেই।

আমেরিকায় যুদ্ধবিরতির প্রতিক্রিয়া

আমেরিকার শ্রম পরিসংখ্যান সংস্থার প্রধান এবং সরকারী বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদগণের অন্যতম মিঃ ইভান ক্ল্যাগ ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর যুদ্ধবিরতির প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে মন্তব্য করিয়া বলেন, "কোরিয়ার যুদ্ধবিরতির তেমন কোন প্রতিক্রিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর হইবে না।" তিনি বলেন, "পূর্ণোদ্যমেই কলকারখানার কাজসমূহ চলিতে থাকিবে। চাকুরীর সংখ্যা যে অদূর ভবিষ্যতে হ্রাস পাইবে তাহারও কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। তবে কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতির ফলে ব্যয় হ্রাসের পরিমাণ যতটা হইবে বলিয়া সাধারণ ভাবে আশা করা গিয়াছিল তাহা হইবে না।"

সরকারী অভিজ্ঞমহলের অভিমত এই যে, বর্তমানে সামরিক ব্যয় হ্রাসের পরিমাণ খুব বেশী হইবে না, কারণ কতকগুলি স্থায়ী খরচ পূর্ব্বের মতই চালাইয়া যাইতে হইবে। যুদ্ধবিরতির ফলে যে পরিমাণ সরকারী ব্যয় হ্রাস পাইবে, ১৯৫৪ সনের দ্বিতীয় কোয়ার্টারের পূর্ব্বে তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে না।

'নিউইয়র্ক টাইমসে'র এক সংবাদে প্রকাশ, বিশিষ্ট মার্কিন ব্যবসায়িগণেরও অভিমত এই যে, ব্যবসায়ের উপর যুদ্ধবিরতির প্রভাব তেমন পড়িবে না এবং বর্তমান বৎসরের বাকী কয়েক মাসে ভাল ব্যবসাই হইবে বলিয়া তাঁহারা আশা করেন।

"ওয়াল ষ্ট্রীট জার্ণালে"র এক সাম্প্রতিক সমীক্ষায় বলা হইয়াছে যে, বিভিন্ন সংস্থায় সরকারী অর্থনীতিবিদগণ মিঃ ক্ল্যাগের অভিমত সমর্থন করিয়া বলিতেছেন যে, ১৯৫৪ সন পর্যন্ত ব্যবসার ক্রমোন্নতি অব্যাহত থাকিবে। তবে তাঁহারা মনে করিতেছেন, ১৯৫৪ সনের তৃতীয় কোয়ার্টারে হয়ত ব্যবসায় মন্দা দেখা দিতে পারে।

উক্ত পত্রিকায় উদ্ধৃত সরকারী বাণিজ্য-দপ্তরের এক বিবৃতিতে বলা হইয়াছে—বর্তমান বৎসরের উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৫২ সনের সর্বাধিক উৎপাদনের পরিমাণকে ছাড়াইয়া যাইবে। ১৯৫২ সনে ৩৪,৮০০ কোটি ডলার মূল্যের পণ্য উৎপাদন করা হইয়াছিল। পণ্যোৎপাদন-ব্যবস্থা অব্যাহত থাকিলে ১৯৫২ সনের সর্বাধিক পণ্য উৎপাদনের তুলনায় ১৯৫৩ সনের উৎপাদনের পরিমাণ শতকরা ৮ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে।

যুদ্ধের সহিত ব্যবসায়ের যেরূপ যোগ থাকে তাহাতে অল্পসংখ্যক লোকই প্রচুর লাভবান হয়। শ্রমিক ও মজুর কিছু পারিশ্রমিক বেশী পায় এবং পারিশ্রমিকের হারও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পারিশ্রমিক বৃদ্ধির দাবি যেমন অগ্রসর চলে, পণ্যমূল্য এবং খাদ্যমূল্যও ততোধিক বৃদ্ধি পায়। ফলে লাভের কোঠায় তাহাদের ঘাটতিই দাঁড়ায় শেষ পর্যন্ত। আমরা দেখি শেষ পর্যন্ত লাভ হয় কতকগুলি পুঁজিপতির এবং কতকগুলি ভুঁইফোঁড় নেতার দলের। দেশের সাধারণের কষ্ট বাড়ে বই কমে না।

মার্কিন কংগ্রেসের অধিবেশন

মার্কিন কংগ্রেসের সাম্প্রতিক অধিবেশনে আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। স্থির হইয়াছে যে, পারস্পরিক নিরাপত্তা আইন অনুসারে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রকে সাহায্যদান অব্যাহত থাকিবে। এই সাহায্যের জন্য যে পরিমাণ অর্থ চাওয়া হইয়াছিল তাহা অনুমোদিত না হইলেও ইহা স্বাধীন বিশ্বের নিরাপত্তা রক্ষায় যথেষ্ট সাহায্য করিবে ও ইহার শক্তি বৃদ্ধি করিবে। ইউরোপের দুই লক্ষ শরণার্থীর স্থান যাহাতে যুক্তরাষ্ট্রে হইতে পারে তজ্জন্য একটি আইন গৃহীত হইয়াছে।

শুল্কপ্রথা সহজ করিবার জন্য যে বিল উত্থাপন করা হইয়াছিল তাহা সামান্য অদলবদল করিয়া প্রতিনিধি-পরিষদ ও সেনেটের অধি-

বেশনে গৃহীত হইয়াছে। পারস্পরিক বাণিজ্যচুক্তির কার্যকাল আরও এক বৎসর বৃদ্ধি করিবার সম্পর্কে যে সকল বিল উত্থাপন করা হইয়াছিল তাহাও প্রতিনিধি-পরিষদ এবং সেনেটের অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছে। কোরিয়ার পুনর্বাসনের জন্য ২০ কোটি ডলার প্রদানেরও ব্যবস্থা হইয়াছে।

এতদিন মার্কিন দেশের সহিত তাহার প্রভাবিত বা মিত্রজাতি সকলের সহিত যে সম্বন্ধ ছিল তাহাতে আদান-প্রদান শুধু প্রদানের গণ্ডীতেই আবদ্ধ হইতেছিল। ইহা বিশ্বমৈত্রীর স্থায়িত্বের অনুকূল ত নহেই উপরন্তু সাহায্যপ্রাপ্ত জাতিসকলের নৈতিক অধোগতিরও সহায়ক। নূতন ব্যবস্থায় ভারতের সম্পর্কে কোনও ইতর-বিশেষ এখনই হইবে বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু কালে উহার পরিবর্তন হইবার পথ খুলিয়া যাইবে।

ভারতে বিদেশী মূলধন

বিদেশী মূলধন নিয়োগ সম্পর্কে ভারতের মনোভাব সম্পর্কে আমেরিকার "স্প্রিংফিল্ড ইউনিয়ন" নামক এক পত্রিকায় সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হইয়াছে, স্বাধীনতালাভের পর ভারতে সাড়ে তিন কোটি ডলারেরও অধিক মূলধন লইয়া ২২টি বিদেশী কোম্পানী সংগঠিত হইয়াছে। উক্ত পত্রিকার মতে, "বিদেশী মূলধন সম্পর্কে ভারতের জনসাধারণের মনোভাবের যে কতকটা পরিবর্তন হইয়াছে এবং মূলধন নিয়োগকারীরাও যে সেই মনোভাব পরিবর্তন দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন উহাই তাহার প্রমাণ।"

পত্রিকাটির অভিমতে স্বাধীনতালাভের প্রাক্কালে এবং তাহার অব্যবহিত পরে বিদেশী মূলধন সম্পর্কে ভারত যে সন্দেহাকুল মনোভাব পোষণ করিত তাহা ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে। সরকারী নীতিও বিদেশী মূলধনকে অভ্যর্থনা জানাইতেছে। পত্রিকাটি লিখিতেছেন, "ইহা ভালই; কারণ ভারতের এখন ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ দরকার।"

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম স্থান অধিকার এবং সোবিয়েট ইউনিয়ন ও চীনের সহিত ভারতের বাণিজ্যের স্বল্পতার উল্লেখ করিয়া পত্রিকাটি লিখিতেছে, "ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে যে পরিবর্তন সাধিত হইতেছে এবং পশ্চিমী দেশসমূহ হইতে মূলধন সম্পর্কে মনোভাবের কেন যে পরিবর্তন ঘটিতে পারে ইহা হইতে তাহার কতকটা পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে।"

এই বিষয়ে আমাদের অভিমত ইতিপূর্বেই বহুবার ব্যক্ত হইয়াছে। ভারতে বিদেশী মূলধন শুধু দুই সর্তে আসিতে পারে। প্রথমতঃ, ঐরূপে স্থাপিত কারখানা বা পণ্য প্রতিষ্ঠান সর্বতোভাবে ভারত-সরকারের আয়ত্তে থাকিবে—অবশ্য দেশী শিল্পের অনুরূপ ভাবে। দ্বিতীয়তঃ, কাঁচামাল যতটা সম্ভব ভারতীয় হওয়া চাই এবং প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক হইতে উচ্চতম কার্যপরিচালক পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে ভারতীয়দিগের অধিকার থাকিবে। বিশেষজ্ঞ বা নিপুণ শ্রমিক প্রথমে বিদেশ হইতে আনাইতে হইবে কিন্তু তাহাদের একচেটিয়া অধিকার কোথায়ও থাকিবে না বা কোন কার্যক্রম বা প্রক্রিয়া ভারতীয়দিগের নিকট লুক্কায়িত থাকিবে না। সকল ক্ষেত্রেই উপযুক্ত ভারতীয় শিক্ষানবীশ লওয়া হইবে।

মার্কিন কারিগরি সাহায্য-সংস্থা

১৩ই জুলাই ওয়াশিংটন হইতে প্রকাশিত মার্কিন কারিগরি সাহায্য-সংস্থার এক বিবরণীতে বলা হইয়াছে যে, উক্ত সংস্থার বিভিন্ন পরিকল্পনাসমূহ ৩৫টি রাজ্যে কার্যকরী করা হইতেছে এবং প্রায় ১৪০০০ কর্মচারী তাহাতে নিয়োজিত আছেন—তন্মধ্যে ১৪৪৬ জন আমেরিকাবাসী এবং ১২,৫২৪ জন স্থানীয় অধিবাসী।

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিই চতুর্থ দফা পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য। কর্মচারী নিয়োগের প্রতি লক্ষ্য করিলেই তাহা স্পষ্ট হয়। বিদেশে নিযুক্ত ১৪৪৬ জন মার্কিন বিশেষজ্ঞের মধ্যে ৪৭৩ জন খাদ্য-পরিস্থিতির উন্নতিসাধনের জন্য কাজ করিতেছেন। ভারতে ১০৮ জন মার্কিন বিশেষজ্ঞ বর্তমানে বিভিন্ন পরিকল্পনায় নিযুক্ত আছেন।

আমরা এখানে ঐ "পয়েন্ট ফোর" পরিকল্পনা সম্পর্কে খুব আশান্বিত নহি। কেননা যেভাবে এদেশীয় লোক নিয়োগ করা হইয়াছে, তাহাতে যোগ্যতার কোনও প্রশ্নই আসে নাই। ফলে টাকা খরচ হইবে এবং কিছু ফল দেখা যাইবে, যাহার মূল কারণ অন্য কিছু। কিন্তু পরিকল্পনার শতকরা ১০ ভাগও বাস্তবে পরিণত হইবে না।

ভারতের জন্য সাড়ে নয় কোটি ডলার

"আমেরিকান রিপোর্টার"র সংবাদ দিতেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৫৪ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত বিদেশে মার্কিন সাহায্যের জন্য প্রায় ৫১০ কোটি ডলার অনুমোদন করিয়াছেন এবং তাহা হইতে ভারতবর্ষকে ৯ কোটি ৫০ লক্ষ ৮০ হাজার ডলার (প্রায় ৪৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা সাহায্য দেওয়া হইবে। ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সফল করিবার জন্যই উক্ত সাহায্য দেওয়া হইতেছে। ভারত ও পাকিস্থানের জন্য বিশেষ বৈষয়িক সাহায্য হিসাবে যে ৭ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার অনুমোদিত হইয়াছে তন্মধ্যে ৬ কোটি ৫৫ লক্ষ ডলার এবং তদ্ব্যতীত অতিরিক্ত ৩ কোটি ১ লক্ষ ডলার দেওয়া হইবে ভারত-মার্কিন কারিগরি সহযোগিতা চুক্তি অনুযায়ী।

এই সকল সাহায্যের সুফল কতটা, কুফলই বা কতটা তাহা নির্ণয়ের সময় আসিয়াছে। যে ভাবে ঐ টাকা ব্যয় হইতেছে তাহাতে লাভ অপেক্ষা লোকসানের খাতেই বেশী পড়িতে পারে। যোগ্যতার বিচার বিনাই যদি লোক নিয়োগ চলে তবে সুফলের আশা করা অন্যায়।

কোরিয়ার যুদ্ধে কমনওয়েলথ ডিভিসন

গত ২৮শে জুলাই কোরিয়ায় যুদ্ধনিরত কমনওয়েলথ বাহিনীর দ্বিতীয় বৎসর পূর্ণ হইল। এই কমনওয়েলথ ডিভিসনের ইতিবৃত্তান্ত দিয়া মিঃ জি. ডি. আর্নট টেলর লিখিতেছেন যে, ১৯৫১ সালের ২৮শে জুলাই কোরিয়ার পশ্চিম রণাঙ্গনের নিকটবর্তী টচেন

নামক স্থানে একটি ক্ষুদ্র ও অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্যে কমনওয়েলথ ডিভিসন জন্মগ্রহণ করে। একটি বিশেষ প্যারেড গ্রাউণ্ডের মধ্যস্থলে ব্রিটেন, অষ্ট্রেলিয়া, নিউ জীল্যাণ্ড, কানাডা ও ভারত এই পাঁচটি দেশের পাঁচটি পতাকা উড়াইয়া পাঁচটি বাহিনীকে একত্রীভূত করা হয়।

কোরিয়াতে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার দুই মাসের মধ্যে ১৯৫০ সালের আগষ্টে ২৭শ ব্রিটিশ পদাতিক বাহিনী রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। নবেম্বর মাসে ২৯শ বাহিনী যোগদান করে। যুদ্ধের প্রথম বৎসরে তাহারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মার্কিন ডিভিসনের অংশ হিসাবে লড়াই করে। ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অষ্ট্রেলীয় বাহিনী ৮ম আর্মিতে যোগদান করে। ইহার পর নবেম্বর মাসে ভারতীয় ফিল্ড এম্বুলেন্স ও ডিসেম্বর মাসে নিউজিল্যাণ্ডের গোলন্দাজ বাহিনী কোরিয়াতে আসে। ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসে ২৫শ কানাডীয় পদাতিক বাহিনী আসিবার পর একটি সর্ব্ব-কমনওয়েলথ ডিভিসন গঠনের চিন্তা জন্মলাভ করে। নিম্নলিখিত বাহিনীগুলিকে লইয়া প্রথম কমনওয়েলথ ডিভিসন গঠিত হয়। ২৫শ কানাডীয় পদাতিক বাহিনী, ২৮শ ব্রিটিশ কমনওয়েলথ বাহিনী এবং ২৯শ ব্রিটিশ পদাতিক বাহিনী। এই রেজিমেণ্টগুলি ছাড়াও তিনটি ব্রিগেডের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্য সমস্ত সৈন্যদেরও কমনওয়েলথ ডিভিসনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এই দুই বৎসরে কমনওয়েলথ ডিভিসন মাত্র একবার (১৯৫২ সালের ২৯শে জানুয়ারী হইতে ১লা এপ্রিল পর্যন্ত) যুদ্ধ হইতে বিরত ছিল। অবশিষ্ট সময় তাহারা দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিওলের প্রবেশ পথের উপর একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি রক্ষার কার্যে নিযুক্ত ছিল। বর্তমানে ইহারা ইমজিন নদী বরাবর একটি লাইনে অবস্থান করিতেছে। বড় বড় সংঘর্ষে ইহারা অপরিসীম কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে। কমনওয়েলথ ডিভিসন গঠনের সময় যে সকল বাহিনী ইহার মধ্যে ছিল অবশ্য এখন তাহারা আর নাই। তাহাদের পরিবর্তে নূতন বাহিনী আসিয়াছে।

শুধু লড়াইয়ে নহে, মানবতামূলক কার্যেও কমনওয়েলথ ডিভিসনের কৃতিত্ব কম নহে। মিঃ টেলর লিখিতেছেন, এ বিষয়ে ৬০তম ভারতীয় ফিল্ড এম্বুলেন্সের কথা সর্ব্বাগ্রে স্মরণ করিতে হয়।

আজ পর্যন্ত দুই জন অধিনায়ক কমনওয়েলথ ডিভিসনের নেতৃত্ব করিয়াছেন। তাঁহাদের এক জনের নাম মেজর জেনারেল এ. জে. এইচ. (জিম) ক্যাসেলস এবং অপর জন হইতেছেন মেঃ জেঃ এম. এস. অলষ্টন-রবার্টস-ওয়েষ্ট। আগামী শরৎকালে মেঃ জেঃ মারে ওয়েষ্টের পদে নিযুক্ত হইবেন।

লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র

গত ৯ই শ্রাবণ (২৫শে জুলাই) ভারতীয় পার্লামেণ্টের সদস্য পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র মাত্র ৫৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের শোচনীয় মৃত্যুর অল্পকাল মধ্যেই পণ্ডিত মৈত্রের পরলোকপ্রাপ্তিতে সমগ্র বাঙালী জাতি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত নদীয়া-শান্তিপুরের একটি সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে তিনি বাংলা ও সংস্কৃতে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তাহার পর ক্রমে নিজ মেধাবলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি বি-এল পাস করিয়া কৃষ্ণনগরে ওকালতী আরম্ভ করেন। ছাত্রাবস্থায় পাঠ্য বিষয় বাদে তিনি সংস্কৃত সাহিত্য রীতিমত অধ্যয়ন করিয়া তাহাতে বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি কাব্য-সাংখ্যতীর্থ উপাধিতেও ভূষিত হন। কৃষ্ণনগর ও শান্তিপুরে বিবিধ জনহিতকর কার্যে তিনি প্রথম যৌবনেই বিশেষভাবে তৎপর হইয়াছিলেন। আইন-ব্যবসায়েও তিনি খ্যাতি অর্জন করেন।

প্রধানমন্ত্রী রামজে ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী দল যে আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহাতে পণ্ডিত মৈত্র কায়মনে যোগ দিয়াছিলেন। ১৯৩৪ সনে এই দলের পক্ষ হইতে তিনি দিল্লীর কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে সদস্য নির্ব্বাচিত হন। সেই সময় হইতে প্রায় কুড়ি বৎসরকাল কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য থাকিয়া তিনি ভারতবাসী, বিশেষ করিয়া বাঙালী জাতির অক্লান্তভাবে সেবা করিয়া আসিয়াছেন। স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৪৭ সনে গণ-পরিষদে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অন্যতম প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন। ভারতীয় নূতন রাষ্ট্রতন্ত্র বা সংবিধান রচনায়ও তাঁহার বিশেষ দান রহিয়াছে। গত পাঁচ-ছয় বৎসর যাবৎ পশ্চিমবঙ্গে যেসব সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে তাহার প্রায় প্রত্যেকটির সমাধানকল্পে পণ্ডিত মৈত্র চেষ্টিত ছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যা ভারতরাষ্ট্রের দায় হইলেও ইহার চাপ সম্পূর্ণরূপে বহন করিতে হয় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যকে। ১৯৫০ সনে পূর্ব্ব পাকিস্তানে ব্যাপক দাঙ্গার উদ্ভব হইলে তথাকার হিন্দুগণ বন্যার জলস্রোতের ন্যায় পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহার প্রতিক্রিয়া ভারতরাষ্ট্রের উপর গিয়া পড়ে। ফলে নেহরু-লিয়াকৎ আলী চুক্তি সম্পাদিত হয়। তখন পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র পার্লামেণ্টের সদস্যরূপে ইহার ত্রুটি-বিচ্যুতি দর্শাইয়া প্রধান মন্ত্রীর নিকট যে স্মারকলিপি প্রদান করেন, নানা দিক হইতে তাহার গুরুত্ব আজও পর্যান্ত উপলব্ধি হইতেছে। গত সাধারণ নির্ব্বাচনে তিনি নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিক্যে পার্লামেণ্টের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি জনচিত্তে কত দৃঢ় আসন অধিকার করিয়াছিলেন ইহা তাহারই প্রমাণ। ভারত-সরকারের বিভিন্ন কমিটিতে অতি যোগ্যতার সহিত তিনি কার্য করিয়া গিয়াছেন।

পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতাশক্তি, কর্ম্মতৎপরতা সবকিছুই লক্ষ্মীকান্ত দেশের সেবায় একান্তভাবে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলাদেশ একজন একনিষ্ঠ সেবক এবং সমগ্র ভারতরাষ্ট্র একজন বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞকে হারাইয়াছে। তাঁহার অভাব শীঘ্র পূরণ হইবার নহে।

শাহজাদা দারাশুকো

সামুগড়ের যুদ্ধ [২৯শে মে ১৬৫৮ খ্রীঃ]

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো

১

বিদায়-সম্বর্দ্ধনার বহ্বাড়ম্বরে শাহজাদা দারার যাত্রাভঙ্গ হইয়াছিল। উহার পরদিন (১৯শে মে) তিনি প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ সৈন্য লইয়া আগ্রা হইতে যাত্রা করিলেন এবং অপেক্ষাকৃত দ্রুত কুচ করিয়া ২২শে মে ধোলপুর পৌঁছিলেন। আগ্রা হইতে প্রায় সোজা দক্ষিণে সাঁইত্রিশ মাইল দূরে চম্বল নদীর উত্তর তীরে ধোলপুর। উহা সেকালে সাধারণ কস্‌বা বা ছোট শহর ছিল; এইখানে চম্বল নদী পার হইবার সরকারী ঘাট দুই দিকেই সুরক্ষিত, নদী পার হইয়া বাদশাহী রাস্তা গোয়ালিয়র চলিয়া গিয়াছে। আওরঙ্গজেব ও মোরাদ ভদ্র লোকের মত সোজা বাদশাহী রাস্তা ধরিয়া ধোলপুরেই চম্বল নদী সসৈন্যে পার হওয়ার চেষ্টা করিবেন—এই ভরসায় এই স্থানে ছোট বড় অনেক কামান বসাইয়া কাকের পক্ষেও চম্বল অতিক্রম অসাধ্য করা হইয়াছিল, এবং বাদশাহী ফৌজ ধোলপুর-আগ্রা রাস্তা বরাবর এইখানেই মূল শিবির স্থাপন করিল। চতুর আওরঙ্গজেব এই মরণের ফাঁদে পা দেওয়ার ব্যক্তি নহেন,—এমন সন্দেহ করিবার মত বুদ্ধি দারার মগজে ছিল না; তবে শত্রুপক্ষের গতিবিধি সম্বন্ধে কোন খবর না পাইয়া অতিরিক্ত সাবধানতা স্বরূপ নদীর ভাটিতে ধোলপুরের কাছাকাছি পারাপারের চোরা পথ পাহারা দিবার জন্য কয়েকটি থানা বসাইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

২

আর্য্যাবর্তভূমির কণ্ঠে মুক্তাহার-স্বরূপ, উপলবিষম বিন্ধ্যপাদবিলগ্না চর্ম্মণ্বতী রন্তিদেবের অসংখ্য গোমেধ যজ্ঞের রুদ্রকীর্তি বহন করিয়া ধোলপুর (প্রাচীন দশপুর ?) হইতে অন্তর্বেদ্‌ (যমুনা-চম্বলের মধ্যবর্ত্তী দোয়াব) ভূভাগের প্রান্ত-সীমায় ভিন্দ ও ইটাবার কিছু দূরে যমুনা-সঙ্গম লাভ করিয়াছে। আঁকাবাকা ছোট পাহাড়ী নদী হইলেও চম্বল নদীর সামরিক গুরুত্ব গঙ্গা-যমুনা অপেক্ষা অনেক অধিক। রাজপুতানার কেরোলী রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিমে বনাস নদীর সঙ্গমস্থান হইতে যমুনা-চম্বল সঙ্গমস্থান পর্য্যন্ত এই নদী সুবা আগ্রা এবং সুবা মালব ও বুন্দেলখণ্ডের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক পরিখাস্বরূপ। ইহার দক্ষিণ পারে আগাগোড়া খাড়া উচ্চ পাথুরে জমি পাহাড় ও দুর্ভেদ্য জঙ্গল, উত্তর পারে নদীর স্রোত কোন কোন স্থানে ভিতরে এক মাইল পর্য্যন্ত গভীর খাত কাটিয়া অনেকগুলি বোতলাকৃতি ব-দ্বীপ সৃষ্টি করিয়াছে; এই পারে বহুবিস্তৃত ঘনসন্নিবিষ্ট কাঁটা বাবুলের জঙ্গল। পাড়ের উপর হইতে প্রায় খাড়া ১০০।১৫০ হাত নীচে না নামিলে জলের নাগাল পাওয়া যায় না, নদীতে যত জল তত কুমীর। নদীর বিস্তার গরমের দিনে ঘাট ছাড়া কোথায়ও এক শত হাতের বেশী নয়, নৌকা সব জায়গায় চলে না; মাঝে মাঝে জলের নীচে গভীর গর্ত্ত থাকার দরুন হাঁটিয়াও পার হওয়া যায় না। যেখানে হাঁটিয়া পার হওয়া যায় সেই সমস্ত স্থান নিকটস্থ গ্রামবাসী এবং ডাকাত ছাড়া কেহ জানে না। চম্বল নদীর তীরে ও আশেপাশে সাধুজনের ঠাঁই নাই, কিন্তু উহা চোর ডাকাত বাটপাড়ের ভূস্বর্গ— চাষবাস হয় না, তবে যমুনাপারী আসল রামছাগলের জন্মস্থান। এই সমস্ত স্থানে কতকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত ডাকাতদের আধিপত্য চলিতেছে, কেহ বলিতে পারে না। মোগল আমলে পূর্ব্ব-মালব এবং যমুনা-চম্বলের মধ্যবর্ত্তী দোয়াব বেসরকারী দস্যু-রাজ্যের আওতার মধ্যে ছিল। বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত মাহোবার রাজা চম্পৎ রায় বুন্দেলা সেকালের সর্ব্বাপেক্ষা নামজাদা ডাকাত। মাঝে মাঝে দায়ে পড়িয়া মোগল সম্রাটের চাকরি স্বীকার করিলেও দস্যু ব্যবসায় তিনি ছাড়েন নাই। দারা এক সময়ে তাঁহার অনেক উপকার করিয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহার কৃতজ্ঞতার উপর ভরসা করিয়া আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে মালব ও বুন্দেলখণ্ড সীমান্ত বরাবর চম্বল নদীর দক্ষিণ তীর রক্ষার ভার চম্পৎ রায়ের উপর ন্যস্ত করিয়া শাহজাদা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিলেন। এই অপাত্রে বিশ্বাস স্থাপন তাঁহার কালস্বরূপ হইল।

পণ্ডিতী ছাড়িয়া দারা নিতান্ত দায়ে পড়িয়া হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া যুদ্ধবিদ্যা শিখিতেছিলেন, অথচ উৎকট আত্মম্ভরিতার দরুন অভিজ্ঞ সেনানায়কগণের নিকট হইতে কিছু শিখিবার কিংবা সৎপরামর্শ গ্রহণ করিবার মনোবৃত্তি তাঁহার ছিল না। সাহস ব্যতীত তাঁহার কিছুমাত্র সামরিক যোগ্যতা থাকিলে তিনি আসন্ন বর্ষার তিন-চারি মাস অনায়াসে আওরঙ্গজেবকে চম্বল নদীর অপর পারে আটকাইয়া রাখিতে পারিতেন; ইহার জন্য চতুর্দ্দশ লুইয়ের সেনাপতি টুরেন্‌ কিংবা নেপোলিয়ানের সামরিক প্রতিভার প্রয়োজন ছিল না। ধোলপুর অপেক্ষাকৃত অরক্ষিত রাখিয়া এই স্থানে আওরঙ্গজেবকে নদী অতিক্রমে প্রলুব্ধ করিতে পারিলে দারা তাঁহাকে বেকায়দায় ফেলিতে পারিতেন, কোন স্থানে বিদ্রোহিগণ ছোটখাটো ধাক্কা খাইলেও উহার নৈতিক প্রতি-

ক্রিয়ায় যুদ্ধের মোড় ফিরিয়া যাইত। চম্বল নদী বরাবর পূর্ব্বদিকে চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল ব্যাপী পদাতিক সৈন্যের ছোট ছোট ঘাটি বসাইলে এবং ঐগুলির উপর সতর্ক দৃষ্টি ও শত্রুকে প্রাথমিক বাধাদানের জন্য পালাক্রমে ভ্রাম্যমাণ পাঁচ হাজার অশ্বারোহী মূল শিবির হইতে প্রেরণ করিলে ধোলপুরের ঘাটি বিপন্ন হইত না, শত্রুসৈন্য তোপখানা সহ নদী অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই মূল শিবিরে দ্রুত খবর পৌঁছিত। এই সমস্ত বিষয়ে মাথা না ঘামাইয়া দারা জ্যোতিষী ও সাধু ফকীরের ভবিষ্যদ্বাণী লইয়াই মশ্‌গুল রহিলেন।

যুদ্ধে জয়লাভ সম্বন্ধে স্বয়ং দারা ব্যতীত তাঁহার অতি-বিশ্বস্ত অনুচর ও শুভাকাঙ্ক্ষিগণ সকলেই বিলক্ষণ সন্দিহান ছিলেন। রাও ছত্রসালের মত যাঁহারা মরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন তাহাদের জিতের ভাবনা তাঁহাদের আদৌ ছিল না। দারার তোপখানায় নবনিযুক্ত মানুসী সাহেব আগ্রা হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে কৌতূহলবশতঃ শাহজাদার অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু Father Henrique Buzes-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, দারার বাদশাহ্ হওয়ার সম্ভাবনা সম্বন্ধে তিনি কি মনে করেন। পাদ্রী-সাহেব বলিয়াছিলেন, এই সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট সন্দেহ ও আশঙ্কা আছে; কেননা হিন্দুস্থানের লোকগুলি ভারি বদ-কুচক্রী (malicious); তাহাদিগকে শাসন করিবার জন্য আরও অধিকতর কুচক্রী লোকের প্রয়োজন; ইহাদিগের উপর বাদশাহী করা দারার মত ভালমানুষের কাজ নহে (*Storia*, I. 266)।

পাদ্রী-সাহেব হিন্দুস্থানের নাড়ী ঠিকই ধরিয়াছিলেন। তবে দোষটা কেবল হিন্দুস্থানের নহে, ইহা মানুষের জন্মগত ব্যাধি। কবি মিল্টন কল্পিত Democracy (গণতন্ত্র) কিংবা হিন্দুর সত্যযুগ ছাড়া শাসন ব্যাপারে ভালমানুষের স্থান নাই। সিধা আঙ্গুলে ঘি কোথাও উঠে না, হিন্দুস্থানে প্রবাদই চলিয়া আসিতেছে—সিধা কা মুঁহ কুত্তা চাটতা হায়।

৩

দারা ধোলপুর পৌঁছিবার এক দিন পূর্ব্বে সন্ধ্যার সময় (২১শে মে, ১৬৫৮) আওরঙ্গজেব ও মোরাদ গোয়ালিয়র দুর্গের বাহিরে তাঁবু ফেলিয়া ভবিষ্যৎ ভাবিতেছিলেন। গোয়ালিয়র হইতে সত্তর মাইল সোজা উত্তরে ধোলপুর ঘাট; ঐ রাস্তা ব্যতীত চম্বলনদী পার হওয়ার উপায় নাই। রাত্রির অন্ধকারে কয়েক হাজার সাহসী অশ্বারোহী যোদ্ধা কয়েকটি হাল্‌কা তোপ সহ সাধারণের অলক্ষিতে গোয়ালিয়র শিবির হইতে বাহির হইয়া পড়িল, কোথায় কি জন্য তাহারা চলিয়াছে, উহা তিন জন সেনাধ্যক্ষ ও পথপ্রদর্শক ছাড়া কেহই জানে না, পথ থাকিলে পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন হইত না। গোয়ালিয়র হইতে উত্তর-পূর্ব্বদিকে বসতিবিরল উঁচু-নীচু টিলা-টক্কর পাথুরে জমি ও বহুদূরব্যাপী কাঁটা-জঙ্গল ক্রমশঃ চম্বল নদীর নিকটবর্ত্তী হইয়া বুন্দেলখণ্ড সীমান্ত পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। একটি সঙ্কীর্ণ পগ্‌দণ্ডী বা পায়ে হাঁটা গ্রাম্য পথে অশ্বারোহিগণ এই দুর্গম প্রান্তরে প্রবেশ করিয়া সারা রাত্রি ঘোড়া দৌড়াইয়া, কোথারও বা ঘোড়াকে হাঁটাইয়া অজানার সন্ধানে দুর্জ্জয় পণ করিয়া সম্মুখে ছুটিয়াছে, অন্ধকারে ঠেলা-ঠেলিতে দৈবাৎ যাহারা নালা খাদে পড়িল তাহারা আর উঠিল না, সম্মুখে পশ্চাতে কেহ তাহাদের উদ্ধারের জন্য তিলার্দ্ধ অপেক্ষা করিল না। সূর্য্যোদয়ের পর এই অশ্বারোহিগণের অগ্রগামী দল ধোলপুর হইতে সোজা পূর্ব্বদিকে চম্বল-নদীর দক্ষিণ তীরে ভাদোলী* নামক স্থানে উপস্থিত হইল। ইহার অল্পদূরে চম্বল নদীর খাতে এক স্থানে মাত্র একহাঁটু জল, অপর পারে বাধা বা পাহারা দেওয়ার কেহ নাই। এই স্থানে অগ্রগামী অশ্বারোহী দল নদী পার হইয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। এই খবর পাইয়া স্বয়ং আওরঙ্গজেব ঐ দিন (২২শে মে ১৬৫৮) গোয়ালিয়র হইতে যাত্রা করিলেন, ভারী তোপখানা ও লটবহর পৃষ্ঠরক্ষী সেনাদলের অধীনে শিবিরে পড়িয়া রহিল। ২২ ও ২৩ তারিখ প্রায় একটানা দ্রুত কুচ করিয়া ২৩ তারিখ সন্ধ্যায় আওরঙ্গজেব উক্ত স্থানে চম্বল অতিক্রম করিয়া অপর পারে শিবির স্থাপন করিলেন, তখন পর্য্যন্ত আট-দশ হাজার সৈন্যের বেশী তাঁহার সঙ্গে আসিতে পারে নাই। গোয়ালিয়র হইতে চম্বল পর্য্যন্ত এই দুঃসাহসিক পথযাত্রার ধর্ম্মাতের যুদ্ধের সমানসংখ্যক প্রায় পাঁচ হাজার যোদ্ধা বিনা যুদ্ধে পথে মরিয়া রহিল; ঘোড়া, খচ্চর, বলদ, মুটেমজুরের হিসাব কে করিবে? রাস্তায় জলের অভাব, মাথার উপরে রোদের আগুন, পায়ের নীচে পাথর রোদে তাতিয়া গরম তাওয়া হইয়া গিয়াছে, তবুও পথ চলিতে হইবে। আওরঙ্গজেবের নিজের প্রাণের উপর মমতা ছিল না, পরের

* বর্ত্তমানে গ্রাম্য রাস্তা গোয়ালিয়র হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে গোহদ এলাকা ঘুরিয়া ভাদোলীর আরও কিঞ্চিৎ পশ্চিমে চম্বল নদীর অপর পারে উত্তরমুখী হইয়া যমুনাতীর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। এই ভাদোলীই সম্ভবতঃ আলমগীর-নামা ও আকিল খাঁ-কথিত ভাদোরিয়া বা ভাদোর—যেখানে এই অভিযানে আওরঙ্গজেব চম্বল নদী অতিক্রম করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

দ্রষ্টব্য—*History of Aurangzib* (Sarkar), Vols. I & II p 373; footnote. ফতুহাৎ-ই-আলমগিরী রচয়িতা ঈশ্বরদাস নাগর চম্বল নদীর এই চোরাঘাটের নাম লিখিয়াছেন, "কণিরা"। বর্ত্তমান ম্যাপে ভাদোলী হইতে তিন মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে কণেরা নামক গ্রাম আছে। আওরঙ্গজেবের ৫০।৬০ হাজার ফৌজ হয়ত ভাদোলী ও উহার কাছাকাছি কনেরা দুই স্থানেই চম্বল পার হইয়াছিল—এই জন্য ইতিহাসে নাম-বিভ্রাট ঘটিয়াছে।

নজরে মানুষ কামানের খোরাকের বাড়া কিছুই নয়।

চম্বল নদী পার হইয়া আওরঙ্গজেব তাঁহার তোপখানা ও অবশিষ্ট সৈন্যের জন্য অপেক্ষা করিলেন না; যমুনার দক্ষিণ তীর ধরিয়া সোজা আগ্রার দিকে কুচ করিয়া চলিলেন। আগ্রা দুর্গ ও তাজমহলের বাঁক অতিক্রম করিয়া যমুনা নদী যেখানে পূর্ব্বগামিনী হইয়াছে তাহার আট মাইল ভাটিতে রায়পুরে পারাপারের ঘাট; সুবা এলাহাবাদের মধ্য দিয়া যে বাদশাহী রাস্তা যমুনার উজান ধরিয়া আগ্রা গিয়াছে, তাহা অপর পার হইতে রায়পুরে যমুনা পার হইয়াছে; রায়পুরের বিপরীত দিকে দক্ষিণ তীরে আগ্রা হইতে আট মাইল দূরে ইমাদপুর গ্রাম। কুমার সুলেমান শুকো সম্রাটের আদেশে খুল্লতাত শুজার সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া আগ্রা যাত্রা করিয়াছিলেন (৭ই মে, ১৬৫৮ খ্রীঃ)। ইমাদপুরে সেনাসন্নিবেশপূর্ব্বক দারা ও সুলেমানের সেনাবল বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিবার অভিপ্রায়ে আওরঙ্গজেব চম্বল পার হইয়া ঐ দিকে সৈন্যচালনা করিলেন। ইমাদপুরে আশী হাজার টাকা খরচ করিয়া সম্রাট শাহজাহান প্রাসাদাদি নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন, শিকার খেলিবার সময় তিনি এইখানে আরাম করিতেন। ইহার আট-দশ মাইল দূরে জাহাঙ্গীর কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করিয়া নূর-মঞ্জিল নামক প্রাচীর-বেষ্টিত সুবৃহৎ বাগানবাড়ী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। নিরাপদে শিবির স্থাপন করিবার জন্য ইহা অতি উপযুক্ত, বিশেষতঃ জলের যথেষ্ট সুবিধা। ইমাদপুর ও নূর-মঞ্জিলের চারিদিকে বহু বিস্তৃত সমতল ভূমি, মাঝে মাঝে জঙ্গল। বিরাট বাহিনী ইচ্ছামত পরিচালনা করিবার পক্ষে ইহা অত্যন্ত সুবিধাজনক স্থান; পরবর্ত্তীকালে আগ্রা দখলের জন্য এইখানেই বরাবর ভাগ্যপরীক্ষা হইয়াছে।

৪

আওরঙ্গজেব যখন গোয়ালিয়র হইতে চম্বল অতিক্রম করিয়া অলক্ষিতে আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখনও বাদশাহী ফৌজের সচকিত দৃষ্টি সম্মুখে চম্বলের অপর তীরে আওরঙ্গজেবকে খুঁজিতেছিল; দারার নিশ্চেষ্টতায় সৈন্যদের উৎসাহে ভাটা পড়িল। ধোলপুর হইতে মাত্র চল্লিশ মাইল দূরে শত্রুসৈন্যের চম্বল নদী অতিক্রম করার সংবাদ দারার কাছে পৌঁছিতেই দুই-তিন দিন কাটিয়া গেল, ইতিমধ্যে বাদশাহী ফৌজকে পাশ কাটাইয়া আওরঙ্গজেব আগ্রার দিকে ছুটিয়াছেন। খবর পৌঁছিতেই ধোলপুর এবং আগ্রায় আতঙ্ক ও হাহাকার পড়িয়া গেল, বাদশাহী ফৌজ যুদ্ধের ভারী সরঞ্জাম ও বড় বড় তোপগুলি যেখানে ছিল করিতে বাধ্য হইল। সম্রাট দারার কাছে লিখিয়া পাঠাইলেন যুদ্ধ না করিয়া, সেনাবাহিনীকে আগ্রায় লইয়া আসিয়া কুমার সুলেমান শুকোর প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত শহরের বাহিরে শত্রুর গতিরোধ করাই এই অবস্থায় একমাত্র উপায়।

বয়স ও অবস্থার ফেরে পড়িয়া শাহজাহানের বিচারক্ষমতা হ্রাস পাইলেও যুদ্ধের ব্যাপারটা তিনি দারা অপেক্ষা তখনও ভাল বুঝিতেন। তাঁহার উপদেশমত আগ্রা শহরকে কেন্দ্র করিয়া অর্দ্ধ লক্ষ সেনা আত্মরক্ষামূলক ব্যূহরচনা করিলে আওরঙ্গজেব ফাঁপরে পড়িতেন, কালক্ষেপ তাঁহার পক্ষে মারাত্মক হইত। কুমার সুলেমান শুকো এই সময়ে এলাহাবাদের কাছাকাছি পৌঁছিয়াছিলেন। সামুগড়ের যুদ্ধে দারার পরাজয় না ঘটিলে মীর্জ্জা রাজা জয়সিংহ ও দেলের খাঁ সরাসরি আওরঙ্গজেবের পক্ষে যোগ দিতে অন্ততঃ ইতস্ততঃ করিতেন। আওরঙ্গজেবকে আগ্রার বাহিরে কিছু দিনের জন্য ঠেকাইয়া রাখিতে পারিলে, পঞ্জাব হইতে দারার বিশ্বস্ত সেনানায়কগণ এবং মারবাড় হইতে মহারাজা যশোবন্ত হয়ত আসিয়া পড়িতেন। পিতাকে উদ্ধার এবং দারাকে রক্ষা করিবার মতলব না থাকিলেও শাহশুজা হয়ত সসৈন্যে আবার অগ্রসর হইয়া সুবা এলাহাবাদ দখল করিয়া বসিতেন। এইভাবে বেষ্টিত হইয়া পড়িলে নিশ্চয়ই আওরঙ্গজেবের সুর নরম হইত, সম্রাট পুত্র-বিগ্রহের প্রথম ধাক্কা সামলাইয়া উঠিতে পারিতেন। মোট কথা, শাহজাহান যৌবনে পিতার বিরুদ্ধে দাক্ষিণাত্য হইতে অভিযান করিয়া যে অবস্থায় পড়িয়াছিলেন আওরঙ্গজেব-মোরাদেরও সেই অবস্থা হইত।

যাহা হউক, দারার হঠকারিতা এবং খলিলুল্লা খাঁর দুষ্ট বুদ্ধি ও বিশ্বাসঘাতকতায় সব বানচাল হইয়া গেল। ধোলপুর হইতে আগ্রার পথে সমস্ত সৈন্য লইয়া দারা যখন আওরঙ্গজেবের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, সেই সময়ে সুবিখ্যাত আলীমর্দ্দান খাঁর পুত্র যুবক সেনানায়ক ইব্রাহিম খাঁ শাহজাদাকে সময়োচিত সৎপরামর্শ দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—বার হাজার রণকুশল অশ্বারোহী দক্ষিণ দিকে শত্রুর সন্ধানে প্রেরণ করিলে তাহারা চম্বলতীর হইতে যমুনা পর্য্যন্ত ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত এবং পথশ্রমে অর্দ্ধমৃত শত্রুসৈন্যকে যে কোন স্থানে সুযোগমত আক্রমণ করিয়া খণ্ডশঃ ধ্বংস করিতে পারিবে; বিশেষতঃ তোপখানার ভয় নাই; কারণ উহাকে চম্বল পার করাইতে সময় লাগিবে। মেসো খলিলুল্লা খাঁকে ডাকাইয়া দারা ইব্রাহিম খাঁর প্রস্তাব সম্বন্ধে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, এই সমস্ত ছেলে চ্যাঙড়ার কথায় কান দিলে কি চলে? এই ভাবে বার হাজার ফৌজ হাতছাড়া করিয়া শাহজাদার

সুনিশ্চিত জয়লাভের সম্ভাবনাকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া উচিত নয়; অধিকন্তু, যদি কোন সেনানায়ক বার হাজার অশ্বারোহী লইয়া শত্রুকে ছত্রভঙ্গ করিয়া জয়মণ্ডিতই বা হয় তাহাতে শাহাজাদার ক্ষতি ছাড়া লাভ কিছুই হইবে না; এই কৃতকার্য্যতার গৌরব কেহ শাহজাদাকে দিবে না।

মেসোর কথায় দারা ভড়কাইয়া গেলেন। কিন্তু দারার স্থলে স্লেমান শুকো হইলে খলিলুল্লার মতলব ধরা পড়িত। ইব্রাহিম খাঁর পরামর্শমত কাজ করিবার সাহস ও দৃঢ়তা থাকিলে দারা হেলায় দিল্লীর মসনদ হারাইয়া বসিতেন না। রুস্তম খাঁ বাহাদুর ফিরোজজঙ্গ কিংবা রাও ছত্রসালের সেনাপতিত্বে ইব্রাহিম খাঁর মত কর্মচারীর অধীনে বার হাজার অশ্বারোহী এই সময়ে যমুনা হইতে চম্বল পর্য্যন্ত ব্যাপী চলমান শত্রুবাহিনীকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রেরণ করিলে যুদ্ধোদ্যম (initiative) আওরঙ্গজেবের হাতছাড়া হইত, চম্বলের সেতুমুখ রক্ষার জন্য তাঁহাকে আগ্রার রাস্তা ছাড়িয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে হইত। লড়াইয়ের ময়দানে সামনে পঞ্চাশ হাজার অপেক্ষা ডাহিনে বাঁয়ে পিছনে পাঁচ হাজার শত্রুসেনা অধিক মারাত্মক। বলা বাহুল্য, খলিলুল্লা এই জন্যই ইব্রাহিম খাঁর প্রস্তাবে আঁতকাইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং ইহাই দারার পরাজয়ের প্রথম সূচনা।

৫

আগ্রা হইতে সোজা আট মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে সামুগড়ের ময়দান, ইহার আধ মাইল উত্তরে এবং চার মাইল পূর্ব্বে যমুনার বাঁক চলিয়া গিয়াছে—সামুগড় হইতে এক মাইল আরও দূরে ইমাদপুরের শিকার-মঞ্জিল লক্ষ্য করিয়া আওরঙ্গজেবের অগ্রগামী সেনাদল ছুটিয়া আসিতেছিল। বাদশাহী ফৌজ আগ্রার রাস্তা ছাড়িয়া সামুগড়ের দিকে অগ্রসর হইল এবং ২৭শে মে উহার অনতিদূরে ধুধু মাঠে শিবির স্থাপন করিল। ২৮শে মে আওরঙ্গজেব সামুগড়ের তিন মাইলের মধ্যে পৌঁছিয়াছেন শুনিয়া দারা যুদ্ধার্থ সৈন্যসজ্জার হুকুম দিলেন। নিজের বুদ্ধিতে এবং পিতার আদেশের বিরুদ্ধে সেনাপতি হিসাবে এই যুদ্ধসজ্জা দারার প্রথম কার্য্য। আওরঙ্গজেব চম্বল পার হইয়াছে শুনিয়া বৃদ্ধ সম্রাট দারার জয়ের আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন এবং যুদ্ধ না করিবার জন্য দারার কাছে হুকুম পাঠাইয়াছিলেন। সম্রাট স্থির করিলেন—তিনি স্বয়ং আগ্রা হইতে যাত্রা করিয়া উভয় সেনার মধ্যস্থলে শিবির স্থাপন করিবেন, এই জন্য তিনি শহরের বাহিরে শাহী পেশ্‌-খানা (অগ্রবর্ত্তী তাঁবু) ফেলিবার হুকুম দিয়াছিলেন

২৮শে মে দুপুরের পূর্ব্বে দারার অর্দ্ধলক্ষ সেনা যুদ্ধার্থ ব্যূহবদ্ধ হইয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল; তখন পর্য্যন্ত আওরঙ্গজেবের সমস্ত ফৌজ ও ভারী তোপখানা আসিয়া পৌঁছে নাই, যাহারা আসিয়াছে—পথে একটানা চলিয়া আধ-মরা হইয়াছে, ইহাই তাঁহার সঙ্কটমুহূর্ত্ত। আওরঙ্গজেব কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া যেখানে ছিলেন সেখানে কেবলমাত্র আত্মরক্ষার জন্য সেনাসন্নিবেশ করিলেন, কেহ প্রতিপক্ষের নিকটস্থ হইল না। দারার সেনাবাহিনী যুদ্ধার্থ সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়াও আওরঙ্গজেবকে আক্রমণ করিল না, দুপুর হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত নিশ্চেষ্টভাবে শত্রুর দৃষ্টিপথে দাঁড়াইয়া রহিল, প্রখর রৌদ্রে তৃষ্ণায়, বালুকাভূমির উত্তপ্ত নিশ্বাসে প্রবহমাণ তাপতরঙ্গের সর্দ্দি-গর্ম্মিতে যোদ্ধা, যুদ্ধাশ্ব ও ভারবাহী জন্তুসমূহ মরিতে লাগিল; লোহার সাঁজোয়া-পরা জঙ্গী হাতী, ঘোড়া এবং কবচধারী যোদ্ধগণের বর্ম্মসমূহ রৌদ্রে তাতিয়া আগুন হইয়াছে, কোথায়ও জল নাই, ছায়া নাই; অথচ হামলা করিবার হুকুম নাই, শিবিরের আশ্রয়ে ফিরিবার অনুমতি নাই।

শত্রুর সম্মুখে মোহগ্রস্তের ন্যায় দারার কেন এই ক্লৈব্য? দারার শিবিরে (এবং সমসাময়িক) ইতিহাসেও দারার এই ভীরুতা ও অব্যবস্থিতচিত্ততা জল্পনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছিল। প্রত্যক্ষদর্শী ঐতিহাসিক দারার সৈন্যের দুর্দ্দশার কথা লিখিয়া গিয়াছেন, বৃদ্ধ ম্যানুসী প্রথম যৌবনের অস্পষ্ট স্মৃতি মনে করিয়া দারার মতপরিবর্ত্তন সম্বন্ধে অনেক জল্পনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, এই দিন দারা বাস্তবিকই যুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু বিশ্বাসঘাতকগণ পঞ্জিকার দোহাই দিয়া দিনক্ষণ শুভ নয়—এই অজুহাতে শাহজাদাকে নিরস্ত করিয়াছিল। জ্যোতিষগণনার উপর দারার নিঃসন্দেহ অটুট বিশ্বাস ছিল; কিন্তু যাত্রার পূর্ব্বে মুহূর্ত্ত-বিচার না করিয়া তিনি বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং শত্রুর সম্মুখীন হইয়া গণৎকার ডাকাইয়াছিলেন—এমন কথা মানিয়া লওয়া যায় না। তিনি আরও লিখিয়াছেন, ঐ দিন সকালবেলা এক পশলা বৃষ্টি হইয়াছিল। দারার শিবিরে আওরঙ্গজেবের প্রচ্ছন্ন হিতৈষিগণ এই প্রাকৃতিক ঘটনার এক অদ্ভুত দৈবী ভাষ্য করিয়া বসিল। ইহাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল যাহাতে আওরঙ্গজেব অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রান্ত না হয়; সেইজন্যই যেকোন ভাবে দারার যাত্রায় বিঘ্ন ও বিলম্ব সৃষ্টি। এই অপ্রত্যাশিত বর্ষণ উহাদের মতে ঐ দিন দারার অমঙ্গল-আশঙ্কায় অশ্রুপাত—সুতরাং খোদাতালার ইশারা না মানিলেই বিপদ। ইহাতে দারার মত ব্যক্তির ভড়কাইয়া যাইবার কথা বটে; খলিফা আব্দুল মালিকের সেনাপতি হাজ্জাজ-বিন্ ইউসুফের

মত* "লৌহমানব" হইলে শাহজাদা এই বর্ষণকে যাত্রার প্রাক্কালে বিধাতার হাতে জয়াভিষেক-বারিসিঞ্চন মনে করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে ঐদিন যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িতেন। আসল কথা, এই ব্যাপারের এক দিন পূর্ব্বে দারা সম্রাটের নিকট হইতে এক জরুরী আদেশ পাইয়াছিলেন যেন বাদশাহী ফৌজ লইয়া তিনি আগ্রায় ফিরিয়া আসেন এবং সুলেমান শুকোর প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেন। ইহার উত্তরে দারা লিখিয়াছিলেন, ফৌজ হটাইয়া লইলে দুশমন টিট্‌কারি দিবে, তিন দিনের মধ্যেই ঈশ্বর-ইচ্ছায় অবাধ্য আওরঙ্গজেব ও মোরাদকে হাত-পা বাঁধিয়া দরবারে হাজির করা যাইবে—বাদ-বাকী শাহানশাহের মর্জ্জি! এইজন্য পরদিন দারা সম্ভবতঃ বোঁকের মাথায় কোন বাধা না মানিয়া সৈন্যচালনা করিয়াছিলেন; কিন্তু বিপক্ষকে আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে এমনকিছু ঘটিয়াছিল যাহার জন্য প্রথমে হামলা করিয়া সম্রাটের আদেশ লঙ্ঘন করিবার সাহস তিনি করেন নাই। সম্রাট বার-বার বলিয়াছিলেন সেনাধ্যক্ষগণের সহিত পরামর্শ না করিয়া যেন যুদ্ধ আরম্ভ করা না হয়। এই ক্ষেত্রে দারার প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন বিশ্বাসঘাতক কপটী খলিলুল্লা খাঁ, ইঁহার মতের বিরুদ্ধে সম্রাটের আদেশ উপেক্ষা করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে রাও ছত্রসাল ও ফিরোজজঙ্গ হয়ত ইচ্ছা সত্ত্বেও ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, সূর্য্যাস্তের সময় দারার সুসজ্জিত বাহিনী ভাঙ্গামন, ক্লান্তদেহ এবং বিনা যুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানি ও অবসাদে অভিভূত হইয়া ফিরিয়া আসিল; অপরপক্ষে আওরঙ্গজেবের শিবিরে জয়োল্লাস ও অসীম উদ্দীপনা। ঐদিন অর্দ্ধ নিশায় আওরঙ্গজেবের শিবির হইতে তিন বার তোপধ্বনি হইল, এবং দারার তোপখানা তিন বার তোপ দাগিয়া ইহার জবাব দিল। বিপক্ষের এই সঙ্কেত দারার শিবিরে যাহারা শুনিবার জন্য কান খাড়া করিয়া বসিয়াছিল তাহারা বুঝিয়া লইল। ভোরের আঁধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত অশ্বারোহী দারার শিবির ত্যাগ করিয়া চুপচাপ বাহির হইয়া পড়িল; তাহারা আর ফিরিল না।

৬

রাত্রি ভোর হওয়ার পূর্ব্ব হইতে উভয় শিবিরে যুদ্ধ-সজ্জার ধুম পড়িয়া গেল। সামুগড়ের সুবিস্তৃত বালুকা-প্রান্তরে শিবিরের বাহিরে দুই মাইল ব্যাপী স্থান জুড়িয়া বাবরশাহী কায়দায় দারার বিরাট বাহিনী যুদ্ধার্থ ব্যূহবদ্ধ হইল। ব্যূহের অগ্রভাগে একই সারিতে সজ্জিত তোপখানা, তোপবাহী কামানের গাড়ীর (রেহ্‌কল) সম্মুখে বিপক্ষ অশ্বারোহীর গতিবেগ রোধ করিবার জন্য "অরাবা"-র চলমান কাষ্ঠপ্রাচীর। বলদ ছাড়া গরুর গাড়ীর সারি সারি পাটাতন সামনের দুই চাকার উপর ভিতরের দিকে হেলান ভাবে খাড়া করিয়া এই "অরাবা" প্রস্তুত করা হইত; গাড়ীগুলি পরস্পরের সহিত মোটা কাঁচা চামড়া ফালি কিংবা দড়ি দিয়া বাঁধা থাকিত। তোপখানার সারি এবং "অরাবা" উভয়েরই মাঝে মাঝে নির্গম-পথ এবং তোপখানার কাপ্তানগণের ছোট ছোট তাঁবু। এই অরাবা-র পিছনে ও তোপখানার তিন দিকে পঁচিশ হাজার বন্দুকধারী পদাতিক এবং অন্যান্য পদাতিক যোদ্ধা। পদাতিক-শ্রেণীর পশ্চাতে "শোতর-নাল্" বা ক্ষুদ্র নালিকাস্ত্রবাহী উটের কাতার, সংখ্যায় পাঁচ শত। ইহাদের পশ্চাতে লৌহবর্ম্মসজ্জিত যুদ্ধহস্তীসমূহ অন্তর্ব্যূহের সম্মুখে দ্বিতীয় প্রাকারের ন্যায় দণ্ডায়মান। ইহাদের পশ্চাতে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট হাজার অশ্বারোহী যোদ্ধা মোগল সামরিক পদ্ধতি অনুসারে "ইল্‌তিমিশ", "হরাবল" ইত্যাদি বিভিন্ন ভাগে যুদ্ধার্থ স্থান গ্রহণ করিল। "হরাবল" বা ব্যূহমুখে ভীমকর্ম্মা ভীষ্মপ্রতিম বুন্দীরাজ ছত্রসালের সেনাপতিত্বে হাড়া, রাঠোর, গৌর, শিশোদিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন কুলের রাজপুত-যোদ্ধা, চারি সহস্র রণদুর্ম্মদ পাঠান এবং শাহজাদার বক্‌শী (paymaster) আস্কর খাঁর অধীনে দারার নিজ তাবিনের বাছা বাছা তিন হাজার অশ্বসাদি স্থাপিত হইয়াছে। এই হরাবল ব্যূহের বর্শাফলক, দারার প্রধান ভরসাস্থল। হরাবলের কিছুদূর পশ্চাতে "কেন্দ্রভাগ" এবং কেন্দ্রের উভয় পার্শ্বে ব্যূহের ডান ও বাম বাহু যথারীতি স্থান গ্রহণ করিয়াছে। কেন্দ্র এবং হরাবলের মধ্যস্থানে অগ্রবর্ত্তী সংরক্ষিত সেনাভাগে (Advanced Reserve) রাজপুত ও দারার অনুগত মুসলমান অশ্বারোহীর মিশ্র দল, সংখ্যায় দশ হাজার; ইহাদের অধিনায়ক যথাক্রমে কুমার রামসিংহ (মীর্জ্জা-রাজা জয়সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র) এবং সৈয়দ বহির খাঁ।

কেন্দ্রের "কলিজা"র ("কাল্‌ব") মধ্যভাগে ঐরাবততুল্য গজপৃষ্ঠে কেন্দ্রস্থ বাহিনীর অধিনায়ক স্বয়ং শাহজাদা দারা;

* খলিফা আব্দল মালিক এই তড়িৎকর্ম্মা ব্যক্তিকে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী আব্দল্লা ইবন্ জোবায়েরের বিরুদ্ধে সেনাপতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মুসলমান মক্কাশরীফের উপর হামলা করিবে না এই ভরসায় কাবার মন্দিরেই ইবন্ জোবায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। যখন হাজ্জাব বিন্ ইউসুফ মক্কার উপর আক্রমণ আরম্ভ করিলেন, তখন আকাশে ঘনঘটা, পৃথিবী বজ্রপাতে কম্পমানা। ইহাকে খোদার গজব মনে করিয়া তাঁহার সৈন্যগণ ভীত হইয়া পড়িল। হাজ্জাব বিন্ ইউসুফ তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, তোমরা গুনাহ্‌গার বুজ্‌দিল আহ্‌মক; আমাদের কাজে খুশী হইয়া খোদাতালা দুনিয়া কাঁপাইয়া আগেই মোবারক-বাদ জানাইতেছেন—এটা বুঝিবার মগজ তোমাদের নাই? বলা বাহুল্য, ইনি জয়ী হইয়াছিলেন।

আশেপাশে বাদ্যভাণ্ড ও পতাকাবাহী হাতী এবং তাঁহার সাক্ষাৎ হুকুমে নিজ তাবিনের সর্ব্বাপেক্ষা রণকুশল ও অতি বিশ্বস্ত তিন হাজার অশ্বসাদি। এই ভাগের উভয় পাশ্বি-রক্ষক অশ্বারোহীর অধিনায়ক নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহার অতি অন্তরঙ্গ অনুচর জাফর খাঁ এবং ফকর খাঁ।

দারার দক্ষিণ বাহু (right wing) বানু দরবারী তথা পাকা ঘুঘু মেসো খলিলুল্লার অধীনে পঞ্চদশ সহস্র সুচতুর তাতার ইয়ুজবক্ অশ্বারোহী লইয়া গঠিত হইয়াছিল। বাহিনীর বামপক্ষের (left wing) নামমাত্র অধিনায়ক দারার নাবালক পুত্র কুমার সিপ্‌হর শুকো, কিন্তু এই ভাগের কার্য্যতঃ মুখ্য সেনাপতি রুস্তমতুল্য পরাক্রমশালী দারার জন্য ত্যক্তজীবিত বীরশ্রেষ্ঠ ফিরোজজঙ্গ-বাহাদুর। এই ভাগের জন্য দশ-পনর হাজার বারাহ্-বাসী অমিত-বিক্রম সৈয়দ ও বাদ্‌শাহী-গুরজ্-বরদার (mace-bearer) এবং সম্রাটের দেহরক্ষী-আহদী অশ্বসাদি।

৭

সামুগড়-প্রান্তরে দারার বূহবদ্ধ সেনা-বারিধি বেলা বাড়িবার (২৯শে মে, ১৬৫৮) সঙ্গে সঙ্গে বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া বিপক্ষ-বাহিনীকে গ্রাস করিবার জন্য অধিকতর চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। স্থূল দৃষ্টিতে মনে হয় যেন দাক্ষিণাত্য তরঙ্গিণী এই সেনাপ্রবাহের উত্তরবাহিনী প্রলয়ঙ্করী কীর্ত্তিনাশা এই সমুদ্রে অতলে তলাইয়া যাইবে, কিন্তু সামরিক দৃষ্টিতে সমগ্রভাবে উভয় সেনার বলাবল বিবেচনা করিলে বলিতে হয় দারার বাহিনী ভয়সঞ্চারী অচলায়তন মাত্র। ইহার প্রতিরোধক্ষমতা আছে, কিন্তু নড়িবার চেষ্টা করিলে ভাঙ্গিয়া পড়িবে। সেনাপতি হিসাবে আওরঙ্গজেবের তুলনায় দারা দাড়ি পাকাইয়াও অজাতশ্মশ্রু শিক্ষানবীস, খোলা ময়দানে সৈন্যচালনায় তাঁহার সবেমাত্র হাতেখড়ি। মাথা ঠাণ্ডা না রাখিলে, অল্পে অস্থির হইলে যুদ্ধ জয় হয় না; পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে ঘোড়ার উপর বসিয়া অবিরাম হুঁকা টানিতে টানিতে আবদালী লড়াই ফতে করিলেন, উগ্রকর্ম্মা ভাও সারাদিন দুই হাতে তলোয়ার চালাইয়া মরিলেন। আওরঙ্গজেব অতি বিচক্ষণতার সহিত উপায়ের সঙ্গে সঙ্গে "অপায়" চিন্তা করিয়া পূর্ব্বেই প্রতিকারের ব্যবস্থা করিয়া রাখিতেন; দারার কোন চিন্তার বালাই ছিল না, বুক-ভরা সাহসের জোরে ঝোঁকের মাথায় চলিতেন; সুতরাং স্থিরবুদ্ধির বিরুদ্ধে স্নায়ুবিকারগ্রস্ত ব্যক্তির জয়ের সম্ভাবনা কোথায়? দারার পক্ষে প্রবীণ যোদ্ধা রাও ছত্রসাল ও ফিরোজজঙ্গ প্রমুখ কয়েকজন সেনানায়ক ছিলেন যাঁহারা যুদ্ধ দারা অপেক্ষা ভাল বুঝিতেন; কিন্তু এই ক্ষেত্রে সমর-তরণীর কর্ণধার স্বয়ং শাহজাদা, অন্যান্য সকলেই খালাসী দাঁড়ী-মাল্লা; মাঝ দরিয়ায় বানের মুখে মাঝির মাথা ও নৌকার হাল ঠিক না থাকিলে ভীম-রুস্তমও দাঁড় টানিয়া নৌকা বাঁচাইতে পারে না।

দ্বিতীয় কথা, দাক্ষিণাত্যে চার-পাঁচ বৎসর একটানা লড়াই ও কুচ করিয়া আওরঙ্গজেবের সিপাহী, হাতী, ঘোড়া উটের গায়ে চর্ব্বি জমিবার অবকাশ হয় নাই, তোপে মরিচা ধরে নাই, গোলন্দাজের হাত পাকা হইয়াছে। ফৌজে খরচের জায়গায় যেগুলি নয়া ভর্ত্তি হইয়াছে, তাহাদিগকে পুরাতন সিপাহীর পল্টনে ভাঁজ দিয়া হাড়-পাকা করা হইয়াছে। গোলাগুলির আওয়াজ যুদ্ধের সোরগোল তলোয়ারের হাল্‌কা চোট, তীরের ফলা, বর্শার খোঁচা তাঁহার উট ঘোড়া হাতীর কান ও গা-সহা হইয়া গিয়াছে।

অপর পক্ষে দারার ফৌজে এক-তৃতীয়াংশ সিপাহী বিনা বাদ-বিচারে মাসখানেক পূর্ব্বে ভর্ত্তি করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বেশীর ভাগ আগ্রা শহরের ভবঘুরে সইস দর্জ্জি কসাই পাখী-বেহারা টাকার লোভে ঘোড়া ধার করিয়া এমন সখের সিপাহী সাজিয়াছে, যাহাদের সামনে গোলা ফাটিলে হয়তো আওয়াজেই মরিয়া যাইবে! শাহজাদার এবং বাদশাহী আস্তাবলের ঘোড়া ও হাতী বসিয়া খাইতে খাইতে মোটা হইয়াছে, এইগুলি গরম সহ্য করিতে পারে না, যুদ্ধ কদাচিৎ দেখিয়াছে। কামানের সংখ্যা ও আকারে দারার তোপখানা অধিকতর ভারী ছিল; কিন্তু বড় বড় তোপগুলি ধোলপুর ঘাটে পাকাপোক্ত ভাবে বসানো হইয়াছিল, ঐগুলি সামুগড় পর্য্যন্ত লইয়া আসিবার সময় হয় নাই। আওরঙ্গজেবের তোপখানা ছোট হইলেও গোলন্দাজসমূহ বিশ্বস্ত ও কাজের লোক, কামানের গাড়ী হাল্‌কা এবং দ্রুতগামী; সুতরাং লড়াইয়ের ময়দানে প্রয়োজন অনুসারে এক জায়গা হইতে অন্যত্র সরাইয়া লওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। বিভিন্ন জাতি ও দেশ হইতে সংগৃহীত হইলেও মোরাদ এবং আওরঙ্গজেবের সৈন্যগণ ধর্ম্মাতের যুদ্ধে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিয়াছে, দুই মাস একত্র কুচকাওয়াজ করিয়া উহাদের মধ্যে পরস্পরের উপর বিশ্বাস ও নির্ভরতা দৃঢ় হইয়াছে। দারার সেনাবাহিনী দশ দিনের মধ্যে আগ্রা হইতে ধোলপুর এবং ধোলপুর হইতে সামুগড় পর্য্যন্ত মোট চুয়াত্তর মাইল একত্র কুচ করিয়া ঐরূপ দৃঢ়সংবদ্ধ হইতে পারে নাই।

যুযুৎসু বাহিনীদ্বয়ের মধ্যে মনোবলের অনুরূপ বৈষম্য। আওরঙ্গজেবের ফৌজ জয়ের উদ্দীপনায় একদিল হইয়া যুদ্ধে নামিয়াছে, দারার সেনা দোমনা এবং সংশয়াকুল। আওরঙ্গজেবের ক্ষমতার উপর সিপাহী মনসবদার সকলের অগাধ বিশ্বাস; তাঁহার সেনাবাহিনী একই ব্যক্তির অখণ্ড

নেতৃত্ব ও বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত, দুর্ব্বারগতি বিরাট যুদ্ধ-যন্ত্র। দেড় মাস পূর্ব্বে ধর্ম্মাতের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া যাহাদের আত্ম-প্রত্যয় সুদৃঢ় হইয়াছিল, বার ঘণ্টা পূর্ব্বে দারার ফৌজ বিনা-যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া তাহাদের উৎসাহ ও আত্মবিশ্বাস দ্বিগুণ করিয়া তুলিয়াছে। অন্য দিকে দেখা যায়, দারার বিশাল বাহিনীর এক অংশ শত্রুর প্রচ্ছন্ন হিতাকাঙ্ক্ষী বিশ্বাসঘাতকপুষ্ট এবং পক্ষাঘাতগ্রস্ত। তাঁহার প্রধান সহকারিগণের মধ্যে মতের মিল নাই, খলিলুল্লা রন্ধ্রগত শনি; রাজপুত, সৈয়দ, পাঠান, তাতার, খোরাসানীর মধ্যে রেষারেষি, তেল-জলের মত মিশ খাইবার নহে। সাধারণ অফিসার ও সিপাহী যাহারা জান কবুল করিয়া দারার পক্ষে যুদ্ধে নামিয়াছে, শাহজাদার ভাবগতিক দেখিয়া তাহারাও বিমর্ষ বিরক্ত,—যথা ম্যানুসী* সাহেব।

দারার প্রধান ভরসা এবং আওরঙ্গজেবের ভয়স্থান ও দুশ্চিন্তার বিষয় রাও ছত্রসাল-পরিচালিত রাজপুত-বাহিনী মুসলমান ঐতিহাসিকের ভাষায় রাজপুতের হামলা বুনো শূয়রের গোঁ-ধরা দৌড়; উহার সামনে কেহ বাঁচে না। আওরঙ্গজেব রাজপুতের দোষগুণ, বৈশিষ্ট্য ও দুর্ব্বলতা ভালরকম জানিতেন। অর্দ্ধশতাব্দী পরে মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি পুত্র আলি-জাকে (শাহ আলম) এক চিঠিতে প্রসঙ্গক্রমে লিখিয়াছিলেন—"বেপরোয়া হিম্মত ও নিমকহালালীতে রাজপুতের জুড়ি নাই; কিন্তু বদ্ধ বেকুবী (crass stupidity) উহাদের প্রধান দোষ। খোরাসানী চতুর যোদ্ধা, ইশারায় চলে; লড়াইয়ের ময়দানে উহাদের ফৌজ চুপচাপ সামনে পিছনে ঘুরাইতে পারা যায়। রাজপুত সম্বন্ধে আওরঙ্গজেবের উক্তি অতি সত্য সন্দেহ নাই। কলিযুগে মহাভারতের দোহাই দিয়া যাহারা লাভক্ষতি বিবেচনা না করিয়া নিমকহালালী করে, মুসলমানের দুশমন মারিয়া স্বর্গ কামনা করে, পরের জন্য নিজের কাঁচা মাথা কাটায়, স্বেচ্ছায় মরণের মুখে লাফাইয়া পড়িয়া ক্ষত্রিয়ত্ব জাহির করে, ইশারা বুঝে না, পিছে হটিবার হুকুম পাইলে ভ্যাবাচাকা খায়, "কেঁউ হটেঙ্গে" বলিয়া গোলমাল বাধায়, তাহারা পাটোয়ারী বুদ্ধির মাপকাঠিতে নিশ্চয়ই নিরেট বোকা।

* "The presumption that I discovered in Dara afflicted me, seeing him give cerdit to the words of traitors. . . . . . On the whole I did not feel satisfied, finding that Dara was not making the exertions required for the good ordering of such a huge army. He had no sufficient experience in war . . . . and gave undue credit to the words of traitors.
(*Storia* i, p. 273)

মিলনে ও বিরহে

শ্রীকালিদাস রায়

মিলনের দিনে গগন ভরিয়া
কত বার এলে জলধর।
তোমারে চিনি নি তোমাপানে চেয়ে
দেখিতে ছিল না অবসর।
নিভৃত কক্ষে প্রিয়া বাহুপাশে
রহি তন্ময়, আষাঢ়-আকাশে
শুনিয়া কেবল গভীর মন্দ্র
উদাসী হয়েছে অন্তর।
শিথিল হয়েছে বাহু-বন্ধন।
শুনিয়াছি যেন দূর ক্রন্দন।
অজানা ব্যথায় অজানা কারণে
ব্যথিয়া উঠেছে পঞ্জর।

বিরহের দিনে তোমারে আজিকে
চিনিতে পেরেছি, জলধর,
ইন্দ্রধনুর শিখিচূড়া-শিরে
তুমি যেন শ্যাম মনোহর।
প্রথম আমার জুড়াইলে আঁখি,
আজি তোমা প্রাণসখা ব'লে ডাকি,
বুঝেছি মিলনে যে নয় আপন
বিরহে সে জন নহে পর।
তুমি সখা মোর বুঝেছ কি ব্যথা?
আনিয়াছ তুমি প্রিয়ার বারতা?
আমারো বারতা প্রিয়ার সকাশে
বয়ে নিও যাও দূতবর।

দুটি জানালা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

বড় রাস্তা থেকে বেরিয়েছে বটে গলিটা—ওর কোনখানেই সরকারী ছাপ নেই। ওটা ব্যক্তিগত সম্পত্তিই, মাত্র গুটি-তিনেক বাড়ীর মধ্যে শাখা বিস্তার করে ফুরিয়ে গেছে। বড় রাস্তার সরকারী আলোর নরম ছায়া গলির অল্পদূরে এসে অন্ধকারে হারিয়ে গেলেও মানুষকে হাতড়ে হাতড়ে গলি পার হতে হয় না। গলির মাঝ বরাবর যে তিনতলা বাড়ীটা রয়েছে তার অনেকগুলি খোলা জানালা দিব্য আলো-আঁধারি ছায়াপথ রচনা করে মানুষকে আশ্বাস দেয়। তবে একতলার জানালাগুলি প্রায় বন্ধ থাকে। অত বড় বাড়ীটায় ঘরের অভাব নাই। বসতদার সে হিসাবে কম, কাজেই সব ঘর ব্যবহৃত হয় না।

আজ হঠাৎ আলো জলে উঠেছে একতলার বড় ঘরে, এ দিকের কয়েকটি জানালাও গেছে খুলে। আলোর চিক বুনে কে যেন গলির বুকে বিছিয়ে দিয়েছে। মানুষও জমেছে ওই বড় ঘরখানিতে। নানা কণ্ঠের হাসির আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নানান্ যন্ত্রে সুরের অস্ফুট আওয়াজ উঠছে। বাতাসে ভেসে আসছে ফুলের মিশ্র সৌরভ। সহসা পাষাণ-অবরোধ ভেঙে বৃহৎ বন্যার বেগ গ্রাম জনপদকে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে কাঁপিয়ে তুলছে যেন। অথচ এ বন্যায় ক্ষতির ভ্রূকুটি নাই।

ওই বড় ঘরখানিতে বৈঠক বসেছে। ওটি বৈঠকখানাই এ বাড়ীর। ঘরজোড়া ছোট পায়ার চারখানি তক্তপোশ পাতা, তার উপর সতরঞ্চ বিছানো—তার উপর ফরসা ধবধবে চাদর—সবসুদ্ধ মিলিয়ে রুচিরম্য একটি ফরাস পাতা রয়েছে। সেই ফরাসের উপর উত্তর দিকের দেওয়াল ঘেঁসে ছোট মখমলের বিছানা পাতা—তার উপর কিংখাবমণ্ডিত গোটা-কয়েক তাকিয়া। আতরদান—গোলাবপাশ আর ফুল-দানিতে সাজানো সে শয্যা, সাধারণ শয্যা নয়—বরশয্যাই বটে। ঘরের পুরাতন বিদ্যুৎ-বাতিটা ফাউস্বরূপ জ্বলছে—ওই দিকের দেওয়ালেই তরল বিদ্যুৎ-বাতী আধারদণ্ড সংযোজিত হয়েছে—তার উজ্জ্বল প্রভায় রাত পালিয়েছে গলির এ পাশে।

গলির এ পাশেও ছোট একতলা বাড়ীর একখানি ঘর—তার একটিমাত্র জানালা তিনতলা বাড়ীটার বৈঠকখানার বড় জানালার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। সে জানালা দিয়ে কেরোসিন আলোর মলিন আভাস শুধু ঘরের অস্তিত্বটুকুই জানাতে পারে—চিকের অলঙ্কার দিয়ে পথ সাজানো তার সাধ্য নয়। সুতরাং সে জানালার কথা আপাতত থাক।

এ বাড়ীর সাজসজ্জা আয়োজন যা দেখা যায়—তাতে বিয়ের সভা বসেছে বলে ভুল হবে—অথচ এ মাসে একটিও বিয়ের দিন নাই। নাই থাকুক, লতা পাতা ফুল দিয়ে সাজানো ঘরে উজ্জ্বল আলোয় মাখামাখি বরাসন রচনা আর কি প্রয়োজনই বা হতে পারে? উৎসব যদি নাই হবে—ছেলে বুড়ো সবাই এমন মনোহর বেশ পরিধান করেছে কেন? কেন এত হাসির উদ্দামতা—কথার বসোচ্ছাস? অগুরু চন্দন ধূপধুনা পুড়ে পুড়ে বায়ুমণ্ডলে কেন সুরভি পরিবেশ গড়ে তুলেছে? কেন কণ্ঠের সঙ্গে যন্ত্রের সুরসাধনা? ছেলেরা গলায় পরেছে একহারা রজনীগন্ধার মালা, মেয়েরা কবরীতে বেড়ে দিয়েছে সেই মালা, আর মোটা গড়ের এক গাছি মালা চন্দন সুবাসিত থালিকায় প্রীতিভরে ন্যস্ত রয়েছে কোন ভাগ্যবন্ত নায়কের জন্য।

বাইরের গেটে মোটর আসছে ঘন ঘন। বাইরের উঠান পার হয়ে সুবেশ তরুণ-তরুণীর দল চলে যাচ্ছে অন্দরের দিকে। হাতে তাদের ফুলের মালা, বই কিংবা উপহার দেওয়ার ওই রকম কোন জিনিস। একটা বড় টেবিলে জমছে সেগুলি, অবশ্য দাতার নাম মিলিয়ে ফর্দ তৈরি করছে না কোন হিসাব-রক্ষিণী। এটা বিয়ের উৎসবই বটে, একটু ভিন্নতর।

অবশেষে শাঁখ বাজল—পুরাঙ্গনারা দিলেন হুলুধ্বনি। কিশোর-কিশোরী ছেলেমেয়েরা সার বেঁধে দাঁড়াল, অভিনন্দন সঙ্গীত হবে। যন্ত্রবিদ্ সুরবাঁধা বীণা কোলে নিয়ে সোজা হয়ে বসল—সঙ্গতদার কোলে তুলে নিলে বাঁয়াটিকে, তবলা রইল হাঁটুর কাছে—ডানহাতের নাগালে।

গলায় শুভ্র মল্লিকামালা—ললাটে শ্বেতচন্দনের অনুলেপন, ক্ষৌম বাস পরিহিত গৌরতনু শুভ্রকেশ বর এসে বসলেন—বরাসনে। পূর্ণ হ'ল আনন্দের যোলকলা। সেই আনন্দের বেগে ভেসে গেল চারপাশের জিনিস—গলি, গলির ওপারে একতলা বাড়ী, সে বাড়ীর মানুষজন।

কখন আকাশের কোলে এক টুকরো মেঘ জমেছিল—সুযোগ নিয়ে সে দেহ বিস্তার করেছে, শুষে নিয়েছে পৃথিবীর বাতাসটুকু। এ ঘরে হাসি আনন্দের হাটে বেসাতি নিয়ে বসতে তারও লোভ হ'ল বুঝি! বায়ুতরঙ্গে সওয়ার হয়ে

লোভীর মত হুড়মুড় করে সে ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে। অশ্বখুর সঞ্চালনে এক রাশ ধুলো উড়ে এল, আলো কাঁপিয়ে ছবি দুলিয়ে ফুল পাতা উড়িয়ে—অঙ্গাবরণ এলোমেলো আর কুন্তলদাম বিপর্য্যস্ত করে তার অভিনন্দন পাঠিয়ে দিল। সামাল-সামাল রব উঠল। বন্ধ কর জানালা, ঝড় উঠেছে—বন্ধ কর—

জানালা বন্ধ হয়ে গেল, গলিটি হ'ল অন্ধকার। কিন্তু ওই অন্ধকারেই এ পাশের জানালাটি গেল খুলে। জানালার কাছে এসে দাঁড়াল একটি তরুণী মেয়ে। উদাস দৃষ্টি ফেললে আকাশের দিকে। সামনের বাড়ীর উৎসব-সমারোহের সঙ্গে তার কোন সংস্রব নাই বুঝি। আকাশের সৌন্দর্য্যলোক থেকে সে প্রত্যহ যা সংগ্রহ করে বিশেষ একটি দিনের উৎসবের জাঁকজমক তার কাছে কত সামান্য! রাতের আকাশ কোনদিন পুরাতন হয় না; তারার রহস্যলোকে মানুষের স্বপ্ন চারণা নূতন করে গড়ে মানুষকে, তারই মাঝে মগ্ন হয়ে সংসার ভুলে যায় সে।

ছায়াময় হারিকেনের আলো জানালার ধারে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছে—আলোর সামনে বসে দুটি কিশোর ছেলে পড়া তৈরি করছে:

পৃথিবীতে তাঁহারাই উত্তম মানুষ—পরের দুঃখে যাঁহাদের হৃদয় কাঁদে। আপন প্রতিবেশীকে ভাল না বাসিতে পারিলে সংসারে সুখের আস্বাদ লাভ করা যায় না।

প্রতিবেশীকে ভালবাসা কি দিদি? ও দিদি, শুনছ?

ভাইয়ের প্রশ্নে আকাশ থেকে দৃষ্টি নামিয়ে হারিকেনের স্তিমিত আলোর ধারে আসে মেয়েটি।

উত্তম মানুষ কারা?

যাঁরা পরের দুঃখ দূর করবার চেষ্টা করেন। যাঁরা ভালবাসেন তাঁদের প্রতিবেশীকে—কি না আমাদের কাছাকাছি যাঁরা বাস করেন তাঁদেরকে ভালবাসতে হবে।

তা কি করে হয়? ছোট ছেলেটি মুখ তুলে প্রতিবাদ করে। ওদের শ্যামল বল খেলছিল—আমরা দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। বললে, ভাগ এখান থেকে। আচ্ছা দিদি, গলিটা কি একা ওদের?

মেয়েটি বলে, বইয়ের পড়াতে নিশ্চয় বল খেলার কথা নেই?

না—তা কেন। যারা কাউকে দেখতে পারে না তাদের ভালবাসা যায় কখনও?

প্রশ্নটির মধ্যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ লুকিয়ে আছে, এক টুকরো উজ্জ্বল সত্য। 'তুমি দিলে কাঁটা—আমি দিনু ফুল' জাতীয় ভালবাসা কি সত্যই আছে? প্রতিবেশীরা—শুধু দূরের প্রতিবেশীরা মানুষের মনে ঠাঁই পায়—ভাল লাগে তাদের, অত্যন্ত নিকটে বাড়ীর পিঠাপিঠি যারা থাকে তাদের সঙ্গে ভালবাসা ছাড়া অন্য বস্তুর লেন-দেন যে নিত্যই চলে।

মেয়েটি বললে, ভালবাসতে চেষ্টা করা উচিত, না হলে দুঃখ ভোগ করতে হয়।

আচ্ছা দিদি, বড় বাড়ীতে বিয়ে হচ্ছে বুঝি?

কে বললে, বিয়ে হচ্ছে?

বাঃ রে, জান না? শ্যামলের দাদুর বিয়ে যে আজ।

দূর বোকা—বিয়ে নয়, বিয়ের দিন। বড় ছেলেটি সংশোধন করে।

বিয়ের দিনেই ত বিয়ে হয়। ছোট ছেলেটি প্রতিবাদ করে।

মেয়েটি বললে, যে দিনে বিয়ে হয়—সেই দিনটিকে মনে রাখবার জন্য—

কিন্তু কনে কই?

মেয়েটি হাসলে, কনে বাড়ীতেই আছে—পঞ্চাশ বছর ধরে আছে। পঞ্চাশ বছরে কত কি বদলে যায়—কোথাকার মানুষ কোথায় যায় চলে। অথচ যারা এতদিন একসঙ্গে রইল, তারা আশ্চর্য্য নয় কি?

তা হলে ওঁদের যখন বিয়ে হয়—তুমি জন্মাও নি দিদি?

না।

মা? বাবা?

ওঁরাও জন্মান নি।

বাঃ রে—তবে কে জন্মেছিল?

তখন ওঁরাই জন্মেছিলেন। মেয়েটি হাসলে।

দুটি ভাই কাছে এসে দু'হাত ধরলে। বললে, হাসছ যে?

এমনি—আয় পড়বি আয়।

সবাই এসে মাদুরে বসল। ছোট ছেলেটি বললে, আচ্ছা দিদি, আমরা ত ওঁদের প্রতিবেশী—আমাদের নেমন্তন্ন হ'ল না যে?

আদেখলা কোথাকার! বড়টি বললে।

এই মন্তব্যে ছোটটি রুখে উঠল। কিন্তু ঝগড়া বাধবার ফুরসৎ হ'ল না। ওদের বাবা এসে পড়লেন। বললেন, কি রে, পড়াশুনা ছেড়ে খুনসুটি লাগিয়েছিস ত? তিপু, জানালাটা বন্ধ করে দে ত মা।

তোমার ফিরতে এত দেরী হ'ল কেন বাবা?

সাধে দেরী হয়। আপিসের চাকরি হয়—দশটা-পাঁচটা হয়ে গেল—ব্যস, এযে ছেলে মানুষ করার কাজ! সারাদিন বকে বকে—

হাত-মুখ ধুয়ে নাও—জলখাবার আনছি।

জলখাবার! কি কালিয়া, পোলাও খাওয়াবি বল্ ত?

আধবাসি মুড়ি চিবোতে আর ভাল লাগে না। একটি নিশ্বাস ফেললেন তিনি।

মেয়েটি তাড়াতাড়ি জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল।

কাল-বৈশাখীর ঝড় থেমে গিয়ে আকাশ নির্ম্মল হয়েছে ততক্ষণে। বড় বাড়ীর জানালাটাও খোলা। নিমন্ত্রিতের দল রঙীন প্রজাপতির মত ঘুরছে—এঘরে ওঘরে। ট্রেতে কাপ ডিস সাজিয়ে, বড় কেটলি হাতে ঝুলিয়ে কয়েকটি ছেলে অকারণে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। অতিথিরা কেউ একসঙ্গে দু'কাপ ঢেলে নিচ্ছেন—কেউ-বা হাত জোড় করে মাপ চাইছেন। কাঠের ট্রেতে ছোট ছোট ডিস সাজানো—সিঙ্গারা, কচুরি, নিমকি, চপ ইত্যাদিতে ভর্ত্তি। পরিবেশকরা অনুরোধ জানাচ্ছে নিমন্ত্রিতদের, এক একটি ডিস তুলে নেবার জন্য। কেউ কেউ রহস্য করে দুখানা ডিসও তুলে নিচ্ছেন। চা জলযোগের সঙ্গে হাসি-গল্পের আসর জমজমাট হয়ে উঠল। কতকগুলি তরুণ তরুণী বৃদ্ধ বরকে ঘিরে ধরল।

বল না দাদু—তোমার বিয়ের গল্প? সেই পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। দিদিমার লাভে পড়েছিলে বুঝি? না দিদিমা তোমার লাভে পড়েছিলেন?

সস্মিত হাসিতে ভরে উঠল বৃদ্ধের মুখ। বললেন, না রে ভাই, লাভালাভের কথা নয়—সে বড় বেয়াড়া দিনকাল ছিল। চোরে কামারে দেখা না হলেও সিঁদকাঠি তৈরি হয় জানিস ত? তা তোরাই বা জানবি কি করে! ছোট্ট ছোট্ট ছেলে মেয়েদের মধ্যে যে প্রেম জন্মাত—তার সঙ্গে চোখের সম্পর্ক থাকত সামান্যই, মনের সম্পর্ক ত থাকতই না।

তবে কিসের সম্পর্ক নিয়ে ভালবাসা জন্মাত?

কেন—ঘ্রাণের আর রসনার—যা উদরজাত করেই শেষ হ'ত।

সবাই হেসে উঠল।

বৃদ্ধ বললেন, হাসির কথা নয়—একালও এ বিষয়ে খুব এগোয় নি। ওই চপ কাটলেট সন্দেশ পুডিং ওরাই কি তোদের কম টানছে?

বাজে কথা বল না, তোমার বিয়ের কথা বল।

সে কথা দু'মিনিটে শেষ করা যায়। এ তো আর এক যে ছিল রাজার গল্প নয়। একটু হেসে বললেন, শোন্ তবে। আমি তখন চাকরি করি বন বিভাগে। মাইনে মোটা—বয়সও কুড়ি-বাইশ। এহেন ছেলের এত বয়স পর্য্যন্ত বিয়ে না হলে বাড়ীর লোকেদের চেয়ে বাইরের লোকদের দুর্ভাবনা বেশী হয়ই। তাঁদেরই উৎসাহে সম্বন্ধ আসতে লাগল। বাড়ীর চিঠিতে বাড়ী-ফেরার তাগিদ কড়া হয়ে উঠতেই সাফ জবাব দিলাম, এখন ছুটি পাব না—তা ছাড়া বিয়ে করার ইচ্ছে আমার আপাতত নাই। বাস, বাড়ীর সবাই ধরে নিলেন উল্টোটি। যেহেতু বন-বিভাগে কাজ করি—ঘুরতে হয় অগম-বিজন বনে, সেখানে সাধু-ফকির বা দেবতার পাল্লায় পড়ে যাওয়া আশ্চর্য্যের নয়। কুড়ি বছরের ছেলে লিখছে বিয়ে করব না—এর চেয়ে পরম আশ্চর্য্য বা দুর্ভাবনার বিষয় পৃথিবীতে আর কিই-বা থাকতে পারে! সুতরাং সপ্তাহ পরে টেলিগ্রাম এল। তোমার মায়ের জীবন-সঙ্কট পীড়া—অবিলম্বে চলে এস।

এসে দেখলেন বুঝি বড়-মা শয্যাশায়ী!

হাঁ—গাড়ী থেকে নামতেই দোর গোড়ায় তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। গঙ্গাস্নান করে এক বালতি গঙ্গা-মৃত্তিকা নিয়ে ভিজে গামছা মাথায় দিয়ে সেইমাত্র তিনি বাড়ী ফিরছেন।

খিল খিল করে হেসে উঠল শ্রোতার দল। খুব শক্ত অসুখ ত?

তখন আমার মনের অবস্থা যদি বুঝতিস! সারা পথ দুর্ভাবনা বয়ে আসছি দু'রাত্রি ঘুমোই নি, মাকে সুস্থ দেখে এত আনন্দ হ'ল যে, ওঁদের কৌশলের কথা ভুলেই গেলাম। সেই আনন্দের জোয়ারে থাকতে থাকতেই বিয়েটা হয়ে গেল।

সে কি—কনে পছন্দ করলেন না?

সেকালে যাঁদের পছন্দে শুভ কাজ হ'ত তাঁরাই সব সেরে রেখেছিলেন।

দিদিমাকে আপনার পছন্দ হ'ল?

হবে না, খেলনা পছন্দ হয় না কোন্ ছেলের?

ওমা, উনি বুঝি খেলনা?

দশ বছরের মেয়ে তার বেশী আর কি!

তবে আর আসল ভালবাসাটা হ'ল না?

বৃদ্ধ হেসে উঠলেন, আসল আর নকল বোঝা যায় কি এক নজরে—আর অত অল্প বয়সে? প্রথম ভালবাসার ক্ষণটি নিয়ে আরম্ভ হয় তাঁত বোনার কাজ। জড়ানো সুতোর মধ্যে মাকু চলে সর্ সর্ শব্দে—শক্ত হয়ে ওঠে জমি। দক্তির পাকে জড়িয়ে থাকে কাপড়—তুলোয় সুতোয় আর কাপড়ে তখন একাকার।

তার পর?

তার পর অর্থ উপার্জ্জন—দেশ ভ্রমণ—উন্নতি। ছোট বাড়ী ঘুচে বড় বাড়ী হ'ল—আসবাব পত্তর হ'ল, মোটর হ'ল। এর পরেও তোদের ঠাকমাকে ভাল না বেসে থাকতে পারে কোন্ পাষণ্ড ঠাকুরদাদা?

ভিতর দিকে হৈ হৈ শব্দ উঠল।

ব্যাপার কি?

একটি ছেলে ছুটতে ছুটতে এসে বললে, আপনারা সব আসুন—খাবার জায়গা হয়েছে।

দাদুকে ফেলে সবাই হুড়মুড় করে উঠে গেল।

খোলা জানালার সামনে দাদু বসে রইলেন একা।

এ দিকের জানালাটি এমন সময়ে খুলে দিলে কে! বললে, তোমাদের কাণ্ডখানা দেখে অবাক! এই গুমোট, এক ঘর মানুষ—জানালা বন্ধ করে দিব্যি বসে রয়েছ? ধন্যি তপস্যা যা হোক!

কি করব—ওদিকে যে গোলমাল হচ্ছে বড্ড।

তাই বলে অন্ধকূপ হত্যে হবে! ওদের কি বল না—একটা তিনকেলে গঙ্গাপানেঠ্যাঙ বুড়োকে নিয়ে করছে আদিখ্যেতা! তা টাকা থাকলে মানুষ শ্যাল কুকুরের বিয়ে দিয়ে লাখে লাখে টাকা খরচ করে—এ তবু একটা মানুষ! মরুক গে—এক দিনই তো—মনের সাধ মিটিয়ে করুক সে আমোদ। তা তোমরা এখন খাবে—না হাঁড়ি হেঁসেল আগলে বসে থাকব?

দাও খেয়েই নিই।

অমন কুঁতিয়ে বলবার দরকার কি—না হয় পরেই খেয়ো খন। ছেলেদের পানে চেয়ে বললেন, তোরা খাস তো খাবার এনে দিই এখানে।

ঘরখানা পুরনো হলেও বড়, রাত্রির খাওয়া-দাওয়া ছেলেরা এই ঘরের এক প্রান্তেই সেরে নেয়। খাওয়া না খাওয়া—খানকতক রুটি আর একটা তরকারি—কুমড়ো কাঁচকলা আর আলুর ঘাঁট। আলু আক্রা হলে কচু কিংবা রাঙালু পড়ে। ছেলেরা খুঁত খুঁত করে, ভাল করে খায় না। কিন্তু এর চেয়ে রসনা-রোচক ব্যঞ্জন পাতে দেবার সামর্থ্য কোথায় গৃহকর্ত্রীর?

সেই চিরপরিচিত ব্যঞ্জন নিয়ে ছেলেরা খেতে বসল। ও বাড়ীর সঙ্গে দূরত্ব মাত্র একটা ফালি গলি। নানাবিধ সুভোজ্যের সুগন্ধ বায়ুস্তরে ভাসছে—এ ঘরের মধ্যেও গন্ধটা ঘন হয়ে লেগে বসেছে।

ছোট ছেলে নাকে কাঁদতে সুরু করলে, দূর ছাই—রোজ রোজ কুমড়োর ডালনা ভাল লাগে না। এক দিন যদি একখানা চপ খাওয়ালে!

মা ব্যথিত কণ্ঠে বললেন, কাল খাওয়াব। আজ খেয়ে নাও—লক্ষ্মীটি। ওগো, জানালাটা বন্ধ করে দাও না।

জানালা বন্ধ করেও রবাহুত গন্ধকে তাড়ানো গেল না। ছেলেরা কোনরকমে দু'একখানি রুটি চিবিয়ে জল খেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। মা সকলের অলক্ষ্যে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

ততক্ষণে ওদিকের ঘরে কোলাহল উঠল। খাওয়া দাওয়া সেরে বিদায় নিচ্ছে নিমন্ত্রিতেরা। বিদায় নেবার আগে জমেছে ওই ঘরে। কেউ দিচ্ছে উপহার, কেউ জানাচ্ছে শুভেচ্ছা, শতায়ু হবার প্রার্থনাও করছে কেউ কেউ। প্রণাম দিয়ে আশীর্ব্বাদ নিচ্ছে অসংখ্য জন। দাদু সকলকে জানেন না। বৃদ্ধ বটগাছ কি অসংখ্য শাখা-প্রশাখার খবর রাখে। তবু আত্মজ বলে স্নেহসিক্ত রসধারায় বলিষ্ঠ করে শাখা-দেহ। দাদু সকলকে আশীর্ব্বাদ করছেন।

দাদু আসি।

এস ভাই।

আসছে-বার বিয়ের স্মরণ তিথির উৎসব করবেন ত? এবার যখন জয়ন্তী হ'ল—

এখন থেকে জয়-জয়ন্তী চালিয়ে যেতেই হবে। প্রসন্ন কণ্ঠে উত্তর দিলেন দাদু।

সবাই চীৎকার করে উঠল, দাদু শতজীবী হউন।

একে একে সবাই চলে গেল—এদিক ওদিকের আলো নিবে গেল ক্রমশঃ। এ ঘরের তরল বৈদ্যুতিক আলোটা নিবে গেছে, শুধু কমশক্তির পুরনো বাতিটা জলছে। উৎসব-শেষের আসরের মত বহু পদলাঞ্ছিত চাদরখানা হয়েছে ময়লা, সজ্জা হয়েছে এলোমেলো কিছু-বা স্থানচ্যুত ভগ্ন, তেল-ফুরানো বাতিটা কালিপড়া ফানুসের মধ্যে যেন মুমূর্ষু-প্রায়। এমনি করে একটা অঙ্ক শেষ হয়ে যায়—অন্য অঙ্কের পট উত্তোলিত হয়।

ধীরে ধীরে এক বৃদ্ধা এসে বসলেন তক্তপোষের উপরে। সামনে চীনে মাটির ভাসে ফুটন্ত রজনীগন্ধার ঝাড় থেকে তখনও মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ উঠছে—পুষ্পসার-সুরভিত বায়ুস্তরে ভেসে বেড়াচ্ছে সেই সৌরভ।

বৃদ্ধা বললেন, বলি নিজের বিয়ের দিনটা ত পালন করলে, এইবার নাতনীর বিয়েটা কবে দিচ্ছ শুনি?

হবে। আজকের ওদের জন্য পাত্র নির্ব্বাচন আমরা করব না—ওরা স্বয়ম্বরা হবে।

রাখ তোমার রসিকতা! কত খরচ করছ বল?

যা বল। দশ বিশ-ত্রিশ হাজার?

অত কমে কি ভাল সম্বন্ধ জুটবে?

তাই ত স্বয়ম্বরের ব্যবস্থা করছি।

থাক্—থাক্ খুব হয়েছে। শোবে এস। জানালা বন্ধ করে দিই?

দাও।

জানালা বন্ধ হ'ল, গলিটা আত্মগোপন করল অন্ধকারে।

সেই অন্ধকারেই এপারের জানালা খুলে গেল ধীরে ধীরে। সেই অনূঢ়া মেয়েটি নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল সেখানে। দু'হাতে গরাদে চেপে ধরে চাইল আকাশের পানে। তারা-ভরা অন্ধকার আকাশ—অত্যন্ত নীল। তারার জ্যোতি-প্লাবন গঙ্গাবারি-প্রবাহের মত এপার-ওপারে স্রোত রচনা

করেছে। ওরই নাম আকাশ-গঙ্গা। ওই আকাশ-গঙ্গায় স্নান করলে মনের গ্লানি-বেদনা বুঝি মুছে যায়। ওর প্রবাহ-ধারায় নিত্য অবগাহন করে মেয়েটি। অনুভব করে প্রতি-দিনকার কর্ম্ম-অবসাদ দূর হ'ল—চিন্তাভার লঘু হ'ল। রাত্রির অন্ধকার প্রাসাদ আর কুঁড়ে ঘরের ব্যবধান ঘুচিয়ে আশ্বাস দেয় ওকে। ও পৌঁছে যায় এই জীবনপারের অন্য এক জীবনক্ষেত্রে—আনন্দময়, অপরাজেয়, অনন্ত,. এক জীবনে। তখন সঙ্কীর্ণ গৃহবন্ধনের জালা, বহু অপূর্ণ আশার বেদনা, বহু রঙীন কল্পনার ছলনা ওর মন থেকে অবলুপ্ত হয়ে যায়। ও মগ্ন হয়ে যায় সেই ধ্যানের জগতে।...

হঠাৎ বাস্তবের রূঢ়স্পর্শে মেয়েটির ধ্যান ভাঙ্গল। সামনের বাড়ীর জানালা থেকে কথা ভেসে আসছেঃ কত খরচ হ'ল জান? হাজার টাকার কম নয়। একটি পয়সা কম নয়।

এই জানালাতেও প্রতিধ্বনি তুলল সে শব্দঃ সব মিলিয়ে হাজার টাকাই ত—তার বেশী ত চাইছি না। আজকালকার দিনে হাজার টাকা আর ক'টি টাকা- ওর কমে কখনও শুভ কাজ হয়?

মাত্র দু'দিন আগেকার কথা। এ বাড়ীতে মেয়ে দেখার পালা শেষ করে কঠিন রায় দিয়ে গেছেন বিচারক, ও বাড়ীতে পুরনো বিয়ে নূতন করে স্মরণে আনবার জন্য হাজার টাকা খরচ করার কল্পনা কেউ হয়ত তখনও করেন নি।

বিস্ময়

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

তুমি ছিলে—যবে শিব বর্ণীর বেশে
দাঁড়ান শৈল-সুতার সুমুখে এসে,
তুমি বেপমান ছিলে বিস্মিত চুপ,
পার্থ যখন দেখেন বিশ্বরূপ—
শ্রীভগবানের তনুতে ভুবন মেশে।

ওগো বিস্ময়, হে অনির্ব্বচনীয়,
মাঝে মাঝে তব শুভ দর্শন দিয়ো।
সাগরে তোমারে দেখেছি চন্দ্রোদয়ে,
ঊষায় তুষার-মণ্ডিত হিমালয়ে,
মানস-সরের কমল-কাননে প্রিয়।

যেথা জলিতেছে 'অরোরা' আলোর শিখা,
মরুতে যেখানে ছলিতেছে মরীচিকা,
প্রপাত-সলিল, প্রলয় নৃত্য করি,
যেখানে লক্ষ রামধনু দেয় গড়ি।
তোমারে বন্দে আনন্দে বিভীষিকা

চুম্বক যেথা লৌহ-কণিকা টানে,
মৌমাছি রচে মৌচাক, মধু আনে,
ডিম্ব ভাঙিয়া বাহিরায় প্রজাপতি,
মুকুলের হয় ধীরে ফলে পরিণতি,
সেখানেও তুমি হাসি চাহ মোর পানে।

তোমারে দেখেছি দর্পী মৃত্তিকায়,
অধিবাসী যার ধরণী গ্রাসিতে চায়।
সেখানেও তুমি থমকি দাঁড়াও আসি'
কাপুরুষ দেয় বীরগণে যেথা ফাঁসি।
ন্যায় যেথা ডোবে হিংসার মোহানায়।

তোমাকে দেখেছি গান্ধী মহাত্মাতে,
তোমাকে দেখেছি মোরা রবীন্দ্রনাথে,
চমকি দেখেছি নেতাজীর পলায়নে,
পুনঃ 'কোহিমা'র পুণ্য রণাঙ্গনে,
স্বাধীন ভারতে অমৃতভাণ্ড হাতে।

বাহিরিয়া এসো তুমি যেন বন টিয়া—
কাঁচা স্বর্ণের টোপর মাথায় দিয়া।
পলকে মধুর কর হে জলস্থল,
রাঙাও পুলক-আবীরে ভূমণ্ডল,
দৈন্যকে লও ঋদ্ধিতে আবরিয়া।

ভঞ্জন কর মানবের অপরাধ,
দেবের মহিমা দেখিতে যে হয় সাধ
যম ফিরে দেন আবার সত্যবানে
পতিব্রতার সকরুণ আহ্বানে।
গরলেতে পা'ক অমৃত প্রহ্লাদ।

অতি-যান্ত্রিক প্রাণহীন চারুকলা,
তুঙ্গ মিনার, সৌধ শতেক-তলা—
লাগে নাকো ভাল, প্রসন্ন হও মিতা
শুনাও ধরাকে শুনাও, নূতন গীতা,
নব মেঘদূত, নূতন শকুন্তলা।

হে সখা,—শ্যামের সমাগম উৎসবে
মোর নাম মোর মনে পড়িবে না কবে?
আনি সুধাসম সে দিন আকাঙ্ক্ষিত
করি' পুলকিত, মোহিত, রোমাঞ্চিত,
তুমি কি আমারে আপন করিয়া লবে?

আমেরিকায় শিক্ষার সুযোগ ও পদ্ধতি

শ্রীরথীন্দ্রনাথ মিত্র

ধরিয়া লওয়া যাউক, আমেরিকার একজন সাধারণ বালকের নাম জন ; জনের শিক্ষার সুযোগ ও পদ্ধতি জানিতে পারিলেই আমেরিকার একজন সাধারণ বালকের শিক্ষার সুযোগ ও পদ্ধতি জানা যাইবে এবং ইহা হইতে অতি সহজেই উপলব্ধি করা যাইবে আমাদের দেশের শিক্ষার সুযোগ কত সীমাবদ্ধ এবং পদ্ধতি কত ত্রুটিপূর্ণ।

জনের যখন ছয় বৎসর বয়স, তখন সে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায়, শহরের অনেক বালক বালিকা ইহা অপেক্ষা কম বয়সেও 'নার্সারী' ও 'কিণ্ডারগার্টেন' বিদ্যালয়ে গমন করে ; আবার কোন রাষ্ট্রের বালক-বালিকাগণ আট বৎসর বয়সেও শিক্ষা আরম্ভ করে ; যাহা হউক, জনের কথাই বলা হইতেছে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জনকে আট বৎসর পড়িতে হয় ; এই সময়ের মধ্যে জন লিখিতে এবং পড়িতে শিখে, সংখ্যা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে, মনের ভাব প্রকাশ করিতে শিখে, ভূগোল, বিশ্ব ইতিহাস, জাতীয় ইতিহাস এবং প্রাথমিক বিজ্ঞান পাঠ করে। ইহা ছাড়া সঙ্গীত, কলা এবং অন্যান্য বিষয়ের (যাহাতে তাহার সৃজনীশক্তি বৃদ্ধি পায়) চর্চা করিতে হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে জনকে প্রত্যহ ব্যায়ামে যোগদান করিতে হয় এবং মধ্যে মধ্যে এই সম্বন্ধে পরীক্ষা দিতে হয় ; শরীররক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষালাভও সে করে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ

প্রত্যেক সপ্তাহে পাঁচ দিন বিদ্যালয়ে যাইতে হয় অর্থাৎ বৎসরে ১৭৮ দিন জন বিদ্যালয়ে গমন করিয়া থাকে। সকাল ৮-৪৫ মিনিটে বিদ্যালয়ের শিক্ষা আরম্ভ হয় এবং অপরাহ্ণ সাড়ে তিনটার সময় শেষ হয়। চৌদ্দ বৎসর বয়সে জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে।

মাধ্যমিক শিক্ষা : মাধ্যমিক শিক্ষালয়ে যোগদান করিয়া জন নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী পাঠ্য বিষয় নির্ব্বাচন করিতে পারে। এই সময় হইতেই সে উচ্চশিক্ষার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে। সে ব্যবসা সংক্রান্ত শিক্ষণীয় বিষয় (বুক কিপিং, টাইপ-রাইটিং) গ্রহণ করিতে পারে। এইরূপ শিক্ষায় কৃতিত্ব অর্জন করিতে পারিলে ভবিষ্যতে ব্যবসায় ক্ষেত্রে সে স্থান লাভ করিতে পারিবে। সে ইচ্ছা করিলে কারিগরী শিক্ষা অথবা চারি বৎসর ধরিয়া সাধারণ শিক্ষা লাভেও সক্ষম হইবে। অর্থাৎ, ছাত্র তাহার রুচি অনুযায়ী নিজেকে ভবিষ্যৎ জীবনের উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে।

অন্যান্য ছাত্রদের ন্যায় ধরা যাউক, জনকে ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য যে সকল বিষয়ের প্রয়োজন তাহা সে গ্রহণ করিতে মনস্থ করিল ; উক্ত বিষয়ের সহিত সে কতকগুলি অর্থকরী বিষয়ও আয়ত্ত করিতে পারে যাহার দ্বারা উত্তর জীবনে কাহারও সাহায্য ব্যতিরেকেই আপনার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয়।

দ্বিবিধ বিষয়ে শিক্ষালাভের এই সুযোগ আমেরিকার শিক্ষা-ব্যবস্থাকে অন্যান্য দেশের শিক্ষা-পদ্ধতি হইতে পৃথক করিয়াছে। কৃতবিদ্য এবং সাধারণ ছাত্রদের জন্য পৃথক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা আমেরিকায় সাফল্য লাভ করে নাই। জীবনের প্রারম্ভে এই সম্মিলিত ছাত্রজীবন ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের পক্ষে বিশেষ কার্য্যকরী বলিয়া আমেরিকায় গণ্য হইয়া থাকে। আমেরিকায় শারীরিক সামর্থ্য এবং মানসিক প্রতিভা উভয়ই তুল্য মর্যাদার অধিকারী। সুতরাং তথাকার ছাত্রগণ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে অনায়াসেই গমন করিয়া পুঁথিগত বিদ্যা এবং অর্থকরী বিদ্যা উভয়ই একই সঙ্গে শিখিতে সক্ষম। যে সকল ছাত্র উচ্চশিক্ষার জন্য প্রস্তুত হয় তাহারা যেমন কাঠের কাজ শিখিতে পারে তেমনি যে ছাত্র কৃষি-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করে তাহার পক্ষে কবিতা পড়িতে কোন বাধা নাই ; অর্থাৎ আমেরিকায় পাঠ্য বিষয় ছাত্রের উপর চাপাইয়া দেওয়া হয় না—সেখানে ছাত্রের খুশীই পাঠ্য বিষয় নির্ব্বাচনে নিয়ামক-স্বরূপ।

১৪ হইতে ১৭ বৎসর পর্য্যন্ত শতকরা ৮৫ ভাগ ছাত্র-ছাত্রীর সহিত জন চারি বৎসর ধরিয়া হাই স্কুলে প্রত্যহ চারিটি বিষয়

সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করিত। বিভিন্ন বিষয় সে বিভিন্ন শিক্ষকের নিকট পড়িত। হাই স্কুলে প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য নির্দিষ্ট ঘর আছে, একই ঘরের বৈচিত্র্যহীন পরিবেশে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া ছাত্রকে পড়া শিখিতে হয় না।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীগণ

বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট সময়ের এক-চতুর্থাংশ জন ইংরেজী ভাষা শিক্ষা এবং ভাব আদান-প্রদান করিবার পক্ষে প্রয়োজনীয় রীতি-পদ্ধতি প্রভৃতি শিক্ষা করিতে ব্যয় করে। উক্ত নির্দিষ্ট সময়ের একটি বিরাট অংশ সামাজিক শিক্ষার জন্য যথা আমেরিকার ইতিহাস, পৃথিবীর ইতিহাস, সরকারের সমস্যা ইত্যাদি জানিবার জন্য লাগিয়া যায়। মাধ্যমিক শিক্ষার প্রথম দিকে জনকে অঙ্ক এবং বিজ্ঞান সম্পর্কে কিছু পড়িতে হয়। স্বাস্থ্যবিজ্ঞান মাধ্যমিক শিক্ষার একটি অবশ্যপঠনীয় বিষয়। সে অর্থকরী বিষয় জন গ্রহণ করিয়াছিল তাহার ফলে তাহাকে এক বৎসর দোকানের ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি এবং দুই বৎসর ধাতু দ্রব্য নির্মাণ-কৌশল আয়ত্ত করিতে হইয়াছিল। ভবিষ্যতে মেক্সিকো বা আরও দক্ষিণের দেশসমূহে যাইতে পারে সম্ভবতঃ এই কারণে অবশিষ্ট নির্বাচিত বিষয়ের মধ্যে জন স্পেনীয় ভাষা শিখিয়া লয়। পাঠ্য বিষয়ের বহির্ভূত অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দেওয়া আমেরিকার শিক্ষা-পদ্ধতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। জন খেলাধূলা পছন্দ করিত, কিন্তু খেলোয়াড়সুলভ দেহের অধিকারী না হওয়ায় বিদ্যালয়ের পত্রিকার খেলাধূলা বিভাগের পরিচালকের পদ গ্রহণ করিয়াছিল। সে "গ্লী ক্লাব" নামক একটি সঙ্গীতশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদান করে এবং তথায় সে নিয়মিত সঙ্গীতের মহড়া দিত। পরে তাহাকে ছাত্রসভা এবং অন্যান্য বহু অনুষ্ঠানে সঙ্গীতে যোগ দিতে দেখা গিয়াছিল। এক বৎসর জন "ক্যামেরা ক্লাবে" ভর্তি হইয়া ছবি তোলা এবং এনলার্জমেণ্ট ইত্যাদি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করে। হাই স্কুলে থাকিবার শেষ বৎসরে সে ডিবেটিং ক্লাবে যোগদান করিয়াছিল। ইহার ফলে সে সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে কথা বলিবার অথবা বক্তৃতা করিবার art বা কলা আয়ত্ত করে। পাঠ্য-সূচী-বহির্ভূত এই সকল নানা বিষয় শিক্ষাদান করিবার পরিচালক এবং উদ্যোক্তা স্বয়ং ছাত্রগণই। কর্তৃপক্ষ এই সম্পর্কে তাহাদের যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া তাহাদের প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করেন। এই সকল অনুষ্ঠানে যোগদান করা ছাত্রগণের ইচ্ছাধীন—কোনও বাধ্যবাধকতা নাই। আমেরিকায় দেশের অগ্রগতি জনসাধারণের উপরই নির্ভরশীল: সুতরাং রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যৎ নাগরিকবৃন্দের মানসিক বৃত্তিসমূহের উৎকর্ষের সহায়ক নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

এইরূপে জন অর্থাৎ জনের ন্যায় হাজার হাজার ছাত্র চারি বৎসর অন্তে নানা বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া বিদ্যালয় ত্যাগ করে এবং এত দিনের অধীত বিষয়সমূহকে কাজে লাগাইয়া আপনার জীবিকা নির্দ্ধারণ করে।

আমেরিকায় কেবল যে "জনে"র মত ছাত্রেরাই পড়াশোনার এই ব্যাপক সুবিধা লাভ করে তাহা নহে, "মেরী"র ন্যায় অসংখ্য ছাত্রীও সেখানে লেখাপড়া শেখার সমান সুযোগ-সুবিধার অধিকারিণী।

উচ্চশিক্ষা: উচ্চশিক্ষার ব্যাপক বিস্তৃতি আমেরিকার শিক্ষা-পদ্ধতির একটি প্রকৃষ্ট অবদান। মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দশ জন ছাত্রের মধ্যে প্রায় চারি জন উচ্চশিক্ষা লাভার্থে কলেজে যোগদান করে। অন্যান্য রাষ্ট্রে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যে সংখ্যক ছাত্র শিক্ষা লাভ করিতে যায় তাহার চেয়ে অধিকসংখ্যক ছাত্র আমেরিকায় উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য কলেজে প্রবেশ করে। প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা পর্য্যায়ের ন্যায় উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রেও সহশিক্ষা ব্যবস্থা তথায় বলবৎ আছে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনও নির্দিষ্ট পরিমাপ নাই। আমেরিকায় এক একটি ঐরূপ প্রতিষ্ঠানে ১০০ হইতে ৫০,০০০ হাজার ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কলেজের কর্তৃপক্ষ স্বাধীন ভাবেই স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের নিয়মাবলী প্রণয়ন করিয়া থাকেন। শিক্ষাদানের মান অনুযায়ী ঐ সকল উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান আপনাদিগকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। ছাত্রছাত্রীগণ নিজেদের যোগ্যতা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যোগ-দান করিতে পারে।

আমেরিকার বৈচিত্র্যময় শিক্ষা-ব্যবস্থায় "জুনিয়র কলেজ" বা "কম্যুনিটি কলেজ" নামক দুই বৎসর কাল স্থায়ী একটি শিক্ষা বিভাগ

আছে। হাই স্কুলের মোট চারি বৎসর শিক্ষাকালকে বৃদ্ধি করিয়া "জুনিয়র কলেজে"র সৃষ্টি হইয়াছে। এইখানে পাঠ সমাপ্ত করিয়া তাহারা চারি বৎসর কাল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে পারে। এই জুনিয়র কলেজে অর্থকরী শিক্ষা এবং শিল্প শিক্ষাদান করা হইয়া থাকে। যাহারা জীবিকা সংস্থান এবং পড়াশুনা একই সঙ্গে করিতে চায় তাহাদের সুবিধার জন্য এই জুনিয়র কলেজে দিনে এবং রাত্রে উভয় সময়েই শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এই জুনিয়র কলেজেরও কোন নির্দিষ্ট পরিমাপ নাই। এই শ্রেণীর কোন কোন কলেজের ছাত্রসংখ্যা দশ হাজারেরও অধিক।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে আমেরিকার উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্র বড় ব্যাপক। যে সকল বিষয়ে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রী দান করিয়া থাকে সেই সমস্ত বিষয় আয়ত্ত করিতে একজন সাধারণ ছাত্রের প্রায় ত্রিশ বৎসর লাগে। স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় বহুবিধ বিষয় পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত থাকায় ছাত্রগণ সহজেই বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতা দেখাইতে পারে। প্রায় প্রত্যেক ছাত্রই নিজের রুচি অনুযায়ী পাঠ্য-বিষয় নির্ব্বাচিত করিতে পারে।

বর্তমানে আমেরিকার শিক্ষাবিদ্‌গণ পাঠ্যতালিকার মধ্যে আরও কতকগুলি সাধারণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষপাতী। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পুথিগত শিক্ষার সহিত অন্যান্য সাধারণ শিক্ষাদান করা হইয়া থাকে। উক্ত বিদ্যালয়ে লেখাপড়া এবং হাতে কলমে কাজ শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগারে ছাত্রছাত্রীগণ অধ্যয়নে রত

বেসরকারী বিদ্যালয়: আমেরিকার সাধারণ শ্রেণীর ছাত্রগণের ন্যায় জন জনসাধারণ কর্তৃক ট্যাক্স দ্বারা পরিচালিত অবৈতনিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হইয়াছিল। ১৯৪৯-৫০ সনে আমেরিকায় জনসাধারণ পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল ১,৯৪,৭৭,৬৯১ এবং বিশেষ প্রতিষ্ঠান অথবা ব্যক্তি পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল ২৭,২৩,৮১৪। মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রেও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হাই স্কুলের ছাত্রসংখ্যা অধিক ছিল। সর্ব্বজাতীয় মানবিক অধিকারের ঘোষণা অনুযায়ী আমেরিকার জনমত এই ধারণা পোষণ করে যে, আপনার সন্তান কিরূপ শিক্ষা লাভ করিবে তাহা নির্ব্বাচন করিবার চূড়ান্ত স্বাধীনতা প্রত্যেক অভিভাবকের আছে।

অর্দ্ধেকেরও বেশী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহ আমেরিকার বিভিন্ন চার্চ্চ দ্বারা পরিচালিত হয় এবং অবশিষ্ট বিদ্যালয়সমূহ কোন ব্যক্তি কর্তৃক আয়প্রদ হিসাবে অথবা কোন সাধারণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কিছুমাত্র আয় ব্যতিরেকেই পরিচালিত হয়। এই সকল বিদ্যালয়ে আয়ের প্রধান উৎস ছাত্রদের দেয় বেতন। সাধারণ সাহায্য এবং দান ইত্যাদিও এই সকল বিদ্যালয় পাইয়া থাকে।

উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারী এবং বেসরকারী উভয় প্রকার বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা সমানই থাকে। উভয়বিধ বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা বর্তমানে দ্রুতপ্রসারমান। তবে সরকারী বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীদের সংখ্যা কিছু অধিক। আমেরিকার জনসাধারণই ইহার জন্য ধন্যবাদার্হ। তাহাদেরই স্বতঃস্ফূর্ত দাক্ষিণ্যে আজ অসংখ্য যুদ্ধ-ফেরত সৈনিক ছাত্র অসমাপ্ত শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার সুযোগ পাইতেছে। উভয়বিধ বিদ্যালয়ের আপেক্ষিক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমেরিকায় সর্ব্বদাই আলাপ-আলোচনা হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত আমেরিকার বিভিন্ন ভাষাভাষী সম্প্রদায় আপন আপন ভাষার উৎকর্ষ সাধনের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া থাকে। এই বিদ্যালয়গুলি কখনও সরকারী বিদ্যালয়ের পরিপূরক হিসাবে, কখনও-বা উহার পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এই ত গেল স্কুল-কলেজের নিয়মমাফিক শিক্ষা-ব্যবস্থা। কিন্তু আমেরিকায় শিক্ষা-ব্যবস্থাকে বিদ্যালয়গৃহের অসংখ্য নিয়মরীতির রজ্জুবন্ধনে বাঁধিয়া রাখা হয় নাই। বিদ্যালয়ের বাহিরে থাকিয়াও যাহাতে জনচেতনা শিক্ষার আলোকে উদ্বুদ্ধ হইতে পারে তাহারও বিশেষ ব্যবস্থা আমেরিকায় বর্তমান আছে। যাদুঘর, গ্রন্থাগার, ছায়াচিত্র, শিক্ষাপ্রদ সাময়িক পত্রাদির মাধ্যমে শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্যকে অসংখ্য জনচিত্তের মধ্যে প্রসারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমেরিকায় প্রায় সাড়ে সাত হাজার গ্রন্থাগার আছে; ইহা ব্যতীত কয়েকটি অঞ্চলে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারও আছে। ব্যবসা এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারীবৃন্দকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। শ্রম সংস্থার সদস্যদিগকে ভবিষ্যতে শ্রমিক নেতা হইয়া গড়িয়া উঠিবার

জন্য বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহা ব্যতীত বিভিন্ন শ্রমিক-কেন্দ্রের নিজস্ব প্রকাশনা বিভাগ আছে এবং তথা হইতে নিয়মিত পুস্তকাদিও প্রকাশিত হইয়া থাকে। ক্ষেতের কৃষকও শিক্ষালাভে বঞ্চিত নহে; তাহাকেও বিভিন্ন কৃষিকার্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করিয়া দেওয়া হয়। এই ভাবে গীর্জ্জা, যুবক সমিতি, নারীকেন্দ্র প্রভৃতি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হইতে বিদ্যালয় ব্যতিরেকেই আমেরিকায় শিক্ষার প্রসার করা হইতেছে।

প্রায় ত্রিশ লক্ষ মার্কিনী প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি সরকারী বিদ্যালয় হইতে শিক্ষা পাইয়া থাকে; ইহার উপর প্রায় আট লক্ষ বয়স্ক আমেরিকাবাসী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ ব্যবস্থায় নির্দ্দিষ্ট কোনও বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিয়া থাকে। ইহা অনুমিত হয় যে, আমেরিকায় প্রতি চারজনে একজন করিয়া বয়স্ক ব্যক্তি কোন না-কোন শিক্ষাকেন্দ্রে যোগদান করিয়া থাকে।

বিশেষ শিক্ষা : বিকলাঙ্গ, বিকৃতমস্তিষ্ক এবং সমাজবিচ্যুত ছেলে-মেয়েরাও আমেরিকায় শিক্ষালাভে বঞ্চিত নহে। এমন কি, যে সকল ছাত্র শারীরিক অসামর্থ্যের জন্য গৃহের বাহিরে আসিতে পারে না, গৃহে গিয়া তাহাদের শিক্ষাদানের বিশেষ ব্যবস্থা আমেরিকায় বিদ্যমান। কয়েকটি অঞ্চলে প্রতিভাসম্পন্ন বালক-বালিকাদিগকে পৃথক শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা আছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রচলিত শিক্ষার দ্বারাই সকল শ্রেণীর ছাত্র-গণের চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করা হইয়া থাকে।

শহরের ছাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া চাষীর পুত্র পর্য্যন্ত সকলকেই শিক্ষালাভের সমান সুযোগ-সুবিধা দানের জন্য ছাত্রগণের পরিবহন-ব্যবস্থা শিক্ষালয়ই করিয়া থাকে। ১৯৪৯-৫০ সনে প্রায় সত্তর লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীকে বিদ্যালয়ের বাসসমূহ পরিবহন করিয়াছিল।

আমেরিকার শিক্ষা-ব্যবস্থা একটি বৃহৎ যজ্ঞের ন্যায়, সরকারী বিদ্যালয়ে সেখানে প্রতি বৎসর ছাত্রপ্রতি ২২৮ ডলার ব্যয় করা হইয়া থাকে। ১৯৫১-৫২ সনে মার্কিনী জনসাধারণ প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য ৬.৯ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করিয়াছিল, ইহার উপর উচ্চশিক্ষার জন্য তাহারা ১.৯ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করিয়াছে।

এই অর্থব্যয় এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের বিরাট আকৃতি কিন্তু ইহার একমাত্র উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নহে। বিদ্যালয় যত বৃহৎই হউক না কেন, প্রত্যেক ছাত্রের প্রতিই বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়া থাকে যাহাতে সে সুনাগরিক হিসাবে গড়িয়া উঠিতে পারে। প্রায় প্রত্যেক বিদ্যালয়েই শিক্ষা-ব্যবস্থাকে প্রতিটি ছাত্রের নিজস্ব বৃত্তিসমূহের উন্নতির পরিপোষক হিসাবে তৈয়ারী করা হয়।

বিশ্বশান্তির জন্য শিক্ষা : বিশ্বশান্তিকে ত্বরান্বিত করিবার জন্য আমেরিকার শিক্ষালয়গুলির প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান এবং তাহার বিভিন্ন কর্ম্মধারা সম্পর্কে ছাত্রদিগকে ওয়াকিবহাল করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা বিদ্যালয়ই করিয়া থাকে। আন্তর্জাতিক ভাব-ধারণা আদান-প্রদানের পরিপোষক হিসাবে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা বিদ্যালয়গুলিতে আছে। প্রত্যেক দেশেরই ছাত্র সেখানকার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে সাদর অভ্যর্থনা লাভ করিয়া থাকে। আন্তর্জাতিক ছাত্র-আদান-প্রদান-ব্যবস্থাকে আমেরিকায় বিশেষ উৎসাহ দান করা হয়। বিশ্বশান্তির সহায়কস্বরূপ নানা ব্যবস্থা আমেরিকার বিদ্যালয়গুলিতে করা হইয়া থাকে।*

* "আমেরিকান এডুকেশান" মাসিক পত্রিকার 'এডুকেশান ইন দি ইউনাইটেড স্টেটস' শীর্ষক প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত।

প্রবন্ধের ছবিগুলি *USIS*-এর মিঃ কেনেথ জে. ফরম্যানের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

নারিকেলের স্তূপ—নারিকেল ত্রিবাঙ্কুরের অন্যতম প্রধান সম্পদ

ত্রিবাঙ্কুরের রূপ

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

চিত্রপুরেই স্নান, আহার ও রাত্রির নিদ্রার ব্যবস্থা হয়েছিল। দ্বিতীয় আর তৃতীয়ের ফাঁকে স্থানীয় ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়র আমাদের প্রায় ৭০০০ ফুট উঁচুতে মাটুপেট্টি নামক একটা জায়গায় নিয়ে গিয়ে পল্লীবাসল জলবিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান একটি কেন্দ্র দেখিয়ে নিয়ে এলেন। পাহাড়ী নদীকে কংক্রীটের বাঁধ দিয়ে বেঁধে তার জলকে প্রথমে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও পরে চাষীর ক্ষেতে সেচের কাজে লাগাবার বিরাট আয়োজন হয়েছে। অত উঁচুতে অমন পরাক্রান্ত অথচ অমন খামখেয়ালী স্রোতস্বিনীকে যা করে বশ মানান হয়েছে তা দেখে বিস্মিত হয়েছি আমরা, তৃপ্তও হয়েছি। পর দিন সকালে দেখেছি ওরই আনুষঙ্গিক কারখানাগুলিকে।

এই সব দেখাশোনার জন্য যতটা না হউক, বাস একখানা খারাপ হয়ে যাওয়াতে যাত্রার বিলম্ব হয়ে গেল আমাদের। ঘণ্টা তিনেক আটক থাকতে হ'ল মুন্নার শহরে।

কার্যাকারণ সূত্রের এও একটা গ্রন্থি। পরবর্তী যাত্রাপথে দুর্ভোগ যা ভুগেছি, মুন্নারে আটকে যাওয়াটা তার একটা কারণ। আর দুর্ভোগ মনে না করে ওকে যদি অভিজ্ঞতা অর্জন করবার সুযোগ মনে করি তবে বাস বিগড়ে যাওয়া ব্যাপারটাকেও সুযোগই বলতে হয়। অন্ততঃ আমি তাই বলি।

মুন্নার শহরটিকে এই সুযোগে দেখে নেওয়া গেল। তিন ঘণ্টা ধরে দেখবার মত বড় না হলেও দেখবার মত শহর ওটা নিশ্চয়ই। মুন্নার ত্রিবাঙ্কুরের অন্যতম স্বাস্থ্যনিবাস। বেশ যে ঠাণ্ডা তা আগের রাত্রেই বন্ধ ঘরে মোটা চাদরের (অবশ্য সূতীর) নীচে শুয়ে কাঁপতে কাঁপতে উপলব্ধি করেছিলাম। আর বুঝেছিলাম পেট-রোগা বাঙালীর হজমশক্তিকেও উজ্জীবিত করে তুলবার অসামান্য শক্তি রয়েছে ওর জল আর বাতাসে। সাহেবদের গড়া শহর মুন্নার। তাদের চা-ব্যবসায়ের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। বেশীর ভাগ ঘরবাড়ীই বিলাতী প্যাটার্নে তৈরি। বাজার বেশ বড়। সেখানে সবরকমের জিনিস পাওয়া যায়, মায় বিলাতী মদ পর্যন্ত। ভাল হোটেল আছে কিনা সাক্ষাৎ জানতে পারি নি, তবে চলনসই দেশী হোটেল আছে বিস্তর। নিরামিষের মত আমিষও পাওয়া যায়। ঘণ্টা তিনেক বাধ্য হয়ে ঐ শহরে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে আমার অনেক সহযাত্রীই পেটের জ্বালার সঙ্গে আরও অনেক জ্বালা মিটিয়ে নিয়েছিলেন।

দিল্লীর মেহনৎই সার হ'ল, ভাড়া বাস জোড়া লাগল না। অগত্যা একখানি বাসের মধ্যে গাদাগাদি হয়ে বসেই রওনা হলাম আমরা। মধ্যাহ্ন তখন উৎরে গিয়েছে।

শুধু কি বাস নিয়ে বিভ্রাট! পথ নির্ণয় নিয়েও বিভ্রাটে পড়া গিয়েছিল। পেরিয়ার হ্রদের তীরে সরকারী পশুসদন—আমাদের গন্তব্য স্থান ও প্রধান লক্ষ্য। কোটায়াম থেকে সেখানে যাবার সোজা পথ আছে এবং বেশ ভাল পথ। কিন্তু সে পথ ব্যবহার করতে হলে প্রথমেই প্রায় আশী মাইল—যা গতকাল আমরা অতিক্রম করে এসেছি—পিছু হটতে হয়। তার পরের দূরত্ব শ-খানেক মাইল। মুন্নার থেকে দ্বিতীয় যে পথ আছে তার দূরত্ব

রাষ্ট্রীয় অতিথিভবন—ত্রিবান্দ্রম্

শুনলাম অন্ধেক। কিন্তু সেটি নূতন, মানে পার্বত্য পথকে মোটর চলবার পথে পরিণত করা হয়েছে, কি করবার চেষ্টা হচ্ছে এইরকম। চিত্রপুরে পৌঁছবার পর থেকেই কাণাঘুষা শুনছিলাম, পথের অবস্থা নাকি ভাল নয়, একাধিক সাঁকো ভেঙে গিয়েছে, স্থানীয় ইঞ্জিনীয়রেরা ও পথে যাওয়া খুব নিরাপদ মনে করেন না। তবু শেষ পর্যন্ত কেন যে সেই দুর্গম পথ দিয়ে যাবার সিদ্ধান্তই স্থির হ'ল তার হদিস আজও পাই নি—হ্রস্বতর পথ বলেই হবে হয় তো। আমাদের সায় অবশ্যই ছিল—জানা নেই তো কিছুই, কল্পনা খুব সোজা একটা অঙ্ক কষে ঠিক করে নিয়েছিল যে সন্ধ্যার মধ্যেই আমরা আমাদের গন্তব্যস্থানে পৌঁছে যাব।

বিধাতার পরিকল্পনা ছিল অন্য; একখানা বাস বিগড়ে দিয়ে তিনি হয়তো তারই আভাস দিয়েছিলেন। কিন্তু তাকে পরোয়া করে কে?—বিশেষতঃ স্থানীয় ইঞ্জিনীয়রেরাই যখন 'অল ক্লীয়র' সার্টিফিকেট দিয়ে দিলেন!

আবার নূতন আবিষ্কারের আনন্দ। ফুটের মাপে উচ্চতার পরিমাণ পথের পার্শ্বে কোথাও লেখা থাকলেও তা আর চোখে পড়ছিল না। তবে বাতাসের শৈত্য আর নির্মলতার উপলব্ধি থেকে, বিশেষ করে নীচের দিকে অপেক্ষাকৃত ছোট পাহাড়ের গায়ে গায়ে কালো বা রামধনু রঙের মেঘের বিচিত্র লীলা দেখে বুঝতে পারছিলাম যে, বেশ উঁচু দিয়ে চলেছি আমরা। এবারের পরিবেশ নূতন। নারিকেল ও কদলীকুঞ্জ একেবারে অদৃশ্য হয়েছে। রবার বা শালগাছও আর বড় একটা চোখে পড়ে না। দেখা যাচ্ছে কেবল চা-বাগান। উপরে, নীচে, ডাইনে, বামে যেখানে চোখ পড়ে সেখানেই সুবিন্যস্ত চা-বাগান—নাতি-উচ্চ গাছ, মাথাটা বেশ ঝাঁকড়া, পরিপাটি করে ছাঁটা, উচ্চতায় সব সমান। একটু দূর থেকে দেখলেই গাছ বলে আর চেনাই যায় না; পাহাড়ের গায়ে আঁট-সাট মখমলের জামা বলতে মন যদি না-ও চায়, ঘন শেওলায় পুরু আস্তরণ বলে ভ্রম নিশ্চয়ই হয়। ত্রিবাঙ্কুরের অন্যতম সম্পদ এই চা। প্রায় ৭০,০০০ একর জমিতে এর চাষ হয়, প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকার চা এই রাজ্য থেকে রপ্তানী হয়। তবে শুনলাম যে দেশীয় লোক চায়েরই মালিক, গ্রাসের মালিক নয়। চা ও কাফির বাগানের উপযোগী এই সমস্ত উঁচু জমি দীর্ঘকালের জন্য শ্বেতাঙ্গ পুঁজির মালিককেই ইজারা দেওয়া আছে।

আশ্চর্য বোধ হ'ল যে, বাগান আছে অথচ কাজকর্ম নেই। চা-বাগান কথাটা শুনলেই কল্পনার পটে যে ছবি আপনা থেকেই ভেসে ওঠে সেই চা-কুলী বা কুলী-কামিনী যাবার পথে একটিও চোখে পড়ল না, হয়তো 'দুটি পাতা ও একটি কুঁড়ি' চয়ন করবার মরশুম এটা নয়। অথবা চা শিল্পে যে সঙ্কট চলেছে তার জন্যই কাজকর্ম এখন বন্ধ।

কেবল মাঝে মাঝে দেখা যেতে লাগল গুদাম ঘরের মত বড় এক একটি ইমারত এবং তারই চারিদিকে ছোটখাট এক একটি বসতি। শুনলাম এগুলি চায়ের কারখানা আর কর্মচারীদের বাসগৃহ।

দৃশ্যপটের পরিবর্তন হচ্ছিল প্রায় ছায়াছবির মতই দ্রুতবেগে। হঠাৎ বেশ একটু ফাঁকা জায়গায় এসে গেলাম যেন। তাকিয়ে দেখলাম বেশ বিস্তৃত উপত্যকা, চারিপাশের পাহাড়গুলি বেশ দূরে সরে গিয়েছে যেন। গন্তব্যস্থানে এসে গেলাম নাকি? গাড়ীর কণ্ডাক্টরকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলাম। সে মুখে উত্তর দিলে না, ঠোঁট বেঁকিয়ে যা প্রকাশ করলে তার অর্থ হয়, পাগল।

আবার চলা। কিন্তু একটি সাঁকোর কাছে এসে বাস থেমে গেল। পার্বত্য নদীর উপর সাঁকো—বেশ গভীর, বিস্তারও উপেক্ষা করবার মত নয়। ঝির ঝির করে জলের সূক্ষ্ম কয়েকটি ধারা ছোট বড় পাথরের গা-বেয়ে নীচের দিকে ছুটে চলেছে। এবার পরিবেশটা অন্য রকমের। কাছাকাছি কোথাও চা-বাগান নেই, কিন্তু পথের দু'দিকেই বড় বড় গাছ। বেলা তখন চারটের কাছাকাছি তবু মনে হয় অন্ধকার। ঠিক এইরকম একটা পরিবেশের মধ্যে এসে জানতে পারলাম যে, পথ ভুল হয়েছে। আরও আশঙ্কার কথা, ড্রাইভার মুখ ফুটে স্বীকার করলে, পেরিয়ার হ্রদে যাবার এই নূতন পথ তার একেবারেই অচেনা।

লোকজনের বসতি কাছেই ছিল, কণ্ডাক্টর খোঁজ-খবর করে জেনে নিলে। গাড়ী বেশ খানিকটা পিছু হটে, একটা বাঁক ঘুরে নূতন একটা পথে ছুটে চলল।

এই সুরু হ'ল। এর পর প্রায় পায়ে পায়ে ভুল। খানিকটা

গিয়ে আবার ফিরে আসা; ডাইনে যেতে যেতে হঠাৎ হয়তো বাঁ দিকে ঘুরে যাওয়া। দেখে অন্ততঃ আমাদের মনে হ'ল যে, ড্রাইভার বার বার পথ ভুল করছে। দৃশ্যপটেরও পরিবর্তন হচ্ছে ঘন ঘন। গাড়ী অনবরত ওঠা-নামা করছে। হয়তো বেশ খটখটে রোদ, কিন্তু মোড় ফিরতেই গা ছম ছম করা অন্ধকার, সূর্য্য পাহাড়ের পিছনে ঢাকা পড়ে গিয়েছে। কার্পেটের মত সমতল চা-বাগানের ভিতর দিয়ে চলেছি, হঠাৎ হয়ত একটি অরণ্যের মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

এমনি একটা বনের পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ চোখে পড়ল বেশ উঁচু এবং মোটা একটি গাছের প্রায় মাথার কাছাকাছি একাধিক শাখাকে আশ্রয় করে একটি কুটির তৈরি হচ্ছে। অনভ্যস্ত চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে গেল; মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল, ঐ কি ঘর ভুলবার জায়গা?

ঘর নয়, মাচান। অভিজ্ঞ বন্ধুরা বুঝিয়ে দিলেন, ঐ মাচানের উপর বসে শিকারী শিকার করবে।

কি শিকার করবে?

বাঘ, ভালুক, হাতী—সবই এখানে আছে!

সমুদ্রস্নানের ঘাট—কোভালম্

বেলা তখন প্রায় পাঁচটা, সূর্যাস্তের বিলম্ব থাকলেও উপত্যকা ভূমিতেও রৌদ্রের প্রাচুর্য নেই। বাগান অঞ্চল ছেড়ে অরণ্য অঞ্চলে ঢুকে পড়েছি। জনপ্রাণী এক রকম নেই বললেই চলে। মাঝে মাঝে এক একটি মাচান চোখে পড়ছে। ওতে গা ঢাকা দিয়ে বসে শিকারীরা যাদের গুলি করে মারেন তাদেরই আত্মীয়স্বজন কারও মনে এই মুহূর্তে প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহাটা প্রবল হয়ে উঠতে পারে না কি?

কিন্তু দুর্ভাবনা কেবল একটিই নয়। গাড়ী তখন একটি পাহাড়ের গা বেয়ে উপরের দিকে উঠছিল। বামদিকে চা-বাগান, একটি ছোট বসতিও চোখে পড়ছিল। কিন্তু সে সব কম করেও শ' পাঁচেক ফুট নীচে। একেবারে পিছনের বেঞ্চিতে বামকোণের সীটটিতে বসে গাড়ীর গতি লক্ষ্য করতে করতে মনে হচ্ছিল, পিছনের চাকাটা আর দু-তিন ইঞ্চি বামদিকে পিছলে গেলেই মাধ্যাকর্ষণের টানে সমস্ত গাড়ীখানাই নীচে খাদের মধ্যে পড়ে যাবে। মনের ঠিক এই রকম অবস্থাতেই বিকট একটি শব্দ কানে এসে চেতনাকেই আচ্ছন্ন করে ফেললে।

না, গাড়ী নীচে পড়ে যায় নি, কিন্তু পিছনের চলন্ত একটি চাকার আঘাতে দূরত্ব নির্দ্দেশক একটি প্রস্তরফলক মূলশুদ্ধ উৎপাটিত হয়েছে আর সেই সংঘাতে চাকাটিও ফেটে গিয়েছে। সন্ধ্যা তখন হয় হয়।

অতিরিক্ত চাকা একটি সঙ্গেই ছিল। ড্রাইভার ও তার সহকারী ছাদের উপর থেকে সেটিকে নাবিয়ে যথাযোগ্য ব্যবস্থা করতে লেগে গেল। আর আমরা? আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম। সকলের মনেই অনুচ্চারিত প্রশ্ন—গাড়ী মেরামত করা যদি সম্ভব না হয়?

বোধ করি আমাদের অবস্থাটা অনুমান করেই হবে, দূরের পল্লী থেকে কয়েকজন লোক এলেন, দু'একজন বেশ ভাল ইংরেজী বলতে পারেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম এটা বিশেষ করে বন্যহস্তী-অধ্যুষিত অঞ্চল। সন্ধ্যার পরেই দলে দলে হাতী বেরিয়ে আসে, ক্ষেতের ফসল নষ্ট করে, মানুষের দেখা পেলে তার সঙ্গে যে আচরণ করে সেটা রূপকথার শ্বেত হস্তীর আচরণের মত মোটেই নয়। এই বাসখানা এই পথের উপর রাত্রে যদি ফেলে রাখা যায়—একজন বুঝিয়ে বললেন—তা হলে কাল ভোরে এর একটি টুকরাও এখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বসতি বা শস্যক্ষেত্রের চারিদিকে তাই এ অঞ্চলে গভীর পরিখা খনন করে রাখা হয়। হাতী নাকি গর্ত্তকে খুব ভয় করে।

ঘণ্টাখানেক মেহনত করবার পর অচল বাস সচল হ'ল। চলতেও

হাটবার—কদলীর ছড়াছড়ি

হ'ল আবার, কেননা ঐ জায়গায় মানুষগুলির থাকার ব্যবস্থা যদিও বা করা সম্ভব হয়, বাস রাখার ব্যবস্থা করা একেবারে অসম্ভব। সরু ও সর্পিল পথে অন্ধকার রাত্রে বাস চালিয়ে পিছনের দিকে যাওয়া যায় না।

সুতরাং এগোতে হ'ল। সেই আঁকা-বাঁকা পথ—একদিকে পাথর ও আর একদিকে খাদ পথের সীমানা এমনভাবে বেঁধে দিয়েছে যার একচুল ব্যতিক্রম করবার সাধ্য কারও নেই। গাড়ী ক্রমাগত উঠছে আর নামছে। যখন নামছে তখন বনের ভিতর দিয়ে চলেছি। বন নয়, অরণ্য। বেশ রাত হয়েছে। তার উপর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। অরণ্যের অভ্যন্তরে তো বটেই, পথের উপরেও সূচীভেদ্য অন্ধকার। কোথায় যে আমরা চলেছি তারই সুস্পষ্ট ধারণা কারও নেই, কেবল অস্পষ্ট আশা আছে, চলতে চলতে পথের ধারে একটি বসতি পেয়ে যাবে হয়তো। গাড়ীর ভিতরে আমাদের হৈ-হল্লা আপনা থেকেই থেমে গেল।

তাতেও সোয়াস্তি নেই। মাঝে মাঝে বাস থেকে নামতে হচ্ছে—হয়তো পথ অত্যন্ত সরু বা পিচ্ছিল, হয়তো কোন হালকা সাঁকো পার হতে হবে। নেমে আবার উঠবার সময় সবাই উঠেছে কি না তা গুণে ঠিক করে নিতে হয়। যে অরণ্য আর যে অন্ধকার—বাঘের পেটে যে কেউ যায় নি তা কি নিঃসংশয়ে বলা যায়!

দুর্ভাগ্যের ষোলকলা পূর্ণ করবার জন্যই যেন একবার চেপে জল এল। বৃষ্টির ফোঁটা তো নয় যেন এক একটি বরফের তীর গায়ে এসে ফুটছে। বাইরে ভিজবার পর ভিতরে বসে অনেকেই হু হু করে কাঁপতে লাগলাম।

আশ্রয় যখন পাওয়া গেল রাত তখন প্রায় ন'টা। ত্রিবাঙ্কুরের পল্লী। পাহাড়ের গায়ে গায়ে বাড়ী। বাজার আর গ্রামের পার্থক্য তেমন বোঝা যায় না। চার-পাঁচখানা দোকানের মধ্যে অন্ততঃ দুখানা কাফিখানা ও হোটেল। বনবিভাগের ক'জন কর্ম্মচারী এখানে থাকেন। তাঁরাই সব শুনে বেশ আগ্রহ করেই থাকবার একটু ব্যবস্থা করে দিলেন। খাওয়ার ব্যবস্থা করে নেওয়া গেল একটি দোকানে। খাদ্য অবশ্য কেবল ভাত আর সম্বর: তবে তার সঙ্গে চা বা কাফি যে যত চায়।

গ্রাম হউক, শহর হউক, পরিখা দিয়ে ঘেরা। উদ্দেশ্য হস্তীযূথের আক্রমণ থেকে জনপদটিকে রক্ষা করা। শুনলাম যে খুব ভোরে উঠলে অদূরবর্ত্তী পাহাড়ের গায়ে বা ঝর্ণার ধারে দলে দলে হাতী দেখা যায়। কিন্তু একে পথশ্রমে ক্লান্ত দেহ, তায় আবার শীত। ভোরে ওঠা সম্ভব হ'ল না। ওরই মধ্যে সকাল সকাল উঠে যাঁরা টিলার উপরে গিয়ে দাঁড়ালেন তাঁদের ভাগ্যেও হাতীর দর্শন মিলল না।

ইড্‌লী-কাফির প্রাতরাশ সেরে রওনা হওয়া গেল।

আবার সেই পথ। বরং আরও দুর্গম, আরও বিপজ্জনক। পিচ্ছিল না হলেও কর্দ্দমাক্ত,—পায়ের জুতাই মাটিতে খানিক বসে যায়। এঁটেল মাটি, ছাড়ানো সোজা নয়। বিশ-পঁচিশ গজ পরে পরেই বাঁক, না হয় সন্দেহজনক সাঁকো। বেশী ভারে পাছে ভেঙে পড়ে সেই আশঙ্কায় ড্রাইভার নামতে বলল। দু'তিনবার ওঠানামার পর অনেকেই হেঁটে যাওয়াটা প্রশস্ত মনে করলেন।

কত দূর যেতে হবে? বৃথা এ জিজ্ঞাসা। মাইলের হিসাব এ পথে অচল। মাইল পোষ্ট থাকলেও চোখে পড়ছিল না। তা ছাড়া গাড়ীর যে গতি—ঘণ্টায় পাঁচ মাইলও চলছে কিনা সন্দেহ।

চড়াই-উৎরাইয়ের পথ অজগরের মত এঁকে-বেঁকে চলেছে গভীর অরণ্যের ভিতর দিয়ে। যে দিকে তাকাই গা ছম ছম করে। সেটা সকালবেলা, আকাশে মেঘও নেই। তথাপি অন্ধকার। মাথার উপরকার পুরু আচ্ছাদন ভেদ করে সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করতে পারছে না। তবুও ত গুল্ম নেই। সযত্নরচিত উদ্যানের মতই এ অরণ্যের গাছগুলির অবস্থিতিতে বিন্যাসের আভাস পাওয়া যায়। গাছ ত নয় মহীরুহ। মোটা কাণ্ডের গায়ে ঘন হয়ে শেওলা জমে রয়েছে। অনেক দিন আগে ভুটান সীমান্তের বক্সা দুর্গে যাবার পথে ডুয়ার্স অঞ্চলের অরণ্য দেখেছিলাম—এমনি পাহাড়, মহীরুহ, গা ছম ছম করানো অন্ধকার। আজ মনে হ'ল যে এর তুলনায় সে ছিল অকিঞ্চিৎকর—সমর্থ প্রৌঢ়ের তুলনায় যেমন কিশোর।

কি গাছ ও সব? কে জানে! মনে হ'ল যে ৺বিভূতিভূষণ যদি সঙ্গে থাকতেন বেশ ভাল হ'ত। হয়ত অনেক গাছ তিনি চিনতে পারতেন, না চিনলেও চিনে গিয়ে পরে স্বীয় সরস রচনার মাধ্যমে আরও অনেক লোককে চেনাতে পারতেন। আমরা অবাক

বিস্ময় এবং বেশ একটু ভয়ে ভয়ে চেয়েই রইলাম। নাম যা শুনলাম তার অধিকাংশই এখন আর মনে নেই কেবল সিলভার ওক ছাড়া।

এ সব গাছ কেটে নিয়ে যায় না কেউ?

প্রশ্নটি হয়ত অবান্তর। এখানে গাছ কাটতে আসবে কে? আর কাটলেও নেবেঁ কেমন করে? তথাপি স্থানীয় সহযাত্রীটি উত্তর দিলেন, না, এটা সংরক্ষিত বনভূমি। গাছ দূরে থাক, হুকুম ছাড়া একটি শাখাও কাটবার অধিকার কারও নেই।

কিন্তু চাষবাস হতে পারে না কি? বন হলেও তলাটা ত বেশ পরিষ্কার!

হয়, সরকারের অনুমতি নিয়ে চাষ হয়, কিন্তু কেবল একটিমাত্র জিনিসের।

সেটি এলাচদানা। এতক্ষণ চোখে পড়েনি, এখন পড়ল। কতকটা আনারস গাছের মত, স্তবকে স্তবকে বোনা রয়েছে। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের আর এক মূল্যবান সম্পদ।

পেরিয়ার হ্রদ—তীরে পশুমদন দেখা যাচ্ছে

ওকে যদি ফল বলা যায় ত এ অঞ্চলের ঐ একমাত্র ফল। আর কোন গাছেই ফল নেই, ফুলও নেই। আশ্চর্য্য, সারা ত্রিবাঙ্কুরেই ফুলের আকাল। সেই যে এ রাজ্যে ঢোকবার মুখে নীচের উপত্যকায় গুটিকয়েক কৃষ্ণচূড়ার পুষ্পিত গাছ দেখেছিলাম তার পর ফুল আর

টাপিয়োকা—ভাতের বদলে যা খাদ্য হিসাবে চালাবার চেষ্টা হচ্ছে

চোখেই পড়ে নি। এত বড় অরণ্যে একটানা সবুজের একঘেয়েমি কতকটা দূর করছে কেবল সিলভার ওকের পাতার পিছনের দিকটার রূপালী আভা।

হঠাৎ মনে হ'ল অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে। সচেতন হয়ে বুঝতে পারলাম যে, অরণ্য নীচে নেমে গিয়েছে অর্থাৎ গাড়ী পাহাড়ের গা বেয়ে উপরের দিকে উঠছে। আগেও মাঝে মাঝেই উঠছিল, কিন্তু এবার উঠছে ত উঠছেই। সেই আঁকাবাঁকা পার্ব্বত্য পথ, কিন্তু আরও যেন সঙ্কীর্ণ। বাম দিকে কোণের সীটে বসেছিলাম। সেদিকেই পাথরের প্রাচীর। উচ্চতাটা আন্দাজ করবার জন্য মাথা বের করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সভয়ে ভিতরে টেনে নিতে হ'ল। যতটুকু দেখা গিয়েছে তাই মাথা ঘোরাবার মত। কিন্তু তার চেয়েও বড় আশঙ্কা যে মাথাটা পাহাড়ের গায়ে ঠুকে যেতে পারে—ওকে এত কাছাকাছি ঘেঁষে বাস চলেছে। আত্মরক্ষার সহজ প্রবৃত্তির প্রেরণাতেই কনুইটিকেও ভিতরে টেনে নিলাম। আর ডান দিকে? যেখানে বসেছিলাম সেখান থেকে দেখা যায় কেবলই আকাশ, পেঁজা তুলোর মত হাল্কা সাদা মেঘের অসংখ্য খণ্ড ভেসে বেড়াচ্ছে কি স্থির হয়ে রয়েছে ভাল বোঝা যায় না। কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়ে ডান দিকে সরে গিয়ে নীচে একবার তাকিয়ে দেখলাম,—উপত্যকা আর প্রত্যক্ষ দর্শনের বিষয়বস্তু নয়, অনুমান-সাপেক্ষ।

ব্যোমযানে মেঘলোকের ভিতর দিয়ে একাধিকবার সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছি, কিন্তু মাটির সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হবার এ হেন ভীতিপ্রদ উপলব্ধি আগে কখনও হয় নি। মাটি কেন শক্ত পাথরের পথ বেয়েই বাস চলেছে, তবু মনে হচ্ছিল যে, একেবারে নিরাশ্রয়। বাসের ভিতরেও পরস্পরকে দেখা যাচ্ছে আবছায়া, প্রেতমূর্ত্তির মত। ডান দিকে কেবল মেঘ আর মেঘ, উপত্যকা, অধিত্যকা, মহারণ্য সমস্ত একাকার করে দিয়ে ফেনশুভ্র মেঘের নিস্তরঙ্গ মহাসমুদ্র নিঃশব্দে স্তব্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে যেন। বাসের গতি ক্রমশঃই কমে আসছিল, ভিতরে ভাষাও সহসা মহা আশঙ্কায় একেবারে মৌন হয়ে গেল।

ভারসাম্যের অতি সামান্য পরিবর্তনও যদি হয়, ড্রাইভারের দৃষ্টি বা আঙুলগুলি মুহূর্তের জন্যও যদি কেঁপে যায়, বাসের কোন একটি চাকা এক তিলও যদি এদিক-ওদিক হয়ে যায় ত তার অবশ্যম্ভাবী ফল

রবার গাছ— আঠা সংগ্রহ করা হচ্ছে

কল্পনা করে আমাদের শিরা-উপশিরার মধ্যে রক্তস্রোতও যেন স্তব্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু একটু পরেই আবার উৎরাই। মেঘের প্রলেপ স্বচ্ছ হতে হতে পরে একেবারেই অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর আবার সেই মহারণ্য, সেই শাল, সিডার টিক ও আরও কত কি নামের অগণিত মহীরুহ, সেই এলাচির ঝাড় আর সেই গা ছম ছম করানো অন্ধকার।

অসহ্য হয়ে আসছিল। দেহ ক্ষুৎপিপাসায় কাতর। সভ্যতা পিছনে ফেলে এসেছি, মোড়ে মোড়ে কাফিখানা আর পাওয়া যায় না। বসতি নেই বললেই চলে। দুএকটি যা মিলল তার অধিবাসীরা অবিশ্বাস্য রকমের স্বার্থপর। বেশ সুদৃশ্য ও বড় বাংলোর বাসিন্দা এক তামিল ব্রাহ্মণ কাফি দূরে থাক, পান করবার জন্য এক গ্লাস জল দিতেও অস্বীকার করলেন—খাদ্য বা পানীয় এই দুর্গম দেশে সহজলভ্য নয়। ক্রমাগত ওঠা-নামার প্রতিক্রিয়ায় ক্ষুৎপিপাসাতুর দেহের স্নায়ুগুলি অবসন্ন হয়ে এসেছে। মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম ভাব, পেটের নাড়ীগুলি মোচড় দিচ্ছে। আমাদের এক জন সঙ্গী বমি করতে লাগলেন যদিও তিনি পাঞ্জাবী শিখ, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে দেখবার মতই তাঁর বপু। মনের মধ্যেও আকুলি-বিকুলি ভাব—পাষাণের কারাগারে এই যে আমাদের বন্দীদশা, এর কি অবসান হবে না? রবীন্দ্রনাথের 'দেবতার গ্রাস' কবিতার রাখালের শিশুচিত্ত নিরন্তর জল দেখে দেখে বিকল হয়েছিল পাহাড়ের জঠরে অরণ্যের নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে আমাদের অবস্থা হ' প্রায় পাগল হবার মত। এ যে সমুদ্রের মতই অসীম, তরঙ্গের মতই ভয়ঙ্কর এবং জলের চেয়েও গহন। অবারিত মাঠের নিশ্চিন্ত নির্ভরতার জন্য অন্ততঃ আমাদের বাঙালী চিত্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল।

ঠিক অবারিত মাঠ না হলেও লোকালয় যখন পাওয়া গেল মধ্যাহ্ন তখন অতীত হয়ে গিয়েছে। ত্রিবাঙ্কুর আর মাদ্রাজের সীমান্তে ছোট একটি শহর। একাধিক বাসরুটের জংশন সেটি, পোষ্ট আপিস ও টেলিগ্রাফ আপিস আছে, সিনেমা আছে আর আছে ডজনখানেক কাফিখানা ও হোটেল। শহরের নাম কুমালি। সহযাত্রী স্থানীয় বন্ধু ও পরিচালক আশ্বাস দিয়ে বললেন, মাইল তিনেক দূরেই সরকারী বিশ্রামভবন—আমাদের গন্তব্য স্থান।

সেটা আশ্বাসের কথা। কিন্তু ওর চেয়েও বড় আশ্বাস আমাদের চোখের সামনেই। জন চল্লিশেক ক্ষুৎপিপাসাতুর লোক বাস থেকে নেমেই চীনামাটির বাসনের দোকানে ষণ্ডের মত ঢুকে পড়ল।

সেই ইডলি, দোসা ও বড়া জাতীয় খাদ্য; সঙ্গের উপাদান এক রকমের চাটনি। তবু কি আগ্রহেই না খাওয়া। স্নান হয়নি, মুখ ধোবারও তর সইল না। আধ ঘণ্টার মধ্যেই সব কয়টি দোকানের সঞ্চিত খাদ্যই প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেল। সভ্যতা থেকে বর্ব্বরতায় প্রত্যাবর্ত্তনের প্রক্রিয়া যে সম্পূর্ণ হয়েছে, খাওয়ার পর খাদ্যগুলির চেহারা এবং পরিবেশনের পদ্ধতি লক্ষ্য করে সে সম্বন্ধে সন্দেহের লেশমাত্রও আর অবশিষ্ট রইল না।

ভালই হয়েছিল খেয়ে নিয়ে, কেননা পেরিয়ার হ্রদের ধারে ঠেকাড়ি নামক গ্রামে সরকারী বিশ্রামভবনে গিয়ে শুনলাম যে, যেহেতু আমাদের আসবার কথা ছিল আগের দিন সন্ধ্যায় এবং যথাসময়ে আমরা আসি নি, সুতরাং আমাদের জন্য কোন আয়োজনও হয় নি।

তবে পশুসদন দেখবার আয়োজন করে দিলেন স্থানীয় ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। আয়োজন মানে ছোট ছাদওয়ালা ডিঙ্গি নৌকায় মোটর লাগিয়ে দেওয়া। তাতেই আমরা খুশী। যার জন্য এত কষ্ট করে এত সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসেছি সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব পশুজীবনের স্বাভাবিক রূপ প্রত্যক্ষ দেখতে পাব তো!

কিন্তু হরি হরি! সবই ভাঁওতা নাকি, না আমাদেরই দুরদৃষ্ট? যেখানে নৌকায় চেপেছিলাম সে তো জল সেচনের খাল। হ্রদ বলে কথিত যে জলাশয়ে এসে পড়লাম তাকে বিল বলতেও আমাদের বাধবে। অবশ্য আয়োজনের কোন ত্রুটি নেই। বিলের মধ্যে অগণিত খুঁটি পোঁতা হয়েছে। সে নাকি বেড়া। দেওয়া হয়েছে এই জন্য যাতে হিংস্র বন্য পশুরা সাঁতার কেটে এদিকের লোকালয়ে ঢুকে না যেতে পারে। ওদিকে সত্যই গভীর বন।

বড় বড় গাছই কেবল নেই, গুল্মও প্রচুর। ওসব ভেদ করে দৃষ্টি খুব বেশী দূর যেতে পারে না।

তখন সন্ধ্যা হয় হয়। পশুদর্শনের এটাই নাকি প্রশস্ত সময়, কেননা এই সময়েই ওরা নাকি জল পান করবার জন্য বন থেকে বের হয়ে আসে। ভীতিমিশ্রিত কৌতূহল উদগ্র হয়ে উঠল। সমস্ত অন্তর দুই চোখে কেন্দ্রীভূত করে তাকিয়ে রইলাম।

এক রকম বৃথাই সে প্রতীক্ষা। এক পাল "বন্য বরাহ" দেখা গেল। মনে মনে কৃতার্থ বোধ করবার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু সহযাত্রী জনৈক বন্ধু সব মাটি করে বলে উঠলেন, কলকাতার ট্যাংরা অঞ্চলে এ রকম শূকরপাল ঢের ঢের দেখা যায়।

আর দেখলাম তিনটি হাতী, একত্র বিচরণ করছে। প্রথমে মনে করেছিলাম যে হস্তী, হস্তিনী ও তাদের শাবক। কিন্তু ভাল করে তাকিয়ে দেখে মনে হ'ল যে, দুটিই শাবক—পুং জাতীয়; বড়টি তাদের মা।

কাছে যাবার আগ্রহ হচ্ছিল, দু'একজন তীরে নামবার জন্যও আগ্রহ প্রকাশ করলেন। কিন্তু মাঝি রাজি হ'ল না—বন্য জন্তুদের কোন রকমে বিরক্ত করা নাকি নিষেধ।

মানতে রাজী আছি যে আমাদের ভাগ্য খুব প্রসন্ন ছিলেন না আমাদের উপর। তবে যা রটেছে, ভারতের জাতীয় পশুসদন ঠিক ততটা নয়, সে সম্বন্ধেও নিঃসন্দেহ হয়ে এসেছি। ওটা যখন বন তখন বন্য জন্তু ওখানে নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সংখ্যায় তারা খুব বেশী নয়। আর তাদের জনসাধারণের দর্শনীয় বস্তু করবার জন্য আয়োজন কিছুই হয় নি। পরে শুনেছি যে পণ্ডিত জবাহরলাল যখন ঐ বন দেখতে গিয়েছিলেন তখন পশুগুলিকে তাঁর দৃষ্টির আওতার মধ্যে আনবার জন্য বিশেষ আয়োজন নাকি করা হয়েছিল। সেটা দরকার বলে মনে হয়—হ্রদের তীরে লক্ষ টাকা খরচ করে প্রাসাদোপম অতিথিভবন নির্মাণ করার চেয়েও বেশী দরকার; নইলে প্রচারে আকৃষ্ট হয়ে বিদেশী পরিব্রাজকেরা ঠেকাড়ি গিয়ে দু-এক পাল শূকর ও দু-একটি হাতী দেখেই যদি ফিরে আসে তবে দেশে গিয়ে আমাদের জাতির অনুপাতজ্ঞান সম্বন্ধে কি অভিমত প্রকাশ করবে?

পর দিন উল্টা যাত্রা। এবার সোজা পথ এবং ভাল পথ দিয়ে। পার্ব্বত্য পথ নিশ্চয়ই, তবে দুরারোহ, দুর্গম পথ নয়। দু'দিকেই চা-বাগান। তা ছাড়াও চাষ আছে রবার, গোলমরিচ, এলাচি এবং বহুবিজ্ঞাপিত টাপিয়োকার। একটু দূরে দূরেই বসতি, মাঝে মাঝে ছোটখাট এক একটি শহর—সব ক'টিই নাকি স্বাস্থ্য-নিবাস। ফিরতি পথে ত্রিবাঙ্কুরের অধিবাসীদের ভাল করে লক্ষ্য করবার সুযোগ মিলল।

বিচিত্র দেশ, বিপুল এর সম্পদ। পাহাড়, অরণ্য, সমুদ্র, উর্ব্বর সমতল ভূমি, নদী, খাল, বিল—কিছুরই অভাব নেই। এর শ্যামশোভাই এর উর্ব্বরতার জীবন্ত সাক্ষী। প্রায় ৭,০০০ স্কোয়ার মাইল হবে খাস ত্রিবাঙ্কুরের আয়তন যার অধিকাংশই নিজের চোখে দেখে এসেছি। এমন এক টুকরা ভূমিও চোখে পড়ে নি যা মানুষের প্রয়োজন মিটাবার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে না। পার্থিব সম্পদ যেখানে নেই সেখানে আছে অপার্থিব সৌন্দর্য্য।

কফির গাছ—ত্রিবাঙ্কুরের আর এক সম্পদ

একদিকে আরব সাগর আর একদিকে পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালা। স্বয়ংসম্পূর্ণ এক দেশ। তথাপি এর নিজস্ব সংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ আছে কি? এ সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা কি বলেন ভাল জানা নেই, কিন্তু নিজের মনে সন্দেহ জন্মেছে। মুসলমানের ছোঁয়াচ এরা বাঁচিয়ে চলেছে নিশ্চয়ই, কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতা এদের আদিম সংস্কৃতিকে খুব বেশী প্রভাবান্বিত করেছে বলে মনে হয়। সাজ-পোশাকে না হলেও এদের ঘর-বাড়ীর গড়ন ও খাওয়া-থাকার ধরণে পাশ্চাত্যের প্রভাব বড় বেশী প্রকট। অধিবাসীদের ধর্ম্ম বিভাগ থেকেও এই সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যায়। ত্রিবাঙ্কুর কোচিনের প্রায় ৭৫ লক্ষ লোকের মধ্যে প্রায় ২৪ লক্ষ খ্রীষ্টান। মন্দির এ দেশে খুঁজে নিতে হয়, কিন্তু গীর্জ্জা চোখে পড়ে মোড়ে মোড়ে।

এদেশে লোকসংখ্যা নাকি অবাঞ্ছনীয়রকমে বেশী—প্রতি স্কোয়ার মাইলে ৮১৯ জনের বসতি। অথচ আশ্চর্য্য এই যে, ত্রিবান্দ্রম্ শহরে চলতে চলতেও মনে হয়েছে যে এদেশে লোকই নেই। রেলগাড়ীর তৃতীয় শ্রেণীতেও গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি হয় না। এরা দেখতে খাটো, এদের বর্ণ কালো, সাজপোশাকে কিছু-মাত্র আড়ম্বর নেই। তবু স্বতঃই শ্রদ্ধা হয় এদের প্রতি। আশ্চর্য্য রকমের শান্ত এরা। ত্রিবাঙ্কুরের ভিতরেই অন্ততঃ হাজারখানেক মাইল ঘুরেছি; কিন্তু কোথাও দুটি লোককে ঝগড়া করতে দেখি নি, কোথাও গোলমাল কানে আসে নি। বাসের ভিতরে নিজেরা

হৈ-হল্লা করেছি বলে আমারই কেমন লজ্জা করেছে—পার্থক্যটা বড্ড বেশী কিনা!

গোলমরিচ—যা প্রতীচ্যের বণিককে ভারতের উপকূলে টেনে এনেছিল

রাত বারটার পর রাজনৈতিক সভা হতে দেখেছি। ত্রিবাঙ্কুরের জনসাধারণের রাজনৈতিক সচেতনতার এর চেয়ে নির্ভুল প্রমাণ আর কি হতে পারে?

এরা শিক্ষিত জাতি। ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন রাজ্যে লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা শতকরা ৪৫ জন; স্ত্রীলোকের মধ্যেও শতকরা ২৪ জন লেখাপড়া জানেন। কেবল ত্রিবাঙ্কুরের হিসাব নিলে শতকরা হার নাকি আরও বেশী হয়। সমগ্র ত্রিবাঙ্কুর কোচিনে ২০টি দৈনিক, ৬৫টি সাপ্তাহিক এবং ৫৫টি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। এই সব কাগজের বিক্রয়ের হিসাব বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে যে, প্রতি ৩ জন অধিবাসীর মধ্যে ১ জন সংবাদপত্রের ক্রেতা। অধিকাংশ সংবাদপত্রই দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত হয় এবং তা-ও রাজনৈতিক প্রচারের উদ্দেশ্যে। এ থেকেও জনসাধারণের রাজনৈতিক সচেতনতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

মুগ্ধ হয়ে এসব কথা ভাবছিলাম, পরিবেশের আকস্মিক পরিবর্তনে সজাগ হয়ে উঠলাম। বাস কোট্টায়াম শহরে এসে গিয়েছে।

রাতের খাওয়া শহরের একটা নামকরা হোটেলে রীতিমত রাজসিকভাবে সেরে নেওয়া গেল। তার পর আবার যাত্রা। ত্রিবান্দ্রম পৌঁছতে রাত তিনটে। সরকারী সফরেরও অবসান। দল ভেঙে গেল। ভোরের গাড়ী ধরবার জন্য অনেকেই ষ্টেশনে চলে গেলেন।

আমরা তিন জন রওনা হলাম কন্যাকুমারীতে সাগরসঙ্গম দেখতে—গঙ্গার সঙ্গে সাগরের সঙ্গম নয়, সাগরের সঙ্গে সাগরের। তাও দুটি নয়, তিনটি—পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর ও পশ্চিমে আরব সাগর।

পার্থক্য নাকি স্পষ্ট চোখে দেখা যায়, যেমন গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমে। তিন দিক থেকে ছুটে আসা তরঙ্গমালার পুলকোচ্ছল আলিঙ্গনের দৃষ্টিগ্রাহ্য দৃশ্য। তত তীক্ষ্ণদৃষ্টি আমার নেই। আমি দেখলাম বিশাল বারিধিকে। তীরে কি আছে? তাল-নারিকেলের শ্যামল কুঞ্জ, ছোট ছোট পাহাড়, ছোটবড় বাড়ী, দেবী কুমারীর মন্দির—প্রত্যেকটিই দেখে মুগ্ধ হবার মত দৃশ্য। কিন্তু সে সবই তো পিছনে—ঘাড় না ফেরালে চোখে পড়ে না। চোখে প্রতিভাত হচ্ছে কেবল অনন্ত জলরাশি, মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের উজ্জ্বল কিরণে আরও বেশী নীল। তরঙ্গের পর তরঙ্গ মণিকিরীটিনী ফণিনীর মত লীলায়িত ছন্দে ছুটে এসে ঘাটের কাছে অর্দ্ধ-নিমজ্জিত শিশু-পর্ব্বতমালার কঠিন বক্ষে কোটি কোটি মুক্তা ছড়িয়ে দিয়ে শিলাতলে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, অজগরের চোখের মতই ওদের সম্মোহিনী শক্তি। কিন্তু সেও তো পায়ের নীচের দৃশ্য—চোখ না নামালে দেখা যায় না। বিনা আয়াসে যা দেখতে পাচ্ছি তা দিগন্তবিস্তৃত নীলাম্বুরাশি। তার কোথাও ছেদ নেই, প্রক্ষিপ্ত বৈপরীত্য নেই, তরঙ্গের উচ্ছ্বাসও নেই। কাচের মত ঝকঝকে নিস্তরঙ্গ শান্ত বিপুল জলরাশি। 'সমুখে শান্তির পারাবার' —

গত এক পক্ষকাল ত্রিবাঙ্কুরের যে রূপ দেখেছি এ যেন তার সরব কিন্তু স্নিগ্ধ অস্বীকৃতি।

সন্ধ্যার পর বালুকাময় বেলাভূমিতে একখানি পাথরের উপরে একাকী চুপ করে বসেছিলাম। আগামীকাল ফিরে যেতে হবে, সোজা একেবারে কলকাতায়; সময় নেই, কোথাও দেরী করা যাবে না, মন্দিরের দেশ দাক্ষিণাত্যে এসেও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ অনেক মন্দির না দেখেই দেশে ফিরে যেতে হবে। মনটা কেমন খুঁৎখুঁৎ করছিল,—কি সব বন-বাদাড় দেখে এতগুলি দিন নষ্ট করলাম —

সহসা একটি প্রকাণ্ড তরঙ্গ এসে আমারই বসবার পাথরখানির গায়ে সশব্দে আছড়ে পড়ল। চমকে উঠলাম। কে যেন মর্ম্মঘাতী ভাষায় আমাকে তীব্র তিরস্কার করছে,—মন্দির দেখ নি কি?

মুহূর্ত্তে সংশয় কেটে গেল, প্রাপ্তির নিবিড় এক উপলব্ধিতে বুক ভরে উঠল আমার। দেখেছি বৈ কি! এ কয়দিন কেবল মন্দিরই তো দেখেছি। নয়নাভিরাম শ্যামল নারিকেল ও কদলীকুঞ্জ, গগনচুম্বী পর্ব্বতমালা, সূর্য্যালোকের প্রবেশপথহীন নিবিড় মহারণ্য, নৃত্যচঞ্চলা সঙ্গীতমুখরা পর্ব্বতদুহিতার আকস্মিক উদ্দাম আত্মপ্রকাশ আর এই দিগন্তপ্রসারী মহাসিন্ধুর বিশাল প্রশান্ত বুক,—এ সবই তো মহাদেবের আসল মন্দির।

পরদিন সকালে দেবী কুমারীর মন্দির দেখতে গিয়ে আমার এই উপলব্ধিরই সমর্থন পেয়েছিলাম। অতি সাদাসিধা মন্দির। কারুকার্য্য একেবারেই নেই। উচ্চতাও নগণ্য। ভারতবর্ষের অন্যান্য অনেক সাধারণ মন্দিরের সঙ্গেও এর তুলনা হতে পারে না।

হয়তো এ মন্দিরের শিল্পীও বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইট-পাথরের মন্দির ওখানে অনাবশ্যক।

নায়িকা

(তিন অঙ্ক নাটক)

শ্রীসুবোধ বসু

তৃতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

[প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের মমতার বাড়ীর বসিবার কামরা। সন্ধ্যা হইয়াছে। পটোত্তোলনের কয়েক সেকেণ্ড পরে পাশের কুঠরি হইতে হাত দিয়া মুখ-ঢাকা সেবার পিঠ বেষ্টন করিয়া মমতার প্রবেশ।]

মমতা। ছিঃ! এই ভর-সন্ধ্যায় কেউ অমন করে শুয়ে থাকে। কেন, কি হয়েছে! যারা তোদের সেবার মূল্য বোঝে না, যাদের কোনও কৃতজ্ঞতাবোধ নেই, তাদের আচরণে মন-খারাপ করে বসে থাকার মানে হয় না।···ওরা যতটুকু সন্তুষ্ট, ততটা ওরা পেয়েছে; ঠকেছে কি জিতেছে, তা ওদেরই ভাবতে দে।···নে, এখানে বোস (কৌচে বসাইল)···আমি আর দেরি করতে পারি নে। সাড়ে ছ'টায় যাব বলেছি, আর এখন সাতটারও ওপর। হয়তো রিহার্সেল বন্ধ করেই সবাই বসে আছে···আমি মোটেই দেরি করব না, আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসব। এর মধ্যে যদি আমার অতিথিটি এসে হাজির হয়···

সেবা। না, মোটেই আমি অভ্যর্থনা করতে পারব না; যীশুখৃষ্টসুলভ ক্ষমাগুণ আমার নেই। কুচক্রী ক্যাপিটালিষ্টদের আমরা অন্যরকম অভ্যর্থনা জানাতে অভ্যস্ত···

মমতা। (স্মিতহাস্যে) কেন, সে তোর সঙ্গে কোন্ খারাপ ব্যবহারটা করেছে?···

সেবা। খারাপ ব্যবহার ওরা করে না। রূপোর শরবৎ খেয়ে এদের গলার স্বর মোলায়েম; আচার ব্যবহার চকচকে। কিন্তু ক্ষতি করার বেলায় প্রথম নম্বরের···

মমতা। কেন, কি ক্ষতিটা করেছে? ক্ষতির মধ্যে তো দেখছি পুলিসের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে···

সেবা। তবে আর কি; একেবারে দয়ার মহাসাগর বনে গেছেন! পুলিসের হাজতে গেলে আজ অনেক ভাল ছিল। তবে আজ এমন অপমান হতে হ'ত না। অথচ দেখা হলেই উনি ঠারে-প্রকারে জানিয়ে দেবেন, নিতান্ত তোমার বোন বলেই দয়া করে আমার এত বড় মহা উপকারটা···

মমতা। পাগল! দেখিস সে কখখনো তা বলবে না। প্রদোষের মত ছুটি ছেলে হয় না। মজুরদের জন্য, গরিব-দুঃখীর জন্য তার কত সহানুভূতি···

সেবা। (আপত্তিসহকারে) মজুর কারো সহানুভূতির গোলাম নয়। তার সহানুভূতি তাঁকে ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে রাখতে বলো। মজদুররা সংগ্রাম করেই তাদের পাওনা আদায় করবে। আমাদের এই হারাই শেষ হারা নয়···

মমতা। (হালকাসুরে) তবে আর কি। তবে আর মুখভার করে আছিস কেন?···আর আমি দেরি করতে পারছি নে।···তাকে অভ্যর্থনা করবার দরকারই হবে না; নিজেই সে নিজেকে আর হাজার মানুষকে অভ্যর্থনা করতে পারে। তা হলেও আমাদের একবার ভদ্রতা করে বসতে বলতে হবে তো; সে যেন না বলতে পারে, দিদি নেমন্তন্ন করে বাড়ী ছেড়ে পালিয়েছেন!··· একা একা বসে বসে আর কি করবি; বরং গ্রামোফনটা বাজিয়ে শোন না, কতকগুলি নতুন রেকর্ড··

সেবা। (অধীর কণ্ঠে) আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে। তুমি যাও তো।···মনে আমার গান শোনার পুলক একেবারে থৈ থৈ করছে।·

মমতা। (সহাস্যে) তোর যা ইচ্ছে কর বাপু।···আমি যাব, আর চলে আসব···

[প্রস্থান : দরজা দিয়া গণেশের প্রবেশ]

গণেশ। (আগাইয়া আসিয়া) মা বলে গেছেন, একটু চা তৈরি করে দেব কি, মাসিমা? যদি কফি খান, তাও···

সেবা। কিচ্ছু দিতে হবে না। যাও ত, বাছা, কাজে যাও। মহামান্য অতিথি আসছেন, তার জন্য রাজভোগ তৈরি করতে হবে ত?

গণেশ। রান্নার কথা বলছেন? সে মা-ই সেরে গেছেন, সারা দুপুর ধরে রেঁধেছেন; আমার এক ময়দা সানা। তা এমন কিছু···(বাইরের দরজায় ধাক্কার শব্দ)

সেবা। (সভয়ে চাহিয়া) যাও, দেখ গিয়ে। তোমাদের সেই মহামান্য পুরুষটি পৌঁছে গেছেন। দরজা খুলে একটা রাজোচিত (গণেশ আগাইয়া গেল) সম্বর্দ্ধনা জানিয়ে ভেতরে নিয়ে এস।— এমন জানলে কখখনই আমি এ বাড়ীতে এসে উঠতাম না, সরাসরি কলকাতায়···

[গণেশ দরজা খোলার পর ক্যাম্বিসের ব্যাগ হস্তে পুরু কাঁচের চশমা পরা এক বৃদ্ধের ব্যস্তসমস্ত ভাবে প্রবেশ]

গণেশ। কর্ত্তা বাবু!

সেবা। বাবা!

বৃদ্ধ। খুকী! (হাঁপাইতে হাঁপাইতে)—এ সব কি কাণ্ড! আমাকে না মেরে কিছুতেই কি তোর শান্তি হবে না? উদ্বেগে উদ্বেগে সারা হয়ে আর চুপ থাকতে পারলাম না। কলকাতা থেকে ছুটে···

সেবা। বাঃ রে, তুমি এসেছ কেন? (কাছে অগ্রসর) ব্যাপার কি? হয়েছে কি শুনি। বেশ তো!

বৃদ্ধ রায় মশায়। কি হয়েছে! আবার জিজ্ঞেস করছিস? এক

দল যণ্ডা ছেলে সঙ্গে নিয়ে দেশময় দস্যিপনা করে বেড়াচ্ছিস, আবার জিজ্ঞেস করছিস…

সেবা। (বৃদ্ধের পিঠে হাত দিয়া) বুড়ো হলে মানুষ কি রকম ছেলেমানুষ হয়ে উঠতে পারে, এক তুমিই তার যথেষ্ট নমুনা। কেন, আমার কি হয়েছে যে, বুড়োমানুষ একা এমন করে কলকাতা থেকে ছুটে আসতে হবে!…(গণেশকে) যাও তো, বাছা, এবার চায়ের জল চড়াও গিয়ে…(গণেশের প্রস্থান) চল, বাবা, ভেতরে চল। সন্ধ্যা-আহ্নিক হয়েছে?…

বৃদ্ধ। সন্ধ্যা-আহ্নিক জপ তপ সব পাটে উঠেছে।… মমতা কৈ, আগে ডাক ওকে…

সেবা। দিদি বাইরে গেছে। এখুনি আসবে। তুমি ভেতরে চল। আগে জামা-কাপড় ছোড়…

[দরজায় মোটরের আওয়াজ। অবিলম্বে প্রদোষের প্রবেশ।]

প্রদোষ। (প্রবেশ করিতে করিতে) দিদি, আমি পৌঁছে গেছি।…

[সেবাকে ও বৃদ্ধকে অনিশ্চিত দৃষ্টিতে দেখিয়া মধ্যপথে থামিয়া গেল।]

(সেবার প্রতি) আমি দুঃখিত। দিদি কোথায়? ওঁকে একবার…

সেবা। (অন্য দিকে চাহিয়া) দিদি বাড়ী নেই। (সামান্য দ্বিধা) ইচ্ছে করলে বসতে পারেন। শীগগিরই ফেরবার কথা।

প্রদোষ। (বৃদ্ধকে দেখাইয়া) বাবা?

সেবা। (অনাত্মীয়তার সুরে) হুঁ।

[প্রদোষ অগ্রসর হইয়া বৃদ্ধের পদধূলি লইল।]

প্রদোষ। আমাকে কি চিনতে পারছেন না, রায়-মশায়?

বৃদ্ধ। (বিপন্ন ভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া সেবার প্রতি) তোর দলের কেউ বুঝি?—

প্রদোষ। (সকৌতুক মুখে) আজ্ঞে না, আমি এর বিপক্ষ দলের। ইনি যাদের শায়েস্তা করতে এসেছিলেন, আমি সেই দুরাত্মাদের অন্যতম।…আপনার মনে আছে কি, ১৯৩৮ সালের শেষের দিকে মমতাদি যখন এখানকার হেডমিস্ট্রেসের কাজ নিয়ে আসছিলেন, তখন ট্রেনের সেই একই কামরায় একটি বেকার ছেলে চাষ-বাস করার উদ্দেশ্যে…

বৃদ্ধ। (চশমা উঁচু করিয়া) প্রদোষ!

প্রদোষ। আজ্ঞে, হাঁ। আমিই প্রদোষ।

বৃদ্ধ। (চিনিয়া) প্রদোষ! আমি সব শুনেছি, বাবা। তুমি এখন প্রকাণ্ড ধনী; দেশের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি! এ যে আমাদের…

প্রদোষ। আশীর্বাদ নিশ্চয়ই। নইলে আমার চাষের জমির তলায় কয়লার খনি বেরুবে কেন।—ধনী হওয়ার একমাত্র উপায় …আমার বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হয় নি। দেবতারা বিশেষ বিশেষ লোককে বিশেষ খাতির দেখিয়ে থাকেন। অথচ সেব দেবীরা কিছুতেই এই ডিভাইন্ থিয়োরিটা বুঝতে চান না; দলবল নিয়ে এই ভগবদ্দত্ত অধিকারে বাধা দিতে আসেন…

সেবা। (অসন্তুষ্ট কণ্ঠে) এস, বাবা, ভেতরে এস। আগে আহ্নিক সেরে নাও। আমি চা করতে বলেছি—

বৃদ্ধ। যাচ্ছি মা, যাচ্ছি। প্রদোষ আমাদের আপনার লোক। কত বছর পরে ওর সঙ্গে আজ দেখা হ'ল…

সেবা। ধনিকেরা কারুর আপনার লোক হয় না, বাবা।… তুমি ভেতরে এস। ট্রেনের পরিশ্রমের পর তোমার খাওয়া দরকার, জিরনো দরকার…

প্রদোষ। (বৃদ্ধকে) হাঁ, আপনি তাই করুন। আমি এখানে কয়েক ঘণ্টা আছি; মমতাদির নেমন্তন্ন আছে। আপনি সুস্থ হয়ে আসুন…নইলে ইনিও শান্তি পাবেন না…

সেবা। (বৃদ্ধকে আকর্ষণ করিয়া) এস, বাবা চলে এস…

বৃদ্ধ। (চলিতে চলিতে) আমি আহ্নিক সেরে এখুনি আসছি। তুমি বসো, প্রদোষ। কত কাল পরে তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল। বড় আনন্দ পেলাম। তোমার উন্নতি আমাদের পরম গর্বের বিষয়…

[প্রদোষের সেবার প্রতি সকৌতুক দৃষ্টিক্ষেপ। সেবার মুখে অসন্তোষ ও বৃদ্ধসহ তাহার প্রস্থান।]

[প্রদোষ গ্রামোফোনটার কাছে আগাইয়া গেল ও রেকর্ড বাছিতে লাগিল।]

(গণেশের প্রবেশ)

গণেশ। মাসিমা জিজ্ঞেস করে পাঠালেন, এক পেয়ালা চা খাবেন কি?

প্রদোষ। (ফিরিয়া) না, চায়ের দরকার নেই।…তোমার মাসিকেই একবার বরঞ্চ ডেকে দাও…

গণেশ। যে আজ্ঞে। (প্রস্থান)

[একটা রেকর্ড চাপাইয়া প্রদোষ গ্রামোফোনে চাবি দিতে লাগিল।]

(সেবার প্রবেশ)

সেবা। (দূর হইতে) কি দরকারটা?

প্রদোষ। (আবার ফিরিয়া) এই যে। হাঁ, দেখুন, রায়-মশায়কে আহ্নিকে বসিয়ে দিয়েছেন কি? তবে…

সেবা। আহ্নিকে তিনি নিজেই বসতে জানেন।

প্রদোষ। তা হলে নিশ্চয়ই আপনি ততটা আর ব্যস্ত নেই। দিদি কোথায় গেছেন, এখন বলবার ফুরসত হবে কি?…মানে, যদি…

সেবা। কখনই তার অভাব ছিল না…কাল স্কুলে লাট-সাহেব আসছেন। হেডমিস্ট্রেস তাঁর আপ্যায়নের ব্যবস্থা পাকা করতে স্কুলে গেছেন…

প্রদোষ। অত্যন্ত মন্দ কাজ! তবে চলুন না, গাড়ীটা করে

তাঁকে চট করে তুলে নিয়ে আসি। আপ্যায়ন ত আজ আমারই পাওনা…

সেবা। কেউ আপনাকে আটকে রাখছে না; অনায়াসেই যেতে পারেন। কিন্তু আমি যেতে গেলাম কেন? আমার কি দরকার?…

প্রদোষ। আপত্তিটা কি? আমি ক্যাপিটালিষ্ট-শ্রেণীভুক্ত বলে আপত্তি নয় ত?…

সেবা। যদি তাই হয়!…পরকে ঠকিয়ে যারা মুনাফা লোটে, তারা এমন কোনও নমস্য…

প্রদোষ। আপনার প্রস্তাবটা তবে কি? ব্যবসার মুনাফার সবটাই শ্রমিকদের দিয়ে দিতে হবে, তাই কি?…

সেবা। তা নয়ই বা কেন?

প্রদোষ। (সহাস্যে) এই জন্য নয় যে, তা হলে আমাদের মত দুরাত্মারা কিছুতেই এই ভূতের বেগার খাটতে আসবে না! আপনার মজুরদেরই কোম্পানী চালাতে হবে।…শিবু-সর্দ্দার, মাইতিবাবু এরা ঠিকমত চালাতে পারবে বলে মনে হয়?…

সেবা। ভাল লোকের কোনই অভাব নেই।

প্রদোষ। এই নোংরা কাজে টানতে হলে তাদেরও টাকার লোভ দেখাতে হবে…

সেবা। টাকাটাই সবার কাছে বড় কথা নয়। সমাজসেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বহু লোক এগিয়ে আসবে, যদি তাদের…

প্রদোষ। ডাকা হয়, কেমন? কিন্তু কে তাদের ডাকবে? তারা ক্যাপিটাল পাবে কোথায়?

সেবা। কেন, গবর্ণমেণ্ট দেবে, মানে সমাজতন্ত্রী গবর্ণমেণ্ট।

প্রদোষ। তা হলে সর্ব্বপ্রথমেই সমাজতন্ত্রী গবর্ণমেণ্ট চাই বলুন, যারা সব ইনডাষ্ট্রি চালাবারই ভার নেবে…

সেবা। হাঁ। কিন্তু সমাজতন্ত্রী গবর্ণমেণ্ট গঠনের পক্ষে প্রধান শত্রু আপনারা। নিজেদের কায়েমী স্বার্থরক্ষার চেষ্টায়…

প্রদোষ। আমরাই বরঞ্চ সমাজতন্ত্র ত্বরান্বিত করে তুলছি। ব্ল্যাক-মার্কেট, অতি-মুনাফা, মজুর-শোষণ এসবও যদি পুঁজিবাদের অবসান না ঘটাতে পারে তবে আমরা নাচার!…আমাদের দেশের নূতন কনষ্টিট্যুশনে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার আছে। এরা ইচ্ছে করলেই নিজেদের মনোমত গবর্ণমেণ্ট গঠন করতে পারবে। কিন্তু যতদিন না গবর্ণমেণ্ট উৎপাদনের ভার নিচ্ছে, ততদিন আমরাই ভরসা। অনর্থক আমাদের চটালে বিপদে পড়বেন —প্রোডাকশন একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে…

সেবা। আপনাদের উপযুক্ত কথাই হয়েছে! এই হুমকি দেখিয়ে আপনারা আর যাদেরই ভয় দেখাতে পারেন, আমাদের পারবেন না। এর জবাব আমরা ভাল করেই জানি…

প্রদোষ। জবাব তৈরি আর জিনিষ তৈরি এক কথা নয়, সেবা দেবী। কিন্তু দেখুন, এক কাজ করলে হয় না; ঝগড়াটা আজকের মতন মুলতুবি রাখলে কেমন হয়? ইতিমধ্যেই কি তা এক দিনের পক্ষে যথেষ্ট হয়ে যায় নি? অন্ততঃ বৈচিত্র্যের খাতিরেও প্রসঙ্গটা বদলানো উচিত এই ধরুন, আপনি গান গাইতে জানেন? তবে না হয় একটা গানই করুন না? আর বেশী ঝগড়া করলে আমার এত ক্ষিধে পাবে যে, দিদি অসুবিধেয় পড়ে না যান!…

সেবা। সখের প্রাণ গড়ের মাঠ! ষ্ট্রাইক্ জিতে এখন গান শুনতে ইচ্ছে হয়েছে! গাইতে জানলেও কখনও আপনার জন্য গাইতে বসতাম না, তা ঠিক…

প্রদোষ। (সকৌতুকে) কি ভয়ানক রাগ! শুধু গান জানেন না বলেই সন্তুষ্ট নন, জানলেও শোনাতেন না বলে পোড়া ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে চাইছেন! কিন্তু বৃথা চেষ্টা! এই গণ্ডারের চামড়ায় কোনও আঁচড়ই লাগবার নয়।…কিন্তু এতটা খাপ্পা হয়ে উঠেছেন কেন শুনি? ষ্ট্রাইক্ ভেঙে দিয়েছি বলে কি? দেখুন, সেটা নিতান্ত আত্মরক্ষার্থ করতে হয়েছে, নইলে…

সেবা। (সাভিমানে) সেটাই সবচেয়ে বড় আঘাত নয়! যুদ্ধে হার-জিত আছেই। কিন্তু আপনারা নির্লজ্জ চক্রান্ত করে প্রমাণ করে ছেড়েছেন, আমি মজুরের শত্রু! নিজের কর্তৃত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যেই আমি ওদের নিজেদের স্বার্থ-বিরোধী সংগ্রাম চালিয়ে যেতে প্ররোচিত করছিলাম!…মজুর-সেবকের পক্ষে এর চেয়ে বড় অপবাদ আর কিছু হতে পারে না!…কিন্তু আপনাদের তাতে কি? বিজয়োল্লাসে একেবারে ডগমগ করছেন! বাইরে জ্যোৎস্না দেখে গান শোনার শখ হয়েছে…

(মমতার প্রবেশ)

মমতা। প্রদোষ! এসে পড়েছ!

প্রদোষ। দিদি! দেখুন ত কি করেছেন, আমাকে একটা জলন্ত আগ্নেয়গিরির মুখে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে আপনি ছুলের…

সেবা। (বাধা দিয়া) বাবা এসেছেন, দিদি। ভেতরে চল…

মমতা। (সবিস্ময়ে) বাবা! সে কি রে। কখন এলেন? (প্রদোষকে) বস, তুমি প্রদোষ। বস, ভাই। আমি এক মিনিটের মধ্যে আসছি। (সেবাকে) এ আর কিছু নয়। তোর জন্যই ভেবে ভেবে…

সেবা। (অসন্তুষ্ট ভাবে) তার আমি কি করব…চল, এখন ভেতরে চল। নিজেরা নিজেরা একটু কথা বলি গিয়ে…

[মুখ টিপিয়া হাসিয়া প্রদোষের দিকে তাকাইয়া সেবার সঙ্গে মমতার প্রস্থান। প্রদোষ আগাইয়া গিয়া গ্রামোফোনের ডালা বন্ধ করিল এবং দেয়ালের যেখানে সেবার ফটো টাঙানো ছিল, সেইখানে গিয়া দাড়াইয়া ফটো লক্ষ্য করিতে লাগিল।

[মমতা ও রায়-মশায়ের প্রবেশ]

বৃদ্ধ। এস বাবা, প্রদোষ। তোমার সঙ্গে বসে একটু গল্প করি। কত কাল পরে দেখা হ'ল। কিন্তু সব খবরই রাখি। কত

নাম করেছ, কত প্রতিষ্ঠা হয়েছে। বস, বাবা, বস···(প্রদোষ কৌচে রায়-মহাশয়ের পাশে এসে বসিল)···তার পর বিয়ে-থা করেছ?···(প্রদোষ ঘাড় নাড়িল)

মমতা। আজকাল যেমন ছেলেরা, তেমনি মেয়েরা। কেউ সময়মত বিয়ে করবে না···

প্রদোষ। সবাই আজকাল অর্থনীতির দাস কিনা দিদি। আজকাল প্রজাপতির মর্জির ওপর বিয়ে নির্ভর করে না; নির্ভর করে আয়ের ওপর, টাকার ওপর···

মমতা। তোমার তো টাকার খুব অভাব হবার কথা নয়, প্রদোষ।···এ ঠিক নয়। বিয়ে-টিয়ে করো; দেখো সুখী হবে···

প্রদোষ। সুখ একমাত্র বরাতে হয়। আমি একজন বরাত-বাদী। যদি সুখ হবার হয়, বরাতই তার ব্যবস্থা করে দেবে।··· আমি যখন চাষের জমি ইজারা নিচ্ছি, তখন আমার জমিদার রগড় করে বললেন: দলিলে খনি-স্বত্বও লিখে দেব কি? আমিও সমান রগড়ের সঙ্গে বললাম: আজ্ঞে হাঁ, দিন না, ক্ষতি কি। তার ফলাফল দেখছেন তো! কোথা দিয়ে যে মানুষের জীবনে কি হয়ে যায়, আগের মুহূর্তেও সে টের পায় না···

বৃদ্ধ। তোমার তো বাবা কত জায়গায় যাতায়াত, কত জানা-শোনা। খুকীর জন্যে একটি ভাল পাত্র দেখে দাও না। বিয়ে-থা হলে তবে যদি ওর মতিগতি ফেরে। তবে আমি নিশ্চিন্ত হই···

মমতা। সত্যি, দেখো না, প্রদোষ। তোমার বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে যদি কেউ থাকে, তবে তো খুবই ভালো হয়···

বৃদ্ধ। খুব বড়ো কিছু আমরা চাইনে, বাবা। সংস্বভাবের লেখাপড়া জানা ছেলে, স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করতে পারে, এমন হলেই চলবে।···মস্ত কিছু চাইলেই বা আমরা পাচ্ছি কোথায়। মোটামুটি সুখে থাকতে পারলেই যথেষ্ট।···(দীর্ঘশ্বাস) এক বোনের জীবন তো নষ্টই হয়ে গেছে (মমতার অধোবদন), বাকি এইটি···

প্রদোষ। আমি দেখব। আমি ভেবে দেখি। (মমতাকে) একটি খুবই সুপাত্র আছে, কিন্তু···

মমতা। কিন্তু কি?

প্রদোষ। তার একটা মস্ত দোষ! লোকটা অত্যন্ত অন্যায় রকম বেশী টাকার মালিক, প্রায় স্বর্ণগর্দভ বলা চলে। আপনার বোন কি রাজী হবেন?···

বৃদ্ধ। (সোৎসাহে) দেখ, বাবা, একটু চেষ্টা করে দেখ। খুকীর বিয়ে-থা দিয়ে যেতে পারলে এবার আমি নিশ্চিন্তে···

[ভৃত্য গণেশের প্রবেশ]

গণেশ। (বৃদ্ধকে) মাসিমা আপনাকে একবার ভেতরে ডাকছেন, কর্তাবাবু।···প্রদোষের সকৌতুকমুখে মমতার দিকে দৃষ্টিপাত)

বৃদ্ধ। (অসন্তুষ্টভাবে) কেন? না, আমি এখন যেতে পারব না; প্রদোষের সঙ্গে বসে একটু গল্প করছি। তাকে বলগে···

গণেশ। আপনার সন্ধ্যেবেলার ওষুধ খাওয়ার সময় হয়েছে। ওষুধের শিশিটা আপনি কোথায় রেখেছেন, তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না···

বৃদ্ধ। কি জ্বালা! বলগে, আজ ওটা থাক। ক্যালি ফস একদিন বাদ দিলে এমন কোনও ক্ষতি, মানে গুরুতর ক্ষতি···

প্রদোষ। (সহাস্যে) আপনি বরঞ্চ ওষুধটা খেয়েই আসুন। তবেই যদি নিশ্চিন্তে বসে গল্প করা যায়···

[বৃদ্ধ অনিচ্ছুকভাবে উঠিলেন।]

বৃদ্ধ। সব তাতেই খুকীর বাড়াবাড়ি! তুমি বসো, প্রদোষ। আমি এলাম বলে। কোথায় জানি রেখেছিলাম শিশিটা। সব ভুলে যাই। বুড়ো হওয়ার এই তো মুশকিল···

[প্রস্থান।]

[শোফেয়ারের প্রবেশ ও অভিবাদন।]

প্রদোষ। কেয়া খবর?

শোফেয়ার। পেট্রোল তো মিলা নহী, হজুর। বিলকুল—

প্রদোষ। (সোদ্বেগে) মিলা নহী! কেও?—ষ্টেশনের কাছের পাম্পটায় খোঁজ করেছিলে?—

শোফেয়ার। জী সাহাব। হুঁয়া বিলকুল খতম হো গয়া—

প্রদোষ। তবে তো মুশকিল বাধালে! কাল ভোর হবার আগেই যে আমাকে বেরিয়ে পড়তে হবে। (শোফেয়ারকে) চল দেখি, আমি নিজেই একবার ঘুরে আসি। (মমতার প্রতি) দিদি, আমি নিজে একটু দেখে আসি; পেট্রোল না পাওয়া গেলে কিছুতেই চলবে না। দরকার হলে রাণীগঞ্জ পর্যন্ত যেতে হবে।—(শোফেয়ারের প্রস্থান) তবে আশা করি অতটা হাঙ্গামা করতে হবে না। ব্ল্যাক-মার্কেটের দাম দিলে অধিকাংশ পেট্রোল ষ্টেশনের বিশুদ্ধ উৎসই পেট্রোলে ভরে ওঠে। আর এই দাম দিতে আমি কখনই কার্পণ্য করিনে—যারা ব্ল্যাক-মার্কেটের দাম নেয় তারা সবাই আমার মাসতুত ভাই! দ্রব্যের সরবরাহ চেপে দিতে পারলেই দাম ফাঁপিয়ে তোলা যায়, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার এই তো সুবিধে। এই সুবিধে দু'হাতে গ্রহণ করতে আমি যখন কসুর করিনে, তখন অন্যদের বেলায়ই আপত্তি করব কেন। আপত্তি করবে জনসাধারণ ···আপত্তি করবে আপনার বোন। কিন্তু তিনি গেলেন কোথায়? কি ভয়ানক তাঁকে চটিয়ে দিয়েছি, দেখুন। একেবারে গা-ঢাকা দিয়েছেন—

মমতা। চটাচটির চেয়ে তাই বা মন্দ কি?

প্রদোষ। ঢের মন্দ। কঠিন ধাতু দ্রব করতে উত্তাপের জুড়ি নেই। আমি সেই উত্তাপ সংযোগ করে গিয়েছি। ভরসা আছে, খাবার টেবিলের আবহাওয়া অনেকাংশে তরল হয়ে উঠবে···আপনি খাবার নিয়ে তৈরি থাকুন···

মমতা। (সহাস্যমুখে) তুমি আগে ফিরে এসোই তো—

[প্রদোষের প্রস্থান। সেবার প্রবেশ।]

সেবা। (চার দিক চাহিয়া) তিনি বিদেয় হয়েছেন?—

মমতা। কিনি? প্রদোষ? না খেয়েই সে যাবে কি রে,

তার যে নেমন্তন্ন। কোথাও নাকি পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে না. সে পেট্রোলের খোঁজে বেরিয়েছে। এখুনি আবার আসবে।···আমরা তোর একটা বিয়ের ব্যবস্থা করছি, খুকী। আর পাগলামি করা চলবে না। বাবা ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। প্রদোষ বলেছে···

সেবা। (কৃত্রিম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে) তিনিই কি দয়া করে আমাকে বিয়ে করছেন?···

মমতা। (সভয়ে) আরে না, না। তা কেন। তবে তার জানা খুব বড়লোক একটি ভাল পাত্র···

সেবা। (সহসা অসন্তুষ্ট ভাবে) যথেষ্ট হয়েছে। তোমাদের অনেক ধন্যবাদ। দয়া করে আমার জন্যে কাউকে কিছু করতে হবে না। আমি কারুর দয়ার পাত্র হতে পারব না।—(উচ্ছ্বাসের সঙ্গে) আমি সবার চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়িয়েছি! কেউ আমাকে দেখতে পারে না। আমাকে অপমান করতে পারলেই সবার আনন্দ। কেন, কেন, কেন? আমি কি অপরাধ করেছি···(দুই হাতে চোখ ঢাকিয়া ক্রন্দন)

মমতা। (স্তম্ভিত হইয়া) ও কি হ'ল। কে তোকে অপমান করেছে? কে তোকে চায় না?—(কাছে অগ্রসর)

সেবা। যাও তোমরা। সরে যাও। সরে যাও। কাউকে আমি চাই না। আমার যে দিকে দু'চোখ যায়, আমি চলে যাব···

[চোখ আবৃত করিয়া ভিতরের দিকে দ্রুত প্রস্থান]

মমতা। (অনুসরণ করিয়া) কি পাগলা মেয়ে! কখন কি মর্জ্জি হবে, তার কিছু ঠিক নেই···

[পট পতন]

—

তৃতীয় অঙ্ক

২য় দৃশ্য

[প্রথম দৃশ্যের বনান্তর। সত্য সহ সেবার প্রবেশ। সেবার হাতে একটি স্টীলের হ্যাভারস্যাক্।]

সত্য। এ কোথায় এলাম, সেবা?···

সেবা। দেখতেই ত পাচ্ছ, এটা একটা জঙ্গল। কলকাতার ইডেন গার্ডেন নয়, লেকের ধার নয়···

সত্য। তা ত দেখছি। কিন্তু এখানে কেন? আমি ভেবেছি, কোনও নতুন কোলিয়ারিতে ষ্ট্রাইক সুরু হয়েছে, তাই অত ভোরে উঠে···

সেবা। এক কোলিয়ারীতেই যা চমৎকার ষ্ট্রাইক চালিয়েছে, আবার আর একটা? যেন পরের দিনই আবার নাকাল না হলে চলছে না।···আমি বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছি···

সত্য। (সবিস্ময়ে) পালিয়ে এসেছ! সে কি! কেন?—

সেবা। পালিয়ে না এসে উপায় ছিল না। সে অনেক কথা। সে তুমি বুঝবে না···

সত্য। তা না হয় বুঝব না। কিন্তু এখানে কেন? পালিয়ে ত দিব্যি কলকাতায় চলে যাওয়া যেত···

সেবা। তা বৈ কি! সকাল আটটার আগে কোনও ট্রেন নেই, সে খেয়াল আছে? দিদি তার অনেক আগেই আমার চিঠিটা পেয়ে যেত। আর ছুটে যেত সবার আগে ষ্টেশনে।··· এতক্ষণে হয় ত কাছাকাছির প্রত্যেকটা ষ্টেশনে খোঁজ হয়ে গেছে। তাদের এখন লোকের অভাব কি···

সত্য। তা ত হ'ল, কিন্তু এখানে থাকবে কোথায়?

সেবা। (প্রায় ধমকাইয়া) থাকব তোমাকে কে বললে। অবিবাদিত কোনও ষ্টেশনে হাজির হয়ে ট্রেনে চেপে বসব। তা বলে এখুনি পারা যাবে না। সব ওৎ পেতে আছে···

সত্য। কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার তো ব্যবস্থা করতে হবে···

সেবা। উঃ, কি খাই-খাই তোমরা ব্যাটাছেলেরা। সকাল হতে না হতেই খাবারের ভাবনায় দিশেহারা হয়ে পড়েছ! তা যাও না, আশেপাশের কোনও গাঁয়ে গিয়ে খাবার জোগাড় করে আন না, কে মানা করছে···

সত্য। তাই করতে হবে। এখানকার গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডটাকে ঠিক কলেজ ষ্ট্রীট বা ধর্ম্মতলার মত দোকানবহুল মনে হচ্ছে না···

সেবা। আশ্চর্য্য আবিষ্কার তো! (ব্যাগ হইতে টাকা বাহির) এই নাও। এ দিয়ে যা হয় কিছু জোগাড় করে আন। সন্ধ্যার আগে যখন বেরোনো যাবে না, তখন ব্যবস্থা একটা করতেই হবে···

সত্য। (সোদ্বেগে) যাব ত, কিন্তু তুমি এখানে একলা থাকতে পারবে? কাছাকাছি কোনই···

সেবা। (রুষ্ট কণ্ঠে) দেখ, সত্যদা, এসব মধ্যযুগীয় শিভালরি ছেড়ে দাও ত। একলা থাকতে পারবে! যেন জুজুর ভয়ে আমি মূর্চ্ছা যাব···

সত্য। (সাতঙ্কে) আরে না, না। আমি তা বলছি না। তবে শত হোক অজানা-অচেনা জায়গা, এখানে···

সেবা। আজ্ঞে না, এটা মোটেই আমার অজানা-অচেনা জায়গা নয়।···নিশ্চিন্ত মনে যেতে পার।···জল আমার থলেতেই আছে, আগে থাকতে ঠিক থাকলে খাবারও সঙ্গে আনতে পারতাম···

সত্য। (স্মিতমুখে) তাও ঠিক ছিল না। ঐ তো তোমার দোষ। সবকিছুই ঝোঁকের মাথায় করবে।···ইদিকে তোমার দিদি হয়ত ভাবনার চিন্তায়···

সেবা। যথেষ্ট হয়েছে।···দিদির ভাবনার জন্য আর তোমাকে ভেবে মরতে হবে না।··· সবাই কেবল আমার সঙ্গে শত্রুতা করবে। ইনি, উনি, সবাই। কেন, কেন শুনি। যেন আমি তৈজস-পত্রের মত অচেতন পদার্থ। যার যা পছন্দ, আমার সম্বন্ধে তাই করতে পারে। দয়া দেখাতে পারে, সেন্টিমেন্টে আঘাত করতে পারে। এ আমি কিছুতেই সহ্য করব না···যাও তো, আর আমাকে বকিও না। একটা দেশলাই জোগাড় করে আনতে পারলে চা-ও খাওয়াতে পারব।···তুমি তো আবার সিগ্রেট খাও

না। প্রভাত-দাকে আনলে ঢের সুবিধে হ'ত···অন্ততঃ খাওয়ার মত কিছু তো আন···

সত্য। এখন তাও জোগাড় হয় কি না, তাই তো ভাবনা···

সেবা। হবে না তো হবে না। একটা দিন না খেলে শুকিয়ে মরবে না! যে দেশের অধিকাংশ মানুষকে অর্দ্ধেক দিনই উপোস করে কাটাতে হয়, সে দেশের···

সত্য। আচ্ছা, আচ্ছা, আমি যাচ্ছি···

[সভয়ে প্রস্থান।]

সেবা। (কাঁধ হইতে হাভারস্যাক খুলিয়া) নিশ্চিন্দি!··· এতক্ষণে দিদি হেঁ হেঁ করে তার বড়মানুষ অতিথিকে তোয়াজ করছেন! যত সব আদিখ্যেতা! দু'চক্ষে দেখতে পারি নে!··· কেন, কি দরকার ছিল তাকে রাতে থেকে যেতে বলবার! উপকার করে তিনি উল্টে দেবেন! অত হাসি আমার দু'চক্ষের বিষ··· ঢোক করে দেবেন! একেবারে দয়ার অবতার!···পালিয়েছি, ঠিকই করেছি!···ভোরে উঠে আবার বড়লোকের মুখ দেখতে হলে আমার মেজাজ বিগড়ে যেত···

[হাভারস্যাক হইতে সে জলের বোতল, চায়ের কেটলি, কাপ প্রভৃতি একে একে বাহির করিয়া মাটিতে রাখিল। অবশেষে একটা বই বাহির করিয়া হাতে লইয়া অদূরবর্ত্তী একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া বসিল। বইয়ের এ-পাতা ও-পাতা উল্টাইয়া একটা কবিতা বাছিয়া ক্রমে সে উচ্চৈঃস্বরে কবিতা পাঠ সুরু করিল। কবিতার বিষয়বস্তু স্বাধীনতাদ্যোতক।

এই কবিতা-পাঠের মধ্যেই পা টিপিয়া সকৌতুক মুখে প্রদোষের প্রবেশ ও কিছুক্ষণ কবিতা পাঠ শ্রবণ। কবিতা পড়া শেষ হইলে সে হাততালি দিয়া উঠিল।]

প্রদোষ। (হাততালি দিয়া) এই যে, এখানে বসে কবিতা পড়ছেন। অথচ দেখুন তো কাণ্ড···

সেবা। (চমকাইয়া চাহিয়া) এখানে কি করে এলেন?

[উঠিয়া দাঁড়াইল]

প্রদোষ। তা আর এমন কি কঠিন। আমার একটা চাটিস গাড়ি আছে, জানেনই তো; ঘণ্টায় ষাট মাইল হিসেবে···

সেবা। (অসন্তুষ্টস্বরে) বেশী বাজে বকবেন না। এখানটায় আছি, কি করে সন্ধান পেলেন?

প্রদোষ। তাতেও কিছু অসুবিধে হয়নি। ছেলেবেলা থেকেই ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়ে আসছি, 'ক্লু' পেতে মোটেই দেরি হয় না। অন্যেরা এতক্ষণে ষ্টেশন, থানা, পোষ্টাপিস করছে, কিন্তু আমার সিদ্ধান্তই নির্ভুল···

সেবা। সিদ্ধান্ত অখণ্ডিত। প্রভাত-দার কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে এসে বড় বাহাদুরি করা হচ্ছে। এ পথ দিয়ে কলকাতায় পালাচ্ছিলেন; খেয়াল হ'ল, নেমে পড়ে একটু কালতো ভদ্রতা করে গেলেন। সেই সোয়া শ' ট্রাকার শোকেই নেমে পড়েন নি, তাই বা কে বলবে!···আসুক প্রভাত-দা, যাকে তাকে খবর খয়রাত করাটা দেখাচ্ছি।···যান, সরে পড়ুন। আমি একটু একলা থাকতে চাই···

প্রদোষ। মাত্র এর জন্য শেষরাত্রে বাড়ী থেকে পালিয়ে আসবার কিছুই দরকার ছিল না। চা খেয়ে, ধীরেসুস্থে চলে আসতে পারতেন। কলকাতায় ফেরবার পথে আমিই আপনাকে নিঃসঙ্গতা উপভোগের জন্য এখানটায় নামিয়ে দিয়ে যেতে পারতাম। স্বেচ্ছায় বনবাস···

সেবা। হাঁ। স্বেচ্ছায়ই বনবাস। (সাভিমানে) যাকে কেউ দেখতে পারে না, তাকে বনবাসেই আসতে হয়। তার মরে গেলেও কোনও ক্ষতি নেই।···কেন, কি করেছি আমি আপনাদের, এমন করে আমার পেছনে লেগেছেন কেন! আপনাদের চক্রান্তের ফলে মজুরেরা আমাকে চায় না, আমার বাড়ীর লোকেরা আমাকে চায় না, আমার···

প্রদোষ। বাড়ীর লোকেরাও চায় না! সে কি? কেন?···

সেবা। (অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে) হাঁ, চায় না। চায় না। এক শ' বার চায় না। আমি বলছি চায় না।···আর আপনি নিজেই তার সলা দিয়ে এসেছেন; কি সব মাথামুণ্ডু বলে এসেছেন। বলে এখন ওঁর সাধু সেজে বসেছেন। একেবারে দয়ার সাগর!··· চায় না মানে চায় না, বাড়ী থেকে তাড়াতাড়ি বিদেয় করতে চায়

প্রদোষ। (স্মিতহাস্যে) ভারি মন্দলোক তো! তা বিদেয় করুক না। আপনাকে খুবই চায়, এমন লোক পলকে এসে হাজির হবে···

সেবা। (সরোষে) কে, আপনার সেই বন্ধুটি নয় ত, দিদিকে ইনিয়ে বিনিয়ে যার কথা···

প্রদোষ। হাঁ, সেই বটে। কিন্তু দিদিকে যথেষ্ট ইনিয়ে বিনিয়ে বলা হয়নি, কারণ সেই লোকটি স্বয়ং প্রদোষকুমার গুপ্ত···(কাছে অগ্রসর)

সেবা। (সরিয়া গিয়া) ভেবেছেন, আপনি মস্ত বড়লোক 'হুঁ' বলে ডাকলেই ছুটে যাব···

প্রদোষ। শুধু তা ভাবি নি তা নয়, ভেবেছি এত বড় মারাত্মক কীর্তি নিয়ে আমার কি কোনই আশা আছে। ভয়ে দিদির কাছে নাম প্রকাশ করতে পর্য্যন্ত সাহস পাই নি। স্বর্ণগন্ধভের ছদ্মনাম ব্যবহার করেছি···

সেবা। যথেষ্ট বিনয় করেছেন!

প্রদোষ। তা হলে রাজী আছ, বলো?

সেবা। মোটেই না। ক্যাপিটালিষ্ট শ্রেণীর সঙ্গে আমাদের আপোষহীন সংগ্রাম চালাতে···

প্রদোষ। (সকৌতুকে) তাতে কিছুই অসুবিধে হবে না। একা আমিই নিজের আচরণে তোমাকে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার যথেষ্ট সুবিধা দেব! এক পক্ষ মুনাফার লোভে মানুষের রক্ত-খাওয়া বাঘের মতো ছুটবে, তবে তো অপর পক্ষ বাঘশিকারের সুযোগ পাবে···

সেবা। (তাচ্ছিল্যভরে) তা বৈ কি। সব সুযোগেরই তখন ইতি হতে পারবে···

প্রদোষ। অন্যান্য যুদ্ধের মতো মত-যুদ্ধেও আমি "ক্লীন্ ফাইট"-এ বিশ্বাসী। যদি পুঁজিবাদের ব্যবস্থা কর্মনৈপুণ্যগুণে জনসাধারণকে পরিতৃপ্ত রাখতে পারে, তবে যতই তাকে ঘুষি মারো না কেন তার আসন অটল থাকবে। আর যদি পুঁজিবাদের লোভ জনসাধারণকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়, তবে সাধারণ লোক ক্রমেই গিয়ে তোমাদের দলে ভিড়বে; কোনও চক্রান্তই তাদের বিভ্রান্ত করতে পারবে না। জনগণেশের স্বার্থই সর্বাগ্রে। তাদের সুখ-সুবিধের হিসেব দিয়েই স্থির হবে সমাজে কোন্ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকবে···

সেবা। জনসাধারণ কোন্ ব্যবস্থা চায়, এখনও কি সে সম্বন্ধে ক্যাপিটালিস্টদের সন্দেহ আছে? ভেতামিরও একটা মাত্রা থাকা উচিত। নইলে মানুষ মেরেই যাদের ভোগ, লোকে তাদের কোন্ চোখে···

প্রদোষ। অমন দৃষ্টি আরও চাঞ্চল্যকর। ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁর নিজস্ব হাতীর মাথায় তুলে এনে তবে ধনী প্রদোষ গুপ্তের সৃষ্টি করেছেন। নইলে আমি তখন চাকরির খোঁজে গলদঘর্ম; জন্মের কথা মনেই উদয় হয় নি, মৃত্যু এড়াবার জন্যই মরীয়া হয়ে উঠেছি। যাদের কাছেই সাহায্যের আশায় গেলাম, সবাই বললেন, উপোস করো, আমাদের কি! তারা কেউ অভাবগ্রস্ত মানুষকে সম্মান করে না, তারা সৌভাগ্যকে সম্মান করে! অগত্যা ভাগ্যদেবী অপার কৌতুকে আমাকে তাদের নাকের কাছে তুলে ধরলেন সোনার পোশাক পরিয়ে। এখন সবাই সসম্ভ্রমে সেলাম করে একস্বরে বলে উঠল, "সাবাস"···তুমি বলো, এর পরেও ধনীজন্মের জন্য লজ্জিত হবো?···

সেবা। (ক্ষণকাল প্রদোষের মুখের দিকে চাহিয়া) এই স্বার্থপর সমাজ আমরা গুঁড়ো করে দেব। শাবল মেরে মেরে ধনতন্ত্রের থামগুলো···

প্রদোষ। তাতে যদি দেশের লক্ষকোটি বেকার প্রদোষ গুপ্তের বেঁচে থাকার নিশ্চিত ব্যবস্থা হয়, তবে নিজের বেকার-জীবনের বিভীষিকার কথা স্মরণ করে বর্তমান আবুহোসেনটি আপত্তি না-ও তো করতে পারে। বরঞ্চ সে হয়তো দিদির বাংলোটার পাশে আর একটা বাংলো তৈরি করে তাঁরই ইস্কুলে একটা চাকরি চেয়ে নেবে···

সেবা। (ভ্যানিটিব্যাগ কাঁধে ঝুলাইতে ঝুলাইতে) থাক, অত চঙসঙের কথা শুনে আমার কাজ নেই। একমাত্র যারা আমাদের দলের, শুধু তারাই আমার আপন। পুঁজিপতিরা আমার শত্রুপক্ষ···

প্রদোষ। বনেদী ক্যাপিটালিস্টদের সমশ্রেণীভুক্ত করে আমাকে বিশেষ সম্মানিত করছ সন্দেহ নেই, কিন্তু ক্যাপিটালের সুবিধে এবং অর্থাভাবের অসুবিধে দুটোই যে চূড়ান্তভাবে জেনেছে, নিজস্ব স্থান সম্বন্ধে সে অতটা স্থিরনিশ্চয় নয়। বরঞ্চ ত্রিশঙ্কুর মত সে উপরতলা আর নীচতলার মধ্যে দোদুল্যমান। যারা তাকে জোর করে টেনে নিতে পারে, তার স্থান তাদেরই মধ্যে।··· আর কিছু না হোক, সেবা, যে তোমাদের শত্রু নয় তাকে তাচ্ছিল্য করে শত্রুপক্ষের দলে ঠেলে দেওয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে?···

সেবা। (বিব্রত ভাবে) আমি এবার যাই···

প্রদোষ। (আগাইয়া আসিয়া) তা হয় না। হীরার খনির সন্ধান পেয়ে ধনিক ছুটে আসে গিরিপ্রান্তর ডিঙিয়ে, সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে। আমাকে অত হাঙ্গামা করতে হয় নি; গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে সামান্য ক'মাইল এগিয়ে আসতে হয়েছে মাত্র। অথচ দেখ তো আমার বরাত! কয়লাতে সন্তুষ্ট ছিলাম, একেবারে হীরে পেয়ে গেলাম! এখন এত সহজেই কি তার স্বত্ব ছেড়ে দিতে পারি?

[সেবা ছুটিয়া পলাইবার চেষ্টা করিল। প্রদোষ চকিতে পথ আটকাইয়া সেবার ডান হাত মুঠো করিয়া ধরিল।]

প্রদোষ। বৃথা চেষ্টা, সেবা। দখল করে বসাই যে ক্যাপিটালিস্টের ধর্ম!

সেবা। [হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়া] হাত ছাড়ুন

[প্রদোষের হস্তত্যাগ]

প্রদোষ। সোয়া শ' টাকা পিস্তল দেখিয়ে লুট করেছিলে, মনে আছে? আমার সেই টাকা আজ লক্ষ কোটি পার্সেণ্ট কম্পাউণ্ড ইণ্টারেস্ট নিয়ে ফিরে এসেছে; এতে আমার পূর্ণ অধিকার! যতই না কেন ছটফট কর, এবার কাণাকড়িও ছাড়ব না। (সেবার চোখে চাহিয়া) কাকে তুমি ঠকাবার চেষ্টা করছ, সেবা? আমি ঝানু ব্যবসাদার। কখন আমার লাভের মরশুম সুরু হয়, তা আমার বুঝতে দেরি হয় না, আমাকে বলে দেওয়ারও দরকার হয় না। প্রথম থেকেই আমার কোনও সন্দেহ ছিল না। যাও বা ছিল, তাও দূর হ'ল যখন শেষরাত্রে বাড়ী থেকে পালাবার আগের মুহূর্তে আমার শোবার কৌচটার উপর ঝুঁকে কয়েকটা দুর্লভ মুহূর্ত তুমি থমকা দাঁড়িয়ে রইলে···

সেবা। [অপ্রতিভ ভাবে] খোঃ, কখখনো না, কখখনো আমি তা করি নি। সদর দরজা খুলে বেরবার আগে আপনি জেগে আছেন কি না মাত্র তাই জেনে নিতে···

প্রদোষ। [সহাস্যে] ভালই করেছিলে। নইলে আমি জেগে উঠে ড্রাইভারকে তোমার পিছু নিতে বলতে পারতাম না। খুঁজে পেতে কত দেরি হয়ে যেত বল ত; গোয়েন্দা-কাহিনী পড়া ব্যর্থ হ'ত! সেবা, তুমি নিশ্চয়ই আমার প্রেমে পড়েছ। নইলে কখনও বিরাগের অত বাড়াবাড়ি করতে না। বল, সত্য কি না? চোখের দিকে তাকাও···

সেবা। আপনি ভয়ানক অভদ্র লোক! আমি কিছু বলব না। বলতে আমি বাধ্য নই। আপনি সরুন। সবকিছু নিয়ে জোর করবেন না। আমাকে ভাবতে দিন। ভাল করে ভাবতে···

প্রদোষ। [সহাস্যে] তার আর সময় নেই। [বাইরে প্রদোষের মোটরের হর্ণ] ঐ শোন, তোমার বাবা আর দিদি এসে পড়েছেন

[উদ্বিগ্নভাবে রায়মশায় ও মমতার প্রবেশ]

বৃদ্ধ। [সপ্রশ্রয় তিরস্কারে] খুকী!

সেবা। [বাবার কাছে গিয়া তাঁর বুকে মুখ রাখিয়া] বাবা!

বৃদ্ধ। এ কি করছিস, মা! আমি যে মরে যাচ্ছি। এমন করে কি বুড়ো বাপকে কষ্ট দিতে হয়!

সেবা। আর করব না, বাবা।

মমতা। তবে এস। বাড়ী চল। প্রদোষ, তুমিও এস। এ বেলাটা থেকে যাও। যা তোমাকে কষ্ট দিয়েছি। শুধু ভাগ্যিস তুমি ছিলে। বাবা ত একেবারে অস্থির। তোমার গাড়ী ফিরে যাবার পর তবেই খানিকটা সুস্থ হলেন। যা হোক, ভালয় ভালয় যে সব মিটে গেল···

[চোখে সিনেমার ডাকাত-সুলভ কালো কাপড়ের চশমা পরিয়া পিস্তল উদ্যত করিয়া প্রভাতের প্রবেশ ও ফাঁকা আওয়াজ।]

প্রভাত। (থিয়েটারি ভঙ্গীতে) হ্যাণ্ডস আপ। টাকা পয়সা যা সঙ্গে আছে, সব বের করে দিন···

[রায়মশায়ের বিপন্ন মুখভঙ্গী। মমতার বিস্ময়। প্রদোষের মুখে সকৌতুক হাসি। সেবার মুখে বিরক্তি।]

সেবা। ছেলেমানুষি রাখ, প্রভাত-দা: দেখছ না, বাবা ভয় পেয়ে গেছেন। কি চাও এখানে?—

প্রভাত। (চশমা খুলিয়া কৃত্রিম গম্ভীর স্বরে) জবাবদিহি চাই, শুদ্ধ বাংলায় যাকে বলা হয় "এক্সপ্লেনেশান"। তুমি "বিট্রে" করেছ; শমিকের স্বার্থ বিট্রে করেছ। বৃক্ষান্তরাল হতে আনুপূর্বিক সকল ঘটনার ওপরই আমি নজর রেখেছি। (সেবার নাসা-কুঞ্চন) তোমার বুর্জোয়া-সুলভ দুর্বলতায় স্তম্ভিত হয়েছি। নিজের কান দুটোকে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়েছে। কাঠিন্যের এমন অভাব বীরাঙ্গনার অযোগ্য।···এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে নিজ হাতে করতে হবে। বদান্যতার বিষাক্ত অস্ত্র-প্রয়োগে যে আমাদের এত উদ্বেগের, এত মেহনতের ট্রাইকটা ভণ্ডুল করতে কিছুমাত্র দ্বিধা করেনি, আমাদের সেই দুষমন, পার্টিয়েদের সেই দুষমনকে (ইঙ্গিতে প্রদোষকে প্রদর্শন) হাতের নাগালের মধ্যে পেয়েছি। পরাজয়ের প্রতিশোধ তোলবার এ সুবর্ণসুযোগ। (সেবাকে পিস্তল প্রদান) এই নাও। ভাল করে শত্রুর ললাট লক্ষ্য কর। পিস্তল ভরা আছে। হাত যেন কম্পিত না হয়। আদেশের অপেক্ষা কর। এক, দুই···

বৃদ্ধ। (সভয়ে) খবরদার, খুকী। খবরদার। কখখনো এ করিস নি, কখখনো নয়—(ছুটিয়া প্রদোষকে আড়াল করিতে গেলেন)

প্রভাত। (সকৌতুক মুখে) বৃথা আপনি আশঙ্কিত হচ্ছেন, রায়মশায়! এমন অহিংস অস্ত্র জগতে অদ্বিতীয়। চিংড়িহাটা থেকে নগদ সাড়ে তিন টাকায় কেনা—একেবারে ফাঁকা আওয়াজ। (মমতাকে) কিন্তু কার্যকারিতায় এর তুলনা নেই, তা তুমি সম্যক্ অবগত আছ, বৎসে। শুধু মোটর 'হোল্ডআপে'র সময় মনোবল নষ্ট হবে আশঙ্কায় এর স্বরূপটি তোমার কাছে আগে উদ্ঘাটন করি নি। যাও বৎসে, অন্য উপহারের অভাবে সম্প্রতি এইটিই তোমাকে যৌতুক দিলাম···

মমতা। (সবিস্ময়ে) যৌতুক!

প্রভাত। হ্যাঁ, দিদি। অত্যুক্তি নয়, ভাষা-প্রয়োগের ত্রুটি নয়, নির্ভেজাল যৌতুক। কিন্তু এ রহস্য ক্রমশঃ প্রকাশ্য। অর্থাৎ, যদি একটা ভোজের ব্যবস্থা করতে পারেন, তবেই প্রকাশ্য ভাবে ব্যাপারটা জানাতে পারি, নচেৎ এই ঠোঁটজোড়া এখন যেমন বন্ধ আছে, অনন্তকাল ধরে তেমনি বন্ধ থাকবে—অতএব বলুন, আপনার ওখানে আরও দু'জন নেমন্তন্নে আসতে পারি কি, দিদি?···

মমতা। (সহাস্যে) নিশ্চয়ই পার। দুপুরে আমার বাড়ীতে, আর সন্ধ্যায় আমার স্কুলের প্রাইজে তোমাদের সকলের নেমন্তন্ন কিন্তু দু'জনের আর একজন কোথায়?···

প্রভাত। সে ঠিকই আছে। সত্যকে বাইরে পাহারায় দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি। ক্যাপিটালিজম ঘায়েল হয়েছে খবর পেলে সে-ও এসে বিজয়োল্লাসে যোগদান করবে। সুতরাং ডাক দেওয়া যাক—(সচীৎকারে) জয়, লাল ঝাণ্ডার জয়। বন্দেমাতরম্ ইনকিলাব জিন্দাবাদ। জয় হিন্দ···(বিস্মিতমুখে সত্যের প্রবেশ)

[সেবা কৌতুকচ্ছলে প্রভাতের দিকে পিস্তল তাক করিয়া ফাঁকা আওয়াজ করিল]

যবনিকা

কালিদাস-সাহিত্যে বিমান-ভ্রমণ

শ্রীরঘুনাথ মল্লিক

মহাকবি কালিদাসের একাধিক কাব্যনাটকে বিমান ও বিমাণ-ভ্রমণের নানা বিবরণ পাওয়া যায়। একথা শুনিয়া পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে হয়ত অনেকেই কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, 'তখনকার দিনে বিমান ছিল না কি ?' তখনকার দিনে সত্যই বিমান ছিল কি ছিল না, সে উত্তর মহাকবির বর্ণনাগুলি পড়িয়া তাঁহারা নিজেরাই দিন, আমি কেবল লেখাগুলি এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তবে তখনকার দিনে বিমান থাকুক বা নাই থাকুক একথা সত্য যে, 'রঘুবংশ' মহাকাব্যের ত্রয়োদশ সর্গে রাম যখন রাবণ বধ করিয়া সীতাকে লইয়া স্বর্ণপুরী লঙ্কা হইতে 'পুষ্পক' নামক বিমানে বসিয়া মহাসমুদ্রের উপর দিয়া অযোধ্যায় আসিতেছিলেন, তখনকার সমুদ্র ও পথের বাস্তবচিত্র মহাকবি শ্লোকের পর শ্লোকে যেরূপ নিখুঁতভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা যে-কোনও লোক পড়িয়া বিস্মিত হইয়া ভাবিবেন, এ যেন সেই দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বের নয়, এই বিংশ-শতাব্দীরই কোনও অতি-আধুনিক কবি স্বয়ং 'উড়োজাহাজে' বসিয়া লঙ্কা হইতে অযোধ্যা অবধি আসিয়া নিজের বিমান-ভ্রমণের বাস্তব বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। মহাকবি কালিদাসের যে কি অপূর্ব্ব কল্পনাশক্তি ছিল, কি প্রতিভাবান পুরুষ ছিলেন তিনি, তাহা এই বিমান-ভ্রমণের বিবরণ হইতেও বুঝিতে পারা যায়।

প্রথমে তাঁহার 'বিক্রমোর্ব্বশী' নামক নাটক হইতে বিমানের কি বিবরণ পাওয়া যায় দেখাইব।

দুইটি অপ্সরা—উর্ব্বশী ও চিত্রলেখা এক দিন যখন যক্ষপতির প্রাসাদে নৃত্যগীত সারিয়া স্বগৃহে ফিরিয়া আসিতেছিলেন, তখন পথে কেশী নামক এক দানব জোর করিয়া তাঁহাদিগকে ধরিয়া লইয়া পলায়ন করে। সেই সময় প্রতিষ্ঠানপুরের তরুণ রাজা পুরূরবা হিমালয়ের প্রসিদ্ধ সূর্য্য-মন্দিরে উপাসনা করিয়া ফিরিতেছিলেন, অপ্সরাদের করুণ আর্ত্তনাদ শুনিয়া সেই দিকে গিয়া দৈত্যের হস্ত হইতে তাঁহাদের উদ্ধারসাধন করেন। তার পর যখন তাঁহারা আবার স্বর্গে যাইবার জন্য মহারাজের নিকট হইতে বিদায় লইলেন তখন তাঁহারা উঠিলেন গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথের 'আকাশযানে'। ইংরেজীতে যাহাকে বলে 'stage direction', নাটকে মহাকবি তাহারই নির্দ্দেশ দিতে গিয়া বলিতেছেন, 'ইতি সর্ব্বাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ আকাশযানং রূপয়ন্তি'—অর্থাৎ, এবার সকলে (অপ্সরারা) গন্ধর্ব্বগণের সহিত 'আকাশযানে' আরোহণ করার অভিনয় করিলেন।

দ্বিতীয় অঙ্কে দেখা যায়, স্বর্গে ফিরিয়া গিয়াও উর্ব্বশী স্থির থাকিতে পারিলেন না। প্রথম দর্শনেই তিনি পুরূরবাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিলেন, আর একবার তাঁহাকে দেখিবার জন্য হৃদয় তাঁহার অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল, তাই এক দিন তিনি সখী চিত্রলেখাকে লইয়া পুরূরবাকে দেখিবার জন্য পৃথিবীতে নামিয়া আসিতেছিলেন। কিভাবে আসিতেছিলেন ? মহাকবি এখানেও 'stage direction' দিয়াছেন—"ততঃ প্রবিশতি আকাশযানেন উর্ব্বশী চিত্রলেখা চ"—অর্থাৎ, এর পর 'আকাশযানে' বসিয়া উর্ব্বশী ও চিত্রলেখা (রঙ্গমঞ্চে) প্রবেশ করিলেন। সুতরাং এই stage direction হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহারা আকাশযানে বসিয়া স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে আসিতেছিলেন, এবং পরবর্ত্তী কথোপকথন হইতে জানা যায় যে, উর্ব্বশী তাঁহার নিজস্ব আকাশযানখানি স্বহস্তে চালনা করিয়া আসিতেছিলেন, কারণ চিত্রলেখা বলিতেছেন, "সখি উর্ব্বশী, কোথায় নিয়ে চলেছিস্, কেনই বা যাচ্ছিস্ ?" অর্থাৎ, পরিচিত সব স্থান ছাড়িয়া অপরিচিত পথে কোথায় যে উর্ব্বশী তাঁহাকে লইয়া যাইতেছে তাহা তিনি অনুমান করিতে পারিতেছিলেন না ; উর্ব্বশী কোথায় যাইতেছেন, আর কেনই বা যাইতেছেন বলিতে প্রথমটা লজ্জা হইতেছিল, তবু প্রিয়সখীকে মনের গোপন কথাটি না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না। তারপর তিনি চিত্রলেখাকে বলিতেছেন, "পথটা চিনিয়ে দিও প্রিয়সখি, যেন কোনও বিঘ্ন না ঘটে।" একথা বলার অর্থ এই যে, উর্ব্বশী কেবল হৃদয়ের উৎকণ্ঠা রোধ করিতে না পারিয়া পৃথিবীতে আসিতেছিলেন, অথচ পৃথিবীতে যাতায়াতের পথ তাঁহার ভাল জানা ছিল না—পাছে আবার কোনও দৈত্যদানবের হাতে পড়িতে হয়, তাই সখীর সাহায্য চাহিতেছিলেন।

দুই জনে চলিতেছেন, তারপর উপর হইতে যখন প্রতিষ্ঠানপুরের রাজপ্রাসাদ তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইল, তখন চিত্রলেখা উর্ব্বশীকে বলিতেছেন, "সখি, দেখ দেখ, ওই প্রতিষ্ঠানপুরের শিখালঙ্কারস্বরূপ রাজর্ষির প্রাসাদে উপস্থিত হইয়াছি।"

প্রাসাদ-সংলগ্ন প্রমোদবন দেখিয়া চিত্রলেখা বলিলেন, "দেবরাজের নন্দন-কাননের মত এই প্রমোদবনের একপাশে অবতরণ করা যায়।" stage direction—'উভে অবতরতঃ' —অর্থাৎ, দুই জনে আকাশযান হইতে অবতরণ করিলেন।

তৃতীয় অঙ্কেও দেখা যায়, স্বর্গে দেবতাদের সভায় 'লক্ষ্মীস্বয়ম্বর' নাটকের অভিনয় করিতে করিতে লক্ষ্মীবেশ-

ধারিণী উর্ব্বশী একটা মারাত্মক ভুল করিয়া ফেলায়, নাট্যকার ভরত মুনি কর্তৃক অভিশপ্তা হন, এবং যখন কৃপাপরবশ মহেন্দ্রের অনুকম্পায় পৃথিবীতে গিয়া পুরূরবার স্ত্রী হইয়া আসিবার অনুমতি পাইয়া স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে আবার আসিতেছিলেন, তখনও তাঁহারা 'আকাশযানে' বসিয়াই আসিতেছিলেন, কারণ মহাকবি এখানেও 'stage direction' দিয়াছেন, "ততঃ প্রবিশতি আকাশযানেন কৃতাভিশরণবেশা উর্ব্বশী চিত্রলেখা চ।" অর্থাৎ এর পর প্রবেশ করিতেছেন আকাশযানে বসিয়া অভিসারিকাবেশে উর্ব্বশী ও চিত্রলেখা।

তার পর যখন তাঁহারা পুরূরবার 'মণিহর্ম্ম্য' নামক প্রাসাদের উপর আসিয়া পড়িলেন তখন দ্বিতীয় অঙ্কের মত এখানেও 'stage direction' দেওয়া হইয়াছে, 'উভে অবতরতঃ' অর্থাৎ দুই জনে নামিয়া আসিলেন।

'কুমারসম্ভব' কাব্যে 'বিমান' শব্দটির বহুবার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় স্বর্গে দেবতারা ব্রহ্মাকে তারকের অত্যাচারে নিজেদের দুর্দ্দশা বর্ণনার প্রসঙ্গে বলিতেছেন, "বিমানানাং তদাপাতভয়াৎ পথি" ইত্যাদি (কু-২।৪৫)—অর্থাৎ, মহাসুর তারকের ভয়ে বিমান-চলাচল আকাশপথে বন্ধ হইয়া গিয়াছে; (পাছে দেবতাদের বিমান দেখিতে পাইলে সে কোনও বিপর্যয় ঘটাইয়া দেয়)।

ত্রয়োদশ সর্গের নিম্নলিখিত শ্লোকটি তথ্যপূর্ণ:

"অত্রান্তরে পর্ব্বতরাজপুত্র্যা
সমং শিবঃ স্বৈরবিহারহেতোঃ।
নভো বিমানেন বিগাহমানো
মনোঽতিবেগেন জগাম তত্র॥" কু-১১।৪

অর্থাৎ, ইতিমধ্যে পর্ব্বতরাজের কন্যা গৌরীকে সঙ্গে লইয়া শিব ইচ্ছামত আনন্দ-ভ্রমণের নিমিত্ত বিমানে বসিয়া মন অপেক্ষাও দ্রুতগতিতে আকাশপথে যাইতে যাইতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বিমান হইতে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন নীচে পৃথিবীর উপর ভাগীরথীর তীরে শরবনে একটি শিশু রহিয়াছে—মহেশ্বরের মুখ হইতে যখন দেবী পার্ব্বতী শুনিলেন যে শিশুটি তাঁহারই পুত্র, তখন? মহাকবি বলিতেছেন:

"বিমানতোঽবাতরদাত্মজং তং
গ্রহীতুমুৎকণ্ঠিতমানসাভূৎ।" কু—১১।১৬

অর্থাৎ, শিশুটি তাঁহারই পুত্র শুনিয়া তাহাকে লইবার জন্য মনে মনে উৎকণ্ঠিতা হইয়া তিনি বিমান হইতে অবতরণ করিলেন। তারপর?

"কুমারমুৎসঙ্গতলে দধানা
বিমানমত্রংশিমাঙ্গরোহ।" কু-১১।২৭

শিশুটিকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিতে করিতে মহেশ্বরের হাত ধরিয়া দেবী পার্ব্বতী আবার তাঁহাদের অভ্রভেদী বিমানে আরোহণ করিলেন। বিমানে উঠিয়া বসিবার পর কি হইল? মহাকবি বলিতেছেন:

"সংশ্লিষ্যমানঃ শশিখণ্ডধারী
বিমান-বেগেন গৃহঞ্জগাম।" কু-১১।২৯

পার্ব্বতীর নিকট হইতে শিশুটিকে লইয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া চন্দ্রশেখর বিমানে করিয়া দ্রুতগতিতে গৃহে ফিরিয়া গেলেন। গৃহে ফিরিয়া যাইবার পর কি হইল?—

"দিবৌকসাং ব্যোম্নি বিমানসঙ্ঘা
বিমুচ্য পুষ্পপ্রচয়ান্ প্রসক্রঃ।" কু-১১।৩৮

আকাশ হইতে দেবতাদের এক ঝাঁক বিমান তাঁহাদের বাড়ীর উপর পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল।

'কুমারসম্ভবে'র ত্রয়োদশ সর্গে দেবতারা যখন কার্ত্তিককে দেবসেনাপতিপদে বরণ করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া পরিত্যক্ত অমরাবতীতে বহুদিন পরে আবার প্রবেশ করিলেন তখন শ্রীভ্রষ্ট নগরীর দুর্দ্দশা দেখিতে দেখিতে যাইতে যাইতে তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইল:

"নিলূননলীলোপবনামগন্ধ
দঃসঞ্চরীভূতবিমানমার্গাম্॥" কু-১৩।৩৩

শহরের প্রমোদবন, 'নন্দনকানন' বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে, বিমান-চলাচলের পথে চলাও দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে।

চতুর্দ্দশ সর্গেও বিমানের উল্লেখ পাওয়া যায়। দেবসৈন্য যখন অসুররাজ তারকের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সুসজ্জিত হইয়া সুমেরু পর্ব্বতের উপর হইতে অতিবেগে নামিতেছিলেন, তখন—

"বিমানরন্ধ্রপ্রতিনাদমেদুরৈঃ॥" ১৪।৩৯

অর্থাৎ, তাঁহাদের রণবাদ্য এমন উচ্চশব্দে বাজিতেছিল যে, সে শব্দ আকাশে উঠিয়া, যে সমস্ত বিমান সে সময় আকাশপথে চলিতেছিল, তাহাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া এমন ভাবে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল যে, মনে হইতেছিল যেন আকাশই বুঝি স্বয়ং প্রতিধ্বনিচ্ছলে গভীর গর্জ্জন করিয়া উঠিতেছে।

'রঘুবংশে'ও বিমান এবং বিমান-ভ্রমণের অনেক সুন্দর সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। অযোধ্যায় রাজপ্রাসাদের দ্বারে যখন একজন ব্রাহ্মণ তাঁহার অকালমৃত পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া আসিয়া শোক করিতেছিলেন, তখন শ্রীরামচন্দ্র লজ্জিত হইয়া যমপুরে গিয়া যমকে জয় করিয়া ব্রাহ্মণের মৃতপুত্রকে জীবিত করিবার জন্য, 'কৌবের যানকে' অর্থাৎ 'পুষ্পক' বিমানকে স্মরণ করিয়াছিলেন, (রঘু-১৫।৪৫); এবং তারপর দৈববাণীর নির্দ্দেশমত সেই পুষ্পক বিমানে বসিয়া যমপুরে না গিয়া রাজ্যের কোথায় বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিরুদ্ধাচার হইতেছে

দেখিবার জন্য আকাশপথে চারিদিক দেখিতে দেখিতে যাইতেছিলেন, তখন বেগবশতঃ 'পুষ্পকের' পতাকা নিষ্কম্প দেখাইতেছিল (পত্রেণ বেগ নিষ্কম্প কেতুনা—রঘু-১৫।৪৮)

শ্রীরামচন্দ্রের মহাপ্রস্থানের বর্ণনায় মহাকবি বলিতেছেন,

"উপস্থিতবিমানেন তেন ভক্তানুকম্পিনা।
চক্রে ত্রিদিব-নিঃশ্রেণিঃ সরয়ূরনুযায়িনাম্ ॥" রঘু-১৫।১০০

শ্রীরামচন্দ্রকে ধরাধাম হইতে বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইবার জন্য যখন স্বর্গ হইতে বিমান আসিয়া উপস্থিত হইল তখন তিনি ভক্তদিগের প্রতি অনুকম্পাবশতঃ যাহারা তাঁহার সঙ্গে যাইবার ইচ্ছা করিয়াছিল, তাহাদের জন্য সরযূনদীকে স্বর্গে যাইবার সোপান করিয়া দিলেন। (অর্থাৎ, সরযূর জলে প্রাণত্যাগ করিলে স্বর্গে যাইতে পারিবে, এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিলেন)।

'রঘুবংশে'র ষোড়শ সর্গে পুরনারীদের সহিত মহারাজ কুশের সরযূনদীতে জলবিহারের বর্ণনায় মহাকবি বলিতেছেন,

"স নৌ-বিমানাদ্ অবতীর্য্য রেমে।" ১৬।৬৮

অর্থাৎ, মহারাজ কুশ—যিনি এতক্ষণ নৌকায় বসিয়া সরযূনদীর জলে স্নানরতা, প্রাসাদের মহিলাদের জলক্রীড়া দেখিয়া আনন্দ পাইতেছিলেন, এবার নৌকারূপ বিমান হইতে নামিয়া আসিয়া স্বয়ং তাঁহাদের সহিত জলক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। এখানে বিমানের সহিত নৌকাখানির উপমা দিয়া 'রূপক' সমাস করিবার দরুন বুঝিতে হইবে যে, মানুষ যে ভাবে বিমানে বসিয়া আকাশের চারিদিক ভ্রমণ করিয়া আসিবার পর অবতরণ করে, কুশও নৌকায় বসিয়া নদীর জলে সেইভাবে ভ্রমণ করিয়া অবতরণ করিলেন।

দ্বাদশ সর্গের শেষ শ্লোকে শ্রীরামচন্দ্র যখন রাবণবধ করিয়া সীতার অগ্নি-পরীক্ষা দেখিয়া পত্নীকে সঙ্গে লইয়া অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন, তখন তিনি—

"রবিসুতসহিতেন তেনানুযাতঃ সসৌমিত্রিণা।
ভুজবিজিতবিমানরত্নাধিরূঢ়ঃ প্রতস্থে পুরীম্ ॥" রঘু-১২।১০৪

অর্থাৎ, রবিপুত্র সুগ্রীবের সহিত, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া বাহুবলে বিজিত অতি উৎকৃষ্ট বিমানখানিতে আরোহণ করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলেন। তারপর ত্রয়োদশ সর্গে—

"অথাত্মনঃ শব্দগুণং গুণজ্ঞঃ
পদং বিমানেন বিগাহমানঃ। রঘু-১৩।১

তারপর সেই গুণজ্ঞ পুরুষ (শ্রীরামচন্দ্র) বিমানে বসিয়া আকাশপথে চলিলেন। বিমানখানি কিভাবে চলিতে লাগিল ?

"কচিৎ পথা সঞ্চরতে সুরাণাং
কচিদ্ ঘনানাং পততাং কচিচ্চ।
যথাবিধো মে মনসোঽভিলাষঃ
প্রবর্ত্ততে পশ্য তথা বিমানম্ ॥ রঘু-১৩।১৯

অর্থাৎ, রাম বলিতেছিলেন, "দেখ সীতা, কেমন এই বিমানখানি কখনও দেবতাদের পথ বাহিয়া, কখনও-বা মেঘেদের, কখনও-বা পক্ষীদের চলিবার পথ দিয়া উড়িয়া চলিয়াছে! আমি যেমনটি ইচ্ছা করিতেছি, ঠিক সেইভাবে আকাশযান চলিতেছে।" অর্থাৎ, কখনও খুব উপর দিয়া, কখনও-বা তদপেক্ষা নিম্ন দিয়া, আবার কখনও-বা আরও নীচু হইয়া বিমান চলিয়াছে।

মহাসমুদ্রের উপর উড়িতে উড়িতে বিমানখানি যখন স্থলের নিকট আসিয়া পড়িল তখন বহু দূর হইতে তটরেখা কিরূপ দেখাইতেছিল? মহাকবি বলিতেছেন:

"তাল ও তমালবনে সমাচ্ছন্ন, লবণাম্বুরাশির নীল সূক্ষ্ম বেলাভূমি দেখাইতেছে যেন রথচক্রের লোহার কালো সরু পাতটি।" (রঘু-১৩।১৫)

তারপর বিমানখানি যখন সমুদ্র অতিক্রম করিয়া শুক্তি-সমাচ্ছাদিত, সুপারি-বৃক্ষে শোভিত তীরের উপর আসিয়া পড়িল, তখন একবার পিছন দিকে দৃষ্টি পড়াতে, রামের মনে হইল,

"এষা বিদূরীভবতঃ সমুদ্রাৎ
সকাননা নিষ্পততীব ভূমিঃ।" রঘু-১৩।১৮

অর্থাৎ, রাম বলিলেন:

"একবার পিছনদিকে ফিরিয়া চাও, মনে হইবে সমুদ্র বুঝি দূরে চলিয়া যাইতেছে, আর পৃথিবীটা তাহার ঘন বনগুলি সঙ্গে লইয়া সমুদ্র হইতে উঠিয়া আসিতেছে।"

পুষ্পক বিমানখানিতে যে 'বাতায়ন' অর্থাৎ জানালা ছিল, মহাকবি তাহাও জানাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, সীতা চারিদিকে এত মেঘ দেখিয়া কৌতূহলী হইয়া বিমানের জানালার মধ্য দিয়া হাত বাড়াইয়া মেঘ ধরিতেছিলেন, আর মধ্যে মধ্যে যখন বিদ্যুৎ চমকাইতেছিল তখন রামের মনে হইতেছিল, যেন মেঘও বুঝি (খুশী হইয়া) সীতার হস্তে তাঁহার দ্বিতীয় আভরণস্বরূপ বিদ্যুতের বালা পরাইয়া দিতেছিল। (রঘু-১৩।২১)

জানালা ছাড়া বিমানখানির উপরতলাতেও যে কয়েকটি ছোট ছোট ঘর ছিল, তাহাও আমরা এই প্রসঙ্গে জানিতে পারি। রামচন্দ্র সীতাদেবীকে বলিতেছেন:

"বিয়দ্গতঃ পুষ্পকচন্দ্রশালাঃ
ক্ষণং প্রতিশ্রুন্মুখরাঃ করোতি ॥" রঘু-১৩।৪০

(নীচে শাতকর্ণি মুনির গীতবাদ্যের ধ্বনি) আকাশে উঠিয়া আসিয়া এই পুষ্পকের 'চন্দ্রশালা'গুলিতে অর্থাৎ উপরকার গৃহগুলিতে (চন্দ্রশালা শিরোগৃহমিতি হলায়ুধঃ) ক্ষণকালের জন্য প্রতিধ্বনিত হইয়া মুখরিত করিয়া দিতেছে।

বিমানখানি উড়িতে উড়িতে যখন সুতীক্ষ্মমুনির

তপোবনের উপর আসিয়া পড়িল, দেখা গেল, মহর্ষি তখন ঊর্দ্ধদিকে মুখ করিয়া একদৃষ্টে সূর্য্যের পানে চাহিয়া তপস্যা করিতেছেন। বিমান আসিয়া আচ্ছন্ন করায় সূর্য্য তাঁহার দৃষ্টির অন্তরাল হইয়া গেল, তারপর বিমান যখন সে স্থান হইতে চলিয়া গেল, তাঁহার দৃষ্টি মুক্ত হইল, আবার তিনি পূর্ব্বের মত সূর্য্যকে দেখিতে লাগিলেন (দৃষ্টিং বিমান-ব্যবধানমুক্তাং'—রঘু-১৩।৪৪)।

তারপর পুষ্পক যখন ক্রমে অযোধ্যার উপকণ্ঠে আসিয়া পড়িল তখন রামের এখানে নামিবার ইচ্ছা যেন বুঝিতে পারিয়াই বিমানের 'অধিদেবতা' জ্যোতিষ্কদের পথ হইতে এবার ভূমির উপর বিমানখানি নামাইলেন, আর যে সব প্রজা ভরতের সঙ্গে রামকে স্বাগত জানাইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা বিস্ময়ে মুগ্ধ হইয়া বিমানের পানে চাহিয়া রহিলেন ('ইচ্ছাং বিমানাধিদেবতয়া বিদিত্বা' ইত্যাদি —রঘু-১৩।৬৮)।

বিমান যখন ভূমির উপর নামিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল তখন রামচন্দ্র সুগ্রীবের হাত ধরিয়া বিভীষণ পথ দেখাইয়া দিলে, স্ফটিক-রচিত সিঁড়ি বাহিয়া বিমান হইতে ভূমির উপর নামিয়া আসিলেন (রঘু-১৩।৬৯)।

নামিয়া আসিয়া প্রথমে গুরুদেব বশিষ্ঠকে প্রণাম করিয়া ভরত, শত্রুঘ্ন, বৃদ্ধ মন্ত্রী প্রভৃতি সমাগত বহু লোকের সহিত অভিবাদন আদান-প্রদান করিলেন। তারপর মহাকবির ভাষায়:

"ভূয়স্ততো রঘুপতির্বিলসৎপতাক-
মধ্যাস্ত কামগতি সাবরজো বিমানম্।" (রঘু-১৩।৭৬)

শ্রীরামচন্দ্র ভ্রাতাদের সঙ্গে লইয়া আবার সেই পতাকা-শোভিত, ইচ্ছানুসারে গতিশীল বিমানে আরোহণ করিলেন। বিমানের মধ্যে উঠিয়া গিয়া ভরত সীতাদেবীর নিকটে গিয়া তাঁহার চরণে মস্তক স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। ভরতের যে পবিত্র জটাজাল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মত অযোধ্যার রাজ-সিংহাসন উপেক্ষা করিয়াছিল, তাহা যখন সীতার পদযুগলে,—যে পবিত্র চরণযুগল লঙ্কেশ্বরের সকল প্রলোভন তুচ্ছ করিতে পারিয়াছিল, স্পৃষ্ট হইল তখন মনে হইল যেন উভয়ের স্পর্শে উভয়ের পবিত্রতা আরও বৃদ্ধি পাইল (রঘু-১৩।৭৮)। তারপর?

"ক্রোশার্দ্ধং প্রকৃতিপুরঃসরেণ গত্বা
কাকুৎস্থঃ স্তিমিতজবেন পুষ্পকেণ।
শত্রুঘ্নপ্রতিবিহিতোপকার্য্যমার্য্যঃ
সাকেতোপবনমুদারমধ্যুবাস।" রঘু-১৩।৭৯

অর্থাৎ, শত্রুঘ্ন তাঁহাদের বাসের জন্য অযোধ্যার যে সুবিস্তৃত উপবনে পটভবন সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, সে উপবনটি এ স্থান হইতে অর্দ্ধক্রোশ দূরে, তাঁহারা এবার পুষ্পকের গতিবেগ মন্দীভূত করিয়া (ধীরে ধীরে) প্রজাদের সঙ্গে সঙ্গে এই অর্দ্ধক্রোশ পথ চলিয়া উপবনে উপস্থিত হইলেন।

রূপসী ঘাটশিলা

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

এ মাঠে যবে বৃষ্টি-বারি ঝরে:
আকাশ জুড়ে ঘোরে কালো মেঘ
শালের বনে তখন অভিষেক।
টিনের চাল ককিয়ে ওঠে ঝড়ে,
পাতায় ঘরে তোমায় মনে পড়ে।

রাতের চোখে আজকে ঘুম নেই
বিষের জ্বালায় বেপথু-বিগ্রহ,
মরণ নয়—কঠিন বিদ্রোহ
তোমাতে তারা বাত্রা হারাবেই।
পেয়েছি আজ তারই যে তাই খেই।

ধূসর হয়ে ওঠে দূরের টিলা।
ভেঙে পড়ে বড় নদীর তীর।
ঢেউয়ে উধাও চিকুর মানিনীর···
নিঝুম দিন বিরামহীন লীলা—
লুটায়ে তোলে রূপসী ঘাটশিলা।

স্বপ্ন ও সমাধি

শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য

কচি কচি হাত দুটি দিয়ে মায়ের গলাটা জড়িয়ে ধরে মৃদুলা তার মাকে জিজ্ঞাসা করে—হ্যাঁ মা, বাবা কবে আসবে ?

অবোধ শিশুর আগ্রহভরা মুখের পানে তাকিয়ে মৃদুলার মাও আর স্থির থাকতে পারে না। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে কতকটা যেন আত্মগত ভাবে বলে—আসবে মা আসবে, তুমি বড় হও, ভাল করে লেখাপড়া শেখ, তোমার বিয়ে হোক তারপর তোমার বাবা তোমার কোলেই ফিরে আসবেন।

ছ'বছরের অবোধ শিশু, মায়ের কথাটার নিগূঢ় অর্থ পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করতে পারা তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। তবে সে পরমোৎসাহে তার 'রেখা ও লেখা' বইখানি নিয়ে শিশুসুলভ উচ্চকণ্ঠে পাঠ মুখস্থ করতে বসে যায়। হয়ত তার ধারণা ভাল করে লেখাপড়া না শিখলে তার বাবা তার কাছে আর ফিরে আসবে না।

পাঁচ-ছয় মাস হয়ে গেলেও মৃদুলার মনে হয় যেন এই সেদিনকার কথা। সে তার পাশের বাড়ীর রাঙাপিসীর কাছে অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। হঠাৎ সমবেত কণ্ঠের চাপা কান্নার সুরে ঘুমটা ভেঙে যেতেই সে দেখে বিছানায় রাঙাপিসী নেই। তক্তাপোশ থেকে আস্তে আস্তে নেমে ঘরের বাইরে এসে দেখে তার বাবাকে উঠোনের তুলসীতলায় শোয়ানো হয়েছে—বাবার বিছানার আশেপাশে অনেকগুলি লোক; মা তার বাবার পায়ের কাছে গুম হয়ে বসে আছে। তাকে ঘিরেও পাড়ার অনেকগুলি মেয়েছেলে।

পা পা করে সে মায়ের কাছটিতে গিয়ে দাঁড়াতেই রাঙাপিসী কোথা থেকে ছুটে এসে তাকে দূরে টেনে নিয়ে গেল।

ব্যাপারটা যে কি হয়েছে কিছুই সে বুঝতে পারলে না। বাবার খুব অসুখ করেছিল তা সে জানে, কিন্তু সন্ধ্যার সময় যখন সে আজ ঘুমোতে যায় তখনও তার বাবাকে সে কথা কইতে দেখেছিল। তাকে ডেকে মাথায় মুখে হাত বুলোতে বুলোতে হাঁপাতে হাঁপাতে বাবা জিজ্ঞাসা করেছিলেন—আমি মরে গেলে তুই আমায় ছেড়ে থাকতে পারবি মৃদু ?

মরে যাওয়া কাকে বলে মৃদুলা তা না জানলেও বাবাকে ছেড়ে থাকা যে তার পক্ষে সম্ভব নয় এটা সে বোঝে, তাই সে বাবার প্রশ্নের উত্তরে শুধু বলেছিল—না—না।

বাবা আবার বলেছিলেন—না কি রে, ঐ ওদের অমরের বাবা মরে গেছে, সবলের বাবা মরে গেছে, ওরা ওদের মায়ের কাছে কেমন থাকে।

তার শিশুমন অতশত তলিয়ে বুঝতে শেখে নি, সে শুধু বাবার বুকে মাথাটি রেখে বার বার একটা কথাই বলেছিল—না—না সে থাকতে পারবে না। তখন বাবার গলার ভিতরে ঘড় ঘড় করে কি একটা শব্দ হচ্ছিল। শিয়রে বসে মা তার বাবার বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। তার পর অর্দ্ধেক রাত্রে ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে যেতেই দেখে—এই ব্যাপার।

ক্রমে সে আরও দেখলে—পাড়ার লোকেরা কোথা থেকে বাঁশ কেটে এনে একটা মাচার মত তৈরি করে তার উপর তার বাবাকে শোয়ালে, তার পর মোটা মোটা দড়ি দিয়ে বেশ আঁট করে বেঁধে "বল হরি হরি বোল" বলতে বলতে তাকে কোথায় নিয়ে চলে গেল। কৈ তার বাবা ত একটা কথাও বললে না বা বাড়ীর অপর কেউও ত ওদের বাধা দিলে না। অথচ বাড়ীর সবাই চীৎকার করে কেঁদে উঠল। তার মাও কাঁদতে কাঁদতে উঠোনে আছাড় খেয়ে পড়ল। সবাই কাঁদছিল বলে সেও হাঁউ মাউ করে কেঁদে উঠতেই তার রাঙা পিসী এসে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল—কেঁদো না মৃদু, তোমার বাবার অসুখ করেছে কিনা, তাই তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। ভাল হলেই ফিরে আসবে।...তারপর কতদিন হয়ে গেছে, কিন্তু তার বাবা এখনও ফিরে আসছে না কেন ?

পাঁচ জনে বলাবলি করে তার বাবা নাকি মরে গেছে। সেদিন ওদের ছেনুও ঠিক ঐ কথাই বলছিল। খেলা করতে করতে সবাই যখন যে যার বাবার গল্প করছিল তখন মৃদুলাও বলেছিল—তার বাবা তার জন্তে আপিস থেকে আসবার সময় গুঁজিয়া কিনে আনে।

ছেনু বললে—তোর বাবা ত মরে গেছে ভাই।

উত্তরে সে বলেছিল—তা গেলেই বা, বাবা যখন ভাল হয়ে ফিরে আসবে তখন দেখিস আমার জন্তে ঠিক গুঁজিয়া কিনে আনবে।

ছেনু ওদের সকলের চেয়ে বয়সে বড়। কথাটা শুনে সে খিল খিল করে হেসে উঠে মৃদুলার অজ্ঞতা প্রমাণ করবার জন্তে অন্যান্য সঙ্গীদের সম্বোধন করে মুরুব্বিয়ানা সুরে বলেছিল—মৃদুটা কি বোকা দেখ ভাই, ওর বাবা ত কবে মরে গেছে আর ও বলে কিনা বাবা যখন ভাল হয়ে ফিরে আসবে তখন ওর জন্তে গুঁজিয়া নিয়ে আসবে। মরে গেলে আবার কেউ ফিরে আসে নাকি ?

ছেনুর কথা বেদবাক্য—অন্যান্য মেয়েরা কেউ কতকটা বুঝে, কেউ-বা না বুঝেই সায় দিয়েছিল।

তাদের কথা শুনে মৃদুলা প্রথমটা গুম হয়ে গিয়েছিল, তারপর তার মনে হয়েছিল ছেনু ত ছোটই, রাঙাপিসী কত বড়। রাঙাপিসী বলেছিল, তার বাবা হাসপাতালে গেছে, ভাল হলেই ফিরে আসবে। ধরে নিলাম ছেনুর কথাই সত্যি—বাবা হাসপাতালে গিয়ে মরে গেছে, কিন্তু মরে গেছে বলে কি আর ফিরে আসবে না ? বা রে, রাঙাপিসীর কথা বুঝি মিথ্যে হয় ? ছেনুটা ভারি দুষ্টু। রাঙাপিসী যে এখন এখানে নেই, কলকাতায় পড়তে গেছে, নইলে

রাঙাপিসীকে ডেকে এনে সে এতক্ষণে ছেনুকে কথাটা ভজিয়ে দিত। আচ্ছা, রাঙাপিসী আসুক না, দেখা যাবে তখন।

কিন্তু রাঙাপিসীর আসতে বড় দেরি, তাই সে মাঝে মাঝে মায়ের কাছে গিয়ে অস্থির হয়ে জিজ্ঞাসা করে—তার বাবা কবে আসবে? মা যা উত্তর দেয় তা সম্পূর্ণ বুঝতে না পারলেও তার বাবা যে ফিরে আসবেই এটা সে আন্দাজ কতকটা বুঝে নেয়।

সময় সময় একটা কথা মৃদুলার মনে হয়—আচ্ছা, হাসপাতালটা কোথায়? হাসপাতালে গিয়ে বাবাকে এক দিন দেখে এলে হয় না? যদি বাবা সত্যি সত্যিই মরে গিয়ে থাকে তা হলেও সে গেলেই নিশ্চয়ই বাবা ফিরে আসবে। বাবা তাকে খুব ভালবাসে কিনা।

এক এক সময় বাবার উপর তার খুব রাগও হয়। বাবাকে ছেড়ে সে কখনও থাকে নি, আর এবার তাঁকে নিয়ে যাওয়ার পর কত দিন হয়ে গেল। তার বুঝি মন কেমন করে না? বাবা ত বেশ!

বাড়ীর অনতিদূরে ডাক-বাংলো পার হলেই বড় রাস্তা। মৃদুলার বড় ইচ্ছে হয় সেই রাস্তাটার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে। কত লোক যাওয়া-আসা করে। কারও সঙ্গে কি তার বাবার দেখা হয় না? হাসপাতালটা কত দূরে কে জানে? বড় রাস্তার ওদিকে ঐ যে সাদা লাল হলুদ রঙের বড় বড় বাড়ীগুলো দেখা যায় ওগুলোর একটাও কি হাসপাতাল নয়? তার মা বলেছে সামনের মাঘ মাসে তাকেই ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দেবে, তখন সে এক দিন ঐ দিকে গিয়ে দেখবে যদি হাসপাতালটা খুঁজে বার করতে পারে।

আশ্বিন মাসে পূজোর ছুটিতে রাঙাপিসী দেশে আসে। মৃদুলা দেখে রাঙা পিসীর অনেক পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। আজকাল সে সর্ব্বদাই ফিটফাট থাকে, ঘুরিয়ে কাপড় পরে। কারও বাড়ী যাবার সময় জুতো পরে যায়। কথাবার্ত্তাও কেমন আস্তে আস্তে চিবিয়ে চিবিয়ে বলে। তার ভারিক্কি চাল দেখে তার সঙ্গে বেশী কথা কইতে মৃদুলার আজকাল কেমন ভয় ভয় করে। তবুও সে এক দিন রাঙাপিসীকে জিজ্ঞাসা করে—হ্যাঁ রাঙাপিসী, হাসপাতাল কত দূরে?

—কেন রে মৃদু? রাঙাপিসীর কণ্ঠে বেশ একটা মমতাভরা মিষ্টি সুর।

তবুও উত্তর দিতে মৃদুলার কেমন যেন সঙ্কোচ হয়। সে দেয়াল ধরে চুপটি করে দাঁড়িয়ে নতমুখে হাতের নখ খুঁটতে থাকে। কাছে সরে এসে রাঙাপিসী চিবুকে হাত দিয়ে তার মুখখানা তুলে ধরে বলে—কি রে, উত্তর দিচ্ছিস না যে! বেদনায় মৃদুলার কণ্ঠরোধ হবার উপক্রম হয়, সে কোনরকম করে বলে—বাবার কাছে যাব।

রাঙাপিসীর মুখখানা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে ওঠে। মৃদুলাকে কোলে তুলে নিয়ে মুখে চুমু খেয়ে বলে—বাবার কথা অত ভাবতে নেই মৃদু। তোমার বাবা যেখানে গেছেন সেখানে খুব ভাল আছেন।

—তবে যে ছেনু বলছিল বাবা মরে গেছে, আর ফিরে আসবে না? বলে একটুখানি থেমে মৃদুলা আবার জিজ্ঞাসা করে—হ্যাঁ রাঙাপিসী, কেউ মরে গেলে আর কি সে ফিরে আসে না?

তার মুখের পানে তাকিয়ে একটুখানি চুপ করে থেকে রাঙাপিসী বলে—ছেনুর কথা শুনিস কেন মৃদু, ও ছেলেমানুষ কিনা তাই জানে না, মানুষ মরে যাবার পর তাকে কোথাও নিয়ে গেলেও আবার ফিরে আসে।

মৃদুলার কচি মুখখানা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। পরক্ষণেই আপসোস হয়—ছেনু যে এখানে নেই, মামার বাড়ী গেছে, তা না হলে এখখুনি সে ছেনুকে রাঙাপিসীর কাছে ধরে নিয়ে এসে তার অজ্ঞতা প্রমাণ করে দিত।

রাঙাপিসী আবার জিজ্ঞাসা করে—হ্যাঁ রে মৃদু, বাবার জন্যে তোর খুব মন কেমন করে বুঝি?

মুখ নীচু করে মৃদুলা বলে—হুঁ।

তার মুখে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে সান্ত্বনার সুরে রাঙা-পিসী বলে—না মৃদু, মন কেমন করতে নেই বুঝলে? তা হলে সেখানে তোমার বাবার খুব কষ্ট হবে।

কথাটা মৃদুলা ঠিক বুঝতে পারে না। সে রাঙাপিসীর মুখের দিকে ক্যাল ক্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

রাঙাপিসী তাকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে বলে—চল ত দেখি তুই কি কি বই পড়িস?

আসতে আসতে মৃদুলা বলে—রাঙাপিসী, আমি খুব ভাল করে পড়ি, মা বলেছে ভাল করে লেখাপড়া করলে আমার বাবা ফিরে আসবে, আসবে ত রাঙাপিসী?

তার ব্যাকুল আগ্রহভরা মুখের পানে তাকিয়ে রাঙাপিসী উত্তর দেয়—আসবে বৈকি মৃদু, নিশ্চয়ই আসবে।

রাঙাপিসীর কণ্ঠস্বর হঠাৎ ভারী হয়ে ওঠে।

মৃদুলার মনে আবার আপসোস হয় ছেনু যে এখন এখানে নেই, থাকলে বোধ হয় আজ একচোট হয়ে যেত।

মাঘ মাসের প্রথমেই মৃদুলা স্কুলে ভর্ত্তি হয়। ডাকবাংলো পার হয়ে বড় রাস্তার ওধারেই স্কুল। মৃদুলা একাই স্কুলে যাতায়াত করে। পথ দিয়ে কত লোক যায় আসে, তারই মত কত ছোট ছোট ছেলেমেয়ে বাপের হাত ধরে বেড়াতে যায় হয়। তার বাবাও তাকে নিয়ে রোজ বিকেলে এমনি করে বেড়াতে যেত। কত গল্প করত, কত খেলনা কিনে দিত। ওঃ! কত দিন হয়ে গেল সে বাবাকে দেখে নি, তার মন কেমন করে না বুঝি! রাঙাপিসীর সঙ্গে বাবার কথা কইতে মৃদুলার বড় ভাল লাগে, কিন্তু আজকাল রাঙাপিসী যে বেশীর ভাগ সময়ই এখানে থাকে না। রাঙা-পিসী বলে, লেখাপড়া শিখে সে ডাক্তার হবে। সে শুনেছে ডাক্তারেরা নাকি হাসপাতালেও চাকরি করে। আচ্ছা রাঙাপিসীও যদি হাসপাতালের ডাক্তার হয়? তা হলে বেশ হয়। এক দিন সে রাঙাপিসীর সঙ্গে হাসপাতালে গিয়ে তার বাবাকে ঠিক ধরে নিয়ে আসবে। আচ্ছা তার মা কেন বাবার কথা বলে না? বরং সে লক্ষ্য করেছে বাবার কথা জিজ্ঞাসা করলে তার মার মুখখানা কেমন

শুকিয়ে যায়, চোখ ছল ছল করে ওঠে—অন্য দিকে মুখ ফেরায়। মায়ের মনের ভাবটা কেমন যেন দুর্বোধ্য।

সেদিন মৃদুলার মনটা অকস্মাৎ এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দে ভরপূর হয়ে উঠল। এত দিন ধরে মনে মনে সে যার অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছিল, এক দিন অভাবনীয় রূপে সে বস্তুটি তার কাছে আবিষ্কৃত হয়ে গেল।

সেদিন দুপুরের পর মৃদুলা পাড়ার বড় মেয়েদের সঙ্গে কালীতলায় পুতুল-নাচ দেখতে গিয়েছিল, বিকেলে ফেরার পথে একটা হলদে রঙের লম্বা একতালা বাড়ীর ফটকের মাথায় প্রকাণ্ড একটা সাইনবোর্ড লাল লাল বড় বড় অক্ষরে 'হাসপাতাল' কথাটা কষ্টে-সৃষ্টে বানান করে পড়ে তার মনটা আনন্দে অধীর হয়ে উঠলো। সঙ্গের এক জনকে জিজ্ঞাসা করে সে স্থিরনিশ্চয় হ'ল যে, ঐ যে বাড়ীটাই হাসপাতাল। তার ভারি ইচ্ছে হ'তে লাগল যে একবার তৎক্ষণাৎ ভিতরে যায়, কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে আসছিল বলে সকলে বাড়ী ফেরার জন্যে ব্যগ্র হয়ে ওঠায় সেদিন আর যাওয়া হ'ল না।

পরের দিন বিকেলে।

স্কুলের ছুটির পর বাড়ী না গিয়ে সে পা পা করে হাসপাতালের দিকে এগিয়ে গেল। ফটকটা খোলাই ছিল, প্রবেশ করতে কেউ তাকে বাধা দিলে না। গাড়ী-বারান্দার উপর উঠে সে পা টিপে টিপে প্রত্যেকটি ঘরের দরজার কাছে গিয়ে ভয়ে ভয়ে উঁকি মেরে দেখতে লাগল। এক-একটা ঘরে লোহার খাটে অনেকগুলি করে রোগী শুয়ে আছে। কারও মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, কারও পায়ে, কেউ বা যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে। কিন্তু অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করেও সে তার বাবাকে দেখতে পেলে না।

সে দিশেহারার মত এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল এমন সময় এক জন নার্স তাকে দেখতে পেয়ে তার হাতের বই শ্লেটের দিকে আড়চোখে তাকাতে তাকাতে জিজ্ঞাসা করলে—কি খুকী, তুমি এখানে কাকে খুঁজছ?

থতমত খেয়ে খুব ভয়ে ভয়ে মৃদুলা উত্তর দিলে—আমার বাবাকে।

—তোমার বাবা কি করেন এখানে?

—বাবার অসুখ করেছে।

—ও, বুঝেছি—তোমার বাবা এখানে এসেছেন কে বললে?

অম্লান বদনে বলে দিলে মৃদুলা—রাঙাপিসী।

নার্সের কৌতূহল বেড়ে উঠল। তাকে একটা বেঞ্চে বসিয়ে পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগল। মৃদুলা বললে, তার বাবার খুব অসুখ করেছিল তার পর এক দিন অনেক রাত্রে তার ছোট কাকা ন' কাকা ছেজ্যে বাবা বেলার দাদা সবাই মিলে বাবাকে বাঁশের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে হরিবোল বলতে বলতে নিয়ে চলে এসেছে। রাঙাপিসী বলেছিল—তার বাবার অসুখ করেছে বলে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা নার্সের কাছে পরিষ্কার হয়ে আসে। সে কাদের বাড়ীর মেয়ে, বাড়ীতে আর কে কে আছে একে একে নার্স সব জেনে নিলে, তার পর বললে—খুকু এখানে বড় ডাক্তার নেই কিনা তাই তোমার বাবাকে খুব বড় হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বুঝলে? শিগ্‌গীর তোমার বাবা ভাল হয়ে ঘরে ফিরে যাবেন।

নার্স হয়ত ভাবলে, মিথ্যা যেখানে অবোধ শিশুকে সুখী করে সেখানে নিষ্ঠুর সত্যভাষণের কি প্রয়োজন?

মৃদুলা যেন আজ একেবারে মরীয়া হয়ে উঠেছিল, একটা ঢোঁক গিলে সে জিজ্ঞাসা করলে—বড় হাসপাতালটা কোন্ দিকে?

তার চিবুক ধরে আদর করতে করতে স্নেহের সুরে নার্স বললে—সে যে অনেক দূর খুকী, রেলগাড়ী করে যেতে হয়, অনেক দিন লাগে, সে অ-নে-ক দূর।

তাকে একটু বসিয়ে রেখে নার্স একবার উঠে গিয়ে খানকয়েক বিস্কুট এনে তার হাতে দিয়ে বললে—চল খুকী, তোমায় বাড়ীতে দিয়ে আসি, হাসপাতালে কি একলা আসতে আছে?

নার্সের মুখে সকল কথা শুনে চোখের জল মুছতে মুছতে মৃদুলার মা মৃদুলাকে বললে—হাসপাতালে যেতে আছে মৃদু, পুলিসে ধরবে যে।

মৃদুলা চুপ করে থাকে। তার মনের কথা কেউ যেন বুঝতে চায় না। বাবাকে ছেড়ে সে আর কতদিন থাকতে পারে? তার মন কেমন করে না বুঝি? অবোধ শিশুর অন্তর্বেদনা মৃত্যুর পরপারে গিয়ে পৌঁছায় কি না কে জানে?...

দিনের পর দিন এমনি করেই কাটে।

সেদিন শেষরাত্রে, মৃদুলা অঘোরে ঘুমোচ্ছিল, এমন সময় তার মা তাকে ডেকে তুললে। বিছানার উপর বসে চোখ রগড়াতে রগড়াতে মৃদুলা জিজ্ঞাসা করলে—কি হয়েছে মা?

মা বললে—মুখটা ধুয়ে কিছু খাবার খেয়ে নাও মৃদু।

মৃদুলা দেখে বিছানার পাশে মেঝের ওপর একখানা থালায় খানিকটা ছানা চিনি কিছু ফল কাটা আরও যেন কি সব।

সে একটু বিস্মিত হ'ল, এমন সময় সে ত কোন দিনই খাবার পায় না।

সে জিজ্ঞাসা করলে—এখন খাবার খাব কেন মা?

মা ক্ষণকাল কি ভাবলে, তার পর বললে—আজ তোমার বাবার জন্যে পূজো হবে, তোমাকেও পূজো করতে হবে কি না তাই তোমার আজ ভাত খেতে অনেক দেরি হবে।

কিসের পূজো মৃদুলা তা কিছু বোঝে না তবে বাবার জন্যে যখন পূজো তখন ভাত খেতে অনেক দেরি হলেও তার কোন কষ্টই নেই।

বাড়ীর একপাশে গোয়ালঘরের মেঝেটা গোবর দিয়ে বেশ করে মুছে পূজার আয়োজন করা হয়েছে। আজ মৃদুলার বাবার সপিণ্ডীকরণ। পুরুত মশাই এসেছেন। পুরুতমশাইকে মৃদুলার বড় ভাল লাগে। তিনি প্রায়ই এ বাড়ীতে আসেন। যখনই আসেন মৃদুলাকে কাছে ডেকে কোলে বসিয়ে আদর করেন, কত ভাল ভাল কথা বলেন, মৃদুলা তার কতক বোঝে, কতক বোঝে না।

যথাসময়ে পুরুতমশাই ক্রিয়াকলাপ সুরু করে দিলেন। প্রথমে মৃদুলার মা পিণ্ড দিলে। মৃদুলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল—পুরুতমশায়ের আদেশে মন্ত্র-উচ্চারণ করতে করতে বার বার মায়ের চক্ষু ছল ছল করে উঠছে। মৃদুলা ভাবে মায়ের চোখে জল আসে কেন?

আর একটা কথায় বার বার মৃদুলার মনে কেমন যেন সংশয় দেখা দিতে লাগল। পুরুতমশায় মন্ত্র পড়ার সময় যত বারই তার বাবার নামটা উচ্চারণ করেন, তত বারই নামের আগে প্রেত কথাটা বলেন কেন?

প্রেত কথার অর্থ সে কতকটা বোঝে।

ভূতপ্রেতকে তার খুব ভয় করে।

তারপর মৃদুলাও পিণ্ড দিলে।

পিণ্ডদানের আগে পুরুতমশাই বললেন—তোমার বাবাকে খুব ভাল করে ভেবে দেখ মৃদু, এক মনে খানিকক্ষণ বাবার কথা মনে কর। পুরুতমশায়ের কথামত মৃদুলা যন্ত্রচালিতবৎ কাজ করে যায়।

আবার সেই কথা—প্রেতঃ বিশ্বনাথ দেবশর্ম্মণঃ।

মৃদুলা ভাবে—তার বাবা কি ভূতপ্রেত হয়ে গেছে নাকি?

সব ব্যাপার শেষ হতে অনেক বেলা হয়ে গেল।

তখনও মৃদুলার খাওয়া হয় নি। স্নানের ঘাটের ধারে যেখানে কলাপেটোসুদ্ধ পিণ্ডের ভাতগুলি জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেই খানটায় দাঁড়িয়ে সে জলের দিকে চেয়ে একমনে কি যেন ভাবছিল। এমন সময় বাড়ী যাবার পথে পুরুতমশাই তাকে দেখতে পেয়ে বললেন—মৃদু তুমি এখানে, তোমার মা যে তোমায় চারদিকে খুঁজছেন।

সেকথার কোন উত্তর না দিয়ে একটু থতমত খেয়ে একটা ঢোঁক গিলে মৃদুলা জিজ্ঞাসা করলে—হ্যাঁ পুরুতমশাই, আমার বাবা কোথায়?

প্রশ্ন শুনে পুরুতমশাই থতমত খেয়ে গেলেন। কি উত্তর দেবেন কিছুই ভেবে পাচ্ছিলেন না। মিথ্যা কথা বলা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ।

কিন্তু মৃদুলার যেন আর তর সইছিল না। আবদারের সুরে সে আবার জিজ্ঞাসা করলে—বলুন না পুরুতমশাই, বাবা কোথায়?

হঠাৎ পুরুতমশাইয়ের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল—তোমার বাবা স্বর্গে।

—স্বর্গ কোথায়?

—ওই ওপরে,—বলে পুরুতমশাই আকাশের দিকে আঙুল দেখালেন। তারপর একটু থেমে মৃদুলাকে কোলে টেনে নিয়ে পরম স্নেহে তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন—বাবার কথা যখন তখন ভাবতে নেই মৃদু, তাতে সেখানে তোমার বাবার কষ্ট হবে যে!

রাঙাপিসীও একদিন ঐ ধরণের কথা বলেছিল।

মৃদুলা আবার জিজ্ঞাসা করে—হ্যাঁ পুরুতমশাই, স্বর্গ থেকে কেউ কখনও ফিরে আসে না?

পুরুতমশায়ের চক্ষু সজল হয়ে উঠে। মৃদুলাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আকাশের দিকে তাকিয়ে আর্ত্তকণ্ঠে বলে উঠেন—তুমি এ কি করেছ ভগবান, অবোধ শিশুর সঙ্গে তোমার এ কি নিষ্ঠুর পরিহাস।

পুরুতমশাই মুখে কিছু না বললেও মৃদুলার বুঝতে দেরি হয় না যে 'স্বর্গে গেলে' কেউ কখনও ফিরে আসে না।

তা হলে ছেনুর কথাটাই ঠিক। বাবা আর কখনও ফিরে আসবে না। মা ও রাঙাপিসী তাকে মিথ্যা কথা বলে এত দিন ভুলিয়ে রেখেছে।

সে আর স্থির থাকতে পারলে না। পুরুতমশায়ের কোল থেকে কোনরকমে নেমে সে এক দৌড়ে শোবার ঘরে গিয়ে বিছানায় মুখ গুঁজে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।

এমন সময় মা ঘরে ঢুকে তাকে বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখে বললে—তুই এখানে মৃদু, আর আমি যে তোকে খুঁজে খুঁজে হয়রান, ওমা, তুই কাঁদছিস কেন রে?

মৃদুলা কোন কথা কয় না, বালিশে মুখ ঘষতে ঘষতে সে শুধু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

জোর করে তার মুখখানা তুলে ধরে মা জিজ্ঞাসা করে—কি হয়েছে রে, বল না।

কাঁদতে কাঁদতে মৃদুলা বলে—বাবা আর ফিরে আসবে না, পুরুতমশাই বললেন।

মায়ের চোখেও অজস্র অশ্রু আর বাধা মানতে চায় না।

কম্যুনিষ্ট পুলিশ শাসনের বিরুদ্ধে জার্ম্মান নাগরিকদের বিদ্রোহ দমনার্থ পূর্ব্ব বার্লিনের রাস্তায় সোভিয়েট ট্যাঙ্কসমূহের টহল

ভারতের সহ-রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের নেতৃত্বে ফ্রেডারিক্সবার্গ, (ভার্জিনিয়া) মেরি ওয়াশিংটন কলেজের 'ফ্যাকাল্টি মেম্বর'দের শোভাযাত্রা। ১৯৫৩ সালের ২রা জুন ডঃ রাধাকৃষ্ণণ ঐ কলেজে সমাবর্ত্তন-ভাষণ প্রদান করেন

ফালুত হইতে এভারেস্ট শৃঙ্গের দৃশ্য

পূর্ব্ব বার্লিনে সোভিয়েট-বিরোধী জার্মান নাগরিকগণ কর্ত্তৃক ব্রাণ্ডেনবার্গ গেটের

মাধ্যমিক শিক্ষা-পর্ষৎ

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

।ত ১৪ই জুলাই পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা-পর্ষতের দ্বিবার্ষিক ।ধিবেশনে পর্ষৎ-অধ্যক্ষ শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দ বাৎসরিক কার্য-বিবরণী পেশ করিয়াছিলেন। নাতিবৃহৎ বিবরণীটিতে পর্ষতের বিভিন্ন ার্য এবং নানাক্ষেত্রে অগ্রগতির ইঙ্গিত থাকিলেও ইহার উপসংহার ।র্থতাজনিত ক্ষোভে পূর্ণ। কার্য-বিবরণীটিতে যে সকল তথ্য সন্নি-বেশিত হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্তসার এইরূপ :

প্রথমেই অধ্যক্ষ মহাশয় গত স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে ম্পন্ন হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। এই পরীক্ষায় মোট ২,১৬৫ জন পরীক্ষার্থী যোগদান করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে ১০,২৪৬ ন 'প্রাইভেট' পরীক্ষার্থী ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে মোট ২৭,৬৬২ ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ১৯৫২ সনে স্কুল ফাইনাল রীক্ষার সাফল্যের হার ছিল ৫০·১ এবং ১৯৫৩ সনে উক্ত ৫৩·২ হইয়াছে। অতঃপর তিনি মন্তব্য করিয়াছেন যে, রীক্ষাগৃহে উগ্র অশিষ্ট আচরণ না করিলেও ছাত্রগণ অনেকে অসৎ পায় অবলম্বন করিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, দৈহিক র্যাতনের ভয়ে বহু পরিদর্শক অনেক ক্ষেত্রে স্ব স্ব কর্তব্য সম্পাদন ইতে বিরত থাকেন। প্রাইভেট পরিক্ষার্থীর এইরূপ দ্রুত বৃদ্ধি-াপ্ত সংখ্যা খুবই চিন্তার কারণ বলিয়া অধ্যক্ষ মহাশয় উল্লেখ রন। তিনি অভিভাবকদিগের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন করেন যে, অনেকক্ষেত্রে তাঁহারা আদালতের মিথ্যা নজির প্রদর্শন রাইয়া স্ব স্ব সন্তানদিগের জন্য বেআইনী ভাবে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে পরীক্ষা দিবার অনুমতি-পত্র আদায় করেন। ইহারও প্রতিরোধ হওয়া আবশ্যক।

অধ্যক্ষ মহাশয়ের কার্য-বিবরণী হইতে একথাও জানা যায় যে, আমাদের বিদ্যালয়সমূহে অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাব অনুভব করিয়া—যাহাতে বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ বিশেষ "ট্রেনিং" লাভ করিতে ।ারেন তাহার ব্যবস্থা পর্ষৎ করিয়াছেন। সাহায্য-প্রাপ্ত এবং সাহায্য-অপ্রাপ্ত উভয়বিধ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে অভিজ্ঞতা র্জনের জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়া থাকে। অধ্যক্ষ মহাশয় ঘোষণা করেন যে, প্রায় তিন শত শিক্ষক আলোচ্য বৎসরে "ট্রেনিং" প্রাপ্ত হইতেছেন।

বাংলাদেশের বিদ্যালয়গুলির আসবাবপত্রের স্বল্পতা সর্বজন-। পর্ষতের সামর্থ্য সীমাবদ্ধ বলিয়া বিরাট একটা কিছু য্য উক্ত প্রতিষ্ঠান করিতে পারে না সত্য; কিন্তু এই উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য সাহায্য দিবার ব্যবস্থা আছে। চলতি বৎসরে এই ব্যাপারে দুই লক্ষ আশী হাজার টাকা সাহায্য মঞ্জুর করা হইয়াছে। বিশেষ-ভাবে পল্লী অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলিতে এই সাহায্য প্রদান করা হইয়াছিল। এই কারণে কোনও বিদ্যালয়কেই ৭৫০্ টাকার অধিক মঞ্জুর করা হয় নাই।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে শারীরিক কলাকৌশল প্রদর্শন প্রতিযোগিতায় তিনটি পুরস্কার দেওয়ার যে প্রস্তাব অরবিন্দ-আবির্ভাব কমিটি করিয়াছেন, অধ্যক্ষ মহাশয় সে প্রস্তাবটিকে স্বাগত করেন। পর্ষৎ নিজের তত্ত্বাবধানে এই প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হন নাই। এইবার আবির্ভাব-কমিটিই প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা ছিলেন। পদকপত্রের জন্য পর্ষৎ উক্ত কমিটির হস্তে হাজার টাকা দিয়াছিলেন। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ক্রীকেট প্রভৃতি নানা প্রকার প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলা প্রদর্শন করিয়া থাকে। তিনি একথাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, কর্ম-পরিষদ স্বাস্থ্য-শিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছেন। উহা সরকারের নিকট পেশ করা হইয়াছে।

বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্যও একটি পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে ২০,০০০ টাকার একটি পরীক্ষামূলক পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে।

বিবরণী হইতে আরও জানা যায় যে, ছাত্রদের জলখাবারের ব্যবস্থা করিবার যে পরিকল্পনা আছে, সকল বিদ্যালয়ে তাহার পূর্ণ প্রয়োগ করিতে মোট পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে; পর্ষৎ পঞ্চাশ পঞ্চাশ ভিত্তিতে এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে উৎসুক। এই কারণে মাসিক ছাত্রপিছু এক টাকা করিয়া দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই বৎসরের সংশোধিত বাজেটে ৭২,০০০ টাকা উক্ত উদ্দেশ্যে রাখা হইয়াছে। ১৯৫৩-৫৪ সনের বাজেটে এই বাবদ এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

রাজ্য সরকার কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া কেন্দ্রীয় সরকারের "চিলড্রেন্স থিয়েটার" পরিকল্পনাটি পর্ষৎ একটি বিশেষ সাব-কমিটি দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া তাহার মতামত রাজ্য সরকারের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

আলোচ্য বৎসরে ১৫৪টি বিদ্যালয়কে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় রূপে অনুমোদন দেওয়া হইয়াছিল। ইহার মধ্যে চব্বিশ পরগণায় ৩৬টি, মেদিনীপুর জেলায় ২০টি, এবং কলিকাতায় ২০টি; পশ্চিম দিনাজপুরে ১টি, কুচবিহারে ১টি, মালদহে ৪টি, জলপাইগুড়িতে ৪টি এবং বীরভূমে ৩টি। অনুমোদনের জন্য আবশ্যক সর্তাবলীর উপর প্রথম অনুমোদনের সময় বিশেষ জোর দেওয়া হয় না; কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্তগুলি অবশ্য পালনীয়। ন্যূনতম সর্তগুলি এই: বিদ্যালয়ে অন্ততঃ একজন অভিজ্ঞ (trained) গ্র্যাজুয়েট এবং তিন জন গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক থাকিবেন এবং বিদ্যালয়ের সঞ্চিত অর্থভাণ্ডারে দেড় হাজার টাকা রাখিতেই হইবে।

পর্ষৎ চূড়ান্ত ভাবে "কোড" প্রণয়ন করিয়া গত ১৫ই নবেম্বর

অনুমোদন সাপেক্ষে সরকারের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি সরকার কতকগুলি ধারা সম্পর্কে তাঁহাদের মতামত পাঠাইয়াছেন। মতামতগুলি শীঘ্রই পর্ষৎ কর্ত্তৃক বিবেচিত হইবে। "স্কুল কোড" তৈয়ারী করিবার কালে যে আন্দোলন চলিয়াছিল তাহাতে অধ্যক্ষ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন এবং উক্ত আন্দোলনে ছাত্রগণকে জড়াইবার ব্যাপারটির তিনি তীব্রভাবে নিন্দা করেন। তিনি দুঃখের সহিত ইহাও বলেন যে, কোন কোন ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ এই আন্দোলনে যোগ দিবার জন্য ছাত্রদিগকে উৎসাহিত করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি এরূপ মন্তব্যও করেন যে, বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে সমাজবিরোধী আন্দোলনে যোগদান করিবার জন্য উস্কানি দেওয়া হইতেছে। এই সম্পর্কে তিনি বর্তমান ট্রাম-ভাড়া বৃদ্ধি আন্দোলনের কথা উল্লেখ করেন।

গত ১৭ই জানুয়ারী স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার পাঠ্যতালিকা (curricula) চূড়ান্ত ভাবে গৃহীত হইয়াছে : এই বৎসরের শেষে পর্ষৎ কার্যনির্বাহক সমিতি কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত কয়েকটি বিষয় আলোচনা করিবেন। এই পাঠ্যতালিকার কথা উল্লেখ করিয়া অধ্যক্ষ মহাশয় বলেন যে, যদি পরিকল্পনাটিকে যথাযথভাবে কার্যকরী করিয়া তুলিতে পারা যায় তাহা হইলে আমাদের ছাত্রদের প্রকৃত শিক্ষালাভের পথ সুগম হইবে এবং তাহারা তাহাদের যোগ্যতা এবং ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠ্য বিষয় গ্রহণ করিতে পারিবে। তিনি এই আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন যে, এই পাঠ্যক্রমের প্রবর্তনে যে সকল ছাত্রের যন্ত্রবিদ্যাসংক্রান্ত কাজ-কর্মাদি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ আছে তাহাদের বিশেষ সুবিধা হইবে। বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যতালিকার চূড়ান্ত নির্বাচন হইয়া গিয়াছে। বিভিন্ন সাবকমিটি এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই তালিকা অনুযায়ী সমবায় পদ্ধতিতে "টেক্সট বুক" রচনা করা সমীচীন। কারণ তাঁহারা মনে করেন যে, ইহা কার্যে পরিণত হইলে ছাত্রগণ যথোচিত জ্ঞানলাভের সহায়ক পুস্তকাদি পড়িতে সক্ষম হইবে। ইহার উপর মন্তব্য করিয়া শ্রীযুত চন্দ বলেন যে, তাঁর মতে অভিজ্ঞ পুস্তক-প্রণেতাদের দ্বারা পুস্তক লিখাইয়া তাহা পর্ষৎ কর্ত্তৃক নিযুক্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দিয়া গঠিত কমিটি মারফত পরীক্ষা করিয়া লইলে পুস্তকসমূহ প্রকৃতপক্ষে ছাত্রদের উপযোগী হইতে পারে।

অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁহার দুই বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, আলোচ্য মাধ্যমিক শিক্ষা আইনের বিশেষ পরিবর্তন অপরিহার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি দুঃখের সহিত বলেন যে, পুনর্গঠিত সেনেট সভায় পদাধিকার বলে পর্ষৎ-অধ্যক্ষ ব্যতীত আর কাহারও পর্ষতের প্রতিনিধিত্ব করিবার ব্যবস্থা হয় নাই ; কিন্তু চুয়াল্লিশ জন সদস্য দ্বারা গঠিত মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আট জন প্রতিনিধি আছেন।

অধ্যক্ষ মহাশয়ের উপসংহারটি নানা দিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলিতেছেন, "আমি ক্রত হতাশ হইয়া পড়িতেছি। আমরা নানা সমিতি এবং উপ-সমিতির মধ্য দিয়া বহু সময় ব্যয় করিতেছি, কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষা-সংস্কার ক্ষেত্রে আমাদের সক্রিয় সহায়তা কতটুকু ? আমাদের বিদ্যালয়গুলি পরিচালনাভিলাষী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের যুদ্ধক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

অধিকাংশ সময় একই বিদ্যালয়ের বিভিন্ন দলের বিবাদ ইত্যাদির ফিরিস্তি শুনিতেই ব্যয়িত হয় একথা উল্লেখ করিয়া চন্দ মহাশয় বলেন যে, অতীতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য যেমন সাধারণের সহানুভূতি এবং আর্থিক সাহায্য পাওয়া যাইত বর্তমানে তাহা খুবই হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। সম্প্রতি নূতন বিদ্যালয়গুলিকে প্রধানতঃ ছাত্রছাত্রীদের বেতন এবং পর্ষৎ কর্ত্তৃক প্রদত্ত আর্থিক সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে হয়।

অধ্যক্ষ মহাশয়ের বিবরণীতে এ কথার স্বীকৃতি আছে যে, আমাদের বিদ্যালয়গুলির দুরবস্থার প্রতিকারের দিক দিয়া পর্ষৎ বিশেষ কিছু করিতে সক্ষম হয় নাই। কিন্তু তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, এই দোষ কেবল পর্ষতেরই নয়। তিনি এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভা এবং শাসকগোষ্ঠীকে তাঁহাদের দায়িত্ব স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন : পঃ বঙ্গের আর্থিক বুনিয়াদ যে দৃঢ় নহে সে কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, এই রাজ্যে অন্যান্য অনেক বিষয়ের আশু সংস্কার এবং উন্নতি বিধানের প্রয়োজন আছে। কিন্তু তাঁহার মত এই যে, তন্মধ্যে শিক্ষার উন্নতি এবং সংস্কারকে অগ্রাধিকার দেওয়া কর্ত্তব্য।

মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কীয় বিধান অনুসারে দুই বৎসরের মধ্যে বিদ্যালয়গুলির সংস্কারমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবার দায়িত্ব পর্ষৎকে দেওয়া হইয়াছিল। পর্ষৎ একটি উন্নয়ন সমিতি গঠন করিয়াছিলেন এবং উহা দ্বারা কিছু প্রাথমিক কার্য্যও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ পর্যন্ত কোন পরিকল্পনা কর্মে রূপায়িত করা যায় নাই। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, আর্থিক অনটন হেতু পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করা সম্ভব হইয়া উঠিতেছে না। ইহার পর অধ্যক্ষ মহাশয় হতাশার সুরে বলেন, দুই বৎসর পূর্ব্বে বহু আশা লইয়া আমি এই গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলাম, কিন্তু দুই বৎসরের অভিজ্ঞতার পর আজ আমি এই কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, আমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে।

উপরোক্ত বার্ষিক বিবরণীর উপসংহারে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষতের অধ্যক্ষ মহাশয়ের যে আক্ষেপ দেখিলাম তাহা কেবলমাত্র তাঁহার একলারই নয়—বর্ত্তমান বাংলার সকল শিক্ষাবিদের আক্ষেপ তাঁহার উক্তিতে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিবরণীটিতে দেখিলাম, পর্ষতের আশা এবং আকাঙ্ক্ষা আছে বহু কিন্তু সেগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করিয়া তুলিবার সামর্থ্য তাঁহার নাই ; আর্থিক অনটনই আজ পর্ষতের বিভিন্ন কর্মধারার পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গতানুগতিক শিক্ষাধারার মধ্যে পর্ষৎ একটি বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন আনয়নে বদ্ধপরিকর। ছাত্রগণের চিত্তকে পড়াশোনার মধ্যে একাগ্র ভাবে নিবিষ্ট করিবার জন্য শিক্ষা-ব্যবস্থাকে নানা ভাবে বৈচিত্র্যময় করিয়া তোলা হইতেছে। কিন্তু রূপার অভাব যেখানে প্রতিপদক্ষেপে

স্বচ্ছন্দ গতিকে ব্যাহত করিতেছে সেখানে রূপের পরিবর্তন কতদূর সাধিত হইবে তাহা বলা কঠিন।

কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষতের দ্বি-বার্ষিক কার্য্যবিবরণী আরও একদিক দিয়াও হতাশার কারণ। মহাত্মা গান্ধী নৈ তালিম বা বুনিয়াদি শিক্ষাকে স্বাধীন ভারতের শিক্ষার আদর্শ হিসাবে গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন এবং বর্ত্তমান সরকারও শিক্ষাক্ষেত্রে মহাত্মার পরিকল্পনাটি সংস্কৃত এবং উন্নততর আকারে প্রয়োগের পক্ষপাতী। কিন্তু বিবরণীটিতে পুঁথিগত বিদ্যার সহিত অর্থকরী বিদ্যা এবং শিল্প শিক্ষার কোনও ইঙ্গিতই পাওয়া গেল না। 'চিলড্রেনস থিয়েটার,' শারীর শিক্ষা ইত্যাদি নানা প্রয়োজনীয় ব্যাপারের উল্লেখ অধ্যক্ষ মহাশয় করিয়াছেন, কিন্তু যে উপায়ে গ্রামের মাটি গ্রামের ছেলেকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে সে সম্পর্কে তিনি নীরব রহিয়াছেন। বাংলা তথা ভারতের সামগ্রিক পরিচয় কলিকাতা প্রভৃতি কতকগুলি নগরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়—তাহার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাইবে দারিদ্র্য-কবলিত অসংখ্য গ্রামে। মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যাহার ফলে দেশের প্রতি ছাত্রদের আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। শিক্ষিত ছাত্রগণের সমবেত প্রচেষ্টাতেই গ্রামসমূহের উন্নতি সাধিত হইতে পারে এবং তাহারই সুদূর প্রসারী ফলস্বরূপ সমগ্র দেশ সমৃদ্ধ হওয়া সম্ভবপর। কিন্তু আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার গলদ তখনই হৃদয়ঙ্গম করি যখন দেখিতে পাই প্রতি বৎসর স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার পর গ্রামের বিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্রবৃন্দ গ্রাম ছাড়িয়া চাকুরীর উমেদারীর জন্য কলিকাতার দিকে ধাওয়া করে, কিংবা দারিদ্র্যবশতঃ উচ্চশিক্ষা লাভে অসমর্থ হয়, অথবা গ্রামে থাকিয়াই বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করে ও গ্রাম্য দলাদলিতে অংশ গ্রহণ করে। সঙ্গে সঙ্গে পল্লী অঞ্চলে অসন্তোষের সৃষ্টি ও বিস্তার হয়; ইহার ভয়াবহ পরিণাম সকলেই উপলব্ধি করিতেছেন।

পাঠ্য-সূচীর মধ্যে কৃষি-বিজ্ঞানকে যুক্ত করা বিশেষ প্রয়োজন। তাহা হইলে এই অকারণ অপচয় নিবারিত হইতে পারিবে। পর্ষতের একজন সদস্য হিসাবে বর্ত্তমান লেখক ইহার প্রতি বহুবার পর্ষতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন—কিন্তু কোন ফল হয় নাই। গ্রামস্থ বিদ্যালয়সমূহের অধিকাংশ ছাত্রের জন্মগত পেশা কৃষিকার্য্য। কিন্তু তথাকার উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে তাহাদের উক্ত বৃত্তিতে পারদর্শী করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা নাই। উপরন্তু উচ্চ শিক্ষালাভ করিয়া তাহাদের এরূপ মনোবৃত্তি হয় যে, তাহারা কৃষিকার্য্যকে নিন্দনীয় পেশা বলিয়া মনে করিয়া মাতা-পিতার দুঃখের কারণ হয়। সুতরাং বিদ্যালয়ে, বিশেষ করিয়া পল্লী অঞ্চলের বিদ্যালয়ে কৃষি-বিজ্ঞানকে অন্যতম পাঠ্য বিষয় হিসাবে নির্ব্বাচিত করা আশু কর্ত্তব্য।

জাগিছে জ্যোতির্ম্ময়

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

কালো অমানিশা ছেয়ে আছে শুধু চেয়ে দেখি যত দূর,
মোর চারিধারে নিবিড় অন্ধকার!
ব্যাকুল করিছে তবুও আমারে কোন্ অজানার সুর,
যেন কোন্ আলো বুকে জাগে অনিবার!
চলার সরণি আজো দুর্গম—লক্ষ্য-ইসারা নাই,
মনে হয় যেন নাই তার কভু শেষ,
উদাস-নয়নে তাকায়ে তাকায়ে পথে পথে আমি ধাই,
কোন্ রহস্যে ভরা যেন দিগ্‌দেশ।
বক্ষে আমার যত আশা জাগে, লীন হয় নিরাশায়,
বেদনায় বোঝা হয়ে ওঠে নিদারুণ;
মোর দেহ-মন অবসাদ আর ক্লান্তিতে ভরে যায়,
এ ভুবন যেন মোর প্রতি অকরুণ!

আঁধারের মাঝে লুকায়ে রয়েছে কি যেন আলোর আশা,
লুকায়ে রয়েছে কি যেন ছন্দ-সুর!
মূক-জীবনের স্পন্দনহীন স্তব্ধ-নীরব ভাষা,
ভরিয়া তুলেছে সারা অন্তরপুর!
সম্মুখে মোর মসীময় হেরি মাঠ ঘাট নদ-নদী,
কালো হয়ে আছে সুদূর দিগন্তর!
স্বপ্নে আমার তবু এ বিশ্ব উজ্জ্বল নিরবধি,
চক্ষে আমার সব যেন সুন্দর!
তিমিরের পারে উদিছে সূর্য্য মিথ্যা তা কভু নয়,
মিথ্যা নয় গো মোর মর্ম্মের সাধ!
যেন কুয়াশার জাল অপসারি' জাগিছে জ্যোতির্ম্ময়,
ঝরে অলক্ষ্যে আলোর আশীর্ব্বাদ!
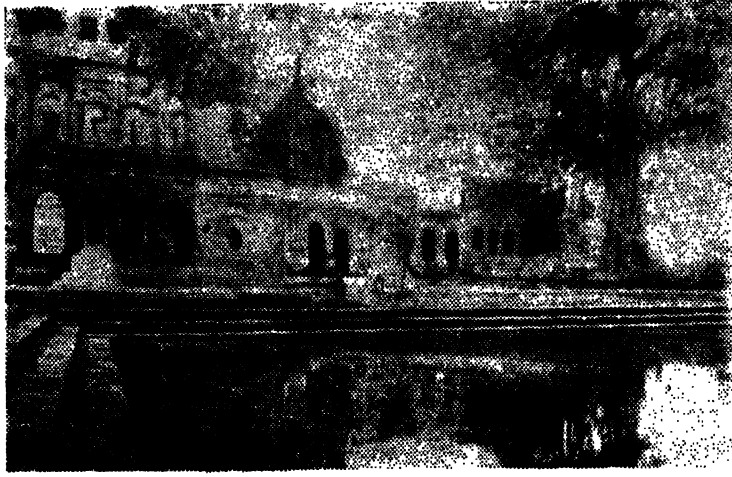
স্থাণুসরের তীরে স্থাণীশ্বর শিবের মন্দির

শ্রীকৃষ্ণ যেখানে গীতা উপদেশ করিয়াছিলেন

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

ধর্মক্ষেত্র-কুরুক্ষেত্রে যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গীতা উপদেশ ও বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই স্থান দর্শন করিলে হৃদয়ে অদ্যাপি লোকাতীত ভাবের উদয় হয়। আজও যেন সেই স্মৃতি কুরুক্ষেত্রের আকাশ-বাতাস পরিবেশের মধ্যে ভরপুর হইয়া রহিয়াছে।

পূর্ব-পঞ্জাবে কুরুক্ষেত্র রেলওয়ে-ষ্টেশন হইতে প্রায় পাঁচ মাইল পশ্চিমে এবং থানেশ্বর ষ্টেশন হইতে প্রায় চারি মাইল দূরে অবস্থিত 'জ্যোতিঃসর' তীর্থ। কথিত আছে, এই স্থানেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গীতা উপদেশ ও বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। জ্যোতিঃসরের তীরে কয়েকটি মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ দিকের মন্দিরে অর্জুন ও পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণ রথে উপবিষ্ট এবং উত্তর দিকের মন্দিরে শিব অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। জ্যোতিঃসরের দক্ষিণ তীরের পশ্চিমাংশে একটি বিস্তীর্ণশাখ অশ্বত্থবৃক্ষ, তাহার চতুর্দিকে একটি সুন্দর চবুতরা। চবুতরামধ্যে শ্রীকৃষ্ণের পাদপীঠ এবং মন্দিরাভ্যন্তরে একটি চতুর্মুখ শ্রীমূর্তি সংস্থাপিত রহিয়াছেন। বনমালী পণ্ডিত নামক এক ব্রাহ্মণ (গীতোপদেশের) বর্তমান স্থানটি দ্বারভাঙ্গার মহারাজের অর্থানুকূল্যে নির্দেশ করিয়াছেন।

দৃষদ্বতীর উত্তরে ও সরস্বতী নদীর দক্ষিণে পুণ্যপ্রদ ব্রহ্মর্ষি-সেবিত ব্রহ্মবেদী কুরুক্ষেত্র-নামে প্রসিদ্ধ। কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে এই ব্রহ্মবেদী কুরুক্ষেত্রই মনুপ্রোক্ত 'ব্রহ্মাবর্ত দেশ'।*

আবার কেহ কেহ মনুসংহিতার নিম্নলিখিত উদাহরণ উল্লেখ করিয়া বলেন, ব্রহ্মাবর্ত ও কুরুক্ষেত্র এক নহে :

> সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
> তং দেবনির্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্তং প্রচক্ষতে॥
> কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
> এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্তাদনন্তরঃ॥১

অর্থাৎ, সরস্বতী ও দৃষদ্বতী—এই দুই দেবনদীর মধ্যে যে দেবনির্মিত প্রদেশ আছে, তাহাকে 'ব্রহ্মাবর্ত' কহে। কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পঞ্চাল (কান্যকুব্জ) ও শূরসেনক (মথুরা) এই সকল ব্রহ্মর্ষিদেশ, এই ব্রহ্মর্ষিদেশ ব্রহ্মাবর্ত হইতে ভিন্ন। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ-ঘটনার বহু পূর্ব হইতেই কুরুক্ষেত্র প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৭ ৩০), শুক্লযজুর্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণ ১১।৫।১।৪, কাত্যায়নশ্রৌতসূত্র ২৪।৬।৩৪, শাঙ্খায়নব্রাহ্মণ ১৫।১৬।১২, তৈত্তিরীয় আরণ্যক (৫।১) প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থেও কুরুক্ষেত্রের উল্লেখ আছে।

> কুরুক্ষেত্রেঽমী দেবা যজ্ঞং তন্বতে।২

পূর্বকালে কুরু নামক রাজর্ষি এই ক্ষেত্রের কর্ষণ করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত ইহার নাম 'কুরুক্ষেত্র' হইয়াছে—

> পুরা চ রাজর্ষিবরেণ ধীমতা, বহূনি বর্ষাণ্যমিতেন তেজসা।
> প্রকৃষ্টমেতৎ কুরুণা মহাত্মনা, ততঃ কুরুক্ষেত্রমিতীহ পপ্রথে॥৩

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে, সম্বরণের ঔরসে সূর্যতনয়া

---

* Cunningham's *Arch. Sur. Repts*, Vol. II, p. 215 & Vol. XIV, p. 87

১। মনুসংহিতা ২।১৭,১৯। ২। শতপথ ব্রাহ্মণ ৪।১।৫।১৩। ৩। মহাভারত, শল্যপর্ব ৫৩।২।

তপতীর গর্ভে কুরু নামে যে রাজা জন্মগ্রহণ করেন, তিনিই কুরুক্ষেত্রপতি।

"তপত্যাং সূর্যকন্যায়াং কুরুক্ষেত্রপতিং কুরুং।"[৪]

চীন-পরিব্রাজক বলেন যে, তিনি যে সময় কুরুক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন সেই সময়েও ধর্মক্ষেত্রে মৃত বীরগণের অস্থি-রাশি বিদ্যমান ছিল। তিনি থানেশ্বরের উত্তর-পশ্চিমে অনতিদূরে বৌদ্ধরাজ অশোকের নির্মিত ৩০০ ফুট উচ্চ একটি বৌদ্ধস্তূপ দর্শন করিয়াছিলেন। তৎপরে এই স্থান কান্যকুব্জরাজগণেরই অধিকারভুক্ত ছিল, ইহা কান্যকুব্জ-রাজগণের সময়ে খোদিত পৃথূদক হইতে প্রাপ্ত শিলাফলকাদি পাঠে অবগত হওয়া যায়।

১০১১ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান মামুদ থানেশ্বর আক্রমণ করিয়াছিলেন। ১০৪৩ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুরাজগণ বিধর্মীর কবল হইতে কুরুক্ষেত্রের উদ্ধার সাধন করেন। ১১৯২ খ্রীঃ পৃথ্বীরাজের গৌরব-রবি অস্তমিত হইলে কুরুক্ষেত্র ও সরস্বতী-প্রবাহিত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড মুসলমানের অধিকারভুক্ত হয়। মুসলমানগণের আধিপত্যকালে কুরুক্ষেত্রের অনেক পুণ্যতীর্থ লুপ্ত এবং অধিকাংশ দেবালয় বিধ্বস্ত হয়। সেই সময়ও সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রী জীবন তুচ্ছ করিয়া বহু দূর দেশ হইতে কুরুক্ষেত্রের পবিত্র তীর্থসকল দর্শনার্থ আগমন করিতেন। তারিখ-ই- দাউদী নামক মুসলমান-ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, সিকন্দর লোদীর সিংহাসন লাভের পূর্বে কুরুক্ষেত্রে স্নান করিবার জন্য একবার বহু তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়, সিকন্দর তাঁহাদের সকলকেই বিনাশ করিবার সঙ্কল্প করেন। তবকাৎ-ই-অকবরীর বর্ণনায় অবগত হওয়া যায়, আকবর একবার থানেশ্বরে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে কুরুক্ষেত্রের সরোবর-তটে স্নানার্থ বহু সাধু-সন্ন্যাসী গ্রহণ উপলক্ষে সমবেত হন। তীর্থযাত্রীরা ব্রাহ্মণদিগকে বহু স্বর্ণ ও মণিরত্নাদি দান করিতেছিলেন। আওরঙ্গজেব কুরুক্ষেত্রের বৃহৎ সরোবরের মধ্যবর্তী দ্বীপাকার স্থানে 'মোগল-পাড়া' নামে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন, সেই দুর্গ হইতে সমাগত তীর্থযাত্রিগণকে গুলি করিয়া বিনাশ করা হইত। শিখদিগের অভ্যুদয়ে কুরুক্ষেত্রের তীর্থ ও প্রাচীন দেবমন্দির-সমূহ পুনঃপ্রকাশিত হয়।

কুরুক্ষেত্রের বন ও নদীর নাম

এই পবিত্র ভূমিতে সাতটি বন আছে। এই সকল স্থানে ঋষিগণ বিষ্ণুর উপাসনা করিয়াছিলেন। (১) কাম-বন কমোদ পরগণা থানেশ্বরে, (২) অবনী-বন—আমিন গ্রামের নিকট। মহাভারতের যুদ্ধকালে এই স্থানে কৌরবগণের

ভদ্রকালীর মন্দির

চক্রব্যূহ রচিত হইয়াছিল; অর্জুনের পুত্র অভিমন্যু এই স্থানে নিহত হন। অবনী-বনের অপভ্রংশ আমিন গাঁও। এই বনে অবনীকুণ্ড, সূর্যকুণ্ড, বামনকুণ্ড, সোমতীর্থ, গোময়-তীর্থ প্রভৃতি বহু তীর্থ রহিয়াছে। (৩) ব্যাস-বন—ব্যাসগ্রাম পরগণা কর্ণালে অবস্থিত। (৪) মধু-বন—গ্রামমোহনা কৈথল পরগণায় অবস্থিত। (৫) ফলকী-বন—কৈথল পরগণায় অবস্থিত, এই স্থানে ফল্গু নামক একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ আছে; আশ্বিনী সোমবতী অমাবস্যায় এই স্থানে বহু জনসমাগম হয়। (৬) শ্বেত-বন—স্যন পরগণা কৈথলে অবস্থিত। (৭) সূর্য-বন—গ্রাম সন্ধোবান, পাতিয়ালা এলাকায় অবস্থিত।

প্রাচীনকালে এই ধর্মভূমিতে নয়টি নদী প্রবাহিত ছিল। এখন সবগুলি দেখা যায় না। তবে বর্ষাঋতুতে কোন কোন নদী প্রকাশিত হইয়া থাকে। (১) সরস্বতী—উত্তর সীমায়, (২) বৈতরণী—পুণ্ডরী এলাকায়, (৩) উপগয়া—কৈথলের পশ্চিমে, (৪) মন্দাকিনী—মগধদেশ হইয়া প্রবাহিত হইয়াছে। (৫) মধুস্রবা—কৈথলের উত্তর দিকে, (৬) অংশবতী—নগরের মধ্যস্থলে, বিলায়ত সাহের দর্গার নিম্নদেশ এবং অঞ্জনী নামক টীলার পার্শ্বদেশ দিয়া প্রবাহিত, (৭) কৌশিকী—মৌলি ও বালুগ্রাম দিয়া প্রবাহিত, (৮) দৃষ্টবতী—কৈথল হইতে প্রবাহিত, (৯) বর্ণবতী—থানেশ্বর গুরুকুলের নিম্নভাগে এবং বারদার পার্শ্বদেশ দিয়া প্রবাহিত।

৪। ভাঃ ৯।২২।৪

ব্রহ্মসর—কুরুক্ষেত্র তীর্থ ব্রহ্মসরের মধ্যেই বিরাজমান। এই সরোবর থানেশ্বরের ন্যূনাধিক ৭০০ গজ দক্ষিণ কোণে। ইহা দৈর্ঘ্যে ১৪৪২ গজ ও প্রস্থে প্রায় ৭০০ গজ। প্রথমে ইহার চতুষ্পার্শ্বেই বাঁধানো ঘাট ছিল। সম্প্রতি কুরুক্ষেত্র জীর্ণোদ্ধার সমিতি সাধারণের সাহায্যে এই সমস্ত

সন্নিহিত তীর্থ

স্থান সংস্কার করিয়াছেন। ব্রহ্মসরের তীরে উত্তরভাগে শ্রীব্যাস গৌড়ীয়-মঠ প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মসরের মধ্যে চন্দ্রকূপ নামক একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ আছে। প্রাচীনকালে এই স্থানে একটি যন্ত্রমন্ত্র ছিল। জ্যোতির্বিদ্‌গণ এই যন্ত্রমন্ত্র হইতেই সূর্যগ্রহণের কথা ভারতের সর্বত্র ঘোষণা করিতেন। সূর্য-গ্রহণের সময় এবং গ্রহণ মোক্ষের পর লক্ষ লক্ষ লোক অদ্যাপি এই ব্রহ্মসরে স্নান করিয়া থাকেন।

সন্নিহিত তীর্থ—কেহ কেহ বলেন যে, মহাভারতের যুদ্ধের সময় কৌরব ও পাণ্ডব উভয় পক্ষের কর্মসচিব এবং সেনাধ্যক্ষগণ বীরভাব পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানে উপবেশন-পূর্বক পরামর্শ করিয়াছিলেন, এইজন্য ইহার নাম সন্নিহিত। মহাভারতে বর্ণিত আছে, এই স্থানে নিখিল তীর্থের সমাগম হয় বলিয়া এই স্থান সন্নিহিত তীর্থ নামে খ্যাত। এই সরোবরের দৈর্ঘ্য ৫০০ গজেরও অধিক এবং প্রস্থ প্রায় ১৫০ গজ; ইহা কুরুক্ষেত্রের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত।

কুরুক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যদেব

নাভাদাসের 'হিন্দীভক্তমালে'[৫] লিখিত আছে যে, শ্রীচৈতন্যদেব কুরুক্ষেত্রে থানেশ্বরী জগন্নাথ বিপ্রের গৃহে পদার্পণ করিয়া তিন দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে সূর্যগ্রহণোপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুভবিজয় হইয়াছিল। প্রাচী সরস্বতীর তীরে সেই থানেশ্বরী-জগন্নাথের (পরে শ্রীচৈতন্যদেব কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণদাস নামকরণ) স্থান অদ্যাপি দৃষ্ট হয়।

প্রাচীন ঐতিহাসিক স্মৃতি-বিজড়িত থানেশ্বরনগর সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত। 'স্থাণ্বীশ্বর' (স্থাণু+ঈশ্বর) শিবের নাম হইতে এই স্থানের নাম 'স্থাণ্বীশ্বর' এবং তাহারই অপভ্রংশ থানেশ্বর হইয়াছে। এখানে স্থাণ্বীশ্বর শিবের একটি সুবৃহৎ সুরম্য মন্দির বিরাজমান। মহাভারতে স্থাণুতীর্থ নামে এই স্থানের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীন-পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ্ এখানে আগমন করেন। তৎকালে থানেশ্বর স্বতন্ত্র রাজ্যরূপে পরিগণিত ছিল। চীনপরিব্রাজক বলেন যে, এই রাজ্য প্রায় ৬০০ ক্রোশ বিস্তৃত ছিল। গজনীর সুলতান মামুদ এই নগর লুণ্ঠন করিয়া বহুমূল্যবান দ্রব্য স্বদেশে লইয়া যান। শিখদিগের অভ্যুদয়কালে সর্দার মিটসিং থানেশ্বর অধিকার করেন এবং স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে এই স্থান অর্পণ করিয়া যান। মোগলদিগের আধিপত্যকালে তাহারা থানেশ্বরের অনেক দেবমন্দির ভাঙিয়া তাহার উপর মসজিদাদি নির্মাণ করেন। মিটসিংএর বংশলোপ হইলে এই স্থান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

ভদ্রকালী

প্রাচী সরস্বতীর অভিমুখে যাইবার কালে পথে ভদ্রকালীর মন্দির পাওয়া যায়। ভদ্রকালী স্থানটি অতি প্রাচীন। মহাভারতে ও শ্রীমদ্ভাগবতে এই ভদ্রকালী দেবীর কথা আছে। মহাভারতের যুদ্ধের সময় পাণ্ডবগণ যুদ্ধে বিজয়কামী হইয়া ভদ্রকালীর স্থানে কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে ভদ্রকালী 'বিজয়-কাত্যায়নী' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে, 'মহারাজ ভরত রাজ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া পুলহাশ্রমে গণ্ডকী নদীতীরে যখন ভজন করিতেছিলেন, সেই সময় একটি সদ্যপ্রসূত হরিণ-শাবককে স্রোতোবেগে ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া উক্ত মৃগশাবকের রক্ষণাবেক্ষণে আসক্ত হইয়া পড়েন এবং তাহার ফলে ভরতের মৃগজন্ম লাভ হয়। সেই মৃগদেহ পরিত্যাগ করিবার পর তিনি কোন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মলাভ করেন এবং বিষয় সম্পর্কের

৫। নাভাদাসজী কৃত হিন্দিভক্তমাল, বার্তিক প্রকাশটীকা, ৫৯০-৫৯৬ পৃষ্ঠা, নবলকিশোর প্রেস, লক্ষ্ণৌ, ১৯১৩ খ্রীঃ

ভয়ে জড়-মূক-বধিরের ন্যায় অবস্থান করেন। কতকগুলি চোর এক গভীর রাত্রিতে শস্যক্ষেত্র রক্ষায় নিযুক্ত জড় ভরতকে বন্ধন করিয়া ভদ্রকালীর সমীপে বলি দিবার উদ্দেশ্যে লইয়া যায়। চোরগুলি যখন দেবী প্রতিমার সম্মুখে জড়ভরতকে বধ করিবার জন্য শাণিত খড়্গ উত্তোলন করিল। তখন ভদ্রকালী দেবী ভগবদ্ভক্ত ভরতের প্রতি ঐরূপ আসুরিক অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া প্রতিমা হইতে ভীষণ মূর্তিতে বহির্গত হইলেন এবং তাহাদের হস্ত হইতে খড়্গ কাড়িয়া লইয়া চোরগুলির মুণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

কুরুক্ষেত্রে রাজা কর্ণের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ
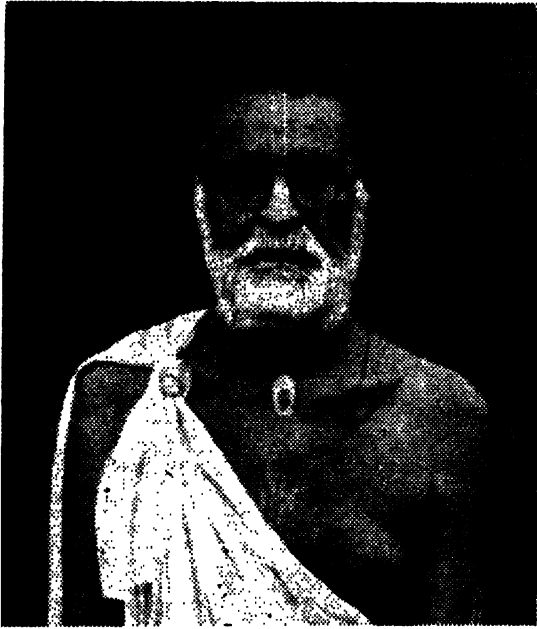
প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ

ভদ্রকালীর মন্দিরের পূজারী শ্রীবদরী নারায়ণদাসজী আপনাকে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের উদাসীন ব্যক্তি বলিয়া পরিচয় দিলেন। তিনি বলিলেন, ভদ্রকালীর মন্দিরে কোনপ্রকার জীবহিংসা বা পশুবলি প্রভৃতি হয় না; দেবীর সম্মুখে নারিকেল, কদলী, কুমড়া প্রভৃতি বলি দেওয়া হয়। ভদ্রকালীর মন্দিরের একটি বিস্তৃত কূপ দেখাইয়া বলিলেন, এই স্থানটি যোগপীঠ। ইহার নাম দুর্গাকূপ। এখানে দেবীর গুল্ফদেশ পতিত হইয়াছিল।

কুরুক্ষেত্রের অপর নাম স্যমন্তপঞ্চক। স্যমন্তপঞ্চক মহাভারতে ব্রহ্মার উত্তরবেদী বলিয়া কথিত।৬ শ্রীমদ্ভাগবতেও৭ স্যমন্তপঞ্চকের কথা আছে। শ্রীচৈতন্যদেব এই স্যমন্তপঞ্চক কুরুক্ষেত্রের আদর্শের দ্বিতীয় সংস্করণরূপেই নীলাচলে রথাগ্রে বিপ্রলম্ভ-লীলা প্রকটিত করিয়াছেন। উহার বিস্তৃত বিবরণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায়।

কুরুক্ষেত্রে সূর্যগ্রহণ

দ্বাপরযুগে দ্বারকাপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকানগরীতে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হয়। তদুপলক্ষে ভারতের অসংখ্য লোক কুরুক্ষেত্রে স্নানদানাদির জন্য আগমন করিয়াছিলেন। বিভিন্ন দেশের যাবতীয় রাজন্যবর্গ পুণ্যকামনায় সেই সময় কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সূর্যোপরাগের ছল করিয়া দ্বারকা হইতে কৃষ্ণচন্দ্র এবং বৃন্দাবন হইতে দীর্ঘ কৃষ্ণবিরহোন্মত্ত গোপ-গোপীগণ স্যমন্তপঞ্চকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছিলেন।

এখনও কুরুক্ষেত্রে সোমাবতী অমাবস্যায় সূর্যগ্রহণ উপস্থিত হইলে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে লক্ষ লক্ষ যাত্রী তথায় স্নানার্থ গমন করেন। এই সময় কুরুক্ষেত্র ও থানেশ্বরের বহু ক্রোশব্যাপী উন্মুক্ত ক্ষেত্রে সহস্র সহস্র শিবির সংস্থাপিত হয়। শত শত নলকূপ, জলসত্র, অন্নসত্র, বহু চিকিৎসাগার স্থাপিত হয় এবং অসংখ্য বিপণিশ্রেণী, প্রমোদশালা প্রভৃতির সমাবেশ হয়। লক্ষ লক্ষ যাত্রী ব্যতীতও

৬ মহাভারত, শল্যপর্ব, ৫৩। । ৭ ভাঃ ১০৮২।২-৪।

বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের সহস্র সহস্র সাধু, সন্ন্যাসী, তপস্বী, উপদেশক, প্রচারক, পাঠক, কথক, গায়কের সমাগম হয়।

কুরুক্ষেত্রে শ্রীলক্ষ্মীকুণ্ডের তীরে শ্রীগৌড়ীয় মঠই বঙ্গদেশীয় একমাত্র ধর্মপ্রতিষ্ঠান। প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর উক্ত মঠ স্থাপন করিয়া তথা হইতে পঞ্জাব-প্রদেশে শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তদ্দেশবাসী লালা দেওয়ালী রামের উদ্যোগে পাতিয়ালার রাজার অর্থানুকূল্যে নির্মিত গীতা-ভবন নামক একটি প্রতিষ্ঠানও এখানে দৃষ্ট হয়।

পাগলের প্রতি

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ক্ষুদ্র এ হৃদয়
কত আর পারে সহিবারে ?
চতুর্দিকে জগৎ-জলধি,
অনন্ত বিস্ময়
বিমূঢ় করিছে তারে।
উত্তাল তরঙ্গদল আছাড়িয়া পড়ে রাত্রিদিন
হৃদয়ের তটে,
নিত্য তারে ভাঙে আর গড়ে।

অতল ভূতল হ'তে উদ্বেলিয়া ওঠে
বাসনার আগ্নের উচ্ছ্বাস
বিদারিয়া তটভূমি শতশিখা জাগে।
মানুষের মন
ক্ষুদ্র বালুবেলা।
সহিতে কি পারে এত অসংখ্য আঘাত,
আপনার মাঝে এই তীব্র আলোড়ন ?

ছিন্নগ্রন্থি মানস-চেতনা—
যুক্তির শৃঙ্খলমুক্ত, ভ্রমিছে অসীমে।
ঘন ঘন বিদ্যুৎস্ফুরণ
মস্তিষ্ক-গগনে ;
গ্রহতারা ছুটিছে উধাও,
সংঘাতে সংঘর্ষে কভু চূর্ণ রেণু রেণু।
ছুটিছে ঝঞ্ঝার বেগে বিশ্ববস্তুচয়
মনোনেত্র-সম্মুখে তাহার ;
সীমারেখা মুছে গেছে ক্ষুদ্র-বৃহতের
দুঃখ ও সুখের।

২

নির্বিকার ঔদাসীন্য—নির্বিকল্প সমাধি-সূচনা
অদ্বৈত-সামীপ্য এ কি ?
হে উন্মাদ, হে উন্মাদ,
উন্মোচিয়া ব্যবধান-পট
নিরখিতে চাহ তুমি রহস্য-সাগর,
তাই এ অদ্ভুত আচরণ ?

নিমেষে নিমেষে তব নব ভাব, নূতন ভঙ্গিমা,
তুমি বহুরূপী।
মোরে তুমি কোথা নিয়ে এলে ?
অনভ্যস্ত অজানা জগৎ
নিঃসীম এ মহাশূন্য পথ
ভয়ঙ্কর ! এ নহে আমার।

তবু, হায়,
যন্ত্রণা-জর্জর হিয়া এই পথে বুঝি পায়,
ক্ষণিক মুক্তির স্বাদ—
আকর্ষণ তাই দুর্নিবার।

বর্মা শেল তৈল-বিশোধনাগার

বর্মা 'শেল'-কর্তৃক সম্প্রতি ভারতের বৃহত্তম তৈল বিশোধনাগারের নির্মাণকার্য্য চলিতেছে। ১৯৫৫ সালের গোড়ারদিক হইতেই ইহাতে তৈল বিশোধন-কার্য্য আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। ভারতের বাজারে যে পরিমাণ প্রধান প্রধান পেট্রোলিয়াম দ্রব্য, মোটর স্পিরিট, কেরোসিন, হাই স্পীড ডিজেল অয়েল, ফার্নেস অয়েল প্রভৃতির" প্রয়োজন তাহা এখানে প্রস্তুত হইবে। ভারত সরকার আশা করিতেছেন যে, এই বিশোধনাগার চালু হইবার পর বিদেশ হইতে অধিকতর মূল্যবান বিশোধিত তৈলাদির পরিবর্ত্তে যে সস্তা দামের অ-বিশোধিত তৈল (crude oil) আমদানী করা হইবে তাহার দরুন ভারতের বৈদেশিক বিনিময়ে (Foreign Exchange) প্রতি বৎসর ৪'৩ কোটি হইতে ছয় কোটি টাকা পর্য্যন্ত বাঁচিয়া যাইবে।

নবনির্ম্মিত রাস্তায় বসানো তৈলবাহী পাইপ

দুই কোটি টন তৈল বিশোধনের ক্ষমতা-সম্পন্ন এই বিশোধনাগার নির্ম্মাণে ব্যয় হইবে সবসুদ্ধ পঁচিশ কোটি টাকা। হল্যাণ্ডের 'রয়াল ডাচ শেল গ্রুপ' আপিসের তৈল-বিশোধন-বিশেষজ্ঞগণ ইহার পরিকল্পনা করিতেছেন। ইহাতে তৈল-বিশোধন সম্পর্কিত অতিআধুনিক ব্যবস্থাসমূহ প্রবর্ত্তিত হইবে। ইহার অন্তর্ভুক্ত 'ক্যাটালিক্‌টিক ক্র্যাকিং ইউনিটে' শুধু যে গ্যাসোলিনের উৎপাদনই বাড়িবে তাহা নয়, গুণের দিক দিয়াও এই বস্তুর উৎকর্ষ সাধিত হইবে। যানবাহনাদি চলাচলের জন্ত বার মাইল লম্বা রাস্তা নির্ম্মিত হইবে এবং প্রায় ৪,৫০,০০০ টন তৈল ধারণের উপযোগী ট্যাঙ্কও তৈরি হইবে। আশা করা যায় যে, বর্ম্মা শেল তৈল বিশোধনাগারের অ-বিশোধিত তৈল আসিবে পারস্য-উপসাগর এলাকা হইতে এবং তাহা ৩০,০০০ টন তৈল ধারণের উপযোগী ট্যাঙ্কসমূহ দ্বারা বাহিত হইবে।

তৈল-বিশোধনাগারের একটি দৃশ্য

ট্রম্বের ৪৫০ একর পরিমিত স্থানের এক বৃহৎ অংশ সম্প্রতি পরিষ্কৃত এবং সমতলে পরিণত করা হইয়াছে। রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পূর্ণপ্রায় এবং মৌসুমি বায়ুর কবল হইতে তৈল বিশোধনের যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে অনেকগুলি শেডও নির্ম্মিত হইয়াছে। বিশোধনাগারের কতকগুলি বৃহত্তর ইউনিটের গোড়াপত্তনের কাজও যথারীতি শুরু হইয়া গিয়াছে।
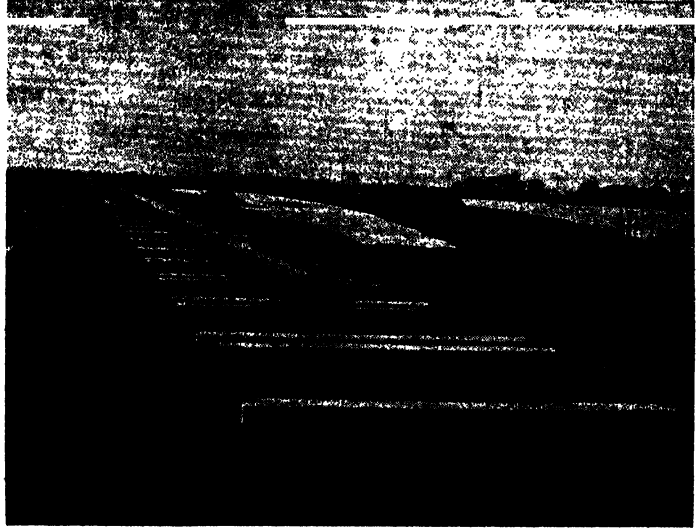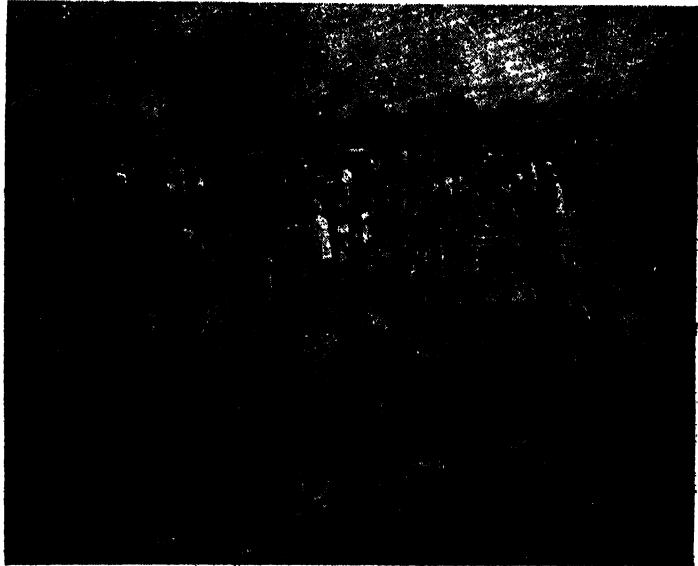
খাদি বোর্ড

শ্রীবিনোবা ভাবে

অনুবাদক—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গুহ

খাদিশিল্পের প্রসারের নিমিত্ত সরকার সম্প্রতি একটি খাদি-বোর্ড গঠন করিয়াছেন। খাদির ভাবে ভাবুক অনেক খ্যাতনামা একনিষ্ঠ খাদি-কর্মীকে বোর্ডে লওয়া হইয়াছে। খাদির উৎপাদন খুব বাড়িবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। খাদির দাম কিছু সস্তা করার জন্য সরকার সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন, "স্বরাজলাভের এত দিন পরে যে এই বোর্ড কেন গঠিত হইল তাহা আমি ভাবিয়া পাই না।" বেদেও এরূপ কথা বলা হইয়াছে—যাহাকে এ জগতের নিয়ন্তা বলা হয়, কে বলিবে তিনি স্বয়ংই এ জগতের কাজকারবারের খবর সঠিক রাখেন কি না।

"সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ।"

যে কেহ সুতা কাটিবে তাহারই সুতা লওয়া হইবে। সুতা লইব না, একথা বলা চলিবে না,—এরূপ কথা শোনা যাইতেছে। এই উক্তির পশ্চাতে সম্ভবতঃ এই বিশ্বাস রহিয়াছে যে, সুতা কাটিতে খুব বেশী লোক পাওয়া যাইবে না। শোনা যাইতেছে, খাদির দাম টাকা প্রতি তিন আনা কমানো হইবে। তাহা সত্ত্বেও মিল হইতে খাদি মাগ্‌গি থাকিবে। সে স্থলে খাদি যদি বিক্রী না হয় ত সরকার কি করিবেন? চাপরাসী প্রভৃতির অঙ্গে খাদি চড়ানো হইবে। উচ্চ পদাধিকারীদিগকে অঙ্গে খাদি পরিতে বাধ্য করা নাকি নাগরিক স্বাধীনতার বিরোধী হইবে। অতএব খাদি-পরা চাপরাসী মিল বা বিদেশী পোশাকে সুশোভিত অফিসারদের সেলাম করিতেছে, এই দৃশ্য আমরা দেখিতে পাইব।

মিলিটারির জন্যও সরকারকে বেশ কিছু কাপড় কিনিতে হয়। কিন্তু মিলিটারির যোগ্য খাদি তৈরি হয় না। খাদি 'মিল্লার উর্দি' হওয়ার অযোগ্য বিবেচিত হইয়াছে। ভাল, এই এক গুণেই খাদি অমর হইয়া যাইবে।

বেকারকে কাজ দেওয়ার কর্তব্য কোন সরকারই অবহেলা করিতে পারে না। বেকার-সমস্যার সমাধানের জন্য কোন পন্থা দেখা যাইতেছে না, অতএব এখনকার মত বেকার-দের সুতাকাটার কাজ দেওয়া যাক, ইহা অপেক্ষা গভীর দৃষ্টি খাদি বোর্ডের মূলে দেখা যায় না। খাদির এই অবস্থা হইতেছে 'অকালী' পন্থের অবস্থা। অকালী খাদিতে দুইটি কথা গৃহীত :

১। আত্মা দেহ ছাড়িয়া না যায় তদুপযুক্ত নিম্নতম মজুরি;

২। ভারস্বরূপ এই খাদির হাত হইতে কত তাড়াতাড়ি অব্যাহতি পাওয়া যায় এই ভাবনা।

খাদি-সেবকদের বিশ্বাস, বেকার অবস্থার রিক্ততার ছিদ্র-পথে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তাঁহারা খাদির গোঁজ ঢুকাইয়া দিতেছেন। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকারিগণ মনে করেন—এই সুযোগে পঞ্চবার্ষিকীতে খাদিওয়ালাদের তাঁহারা জুতিয়া লইতেছেন। ইহা এক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পারস্পরিক সহযোগিতা।

"স্বরাজলাভের আগে খাদির পিছনে প্রেরণা ছিল। সেই প্রেরণা আজ নাই। খাদিকে দাঁড়াইতে হইলে এখন উপযোগিতার শক্তির উপরই দাঁড়াইতে হইবে"—এই সতর্কবাণী পণ্ডিত নেহরু উচ্চারণ করিয়াছেন। খাদি ব্যতীত গ্রাম-রাজ্য হইতে পারে না, এ-বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। অতএব খাদির পেছনে যে প্রেরণা ছিল তাহা আজ লুপ্তপ্রায় মনে হইতেছে। ইংরেজ শাসনের অবসানের নিমিত্ত খাদি-ভাবনার যতটা দরকার ছিল, গ্রামের উপর শহরের প্রভুত্বের অবসান করার নিমিত্ত খাদি-ভাবনার দরকার যে তদপেক্ষা অধিক একথা বুঝিতে কষ্ট হয় না। গ্রাম হইতে শহরের প্রভুত্ব অবসানের কল্পনাই যাহাদের নাই, তাহাদের খাদির ভাবনা-শক্তি যদি লুপ্তপ্রায় হইয়া থাকে ত বিস্ময়ের কিছু নাই। স্বরাজলাভের জন্য যতটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা লোকের মনে জন্মিয়াছিল, গ্রাম-রাজ্য সংগঠনের জন্য ততটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা এখনও জন্মে নাই। সেই তীব্র আকাঙ্ক্ষার সঞ্চার করা খাদির আদর্শে বিশ্বাসীদের কাজ। সরকারের খাদি-বোর্ডে যোগ দেওয়ার নেশায় যেন আমরা এই কর্তব্য ভুলিয়া না যাই।

মূল মারাঠী হইতে

মানব-পুরুষকারকে নমস্কার

শ্রীদাদা ধর্মাধিকারী

অনুবাদক—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ

'উন্নতি'র আকাজ্ঞা: ঊর্ধ্ব আকাশে আরোহণের বাসনা মনুষ্য-হৃদয়ের অনাদি কালের চিরন্তন আকাজ্ঞা। দশ দিকের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতাদের নমস্কার করার সময় উপরের দিকে নমস্কার করিতে গিয়া আমরা বলি 'ঊর্ধ্বায়ৈ দিশে ব্রহ্মণে নমঃ'—উপরের দিকে ব্রহ্মাকে নমস্কার। ভগবানের নিবাস আকাশে ইহা আমাদের চিরকালের অবিচলিত বিশ্বাস। অতএব 'উন্নতি'র—ঊর্ধ্বে আরও ঊর্ধ্বে আরোহণের আকাজ্ঞা মানুষের চিরদিনের সর্বশ্রেষ্ঠ আকাজ্ঞা।

কালিদাস হিমালয়কে পৃথিবীর মানদণ্ড বলিয়াছেন। আর এক অর্থে হিমালয় আমাদের ধরাতলের উচ্চতা মাপারও মানদণ্ড। আকাশকে আলিঙ্গন করার জন্য পৃথ্বী উপরের দিকে উঠিল, আর যতদূর উঠিতে সক্ষম হইল সেই স্থানের নাম এত দিন ধারণা ছিল 'গৌরীশঙ্কর'—ইংরেজীতে যাহাকে বলা হয় 'এভারেষ্ট শৃঙ্গ'। এই শৃঙ্গ পৃথিবীর উচ্চতম বিন্দু। উহা কৈলাস পর্বত হইতেও উঁচু। কৈলাস পর্বতকে আমরা বিশ্বের শিবালয় জ্ঞান করি। কোন কোন প্রদেশের লোকের কাছে 'কৈলাস' শব্দ উচ্চলোকের দ্যোতক। কেহ যখন পরলোকগমন করে, তখন লোকে বলে সে 'কৈলাসবাসী' হইয়াছে অর্থাৎ শিবালয়ে গিয়াছে। কৈলাস ও মানস-সরোবর প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে আমাদের দেশে পুণ্যক্ষেত্র হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু উক্ত উচ্চতম শৃঙ্গে আরোহণ করার চেষ্টা সম্ভবতঃ প্রাচীনকালে কেহ করে নাই। হিমালয় এদেশের যোগী, তপস্বী ও মুনিদের তপোভূমি ও উপাসনাক্ষেত্র। কিন্তু কেবল লৌকিক যশের আকাঙ্ক্ষায়, কেবল প্রকৃতির উপর বিজয়-লাভের বাসনায় পর্বতারোহণের প্রয়াস এদেশের পুরুষার্থবান, সাধন-সম্পন্ন, সাহসিকতা-প্রেমী পুরুষেরা করেন নাই। এই প্রকারের প্রেরণাই আমাদের জীবনাদর্শের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

সম্রাটের সিংহাসন অপেক্ষাও উচ্চ: এই সেই দিন—মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে—ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম, কর্ণেল হান্ট নামক ব্রিটিশ নেতার নেতৃত্বে শেরপা তেনজিং ও হিলারী পৃথিবীর সর্বোচ্চ বিন্দুতে আরোহণ করিয়াছিলেন। সমগ্র জগৎ তাঁহাদের উপযুক্ত সম্মান দিয়াছে, অভিনন্দিত করিয়াছে। ইংলণ্ডের রাণী যেদিন সিংহাসন আরোহণ করেন সেদিন এই পর্বতারোহণের সমাচার প্রচার করা হয়। ইহা মানবজাতির গৌরববৃদ্ধি করিয়াছে, পুরুষার্থের প্রেরণাকে মহামহিমান্বিত করিয়াছে।

উচ্চ পাদপীঠ ও ব্যাপক দর্শন: মনুষ্য যতই উচ্চে আরোহণ করে তাহার দিগন্ত ততই প্রসারিত হইতে থাকে। আমাদের পাদপীঠ যত উঁচু হইবে, আমাদের দর্শনও ঠিক তত ব্যাপক হওয়া চাই। আমরা কেবল

এভারেষ্ট বিজয়ী তেনজিং নোর্‌কে

[ফটো: ডি. রতন এণ্ড কোং
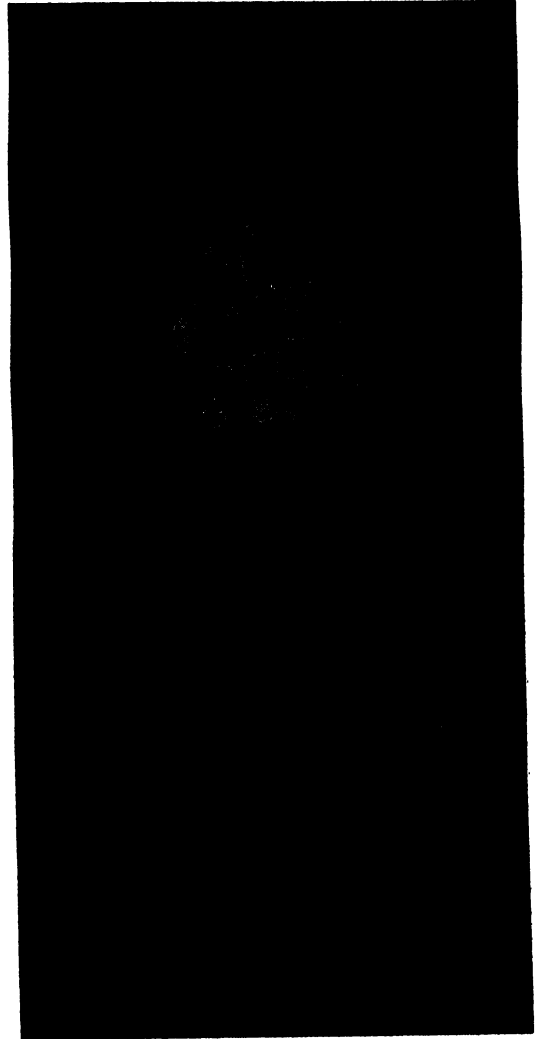
ইহাই জানি যে, দুই জন মানুষ এভারেস্ট আরোহণের প্রয়াসে সাফল্যলাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের কে 'নিউজিল্যাণ্ডার' আর কে ভারতীয় সে বিচারে কি দরকার? এত উচ্চে আরোহণের পরেও কি 'অয়ং নিজঃ পরো বেত্তি'—ইহা

আমার, ইহা পরের এই ভাব মনে ঠাঁই পায়? এই পর্ব্বতা-রোহণকারীরা যখন এক পা এক পা করিয়া উপরে উঠিতে-ছিলেন, তখন তাঁহাদের মনে কি নিজ বর্ণ, জাতি ও ধর্ম্ম-ভেদের কথা আদৌ ছিল? তাঁহারা কাঁধে কাঁধ দিয়া চলিতে-ছিলেন। একে অপরের সঙ্গী ছিলেন—জীবনেরও সাথী, মরণেরও সাথী—যশেরও ভাগী, অপযশেরও অংশীদার। আমরা যাহারা নীচে রহিয়া গিয়াছি, আর কোন দিন যাহারা মাথা উঁচু করিয়া এভারেস্ট শৃঙ্গের উচ্চতা দেখারও চেষ্টা করি নাই, সেই আমরা আজ নিজ নিজ জাতিকুটুম্বের দাবি লইয়া আগাইয়া আসিয়াছি।

তাঁহারা নিখিল মানবের: কলম্বস কে ছিলেন? আইনষ্টাইন কে? নিউটন্ কোন্ দেশবাসী ছিলেন? ইউক্লিড কাহার জাতি ছিলেন? বাল্মীকি, ব্যাস, বুদ্ধ, মহাবীর ও নানক কখন এবং কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? তাঁহাদের বর্ণ ছিল কি, জাতি ছিল কি? ব্যাপক মানবীয় বৃত্তি-সম্পন্ন সাধারণ লোকে এবম্বিধ খোঁজখবর কখনও করে না। আমাদের এখানে ত কথাই রহিয়াছে যে, নদীর মূল ও ঋষির কুল জিজ্ঞাসা করিতে নাই। প্রকৃতির বিবিধ নিয়ম যাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছেন, অথবা জীবন-সাধনার যাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই সমগ্র মানব জাতির। আমি সকলের আত্মীয়, আমি তাহার, সে আমার। এভারেস্ট শিখরে যিনি প্রথমে আরোহণ করিয়াছেন তাঁহাকে প্রথম নমস্কার আর যিনি তাঁহার পরে উঠিয়াছেন তাঁহাকে দ্বিতীয় নমস্কার। কিন্তু নমস্কারের ক্রমানুসারে যেন তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা ও মহিমায় কমিবেশী না করি।

গর্বানুভবের বিষয়: কিরূপ পতাকা এভারেস্ট শৃঙ্গে সর্বাগ্রে উত্তোলন করা হইয়াছে, প্রশ্ন তাহা নয়। পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম বার এভারেস্ট শৃঙ্গে মানবীয় পুরুষ-কারের ধ্বজা উড্ডীন হইয়াছে ইহাই আনন্দের বিষয়।

'সর্বোদয়' হইতে

বরষায়

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

কবির গভীর দৃষ্টি আমার নাই,
কবি হইবার কামনা ছেড়েছি তাই,
আমি পতঙ্গ, নহি স্বর্গের পাখী,
তৃণ ও মাটির অতি কাছাকাছি থাকি।

কবির নিকটে কবিতায় লেখা চিঠি,
মার্জনাহীন ধৃষ্টতা জানি সেটি।
তবু কেন লিখি, রহস্যময় ঠিক
চেতনায় কোন অল্প একটা দিক।

আমাদের এই কঙ্করময় দেশ
যবে বরষায় ধরেছে আর এক বেশ।
জলহীন নদী জলে থৈ থৈ করে,
তৃণহীন মাঠ কোমল শস্যে ভরে।

সারাদিন শুনি ঝম ঝম ঝম ঝম,
সবুজ বনানী হয়েছে সবুজতর।
রাখাল গাহিছে, "বায়ু বহে পূরবিয়া,
বঁধু পরদেশ, কৈছে রাখব জিয়া।"

পাহাড়ের বুকে কভু আলো কভু ছায়া,
শাল ও তমালতলায় ঘনায় মায়া।
সাঁওতালী মেয়ে সেজেছে ফুলের সাজে,
অবেলায় শুনি উতলা মাদল বাজে।

দূরের পথিক মেঠো পথ ধ'রে চলে,
বৃষ্টি আসিলে দাঁড়ায় মহুয়াতলে।
খুঁট হ'তে খুলে খৈনি ফেলিয়া মুখে
ছিন্ন ছাতাটি বাগায়ে বসে সে সুখে।

পদ্মানদীর পারের আমরা লোক,
প্রবাসীর বুকে বর্ষা জাগায় শোক।
মনে পড়ে সেই ধূ ধূ করে জলরাশি,
পাল তুলে দিয়ে নৌকো চলেছে ভাসি।

আনাচে-কানাচে আধা আঙিনায় জল,
দিবস-রাত্রি কল কল ছল ছল।
ভাটিয়ালী গান বাতাসে ভাসিয়া আসে,
কোন্ সে কন্যা, কাহারে সে ভালবাসে।

ভাঙা জাহাজ

শ্রীউমা দেবী

জ্যোৎস্না-রাত্রে মাঠে বেড়াতে গেলে একটি লোকের কথা আমার প্রায়ই মনে পড়ে। তার বয়স পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন, বিষণ্ণ মুখে ক্লান্তির ছাপ, পুরোনো দিনের ডবল-ব্রেষ্ট খাটো-কলার শক্ত ইস্ত্রি-করা সাদা শার্টের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আছে লম্বা সরু গলা, চাউনিতে কেমন এক অসহায় ভাব।

তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির সামনের মাঠে। আমি থাকতাম এন্‌ট্যালিতে, করতাম মাষ্টারি আর ইস্কুলেরই নীচে ছোট একটি ঘরে একলা থাকতাম।

পড়ার নেশা ছিল আমার। বই পড়তাম যত তার চেয়ে বই ঘাঁটতাম অনেক বেশী। এমন কত দিন হয়েছে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে বসে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলি দেখতে দেখতে সন্ধ্যা সাতটা বেজে গেছে। লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে যেদিনই দেখেছি সামনের মাঠে চাঁদের আলোর ঢেউ নেমেছে সেদিনই অন্ততঃ ঘণ্টাখানেক বসে বাড়ী ফিরেছি। সব দিন কাছে পয়সাও থাকত না, হেঁটে হেঁটে বাড়ী পৌঁছতে অনেক রাত হয়ে যেত।

অপেক্ষা করে থাকবার মত কেউ বাড়ীতে ছিল না বলে সেখানে পৌঁছবার তাগাদাও ছিল না। গৃহিণী গৃহমুচ্যতে যে যুগের কথা সে যুগের লোক আমি নই। তবে আমার ভাগ্যে গৃহিণীর মত গৃহও ছিল না। ইস্কুল বাড়ীর নীচের তলায় যে ঘরখানায় থাকতাম তার তিন দিক চাপা—জানলা দরজা বলে কিছু ছিল না। উত্তরে যেদিক খোলা ছিল সেদিকেও হাত-দুয়েক চওড়া গলির পরেই প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ী। সে গৃহে আমি অসূর্য্যম্পশ্যা হয়ে থাকতাম, কারণ উত্তরায়ণের ঢলে পড়া সূর্য্যের পদক্ষেপ মধ্যদিনেও সে বাড়ীতে ঘটত না আর আকাশের মধ্যবিন্দুতে চন্দ্র এসে পৌঁছবার আগেই গভীর সুষুপ্তিতে ঢলে পড়তাম—এত ক্লান্তি থাকত সারা দেহে সারা মনে। তাই অবকাশ পেলেই চাঁদের আলোয় যেদিন সারা মাঠে উজান বইত সেদিন আমি না বসে থাকতে পারতাম না—এ আমার এক নেশা হয়ে উঠেছিল।

যেদিনের কথা বলছি সেদিনও এমনি এক জ্যোৎস্না-রাত। মাঠে চাঁদের আলোর বান ডেকেছে আর বাণবিদ্ধ লোকেরা সেই ডাকে কেউবা যুগলে, কেউবা একলা—অনেকে বা চক্রাকারে বসে সোমদেবের সুধাপানের আসরে মেতে উঠেছে। তাদের অনেকেরই গলায় বেলফুলের মালা, হাতে ধূমায়মান সিগারেট ও অংসে উড্ডীয়মান উত্তরীয়। লম্বা পাঁৎলুন ও খাটো শার্টপরা দু-একজন বৃদ্ধ হাতে ছড়ি, পাশে রূপসী কিশোরী নিয়ে সান্ধ্যভ্রমণ সমাপ্ত করে বাড়ী ফিরছেন। মাঠের মধ্যে জায়গায় জায়গায় কৃষ্ণচূড়ার চূড়ায় চূড়ায় ফুলের জৌলস, শীতের মরশুমী ফুলের কিছু কিছু শোভা মাঠের মাঝে মাঝে ত্রিভুজ চতুর্ভুজ ও মণ্ডলাকার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে। পুবালি বাতাসের মতন উদ্দাম হয়ে বয়ে চলেছে বসন্তের মাতাল দক্ষিণা বাতাস—সাদা পাঞ্জাবী, পাগড়ী আর ধুতি সাদা হাঁসের মত উড়াল দিয়ে উড়ে চলেছে।

আমি এসে ধীরে ধীরে সেখানে বসলাম। সারাদিনের পরিশ্রমের পর ক্লান্তিতে আমার সর্ব্বাঙ্গ ভেঙে পড়ছিল—মনে হচ্ছিল এই মাঠেই চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে খানিকটা ঘুমিয়ে নিই। কিন্তু সেটা আমার রুচিতে বাধল—আমি বসে বসে হাই তুলতে লাগলাম।

ঊর্দ্ধে আকাশে খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘ ভেসে চলেছে চাঁদের উপর দিয়ে। ষোল-কলায় পূর্ণ চাঁদ এক ষোড়শী মেয়ের মত পাতলা সাদা মলমলের রুমালে মুখ মেজে সেগুলি একটি একটি করে উড়িয়ে দিচ্ছে দক্ষিণ বাতাসে—কার কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে কে জানে! আচমকা হাওয়ায় চমকে উঠে ঝর্‌ঝরিয়ে ঝরে পড়ছে কৃষ্ণচূড়ার শিথিলবৃন্ত পাপড়িগুলি আগুনের ফুল্‌কির মত। চাঁদের আলোর স্নিগ্ধ বন্যায় আমার শরীর ক্রমশঃ শীতল হয়ে গেল—যেন স্নান করে উঠলাম। আর দুধের ধারার মতন সেই জ্যোৎস্না অঞ্জলি অঞ্জলি নয়ন ভরে পান করতে লাগলাম।

কতক্ষণ এমনভাবে ছিলাম জানি না। যদিও আমার আশেপাশে খানিকটা দূরে দূরে গোল হয়ে বসে আড্ডাধারীরা গালগল্পে মশগুল হয়ে উঠেছিল তবু তাদের গলার স্বর কানে এলেও কথা বোঝা যাচ্ছিল না বলে আমার নির্জ্জনতা কিছু-মাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি। যতক্ষণ চাঁদের নেশায় বিভোর হয়ে ছিলাম ততক্ষণ আমার চারপাশ দিয়ে অবিরল জনস্রোতের সঙ্গে সঙ্গে বেলফুলওয়ালা বেলফুল-মালা হেঁকে হেঁকে চলে গেল। একটি বাচ্চা ছেলে কতকগুলো তেলের শিশি হাতে ঝুলিয়ে আমার আশেপাশে ঘুরপাক খেতে লাগল। তারপর একের পর এক করে বরফওয়ালা, কুল্‌পিওয়ালা, আলুরদম-ঘুঘনি-ওয়ালা, মুড়িউলি, চীনাবাদামউলি সকলেই একটা সুনির্দ্দিষ্ট সময় বাদ দিয়ে দিয়ে আমার ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে কিনা বারে বারে খোঁজ নিতে লাগল। বিরক্ত হয়ে এক সময় সেই স্থান

ত্যাগ করে মাঠের অপেক্ষাকৃত নির্জনতায় যাব বলে উঠি উঠি করছি—এমন সময় পেছন থেকে কে একজন বলে উঠলেন—উঠছেন বুঝি ! অনেকক্ষণ বসে আছেন অবশ্য—

একটু আশ্চর্য্য হয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছি কোন পরিচিত মুখ দেখবার আশায়, এমন সময় সম্পূর্ণ অপরিচিত এক মূর্ত্তি আমার সামনে এসে বসলেন। মুখখানা কাঁচুমাচু করে অত্যন্ত অপরাধীর মতন তিনি বলে উঠলেন—আর একটু বসুন না স্যার—

যিনি বললেন, তাঁর বয়স হবে পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন। রোগা লম্বা চেহারা, খাটো ধুতি কোঁচা ঝুলিয়ে পরা, গলায় হাতে চক্‌চকে পালিশ-করা শার্ট প্রায় হাঁটু পর্য্যন্ত ঝোলানো। শার্টের গোটা বুকটাও তেমনি শক্ত আর চক্‌চকে পালিস করা। এ ধরণের শার্ট এখন আর কেউ পরে না—খাটো ধুতির সঙ্গে সেই শার্টের অপূর্ব্ব সমন্বয় দেখে আমি কোনমতে হাস্য সম্বরণ করলাম।

তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম সে মুখ শীর্ণ। চক্ষু দুটি কোটরস্থ এবং আঁখিজ্যোতি ম্লান। তাঁর চোখের পাতা ভারী হয়ে ঝুলে এসেছে, চোখের নীচেও প্রগাঢ় কালিমা।

শ্বেতপদ্মের মত শুভ্র সুন্দর ও নিটোল সেই জ্যোৎস্না-রাত্রে এমন একটি কুরূপ কুৎসিত ও বৃদ্ধ মানুষের সাক্ষাৎ মোটেই রুচিকর নয়। আমি চুপ করে থেকে বিরক্তি প্রকাশ করলাম।

তিনি আবার আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, মহাশয়ের নিবাস ?

এ শ্রেণীর প্রশ্নকে আমরা নিতান্ত ঘরোয়া প্রশ্ন বলে মনে করতে শিখেছি। অসীম অবজ্ঞায় এবারও চুপ করে রইলাম।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে থেকে ভদ্রলোক প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কি আপনাকে বিরক্ত করলাম ?

লজ্জিত হয়ে বললাম, না না, বিরক্ত কেন হব। বলুন কি বলছেন।

ভদ্রলোক লোলুপ দৃষ্টি দিয়ে আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন। তারপর ধীরে ধীরে যেন প্রায় নিজের মনেই বললেন, আমারও এক কালে এমনই স্বাস্থ্য ছিল।

তাঁর দীর্ঘশ্বাস ফেলা দেখে তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই আমি বললাম, বয়স হলে স্বাস্থ্যহানি সবারই ঘটে।

মুখে আমি একথা বললাম বটে, কিন্তু তাঁর চেহারা দেখে আমার দৃঢ় প্রত্যয় হ'ল যে, উচ্ছৃঙ্খল যৌবনে ইনি অনেক অত্যাচার করেছেন—বিশেষ করে ঐ ঝোলা ঠোঁট সেই রকম ইঙ্গিতই দিচ্ছিল।

ভদ্রলোক আবার একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, তারপর হঠাৎ ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনি কি বিবাহ করেছেন ?

এবার আমার দীর্ঘশ্বাস ফেলার কথা। সে সময় এক অনিশ্চিত প্রেমের পঙ্কে আমি আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে ছিলাম। একমাত্র উদ্বাহ-বন্ধনের রজ্জুই আমাকে সেই নিমজ্জন থেকে টেনে উদ্ধার করতে পারত, কিন্তু আমি কিছুতেই তাঁকে এ বিষয়ে রাজী করাতে পারছিলাম না। দীর্ঘশ্বাস গোপন করে আমি তাঁকে সংক্ষেপে উত্তর দিলাম—না।

ভদ্রলোক আবার আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে প্রায় শাসনের ভঙ্গিতে বললেন, কেন, বিবাহ করেন নি কেন?

এই স্পর্দ্ধিত প্রশ্নে আমার রাগ করার কথা! কিন্তু তাঁর প্রশ্নে শাসনের ভঙ্গি থাকলেও দৃষ্টিতে একটা কাতর হতাশা ছিল, যেন তাঁর জীবন-মরণ এই প্রশ্নের উত্তরের উপরই নির্ভর করছে। করুণায় কোমল হয়ে সত্য গোপন করে আমি আস্তে আস্তে বললাম, বিবাহ করব না—ঠিক করেছি।

ব্যাকুল হয়ে কাতর স্বরে ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, না না, ওকথা বলবেন না—ওকথা বলবেন না। বয়সের একটা ধর্ম্ম আছে, বিপথে পড়তে কতক্ষণ ?

ভদ্রলোক হাত কচলাতে লাগলেন। আমার মত সম্পূর্ণ এক অপরিচিত ব্যক্তির জন্য তাঁর অকারণ এই ব্যাকুলতা ও কাতরতা দেখে আমার বেজায় হাসি পেল। আমি রুমাল বার করে মুখ মোছার ছলে ভদ্রতাবশতই হাসি গোপন করলাম। তিনি আমার আচরণের প্রতি দৃক্‌পাত মাত্র না করে নিজের মনেই বলে যেতে লাগলেন—আরে, ওরকম অনেক কথা যৌবনকালে আমরাই কি বলি নি, তখনকার দিনে জিতেন্দ্রিয় লক্ষণ ভট্টকে কে না চিনত ? এই দশাসই চেহারা—ইয়া বুক—ইয়া গালপাট্টা! রোজ যোগাসন অভ্যাস করে—মেয়েমানুষের দিকে ফিরেও তাকায় না—

বলতে বলতে ভদ্রলোকের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল —এক অস্বাভাবিক রক্তোচ্ছ্বাসে সমস্ত মুখ গন্‌গন্ করতে লাগল। তারপরেই হঠাৎ সেই রক্তোচ্ছ্বাস অপসারিত হয়ে মুখখানা মড়ার মুখের মতন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তিনি যেন চুপসে গিয়ে ঘাড় নীচু করে বসে রইলেন, তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আবার সুরু করলেন—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কি হ'ল তার! কি হ'ল ? থিয়েটার দেখতে গিয়ে সখিদলের মধ্যে কামদাকে দেখে কি হ'ল তার ? ধর্ম্ম গেল, যৌবন গেল, যশ গেল—এল শুধু গ্লানি আর নিন্দা! শেষকালে দেখুন, এই বুড়ো বয়সে শাস্ত্রমতে এক কুলকন্যা

বিবাহ করে পর বুঝেছি দাম্পত্য প্রেমই সবচেয়ে নির্ম্মল।

ভদ্রলোক একটু দম নিয়ে হঠাৎ অন্তরঙ্গতার গলে গিয়ে বলতে লাগলেন, জানেন ত—স্ত্রী-ই হচ্ছে শক্তি, এখন শক্তি-সাধনায় মন দিয়েছি। বাজে গল্প উপন্যাস লেখা ছেড়ে দিয়ে সুরু করেছি মহাকাব্য লেখা—

এতক্ষণ তবু এক রকম চলছিল, এবার আর সন্দেহমাত্র রইল না যে আমি এক পাগলের পাল্লায় পড়েছি। তাঁর হাঁটু পর্য্যন্ত লম্বা পুরোনো ধরণের শার্টের বুকজোড়া চক্‌চকে শক্ত ইস্ত্রি আর খাটো ধুতির ঝোলানো পরিপাটি কোঁচা, তাঁর নিষ্প্রভ চোখ ও শীর্ণ মুখের আকস্মিক রক্তাভ উচ্ছ্বাস আর এই রকম গায়ে-পড়া অন্তরঙ্গতা—এ সবই আমার প্রত্যয়কে দৃঢ় করতে লাগল। এক ঘৃণামিশ্রিত অবজ্ঞায় আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কোথায় থাকেন ?

—বাদুড়বাগানে।

—সেখান থেকে এত দূর এসেছেন বেড়াতে ?

ভদ্রলোক আহত হলেন। আব্‌দারের ভঙ্গিতে বলতে লাগলেন, এটুকু আর কি এমন হাঁটা! তা ছাড়া—তা ছাড়া—কত লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, এই যেমন আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। এককালে লক্ষণ ভট্টকে চিনত না এমন লোক ছিল না। তার লেখা "ভুল না ফুল" উপন্যাস নিয়ে এক দিন সাড়া পড়ে গিয়েছিল। আপনারা এ যুগের লোক, সে যুগের খবর আর কি করে রাখবেন বলুন!

এইটুকু বলে তিনি চোখ বুঁজে খানিকক্ষণ বসে রইলেন।

আমার ইচ্ছে হতে লাগল উঠে চলে যেতে। তিনি চোখ খুলে আবার সুরু করলেন—কিন্তু ওসব কিছু না। ওসব যশের কোন মূল্য নেই। পতিতার প্রেম কত খাঁটি—এইটি বলবার জন্যই আমার উপন্যাসের কাহিনী রচনা করেছিলাম। কি বিক্রীই হয়েছিল—কত প্রশংসাই পেয়েছিলাম। শেষকালে এক দিন কামদা পর্য্যন্ত বলেছিল, আমাকে বিয়ে কর তুমি, নিয়ে চল সদ্‌গুরুর কাছে—

এসব আলাপকে পাগলের প্রলাপ বলে ধরে নিয়ে আমি ভাবলাম এখানে আর থাকা উচিত নয়। বললাম, এবার উঠি, অনেক দূর যেতে হবে।

কথাটা শুনেই ভদ্রলোক ভীষণ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন আর অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে বলতে লাগলেন, না না, এখন উঠবেন না। বসুন, আর একটু বসুন। ভাবছেন বুঝি এক মাতালের বদখেয়ালের কথা শোনবার কি দরকার ? সত্যি বলছি, এক কালে মদ খেলেও এখন আর খাই না। কেন খাই না জানেন ? সেও এই আমার সতী-সাধ্বী স্ত্রীর জন্যে। তিনি এক দিন আমার পা ধরে বললেন, আমার মাথা খাও, আর ওসব খেয়ো না—

—আর আপনিও তখ্‌খুনি ছেড়ে দিলেন, তাই না ?—বিদ্রূপ করে আমি বললাম।

আমার কথাটা তাঁর মুখে যেন এক চাবুকের কশা বসিয়ে দিল। প্রায় আর্ত্তনাদ করে তিনি বললেন, না না, সেদিন ছাড়ি নি। বরঞ্চ সেকথা বলবার জন্যে রেগে গিয়ে তার পিঠে এমন পদাঘাত করেছিলাম যে লাঞ্ছনার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে সেই রাত্রেই তিনি আত্ম-ঘাতী হয়েছিলেন। সে আজ প্রায় পঁচিশ বছর আগেকার কথা। কিন্তু—

এই পর্য্যন্ত বলে ভদ্রলোক অত্যন্ত অন্তরঙ্গ হয়ে আমার কাছে ঘেঁসে বসলেন। আমার পকেটে টাকা-পয়সা বা রুমালটুকু পর্য্যন্ত ছিল না, কাজেই তাঁর এই ঘনিষ্ঠতায় কোনও আপত্তি জানালাম না। তিনি আমার কানের কাছে মুখ এনে গোপন কথা বলবার মতন করে বলতে লাগলেন, কিন্তু সতী-সাধ্বী সে। জন্মজন্মান্তরে আমাকেই স্বামী বলে জেনেছে, আমাকে ছেড়ে কি থাকতে পারে ? পঞ্চাশ বছর বয়সে আমি যে একটি চৌদ্দ বছরের মেয়েকে বিবাহ করেছি—কেন ? তাকে আমার সেই স্ত্রী বলে চিনতে পেরেছি বলে ত! সে যদি আমার পূর্ব্বেকার স্ত্রী না হ'ত—আমার সাধ্য ছিল হিন্দু হয়ে আর কাউকে বিবাহ করা ? সর্পদংশন হয়ে যেত না ?

বাহবা রে—কলিযুগের মহাদেব—আমার চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে হ'ল। কিন্তু চীৎকার না করে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি বই লিখছেন ?

ভদ্রলোক বললেন, মহাকাব্য, গোটা মহাভারতের পদ্যানুবাদ। তার মধ্যে আবার কতকগুলি চরিত্রের ব্যাখ্যা-মূলক অনুবাদও আছে।

এইটুকু বলে তিনি এক দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, যৌবন বয়সে ভ্রান্তপথে চললাম, সংসার-ধর্ম্ম করলাম না, মানব-ধর্ম্ম বুঝলাম না। কামিনী আর কাঞ্চন নিয়ে মেতে রইলাম। অমন জোয়ান বয়সে যদি আরম্ভ করতাম—তা হলে এত দিনে শেষ হয়ে যেত।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার স্ত্রী সে মহাকাব্য পড়েন, বোঝেন ?

ভদ্রলোক কেন জানি না উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, বললেন, না না, তিনি লিখতে পড়তে জানেন না। আমি রাত্রে পড়ে শোনাই, তিনি শোনেন, তা—খুব তদ্‌গতচিত্ত হয়েই শোনেন। সংসারের কাজকর্ম্ম তখন থাকে না, ছেলেটিও ঘুমিয়ে পড়ে—

—ছেলের বয়স কত ?

৩। আম

ইহার শাখা পঞ্চপল্লবের অন্তর্ভুক্ত। মঙ্গলকার্য্যে যে ইহা ব্যবহৃত হয় তাহা সকলে জানেন। এতদ্ভিন্ন আম্রমুকুল শিবপূজা, সরস্বতীপূজায়ও প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়।

প্রথমে আম্রের উৎপত্তি যে দক্ষিণ এশিয়ায় হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। হিমালয়ের পাদদেশে, বিশেষতঃ সিকিম, খাসিয়া পাহাড়, আরাকান, পেগু ও আন্দামান দ্বীপে বর্ত্তমান আচার্যজাতীয় আমের বন্য গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। চীন, ফিলিপাইন ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে আম পরে প্রবর্তিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশে ইহার প্রবর্ত্তন হয় আরও পরে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আমেরিকার ব্রেজিল প্রদেশে প্রথমতঃ আম লইয়া যাওয়া হয়। এখন ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ও আমেরিকার নানাস্থানে অল্পবিস্তর পরিমাণে আম উৎপাদিত হইতেছে। আম্র কিন্তু ভারতের বিশিষ্ট ফল এবং চাষ দ্বারা এতদ্দেশে ইহার প্রায় ৫০০ শত প্রকারভেদ সৃষ্টি হইয়াছে। সুস্বাদু ফল ও সুস্নিগ্ধ ছায়া প্রদান ব্যতীত আম্রবৃক্ষ আরও নানাবিধ উপায়ে মানুষের কাজে লাগে। তক্তা, কড়ি, বরগা প্রভৃতি প্রস্তুতিতে, নৌকার খোল ও জাহাজ নির্ম্মাণে এবং চালানি বাক্স নির্ম্মাণেও আমকাঠের ব্যবহার যথেষ্ট হইয়া থাকে।

গুণাবলী—আমের নানাবিধ রোগনাশক গুণ আছে। পক্ব আম্র প্রসাদক, মেদবর্দ্ধক ও মৃদুবিরেচক। কাঁচা আম বা আমচুর স্কার্ভি নিবারক।

৪। ইক্ষু

ইক্ষুর ন্যায় ফসল প্রাচীন ভারতের আর্য্যগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল এবং দেবপূজায় ব্যবহৃত হইত। দক্ষিণ এশিয়ায় ইক্ষুর জন্ম, তথা হইতে উহা আফ্রিকায় ও আমেরিকায় নীত হয়। প্রসিদ্ধ উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ De Candolle-এর মতে বঙ্গদেশ হইতে কোচিন-চীনের মধ্যস্থ ভূখণ্ডেই ইক্ষু প্রথম দেখা দেয়।

প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে গুড় ও শর্করার ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে। কোচিন চীনের দিক হইতে ইক্ষু প্রথমে চীনে প্রবেশলাভ করিলেও ভারতই সর্ব্বাগ্রে চীনকে গুড়ের সহিত পরিচিত করায়।

৫। কদলী

হিন্দুগণের মঙ্গলকার্য্যে কলার গাছ ও কদলীপত্র আবশ্যক হয়। কদলীর ন্যায় উপকারী উদ্ভিদ গ্রীষ্মমণ্ডলে বিরল বলিয়াই প্রাচীন হিন্দুরা ইহার এত আদর করিতেন। কলার পুষ্টিকারিতার কথা ছাড়িয়া দিলেও ইহা হইতে আরও অনেক উপকার পাওয়া যায়। আধুনিক গবেষণা হইতে জানিতে পারা গিয়াছে যে, ১ টন (২৭।০ মণ) শুষ্ক কলার খোলা হইতে ২৭ পাউণ্ড (১৩।০ সের) পটাস কার্ব্বনেট পাওয়া যায়। এই জন্য কিছু দিবস পর্য্যন্ত রজকগণ বস্ত্র ধুইবার জন্য কলার খোলের ছাই যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োগ করিত। বাংলা, উড়িষ্যা ও দাক্ষিণাত্যে কলার পাতা প্রচুর পরিমাণে অন্ন-পাত্ররূপে ব্যবহৃত হয়। ত্রিবাঙ্কুরে কদলীপত্র হইতে একপ্রকার চট প্রস্তুত হয়।

ঔষধার্থে কদলীর অনেক প্রকার ব্যবহার প্রচলিত আছে। অপক্ব কদলী বহুমূত্র রোগীর পক্ষে উপকারী খাদ্য। ইহার মৃতও প্রস্তুত হয়।

৬। কুশ

ভারতের সর্ব্বত্র কুশ পাওয়া যায়। অতি প্রাচীন কাল হইতে হিন্দুগণ এই তৃণকে শ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছেন। প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থে ইহার অনেক নাম আছে, যথা—দর্ভ, সূর্য্যাগ্র, পুণ্যতৃণ, যজ্ঞভূষণ ইত্যাদি।

কুশের অন্যবিধ উপকারিতা অর্থাৎ গৃহনির্ম্মাণে কুশরজ্জু, গৃহ-সজ্জায় কুশাসন, কুশের চাটাই প্রভৃতি ভারতে বহুকাল পূর্ব্বে উপলব্ধ হইয়াছিল।

৭। গোধূম

গোধূমের আদি জন্মস্থান কোথায় তাহা ঠিক নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় না। অনেক উদ্ভিদতত্ত্ববিদের মতে ছয়-সাত হাজার বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান মেসোপটেমিয়ার কোন স্থান হইতে গোধূম পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় দিকেই প্রসারলাভ করিয়াছিল। গোধূমের দৈব উৎপত্তি সম্বন্ধে রোমক, গ্রীক ও হিন্দুগ্রন্থে যে সমস্ত প্রবাদ সন্নিবদ্ধ আছে তাহা হইতে অনুমান করা যায় যে, এই সকল জাতি যখন ব্যাপকভাবে গোধূম চাষ আরম্ভ করে তাহার বহু পূর্ব্বে হইতেই গোধূম খাদ্যশস্যরূপে পরিচিত ছিল। এইরূপ প্রবাদের সত্যতা জনকরাজার লাঙ্গলের ফলা দ্বারা কর্ষিত জমি হইতে সীতার উদ্ভব ব্যাপারে পরিস্ফুট।

ঋগ্বেদে কৃষির অধিষ্ঠাত্রীরূপে সীতার স্তব আছে। যাগযজ্ঞে হিন্দুদের ন্যায় গ্রীক এবং রোমকগণও গোধূম ব্যবহার করিতেন। গোধূমের প্রতি শ্রদ্ধার মূলে খাদ্যশস্যরূপে ইহার উপকারিতা যে নিহিত আছে তাহা বলা বাহুল্য।

৮। চন্দন (শ্বেত-চন্দন)

চন্দনের ব্যবহার ভারতে বোধ হয় প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। "মলয়জ" নামদ্বারা ইহার উৎপত্তিস্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে মহীশূর ও কুর্গরাজ্যেই প্রধানতঃ চন্দনবৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশের কোন কোন জেলায়ও অল্পবিস্তর পরিমাণে চন্দন পাওয়া যায়।

যাস্ক প্রণীত নিরুক্তে চন্দনের উল্লেখ আছে। উক্ত গ্রন্থ খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। রামায়ণে এবং মহাভারতেও নানা স্থানে চন্দন ব্যবহার-প্রথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থাদির মধ্যে কথাসরিৎসাগরে চন্দন স্বর্গের তরু বলিয়া উক্ত হইয়াছে এবং সূর্য্যের রথ চন্দনকাষ্ঠে নির্ম্মিত ও সুবর্ণমণ্ডিত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

পূজানুষ্ঠানে, অঙ্গরাগে এবং তিলকরচনা প্রভৃতি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে চন্দনের ব্যবহারের কথা সুবিদিত। এতদ্ভিন্ন পারসিক ও হিন্দুগণের মধ্যে শবদেহ-সৎকারেও চন্দনকাষ্ঠ দেওয়া হয়। চীনে ধনবান ব্যক্তিগণের শব চন্দনকাষ্ঠনির্ম্মিত শবাধারে রক্ষিত হয়। আলেক-

আণ্ডারের সময় হইতেই চন্দনকাষ্ঠ প্রাচীন গ্রীসে বিশেষরূপে পরিচিত হয়। চন্দনের প্রলেপ মস্তকবেদনা, চুলকানি, ঘামাচি, ইরিসিপিলাস প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয়। উহা সংক্রামকতানাশক এবং দুর্গন্ধযুক্ত পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস রোগেও বিশেষ ফলপ্রদ।

৯। জাফ্রান

জাফ্রানের আদি জন্মস্থান পশ্চিম-এশিয়া; কিন্তু কোন্ অঞ্চলে তাহা ঠিক নির্দ্ধারণ করা যায় না। সুদূর অতীতকাল হইতে এশিয়া মাইনর, পারস্য ও কাশ্মীরে জাফ্রান উৎপাদিত হইয়া আসিতেছে। উজ্জ্বল পীতবর্ণ ও সুগন্ধের জন্য প্রধানতঃ ইহার কদর। জাফ্রান শব্দ পারসিক জরদ হইতে উদ্ভূত। কাশ্মীরে জাফ্রান কেশর নামে অভিহিত হয় এবং এই নামই হিন্দীতে প্রচলিত।

শুধু ভারতে নয়, চীন, পারস্য, আরব, গ্রীস, ইটালী এবং স্পেনেও জাফ্রান নানাবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠানে ও মঙ্গলকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপে স্পেন ও ফ্রান্সের কতিপয় জেলাই জাফ্রান উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। জাফ্রান ঔষধে সুগন্ধের জন্য ব্যবহার করা হয়। ইহা ব্রিটিশ ফার্ম্মাকোপিয়ার অন্তর্ভুক্ত। গুণাবলী—উত্তেজক ও বায়ুনাশক।

১০। তুলসী

বৈদিক যুগে তুলসীর তত প্রাধান্য না থাকিলেও পৌরাণিক যুগ হইতে ইহা শুধু যে পূজার অন্যতম উপকরণ হইয়াছে তাহা নহে; ইহা নিজেই পূজ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে তুলসী-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে একটি বিশেষ অধ্যায় আছে এবং পদ্মপুরাণের শেষাংশেও তুলসীকে যথেষ্ট ভক্তি করিতে বৈষ্ণবদিগকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। যদিও ক্ষেত্রবিশেষে শিবপূজায় প্রযুক্ত হয়, তথাপি তুলসী বিষ্ণুপূজারই উপকরণ।

অধিকাংশ হিন্দুর গৃহে মঞ্চ করিয়া তুলসীগাছ রক্ষা করার প্রথা আছে। তুলসীমঞ্চকে বৃন্দাবনও বলা হয়। তুলসীমঞ্চে সময়বিশেষে জলধারা এবং প্রতিসন্ধ্যার প্রদীপ দেওয়ার প্রথা বাঙালী হিন্দুর ঘরে ঘরে বিদ্যমান। হিন্দুর জীবনে মরণে সব সময়েই তুলসী আবশ্যক। এক দিকে যেমন সদ্যোজাত শিশুর মুখে তুলসীপত্রযুক্ত চরণামৃত দেওয়ার প্রথা কোন কোন স্থানে আছে; অন্য দিকে তেমনি সদ্যমৃত ব্যক্তির মস্তক তিল-তুলসীর জলধারা ধৌত করিয়া দেওয়া হয়, এবং বক্ষে তুলসীমঞ্জরী রক্ষিত হয়। এক সময়ে আদালতেও শপথ গ্রহণ করিবার জন্য তুলসী, তামা, গঙ্গাজল, এমন কি শালগ্রামও আবশ্যক হইত।

বঙ্গদেশে নিম্নলিখিত কয়েক জাতীয় তুলসী সচরাচর দৃষ্ট হয়:

কৃষ্ণতুলসী

ইহা সচরাচর গৃহ-প্রাঙ্গণে রোপিত হয়। ইহার জন্মস্থান অবিদিত। পশ্চিমে আরব হইতে পূর্ব্বে অস্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত ইহার প্রসার।

রামতুলসী

সাধারণতঃ দেবালয়ের পার্শ্বে অথবা বাগানে রামতুলসী গাছ দেখা যায়। ইহা সাধারণ তুলসীর দ্বিগুণ উচ্চ হয় (পাঁচ-ছয় ফুট) এবং তুলসীর অপরাপর জাতি অপেক্ষা ইহার সুগন্ধ অধিক। মাড়োয়ার প্রদেশে ইহা বন্য অবস্থায় দেখা যায়।

শ্বেত-তুলসী

ইহার গাছ দুই ফুটের অধিক উচ্চ হয় না। কোমল পাতা ও কাণ্ড সূক্ষ্ম কেশযুক্ত বলিয়া অনেকটা শ্বেতাভ দেখায়। ইহা কৃষ্ণ-তুলসীর ন্যায় সহজপ্রাপ্য নয়।

বাবুই তুলসীর গন্ধ হিন্দুগণ বিশেষ পছন্দ করেন না এবং হিন্দু-সমাজে ইহার তাদৃশ আদর নাই। মুসলমান-সমাজে ও পাশ্চাত্ত্য জগতে বাবুই তুলসী শ্রদ্ধার জিনিষ।

সকল তুলসীতেই অল্পবিস্তর essential oil (বায়বী তৈল) আছে। সূর্য্যোত্তাপে উক্ত তৈলের বিকীরণ দ্বারা স্থানীয় বায়ু কতক পরিমাণে শোধিত হওয়া সম্ভবপর।

গুণাবলী—তুলসীপাতার রস কফনিঃসারক। মূলের কাথে অবিরাম জ্বরে বেশ উপকার দর্শে। বীজ স্নিগ্ধকারক।

১১। তিল

সাধারণতঃ দুই জাতীয় তিলের চাষ হয়—কৃষ্ণ ও শ্বেত তিল। কৃষ্ণ তিলে তৈলের মাত্রা অধিক, সেজন্য ইহার চাষ বহুবিস্তৃত। শ্বেত তিল প্রধানতঃ পিষ্টকাদি প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়। ধর্ম্মানুষ্ঠানে তিলের ব্যবহার বৈদিক যুগের শেষভাগে সূচিত হইয়াছিল। ব্রহ্মপুরাণের মতে তিল যম কর্ত্তৃক সৃষ্ট এবং উহা অমরত্বব্যঞ্জক। মৃতের উদ্দেশ্যে তিল তর্পণ করা হয়। প্রাচীন ভারতে তিলই বোধ হয় প্রথম আবিষ্কৃত তৈলবীজ। তিলের নাম হইতে তৈল শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। ভারতবর্ষে ইহার ব্যবহার যে ২০০০ বৎসরেরও অধিক পুরাতন তাহা অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

তৈল ব্যতীত খাদ্যরূপে তিলের ব্যবহার এক সময়ে যথেষ্ট ছিল এবং এখনও উঠিয়া যায় নাই। যথা—তিলকুটো, তিলের লাড্ডু।

তিলের ব্যবহারিক প্রয়োগ নানাবিধ। মাদ্রাজে, গুজরাটে ও বাংলায় সরিষার তৈলের ন্যায় তিল তৈলের যথেষ্ট প্রচলন আছে। ফুলের ও অন্যান্য সুবাসিত তৈলের মূল উপাদান তিল তৈল। গুণাবলী—অধিকাংশ কবিরাজী তৈল তিল তৈলের দ্বারাই প্রস্তুত।

তিলের স্নিগ্ধকারক, পোষক, বলকারক, মূত্রকারক ও দুগ্ধ-নিঃসারক গুণ আছে। অর্শরোগে ইহা বিশেষ উপকারী। আমাশয় ও মূত্ররোগে অন্যান্য ঔষধের সহিত তিল ব্যবহৃত হয়। বিলাতী জলপাইয়ের তৈল (olive oil) যে সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, তিল তৈলের দ্বারা সেইরূপ উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে।

১২। দাড়িম্ব

নব পত্রিকার উপাদানের মধ্যে ইহা একটি। প্রাচীন আর্য্যগণ

যে সমস্ত প্রদেশের ভিতর দিয়া ভারতে আগমন করিয়াছিলেন, সেই সকল দেশ অর্থাৎ পারস্য, আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান প্রভৃতি, দাড়িম্বের আদি বাসস্থান। পঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম হিমালয়ের নিম্নাংশ—এই সমস্ত স্থানেই রম্য ডালিম সহজপ্রাপ্য ও সুলভ। কাশ্মীরে দেবালয়-প্রাঙ্গণে দাড়িম্বগাছ রোপিত হইতে এবং ফুল ও ফল পূজায় ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

গুণাবলী—দাড়িম্বমূলের ছাল কৃমিনাশক ও ঈষৎ সঙ্কোচক। ইহার কাথ দন্তপীড়ায় কুলিরূপে ব্যবহৃত হয়।

১৩। দূর্ব্বা

দূর্ব্বা ভারতের সর্ব্বত্রই জন্মিয়া থাকে। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপকভাবে এবং সর্ব্বত্র জ্ঞাত সাধারণ ঘাস। দূর্ব্বা এতদ্দেশের পশুখাদ্যের শতকরা ৬০ ভাগ একথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাচীন আর্য্যগণ জীবনধারণের জন্য প্রধানতঃ পশুপালনের উপর নির্ভর করিতেন। কৃষির প্রাধান্য তখনও ততটা হয় নাই। সুতরাং তখন দূর্ব্বা তাঁহাদের নিকট যথেষ্ট সম্মানজনক উদ্ভিদ হইয়া দাঁড়িয়াছিল। ধর্ম্মগ্রন্থাদিতে দূর্ব্বাকে নম্রতা, প্রাচুর্য্য ও দীর্ঘস্থায়িত্বব্যঞ্জক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

ঋগ্বেদে দূর্ব্বার উল্লেখ আছে। অথর্ব্ববেদে দূর্ব্বা-স্তোত্র উল্লিখিত হইয়াছে। দূর্ব্বা বিষ্ণু ও গণেশের প্রিয় উদ্ভিদ।

গুণাবলী: মূলসমেত সমস্ত তৃণ সঙ্কোচক, বমননিবারক ও মূত্রকারক। দূর্ব্বার রস সেবনে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। নাসা ও ক্ষতস্থানের রক্তস্রাব নিবারণার্থ দূর্ব্বা খুবই ফলদায়ক। গ্রীষ্মাগমে অপর সমস্ত ঘাস মরিয়া যায়, কিন্তু দূর্ব্বা মরে না।

১৪। ধান্য

ধান্যচাষের সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন বিবরণ চীনের ইতিহাসে পাওয়া যায়। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২৮০০ অব্দে তদানীন্তন চীনসম্রাট একটি পর্ব্বের প্রবর্ত্তন করেন। উক্ত পর্ব্ব উপলক্ষে পাঁচটি প্রধান খাদ্যশস্য বপন করা হইত। তন্মধ্যে সম্রাট নিজ হস্তে ধান্য বপন করিতেন। ভারতে ধান্যের চাষ চীন ও ব্রহ্মদেশ অপেক্ষা পরবর্ত্তীকালের হইলেও চীন হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত ভূখণ্ড যে ধান্যের আদি জন্মভূমি সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। পঞ্চশস্যের মধ্যে ধান একটি। সেকেন্দর শাহের আগমনের সময়, অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে উত্তর-ভারতে ধান্যচাষ অল্পবিস্তর প্রসারলাভ করিয়াছিল।

ঋগ্বেদের সময় খাদ্যশস্যরূপে বোধ হয় ধান্যের প্রচলন হয় নাই। অথর্ব্ববেদে যব, মাষ, তিলের সহিত ব্রীহি অথবা ধান্যের কথা বলা হইয়াছে। বিবাহের সময় তণ্ডুল নিক্ষেপ ও ধান দূর্ব্বার ব্যবহার সকলেই জানেন। চালের আর এক প্রকার বিচিত্র ব্যবহার স্থানে স্থানে দেখা যায় "চাল পড়া"।

গুণাবলী: উদরাময় অথবা আমাশয় রোগে চিঁড়ার ব্যবহার সকলেই জানেন। চাউল ভিজানো জল ঔষধসেবনে ও পানীয় রূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা সকলের জানা উচিত যে, এক সের চাউল আড়াই সের জলে সুসিদ্ধ হয় এবং ফেন ফেলিয়া দিতে হয় না। ফেন ফেলিয়া দেওয়া অপচয় ভিন্ন আর কিছু নহে।

১৫। ধুতুরা

ধুতুরার বিভিন্ন জাতি ভারতের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। সমতল প্রদেশে সাদা ও ঘোর বেগুনী রঙের ধুতুরা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ফুলের বর্ণের অনেক বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় ও ফুল সময় সময় জোড়া (double) হইয়া থাকে। সাধারণ লোকের বিশ্বাস ধুতুরা শিবের প্রিয় পুষ্প। কিন্তু শাস্ত্রাদিতে শিবপূজায় ধুতুরার বিশেষ প্রয়োগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। বোধ হয়, ধুতুরা বীজ-মাদক বলিয়া এবং বিষ ও মাদক দ্রব্যমাত্রেরই সহিত মহাদেবের অল্পবিস্তর সম্বন্ধ থাকায় শিবের সহিত ইহার সম্পর্ক কল্পিত হয়। পূর্ব্বকালে ঠগীরা চৌর্য্য ও নরহত্যাবৃত্তিতে ধুতুরা-বীজ যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করিত। কাশ্মীরে শিবপূজায় ধুতুরার ফুল ব্যবহার এবং সাধু সন্ন্যাসিগণের জটায় অথবা কর্ণমূলে শ্বেতধুতুরার ফুলধারণ বিরল নহে।

গুণাবলী: ইহার গুণ—প্রধানতঃ উন্মাদক, পাচক, বমনকারক এবং উত্তাপজনক। জ্বরে, নানাবিধ চর্ম্মরোগে এবং উন্মাদরোগে ইহার ব্যবহার আছে। কোন স্থান ফুলিয়া গেলে ধুতুরা পাতা থেঁতো করিয়া হরিদ্রার সহিত প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে। দন্তশূল ও হাঁপানিতে ধুতুরা-পাতা ব্যবহৃত হয়। ইহার অরিষ্ট বেলেডোনার সদৃশই কার্য্য করে।

১৬। নারিকেল

নারিকেলের আদি উৎপত্তিস্থান কোথায় তৎসম্বন্ধে প্রচুর মতভেদ আছে। সুবিখ্যাত উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ ডি. কোণ্ডোল বিবিধ প্রমাণাদি বিচার করিয়া এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে, মালয় ও প্রায় তৎসন্নিহিত দেশসমূহই নারিকেলের আদি জন্মভূমি। তথা হইতে চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে নারিকেল চীন, সিংহল ও ভারতের দিকে প্রসারলাভ করে। সমুদ্রস্রোতবাহিত ফল দ্বারা আমেরিকা ও আফ্রিকার উপকূলে নারিকেলের প্রথম প্রবর্ত্তন হয়। তাহা সম্ভবতঃ আরও আগে হইয়াছিল। নারিকেল বিশ্বামিত্র দ্বারা সৃজিত হয় বলিয়া একটি কিংবদন্তী আছে। উহা হইতে একথা অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, নারিকেল এতদ্দেশীয় আদিম উদ্ভিদ নহে, প্রবর্ত্তিত বৃক্ষ। বর্ত্তমান সময়ে নারিকেল ভারতের উপকূল অংশে প্রায় সর্ব্বত্রই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। নারিকেল হইতে যে সমস্ত পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তন্মধ্যে প্রধান বলা যাইতে পারে শাঁস ও জল, ছোবড়া, কোপ্‌রা, শুষ্কীকৃত শাঁস ও তৈল। এত উপকারী ফল বলিয়াই সম্ভবতঃ শাস্ত্রকারগণ পূজায় ইহার ব্যবহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

নারিকেলের জল স্নিগ্ধকারক, জ্বর ও মূত্ররোগে ইহার ব্যবহার আছে। অপক্ক নারিকেল কুরিয়া যে দুগ্ধবৎ পদার্থ পাওয়া যায় তাহা

পুষ্টিকর খাদ্য। নারিকেলের কৃমিনাশক গুণও আছে। পক্ক নারিকেল হইতে কবিরাজী নারিকেলখণ্ড প্রস্তুত হয়; ইহা অতিসার ও ক্ষয়-রোগের ঔষধ।

পূজা-পার্ব্বণ অথবা মঙ্গলকার্য্য উপলক্ষে ঘটস্থাপন করিতে নারিকেলের আবশ্যক হয়। পার্ব্বণ, বিবাহ, দ্বিতীয় সংস্কার, প্রথম গর্ভ, উপনয়ন ইত্যাদি উপলক্ষে নারিকেল ও মিষ্টদ্রব্য বিতরণের প্রথা দাক্ষিণাত্যে প্রায়শঃই দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের অন্যান্য স্থানে নারিকেলের পরিবর্ত্তে উপরোক্ত অনুষ্ঠানাদিতে সুপারি ব্যবহৃত হয়।

১৭। পদ্ম

প্রথম পদ্মের উৎপত্তি ঠিক কোন্ দেশে হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। বর্ত্তমান সময়ে ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই পদ্ম দেখিতে পাওয়া যায়। পশ্চিমে উত্তর আফ্রিকা ও পারস্য হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বে মালয়, শ্যামদেশ, চীন, জাপান, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ও অষ্ট্রেলিয়ার গ্রীষ্মমণ্ডল পর্য্যন্ত পদ্ম প্রসারলাভ করিয়াছে। প্রাচীন মিশরে পদ্মবীজ পবিত্র বীজ (sacred bean) বলিয়া পরিগণিত হইত, কিন্তু এখন পদ্ম আর তথায় জন্মায় না। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রে পদ্মের স্থান খুবই উচ্চে। বাস্তবিক পূজার পুষ্পসমূহের মধ্যে ইহার ন্যায় প্রাচীন আর কোনও ফুল নাই। ব্রহ্মা শতদলে বাস করেন। লক্ষ্মীর আসনও কমল। "ওম্ মণিপদ্মে হুং"—এই মন্ত্র হইতে বৌদ্ধগণের পদ্মের প্রতি শ্রদ্ধার মাত্রা বুঝিতে পারা যায়।

সংস্কৃত-সাহিত্যে তিন প্রকার পদ্মের উল্লেখ আছে—শ্বেত, রক্ত ও নীল। ইহাদিগকে যথাক্রমে পুণ্ডরীক, কোকনদ ও ইন্দীবর নাম দেওয়া হইয়াছে। গোটা পদ্মগাছের নাম পদ্মিনী; বীজকোষ —কর্ণিকার; মধু—মকরন্দ; পরাগবৃন্ত—কিঞ্জল্ক এবং পত্রবৃন্ত— মৃণাল। পদ্মগাছের প্রত্যেক অংশের বিশেষ বিশেষ নাম থাকায় উহাদের ব্যবহারিক প্রয়োগ ছিল বলিয়া মনে হয়। ঠিক পদ্মের কোন নীল পুষ্পযুক্ত জাতি নাই। বঙ্গদেশে কেবল শ্বেত ও ফিকে লাল বর্ণের পদ্ম আছে। রক্তবর্ণ পদ্ম চীন হইতে আমদানি।

হাকিম ও বৈদ্যগণ পদ্মফুলকে স্নিগ্ধকারক ও সঙ্কোচক বলিয়া বিবেচনা করেন এবং উদরপীড়ায় ইহা প্রয়োগ করা হইয়া থাকে।

১৮। পলাশ

পলাশের সহিত প্রাচীন হিন্দুগণ বিশেষ পরিচিত ছিলেন। পলাশ ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র পাওয়া গেলেও মধ্য ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে বহুসংখ্যক পলাশ বৃক্ষের সমাবেশ দেখা যায়। চৈত্র-বৈশাখ মাসে যখন ইহার রক্তবর্ণ ফুল প্রস্ফুটিত হয় তখন দূর হইতে পুষ্পিত পলাশবৃক্ষের দিকে তাকাইলে মনে হয় যেন বনে রঙের আগুন ধরিয়া গিয়াছে।

পলাশ হিন্দুদিগের নিকট অত্যন্ত পবিত্র। ইহা ধনরত্ন ও যাগযজ্ঞের অধীশ্বর। বৈদিক যুগে পলাশ-শাখা অন্যতম 'সমিধ' ছিল অর্থাৎ হোমাগ্নির ইন্ধনরূপে ব্যবহৃত হইত। ব্রাহ্মণগণের উপনয়নের সময় পলাশকাষ্ঠের পাত্র ও দণ্ড নবীন ব্রহ্মচারীর হস্তে অর্পণ করা হয় এবং পলাশপাত্রে তাহাকে আহার করিতে দেওয়া হয়। সেইজন্য পলাশের অপর নাম ব্রহ্মপত্র। রক্ত পলাশে কালী খুবই প্রীতা হন।

পলাশ লাক্ষা-চাষের অন্যতম পোষক বৃক্ষ। প্রাচীন হিন্দুগণ ইহা জানিতেন এবং তজ্জন্য পলাশের লাক্ষাতরু নাম হইয়াছে। তৎকালে লাক্ষা কেবল রং উৎপাদনের জন্যই ব্যবহৃত হইত; লাক্ষা-রঞ্জনের আবিষ্কার নিতান্তই আধুনিক।

পলাশের বহুবিধ ব্যবহারিক প্রয়োগ আছে। ইহার মূল ত্বক হইতে উত্তম তন্তু পাওয়া যায়; কাণ্ডত্বকে দাগ কাটিলে রক্তবর্ণ আঠা (পলাশ গঁদ) নিঃসৃত হয়। এতদ্ভিন্ন পলাশ-শাখা হস্তী ও মহিষের উত্তম খাদ্য।

পলাশ গঁদ সর্ব্বতোভাবে প্রকৃত কাইনোর (kino) তুল্য এবং তৎপরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। পুরাতন উদরাময় ও অজীর্ণ রোগে ইহা বিশেষ উপকারী। পলাশবীজ কৃমিনাশক।

১৯। পান

পান ভারতের নানা স্থানে উৎপাদিত হইলেও কুত্রাপি বন্য অবস্থায় পান দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহাতে অনুমান করা যায় যে, ইহা ভারতের আদিম উদ্ভিদ নহে। পান সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, অর্জ্জুন স্বর্গ হইতে এক খণ্ড লতা অপহরণ করিয়া আনেন এবং সেই হইতেই মর্ত্তে পানচাষের সূত্রপাত। এইরূপ প্রবাদ বিদেশ হইতে প্রাপ্ত নূতন উদ্ভিদের চাষ-প্রবর্ত্তনের মতের সমর্থক।

পূজা-পার্ব্বণে পানসুপারির ব্যবহার সুবিদিত। অনেক সামাজিক অনুষ্ঠানের সহিত পান পূর্ব্বেও জড়িত ছিল এবং এখনও আছে। পানসুপারি অথবা পান-আতর বর্ত্তমান সময়েও সম্বর্দ্ধনা-অনুষ্ঠান উপলক্ষে ব্যবহৃত হয়। চর্ব্বণ দ্বারা গলাধঃকরণ ব্যতীত পানের আর বিশেষ কোন ব্যবহার নাই। পানে একপ্রকার তৈল আছে। উহা কতক পরিমাণে বীজাণুনাশক বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে।

পানের রস অনেক কবিরাজী ঔষধের অনুপান। ইহা আগ্নেয়, উত্তেজক ও সঙ্কোচক। মাথা ধরায় ও গ্রন্থিস্ফীতিতে পানের পাতা প্রয়োগ করিয়া বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

২০। বট

ভারতের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বটের ন্যায় বহুবর্ষজীবী ও স্নিগ্ধ ছায়াপ্রদায়ী তরুর আদর হওয়া স্বাভাবিক। নর্ম্মদানদীর একটি দ্বীপে কবীর-বট নামে একটি পুরাতন বটবৃক্ষ আছে। কেহ কেহ বলেন যে, মহাত্মা কবীর দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঐ বট রোপণ করেন; আবার অনেকের বিশ্বাস যে, উহাই রামায়ণ, কূর্ম্মপুরাণ ও উত্তররামচরিতোক্ত বৃদ্ধ বট। প্রয়াগের অক্ষয় বটের বিষয় অনেকে

শুনিয়াছেন; ইহা খুব পুরাতন বলিয়া মনে হয় না। বট বুদ্ধদেবের প্রিয় তরু ছিল এবং বৌদ্ধশাস্ত্রের নানাস্থানে ইহার উল্লেখ আছে। অশ্বত্থের ন্যায় নবীন বটবৃক্ষেও বৈশাখ মাসে জলধারা দেওয়া হয়।

বড় বড় রাস্তার ধারে বটবৃক্ষের চারা রোপণ, জলাশয় খনন ও পথিকের আশ্রয়স্থান নির্মাণ পূর্ব্বে পুণ্য কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইত।

২১। বংশ

পূর্ব্বে বিভিন্ন জাতীয় বাঁশের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ ধরা হইত কিনা সন্দেহ। বংশের অপর নাম বেণু। ধর্ম্মানুষ্ঠানে বাঁশের সমধিক প্রচলন বৈদিকযুগের পরে হইয়াছে। বংশ অথবা বেণুবনের উল্লেখ সংস্কৃত-সাহিত্যের অনেক স্থলে পাওয়া যায়। ধর্ম্মসংক্রান্ত বিবিধ ক্রিয়াকলাপের সহিত বংশবৃক্ষের সম্বন্ধ আছে। সন্ন্যাসিগণের হাতে চক্রবংশ যষ্টি প্রায়ই দেখা যায়। বাঁশের কোমল কোঁড় তরকারি করিয়া খাওয়া হয়।

গৃহনির্ম্মাণ, গৃহসজ্জা, বিবিধ যন্ত্রাদি প্রস্তুত ও অন্যান্য কাজে বংশের নানাবিধ ব্যবহার প্রাচীন হিন্দুগণ কালক্রমে শিক্ষা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে বংশতন্তু কাগজ-উৎপাদনে ব্যবহৃত হইতেছে। সদ্যপ্রসূতিকে বাঁশের গাঁটের ক্বাথ খাওয়াইলে উপকার হয়। শ্লীপদস্ফীতিতে উহা বাটিয়া প্রলেপ দেওয়া হয়। ঘোড়ার সর্দ্দি-কাসি রোগে বাঁশপাতা খাওয়ানো হয়। বংশলোচন বলকারক, মিষ্ট ও শীতল।

২২। বেল

বেলকে অতিমাঙ্গল্য বলা হয়। ইহা বিশেষ পবিত্র বলিয়া গণ্য এবং নিষ্ঠাবান হিন্দু বেলগাছ কর্ত্তন করেন না। ইহার ত্রিপত্রের সহিত হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ত্রিমূর্ত্তির কল্পনা করা হয়, কিন্তু ইহা প্রধানতঃ শিবপূজাতেই লাগে। প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্যে বেলতরু বংশবৃদ্ধিসূচক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বন্য বেলগাছ বিপুল সংখ্যায় এসিয়া ও আফ্রিকার গ্রীষ্মমণ্ডলে দৃষ্ট হয়।

গুণাবলী: মৃদু, বিরেচক, সঙ্কোচক ও শোষক। অপাক, কোষ্ঠবদ্ধতা, অতিসার, উদরাময় প্রভৃতি রোগে ইহা সচরাচর ব্যবহৃত হয়। দগ্ধ অপক্ব বেল উদরাময় ও অতিসারে বিশেষ ফলপ্রদ। পক্ব বেলের সরবৎ সেবনে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। জ্বরের সহিত উদরাময় থাকিলে বেলশুঁটির ক্বাথ উপকারক। বিল্বপত্র পিত্তনাশক ও জ্বরঘ্ন। বিল্বমূলের ত্বক্ দশমূল পাচনের একটি উপাদান। কুপিত বায়ুজনিত রোগে ইহার প্রয়োগ হয়।

২৩। ভূর্জ্জপত্র

ভূর্জ্জপত্র পূজায় ব্যবহৃত হয় না বটে, কিন্তু পুরাকালের অনেক পুঁথিই ভূর্জ্জপত্রে লিখিত হইত এবং এখনও কবচাদির মন্ত্র লিখিবার জন্য ভূর্জ্জপত্র ব্যবহৃত হয়। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ও কাশ্মীরে যথেষ্ট ভূর্জ্জপত্র-বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। ইহার ত্বক্ হইতেই ভূর্জ্জপত্র প্রস্তুত হয়। কাশ্মীরের দোকানদারগণ ইহার মোটা ছাল কাগজের ন্যায় পুঁটলি ইত্যাদি বাঁধিতে ব্যবহার করে। এতদ্ভিন্ন কাষ্ঠ-নির্ম্মিত ছাদের বৃষ্টি নিবারণ করিতে ভূর্জ্জপত্র ব্যবহৃত হয়। ইহার অভ্যন্তরের পাতলা ও মসৃণ ছালই লিখিবার জন্য ব্যবহার করা হয়। পূর্ব্বে কাশ্মীর হইতে বহুল পরিমাণে ভূর্জ্জপত্র আসিত। ভারতে মোগলসম্রাট আকবর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত কাগজশিল্পের উন্নতির সহিত লিখিবার উদ্দেশ্যে ভূর্জ্জপত্রের প্রচার কমিয়া গিয়াছে। ভূর্জ্জপত্র প্রস্তুতের প্রাচীন প্রথাও লোপ পাইয়াছে। কেবল এইমাত্র জানিতে পারা গিয়াছে যে, বাদামের অঙ্গারকে দ্রব্যবিশেষে সিদ্ধ করিয়া ভূর্জ্জপত্রে লিখিবার কালি প্রস্তুত হইত। এইরূপ কালি বহু বৎসর ধরিয়া অবিকৃত থাকিত এবং স্যাঁতসেঁতে ও আর্দ্র স্থানে থাকিলেও লেখা অস্পষ্ট হইয়া যাইত না।

২৪। মাষকলাই

পঞ্চনদে ইহাকে উরদ বলে। বৈদিক যুগে মাষের যথেষ্ট ব্যবহার ছিল, এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানে তিল-যবের সহিত ব্যবহৃত হইত। অদ্যাবধি পঞ্চনদে উরদই সর্ব্বজনপ্রিয় দাল শস্য। ইহার দুইটি উপজাতি আছে। একটির দানা বড় ও কৃষ্ণ অথবা ঘোর ধূসর বর্ণের—ইহা শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে পাকে। অন্যটির বীজ হরিতাভ ও ছোট, পাকিবার সময় আশ্বিন-কার্ত্তিক মাস। মাষকলাইয়ের গাছ উত্তম পশুখাদ্য। মাষ হইতে মাষা ওজনের উৎপত্তি হইয়াছে। বারটি মাষকলাইয়ে এক মাষা হয় এবং ইংরেজী ওজন এক পাউণ্ড ৪৮০টি মাষকলাইয়ের ওজনের তুল্য। একান্ত প্রয়োজনীয় সাধারণ খাদ্যশস্য বলিয়া ইহা যে পূজার উদ্ভিদরূপে পরিগণিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

২৫। যব

প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে যে কয়েক জাতীয় যবের চাষ হইয়া আসিতেছে তাহার নানা প্রমাণ পাওয়া যায়। পুরাকালে যব অন্যতম প্রধান খাদ্যশস্য ছিল। অবশ্য এখন অনেক স্থলে ধান্য ও গোধূমের প্রাধান্যবশতঃ খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে ইহা গৌণ স্থান অধিকার করিয়াছে। ঋগ্বেদে ইন্দ্রকে যবপ্রদাতা বলা হইয়াছে। অথর্ব্ববেদে ধান্য ও যব তর্পণ ও স্বস্ত্যয়ন উভয় উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করিবার কথা উল্লিখিত আছে। বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষে যবচতুর্থী নামে একটি ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। উত্তর-ভারতে ঐ সময়ে লোকে যবের ছাতু পরস্পরের গাত্রে নিক্ষেপ করে। যবসুরা প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল এবং এখনও হিমালয়ের পার্ব্বত্য জাতিসমূহের মধ্যে ইহার রেওয়াজ আছে। যবের প্রাচীনত্বের প্রমাণ চীনের ইতিহাস হইতেও পাওয়া যায়। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২৭০০ অব্দে সম্রাট সেন্‌লুং সমারোহের সহিত যে পঞ্চশস্য বপন করিতেন যব তন্মধ্যে একটি। মিশর ও সিরিয়ায় যব প্রভূত পরিমাণে উৎপাদিত হইত বলিয়া বাইবেলে উল্লেখ আছে। যব আর্য্যগণ কর্ত্তৃক এতদ্দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। ইহা সে সময়ের প্রধান খাদ্য থাকার

অন্যান্য প্রাচীন জাতির ন্যায় আর্য্যগণও যবকে ধনসম্পদের পরিচায়ক বলিয়া গণ্য করিতেন।

যবের ছাতু রোগীর পথ্য। যব-ছাতুর তরল মণ্ড সহজপাচ্য। যন্ত্রণাদায়ক অতিসার রোগে ইহা সেবনে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়।

২৬। জবা

নানা পূজায়, বিশেষতঃ কালীপূজায় জবার ব্যবহার আছে। কিন্তু এই প্রথা খুব প্রাচীনকালের বলিয়া বোধ হয় না। জবার নানাপ্রকার জাতিভেদ (variety) আছে এবং 'একানে' ও 'জোড়া' ফুল প্রায়ই দেখা যায়। ফুলের বর্ণ রক্ত, শ্বেত, পীত অথবা উক্ত তিনটির মধ্যে একাধিক বর্ণের সংমিশ্রণ হইতে পারে। কোন কোন জাতীয় জবা চীন হইতে এতদ্দেশে আসিয়াছে।

২৭। যজ্ঞডুমুর

ইহার অন্যান্য নাম 'পবিত্রক','যজ্ঞীয়' ইত্যাদি হইতে ধর্ম্মানুষ্ঠানে ইহার ব্যবহার বুঝিতে পারা যায়। ঔষধার্থে ইহার ফল ও ছালের যথেষ্ট উপযোগিতা আছে। সংস্কৃত উড়ুম্বর হইতে শব্দের ডুমুর উৎপত্তি হইয়াছে। যজ্ঞডুমুরের ফল অপরাপর ডুমুরের ন্যায় তরকারিতে ব্যবহৃত হয়। যজ্ঞডুমুরের কাষ্ঠ হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করিতে আবশ্যক হয়।

ইহার পক্ব ফলের রস সাধারণতঃ ধাতুঘটিত কবিরাজী ঔষধের অনুপানরূপে ব্যবহৃত হয়। ফলের সঙ্কোচক ও আগ্নেয় গুণ আছে।

২৮। রক্তকমল

ইহা শালুকের উপজাতি বিশেষ। ইহার ফুল সাধারণতঃ শালুক অপেক্ষা বড় হয় এবং উহার রং লাল অথবা রক্ত এবং বেগুনি রঙের সংমিশ্রণ। লক্ষ্মীপূজায়ই রক্তকমলের সমধিক ব্যবহার; কিন্তু অন্যান্য পূজায়ও গ্রামাঞ্চলে ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহার ডাঁটা ও বীজ অনেকে খাইয়া থাকে।

২৯। রক্ত-চন্দন

রক্ত-চন্দন শ্বেত-চন্দনের ন্যায় বাটিয়া পূজানুষ্ঠানাদিতে ব্যবহৃত হয়। ইহা শ্বেতচন্দনের ব্যবহারপ্রথার অনুরূপ বলিয়া বোধ হয় ইহার রক্তচন্দন নাম হইয়াছে। ধর্ম্মসম্প্রদায়সূচক নানা আকারের চিহ্ন দেহে অঙ্কিত করিতে রক্তচন্দনবাটা আবশ্যক হয়। শাক্তগণ ইহা অধিকতর পরিমাণে ব্যবহার করেন। রক্তচন্দন বৃক্ষের উৎপাদন দাক্ষিণাত্যেই সীমাবদ্ধ। পূর্ব্বে রঞ্জন করিবার উদ্দেশ্যে ইহার কাষ্ঠ প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হইত। ফ্রেঞ্চ পালিশ নামক প্রসিদ্ধ বার্ণিশের ইহা একটি উপকরণ।

বৈদ্যগণ রক্তচন্দনকে সঙ্কোচক বলিয়া বিবেচনা করেন। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির স্ফীতিতে ও মাথাধরায় ইহার প্রলেপ স্নিগ্ধকারক। এলোপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্রে ঔষধ রং করিতে ইহা ব্যবহৃত হয়।

৩০। লোধ্র

সংস্কৃতে লোধ্রের অপর নাম 'শবর', 'শ্রীমত', 'তিলক' ইত্যাদি। শেষোক্ত নামের দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, লোধ্রের ছালের রং দ্বারা তিলক কাটা হইত। লোধ্র রং দ্বারাই রক্ত-আবির প্রস্তুত হইত। মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমান জেলায় বন্য লোধ্র নিতান্ত বিরল নহে।

আয়ুর্ব্বেদে চক্ষু, যকৃৎ, জ্বর, আমাশয় ও উদররোগে লোধ্র-ত্বকের ব্যবহার উল্লিখিত আছে। দন্তশূল রোগেও ইহার কাথের কুলি করিলে উপকার দর্শে।

৩১। শাল

এই সুপরিচিত বৃক্ষের বিশেষ বর্ণনা অনাবশ্যক। সংস্কৃতে ইহার নাম অশ্বকর্ণ। শাল গৌণভাবে দেবপূজার সহিত সংশ্লিষ্ট। কারণ ইহার নির্য্যাস "ধুনা" হিন্দুর প্রায় যাবতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠানে এবং প্রতিদিন গৃহে 'সন্ধ্যা' দেওয়ার জন্য আবশ্যক হয়। দুর্ভিক্ষের সময় শালের বীজ ও মহুয়াফুল খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

৩২। সুপারি

ভারতের সর্ব্বত্র চাষ দিয়া উৎপন্ন-করা সুপারিবৃক্ষ দেখা যায়। বন্য সুপারি ভারতে নাই। মালয়, শ্যাম ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ সুপারির আদি উৎপত্তিস্থান বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। গ্রীকদের আগমনের সময় হইতে এদেশে পান-সুপারির প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে। হিন্দুর প্রায় সমস্ত পূজাপার্ব্বণে পান-সুপারি আবশ্যক হয়। এতদ্ভিন্ন সামাজিক ব্যাপারে সুপারির যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। পানের আনুষঙ্গিকরূপে সুপারির ব্যবহার হয়। বৈদ্যগণের মতে অপক্ব সুপারি আগ্নেয় ও মৃদুবিরেচক। শুষ্ক ও পক্ব সুপারির দ্বারা মাড়ি শক্ত হয়। টাটকা সুপারি খাইলে মাথা ঘোরে ও দম আটকাইয়া আসে। ইহা সুপারির বীর্য্য arceoline-জনিত। সুপারিকে সিদ্ধ করিলে ইহা নষ্ট হইয়া যায়। সেইজন্য সুপারিকে সিদ্ধ ও শুষ্ক করিয়া বাজারে বিক্রয় করা হয়। ইহা সঙ্কোচক—পশু-চিকিৎসায় ইহার যথেষ্ট ব্যবহার আছে।

৩৩। সিদ্ধি

ভাঙ অর্থাৎ পুংসিদ্ধি গাছের পাতা পূজায় ব্যবহৃত না হইলেও হিন্দুধর্ম্মগ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। প্রথমে ইহা তন্তু উৎপাদক উদ্ভিদরূপে পরিচিত ছিল। রুশিয়ার ন্যায় ভারতেও সিদ্ধিতন্তু যথেষ্ট উৎপাদিত হইত এবং এখনও কাশ্মীর, নেপাল প্রভৃতি পার্ব্বত্য প্রদেশে সিদ্ধিগাছের সূতা হইতে এক প্রকার চট প্রস্তুত হয়। সিদ্ধির মাদকতা-গুণ পরে আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

ইহা ব্রিটিশ ফার্ম্মাকোপিয়ার অন্তর্ভুক্ত একটি বিশেষ আবশ্যক ঔষধ। ইহার সার আমাশয় ও অনিদ্রায় বিশেষ ফলপ্রদ।

গাঁজা, সিদ্ধি ও চরস প্রায় একই প্রকার গুণযুক্ত। সিদ্ধি—মস্তিষ্ক-উত্তেজক, মাদক, নিদ্রাকারক, বেদনা ও আক্ষেপ নিবারক, জরায়ু-সঙ্কোচক। ইহা উদরাময়, অতিসারে প্রয়োগ করা হয়।

৩৪। হরিতকী

বিবিধ শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপে হরিতকী আবশ্যক হয়। আয়ুর্ব্বেদে হরিতকীর বিশেষ প্রশস্তি আছে। হরিতকীর কষায়-গুণ পূর্ব্বেই যথেষ্ট জানা ছিল। কিন্তু কষ ও রং প্রস্তুতে ইহার প্রয়োগ আধুনিক।

হরিতকীর নানা প্রকার গুণ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। অপক্ক ফল মৃদুবিরেচক। সুপক্ক ফল সঙ্কোচক। পিত্তাধিক্য, কোষ্ঠ-কাঠিন্য ও অপরিমিত পানাহারজনিত পীড়ায় হরিতকী ব্যবহারে উত্তম ফল প্রদান করে। ইহার অগ্নিবৃদ্ধিকর এবং বায়ুনাশক গুণও আছে। দন্তক্ষতে ও স্রাবযুক্ত চর্ম্মরোগে হরিতকীচূর্ণ প্রয়োগ করিলে উত্তম ফল পাওয়া যায়।

৩৫। হরিদ্রা

আর্য্যগণ সূর্য্য-উপাসক ছিলেন। সেইজন্য স্বর্ণাভ পীতবর্ণের উপর তাঁহাদের এতটা অনুরাগ। উক্ত বর্ণ জাফ্রান হইতে পাওয়া যাইত, কিন্তু ভারতে জাফ্রানের উৎপাদন প্রচুর নহে। সেইজন্যই পরবর্ত্তী সময়ে হলুদ জাফ্রানের স্থান অধিকার করিয়াছে এবং নানাবিধ মাঙ্গলিক কার্য্যে ইহার প্রাধান্য হইয়াছে। বিবাহসংক্রান্ত বহুবিধ অনুষ্ঠানে হলুদ দরকার হয়। হলুদ অর্ঘ্যের একটি উপকরণ। হলুদবাটা অনেকটা সাবানের কার্য্য করে। গায়ে ভাল করিয়া মর্দ্দন করিলে ইহার সহিত ময়লা উঠিয়া আসে ও ইহার জীবাণুনাশক গুণ থাকায় লোমকূপ-সংলগ্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটাণুসমূহ মরিয়া চর্ম্মকে রোগমুক্ত করে। হরিদ্রা-সংযোগে নববধূর গাত্রের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার প্রথা অদ্যাবধি উৎকলে, গোয়ায় এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে প্রচলিত আছে।

গার্হস্থ্য চিকিৎসায় হরিদ্রার নানারূপ প্রয়োগ আছে। চুণ-হলুদ প্রলেপ অধিকাংশ বেদনায় উপকারী। হরিদ্রার কাথ দ্বারা চক্ষু ধুইলে নানাপ্রকার চক্ষুরোগের উপশম হয়, যেমন—Purulent Conjunctivitis। সর্দ্দি বসিয়া গেলে হরিদ্রা-ধূমের নস্য গ্রহণ করিলে সহজেই তাহা ঝরিয়া যায়। কাঁচা হরিদ্রা কৃমিনাশক।

হিমালয়-দর্শনে

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

হে গিরি, শিখরে তব জ্যোতির কণিকা
চারি পাশে ঝরে পড়ে অরুণ-কিরণে।
বক্ষে তব যুগান্তের ইতিহাস লিখা।
পাদমূল সুশোভিত 'হরিতে চিরণে'।

তোমার করুণাধারা উচ্ছল প্রবাহে
নেমে আসে নদীরূপে ভারতে নিয়ত।
দগ্ধ হয়ে সংসারের তীব্র দাবদাহে
তবাশ্রয়ে শান্তি লভে নর-নারী কত।

অনন্তে হেরেছ তুমি তাই শান্ত রূপ।
রুদ্ধ বাক্, সংযমের অপূর্ব্ব মূরতি।
ধ্যানমগ্ন, নির্ব্বিকার, নিশ্চল, নিশ্চুপ,
প্রাণের গানের ছন্দে পড়ে না ত যতি।

অধ্যাত্ম সাধনভূমি, শিলাব্রহ্ম নমঃ।
চিরদিন ভারতের তুমি প্রিয়তম।

মহাচীনের নারীপ্রগতি

শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়

কিছুকাল পূর্ব্বেও চীনা নারীকে শুধু রান্নাবান্না, ঘরকন্না এবং সন্তান-পালনে পারদর্শিনী হইতে হইত। সমাজ আশা করিত যে, নারী বিবাহের পূর্ব্বে পিতার, বিবাহিত জীবনে স্বামীর এবং স্বামীর মৃত্যুর পর পুত্রের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া চলিবে। পদে পদে তখন নারীর স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করিয়া তাহার ব্যক্তিত্বকে পঙ্গু করিয়া রাখা হইয়াছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর গোড়া হইতে যে দারুণ দুর্য্যোগের ঝড় মহাচীনের মাথার উপর দিয়া বহিয়া চলিয়াছে, তাহার ফলে তাহার সামাজিক, রাষ্ট্রিক এবং অর্থনৈতিক সংগঠন আমূল বদলাইয়া গিয়াছে। দুঃখ-দুর্য্যোগের দুঃসহ ব্যথার মধ্য দিয়া মহাচীন নবজন্ম লাভ করিয়াছে। জরাজীর্ণ প্রাচীন ব্যবস্থা ভাঙিয়া-চুরিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। রাষ্ট্রবিপ্লব এবং সমাজবিপ্লবের আগুনে, সুতীব্র দুঃখ-দহনের মধ্যে, চীনের ইতিহাসের নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইয়াছে।

জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রেই চীনা নারী আজ পুরুষের পার্শ্বচারিণী, সর্ব্বপ্রকারেই তাহার সহকর্ম্মিণী। এই নবলব্ধ মর্য্যাদা এবং স্বাধীনতার ফলে চীনে যে নারীপ্রগতি আরম্ভ হইয়াছে তাহার তুলনা সত্যই বিরল।

প্রয়োজনের তাগিদেই বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থার উৎপত্তি হয়। প্রয়োজনের তাগিদেই আবার প্রচলিত ব্যবস্থা লোপ পায়। ইহাই জগতের নিয়ম। সেইজন্যই যুগে যুগে রাষ্ট্র, সমাজ এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বদলায়। ধর্ম্মাধর্ম্ম, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যার সংজ্ঞাও এই কারণেই বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন প্রকার। ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে। কোন ব্যবস্থা যত দিন যুগের প্রয়োজন পূর্ণ করে, তত দিনই ইহা ভাল। কিন্তু সেই প্রয়োজন মিটাইবার ক্ষমতা নিঃশেষিত হইবার পর ইহা কল্যাণের পরিবর্ত্তে অকল্যাণই সাধন করিয়া থাকে।

আজ হইতে পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে ১৯২৭ সনে মাও-সে-তুঙের নেতৃত্বে চীনের সাম্যবাদী দল যখন শহর ছাড়িয়া পল্লী-অঞ্চলে সরিয়া যাইবার সিদ্ধান্ত করেন, তখন মুক্তি-সংগ্রামের সফলতার জন্য সামন্ততান্ত্রিক শাসনে সর্ব্বস্বান্ত পল্লীবাসী নর-নারীর সহায়তা ও সহযোগিতার প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। ইহার পর ১৯২৭ হইতে ১৯৩৭ সন এই দশ বৎসর কাল নারী চিয়াং-সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পুরুষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিয়াছে। ইহার ফলে নারীসমাজ যে অভিজ্ঞতা এবং মনোবল অর্জ্জন করিয়াছে, আজ তাহা জাতীয় পুনর্গঠন-কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছে। যেমন সংগ্রামের যুগে তেমনই আবার পুনর্গঠনের যুগেও নারী পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া সমান তালে পা ফেলিয়া চলিয়াছে। সে জানে যত দিন সে পুরুষের দায়িত্বের অংশ গ্রহণ করিয়া জাতীয় প্রগতিমূলক সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থার সহিত নিজেকে একাত্ম করিতে না পারিবে তত দিন পুরুষের সহিত তাহার সমান অধিকারের আদর্শ বাস্তব রূপ গ্রহণ করিবে না।

আধুনিক চীনা-নারী যে মর্য্যাদা এবং অধিকার লাভ করিয়াছে সেজন্য তাহাকে যথাযোগ্য মূল্য দিতে হইয়াছে এবং হইতেছে। সে জানে যে, এই মূল্য দেওয়ার ক্ষমতা যখন তাহার থাকিবে না অথবা সে যখন এই মূল্য দিতে স্বীকৃত হইবে না, তখন শত চেষ্টাতেও এই মর্য্যাদা ও অধিকার রক্ষা করা যাইবে না।

১৯৫০ সনের ১লা মে হইতে চীনের বিবাহ-সংক্রান্ত নূতন আইন বলবৎ হইয়াছে। এই আইনকে নারীর অধিকারের সনদ রূপে গণ্য করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে চীনে নারী বা পুরুষ কেহই নিজের ইচ্ছামত বিবাহ করিতে পারিত না। মাতা-পিতাই পাত্র-পাত্রী নির্ব্বাচন করিতেন। বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহ প্রথা উভয়ই প্রচলিত ছিল। ব্যভিচার আইনতঃ বা সমাজের দৃষ্টিতে দূষণীয় ছিল না। সমাজের উচ্চতর স্তরে বহুবিবাহ প্রথার বহুল প্রচলন ছিল। বিধবাবিবাহে আইনতঃ কোন বাধা না থাকিলেও সমাজের দৃষ্টিতে বিধবাবিবাহ অত্যন্ত নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত। অনেক ক্ষেত্রে মাতা-পিতা বা ভ্রাতৃগণ পত্যন্তর গ্রহণকারিণী বিধবাকে পরিবারের কলঙ্কস্বরূপ মনে করিয়া তাহার প্রাণনাশ করিত। জলে ডুবাইয়া শিশুকন্যার প্রাণনাশের কথাও শোনা যাইত। কুওমিণ্টাং সরকারের আইনে সাতটি বিভিন্ন কারণে পুরুষ বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিতে পারিত। নারীর পক্ষে বিবাহবন্ধন ছিন্ন করা প্রায় অসম্ভব ছিল। স্ত্রী ক্রয় এবং বিক্রয়, স্বামী কর্ত্তৃক স্ত্রীর উপর এবং শাশুড়ী কর্ত্তৃক পুত্রবধূর উপর অত্যাচারও একান্তই সাধারণ ঘটনা ছিল।

উল্লিখিত নূতন আইনে বলা হইয়াছে যে, স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ ও পারস্পরিক সহায়তা, বিবাহের ফলে জাত সন্তানের লালন-পালন, জাতীয় উৎপাদনে সহায়তা এবং নূতন সমাজগঠনই বিবাহের উদ্দেশ্য। বিবাহ-সংক্রান্ত নূতন আইন অনুযায়ী স্বামী এবং স্ত্রী সর্ব্বতোভাবে পরস্পরের সমান। উভয়েই নিজের ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারে। পতি বা পত্নী নির্ব্বাচনে স্বাধীনতা, একপতি ও একপত্নীক প্রথা এবং নারী ও পুরুষের অধিকার-সাম্যের ভিত্তিতে ও তাহাদের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থসংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এই আইন রচিত হইয়াছে। বহুবিবাহাদির প্রাচীন প্রথা, শিশুসন্তান বা অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকার বাগ্‌দান, বিধবাবিবাহে বাধাপ্রদান এবং জুলুম করিয়া যৌতুক আদায় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

নূতন আইনে পুরুষ কুড়ি বৎসর এবং নারী আঠার বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে বিবাহ করিতে পারে না। বিবাহ ব্যাপারে

তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ বর-কনে ব্যতীত কাহারও কোন কথা বলিবার অধিকার নাই। বিশেষ কতকগুলি রোগগ্রস্ত নারী এবং পুরুষ বিবাহ করিবার অধিকারী নহে। বর-কনে নিজেদের দায়িত্বে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কোন কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হইলে তাহারা অবিলম্বে বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিতে পারে। বিবাহ-বিচ্ছেদের পর ইচ্ছা করিলে তাহারা আবার পরস্পরকে বিবাহ করিতে পারে। স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে একজন যদি বিবাহ-বিচ্ছেদে সম্মত না হয়, তবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ প্রথমতঃ তাহাদের বিরোধ মিটাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করেন। এই চেষ্টা ব্যর্থ হইলে আদালতে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়। আদালত প্রথমতঃ আপষের চেষ্টাই করে। এই চেষ্টায় কোন ফল না হইলে আদালত বিবাহ-বিচ্ছেদের অনুমতি প্রদান করিয়া থাকে। এই অনুমতি প্রদানের সময় দম্পতির অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের স্বার্থরক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। বিবাহবন্ধন ছিন্ন হইবার পরও উভয় পক্ষই অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের ভরণ-পোষণ এবং শিক্ষার জন্য দায়ী থাকে।

চীনের নারী আজ বিগত যুগের পক্ষপাতদুষ্ট প্রথার দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রেই সে আজ পুরুষের সমান অধিকার ভোগ করে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের পরিপূর্ণ অধিকার-সাম্যের নীতি গৃহীত হইয়াছে। চীনের জাগ্রত নারী-সমাজ তাহাদের স্বাধীনতা এবং অধিকারের সুযোগ গ্রহণ করিয়া দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। জাতীয় কল্যাণ এবং প্রগতি-সহায়ক প্রতিটি কার্য্যে চীনের নারী আজ পুরুষের সহকর্মিণী। নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী আজ আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

চীনের বিভিন্ন জেলার পল্লী অঞ্চলে জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বমূলক যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান আছে তাহাদের সদস্য-সংখ্যার শতকরা পনর জন নারী। শহর অঞ্চলে এই হার আরও অধিক। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন বিভিন্ন সমিতির সহকারী সভাপতি, মন্ত্রী, সহকারী মন্ত্রী, বিভাগীয় প্রধান কর্মচারী প্রভৃতির মধ্যে অনেকেই নারী। এই সমস্ত উচ্চপদে অধিষ্ঠিতা নারীর সংখ্যা বর্ত্তমানে ষাট।

বিভিন্ন দপ্তর এবং কল-কারখানায় নারীকর্ম্মীর সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। গত বৎসর, অর্থাৎ ১৯৫২ সনে ৯,৯০,০০০ জন নারী কল-কারখানা এবং সরকারী ও বেসরকারী দপ্তরে কাজ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। ১৯৫০ সনে অর্থাৎ যে, বৎসর চিয়াং-সরকারের পতন হয় তাহার পরের বৎসরের তুলনায় এই সংখ্যা প্রতিশতে চুয়াত্তর জন অধিক। এই সমস্ত নারী-কর্ম্মীর অনেকেই স্ব-স্ব কার্য্যে বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সরকারী কল-কারখানাগুলিতে সাধারণতঃ নারী এবং পুরুষ কর্ম্মীদিগকে একই প্রকার কাজের জন্য একই হারে বেতন দেওয়া হইয়া থাকে। যে সমস্ত শ্রম-শিল্প প্রতিষ্ঠানে অন্যূন এক শত জন কর্ম্মী কাজ করে, ১৯৫১ সন হইতে তাহাদের কর্ম্মীদিগের জীবন-বীমার ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। এই বীমা-আইনে কর্ম্মীদিগের জন্য হাসপাতাল, স্বাস্থ্যনিবাস এবং পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বাসস্থান নির্ম্মাণের ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। এই আইনে নারী-কর্ম্মীদিগের প্রয়োজনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে।

মহাচীনের পল্লী অঞ্চলে কৃষি-ব্যবস্থায় যে বিরাট, পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে তাহাতে নারীর দানের পরিমাণ মোটেই উপেক্ষা করিবার মত নহে। ১৯৫১ সনে যখন চীনে নূতন ভূমি-সংস্কার আইন প্রবর্ত্তিত হয়, তখন চীনের কৃষক সমিতিগুলিতে মোট চার কোটি নারী-সদস্য ছিল। নূতন ভূমি-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনে ইহারা একটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছে। এই ব্যবস্থায় জমিতে কৃষকের অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। ভূমিহীন ক্ষেত-মজুরকে ভূমি দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সমস্ত ব্যবস্থার ফলে চীনের কৃষক-সমাজে নবজীবনের জোয়ার আসিয়াছে এবং নর-নারী-নির্ব্বিশেষে প্রতিটি কৃষকের মনে অপূর্ব্ব উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছে। চীনের কৃষক আজ প্রাণ পণ করিয়া উৎপাদনবৃদ্ধির কার্য্যে নিজের শক্তি এবং সামর্থ্য নিয়োজিত করিয়াছে। ফলে এক দিকে যেমন জমির উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে, অপর দিকে তেমনই আবার কৃষকের জীবন-যাত্রার মানেরও উন্নয়ন ঘটিয়াছে। শ্রমশিল্পের ন্যায় কৃষিকার্য্যেও নারী পুরুষের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। চীনের অধিকাংশ পল্লী-গ্রামেই নারীদিগের মধ্যে শতকরা ষাট জনেরও বেশী এবং কোন কোন অঞ্চলে শতকরা নব্বই জন বা তাহারও বেশী নারী কৃষি-কার্য্যে পুরুষের সহযোগিতা করে। কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত নারীদিগের মধ্যে প্রতি শতে চল্লিশ হইতে ষাট জন কৃষক সমবায় সমিতি এবং এই জাতীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিয়াছে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ গত বৎসর মোট যত কাজ করিয়াছে তাহার এক-তৃতীয়াংশের কৃতিত্ব নারীদিগের প্রাপ্য।

কৃষিকার্য্য এবং শ্রমশিল্পে নিযুক্ত নারীদিগের সুখ-সুবিধার প্রতি সরকার বিশেষ মনোযোগী। যে সমস্ত নারী-কর্ম্মী এবং শ্রমিকের দুগ্ধপোষ্য সন্তান আছে তাহাদের সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিশুদিগের রক্ষণাবেক্ষণের বিশেষ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। মাতা যখন কার্য্যে ব্যাপৃতা তখন ইহারাই শিশুদিগের তত্ত্বাবধান করে। বিবাহিতা নারী-কর্ম্মী এবং শ্রমিকের সুবিধার জন্য উন্নত ধরণের ধাত্রীবিদ্যা এবং শিশুপালন-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। নারী-সমাজের সংস্কৃতির মানের উন্নয়ন ঘটাইয়া তাহাদিগকে উত্তরোত্তর অধিকতর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে নিয়োগের যোগ্য করিয়া তুলিবার জন্য বহু বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে। নানা স্থানে সমবেত ভাবে সংবাদপত্র পাঠের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

চীনের সমবায় সমিতিসমূহের মধ্যে অনেকগুলিই নারীর কর্তৃত্বে পরিচালিত হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ সান্‌সি প্রদেশের চ্যাং চি জেলার নাম করা যাইতে পারে। চ্যাং চি'র মোট ১১৮টি কৃষি সমবায় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৯৫টিরই পরিচালিকা অথবা সহকারী পরিচালিকা নারী। নূতন নূতন যন্ত্রের ব্যবহারে এবং বৈজ্ঞানিক

প্রণালীতে কৃষিকার্য্যে চীনা-নারী বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করিয়াছে। বহু নারীই এখন কলের লাঙ্গল চালাইতে পারে।

১৯৫১ এবং ১৯৫২ সনে হুয়াই নদী পরিকল্পনা এবং চিং কিয়াং বন্যা প্রতিরোধ পরিকল্পনার রূপায়নে ৩,০০,০০০ জন নারী-কর্ম্মী সহায়তা করিয়াছে। তাহাদের উৎসাহ এবং কর্ম্মনৈপুণ্য এই পরিকল্পনা দুইটির সাফল্যের অন্যতম কারণ। এই দুইটি পরিকল্পনাতেই মাতা ও পুত্র এবং স্বামী ও স্ত্রী পাশাপাশি দাঁড়াইয়া কাজ করিয়াছে। বহু স্থানেই নারী আবার পুরুষকে বন্যা প্রতিরোধের কাজে আগাইয়া দিয়া নিজেরা সমাজের মঙ্গলসাধন এবং ক্ষেতের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছে।

জাতীয় জীবনের পুনর্গঠন-কার্য্যে পুরুষের সহিত পাল্লা দিয়া চলিবার যোগ্যতা অর্জ্জনের জন্য আধুনিক চীনা নারী একান্ত আগ্রহান্বিতা। সেইজন্যই দেশের শিক্ষায়তনসমূহে ছাত্রীর সংখ্যা উপেক্ষণীয় নহে। ১৯৫২ সনের শেষভাগ হইতে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, উচ্চ বিদ্যালয়, নর্ম্যাল স্কুল এবং শ্রমিক ও কৃষকদিগের জন্য পরিচালিত বিশেষ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির নিমিত্ত পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সমস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদিগকে সরকারী ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়। বেতনও তাহাদিগকে দিতে হয় না। চীনের নারী এই সুযোগের যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার করিতেছে। উল্লিখিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্যতীত দেশের সর্ব্বত্র প্রাপ্তবয়স্কদিগের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য অনেকগুলি বিশেষ বিদ্যালয় এবং সান্ধ্য-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সমস্ত বিদ্যালয়ে বিস্তর নারী শিক্ষালাভ করিতেছে। ১৯৫১ সনের একটি বিবরণীতে দেখিতে পাই যে, কেবলমাত্র শীতকালীন বিদ্যালয়সমূহের ন্যূনাধিক সোয়া চার কোটি কৃষক-ছাত্রছাত্রীর মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেকই নারী। এই সময়ের আর একটি বিবরণীতে দেখা যায় যে, অবসর সময়ে বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকারী কৃষকগণের মধ্যে শতকরা প্রায় পঞ্চাশ জনই নারী। গত বৎসরের একটি বিবরণীতে দেখি, বিভিন্ন দপ্তর ও কারখানায় নিযুক্ত কর্ম্মীদিগের মধ্যে ৩০,২০,০০০ জন নারী ও পুরুষ কর্ম্মী তাহাদের জন্য পরিচালিত বিশেষ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতেছে। চীনের নারী-সমাজের নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য সরকার চেষ্টার কোন ত্রুটি করিতেছেন না।

আইন পাস করিয়া মাতা ও শিশুর স্বাস্থ্য এবং স্বার্থরক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শ্রমিকদিগের জন্য বিধিবদ্ধ বীমা আইনে গর্ভবতী নারী-শ্রমিককে প্রসবের পূর্ব্বে এবং পরে আট সপ্তাহ পূর্ণ বেতনে ছুটি দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। এই আইন অনুযায়ী শ্রমিকের গর্ভবতী পত্নীও কতকগুলি সুবিধালাভের অধিকারিণী। সমগ্র দেশে প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য শিশুমঙ্গল কেন্দ্র জাতির ভবিষ্যৎ আশা শিশুদিগের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছে। ১৯৪৯ সন হইতে ১৯৫২ সনের মধ্যে খনি, কারখানা এবং বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত নারী-কর্ম্মীদিগের শিশু-সন্তানদের শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয় এবং তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা পনর গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। মাতা এবং শিশুর স্বাস্থ্যের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য সমগ্র চীনে আজ একুশ হাজারেরও অধিক প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে কাজ করিবার জন্য আজ পর্য্যন্ত ১,৭৩,০০০ জনেরও অধিক ধাত্রী এবং অন্যান্য কর্ম্মীকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে: এই সমস্ত বিভিন্ন ব্যবস্থার ফলে এক দিকে যেমন শিশু-মৃত্যুর হার বিশেষ রূপে কমিয়া গিয়াছে, অপর দিকে তেমনই আবার মাতা ও শিশু উভয়েরই স্বাস্থ্যোন্নতি হইতেছে।

সমগ্র চীনের নারী-সমাজের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান 'নারী গণতান্ত্রিক সঙ্ঘে'র জনপ্রিয়তা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। দেশের প্রায় সমগ্র অঞ্চলেই ইহার শাখা খোলা হইয়াছে। প্রায় চল্লিশ হাজার নারী এই সঙ্ঘের অধীনে কাজ করে। ইহার কোন পুরুষ-কর্ম্মী নাই।

প্রধানতঃ তিনটি কারণে চীনের নারী-প্রগতি সম্ভব হইয়াছে। প্রথমতঃ, নারী-মুক্তি-আন্দোলন সর্ব্বপ্রকারে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের সহিত সংযোগ এবং সহযোগিতা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। তাহা না হইলে মহাচীনের নারী-আন্দোলন কোনদিনই সার্থক পরিণতি লাভ করিতে পারিত না। দ্বিতীয়তঃ, দীর্ঘদিন স্থায়ী সংগ্রামের যুগে সমাজের সর্ব্বস্তরের নারী সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজ করিয়াছে। ইহার ফলে যে একাত্মবোধ এবং অখণ্ড ঐক্য গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা নারীর মুক্তিকে নিশ্চিততর করিয়া তাহার অগ্রগতিতে বেগ সঞ্চার করিয়াছে। তৃতীয়তঃ, চীনের নারী-পুরুষ উভয়েই জানে যে, আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষা করিতে না পারিলে জাতীয় পুনর্গঠন ও জাতীয় সমৃদ্ধি বাড়াইবার কার্য্য এবং জাতির ভবিষ্যৎ বংশধর শিশুদিগের জীবন নিরাপদ ও আনন্দময় করা যাইবে না। এই ত্রিবিধ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য চীনের নারী-সমাজ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে।

মহাশৈব তিরুজ্ঞান-সম্বন্ধর

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী

পৌরাণিক শিবপ্রতীকের কল্পনা অবলম্বনে যে ভক্তিবাদ দাক্ষিণ-ভারতে প্রবর্তিত হয় তাহার উপাসকগণ 'নায়নার' নামে বিখ্যাত। সর্বসমেত তেষট্টি জন নায়নারের কথা শোনা যায়। তাঁহাদের মধ্যে তিরুজ্ঞান-সম্বন্ধর, আপ্পার (অপ্পর স্বামী), সুন্দরর ও মাণিক্কবাচকর সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই শৈবাচার্যগণ 'চিত্তর' (সিদ্ধ) আখ্যায় অভিহিত। ইঁহারা দাস মার্গ, সৎপুত্র মার্গ, সহ মার্গ এবং সন্মার্গের ভিতর দিয়া ভগবান সুন্দরেশের (শিব) উপাসনা করেন। তিরুজ্ঞান-সম্বন্ধর সৎপুত্র মার্গের উপাসক ছিলেন। তিরুজ্ঞান-সম্বন্ধর অর্থে যাঁহার তত্ত্বজ্ঞানে যোগাযোগ হইয়াছে (তিরু=শ্রী, জ্ঞান=তত্ত্বজ্ঞান এবং সম্বন্ধর=যোগাযোগ)।

এই চারি জন সিদ্ধপুরুষ প্রত্যেকেই ব্রাহ্মণ-সন্তান। ইঁহাদের মধ্যে সম্বন্ধর সর্বপ্রধান এবং সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। আরাধ্য দেবতা সুন্দরেশের উদ্দেশ্যে হৃদি-নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া ইঁহারা অপরূপ মাধুর্যমণ্ডিত ছন্দোবদ্ধগীতিস্তোত্র রচনা করেন। চোল-সম্রাট রাজরাজের রাজত্বকালে জনৈক তামিল কবি কর্তৃক প্রথমোক্ত তিন জন সাধকের স্তোত্রসমূহ 'তেবারম্' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়। তেবারম্ শব্দে 'দেবতার' বুঝায়। এই সকল শৈবভক্তের সাধন-ধারা মহাবল্লীপুরম্ ও কাঞ্চীর অপরূপ স্থাপত্যশিল্পকলাপূর্ণ মঠমন্দিরে রূপায়িত হইয়া আজও মধ্যযুগের সাধন-ধারাকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে।

মহাশৈব সম্বন্ধর সম্ভবতঃ ৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে আবির্ভূত হন। আদি শঙ্করাচার্য তাঁহাকে 'দ্রাবিড় শিশু' আখ্যা প্রদান করেন। শিরুত্তোণ্ডর (পরঞ্জোতিয়ার) সম্বন্ধরের সমসাময়িক ছিলেন; পরঞ্জোতিয়ার পল্লবরাজ প্রথম নৃসিংহ বর্মনের সেনাপতি ছিলেন। নৃসিংহ ও মহেন্দ্র বর্মনের শাসনকালের তথ্যাদি হইতে জানা যায়—পরঞ্জোতিয়ার শৈবধর্মে দীক্ষিত হন এবং সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। এই উভয় নায়নার আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ৬৩০-৬৬০ অব্দে বিরাজমান ছিলেন। পাল্অরাবায়্ (চিরদুগ্ধমুখ) ও আলুডৈয় পিল্লৈ (ভগবানের পুত্র) নামেও সম্বন্ধর পরিচিত ছিলেন।

সম্বন্ধর চোল (দাক্ষিণাত্য) দেশের ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শীর্‌কাষি বা তোণিপুরম্ ইঁহার জন্মস্থান। পুরাণে বর্ণিত আছে, মহাপ্রলয়ের সময় এই স্থান নৌকার ন্যায় জলের উপর ভাসমান ছিল। তোণিপুরম্ শব্দের অর্থ—নৌপুর। পিতার নাম শিবপাদহৃদয় এবং মাতার নাম ভগবতী। সম্বন্ধরের বাল্যনাম পিল্লাই। তামিল ভাষায় পিল্লাই শব্দে খোকা বুঝায়।

একদা শিবপাদহৃদয় চারি বৎসরের শিশু সম্বন্ধরকে সঙ্গে করিয়া শিবের অর্চনা করিতে ব্রহ্মতীর্থম্ নামক পুষ্করিণীতে গমন করেন। ছেলেকে পুষ্করিণীর তীরে রাখিয়া শিবপাদহৃদয় স্নানের নিমিত্ত জলে নামিলেন। স্নান-তর্পণাদি করিতে বহুক্ষণ অতিবাহিত হইল। এদিকে পিল্লাই পিতাকে অনেকক্ষণ দেখিতে না পাইয়া 'বাবা' এবং 'মা' বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। নিকটেই ছিল তোনিয়প্পরের (নৌকা-ঈশ্বর) মন্দির। হর-পার্বতী কৃপাপরবশ হইয়া শিশুর নিকট আগমন করিলেন। পার্বতী শিশুকে কোলে করিয়া স্তন্যপান করাইলেন। স্তন্যপানে শিশুর শিবজ্ঞান লাভ হয়। শিশু শান্ত হইলে হর-পার্বতী অন্তর্হিত হইলেন।

স্নান সমাপন করিয়া শিবপাদহৃদয় পুত্রের নিকট উপনীত হইলেন। বালকের মুখে তখনও দুধের চিহ্ন লাগিয়া রহিয়াছে। তিনি ভাবিলেন—হয় ত অস্পৃশ্য জাতীয় কোন স্ত্রীলোক তাঁহার পুত্রকে স্তন্যপান করাইয়া গিয়াছে। তাই ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি পুত্রকে সত্য ঘটনা প্রকাশের জন্য তাড়ন করিতে লাগিলেন।

বালক সম্বন্ধর দেব-দেউলের গোপুর দেখাইয়া 'তোডুডৈয় শেবিয়ন্' (কর্ণাভরণভূষিত শিব) নামক একটি পদিকম্ (দশক) গাহিলেন। পদিকম্-এর ভাবার্থ এই—'কর্ণাভরণভূষিত, বৃষভবাহন, নির্মল শ্বেতচন্দ্রশেখর, চিতাভস্মভূষিত, হৃদয়রাজ, মুনিগণ-বন্দিত, দয়ালু, ব্রহ্মপুরাধিষ্ঠাতা ভগবান শিব আমাকে দুগ্ধপান করাইয়া গিয়াছেন।'

পরবর্তীকালে 'তেবারম্' গ্রন্থে সম্বন্ধরের রচিত স্তোত্রাবলীর প্রথম পদিকম্ হিসাবে ইহা স্থান পাইয়াছে। সে যাহা হউক, এই অদ্ভুতপূর্ব ব্যাপারে শিবপাদহৃদয় ত অবাক। অবশেষে তিনি বুঝিতে পারিলেন, সুন্দরেশ কৃপা করিয়া পুত্রকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

উপরোক্ত পদিকম্-এ দেবাদিদেব মহেশ্বরের পাঁচটি রূপের বর্ণনা আছে। যথা—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, তিরোভাব এবং কৃপা। তাঁহার কর্ণাভরণভূষিত মূর্তি সৃষ্টির দ্যোতক; বৃষভবাহন ও চন্দ্রশেখর বেশে তিনি স্থিতিরূপে বিরাজমান; শ্মশানভস্মাচ্ছাদিত মূর্তিতে তিনি প্রলয়ঙ্কর শিব; তিনি জীবের হৃদিমধ্যে প্রচ্ছন্ন আছেন, ইহা তিরোভূত মূর্তি; তিনি মুনি এবং ভক্তবৃন্দ কর্তৃক সম্পূজিত হইয়া কৃপা বিতরণ করিয়া থাকেন, তাই তিনি কৃপাময়।

প্রাগুক্ত ঘটনার পর সম্বন্ধর পরিব্রাজকের বেশে দেশ-দেশান্তরে শিব-মাহাত্ম্য কীর্তন ও প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সর্বত্রই তাঁহার অধ্যাত্মপ্রভাব অলৌকিকভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। দেখিতে দেখিতে চের, চোল, পাণ্ড্য প্রভৃতি দেশে তাঁহার প্রচারিত ভাবধারা সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। জনগণ শৈবধর্মে দীক্ষিত হইতে থাকে। তৎকালে প্রচলিত বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম এবং সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁহার মতবাদ বিভিন্ন পদিকম্-এর মাধ্যমে সাধারণ্যে প্রচারিত হইতে লাগিল।

কথিত আছে, বিভিন্ন জনপদ পর্যটন করিতে করিতে তিরুক্-কোলক্কা নামক দেব-দেউলে তিনি উপনীত হন। সেখানে 'মডৈয়িল বালৈ' নামে একটি পদিকম্ গাহিতে আরম্ভ করেন। সেই সময় আকাশ হইতে পঞ্চাক্ষরমুদ্রিত একজোড়া মন্দিরা প্রাপ্ত হন। এই মন্দিরা সহযোগে তিনি শিব-মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে করিতে বিভিন্ন জনপদ অতিক্রম করিতে থাকেন। এই সময় নীলকণ্ঠ য়াযপ্পানর (য়ায্=বীণা) নামক জনৈক অস্পৃশ্য জাতীয় বীণাবাদক সম্বন্ধরের অলৌকিক মহিমার কথা শুনিতে পাইলেন। ইনি এক জন শিব-ভক্ত। সস্ত্রীক তিনি সম্বন্ধরের সহিত দেখা করেন। সম্বন্ধরের গান শুনিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন। অনেক অনুনয়-বিনয় করিবার পর সম্বন্ধর তাঁহাকে সঙ্গে লইতে সম্মত হন। সম্বন্ধরের সহিত তিনি বিভিন্ন তীর্থ-পর্যটন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বীণাবাদনের সহিত সম্বন্ধরের সুললিত কণ্ঠের রাগিণী এক স্বর্গীয় মূর্ছনার সৃষ্টি করিত। যে শুনিত সেই বিমোহিত হইত। এই অস্পৃশ্য দম্পতীর প্রতি ব্রাহ্মণ-সাধকের শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা প্রদর্শনে আপামর জনসাধারণ পরম বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিল।

শীর্কাযিতে মহাসমারোহে সম্বন্ধরের উপনয়ন সম্পন্ন হয়। এই সময় শৈবাচার্য আপ্পার (অপ্পর স্বামী) তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সম্বন্ধর তাঁহাকে 'অপ্পরে' (হে পিতা অপ্প) বলিয়া স্বাগত সম্ভাষণ জানাইয়া প্রণাম করেন। আপ্পারও এই শিশুকে প্রত্যভিবাদন জ্ঞাপন করেন। এই সময় হইতেই উভয়ের মধ্যে অশেষ শ্রদ্ধা-ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

কথিত আছে, শৈবাচার্য আপ্পার যখন পান্দুকালোরে অবস্থান করিতেছিলেন সেই সময় সম্বন্ধর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। এখান হইতে উভয় আচার্য শৈবতীর্থসমূহ দর্শনের নিমিত্ত বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করিতে থাকেন। ক্রমে উভয়ে বেদারণ্যম্ (তিরুমরৈক্কাড়) নামক স্থানে উপনীত হন। ইহা তাঞ্জোর জেলার অন্তর্গত। এখানে একটি প্রাচীন শিবমন্দির ছিল। ইহা সর্বদা অর্গলবদ্ধ থাকিত। অনুসন্ধান করিয়া তাঁহারা জানিতে পারিলেন, পূর্বে বেদগণ (চতুর্বেদ) এখানে আসিয়া প্রত্যহ শিবের পূজা দিতেন। কিন্তু বহু দিন যাবৎ তাঁহারা আর পূজা করিতে আসেন নাই। সম্বন্ধর এবং আপ্পার উভয়ে শিব-স্তোত্র বিষয়ক পদিকম্ গাহিতে লাগিলেন। অবশেষে মন্দির-দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। আপ্পার বুঝিতে পারিলেন—সম্বন্ধর এক জন পরম বৈদিক ব্রাহ্মণ। জৈনধর্মের প্রচার এবং প্রসার ও বেদ-উপনিষদের প্রতি লোকের অনুরাগহীনতা এই উপাখ্যানে সূচিত হইয়াছে। এখান হইতে সম্বন্ধর মাদুরায় গমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

মাদুরা পাণ্ড্যরাজগণের রাজধানী ছিল। তখন পাণ্ড্যরাজ নেডুমারন্ সিংহাসনে সমাসীন। তিনি জৈনধর্মাবলম্বী ছিলেন।

আপ্পার তাঁহাকে মাদুরায় গমন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন; কারণ শ্রমণদের ক্রূর প্রকৃতি তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। সম্বন্ধরকে কৃতনিশ্চয় জানিতে পারিয়া তিনি তাঁহার সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু সম্বন্ধর তাঁহাকে বেদারণ্যম্-এ অপেক্ষা করিতে বলিয়া মাদুরার উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেন।

পাণ্ড্যরাজ জৈনধর্মাবলম্বী হইলেও তদীয় মহিষী মঙ্গয়র্করশি ও মহামন্ত্রী কুলচ্চিরৈ শৈব মার্গাবলম্বী ছিলেন। সম্বন্ধর তিরুমুনুরিল নামক স্থানে উপনীত হইলে রাজমহিষী ও মহামাত্য তথায় আসিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন।

সম্বন্ধর মাদুরায় আসিতেছেন শুনিয়া শ্রমণেরা রাজার নিকট সদম্ভ উক্তি করে। তাহারা বলে, মহারাজ, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। মন্ত্রের প্রভাবে এই শৈব সন্ন্যাসীকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিব।

এদিকে সম্বন্ধর মাদুরায় উপনীত হইয়া একটি মঠে রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করিলেন। ক্রমে রাত্রি গভীর হইয়া আসিল। জনপদের সকলে গভীর সুষুপ্তির কোলে মগ্ন। রাত্রির অন্ধকারে শ্রমণের দল মঠে আসিয়া সমবেত হইল। তারপর মশাল জ্বালাইয়া মঠে অগ্নিসংযোগ করিল। উদ্দেশ্য ছিল, সম্বন্ধরকে জীবন্ত দগ্ধ করিয়া হত্যা করা। সৌভাগ্যক্রমে তাহাদের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল। এই সময় সম্বন্ধর 'শেয়্যনে' নামক পদিকম্ গাহিতে থাকেন। কি আশ্চর্য! সঙ্গে সঙ্গে রাজার উদরে ভীষণ ব্যথার সঞ্চার হইল। ব্যথায় রাজা পরিত্রাহি চীৎকার করিতে লাগিলেন। শ্রমণেরা ময়ূরপুচ্ছের পাখা রাজার সর্বাঙ্গে বুলাইয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিল। সর্বনাশ! পাখা পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল! কমণ্ডলু হইতে মন্ত্রপূত বারি রাজার সর্বাঙ্গে প্রোক্ষণ করা হইল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না।

অতঃপর পট্টমহাদেবী মঙ্গয়র্করশি সম্বন্ধরের সকাশে উপনীত হইলেন। প্রণাম এবং প্রদক্ষিণ করিয়া করজোড়ে নিবেদন করিলেন—'প্রভো, দয়া করে রাজগৃহে পদধূলি দিন। আপনি কৃপা না করলে মহারাজের মৃত্যু অবধারিত। দাসীর প্রতি কৃপা-দৃষ্টি করুন।'

পট্টমহাদেবীর ব্যাকুল আবেদনে সম্বন্ধরের হৃদয় করুণায় বিগলিত হইল। তিনি রাজমহিষীকে আশ্বস্ত করিয়া বিদায় দিলেন। অতঃপর সম্বন্ধর নিকটবর্তী শিবমন্দিরে গিয়া সুন্দরেশের পূজা-অর্চনা করিলেন। পূজা শেষ করিয়া তিনি রাজদর্শনে গমন করিলেন। সম্বন্ধরের বিভূতি হস্তের স্পর্শে রাজা আরোগ্যলাভ করিলেন।

ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত সম্বন্ধর ও শ্রমণদের মধ্যে তুমুল তর্কযুদ্ধ এবং বিবিধ ঐশ্বরিক পরীক্ষা চলিতে থাকে। অবশেষে সর্বপ্রকারে শ্রমণেরা পরাভূত হইল। জৈনধর্ম হেয় এবং শৈবধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইল। সম্বন্ধরের জয়ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত হইল। পাণ্ড্যরাজ নেডুমারন্ জৈনধর্ম পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় পিতৃপিতামহের ধর্ম (শৈব) গ্রহণ করিলেন। শ্রমণদের অনেকে শূলে প্রাণ হারাইল। আবার অনেকে শৈবধর্ম গ্রহণ করিয়া প্রাণ বাঁচাইল।

আপ্পারকে এই বিজয়বার্তা জানাইবার জন্য সম্বন্ধর

শিবিকারোহণে তৎসকাশে গমন করেন। কতিপয় শৈবভক্ত এই শিবিকা-বহনকার্যে যোগদান করেন। কিয়দ্দূর গমনের পর সম্বন্ধরের কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। তিনি উঁকি মারিয়া দেখিতে পাইলেন, মহাশৈব আপ্পার পালকী-বাহকদের মধ্যে রহিয়াছেন। সম্বন্ধর তড়িদ্বেগে শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া বয়োজ্যেষ্ঠ সাধকপ্রবরকে দৃঢ় আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিলেন। তাঁহার দুই নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু পতিত হইতে লাগিল। সম্বন্ধর তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ক্ষমা চাহিলেন। আপ্পার মৃদু হাসিয়া বলিলেন—'আজ আমি ধন্য, আপনার শিবিকা বহন করে আমার মানব-জন্ম সার্থক হয়েছে।'

বোধিমঙ্গৈ নামক স্থানে বৌদ্ধগণ সম্বন্ধরকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করিতে প্রয়াস পায়। বুদ্ধনন্দী তাহাকে অধ্যাত্ম বিষয়ে কূট প্রশ্ন করিতে থাকেন। কিন্তু এই সময় তিনি বজ্রাহত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। অতঃপর ভগবান তথাগতের অন্তরঙ্গ শিষ্য সারিপুত্ত তাঁহাকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেন। পরিণামে সম্বন্ধরেরই জয় হয়। এই সময় সম্বন্ধর মাত্র ষোল বৎসর বয়স্ক ছিলেন।

দেখিতে দেখিতে সমস্ত দক্ষিণ-ভারতে সম্বন্ধরের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। শৈবধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের নিকট আনমিত হইল জনগণের মস্তক।

এই সময় ময়িলাপ্পূরে শিবনেশ নামে এক শ্রেষ্ঠী বাস করিতেন। তাঁহার কন্যার নাম পুম্পাবৈ। পুম্পাবৈ অসামান্য রূপলাবণ্যময়ী ছিলেন। এক দিন পুষ্পোদ্যানে পুষ্প চয়ন করিতে গিয়া সর্পের দংশনে তাঁহার মৃত্যু হইল। শিবনেশের একান্ত ইচ্ছা ছিল—সম্বন্ধর তাহার কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন। কিন্তু ভগবান একি বাদ সাধিলেন। তাঁহার আশা কি পূর্ণ হইবে না? তিনি ছিলেন আশাবাদী। তাই হাল ছাড়িলেন না। সযত্নে একটি মৃৎপাত্রে কন্যার অস্থি ও চিতাভস্ম রাখিয়া দিলেন।

দিন যায়। সম্বন্ধরের প্রতীক্ষায় শিবনেশ দিন গুণিতে লাগিলেন। এই সময় তিরুবোত্রিয়ূর নামক স্থানে সম্বন্ধর আগমন করেন। কালবিলম্ব না করিয়া তিনি তথায় গমন করিলেন। অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর সম্বন্ধর ময়িলাপ্পূরে গমন করিলেন। পাদ্য-অর্ঘ্যাদি দ্বারা সন্ন্যাসীপ্রবরকে অর্চনা করা হইল। অতঃপর কন্যার অস্থি ও চিতাভস্মসম্বলিত মৃৎপাত্র সম্বন্ধরের সম্মুখে রক্ষা করিয়া করজোড়ে শিবনেশ বলিলেন—'প্রভো, কৃপাদৃষ্টি করুন। মৃত কন্যার জীবনদান করে আমার দগ্ধ প্রাণ শীতল করুন। একমাত্র কন্যা হারিয়ে সবকিছু শূন্য মনে হচ্ছে।'

স্মিতহাস্যে সন্ন্যাসী বলিলেন—'মৃতদেহে প্রাণদান করা কি সম্ভব? বিধিলিপি খণ্ডন করা সন্ন্যাসীর করায়ত্ত নয়। যা হবার হয়েছে, এজন্যে শোক করা বৃথা। ধৈর্য ধারণ করুন।'

কিন্তু শিবনেশ সম্বন্ধরের উপদেশবাক্যে কর্ণপাত করিলেন না। তিনি কন্যার জীবনদানের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সম্বন্ধর আর কি করিবেন। অগত্যা 'মট্টিট্টপুন্নৈয়ঙ্কানল্' নামক একটি পদিকম্ গাহিলেন। তাহার পর মৃৎপাত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—'ওহে পুম্পাবৈ, একবার দেখা দাও দেখি।'

কি আশ্চর্য! সম্বন্ধরের বাক্য শেষ হইতে না হইতেই অপরূপ নীবিশোভিতা হাস্যময়ী এক বালিকার আবির্ভাব হইল।

শিবনেশ কন্যাকে দুইটি বাহু দ্বারা জড়াইয়া আপন বক্ষে টানিয়া লইলেন। তাঁহার দুই নয়নে অবিরলধারায় আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। পিতাপুত্রীর এই অপার্থিব মিলন-দৃশ্যে সম্বন্ধরের চক্ষুদ্বয়ও অশ্রুসজল হইয়া উঠিল।

শিবনেশ এইবার কন্যাকে বলিলেন—'মা, সন্ন্যাসীকে প্রণাম কর। এঁর দয়া না হলে আর তোমায় ফিরে পেতাম না।'

'কল্যাণী, ভগবান সুন্দরেশ তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ করুন।' বলিয়া সম্বন্ধর বালিকাকে আশীর্বাদ করিলেন।

অতঃপর শিবনেশ বলিলেন—'প্রভো, এবার অনুমতি দিন, আপনার সম্মতি পেলেই শুভবিবাহের আয়োজন করতে পারি। আপনি পুম্পাবৈকে গ্রহণ না করলে ওকে চিরচারিণী হতে হবে।'

সম্বন্ধরের ললাট কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—'দেখুন, আপনার ইচ্ছা পূরণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। কারণ পুম্পাবৈ-এর জীবনদান করায় আমি ওর পিতৃস্থানীয় হয়েছি। তা ছাড়া আমি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী। আপনার অনুরোধ রক্ষা করতে না পারায় আমি আন্তরিক দুঃখিত। এজন্যে আমি ক্ষমা চাইছি।'

সম্বন্ধর তথা হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। পুম্পাবৈ জীবনে আর কাহাকেও পতিত্বে বরণ করেন নাই। আজীবন ব্রহ্মচারিণী ছিলেন।

সম্বন্ধরের জীবনে এইরূপ বহু অলৌকিক ঘটনার কথা শোনা যায়। এই সব ঘটনার আভাস তাঁহার 'পদিকম'গুলিতে পাওয়া যায়। সম্বন্ধর ষোল হাজার পদিকম গাহিয়াছিলেন। তন্মধ্যে তিন শত পঁচাশিটি পদিকম-এর সন্ধান পাওয়া যায়। আরাধ্য দেবতা দেবাদিদেব ভগবান সুন্দরেশের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাঁহার মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যেই এই সকল পদিকম গীত হইয়াছে। মহান্ পিতারূপে তিনি সুন্দরেশের রূপদান করিয়াছেন। ভাবার গাম্ভীর্য এবং শব্দের ঝঙ্কারে পদিকমগুলি মাধুর্যমণ্ডিত। সত্যম্ শিবম্ সুন্দরমের পূজারী তিনি। মহতী প্রজ্ঞা আধ্যাত্ম-চেতনা এবং জ্যোতির্ময় গুণের মূর্ত-প্রতীক হইলেন ভগবান শিব। সম্বন্ধরের প্রতিভা এবং শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে এস. সচ্চিদানন্দম পিল্লাই বলেন :

'His hymns strike a happy and buoyant note throughout. Their idyllic poetry reveals him as revelling in the enjoyment of the beauties of nature and the grace of God. . . . .One of his special contributions to the thought and life of the age was his insistence on the recognition of the dignity and beauty of womanhood. There is no decad of his which fails, while describing *Siva* in his personal aspect, to mention his divine consort Uma.'

দক্ষিণ-ভারতের শৈবতীর্থগুলি পরিক্রমা শেষ করিয়া সম্বন্দর উত্তর-ভারতেও বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেন। তিনি বৈদিক এবং পৌরাণিক আখ্যায়িকার সাহায্যে ধর্ম-দর্শনাদির নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ অথচ হৃদয়গ্রাহী সরল বক্তৃতায় আকৃষ্ট হইয়া অগণিত জনতা শৈবধর্মে দীক্ষিত হইতে থাকে। মৃত মূর্ছিত জনগণের অন্তরাত্মা জাগ্রত হইয়া উঠে তাঁহার চিন্ময়মধুনিষ্যন্দী অমরবাণীতে। শিবময় ভগবানের বিরাট স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তাহারা অমরজীবনের পথে পরিচালিত হয়।

সম্বন্দর ভগবান সুন্দরেশকে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা বলিয়া কল্পনা করেন। পুরুষ এবং প্রকৃতিও তিনি। আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক কার্য-কারণের দ্যোতকও ভগবান শিব। তিনিই আদি আবার তিনিই অন্ত; অসীম হইয়াও তিনি সসীম। সম্বন্দর ভগবানের কৃপায় তাঁহার অন্তর্লীন মাধুরিমা উপলব্ধি করিয়া ধন্য হন। ভগবৎপ্রেমের গঙ্গোত্রীধারায় স্নাত হইয়া তিনি দিব্যোন্মাদনায় অভিভূত হইয়াছিলেন।

উত্তর-ভারত হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি চিদম্বরম্ দেব-দেউলে অবস্থান করিতেছিলেন। এখানে শিবপাদহৃদয় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সম্বন্দর পিতাকে প্রণাম এবং প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার আগমনের কারণ জানিতে চাহিলেন। তখন শিবপাদহৃদয় তাঁহাকে বলিলেন, 'শোন পুত্র, আমার বহু দিনের আশা আজ তোমায় পূরণ করতে হবে।'

'বলুন পিতা। কি সে ইচ্ছা।'

'তোমাকে বিয়ে করতে হবে। না বললে চলবে না। কারণ নম্বাণ্ডারনম্বিকে আমি কথা দিয়েছি। এ বিয়ে না হলে আমায় মিথ্যাপ্রতিজ্ঞ বলে সবাই ভাববে।'

'কিন্তু আপনি তো জানেন পিতা, গার্হস্থ্য সুখের কামনা করা সন্ন্যাসীর অনুচিত। আমায় ক্ষমা করবেন।

'কিন্তু ভেবে দেখ পুত্র। আমাদের ধর্মশাস্ত্র কি বলেছে? পিতৃসত্য পালনের জন্যে সূর্যবংশধরেরা কি না করেছেন। পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্বদেবতা—একথা কি তুমি জান না?'

ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া গভীরভাবে চিন্তা করিতে থাকেন সন্ন্যাসী। অবশেষে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সম্বন্দর বলিলেন—'তাই হবে পিতা, আপনার আদেশ শিরোধার্য।'

'সাধু, পুত্র, সাধু। আজ আমি সত্যি ধন্য। তুমি কুলপুত্র, তোমার কর্তব্যনিষ্ঠায় পিতৃলোক অতীব আনন্দিত হবে।'—বলিয়া শিবপাদহৃদয় পুত্রকে গভীরভাবে আলিঙ্গন করিলেন। আনন্দে তাঁহার দুই চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিল। অতঃপর যথাবিধি বিবাহকার্য নিষ্পন্ন হইল। এইবার নবদম্পতী আত্মীয়-স্বজন ও ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে তিরুনল্লুর দেবালয়ে গমন করিলেন। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তাঁহারা সকলে বিস্ময়ে হতভম্ব হইয়া পড়িলেন। দেখিলেন, গর্ভগৃহ এক দিব্যজ্যোতিতে পূর্ণ হইয়াছে। পারিজাতকুসুমের সৌরভে যেন চতুর্দিক আমোদিত। এক অপরূপ আনন্দহিল্লোলে সকলের দেহ রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। যেন সমস্ত দেহ-মন আবিষ্ট হইয়া আসিতে লাগিল।

উপস্থিত সকলে দেখিল, চক্ষু মুদিত করিয়া করজোড়ে সম্বন্দর 'এল্লিরুম্ ইচ্‌চোত্তিয়ুল্ পুগুম্' নামক একটি পদিকম্ গাহিতেছেন। তাঁহার কপোল বহিয়া দরবিগলিতধারায় প্রেমাশ্রু পতিত হইতেছে।

দেখিতে দেখিতে সেই দিব্যজ্যোতি বিস্তৃতি লাভ করিতে লাগিল। সম্বন্দর, তদীয় নবপরিণীতা বধূ, শিবপাদহৃদয় ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ ঐ জ্যোতির্মণ্ডলে আবৃত হইয়া গেলেন। অতঃপর তাঁহাদের আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।*

---

* এই প্রবন্ধ রচনায় টি. এন্. সেনাপতি নামক মাদ্রাজী বন্ধু আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।—লেখক

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

শঙ্করাচার্য্যের দার্শনিক মত অদ্বৈতবাদ নামে পরিচিত। রামানুজের মত বিশিষ্ট-অদ্বৈতবাদ নামে খ্যাত। উভয় মতেই এক ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু সত্যবস্তু নাই। এজন্য উভয় মতকেই অদ্বৈতবাদ বলা যায়। এই অংশে উভয় মতের সাদৃশ্য থাকিলেও উহাদের মধ্যে গুরুতর মতভেদ আছে। প্রধান মতানৈক্য এই যে, শঙ্করের মতে জীব ও ব্রহ্মে কোনও ভেদ নাই, কিন্তু রামানুজ-মতে জীব ব্রহ্মের অংশ। ইহা ভিন্ন আরও কয়েকটি বিষয়ে অনৈক্য আছে।

বেদে (আমরা বেদ বলিতে উপনিষদকেও বুঝি, কারণ উপনিষদগুলি বেদের অন্তর্গত১) দুই রকম বাক্যই পাওয়া যায়। কতকগুলি বাক্যে বলা হইয়াছে যে, জীব ও ব্রহ্মে ভেদ নাই; আবার কতকগুলি বাক্যে বলা হইয়াছে যে, জীব ও ব্রহ্মে ভেদ আছে। জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ নাই এরূপ কতকগুলি বাক্যের অনুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল:

"তুমিই ব্রহ্ম"

---

১ বেদের দুই ভাগ, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। "মন্ত্র ব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্" (আপস্তম্ব প্রণীত যজ্ঞপরিভাষা সূত্র)। অধিকাংশ উপনিষদ বেদের ব্রাহ্মণ অংশের অন্তর্ভুক্ত। কয়েকটি উপনিষদ মন্ত্র অংশে পাওয়া যায়।

"এই সবই ব্রহ্ম"

"ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য দ্রষ্টা নাই"

"ব্রহ্ম বিষয়ে কোন ভেদ নাই"

"যিনি ভেদ দর্শন করেন তিনি বারংবার মৃত্যুমুখে পতিত হন।"

কৈবর্ত্তগণ ব্রহ্ম, ভৃত্যগণ ব্রহ্ম, প্রতারকগণ ব্রহ্ম (অর্থাৎ সকলেই ব্রহ্ম)

অতঃপর জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদবাচক কয়েকটি বাক্যের অনুবাদ দেওয়া যাইবে।

"ব্রহ্মকে দর্শন করিতে হইবে। (তাহার জন্য প্রথমে শাস্ত্রবাক্য) শ্রবণ করিতে হইবে, তাহার পর চিন্তা করিতে হইবে, তাহার পর ধ্যান করিতে হইবে।"

এখানে জীবকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে সে যেন ব্রহ্মকে দর্শন করে। যে বস্তু দর্শন করিবে, এবং যাহাকে দর্শন করিতে হইবে উভয়ের মধ্যে ভেদ আছে ইহা অবশ্যস্বীকার্য্য।

"ব্রহ্মকে অনুসন্ধান করা উচিত। তাঁহার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা উচিত।

"সুষুপ্তির সময় জীব ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায়"—ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে জাগ্রৎ অবস্থায় কিছু ভেদ থাকে।

"মৃত্যুর সময় ব্রহ্ম জীবের উপর আরোহণ করেন।"

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ বলেন, উপনিষদের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা রচিত হইয়াছে। ঐ সকল রচয়িতার মধ্যে মতভেদ ছিল, এজন্য উপনিষদের বিভিন্ন বাক্যে মতানৈক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ব্রহ্মসূত্র-প্রণেতা আচার্য্য বাদরায়ণ বা বেদব্যাস হইতে শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব প্রভৃতি পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ কেহই এই মত প্রচার করেন নাই। প্রশ্ন হইতে পারে, তাঁহারা প্রচার না করুন কিন্তু ইহা গ্রহণ করিতে কি আপত্তি থাকিতে পারে? আপত্তি এই যে, এই মত গ্রহণ করিলে সমগ্র বৈদিক সংস্কৃতি ধূলিসাৎ হইয়া যায়। বেদ অপৌরুষেয় (অর্থাৎ কোনও ব্যক্তির রচনা নহে) অতএব অভ্রান্ত—সকল সম্প্রদায়ের হিন্দু, অদ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী, শৈব শাক্ত বৈষ্ণব, সকলেই ইহা স্বীকার করিয়াছেন। বেদ যদি বিভিন্ন ব্যক্তির স্বকপোলকল্পিত রচনার সমষ্টি হয়, তাহা হইলে বেদে ভ্রম-প্রমাদের সম্ভাবনা থাকে, এমতাবস্থায় বেদকে আজীবন সাধনার অবলম্বনরূপে গ্রহণ করা যায় না। কান্ট বা হেগেল কিংবা আইনষ্টাইনের মতকে অবলম্বন করিয়া কেহ সত্যদর্শন করিবার জন্য সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনা করেন না। সকলেই জানেন—ইঁহারা কেহই সত্যদর্শন করেন নাই, যাঁহার বুদ্ধিতে যাহা সঙ্গত মনে হইয়াছে, তিনি তাহাই প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু স্মরণাতীত কাল হইতে কত মহাপুরুষ বেদকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া সত্য উপলব্ধির জন্য আজীবন সাধন করিয়াছেন, লোকচক্ষুর সম্মুখে বা অন্তরালে এখনও কত মহাত্মা সাধন করিতেছেন, ইঁহাদের সাধনার ফলে ভারতের কৃষ্টি কত ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছে কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে। এজন্য প্রাচীন আচার্য্যেরা কেহই এরূপ মত গ্রহণ করেন নাই যে, বিভিন্ন বেদবাক্য পরস্পরবিরোধী হইতে পারে। সকল বেদবাক্যের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করা যায়—এ বিষয়ে সকল আচার্য্যই একমত। সেই সামঞ্জস্য অবশ্য বিভিন্ন আচার্য্য বিভিন্ন ভাবে করিয়াছেন। কোন্ আচার্য্য কি ভাবে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়াছেন, সামঞ্জস্য স্থাপনের কোন্ পদ্ধতিটি অধিকতর সন্তোষজনক হইয়াছে অতঃপর এ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। এই আলোচনার সময় যে সকল বেদবাক্যে জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদের উল্লেখ আছে সেগুলিকে "ভেদবাচক বেদবাক্য" এবং যে সকল বেদবাক্যে জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে অভেদের উল্লেখ আছে সেগুলিকে "অভেদবাচক বেদবাক্য" বলিয়া নির্দ্দেশ করিব।

দ্বৈতবাদীর (মধ্বাচার্য্যের) মতে ভেদবাচক বাক্যগুলি প্রকৃত অর্থ নির্দ্দেশ করিতেছে। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম এবং অল্পজ্ঞ ক্ষুদ্রশক্তি জীব ইহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন তত্ত্ব। তবে যে অভেদবাচক বেদবাক্যে বলা হইয়াছে জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ নাই, তাহার উদ্দেশ্য এই যে ব্রহ্ম যেরূপ আনন্দময় জীবও সেইরূপ আনন্দময়, মোক্ষলাভ করিবার পর জীব তাহার আনন্দময় স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে। অপরপক্ষে অদ্বৈতবাদীর (শঙ্করাচার্য্যের) মতে অভেদবাচক বেদবাক্যগুলিতেই চরম সত্য নিহিত আছে। ভেদবাচক বেদবাক্যগুলিতে ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে প্রভেদ আছে জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত এই মতটি উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র। সুতরাং দ্বৈতবাদী ভেদবাচক বেদবাক্যে যেরূপ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন, অভেদবাচক বেদবাক্যে সেরূপ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। অপরপক্ষে অদ্বৈতবাদী অভেদবাচক বেদবাক্যে যেরূপ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন, তৎকর্ত্তৃক ভেদবাচক বেদবাক্যে সেরূপ গুরুত্ব আরোপিত হয় নাই। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ বলিয়াছেন যে, কতকগুলি বেদবাক্যে অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া অপর কতকগুলি বেদবাক্যে গুরুত্ব আরোপ না করা অন্যায়। অন্ততঃপক্ষে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, যদি বেদবাক্যগুলির এরূপ ব্যাখ্যা করা যায় যাহাতে ভেদবাচক ও অভেদবাচক উভয় প্রকার বেদবাক্যগুলিকে সমান গুরুত্ব প্রদান করা হয়, উভয় প্রকার বাক্যগুলির মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিতে কোনও বাধা না থাকে তাহা হইলে সেইরূপ ব্যাখ্যাই অধিকতর সন্তোষজনক। রামানুজ দেখাইয়াছেন, বিশিষ্টাদ্বৈত মতে যে ভাবে

ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহাতে ভেদবাচক বেদবাক্য এবং অভেদবাচক বেদবাক্য উভয়ের প্রতি সমান গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে—উভয় প্রকার বাক্যগুলির মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিতে কোনও বাধা নাই। কারণ বিশিষ্টাদ্বৈত মতে জীব ব্রহ্মের অংশ। ব্রহ্ম অংশী, জীব অংশ। অংশ ও অংশীর মধ্যে ভেদও আছে, অভেদও আছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ সমুদ্র ও তরঙ্গের মধ্যে কি সম্বন্ধ তাহা আলোচনা করা যাক। সমুদ্র অংশী, তরঙ্গ তাহার অংশ। ইহা বলা যায় যে, তরঙ্গ ও সমুদ্রের মধ্যে ভেদ নাই, তরঙ্গ সমুদ্র ভিন্ন অন্য কিছু নহে। আবার ইহাও বলা যায় যে, সমুদ্র তরঙ্গ হইতে অনেক বড়, সুতরাং তরঙ্গ হইতে ভিন্ন। সেইরূপ ইহাও বলা যায়, জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে (অভেদবাচক বেদবাক্যে তাহাই বলা হইয়াছে)। আবার ইহাও বলা যায় যে, ব্রহ্ম জীব অপেক্ষা অনেক বড়, সুতরাং জীব হইতে ভিন্ন (ভেদবাচক বেদবাক্যে তাহাই বলা হইয়াছে)। সুতরাং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী যেভাবে ভেদবাচক বেদবাক্য এবং অভেদবাচক বেদবাক্যকে তুল্য মর্যাদা প্রদান করিয়াছেন, উভয় প্রকার বেদবাক্যেরই মুখ্য অর্থ রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, দ্বৈতবাদী বা অদ্বৈতবাদী কেহই তাহা পারেন নাই। অতএব বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী যেভাবে উভয় প্রকার বেদবাক্যের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়াছেন তাহাই সর্বাপেক্ষা সন্তোষজনক।

আর এক কথা। মহর্ষি বাদরায়ণ যে ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, সকল সম্প্রদায়ের আচার্য্যই তাহাকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাও সকলে স্বীকার করেন যে, বেদব্যাসের অপর এক নাম বাদরায়ণ। বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রে এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন যে, জীব ব্রহ্মের অংশ, কারণ বেদে কোনও কোনও স্থলে জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদের উল্লেখ আছে, আবার কোনও কোনও স্থলে অভেদের উল্লেখ আছে। মহর্ষি বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রে যাহা বলিয়াছেন, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী তাহাই বলিয়া থাকেন। জীব যে ব্রহ্মের অংশ এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে বাদরায়ণ বলিয়াছেন, বেদে ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে যে জীব ব্রহ্মের অংশ। পুরুষসূক্তে বলা হইয়াছে:

"বিশ্বের যাবতীয় প্রাণী ব্রহ্মের এক-চতুর্থ অংশ, ব্রহ্মের অপর তিন-চতুর্থাংশ মৃত্যুহীন দিব্যলোকে বিরাজমান।"* গীতাতেও ভগবান বলিয়াছেন, "পৃথিবীর জীবগণ আমারই অংশ।† জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিলে যে সকল আপত্তি উঠিতে পারে ব্রহ্মসূত্রে বাদরায়ণ সেই আপত্তিগুলি আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, আপত্তিগুলির সম্যক্ উত্তর দেওয়া যায়। একটি আপত্তি হইতে পারে যে, জীব যদি ব্রহ্মের অংশ হয় তাহা হইলে জীব যখন দুঃখভোগ করিবে ব্রহ্মও তখন দুঃখভোগ করিবেন; কোনও ব্যক্তির দেহের অংশ হস্ত বা পদে আঘাত লাগিলে ঐ ব্যক্তি যেমন দুঃখভোগ করে, সেইরূপ ব্রহ্মের অংশ জীব দুঃখভোগ করিলে ব্রহ্মেরও দুঃখভোগ করা যুক্তিযুক্ত হইবে। কিন্তু ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ—তিনি সত্য, জ্ঞান এবং আনন্দ-স্বরূপ। তিনি পূর্ণানন্দ—তাঁহাতে দুঃখের লেশমাত্র থাকা সম্ভব নয়, জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিলে যখন ব্রহ্মের মধ্যে দুঃখের সম্ভাবনা আসিয়া পড়ে, তখন জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলা উচিত হয় না। ইহার উত্তরে বাদরায়ণ বলিয়াছেন যে, সূর্য্যের রশ্মিসকল যেরূপ সূর্য্যের অংশ, জীবসকল সেইরূপ ব্রহ্মের অংশ। সূর্য্যের কোনও রশ্মি অপবিত্র স্থানে পতিত হইলে সূর্য্য অপবিত্র হন না, সেইরূপ জীব দুঃখভোগ করিলেও ব্রহ্ম দুঃখভোগ করেন না। আর একটি আপত্তি হইতে পারে যে, সকল জীবই যখন ব্রহ্মের অংশ তখন একটি জীব অপর জীবের কর্ম্মফল ভোগ করে না কেন? ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, একটি জীবের একটি দেহের সহিতই সম্বন্ধ থাকে, অপর দেহের সহিত সম্বন্ধ থাকে না। যে দেহের সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকে ঐ দেহ যে কর্ম্ম করে তাহার ফল সেই জীব ভোগ করে, অন্য দেহ যে কর্ম্ম করে তাহার ফল ঐ জীব ভোগ করে না।

অদ্বৈতবাদী আপত্তি করেন, বেদ বলিয়াছেন যে ব্রহ্মের অংশ হয় না, তথাপি তুমি কিরূপে বল যে জীব ব্রহ্মের অংশ। ইহার উত্তর এই যে, বেদ যদি স্পষ্টভাবে একথা না বলিতেন যে জীব ব্রহ্মের অংশ, তাহা হইলে অপর বেদবাক্য হইতে অনুমানের সাহায্যে এই সিদ্ধান্ত করিতে পারা যাইত যে, জীব ব্রহ্মের অংশ নহে। কিন্তু স্বয়ং বেদই যখন স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, জীব ব্রহ্মের অংশ তখন অনুমানের সাহায্যে একথা বলিতে পার না যে, জীব ব্রহ্মের অংশ নহে। প্রশ্ন হইতে পারে বেদ এক স্থানে বলিতেছেন যে, ব্রহ্মের অংশ হয় না, আবার আর এক স্থানে বলিয়াছেন জীব ব্রহ্মের অংশ, বেদ কেন এরূপ আপাতবিরোধী কথা বলিতেছেন? কোনও বস্তুর যদি অংশ থাকে তাহা হইলে কতকগুলি অংশ গ্রহণ করিলে বস্তুটির মহত্ত্বের লাঘব হয়, কিন্তু যদিও ব্রহ্ম হইতে অনন্তকোটি জীব ও অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড আবির্ভূত হইতেছে তথাপি ব্রহ্মের কিছুমাত্র ন্যূনতা হয় না। বেদ বলিয়াছেন, "অনন্ত ব্রহ্ম হইতে অনন্ত জীবজগৎ লইলেও অনন্ত ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন।" এজন্য বলা যায় যে, ব্রহ্মের কোনও অংশ নাই। অপর পক্ষে জগতে ব্রহ্ম ভিন্ন কোনও

* পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি। ঋগ্বেদসংহিতা ১০।৯০।৩
† মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। গীতা ১৫।৭

বস্তু নাই। সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, মনুষ্য, পশুপক্ষী এ সকলই ব্রহ্ম। বস্তু হিসাবে জীবাত্মাও জ্ঞান-স্বরূপ, ব্রহ্মও জ্ঞান-স্বরূপ, ব্রহ্মরূপ অনন্তজ্ঞানসমুদ্রে জীবরূপ ক্ষুদ্র জ্ঞান-কণা। সুতরাং জীবকে ব্রহ্মের অংশ না বলিয়া ব্রহ্ম ব্যতীত কোনও বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করা উচিত নহে। এই ভাবে বিবেচনা করিলে ব্রহ্মের কোনও অংশ নাই, এবং জীব ব্রহ্মেরই অংশ এই দুই বেদবাক্যের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করা যায়।

অধ্যাপক ভি. লেজনী ও ভারতবর্ষ

শ্রীমিলাদা গঙ্গোপাধ্যায়

(১৮৮২ সনের এপ্রিল মাসে ভিনসেন্স লেজনীর জন্ম হয় এবং ১৯৫৩ সনের এপ্রিল মাসে তিনি পরলোকগমন করেন। তিনি প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারত-তত্ত্বের (Indology) অধ্যাপক ছিলেন। বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে রচিত তাঁর গবেষণামূলক গ্রন্থসমূহের জন্য তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাচ্য-তত্ত্ববিদদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন।)

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপন-রত অধ্যাপক লেজনী

প্রথম শান্তিনিকেতনে যাবার পর যখন আমি গুরুদেবের সঙ্গে পরিচিত হই এবং তিনি জানতে পারলেন যে, আমার দেশ হচ্ছে চেকোস্লোভাকিয়া তখন তিনি বললেন, "ওঃ, ওখানে আমাদের একজন হিতৈষী বন্ধু আছেন—অধ্যাপক ভিনসেন্স লেজনী। এখানে কয়েক মাস তিনি আমাদের সঙ্গে কাটিয়েছিলেন, তিনি আমাদের বিশেষ প্রিয়জন। বাংলা ভাষা তিনি ভাল করেই জানেন।"

বস্তুতঃ অধ্যাপক লেজনীকে ভারতবর্ষ পেয়েছিল একজন উত্তম সুহৃদরূপে, হয়ত অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং একনিষ্ঠ বন্ধু হিসাবে। অধ্যাপক লেজনীকে যাঁরা জানতেন তাঁরা এটা অনুভব করতে পারতেন তাঁর মনোভাব আর তাঁর উৎসাহ-পূর্ণ আলাপন থেকে। যাঁরা তাঁর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না তাঁদের নিকট তাঁর এই ভারতপ্রীতি প্রতিভাত হ'ত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লিখিত তাঁর বহুসংখ্যক গ্রন্থ থেকে এবং স্বদেশ ও বিদেশের শুধু বিদগ্ধগোষ্ঠীর নয়, জনপ্রিয় পত্রিকাসমূহেও তিনি যে অসংখ্য মৌলিক প্রবন্ধ এবং অনুবাদ প্রকাশিত করেছিলেন সেগুলি পাঠ করে।

অধ্যাপক লেজনী ছাত্রাবস্থায়ই ভারতীয় দর্শন এবং ভারতীয় ভাষাসমূহের প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভাসের নাটকাবলীতে প্রাকৃত উপভাষাসমূহের বিকাশ সম্বন্ধে প্রথম তাঁর বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা-পুস্তক, "দি ডেভেলপমেণ্টাল ডিগ্রি অব প্রাকৃত লিটারেচার ইন ভাসেস ড্রামা" প্রকাশ করেন।

১৯২৭ সনে প্রকাশিত তাঁর "স্পিরিট অব ইণ্ডিয়া" এবং ১৯৩১ সনে প্রকাশিত এর পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ—"ইণ্ডিয়া এণ্ড দি ইণ্ডিয়ান্‌স্—এ পিলগ্রিমেজ থ্রু দি সেঞ্চুরিজ (ভারত এবং ভারতবাসী—যুগ-যুগান্তরের তীর্থযাত্রা) নামক পুস্তকই তাঁর সর্ব্বাপেক্ষা পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। এই পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠায় অধ্যাপক লেজনীর সঙ্গে তোলা গুরুদেবের একখানি ছবি আছে, আর দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় সন্নিবিষ্ট হয়েছে—গুরুদেবের

একটি কবিতার অনুবাদ—"ইণ্ডিয়া, মাই ডিয়ার মাদারল্যাণ্ড", (হে ভারত, আমার প্রিয় মাতৃভূমি)। এই পুস্তকে গ্রন্থকার আমাদের প্রাচীনতম হরপ্পার যুগের সংস্কৃতি থেকে জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম পর্য্যন্ত বিভিন্ন যুগের ইতিহাসের ভিতর দিয়ে নিয়ে যান, ভারতীয় চিন্তা ধর্ম্ম এবং সাহিত্য-কৃতির মূল ধারাসমূহের সঙ্গে আমাদের পরিচয়সাধন করিয়ে দেন। এতে সন্নিবেশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর কর্ম্ম সম্বন্ধে একটি বৃহৎ অধ্যায়, তাঁর কবিতাসমূহেরও উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে।

শান্তিনিকেতনে অধ্যাপক লেজনী ও রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-গ্রন্থসমূহ বহু পূর্ব্বেই তাঁর মনকে অভিভূত করে—১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁর একটি কবিতা-সঞ্চয়ন প্রকাশিত করেন। গুরুদেবের প্রতি তাঁর যে ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা ছিল তা ১৯২৩ সনে একবার এবং ১৯২৭ সনে পুনরায় তাঁরই আমন্ত্রণে শান্তিনিকেতনে আগমন ও অবস্থানের দরুন দৃঢ়তর হয়। সংস্কৃত এবং বাংলা ভাষায় গভীর ব্যুৎপত্তির জন্যে গুরুদেবের বহু রচনার উৎকৃষ্ট অনুবাদ প্রকাশ করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ সংস্পর্শের দরুন অধ্যাপক লেজনী—"রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—হিজ পারসোন্যালিটি এণ্ড ওয়ার্ক" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং কর্ম্ম) নামে তাঁর একখানি বিশদ জীবনী রচনা করতে সমর্থ হন। দুর্ভাগ্যক্রমে বিগত বিশ্বযুদ্ধের সময় লণ্ডনে বোমাবর্ষণের ফলে এই গ্রন্থের অধিকাংশ কপিই বিনষ্ট হয়ে যায়, মাত্র কয়েক শত

প্রাগের ওরিয়েণ্টাল ইনষ্টিটিউটে অধ্যাপক লেজনী

কপি রক্ষা পায়। যে সকল বিদ্বান ব্যক্তি নিজেদের রচনায় কবির মহান্ ব্যক্তিত্ব, সৃষ্টিধর্ম্মী কর্ম্মপ্রচেষ্টাসমূহের বিকাশ-ধারা, শিক্ষাবিষয়ক আদর্শ, এবং ভারতের স্বাধীনতার

প্রিয় অধ্যাপক লেস্‌নি,

শান্তিনিকেতনে একদিন তোমার সঙ্গে আমাদের মিলন হয়েছিল সে আমি সৌভাগ্য বলে মনে করি। নানা জাতির বিদ্যাসম্মিলনের মধ্য দিয়ে পরস্পরের হৃদয়ের যোগ স্থাপন শান্তিনিকেতনের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধনে তোমার সহায়তা ও সৌহৃদ্য আমরা মূল্যবান বলে মনে করি। অল্পকালের মধ্যে বাংলা ভাষার অন্তরে প্রবেশ করে আমার রচনার উপরে তুমি যে রকম অধিকার লাভ করেছ, সে

অধ্যাপক লেজনীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র

জন্তে তাঁর সারাজীবনের সংগ্রামের কথা ইত্যাদি নানা বিষয়ের উপর প্রথম আলোকপাত করেন লেজনী তাঁদের অন্যতম।

বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে বহু বৎসর পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়নের পর ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে লেজনী তাঁর "বৌদ্ধধর্ম্ম" নামক বৃহদায়তন পুস্তকখানি প্রকাশিত করেন, উক্ত গ্রন্থে বুদ্ধদেবের শিক্ষা এবং খ্রীষ্টধর্ম্মের উপর তার প্রভাবের বিষয় তিনি প্রশ্নোত্তর-ছলে বর্ণনা করেছেন।

এতদ্ব্যতীত অধ্যাপক লেজনী ভাস এবং কালিদাসের নাটকাবলী, জরথুষ্ট্রের মতবাদ, অবেস্তার ভাষা, জিপ্সীদের ভাষা এবং জীবনের বিভিন্ন দিক ইত্যাদি সম্পর্কে বহু বিজ্ঞানসম্মত গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী যোগাযোগ সম্পর্কেও তাঁর বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর জীবনের শেষের দিকে রচিত একটি গ্রন্থের বিষয়বস্তু হচ্ছে আফানিসিজ নিকিটিন নামক জনৈক রাশিয়ান বণিকের পর্য্যটন-কথা যিনি পঞ্চদশ শতাব্দীতে তিন সমুদ্র অতিক্রম করে ভারতবর্ষে আসেন।

অধ্যাপক লেজনী চেকোস্লোভাকিয়ার পণ্ডিতদের প্রাচ্য-তত্ত্ব চর্চ্চার কেন্দ্র প্রাগের ওরিয়েণ্টাল ইনষ্টিটিউট এবং 'স্কুল অব ওরিয়েণ্টাল ল্যাঙ্গোয়েজেস' নামক সংস্থাদ্বয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও 'নবী ওরিয়েণ্ট' নামক সাংস্কৃতিক পত্রিকার প্রবর্ত্তক।

ভারত এবং চেকোস্লোভাকিয়ার মধ্যে মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে গত বিশ্বযুদ্ধের পর তিনি ওরিয়েণ্টাল ইনষ্টিটিউটের ভারতীয় বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন।

ভারতকে গভীরভাবে বুঝিবার উপযোগী মনোভাব সৃষ্টি এবং ভারত ও তাঁর নিজের দেশের মধ্যে প্রীতিকর সম্পর্ক স্থাপনের জন্য অধ্যাপক লেজনীর সমগ্র জীবনব্যাপী প্রয়াসের আভাসটুকুমাত্র এই প্রবন্ধে দেওয়া হ'ল।*

* শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র কর্তৃক ইংরেজী হইতে অনূদিত।

দ্বন্দ্ব ও মিলন

শ্রীধরণীকান্ত দাস

সমষ্টির বিচিত্রতা ব্যষ্টিতে প্রকাশ
প্রকৃতিতে প্রকাশিত যথা বিশ্বনাথ—
স্বাধীন প্রকৃতি মাঝে বিপুল উল্লাস
দিকে দিকে প্রধাবিত তার মুক্ত গতি,

বিজন গহন পথে চলে প্রস্রবণ
কিবা তার গতিভঙ্গী মধুর নর্ত্তন!
সুবিরাট মহীরুহে—পত্র পুষ্প ফল
ছড়ায়ে সৌন্দর্য্যরাশি দোলে মৃদু বায়।

উর্ম্মিমালা রূপে গেলে সাগরের জল—
কেহ ক্ষুদ্র সুবিশাল।—কেহবা তাহার
একেরই প্রেরণা নিয়ে চলিয়াছে ধেয়ে
ভাবোন্মাদে, আপনার সুখগীতি গেয়ে।

ফুটে পদ্ম দিবাভাগে—কুমুদ নিশীথে;
সূর্য্যমুখী করে সদা সূর্য্যাভি গমন
শেফালি বকুল ঝরি' পড়িছে ভূমিতে
অনন্ত ভাবের খেলা কে করে গণন?

কোকিলে পীযুষ ঢালে, কাকে ঢালে বিষ
এই দ্বন্দ্ব যেন সদা হেরি অহর্নিশ।
মানবের দ্বন্দ্ব মাঝে স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাব
মিলনের মহাযাগে মিলনের তরে—

সেই দিন ঘুচে যাবে সকল অভাব
ঝরণা মিলিবে যবে অনন্ত সাগরে।
বিকাশের পথে হও সহায় তাহার
নিশ্চয় ঘুচিবে দ্বন্দ্ব তাহার তোমার;

রবীন্দ্রনাথ ও শিশুসাহিত্য

শ্রীইন্দিরা দেবী

শিশুসাহিত্য রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনার একটি অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ। জীবনের ও জগতের এক একটা রূপ, রং এক এক সময়ে কবির অন্তরে সুগভীর আলোড়নের সৃষ্টি করেছে—তখনই কবি তাকে আপন করে পাবার জন্যে, একান্তভাবে উপলব্ধি করবার জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। প্রয়োজনের তাগিদে বা জ্ঞানবুদ্ধির ঘোরালো পথে কোন জিনিসকে আপন করে তোলার আকাঙ্ক্ষা ছিল কবির স্বধর্ম্ম-বিরোধী। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের সকল প্রকার চিন্তা ও কর্ম্ম-প্রচেষ্টা তাঁর অন্তর্নিহিত সত্তার আত্মপ্রকাশের অদম্য আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়। কবির সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে এই আত্ম-প্রকাশের ব্যাকুলতাই রূপ ও রস-বৈচিত্র্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের শিশু-সাহিত্যের মূল সুরটিও তাই। শিশুজীবনের লজ্জাহীন সজ্জাহীন বিত্তহীন আপনাবিস্মৃত রূপটি কবি আপন অন্তরে উপলব্ধি করেছেন—তার ভিতর দেখেছেন বিশ্বপ্রকৃতির অপূর্ব্ব লীলাচাঞ্চল্য। রবীন্দ্রনাথের এই শিশু বাইরের কেহ নয়—কবি-সত্তারই একটি বিশেষ উপলব্ধি। সেই শিশু কবি স্বয়ং। কখনও এই শিশুর সঙ্গে কবি নিজেকে এক করে ফেলেছেন—শিশুর নির্লোভ, নিরাসক্ত জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনের ধারাটিকেও এক সুরে বেঁধে দিয়েছেন—কখনও বা দূরে দাঁড়িয়ে দরদভরা অন্তরে কবি শিশুর জীবনকে দেখেছেন।

কিন্তু এমনি শিশু হবার সাধ কবির মনে জাগলো কেন? 'যাত্রী' গ্রন্থের একস্থানে 'শিশু ভোলানাথ' রচনা প্রসঙ্গে কবি নিজেই বলেছেন : 'ঐ শিশু ভোলানাথের কবিতাগুলো খামকা কেন লিখতে বসেছিলুম। সেও লোকরঞ্জনের জন্য নয়, নিতান্ত নিজের গরজে। আমেরিকার বস্তুগ্রাস থেকে বেরিয়ে এসেই শিশু ভোলানাথ লিখতে বসেছিলুম, বন্দী যেমন ফাঁক পেলেই ছুটে আসে সমুদ্রের ধারে হাওয়া খেতে তেমনি করে। দেয়ালের মধ্যে কিছুকাল সম্পূর্ণ আটকা পড়লে তবেই মানুষ স্পষ্ট করে আবিষ্কার করে, তার চিত্তের জন্য এত বড় আকাশেরই ফাঁকটা দরকার। প্রবীণের কেল্লার মধ্যে আটকা পড়ে সেদিন আমি তেমনি করেই আবিষ্কার করেছিলুম অন্তরের মধ্যে যে শিশু আছে তারই খেলার ক্ষেত্র লোকে লোকান্তরে বিস্তৃত। এইজন্য কল্পনায় সেই শিশুলীলার মধ্যে ডুব দিলুম, সেই শিশুলীলার তরঙ্গে সাঁতার কাটলুম—মনটাকে স্নিগ্ধ করবার জন্যে, নির্ম্মল করবার জন্যে, মুক্ত করবার জন্যে।'

তাই কবি গেয়ে উঠলেন,

> 'শিশু হবার ভরসা আবার
> জাগুক আমার প্রাণে
> লাগুক হাওয়া নির্ভাবনার পালে।'

ব্যাকুল কণ্ঠে তিনি ফিরে চাইলেন শিশুর জীবন,

> 'আবার ওগো শিশুর সাথি
> শিশুর ভুবন দাও গো পাতি,
> করবো খেলা তোমায় আমায় একা।
> চেয়ে তোমার মুখের দিকে
> তোমায়, তোমার জগৎটিকে
> সহজ চোখে দেখব সহজ দেখা।'

জীবনের কঠিন দুর্গে, বস্তুসম্ভারের অন্ধভাণ্ডারে তিলে তিলে জঞ্জাল জমানোর সঙ্কীর্ণতা কবিকে যখন বিভ্রান্ত করে তুলল, তখনই তিনি ফিরে চাইলেন শিশুর দিকে—শিশুর মধ্যে দেখতে পেলেন ভাগবত দীপ্তির অপূর্ব্ব প্রকাশ। কবি উপলব্ধি করলেন—"জমিয়ে তোলবার মত এত বড় মিথ্যে ব্যাপার জগতে আর কিছুই নেই। এই জমাবার জমাদারটা বিশ্বের চির চঞ্চলতাকে বাধা দেবার স্পর্দ্ধা করে—কিন্তু পৃথিবীতে সৃষ্টির যে লীলাশক্তি আছে, সে নির্লোভ, সে নিরাসক্ত; সে অকৃপণ, সে কিছুই জমতে দেয় না, কেননা জমার জঞ্জালে তার সৃষ্টির পথ আটকায়। সে যে নিত্য নূতনের নিরন্তর প্রকাশের জন্য তার অবকাশকে নির্ম্মল করে রেখে দিতে চায়।" মহাসৃষ্টির এই নিগূঢ় রহস্যটি রবীন্দ্রনাথের শিশু বুঝতে পারে, তাই তাকে

> 'দারিদ্র্য করে না দীন, ধূলি তোরে করে না অশুচি
> নৃত্যের বিক্ষোভে তোর সব গ্লানি নিত্য যায় ঘুচি।

রবীন্দ্রনাথের শিশু মহাকালেরই প্রতীক। কৃপণের সঞ্চয় গর্ব্বের ঔদ্ধত্য মহাকাল কখনই সহ্য করে না—সঞ্চয় সৃষ্টির পথে বাধা—জড়বস্তুপুঞ্জের অন্ধকার ভাণ্ডারে সৃষ্টি আপন পথ খুঁজে পায় না। তাই সৃষ্টির জন্যেই সৃষ্টির প্রতি মহাকালকে হতে হয়েছে নির্লোভ, নিরাসক্ত, নির্ম্মম, তার সঞ্চয়ের থলি রাখতে হয়েছে চিরশূন্য। রবীন্দ্রনাথের শিশুও এই মহাকালের মতই—

> 'আপন বিভব
> আপনি করিস নষ্ট হেলাভরে;
> প্রলয়ের ঘূর্ণচক্র পরে
> চূর্ণ খেলনার ধূলি উড়ে দিকে দিকে,
> আপন সৃষ্টিকে
> ধ্বংস হতে ধ্বংস মাঝে মুক্তি দিস অনর্গল
> খেলারে করিস রক্ষা ছিন্ন করি খেলেনাশৃঙ্খল।

'অকিঞ্চন, তোর কাছে কিছুরই ত কোনও মূল্য নাই,
রচিস যা তোর ইচ্ছা তাই
যাহা খুসি তাই দিয়ে,
তারপর ভুলে যাস যাহা ইচ্ছা তাই নিয়ে।'

মহাকালের সৃষ্টিলীলার এই চির-চঞ্চল, চির-নির্লোভ রূপটির প্রকাশই রবীন্দ্রনাথ শিশুর মধ্যে দেখতে পেয়েছেন। এই শিশু মহাকালের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ ছাড়া আর কিছুই নয়।

এমনি দৃষ্টিতে শিশুকে দেখেছেন বলেই রবীন্দ্রনাথের শিশুকাব্যসমূহ রহস্য রসে, দার্শনিক জিজ্ঞাসার জটিলতায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। শিশুর মনের বা মুখের কথাই কেবল শিশুকবিতার মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি —শিশুমনের সহজ সরল খেয়াল খুশী কবির মনে কঠিন জিজ্ঞাসার পরম রহস্যে রূপান্তরিত হয়ে উঠেছে।

দশ বছরের কন্যা মীরা আর আট বছরের পুত্র শমীন্দ্রনাথকে রেখে কবিপত্নী যখন পরলোকগমন করেন, তখন এই মাতৃহীন শিশু-সন্তান দুটি একান্তভাবেই পিতার আশ্রয় নিতে বাধ্য হ'ল। রবীন্দ্রনাথই হলেন একাধারে তাদের মা-বাবা। মাতৃস্নেহবঞ্চিত শিশু দুটি পিতার কাছে থেকেই স্নেহলাভ করতে সুরু করল। আর শোকাশ্রুধৌত একক জীবনে এরাই হ'ল কবির পরম সান্ত্বনা, একমাত্র অবলম্বন। এই সময়ে বাৎসল্য রসের প্রকৃত উপলব্ধি কবির মনে দেখা দিল। বিচ্ছেদের পর পরম শান্তির মধ্যে কবি-হৃদয়ের বাৎসল্য রস শিশু-সন্তান দুটিকে কেন্দ্র করে অপরূপ রূপ লাভ করল। শুধু পত্নীবিয়োগই নয়—পুত্র শমীন্দ্রনাথের উপরও বুঝি যমরাজের নজর পড়েছে—শমীন্দ্রনাথ তখন অন্তিম শয্যায়। পুত্রের আনন্দবিধানের জন্য সন্তান-বৎসল পিতা শমীন্দ্রনাথকে কবিতা রচনা করে শোনাতে লাগলেন। এই পটভূমিকায়ই রচিত হয়েছিল 'শিশু' গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা।

শমীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে মানব হৃদয়ের চিরন্তন শিশুটি কবির অন্তরে মুখর হয়ে উঠল অসংখ্য জিজ্ঞাসায়, গভীর কৌতূহলে শিশুমনের সহজ প্রশ্নগুলি রহস্যের ধূম্রজালে কবির অন্তর্লোককে পরিব্যাপ্ত করে ফেলল। এর ফলেই রবীন্দ্রনাথের শিশুকবিতায় বাৎসল্য-রসের সঙ্গে রহস্য-রস ওতঃপ্রোতভাবে মিশে গেছে—শিশুর সহজ জিজ্ঞাসার আবরণে কবি জীবন-দর্শনের কঠিন প্রশ্নকে লুকিয়ে রেখেছেন। শিশুকে কবি দেখেছেন বিশ্ব-জীবনের একটি খণ্ড অংশরূপে, স্বর্গীয় মহিমার পরম প্রকাশরূপে। এই শিশু নিত্যকালের চির-পুরাতন শিশু—জগতের স্বপ্ন থেকে এর জন্ম তাই স্বপ্নের মতই সে রহস্যপূর্ণ। যারা সংসারী বুদ্ধিজীবী, তাদের পক্ষে এই শিশুর রহস্য উদ্ঘাটন করা সহজ নয়—এমন কি শিশুর মায়ের মনেও এই প্রশ্ন:

'নির্নিমেষে তোমায় হেরে
তোর রহস্য বুঝি নেরে
সবার ছিলি আমার হলি কেমনে।'

এই শিশু বিশ্বের ধন—জগৎ-মায়ের অন্তঃপুরে তার বাস। সৃষ্টির মূল সুরের সঙ্গে শিশুর জীবন একই রাগিণীতে বাঁধা। শিশুর খেলাঘর বিশ্বজগতের সৃষ্টিশালা। তাই শুধুমাত্র শিশুচিত্তের সরল পরিচয় হিসেবে নয়, নিতান্ত দর্শনরূপী কাব্য হিসেবেই রবীন্দ্রনাথের শিশুকবিতাসমূহ বাংলা-সাহিত্যের পরম সম্পদ হয়ে উঠেছে। বাৎসল্য-রসে রসাল কবিতা আমাদের সাহিত্যে হয়ত অনেকই সৃষ্টি হয়েছে,-কিন্তু সেই বাৎসল্য-রসের সঙ্গে কোথাও রহস্য রসের-পরিণয় ঘটে নি। এই পরিণয় ঘটিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, তাই তাঁর 'শিশু'কাব্যগ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের অদ্বিতীয় অতুলনীয় সম্পদ।

শিশু ভোলানাথে কবি যেন আবার নতুন করে নতুন দৃষ্টি মেলে শিশু-জীবন উপভোগ করলেন, কখনও খেলাচ্ছলে কখনও শিশুলীলাকে রহস্যজালে মণ্ডিত করে। শিশু ভোলানাথের শিশুর সঙ্গে কবি নিজেকে একসূত্রে বাঁধেন নি, সেই শিশুর অনাবিল আনন্দের অংশ কবি গ্রহণ করেন নি। এখানে শিশু হবার জন্য, শিশুর দলে মিশে যাবার জন্য কবির ব্যাকুলতা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে—

'ওরে শিশু ভোলানাথ, মোরে ভক্ত বলে
নে রে তোর তাণ্ডবের দলে
দে রে চিত্তে মোর
সকল ভোলার ঐ ঘোর।
খেলেনা ভাঙার খেলা দে আমারে বলি
আপন সৃষ্টির বন্ধ আপনি ছিঁড়িয়া যদি চলি
তবে তোর মত্ত নর্তনের চালে
আমার সকল গান ছন্দে ছন্দে মিলে যাবে তালে।'

কবি এখানে শিশুলীলার দর্শকমাত্র, তিনি শিশুর দরদী ভক্ত, নিজে কিন্তু শিশু নয়। তিনি যেন দূরে দাঁড়িয়ে সুগভীর দরদ দিয়ে অনিমেষ আঁখি মেলে শিশু-জীবনের অন্তর্লোকের রহস্যের মধ্যে দৃষ্টি নিমজ্জিত করে আছেন, তাকে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে উপভোগ করছেন।

যে রবীন্দ্রনাথ এক দিন অপরূপ সৌন্দর্য্যের স্নিগ্ধ সলিলে একেবারে ডুবে গিয়েছিলেন—যিনি ছিলেন অতৃপ্ত, অ-শান্ত, নব নব অনুভূতি যাঁর হৃদয়ে নিত্য নূতন রসের সঞ্চার করত তিনি আজ সহৃদয় দর্শকমাত্র। সমস্ত সৌন্দর্য্যের মহোৎসব থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে, দূরে রেখে বাল্য-জীবনের দিকে তাকিয়ে আছেন, ভাবছেন—

'বাল্য দিয়ে যে জীবনের
আরম্ভ হয় দিন
বাল্যে আবার হউক না তাহা সারা।'

বস্তুতঃ পক্ষে রবীন্দ্রনাথ সারা জীবনই ছিলেন একটি অশান্ত অতৃপ্ত শিশু। আজ যাকে একান্ত আপনার করে আঁকড়ে ধরলেন, কালই তাকে অসীম ঔদাসীন্যে সরিয়ে দিলেন দূরে। কোন একটা বিশেষরূপ বা ভাবধারার মধ্যে কোন দিন তিনি নিজেকে বন্দী করে রাখতে পারেন নি। ভাঙা-গড়ার পথেই চলে শিশুর খেলা—এমনি খেলাতেই তার আসল আনন্দ। এই শিশুসুলভ আনন্দই কবির মনের বীণাটিতে ঝঙ্কারের পর ঝঙ্কার তুলে গেছে, বিচিত্র রূপ ও রস মাধুর্য্যে কবি-হৃদয়কে চঞ্চল করে তুলেছে। কবি বলেছেন : মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে। তারপরই আবার শোনা গেল অতৃপ্ত আত্মার আকুল আর্ত্তনাদ—হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনখানে—।

তাই রবীন্দ্রনাথের কাব্য মুখতঃ বন্ধন-মুক্তির কাব্য। কিন্তু বন্ধনকে তিনি কখনই অস্বীকার করেন নি—বন্ধনের মধ্যেই তিনি ছিলেন, অথচ তাকে এড়িয়ে চলেছেন সব সময়। কোন বিশেষ ভাব-বন্ধনই কবিকে বেশী দিন বেঁধে রাখতে পারেনি—তাঁর মনের তারে এক-একবার এক একটা রাগিণী ঝঙ্কার তুলেছে, কবি তখনই তাকে জেনেছেন, বুঝেছেন, নিজের মনের রস দিয়ে উপভোগ করেছেন। কিন্তু তার পরই আবার চঞ্চল হয়ে উঠেছেন নতুনের জন্য। এটা কবি-কল্পনার ধর্ম্ম—এই ধর্ম্ম রবীন্দ্রনাথের সকল রচনার মধ্যে পরিস্ফুট। কবি নিজেই বলেছেন…ঘন দেওয়ালের বাইরের রাস্তা থেকে চির-পথিকের পায়ের শব্দ শুনতে পেতাম, সেই শব্দের ছন্দই যে আমার রক্তের মধ্যে রাজে, আমার ধ্যানের মধ্যে ধ্বনিত হয়। তাই কবি গেয়েছেন—'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী।' এই সুদূরের সঙ্কেত, অজানার ইঙ্গিত, সকরুণ গীতিমাধুর্য্যে আত্মপ্রকাশ করেছে ডাকঘরের অমল-চরিত্রে। মুক্তির জন্য অমলের আকুলতা কবির নিজেরই ছেলেবেলার কথা, যারা লোভী, অতিমাত্রায় সংসারী, হিসাবের ছকের মধ্যে তাদের জীবন সীমাবদ্ধ—কৃপণের মত জগতের সবকিছু আঁকড়ে ধরে রাখতে চায় তারা। হাতের মুঠোতে যা ধরে রাখা চলে তাতেই তাদের একমাত্র বিশ্বাস। সুদূরের ডাক তারা শুনতে পায় না। আবদ্ধ জীবনের এমনি নির্ম্মমতার সঙ্গে ছেলেবেলাতেই কবির পরিচয় ঘটেছিল। সেই দিনের এই নিষ্ঠুর স্মৃতি কোনদিনই তিনি ভুলতে পারেন নি—তাই জীবন ভোর বাইরের আহ্বান তাঁকে এত বেশী চঞ্চল করে তুলত, মুক্তির স্বপ্নে তিনি উৎফুল্ল হয়ে উঠতেন।

গল্পসল্পও কবির এমনি একটা রহস্যময় সৃষ্টি। সহজ সুরে, সহজ ভাষায় গল্পচ্ছলে যা বলে গেছেন, তার আসল কথাটি মোটেও সহজ নয়। এ বিষয়ে কবি নিজেই বলেছেন—'গল্পসল্পের ছোট গল্পগুলো ছেলেরা দখল করতে চায়, কিন্তু হাত ফসকে যায়। আসলে এর ভিতরের খবর বড়দের জন্য।'

আসল কথা, কবি যখন দেখলেন বস্তুজগতের সঞ্চয়ের বোঝা জমতে জমতে চারদিক থেকে তাঁকে ঘিরে ফেলতে চাইছে, তখনই তিনি শিশুলীলা নিয়ে মেতে উঠার আগ্রহ অনুভব করলেন। নিজের সৃষ্টিকে নিজের হাতে ভেঙে চুরমার করে তবেই তিনি উন্মুক্ত করতে চাইলেন নতুন সৃষ্টির পথ। মহাকালের সৃষ্টিলীলাও এই নিয়মেই চলে, আর জগতে তার অধিকারী একমাত্র শিশু। কবি যখন—

'ভবিষ্যতের ভয়ে ভীত
দেখতে না পাই পথ,
তাকিয়ে থাকি পরশুদিনের পানে,
ভবিষ্যৎ তো চিরকালই
থাকবে ভবিষ্যৎ
ছুটি তবে মিলবে বা কোন্‌খানে?'

তখনই শিশুজীবনের হাতছানি কবিকে চঞ্চল করে তুলল। এই শিশুর কথাটিই রবীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্যের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে এবং এই ভাবটি দিয়েই শিশুসাহিত্যের মূল সুর রচিত।

'মঙ্গল গীত' কবিতাটিতেও রবীন্দ্রনাথের শিশুর মনের কথা অপরূপ মাধুর্য্যে ফুটে উঠেছে।*

* শ্রীরামপুর বনফুল সাহিত্য-সমিতির রবীন্দ্রায়নে প্রধান অতিথির ভাষণ।

ত্যাগ করিয়া গৌণ অর্থ গ্রহণে কোন মতের সহিত বিরোধ হয় না, পদটির সার্থকতাও রক্ষিত হয়।

অচেতন বায়ু ইচ্ছাপূর্ব্বক অগ্নির সহায়তা করে না, অগ্নি প্রজ্বলন স্থানে এমন কতকগুলি কারণ ঘটে, যাহার ফলে বায়ুর সহায়তা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকদিগের একটি প্রসিদ্ধ মত আমরা পাই। তাঁহাদের মতে যেস্থানে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, সে স্থানের ভারী বায়ু তাপের সম্পর্কে হাল্কা হইয়া ঊর্দ্ধে গমন করে, ফলে স্থানটি শূন্য হয়; শূন্য স্থানে পার্শ্বস্থ বায়ু বেগে ধাবমান হয়, ফলে দাহ্য বস্তুগুলিতে অগ্নি সংক্রমিত হয়। দাহ্য বস্তুগুলিতে অগ্নিকে সংক্রামিত করাই অগ্নির সহায়তা করা—ইহা একটি নৈসর্গিক কারণের ফলেই বায়ুর পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। বৈজ্ঞানিকদিগের এই মতের সহিত প্রাচীন ভারতের দার্শনিক বৈশেষিকদিগের কিছু বিরোধ দৃষ্ট হয়; বৈশেষিক মতে বায়ু সমস্ত বস্তু হইতে হাল্কা, তাহাতে কিছুমাত্র ভার নাই। অবস্থাবিশেষে বায়ুর সহিত জলীয়-কণিকা বা পার্থিব কণিকা মিশ্রিত থাকে। এই পার্থিব বা জলীয় কণিকার মিশ্রণের ফলে বায়ুকে ভারী বলিয়া ভ্রম হয়। ঐ ভার বাস্তবিক পক্ষে পার্থিব বা জলীয় কণিকার।

বৈশেষিকদিগের এ মতে বায়ু কোন অবস্থাতেই হাল্কা হয় না, যাহাতে কিছুমাত্র ভার আছে, তাহাই হাল্কা হইতে পারে, বৈশেষিক মতে বায়ু সর্ব্বদা ভার নির্ম্মুক্ত। ফলে বৈশেষিক মতানুসারে তাপ সংস্পর্শে বায়ু হাল্কা হইয়া ঊর্দ্ধে গমন করে একথা স্বীকার করা চলে না। এমতাবস্থায় অগ্নির প্রজ্বলন স্থানে বায়ু জোরে বহিবার কারণ কি? এ সম্বন্ধে বৈশেষিক মতের অনুসারেও একটি সমাধান দেওয়া চলে। তাপের সংস্পর্শে বায়ু স্তিমিত হয়। গ্রীষ্ম-কালে ঝটিকার পূর্ব্বক্ষণে প্রকৃতি স্তব্ধ ভাব ধারণ করে, বায়ু বহে না, স্তিমিত হয়, বায়ুর এই স্তৈমিত্য বা স্তব্ধতা বৈজ্ঞানিকের মতে বায়ুশূন্যতা। গ্রীষ্মতাপে পৃথিবী-পৃষ্ঠস্থ বহু মাইলব্যাপী বায়ু লঘু হইয়া ঊর্দ্ধে গমন করে, ফলে স্থানটি বায়ুশূন্য হয়। বৈশেষিকাচার্য্য শিবাদিত্য সপ্তপদার্থী গ্রন্থে বায়ুস্তৈমিত্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "স্তিমিত বায়ুস্তু পরমাণু সমূহোঽনারম্ভক এব"—বায়ুনাশের পর কতকগুলি বায়বীয় সূক্ষ্ম কণিকা বিদ্যমান থাকে, এই সূক্ষ্ম বায়ুকণিকাই স্তিমিত বায়ু।

তাপ সংস্পর্শে বায়ু নষ্ট হয় এ সম্বন্ধে আরও একটি স্পষ্ট উক্তি পাওয়া যায়। কুসুমাঞ্জলি টীকায় বর্দ্ধমান বলিয়াছেন, "নির্ব্বাত স্থিতস্য দীপস্য বাতং বিনা নাশদর্শনেন"—বায়ুছাড়া আগুন জ্বলিতে পারে না। একটি দীপকে পাত্রাবৃত করিলে কিছুক্ষণ পরে দীপ নিবিয়া যায়। পাত্র-মধ্যস্থ বায়ু যে পর্য্যন্ত দীপতাপে নষ্ট না হয়, সে পর্য্যন্ত দীপ জ্বলে, পরে বায়ুর অভাবে নিবিয়া যায়। এইরূপে বৈশেষিক মতে তাপের সম্পর্কে বায়ুর নাশ স্বীকৃত হইয়াছে, বায়ুর ঊর্দ্ধগতি স্বীকৃত হয় নাই। প্রজ্বলিত কেরোসিন ল্যাম্প প্রভৃতির উপরিস্থিত টিনের চাকৃতির ঘূর্ণন বায়ুর ঊর্দ্ধগতির ফলে। একথা বৈশেষিক-মতে স্বীকার না করিলেও চলে, বৈশেষিকদিগের মতে যে স্থলে তাপ অনুভূত হয়, সে স্থলে দৃশ্য বা অদৃশ্যরূপে তেজ বিদ্যমান থাকে, তেজের বেগেও বস্তুর সঞ্চালন সম্ভব হয়, ফলে কেরোসিন ল্যাম্প প্রভৃতির উপরিস্থিত টিনের চাকৃতির ঘূর্ণন বহ্নিশিখানির্গত অদৃশ্য তেজের বেগে সম্ভব হইয়া থাকে, ইহা এ মতে স্বীকার করিতে বাধা থাকে না। সুতরাং বায়ুর ঊর্দ্ধগতি স্বীকার করিবার প্রয়োজনও ইহাদের হয় না।

যেখানে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, সেখানেও অগ্নিতাপে স্থূলবায়ু বিনষ্ট হয়, অবশিষ্ট থাকে বায়বীয় সূক্ষ্ম কণিকা। এই সূক্ষ্ম কণিকা পার্শ্বস্থ বেগশালী বায়ুর আগমনে বাধাদায়ক নহে, ফলে এ যাবৎ যে সকল পার্শ্বস্থ বায়ু স্থূলবায়ু থাকার ফলে অবরুদ্ধ-বেগ ছিল, তাহারা বন্ধনহীন নদীস্রোতের মত অগ্নি-প্রজ্বলন স্থানটিকে পরিপূর্ণ করে। পরিপূর্ণ করার কালে বায়ুর বেগে অগ্নি প্রচলিত হয়, প্রচলিত অগ্নি নূতন দাহ্য বস্তুতে সংক্রমিত হয়, ফলে অধিকতর জ্বলনশীল হইয়া থাকে। এইরূপে যে পর্য্যন্ত দাহ্য বস্তু সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত না হয়, সে পর্য্যন্ত তাপ-বশতঃ বায়ুর নাশ, স্থানের শূন্যতা ও পার্শ্বস্থ বায়ুর বেগে আগমন, এই তিনটি অবিচ্ছিন্ন ধারায় বিদ্যমান থাকে। ক্রমে দাহ্য নিঃশেষে অগ্নির সমাপ্তি হয়, স্থানটি তাপ বর্জ্জিত হয়। তাপের অভাবে বায়ুর নাশ, নাশের ফলে স্থানের বায়ুশূন্যতা—শূন্য স্থানে পার্শ্বস্থ বায়ুর আগমন, এই তিনটিরও উচ্ছেদ হয়।

এইরূপে বৈশেষিকদিগের মত অনুসারেও অগ্নির প্রতি বায়ুর সহায়তার নৈসর্গিক কারণ প্রদর্শন করা চলে। বৈজ্ঞানিক ও বৈশেষিক মত অনুসারে বায়ুসখা নামটিকেই সার্থক বলা চলে, বায়ুসখ নামটিকে বলা চলে না। নামটির ব্যুৎপত্তি অনুসারে অগ্নিকে বায়ুর সখারূপে স্বীকার করিতে হয়। অগ্নি বায়ুর সখাও নহে, সহায়কও নহে, প্রত্যুত বৈশেষিক মতে সম্পূর্ণরূপে সখার বিপরীত; নাশক, অর্থাৎ শত্রু। এমতাবস্থায় অগ্নির বায়ুসখ নামটি ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ-শূন্য স্বীকার করিতে হয়। অমরসিংহকৃত কোষে বায়ুসখা নামটিই মুদ্রিত প্রামাণিক পুস্তকে অধিকাংশ স্থলে গৃহীত হইয়াছে। কোনও কোনও পুস্তকে বায়ুসখ নামটিও দেখা যায়। উল্লিখিত যুক্তি অনুসারে মনে হয় বায়ুসখা নামটিই প্রামাণিক।

প্রসন্ন অধিকারী

শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

প্রসন্ন দাসের পিতা বলহরি দাস দুই বেলা নিয়মিত জপ-আহ্নিক করিয়া তবে জল গ্রহণ করিতেন। কপালে দীর্ঘ চন্দনের তিলক কাটিয়া, দীর্ঘ শিখায় সাদা ফুল বাঁধিয়া, হরিনামের ঝোলার ভিতর হাত ঢুকাইয়া অনুচ্চস্বরে প্রায়ই বলিতেন, সংসার অনিত্য, একমাত্র প্রভু তুমিই সার। কিন্তু বলহরি দাস একমাত্র পুত্র প্রসন্নকে প্রায়ই উপদেশ দিতেন, বাপু, সংসার অনিত্য সত্যিই, কিন্তু তার মধ্যে একমাত্র সার টাকা। এটা যেন ভুলো না বাপু। বি-এ টা চট করে পাস করে ফেল, তারপর সরকারী চাকরিতে ঢুকিয়ে দেব। আমার বন্ধু, সেই যে কলকাতার কুঞ্জলাল, সে মস্ত চাকরে। সরকারী চাকরি—বুঝলে কিনা, ওটা একটা বড় জমিদারীর সামিল। এর হাঙ্গা নেই ঝুকো নেই, মাসের তিরিশটে দিন কাবার হলেই, হাতে নোটের তাড়া এসে পড়বে। এর চেয়ে সুখের কাজ আর কি আছে বাপু। তারপর হাঁ সারা দিনের কাজের শেষে, সন্ধ্যা-বেলায় প্রভুর নাম কর—প্রাণভরে ডাক, সংকীর্তন কর, এর মত আর কি আনন্দ আছে। কি বলছিলাম যেন—হাঁ, তোমার সেই কুঞ্জকাকার কথা। তোমার কুঞ্জকাকা জানিয়েছে, বি-এ পাস করলেই তোমায় ভাল সরকারী চাকরিতে ঢুকিয়ে দেবে। তারপর, ওরই এক বন্ধু নিবারণ বাবুর মেয়ের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ এক রকম পাকা হয়ে রয়েছে। মেয়েটি সুন্দর, সুশ্রী, স্বভাবটিও চমৎকার। আর পাওনাও হবে ভাল। বলেছে, কলকাতার একখানা বাড়ী লিখে দেবে। তাই বলছি বাপু মন দিয়ে পড়ে বি-এ পাসটা দিয়ে ফেল।

কিন্তু প্রসন্নকে আমরা হাঁদা আর আহাম্মকই বলিব। বলহরি দাসের এমন সাজানো প্ল্যানকে বানচাল করিয়া দিয়া, প্রসন্ন বি-এ ফেল করিল। প্রসন্নর নাকি একটুখানি কাব্যরোগ ছিল। কলেজের পড়া না করিয়া, মোটা খাতায় সে কবিতা লিখিত। প্রসন্ন যখন পিতার আদেশ অমান্য করিয়া, পদ্মাসনা সরস্বতীর আরাধনায় রত ছিল—তখন তাহার অলক্ষিতে, কখন যে লক্ষ্মীদেবী বিমুখ হইয়া গেলেন, এ খবর সে জানিল না—

বলহরি দাস পুত্রের ফেল হওয়ার দুঃসংবাদ শুনিয়া সেইদিন আর জলগ্রহণ করেন নাই। হরিনামের মালাগাছটি লইয়া, কম্পিত হস্তে ঘন ঘন নাম জপিতে জপিতে বারংবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছেন, হতভাগা বাঁদর বেল্লিক, আমার সর্ব্বনাশ করল। হতভাগাকে আর একটা পয়সাও দেব না।

প্রসন্ন কিন্তু নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে কলিকাতা হইতে বাড়ী না আসিয়া, আর এক সমশ্রেণী বন্ধুর সহিত দেশ ভ্রমণের জন্য পুরীধামে চলিয়া গেল। সঙ্গে সেই মারাত্মক সর্ব্বনাশ কাব্য-চর্চ্চার মোটা খাতাখানি সুটকেসের মধ্যে সযত্নে লইল।

পুরীধামে দুই বন্ধুতে মিলিয়া প্রায় দুই মাস সমুদ্রের হাওয়া খাইল বিস্তর, সমুদ্রে স্নান করিল অনেকবার। দিনরাত বালুর উপর বসিয়া, অনিমেষ চোখে, সমুদ্রের বহু ঢেউ গুনিল। প্রসন্নর বন্ধু যখন বালুর উপর কাৎ হইয়া শুইয়া সিগারেট টানিতে টানিতে গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিত, সেই সময় প্রসন্ন তাহার মোটা খাতাখানির সাদা পাতায় দামী ফাউন্টেন পেন দিয়া কবিতা লিখিয়া ভরাইয়া ফেলিল। সেই সব কবিতা আমরা পড়ি নাই, আর কবিতাও ভালরূপ বুঝি না। তবে প্রসন্নর বন্ধু ব্যোমকেশ কবিতাগুলি পড়িয়া, তাহার ভাব, ভাষা প্রভৃতি দুর্ব্বোধ্য দেখিয়া কি বুঝিল জানি না, তবে বেশ তারিফ করিয়া বলিল, প্রসন্ন এসব লেখাগুলো তোমার বই আকারে ছাপাইতেই হইবে। নতুবা এমন সব উচ্চ উচ্চ কবিতার রস থেকে দেশবাসীকে বঞ্চিত করা নিতান্তই অন্যায়। দেখ আমার মনে হয়, দেশসুদ্ধ লোক, এমন সব কবিতা পড়ে, নিশ্চয়ই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়বে। আর তোমার প্রশংসায় দেশ ভরে যাবে—

প্রসন্ন ব্যগ্রভাবে বলিল, সত্যি নাকি? তবে এখন ছাপাবার কি করা যায়। আমার তো ভাই টাকা পয়সা নেই আর বাবা যে দেবেন তাও মনে হয় না। একে ফেল করেছি, তাঁকে না জানিয়ে বেড়াতে এসেছি, এতেই রেগে টং হয়ে আছেন। এর ওপর কবিতার বই ছাপাব বলে টাকা চাইলে নিশ্চয়ই ত্যাজ্যপুত্র করবেন···

ব্যোমকেশ বলিল—বটে। দেখ চিরকাল প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের কপালে এমনিই হয়। দুঃখকষ্টই তো জীবনের কষ্টি-পাথর। সোনার পরখ যেমন কষ্টিপাথরে তেমনি প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের মাপকাঠি হ'ল দুঃখ-বেদনার মাঝে। আর সেকেলে বুড়োবুড়ী বাপ-মায়ের কথা শুনতে গেলে চলে না। সে সব যুগ শেষ হয়ে গিয়েছে ব্রাদার।—এই বলিয়া ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ ধরিয়া অনলবর্ষী বক্তৃতায় প্রসন্নর ভীরু স্বভাবকে কিঞ্চিৎ সাহসী করিয়া তুলিল।

প্রসন্ন বলিল, কিন্তু টাকার কি হবে—

—তার জন্যে কোন ভাবনা নেই ব্রাদার। কলকাতায় আমার এক চেনা ছাপাখানা আছে। তাদের ওখানেই সব ব্যবস্থা হবে। কিন্তু ব্রাদার উপহার-পৃষ্ঠায় আমার নামটা যেন থাকে—

প্রসন্ন হাসিয়া বলিল, সে আর বলতে। তোমার টাকাতেই যখন বই বেরুচ্ছে, তখন আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ তোমাকেই উৎসর্গ করলাম···

কথায় আছে, কান টানিলেই মাথা আসে। প্রসন্নর অবস্থা সেইরূপ হইল। বলহরি দাস যখন টাকা পাঠানো বন্ধ করিলেন,

তখন প্রসন্নর আর কলিকাতায় থাকা হইল না। হাত একেবারে শূন্য—পকেটে টাকা নাই—মেসের ম্যানেজার টাকার জন্য বারংবার তাগাদা দিতেছেন। ধোপা, নাপিত, চা জলখাবার এই রকম নিত্য খুচরা খরচ, সব সময়ই মুখ হাঁ করিয়া রহিয়াছে। অথচ না করিলেও নয়। প্রসন্ন চিরকাল ভাল খাইতে অভ্যস্ত। সকাল বিকাল উৎকৃষ্ট জলখাবার না হইলে মেজাজ খারাপ হইয়া যায়। কিন্তু আজ দুই দিন হইতে ছাতু বা মুড়ি কিনিবার পয়সা পর্য্যন্ত নাই। ব্লেডের অভাবে মুখময় দাড়ী-গোঁফের জঙ্গল হইয়াছে—কাপড়-জামা ময়লা হইয়া গিয়াছে। জুতা জোড়ার অবস্থাও বিশেষ ভাল নয়। প্রসন্ন যখন প্রতিক্ষণে পিতার নিকট হইতে টাকার প্রত্যাশায় পিওনের পথ চাহিয়া রহিয়াছে, ঠিক সেই সময় ব্যোমকেশ আসিয়া উপস্থিত। ব্যোমকেশের জামা-কাপড় সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ব্যোমকেশ দিব্য সাজিয়া-গুজিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে সিগারেট ধরাইয়া প্রসন্নর বিছানায় বসিয়া বলিল—তার পর ব্রাদার খবর কি।—প্রসন্ন শুষ্ক মুখে বন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া, আজ এতদিন পর যেন তাহার উপর চটিয়া গেল। আমি আজ না খাইয়া মরিতেছি, আর বাপু তুমি আমারই মত পরীক্ষায় লাড্ডু মারিয়া দিব্য সাজিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে কথা বলিতেছ। এটা কোন্ জাতীয় ন্যায় ও নীতির কথা।—প্রসন্ন কিছু বলিল না। ব্যোমকেশ ভাবিল, বন্ধু বোধ হয় কোন উচ্চ চিন্তা করিতেছে। কিংবা কোন নূতন ভাব আসিয়াছে—তাই এই অন্যমনস্কতা। ব্যোমকেশ দুলিয়া দুলিয়া সিগারেট টানিতে লাগিল। প্রসন্ন নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল। আজ আর টাকা আসিল না। প্রসন্ন পিতার উপর মর্ম্মান্তিকভাবে চটিয়া গেল। ঘরের নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া ব্যোমকেশই কথা বলিল, তোমার বই বের করার সব ব্যবস্থা করে এলাম ব্রাদার।—কিন্তু কি আশ্চর্য, এত বড় সুখবর শুনিয়া কোন কবিযশঃপ্রার্থী নবীন লেখক চুপ করিয়া থাকে! বরং বন্ধুকে জড়াইয়া ধরিয়া আনন্দে ধেই ধেই করিয়া নৃত্য করারই কথা।

ব্যোমকেশ বলিল, তার মানে? শুধু শুকনো হুঁ দিয়ে চুপ মেরে গেলে যে ব্রাদার।

প্রসন্ন বলিল, উপায় কি বল। টাকা থাকলে সন্দেশ এনে মিষ্টি-মুখ করে দিতাম। বাবা টাকা পাঠান নি। পকেটে একটা পয়সা নেই—কাল থেকে একরকম উপবাসই দিচ্ছি।

ব্যোমকেশ বন্ধুর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, বিলক্ষণ। তা তোমার বাবার আক্কেলকে বলিহারি যাই। কিন্তু মোট কথা, এটা ভাবনার কথাই প্রসন্ন। আর আমার বাবা—হুঁ একেবারে সত্যিকারের আদর্শ পিতৃদেব বলতে হবে কিন্তু। বললেন, হারে বেমা ফেল করেছিস নাকি? ওটি হবে না—আবার পড়, যেমন করে হোক পাস করতেই হবে—ট্রাই ট্রাই এগেন্। কিন্তু তোমার বাবা কেমন ধারা বাবা তা তো বুঝছি নে ব্রাদার—

প্রসন্নর কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল কিনা জানি না। কিন্তু প্রসন্নর পড়া আর হয় নাই। টাকা পাঠাইবার যিনি মালিক, সেই বলহরি দাস হঠাৎ সামান্য জ্বরে মারা পড়িলেন। বেচারা প্রসন্ন কোনরূপে কলিকাতা হইতে বাড়ী আসিয়া পৌঁছাইল। বলহরি দাসের কোন আশাই মিটিল না। না হইল প্রসন্ন পাস—অথবা না হইল তাহার কোন সরকারী চাকরী। যে মেয়ের সহিত প্রসন্নর বিবাহ হইবার কথা ছিল, তাহাও হইল না। প্রসন্ন একমাত্র বৃদ্ধা মাসীর অনুরোধে গ্রামেরই এক দরিদ্র ব্যক্তিকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিল। বলহরি দাস কিছু জমিজমা, বাগান ও নগদ কিছু টাকা রাখিয়া গিয়াছিল, প্রসন্ন তাহাই ভাঙাইয়া ভাঙাইয়া দিব্য খাইতে লাগিল। নববধূর সহিত যেমন চলিল প্রেমচর্চ্চা তেমনি সঙ্গে সঙ্গে কাব্য-চর্চ্চাও চলিতে লাগিল। সেই পুরাতন মোটা খাতার পাতা শেষ হইলে আর একখানি মোটা খাতা আসিল। প্রসন্নর কালি-কলমের স্পর্শে খাতার সব শুভ্র পৃষ্ঠা কবিতায় ভরিয়া গেল। দ্বিপ্রহরে যখন চরাচর নিস্তব্ধ—দুপুরের তপ্ত হাওয়া বহিয়া যাইতেছে, সেই সময় প্রসন্ন তাহার রচনা একে একে বধূকে শোনায়। নববধূ মায়া মাথার কাপড় ফেলিয়া বালিশে চুল এলাইয়া দিয়া এক মনে শুনিতে শুনিতে কখন ঘুমাইয়া পড়ে। প্রসন্নর সেই দিকে দৃষ্টি নাই—সে নিজের রচনা মুগ্ধ হইয়া পড়িয়া যায়।...কিন্তু এই নিরুদ্বেগ জীবনে বাধা পড়িল। এক দিন মায়ার কথায় সচকিত হইয়া হাতের কলম নামাইল।

মায়া বলিল, চাল-ডাল সব ফুরিয়েছে যে।

প্রসন্ন বলিল, তাতে কি। কিনলেই হবে।

—কিন্তু টাকা?—প্রসন্ন দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল, বল কি? কলম রাখিয়া খাতা বন্ধ করিল। এত দিন ধরিয়া বসিয়া বসিয়া খাইলে রাজভাণ্ডারও ফুরাইয়া যায়। আর এ তো সামান্য আয়—সামান্য অর্থ। এইবার প্রসন্ন চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল। দেখিল গোয়ালে গরু নাই, ধানের গোলায় ধান নাই—বাগানে বেড়া নাই। লোকের ছাগল গরুতে সব খাইয়া দিব্য এক তৃণহীন মাঠ বানাইয়া ফেলিয়াছে। মুদীর দোকানে দেনা হইয়াছে বিস্তর, একমাত্র বৃদ্ধা দাসী, সেও মাহিনার অভাবে কাজ করিতে অস্বীকার করিয়াছে।

মাসী বলিল, বাবা, বেটাছেলে হয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে কি ভাত জোটে—আর বৌমা এ বাছা তোমারই দোষ।

নববধূ মায়া দীর্ঘ ঘোমটার অন্তরালে চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া দুই ভীরু নয়ন তুলিয়া স্বামীর দিকে তাকাইল।

প্রসন্ন বলিল, মাসী ওর কি দোষ। সে যাক্—এবার আমি উপার্জ্জনের চেষ্টা দেখছি। মাসী বলিল, তা ভাল। এত দিনে যে সুবুদ্ধি হ'ল এও মন্দের ভাল। আর আমিও বলি—বৌমা, গৃহস্থঘরের বৌ, এত বেআক্কেলপনা ভাল নয়। দিনরাত স্বামীর সঙ্গে গুজ-গাজ ফুসফাস করা—ছড়া শোনা একি ভাল। ঘর-সংসারের কাজ কর—নিজের সংসার তুমি যদি না দেখ, তবে দেখবে কে? তোমরা

শ্বশুরের আমলে ঘর-সংসারের কেমন ছিরি-ছাদ ছিল। আর আজ? তোমাদের সন্ধ্যা-আহ্নিক নেই—ঠাকুর-দেবতার নাম নেওয়া নেই—ধুনো গঙ্গাজল দেবার পাট নেই। এতে কি লক্ষ্মী থাকে?

নববধূ আবার চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া কাজে লাগিল। প্রসন্নর মনে হইল, দুই জনে গৃহের এক কোণে বসিয়া বসিয়া এতদিন যে শ্বেতপদ্মাসনা সরস্বতীর ধ্যান করিয়াছিল—এত দিন যে মোহজাল রচনা করিয়াছিল, সমস্তই যেন সংসারের চাল-ডালের চাহিদা আসিয়া ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল। জ্যোৎস্নারাত্রির সুধারস—বসন্তের গান—কোকিলের সঙ্গীত—এই পৃথিবীর যাবতীয় রূপ-রস-গান আজ সবই নিরর্থক হইয়া উঠিয়াছে। প্রসন্ন ভাবিল, সৃষ্টি-কর্ত্তার এ কি অবিচার। ভগবান যদি মানুষ সৃষ্টি করিলেন, তবে কেনই বা ক্ষুধা দিলেন। ক্ষুধা যদি দিলেন তবে ক্ষুধার উপকরণ কিনিতে অর্থেরই বা কেন সৃষ্টি হইল। সেই অর্থ তবে ভগবান তাহাকেই বা কেন দিলেন না। এতদিন পর প্রসন্নর খেয়াল হইল, সংসারী মানুষের অর্থের দরকার। কারণ ক্ষুধা মিটাইবার জন্য টাকা চাই। এই উদর বস্তুটি এমনি বেয়াড়া যে, ইহার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন হয়, তখন কোন মতেই মানুষকে স্থির থাকিতে দেয় না। এমন কি গৃহত্যাগী সাধু-সন্ন্যাসীও তখন ভগবানের নাম ভুলিয়া উদরকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ঝুলি হাতে করিয়া বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা মাগিতে থাকে। প্রসন্নর মনে হইল সমস্ত দেহের মধ্যে এই উদর-বস্তুটি যদি ভগবান সৃষ্টি না করিতেন, তবে খুবই ভাল কাজ করিতেন। ভগবানের শিল্প-চাতুর্য্য ঐখানেই শেষ হইয়াছে। কিন্তু এখন আর উপায় নাই—দেহ হইতে উদরকে বাদ দেওয়া যেমন যায় না তেমনি অস্বীকার করিবারও উপায় নাই। সর্ব্বনাশা ক্ষুধা আসিয়া সবকিছু ভুলাইয়া ঘোলাইয়া দিতেছে। প্রসন্ন পকেটে হাত দিয়া দেখিল মাত্র দুটি টাকা আছে। উপস্থিত ইহার দ্বারাই চাল, ডাল, নুন, তরিতরকারী আনাইয়া ক্ষুধার নিবৃত্তি হোক, তার পর বসিয়া বসিয়া ভাবিলেই চলিবে।

দুপুরে আহারাদির পর একটি পোড়া বিড়ি টানিতে টানিতে প্রসন্ন মায়াকে বলিল, তোমার কাছে কত আছে?

মায়া বলিল, বাঃ, আমি আর পাব কোথায়। এতদিন যা ছিল সবই তো খরচ হয়ে গেল। কিছুই তো দেখতে না···

প্রসন্ন বলিল, এর জন্যে তুমি দায়ী।

মায়া দুই ডাগর চক্ষু আরও বিস্ফারিত করিয়া বলিল, বাঃ আমি কি করে···

হাসিয়া প্রসন্ন বলিল, ভেবে দেখ তুমি কিনা—

মায়া সুখের হাসি হাসিয়া বলিল, বাঃ, শুধু একা আমারই বুঝি দোষ···

প্রসন্ন বলিল, সে যা হয় হোক। এখন একটা উপায় বাংলাও দেখি।

মায়া বলিল, তুমি পুরুষমানুষ, তুমি বিদ্বান লোক—ওর আমি কি জানি।

অনেকক্ষণ ভাবিয়া প্রসন্ন বলিল, মাসীর হাতে টাকা-পয়সা থাকাই সম্ভব। সেকালের লোক ত—কিন্তু ওরা ভারি চাপা। টাকা পয়সা খরচ করতে চায় না। বাবার আমল হতে, মনে হয় অনেক টাকা মাসি জমিয়েছে। তুমি বলে দেখ দেখি।

মায়া বলিল, সর্ব্বরক্ষে। সে আমি পারব না।

প্রসন্ন টাকা চাহিতেই, মাসি স্রেফ অস্বীকার করিয়া বলিল, পেসো, আমি টাকা পয়সা কোথায় পাব বাবা। আমি আর বাপু এ সংসারে থাকতে চাইনে। আমি লোক ঠিক করেছি—দু'এক দিনের মধ্যে কাশী চলে যাব। শেষ ক'টা দিন বাবার চরণতলে কাটিয়ে দেব। আমায় আর মিথ্যে মায়ায় জড়াস নে। প্রসন্ন বুঝিল, মাসী এক পয়সা দিবেন না। সঞ্চিত অর্থ লইয়া কাশীবাসী হইয়া থাকিবেন।

মায়া বলিল, মাসী ত কিছুই দিলেন না। আমি বলি চাকরির চেষ্টা কর।

প্রসন্ন উত্তর দিল, চাকরি ত আর গাছে পাওয়া যায় না। কলকাতায় যেতে হয়—খোঁজ করতে হয়। সে অনেক দেরি। আর তা ছাড়া এখানে কে তোমায় দেখবে···

মায়া বলিল, তাও বটে। তবে এক কাজ কর—হাটে দোকান খোলো। কত লোক মুদীখানার দোকান করে বড়লোক হয়েছে। আমার গয়না বেচে দোকান খোলো। যখন টাকা হবে—তখন গড়িয়ে দেবে।

অনেকক্ষণ ভাবিয়া প্রসন্ন বলিল, এ কথাটা মন্দ নয়···

হাটের মাঝে প্রসন্ন মুদী দোকান খুলিয়া বসিল। ম'সকয়েক চলিয়া যাইবার পর দেখা গেল, ধার পড়িয়াছে অনেক। মহাজনের ঋণ হইয়াছে বিস্তর, অথচ দোকানে মাল নাই। মহাজন আর বাকিতে মাল দিতে সম্মত নয়। লোকের নিকট যাহা পাওনা আছে, তাহাও আর আদায় হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রসন্ন বি-এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছে বটে, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে তাহার ব্যবসা-সংক্রান্ত কোন শিক্ষাদীক্ষা হয় নাই। ব্যবসায়ের অ আ ক খ না জানিয়া যে লোক ব্যবসায়ে নামে, তাহার দোকানে গণেশ ঠাকুর যে অচিরাৎ ডিগ্‌-বাজী খাইবে, এ কথা প্রথমেই ধরিয়া লইতে হইবে। প্রসন্নর দোকান উঠিয়া গেল, মাঝখান হইতে মায়ার অলঙ্কারগুলি ডুবিয়া গেল।

প্রসন্ন মায়াকে বলিল, আমি অকর্ম্মণ্য লোক। আমার দ্বারা কোন কাজই হবে না। মাঝ থেকে তোমার গহনাগুলো চলে গেল। ইতিমধ্যে প্রসন্নর একটি পুত্রসন্তান হইয়াছিল। খোকা হামাগুড়ি দিতে শিখিয়াছে—আধো আধো ভাষায় নানান্ কথা বলিয়া যায়। প্রসন্ন পুত্রকে কোলে করিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে থাকে···

ইহার পর দীর্ঘকাল চলিয়া গিয়াছে। প্রসন্ন আবার দোকান

করিয়াছিল, কিন্তু তাহাও চলে নাই। অন্য দোকানে চাকরি, মুহুরী-গিরী, ট্রেনে ফেরী, পাঠশালায় মাষ্টারী প্রভৃতি হরেকরকম কাজ করিয়াও অর্থাভাব ঘোচে নাই। ইতিমধ্যে আরও একটি কন্যা ও পুত্র হইয়াছে। কিন্তু প্রথম পুত্রটি শৈশবেই মারা যায়। সেই পুত্রশোক সামলাইতে প্রসন্নর অত্যন্ত বেগ পাইতে হয়। মায়া প্রায় ছয় মাস শয্যাশায়ী ছিল। তার পর ক্রমশঃ উঠিয়া বসে। সংসারের দিকে তাকাইয়া দেখিল, সংসার তেমনি চলিতেছে। সেই দিন সেই রাত্রি ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। তেমনি সূর্য্য তেমনি চন্দ্র উঠিতেছে—আবার অস্ত যাইতেছে। দিন হইতে মাস—মাস হইতে বৎসর—এমনি ভাবে দিন চলিয়া যাইতেছে। দিন যাই-তেছে—রাত্রি যাইতেছে—আবার ফিরিয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহার অজয় আর ফিরিয়া আসিবে না।

বৎসর দুই পূর্ব্বে প্রসন্ন নিকটস্থ গ্রামের এক যাত্রাদলে ঢুকিয়াছিল। সেই হইতে যাত্রাদলেই রহিয়াছে। দলের সমস্ত অভি-নেতার মধ্যে একমাত্র প্রসন্নই শিক্ষিত ও সুমধুর কণ্ঠের অধিকারী। ওর চেহারায় লাবণ্য আছে এবং একটা ভদ্রোচিত ছাপ আছে। শান্তি অপেরা পার্টির অধিকারী গণেশ চক্রবর্ত্তীর মৃত্যুর পর প্রসন্ন গণেশ চক্রবর্ত্তীর পদ অধিকার করিল। গ্রাম্য মেলায়, বিবাহে, অন্নপ্রাশনে, নানা পূজা-পার্ব্বণে শান্তি অপেরা পার্টি গান গাহিয়া থাকে। উহাতে নাম কিছু হইয়াছে বটে, কিন্তু অর্থের দিক দিয়া মোটেই আশাপ্রদ নয়। বৎসরের বেশীর ভাগ সময়ই দলকে শুধু শুধু বসিয়া থাকিতে হয়। লোকে এখন সিনেমা দেখিতে যায় —মাত্র আড়াই ঘণ্টা তিন ঘণ্টা বসিয়া, স্বল্পব্যয়ে কত মজাদার জিনিষ দেখিয়া আসে। সেইজন্য যাত্রাদলের অবস্থা অত্যন্ত নৈরাশ্য-জনক হইয়াছে। এই দলটির উপর কেমন এক মায়া বসিয়া যাওয়াতে, প্রসন্ন আর এই দল ছাড়িতে পারে না। আর এ যেন এক নেশা। রাত্রে সামিয়ানার নীচে, অজস্র স্ত্রী-পুরুষের সম্মুখে, যাত্রাদলের জরী, ভেলভেট, চুমকি বসান সুন্দর পোশাকে দেহ ঢাকিয়া, অভিনয় করার ভিতর যেন এক নেশা আছে। ঢং করিয়া শেষ ঘণ্টা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে সমবেতভাবে হারমোনিয়ম, বেহালা, ডুগিতবলা, বাঁশী যখন বাজিয়া উঠে, তখন বুকের ভিতর যেন এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের তরঙ্গ খেলিয়া যায়। তার পর সমস্ত রাত ধরিয়া যখন একে একে সেই সব অতি প্রাচীন কালের কথা অভিনীত হইতে থাকে, তখন প্রসন্নর আর বাহ্যজ্ঞান থাকে না। মনে হয়, সেই অতি পৌরাণিক কাল বুঝিবা ফিরিয়া আসিয়াছে—বুঝি সেই যদুপতি কৃষ্ণ, সেই পঞ্চ পাণ্ডব, সেই কর্ণ, দুর্য্যোধন সব আসিয়াছেন। প্রসন্নর মনে হয়, সেই রাম—সেই সীতা—সেই রাবণ দেখা দিয়াছে। গ্রামের নিভৃত অংশে সহস্র সহস্র নিরক্ষর জনগণের বক্ষে আনন্দের বন্যা বহিয়া যায়। লোকগুলি এক মনে শুনিতে থাকে—কখনও বা একসঙ্গে হরি হরি বোল বলিয়া জয়ধ্বনি দিয়া উঠে। গ্রাম্য লোকগুলি সমস্ত টাকা পয়সা মিটাইয়া দেয়—সাধ্যমত যত্ন সহকারে যাত্রার দলকে ভোজনে পরিতৃপ্ত করে। উহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তিতে প্রসন্ন মুগ্ধ হইয়া যায়।

রাজ-পরিচ্ছদের অন্তরালে তাহার ময়লা ছিন্ন বস্ত্র, বুভুক্ষিত উদর, এ সবকে ভুলিয়া প্রসন্ন রাতের পর রাত নিজের সমস্ত শক্তি দিয়া, নাটককে প্রাণবন্ত করিয়া তোলে। নাটকের হাসি-অশ্রু-বিষাদ কাহিনীগুলি লোকের বুকের ভিতর গিয়া প্রবেশ করে। দর্শকদের অন্তর হইতে রুদ্ধ অশ্রুজল দুই চক্ষু দিয়া দর দর ধারে নামিতে থাকে। নিস্তব্ধ গ্রামের এক ঠাকুরবাড়ীর সম্মুখে, পুরাতন সামিয়ানার তলায় দপ্ দপ্ করিয়া মশাল জ্বলিতে থাকে। একটি ডে-লাইট জ্বলিয়া আসরকে গৌরবান্বিত করে। আশেপাশে ছিন্ন-বসন পরিহিত নিরক্ষর গ্রাম্য চাষাভুসোর দল, মাটির উপর, অথবা চাটাইয়ের উপর বসিয়া থাকে। চিকের অন্তরালে চাষীদের বৌ-ঝিরা নির্নিমেষ নয়নে আসরের দিকে তাকাইয়া থাকে। সেই মশালের আলোর মাঝে অজ্ঞাত, অখ্যাত, ঠাকুরবাড়ীর সম্মুখে করুণ সুরে কনসার্ট বাজিতে থাকে। সেই সময়, সমস্ত দর্শকের মনে হয় এ জগৎ যেন রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। মনে হয় যেন সেই অযোধ্যা আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। মনে হয় বুঝি সেই যমুনাতীরে শত গোপিনী পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী বাজাইতেছেন। এই স্থল-জল-অরণ্য, গ্রামের ছোট ছোট ঘরবাড়ী, মাঠ ঘাট—সব যেন কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

অনেক দিন যাত্রার দল বসিয়া ছিল। লোকের অবস্থা খারাপ হইয়া গিয়াছে, সহসা যাত্রা দিতে সাহস পায় না। হরিনারায়ণ বাবুরা প্রতি বৎসর তাঁহাদের বাড়ীতে মাঘ মাসে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে দুই দিন যাত্রা দিয়া থাকেন। প্রসন্ন অনেক হাঁটিয়া, বাবুদের দুই রাত যাত্রা দেওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়া, বায়না লইয়া আসিল। প্রথম রাত্রে হইবে রাম নির্ব্বাসন, দ্বিতীয় রাত্র হইবে নলদময়ন্তী পালা। প্রসন্ন এই কয় দিনের মধ্যে যতটা সম্ভব দলকে সংস্কার করিতে চেষ্টা করিতেছে। যদি এখানে ভাল ভাবে দুই রাত্রি উৎরাইয়া যায়, তবে আরও অন্য স্থানে বায়না পাইবার বিশেষ সম্ভাবনা। চাই কি, বাবুরা দুই-একখানি মেডেল এবং কিছু বকশিশও দিতে পারেন।

সেই দিন যাত্রার প্রথম রাত। প্রসন্ন তাহার দলবল লইয়া আসিয়াছে। নদীর ধারে একখানি গৃহে যাত্রাদলের থাকিবার স্থান হইয়াছে। বাবুদের বাড়ীতে যাত্রা হইবে—অনেক জায়গায় নিমন্ত্রণ গিয়াছে, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ আসিবেন—গ্রামস্থ শত শত লোক আসিবে। আজিকার সাফল্যের উপর দলের জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে। প্রসন্ন স্বয়ং রাজা দশরথের পাট করিবে। রামের অভিনয় করিবে আর একজন প্রিয়দর্শন যুবক। প্রসন্ন তাহাকে প্রচুর লোভ দেখাইয়া, অন্য দল হইতে ভাঙাইয়া আনিয়াছে। যাত্রাদলের কাহারও এখন বিশ্রামের অবসর নাই। সকলেই

রাত্রির অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য নানা প্রকারে প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু প্রসন্নর মন ভাল নয়। বাড়ীতে কিছু টাকা না পাঠাইলে চলিবে না। ছেলেমেয়ের অসুখ, ডাক্তার দেখাইতে হইবে, ঔষধ দিতে হইবে। এদিকে যাত্রাদলের প্রত্যেকেরই দুই মাসের মাহিনা বাকী। প্রসন্ন সকলকেই বলিয়াছে, বাবুদের বাড়ী দুই রাত গান গাহিয়া প্রত্যেকের বেতন শোধ দিব।

সন্ধ্যা হইতেই জমিদার-বাড়ী আলোয় ও লোকজনের কোলাহলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। দরজায় দরজায় হুকুমধারী দারোয়ান দাঁড়াইয়াছে। নিমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত অতিথিগণ চেয়ারে বসিয়াছেন—ঢালা ফরাসের উপর অন্যান্য লোকজন বসিয়াছে। দ্বিতলের বারান্দায় মহিলাগণ আসন গ্রহণ করিয়াছেন। আসরের চতুর্দ্দিকে বড় বড় ঝাড়-লণ্ঠন শোভা পাইতেছে—নানারূপ ছবি, বড় বড় আয়নায় সমস্ত আসর যেন ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। কোথাও কোন শব্দ নাই—সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া যাত্রা আরম্ভের প্রতীক্ষা করিতেছে। রাত্রি নয়টা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে কনসার্ট সুরু হইয়া গেল। প্রসন্ন সাজ-ঘরে যাইয়া সকলকে বলিল, আজ যদি ভাল করে গাইতে পার তবেই মানসম্মান থাকবে। ভবিষ্যতেরও আশা আছে।

যথাসময়ে যাত্রা শুরু হইয়া গেল। এক দৃশ্যের পর এক দৃশ্য চলিয়া যাইতেছে। লোকে কখনও হাসিতেছে, কখনও গান শুনিয়া বাহবা দিতেছে। এমনি ভাবে দৃশ্যের পর দৃশ্য চলিয়া যাইতেছে। রাত্রি গভীর হইতে গভীরতর হইল—আকাশে চাঁদ পশ্চিম দিকে হেলিয়া পড়িয়াছে, গ্রাম নির্জ্জন নিস্তব্ধ; আসরও তেমনি নিঃশব্দ। সকলেই প্রাণ ঢালিয়া অভিনয় করিয়া যাইতেছে। প্রসন্ন নিজে লইয়াছে বৃদ্ধ রাজা দশরথের ভূমিকা। শেষে আসিল সেই বিদায়ের দৃশ্য। রাম, লক্ষ্মণ, সীতা। পিতৃ-সত্য পালনের জন্য রাম বনবাসে যাইতেছেন। বৃদ্ধ রাজা দশরথের মনে পড়িয়া গেল, অনেক দিন আগেকার কথা। সেই তপস্বী বৃদ্ধ অন্ধমুনির অভিশাপের কথা। প্রাণাধিক পুত্র স্বেচ্ছায় পিতৃসত্য পালনের জন্য বনবাসে যাইতেছে। কি করিয়া পিতা হইয়া সেই করুণ দৃশ্য দেখিতে পারে। অভিনয় করিতে করিতে হঠাৎ প্রসন্নর মনে পড়িয়া গেল—তাহার মৃত আট বৎসরের পুত্রের কথা। মনে পড়িয়া গেল সেই মৃতপুত্রের মুখ। তাহার সেই অতি প্রিয় পুত্র আজ আট বৎসর পূর্ব্বে এক দুর্য্যোগভরা রাত্রে প্রায় বিনা চিকিৎসায় চিরবিদায় লইয়াছে। না আর সে আসিবে না—ফিরিবে না—একবারও বাবা বলিয়া ডাকিবে না। প্রসন্নর চোখ দুটি সকরুণ হইয়া উঠিল। আজিকার এই আসর শত শত লোকজন, উজ্জ্বল আলো, বাহিরের স্বল্প জ্যোৎস্নালোক, ঐ ধানক্ষেত, সুপারি নারিকেল আম কাঁঠালের বাগান, নিবিড় বাঁশবন, আসরের এই অগণিত দর্শক এই সমস্তকে ভুলাইয়া ডুবাইয়া দিয়া হারানো মৃতপুত্রের মুখখানি নূতনভাবে জাগিয়া উঠিল। দুই চোখ দিয়া দর দর ধারে অশ্রু নামিয়া আসিল, অবরুদ্ধ রোদনের উচ্ছ্বাসে বক্ষ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। এক অন্তহীন সকরুণ ভাবাবেগে প্রসন্নর দেহমন মূর্চ্ছিত হইয়া গেল। রাম সীতা লক্ষ্মণ যখন বিদায় লইয়া নয়নের পথ হইতে সরিয়া গেল, ঠিক সেই সময়, সেই আসরের উপর উপুড় হইয়া শুইয়া দুই বাহু সম্মুখে প্রসারিত করিয়া দিয়া তাহাদের গমন-পথের দিকে অশ্রুমাখা নয়নে চাহিয়া কান্না-ভেজা ভাঙ্গা বিকৃত অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে মর্ম্মান্তিকভাবে প্রসন্ন চীৎকার করিয়া উঠিল, ওরে ফিরে আয়—ফিরে আয় বাছা—ফিরে আয় বাবা। বুঝি প্রসন্ন সেই হারানো মৃত-পুত্রকে চক্ষের সম্মুখে দেখিয়া তাহাকে ফিরাইবার জন্য মর্ম্মভেদী করুণস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

সমস্ত আসর যেন এক অব্যক্ত বেদনায় কাঁপিয়া উঠিল—সকল মনে রাজা দশরথের এই শোক যেন দর্শকের বুকে যাইয়া আঘাত দিল। সমস্ত দর্শক একসঙ্গে কাঁদিয়া উঠিল—তার পর বহুক্ষণ ধরিয়া হাততালিতে আসর ভরিয়া গেল। সকলে অশ্রু মুছিয়া বলিয়া উঠিল—সাবাস—সাবাস। এমনটি অনেক দিন শুনি নি, কান জুড়িয়ে গেল।—বাবুরা দুইখানি মেডেল পুরস্কার ঘোষণা করিলেন। প্রথম পালাটি অতি সাফল্যের সহিত উৎরাইয়া গেল।

পরের দিন সকালে প্রসন্ন ভাবিল, আজিকার গান হইয়া গেলে বাড়ী ঘুরিয়া আসিবে। কালকের সাফল্যে সকলেই আনন্দিত হইয়া গত রাত্রির অভিনয়ের কথাই আলোচনা করিতেছিল, এমন সময় বাবুদের নায়েব মশায় রাইকিশোরবাবু আসিয়া বলিলেন, কই প্রসন্নবাবু কোথায়?

প্রসন্ন হাসিমুখে নমস্কার করিয়া বলিল, আসুন, আসুন নায়েব মশায়।

—না বেশীক্ষণ দাঁড়াচ্ছি নে। সোজাকথা, বাবুরা বললেন, একটু পরে কাছারি-বাড়ী গিয়ে কালকের গানের টাকাটা নিয়ে আসবেন।

অবাক্ হইয়া প্রসন্ন বলিল, তার মানে?

হাত ঘুরাইয়া রাইকিশোরবাবু বলিলেন, আজ্ঞে, মানে আছে বৈকি। মানে হচ্ছে যাত্রা খুবই ভাল হয়েছিল—বুঝলেন কিনা। তবে কিনা, যাত্রা শুনতে এসে শুধু যদি চোখের জল খালি খালি মুছতে হয়—তবে সে এক গেরো মশায়। গান শুনব, দুটো হাসির কথা, দুটো রসের কথা, দুটো ভাল তালের গান, সখীদের নাচ—এ সব থাকবে প্রাণটা ঠাণ্ডা হবে মশাই। কিন্তু খালি খালি চোখের জল ফেলে কাল আসরটাই মশায় মাটি হয়ে গিয়েছে—এ আপনি যাই বলুন। তাই বাবুরা আজকের রাতে বাঈনাচ দেবেন। কলকাতা হতে হীরাবাঈ আসবে। আর বুঝলেন না মশায়—বাবুদের ও-সব নইলে কি চলে?

প্রসন্ন বলিল, আমাদের সঙ্গে যে কথা দু' রাতের। বায়নাও যে হয়েছে…

ওসব গিয়ে বলুন না কেন মশায়। বাবুরা তো কাছারিতেই আছেন—যান বলুন গে।

প্রসন্নর মাথা ঘুরিয়া উঠিল। সে যে এই দুই রাতের ভরসাতেই বুক বাঁধিয়া রহিয়াছে। এখন উপায়? যাত্রাদলের লোকদের দু' মাসের মাহিনা বাকী। এ মাহিনা সে কোথা হইতে মিটাইবে? মায়া লিখিয়াছে ছেলেদের অসুখ, টাকা না পাঠাইলে ওদিকে সংসার অচল—ছেলেমেয়ের চিকিৎসাও হইবে না। প্রসন্ন আর ভাবিতে পারিল না। এক সঙ্গে অনেকগুলি দুর্দ্দশার চিত্র তার চোখের সম্মুখ দিয়া বিদ্যুদ্বেগে চলিয়া গেল। তাহার চোখের উপর হইতে প্রভাতের উজ্জ্বল আলো যেন ক্রমশঃ কালো হইয়া গেল। ধীরে ধীরে কোনমতে সেই স্থানে বসিয়া পড়িয়া কপাল টিপিয়া ধরিয়া বলিল—ওহে এক গেলাস জল দাও দেখি।

কীট-পতঙ্গের মন

শ্রীমিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়

কীট-পতঙ্গের স্বভাব ও আচরণে সহজ-প্রবৃত্তির প্রভাব যথেষ্ট। জীব জগতের নীচের দিকে অবস্থিত এই অবজ্ঞাত অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের দৈনন্দিন জীবন যেমন চমকপ্রদ তেমনি বৈচিত্র্যপূর্ণ। সরল নিরাড়ম্বর জীবনযাত্রার প্রতিভূ এই ক্ষুদ্র প্রাণীরা পৃথিবীতে এসেছে অন্ততঃ পঁচিশ কোটি বৎসর পূর্ব্বের অঙ্গার যুগে, স্তন্যপায়ীদের আবির্ভাবের বহু কোটি বর্ষ আগে; অগণিত সংখ্যায় আধিপত্য করেছে অনেক দিন ধরে—জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে মাটির নীচে এদের বসতি। জাত হিসাবে অসামান্য এরা জীবন-যুদ্ধে উড়িয়েছে বিজয়-পতাকা প্রতি যুগে প্রতি দেশে। এই শ্রেণী আয়তনে-বিস্তৃতিতে, কাজে-কর্ম্মে, আচারে-ব্যবহারে, অমেরুদণ্ডীদের ভিতর সবার উপরে। বিশ্ব-প্রকৃতির পরীক্ষাগারে উৎকর্ষের গবেষণা চলেছে অনন্তকাল ধরে। অনেকে এসেছে অনেকে গেছে, বিশাল দৈত্যাকৃতি ডিনশর টিটানোশর মহাপরাক্রান্ত খড়্গদন্তী বাঘ আজ যাদুঘরের উপকরণ, কিন্তু কীটপতঙ্গ অজরামর, তুচ্ছ ক্ষুদ্র হলেও জিতেছে অগণিত সংখ্যার দ্বারা, এদের বিলুপ্তির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। জাতি-উপজাতির শাখা-প্রশাখা সমন্বিত হয়ে এরা বর্দ্ধিষ্ণু পরিবার, নানাবিধ বিস্ময়কর প্রতিবেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। সুসভ্য মানুষের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী কীটপতঙ্গগোষ্ঠী কোথাও কোথাও উৎখাত করেছে তাকে (ম্যালেরিয়া রোমানদের ধ্বংসের কারণ), তবে একাধিপত্য করতে না পারার একমাত্র কারণ এদের ক্ষুদ্র খর্ব্ব দেহ। অরণ্যে ত কথাই নেই, শাদ্বল মাঠে উজ্জ্বল আলো জ্বললেই পোকার বাহার—আকারে আয়তনে, রূপে-রঙে-গন্ধে যে কত বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে তার দৃষ্টান্তের অন্ত নেই।

মনস্তত্ত্বের মতানুসারে পোকাদের সু-উন্নত না হলেও অনুন্নত বলা চলে না, জৈব বৈচিত্র্যের এও এক পরম নিদর্শন। অনেক বিষয়ে অনেকের চেয়ে পিছিয়ে আছে বটে—দেহটাই সচরাচর চোখে পড়বার মত নয়, কিন্তু টেক্কা দেয় আচরণে, প্রতিকূল পরিবেশে চমৎকার মানিয়ে চলতে পারে অবস্থার সঙ্গে। প্রকৃতি ও মানসিক অবস্থা এদের যথেষ্ট উন্নত, কারও কারও প্রায় মানুষের মত সুশৃঙ্খল সঙ্ঘবদ্ধ সামাজিক জীবন, পরিপাটী বিধি-ব্যবস্থা উন্নত রীতিনীতি। আমাদের সঙ্গে ওদের মানসিক সাদৃশ্য যেমন নিবিড়, আবার ব্যবধানও সেরূপ দুস্তর। জৈব-বিবর্ত্তনের ফলে উদ্ভূত হলেও দুটি স্বতন্ত্র ধারায় আমাদের অভিব্যক্তি, সে কারণে মনে মূলগত বিশেষ পার্থক্য না থাকলেও শরীর ভিন্নরূপে গঠিত। কীট-পতঙ্গদের হস্তপদ ও অন্যান্য অঙ্গ সাধারণতঃ স্তন্যপায়ীর চেয়ে অধিক, আবার প্রত্যেকে এক একটি কার্য্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। আকাশচরদের উদ্ভূত হয়েছে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পক্ষ, মৎস্য, সরীসৃপ, পক্ষী স্তন্যপায়ীর মত সম্মুখের হস্তদ্বয়ের রূপান্তর ঘটেনি। আর একটি বিষয়ে এরা ছাপিয়ে উঠেছে আমাদের, দেহের তুলনায় এরা অনন্যসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী। পিঁপড়ে বা গুবরেপোকা দেহভার অপেক্ষা বহুগুণ ভারী বস্তু অনায়াসে বহন করে নিয়ে যায়, অপরিচ্ছন্ন স্থানের পোকারা দেহ অপেক্ষা অনেক গুণ অধিক ময়লা খেয়ে সাবাড় করে দেয়।

প্রকৃতির নিয়মে সকল জীবই কালক্রমে আকারে আয়তনে গুরু-ভার হয়ে ওঠে, কিন্তু কীটেরা এত দিন সাফল্যের সহিত পৃথিবীতে অবস্থান করেও ক্ষুদ্রায়তন রয়ে গেছে কেন? এদের দেহ ফুসফুসহীন, রক্তচলাচলের ব্যবস্থা নেই, সরাসরি বাতাস গ্রহণ করতে হয় বলে সারা দেহে বায়ুনালীজাল, সেজন্য দেহবৃদ্ধি হবার সুযোগ নেই। খর্ব্বাকৃতি হওয়ায় ভালই হয়েছে, জলের প্রয়োজন গেছে কমে—জলাশয়ের নিকটে যাওয়া মানে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হওয়া।

কীট-জীবন বিভক্ত দুই পৃথক ভাগে, আবার মধ্যে রূপান্তর অবস্থা। লার্ভা অবস্থায় খাওয়া ছাড়া কোন কাজ নেই, তারপর পিউপা অবস্থা, শেষে জাতির স্বভাব-সমন্বিত পূর্ণকীট। অদ্ভুত এদের জীবনচক্র, এদিকে জ্ঞান যথেষ্ট অথচ প্রবৃত্তির দাস। পূর্ব্বপুরুষ যা-যা করে গেছে সন্তানকে অবিকল তাই করতে হবে যেন কোন অদৃশ্য শক্তির নিয়ন্ত্রণে। যে কীট যত আদিম তাকে তত বিধি-নিষেধের ভিতর দিয়ে জীবন-যাপন করতে হয়, দৈনন্দিন জীবনে কুলস্মৃতির কঠিন নাগপাশ। এরা যেন আদি প্রাণশক্তির দেহধারী পার্শ্বচর, অন্ধভাবে একটির পর একটি পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সমাপন করে চলে,

অর্থ হৃদয়ঙ্গম হোক বা না হোক। অনুসরণ করে অগ্রসর হবার লক্ষ্য আছে, কিন্তু উদ্যম অতি প্রাচীন আদিমতম আদর্শ, ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বেদনা-অনুভূতি অকাতরে বিসর্জন দিয়ে জাতি-গঠনে মনোনিবেশ করতে হয়—বংশরক্ষা একমাত্র পরিচিত নীতি।

এক বাক্ ব্যতীত অপর সকল ইন্দ্রিয়স্থান এদের বর্তমান, তবে আমাদের মত নয় অন্য ধরণে গঠিত। মাকড়সার চক্ষু আটটি, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি কি মেরুদণ্ডীর ন্যায় তীক্ষ্ণ? অনেক কীটের সম্মুখে পশ্চাতে উপরে নীচে পার্শ্বে সর্বত্র দেখতে পায় অথচ সে দেখা খুব স্বচ্ছ নয়, আকৃতি পরিসর বর্গক্ষেত্র সম্পর্কিত ধারণা অল্প। অবশ্য অতি নিকটের বস্তু যেরূপ সুস্পষ্টভাবে এদের অন্তরে প্রতিফলিত হয় তা আমাদের অনধিগম্য। পতঙ্গ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ দুইটি আয়তনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবহিত, উচ্চ ঘনত্ব সম্বন্ধে। ইন্দ্রিয়ের উন্মেষ আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষার সম্বন্ধে, বাধাবিঘ্ন বিপদ প্রতিরোধ কল্পে সহজ উন্নতির অন্তরায় প্রতিকূল অবস্থার সহিত প্রতিনিয়ত বিবাদ করে হস্ত-পদ-পক্ষ ইন্দ্রিয়স্থানের বিকাশ হয়েছে। আধুনিককালে পতঙ্গ ও খেচরকুলের পক্ষ মাত্র এক জোড়া, আদিম যুগে যে সব পতঙ্গ আকাশ অভিযানে বার হ'ত তাদের পক্ষ তিন জোড়া। সরীসৃপ অশ্ব সিংহ চামচিকা বানর ইত্যাদি মেরুদণ্ডীদের আভ্যন্তরিক গঠন মানুষের কাছাকাছি হওয়া সত্ত্বেও মানসিক অবস্থার তারতম্য বেশ প্রকট। আমাদের সঙ্গে পোকাদের দৈহিক মিল অতি অল্প সেজন্য ওদের মনের গতি ও প্রতিকৃতি যে আমাদের মত নয় তা বলাই বাহুল্য। আকার আয়তনে ক্ষুদ্র বৃহৎ ইন্দ্রিয়শক্তি নির্দ্ধারণ করে না, পোকাদের চক্ষু দেহের তুলনায় বিশেষ ক্ষুদ্র নয়, আবার তিমি, হাতীর মত বৃহৎ স্তন্যপায়ীর চক্ষু দেহের তুলনায় বেশ ক্ষুদ্র, কিন্তু দৃষ্টি প্রখর। লুবক ফোরেল ইম্যাস প্রভৃতির পরীক্ষামূলক পর্যবেক্ষণে পোকাদের বর্ণ-তারতম্য জ্ঞান প্রমাণিত হয়েছে। শ্রবণশক্তি আছে তবে নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর। কীটপতঙ্গ গন্ধ ও স্পর্শপ্রবণ; শুঁয়াপোকা প্রভৃতি অন্ধ-কীটেরা জীবন যাপন করে কেবল স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যে, শত্রুমিত্র চেনবার উপায় ঐ স্পর্শশক্তি। স্পর্শের পরেই গন্ধ-জগৎ, অনেকে গন্ধ নির্গত করে শত্রুকে তাড়াবার জন্য (যেমন গন্ধপোকা), আবার স্ত্রী-মথ স্ত্রী-প্রজাপতি নিঃসৃত গন্ধের আমেজ পেয়ে দু' তিন মাইল দূর থেকে আসঙ্গলিপ্সু পুরুষ-প্রজাপতি উপস্থিত হয়। তবে তার প্রণয়-নিবেদন গন্ধথলির প্রতি, গন্ধহীন স্ত্রীতে আসক্তি নেই—আবার মস্তকহীন স্ত্রীর সহিত সানন্দে মিলিত হয়। কীটপতঙ্গের মন যেন ছাঁচে ঢালা প্রতিকৃতি, নিষ্কাম ভালবাসা অথবা অপর কোন অবিমিশ্র কার্য্য এদের ধাতে নেই, মনের সমস্তটাই নির্জ্ঞান। যন্ত্রবৎ কাজ করে যায়, মানুষ বা অন্য কোন বুদ্ধিমান জীবের মানদণ্ডে এদের বিচার করতে যাওয়া বাতুলতা। সমস্ত কর্ম্ম প্রক্রিয়ার পশ্চাতে অবিচলিত ধৈর্য্য থাকলেও পদে পদে সহজবুদ্ধির অভাব পরিলক্ষিত হয়। উদ্দেশ্যমূলক কর্ম্মীগোত্রের এই জীবদের ক্রিয়া-কলাপ, আহার-বিহার মাত্র দুটি উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে, আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষা। খাওয়া বিষয়ে এদের সবিশেষ পারদর্শিতা; বিভিন্ন জাতের খাদ্যপ্রণালী ভিন্ন ভিন্ন, অঙ্গ প্রয়োজনানুরূপ উপযোগী করে নিয়েছে বিবর্ত্তনের ধারায়। ফড়িং ও আরসোলার মুখ একেবারে আদিম ছোট উপাঙ্গগুলি তৃণ-পল্লবের মত কোমল দ্রব্য চর্ব্বণোপযোগী; এই উপাঙ্গ আবার খনক উইভিলের শক্ত তণ্ডুলকণা চূর্ণ করিবার কঠিন চোয়ালে পরিবর্ত্তিত। ছারপোকা এফিড মশামাছি উকুন প্রজাপতি মথরা শোষক, খাদ্য পান করে চুষে, কেহ রক্ত কেহ রস—মুখ ঠিক ঐ ভাবে গঠিত। মধুপ ও বোলতাদের ভক্ষণ কামড়ে কেটে অবলেহন করে, মুখের এক প্রান্ত লেহনোপযোগী, অন্য প্রান্ত বাসার কাঠ চর্ব্বণ, মোম তৈরির কাজে লাগে।

কাজকর্ম্মের সঙ্গে মনের বিশেষ সম্বন্ধ, পোকাদের ক্রিয়াকলাপ যখন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের তখন আমাদের মন দিয়ে ওদের মন বিচার করা অনুচিত। অভিব্যক্তির যে কয়টি ধারা সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে (শামুক বিবর্ত্তন, মেরুদণ্ডী বিবর্ত্তন, কৃমি বিবর্ত্তন) তার ভিতর কীট-বিবর্ত্তন অন্যতম প্রধান। সকল প্রাণীর উৎস আদিম প্রাণরূপ যেন পরীক্ষামূলক ভাবে এদের বিকাশ ঘটিয়েছিল একটি স্বতন্ত্র বৃত্তির মাধ্যমে—জয়যুক্ত হয়েছে সহজ-প্রবৃত্তি। স্বভাব ও কার্য্যপ্রণালীর মধ্যে দুস্তর ব্যবধান নিবন্ধন মনস্তাত্ত্বিকরা এদের মনোবৃত্তির পর্য্যালোচনা সহজবুদ্ধি দিয়ে করেন নি—এদের কার্য্যপ্রণালীর দ্যোতক সহজ প্রবৃত্তি। কীটপতঙ্গ-জগতের কয়েকটি গুণ অপূর্ব্ব, বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয় এদের কার্য্যকারিতা দেখে। পরিণামদর্শিতা সুসভ্য মানুষের আছে কতটুকু? কীটের কাজকর্ম কিন্তু অচিন্তিতপূর্ব্ব ভবিষ্যতের পরিপ্রেক্ষিতে। আমাদের দেশে এক জাতের রসনিঃসরণকারী শুঁয়াপোকাকে পিঁপড়ে সযত্নে লালনপালন করে কারণ এরা রসের অতিভক্ত; প্রজাপতি যেন একথা সম্যকরূপে অবহিত, সে ঠিক ঐ বিশেষ গাছের ঐ পিঁপড়ে অধ্যুষিত বিশেষ স্থানটিতে ডিম পাড়ে। কেবল ঐ জাতের পিঁপড়ে হলে চলবে না, ঐ বিশিষ্ট গাছ ও সেখানে পিঁপড়ের আনাগোনা সমস্তই লক্ষ্য রাখতে হবে—অর্থাৎ জীব ও উদ্ভিদের জ্ঞান যথেষ্ট নয় পর্য্যবেক্ষণশক্তিও দরকার। প্রজাপতি কি ঐ বিশেষ গাছ ও পিঁপড়ে স্মরণ রেখেছে যে অন্বেষণ করে বেড়ায়? সে কি জানে যে শুঁয়াপোকা থেকে সে নিজেই উদ্ভূত? নিশ্চয়ই নয়। এরূপ পূর্ব্বজ্ঞান পরিচিত কোন বুদ্ধিবৃত্তির তালিকায় নেই, এর উৎস কুলস্মৃতি, সহজ-প্রবৃত্তি যন্ত্রবৎ কাজ করে যায় মাত্র। দৈহিক উত্তরাধিকার যেমন সহজাত এও অমনি সহজাত বৃত্তি, ঊর্দ্ধতন পূর্ব্বপুরুষেরা সকলে ঐ একই উপায়ে সন্তান যন্ত্রবৎ রক্ষাকরে গেছে, অতএব জাতির প্রত্যেক ব্যক্তিকে না বুঝে না জেনে আরব্ধ কর্ম্ম করে যেতে হয়: বংশ তথা জাতি রক্ষার প্রকৃষ্ট পন্থা। প্রবৃত্তিমূলক কাজে যে বিচক্ষণতা বিদ্যমান তাহা প্রায় বুদ্ধির তুল্য, এমন কি এ অসাধারণ পুরোদৃষ্টি বুদ্ধিমান জীবের ঈর্ষার বস্তু। পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকলে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বিষয়ের গভীর জ্ঞান কি প্রকারে সম্ভব? হুইলার প্রমুখ কীটতত্ত্ববিদেরা সহজ প্রবৃত্তির

বিস্ময়কর পুরোদৃষ্টিকে গল্পকথা বলে উড়িয়ে দিতে চান, কিন্তু একক বোলতাদের এই আশ্চর্যজনক প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁদের ব্যাখ্যা জানতে ইচ্ছা হয়। একক বোলতারা একটি নির্দিষ্ট পোকাকে হুল ফুটিয়ে অসাড় করে ফেলে, আপন বাসায় টেনে নিয়ে গিয়ে তার বুকের উপর ডিম প্রসব করে শেষে বাসার দরজা কাদামাটি দিয়ে এঁটে চিরকালের মত উধাও হয়ে যায়; লার্ভা অসাড় পোকার দেহ ভক্ষণে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে দরজা ভেঙে বার হয়। দংশন প্রায় ভ্রমশূন্য, অঙ্গের ঠিক যেখানটিতে বিষ ঢেলে দিলে সর্বদেহে মৃত্যুহীন অসাড়ত্ব এসে যায় সেই বিশেষ স্থানটির সহিত এদের পরিচয় যেন বহুকালের। আশ্চর্য, শিকার পরিবর্তনের সঙ্গে দংশনেরও তারতম্য ঘটে। সফিক্স শাবকের খাদ্য ঝিঝিপোকা, যাদের তিনটি নার্ভগ্রন্থি বিশিষ্টদেহ, এদের দংশন করতে হয় তিন বার; স্কলিয়া গুবরে পোকাগুলো ধরে বক্ষস্থলে একটিমাত্র দংশনের সাহায্যে; ঐ স্থানে এদের নার্ভগ্রন্থি সন্নিবিষ্ট; সারসেরিস উইভিলদের ঐ প্রয়োজনীয় স্থানটিতে একবার মাত্র দংশন করে কার্য সমাধা করে। শুঁয়াপোকা শিকারী এমোফিলাকে একাধিকবার দংশন করতে হয়, কারণ শুঁয়াপোকার দেহাংশ অনেক, লম্বা নার্ভগ্রন্থিতে সর্বসমেত তিন থেকে নয় বার দংশনের প্রয়োজন। শারীরসংস্থান বিদ্যায় পারদর্শী না হলে দেহাভ্যন্তরের এরূপ বিস্তারিত তত্ত্বজ্ঞান আসে কোথা থেকে? শিকার কয়েক সপ্তাহ অজ্ঞান নিরুপায় রেখে ছানাকে তাজা আহার যোগাতে হবে—এ তথ্য বুদ্ধি ছাড়া অন্য কোন উপায়ে লব্ধ হবার কথা নয় অথচ কার্যকারণের বিচার শক্তি এদের নেই; অভিজ্ঞতা পুষ্ট নয়—শাবকের কি হ'ল একটি বারও সন্ধান নিতে আসে না। নিসর্গী মেজর হিংষ্টন ক্রিপ্টসেলাস বোলতার কৃষ্ণকায় মাকড়সা তারানটুলা শিকার বর্ণনা করেছেন:—

শিকার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত বোলতাটি হঠাৎ একটি সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করল। দেখা গেল, একটি মোটাসোটা ভারী বোয়াল মাকড়সাকে তাড়া করে নিয়ে আসছে। ওজনে অন্ততঃ দ্বিগুণ তারানটুলা পদ প্রসারিত করে ফিরে দাঁড়াল দেহি রণং ভাবে, বোলতাটি ক্রমান্বয়ে ঘুরে ফিরে সাঁড়াশীর মত চোয়ালের মৃত্যু-আলিঙ্গন বাঁচিয়ে পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণের প্রয়াস করছিল, শেষে বিদ্যুৎ-গতিতে পিছন দিক দিয়ে হুল বিদ্ধ করে দিল, দুর্বল হয়ে এল ঐ ভীমকায় অষ্টপদ তার পর এক সময় দ্রুতবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে জাপটে ধরে কটি বেঁকিয়ে খুঁজতে লাগল শত্রুর অন্তস্তল, যেখানে সেখানে দংশন করলে অভীপ্সিত ফললাভ দুষ্কর। অবশেষে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদদ্বয়ের মধ্যে অভীষ্ট স্থান পাওয়া গেল, তার পর তা তীব্র দংশনে নিশ্চল হ'ল।

মস্তকদংশনে মৃত্যু-সম্ভাবনা; পৃষ্ঠদংশনে বিশেষ ক্ষতি হয় না, তাই এদের অচেতন দংশন বক্ষস্থলের অন্তঃস্থিত গর্ভ-কেন্দ্রে। এ জ্ঞান অভিজ্ঞতালব্ধ নয়—জটিল ও সূক্ষ্ম আক্রমণাত্মক কার্যকারিতার মূল কোথায় জানি না, তবে এ বিস্ময়কর কৌশল দুই চার জন্মে আয়ত্ত করা অসম্ভব। মাকড়সারা জন্মের পরক্ষণেই সূতা-তন্তু নির্মাণে তৎপর হয়; ভীমরুল-জাতীয় পতঙ্গ কর্কটের দংষ্ট্রা পূর্বে না দেখেও তার ভয়াবহতা সম্বন্ধে সম্যক্ অবহিত। জন্মের পর-ক্ষণেই এরা সুদক্ষ কারিগর, যেন কত যুগ-যুগান্তের অভিজ্ঞতা-সঞ্চিত মন এদের।

অনেকের হয়ত মনে হতে পারে যে, কীট-পতঙ্গের জীবনচক্রে ব্যক্তিগত স্মৃতির প্রভাব থাকে, সন্তানরক্ষার নিমিত্ত আচরণ ও কার্যাবলী আপন শৈশবের পুনরাবৃত্তি। কিন্তু অনেক কর্ম ও বস্তু এরা কখনই দেখে না, তাদের সুপরিচিত বিবরণ আসে কোথা থেকে? কিছু কিছু স্মরণশক্তি অবশ্য এদের বর্তমান। বোলতা ভীমরুল পিঁপড়ে তিন চার মাইল অনায়াসে ভ্রমণ করে পথভ্রষ্ট হয় না, তবে বার হবার পূর্বে স্থান-বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে দেখে নেয়, সেখানকার ভৌগোলিক সংস্থানের তারতম্য ঘটলে এদের বেশ অসুবিধায় পড়তে দেখা গেছে—মৌচাকের নবজাতকদের অকস্মাৎ দূরে নিয়ে ছেড়ে দিলে তারা কখনই ফিরতে পারে না; স্মৃতি অতি সামান্য, যেমন দেহ তেমনি মনে রাখার ক্ষমতা। বাসার আশপাশে অনাচে-কানাচের বস্তুগুলি সরিয়ে নড়িয়ে গোলমাল করে দেওয়া হোক, নিকটে এসে ঘুরবে ফিরবে কিন্তু বাসায় প্রবেশ করতে পারবে না। মাকড়সা মনে রাখতে পারে আট থেকে চব্বিশ ঘণ্টা; অণ্ডথলি ছিনিয়ে নিয়ে কিছু সময় পর পর ফেরত দিয়ে দেখা গেছে: দু' তিন ঘণ্টার ভিতর ব্যাকুল আগ্রহে গ্রহণ করে, সাত-আট ঘণ্টায় একটু দেখেশুনে তার পর নেয়, দশ-পনের ঘণ্টা অবধি ইতস্ততঃ করে ফেরত নিয়েছে, চব্বিশ ঘণ্টার পর সাধারণতঃ আর গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নয়, ছত্রিশ ঘণ্টা পরে চিনতেই পারে না। প্রবল স্মৃতিশক্তিবিশিষ্ট পতঙ্গ বিরল নয়। মধুপদের মিষ্টি দিয়ে দেখা গেছে যে, বৃষ্টি-বাদল-দুর্যোগ নিবন্ধন পরদিন আসতে অক্ষম হলেও তার পর দিন ঠিক উপস্থিত। এক জন শরৎকালে জানলায় মধু রেখেছিলেন, ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি এল, শীতে জানলা বন্ধ, বসন্ত সমাগমে তারা আবার হাজির।

কীট-জগতে স্নেহ-প্রেম মায়া-মমতা একরূপ নেই। সঙ্গী-সাথী বিপদগ্রস্ত হলে সাহায্যের জন্য কেউ ছুটে আসে না, পাশাপাশি দুটি মৌমাছির একটি পিষ্ট হয়ে গেলেও অপরটি নির্বিকার চিত্তে কাজ করে যায়। মাংসাশী কীটেরা অম্লানবদনে দুর্বল অঙ্গহীন ব্যাধিগ্রস্ত সঙ্গীকে উদরসাৎ করে ফেলে, স্ত্রীম্যান্টিস স্ত্রী-'স্বর্ণমালী' পুরুষদের দেহ দিয়ে ভোজ চালায় নির্বিবাদে।

কীটকুল এসেছে সহজ-প্রবৃত্তির ধারায়, আদিম ভাব মজ্জায় মজ্জায়, সহানুভূতি সমবেদনা দয়া-দাক্ষিণ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। নিমজ্জমান মৌমাছি বা পিঁপড়ের সাহায্যার্থে অন্যান্যদের আসতে দেখা যায় কি? রসে আঁটকে যাওয়া কীট ঐভাবেই প্রাণত্যাগ করে, তার জন্য দুঃখবেদনা প্রকাশ করবার কেউ নেই। অনুভূতিপ্রবণ মন এদের নয়, কোমল ভাব যদি কোথাও দেখা যায় তবে সে ব্যতিক্রম নিয়ম নয়। তবে পিঁপড়েদের আতুর অঙ্গহীনকে মাঝে

মাঝে সাহায্য করতে দেখা যায়, অন্য কোন কীটের ভিতর সুকুমার বৃত্তির লেশমাত্র নেই।

সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে গঠিত হলেও পিঁপড়েরা এই কোমলবৃত্তিকে ভিত্তি করে অপূর্ব সভ্যতা ও কৃষ্টির সূত্রপাত করেছে, সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর মানুষ ছাড়া তার সমকক্ষতা লাভ করবার যোগ্যতা আর কারও নেই। পারস্পরিক আদান-প্রদান ও সমবায়ের ভিতর দিয়ে জনকল্যাণের যে চরমোৎকর্ষ তা সুপরিস্ফুট পিপীলিকা মধুপ উইপোকাদের সমাজতন্ত্রবাদে। শ্রমবিভাগ নিয়ম-শৃঙ্খলা ও সংহতি সভ্যতার মান কত উচ্চে প্রতিষ্ঠিত করে দিতে পারে এদের কর্মকুশলতায় তার প্রমাণ ভূরি ভূরি। গৃহনির্মাণে নৈপুণ্য অভিনব, ঘর প্রকোষ্ঠ ধাত্রী-গৃহ চেম্বার রক্ষী-গৃহ রাস্তা খিলান গলি সেতু খাল সুড়ঙ্গ গম্বুজ মন্ত্রণাকক্ষ সংযোগশীল মনের পরিচায়ক। উইপোকা পিঁপড়ের সগোত্র। এদের কলোনিতে আবার কর্মী ব্যতীত এক দল রক্ষী সৈন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত। সাধারণতঃ আক্রান্ত না হলে আক্রমণ করা এদের রীতি-বিরুদ্ধ, তবে যুদ্ধকালে এরা দুর্দ্দমনীয়, বিপদের আভাস মাত্রেই কর্মীরা গৃহমধ্যে অদৃশ্য হয়, দেখা দেয় এক সারি কলহনিপুণ যোদ্ধা, তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করে ক্রুদ্ধ বিক্রমে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুর উপর, সম্মুখের সারি সাবাড় হয়ে গেলে দ্বিতীয় সারি সে স্থান গ্রহণ করে, দেহে কামড় দিলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না মস্তক ছিন্ন হয়ে যাবে ততক্ষণ সাঁড়াশী সদৃশ্য চোয়াল হতে নিস্তার নেই। যোদ্ধারা নিজেদের জীবন অকাতরে বিসর্জন দিয়ে কর্মীদের অক্ষত রাখে—শিশুসন্তানদের পরিচর্যা ও লালন-পালনে যাতে বিঘ্ন না ঘটে। কর্মীদলও কোন বিষয়ে অনগ্রসর নয়, যুদ্ধ শেষ হবার মুহূর্ত্তেই তারা গৃহ মেরামতের সাজসরঞ্জাম এনে হাজির। পিঁপড়েরা যে কি ভাবে পরস্পরের মধ্যে ভাববিনিময় করে তা আজও রহস্যাবৃত, সহযোগিতা ও নিয়মানুবর্তিতা এদের গভীর। আবার চিনতেও পারে আশ্চর্য্য ভাবে, অপরিচিত বিদেশী ভ্রমক্রমে এসে পড়লে প্রাণহানির সম্ভাবনা, কিন্তু শিশু অবস্থায় সরিয়ে রেখে, বাসা দুভাগে ভাগ করে আলাদা আলাদা লালন-পালন করে দেখা গেছে ওরা পরস্পরকে সমাদরেই গ্রহণ করে। ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেকে প্রত্যেককে চিনতে পারে মনে করা উচিত নয়—কলোনির মধ্যে সঙ্কেত-শব্দ বা কোন অভিজ্ঞানও নেই। তবে উন্মত্ত অবস্থায়, তিন-চার মাস অদর্শনের পর, এমন কি দাসদেরও পর্য্যন্ত চিনতে অসুবিধা হয় না।

মানুষ অথবা অপর স্তন্যপায়ীর কার্য্যকলাপ একেবারে স্বতন্ত্র। সেখানে বোধশক্তির প্রাবল্য, শিক্ষা ও অনুজ্ঞার অপর্য্যাপ্ত সুবিধা থাকায় যুক্তি ও কৌশল-উদ্ভাবন-ক্ষমতা এদের যথেষ্ট। কীট-পতঙ্গের মন নিত্য কর্মধারার লৌহশৃঙ্খলে বাঁধা, কর্মের অগণ্যতা সত্ত্বেও ব্যক্তিগত বিচারশক্তি নেই, ঐকান্তিক অধ্যবসায় আছে—অভাব শুধু সহজ বুদ্ধির। নিয়মিত ক্রমের ব্যতিক্রম হলে এরা অকূল পাথারে একেবারে দিশাহারা হয়। গৃহকোণে অব্যবহৃত স্থানে ঝুলো-মাকড়সারা থাকে, তাদের ডিম্ব-থলির চারদিকে রেশমী সূতার আট বুনন, থলি থেকে ডিমগুলি অপসারিত করলেও শ্রমসাধ্য বুনন কর্মার ব্যতিক্রম হবে না। খনক বোলতা মাটির নীচে সুড়ঙ্গ করে, শিকার ধরে এনে গর্ত্তে রেখে তার উপর ডিম পাড়ে—শেষে কাদামাটি দিয়ে গর্ত্তের মুখ বন্ধ করে অন্তর্হিত হয়। অর্দ্ধসমাপ্ত একটি বাসা থেকে শিকার সমেত ডিম বাইরে এনে দরজার কাছে রেখে দেওয়া হ'ল, যাতে অতি সহজেই নজরে পড়ে। হা হতোস্মি! সে দেখেও দেখল না, যেন কিছুই হয় নি—সব ঠিক আছে এই মনোভাব নিয়ে বিপুল উৎসাহে শূন্য গৃহদ্বার বন্ধ করতে আরম্ভ করল। প্রবৃত্তি তাকে অনুক্ষণ আরব্ধ কার্য্য সমাপ্ত করতে উদ্দীপ্ত করছে, উত্তেজনা-মুহূর্ত্তের অবিরাম গতির মাঝে বিচার-বিবেচনা লীন। সিগেল পোকার গায়ক হিসাবে পটুতা আছে। লতার কাঁপা নলে এরা ডিম দেয়, অল্পক্ষণ পরেই অপেক্ষাকৃত খর্বাকৃতি মাছি এসে সে ডিমগুলি উৎখাত করে সেই স্থানে নিজের ডিম রেখে দেয়, উপরের ডালে বসে সিগেল সমস্ত নিরীক্ষণ করছে অথচ আপত্তি করছে না। একটি আঘাতেই খুদেমাছির দফা নিকেশ হয়ে যেতে পারে, কিন্তু শতাব্দীর অভিজ্ঞতা সিগেলকে শিক্ষা দিতে পারেনি কিছুই।

ভ্রম-ভ্রান্তির উদাহরণ অজস্র। হাসি পায় যখন দেখি ভ্রমর চিত্রপটের ফুলে বসবার উদ্যোগ করছে। অনেকে বোলতাদের মাছি-চিত্র শিকার করতে দেখেছেন। পেকহাম দম্পত্তি প্রসিদ্ধ কীটপতঙ্গ পর্যবেক্ষক, তাঁরা দেখেছেন যে বোলতারা বার বার আপন বাসার প্রবেশদ্বার ভুলে যাচ্ছে। অপর প্রাণীদের ভ্রমাত্মক কার্য আরও অবিমৃষ্যকারিতার পরিচায়ক। টেবলের ফুলদানিতে রং-বেরঙের কৃত্রিম ফুলের গুচ্ছ সাজানো—কোথা থেকে এক মথ এসে তার উপর বসবেই বসবে, কি তাকে সম্মোহিত করেছে—গন্ধ নয় নিশ্চয়, রূপ—কিন্তু রসশূন্য রূপের মোহ থাকবে কতক্ষণ? ভারতের সুর্যমথ ডিম্ব প্রসব করে আফিমফুলে, শূক বীজকোষ ছিদ্র করে ঢুকে পড়ে সেখানেই বড় হয়, গুটিকা থেকে মথের অবস্থান্তর ওর ভিতর। সমস্যা দেখা দেয় বাইরে আসবার সময়—শূকের অপ্রশস্ত ছিদ্রমুখে পূর্ণাঙ্গ মথ বন্দী, এই ভাবে শতকরা সত্তর-আশীটিকে জীবন আহুতি দিতে হয় স্বরচিত কারাগারে। মাকড়সারা শাবকের থলি বহন করে বেড়ায়, আবার অনেক ক্ষেত্রে ঐরূপ শূন্যগর্ভ বস্তু (যেমন গেঁড়ির খোলা, ফাঁপা রবার) বহনে আত্মপ্রবঞ্চনা করে। স্ত্রী-মাকড়সা অত্যন্ত কোপনস্বভাবের, দুটিতে দেখা হলেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম অনিবার্য্য, যার অবসান শুধু একের নিধন ও জীবিতের মৃতকে উদরসাৎ করণে। হয়ত দু'জনের পিঠেই অগণিত ছানা, কিন্তু তাতে দ্বন্দ্ব ব্যাহত হয় না, নিহত মাতার সন্তানেরা গুটি গুটি ওঠে গিয়ে মাতৃহন্ত্রীর পৃষ্ঠে আর সেও অম্লানবদনে ঐ দ্বিগুণ দেহভার বহন করে বেড়ায়।

এদের মানসিক বৃত্তি আমাদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলেই মনে হয়। সহজ-প্রবৃত্তির কার্যকলাপ সাধারণতঃ ভ্রান্তিহীন ও অখণ্ড, কিন্তু সময় সময় সহজবুদ্ধির অভাবে ক্লেশ,যত্ন ও অধ্যবসায়পূর্ণ প্রয়াস শুধু ব্যর্থতায় পর্যবসিতই হয় না, তা সন্তান-সন্ততি তথা জাতির

পক্ষে নিদারুণ মারাত্মক হয়ে উঠে। প্রজাপতি ক্রমাগতে যদি ভ্রমবশে ঠিক গাছটি ছাড়া অন্য গাছে শূক প্রসব করে, সূর্যমথ যদি ক্রমাগত বন্দী অবস্থায় প্রাণত্যাগ করে, তা হলে জাতি-ধ্বংসের আশু সম্ভাবনা। তবে ভ্রম-প্রমাদ সত্ত্বেও কীট-পতঙ্গকুলের তিরোধান সম্ভব হবে না, এদের উৎপাদন ক্ষমতা অত্যধিক।

কাজকর্মের মধ্যে প্রবহমাণ ছন্দ ব্যাহত হলে এরা সম্ভবতঃ কিং-কর্তব্যবিমূঢ় হয়; স্মৃতিশক্তির প্রভাব অল্প বলে অভিজ্ঞতা কাজে লাগে না। প্রতি পদক্ষেপ পূর্ব্বকর্মের উদ্দীপক, কার্য্যকারণরূপ শৃঙ্খল মুক্তা'র মত বিনি সূতার মালায় গাঁথা, বর্ত্তমান কাজটি আগের কাজের ইঙ্গিতস্বরূপ, আবার ভবিষ্যতে কর্ম্মপদ্ধতি জেগে উঠে বর্ত্তমানের গহন থেকে—সমাপ্তিমুখে আকস্মিক ভাবে ছেদ পড়লে এরা দিশেহারা, হয়ত অসমাপ্ত কাজ পড়ে থাকে নতুবা নূতন করে আরম্ভ করতে হয় গোড়া থেকে। কারতো একটি এমোফিলার সুড়ঙ্গপথ বন্ধ হয়ে যাবার অব্যবহিত পরে নির্গমন-পথে রেখে দিলেন এক অসাড় মাকড়সা। সে পড়ল ধোঁকায়, একবার গিয়ে বন্ধদ্বার উন্মোচন করে দেখে শিকার ঠিক আছে কিনা, দ্বার বন্ধ করে ফিরতে গিয়ে চোখে পড়ে মাকড়সা, আবার গৃহে ফিরে যায় পরীক্ষা করতে—এটা কি তার শিকার! একটি কাজের সহিত পরেরটির যোগসূত্র কেটে গেলে এরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। সহজ-প্রবৃত্তির চমৎকার কার্য্যপদ্ধতি, সুনিপুণ দৃষ্টিভঙ্গী ও উৎকৃষ্ট উপসংহারের মাঝে এরূপ অপরিসীম মূঢ়তা সত্যই আশ্চর্য্যজনক। সামান্য অভিজ্ঞতাও যে এদের মন গ্রহণ করতে নারাজ! একবার দেখি নির্ভুল কার্য্যপ্রণালী, বিবেচনা-প্রসূত কর্ম্ম, আবার যেই ধরা-বাঁধা পথ হতে সরিয়ে দেওয়া হ'ল অমনি জড়বুদ্ধির চরম নিদর্শন দেখা গেল। সহজ-প্রবৃত্তি-প্রসূত কর্ম্ম পূর্ব্ব হতে নির্দ্ধারিত, সে সঙ্কীর্ণ সীমা লঙ্ঘন করবার উপায় নেই। লূতাতন্তু নির্ম্মাণরত মাকড়সাকে জাল থেকে তুলে নিয়ে কিছুক্ষণ পরে যথাস্থানে বসিয়ে দিলে সে কি পুনরায় সেখান থেকে কাজ আরম্ভ করবে? নিশ্চয়ই নয়। সমস্ত জালটিকে গিলে ফেলে নূতনভাবে আরম্ভ হবে তার কাজ।

কীটকুলের স্বভাব ও কর্ম্মপদ্ধতি যে ধারায় এসেছে তার নাম সহজ-প্রবৃত্তি। গূঢ় ও জটিল বিষয় স্বতন্ত্রভাবে চিন্তার অবসর এখানে নেই, সর্ব্ববিধ বিশ্লেষণ-ক্ষমতা-বিরহিত এ বৃত্তির অনুভূতি কিন্তু তীক্ষ্ণ। লক্ষ লক্ষ বৎসরের অভ্যাসগত কর্ম্ম প্রণালী সুপ্তভাবে বিদ্যমান, সেজন্য অদেখা অজানা কর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত থেকে দৈনন্দিন কাজ-কর্ম্ম চমৎকার চালিয়ে যায়। ব্যবহারিক জ্ঞান-বিশ্লেষণে সহজ-বুদ্ধির প্রভাব যেমন দীপ্ত, সহজ-প্রবৃত্তি তেমনি নিবিড়ভাবে আয়ত্ত করেছে জীবনকে—প্রাণরূপের দুই ভিন্ন বৃত্তি এরা।

মহাকবিচক্রবর্ত্তী ছিত্তপ

ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার

সংস্কৃত কবিতা সংগ্রহগুলিতে ছিত্তপ নামক জনৈক কবির বহুসংখ্যক শ্লোক উদ্ধৃত দেখা যায়। এই কবির কোন কাব্য এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কবির নামটিও সর্ব্বত্র ঠিক এক আকারে পাওয়া যায় না। ছিত্তপ স্থলে অনেক ক্ষেত্রে চিত্তপ, ছিত্তিপ, ছিন্নম এবং ছিত্রম লিখিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত বিভিন্ন সূত্র হইতে কবি ছিত্তপের যতগুলি শ্লোকের সন্ধান মিলিয়াছে, এফ. ডব্লু. টমাস সাহেব সেগুলি তৎসম্পাদিত 'কবীন্দ্র বচনসমুচ্চয়ে'র পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকায় অকারাদিক্রমে সজ্জিত করিয়াছেন। অবশ্য ইহাতে শ্লোকগুলির প্রতীক অর্থাৎ প্রথমাংশমাত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। টমাস সাহেবের মতে 'কবীন্দ্র বচনসমুচ্চয়ে'র সংকলনকাল খ্রীষ্টীয় ১২০০ অব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী। এই গ্রন্থে কবি ছিত্তপের একটিমাত্র শ্লোক উদ্ধৃত দেখা যায়। কিন্তু শ্রীধরদাস তৎসংকলিত 'সদুক্তি-কর্ণামৃতে' এই কবির উনচল্লিশটি শ্লোক সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। টমাস সাহেব 'সদুক্তি কর্ণামৃতে'র সংকলনকাল দ্বাদশ শতাব্দী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা ১২০৫-০৬ খ্রীষ্টাব্দে (অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে) বাংলার সেন-বংশীয় নরপতি লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে সংকলিত হইয়াছিল। জুভাষিত হারাবলী, অলঙ্কারকৌস্তুভ, গণরত্নমহোদধি, সূক্তিমুক্তাবলী প্রভৃতি গ্রন্থেও কবি ছিত্তপের কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত দেখা যায়। এই সকল সূত্রে কবির যে শ্লোকসমূহের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে সাতটি শ্লোক পরমার-বংশীয় নরপতি ভোজ তৎকৃত 'সরস্বতী-কণ্ঠাভরণ' গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। উত্তরকালীন অনেক কবিতা-সংগ্রহেও ছিত্তপের বহু কবিতা স্থান পাইয়াছে। কিন্তু এই সকল ক্ষেত্রে কবিতাগুলিকে ছিত্তপের পরিবর্ত্তে "কোন অজ্ঞাত কবি" অথবা সিংহদত্ত, নবকর, দাক্ষিণাত্য, অকালজলদ কিংবা হনুমান নামক কোন কবি, অথবা 'ভোজ প্রবন্ধ' প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষের প্রতি আরোপ করা হইয়াছে। ইহা হইতে মনে হয়, কবি ছিত্তপের প্রকৃত নাম এবং রচনাবলী সম্পর্কে লোকের ধারণা সুস্পষ্ট ছিল না। 'সদুক্তি কর্ণামৃত'-ধৃত ছিত্তপের একটি শ্লোক এই—

> বাল্মীকেঃ কতমোসি কস্তমথবা ব্যাসস্য যেনৈষ ভোঃ
> শ্লাঘ্যঃ স্যাস্তব ভোজভূপতিভুজস্তম্ভস্তুতাবুদ্যমঃ।
> পঙ্গু পর্ব্বতমারুরুক্ষসি বিধুস্পর্শং করেণেহসে
> দোর্ভ্যাং সাগরমুত্তিতীর্ষসি যদি ভ্রমঃ কিমদ্ভোত্তরম্।

ইহা হইতে জানা যায়, ভোজ নামক জনৈক নরপতি কবির

সমসাময়িক এবং সম্ভবতঃ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়াছেন, এই ভোজরাজ পরমার-বংশীয় সুপ্রসিদ্ধ ভোজ ব্যতীত অপর কেহ নহেন। টমাস সাহেব বলিয়াছেন যে, সরস্বতীকণ্ঠাভরণে ভোজরাজ তাঁহার সমসাময়িক কবি ছিত্তপের কাব্য হইতে শ্লোকাবলী উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তিনি বলিয়াছেন, "কবি ছিত্তপ দশম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।" অবশ্য তাঁহার গ্রন্থের অন্যত্র পরমার বংশীয় ভোজের রাজত্বকাল একাদশ শতাব্দীতে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ভোজরাজের লিপিমালায় ১০২০ হইতে ১০৪৭ খ্রীষ্টাব্দের তারিখ দেখা যায়। তিনি ১০৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দে অথবা উহার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন; কারণ ঐ তারিখে তাঁহার পুত্র এবং উত্তরাধিকারী জয়সিংহ একখানি তাম্রশাসন দান করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। 'ভোজপ্রবন্ধে'র একটি কিংবদন্তী অনুসারে পরমার ভোজ ৫৫ বৎসর ৭ মাস ৩ দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং মোটামুটিভাবে ভোজের রাজত্বকাল ১০১০-৫৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্দ্ধারিত করা যাইতে পারে। তাঁহার সমসাময়িক এবং সম্ভবতঃ সভাকবি ছিত্তপও অবশ্যই একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে জীবিত ছিলেন।

গত শীতকালে আমি মধ্যভারত এবং রাজস্থানের কয়েকটি জেলায় ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম। তদুপলক্ষে জানুয়ারীর শেষভাগে আমি ভূতপূর্ব্ব গোয়ালিয়র রাজ্য অর্থাৎ বর্ত্তমান মধ্যভারতের অন্তর্গত ভীলসা নগরীতে উপস্থিত হই। ভীলসা ডাকবাংলায় অবস্থানকালে দেখিলাম, উহার প্রাঙ্গণে প্রস্তরমূর্ত্তি, শিলালেখ প্রভৃতি কতকগুলি প্রত্নবস্তু সংগৃহীত রহিয়াছে। শুনিলাম, রাজমল জৈন মড়ৈয়া নামক জনৈক স্থানীয় প্রত্নোৎসাহী ব্যক্তি ঐগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন। সম্প্রতি দ্রব্যগুলির প্রতি মধ্যভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব-বিভাগেরও দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। উহার মধ্যে কতকগুলি বস্তুর যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য আছে বলিয়া বোধ হইল। সেগুলি রৌদ্র-বৃষ্টিতে নষ্ট হইতেছে দেখিয়া আমি দুঃখিত হইলাম। মনে হইল, ইহার চেয়ে সেগুলির পক্ষে মৃত্তিকার নিম্নে লুক্কায়িত থাকাই নিরাপদ ছিল।

ভীলসা ডাকবাংলার প্রাঙ্গণস্থিত প্রত্নবস্তুসমূহের মধ্যে একখানি শিলালিপি আমার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিলাখণ্ডের উপরের এবং বামদিকের কতক অংশ ভাঙিয়া গিয়াছে। সুতরাং লেখটি সম্পূর্ণ নহে। কিন্তু দুই-চারি মিনিটকাল পরীক্ষা করিতেই লেখটির শেষভাগে নিম্নোদ্ধৃত বাক্য দুইটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল: "কৃতিরিয়ং মহাকবিচক্রবর্ত্তী পণ্ডিত শ্রীছিত্তপস্য। কাবিতেয়ং দণ্ডনায়কশ্রীচন্দ্রেণ।" অর্থাৎ উল্লিখিত শিলালিপির রচয়িতা ছিলেন 'মহাকবিচক্রবর্ত্তী' উপাধিধারী পণ্ডিত ছিত্তপ (ছিত্তপ) এবং উহা প্রস্তরে উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন 'দণ্ডনায়ক' পদাধিকারী রাজকর্ম্মচারী চন্দ্র। আমার তৎক্ষণাৎ মনে হইল, এই মহাকবিচক্রবর্ত্তী পণ্ডিত ছিত্তপ মালবরাজ ভোজের সভাকবি ছিত্তপ ব্যতীত অপর কেহ নহেন। এই মূল্যবান্ শিলালিপিটির প্রতি এতদিন পণ্ডিতসমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই কেন, ভাবিয়া আমার আশ্চর্য্য বোধ হইল। কারণ প্রত্নতত্ত্বোৎসাহী এম. বি. গর্দ্দে মহাশয় গোয়ালিয়র রাজ্যের পুরাতত্ত্ব বিভাগের কর্ত্তা ছিলেন; তিনি এই অঞ্চলের শিলালিপি ও তাম্রশাসন-সমূহের সন্ধান লইয়া ঐ বিভাগের বার্ষিক বিবরণীতে তৎসম্পর্কে আলোচনা প্রকাশ করিতেন। ইহার ফলে এ অঞ্চলের লেখমালা পণ্ডিতসমাজে সুপরিচিত। এ অবস্থায় কবি ছিত্তপের রচিত শিলালিপিটির অবহেলিত হইবার কারণ বুঝিতে পারিলাম না। পরে অনুসন্ধানে জানা গেল যে, গোয়ালিয়র পুরাতত্ত্ব বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ উল্লিখিত লিপিটির সম্যক্ পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই বলিয়াই উহা এতদিন অবজ্ঞাত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে।

গোয়ালিয়র পুরাতত্ত্ব বিভাগের ১৯৯৮-২০০২ সংবৎ অর্থাৎ ১৯৪২-৪৬ খ্রীষ্টাব্দের কার্য্য বিবরণীতে (পৃষ্ঠা ২৫) এই শিলালিপি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, লিপিটি ভগ্ন এবং অস্পষ্ট; ইহা কোন রাজা বা রাজমন্ত্রীর প্রশস্তি; দ্বিত্তপ নামক জনৈক কবি ইহার রচয়িতা ছিলেন। ঐ বিভাগদ্বারা প্রকাশিত হরিহর নিবাস দ্বিবেদীর রচিত 'গোয়ালিয়র রাজ্যকে অভিলেখ' সংজ্ঞক হিন্দীগ্রন্থেও এইরূপ বিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে; তবে ইহাতে কবির নাম দেওয়া হইয়াছে 'দ্বিত্রয়'। দুঃখের বিষয়, উল্লিখিত দুইখানি গ্রন্থে শিলালিপিটির যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে উহা সর্ব্বাংশেই ভুল। প্রথমতঃ, কবির নাম অবশ্যই ছিত্তপ (ছিত্তপ) এবং উহা কোন ক্রমেই দ্বিত্তপ কিংবা দ্বিত্রয় পড়া যাইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, লিপিটিতে উক্ত কবির রচিত সূর্য্যদেবতার প্রশস্তিমূলক একখানি খণ্ডকাব্য উৎকীর্ণ হইয়াছে; উহা অবশ্যই কোন রাজা বা রাজমন্ত্রীর প্রশস্তি নহে।

আধুনিক পূর্ব্বমালব অঞ্চলে প্রাচীনকালে আকর বা দশার্ণ রাজ্য অবস্থিত ছিল। উহার রাজধানী ছিল বিদিশা নগরী; ইহা ভীলসার নিকটস্থ বেত্রবতী বা আধুনিক বেত্তোয়ানদীর পরপারবর্ত্তী বর্ত্তমান বেসনগর। মধ্যযুগের প্রথম দিকে প্রাচীন বিদিশার স্থলে ভীলসা নগরী এই অঞ্চলে প্রাধান্য লাভ করে। এই স্থানে ভৈলস্বামী সংজ্ঞক সূর্য্যদেবতার এক সুবৃহৎ মন্দির ছিল। ঐ দেবতার নাম হইতেই নগরীর নাম হয় 'ভৈলস্বামী'। বর্ত্তমান 'ভীলসা' বা 'ভেলসা' উহারই অপভ্রংশ। ১১৩৩ খ্রীষ্টাব্দের একখানি লিপিতে ভৈলস্বামীনামক নগরের সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। ভীলসা জেলার অন্তর্গত উদয়পুরের উদয়েশ্বর মন্দিরে ১১৭৩ খ্রীষ্টাব্দের একখানি লিপি আছে। উহাতে চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলকে বলা হইয়াছে 'ভৈলস্বামি-মহাদ্বাদশক' অর্থাৎ বারটি গ্রামাঞ্চলের সমষ্টি ভৈলস্বামী নামক জেলা। ভীলসার ভৈলস্বামী দেবতা কত প্রাচীন তাহা নির্ণয় করা কঠিন। ৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের একখানি লিপিতে সম্ভবতঃ ভীলসাকে 'মালব-নদীতীরস্থিত ভাস্বান্' বলা হইয়াছে। তাহা হইলে দশম শতাব্দীতে বোধ হয় দেবতা ভৈলস্বামী 'ভাস্বান্' নামে উল্লিখিত হইতেন।

ভীলসা ও উহার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে পরমার-বংশীয় রাজগণের বহুসংখ্যক লেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় ঐ অঞ্চল পরমাররাজ ভোজের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। সম্ভবতঃ দণ্ডনায়ক চন্দ্র ভোজের কর্ম্মচারীরূপে ভীলসা অঞ্চল শাসন করিতেছিলেন। তিনি ভীলসার সূর্য্যদেবতা অর্থাৎ ভৈলস্বামীর ভক্ত ছিলেন। দেবতার একখানি প্রশস্তি প্রস্তরখণ্ডে উৎকীর্ণ করাইয়া তিনি ভৈলস্বামীর মন্দির-প্রাচীরে সংলগ্ন করিতে ইচ্ছুক হন এবং সম্ভবতঃ এই উদ্দেশ্যে মহাকবিচক্রবর্ত্তী ছিত্তপকে প্রশস্তিটি রচনা করিয়া দিতে অনুরোধ করেন। ইহা হইতে মনে হয় ছিত্তপ বোধ হয় ভীলসা অঞ্চলেরই অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার 'মহাকবি চক্রবর্ত্তী' উপাধি সম্ভবতঃ ভোজরাজের প্রদত্ত। তিনি ভোজের মুখ্য সভাপণ্ডিত ছিলেন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

ছিত্তপ যে উচ্চাঙ্গের কবি ছিলেন, তাহা সংস্কৃত কবিতাসংগ্রহগুলিতে উদ্ধৃত তাঁহার শ্লোকসমূহ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাঁহার নাম সর্ব্বত্র এক আকারে পাওয়া যায় না। আবার শ্লোকগুলি অনেকক্ষেত্রে বিভিন্ন লেখকের প্রতি আরোপিত দেখা যায়। এই অবস্থায় ভীলসা শিলালিপিতে উদ্ধৃত ছিত্তপের খণ্ডকাব্যটি সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে যে একটি মূল্যবান্ বস্তু তাহাতে সন্দেহ নাই। কাব্যটি অনুষ্টুভ ছন্দে রচিত। দুঃখের বিষয় লিপিটি খণ্ডিত। উহার যে শ্লোকগুলির পাঠোদ্ধার করা গিয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

... ...

রাহুত্রাসোচিযে দংষ্ট্র হতস্তেনুজন্মনা।
শিরোলূনাপি চুষ্টৈরো যাচনা কৌশলং হিতঃ॥
তেভস্তবার্দ্দমাদ্রৌ ক্রুবং ক্রুরেষু জহুতে।
ভক্ত্যাভিপ্রায়নিম্নস্থ চন্দ্রা······ক্ষতে॥
ফণামণিষু শেষস্য মুক্তামণিষু তোয়ধেঃ।
তারামণিষু চ ব্যোম্নস্তব রোচির্ব্বিরোচতে॥
তব সংক্রান্তমেণাঙ্কে চক্রবালে পয়োমুচি।
জ্যোতি র্জ্যোৎস্নেতি সন্ধ্যেতি সুরধন্বেতি গীয়তে॥
······লাক্ষা মদরাগং কপোলয়োঃ।
পয়োধরতটে তেচ্চিঃ প্রতীচ্যাঃ কুঙ্কুমদ্রবঃ॥

স্বর্ভানুস্ত্বাং ন গৃহ্ণাতি ক্রীড়ালোলঃ কলাবতি।
অন্তর্দ্ধংসে ত্বমজিহ্মাঃ প্রেম্ণো হি কুটিলাগতিঃ॥
ন তথোন্নিদ্রমব্জাস্যা······সি পদ্মিনীম্।
নূনং বিকত্থনোর্থেন শব্দেন ত্বং বিকর্ত্তনঃ॥
ছায়ালিঙ্গাঙ্কিনীং চুম্ব শ্রয়াপ্রাচীং ব্রজোত্তরাম।
রজ প্রাচ্যাং প্রতীচ্যাং বা দিনশ্রীস্ত্বাং ন মুঞ্চতি॥

... ...

রোচমানিং পুনঃ সা ত্বামস্তামন্তেহনুগচ্ছতি॥
পূর্ব্বমুন্মীয়তে প্রাতঃ পশ্চাৎ সংবিশ্যতে নিশি।
অহো সুগৃহিণীবৃত্তমসা [illegible]॥

... .

করস্পর্শেপি তে নাথ [illegible] নিমীলিততারকা।
যাসৌ সর্ব্বাঙ্গসংক্রান্তা ন বিঃ কিং করিষ্যতি॥
······চন্দ্রতাড়ঙ্কঃ প্রাচ্যাং সন্ধ্যাংশুকঃ দিবঃ।
ম্রিয়তে হোড়হারশ্চ পূর্ণ পাত্রং তবাগমে॥
প্রাচ্যামুদ্গচ্ছতো যাতু প্রতীচীং শ্রিয়তো দিবম্।
স্বগতে নাথ বহ্বীষু প্রতিপত্তিঃ প্রিয়াসু তে॥
তমো ভেত্তং যথা বাহ্যং তথান্তরমপীশিষে।
তবোদয়ে যথা রাত্রিস্তথা নিদ্রাপি নশ্যতি॥

... ...

ইনোহর্কোসি সূর্য্যোসি পর্য্যাপ্তেত্যেব তে স্তুতিঃ॥

উদ্ধৃত শ্লোকাবলী হইতে কবি ছিত্তপের রচনারীতির প্রাঞ্জলতা স্পষ্ট বুঝা যায়। ইহার কতকগুলি শ্লোক যে অত্যুচ্চ কবিত্বশক্তির পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই। একটি শ্লোকে কবি বলিয়াছেন যে, সূর্য্যরশ্মির চন্দ্রে এবং জলগর্ভ মেঘে সংক্রমণ ফলেই যথাক্রমে জ্যোৎস্না এবং ইন্দ্রধনুর উদ্ভব হয়। এই দুইটি ভাবের মধ্যে প্রথমটি কালিদাসকৃত রঘুবংশ (৩.২২), কামরূপরাজ হর্জ্জরবর্ম্মার হায়ুংথল তাম্রশাসন প্রভৃতি সংস্কৃত রচনায় দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন যে, এই ধারণা প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতিষ গ্রন্থেও দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় ভাবটি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত। কিন্তু ইহা প্রাচীন কবিগণের প্রিয় ছিল বলিয়া বোধ হয় না।
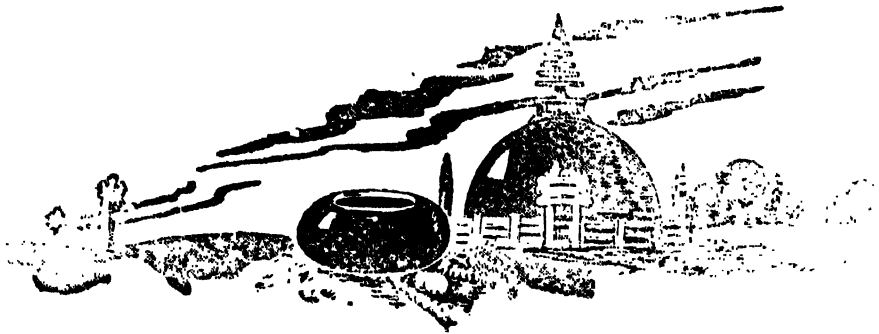
ঝরণা—নদীর কথা

শ্রীরেণুকা দেবী

ভাত সূর্যকে বন্দনা করে বেজে উঠেছে নহবতের সুর। ঘুমন্ত পুরী জেগে উঠার আভাস দূর থেকে ভেসে এলেও, তখনও ঘুমের ঘোর কাটে নি, তাই দূর থেকে ট্রাম চলার শব্দ, রাস্তা ধোয়ার খস-ঘসানির মধ্যেও নিস্তব্ধতার ভাবও রয়েছে চারদিকে। বসন্তের প্রভাতী হাওয়ায় দিকে দিকে ছড়িয়ে গেল ভৈরবী রাগিণীর মধু-স্রোত। আনন্দ-উচ্ছল সানাইয়ের সুর কানে যেতেই চমকে উঠল সুরমা, আবার যেন নিজের মধ্যেই নিজে ফিরে এল। তাই তো সানাই বাজছে, তারই বাড়ীতে সানাই বাজছে, তারই মেয়ে ইলার আজ বিয়ে। দধি-মঙ্গল সারা হলে কখন যে এসে দাঁড়িয়েছিল বারান্দায়, আনমনা হয়ে তাকিয়েছিল নিষ্প্রভ শুক-তারার পানে। সানাইয়ের সুরে চমকে উঠে মুখ ফেরাতেই দেখলে, বারান্দার ওধারে এসে দাঁড়িয়েছে ইলা। মেয়ের ঈষৎ আনত মুখের দিকে তাকিয়ে সুরমার মনে পড়ল ঐ অনুজ্জ্বল শুকতারার কথা, আকাশের দিকে ফের তাকিয়ে দেখল নেই, মিলিয়ে গেছে উষার আলোর সঙ্গে। মনটা কেমন করে উঠল সুরমার, গুপ্ত স্নেহের বন্যা এল, মেয়ের কাছে সরে গিয়ে, আস্তে হাত রাখল তার পিঠের উপর। কি মনে হচ্ছিল সুরমার—সেই এতটুকুন ছিল ইলা, কখন সবার চোখের আড়ালে এত বড় হয়ে উঠল নাকি ইলা—চঞ্চলা ইলা, আদরিণী ইলু, দেখতেই বড় হয়েছে, কি করে করবে শ্বশুরবাড়ীর লোকের মনোরঞ্জন, কে বুঝবে ওকে সুরমার মতন করে। ভাবতে ভাবতে মন খারাপ হয়ে যায়। শেষে সে আর কিছুই ভাবে না, উদ্বেলিত মাতৃস্নেহকে শান্ত করে মেয়ের স্পর্শ দিয়ে।

—ওমা, এইখেনে দাঁড়িয়ে মেয়ে সোহাগ হচ্ছে আর আমি গোটা বাড়ী বৌদি বৌদি করে চেঁচিয়ে মরছি—

—কেন আর লোক পেলিনে, বৌদি বৌদি করে কে তোকে চেঁচোতে বলল।

—কে বলবে, জান না নাকি? দধি-মঙ্গল সারা হ'ল, ভাবনু আঁধার রইছে একটু কাত হই, কোন্ রাতে শুইছি। তা কি উপায় আছে—ও বিন্দি ওঠ, ও বিন্দি ওঠ, উঠনু বাবা, তাও কি ছাড়ান আছে, বিন্দি ছেরাদ্দ, বিন্দি ছেরাদ্দ করে আমার ছেরাদ্দর জোগাড় করতে লেগেছে। এখন বল বিন্দি ছেরাদ্দ কোন্ ঘরে হবে, গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে পুঁছে দিয়ে আসি।—আজকের দিনের অসংখ্য কাজ, আত্মীয়-স্বজনের খাওয়া-দাওয়া নিমন্ত্রিতের পরিচর্যা ইত্যাদির কথা ভেবে ব্যস্ত হয়ে ওঠে সুরমা, নিজের অন্যমনস্কতার জন্য দেরি হওয়াতে ভীত হয়ে আস্তে করে জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁ রে গিন্নী এখন কোথায়, কি করছেন, আহ্নিক করা হয়ে গেছে দেখলি।

—কে জানে আহ্নিক হয়েছে কিনা, হাতে তো মালা রয়েছে, কি জপ করছেন গোবিন্দই জানেন, মুখে তো খই ফুটছে।

তুমি জান না বিন্দুপিসী, বকলে রাঙ্গাঠাকু'মার মালা জপ বেশী হয়, বলে ইলা।

—কে জানে পিসীমণি, আমি যাই, আবার দেরি হলে রক্ষে থাকবে না।

ভয়ে ভয়ে সুরমা বলে—তুই যা, আমিও চলি।—এত রাগ যে সুরমার অনুপস্থিতির জন্যে তা বুঝতে পারে, তা না হলে নান্দীমুখের জায়গার ব্যবস্থা করতে সুরমার কাছে খোঁজ করতেন না বিধুমুখী। নীচে এসে দেখলে, নীচেটা মুখর হয়ে উঠেছে বিধুমুখীর কলরবে। স্বামী আর দেবরদের উৎকণ্ঠিত মুখের দিকে তাকিয়ে ভরসা দিচ্ছেন তিনি। পাশ কাটিয়ে চলে যায় সুরমা নির্ভয় অন্তরে। বহুকাল পরে এ বাড়ীতে মেয়ের বিয়ে হচ্ছে। সে কতকাল আগে বিয়ে হয়েছিল বিধুমুখীর, তারও আগে তার দিদি রাজুবালার। রাজুবালা ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনী রেখে স্বর্গে গেছেন আর বালবিধবা বিধুমুখী এখনও শক্ত খুঁটির মত ধরে রেখেছেন ভাইপোদের সংসার, চালিয়ে যাচ্ছেন চরকার মত। নিখুঁত দৃষ্টি তাঁর মানমর্যাদা রক্ষার দিকে। নিজের কোন ননদ ছিল না সুরমার। শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান, বংশগত আচার-নিয়ম, বরযাত্রী এবং নিমন্ত্রিতদের মানরক্ষার ভার, সকল দিকে দৃষ্টিসম্পন্না, পিসশাশুড়ী বিধুমুখীর উপরে নির্ভয়ে নির্ভর করলেও সুরমার নিজের কাজই কি কম। খুড়তুত জা, ননদ, নিজের মাসী-পিসী তো কম আসে নি, আর তাদের ছেলেপুলেও তো কম নয়, এদের সবরকম পরিচর্যাই পরিপাটী ভাবে হওয়া চাই। চতুর্দিকে চরকির মত পাক দিয়েও কুলকিনারা করতে পারছে না।

—বাজারে যাব টাকা বার করে দাও বৌদি, দাদা বললেন প্রথম ভাঁড়ার থেকে দিও।

—হ্যাঁ রে সুরো, এ তোদের কেমন ধারা ব্যবস্থা বল্ তো, টুবলীর কচি ছেলে, সকাল থেকে হেদ্দে হয়ে গেল এক ফোঁটা দুধ নেই, কচিকাচা আসবে আমরা তো বাপু দুধের ব্যবস্থা আগে করি—বড় মাসীমা রাগে গজ গজ করেন।

খুড়তুত ননদ বেলা এসে বলে, বৌদি শাঁখারির কাপড়টা দাও, পিসীমা সিধে সাজিয়ে রাখবেন।—কত দিকে তাল দেবে সুরমা, তবুও তাল দিতে হয়, এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করতে হয়। এত কাজের মধ্যেও চোখ গিয়ে বার বার পড়ছে ইলার উপর, ওই তো বসে রয়েছে তার শোবার ঘরে, দু'একটি সমবয়সী বন্ধু ও মাসতুত পিসতুত বোনদের সঙ্গে গল্প করছে। যে লালপাড় কোরা তাঁতের শাড়ী পরে দধি-মঙ্গল হয়েছিল তাই পরেই বসে রয়েছে ইলা। হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সুরমা—

ইলাকে যেন তার নূতন লাগে—ওর সারা অঙ্গ ঘেরা লাল পাড়ে, কপালের দধিচন্দনের ফোঁটায় ও যেন নূতন হয়ে উঠেছে। শাঁখ বেজে উঠল পোঁঃ পোঁঃ, ওই যে গায়ে হলুদের তত্ত্ব এসেছে, ছুটে যায় সুরমা। বিধুমুখী এক পাশে ডেকে সুরমাকে সাবধান করে দেন, এ সব বরের বাড়ীর জিনিস, সকলের দেখা হলেই, সাবধানে একেবারে বড় আলমারীতে তুলে রাখ, আর চাবি খুব সাবধান। তত্ত্ব বওয়া দাস-দাসীদের জলখাবার ও বকশিসের ব্যবস্থায় চলে যান তিনি। সাবধানেই সব তুলে রাখছিল সুরমা, সত্যি তার নিজেরি এক মাসতুত ভাইয়ের বদনাম আছে—কিছু হলেই কেলেঙ্কারী। শিউরে ওঠে সুরমা, বিধুমুখী তো আর তা হলে ছেড়ে কথা কইবেন না। বিন্দু এসে ডাকে ও বৌদি, আহা দেখবে এস, আমার পিসীমণিকে দেখবে এস।—শাঁখারি এসে শাঁখা পরিয়ে দিয়ে গেল, রাঙা শাঁখায় কি সোন্দর দেখাচ্ছে।—শাঁখার কথায় শঙ্কিত হয়ে ওঠে সুরমা, যে চঞ্চল মেয়ে হাঁটে না তো লাফিয়ে চলে, সিঁড়ি দিয়ে নামে হুড়হুড়িয়ে। সুরমা বলে, ওরে আস্তে আস্তে নাম।—হা হা করে হেসে ওঠে ইলা, তোমার সবতাতেই ভয়।

আলমারী চাবি-বন্ধ করে জিজ্ঞাসা করেন, পিসীমা কি বরছেন, হ্যাঁ রে কলাগাছ এসেছে?

সব। সে-সব কিছু বাকি রাখবার উপায় আছে, সদরে মঙ্গলকলস, গাছ পোঁতানো, আমের পল্লব ঝোলানো, কলাতলা—সে-সব কুটুম-বাড়ীর লোক আসবার আগেই হয়েছে, দিদি-ঠাকুরুণ থাকতে তা এক চুল এদিক-ওদিক হবে না, যতই মুখ চালাক, বুক দিয়ে ওর মত করবে কে বৌদি, তোমার মাও পারবে না।—তা কি আর সুরমা জানে না, জানে সবই, আর সবই জানে এই বিন্দু—সুরমার শাশুড়ীও তো এই বিন্দুর সঙ্গেই ননদের রূঢ় বাক্য, কঠিন মন্তব্যের সমালোচনা করে মনের ভার লাঘব করতেন। সুরমাও করে। দেওররাও মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে, পিসীমার মেজাজ কেমন বিন্দুদি।

চারদিকে কলাগাছ পোঁতা মাঝখানে শিলের উপর দাঁড়িয়েছে ইলা, পাঁচ এয়োয় মিলে উলুধ্বনি দিয়ে হলুদ ছোঁয়ালে। সুরমার বড় ভাজ মনোরমা আবার একটু রঙ্গময়ী, একটা বালতি করে হলুদ-জল গুলে রেখেছিল, মেয়ের মা হওয়া সোজা নয় ঠাকুরঝি—ঢেলে দিল সেই হলুদ-জল সুরমার সর্ব্বাঙ্গে, সবাই হেসে উঠল, বিধুমুখী পর্য্যন্ত। নিজেকে সামলে নিয়ে, মেয়ের দিকে তাকাতেই দেখলে ইলাও হাসছে মুখ টিপে। আশ্চর্য্য, মেয়েটা আজ পুরোপুরি বদলে গেল নাকি। স্বভাবসিদ্ধ ভাবে, হা হা করে হেসে গড়িয়ে পড়ল না তো। কোন ব্যাপারেই এমন মুখ টিপে হাসতে দেখি নি তো ওকে। তুচ্ছ কারণেই হা হা করে উচ্চ হেসে গড়িয়ে পড়া দেখে কত বকেছে সুরমা, ওরে আস্তে, লোকে কি বলবে। লোকে কি বলবে—মার এই অহেতুক আশঙ্কায় আরো জোরে হেসে উঠেছে ইলা।

বেলা পাঁচটা বাজে, বিধুমুখী আর এক দফা তাড়া দিয়ে যান, কনে সাজাও, ইলার এলো চুলে হাত দিয়ে বলেন, এখনও চুল বাঁধা হয় নি, লোকজন আসার আগেই কনে সাজনো চাই।

মনোরমা বলে, আয় ইলা চুল বেঁধে দিই।

সুরমা বলে উঠে, তোমার কাছে চুল বাঁধবে ও, তবেই হয়েছে, কারো বাঁধা পছন্দ হবে ওর!

কেন রে, পছন্দ হবে না নাকি? আজ সব পছন্দ করতে হয়, আয় আয়। আজ যে বিয়ের দিন, বর আসবে যে লো—বলে ভাগ্নীর গাল টিপে দেয় মনোরমা। মনোরমার এর চেয়ে অনেক হাল্কা ঠাট্টায় রাগে মুখ লাল হয়ে উঠেছে ইলার, বলেছে ভারি অসভ্য বড় মামী। সুরমা ধমক দিয়ে বলেছে—ছিঃ ওরকম করে বলতে নেই, হাজার হোক বড় তো। আজ কিন্তু রাগের বদলে লজ্জায় লাল হয়ে ধীরে ধীরে এসে বসে ইলা মনোরমার কাছে। সুরমা চলে যায় অন্য কাজে, একটু পরেই আবার কি জন্যে ঘরে এসে দেখে ঘাড় হেঁট করে মনোরমার কাছে চুল বাধছে ইলা। মেয়ের হেঁট হয়ে বসা শান্ত ভঙ্গীর দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যায় সুরমা। ঘর থেকে বারান্দা আর বারান্দা থেকে ঘর, বেড়িয়ে বেড়িয়ে জট ছাড়িয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কবরী রচনারতা ইলার রূপটা কল্পনা করে অবাক লাগে সুরমার। হঠাৎ কোন্ যাদুমন্ত্রে এত ধীরস্থির হয়ে উঠল মেয়েটা। চঞ্চলতা বন্দী হ'ল শান্ত ছন্দের মধ্যে। বেনারসী আর জড়োয়া গহনায় সাজবার আগে, সবে ঘরে এসে বসেছে ইলা। মামী মাসীর দল সাজাবার উদ্যোগ করছে, ঘরে এল সুরমা গয়না বার করে দিতে। আলতা-পরা পা দুটিকে এগিয়ে দিয়ে নতুন চুড়ি পরা হাতে, হাঁটু জড়িয়ে লালপেড়ে কোরা-শাড়ী পরে বসে রয়েছে ইলা।

কি রে কি ভাবছিস, খিদে পেয়েছে···মেয়ের কাছে সরে আসে সুরমা। মৌনভঙ্গীতে মাথা নাড়ে ইলা। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সুরমা, এ যেন তার সেই ইলা নয়, এ যেন অন্য কোন অচিনদেশের মেয়ে, বহু অপরিচিতের মাঝখানে এক পাশ হয়ে রয়েছে। সুরমার কাছেও এ এক অপরূপ বিস্ময়।

পরের দিন। কুশণ্ডিকা শেষ হয়েছে, লাল বেনারসী, লাল সিন্দুর, নূতন অলঙ্কারে অপূর্ব্ব দেখাচ্ছে ইলাকে, সকলের মুখেই কি সুন্দর দেখাচ্ছে, কেমন মানিয়েছে—শুধু এই কথা। প্রাণ ভরে দেখলে সুরমা। গৌরী গৌরবান্বিতা হয়ে উঠিছেন শ্রীদুর্গায়। স্তব্ধ হয়ে রইল সুরমা মেয়ের মুখের পানে তাকিয়ে। কনকাঞ্জলি দেওয়া শেষ হয়েছে। বর-কনে উঠবে গাড়ীতে, দু-এক ফোঁটা জল টল টল করে উঠল সুরমার চোখে—সকলে বলে আনন্দ কর, আনন্দ কর, এমন আনন্দ কি আর আছে। আনন্দই করবে সুরমা, কে জানত ওই চঞ্চলা দুরন্ত মেয়েটাই সকল আনন্দের সার ছিল এ বাড়ীর। মেয়ের দুপদুপ করে আসার শব্দে কাছেপিঠের জিনিস সরিয়ে রেখেছে সুরমা, চওড়া পাড়ের শাড়ীটা কিনে ভেবেছে থাক এটা নিয়ে আর টানাটানি করবে না। কিন্তু কোন্ সময়ে বের করে নিয়ে, 'মা তোমার শাড়ীটা পরলাম' বলে আহ্লাদে গড়িয়ে

পড়েছে, 'তুমি বকবে না তো বল আগে'। কিছুই বুঝতে না পেরে হেসে ফেলেছে সুরমা, মায়ের হাসিতে অভয় পাওয়া মুখের কথায় নূতন জর্জেট শাড়ীটার খোঁচা লাগার কাহিনী শুনেছেন, জল বদলাতে গিয়ে ফুলদানি, চা দিতে গিয়ে পেয়ালা অস্থির হাতে স্থির থাকে নি। মায়ের বকুনিতে অভিমানের পর বাপের আদরে দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে চঞ্চলতা। কত তুচ্ছ ঘটনার মধ্যে গিঁঠায় গিঁঠায় বাঁধা ছিল পদে আনন্দ, ঝরণাধারার মত, সাবধানতার উপল দিয়ে যতই বাঁধন দিতে গিয়েছে ততই মুখর হয়েছে নির্ঝরিণী ...

পাত্রপক্ষ থেকে নেমন্তন্ন হয়েছে বৌভাতের। এই একটি ভয় ছিল সুরমার, যে অস্থির মেয়ে, কি করে বসে থাকবে স্থির হয়ে। সুন্দর ভাবে বেশ-বাস করা, বৌভাতের সবুজ রঙের বেনারসী পরা—একটা ইজিচেয়ারে বসে ছিল ইলা, মেঝের পাতা সতরঞ্চিতে বসা, চারিদিকের অপরিচিত মুখের মাঝখানে শান্ত স্থির ভাবে। সুরমাদের ঢুকতে দেখে, একবার চোখ তুলে তাকাল, একটু হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠল ঠোঁটের কোণে। সুরমার মনে হ'ল, সেও বউ দেখতে এসেছে, এদের বাড়ীর বউ—মা, বলে চীৎকার করে ওঠা ঝঙ্কারিণী ইলা কই? সেই কি ওই শান্ত নববধূটি।

আসবার সময় সুরমা জিজ্ঞাসা করল, কিরে, ভয় করছে? মন কেমন করছে? ভাবল এই বার, এই বার হয়ত ঝাঁপিয়ে পড়বে তার অশ্রুধারা। স্থির হয়ে রইল, চুপ করে রইল একটুখানি, তার পর বড় বড় চোখ মায়ের মুখের দিকে তুলে আস্তে বলল—না ত।

গাড়ীতে করে বাড়ী ফেরার পথে সুরমা আবার উচ্চারণ করল, মেয়ের মুখের ছোট্ট দুটি অক্ষর—না-ত। এক দিনেই কোথা থেকে এল, এত মমতা, এত মায়া, না-ত। এত বোধ এল কোথা থেকে, উল্টে মাকেই সান্ত্বনা দিচ্ছে—না-ত। কেমন করে জানল—মেয়ের জন্য কত উৎকণ্ঠিত হয়ে রয়েছে সুরমা, মেয়ের জন্যে বড্ড মন কেমন করতে লাগল সুরমার।

ভারতবর্ষে ভেষজশিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা

শ্রীমোহিনীমোহন বিশ্বাস, এম-এস্‌সি

গত ১৯৫০ সনের ডিসেম্বর মাসে নিখিল-ভারত ভেষজ-সম্মেলনের কলিকাতা অধিবেশনে ভারতীয় ভেষজশিল্পের বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় সমালোচিত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই সভার উদ্বোধন করেন। তিনি সমবেত বৈজ্ঞানিকগণকে দেশীয় গাছ-গাছড়া, রাসায়নিক প্রভৃতির সম্যক্‌ব্যবহার করে ভেষজ তৈরি করতে উপদেশ দেন। ইহাতে দেশ অনেকাংশে স্বাবলম্বী হতে পারবে। ডাঃ রায় বিশেষ করে জনসাধারণের সহযোগিতা লাভের জন্য চেষ্টা করতে বলেন। দেশীয় ভেষজশিল্পের উপর যাতে আস্থা আসে সেজন্য জনশিক্ষার দরকার। তাঁর মতে ভেষজ-বিজ্ঞানের শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা এবং জীববিদ্যা সবই প্রয়োজন। একজন ভেষজবিদের ঔষধ-প্রস্তুত ও ব্যবহার উভয়ই শিক্ষা করতে হবে। উক্ত সভার সভাপতি ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ তাঁর অভিভাষণে দেশীয় ভেষজসমূহ যাতে জনসাধারণের বিশ্বাস অর্জ্জন করতে পারে তৎপ্রতি সর্ব্বাগ্রে মনোযোগ দিতে বলেন। তাঁর মতে কেবল অভিযোগ করলেই হবে না যে, এদেশের চিকিৎসকগণ অনেক ক্ষেত্রে দেশীয় ঔষধ ব্যবহার করতে রাজী হন না। এ বিষয়ে ভালরূপ তদন্ত করা আবশ্যক। ডক্টর ঘোষ বলেন, যদি ড্রাগ-কন্ট্রোল-আইন যথাযথভাবে প্রযুক্ত হয় এবং ঔষধে ভেজাল কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রিত হয় তবে দেশীয় ঔষধের উপর জনসাধারণের আস্থা অচিরে ফিরে আসবে এবং প্রতিযোগিতার বাজারে ভারতবর্ষ সগৌরবে দাঁড়াতে পারবে। তিনি বলেন, ঔষধ-শিল্পে স্বাবলম্বিতা আনতে হলে আলকাতরাজাত এবং ঔষধে ব্যবহার্য্য রাসায়নিকসমূহ (fine chemicals) তৈরি করতে প্রয়োজনীয় শিল্পের প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। কারণ দেশীয় ঔষধ তৈরির জন্য উক্ত রাসায়নিকসমূহ বিদেশ হতে আমদানী করতে হয়। তিনি ভারতীয় শিল্পসমূহের গবেষণার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। তিনি এখানে গবেষণার বিরুদ্ধপন্থী দলের কথা উল্লেখ করেন যারা ঔষধশিল্পে গবেষণার কোন প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না। এই দলের মতে দেশের কাঁচামাল, কয়লা, বিদ্যুৎ প্রভৃতি শক্তির প্রাচুর্য্য, যানবাহনের সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি আগে দেখে পরে শিল্প-প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা উচিত। এঁদের মতে বিদেশ থেকে বিশেষজ্ঞ, যন্ত্রপাতি ও বিবিধ সরঞ্জাম আমদানী করে আগে শিল্প-প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং পরে যখন ঐ শিল্পটি ভালরূপ চালু হবে তখন দেশীয় কারিগর প্রভৃতির দ্বারা ঐ শিল্প রক্ষা করতে হবে। ইহাতে শিল্প-প্রতিষ্ঠা হলেও বৈদেশিক সংযোগ অস্বাভাবিক এসে পড়বে। জার্ম্মানী এবং ইংলণ্ডের শিল্প-প্রতিষ্ঠার ইতিহাস পড়লে এই ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হবে। বিলাতের ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইন্‌ডাষ্ট্রীর গবেষণা বিভাগ বহু লক্ষ পাউণ্ড ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং রাসায়নিক শিল্পের বিভিন্ন বিভাগে বহু মূল্যবান গবেষণা বিস্তার লাভ ঘটেছে।

শিল্প প্রতিষ্ঠানের গবেষণার বিষয় সম্যক্‌ আলোচনা করতে গেলে দেখা যায় পৃথিবীর কয়েকটি শ্রেষ্ঠ ঔষধের গবেষণা কাজ এখানে সম্পন্ন হয়েছে এবং এই গবেষণা কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা ইন্‌ষ্টিটিউট লেবরেটরির গবেষণা অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। আই,

সি. আই-এর প্যালুড্রিন এবং গ্যামাক্সেন, গাইগির ডি. ডি. টি, মে এণ্ড বেকার ও সিবার সালফনামাইডের ও পার্ক ডেভিসের ক্লোরো-মাইসেটিনের কার্য্যকারিতার বিষয় অনেকেই অবগত আছেন।

বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতীয় ভেষজ শিল্পে উল্লেখজনক উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে। দেশীয় গাছ-গাছড়া থেকে বিভিন্ন ঔষধ তৈরি হয়েছে এবং রাসায়নিক পদ্ধতিতে ও জীব-জানোয়ার এবং রোগীদের দেহের উপর বিবিধ পরীক্ষাকার্য্য চালিয়ে ঐ সমস্ত ঔষধের যথাযথ মান নির্দ্ধারণ করা হয়েছে। নানা গাছ-গাছড়া (drug) থেকে কয়েকটি নূতন এলক্যালয়ড্স (সারাংশ) প্রস্তুত করা হয়েছে। Kama'a (drug) থেকে পাঁচটি পৃথক অংশ বাহির করা হয়েছে এবং উহাদের অন্ত্রস্থ কীটাণুধ্বংসী শক্তি নিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে। Holarrhena Antidysentrica'র ছাল নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। Premna Integrifolia গাছ থেকে 'Gani karine' নামক নূতন এলক্যালয়ড বের করা হয়েছে। Ramalina Tayloriana'র সঙ্গে একটি হলুদ রঙের lichen (শৈবাল) চন্দন-গাছের উপর জন্মাতে দেখা গেছে এবং তার রাসায়নিক প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে। বেলপাতা থেকে 'essential oil' বের করে তার রাসায়নিক স্বরূপ সম্বন্ধে পরীক্ষা-কার্য্য চালান হয়েছে। Archa থেকে চারটি বিভিন্ন ঔষধ বের করে তাদের রাসায়নিক পরীক্ষা করা হয়েছে। Ephedra গাছ সম্বন্ধে আরও নূতন কাজ হয়েছে। সিনকোনা গাছের ছালের বিভিন্ন এলক্যালয়ড্সমূহের পরিমাণ নির্ণয় এবং উহাদের রাসায়নিক পরীক্ষা প্রভৃতি বিষয়েও অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছে।

দেশীয় উপাদান হতে বিভিন্ন ভেষজ দ্রব্য প্রস্তুত হয়েছে। নারিকেলের মালা, বাদামের খোসা, বাঁশ প্রভৃতি থেকে একটিভেটেড কার্ব্বন তৈরি হয়েছে। দেশীয় কেওলিন থেকে রোগীর ব্যবহার্য্য বিশুদ্ধ কেওলিন তৈরি করা সম্ভব হয়েছে যদিও তা বর্ত্তমানে বিলাতী কেওলিনের সমপর্য্যায়ের হয় নি।

ভিটামিন ও হরমোন সম্বন্ধীয় গবেষণায় অনেক উন্নতি দেখা গেছে। কডলিভার তেলের ঘাটতি পড়ায় হাঙ্গর-লিভার তেলের ব্যবহার বেড়ে গেছে। শেষোক্ত তেলের ভিটামিন 'এ'র পরিমাণও অনেক বেশী। ভিটামিন 'এ'র সংশোধন এবং ভিটামিন বি-১, ভিটামিন সি প্রস্তুত-করণ এবং উহাদের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে অনেক কাজ হয়েছে। Moringa Oleifera গাছের পাতায় যে ভিটামিন সি আছে তার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে গবেষণা হয়েছে।

ভারতবর্ষে এড্রিন্যালিন, পিটুইট্রেন প্রভৃতি হরমোনও প্রচুর পরিমাণে তৈরি হয়েছে। এদেশে প্রস্তুত লিভার এক্‌ষ্ট্রাক্টের পরিমাণ ও মান উভয়েরই উন্নতি সাধিত হয়েছে।

জৈব-রাসায়নিক ভেষজ (organic pharmaceuticals) সম্বন্ধেও অনেক মূল্যবান গবেষণা হয়েছে। লেবরেটরিতে ম্যালেরিয়া কালাজ্বর, আমাশয় প্রভৃতি রোগের ঔষধ তৈরি হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে এগুলি বিলাতী ঔষধের সমপর্য্যায়ভুক্ত হয়েছে। আবার

সম্পূর্ণ নূতন আবিষ্কারও দেশকে গৌরবান্বিত করেছে যেমন ডাঃ ব্রহ্মচারীর ইউরিয়াষ্টিবামাইন—কালাজ্বরের মহৌষধ।

এন্টিবায়োটিক্‌সের যুগে ভারতবর্ষ একেবারে উদাসীন নেই। ভারতবর্ষে বিভিন্ন গাছড়া, ছত্রাক (fungus) এবং মৃত্তিকাজ ব্যাকটিরিয়া নিয়ে গবেষণা করে এন্টিবায়োটিক শক্তির সন্ধান পাওয়া গেছে। জাতীয় সরকার পেনিসিলিনের কারখানা নির্মাণে মনোযোগী হয়েছেন। সুদূর ভবিষ্যতের জন্য আরও নানারূপ কার্যকরী পরিকল্পনাসমূহ রচিত হয়েছে। বর্তমানতঃ দেখা যায় যে ভেষজ সম্বন্ধীয় গবেষণা নানা ক্ষেত্রে বিস্তৃতি লাভ করেছে বটে তবে খুব সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে এ সব গবেষণায় শিল্প সম্ভাবনা দেখা গেছে। শিল্পই জাতির সম্পদ, সুতরাং গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হবে শিল্পের উন্নতিসাধন

সেণ্ট্রাল ড্রাগ ল্যাবরেটরির ডিরেক্টর স্যর বি মুখার্জী মেদিনীপুরে ইণ্ডিয়ান ফার্মাসিউটিক্যাল কনফারেন্সের উদ্বোধন প্রসঙ্গে ভারতবর্ষে ফার্মেসীর মান নির্দ্ধারণের ও অযোগ্য কর্মীদের হাত থেকে তাহার উদ্ধার সাধনের আশু প্রয়োজনীয়তার বিষয় উল্লেখ করেন। কেবল ভেষজ শিল্পের বিস্তার সাধন করলেই চলবে না। দেখতে হবে কি করে এবং কত অল্প সময়ের মধ্যে দেশীয় ঔষধের উপর দেশবাসীর আস্থা ফিরে আসে। স্যর মুখার্জী বলেন 'ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে যারা ভেষজবিদ (Pharmacist) বলে পরিচয় দেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই অশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত এবং সেইজন্য কার্য্যে বেশ অভ্যস্ত। তাঁদের মধ্যে অনেক নিজেদের চিকিৎসক বলে পরিচয় দেন, গলাতে ষ্টেথিস্কোপ বহন করেন এবং মাঝে মাঝে ইন্‌ট্রাভেনাস ইনজেকসনও দেন। স্যর মুখার্জী প্রভৃতি কয়েকজন বিশেষজ্ঞের চেষ্টায় আজ লাগসই কার্য্যকরী হয়েছে এবং ফার্মেসীর আজ নির্দ্দিষ্ট মান ঠিক করা হয়েছে। বারাণসী, অন্ধ্র, বোম্বাই, মাদ্রাজ, আগ্রা, আমেদাবাদ, পঞ্জাব প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ ফারমেসী-নির্দ্দিষ্ট মানে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। কম্পাউণ্ডার শ্রেণীর লোকদেরও নির্দ্দিষ্ট মানে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে মোট কথা আজ দেশের চিকিৎসকগণের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করতে সক্ষম এরূপ ফার্মেসিষ্ট (ভেষজবিদ) তৈরি হয়েছে এবং শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে আরও বিশ্বস্ত কর্ম্মী তৈরি হবে আশা করা যায়। চিকিৎসকদের দেশীয় ঔষধের ব্যবহারোপের পূর্ব্বে ফার্মেসিষ্টদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করে দেখা দরকার এবং ফারমেসী-শিক্ষার মান যথাযথ ঠিক হলে তখন দেশী ও বিলাতী ঔষধের তুলনামূলক ব্যবহার করা সমীচীন হবে। দেশীয় ভেষজশিল্পে তখন যুগান্তর আসবে।

ঔষধের মান নির্দ্ধারণের জন্য বিভিন্ন ফারমাকোপিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। প্রত্যেকটি ফারমাকোপিয়ায় নির্দ্দিষ্টসংখ্যক ঔষধের গুণাবলী ও মান লিপিবদ্ধ হয়েছে। এদের মধ্যে আই, পি, এল, বি, পি, ইউ, এস পি, বি পি, সি প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেকটি ফারমাকোপিয়ার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে এবং নিজস্ব কয়েকটি ঔষধের বিশেষ পরিচয় তথায় লিপিত আছে। সময় এবং গবেষণার উন্নতির সঙ্গে ঔষধের মান ক্রমশঃ উন্নত হয়ে চলেছে এবং এজন্য বিভিন্ন ফারমাকোপিয়ার পুনর্লিখনের প্রয়োজন দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে আবার দেখা যায় একই ঔষধের বর্ণনা প্রত্যেক ফারমাকোপিয়াতে কিছু পৃথক ভাবে লিপিত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেকটি ফারমাকোপিয়ার মান সমান নয়। সম্প্রতি ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন (WHO) এ বিষয় দৃষ্টিপাত করেছেন এবং পৃথিবীস্থ ফারমাকোপিয়া সমূহের সামঞ্জস্য বিধান করতে সচেষ্ট হয়েছেন। পৃথিবীর সকল সভ্য দেশের ভেষজসমূহের একটা সাধারণ মান নির্দ্ধারণ সম্পর্কে গবেষণা করবার জন্য ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের নেতৃত্বে গত বৎসর (১৯৬০) নিউইয়র্কে একটি স্থায়ী সভা আহূত হয়। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল সকল ফারমাকোপিয়ার একীকরণ ও একটি আন্তর্জাতিক ফারমাকোপিয়া সম্পাদন। ইতিপূর্ব্বে এক দেশের ভেষজের পরিমাপ অন্য দেশের সহিত অনেক ক্ষেত্রে মিলত না এবং একই নামে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ঔষধ ফারমাকোপিয়াভুক্ত ছিল। এতে দেশ ছেড়ে দেশান্তরে যাবার সময় অনেক বিপদ আপদের সম্মুখীন পড়ত এবং অনেক ক্ষেত্রে বিপজ্জনক ভুলের মধ্যে পড়তে হ'ত। ভেষজ সম্বন্ধীয় জ্ঞানের বিস্তার হেতু নাড়ী হ'ত না এবং ভেষজ বিজ্ঞান চর্চায় যথেষ্ট ক্ষতি হ'ত। ব্যবসায়েও যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি হ'ত। এই সকল অসুবিধা দূরীকরণে পৃথিবীস্থ আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সম্মিলিত প্রতিষ্ঠান (WHO) আন্তর্জাতিক ফারমাকোপিয়া প্রস্তুতে মনোনিবেশ করেন। সম্প্রতি এই আন্তর্জাতিক ফারমাকোপিয়ার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। আপাততঃ অত্যাবশ্যক ভেষজ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক মান নির্ণয়ের একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থা এর মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে। একটি সাধারণ আন্তর্জাতিক মানের প্রয়োজনীয়তার কথা অস্বীকার করা যায় না এবং যে সকল ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব সেখানে এক সমান মান বজায় রাখাই সমীচীন। এতে বিভিন্ন দেশের শিল্প সমূহের মধ্যে একটা আন্তর্জাতিকতার ভাব নিয়ে আসবে এবং কোন দেশের উৎপন্ন বা মান যদি আর এক দেশের মানের থেকে কিছু নিম্ন শ্রেণীর হয় তবে তাও সংশোধনযোগ্য। এর ফলে কোন দেশের স্বাধীন মনোবৃত্তির অন্তরায় সৃষ্ট হবে বলে মনে হয় না। পৃথিবীতে যত রকম শিল্প আছে তার মধ্যে ভেষজশিল্পে মান নির্দ্ধারণের প্রয়োজনীয়তা যত বেশী তত আর কারও নেই। সুতরাং সকল দেশের পক্ষেই এই ভেষজ শিল্পের উন্নতি সাধনের সঙ্গে এর মান উন্নয়নের কথা বিস্মৃত হলে চলবে না। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবর্ষ এই কার্য্যে অনেক অগ্রসর হয়েছে এবং সমগ্র পৃথিবীর ভেষজ সম্মেলনে তার আসন কারও নীচে হবে না আশা করা যেতে পারে।
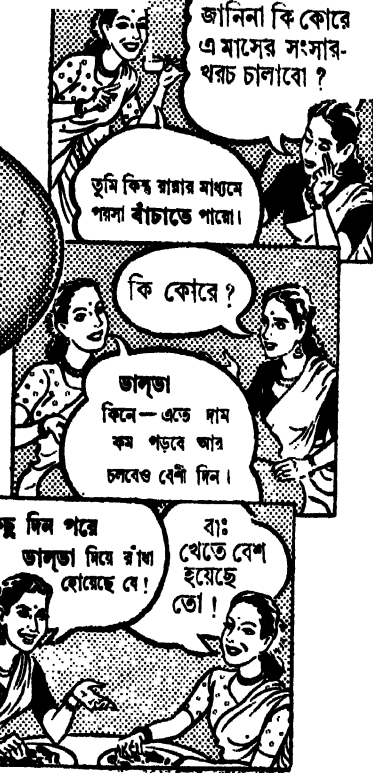
"পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস"

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুত তারকচন্দ্র রায় প্রণীত পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ড,* প্রথম খণ্ডের অনতিবিলম্বে মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে দেখে যার পর নাই আনন্দিত হয়েছি। গ্রন্থের পরিকল্পনার বিরাটত্ব ও বিষয়বস্তুর গুরুত্ব এ বিষয়ে বিঘ্ন হবে আশঙ্কা হয়েছিল; কিন্তু গ্রন্থকারের অধ্যবসায় ও কর্ম্মশক্তি সে বিঘ্নকে জয় করেছে।

প্রথম খণ্ডের যে গুণগুলি তাকে বিশিষ্টতা দান করে বাংলা-সাহিত্যের একটি গৌরবের বস্তুতে পরিণত করেছিল, দ্বিতীয় খণ্ডে সে গুণগুলি সবই বর্তমান—বরং মনে হয় তারা যেন আরও উজ্জ্বলতা লাভ করেছে। যে দার্শনিকের দর্শন আলোচিত হয়েছে, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন, যে পরিবেশের মধ্যে তাঁর জন্ম সেটির সবিস্তার বর্ণনা, সহজবোধ্য ভাষায় তাঁর দর্শনের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা এবং পরিশেষে তাঁর দার্শনিক মতের সমালোচনা এ গ্রন্থেও সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রধান প্রধান দার্শনিকের দর্শনের ব্যাখ্যার দ্বারা তাকে সহজবোধ্য করবার জন্য অসীম কষ্ট স্বীকার করা হয়েছে। এই সম্পর্কে কাণ্ট হেগেল ও স্পিনোজার দর্শনের আলোচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমার ত মনে হয় স্পিনোজার দর্শনের এমন সর্ব্বাঙ্গীণ পরিপূর্ণ আকারে ব্যাখ্যা অন্য কোন দর্শনের ইতিহাস-বিষয়ক গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

প্রথম খণ্ডের বিষয়বস্তু ছিল গ্রীক দর্শন ও মধ্যযুগের দর্শন। দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচিত হয়েছে বেকন থেকে আরম্ভ করে হেগেলের দর্শন পর্য্যন্ত। পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ যুগ। সেটি সহজেই উপলব্ধি হবে এই যুগের দর্শনের চিন্তাধারার মূল সূত্রটি অনুধাবন করলে। গ্রীক যুগে স্বাধীন চিন্তাধারা বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু তখনও দার্শনিকের মন পরিপক্কতা লাভ করে নি। তা যেন পাশ্চাত্য দর্শনের শৈশব অবস্থা। মধ্যযুগে ধর্ম্মের প্রভাব তাকে নানা বিধিনিষেধের মধ্যে ফেলে তার আলোচনা-ক্ষেত্র বিশেষ সঙ্কুচিত করা হয়েছিল। অবাধ স্বাধীন চিন্তার সুযোগ সেখানে মিলত না। এ যেন পাশ্চাত্য দর্শনের জীবনে কৈশোর অবস্থা, গুরুজনের শত শাসন ও নিষেধ তাকে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করতে দেয় না। তার পর এল পাশ্চাত্য দর্শনের যৌবন। তখন তার সাহস বাড়ল, সে বলল গুরুজনের মানা মানি না। এই যুগের মূল সূত্র হ'ল স্বাধীন চিন্তায় পক্ষপাত এবং নিছক চিন্তাশক্তির সাহায্যেই সত্যের সন্ধানে আত্মনিয়োগ। সুতরাং জ্ঞানের স্বরূপ কি, চিন্তাশক্তির কর্ম্মপদ্ধতি কিরূপ, তার নাগাল কত দূর এই প্রশ্নগুলি দর্শনের প্রধান আলোচনার বিষয় হয়ে গেল। এই যুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কাণ্টের দর্শনে এর আলোচনা জটিলতম আকারে আমরা দেখতে পাই। এটিকে সত্যই পাশ্চাত্য দর্শনের যৌবনের যুগ বলা চলে। তা একটি সমগ্র খণ্ডের বিষয়বস্তু হয়ে ভালই হয়েছে। গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে আমরা পাশ্চাত্য দর্শনের পরিণত অবস্থায় প্রৌঢ় রূপটি দেখবার আশা রাখি।

বাংলায় পরিভাষা রচনায় গ্রন্থকার যে পরিমাণ ক্লেশ স্বীকার করেছেন তা সার্থক হয়েছে। এ কথাটি হৃদয়ঙ্গম করবার জন্য একটু সবিস্তার আলোচনার প্রয়োজন আছে মনে হয়। বাংলা ভাষায় পাশ্চাত্য দর্শনের আলোচনাকে বিশুদ্ধ বাংলায় সম্ভব করে তুলতে এইরূপ পরিভাষা-রচনা একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। কিন্তু আমাদের দেশে ও পাশ্চাত্য দেশে দর্শনের সবিস্তার আলোচনা হয়ে থাকলেও তাদের আলোচনার ধারা স্বতন্ত্র পথ গ্রহণ করেছে। ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে একই বিষয়বস্তু নির্দ্দেশের জন্য উভয় দেশের দর্শনেই উপযুক্ত পরিভাষা রচিত হয়েছে বটে, কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তা পাওয়া যায় না। সেখানে গ্রন্থকারের নিজেরই চেষ্টায় পরিভাষা রচনা করে নিতে হয়। এখানে গ্রন্থকার সর্ব্বক্ষেত্রেই বাংলা পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। যেখানে তা সহজলভ্য সেখানে কষ্ট নেই, কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তা সহজলভ্য হয় নি এবং বিশেষ শ্রম স্বীকার করে নিজেকে তা রচনা করতে হয়েছে।

এক্ষেত্রে পরিভাষা-রচনায় যে মার্গ বুদ্ধিসম্মত, তাই লেখক গ্রহণ করেছেন। পাশ্চাত্য দর্শনের ব্যাখ্যায় পরিভাষা খুঁজতে ভারতীয় দর্শনে ব্যবহৃত অনুরূপ বা সমস্থানীয় পরিভাষারই পথ নির্দেশ কর[া] উচিত। পরিভাষা রচনা করতে তিনি সেই পথই অবলম্বন কর[ে]ছেন, ফলে সাফল্যলাভ হয়েছে আশাতীত। এখানে দু'একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। পাশ্চাত্য দর্শনে যাকে 'object' বলা হয়, তাকে তিনি বলেছেন 'বিষয়'। ভারতীয় দর্শনে তা[র] নজির আছে। কঠ উপনিষদে আমরা পাই "ইন্দ্রিয়াণি হয়ান্যাহু বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।" এইখানে 'বিষয়' পরিভাষাটি এমনি পাওয়া যায়। তা হতে তিনি 'Subject'-এর সমার্থবোধক পরিভা[ষা] রচনা করেছেন 'বিষয়ী'। ভারতীয় দর্শনে এই বস্তুটি জ্ঞাপন কর[তে] কোথাও 'ভোক্তা' কোথাও 'দ্রষ্টা' কথার ব্যবহার হয়েছে। 'বিষ[য়ী]' কথাটির ব্যবহার 'বিষয়' সম্পর্কিত হলেও গ্রন্থকারের নিজস্ব। এইরূপ হেগেলের 'Dialectic Method'-এর বাংলা পরিভা[ষা] রচনা করতে তিনি জৈন দর্শনের 'সপ্তভঙ্গী নয়' পরিভাষাকে নি[য়ে] করে 'ত্রিভঙ্গী নয়' এই পরিভাষার ব্যবহার করেছেন। ফলে পরিভা[ষা] সহজবোধ্য হয়েছে।

যেখানে এরূপ নজির জোটে নি সেখানে গ্রন্থকারকে স[ম্পূর্ণ] নিজের বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভর করতে হয়েছে। সেখানে [...]
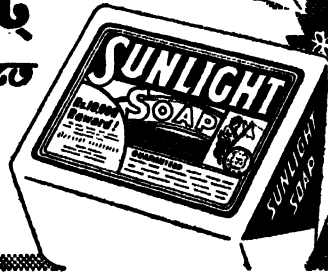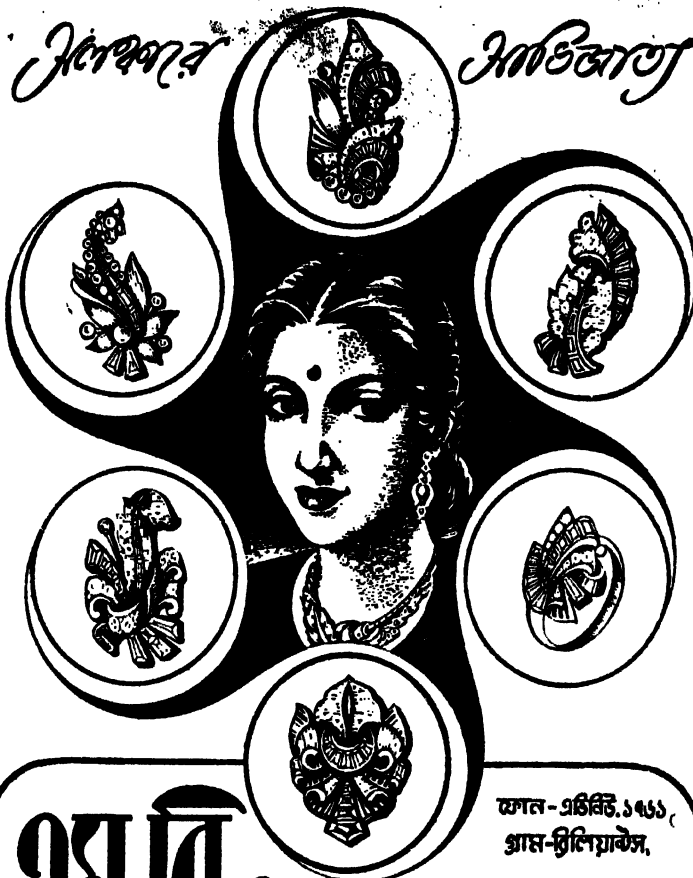
---

* গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ৫০৪ পৃষ্ঠা (রয়্যাল)। মূল্য দশ টাকা।

ধপ্‌ধপে
ক'রে কাচা
ঝক্‌ঝকে
ক'রে কাচা
সান্‌লাইট
সাবানের দৌলতে
না আছড়ে কাচলেও
কাপড়চোপড় সাদা ও
ঝক্‌ঝকে ক'রে দ্যায়!
SUNLIGHT
SOAP
SUNLIGHT SOAP

অগাধ পাণ্ডিত্য ও ভাষার ব্যুৎপত্তির দরুন তাঁর সাফল্য সহজ-লভ্য হয়েছে। দু' একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—যা 'a priori' তাঁর পরিভাষায় তা 'প্রত্যক্ষপূর্ব্ব', যা 'a posteriori' তা হ'ল 'প্রত্যক্ষোত্তর'। পাশ্চাত্ত্য পরিভাষায় যা 'Sensation' তাঁর পরিভাষায় তা 'সংবেদন'; যা 'perception' তা 'প্রত্যয়' ও যা 'concept' তা 'সম্প্রত্যয়'। বাংলা-সাহিত্যের যে বিদেশী দর্শনের ব্যাখ্যার উপযুক্ত পরিভাষা রচনার এত শক্তি আছে তা গ্রন্থকারের সাফল্য হৃদয়ঙ্গম না করলে প্রত্যয় হয় না। কোথাও তিনি প্রথম খণ্ডে যে পরিভাষার ব্যবহার করেছেন, তার সামান্য পরি-বর্ত্তনসাধন করে তাকে মার্জ্জিত করতে কুণ্ঠিত হন নি। ইউরোপীয় দর্শনে যাকে 'Universal' বলা হয় প্রথম খণ্ডে তার পরিভাষা করেছিলেন 'সার্বিক প্রত্যয়'। এই খণ্ডে এই অর্থে তিনি কেবলমাত্র 'সার্বিক' পদটির ব্যবহার করেছেন। মনে হয় তার ফলে পরিভাষা হিসাবে তার সার্থকতা পরিবর্দ্ধিত হয়েছে।

দর্শনের বিষয়বস্তু অত্যন্ত জটিল। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণমূলক চিন্তাধারা নিয়ে তার কারবার। এক্ষেত্রে কেবল নীরস আলোচনার মধ্যে তাকে সীমাবদ্ধ রাখলে তা সহজবোধ্য হয় না। তাকে সহজবোধ্য করে তুলতে দরকার দৈনন্দিন জীবনে নিত্যদৃষ্ট বস্তুর সহিত তার সম্বন্ধ স্থাপন করা, বা এমন উপমার ব্যবহার করা যার সঙ্গে আমাদের বিশেষ পরিচয় আছে। যা পরিচিত, যাকে ভাল করে জানি এবং বুঝি, তার সহিত সম্বন্ধ আবিষ্কার করে, আমরা যা সূক্ষ্ম, যা জটিল, যা অপরিচিত তাকে বুঝি। এইখানেই উপমা-প্রয়োগের সার্থকতা।

গ্রন্থকার বিশেষ বিশেষ দর্শনকে সহজ-বোধ্য করবার চেষ্টায় এই উপায়টির প্রচুর ব্যবহার করেছেন। ফলে তাঁর ব্যাখ্যার প্রাঞ্জলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানে এই সম্পর্কে একটিমাত্র উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে। ইন্দ্রিয়ানুভূতি হতে বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে আমরা কিরূপে জ্ঞান উপলব্ধি করি কাণ্টের দর্শনের তাই হ'ল আলোচ্য বিষয়। তাঁর মনে ইন্দ্রিয়ানুভূতি হ'ল কাঁচা মাল, তার উপর 'দেশ' ও 'কালের' প্রত্যয়ের ছাপ পড়ে আমরা পাই 'সংবেদন' এবং তার পরবর্তী অবস্থায় নানা category-র ছাপ পড়ে আমরা পাই জ্ঞান। এই ব্যাখ্যাটিকে প্রাঞ্জল করবার উদ্দেশ্যে গ্রন্থকার যে উদাহরণ প্রয়োগ করেছেন তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তা তাঁর ব্যাখ্যার প্রাঞ্জলতা ও উপমা-প্রয়োগ-কৌশল এই উভয় গুণেরই আস্বাদ দেবে: "পাকযন্ত্রের ভিতর হইতে যে রস নিঃসৃত হয় তাহার সাহায্যে খাদ্যদ্রব্য যেমন পরিপাকপ্রাপ্ত হয়, তেমনি ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকলও মন হইতে ক্ষরিত দেশ ও কালের জ্ঞানের সহিত মিশ্রিত হইয়া অর্দ্ধপরিপক্ব হয়। পাকস্থলীর অর্দ্ধপরিপক্ব ভুক্তদ্রব্য যেমন অন্ত্রে স্থানান্তরিত এবং তথায় সম্পূর্ণ পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া রক্ত-মাংস ও মেদে পরিণত হয়, তেমনি মনের নিম্ন কক্ষে অর্দ্ধ জীর্ণ জ্ঞানোপাদান, দেশ ও কালের রাগে রঞ্জিত সংবেদন উপরিস্থিত বুদ্ধিকক্ষে নীত হয় এবং তথায় সেই অর্দ্ধপক্ক জ্ঞানের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয় বুদ্ধি হইতে ক্ষরিত নানা প্রকার 'জ্ঞাতিরস'। সেই রসে পূর্ণ পরিপাক লাভ করিয়া জ্ঞানের উপাদানসকল জ্ঞানে পরিণত হয় এবং আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।"

দিনে দিনে
আরও মস্থণ,
আরও লাবণ্যময় ত্বক্

তাসের দেশ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী, ৬।৩, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭। মূল্য তিন টাকা।

তাসের দেশ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৪০ সনের ভাদ্র মাসে। পরে ১৩৪৫ সনে এই গ্রন্থের সংশোধিত ও পরিবর্তিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বর্তমান আলোচনাধীন সংস্করণের বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে নাটক এবং নাটকের অন্তর্গত সকল গানের স্বরলিপি একত্রে মুদ্রিত হয়েছে। এই ব্যবস্থায় তাসের দেশ নাটকের অভিনয়ার্থিগণের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হ'ল। অভিনয়ের জন্য নাটকের গানগুলির সুর ও স্বরলিপি সংগ্রহের ব্যাপারে বেগ পেতে হবে না।

স্বরলিপি পরীক্ষা করে দেখে খুশী হয়েছি। সুরের প্রধান স্বরগুলির কাঠামোর উপরে সরল ভাবে স্বরলিপিগুলি আকারমাত্রিক পদ্ধতিতে রচিত। স্পর্শস্বরের বাহুল্য জটিলতা না থাকায় স্বরলিপি হতে গানগুলি উদ্ধার করা প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষেও কঠিন হবে না। স্বরলিপি করেছেন শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ। শুধু 'খরবায়ু বয় বেগে' গানটির স্বরলিপি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের করা।

নাটক সম্বন্ধে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। শুধু এইটুকু বলা যেতে পারে এই রূপক নাটকটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে সত্য প্রকটিত করেছেন, শুধু তাসের দেশের পক্ষেই তা সত্য নয়, সকল দেশের সকল সময়ের পক্ষে সত্য। মানুষ নিজের প্রয়োজনে নিয়মের সৃষ্টি করে, তারপর সেই নিয়ম পালন করতে করতে নিয়মে জড়িত হয়ে আড়ষ্ট হয়ে মরে। তখন সেই নিয়মনিষ্পিষ্ট দেশকে পুনরুজ্জীবিত করবার জন্য প্রয়োজন হয় ভিন্ন দেশের রাজপুত্রের 'উৎপাতের' ভেট সহ এসে দেশবাসীর কানে 'ইচ্ছামন্ত্র' দেবার।

নাটকের সর্বত্র একটি সরস তরল কৌতুক-রস পরিব্যাপ্ত থাকায় অভিনয় সহজেই চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠে।

স্বরবিতান (বিংশ খণ্ড)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী, ৬।৩, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭। মূল্য তিন টাকা।

কবির অপেক্ষাকৃত প্রথম দিকের ত্রিশটি গান ও গানগুলির স্বরলিপি এই গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে।

কবির পরিণত কালের গীতিগুলিকে যদি প্রবীণা বলি, তা হলে এ গীতিগুলি কিশোরী। প্রবীণার মহিমা এই গীতিসমূহের মধ্যে একান্তই না যদি পাই, কিশোরীর সুষমায় গানগুলি ভরপুর। 'মনে রয়ে গেল মনের কথা'-প্রভৃতি এই গ্রন্থের কয়েকটি গান তরুণ বয়সে আমাদের কানে সুধাবর্ষণ করত, তার স্মৃতি এখনও মনের মধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে আছে।

শুধু পরিণত কালের রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সঙ্গেই যাঁরা পরিচিত, পুরাতন গানগুলির মধ্যে তাঁরা রবীন্দ্র-সঙ্গীতের একটি নূতন আস্বাদ করবেন।

এই পর্যায়ের একটি গান বিংশ খণ্ডে একটু যেন হারাচ্ছি। গানটি— কেন চুরি ক'রে চায়'। 'কি যেন গানেরি মতো বেজেছে কানেরি কাছে যেন তার প্রাণের কথা আধেকখানি শোনা গেছে'—এই হাল্কা কাব্যের সহিত তরল সুরের মৈত্রীর যে মাধুর্য, তার তুলনা নেই। আশা করি গানটি অবহেলিত হয় নি, অন্য কোনও 'বিতানে' স্থান পেয়েছে।

গ্রন্থের স্বরলিপি আকারমাত্রিক পদ্ধতিতে রচিত।

রবীন্দ্রসঙ্গীত—শ্রীশান্তিদেব ঘোষ। বিশ্বভারতী, ৬।৩, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা। মূল্য চার টাকা।

এই বইখানি আদ্যন্ত পাঠ করে বিশেষ আনন্দ লাভ করেছি। রবীন্দ্রসঙ্গীতের গঠনশৈলী সম্বন্ধে, সুতরাং সে সঙ্গীতের ধর্ম সম্বন্ধে যাঁদের স্পষ্ট ধারণা নেই তাঁরা এই বইখানি পাঠ করে বিশেষ উপকৃত হবেন; 'আধুনিক বাংলা গান' বলতে যে শ্রেণীর সঙ্গীত বোঝায় তা থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের পার্থক্য কোথায়, তা বোঝাও তাঁদের পক্ষে কতকটা সহজ হতে পারবে।

যে অনন্যসাধারণ শিল্পবুদ্ধির সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ যুগপৎ কথা ও সুর রচনার দ্বারা, অথবা পূর্বরচিত কাব্যের দেহে সুর-পরিচ্ছদের যোজনার দ্বারা গানের সৃষ্টি করতেন, তার ফলে তাঁর গান হ'ত কথায় ও সুরে একটি

লাইফ্‌বয় সাবান

প্রতিদিনের ময়লার বীজাণুর
হাত থেকে আপনাকে বাঁচায়

LIFEBUOY SOAP

L. 231-50 BG
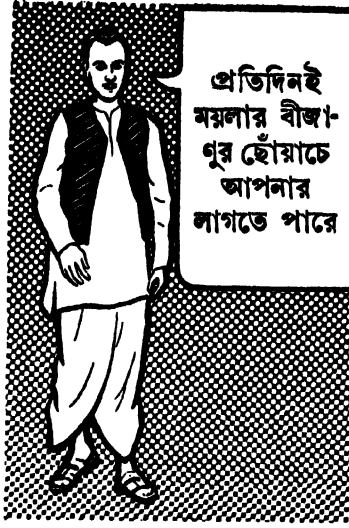
অপরিহার্য্য একথা রাজা স্বীকার করিতে চায় না, কিন্তু নন্দিনীকে জীবন হইতে সরাইয়া দেওয়ার অর্থ প্রেমকে জীবন হইতে নির্ব্বাসিত করা। বিশুর প্রেমে কিন্তু না-পাওয়ার বোধ জাগিয়া উঠিয়াছে। এই প্রেমে নারী ভোগের লক্ষ্য না হইয়া ভাবের প্রেরণা হইয়া দাঁড়ায়। "রবীন্দ্রনাথ নারীপ্রেমের একটি রমণীয় পটভূমি এবং ব্যক্তিজীবনে একটি অভিনব অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন।"—এই পর্য্যন্ত আমরা লেখকের সহিত একমত। কিন্তু তিনি যেখানে রাজা ও রঞ্জনকে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন সেখানে আমরা তাঁহার কথা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারি না। এইখানে হয়ত কবি চরিত্র, কাহিনী এবং ভাবকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য সঙ্কেতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। রঞ্জন শুধু রাজার নয়, হয়ত সাধারণভাবেই যৌবন ও যৌবন-স্বপ্নের প্রতীক।

গ্রন্থকার চিন্তাশীল এবং রসগ্রাহী। পুস্তকের নয়টি অধ্যায়ে তিনি ভাববস্তু, শিল্পভঙ্গী, নাট্যভঙ্গী, প্রকাশভঙ্গী, নাট্যকাহিনী, যক্ষপুরী, রাজার বিদ্রোহ, নন্দিনী—মানবী ও রক্তকরবী, এবং বিশুর কথা আলোচনা করিয়াছেন। লেখকের ভাষা স্বচ্ছ এবং সাবলীল, বলিবার ভঙ্গী হৃদয়গ্রাহী, যুক্তির মধ্যে বিন্যাস আছে, রচনায় বৃথা বাগ্‌বাহুল্য নাই। পুস্তকখানি "রক্তকরবী"র রসাস্বাদনে পাঠককে প্রকৃতই সাহায্য করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

প্রতিদিন—শ্রীকুমুদকান্ত চক্রবর্ত্তী। দেব প্রকাশনী, ৫৮।৩, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য—বার আনা।

প্রত্যূষ হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত একটি কেরাণী-জীবন সংসার-বৃত্তে কেমন করিয়া পাক খাইতেছে তাহারই যথাযথ চিত্র। গৃহ হইতে কর্ম্মক্ষেত্র—তাহার মাঝখানে পথ এবং রেল-কামরা—প্রতিদিনের যাওয়া-আসার ক্ষণগুলিকে একটি দিনে ধরিয়া রাখিয়াছে। রং তেমন চড়া হয় নাই, রেখাগুলিতেও বৈচিত্র্য কম (সাধারণ মানুষের জীবনের মত)—বিচ্ছিন্ন চরিত্রগুলিও ঘটনার সূত্রে বাঁধা পড়ে নাই—তথাপি দুঃখ-জর্জ্জর কেরাণী-জীবন অস্বস্তিকর পারিপার্শ্বিক লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাধনা করিলে কথা-সাহিত্যে লেখক সাফল্যলাভ করিতে পারিবেন।

যাঁরা তোমায় ঘিরে আছেন—শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত। সত্যব্রত লাইব্রেরী, ১৯৭, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

ছোট ছোট ছেলেমেয়ে যাহারা আজগুবি রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনিয়া ও পড়িয়া জগৎ বা জীবনকে বিকৃতরূপে কল্পনা করিয়া লয় তাহাদের জন্য লেখক স্বভাব-সুন্দর এই চিত্র-কথিকাগুলি রচনা করিয়াছেন। বাঙালী-পরিবারের দাদু, মা, বোন, মাষ্টার মশাই, বউদি প্রভৃতির স্নেহ, প্রীতি, শাসন, নীতিকথা, ত্যাগ পরার্থপরতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে কথিকাগুলি পরিপূর্ণ। ছেলেমেয়েরা একত্র মিলিয়া এইগুলি আবৃত্তি কিংবা অভিনয় করিয়া প্রচুর আনন্দ ও শিক্ষালাভ করিবে। লেখকের উদ্যম প্রশংসনীয়।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

বেদান্তদর্শন—শ্রীমতিলাল রায়। প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স, ৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৭॥০।

"প্রবর্ত্তক" মাসিকপত্রে ধারাবাহিক প্রকাশিত সঙ্ঘগুরুর লেখা "বিলাতী কাগজে পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ, সাজ-সজ্জা, গঠন-পরিপাট্যে আধুনিক রুচিসম্মত আভিজাত্য" লইয়া মহাগ্রন্থ-রূপে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ মহামহোপাধ্যায়ের অকুণ্ঠ প্রশস্তি শিরোধার্য্য করিয়া বাহির হইল। বাংলা ভাষায় বেদান্তদর্শনের বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে—নানাবিধ ভাষ্য, টীকা, অনুবাদ, নিবন্ধ, প্রবন্ধ প্রভৃতি। কিন্তু আলোচ্য "জীবনভাষ্য" একেবারেই অভিনব—ইহা "প্রগতিশীল" বাঙালীর আদরণীয় হইবে, সন্দেহ নাই। কারণ এতকাল বেদান্তের চর্চ্চা কেবল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ ও তাঁহাদের ভক্তদের মধ্যেই চলিয়াছিল—এখন যে-কোন শিক্ষিত বাঙালী ইহার চর্চ্চা করিতে পারিবে। প্রকাশকের নিবেদনে আছে, সঙ্ঘগুরু "তথাকথিত প্রগাঢ় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত নহেন।" অথচ "দুঃসাহসের সঙ্গে" তিনি শঙ্কর হইতে বলদেবের ভাষ্যগ্রন্থ পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া বহু স্থলে "সশ্রদ্ধায়" তাঁহাদের ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য করিয়া যুগোপযোগী "দিব্য জীবনবাদ" সূত্রকারের প্রকৃত অভিমত বলিয়া খ্যাপন করিয়াছেন। প্রথম সূত্রে 'অথ' শব্দদ্বারা এতকাল মাত্র সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন ব্যক্তিরই শাস্ত্রে অধিকার নির্ণীত হইয়াছিল—এখন "অতি অসচ্চরিত্র" লোকেরও ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায় অধিকার আসিয়া গেল এবং দুরূহ সংস্কৃত-গ্রন্থের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে এখন আর সংস্কৃতজ্ঞ হইতে হয় না—সঙ্ঘগুরু কি এই মহাগ্রন্থে তাহা প্রতিপাদন করিতে চান? "গৌণ" শব্দের অর্থ "সগুণ" (পৃঃ ১৬), "প্রকরণাদসাহিত্যাচ্চ" পদের অর্থ "যে-হেতু প্রকরণ জীবের সহিত নহে, জীব একান্ত নিরাশ্রয় হইয়াই ব্রহ্মগত হইয়াছে।" তাই তার "ব্রহ্মানন্দং পরমং সুখদং কেবলং" (পৃঃ ৫৫৮), "উপমর্দ্দং চ" (৩।৪।১৬) সূত্রের অর্থ "ঈশ্বরযুক্ত পুরুষের যথেচ্ছাচার উপমর্দ্দিত হয়" (পৃঃ ৪১৭) প্রভৃতি স্থলে তাঁহার "অপূর্ব্ব অনুপ্রবেশ সত্যই বিস্ময়কর" (পৃঃ ১।/০)। শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধে তিনি "সশ্রদ্ধায়" লিখিয়াছেন—"এই অভিমত কি তাঁহার অজ্ঞতা-হেতু?" (পৃঃ ৫৪), "জীবকে 'মায়া' বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার স্বকপোল-কল্পিত ভাষ্য বেদান্তবাদী ভারতে শ্রীবত্বপ্রাপ্তির মন্দ যুগে স্বীকৃত হইয়াছে" (পৃঃ ৫৫৪), "এই ভাষ্য···অতি চতুর কোন এক শূন্যবাদী বৌদ্ধ ভিক্ষুর" (পৃঃ ৫৪০) ইত্যাদি। এই গ্রন্থে ছাপার ভুল বিস্তর দৃষ্ট হইল।

"বিদ্যার্থী"

ভারত ও বাংলা—শ্রীসুধীরকুমার মিত্র। ১১০।১, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯। পৃষ্ঠা ১০৭, মূল্য ১।০।

পশ্চিমবাংলা সমস্যাবহুল রাজ্য। বাংলাদেশ দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার পর পশ্চিম-বঙ্গ ভূমি পাইয়াছে অখণ্ড বঙ্গের এক-তৃতীয়াংশ, সুতরাং পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বাস্তু-হারাদের আগমনে এই রাজ্যে ভূমির উপর যে চাপ পড়িয়াছে তাহার সমাধান রাজ্যসরকারের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অথচ বিহারও ভাষার ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ সীমানাবৃদ্ধির সম্পর্কে ন্যায্য দাবির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া চলিয়াছে। এমতাবস্থায় বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বে ভারতের রাজ্যসমূহের সীমানা নির্দ্ধারণ কমিটি নিযুক্ত হইবে বলিয়া পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু সম্প্রতি যে ঘোষণা করিয়াছেন তাহাতে অনেকের মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি সকল সমস্যাই পশ্চিমবঙ্গে জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। বেকার ও খাদ্যসমস্যার সমাধান না করিতে পারিলে এ রাজ্যের অবস্থা সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইবার সম্ভাবনা। শিল্পবাণিজ্য অবাঙালীর করতলগত, কারখানার শ্রমিক অবাঙালী, ভারত গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা অবাঙালী, স্থল, বিমান, নৌ-বিভাগে বাঙালী তরুণের নিয়োগ খুবই সীমাবদ্ধ, এ সকল কারণে পশ্চিমবঙ্গে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহা খুবই গুরুতর। পশ্চিমবঙ্গ ভারত-রাষ্ট্রের সীমান্ত রাজ্য, এই রাজ্যের বিভিন্ন অংশের আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ-ব্যবস্থা বহু ত্রুটিপূর্ণ, রাজ্যের বাজেটে ঘাটতি, বাস্তুহারা সমস্যা সমাধানে কেন্দ্রীয় সরকারের ঔদাসীন্য এবং রাজ্যসরকারের অক্ষমতা, সর্ব্বোপরি রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদ এই সমস্যাবহুল রাজ্যকে চরম সঙ্কটের মুখে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে। লেখক সত্যই বলিয়াছেন যে, বাংলা ও বাঙালীর বাঁচিবার ব্যবস্থা না করিলে, হিন্দুস্থানী বা হিন্দিভাষী সাম্রাজ্যবাদ স্বাধীন ভারতকে রক্ষা করিতে পারিবে না। লেখক তাঁহার বক্তব্যের সমর্থনে বিশিষ্ট লেখকগণের মতামত উদ্ধৃত করিয়াছেন। উপসংহারে লেখক বলিয়াছেন, 'বাংলা সরকারকে ন্যায় বিচারের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেই ভারত অন্তর্বিপ্লবের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে।' কথাগুলি প্রণিধানযোগ্য।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

বহ্নিপ্রেম—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দাস। ফিনিকস্ প্রেস লিমিটেড। ৪৬ বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১। দাম তিন টাকা।

লেখক একদা অধুনালুপ্ত মানসী ও মর্ম্মবাণী, ভারতী, মালঞ্চ প্রভৃতি পত্রিকায় গল্প লিখিতেন। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার কুড়িটি গল্প সমালোচ্য পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। ব্রহ্মদেশের জীবন ও নরনারী লইয়া লিখিত গল্পগুলিতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ছাপ আছে। পুস্তকের ভূমিকায় ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লেখক ও তাঁহার রচনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

বঙ্কিমের গল্প (প্রথম খণ্ড)—শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ। বাণীরূপা সাহিত্যসদন, ৮, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য—১।০ আনা।

শ্রেষ্ঠ লেখকদের রচনার সঙ্গে ছেলেমেয়েদের পরিচয় করাইয়া দেওয়া খুব বড় কাজ। সুখের বিষয়, বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এই কাজে হাত দিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পাঁচখানি উপন্যাসের গল্পাংশ এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে স্থান পাইয়াছে: আনন্দমঠ, রাজসিংহ, দেবীচৌধুরাণী, ইন্দিরা এবং মৃণালিনী। যাহারা পুরা বই পড়িতে অথবা পড়িয়া বুঝিতে পারিবে না, তাহারা এই গ্রন্থ হইতে গল্পের রস উপভোগ করিতে পারিবে। 'নিবেদনে' ভ্রমবশতঃ চার্লস্ ল্যাম্-এর নাম চার্লস্ ল্যাম্বস্ ছাপা হইয়াছে।

বিরহি মাধব—শ্রীবিষ্ণুসরস্বতী। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৲ টাকা।

কৃষ্ণলীলাকাব্য। মথুরাপতি হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনবিরহ অনুভব করিয়াছেন। বৃন্দাবনবাসিগণও তাঁহার বিচ্ছেদ-বেদনায় অধীর। এ অপার্থিব বিরহবেদনার গান প্রাচীন ও নবীন বাঙ্গালী কবিগণ অনেকে করিয়াছেন। বৈষ্ণব-সাধনার ধারা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু তাহার ভাবরসতৃষ্ণা আজিও আমাদের হৃদয় হইতে তিরোহিত হয় নাই। তাই বৃন্দাবনগাথা আধুনিক বাংলা কাব্যেরও একটি বিশিষ্ট অংশ অধিকার করিয়া আছে। পুরাতন বৈষ্ণব কাব্যের গভীরতা আধুনিক কাব্যে আশা করিতে পারি না। তথাপি মানব-হৃদয়ের যে চিরন্তন আকুতি লইয়া কৃষ্ণলীলার কল্পনা, তাহা আলোচ্য কাব্যেও রসসঞ্চার করিয়াছে।

রৌদ্রজ্যোৎস্না—শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত। রাইটার্স কর্ণার, ১০৪।১৪, গোপাললাল ঠাকুর রোড, কলিকাতা-৩৬। দাম ২৲ টাকা।

খরতপ্ত আজিকার জীবনের পথ। চলিতে চলিতে ক্লান্ত হইয়া পড়ি। জ্যোৎস্না কখন নামে, ভাল করিয়া দেখিবার অবকাশ পাই না। তবু জীবনকে ভালবাসি, জীবনের গান গাই, নূতন দিনের কল্পনা করি।

সেই নূতন দিনের কল্পনা আলোচ্য কাব্যে জাগাইয়াছে আশার সঙ্গীত। কবির স্বরে জড়তা নাই। বোধ হয় আবেগ স্বতঃস্ফূর্ত বলিয়াই তাহার প্রকাশ এমন সহজ ও সতেজ। প্রথম কবিতা 'ইতিহাস-নারী'—"জীবনের প্রেম ধ্যান স্বপ্ন দিয়ে গড়া। * * * এবারো তো তার প্রেমে হবো উত্তরণ। মৃত্যুহীন দীপ্ত ভালবাসা, জোগাবে সাহস, জয়, উজ্জীবিত আশা।" মহত্তর জীবনের আকাঙ্ক্ষা এবং আশ্বাসের বাণী অধিকাংশ কবিতাতেই ধ্বনিত হইয়াছে। দুই-একটি কবিতা বাস্তব ও কল্পনার মিলনে বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে: "সেদিন ছিল ঝড়ের রাত বেরিয়ে এলো তারা", তারপর "ছেলেটি কলে চাকরি করে, মেয়েটি মাষ্টারি।"

> "সে ঝড় আজো থামেনি তবু। * * *
> ঘরের ভিত ভীষণ নাড়ে, বাসন্তিকা প্রাণে
> ছড়ায় কালবোশেখী ডাক, মেঘের হাহা হাসি।"

চূড়ালা ও শিখিধ্বজ—শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত। বর্তমান প্রকাশনা, ৩৩এ মদন মিত্র লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য ১।০।

'চূড়ালা ও শিখিধ্বজ' যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের আখ্যায়িকা অবলম্বনে রচিত দীর্ঘ কবিতা। অনুবাদ নহে, কিন্তু বিষয়ের গাম্ভীর্য রক্ষা করিয়া ইহা একটি মনোজ্ঞ কবিতারূপেই দেখা দিয়াছে। রাজ্ঞী চূড়ালার জ্ঞান ও চরিত্র-মহিমা ইহাতে সুন্দর পরিস্ফুট হইয়াছে। ইহা ছাড়া আরও নয়টি কবিতা এ গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যে গ্রন্থকারের বিশেষ অভিনিবেশ, স্বাভাবিক রসবোধ এবং বাংলা ভাষা ও ছন্দের উপর তাঁহার অনায়াস অধিকার এই ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থখানিতে সপ্রমাণ।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
প্রতিষ্ঠিত
আশ্বিন, ১৩৬০
মীরা স্নো

মাধবীমূলে শকুন্তলার জলসিঞ্চন

শ্রীসতীন্দ্রনাথ লাহা

পথ — শিল্পী শ্রীমানিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

খেলা — শিল্পী · শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৩শ ভাগ
১ম খণ্ড

আশ্বিন, ১৩৬০

৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বেকার-সমস্যা

ভারতের উন্নতি ও অগ্রগতির অন্তরায় রূপে যে কয়টি সমস্যা রহিয়াছে, বেকার-সমস্যা তাহাদের অন্যতম। অন্ন-সমস্যার কতকটা সমাধান হইতেছে এবং আশা হয় নিকট ভবিষ্যতে এদেশের লোকের উদরপূর্ত্তির জন্য বিদেশে হয়ত ভিক্ষাপাত্র লইয়া যাইতে হইবে না। কিন্তু বেকার-সমস্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া এরূপ ভয়াবহ অবস্থায় আসিয়াছে যে, কয়েকটি প্রদেশে, বিশেষতঃ বাংলায়—উহা দেশের শান্তিশৃঙ্খলা, শিক্ষাপ্রগতি, বাণিজ্য-উদ্যোগ সবকিছুই ব্যাহত করিয়া জাতির ধ্বংসের কারণ হইয়া দাঁড়াইতেছে। পশ্চিমবঙ্গে ইহার আশু সমাধান না হইলে এই রাজ্যের চরম দুর্গতি অনিবার্য্য। স্থিরভাবে বিচার না করিয়া ভাবের উচ্ছ্বাসে ভাসিয়াই এই অবস্থা আমরা আনিয়াছি, সুতরাং চিন্তাবিমুখ হইলে সর্ব্বনাশের পথেই বাঙালীকে যাইতে হইবে। অতএব এই সমস্যার বিচার স্থির ভাবে এবং সম্পূর্ণ ভাবোচ্ছ্বাসবর্জ্জিত ভাবে করিতে হইবে।

বেকার দুই প্রকার। কর্ম্মঠ ও কর্ম্মেচ্ছু উপযুক্ত লোক সুযোগ বা সহায়তার অভাবে নিষ্ক্রিয়ভাবে বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয় বহু ক্ষেত্রে। সেই সুযোগ বা সহায়তা পাইলে তাহাদের বেকার-সমস্যা দূর হয়। আবার বহু কর্ম্মবিমুখ অকেজো লোক আছে যাহারা চাহে যে কাজ তাহারা ইচ্ছামত করিবে, কাজের ফলের পরিমাণ ও ভাল-মন্দও তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী হইবে, ফাঁকি বা অনুপস্থিতি দোষ হিসাবে গণ্য হইবে না, অথচ ঐরূপ কাজের প্রতিদানে তাহারা কর্ম্মঠ লোকের পূর্ণ পরিমাণ উৎকৃষ্ট কাজের প্রতিদানের সমান অর্থ অর্জ্জন করিবে। এইরূপ লোকের বেকার-সমস্যা বর্ত্তমান জগতে পূরণ হইতে পারে না। শুধু তাহাই নয় ইহারা যোগ্য লোকের সুযোগ-সুবিধা নষ্ট করিয়া সমস্যা জটিলতর করিয়া তোলে।

আমাদের ধারণা ভুল হইতে পারে, কিন্তু আমরা বলিতে বাধ্য যে, বর্ত্তমানে এদেশের বিষাক্ত আবহাওয়ায় অকেজো—যাহাকে ইংরেজীতে বলে unemployable—লোকের সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহা জাতির ভবিষ্যতের পক্ষে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি। সুতরাং ইহার প্রতিকার দৃঢ় চিত্তে ও মায়া-মমতার প্রশ্ন না তুলিয়া করিতে হইবে। না হইলে বাঙালী জাতি অচিরে ঘৃণ্য ও হেয় অন্নদাসে পরিণত হইবে। কেননা বর্ত্তমান জগতে কর্ম্মবিমুখ লোকের স্থান নাই।

দ্বিতীয় প্রশ্ন যোগ্য লোকের সুযোগ-সুবিধার অভাবে ব্যর্থতা। অযোগ্য ও অকেজো লোক "খুঁটি"র জোরে বা অন্যবিধ কারণে কাজ পায় অথচ যোগ্য লোকে পায় না, একথা এখন সাধারণ-ভাবে চলিত হইয়াছে। ইহারও প্রতিকার প্রয়োজন এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজন কার্য্যের ক্ষেত্রে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা। এই প্রসঙ্গে আমরা ১৪ই ভাদ্রের "নবসঙ্ঘ" হইতে নিম্নোক্ত মন্তব্য উদ্ধৃত করিলাম :

"কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্ট শিক্ষা-পরিকল্পনার সম্প্রসারণ ও সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত বেকার সমস্যার লঘুকরণ লক্ষ্য রাখিয়া সম্প্রতি ৮০,০০০ শিক্ষক নিয়োগ করার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। রাজ্য গবর্ন্মেণ্ট-গুলির সহিত আর্থিক ও অন্যবিধ সহযোগিতায় এই প্রস্তাব কার্য্যকরী করার ব্যবস্থা হইবে। আমরা ইহাও জানিয়া আনন্দিত হইয়াছি যে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ ভাবে পশ্চিমবঙ্গের জন্য ২০,০০০ শিক্ষক লইয়া সম্প্রসারণের পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন, তাহারও ব্যবস্থা অগ্রসর হইতেছে। জাতির শিক্ষা ও শিক্ষক-সমস্যার সমাধান-কল্পে এই চিন্তা, পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা প্রত্যেক শিক্ষানুরাগী ও দেশ-হিতকামী নর-নারীর মনে আশা ও আনন্দের সঞ্চার করিবে।

দেশে শিক্ষাবিস্তার হইতেছে; এই শিক্ষা যাহারা পাইতেছে ও পাইবে, তাহাদের শুধু শিক্ষার জন্যই শিক্ষা পাওয়া নহে, শিক্ষার মধ্য দিয়া জীবন ও জীবিকা সমস্যারও যথাযোগ্য প্রতিবিধান চাই। শিক্ষকের জীবিকাও জীবন-সংস্থানের অন্যতম উপায়। ইহা গবর্ন্মেণ্টের স্থায়ী সেবক বা কর্ম্মচারিগণের বৃত্তিরই মত মর্য্যাদায় ও উপার্জ্জনে তুল্যস্থানীয় হওয়া উচিত। দুঃখের বিষয়, শিক্ষকবৃত্তি এখনও ব্যাপক ও সাধারণ ভাবে এই তুল্য মর্য্যাদা দেশ বা রাষ্ট্র কাহারও নিকট পায় নাই। আমরা আশা করিব—শিক্ষাদপ্তরের কর্ত্তৃপক্ষ ও কর্ণধারগণ এই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াই তাঁহাদের পূর্ব্বোক্ত পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন এবং উহা কার্য্যে পরিণত হইলে দেশের শিক্ষাব্রতী তরুণগণ দলে দলে এই বিভাগে যোগদান করিয়া, মর্য্যাদা ও গৌরবের সহিত জাতিগঠনের সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এই কর্ত্তব্যভার গ্রহণ ও বহনে আকৃষ্ট হইবেন। যুগপৎ আহার ও ঔষধের ন্যায় এই শিক্ষাবৃত্তি যেন বিবেচিত হইতে পারে—ইহার চেয়ে পবিত্র ও শ্রদ্ধাযোগ্য কর্ম্মবৃত্তি আর নাই—এই মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীই আজ সর্ব্বত্র চাই। রাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থায় সেই শুভ নীতিই সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপালিত হউক—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।"

আমরা এই মন্তব্যের সমর্থন করিতেছি। শিক্ষক অসন্তুষ্ট বা অনুপযুক্ত হইলে ছাত্র অকেজো হওয়াই সম্ভব এবং দারিদ্র্যগ্রস্ত

শিক্ষক আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া ছাত্রকে নিয়মানুগত করিতে স্বভাবতঃই অসমর্থ হন। অন্য দিকে শিক্ষকের যোগ্যতার প্রশ্নও আছে।

কিন্তু স্কুল কলেজে আর কত লোকের জায়গা হইবে? প্রয়োজন—অন্যভাবে কাজের সংস্থান করা, যাহাতে পল্লীগ্রামে পর্যন্ত কাজ-কর্ম্মের একটা ব্যবস্থা হয়। এ বিষয়ে ২৯শে আগষ্টের "হরিজন পত্রিকা" "দি হিন্দু"র মত সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন:

"বর্ত্তমান বেকার সমস্যার কারণ দেখাইতে গিয়া কতক লোক বলিতেছেন যে, এই সমস্যা সমাধান করিবার মত মূলধন আমাদের হাতে নাই।

আর একটি অদ্ভুত কারণও উল্লেখ করা হয়; তাহা হইল এই যে, প্রতি বৎসর বেকারদের দলে ২০ লক্ষ বা ততোধিক ব্যক্তি বৃদ্ধি পাইতেছে। বোধ হয় আমাদের লোকসংখ্যার বার্ষিক বৃদ্ধি দেখিয়া এই কথা বলা হয়। তাহা হইলে কি কথা ইহাই যে, নবাগতকেরা আসিয়া বয়োবৃদ্ধদের স্থান অধিকার করিয়া তাহাদিগকে কর্মচ্যুত করিতেছে?

এই সকল কথায় ইহাই বুঝায় যে, সকলেই সমাধান খুঁজিতে গিয়া প্রশ্নটিকেই ঘুরাইয়া বলিতেছেন। সরল কথা হইল আমাদের হাতে বিনিয়োগ করিবার মত পুঁজি অল্পই অথচ প্রয়োজনীয় কাজে লাগাইবার মত লোক অসংখ্য রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় কোন পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে হইলে নিষ্ক্রিয় হাতগুলিকে কাজে লাগাইবার উপায় বাহির করা চাই। কেবল ঐ পথেই মূলধন বিনিয়োগ যথার্থ কার্য্যকরী হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রাজকর্ম্মসূচীতে এই নীতিকে স্বীকার করা হয় নাই। বর্ত্তমান বাস্তব অবস্থায় এই কথাটি সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। ১০ই জুলাই '৫৩ তারিখের 'দি হিন্দু' পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বেকার সমস্যার আলোচনায় সেই কথা ভালভাবে বলা হইয়াছে।"

'দি হিন্দু' বলিয়াছেন যে, ছোট ছোট স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান সারা দেশ ছড়াইয়া, ছোট ছোট অঞ্চলের স্থানীয় সঙ্গতি ও মানব-শ্রমের পরিমাণ বুঝিয়া গড়িয়া তুলিলে প্রকৃত সমস্যা পূরণ হইবে। এক লক্ষ টাকা মূলধনে দশ জনেরও অন্নের সংস্থান হইতে পারে, এক শত জনেরও হইতে পারে। স্থানীয় অবস্থা বুঝিয়া ঐরূপে ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আমরাও মনে করি ইহাই পথ। ইহাতে বাংলার পল্লীর পূর্ব্বশ্রী ফিরিয়া আসিবে ও দেশের ছেলে ঘরে ফিরিয়া মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়া পাইবে। তবে এইরূপ ব্যবস্থার জন্য অনেক চিন্তা ও প্রয়াসের আবশ্যক, শুধু বড় বড় টাকার অঙ্কে কিছু হইবে না। উদ্বাস্তুর বিষয়ে সে অভিজ্ঞতা ত পাওয়াই গিয়াছে।

জানা গিয়াছে যে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অবশিষ্ট কয়েক বৎসরে বেকার সমস্যা দূরীকরণার্থ ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ের একটি পরিকল্পনা ভারত-সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

এইরূপ অনুমান করা হইতেছে যে, বর্ত্তমানে পরিকল্পনা বহির্ভূত অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কাজে ঐ ৫০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে। সরকার দেশে লোকদের কর্ম্মে নিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য ইতি-মধ্যে পরিকল্পনা সংশোধনের অনুকূলে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কমিশন রাজ্যসরকারসমূহের নিকট লিখিত পত্রে দেশে বেকার সমস্যা দূরীকরণার্থ একটি এগার দফা কর্ম্মসূচীর বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

কলিকাতায় শান্তিশৃঙ্খলা

কলিকাতার অবস্থা ক্রমেই আশঙ্কাজনক হইতেছে। নি[illegible] দুইটি সংবাদের প্রথমটি আশাপ্রদ। বাঙালী মেয়েটির সাহসের প্র[illegible] আমরা করিতেছি। কিন্তু দ্বিতীয় সংবাদটি ততটা আশাপ্রদ ন[illegible]

দেশে অশান্তি ও দুর্নীতির প্রাবল্য যে ভাবে ঘটিতেছে তাহ[illegible] জাতির আশা-ভরসা ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। ইহার প্র[illegible]কার প্রয়োজন বলা বাহুল্য। জনমত না বদলাইলে তাহা সম্ভব ন[illegible]

"বেপরোয়া দুর্বৃত্তের দুই দুই বার গুলিবর্ষণ সত্ত্বেও বুধবার গি[illegible]পুর অঞ্চলে এক গৃহমধ্যে সম্ভ্রান্ত এক বাঙালী মহিলা—শ্রী[illegible] সান্ত্বনা মুখোপাধ্যায়—অসামান্য সাহসিকতার জন্য আত্মরক্ষায় সমর্থ[illegible] এবং দুরভিসন্ধিতে ব্যর্থ দুই জন দুর্বৃত্ত পলায়নে বাধ্য হয়।

গুলিতে আহত হইয়াও শ্রীমতী সান্ত্বনা যে তাহাদের দো[illegible] ফ্লাট হইতে এক তলা পর্য্যন্ত পলায়নপর সশস্ত্র দুর্বৃত্তের পশ্চাদ্ধা[illegible] করিয়াছিলেন সিঁড়ি-সংলগ্ন দেওয়ালে দেওয়ালে রক্তাক্ত বাম হা[illegible] ছাপ দেখিয়া তাহা অনুমান করা যায়।

আহতাবস্থায় শ্রীমতী সান্ত্বনাকে পোর্ট কমিশনার্স হাসপাতা[illegible] ভর্ত্তির পর তাঁহার মস্তিষ্কের কেশগুচ্ছে নাকি একটি ব্যবহৃত কার্তু[illegible] সিসা পাওয়া যায়। আরও প্রকাশ যে, অনুরূপ একটি ব্যব[illegible] কার্তুজ মুখোপাধ্যায়-পরিবারের যে ফ্লাটে দুর্বৃত্তেরা অনধিকার প্র[illegible] করিয়াছিল, উহার মেঝের পাওয়া যায়।

ঘটনাকালে মুখুজ্যে-দম্পতির পাঁচ বৎসর ও তিন বৎসর [illegible] দুইটি শিশু-সন্তান ছাড়া উক্ত ফ্লাটে কোন বয়স্ক ব্যক্তি ছিল [illegible] শ্রীমতী সান্ত্বনার স্বামী শ্রীসুধীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পোর্ট কমিশনা[illegible] চীফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের একজন ফোরম্যা[illegible] তিনি তখন কর্মস্থলে ছিলেন।"

দ্বিতীয় সংবাদে প্রকাশ,

"রিভলবার, ব্রেণগানে সুসজ্জিত এবং ট্রাউজার ও মুখোশ-পরি[illegible] একদল হানাদার শনিবার প্রথম রাত্রিতে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানা[illegible] রোডের এক অলঙ্কারের দোকান হইতে পঁচিশ-ত্রিশ হাজার টা[illegible] মূল্যের অলঙ্কার লুণ্ঠনের পর বোমা ও গুলী ছুঁড়িতে ছুঁড়ি[illegible] পলায়ন করে।

একখানি গাড়ী আক্রান্ত দোকান হইতে কিছু দূরে সুরেন্দ্র[illegible] ব্যানার্জ্জি রোডেই পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। পলায়নকা[illegible] উহারা এলোপাথারি গুলি ও বোমা নিক্ষেপ করিয়া পথচারী নিকটবর্ত্তী দোকানগুলির লোকজনকে সন্ত্রস্ত করিয়া তোলে ও ধূম্রাচ্ছন্ন আবহাওয়ার মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি রোড বরা[illegible] পূর্ব্ব দিকে চলিয়া যায়।

ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট ও সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি রোডের সংযোগস্থ তালতলা থানার অন্তর্গত এই ঘটনাস্থলে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত পুলিস কৌতূহলী জনতার ভীড় নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়। ঘটনার অনুম[illegible] দশ মিনিট পর পুলিস ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়।"

স্থানীয় লোকের বিবরণে প্রকাশ, অনুমান রাত্রি আট ঘটিক[illegible]

একটি কালো রঙের মোটরগাড়ী করিয়া পাঁচ-ছয় জন ট্রাউজার-পরা লোক ১০৫।৫ নং সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি রোডে অবস্থিত এক অলঙ্কারের দোকানের সম্মুখে উপস্থিত হয়। তাহাদের মুখে মুখোশ এবং হাতে রিভলবার অথবা ষ্টেনগান ছিল। দুই-তিন জন দোকানের অভ্যন্তরে যায়, এক জন দরজার বাহিরে পাহারা দিতে থাকে।"

চিনি

পশ্চিমবঙ্গে সম্প্রতি তিন মাসের জন্য চিনির উচ্চতম দর সাড়ে বার আনা সেরে আবদ্ধ রাখার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সম্পর্কে নানা জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। দর যে ভাবে চড়িতেছিল তাহাতে পূজায় এক টাকা সের উঠিবার আশঙ্কা ছিল। এ অনুমান কতটা প্রকৃত তাহা বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ-পরিচালিত "জ্ঞান ও বিজ্ঞানে"র আগষ্ট সংখ্যা, ৪৮৬ পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত মন্তব্যে বুঝা যায় :

"পশ্চিমবঙ্গে মাত্র একটি চিনির কল রয়েছে। এই চিনির কলে গড়ে প্রতি বৎসর মাত্র ৮ হাজার টন চিনি উৎপন্ন হয়ে থাকে। অথচ পশ্চিমবঙ্গের চাহিদা হচ্ছে বার্ষিক প্রায় ৫০,০০০ টন। সুতরাং পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যগুলির উৎপন্ন চিনির উপরেই পশ্চিমবঙ্গকে নির্ভর করতে হয়। তা ছাড়া বাংলাদেশে বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ রয়েছে। দুর্গাপূজা, কালীপূজা এবং অন্যান্য বিভিন্ন পূজা-পার্ব্বণে চিনির চাহিদা অতিমাত্রায় বেড়ে যায়। বর্ত্তমানে কলকাতার বাজারে ১১০ থেকে ১২০ আনা এবং ৫৫ টাকা পাইকারী দরে চিনি বিক্রী হচ্ছে। খুচরা মূল্য ৫৪,।৫৫ টাকার কম নয়।

"প্রকাশ যে, কেন্দ্রীয় সরকার বিদেশ থেকে এক লক্ষ টন চিনি আমদানীর সিদ্ধান্ত করেছেন। এতে পশ্চিমবঙ্গে চিনির মূল্য কতটা হ্রাস পাবে তদ্বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। কারণ কি পরিমাণ চিনি আমদানী হবে এবং আমদানীকৃত চিনির কতটা পশ্চিমবঙ্গের জন্যে বরাদ্দ হবে তা এখনও জানা যায় নি। চাহিদা-মাফিক চিনি যদি বণ্টিত না হয়, তা হলে অন্ততঃ পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা থেকেই যাবে।"

এই দর তিন মাস পরেও যাহাতে না বাড়ে তাহার চেষ্টাও হইতেছে। বোম্বাইএর শ্রীকিদোয়াইয়ের মন্তব্যে তাহা বুঝা যায়।

শ্রীকিদোয়াই বলেন, চিনির দর বর্ত্তমানে যাহা আছে, তাহা অপেক্ষা আর বাড়িবে না। বিদেশ হইতে আনা চিনি কলিকাতায় পৌঁছিয়া গিয়াছে। উহা এই মাসের শেষাশেষি বোম্বাই ও অন্যান্য রাজ্যে পৌঁছিয়া যাইবে। চিনির দর কিছু কমিবে বলিয়াই তিনি আশা করেন। বিদেশ হইতে অপরিশোধিত চিনি আমদানীর বিষয় বিবেচনা করা হইতেছে; উহার দর মণকরা ১৫৲ টাকার বেশী পড়িবে না।

বস্ত্রমূল্য

পূজায় যাহাতে পশ্চিম বাংলায় ধুতিকাপড় কিছু সস্তায় পাওয়া যায় তাহার চেষ্টা চলিতেছে। মাঝে ধুতির দর প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ বাড়িয়াছিল।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ৭ই সেপ্টেম্বর এক প্রেসনোটে প্রকাশ : টেক্সটাইল কমিশনার এই মর্ম্মে এক নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ এলাকার বাহিরে কোনও স্থানে ধুতি প্রেরণের জন্য পশ্চিমবঙ্গের মিল বা ব্যবসায়ীদিগকে কোন প্রকার পরিবহনের ছাড়পত্র দেওয়া হইবে না। সুতরাং ধুতি প্রেরণের ছাড়পত্রের জন্য কোন আবেদন গৃহীত হইবে না এবং ৮ই সেপ্টেম্বর হইতে পশ্চিমবঙ্গের টেক্সটাইল ডিরেক্টরেট উক্ত প্রকার ছাড়পত্র দিবেন না।

ভাষাভিত্তিক রাজ্য

ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের সপক্ষে বহু সমীচীন মত বহু বার ঘোষিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। কংগ্রেসও এ নীতির সমর্থন স্পষ্ট-ভাবে করিয়াছেন।

উহার বিপক্ষে একমাত্র কায়েমী স্বার্থ এবং বিষাক্ত প্রাদেশিক মনোভাব। যাহারা ভুক্তভোগী—যথা মানভূমের বাঙালী—তাঁহারাই জানেন উহা কতটা বিদ্বেষ ও হিংসা প্রসূত।

আমরা এই নূতন অন্ধ্র রাজ্য গঠনে আনন্দ জ্ঞাপন করিতেছি।

ডঃ কাটজুর প্রস্তাব যদি পরিহাস না হয়—তিনি নিজে বলিয়াছেন উহা ব্যঙ্গোক্তি নয়—তবে উহা যাচাই করিয়া দেখা উচিত। প্রথম দৃষ্টিতে উহা যতটা বিসদৃশ মনে হয়, একটু চিন্তার পরে ঠিক সেরূপ মনে হয় না। সাম্য ও মৈত্রীর পথে উহাকে একেবারে বর্জ্জনীয় বলা চলে না।

"১০শে আগষ্ট লোকসভায় সকল শ্রেণীর সদস্যের সমর্থন-সূচক ধ্বনির মধ্যে পার্লামেন্টের নিম্ন সভায় সংশোধিত অন্ধ্র বিল গৃহীত হয়।

মিঃ ফ্রাঙ্ক এন্টনী ছাড়া অন্যান্য সদস্যের বক্তৃতায় বিদায়ের সুর ধ্বনিত হয়। অন্ধ্র, মহীশূর ও তামিলনাদী সদস্যরা পরস্পরের প্রতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। মিঃ এন্টনির বক্তৃতায় সঙ্গতির অভাব পরিলক্ষিত হয়। গত নয় দিন যাবৎ সদস্যদের বক্তৃতায় যে বিদ্বেষ ও ঘৃণা প্রকাশ পায়, আজ শেষদিনে আনন্দময় পরিবেশের মধ্যে তাহার পরিসমাপ্তি ঘটে।

এই বিল অনুযায়ী ১লা অক্টোবর হইতে নূতন অন্ধ্র রাজ্য গঠিত হইবে। এই বিলে সকল দল সর্ব্বতোভাবে সন্তুষ্ট না হইলেও একটি বিরাট উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনে কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি অনুসারে রাজ্যগুলির সীমানা পুনর্নির্দ্ধারণের জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ডঃ কাটজু ঘোষণা করেন যে, ভাষাভিত্তিক রাজ্য-গঠন সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ ও এই বিষয়ে বিচার-বিবেচনার জন্য এই বৎসরেই সর্ব্ব-ভারতীয় সীমানা কমিশন গঠন করা হইবে এবং এই কমিশন বাংলার সীমানা পুনর্নির্দ্ধারণের বিষয়ও বিবেচনা করিবেন।

ডঃ কাটজু বলেন, কলিকাতাকে রাজধানী করিয়া বিহারের সহিত বাংলাকে যুক্ত করা যাইতে পারে।

প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি বাবু পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন ও

কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী অধ্যাপক এস. এন. আগরওয়াল বিলটি সমর্থন করেন। শ্রীআগরওয়াল বলেন যে, ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের জন্য অনশনের অস্ত্র প্রয়োগ করা গান্ধীবাদসম্মত নহে।

মিঃ জোয়াকিম আলভা (কংগ্রেস—বোম্বাই) বলেন যে, ভাষার ভিত্তিতে সীমানা পুনর্নির্দ্ধারিত হইলে মোট পনরটি রাজ্য গঠিত হইতে পারে, তাহার বেশী নয়। বর্ত্তমানে রাজ্যের সংখ্যা ২৭। ইহাতে ব্যয়ভারও হ্রাস পাইবে।

মিঃ ফ্রাঙ্ক এন্টনি ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনের দাবির তীব্র নিন্দা করেন। তিনি বলেন যে, রাজনৈতিক সুবিধাবাদ অথবা দুর্ব্বলতা বশতঃই সরকার এই দাবি মানিয়া লইয়াছেন। তাঁহার মতে ইহা সরকারের নির্বুদ্ধিতা নয়, সড়যন্ত্র এবং এই দাবি সংস্কৃতি হইতে উদ্ভূত নয়, ইহা রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক দাবি।

ডঃ লঙ্কাসুন্দরম বলেন, বিশাল অন্ধ্র রাজ্য গঠনের প্রাথমিক ব্যবস্থা গৃহীত হইতেছে বলিয়া তিনি গভীর সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ভারতের মাটির প্রতি মিঃ এন্টনির টান নাই বলিয়াই ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনের প্রস্তাবে এইরূপ ক্রুদ্ধ হইয়াছেন।"

কূপমণ্ডূক মনোবৃত্তি

আমরা নিম্নোক্ত সংবাদটির দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বাঙালী সারা ভারতে সর্ব্বপ্রথমে উদার সার্ব্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্ত্তন করে। আজ সারা ভারত অগ্রসর হইয়া চলিতেছে, কিন্তু বাঙালী ক্রমেই নিস্তেজ হইয়া কূপমণ্ডূকে পরিণত হইতে চলিয়াছে—সকল দিকে ও সকল ক্ষেত্রে। অদৃষ্টের কি পরিহাস!

আমরা নিজেদের মতবাদ, নিজেদের স্বার্থ লইয়া এতই মশগুল হইয়া আছি যে, সমস্ত দেশের মধ্যে আমাদের স্থান কোথায় পড়িয়া আছে তাহা ভাবিবারও সময় নাই।

"নয়াদিল্লী, ২২শে আগষ্ট—অদ্য অপরাহ্নে প্রধানমন্ত্রী জবাহরলাল নেহরু দিল্লীর প্রাচীনতম সাংস্কৃতিক মেলা—'ফুলবালো কী সৈর'-এর উদ্বোধন উপলক্ষে বলেন, বহির্বিশ্বের ঘটনাবলীর প্রতি উদাসীন হইয়া নিজেদের সামান্য ব্যাপার লইয়া আমরা মত্ত থাকি; আমাদের এই কূপমণ্ডূকতাই ভারতের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অবনতির মূল কারণ। যে রাষ্ট্র সকলের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সঙ্কীর্ণ মনোভাব লইয়া চলিয়াছে তাহার কোন দিন উন্নতি ও সমৃদ্ধি হয় নাই—ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

দিল্লী হইতে বার মাইল দূরে মেহেরৌলির সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক স্তম্ভের উত্তর পূর্ব্ব কোণে বিরাট উন্মুক্ত ক্ষেত্রে ফুলবালো কী সৈর (পুষ্পোৎসব) আরম্ভ হয়। প্রধানমন্ত্রীকে দেখিবার জন্য প্রায় এক লক্ষ লোক সমবেত হইয়াছিল।

১৪১ বৎসর পূর্ব্বে তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার দ্বিতীয় আকবরের প্রিয়তমা মহিষী মমতাজ মহলের পুত্র মির্জা জাহাঙ্গীরের মুক্তি দেন। এই উপলক্ষে একটি মেলা হইয়াছিল, তাহাতে মুসলমান ও হিন্দুরা যোগদান করে। দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রী শ্রীব্রহ্মপ্রকাশের উদ্যোগে এই মেলার পুনরায় প্রচলন হইল।"

উত্তরাধিকার কর

এই কর প্রথম দিকে যে ভাবে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল তাহাতে বাঙালী প্রমুখ দায়ভাগ ন্যায়ের অন্তর্গত পরিবারের উপর বিষম অবিচার হইতেছিল। অথচ নিম্নোক্ত সংশোধনে অনেক মিতাক্ষরা-ভুক্ত সদস্য বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। এমনই অদ্ভুত প্রাদেশিকতা অন্য প্রদেশে আছে:

"১০ই সেপ্টেম্বর—অ-হিন্দু যৌথ পরিবারের (মিতাক্ষরা আইন-বহির্ভূত) সম্পত্তির ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার কর ধার্য্যের ব্যাপারে অব্যাহতি দানের পরিমাণ ৭৫ হাজার টাকার পরিবর্ত্তে এক লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। অব্যাহতি দানের মাত্রা বৃদ্ধিকল্পে অদ্য লোকসভায় একটি সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপিত হয় এবং তাহা গৃহীত হয়।

অদ্য লোকসভায় উত্তরাধিকার কর বিলের আরও ২১টি অনুচ্ছেদ গৃহীত হইয়াছে। গতকল্য ৩৭ ক অনুচ্ছেদটি গ্রহণ স্থগিত ছিল; অদ্য তাহা গৃহীত হয়।"

কাশ্মীর

শেখ আবদুল্লার অপসারণে কাশ্মীরের উপর দিয়া যে ঝড় বহিয়া গিয়াছে, তাহার ঝাপটা পাকিস্থানেই লাগিয়াছে অধিক। ইহাতে মনে হয় শেখ আবদুল্লা ও তাঁহার সহচরদিগের কার্য্যকলাপে পাকিস্থানে কিছু নূতন প্রকার আশার সৃষ্টি হইয়াছিল। নিম্নলিখিত সংবাদগুলিতে তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়:

"শ্রীনগর, ৬ই সেপ্টেম্বর—পাকিস্থানী নেতৃবৃন্দ ও সংবাদপত্রসমূহ কাশ্মীর সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষতিকর তীব্র প্রচারকার্য চালাইবার ফলে কাশ্মীরের রাজনৈতিক মহলে বিশেষ বিরক্তি ও ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে বলিয়া প্রেস ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়ার সংবাদদাতা জানাইয়াছেন।

পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী গত মঙ্গলবার তাঁহার চলতি মাসের প্রথম বেতার-বক্তৃতায় বক্সী-সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা-প্রসঙ্গে উক্ত সরকার ভারত-সরকারের প্রচ্ছন্ন অনুমোদনক্রমে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, এইরূপ ইঙ্গিত দিয়া যে সকল উক্তি করিয়াছেন, কাশ্মীরের রাজনৈতিক মহল সেই সকল উক্তি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন যে, কাশ্মীরের মন্ত্রীসভার পরিবর্ত্তন একান্তভাবে কাশ্মীরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার; পাকিস্থানী প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন, কাশ্মীরের ঘটনাবলীতে নাকি পাকিস্থানের জনগণের ভারসাম্য বা স্থৈর্য্য ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে; কিন্তু কাশ্মীরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে পাকিস্থানী নেতৃগণ ও পত্রিকাসমূহ ভারতের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লিপ্ত থাকার যে সকল অভিযোগ করিতেছেন, তাহার কোন সঙ্গত কারণই থাকিতে পারে না।

এতৎপ্রসঙ্গে কাশ্মীরী রাজনৈতিক মহল গত ১০ই আগষ্ট ভারতীয় লোকসভায় কাশ্মীর সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী শ্রীজবাহরলাল নেহরুর বিবৃতির উল্লেখ করিয়া বলেন, নেহরুজী বলিয়াছিলেন যে, ভারতীয় সৈন্যগণ কাশ্মীরের ব্যাপারে কোনভাবে লিপ্ত হয় নাই। গত ২০শে আগষ্ট নয়াদিল্লীতে সাংবাদিক সম্মেলনে পাকিস্থানের

প্রধানমন্ত্রী জনাব মহম্মদ আলীও শ্রীনেহরুর এই বিবৃতি সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন যে, শেখ আব্দুল্লার পদচ্যুতি ও গ্রেপ্তারের পরবর্তী ব্যাপারসমূহে কাশ্মীরে ভারতীয় সৈন্যগণ কোন ভাবে লিপ্ত হয় নাই।

কাশ্মীরের উপরোক্ত রাজনৈতিক মহল আরও বলেন, কাশ্মীরের নব-প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে স্নায়ু-যুদ্ধের অপর একটি দিক হইতেছে আজাদ কাশ্মীর নেতৃবৃন্দের তৎপরতায় তথাকথিত "কাশ্মীর মুক্তি ফ্রন্ট" গঠন। কিন্তু আজাদ কাশ্মীর নেতাদের কোন ভীতি প্রদর্শন বা মিথ্যা প্রচার ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে পরিপূরকরূপে পাকিস্থানী বেতারের যে কোন অপপ্রচারই নব-গঠিত কাশ্মীরের জনগণের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করিতে পারিবে না।

করাচী, ৮ই সেপ্টেম্বর—পাকিস্থানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার মহম্মদ জাফরুল্লা "টাইমস অব করাচী"র সংবাদদাতার সহিত এক সাক্ষাৎকারে বলিয়াছেন যে, অ্যাডমিরাল নিমিৎসের পদত্যাগের সংবাদ সত্য হইলে তিনি সত্যসত্যই গভীরভাবে "মর্মাহত হইবেন।" কারণ, নিমিৎসের পদত্যাগ কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের ব্যাপারেই যে শুধু তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে তাহা নহে—নিমিৎসের পদত্যাগ এমন ধারণাও সৃষ্টি করিতে পারে যে, নিমিৎস পদত্যাগ করেন নাই—তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইয়াছে।

স্যার জাফরুল্লা আশা করেন যে, নিমিৎসের পদত্যাগ কোন কোন মহলের একান্ত অভিপ্রেত হইলেও ইহা গুজব বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে।

'টাইমস অব করাচী' পত্রিকাটি একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে স্বস্তি পরিষদ যাহা কিছু করিয়াছে যুক্তরাষ্ট্র এই সময়ে এডমিরাল নিমিৎসকে প্রত্যাহার করিয়া লইয়া তাহা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে বলিয়া যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছে। 'পশ্চাতে ছুরিকাঘাত' এই শিরোনামায় এই পত্রিকা লিখিয়াছেন যে, নিমিৎসকে প্রত্যাহার করিয়া লইয়া আমেরিকা ভারতকে সন্তুষ্ট করিয়াছে এবং প্রকারান্তরে পাকিস্থানকে চরম আঘাত হানিয়াছে। পাকিস্থানের বন্ধু বলিয়া জ্ঞাত যুক্তরাষ্ট্র যাহা করিয়াছে তাহা হইতে বুঝা যায়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাকিস্থানের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় এবং কূটনীতির দিক হইতে তাঁহারা কিরূপ ব্যর্থ হইয়াছেন। এডমিরাল নিমিৎসকে প্রত্যাহারের অর্থ ভারত কাশ্মীর প্রশ্ন সম্পর্কে পাকিস্থানকে রাষ্ট্রসঙ্ঘ হইতে বহিষ্কৃত করিতে যেরূপ আগ্রহান্বিত, যুক্তরাষ্ট্র তাহা অপেক্ষা কম নয়। এই প্রবন্ধে আরও বলা হইয়াছে যে, পাকিস্থান স্বস্তি পরিষদে কাশ্মীর প্রশ্নের মীমাংসার দাবী অব্যাহত রাখিবে, তবে মার্কিন মনোভাব হইতে বুঝা যায় যে, অগ্রগতির কোন আশা নাই। হায়দরাবাদ এবং জুনাগড় প্রশ্নের মতই কাশ্মীরও এখন শুধু স্বস্তি পরিষদের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্তই থাকিবে।

এই বিষয়ে সাপ্তাহিক "নিশান" মন্তব্য করিয়াছেন :

"হঠাৎ খবর এসেছে, ইউনো কর্তৃক নির্বাচিত (যদিও ভারত তা কোনও দিন মেনে নেয়নি) কাশ্মীরের গণভোট-নিয়ামক শ্রীযুক্ত এডমিরাল নিমিৎস সাহেব পদত্যাগ করেছেন। মজাটা মন্দ নয়। যে পদটা সৃষ্টিই হয় নি, এবং যাতে চাকরীই দেওয়া হয় নি, সে পদ ত্যাগ করলেন নিমিৎস্।

"কাশ্মীরের আদি কথায় ফিরে যাওয়া যাক্। ইংরেজ কয়েকজন সেনাপতি, যারা পাকিস্থানে চাকরী করত আর ঘাঁটী গেড়েছিল, তাদের প্ররোচনায় আর নেতৃত্বে পাকিস্থান বাহিনী হানাদারদের বেনামে হঠাৎ কাশ্মীর আক্রমণ করে বসল—তারা শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে এসে যখন শ্রীনগর প্রায় গ্রাস করে ফেলে তখন মহারাজা যোগ দিলেন ভারতের সঙ্গে। ভারতের ইংরেজ বড়লাট, যিনি অকিনলেক প্রভৃতির সঙ্গে গোপনে যুক্ত ছিলেন এ বিষয়ে, তিনি নেহেরুকে দিয়ে প্রচার করলেন যে, মহারাজার ভারতভুক্তিই শেষ সিদ্ধান্ত নয়। সাময়িক ভারতভুক্তি বলে গণ্য করা হবে একে। হানাদারমুক্ত শান্ত কাশ্মীরে গণভোট নিয়ে সেখানকার জনসাধারণের মতামতেই পাকাপাকি ভারতভুক্তি স্থির হবে।

"তার পর গঙ্গার উপর দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। পাকিস্থানের উকিল-মুহুরী ইংরেজ-আমেরিকার তদারকে ভারতের একাংশ এখনও পাকিস্থানের দখলে। নানারকম ফাঁকিফন্দি করেও যখন কাশ্মীর গ্রাস করা গেল না, তখন গণভোট-নিয়ামক হিসেবে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল নিমিৎসকে।

"বেগতিক দেখে নিমিৎস সাহেব কি এখন পদত্যাগ করলেন? একি তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছার দরুনই হয়েছে? তিনি কি চাকরীতে থেকে আমেরিকার সরকারী নীতির বিরোধিতা করতে পারেন? তাঁর পদত্যাগের পেছনে কি আমেরিকার সরকারী কোন ইঙ্গিত নেই?"

ভারতে সরকারী খরচের উপর নিয়ন্ত্রণ

কিছুদিন যাবৎ এষ্টিমেট কমিটি, পাবলিক একাউন্টস কমিটি এবং গবর্মেণ্ট অডিট অফিসাররা সরকারী যথেচ্ছা খরচ ও বেআইনী খরচের প্রতি গবর্মেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। সরকারী বিভাগগুলি পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকা সত্ত্বেও যথেচ্ছ পরিমাণে খরচ করিয়া যায়। আইন-পরিষদের বিনা অনুমোদনে ভারতীয় সঞ্চিত নিধি (Consolidated Fund) হইতে কোন খরচ করিবার নিয়ম নাই। কেন্দ্রীয় সরকারের যাহা কিছু খরচ এই সঞ্চিত নিধি হইতে করিতে হইবে। ভারতীয় রাষ্ট্রতন্ত্রের ১১৪ ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের খরচের উপর কেন্দ্রীয় আইন-পরিষদের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে। সেইরূপ রাষ্ট্রতন্ত্রের ২৬৬ ধারা অনুসারে প্রাদেশিক খরচের উপর প্রাদেশিক আইন-পরিষদের সর্বময় ক্ষমতা আছে। পাবলিক একাউন্টস কমিটির মতে রাষ্ট্রতন্ত্রের এই দুইটি ধারাকে সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী হইতে হইলে ভারতীয় শাসনযন্ত্রের কিছু পরিবর্তনসাধন প্রয়োজন। অর্থনৈতিক শাসন-কাঠামো পুরনো প্রথা অনুসরণ করিয়া আসিতেছে, তাই নূতন আইন সফল হইতে পারিতেছে না।

বর্ত্তমান অর্থনৈতিক শাসন-কাঠামোর ব্যবস্থা অনুসারে ভারতবর্ষে প্রায় তিন শত ট্রেজারী আছে, প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়া এবং প্রত্যেক ট্রেজারীর অধীনে একটি কি দুইটি করিয়া সাবট্রেজারী আছে। এই ট্রেজারী এবং সাবট্রেজারীগুলিতে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের আয় ও ব্যয়খাতে জমা ও খরচ করা হয়। এই ক্ষেত্রে গণ্ডগোল হওয়া খুবই স্বাভাবিক এবং সমস্ত ট্রেজারীর জমা ও খরচের উপর কড়া নজর রাখা খুবই দুরূহ ব্যাপার। বিলাতের ব্যবস্থা কিন্তু অন্যরকম। সেখানে ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের মাধ্যমে সমস্ত সরকারী খরচ হয়। তবে ইংলণ্ড অপেক্ষাকৃত অনেক ছোট দেশ বলিয়াই হয়ত এই ব্যবস্থা সম্ভবপর হইয়াছে। ভারতের মত বিরাট দেশে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মত একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সারা ভারতবর্ষের সরকারী আয় ব্যয়ের দায়িত্ব বহন করা দুরূহ ব্যাপার হইবে সন্দেহ নাই। তবে এদেশে ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে অনেক ট্রেজারীর কাজ করানো হয়। যে সকল জায়গায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শাখা নাই, সেখানে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের শাখার দ্বারা কাজ করানো হয়। সরকারী খরচের উপর নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করা বিভিন্ন সরকারী বিভাগগুলির প্রাথমিক দায়িত্ব। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে সরকারী বিভাগগুলি এই নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করিতেছে না, ফলে সরকারী খরচের উপর সংশ্লিষ্ট বিভাগের ক্ষমতা প্রায় নাই বলিলেই চলে—এই কথা কম্পট্রোলার এবং অডিটর-জেনারেল, পাবলিক একাউণ্টস কমিটির নিকট বলিয়াছেন।

বর্ত্তমান প্রথা অনুসারে প্রাদেশিক সরকারের খরচের হিসাব কম্পট্রোলার এবং অডিটর-জেনারেল রক্ষা করেন। সাম্প্রতিক ব্যবস্থা অনুসারে ইহা করা হইতেছে। শেষকালে প্রদেশগুলিকে বলা হইবে যে, তাহাদের খরচের হিসাবরক্ষার দায়িত্ব তাহাদের নিজেদের হাতে লইতে হইবে।

ভারতীয় রাষ্ট্রতন্ত্রের সপ্তম অনুসূচীর প্রথম বিষয়ে আছে যে, কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের হিসাব পরীক্ষা করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। একই বিভাগের উপর হিসাব রক্ষা করা এবং হিসাব পরীক্ষা করার দায়িত্ব আছে অর্থাৎ ভারতীয় অডিট ডিপার্টমেণ্টের উপর এই দুটি দায়িত্ব যুক্তভাবে ন্যস্ত আছে। সাইমন কমিশন এই ব্যবস্থাকে অযৌক্তিক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, ইহা ১৯২০ সনের আগেকার কেন্দ্রীভূত শাসন-ব্যবস্থার অবশিষ্টাংশ। দুঃখের বিষয়, এ ব্যবস্থা বর্ত্তমানকাল অবধি চলিয়া আসিতেছে এবং নিরবচ্ছিন্নতার অজুহাতে ইহার পরিবর্ত্তন সাধন করা হয় নাই।

বিলাতে সরকারী খরচ তিন রকম উপায়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রথমতঃ, প্রত্যেক মন্ত্রী-বিভাগের নিজস্ব একাউণ্টিং অফিসার আছেন যিনি সেই বিভাগের সমস্ত দেয় বিল পাস করেন এবং পেমাষ্টার জেনারেলের উপর টাকা দেওয়ার আদেশ দেন। এই একাউণ্টিং অফিসার দেখেন যে, মোট যে পরিমাণ টাকা দেওয়া হইতেছে তাহা যেন আইন-পরিষদের অনুমোদন ছাড়াইয়া না যায়। দ্বিতীয়তঃ, এষ্টিমেটস কমিটি এবং পাবলিক একাউণ্টস কমিটি প্রত্যেক বিভাগের খরচের হিসাব আইন-পরিষদে যাওয়ার পূর্ব্বে পরীক্ষা করিয়া দেন। অবশ্য গবর্মেণ্ট বিভাগও একবার পরীক্ষা করেন। বিলাতে এষ্টিমেটস কমিটির চেয়ারম্যান হইতেছেন আইন-পরিষদের বিপক্ষ দলের নেতা। প্রকৃত খরচ পাবলিক একাউণ্টস কমিটি বিশদভাবে পরীক্ষা করেন এবং যাহারা খরচের জন্য দায়ী তাঁহারা দেখেন যাহাতে এই কমিটির বিরাগভাজন না হন। তৃতীয়তঃ, এবং শেষকালে কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল হিসাব পরীক্ষা করেন।

ভারতীয় রাষ্ট্রতন্ত্রে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে সবকিছুই বিলাতের অনুকরণ করা হইয়াছে, কিন্তু আসল জিনিসটিই বাদ গিয়াছে। এদেশেও এষ্টিমেটস কমিটি, পাবলিক একাউণ্টস কমিটি ও কম্পট্রোলার এবং অডিটর-জেনারেল আছেন। কিন্তু যাহা নাই তাহা হইতেছে হিসাব রক্ষা (Acc unt) এবং হিসাব পরীক্ষার (Audit) মধ্যে ব্যবধান। এই দুইটি কাজের বিভিন্নতা রক্ষা করা অবশ্য-কর্ত্তব্য—যেমন কার্য্যপালিকা (exe utive) এবং ন্যায়পালিকার (ju liciary) মধ্যে ব্যবধান অবশ্যম্ভাবী। ইংলণ্ডে ১৯৫১ সনের অক্টোবর মাসে কমনওয়েলথ অডিটর জেনারেলদের যে কনফারেন্স হয় তাহাতে স্বীকৃত হয় যে, অডিটর জেনারেল কোন টাকা প্রদান করিবেন না কিংবা কোন হিসাব রক্ষা করিবেন না। তাঁহার কাজ হিসাব পরীক্ষা করা। এই সম্বন্ধে ভারতীয় কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল পাবলিক একাউণ্টস কমিটির কাছে তাঁহার রিপোর্টে যে অভিমত দিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে যদি সত্যকার ভাবে সরকারী খরচের উপর নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করিতে হয় তাহা হইলে ইংলণ্ডের মত এদেশেও প্রত্যেক মন্ত্রী বিভাগের সঙ্গে হিসাবরক্ষক অফিসার রাখিতে হইবে যাহাদের মাধ্যমে সেই সেই মন্ত্রী-বিভাগে খরচ কেন্দ্রীভূত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে। এই ব্যবস্থার ফলে ভারতের প্রদেশগুলিকে নিজেদের হিসাব রক্ষার দায়িত্ব নিজেদের হাতে লইতে হইবে—বর্ত্তমানে এ দায়িত্ব কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেলের উপর ন্যস্ত আছে। অধিকন্তু বর্ত্তমানের ব্যবস্থা অনুসারে হিসাব রক্ষা ও হিসাব পরীক্ষার দায়িত্ব একত্রিত ভাবে একই ডিপার্টমেণ্টের উপর ন্যস্ত আছে। ইহা অত্যন্ত অযৌক্তিক ও দূষণীয়। ইহার পরিবর্ত্তন সাধন প্রয়োজন।

পাবলিক একাউণ্টস কমিটি এই অভিমত সমর্থন করিয়াছেন। কমিটি বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান ব্যবস্থা অনুসারে বিভিন্ন বিভাগগুলির নিজেদের খরচের উপর কর্ত্তৃত্ব প্রায় নাই বলিলেই চলে এবং আইন-পরিষদের কাছে তাঁহাদের দায়িত্বের সত্যকার কার্য্যকারিতা নাই। বাজেট অনুমোদনের মধ্যে খরচ সীমাবদ্ধ রাখার জন্য ডিপার্টমেণ্টগুলি পার্লামেণ্টের নিকট মন্ত্রী-পরিষদের মাধ্যমে দায়ী। বর্ত্তমান ব্যবস্থার আশু পরিবর্ত্তন সাধনের জন্য কমিটি তাগিদ দিয়াছেন।

১৯২৪ সনে তদানীন্তন ভারত-সরকার উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত

প্রদেশে, উত্তরপ্রদেশে, রেলওয়ে বিভাগে ও কেন্দ্রীয় কয়েকটি বিভাগে হিসাব রক্ষা ও হিসাব পরীক্ষার ব্যবস্থা পৃথক করিয়া দেন। ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে দেশরক্ষা বিভাগেও এ ব্যবস্থা প্রচলন করা হয়। কিন্তু ১৯৩০-৩১ সনে মিতব্যয়িতার ওজুহাতে দেশরক্ষা ও রেলওয়ে বিভাগ ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে এবং প্রদেশগুলিতেও এ ব্যবস্থা রদ করিয়া দেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্তের দ্বারা খরচ বাঁচানোর পরিমাণ অত্যন্ত নগণ্য বলিলেও চলে—যথা, উত্তরপ্রদেশ গবর্মেণ্টের খরচ বাঁচিত মোট সাড়ে তিন লক্ষ টাকার মত। তদানীন্তন ভারত-সচিব এই ব্যবস্থা রদ হওয়াতে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। যে সংশোধন প্রচলিত হইয়াছিল এবং মিতব্যয়িতার ওজুহাতে পরে রহিত হইয়া যায়, বর্ত্তমানে সরকারী খরচের মিতব্যয়িতার জন্য আবার সেই ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করার জন্য ব্যবস্থা করা হইতেছে। আজ ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে, মিতব্যয়িতার ওজুহাতে হিসাব রক্ষা এবং হিসাব পরীক্ষা করার ব্যবস্থা এক করা অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে।

নূতন ব্যবস্থায় এই দুইটি দায়িত্ব ভিন্ন করিয়া দেওয়া উচিত, তাহাতে প্রথম কিছু খরচ হইবে ঠিকই, কিন্তু সাকুল্যে সরকারী খরচের মিতব্যয়িতা হইবে। নূতন ব্যবস্থা অনুসারে প্রদেশগুলিকে তাহাদের নিজেদের সরকারী খরচের দায়িত্ব নিজেদের উপর লইতে হইবে।

ইদানীং কোনও কোনও সরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে "প্রাইভেট লিমিটেড" কোম্পানীতে পরিণত করা হইয়াছে, যেমন সিন্দ্রী সারের কারখানা। কম্পট্রোলার এবং অডিটর জেনারেল তাঁহার রিপোর্টে এইরূপ ব্যবসাকে ভারতীয় কোম্পানী আইনের উপর প্রতারণা মাত্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, কারণ তাঁহার মতে ভারতীয় "সঞ্চিত নিধি" হইতে টাকা লইয়া এইরূপ প্রতিষ্ঠানের জন্য খরচ করা অত্যন্ত বেআইনী—আইনতঃ ভারতীয় প্রেসিডেণ্ট কিংবা তাঁহার মনোনীত ব্যক্তি অংশীদার হইতে পারেন না। ইঁহাদের যখন নিজস্ব কোন স্বার্থ এই সকল প্রতিষ্ঠানে থাকিতে পারে না, তখন তাঁহারা অংশীদার হিসাবে যোগ দিলেও সত্যকার কোম্পানী গঠিত হয় না। আইনের খাতিরে ভারতীয় আইন-পরিষদ দ্বারা যথোচিত আইন পাস করাইয়া লওয়া উচিত যাহাতে "সঞ্চিত নিধি" হইতে টাকা সরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য লওয়া যাইতে পারে।

এই সম্বন্ধে আর একটি আপত্তিজনক ব্যাপার আছে। এই সকল সরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টরবর্গ নিজেরাই অডিটর নিযুক্ত করেন, তাহাতে ইঁহাদের সত্যকার আর্থিক অবস্থা সম্যক্ জানা যায় না। এই সকল সরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানের হিসাব পরীক্ষা করিবার জন্য কম্পট্রোলার এবং অডিটর-জেনারেলের "স্বাভাবিক" ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন, অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করিলেই ইঁহাদের খাতাপত্র পরীক্ষা করিতে পারিবেন। পাবলিক একাউণ্টস কমিটির মাধ্যমে পার্লামেণ্ট ইঁহাদের খরচের হিসাব যথোচিতভাবে তদারক এবং নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন না।

পশ্চিমবঙ্গে জনসাধারণের জীবিকার্জ্জনের নমুনা

সাম্প্রতিক (১৯৫১ সনে) লোকগণনায় পশ্চিমবঙ্গে জনসাধারণের জীবনযাপনের যে চিত্র উদ্ঘাটিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গে মোট কৃষিজীবীর সংখ্যা ১৪,১৯৫,১৬১ জন; তন্মধ্যে ৭,২৬৯,২০৩ জন পুরুষ এবং ৬,৯২৫,৯৫৮ নারী। ইঁহাদের মধ্যে ৩,২৬৭,৮৭০ জন পুরুষ ও ৪৩০,৭৪০ জন নারী আত্মনির্ভরশীল; এবং ৩,৬০৬,৩০৯ জন পুরুষ ও ৬,৩০১,৭৪২ জন নারী পরনির্ভরশীল ও কোনরূপ উপার্জ্জন করেন না। উপার্জ্জনকারী পোষ্যের সংখ্যা পুরুষ ৩৯৯,০২৪ এবং নারী ১৯৩,৪৭৬।

জমি আছে এবং প্রধানতঃ নিজেদের জমি চাষ করেন এরূপ কৃষকের সংখ্যা: পুরুষ ৪,০৬৬,৮৩৮ এবং নারী ৩,৯৫৬,৮৫৩। ইঁহাদের মধ্যে ১,৬৬৫,৮৯৩ জন পুরুষ এবং ২০৫,৫৯০ নারী আত্মনির্ভরশীল, ২২৯,১৪২ পুরুষ এবং ৯৮,২৫০ নারী উপার্জ্জনকারী পোষ্য এবং ২,১৭১,৮৬২ জন পুরুষ ও ৩,৬৫৩,০১৯ নারী কোনরূপ উপার্জ্জন করেন না এবং সম্পূর্ণরূপে পরনির্ভরশীল।

কৃষিজীবীদের মধ্যে যাঁহারা সম্পূর্ণরূপে ভূমিহীন বা প্রধানতঃ ভূমিহীন তাঁহাদের মধ্যে ১,৫২১,৫৩২ জন পুরুষ এবং ১,৪৫৮,৮৭০ জন নারী, এবং ক্ষেতমজুর ও তাহাদের পোষ্যদের মধ্যে ১,৬০৫,৬৮০ জন পুরুষ এবং ১,৪৫৮,২০১ জন নারী।

যাঁহারা খাজনা-ভোগী এবং যে সকল জমির মালিক নিজে চাষ করেন না তাঁহাদের সংখ্যা পুরুষ ৭৫,০৯৩ এবং নারী ৭৪,০২৮।

অকৃষিজীবীদের মধ্যে যাঁহারা বাণিজ্য, যানবাহন এবং কৃষি ভিন্ন অন্য উৎপাদনে নিযুক্ত আছেন তাঁহাদের মোট সংখ্যা ১০,৬১৫,১৪৭। তাঁহাদের মধ্যে ৬,০৭৬,২৩৮ জন পুরুষ এবং ৪,৫৩৮,৯০৯ জন নারী। ইঁহাদের মধ্যে আবার ৩,৫১৩,০১৮ জন পুরুষ এবং ৬০৯,১২২ জন নারী আত্মনির্ভরশীল।

কৃষি ভিন্ন অন্যরূপ উৎপাদনকার্য্যে নিযুক্ত আছেন এইরূপ লোকের সংখ্যা পুরুষ ২,১১৬,৪৭১ এবং নারী ১,৬৩৪,৮২৯। তাঁহাদের মধ্যে ১,৩৪৫,০৯২ জন পুরুষ এবং ৩২০,৫৮৩ জন নারী আত্মনির্ভরশীল।

বাণিজ্যে নিযুক্ত পুরুষের সংখ্যা ১,৩২৩,৯১১ এবং নারীর সংখ্যা ৯৮১,৩৩৮। পুরুষদের মধ্যে আত্মনির্ভরশীলের সংখ্যা ৭২১,১২৭ এবং নারীর মধ্যে ৫৩,৬৮৩।

যানবাহনে নিযুক্ত আছেন ৪৮০,৫৭৯ জন পুরুষ এবং ২৭৫,৭১৮ জন নারী। ইঁহাদের মধ্যে আত্মনির্ভরশীলের সংখ্যা পুরুষ ৩১৮,৮৩৬ এবং নারী ৭,২১৮।

উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগ হইতে বাদ পড়িয়াছেন এইরূপ লোকের মধ্যে আছেন ২,৩৮৯,২৭৭ জন পুরুষ এবং ১,৬৪৬,৯৬৪ জন নারী। ইঁহাদের মধ্যে ১,১২৭,৯৬৩ জন পুরুষ এবং ২২৭,৬৩২ জন নারী আত্মনির্ভরশীল।

ভূমি-সংরক্ষণে বৃক্ষের ভূমিকা

ডঃ এ. টি. সেন ইংরেজীতে প্রকাশিত "সাপ্তাহিক পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা"য় মৃত্তিকা-সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে লিখিতেছেন যে, আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে ভূপৃষ্ঠের মাত্র এক-চতুর্থাংশ স্থলভাগ। যাহাতে সমুদ্র আসিয়া তাহা গ্রাস করিয়া না ফেলে সেই দিকে আমাদের সচেষ্ট হইতে হইবে। সেইজন্যই মৃত্তিকা-সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

এই মৃত্তিকা-সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বৃক্ষরাজির ভূমিকা অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ। অতীতে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া যথেচ্ছ ভাবে বৃক্ষের ধ্বংস সাধনের ফলে বন্যা এবং ভূমিপতনের সংখ্যা ও তীব্রতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বন্যা এবং ভূমিপতন আকস্মিকতায় সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; কিন্তু অপরিণামদর্শীর ন্যায় বৃক্ষ কর্তনের ফলে আমরা যে আর এক মহাবিপদের সম্মুখীন হইবার পথে সে সম্বন্ধে আমরা তত সচেতন নহি।

বৃক্ষের অপসারণের ফলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হয় অল্প; ফলে মাটির আর্দ্রতা হ্রাস পাইয়া উর্ব্বরতার লাঘব ঘটে এবং চাষের জন্য অধিকতর জমির প্রয়োজন হওয়ায় বৃহত্তর ক্ষেত্র হইতে বৃক্ষের অপসারণ ঘটে। এই প্রক্রিয়ায় শস্যশ্যামলা ভূমি মরুভূমিতে পরিণত হয়। অপরিকল্পিত বৃক্ষোৎপাটনের ফল কিরূপ হইতে পারে সাহারা, আরব, গোবী এবং রাজপুতানার মরুভূমি তাহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। সাম্প্রতিক ইতিহাসে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যভাগে "ধূলিপাত্র" (dust bowl) প্রভৃতি মরুভূমি এলাকার সৃষ্টি হইতে অপরিণামদর্শীর ন্যায় উদ্ভিজ্জের ধ্বংসসাধনের কুফল বুঝিতে পারা যায়।

মাত্র ছয় বৎসর পূর্ব্বে জনৈক বৈজ্ঞানিক এই বলিয়া সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন যে, রাজপুতানা মরুভূমি বার্ষিক অর্দ্ধ মাইল হারে উত্তরপ্রদেশের দিকে ধাবিত হইতেছে। তথ্যঘটিত অসম্পূর্ণতার জন্য তাঁহার পর্য্যবেক্ষণে ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এই সাবধান-বাণীর ফলে এ সমস্যার প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। প্রকাশ, এক বৃক্ষবেষ্টনী সৃষ্টি করিয়া মরুভূমির বিস্তৃতিকে প্রতিরোধ করিবার প্রয়াস চলিতেছে।

মৃত্তিকা-সংরক্ষণের সহিত অঙ্গাঙ্গীরূপে জড়িত মৃত্তিকার উন্নতি-সাধনের প্রশ্ন। অভিজ্ঞতালব্ধ ফল হইতে জানা যায় যে, গাছের পাতা এবং গোবর হইতে প্রস্তুত সার প্রতি বৎসর জমিতে ছড়াইলে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য জমির উর্ব্বরতা অক্ষুণ্ণ থাকে; আমাদের কৃষকেরা একথা জানেন, কিন্তু অর্থের অভাবে তাঁহারা পাতা এবং গোবর জ্বালানী রূপে ব্যবহার করিতে বাধ্য হন। ফলে আমাদের ভূমির উর্ব্বরতাশক্তি প্রভূত পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। অতীতে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া গাছ কাটার কুফল আমরা বর্তমানে ভোগ করিতেছি। অনুমান করা যায় যে, আমাদের দেশের আয়তনের শতকরা ২০ ভাগ বৃক্ষাচ্ছাদিত থাকিলে আমাদের জ্বালানী, কাঠ এবং মৃত্তিকা-সংরক্ষণ ত্রিবিধ কার্য্যই সুসম্পন্ন হইতে পারে।

এদেশে বৃক্ষ-রোপণ উৎসব এখন বাৎসরিক অনুষ্ঠানে দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এই বৃক্ষ-রোপণ হইতেছে ভুল ক্ষেত্রে। পুকুরের পাড়, ডাঙ্গা জমি, খোয়াইয়ের দুই পাশ, এই সকল স্থলেই বৃক্ষ-রোপণ হওয়া উচিত। বৃক্ষও হইবে এইরূপ যে তাহার কিছু অংশ দ্রুত বাড়িবে এবং বহুদূর শিকড় ছড়াইবে, যাহাতে জ্বালানী বা তক্তার কাঠ শীঘ্র পাওয়া যায় ও জমিও ক্ষয় হইতে বাঁচে এবং কিছু হইবে এইরূপ যে তাহার ফল, পাতা বা ছাল মানুষ ও গৃহপালিত পশুর ব্যবহারে আসে। প্রাকৃতিক শোভা বৃদ্ধির জন্য ফুলের বা পাতাবাহারের গাছ শহরের পথে ঘাটে বা উদ্যানে দেওয়া যাইতে পারে। এ বিষয়ে বনবিভাগের পরামর্শ লওয়া প্রয়োজন।

বৃক্ষ-রোপণ অপেক্ষা বৃক্ষ-রক্ষণ আরও প্রয়োজন। সে বিষয়ে এদেশে দৃষ্টি দেওয়া হয় না। উত্তরপ্রদেশে অনেক গ্রামে আমরা পোষ্টার দেখিয়াছি "হরা পেড় কাটনা অওর অপনা পেট কাটনা একহি হায়" অর্থাৎ "সবুজ গাছ কাটা এবং নিজের পেটকাটা একই কথা।" অনুরূপ উপদেশ এখানকারও গ্রামে গ্রামে ছড়ান দরকার।

ভারতের খাদ্য-সমস্যা

দিল্লী বেতার-কেন্দ্র হইতে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী ডঃ পাঞ্জাবরাও দেশমুখ বলেন: আমরা খাদ্য-সমস্যার মোড় ফিরাইতে সক্ষম হইয়াছি। দেশের অধিকাংশ অঞ্চলেই আজ আর দৈনন্দিন খাদ্য-শস্যের জন্য রেশন দোকানের সম্মুখে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়াইয়া প্রতীক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই। প্রত্যেকে নিজের পছন্দমত খাদ্যশস্য ক্রয় করিতে পারে। চাষীও তাহার উৎপন্ন শস্য রাজ্যের যে কোনও স্থানে চালান দিয়া ন্যায্য মূল্য পাইতে পারে। লেভী হিসাবে সরকার তাহাদের নিকট হইতে যেটুকু সংগ্রহ করিতেছেন, তাহা তাহাদের কিছুমাত্র অসুবিধার সৃষ্টি করে নাই। খাদ্যশস্যের অবাধ ব্যবসায়ও অনেকাংশে আরম্ভ হইয়াছে। ব্যবসায়ীরা যদি সাধারণ ক্রেতার প্রতি ন্যায্য আচরণ করেন, তবে ভবিষ্যতেও কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ চাপাইবার প্রয়োজন হইবে না।

গত বৎসরে আবহাওয়া ভাল থাকায় এবং সুবৃষ্টি হওয়ায়, খাদ্য-শস্যের আবাদ সর্ব্বাধিক অর্থাৎ ২০ কোটি একর হইয়াছে। এই সময়ে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় ৫০ লক্ষ টন অধিক খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৫২-৫৩ সনে চাউল, ভুট্টা ও যবের উৎপাদন রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছে।

খাদ্যশস্যের মূল্য এখন পর্য্যন্ত কোথাও আশঙ্কার সৃষ্টি করে নাই। জুন হইতে সেপ্টেম্বর মাসে খাদ্যশস্যের টান পড়ে বলিয়া সম্প্রতি দর কিছু বাড়িয়াছে সন্দেহ নাই, তবে গত বৎসরের তুলনায় মূল্য কমই আছে। গত মে মাসের পর হইতে পশ্চিমবঙ্গের ১৩টি জেলায় আংশিক রেশনের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ, মাদ্রাজ ও ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে রেশনে চাউলের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। মাদ্রাজে চাউলের দর হ্রাস করা হইয়াছে এবং আমদানী করা গম ১৪৲ টাকা মণ দরে বিক্রয় করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ, বোম্বাই, মহীশূর ও উত্তরপ্রদেশে প্রেরণ করা হইয়াছে।

রেশনিং ব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে তুলিয়া লওয়ার এবং খোলা বাজারে ক্রয়-বিক্রয় আরম্ভ হওয়ায়, সরকারী সূত্রে খাদ্যশস্য বণ্টনের পরিমাণও ক্রমেই হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৫১ সনে সরকারী দোকানের মারফত ৭৯ লক্ষ টন খাদ্যশস্য বিক্রয় করা হইয়াছিল। ১৯৫২ সনে উহার পরিমাণ ছিল ৬৭ লক্ষ টন। বর্ত্তমানে রেশনভুক্ত এলাকার লোক-সংখ্যা ৮ কোটি ৯০ লক্ষ, ১৯৫২ সনের শেষে ছিল ১২ কোটি ৮০ লক্ষ। কাজেই ১৯৫৩ সনে খাদ্যশস্য বণ্টনের পরিমাণ আরও কম হইবে।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের হাতে মজুত খাদ্যশস্যের পরিমাণও যথেষ্ট। গত আগষ্ট মাসের প্রথম দিকে রাজ্যসমূহে মজুত ছিল ১৬ লক্ষ টন। ইহার অর্দ্ধেকটা চাউল। ইহা ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ৬ লক্ষ টন খাদ্যশস্য মজুত ছিল।

পুণা নগরীতে গত ১০ই সেপ্টেম্বর এক সাংবাদিক বৈঠকে বোম্বাইয়ের অসামরিক সরবরাহ-সচিব শ্রীচাবন ঘোষণা করেন যে, আগামী ১লা অক্টোবর হইতে ক্রেতারা যত ইচ্ছা গম ক্রয় করিতে পারিবে। কেন্দ্রীয় সরকার বোম্বাই রাজ্যের চাহিদা অনুযায়ী আমদানীকৃত গম সরবরাহের প্রতিশ্রুতিদানের ফলেই এই ব্যবস্থা করা সম্ভব হইতেছে। তবে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার মধ্যে গমের চালান মূল্য ও বণ্টনের উপর নিয়ন্ত্রণ যথাপূর্ব্ব বজায় রহিবে। সাংবাদিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় খাদ্যসচিব শ্রীকিদোয়াই উপস্থিত ছিলেন।

বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে গমের চালানের উপর যে সব বাধা-নিষেধ আছে, তাহা দূর করিবার কোনও প্রস্তাব বর্ত্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন নাই বলিয়া শ্রীকিদোয়াই জানান। শ্রীকিদোয়াই আরও বলেন, বিশ্বের বাজারে বর্ত্তমানে গমের দর হ্রাস পাইতেছে। আমদানীকৃত গমের দর দেশী গমের দর অপেক্ষা অনেক কম হইবে বলিয়া তিনি আশা প্রকাশ করেন।

বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে জোয়ার, বাজরা প্রভৃতির চালানের উপর যে সব বাধা-নিষেধ আছে, তাহা অপসারণের বিষয় বিবেচনা করা হইতেছে।

শ্রীকিদোয়াই প্রকাশ করেন, বর্ত্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে সাত লক্ষ টন গম মজুত আছে এবং শীঘ্রই আরও গম আসিতেছে। কেন্দ্রীয় সরকার গম সম্পর্কে বোম্বাইয়ের সমস্ত চাহিদা পূরণ করিতে প্রস্তুত আছেন।

তিনি আরও বলেন, চলতি বৎসরে আমদানীকৃত খাদ্যশস্যের পরিমাণ কুড়ি লক্ষ টনের বেশী হইবে না এবং আগামী বৎসরে উহা দশ লক্ষ টনের কাছাকাছি নামিয়া আসিবে।

খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেশী হওয়ায় এবং উদ্বৃত্ত শস্য বাজারে আসায় বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি হ্রাস করা হইয়াছে। ১৯৫১ সনে যেখানে ৪৭ লক্ষ টন এবং ১৯৫২ সনে ৩৯ লক্ষ টন আমদানি করিতে হইয়াছিল, ১৯৫৩ সনে সেখানে আমদানির পরিমাণ ২৯ লক্ষ টনেরও কম হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। আন্তর্জাতিক গম চুক্তিতে আমরা আমদানির বার্ষিক পরিমাণ ১৫ লক্ষ টন হইতে কমাইয়া ১০ লক্ষ টন করিয়াছি। দেশে এতকাল চাউলের অবস্থা বেশ সঙ্কটপূর্ণ ছিল। কিন্তু এখন অবস্থা প্রায় স্বাভাবিক হইয়া আসিয়াছে। আমরা এখন আর বিদেশ হইতে যে কোনও মূল্যে চাউল কিনিতে রাজী নহি।

১৪ই সেপ্টেম্বরের খবরে জানা যায় যে, সম্প্রতি এদেশের আটা ময়দা কলের অধিকারীদিগকে এবং কিছু চাউল ব্যবসায়ীকে বিদেশ হইতে শস্য আমদানীর লাইসেন্স দেওয়া হইবে। ইহা শুভ লক্ষণ, কিন্তু অসাধু ব্যবসায়ীকে লাইসেন্স দিলে বিপদ হইতে পারে। এ দেশে প্রবল অর্থশক্তিযুক্ত অসাধু লোকের অভাব নাই।

ডায়মণ্ডহারবারে খাদ্যসঙ্কট

১৩ই ভাদ্র "বন্ধু" পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ যে সম্প্রতি ডায়মণ্ড-হারবার মহকুমার শাসকের সহিত এক কৃষক প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করিয়া কাকদ্বীপ, মথুরাপুর, কুল্পী থানা প্রভৃতি এলাকার তীব্র খাদ্য-সঙ্কটের কথা আলোচনা করেন। আলোচনায় মহকুমা-শাসক খয়রাতি সাহায্য যাহাতে অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় সেজন্য সরকারকে অনুরোধ জানাইবেন বলিয়া আশ্বাস দেন। সর্ব্বত্র সস্তা রেশন প্রবর্তনের জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়া তিনি আরও বলেন যে, যাহাতে কনট্রোলের চাউলেরও দাম কমাইয়া সাবসিডাইজড (অল্প) হারে দাম নির্দ্ধারণ করা যায় সেজন্যও তিনি সরকারকে জানাইবেন। উক্ত সংবাদে আরও প্রকাশ, "সম্পূর্ণ আটা না লইলে চাউল দেওয়া হইবে না এই নিষেধাজ্ঞা বাতিল করিয়া অন্ততঃপক্ষে যেন অর্দ্ধেক পরিমাণ আটা ও অর্দ্ধেক পরিমাণ চাউল দেওয়া হয়—এই দাবী জানাইলে তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং টেষ্ট রিলিফের কাজ আগামী সেপ্টেম্বর মাস হইতে চালু করিবার প্রতিশ্রুতি দেন।" অবিলম্বে কৃষিঋণ না দিলে সুন্দরবনে খাদ্যাভাব চরমে উঠিবে প্রতিনিধিগণ এই আশঙ্কা প্রকাশ করেন। উত্তরে মহকুমা-শাসক বলেন যে সরকারের নিকট হইতে প্রার্থিত অর্থ অপেক্ষা তিনি অনেক কম পাইয়াছেন; তবে অধিকতর অর্থের জন্য সরকারকে অনুরোধ করিবেন বলিয়া তিনি আশ্বাস দেন।

এ ত গেল স্বল্পমেয়াদি ব্যাপার। কিন্তু মূল সমস্যা লোকের আয়ের। হয় সকল নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুর মূল্যমান কমাইতে হইবে, না হইলে লোকের উপার্জ্জন-ক্ষমতা বাড়াইতে হইবে। এই প্রশ্নের সমাধান তখনই হইবে যখন দেশের চিন্তাশীল ও শক্তিশালী লোকমাত্রেই হুজুক ছাড়িয়া এ বিষয়ে অবহিত ও চেষ্টিত হইবেন। দেশের সমস্যা অনেক, কিন্তু সেই সমস্যাগুলির সমাধান করিতে হইলে উহা কূটনৈতিক চালের বাহিরে রাখিতে হইবে।

মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমানে ধান্যের মহামারী

৪ঠা ভাদ্রের "দামোদর" পত্রিকা এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিতেছেন, "বর্দ্ধমান জেলার প্রতিটি মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সংবাদ আসিতেছে, গত শ্রাবণ মাসের প্রথম হইতেই ধান গাছে

পোকা ধরিতে আরম্ভ করিয়া ইতিমধ্যে সমগ্র জেলায় ব্যাপকভাবে পোকায় ধানগাছ নষ্ট করিতেছে। তৈয়ারী ধানগাছ লালচে, তামাটে ও সাদা হইয়া যাইতেছে। এবার সময়ে সুবৃষ্টি হওয়ায় জেলায় ধান্য-ফসলের অবস্থা আশাপ্রদ হইয়াছিল এবং চাষীদের মধ্যে প্রবল আশা ও উৎসাহ দেখা দিয়াছিল, কিন্তু এ বৎসরও ব্যাপকভাবে ধান্যে পোকা লাগায়, ধান্য-চাষীরা হতাশ হইয়া পড়িয়াছে। নানা স্থান হইতে চাষীরা প্রতিকারের জন্য ধান্য-চাষী সঙ্ঘ মারফত সরকারের নিকট দাবি জানাইতেছে।"

৯ই সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর হইতে নির্বাচিত বিধানমণ্ডলীর একদল কংগ্রেসীসদস্য মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অনাবৃষ্টি ও কীটের উৎপাতে ব্যাপকভাবে শস্য নষ্ট হইবার ফলে মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে যে দুর্গতি দেখা দিয়াছে, সেই সম্পর্কে দীর্ঘকাল আলোচনা করেন। এই দলে একজন মন্ত্রী এবং একজন উপমন্ত্রীও ছিলেন।

প্রতিনিধিমণ্ডলীর পক্ষ হইতে মেদিনীপুরের দুর্গত অঞ্চলসমূহের জন্য সরকারী সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং ঐ সব অঞ্চলে অবিলম্বে আংশিক রেশন ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি করিয়া মুখ্যমন্ত্রীর নিকট একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়। আলোচনান্তে উক্ত সদস্যগণ সাংবাদিকদের জানান যে, মেদিনীপুরের বিভিন্ন দুর্গত অঞ্চলের অধিবাসিগণের সংখ্যা প্রায় ১২ লক্ষ হইবে।

ডাঃ রায়ের নিকট যে স্মারকলিপি পেশ করা হয় তাহাতে মেদিনীপুরের বর্তমান দুর্গতির কথা উল্লেখ করিয়া বলা হয় যে, কীটের উৎপাতে ব্যাপকভাবে শস্য নষ্ট হইয়াছে। গত বৎসর অনাবৃষ্টির ফলেও শস্যহানি হইয়াছে। সদর ও ঝাড়গ্রাম মহকুমাতেও এই বৎসর বন্যার ফলে 'আউস' ধান সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছে। শ্রমিকগণও কাজ পাইতেছে না।

আমরা প্রতি বৎসরই এইরূপ অভিযোগ শুনি। কিন্তু এতাবৎ উহার সত্যাসত্য নির্ণয়ের চেষ্টা বা সত্য হইলে প্রতিকারের চেষ্টা কোনটিরই বিশদ বিবরণ পাই নাই। বর্তমানে সমগ্র জেলায় ব্যাপকভাবে এইরূপ পোকা লাগিয়াছে এ কথার কিন্তু সমর্থনযোগ্য প্রমাণ আমরা পাইতেছি না। আমরা বহু লোককে প্রশ্ন করার ফলে বুঝিলাম কয়েক স্থলে প্রতি বৎসরই এইরূপ হইতেছে। সত্যাসত্য যাহাই হউক ধান্য রক্ষার জন্য এই রোগের প্রতিকার নিতান্তই প্রয়োজন। সরকারী ঘোষণায় বলা হইয়াছে, পোকা লাগার প্রতিকারে সরকার সফল হইয়াছেন। "দামোদর" কিন্তু বলেন, সরকার উদাসীন।

জয়নগরে সমাজ-উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপনের আবেদন

"বন্ধু" পত্রিকা এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে জয়নগর থানার অধিবাসীদিগকে সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য আবেদন জানাইয়াছেন। জয়নগর থানা বহুদিন যাবৎ খাদ্যশস্য ব্যাপারে উদ্বৃত্ত অঞ্চল হিসাবে ছিল, কিন্তু সার, প্রয়োজনানুরূপ সেচ-ব্যবস্থা এবং কৃষি-মূলধনের অভাবে উহা এখন ঘাটতি এলাকায় পরিণত হইয়াছে। বর্তমানে সেখানে বহু চাষযোগ্য জমি পতিত অবস্থায় রহিয়াছে এবং কোথাও বা আবার তাহা বাঁধের অভাবে লোনা জলে নিমজ্জিত রহিয়াছে। দুর্ভিক্ষের প্রকোপে এবং মহাজনের ঋণের দায়ে বহু কৃষক আজ ভূমিহীন।

জয়নগর থানা এলাকার মোট ১ লক্ষ ৭৫ হাজার লোকের মধ্যে ১ লক্ষ ৮১ হাজার লোকই কৃষির উপর নির্ভরশীল। এই পত্রিকাটির অভিমতে, এই সকল অবস্থা বিবেচনা করিয়া জয়নগর থানা সমাজ-কল্যাণ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইবার সম্পূর্ণ উপযোগী। পরিকল্পনা চালু হইলে ঐ অঞ্চলের অধিবাসিগণ সমগ্রভাবে উপকৃত হইবেন। আমাদের বক্তব্য এই যে, উন্নয়নকেন্দ্র স্থাপন করিলেই কিন্তু সকল দুঃখের অবসান হইবে না। স্থানীয় জনসাধারণ নিজেদের দুর্দশা দূরীকরণে সক্রিয়ভাবে চেষ্টিত না হইলে সবই বিফল হইবে। কম্মবিমুখের উদ্ধার অসম্ভব।

জঙ্গীপুরে কুটীর-শিল্পের শোচনীয় অবস্থা

"ভারতী" পত্রিকার ১০ই ভাদ্র সংখ্যায় এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে জঙ্গীপুর মহকুমার কুটীর-শিল্পের শোচনীয় অবস্থার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া প্রয়োজনানুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের অনুরোধ জানানো হইয়াছে।

জঙ্গীপুর মহকুমা বহুকাল হইতেই কুটীর-শিল্পের দিক দিয়া উন্নত। সেখানকার রেশম-শিল্প আজিও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাহা ছাড়া পশম-শিল্প, তাঁত-শিল্প, হাতে তৈয়ারি কাগজের ব্যবসা এবং পিতল-কাঁসার কাজের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কুটীর-শিল্পীরা নিজ নিজ পেশা ত্যাগ করিয়া অন্য পেশা গ্রহণ করিতেছেন বা বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছেন। অন্য পেশা গ্রহণের মধ্যে প্রধানতঃ চাষ-আবাদেই তাঁহারা জীবিকার্জনের চেষ্টা করিতেছেন। ফলে ক্ষতি হইতেছে উভয় ক্ষেত্রেই সমান। মহকুমায় তৈল-শিল্পের ক্ষেত্রে অবস্থা এইরূপ সঙ্গীন হইয়াছে যে, আর কিছুকাল এরূপ চলিলে ইহার পুনরুদ্ধার কোন্ কথা, কোনও কালে যে এইরূপ একটা শিল্প এ অঞ্চলে ছিল তাহাও স্মরণ করা কঠিন হইবে। ইতিমধ্যে ঐ সকল শিল্পী অন্যরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে এবং ইহাদের অধিকাংশ উপযুক্তরূপে শিক্ষিত না হওয়ায় অন্যের দোকানে চাকুরী করিতেছে; অথচ খুব বেশী দিনের কথা নয়, যখন এই মহকুমা ছিল তৈল-শিল্পে, অন্ততঃ খাবারের তৈলে স্বয়ংসম্পূর্ণ আর এই সব শিল্পী ছিল বেশ সমৃদ্ধ।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকার কুটীর-শিল্পের উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। তাহাতে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া উক্ত মন্তব্যে বলা হইয়াছে যে, সরকার কুটীর-শিল্প উন্নয়ন পরিকল্পনায় উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতির তথা উৎপাদন বৃদ্ধি, কারিগরদিগের দক্ষতার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান, শিল্পসমবায় প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কয়েকটি বিষয়ের

উপর জোর দিয়া যে শিল্প-সূচী প্রস্তুত করিয়াছেন মহকুমার অনেকগুলি শিল্পই তাহার মধ্যে পড়ে।

কিন্তু এই দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এক সমস্যা। পত্রিকাটি লিখিতেছেন, "অপর পক্ষে এই সম্পর্কে যথাবিধি ক্ষমতাপ্রাপ্ত সরকারের কোন সংস্থা আমাদের মহকুমায় আছে কিনা তাহা আমরা জানি না। থাকিলে সাধারণ শিল্পীরা কেমন করিয়া তাহার সংস্পর্শে আসিবে, কিভাবে তাহার সাহায্য ও উপদেশ ইত্যাদি পাইতে পারিবে সরকারের প্রচার-দপ্তর মারফত তাহা যথাযথ ঘোষণা করিয়া দিলে ভাল হয়।" শিল্পীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত এবং স্বভাবতঃই লাজুক, সেই কথা স্মরণ রাখিয়া এ ব্যাপারে অনতিবিলম্বে সরকারের তৎপর হওয়া কর্ত্তব্য। অবশ্য জনসাধারণকেও সহযোগিতার পথে অগ্রসর হইয়া আসিতে হইবে।

বাঁকুড়া ও বীরভূমেও একই সমস্যা। লক্ষ লক্ষ তাঁতি, যুগী, কাসারী ও কর্ম্মকার ত ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। লাক্ষা, রেশম, পশম, তসর ও অন্যান্য কুটীর-শিল্পে শত শত গ্রাম ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও সমৃদ্ধ ছিল। সে সকল কারু-শিল্পের ধ্বংস ত উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে।

বেকার-সমস্যা সমাধানের প্রধান উপায় ঐ সকল শিল্পকে বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক বুনিয়াদের উপর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। না হইলে এই ধ্বংসে মুগ্ন জাতিকে রক্ষা করা যাইবে না। সকল প্রকার গোঁড়ামি ও কুসংস্কার বর্জ্জন করিয়া এ বিষয়ে প্রচেষ্টা হওয়া উচিত। জাপান এ বিষয়ে অনেকটা পথ দেখাইয়াছে, কিন্তু সমবায় প্রথায় পাশ্চাত্ত্য দেশের অনেক ছোট রাষ্ট্র আরও অনেক অধিক কার্য্যকারিতা প্রদর্শন করিয়াছে।

পল্লীতে তৈলের ঘানি

১লা আগষ্ট 'হরিজন' পত্রিকায় প্রকাশিত অখিলভারত খাদি ও গ্রামোদ্যোগ বোর্ডের ১৯৫৩-৫৪ সনের কার্য্যক্রম হইতে জানা যায় যে, ভারতে বৎসরে প্রায় ৩০ লক্ষ টন তৈলবীজ ভাঙা হইয়া থাকে। তন্মধ্যে রেজিষ্ট্রিকৃত তৈলমিলগুলিতে ১০ লক্ষ টন, ক্ষুদ্র তৈলকলগুলিতে ৫ লক্ষ টন এবং বলদের ঘানিতে ১০ লক্ষ টন ভাঙা হইয়া থাকে। বলদের ঘানির সংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষ। প্রতি ঘানিতে গড়ে বৎসরে ৩½ টন বীজ ভাঙা হইয়া থাকে, যদিও মনে হয় যে, ঘানিতে বৎসরে উহার দ্বিগুণ বীজ ভাঙান যাইতে পারে। ইহার প্রধান কারণ যথেষ্ট পরিমাণে বীজ পাওয়া যায় না। উন্নততর ঘানিতে বৎসরে ১০ টন বীজ ভাঙা চলিতে পারে।

বর্ত্তমানে মিলে উৎপন্ন তৈলের প্রতিযোগিতার ফলে ঘানির তেল বিশেষভাবে অসুবিধায় পড়িয়াছে। পল্লী অঞ্চলে ঘানিগুলির সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইলে কিছু বেকার লোকের কর্ম্মসংস্থান হইতে পারে এবং জনসাধারণের টাটকা ও ভেজালহীন তৈল পাইবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়।

বোর্ডের গৃহীত কার্য্যক্রম অনুযায়ী ১৯৫৩-৫৪ সনে ২,০০০ উন্নততর ঘানি প্রবর্ত্তন করা হইবে; পুরাতন ঘানিগুলিকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইবে। পরিকল্পনার মধ্যে উন্নততর ঘানি নির্ম্মাণ ও সরবরাহ করা, কর্ম্মী শিক্ষাদান, অনুসন্ধান ও গবেষণা করা এবং বীজভাণ্ডার রক্ষার সুদ খরচ অথবা উৎপাদনের পরিমাণ অনুসারে সাহায্য দান করা, এই কয়টি বিষয় ধরা হইয়াছে।

আমরা যতদূর বুঝি তাহাতে 'হরিজন' পত্রিকায় গ্রামোদ্যোগের কার্য্যক্রমে দুইটি বিভিন্ন বিষয় একসঙ্গে দেওয়া হইয়াছে। উন্নততর ঘানিতে অধিক তৈল উৎপন্ন হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু খরচ যথেষ্ট কমিবে কি? বীজ সরবরাহ সুষ্ঠুভাবে না হইলে সেখানেও দাম চড়িবে। দরিদ্র দেশে "সাহায্য দান" শব্দটা মুখরোচক এবং বেকার সমস্যাও কঠিন সন্দেহ নাই, কিন্তু বেকার সমস্যা সমাধান বা গ্রামোদ্যোগ দুই-ই যদি সরকারী সাহায্যের উপর চিরনির্ভরশীল হয় তবে তাহার শেষ কোথায়? গ্রামের বীজ যদি গ্রামের ঘানিতে সস্তায় ভাঙে তবেই এ সমস্যা পূরণ হয়।

বাঁকুড়া ষ্টেশনে অসুবিধা

শ্রীদুর্গা ১১ই ভাদ্রের "হিন্দুবাণী" পত্রিকায় লিখিতেছেন যে, খড়গপুর ও আদ্রার মধ্যে বাঁকুড়া একটি গুরুত্বপূর্ণ ষ্টেশন এবং ইহার আয় ঐ লাইনের অনেক ষ্টেশন অপেক্ষা বেশী, কিন্তু কতকগুলি অসুবিধার জন্য জনসাধারণ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন। প্রথমতঃ ষ্টেশনের প্লাটফর্ম খুবই নীচু হওয়ায় বৃদ্ধ ও মহিলাদের বিশেষ অসুবিধা হয়। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যহ বহু যাত্রী ঐ স্থান হইতে কলিকাতায় যাতায়াত করেন, কিন্তু কলিকাতা যাতায়াতের সুবিধাজনক ট্রেন মাত্র একটি। খড়গপুর হইতে আসানসোল যাতায়াত করা খুবই কষ্টসাধ্য। রাত্রি দেড়টার পর হইতে বেলা তিনটা পর্য্যন্ত আসানসোল হইতে খড়গপুর এবং বেলা এগারটার পর রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত খড়গপুর হইতে আসানসোল যাইবার কোন ট্রেন নাই। ষ্টেশনের ওভারব্রীজটি খুবই সঙ্কীর্ণ; ষ্টেশন রোডের অবস্থা শোচনীয় এবং আলোর সংখ্যা খুবই অল্প। ইহার প্রতিকার প্রয়োজন এবং যাহাতে খড়গপুরে মাদ্রাজ মেলের সহিত ঠিক মত সংযোগ হয় তাহার ব্যবস্থা করা দরকার এবং খড়গপুর হইতে আসানসোল যাইবার জন্য আর একটি ট্রেনের ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন।

বর্ত্তমানে "জোনাল" বিভাগের ফলে পশ্চিম বাংলার রেলযাত্রী ও রেলে মাল প্রেরণকারী দুইয়েরই অসুবিধা নানারূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবুও যদি ঐসব অসুবিধার অভিযোগ লোকসভার প্রতিনিধি মারফত যথাস্থানে পৌছায় তবে কিছু প্রতিকার হইতে পারে। স্থানীয় লোকের এ বিষয়ে চেষ্টিত হওয়া প্রয়োজন।

উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত প্রদেশ

১৬ই ভাদ্র "সুরমা" পত্রিকায় শিলং হইতে প্রকাশিত 'ইউ খুন কারি' নামক খাসিয়া ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রে "উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত নব ব্যবস্থা—কেন স্বতন্ত্র পাহাড়িয়া প্রদেশ নয়" শীর্ষক

প্রবন্ধের এক মর্ম্মার্থ প্রকাশিত হইয়াছে। জুলাই মাসের শেষদিকে প্রকাশিত উক্ত প্রবন্ধে উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত নূতন গঠন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আসামের সমতলবাসীদের উত্তেজনাতে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলা হইয়াছে : "প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় আমরাই মুখ্যতঃ জড়িত এবং পাহাড়িয়া অধিবাসীদের কল্যাণের দিক দিয়া দেখিতে গেলে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিবার কোন কারণ আমরা খুঁজিয়া পাই না। বরং এই ব্যবস্থায় আমরা খুশীই হইব এবং কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।" প্রবন্ধে প্রশ্ন করা হইয়াছে যে, সমতলবাসীদের প্রতিবাদের মূলে কি ঈর্ষা লুক্কায়িত রহিয়াছে? আসাম সরকারের পরিচালক সমতলের অধিবাসিগণ বিগত অনেক বৎসর হইতেই তাঁহাদের পাহাড়ী ভ্রাতৃগণকে উন্নত করিবার সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও উল্লেখযোগ্য কিছুই করেন নাই; অপরপক্ষে তাহাদিগকে "পিষিয়া মারিবারই চেষ্টা" করিয়াছেন। সমতলবাসীদের প্রতি পাহাড়িয়াদের ক্রমবর্দ্ধমান অসন্তোষের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, বস্তুতঃ সমতলবাসিগণ পার্ব্বত্য অঞ্চলের অধিবাসিগণের সহিত একই পরিবারের ভাই বন্ধু হিসাবে বাস করিতে চায় না বরং তাহাদিগকে বন্য পশুর সমপর্য্যায়ে দেখে। সীমান্তবাসীদিগের দুঃখদৈন্য দূর করার কোন চেষ্টা হয় নাই।

প্রবন্ধে বলা হইয়াছে, "এ সমস্ত ছাড়াও আমাদের জীবনযাত্রা, খাদ্যদ্রব্য, ধর্ম্মবিশ্বাস এবং অন্তর্লীন স্বায়ত্ত্বশাসনতন্ত্রের গঠন ইত্যাদি সবই সমতল ভ্রাতাদের হইতে পৃথক। এই সকল অনস্বীকার্য্য উপাদানের জন্য আসামের পার্ব্বত্যাঞ্চলবাসীদের কল্যাণার্থে ভারতের রাজধানীস্থ আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণ উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত প্রদেশ গঠনের যে প্রস্তাব আনয়ন করিয়াছেন তাহা নিশ্চয়ই প্রশংসার্হ।

"এই সকল অবস্থা বিবেচনায় আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে স্বার্থান্ধ ও সম্বন্ধহীন লোকদের ভিত্তিহীন প্রতিবাদে কর্ণপাত না করিতেই অনুরোধ জানাইতেছি।...নাগারা এই ব্যবস্থায় অন্যান্য পাহাড়িয়া ভাইদের সহিত একত্র থাকিবে বুঝিতে পারিলে নূতন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইতে চাহিবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে আমরা আরও নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, নূতন প্রদেশে নাগাদিগকে আমাদের সহিত কাজে যোগদান করাইতে বা পরস্পর সহযোগিতা করিতে কোনই অসুবিধা হইবে না, বরং আমাদের পিতৃভূমি ভারতের পূর্ব্বসীমান্তে নূতন প্রদেশকে এক সুদৃঢ় বন্ধনীরূপে (strong barrier) সৃষ্টি করিয়া স্বাধীন সার্ব্বভৌম ভারতকে বলশালী করিয়া তুলিবে।"

উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত প্রদেশ গঠনে অনেক জটিল সমস্যা আছে। সে সকল সমস্যা ঐ প্রদেশ গঠিত হইলেই সমাধান হইবে না। বর্ত্তমানে আসাম প্রদেশ যাঁহাদের হাতে রহিয়াছে তাঁহাদের মনোভাব ও কর্ত্তব্যজ্ঞান এতই হীন যে, ঐ সকল সমস্যার পূর্ণ আলোচনা করাও দুরূহ, কেনন সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসীদিগের উন্নতির অন্তরায় যাঁহারা তাঁহাদের সপক্ষে যুক্তি দেওয়াও ঠিক নহে। তবে আমরা এই পর্য্যন্ত বলিব যে, অসমীয়া দলের অক্ষুণ্ণ অধিকার—যেম বর্ত্তমানে আছে—ঐ পার্ব্বত্য অঞ্চলের লোকদের উন্নতির পরিপন্থী সুতরাং তাঁহাদের মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন না হইলে এই সীমান্ত প্রদে গঠন মন্দের ভাল।

আসামের নাম পরিবর্ত্তনের আবেদন

নাগা পাহাড়ের ছাত্রবৃন্দ ১৫ই আগষ্টের সভায় যোগদান ন করায় ডেপুটি কমিশনার অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বিদ্যালয় বন্ধ করিবা নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে ৯ই ভাদ্রের "সুরমা" পত্রিকা এই ঘটনায় জনমতের যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া লিখিতেছেন যে, নাগারা সরকারে প্রতি আস্থাশীল হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া যে প্রচার করা হইয়াছি এই ঘটনা তাহা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতেছে। নেফার আন্দোলনে পার্ব্বত্যবাসীদের মধ্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাস বৃদ্ধি পাইয়াছে। খাসিয় পাহাড়ের একখানি প্রভাবশালী সংবাদপত্র পৃথক পার্ব্বত্য প্রদেশে দাবী করিয়াছে এবং এই দাবী স্বীকৃত হইলে নাগারা স্বাতন্ত্র্যের দাবী পরিত্যাগ করিয়া ভারতীয় সংবিধানের অনুগত হইবে বলিয়াছে।

কাছাড়ে সম্প্রতি কংগ্রেস-প্রভাবান্বিত একটি ছাত্রসভা আসামে বৈষম্যমূলক বিধানের নিন্দা করিয়া বাংলা ও অসমীয়া দুই ভাষাকে আসামের রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণের জন্য যে দাবী করিয়াছে তাহা হইতে "ইহা প্রকট হইয়াছে যে, কংগ্রেস-প্রভাবান্বিত কাছাড়ের অধিবাসীরাও 'অসমীয়া' নেতৃত্বকে আর নীরবে সহ্য করিতে পারিতেছে না। সমস্ত কণ্ঠে প্রতিবাদ তুলিতে আরম্ভ করিয়াছে।"

"আসাম অসমীয়াদের" এই দাবীর সমালোচনা-প্রসঙ্গে "সুরমা" লিখিতেছেন যে, নেতৃবৃন্দ এই দাবীকে পরিষ্কার করিয়া ব্যাখ্যা করেন নাই। "প্রদেশের নাম 'আসাম' এবং তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া এক শ্রেণীর উগ্রপন্থীরা আসর জমাইয়াছে। বর্ত্তমান সরকারের কর্ণধারগণ ইহাদের বিরাগভাজন হইতে ভীত, পরন্তু পরোক্ষভাবে তাহাদের অনেকে এই সব আন্দোলনকারীর সমর্থক। যদি আসামকে সর্ব্বনাশের পথ হইতে রক্ষা করিতে হয় তবে প্রধানতম কাজ হইবে উহার নাম পরিবর্ত্তন করতঃ পূর্ব্বপ্রদেশ বা অনুরূপ কোন নাম দিতে হইবে।"

কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে অবহিত না হইলে আসামে ক্রমে দলাদলি বাড়িবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে এই পরিস্থিতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় সচেতন করা বাংলার সংবাদপত্রের কর্ত্তব্য। কিন্তু সে কর্ত্তব্যপালনে তাঁহাদের কোনও আগ্রহ দেখা যায় না।

শিলচর সরকারী হাসপাতাল সম্পর্কে অভিযোগ

২রা ভাদ্রের "সুরমা" পত্রিকায় শিলচর সরকারী হাসপাতাল সম্পর্কে নানারূপ গুরুতর অভিযোগের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। হাসপাতালটি পূর্ব্বে লোক্যাল বোর্ডের সাহায্যে চলিত এবং স্বাধীন

লাভের পর সরকার উহার পরিচালনাভার গ্রহণ করেন। হাসপাতালের শুভাশুভ লক্ষ্য করিবার জন্ম ডেপুটি কমিশনারের সভাপতিত্বে একটি পরিদর্শক কমিটি আছে। কমিটি হাসপাতালের প্রতি সরকারের ঔদাসীন্যের সমালোচনা করিলে "সরকার হাসপাতালের উন্নতির জন্ম বাজেট বরাদ্দ করেন কিন্তু পি. ডব্লিউ. ডি. বিভাগ সময়ের অল্পতার দোহাই দিয়া কোন বৎসর সকল টাকা ব্যয় করিতে পারেন না বলিয়া প্রতি বৎসর বহু সহস্র টাকা বাতিল হয়, আর যেখানকার হাসপাতাল সেখানেই থাকিয়া যায়। গত বৎসর যৎসামান্য মেরামতি ও নির্ম্মাণকার্য্য ও এই বৎসর একটি X-ray যন্ত্র বসান হইলেও একটি প্রধান জেলার একমাত্র হাসপাতালের নামে বর্ত্তমান ব্যবস্থা নিদারুণ উপহাসমাত্র।"

সরকারী উপেক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মীদের হৃদয়হীনতার ফলে জনসাধারণ হাসপাতালের সুযোগ-সুবিধা খুব কমই গ্রহণ করিতে পারেন। জনৈক উদ্বাস্তুর পুত্রকে কুকুরে কামড়াইলে তিনি হাসপাতালে পুত্রের চিকিৎসার জন্ম গিয়া যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন তাহার বর্ণনা করিয়া তিনি লেখেন: "হাসপাতালের ঝাড়ুদার, পাচক হইতে আরম্ভ করিয়া ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ পর্য্যন্ত সকলের নিকট রোগীকে তটস্থ, ত্রাসগ্রস্ত হইয়া থাকিতে হয় যেন রোগী হওয়া অপরাধ।...নার্সদের কর্ত্তব্য শুধু উত্তাপ লওয়া ও ঔষধ খাওয়ান তাহাও রাত্রে নাই। চিকিৎসা-বিভ্রাটের ফলে শিশুটির মৃত্যু হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপত্র পর্য্যন্ত দেওয়া হয় না।

"সম্প্রতি আসামের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শিলচরে আসিলে পৌরপতি ও জনসাধারণের পক্ষ হইতে হাসপাতাল সম্পর্কে যে সকল অভিযোগ করা হয় তাহার মধ্যে গুরুতর অভিযোগ এই যে জনসাধারণের অর্থে নির্ম্মিত paying ward-এর দৈনিক চার্জ্জ হাসপাতাল কমিটির সহিত কোনও রকম পরামর্শ না করিয়াই বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। সংক্রামক ব্যাধির রোগের জন্ম পৌরসভা হাসপাতালের মধ্যে নিজের ব্যয়ে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া দিতে সম্মত থাকা সত্ত্বেও কর্ত্তৃপক্ষের অসহযোগিতা হেতু তাহা সম্ভব হয় নাই, ফলে সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্তদের চিকিৎসা বা পৃথককরণের কোন ব্যবস্থা নাই।"

আসামের সরকারী বিভাগ উত্তরোত্তর যেন অকর্ম্মণ্য হইয়া চলিয়াছে।

রাজচাকরির পুনর্গঠন

ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী এদেশে রাজচাকরির একটি লৌহ কাঠামো সৃষ্টি করিয়াছিল। উহার সাহায্যে তাহাদের উদ্দেশ্য বেশ ভালভাবেই সাধিত হইত। কিন্তু এইরূপ কাঠামোর সাহায্যে স্বাধীন এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নিত্য-নূতন কর্ত্তব্য সমাধান করা যায় না। সেই কারণেই এই কাঠামোর পরিবর্ত্তনের সুপারিশ করিয়া এক প্রবন্ধে শ্রীমান নারায়ণ আগরওয়াল লিখিতেছেন যে, হিতব্রতী রাষ্ট্রের আশু কর্ত্তব্য পালনের এবং উহার প্রয়োজন সিদ্ধির পথে ফলপ্রসূ ও কার্য্যকরী হইতে পারে এইরূপ কাঠামো রচনা করিতে হইলে "রাজসরকারের বিভিন্ন বিভাগের কর্ম্মধারা এবং উহাতে নিযুক্ত কর্ম্মচারীদের চাকরির বর্ত্তমান নিয়মাবলীর আমূল সংশোধন করিয়া দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। ব্রিটিশেরা একটি সুনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই নিয়মাবলী রচনা করিয়াছিল। ব্রিটিশ আমলাদের মর্য্যাদাকে ঠেকা দিয়া তাঁহারা উচ্চে বজায় রাখিতে চাহিতেন। তাই তাঁহারা নিয়মকানুনের বেড়াজাল এমনভাবে রচনা করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের আমলাতন্ত্রের নিম্নতম কর্ম্মচারীরও কেশাগ্র স্পর্শ করা এদেশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের পক্ষেও সম্ভব হইত না। অতএব এখন যদি রাজ-আমলাদের জনসাধারণের সত্যকার সেবকে পরিণত করিতে হয় তবে চাকরির এবং বিবিধ নিয়মাবলীর আমূল সংশোধন করিতে হইবে। কেন্দ্ররাজ এবং প্রদেশ-রাজগুলি সকলকেই এই আমূল সংশোধন সম্পন্ন করিতে হইবে। লোকসভা ও প্রাদেশিক আইনসভা দ্বারা এই সংশোধনের কাজ করা চলিবে ভারত-সংবিধানে সেইরূপ ব্যবস্থা আছে।"

শ্রীআগরওয়ালের মতে "অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নূতন নিয়মাবলীতে এই ব্যবস্থা রাখিতে হইবে যে, যোগ্য কোন ট্রাইবিউন্যাল প্রয়োজন মাত্রেই দপ্তরের আভ্যন্তরীণ কার্য্যকলাপের দ্রুত অনুসন্ধান করিতে পারিবেন, যাহাতে অযোগ্য অথবা দুর্নীতিপরায়ণ কর্ম্মচারীদিগকে অচিরে নিশ্চিত পদচ্যুত ও অপসারিত করা যায়।" নিয়মাবলীতে সৎ ও যোগ্য কর্ম্মীর কর্ম্মক্ষমতার যথাযথ প্রয়োগের সুযোগ করিয়া দিতে হইবে; সকলকেই অনুসন্ধান ও জেরার সম্মুখীন হইয়া নিজের সততা সপ্রমাণ করিবার জন্ম প্রস্তুত থাকিতে হইবে। অসৎ ও দুষ্ট কর্ম্মচারীদের শাস্তি হিসাবে শুধু কর্ম্মচ্যুত করিলেই চলিবে না, ভারী জরিমানা করিতে হইবে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে মামলা করিতে হইবে। দেশের নূতন আইনে দুর্নীতি ও অসততাকে সর্ব্বাধিক গুরু অপরাধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে।"

শ্রীআগরওয়াল কিন্তু একটি কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। নূতন "সংবিধান" এমনই অপরূপ যে হাইকোর্ট ও সুপ্রীমকোর্টের জজদিগের খামখেয়ালীর উপর সবকিছুই নির্ভর করে। তাঁহাদের অযোগ্যতার প্রতিকার কিছু না হইলে দেশে অন্যায় বা দুর্নীতির প্লাবন চলিবেই। আমাদের রাষ্ট্র শাসনের মূল সমস্যা ঐখানে। চটুল বাক্যে আমলাতন্ত্রকে সকল বিষয়ে অপরাধী না করিয়া সংবিধান সংস্কারের দিকেও নজর দেওয়া প্রয়োজন।

এশিয়ার গৃহসমস্যা সমাধান সম্পর্কে সুপারিশ

রাষ্ট্রসঙ্ঘের আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার বিশেষজ্ঞগণ এশিয়ার জরুরী গৃহসমস্যা সমাধান সম্পর্কে সুপারিশ করিয়া বলিয়াছেন, "বিদেশ হইতে মূল্যবান গৃহ নির্ম্মাণের উপকরণ আমদানী করিয়া ব্যাপকভাবে ও বিরাট গৃহ নির্ম্মাণের তুলনায় স্থানীয় উপকরণ দ্বারা সাধারণ ছোটখাট গৃহ নির্ম্মাণ করিলে এই সমস্যার অনেকখানি সমাধান হইতে পারে। সস্তা জমির উপরে স্থানীয় উপকরণ দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করা সহজ। তবে বড় বড় শহরে যাহাতে আরও স্থায়ী গৃহ নির্ম্মাণ পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে।"

১৪ই সেপ্টেম্বর হইতে ১৯শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত টোকিওতে আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার এশিয়ান আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। এই অধিবেশনে এশিয়ায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের কারিগরি সাহায্য প্রয়োগ সম্পর্কে যে আলোচনা হইবে সেই আলোচনা-প্রসঙ্গে এশিয়ায় এই বাড়ীঘর নির্মাণের বিষয়টিও বিবেচনা করা হইবে।

এশিয়ায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে গৃহ নির্মাণ উদ্যোগের উন্নতি ও প্রসার হইতেছে না এবং চাহিদা মিটাইতে পারিতেছে না বলিয়াও আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা উল্লিখিত সুপারিশ প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন। তবে জাপান, মালয় ও সিংহলে গৃহ নির্মাণ শিল্পের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হইয়াছে।

গৃহসমস্যা আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। প্রতিকারের উপায়ও যে একেবারে অজানা তাহা নয়। বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে এই সকল সুপারিশ প্রায় অর্থহীন। তবে আমাদের শাসকদের কথা স্বতন্ত্র। সুইডেন হইতে কোটি টাকা দণ্ড দিয়া যাঁহারা প্রি-ফ্রেব (Pre-fabricated) বাড়ীর সাহায্যে গৃহসমস্যা সমাধানের স্বপ্ন দেখেন তাঁহাদের জন্য এখনও এইরূপ সুপারিশের প্রয়োজন আছে বৈকি। তবে তাঁহাদের পরমুখাপেক্ষী বহির্মুখী উদাস দৃষ্টির উপর এই ধরনের সুপারিশ কতটা প্রভাব বিস্তার করিবে তাহা অনুধাবনযোগ্য।

গৃহসমস্যার সমাধানের প্রধান উপায় বিকেন্দ্রীকরণ। ছোট নগরীতে ও গণ্ড গ্রামে এখনও লক্ষ লক্ষ গৃহ আছে যাহার সংস্কার হইলে এবং ঐ অঞ্চলের স্বাস্থ্য ও যাতায়াত ইত্যাদির ব্যবস্থার উন্নতি হইলে বহু লক্ষ লোক অপেক্ষাকৃত অল্প খরচে বাসের অধিক সুবিধা পাইতে পারে।

পূর্ব্ববঙ্গে সাধারণ নির্ব্বাচন ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়

"সোনার বাংলা" ৮ই আগষ্ট এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিতেছেন: "পূর্ব্ববঙ্গ সরকার, বিশেষ করিয়া প্রধানমন্ত্রী জনাব নুরুল আমীনের সাম্প্রতিক এক বক্তৃতা এবং নির্ব্বাচন সংক্রান্ত কাজকর্মের গতিধারা লক্ষ্যে একথা বর্ত্তমানে নিশ্চিন্ত ধারণা করার অবকাশ ঘটিয়াছে যে, সত্যসত্যই পূর্ব্ববঙ্গের সাধারণ নির্ব্বাচন সুদীর্ঘকাল পরে হইলেও আগামী সনের ফেব্রুয়ারী অথবা মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ নাগাদ অনুষ্ঠিত হইবে।"

মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী ব্যতীত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সকলেই যুক্ত নির্ব্বাচনের পক্ষে মত ঘোষণা করিয়াছেন। সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মধ্যেও বুদ্ধিজীবীদের এক অংশ, এমনকি কোন কোন প্রভাবশালী সংবাদপত্রও যুক্ত নির্ব্বাচনের পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন। "তথাপি আশ্চর্য্যের কথা এই যে, বর্ত্তমান নির্ব্বাচনে যুক্ত নির্ব্বাচন ব্যবস্থা বর্ত্তমান সরকার কার্য্যকরী হইতে দেন নাই। বরং হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেও পৃথক নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ফলে এইবার বর্ণহিন্দু ও তপশীলী হিন্দু প্রার্থীরা তাহাদের সম্প্রদায়ের দ্বারা পৃথক পৃথকভাবে নির্ব্বাচিত হইবেন। জনসংখ্যার ভিত্তিতে ইহাদের সংখ্যা সারা পূর্ব্ববঙ্গে নিরূপিত হইয়াছে যথাক্রমে ৩০ ও ৩৬ জন।"

যাহা হউক, বর্ত্তমান গণতন্ত্রী দুনিয়ার সাধারণ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ন্যায়সঙ্গত অভিপ্রায় জানাইবার মাধ্যম হিসাবে নির্ব্বাচনের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া হতাশায় নিমজ্জিত সমগ্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে আগামী নির্ব্বাচনে আপন অভিমত গণতন্ত্রসম্মত পন্থায় নির্ব্বাচনের মাধ্যমেই জানাইয়া দিতে হইবে, ইহাই পত্রিকাটির অভিমত।

সম্প্রতি এক জনসভায় পূর্ব্ববঙ্গের রাজ্যপাল চৌধুরী খালিকুজ্জমান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে আশ্বস্ত করিয়া বলেন যে, পাকিস্থান সরকার সংখ্যালঘুদের স্বার্থসংরক্ষণ ব্যাপারে উদাসীন নহেন। তিনি বলেন, "কার্য্যতঃ, এখানকার সংখ্যালঘুদের জন্য ভারতের জনসাধারণের যে দরদ রহিয়াছে তেমনি ভারতের সংখ্যালঘুদের জন্যও এখানকার মুসলিমদের দরদ রহিয়াছে। উভয় দেশের সংখ্যালঘুদের ন্যায়সঙ্গত দাবীগুলি যে উপেক্ষিত হইবে না ইহাই তাহার সবচেয়ে বড় গ্যারান্টি।"

রাজ্যপালের এই উক্তির সমালোচনা-প্রসঙ্গে "সোনার বাংলা" লিখিতেছেন যে, উভয় দেশের সংখ্যালঘুদের ন্যায়সঙ্গত দাবী উপেক্ষিত না হইবার পক্ষে উহাই গ্যারান্টি এ কথা মনে করিয়া কোন রাষ্ট্রের সংখ্যালঘুই নিজকে নিরাপদ মনে করিতে পারে কি? "কোন রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু অপর রাষ্ট্রের সংখ্যালঘুর অধিকার ও নিরাপত্তার 'প্রতিভূ' হইবে ইহা কখনও বাঞ্ছনীয় নহে।"

মস্কোতে ভারতীয় চিত্র প্রদর্শনী

সর্ব্বভারতীয় কারুকলা ও চারুকলা সঙ্ঘ, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সংস্কৃতি বিভাগ ও 'একাডেমী অফ আর্টসের' সম্মিলিত উদ্যোগে গত ৬ই আগষ্ট মস্কোতে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের একাডেমি অব আর্টস ভবনে ভারতীয় শিল্পের এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সংস্কৃতি বিভাগের উপমন্ত্রী আই. ভি. বলশাকভ প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন এবং মস্কোতে সমাগত ভারতীয় শিল্পীবৃন্দকে অভিনন্দন জানান।

প্রদর্শিত চিত্রাবলীর আলোচনা-প্রসঙ্গে আর্মেনিয়ান প্রজাতন্ত্রের লোকশিল্পী মার্টিরোস সারিয়ান লিখিতেছেন, "ভারতীয় শিল্পীরা এক অপূর্ব্ব আঙ্গিকের আশ্রয় লইয়া আধুনিক ভারতের স্বরূপ ফুটাইয়া তোলেন, অথচ তাঁহাদের যুগযুগান্তের অতীত ঐতিহ্য হইতে বিচ্যুত হন না। তাঁহাদের নৈপুণ্য বহুলাংশে প্রাচীন শিল্পকলাসম্পদের উপর নির্ভরশীল। ইহার জন্যই আমরা পাই অদ্ভুত কমনীয় চিত্র, খুঁটিনাটির দিকে সস্নেহ সাগ্রহ মনোযোগ।...

"প্রদর্শনীতে ভারতীয় শিল্পকলার বিভিন্ন ধারা ও বিভিন্ন পন্থার সমাবেশ হইয়াছে। কোন কোন ছবিতে আঙ্গিকবাদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সমগ্রভাবে দেখিতে গেলে ভারতীয় শিল্পকলার সঞ্জীবনী সুধা জোগাইতেছে লোককলা ও লোকবুদ্ধি।"

মস্কোতে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ও প্রতিনিধি শ্রী কে. পি. এস.

যেমন প্রদর্শনী উদ্বোধনকে অপূর্ব্ব ঘটনা বলিয়া অভিহিত করেন।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের একাডেমী অব আর্টসের সভাপতি এ. এম. গেরাসিমফ প্রদর্শনী উদ্বোধন উপলক্ষে এক বক্তৃতায় বলেন, "ভারতের সুপ্রাচীন জাতীয় সংস্কৃতি-প্রসূত ভারতীয় শিল্পকলা চিরদিনই রাশিয়ান ও সোভিয়েট শিল্পীদের আকর্ষণ করিয়াছে। বিগত শতাব্দীর প্রখ্যাত রাশিয়ান শিল্পী ভেরেশ্চাগিন দুই বার ভারত ভ্রমণে গিয়াছিলেন ও সেই সময় তিনি ভারতের জনগণ ও জাতি-সমূহের জীবন, ভারতবর্ষের অপূর্ব্ব বর্ণাঢ্য, নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী ও অতুলনীয় সৌন্দর্যবিশিষ্ট স্মৃতিমন্দিরসমূহ অবলম্বন করিয়া বহু চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।"

শ্বেতকায় মাউ মাউ

কেনিয়ায় ব্রিটিশ সরকারের মিথ্যা প্রচারের প্রকৃত রূপ প্রকাশ করিয়া "পীস নিউজ" পত্রিকার আফ্রিকাস্থ সংবাদদাতা রেজিনল্ড রেনলড্স যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা ৮ই আগষ্ট "হরিজন" পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। তিনি লিখিতেছেন: "সরকারী তথ্যাদি সময়ে সময়ে শিক্ষাপ্রদ হইতে পারে। টাঙ্গানিকা ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকা (এপ্রিল ২৫) এবং সেণ্ট্রাল আফ্রিকান পোষ্ট অব লুসাকা পত্রিকা (জুন ১২) হইতে গৃহীত নিম্নের পরিসংখ্যানগুলির দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। উভয় পত্রিকাই ইউরোপীয়দের। ১৯৫২ সনের অক্টোবর মাসে যখন 'ষ্টেট অব ইমারজেন্সী' বা জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয় তখন হইতে হতাহতের সংখ্যা ইহাতে প্রকাশ করা হইয়াছে।

মাউ মাউ কর্ত্তৃক নিহত	২৩শে এপ্রিল পর্য্যন্ত সরকারী নথিপত্র	৩রা জুন পর্য্যন্ত শেষ সরকারী হিসাব
আফ্রিকান	৪৭০	৪৩১
ইউরোপীয়ান	১০	১৭
এশিয়ান	৪	৪
মাউ মাউ-বিরোধী অভিযানে নিহত		
আফ্রিকান	৫৯৫	৮৪৬

"মাউ মাউ কর্ত্তৃক নিহত এশিয়ানদের সংখ্যা অপরিবর্তিত ছিল, কিন্তু এপ্রিল ২৩ হইতে জুন ৩ পর্য্যন্ত আরও ৭ জন ইউরোপীয়ান নিহত হন অথচ ৩৯ জন নিহত আফ্রিকানকে ইতিমধ্যে বোধ হয় পুনর্জীবিত করা হয় কারণ ঐ পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে নিহত আফ্রিকান-দের সংখ্যা ৩৯ জন হ্রাস পায়।

"এরূপ অনির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান হইতে কোন সিদ্ধান্ত করা কঠিন; কিন্তু নিহতদের হিসাব হইতে নিম্নলিখিত দুইটি স্বীকার্য্য সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌছান যায়:

"১। মাউ মাউ কর্ত্তৃক নিহত বলিয়া কথিত ব্যক্তিদের মধ্যে আফ্রিকানদের সংখ্যা ইউরোপীয়দের চেয়ে বহু গুণে বেশী।

"২। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষাকারী পুলিস ও সৈন্যগণ কর্ত্তৃক নিহত আফ্রিকানদের সংখ্যা মাউ মাউ কর্ত্তৃক নিহত আফ্রিকানদের সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশী। এই সংখ্যা দ্রুতহারে বাড়িয়া চলিয়াছে।"

কেনিয়াস্থিত ইউরোপীয় শাসকগোষ্ঠীর মনোভাব সম্পর্কে আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি কর্ণেল গ্রোগান নামক আইনসভার জনৈক ইউরোপীয় সদস্যের উক্তির উল্লেখ করেন। উক্ত সদস্য বলেন যে, রাজসরকারের উচিত দুষ্ট লোকগুলির মধ্যে শতখানেক ব্যক্তিকে ধরিয়া আনিয়া তাহাদিগের মধ্যে জনকয়েককে বাকী সকলের সমক্ষেই ফাঁসী দেওয়া এবং অবশিষ্টদের যে যাহার বাড়ীতে পাঠাইয়া দেওয়া। মিঃ রেনল্ডসের ভাষায় "সন্ত্রাসবাদের পরিবর্তে প্রতি-সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হউক, গ্রোগান সাহেব এই নীতি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিলেন।" এই মনোভাব শুধু গ্রোগান সাহেবের একার নহে, অধিকাংশ ইউরোপীয়ই এইরূপ মনোভাব পোষণ করেন। একজন ইউরোপীয় সদস্য রেনলড্সকে বলেন যে, গ্রোগানের কথা হাসি-ঠাট্টা মনে যেন না করা হয়।

মিঃ রেনল্ডস লিখিতেছেন: "ক্রমশঃই প্রমাণ ভারী হইয়া উঠিতেছে যে, গ্রোগানের সন্ত্রাসবাদ বেসরকারীভাবে কার্য্যকরী করা হইতেছে। কেনিয়া-পুলিস-রিজার্ভ এই কার্য্যে বিশেষ তৎপর হইয়াছেন। ইউরোপীয় বসতিকারিগণ এবং তাঁহাদের পুত্রগণ অস্ত্রসজ্জিত হইয়া এবং যত্রতত্র খেয়ালখুশীমত বন্দুক ছোড়াছুড়ি করিয়া আজ আফ্রিকানদের পক্ষে মাউ মাউদিগের অপেক্ষা ভীষণতর বিভীষিকার কারণ হইয়া উঠিয়াছেন। অনেক আফ্রিকান এই বিভীষিকার উপদ্রবকে 'শ্বেত মাউ মাউ' আখ্যা দিয়াছেন।

"একজন আফ্রিকানের পক্ষে শিক্ষিত হইলেই সন্দেহভাজন হইতে হয়। একজন কিকুয়ু প্রশ্ন করেন, 'সশস্ত্র হিলদার ইউ-রোপীর পাহারাদারেরা ডাক দিলে পর ছুটিয়া পলাইতে পারে না বলিয়া যে সকল কিকুয়ুদের গুলি করা হয় তাহাদের মধ্যে শিক্ষিত কিকুয়ু ব্যক্তিরাই অধিক গুলি খাইয়া নিহত হইতেছে কেন বলিতে পারেন? গুলি খাইয়া নিহত হয় এই খবরটি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিবেন। কেনিয়া রিজার্ভ পুলিসের মারাত্মক গুলিনিক্ষেপের সময় শিক্ষিত কিকুয়ুদের দিকে এই নির্ভুল ও নিশ্চিত সন্ধান কি করিয়া ঘটিতেছে ইহা সন্দেহের ব্যাপার নহে কি?'"

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন

মার্কিন বার্তার সংবাদে প্রকাশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম প্রান্তিক একটি পল্লী এলাকায় মৃত্তিকা খননের ফলে দশ হাজার বৎসরের প্রাচীন সভ্যতা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ওয়াশিংটন ষ্টেট কলেজের নৃতত্ত্ব বিভাগের উপদেষ্টা রিচার্ড ডোয়াটি উল্লিখিত ঘোষণা করিয়াছেন। ওয়াশিংটন রাজ্য যে একদা সুপ্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্র ছিল তাহা এই আবিষ্কারের ফলে প্রমাণিত হইয়াছে এবং এশিয়া হইতে প্রথম মানুষ যে উত্তর আমেরিকায় আসিয়াছিল নৃতত্ত্ববিদগণের এই ধারণা ও দাবী ইহা দ্বারা সমর্থিত হইতেছে।

সেই আদিম মানবেরা আগুনের ব্যবহার জানিত। তাহাদের

প্রস্তুত ছুরি, নানাপ্রকার অস্ত্র, পাথরের খণ্ড প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। ঐ এলাকা জুড়িয়া একটি হ্রদ হয়ত সেই সময়ে ছিল। বর্ত্তমানে তাহার কোন অস্তিত্ব নাই।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের বার্ষিক বিবরণী

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের বার্ষিক সভার অধিবেশন হইয়াছে। এ বৎসরের বার্ষিক রিপোর্টে পৃথিবীর ব্যবসায় সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার কিছু বাস্তবতার পরিচয় দিয়াছে। এ বৎসরের প্রথম দিকে কমনওয়েলথ অর্থনৈতিক কনফারেন্সের অধিবেশনের পর ধারণা হইয়াছিল যে, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার এবারে আন্তর্জাতিক মুদ্রা-বিনিময়ের হার কিছু পরিমাণ পরিবর্তন করিবে। এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, আন্তর্জাতিক ভাণ্ডারের নিয়ম অনুসারে মুদ্রা বিনিময়ের হার নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে—যুদ্ধপূর্ব্ব যুগের ব্যবসায়ের গতি দ্বারা মুদ্রাবিনিময়ের হার নির্দ্ধারণ বর্ত্তমানে হয় না। আর একটি ধারণা হইয়াছিল যে, আন্তর্জাতিক ব্যবসা তথা মুদ্রা-বিনিময় সহজ ও স্বাভাবিক করিবার জন্য অর্থভাণ্ডার অধিকতর পরিমাণে ঋণদানের ব্যবস্থা করিবে। কিন্তু বার্ষিক বিবরণীতে এই দুইটি ব্যাপার সম্বন্ধে আশার কথা অত্যন্ত ক্ষীণ এবং অস্পষ্ট।

পৃথিবীর ডলার অভিমুখী একতরফা ব্যবসায়ের গতি বন্ধ করিবার জন্য অর্থভাণ্ডার এবারে সজাগ হইয়াছে। ইহার মতে আমেরিকার ব্যবসায়-নীতির পরিবর্তন করিলে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের গতি অনেক সহজ হইবে। প্রথমতঃ প্রয়োজন আমেরিকায় আমদানী করার পথ সুগম করা। ইহার জন্য প্রয়োজন আমেরিকার আমদানী শুল্কের হ্রাস, আমদানীর নিয়মকানুন সহজকরণ, কৃষিজাত দ্রব্যের আমদানীর পরিমাণ নির্দ্ধারণ ব্যবস্থার বিলোপ সাধন, জাহাজী নীতির পরিবর্তন এবং সর্ব্বোপরি "আমেরিকার জিনিস ক্রয় কর" (Buy American) সংক্রান্ত আইনগুলির রদবদল করা। সোজা কথায়, ডলার দেশগুলি যদি অধিক পরিমাণে ষ্টার্লিং দেশগুলি হইতে আমদানী করে তাহা হইলে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্র হইতে ডলার ঘাটতির সমস্যা বহুল পরিমাণে সমাধান হইবে। ১৯৫২ সনের দ্বিতীয় ভাগে আমেরিকার আন্তর্জাতিক দেনা-পাওনার খাতে ঘাটতি ছিল। তবে এই ঘাটতির কারণ ব্যবসায়গত নহে, আমেরিকার বিভিন্ন দেশগুলিকে ঋণদানের জন্য।

ডলার ঘাটতি আজ বিশ্ব-বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান সমস্যা। সামরিক সাহায্য বাদে ১৯৫২ সালে এই ঘাটতির পরিমাণ ছিল প্রায় ২৩০ কোটি ডলার। ডলার-ঘাটতি পূরণের জন্য আমেরিকার জাতীয় পরিকল্পনা সমিতির চেয়ারম্যান এবং বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যে নিযুক্ত নিউ ইয়র্কের একটি ব্যাঙ্কের প্রধান কর্ম্মচারী মিঃ এইচ. ক্রীশ্চিয়ানসন একটি তিন দফা পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথমতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অধিক পরিমাণে পণ্য আমদানী করিতে হইবে। তাঁহার মতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একশত কোটি ডলার পর্য্যন্ত আমদানী বৃদ্ধি করিতে পারে। আমদানী নিয়ন্ত্রণ ও শুল্ক ব্যবস্থার স্থায়িত্ববিধান করিতে হইবে তাহা হইলে বিদেশের উৎপাদনকারিগণ তাঁহাদের ব্যবসার ভবিষ্য সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা করিতে পারিবেন। যে সকল ছোট খাট ব্যবসায় বৈদেশিক প্রতিযোগিতার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হইবা সম্ভাবনা আছে তাহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য একটি জাতী কমিশন প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সুপারিশ করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ বিদেশে মার্কিন মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে। তবে সেইজন্য যে সকল দেশে মার্কিন মূলধন বিনিয়োগ করা হইবে সেই সকল দেশে বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়া ও অপরিবর্তিত পরিবেশ থাকা উচিত, নচেৎ সেই পরিবেশ ও আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ মার্কিন জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমবর্দ্ধমান হারে বৃদ্ধি করিতে হইবে।

মার্কিন কংগ্রেসের সাম্প্রতিক অধিবেশনে গৃহীত আমদানী-রপ্তানী কার্য্যে লিপ্ত ব্যাঙ্কসমূহের এবং পুনর্গঠন ও উন্নয়ন কার্য্যে নিযুক্ত আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কসমূহের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য যে প্রস্তাব গৃহীত হয় সেই অনুযায়ী সেনেটের ব্যাঙ্কিং ও কারেন্সী কমিটির উদ্যোগে ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত আর্থিক বিষয়সমূহ সম্পর্কে পর্য্যালোচনা সুরু হইবে। কমিটির চেয়ারম্যান সেনেটর হোমার ইকেপহার্ট বলেন, "আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে যে সকল সমস্যা রহিয়াছে তাহাদের সমাধানে ব্যাঙ্কিং ও কারেন্সী কমিটি এবং [নাগরিকদের] উপদেষ্টা কমিটি সাহায্য করিতে পারিলে আন্তর্জাতিক বুঝাপড়ার পথে অনেকখানি অগ্রসর হওয়া যাইবে। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষেও ইহা একটি প্রধান বিষয়।"

তিনি আরও বলেন যে, ব্যাঙ্কিং ও কারেন্সী কমিটি এবং নাগরিকদের উপদেষ্টা কমিটি প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার, ক্ল্যারেন্স বি. র‍্যাণ্ডেলের নেতৃত্বে এই সমস্যার কোন কোন বিষয় সমাধানের জন্য যে কমিশন গঠন করিয়াছেন তাহাকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিবে।

ভারতের অর্থনৈতিক নীতির প্রশংসা রিপোর্টে করা হইয়াছে। এ কথা বলা হইয়াছে যে, ১৯৪৯ সনে ও ১৯৫৩ সনের গোড়ার দিকে পাইকারী দ্রব্যের মূল্যমান প্রায় সমান ছিল—কিন্তু ইহা ভুল তথ্য। ১৯৪৯ সনের জুলাই মাসে পাইকারী দ্রব্যের সাধারণ মূল্যমান ছিল ৩৮০·৬ আর ১৯৫৩ সনের জুলাই মাসে ইহা ছিল ৪০৭·৫। ১৯৪৯ সনের জুলাই মাসে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যমান ছিল ৩৯৫·৯ আর এ বৎসর জুলাই মাসে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যমান ছিল ৪০৬·৪। মূল্যমান হ্রাসের দরুন ডলার দেশগুলি হইতে খাদ্য ও অন্যান্য আমদানীর খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় এদেশে পাইকারী দ্রব্যের মূল্যমান এবং জীবনযাত্রার মান উভয়ই বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৯৫২ সনে পৃথিবীর মোট সোনা উৎপাদনের মূল্য ছিল ৮৫·১০ কোটি ডলার, কিন্তু ১৯৫১ সনে ছিল ৮২·৮০ কোটি ডলার। ১৯৫০ সনে মোট ৮৪·৪০ লক্ষ ডলার মূল্যের সোনা উৎপাদন করা হইয়াছিল। এই হিসাবের মধ্যে অবশ্য কম্যুনিষ্ট দেশগুলির সোনা উৎপাদনের পরিমাণ ধরা হয় নাই।

শাহজাদা দারাশুকো

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো

দারার পরাজয় ও পলায়ন

[সামুগড়ের যুদ্ধ, ২৯শে মে, ১৬৫৮ খ্রীঃ]

১

আষাঢ়ের হ্রস্বযামা যামিনী প্রভাত হইবার পূর্ব্ব হইতেই আগ্রার অদূরে সামুগড় প্রান্তরে দারা ও আওরঙ্গজেবের অনীকিনী যুদ্ধার্থ ব্যূহবদ্ধ হইতেছিল। প্রায় এক প্রহর রাত্রি থাকিতে দারা স্বল্পসংখ্যক দেহরক্ষী অশ্বারোহী পরিবৃত হইয়া শিবির হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। শিবিরের সম্মুখে সারিবদ্ধ তোপখানা, তোপগাড়ীর পিছনে তোপখানার মনসবদারগণের তাঁবুর সারি, তাহাদের চাকর, খালাসী ও তোপের লটবহর। শাহজাদার অশ্বারোহিগণের জন্য তাঁবু উঠাইয়া রাস্তা করিবার হুকুম হইল। তাঁবুর সঙ্গে তোপখানার নূতন অফিসার ম্যানুসী সাহেবও উঠিয়া পড়িলেন। তিনি পূর্ব্বে কখনও লড়াই দেখেন নাই; কিছুক্ষণ পরে রাতের আঁধারে তিনিও ঘোড়ায় চড়িয়া বাহিরে কি হইতেছে দেখিবার জন্য চলিলেন; এই গোলমালে আরও অনেকে অন্য মতলবে গা ঢাকা দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। ছাউনীর বাহিরে সান্ত্রী পাহারা নাই, গুপ্তসঙ্কেত (password) তলব করিবার বালাই নাই। কিছুদূর ঘোড়া দৌড়াইয়া ম্যানুসী এক গ্রামে পৌঁছিলেন, গ্রামটা উজাড়—জনমানবশূন্য, পাশে টিলার মত উঁচু জায়গা। ঐ টিলার উপর বসিয়া তিনি চারিদিক দেখিতেছিলেন; এখনও ভোর হওয়ার অনেক দেরি, বিপক্ষের কোন সাড়াশব্দ নাই, অথচ ঐ স্থান অতিক্রম করিয়া এ পক্ষের ঘোড়সওয়ার যাহারা যাইতেছে তাহারা ফিরিতেছে না। ভোরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে দেখা গেল—অপর দিক হইতে স্বল্পসংখ্যক অশ্বারোহী পরিরক্ষিত একদল পদাতিক ও কয়েকটি উট দ্রুত গাঁয়ের দিকে আসিতেছে। উহারা গাঁয়ের কাছে আসিয়া থামিয়া গেল এবং ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া কিছু দূরে স্থান গ্রহণ করিল; উটগুলির পিঠে গাদাকরা "বোমা"; অর্থাৎ হাউইবাজি, পটকা, "হুক্কা" [ডাবার খোলাকৃতি পোড়ামাটির খোলে বারুদ ভর্ত্তি সেকেলে হাতবোমা] সূর্য্যোদয়ের পর দিগ্‌বলয়-রেখায় দেখা গেল বিপক্ষ সেনা পাঁচ অশ্বারোহী দলে বিভক্ত অথচ অবিচ্ছিন্ন ভাবে সচল অরণ্যানীর ন্যায় নিঃশব্দে ধীরমন্থর গতিতে অগ্রসর হইতেছে।

আরও একটু আড়াল হইয়া ম্যানুসী সাহেব মনের সুখে বেলা আটটা পর্য্যন্ত তামাশা দেখিতেছিলেন, এমন সময় ছাউনী হইতে হুকুম আসিল—যাহারা বাহিরে আছে তাহারা জলদি লাইনে ঢুকিয়া পড়ুক, তোপদাগা সুরু হইবে। ম্যানুসী সাহেব ঘোড়া দৌড়াইয়া কোনক্রমে ছাউনীতে ঢুকিয়া পড়িলেন; একজন মোগল সওয়ারও মানুসীর পিছে পিছে আসিতেছিল, তোপের প্রথম গোলায় বেচারা উড়িয়া গেল, অথচ তখনও বিপক্ষ সেনা অন্যূন তিন মাইল দূরে।

২

যাত্রার প্রাক্কালে আওরঙ্গজেব সেনাধ্যক্ষগণকে ডাকাইয়া প্রয়োজনীয় উপদেশ দেওয়ার পর বলিলেন, তোমাদের দৃষ্টিপথে আগ্রা; দৌলতাবাদ বহুদূর; পশ্চাতে চম্বল নর্ম্মদা, দুর্গম অরণ্য ও দুলঙ্ঘ্য বিন্ধ্যাগিরি; বাহাদুরীর ইনাম হিন্দুস্থানের ধনদৌলত ও দিল্লীর বাদশাহী; ভীরুতার পরিণাম মৃত্যু ও অপমান; কাফের দারার কবল হইতে সম্রাটের মুক্তি ও ইসলামের ইজ্জত রক্ষার ভার তোমাদের উপর—আল্লা তোমাদের সহায়।

আওরঙ্গজেবের সেনা সংখ্যায় বোধ হয় চল্লিশ হাজারের বেশী ছিল না, মোরাদের দশ হাজার অশ্বারোহী লইয়া তোপখানার লস্কর ও পদাতিক বাদ মোট পঞ্চাশ হাজার অশ্বারোহী। সম্মুখে অশ্বারোহী এবং পিছনে তোপখানা ও পদাতিকগণকে রাখিয়া আওরঙ্গজেব শিবির হইতে বেলা আটটায় যাত্রা করিয়াছিলেন, ঘোড়া হাতীও প্রায় গাড়ীর বলদের মত শম্বুক-গতিতে হাঁটিয়া চলিতেছিল। চারি ঘণ্টায় অনধিক চার মাইল খোলা ময়দান অতিক্রম করিয়া বেলা বারটায় সময় প্রায় মাইলখানেক দূরে আওরঙ্গজেবের অর্দ্ধচন্দ্র পতাকা ও লৌহগোলক-চিহ্নিত ধ্বজা দারার বাহিনীর দৃষ্টিগোচর হইল। যুদ্ধস্থলে পৌঁছিবামাত্র তোপখানা পশ্চাৎ হইতে ব্যূহের অগ্রভাগে চলিয়া আসিল; তোপখানার আড়ালে অশ্বারোহীদল পূর্ব্ব পরিকল্পনা অনুসারে শৃঙ্খলার সহিত ব্যূহবদ্ধ হইল; কোথাও চাঞ্চল্য নাই, বাহ্বাস্ফোটন নাই।

আওরঙ্গজেব নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার মহম্মদ সুলতানকে দশ হাজার অশ্বারোহীসহ রণব্যূহের "হরাবল" বা সূচীমুখে

স্থাপন করিলেন। কুমারের পাশেই তাঁহার সামরিক উপদেষ্টা-স্বরূপ রহিলেন "খান্‌খানাঁ" উপাধির দ্বারা সদ্য সম্মানিত অমিতপরাক্রম বিচক্ষণ সেনানী নেজাবত খাঁ। হরাবলের যোদ্ধৃগণ সকলেই মুসলমান, বেশীর ভাগই তাতার মোগল জাতীয়।

ব্যূহের বাম-পক্ষের (Left Wing) পরিচালক আওরঙ্গজেবের দক্ষিণহস্তস্বরূপ শাহজাদা মোরাদ্‌বখ্‌শ। ভীমকর্ম্মা মোরাদের অধীনে দশ হাজার রণকুশল অশ্বারোহী,—অধিকাংশই মোগল-তাতার জাতীয় পাকা সওয়ার। দক্ষিণপক্ষ (Right Wing) পরিচালনার জন্য মনোনীত হইয়াছিলেন বিশ্বাসী সেনানী ইস্‌লাম খাঁ। ইঁহার অধীনে বুঁদেলা, রাজপুত ও মুসলমানের পাঁচমিশালি ফৌজের মধ্যে দারার প্রতি বিশ্বাসঘাতক মহোবার রাজা চম্পৎরায় বুঁদেলা, ধামদেরার রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এবং রাও ছত্রসালের পুত্র সিংহপরাক্রম ভগবন্ত সিংহ হাড়ার নাম উল্লেখযোগ্য।

অতঃপর উভয় পক্ষের স্নায়ু-যুদ্ধ কিছুক্ষণ চলিতে লাগিল।

৩

পূর্ব্বদিনের স্নায়ু-যুদ্ধে দৃঢ়সত্ত্ব আওরঙ্গজেবের নিকট দারা পরাজিত হইয়াছিলেন; অপ্রস্তুত অবস্থায় শত্রুকে তিনি যুদ্ধে নামাইতে পারেন নাই, নিজে প্রস্তুত থাকিয়াও শেষ পর্য্যন্ত আওরঙ্গজেবকে আক্রমণ করিবার সাহস হয় নাই।

সেই দিন তিনি মাঝ রাতে অকারণে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন, সিপাহী সওয়ার মনসবদার কাহাকেও নিরুপদ্রবে ঘুমাইতে দেন নাই। আওরঙ্গজেব যথারীতি ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিয়া চুপচাপ তস্‌বী জপ করিতে করিতে হয় খোদাতালা না হয় লড়াইয়ের ধ্যান করিতেছিলেন, বাদবাকী মানুষ ও জানোয়ার নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছিল। পরের দিন সকাল আটটা বাজিতেই দারার ব্যূহবদ্ধ বিরাট বাহিনীর হাত-পা খিঁচুনি আরম্ভ হইল, চারিদিকে "আসিয়া পড়িল" চীৎকার; অথচ তখনও চার-পাঁচ মাইল দূরে আওরঙ্গজেব সবেমাত্র রেকাবে পা দিয়াছেন। সেইদিন ভোরবেলা দারার ছাউনীতে হিন্দু সিপাহীর খিচুড়ির ভড্ডু ও মুসলমানের ডেগ চড়িয়াছিল কিনা সন্দেহ; বলদের জল-ভুষি, ঘোড়ার ঘাস-দানা, হাতীর খোরাকের খবর কে রাখিবে? দুশ্‌মনের টিকির দেখা নাই; অথচ গোলা দাগিবার হুকুম, লড়াইয়ের বাজনা ও অনর্থক হৈ-হল্লা। ইহা অপেক্ষা স্নায়ু-বিকারের আর কি লক্ষণ থাকিতে পারে? ইহার উপর দিন বারটা পর্য্যন্ত আষাঢ় মাসের রৌদ্র মাথায় করিয়া ঠায় মাঠে দাঁড়াইয়া উদ্বেগ ও অপেক্ষা করিবার যন্ত্রণা ভোগ করিলে ৫০।৬০ হাজার সিপাহী লস্করের স্নায়ুবল অক্ষুণ্ণ থাকিবার কোন কারণ নাই।

বাবরশাহী কায়দায় বন্দুকধারী পদাতিক রক্ষিত তোপখানা লইয়া খোলা ময়দানে লড়াই করিতে হইলে দুইটি কৌশল অপরিহার্য্য ছিল; প্রথমতঃ, তোপখানাকে পাত্‌লা অশ্বারোহীশ্রেণীর পর্দার আড়ালে রাখিয়া শত্রুকে প্রথম আক্রমণের জন্য প্ররোচিত এবং প্রলোভিত করা; দ্বিতীয়তঃ, শত্রুর আক্রমণকে তোপখানার সম্মুখে প্রতিহত করিয়া নিজের দক্ষিণ ও বাম পক্ষের বাহিরে পার্ষ্ণিঘাতক সঞ্চরমাণ অশ্বসাদির দ্বারা শত্রুকে পরিবেষ্টিত ও বিব্রত করা। বাবরশাহী ব্যূহ আক্রমণাত্মক রীতির উপযুক্ত নহে। এই প্রকারের ব্যূহ স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া আগে পিছে সহজে নড়িবার সাধ্য নাই; অধিকন্তু, চলমান অবস্থায় আক্রান্ত হইলেই বিপদ। কুচ করিবার সময় রাস্তায় এই প্রকার আক্রমণ আশঙ্কা করিয়াই আওরঙ্গজেব অতি সন্তর্পণে বাহিনী চালিত করিতেছিলেন। ঐদিন সকালবেলা দারা যদি ফিরোজ-জঙ্গ বাহাদুরের মত সাহসী ও বিচক্ষণ সেনানীর অধিনায়কত্বে দশ হাজার অশ্বারোহী শত্রুকে রাস্তায় হঠাৎ হাম্‌লা করিবার জন্য পাঠাইয়া দিতেন কিংবা পশ্চাদ্ধাবমান শত্রুকে প্রতারিত করিয়া নিজ পক্ষের তোপখানার পাল্লার ভিতর লইয়া আসিতে পারিতেন তাহা হইলে সেদিন আওরঙ্গজেবের যাত্রাভঙ্গ হইত; কিন্তু দারার সেই সাহস ও রণপাণ্ডিত্য কোথায়? সকালবেলা সমগ্র বাহিনীর সহমরণ-ব্যবস্থা না করিয়া দারা যদি কয়েকটি সংবাদ-সংগ্রাহক অশ্বারোহীদল (scouting parties) সামনে পাঠাইয়া দিতেন কিংবা তাঁহার শিবিরের নিকটস্থ পূর্ব্বোক্ত উজাড় গ্রাম হইতে মুষ্টিমেয় শত্রুকে বিতাড়িত করিয়া দিতেন তাহা হইলে অহেতুক ত্রাসে নিজ পক্ষের মনোবল হ্রাস পাইত না।

দারা নিজ ছাউনী পিছনে রাখিয়া সৈন্যসজ্জা করিয়াছিলেন। স্থান-নির্ব্বাচন ভালই হইয়াছিল, পাশ কাটাইয়া শত্রুর পার্শ্ব কিংবা পশ্চাতে পৌঁছিবার উপায় ছিল না। সেনাব্যূহের সম্মুখে বালুকাভূমি, মাঝে মাঝে ফাটল, শুক্‌না ঝিল, উঁচু-নীচু ঢিবি; অশ্বারোহীর পক্ষে সুগম না হইলেও দুর্গম নহে। কিন্তু তোপখানা লইয়া পাল্লার ভিতরে আসা আয়াসসাধ্য ব্যাপার। এরূপ স্থানে যে পক্ষ আগুয়ান হইয়া অপর পক্ষকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিবে তাহারা উক্ত অসুবিধার দরুন বেকায়দায় পড়িবে। এইজন্য আওরঙ্গজেব দারাকেই আক্রমণে টানিবার ফিকিরে ছিলেন, ময়দানে উপস্থিত হইয়া তিনি লড়াইয়ের কোন গরজ দেখাইলেন না—দারার তোপখানার পাল্লার দ্বিগুণ দূরে থাকিয়া তাঁহার তোপখানা কয়েকটা হাউইবাজি ফাটাইয়া বাদশাহী ফৌজকে অভ্যর্থনা জানাইল। এইদিকে দারার তোপখানা পূর্ব্বেই গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিয়াছিল। চোখের দৃষ্টির পাল্লা ও

তোপের পাল্লা সেকালে সমান ছিল না; গোলা কতদূর যাইবে, কিসের উপর নিশানা করিবে এই বিবেচনার অবকাশ দারা তোপখানার মনসব্‌দারগণকে দিলেন না; ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাহাদিগকে তোপ দাগিবার হুকুম পাঠাইলেন। বাদশাহী তোপখানার গোলা ময়দানের মাঝখানে ফাটিতে লাগিল, আওরঙ্গজেবের কেশাগ্রও কম্পিত হইল না। ম্যান্থুসী*প্রমুখ তোপখানার ফিরিঙ্গী অফিসারগণ এইরূপ বৃথা পরিশ্রমে বিরক্ত হইয়া উঠিল।

৪

প্রায় এক ঘণ্টাকাল দারার শতাধিক কামান গর্জ্জনে যুদ্ধভূমি কাঁপিয়া উঠিল; ধূলি ও ধূম্রজালে ভূতল-আকাশ আচ্ছন্ন, উহার আড়ালে কোথায় কি ঘটিতেছে কাহারও দেখিবার সাধ্য নাই। আওরঙ্গজেবের তোপখানার আওয়াজ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া অবশেষে সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ হইয়া গেল, সেনাদল নিশ্চেষ্ট। দারা মনে করিলেন লড়াই আধা জিতিয়া লইয়াছেন—ইহা তাঁহার তোপখানার কেরামতি। এমন সময় বাহিনীর দক্ষিণ বাহুর অধিনায়ক ঘোড়া দৌড়াইয়া ছুটিয়া আসিলেন এবং দারাকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "শাহজাদা বুলন্দ-ইকবাল! আপনার ফতে মোবারক! দুশ্‌মন একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে; এখনই হাম্‌লা করিয়া ময়দানের মালিক হওয়ার সুযোগ।" মেসোর কথা দারার মতের সঙ্গে মিলিয়া গেল, পরামর্শ করিবার জন্য তিনি প্রধান সেনানায়কগণকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। খলিলুল্লার বক্তব্য শুনিয়া ফিরোজ-জঙ্গ বাহাদুর নিবেদন করিলেন, "শত্রুপক্ষ অনেক দূর হইতে আমাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছে; লড়াইয়ের কায়দা অনুসারে আমাদিগের উপর হাম্‌লা করা ব্যতীত তাহাদের গত্যন্তর নাই; সুতরাং তাহাদের আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করাই যুক্তিসঙ্গত। তোপখানার সামনে হাম্‌লা করিতে আসিলেই তাহারা বেকায়দায় পড়িবে, তখন আমরা আমাদের সুরক্ষিত অবস্থানের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া উহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িব।"

উক্ত অবস্থায় ইহাই ছিল ফিরোজ-জঙ্গের মত প্রবীণ সেনানী এবং দারার প্রকৃত হিতৈষীর উপযুক্ত উপদেশ; কিন্তু অসহিষ্ণু দারা স্নায়ু-যুদ্ধে আবার হার মানিলেন। এই উপদেশমত কাজ করিলে এই দিন যুদ্ধ না করিয়া আওরঙ্গজেবকে ব্যর্থকাম হইয়া নিজ শিবিরে ফিরিয়া যাইতে হইত, বহু সৈন্যক্ষয় করিয়া জয়ের অনিশ্চয়তার ঝুঁকি লইবার মত হঠকারী অপরিপক্ক যোদ্ধা তিনি নহেন; দারার বাহিনীকে পিছনে রাখিয়া আগ্রার দিকে অগ্রসর হওয়ার বিপদ তাঁহার অজানা ছিল না।

ধূর্ত্ত খলিলুল্লা দেখিলেন ঘাটে আসিয়াই বুঝি বেইমানীর ভরা ডুবিল। মহামানী ফিরোজ-জঙ্গের দুর্ব্বলতা কোথায় তিনি জানিতেন। তিনি কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক টিটকারী দিয়া বলিলেন, "দুশ্‌মনকে আমরা প্রায় সাবাড় করিয়া আনিয়াছি, একটু হিম্মত দেখাইলেই ফতে হাসিল হইয়া যায়। এমন সুযোগে হাম্‌লা না করিয়া বুজ-দিলের মত হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিবার কথা ফিরোজ-জঙ্গ বাহাদুরের মত নামী সিপাহ্‌-সালারের মুখে শুনিয়া আমি তাজ্জব হইয়া গেলাম।"

দারা খলিলুল্লার কথায় সায় দিয়া সেনানীগণকে স্ব স্ব স্থান হইতে একযোগে বিপক্ষব্যূহ আক্রমণ করিবার সরাসরি আদেশ দিলেন, তোপদাগা বন্ধ করিয়া কামানশ্রেণীর শিকল খুলিয়া দিয়া অশ্বারোহী হাতী-উটের নির্গমপথ পরিষ্কার করিবার হুকুম হইল।

৫

কিছুক্ষণ অশিব নিস্তব্ধতার পর রণস্থলে প্রলয়ের বিষাণ বাজিয়া উঠিল; যুগপৎ সহস্র তূর্য্যধ্বনি, শত শত দামামা-দুন্দুভির ভীম নির্ঘোষ, হস্তীর বৃংহিত, অশ্বের হ্রেষা ও কোষমুক্ত তরবারির ঝঞ্ঝনা যুদ্ধভূমি প্রকম্পিত করিয়া দারার সেনা-সমুদ্রে রণোন্মাদনার তুফান তুলিয়াছে। গোলার ধূম্রজাল আহত বালুকাভূমি-সমুত্থিত ধূলিরাশির দ্বারা আষাঢ়ের নির্ব্বাত মধ্যাহ্নে উভয় সেনার মধ্যে যেন কুজ্ঝটিকার পর্দ্দা টানিয়া দিয়াছে; যোদ্ধৃগণের শাণিত অসি ও বর্শা-ফলক এই আঁধারে উড্ডীয়মান খদ্যোৎপুঞ্জের ন্যায় যুদ্ধহস্তী-সমূহের কৃষ্ণ ছায়াকে পরিবৃত করিয়া সম্মুখে চলিয়াছে।

দক্ষিণে খলিলুল্লা, বামে ফিরাজ-জঙ্গ, মধ্যে হরাবল লইয়া স্ব স্ব বাহিনীকে ঘন সন্নিবিষ্টভাবে ব্যূহবদ্ধ করিলেন; কেন্দ্র-ভাগ দারার অধীনে কামানশ্রেণীর পশ্চাতে রহিল, অগ্রবর্ত্তী রিজার্ভ সেনা হরাবলের স্থান গ্রহণ করিল। দারার পৃষ্ঠরক্ষী কোন অশ্বসাদি ছিল না, এবং শিবির রক্ষার্থ কোন ফৌজ মোতায়েন রাখা তিনি প্রয়োজনীয় মনে করেন নাই।

অকস্মাৎ সর্ব্বপ্রথমে ব্যূহের বামপার্শ্ব হইতে বিকট যুদ্ধ-ধ্বনি উঠিল, তারপর রাজপুতের "মার মার" রণহুঙ্কার, শেষে তাতার অশ্বারোহীর ফার্সি "বে-কুশ্‌, বে-কুশ্‌" হানাহানি চীৎকার। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার ধাবমান অশ্বের খুরোত্থিত ধূলায় ধূম্রকুজ্ঝটিকা ভূতলচুম্বী মহামেঘের ন্যায় রণস্থলে দারার দৃষ্টিপথ অবরুদ্ধ করিল।

ফিরোজ-জঙ্গ বাহাদুর ও কুমার সিপহর শুকোর নেতৃত্বে দারার বামপক্ষ আওরঙ্গজেবের দক্ষিণ পক্ষকে আক্রমণ করিবার কথা; কিন্তু তাঁহারা সামনে শ্রেণীবদ্ধ শত্রুসেনা দেখিতে পাইয়া ঐ দিকে সৈন্য চালনা করিলেন, দশ সহস্র

* STORIA, i, 276.

উত্থিত তরবারি ঝড়ের বেগে শত্রুকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। বিপরীত দিকে কোন বাধা না পাইয়া ফিরোজ-জঙ্গের অশ্বারোহী দল অপ্রতিহত গতিতে নাগালের ভিতর পৌঁছিতেই তাহাদের রাস্তা হইতে শত্রুর অশ্বসাদি বিনাযুদ্ধে পিছু হটিয়া বামে দক্ষিণে সরিয়া গেল, হঠাৎ তোপখানার মৃত্যুবর্ষী অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। ঝাঁকে ঝাঁকে গোলাগুলির আঘাতে অশ্ব ও অশ্বারোহী ছিন্নাঙ্গ হইয়া ধরাশায়ী হইতে লাগিল।

ফিরোজ-জঙ্গের বাহিনী আওরঙ্গজেবের তোপখানার অধ্যক্ষ সফ-শিকন খাঁর কৌশলে মৃত্যুর মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল। এই অবস্থার জন্য পূর্ব্বে প্রস্তুত থাকিলে তোপখানা তাঁহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিত না। ফিরোজ-জঙ্গ দেখিলেন পতঙ্গের মত তোপখানার সামনে মরিলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না। তিনি তোপখানার পাশ কাটাইয়া উহার পশ্চাতে কিছুদূরে আওরঙ্গজেবের হরাবলের উপর হামলা করিতে চলিলেন। আওরঙ্গজেব তোপখানা ও হরাবলের জন্য আশঙ্কান্বিত হইয়া তাঁহার দক্ষিণ পার্ষ্ণি-রক্ষক বাহাদুর খাঁকে সামনে পাঠাইয়াছিলেন; মধ্যভাগে তাঁহার পাঁচ হাজার অশ্বারোহী ফিরোজ-জঙ্গের সেনার সহিত ভীষণ হাতাহাতি যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ বিপক্ষের আক্রমণে পর্য্যুদস্ত হইল, বাহাদুর খাঁ গুরুতর ভাবে আহত এবং তাঁহার সাহসী সহকারী সৈয়দ দিলাবর খাঁ ও হাদিদাদ খাঁ নিহত হইলেন।

৬

এই সুখবর পাইয়া দারার মাথা ঘুরিয়া গেল, ফিরোজ-জঙ্গ নিঃসন্দেহ যুদ্ধ জিতিয়াছেন মনে করিয়া বিজয়-বাদ্য বাজাইবার হুকুম দিলেন এবং মহা উৎসাহে বাহিনীর কেন্দ্র-ভাগ লইয়া ফিরোজ-জঙ্গের সাহায্যার্থ বাহির হইয়া পড়িলেন, তোপখানা পিছনে পড়িয়া রহিল। দারা বামে ঘুরিয়া আওরঙ্গজেবের দক্ষিণ পক্ষ আক্রমণ করিতে চলিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তোপ দাগিবার হুকুম পাঠাইলেন। ফিরিঙ্গী গোলন্দাজ-নায়ক এত বেকুব নহে, তোপ দাগিলে সামনে স্বপক্ষের লোকই মরিবে, হয়ত শাহাজাদার উপরও পড়িতে পারে; সুতরাং তাহারা দারার বুদ্ধির বাহবা দিয়া চুপ করিয়া রহিল।

বুদ্ধির দোষে দারাও সফ-শিকন খাঁর তোপের পাল্লার ভিতর পড়িয়া ফিরোজ-জঙ্গ অপেক্ষা মারাত্মক সম্বর্দ্ধনা পাইলেন, অগ্নিবর্ষণের মুখে তাঁহার বাহিনী বিব্রত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল, অথচ ইহার পাল্টা জবাব দেওয়ার উপায় নাই। নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া দারা তাঁহার তোপখানাকে আগাইয়া আনিবার জন্য হাতীর উপর হইতে ইশারা করিলেন; কিন্তু লাথি-জুতা-চাবুক ও বল্লমের খোঁচার কাজ ইশারায় হাসিল হইবার নয়। দারা হুড়মুড় করিয়া তোপখানা ফেলিয়া না আসিলে রক্ষী সেনাগণ উক্ত উপায়ে পদাতিক ও ছাউনীর দশ-পনর হাজার চাকর-বাকরকে দিয়া তাঁহার বিরাট তোপখানাকে টানাইয়া আওরঙ্গজেবের তোপখানার কাছাকাছি লইয়া আসিতে পারিত; শাহজাদার উপস্থিতিতে সকলেই শায়েস্তা থাকিত। দারার তোপখানা আওরঙ্গজেবের তোপখানা ঠেকাইয়া রাখিলে উভয়পক্ষের বল-সাম্য হইত; জয় না হইলেও যুদ্ধের ফল অন্ততঃ অমীমাংসিত থাকিত। স্বয়ং যুদ্ধে লাফাইয়া পড়িয়া দারা তাঁহার বুদ্ধির খেই ও লড়াইয়ের বাগ্‌-ডোর দুই-ই হারাইয়া বসিলেন। সেনাপতি হিসাবে ইহাই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা নিন্দনীয় ভুল এবং সর্ব্বনাশের প্রধান কারণ।

দারার অনুপস্থিতিতে কামান, গোলন্দাজ ও তাহাদের নায়কগণকে ফেলিয়া চাকর-বাকর ছাউনীর ভবঘুরে নাপিত কসাই সিপাহী সকলেই শাহজাদার তাঁবু লুঠ করিতে লাগিল। সেখানে সিন্দুক ভাঙ্গিয়া টাকা, আশ্‌রফী ও দামী জিনিষপত্র যে যাহা পাইল লুণ্ঠন করিতে লাগিল এবং পরস্পরের মধ্যে খুনোখুনি করিয়া মরিল কিংবা বাড়ী পলাইয়া গেল। কামানের গাড়ীর বলদ নাই, বলদ হাঁকাইবার লোক নাই, খালাসী-লস্কর নাই; এই অবস্থায় তাঁহার বিশ্বস্ত ফিরিঙ্গী অফিসারগণ কি করিবেন? তবুও তাঁহারা ঘোড়ায় চড়িয়া শাহজাদার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন, ইঁহাদের মধ্যে ম্যানুসী সাহেবও ছিলেন।

৭

দারা নিজ বাহিনীকে পুনঃস্থাপিত করিয়া সোজা আওরঙ্গজেবকে আক্রমণ করিতে চলিলেন। আওরঙ্গজেবের কেন্দ্রভাগ এবং হরাবলের মধ্যবর্ত্তী স্থানে পাঁচ হাজার অশ্বারোহী লইয়া অগ্রবর্ত্তী সংরক্ষিত সেনার অধিনায়ক শেখ মীর দারার গতিরোধ করিলেন। এইখানে প্রচণ্ড হাতাহাতি যুদ্ধ হইল। শার্দ্দূল বিক্রমে দারা যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন; শেখ মীরের অধিকাংশ সৈন্য হতাহত হইল, বাদবাকী পিছু হটিল। আওরঙ্গজেবের দক্ষিণ পার্ষ্ণি তখন সম্পূর্ণ অরক্ষিত, বাহাদুর খাঁ ফিরোজ-জঙ্গের সহিত আহত এবং তাঁহার অশ্বসাদি ও দক্ষিণ পক্ষের অধিনায়ক ইসলাম খাঁ বহুদূরে দারার বামপক্ষের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত। দারার সামনে আওরঙ্গজেবের অল্পসংখ্যক দেহরক্ষী সেনা। আওরঙ্গজেব উচ্চস্বরে সেনামুখ্যগণের নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন এবং সেনাগণকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। শেখ মীরের সেনাদল ভঙ্গপ্রায় দেখিয়া আওরঙ্গজেব হাওদার ভিতর হইতে দুই হাত তুলিয়া চীৎকার ছাড়িতেছিলেন, "ইয়া খোদা! ইয়া খোদা! তুমিই ভরসা!"

শেখ মীরকে পরাজিত করিয়া দারা তৃষ্ণা, রৌদ্র এবং যুদ্ধশ্রমে কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন ; আওরঙ্গজেবের কেন্দ্র-ভাগকে আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে তিনি একটু দম লইতে-ছিলেন। এই বিশ্রাম তাঁহার সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড করিল। এই অবসরে চারিদিক হইতে নূতন ফৌজ আনাইয়া আও-রঙ্গজেব তাঁহার ভগ্নপ্রায় ব্যূহ দৃঢ়সজ্জিত করিলেন। এইদিন দারা যদি আক্রমণ স্থগিত না রাখিয়া সোজা আওরঙ্গজেবের উপর গিয়া পড়িতেন তাহা হইলে তাঁহার সংখ্যাগরিষ্ঠতা শত্রুকে পরাজয়ের মুখে ঠেলিয়া দিতে পারিত।

ইতিমধ্যে দারার কাছে সংবাদ আসিল, রাও ছত্রসাল ও রাজপুতগণ শাহজাদা মোরাদকে পরাজিত করিয়া আওরঙ্গ-জেবের বাম পার্ষ্ণি আক্রমণ করিয়াছেন, এখন তাঁহাদিগকে অতি সত্বর সাহায্য করা প্রয়োজন। দারা ত্রস্তব্যস্ত হইয়া নিজ ব্যূহের বাম বাহুর শেষ হইতে দক্ষিণ বাহুর দিকে সেনাবাহিনী ফিরাইয়া লইলেন। আওরঙ্গজেবের তোপখানা পার্শ্ব হইতে গোলা দাগিয়া বহু অশ্বারোহীকে হতাহত করিল। হতাবশিষ্ট ক্লান্ত সেনাদলসহ তিনি রাজপুতগণের সাহায্যার্থ উপস্থিত হইয়া শুনিতে পাইলেন ডানে বামে সব শেষ হইয়া গিয়াছে, খলিলুল্লার খবর নাই ; রাও ছত্রসাল ও রামসিংহ রাঠোর নিহত, ফিরোজ-জঙ্গ বহু শত্রুসেনাদ্বারা আক্রান্ত হইয়া স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করিয়াছেন, কুমার সিপহর শুকো ও মুষ্টিমেয় যোদ্ধামাত্র রক্ষা পাইয়াছে।

৮

দারা তাঁহার বাহিনীর প্রাথমিক জয়মণ্ডিত বামপক্ষকে সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, বরং নিজের সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিলেন।

বাহাদুর খাঁর ধ্বংসপ্রায় ফৌজকে ফিরোজ-জঙ্গ যখন আওরঙ্গজেবের হরাবলের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছিলেন তখন শেখ মীরের অধীনে আওরঙ্গজেবের অগ্রবর্ত্তী রিজার্ভ পাঁচ হাজার অশ্বারোহী হরাবলের পিছন ঘুরিয়া হঠাৎ ফিরোজ-জঙ্গের বামপার্ষ্ণি আক্রমণ করিল, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ইস্লাম খাঁ-পরিচালিত শত্রুর অটুট দক্ষিণপক্ষের দশ হাজার অশ্বারোহী হাল্‌কা তোপ ও বন্দুকধারী পদাতিক তাঁহার দক্ষিণ পার্ষ্ণি ও পশ্চাৎ ভাগ পরিবেষ্টিত করিয়া ফেলিল। সংখ্যায় দ্বিগুণ নূতন শত্রুসেনার দ্বারা চতুর্দ্দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া ফিরোজ-জঙ্গ সাহায্যের আশায় সুকৌশলে অবিচলিত চিত্তে যুদ্ধ করিতেছিলেন।

স্থান ত্যাগ না করিয়া দারাও যদি আওরঙ্গজেবের মত মাথা ঠিক রাখিয়া কুমার রামসিংহ এবং সৈয়দ বহির খাঁর নেতৃত্বে অগ্রবর্ত্তী দশ হাজার রিজার্ভ অশ্বারোহী সেনাকে কামানশ্রেণীর আড়ালে গা ঢাকা দিয়া বামপক্ষের পরিত্যক্ত স্থান হইতে বাহির হইয়া সোজা যুদ্ধস্থানে পৌঁছিবার আদেশ দিতেন তাহা হইলে উভয় দিক রক্ষা পাইত ;—ফিরোজ-জঙ্গ শেখ মীর ও ইস্লাম খাঁর ফৌজকে ধ্বংস করিয়া সম্পূর্ণ বিজয়ী হইতেন।

যাহা হউক, যুদ্ধের অবস্থা দ্রুত সঙ্গীন হইয়া উঠিল। ফিরোজ-জঙ্গ ও দারার পুত্রকে জীবন্ত বন্দী করিবার উৎসাহে শত্রুপক্ষ হাম্‌লার পর হাম্‌লা করিতে লাগিল, উভয় পক্ষের বীর-রক্তে ভিজিয়া ময়দানের বালু হোলির আবির হইয়া পড়িল। রণস্থলে অচল শিলাখণ্ডের ন্যায় প্রোথিত ফিরোজ-জঙ্গের ব্যূহের উপর যুদ্ধ-তরঙ্গ বার বার প্রতিহত হইয়া যখন ভাটার মুখে চলিয়াছে, তখন একটি গুলি আসিয়া ফিরোজ-জঙ্গের এক বাহুতে বিদ্ধ হইল। তিনি বুঝিলেন এইবার শেষ পাড়ি দেওয়ার ডাক পড়িয়াছে। ফিরোজ-জঙ্গ হাতী হইতে নামিয়া হতাবশিষ্ট সেনার নিকট হইতে বিদায় লইলেন, এবং কুমার সিপহর শুকোকে মধ্যে রাখিয়া পিছনের দিক হইতে শত্রুর ঘেরাজাল ভেদ করিবার ভার ভীমকর্ম্মা বিশ্বস্ত সৈয়দগণের উপর ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। ভাঙ্গা হাত লইয়া শেষযাত্রার জন্য ফিরোজ-জঙ্গ ঘোড়ায় চড়িলেন, দ্বাদশ জন অশ্বারোহী স্বেচ্ছায় তাঁহার মরণের সাথী হইয়া অগ্রসর হইল। ক্ষুধার্থ সিংহযূথের ন্যায় ফিরোজ-জঙ্গের সহযাত্রী বীরগণ উপযুক্ত শিকারের সন্ধানে সম্মুখে অগণিত শত্রুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, অপর দিক হইতে অবশিষ্ট ফৌজ সমান তেজে যুদ্ধ করিতে করিতে কুমারকে লইয়া বাহির হইয়া গেল, ফিরোজ-জঙ্গ ও তাঁহার দ্বাদশ যোদ্ধা তরবারি দ্বারা শত্রুদলের মধ্যভাগে মৃতদেহের সমাধিস্তূপ রচনা করিয়া উহার মধ্যে চিরতরে শয্যা গ্রহণ করিলেন।

৯

দারার হরাবল এবং দক্ষিণপক্ষ ফিরোজ-জঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই অন্যদিক হইতে আওরঙ্গজেবের ব্যূহ আক্রমণ করিয়া-ছিল। খলিলুল্লা খাঁ দক্ষিণপক্ষ লইয়া মহা দাপটে মোরাদ-চালিত আওরঙ্গজেবের বামপক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ; দুই পক্ষে তীর বর্ষণ আরম্ভ হইল। কিছুক্ষণ পরে গায়ে আঁচ না লাগিতেই খলিলুল্লা তাহার দশ হাজার তাতার অশ্বারোহী লইয়া পিছু হটিতে লাগিলেন। মোরাদ নিজ-সেনাদলকে আগে বাড়াইয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হওয়ামাত্র খলিলুল্লা পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার দলের অল্পসংখ্যক রাজপুত ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। ধর্ম্মাতের যুদ্ধে কাসিম খাঁর ভূমিকার প্রথম অঙ্ক সামুগড়ে এই ভাবে অভিনয় করিয়া খলিলুল্লা অক্ষত শরীরে সরিয়া পড়িলেন।

মোরাদ এই সময়ে তাঁহার বামদিকে কিছু দূরে স্বপক্ষীয় জুলফিকর খাঁর তোপখানা পিছনে ফেলিয়া সামনে শত্রুকে তাড়া করিতেছিলেন। এই সুযোগে রাও ছত্রসাল জুলফিকর খাঁর কামানের পাল্লা এড়াইয়া মধ্যবর্ত্তী ফাঁকে হরাবল চালিত করিয়া আওরঙ্গজেবের ব্যূহের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন, মোরাদের বাহিনী আওরঙ্গজেব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। এইখানে রাজপুতগণ মোরাদের বাহিনীর উপর শার্দ্দুল-বিক্রমে ঝাঁপাইয়া পড়িল; মরণের ময়দানে মোরাদের হস্তীকে লক্ষ্য করিয়া হাড়া গৌর রাঠোরের বাজীর ঘোড়দৌড় আরম্ভ হইল। এই দৌড়ে বাহাদুরির প্রথম বাজি মারিয়া লইলেন রামসিংহ রাঠোর। পরিধানে কেসর বস্ত্র, উষ্ণীষে মোতির মালা, হস্তে করাল কৃপাণ লইয়া রামসিংহ অনুরূপ কেসর বস্ত্র পরিহিত মৃত্যুভয়শূন্য নিজ কুলের অশ্বারোহী পরিবৃত হইয়া ঘোড়ার লাগাম ছাড়িয়া মোরাদের প্রতি ধাবিত হইলেন। রামসিংহ মোরাদের তোপ অধিকার করিয়া শাহজাদার অগ্রবর্ত্তী রক্ষীসেনাকে ছত্রভঙ্গ করিলেন। এই আক্রমণের মুখে কেহই স্থির থাকিতে পারিল না। মোরাদের বিশ্বস্ত দেহরক্ষী সেনাগণ শাহজাদার হাতীকে মধ্যে রাখিয়া রুখিয়া দাঁড়াইল; রাজপুতের শব-বস্ত্রে রণস্থল যেন জয়লক্ষ্মীর জাফরানের গালিচায় সজ্জিত হইয়াছে, উহার চারি কিনারায় রক্ত-কর্দ্দমের লাল সালুর আস্তরণ। অবশেষে রাঠোর রামসিংহ মোরাদের সামনে পৌঁছিয়া বিক্রপভরে তারস্বরে মোরাদকে শুনাইলেন, "দারার সিংহাসন কাড়িয়া লইবে তুমি?" হাওদাস্থিত মোরাদের উপর শ্রাবণের ধারার স্থায় দৃঢ় হস্তমুক্ত তীরবৃষ্টি হইতে লাগিল। মোরাদ অসীম সাহসী বিচক্ষণ যোদ্ধা, এইরূপ সঙ্কটের মধ্যে যুদ্ধ পাইলেই তাঁহার আনন্দ। ভীমের কার্ম্মুক-মুক্ত গজকুম্ভভেদী নারাচের ন্যায় মোরাদের প্রত্যেকটি শর এক একজন রাজপুত অশ্বারোহীকে ধরাশায়ী করিতে লাগিল। প্রতিপক্ষের তীরবিদ্ধ হইয়া তাঁহার হাওদাও শঙ্কিত সজারু-পৃষ্ঠের ন্যায় কণ্টকিত হইল। রাঠোর রামসিংহ মোরাদের মাহুতকে হুকুম দিলেন, "যদি বাঁচিতে চাও, হাতীকে হাঁটুর উপর বসাও।" শাহজাদার হাতী জানু নত করিল না, মাহুতের মৃতদেহ মাটিতে পড়িয়া গেল।

এইবার মোরাদ ফাঁপরে পড়িলেন, হাতী সামলাইবেন, যুদ্ধ করিবেন, না নিজের শিশুপুত্রের প্রাণরক্ষা করিবেন? যুদ্ধের তামাশা দেখিবার জন্য মোরাদ তাঁহার অপোগণ্ড পুত্রকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন, তৈমুর-বংশে ইহা নূতন ব্যাপার নহে। মোরাদ উহাকে বাঁচাইবার জন্ম এক জানুর দ্বারা পুত্রের দেহ আড়াল করিলেন এবং ঢাল সামনে ধরিয়া পুত্রকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন; এই অবস্থায় তিনটি তীর তাঁহার মুখে বিদ্ধ হইয়া লাগিয়া রহিল। রামসিংহ মোরাদকে লক্ষ্য করিয়া হস্তস্থিত ভল্ল নিক্ষেপ করিলেন; মোরাদ নিজেকে বাঁচাইয়া শত্রুর প্রতি তাগ করিলেন—এই মৃত্যুবাণে রামসিংহ বীরশয্যা গ্রহণ করিয়া স্বামী-ঋণ-মুক্ত হইলেন। রাজপুতের পিছনে দায়ূদ খাঁর উপজাতীয় রণোন্মত্ত পাঠানগণ মোরাদের ভগ্নপ্রায় সেনার উপর শের-হামলা করিয়া ছুটিয়া আসিল। এই নূতন আক্রমণের মুখে মোরাদ হটিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন, তাঁহার নির্ভীক সেনাধ্যক্ষ ইহায়া খাঁ, সরফরাজ খাঁ এবং রাণা গরীবদাস নিহত হইলেন, হতাবশিষ্ট ফৌজ ইতস্ততঃ ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল।

১০

যুদ্ধের এই সঙ্কট-মুহূর্ত্তে আওরঙ্গজেবের সেনাপতিত্বের চরম পরীক্ষা হইয়া গেল। যোদ্ধা হিসাবে দারার উপর উচ্চ ধারণা না থাকিলেও যুদ্ধে নামিয়া প্রতিপক্ষের শক্তি ও বুদ্ধিমত্তা ছোট করিয়া দেখিবার মত অর্ব্বাচীনতা তাঁহার ছিল না। সে যুগের মোগল যুদ্ধরীতি অনুসারে শত্রুকে নিজ কেন্দ্রভাগ ও তোপখানার উপর আক্রমণ করিবার জন্য হয় প্রলোভিত কিংবা বাধ্য করিবার উপরই যুদ্ধের সাফল্য নির্ভর করিত। আক্রমণ করিবার সময় প্রথমে বাহিনীর পক্ষদ্বয় প্রতিপক্ষের বলাবল পরীক্ষা করিয়া সুবিধা করিতে পারিলে শত্রুর কেন্দ্রভাগকে পরিবেষ্টিত করিয়া ফেলিত এবং নিজপক্ষের কেন্দ্রভাগ ও তোপখানা অগ্রসর হওয়ার অপেক্ষায় থাকিত। শত্রুর পক্ষদ্বয় প্রবল হইলে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট স্থানে ফিরিয়া আসিয়া স্বপক্ষের তোপখানা ও কেন্দ্রের আশ্রয়ে যুদ্ধ করাই ছিল নিয়ম। নিজপক্ষের তোপখানা ও কেন্দ্রভাগ কেবলমাত্র যুদ্ধের শেষ পর্য্যায়ে রণক্লান্ত প্রতিপক্ষের উপর চরম আঘাত হানিবার জন্যই আগুয়ান করা হইত। দারার পক্ষদ্বয় এবং হরাবল "অপুনরাগমনায়" পণ করিয়া যুদ্ধে নামিবে, নিজের তোপখানা নিষ্ক্রিয় করিয়া দারা অসময়ে ব্যূহ ত্যাগ করিবেন এমন কাঁচা যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া আওরঙ্গজেব সামুগড়ে সৈন্যচালনা করেন নাই; তাঁহার বামে দক্ষিণে যুদ্ধের এত ঝড়-ঝাপটার মধ্যেও কুমার মহম্মদ সুলতান-পরিচালিত হরাবলের দশ হাজার অশ্বারোহী অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে বিনা হুকুমে একচুল নড়ে নাই। হরাবলের ফৌজ খরচ করা যে কথা, অশ্বারোহীর দীর্ঘ ভল্লের লোহার ফলা খুলিয়া তাহাকে ডাণ্ডাবাজী করিবার হুকুম দেওয়াও সেই কথা—ছত্রসালকে হাতছাড়া করিয়া দারা ঠিক এই কার্য্যই করিয়াছিলেন।

রাও ছত্রসাল মহারাজা যশোবন্ত নহেন; শৌর্য্য, স্থির বুদ্ধি ও রণকৌশলে মীর্জা রাজা জয়সিংহ ব্যতীত রাজপুতের

ধ্যে তাঁহার সমকক্ষ সেনানী সেকালে ছিল না। তিনি র্থার্থ আদিষ্ট হইয়া অভিমানী ফিরোজ-জঙ্গের মত সরাসরি াওরঙ্গজেবের তোপখানার উপর গিয়া পড়েন নাই ; তাঁহার ঞ্চনদৃষ্টি প্রতি ব্যূহের রন্ধ্র খুঁজিতেছিল। মোরাদের হঠ-গারিতা ও চালের ভুলের সুযোগে তিনি জুলফিকর খাঁর তাপখানাকে ফাঁকি দিয়া মোরাদ ও আওরঙ্গজেবের মধ্যস্থলে কিয়া পড়িয়াছিলেন। মোরাদের বিচ্ছিন্ন বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ রিয়া রাও ছত্রসাল ভ্রাতার সাহায্যার্থ আগুয়ান আওরঙ্গ-জবকে প্রচণ্ড বিক্রমে আক্রমণ করিলেন।

১১

মোগল-কুরুক্ষেত্রে এইবার ছত্রসাল-পর্ব্ব* আরম্ভ ইল। মোরাদকে আক্রমণ করিবার সময় রাও ছত্রসাল রাবলের পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিতেছিলেন, শত্রু-ব্যূহের মধ্যে প্রবিষ্ট তাঁহার বাহিনী ঐদিক হইতে আওরঙ্গজেবের আগমন-প্রতীক্ষায় ছিল। পলায়মান মোরাদের ফৌজকে ছাড়িয়া তিনি নবোদ্যমে শত্রুর কেন্দ্রভাগে আঘাত হানিবার জন্য লিলেন। এইবার সর্ব্বাগ্রে হাড়াকুল স্থাপিত হইল, রণ-গস্ত রাজপুত এবং পাঠানগণ পিছনে থাকিয়া পুনঃস্থাপিত রাবলের পৃষ্ঠরক্ষার ভার পাইলেন।

দিগ-বধূর বর-সাজে সজ্জিত বৃদ্ধ ছত্রসাল সানুচর এবং কুলপরিবেষ্টিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে চলমান সুমেরু-শৃঙ্গের ন্যায় ক্রমশঃ আওরঙ্গজেবের নিকটবর্ত্তী হইলেন। আগ্নেয়াস্ত্র ব্যতীত আওরঙ্গজেবের রাজপুতের তরবারির পাল্লার ভিতর ড়িতে দ্বিধাবোধ করিলেন। তাঁহার হালকা তোপ, উষ্ট্র-াহিত নালীকাস্ত্র (শোতর নাল)রক্ষী বন্দুকধারী পদাতিকগণ অবিরাম গোলাবৃষ্টি করিয়া রাজপুত অশ্বারোহীদের গতিবেগ াধ করিল। তোপখানা ও পদাতিকের সাহায্যবঞ্চিত দারার রোবল শুধু সাহসের জোরে ক্ষয়ক্ষতি উপেক্ষা করিয়া অসমান দ্ধ করিতেছিল। দূরে বিক্রান্তমূর্ত্তি আওরঙ্গজেব হাতীর উপর হইতে যুদ্ধ পরিচালনা করিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া অভীপ্সিত লক্ষ্যের দিকে রাও ছত্রসাল নিজের হাতী চালাইয়াছিলেন ; তাঁহার হাতীর উপর বিপক্ষের অগ্নিবর্ষণ কেন্দ্রীভূত হইল। এই অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে অগ্রসর হইবার সময় ছত্রসালের নাবালক পুত্র ভরত সিংহ, ভ্রাতা মুহকমসিংহ, কাকা হরিসিংহ ধরাশায়ী হইলেন। তাঁহার হাওদার উপর একটা গোলা ফাটিতেই হাতী বেসামাল হইয়া পিছনের দিকে ছুটিল। রাও ছত্রসাল তৎক্ষণাৎ লাফ দিয়া মাটিতে নামিলেন এবং সিংহগর্জ্জনে সেনাগণকে উৎসাহিত করিয়া বলিলেন, হাতী পলাইতে পারে, হাতীর মালিক কিন্তু পায়ে "রণ-লঙ্গর" লইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিবে না। ইহার পর হাড়াকুলের শেষযাত্রা সুরু হইল। রাজপুত প্রথা অনুযায়ী হতাবশিষ্ট জ্ঞাতিগণের সহিত "গাঁটছড়া" বাঁধিয়া আফিমের আখেরী মাত্রা পরস্পরের সহিত বিনিময় করিয়া অসিহস্তে ছত্রসাল সম্মুখে ধাবিত হইলেন।

অসুরপরাক্রম নাসিরী খাঁ এবং জুলফিকর খাঁর অপরাজেয় অশ্বসাদি কদম জমাইয়া সঘন কণ্টক-তরুশ্রেণীর ন্যায় অপ্রধৃষ্য মহামহীরুহ আওরঙ্গজেবকে বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছে, আফিম ও লড়াইয়ের নেশায় রাজপুতের বলাবল সাধ্য-অসাধ্য জ্ঞান নাই। রাও ছত্রসালের মরণের সাথীগণ ভৈরব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শত্রুসেনার এই গহন অরণ্যের মধ্যে দুই হাতে মানুষ ঘোড়া কোপাইতে কোপাইতে পশ্চাতে স্বপক্ষীয় অশ্বারোহি-গণের জন্য শবাস্তীর্ণ পথ প্রস্তুত করিয়া চলিল। এই বেকায়দার লড়াইয়ে পাকা জাহাঁবাজ সওয়ারও হতভম্ব হইয়া পিছু হটিতে লাগিল। প্রতি পদক্ষেপে নির্ভীক হাড়াকুল ধরাশায়ী হইতে লাগিল ; কিন্তু অগ্রগতির বিরাম নাই। রাও ছত্রসালের ছত্রপতাকাবাহী, আশ্রিতচারণ, জলভাণ্ডবাহক ও শূদ্রজাতীয় পরিচারকগণ রাজপুতের ন্যায় সমান বিক্রমে যুদ্ধ করিতে করিতে প্রভুর অনুগামী হইল। রাও ছত্রসাল এইভাবে যুদ্ধ করিতে করিতে শত্রুব্যূহের মধ্যভাগে অসংখ্য শস্ত্রাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া পিতামহ ভীষ্মের ন্যায় শরশয্যা গ্রহণ করিলেন।

রাও ছত্রসালের এই দুর্জ্জয় সাহস ও আত্মবলিদান দারার হরাবলের হিন্দু-মুসলমান প্রত্যেক যোদ্ধাকে অসম্ভব সম্ভব করিবার উগ্র উদ্দীপনা যোগাইয়াছিল। সেনাপতির মৃত্যুতে কোন হাহাকার উঠিল না, যোদ্ধার মুখমণ্ডলে বিষাদ ও নিরাশার ছায়া পড়িল না, কাহারও শস্ত্রমুষ্টি শ্লথ হইল না। যমপুরের বরযাত্রী বুন্দী হইতে যাত্রা করিয়া এইখানে নিরস্ত হইল না, এই বরাতে বুন্দীর পাঠান সামন্তগণ স্ব-স্ব গোত্রের যোদ্ধাদের সহিত উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাও ছত্রসালের পার্শ্বে যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ দিলেন, হতাবশিষ্টগণের মধ্যে একাধিক অস্ত্রচিহ্ন ধারণ না করিয়া কেহ বুন্দী ফিরে নাই।

বিবাহবস্ত্রসজ্জিত সালঙ্কার শবদেহাকীর্ণ রণভূমি

* বুন্দীর ঐতিহাসিক ও কবি সুরজমল রাজপুত শৌর্য্যের এই অপূর্ব্ব ধ্যায় অবলম্বনে এক স্বতন্ত্র কাব্য লিখিবার সঙ্কল্প করিয়া স্বরচিত "বংশ-াস্কর" মহাকাব্য হইতে এই অংশ বাদ দিয়াছিলেন, অথচ কাব্যও লেখা য় নাই। যাহারা এই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, কিংবা গুরুতর াহত হইয়া ফিরিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম গ্রন্থের পরবর্ত্তী অধ্যায়ে পাওয়া ায়। এই ময়দানের অন্তভাগে যুদ্ধে ব্যাপৃত ম্যানুসী সাহেব সমগ্র যুদ্ধের থাযথ বর্ণনা দিতে পারেন নাই ; ভুলভ্রান্তি গুজব অনেক আছে। আচার্য্য দুনাথ সরকারী-বেসরকারী ইতিবৃত্ত ও দলিলাদির সাহায্যে যে বিবরণ সঙ্কলন রিয়াছেন উহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য ও বিশদ, ছিটাফোঁটা মাত্র অন্যত্র পাওয়া যাইতে পারে।

চামুণ্ডার রুদ্র-বাসরের ভয়াবহ রূপ ধারণ করিয়াছে, কিন্তু কাহারও হৃদয়ে শঙ্কা নাই, ছত্রসালের কৃপাণ-কর্ত্তিত পথে পাঠান রাঠোর গৌর আওরঙ্গজেবের হাতীকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়াছে। আওরঙ্গজেবের দেহরক্ষী সেনাগণ ব্যূহবদ্ধ হইয়া দানব-বিক্রমে যুদ্ধ করিতেছিল, প্রতিপক্ষের শৌর্য্য-তরঙ্গ বার বার এই ব্যূহে প্রতিহত হইয়া মৃত্যুর ফেনা তুলিল; এই অশ্রান্ত প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে সুরধুনী-স্রোতস্পর্দ্ধী ঐরাবতের ন্যায় আওরঙ্গজেবের ব্যূহ টলিতে লাগিল। রাও ছত্রসালের মৃত্যুর পর জিঘাংসা-দীপ্ত দুঃশাসন-রক্তলোলুপ ভীমসেনের ন্যায় উগ্রকর্ম্মা ভীমসিংহ গৌর, শিবরাম গৌর প্রভৃতি চমূ-নায়কগণ শত্রুরক্তে হাড়াকুলের জন্য তর্পণাঞ্জলি প্রদান করিয়া শিবলোকে প্রয়াণ করিলেন। এইবার রাজা রূপসিংহের সিংহপরাক্রম রাঠোরগণ মৃত্যুকে লঙ্ঘন করিয়া স্বয়ং আওরঙ্গজেবের উপর আপতিত হইল। হাতীর সামনে ঘোড়া বেসামাল হইতেছে দেখিয়া রাঠোর রূপসিংহ মাটিতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং তলোয়ার লইয়া হাতীর উপর হাম্‌লা করিলেন। রক্ষিগণকে পরাভূত করিয়া তিনি হাতীর পেটের নীচে গিয়া পড়িলেন এবং হাতীর পেটির দড়ি কোপাইতে লাগিলেন। হাওদা সহ আওরঙ্গজেবকে মাটিতে নামাইতে না পারিয়া হাতীকে বসাইবার মতলবে উহার পায়ে এক কোপ বসাইয়া দিলেন; তখন তিনি একক, নিঃসহায়, তাঁহাকে রক্ষা করিতে গিয়া সহযোদ্ধগণ প্রাণবিসর্জ্জন করিয়াছেন। আওরঙ্গজেব প্রকৃত বীর, বীরের মর্য্যাদা তাঁহার কাছে কোন দিন ক্ষুণ্ণ হয় নাই। কাফেরের "জমঢাড়" [দীর্ঘ তরবারি] হজরত আলীর "জুলফিকর" তলোয়ারের পাল্লা লইতেছে দেখিয়া আওরঙ্গজেব স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইলেন; কিছুমাত্র ভীত না হইয়া গুণগ্রাহী আওরঙ্গজেব হাওদা হইতে ইশারা ও আওয়াজের দ্বারা নিজের রক্ষিগণকে রূপসিংহের উপর অস্ত্রাঘাত করিতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু রক্ষীরা উত্তেজনার মুখে জীবন্ত সিংহের উপর একযোগে ঝাঁপাইয়া পড়িল, বীরের বিদেহী আত্মা সূর্য্যলোক প্রাপ্ত হইল।

ভগ্নদূত এই দারুণ সংবাদ লইয়া শাহজাদা দারার সন্ধানে চলিল।

১২

যুদ্ধক্ষেত্রের বামভাগে দারা যখন আওরঙ্গজেবের অগ্রবর্ত্তী রিজার্ভ ফৌজকে ছত্রভঙ্গ করিয়া পরবর্ত্তী আক্রমণের জন্য একটু দম লইতেছিলেন তখন এই দুঃসংবাদ তাঁহার কাছে পৌঁছিল; দারা তাঁহার সামনে অসহায় আওরঙ্গজেব ও সুনিশ্চিত জয়ের সম্ভাবনাকে ছাড়িয়া চলিলেন। ইহাই তাঁহার কাল হইল, তিনি দুই দিকই হারাইয়া বসিলেন। তিনি যদি বিচলিত না হইয়া এই সময়ে সরাসরি আওরঙ্গজেবের ভগ্নপঞ্জর কেন্দ্রস্থ সেনার "কলিজা"র (*Qalb*) উপর সরাসরি হাম্‌লা করিতেন তাহা হইলে সংখ্যালঘিষ্ঠ এবং বামপার্শ্বি হইতে রাজপুত আক্রমণে বিব্রত শত্রুসৈন্য আওরঙ্গজেবকে রক্ষা করিতে পারিত কি না সন্দেহ।

বিচারমূঢ় সেনাপতি দারা তাঁহার নিজবাহিনীকে যুদ্ধস্থলের এক সীমান্ত হইতে অন্য সীমান্তে চালিত করিলেন। দারুণ রোদে বালুজমির উপর বামে দক্ষিণে প্রায় দেড় মাইল রাস্তা দৌড়াদৌড়ি করিতে করিতে ঘোড়াগুলি আধমরা হইল, সওয়ারের গায়ে ইস্পাতের সাঁজোয়ার রোদে তাতিয়া ফোস্কা ফেলিল, জলের অভাবে তৃষ্ণায় জানোয়ার ও মানুষের ছাতি ফাটিতে লাগিল; ইহার উপর আওরঙ্গজেবের তোপখানা হইতে অগ্নিবৃষ্টি। এই ভাবে শাহজাদার ক্রমশঃ ক্ষীয়মাণ সেনাদল অবশেষে তাঁহার হরাবলের সহিত মিলিত হইল।

দারার দক্ষিণ-পক্ষ লইয়া বিশ্বাসঘাতক খলিলুল্লা বিনা যুদ্ধে উধাও হইয়াছিল, ফিরোজ-জঙ্গের মৃত্যুর পর বামপক্ষের অস্তিত্ব রহিল না। শাহাজাদার বাহিনীর তখন রামায়ণের পক্ষদ্বয়-ছিন্ন জটায়ু পাখীর অবস্থা; অধিকন্তু রাবণের রথ গিলিবার জন্য হরাবল-চঞ্চুও ছত্রসাল-রামসিংহ-রূপসিংহের সহিত কাটা পড়িয়াছে। ইতিমধ্যে মোরাদ আওরঙ্গজেবের বামপক্ষকে পুনঃস্থাপিত করিয়া কেন্দ্রের বামপার্শ্বির সহিত মিলিত হইয়াছিল এবং বিজয়ী দক্ষিণ পক্ষ ইসলাম খাঁর নেতৃত্বে পলায়মান কুমার সিপহর শুকোকে তাড়া করিতে করিতে দারার পশ্চাৎ ভাগে আসিয়া পড়িল। মুষ্টিমেয় বিশ্বস্ত অশ্বারোহী কোন প্রকারে কুমারকে রক্ষা করিয়া দারার সহিত মিলিত হইল।

পড়ন্ত রোদে পশ্চিমমুখী হইয়া দারার বাহিনী আবার যুদ্ধ আরম্ভ করিল, বক্‌শী আক্তর খাঁর নেতৃত্বে হরাবল তখন দারার দক্ষিণ বাহু-স্বরূপ হইল, দারা স্বয়ং নিজ তাবিনের তিন হাজার অশ্বারোহী লইয়া ব্যূহমুখে আক্রমণার্থ প্রস্তুত হইলেন, তাঁহার বামপার্শ্বি কুমার সিপহর শুকোর সহিত মিলিত ভাবে বামপক্ষের স্থান গ্রহণ করিল। কেন্দ্রের বাকী নয় হাজার বাদশাহী ফৌজ এই পর্য্যন্ত শাহজাদাকে ঝড়-ঝাপটার মুখে ফেলিয়া তামাশা দেখিতেছিল, ইহাদের মধ্যে অনেকেই বাম দিক হইতে দক্ষিণে ফিরিবার সময় ইচ্ছা করিয়া পিছনে পড়িয়াছিল; যাহারা আসিয়াছিল তাহারা মধ্য ভাগে রহিল; কুমার রামসিংহ এবং সৈয়দ বহির খাঁর অধীনে দারার অগ্রবর্ত্তী দশ হাজার রিজার্ভ অশ্বারোহী বাদশাহী ফৌজের পিছনে ব্যূহের পৃষ্ঠরক্ষক (rearguard) রহিল। ময়দানের যেখানে খাদ ঢিবি টিলা-টক্কর ছিল, বাহাদুর বাদ-

শাহী আহদী রিসালা ঐগুলির আড়ালে লুকাইয়া ভাবিতে-ছিল, মরিয়া গেলে মরা সরকারে চাকরী করিবে কে? পাছে দারা জিতিয়া যায় এই আশঙ্কায় শুধু তাহারা পলায়নের অপেক্ষা করিয়া রহিল।

১৩

সাহায্যার্থ দারা উপস্থিত হওয়া মাত্র হরাবলের নির্ব্বাপিত-প্রায় বীর্য্যবহ্নির শেষ শিখা জ্বলিয়া উঠিল। রাজপুতগণ নায়কশূন্য হইয়াও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত ক্ষুধিত বৃকপালের ন্যায় প্রত্যেক বংশের যোদ্ধারা রণহুঙ্কারে যুদ্ধস্থল কাঁপাইয়া শত্রুসেনার মধ্যে শিকারের সন্ধানে চলিল, তাহাদের সামনে যাহারা পড়িল তাহারা রক্ষা পাইল না। অনিয়ন্ত্রিত শৌর্য্যশঙ্কার কারণ হইলেও পরিণামে ফলপ্রসূ হয় না। বহুগুণ অধিক শত্রুর দ্বারা পরিবৃত রাজপুতগণ দারুণ মার-কাট করিয়া স্বর্গের পথে চলিল। দারার বক্শী আস্কর খাঁ এবং দায়ুদ খাঁর কয়েক হাজার অশ্বারোহী অধিকতর শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া অচল শিলাখণ্ডের ন্যায় মোরাদের পাল্টা আক্রমণ প্রতিহত করিয়া শাহজাদার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল; এইবার তাহারা শেষ আঘাত হানিবার জন্য অগ্রসর হইল।

দারা অসীম সাহসে আওরঙ্গজেবকে লক্ষ্য করিয়া সম্মুখে সেনাচালনা করিলেন। এই সময়ে জুলফিকর খাঁর তোপ-খানা ও পাঁচ হাজার অশ্বারোহী বামপার্শ্ব হইতে তাঁহার বাহিনীকে আক্রমণ করিল এবং একই সময়ে শাহজাদা মোরাদ তাঁহার দক্ষিণ-পার্শ্বের উপর ভীমবেগে আপতিত হইলেন। কিছুক্ষণ তুমুল যুদ্ধ হইল, বক্শী আস্কর খাঁ ও দায়ুদ খাঁ নিহত হইলেন, দারার ব্যূহের দক্ষিণ পঞ্জর ভাঙ্গিয়া গেল; গোলাবর্ষণ ও নূতন সৈন্যের আক্রমণে বাম পঞ্জরও নিশ্চিহ্ন হইল। কুমার সিপহর শুকো ক্রমশঃ হটিয়া গেলেন, আওরঙ্গজেবের তোপখানা দ্বিগুণ তেজে সরাসরি দারার কেন্দ্রভাগের উপর অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ করিল, অথচ পাল্টা জবাব দেওয়ার মত দারার কাছে একটা হাউইবাজীও নাই—এক শত কামান পরিত্যক্ত অবস্থায় বহু দূরে পড়িয়া রহিয়াছে।

ঐতিহাসিক এবং প্রত্যক্ষদর্শী শত্রু-মিত্র কেহই সামুগড়ের যুদ্ধে দারার বুদ্ধির তারিফ করিবার অবকাশ না পাইলেও সকলে একবাক্যে শাহজাদার বেপরোয়া সাহস ও বিপদের মুখে অসামান্য দৃঢ়তার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। যুদ্ধের শেষভাগে ময়দানের যে অংশে গোলাবৃষ্টি সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক, যেখানে শত্রুর চাপে বাহিনী ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম, সেইখানেই উপস্থিত হইয়া দারা সৈন্যগণকে নূতন প্রেরণা যোগাইয়াছিলেন—তাঁহার দিকে চাহিয়াই ক্লান্ত ও শত্রু-বিমর্দ্দিত যোদ্ধ প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়া শেষনিশ্বাস পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতেছিল। হরাবলের রাজপুত সেনা ধ্বংস ও ফিরোজ-জঙ্গ নিহত হইবার পরেও মুসলমান সেনা দারার জন্য প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধ করিবে—আওরঙ্গজেব ইহা মনে করিতে পারেন নাই। আজীবন তিনি যাহাকে "পাগলের মুরব্বী", অর্ব্বাচীন ভীরু কাফের, কাতা-খোলা পণ্ডিত বলিয়া ঘৃণা ও অবজ্ঞা করিয়াছেন, যুদ্ধক্ষেত্রে নিশ্চিত পরাজয় ও মৃত্যুর মুখে তাঁহার দুর্জ্জয় পরাক্রম দেখিয়া আওরঙ্গজেব শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, দারা বাঁচিয়া থাকিতে বিপক্ষ সেনা রণে ভঙ্গ দিবে না; সুতরাং দেহরক্ষীবেষ্টিত দারার হাতীই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য হইল। এইবার আওরঙ্গজেব তাঁহার ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়িলেন। কুমার মহম্মদ সুলতান ও নেজাবত খাঁ হরাবলের দশ সহস্র অশ্বারোহী চর্ম্মবন্ধনীমুক্ত লেলিহান শিকারী চিতাবাঘের ন্যায় দারার বিধ্বস্ত বাহিনীর উপর হাম্‌লা করিল; আওরঙ্গজেব স্বয়ং কেন্দ্রস্থ সেনা লইয়া হরাবলের পিছন হইতে আক্রমণ পরিচালনা করিতে লাগিলেন। দারার উপর যাহাদের প্রাণের টান ছিল তাহারা শাহজাদার হাতীকে মধ্যে রাখিয়া অদ্ভুত দৃঢ়তা ও সাহসের সহিত দুশ্‌মনের তাজা ঘোড়া ও সওয়ারকে ঠেকাইয়া রাখিল, কিন্তু তাঁহার হাওদাকে তোপের নিশানা হইতে বাঁচাইবার উপায় নাই; আট দশ সের ওজনের গোলা কাহারও হাত কাহারও মাথা উড়াইয়া লইয়া গেল, নক্ষত্র-বৃষ্টির ন্যায় মাথার উপর জ্বলন্ত হাউইবাজি পড়িতে লাগিল। দারার দেওয়ান মহম্মদ সালেহ্, আলীমর্দ্দান খাঁর দুই পুত্র, দায়ুদ খাঁ পাঠান, বখ্‌শী আস্কর খাঁ এবং শৌর্য্যে অতুলনীয় বারহা-বাসী পাঁচ জন সেনানায়ক সিংহবিক্রমে যুদ্ধ করিতে করিতে শেষের ডাকে খোদার দরবারে এত্তালা দিতে চলিলেন। চাটুকার মতলব-বাজ মোসাহেব বলিয়া দারার যে সমস্ত অন্তরঙ্গ কর্ম্মচারী সাধারণের নিন্দাভাজন ছিল তাহারা অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া প্রভুর অকপট বিশ্বাস ও দয়া-দাক্ষিণ্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিল।

এই আক্রমণের মুখে দারা বিচার-বুদ্ধি ও মাত্রাজ্ঞান হারাইয়াছেন, কিন্তু দুর্জ্জয় অভিমান তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে; বিপদ যতই ঘনীভূত হইতেছে, স্বকৃত ভুলের অনুশোচনার ততই নিজের উপর কঠোরতা যেন বাড়িয়া চলিয়াছে। উজীর খাঁ প্রভৃতি তাঁহার কয়েকজন আমীর দারার সম্মুখেই ভূতলশায়ী হইলেন, তবুও শাহজাদা অকুতো-ভয়ে আগাইয়া চলিলেন। যাঁহারা দীর্ঘকাল একনিষ্ঠ সেবার দ্বারা তাঁহার উপর জোর চালাইবার সাহস অর্জ্জন করিয়া-ছিলেন তাঁহারা হাতীকে পিছনে হটাইয়া শাহজাদাকে

অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে হাওদা ছাড়িয়া নীচে নামিতে বাধ্য করিলেন*; এই তাড়াহুড়ার মধ্যে হাওদার ভিতরে তাঁহার লৌহকবচ অস্ত্রশস্ত্র (ধনু ব্যতীত ?) ও পায়ের জুতা পড়িয়া রহিল। দারা শিরস্ত্রাণরক্ষিত মাথা বাঁচাইয়া খালি পায়ে ঘোড়ার উপর চড়িলেন, একজন বালক ভৃত্য তাঁহার কোমরে তূণ বাঁধিয়া দিতেছিল, গোলার আঘাতে তাহার দেহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। যাঁহারা শাহজাদাকে হাতী হইতে নীচে নামিয়া আসিবার জন্য জিদ করিয়াছিলেন তাঁহারা কেহ পলাইয়া নিজেদের প্রাণ বাঁচাইবার মতলবে এইরূপ করেন নাই; তাঁহাদের কোনপ্রকার দুরভিসন্ধিও ছিল না; হাওদার ভিতরে নিশ্চিত মৃত্যুকে ডাকিয়া আনা অপেক্ষা ঘোড়ায় চড়িয়া যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়া শ্রেয়স্কর বিবেচনা করা ব্যতীত অন্য কোন অপরাধ তাঁহারা করেন নাই।

যাহা হউক, ইহার ফল বিপরীত হইল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত গজারূঢ় শাহজাদার ব্যক্তিত্ব ও পৌরুষ শক্তিশালী চুম্বক-খণ্ডের ন্যায় বাহিনীর খণ্ডাংশসমূহকে যুদ্ধক্ষেত্রে সংহত করিয়া রাখিয়াছিল। হাওদা খালি দেখিয়া দুরন্ত সেনাগণ ধরিয়া লইল দারা গতাসু হইয়াছেন, এখন কাহার জন্য তাহারা যুদ্ধ করিবে? বাদশাহী ফৌজ যেদিকে পারিল পলাইতে লাগিল, সর্ব্বপশ্চাতে কুমার রামসিংহের রাজপুতগণও এই ধাক্কায় সরিয়া পড়িল, শেষ পর্য্যন্ত হতাবশিষ্ট দেহরক্ষী ও কয়েক শত অশ্বারোহী দারাকে রক্ষা করিবার জন্য পড়িয়া রহিল। দক্ষিণ হইতে মোরাদ, বাম দিক হইতে জুলফিকর খাঁ, পশ্চাৎ ভাগ হইতে ইসলাম খাঁ দারার হতাবশিষ্ট সেনাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল; সামনে কুমার মহম্মদ সুলতান ও নেজাবত খাঁ, অশ্বারোহীতরঙ্গ; ভুলের চরে ঠেকিয়া ভাঙ্গা জাহাজের আনাড়ী কাপ্তান কতক্ষণ বাঁচিবেন? এই সময়ে ভীষণ ধূলিবৃষ্টি ও তাপ-প্রবাহ আওরঙ্গজেবের পিঠের উপর দিয়া দারার সৈন্যগণের মুখে আঘাত করিল; অপরাহ্নে সন্ধ্যার অন্ধকার—পাঁচ হাত দূরে লোকের মুখ দেখা যায় না; যাহারা "জল, জল" করিয়া চীৎকার করিতেছিল তাহাদের মুখ ধূলায় ভর্ত্তি, সর্ব্বাঙ্গে গরম হাওয়ার ছেঁকা। দারার পাশে তাঁহার কচি নাবালক পুত্র সিপহর শুকো আতঙ্ক ও যন্ত্রণায় কাঁদিতে লাগিলেন। বালকের ক্রন্দন শত্রুর শস্ত্রাঘাত অপেক্ষাও তীব্রভাবে তাঁহার মর্ম্মস্থলে আঘাত করিল, তিনি মৃত্যুর সন্ধানে সম্মুখে অশ্ব চালিত করিলেন। যাঁহারা নিজের প্রাণ অপেক্ষা দারার প্রাণের উপর অধিক মমতা রাখিতেন তাঁহারা পিতা-পুত্রের ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া আগ্রার পথ ধরিলেন। যাত্রার অবসানে শবাকীর্ণ রণভূমি কাঁপাইয়া আওরঙ্গজেবের বিজয়-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল।

১৪

মোগল-কুরুক্ষেত্রে এই ভাবে ধর্ম্মের পরাজয় হইল, ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ মহামানবতার ভিত্তির উপর জাতি, ধর্ম্ম, রাষ্ট্র ও ভাষার দ্বারা কালচক্রে খণ্ডিত ভারতের অঙ্গযোজনা করিয়া "মহাভারত" স্থাপনার আকবরশাহী স্বপ্নের এই সামুগড়েই শেষ সমাধি। যুগে যুগে ধর্ম্মের উপর অসুরবল-দৃপ্ত ছল-পরায়ণ অধর্ম্ম জয়লাভ করিয়াছে; পার্থসারথির মত কর্ণধার থাকিতেও ধর্ম্মের তরণী কুরুক্ষেত্রে প্রায় ডুবিতে বসিয়াছিল, অধর্ম্মের শক্তিকে উপেক্ষা করিলে ভবিষ্যতেও ধর্ম্মের পরাজয় ঘটিতে পারে।

সামুগড়ের যুদ্ধে দারাকে জয়ী করা খোদাতালারও অসাধ্য ছিল। দারার পরাজয়ের কারণ আওরঙ্গজেব, খলিলুল্লা নহেন, তাঁহারা নিমিত্তমাত্র। শাহজাহান পুত্রকে ফৌজ, তোপখানা অপরিমিত ধন দিয়াছিলেন, কিন্তু যাহা মগজে নাই উহা তিনি কেমন করিয়া দিবেন? লড়াইয়ের দাবাখেলায় আওরঙ্গজেব ও দারা যদি স্থানবিনিময় করিতেন তাহা হইলেও দারা আওরঙ্গজেবের ঘুঁটি লইয়া নিঃসন্দেহে হারিয়া যাইতেন, খলিলুল্লার বিশ্বাসঘাতকতা আওরঙ্গজেবকে কাবু করিতে পারিত না।

আওরঙ্গজেবের ব্যক্তিত্বের গুণে তাঁহার হাতে মাটি লোহা হইয়াছিল; দারার হাতে লোহাও মাটি হইয়া গেল। আওরঙ্গজেব অপেক্ষা তিন গুণ অধিক মনসব ও সুযোগ-সুবিধা পাইয়াও তিনি উহার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই। দারা স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়া হুকুম না চালাইলে ফিরোজ-জঙ্গ ও রাও ছত্রশাল যুদ্ধ অন্ততঃ অমীমাংসিত রাখিয়া বাহিনীকে নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরাইয়া আনিতে পারিতেন। দারার পরাজয়ের জন্য তিনিই সম্পূর্ণ দায়ী; এবং জয়ের বরমাল্য আওরঙ্গজেবের উপযুক্ত পুরস্কার—ইহা অস্বীকার করিলে সত্যের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়।

এই যুগের তুলনায় সেই যুগের হাতাহাতি যুদ্ধকে একটা বড় রকমের দাঙ্গা বলিলেই হয়। তিন-চারি ঘণ্টার মধ্যে সরকারী হিসাবে আওরঙ্গজেবের পক্ষে পাঁচ হাজার ও দারার পক্ষে দশ হাজার সৈন্য নিহত হইয়াছিল; বেসরকারী হিসাবে হয়ত আরও বেশী লোক মরিয়াছিল। দারার পক্ষে নামজাদা নয় জন রাজপুত এবং উনিশ জন মুসলমান সেনাধ্যক্ষ নিহত হইয়াছিলেন; আওরঙ্গজেবের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দাক্ষিণাত্যের দেওয়ান মুলতাফত খাঁ গরমেই মারা গিয়াছিলেন এবং চারি জন দ্বিতীয় শ্রেণীর মনসবদার লড়াই করিয়া মরিয়া-

* [illegible] ইহার জন্য খলিলুল্লাকে দোষী করিয়াছেন। খলিলুল্লা [illegible] [illegible] পড়িয়াছিলেন। ইহা জল্পনা ব্যতীত কিছুই নয়।

ছিলেন ; ইহা ব্যতীত বাহাদুর খাঁ প্রভৃতি আট জন আহত হইয়াছিলেন। সুজানসিংহ শিশোদিয়া ধর্ম্মাতের যুদ্ধ হইতে পলায়নের পর মোরাদের পক্ষে সামুগড়ের যুদ্ধে নিমকহালালী করিয়াছিলেন।

১৫

দারা ও সিপহর শুকোকে লইয়া হতাবশিষ্ট দেহরক্ষিগণ ঊর্দ্ধশ্বাসে ঘোড়া দৌড়াইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে তিন-চারি মাইল দূরে গিয়াছিল। শাহজাদা এইখানে এক গাছের ছায়ায় লোহ-শিরস্ত্রাণ খুলিবার জন্য বসিয়া পড়িলেন ; তাঁহার চোখে দুনিয়া আঁধার, সাজানো বাগান চোখের সামনে শুকাইয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে অনুসরণকারী শত্রুর দামামাধ্বনি নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, কিন্তু অনুচরগণের অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও দারা উঠিলেন না, পলাইয়া কি হইবে? অবশেষে তাঁহাকে ঘোড়ায় তুলিয়া সকলে সন্ধ্যার অন্ধকারে আগ্রার কাছে উপস্থিত হইল, শাহজাদা আঁধারে মুখ ঢাকিয়া নিজ প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। সেই করাল সন্ধ্যায় আগ্রা শহরের প্রতি গৃহে রোদনের ধ্বনি, ব্যাপক আতঙ্ক। ম্যানুসী খলিলুল্লা খাঁর হাবেলীর পাশ দিয়া যাইতেই এক বাঁদী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সাহেব আমাদের খাঁ সাহেবের খবর কি? খলিলুল্লার উপর ম্যানুসী হাড়ে হাড়ে চটা, হঠাৎ দুষ্ট বুদ্ধি মাথায় আসিল। তিনি খলিলুল্লার শোচনীয় মৃত্যুর এক বিশদ ও সম্পূর্ণ মিথ্যা কাহিনী বাঁদীকে শুনাইয়া তাঁহার বাড়ীতেও মরা-কান্নার রোল তুলিলেন।

পল্লী অঞ্চলের উন্নতি

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

পল্লী অঞ্চলের উন্নতির উদ্দেশ্যে ভারত-সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারসমূহ বড়, ছোট, মাঝারি বহু রকমের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। অনেক ক্ষেত্রেই এই সকল পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই কার্য্যকরী হইয়াছে। ট্রাক্টরের সাহায্যে বহু অঞ্চলের আবাদযোগ্য পতিত জমি সংস্কার করা হইয়াছে এবং হইতেছে। সিন্ধ্রীতে সারের কারখানা স্থাপন করা

পাটনা—সেন্ট্রাল পটেটো রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে প্রদর্শিত দুই সারি গোল আলু

হইয়াছে ; এবং ইতিমধ্যেই বহুল পরিমাণে রাসায়নিক সার প্রস্তুত হইতেছে, এবং পল্লী অঞ্চলে সরবরাহ করা হইতেছে, উন্নত শ্রেণীর বীজ উৎপাদনের জন্য গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, গবেষণা চলিতেছে, এবং গবেষণার ফলও ইতিমধ্যে পাওয়া গিয়াছে। কৃষির উন্নতির জন্য, বিশেষতঃ অধিকতর পরিমাণে খাদ্য উৎপাদনের জন্য আরও বহু রকমের পরিকল্পনা অনুসারে কাজ চলিতেছে। মাছের উৎপাদন বাড়াইবার জন্য "ট্রলার" হইতে আরম্ভ করিয়া খাল, বিল, পুকুর প্রভৃতিতে মাছের চাষ বাড়াইবার উদ্দেশ্যে বহু পরিকল্পনা আছে।

সিন্ধ্রি ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরির ভিতরকার একাংশ
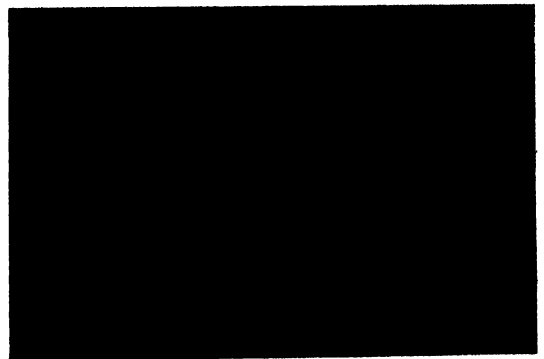
কিন্তু দুঃখের বিষয়, খাদ্যের ঘাটতি এখনও পূরণ হইল না, খাদ্য সম্বন্ধে দেশ এখনও স্বয়ংসম্পূর্ণ হইল না। পল্লী অঞ্চলের ব্যাপক উন্নতি এখনও দেখা যাইতেছে না ; জনসাধারণ অদ্যাপি অন্ন, বস্ত্র, এবং অন্যান্য অভাবে এখনও জর্জ্জরিত। অনেকের মতে জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ক্রমশঃ

জটিলতর হইয়া উঠিয়াছে এবং উঠিতেছে, সরকার কর্তৃক বহু প্রকারের পরিকল্পনা গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও "পল্লী অঞ্চলের প্রতি সরকারের আদৌ দৃষ্টি নাই"—ইহাই হইতেছে জনসাধারণের মত। ইহার কারণ অনুসন্ধান করা বিশেষ প্রয়োজন।

পাটনা—সেন্ট্রাল পটেটো রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে গবেষণা-কার্য্যে রত একজন গবেষক

জনসাধারণের সহিত সরকারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ নাই—ইহাই প্রধান অভিযোগ, উপরিস্থ কর্মচারিগণ উপরেই অবস্থান করেন, নীচে অবতরণ করেন না, কখনও কখনও নীচে অবতরণ করিলেও জনসাধারণের পক্ষে তাঁহাদের দর্শনলাভ দুঃসাধ্য। অথচ সরকারী মহল ও কংগ্রেস জনসাধারণের সহিত যোগাযোগের উপর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন। নিজের অভিজ্ঞতা হইতে প্রচুর উদাহরণ দিতে পারি যে, উপরিস্থ কর্মচারিগণ পল্লী অঞ্চলের কোন্ কোন্ স্থানে গমন করেন, প্রত্যেক স্থানে গমন করিয়া ক' ঘণ্টা অবস্থান করেন এবং কি কাজ করেন। এ সম্বন্ধে লেখা নিষ্প্রয়োজন, পল্লী অঞ্চলের প্রায় সকলেই এই জানেন।

প্রচারের অভাবে বহু পরিকল্পনা সম্বন্ধে জনসাধারণ একেবারে অজ্ঞ, আবার অনেক ক্ষেত্রে পরিকল্পনাসমূহের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করিতে হইলে এত বেশী লেখালেখি, হাঁটাহাঁটি করিতে হয়, যাহা সাধারণ পল্লীবাসীর পক্ষে সম্ভব নয়, আবার অনেক পরিকল্পনার এমন সব সর্ত্ত আছে, যাহা পালন কর প্রায় দুঃসাধ্য, এমন উদাহরণ আছে যে, কোন

পাটনা—সেন্ট্রাল পটেটো রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে গবেষণাকার্য্য

কোন পরিকল্পনার প্রাথমিক অনুসন্ধান শেষ হইবার পর কর্মচারিগণের অজ্ঞতার জন্য পরিকল্পনা অনুসারে কাজ আর অগ্রসর হইল না, যিনি পরিকল্পনার সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়াছিলেন অনর্থক তাঁহার হয়রানি হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছু অর্থদণ্ডও হইল, মৎস্য বিভাগের একটি পরিকল্পনার সুযোগ গ্রহণ করিতে গিয়া লেখক এই অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন।

ইংরেজ শাসনের আমলে কৃষি বিভাগের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ ছিল, তাহাদের মধ্যে একটি অভিযোগও বিদূরিত হয় নাই, বরং অভিযোগের সংখ্যা বাড়িয়াছে। এই সকল অভিযোগের মধ্যে প্রধান হইতেছে—(১) উৎকৃষ্ট ও উন্নত
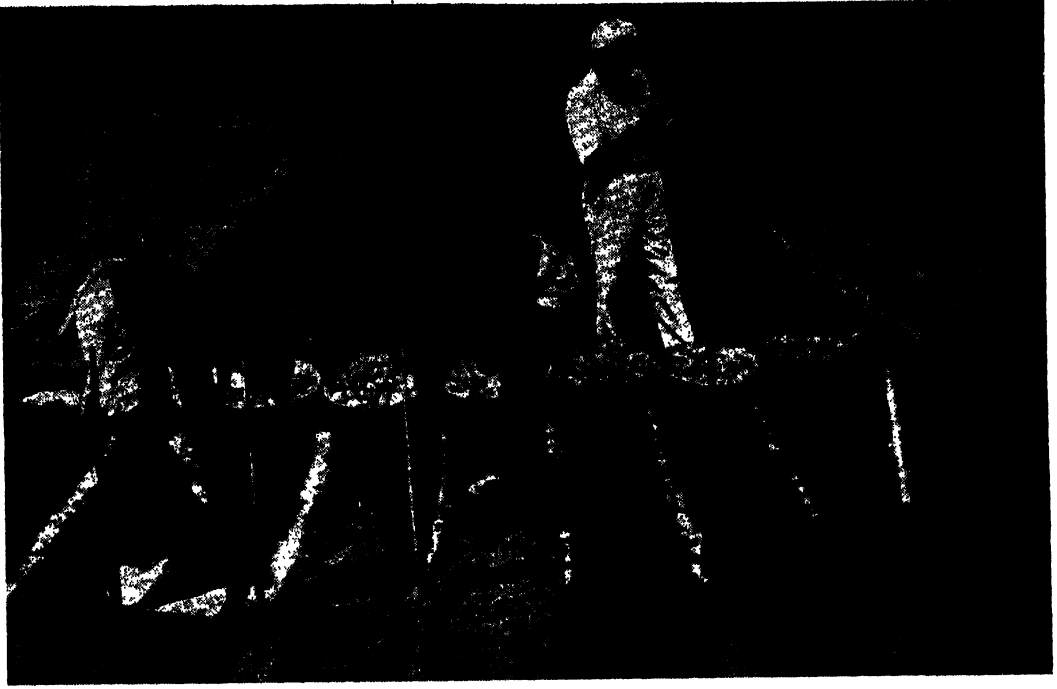
পাটনা—সেণ্ট্রাল পটেটো রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের কৃষিক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক ভাবে বীজ-আলু বপন

শ্রেণীর বীজের অভাব, (২) সারের অভাব, (৩) বপনের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইবার পর বীজ সরবরাহ, (৪) উপযুক্ত সময়ে সারের দুষ্প্রাপ্যতা এবং সর্ব্বোপরি, (৫) কৃষি বিভাগ কর্তৃক নিকৃষ্ট শ্রেণীর বীজ ও সার সরবরাহ; আরও বহু প্রকারের অভিযোগ আছে—যথা, সময়মত উপযুক্ত পরিমাণে কৃষি-ঋণ না পাওয়া, গোমড়কের সময় পশু-চিকিৎসকের অনুপস্থিতি ইত্যাদি। ইহার ফলে কৃষি বিভাগের উপর জনসাধারণের তেমন কোন আস্থা নাই। দেখা গিয়াছে যে, কৃষিবিভাগের বীজের অপেক্ষা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বীজের চাহিদাই অধিক; এবং শেষোক্ত বীজ অধিকতর মূল্যে ক্রয় করিতেই জনসাধারণ বেশী আগ্রহান্বিত। বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকদিগের বিভিন্ন রকমের অভাব, অসুবিধা ও প্রয়োজন, এ সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান না করিয়াই একই পরিকল্পনা অনুসারে সকল অঞ্চলেই একই রকমের বীজ, সার ইত্যাদি সরবরাহ করা হইয়া থাকে।

কৃষিবিভাগ অনেক নূতন নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাদের মধ্যে 'শস্য উৎপাদন প্রতিযোগিতা' একটি প্রধান পরিকল্পনা; আলু, ধান, গম—এই তিনটি প্রধান খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়াইবার উদ্দেশ্যে এই পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। ইহার জন্য প্রতি বৎসর বহু অর্থ ব্যয়িত হইতেছে, কিন্তু তাহার তুলনায় ফল বিশেষ কিছু পাওয়া যাইতেছে না, এক বিঘা জমিতে ৫০০ মণ আলু উৎপাদন করিয়া একজন ৫০০৲ টাকা পুরস্কার পাইলেন; কিন্তু ৫০০ মণ আলু উৎপাদন করিতে তাঁহার যে ব্যয় হইয়াছে, আলু বিক্রয় করিয়া তিনি তাহা উসুল করিতে পারিলেন না, তাঁহার ক্ষতি হইল। যাহা হউক, তিনি ৫০০৲ টাকা পুরস্কার পাইলেন বলিয়া তাঁহার ক্ষতি পূরণ হইয়া গেল; কিন্তু অন্য প্রতিযোগিতাকারীদের অবস্থা কি হইল? তাঁহারাও পুরস্কার পাইবার আশায় চাষের খরচের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া অধিকতর পরিমাণে শস্য উৎপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন, এবং অতিরিক্ত ব্যয় করিয়াছেন; শস্য বিক্রয় করিয়া খরচ উসুল করিতে পারিলেন না; ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। ইহাও দেখা গিয়াছে যে, যাঁহারা পুরস্কার পাইয়াছেন পরবর্ত্তী বৎসরে তাঁহারা জমির পরিমাণ বাড়ান নাই, কিংবা পুরস্কারও পান নাই। আমার এলাকার শ্রীযুত গিরীন্দ্রনাথ সাহা আলুর প্রতিযোগিতায় ৩০০৲ টাকা পুরস্কার পাইয়াছিলেন, তিনি আমাকে এ সম্বন্ধে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহা নিয়ে উদ্ধৃত হইল:

শ্রদ্ধের দেবেনবাবু!

আপনার চিঠি পেলাম। আলু চাষের পদ্ধতি ও খরচের একরপ্রতি হিসাব

কটক—সেণ্ট্রাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট সংশ্লিষ্ট পরীক্ষামূলক কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদিত চীনা ধান্ত
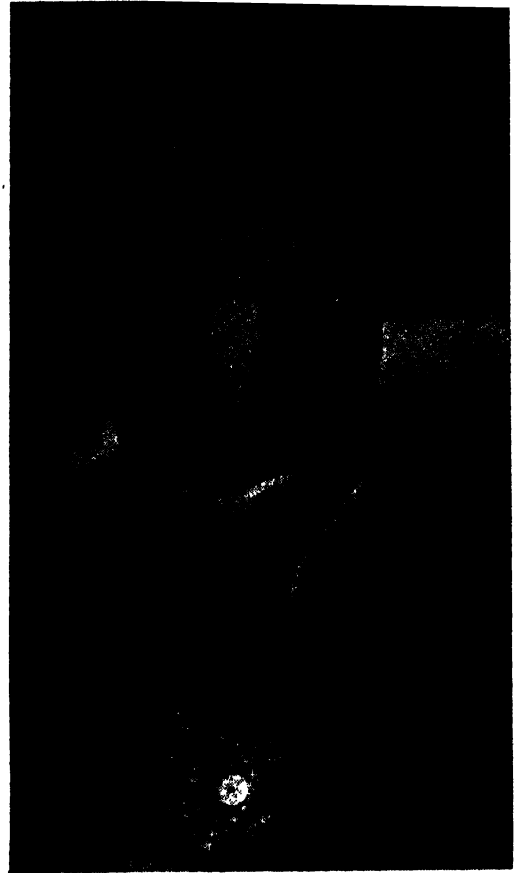
পাটনা—সেণ্ট্রাল পটেটো রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের ক্ষেতে উৎপন্ন একটি প্রকাণ্ড গোল আলু

লিখিলাম। আমার চাষে যা খরচ হয়েছিল তা মোটেই Economic হয় নাই। আশা করি আগামী বৎসর আলু চাষের সঠিক পন্থা যা সাধারণ চাষী কাজে লাগিয়ে বেশী ফলাতে পারবেন বলতে সক্ষম হব। যা হোক আমার পদ্ধতি যদি কারও কাজে লাগে তা হলে নিজেকে ধন্য মনে করব। আপনার স্বাস্থ্য ও কুশল কামনা করি।

ইতি
ভবদীয়
শ্রীগিরীন্দ্রনাথ সাহা

আলু চাষের বিবরণ ও খরচ : একর প্রতি

বীজ : গৌহাটি গোটা (১১৬ দিনে আলু উত্তোলন করা হইয়াছিল)

লাইনের দূরত্ব—২০" ইঞ্চি ; বীজ রোপণের দূরত্ব ৭॥ ইঞ্চি

পাট চাষের পর আলু চাষ। সার : হাড়গুঁড়া ৬/ মণ, গোবর সার ৪২০/, কম্পোষ্ট সার ১৫০/, ছাই ৬০/ মণ, খইল বাদাম ৩৩/ মণ, রেড়ি ৩৩/ মণ, মিশ্র সুসমসার ১৬॥, বীজ গৌহাটি বাছাই ২৫॥০ মণ।

বিশেষতঃ অন্যত্র কিছু বীজ রোপণ করিয়া রাখিয়াছিলাম, জমিতে যে স্থানে বীজ অঙ্কুরিত হয় নাই বা কমতেজি গাছ ছিল সেইস্থানে মাটিশুদ্ধ আলু গাছ লাগান হইয়াছিল অর্থাৎ ইহাতে জমিতে cent per cent গাছ ছিল।

জমি তৈয়ারি বাবদ

১। ১৫ ইঞ্চি গভীর কোপান (মজুর ৫৪টি ২৲ হিঃ)— ১০৮৲
২। ১৮টা চাষ (৫৪টা লাঙল ৩৲ হিঃ) ১৬২৲
ঘাটের গোড়া বাছাই ও ঢেলা বাছাই (১২টা মজুর ২৲ হিঃ) ২৪৲

সার বাবদ

৪।	হাড় গুঁড়া	৬	৪২৲
৫।	কম্পোষ্ট সার	১৫০/	২৪
			তৈয়ারি বহন ও জমিতে ছড়ান
৬।	গোবর সার	৪২০/	৩৬৲
৭।	ছাই	৬০/	১২৲
৮।	খইল বাদাম	৩৩/	৪২৭॥০
৯।	খইল রেড়ি	৩৩/	৪৬৫৲
১০।	মিশ্র (সুসম) সার	১৬॥ (Shaw Wallace Co)	২০৬৷৩

বীজ

১১।	গৌহাটি বাছাই (গোটা)	২৫॥০	১১৪৭॥০
১২।	আলু রোপণ (মজুর ৩৬টা ২৲ হিঃ)		৭২৲
১৩।	নিড়ান (বুক কোপান) (১৮টা মজুর)		৩৬৲
১৪।	ঐ (কোঁড় দেওয়া ও গাছ ধরিয়া দেওয়া (১৮টা মজুর)		৩৬৲
১৫।	ভেলি বাঁধা	(৩৬ মজুর)	৭২৲

সেচ

১৬।	৪টা কাপটান সমেত মোট ১৮টা সেচ	মজুর ২৲	৩৬৲
১৭।	পাম্পিং মেসিনের খরচ		১০৮৲
১৮।	আলু উত্তোলন	(৪২টা মজুর)	৮৪৲
			৩০৮৮৷০

কটক—রাইস রিসার্চ ইনষ্টিটিউট সংশ্লিষ্ট কৃষিক্ষেত্রে ধানের চারা রোপণ

উপরে উদ্ধৃত পত্র হইতেই শস্য উৎপাদন প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য কতদূর সাধিত হইতেছে তাহা অনেকটা বুঝা যাইবে। শস্য উৎপাদন প্রতিযোগিতায় আয়ব্যয় প্রধান লক্ষ্য হওয়া দরকার; লেখক যখন ফরিদপুর জেলার কৃষি-কর্ম্মচারী ছিলেন, তখন ফরিদপুর কৃষি-প্রদর্শনীতে নানাবিধ শস্যের জন্য যে পুরস্কার দেওয়া হইত তাহার মধ্যে জেলের শাকসব্জীর এবং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, জেলা জজ প্রভৃতির বাগানে উৎপাদিত শাকসব্জীর গুণাগুণ সাধারণ কৃষকদের উৎপাদিত শাকসব্জীর সহিত বিচার করা হইত না; কারণ প্রথমোক্ত উৎপাদকগণের নিকট ব্যয়ের কোন প্রশ্ন ছিল না। তাঁহারা প্রচুর ব্যয় করিয়া হয়ত বৃহৎ আকারের আলু,

কপি ইত্যাদি উৎপাদন করিয়াছেন যাহা সাধারণ কৃষকের পক্ষে মোটেই সম্ভব নহে। জেলের এবং কর্ম্মচারিগণের শাকসব্জী পৃথকভাবে বিচার করা হইত, এবং প্রধানতঃ তাঁহাদিগকে সার্টিফিকেট দেওয়া হইত।

সিন্ধ্রি ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরির কর্ম্মচারীদের জন্য নির্ম্মিত ই-টাইপ বাসভবন

সুতরাং বর্ত্তমান প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি-গণের খরচ এমন হওয়া উচিত যাহা শস্য বিক্রয় করিয়া উসুল করা যাইবে এবং যাহা সাধারণ কৃষকের সাধ্যায়ত্ত হইবে। কৃষি বিভাগ এইরূপ অকেজো বহু পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা পল্লী অঞ্চলের কোন উন্নতি সম্ভব নয়।

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যুবকগণ পল্লী অঞ্চলে অবস্থান করিয়া ৩০।৩৫ বিঘা জমিতে (এক লপ্তে) উন্নত উপায়ে কৃষিকার্য্য করিয়া মোটামুটি সুখে স্বচ্ছন্দে জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারেন, এই উদাহরণও কৃষি বিভাগ দেখাইতে পারেন নাই। পল্লী অঞ্চলের বহু যুবক এইরূপ উদাহরণের অভাবে বেকার বসিয়া আছে; তাঁহাদের আগ্রহ, অর্থ, জমি—সবই আছে, কিন্তু এই পরিমাণ জমি হইতে যে, গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হইতে পারে সেই দৃষ্টান্ত তাঁহাদের সম্মুখে নাই। পল্লী অঞ্চলের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যুবকগণকে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রেই এইরূপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করা দরকার। 'জমির দিকে ফিরে চল' কেবল এই শ্লোগানে বা ধুয়াতেই বিশেষ কিছুই ফল হইবে না। এই উদ্দেশ্যে একটি কার্য্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। এ সম্পর্কে একটি 'খসড়া পরিকল্পনা লেখক কর্তৃপক্ষস্থানীয়দের নিকট পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু কোন ফল হয় নাই।

পশ্চিমবঙ্গ কৃষি বিভাগের একটি উপদেষ্টা কমিটি আছে, এই কমিটির অধিবেশন খুব কমই হয়। আবার কমিটির সুপারিশও সরকার সব সময়ে গ্রহণ করেন না, কিংবা কমিটির সুপারিশ অনুসারে সব সময়ে কাজ হয় না। প্রধান কথা, এই কমিটিতে কৃষকের স্থান নাই, এবং এই কমিটির সহিত পল্লী অঞ্চলের কোন যোগাযোগ নাই। পল্লীর জনসাধারণ

এই কমিটির অস্তিত্বও জানেন না। এই কমিটির কার্য্যাবলী, সুপারিশ প্রভৃতি কখনও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় নাই।

এ কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না যে, কৃষির উন্নতির উপরেই পল্লী অঞ্চলের উন্নতি সর্ব্বপ্রথম নির্ভর করে ; কৃষিকে উন্নত ও অর্থকরী করিতে পারিলে পল্লী অঞ্চলের অন্যান্য উন্নতি সহজসাধ্য হইবে। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন রকমের পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে। এই সকল পরিকল্পনার মধ্যে জলসেচনের ব্যবস্থাই সর্ব্বাগ্রে করা দরকার ; সঙ্গে সঙ্গে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থাও করিতে হইবে। সুতরাং কৃষি বিভাগের বর্ত্তমান পরিকল্পনাগুলির সংশোধন করা আবশ্যক।

ধান, আলু প্রভৃতি অনেক রকম শস্য সম্বন্ধে গবেষণা চলিতেছে, এই সকল গবেষণা ফলপ্রসূ হইয়াছে, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তবে যে অভিযোগ পূর্ব্বেও ছিল সেই অভিযোগ এখনও আছে। সেই অভিযোগ হইতেছে প্রচার ও প্রদর্শনের অভাবে এবং ত্রুটিতে গবেষণার ফল কৃষকেরা সম্যকভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। এই অভিযোগ দূর করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক।

মায়ালতা

শ্রীঅনুরূপা দেবী

আমার জীবনে
এসেছিলে জীবনের কোন্ সেই মহা সন্ধিক্ষণে,
আমাদের দেখা
হয়েছিল কি সে তিথি পাঁজির পাতায় ছিল লেখা।
জানা তো ছিল না,
আজ কি খুঁজিয়া পাবো সেদিনের সেই পাঁজিখানা ;
বহু বহু দিন
তার পর কেটে গেছে, মন হতে হয় নি বিলীন ;
কিশোর সে প্রাণ
বুঝিতে করে নি ভুল, সেও দিয়েছিল প্রতিদান।
এত ভালবাসা
নিমেষে বদল পাবো—আমি তো করি নি তত আশা ;
কেমনে এ হয় ?
যার সাথে কোন দিন কোনই ছিল না পরিচয় ;
একটি নিমেষে,
জীবনে পড়িল বাঁধা দু'জনে, দু'জনে ভালবেসে !
আজও পড়ে মনে
নিয়ত ছুটেছে প্রাণ তব প্রতি কি সে আকর্ষণে।
কাছে পাইবারে,
ঠেলেছে বিপুল বাধা উন্মাদ হইয়া বারে বারে।
এর পরিচয়,
কেমনে পাইবে অন্যে, এ প্রেম তো জাগতিক নয় !
মাস বর্ষ দিনে,
দু'জনের ভালবাসা দু'জনারে নিয়েছিল জিনে,
আত্মার আত্মীয়,
তাই বুঝি হয়েছিলে প্রিয়তম হইতেও প্রিয় ?
বহু সুখে দুঃখে
একটি সুরের ধ্বনি ধ্বনিয়া উঠেছে দুটি বুকে।
গভীর আঘাতে
বুক যবে ভেঙ্গে গেছে, নীরবে ফিরেছ সাথে সাথে।
মনে দিতে বল,
গভীর মমতামাখা ফেলিয়াছ সাথে অশ্রুজল।
একটুকু সুখ
হেরিয়াছি, কি আনন্দে সুপ্রফুল্ল করিয়াছে মুখ।
চলে গেছ আজ
শেষ করে জীবনের ছিল যাহা সুনির্দ্দিষ্ট কাজ।
জানো কি এ কথা,
তোমার বিচ্ছেদ দিয়ে জ্বেলে গেছ কতগুলি চিতা !
করিয়া কৌতুক
কখনও দাও নি ব্যথা ; আজ কেন ভেঙ্গে দিলে বুক ?
অথবা তোমার
আত্ম-জীবনের 'পরে ছিল না তো কোন অধিকার।
হোক, তাই হোক,
আঁখিতে শুখাক্ অশ্রু মন হ'তে মুছে যাক্ শোক,
জীবনে যখন
বিচ্ছেদ ঘটে নি কভু, বিচ্ছিন্ন কি করিবে মরণ ?
তোমার আমার
আবার মিলন হবে—রহিলাম সেই প্রতীক্ষার।

সত্যিই গল্প, সত্যি নয়

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

ছেলেবেলায় একজন বিখ্যাত সাহিত্যিকের লেখায় পড়েছিলাম জীবনে যা ঘটে না তা নিয়ে নাকি সাহিত্যরচনা হয় না। তখনও আমি লিখতে সুরু করি নি, কিন্তু সাহিত্যিকদের শ্রদ্ধা করতে সুরু করেছি। বোধ হয় সেই কারণেই কথাটা ভাল লাগে নি, মনে হয়েছিল। তিনি অন্যান্য সাহিত্যিকদের নিকৃষ্ট কল্পনা-শক্তির প্রতি কটাক্ষ করছেন বুঝি। তারও অনেক দিন পরে যখন ধীরে ধীরে লিখতে আরম্ভ করেছিলাম তখন এক দিন চমকে উঠে দেখি আমার সব গল্পগুলোই 'সত্য ঘটনা অবলম্বনে' লিখিত। ব্যাপারটা আবিষ্কার করে প্রথমে একটু ভীতও হয়ে পড়েছিলাম—আমার গল্প-উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারা তা হলে অবাস্তব নয়! তাদের কারও সঙ্গে আমার দেখা হচ্ছে দু'বেলা, কারও সঙ্গে চার-বেলা, কারও সঙ্গে দীর্ঘদিনের ব্যবধানে। তাদের কেউ আমাকে দেখে হাসে, কথা কয়, কেউ শুধু নমস্কার করে চলে যায়—কেউ শুধু মুখই চেনে আমার। কিন্তু তারা যদি জানতে পারে—আমি তাদের নিয়ে সাহিত্যরচনা করছি, তাদের বিশেষত্বগুলো ছাপার অক্ষরে অক্ষয় করে রাখছি, তা হলে? তা হলে কি আর কেউ আমার সঙ্গে মিশবে অথবা বিশ্বাস করে কথা কইবে? কি জানি, হয়ত এমনও হতে পারে আমার নামে তারা মানহানির মামলা আনবে। অবশ্য সে ভয় আমার বেশী দিন থাকে নি। লেখাগুলো ভাল করে নেড়ে-চেড়ে নিঃসন্দেহ হয়েছিলাম—কতখানি কল্পনা আর কতখানি সত্য ঘটনা আমি মেশাই সেকথা আমি ছাড়া আর কেউ জানতে পারবে না, নায়ক-নায়িকাদেরও কেউ চিনতে পারবে না, এমনকি নিজেদেরকেও চিনতে পারবে না তারা।

কিন্তু মুশকিলে পড়েছি রাধামোহনকে নিয়ে। রাধামোহন আমার সর্ব্বশেষ উপন্যাসের নায়ক। তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হ'ত প্রায় রোজই, তবে দু'বেলা নয়, একবেলা। প্রায় প্রতিদিনই এক ট্রামে যেতাম দু'জনে, একেবারে পাশেও বসতাম কোন কোন দিন। তিনি নিশ্চিন্ত মনে গল্প করে চলতেন বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে, আর এদিকে আমি তাঁকে লক্ষ্য করে যেতাম আগাগোড়া, তাঁর প্রতিটি কথা টুকে নিতাম মনের নোট বইয়ে আর রেকর্ড করে নিতাম তাঁর প্রতিটি হাবভাব। প্রথম তাঁকে দেখেছিলাম বোধ হয় তিন বছর আগে, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে প্রথম সচেতন হয়ে উঠেছিলাম মাত্র মাস-ছয়েক হ'ল—আর তখন থেকেই লিখতে সুরু করেছিলাম উপন্যাসখানা। তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ ছিল না যদিও আলাপ-পরিচয় করে নেওয়া একটুও কঠিন ছিল না আমার পক্ষে। কিছু নয়, আমার মুখে তাঁর একটা পা মাড়িয়ে দিয়েই ক্ষমা চাইতাম অজস্র, আর তার পর থেকে দেখা হলেই কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করতাম, "কি দাদা, ভাল আছেন?" (রাধামোহন আমার বাবার বয়সী হলেও দাদা বললে অখুশী হতেন না নিশ্চয়ই।) কিন্তু এ-সবের কিছুই করি নি আমি, এমনকি এক দিন আলাপ হবার সম্ভাবনাকে একটু অভদ্রভাবেই এড়িয়ে গিয়েছিলাম ইচ্ছে করে। যদিও অতি অল্প সময়ই আমি দেখতাম তাঁকে আর তাও একই সময়ে এবং একই অবস্থায়, কিন্তু অনেক দিন ধরে লক্ষ্য করতে করতে তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে আমার নিজস্ব একটা ধারণা জন্মে গিয়েছিল। সেই ধারণার উপর ভিত্তি করেই আমি রচনা করেছিলাম সম্পূর্ণ উপন্যাসখানি, তাঁর ছেলেবেলা থেকে আরম্ভ করে কলেজ-জীবন, গার্হস্থ্য-জীবন, প্রৌঢ়ত্ব এমন কি তাঁর মৃত্যুর পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তের অবস্থা পর্য্যন্ত এঁকেছিলাম তাতে। আমি জানতাম হয়ত সে সবের শতকরা এক ভাগও সত্য নয়, কিন্তু ভেবে দেখেছিলাম তাতে ক্ষতি হয় নি কিছু, বরং তাঁর আসল পরিচয়টা পেলেই হয়ত ঝিমিয়ে পড়ত লেখার গতি। এই সব নানা কথা ভেবেই আমি তাঁর সঙ্গে আলাপ করি নি কোন দিন, করবও না ভেবেছিলাম, কিন্তু এক দিন আলাপ হয়ে গেল অকস্মাৎ। অবশ্য তাতে ক্ষুণ্ণ হলাম না, আমার উপন্যাস শেষ হয়ে গিয়েছে তত দিনে—এমন কি অর্দ্ধেক ছাপানোও হয়ে গিয়েছে।

বেশ ভিড় ট্রামে, যদিও অসহ্য নয়। আমি দাঁড়িয়ে পেছন দিকে রড ধরে। ট্রাম চলেছে আস্তে আস্তে। হঠাৎ মনে হ'ল পিঠের দিকে চাপটা যেন একটু বেশী ঠেকছে ভিড়ের তুলনায়। ঘাড় না বেঁকিয়েই আড়চোখে চেয়ে দেখলাম—একজন লোক তার সম্পূর্ণ দেহভার আমার পিঠে ন্যস্ত করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তন্দ্রাসুখ উপভোগ করছে। প্রথমটায় একটু রাগ হ'ল, ভাবলাম দিই একটা ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে। তারপর একটা দুষ্ট বুদ্ধির প্ল্যান আঁটলাম মনে মনে। পরের ষ্টপেজ থেকে ট্রাম ষ্টার্ট নেবার সঙ্গে সঙ্গে চট্ করে সরে গেলাম ডানদিকে, আর সঙ্গে সঙ্গে পেছনের লোকটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সীটে-বসা এক ভদ্রলোকের গায়ে। এক নিমিষে এই বিপর্য্যয় ঘটিয়ে দিয়ে সেদিকে ভাল করে তাকাতেই আমার চক্ষু স্থির—এ যে দেখছি রাধামোহন, আমার উপন্যাসের নায়ক! লজ্জিতভাবে রাধামোহন উঠে দাঁড়ালেন ঠিক হয়ে। ডান হাত থেকে পানের ডিবেটা খুলে গিয়ে পানগুলো ছড়িয়ে পড়েছিল সেই ভদ্রলোকের কোলে, সেগুলো তুলতে লাগলেন নত হয়ে। ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে বললেন, "ট্রামে চড়তে হলে একটু ব্যালেন্স রাখতে হয়।" পরিষ্কার পাঞ্জাবীটায় পানের দাগ লেগে গিয়েছিল, সেদিকে তাকিয়ে আবার বললেন, "পানটানগুলোও একটু সামলে রাখতে হয় মশাই।"

পানগুলো ডিবের ভরে রাধামোহন একটু লজ্জিতভাবে হেসে

বললেন, "আজ্ঞে আপনি ঠিকই বলেছেন, আপনার বলায় হক্ আছে বটে। কিন্তু কি জানি কেমন একটু নিদ্রা এসে গেল, মানে ঠিক নিদ্রা নয়, নিদ্রা—এই একটু ঝিমুচ্ছিলাম এই ভদ্রলোকের পিঠে ভর দিয়ে। ভেবেছিলাম ছেলেছোকরা মানুষ, অসুবিধে হবে না। কে জানত যে উনি একটুকু ভারও সহ্য করতে পারবেন না। তা দাদা ক্ষমা যদি করে থাকেন, দুটো পান নিন্।"

দুটো পান দিলেন ভদ্রলোককে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও পানদুটো নিলেন তিনি। আমার দিকেও দুটো পান এগিয়ে দিয়ে বললেন, "নিন্ ভাই, পান খান। পানে ক্যালসিয়াম আছে, ক্যালসিয়ামে হাড় শক্ত করে, আর হাড় শক্ত হলেই শরীর শক্ত হয়।"

নিতে হ'ল অনিচ্ছাসত্ত্বেও। মনে মনে বেশ লজ্জিত হয়েছিলাম আগে থেকেই, রাধামোহনের শেষের কথাগুলোয় আরো অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলাম। কি দরকার ছিল অমন করে ফেলে দেবার। সামান্য একটু ধাক্কা দিলেই জেগে যেতেন। বুড়োমানুষ, কোথাও যে চোট লাগে নি এই যথেষ্ট।

পরদিন একটু আগে বেরিয়েছি। ভিড় অনেক কম। ট্রামে উঠেই দেখি রাধামোহন দরজার দিকে মুখ করে বসে আছেন লম্বা গদিটাতে। আমি কিছু না বলেই এগিয়ে যাচ্ছিলাম সামনের দিকে, তিনি হাত জোড় করে হেসে বললেন, "কি দাদা চিনতে পারলেন না? এখনও তা হলে ক্ষমা করেন নি?"

জবাব দিলাম, "আর কেন লজ্জা দিচ্ছেন দাদা, অপরাধটা আমারই—স্বীকার করছি।"

বসতে অনুরোধ করলেন পাশে। একটা পানও দিলেন। ক্রিকেটের প্রসঙ্গ তুললেন, এই বুড়ো বয়সেও নাকি তাঁর প্রত্যেক টেস্টে হাজিরা দেওয়া চাই। তারপর আস্তে আস্তে কণ্ট্রোলের কথা তুললেন, কণ্ট্রোল থেকে পলিটিক্স। আমি হুঁ হ্যাঁ জবাব দিয়ে যাচ্ছিলাম, তিনি কি বলছেন সেদিকে মন ছিল না, ভাবছিলাম অন্য কথা। আমার উপন্যাসের নায়কের সঙ্গে আমি কথা বলছি। আমাকে বিশ্বাস করে গল্প জুড়ে দিয়েছেন তিনি, যদি একবার জানতে পারতেন কার সঙ্গে কথা কইছেন!

সেই পরিচয়ের পর থেকেই হৃদ্যতা বাড়তে লাগল ক্রমশঃ। প্রথম প্রথম 'দাদা' আর 'আপনি,' তারপর 'ভায়া' আর 'তুমি,' কখনও কখনও 'তুই'। মুখে সেই অমায়িক হাসি আর হাতে সেই পানের ডিবাটি। ট্রামে তিনি সাধারণতঃ একটা কোণ অধিকার করে বসেন দু'চার জন পরিচিত ব্যক্তিদের মাঝে। তাদের কারও বয়স বিশ, কারও চল্লিশ, কারও-বা ষাট। তাঁর নিজের বয়স পঞ্চাশের ওদিকে যদিও হঠাৎ দেখে সেকথা মনে হওয়া মুশকিল। চুল বিশেষ পাকে নি, মুখেও বেশী রেখা পড়ে নি, ছিটের শার্ট গায়ে [illegible] মালকোঁচা মেরে কাপড় পরেন—আর পরেন এক জোড়া সু। সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হ'ল তাঁর গলার স্বর। ছোট ছেলের মিষ্টি গলা আর বাস্তব শব্দ মিশলে যে রকম শব্দ সৃষ্টি হবে বলে অনুমান করা যায় অনেকটা সেই ধরণের শব্দ। শ্রুতিমধুরও নয়, শ্রুতিকটুও নয়, কিন্তু বিশিষ্ট—আর দশ জনের চেয়ে ভিন্ন। বোধ হয়, রাধামোহনের গলার আওয়াজ শুনেই আমি প্রথম তাঁর দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলাম।...

এক দিন বিকেলে গ্যালারিতে বসে ফুটবল খেলা দেখছি তন্ময় হয়ে; হঠাৎ ঠক করে কি যেন একটা এসে পড়ল মাথায়। চেয়ে দেখি একটা বাদাম। উপর দিকে চেয়ে দেখি রাধমোহন হাসছেন মৃদু মৃদু। উঠে গেলাম তাঁর কাছে। বললেন, "ভায়া খেলা দেখতে এসেছ ভাল কথা, কিন্তু আর কোন দিকে যে লক্ষ্য থাকবে না এটা তো ভারি অন্যায়।"

হেসে জবাব দিলাম, "সেটা যে অন্যায় তা একশ' বার স্বীকার করছি। কেন যে ভগবান পেছন দিকে দুটো চোখ দেন নি।"

"আরে দূর, আমার জন্যে থোড়াই বলছি। আমি তো কদ্দিন তোমাকে মাঠে দেখেছি, কোনদিন ডাকিনি। কিন্তু আজ তোমার আচরণ দেখে না ডেকে পারলাম না।"

"মানে?" আর একটা কৌতুকের অপেক্ষা করতে থাকি আমি।

"মানে তোমার মত যুবকেরা খেলা দেখতে এসে যদি শুধু প্রাণহীন বলটার দিকেই নজর দেয় তবে ভদ্রমহিলারা মাঠে আসবেন কেন?"

"ঠিক বুঝতে পারলাম না।"

"তা পারবে কেন হাঁদারাম। ঐ দেখো দু'জন ভদ্রমহিলা তখন থেকে ঘন ঘন তোমার দিকে তাকাচ্ছেন অথচ তুমি একবারও নজর দাও নি সেদিকে। এটা কিন্তু ভারি অসভ্যতা। অন্ততঃ কার্টসির খাতিরেও বারকয়েক দৃষ্টিবিনিময় করা উচিত ছিল তোমার।"

রাধামোহনের দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখি নীচের দিকে দুটি তরুণী বসে রয়েছে একটা খালি বেঞ্চিতে। তাদের দেখেই চিনলাম, গীতা সোম আর বিজলী গাঙ্গুলী। বললাম, "আপনি কি বলুন তো? না জেনে শুনেই কি সব যা তা বলছেন। আমি ওদের পরিচিত, এককালে একসঙ্গে কাজ করেছি এক আপিসে।"

"ও তাই নাকি, তাই নাকি! তা হলে তো বড্ড অন্যায় করে ফেলেছি তোমাকে ডেকে। কিন্তু এ বুড়ো না থাকলে যে আজ দেখাই হ'ত না! কোথায় আমাকে ধন্যবাদ দেবে—তা নয়, উল্টে আমাকেই যমকান্তে সুরু করেছ,"—রাধামোহন বললেন ঘাড় নেড়ে।

আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, "আঃ চুপ করুন।"

"বটে চুপ করে থাকব? বলি আমি না থাকলে আজ দেখা হ'ত কি করে?"

হেসে বললাম, "তা দেখা হ'ত ঠিকই। দেখা না করে ওরা যেত না।"

রাধামোহন বড় বড় চোখ করে বললেন, "বটে, এত দূর?"

জবাব দিলাম, "আশ্বস্ত হোন, বছরখানেকের মধ্যে ওদের সঙ্গে

আমার দেখা হয়নি। তবে এককালের সহকর্মী আমি, সেই সূত্রেই দেখা করে যেত আশা করি।"

"বড্ড হতাশ হলাম। তোমার কথা ভেবে ভেবে আমি সত্যি দুঃখ অনুভব করি"—মুখে অপ্রসন্ন ভাব টেনে এনে বললেন তিনি।···

এই রকমই লোক রাধামোহন। ট্রামে যেতে যেতে হয়ত রাস্তার কোন মেয়ের দিকে চোখ পড়েছে অমনি বলে উঠলেন, "ও কি হচ্ছে। এক জন বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসে রয়েছেন পাশে তবু তাকাচ্ছ বেহায়ার মত।" আবার যদি কখনও কোন মেয়ের দিকে চোখ পড়ামাত্র দৃষ্টি ফিরিয়ে আনি নিজের দিকে, রাধামোহন হয়ত বলে উঠবেন—"কি ভায়া ভয় পেয়ে গেলে।" বলা বাহুল্য, তাঁর মুখ থেকে এসব শুনতে প্রথম প্রথম অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব করতাম। পরে অবশ্য সব সয়ে গিয়েছিল, বরং একটু মজাও লাগত, রসবোধ তাঁর সূক্ষ্ম না হতে পারে, কিন্তু তিনি যে রসিক তাতে সন্দেহ নেই।

আমার উপন্যাসখানা ছাপা হয়ে গেল। প্রকাশক নিজে এসে কয়েকখানা কপি দিয়ে গেলেন। আলমারিতে সেগুলো সাজিয়ে রাখতে রাখতে প্রথমেই মনে পড়ল রাধামোহনের কথা। এক কপি তাঁকে দেব নাকি? কল্পনায় বাস্তবে মিশিয়ে যাঁর চরিত্রকে রূপায়িত করেছি এ বইটিতে, যাঁর কাছে সব চেয়ে বেশী ঋণী আমি, তাঁকে এক কপি উপহার দেওয়া উচিত নয় কি আমার? কিন্তু···কি দরকার তাঁকে আমার সত্য পরিচয় জানিয়ে। এক দিন জানতে পারবেন নিশ্চয়ই, কিন্তু যত দিন না পারেন তত দিনই মঙ্গল। রাধামোহনের সম্পূর্ণ পরিচয় এখনও পাই নি কিন্তু জ্ঞানে-অজ্ঞানে আমার নায়কের চরিত্রের সঙ্গে তাঁর চরিত্রের কিছু মিল যে রয়ে গিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কে জানে তা দেখে তিনি খুশী হবেন না অখুশী হবেন।

কিছুদিন পরে। রাধামোহন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন, "তোমার সঙ্গে বিশেষ কথা আছে ভায়া।"

চমকে উঠলাম। নিশ্চয়ই তিনি আমার বইখানি পড়েছেন আর সেই সম্বন্ধেই কথা বলতে চাইছেন।

"বলুন।"

"না, এখানে বলা চলে না, আমার বাড়ী যেতে হবে।"

আমার সংশয় আরও বাড়ল। বললাম, "বেশ, ট্রাম থেকে নেমেই বলবেন 'খন।"

"না, অনেক সময় লাগবে। তা ছাড়া সে সব রাস্তায়ও বলা চলে না। কেন বাড়ী যেতে আপত্তি কিসের? ভয় পাচ্ছ নাকি?" বললেন তিনি।

এর পর আর কথা চলে না। দুরুদুরু বুকে নির্দিষ্ট দিনে রওনা হলাম তাঁর বাড়ীর দিকে। সমস্ত রাস্তা ভাবতে ভাবতে গেলাম রাধামোহন কি বলতে পারেন, আর আমি কি বলে আত্মপক্ষ সমর্থন করব।

দরজার পাশে রাধামোহন দাঁড়িয়েছিলেন। আমি কাছে যেতেই গম্ভীর হয়ে বললেন, তোকে বউ দেখাতে এনেছি।

ঠিক ধরতে পারলাম না কথাটা। তবুও মুখে হাসি টেনে এনে বললাম, "ও আপনার ছেলের বিয়ের কথা শুনেছিলাম যেন। কবে হ'ল বিয়ে?"

"দূর হাঁদারাম, ছেলের তো বিয়ে হয়ে গেছে তিন বছর। ছেলের বউ দেখাতে ডাকব কেন, নিজের বউ দেখাতেই ডেকেছি।"

এতটা অবশ্য আশা করি নি। মুহূর্তের মধ্যে সামলে নিয়ে হেসে বললাম, "দ্বিতীয় পক্ষ না তৃতীয় পক্ষ?"

"তুই তো বড় নেমকহারাম দেখছি। কোথায় তোকে নেমন্তন্ন করলাম আর তুই আমার বাড়ী এসে গালাগাল দিচ্ছিস! আর তাও আমার নামে নয়, আমার বউয়ের নামে—যে তোকে আসতে বলেছে?"

আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, "সে কি খুড়ীমা ডেকেছেন আমাকে? কি সৌভাগ্য, এতক্ষণ বলেন নি কেন?"

বললে কোমর বেঁধে ঝগড়া করতিস কি করে?" জবাব দিলেন তিনি।

তার পর নিয়ে গেলেন অন্দরমহলে। গৃহিণী এলেন, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম। বসতে অনুরোধ করে বললেন, "তুমি যে এসেছ বাবা এতে আমি খুব খুশী হয়েছি। উনি রাত দিন তোমার গল্প করেন—ট্রামে যেতে যেতে কি কথা হয়েছিল, তুমি কি জবাব দিয়েছিলে, কার সঙ্গে কবে প্রায় ঝগড়া বাধাবার উপক্রম করেছিলে···আমি কতদিন ওঁকে বলেছি তোমাকে আমার জন্য কিন্তু উনি রাজী হন নি, কেবলই বলেছেন তুমি নাকি ভীষণ লাজুক, কিছুতেই আসবে না। আমি বলেছি একবার বলেই দেখ না, না দেখেও আমার যত দূর মনে হচ্ছে আসতে বললেই ও আসবে। আমার কথাই ঠিক হ'ল তো শেষ পর্যন্ত।"

হেসে বললাম, "আপনি যে আমায় ডেকেছেন কাকীমা সে আমার সৌভাগ্য। কিন্তু উনি আমার সম্বন্ধে যে ধরণের গল্প করেন শুনলাম, তার পর আর কোন্ মুখে এ বাড়ী আসব তাই ভাবছি।"

গিন্নী কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, ব্যস্ত হয়ে রাধামোহন বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, "কোন মুখ নিয়ে আসবে? যে মুখ নিয়ে ঝগড়া করো সবার সঙ্গে!"

"দেখুন কাকীমা দেখুন! এত দিন একতরফা শুনে এসেছেন, এবার নিজের চোখে দেখুন কে ঝগড়া করে, আর কে চুপ করে থাকে। পেয়েছেন বোকা ছেলে তাই যা-তা বলে নিচ্ছেন,"—রাধামোহনের দিকে চেয়ে বললাম আমি।

"হুঁ বোকাই বটে। তাই আপিস পালিয়ে ধন্না দিয়ে পড়ে থাকা হয় খেলার মাঠে, আর বোকা বলেই ট্রামে ভিড়ের মধ্যে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হয় ভালমানুষদের।"

"সেকথা এখনও ভোলেন নি! কিন্তু আপনি কাকীমা এসব কথায় বিশ্বাস করবেন না।"

গৃহিণী বললেন, "সেকথা আর বলতে হবে না বাবা। তিরিশ বছর ধরে ঘর করছি, ওঁকে আর চিনতে কিছু বাকি নেই।"

"বটে! শেষকালে তুমিও ওর পক্ষে চলে গেলে? এই জন্যই তো আমি ওকে আনতে চাই নি,"—রাধামোহন বললেন।

দরজার পাশে একটা ছোট শেল্‌ফ, খানকতক বই সাজানো রয়েছে তাতে। লক্ষ্য করলাম—আমার সদ্যপ্রকাশিত উপন্যাসখানিও রয়েছে এক দিকে। অনুমতি নিয়ে আস্তে আস্তে বের করলাম। একেবারে টাটকা, পাতায় পাতায় প্রেসের গন্ধ। বললাম, "বইটা পড়েছেন নাকি? কেমন লিখেছে?"

রাধামোহন বললেন, 'নাঃ এখনও পড়ি নি, দু'চার পাতা উল্টে দেখেছি শুধু। কিন্তু একেবারে বাজে। এত গাঁজা যে লোকে কোত্থেকে পায় তা সত্যিই একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার।

"কেন? আমি অবিশ্যি এ বইটা পড়ি নি, তবে এই লেখকের দু'একটা গল্প পড়েছি কাগজে, একেবারে খারাপ লেখে না ত!" পাতা উল্টাতে উল্টাতে বললাম।

"তোর ত ভাল লাগবেই—একই নাম কিনা! নামের মিলের জন্যে পক্ষপাত থাকাটা আশ্চর্য্য নয়। তবে তুই নেহাত মিথ্যে বলিস নি, ওর অন্য লেখাগুলো এত খারাপ নয়। কিন্তু এটা একেবারে খাঁটি গাঁজা,"—বিরক্ত মুখে জবাব দিলেন রাধামোহন।

আমি আর কথা বাড়াতে সাহস পেলাম না। কে জানে আরও কত কি অপ্রীতিকর মন্তব্য শুনতে হবে। তবুও খেতে খেতে তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি ও বইটা পড়েছেন কাকীমা?'

"না, এখনও সময় পাই নি, যদিও বইটা কিনেছিলাম আমিই। সেদিন আমরা দোকানে গিয়েছিলাম ছেলেমেয়েদের বই কেনার জন্যে। শো-কেসে সাজানো ছিল বইটা। লেখকের নাম আর তোমার নাম এক দেখেই কেমন যেন মনে হ'ল বইখানা কিনতে হবে।"

হেসে বললাম, 'তা হলে আমি একটা বিখ্যাত লোক বলুন। নিজেকে এই বইয়ের লেখক বলে চালিয়ে দিলেও কেউ ধরতে পারবে না।"

রাধামোহন বলে উঠলেন, "দয়া করে আর লেখক হবার চেষ্টা করো না। বা-বিদ্যে আছে তাতেই আমরা হাবুডুবু খাচ্ছি, লিখতে সুরু করলে বাজারে আর কলম পাওয়া যাবে না।"

একটা জবাব ঠোঁটের আগায় এসে গিয়েছিল, কিন্তু চেপে গেলাম। দেখাই যাক না শেষ পর্য্যন্ত কি হয়।...

বাড়ী ফিরে মনে হ'ল কাজটা ভাল করি নি। যখন শুনবেন আমিই ও বইয়ের লেখক তখন কি ভাববেন তাঁরা? এত দিন নিজের পরিচয় দিই নি কেন তার কারণ দেখাতে গিয়ে বলতে পারতাম, পরিচয় দেবার সুযোগ হয় নি কখনও। কিন্তু আমার লেখা বইখানি আমারই সামনে রয়েছে, আর আমি সে বিষয়ে উচ্চবাচ্য করলাম না—বরং কৌশলে তাঁদের মতামত জেনে নিলাম, এটা কি তাঁরা ক্ষমা করতে পারবেন? অবশ্য আমার বলার পথ খোলাই থাকবে, বলতে পারব নিজের পরিচয় দেব বলেই ঠিক করেছিলাম, কিন্তু তাঁদের মন্তব্য শুনে আর সাহস পাই নি—আর তাই অত তাড়াতাড়ি পালিয়ে এসেছিলাম সেখান থেকে। কিন্তু সেটা কি নেহাতই শুকনো যুক্তি হবে না? সেকথা শুনে আমার প্রতি তাঁদের ঘৃণা কি আরও বেড়ে যাবে না?

কয়েকটা দিন বড় অস্বস্তির ভেতর দিয়ে কাটালাম। উপন্যাস বা গল্প লিখে এত অস্বস্তি কোন দিন অনুভব করি নি। কি ক্ষতি হ'ত আমার নিজের সত্যিকারের পরিচয় জানালে। যে ভয়ে আমি পরিচয় দিই নি হয়ত সেটা মিথ্যে ভয়, হয়ত আমার উপন্যাসের সঙ্গে রাধামোহনের আসল জীবনের কোনই মিল নেই, একটু-আধটু যা আছে তাও সম্ভবতঃ তিনি নিজেই ধরতে পারবেন না। রাধামোহন-গৃহিণীর কথা মনে পড়ল। চওড়া লালপেড়ে শাড়ি, সিঁথিতে মোটা সিঁদুরের ফোঁটা, গোলগাল মুখ, সহাস্য চোখ, আঁচলের কোণে সুপুরি আর এলাচ বাঁধা, মাঝে মাঝে মুখে দিচ্ছেন—আর অতি সামান্য কারণেই ব্যস্ত হয়ে উঠছেন অতিথি-সংকারে সম্ভাব্য ত্রুটির কথা ভেবে। আরও মনে পড়তে লাগল তাঁর স্নিগ্ধ মন্তব্য—লেখকের নাম আর তোমার নাম এক দেখেই কেমন যেন মনে হ'ল বইটা কিনতে হবে। কত সরল বিশ্বাসে বলেছিলেন কথাগুলো। কে জানে যদি জানতে পারতেন যে, আমিই সেই লেখক তা হলে হয়ত খুশীই হতেন, গর্ব্বও অনুভব করতেন আমার কথা ভেবে। খুব সম্ভব পাড়াপড়শীকেও সালঙ্কারে শোনাতেন আমার কথা, আমি যে তাঁদের বাড়ীতে গিয়েছিলাম সে কথা, তাঁকে যে কাকীমা বলে সম্বোধন করেছি—সে কথা। আমার খ্যাতি তাতে কিছু বৃদ্ধি হ'ত না বা আমার বইও হয়ত বিক্রী হ'ত না বেশী, কিন্তু রাধামোহনের পরিবার বোধ করি তাতে আনন্দ বোধ করতেন কিছুক্ষণের জন্য।

কল্পনায় দেখতে পেলাম—রাধামোহন জেনে গিয়েছেন আমি কে, আর কতকগুলো বাছাই-করা বিশেষণ আর বিশেষণের বিশেষণ শাণিয়ে রেখেছেন আমার জন্য। ভয়ে ভয়ে কয়েক দিন এড়িয়ে চললাম তাঁকে। কিন্তু ঘড়িটা বোধ হয় স্লো ছিল সেদিন, ট্রামে উঠতেই দেখি রাধামোহন পারিষদবর্গসহ জাঁকিয়ে বসেছেন ট্রামের পেছন দিকটাতে। আমি উঠামাত্র কলস্বরে স্বাগত করলেন তিনি আর তাঁর বিভিন্ন বয়সী বন্ধুরা—আমি তাঁর বন্ধুদেরও বন্ধু হয়ে গিয়েছিলাম।

রাধামোহন বললেন, "কি বাবাজীবন, এখনও তা হলে মহাজীবনে রূপান্তরিত হও নি।"

জায়গা খালি ছিল, বসলাম। একটা পান দিয়ে বললেন, "একটা ভারি মজার কাণ্ড হয়েছে। তুই এসে পড়েছিস ভালই হ'ল, দু'বার করে আর বলতে হবে না। সেই যে তুই একটা বই দেখে এসেছিলি, আমার শেল্‌ফে মনে পড়ে?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, সন্দীপ ঘোষের লেখা?"

"হ্যাঁ তোর নামের সঙ্গে হুবহু মিল আছে বটে। তা সে বইটা

শেষ করেছি ক'দিন আগে। পড়ে তাজ্জব বনে গেছি মাইরি। লোকটাকে আমি চিনি নে বটে, কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে সে আমাকে চেনে। শুধু চেনেই না, আমার অনেক কথাই জানে। কিন্তু কি করে যে এটা সম্ভব হ'ল ভেবে পাচ্ছি না। ছেলেবেলাকার বন্ধুবান্ধবেরা সব অনেক আগেই ছিটকে পড়েছে, বরাবর আমার খোঁজখবর নিয়ে এসেছে—এমন একটি বন্ধুও ত নেই এ'ন। অথচ আমি কেমন করে কথা বলি, কি ভাবে জুতোর ফিতে বাঁধি, কি ভাবে ইয়ার্কি করি সব হুবহু লেখা রয়েছে। আশ্চর্য্য!

আমি আশঙ্কায় উদ্বেগে ঘেমে উঠতে থাকি।

"অবিশ্যি বেশীর ভাগ জায়গাতেই আমার সঙ্গে মিল নেই, তবে আসল জিনিষটা ঠিক আছে। আমি কবে কি করেছি, কেন করেছি, কি ভাবে করেছি সে সবের উল্লেখ নেই বটে, কিন্তু আমার স্বভাব-চরিত্রের সঙ্গে আশ্চর্য্য মিল রয়েছে। গিন্নী ত ক'পাতা পড়েই লাফিয়ে উঠে বললে, 'ফুল-চন্দন পড়ুক এ বই যে লিখেছে তার মুখে। ওকে আমি এক দিন নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াব। তোমার সঙ্গে ওর জানাশুনা না থাকলে তোমার সম্বন্ধে এত সত্য কথা লিখতে পারত না। আর এ বই না কিনলে তুমি আসলে কি তা বুঝতেও পারতাম না।'—ভেবে দেখ আমার অবস্থাটা। গিন্নী আসলে কি ভেবেছিল জানিস? ভেবেছিল লেখকটার সঙ্গে বুঝি আমার জানাশুনো আছে আর আমার জীবনের সত্য ঘটনা নিয়েই লেখা হয়েছে বইটা। কি লজ্জা দেখ। বইটার নায়ক হ্যাবলা সুশান্ত আর আমি হলাম গিয়ে কিনা একই লোক। গিন্নী ত কিছুতেই মানবে না যে বইটা আমাকে নিয়ে লেখা নয়। শেষে অনেক বলে-কয়ে তাকে বোঝাই যে এ রকম হয়ে থাকে অনেক সময়, একবার এক ডাক্তারকে দেখে আমি প্রায় বিশ্বাস করে ফেলেছিলাম নিশ্চয়ই সে রবীন্দ্রনাথের এক উপন্যাসের নায়ক। গিন্নীকে ত কোন রকমে ঠাণ্ডা করেছি, কিন্তু আমার নিজেরই যে অবাক লাগছে।"

"মানে তারা নিজেই ঠাণ্ডা হতে পারছ না?" মন্তব্য করলেন রাধামোহনের প্রবীণতম ইয়ার ষাট বছরের নরেন শীল।

"তা দাদা কথাটা মিথ্যে নয়। শা—এমন সব কথা লিখেছে পড়তেও লজ্জা করে, বলা ত দূরের কথা। সুশান্ত বাঁড়ুজ্যে যদি আমিই হই, তবে বলতে হয় আমি প্রেম করা সুরু করেছি পাঁচ বছর বয়স থেকে, ম্যাট্রিক দেবার আগেই দশটি মেয়ের সঙ্গে প্রেমপত্রের আদান-প্রদান সুরু করেছি আর কলেজে পড়ার সময় ঘুড়ির গায়ে চিঠি লিখে মেয়েদের হোষ্টেলের ছাদে ফেলে দিয়েছি আর মেয়েরা তার জবাব সেঁটে দিয়েছে ওপিঠে। তারপর রাত্রির অন্ধকারে নির্দ্দিষ্ট জানালায় প্রেমপত্র ছুঁড়ে দিয়েছি আর একবার ধরা পড়ে নাকালের একশেষ হয়েছি। শুধু কি তাই, বিয়ের পরেও নাকি শালীদের সঙ্গে মাত্রাতিরিক্ত ইয়ার্কি করতে গিয়ে জব্দ হয়েছি আর তারপর তিন বছর শ্বশুর-বাড়ীতে ঢুকতে পাই নি! মানে মায়ের পেট থেকে পড়েই প্রেম করতে সুরু করেছি আর সমস্ত জীবন ধরে শুধু প্রেমই করে চলেছি।"

ডানদিকের কোণে চুপ করে বসে ছিল সন্তোষ রায়, ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়স হবে তার। এবার সে মুখ খুলল। বলল, "তুমিও বড্ড বেশী বাড়িয়ে বলছ খুড়ো। বইটা ত আমিও পড়েছি, অমন কথা ত লেখা নেই কোথাও।"

"তাই পড়েছিস। সব কথা স্পষ্ট করে বলে নি বটে, কিন্তু ইঙ্গিতের ছড়াছড়ি গোটা বইতে। চোখ-কান খুলে পড়লে সব বুঝতে পারতিস জলের মত। ও-সব সূক্ষ্ম ব্যাপার বোঝার ক্ষমতা তোদের থাকলে ত! আজকালকার ছেলে সব, কি জানিস কতটুকু বুঝিস?"

"রাধুভায়া আমাদের অভিজ্ঞ লোক, ওর উপর কি আর কোনও কথা চলে?" গম্ভীর হবার ভান করে বললেন নরেন শীল।

"তা দাদা আপনি যা বলেই গালাগালি দিন এসব ব্যাপারে আমি আজকালকার ছোঁড়াদের তুলনায় অনেক বেশী বুঝি, মানে এককালে বুঝতাম। জানি না লেখক বুড়ো না ছোকরা, তবে লেখা পড়ে মনে হয় চুলে এখনো পাক ধরে নি এবং বুদ্ধিও পাকে নি, নইলে এত গাঁজা ছড়াত না।"

"কেন, গাঁজা হ'ল কেন? তোমার ভাল লাগে নি বলে?" জিজ্ঞাসা করল সন্তোষ।

"এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি কেন তুই এত ওকালতি করছিস এই রদ্দি বইয়ের লেখকের পক্ষে। তোদের খালি ভাল লাগে বাড়াবাড়ি। এটা ঠিক তোদের দোষ নয়, যুগের দোষ। বাড়াবাড়ি না দেখাতে পারলে আজকাল কোন জিনিষেরই ঠাঁই নেই, লেখাতেও তাই। প্রেমের বাড়াবাড়ি, ন্যাকামোর বাড়াবাড়ি…"

"আমার কথা উইথড্র করছি খুড়ো, চুপ কর দয়া করে। এটা ট্রাম, ভদ্রলোকেরা সব রয়েছেন…"

সন্তোষকে থামিয়ে দিয়ে রাধামোহন বললেন, "আর আমরা সব ছোটলোক, না? দেখ চেয়ে, ট্রামসুদ্ধ লোক কান খাড়া করে শুনছে আমার কথা।"

সেই অদ্ভুত ধাতব স্বর। কথা বলতে বলতে রাধামোহন গলার পর্দা বেশ চড়িয়েছেন, কিন্তু আস্তে বললেও সামনের লোকটি পর্য্যন্ত শুনতে পেত স্পষ্ট।

রাধামোহন আবার সুরু করলেন, "বইয়ে একটু বাড়াবাড়ি দেখলেই তোরা নাচতে সুরু করিস, ভাবিস খাসা রোমান্স ত! কিন্তু গাঁজা খেলেও রোমান্স করা যায় অন্ততঃ রোমান্স অনুভব করা যায়; তোরাও বইয়ের গাঁজা খেয়ে ভাবিস রোমান্সের চূড়ান্ত বুঝি। আরে সত্যিকারের রোমান্স কি আর বাড়াবাড়িতে হয়? নিজের জীবনের উদাহরণ দিয়ে বলি শোন্…"

সন্তোষ মুচকি হেসে বলল, "কেন আর নিজেকে চাবকাতে চাইছ

খুড়ো। ট্রামে ভিড় বাড়তে আরম্ভ করেছে, তা ছাড়া কত রকম লোক রয়েছে এখানে, কি দরকার সবাইকে তোমার রোমান্সের গল্প শুনিয়ে। বরং বইখানা সবাইকে একবার করে পড়তে দিও তা হলেই সব কথা ভালভাবে জেনে যাবে সবাই, তোমাকে আর কষ্ট করে জানাতে হবে না।"

"তুই তো দেখি কম ত্যাঁদড় ন'স। ভালমানুষের মত দেখতে অথচ পেটে পেটে এত। শা—।"

"আহা হা রাধু ভায়া করিস কি! ট্রামের মধ্যে অত আত্মীয়তা পাতাচ্ছিস গিন্নী শুনলে রাগ করবে যে"—মাঝখানে বলে উঠলেন আশুতোষ, রাধামোহনেরই প্রায় সমবয়সী বন্ধু।

"কিন্তু ওর ভুলটা তো ভেঙে দেওয়া দরকার। সেইজন্যই বলতে যাচ্ছিলাম আমার কথা।"

"তা ভায়া অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? তুমিই তো বললে গল্প গল্পই। তাই যদি হয় তবে সব খুলে না বললেও চলবে। আমরা তোমাকে বিশ্বাস করি।" গম্ভীরভাবে বললেন নরেন শীল।

"আপনিও দাদা ঠাট্টা আরম্ভ করলেন! না, তবে তো বলতেই হ'ল দেখছি, এই ট্রামের মধ্যেই বলছি।"

একটু সুপুরি মুখে পুরে রাধামোহন সুরু করলেন, "আমি প্রেমে পড়েছিলাম মাত্র তিন বার। কথায় বলে না বার বার তিন বার? প্রথম বার, যখন ক্লাস সিক্স না সেভেনে পড়ি। গাঁয়ে থাকতাম তখন। কি করে প্রেমনিবেদন করতে হয়, পাকাপোক্ত বন্ধুদের কাছ থেকে তার তালিম নিয়ে যেদিন ঠিক করলাম গাছ থেকে পেয়ারা পেড়ে দিতে দিতে খেঁদীর হাতদুটো চেপে ধরে বলব, আমি তোমাকে ভালবাসি, ঠিক সেদিনই শুনি ওদের বাড়ী থেকে একসঙ্গে অনেকগুলো শাঁখের আওয়াজ বেরুচ্ছে,... কি ব্যাপার? না ওর পাকা দেখা হয়ে গেল। এই গেল আমার প্রথম প্রেম। দ্বিতীয় বার প্রেমে পড়লাম বিয়ে-বাড়ীতে। অবশ্য আমার বিয়েতে নয়, এক আত্মীয়ের বিয়েতে সে মেয়েটিকে প্রথম দেখি আর সামান্য একটু একসিডেন্টের কল্যাণে আলাপ। সেই আলাপ থেকে বেরিয়ে পড়ল ওরা আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়ও হয়, সুতরাং যাওয়া-আসা বাড়তে লাগল ক্রমশঃ। একবার অসুখ হয়ে অনেক দিন পড়ে রইলাম বাড়ীতে। একটু ভাল হয়েই সাইকেল নিয়ে ওদের গ্রামে ছুটলাম। দেখি সবাই রয়েছে শুধু সে নেই। কি হ'ল? মরে গেল নাকি? না, মরে নি, বিয়ে হয়ে গেছে। দু'দু'বার এ রকম আশাভঙ্গে নিজের উপর ঘেন্না ধরে গেল, ঠিক করলাম এ জীবনে আর প্রেমে পড়ব না। কিন্তু তবুও পড়তে হ'ল আর সেই শেষ বার। সেবার প্রেমে পড়ে নাকে-কানে খত দিয়েছি—আর প্রেম নয়।"

"ঠিক বুঝলো বুঝতে পারলাম না খুড়ো। এতই যদি দয়া করলে তবে আর একটু খুলে বলো," বলল সন্তোষ।

"মানে প্রেমে পড়লাম আর সেই পতনের ফলে সবাই মিলে হাতে কড়া আর পায়ে বেড়ি পরিয়ে দিলে..."

নরেন শীল বললেন, "ব্যস, ব্যস রাধু ভায়া, আর নয়। পরের কথাটুকু আমরা সবাই যোগ করে নেব'খন।"

"তা হলে তোমার জীবনের সঙ্গে মিল নেই বলেই বুঝি বইটা ভাল লাগে নি তোমার?" চোখ দুটোকে ছোট ছোট করে জিজ্ঞাসা করল সন্তোষ।

রাধামোহন বললেন, "শুনছেন নরেনদা, চ্যাংড়াটার কথা শুনছেন? একবার বলবে মিল রয়েছে বলে ভাল লাগে নি আর একবার বলবে মিল নেই বলে ভাল লাগেনি। আমার জীবনের সঙ্গে মিল নেই বটে, কিন্তু গিন্নী বলে আমার স্বভাবটার সঙ্গে নাকি হুবহু মিল রয়েছে। বইটা পড়তে আরম্ভ করেই গিন্নীর সন্দেহ হয়েছিল সেটা বুঝি আমাকে নিয়েই লেখা আর তাই ক'দিন আমাকে ক্ষেপিয়ে অস্থির করে তুলেছিল। কিন্তু বইটা শেষ করে গিন্নী কেঁদে ফেলে আর কি! কি ব্যাপার? না সুশান্ত বাঁড়ুজ্যে মারা গেল কলেরায়, বিনা চিকিৎসায়, আর তার বউ তখন বাপের বাড়ীতে রেডিও শুনছে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে—কয়েক মাস আগে সে ঝগড়া করে চলে গিয়েছিল বাপের বাড়ী। আগের রাত্রে আমাদেরও একটু কথা কাটাকাটি হয়েছিল, সেও ঐ বইটা নিয়েই। তর্কে হেরে গিয়ে গিন্নী ভয় দেখিয়েছিল বাপের বাড়ী চলে যাব। এখন বইটা শেষ করে গিন্নী বলতে আরম্ভ করল, 'কি অলক্ষুণে বই! একেবারে গাঁজা।' আমি বললাম, 'গাঁজা হবে কেন? সন্দীপ ঘোষ আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু, আমাকে নিয়েই সে লিখেছে বইটা। আর শেষটার কথা বলছ? সন্দীপ হাত গুণতেও জানে, অনেক দিন আগেই আমার হাত দেখে বলেছিল আমার নাকি কলেরায় মৃত্যু হবে আর তখন কেউ আসবে না কাছে।' গিন্নী অবিশ্যি বুঝতে পারল আমি ঠাট্টা করছি তবুও চোখে আঁচল চাপতে চাপতে চলে গেল অন্য ঘরে।"

"এতক্ষণে বুঝলাম ভাল না-লাগার কারণটা। গিন্নীর চোখে জল দেখেই বুঝি অমন করে গালাগাল দিচ্ছিস সন্দীপকে?" আশুতোষ বললেন।

"গালাগাল তো দিই নি এখনও, শুধু গাঁজাখোর বলেছি। আর গালাগাল দিলেও অন্যায় হ'ত না কিছু। আমাকে দিয়ে এত লীলা করিয়েও হতভাগা শান্তি পেলে না, শেষকালে আমাকে কিনা মেরেই ফেলল! কাণা খোঁড়া অকর্ম্মণ্য করে রাখলেও একটা কথা ছিল, অন্ততঃ গিন্নি এতটা মুষড়ে পড়ত না, কিন্তু একেবারে খতম করে দেওয়া, এ হচ্ছে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।" জবাব দিলেন রাধামোহন।

নরেন শীল কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় দেখা গেল তাঁরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গিয়েছেন। হুড়মুড় করে নেমে গেলেন সবাই। আমি গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলাম এত কাণ্ডের

পরে আমার পরিচয় দেওয়া ঠিক হবে কি? রাধামোহন ঠাট্টা করে গৃহিণীকে বলেছেন—তিনি লেখককে চেনেন। কিন্তু গৃহিণী যখন জানবেন আমি আর লেখক সন্দীপ ঘোষ একই লোক তখন হয়ত রাধামোহনের সেই ঠাট্টাকেই সত্যি বলে ধরে নেবেন, হয়ত বইটার অন্যান্য কথাও বিশ্বাস করে বসবেন। আর তখন রাধামোহন সে-সব হেসে উড়িয়ে দিতে চাইলেও বিশ্বাস করবেন না, ভাববেন তিনি আমাকে তাঁর জীবনের সমস্ত কথা খুলে বলেছেন (যে-সব কথা নিজের স্ত্রীকে পর্য্যন্ত বলেন নি) আর আমি সব শুনেই লিখেছি উপন্যাসটা। এমন কি হয়ত বিশ্বাসও করতে চাইবেন না যে, আমি হাত দেখায় বিশ্বাস পর্য্যন্ত করি না। বাংলার মধ্যবিত্ত পরিবারের পতিগতপ্রাণ গৃহিণী তিনি, বইয়ে তাঁর স্বামীর সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছি মনে করে হয়ত তিনি কেঁদে কেটে সারা হবেন, আরও কত কি করবেন কে জানে।

আমি গোপন করতে চাইলেও একদিন-না-একদিন তাঁরা জানতে পারবেন আমার পরিচয়। এখন যদি আমি নিজে থেকে আমার পরিচয় দিয়ে বলি রাধামোহনের সঙ্গে আলাপ হবার আগেই আমার উপন্যাসটা শেষ হয়ে গিয়েছিল তবে অনেক দিন ধরে তাঁকে দেখেছি ট্রামে, হয়ত তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি নিজের অজ্ঞাতসারে আর সেই কারণেই হয়ত তাঁর চরিত্রের সঙ্গে সুশান্ত-চরিত্রের একটু মিল রয়ে গিয়েছে—আমি নিজে ইচ্ছে করে করি নি, তা হলে হয়ত তাঁরা ক্ষমা করতে পারেন সন্দীপ ঘোষকে, এমন কি রাধামোহন-গৃহিণীর মন থেকে সমস্ত অমঙ্গল-আশঙ্কাও দূর হয়ে যেতে পারে। কিন্তু যদি তাঁরা নিজে থেকে আবিষ্কার করেন সন্দীপ ঘোষকে তবে আর ক্ষমা চাওয়ার কোন পথ থাকবে না। বুঝতে পারবেন সুশান্ত আসলে রাধামোহনেরই পরিবর্ত্তিত রূপ আর সেই জন্যই আমি চেপে গিয়েছি আমার পরিচয়। রাধামোহনের সঙ্গে আমার পরিচয় যে খুব দীর্ঘকালের নয় এবং আমি যে হাত দেখতে জানি না সেকথা হয়ত তখন কিছুতেই বোঝানো যাবে না তাঁর গৃহিণীকে, হয়ত রাধামোহনও বুঝিয়ে উঠতে পারবেন না—উপন্যাসের ঘটনাগুলো সত্যিই গল্প, সত্যি নয়।

ট্রাম থেকে নামতে নামতে ঠিক করলাম আজকে রাত্রেই যাব তাঁদের বাড়ীতে।

অকালের পূর্ণাহুতি

শ্রীমহাদেব রায়

জলদের রেখা নাহি অম্বরে, কে মহাবজ্র হানিল শিরে?
নিমেষে দগ্ধ রক্ষা-কবচ রেখেছিল প্রাণে সদা যে ঘিরে।
নিদারুণ একি বার্ত্তা করুণ সহসা আসিয়া মথিল হিয়া!
অকালে চলিলে যজ্ঞের হোতা, প্রাণের পূর্ণ আহুতি দিয়া?

চলে শবাধার শেষের আধার নগরীর শোক-দগ্ধ বুকে,
মথিয়া সে বুক বেদনা-রোদন শত উচ্ছ্বাসে ফুটিছে মুখে,
নবীভূত যেন পিতার দেহের শেষ অভিযান গৃহের পানে
কি শেল হানিল এ বিয়োগ-ব্যথা মরণের মুখে মায়ের প্রাণে!

শ্মশান-পথের জনতাম্বুধি বিসর্জ্জিল যে বাষ্পরাশি,—
সে-ই কি রচিল নির্ব্বাণ-ধারা নিভাতে অনল সর্ব্বনাশী?
সব নাশ হ'ল, রহিল কি আর? করে হাহাকার সর্ব্বদেশ,
ইন্দ্র-পতনে ইন্দ্রপ্রস্থ-নন্দন-শোভা হইল শেষ।

দিনান্তের ঐ স্নিগ্ধলয়ের স্বর্ণ আলোকে ঊর্দ্ধলোকে
দেখাইছে পথ জ্যোতির্ম্ময়ের আত্মারে যাঁর, তাঁহার শোকে
তিলে তিলে হোক দগ্ধ এবার শত বেদনার আর্ত্তজন,
বীর হৃদয়ের সংগ্রাম শেষ করিতে ব্যথার চিরমোচন।

মেধার দীপ্ত-জ্যোতিতে যাহার শোভিত তথ্যে যুক্তিজাল
কম্পিত করি' কম্বুকণ্ঠে তর্কের সভা, সে দিক্‌পাল
করিয়া আঁধার দশ দিক্ আজি অকালে লুকাল কাঁদায়ে দেশ
স্বদেশজননী উদাস নয়নে চাহিয়া শূন্যে নির্নিমেষ।

শ্যামার প্রসাদে জননী ধন্যা যোগ্য তনয়ে বক্ষে ধরে'
শ্যামা জন্মদা শেষের ভরসা রেখেছিল এক তোমারই 'পরে,
ব্যথা-জর্জ্জর বক্ষে তাদের আজি শোক-ভার অগাধজল,—
কাঁদিয়া কাঁদিয়া নয়নে তাদের শুকাইল বুঝি অশ্রুজল।

স্নেহ-সার প্রাণে দৃঢ়তা অতুল—কোমলে-কঠোরে অতুলনীয়
দুর্গম পথে নির্ভীক হিয়া চলেছিলে একা হে বরণীয়,
করি মহাপণ সঁপিলে জীবন শৃঙ্খল-গত যাদের তরে,
দিশাহারা তারা অঞ্জলি-ভরা সঁপিছে অশ্রু তোমার করে।

তীব্র বিয়োগ-বেদনা বাড়ায়ে আজি আষাঢ়ের অম্বুবাহ
দুষ্ট নিশার প্রভাতে রচিল বিরহ-প্রবাহ দুরবগাহ,
সে প্রবাহ পারে চিরশান্তির দেশ হ'তে তব অভয়-বাণী
চাহিছে স্বদেশ দুর্দ্দিনে তার অভয়-ভরসায় বুকপাণি।

শব্দমুক্তামহার্ণব

(বর্ণানুক্রমিক আদি মহাভিধান)

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে একটি বর্ণানুক্রমিক সংস্কৃত অভিধান রচনার পরিকল্পনা গৃহীত হয়। সুবিখ্যাত কোলব্রুক সাহেবের নির্দ্দেশে এবং তাঁহার তত্ত্বাবধানে ইহার রচনাভার অর্পিত হয় তৎকালীন একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত নবদ্বীপরাজগুরু রঘুমণি বিদ্যাভূষণের উপর। তিনি ৫ বৎসরে (১২০৯-১৪ বঙ্গাব্দে) রচনা শেষ করিয়া ২০০০৲ টাকা পারিশ্রমিক পাইয়াছিলেন। রঘুমণির সংক্ষিপ্ত জীবনী আমরা ৯ বৎসর পূর্ব্বে এক প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছি (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৫১ বর্ষ, পৃ. ২৪-৩১)। শব্দমুক্তামহার্ণবের তিনটি মাত্র প্রতিলিপি বিদ্যমান আছে বলিয়া আমাদের জানা। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে যে প্রতিলিপি ছিল (বৃহৎ চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ) তাহা এক্ষণে এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত আছে। ইহাতে গ্রন্থকারের নাম নাই—সোসাইটির গ্রন্থসূচিতে ভ্রমক্রমে গ্রন্থকারের নাম "রঘুপতি বিদ্যাভূষণ" বলিয়া মুদ্রিত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে রঘুপতি ছিলেন রঘুমণি বিদ্যাভূষণেরই এক অপ্রসিদ্ধ সহোদর এবং তাঁহার উপাধি ছিল "তর্কবাচস্পতি"। রাজা রাধাকান্ত দেবের গ্রন্থাগারে এই মহাভিধানের প্রতিলিপি (সুবৃহৎ দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ) রক্ষিত আছে—প্রারম্ভে ১৯ শ্লোকের এক দীর্ঘ ভূমিকায় মঙ্গলাচরণ, গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের সম্যক্ পরিচয় ব্যতীত 'কম্পানি', "তচ্চক্রবর্ত্তিপদাভিষেক্তা শ্রীযুক্ত-মারিঙ্গ্‌টন-লাডনামা" (অর্থাৎ Lord Mornington) এবং "ভদ্রতামস-হেন্‌রুক্-কুলবুরুক্-সাহেব-সাম্রাজ্যভাক্" (অর্থাৎ, Henry Thomas Colebrooke) শ্লোকত্রয়ে (৪-৬ সংখ্যক) কর্ত্তৃপক্ষের কৌতুকজনক প্রশস্তি আছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে হুগলীনিবাসী একজন ভদ্রলোক আবর্জ্জনা মনে করিয়া বহুখণ্ডে বিভক্ত এই মহাকোষের একটি প্রতিলিপি ফেলিয়া দিয়াছিলেন এবং আমাদের সুহৃদ্বর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কাশীনাথ বিদ্যানিধি কাব্যতীর্থ মহাশয় তাহা সযত্নে কুড়াইয়া আনিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তাহা বিদ্যানিধি মহাশয়ের সৌজন্যে আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই প্রতিলিপির প্রায় ১০০ পৃষ্ঠা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহাতেও গ্রন্থকারের নাম নাই। গ্রন্থরচনা সম্পূর্ণ হইলে কোলব্রুক সাহেবের নির্দ্দেশে বহু বৎসর ধরিয়া ইহা কয়েক জন পণ্ডিতদ্বারা আমূল সংশোধিত হইয়াছিল—তাঁহারা সংশোধন করিয়াছিলেন তাহা লিপিবদ্ধ নাই এবং বর্ত্তমানে জানিবার উপায় নাই। সম্ভবতঃ তাঁহারা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। এই সংশোধনকার্য্য অতি নিপুণভাবে সম্পাদিত হইয়াছিল এবং আলোচ্য প্রতিলিপিটি এই অতীব মূল্যবান্ সংশোধিত সংস্করণ বটে।

গ্রন্থরচনাকালে সংস্কৃত কোন অভিধানই মুদ্রিত হয় নাই—যাবতীয় কোষের পুঁথি সংগ্রহ করিয়া এবং বিশাল সংস্কৃত সাহিত্য আলোড়ন করিয়া তাহা হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিতে গ্রন্থকারকে যে পরিশ্রম করিতে হইয়াছে অধুনা কলিকাতা মহানগরীর প্রাসাদে ফ্যান্-কোন্-সজ্জিত কক্ষে বসিয়া আমরা তাহা কল্পনাও করিতে পারি না। এই অভিধানের বৈশিষ্ট্য প্রধানতঃ তিনটি—শব্দসমূহের বিশদ ব্যুৎপত্তি, নানার্থের প্রমাণস্বরূপ বহু সংখ্যক মূল কোষের অবিকল উদ্ধৃত বচন এবং স্থলে স্থলে নানা কাব্যাদি হইতে উদ্ধৃত মনোহর উদাহরণ শ্লোক। আমরা এই তিন প্রকার বৈশিষ্ট্যের মাত্র তিনটি নিদর্শন দেখাইতেছি:

১। "অকূপার" শব্দের ব্যুৎপত্তি—"কুং পৃথ্বীং পিপর্ত্তি পূরয়তি বেতি কূপারঃ, পৄ পালনপূরণয়োঃ কর্ত্তর্য্যণ্ অন্যেষামপীতি পূর্ব্বপদদীর্ঘঃ ন কূপারঃ ইত্যকূপারঃ নঞ্ সমাসঃ। অথবা খগতৌ কর্ত্তর্য্যণ্ অগাধত্বাৎ কূপং ঋচ্ছতীতি বিগ্রহঃ। যদ্বা কু কুৎসিতং পারমস্যেতি কূপারঃ ততো নঞ্ সমাস ইত্যপি কশ্চিৎ। অবিদ্যমানা কুঃ পৃথিবী পারেঽস্যেত্যন্যে—এতন্মতেঽন্যেষামপীতি দীর্ঘঃ।

সংশোধনকর্ত্তা যোজনা করিয়াছেন "অকুৎসিতং পারমস্য অকূপারঃ অন্যেষামপীতি দীর্ঘঃ। ন কুং পৃথ্বীং পিপর্ত্তি মর্য্যাদাপালনাদিভিঃ অকূপার ইতি তু স্বামী। অবিদ্যমানা কুঃ পৃথ্বী পারেঽস্যেতি স্বন্যে। ন কুং পৃথ্বীং বৃণোতি অপি পূর্ব্ববদ্দীর্ঘত্বে অকূবার ইত্যন্যে ইতি রায়মুকুটঃ। ন কূপং ঋচ্ছতি খগতৌ কর্ম্মণ্যণ্ ইতি রামাশ্রমঃ।"

২। "অবষ্টম্ভ" শব্দের অর্থ—"অবষ্টম্ভঃ সুবর্ণে চ স্তম্ভপ্রারম্ভয়োরপি" ইতি মেদিনীশব্দরত্নাবলী-ত্রিকাণ্ডশেষ-জটাধর-বিশ্ব-শব্দমালাসু। 'সৌষ্ঠবং স্যাদবষ্টম্ভ' ইতি তৎপর্য্যায়ে হলায়ুধঃ।" সংশোধনকর্ত্তা সৌষ্ঠব শব্দের অর্থ-যোজনা করিয়াছেন "প্রশংসায়াং, প্রশ্রয় ইতি যাবৎ।"

৩। অব্যয় 'অন্তরে' শব্দের প্রয়োগ একটি অতি দুর্লভ শ্লোকে প্রদর্শিত হইয়াছে—"অত্রান্তরে সমুপসৃত্য মনোজমূর্ত্তি-দৌবারিকঃ সবিনয়ং কিল মাং জগাদ।

বালে ত্বদীয়জননী শুভনীতিযুক্তা

ত্বাং দ্রষ্টুমত্র সদনাৎ সমুপাগতাস্তি ॥

ইতি পদ্যকাদম্বরীকাব্যে তারামণিঃ।"

ভারতবর্ষে বিগত ১৫০ বৎসর মধ্যে বহু অভিধান রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে—আলোচ্য মহাভিধানের এই ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্য কুত্রাপি অনুসৃত হয় নাই। গ্রন্থকার ও সংশোধকগণ যে সকল পূর্ববতন অভিধানাদির বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাদের একটি তালিকা আমরা যথাসাধ্য সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

অজয়পাল, অমরকোষ, অমরমালা, উণাদিকোষ, উণাদিবৃত্তি (উজ্জ্বলদত্তকৃত, সিদ্ধান্তকৌমুদী ও সংক্ষিপ্তসার-সম্মত), উৎপলিনী, একাক্ষরকোষ, কৌমুদী (দীক্ষিতকৃত), চিকিৎসা-রত্নমালা (সংক্ষেপে রত্নমালা), জটাধর, ত্রিকাণ্ডশেষ দ্বিরূপকোষ (পুরুষোত্তম ও ভরতকৃত), দুর্গ, ধরণি, নানার্থ-ধ্বনিমঞ্জরী, ভূরিপ্রয়োগ, মেদিনী, রত্নকোষ, রন্তিদেব, রভস, রাজনির্ঘণ্ট, রাজবল্লভ, বর্ণাভিধান, বামন, বিশ্বপ্রকাশ, বোপদেব, শব্দচন্দ্রিকা, শব্দমালা, শব্দরত্নাবলী, শাশ্বত, সারস্বত, হলায়ুধ, হারাবলী, হেমচন্দ্র (সটীক)। শব্দমুক্তা-মহার্ণবের মুদ্রণ বিষয়ে হতাশ হইয়া রঘুমণি খড়দহের প্রাণ-কৃষ্ণ বিশ্বাসের অর্থে "প্রাণকৃষ্ণীয় শব্দাব্ধি" নামে একটি ক্ষুদ্র অভিধান ১৭৩৭ শকাব্দে মুদ্রিত করিয়া যান (পুথির আকারে পত্রসংখ্যা ১৭১)। সমগ্র ভারতবর্ষে ইহাই সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত বর্ণানুক্রমিক সংস্কৃত অভিধান। শব্দাব্ধির প্রারম্ভে একটি প্রমাণপঞ্জী আছে—তন্মধ্যে একটিমাত্র নূতন নাম দৃষ্ট হয় "শব্দমুক্তাবলী"। এতদ্ভিন্ন অমরকোষের বহু টীকার বচন মহার্ণবে উদ্ধৃত হইয়াছে—ক্ষীরস্বামী, রায়মুকুট, রমানাথ, রামনাথ, সারসুন্দরী, রামাশ্রম এবং সর্ব্বোপরি ভরতমল্লিক।

রঘুমণি যে সকল গ্রন্থ হইতে উদাহরণ শ্লোক আহরণ করিয়া মহাভিধানকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন তাহাদের সূচি সঙ্কলন করা দুঃসাধ্য—পুরাণ, স্মৃতি, দর্শন, তন্ত্রশাস্ত্র, জ্যোতিষ, বৈদ্যক, কাব্যনাটকাদি, অলঙ্কার, ছন্দঃ প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রে তাঁহার অভিনিবেশ দেখিলে তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞকল্প মহাপণ্ডিত বলিয়া জানা যায়। পাদ্রী ওয়ার্ড সাহেব তাঁহার "হিন্দু" গ্রন্থে ১৮১৭ সনে জীবিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তিন জন পণ্ডিতের মধ্যে রঘুমণির নামোল্লেখ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী কালে রোথ-বোঠলিঙ্ক, মনিয়র উইলিয়াম্‌স্ ও আপ্‌টের অভিধান উদাহরণ সঙ্কলন করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছে। অথচ যে বাঙ্গালী মহাপণ্ডিত এ বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম বিপুল চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহার নাম ও কৃতিত্ব বিস্মৃতির অন্ধকারে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। আমরা কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত করিয়া রঘুমণির পাণ্ডিত্যের নিদর্শন প্রকাশ করিতেছি।

ইভনিমীলিকা—ইভস্যেব নিমীলো দৃষ্টিপাতো যস্যাং দর্শন-স্যাল্পত্বাৎ—বহুব্রীহৌ কপ্রত্যয়ে ইভনিমীলিকা। "বৈদগ্ধী ভঙ্গিশ্চেভনিমীলিকেতি" ত্রিকাণ্ডশেষঃ। গজপর্য্যায়াৎ নিমীলনবাচকোপপদস্যাঃ পর্য্যায়ঃ—"গজনিমীলনবদ্ধমনশ্চিরং দধতি দর্শনতত্ত্ববিদঃ স্বতো" ইতি তিথিবিবেক-তাৎপর্য্য-দীপিকায়ামাচার্য্যচূড়ামণিঃ।

জল্লাক—"ভ্রূভাবং পুনরাহ গৌতমমুনির্জল্লাককল্লানল" ইতি ন্যায়সংগ্রহঃ।

তনূজ—"তনূজং প্রাসূত প্রথমমহিষী তস্য নৃপতেরিতি" রামচরিত্রকাব্যম্।

দ্রব—"দ্রবীকৃতং যন্মুরবৈরিসেবকৈ

র্ন তেন খেদং কুরু কঞ্চ কাঞ্চন।

উপেত্য মঞ্জীরপদং হরেঃ পদং

দ্রবন্ন কস্য দ্রবতাং বিধাস্যসি॥"

ইতি কৃষ্ণপদামৃতকাব্যম্।

ধুরীণ—"মুখেন্দুনির্বিরীষনিঃসৃতসুধাধরীমাধুরী-

ধুরীণভণিতাধরীকৃতকণাধরাধীশিতুঃ।"

ইতি সংক্ষেপশঙ্করদিগ্বিজয়ঃ।

রঘুমণি-সঙ্কলিত এই উদাহরণমালা পৃথক্ সঙ্কলন করিয়া মুদ্রিত করিলে একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হয় এবং তদ্দ্বারা এই মহা-পণ্ডিতের সমুচিত স্মৃতিতর্পণ সাধিত হইতে পারে। তিনি যে সকল বিস্মৃতপ্রায় কবির শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন কেবল তাঁহাদেরই একটি সূচি সঙ্কলিত হইল—অচল পণ্ডিত, কুমুদানন্দ, গণপতিকবি, চৈতন্যদেব, তারামণি, ত্রিবিক্রিম ভট্ট, নরহরিকবি, লক্ষ্মণকবি, বাহিনীপতি, শিবস্বামিকবি প্রভৃতি। নানা নাটকের মধ্যে তাঁহার প্রিয়তম গ্রন্থ ছিল "প্রসন্নরাঘব" (তাঁহার মতে পক্ষধর মিশ্র-রচিত)। "সৎ-পদ্যরত্নাকর"ও তাঁহার একটি প্রিয় গ্রন্থ এবং "ইতি প্রাচীনাঃ" বলিয়া বহু মনোহর উদ্ভট শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তিনি রসজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন।

রাজগুরুবংশীয় শিষ্যসম্পত্তিশালী রঘুমণি তন্ত্রশাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন, বলা বাহুল্য মাত্র এবং বহু তন্ত্রের বচন তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তন্মধ্যে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত (এবং তন্ত্রগুরু) রামেশ্বর তর্কবাগীশ-রচিত "তন্ত্র-প্রমোদ" গ্রন্থ হইতে বহু মনোহর শ্লোকাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। রঘুমণি স্বয়ং "আগমসার" নামক একটি তান্ত্রিক নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন—"উতথ্যানুজ" শব্দের ব্যাখ্যা-স্থলে এই গ্রন্থের একটি গদ্যবচন উদ্ধৃত হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা কৌতুকজনক তথ্য হইল, রঘুমণি যে স্বয়ং "দণ্ডকচন্দ্রিকা" রচনা করিয়া প্রাচীন স্মার্ত্ত কুবেরের নামে তাহা চালাইয়া দিয়া ঐ সময়ের সকল কর্ত্তৃপক্ষকে প্রতারিত করিয়াছিলেন,

ঐ গ্রন্থের শেষ সঙ্কেত শ্লোকের একটি পাদ অভিধানে উদ্ধৃত হইয়াছে :

তারণি (নৌকায়াং)—"অঙ্গিনাং ধর্ম্মতারণিরিতি চন্দ্রিকায়াম্।"

এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হয়, দত্তকচন্দ্রিকা ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল।

শব্দমুক্তামহার্ণব ও উইলসনের অভিধান

রঘুমণির এই বিরাট গ্রন্থ যাঁহাদের হস্তে সংশোধিত হইয়াছিল তাঁহারা কতিপয় স্থলে 'ইতি কোলবুরুক" বলিয়া প্রমাণ বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। অর্থাৎ কোলব্রুক্ সাহেবই এই অভিধান রচনায় ও সংশোধনে প্রধান পুরুষ ছিলেন। এই মনীষী সংস্কৃত গ্রন্থের ও শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু যাঁহার উপর এই অভিধানের অনুবাদভার অর্পিত হইয়াছিল সেই উইলসন সাহেব পণ্ডিতদের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন এবং তাঁহাদের প্রতি কপটাচরণের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। শব্দমুক্তামহার্ণবের সংশোধিত প্রতিলিপিটি আবিষ্কৃত হওয়ায় উইলসনের এই বিস্ময়জনক কপটাচরণ আজ নূতন করিয়া প্রকাশ হইয়া পড়িল। "দৌঃসাধিক" শব্দের পর এই প্রতিলিপিতে একটি কাল নির্দ্দেশ আছে—"শকাব্দাঃ ১৭৩৬ আষাঢ়স্য ৩১ দিবসে গুরুবারে প্রস্তুতমেতৎ" (= ১৮১৪ খ্রীঃ)। এক বৎসর পরে ১৮১৫ খ্রীঃ উইলসনের অনুবাদের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় এবং রঘুমণির মৃত্যুর কয়েক মাস পরে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে তাহা সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয়। সুদীর্ঘ ভূমিকার প্রারম্ভে সাহেব দুঃখ করিয়া লিখিলেন, মূলগ্রন্থ একমাত্র অভিধান (Dictionary) পদবাচ্য হইলেও ইহার আয়তন ও গৌরব (extent and value) অনুপাতে রচনায় বেশ বিলম্ব ঘটিয়াছে এবং ১৮০৯ সনে সম্পূর্ণ হইয়াছে; কারণ, বাধ্য হইয়া রচনাকার্য্য অনভ্যস্ত দেশীয় পণ্ডিতদের (native scholars) দ্বারা করাইতে হইয়াছে !! প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থটি শেষ হইয়াছিল ১৮০৭ সনে (*Bengal : Past and Present*, xxi, pp. 191-2) এবং অনুবাদ কার্য্যে নিজের অযোগ্যতা ও অত্যধিক বিলম্ব ঢাকিবার জন্য সাহেব এই লজ্জাকর অসত্য ভাষণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রাথমিক অনুবাদ কোলব্রুক সাহেব ফিরাইয়া দিয়া মূলগ্রন্থ সংশোধন করিয়া লইতে বলিয়াছিলেন। তখন নাকি দেখা গেল, রঘুমণির শুদ্ধরচনার ক্ষমতাই ছিল না ("accuracy was no part of the compiler's merits" p. iii)—অসংখ্য ভুল [illegible] ইত্যাদি !! অথচ এই রঘুমণির দত্তকচন্দ্রিকা অর্দ্ধ-[illegible] ধরিয়া এই সাহেবদের নিকট সুপ্রাচীন প্রমাণ গ্রন্থরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল। "সৌভাগ্যবশতঃ" (fortunately) এই সংশোধন কার্য্যটাও নামোল্লেখ না করিয়া দেশীয় সহকারী দ্বারাই (native assistants) করিতে হইয়াছে—অবশ্য সাহেবের কড়া নজরে। কিন্তু যদিও তাঁহাদের অনেকেই বিখ্যাত এবং প্রবীণ পণ্ডিত ছিলেন একজনকেও তিনি সহযোগীর (partner) মর্য্যাদা দিতে রাজী হন নাই। এস্থলে সাহেব চতুর্ম্মুখে পণ্ডিতদের চরিত্রে আলস্য প্রভৃতি নানা দোষের বিশদ বর্ণনা করিয়াছেন (আমরা pp. iii-iv সকলকে পড়িয়া দেখিতে বলি)। এক জন পাঠক তাহা পড়িয়া মন্তব্য করিয়াছেন "still their assistance! fine indeed!" (এসিয়াটিক সোসাইটির বই দ্রষ্টব্য)। সাহেব পরেও আর এক বার সোল্লাসে রঘুমণির সীমাহীন ভ্রমপ্রমাদের উল্লেখ করিয়াছেন (pp. xlii-iii) —কমপক্ষে তিনি নাকি স্বয়ং বহু সহস্র ভুল সংশোধন করিয়াছেন !! সাহেবের এই দম্ভোক্তি যে একটি নির্জ্জলা মিথ্যা ভাষণ তাহা সংশোধিত শব্দমুক্তামহার্ণবের প্রতিলিপি দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়—একটি ভুলও তিনি পণ্ডিতদের সাহায্যব্যতিরেকে সংশোধন করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। ঐ-অক্ষরে মোট শব্দসংখ্যা ২৪, তন্মধ্যে রঘুমণি ভুল করিয়াছিলেন মাত্র একটি—ঐঙ্গুদ "ন্যগ্রোধফলে" (সংশোধন হইয়াছে "ইঙ্গুদফলে")। এই ভুল স্বল্পপাঠী বালকেও ধরিতে পারে—এস্থলে (নিঃসন্দেহ স্বয়ং উইলসন সাহেব) মন্তব্য করিয়াছেন "Mistake of meaning"! শেষ তিন শব্দ (ঐষমস্, ঐষমস্ত্য, ঐষমস্তন) সংশোধকের নিপুণ হস্তে সংযোজিত। সংশোধক "মৈরেয়মিতি পাঠঃ সম্যগেব" বলিয়া "ঐরেয়" শব্দ কাটিয়া দিয়াছিলেন—সাহেব তাহা বর্জ্জন করেন নাই। ও-অক্ষরে একটি মাত্র শব্দ (ওন্দন) কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং একটি (ওজ) যোজিত হইয়াছে। ওম্ শব্দের ব্যুৎপত্তি রঘুমণি দেন নাই—সাহেব দিয়াছেন "অব+মন reject টি of the affix Un. 1 1. 35"। অনধিক পাঁচ বৎসরে রঘুমণি যে বিরাট সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন দশ-বারো বৎসর ধরিয়া পণ্ডিতদ্বারা তাহার এজাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গ-শোধন করিয়া যিনি "দূর্ শালা" বলিয়া তাঁহাদিগকে গালাগালি করিয়া বিদায় দিয়াছিলেন, তাঁহার কুৎসিত মনোবৃত্তির তুলনা রঘুমণির উদ্ধৃত একটি শ্লোকার্দ্ধে আছে—"দোষগ্রাহী গুণত্যাগী চালনীব হি দুর্জ্জনঃ" (চালনী শব্দ দ্রষ্টব্য)।

শব্দমুক্তামহার্ণব ও শব্দকল্পদ্রুম

বিশ্ববিখ্যাত শব্দকল্পদ্রুম অভিধানের প্রথম খণ্ড ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়—উইলসন সাহেব ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দেই ভূমিকায় (p xxxviii পাদটীকা) তাহার প্রশস্তিপূর্ব্বক

বিজ্ঞাপন দিয়া লিখিয়াছেন, এই পরমোৎকৃষ্ট অভিধান শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদ্বারা কলিকাতায় রচিত হইতেছে ("with the assistance of the best Pandits") এবং রাধাকান্ত দেব বয়োজ্যেষ্ঠ হইয়াও যৌবনসুলভ প্রবৃত্তির পরিবর্তে এই বিদ্যাচর্চ্চার জন্য সাহেবের নিকট বাহবা লইয়াছেন। আমরা দেখিয়াছি শব্দমুক্তামহার্ণবের প্রতিলিপি অদ্যাপি রাধাকান্ত দেবের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে এবং প্রকৃতপক্ষে তাঁহার অভিধানের শব্দনির্ব্বাচন, সংক্ষিপ্ত ব্যুৎপত্তি ও আকর-প্রদর্শন প্রায় বার আনাই অবিকল ঐ শব্দমুক্তামহার্ণব হইতে টোকা। রঘুমণির অনেক ভ্রান্ত পাঠও রাধাকান্ত দেব ঢুকিয়া লইয়াছেন—"হৈমা" শব্দ সংশোধক "হেমা ইতি পাঠঃ" বলিয়া কাটিয়া দিয়াছিলেন, "হংসলোহক" শব্দ অমূলক (প্রকৃত পাঠ সংশোধক উদ্ধৃত করিয়াছেন, 'পীতলোহং সুলোহকং'), "ভটা" শব্দ চির্ভটা হইবে ইত্যাদি। অথচ রঘুমণি ও তাঁহার গ্রন্থের নাম প্রযত্নপূর্ব্বক গোপন করা হইয়াছে এবং যে সকল হতভাগ্য দরিদ্র পণ্ডিত যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা পাইয়া আত্মনাম বিলোপ করিয়া রাধাকান্ত দেবকে বিশ্ববিখ্যাত করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের নাম ঘুণাক্ষরেও কুত্রাপি উল্লিখিত হয় নাই। এ বিষয়ে রাধাকান্ত দেব উইলসন সাহেবকেও হারাইয়া দিয়াছেন—সাহেব অন্ততঃ রঘুমণির এবং এক জন সাহায্যকারী বিদ্যাকর মিশ্রের নাম করিয়াছেন। যুগে যুগে এবং দেশে দেশে প্রতিভাচোষণকারী (brain-suckers) এক শ্রেণীর লোক সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, কিন্তু ইংরেজশাসনে ভারতবর্ষে এবং বিশেষ করিয়া বঙ্গদেশে এই শ্রেণীর গ্রন্থকারদের যে অপলীলা চলিয়াছিল (এবং নিতান্ত দুঃখের বিষয় অদ্যাপি চলিতেছে) তাহার তুলনা নাই।

সম্মোহনতত্ত্ব

শ্রীমণীন্দ্রনাথ দাস

সম্মোহনতত্ত্বের সম্যক্ সমালোচনার অভাবে এদেশে ঐ বিদ্যা এখনও বহুল পরিমাণে রহস্যাবৃত এবং কুহেলিকাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই বিষয় সম্পর্কিত বিবিধ তথ্যের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা দ্বারা সন্দেহভঞ্জন ও কৌতূহল-নিরসনের যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইবে, তবে সংক্ষেপে এই প্রয়াস কতদূর ফলপ্রসূ হইবে বলা যায় না।

সম্মোহিত অবস্থাকে এক প্রকার কৃত্রিম তন্ময় নিদ্রা বলা যাইতে পারে। স্বাভাবিক নিদ্রার সময় বহির্জগতের সহিত মানুষের বিশেষ কোন মানসিক যোগাযোগ থাকে না, কিন্তু সম্মোহন-সময়ে অল্লাধিক বাহ্যজ্ঞানশূন্য পাত্রের (Subject) মন শুধু সম্মোহনকারীর প্রতি একাগ্রভাবে আকৃষ্ট থাকে। এ অবস্থায় সে নিকটস্থ দর্শকদের কোন কথায় প্রভাবিত হয় না, কিন্তু সম্মোহকের ক্ষীণতম আজ্ঞাও তৎক্ষণাৎ পালন করে; সেজন্য সম্মোহক এই সময়ে সম্মোহিত ব্যক্তির কতিপয় দৈহিক ও মানসিক ক্রিয়া ইচ্ছামত পরিচালিত করিতে পারেন। কোন কোন মনস্তত্ত্ববিদের মতে সম্মোহনকালে পাত্রের সমগ্র মনের একাংশ বিশ্লিষ্ট (dissociated) হইয়া সম্মোহনকারীর সহিত আবদ্ধ হয়। অপরের উপর ক্ষমতাবিস্তারের অভিপ্রায় এবং অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হইবার আশঙ্কা—মানব-মনের এই দ্বিবিধ অভিপ্রায়ের জন্য সম্মোহন-বিদ্যার উদ্ভব সম্ভব হইয়াছে। খুব সম্ভব, সম্মোহনতত্ত্ব সর্ব্বপ্রথম ইউরোপে ডাক্তার মেসমার কর্তৃক আবিষ্কৃত ও প্রচলিত হয়। ভারতে তন্ত্রশাস্ত্রে বশীকরণবিদ্যার উল্লেখ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সম্মোহন-পদ্ধতির যে রূপের সহিত বর্ত্তমানে আমরা পরিচিত তাহার সঙ্গে তন্ত্রোক্ত বশীকরণতত্ত্বের বিশেষ কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না। সম্মোহন-বিজ্ঞান প্রধানতঃ পাশ্চাত্ত্য ভাবেই অনুপ্রাণিত। অবশ্য একথা খুবই সত্য যে, স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতীয় যোগীরা নাসাগ্র অথবা প্রদীপ-শিখার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আত্ম-সম্মোহন অভ্যাস করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু পর-সম্মোহনের সহজসাধ্য প্রক্রিয়া-পদ্ধতি উদ্ভাবনের কৃতিত্ব ইউরোপবাসীদেরই প্রাপ্য। অনেকের ধারণা—যাহাদের স্নায়ু দুর্ব্বল এবং যাহারা দুর্ব্বলচিত্ত, তাহারা সহজে সম্মোহিত হয়, কিন্তু এই বিশ্বাস সত্য নয়, অধিকাংশ অভিজ্ঞ সম্মোহনকারী ডাক্তারের অভিমত শতকরা প্রায় ৯০ জন সুস্থ সবল ও বুদ্ধিমান নর-নারীকে অল্লাধিক মোহাচ্ছন্ন করা সম্ভব। ক্ষীণবুদ্ধি ব্যক্তি এবং উন্মাদ রোগী বেশীক্ষণ মনঃসংযোগ করিতে পারে না বলিয়া তাহাদের প্রভাবিত করা একরূপ অসম্ভব। কেহ কেহ মনে করেন—সম্মোহক প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারা অন্য লোককে বশীভূত করেন, কিন্তু এই প্রকার আস্থারও কোন ভিত্তি নাই, কারণ অত্যন্ত অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে জোর করিয়া কখনও সম্মোহিত করা যায় না। সম্মোহন-কার্য্যে সাফল্য লাভ করিতে

হইলে পাত্রের সম্মতি ও সহযোগিতার বিশেষ প্রয়োজন। সম্মোহন-প্রক্রিয়া আয়ত্ত করা কঠিন নয়, ইহার জন্ম চাই আত্মবিশ্বাস আর বিচারবুদ্ধি। কোন কোন রোগের চিকিৎসায়, মনোবিশ্লেষণ-কর্ম্মে, মনোবৃত্তির উন্নতিসাধনে এবং পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানে সম্মোহন-বিদ্যার ব্যবহারিক প্রয়োগের প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে, সেজন্য এই দিকে সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইতেছে।

এখন, মোহনিদ্রা উৎপন্ন করিবার যে চারি প্রকার পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইল:

১। ডাঃ মেসমারের প্রক্রিয়া

২। ডাঃ ব্রেডের প্রণালী

৩। ডাঃ বার্ণহিমের পন্থা

৪। রাসায়নিক পদ্ধতি

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভিয়েনার জার্ম্মান ডাক্তার ফ্রেডরিক এণ্টন মেসমার (১৭৩৩-১৮১৫) কোন মাদকদ্রব্যের সাহায্য ব্যতীত যে মানুষকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করা যায় তাহা সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। তাঁহার নাম হইতেই Mesmerism শব্দের উৎপত্তি। ডাক্তার মেসমার জৈব-চৌম্বক শক্তির (Animal Magnetism) অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, সম্মোহনের সময় প্রয়োগকর্ত্তার (operator) শরীর হইতে এক প্রকার চৌম্বক-শক্তি বাহির হইয়া পাত্রের দেহে প্রবেশ করে বলিয়া সে আবিষ্ট হইয়া পড়ে। এই প্রণালীতে নিদ্রা উৎপন্ন করিতে হইলে পাত্রের চক্ষুর দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিতে হয়, আর তাহার সমস্ত শরীরের উপর দিয়া স্পর্শ না করিয়া ধীরে ধীরে হস্ত সঞ্চালন (Passes) করিতে হয়।

অতঃপর উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংলণ্ডে ডাক্তার জেমস ব্রেড তন্দ্রা উৎপাদন করিবার আরও সহজসাধ্য প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া তাহার নাম Hypnotism দেন। গ্রীক শব্দ Hypnos মানে নিদ্রা। ডাক্তার ব্রেড তাঁহার রোগীকে উপবেশন করাইয়া কোন উজ্জ্বল ধাতব বস্তুর দিকে একদৃষ্টে কুড়ি-পঁচিশ মিনিট তাকাইয়া থাকিতে বলিতেন। ইহাতেই খানিকক্ষণের মধ্যে সে মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িত।

তদনন্তর উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ফ্রান্সের সুপ্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ববিদ্ চিকিৎসক বার্ণহিম প্রচার করেন যে, কৃত্রিম নিদ্রা সৃজন করিতে হইলে কেবল মৌখিক আদেশ বা অভিভাব (suggestion) যথেষ্ট। ডাক্তার বার্ণহিম রোগীকে স্থির ভাবে বসাইয়া ধীর অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া যাইতেন—তাহার চোখের পাতা ভারী বোধ হইতেছে, সমস্ত শরীর তন্দ্রালু হইয়া আসিতেছে, সর্ব্বদেহ ঘুমে ঢুলিয়া পড়িতেছে, শীঘ্রই সে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িবে—এই ভাবে কিছুক্ষণ নিদ্রাবাণী উচ্চারণ করিয়া তিনি বহু ব্যক্তিকে সম্মোহিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

মোহাবিষ্ট করিবার আধুনিক রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বিষয় উল্লেখ করিতেছি। আজকাল ইউরোপ, আমেরিকার কোন কোন চিকিৎসক রোগীর শরীরে মৃদু মাত্রায় সোডিয়াম এমিটাল, সোডিয়াম পেণ্টোথাল প্রভৃতি ঔষধ ইঞ্জেকশন দিয়া সম্মোহনের মত আবিষ্ট অবস্থা সৃজন করিয়া থাকেন। এইরূপে উৎপন্ন অর্দ্ধ-নিদ্রিত ভাব মনোবিশ্লেষণ ও মানসিক চিকিৎসার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এতদ্ব্যতীত কখনও কখনও অল্প পরিমাণ ক্লোরোফর্ম বা ইথারের আঘ্রাণ লওয়াইয়া কিংবা যৎসামান্য সুরাসার সেবন করাইয়া কোন কোন বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন ব্যক্তিকে সম্মোহনের অনুকূল অবস্থায় আনয়ন করা যায়।

গভীরতা অনুসারে সম্মোহন-অবস্থার শ্রেণী-বিভাগ করা হইয়াছে:

প্রথম অবস্থায়—পাত্রের চোখের পাতা ভারী বোধ হয় আর দেহ তন্দ্রাচ্ছন্ন বোধ হয়।

দ্বিতীয় অবস্থায়—পাত্রের হস্ত কোন বিশেষ ভঙ্গীতে স্থাপন করিয়া যদি বলা হয় তাহার হস্ত ঐ ভাবেই অবস্থান করিবে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে হস্ত অপসারণ করা অসম্ভব হইয়া যায়। কখনও কখনও দেখা যায়, কোনপ্রকার অনুজ্ঞা ব্যতিরেকেও আপনা হইতেই সম্মোহনাবিষ্ট পাত্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমন নমনীয় হইয়া পড়ে যে, সম্মোহনকারী তখন যে ভাবেই তাহার অঙ্গ রক্ষা করুন না কেন উহা সেই ভাবেই অবস্থিতি করে। প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায় পাত্রের জ্ঞান ও স্মৃতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক থাকে।

তৃতীয় অবস্থায়—বহির্জগতের সহিত তাহার আর কোন সম্বন্ধ থাকে না, সে কেবল প্রয়োগকর্ত্তার গলার স্বর শুনিতে পায়।

চতুর্থ অবস্থায়—সম্মোহনকালীন কোন ঘটনা পরে জাগ্রত হইয়া সে আর মোটেই স্মরণ করিতে পারে না। এই স্তরে পাত্রের মনে নানা রকম বিভ্রম উৎপন্ন করা যায়।

কাহারও মনে কোন রকম ভয় ভাবনা, অনিচ্ছা, অবিশ্বাস, বিরুদ্ধতা বা ব্যঙ্গের ভাব বিদ্যমান থাকিলে কিংবা কোন প্রকার শারীরিক অস্বস্তি-অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভূত হইলে তাহাকে সম্মোহিত করিবার সকল প্রয়াস বিফল হয়। পাত্রের মন শান্ত ও শরীর স্বচ্ছন্দ থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। অধ্যাপক ম্যাকডুগালের মতে বহির্মুখীচিত্ত (extrovert) ব্যক্তিবর্গকে সম্মোহিত করা অপেক্ষাকৃত সহজ, যাহাদের মন অন্তর্মুখী (introvert) তাহাদের সম্মোহিত করা কিছু কঠিন। অভিজ্ঞ সম্মোহকগণের ধারণা মানুষকে পাঁচ হইতে আশী বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মোহাচ্ছন্ন করা যায়। কোন কোন লোককে এক বারের চেষ্টাতেই প্রভাবিত করা যায় আবার কাহাকেও কাহাকেও তিন-চারি বারের প্রয়োগের পর কৃতকার্য্য হওয়া যায়।

সচরাচর মোহনিদ্রা ভঙ্গ করিতে কোন ক্লেশ পাইতে হয় না, —পাত্রকে দৃঢ়কণ্ঠে কয়েক বার জাগিয়া উঠিতে বলিলে এবং তৎসহ করতালি প্রদান করিলে তখনই সে সজাগ হইয়া উঠে। অবশ্য সম্মোহিত ব্যক্তি কোন কারণে সত্বর জাগরিত না হইলে ভয়ের কোন হেতু নাই, ঐরূপ অবস্থায় তাহাকে ছাড়িয়া দিলে তাহার

সম্মোহন-নিদ্রা ক্রমশঃ স্বাভাবিক নিদ্রায় পরিণত হয় এবং সে সময়-মত নিজেই জাগ্রত হয়।

আবিষ্ট ব্যক্তির চিত্তে কিরূপ বিভ্রম উৎপাদন করা যায় এখন তাহার বিষয় উল্লেখ করিতেছি। যদি তাহার হাতে একটি ছড়ি দিয়া বলা হয়—উহা ছিপ এবং সম্মুখে এক স্বচ্ছ জলাশয় রহিয়াছে, উহাতে অসংখ্য মৎস্য বিচরণ করিতেছে তাহা হইলে সে মৎস্য শিকারের কৌতুকজনক অনুকরণ করিতে থাকে। একটি রশুন তাহার নাসারন্ধ্রের নিকট ধরিয়া যদি বলা হয় উহা গোলাপ ফুল, তাহা হইলে সে তাহাই বিশ্বাস করে এবং মনে করে যথার্থই উহা হইতে গোলাপের সুমধুর সৌরভ উত্থিত হইতেছে। সম্মোহিত ব্যক্তির মুখে এক টুকরা আলু দিয়া যদি তাহাকে বলা হয় উহা নাসপাতি, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ উহা সাগ্রহে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়া দেয়। তাহাকে বধির বলিয়া সম্বোধন করিলে সে আর কোন শব্দই শ্রবণ করিতে পারে না; যদি তাহাকে কুকুর বলা হয়, তবে সে ঠিক সারমেয়সুলভ আচরণ আরম্ভ করিয়া দেয়। এই প্রকারে আবিষ্ট ব্যক্তির প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের উপরেই সম্মোহনকারী প্রভূত পরিমাণে কর্তৃত্ব করিতে পারেন—তবে মোহনিদ্রা যথেষ্ট গভীর হওয়া চাই।

ইহা ছাড়া সম্মোহক পাত্রের ইন্দ্রিয়সমূহকে ইচ্ছামত প্রখর অনুভূতিপ্রবণ বা স্বল্পানুভূতিপ্রবণ করিয়া দিতে পারেন। খুব সম্ভব আবিষ্ট অবস্থায় প্রদত্ত আজ্ঞা অনুসারে পাত্রের মনোযোগের যেমন প্রভেদ হয়, তাহার ইন্দ্রিয়ানুভূতিরও সেই অনুযায়ী তারতম্য ঘটিয়া থাকে।

সম্মোহিত অবস্থায় পাত্রের স্পর্শবোধকে অভিভাবের দ্বারা একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া যায়। ইথার ক্লোরোফর্ম, নাইট্রাস অক্সাইড, নভকেন প্রভৃতি বেদনালোপকারী ঔষধের ব্যবহার আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে কোন কোন অস্ত্র-চিকিৎসক সম্মোহন-শক্তির সাহায্যে রোগীকে অজ্ঞান করিয়া নির্ব্বিঘ্নে তাহার শরীরে অস্ত্রোপচার করিতেন। কলিকাতা নগরেই বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রেসিডেন্সী সার্জ্জন ডাক্তার জেমস এসডেল সম্মোহনবিদ্যার সহায়তায় ২৬১ সংখ্যক বেদনা-বিহীন অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করেন। ইহার কিছু পূর্ব্বে বিলাতে—যিনি প্রথম ষ্টেথিসকোপ যন্ত্র ব্যবহার করেন—সেই ডাক্তার জন ইলিয়টসন বহুসংখ্যক রোগীর অঙ্গে সম্মোহিত অবস্থায় সাফল্যের সহিত অস্ত্রোপচার সম্পাদন করেন। পরবর্ত্তীকালে ক্লোরোফর্ম ও অন্যান্য অসাড়তা-উৎপাদক পদার্থ উদ্ভাবনের ফলে রোগীকে অচেতন ও অবশ করা অপেক্ষাকৃত সুবিধা-জনক হওয়ায় সম্মোহন-শক্তির ব্যবহার ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

সম্মোহকের আদেশমত পাত্রের ঘ্রাণশক্তি, শ্রবণশক্তি ও স্পর্শবোধ আশ্চর্য্য রকম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। গোডেয়ার নামক এক বৈজ্ঞানিক একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন—যে স্থলে কোন আবিষ্ট ব্যক্তি আট জন লোকের হাতের আঘ্রাণ লইবার পর প্রত্যেককেই ঠিক ভাবে তাহাদের নিজ নিজ রুমাল প্রদান করে, যদিও তাহাকে ভুলপথে পরি-চালিত করার যথেষ্ট চেষ্টা হইয়াছিল। ডাক্তার ব্রেড একটি ঘটনার কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যেখানে ৪৫ ফুট দূর হইতে গোলাপের গন্ধ নির্ভুলভাবে নিরূপিত হইয়াছিল। সাধারণতঃ ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ প্রায় তিন ফুট দূর পর্য্যন্ত শ্রুতিগোচর হয়, কিন্তু মোহাবিষ্ট অবস্থায় কেহ কেহ এই ক্ষীণ শব্দ ৩৫ ফুট দূর হইতেও যে শ্রবণ করিতে পারে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। ডাক্তার ব্রেড আরও পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছিলেন—কোন কোন সম্মোহিত লোকের স্পর্শশক্তি এত তীক্ষ্ণ হয় যে, চোখ বাঁধা থাকিলে কিংবা সম্পূর্ণ অন্ধকার ঘরেও তাহারা কোন বস্তুর সহিত সঙ্ঘর্ষ না বাধাইয়া অক্লেশে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে পারে। খুব সম্ভব উত্তাপের প্রভেদ ও বায়ুর চাপের পার্থক্য হইতে তাহারা বিভিন্ন বস্তুর অস্তিত্বের আভাস পায়।

সম্মোহনবিদ্যার আরও অনেক অদ্ভুত ব্যবহারিক প্রয়োগ আছে। সম্মোহনকারীর আজ্ঞানুযায়ী পাত্রের হৃৎপিণ্ড অতি শীঘ্র কিংবা ধীরে ধীরে চলিতে থাকে। উপযুক্ত অভিভাবের দ্বারা তাহার দেহে ঘর্ম্ম উৎপন্ন করা যায়। এমনকি আদেশ দিয়া মোহাবিষ্ট ব্যক্তির শারীরিক উত্তাপ দুই-তিন ডিগ্রী ফারেনহাইট বাড়ানো বা কমানো সম্ভব হয়। তাহার কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে রক্তসঞ্চার প্রয়োজকের অনুজ্ঞানুযায়ী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কিংবা হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে পারে। কখনও কখনও বাক্ প্রয়োগের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তির চর্ম্ম হইতে রক্তক্ষরণ করানোও সম্ভবপর হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর বিষয় এই যে, প্রয়োগকর্তার বাক্যের প্রভাবে কোন কোন স্থলে বশীভূত ব্যক্তির দেহে ফোস্কা পর্য্যন্ত পড়িয়াছে।

ডাক্তার লয়েড টাকী এক বার কোন এক সম্মোহিত ব্যক্তির শরীরে একখানি ডাকটিকিট আটকাইয়া দিয়া বলেন যে, তাহার দেহে উত্তপ্ত লৌহ স্পর্শ করানো হইল। ইহার অল্পক্ষণ পরে দেখা গেল সত্য সত্যই ঐ জায়গায় ফোস্কা পড়িয়া গিয়াছে। ম্যাকডুগাল ও হ্যাডফিল্ড উভয় চিকিৎসকই পৃথকভাবে এই পরীক্ষা সম্পাদন করিয়া সমান সাফল্যলাভ করিয়াছেন।

এই সম্পর্কে অধ্যাপক ভেলবিউফ আর একটি অত্যাশ্চর্য্য পরীক্ষা সম্পন্ন করেন। তিনি প্রথমতঃ দুই জন লোকের দুই হাতের কিয়দংশ ঠিক সমান করিয়া দগ্ধ করিয়া দিলেন। প্রত্যেকেরই এক হাতের ক্ষতস্থানের কোন চিকিৎসা না করিয়া তিনি উহার ভার প্রকৃতির উপর ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু উক্ত ব্যক্তিদ্বয়কে সম্মোহিত করিয়া তিনি অনুজ্ঞা দিতে লাগিলেন যে, অপর হাতের ক্ষত সত্বর নিরাময় হইবে। তিনি কার্য্যক্ষেত্রে দেখিলেন যে, সেই হাতের ক্ষত অন্য ক্ষত অপেক্ষা শীঘ্র ও সহজে সারিয়া গেল।

ডাক্তার লয়েড টাকী তাঁহার গ্রন্থে সম্মোহনের সাহায্যে এক বৃদ্ধা বহুমূত্র রোগিণীর চিকিৎসার কথা বিবৃত করিয়াছেন। তিনি উক্ত রোগিণীকে গভীরভাবে সম্মোহিত করিয়া প্রায়ই বাক্ প্রয়োগ করিতেন যে তাহার রোগ নিশ্চয়ই হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে। একজন রাসায়নিক ঐ বৃদ্ধার মূত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন। তাঁহার পরীক্ষায়

ফলাফলে দেখা যায় যে, প্রকৃতই রোগিণীর প্রস্রাবে শর্করার ভাগ ক্রমশঃ কমিয়া গিয়াছিল। মানুষের অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিগুলির উপরেও কতখানি মানসিক প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব তাহা এই ঘটনায় প্রতিপন্ন হয়।

এখন, সম্মোহন-বিজ্ঞানের সর্ব্বাপেক্ষা অলৌকিক ও অতীন্দ্রিয় দিকটি আলোচনা করিব, কিন্তু প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে এই সকল আশ্চর্য্য ঘটনা সম্পূর্ণরূপে সত্য হইলেও সাধারণতঃ অত্যন্ত বিরল। বৈজ্ঞানিক সার উইলিয়াম ব্যারেট ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে একটি সম্মোহিত বালিকার চোখ বাঁধিয়া তাহার দিব্য অনুভূতির প্রসার পর্য্যবেক্ষণ করেন। তিনি বালিকার পশ্চাতে দণ্ডায়মান থাকিয়া স্বীয় মুখমধ্যে লবণ, চিনি, রাইসরিষা, আদা, মরিচ প্রভৃতি বিভিন্ন বস্তু ক্রমান্বয়ে স্থাপন করেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, বালিকাটি নির্ভুলভাবে ঐ সমস্ত পদার্থের নাম ও আস্বাদ বলিয়া গেল। তাহার এই অতীন্দ্রিয় আস্বাদজ্ঞানের পরিচয় পাইয়া ব্যারেট সাহেব অবাক হইয়া যান। অতঃপর তিনি নিজের এক হাত জ্বলন্ত মোমবাতির উপর ধরিয়া যৎসামান্য দগ্ধ করিলে, সম্মোহাচ্ছন্ন বালিকা তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল কে যেন তাহার হাতখানি পোড়াইয়া দিয়াছে। আর একবার ব্যারেট একখানি তাস লইয়া একটি পুস্তকের মধ্যে রাখিয়া বালিকাকে জিজ্ঞাসা করেন, উহার ভিতর কি আছে। সে উত্তর দেয় লাল ফোঁটা সম্বলিত কোন কিছু রহিয়াছে। উহাতে কয়টি ফোঁটা আছে প্রশ্ন করায় বালিকা পাঁচটি ফোঁটার কথা বলিল, তাসখানি প্রকৃতই রুহিতনের পাঞ্জা ছিল।

মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা সভার (Psychical Research Society) প্রথম দিকে এডমণ্ড গুর্ণী ও উইলিয়াম ব্যারেট উভয়েই সম্মোহিত অবস্থায় অতীন্দ্রিয় বোধশক্তি-সম্পর্কিত কতিপয় পরীক্ষার সময় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা লক্ষ্য করেন—কখনও কখনও সম্মোহক যদি পাত্রের অজ্ঞাতসারে কোন মুদ্রা, পুস্তক বা অন্য কোন বস্তুর উপর আকর্ষণের জন্য হস্তসঞ্চালন কিংবা অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া অন্যত্র গমন করিতেন, তাহা হইলে পরে ঐ কক্ষে সূক্ষ্ম অনুভূতি-সম্পন্ন পাত্রকে আনয়ন করিলে অবিলম্বে সে নির্দ্দিষ্ট বস্তু নির্ভুলভাবে নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইত।

এখন দূর-সম্মোহনের বিষয়ের অবতারণা করা হইবে। ফ্রান্সে ১৮৮৬ সনে অধ্যাপক জানেট ও ডাক্তার গিবার্ট একজন অনুভূতিশীল ব্যক্তির উপর প্রায় এক মাইল দূর হইতে সম্মোহন-প্রভাব প্রয়োগ সম্ভব কিনা তাহা পর্য্যবেক্ষণ করেন। এক্ষেত্রে পাত্রের সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত সময়ে যখন দূরবর্ত্তী সম্মোহনকারী প্রবল ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিতেন তখন দেখা গেল পঁচিশ বার প্রয়াসের মধ্যে অন্ততঃ আঠার বার তাহার মোহনিদ্রা উৎপন্ন হইয়াছিল।

অনেকেই বোধ হয় জানেন, সম্মোহনবিদ্যার দ্বারা বিমোহিত ব্যক্তির স্মরণশক্তি কত দূর বাড়ানো যায়। ইহার সহায়তায় তাহার পূর্ব্বকার অনেক অভিজ্ঞতা ও বিস্মৃত বিষয় পুনরুদ্ধার করা সম্ভবপর হয়। [illegible] এমন একজন সাধারণ স্মৃতিসম্পন্ন যুবকের কথা জানিতেন যে মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় আগের দিনের পড়া কোন বই ঠিক ভাবে পুনরাবৃত্তি করিতে পারিত। নিম্নের ঘটনাটি কৌতুকজনক। একখানি ডুবো জাহাজের বিস্ফোরণের ফলে উহার পরিচালক অজ্ঞান হইয়া পড়ে। জ্ঞানলাভের পর তাহার এমনই স্মৃতিভ্রংশ ঘটে যে, কয়েক মাস পূর্ব্বে যে সে বিবাহ করিয়াছিল তাহাও সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়। ইহার জন্য সে তাহার নববিবাহিতা পত্নীকে চিনিতে না পারিয়া তাহার সহিত বসবাস করিতেও অসম্মত হয়। বলা বাহুল্য, সম্মোহন-বিদ্যার সাহায্যে তাহার এই স্মৃতিবিভ্রম সত্বর অপসারিত হইয়াছিল।

কাহারও অন্তর্নিহিত অব্যক্ত কোন ক্ষমতা থাকিলে সম্মোহনের দ্বারা সহজেই তাহার বিকাশসাধন করা যাইতে পারে। যদি কোন লোকের মনে সঙ্গীত বা চিত্রাঙ্কনের প্রচ্ছন্ন প্রতিভা থাকে, তবে উহা এইরূপে ক্রমে ক্রমে জাগাইয়া তোলা যায়।

পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা গিয়াছে, সম্মোহন-অবস্থায় মানুষের সময়জ্ঞান অসাধারণ রকম বাড়িয়া যায়। মিল্‌নে ব্র্যামওয়েল একবার এক উনিশ বৎসর বয়স্কা তরুণীকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া আজ্ঞা দেন, সে যেন ৪৩৩৫ মিনিট পরে ক্রুশ চিহ্ন অঙ্কিত করে। যদিও নিদ্রাভঙ্গের পর এই কথা তাহার আর কিছুই মনে থাকিল না, তথাপি নির্দ্ধারিত সময় আগমন করিবামাত্র সে ঘড়ি না দেখিয়া আদিষ্ট কর্ম্ম ঠিক ভাবে নিষ্পন্ন করিয়া সকলকে বিস্মিত করিল। মোহাবস্থায় প্রদত্ত যে আদেশ জাগরণের পর কার্য্যকরী হয় তাহাকে সম্মোহনোত্তর-অভিভাব (Post Hypnotic Suggestion) বলা হয়। সম্মোহনোত্তর আদেশ এক বৎসর পরেও সক্রিয় হইয়াছে।

সম্মোহন-শক্তির সাহায্যে নানা প্রকার চরিত্রদোষ ও মন্দ অভ্যাস সংশোধন করা যায়। মাতাল ও নেশাখোরের মদ বা মাদক-দ্রব্যের প্রতি যে অদম্য আকর্ষণ পরিলক্ষিত হয়, এই বিদ্যাবলে তাহা নিবারণ করা যাইতে পারে। কৈশোরকালীন অন্যায় অপরাধ-প্রবণতা কতকটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্মোহন-বিজ্ঞানের সহায়তায় সম্ভব হয়।

শারীরক্রিয়ার ত্রুটিজনিত নানা রকম অসুখ, ব্যথা-বেদনা, শ্বাস-কষ্ট, পরিপাক যন্ত্রের গোলযোগ, সামান্য জ্বর, অনিদ্রা, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যাধি সম্মোহনশক্তির সাহায্যে নিরাময় করা যায়। কারণ এই আবিষ্ট অবস্থায় রোগীর মন অত্যন্ত বিশ্বাস-প্রবণ থাকে। প্রকৃতপক্ষে পীড়িত ব্যক্তির নিজের মনই তাহার রুগ্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ করিয়া তোলে, সম্মোহনকারী চিকিৎসক কেবল তাহার জীবনীশক্তিকে বিশেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা অতিশয় জাগ্রত ও একাগ্র করেন মাত্র।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, উন্মত্ত রোগীকে সম্মোহিত করা একরূপ অসম্ভব, কিন্তু ফ্রান্সে ডাক্তার আগষ্ট ভয়সিন এক সময় এই অসম্ভবকেও সম্ভব করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি অতিশয় উত্তেজিত এক উন্মাদিনীকে সম্মোহিত করিতে মনস্থ করেন। প্রথমে ঐ উন্মাদ রোগিণী তাঁহার প্রতি কিছুতেই স্থির ভাবে না চাহিয়া

অধিকতর উত্তেজিত ভাবে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিতে লাগিল, কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ডাক্তার ভরসিন অবিচলিত ভাবে—যে দিকেই সে চক্ষু ফেরাক না কেন—সেই দিকে তাঁহার মর্ম্মভেদী অচঞ্চল দৃষ্টি স্থাপন করিতে লাগিলেন। প্রায় পনর মিনিট কাল পরে ঐ উন্মত্তা নারীর নয়নদ্বয় ক্রমশঃ নিমীলিত হইয়া আসিল এবং সে গাঢ় তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। এই প্রক্রিয়া বহু দিন ধরিয়া প্রয়োগ করা হইয়াছিল, ধীরে ধীরে ঐ ব্যাধিগ্রস্তা রমণী আবিষ্ট অবস্থায় কিছুক্ষণের জন্য প্রকৃতিস্থ থাকিতে আরম্ভ করিলেও জাগ্রতকালে পুনরায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিত। ক্রমশঃ সে আবিষ্ট অবস্থায় প্রদত্ত আদেশ ও উপদেশ জাগ্রত অবস্থায় প্রতিপালন করিতে লাগিল। ইহার ফলে তাহার আচরণ ক্রমে ক্রমে এতই স্বাভাবিক ও উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল যে, পরিশেষে তাহাকে এক হাসপাতালে নার্সের কার্য্যে নিয়োগ করা হয়।

অনেকের ধারণা বশীভূত ব্যক্তিকে দিয়া যখন সম্মোহক যাহা ইচ্ছা তাহাই করাইতে সক্ষম, তখন তাহাকে চুরি, নরহত্যা, ব্যভিচার বা অন্য কোন দুষ্কর্ম্মে প্ররোচিত করাও হয়ত অসম্ভব নয়, কিন্তু এই কথা সর্ব্বাংশে সত্য নয়। সাধারণতঃ কোন চরিত্রবান ব্যক্তিকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া অন্যায় কাজ করিতে আদেশ দিলে, সে তাহা সম্পাদন করিতে অস্বীকৃত হয় এবং তাহার মোহনিদ্রাও সঙ্গে সঙ্গে ভাঙ্গিয়া যায়, এ অবস্থায় কিন্তু কোন অসচ্চরিত্র ব্যক্তিকে সহজে দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত করানো যায়। ডাক্তার হলাণ্ডারের মতে মন্দ লোকেরাই মন্দ অভিভাব গ্রহণ করে। তবে একথাও যথার্থ যে, সম্মোহন-নিদ্রা যদি প্রগাঢ় হয় এবং পাপকার্য্যকে যদি পুণ্যের আকারে পাত্রের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়, তাহা হইলে সে উহা নিষ্পন্ন করিতে ইতস্ততঃ নাও করিতে পারে। এজন্য কোন কোন দেশে সুযোগ্য চিকিৎসক ব্যতীত অন্যের পক্ষে সম্মোহন আইন-বিরুদ্ধ।

এতক্ষণ পর-সম্মোহনের বিষয় আলোচনা করা হইতেছিল, এখন আত্ম-সম্মোহনের ব্যাপার ব্যাখ্যা করা হইবে। সচরাচর হৃৎস্পন্দন, তাপ-নিয়ন্ত্রণ, গ্রন্থিরস নিঃসরণ, শোণিত-সঞ্চলন প্রভৃতি দৈনিক কার্য্য সাধারণ মানুষের ইচ্ছাধীন নয়। কোন কোন বৈজ্ঞানিকের মতে আমাদের নির্জ্ঞান মনই স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্য দিয়া সমগ্র দেহ-যন্ত্রকে পরিচালনা করে। মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় নির্জ্ঞান মনের সহিত সংযোগ স্থাপিত হয় বলিয়া এই সময় যেরূপ আদেশ দেওয়া হয় রোগীর নির্জ্ঞান মন তৎক্ষণাৎ তাহা প্রতিপালন করিয়া দৈহিক পরিবর্ত্তন সাধন করে। শুধু যে সম্মোহিত অবস্থায় অপরের সাহায্যে নিজের মন দিয়া দেহকে প্রভাবিত করা সম্ভব এমন কোন কথা নাই। স্বচেষ্টায় শরীর-যন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতা প্রত্যেকের মনের মধ্যে সুপ্ত রহিয়াছে। ফ্রান্সে এমিল কুইএ (১৮৫৭-১৯২৬) এই দিকে যথেষ্ট গবেষণা করেন। তাঁহার মতে প্রত্যহ প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে এবং রাত্রিতে নিদ্রিত হইবার অগ্রে যদি সজ্ঞানে কুড়ি বার একাগ্রভাবে চিন্তা করা যায়—আমি প্রতিদিন সব রকমে উন্নতিলাভ করিতেছি—তাহা হইলে এই স্বাস্থ্যকর চিন্তাধারা ক্রমশঃ নির্জ্ঞান মনে প্রবেশ করিয়া শরীরকে সত্বর সুস্থ নীরোগ করিয়া তোলে। কুইএ এইভাবে তাঁহার রোগীদের আত্ম-সম্মোহনের অভ্যাস শিক্ষা দিয়া বহুবিধ ব্যাধি বিদূরিত করেন।

প্রসিদ্ধ মনোবৈজ্ঞানিক উইলিয়াম ম্যাকডুগাল এক স্থানে বলিয়াছেন, কদাচিৎ কখনও এমন লোকও দেখা যায়, যাহার হৃৎপিণ্ডের গতি পরিবর্ত্তন করার ক্ষমতা সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। অপর কেহ কেহ আবার শরীরের অংশবিশেষে রক্তসঞ্চার নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ হয়। এই প্রকার একজন শক্তিধর লোককে সতর্কভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছিল, সে ইচ্ছামত নিজেকে এমন এক সমাধি-অবস্থায় আনিতে পারিত যখন তাহার বাম হস্ত সম্পূর্ণ শোণিত-শূন্য হইয়া পড়িত, এমনকি তখন উহাতে একটি মোটা সূচ বিদ্ধ করিয়া দিলেও মোটেই রক্তপাত হইত না।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার রাজযোগে লিখিয়াছেন, 'খুব দৃঢ় অভ্যাসের দ্বারা আমাদের শরীরস্থ অনেকগুলি ক্রিয়া, যাহা এক্ষণে আমাদের ইচ্ছাধীন নহে, তাহাদিগকে পুনরায় আমাদের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বশবর্ত্তী করা যাইতে পারে। শরীরের এমন কোন পেশী নাই, যাহা হঠযোগী নিজ বশে আনিতে না পারেন, হৃদযন্ত্র তাঁহার ইচ্ছামত বন্ধ অথবা চালিত হইতে পারে—শরীরের সমুদয় অংশই তিনি ইচ্ছামত পরিচালিত করিতে পারেন।'

মানুষকে সম্মোহিত হইতে দেখিয়া যাঁহারা বিস্ময় প্রকাশ করেন, তাঁহারা বোধ হয় জানেন না অনুরূপ প্রক্রিয়ার দ্বারা ইতর প্রাণীদেরও সম্মোহিত করা সম্ভব। জৈব সম্মোহনের দুইটি প্রচলিত পদ্ধতি আছে: (১) অকস্মাৎ তীব্র উত্তেজনা প্রয়োগ; (২) অবিরাম মৃদু উত্তেজনা প্রয়োগ।

প্রথম পদ্ধতি—ফড়িং, কাঁকড়া, ব্যাঙ, পাতিহাঁস, খরগোস, ছাগল, শূয়র প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় জীবকে অতর্কিতভাবে ধরিয়া হঠাৎ চিৎ করিয়া ফেলিলে খানিকক্ষণ পর্য্যন্ত উহারা নিশ্চলভাবে অবস্থান করে। সাপের ঘাড় ধরিয়া প্রবল ঝাঁকুনি দিলে সে নিস্পন্দভাবে পড়িয়া থাকে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি—এই প্রণালীতে চিংড়ি, মুরগী, গিনিপিগ প্রভৃতি প্রাণীকে সম্মোহিত করা সম্ভব। প্রথমে ইহাদের দৃঢ়ভাবে কিছুক্ষণ একভাবে ধরিয়া রাখা হয়, তাহার পর ধীরে ধীরে হাত সরাইয়া লওয়া হয়, কিন্তু হস্ত অপসারিত হইলেও উহারা পূর্ব্বে যে অবস্থায় স্থাপিত হইয়াছিল ঠিক সেই ভাবে স্থির হইয়া কয়েক মিনিট অবস্থান করিতে থাকে। নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্ত রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক পাভলভ কুকুরের কানের কাছে অবিরাম একঘেয়ে মৃদু শব্দ করিয়া তাহাকে সম্মোহিত করিতে সফল হইয়াছিলেন।*

* রাঁচি ইউনিয়ন ক্লাব সাহিত্যসভায় পঠিত।

সাহিত্য-শিক্ষকের কাহিনী

এনটন পাভলোভিশ শেকভ

অনুবাদক—শ্রীজীবনময় রায়

[এন্‌টন্ প্যাভলোভিশ শেকভ (১৮৬০-১৯০৪) : রুশিয়ার ছোটগল্প-লেখক ও নাট্যকার শেকভের পিতামহের ছিল মুদীর দোকান। তিনি টাকা দিয়ে নিজেকে আর তাঁর পিতাকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করেন। শেকভের পিতা ছিলেন অতি সাধু প্রকৃতির শিক্ষিত মানুষ। শেকভ বলেছেন যে, তিনি প্রতিভার উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন পিতার দিক থেকে, আর মায়ের দিক থেকে পেয়েছিলেন হৃদয়বত্তা আর তেজস্বিতা। কথাটা তাঁর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সত্য। মায়ের কাছ থেকেই তিনি শিখেছিলেন অত্যাচারীকে ঘৃণা করতে, আর পশুপক্ষী এবং ছেলেপিলেদের ভালবাসতে।

যখন তাঁর ষোল বছর বয়স তখন তাঁদের পরিবার মস্কো চলে আসেন। সেখানে তিনি নিজের কলেজের খরচ চালাতেন ছেলে পড়িয়ে। কিছুদিন তিনি ডাক্তারীও পড়েছিলেন, ডাক্তারী ব্যবসাও করেছিলেন অল্প কিছুকাল। কিন্তু একাগ্রমনে লেখকের বৃত্তি ধরবার আগে কিছুকাল তিনি পত্রিকা পরিচালন (তাও হাস্যরসের) করেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর ভিতরের প্রকৃত শিল্পী জেগে উঠে তাঁকে কথা-সাহিত্যের আসরে এনে প্রতিষ্ঠিত করল। সঙ্গে সঙ্গেই নাট্যকলার উপর তাঁর আকর্ষণ হয়। অবশ্য এ কয় বছর তিনি কূপমণ্ডুক হয়ে ঘরে বসে থাকেন নি। সাইবেরিয়ায় গিয়ে তিনি সশ্রম কারা ও নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীদের জীবনযাত্রা পর্য্যবেক্ষণ করেন এবং স্বাস্থ্যের খাতিরে ক্রিমিয়াতেও কিছুকাল ছিলেন। তারপরই তিনি অনেকগুলি ছোটগল্প এবং "দি থ্রি সিসটার্স"র মত বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ কয়েকখানি নাটক রচনা করেন। এই লেখাগুলি প্রকাশিত হলে তাঁর যশ ছড়িয়ে পড়ে এবং সম-সাময়িক বহু সুধী সাহিত্যিক এবং বিখ্যাত লোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তাঁর নাটকের প্রধানা অভিনেত্রীকে তিনি বিবাহ করেন এবং এই নারী তাঁর জীবনকে আনন্দময় করেছিলেন। জীবনে শেকভ স্বাস্থ্যসুখ কখনও উপভোগ করেন নি। শেষের কয় বৎসর তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা ক্রমে আরও খারাপ হতে থাকে। অবশেষে ১৯০৪ সনে তাঁর মৃত্যু ঘটে। সমস্ত পৃথিবীর সাহিত্যিক সুধীবৃন্দ সেদিন তাঁর-জন্য আত্মীয়বিচ্ছেদের দুঃখ অনুভব করেছিলেন।

ছোটগল্প-লেখক হিসাবে শেকভ শীর্ষস্থানীয় এবং অন্যান্য গল্প-লেখকদের উপর তাঁর প্রভাব গভীর ও ব্যাপক। এক ধনী সমাজের চিত্র তিনি আঁকেন নি ; তা ছাড়া শেকভ বিচিত্র, অজস্র এবং সর্ব্ব-স্তরের মানুষের চরিত্র এঁকে গিয়েছেন। তাঁর মধ্যে কবি, শিল্পী এবং বাস্তবপন্থীর এক বিচিত্র সমাবেশ ঘটেছে। বাস্তববাদী হিসাবে তিনি তাঁর নিজের যুগের, নিজের প্রত্যক্ষ-করা মানুষদের আশ্চর্য্য [illegible] রেখায় এঁকে গিয়েছেন ; আর শিল্পী হিসাবে তাঁর কলা-কৌশল শুধু অনবদ্য নয়, অননুকরণীয় ; ব্যক্তিত্বের ছাপ তাতে জাজ্বল্যমান। অথচ যা-কিছু তিনি লিখেছেন তাতেই তাঁর অন্তরের কবি-মানুষটি তার অনন্যসাধারণ কল্পনাশক্তি নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর গল্পগুলির মধ্যে কয়েকটি বিখ্যাত গল্পের নাম হচ্ছে—দি লেডি উইথ দি ডগ, এ ড্রিয়ারী ষ্টোরি, এন এননিমাস ষ্টোরি, এ মিস্‌ফরচুন এট দি ম্যানর, ওয়ার্ড নং ৬, থ্রি ইয়ার্স ইত্যাদি।

প্রতিদিনকার সামান্য ঘটনা থেকে নেওয়া দুটি অনভিজ্ঞ অপরিণত তরুণ-তরুণীর এই গল্পটির মধ্যে তাঁর সহানুভূতি ও সহজ অন্তর্দৃষ্টি-পূর্ণ অনাড়ম্বর বর্ণনা সামান্যকে অসামান্যের মর্য্যাদা দান করেছে। তাঁর বিশিষ্ট প্রতিভার মানুষের মনের ছায়ালোকে প্রতিবিম্বিত, পারি-পার্শ্বিক বস্তু, ঘটনা এবং বিশ্বপ্রকৃতির সমাবেশের মধ্যে দিয়ে গভীর মনস্তত্ত্বের সন্ধান অগোচরে আমাদের মনকে রসে ও আবেদনে পূর্ণ করে তোলে।]

প্রথম পর্ব্ব

কাঠের মেঝের উপর ঘোড়ার খুরের দুদ্দাড় শব্দ শোনা যায়, কালো ঘোড়া কাউণ্ট নুলিনকে ওরা আস্তাবল থেকে বার করে আনে, তারপর আনে সাদা জায়েণ্টকে, তারপর তার বোন মাইকাকে। সব ক'টা ঘোড়াই খুব দামী আর আশ্চর্য্য সুন্দর। জায়েণ্টের উপর জিন এঁটে বৃদ্ধ শেলেষ্টক কন্যা মাশাকে ডাক দেন :

এই যে, মারি গোডেফ্রয়, আয়, উঠে পড়। "হপ-লা।"

ওদের পরিবারে সবচেয়ে ছোট মেয়ে মাশা শেলেষ্টক : বয়স আঠারো। কিন্তু পরিবারের কেউই তাকে 'খুকী নয়' একথা ভাবতে পারে না, তাই আজও তাকে সকলে খুকু—খুকুমণি বলেই ডাকে। বিশেষতঃ, সম্প্রতি শহরে একটা সার্কাস এসেছিল সেই সার্কাস দেখতে ছুটে যাবার পর থেকে তাকে সবাই মারি গোডেফ্রয় বলে ডাকতে শুরু করেছে।

জায়েণ্টের উপরে উঠে সে বললে, "হপ-লা।" ওর দিদি ভারিয়া মাইকার উপরে, নিকিটিন কাউণ্ট নুলিনের উপর, আর অফিসারেরা যে যার ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বসে। তারা সব সাদা জরী-পোশাকে আর মেয়েরা সওয়ারী পোশাকে ঘোড়ায় চড়ে ছবির মত সার বেঁধে উঠোন বেয়ে বেরিয়ে আসে।

নিকিটিন লক্ষ্য ক'রে যে, কেন, কে জানে, ঘোড়ায় চড়বার সময় আর বাইরে এসেও মাশা বিশেষ করে তারই খবরদারী করছে, অন্য কারও দিকে নজর দিচ্ছে না। ব্যস্ত হয়ে তার দিকে আর কাউণ্ট নুলিনের দিকে চেয়ে মাশা বলছে, "দেখ, সারজি ভাসিলিচ, ওর কাজাইটা চেপে ধরে থেকো সব সময়। ওকে ঘাবড়ে দিও না যেন। ও কিন্তু ভান ধরে রয়েছে।

হয় তার জায়েণ্টের সঙ্গে কাউণ্ট নুলিনের খুব ভাব তাই, আর না হয় এমনিই, সে বরাবর নিকিটিনের পাশে পাশে চলেছে

"অস্ত্রপূজা"

সম্মুখে—অমলা ও উদয়শঙ্কর ; পিছনে (বাম দিক হইতে দ্বিতীয়)—শ্রীস্মৃতি চক্রবর্ত্তী
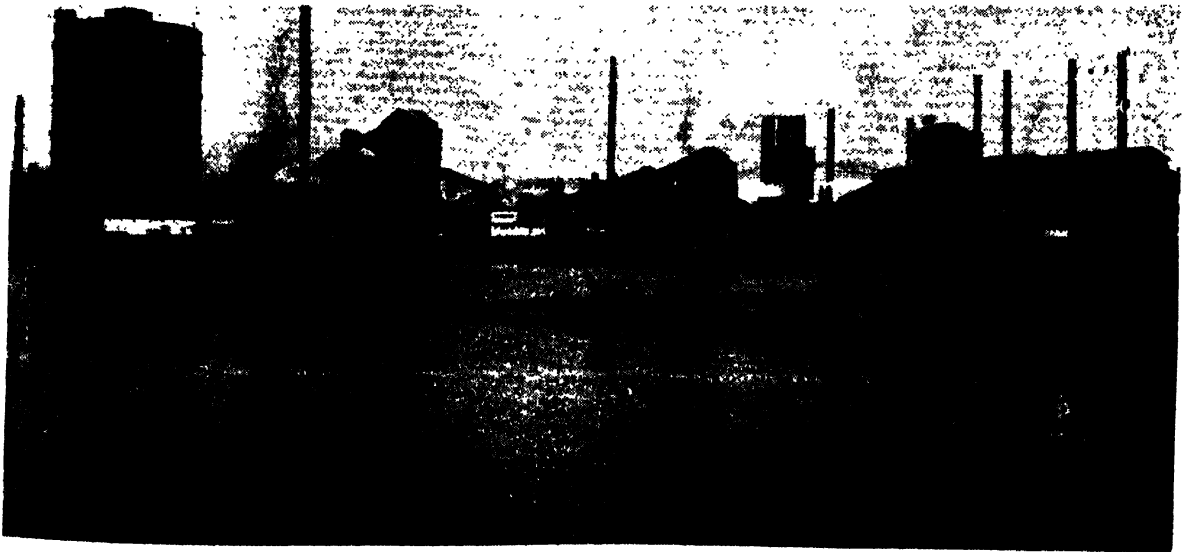
সিন্ধ্রি ফারটিলাইজিং ফ্যাক্টরির সাধারণ দৃশ্য
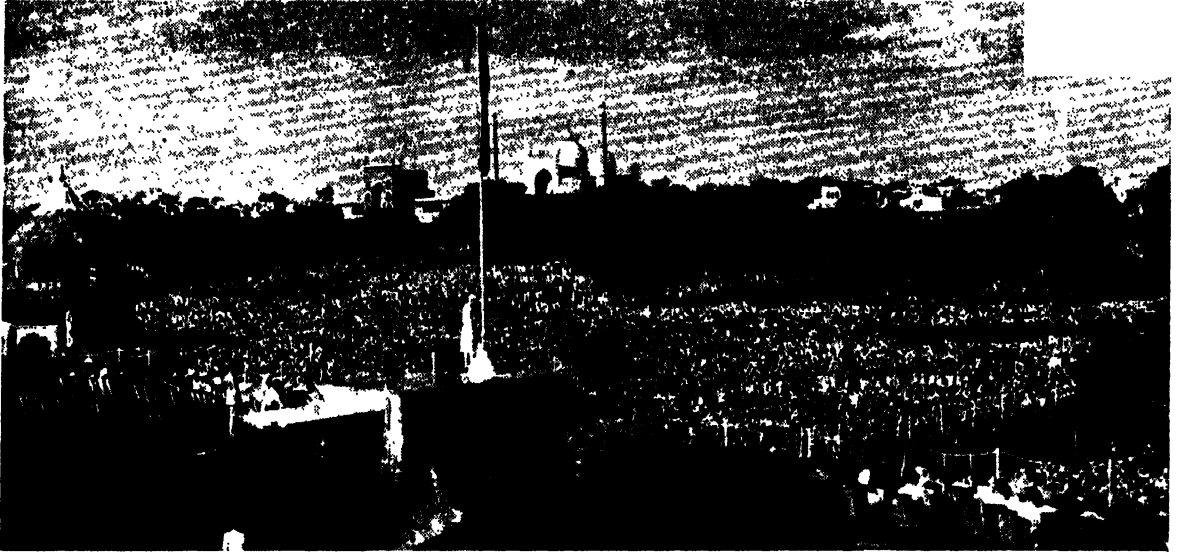
ভারতের স্বাধীনতার ষষ্ঠ বাষিকী উপলক্ষে দিল্লীর লাল কেল্লায়
পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর বক্তৃতা

করাচির আমুরিপুর বিমানঘাটিতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ আলি কর্তৃক ভারতের
প্রধানমন্ত্রী জবাহরলাল নেহ্‌রু ও শ্রীবিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের সংবর্দ্ধনা

আগের দিনও তাই করেছিল, তার আগের দিনও। আর নিকিটিন, তেজী সাদা ঘোড়ার উপর সওয়ার সেই মনোহারী মূর্তির দিকে, তার কমনীয় মুখের পানে, তার বেমানান বুজ্রুক ধুচনি টুপির দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে—দেখে, আর মনটা খুশীতে, রসে ভরে যায়, উচ্ছ্সিত হয়ে ওঠে। মাশার বকুনির দিকে কান পেতে থাকে, কিন্তু তার কথা কিছু ওর কানে যায় না। মনে মনে বলে :

"প্রতিজ্ঞা করছি, ঈশ্বরের দিব্যি—ভয় করব না। আজ ওকে বলবই।"

সন্ধ্যা সাতটা। এই সময়টাতে একেশিয়া আর লিলাকের সুবাসে বাতাস, এমন কি ঐ গাছগুলো পর্যন্ত ভরাট হয়ে থাকে। শহরের বাগানে ব্যাণ্ডের বাজনা সুরু হয়ে গেছে। পাকা রাস্তার উপর ঘোড়ার খুরের শব্দ, চারিদিকে হাসি, উল্লাস, গেট খোলাখুলির আওয়াজ। পথে পথে সিপাহীরা অফিসারদের দেখে সেলাম করছে, ছাত্রেরা নিকিটিনকে নমস্কার করছে, আর যারা সব ব্যাণ্ড শুনতে ছুটেছে, এই মিছিল দেখে তারা খুশী হয়ে উঠছে। আর কি সুন্দর গরম দিন! আকাশের গায়ে এলোমেলো করে ছড়ানো সাদা সাদা মেঘগুলো কেমন নরম! তা ছাড়া, পপলার আর একেশিয়ার দীর্ঘ ছায়াগুলো যে রাস্তা পার হয়ে ওধারের বাড়ীর ব্যালকনি পর্যন্ত, এমন কি দোতলা পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে, সেই ছায়াগুলো কি স্নিগ্ধ, কি মধুর!

ঘোড়া চালিয়ে ওরা শহরের বাইরে এসে পড়ে। তারপর বড় রাস্তা ধরে ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়। এখানে লিলাক আর একেশিয়ার সুবাস নেই বটে, ব্যাণ্ডের বাজনাও এখানে শোনা যায় না; কিন্তু এখানে আছে খেতের উচ্ছ্সিত সুগন্ধ, রাই আর গমের চারার সবুজ খেত, কাঠ-বিড়ালীর কিচির-মিচির শব্দ, আর কাকের কাকলী। যেখানেই চোখ পড়ুক শুধু সবুজ আর সবুজ; কেবল মাঝে মাঝে অনাবাদী কালো জমির টুকরো, আর বাঁয়ে, অনেক দূরে, গোরস্থানের ভিতর এপেল মঞ্জরীর শুভ্র ঐশ্বর্য্য।

কসাইখানা, ভাটিখানা পেরিয়ে গিয়ে একটা মিলিটারি ব্যাণ্ডের দলের সঙ্গে ওদের দেখা হ'ল—তারা হনহনিয়ে চলেছে শহরতলীর বাগানে।

ভারিধার পাশে পাশে চলেছে পলিয়েন্সকি। তার দিকে এক পলক তাকিয়ে মাশা বলে, "পলিয়েন্সকির ঘোড়াটা খুব চমৎকার তা স্বীকার করছি। কিন্তু ওর খুঁত আছে অনেক। ওর বাঁ পায়ের ঐ সাদা দাগটা ওখানে মানাচ্ছে না। আর দেখ, ও মাথা চালাচ্ছে কি রকম, দেখো। এখন তুমি আর ওর ও রোগ সারাতে পারবে না—শেষ পর্যন্ত ও অমনি মাথা ঝাঁকিয়ে যাবে।"

বাপেরই মত ঘোড়ার উপর মাশার অসম্ভব টান। অন্য কারুর ভাল ঘোড়া দেখলে ওর ভারি হিংসে হয়। তাদের খুঁত বার করতে পারলে ওর মনটা খুশী হয়ে ওঠে। নিকিটিন ঘোড়া সম্বন্ধে একেবারে গবেট। ঘোড়ার লাগাম ধরে হাঁকাচ্ছে কি কাঝাই ধরে হাঁকাচ্ছে, কদমে চলছে কি হেঁকে চলছে ওর কাছে সবই সমান। ও শুধু জানে যে ঘোড়ায় চড়া অতি অস্বস্তিকর, অতি বেয়াড়া ব্যাপার; সুতরাং যে সব অফিসার বাগিয়ে ঘোড়ায় চড়তে জানে, নিশ্চয় তারা ওর চেয়ে মাশার নজরে বেশী করে পড়ছে। অফিসারদের উপর তার মনে মনে হিংসা হয়।

শহরতলীর বাগিচার ধার দিয়ে যেতে যেতে একজন বলে চল বাগানে ঢুকে খানিকটা মিনারল-ওয়াটার নিয়ে আসি গে। সবাই ভিতরে যায়। বাগানে ওকগাছ ছাড়া অন্য গাছ নেই। সবে তাতে কচি পাতার আমেজ লেগেছে; তাই তাদের ঝালরের মধ্য দিয়ে সারা বাগানটাই নজরে পড়ছে—প্ল্যাটফরম, ছোট ছোট টেবিল, দোলনা আর বড় বড় হ্যাটের মত সব কাকের বাসা। দলবল একটা টেবিলের ধারে এসে নেমে পড়ে আর মিনারল-ওয়াটারের ফরমাস দেয়। বাগানে যারা হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছে তাদের মধ্যে চেনা লোকেরা ওদের কাছে আসে। তাদের মধ্যে আছে হাঁটু পর্যন্ত বুট-পরা জঙ্গী ডাক্তার, আর আছে ব্যাণ্ড-কণ্ডাক্টর—বাজিয়ে দলের জন্যে অপেক্ষা করছে। ডাক্তার নিশ্চয়ই নিকিটিনকে ছাত্র ভেবেছে। বলছে, "গরমের ছুটিতে বেড়াতে এসেছ বুঝি?"

নিকিটিন জবাব দেয়, "না, আমার কাজ এখানে পাকা, আমি স্কুলের শিক্ষক।"

অবাক হয়ে ডাক্তার বলে, "বটে! এইটুকু ছেলে! এরই মধ্যে তুমি মাষ্টার?"

"এইটুকুই বটে! হুঁঃ, আমার বয়স ছাব্বিশ তা জানেন?"

"হ্যাঁ, দাঁড়ি-গোঁফ বেরিয়েছে বটে, কিন্তু লোকে তোমাকে বাইশ-তেইশের বেশী কিছুতেই বলবে না। দেখতে কি আশ্চর্য্য ছেলেমানুষ তুমি!"

নিকিটিন মনে মনে বলে,"কোথাকার হাঁদারাম! উনিও আমাকে খোকা ঠাওরাচ্ছেন!"

মেয়েদের কাছে বা স্কুলের ছেলেদের সামনে কেউ যদি ওর ছেলেমানুষ চেহারার কথা বলে ত ও ভারি চটে যায়। যেদিন থেকে ও মাষ্টার হয়ে এই শহরে এসেছে সেইদিন থেকে নিজের এই খোকা-খোকা চেহারার উপর ওর ভারি রাগ। ছেলেরা ওকে ভয় করে না, বুড়োরাও ওকে "ওহে ছোকরা" বলে কথা বলে। মেয়েরা বসে ওর লম্বা তর্ক শোনার চেয়ে ওর সঙ্গে নাচতে ভালবাসে। বয়সটা দশ বছর বাড়িয়ে নিতে পারলে ও সব দিতে পারে।

বাগান থেকে বেরিয়ে ওরা গেল শেলেষ্টভের গোলাবাড়ীতে। গেটে দাঁড়িয়ে ওরা বেলিকের বৌ প্রাস্কভিয়াকে খানিকটা টাটকা দুধ আনতে বলে। দুধ কিন্তু কেউ খেল না—এ ওর দিকে তাকিয়ে, হেসে ঘোড়া হাঁকিয়ে ফিরে গেল। ওরা ফিরে চলেছে—ব্যাণ্ড বাজছে শহরতলীর বাগানে, সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে গোরস্থানের পিছন দিকে আর সেই অস্তসূর্য্যের আভায় অর্দ্ধেক আকাশ রাঙা হয়ে উঠেছে।

এবারও মাশা চলেছে নিকিটিনের পাশে পাশে। মাশাকে

ও বলতে চায় যে কত প্রাণ দিয়ে ওকে ভালবাসে—কিন্তু পাছে অফিসারেরা বা ভারিয়া শুনে ফেলে এই ভয়ে চুপ করে থাকে। মাশাও নীরব। মাশার নীরবতা আর মাশা যে কেন ওর পাশে পাশে চলেছে সেকথা ও মনে মনে জানছে—জানছে আর মনটা ওর এমন খুশী হয়ে উঠছে যে, এই পৃথিবী, আকাশ, শহরের আলোকসজ্জা, আকাশের পটে ভাটিগানার কালো রেখা, সব মিলিয়ে ওর মনের মধ্যে একটা তৃপ্তি আর আশ্বাসের আমেজ ঘনিয়ে উঠছে—মনে হচ্ছে কাউণ্ট মুলিনের পা যেন মাটিতে পড়ছে না, ঐ রাঙা আকাশের পানে যেন ও উড়ে যাবে।

বাড়ী পৌঁছয় ওরা। ফুটন্ত চায়ের কেটলী টেবিলের উপর এসে গেছে। বুড়ো শেলেষ্টভ সার্কিট কোর্টের মাতব্বর বন্ধুদের নিয়ে বসে আছেন—আর দস্তুরমাফিক একটা কিছুর কুষ্ঠি কাটছেন। বলছেন, "ও হ'ল চাষাড়েপনা হে, চাষাড়েপনা ছাড়া আর কিসসু না। হ্যাঁ, ঠিক তাই।"

নিকিটিন কি না মাশার প্রেমে পড়েছে তাই শেলেষ্টভের বাড়ীর সবকিছুই ওর ভাল লাগে; বাড়ী, বাগান, চায়ের আসর, উইলোর চেয়ার, বুড়ী ধাই; মায় চাষাড়েপনা কথাটাও—কথাটার উপর বুড়োর ভারি ঝোঁক। একমাত্র যা সে দেখতে পারে না তা হচ্ছে একপাল বেড়াল, কুকুর, আর একটা মিশরী কবুতর—সেটা রাত দিন বারান্দায় খাঁচার মধ্যে বসে মড়াকান্না কাঁদে। এত পালে পালে ঘরের কুকুর আর আস্তাবলের কুকুর যে, শেলেষ্টভদের সঙ্গে চেনা হবার পর এতদিনে ও মাত্র দুটোকে চিনে রাখতে পেরেছে—মুশকা আর সম। মুশকা একটা নেড়ী মার্কা ঘেয়ো কুকুর—মুখে ঝাঁকড়া লোম অতি খেঁকী আর আদর দিয়ে মাথা খাওয়া। নিকিটিনের উপর তার রাগ। ওকে দেখলেই সে ঘাড় কাৎ করে দাঁত বার করে আর গোঁ গোঁ করতে থাকে। তারপর ওর চেয়ারের তলায় ঢুকে পড়ে আর তাড়াতে গেলেই আকাশ ফাটিয়ে চেঁচাতে থাকে। তখন পরিবারসুদ্ধ সকলে বলতে থাকে "ভয় নেই। ও কামড়ায় না। বড্ড ঠাণ্ডা কুকুর।"

সমটা একটা মস্ত কালো কুকুর, লম্বা লম্বা ঠ্যাং, ল্যাজটা শক্ত একটা লাঠির মত। ডিনারের সময়, চায়ের সময় ব্যাটা টেবিলের তলায় ঘুরে বেড়াবে আর লোকের বুটে, টেবিলের পায়ায় পটাপট ল্যাজ পিটবে। নিতান্ত ভালমানুষ, বোকাসোকা কুকুর, কিন্তু নিকিটিন ওকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না—কুকুরটার বদরোগ যে সে খাবার সময় লোকের হাঁটুর উপর এসে মাথা রাখবে আর প্যাণ্টের কাপড়ে লাল ফেলে ভিজিয়ে নষ্ট করে দেবে। অনেক বার নিকিটিন ছুরির বাঁট দিয়ে ওর মাথায় ঘা দিয়েছে, নাকে ঠোকোর মেরেছে, ধমকেছে, ওর নামে নালিশ করেছে, কিন্তু কিছু করেই নিজের প্যাণ্ট বাঁচাতে পারে নি।

ঘোড়া দাবড়ে এসে চা, জ্যাম, রাস্ক, মাখন খেতে ভারি আরাম। প্রথম গেলাসটা সবাই মুখ-বুজে আয়েস করে খায়; দ্বিতীয় গেলাস ভরে নিয়ে তর্ক জুড়ে দেয়। চায়ের আসরে ভারিয়াই তর্ক সুরু করে থাকে। ভারিয়া দেখতে ভাল, মাশার চেয়ে সুন্দর, বাড়ীর মধ্যে সকলের চেয়ে লেখাপড়া জানা। বুদ্ধিমতী বলে সবাই জানে। মায়ের মৃত্যুর পর বাড়ীর বড় মেয়ে গিন্নীর পদে বাহাল হলে যেমন গম্ভীর-সম্ভীর ভারভারিক্কি চাল হওয়া উচিত সেই রকম ভব্যসব্য ওর চাল-চলন। বাড়ীর গিন্নী হিসেবে অতিথিদের আসরে একটা ড্রেসিং গাউন পরে আসার আর অফিসারদের সব নাম ধরে ডাকার অধিকার ওর জন্মেছে বলে ওর ধারণা। মাশাকে শিশু বলে মনে করে আর তার সঙ্গে কথা বলে যেন ও তার স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। নিজের কথা বলতে গেলে সে নিজেকে 'বুড়ী থুবড়ী' বলে থাকে—মানে, মনে মনে জানে যে বিয়ে সে করবেই।

প্রত্যেক কথাতেই এমন কি আবহাওয়ার কথা নিয়েও সে তর্ক তুলবে। কথা নিয়ে, ভাষা নিয়ে, শব্দ নিয়ে মারপ্যাঁচ খেলানো তার একটা নেশা। তার সঙ্গে কথা সুরু কর, খানিকক্ষণ সে চুপ করে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে শুনবে, তার পর হঠাৎ বাধা দিয়ে বলে উঠবে, 'মাপ করতে হবে মশায়, সেদিন আপনি ঠিক এর উল্টো কথাই বলেছিলেন।'

কিংবা একটু বাঁকা হাসি হেসে বলবে, 'ও! বটে। পুলিসের গুপ্তচরগিরির কাজটাকে আপনি সম্প্রতি বাহবা দিতে সুরু করেছেন। আপনার তারিফ করতে হয়।'

যদি একটা ঠাট্টা তুমি কর কি কথার মার-প্যাঁচ খেলাও তবে শুনবে, 'ও একেবারে বাসী পচা' কিংবা 'বাজে বাজে'। যদি কোন অফিসার সাহস করে একটা ঠাট্টা করে তবে মুখ বেঁকিয়ে ভঙ্গী করে বলবে, 'জঙ্গী রসিকতা বুঝি!'

'র' টাকে জিবের উপর এমন চরকি ঘুরিয়ে উচ্চারণ করে যে চেয়ারের তলা থেকে মুশকা গর্ গর্ গোঁ গোঁ ক'রে জবাব দেয়।

এক্ষেত্রে নিকিটিন স্কুলের পরীক্ষার কথা তোলায় তর্কটা উঠে পড়ে।

ভারিয়া বাধা দিয়ে বলে, 'বলছ, ছেলেদের পক্ষে শক্ত। বেশ, কিন্তু, বল ত দোষটা কার? ধর, অষ্টম শ্রেণীর বাচ্চাদের সেদিন একটা প্রবন্ধ লিখতে দিয়েছ—'মনস্তাত্ত্বিক পুশকিন।' প্রথম কথা, এমন সব কঠিন বিষয় দেওয়াই অন্যায়; দ্বিতীয়ত, পুশকিন মোটেই মনস্তাত্ত্বিক নন। বরং শেড্রিন, কি উইরভস্কির কথা হলেও বা হ'ত। কিন্তু পুশকিন মহাকবি ছাড়া আর কিছুই নন।

মুখ গোমড়া করে নিকিটিন বলে, 'কোথায় শেড্রিন আর কোথায় পুশকিন—এক হ'ল?'

'জানি, তোমরা তোমাদের হাই স্কুলে শেড্রিনকে মস্ত একটা কিছু ভাব না—কিন্তু আসল কথা ত তা নয়। পুশকিন মনস্তাত্ত্বিক হলেন কেমন করে, তাই বল।'

'মনস্তাত্ত্বিক নন, এই বা আপনি বলছেন কেন? চান ত অনেক দৃষ্টান্ত দিতে পারি।'

নিকিটিন, এই বলে 'ওঙ্কেজিন' থেকে, তার পর 'বরিস গুডুনোফ' থেকে অনেকখানি আবৃত্তি করে গেল।

ভারিয়া ক্লান্ত সুরে বললে, 'কৈ বাপু, মনস্তত্ত্ব ত এর মধ্যে কিছু পেলাম না। মনস্তাত্ত্বিক তাঁকেই বলব যিনি মানুষের মনের গোপনতম অজ্ঞাততমকে ব্যক্ত করেন। আবৃত্তি যা করলে, অতি চমৎকার কবিতা বৈ তা আর কিছু না।'

নিকিটিন বললে, 'কি ধরণের মনস্তত্ত্বে আপনার অভিরুচি তা আমি বুঝেছি। আপনি চান যে একটা ভোঁতা করাত দিয়ে আমার আঙুলটা কেউ কাটতে থাকুক, আর প্রাণপণে আমি চেঁচাতে থাকি—আপনার কাছে ওর নামই হ'ল মনস্তত্ত্ব।'

"বাজে—যাই হোক, পুশকিন মনস্তাত্ত্বিক হলেন কেমন করে তা ত দেখালে না।"

নিকিটিনের মতে সঙ্কীর্ণ, গতানুগতিক বা অমনি কিছু একটা ধরণের মতের বিরুদ্ধে যখন নিকিটিনকে তর্ক করতে লাগতে হয় তখন সে প্রায়ই চেয়ার ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে দুই হাতে মাথাটা চেপে ধরে; গোঁ গোঁ করতে করতে ঘরের এক ধার থেকে অন্য ধার অবধি ছুটোছুটি করতে থাকে। এখনও তাই হ'ল। লাফ দিয়ে উঠে, মাথাটা চেপে ধরে গোঁ গোঁ করতে করতে টেবিলের চারদিকে একটা ঘুরপাক দিয়ে একটু দূরে গিয়ে সে বসে পড়ল।

অফিসারেরা তার মতের সঙ্গে সায় দেয়। ক্যাপটেন পলিয়েন্‌স্‌কি ভারিয়াকে জোর দিয়েই বললে যে, পুশকিন বাস্তবিকই একজন মনস্তাত্ত্বিক ছিলেন, আর তার প্রমাণস্বরূপ "লেরমনটফ" থেকে দু' লাইন আবৃত্তি করে শোনালে। লেফটনেন্ট জারনেট বললে যে, পুশকিন মনস্তাত্ত্বিক না হলে ওরা কখনই মস্কৌতে তাঁর নামে স্তম্ভ খাড়া করত না।

"ওটা চাষাড়েপনা"—টেবিলের অন্য প্রান্ত থেকে শোনা গেল, "গবর্ণরকে আমি ঐ কথাই বলেছিলাম যে, এটা চাষাড়েপনা হুজুর।"

নিকিটিন বললে, "আর তর্ক করব না, ও তর্ক শেষ হবে না। যথেষ্ট হয়েছে। দূর হ, নোংরা কুকুর।" সমকেও তেড়ে ওঠে। সম ওর হাঁটুর উপর তার মাথা আর থাবা তুলে দিয়েছিল।

"গর্‌র্‌...গোঁ গোঁ গোঁ!" টেবিলের তলা থেকে আওয়াজ এল ভারিয়া চেঁচিয়ে বললে, "স্বীকার কর যে তোমার ভুল হয়েছে; মেনে নাও।"

কিন্তু ইতিমধ্যে কয়েকটি মেয়ে এসে পড়ায় তর্কটা আপনিই থেমে যায়। সকলে মিলে ওরা ড্রয়িং-রুমে যায়। ভারিয়া পিয়ানোতে গিয়ে বসে নাচের বাজনা সুরু করে। ওরা প্রথমে ওয়ালজ, তারপর পালক, তারপর কোড্রিল নাচ নাচে। ক্যাপ্টেন পলিয়ান্‌সকি সকলকে চালিয়ে নিয়ে সব ক'টা ঘরে ঘুরিয়ে কোড্রিল নাচ নাচিয়ে নিয়ে আসে—তারপর আবার এক দফা ওয়ালজ নাচ সুরু হয়।

নাচের সময়টাতে বুড়োরা ড্রয়িং-রুমে বসে বসে তামাক ফুঁকতে ফুঁকতে ছোটদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে। নাট্য আর সাহিত্যের আলোচনায় যাঁর খুব নামডাক সেই শেবালডিনও আসরে উপস্থিত। স্থানীয় সঙ্গীত ও নাট্যসমিতি তিনিই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অভিনয়ে তিনি নিজেও অংশ গ্রহণ করতেন, আর কে জানে কেন, চাকরের কমিক পার্ট কিংবা একঘেয়ে সুরে "দি উয়োম্যান হু ওয়াজ এ সিনার" কবিতাটি আবৃত্তি করা ছাড়া অন্য কোনও পার্ট নিতেন না। ঢেঙা, রোগা, লিক্‌লিকে, হাড়গিলের মত চেহারা, গুরুগম্ভীর মুখের ভাব আর মড়ার মত ম্যাড়মেড়ে চোখের জন্যে শহরে তার ডাকনাম দিয়েছিল "মমি"। নাট্যকলায় তাঁর এতদূর নেশা ছিল যে তিনি গোঁফ-দাড়ি পর্যন্ত কামিয়ে ফেলেছিলেন—এতেই আরও বেশী করে তাঁকে "মমি"র মত দেখাত।

গ্র্যাণ্ডচেন করে নাচ শেষ হলে তিনি ভিড়ের মধ্যে এঁকে-বেঁকে নিকিটিনের কাছে গেলেন। কেসে বললেন,

"আমার সৌভাগ্য যে, চায়ের আসরে তর্কের সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। আপনার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। আমাদের চিন্তার ধারা এক রকম। আপনার সঙ্গে আলাপচারি করতে পারলে বড়ই আনন্দ পাব। হামবুর্গের নাট্যকলা সম্বন্ধে লেসিং যা লিখেছেন, তা পড়েছেন ত?"

"না, পড়ি নি।"

শেবালডিন আঁৎকে উঠলেন। আঙুলগুলো যেন পুড়ে গেছে এমনি ভাবে হাত ঝাড়া দিয়ে, আর বাক্যব্যয়মাত্র না করে টলতে টলতে নিকিটিনের কাছ থেকে সরে পড়লেন। শেবালডিনের হাবভাব, তাঁর প্রশ্ন, তাঁর চমকে যাওয়ার ধরণে নিকিটিনের বেশ মজা লাগে। তা হলেও একথা না মনে করে সে পারে না যে:

"সত্যিই ত, ভারি লজ্জার কথা! আমি একজন সাহিত্যের শিক্ষক আর আজ পর্যন্ত আমি লেসিঙের লেখা পড়ি নি! পড়তেই হবে।"

রাত্রের খাওয়ার আগে ছেলেবুড়ো সবাই মিলে "ভাগ্য" খেলতে বসে। এক প্যাকেট তাস বেঁটে দেওয়া হয়, আর এক প্যাকেট উপুড় করে টেবিলের উপর রাখা থাকে।

উপুড়-করা তাসের উপরের খানা তুলে নিয়ে বুড়ো শেলেষ্টফ গম্ভীর মুখে বলেন, "যার হাতে এই তাস আছে, তার ভাগ্যে আছে যে, নার্সারীতে গিয়ে ধাইমাকে সে চুমু খাবে। ধাইমাকে চুমু দেবার সৌভাগ্য জুটল শেবালডিনের কপালে।

সকলে তাকে ঘেরাও করে ধাইমার কাছে ধরে নিয়ে গিয়ে খুব হাসাহাসি করে হাততালি দিতে দিতে ওকে দিয়ে ধাইমাকে চুমু খাওয়ায়। খুব হৈ হৈ হল্লা হতে থাকে।

হাসতে হাসতে শেলেষ্টফের চোখে জল বেরিয়ে পড়ে, চেঁচিয়ে বলে, "অত মত্ত হয়ো না হে, অত মত্ত হয়ো না।" নিকিটিনের ভাগ্যে পড়ে সকলকে "পাপ স্বীকার" করানোর কাজ। ড্রয়িং-রুমের মধ্যিখানে একটা চেয়ারে সে বসে। তার মাথার উপর একটা শাল ঢাকা দেওয়া হয়। প্রথমে তার কাছে আসে ভারিয়া।

অন্ধকারে ওর কঠিন মুখের রেখার দিকে চেয়ে নিকিটিন সুরু করে, "আপনার সব পাপের খবর আমি রাখি। হ্যাঁ, ঠাকরুণ, বলুন ত নিত্যি পলিয়ান্‌সকিকে নিয়ে বেড়াতে যান কেন?

অকারণে একজন হাসারকে নিয়ে কিছু আর ঘোরাফেরা করেন না !"

"বাজে !" এই বলে ভারিয়া চলে যায়।

তারপর শালের তলায় বড় বড় উজ্জ্বল নির্নিমেষ চোখের দীপ্তি ওর চোখে পড়ে, অন্ধকারে ওর চোখে ধরা পড়ে, একখানি প্রিয় মুখের রেখা ; সঙ্গে সঙ্গে একটা পরিচিত দামী এসে-ন্সর গন্ধ মাশার ঘরের কথা নিকিটিনকে মনে পড়িয়ে দেয়।

ওর স্বর এত মৃদু আর কোমল হয়ে আসে যে, নিজের গলাই নিজে চিনতে পারে না। নিকিটিন বলে, "মারি গোড্রেফ্রয়, তোমার কি পাপ গো।"

চোখ পাকিয়ে, টুক করে একটু জিব বার করে মুখ ভেংচে—মাশা হাসতে হাসতে চলে যায়, এক মিনিট পরেই ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাততালি দিতে দিতে হাঁকে, "খানা, খানা, খানা।"

ওরা সবাই মিলে হুড়মুড় করে খাবার ঘরে যায়। খাবার সময় ভারিয়া আবার তর্ক তোলে, এবারে বাপের সঙ্গে। পলিয়ানস্কি এক কাঁড়ি খেয়ে, লাল মদ টেনে, নিকিটিনকে গল্প শোনায়, কেমন করে একবার এক শীতের রাতে লড়াইয়ের সময় সারারাত ওকে একটা দকের মধ্যে এক হাঁটু কাদায় খাড়া দাঁড়িয়ে কাটাতে হয়েছিল। শত্রুরা এত কাছে ছিল যে চুরুট ফোঁকা কি কথা বলার হুকুম ছিল না। শীতের রাত, অন্ধকার, আর একটা বাতাস যা বইছিল, একেবারে হাড়বেঁধানো। নিকিটিন শুনছে আর লুকিয়ে মাশার দিকে আড়চোখে চাইছে। মাশা একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে আছে, পলক ফেলছে না, যেন কি একটা ভাবছে কিংবা একটা স্বপ্নে বিভোর হয়ে গেছে। একাধারে খুশীতে আর ব্যথায় নিকিটিনের মনটা ভরে উঠে।

'ওরকম করে কেন চেয়ে আছে ও'—কথাটা ওর মনে অস্বস্তি জাগায়। 'ভারি বে-তর। লোকে যদি দেখে ফেলে! সত্যি! কি ছেলেমানুষ, কত সরল, ও।'

আড্ডা গিয়ে ভাঙল মাঝরাতে। নিকিটিন সবে গেট পর্য্যন্ত পৌছেছে, এমন সময় দোতলার একটা জানলা খুলে মাশা দেখা দিল।

সে ডাকলে, 'সারজি ভ্যাসেলিচ !'

'কি ব্যাপার ?'

বললে, 'বলছি কি।' স্পষ্টই বোঝা যায় কি বলবে ঠিক পাচ্ছে না।

'বলছি ব্যাপারটা কি। পলিয়ানস্কি বলেছে যে সে দু'এক দিনের মধ্যেই একটা ক্যামেরা নিয়ে এসে আমাদের সকলের ছবি তুলবে। নিশ্চয় এস।'

'বেশ কথা।'

মাশা নিরুদ্দেশ—জানলা দড়াম করে বন্ধ হয়—প্রায় তখনই বাড়ীর মধ্যে কে যেন পিয়ানো বাজাতে থাকে।

রাস্তা পার হতে হতে নিকিটিন মনে মনে ভাবে এই একটা পরিবার—এ বাড়ীতে দুঃখের কাঁদুনি শোনা যায় না। কাঁদুনে সুর তোলে শুধু মিশরী কবুতর—ওদের মনের খুশী অন্য কোন উপায়ে জাহির করতে পারে না বলে।

কিন্তু শেলেষ্টফদের বাড়ীতেই শুধু যে উৎসব হয়, তা নয়। দু'শো কদমও সে এগোয় নি, শোনে—পিয়ানোর শব্দ আসছে আর একটা বাড়ী থেকে। আর কিছু দূর যেতেই দেখে গেটে দাঁড়িয়ে একজন কৃষক দু'তারের গীটার বাজাচ্ছে। বাগানে ব্যাঙে বাজচ্ছে রুশের মিশ্র সঙ্গীত।

শেলেষ্টফদের বাড়ী থেকে আধ মাইলটাক দূরে আট-ঘরা একটা ফ্ল্যাট—বছরে তিন শ' রুবলে, সহকর্ম্মী ভূগোল ও ইতিহাসের শিক্ষক আইপোলিট আইপোলিটিচের সঙ্গে ভাগে ভাড়া নিয়ে নিকিটিন থাকে। ঘরে ঢুকে দেখে—আইপোলিট আইপোলিটিচ টেবিলে বসে ছাত্রদের মানচিত্র সংশোধন করছে। নাকটি ধ্যাবড়া, মাঝারি বয়স লালচে দাড়ি, সাদামাটা, ভালমানুষ, মুটে-মজুরের মত মেধাহীন মুখের ভাব আইপোলিটের। সে মনে করে ভূগোল শিক্ষার সবচেয়ে দরকারী জিনিস হ'ল ম্যাপ আঁকা ; আর ইতিহাসের সবচেয়ে দরকারী জিনিস তারিখ মুখস্থ করা। রাতের পর রাত জেগে সে নীল পেনসিল দিয়ে ছেলেমেয়েদের ম্যাপ ঠিক করে দেয় কিংবা তারিখের তালিকা তৈরি করে।

ঘরে ঢুকে নিকিটিন তাকে বলে, 'দিনটা কি চমৎকার ছিল আজ—আশ্চর্য্য আপনি ঘরের ভিতরে বসে আছেন কি করে ?'

আইপোলিট আইপোলিটিচ বেশী কথা বলে না। হয় সে চুপ করে থাকে, আর না হয় যা সকলেরই জানা আছে—এমন সব বিষয়ে কথা বলে। এ ক্ষেত্রে সে বলে :

'হ্যাঁ খুব সুন্দর দিন। এটা হ'ল মে মাস ; এইবার খাটি গরম কাল পড়বে। আর শীতকাল থেকে গরম কাল একেবারে আলাদা। শীতের সময় তোমাকে ষ্টোভে আগুন করতে হয়, কিন্তু গরমের সময় বাইরে গেলেই রোদ পোয়াতে পার। গরমের সময় রাত্রে জানলা খুলে শোও তবু শীত করবে না, আর শীতের সময় ডবল জানলা বন্ধ করেও শীতে ঠক্ ঠক্ করবে।'

এক মিনিট যেতে না যেতেই নিকিটিন বিরক্ত হয়ে টেবিল থেকে উঠে যায়।

উঠে হাই তুলে বলে, 'শুভ রাত্রি। আমি তোমাকে নিজের সম্বন্ধে একটা রসের খবর দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি হলে—ভূ-গোল। কেউ যদি এসে তোমাকে প্রেমের কথা বলে—তবে তুমি তখুনি তাকে প্রশ্ন করবে 'কালকা'র যুদ্ধের তারিখটা কি বল ত ? তোমার যুদ্ধ আর সাইবিরিয়ার অন্তরীপ নিয়ে তুমি গোল্লায় যাও।'

'কি হ'ল ? চটলে কেন ?'

'বিরক্তিকর না ?'

তার পর, মাশাকে বলতে পারে নি বলে, আর নিজের প্রেমে পড়ার কথাটা বলবার একটা মানুষ নেই বলে সে মনে মনে বিরক্ত হয়ে পড়বার ঘরে গিয়ে সোফার উপর শুয়ে পড়ে। পড়বার ঘর

অন্ধকার নিস্তব্ধ। অন্ধকারে চোখ মেলে কেন যে সে ভাবতে থাকে তা কে বলবে। ভাবে যে দু' তিন বছরের মধ্যে কেমন করে সে পীটার্সবুর্গে যাবে ; ষ্টেশনে তুলে দিতে গিয়ে মাশা কেমন করে কেঁদে ফেলবে ; পীটার্সবুর্গে বসে মাশার লম্বা চিঠি পাবে, কান্নাকাটি করে লিখবে, 'যত শীগগির পার চলে এস'। ও তাকে জবাব দেবে··· চিঠি এমনি করে সুরু করবে, 'আদরের টুনটুনি আমার।'

'হ্যাঁ, আদরের টুনটুনি আমার' বলে সে হাসে।

যে ভাবে শুয়েছিল তাতে আরাম পাচ্ছিল না। মাথার তলায় হাত দিয়ে বাঁ-পাটা সে সোফার পিঠের উপর তুলে দেয়। এবার একটু আরাম পায়। ইতিমধ্যে জানলার উপর ঘোলাটে আলোর আভাস দেখা যায়, উঠান থেকে শোনা যায় আধ-জাগা মোরগের ডাক। নিকিটিন ভেবে চলে—পীটার্সবুর্গ থেকে কেমন করে সে ফিরে আসবে, মাশা কেমন করে তাকে ষ্টেশনে নিতে আসবে, তার পর আহ্লাদে চীৎকার করে ওর গলায় ঝাঁপিয়ে পড়বে। না, তার চেয়ে, কিছু না জানিয়ে ফাঁকি দিয়ে রাত্রে চুপি চুপি বাড়ী ফিরবে, রাঁধুনী দরজা খুলে দেবে, তার পর পা টিপে টিপে শোবার ঘরে ঢুকে, নিঃশব্দে কাপড় ছেড়ে লাফ দিয়ে বিছানায় গিয়ে পড়বে। হঠাৎ, জেগে উঠে, মাশা আহ্লাদে আটখানা হয়ে যাবে।

আলো ক্রমে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। এদিকে জানলা, পড়ার ঘর সব ওর চোখের উপর মিলিয়ে যায়। দেখে, সেদিন যে ভাটিখানার পাশ দিয়ে ওরা ঘোড়ায় চড়ে গিয়েছিল তারই সিঁড়ির উপর মাশা বসে আছে, ওকে কি একটা বলছে। তারপর সে নিকিটিনের হাতটা জড়িয়ে ধরে চলেছে ও:ক শহরতলীর বাগানে নিয়ে। দেখে, সেই ওকগাছের সারি আর তার উপরে সেই হ্যাটের মত সব কাকের বাসা। একটা বাসা নড়ে ওঠে, তার মধ্যে থেকে গলা বাড়িয়ে উঁকি দেয় শেবালডিন। চেঁচিয়ে বলে, "লেসিং-এর লেখা পড়ো নি!"

সমস্ত দেহ ওর কেঁপে ওঠে—চোখ মেলে চায়। দেখে, আইপোলিট আইপোলিটিচ সোফার সামনে দাঁড়িয়ে, পিছন দিকে মাথা হেলিয়ে গলাবন্ধ জড়াচ্ছে।

"ওঠো, স্কুলের বেলা হ'ল। পোষাক পরে ঘুমুতে নেই, ওতে পোশাক নষ্ট হয়ে যায়। কাপড় ছেড়ে, বিছানায় গিয়ে ঘুমুতে হয়।"

অভ্যাসমত, ধীরে ধীরে এবং ঝোঁক দিয়ে যা চিরকাল সবাই জানে তাই বলতে থাকে।

প্রথম ঘণ্টায় নিকিটিনের দ্বিতীয় শ্রেণীতে রুশ ভাষা পড়ানোর কথা। ন'টায়, ঠিক সময়মত ; যখন সে ক্লাসে গিয়ে ঢোকে, দেখে, ব্লাক্ বোর্ডের উপর দুটি অক্ষর মোটা মোটা করে লেখা ম-শ। তার মানে, নিশ্চয়ই মাশা শেলেষ্টভ।

নিকিটিন ভাবে, "ছোঁড়ারা এরই মধ্যে টের পেয়ে গেছে দেখছি, শয়তান সব···" "ওরা যে কেমন করে সব কথা জানতে পারে!"

দ্বিতীয় পাঠ, পঞ্চম শ্রেণীতে। দেখে ম-শ দুটো অক্ষর ব্লাক বোর্ডের উপর লেখা ; আর, পড়িয়ে ক্লাস থেকে বেরিয়ে যাবার মুখে শোনে পিছন থেকে চেঁচাচ্ছে, "মাশা শেলেষ্টকের জয়"—যেন থিয়েটারের গ্যালারী থেকে চেঁচাচ্ছে।

পোশাক পরে ঘুমিয়ে মাথাটা ভার হয়ে উঠেছে—দেহ জড়তায় অচল। প্রতিদিন ছেলেরা আশা করে থাকে যে, পরীক্ষার আগে ক্লাস বন্ধ হবে, তাই কিছু পড়াশুনো করে না, ছটফট করে। এত অসহ্য লাগে তাদের যে তারা নানারকম উৎপাত সুরু করে দেয়। নিকিটিনও অস্থির হয় ; ওদের দুষ্টুমি লক্ষ্যই করে না ; ক্রমাগত জানলার কাছে ছুটে ছুটে যায়। দেখে, রোদে ধোয়া উজ্জ্বল পথ, বাড়ীগুলোর মাথার উপর নির্মল নীল আকাশ, পাখীর ঝাঁক ; দূরে আরো দূরে, বাগান আর বাড়ী সব ছাড়িয়ে অজানা দূরত্ব, বিপুল সুদূর। নীল কুয়াসার মধ্যে সবুজ অরণ্য—চলে যাওয়া রেলগাড়ীর ধোঁয়া··

এখানে,—সাদা পোশাক পরা দু'জন অফিসার, ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে রাস্তা বেয়ে একেশিয়ার ছায়ায় তলে চলে যায়। এই একদল সাদা দাড়িওয়ালা ইহুদী, মাথায় গোল টুপি এঁটে খোলা গাড়ী হাঁকিয়ে চলে গেল। ডিরেক্টরের নাতনীকে নিয়ে তার গভর্নেস চলেছে। সম অন্য দুটো কুকুরের সঙ্গে দৌড়ে চলে গেল এখান দিয়ে···তারপর গেল ভারিয়া, সাদাসিধে ধূসর একটা গাউন আর লাল মোজা পরে ; হাতে তার "ভাইসেনিক ইউরোপি"—নিশ্চয়ই শহরের লাইব্রেরীতে গিয়েছিল···"

ওঃ! সেই কখন তিনটের সময় পড়ানো শেষ হবে। স্কুলের পরেও বাড়ী যাওয়া হবে না, শেলেষ্টকদের ওখানেও নয় ; যেতে হবে উলফের বাড়ী, পড়াতে। উলফ একজন ধনী ইহুদী—এখন লুথারপন্থী খ্রীষ্টান হয়েছে। বাড়ীর ছেলেপিলেদের স্কুলে দেয় না। স্কুলের মাষ্টারদের বাড়ী এনে ছেলেদের বাড়ীতে পড়ায়। আর পাঠপিছু পাঁচ রুবল করে দেয়।

বিরক্তি, বিরক্তি, বিরক্তি।

তিনটের সময় সে উলফের বাড়ী যায়। মনে হয়, সময় অনন্ত। পাঁচটার সময় সেখান থেকে বেরোয়। আবার সাতটার আগেই স্কুলে যেতে হবে, মাষ্টারদের একটা মিটিঙে—চতুর্থ এবং ষষ্ঠ শ্রেণীর মৌখিক পরীক্ষা কি ভাবে নেওয়া হবে তার একটা খসড়া করতে।

রাত্রের দিকে যখন সে শেলেষ্টকেদের বাড়ী গেল তখন তার মুখ লাল, বুক দুর্ দুর্ করছে। এক মাস আগে, এমন কি এক হপ্তা আগেও যখনই সে কথাটা মাশাকে বলবে বলে মন স্থির করেছে, তখনই ভূমিকা এবং উপসংহারসুদ্ধ আগাগোড়া যা বলবে তার একটা গোটা বক্তৃতা সে মনে মনে তৈরি করে নিয়েছে। আজ তার একটা কথাও তৈরি নেই ; মাথার মধ্যে সব তালগোল পাকিয়ে গেছে ; শুধু এইটুকু সে জানে যে আজ সে বলবেই—আর অপেক্ষা সে কিছুতেই করতে পারবে না।

ভাবে যে, "ওকে বাগানে আসতে বলব। দু'জনে খানিকক্ষণ বেড়াব—তখন বলব।"

হলঘরে কেউ নেই ; সে খাবার ঘরে তারপর বসবার ঘরে যায়···। ওখানেও কেউ নেই। শোনে, ভারিয়া কার সঙ্গে যেন তর্ক করছে, আর শিশুমহল থেকে দর্জির কাঁচি চালানোর আওয়াজ আসছে।

বাড়ীতে একটা ছোট ঘর ছিল। তিনটি নামে সেটি পরিচিত—ছোট ঘর, গলি ঘর, আর আঁধারে ঘর। ঘরে একটা মস্ত বাসনের আলমারি। তাতে ওরা ওষুধপত্র, বারুদ, শিকারের সরঞ্জাম এই সব রাখে। এই ঘরের ভিতর দিয়ে একটা সরু কাঠের সিঁড়ি আছে—সেখানে দেখে: গে, সব সময় একপাল বিড়াল ঘুমিয়ে আছে। ঘরের দুটো দরজা—একটা নার্সারিতে যাবার আর একটা বসবার ঘরের। উপরে যাবার জন্তে নিকিটিন যেই ঐ ঘরে ঢুকেছে অমনি নার্সারির দিকের দরজাটা এমন দড়াম করে খোলে আর বন্ধ হয় যে সিঁড়ি আলমারী সব কেঁপে ওঠে। মাশা হাতে কি একটা নীল জিনিস নিয়ে নিকিটিনকে লক্ষ্য না করেই দৌড়ে সিঁড়ির দিকে যায়।

নিকিটিন তাকে থামিয়ে বলে, "দাঁড়াও···শুভ সন্ধ্যাকাল গোডে-ক্রয়—শোন বলি· ·"

কি বলবে কিছু ভেবে না পেয়ে খাবি খায় ; এক হাতে মাশার হাত আর অন্য হাতে সেই নীল জিনিসটা ধরে। মাশা খানিকটা ভয় পেয়ে, খানিকটা অবাক হয়ে বড় বড় চোখ তুলে ওর দিকে তাকায়।

মাশা পাছে চলে যায় এই ভয়ে, শোন···একটা কথা তোমাকে আমার বলা বড় দরকার···শুধু···এখানে বলা সম্ভব নয়। আর পারছি না, ক্ষমতা নেই আমার···বুঝতে পারছ গোডেক্রয়···আমি পারি না···ব্যস, আর কিছু না।

নীল জিনিসটা মাটিতে পড়ে যায়। নিকিটিন মাশার অন্য হাতটা ধরে। মাশার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়, ঠোঁট নড়ে, তারপর নিকিটিনের কাছ থেকে পেছিয়ে আসতে গিয়ে দেখে যে ঘরের কোণে দেয়াল আর আলমারির মধ্যে গিয়ে পড়েছে।

মৃদুকণ্ঠে নিকিটিন বলে, "মাশা, শপথ করে বলছি, আমায় বিশ্বাস কর···শপথ করছি, মাশা···"

মাশা মাথাটাকে পিছন দিকে হেলিয়ে দেয়, আর নিকিটিন ওকে চুমু খায়। গাল দুটি টিপে ধরে, যাতে অনেকক্ষণ ধরে চুমু খেতে পারে। আর কেমন করে যেন নিকিটিন ঘরের কোণে দেয়াল আর আলমারির মধ্যে গিয়ে পড়ে আর মাশা ওর গলা জড়িয়ে নিজের মাথাটা ওর বুকে চেপে ধরে।

তারপর দু'জনে দৌড়ে বাগানে চলে যায়। তিরিশ বিঘে জমির উপর শেলেষ্টকের বাগান। তাতে গোটাকুড়িক পুরনো ম্যাপল আর লেবু গাছ ; একটা মাত্র ফার আর বাকী সবটাই ফলের বাগান ; চেরী, এপেল, পীয়ার, চেসনাট, রূপোলী জলপাই··· তা ছাড়া গাদা গাদা ফুলও।

মাশা আর নিকিটিন গাছের ফাঁকে ফাঁকে ছুটোছুটি করে—মাঝে মাঝে এ ওকে অবান্তর প্রশ্ন করে—কেউই তার জবাব দেয় না। কাস্তের মত চাঁদ উঠে বাগানের মাথায় ঝকমক করে ; এর কালো কালো ঘাসের ভিতর থেকে আধ-ঘুমন্ত টিউলিপ আর আইরিশেরা চাঁদের ক্ষীণ আলোর উপর পানে গলা বাড়িয়ে দেয়—যেন ওদেরও কেউ প্রেমের কথা বলুক এই ভিক্ষা চায়।

নিকিটিন আর মাশা বাড়ীর ভিতর ফিরে যায়। অফিসাররা আর মেয়েরা ইতিমধ্যেই মাজুরকা নাচতে সুরু করে দিয়েছে। পলিয়ানস্কি আবার সব ঘরে ঘরে গ্রাণ্ডচেন করে ঘুরিয়ে আনে। আবার 'ভাগা' খেলা হয়। রাতের খানার আগে অতিথিরা সব বসবার ঘরে গেছে, নিকিটিনকে একলা পেয়ে মাশা তাকে জড়িয়ে ধরে বলে, "বাবাকে আর ভারিয়াকে তুমি নিজে বল ; আমার লজ্জা করে।"

খাওয়ার পর নিকিটিন বুড়ো বাবার সঙ্গে গিয়ে কথা বলে। ওর কথা শুনে, একটু ভেবে নিয়ে শেলেষ্টক বলেন।

"আমাকে এবং আমার মেয়েকে তুমি যে সম্মান দিলে তার জন্তে আমি কৃতজ্ঞ ; কিন্তু বন্ধুভাবে তোমাকে কিছু বলি, শোন। মেয়ের বাবা এভাবে আমি তোমাকে বলছি না ; বলছি ভদ্রলোকে ভদ্রলোককে যেমনটি বলতে পারে সেই ভাবে। বল ত, এত ছোট-বেলায় বিয়ে করতে চাচ্ছ কেন? কেবল চাষারাই ছোটবেলায় বিয়ে করে—আর বাস্তবিক তা চাষাড়েপনা। কিন্তু তুমি! তুমি কেন তা করবে? তোমার বয়সে এই শিকল পরায় কি সুখ?"

আঁতে ঘা লাগে ওর, বলে, "আমি ছেলেমানুষ নই! আমি সাতাশে পড়েছি।"

অন্য ঘর থেকে ভারিয়া চেঁচিয়ে বলে, "বাবা, ঘোড়ার নাল-ওলা এসেছে।"

কথাবার্ত্তা ঐখানেই বন্ধ হয়। ভারিয়া, মাশা আর পলিয়ানস্কি নিকিটিনকে বাড়ী পৌঁছে দিতে গেল। ওর দরজায় পৌঁছে ভারিয়া বললে, "আচ্ছা, তোমার ঐ অদ্ভুত মেট্রোপলিট মেট্রোপলিটিচকে কোথাও দেখা যায় না কেন বল ত? আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারে না?"

নিকিটিন যখন বাড়ী ঢুকে তার কাছে গেল তখন সেই অদ্ভুত আইপোলিট আইপোলিটিচ বিছানায় বসে প্যাণ্ট ছাড়ছে।

"ওহে ভায়া, শুতে যেয়ো না" এক নিঃশ্বাসে নিকিটিন বলে যায় "শুয়ো না, একটু অপেক্ষা করো।"

তাড়াতাড়ি প্যাণ্টটা পরে নিয়ে আইপোলিট আইপোলিটিচ ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলে "কি, ব্যাপার কি?"

"বিয়ে করছি।"

নিকিটিন সঙ্গীটির পাশে গিয়ে বসে, নিজের ব্যাপারে যেন অবাক লাগছে, এই ভাবে অবাক মুখ করে ওর দিকে চায়। বলে, "কল্পনা কর, আমি বিয়ে করতে চলেছি! মাশা শেলেষ্টক। আজ তার কাছে প্রস্তাব করেছি।"

"বটে? তাকে দেখলে ভাল মেয়ে বলেই মনে হয়। কিন্তু বড় ছেলেমানুষ।"

"হ্যাঁ, ছোট বটে!" বড় চিন্তার কথা, এইভাবে মাথা নেড়ে বলে, "হ্যাঁ, বড়ই ছেলেমানুষ।"

"হাই স্কুলে ও আমার ছাত্রী ছিল। আমি ওকে জানি। ভূগোলে নেহাত খারাপ ছিল না—কিন্তু ইতিহাস একেবারেই পারত না। তা ছাড়া, ক্লাসে বড় অমনোযোগ করত।"

হঠাৎ কি কারণে, বন্ধুর জন্যে মনটা ওর ব্যথিয়ে ওঠে। ওকে একটা মিষ্টি কথা, একটা সান্ত্বনার কথা বলতে চায়।

শুধোয়, "ওহে ভায়া, বিয়ে করে ফেল না কেন? ধর, এই ভারিয়াকেই বিয়ে কর না কেন? চমৎকার, একের নম্বরের মেয়ে। সত্যি বটে, একটু তর্ক করতে ভালবাসে, কিন্তু প্রাণটা—কি হৃদয়! এখুনি তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিল। তাকে বিয়ে করে ফেল হে ভায়া। কি বল?"

ও ভাল করেই জানে যে ভারিয়া, এই নির্বোধ, থ্যাবড়া নাক-ওয়ালা লোকটাকে বিয়ে করবে না, কিন্তু তবু ওকে বিয়ে করার জন্যে পীড়াপীড়ি করে—কেন?

একটু চিন্তা করে নিয়ে আইপোলিচ আইপোলিটিচ বলে, "বিবাহ একটা গুরুতর ব্যাপার। ওর সব দিক দেখে শুনে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করে দেখতে হয়, হঠাৎ, বিবেচনা না করে কথা উচিত নয়। বিচারবুদ্ধিটা সবক্ষেত্রেই ভাল; বিশেষ করে বিয়ের ব্যাপারে। কেননা তখন আর তুমি অবিবাহিত থাকছ না, একটা নতুন জীবন সুরু করছ।"

তার পর, সবাই যা যুগ যুগ ধরে জেনে এসেছে—সেই সব কথা বলতে থাকে। শোনবার জন্যে নিকিটিন বসে থাকে না, শুভরাত্রি জানিয়ে ঘরে চলে যায়। তাড়াতাড়ি কাপড় ছেড়ে বিছানায় গিয়ে ঢোকে—তাড়াতাড়ি শুয়ে সুখের কথা, মাশার কথা, ভবিষ্যতের কথা ভাবতে চায়। মুখে হাসি ফুটে ওঠে। হঠাৎ মনে পড়ে লেসিং-এর লেখা পড়া হয় নি।

ভাবলে, 'পড়তেই হবে লেসিং-এর লেখা। যদিও কেনই বা যে পড়তে যাব। মরুকগে লেসিং।'

তার পর পরিতৃপ্তিতে, পরিশ্রান্ত হয়ে, তখনি ও ঘুমিয়ে পড়ে—আর মৃদু হাসি ওর মুখে লেগে থাকে সকাল অবধি।

স্বপ্ন দেখে—শুনতে পায়, কাঠের মেঝের উপর ঘোড়ার খুরের শব্দ—কালো ঘোড়া মুলিনকে স্বপ্ন দেখে, তার পর সাদা ঘোড়া জায়েন্টকে, তার পর তার বোন মাইকাকে—আস্তাবল থেকে ওদের বার করে নিয়ে আসা হচ্ছে।

আগামীবারে সমাপ্য

নীড়

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

অনেক প্রত্যাশা নিয়ে মাটি গড়ে গ'ড়ে তুলি নীড়।
উপরে উন্মুক্ত থাকে আকাশের নক্ষত্র নিবিড়,
নিয়ে খরস্রোতা নদী, বৃক্ষলতা—অরণ্যের ডোর
মাটির মমতা-মাখা।—এ নীড়ের স্পর্শকাম্য মোর।

দিনে স্নিগ্ধ সূর্য্য-দীপ্তি, বিমণ্ডিত আছে নৈশ-চার,
পেয়েছি পরম তৃপ্তি—জীবনের আস্বাদ, আহ্লাদ।
তবুও অপূর্ণ থাকে হৃদয়ের অনেক কিছুই—
এক দিন তাও মেলে অতর্কিতে—বাসনার জুঁই।

সমুদ্র-ঢেউয়ের মত আকাঙ্ক্ষার শেষ বুঝি নেই।
এক গেলে আর ল'য়ে অভ্যস্ত যে জাল বুনতেই।
অঙ্কুর উদ্গত হয় উজ্জীবিত কত অভীপ্সার,
মানে না দুর্দ্দৈব-বাধা, দুর্নিবার অগ্রগতি তার।
বিচূর্ণিত হলে নীড় পল্লবিত আবার নতুন,
শরৎ-হেমন্ত গেলে অনুবর্ত্তী রয়েছে ফাল্গুন।

রামায়ণ ও ইলিয়ড

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

রামায়ণ ও ইলিয়ডের আখ্যানভাগে সাদৃশ্য আছে। রামের স্ত্রী সীতাকে রাবণ লইয়া আসিয়াছিল, রাম যুদ্ধে রাবণকে পরাস্ত করিয়া সীতা উদ্ধার করেন। সেইরূপ মেনিলসের স্ত্রী হেলেনকে পেরিস লইয়া আসিয়াছিল, মেনিলস ও এগেমেমনন পেরিসকে পরাস্ত করিয়া হেলেনকে লইয়া আসিল। আখ্যানভাগে সাদৃশ্য থাকিলেও উভয় গ্রন্থে আদর্শের পার্থক্য যেন আকাশ-পাতাল, এবং এই আদর্শের পার্থক্য হিন্দু জাতির সহিত পাশ্চাত্ত্য জাতিসকলের চরিত্রের পার্থক্য সূচনা করিতেছে।

প্রথমতঃ, হেলেনকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইতে হয় নাই, সে স্বেচ্ছায় তাহার স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া পেরিসের সহিত পলায়ন করিয়াছিল। দণ্ডকারণ্যে সীতাকে একা পাইয়া রাবণ যখন বলিল, "তুমি বনচারী, রামকে পরিত্যাগ করিয়া লঙ্কায় চল, তোমাকে প্রধান মহিষী করিব, পঞ্চসহস্র দাসী তোমার পরিচর্য্যা করিবে," তখন সীতা যে তেজোদৃপ্ত বাক্যে রাবণকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন, বাল্মীকি তাহা অমর করিয়া গিয়াছেন, "রাম অকম্পনীয় মহাগিরির ন্যায়, অক্ষোভ্য-মহাসমুদ্রের ন্যায়—আমি রামেরই অনুব্রত। রাম সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন সত্যসন্ধ ও মহা ভাগ্যবান—আমি রামেরই অনুব্রত। রাম মহাবাহু, তিনি পুরুষদের মধ্যে সিংহের ন্যায়, তিনি জিতেন্দ্রিয়—আমি রামেরই অনুব্রত। তুমি আমাকে লাভ করিবার ইচ্ছা করিয়াছ, যেন শৃগাল হইয়া সিংহীকে লাভ করিতে চাও। তুমি যেন বিষধর সর্পের মুখ হইতে তাহার দাঁত লইতে চাও। তুমি কালকুট বিষ পান করিয়া সুখে বাস করিতে চাও। তুমি সূচের দ্বারা চক্ষু কণ্ডুয়ন করিতে চাও। তুমি গলায় প্রস্তর বন্ধন করিয়া সমুদ্র পার হইতে ইচ্ছা কর। তুমি প্রজ্বলিত অগ্নি বস্ত্র দ্বারা গ্রহণ করিতে চাও।" রাবণের সমস্ত প্রলোভন ও তর্জ্জন পদাঘাত করিয়া বাল্মীকির কাব্যে সীতা অপরূপ মহিমায় বিরাজ করিতেছেন।

যখন রাবণ জোর করিয়া সীতাকে বিমানে তুলিয়া লইয়া গেল তখন সাশ্রুমুখী সীতাদেবী জনস্থানের বৃক্ষ, নদী, পর্ব্বত সকলকে আকুলভাবে ডাকিয়া বলিতেছেন, "শীঘ্র রামকে বল, রাবণ সীতাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।"

ইহার সহিত তুলনা করুন হেলেনের চরিত্র। হেলেনকে লেসিডিমন হইতে যখন পেরিস জাহাজে তুলিয়া লইয়া গেল ক্রেনি দ্বীপে, পরস্পর বাহুপাশে আবদ্ধ হইয়া তখন তাহারা কি সুখে রজনীযাপন করিয়াছিল, পেরিস তাহা হেলেনকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে (ইলিয়ড, তৃতীয় অধ্যায়)। মেনিলসের সহিত দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে পেরিস পরাস্ত হইয়াছিল, এফ্রোডাইটি দেবীর কৃপায় প্রাণরক্ষা হইল, প্রণয়কুপিতা হেলেনকে এফ্রোডাইটি দেবী পেরিসের শয্যায় তুলিয়া দিয়া তাঁহার কর্ত্তব্য সমাপ্ত করিলেন। (ইলিয়ড, তৃতীয় অধ্যায়)।

হেলেন পেরিসের স্ত্রীরূপে ১৯ বৎসর বাস করিয়াছিল (ইলিয়ড, ২৪ অধ্যায়)। আবার যখন ট্রয়-ধ্বংসের পর মেনিলস তাহাকে লইয়া গেল তখন সে মেনিলসের রাণী হইল (ওডিসিয়স, ৪ অধ্যায়)। হেলেন যে কোনও অন্যায় কার্য্য করিয়াছিল তাহা কাহারও মনে হইল না, কবিরও নয়। স্ত্রীলোক ভোগের সামগ্রী—তাহার কর্ত্তব্যবোধ থাকিতে পারে, ধর্ম্ম থাকিতে পারে ইহা তাঁহাদের কল্পনার অতীত।

ইহার সহিত তুলনা করুন সীতার চরিত্র। সমুদ্রপরিবেষ্টিত, অগণিত রাক্ষসসৈন্য-পরিবৃত লঙ্কা-দ্বীপে সীতা বন্দিনী। মেনিলসের ন্যায় রামচন্দ্রের রাজত্ব নাই, সৈন্য নাই, তিনি বনচারী। সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া, রাক্ষসসৈন্য পরাস্ত করিয়া রামচন্দ্র যে সীতাকে উদ্ধার করিতে পারিবেন, তাহার সম্ভাবনা কোথায়? অশোকবনে ভীষণ-দর্শন রাক্ষসীগণ নানারূপ ভয় দেখাইতেছে। পুষ্পিত অশোক বৃক্ষের বিপুল শাখা অবলম্বন করিয়া সীতা অধোমুখে রোদন করিতেছেন, বলিতেছেন, 'তোমরা আমাকে ভক্ষণ করিয়া ফেল, তথাপি আমি রাবণের স্ত্রী হইব না।' 'হা রাম, হা লক্ষ্মণ, হা কৌশল্যা, হা সুমিত্রা···না জানি পূর্ব্বজন্মে কি মহাপাপ করিয়াছিলাম, যে জন্য এত দুঃখ পাইতেছি।'

আবার দেখি রাবণ বধ হইয়াছে, সীতাকে রামের নিকট আনা হইল, রাম বলিলেন, 'রাবণ বধ হইয়াছে, আমার অবমানের প্রতিশোধ লওয়া হইয়াছে, আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইয়াছে।' হর্ষোৎফুল্ল লোচনে সীতা রামের দিকে চাহিলেন, এইবার সীতা দুই-চারিটি সহানুভূতির কথা শুনিতে পাইবেন, তাহা শুনিয়া এত দিনের অসহ্য কষ্ট কিছু প্রশমিত হইবে। কিন্তু এ কি কথা সীতা শুনিতেছেন। শ্রীরামচন্দ্র বলিতেছেন, 'সীতা, তুমি রাবণের গৃহে বাস করিয়াছ, আমি তোমাকে কিরূপে গ্রহণ করি? তুমি যথা ইচ্ছা যাও।' সীতা চক্ষুজল মুছিতে মুছিতে গদগদ বাক্যে বলিলেন, 'আমাকে এরূপ কথা বলা তোমার উচিত নহে। রাবণ জোর করিয়া লইয়া গিয়াছিল, আমি কি করিব? আমার মনে কিন্তু অন্য কোনও পুরুষের চিন্তা উদিত হয় নাই।—

'মদধীনং তু যত্তন্মে হৃদয়ং ত্বয়ি বর্ত্ততে।
পরাধীনেষু দেহেষু কিং করিষ্যাম্যনীশ্বরী

আমার হৃদয়—যাহা আমার অধীন তাহা তোমাতেই নিবিষ্ট আছে। দেহ আমার অধীন নহে, আমি দুর্ব্বল, কি করিব? লক্ষ্মণ চিতা প্রস্তুত কর। মিথ্যা অপবাদের পর আর আমি বাঁচিয়া থাকিতে পারি না।' রাবণ ধরিয়া লইয়া যাইবার সময় সীতা যে সকল তেজোদৃপ্ত বাক্য বলিয়াছিলেন, সে তেজ এখন কোথায়?

চিতা প্রস্তুত হইল। সীতা রামকে প্রদক্ষিণ করিয়া জলন্ত চিতায়

প্রবেশ করিলেন। সকলে হাহাকার করিয়া উঠিল। দেবগণ বিমানে আরোহণ করিয়া সেখানে আগমন করিলেন। স্বয়ং অগ্নিদেব সীতাকে রামের নিকট প্রদান করিলেন, বলিলেন, 'রাম, ইনি নিষ্পাপ। ইঁহাকে গ্রহণ কর।'

কাব্যে পাপ, পুণ্য দুই-ই দেখাইতে হয়। সেই কাব্যই সার্থক যাহাতে পুণ্য চরিত্র চিত্তাকর্ষক ভাবে অঙ্কিত হয়, পাপের চিত্র এ ভাবে অঙ্কিত হয় যাহাতে শ্রোতার চিত্তে ঘৃণার সঞ্চার হয়। রামায়ণে সীতার চরিত্র এ ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে যে তাহা শ্রবণ করিলে স্বতঃই সীতার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদয় হয়। রাবণের কার্য্য দেখিলে ঘৃণার সঞ্চার হয়। কিন্তু ইলিয়ডে পাপ-চিত্রসকল সে ভাবে অঙ্কিত হয় নাই। পেরিস ও হেলেনের মিলনের চিত্রগুলি কবি এ ভাবে বর্ণনা করেন নাই যাহাতে দর্শকের চিত্তে ঘৃণার সঞ্চার হয়। হেলেনের প্রণয়-কোপ যাহাতে শীঘ্র দূর হয়, সে যাহাতে স্বেচ্ছায় পেরিসের সহিত মিলিত হয়, কবির হৃদয় তাহার জন্যই ব্যগ্র, কবির এই ব্যগ্রতা শ্রোতার হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। স্বয়ং এফ্রোডাইটি দেবী এই মিলনের সঙ্ঘটয়িত্রী। সাধারণ লোকদের মধ্যে ত ঘৃণার সঞ্চার নিশ্চয়ই হয় নাই, হেলেনের স্বামী মেনিলসের মনেও কোনও ঘৃণা, কোনও দ্বিধার ভাব উৎপন্ন হয় নাই, হেলেনের সহিত মিলিত হইয়া যে ইন্দ্রিয়সুখ লাভ হইবে সেই চিন্তায় অপর সকল কথা ডুবিয়া গিয়াছে।

রামায়ণ ও ইলিয়ডের মূল চরিত্রে যেরূপ পার্থক্য, অন্য অপ্রধান চরিত্রের মধ্যেও তাহা দেখা যায়। ইলিয়ড যেখানে আরম্ভ হইয়াছে সেখানে দেখি গ্রীক, সেনাপতি এগেমেমনন এপোলো দেবতার পুরোহিত ক্রাইসিসের কন্যাকে ধরিয়া রাখিয়াছিল। ক্রাইসিস তাহার কন্যাকে চাহিয়া অপমানিত হইয়া চলিয়া গেল। কারণ এগেমেমনন ক্রাইসিসের কন্যাকে বড় ভালবাসে, এমন কি নিজের স্ত্রী ক্লাইটিমনেষ্ট্রা অপেক্ষাও বেশী ভালবাসে, কারণ ক্রাইসিসের কন্যা আরও সুন্দরী, আরও নিপুণা সুতরাং ক্রাইসিসের কন্যা যে স্বেচ্ছায় এগেমেমননের সহিত মিলিত হইত তাহাতে সন্দেহ কি? যখন ক্রুদ্ধ এপোলো গ্রীকসৈন্য ধ্বংস করিতে আরম্ভ করিল, তখন দৈবজ্ঞ কালচস বলিল, এপোলোর পুরোহিতের প্রার্থনা শোনে নাই বলিয়া এপোলো ক্রুদ্ধ হইয়াছে, তখন অনিচ্ছায় এগেমেমনন ক্রাইসিসের কন্যাকে ফিরাইয়া দিল এই সর্ত্তে যে, তাহাকে আর একটি নারী দিতে হইবে। বীরবর একিলিস বলিল, 'তাহা কি করিয়া হইবে? যে সকল নগরী আমরা অধিকার করিয়াছি, তাহাদের সকল নারীকে ত আমরা বণ্টন করিয়া লইয়াছি, নারী কোথায় পাইব যে তোমাকে দিব? ট্রয় নগর জয় করিতে পারিলে তোমাকে তিন-চারিটি সুন্দরী যুবতী নারী দিব, এখন নয়।' কিন্তু এগেমেমনন তাহা শুনিল না। সে বলিল, 'আমি ক্রাইসিসের কন্যা ক্রাইসেইসকে ছাড়িয়া দিব, কিন্তু একিলিস যে নারী লাভ করিয়াছে সেই সুন্দরী ব্রাইসেইসকে লইয়া আসিব।' একিলিস অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ব্রাইসেইসকে ছাড়িয়া দিল। রাগ করিয়া যুদ্ধ করিল না। গ্রীকরা প্রায় হারিয়া গিয়াছিল। অনেক কষ্টে একিলিসকে যুদ্ধ করিতে রাজী করানো হয়। শেষ পর্য্যন্ত গ্রীকদের জয় হয়।

ইলিয়ডের চরিত্রগুলির সহিত রামায়ণ-বর্ণিত চরিত্র রাম, লক্ষ্মণ, ভরত প্রভৃতির তুলনাই হয় না। বালি সুগ্রীবকে পরাস্ত করিয়া সুগ্রীবের স্ত্রী রুমাকে গ্রহণ করিয়াছিল, এই বানর-সভ্যতার সহিত গ্রীক-সভ্যতা তুলনীয়।

দশরথ বহু বিবাহ করিয়াছিলেন। তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীর অন্যায় আবদারের জন্য রামকে বনবাস দিতে হইয়াছিল। কিন্তু পিতার এই দুর্ব্বলতার প্রতি রাম কখনও কটাক্ষ করেন নাই। বেদ বলিয়াছেন, 'পিতৃদেবো ভব' (তৈত্তিরীয় উপনিষদ—১।১১।২), এই বৈদিক উপদেশের দৃষ্টান্ত রামচরিত্র। দেবতাকে যেরূপ পূজা করা কর্ত্তব্য—দেবতার দোষ ধরা কর্ত্তব্য নহে সেইরূপ পিতাকে দেবতার ন্যায় পূজা করাই কর্ত্তব্য—পিতার দোষ দেখা পুত্রের পক্ষে সমীচীন নহে। তাই রাম বলিয়াছেন, 'পিতা প্রত্যক্ষ দেবতা, তাঁহার কথায় আমি অগ্নি প্রবেশ করিতে পারি, বিষ ভক্ষণ করিতে পারি, সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে পারি (বাল্মীকি, অযোধ্যাকাণ্ড ১৮ সর্গ)। জিতেন্দ্রিয় লক্ষ্মণ, সর্ব্বত্যাগী ভরত—এই সকল উচ্চ আদর্শের সহিত তুলনা করা যায় এরূপ একটি চরিত্রও ইলিয়ডে নাই। স্ত্রীসম্ভোগ, তাহা বৈধ হউক বা অবৈধ হউক—ইহা ইলিয়ডের প্রধান বস্তু। ঋষির তপস্যালব্ধ জ্ঞানে রামায়ণ পরিপূর্ণ। কত সহস্র বৎসর ধরিয়া সমগ্র ভারতে ইহার পুণ্য প্রভাব হিন্দুর জাতীয় চরিত্রগঠনে সহায়তা করিতেছে তাহা কে বলিতে পারে?

পুরোহিতের প্রতি শ্রদ্ধা সম্বন্ধেও উভয় গ্রন্থে অত্যন্ত পার্থক্য রহিয়াছে। এপোলোর পুরোহিত ক্রাইসিসের সহিত এগেমেমননের ব্যবহার এবং বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ প্রভৃতির সহিত দশরথ, রামচন্দ্র প্রভৃতির ব্যবহার তুলনা করিলেই তাহা বুঝা যায়। ভারতে পুরোহিতকে ভক্তিশ্রদ্ধা করা হইত, গ্রীসে তাহা হইত না।

পাখী

শিল্পী—শ্রীগোপাল ঘোষ

বর্ত্তমান বাংলার শিল্পকলায় রচনাশৈলী

শ্রীমাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্রকলার ক্ষেত্রে আজ নব নব পরীক্ষণের পালা চলছে। রচনাশৈলী এবং বিষয়বস্তু আজ আর পরম্পরাগত ঐতিহ্য মেনে চলছে না—সৃষ্ট হচ্ছে নানা মত ও পথ, দৃষ্টিভঙ্গির নানা অভিনবত্ব। এটা প্রাণধর্ম্মের লক্ষণ। একথা স্বীকৃত হয়েছে যে, পুরাতন পদ্ধতির গতানুগতিক অনুকরণে আধুনিক ভারতের রূপ এবং প্রাণধারাকে আমরা খুঁজে পাব না। আবার শুধু বৈদেশিক ভাবধারা এবং পদ্ধতির অনুবর্ত্তনের মধ্যেও ভারতীয় রূপের বিকাশ হবে না। তাই চিত্রকলায় বর্ত্তমান ভারতের প্রাণসত্তার বিকাশ অজন্তা, বাঘগুহার চিত্র-রচনাশৈলীর বা মোগল, রাজপুত-শৈলীর অনুকরণে যেমন সম্ভব নয়, তেমনি কেবলমাত্র পাশ্চাত্যের নানা মত ও পথের অনুকরণও ভারতের প্রাণলীলার সার্থক রূপায়ণের সহায়ক নয়। যোগ্য প্রতিভা নব নব পথে যুগোপযোগী রচনাশৈলীর মাধ্যমে দেশ ও কালের প্রাণ-ধারাকে শিল্পকলায় রূপায়িত করেছে। বর্ত্তমানেও তার ব্যতিক্রম হবে না। ভারতের প্রাণধারার বিকাশ হবে আধুনিক রচনাশৈলীতে—এতেই ফুটে উঠবে বর্ত্তমানের রূপ ও রস—তারই সূচনা দেখি নানা আঙ্গিকের অভিনবত্বে—যা কোথাও সার্থক, কোথাও নিরর্থক।

মাত্র আঙ্গিকের অনুকরণে সার্থক শিল্পকলার সৃষ্টি হয় না—তাতে সৃষ্ট হয় পরম্পরাগত ধারা এবং এটাই বহুক্ষেত্রে শিল্পকলার রসের প্রবাহকে ক্ষুণ্ণ করে ম্যানারিজমে পর্য্যবসিত করে। যুগে যুগে এ রকম ম্যানারিজমের সৃষ্টি হয়েছে শিল্পকলার ক্ষেত্রে—আবার শক্তিমান শিল্পীর প্রতিভার সোনার কাঠির প্রাণবন্ত স্পর্শে নূতন যুগে নূতন আঙ্গিকে দেশ ও কালের রূপ সার্থক হয়ে ধরা দিয়েছে।

ভারতের অতীত দিনের শিল্পকলা মহান্ ঐতিহ্যে গরীয়ান। এর ভবিষ্যৎও মহিমামণ্ডিত হয়ে উঠবে শিল্পীদের সাধনায়। কিন্তু কোন্ পথে? অতীত আমাদের প্রেরণা দেবে—সেই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা আরও উৎকর্ষ লাভ করব। কিন্তু হুবহু অতীতের মত করে গড়ে তুলতে গেলে ভুল করা হবে। এ সম্বন্ধে আচার্য্য নন্দলাল তাঁর "শিল্পকথা"য় বলেছেন—"...পরম্পরাগত শিল্প ব্যবসার মূলধনের মত। তাকে খাটিয়ে অল্পায়াসে আরও অনেক ঐশ্বর্য্য লাভ করা সম্ভব হয়।" অতীতের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে, অতীতের কায়াকে রূপদান না করে, ভারতের শাশ্বত সত্তাকে যুগোপযোগী করে রূপায়িত করে তুলতে হবে।

অতীতে ভারতের চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্য্যের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন যুগে বিভিন্ন রচনাশৈলীর বিকাশ হয়েছে। অজন্তা এবং বাঘ-গুহাচিত্র, ইলোরা কোণারকের ভাস্কর্য্য, রাজপুত মোগল
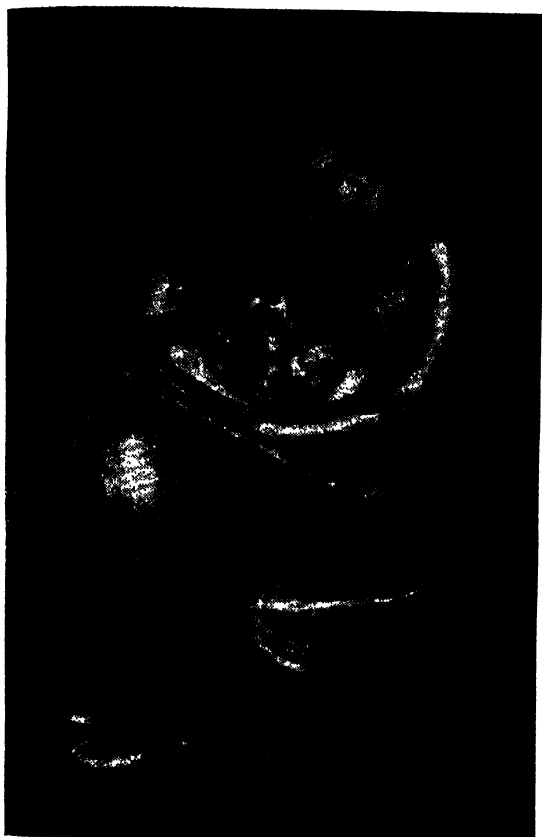
মা ও ছেলে ভাস্কর—শ্রীপ্রদোষ দাশগুপ্ত

গম ভাঙা ভাস্কর—শ্রীপ্রদোষ দাশগুপ্ত

প্রতীক্ষা শিল্পী—শ্রীসুশীল সেন
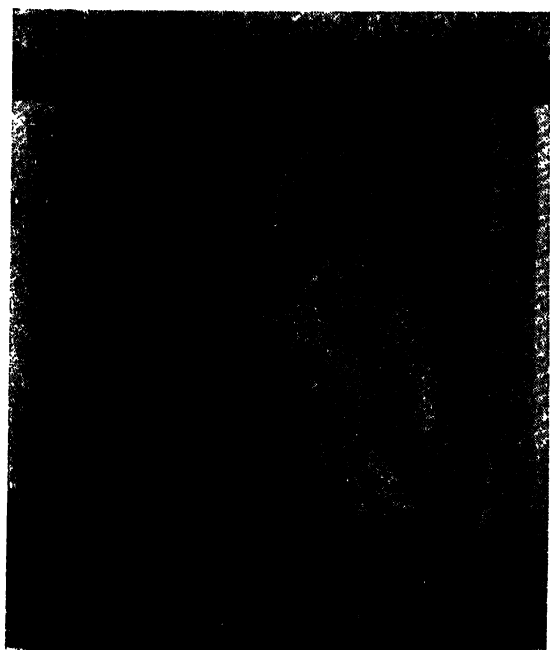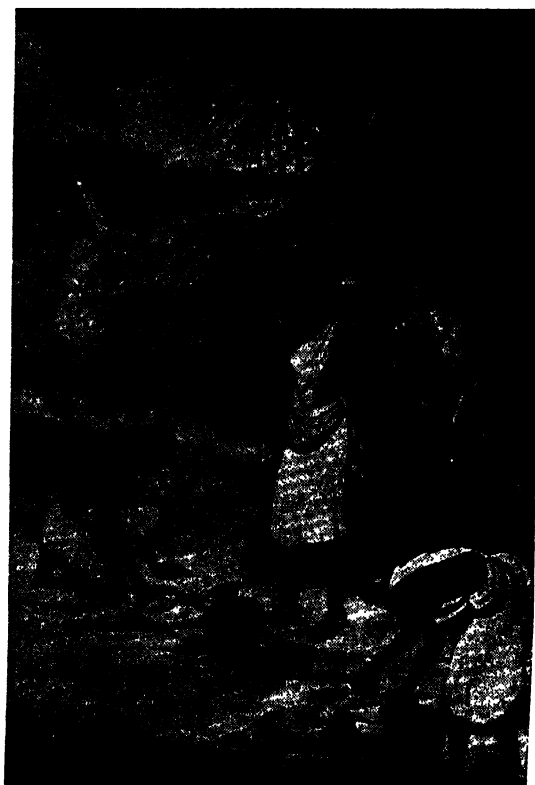
সাঁওতাল শিল্পী—শ্রীগায়ত্রী দত্ত

ইত্যাদি বিভিন্ন পদ্ধতির চিত্রকলার রচনাশৈলীর মাধ্যমে বিভিন্ন কালে ভারতীয় রূপ ও রস ধরা দিয়েছে। আবার আধুনিক যুগে প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কাল পূর্ব্বে অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার স্পর্শে হ'ল ভারত-শিল্পের নব রূপায়ণ।

আজকের যুগ বিজ্ঞানের যুগ। আধুনিক বিজ্ঞান শিল্পকলার ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করেছে। বিভিন্ন ভাবের আদান-প্রদান আজ সহজসাধ্য হয়েছে। বিদেশীয় ভাবধারার প্রভাবে আমরা প্রভাবান্বিত—আমাদের সাহিত্য, শিল্প তাতে করে পুষ্টই হচ্ছে। এই প্রভাবকে বাদ দিতে গেলে গোঁড়ামির পরিচয় দেওয়া হবে। সারা বিশ্বে বিজ্ঞান এনে দিয়েছে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি, তাই জীবনের রূপ আজ নূতন—অভিনব দৃষ্টিভঙ্গিতেই সেই রূপের বিকাশ হবে। কোনো একটা বিশেষ ধরণের ষ্টাইল বা রচনারীতির অন্ধ অনুকরণে আজকের ভারতীয় চিত্রকলা স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবে বলে মনে হয় না, বরং শিল্পীর সাধনায় ষ্টাইল আপনি গড়ে উঠবে। করণ-কৌশল যাই হোক না কেন—জাতীয় আত্মার সন্ধান যে রূপে মিলবে, সেই রূপই হবে জাতীয় রূপ। ভারতের রূপ এবং প্রাণের উপলব্ধি যে চিত্রকলায় বা ভাস্কর্য্যে প্রতিফলিত হবে—তাই হবে ভারতীয় আর্ট। শিল্পের জাত নেই সত্য, তা সত্ত্বেও কিন্তু প্রত্যেক চিত্রে বা ভাস্কর্য্যে থাকে একটি বিশেষ জাতিগত কৃষ্টি এবং শিল্পীর বৈশিষ্ট্যের ছাপ—নচেৎ শিল্প সার্থক হয় না।

আর্টের জাত নেই, কাল নেই—সার্থক শিল্প সর্ব্বকালের এবং সর্ব্বদেশের। বিভিন্ন দেশের নানা আঙ্গিকের বিচিত্র ভাবধারার সহজ আদান-প্রদানের ফলে কোনও দেশের শিল্পকলা আজ আর একটিমাত্র বিশেষ জাতীয় আঙ্গিকে নিজের পরিপুষ্টির পথকে সীমাবদ্ধ রাখছে না। তাই দেখি চীন ও জাপানের চিত্রকলায় আধুনিক ইউরোপের প্রভাব—তৈলরঙের নানা আধুনিক আঙ্গিকের অনুশীলন। তেমনি আবার আধুনিক ইউরোপ ও আমেরিকার নানা চিত্রে আদিম যুগের চিত্রকলার (মিশরীয় ভারতীয় এবং চৈনিক) প্রভাব সুপরিস্ফুট। দেশে দেশে চলছে নানা করণ-কৌশলের পরীক্ষা।

Art নামক গ্রন্থে মনীষী ক্লাইভ বেল সংজ্ঞা-নির্ণয়-প্রসঙ্গে বলেছেন যে, আর্ট হচ্ছে তাৎপর্য্যপূর্ণ রূপের অভিব্যক্তি—"**Expression of significant form**", যা আমাদের মনে aesthetic emotion বা সৌন্দর্য্যানুভূতি-সঞ্জাত ভাবাবেগ জাগায়। যুগে যুগে দেখি আদর্শের নানা রূপ, তবুও বিভিন্ন আদর্শের, বিভিন্ন দেশের এবং কালের শ্রেষ্ঠ শিল্পগুলি সার্থক সৃষ্টি হিসাবে আমাদের মনকে নাড়া দেয়। এমন একটা

রাতের যাত্রী — শিল্পী—শ্রীমাখন দত্তগুপ্ত

জিনিষ এই শিল্পসৃষ্টিগুলির মধ্যে রয়েছে, যাতে এগুলি হয়েছে সার্থক রচনার পর্য্যায়ভুক্ত। এই বিশেষ জিনিষটি হ'ল significant form বা ভাবদ্যোতক রূপ—যার প্রকাশ ভারতের নটরাজ বা বুদ্ধমূর্ত্তিতে, মেক্সিকোর কোন কোন ভাস্কর্য্য, মিশরীয় ভাস্কর্য্য এবং চিত্রকলায়, গ্রীক মূর্ত্তিশিল্পে, গিয়োত্তোর চিত্রে, অজন্তার গুহাচিত্রে অথবা অবনীন্দ্রনাথের চিত্ররচনায়। এই সকল দৃষ্টে সব দেশের কলারসিকের মনই সমান আনন্দ উপভোগ করে। বস্তুর রূপ চেতনার স্পর্শে যেখানে প্রাণবান, খণ্ড উপলব্ধি একটি অখণ্ড ছন্দে যেখানে ধরা পড়েছে সেখানেই হয়েছে সার্থক সৃষ্টি, সেখানেই আর্ট হয়েছে আন্তর্জাতিক—শুধু জাতিবিশেষের একলার জিনিষ নয়।

বর্ত্তমানে বাংলার শিল্পকলার ক্ষেত্রেও দেখি রচনাশৈলীর নানা অভিনবত্ব; বিষয়বস্তুর নির্ব্বাচনও আজ আর কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সুখদুঃখের নানা বিষয়, হাটবাজার, লোকনৃত্যের নানা ছন্দ, যন্ত্রযুগের বিপর্য্যস্ত মানুষের নানা

দ্বন্দ্ব, বিরাট এবং আপাত দৃষ্টিতে তুচ্ছ নানা বিষয় রূপায়িত হচ্ছে চিত্রকলায়। নূতনের পথে এই অনুসন্ধিৎসা জাতির পক্ষে কল্যাণকর। আজকের বাংলার শিল্পকলা কোন বিশেষ ষ্টাইল বা ফর্মুলার মধ্যে নিজের প্রকাশভঙ্গীর গণ্ডী টেনে

কারশিল্প শিল্পী—শ্রীমনোরঞ্জন ঠাকুর

দেয় নি, দেশী বিদেশী নানা আঙ্গিকের মাধ্যমেই শিল্পকলা আজ অভিব্যক্ত হচ্ছে। একথা সত্য যে, সকল পরীক্ষা এবং প্রয়াসই সার্থক হচ্ছে না—কিন্তু আশা করা যেতে পারে এক দিন এই সাধনা সাফল্যমণ্ডিত হবে।

স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী এবং রচনারীতি যাদের শিল্পসৃষ্টিতে সৌন্দর্য্যানুভূতি-সঞ্জাত ভাবাবেগ সৃষ্টি করেছে বাংলার এমন কয়েক জন আধুনিক শিল্পীর শিল্পসৃষ্টির সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

মৃদু এবং স্বচ্ছন্দ তুলির আঁচড়ে, স্নিগ্ধ রঙের প্রয়োগে রচনাশৈলীর নিপুণতায় অনুভূতিশীল শিল্পীমনের বিকাশ দেখতে পাই মাখন দত্তগুপ্ত ও সুশীল সেনের পাশ্চাত্য প্রথায় আঁকা বহু চিত্রে। বাংলার পটচিত্রের সংযত সরল প্রাণবান 'form' বা রূপের প্রভাব মাখন দত্তগুপ্তের আঁকা কতকগুলি চিত্রে দেখা যায়। বর্ত্তমান বাংলার সমাজ-জীবনের নানা ছবি এঁকেছেন এই শিল্পীদ্বয়। ভারতীয় পদ্ধতিতে আঁকা সুশীল সেনের চিত্রাবলী কমনীয় রেখাসম্পাতে ও বর্ণসুষমায়

দ্রোণাচার্য্যের অস্ত্র-শিক্ষাদান
শিল্পী—শ্রীঅমূল্যগোপাল সেন

মাধুর্য্যমণ্ডিত। প্রতিভাশালী শিল্পী হিসাবে এঁদের খ্যাতি আছে।

শিল্পী গোপাল ঘোষের রচনারীতিতে নূতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বিদ্যমান। অতি সাধারণ বিষয়বস্তু অবলম্বনে আঁকা এঁর বহু রচনা উচ্চাঙ্গের সৃজনী-প্রতিভার পরিচায়ক। রঙ ও রেখার নিপুণ এবং ছন্দময় সুষমা এঁর চিত্রাবলীতে সুপরিস্ফুট। গোপাল ঘোষের রচনায় পাশ্চাত্য এবং বিশেষ ভাবে চৈনিক চিত্রকলার প্রভাব প্রবল—তবুও এঁর সৃষ্টিতে বাংলার প্রাণধর্ম্মের পরিচয় মেলে। বাংলার গ্রাম, নদনদী

ছোট ছোট ফর্নফুলের গাছ, লতা-পাতা, প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্য্যসম্ভার অবলম্বনে আঁকা এঁর স্কেচগুলিতে যথার্থ শিল্পীমনের প্রকাশ দেখতে পাই।

আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ এবং নন্দলাল-প্রবর্ত্তিত রীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আঁকা ধীরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মের 'চতুরাশ্রম,' 'চতুর্বর্ণাশ্রম, খেলা প্রভৃতি ছবিগুলি পরিকল্পনার অভিনবত্বে, বর্ণব্যঞ্জনায় এবং রেখার বিন্যাসে সার্থক শিল্পসৃষ্টি। অমূল্য সেনের অঙ্কিত 'দ্রোণাচার্য্যের অস্ত্র-শিক্ষা দান' ছবিটি ভাবব্যঞ্জনা ও রচনা-কৌশলে রূপসৃষ্টির দিক দিয়ে অনবদ্য। ছবিটি 'এগ টেম্পারা' রঙে আঁকা। মনোরঞ্জন ঠাকুর অঙ্কিত 'কারুশিল্প' নামক চিত্রের পরিকল্পনায় এবং কার্য্য-রত নারীপুরুষের ভঙ্গিমার সরল ও ভাবব্যঞ্জক গঠনে অভিনবত্বের পরিচয় আছে। ছবিটি দেয়ালে অঙ্কিত, ফ্রেস্কো রীতিতে আঁকা। কুমারী গায়ত্রী দত্ত অঙ্কিত 'সাঁওতাল' ছবিটিতে শিল্পীর কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। ইন্দু রক্ষিতের রচনারীতিতে প্রতিভা এবং স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ দেখতে পাই। তাঁর আঁকা 'নৃত্য' নামক প্রাচীর-চিত্রটির ছন্দোবদ্ধ সংযোজনা, রঙের সমাবেশ এবং ভাব-ব্যঞ্জনা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক। ইন্দু রক্ষিতের শকুন্তলা ও দুষ্মন্ত নামক রিলিফ ওয়ার্কটিও ভাবব্যঞ্জক। সমর ঘোষ, হেরম্ব গাঙ্গুলি, কমলারঞ্জন ঠাকুর প্রমুখ শিল্পীদের রচনা স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যে এবং নিপুণতায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শকুন্তলা ও দুষ্মন্ত — শিল্পী—শ্রীইন্দু রক্ষিত

ভাস্কর্য্যের ক্ষেত্রে প্রদোষ দাশগুপ্তের রচনাসমূহের অভিনবত্ব আছে। এঁর রচনারীতি কোন বিশেষ ধারায় সীমাবদ্ধ নয়। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের পরম্পরা-গত (traditional) এবং আধুনিক বিভিন্ন ভাস্কর্য্যরীতির অনুপ্রেরণা এঁর নানা সৃষ্টিকে প্রভাবিত করেছে। এঁর সৃষ্টিতে কল্পনার বৈশিষ্ট্য এবং শিল্পীমনের স্বাতন্ত্র্যও লক্ষণীয়।
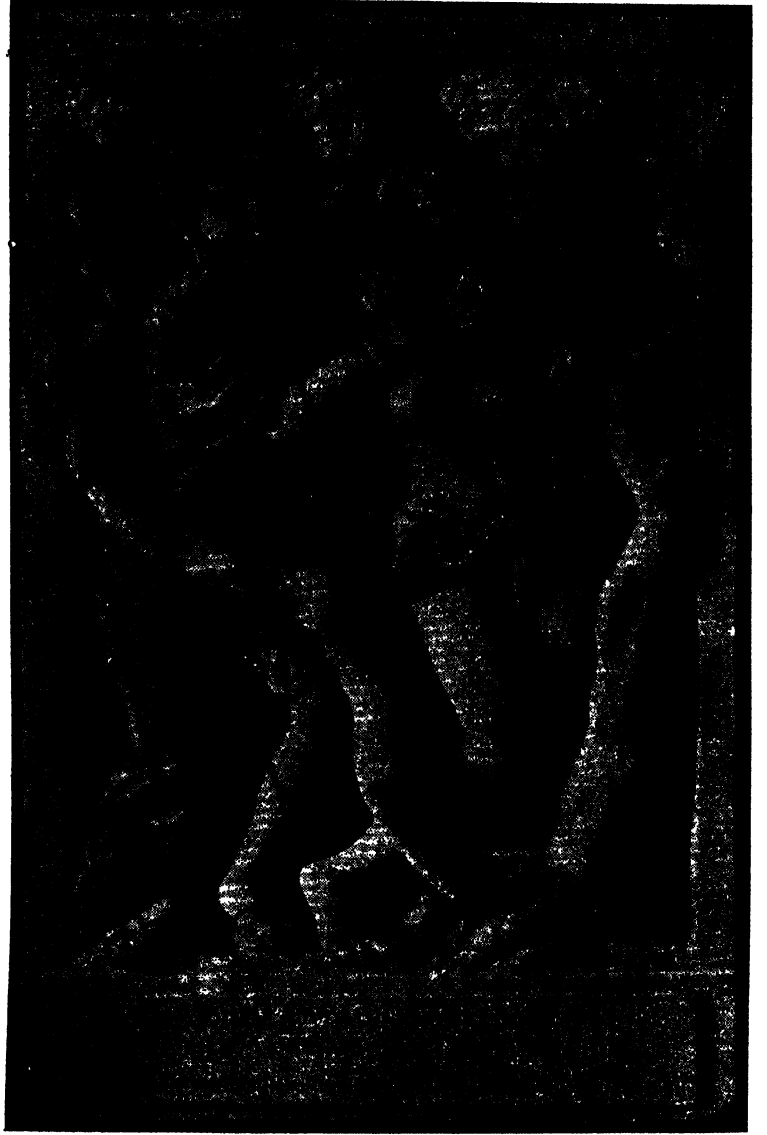
ত্রৈবিক্রমম্

একটি নবাবিষ্কৃত প্রাচীন নাটিকা

শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতের নাট্য-শিল্প অত্যন্ত প্রাচীন শিল্প;—পণ্ডিতেরা বৈদিক কাল হইতে নাট্য-শিল্পের উৎপত্তি ও ইতিহাস অনুসরণ করিয়াছেন। প্রাক্-ঐতিহাসিক কাল হইতে, যুগে যুগে, স্তরে স্তরে বিভক্ত হইয়া, নাট্য-শিল্প, নানা পরিস্থিতির মধ্যে সুদীর্ঘকাল অতিক্রম করিয়া পূর্ণাবয়ব, সুপরিণত শিল্পে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। নাট্য-শিল্পের ক্রমোন্নতির ইতিহাস অতীব বিচিত্র ও অত্যন্ত কৌতুকপ্রদ।

নাট্য-শিল্প পরিণতি লাভ করিবার পর, নাট্যবেদবিদ্ বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতেরা নাট্য-শিল্প বিশ্লেষণ করিয়া, নাট্যের লক্ষণ, জাতি ও রসাদি বিচার করিয়া নানা শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহার মধ্যে ভরত মুনির "নাট্য-শাস্ত্র" সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বিখ্যাত গ্রন্থ। ভরত মুনির পরেও একাধিক নাট্য-সমালোচক নাট্য-শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন—তাহাদের মধ্যে "ভাব প্রকাশ", "দশ-রূপক" "সাহিত্য-দর্পণ," "নাটদর্পণ" ও "নাট্য-বেদ-বিবৃতি" বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

এই সব গ্রন্থে নানা রূপের বা নানা জাতির নাটকের উল্লেখ, লক্ষণ, বিশ্লেষণ ও বিবরণ আছে। তাহার মধ্যে "উপরূপকে"র কথা বাদ দিলে, অন্ততঃ দ্বাদশ প্রকার নাটকের লক্ষণ লিপিবদ্ধ আছে, যথা, নাটক, প্রকরণ, নাটিকা, প্রকরণী, ব্যায়োগ, সমবকার, ভাণ, প্রহসন, ডিম, অঙ্ক, ঈহামৃগ এবং বীথী। বিভিন্ন অঙ্ক-সংখ্যা, বিভিন্ন বিষয়বস্তু, বিভিন্ন নায়ক, বিভিন্ন রস ইত্যাদি নানা বিভেদ অনুসারে বিভিন্ন রীতি বা জাতির নাটকের স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই সব বিভিন্ন জাতির নাটকের সুবিখ্যাত উদাহরণ ভারতের নাট্য-সাহিত্যের বিপুল কলেবরে এখনও প্রচলিত আছে—যাহার আলোচনা করিয়া নাট্য-রসিকেরা নাট্য-শিল্পের নানা বিচিত্র রসের আস্বাদন করিয়া থাকেন।

সম্প্রতি একটি অদ্ভুত রসের নাটিকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে—যাহার আদর্শ নাট্যশাস্ত্রে ধৃত দ্বাদশ জাতির নাটকের মধ্যে পাওয়া যায় না। নাট্যশাস্ত্র অনুসারে 'ব্যায়োগ' ও 'ভাণ' এই দুই জাতির নাটক মাত্র দুই ব্যক্তির কথোপকথনে (dia logu) এবং এক ব্যক্তির কথনে (monologue) নিবদ্ধ সর্ব্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত আকারের নাটক-সৃষ্টি। কিন্তু এই নূতন আবিষ্কৃত নাটিকাটি 'ভাণ' অপেক্ষা স্বল্প অবয়বের নাটক এবং দুই জন নটের নামমাত্র উল্লেখ থাকিলেও বস্তুতঃ এক নটের মুখে 'আরোপিত' এক-মুখী কথনোক্তি (monologue)। এতাবৎকাল পরিচিত নানা নাট্যরূপের মধ্যে এই নাটিকাটি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র আকারের নাটক-কল্পনা। ইহার বিশিষ্ট বিচিত্র রূপটি, কেবল নাট্যরসিক নহে, সকল শ্রেণীর সাহিত্য-রসিকের কৌতুক উদ্রেক করিবে, একথা সাহস করিয়া বলা যায়। এই ক্ষুদ্র নাটিকার কাব্য-রসও উপভোগের বস্তু।

সূত্রধার ও তাহার স্ত্রীকে লইয়া এই নাটিকার সৃষ্টি। ইহার বিষয়বস্তু বামন অবতারে বিষ্ণুর দৈত্যরাজ বলিকে ছলনা। একজন পণ্ডিত এই নাটিকার শেষ দুটি শব্দ "স্বস্তি গোব্রাহ্মণেভ্যঃ" এই স্বল্প কথার "ভরতবাক্য" অনুসরণ করিয়া নাটিকাটির রচনা-কালের ইঙ্গিত অনুমান করিয়াছেন। এই সঙ্কেত অনুসারে নাটিকাটি সম্ভবতঃ ৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। লেখকের নাম নাটিকার মধ্যে উল্লেখ নাই, তথাপি অন্যান্য বাহ্যিক ও অবান্তর প্রমাণের সাহায্যে একজন পণ্ডিত "কল্যাণ-সৌগন্ধিকমে"র রচয়িতা দক্ষিণ দেশের নীলকণ্ঠ কবিকে এই নাটিকার রচনাকার অনুমান করিয়াছেন।

যাহা হউক, নাটিকাটির যথার্থ রূপ মূল সংস্কৃত ভাষায় উদ্ধৃত হইল। নাট্য-রসিকরা ইহার সমাদর করিলে বর্ত্তমান লেখকের পরিশ্রম সার্থক হইবে। নাটিকাটির নাম—"ত্রৈবিক্রমম্"।

(নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্র-ধারসূসহ প্রিয়য়া)।

সূত্রধারঃ। আর্য্যে তৃতীয়ে খলু চিত্র-পটে,—
দৈত্যেন্দ্র মৌলি-মণি-ঘৃষ্ট-কিনীকৃতস্য
পাদস্য যস্য গমনোৎ-গম-গর্বিতস্য
ত্রৈবিক্রমং ত্রিভুবনাততমৎভুতং যৎ
ভক্তৈর্বিভক্তমখিলং বটুবামনস্য ॥১॥

নটী। নমো ভঅবদো বটুবামনায়। অ,-অ, তদো তদো।

সূত্রধার। আর্যে, শ্রূয়তাম্। দৈত্যেন্দ্রং বলিং বৈরোচনং কৃতাশ্বমেধমবভৃথ-স্নানম্ মৌক্তিক-জালালংকৃতোত্তমাঙ্গং কৃষ্ণা-জিনাবলং বিতোত্তরীয়ং পত্নীসহিতং বরপ্রদানাভিমুখং ত্রিদশ-গণ-ভূত-হিতার্থম্ উপাধ্যায়রূপং বৃহস্পতিং পুরস্কৃত্য স্বয়ং বটুবামনো ভূত্বা বামদেব্যং সামোৎগায়ন্ যজ্ঞ-সমৃদ্ধিং প্রশংসন্ পস্ত্যো ভবতি ভগবান্ মহাবিষ্ণুঃ।

নটী। তদো তদো।

সূত্রধারঃ। ততস্তং দৃষ্টৈব প্রহ্লাদিতমনসা বলিনাপ্যভিহিতং—'ইত-ইতো ভগবান্। যথেষ্টং প্রতিগৃহ্লীষ বরং' ইতি।

নটী। তদো তদো।

সূত্রধারঃ। তত আজ্ঞাপয়ন্নিব 'মম গুরোর্যজ্ঞশরণার্থং ত্রীন্ ক্রমান্ ইচ্ছামি' ইত্যুক্তং ভগবতা।

নটী। তদো তদো।

সূত্রধারঃ। তত ঐশ্বর্য্য-মদ-গর্বিতেন কেনাপ্যবিচার্য্যমানেন 'বাঢ়ং দদামি' ইত্যুক্তং বলিনা।

নটী। তদো তদো।

সূত্রধারঃ। এবং প্রবৃত্তমানৈর্বিমল-বিশাল-বুদ্ধি-হৃদয়েন সংহ্লাদ নামামাত্যেন নিবারিতঃ 'ন দাতব্যং ন দাতব্যং' ইতি।

অয়ং স বিষ্ণু-র্মনসাপ্যজেয়ঃ
সুরাসুরাণাং সুখ-শোক-কর্তা।
বটুশ্চ নায়ং সকলং বিজেতুম্
প্রাপ্তো যদি স্যাৎ ন জলং প্রদেয়ম্ ॥২॥

অপিচ—

ভিত্বা গুরুং তব জঘান নৃসিংহরূপী
বক্ষস্থলং নখমুখৈর্নিশিতৈঃ পুরা যঃ।
সাক্ষাৎ-হিরণ্যকশিপুং সুর-দৈত্যনাথং
প্রাপ্তাখিলাজিতবর-প্রবরং বিরিঞ্চাৎ ॥৩॥

ইত্যুক্তঃ সংহ্লাদেন।

নটী। তদো তদো।

সূত্রধারঃ। ততঃ

'সোঽয়ং যদি স্যাদ-হি-ভোগ-শায়ীঃ
শার্ঙ্গাসি চক্রোদ্যত-শংখ্য-পাণিঃ।
যুদ্ধেষ্বসহ্যো যদি যাচতে মাম্
দাস্যামি সত্য-ব্রতমাস্থিতোঽহম্ ॥৪॥'

অপিচ। এতদপ্যুক্তং বলিনা—

দেহীতি যো বদতি তং প্রবিশত্যলক্ষ্মীঃ
নাস্তীতি যো বদতি তং পুনরভ্যুপৈতি।
তস্মাদ্দদামি পৃথিবীং মধুসূদনায়
শ্রীরেব মাং ভজতু তং প্রবিশত্বলক্ষ্মীঃ ॥৫॥

ইত্যেবমুক্তা বিসর্জিতঃ সংহ্লাদঃ।

নটী—তদো তদো।

সূত্রধারঃ—ততঃ খর-মুর-নর-নরক-নমুচি-প্রভৃতি-বার্যমাণো বার্য্যমাণস্তাংস্তান্নির্ভৎস্যাত্মনঃ সত্যবচনমেবাস্থায় সুরগণাহিত-করাভ্যাং জাম্বুনদময়ং ভৃঙ্গারমাদায়, 'ইতো ইতি ভগবান্, যথেষ্টং তোয়ং গৃহাণ' ইত্যুক্তং বলিনা।

নটী—তদো তদো।

সূত্রধারঃ—ততঃ সুরগণ-হিতকরে হসুরগণ-নিধন করেহ মঙ্গকমল-সদৃশে।
তস্মিন করতলে প্রসূত-মাত্রে তোয়ে চতুর্ভির্দোর্ভিঃ শর-শার্ঙ্গ-শঙ্খ-চক্র-গদাভিরায়ুধৈরলংকৃত্য ত্রৈলোক্য প্রমাণং প্রবিজৃম্ভিতো ভগবান্ দিব্যমূর্ত্তিঃ।

নটী—তদো তদো।

সূত্রধারঃ—ততো বিকৃত-বদন-বিদষ্টৌষ্ঠা ভ্রূকুটি পুট-বিষমীকৃত-রক্ত-নয়নাঃ সসংরম্ভমহ-মহমিকয়া সমুত্থিতা দৈত্যেন্দ্র সংঘাঃ।

নটী—তদো তদো।

সূত্রধারঃ—ততস্তত্তেজসৈব, "অয়ং বিষ্ণুরয়ং বিষ্ণুঃ"
ইতি অন্যোন্যং প্রহৃত্য নষ্টা দৈত্যাঃ। হৃষ্টাঃ দেবাঃ।
আহতা দেবদুন্দুভয়ঃ। অত্যুচ্চারিতো বায়ুঃ।
অতি-তপত্যাদিত্যঃ। শ্রান্তা মেঘাঃ। শান্তিমিব নভঃ
স্খলিতাঃ পর্বতাঃ। ক্ষুভিতাঃ সাগরাঃ। প্রলীনা
বাসুকি-প্রভৃতয়ঃ ভুজঙ্গেশ্বরাঃ।
কিং নু খল্বিদম্।

প্রলয়মিদমুপেতং কিং নু মায়া ন বিদ্মঃ
প্রভুরবতু হরির্নো হন্ত হাহা হতাস্মঃ।
ইতি বিবিধ-নিমিত্তৈর্মোহমভ্যাগতাস্তে
ভুবনপতি-মুপেন্দ্রং সর্বলোকাঃ প্রণেমুঃ ॥৬॥

নটী—তদো তদো।

সূত্রধারঃ—ততঃ

'নারায়ণায় হরয়ে মুর-শাসনায়
ত্রৈলোক্য-জন্ম-লয়-পালন-কারণায়।
দেবায় দৈত্য-মথনায় জগদ্ধিতায়,
বিশম্ভরা-হিত-করায় নমোঽচ্যুতায় ॥৭॥

ইত্যুক্ত্বা প্রণিপতিতানি সর্বভূতানি।

নটী—তদো তদো।

সূত্রধারঃ—তত এব প্রবৃত্তমানে, 'মা ভৈষ্ট, মা ভৈষ্ট,, বিষ্ণো-বিজয়ঃ
বিষ্ণো-বিজয়ঃ' ইত্যুক্ত্বা ত্রীন্ লোকান্ ত্রিসপ্তকৃত্বঃ ভেরীং প্রহরন্ পর্য্যটতি জাম্ববান্।

নটী—তদো তদো।

সূত্রধারঃ—দর্পান্ধঃ পাদ-লগ্নো নমুচিরপসৃতো যাত্যেব গগনম্ সংহ্লাদঃ পাদ-বেগাৎ-বিপুল ইব গিরিভূর্মৌ নিপততি।

নির্দ্দৈখা যস্ত ভূমিঃ স গিরিবনপুরা মস্তেব চলিতা
ধর্ম্মজ্ঞঃ সত্যসন্ধঃ সুকৃত ইব বলি-র্ধৈর্য্যান্ন চলতি ॥৪॥

অপিচ—

স্বর্গং সুরেন্দ্র ইব দত্তমনেক-ভোগম্
পাতালমেত্য সুতলং হরিণা স দৈত্যঃ
ভক্ত্যার্চ্চয়ন্ পরময়া রমতে বিভুং তম্
কিংবা করোতি বরতা ন সমাশ্রয়াঙ্গম্ ॥৯॥

নটী—রমণিজ্জা খু কহা। অণং চিত্তবধং বণেদু অও।
[=রমণীয়া খলু কথা। অন্যাং চিত্রবন্ধাং বর্ণয়তু আর্য্যঃ।]

সূত্রধারঃ—

আর্য্যে বাঢ়ং হরিপদকথা সেয়মস্তুঃ প্রযাতা
ভক্তির্ভূয়াৎ তব চ মম চ শ্রীধরস্যাঙ্ঘ্রি-পদ্মে।
নশ্যত্বেনং দুরিত-মসকৃৎ পশ্যতাং নৃত্যতাং নঃ
স্বস্তো রাজাপ্যবতু বসুধাং স্বস্তি গোব্রাহ্মণেভ্যঃ ॥১০॥

ত্রৈবিক্রমম্ সমাপ্তম্ ॥

ত্রৈবিক্রম

(বঙ্গানুবাদ)

(নান্দীবচনের শেষে, অতঃপর, সূত্রধার তাঁহার প্রিয়ার সহিত [রঙ্গমঞ্চে] প্রবেশ করিতেছেন)।

সূত্রধার। আমরা তৃতীয় চিত্রে দেখিতেছি—

ত্রিভুবন পরিক্রমণ করিয়া বটুকবামনের তিনটি গগন-চুম্বী, অদ্ভুত ও গর্ব্বিত পাদক্ষেপ,—যাহা দৈত্যরাজগণের মুকুটের মণিদ্বারা ধর্ষিত—এবং যাহা নিখিল ভক্তগণের উল্লাসে গৌরবান্বিত (হইয়াছে) ॥১॥

নটী। ভগবান্ বটুবামনকে আমার প্রণাম জানাই। আর্য্য !—তাহার পর, তাহার পর ?—

সূত্রধার। আর্য্যে ! শ্রবণ করুন !—

বিরোচনের পুত্র দৈত্যগণের অধিপতি বলি-রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া অবভৃথ স্নান করিয়াছেন, এবং তখন—মৌক্তিকজালে মস্তক সুশোভিত করিয়া, কৃষ্ণমৃগের উত্তরীয় স্কন্ধে অবলম্বিত করিয়া, সহধর্ম্মিণীকে সঙ্গে লইয়া, বরদানে অভিমুখী হইয়া (দণ্ডায়মান হইয়াছেন), তখন দেবগণের কল্যাণের জন্য আবির্ভূত হইলেন—স্বয়ং ভগবান্ মহাবিষ্ণু, বটুবামনের রূপ ধারণ করিয়া, গুরু বৃহস্পতিকে অগ্রে রাখিয়া, বামদেবের স্তুতিমূলক সামগান করিতে করিতে বলিরাজার যজ্ঞ-আয়োজনের সমৃদ্ধির প্রশংসা করিতে করিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন।

নটী। তাহার পর,—তাহার পর ?

সূত্রধার। তাহার পর, তাঁহাকে (বটুবামনকে) দেখিবামাত্র আহ্লাদিত মনে বলিরাজ বলিয়া উঠিলেন—
"ভগবান্ ! আসুন ! আসুন ! এইদিকে আসুন ! আপনার ইচ্ছামত বর গ্রহণ করুন !"

নটী। তাহার পর, তাহার পর ?—

সূত্রধার। তাহার পর ভগবান্ আজ্ঞা করিলেন—"আমার গুরুর যজ্ঞের শরণার্থ মাত্র তিন পাদ ভূমি লইতে ইচ্ছা করিতেছি।"

নটী। তাহার পর, তাহার পর ?

সূত্রধার। তাহার পর ঐশ্বর্য্যমদ গর্ব্বিত বলি—কোনও-রূপ বিচার না করিয়াই বলিয়া ফেলিলেন—"হ্যাঁ, নিশ্চয়—আপনাকে (উহা) দান করিতেছি"।

নটী। তাহার পর, তাহার পর ?—

সূত্রধার। উক্তরূপে, রাজা দানে প্রবৃত্ত হইলে, বিমল-বিশাল-বুদ্ধি-হৃদয়ে রাজার অমাত্য—সংহ্লাদ নিবারণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"দিবেন না ! দিবেন না !"

("ইনি যে সে মনুষ্য নহেন)—

ইনি সেই বিষ্ণু (দেবতা)—মনে মনেও যাঁহাকে জয় করা যায় না,—যিনি দেবগণের সুখের কর্ত্তা, এবং অসুরগণের দুঃখের জনক,—ইনি বটুমাত্র নহেন,—

যদি আমাদের সকলকে জয় করিতে এখানে উপস্থিত হইয়া থাকেন, ইহাঁকে দানের জন্য (অভিষেক) বারি প্রদান করা বিধেয় নহে ॥২॥

আরও (স্মরণ করুন)—

পুরাকালে ইনিই ব্রহ্মার নিকট অজেয়তার বরপ্রাপ্ত হইয়া সুর ও অসুরগণের অধিপতি, আপনার গুরু সাক্ষাৎ হিরণ্যকশিপুকে, নৃসিংহরূপ ধারণ করিয়া,—সুতীক্ষ্ণ নখ-মুখ দ্বারা বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া হত্যা করিয়াছিলেন।" ॥৩॥ সংহ্লাদ (রাজাকে সতর্ক করিয়া) এই কথা বলিলেন।

নটী। তাহার পর, তাহার পর ?

সূত্রধার। তাহার পর—(বলিরাজ বলিলেন)—

"যদ্যপি ইনিই সেই যুদ্ধে অপরাজেয় শেষ-সর্প-শায়ী, ধনু, অসি, উৎগতচক্র, গদা ও শঙ্খধারী হন,—তথাপি ইনি যদি আমার নিকট যাচ্ঞা করেন, আমি সত্যব্রতে আশ্রিত হইয়াছি—আমাকে দান করিতেই হইবে।" ॥৪॥

বলিরাজ আরও বলিলেন—

"যিনি বলেন—'আমাকে দান কর', তাঁহার দেহে অলক্ষ্মী প্রবেশ করেন, এবং যিনি বলেন—'দান দিব না,' তাঁহার দেহেও অলক্ষ্মী প্রবেশ করেন, এই জন্যই আমি মধুসূদনকে ভূমি দান করিতেছি—সুতরাং লক্ষ্মীদেবী আমাকে ভজন করুন এবং অলক্ষ্মী সেই বিষ্ণুকে আশ্রয় করুন।" ॥৫॥

এই কথা বলিয়া (বলিরাজ) (তাঁহার অমাত্য) সংহ্লাদকে বিদায় দিলেন।

নটী। তাহার পর, তাহার পর ? —

সূত্রধার। তাহার পর (রাজা বলি)—খর, মুর, নর, নরক, নমুচি প্রভৃতি অসুরগণ কর্ত্তৃক পুনঃপুনঃ নিবারিত হইয়াও তাহাদিগকে ভৎর্সনা করিয়া—আপন সত্যবচনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া—দেবগণের অনিষ্টকারী করদ্বয় দ্বারা সুবর্ণময় ভৃঙ্গার গ্রহণ করিয়া—"এই দিকে, এই দিকে আসুন, ভগবান! আপনার ইচ্ছামত জল গ্রহণ করুন"—

বলি এই কথা বলিলেন।

নটী—তাহার পর, তাহার পর ?

সূত্রধার—তাহার পর, যে মুহূর্ত্তে সেই (অভিষেক) বারি দেবগণের হিতকারী এবং অসুরগণের অহিতকারী—তাঁহার সেই নির্ম্মল কমলসদৃশ করতলে প্রস্তুত হইল—সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার দেহ ত্রিলোক আচ্ছাদন করিয়া প্রকাশিত হইল, তাঁহার দুই হস্তের স্থানে চারি হস্ত—শার্ঙ্গ, শঙ্খ, চক্র, গদা প্রভৃতি আয়ুধে অলঙ্কৃত হইয়া ভগবানের দিব্যমূর্ত্তি প্রস্ফুটিত হইল।

নটী—তাহার পর, তাহার পর ?

সূত্রধার—দৈত্যেন্দ্রকুল সহসা একসঙ্গে দণ্ডায়মান হইয়া অহমিকায় দৃপ্ত, বিকৃত বদনে ওষ্ঠ দংশন করিয়া ভ্রূকুটি রচনা করিয়া আরক্ত নয়নে দৃষ্টিপাত করিতে আরম্ভ করিল।

নটী— তাহার পর, তাহার পর ?

সূত্রধার—তাহার পর, সেই বিষ্ণুর তেজেই ক্লিষ্ট হইয়া "এই সেই বিষ্ণু! এই সেই বিষ্ণু!" এই বলিয়া পরস্পরকে প্রহার করিয়া (দৈত্যগণ) নিজেরাই নষ্ট হইল। দেবগণ হর্ষিত হইলেন। এবং তাঁহারা দেব-দুন্দুভি বাদ্য করিতে লাগিলেন। বায়ু প্রবল বেগে বহিতে আরম্ভ করিল। আদিত্য অসহ্য তাপ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মেঘকুল ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমাণ হইল, (কিন্তু) আকাশ শান্ত মূর্ত্তিতে বিরাজমান হইল। পর্ব্বত সকল স্খলিত হইল, সমুদ্র ক্ষুব্ধ ও চঞ্চল হইল, বাসুকি প্রভৃতি ভুজঙ্গপতিগণ নিজ নিজ আশ্রয়ে পলায়ন করিল। সকলে আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিল "ব্যাপার কি ?" "একি মায়া ? কিংবা প্রলয় উপস্থিত হইল ? তাহা বুঝা যায় না ?

হায়! হায়! আমরা কি হত হইলাম ? ভগবান্ হরি আমাদিগকে রক্ষা করুন!"

এইরূপে নানা 'নিমিত্ত' দর্শনে মোহ আবিষ্ট হইয়া সমস্ত লোকের জীবগণ ভুবনপতি উপেন্দ্রকে প্রণাম জানাইল। ॥৬॥

নটী—তাহার পর, তাহার পর ?

সূত্রধার—তাহার পর,

"নারায়ণকে, হরিকে, মুরারিকে, ত্রিলোকের জন্ম, লয় ও প্রলয়কারীকে, দৈত্য-মথনকে, জগতের হিতকারী দেবতাকে, বিশ্বের পালনকারী অচ্যুতকে নমস্কার করি" ॥৭॥

—এই কথা বলিয়া সমস্ত লোকের প্রাণিগণ প্রণিপাত করিল।

নটী—তাহার পর, তাহার পর ?

সূত্রধার—এই ঘটনার পর, "ভয় নাই! ভয় নাই! বিষ্ণুর বিজয় হইয়াছে, বিষ্ণুর বিজয় হইয়াছে!" এইরূপ বলিতে বলিতে জাম্ববান্ ভেরী নিনাদ করিতে করিতে একবিংশতি বার ত্রিভুবন বিচরণ করিতে লাগিল।

নটী—তাহার পর, তাহার পর ?

সূত্রধার—তাহার পর—

দর্পান্ধ নমুচি (বলির) পাদলগ্ন হইলে, পদাঘাতে শূন্যে নিক্ষিপ্ত হইল—সংহ্লাদ বিপুলকায় পর্ব্বতের মত ভূমিতে নিপতিত হইল, গিরি বন ও নানা পুরী সমন্বিত (বলির) রাজ্য ভূমি মত্তের মত টলিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু নিষ্ঠাবান্, ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যসন্ধ, মূর্ত্তিমান সুকৃতি বলিরাজা ধৈর্য্য হইতে বিচলিত হইলেন না। ॥৮॥

তাহার পর—

হরির সহিত সুতল পাতালে গমন করিয়া ইন্দ্রের স্বর্গের তুল্য নানা ভোগ্য বস্তু লাভ করিয়া সেই দৈত্যরাজ পরম ভক্তির সহিত হরিকে অর্চ্চনা করিতে করিতে পরমানন্দে বাস করিতেছেন; বরদাতা (দেবতার) আশ্রয় পাইলে কোন বস্তু অপ্রাপ্য থাকে ? ॥৯॥

নটী—আপনার কাহিনী বাস্তবিকই অতি রমণীয়! হে আর্য্য! চিত্রে লিখিত আর একটি কাহিনী বর্ণনা করুন!

সূত্রধার—এই হরিপদ-কথা যে তোমার অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে তাহা যুক্তিযুক্ত ও সার্থক!

শ্রীধরের পাদপদ্মে তোমার এবং আমার ভক্তি যেন অচলা থাকে! দর্শক এবং অভিনেতার পাপ এককালেই দূর হউক! রাজা সুস্থচিত্তে তাঁহার রাজ্য প্রতিপালন করুন। গো এবং ব্রাহ্মণগণের "স্বস্তি" লাভ হউক! ॥১০॥

॥ ত্রৈবিক্রম সমাপ্ত ॥

বেদের মর্ম্মবাণী

ডক্টর শ্রীমতিলাল দাশ

মূকং করোতি বাচালম্ পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্।

ভারতবর্ষের পুরাণী প্রজ্ঞা রয়েছে গোপন বেদ-সাহিত্যের মাঝে। তপস্যাদীপ্ত অন্তরে সেই মহান্ সত্য আবির্ভূত হয়। ত্যাগ সংযমহীন আমরা সেই রহস্যময় মণিকোঠা থেকে রত্ন আহরণ করব এ দুঃসাহস নেই, তবে আপনাদের আদেশে পথিকৃৎ ঋষিদের কৃপা স্মরণ করে, পরমানন্দ মাধবকে প্রণিপাত করে বেদের ভাবধারার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দেব।

মহর্ষি মনু বলেছেন—বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলম্ স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্।। অখিল বেদ আর বেদজ্ঞগণের স্মৃতি ও আচরণ ধর্ম্মের প্রমাণ। মনু তাই বলছেন তিনি যা কিছু ধর্ম্ম পরিকীর্ত্তন করেছেন বেদে তাহা সেই ভাবেই কথিত আছে। শুধু মনু নয়, সমস্ত দর্শনকার, সমস্ত স্মৃতিপুরাণকার এক বাক্যে বেদের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেছেন। ধর্ম্মপ্রিয় হিন্দু আমরা কিন্তু ধর্ম্মের সেই পরম প্রমাণ শ্রুতিকে ভুলতে বসেছি।

মুসলমান যতই নিরক্ষর হোক, একখানি কোরান নির্ভর করে থাকে। খ্রীষ্টানরা বাইবেল নিত্য স্বাধ্যায় করে, কিন্তু বাংলাদেশে শতকরা নিরানব্বই জন শ্রুতির একটি মন্ত্রও মূলে পাঠ করেন না। ইহা একান্ত দুঃখের বিষয়।

আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বীজাগার বেদ-সাহিত্য, আমাদের কৃষ্টির উৎস, তাকে জানলে আমরা ফিরে পাব নবশ্রী, ফিরে পাব পথ চলার দ্যোতনা, ফিরে পাব জাগরণের ও উন্নয়নের বাণী।

বেদ-সাহিত্যের চারিটি স্তম্ভ—মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষৎ। ষড় বেদাঙ্গ লইয়া এই বিরাট বেদ-সাহিত্য এক অপূর্ব্ব বস্তু—তাহাকে সম্যক হৃদয়ঙ্গম করা ও আয়ত্ত করা সুগভীর সাধনাসাপেক্ষ।

আজ তার শাখা-প্রশাখা ও তার বিরাট ব্যাপ্তির কথা আমরা আলোচনা করব না—আজ তার মর্ম্মনিহিত সত্যের উপলব্ধির আয়াস করব। ত্রিবেণী তীর্থের কথা আমরা সবাই জানি—প্রয়াগে যে ত্রিবেণী সেখানেও সরস্বতী লুপ্ত, বাংলার ত্রিবেণীতেও সরস্বতী নাই। যুক্ত হোক আর মুক্ত হোক ত্রিবেণীতে সরস্বতী চাই। কিন্তু কেন চাই সে কথা কি আমরা কখনও ভেবেছি?

এই জাতীয় মনোভাবের মূল আছে বেদে। সেখানে বিশ্বামিত্র-পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি গাইছেন—

পাবকা নঃ সরস্বতী বাজেভি র্বাজিনীবতী। যজ্ঞংবষ্টু ধিয়া বসুঃ।
চোদয়িত্রী সুনৃতাং চেতন্তী সুমতীনাম্। যজ্ঞং দধে সরস্বতী।
মহো অর্ণ সরস্বতী প্র চেতয়তি কেতুনা। ধিয়ো বিশ্বা বিরাজতি।

হে জননী সরস্বতী! তুমি আমাদের পবিত্র করে তুলছ, তুমি পূর্ণ সম্পদে আমাদের সমৃদ্ধ করছ, বুদ্ধি তোমার সত্তার সম্পদ, তুমি আমাদের জীবনাহুতি গ্রহণ কর। এস মা! তুমি মা কল্যাণময় সত্য বাক্যের পরিচালিকা, তুমি সুমতি ব্যক্তির চেতনাকে অনুপ্রাণিত কর। তুমি আমাদের জীবন-যজ্ঞকে ধারণ কর। তুমি ভূমার সাগরকে চেতন করে তুলছ—তোমার সত্তা ও জ্ঞানের জ্যোতির্ম্ময় পতাকায় প্রোজ্জ্বল করছ, তুমি সকল ধীকে বিকশিত কর।

সেই বাগ্বাদিনী নদীরূপা সরস্বতী, সেই অমৃতরূপা দেবীর চরণে ধীশক্তি প্রার্থনা করে বেদের দুষ্পার ভাব-সমুদ্রে অবগাহন করবার চেষ্টা পাব।

বেদের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ বাণী কর্ম্ম ও আনন্দের বাণী। বেদের ঋষি বৈরাগী নহেন, তিনি অনুরাগী। তিনি সুন্দর ভুবনে মরিতে চান না, তিনি মানুষের মাঝে বাঁচিতে চান। তাই তাঁর কণ্ঠে জাগে মন্ত্র:

তচ্চক্ষুর্দেবহিতং শুক্রমুচ্চরৎ। পশ্যেম শরদঃ শতম জীবেম শরদঃ শতম্॥

আমরা শত শরৎ দেখব মিত্রাবরুণের শুভ্র দীপ্ত চক্ষু যা আনে কল্যাণ ও প্রবৃদ্ধি, আমরা শত শরৎ বাঁচব জয়গৌরবে। আমরা জাগব জ্যোতিতে ও মহিমায়।

বৈদিক ঋষি পৃথিবীকে দুঃখ-নিকেতন বলে অশ্রুপাত করতে বসেন নি যা-কিছু আনন্দ আছে—গন্ধে রসে, গানে, তাকে তিনি নিঙড়ে পান করতে চান। তিনি নবনবোন্মেষের সন্ধানে ব্রতী।

ঋগ্বেদের প্রথম সূক্তের ঋষি গাইছেন:

অগ্নিনা রয়িমশ্নবৎ পোষমেব দিবে দিবে। যশসং বীরবত্তমং।

অগ্নি হৃদয়ে তপঃশক্তি জ্বালেন। সেই তপস্যারূপ ধনের সাহায্যে আমরা পরিপূর্ণতা লাভ করব, যে পরিপূর্ণতা প্রতিদিনের আলোকে নব নব ভাবে পরিপুষ্ট হয়ে নবনবোন্মেষের দিকে এগিয়ে চলে অগ্নি দেন কীর্ত্তির পতাকা যা রয় চির-উচ্চ—দেন পরিপূর্ণ বীর্য্য।

দশম মণ্ডলের ১৩৩ সূক্তে শত্রু শাতন মন্ত্রে শত্রু নিধনের প্রার্থনা শেষে ঋষি গাইছেন:

বয়মিন্দ্র ত্বায়বঃ সখিত্বমারভামহে।
ঋতস্য ন পথা নয়াতি বিশ্বানি দুরিতা
নভন্তামন্যকেষাং জ্যাকা অধি ধন্বসু।
অস্মভ্যং সু ত্বমিন্দ্রং তাং শিক্ষ যা দোহতে প্রতি বরং জরিত্রে
অচ্ছিদ্রোধ্নী পীপয়দ্যথা নঃ সহস্রধারা পয়সা মহী গৌঃ।

হে ইন্দ্র, আমরা তোমারই হতে চাই, তোমার বন্ধুত্ব প্রার্থনা করি, তুমি লও আমাদের সত্যের পথে—সমস্ত পাপ ও দুঃখ শেষ করে ঋতের আলোকে আলোকিত কর, শত্রুর ধনুর জ্যা তুমি ছিন্ন কর—আর বরনারম্ভ আমাদের তৃণ পূর্ণ করে তোল। তুমি আমা-

দের সেই মন্ত্র শিখাও, সেই বিদ্যা জানাও, যাতে ধরণী-ধেনুর সহস্র-ধারা ক্ষীরধারা দোহন করে সমর্থ ও ঋদ্ধ হতে পারি, যাতে বৃদ্ধি ও সিদ্ধি লাভ করে আমাদের অক্ষয় তৃপ্ত হয়। পৃথিবীকে ত্যাগ করে পারলৌকিক এক আনন্দের বাগ্রতা এ নয়। এ শূন্যতা নয়—এ হ'ল প্রাণবন্ত শক্তিমন্ত জাতির উদ্বেল প্রাণধারার আনন্দিত স্পন্দন।

পৃথিবীর এই প্রিয় সন্তানগণের চোখে তাই বিশ্ব অমৃতময়। যেখানে তাঁদের দৃষ্টি যায় সেখানে তাঁরা দেখেন মধুধারা। তারা গান করেন মনের খুশীতে—

মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ।
মধুনক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা।
মধুমান্নো বনস্পতি মধুমান্ অস্তু সূর্য্যঃ
মাধ্বী গাবঃ ভবন্তু নঃ।

মধুর বাতাস বয়ে যাক, সমুদ্র মধুধারা বহন করুক। বনস্পতি ও ওষধী মধুর সঞ্চয়ে সমৃদ্ধ হোক। রাত্রি হোক মধুময়, আসুক প্রভাত আনন্দমুখর—পৃথিবীর ধূলিও ভরে উঠুক আনন্দোৎসবে—ঊর্দ্ধে ঐ নিঃসীম আকাশ সেও হোক মধুময়। বনস্পতি মধুময় হোক, সূর্য্য হোক মধুর আলোর বাহক—দিকসকল মধুতে উঠুক ভরে।

এই মধু-প্রীতির মাঝে জেগেছিল তাঁদের আনন্দরসের বোধ। দৃপ্ত ও দীপ্ত ঋষির কণ্ঠে স্ফূর্ত হয়েছিল নিখিল সৃষ্টির মর্ম্মকথা। তাঁরা জেনেছিলেন—আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। সৃষ্টির মূল কথা আনন্দের কথা। তাঁরা অনুভূতির নিভৃতকোষে অনুভব করলেন—ওঁ সত্যমজ্ঞানমমৃতমানন্দরূপং যদ্বিভাতি। তৈত্তিরীয় উপনিষদে ভৃগুবল্লীতে এই আনন্দতত্ত্ব দর্শনের প্রোজ্জ্বল ভাতিতে ভাস্বর হয়েছে।

রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি
কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।
এষ হ্যেবানন্দয়াতি।

তিনি রসময়। মানুষ এই রস পেয়ে আনন্দিত হয়। যদি আকাশে আনন্দ না থাকত, তবে কেইবা বাঁচত, কেইবা প্রাণক্রিয়া করত?

বেদের সূক্তে সূক্তে মন্ত্রে মন্ত্রে এই আনন্দধ্বনি বাজে। প্রতি ঋষির বোধে যেন রসকন্দ খুলে যায়, প্রতি কথায় যেন আনন্দ ছড়িয়ে যায়।

আনন্দিত এই বীরের দল ধ্যানের ও তপস্যার মোহে ঘরে বসে থাকতে চান নি, তাঁরা চেয়েছেন চলতে—নিত্যনূতন সমৃদ্ধির সন্ধান করতে তাই তাঁদের মন্ত্র ছিল—

"শুধু চলা শুধু চলা দিক হতে দিগন্তরে
নব নব বাণীর সন্ধানে।"

এ কাব্য নয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের চরৈবেতির শ্লোকগুলি শুনুন:

"শ্রান্ত যেজন পন্থা চলি, শ্রী যে তারই নানা,
ইক্ষাকুসুত রোহিত ওগো এই ত চিরশ্রুতি;
রইলে শুয়ে শ্রেষ্ঠ জনও লভে পাপের হানা,
ইন্দ্রসখা পান্থ জনের, বলছে চরৈবেতি।
জঙ্ঘাযুগল পুষ্পিত তার যেজন চলে পথে
ফলগ্রাহি আত্মা যে তার বৃহৎ নেয় লুঠি,
পলায় যে তার পাপের বোঝা চড়ি মৃত্যুরথে
পথে চলার শ্রমে হ'ত, চল পথে ছুটি
যে জন বসে ভাগ্য যে তার রয়ত বসে বসে,
উচ্চশিরে যে রয় সে রয়, উন্নতিরি রথে
যে জন রহে শয়ন সুখে ভাগ্য তাহার খসে,
যে চলে তার ভাগ্য বাড়ে, চল, চল পথে।
কলি কোথায় যে রয় শুয়ে আছে তারই কাছে
যে জেগেছে জীবনে তা'র দ্বাপর জাগে হাসি,
যে উঠেছে, সে চলেছে, ত্রেতাযুগের পাছে
যে চলে সে সত্যযুগে, বাজাও চলার বাঁশী
যে চলেছে, সে পেয়েছে অমৃতময় মধু
যে চলেছে স্বাদু ডুমুর খায় সে হাসি হাসি,
চেয়ে দেখ দীপ্ত সূর্য্য আকাশ পথের বঁধু
তন্দ্রাবিহীন চলেছে শুধু, বাজাও চলার বাঁশী।"

এ চলার বাণী দুঃসাহসিক যাযাবর পিতৃপুরুষের বাণী। নবজাগ্রত ভারতবর্ষ যদি অভ্যুদয় চায়, হবে তাকে ফিরে নিতে হবে এই চরৈবেতি মন্ত্র—এই চলার গান—তাকে ছুটতে হবে অচলায়তন ভেঙে বিশ্বের বিরাট পথে। এই প্রার্থনাই মন্ত্রেও ফুটেছে বারংবার

এন্দ্র সানসিং রয়িং সজিত্বানং সদাসহং। বর্ষিষ্ঠমূতয়ে ভর।
নি যেন মুষ্টিহত্যয়া নিবৃত্রা রুণধামহৈ। ত্বোতাসো ন্যর্বতা।

হে মঘবা, তুমি আন সার্থকতা আমাদের জীবনে, স্বস্তির জন্য, রক্ষার জন্য; আন সেই সম্পৎ যা সকল অধিকারে অধিকারী, সকল জয়ে জয়ী, যা সকলকে পরাভব করে অগ্রসর হয়, তোমার সেই পূর্ণতার প্রসাদে আমরা যেন শত্রু দমন করি, আমরা যেন মন্ত্রবীর্য্যকে আশ্রয় করে তোমার দ্বারা পরিচালিত হয়ে অমঙ্গল-বাহিনীকে নিঃশেষে ধ্বংস করি।

অম্বরীষ ঋষি প্রার্থনা করছেন:

আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন ঊর্জে দধাতন।
মহে রণায় চক্ষসে। ১০।৯।১

হে পৃথিবীর জলসকল, তোমরা দাও আমাদের অমোঘ বীর্য্য—আমরা দেখব নিত্যপ্রবুদ্ধ আনন্দস্বরূপকে, তোমার সুখের আকর, দাও আমাদের সুখের পথ্য, দাও পরমানন্দের দর্শন। এমনই সর্ব্বত্র তাঁরা চেয়েছেন চলার পথ, চেয়েছেন অবাধ গতি—পরিপূর্ণ জীবন আর প্রগতি মধুর জীবনযাত্রা।

বেদের দ্বিতীয় কথা যজ্ঞার্থ জীবন। যজ্ঞের পটভূমিকার উপর

বেদের সমস্ত সূক্ত উচ্চারিত হয়েছে, সমস্ত সাম রুক্ত হয়েছে ও সমস্ত সাধনা সংহৃত হয়েছে। বেদ বুঝতে হলে এই যজ্ঞ বুঝতে হবে। দর্শপূর্ণমাস যাগ, সৌত্রামণি যাগ, অগ্নিষ্টোম, জ্যোতিষ্টোম, রাজসূয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের সঙ্গে বিরাট এক কর্ম্মকাণ্ডের ছবি আমাদের মনে পড়ে। তার বিচিত্র কর্ম্মানুষ্ঠান, বিচিত্র মন্ত্র-সমবায়, নানাবিধ উপচার সব মিলে মনে এক রহস্যময় পরিবেশ গড়ে তোলে।

কিন্তু যজ্ঞের এই বহিরঙ্গ কথা আজ আলোচনা করব না—আজ যজ্ঞের অন্তরঙ্গ মর্ম্ম বুঝবার চেষ্টা করব। অবশ্য এখানে সুবিধা রয়েছে—সর্ব্বোপনিষদসার গীতার মাঝে যজ্ঞের তত্ত্ব উদঘাটন করা আছে।

গীতা বলেছেন—যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধন। যজ্ঞার্থ কর্ম্ম কর। যজ্ঞহীন কর্ম্ম বন্ধনের কারণ। তাই পার্থসারথি তারস্বরে বলছেন—যজ্ঞময় জীবন মুক্তির পথ। যজ্ঞের মাঝে আছে দেওয়া-নেওয়ার কথা—বিশ্ব এই দেনাপাওনার মাঝেই তার লীলা স্ফূর্ত্ত করছে। দেওয়া-নেওয়ার এই তথ্যটি মনে রেখে যদি কাজ করি, তা হলে বিশ্বে আসে শান্তি ও কল্যাণ। তা না করে মানুষ যখন আত্মসর্ব্বস্ব হয়ে, নিজের জন্যই ভোগোপকরণ সঞ্চিত করে, তখনই ভারসাম্য নড়ে যায়, পৃথিবীতে আসে বিপ্লব, হিংসা, যুদ্ধ ও অনর্থ।

ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ

যে কেবল নিজের ভোগের জন্যই জীবনযাপন করে, সে পাপজীবন যাপন করে। যজ্ঞচক্রের নিয়মিত আবর্ত্তনেই পৃথিবীতে আসে শান্তি, স্বস্তি ও শৃঙ্খলা—সে চক্রকে ব্যাহত করা কারও উচিত নয়। যজ্ঞজীবনের এই মর্ম্মটি বর্ত্তমানের প্রগতিশীল রাষ্ট্র সোভিয়েটের আদর্শ, তাই তারা নিত্য নব অভ্যুদয়ের পথে চলেছে। ওয়েব-দম্পতি সোভিয়েট সংস্কৃতিকে নবসভ্যতা বলে অভিনন্দন করেছেন—তিনি তাঁর পুস্তকে লিখেছেন :

The dominant motive in everyone's life must be not pecuniary gain to any one but the welfare of the human race, now and for all time. For, it is clear that everyone starting life is in debt to the community in which he has been born and bred, cared for, fed and clothed, educated and entertained. Anyone who, to the extent of his ability, does less than his share of work and takes a full share of the wealth produced in the community, is a thief, and shall be dealt with as such. That is, to say, he should be compulsorily reformed in body and mind so that he may become a useful and happy citizen. On the other hand, those who do more than their share of the work, that is useful to the community, who are able and devoted leaders in production and administration, are not only provided with every pecuniary or other facility for pursuing their chosen career, but are also honoured as heroes and publicly proclaimed as patterns and benefactors. The ancient maxim of "Love your neighbour as yourself" is embodied, not in the economic but in the utilitarian calculus, namely, the valuation of what conduces to the permanent well-being of the human race. Thus in the U.S.S.R., there is no distinction between the Code professed on Sundays and that practised on weekdays. The citizen acts in his factory or farm according to the same scale of values as he does in his family, in his sports, or in his voting at elections. The only good life at which he aims "a life that is good for all his fellow men, irrespective of sex, religion or race."

উপরে যেখানে মানবতার কথা বলা হয়েছে সেখানে দেবতা বসালে ভারতীয় যজ্ঞকল্পনার সঙ্গে উক্ত আদর্শের হুবহু মিল হবে। এই যজ্ঞজীবন বেদের বড় কথা। মানুষ যখন নিবেদিত ভাগবত জীবনযাপন করে, তখন সে পায় শান্তি ও আরাম, জীবন তখন সংগ্রামমুখর রণভূমি না হয়ে নন্দনবনে পরিণত হয়।

বেদের তৃতীয় বিশেষত্ব তার সমুদায় দৃষ্টি ও উদার ঐক্যবোধ। ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু আজ সর্ব্বনাশের পথে চলেছে—সঙ্কুচিত করে নিজেকে সে ধ্বংসের গহ্বরে নিয়ে চলেছে। জাতিভেদ, পাতিত্য সমস্যা, অস্পৃশ্যতার আবর্জ্জনা, শুচিতার নামে নির্ম্মমতা হিন্দুত্বকে আজ কলঙ্কিত করেছে। কিন্তু আমাদের পিতামহেরা ছিলেন উদার এবং মহৎ প্রাণ।

যজুর্ব্বেদে পাই :

যথেমাং বাচম্ কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ। ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চরণায় চ।

এই কল্যাণী বাক্য দিয়েছি সবার কাছে ও সবার জন্য, সবাই তাকে ভোগ করুক। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, আত্মীয় ও অনাত্মীয় সকলেই এই কল্যাণী শ্রুতি লাভ করুক, বাক্সম্বন্ধরহিত যে শত্রু তাকেও দেবে এই কল্যাণী বাণী।

অথর্ব্ববেদে পাই :

প্রিয়ং মা কৃণু দেবেষু প্রিয়ং রাজসু মা কৃণু!
প্রিয়ং সর্ব্বস্য পশ্যতঃ উত শূদ্র উতার্য্যে।

হে ভগবান, তুমি কেবল দেবতাদের কল্যাণ কর না, কেবল রাজন্যদের কৃপা কর না। কি শূদ্র, কি আর্য্য তুমি যেন সকলের কল্যাণ কর।

এই সমুদার দৃষ্টির প্রেরণা তাঁরা পেয়েছিলেন তাঁদের সুগভীর ব্রহ্মবোধের মধ্যে। তাঁরা সর্ব্বত্র অনুস্যূত দেখেছিলেন এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা—দেখেছিলেন জলে স্থলে ওষধীতে বনস্পতিতে একই দেবতার লীলা, তাই মানুষকে তাঁরা ঘৃণা করতে পারেন নি—এই আত্মবাদ শেষে বেদান্তে অদ্বৈতবাদের মহান্ তত্ত্বে পরিণত হয়েছে, কিন্তু তার মূল রয়েছে মন্ত্র-সংহিতায়। বামদেব ঋষি চতুর্থ মণ্ডলে বলছেন :

হংস শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ।
নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতম্।

তিনি আকাশে হংসরূপে বিরাজ করেন সূর্য্যের মাঝে, বসুরূপে অন্তরীক্ষে চলে তাঁর লীলা, বেদীর মাঝে তিনি জাগেন হোতা হয়ে,

অতিথি হয়ে আসেন মানুষের গৃহে। তিনি রয়েছেন প্রতি মানুষের মাঝে, তিনি রয়েছেন যেখানে যা-কিছু বরণীয় তার অন্তরে, তিনি রয়েছেন সত্যের ও ঋতের গোপন বুকে, তিনি রয়েছেন ব্যোমে ব্যোমে পরিব্যাপ্ত হয়ে, তিনি রয়েছেন জলে, তাঁর দীপ্তি ফুটছে অনলে, তিনি বিশ্বনীতির মাঝে আপনাকে আবির্ভূত করেন, তিনি রয়েছেন দৃঢ় পর্ব্বতভূমিতে—তিনি যে সত্য-স্বরূপ। পরমেশ্বরের এই পিতৃত্বের, আত্মার এই ঐক্যের উপর নির্ভর করে ঋষি সবাইকে আপন বলে জানেন।

এই অসীমতার বোধ রূপ নিয়েছে তাদের কল্পনায় অদিতিরূপে। রাহুগণীয় গোতম বলছেন :

অদিতি র্দ্যৌরদিতিরন্তরীক্ষমদিতি র্মাতা স পিতা স পুত্রঃ।

বিশ্বেদেবা অদিতিঃ পঞ্চজনা অদিতির্জাতমদিতি র্জনিত্বম্।

অদিতিকে দেখি দ্যুলোকে, তিনি প্রকাশ পেয়েছেন ব্যোমে, তিনিই মাতা, তিনিই পিতা, তিনিই আবার পুত্র। অদিতিই সকল দেবতা—তিনিই পঞ্চশ্রেণীর মানুষ। অদিতিই জন্ম এবং অদিতিই জনিতা।

এই কথাই অথর্ব্ব বেদে উক্ত হয়েছে :

ইদং জনাসো বিদথ মহৎ ব্রহ্ম বদিষ্যতি

ন তৎ পৃথিব্যাং নো দিবি যেন প্রাণন্তি বীরুধঃ। ১।৩২।১

হে পৃথিবীর তাপিত নর ও নারী, তোমরা শোন, তোমাদের নিকট মহৎ ব্রহ্মের কথা বলব—তিনি পৃথিবীতে নেই আকাশেও নেই, অথচ তাঁরই তেজে লতাগুল্মে প্রাণের লীলা অব্যাহত হয়ে চলে—তিনি যে কোথায় কেউ তা জানে না।

এই দীপ্ত আত্মবোধ অস্পৃশ্যতা ও বর্ণভেদের সহায়ক হতে পারে না। বৈদিক যুগের যে সামাজিক বিবরণ সূক্তের মাঝে পাই, তাতে দেখা যায় বর্ণাশ্রমের যে অচলায়তনে বেঁধে আমরা হিন্দু ধর্ম্মকে কৃশ ও পঙ্গু করে তুলেছি, বৈদিক যুগে তা ছিল না। ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের ১১২ সূক্তে শিশুঋষি বৃত্তিভেদের পরিচয় প্রসঙ্গে বলছেন যে, তিনি নিজে কারু, তাঁর পিতা ভিষক, তাঁর মাতা যাঁতা-পেষণকারিণী। তিনি বৃত্তিভেদের নানা উদাহরণ দিয়ে মন্তব্য করছেন যে নানা লোকের নানা রকম বুদ্ধি, তাই তাহাদের ব্রত নানাবিধ। ঋষি সকল মানুষের জন্য সোমরস প্রবাহ চাইছেন—তার মধ্যে আছে সেও যে বনের মধ্যে গাছগাছড়া খুঁজে বেড়ায়, যে বনে বনে পাখীর পালক সন্ধান করে। কিন্তু তাদের কাউকে তিনি ঘৃণার চক্ষে দেখেন নি, বরং সকলের জন্য তিনি সোমরসের প্রবাহ চেয়েছেন।

দশম মণ্ডলের পুরুষসূক্তের অপব্যাখ্যা করে কেউ কেউ চারি-বর্ণের উচ্চতা ও নীচতার পরিমাপ করেন। ইহা একান্ত পরিতাপের বিষয়। পুরুষসূক্ত রূপক বর্ণনার এক সুন্দর দৃষ্টান্ত। বিশ্বসৃষ্টিকে ঋষিরা এক যজ্ঞকাজ রূপে দেখেছিলেন। চারিবর্ণকে সেই বিরাট পুরুষের চারি অঙ্গে তাঁরা দেখেছিলেন—কিন্তু সেখানে শ্রেষ্ঠত্বের কোনও পরিচয় বা তাৎপর্য্য ছিল না। এই কথাটিই বেদমূলক মহাভারতেও বলা হয়েছে :

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাম্, সর্ব্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ

ব্রহ্মণা পূর্ব্ব সৃষ্টং হি কর্ম্মভিঃ বর্ণতাং গতম্।

বর্ণ সকলের কোনও বিশেষ নেই—সকলই ব্রহ্ম হতে উৎপন্ন হয়েছে, সকলেই ব্রহ্মের সন্তান ব্রাহ্মণ—কর্ম্মের ভেদ অনুসারে বর্ণভেদ হয়েছে। সামাজিক এই ভেদ মূলগত ঐক্যকে ভুল করতে পারে না, ভোলা উচিতও নয় কিন্তু সেই বৈদিক ঐক্যের বাণী ভুলে ভারতবর্ষ আজ মানুষকে চরম অবমাননা করেছে।

ভারতবর্ষ তার অভ্যুদয়ের দিনে সেই বৈদিক ব্রহ্মবাদকে অবলম্বন করুক—তার রাষ্ট্রতন্ত্রে মানুষের জন্মগত মহৎ মহিমাকে স্বীকার করুক। সমস্ত বৈষম্য, সমস্ত অত্যাচার, সমস্ত ঘৃণা নিঃশেষ হোক।

ভারতবর্ষ আজ গড়বে নূতন সংস্কৃতি। সে সংস্কৃতি মানুষকে জানাবে তার মহৎ মহিমা। পৃথিবীর যেখানে যে আছে তাকে ডেকে বলবে, হে অমৃতের পুত্র, তুমি অমৃত ধনে অধিকারী, অমৃত ধনের ভাগ আজ নাও। মানুষকে পীড়ন করে ধনলাভের আশায় যে গৃধ্নু জীবনযাপন সে ত ধর্ম্মজীবন নয়—সে ত পাপজীবন। তুমি নিত্য যাপন করবে অকলঙ্ক পবিত্র জীবন তুমি অনুভব করবে—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

যা কিছু রয়েছে জগতে তা ঈশ্বরেই পরিব্যাপ্ত—সমস্ত নিখিল বিশ্বে চলছে তাঁরই প্রাণের স্পন্দন—সেই স্পন্দন অনুভব কর—

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যাসিদ্ধনম্।

ত্যাগের মধ্য দিয়েই ভোগ কর, কারও ধনে লোভ কর' না।

ভারতবর্ষও মানুষকে নিষ্ক্রিয় থাকতে বলে নি। তাকেও নিস্পৃহ নিষ্কাম কর্ম্মে প্রতি মুহূর্ত্তে সমাহিত হয়ে থাকতে হবে—তাকেও ধনসঞ্চয়ের লোভ থেকে নিবৃত্ত থাকতে হবে। সোভিয়েট নিয়েছে ভারতীয় সাধনাকে—তার ব্রহ্মবাদ শূন্য করে—ভারতবর্ষ সেই শূন্যতাকে পূর্ণ করবে রসময় আনন্দময় পরমপিতার আশীর্ব্বাদ দিয়ে।

ভারতবর্ষ তার ধ্যানগম্ভীর নিস্তব্ধতার মাঝে ডুবে থাকতে পারবে না—আজ উদাসীন ভারতবর্ষকে পৃথিবীর বেগবান প্রবাহের মাঝে এসে দাঁড়াতে হবে—অনাবৃত বিশাল বিরাট বিশ্বের কর্ম্ম-প্রাঙ্গণে সকলের সঙ্গে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে তাকেও নবসভ্যতার ভিত্তি গড়তে হবে।

ভারতবর্ষ অসীম আত্মার অতলস্পর্শের মধ্যে অবগাহন করে যে মহৎ সম্পৎ লাভ করেছে, সে সম্পৎ তার সহায় হবে—জীবনের বিচিত্র কল্লোলে ভারতবর্ষ যেন তার সেই চিরপুরাতন অথচ চির-নূতন মন্ত্র না হারায়। সেই পুরাতন মন্ত্র রয়েছে আমাদের বেদে। তাকেই আমরা জানব, তাকেই আমরা বুঝব, তাকেই আমরা মানব।

বেদ-সাহিত্যের বহুমুখী বৈচিত্র্যের কথা সব বলা একটি প্রবন্ধে সম্ভব নয়। তার প্রধানতম ভাবধারার কথা বলেছি। আর দু-একটি দিকের কথা বলে আজকের আলোচনা শেষ করব।

বৈদিক ঋষি সত্যকে জানতে কুশাগ্রবুদ্ধি হয়ে অগ্রসর হতে ভয় পেতেন না—সংশয়কে অগ্রাহ্য করতেন না—অন্ধ বিশ্বাসকে তিনি কোথাও আমল দেন নি—এই কথার সত্যতা উপলব্ধি করি নেম ঋষির সংসাহসে। অষ্টম মণ্ডলের শততম সূক্তে তিনি বলছেন :

প্র সু স্তোমং ভরত বাজয়ন্ত ইন্দ্রায় সত্যং যদি সত্যমস্তি।

নেন্দ্রো অস্তীতি নেম উ ত্ব আহ ক ঈং দদর্শ কমভি ষ্টবাম॥

হে ভরত, ইন্দ্র যদি সত্যই থাকেন, তবে তার জন্য স্তব কর কিন্তু কে দেখেছে সেই ইন্দ্রকে? কাকে আমরা পূজা করব? কেউ কেউ বলেন ইন্দ্র নেই।

এই সংশয় ও প্রশ্ন সৃষ্টি সূক্তে আরও কবিত্বময়, আরও মধুর করে প্রকাশিত হয়েছে—

পরমেষ্ঠী ঋষি বলছেন—

কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ।
কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ॥
অর্ব্বাগ্দেবা অস্য বিসর্জ্জনেনাথা
কো বেদ যত আবভূব॥
ইয়ং বিসৃষ্টি কুত আবভূব
যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষ পরমে ব্যোমন
সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ।

কে জানে সৃষ্টির আদিম রহস্য? কে বলবে সেই পুরাতনতম কথা, আগে সৃষ্টি হয়েছিল জগৎ, তার পর এসেছিলেন দেবতারা, কে তবে বলবে কেমন করে এই জগৎ হ'ল?

এই সৃষ্টি কেমনে হ'ল? পরব্যোমে যিনি এর অধ্যক্ষতা করেন, তিনি কি জানেন অথবা তিনি ত জানেন না?

বৈদিক ঋষি তাই সত্য পথিক। সত্যের জন্য তিনি সবই বিসর্জ্জন দিতে পারেন না। তাঁর এই বিজ্ঞানী মন, তাঁর এই অপক্ষপাত দৃষ্টি, তাঁর এই সংসাহস আমাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশের মুক্তির উপায় হোক এই প্রার্থনাই করি।

ভারতীয় সাধনার এক অঙ্গ শেষে কেবল আপন মুক্তির জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। জগৎসংসার থাক বা না থাক—তাতে আমার কিছু নয়, আমি যদি ভগবান পাই তবেই আমার সব। এই মনোভাব আত্মঘাতী সমাজদ্রোহী মনোভাব। বলিষ্ঠ দ্রঢ়িষ্ঠ পিতামহেরা কিন্তু গোষ্ঠী জীবন যাপন করতেন। সকলের জন্য তাঁরা ভাবতেন—সকলের জন্য ছিল তাঁদের ক্রিয়াকলাপ, যজ্ঞ ও অনুষ্ঠান।

ইন্দ্রং বো বিশ্বতস্পরি হবামহে জনেভ্যঃ
অস্মাকমস্তু কেবলঃ।

সকল লোকের জন্যই আমরা আহ্বান করব লোকপাল ইন্দ্রকে। তিনি একক আমাদেরই হউন। মধুচ্ছন্দা অগ্নিকে স্তব করছেন—

স নঃ পিতেব সূনবেঽগ্নে সুপায়নো ভব। সচস্বা নঃ স্বস্তয়ে।

হে দেব জ্যোতির্ম্ময় অগ্নি, পিতা যেমন পুত্রের নিকট সুপ্রাপ্য, তুমিও তেমনই আমাদের সুগম হও—শুধু আমার নয়, আমাদের কল্যাণের জন্য প্রবৃত্ত হও। একান্ত দুঃখের বিষয়, এই গোষ্ঠী-বোধ আমাদের দেশ থেকে কালে প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। আসমুদ্র-হিমাচল যে পুণ্যভূমি, সেই পুণ্যভূমিতে অতীতের কোন শুভলগ্নে ফুটে উঠেছিল বাণী। রাজ্যসাম্রাজ্যের কত উত্থানপতন, যুগযুগান্তরের কত প্রয়াস ও বিপ্লবকে উপেক্ষা করে আমাদের গৃহে তাই পিতৃধন আজও সঞ্চিত আছে। আজ ঝঞ্ঝাবিধ্বস্ত মানবতা সেই বাণীর জন্য লোলুপ—তাদের সেই ব্যাকুলতা নিষ্ফল হবে না। জগতের সেই আহ্বান ঋষিদের অন্তরকে স্পন্দিত করে তুলেছে। বেদের অতল-স্পর্শ অমৃতসমুদ্র আজ সবার জন্য উন্মুক্ত হবে—সবাইকে আজ ডেকে বলতে হবে—

সংগচ্ছধ্বম্ সংবদধ্বম্ সং বো মনাংসি জানতাম।
দেবা ভাগং যথা পূর্ব্বে সঞ্জানানা উপাসতে।
সমানো মন্ত্র সমিতি সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্।
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি
সমানী বঃ আকুতি সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি।

হে বিশ্বমানব, তোমরা এক হও, একই কথা বল। তোমাদের মন এক হোক, বিশ্বের প্রত্যেকের আছে নির্দ্দিষ্ট নিরূপিত কাজ, তাই যজ্ঞকাজে সে আপনাকে নিবেদন করুক। একই মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে, একই আশায় পরিচালিত হয়ে তোমরা এক মহাপূজায় সম্মিলিত হও। সেই ঐক্য ও সঙ্গতির উপর নির্ভর করবে বিশ্বকল্যাণ ও বিশ্বশান্তি।

পৃথিবী আজ তার সমস্ত দুয়ার খুলেছে—দেশে দেশে আজ মানুষের মহৎ মিতালি। এই মিতালির দিনে আমরা গর্ব্বিত হৃদয়ে বিশ্ববাসীকে দেব আমাদের বেদসুধা—আর সেই অমৃত পান মহোৎসবে বিভোর হয়ে আমরা পরস্পরের হাত ধরে চলব এক অদৃষ্টপূর্ব্ব মহৎ অভ্যুদয়ের পানে।

ভাব

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ভাবে সৃষ্ট এ ভুবন, সৃষ্টির আগেও তুমি ছিলে,
এই বিশ্ব রহস্যে ভরিলে।
জন্মিল আকাশ, তেজ, জল, বায়ু, ভূমি,
পদার্থেতে রূপ পেলে তুমি
কান্তিমতী ধরণীকে মৃন্ময়ী ও চিন্ময়ী করিলে।

২

তোমাতেই রহিয়াছে হরির অনন্ত শয্যা পাতা,
তুমি চতুর্ব্বর্গ ফলদাতা।
পূজা ও তপস্যা তুমি, ধ্যান ও মনন,
ভাবগ্রাহী নিজে জনার্দ্দন।
সুন্দর শাশ্বত দিব্য জীবনের তুমিই বিধাতা।

৩

ক্ষীরোদ-সাগর তুমি, সুধা উঠে তোমার মন্থনে,
অমরত্ব দাও গুণীগণে।
তুমি দাও কালজয়ী শ্রেষ্ঠ যা সঞ্চয়,
ভুবন তোমারি কথা কয়।
পরিপূর্ণ শ্রেষ্ঠতম যাহা—তাই তুমি গড় সঙ্গোপনে।

৪

মানবের ভাবদেহ রাখো যে অক্ষয় তুমি করি,
ধরা রাখে তুচ্ছ অস্থি ধরি।
তুমি রক্ষা কর মহামানবের দান
ভস্ম তার কি দিবে সন্ধান?
বাল্মীকির পরিচয় দিবে ধরা কি বল্মীক গড়ি।

দুঃখে অবসন্ন কর, কর তুমি আনন্দে উচ্ছল,
কর পুণ্যে শুভ্র সমুজ্জল।
মানুষের বুক তুমি এত বড় করো,
বিরাজেন ত্রিভুবনেশ্বরও,
সর্ব্বযুগ জাতি সহ স্থান পায় এ সৌরমণ্ডল।

৬

ভৃত্য হয়ে সেবা কর, বীর হয়ে তুমি যাও রণে,
বন্ধু হয়ে বাঁধো আলিঙ্গনে।
মাতা হয়ে অঙ্কে ধর, পিতা হয়ে পালো,
পত্নী হয়ে তুমি বাসো ভাল।
মুক্ত কর—মুক্ত কর সুকোমল কঠিন বন্ধনে।

৭

তুমি অঙ্গ লভ ভক্তে, রূপ দাও তুমি ভগবানে,
ভাব রহে রূপের ধেয়ানে।
আজ যাহা ভাব, কাল রূপে হবে নীত,
রামায়ণ রামে রূপায়িত।
পার্থিব চাহিয়া আছে নিরন্তর অপার্থিব পানে।

৮

অন্তে যেই ভাব লয়ে ত্যজে জীব জীর্ণ কলেবর—
ভাব-দেহ ধরে ধরা 'পর;
প্রেম জন্ম লয়, হয় রস যে বিগ্রহ
লীলা চলিতেছে অহরহ
জীবে শিবে বিনিময় এমনি হতেছে পরস্পর।

তুমিই মুক্তির বাণী কহ গিয়া কহ তার কাছে—
যে অহল্যা শিলা হয়ে আছে।
কেহ আছে তরু হয়ে, কেহ বা ভূধর,
তুমি কর সবে জাতিস্মর।
ধরাকে চেতনা দাও স্রষ্টারে সে ভুলে যায় পাছে।

চুম্বক-পরশ তব, সুধাস্পর্শ বক্ষে লেগে রয়—
ভুলায় দেহের পরিচয়।
তোমাতে মিলায়ে যাই, করি প্রণিপাত
মোরে তুমি কর আত্মসাৎ—
জরী এ দেহকে মোর করে দাও তুমি ভাবময়

অভিজ্ঞান

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী

"রণুদা ও রণুদা শুনতে পাচ্ছ—এদিকে একবার চেয়ে দেখ না—তোমার জন্ম নারকেলের সন্দেশ এনেছি—মামাবাড়ী থেকে পাঠিয়েছে।"

রণুদা কিন্তু তখন ঢিল ছুঁড়িয়া আম পাড়িতে ব্যস্ত, কোনদিকে তাহার চাহিবার সময় নাই, কিন্তু প্রমীলার কথার জবাব ত না দিলেও নয়—তাই বলিল—"পমি, ও সন্দেশ এখন তোর কাছেই রাখ, আগে ঐ দেখছিস না—ঐ আমটা পেড়ে নিই, সন্দেশ ত আর পালিয়ে যাচ্ছে না।"

হারিবার পাত্রী প্রমীলা নয়, যেন তেন-প্রকারেণ রণজিতের দৃষ্টি তার দিকে পড়া চাই-ই: তাই বলিল—"আচ্ছা সন্দেশ না হয় রইল, কিন্তু আর একটা জরুরি কথা ছিল যে তা কি তুমি কিছু জান? এখখুনি না বললে হয়ত ভুলে যাব, আর তখন কি হবে বল ত?" প্রমীলা রণজিতের হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল।

অগত্যা রণজিতকে ফিরিতে হইল—"আঃ, কি বলবি বল না, হাতের টিপ একবার নষ্ট হলে আর ও আম পাড়া যাবে না।"

কথাটার গোপনতা রক্ষা করিবার জন্ম রণজিতের কানের কাছে গিয়া আস্তে আস্তে বলিল—"রণুদা, লক্ষীটি, তুমি কিন্তু কিছুতেই রাজী হয়ো না। মা হয়ত তোমায় অনেক করে বলবে, কিন্তু তুমি যদি রাজী হয়ে যাও, তা হলে বলে দিচ্ছি কিন্তু, তোমার সঙ্গে আড়ি, আড়ি, আড়ি!"

"ওঃ, এই কথা! তা আমি যাচ্ছি কি না! কাকা এলেই বুঝি আমি তার সঙ্গে চলে যাব! তুই কিছু ভাবিস নে; আগে এখন আমটা ত পাড়ি।"

প্রমীলা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাততালি দিতে দিতে বলিল—"তুয়ো, তুয়ো, বলতে পারলে না—"

"এই যা; সত্যি ত তুই বলেছিলি শৈলকে পাখীর ছানা না দিতে। আচ্ছা না হয় তোকেই দেব। এবার হ'ল ত?"

"না—হ'ল না, হ'ল না, হ'ল না; তুমি যে কি—কিছু বুঝতে পার না।" রণজিতের অজ্ঞতা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইয়া কথাটা খুলিয়া না বলিয়া পারিল না—'কি হয়েছে জান? মা আর ছোট পিসিমা বলাবলি করছিল—রণু আর পমিতে খুব ভাব, দুটিতে মানায়ও বেশ—বিয়ে দিতে পারলে বেশ হ'ত। কিন্তু কি যে পোড়া ভাইয়ের জাতের বালাই তা কি আর হবার উপায় আছে। আরও কি সব বলছিল! আমার কিন্তু রণুদা খুব ভয় হচ্ছে! সত্যি যদি আমাদের বিয়ে হয়ে যায় তা হলে কি মুশকিল হবে বল ত? এমনি করে তবে ত আর দু'জনে মিলে খেলা করতে পারব না! ঘোমটা টেনে আমার ঘরে বসে থাকতে হবে—আর তোমার সঙ্গে কথাই কইতে পাব না—হ্যাঁ গো, হ্যাঁ আমাদের নতুন বৌদি, তাকে ত দেখছি চব্বিশ ঘণ্টা ঘোমটা টেনেই ঘরে বসে আছে! দুর ছাই—সে বড় বিচ্ছিরি—ও আমার ভাল লাগবে না।"

"ওঃ, এই কথা—কে বলেছে যে আমি তোকে বিয়ে করব?"

"তবে কি পটলিকে বিয়ে করবে?"

"না, না, না। তুই, পটলী, মিনি, পুঁটি—আমি কাউকেই বিয়ে করব না।"

"তবে তুমি কাকে বিয়ে করবে রণুদা!"

"জানিস আমি মেম বিয়ে করব—মেম। হ্যাঁ গো মশাই, হ্যাঁ। ঐ যে দেখেছিলি না একটা পাদ্রী না কি সাহেব এসেছিল—ঐ যে রে আমার হাতে লজেন্স দিলে, আমায় খুব আদর করলে—তাদের সঙ্গে যে একটা মেম এসেছিল, আমি তাকেই বিয়ে করব—হ্যাঁ দাদু বলেছে! দিদিমণি কিন্তু জানিস রাজী হয় নি—সে বলেছে আমি নাকি তাকেই বিয়ে করব! শুনে ঠাকুরমা কত রাগ করলেন, বললেন রণু আমাকে বিয়ে করবে, আর কাউকে নয়। আমি মেমই বিয়ে করব।"

"না, না, না, তুমি তাকে বিয়ে করতে পারবে না। দেখ নি তার সঙ্গে কত বড় একটা কুকুর এসেছিল—ওটা যে তোমায় কামড়ে দেবে।"

"ইস, কামড়ে দিলেই হ'ল! কুকুরটাকে আমি মেরেই ফেলব।"

প্রমীলা ও রণজিৎ নিজেদের কথায় মত্ত থাকিলেও, প্রমীলার কোঁচড়ের সন্দেশ লক্ষ্য করিয়া এতক্ষণ যে অলক্ষ্যে দাঁড়াইয়া ছিল, সে সুযোগ বুঝিয়া একদৌড়ে আসিয়া কোঁচড় ধরিয়া টান মারিল। প্রমীলা ব্যাপারটা সম্পূর্ণরূপে বুঝিবার পূর্ব্বেই রণজিৎ ছেলেটির উপর লাফাইয়া পড়িল। ছেলেটি মাটিতে পড়িয়া গিয়া রণজিতের বেড়াজাল হইতে মুক্তি পাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। যে সন্দেশের অধিকার লইয়া এই কাণ্ড—তা ততক্ষণে ধূলায় মিশিয়া গিয়াছিল। বালকটি কোনপ্রকারে নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া চীৎকার করিতে করিতে চলিয়া গেল।

রণজিতের জন্ম তোলা সন্দেশ ধূলায় মিশিল। দুঃখে প্রমীলার বুক ফাটিয়া কান্না বাহির হইতে লাগিল। অভিমানভরে কহিল—"তখনই আমি তোমায় বলেছিলাম, তুমি নিলে ত আর এমনি হ'ত না।" কথা কয়টা শেষ করিতেই প্রমীলার দুই গণ্ড বাহিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

রণজিৎ তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্ম কহিল—তার জন্ম আর কি হয়েছে, বল না—বাছাধন এমনি জব্দ, জন্মে আর এ পথ মাড়াবে না! আর না এদিকে—দেখ তোকে কেমন একটা ভাল আম পেড়ে দিই।

সন্দেশের শোকটা না ভুলিতে পারিলেও আমের কথাটা প্রমীলাকে

আকর্ষণ না ছাড়িয়া পারিল না ! চোখ মুছিতে মুছিতে কহিল, "তবে কিন্তু ঐ আমটা দিতে হবে।" যে আমটাকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল, সেটা ঝুলিতেছিল পুকুরের দিকে জলের উপর একটা ডালে। ডালটার যতদূর যাওয়া গেল তারপরও আমটা সহজে হাতের নাগালে নয়, কিন্তু পমিকে ত না দিলেও নয়, তাই ডালের উপর শুইয়া পড়িয়া এক হাতে পাশবালিশের মত আঁকড়াইয়া ধরিয়া অপর হাত বাড়াইবামাত্র পা ফসকাইয়া গেল, কোনপ্রকারে দুই হাতে শক্ত করিয়া ডাল ধরিয়া ঝুলিতে লাগিল।' হাসিতে হাসিতে কহিল, "দেখেছিস পমি, কেমন মজা হয়েছে !"

প্রমীলা কিন্তু এতক্ষণে আমের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল—ভয়ে তাহার চক্ষু স্থির হইল, চীৎকার করিয়া বলিল, "তুমি যে পড়ে যাবে রণুদা !"

"কি আর হবে ; এক ডুবে ওপারে উঠব গিয়ে," বলিয়াই রণজিৎ হাসিতে লাগিল।

যে ছেলেটি মার খাইয়া পলাইয়াছিল, তাহার হইয়া উপস্থিত হইলেন তাহার বিধবা পিসীমা ! দূর হইতেই চেঁচাইতে চেঁচাইতে আসিতেছিলেন—"ওরে, ও হতচ্ছাড়া, শতেক খোয়াড়ীর ব্যাটা, হারামজাদা, কোন্ সাহসে রে তুই আমার নোটনের গায়ে হাত তুলেছিস ? হাত তোর খসে পড়বে না !"

"বুড়ী, মুখে নুড়ি," বলিয়াই পাকা ফলের মত জলে পড়িয়া এক ডুবে ওপার গিয়া রণজিৎ পলাইয়া গেল।

খড়ে আগুন লাগিল, বুড়ী চেঁচাইয়া উঠিল, "তবে রে ব্যাটা, মুখপোড়া বাঁদর, হারামজাদা, হতচ্ছাড়া, কোথাকার, হাত-পা ভেঙ্গে পড়ে থাক, পড়ে থাক, পড়ে থাক।"

কথায় গায়ের ঝাল মিটাইতে পারিল না। সামনে প্রমীলাকে পাইয়া তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিতে টানিতে লইয়া যাইতে যাইতে কহিল, "পোড়ারমুখী, হারামজাদী, এই হতভাগার সঙ্গে তোকে আর এক দিন দেখেছি ত তোরই একদিন কি আমারই একদিন।"

২

রণজিৎ ও প্রমীলা এক পাড়ারই বালক-বালিকা। রণজিৎ পিতৃহীন ব্রাহ্মণ, প্রমীলা বৈদ্য অধ্যাপকের ছোট মেয়ে।

রণজিৎ গাঁয়ের ছেলেদের অগ্রগণ্য—রূপ বল, দৌরাত্ম্য বল, লেখাপড়া বল, কোন কিছুতেই তার সমকক্ষ ছেলে নাই। দশ-এগার বৎসরের ছেলে হইয়া ভূতের ভয় নাই, আর যমের মত পণ্ডিতের হাত হইতে বেত কাড়িয়া যে ছেলে স্কুল পালাইতে পারে তাহার পক্ষে ছেলেদের সর্দারী পাওয়া কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। স্কুল-কর্তৃপক্ষ কিন্তু তাকে সহসা কিছু বলিতে পারিত না, তার কারণ ইনসপেক্টর স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিলে রণজিৎই ছিল তাহাদের ভরসা।

সৌন্দর্য্যে প্রমীলা রণজিতের চেয়ে কম যায় না—ভয়ের লেশমাত্রও নাই—তার উপর অত্যন্ত জেদী।

রণজিৎ ও প্রমীলা এমনি ভাবেই মিশিয়া ছিল যে দোষে-গুণে গ্রামের লোক এককে ছাড়া অন্যকে ভাবিতে পারিত না। প্রমীলা ও রণজিতের এক দিন ঝগড়া হইয়া গেল। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা অতিক্রান্ত হইতে চলিল, কেহ কাহারও সঙ্গে কথা বলে নাই। রণজিৎ অলক্ষ্যে কয়েকবার প্রমীলার বাড়ী ঘুরিয়া আসিয়াছে। খেলার সাথীরা কেহ তাহাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া ফেলিলে সে বলিত—"পমিকে খুঁজছি, পেলে হয় একবার, মেরে তার হাড় গুঁড়ো করে দেব দেখিস ?"

কোথাও প্রমীলার দেখা না পাইয়া মনে মনে ঠিক করিল, "ভালই হ'ল—বয়ে গেল।" এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া গেল। বোসেদের হরিকে এক পাশে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিল—"তুই বল হরি, পমি কি দোষ করে নি ? পমিও কি আমাকে আঁচড়ে কামড়ে দেয় নি ?" হরি বলিল—"ঠিকই ত, পমিরই ত দোষ ! সেই ত তোমায় মেরেছে।"

রণজিৎ—"তুই ছাই দেখেছিস। ও আর কি করেছে, রেগে গিয়ে আমিই ত বড্ড মেরেছি। ওর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল, কেমন করে আমার দিকে চেয়ে রইল। বড্ড লেগেছে কি না ? তুই কিছু দেখিস নি। তুই একটা হাঁদারাম, বোকা, মিথ্যাবাদী ! এক থাপ্পড়ে দেব মাথা ঘুরিয়ে।" হরি ভয়ে দূরে সরিয়া গেল।

ছেলেদের আসর তখন সরগরম, ক্ষুদিরাম আর কানাইলালের মধ্যে কে বড়, তাহা লইয়া বিবাদ। যে যার যুক্তিমত ক্ষুদিরাম কিংবা কানাইলালকে সমর্থন করিতেছে। রণজিৎ কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও এই তর্কের মধ্যে নিজেকে ডুবাইতে পারিল না। বারে বারেই প্রমীলার সঙ্গে ঝগড়া করার জন্য আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া যুক্তি খুঁজিতেছিল। প্রমীলার চীৎকার যেন তাহার কানে প্রবেশ করিল। সত্যই ত প্রমীলা ! দেখিতে পাইল প্রমীলা চীৎকার করিতে করিতে জঙ্গলের মধ্য দিয়া, পায়ে হাঁটা পথের উপর দিয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিতেছে। জঙ্গলের একটা কাঁটায় সাড়ীর আঁচল লাগিয়া সে 'রণুদা' বলিয়াই হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেল।

রণজিতের সমস্ত ধৈর্য্য, ঔদাসীন্য মুহূর্ত্তে উবিয়া গেল। দৌড়াইয়া প্রমীলাকে উঠাইয়া বলিল, "কি হয়েছে রে পমি ?"

'শিগগীর চল রণুদা, বড়দাকে ধরতে বাড়ীতে পুলিশ এসেছে ?"

উভয়ে দৌড়াইয়া বাড়ী আসিয়া দেখিল—এক ঘরে তার বড়দাকে হাতকড়ি দিয়া পুলিস দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছে। রণজিৎ প্রমীলাকে কহিল, "দেখ পমি, তুই চট করে একটা লাঠি নিয়ে আয়, আমি ততক্ষণে বড়দার শেকলটা ছাড়িয়ে নিই।" এই কথা বলিয়াই হাতকড়িতে একটা হেঁচকা টান মারিয়া কহিল, "ভূপেনদা, তুমি শিগগীর পালাও, আমি ততক্ষণে পুলিসগুলোকে তাড়াই।"

ভূপেন তাহার মায়ের কথা ভাবিতেছিল। পুলিস আসা অবধি তিনি অজ্ঞান হইয়া আছেন। মনটা মায়ের জন্ম একটু বিষণ্ণ, কিন্তু তা সত্ত্বেও রণজিতের কথায় না হাসিয়া পারিল না, কহিল, "আঃ ছেড়ে দে, লাগছে বড্ড।"

সাহেব সুপার পুলিসদিগকে যাইবার হুকুম দিয়া নিজে আগাইয়া চলে। পুলিস ভূপেনকে লইয়া চলিল, কিন্তু রণজিৎ তাহাকে নিজের প্রাণপণ শক্তিতে পেছনে টানিতে লাগিল। বিফল হইয়া, হাতের কাছের একটা কাঁচের গ্লাস ছিল তাহাই সাহেবের দিকে ছুঁড়িয়া মারিবে বলিয়া উঠাইল। কিন্তু গ্লাসটা মাটিতে পড়িয়া সশব্দে ভাঙ্গিয়া গেল।

সাহেব পিছন ফিরিয়াই 'you damned devil' বলিয়া এক লাথিতে রণজিৎকে ধরাশায়ী করিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে পথ চলিতে লাগিল। রণজিতের মুখ দিয়া রক্ত ছুটিল। ক্রোধে ভূপেনের হাতের মুঠি শক্ত হইল, কাহাকে আঘাত করিবার জন্ম শৃঙ্খলিত দুই হাত উপরে উঠাইল—পুলিস তাড়াতাড়ি ধরিয়া ফেলিল। প্রমীলা রণজিতের উপর পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

৩

কয়েক বছর পরের কথা। গ্রামে থাকিয়া রণজিতের পড়াশুনা ঠিকমত হইতেছে না মনে করিয়া—রণজিৎকে তাহার কাকা নিজের চাকুরিস্থল সুদূর পশ্চিমে লইয়া গেলেন।

যদিও রণজিৎকে বিদেশে পাঠাইবার জন্ম সকলেই ব্যস্ত ছিল, বিদায়ের দিনে কিন্তু কাহারও চোখ শুষ্ক ছিল না। পিতামহী রণজিতের কাকাকে বলিলেন, "দেখ রে খোকা, রণু আমার দেখতেই বড় আর দস্যি, রাত্তিরে কিন্তু ওর আমার কাছে না শুলে ঘুম আসে না।"

রণজিৎও সায় দিয়া কহিল, "হ্যাঁ, কাকা, জান—ঠাকুমা যে কত গল্প জানে তার ঠিক নেই। রামায়ণ, মহাভারতের কত গল্প বলে। ঠাকুমা, সে দিন রাত্তিরে বলছিল যে—রামায়ণ মহাভারতের দৈত্যগুলি আমাদের দেশে এখনও আছে, আর আমাদের ওপর অত্যাচার করছে। হ্যাঁ, কাকা, ঠাকুমা বলেন, এই যে সাহেব ওরাই নাকি আসলে ঐ সব দৈত্য।"

কাকা ঈষৎ হাসিয়া গোছগাছ করিতে অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

নিজের গ্রাম, তার পর আরও কত গ্রাম, পাহাড়, বন, ধূ ধূ মাঠ একের পর এক পিছনে ফেলিয়া রেলগাড়ী ছুটিয়াছে—তাহার নিত্য-কার পথে। রণজিতের চোখে আজ সবই অর্থহীন ছবির আভাস মাত্র। সবাইকে যেন আড়াল করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে সেই দুটি করুণ চোখের সজল চাহনি ; মনে পড়িতেছে পমির সেই হাত ধরিয়া অনুরোধ—'রণুদা, তুমি কি সত্যি চলে যাবে? তুমি চলে গেলে আমি কার সঙ্গে কথা বলব, কার সঙ্গে খেলব বল ত? তুমি লক্ষ্মীটি শিগগীর চলে এস।' রণজিতের নিজের চোখও শুষ্ক ছিল না। প্রমীলাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্ম ধরা গলায় বলিয়াছিল—"কাঁদিস না পমি, আমি আবার নিশ্চয় তাড়াতাড়ি চলে আসব, তোকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না পমি।"

পমি দুই হাত দিয়া রণজিতের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিয়াছিল—"তুমি যেও না রণুদা, তুমি যেও না।" সে আর কথা বলিতে পারে নাই, ছুটিয়া চলিয়া আসিয়াছিল।

৪

রণজিৎ শহরে আসিয়া স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া গেল। পরিবেশ সম্পূর্ণ নূতন। এখানে নীরব-নিস্তব্ধতা নাই—নাই বাল্যের সখা-সাথী। এখানে লোক ভিড় করিয়া চলে—গাড়ী ঘোড়া হুস হুস করিয়া পাশ দিয়া চলিয়া যায়। সবাই তার অপরিচিত—সেও তাদের কাছে তাই। তাহার সহপাঠীরাও তাহাকে গেঁয়ো বলিয়া প্রথমে আমল দিতে চাহে নাই, কিন্তু তাহার স্বাভাবিক মিশুক প্রকৃতি ও বুদ্ধির তীক্ষ্নতা এই বাঁধ অতি সহজেই ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। এই নূতন মেলামেশার মধ্যে পমির অভাবটা তাকে প্রতিনিয়ত নূতন ভাবে বেদনা দিতে লাগিল। পমির কথা মনে হইতেই মনে পড়ে সেই সাহেবের লাথি ; এখানে ঐ রকম কত শ্বেতাঙ্গের মুখ তাহার প্রত্যহ দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। এক দিনের সেই নিষ্ফল ক্রোধ প্রতিহিংসার রূপ গ্রহণ করিতে লাগিল। রাস্তায় সাহেব দেখিলেই মনে হইত মারিয়া বসে ; কিন্তু সংযত করিতে হয় মারিবার বাসনা। এক দিন যেন মনে হইল সে পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে। তাহাদের স্কুলেরই এক শিক্ষকের ডনকুস্তির আখড়ায় গিয়া গুপ্ত সমিতির সভ্য হইল। আর অচিরেই সমিতির একনিষ্ঠ কর্ম্মী হইয়া উঠিল।

দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার সঙ্কল্প তাহার সত্তাকে ক্রমশঃ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। গ্রামের পরিবেশ ভুলাইবার জন্ম প্রথম কিছুদিন তাহার কাকা তাহাকে দেশে যাইতে অনুমতি দেন নাই, তাহার পর তিনি অনুমতি দিলেও তাহার আর বহুদিনের মধ্যে দেশে যাওয়া হয় নাই। মাঝে মাঝে পমির কচি মুখ; তাহার আব্দার তাহাকে আকর্ষণ করিত প্রবল ভাবে, কিন্তু কোনও না কোন দায়িত্ব চাপিয়াছে সমিতির কাজে।

সমিতির কাজ উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। রণজিৎ পাইতেছে নিত্য নূতন দায়িত্বভার। এখন এমন হইয়াছে যে, সন্ধ্যার আগে বাড়ী ফিরিয়া কলেজের পড়া ত দূরের কথা, সে যখন বাড়ী ফেরে তখন সকলের রাত্রির খাওয়া-দাওয়া শেষ হইয়া যায়। সরকারী চাকুরিয়ার বাড়ীতে সবই নিয়মবাঁধা। পাচকঠাকুর দুই-চারি দিন ভাত লইয়া বসিয়া ছিল, কিন্তু পরে এক দিন বাড়ীর গৃহিণীকে না বলিয়া পারে নাই। কাকীমা বলিলেন, "এ নিয়ে আর সোরগোল করো না, ভাত-তরকারী ঢেকে রেখে দিও।" নিভৃতে রণজিৎকে ডাকিয়া বলিলেন, "রণু, এত রাত করে এসে ঠাণ্ডা ভাত খেতেও ভাল লাগে না, অসুখও করতে পারে। ঠিক সময়ে বাড়ী এসে রাত্রির খাওয়াটা সেরে নিও বাবা।"

দুই-এক দিন ঠিক সময়ে আসিলেও রণজিৎ আবার আগের মত দেরি করিতে লাগিল। বেশী রাত্রিতে চুপি চুপি আসিয়া না খাইয়া অন্ধকারেই বিছানায় শুইয়া পড়িত। কাকীমা টের পাইয়া রণজিৎকে কাছে বসাইয়া আদর করিয়া বলিলেন, "বাবা রণু, তুই বেশী রাত করে বাড়ী ফিরিস, কোথায় যাস, কি করিস, এ নিয়ে আমি মাথা ঘামাই নে। আমি জানি রণু আমার কোন অন্যায় কাজ করতে পারে না। তবে দেখিস যেন কোন বিপদের মধ্যে জড়িয়ে পড়িস নে! আর রাত্রিতে উপোস করে থাকিস নে। দেরি করে বাড়ী ফিরিস জানতে পারলে তোর কাকাও খুব রাগ করবেন। বাড়ী ফিরে আস্তে আস্তে এই জানলার ধারে এসে আমায় চুপি চুপি ডাকবি, আমি উঠে তোকে খাবার দেব। না খেয়ে থাকলে অসুখ করবে যে!"

এই কাকীমা রণুকে মায়ের মতই ভালবাসিতেন। তিনি নিজে নিরক্ষর হইলেও নির্বোধ ছিলেন না। নির্ভীকতা তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। রণজিৎ এই কারণেই তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করিত। রণজিৎ কাকীমার স্নেহে বিগলিত হইয়া কাকীমার হাঁটুর উপর মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া রহিল। তাহার পুরনো কথা মনে পড়িল—

কাকীমা তখনও গাঁয়েই ছিলেন। রণুর খুল্লতাতের সহিত শহরে আসিয়া স্থায়ীভাবে বাস করিতে আরম্ভ করেন নাই। প্রমীলার দাদা ফেরারী হওয়ায় তাহাকে খোঁজ করিতে পুলিস একবার ভুল-ক্রমে তাহাদের বাড়ী অধিক রাত্রে ঘেরাও করিয়াছিল। বাড়ী বেষ্টন করিয়া পুলিস নীরবে অপেক্ষা করিতেছিল। তখন তাহাদের দেশে খুব ডাকাতের ভয় হইয়াছে, কিছুদিন আগে নিকটেই এক গ্রামে এক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতেরা নাকি বন্দুক ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে তাহাদের গ্রামের ছোট নদী দিয়া নৌকা বাহিয়া চলিয়া গিয়াছিল।

কালো পোশাক পরিয়া বন্দুক হাতে দীর্ঘকায় পুলিসগুলি বাড়ীর ভিতরেও ঢুকিয়া পড়িয়াছে। রণজিতের এক খুড়তুত বোন শেষ-রাত্রে ঘরের বাহিরে আসিয়াছিল, অন্ধকারে কালো কালো মূর্ত্তি দেখিয়া ডাকাত মনে করিল। ভয়ে—'বাবাগো, মাগো' বলিয়া চীৎকার করিয়া নিজের গলার সোনার হার লোকগুলির দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া দৌড়াইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। বাড়ীতে তখন কোন পুরুষ-মানুষ নাই। রণুর এই কাকীমা প্রদীপ হাতে লইয়া দরজা খুলিয়া বাহির হইলেন, নির্ভীকভাবে মূর্ত্তিগুলির কাছে গিয়া ধমক দিয়া বলিলেন, "কে তোমরা ওখানে? এদিকে এস!"

লোকগুলি উত্তর দিল—"মাঠাকুরুন, আমরা পুলিস!"

খুড়ীমা—"পুলিস হও, যাই হও, বাড়ীর ভেতর কেন? দেখছ না বাড়ীর মেয়েরা ভয়ে ঘরের বাইরে আসতে পারছে না!" পুলিস-গুলি একটু সরিয়া দাঁড়াইল। একজন পুলিস বোধ হয় জমাদার কি হাবিলদার—অগ্রসর হইয়া বলিল, "মাঠাকুরুন, ঐ ছোট মা কি একটা ফেলে দিয়ে গেছেন, আপনি নিয়ে যান।" বলিয়া সোনার হারটা ফেরত দিল।

এই গল্পটা রণুদের গ্রামে প্রচলিত হইয়াছিল। অনেকে প্রশংসা করিত, কেহ কেহ অবশ্য বলিত, "মেয়েছেলের অত সাহস ভাল নয়! মান-ইজ্জতের ভয় নেই গা!"

এই গল্প মনে পড়িয়া রণজিৎ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া ছিল। রণু হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল, ঢিপ করিয়া কাকীমাকে প্রণাম করিয়া দৌড়াইয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল। কাকীমা তাহার দিকে স্মিত-হাস্যে চাহিয়া রহিলেন।

সমিতির কাজকর্ম্ম সাধারণতঃ তাহাকে বাড়ীর বাহিরেই করিয়া আসিতে হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে তাহার উপর দায়িত্ব চাপিয়াছে অনেক, কাজেই মাঝে মাঝে ছেলেদিগকে আসিতে হয় তাহার বাড়ীতে নানাপ্রকার নির্দ্দেশ ও পরামর্শের জন্য। তাহার কাকার নিকট ছেলেদের এই আসা-যাওয়ার কারণ জানা না থাকিলেও ইহা তাহার নিকট পরিষ্কার মনে হইল—আর যাহাই হউক ছেলেদের এই আসা-যাওয়া পরীক্ষার পড়ার জন্য নয়। পরীক্ষা কাছে আসিয়াছে, কাজেই নিজের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিলেন; রণজিৎকে ডাকিয়া কহিলেন, "রণু, তোমার পরীক্ষা নিকটে, অথচ আজকাল আর তোমার লেখাপড়ায় তেমন মনোযোগ দেখতে পাইনে। ছেলেরা তোমার কাছে এত ঘন ঘন আসা-যাওয়া করে এ আমি পছন্দ করি নে!"

"ছেলেরা পরীক্ষার কথা আলোচনা করতেই আসে"—মিথ্যা কথা না বলিয়া পারে নাই রণজিৎ।

"এই আলোচনা আপাততঃ কিছুদিন বন্ধ রাখলেই খুশী হব।"

রণজিৎ মনে মনে না হাসিয়া পারে নাই। কিন্তু গুরুজনের সম্মুখে এমনি একটা মিথ্যার ভান করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। পলাইবার জন্য উসখুস করিতে লাগিল। কাকা তাহার অবস্থাটা অনুমান করিয়া কহিলেন, "আচ্ছা যাও এখন।"

রণজিৎ যাইবার জন্য পা বাড়াইতেই দৃষ্টি পড়িল তাহার পোশাকের দিকে। রণজিৎকে থামাইয়া তিনি বলিলেন, "হ্যাঁরে রণু, তোর জামাকাপড়ের হাল এমনি কেন? তোরই হাতে বাড়ীর সবার জামা কাপড় তৈরি করার ভার, আর তুই কিনা ছেঁড়া কাপড় জামা পড়বি?"

রণজিৎ এইবার সত্য সত্যই বিপদে পড়িয়া গেল। টাকা তাহার হাতেই আসে সত্যি, কিন্তু তাহার অংশের টাকার বেশীর ভাগ যায় সমিতির কাজে। এই কথা ত প্রকাশ করিয়া বলা চলে না! তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া কাকাই বলিলেন, "বুঝেছি কষ্টসহিষ্ণুতা, বিলাসিতা ত্যাগ এসব বুঝি আজকাল হয়েছে! ও তাই অশ্বিনী দত্তের 'ভক্তিযোগ', স্বামী বিবেকানন্দের বই এসব পড়ার টেবিলে দেখি! ভাল, ভাল, এতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু এভাবে চললে যে নিজের দৈন্য প্রকাশ পায় রণু! বেশভূষার ছাপ মনেও লেগে যায়। দীনতা থেকে হীনতাও এসে পড়তে পারে। এ আমি একেবারেই বরদাস্ত করতে পারি নে।"

এবার রণু কথা না বলিয়া পারিল না, ধীরে ধীরে অথচ স্পষ্ট করিয়া বলিল, "না. কাকা, আমি হীন হব না কিছুতেই।" কাকা রণুর মুখের দিকে বিস্মিত হইয়া চাহিলেন, পরে বলিলেন—"আচ্ছা, এই নাও, এখখুনি নূতন জামা-কাপড় তৈরি করবার অর্ডার দিয়ে এস।" এই বলিয়া পকেট হইতে কিছু টাকা বাহির করিয়া রণজিতের হাতে দিলেন। টাকা কয়টা হাতে পাইয়া রণজিৎ ভগবানকে মনে মনে প্রণাম জানাইল। সমিতির কাজে আজই কয়েকটা টাকার বিশেষ প্রয়োজন, অথচ তখন পর্য্যন্ত টাকা সংগ্রহ হয় নাই। দুই জন সভ্যকে পাঠাইতে হইবে দূর দেশে এক বিপজ্জনক কাজে। যে টাকা সংগ্রহ হইয়াছিল তাহা যথেষ্ট নয়, কিছু বেশী টাকা সঙ্গে থাকা দরকার।

বাড়ী ফিরিতে সেদিন তাহার কিছু বেশী রাত্রি হইল। দেখিল টেবিলের উপর একটা খাম—অসংখ্য সীলমোহরাঙ্কিত। কবে এই চিঠি ডাকে দেওয়া হইয়াছিল তাহা এখন আর খাম দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই। খামটা বারকয়েক নাড়াচাড়া করিয়া সকৌতুকে দেখিল তারিখ মাস ছয়েক আগেকার! সম্বোধন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল আরও! "রণুদা!" প্রমীলা ভিন্ন তাহাকে এ নামে ত আর কেহ ডাকিত না। তাড়াতাড়ি পৃষ্ঠা উল্টাইয়া দেখিল তাহার অনুমান সত্য। বিস্ময় ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। বৎসর হিসাব করিয়া দেখিল প্রমীলা এখন তরুণী। তাহাকে কেন চিঠি লিখিবে? উদ্‌গ্রীব হইয়া এক নিশ্বাসে চিঠি পড়িতে লাগিল—

শ্রীচরণেষু

রণুদা, আমার বড় বিপদ! তুমি হয়ত আমায় ভুলে গেছ। শহরের নতুন পরিবেশে একদিনের পমি হয়ত আজ তুচ্ছ বাল্যস্মৃতি মাত্র! একদিন বাল্যবয়সে তোমায় নিষেধ করেছিলুম আমায় বিয়ে করতে! কিন্তু সেদিন ত জানতে পারিনে যে ধুলো মাটি মেখে যার সঙ্গে নিত্য খেলা করেছি, সেই ধুলোমাটির মারফত করেছি মনের মালাবদল। বড় হয়ে যখন এ সত্য অনুভব করলাম তখন মনে যেমন জেগেছিল পরম আনন্দ আবার তেমনি বিষাদে মন ভরে গিয়েছিল এই ভেবে যে তোমাকে বেঁধে রাখা কঠিন। ভেবেছিলাম ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ করব। আমার হৃদয়কে তোমার জন্যই জাগ্রত রাখব, যদি তুমি কোন দিন সমাজের বাঁধ ভেঙে দিতে পার! কিন্তু সে আশাও বুঝি পূর্ণ হয় না! আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে। এতদিন যে সম্ভাবনাকে এড়িয়ে এসেছিলাম নানা কৌশলে, তা আর খাটল না। বিয়ের দিন স্থির এ মাসের ২৩শে, তুমি এসে আমায় উদ্ধার করে নিয়ে যাও! না এলে আমি কি করব! চিঠি লুকিয়ে লিখছি। ইতি

তোমারই পমি।

চিঠিটা আস্তে আস্তে রণজিতের হাত হইতে পড়িয়া গেল। স্মৃতির রূপালী পর্দায় বাল্যের বহু ঘটনা ভাসিয়া চলিতে লাগিল। সেই বালিকা পমি এখন তরুণী প্রমীলা। না জানি দেখিতে কেমন হইয়াছে। মনে হইল, এতদিন লেখাপড়া করিয়া সমিতির কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াও তাহার চিত্ত ভরিয়া উঠে নাই! আজিকার এমনি একটা আহ্বানের জন্য যেন তাহার সমস্ত সত্তা অপেক্ষা করিয়া ছিল। হৃদয় তাহার উদ্বেলিত হইয়া উঠিল! দূরে ব্রিটিশ সৈন্যের ছাউনীতে বিউগলে পরীক্ষামূলক বিপদসূচক সঙ্কেত বাজিয়া উঠিল। তাহার বিক্ষুব্ধ চিত্ত ফিরিয়া আসিল এই দাসত্বের বাঁশীর আওয়াজকে লক্ষ্য করিয়া। আজ এইমাত্র তাহার দুই সহ-কর্ম্মীকে সে নিজে আগাইয়া দিয়া আসিয়াছে বিঘ্নবিপদসঙ্কুল পথে। আর সে কি পিছনে ফিরিয়া দাঁড়াইবে এক তরুণীর প্রেমনিবেদন গ্রহণ করিতে? না, তা হয় না, তা সে হইতে দিবে না। হাতের কাছেই ছিল 'আনন্দমঠ'—পড়িতে আরম্ভ করিল, পড়িতে পড়িতে কখন ঘুমাইয়া পড়িল তাহা তাহার খেয়াল নাই। স্বপ্ন দেখিল নিজেদের গ্রাম আর গ্রামের সেই বাল্য-পরিবেশ—দেখিল বিবাহ-বাসরে পমি কনে সাজিয়া মালা হাতে যেন কাহাকে খুঁজিতেছে··· হঠাৎ কিসের শব্দে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। চোখ মেলিয়া দেখিল ভোর হইয়া গিয়াছে। তখনও তাহার মন আচ্ছন্ন। তাড়াতাড়ি হাত পা ঝাড়িয়া উঠিয়া দেখে—চিঠিখানা খোলা অবস্থায় টেবিলের উপর পড়িয়া আছে! চিঠিখানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। খস খস করিয়া প্রমীলাকে চিঠি লিখিল—

পমি, এত দিনে নিশ্চয় তোমার বিয়ে হয়ে গিয়েছে! বিধাতার কাছ থেকে যা পেয়েছ তাতেই খুশী থেক। তোমার আর আমার পথ আলাদা। এই দুই পথের আরম্ভে কিংবা শেষে কোথাও মিল নেই। ইতি

রণজিৎ।

তখনিই চিঠি ডাকে ফেলিয়া দিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল পরিচালকের সন্ধানে।

৫

কিছু দিন হইতেই রণজিৎ সমিতির কার্য্যে এমন ভাবে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিল যে গৃহে তাহার আর বেশী দিন ঠাঁই হইবে না বলিয়া তাহার মনে হইতেছিল। তাহার অনুমান কিছু দিনের মধ্যেই বুঝি সত্যে পরিণত হইতে চলিল। এক দিন রাত্রিতে বাড়ী ফিরিতেই কাকা তাহাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "দেখ, রণু, তোমাকে আজ একটা কথা বলবার আছে। আমাদের পরিবার এবং তোমার ভবিষ্যৎ চিন্তা করে দেখ। আজ আমায় পুলিস সুপার ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি বললেন, 'তুমি নাকি গুপ্ত সমিতির সভ্য, তুমি নাকি বিপ্লবী' এ সত্য কিনা তাই তোমার আর জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন আমার নেই! বাড়ীতে তোমার অনুপস্থিতি, পড়াশুনায় অমনোযোগ, ফলে পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগে পাস—অথচ তুমি চরিত্রবান ছেলে, কোন বদখেয়ালই তোমার নেই, এ সমস্ত থেকেই এটা সত্য বলে মনে হয়। তোমাকে আমার এই অনুরোধ, এ পথ তোমাকে ছাড়তে হবে। না ছাড়লে তোমাকে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে আমার চাকরি যাবে—তার ফল ত তুমি নিজেই জান

জন দুই লোকের অনাহারে মৃত্যু।" আরও অনেক উপদেশ দিয়া তাহাকে বিশ্রাম করিতে বলিলেন।

রণজিৎ মনে মনে হাসিল। কর্ত্তব্য ত তাহার স্থির করাই আছে। এই পথ সে ছাড়িবে কি করিয়া। পরিবারের গণ্ডি যদি তাহার দেশমাতৃকার মুক্তিসাধনার পথে বাধা হইয়া দাঁড়ায়, তবে তাহাকে অপসারিত করাই বাঞ্ছনীয়। বিপ্লবের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয় —কণ্টকময় পথ এড়াইয়া চলিলে চলিবে কেন? মা, কাকা, পিতামহী, আরও আত্মীয়-পরিজন এরা সকলেই আপন, গৃহত্যাগ করিলে ইহারা মর্ম্মান্তিক আঘাত পাইবে, কিন্তু সে ত দেশমাতৃকারও সন্তান—তাহাকে অবহেলা করিবে কোন অছিলায়!

এই ব্যাপারে পাকাপাকি কথা স্থির করিতে পরিচালকের সহিত পরের দিন প্রভাতেই আলাপ করিবার জন্য মনস্থির করিয়া বিছানায় গা এলাইয়া দিল।...

পর দিন রণজিৎ তাহার বাড়ীর নূতন পরিস্থিতিতে গৃহত্যাগের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পরিচালকের সঙ্গে আলোচনা করিতে গেল।

সকল কথা শুনিয়া পরিচালক মনে মনে হাসিলেন। তিনি রণজিতের বিষয়ই ভাবিতেছিলেন। দুর্গম দূরদেশে বিপজ্জনক কাজে কর্ম্মী প্রেরণের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু একান্ত বিশ্বাসী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন কর্ম্মী ভিন্ন এ দুরূহ কর্ম্মে কাহাকেও প্রেরণ করা যুক্তিযুক্ত নয়! রণজিতের কার্য্যপদ্ধতি ও নিষ্ঠা তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু সবরকম বিপদের মুখে তাহার এখনও হাতেখড়ি হয় নাই। রণজিতের নিকট হইতে প্রস্তাব পাইয়া তিনি স্থির করিলেন যে, তাহাকে আপাততঃ গুরুতর কার্য্যের ভার দিয়া পরীক্ষা করিবেন।

পরিচালক হাসিমুখে বলিলেন, "কি রণজিৎ, খুব রাগ হয়েছে—কাকার উপর—নয় কি? কাকা তোমার দেশের সেবায়, সমিতির কাজে বাধা দিচ্ছেন, তাই রেগে গেছ, তাই ত। তাঁকে শত্রু মনে হচ্ছে! এ বাড়ীতে আর এক মুহূর্ত্ত থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে না?"

রণজিৎ—"না দাদা, তাঁকে শত্রু মনে হচ্ছে না। তবে তাঁর বাড়ীতে থেকে আমার আর কাজ করা চলবে না।"

পরিচালক—"তোমাকে বাড়ীতে রেখে চাকরিটি খোয়াতে রাজী নন্ তিনি। তাঁর দিক থেকে তিনি ঠিকই করেছেন। এই চাকরির উপর নির্ভর করছে এতগুলো লোকের অন্ন! তাঁকে ত সাবধানে চলতেই হবে। তিনি তোমাকে ভালবাসেন না তা নয়! তবে তিনি তোমার মত দেশোদ্ধারের ব্রত নেন নি, তোমার মত কারাগারে যাবার বা ফাঁসিতে ঝুলবার জন্য প্রস্তুত নন্। দুই-চার জন বাদে দেশের আর সবাই ত এইরূপ! আর এদের বাদ দিলে দেশ বলে আর কি থাকে! তিনি ত আর দেশদ্রোহী নন। তিনি ত আর তোমাকে ধরিয়ে দিতে যাচ্ছেন না। শুধু পরিবারটা রক্ষা করতে চাইছেন। তাঁর জ্ঞান ও বিশ্বাসমত তোমারও ভাল করতে চাইছেন।"

রণজিৎ—"একথা ঠিক! কাকা আমাকে খুব ভালবাসেন।"

পরিচালক—"তোমাকে ভালবেসে তোমার আদর্শকেও তিনি এক দিন শ্রদ্ধা করবেন। যদিও নিজে হয়ত তা গ্রহণ করতে পারবেন না। এঁদের উপর আমাদের বিদ্বেষ থাকবে না। আমাদের আপন জনকে আমরা শত্রু ভাবব না। অবশ্য সব পিতা-মাতা বা অভিভাবক ভাল লোক নয়। জান ত সেই ডেপুটি ও তাঁর স্ত্রী নিজের ছেলেকেই ধরিয়ে দিলেন এবং বহু বৎসরের জন্য জেলে পাঠালেন। শুধু তাই নয় আরও শোন। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ী, দুই ছেলেই তাঁর ছিল সমিতির সভ্য, কাজেই সমিতির অস্ত্রশস্ত্র ও গোপনীয় কাগজপত্রও কিছু কিছু সে বাড়ীতে নিরাপদ মনে করে রাখা হ'ত। ডেপুটিবাবু সে সব জিনিষ দিলেন পুলিসের হাতে। ফলে হ'ল শত শত লোক গ্রেপ্তার, হ'ল যুদ্ধোদ্যমের ষড়যন্ত্রের মামলা, সমিতি পেল প্রচণ্ড আঘাত।"

রণজিৎ—"আমি জানি ব্যাপারটা। বাপ স্ত্রীর পরামর্শে ও নিজের বুদ্ধিতে অস্ত্রশস্ত্র এবং কাগজপত্রের বাক্স রইলেন আগলে, পুলিস না আসা পর্য্যন্ত বাক্সটার উপর রইলেন চেপে বসে। ছেলেরা অনেক করে বুঝিয়ে, পায়ে ধরে মিনতি করে চেয়েও ওগুলি সরাতে পারলে না। পুলিস এসে মালপত্রসহ ছেলেকে ধরে নিয়ে গেল। তার ফলে হ'ল কত লোক গ্রেপ্তার, ষড়যন্ত্রের মামলা! আমি হলে বাপকে বুঝিয়ে না পারলে জোর করে, এমন কি দরকার হলে মারাত্মক কিছু করেও এ সমস্ত জিনিষ সরিয়ে ফেলতাম। সে ব্যবস্থা করাই কি উচিত হ'ত না?"

পরিচালক—"নিশ্চয়ই! সমিতির মঙ্গলার্থে, দেশের কল্যাণে মহৎকার্য্যসাধন, ভালবাসার লোককে পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দেওয়া—তা হ'ত চোখে জল নিয়ে, বুকে ব্যথা নিয়ে সুকঠিন কর্ত্তব্যসাধন। এতে কোন নৈতিক অপরাধ হ'ত না। কিন্তু তোমার কাকা ত সেরূপ ব্যক্তি নন্।"

রণজিৎ—"আমার কাকার উপর আমার কোন বিদ্বেষ নেই। আর আমার কাকীমা আমাকে শুধু ভালই বাসেন না, আমার এপথে চলার সাহায্যও করেন। আমি ঘর ছাড়তে চাচ্ছি, ঘরে থেকে কাজ করার আর সুবিধে নেই বলে। আমার কোন রাগ বা অভিমান নেই।"

পরিচালক—"আমি এই কথাটাই বুঝতে চাইছিলাম। রাগ বা অভিমানের বশে ঘর ছাড়লে আবার দু'দিনেই ফিরে আসতে চাইবে।"

তখন পরিচালক রণজিতের গৃহত্যাগ করিয়া অন্যত্র কার্য্যভার গ্রহণ করা সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিলেন—

"অন্য জায়গায় কার্য্যভার নিয়ে গেলে সেখানকার পরিচালকের সমস্ত দায়িত্বভারই যে তোমার উপর আসবে! তাই নিজেকে গড়ে তুলতে হবে নানা কাজের ভিতর দিয়ে সব রকম দায়িত্বভার বহন করার ক্ষমতা অর্জ্জন করে, নানারকম বিপজ্জনক কাজ নিজের হাতে করে। এতে ছোট কাজ বড় কাজ নেই। একখানা পত্র ডাক-বাক্সে ফেলাও কম দায়িত্বপূর্ণ কাজ নয়। অসতর্ক হলে এতেই

ঘটতে পারে বিষম বিপদ। চিঠি পড়তে পারে গোয়েন্দার হাতে। সব রকম কাজের অভিজ্ঞতা হলেই তুমি অপরকেও চালিয়ে নিতে পারবে, কাজের নির্দেশও দিতে পারবে। নির্ভুল আর সুষ্ঠুভাবে কাজ করার ক্ষমতার মধ্যেই নিহিত আছে পরিচালনার যোগ্যতা অর্জ্জনের চাবিকাঠি। রণজিৎ মনে রেখ, আমাদের এই সমিতিতে যাঁরা নেতৃস্থানীয় হয়েছেন তাঁরা নিজ হাতে সমস্ত ছোট বড় কাজ করে যোগ্যতা অর্জন করে হয়েছেন, শুধু উপদেশ বিতরণ করে, বইয়ের বাছা বাছা কথা আওড়ে কেউ নেতৃপদ লাভ করেন নি, যোগ্য হয়েই পেয়েছেন। সভাসমিতি করে তাঁদের নির্ব্বাচন করতে হয় নি। দুরূহ কর্ম্মের আগুনে নিজেকে পুড়িয়ে তৈরি করে নিতে হয় গুণ।"

রণজিৎ—"আমাকে উপযুক্ত মনে করে যে কাজই করতে বলবেন আমি তাই করতে প্রস্তুত।"

পরিচালক—"হাঁ, দুই-তিন দিনের মধ্যে দরকার হবে। এই কাজটা শেষ করেই তোমাকে একটা বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ কাজে দূরদেশে যেতে হবে। সেখানে যাওয়াই বিপজ্জনক, ফিরে আসা তার চেয়েও কঠিন, প্রায় অসম্ভব। পাঠাতেই হবে এক জন উপযুক্ত লোককে সেখানে।"

রণজিৎ—"আমি প্রস্তুত দাদা।"

সমিতির কাজকর্ম্ম যেমন একদিকে বাড়িতেছিল, তেমনি অন্যদিকে সরকারী চক্ষুও নিমীলিত ছিল না। ছোটখাটো ঘটনার সূত্রে তাহারা যে সন্ধান পাইয়াছে, তাহার মারফত সরকার-বিরোধী এক যুদ্ধোদ্যমের ষড়যন্ত্র আবিষ্কারের জন্য ব্রিটিশ গোয়েন্দাবিভাগ সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। আপাততঃ শহরের এক বিশিষ্ট গোয়েন্দা কর্ম্মচারীর আনাগোনা সমিতির কর্ম্মীদের গুরুতর বিপদের কারণ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে সরাইতেই হইবে। এই কার্য্যের ভারই রণজিতের উপর দেওয়া হইল।

যাহাকে অপসারিত করিতে হইবে সেই গোয়েন্দা কর্ম্মচারীটির গতিবিধির পথ রণজিতের জানা ছিল। পর দিন সন্ধ্যাবেলা দুই জন সহকর্ম্মী সঙ্গে করিয়া কৌশলে তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল। গোয়েন্দা কর্ম্মচারীটিও একা ছিলেন না, সাধারণ পথচারীর বেশে দুই জন দেহরক্ষী তাঁহার সঙ্গেই চলিয়াছিল। একটা রাস্তার মোড়ে আসিয়াই রণজিতেরা আক্রমণ করিল। প্রথমেই রণজিৎ ও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এক সহকর্ম্মী গুলি করিল গোয়েন্দা অফিসারকে। অফিসার ধরাশায়ী হইল। রণজিতের আর এক সঙ্গী সেই মুহূর্ত্তেই পর পর দুই জন দেহরক্ষীকে গুলি করিল। দুই জনেই ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল। কিন্তু পড়িয়া গিয়াও একজন দেহরক্ষী রণজিতের এক সাথীকে গুলি করে, গুলিতে তাহার বাহু বিদ্ধ হয়। তৎক্ষণে অপর সহকর্ম্মী সেই আঘাতকারী দেহরক্ষীকে নিহত করিল। রণজিতেরা তিন জনেই এক সঙ্গে দৌড়াইতে লাগিল। রণজিৎ সহকর্ম্মীকে বলিল, আঘাতের স্থানটা চেপে ধর, নাও এই রুমালটা। সেই যুবকটি গুলি-বিদ্ধ স্থানটি রুমাল দিয়া দৃঢ়ভাবে চাপিয়া ধরিয়া ছুটিতে লাগিল।

অকস্মাৎ এতগুলি গুলির আওয়াজে চারিদিক সচকিত হইয়া উঠিল এবং বিষম হট্টগোল পড়িয়া গেল। স্থানটা এমনিতেই জনাকীর্ণ, সহজেই ভিড় জমিয়া গেল। অনেকেই চীৎকার করিতে করিতে রণজিৎদের অনুসরণ করিল।

কথা ছিল কিছু দূরে একটা চৌ-রাস্তার মোড়ে পৌঁছিয়া উহারা উত্তর-পশ্চিম দিকের রাস্তায় যাইবে, সেখানে একটা পোলের উপর উহাদের জন্য অপেক্ষমাণ যুবকের হাতে হাতিয়ারগুলি অর্পণ করিয়া সাধারণ পথচারীর মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে। কিন্তু কিছু দূরে অগ্রসর হইয়া সেই পথে একটা ভিড় জমিয়া আছে দেখিয়া সেই দিকে যাইতে পারিল না, তখন দক্ষিণ দিকের রাস্তায় গেল। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া তাহারা ডানদিকে একটা গলিতে ঢুকিয়া পড়িল। খেয়াল ছিল না যে, এটা একটা কাণাগলি, গলির একদিক বন্ধ এবং সেখানেই গলির শেষ। কাজেই ফিরিতে হইল।

তাহারা ফিরিয়া বড় রাস্তার দিকে রওনা হইল। মনে হইল পলায়নের রাস্তা সবই বন্ধ। রণজিৎ বলিল, "চল, বাধা পেলে তিন জনে একসঙ্গে গুলি করতে করতে ভিড় ঠেলে চলে যাব। সকলে এক সঙ্গে চলো, কেউ ছিটকে পড়ো না, এদিক-ওদিক। একলা হয়ে পড়লে ধরা পড়ে যাবে। চলো।"

রণজিতেরা কাণাগলিতে ঢুকিয়া পড়ার পর অনুসরণকারীরা একটু হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল, রণজিতেরা হঠাৎ কোন দিকে গেল ঠিক বুঝিতে পারে নাই, তাহারা দ্বিধায় পড়িল কোন দিকে যাইবে। জনতার বেশীর ভাগ অন্যদিকে আকৃষ্ট হইল। কিছু কিছু লোক এদিক-ওদিক ছড়াইয়া পড়িল।

রণজিতেরা বড় রাস্তায় পড়িয়া আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল কেহ তাহাদের অনুসরণ করিতেছে না। তখন তাহারা আর না দৌড়াইয়া রিভলবার সহ হাত জামার নীচে ঢাকিয়া রাখিয়া রাস্তায় সাধারণ পথচারীর মত হাঁটিয়া যাওয়াই নিরাপদ মনে করিল। কিছুক্ষণ এগলি ওগলি ঘোরাফেরা করিল, কিন্তু তাহা করাও আর যুক্তিযুক্ত নয়, কেননা চতুর্দ্দিকে পুলিস বাহির হইয়া পড়িয়াছে নিশ্চয় এবং যাহাকে-তাহাকে ধরিয়া শরীর তল্লাসীও করিতেছে ভাবিয়া গলির অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া তাহার কাকার বাড়ীর পেছনের দেয়াল টপকাইয়া প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল এবং দেয়ালের অন্ধকারে দাঁড়াইয়া রহিল।

ঘটনাটা ঘটিয়াছিল রণজিতের কাকার বাড়ীর অনতিদূরে। তাহার কাকীমা গুলির এবং হট্টগোলের আওয়াজে সচকিত হইয়া বাড়ীর ছাদে উঠিয়া এদিক-ওদিক দেখিতে লাগিলেন। বাড়ীতে বড়দের মধ্যে তখন এক কাকীমাই ছিলেন। কাকা বাহিরে কোথায় গিয়াছেন। তিনি ছাদ হইতেই দেখিলেন যে, পুলিসের গাড়ী দ্রুতবেগে যাইতেছে। রণজিৎ বাড়ী নাই, গুলির আওয়াজ, পুলিস যাইতেছে, চারিদিকে হৈ-চৈ—কিসের এক অজানা আশঙ্কায় তাঁহার

মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি দোতলায় নামিলেন, বারান্দা হইতে বাড়ীর পিছন দিকে তাঁহার চোখ পড়িতেই তাঁহার মনে হইল অন্ধকারে যেন কয়েকজন লোক আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করিতেছে। আলো হাতে তিনি তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া আসিয়া হাঁক দিলেন—"কে ওখানে? কারা ওখানে দাঁড়িয়ে আছ, এদিকে এস।"

রণজিৎ বেগতিক দেখিয়া দৌড়াইয়া আসিয়া ইঙ্গিতে কাকীমাকে চুপ করিতে বলিয়া আলো নিবাইয়া দিল; বলিল, "কাকীমা, ওখানে আমার সঙ্গী দু'জন। চেঁচাবেন না। একটু দাঁড়ান।"

রণজিৎ মুহূর্ত্তে ফিরিয়া আসিয়া তিনটি রিভলবার ও কার্টিজ কাকীমার হাতে দিয়া বলিল, "এগুলো রেখে দাও সাবধানে। অন্য জায়গায় সরিয়ে ফেলার বন্দোবস্ত করছি, একটু পরেই নিয়ে যাব।" রণজিৎ এক পা অগ্রসর হইয়া পুনরায় বলিল, "আর দেখ, এগুলো তুমি নিজের কাছে যেন রেখো না, আমার বাক্সে রেখে দিও, আমি একটু ঘুরে এসে নিয়ে যাব।"

কাকীমা চাপা ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "থাম্, আর বাহাদুরি করতে হবে না! 'আমার বাক্সে রেখে দিও, ধরা পড়লে আমি পড়ব'—এই ত? হতভাগা কোথাকার! তোকে কিছু ভাবতে হবে না, কোথায় রাখব না রাখব সে দেখা যাবে'খন। কিন্তু এখন তোরা যাবি কোথায়! এখন যে চারদিকে বিপদ।"

"সে তুমি কিছু ভেব না, কাকীমা। আমাদের একজনের হাত দিয়ে ভীষণ রক্তপাত হচ্ছে, তার হাতে একটা গুলি লেগেছে কিনা! তাকে এখখুনি ডাক্তারের কাছে না নিয়ে গেলে ও আর পথ চলতে পারবে না। ও যে ক্রমশঃ দুর্ব্বল হয়ে পড়ছে। তুমি যদি খানিকটা ছেঁড়া কাপড় দাও কাকীমা।"

কাকীমা—"তা হলে যাবে কি করে? এখানেই রেখে দে। কেউ টের পাবে না, তোর কাকাও না, আমি ব্যবস্থা করব'খন।"

রণজিৎ—"তা হয় না কাকীমা। আমার জন্তই আমাদের বাড়ী নিরাপদ নয়! শীগ্‌গির তুমি কিছু ছেঁড়া কাপড় দাও, রক্ত চেপে রাখার জন্ত।"

কাকীমা—"এখন তাড়াতাড়িতে ছেঁড়া কাপড় কোথায় পাব। তুই আমার এই আঁচলের খানিকটাই নিয়ে যা।"—তিনি তাঁহার শাড়ীর আঁচলের খানিকটা ছিঁড়িয়া দিলেন।

উহারা তিন জনই বাহির হইয়া গেল। কাকীমার সমস্ত চিন্তা ঐ বাহিরের অন্ধকারে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। প্রতি আনাচে-কানাচে দেখিতে লাগিলেন, পুলিস যেন রণজিৎদের জন্ত ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে।

কিছুক্ষণ পর রণজিৎ অপর একটি লোককে সঙ্গে লইয়া আসিয়া তাঁহার হাতে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র দিল। রণজিৎ পরিচালকের নিকট সংবাদ দিতে গেল।

পরিচালক তাহাকে নীরবে স্মিতহাস্তে অভিনন্দন জানাইলেন। রণজিতের বুক আনন্দে নাচিয়া উঠিল। পরিচালক রণজিতের পৃষ্ঠে স্নেহস্পর্শ করিয়া তাহাকে নিজের খুব কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "রণু, কালই তোমার যেতে হবে। প্রস্তুত থেকো। ব্রিটিশের প্রধান মিলিটারী ঘাঁটির ভেতরে তোমাকে প্রবেশ করতে হবে! এ পথে প্রবেশ যত কঠিন, নির্গমন তদপেক্ষা দুরূহ, প্রায় অসম্ভব! আশীর্ব্বাদ করি, তোমার নিষ্ঠা সফল হউক!"

পরিচালক ও রণজিৎ উভয়েই কিছুক্ষণ নীরবে রহিলেন। পরিচালক ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা রণজিৎ, একটা কথা বল ত ভাই, কালই ঘর ছেড়ে যাবে, এক অজানা ভবিষ্যতের অন্ধকারে হয়ত বা তলিয়েই যাবে। মনে একটুও কষ্ট হবে না?"

রণজিৎ ধীরে সমস্ত কথা পরিষ্কার উচ্চারণ করিয়া বলিল, "দাদা, ভবিষ্যৎটা একেবারে যে কল্পনা করতে পারিনে তা নয়, তবে তার জন্তে মনে কোন বিভীষিকা নেই! চোখ খোলা রেখেই ত যাচ্ছি—এ ত আপনারই শিক্ষা! তবে ঘর ছেড়ে যেতে মনে একটু কষ্ট হবে, মার জন্ত, কাকীমার জন্ত, প্রিয় পরিজনদের জন্ত মনে একটু ব্যথা জাগবে বৈ কি। মনটা কখনও হয়ত ব্যথিত হবে, যাবার আগে এখন থেকেই তো একটু লাগছে। কিন্তু এ তো আমাদের সইতেই হবে, এটুকু মূল্য ত আমাদের দিতেই হবে।"

পরিচালক খুশী হইয়া বলিলেন, "রণজিৎ তুমি পারবে, তোমার মধ্যে শূন্যগর্ভ আস্ফালন নেই। সত্য স্বীকার করেই আমরা সত্য-পথে চলবার শক্তি পাব। আমার কাছে কেউ কেউ এসে আস্ফালন করে, আমার মধ্যে মায়া নেই, মমতা নেই, প্রেম নেই, ভালবাসা নেই, কোন দুর্ব্বলতা নেই, আমি সব করতে পারি ইত্যাদি। তাদের আমি দুর্ব্বল মনে করি, বিশ্বাস করিনে, তারা এক দিন ভেঙে পড়বে। ঘর থেকে যারা ঘটনাচক্রে বেরিয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছে, মাঝে মাঝে আমি তাদের বাড়ী পাঠিয়ে দিই। যদি বাড়ীর অসচ্ছলতা দেখে, প্রিয়-পরিজনের দুঃখ-দুর্দ্দশা দেখে তারা দুর্ব্বল হয়ে পড়ে, আর না ফিরতে চায়, তবে তাদের আমি সেই সুযোগ দিই। কেউ কেউ ফিরে আর আসে না। তারা ঠিক কাজই করে, মনে দুর্ব্বলতা নিয়ে সমিতির সক্রিয় সভ্য হলে এক দিন সবাইকে বিপদে ফেলবে। তার চেয়ে ফিরে যাওয়াই ভাল। অবশ্য কেউ কেউ বাড়ী থেকে সবল শক্ত হয়ে ফেরে, তারাই হ'ল আমাদের আদর্শ।"

রণজিৎ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া যেন হাওয়ায় উড়িয়া সকাল সকাল বাড়ী ফিরিয়া সকলের সঙ্গে একত্রে আজ বহুদিন পরে আহারে বসিল। আবার কবে কিংবা কোনদিনই আর এমনি করিয়া পরিজন-পরিবৃত হইয়া আহারের সুযোগ আসিবে কিনা কে জানে!

খাওয়া শেষ হইলে কাকীমা একান্তে আসিয়া রণুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁরে রণু, ছেলে দুটি খাবে কোথায়? তুই বরং কিছু খাবার দিয়ে আয়, আমি একটা টিফিন বাক্সে সব সাজিয়ে দিচ্ছি। ঘরে খাবার আছে, কোন অসুবিধা হবে না, আমি ত এখনও খাই নি। তুই যা খাবার নিয়ে।"

রণজিৎ বলিল—"তার প্রয়োজন হবে না কাকীমা, ওদের খাবার ব্যবস্থা আছে।"

কাকীমা আর একটু বসিলেন, কিসের এক অজানা আনন্দে ও আশঙ্কায় কাকীমার হৃদয় আজ উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। রণুর মাথা নিজের বুকে টানিয়া লইয়া সজল নয়নে কহিলেন—"বেঁচে থাক, বাবা বেঁচে থাক ; মা দুর্গা তোদের রক্ষা করুন।"

রণুর হৃদয় কাকীমার এই নব পরিচয়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। বিদায়ের মুহূর্ত্তে এই বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাহাকে বিস্মিত করিল, এই গৃহকে আজ স্বর্গ মনে হইল, এক অপার আনন্দে তাহার চোখ দিয়া দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল, সে কাকীমার পায়ের ধূলা মাথায় লইল।

৬

অতি ভোরেই রণজিতের ঘুম ভাঙ্গিল। ঘরের বাহিরে আসিতেই আজ তাহার কাছে পৃথিবী যেন নূতন রূপে দেখা দিল। ওই যে প্রভাত রক্তরাঙা হইয়া উঠিতেছে, এই যে ঠাণ্ডা হাওয়া ধীরে ধীরে তাহার শরীরের ক্লান্তি মুছিয়া দিতেছে, এই যে আত্মীয়স্বজন-পরিবৃত নিত্যকার গৃহ আজ তাহাকে নূতন করিয়া আকর্ষণ করিল! আজ সে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিল, গৃহত্যাগের সঙ্কল্প এক আর সত্যিকার ত্যাগের মুহূর্ত্ত আর এক। ক্ষণিকের জন্য তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। আজই হয়ত তাহাকে চিরতরে, এই গৃহ-প্রাঙ্গণ, পরিজনের স্নেহপূর্ণ পরিবেশ, সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া কঠিন ভবিতব্যের পানে পা বাড়াইতে হইবে। ভাবিতে ভাবিতে সদর দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া রকে উপবিষ্ট একটি যুবককে দেখিতে পাইল। এত ভোরে এক অপরিচিত যুবককে দেখিয়া গোয়েন্দার লোক বলিয়া সন্দেহ হওয়ায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কে? কাকে চান?"

—"এটা কি নৃপেন বাবুর বাড়ী?" আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিল।

—"আজ্ঞা হাঁ, ভেতরে আসুন।"

আগন্তুক কহিল—"আপনার নামটি কি জানতে পারি?"

"আমার নাম শ্রীরণজিৎকুমার মুখোপাধ্যায়।"

আগন্তুক রণজিতের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ তাহার হাত ধরিয়া আগ্রহভরা কণ্ঠে বলিলেন—"তবে আর প্রয়োজন নেই ভেতরে যাবার। আমি আপনাকেই চাই। যে কর্ত্তব্যের ভার নিয়ে এসেছি তা সম্পন্ন হলেই বিদায় নেব।"

রণজিৎ মনে করিল গোয়েন্দাই বটে! মনের ভাব গোপন করিয়া বলিল—"আপনার পরিচয় পেলাম না—আপনার কর্ত্তব্য কি তাও বুঝতে পারলাম না।"

"আমার নাম খগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। আপনাদের গাঁয়ের পাশাপাশিই আমাদের গাঁ।"

আগন্তুক হাসিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া, বার দুই কাসিয়া ধরাগলায় কহিতে লাগিল, "আমি প্রমীলাকে বিয়ে করেছিলাম—"

রণজিৎ চমকিয়া উঠিল—"এ্যাঃ আপনি! আসুন। সামনের ঐ পার্কটাতে বসি গে।"

পার্কে একটা বেঞ্চে বসিয়াই খগেন্দ্র বলিতে লাগিলেন, "হ্যাঁ, আমি, কিন্তু আমি তার স্বামী হতে পারি নি। বিয়ের দিন রাত্তিরে সব চুকে যাওয়ার পর বাসর-ঘরে এক কোণে বসে কাঁদছিল। ভেবেছিলাম—হয়ত সব কনের মতই বুঝি আত্মীয়-পরিজন ছেড়ে যাওয়ার দুঃখে—আর অনিশ্চিতের মধ্যে ঝাঁপ দেওয়ার আশঙ্কায় কাঁদছে। সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে কাছে গেলাম। অনেক বোঝাবার পর সে আমার পা ধরে বললে—"আপনি আমায় রক্ষা করুন।" আমি একটু আশ্চর্য্য হয়েছিলাম। তাকে বলেছিলাম আজ থেকে আমি তার স্বামী, তাকে সমস্ত আপদ-বিপদ থেকে রক্ষা করাই আমার কাজ। কিছুক্ষণ নীরব থেকে সে আমায় আবার বললে—'জানি আপনি আমায় বিয়ে করেছেন, আপনার কোন দোষ নেই। শুনেছি আপনি সজ্জন ও উদার। আপনাকে স্বামী বলে গ্রহণ করে যে কোন স্ত্রীলোক ধন্য হবে, কিন্তু আমার বিধিলিপি অন্য। বাল্যকাল থেকে আমি যাঁকে হৃদয়ে স্বামী বলে গ্রহণ করেছি—না হোক মন্ত্র পড়ে তাঁর সঙ্গে বিয়ে, কিন্তু তিনিই ত আমায় প্রকৃত স্বামী! তাঁকে ছাড়া ত আমি আর কাউকে স্বামী বলে গ্রহণ করতে পারব না। আমাকে আপনার রক্ষা করতে হবে—এই আমার শেষ অনুরোধ।'

"দু'তিন মিনিট বাসর-ঘর নিস্তব্ধ। আমি দেখতে পেলাম—তার দুটি আকুল চোখ মিনতিভরা দৃষ্টিতে আমার উপর নিবদ্ধ। ভগবান এই কি পরিহাস আমার জন্য জমা রেখেছিলেন! প্রমীলাকে কথা দিয়েছিলাম—বেশ তাই হবে। তুমি আমি আজ থেকে পরস্পরের বন্ধু হয়েই রইলাম। ভগবান আমাদের শান্তি দিন! প্রমীলার চোখে তখন অজস্র ধারায় জল নেমেছে, সে আমায় প্রণাম করে বললে, ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। এর পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত, ক্রমে প্রমীলা অসুস্থ হয়ে পড়ল—এর কারণ আমাদের বাড়ীর আর কারুর কাছে অবিদিত থাকলেও আমার অজানা ছিল না—কেন এই আত্ম-নিগ্রহ। ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে এল দেহ—এক দিন আমায় চুপি চুপি ডেকে বললে, ওগো বিয়ের দিন রাত্তিরে তোমায় আমি অনুরোধ করেছিলাম তুমি সে অনুরোধ আমার রক্ষা করেছ, আজ আমার পৃথিবীর নিশ্বাস ফুরিয়ে আসছে। আজ আবার তোমার কাছে আমার শেষ অনুরোধ—আমার এ আংটি তাঁর হাতে দিও, এই আমার শেষ ইচ্ছা। আর একটা কথা, তুমি আবার বিয়ে করো, আমায় তুমি মন্ত্র পড়ে বিয়ে করলেও আমি তোমার হতে পারি নি। এতে তোমার কোন অন্যায় হবে না।"

কথা কয়টা শেষ করিয়াই রণজিতের হাতে আংটিটা গুঁজিয়া দিল! কোন উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই হন্ হন্ করিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

সন্ধ্যার পর রাওয়ালপিণ্ডীর গাড়ী ছাড়ে। পরিচালকের নিকট

হইতে সমস্ত প্রয়োজনীয় নির্দেশ লওয়ার পর রণজিৎ কহিল, "দাদা এই আংটিটা আপনি রাখুন। এ জিনিষ আমার অতি প্রিয়, একে নিয়ে কোথায় ঘুরব, ধরা পড়লে শত্রু এর মর্য্যাদা রাখবে না। এ আমি সইতে পারব না। এতে সামান্ত কিছু টাকা হবে। সমিতির কাজে লাগিয়ে এর মর্য্যাদা রক্ষা করবেন, আমি তাতেই ধন্ত হব।"

পরিচালকের কোন প্রকার প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বেই রণজিৎ পথে নামিয়া গিয়াছে—তাহাকে আর দেখা যায় না।

ধূমপানে পৃথিবী

শ্রীঅঞ্জনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ধূমপানের দিক থেকে দেখতে গেলে আমেরিকাই পৃথিবীর অন্যান্য দেশকে পথ দেখিয়েছে। শুনতে পাওয়া যায়, আমেরিকা থেকে কলম্বাস সর্ব্বপ্রথম ইউরোপে তামাক আমদানী করেছিলেন। আমাদের দেশে তামাক আমদানী হয় ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। পর্ত্তুগীজ বণিকেরাই সম্ভবতঃ প্রথম এদেশে তামাক নিয়ে আসেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ক্রিমিয়া যুদ্ধের সময় থেকেই সিগারেট জনপ্রিয় হতে থাকে। ইংলণ্ডের ইতিহাসের পাতায় এমন প্রমাণও মেলে যে, ইংলণ্ডের সপ্তম এডওয়ার্ড ও ফ্রান্সের নেপোলিয়ন সিগারেটকে জনপ্রিয় করে তুলতে বিশেষ সহায়তা করেন। পৃথিবীর তিন স্থানে খুব উৎকৃষ্ট তামাক উৎপন্ন হয়—আমেরিকার ভার্জ্জিনিয়াতে, গ্রীসের মেসেডোন অঞ্চলে এবং রাশিয়ার কৃষ্ণসাগরের উপকূলে। ভারতে প্রধানতঃ ভার্জ্জিনিয়ার সিগারেটই ব্যবহৃত হয় এবং অল্প কিছু গ্রীসেরও হয়ে থাকে। কিন্তু গ্রীসের তামাক এখানে টার্কিস বা ঈজিপ্সিয়ান নামে পরিচিত। কারণ গ্রীস যখন তুর্কীর অধীন ছিল, তখন গ্রীসের সমস্ত তামাকই তুর্কীরা নিয়ে আসত।

দেশ-বিভাগের পূর্ব্বে তামাক-উৎপাদনে পৃথিবীর মধ্যে ভারতের স্থান ছিল দ্বিতীয়। তখন ভারতে দশ লক্ষ একর জমিতে তামাকের চাষ করা হ'ত এবং বৎসরে ৮০০০ লক্ষ পাউণ্ড তামাক উৎপন্ন হ'ত। দেশ-বিভাগের পরে তামাক-উৎপাদনে পৃথিবীর মধ্যে ভারতের স্থান হয়েছে তৃতীয়। বর্ত্তমানে এদেশে ০'৮০ একর জমিতে তামাকের চাষ হয় এবং ৫৫০০ লক্ষ পাউণ্ড তামাক উৎপন্ন হয়। বর্ত্তমানে পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী তামাক উৎপন্ন হয় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে, তারপর চীনে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র ৮০ লক্ষ একর জমিতে তামাকের চাষ হয়; তন্মধ্যে অর্দ্ধেকের বেশী চাষ হয় আমেরিকা, চীন ও ভারতে। বিগত কয়েক বৎসরে বিভিন্ন দেশে কি পরিমাণ তামাক উৎপন্ন হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত তালিকা নিয়ে প্রদত্ত হ'ল:

দেশের নাম:	উৎপাদন: (দশ লক্ষ পাউণ্ড হিসাবে)	
	১৯৪৯-৫০	১৯৫০-৫১
আমেরিকা—	১,৯৭২	২,০৩৬
ভারত—	৫০০	৫৪০
তুর্কী—	২২৫	২০৩
কানাডা—	১৪০	১২১
দক্ষিণ রোডেসিয়া—	১০৭	৮৪
দক্ষিণ আফ্রিকা—	৪৯	৪৫
গ্রীস—	১১	১১৬

১৯৫০-৫১ সনে ভারতে ৭,৭৪,০০০ একর জমিতে তামাক-চাষ হয় এবং ৫৪০০ লক্ষ পাউণ্ড তামাক উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে একমাত্র মাদ্রাজেই আছে প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ তামাক-চাষের জমি এবং ১৯৫০-৫১ সনে এখানে ২৪১ পাউণ্ড তামাক উৎপন্ন হয়। মাদ্রাজের পরেই বোম্বাই ও বিহারের স্থান। ভারতের মোট তামাক-চাষের মধ্যে শতকরা ৩৬ ভাগই একত্রে বোম্বাই ও বিহারে হয়।

ভারতীয় তামাকের অধিকাংশই আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় এবং খুব সামান্ত পরিমাণই বিদেশে রপ্তানী করা হয়। ১৯৫০ সনে ৮৯০ লক্ষ পাউণ্ড কাঁচা তামাক বিদেশে রপ্তানী করা হয়। ১৯৪৮ সনে ইহার পরিমাণ অর্দ্ধেকেরও কম ছিল। ভারত থেকে মোট যে পরিমাণ তামাক রপ্তানী হয় তন্মধ্যে অধিকাংশই (শতকরা ৭১ ভাগ) ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়। অন্যান্য কোন্ দেশে কি পরিমাণ রপ্তানী হয় তাহার কয়েকটির পরিমাণ নিয়ে প্রদত্ত হইল:

পাকিস্থান—	৫'৭
মিশর—	৩
এডেন—	২'৮
বেলজিয়ম—	২'০

ভারতীয় তামাকের চাহিদা ইংলণ্ডেই বেশী। ইংলণ্ড নিজস্ব প্রয়োজনীয় আমদানী তামাকের মধ্যে শতকরা ১০ ভাগ ভারতের নিকট হতে ক্রয় করে এবং ৫১ ভাগ কেনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। পৃথিবীতে তামাকের শুধু যে উৎপাদনই বাড়ছে তা নয়, ব্যয়ও দিন দিন বাড়ছে। পনর বৎসর বয়সের উপরে জনপ্রতি গড়ে বৎসরে কি পরিমাণ তামাক ব্যয় হয় তাহার হিসাব নিয়ে দেওয়া হ'ল:

দেশ	বৎসর	পাউণ্ড
আমেরিকা	১৯৫০	১০'২
নেদারল্যাণ্ডস	ঐ	৯'১
ভারত	ঐ	৮'২
ডেনমার্ক	ঐ	৭'৪
কানাডা	ঐ	৭'২
নিউজিল্যাণ্ড	১৯৪৯	৭'২
আইরিশ রিপাবলিক	১৯৫০	৬'৭
বেলজিয়াম	ঐ	৬'৬
সুইজারল্যাণ্ড	ঐ	৬'৩
অষ্ট্রেলিয়া	১৯৪৯	৫'৭
যুক্তরাজ্য	১৯৫০	৫'৬
দক্ষিণ আফ্রিকা	ঐ	৪'৪
	১৪৯	৪'০
সুইডেন	১৯৫০	৩'৯
ফ্রান্স	ঐ	৩'৬
অষ্ট্রিয়া	ঐ	৩'২
তুর্কী	ঐ	৩'২
ইটালী	ঐ	২'৫

সিগার ও সিগারেট শিল্পের সম্বন্ধেও দু'একটা কথা বলা হচ্ছে। সিগার প্রস্তুতের ক্ষেত্রে ভারতের স্থান ব্রহ্মদেশ, কিউবা, জামাইকা, হল্যাণ্ড, আমেরিকা, ব্রাজিল ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের সমস্তরে। ভারতের মধ্যে একমাত্র মাদ্রাজের ত্রিচিনোপল্লী, ওয়ারিয়ার, দিণ্ডিগুল এই কয়টি শহরেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সিগার প্রস্তুত হয়। স্পেন্সার কোম্পানীর বিখ্যাত সিগার এই দিণ্ডিগুলেই প্রস্তুত হয়। এই স্পেন্সার কোম্পানীর কারখানায় ১৯৩৯ সনে ১৭০ জন শ্রমিক কাজ করত। ১৯৪৪ সনে এর সংখ্যা হয়েছিল ৪৩৭ জন। সিগার মাদ্রাজের ত্রিচিনোপল্লী, ওয়ারিয়ার এই দুটি শহরে এবং হায়দরাবাদেই অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হয়। এটি মাদ্রাজের কুটীর-শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। বর্ত্তমানে মাদ্রাজে সাতটি চুরুটের কারখানা আছে। ত্রিচিনোপল্লী ও ওয়ারিয়ারে ৪০০টি ও দিণ্ডিগুলে পনেরটি সিগারের কারখানা আছে। উড়িষ্যা এবং পশ্চিমবঙ্গেও চুরুট এবং সিগার প্রস্তুত হয়। মাদ্রাজে মাথাপিছু বৎসরে ৩৭২টি সিগার খরচ হয়। সমগ্র ব্রহ্মদেশে খরচ হয় ৫৪৭টি। ভারতে ও ব্রহ্মদেশে সিগার ও চুরুট হাতেই তৈরি করা হয়। কিন্তু হল্যাণ্ড, আমেরিকা এবং পাশ্চাত্যের আরও কয়েকটি দেশে সিগার ও চুরুট প্রস্তুতের জন্য যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়। শুধুমাত্র সিগার ও চুরুট তৈরি করবার জন্যই ভারতে বিগত কয়েক বৎসরে নিম্নলিখিত রূপ তামাক ব্যয় হয়ঃ

১৯৪৭-৪৮—	৪৯'৩৯	(দশ লক্ষ পাউণ্ড হিসাবে)
১৯৪৮-৪৯—	৫২,৫৯	,, ,,
১৯৪৯-৫০—	৪৯'১০	,, ,,

ভারতে খুব কমই সিগার আমদানী হয়। যে সকল দেশ ভারতকে সিগার পাঠায় তন্মধ্যে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জই প্রধান; তার পরে যুক্তরাজ্য, হংকং, নেদারল্যাণ্ডস এবং কিউবা। কিউবা-সিগার (হাভানা সিগার) পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হয়। বিগত কয়েক বৎসরে ভারতে সিগার আমদানীর হিসাব নিম্নলিখিত রূপঃ

বৎসর	ওজন (পাউণ্ড)	মূল্য (টাকায়)
১৯৪৪-৪৫	৯৪৪	৩৮৩
১৯৪৫-৪৬	৮৩	১,৬২৬
১৯৪৬-৪৭	৮,৭৬১	১,১০,৪৩৭
১৯৪৭-৪৮	৯,৬৪১	৯৫,৮০৬
১৯৪৮-৪৯	২,৪৮০	১৮,০১৬
১৯৪৯-৫০	১১,১৬৮	৬১,১৪৪

মাদ্রাজ প্রদেশে যত সিগার প্রস্তুত হয় তার অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানী হয়। কিন্তু আমদানীকারক দেশের শুল্কবৃদ্ধি ও সিগারের চেয়ে সিগারেটের ব্যবহার বেশী বলে গত কয়েক বৎসরে ভারতের তামাক-রপ্তানীর পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। তার সংক্ষিপ্ত হিসাব নিম্নে দেওয়া হ'লঃ

বৎসর	ওজন (পাউণ্ড)	মূল্য (টাকায়)
১৯৪৪-৪৫	২১,৯৮০	১,৫৩,৫১১
১৯৪৫-৪৬	৩৯,২৫৩	২,০১,৫৫৩
১৯৪৬-৪৭	৯৩,৩৮৯	৪,৯৯,৭৪১
১৯৪৭-৪৮	৫২,৪০৬	৩,৬৪,৩৪৫
১৯৪৮-৪৯	৬৫,৯০৩	৩,৫৮,৯৭৪
১৯৪৯-৫০	১৬,৭৮৪	৮৭,৪৫৩

এবার সিগারেটের কথা। আগেই বলেছি সিগারেট খাওয়ার ব্যাপারে জগতের অন্যান্য দেশের পথপ্রদর্শক আমেরিকা। আজ আমেরিকার ৬০,০০০,০০০ জন ধূমপায়ী বৎসরে ৪০০ বিলিয়ন সিগারেট খায়। প্রত্যেক বৎসরে নূতন ধূমপায়ীর সংখ্যা হয় ৮০০,০০০ জন করে। সেখানে প্রত্যেকে গড়ে দিনে ১৯টি সিগারেট খায়। বৎসরে সেখানে তামাকের জন্য ব্যয় হয় ১,৯০৭ কোটি টাকা। আমাদের পক্ষে এ এক অভাবনীয় ব্যাপার।

কয়েক বৎসর যাবৎ ভারতে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে, সিগারেট খাবার বহর বেড়ে যাচ্ছে। ১৯৩৪-৩৫ সনের হিসাব থেকে দেখা যায় যে, অবিভক্ত ভারতে প্রতিটি লোক বৎসরে ২০টি সিগারেট খরচ করত। তন্মধ্যে মাথাপিছু আসামে ৪৪টি, বোম্বাইয়ে ৪১টি, বরোদায় ৩৯টি, মহীশূরে ৩৭টি, হায়দ্রাবাদে ৩০টি, পঞ্জাবে ২০টি, বাংলায় ১৯টি, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও কাশ্মীর এই কয়টি প্রদেশের প্রত্যেকটিতে ১৫টি এবং যুক্তপ্রদেশে ও মাদ্রাজে প্রত্যেকটিতে ২০টি। ভারতে বৎসরে গড়ে সিগারেট প্রস্তুতের সংখ্যা নিম্নলিখিত রূপঃ

বৎসর	সংখ্যা (দশ লক্ষের হিসাবে)
১৯৪৬	২৩,৮২১
১৯৪৭	১৮,৮৭৯
১৯৪৮	২১,৮২৫
১৯৪৯	২১,৮৯১
১৯৫০ (প্রথম দশ মাস)	১৯,৫৮৫

বৎসরে ভারতে প্রায় ৩০ হাজার কোটি সিগারেট প্রস্তুত হতে পারে। প্রতি বৎসর কিছু সিগারেট ভারতে আমদানী করা হয়। গত কয়েক বৎসরের আমদানীর পরিমাণ ও মূল্যতালিকা নিয়ে দেওয়া গেল :

বৎসর	পরিমাণ (দশ লক্ষ পাউণ্ড হিসাবে)	মূল্য
১৯৪৫-৪৬	০'১২	৮'৯৭
১৯৪৬-৪৭	০'৯৪	৭৩'৪৪
১৯৪৭-৪৮	১'০৯	৮৪'৫২
১৯৪৮-৪৯	০'৭৯	৬৪'৮০
১৯৪৯-৫০	০'১১	১১'০৯

প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই ভারত প্রচুর পরিমাণে সিগারেট আমদানী সুরু করে। কিন্তু ১৯৩০-৩১ সন থেকে আইন-অমান্য আন্দোলনকে উপলক্ষ করে সমগ্র ভারতে ব্যাপকভাবে বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জনের জন্য যে আন্দোলন সুরু হয়, তার ফলে সিগারেটের আমদানী প্রচুর পরিমাণে কমে যায়। তখন থেকে এ-দেশেই দেশবাসীর চাহিদা অনুপাতে সিগারেট প্রস্তুত হতে লাগল। বর্ত্তমানে ভারতের চাহিদার শতকরা ৯৯ ভাগ সিগারেট ভারতেই তৈয়ারি হয়। এখনও কিছু পরিমাণ সিগারেট প্রধানতঃ যুক্তরাজ্য থেকে আমদানী করা হয়। ১৯৪৮-৪৯ সনে এই আমদানীর পরিমাণ শতকরা ৯৩'৭ এবং মূল্য শতকরা ৯৫'০ হয়েছিল।

এ ছাড়া ভারতের সিগারেট বিদেশে যে একেবারে রপ্তানী হয় না এমন নহে। ভারতের সিগারেট বেশীর ভাগ সিংহল ও পাকিস্থানেই রপ্তানী হয়। বিগত কয়েক বৎসরের রপ্তানীর তালিকা দেওয়া গেল :

বৎসর	পরিমাণ	মূল্য (লক্ষ টাকা)
১৯৪৪-৪৫	০'১২	৩'০০
১৯৪৫-৪৬	০'০৩	০'৮৮
৯৪৬-৪৭	০'৭৯	৫৫'৭৭
১৯৪৭-৪৮	০'২৮	২৬'৯১
১৯৪৮-৪৯	১'৮৪	১৪৭'৯০
১৯৪৯-৫০	১'৩১	৫০'৯১

সিগারেটের তামাকের পাউডারের উপরে যে সাদা কাগজ থাকে তাকে বলা হয় "টিস্যু পেপার"। এই টিস্যু পেপার আমদানী করা হয় যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, যুগোস্লাভিয়া ও আমেরিকা থেকে। গত তিন বৎসর যাবৎ ভারতের রাণীগঞ্জে ঈষ্টার্ণ টিস্যুজ্ লিমিটেড কোম্পানী এই 'টিস্যু পেপার' তৈয়ার করায় বিদেশ থেকে এর আমদানী অনেক কমে গেছে। উক্ত কোম্পানী বার্ষিক এই কাগজ ৪৮০ টন প্রস্তুত করে। সম্প্রতি 'ত্রিবেণী টিস্যুজ্ লিমিটেড' নামে এর আরও একটি কারখানা খোলা হয়েছে। আশা করা যায়, এটি ৩০০০ টন 'টিস্যু পেপার' তৈরি করতে পারবে। বর্ত্তমানে ভারতে মোট ১,৪০,০০০ ববিন সিগারেটের কাগজ তৈয়ারি হয়। কিন্তু এতে মোট চাহিদার মাত্র শতকরা ৫০ ভাগ পূরণ হয়। এই গেল ভারতের তামাক-শিল্পের অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থা। ভারতে তামাকের যেরূপ ব্যাপক প্রচলন, তাহাতে এদেশে এই শিল্পের আরও উন্নতি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

জানাই তোমারে প্রাণের প্রীতিটি

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

বন্ধু, আজিও ভোল নিক' মোরে—বড় লাগে বিস্ময়,
ঝরা বকুলের সুরভিতে—ভরা এখনো যে বনতল ;
সূর্য্য গিয়াছে—গোধূলির আভা তবুও আকাশময়,
উপরে বালুকা, নিম্নে বক্ষ, অবারিত, উচ্ছল !

জীবনে তোমার নব রূপায়ণ এসেছে অনেক দিন,
সমারোহ তার কত সঙ্গীত রচেছে তোমারে ঘিরে ;
নূতন প্রীতির নব অনুরাগে বেজেছে হৃদয়-বীণ্,
মূর্চ্ছনা তার রাঙায় তোমার সকাল-সন্ধ্যাটিরে।

তবুও যে দেখি ভোল নিক' তুমি গেয়ে আসা গানখানি,
সে যে গো এখনো ঝঙ্কার তোলে মনের নিভৃত পুরে,
এখনো যে দেখি পুরানো দিনের সঞ্চিত যত বাণী
জানায় তোমারে অভিনন্দন অতি পরিচিত সুরে।

আজি অবেলায় ডেকেছ বন্ধু, তারি বুঝি অনুরাগে,
গোধূলির সোনা, সকরুণ আলো লেগেছে বিশ্বময়।
তোমার প্রাণের স্বর্ণদীপ্তি আমার আঁখিতে জাগে,
আকাশে-বাতাসে তাই কি তোমার শুনিতেছি—জয় জয়।

বন্ধু, তোমার অতুলন প্রীতি স্বর্গের সুধা-ধারা,
একখানি যেন অরূপরতন জীবনের সরণিতে ;
স্মরণে যে তাই ভরে ওঠে মন, হই যে আত্মহারা—
কত সঙ্গীত, ফোটে যে কুসুম মরুময় ধরণীতে !

বন্ধু, আমার প্রাণের প্রীতিটি জানাই তোমারে আজ,
জানাই তোমারে বিপুল শ্রদ্ধা অন্তরখানি ভরি' ;
আমার চিত্ত-বীণার তন্ত্রী গাহিবে সকাল-সাঁঝ,
যে সুরে বাঁধিলে আজিকে আবার অতীত দিনেরে স্মরি'।

অম্বিকাচরণ উকীল ও বাংলায় সমবায় আন্দোলন

শ্রীসারদাচরণ চক্রবর্ত্তী

স্বাধীন ভারতে আজ যখন দেশের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও উন্নতিকল্পে বিভিন্ন পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য্য চলিতেছে, তখন স্বদেশী যুগের কর্ম্মবীর অম্বিকা উকীলের কথা স্বতঃই মনে হয়। দেশ তাঁহার নিকট যে কত ঋণী, তাঁহার সংক্ষিপ্ত কর্ম্মবহুল জীবন-কথা আলোচনা করিলে তাহা সহজে প্রতীয়মান হইবে। ছাত্রাবস্থা হইতেই তিনি সমবায়-নীতির একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। এম-এ পাস করিয়া তিনি বাঁকীপুর জাতীয় বিদ্যালয়ে ১৮৯০ সনে কাজ আরম্ভ করেন। ব্যবহারিক প্রয়োগ হিসাবে এ সময় তিনি সমবায়-নীতিতে সেখানে একটি পুস্তক বিভাগ খোলেন। অল্প সময় মধ্যেই তাঁহাকে কলিকাতায় আসিতে হয়। যে-কোন রকম সমবায় প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের জন্য সূচনাতে সংশ্লিষ্ট সভ্যদের স্বার্থত্যাগ, পরিশ্রম ও অনুরাগ প্রয়োজন। এগুলি না থাকিলে ইহা গড়িয়া উঠে না। বিশেষতঃ সমবায়-নীতি বিষয়ে জ্ঞান থাকা অপরিহার্য্য। ইহা বুঝিয়া অম্বিকাবাবু দেশে এ বিষয়ে শিক্ষা-প্রসারের জন্য বিদেশ হইতে বহু পুস্তক আনাইয়া বিভিন্ন লাইব্রেরী ও ক্লাব প্রতিষ্ঠা করিয়া সেগুলিতে এতদ্বিষয়ক আলোচনার প্রবর্ত্তন করেন। এ সময়ে তিনি ইংলণ্ডের ইণ্টারন্যাশনেল কো-অপারেটিভ অর্গ্যানাইজেশনের সহিত যোগ রাখেন এবং ভারতের অবস্থানুযায়ী প্রযোজ্য সমবায়-প্রতিষ্ঠান বিষয়ে তথাকার প্রসিদ্ধ *Millgats Monthly Co-operative News* পত্রিকায় নিয়মিতভাবে লিখিতে আরম্ভ করেন।

১৮৯৩ সনে তিনি কলিকাতা শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীটে পায়োনীয়ার্স কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিমিটেড নামক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সমবায়-ভাণ্ডারে সংসারের নিত্যপ্রয়োজনীয় চাল, ডাল, তেল, লবণ, গুড়, চিনি, ঘৃত প্রভৃতি মজুত রাখিয়া নিকটবর্ত্তী কয়েকটি সাধারণ সরকারী হিন্দু হোষ্টেলে বাজারদরে সরবরাহ করা হইত। পরে ইহাতে কাগজ, কলম, পেন্সিল প্রভৃতি ষ্টেশনারী দ্রব্যও রাখা হইত। ইহার লভ্যাংশ অংশীদার ভিন্ন সমবায়-নীতি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্ম্মচারী, ক্রেতা প্রভৃতির মধ্যেও বণ্টন করা হইত। এই জন্য অল্প কালের মধ্যে ইহার বিশেষ উন্নতি হয়। ইহার সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া অম্বিকাবাবু অল্প মূল্যে সাধারণের মধ্যে বিখ্যাত গ্রন্থাবলী ও সমবায় বিষয়ক পুস্তকাদি প্রচারের উদ্দেশ্যে ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশন সোসাইটি লিমিটেড নাম দিয়া একটি সমবায়-প্রতিষ্ঠান গঠিত করেন। এখান হইতে *Co-operative Review* নামক একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ময়মনসিংহের গৌরীপুরের দানবীর জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী তাঁহাকে নগদ টাকা ও মুদ্রাযন্ত্র প্রভৃতি দিয়া তাঁহার যাবতীয় কার্য্যে আনুকূল্য করিয়াছেন।

ইংলণ্ড, জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশে তৎকালে সমবায়-প্রতিষ্ঠানের বিশেষ উন্নতি হইলেও ভারতবর্ষে তখন ইহা ছিল নূতন। ইহার আদর্শ ও নীতি প্রচারের জন্য ইংলণ্ডের রবার্ট ওয়েনের আদর্শে মাদ্রাজ, বোম্বাই, এলাহাবাদ, কাশী, কলিকাতা, ঢাকা প্রভৃতি শহরের কেন্দ্রস্থলে উত্তম গৃহ সংগ্রহ করিয়া স্থানীয় বিশিষ্ট লোকেদের

অম্বিকাচরণ উকীল

লইয়া তিনি কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। এই সকল ক্লাবে সমবায় নীতি-বিষয়ক বহু পুস্তক, পত্রিকা এবং দৈনিক কাগজ রাখা হইত। ইহার অধিকাংশ ব্যয়ভার অম্বিকাবাবু নিজে বহন করিতেন। এ সময়ে তিনি নিউ ইয়র্ক ইনস্যুরেন্স কোম্পানির পূর্ব্ববাংলার চীফ এজেন্টরূপে কার্য্য করেন। এই কার্য্যোপলক্ষে তিনি ভারতের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেন বলিয়া এ সকল বিভিন্ন ক্লাবের উদ্যোগে প্রতি দুই-এক মাস অন্তর সভাসমিতি করিয়া বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ তাঁহার হইত। এ সময়ে তিনি নিজ নামে প্রতি মাসে কোম্পানীকে ন্যূনকল্পে এক লক্ষ টাকার কাজ দিতেন। কাজেই নিজের কাজের জন্য এবং পূর্ব্ববঙ্গের চীফ এজেন্ট হিসাবে তাঁহার মাসিক তিন-চার হাজার টাকা আয় হইত। এই আয় হইতে তিনি নিজের জন্য মাত্র দুই-তিন শত টাকা রাখিয়া বাকী সকল অর্থই সমবায়-নীতি প্রচারে ব্যয় করিতেন। এ সময়ে তিনি মাদ্রাজে 'টি প্লিক্যান আরবান্ কো-অপারেটিভ সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের একটি বড় সমবায় প্রতিষ্ঠান। তিনি যে বীমা কোম্পানীকে লক্ষ লক্ষ টাকার কাজ সংগ্রহ করিয়া দিতেন, তাহাদিগকে এই অর্থ বীমাকারীর উপকারে বিনিয়োগ করার একটি পরিকল্পনা দেন। বীমা কোম্পানী ইহাকে কার্য্যকরী এবং অর্থবিনিয়োগের নিরাপদ পন্থা স্বীকার করিলেও ভারতবর্ষে এ প্রকার পরিকল্পনানুযায়ী কাজ করিবেন না বলিয়া মতপ্রকাশ করেন।

ইহা লইয়া কর্ত্তৃপক্ষের সহিত মতদ্বৈধ হওয়ায় অম্বিকাবাবু এই কোম্পানীর কাজ ছাড়িয়া দেন। তিনি যাহাতে কর্ম্মত্যাগ না করেন সেজন্য আর্থিক উন্নতির প্রলোভন দেখানো হয়, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহার সঙ্কল্প অটুট থাকে। যে-কোন সংসারী লোকের পক্ষে এত বড় একটা স্থায়ী আয় ত্যাগ করিয়া অনিশ্চিতের মধ্যে ঝাপাইয়া পড়া যে কত দুরূহ তাহা ভাবিতে গেলে অবাক হইতে হয়। বিশেষতঃ তিনি সমবায়-নীতি প্রচারের জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করার দরুন কিছুই সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। এই কর্ম্মত্যাগের পর জীবিকার জন্য প্রথমে তিনি মেট্রোপলিটান কলেজে, পরে কাশী সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজে অধ্যাপনার কাজ গ্রহণ করেন এবং দেশে একটি নূতন বীমা কোম্পানী গঠন বিষয়ে চেষ্টা করিতে থাকেন। এ সময় স্বদেশী আন্দোলনের মরশুমের জন্য বাংলায় এপ্রকার বীমা কোম্পানী গঠনের পক্ষে অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছিল। অম্বিকাবাবু কাশী হইতে কলিকাতা চলিয়া আসেন এবং দুই-একটি টিউশনি করিয়া নিজের খরচ চালাইয়া বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠা বিষয়ে তৎপর হইয়া উঠেন। ১৯০৭ সনে তিনি হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড নাম দিয়া এই প্রসিদ্ধ বীমা কোম্পানীর কাজ আরম্ভ করেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে ও আনুকূল্যে ঠাকুরবাড়ীর কয়েকখানি ঘরে বিনা ভাড়ায় প্রথম ইহার কর্ম্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা হয়। অম্বিকাবাবু সংগঠক বা অর্গ্যানাইজার হিসাবে, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর জেনারেল সেক্রেটারী ও শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী কোষাধ্যক্ষ রূপে ইহার কাজের সূচনা করেন। প্রথম অবস্থায় ইঁহাদের কেহই কোন পারিশ্রমিক লইতেন না। বীমাকারীরা প্রয়োজনানুসারে সুবিধা দরে বিভিন্ন কিস্তিমত মাসিক ভাড়া দিয়া যাহাতে নিজেদের বসবাসের জন্য বাড়ীর মালিক হইতে পারে, সে বিষয়ে বিভিন্ন পরিকল্পনানুযায়ী এই কোম্পানীর অর্থবিনিয়োগের ব্যবস্থা হয়। এজন্য বালিগঞ্জ, মনোহরপুকুর প্রভৃতি অঞ্চলে নামমাত্র মূল্যে (বিঘা প্রতি ১০০৲ হইতে ২০০৲ পর্য্যন্ত) বিস্তীর্ণ জমি খরিদ করা হয়। সে সময় ঐ সকল স্থান কর্পোরেশনের এলাকাধীন ছিল না। সমবায়-নীতিতে কোন রেল-ষ্টেশনের নিকটে জনবিরল স্থানে বহু জমি লইয়া তাহার উন্নতিবিধান ও রাস্তা-ঘাট, জলের সুবিধা করিয়া কলোনি আকারে স্কুল, ক্লাব, ডাক্তারখানা প্রভৃতির ব্যবস্থা করতঃ একত্রে কতকগুলি বাড়ী নির্ম্মাণ স্বল্প ব্যয়সাপেক্ষ। ব্যক্তিগত চেষ্টায় বিচ্ছিন্ন ভাবে ঐ প্রকার বাড়ী করিতে তাহার বহুগুণ খরচ লাগা স্বাভাবিক। কাজেই এই প্রকার গৃহনির্ম্মাণের জন্য বীমা কোম্পানীর বাড়ী প্রস্তুত খরচের টাকার সুদ এবং আসল টাকার পরিমাণ জীবন-বীমা করিয়া দীর্ঘ মেয়াদী প্রিমিয়াম চালাইয়া আসল শোধ করিতে পারিলেই ক্রমে যে কেহ সহজে বাড়ীর মালিক হইতে পারে। সুদ ও প্রিমিয়াম বাবদ, বাড়ী দখল করিয়া যে টাকা প্রতি মাসে দিতে হইবে, সেই ভাড়াতে ব্যক্তিগত ভাবে কোন গৃহস্বামী এ প্রকার বাড়ীভাড়া দিতে সক্ষম হইবে না।

বীমাকারীদের সুযোগ-সুবিধাই অম্বিকাবাবুর সকল কর্ম্মপ্রচেষ্টার প্রধান লক্ষ্য ছিল। কাজের দ্রুত প্রসার ও উন্নতির সহিত বীমাকারীদিগেরও বিশেষ সুবিধা হইবে বিশ্বাসে তিনি কম্বাইণ্ড পলিসি নামে নূতন প্রণালীতে এক রকম বীমার প্রচলন করেন। অর্গ্যানাইজার হিসাবে তাঁহাকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে সর্ব্বদা ঘোরাফেরা করিতে হইত বলিয়া তাঁহার পক্ষে বীমা সংক্রান্ত খুঁটিনাটি কাজ দেখা সম্ভব হইত না। তিনি যখন মাদ্রাজে কোম্পানীর কাজে ব্যস্ত, তখন তাঁহার উদ্ভাবিত কম্বাইণ্ড পলিসি বীমা কোম্পানীর কার্য্যের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হইতেছে বলিয়া সংবাদ পান। পরবর্ত্তী জীবনে বিখ্যাত নলিনীরঞ্জন সরকার ইতিপূর্ব্বেই সাধারণ কর্ম্মী হিসাবে এই সোসাইটির কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

মাদ্রাজ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর অম্বিকাবাবু বুঝিতে পারেন যে, অন্যান্য সাধারণ বীমা কোম্পানীর মত ইহাতেও সমবায়-নীতিকে উপেক্ষা করিয়া বীমাকারীদের সুবিধার জন্য বিশেষ কিছু করা হইতেছে না। সমবায়-নীতির উপকারিতা এবং ইহার অত্যুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সোসাইটির অন্যান্য কর্ম্মীদের আস্থা ছিল না। তাহাদের ইহার তাৎপর্য্য বুঝিবার জন্য পর্য্যন্ত কোন আগ্রহ না থাকায় শেষ পর্য্যন্ত তিনি এই সোসাইটির কার্য্য চার বৎসর অতিক্রান্ত না হইতেই পরিত্যাগ করেন। এ সময়ে (১৯১১ সনে) তিনি সমাজ-উন্নয়নের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া ত্রিশ কোটি টাকা মূলধন ধার্য্য করিয়া "ধর্ম্ম সমবায় লিমিটেড" প্রতিষ্ঠান রেজিষ্টারী করতঃ কার্য্য আরম্ভ করেন। "Financial System Suited to an Organised Scheme of Rural Reconstruction," "সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা" প্রভৃতি প্রবন্ধে তিনি নানা বিষয় বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেন। এ সময়ে তিনি হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেডও প্রতিষ্ঠা করেন। "A Scheme of Federal Banking Organisation" প্রবন্ধে এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করেন। উক্ত "ধর্ম্ম সমবায় লিমিটেড" প্রতিষ্ঠানটির সাধু উদ্দেশ্য বুঝিয়া বহু জ্ঞানী ও ধনী ব্যক্তি তাঁহার কার্য্যে প্রভূত সহায়তা করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে দানবীর মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, মনোমোহন ভট্টাচার্য্য, বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম্. পি, বিনয়কুমার সরকার, শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উক্ত ধর্ম্ম সমবায় কোম্পানীর প্রথম কার্য্য—কলিকাতার উপকণ্ঠে একটি গো-শালা স্থাপন এবং কর্পোরেশন আপিসের সান্নিধ্যে প্রকাণ্ড 'সমবায় সৌধ' নির্ম্মাণ। ধর্ম্ম-সমবায়ের যে সকল অংশীদার কলিকাতায় থাকিতেন তাঁহাদিগকে টাকায় /৫ সের হিসাবে খাঁটি দুধ সরবরাহ করা হইত। সমবায়-সৌধের বিভিন্ন অংশে অপেক্ষাকৃত কম ভাড়ায় তাহাদিগকে থাকিবার ও ব্যবসার জন্য ঘর দেওয়া হইত।

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে সমবায় নীতি সম্বন্ধে সে সময়ে অল্প লোকই চিন্তা করিত। বাস্তবিক সমবায়-নীতি অনুযায়ী কর্ম্ম-প্রচেষ্টায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ 'সকলের তরে

সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'—এই নীতিতে উদ্বুদ্ধ হইলেই বেং সহজে কার্য্যসিদ্ধি ও উন্নতি হয়, তখন এবংবিধ চিন্তা-প্রণালী ও শিক্ষার বিশেষ অভাব ছিল। এই মনোভাবের পরিবর্ত্তনসাধনের অভিপ্রায়ে অম্বিকা বাবুর সহকর্ম্মিগণ সকলেই অংশীদারদিগকে কি ভাবে অধিকতর লাভ দেওয়া যায় সেই উদ্দেশ্য লইয়াই কার্য্য করিতেন। কিন্তু সমবায়-নীতি অনুযায়ী গঠিত প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট কর্ম্মচারী, অংশীদার, ক্রেতা, গ্রাহক, বীমাকারী সকলেরই যে ইহার উন্নতি ও লাভে স্বার্থ আছে তাহা লোকে বুঝিতে চাহিত না। ধর্ম্ম-সমবায়ের সাধারণ ক্রেতা কিংবা অংশীদার রূপে কলিকাতায় থাকিয়া টাকায় /৫ হিসাবে দুধ পাওয়া—কিংবা অপেক্ষাকৃত কম ভাড়ায় ঘর পাওয়া এবং সংশ্লিষ্ট কর্ম্মচারীদের বেতনের উপর বোনাস বা লভ্যাংশ প্রাপ্তি সকলেই স্বাভাবিক প্রাপ্য হিসাবে গ্রহণ করিত। এ সকল সুবিধা স্থায়ী ভাবে পাইতে হইলে নিজ প্রতিষ্ঠান মনে করিয়া যে অধিকতর ত্যাগ ও পরিশ্রম আবশ্যক তাহা কেহই ভাবিত না। কো-অপারেটিভ পায়োনিয়ার্স সোসাইটি, হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনস্যুরেন্স সোসাইটি লিমিটেড, হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড, ধর্ম্মসমবায় লিঃ প্রভৃতির সহিত কো-অপারেটিভ কথা সংযুক্ত থাকিলেও, এগুলি সবই ১৯১২ সনের কো-অপারেটিভ আইন-প্রণয়নের পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, যৌথ কারবার হিসাবে জয়েন্ট-ষ্টক কোম্পানিজ এক্ট অনুযায়ী রেজেষ্টারীকৃত। কাজেই সমবায় নীতি অনুসরণ বিষয়ে আইনতঃ বাধা না থাকায়, এগুলি তাঁহাদের উদ্দেশ্য ও আদর্শ রক্ষা করিতে পারে নাই। অম্বিকাবাবু অটুট স্বাস্থ্য ও মনোবল লইয়া সমবায় নীতির প্রচার ও প্রসারকল্পে নানা রকম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দীর্ঘকাল অমানুষিক পরিশ্রম করেন, ফলে শেষ পর্য্যন্ত তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। এ সময়ে বিশ্রামের অবকাশ না পাওয়ায় তাঁহার রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায় এবং দৈন্যদশায় পতিত হইয়া তিনি কয়েক মাস ভোগেন। এ সময়ে তিনি ধর্ম্মসমবায়ের কাজই করিতেছিলেন। সমবায়-নীতি বজায় রাখিয়া দীর্ঘদিন কাজ চালানো সম্ভব হইবে না—ইহা বুঝিতে পারিয়া এ বিষয়ে সহকর্ম্মীদের উদাসীনতা লক্ষ্য করিয়া তিনি অংশীদারদের অধিকাংশ অর্থ যথাসাধ্য ফেরত দেন এবং সমবায় সৌধটি ঋণের দায়ে হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনস্যুরেন্স সোসাইটির হাতে তুলিয়া দেন। জীবনের শেষ কয়েক মাস গুরুতর অসুস্থতা ও দৈন্যের সময়, তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনস্যুরেন্স সোসাইটি তাঁহাকে কোন রকম সাহায্য দিয়াছে বলিয়া অবগত নহি। যদিও এই সময় উক্ত প্রতিষ্ঠানের অবস্থা উন্নত ও বেশ সচ্ছল হইয়াছিল। তাঁহার কোন প্রতিমূর্ত্তি এখনও সেখানে স্থান পায় নাই। নানারকম দুরবস্থার মধ্যে মৃত্যু আসিয়া ১৯২৩ সনে জুলাই মাসে তাঁহার দীর্ঘ কর্ম্মজীবনের উপর ছেদরেখা টানিয়া দিল।

এই কর্ম্মবীরের স্মৃতিরক্ষার জন্য দেশের কল্যাণকামী ব্যক্তিদের তৎপর হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

শরতে

শ্রীঅনিলকুমার চক্রবর্ত্তী

শরৎ নীলাকাশে জলদ নাহি ভাসে
বিহরে শশধর তারকা সাথে;
মরালী সুশোভিত তড়াগ হরে চিত
যেন বা মকরত রূপালী রাতে।
শেফালি শ্বেত বাসে, পাদপ বুকে হাসে
বন ও উপবনে শরৎ রাতে;
বিহগ কলরব করিয়া অনুভব
নবীন অনুরাগে হৃদয় মাতে।
ছাতিম ফুলে ফুলে পাখীরা পড়ে ঢুলে
কেতকী নীপ-বালা স্বরূপহারা;
ময়ূর নাচ ভুলে, চাহে না মুখ তুলে
বহে না যেন দেহে জীবনধারা।

গগন নিরমল শরতে সুবিমল
শীতল যামিনীতে বিমল রাকা;
ধবল কাশফুলে, তটিনী কূলে কূলে
শ্যামল ক্ষেত সিত কুসুম ঢাকা।
গগন-ভালে চাঁদ; মানে না আলো-বাঁধ
শিশির বরিষণে হৃদয়হরা;
নয়ন নন্দিত মানস আকুলিত
রজত কিরণেতে হাসিছে ধরা।
কার না হরে মন কমল অগণন
বাঁধুলি ফুলে রাঙা শ্যামল ভূমি!
ক্ষেতে ও পাকা ধান গগনে মেঘ-যান
কেমন শোভমান দেখ না তুমি!

দেশান্তরে

শ্রীশান্তা দেবী

আমি যে কখনও আমেরিকা যাব তা ভাবি নি। কিন্তু দৈবচক্রে তা হয়ে গেল। আমেরিকা বিষয়ে কোন কথা লিখতে গেলে লোকে পলিটিক্‌স্‌টাই বড় করে লেখে এবং পাঠকরাও সেইটাই বড় করে দেখেন। কিন্তু এমন অনেক মানুষ আছে যারা জীবনে পলিটিক্‌স্‌ চর্চ্চা করে নি এবং সেই দৃষ্টি দিয়ে মানচিত্রকে ও মানবজাতিকে ভাগ করে দেখে না। তাদের কাছে পৃথিবীর বৈচিত্র্য অন্য রকমের এবং তারা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই মানুষের মধ্যে একটা ঐক্য দেখতে পায় ও চায়। অবশ্য সে সব মানুষ সাধারণ মানুষ। তাদের জীবনযাত্রার রূপ আমাদের সঙ্গে কোথায় মেলে আর কোথায় মেলে না এটা সাধারণ মেয়েমা দৃষ্টিতে দেখলে একটা রস পাওয়া যায়।

আমরা আমেরিকান জাহাজ কনষ্টিটিউশনে নেপল্‌স থেকে চড়ে নিউ ইয়র্ক যাত্রা করি। খুব মস্ত জাহাজ, কত তলা যে তার ঠিক নেই। সারাদিন নেপল্‌স বন্দরে হয়রান হয়ে অনাহারে চারটার সময় জাহাজে উঠলাম। হয়রানিটা অনেকটা আমাদের অজ্ঞতা এবং অনেকটা জাহাজঘাটের অব্যবস্থার জন্য। যাদের উপর কাজের ভার তারা আমাদের কথা কিছু বোঝেও না, নিজে থেকে কিছু করেও দেয় না। যাই হোক, অনেক জায়গায় অন্ধকারে মাথা ঠুকে ঠুকে অবশেষে আমরা যথাস্থানে এসে পৌঁছলাম।

জাহাজে ভীষণ রকম খেতে দিল। আমরা যা খাই তার চারগুণ হবে। নিগ্রো আর Mulato ষ্টুয়ার্ডরা পরিবেশন করছে। লোকগুলির চেহারা বেশ ভাল, সবাই কালোও নয়, লম্বাচওড়া সুপুরুষ। তবে সকলেরই চুল কোঁকড়ানো। জাহাজে অনেক মেক্সিকান ষ্টুয়ার্ড ইত্যাদি আছে। আমি কিন্তু তাদের ঠিক চিনতে পারতাম না।

জাহাজ যখন ছাড়ল তখন তীরের দর্শকরা কাগজের রঙীন ফিতা ছুঁড়ে ছুঁড়ে জাহাজ বাঁধছিল। জাহাজের গতির সঙ্গে সঙ্গে দর্শক ও যাত্রীদের ফিতার বন্ধন এক এক করে ছিঁড়ে যেতে লাগল। যদিও একটা বিদেশ থেকে আর একটা বিদেশে যাচ্ছিলাম, তবু বাঁধন ছেঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনটা খারাপ হয়ে গেল। বহু ইটালিয়ান চাকরি-বাকরির জন্য আমেরিকা চলেছে, তাদের চোখে জল আর ডাকাডাকির ব্যগ্রতা দেখে আরও দুঃখ হচ্ছিল। অনেক স্ত্রীলোক অঝোরে কাঁদছে, বলছে, 'মাকে দেখো, বাবাকে দেখো' ইত্যাদি। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সবাই রুমাল নাড়ছে, জাহাজও যত সরে আসছে তারাও তত এগিয়ে এগিয়ে আসছে। শেষে আর দেখা গেল না।

সর্ব্বপ্রথম ভাব হ'ল এক ব্রিটিশ বৃদ্ধার সঙ্গে। তিনি প্রথমে ডাঙ্গা থেকেই আমাদের পথঘাট চিনতে অনেক সাহায্য করেছিলেন। তারপর খাবার টেবিলে আলাপ হ'ল এক আমেরিকান পরিবারের সঙ্গে। মা বাবা আর ছেলে মেয়ে। মেয়েটির সাজসজ্জা সবই আছে, কিন্তু কেমন যেন শুকনো ফুলের মত একটা ধরণ। পরে জানলাম এই বয়সেই বিধবা। একজন সমপাঠীকে বিয়ে করেছিল, সে যুদ্ধে গিয়ে টি. বি. ব ধিয়ে মারা যায়। এখন মেয়েটি স্কুলে চাকরি করে। ছেলেটি রোমান ক্যাথলিক পাদ্রী হবে ঠিক করেছে। বেশ বাঙালী ব্রাহ্মণের মত দেখতে। বাবা মা অন্যান্য দেশের বৃদ্ধবৃদ্ধাদের মতই। বৃদ্ধ আলাপ হবামাত্র মেয়েদের বিবাহের খবরাখবর নিতে লাগলেন। তাঁর স্ত্রী বললেন, "থাক, তোমাকে আর ঘটকালি করতে হবে না।"

নেপল্‌স্‌ ছাড়বার পরদিনই জেনোয়া পৌঁছলাম। এ শহরটাও দেখবার ইচ্ছা ছিল, তাই জাহাজ থেকে নেমে পড়ে হাঁটতে লাগলাম। বেশী সময় হাতে ছিল না, তাই ট্রামে বাসে চড়বার চেষ্টা করলাম না। পথগুলি পাহাড়ের পথের মত, কোথাও সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়, কোথাও বা চাল্‌ গলির মত রাস্তা। কিছু পথ উঠেই ক্রিষ্টফার কলম্বাসের মূর্ত্তির কাছে এলাম। গ্লোব, কম্পাস ও বই সমন্বিত মূর্ত্তি। মূর্ত্তির নীচে চারধারে চারটি পাথরে খোদাই ছবি। ক্রিষ্টফার বিজ্ঞ ব্যক্তিদের গ্লোব দেখিয়ে পৃথিবীর উল্টা দিকের কথা বলছেন প্রথম ছবিতে। দ্বিতীয়টিতে ক্রিষ্টফারকে জাহাজের বিদ্রোহীরা চেন দিয়ে বাঁধছে এবং একজন দূরে জমি দেখতে পেয়ে তাঁর কাপড় চুম্বন করে অভিনন্দন জানাচ্ছে। তৃতীয়টিতে ক্রিষ্টফারকে স্পেনের রাণী আমেরিকা দান করছেন এবং শেষ ছবিতে ক্রিষ্টফার লাল ইণ্ডিয়ানদের সামনে ক্রশ পুঁতছেন। যে দেশে চলেছি সে দেশ-আবিষ্কারকের মূর্ত্তি দেখে, একটু বাজারে গেলাম।

কি দারুণ বাজার! চুল কাটতে ৭০০ লিরা নিল, অর্থাৎ ৫॥০ টাকা আন্দাজ। কয়েকটা কাগজ আর খাম কিনলাম ৬০০ লিরা দিয়ে। রাস্তায় এক দল লোক ক্যামেরা নিয়ে চলেছিল, তারা ভারতীয় মেয়ে দেখে আমার মেয়েদের ছবি তুলতে আরম্ভ করল। সেদিন ওখানে কোন নামজাদা লোকের মৃত্যু হয়েছিল! ইউনিভার্সিটির সামনে কফিন

গাড়ী এবং লোকে লোকারণ্য ! সেইখানেই এক ইটালিয়ান আমাদের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিল, সে নাকি ভারতবর্ষে অনেক দিন ছিল। বলল, "আমি তোমাদের গাইড হয়ে সব দেখিয়ে দেব। তাকে সঙ্গে নিলে তার কিছু রোজগার হ'ত, আমাদেরও কিছু দেখা হ'ত। কিন্তু আমাদের জাহাজ ছেড়ে যাবে, সময় হ'ল না ঘোরবার। কাছাকাছি বোমা-বিধ্বস্ত বড় গির্জ্জা ও ভাঙা ভাঙা ঘরবাড়ী দেখে কিছু লিরা বদলে ১½ ডলার মাত্র সংগ্রহ করে জাহাজে ফিরে এলাম। ডলারহীন অবস্থায় আমেরিকায় নেমে কি দুর্গতি হবে ভেবে পাচ্ছিলাম না, অথচ ইটালীর হোটেল থেকে লিরা বদ্‌লে ১৬ ডলারের বেশী জোগাড় করে উঠতে পারি নি। যাকে বলে কপর্দ্দকহীন অবস্থা ! দেশ থেকে যেটুকু ডলার নেবার অনুমতি পেয়েছিলাম তা নিউ ইয়র্কে নেমে ব্যাঙ্কে গিয়ে তবে পাওয়া যাবে। তার আগের খরচগুলো কি প্রকারে হবে জানি না।

জাহাজে ফিরে অনেক দূর পর্য্যন্ত সমুদ্রের ধারে রিভিয়েরা দেখতে দেখতে চললাম। ধনী বিলাসীদের অবসরযাপনের ক্ষেত্র ! বিকালে ক্যানেস এ পাদ্রী যুবক ও তার বাবা, মা, বোন সবাই নেমে গেলেন। তাঁদের বদলে আমাদের টেবিলে এক দল শিক্ষার্থী ফরাসী (?) নাবিক খেতে বসল। এরা অনেকেই ইংরেজী বলতে পারত না। ফ্রেঞ্চ জানে, তাই না বুঝে না, ডঃ নাগকে ফ্রেঞ্চ ভাষায় জিজ্ঞাসা করে নিত। ব্রিটিশদের উপর এদের ভীষণ রাগ। একটা ছোট ষোল-সতের বছরের ছেলে জিব্রল্টারে ব্রিটিশ দেখবে বলে মহা উৎসাহিত। সে গলায় একটা সোনার মাদুলীর মত পরে থাকত; ইটালীতেও অনেক লোককেই ঐ রকম মাদুলী পরে বেড়াতে দেখতাম। ছেলেগুলি প্রায়ই আমার মেয়েদের জিজ্ঞাসা করত, "তোমরা কেন টিপ পর ?" তাতে তাদেরই দলের একজন মাদুলী-পরা ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কেন মাদুলী পর ?" তখন সে চুপ হয়ে গেল।

এই জাহাজে রোজ সন্ধ্যায় সিনেমা দেখা'ত। কোন কোন ছবি বেশ সুন্দর। কোন কোনটা বড় বেশী অসভ্যের মত। তা দেখে তাদের দেশের একজন ছেলে লজ্জিত হয়ে মুখ নীচু করে বলল, "এই রকম ত আর সত্যি হয় না।" জাহাজে শুধু যে সিনেমা দেখায় তা নয়, এদের প্রতিদিন সুন্দর ছাপা খবরের কাগজ বেরোয়, ক্যাথলিক প্রোটেষ্টাণ্ট এবং ইহুদীদের উপাসনা হয়। বিউটি পার্লার এবং ডাক্তারের পরামর্শের ব্যবস্থা আছে। নাচ, গান, ফ্যান্সি ড্রেস এবং ডেকের নানা রকম খেলা ত আছেই। পাশ্চাত্ত্য জগতের আধুনিক মেয়েদের পুরাকালের মত সভ্যতার আদর্শ আর নেই। কাজেই মেয়েদের অঙ্গে পরিধের বস্ত্রের অভাব আমাদের বড় দৃষ্টিকটু লাগে।

বয়স্কা মহিলাদের আমাদের সম্বন্ধে কৌতূহল খুব উগ্র। আমরা কোন রাজবংশের লোক কিনা তাও কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করলেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান খুবই কম, হয়ত কোথাও কেউ শুনে থাকবেন—বাংলাদেশে বিধবারা সাদা কাপড় পরে। তাই আমরা যখন যে রকম রঙের কাপড় পরতাম, প্রত্যেকটা রঙের বিশেষ কি অর্থ তাঁরা জানতে চাইতেন। কপালের টিপ ত প্রায় সকলেরই কাছে একটা তাজ্জব জিনিষ। তার উপর আমরা আরও বিস্ময় উৎপাদন করতাম সারাদিন শাড়ী পরে থেকে। শাড়ীটা একটা সখের জিনিষ, সন্ধ্যায় একবার পরে ডিনার খাওয়া চলে এ পর্য্যন্ত তাঁরা বুঝতেন, তার চেয়ে বেশী শাড়ীটা সত্যই অসাধ্য সাধন।

যেদিন আমরা জিব্রল্টারে এলাম সেদিন বেশ একটা দেখবার মত জিনিষ হ'ল। সকালে ব্রেকফাষ্টের পর ডেকে গিয়ে দেখলাম চারধারে বড় বড় হোস পাইপ লাগানো এবং তা দিয়ে ক্রমাগত সমুদ্রেই জল ফেলা হচ্ছে। প্রথমতঃ এ রকম ভাবে তেলা মাথায় তেল দেওয়ার মানে বুঝতে পারলাম না। তারপর দেখি অনেকগুলো লোক নৌকায় করে জাহাজের দিকে আসছে। প্রত্যেক নৌকাতে তিন চার জন লোক। পাইপের জল তাদের গায়ে গিয়ে পড়ছে এবং বেচারীদের স্নান হয়ে যাচ্ছে। শুনে বোক হলাম যে ইচ্ছা করেই ওদের গায়ে জল ঢালা হচ্ছে। একে coldwar বলা যেতে পারে! ওরা গতে আগের কারে জাহাজে নিষিদ্ধ জিনিষ ঢোকায় তাই নাকি এই ব্যবস্থা। ভাল মন্দ নির্বিচারে সকলের গায়ে জল পড়তে লাগল। তাদের অবস্থা দেখে বড় খারাপ লাগছিল। তারা কিন্তু বেপরোয়া। ভিজে কাপড়েই তারা জাহাজে জিনিষ বিক্রী করতে লাগল। ক্রেতারাও নাছোড়বান্দা, ক্রমাগত ডাকাডাকি করছে এবং জিনিসের দর করছে। জলে চব্‌চবে হয়ে ভিজে তারা কাগজে ব্রেসলেট মুড়ে মুড়ে জাহাজে ছুঁড়ে দিতে লাগল। এক ডলারে পাঁচটা ব্রেসলেট। অনেকে গোছা গোছা কিনল। তারপর কাগজে মুড়ে ডলার ছুঁড়ে নৌকায় ফেলে দিল। এত কষ্ট সহ্য করে কতটুকুই বা লাভ বেচারীদের।

যাত্রীদের কারুর জন্মদিন থাকলে জাহাজে জন্মদিনের কেক করে বাতি জ্বালিয়ে তাকে উপহার দেয়। যার জন্মদিন সে বাতি নিবিয়ে কেক কাটে, তারপর সব লোক মিলে 'It's a happy birthday to you' করে গান করে।

এদিকে সমুদ্র খুব শান্ত, ঢেউ মোটে নেই, দূরে দ্বীপ বা জাহাজ কিছুই দেখা যায় না। খালি জল আর জল। ডেকটা খুব বড় এবং মাথার উপরটা একেবারে খোলা বলে সমুদ্রের চারধার বেশ বিরাট বাটির কানার মত দেখা যায়। রোদ থাকলে বেশ রোদ পোয়ানো যায়। জাহাজের মেয়েরা কেউ

সারাদিন সাঁতারের পুকুরে স্নান করে, কেউ রোদে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকে, কেউ বা অতি স্বল্পবাসা হয়ে ঘুরে বেড়ায়। বুড়োদের এ সবে তত উৎসাহ নেই, তারা গল্পগাছা করে।

ফ্যান্সি ড্রেস নাচে পোশাক তেমন কিছু ভাল হয় না, তবে নাচটা যেমন হোক হয়। ভাল নাচতে যে কেউ জানে তা মনে হ'ল না। তবে যে যাকে পাচ্ছে গলা জড়িয়ে একটু নেচে নিচ্ছে। এক জন ছেলে খদ্দর পাঞ্জাবী ও টুপি পরে জবাহরলাল নেহরু সেজেছিল, একটি মেয়ে শাড়ী পরে কমলা নেহরু সেজেছিল। মেয়েটি দেখতে নেহরুদের মত খানিকটা। যে সে দুই-একটা প্রাইজ পেল, কিন্তু কি গুণে যে পেল বুঝলাম না।

আমেরিকানদের সংসারে ছোট ছেলেপিলে খুব বেশী। তাই বোধ হয় জাহাজেও অনেক কাচ্চাবাচ্চা। তাদের দেখবার জন্য অনেকগুলি নার্স আছে। কিন্তু তারা খুব সম্ভব ছেলে আগলাতে হলে যথেষ্ট পয়সা নেয়। তাই নার্সদের কাছে ছেলেপিলে দিতে কাউকে বড় দেখি না। ছোট ছোট মায়েরা নিজেরাই সারাদিন ছেলেপিলে সামলে বেড়াত, মায়ের অসুখ-বিসুখ করলে বাপেরা ছেলের খাওয়া-দাওয়া দেখত। পরে এদের দেশে থেকে দেখেছি কেমন অনায়াসে চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ের কাজ মায়েরা সর্ব্বদাই করে। তবে শিশুরাও খুব অল্প বয়স থেকে আত্মনির্ভরতা শেখে।

ইস্রায়েলের কয়েকটি ইহুদী মেয়ে আমেরিকায় পড়তে যাচ্ছে। নিজের দেশে ওরা আজকাল সৈন্য-বিভাগেও কাজ করে। এদের মধ্যে একটি মেয়ে দেশে ফিরে গিয়েছিল সেখানে রাস্তা তৈরি প্রভৃতি কাজে সাহায্য করতে। নোংরা মাটি ঘেঁটে তার সমস্ত গায়ে খোসপাঁচড়া বেরিয়ে গিয়েছে। এখন আবার আমেরিকা ফিরে চলেছে পড়াশুনা করবার জন্য। মেয়েটি শিশুকালে রুশ-ভাষা বলত, তারপর জার্মান বলত। কিন্তু হিটলার যুগের জন্য সাত বৎসর বয়সেই জার্মান ভাষা ছেড়ে দিয়েছিল। এখন সে ইংরেজী বলে, তবে অন্য ভাষা দুটোও জানে।

আর একটি মেয়ে সৈন্য-বিভাগে কাজ করত, এখন পড়াশুনার জন্য আমেরিকা চলেছে। আরব দেশীয় ছেলে জনকয়েক আছে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানলাভের চেষ্টায় ওদেশে চলেছে।

ভগবান! তুমি এলে মানুষের রূপে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

মহা করুণার মহা প্রবাহের সাথে
কত দুর্দ্দিনে, কত দুর্যোগ-রাতে,
ভগবান! তুমি এলে মানুষের রূপে,
সৌরভ তব বহে জীবনের ধূপে।
হৃদি মন্দিরে ইন্দীবরের সম,
বিভূতি তোমার হেরি পুরুষোত্তম।
সুন্দর ওগো! ধরণীর যত ব্যথা
তোমার মাঝারে হ'ল কি কল্পলতা?

দুরা-দুর্জ্জয় সংসারে অবিরত
ঝঞ্ঝাতাড়িত চ্যুত পত্রের মত
শত শত প্রাণ পথে প্রান্তরে রহে,
তুমি দয়া ক'র, বারে বারে তারা কহে।
পুলক-শঙ্কা আলোক-ছায়ায় ভরা
অসীম কালেরে আবেশ দিলে কি ধরা?
জীবের লাগিয়া আসিতেছ যুগে যুগে,
ধরার বেদনা ধরেছ কি নিজ বুকে?

মায়ামৃগ পানে নিষাদের মত মন
সদা ছুটিতেছে, সংসার বন্ধন
আমারে ভুলায়ে রেখেছে, তাই তো আমি
তোমারে পূর্ণ পাই না জীবন-স্বামী।
দেহে মনে তব স্পন্দন জাগে নিতি,
সকল মন্ত্রে তব বোধনের গীতি—
সকল ধ্বনিতে বাণীর মিনতি তব,
বিরহে মিলনে কেন জাগে অভিনব?

পরম পুরুষ নিত্য প্রকাশময়,
প্রিয়তমা সম তোমাতে ধরণী রয়।
চিদাভাস আর মনোবিলাসের মাঝে,
তোমার সত্তা-মৃণাল-সূত্র রাজে।
ভূমার মাঝারে যেথায় সমাধিভূমি,
আত্মদীপের প্রাণশিখা হয়ে তুমি
হৃদয়-গগনে চিত্তের সীমাতীত,
ধ্যানের গুহায় রয়েছ কি সচকিত!

উদয়শঙ্করের সঙ্গে পশ্চিম যাত্রা

শ্রীস্মৃতি চক্রবর্ত্তী

ছোটবেলা থেকে নৃত্যকলার চর্চ্চা করে আসছি একাগ্র নিষ্ঠায়—বড়দি স্নেহ চক্রবর্ত্তী এ বিষয়ে আমার প্রথম প্রেরণাদাত্রী। বাবাও এই কলাবিদ্যার চর্চ্চায় উৎসাহ দিয়ে এসেছেন বরাবর। কলারসিক হিসেবে রসজ্ঞ মহলে আমার পিতা শ্রীযুক্ত বরদাচরণ চক্রবর্ত্তীর প্রতিষ্ঠা আছে।

১৯৪৯ সালের মে মাস। নূতন নৃত্যসম্প্রদায় গঠন করবার জন্যে উদয়শঙ্কর কলকাতায় এসে অবস্থান করছেন টালিগঞ্জে তাঁর শ্বশুর শ্রীযুত অক্ষয় নন্দী মশায়ের বাসায়। উদ্দেশ্য—নৃত্যসম্প্রদায়সহ লণ্ডন হয়ে আমেরিকা যাত্রা।

ইতিপূর্ব্বে 'অভ্যুদয়' এবং 'স্বর্ণভূমি' এই দুটি নৃত্যনাট্যে অংশ গ্রহণ করে কলারসিক মহলে কতকটা পরিচিতি লাভ করেছিলাম, উদয়শঙ্করের প্রযোজিত 'কল্পনা'র সহকারী সঙ্গীত-পরিচালক জিতেন মল্লিক মশায়ের সঙ্গে আমাদের পরিবারের কতকটা ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তিনিই এক দিন নিয়ে এলেন অপ্রত্যাশিত সংবাদ: উদয়শঙ্কর ডেকে পাঠিয়েছেন—আমাদের দুই বোনের নাচ দেখতে চান। শুনে খুশী হলাম, কিন্তু কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগল, বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৃত্যবিদের সামনে আমাদের নৃত্যটা না শেষ পর্য্যন্ত ডাঙ্গায় তোলা কই মাছের নৃত্যের মত হাস্যকর হয়। যাই হোক, দুরু দুরু কম্পিত বক্ষে নির্দ্দিষ্ট সময়ে গিয়ে পৌঁছলাম টালিগঞ্জের বাসায়। প্রসন্ন হাস্যে আমাদের স্বাগত করলেন উদয়শঙ্কর। নিতান্ত সাদাসিধে পোশাক, গায়ে একটি গেঞ্জি। তাঁর সহজ সরল নিরাড়ম্বর ভাব দেখে আমাদের সকল সঙ্কোচ দূর হয়ে গেল। আমাদের নাচ দেখে তিনি খুব খুশী, প্রচুর উৎসাহ দিলেন। তখনই তাঁর দলের সঙ্গে আমাদের পশ্চিম যাত্রার কথাবার্ত্তা সব পাকাপাকি হয়ে গেল। আমার বাবা বললেন, "মেয়েরা টাকা-পয়সা চায় না। আপনার সঙ্গে যেতে পারাটাই তো ওদের মস্ত বড় সৌভাগ্য।" উদয়শঙ্কর মৃদু হেসে বললেন, "টাকা আর কি? মেয়েরা লজেঞ্চুস খাবার মত কিছু পাবে।"

উদয়শঙ্করের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা ফিরে এলাম। তার পর সুরু হ'ল পশ্চিমযাত্রার জন্য আগ্রহাকুল প্রতীক্ষা। দিন যেন আর ফুরোয় না। অবশেষে মাসখানেক পরে মাদ্রাজ থেকে যেদিন এল চুক্তিপত্র সেদিন আমাদের আনন্দ দেখে কে? মে মাসে আমরা মাদ্রাজ চলে গেলাম। সেখানে কয়েক মাস রিহার্স্যাল দিয়ে কলকাতায় এলাম। অক্টোবরের শেষ থেকে নবেম্বরের গোড়ার দিক পর্য্যন্ত নিউ এম্পায়ার ও ছায়ায় নৃত্যপ্রদর্শন হ'ল। নবেম্বরের মাঝামাঝি আমরা কলকাতা পরিত্যাগ করে বোম্বাই গিয়ে পৌঁছলাম।

ব্রহ্মদেশীয় নৃত্যে, লেখিকা

বোম্বাই থেকে ১৭ই নবেম্বর ষ্ট্রাথার্ড জাহাজে আমরা বিলাতের পথে পাড়ি দিলাম। আমরা সবসুদ্ধ ছিলাম চৌদ্দ জন। উদয়শঙ্কর ইতিমধ্যেই আমাদের দুই বোনকে বেশ স্নেহের চক্ষে দেখতে সুরু করেছিলেন। তিনি আমাদের ঠিক নিজের ছোট বোনের মত দেখতে লাগলেন। আমরাও তাঁকে দাদা বলে সম্বোধন সুরু করলাম—আর তাঁর পত্নী অমলা শঙ্করকে ডাকতে আরম্ভ করলাম দিদি বলে। এঁদের একমাত্র সন্তান আনন্দকেও এঁরা এই নৃত্যাভিযানে সঙ্গে নিলেন। আমি এবং আমার বড় বোন প্রীতি চক্রবর্ত্তী ছাড়া অমলা শঙ্করের ছোট বোন গীতা নন্দী ও দীপ্তি ঘোষ এই দু'জন মেয়ে আমাদের সম্প্রদায়ে ছিলেন।

জাহাজে বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে আমাদের দিন কাটতে লাগল। বাইরে দিন রাত শুধু একই দৃশ্য—মাথার উপরে নিঃসীম নীলাকাশ, আর নিম্নে তরঙ্গবিক্ষুব্ধ নীল সমুদ্রবারির অনন্ত প্রসার—সমুদ্রের তরঙ্গ-নৃত্যে যেন নটরাজের প্রলয়-

একটি শহরের মত বিরাট ভবনটি দেখে বুঝতে পারলাম ! এ যে একেবারে কল্পনাতীত ব্যাপার !

নিউইয়র্কে তখন সুরু হয়ে গেছে আসন্ন বড়দিন উৎসবের তোড়জোড়। বাড়ীটার সামনেই একটা অত্যুচ্চ পাইন-গাছকে সাজানো হয়েছে সেলুলয়েডের বেলুন আর ড্রুম দিয়ে। আলোকমালায় ঝলমল করে উঠেছে নিশীথ নগরী—কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যেরই না বিকাশ হয়েছে !

২৪শে ডিসেম্বর আমরা বিশ্ববিখ্যাত এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং নামক ১০২ তলাবিশিষ্ট বিরাট ভবনটি দেখতে গেলাম। নীচে থেকে ৬০ তলা অবাধ দৃষ্টিগোচর হয়, অর্দ্ধেকেরও বেশী দুর্নিরীক্ষ্য। লিফ্‌টে চড়ে ১০২ তলায় উঠবার পর নীচের দিকে তাকালাম। গাড়ী ট্রেন বাস ইত্যাদি যানবাহন ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ে না—ঘরবাড়ী সব অদৃশ্য। বাজার কিংবা ভিড়ে মানুষের মাথাগুলোকে দেখ্‌ছিল ছোট ছোট কালো বিন্দুর মত।

২৫শে ডিসেম্বর রাত ন'টার সময় রেডিও সিটিতে আমরা একটা শো দেখতে গেলাম। হলটি এত প্রকাণ্ড যে, ছয় হাজার লোক এতে একসঙ্গে বসে সিনেমা ও থিয়েটার দেখতে পারে। ষ্টেজের উচ্চতা ৭০ ফুট, তাতে বড় বড় পাইনগাছ বসানো। ঘোড়া কুকুর ও বাঁদরের খেলা, জাপানী ম্যাজিক ইত্যাদির পর আরম্ভ হ'ল ষাট জন মেয়ের সমবেত নৃত্য। নিপুণা নৃত্যকারিণী হিসাবে এদের বেশ নাম-ডাক আছে। একটা জিনিষ দেখে আশ্চর্য্য হলাম—নৃত্যকারিণীদের সকলেরই দেহের উচ্চতা আয়তন এবং গড়ন একই মাপের। এদের শরীরের বৃদ্ধি এবং পুষ্টি যাতে একই অনুপাতে হয় সে উদ্দেশ্যে তাদের জন্যে নাকি একই প্রকার খাদ্য ও ঔষধ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে বরাদ্দ করা আছে। মানুষকে যে এমন ভাবে এক ছাঁচে ঢালাই করা যায়, চোখে না দেখলে তা হয় তো বিশ্বাসই করতে পারতাম না। আজব দেশ আমেরিকায় দেখছি সবই সম্ভব। সবচেয়ে অদ্ভুত লাগল এদের প্যারেড ড্যান্স। প্রায় আশী জন এক সঙ্গে নাচছে সৈনিকের পোশাক পরে—চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে অথচ সঙ্গে সঙ্গে ক্রশচিহ্ন, স্বস্তিকাচিহ্ন ইত্যাদি হরেক রকম ডিজাইন করছে। আরো কয়েক রকম নাচ তারা দেখালে। এ চটকদার নৃত্য চোখকে ভুলায় বটে, কিন্তু অন্তরের গভীর রসপিপাসা এতে পরিতৃপ্ত হয় না।

২৬শে ডিসেম্বর বেলা সাড়ে তিনটের সময় আমরা আমাদের নৃত্যানুষ্ঠানের থিয়েটার হল, ৪৮ ষ্ট্রীট থিয়েটারে গেলাম। ষ্টেজে গিয়ে বিখ্যাত ইম্প্রেসারিও এস. হারোকের সঙ্গে পরিচয় হ'ল। আমাদের নৃত্য পরিবেশনের ভার এঁরই উপর অর্পিত হয়েছে।

'মেট্রো গোল্ডেন মেয়ার' ষ্টুডিওতে অভ্যর্থনার পরে উদয়শঙ্কর ও তাঁহার সম্প্রদায়

২২শে তারিখ এখানে এসেছিলাম তার আজ ২৬শে। এ কয় দিনে এখানকার কম দর্শনীয় জিনিষ দেখা হ'ল না। এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং, রকফেলার সেণ্টার, টাইমস্ স্কোয়ার, কলম্বাস ষ্টুডিও, ষ্ট্যাচু অফ লিবার্টি ইত্যাদি কত কিছুই তো দেখলাম। এগুলির অভ্রভেদী উচ্চতা এবং বিরাটত্ব দেখে হৃদয় শুধু বিস্ময়ে অভিভূতই হয়, কিন্তু এই বাহ্যিক জাঁকজমকে অন্তর তো ভরে উঠে না। এখানে সর্ব্বত্রে নজরে পড়ে যন্ত্র-দানবের ঔদ্ধত্য, উপচীয়মান সম্পদের প্রাচুর্য্য, ভোগ-বিলাসের পরাকাষ্ঠা, কিন্তু মানুষের আত্মা যে থেকে যায় উপবাসী !

২৭শে ডিসেম্বর নিউইয়র্কে আমাদের প্রথম শো। বেলা বারটার সময় আমরা ষ্টেজে গেলাম। রিহার্স্যাল শেষ হ'ল বেলা পাঁচটায় আর শো আরম্ভ হ'ল সাড়ে আটটার সময়। সৌভাগ্যক্রমে নাচ বেশ জমল, দর্শকদের হর্ষধ্বনিতে প্রেক্ষাগৃহ মুখরিত হয়ে উঠল, ষ্টেজের উপর হতে লাগল পুষ্পবৃষ্টি। শো'র শেষে আমরা গেলাম মিসেস্ হ্যামিল্টনের বাড়ীতে। সেখানে সর্দ্দার জে. জে. সিংএর সঙ্গে আলাপ হ'ল। খুব আমুদে ও অমায়িক প্রকৃতির লোক।

২৭শে ডিসেম্বর থেকে ৮ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত আমাদের অনেকগুলো নৃত্যপ্রদর্শন হ'ল। উদয়শঙ্করের নৃত্য-প্রতিভা ও নৃত্য-পরিকল্পনায় স্থানীয় নৃত্য-রসিকেরা মুগ্ধ হলেন—

এখানকার শ্রেষ্ঠ কাগজগুলোতে বেরুতে লাগল আমাদের সম্প্রদায়ের নৃত্যানুষ্ঠানের উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি।
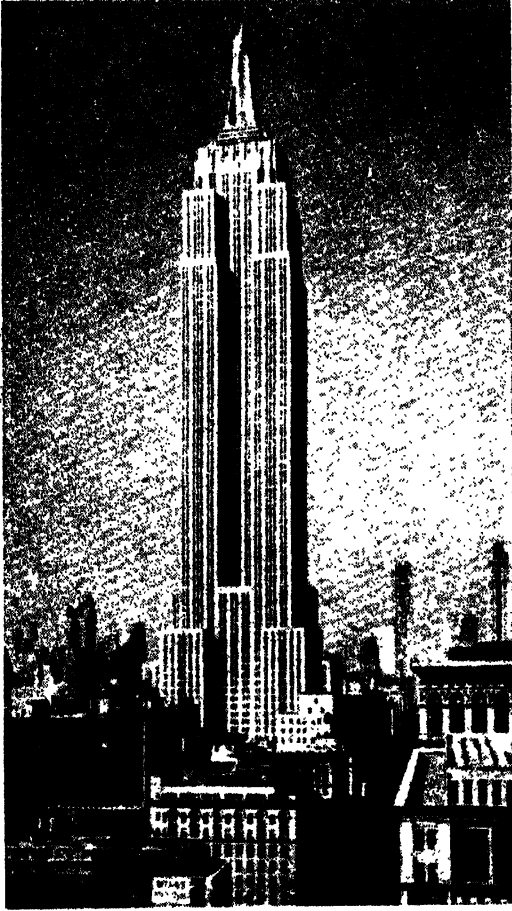
এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং, নিউ ইয়র্ক

৯ই জানুয়ারী—আজ আমাদের শো নেই। আজ ত্রিশ মাইল দূরবর্ত্তী নিউ জারসীতে মিসেস্ আর. আর. সাকসেনার বাড়ীতে আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল। শহরের বাইরের দিককার হাইওয়ে দিয়ে ট্যাক্সি করে আমরা রওনা হলাম নিউ জারসীর পথে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমরা মিসেস্ সাকসেনার বাড়ীতে এসে পৌঁছলাম। স্বামী বিবেকানন্দ যখন প্রথম আমেরিকায় আসেন তখন এই বাড়ীতেই নাকি উঠেছিলেন। সে আজ কতদিনের কথা!

কাশ্মীরের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী শেখ আব্দুল্লাও ছিলেন সেদিনকার নিমন্ত্রিতদের অন্যতম। তিনি যে অত্যন্ত মিশুক প্রকৃতির লোক তা অল্পক্ষণেই বুঝতে পারলাম। তিনি আমাদের এক সঙ্গেই বসে আহার-পর্ব্ব সম্পন্ন করলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর সুরু হ'ল গান-বাজনার পালা। আশ্চর্য্যের বিষয়, আব্দুল্লাও আমাদের গান-বাজনার আসরে যোগ দিয়ে বন্দেমাতরম্ গাইলেন। তাঁর বক্তৃতার সঙ্গে অনেকেই পরিচিত আছেন, কিন্তু তাঁর যে গানের গলাও আছে এ আমাদের সেদিনকার একটা আবিষ্কার বটে!

এই আসরে মিনু মাসানি এবং দানবীর মিঃ ওয়াটমলও উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষ হলে দেড়টা নাগাদ ফিরলাম নিউ ইয়র্কে আমাদের হোটেলে।

১০ই জানুয়ারী—দশটার সময় ষ্টেজে গিয়ে পৌঁছলাম। সাড়ে দশটা থেকে বারোটা পর্য্যন্ত আমার একক 'উর্ব্বশী' নাচের মহড়া হ'ল। কিছুক্ষণ পরে আরম্ভ হ'ল 'অস্ত্র-পূজা' নৃত্যের রিহার্স্যাল। যুদ্ধে অস্ত্র ব্যবহারের পূর্ব্বে অস্ত্রের উপাসনা হচ্ছে এই নৃত্যের বিষয়বস্তু। এই নাচটা কিছুতেই দাদার মনে ধরছিল না, বিরক্ত হয়ে শেষ পর্য্যন্ত তিনি বললেন, "এটা বাদ দিতে হবে।" তখন নৃত্যটিকে যথাযথভাবে রূপদান করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করে শেষ পর্য্যন্ত আমরা সাফল্যলাভ করলাম—দাদা এটিকেও নৃত্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করতে রাজী হলেন

শো আরম্ভ হ'ল সাড়ে আটটার সময়। উদয়শঙ্করের গন্ধর্ব্ব নৃত্য ও দিদির (অমলা শঙ্কর) মাড়োয়ারী নৃত্যের পরই এল আমার একক নৃত্যের পালা। অর্জ্জুনকে প্রণয় নিবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হয়ে উর্ব্বশী তাঁকে অভিশাপ দিচ্ছে—এই পৌরাণিক কাহিনীটি আমাকে রূপায়িত করতে হবে একক নৃত্যের মাধ্যমে। ষ্টেজে নেমেই আমি তো দস্তুরমত ভড়কে গেলাম। সমবেত নৃত্য এক জিনিষ, আর একক নৃত্য সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ। শেষোক্ত ক্ষেত্রে দর্শকমণ্ডলীর অখণ্ড মনোযোগ এবং সমগ্র দৃষ্টি আমার নৃত্যভঙ্গীর প্রতি আকৃষ্ট—আর এই দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে আছেন আমেরিকার বহু শ্রেষ্ঠ কলারসিক। মনে মনে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করলাম যেন এই বুধমণ্ডলীর সামনে নিজেকে বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পীর যোগ্য নৃত্য-সহযোগিনী হিসাবে প্রমাণিত করতে পারি। সৌভাগ্যক্রমে সুরুতেই নাচ জমে উঠল, কার্টেন উঠল চার বার। শো'র শেষে এখানকার শ্রেষ্ঠ পত্রিকাসমূহের তরফ থেকে আমার নৃত্যভঙ্গীর ফটো তুলবার জন্যে অনুরোধ এল।

১১ই জানুয়ারী—ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই নিদারুণ দুঃসংবাদ। দিদি (অমলা শঙ্কর) বললেন "তোমার নাচ সম্বন্ধে কাগজে কি সব বেরিয়েছে। নাচ নাকি হয়েছে একদম বাজে।" আমার মনটা একেবারে মুষড়ে পড়ল কিন্তু মার্কিনী রসিকতার মর্ম্মও তো অনুধাবন করতে পারি না। এত হাততালি, এত প্রশস্তি, এত ফটো তোলা, সব হ'ল বৃথা। বিশুদা আবার কাটা-ঘায়ে নুনের ছিঁটা দিলেন
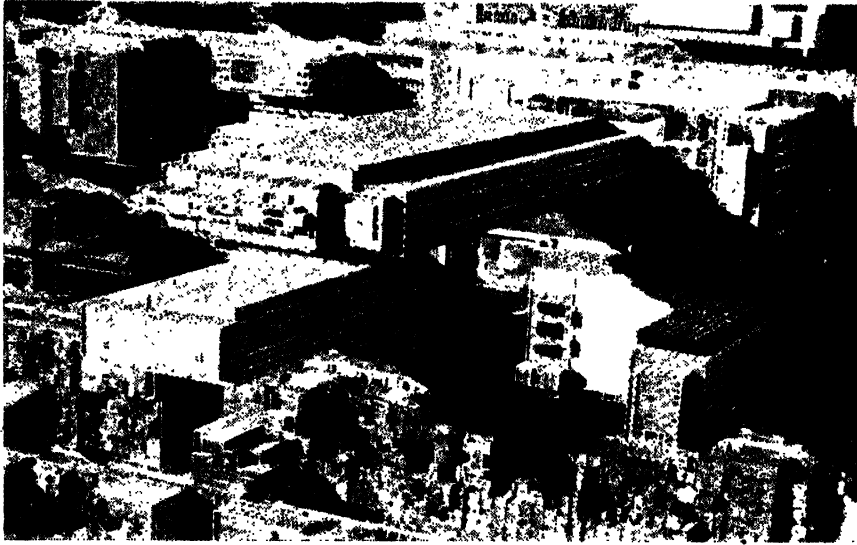
আকাশ হইতে রকফেলার সেণ্টারের দৃশ্য

বললেন, "তা ছাড়া লিখেছে মেয়েটার হাত পা গুলো বড্ড কালো কালো।" শুনে দুঃখের মধ্যেও হাসি পেল, জবাব দিলাম, "সেটা তো আর আমার অপরাধ নয়, আর অপরাধ যদিই বা হয় তা হলেও তো খুব ভাল করেই কালো কালো হাতে পায়ে পেণ্ট করেছিলাম।" বিষণ্ণ মনে চলে আসছি এমন সময় দিদি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "দূর বোকা মেয়ে, ঠাট্টা বোঝো না। আমরা যা আশা করেছিলাম

টাইমস স্কোয়ার, নিউ ইয়র্ক

তার চেয়েও ভাল লিখেছে খবরের কাগজগুলোতে। হেরাল্ড ট্রিবিউন, নিউইয়র্ক টাইমস প্রভৃতি কাগজে প্রচুর-প্রশংসা বেরিয়েছে।"

শুনে মনে যেন খুশীর বান ডাকল—দাদা ও দিদিকে প্রণাম করলাম, তাঁরা প্রাণ ভরে আমাকে আশীর্ব্বাদ করলেন।

বিশুদা ততক্ষণে ট্রিবিউন নিয়ে এসেছেন। তাতে বেরিয়েছে, উদয়শঙ্কর ও অমলা শঙ্করের উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি। বিখ্যাত কলা-সমালোচক জন মার্টিন উদয়শঙ্করকে উল্লেখ করেছেন পাশ্চাত্ত্যে ভারতের সংস্কৃতি-দূত বলে। তাতে সেজদির (প্রীতি চক্রবর্ত্তী) একক ছবি বেরিয়েছে, আমার 'উর্ব্বশী' নৃত্য সম্পর্কেও উচ্চ প্রশংসা-বাণী উচ্চারণ করেছেন আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কলা-সমালোচক জন মার্টিন। তিনি যা লিখেছেন তার সার মর্ম্ম হচ্ছে এই: "এবারকার নৃত্যানুষ্ঠানে 'উর্ব্বশী' একক নৃত্যে নৃত্যপটীয়সী স্মৃতির এই প্রথম আত্মপ্রকাশ। অর্জ্জুনের প্রতি প্রত্যাখ্যাত উর্ব্বশীর অভিশাপের অন্তর্গূঢ় ভাবটি লীলায়িত দেহ-ভঙ্গীতে অপূর্ব নৈপুণ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন কুশলী শিল্পী স্মৃতি।"

বিশুদা যখন এই কথাগুলি পড়ে শোনাচ্ছিলেন তখন আমার ভারি লজ্জা করতে লাগল—সত্যি কি আমি এতটা প্রশংসার যোগ্য।

নিউইয়র্ককে কেন্দ্র করে আমরা সানফ্রানসিস্‌কো, ওকল্যাণ্ড, লস এঞ্জেলস প্রভৃতি আমেরিকার বড় বড় শহরে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম, সর্ব্বত্রই আমাদের নৃত্য-প্রদর্শন সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করতে লাগল। লস এঞ্জেলস থেকে

দুই জন সুপ্রসিদ্ধ জৈনগুরু

ডঃ শ্রীবিমলাচরণ লাহা

(১) ঋষভদেব (আদিনাথ)

জৈনদিগের বিশ্বাস যে, ভারতে মোট চব্বিশ জন তীর্থঙ্করের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। বৌদ্ধদিগের মতে চারি জন বুদ্ধ জগতে আবির্ভূত হন এবং চারি জন হইতে সাত জন, সাত জন হইতে উনত্রিশ জন, উনত্রিশ হইতে অসংখ্য বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঋষভদেব তীর্থঙ্করদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম এবং তাঁহার অপর একটি নাম ছিল আদিনাথ। মানবের দুঃখমোচনের জন্য তাঁহার জন্ম হয়। রাজা নাভি এবং মরুদেবীর পুত্র ঋষভদেব মহাবীরের মৃত্যুর বহু বর্ষ পূর্বে আবির্ভূত হন। ঋষভের শত পুত্র ছিল। জৈনগ্রন্থে এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়।

ঋষভদেবের জন্ম সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। কথিত আছে, মরুদেবী স্বপ্নে দেখেন যে একটি বৃষ তাঁহার দিকে ধাবিত হইতেছে। এই কারণে তিনি পুত্রের নাম দেন ঋষভ। ঋষভদেব যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন একটানা সুখের যুগ চলিয়া গিয়াছে, মানব-জীবনে সুখদুঃখের সমন্বয় ঘটিয়াছে। তিনি কোশলদেশের কাশ্যপ ক্ষত্রিয় ছিলেন। বিনীতা নগরীতে তাঁহার জন্ম হয়। আবার কেহ কেহ বলেন, কাশ্মীরের উত্তরে তাঁহার জন্ম হয়। জৈনধর্ম্মের প্রথম প্রবর্তক, প্রথম রাজা, প্রথম ভিক্ষু, প্রথম জিন এবং প্রথম তীর্থঙ্কর নামেই তিনি খ্যাতিলাভ করেন। কথিত আছে, তিনি বহু বৎসর জীবিত ছিলেন। ঋষভের সহিত সুমঙ্গলার বিবাহ হয়। অতঃপর ঋষভদেব সুনন্দা নামে এক রূপবতী অনাথা বালিকার পাণিগ্রহণ করেন। সুনন্দার গর্ভে পুত্র বাহুবলী ও কন্যা সুন্দরীর জন্ম হয়। সুমঙ্গলাও ভরত নামে পুত্র এবং ব্রাহ্মী নামে একটি কন্যা প্রসব করেন। ঋষভের শত পুত্রের মধ্যে ভরত সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তিনি প্রথম চক্রবর্তী হন এবং অযোধ্যায় বাস করেন। অবশেষে ভরত তাঁহার পুত্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া সকলপ্রকার পার্থিব সুখ ত্যাগ করিয়া জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

ঋষভদেব আপন পুত্রগণকে সদুপদেশ দান করেন। জীবগণ জগতে আপন আপন কৃতকর্ম্মের ফল অবশ্যই ভোগ করিবে। জ্ঞানী এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তি ছল ও প্রতারণা অবলম্বন করিলে শাস্তি পাইবে। আপনাকে সংযত করিতে হইবে। জীবহিংসা হইতে বিরত হওয়া কর্ত্তব্য। অর্হৎদিগের উপদেশ গ্রহণ করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তিগণ চলিবেন। কদাচ পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে না। কামের বশবর্ত্তী হইবে না। যিনি কর্ম্ম ক্ষয় করিয়া কায়মনোবাক্যে সংযত হইয়া সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি জগতে কামজয়ী হইয়া সুখে বাস করেন।

তাঁহার সময়ে লোকেদের পরস্পর পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা লুপ্ত হওয়ায় তাহারা ঋষভদেবকে নৃপতি বলিয়া মানিয়া লইল। ঋষভ প্রকৃতপক্ষে প্রথম নরপতি ও সাম্রাজ্য-স্থাপয়িতা। রাজনীতি ও সমাজনীতিতে তাঁহার অপূর্ব্ব দক্ষতা ছিল। তিনি সর্ব্বপ্রথম বিভিন্ন প্রকারের শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ে শিক্ষা দেন। তাঁহার সময়ে কৃষিবিদ্যা ও ব্যবসায়ের উন্নতি হয়। ঋষভদেব পুরুষদিগকে ৭২টি ও নারীদিগকে ৬৪টি শিল্পবিদ্যা শিক্ষা দেন। রমণীগণ সঙ্গীত ও নৃত্যবিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করেন।

ঋষভদেবের আবির্ভাবকালে ফল ও জলের অভাব ঘটে। লোকে পাতা ও কাঁচা শাকসব্জী ভক্ষণ করিত। কিন্তু সে খাদ্য পরিপাক হইত না বলিয়া তাহারা রোগে ভুগিত। একদা বৃক্ষসমূহের নিরত সংঘর্ষণে অগ্নি দেখা দিল। ঋষভদেব মৃৎপাত্র নির্ম্মাণ এবং রন্ধন করিবার প্রণালী শিখাইলেন। তাঁহার উপদেশে লোকে শুধু রন্ধন করা খাদ্য গ্রহণ করিতে লাগিল। রোগের হাত হইতে তাহারা মুক্তি পাইল। কুটীর-নির্ম্মাণ, বস্ত্র-বয়ন ও চিত্রাঙ্কন তিনি শিখাইলেন।

অসাধারণ বুদ্ধি, সৌন্দর্য্য, ভাগ্য ও শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী, সংযত চিত্ত ঋষভদেব বহু বৎসর জীবিত ছিলেন। তাঁহার সময় নিরূপণ করা সুকঠিন।

তাঁহার রাজত্বকালে বহু প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়। অনেক-গুলি বড় বাজার খোলা হয়। তিনি নগরটি প্রাচীরবেষ্টিত করেন। লোকে পশুপালন ও ভূমিকর্ষণ শিখিল। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটিল। প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইতে লাগিল।

ঋষভদেব ন্যায় ও ধর্ম্মের অনুসরণে রাজ্য শাসন করেন, বহু যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, এবং অবশেষে ভরতের উপর রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া পুলস্ত্যের আশ্রমে গমন করেন। সেখানে তিনি ভিক্ষুজীবন গ্রহণ করিয়া ব্রত উদ্‌যাপন করেন। কঠোর তপস্যায় রত হইয়া তিনি অস্থিচর্ম্মসার হন। নগ্ন মস্তকে ও নগ্ন পদে শীত বা গ্রীষ্মে আক্লিষ্ট না হইয়া তিনি ধ্যানমগ্ন হন। ভ্রমণকালে তিনি শ্রেয়াংশকুমারের গৃহে আসেন এবং তৎপ্রদত্ত ইক্ষুরস পান করেন। প্রকৃত জ্ঞানের

অন্বেষণে তিনি বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া মুক্তিজ্ঞান লাভ করেন। তিনি কোঙ্কন, ভেঙ্কট, কুটক এবং দক্ষিণ কর্ণাটক দেশ পরিভ্রমণ করেন। জীবহিংসা করিও না, চুরি করিও না, প্রত্যেক লোকের সহিত সদ্ভাবে বাস করিবে, মৈত্রীস্থাপন করিবে, পাপকার্য্যে বিরত থাকিবে, অযাচিত দান গ্রহণ করিবে না, সদা সন্তুষ্ট থাকিবে, সৎসঙ্গে বাস করিবে এবং কুচিন্তা ও কুতৃষ্ণা দূর করিবে—ইহাই ছিল তাঁহার উপদেশ। এই উপদেশ মত যাঁহারা চলিতেন, তাঁহারা তীর্থ নামে এক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

পাল্কীতে আরোহণ করিয়া ঋষভদেব বিনীতানগরী পার হইয়া সিদ্ধার্থবনে আসিয়া অশোকতরুতলে দাঁড়াইলেন এবং স্বহস্তে মাথার চুল ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। তিনি আড়াই দিন উপবাস করিয়া একখানি দিব্যবস্ত্র পরিধান করেন এবং পরে ইহাও ত্যাগ করিয়া নগ্নদেহে রহিলেন। দিগম্বরদিগের মতে তিনি প্রথম হইতেই নগ্নসাধু বলিয়া খ্যাত। তিনি বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গ ও চারি হাজার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত গার্হস্থ্য-জীবন ত্যাগ করেন। শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করিয়া তিনি এক সহস্র বৎসর ধ্যানমগ্ন ছিলেন। পুরীমতাল নগরীর বহির্ভাগে শাকটমুখ উদ্যানে ন্যগ্রোধ বৃক্ষতলে সাড়ে তিন দিবস নিরম্বু উপবাসের পর তিনি গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। তিনি পরমজ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টিলাভ করেন। তাঁহার অগণিত শিষ্য, শিষ্যা ও অনুরাগী ভক্ত ছিল।

ঋষভদেব যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ। এক দিক দিয়া তিনি ছিলেন অসংখ্য মানব-বংশের প্রতিষ্ঠাতা, অন্য দিকে তিনি মানবের চিন্তাধারার প্রবর্ত্তক। চতুর্বিধ কর্ম্মের উপশম ঘটিবার পর সাড়ে ছয় দিন নিরম্বু উপবাসান্তে সর্ব্বক্লেশ বিমুক্ত হইয়া অষ্টাপদ পর্বতে দশ সহস্র ভিক্ষুর সমীপে তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন।

(২) পার্শ্বনাথ

জৈনগুরু পার্শ্বনাথ ত্রয়োবিংশতি তীর্থঙ্কর বলিয়া পরিচিত। মহাবীরের ঠিক পূর্ব্বেই তাঁহার আবির্ভাব ঘটে। জিতেন্দ্রিয়, বিনীত, সুদর্শন, জনপ্রিয় পার্শ্বনাথ ধর্ম্মগুরুর সম্মান ও মর্য্যাদা লাভ করিয়া বর্ত্তমান যুগেও পূজিত হন। তাঁহার আবির্ভাবকাল নিরূপণ করা সুকঠিন। তিনি খ্রীষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দীতে জন্মলাভ করেন। তিনি একশত বর্ষকাল জীবিত ছিলেন। ত্রিশ বৎসর বয়সে গার্হস্থ্য-জীবন ত্যাগ করিয়া সত্তর বৎসর কাল পার্শ্ব সন্ন্যাসজীবন যাপন করেন। মহাবীরের ধর্ম্ম আসলে পার্শ্বনাথের ধর্ম্মনীতির নবরূপমাত্র। পার্শ্বনাথ প্রকৃত পক্ষে জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাতা, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। পার্শ্বনাথ ও মহাবীরের ভক্তদের মধ্যে বিরোধ ছিল, পরে এই বিরোধের উপশম হয়।

পার্শ্বনাথ যথার্থ ই একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি। জৈনসূত্রে তাঁহার ধর্ম্মমত ও ভক্তগণের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা গৃহত্যাগের সময়টি জানিতে পারিয়া তিনি পাল্কীতে আরোহণ করিয়া বারাণসীতে গমন করেন। এই স্থান হইতে আশ্রমপদ উদ্যানে আসেন। অশোকতরুতলে অলঙ্কারগুলি খুলিয়া তিনি মাথার চুল ছিঁড়িতে লাগিলেন। তিরাশি দিন সংযত থাকিয়া পার্শ্বনাথ সমস্ত বাধা দূর করিয়া পরমজ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেন।

পার্শ্বের সম্প্রদায়ে অসংখ্য শিষ্য ও শিষ্যা ছিল। সত্তর বৎসর আপন ধর্ম্মমত প্রচার করিবার পর তাঁহার কর্ম ক্ষয় হয়। মহাবীর প্রথমে পার্শ্বনাথের সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। পরে ইহা ত্যাগ করিয়া পার্শ্বনাথের শিষ্যগণকে আপন দলে আনিতে সমর্থ হন। পার্শ্বনাথের ধর্ম্মমতের অনুসরণে মহাবীর একটি নূতন সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিলেন। পার্শ্বের চারিটি ব্রত মহাবীর গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু তিনি তাঁহার ভক্তগণকে চরিত্রবান হইতে উপদেশ দিলেন। পার্শ্বনাথের সম্প্রদায়ভুক্ত শিষ্যগণ বস্ত্র পরিধান করিতেন। মহাবীর প্রথমে বস্ত্র পরিধান করিতেন, কিন্তু পরে সম্পূর্ণ দিগম্বর থাকিবার নিয়ম গ্রহণ করেন।

পার্শ্বনাথের সমগ্র জীবন সর্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। তাঁহার মাতা এক দিন অন্ধকারে শয়নকালে একটি কৃষ্ণ সর্পকে তাঁহার নিকটে দেখিতে পান। তখন হইতে মাতা বামাদেবী পুত্রের নাম দেন পার্শ্বনাথ। সর্প পার্শ্বনাথের চিহ্ন ছিল। পার্শ্ব বড় হইয়া একটি সর্পের জীবন রক্ষা করেন। আর একবার একটি সর্প এক বিশাল কাষ্ঠখণ্ডের মধ্যে লুকাইয়া ছিল। এক ব্রাহ্মণ তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিতে উদ্যত হইলেন। পার্শ্বনাথ সেই ভীত সর্পটির প্রাণ বাঁচাইলেন।

পার্শ্বনাথ বারাণসীর রাজা অশ্বসেন ও রাণী বামার পুত্র। তিনি ইক্ষ্বাকু বংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৮৭৭ অব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সংগঠনকার্য্যে নিপুণ ছিলেন। রাণী বামাদেবী রাত্রিকালে স্বপ্নে কৃষ্ণসর্প দেখিয়া ভীত হইয়া রাজাকে একথা বলেন। তদুত্তরে রাজা বলেন যে তিনি শক্তিমান পুত্রের জননী হইবেন। পরে পার্শ্বনাথ জন্মগ্রহণ করিলেন। যথাকালে তিনি সৌন্দর্য্যে, গুণে, বিদ্যায় ও শক্তিতে অসামান্য হইয়া উঠিলেন। কুশস্থলের রাজা প্রসেনজিৎ কন্যা প্রভাবতীকে সর্বগুণসম্পন্ন কোন সৎপাত্রে দান করিবার কথা ভাবিতেছিলেন। প্রভাবতী পার্শ্বকুমারের প্রতি অনুরাগিণী হন। তাঁহার মাতাপিতা

এই অনুরাগের কথা জানিতে পারিয়া প্রভাবতীকে পার্শ্বের নিকট পাঠাইলেন। এদিকে প্রভাবতীর রূপগুণের কথা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল। অনেক নৃপতি প্রভাবতীর পাণি-প্রার্থী হইলেন। কলিঙ্গরাজ যবন রূপে ও গুণে অসামান্যা প্রভাবতীকে বিবাহ করিতে মনস্থ করেন। রাজা যবন সৈন্য লইয়া কুশস্থল আক্রমণে উদ্যত হন। প্রসেনজিৎ বিপদের কথা জানিয়া বারাণসীতে অশ্বসেনের সাহায্য চাহিলেন। কিন্তু শেষ অবধি যুদ্ধ হয় নাই, কারণ রাজা যবন বৃদ্ধ মন্ত্রীর পরামর্শে প্রসেনজিতের সহিত যুদ্ধ করেন নাই। যদিও পার্শ্বনাথ বিবাহিত জীবন পছন্দ করিতেন না, তবুও পিতার ইচ্ছায় প্রভাবতীকে বিবাহ করেন। প্রভাবতীর বিবাহ-জীবন সুখময় হইয়াছিল।

কমঠ নামে এক মুনি এক দিন মধ্যাহ্নে পঞ্চাগ্নি নামক ধ্যানে মগ্ন হইলেন। পার্শ্ব দেখিলেন একটি সর্পকে কাষ্ঠখণ্ডের মধ্যে রাখিয়া পোড়ান হইতেছে। তখন তিনি ইহা দেখিয়া বলিলেন, "শরীরকে কষ্ট দিয়া ধ্যানে মগ্ন হওয়া মূর্খের কার্য্য। অহিংসা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ।" ইহার উত্তরে কমঠ বলিলেন, "তুমি ধর্ম্মের কি জান? তুমি অশ্ব ও হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিতে জান। আমার মত সাধুরাই ধর্ম্ম কি তাহা বুঝেন।" ইহা শ্রবণ করিয়া পার্শ্ব ভাবিলেন, মানুষ কিরূপ গর্ব্বিত। যাহারা দয়ার সম্বন্ধে কিছুই জানে না, তাহারা তবুও ভাবে যে ধর্ম্মাচরণ করিতেছে। তিনি তাঁহার বন্ধুকে ঐ কাষ্ঠ ছেদন করিতে বলিলেন। ছেদনের পর দেখা গেল যে ঐ সর্পটি অগ্নিতাপে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। তিনি সর্পটিকে নবকারমন্ত্র শোনান এবং ইহা শ্রবণ করিয়া সর্পটি মারা যায়। পরে এই সর্প ধরণেন্দ্রদেব হইয়া পার্শ্বের মস্তকোপরি ফণা বিস্তার করিয়াছিল। ইহাতে কমঠ ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হইলেন এবং পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

পার্শ্বনাথ এক তরুতলে বসিয়া ধ্যানে মগ্ন হন। বৃষ্টিপাত ও বজ্রধ্বনিতে তিনি বিচলিত হন নাই। তিনি মুক্তিজ্ঞান লাভ করেন এবং বহু নরনারীকে ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে উপদেশ দেন। তাঁহার শিষ্যগণ একটি তীর্থ স্থাপন করেন, এবং পার্শ্বনাথ তীর্থঙ্কর নামে পরিচিত হন। পার্শ্বনাথের মাতাপিতা, প্রভাবতী এবং এই পরিবারের আরও অনেকেই জৈন সঙ্ঘে যোগদান করেন। পার্শ্বনাথ বহু প্রাচীন তীর্থস্থান ভ্রমণ করেন। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৭৭৭ অব্দে তিনি সর্ব্বদুঃখ বিমুক্ত হইয়া ৮৩ জন শিষ্য সমক্ষে এক মাস নিরম্বু উপবাসের পর সম্মেত পর্ব্বতে নির্ব্বাণ লাভ করেন। পার্শ্বের অগণিত শিষ্য ও শিষ্যা ছিল। শিষ্যাদলের নেত্রী ছিল সুনন্দা।

পার্শ্বনাথের জীবন সম্বন্ধে বহু কাহিনী পদ্যে লিখিত আছে। পার্শ্বনাথ-চরিত্রগ্রন্থে কেবল যে তাঁহার শেষ জীবনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা নহে, তাঁহার পূর্ব্ববর্তী নয়টি জীবনের কথাও পাওয়া যায়। কেশী নামে পার্শ্বনাথের এক সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ শিষ্য ছিল। তাহার সমসাময়িক ছিল বর্দ্ধমান নামক জৈনগুরুর শিষ্য গৌতম। একদা উভয়ের মধ্যে যে আলোচনা হয় তাহার সারমর্ম্ম এইরূপ :—ক্রোধ, গর্ব্ব, লোভ ও শঠতা ত্যাগ করিবে। প্রেম ও ঘৃণা কঠিন বন্ধন। মমতা ও জীবন ধারণের আকাঙ্ক্ষা ভয়াবহ। কাম অগ্নি-স্বরূপ, ইহাকে দমন করিতে হইবে। বিশৃঙ্খল মনকে নিয়ম দ্বারা সংযত করিতে হইবে। সম্যক্ পথ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। জরা ও মৃত্যু প্রাণিগণকে বিনাশের পথে চালিত করে। সর্ব্বজ্ঞ জিন বহু জন্ম নাশ করিয়া উচ্চস্তর লাভ করেন। নির্ব্বাণ নিরাপদ, সুখময় ও শান্তিপূর্ণ স্থান। বিখ্যাত সাধুগণ ইহা লাভ করেন। এখানে কোনও রকম কষ্ট নাই এবং ইহাকে লাভ করা সুকঠিন। এই ভাবে গৌতম কেশীর মনের সন্দেহ দূর করিয়া তাহাকে তাঁহার দিকে আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কেশী প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভের পাঁচটি ব্রত অবলম্বন করেন।

কালাস বেশীয়পুত্ত নামে পার্শ্বের এক ভক্তের সহিত মহাবীরের এক শিষ্যের বাগ্‌বিতণ্ডার কথা ভগবতীসূত্রে পাওয়া যায়। কালী নাম্নী এক জন বৃদ্ধা কুমারী পার্শ্ব-সম্প্রদায়ে যোগদান করেন। উৎপলার ভগিনীদ্বয় তাঁহার পদানুসরণ করেন। গাঙ্গেয় নামে পার্শ্বের এক জন ভক্ত গুরুর চারি প্রকার ব্রত ত্যাগ করিয়া মহাবীরের পঞ্চমহাব্রত গ্রহণ করেন। কতিপয় নারী পার্শ্বের শিষ্যা হন। উদক নামে পার্শ্বের এক জন শিষ্য ও মহাবীরের গৌতম নামে প্রসিদ্ধ শিষ্যের মধ্যে যে কথোপকথন হয়, তাহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে পার্শ্বের শিষ্যগণ নিগণ্ঠকুমারপুত্ত এবং মহাবীরের শিষ্যগণ নিগণ্ঠনাথপুত্ত নামে পরিচিত ছিল।

জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলেই পার্শ্বের ধর্ম্মে যোগদান করিতে পারিত। বুদ্ধদেবের ন্যায় পার্শ্বনাথও নারীগণকে নিজ সংঘে যোগদান করিতে অনুমতি দেন। পার্শ্ব অহিংসাবাদী ছিলেন। তাঁহার মতে কঠোর মুনিব্রতই মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়। পার্শ্ব ও মহাবীরের মতগুলি সাধারণতঃ অভিন্ন ছিল। তবে শুধু ব্রতপালন এবং পরিচ্ছদধারণ—এই দুই বিষয়ে মতভেদ ছিল। পার্শ্ব চারিটি ব্রত মানিতেন, মহাবীরের ব্রত ছিল পাঁচটি। পার্শ্বনাথ অধোবাস ও উত্তরীয় গ্রহণে অনুমতি দেন। কিন্তু মহাবীর বস্ত্রপরিধানের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। মনে হয়, মহাবীর নগ্নবাদের প্রচারক। জীবহিংসায় বিরত হইবে; মিথ্যা বর্জ্জনীয়; চৌর্য্য পরিত্যাগ করিবে; সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তি গ্রহণে বিরত হইবে। এই

চারিটি ব্রত পার্শ্ব প্রচার করেন। পরবর্ত্তীকালে মহাবীর পার্শ্বনাথ-প্রবর্ত্তিত চারিটি ব্রতের সহিত আর একটি নূতন ব্রত যোগ করেন। মহাবীর-প্রবর্ত্তিত এই পঞ্চম ব্রতটিই হইতেছে জিতেন্দ্রিয়তা।

বৌদ্ধ গ্রন্থকারের মতে জৈনগণ পানীয় এবং সর্ব্বপ্রকার পাপ সম্পর্কে সংযত থাকিবে। সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে বিরত থাকিয়া মনে কোনরূপ পাপ চিন্তা পোষণ না করিয়া জীবনধারণ করিবে। বুদ্ধদেবের মতে চারি প্রকার সংযম বলিতে চারি প্রকার 'শীল'কেই বুঝায়। বৌদ্ধ ভাষ্যকার বুদ্ধঘোষ বলেন যে, জৈনেরা শীতল জল পান করে না, কারণ ইহাতে জীবগণ বিদ্যমান আছে। উপালি নামে জৈনগৃহীর মতে মহাবীর জীব-হত্যাকে পাপকার্য্য বলিয়া গণ্য করিতেন। কিন্তু বুদ্ধদেব বলেন জগতে বিচরণের ফলে প্রাণিহত্যা রোধ করা অসম্ভব। বুদ্ধদেবের এই মত জৈনেরা সমীচীন বলিয়া মনে করেন না।

হাজারিবাগ জেলার অন্তর্গত পরেশনাথ পর্ব্বতের উপর একটি মন্দিরে পার্শ্বনাথের ধ্যানস্থ দিগম্বর মূর্ত্তিটি বিদ্যমান আছে। তাঁহার মস্তকোপরি একটি সর্প ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। পুরাকালে চম্পার অন্তর্গত রত্নাকর প্রদেশে পার্শ্বের একটি মূর্ত্তি ছিল। সোহমাবাসব এবং বিদেহের কন্যা ইহাকে পূজা করিতেন। শঙ্খপুর নগরে একটি পবিত্র স্থানে কৃষ্ণ পার্শ্বনাথের মূর্ত্তি স্থাপন করেন। একটি মন্দিরে এই মূর্ত্তিটি স্থাপন করিয়া তিনি ইহাকে পূজা করিতেন। পরে এই মন্দির ও মূর্ত্তিটি সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন হয়। কান্তি নগরের এক বণিক পার্শ্বনাথের এই মূর্ত্তিটি উদ্ধার করিয়া তাঁহার নিজ দেশে লইয়া যান। বণিকের মৃত্যুর পর অর্হৎশ্রেষ্ঠ নাগার্জ্জুন কামজয় করিবার জন্য ইহাকে স্বগৃহে আনয়ন করেন। সেইজন্য ঐ স্থানটি স্তম্ভনঘতীর্থ নামে পরিচিত। পার্শ্বনাথের মূর্ত্তিটি দর্শন করিলে মহাপুণ্য লাভ করা যায়।

পরিশিষ্ট

এই প্রবন্ধ প্রণয়নকালে নিম্নলিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধ হইতে আমি বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি :

১। বিষ্ণুপুরাণ (Wilson Tr. ii)
২। ভাগবতপুরাণ
৩। উবাসগদসাও (Hoernle Ed.)
4. Jaina Sutras (S.B.E., XLV).
5. *Indian Antiquary*, IX.
6. *Dialogues of the Buddha*, II.
7. Stevenson: *Heart of Jainism.*
8. *Epigraphia Indica*, I.
9. Law: *Some Jaina Canonical Sutras.*
10. Kapadia: *A History of the Canonical Literature of the Jainas.*
১১। Charpentier, উত্তরাধ্যয়ন সূত্র
১২। সূত্রকৃতাঙ্গ Book 1
13. Winternitz: *History of Indian Literature*, II.
১৪। দীঘনিকায় প্রথম ও তৃতীয় ভাগ
15. C. J. Shah: *Jainism in North India.*
১৬। বিবিধতীর্থকল্প, (সিংঘী জৈনগ্রন্থমালা সিরিজ)
১৭। হেমচন্দ্র, অভিধান চিন্তামণি, ১ম অধ্যায়।
১৮। কল্পসূত্র
১৯। অঙ্গুত্তরনিকায় ১, ২, ৪
20. Nahar and Ghosh: *Epitome of Jainism.*
21. Guerinot: *Bibliographie Jaina.*
22. *Cambridge History of India*, Vol I.
23. Hastings—*Encyclopaedia of Religion and Ethics*, Vol. III.
24. Law: *Some Kshatriya Tribes of Ancient India*, Chap. II.
25. Barua: *Pre-Buddhistic Indian Philosophy.*
২৬। হর্ষচরিত (৬ষ্ঠ)
27. *Vinayapitaka*, II.
২৮। ইসিভাসিয়সুত্তাইং (Rutlam, 1927)
29. Law: *Indological Studies*, II.
৩০। নায়াধম্মকহাও (দ্বিতীয়)
৩১। আচারাঙ্গনির্যুক্তি
32. Law: *Geography of Early Buddhism.*
৩৩। পার্শ্বনাথচরিত—(হরগোবিন্দদাস ও বেচরদাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত, বেনারস, ১৯১২)
34. Bloomfield: *The Life and Teachings of the Jaina Savior Parsanath* (1919).
35. *ZDMG*, 1915.
৩৬। ধম্মপদ (P. T. S.)
৩৭। বিশুদ্ধিমগ্গ (P. T. S.)
৩৮। সুমঙ্গলবিলাসিনী (P. T. S.), (প্রথম ভাগ)
39. Law: *Concepts of Buddhism*, Ch. XI.
৪০। ভগবতী সূত্র (প্রথম)
৪১। আচারাঙ্গ সূত্র (দ্বিতীয়)
42. Law: *Mahavira—His Life and Teachings.*
43. Weber: *Fragment der Bhagavati.*
৪৪। আবশ্যকচূর্ণি
45. Jain: *Life in Ancient India as described in th Jaina Canons.*
৪৬। পন্নবণাসুত্ত
৪৭। সংযুত্তনিকায় (প্রথম)
৪৮। মজ্ঝিমনিকায় (দ্বিতীয়)
49. Law: *Historical Gleanings.*

গান

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল

জৌনপুরী—দাদরা

তুমি তো আমায় ছাড়নি কখনো
আমি যেন তোমা না ছাড়ি
তোমাতে ডুবিয়া—তোমাতে মজিয়া
চিরসুধারস পান করি।
সংসারে হেরি শুধু কোলাহল
তোমা-ছাড়া হলে শুধু হলাহল
সুধা পারাবার তুমি অবিরল
তোমাতেই যেন স্নান করি।
দুঃখ-সুখের ঢেউয়ের দোলায়
অনুখন যেন না দুলি
শান্তিসাগর হিয়ায় আমার
তোমারে কখনো না ভুলি।
প্রতিদিন আছি লয়ে তব নাম
আনন্দে যেন গাই অবিরাম
মরণ রাত্রি পরপারে যেন
হে চির-আলোক, তোমা বরি॥

	১´				0				১´				0			
II	পণা	ণা	দা	|	পা	মরা	-মা	I	মা	পা	পা	|	পা	পা	পা	I
	তু	মি	তো		আ	মা০	য়		ছা	ড়	নি		ক	খ	নো	

১´				0				১´				0			
সা	সা	রা	|	মা	পা	র্সা	I	ণা	দা	পা	|	-া	-া	-া	II
আ	মি	যে		ন	তো	মা		না	ছা	ড়ি		০	০	০	

১´				0				১´				0			
পা	র্রা	র্রা	|	র্রা	জ্ঞর্রা	সা	I	ণা	র্সা	ণা	|	দা	পা	পা	I
তো	মা	তে		ডু	বি০	য়া		তো	মা	তে		ম	জি	য়া	

১´ 0 ১´ 0
রা -মা .মা | মা মা -রা I মা মা -পা | পা পা -ণা |
শা ন্ তি সা গ র্ চি য়া য়্ আ মা র্

১´ 0 ১´ 0
ণা ণা দা | পা মরা মা I মা পা পা | -া -া -া } II
তো মা রে ক ণ্ঠ০ নো না ভু লি ০ ০ ০ }

১´ 0 ১´ 0
II {পা মা ণদা | -া র্সা র্সা I র্রণা র্সা র্সা | :

১´ 0 ১´ 0
র্সর্রা র্সর্রা -র্জ্ঞা | র্জ্ঞা র্রা র্সা I ণা -র্সা ণা | দা পা -া } I
আ০ ন০ ন্ দে যে ন গা ই ছ বি রা ম্ }

১´ 0 ১´ 0
পা পা পা | পা -দা পা I মা পা মজ্ঞা | জ্ঞা রা সা |

১´ 0 ১´ 0
রা মা মা | পা র্সা -া I ণা ণা দা | পা -া -া I
হে চি র আ লো ক্ তো মা র রি ০ ০

১´ 0 ১´ 0
I পা র্রা র্রা | র্জ্ঞর্রা -র্সা র্সা I ণা র্সা ণা | দা পা পা I
ম র ণ রা০ ০ ত্রি প র পা রে যে ন

১´ 0 ১´ 0
সা রা মা | পা র্সা -া I ণা ণা দা | পা -া -া II
হে চি র আ লো ক্ তো মা র রি ০ ০

সত্য ও মিথ্যা

শ্রীঅনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়

তখন থেকে কেমন যেন ভয় ভয় করছিলাম। যতই মুখে হাসি মাখিয়ে সহজ হয়ে কথা বলুক, তার মনের খোঁজ সে ছাড়া আর কেউ জানতে পারে না। আর জানা সম্ভবও নয়। এ ভাবে টাকা ত সে কোন দিন নেয় নি। টাকা নেওয়া মানেই ঘুষ। আবার কাকে বলে ঘুষ। কিন্তু ঘুষ ত চায় নি সে। না চাক্, তবু নিলে যখন, ফিরিয়ে দিলে না, তখন একে ঘুষ ছাড়া আর ত কিছু বলা চলে না। এর কোন নতুন সংজ্ঞা নেই। আদিত্য যখন নোট-গুলো টেবিলের ওপর রাখল, তখন সে দেখতে পেলেও তত খেয়াল করে নি। তার পর জানল যখন তখন আপত্তিই করেছিল হরিপদ। কিন্তু জোর করে ফিরিয়ে ত দেয় নি। মুখে সে এনেছিল আপত্তি, কিন্তু মুখের সেই কথার সঙ্গে মনের কি সত্যিকারের যোগ ছিল হরি-পদর? সে বিষয়ে তার নিজেরই সন্দেহ রয়েছে।

আদিত্য চলে যেতে হরিপদ দরজা অবধি পিছু পিছু এল। রোগা মূর্ত্তিটা ডান দিকে মোড়ের মাথায় অদৃশ্য হতেই, হরিপদ তাড়াতাড়ি দরজায় খিল তুলে দিলে। নোটগুলো টেবিল থেকে উঠিয়ে নিলে চারদিকে সতর্ক চোখ বুলিয়ে। দরজা বন্ধ, তবু মন থেকে পুরোপুরি যায় না ভয়। হাজার হোক্, এসব বিষয়ে তেমন ত পাকা নয় হরিপদ। মন তেমন শক্ত হয় নি। ভয় ত একটু-আধটু হবেই। নোটগুলো তাড়াতাড়ি পকেটে ঢুকিয়ে নিলে। গুনতেও সাহস হ'ল না। কে জানে কখন কে দেখে ফেলবে। দিনকাল যা পড়েছে, কাউকে বিশ্বাস নেই। পরে, রাতে শোবার আগে গুনলেই হবে।

আদিত্য এসে ছিল। একটু আগেই এসেছিল। আসা আজই নতুন নয় তার। এ বাড়ীতে তার আনাগোনা অনেক দিনের।

চেয়ারটা টেনে এনে আরাম করে বসল আদিত্য। একটা সিগারেট পুড়িয়ে একগাল ধোঁয়া আনল।

'কি খবর-টবর হে হরিপদ?' ভারিক্কি গলায় বলে উঠল আদিত্য।

'কিছুই নয়। চলে যাচ্ছে এক রকম।' হাসল হরিপদ।

'শুনলাম গোপীনাথের বড় মেয়ের কথাবার্ত্তা হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, তাই ত শুনছি।'

'তুমি আবার শুনবে কি, তোমার কাছে দু'জনের জন্মপত্রিকা, কোষ্ঠী এরই মধ্যে এসে গেছে, কানে যেন খবর এল।' আদিত্য দেয়ালের দিকে মুখ করে ধোঁয়া ছাড়ল।

'হ্যাঁ। তাতে কি?'

'না না, কিছু নয়।' আদিত্য হাসল একগাল। দু'পক্ষেরই আমি হলাম শুভাকাজ্ক্ষী, তাই সুসংবাদটা জানতে এলাম। এই আর কি। তেমন গুরুতর কিছু নয়। তা দেখাটেখা হয়ে গেছে ত?'

'হ্যাঁ। এই খানিক আগেই সব মিলিয়ে দেখছিলাম।'

'বেশ বেশ।' সিগারেটটা জানলা গলিয়ে দিলে ফেলে। তার পর সোজা হয়ে বসল শরীরটা টেনে। 'তা, সব মিলে-টিলেছে, বেশ ভাল ভাবে?'

'মিলেছে। যোগাযোগ ফল অতি শুভ।'

আদিত্যর রোজকার আসা আর আজকের আসার মধ্যে তফাৎ অনেক আছে। এই প্রভেদটা হরিপদর মত সাদা-সিধে মানুষের পক্ষে ধরা বেশ শক্ত। কারণটা নানা কথার মধ্যে আদিত্য প্রচ্ছন্ন রাখলেও, তার অত্যধিক কৌতূহল ও শুভ কামনার মাঝে বেশীক্ষণ সে আর গোপন থাকতে পারছিল না। অবশ্য এটা হরিপদর অনেক আগে থাকতেই নিদেন ওর কথার ধারা থেকে জানা উচিত ছিল। বিশেষ করে হরিপদর যখন আদিত্যের কোন হালচালই অজ্ঞাত নয়। জানে সে আদিত্যর গোপীনাথের বাড়ীতে ঘন ঘন যাওয়া-আসা। গোপীনাথের বড় মেয়ে সুমিতার আশা অনেক দিন থেকেই পোষণ করে আসছে। কিন্তু বিয়ে সুমিতার হচ্ছে রঞ্জনের সঙ্গে। রঞ্জনকেও দেখেছে হরিপদ। ও বাড়ীর নিয়মিত বহিরাগতের মধ্যে রঞ্জনও একজন। আদিত্য ও রঞ্জনের মধ্যে বয়স, চেহারা ও স্বভাবগত যতই তফাৎ থাক, সে বাড়ীতে যাতায়াতের উদ্দেশ্য যে দু'জনেরই এক তাও জানে হরিপদ। সুতরাং বিয়ে সুমিতার পাকা হচ্ছে রঞ্জনের সঙ্গে, তার সঙ্গে নয়, এ খবরে আদিত্য চঞ্চল হবেই। আর এও ঠিক, এ খবরটা কানে যেতে সে চুপচাপ বসে থাকবে না, থাকতে পারে না। তেমন ছেলে সে নয়। হরিপদর মোটা মাথার ভোঁতা মগজে এ সব যায় না কিছুতেই।

'সব বেশ মন দিয়ে দেখছ ত? কোন ভুলচুক নেই ত?' আদিত্য বলে উঠল।

'কেন ভুলচুক থাকবে? সব ঠিক আছে।'

'না না, তাই বলছিলাম। ঠিক বেঠিক হতে আর কতক্ষণ?'

'মানে?' কথাটা ঠিক ধরতে পারে না হরিপদ।

'নাঃ, এই সোজা কথাটার মানে বুঝতে পার না!' আদিত্য মুচকি হাসল।

'সত্যিকে মিথ্যে করতে কতক্ষণই বা লাগে।'

'তা কেমন করে হয়?' হরিপদ ফট করে বলে ফেলল।

'বোকার মত কথা বলো না। সব হয়। কি না হয় পৃথিবীতে।' আদিত্য মুখটা সামনে এনে গলার স্বর নীচু করল। 'আর সেইজন্যেই তো তোমার কাছে আসা।'

'তা আমি কি করতে পারি ?'

'বিশেষ কিছু নয়। বলে দাও, এ বিয়ে হবে না। কুষ্ঠিতে মিলল না। বাস।'

'এটা মিথ্যে বলা হবে না ?'

'আরে নিকুচি করেছে তোমার মিথ্যের।' মেজাজ গরম না করে হরিপদ ছাড়বে না। তবু অনেক কষ্টে আদিত্য রাগটা মনের মাঝেই চেপে নিলে। 'আমি চাই না রঞ্জনের সঙ্গে বিয়ে হোক সুমিতার। কি আছে শুনি রঞ্জন ছোঁড়াটার ? তুমিই বল ? রূপ, চেহারা ? তাতে কি হবে ? ধুয়ে খাবে রূপ নিয়ে ? আসল কথা হ'ল টাকা। তাতে মেয়েটা আর যাই কিছু হোক না হোক, খেয়ে পরে থাকতে পারবে তো।'

রঞ্জনের তুলনায় নিজের চেহারাটা যে খারাপ তা আদিত্য মানে। তার দেহে রূপলাবণ্যের অভাব যে ভগবান টাকা দিয়ে পূরণ করেছেন, এইটেই অনেকখানি ঢেকে দিয়েছে রূপহীন হবার জন্যে তার মনের দুর্বলতাকে। টাকার কাছে আর কোন কিছুরই তুলনা হয় না আজকের পৃথিবীতে। এও ভাল করে জানে আদিত্য।

একটু থেমে আবার সুরু করল আদিত্য, 'অবিশ্যি গোপীনাথের বিশেষ কোন দোষ নেই। সে আমাকেই চেয়েছিল, এখনও চায়। ও তো আর কাঁচা লোক নয়। কিন্তু সব নষ্টের গোড়া ওই মেয়েটা। ও কম চালাক আর পাজি নয়। আমার সঙ্গে কোনদিন ভালভাবে কথাই কইল না। রঞ্জনকে নিয়েই পাগল। কি যে আছে ওই ছেলেটার মাঝে ভগবান জানেন! কিন্তু আমি কি পারব না বিয়েটা পণ্ড করে দিতে ? রঞ্জন ছোঁড়াটাকে বছরখানেক জেল বিছানায় শুইয়ে রাখতে ? কিন্তু ওসব আনস্পোর্টসম্যানলি পথ—ও পথ আদিত্য চালদারের জন্যে নয়।'

আদিত্য উঠবার সময় টাকার দিকে নজর করিয়ে দিল হরিপদ। 'টাকাগুলো ফেলে যাচ্ছ যে ?'

'ও তোমার।' হাসল আদিত্য।

'মানে ?'

'পাছে কাজটার কথা মনে না থাকে ভুলে যাও, তাই নোটগুলোকে রেখে গেলাম মনে করিয়ে দেবার জন্যে।'

আর দাঁড়াল না হরিপদ। রাস্তায় নেমে হন হন করে চলে গেল। কাঁচা ছেলে নয় আদিত্য। জানে সে, আর দাঁড়িয়ে থেকে হরিপদকে বেশী কথা বলার সুযোগ দিলে সব ভেস্তে যাবে।

টাকাগুলো পকেটে পুরে হরিপদ বন্ধ ঘরে পায়চারি করতে লাগল। টাকা আছে আদিত্যর সকলেই জানে। টাকা আছে, তাই দিতে পারছে। টাকা থাকলেই কি কেউ দিতে চায়, না দিতে পারে ? আর টাকা তো সে এমনিই দেয় নি। একটা কাজ করার জন্যেই দিয়েছে। তা সে কাজ যেমনই হোক, ভাল বা মন্দ। মনে মনে এই যুক্তিতে অনেকটা সান্ত্বনা পেল হরিপদ। নাঃ, টাকাটা নেওয়া তেমন অন্যায় হয় নি। ঘুষ ত নয়। হরিপদ শান্ত হ'ল।

তাক থেকে আবার সব টেনে নিয়ে বসল আলোর কাছে। ভাল করে আবার মেলাতে বসল দু'জনের কুষ্ঠী। এই খানিক আগেই সে পরীক্ষা করে দেখেছে। সমস্ত লক্ষণই দু'জনের সুন্দর ভাবে মিলে গেছে। এমন যোগাযোগ হরিপদ খুব কমই দেখেছে। তবু তাকে এমন মিলন রোধ করতে হবে মিথ্যে বলে। সুমিতার কথা একবার ভাবল হরিপদ। মেয়েটাকে বারকয়েক দেখেছে সে। রঞ্জনের পাশে তাকে ভালই মানাবে। রঞ্জন সত্যিই সুন্দর ও স্বাস্থ্যবান। আদিত্য ওর কাছে লাগে না। যাক গে। এ সবে তার কি ? এ সব কথা সে ভেবে মরছে কেন ? বলে দেবে, না, কুষ্ঠিতে মিলল না। বাস। তার কাজ ফুরল। তারপর বুঝুক আদিত্য আর মেয়ের বাপ। সে ত নিশ্চিন্ত। মিথ্যে বলা হবে। তা হোক। একটা মিথ্যেতে কি এমন আসে যায় ? স্বয়ং ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির পর্যন্ত মিথ্যে বলে গেছেন, আর হরিপদ কি এমন মহাপুরুষ ? নোটগুলো পকেট থেকে বার করে গুনতে লাগল। পাঁচ টাকার চারটে নোট। ছোট একটা মিথ্যে বলার জন্যে কুড়িটা টাকা! নাঃ, দাম আছে মিথ্যের। হরিপদ মিথ্যের উপর শ্রদ্ধায় গদগদ হয়ে উঠল।

কথাটা উচ্চারণ করতে গলা আটকে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি সামলে নিলে হরিপদ। টাকার জোরে এ কাজে এই প্রথম।

কথা কানে যেতে মুখ শুকিয়ে গেল গোপীনাথের। কে যেন এক মুঠো কালি ওর সারা মুখে ছিটিয়ে দিলে।

'একেবারেই খারাপ ?' তবু শুধালে গোপীনাথ।

'অতি খারাপ।' হরিপদ মাথা নাড়ল।

'তবে কি হবে ? এর পর তো আর এগোন যায় না।'

'পাগল. এর পরে এগোবে কোন্ সাহসে ? সব জেনে শুনে মেয়েকে বিপদের মুখে ঠেলে দেবে নাকি ?' এক মিথ্যে থেকে পর পর এতগুলো মিথ্যে কথা কি করে ঠোঁটের কাছে এগিয়ে আসছে, ভেবে নিজেরই অবাক লাগে হরিপদর।

'তবে আর কি হবে,' নিরাশার কণ্ঠে বলল গোপীনাথ, 'আদিত্যই এখন আশা-ভরসা। দেখতে তেমন ভাল নয়, তবে স্বভাব-চরিত্র খাঁটি ছেলেটার। তা পুরুষ-মানুষের আবার রূপে কি হবে।'

'তা বটে, তা বটে।' সায় দেবার জন্যে মাথা ওর নড়েই রয়েছে।

'ওর কুষ্ঠিটা নিয়ে যাও। আদিত্য কালই দিয়ে গেছে।'

'বেশ।' কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে রাখল হরিপদ। 'এবার তবে উঠি। সুমি-মায়ের সঙ্গে রঞ্জনের বিয়েটা হলে সব দিক থেকে সুখের হ'ত জিনিষটা। তা ভগবানের মর্জি অন্য রকমের, আমরা কি করতে পারি।' লাঠিটা আনবার জন্যে দেয়ালের কোণে এগোতেই কে যেন জানলা থেকে সরে গেল। ভাল করে বুঝতে না পারলেও রঙীন শাড়ীর প্রান্ত দেখে আঁচ করল, সুমিতাই হবে। জানলার পাশে সে এতক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছিল।

বাড়ী ফিরে হরিপদ বসল ঠিকুজি নিয়ে। লক্ষর পলতেটা খানিক উঁচু করে দিলে। এদের দু'জনেরও মিলনে কোন দোষ নেই। রঞ্জনেরটার মত সবকিছু সুন্দর ভাবে না মিললেও, অমিলের সংখ্যা বেশী নেই বা তেমন গুরুতর নয়। আদিত্য-সুমিতার চার হাত এক হলে অমঙ্গল কিছু ঘটবার কোন সম্ভাবনা নেই।

গুড়মুড় করে সেই রাত্রিতেই হাজির হ'ল আদিত্য। ওর কি আর তর সয়? এসেই সুরু করল, ভাল করে দম না নিয়েই, 'কি খবর?'

হরিপদ হাসল, 'ভালই।'

'যাক, বাঁচা গেল।' হরিপদর সঙ্গে সেদিন দেখা হওয়ার পর থেকে এই আজকে অবধি ক'টা দিনের মধ্যে আদিত্য এই প্রথম আরামে নিঃশ্বাস ছাড়ল। 'আমার যা ভয় হয়েছিল।'

'ভয় কেন?'

'হবে না ভয়? হাজার হোক তুমি একেবারে নূতন, ভরসা করা চলে না যতক্ষণ না কাজটা পুরো করছ। কি জানি মাঝখানে এমন একটা বেফাঁস কিছু যদি করে ফেল।' আদিত্য সিগারেট ধরিয়ে টান দিলে। 'তার পর, পরের খবর কি?'

'আরও ভাল। এই দেখ তোমার কুষ্ঠী।'

'তাই নাকি?' এতটা আশা করেনি আদিত্য। খুশীতে একেবারে গলে গেল যেন। 'দেখেছ নাকি?'

'দেখলাম।'

'কিছু গণ্ডগোল নেই ত?'

'না।'

'যাক্, বাঁচালে, আর নিজেও বাচলে আর একবার মিথ্যে বলার হাত থেকে। তা দেখা হয়ে গেছে যখন, মিথ্যে নষ্ট করছ কেন সময়? যাও না তাড়াতাড়ি।'

'কোথায়?' হরিপদ বুঝতে পারে না।

'সুখবরটা মেয়ের বাপকে দিতে যাবে না?' হরিপদকে বুঝিয়ে দিলে আদিত্য।

'এত রাত্তিরে কোথায় যাব? কাল বলা যাবে।'

'সেই ভাল। কাল কিন্তু সকালে উঠেই চলে যেও। বেশী দেরি করো না।' খুশীতে চঞ্চল আদিত্য উঠে দাঁড়াল। 'আচ্ছা, এবার আমি চলি, সত্যিই অনেক রাত হ'ল। কয়েক পা এগিয়ে থেমে গেল আদিত্য। 'হ্যাঁ ভাল কথা, এই নাও আরও কুড়ি টাকা।' ওর হাতে গুঁজে দিলে আদিত্য। তারপর হেসে বলল, 'এবার আর মিথ্যে নয়, একেবারে খাটি সত্যি বলার জন্যে।

সত্যি কথারও তা হলে দাম আছে সময় বিশেষে। মিথ্যেরই নয় শুধু। ভাবে হরিপদ। এবারে সত্যি বলতে হবে। এতে আর কোন ভয় বা ভাবনার বালাই নেই। সত্যিই কি তাই? হরিপদর মনে ভাবনার ঢেউ অন্য পথে চলে আসে। সত্যি বললে আদিত্যের সঙ্গে বিয়ের সব তোড়জোড় সুরু হয়ে যাবে। ঠিকুজী যখন মিলে গেছে, শুভ কাজে আর দেরি করবে না গোপীনাথ। সুমিতার বিয়ে হবে শেষে আদিত্যের সঙ্গে? যতই টাকা থাক, কোন্ মেয়ে টাকার লোভে পছন্দ করবে হতকুচ্ছিৎ আদিত্যকে? ওর চেয়ে সে নিজেই তো দেখতে ভাল। অবিশ্যি বয়স একটু যা বেশী হয়েছে, কালো চুলের মাঝে কয়েকটা সাদা চুল মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। একটা বউ গত হয়েছে হরিপদর। আবার বিয়ে সে ইচ্ছে করেই করে নি। করতে কি পারত না? করতে এখনও পারে। বিয়ের বয়স এখনও যায় নি হরিপদর। এর চেয়ে অনেক বেশী বয়সে কত লোকই ত করেছে বিয়ে। আরশিটা টেনে এনে মুখ দেখল হরিপদ। না, এমন কিছু বুড়োটে হয় নি চেহারাটা। আদিত্য যদি ওই চেহারা নিয়ে বিয়ে করতে পারে, সেই বা কেন পারবে না? অবিশ্যি সাহস করে কথাটা তুলবে কে গোপীনাথের কানে? সে ত পারবে না কোনমতেই। আদিত্যর সঙ্গে সুমিতার বিয়ে দেওয়া মানে জেনে শুনে মেয়েটাকে সারাজীবন কষ্ট ও যন্ত্রণায় ফেলে রাখা। সুমিতা ওকে পেয়ে কোনমতেই সুখী হতে পারবে না। অন্তর থেকে ভুলেও সে কোনদিন চায় নি আদিত্যকে।

ছব, ঘোড়ার ডিম। সে এ সব কথা ভাবছে কেন? এসব ভেবে তার হবেটা কি? বাঙালীর ঘরের এমনি কত মেয়ের রোজ বলিদান হচ্ছে, একটাকে তার থেকে বাঁচিয়ে হবে কি? ওদের ভবিতব্যই এই। সে কি করবে? কেই বা কি করবে? সেদিন মিথ্যে বলে যে পাপ করল, কাল সত্যি যে পাপ করল—সত্যি বলে সেটা কাটানো যাবে। যাকগে। আলোটা নিবিয়ে বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল হরিপদ।

বাড়ীতে ঢুকতে গিয়েই দেখা পেল সুমিতার। ওর চেহারায় আজ এমন একটা মায়া ছিল যে, কিছুক্ষণের জন্য থেমে পড়তে হ'ল হরিপদকে। সুমিতাকে অনেকবার দেখেছে হরিপদ, কিন্তু এমনটি কখনও দেখে নি। যৌবনের ভরপুর দেহে এক কান্নার ছায়া নেমেছে। দীপ্ত চোখ দুটোয় ঝিমিয়ে এসেছে নিস্তেজ অবসন্নতা। মুখে হতাশার ম্লান ছবি। মাঝ-রাতের কুঁড়ির না ফুটে ঝরে পড়ার এই মর্মান্তিক দৃশ্য হরিপদর বুকটাকে পাথরের মত ভারী করে দিল।...

গোপীনাথ আগ্রহে শুধাল, 'দেখলে?'

'হ্যাঁ।'

'সুখবর?'

'আরও দুঃসংবাদ। মেয়ের অকালবৈধব্য হবে।' এই মিথ্যে কথাগুলো বলেই চমকে উঠল হরিপদ, কেমন করে তার মুখ থেকে বেরুল ভেবে। আর দাঁড়াল না একটা মুহূর্তও। নেমে গেল পথে পকেটে আদিত্যর দেওয়া নোটগুলো বুকে কাঁটার মত ফুটছে।

নূতন দিন

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

নূতন দিনের দেখা কি পেয়েছ ?   আকাশ হয়েছে নীল ?
মানুষের সাথে মানুষ কি খুঁজে পেয়েছে মনের মিল ?
প্রাচীন প্রাচীর অন্তর্হিত কি ?   ঘুচেছে অন্তরাল ?
বর্ত্তমানের অন্তর-মাঝে এসেছে কি ভাবী-কাল ?

জনে জনে আর জাতিতে জাতিতে এমন প্রভেদ কেন ?
কারো পানে ফিরে চায় নাকো—কেহ কাহারে চেনে না যেন।
অলঙ্ঘ্য শুধু বিচ্ছেদ আর অসংখ্য শুধু বাধা,
মানুষের কাছে মানুষ পায় না মানুষের মর্য্যাদা।

নদী-পর্ব্বত রচেনি সীমা—সে নহে প্রকৃতির দান,
মরু ও সাগর আনে নি আনে নি দেশে দেশে ব্যবধান
খণ্ড খণ্ড করিয়া পৃথিবী গণ্ডী রচনা করি'
বৃহতে তুচ্ছ করিয়া মানব ক্ষুদ্রে নিয়াছে বরি।

অখণ্ড ধরা, মানব সে এক পৃথিবীর অধিবাসী,
একই জীবন বিচিত্র হয়ে উঠিতেছে উদ্ভাসি'।
কুহেলি মিলাক্, দূরে স'রে যাক্ সব সংশয় ভয়।
নির্ম্মল নীল আকাশে হ'ল কি নূতন সূর্য্যোদয় ?

শরৎকালের স্মৃতি

শ্রীকরুণাময় বসু

কত দিন ভাবি গেয়ে চলে যাব
শরৎকালের গান :
নবপল্লবে বন-লক্ষ্মী কি
রেখে যাবে কিছু দান ?
তরুণ অরুণ আলো ফুটে ওঠা ভোরে
সবুজ ভ্রমর ফিরেছে বনান্তরে :
পদ্ম-দীঘির নবীন কুঁড়ির
ভেসে আসে আঘ্রাণ,
কত দিন ভাবি গেয়ে চলে যাব
শরৎকালের গান।

কভু উজ্জ্বল, কভু ছলোছল
দিনগুলি যায় ভেসে,
মেঘের পাখায় রামধনু-আঁকা,
চলেছে নিরুদ্দেশে।
বনের হারানো পথ বুঝি ডেকে যায়,
ঘর ছেড়ে আসা পথিক কে আছে আয় ;
ছুটির বাঁশী কি বেজেছে বাতাসে
হাসির ললিত ছলে :
হাঁসের বলাকা ডানার মিছিল
মেলেছে শূন্যতলে।

চলে যায় দিন ছায়ায় নিলীন
শিউলি-ঝরানো বনে ;
গন্ধের স্মৃতি, কবেকার প্রীতি
ভেসে আসে অকারণে।

কুসুমলতায় জড়ানো পাতার ফাঁকে
পূর্ণিমা-চাঁদ ছায়া-আলপনা আঁকে ;
নারিকেল-বনে চিকণ পাতায়
ঝিরি ঝিরি হাওয়া বয় ;
প্রবাসী মানুষ কত কাল পরে
ঘরে ফেরে এ সময়।

শরতের লিপি

আ. ন. ম. বজলুর রশীদ

আমারে লিখেছ চিঠি প্রিয়তম, প্রভাতের স্বর্ণরশ্মি জালে—
আকাশের নীলে নীলে—সাগরের তরঙ্গের তালে—
সে কি ছন্দ কথা গান অবিশ্রান্ত প্রাণের উচ্ছ্বাস
আবেগ-ফেনিল-ঘন অফুরন্ত আনন্দ-আশ্বাস—
নীল আর সবুজের পত্র বুকে রঙের অক্ষরে
রক্ত জবা-পদ্ম নীল শুভ্র শান্ত অস্ফুট টগরে —
শেফালীর গুচ্ছে গুচ্ছে —সন্ধ্যামালতীর ওষ্ঠপুটে
রক্তিম বর্ণের রেখা সুমধুর স্পর্শ ওঠে ফুটে—
সে যে কি মধুর স্পর্শ —রঙে রঙে পেলব চিক্কণ
প্রাণের সুবাস ভরা বহু যুগপ্রত্যাশিত ধন।
কি লিখেছ প্রিয়তম ?   খুব ভালো ভলোবাসা তুমি—
তাই এত রূপে রসে উচ্ছ সিত এই বনভূমি—
আমার ভুবন রাঙা আলোকের স্তবকে স্তবকে
বাতাসে আনন্দ-গন্ধ মুক্তি পূর্ণ প্রাণের পুলকে,
শিরায় রোমাঞ্চ জাগে—সে কি বেগ ঘন শিহরণ
পরম সান্ত্বনা শান্তি স্তব্ধতা ও আবেগ-কম্পন।
খুব ভালোবাসো প্রিয় ?   নাই তবে কোন অভিযোগ
তোমাতে আমাতে মিলে আজ শুধু প্রেমের সম্ভোগ—
সুনিবিড় অনুভূতি—তুমি আমি, আমি তুমি আর
সাগর আকাশ বুঝি দিগন্তরে হ'ল একাকার।
পড়েছি তোমার লিপি—স্বর্ণলিপি শরতের দিনে—
প্রাণ—তবু ভরিল না প্রিয়তম লিপিকার বিনে।

আলোচনা

"বাঙ্গলায় বিপ্লব-প্রচেষ্টার আদিকথা"

(প্রতিবাদ)

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

এ বিষয়ে কিছু বলতে গেলে গোড়াতেই অরবিন্দ ঘোষ এবং যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বলতে হয়। আমি এখানে সেই কথাই বলতে চেষ্টা করব। সে চেষ্টা কতটা সফল হবে তা জানি না। অনেকেই অরবিন্দ ঘোষ, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (স্বামী নিরালম্ব) সম্বন্ধ নিয়ে কয়েকটি বিষয় জানতে চেয়েছেন।

বিরোধের প্রথম কথা, ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখেছেন,—"যতীন্দ্রনাথের নিজ মুখে শোনা যে তিনি ক্রমশঃ দেশপ্রেম ও দেশের প্রতি কর্তব্যের কথা আলোচনা করতে করতে দেশপ্রেমিক শ্রীঅরবিন্দকে রাজনীতিতে টানেন ও বাঙ্গলায় আনেন।" নিঃসন্দেহ যতীন বাবু অরবিন্দ বাবুর সঙ্গে রাজনীতি সম্বন্ধেই আলোচনা করেছিলেন। তবে অরবিন্দ বাবুকে রাজনীতিতে টানেন এ কথা বলা যায় না। অনেক দিনের কথা ডাঃ যাদুগোপালের হয়ত ঠিক মনে নেই; কারণ অরবিন্দের কার্য্যপরম্পরায় দেখা যায় যে, যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও দেখা হওয়ার বহু পূর্ব্ব হতেই অরবিন্দ রাজনীতিতে প্রবেশ করেছিলেন। ডাঃ যাদুগোপাল হয়ত বলতে চেয়েছিলেন যে "বাঙ্গলাদেশে গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য যতীন বাবুই তাঁকে প্ররোচিত করেছিলেন।" সেটা কিছু আশ্চর্য নয়। উভয়ের মধ্যে আলোচনা হয়েছিল বাঙ্গলায় গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠার কথা নিয়ে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। যতীন বাবুর সঙ্গে আলোচনায় অরবিন্দ বাবু যখন বুঝেছিলেন যে, যতীন বাবু ঠিক উপযুক্ত পাত্র তখনই তিনি যতীন বাবুকে পাঠিয়েছিলেন বাঙ্গলায় বাঙ্গলার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নামে চিঠি দিয়ে। যে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের তিনি চিঠি দিয়েছিলেন নিশ্চয়ই আগে হতে অরবিন্দ বাবু তাঁদের জানতেন। এতে যতীন বাবুর বা অরবিন্দ বাবুর কোন অগৌরবের কথা নেই। আর "বাঙ্গলায় আনেন"—এ ত স্বাভাবিক। যতীন বাবু তাঁকে ডেকেছিলেন হয়তো কিছু পরামর্শ করবার জন্য কিংবা তাঁর কাজ দেখবার জন্য। সুতরাং ডাঃ যাদুগোপালের কথায় বিরোধের কিছুই নেই।

১৩৫৯ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত "বঙ্গে বিপ্লব আন্দোলন—গোড়ার কথা" শীর্ষক প্রবন্ধটির লেখক শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে তিনি এই প্রবন্ধটি লিখতে চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন: "রামানন্দ বাবু লিখিয়াছেন 'কথিত আছে, শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ যতীন্দ্রনাথের নিকট হইতে ভারতের স্বাধীনতা মন্ত্র লাভ করেন।' আবার যতীন্দ্রনাথের শিষ্য বঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন: 'যতীন্দ্রনাথের নিজমুখে শোনা যে তিনি ক্রমশঃ দেশপ্রেম ও দেশের প্রতি কর্তব্যের কথা আলোচনা করতে করতে দেশপ্রেমিক শ্রীঅরবিন্দকে রাজনীতিতে টানেন ও বাঙ্গলায় আনেন।" বাগল মহাশয় পরেই বলছেন: "এ বিষয়ে আমরা কোন বিতর্কের মধ্যে না গিয়াও বলিতে পারি যে যতীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ উভয়েই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য ঐকান্তিক প্রয়াসী হইয়াছিলেন। উভয়েই কোনরূপ বিপদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সঙ্কল্প অনুযায়ী কার্য্য করিতে অগ্রসর হন। শ্রীঅরবিন্দ বহু পূর্ব্ব হইতেই রাজনৈতিক আলোচনায় যোগদান করিয়াছিলেন। বিলাতে বসিয়া পার্ণেল প্রভৃতির উপরে সনেট বা চতুর্দ্দশপদী কবিতা এবং এদেশে কংগ্রেসের আবেদন নীতির সমালোচনামূলক প্রবন্ধাবলী (বোম্বাইয়ের 'ইন্দুপ্রকাশে' প্রকাশিত) তাহার প্রমাণ। তবে বাংলায় বিপ্লবকার্য্য প্রবর্ত্তনে যতীন্দ্রনাথের আগ্রহাতিশয় শ্রীঅরবিন্দকেও যে অনুপ্রেরণা দিয়াছিল এরূপ মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। যতীন্দ্রনাথ সৈনিকের কার্য্যে ইস্তফা দিয়া ১৯০২ সনে বাঙ্গলায় আসেন, সঙ্গে আনিলেন সরলা দেবীর নিকট শ্রীঅরবিন্দের একখানি পরিচয়পত্র।"

রামানন্দ বাবুর মত নির্ভীক ও সৎ সমালোচক খুব কমই দেখা যায়। তিনি যদি এ বিষয়ে নিশ্চিত হতেন তবে 'কথিত আছে' কখনই লিখতেন না। এতে বেশ বোঝা যায় রামানন্দ বাবুর মনের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় নি। তারপর ডাঃ যাদুগোপালের কথা প্রথমেই বলেছি। যোগেশ বাবু নিজেই ডাঃ যাদুগোপালের কথায় সায় দিতে পারেন নি। তা তাঁর লেখার মধ্যেই দেখতে পাই। তিনি বলেছেন: "বিতর্কের মধ্যে না গিয়াও···শ্রীঅরবিন্দ বহু পূর্ব্ব হইতেই রাজনৈতিক আলোচনায় যোগদান করিয়াছিলেন।" তাঁর এই উক্তির প্রমাণও তিনি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, "বিলাতে বসে পার্ণেল প্রভৃতির উপরে সনেট রচনা এবং এদেশে কংগ্রেসের আবেদন নীতির সমালোচনা" অরবিন্দ করেছিলেন। তারপরই বাগল মহাশয় বলছেন: "তবে বাংলার বিপ্লবকার্য্য প্রবর্ত্তনে যতীন্দ্রনাথের আগ্রহাতিশয় শ্রীঅরবিন্দকে যে অনুপ্রেরণা দিয়াছিল এরূপ মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে।" শ্রীঅরবিন্দকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল, এরূপ মনে করবার কি সঙ্গত কারণ আছে, বাগল মহাশয় তা বলেন নি। বাঙ্গলায় বিপ্লববাদ প্রবর্ত্তনে শ্রীঅরবিন্দের আগ্রহাতিশয় যে যতীন্দ্রনাথকে অনুপ্রেরণা দিয়াছিল, এরূপ মনে না করবার কি সঙ্গত কারণ আছে? "যতীন্দ্রনাথ সৈনিকের কার্য্যে ইস্তফা দিয়া ১৯০২ সনে বাঙ্গলায় আসেন। সঙ্গে আনিলেন সরলা দেবীর নিকট শ্রীঅরবিন্দের একখানি পরিচয়পত্র।" সৈনিকের

কার্যে ইস্তফা দেওয়াটাই কি শ্রীঅরবিন্দকে অনুপ্রেরণা দেওয়ার সঙ্গত কারণ বলে বাগল মহাশয় ধরে নিয়েছেন? বাগল মহাশয় লিখেছেন: "গত শতাব্দীর শেষ দশকে একজন বাঙালী যুবক সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইয়া ভারত-উদ্ধার প্রচেষ্টাকে কার্যে রূপ দিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তিনি আর কেহই নহেন, বাংলার সশস্ত্র বিপ্লববাদের প্রবর্ত্তক যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি পরে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণপূর্ব্বক নিরালম্ব স্বামী নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।"

"ভারত-উদ্ধার প্রচেষ্টাকে কার্যে রূপ দিতে" তা হলে ভারত-উদ্ধার প্রচেষ্টা চলছিল—তাকে কার্যে রূপ দিতে প্রয়াসী হয়েছিলেন, আবার সৈন্যদলে ভর্ত্তি হওয়া মানেই কি ভারত-উদ্ধার প্রচেষ্টাকে কার্যে রূপ দিতে প্রয়াসী হওয়া? সৈন্যদলে ভর্ত্তি হওয়ার হয়ত তাঁহার একটা খেয়াল ছিল। একজন বড় যোদ্ধা হওয়ার উচ্চ আকাঙ্ক্ষাও হয় ত তাঁর ছিল। অরবিন্দ বাবুর সংস্রবে আসায় তাঁর পূর্ব্বসঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত হওয়া অসম্ভব নয়—বরং এইটাই বেশী সম্ভব। একথা ঠিক যে ভারত-উদ্ধার কার্যকে রূপ দিতে শ্রীঅরবিন্দ পরিকল্পনাকে সফল করে তুলতে সর্ব্বপ্রথম যতীন্দ্রনাথই আসেন আমাদের বাংলাদেশে। বস্তুতঃ যতীনবাবু ভারত উদ্ধার প্রচেষ্টাকে রূপ দিতে পারেন নি। বাংলায় বিশেষ কিছু তিনি করতে পারেন নি। তাঁর সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণের অনেক পরে বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা রূপ পরিগ্রহণ করেছিল। বারীন্দ্র ও তাঁর কয়েকজন সহকর্ম্মীর আপ্রাণ চেষ্টাই এর মূলে ছিল। "যুগান্তর"ই সর্ব্বপ্রথম যুবকদের মধ্যে এক অপূর্ব্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনা এনেছিল এবং এই ঘুমন্ত দেশকে জাগিয়ে তুলেছিল। সন্ধ্যা, বন্দেমাতারম, নবশক্তি যুগান্তরের সুরে সুর মিলিয়ে বিপ্লববাদের সহায়তা করেছিল। এই যুগান্তরের দলই বোমা তৈরি করে ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রের আমদানী করে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য।

যতীনবাবুর মনে কোন হীনতা, দীনতা বা হিংসার স্থান ছিল না। তিনি এ সমস্তের বহু ঊর্দ্ধে ছিলেন। তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দেখাতে গিয়ে কেউ কেউ তাঁর প্রতি অবিচার করেছেন, তাঁকে কোঁদলের মধ্যে টেনে এনে ফেলেছেন। তিনি যে সর্ব্বপ্রথম বাংলাদেশে এসেছিলেন বিপ্লববাদ প্রচার করতে এতে কোন সংশয় নেই—অবিসংবাদিত সত্য।

বাগল মহাশয় লিখেছেন—"সেখানে (১০৮ নং আপার সার্কুলার রোডে) তাঁহার (যতীন্দ্রনাথের) সহধর্ম্মিণী চিন্ময়ী দেবী এবং জনৈকা দূরসম্পর্কীয় বিধবা ভগিনীও আসিয়া বাস করিতে থাকেন।" বাগল মহাশয় খুব সাবধানতা সহকারে তাঁর প্রবন্ধটি লিখেছেন। কিন্তু তিনি কেমন করে জানলেন "জনৈকা দূরসম্পর্কীয় বিধবা ভগিনী?" নিশ্চয়ই কারও লেখা থেকে তিনি উহা উদ্ধৃত করেছেন এবং তা সত্য বলে মেনে নিয়েছেন। যার-তার লেখা থেকে উদ্ধৃত করায় এইরূপ ভুলই হয়ে থাকে। বাগল মহাশয় জেনে রাখুন, জনৈকা দূরসম্পর্কীয় বিধবা ভগিনী তিনি নন। তিনি তাঁর একেবারে নিজ সম্পর্কীয়, তাঁর নিজ সহোদরা ভগিনী। তিনি বিধবাও ছিলেন না, তিনি সধবাই ছিলেন। তাঁর নাম সুশীলা। আজ যদি বাগল মহাশয়ের এই লেখাটি আমার নজরে না আসত তা হলে এই ভুলটাই সত্য হয়ে থাকত। এই সুশীলাকে নিয়েই যতীনবাবু ও বারীন্দ্রের মধ্যে মনোমালিন্য হয়। কেউ কেউ আবার লিখেছেন নেতৃত্ব নিয়ে সংঘর্ষ হয়, এ সমস্ত একেবারেই বাজে কথা। ঐ বাড়ী থেকে সুশীলাকে সরাতে যতীনবাবু রাজী হন নি বলেই বারীন্দ্র ও আমি মদন মিত্র লেনে বাড়ী ভাড়া নিয়ে চলে যাই। যতীন বাবু যে জেদ করে রাজী হন নি, তা নয়। তিনি বলেছিলেন ওকে একটু নিরাপদে রাখবার স্থান কোথাও নেই, তাঁর দেশেও নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। কিন্তু আমরা দেখেছিলাম যে গুপ্ত সমিতির কাজে বাধা হবে তাই আমরা বাধ্য হয়েই যতীনবাবুকে ছেড়ে গিয়েছিলাম। উভয় পক্ষই এই বিচ্ছেদে কষ্ট অনুভব করেছিলেন। অরবিন্দবাবু আমাদের এই বিচ্ছেদের কথা বরোদাতে শোনেন এবং আমাদের পুনর্মিলনের জন্য কলকাতায় আসেন। যতীনবাবু তখন সাতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটের বান্ধব বোর্ডিংএ একটা ঘর ভাড়া করে ছিলেন, সঙ্গে একটি চাকরও রেখেছিলেন। অরবিন্দবাবু ঐ বান্ধব বোর্ডিংএ গিয়েই ওঠেন। বারীন ও আমি সেখানে যাই। আমাদের মধ্যে মনোমালিন্যের কোন কথাই উঠল না। কোন দিন যে আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটেছিল তা একবারও কারও মনে হ'ল না। অরবিন্দবাবুর কথায় মদন মিত্রের বাসা ছেড়ে দিয়ে আমরা ঐ বান্ধব বোর্ডিংএই যতীন বাবুর সঙ্গে থাকি। অরবিন্দবাবুও আমাদের সঙ্গে থাকেন। প্রায় এক মাস পরে অরবিন্দবাবু বরোদায় চলে যান।

অরবিন্দবাবু সাধারণ মানুষের পর্যায়ভুক্ত ছিলেন না। তিনি ছিলেন এক ভিন্ন ধরণের মানুষ। তাঁকে দেখা ও তাঁর সঙ্গে কথা বলার সৌভাগ্য যাদের হয়েছে তারাই তাঁকে কিছু কিছু বুঝতে পারবেন, অন্য লোকের পক্ষে তাঁকে বোঝা সহজ নয়। আমাদের মত সাধারণ মানুষ অমুক-দা, তমুক-দা বলে অনেক সময় ভালবাসা প্রকাশ করে থাকি, কিন্তু অরবিন্দবাবুর এ সমস্ত বালাই মোটেই ছিল না। তিনি এ সবের বহু ঊর্দ্ধে ছিলেন। অরবিন্দবাবু, যতীনবাবু, বারীন্দ্র ও আমি তখন সাময়িক কাল একসঙ্গে থাকি তা আগেই বলেছি। যতীনবাবু অরবিন্দবাবুকে বলতেন অরো আর অরবিন্দবাবু যতীনবাবুকে বলতেন যতি, বারীনকে বলতেন বারি আর আমাকে বলতেন অবি। কোন দিনই অরবিন্দবাবু যতীনবাবুকে যতীন-দা বলেছেন বলে শুনি নি।

বান্ধব বোর্ডিংএ কিছু দিন থাকার পর যতীনবাবু চলে যান। তার পর আমরাও সেখান থেকে চলে যাই। ২২নং গে ষ্ট্রীটে দোতলায় মাত্র একটা লম্বা হলঘর ছিল আর কোন ঘর ছিল না। আমরা সেই ঘরটাই ভাড়া নিই। নীচের ঘরটায় ঘোড়ার ঘাস ও দানা বিক্রীর একটা দোকান ছিল। ঘরের বাইরে একটা সরু সিঁড়ি গাঁথা ছিল, তাই দিয়ে আমরা উপরে যাতায়াত করতাম। এখানে আমরা চার-পাঁচ জন ছিলাম। এক ধারে রান্না হ'ত।

এখানেই অরবিন্দবাবুর No Compromise কম্পোজ করে বাইরের একটা প্রেস থেকে রাতারাতি নিজেরাই ছাপিয়ে নিই। অনেক দিন পরে যতীনবাবুও ঐ স্থানে এসে উঠেন ও কিছু দিন থাকেন। ১৯০৪ সালের কথা এটা।

আগেই বলেছি যতীনবাবুকে আমি খুব ভালবাসতাম ও শ্রদ্ধা করতাম। এখনও ঠিক তাই আছে। তিনিও আমায় খুব ভালবাসতেন ও বিশ্বাস করতেন। যতীনবাবু যখন আপার সার্কুলার রোডের বাড়ী ছেড়ে যান, তখন একটা কৌটায় ভরে সুশীলার গহনাগুলি আমার কাছে নিয়ে আসেন এবং বলেন সেই গহনাগুলি রাখতে। কারণ বলেন যে যেখানে তাঁকে রাখতে স্থির করেছেন সেখানে গহনাগুলি রাখা নিরাপদ নয়। আমি নানা কারণে তা রাখতে চাই নি. কিন্তু তিনি আমার কোন আপত্তি না শুনে গহনাগুলি আমার কাছে রেখে যান। সেই অবধিই তা আমার কাছে ছিল, অন্য কেউ তা জানতে পারে নি। ৯২নং গ্রে ষ্ট্রীটের বাসায় এক দিন গোপনে আমায় বলেন যে, সুশীলাকে দশটা টাকা দিতে হবে, কিন্তু তখন তাঁর হাতে টাকা না থাকায় আমাকে দিতে বলেন। সুশীলা কোথায় আছে তা আমি কোন দিনই জিজ্ঞাসা করি নি। তিনি আমায় আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের একটা বাড়ীর ঠিকানা দিয়ে আমায় তার হাতে দিয়ে আসতে বলেন। সেই সময় যতীনবাবুকে সেই গহনার কৌটার কথা বলি। গহনা দেবার কথায় প্রথমে তিনি রাজী হন নি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি তাঁকে রাজী করিয়েছিলাম। গহনা ও টাকা আমি সুশীলাকে দিয়ে আসি। এই প্রথম সুশীলার সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা হয়। আপার সার্কুলার রোডের বাড়ীতে প্রত্যহই দেখা হ'ত, কিন্তু কোন দিনই কথা আমরা কই নি।

তাঁর দেহত্যাগের কিছুদিন আগে আলমবাজার নগেন্দ্র কাঞ্জিলাল বাড়ীতে তিনি আমায় ডেকে পাঠান। আমি যাওয়ামাত্র তিনি এমন আদর করে বুকে জড়িয়ে ধরলেন যা আমি কোন দিনই ভুলতে পারব না। তিনি যে আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন তখন তা বুঝতে পারি নি। বারীন্দ্রকেও ডেকে এনে ঐরকমভাবে আদর করেছিলেন।

বাগল মহাশয়ের আর একটি কথায় আমার নজর পড়ল; তিনি বলছেন :

"অরবিন্দবাবু কলিকাতা ত্যাগ করিলেন, বিরোধীদের মধ্যে পুনরায় মতান্তর দেখা দিল। ইহা ক্রমে চিরবিচ্ছেদে পরিণত হয়।" একথা তিনি কোথায় পেলেন? "বিরোধীদের" বলতে তিনি কাদের মনে করছেন? বারীন্দ্র ও আমার সঙ্গে যতীন্দ্রবাবুর আর কখনও বিরোধ ঘটে নি। তার পরে বাগল মহাশয় বলছেন : "যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ওরফে বাঘা যতীনের আলাপ পরিচয় হয়। বাঘা যতীন তাঁহার নিকট হইতে যে অনুপ্রেরণা লাভ করেন নিজের জীবন দানে তিনি তার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন।" একথা তিনি কোথায় পেলেন তা জানি না। যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাঘা যতীনের দেখা সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব নাও হতে পারে। তবে কথা এই যে, বারীন্দ্র ও আমি কৃষ্ণনগরে গিয়ে বাঘা যতীনকে পাই। আমাদের কাছেই সে গুপ্ত সমিতির কথা প্রথম শোনে ও আমাদের দলে যোগ দেয়। তখন সে গবর্মেণ্টের চাকরী করত। সে প্রায়ই আমাদের সঙ্গে সলাপরামর্শ করতে যুগান্তর আপিসে আসত। আমরা বিপ্লববাদের জন্য গ্রেফতার হয়ে জেলে আবদ্ধ হবার পর বারীন্দ্র যতীনকে জানায় সে যেন আমাদের আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করতে চেষ্টা করে। বাঘা যতীন প্রাণ দিয়ে তা পালন করেছে।

আসল কথা এই যে, বাংলার বিপ্লববাদের পূর্ণ গৌরব অরবিন্দ, বারীন্দ্র ও তাঁদের কয়েকজন সহকর্মীর উপর বর্ষিত হওয়ায় কেউ কেউ মনঃক্ষুণ্ণ হন। তারই বাহ্য প্রকাশ আর কি।

যতীনবাবুর মন ছিল খুব বড়। তাঁর মুখে সর্ব্বদাই হাসি লেগে থাকত। আজ যতীনবাবু জীবিত থাকলে তাঁকে নিয়ে এইভাবে টানাটানি করায় তিনি খুবই দুঃখিত হতেন সন্দেহ নেই।

বারীন্দ্রও অনেক ভুলভ্রান্তি করেছেন তাঁর লেখার মধ্যে। আমি যা জানি ও যা খাটি কথা তা হচ্ছে এই যে, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীঅরবিন্দের কাছ থেকে কয়েকখানি চিঠি ও কয়েকখানি 'ভবানী মন্দির' পুস্তিকা (ইংরেজী) ও ১৫ দফাযুক্ত একটা প্রতিজ্ঞা-পত্র নিয়ে বাংলায় আসেন। এই চিঠিগুলির মধ্যে একখানি জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসুর নামে ছিল। জ্ঞানবাবু অরবিন্দের মামা হতেন—অরবিন্দের মায়ের খুড়তুতো ভাই। জ্ঞানবাবু আবার যতীনবাবুকে একখানি চিঠি দেন তাঁর বন্ধু সুরেন সেনের নামে। সুরেনবাবু তখন আমাদের আড়বালিয়া গ্রামের হাইস্কুলে হেড মাষ্টার ছিলেন। এই সুরেনবাবু অশ্বিনীকুমার দত্তের ছাত্র ছিলেন। যতীনবাবু আমাদের গ্রাম আড়বালিয়াতে এসে সুরেনবাবুর কাছে পক্ষাধিক কাল ছিলেন। সুরেনবাবুকে যতীনবাবু তাঁর উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করেন। আমি তখন কলকাতায় ছিলাম; সুরেনবাবু এক জন লোক পাঠিয়ে আমায় নিয়ে যান যতীনবাবুর সঙ্গে দেখা করবার জন্য; কারণ দেশভক্ত বলে আমার সুনাম ছিল। যতীনবাবু আমায় বলেন—বরোদা থেকে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ তাঁকে পাঠিয়েছেন বাংলায় গুপ্ত সমিতি গড়বার জন্য, সশস্ত্র বিপ্লব দ্বারা ইংরেজকে ভারতবর্ষ থেকে দূর করে স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠা করবার জন্য; যারা সমস্ত পরিত্যাগ করে জীবন পর্যন্ত পণ করে ঝাঁপিয়ে পড়বে সেই সব যুবককে নিয়ে গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হবে। অরবিন্দ সম্বন্ধে তিনি আমাদের অনেক কথাই বলেন। তিনি বলেন—"ছাত্রাবস্থায় ইংলণ্ডে থাকা কালে অরবিন্দ "Lotus and Dagger" নামে একটি গুপ্ত-সমিতি গড়েছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল—ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘটান; এবং এই সমিতির সভ্যেরা প্রত্যেকে এই প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হন যে, 'যে-উপায়ে পারে,' সেই উপায়ে ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্বের অবসান

ঘটাবার চেষ্টা করবে।" আইরিশ বিদ্রোহী পার্ণেলের সম্বন্ধে লিখিত তাঁর কবিতার কথাও যতীনবাবু বলেন।

"ইংলণ্ড থেকে ফিরে আসার পর পুণায় ঠাকুরসাহেব-প্রতিষ্ঠিত গুপ্ত সমিতির তিনি সভাপতি ছিলেন। হিন্দুধর্ম্ম সংঘ ও ঠাকুর সাহেবের গুপ্ত সমিতি এক করে তিনি উহার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর মত বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ব্যক্তি আর দেখা যায় না"—ইত্যাদি অনেক কথাই যতীনবাবু অরবিন্দের সম্বন্ধে বলেন। আমরা তাঁর মুখে অরবিন্দের কথা শুনে তাঁর প্রতি খুবই আকৃষ্ট হই এবং তাঁর পরিকল্পিত গুপ্ত সমিতিতে যোগ দেবার জন্য অধীর হয়ে উঠি। তিনি পনের দিন পরে তাঁর কলকাতার বাসায় আমায় যাবার জন্য বলেন। তিনি আড়বালিয়াতেই থাকলেন, আমি কলকাতায় ফিরে এলাম। তার পর ঠিক পনের দিন পরে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। বেলা প্রায় চারটার সময় তাঁর বাসায় উপস্থিত হই; তিনি তখন বাসায় ছিলেন না। এই সময় বারীন্দ্র এসে আমায় ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বসান। বারীন্দ্র নিজেই তাঁর পরিচয় দিলেন। তিনি শ্রীঅরবিন্দের ছোট ভাই। বারীন্দ্রের সঙ্গে কথায় কথায় আমাদের মধ্যে ভালবাসা জমে ওঠে। বারীন্দ্র বললে—"সেজদা আগে যতীনবাবুকে পাঠিয়েছেন, তার পর আমি মাত্র কাল এসেছি যতীনবাবুকে সাহায্য করবার জন্য।" বারীন্দ্র আমায় বললে—"যদি দেশের মুক্তি কামনা কর তবে সব ত্যাগ করে এই মুহূর্ত্তেই ঝাঁপিয়ে পড়, আমাদের সঙ্গে যোগ দেও।" সেই সময় থেকেই যে আমি এই গুপ্ত সমিতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ব, তা আমি আগে ভাবি নি। বারীন্দ্রের কথায় উৎসাহিত হয়ে উঠি এবং সেই মুহূর্ত্তেই মন স্থির করে ফেলি। অনেক রাত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেও যতীনবাবুর সঙ্গে দেখা হয় নি। বারীন্দ্রের ডাকে পর দিন সকালবেলায় এসে গুপ্ত সমিতিতে যোগ দিই। যতীনবাবু আমায় পেয়ে খুব খুশী হন। তখন মাত্র আমরা তিন জন। ১০৮-সি, আপার সার্কুলার রোডের বাড়ীতে আমাদের এই সমিতি স্থাপিত হয়।

যতীনবাবু উকীল, ব্যারিষ্টার মহলে ঘোরাফেরা করতেন। তিনি খুব মিষ্টভাষী ছিলেন এবং তাঁর কথা বলার একটা বিশেষ ভঙ্গী ছিল। লোককে তিনি সহজেই স্বমতে আনতে পারতেন। ভয়ে হউক ভক্তিতে হউক, উকীল ব্যারিষ্টার এই সমিতির প্রতি সহানুভূতিশীল হন ও মাসিক কিছু কিছু টাকা চাঁদা দিতেন। আমি ও বারীন ছাত্রমহলে ঘোরাফিরা করতাম—ছাত্র কয়েকজনকে সংগ্রহ করেছিলাম; তারা আসা-যাওয়া করত; লাঠিখেলা, সাইকেল চড়া, ঘোড়াচড়া, সাঁতারকাটা শিক্ষা করত। এ সময়ে দেবব্রত বসু, নলিনী মিত্র (এলাহাবাদ মিশনরী কলেজের অধ্যাপক), জ্যোতিষ সমাজপতি, আমাদের গাঁয়ের রবীন্দ্রনাথ বসু, ভূপেন দত্ত, সতীশ বসু, সখারাম গণেশ দেউস্কর, ইন্দ্রনাথ নন্দী প্রভৃতি অনেকেই প্রায় প্রত্যহ সান্ধ্য-ক্লাসে যোগ দিতেন। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পি. মিত্র আসতেন। এ সম্বন্ধে বহু কথা আমি আগেই বসুমতীতে লিখেছি, কি ভাবে সখারামবাবুর "দেশের কথা" বার হ'ল তাও বলেছি। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ আর দিতে চাই না।

যতীনবাবুর মন ছিল খুব বড়। তাঁর মুখে সর্ব্বদাই হাসি লেগে থাকত। বিরোধের মনোভাব তাঁর মোটেই ছিল না। অরবিন্দবাবু যখন বাঞ্চব বোর্ডিংয়ে যতীনবাবুর বাসায় উঠে বারীনকে ও আমাকে ডেকে আনান তখন বিচ্ছেদের কোন কথাই ওঠে নি। কোনদিন যে বিচ্ছেদ ঘটেছিল তা কারও মনে হয় নি। হাসিমুখে কথাবার্ত্তা হয়েছিল। আমরাও মদন মিত্রের বাসা ছেড়ে দিয়ে যতীন বাবুর সঙ্গে সেই বাঞ্চব বোর্ডিংয়েই এক সঙ্গে থাকলাম। এর পর আর কোন দিনই আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে নি—চিরবিচ্ছেদ ত দূরের কথা। আজ যতীনবাবু জীবিত থাকলে এই সব দেখে তিনি খুবই দুঃখিত হতেন। এটা ১৯০৩ সালের ঘটনা।

বারীন্দ্র বরাবরই উন্মাদ, উন্মাদ মানে কর্ম্মোন্মাদ বা কাজ পাগলা। অনেক ভাল কাজ তিনি করেছেন, ভুলত্রান্তিও অনেক করেছেন। সত্য কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে, বারীন্দ্রই তাঁর কয়েকজন বিশ্বস্ত দেশপ্রেমিক কর্ম্মীর সহায়তায় শুধু বাংলাকে নয় সারা ভারতকে এক আলোড়ন ও উন্মাদনায় মাতিয়ে তুলেছিলেন দাসত্বমুক্ত নতুন জীবনের পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর মনের ছিল খুব উঁচু, কেউ কেউ তা বুঝতে পারেন না। কিন্তু যারা ঘনিষ্ঠ ভাবে তাঁর সঙ্গে মিলেছেন তাঁরাই তা ভালভাবে জানেন। অতীতে তিনি যা করেছেন, ঠিক ঠিক তা এখন বলতে পারেন না। তাঁর লেখার মধ্যে তা আমরা দেখতে পাই। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়েছেন স্মৃতিভ্রংশের জন্য। লেখার অনেক স্থানে নিজেকে হীন করে ফেলেছেন। তিনি যেন অতীতের অতীত হয়ে গেছেন। বারীনের কাছে তাঁর অতীত নেই, ভবিষ্যৎও নেই—আছে শুধু বর্ত্তমান।

বিপ্লববাদের গোড়ার কথা বলতে গিয়ে অনেকেই নানা রকম ভুল করে ফেলেছেন। অনেকের অনুরোধ সত্ত্বেও ঐ সমস্ত ভুলচুকের কথা জানিয়ে দিতে আমার ভাল লাগে না। আমি অসুস্থ, শরীরে সে শক্তি নেই, চোখেও ভাল দেখি না, লিখতেও পারি না। অবশ্য ভুলচুক এক কথা, কিন্তু কোন মতলব সাধনের উদ্দেশ্যে ঘটনার ইচ্ছাকৃত বিকৃতি করা অন্য কথা। কেহ ইচ্ছাকৃত, কেহ অনিচ্ছাকৃত, কেহ শোনা কথার উপর নির্ভর করে, কেহ বা স্মৃতির বিভ্রাট বশতঃ ভুল করে থাকেন। বাগল মহাশয়ের লেখার মাত্র কয়েকটি কথার ওপর আমি যা বললাম তা নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে, কিন্তু সত্য প্রকাশের কর্ত্তব্য বোধে। এই বিতর্কের মধ্যে আমায় আসতে হ'ল বলে আমি দুঃখিত। মহাপুরুষদের এরূপ কোঁদলের মধ্যে টেনে আনা বড়ই বেদনাদায়ক। ইতিহাসে তাঁদের নাম থাক—চাই না থাক, তাঁদের তাতে কিছুই আসে যায় না।

আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ—ছোট ছোট তুচ্ছ বিষয় নিয়ে কেউ যেন ঘোঁট না পাকান। যতীনবাবু, বারীনবাবু এবং আর আর

যাঁরা সকল রকম স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে, মন এবং প্রাণ দিয়ে ভারতের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই আমাদের আন্তরিক ভক্তিপূর্ণ প্রণাম পাবার যোগ্য। এই মুক্তিযুদ্ধে যাদের প্রাণ বলি দেবার সৌভাগ্য ঘটেছিল, তাঁরা যেমন বরেণ্য, যাঁদের প্রাণ বলি দেবার সুযোগ ও সৌভাগ্য ঘটেনি তাঁরাও সমান ভাবে বরণীয়।

উত্তর

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল •

বিগত কার্ত্তিক ১৩৫৯ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে "বঙ্গে বিপ্লব-আন্দোলন—গোড়ার কথা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখি। প্রাচীন বিপ্লবী শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য 'সত্য প্রকাশের কর্ত্তব্যবোধে' 'নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে' আমার 'লেখার মাত্র কয়েকটি কথার উপর' আলোচনা করিয়া ভুল-ত্রুটি দর্শাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার ন্যায় প্রবীণ বৈপ্লবিক কর্ম্মী যে এরূপ কষ্ট স্বীকার করিতে অগ্রসর হইয়াছেন এজন্য আমি তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তাঁহার প্রদর্শিত একটি ভুল প্রথমেই আমি সংশোধন করিয়া লইতেছি। সুশীলা যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (পরে নিরালম্ব স্বামী) সহোদরা ভগিনী, দূরসম্পর্কীয়া ভগিনী নহেন; তিনি ছিলেন সধবা, বিধবা নন। এখন, অবিনাশ বাবু যাহা যাহা লিখিয়াছেন তাহার কতটুকু গ্রহণীয় দেখি।

(১) আমি প্রবাসীর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং ডাঃ শ্রীযাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের নজির উদ্ধৃত করিয়া লিখি যে, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট হইতে অরবিন্দ ঘোষ (পরে, শ্রীঅরবিন্দ) সম্ভবতঃ 'ভারতের স্বাধীনতা মন্ত্র লাভ করেন" এবং তিনি নিঃসন্দেহে তাঁহাকে (অরবিন্দকে) "রাজনীতিতে টানেন ও বাংলায় আনেন।" এ সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় অবিনাশবাবু অনেক কথা বলিয়াছেন; কিন্তু ইহার বিরোধী কোন প্রমাণ বা নজির উদ্ধৃত করিতে পারেন নাই। পরন্তু আমার বক্তব্যের সপক্ষে নিম্নোক্ত নজির উদ্ধৃত করিতেছি:

ডক্টর শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯২৮ সনে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (স্বামী নিরালম্ব) সঙ্গে দেখা করিতে বৰ্দ্ধমান শহর হইতে চান্না গ্রামে তাঁহার আশ্রমে যান। সেখানে ভূপেন্দ্রনাথ তাঁহার সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করেন। রাজনীতির কথা উঠিলে যতীন্দ্রনাথ বলেন, "আজ অরবিন্দ একথা স্বীকার করিবেন না যে, আমিই তাঁহাকে রাজনীতিতে আনয়ন করি। আমি তিলকের কাছে শুনিতাম আর তাহা অরবিন্দকে বলিতাম। তিনি বলিতেন, তাই নাকি।" (ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম—ডাঃ শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃ. ১২৯)

ইহা হইতে বুঝা যায়, অরবিন্দের পূর্ব্বেই লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের কার্য্যকলাপের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল।

(২) আমি লিখিয়াছিলাম, "...গত শতাব্দীর শেষ দশকে একজন বাঙালী যুবক সত্য সত্যই বাংলার বহুদূরে সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইয়া ভারত-উদ্ধার প্রচেষ্টাকে কার্য্যে রূপ দিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন।" এই কথায় অবিনাশবাবু দুই রকম আপত্তি তুলিয়াছেন। তিনি বলেন, "সৈন্যদলে ভর্ত্তি হওয়ার হয়ত তাঁহার একটা খেয়াল ছিল। একজন বড় যোদ্ধা হওয়ার উচ্চ আকাঙ্ক্ষাও হয়ত তাঁহার ছিল।" অবিনাশবাবু কি জানেন না যে, সে যুগে বাঙালীদের সৈন্যদলে ভর্ত্তি হওয়া নিষিদ্ধ ছিল? ১৮৮৭ সনের ১০শে ডিসেম্বর বাংলা-সরকারের পক্ষে পুলিশ বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর-জেনারেল জেলা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টদের নিকট একটি গোপনীয় সার্কুলার জারি করেন। তাহাতে তিনি দশ দফা সম্বলিত কয়েকটি বিষয়ের সংবাদ দিতে থানা অফিসারদের আদেশ দেন। আদেশ-পত্রের দশম দফায় ছিল: "Recruiting for the Indian Army or for Native States," অর্থাৎ—ভারতীয় অথবা দেশীয় রাজ্যের সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইবার বিষয়। এরূপ ক্ষেত্রে নিতান্ত 'খেয়াল' বা 'উচ্চ আকাঙ্ক্ষা'র বশবর্ত্তী হইয়া সৈন্যদলে ভর্ত্তি হওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত, সুধীজনের বিবেচ্য। তখনকার যুব সমাজে ভারত উদ্ধারকল্পে কিরূপ প্রেরণা আসিয়াছিল ঐ সময়ের ইতিহাস-বেত্তারা তাহা সম্যক্ অবগত আছেন। এই প্রেরণা বশেই যে যতীন্দ্রনাথ এলাহাবাদী 'যতীন্দ্র উপাধ্যায়' নামে বরোদার সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন তাহা প্রবীণ বিপ্লবী অবিনাশবাবু উড়াইয়া দিবেন কিরূপে?

দ্বিতীয়তঃ, যতীন্দ্রনাথ "ভারত-উদ্ধার প্রচেষ্টাকে কার্য্যে রূপ দিতে প্রয়াসী হন"—আমার এই উক্তি হইতে অবিনাশবাবু কেমন করিয়া ধরিয়া লইলেন যে, তখনই 'ভারত-উদ্ধার প্রচেষ্টা চলছিল' বুঝিলাম না। একটু আগেই বলিয়াছি, তখন ভাবজগতে এরূপ একটা প্রবল আলোড়ন উপস্থিত হয়। বাংলায় যতীন্দ্রনাথই ইহাকে সর্ব্বপ্রথম রূপ দিতে প্রয়াসী হন—এই কথাই আমি বলিয়াছি।

(৩) ইহার পরেই অবিনাশবাবু আসল কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন: তিনি বলিতে চান, 'অরবিন্দ-পরিকল্পনা' কার্য্যে পরিণত করিতেই যতীন্দ্রনাথ বাংলায় আসেন। আবার ইহার পরেই তিনি বলিতেছেন, 'বস্তুতঃ যতীন বাবু ভারত-উদ্ধার প্রচেষ্টাকে রূপ দিতে পারেন নি। বাংলায় বিশেষ কিছু তিনি করতে পারেন নি। তাঁর সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণের অনেক পরে বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা রূপ পরিগ্রহণ করেছিল। বারীন্দ্র এবং তাঁহার কয়েকজন সহকর্ম্মীর আপ্রাণ চেষ্টাই এর মূলে ছিল।' আমি প্রবন্ধে বলিয়াছি, যতীন্দ্রনাথ ভারত-উদ্ধার প্রচেষ্টাকে কার্য্যে রূপ দিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। এই প্রয়াস বারীন্দ্রকুমার ও তাঁহার সঙ্গীদের দ্বারা কতখানি কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল তাহা বাংলার বিপ্লব-প্রচেষ্টার দ্বিতীয় পর্ব্বের (১৯০৫-৮) কথা। বলা বাহুল্য, এ বিষয়ের বিচার-আলোচনা আমার প্রবন্ধের বহির্ভূতও ছিল। তবে প্রথম পর্ব্বের (১৯০২-০৪) বিপ্লব-প্রচেষ্টা পণ্ড হওয়ার মূলে যে রহিয়াছে বারীন্দ্র ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের কলহের দরুন যতীন্দ্রনাথের চরিত্রের উপরে মিথ্যা দোষারোপ, সেকথা আজ আর অবিদিত নাই।

(৪) অবিনাশবাবু আমার ভুল-ত্রুটি দেখাইতে গিয়া নিজেই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তিনি ৯২ নং গ্রে স্ট্রীটে অরবিন্দের 'No Compromise কম্পোজ' করার কথা বলিয়াছেন। অবিনাশবাবু বলেন, ইহা ১৯০৪ সনের কথা। ইহা ঠিক নহে। ১৯০৫ সনে বারীন্দ্রকুমার উহা বরোদা হইতে বাংলায় লইয়া আসেন। (দ্রষ্টব্য : অগ্নিযুগ—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, পৃ. ১০৬ ও ১১৬)

(৫) অবিনাশবাবু যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে 'চিরবিচ্ছেদ' কথাটিতে ভীষণ আপত্তি তুলিয়াছেন এবং পরবর্তীকালের মেলামেশার নজির তুলিয়া ইহা ভুল প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমি এখানে 'চিরবিচ্ছেদ' কথাটি দ্বারা বৈপ্লবিক কর্ম্মে—এক দিকে বারীন্দ্র ও তদীয় সঙ্গিগণ এবং অন্য দিকে যতীন্দ্রনাথের মধ্যে চির-বিচ্ছেদের কথাই বলিয়াছি। উভয় দলের মধ্যে আপার সারকুলার রোডে যে কলহের সূচনা হয়, অরবিন্দ কর্তৃক মিটমাটের চেষ্টা এবং উহাতে সাময়িক সাফল্য-লাভ সত্ত্বেও 'ইহা ক্রমে চিরবিচ্ছেদে পরিণত হয়' লিখিয়াছিলাম। বারীন্দ্রকুমারের নিম্নের উক্তি দুইটিও আমার কথার সমর্থন করে :

"অরবিন্দের কথায় আমি ও অবিনাশ ক্রমে সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটের বাসায় যোগ দিলাম, নলিন মিত্রের ভাড়া করা বাড়ীর আড্ডা তুলে দিয়ে। স্থির হ'ল আবার দুই দলে একত্র হয়ে নূতন উৎসাহে কাজ হবে।…তবু এ সদিচ্ছা টিকল না, আমি ও শ্রীঅরবিন্দ সামান্য এক মাসের জন্য দেওঘরে মাতামহ রাজনারায়ণ-আলয়ে গেলাম, সেই অনুপস্থিতির অবসরে জোড়াতালি দেওয়া বিপ্লবী চক্র আবার গেল চিড় খেয়ে ভেঙ্গে।" (অগ্নিযুগ, পৃ. ৯৮)

বারীন্দ্রকুমার আবার লিখিতেছেন :

"পুনঃ পুনঃ পত্রে আমরা বুঝতে পারলাম এ গৃহকলহ মিটবার নয়। যতীনদা' বার বার এই ভাঙ্গনের প্রতীকার করার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ অরবিন্দকে পত্রযোগে জানাতে লাগলেন, স্বভাবতঃ মৌন অরবিন্দ রইলেন প্রায় নিরুত্তর হয়েই। তখন বোধ হয় ছয় মাস পরে ১৯০৫ সালের মাঝামাঝি যতীনদা' লিখলেন, তিনিও বিরক্ত হয়ে সব ছেড়ে সন্ন্যাস নিয়ে চলে যাচ্ছেন।" (অগ্নিযুগ, পৃ. ১১৬-৭)

আমার বক্তব্য ছিল মোটামুটি ১৯০৪ সন পর্য্যন্ত ; কাজেই তখন 'চিরবিচ্ছেদে'র কৈফিয়তস্বরূপ এত সব কথা উল্লেখ করি নাই।

(৫) যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাঘা যতীনের (যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) মধ্যে পরিচয় সম্পর্কেও অবিনাশ বাবু কথা তুলিয়াছেন এবং অবিনাশবাবু ও বারীন্দ্রকুমারই যে বাঘা যতীনকে বিপ্লবী-কার্য্যে প্রেরণা যোগান এ বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা যে বিপ্লবকর্ম্মের দ্বিতীয় পর্ব্বের কথা তাহা অবিনাশ বাবু উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। এখন যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাঘা যতীনের কিরূপে পরিচয় হয় বলিব। একথা আজ অনেকেই জানেন যে, বারীন্দ্রকুমার প্রভৃতির চক্রান্তে দল হইতে বিতাড়িত হইবার পর যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ম্যাটসিনি-গ্যারিবল্ডির জীবনচরিতকার যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে থাকেন। যতীন্দ্রনাথ তাঁহার সহযোগে একটি বিপ্লবী চক্র গড়িয়া তুলিয়া কিছু কিছু কাজও শুরু করিয়া দেন। এই সময় যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (পরবর্ত্তী কালের বাঘা যতীন) সঙ্গে বিদ্যাভূষণ মারফত যতীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়। বাঘা যতীনের দিদি স্মৃতি হইতে বলিয়াছিলেন, যতীনের ষোল-সতর বৎসর বয়ঃক্রম কালে কৃষ্ণনগরে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের জামাতা কৃষ্ণনগরের ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভাগিনেয় হইলেন এই বাঘা যতীন। এই সূত্রেই বাঘা যতীন ও যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় সংঘটিত হইয়া থাকিবে। কাজেই যদি বলা যায়, বাঘা যতীন যতীন্দ্রনাথের নিকট হইতে বিপ্লব-কর্ম্মে প্রেরণা-লাভ করিয়াছিলেন তাহা হইলে তাহা অযৌক্তিক হইবে কি? আলিপুর বোমার মামলায় যখন বিপ্লবীরা আটক, তখন সদ্যমুক্ত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (স্বামী নিরালম্ব বিপ্লবী সন্দেহে আটক হইয়াছিলেন) সঙ্গে বাঘা যতীন বিপ্লব-কার্য্য পরিচালনা সম্পর্কে পরামর্শও করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। (দ্রষ্টব্য—শ্রীমৎ নিরালম্ব স্বামী—ডাঃ শ্রীযাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, পৃ. ১৩)

(৬) অবিনাশ বাবু আর একটি ভ্রমাত্মক উক্তি করিয়াছেন। তিনি বলেন, যতীন্দ্রনাথ অরবিন্দের নিকট হইতে কয়েকখানি চিঠির সঙ্গে ১৯০২ সনে 'ভবানী মন্দির' নামক ইংরেজী পুস্তিকার নকলও লইয়া আসিয়াছিলেন। এ উক্তি যে সত্যের বিপরীত তাহা বারীন্দ্রকুমারের নিম্নোক্ত কথাগুলি হইতেই বুঝা যাইবে :

(ক) অরবিন্দ 'ভবানী মন্দির' পুস্তিকার পাণ্ডুলিপি সঙ্গে দিয়ে আমাকে পুনরপি বিপ্লবপ্রচেষ্টার জন্য বাংলায় পাঠালেন আন্দাজ ১৯০৫ সনের মাঝে বলে আমার ধারণা…" (অগ্নিযুগ পৃ. ১৩৬)

আবার অন্যত্র—

(খ) 'ভবানী মন্দির' ও 'No Compromise'-এর পাণ্ডুলিপি বগলে করে ফিরে এসে ১৯০৫ এর গোড়ায় আমি তাঁকে ধরেই আমার কাজ আরম্ভ করি।" (ঐ, পৃ. ১১৬)

(৭) বারীন্দ্রকুমারের কর্ম্মনিষ্ঠা ও কর্ম্মকুশলতায় অগাধ শ্রদ্ধাশীল ও আস্থাপরায়ণ হইয়াও, অবিনাশবাবু উক্ত প্রতিবাদের শেষ দিকে তাঁহার প্রতি সুবিচার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। অবিনাশবাবু লিখিয়াছেন, 'তাঁর লেখার মধ্যে' বারীন্দ্রকুমার 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়েছেন স্মৃতিভ্রংশের জন্য।' অথচ ১৯০৩ হইতে ১৯০৮ সনে তাঁহার আটক হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বারীন্দ্রকুমার যে সব তথ্য তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন তাহার অধিকাংশই সমসাময়িক বিবরণাদি যাচাই করিয়া দেখিলে প্রকৃত মনে করিবার কারণ আছে। কোন কোন তথ্য পুস্তক হইতে বাদ পড়িয়াছে বটে,—যেমন 'যুগান্তরে'র সঙ্গে (ডক্টর) ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের যোগাযোগ তিনি আদৌ উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন, আর এবিষয়ে যে তাঁহার স্মৃতিভ্রংশ হইয়াছে তাহা বলা

ধপ্‌ধপে
ক'রে কাচা
ঝক্‌ঝকে
ক'রে কাচা
সানলাইট্‌
সাবানের দৌলতে
না আছড়ে কাচলেও
কাপড়চোপড় সাদা ও
ঝক্‌ঝকে ক'রে দ্যায়!
SUNLIGHT
SOAP
SUNLIGHT
SOAP
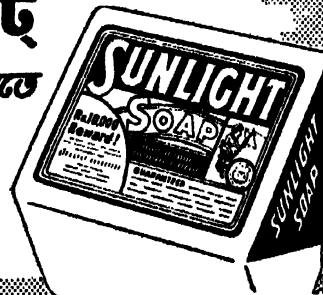
যায় না—কিন্তু 'যুগান্তরে'র সঙ্গে ভূপেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা এখন প্রায় সকলেরই জানা এবং ভূপেন্দ্রনাথও তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

আর যদি সত্য সত্যই বারীন্দ্রকুমার 'স্মৃতিভ্রংশ' হেতু তাঁহার লেখায় 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' চাপাইয়া থাকেন তবে আজ-ই বা কেন একথা উত্থাপিত হইতেছে? বারীন্দ্রকুমারের 'অগ্নিযুগ' আত্মপ্রকাশ করে ১৯৪৮ সনের মাঝামাঝি। ঐ সময় হইতে পুরা পাঁচ বৎসর চলিয়া গেল, অথচ এতদিন প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটনের অথবা বারীন্দ্র রচিত পুস্তকের ভ্রম সংশোধনের চেষ্টা হয় নাই কেন?

পরিশেষে আমিও বলি, "ছোট ছোট তুচ্ছ বিষয় নিয়ে কেউ যেন ঘোঁট না পাকান।" সত্যের মর্য্যাদারক্ষার উদ্দেশ্য লইয়া যদি আমরা আলোচনায় প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলেই ঐ সময়কার গুপ্ত বিপ্লব-প্রচেষ্টার তথ্যসমূহ যথাযথ উদ্ঘাটিত হইতে পারে।

আমি অবিনাশ বাবুর অন্য ছোট-খাটো কথার উত্তর দিতে বিরত রহিলাম। এখানে আর একটি কথা বলি। যতীন্দ্রনাথ যে মেসে ছিলেন, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সেখানে থাকিতেন না, মাঝে মাঝে আসিতেন। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এ বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

সম্পাদকীয় মন্তব্য

যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে, স্বামী নিরালম্ব) যখন এলাহাবাদে আমাদের বাড়ীতে ছিলেন তখন আমার বয়স অল্প। তখনকার সমস্ত ব্যাপার আমার খুব স্পষ্ট মনে থাকার কথা নয়। তবে তখন যাহা যাহা দেখিয়াছি এবং ১৯০৮ সনের পরে যতীন্দ্রনাথের (ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই তিনি স্বামী নারায়ণানন্দ নাম ধারণ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন) নিজ মুখে বহু বার যাহা যাহা শুনিয়াছি, তাহা হইতে তাঁহার ঐ সময়কার এলাহাবাদ গমনের উদ্দেশ্য, পরবর্ত্তী কার্য্যকলাপ ও গতিবিধি সম্বন্ধে অনেক কিছু জানিতে পারিয়াছিলাম। এখানে বলা আবশ্যক যে, যতীন্দ্রনাথ আমার মাতাঠাকুরাণীকে মা বলিয়া সম্বোধন করিতেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অক্ষুন্ন ছিল।

আমার পিতৃদেব এলাহাবাদে কায়স্থ পাঠশালায় প্রিন্সিপাল থাকাকালীন যতীন্দ্রনাথ সেখানে গিয়া উক্ত কলেজে ভর্ত্তি হন এবং আমাদের বাড়ীতে অবস্থান করেন। দেখিতাম পড়াশুনার চেয়ে ঘোরাফেরাই তিনি অধিকতর পছন্দ করিতেন। যতীন্দ্রনাথ এলাহাবাদের দুই পাশে গঙ্গা ও যমুনার ওপারের গ্রামে পল্লীতে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, বিশেষতঃ যমুনা পার হইয়া আড়াইল গ্রামে যাইতেন। উদ্দেশ্য, খাস গ্রাম্য হিন্দী—যাহাকে দেহাতি বলে—শিক্ষা করা। তখন বাঙালীদের সৈন্যবিভাগে ভর্ত্তি হওয়া নিষিদ্ধ ছিল। যতীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ এলাহাবাদী ব্রাহ্মণরূপে সৈন্য বিভাগে ভর্ত্তি হইবার জন্যই দেহাতি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি যে ভারতের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যই সেই সময়ই সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। অস্ত্র-শিক্ষা ও অস্ত্র-ব্যবহার দ্বারাই উহাতে সিদ্ধিলাভ সম্ভব এই বিশ্বাসেই তিনি যুদ্ধবিদ্যা শিখিতে বরোদায় যান এবং সৈন্যবিভাগে ভর্ত্তি হন, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

উক্ত আড়াইল গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী 'যতীন্দর উপাধ্যায়' নামে তিনি বরোদার সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। ঐ অঞ্চলের আর একজন অধিবাসী উক্ত সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইতে গেলে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ স্বভাবতঃই তাহাকে যতীন্দর উপাধ্যায়ের কথা বলেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তি বলে যে, এ নামে ঐ গ্রামে কোন লোক নাই। তখন অধ্যক্ষের সন্দেহ হয় এবং যতীন্দ্রনাথকে সব কথা খুলিয়া বলিতে আদেশ দেন। যতীন্দ্রনাথ আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া উক্ত অধ্যক্ষের পরামর্শে পদত্যাগপত্র দাখিল করিয়াছিলেন।

বরোদায় অবস্থানকালে অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের আলাপ-পরিচয় হয়। পরবর্ত্তী ঘটনাদি সম্বন্ধে কিছু বলা আমি সমীচীন মনে করি না। তবে পক্ষাপক্ষ নির্ব্বিশেষে সত্য নির্দ্ধারিত হওয়া একান্ত আবশ্যক বোধে উক্ত প্রতিবাদ ও উত্তর এখানে পত্রস্থ করিলাম। এ বিষয়ে বাদ-প্রতিবাদ এখানেই ক্ষান্ত করা গেল।

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়,
প্রবাসী-সম্পাদক

"প্রবন্ধসংগ্রহ"

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

এগারো বৎসর আগে প্রমথবাবুর সংবর্ধনা উপলক্ষে তাঁর গল্পের সংগ্রহ সংবর্ধনা সমিতির পক্ষ থেকে প্রকাশিত করা হয়। তখনকার দিনে বোধ হয়, সমিতির উদ্যোক্তাদের মধ্যে অনেকেরই মনে হয়েছিল যে প্রমথবাবুর প্রবন্ধের উৎকর্ষের কথা সর্বজনবিদিত, গল্পলেখক হিসাবে তাঁর কৃতিত্ব সম্বন্ধে বেশী লোকের স্পষ্ট ধারণা নাই, তাই গল্পসংগ্রহ প্রকাশিত হয় ১৩৪৮ সালের ২০ ভাদ্র তারিখে।

প্রমথ বাবুর গল্প বেশী ভাল, না প্রবন্ধ বেশী ভাল, এ নিয়ে মতভেদ হওয়া অসম্ভব নয়। তাঁর হাতে ঐ দুয়েরই যে একটা নিতান্ত ঘনিষ্ঠতা আছে তুলনা করবার সময় আমরা প্রায়ই সেকথা ভুলে যাই। তাঁর কল্পনাশক্তির চমৎকারিতা আর বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, এই দুইটি যেন একই জিনিসের এপিঠ-ওপিঠ। উভয়ের যোগসূত্র হ'ল তাঁর ভাষা। অথবা তাঁর ভাষা কেমন করে ঐ দুই দিকের মর্যাদা রক্ষা করে, সে সম্বন্ধে সাহিত্যরসিকের কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। ফরাসী ও সংস্কৃত, এই দুই ভাষা থেকেই তাঁর নিজের প্রকাশ-রীতির একটা আশ্চর্য বাঁধুনি এসে গিয়েছিল। ফরাসী মনের প্রসাদ-গুণপ্রিয়তা, ফরাসি গদ্য সাহিত্যের শক্তি ও তীক্ষ্ণতা, এবং ভাষাকে শব্দাড়ম্বরে ও বাচালতায় সমৃদ্ধিশালী করবার লোভ সংবরণ করবার ক্ষমতা তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল, আর সংস্কৃত ভাষায় বিদগ্ধ বলতে যা বোঝা যায় তিনি যেন ছিলেন এযুগে তার প্রতীক।

প্রবন্ধসংগ্রহের* এ হ'ল প্রথম খণ্ড—এর মধ্যে সাহিত্য ও ভাষার কথা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ; দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হবে সমাজ, ভারতবর্ষ ও অন্যান্য নানা কথা নিয়ে আলোচনা। রায়তের কথা থাকবে এই দ্বিতীয় খণ্ডে। শ্রদ্ধেয় অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় প্রবন্ধসংগ্রহের ভূমিকায় বলেছেন, "প্রবন্ধগুলিতে মনের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির আহ্বান—উপদেশে ও আচরণে। প্রাচীন ও নবীন সংস্কারের অন্ধতা থেকে মুক্তি, অর্থহীন বন্ধন থেকে মুক্তি।" মুক্তিকামী পাঠকের কাছে এই প্রবন্ধসংগ্রহের যতখানি মূল্য, ততখানি আর কারও কাছে নয়। "সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে।" সুতরাং প্রকৃত বিদ্বানের নিকটে মুক্তিমন্ত্রবাহন এই সংগ্রহের সমাদর হবে, এমন আশা করা অন্যায় বা অসংগত নয়।

প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তুর হিসাব করলে দেখা যায়, তাঁর মানসিক আগ্রহ

---

* প্রবন্ধসংগ্রহ (প্রথম খণ্ড)—প্রমথ চৌধুরী। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। ১৯৫২। মূল্য ছয় টাকা।

কত ব্যাপক। সংস্কৃত সাহিত্য, বৈষ্ণব সাহিত্য, আমাদের বর্তমান যুগের সাহিত্য, সর্বত্র তাঁর খর দৃষ্টি। যা তিনি আমাদের দিয়েছেন তার চেয়ে কত বেশী যে তাঁর জানা ছিল অথচ দিয়ে যান নাই, প্রবন্ধসংগ্রহ পড়ে তাই বারবার মনে হয়। সাহিত্যের তত্ত্বের দিক তিনি পড়েছিলেন রসিকের মন নিয়ে। এককালে আমাদের কোন কোন সমালোচক ব্যঙ্গের চেষ্টায় বলেছিলেন, "পণ্ডিত প্রমথ চৌধুরী।" পণ্ডিত যে তিনি ছিলেন, সে বিষয়ে কারও কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। তবে সে পাণ্ডিত্যের ধার ছিল, ভার কখনও তাঁকে ভারাক্রান্ত করে নাই। পাঠান-বৈষ্ণব রাজকুমার বিজুলি খাঁর সম্বন্ধে এবং হর্ষচরিত সম্বন্ধে আলোচনা পড়লেই এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা হয়। আসল কথা, তাঁর পাণ্ডিত্য মনের সহজ গুণ হয়ে গিয়েছিল, বাইরের অলঙ্করণের ভার তার ছিল না। তাই যে বিষয় নিয়েই তিনি আলোচনা করুন না কেন, তার চিন্তার বা দৃষ্টির অস্পষ্টতা নাই, তার বক্তব্য বিষয়ও স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। অবশ্য এ প্রসঙ্গে বলা উচিত যে, প্রমথ বাবুর সব মতের আমরা অনুবর্তন করি না বা করতে পারি না—দৃষ্টিভঙ্গীর ও বিচারভঙ্গীর পার্থক্যের পরিচয় যেখানে থাকবেই। তবে তার অনুরাগ ও বিরাগের মধ্যে কোথাও ভাজ ছিল না, হয়তো লজিক না মনের মায়া বা স্পষ্ট দৃষ্টির অস্পষ্টতা ঐখানেই।

প্রমথ বাবুর কি গভীর বিশ্বাস ছিল বাঙালীর মনের উপর! চল্লিশ বৎসর আগে তিনি লিখেছিলেন, "আমার বিশ্বাস, বাঙালি জাতির হৃদয় মনের ভিতর অপূর্ব শক্তি আছে।" তবু চল্লিশ বৎসর আগে তিনি যখন সবুজপত্র লিখতে বসেন, তখন যে কথাগুলি বলেছিলেন, যে সাধনার ইঙ্গিত করেছিলেন, যে উদার চর্চার কথা বলেছিলেন, তার প্রয়োগ বহুদূরব্যাপী বহুকালব্যাপী। মিষ্টিক কি আলো-আঁধারি আলাপ-আলোচন তার কাছে স্থান পায় নাই, তাঁর মনে সাড়া জাগাতে পারে নাই। সেদিন তিনি বলেছিলেন, "দেশি কি বিলাতি পাথরে গড়া সরস্বতীর মূর্তির পরিবর্তে বাংলার কাব্যমন্দিরে দেশের মাটির ঘটস্থাপনা করে তার মধ্যে সবুজপত্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে চাই। কিন্তু এ মন্দিরের কোনো গর্ভমন্দির থাকবে না। কারণ সবুজের পূর্ণ অভিব্যক্তির জন্য আলো চাই আর বাতাস চাই। অন্ধকারে সবুজ ভয়ে কালো হয়ে যায়। বদ্ধ ঘরে সবুজ রংপে পাণ্ডু হয়ে যায়। আমাদের নবমন্দিরের চার দিকের অবারিত দ্বার দিয়ে প্রাণবায়ুর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের যত আলো অবাধে প্রবেশ করতে পারবে। শুধু তাই নয়, এ মন্দিরে সকল বর্ণের প্রবেশের সমান অধিকার থাকবে। ঊষার গোলাপি, আকাশের নীল, সন্ধ্যার লাল, মেঘের নীল-লোহিত, বিরোধালংকার স্বরূপে সবুজপত্রের গাত্রে সংলগ্ন হয়ে তার মরকতদ্যুতি কখনো উজ্জ্বল, কখনো কোমল করে তুলবে। সে মন্দিরে স্থান হবে না কেবল শুষ্ক পত্রের।"

সবুজপত্রের এই আহ্বানের জন্যও বাংলা সাহিত্য প্রমথ বাবুকে স্মরণ করবে, তার ইতিহাসে তাঁর জন্য স্থান রাখবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঋণ স্বীকার করতে কখনও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। গল্পসংগ্রহের ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন, "আমি যখন সাময়িক পত্র চালনায় ক্লান্ত এবং বীতরাগ, তখন প্রমথর আহ্বানমাত্রে সবুজপত্র বাহকতায় আমি তাঁর পার্শ্বে এসে দাঁড়িয়েছিলুম। প্রমথনাথ এই পত্রকে যে একটি বিশিষ্টতা দিয়েছিলেন তাতে আমার তখনকার রচনাগুলি সাহিত্যসাধনায় একটি নূতন পথে প্রবেশ করতে পেরেছিল। প্রচলিত অন্য কোন পরিপ্রেক্ষণীর মধ্যে তা সম্ভবপর হতে পারত না।"

রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন যে, সাহিত্য-সিংহাসনে প্রমথ বাবু "রাজদণ্ড গ্রহণ করে শাসনভার" নেবেন। গল্প এবং সনেটের গণ্ডী ছাড়িয়ে প্রমথ বাবু যেখানে সবুজপত্র চালিয়েছেন এবং প্রবন্ধ রচনা করেছেন, সেখানেই তাঁর হাতে এ রাজদণ্ড এসে গিয়েছে। "হালকা ও উজ্জ্বল"—প্রমথ বাবুর প্রবন্ধ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই বর্ণনা যে অতি যথার্থ এবং ভাব ও ভাষা উত্তরের প্রতি প্রযোজ্য পাঠকেরা প্রবন্ধসংগ্রহ পড়তে পড়তে প্রতিপদে তা অনুভব করতে পারবেন, একথা নিঃসংকোচে বলা যায়।

প্রমথ বাবুর ভাব ও ভাষা বলিষ্ঠ, সেই বলিষ্ঠতার প্রাণবস্তু হ'ল সংযম এবং তাঁর এই কথাটির দাম লাখ টাকা: "সাহিত্য গড়তে কোনো বাইরের নিয়ম চাইনে, চাই শুধু আত্মসংযম।" তাঁর অলঙ্কার অসন্দিগ্ধভাবে রসিয়ে কষিয়ে মত প্রকাশ করার ক্ষমতা আমাদের সমাজে সমধিক আদৃত ও সঞ্চারিত হোক।
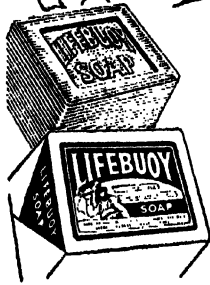
রোজকার ধূলোময়লার
রোগবীজাণু থেকে আপনার স্বাস্থ্যকে নিরাপদে রাখুন
লাইফবয়ের
ফেনার আবরণ
যতোই কেন হুঁসিয়ার হোন্ না—প্রতিদিনেই আপনি ধূলোময়লার রোগবীজাণু থেকে সংক্রমণের ঝুঁকি নিচ্ছেন। লাইফ্‌বয় সাবান মেখে নিত্য স্নানের অভ্যাস কোরে আপনার স্বাস্থ্যকে নিরাপদে রাখুন।
লাইফ্‌বয়ের রক্ষাকারী ফেনা ধূলোময়লার বীজাণুকে ধুয়ে সাফ্ কোরে দেয় ও সারাদিন আপনার শরীরকে স্নিগ্ধ ও ঝরঝরে রাখে।
LIFEBUOY
SOAP
লাইফ্‌বয় সাবান
দৈনন্দিনের রোগবীজাণু থেকে প্রতিদিনের নিরাপত্তা
L. 229-50 BG

পুস্তক পরিচয়

প্রাচীন ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের ভূমিকা—শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। পৃ. ৮৪, মূল্য ২১।

বিগত পঁচিশ বৎসরে বহু নূতন গ্রন্থ আবিষ্কৃত ও মুদ্রিত হওয়ায় অলংকারশাস্ত্রের চর্চা এখন আমূল পরিবর্তিত হইয়া জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। এই বিশাল শাস্ত্র অপূর্ব্ব অভিনিবেশসহ করামলকবৎ অধিগত করিয়া গ্রন্থকার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংক্ষেপে ও অসন্দিগ্ধভাবে তাহার মূল সিদ্ধান্ত প্রস্থানভেদক্রমে প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থের আটটি অধ্যায় রসকলাষ্টিকের মত আস্বাদন করিয়া সকলেই পরিতৃপ্ত হইবেন। এ জাতীয় গবেষণাগ্রন্থ বাংলা ভাষায় অভিনব। ইহার আলোচনা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়বিধ ছাত্র ও শিক্ষকমণ্ডলীর নিকট অপরিহার্য—নতুবা তাহাদের শিক্ষা একটি প্রধান অংশ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে বলিয়া আমরা মনে করি। এই গ্রন্থ বঙ্গভাষায় রচনা করিয়া গ্রন্থকার বৈদগ্ধ্যের পরিচয় দিয়াছেন এবং আশা করি বাংলার শিক্ষিত-সমাজ তাহার সমুচিত সমাদরে পশ্চাৎপদ হইবে না।

ঋতুসংহার—ডাক্তার শ্রীঅমূল্যেন্দু গুপ্ত। মূল্য—২১।

রঘুবংশ—ডাক্তার শ্রীঅমূল্যেন্দু গুপ্ত। প্রকাশিকা লিমিটেড, ৩ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য—৫৷৷০।

চিকিৎসক, মহাকবি কালিদাসের কাব্য পড়িয়া পদ্যানুবাদ করিতে পারেন, এযুগে ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। মনোহর প্রচ্ছদে মণ্ডিত এই গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিয়া আমাদের বিস্ময় অনুরাগে পরিণত হইয়াছে। গ্রন্থকার স্বয়ং একজন উৎকৃষ্ট কবি।

কেয়া ফুলের পরাগ হ'তে, গন্ধ মেখে আপন গায়,
প্রবাসী-মন করছে হরণ আজকে উতল বাদল বায়। (পৃ. ১৯)

প্রভৃতির ছন্দ ও ভাষাকে হুবহু অনুবাদ বলা চলে না। মহাকবির রসোচ্ছল কাব্যখণ্ড মাতৃভাষার স্বচ্ছ প্রবাহে পরিণত করিয়া চিকিৎসক-কবি বাংলার সুরুচিসম্পন্ন বহু পাঠকপাঠিকার রসপিপাসা মিটাইবার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। গ্রন্থশেষে কালিদাসের মূল শ্লোকাবলীও মুদ্রিত হইয়াছে।

রঘুবংশ কালিদাসের পরিণত বয়সের রচনা এবং "রঘৌ কাব্যং পদে পদে"। বহু পূর্ব্বে নবীনচন্দ্র দাস ইহার অনুবাদ করিয়াছিলেন। একটানা পয়ার ছন্দে আলোচ্য অনুবাদটি উৎকৃষ্ট হইয়াছে এবং মহাকবির প্রগাঢ় রচনা মাতৃভাষায় আস্বাদন করিয়া অনেকে পরিতৃপ্ত হইবেন। ছাত্র-সম্প্রদায়ও রঘুবংশের পাঠাংশ এই সরস অনুবাদ হইতে সহজে আয়ত্ত করিতে পারিবে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বুদ্ধদেব বসু প্রভৃতি। নামী, আধানামী, অনামী অনেকে একসঙ্গে। সাম্য-আদর্শের দিক্‌ দিয়ে ভাল্লই। রসাস্বাদন করতে গিয়ে মুশকিলে পড়ি, হয়ত কুসংস্কারগ্রস্ত বলেই। "সূর্যকে ছিঁড়ে আনতে" দেখলে মনটা কেমন-কেমন করে। স্তম্ভিত হয়ে শুনি : "নখে নখে বিক্ষত গুল্ম, ওষ্ঠে অধরে তার মিলিয়ান [illegible] স্পর্শ।" লক্ষ, কোটি—বুঝি এসব কবিতায় অচল, তাই মিলিয়ান। [illegible] কবির আক্ষেপ : "ধর্ষিতা জননীর কথা তবে কবে আর ভাববে ?" বুদ্ধদেববাবু বাণিশে-কুর্ণিশে মিলিয়ে 'ঘৃণার কবিতা' লিখেছেন। [illegible] অলকাকে উদ্দেশ করে এক পংক্তিতে ছ'বার "বলো না" বলেছেন। আশা করি, তারপরে আর অলকা কথা বলেন নি। শেষ কবিতায় দেখছি, "সেই স্মৃতি লুব্রিকেট অয়েলের মত - আর্তনাদে কথা কয়ে ওঠে।" বইখানার নামের সার্থকতা এতক্ষণে বুঝলাম। 'সংশয়ের কবিতা' নয় তো কি ? এর পরেও কি তার বেঁচেথাকা সম্ভব ?

তখত্‌-ই-তাউস্‌—শ্রীঅজয় দাশগুপ্ত। ডি. এম্‌. লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ১॥০।

আওরঙ্গজেবের সিংহাসন অধিকারের কাহিনী নিয়ে লেখা সুখপাঠ্য নাটক। দারার উদারতা, জাহানারার বুদ্ধি ও সাহস, আওরঙ্গজেবের কূট-কৌশল ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে বেশ ফুটেছে। ত্রুটিহীন না হলেও প্রচলিত অনেক নাটকের তুলনায় এখানি সুলিখিত। দু'এক জায়গায় নাট্যসঙ্গতিকে উপেক্ষা করে লেখক আপন মতামত প্রকাশ করতে চেয়েছেন মনে হ'ল। যেমন, জিজিয়া কর প্রবর্তনের সমর্থন করতে গিয়ে আওরঙ্গজেব প্রাচীন ও নূতন হিন্দুধর্মের যে তুলনা করেছেন এবং প্রচলিত হিন্দুসমাজের যে সমালোচনা করেছেন তা আওরঙ্গজেবের পক্ষে স্বাভাবিক নয়, বস্তুতঃ ওগুলি লেখকের মন্তব্যমাত্র। এ জাতীয় বক্তৃতা না থাকলেই ভাল হ'ত। ছাপার ভুলও অনেক রয়ে গিয়েছে বলে মনে হয়।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মাণিক্য মিত্রের কথা (দ্বিজ উমানাথ-বিরচিত)—শ্রীঅজয়কুমার চক্রবর্তী, বি-এ, সাহিত্যবিশারদ, তত্ত্বরত্ন, বিদ্যাশ্রী সম্পাদিত। কটন লাইব্রেরী কমিটি, কটন লাইব্রেরি, ধুবড়ী (আসাম)। মূল্য ১০।

কোচবিহারের রাজা উপেন্দ্রনারায়ণের আশ্রিত দ্বিজ উমানাথ-রচিত একটি লৌকিক কাহিনী আলোচ্য গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে। ১৭৭১ শকাব্দ বা ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত একখানি পুঁথি অবলম্বনে সম্পাদক মহাশয় এই পুস্তক সম্পাদন করিয়াছেন। পুঁথির শেষ পংক্তিতে বলা হইয়াছে—'মাণিক্য মিত্রের কথা হইল সমাপতি।' ইহা হইতেই পুস্তকের নামকরণ করা হইয়াছে, মনে হইতেছে। তবে বর্ণনীয় বিষয়ের সহিত নামকরণের বিশেষ যোগ দেখা যায় না। বর্ণাশুদ্ধিতে পরিপূর্ণ পুঁথিখানি অবিকৃতভাবে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইয়াছে—প্রচলিত প্রথানুসারে তৎসম শব্দগুলির বর্ণাশুদ্ধিরও কোন সংশোধন করা হয় নাই। ইহাতে পড়িতে বিশেষ অসুবিধা হয়। সম্পাদক মহাশয় বর্ণবিন্যাস সম্পর্কে লিপিকরের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়াছেন এবং অপরিচিত, আঞ্চলিক ও বিকৃত শব্দগুলির অর্থ নির্দেশ করিয়াছেন। উপাখ্যানটি উমানাথের কল্পিত অথবা পূর্বপ্রচলিত তাহার কোন উল্লেখ করা হয় নাই। সম্পাদক মহাশয় পুস্তকমধ্যে কবির 'সুপ্ত নাট্যপ্রতিভা ও ঔপন্যাসিক প্রতিভা'র পরিচয় পাইলেও তেমন কোন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ্য করিতে পারি নাই। তবে বিগত যুগের সাহিত্যের নিদর্শন হিসাবে ইহার একটা মূল্য আছে। সম্পাদক মহাশয় এইরূপ নিদর্শন উদ্ধার করিয়া বাংলার সাহিত্যিক ইতিহাসের উপকরণ যোগাইতেছেন এবং প্রাচীন সাহিত্যরসিককে আনন্দ দান করিতেছেন। বিভিন্ন প্রান্তে এইরূপ কাজ করিবার লোকের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

অগ্নিযুগের প্রথম শহীদ প্রফুল্ল চাকী—শ্রীহেমন্ত চাকী। জেনারেল প্রিণ্টার্স এ্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড, ১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। পৃষ্ঠা ১৮৪, মূল্য ৩৲।

লেখক সমালোচ্য পুস্তকে মোট সাতটি অধ্যায়ে বাংলার অমর বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকী এবং ক্ষুদিরাম বসুর জীবন-কথা বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথম অধ্যায়ে জাতীয়তার জন্মকথা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের পটভূমিকা এবং তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলার শক্তি ও বিপ্লব-সাধনার ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। প্রথম তিনটি অধ্যায় মনোযোগ দিয়া পাঠ করিলে পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে প্রফুল্ল-ক্ষুদিরামের জীবন ও ত্যাগের তাৎপর্য্য সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে। ইংরেজ শাসনে ভারতের আত্মা দিন দিন যে তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল, অবশেষে রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের পথে ভারতবাসী তাহার কবল হইতে মুক্তির সন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। ভারতে পরবর্ত্তীকালে যে স্বাধীনতা-সৌধ গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার ভিত্তিমূলে বাংলার এই দুই কিশোরের আত্মদানের কথা আজ ভুলিলে চলিবে না। প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম ১৯০৮ সনের ৩০শে এপ্রিল অত্যাচারী ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ডের গাড়ী ভ্রমে একটি গাড়ীতে বোমা নিক্ষেপ করে, ঐ গাড়ীতে এক ইংরেজ মহিলা ও তাঁহার কন্যা যাইতেছিলেন, কিংসফোর্ডের পরিবর্ত্তে তাঁহারা নিহত হন। কলিকাতায় ফিরিবার পথে মোকামাঘাটে ২রা মে প্রফুল্ল চাকী পুলিসের নিকট আত্মসমর্পণ না করিয়া পিস্তল দ্বারা আত্মহত্যা করে। ১লা মে ওয়াইনী ষ্টেশনে এক খাবারের দোকানে ক্ষুদিরামকে গ্রেপ্তার করিয়া মজঃফরপুর আনা হয়। বিচারে তাহার ফাঁসীর হুকুম হয় এবং হাইকোর্টের আপীলেও এই হুকুম বজায় থাকে। ১৯০৮-এর ১১ই আগষ্ট ক্ষুদিরাম ফাঁসীমঞ্চে জীবনদান করেন।

এই দুই শহীদের জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত, কিন্তু জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ। এই দুই জনের জীবনীপাঠে বাংলার তরুণ বুঝিতে পারিবে বাংলার তথা ভারতের জাতীয় জীবন-প্রভাতে তরুণেরা কি আদর্শবাদের অনুপ্রেরণায় আত্মভোলা হইয়াছিল। আজও পঞ্চাশ বৎসর অতীত হয় নাই, আমরা প্রফুল্ল-ক্ষুদিরামকে হারাইয়াছি। ইংরেজ রাজত্বের অবসানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমরা প্রকাশ্যে তাঁহাদের স্মৃতিতর্পণ করিতে পারিতাম না। আজ পরাধীনতার গ্লানি দূর হইয়াছে, ১৯৪৭-৪৮ সন হইতে ইঁহাদের স্মৃতিতর্পণ ও স্মৃতিরক্ষার আয়োজন হইয়াছে এবং হইতেছে।

তরুণেরা এই পুস্তকপাঠে স্বদেশসেবার অনুপ্রেরণা লাভ করিবে। এই গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। পুস্তকের কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

মনস্তত্ত্বের গোড়ার কথা—শ্রীসমীরণ চট্টোপাধ্যায়। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় কলিকাতা-১২। মূল্য আট আনা।

পুস্তকখানিতে মনোবিদ্যার প্রাচীন মতবাদগুলির সহিত আধুনিককালের দৃষ্টিভঙ্গীসমূহের সমাবেশ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ক্ষুদ্রায়তন পুস্তকে সকল বিষয়েরই যথাযথ আলোচনা সম্ভব নহে। গ্রন্থকার কিন্তু তাহাই করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ফল ভাল হয় নাই। মনোবিদ্যা সম্বন্ধে যাঁহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, এই "গোড়ার কথা" পাঠ করিয়া তাঁহাদের এ বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নহে বলিয়াই মনে হয়। অপ্রচলিত পরিভাষা ব্যবহারের ফলে পুস্তকখানি সুখপাঠ্য হয় নাই। অধিকতর সরল ভাষায় এরূপ পুস্তক প্রণয়ন করাই কাম্য।

শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র

ভ্রম-সংশোধন

গত ভাদ্র সংখ্যা (পৃ, ৬৩৪) 'গল্প-সঞ্চয়ন—শ্রীসুশীলকুমার রায়' স্থলে "সুশীল রায়ের গল্প-সঞ্চয়ন—শ্রীসুশীল রায়" পড়িতে হইবে।